বাংলাবুক পরিবেশিত

লিও তলস্তয়

সংগ্রাম এবং শান্তি

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

লেভ্‌ নিকোলায়েভিচ্‌ তলস্তয়

দুই খন্ড একত্রে

অনুবাদ
মণীন্দ্র দত্ত

The Online Library of Bangla Books

তুলি-কলম
১, কলেজ রো, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৬

প্রকাশক : কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি কলম ॥
১ কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : এ, জি, বাইন্ডার্স এন্ড প্রিন্টার্স
২২, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কলকাতা-৯

The Online Library of Bangla Books

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

লেভ্ নিকোলায়েভিচ্ তলস্তয়

প্রথম পর্ব

The Online Library of Bangla Books

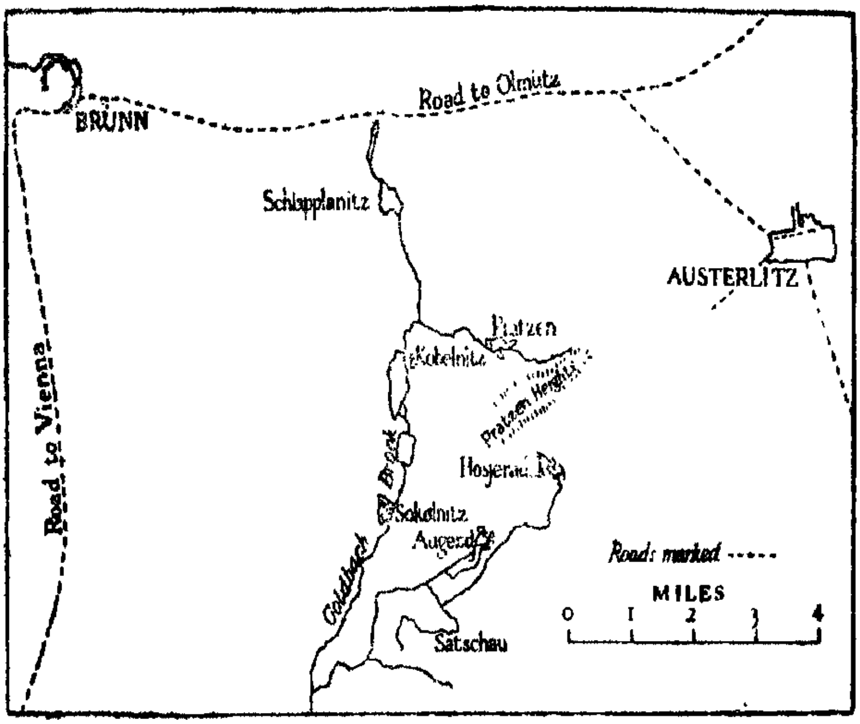
Road to Olmutz
BRUNN
Schlapplanitz
AUSTERLITZ
Pratzen
Kobelnitz
Pratzen Heights
Road to Vienna
Brook
Hosjeradek
Sokolnitz
Augezd
Goldbach
Satschau
Roads marked
MILES
0
1
2
3
4

অস্টার্লিজের মানচিত্র (৩য় পর্ব – পৃঃ ২৮৫)

The Online Library of Bangla Books

"সংগ্রাম ও শান্তি" প্রসঙ্গে

"The greatest novel ever writen—John Galsworthy.

"No English novelist is as great as Tolstoy—that is to say, has given so complete a picture of man's life, both on its domestic and heroic sides."—E. M. Forster

"There are things in it that are unbearable, and things that are wonderful, and the wonderful things (they predominate) are so magnificiently good that we have never had anything better written by anybody, and it is doubtful whether anything as good has been written." —Turgenev.

"In this vast book every human being is created with the same power and authenticty. Tho beautiful happy freshness of Natasha, the stumbling honesty of Pierre, the suffering questioning of Prince Andrew, the contented worldliness of Vera and Berg, the habits, weaknesses of generals and soldiers, even (althogh here there is less certainty) the conceit. arrogance, and humanity of Napoleon...Here, too, one must notice Tolstoy's marvellous conquest of an almost insurmountable difficulty——the recording of passing time...In no other novel of which I am aware has the problem been so triumphantly solved as in War and Peace." —Hugh Walpole.

"I am convinced that it is the greatest book about war that the world has been given...A knowledge of this novel is essential to the intelligent equipment of any youngman and young woman who pretends to a view of life."

—Compton Mackenzie.

পরিশেষে একটি কথা বলা দরকার। "সংগ্রাম ও শান্তি" কাউণ্ট লিও তলস্তয়ের "War and Peace"-এর সংক্ষিপ্ত বা ভাবানুবাদ নয়, মূলানুগ ও পূর্ণাঙ্গ ভাষান্তর।

—কল্যাণব্রত দত্ত

॥ "সংগ্রাম ও শান্তি" প্রসঙ্গে কিছু কথা ॥

লিও তলস্তয়

(Russian Archive, 1868-এ প্রকাশিত নিবন্ধের নির্বাচিত অংশ)

এই গ্রন্থ রচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিবেশে আমি একাদিক্রমে পাঁচটি বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। তাই এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রাক্কালে এ সম্পর্কে আমার নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে পাঠকের মনে যেসব ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে তাকে প্রতিরোধ করতে চাই। যে কথা আমি বলতে চাই নি, অথবা বলতে পারি নি, আমি চাই না যে এই গ্রন্থের পাঠক এখানে সেই কথাই দেখুন অথবা তার খোঁজ করুন; আমি চাই, আমি যা বলতে চেয়েছি কিন্তু এই গ্রন্থের পরিবেশে বিস্তারিতভাবে বলতে পারি নি, সেইদিকেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হোক। যা বলতে চেয়েছিলাম সেকথা পুরোপুরি বলবার মত সময় বা ক্ষমতা কোনটাই আমার ছিল না; তাই একটি বিশেষজ্ঞ পত্রিকার সৌজন্যের সুযোগে আগ্রহী পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে এবং অসম্পূর্ণভাবে গ্রন্থকারের অভিমত এখানে ব্যক্ত করছি।

(১) "সংগ্রাম ও শান্তি" কি? এটা উপন্যাস নয়, কাব্য তো নয়ই, ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তও নয়। গ্রন্থকার যা চেয়েছে এবং যে আকারে তাকে প্রকাশ করতে পেরেছে "সংগ্রাম ও শান্তি" ঠিক্ তাই। একটি শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে প্রথাগত আকারের প্রতি এ হেন অবহেলা অবশ্যই ধৃষ্টতা বলে পরিগণিত হতে পারত যদি সেটা পূর্বপরিকল্পিত হত এবং যদি তার স্বপক্ষে কোন পূর্ব দৃষ্টান্ত না থাকত। কিন্তু পুশ্‌কিনের আমল থেকে রুশ সাহিত্যের ইতিহাসে ইওরোপীয় আকাশ থেকে এ ধরনের সরে যাওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে, বরং তার বিপরীত দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না একটিও। রুশ সাহিত্যের সাম্প্রতিক অধ্যায়ে গোগলের Dead Souls থেকে দস্তয়েভ্‌স্কির House of the Dead পর্যন্ত এমন একটিও গদ্য শিল্পকর্ম পাওয়া যাবে না যা মাঝারি মানের উপর উঠেও কোন উপন্যাস, মহাকাব্যিক রচনা, বা গল্পের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে খাপ খেতে পারে।

(২) সময়কালের বৈশিষ্ট্য। এই গ্রন্থের প্রথমাংশ প্রকাশিত হলে কোন কোন পাঠক আমাকে বলেন যে আমার বইতে এই বৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট স্পষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া হয় নি। এ অভিযোগের জবাবে আমার বক্তব্য: এই সময়কালের কোন্ বৈশিষ্ট্যগুলি লোকে আমার উপন্যাসে খুঁজে পায় না তা আমি জানি—ভূমিদাসত্বের ভয়াবহতা, পত্নীদের গৃহবন্দীত্ব, প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে বেত্রাঘাত, সাল্‌তিকোভা (ধনী জমিদার দারিয়া নিকলায়েভ্‌না সাল্‌তিকোভা; তার ছিল ছ'শ' ভূমিদাস; তার উৎপীড়নে সাত বছরে একশ' ত্রিশ-

জন ভূমিদাসের মৃত্যু হয়।) ইত্যাদি; কিন্তু তৎকালের এইসব বৈশিষ্ট্য আমাদের কল্পনাতেই সত্য, বাস্তবে সেগুলি সত্য বলে আমি মনে করি না, এবং সেগুলিকে নতুন করে উল্লেখ করতেও চাই না। চিঠিপত্র, দিনপঞ্জী, এবং প্রচলিত চিন্তা-ভাবনার পর্যালোচনা করে এইসব ভয়াবহ বর্বরতার এমন কোন নমুনা আমি পাই নি যা আজকের দিনে অথবা অন্য যেকোন কালে দেখতে পাওয়া যায় না। সেকালেও মানুষ ভালবাসত, ঈর্ষা করত, সত্য ও সৎগুণের সন্ধানে ফিরত, কামনার বশীভূত হত; উপর মহলের মানুষদের মধ্যে এই একই জটিল মানসিক ও নৈতিক জীবনের সাক্ষাৎ পাই; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আজকের দিনের চাইতে অধিকতর রুচিশীল ছিল। ……সেকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বিক্ষোভ ও অবাধ্যতা এ কথা মনে করা ঠিক ততখানি অন্যায় যতখানি অন্যায় হয় কোন মানুষ যদি পাহাড়ের ওপারের গাছের মাথাগুলি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে বলে যে ঐ অঞ্চলে শুধু গাছ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। সেকালেরও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অবশ্যই ছিল (সব কালেরই থাকে); সেগুলি সবই নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে উপরের শ্রেণীর মানুষের বিচ্ছিন্নতা, সে সময়কার ধর্মীয় দর্শন, শিক্ষার বৈশিষ্ট্য, ফরাসী ভাষা ব্যবহার, ইত্যাদির মিলিত ফল। সেই বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলতেই আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

(৩) রুশ গ্রন্থে ফরাসী ভাষার ব্যবহার। আমার বইতে রুশ এবং ফরাসীরা কখনও রুশ ভাষায় কখনও ফরাসী ভাষায় কথা বলে কেন? রুশ গ্রন্থের চরিত্ররা ফরাসী ভাষা বলে এবং লেখে কেন এ অভিযোগ তো সেই মানুষটির অভিযোগেরই মত যে কোন প্রতিকৃতিতে কালো দাগ (ছায়া) দেখে অভিযোগ করে যে বাস্তবে যে কালো দাগ নেই তা প্রতিকৃতিতে থাকবে কেন। একজন চিত্রকর যদি প্রতিকৃতির মুখে এমন ছায়া এঁকে থাকে যা আসল মানুষটির মুখে নেই বলে কেউ সেগুলিকে কালো দাগ বলে মনে করে তো সে দোষ তো চিত্রকরের নয়; তার দোষ হবে যদি সেই ছায়াকে সে ভুল করে অথবা রূঢ়ভাবে আঁকে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক নিয়ে লিখতে গিয়ে, এবং একটি বিশেষ শ্রেণীর রুশ চরিত্র, নেপোলিয়ন, ও সেকালের জীবনযাত্রার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত অন্য ফরাসীদের চরিত্র আঁকতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের ফরাসী চিন্তাধারার ব্যাপারটা প্রকাশ করতে গিয়ে আমি হয়তো কিছুটা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আর তাই আমি যে ছায়াগুলো এঁকেছি সেগুলো হয়তো অসত্য ও রূঢ় হয়েছে একথা অস্বীকার না করেও যারা মনে করেন যে নেপোলিয়ন কখনও রুশ কখনও ফরাসী ভাষা ব্যবহার করবেন সেটা একান্তই অবাস্তব তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তারা এটুকু বুঝতে চেষ্টা করুন যে ব্যাপারটা তাদের কাছে অবাস্তব মনে হবার কারণ তারাও প্রতিকৃতিদর্শনকারী লোকটির মতই মুখখানিকে আলো-

ছায়ার প্রতিফলনের মধ্যে না দেখে নাকের নীচে কালো দাগটাই দেখতে পাচ্ছেন।

(৪) গ্রন্থের চরিত্রগুলির নামকরণ। বল্‌কনস্কি, দ্রুবেৎস্কয়, বিলিবিন, কুরাগিন ইত্যাদি নাম সুপরিচিত রুশ নামগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এটা শুনতে আমার কানে খুবই বেথাপ্পা লেগেছে যে একজন কাউন্ট রস্তপ্‌চিন কথা বলছেন কোন প্রিন্স প্রন্‌স্কি, স্ত্রেল্‌স্কি, অথবা কাল্পনিক নামধারী অন্য কোন প্রিন্স বা কাউন্টের সঙ্গে। আসলে তল্‌কন্‌স্কি বা দ্রুবেৎস্কয় না হলেও বল্‌কন্‌স্কি বা দ্রুবেৎস্কয় নামগুলি রুশ অভিজাত পরিবেশে বেশ পরিচিত ও স্বাভাবিক শোনায়। আমার সবগুলি চরিত্রের জন্য এমন নাম আমি খুঁজে বের করতে পারি নি যা আমার কানে নকল মনে না হয়েছে, যেমন বেজুখভ ও রস্তভ; এই অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবার একটিমাত্র পথই আমি খুঁজে পেয়েছি—রুশ কানে পরিচিত শোনাবে এমন যেকোন নামকে বেছে নিয়ে তার দু'একটা অক্ষরকে বদলে দিয়েছি। নকল নাম ও আসল নামের মিল দেখে কেউ যদি মনে করেন যে আমি অমুক বা তমুক ব্যক্তিবিশেষকে বর্ণনা করতে চেয়েছি তাহলে আমার পক্ষে সেটা খুবই দুঃখের কারণ হবে। ····

(৫) ঐতিহাসিক ঘটনার আমার লিখিত বিবরণ ও ইতিহাসকারদের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য। এটা আকস্মিক নয়, অনিবার্য। একটি ঐতিহাসিক যুগকে বর্ণনা করতে গিয়ে একজন ইতিহাসকার ও একজন শিল্পীকে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কাজের সম্মুখীন হতে হয়। একজন ইতিহাসকার যদি একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন তাহলে তিনি ভুল করবেন; আবার একজন শিল্পী যদি সেই ব্যক্তিকে সর্বদাই তার ঐতিহাসিক মূল্যের দিক থেকে ধরতে চেষ্টা করেন তাহলেও তিনি তার কর্তব্য সম্পাদনে ব্যর্থ হবেন। কুতুজভ সর্বদাই একটা দুরবীন হাতে নিয়ে থাকতেন না, সেটাকে শত্রুর দিকে তাক করতেন না, একটা সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হতেন না। রস্ত্‌পচিন সর্বদাই একটা টর্চ হাতে নিয়ে ভরনভ্‌স্কি ভবনে আগুন লাগাতেন না (আসলে সে কাজটি তিনি কখনও করেন নি), আর সাম্রাজ্ঞী মারিয়া ফেদরভ্‌নাও সবসময় লোমের জোব্বা পরে আইনের পুথির উপর হাত রেখে দাঁড়াতেন না। কিন্তু সাধারণ মানুষের কল্পনা তাদের সেইভাবেই চিত্রিত করেছে।

একটা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের দৃষ্টিতে বিচার করে একজন ইতিহাসকার নায়কের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন; কিন্তু একজন শিল্পীর কাজ জীবনের প্রেক্ষাপটে মানুষের নানা সম্পর্ককে বিচার করা; তার কাছে নায়ক বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না, আছে শুধু মানুষ।····

ঘটনার বিবরণের বেলায় এই পার্থক্য তীব্রতর এবং গুরুতর হয়ে ওঠে।

ইতিহাসকারের কাজ ঘটনার ফলাফল নিয়ে, আর শিল্পীর কাজ ঘটনাকে নিয়ে। একটি যুদ্ধের বর্ণনা দিতে ইতিহাসকার বলেন: "অমুক বাহিনীর বাম ব্যূহ অমুক গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুকে বিতাড়িত করল, কিন্তু নিজেরা সরে যেতে বাধ্য হল; তারপর যে অশ্বারোহী বাহিনীকে আক্রমণ করতে পাঠানো হল……" ইত্যাদি। কিন্তু একজন শিল্পীর কাছে এ কথাগুলির কোন অর্থ নেই, আর এসব কথা ঘটনাটিকে স্পর্শও করে না। হয় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে, না হয় তো চিঠিপত্র, স্মৃতিচারণ এবং বিবরণ থেকে শিল্পী একটি ঘটনাকে নিজের মত করে গড়ে তোলেন, এবং প্রায়ই দেখা যায় যে ইতিহাসকারের সিদ্ধান্ত আর শিল্পীর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথ ধরে।……

……কাজেই একজন শিল্পী ও একজন ইতিহাসকারের কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই পাঠক যদি দেখেন যে ঘটনা বা চরিত্রের বর্ণনায় আমার বই ইতিহাসকারের সঙ্গে মিলছে না তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

কিন্তু শিল্পীকে ভুললে চলবে না যে জনমানসে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার যে ধারণা গড়ে ওঠে সেটা কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, প্রতিষ্ঠিত সেই সব দলিলপত্রের উপর যা সংগ্রহ করেন ইতিহাসকাররা; আর তাই একজন শিল্পী তাদের স্বতন্ত্রভাবে উপলব্ধি করে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত করলেও ইতিহাসকারের মতই শিল্পীকেও ঐতিহাসিক উপাদান দ্বারাই পরিচালিত হতে হয়। আমার উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্ররা যাই বলুক আর করুক, আমি কিছুই তৈরি করিনি, ঐতিহাসিক উপাদানকেই ব্যবহার করেছি, আর বই লিখতে বসে একটা গোটা গ্রন্থাগারই সংগ্রহ করে ফেলেছি। এখানে সেসব গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি না, কিন্তু আমার বক্তব্যের প্রমাণস্বরূপ যেকোন সময় সেগুলি উল্লেখ করতে পারি।

(৬) শেষ কথা, ষষ্ঠ এবং আমার দিক থেকে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, আমার মতে ঐতিহাসিক ঘটনার ক্ষেত্রে তথাকথিত মহাপুরুষদের অবদান অতিশয় তুচ্ছ।

যে যুগটি এত বেশী শোকাবহ, ঘটনাবলীর গুরুত্বে যা এত বেশী সমৃদ্ধ, যা আমাদের এত নিকট অতীতের ব্যাপার, যাকে ঘিরে নানা বিচিত্র কথা আজও প্রচলিত, তাকে পর্যালোচনা করে আমি এই সুস্পষ্ট সত্যে পৌঁচেছি যে কোন ঐতিহাসিক ঘটনা যখন ঘটে তখন তার কারণকে বোঝা আমাদের বুদ্ধির অতীত। ১৮১২ সালের ঘটনাবলীর কারণ নিহিত ছিল নেপোলিয়নের প্রভুত্বস্পৃহা এবং সম্রাট প্রথম আলেক্সান্দারের দৃঢ় দেশাত্মবোধের মধ্যে একথা বলা একান্তই অর্থহীন; যেমন অর্থহীন এমন কথা বলা যে একটি বর্বর মানুষের সদলে পশ্চিম অভিমুখে অভিযান এবং একজন রোমক সম্রাটের অক্ষম রাজ্যশাসনই রোমক সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, কিংবা একটা মস্ত বড় পাহাড়কে সমভূমি করবার পথে সেটা একসময় ভেঙে পড়ার কারণ শেষ শ্রমিকটির

কোদালের আঘাত।

যে ঘটনায় লক্ষ লক্ষ মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল, যাতে পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হল, একটিমাত্র লোকের ইচ্ছা কখনও সে ঘটনার কারণ হতে পারে না। একটি মানুষ যেমন একটা পাহাড়কে সমভূমি করতে পারে না, ঠিক তেমনই কোন একটি মানুষ পাঁচ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটাতে পারে না। কিন্তু তাহলে তার কারণটা কি? একজন ইতিহাসকার বলেন, ফরাসীদের আগ্রাসী মনোভাব এবং রুশদের দেশপ্রেমই এর কারণ। অন্যরা বলেন, বিদেশে পরিচালিত নেপোলিয়নের দলবলের গণতান্ত্রিক মনোভাব এবং রাশিয়ার দিক থেকে ইওরোপের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনের কথা। ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ একে অন্যকে হত্যা করতে শুরু করল কেন? কে তাদের সে কাজ করতে বলল? এটা নিশ্চয়ই তারা প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিল যে এতে তাদের কারও কোন উপকার হবে না, বরং আরও খারাপই হবে। তাহলে তারা এ কাজ করল কেন? পরবর্তীকালে এই অর্থহীন ঘটনার কারণ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করা যেতে পারে, করা হয়েছে, কিন্তু এইসব ব্যাখ্যার সংখ্যাধিক্যই প্রমাণ করে যে এই ঘটনার কারণ ছিল অসংখ্য, আর তার কোন একটিই কারণ হিসাবে উল্লেখিত হবার যোগ্য নয়।

মানুষকে হত্যা করা বাহ্যিক এবং নৈতিক সব দিক থেকেই খারাপ; সৃষ্টির আদিকাল থেকে একথা জেনেও কেন লক্ষ লক্ষ মানুষ একে অপরকে হত্যা করল? কারণ এটা এমনই এক অনিবার্য প্রয়োজন যে একাজ সম্পন্ন করে মানুষ প্রাণীতত্ত্বের সেই মৌলিক নিয়মকেই পূর্ণ করল যাকে হেমন্তকালে পরস্পরকে হত্যা করে মৌমাছিরা পূর্ণ করে, এবং যার প্রেরণায় পুরুষ পশু একে অন্যকে ধ্বংস করে। এই ভয়ংকর প্রশ্নের অন্য কোন জবাব কেউ দিতে পারে না। ....

ইতিহাসের ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই আমরা সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারি যে একটি সনাতন বিধান অনুসারেই সব ঘটনা ঘটে। কিন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে আমাদের ধারণা হয় এর ঠিক বিপরীত।

একটি মানুষ যখন অপরকে হত্যা করে, নেপোলিয়ন যখন নিয়েমেন নদী পার হবার হুকুম দেয়, আপনি বা আমি যখন সেনাদলে ভর্তি হবার জন্য একখানা দরখাস্ত পেশ করি, হাত তুলি বা নামাই, তখন আমরা সকলেই সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করি যে আমাদের প্রতিটি কাজই যথেষ্ট কারণের উপর এবং আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে এতই সহজাত, আমাদের প্রত্যেকের কাছে এতই মূল্যবান যে ইতিহাসের প্রমাণ এবং অপরাধের পরিসংখ্যান সত্ত্বেও আমাদের সব কাজের মধ্যে এই স্বাধীনতার চেতনাকে সঞ্চারিত করে দেই।

এই স্ববিরোধিতার কোন সমাধান নেই বলেই মনে হয়। কোন কাজ

করার সময় আমি মনে করি যে স্বাধীন ইচ্ছার প্রেরণাতেই আমি কাজটা করছি, কিন্তু মানব জাতির সাধারণ জীবনযাত্রার সঙ্গে সম্পর্কের দিক থেকে (ঐতিহাসিক তাৎপর্যের দিক থেকে) সে কাজের বিচার করলেই বুঝতে পারি যে সে কাজটি পূর্বনির্দিষ্ট এবং অনিবার্য। তাহলে ভুলটা কোথায়?… …

আমার গ্রন্থ রচনার কালে ভুল করেই হোক আর সঠিকভাবেই হোক এই বিশ্বাসে পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে ১৮০৫, ১৮০৭ এবং বিশেষ করে ১৮১২ সালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী (যেখানে পূর্বনির্ধারণ নিয়মের প্রকাশ অত্যন্ত স্পষ্ট) বর্ণনা করতে বসে স্বভাবতই তাদের কার্যাবলীর উপর আমি কোনরকম গুরুত্ব দিতে পারি নি যারা ভাবেন যে তারাই ঘটনার নিয়ামক, অথচ সেইসব ঘটনায় অংশগ্রহণকারী অন্য সকলের চাইতে তারাই স্বাধীন মানবিক কর্ম-প্রেরণা জুগিয়েছেন অনেক কম। এইসব লোকদের কার্যকলাপে আমার একমাত্র আগ্রহ এইটুকু যে আমার মতে যে পূর্বনির্ধারণ নিয়ম ইতিহাসকে পরিচালিত করে সেগুলি তারই উদাহরণস্বরূপ; তাছাড়া, একটা মানুষ সর্বাপেক্ষা অধিক বাধ্যবাধকতার চাপে কাজ করলেও যে মনস্তাত্ত্বিক নিয়ম কল্পনায় তাকে বাধ্য করে অতীত কার্যকলাপের বিশ্লেষণের দ্বারা নিজের স্বাধীনতাকে প্রমাণ করতে, এইসব মানুষের কার্যকলাপ তারও একটা উদাহরণস্বরূপ বলেই তার প্রতি আমার আগ্রহ।

The Online Library of Bangla Books

উপন্যাসে বর্ণিত প্রধান পরিবারসমূহ এবং অপর কয়েকটি চরিত্র

বেজুখভ-পরিবার

কাউন্ট সিরিল বেজুখভ
পিয়ের, ঐ পুত্র, পরবর্তীকালে কাউন্ট পিতর বেজুখভ
প্রিন্সেস কাতিচে, পিয়ের-এর সম্পর্কিত বোন

রস্তভ-পরিবার

কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ
কাউন্টেস নাতালি রস্তভা, ঐ স্ত্রী
কাউন্ট নিকলাস রস্তভ (নিকোলেংকা), ঐ বড ছেলে
কাউন্ট পিতর বস্তভ (পেত্‌য়া), ঐ ছোট ছেলে
কাউন্টেস ভেরা রস্তভা, ঐ বড় মেয়ে
কাউন্টেস নাতালি রস্তভা (নাতাশা), ঐ ছোট মেয়ে
সোনিয়া, রস্তভ পরিবারের আশ্রিতা
বের্গ, আলফোঁস কার্লিচ, জার্মান বংশোদ্ভুত জনৈক অফিসার, পরে ভেরার স্বামী

বল্‌কন্‌স্কি-পরিবার

প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি, অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি-প্রধান
প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্‌কন্‌স্কি, ঐ ছেলে
প্রিন্সেস মারি বল্‌কন্‌স্কায়া, ঐ মেয়ে
প্রিন্সেস এলিজাবেথ বল্‌কন্‌স্কায়া (লিজে), আন্‌দ্রুর স্ত্রী
তিখন, প্রিন্স এন. বল্‌কন্‌স্কির খানসামা
আলপাতিচ, ঐ নায়েব

কুরাগিন-পরিবার

প্রিন্স ভাসিলি কুরাগিন
প্রিন্স হিপোলিৎ কুরাগিন, ঐ বড় ছেলে
প্রিন্স আনাতোল কুরাগিন, ঐ ছোট ছেলে
প্রিন্সেস হেলেন কুরাগিনা (লেলিয়া), ঐ মেয়ে, পরে পিয়ের-এর স্ত্রী
প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্‌না দ্রুবেৎস্কায়া
প্রিন্স বরিস দ্রুবেৎস্কয় (বরি), ঐ ছেলে
জুলি কুরাগিনা, বরিসের স্ত্রী
বিলিবিন, কূটনীতিবিদ

দেনিসভ, ভাসিলি দিমিত্রিচ, হুজার অফিসার
লাভ্রুশ্‌কা, ঐ সহিস
দলখভ (ফেদিয়া), জনৈক বেপরোয়া অফিসার
কাউণ্ট রস্তপচিন, মস্কোর শাসনকর্তা
শিন্‌শিন্‌, কাউণ্টেস রস্তভার আত্মীয়
তিমখিন, পদাতিক বাহিনীর অফিসার
তুশিন, গোলন্দাজ বাহিনীর অফিসার
প্লাতন কারাতেভ, জনৈক চাষী

প্রধান ঘটনাবলীর তারিখ

॥ প্রথম খণ্ড ॥

১৮০৫

১১ই অক্টোবর	কুতুজভ ব্রাউনাউ-এর নিকটে সেনাদল পরিদর্শন করল
২৩শে „	রুশবাহিনীর এন্‌স্‌ নদী অতিক্রম
২৪শে „	আম্‌স্‌তেতেন-এ যুদ্ধ
২৮শে „	রুশ বাহিনীর দানিয়ুব নদী অতিক্রম
৩০শে „	দুরেন্‌স্তিন-এ মতিয়ের-এর পরাজয়
৪ঠা নভেম্বর	নেপোলিয়ন শোন্‌ব্রুন থেকে মুরাৎকে চিঠি লিখল
	শোন গ্রেবার্ণ-এর যুদ্ধ
১৯শে „	অস্ত্রালিজ-এ সমর-পরিষদের বৈঠক
২০শে „	অস্তারলিজ-এর যুদ্ধ

১৮০৭

২৭শে জানুয়ারি	প্রুশিস্‌স্ক-আইলাউ-এর যুদ্ধ
২রা জুন	ফ্রিড্‌ল্যাণ্ড-এর যুদ্ধ
১৩ই „	তিল্‌সিট্‌-এ দুই সম্রাটের সাক্ষাৎ

The Online Library of Bangla Books

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

১৮১২

১৭ই মে	নেপোলিয়নের ড্রেস্‌ডেন ত্যাগ
১২ই জুন	নেপোলিয়নের নিয়েমেন অতিক্রম করে রাশিয়ায় প্রবেশ
১৪ই জুন	আলেক্সান্দার বলাশেভকে নেপোলিয়নের কাছে পাঠাল
১৩ই জুলাই	অস্ত্রভ্‌নাতে পাভ্‌লোগ্রাদ হুজারদের যুদ্ধ
৪ঠা অগস্ট	আল্‌পাতিচ স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ কামানের গর্জন শুনতে পেল
৫ই "	স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর উপর গোলাবর্ষণ
৭ই "	প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির বল্ড হিল্‌স্‌ ছেড়ে বোগুচারভো যাত্রা
৮ই "	কুতুজভ-এর প্রধান সেনাপতিপদে নিয়োগ
১০ই "	প্রিন্স আন্‌দ্রুর সেনাদলের বল্ড হিল্‌স্‌-এর অদূরে অবস্থান
১৭ই "	কুতুজভ কর্তৃক সেনাবাহিনীর ভার গ্রহণ
	নিকলাস বোগুচারভো পৌঁছিল
২৪শে "	শেভার্দিনো দুর্গের যুদ্ধ
২৬শে "	বরদিনো-র যুদ্ধ

The Online Library of Bangla Books

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

The Online Library of Bangla Books

প্রথম খণ্ড

●

প্রথম পর্ব

অধ্যায়—১

"আচ্ছা প্রিন্স, তাহলে তো জেনোয়া ও লুক্কা এখন বোনাপার্তদের পারিবারিক সম্পত্তি বিশেষ। কিন্তু আমি আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, একেও যদি আপনি যুদ্ধ না বলেন, এখনও যদি সেই খৃস্টবৈরীর—আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে সে লোকটি খৃস্টবৈরী—জঘন্য আচরণ ও সন্ত্রাশকে সমর্থন করেন, তাহলে আপনার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকবে না, আপনি আমার বন্ধুও থাকবেন না, বা আপনি যে নিজেকে আমার 'বিশ্বস্ত দাস' বলে প্রচার করে থাকেন তাও আর থাকবেন না। কিন্তু আপনার হল কি? মনে হচ্ছে আপনাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি—বসে পড়ুন, আর সব খবর আমাকে বলুন।"

১৮০৫-এর জুলাই মাস; বক্তা খ্যাতনামা আন্না পাভ্‌লভ্‌না শেরার, ভদ্রমহিলা সম্রাজ্ঞী মারিয়া ফিয়দরভ্‌নার প্রধান ও প্রিয় সখী। কথাগুলি বলা হল প্রিন্স ভাসিলিকে; ভদ্রলোক উচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী; আজকের বৈঠকে সেই প্রথম সমাগত অতিথি। আন্না পাভ্‌লভ্‌না কয়েকদিন যাবৎ কাশিতে ভুগছে। মহিলা নিজে অবশ্য বলেছে যে সে 'লা গ্রিপ্পে' তে ভুগছে; 'গ্রিপ্পে' কথাটা সেণ্ট পিতার্সবুর্গ-এ নতুন আমদানি হয়েছে; শুধু ভদ্রজনরাই কথাটা ব্যবহার করে থাকে।

তার সব আমন্ত্রণ-পত্রই ফরাসী ভাষায় লেখা; সকালেই সেগুলো বিলি করে এসেছে লাল পোশাক-পরা পরিচারক; তাতে লেখা ছিল:

"কাউণ্ট (অথবা প্রিন্স), আপনার হাতে যদি কাজ না থাকে আর একটি অসহায় পঙ্গু মানুষের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটানো যদি ভয়ংকর বলে মনে না করেন, তাহলে আজ রাতে ৭টা থেকে ১০টার মধ্যে আপনার দর্শন পেলে খুবই পুলকিত হব,—আন্নেৎ শেরার।"

মহিলাটির কথায় বিন্দুমাত্রও ক্ষুব্ধ না হয়ে প্রিন্স বলল, "হা ভগবান! কী তীব্র আক্রমণ!" এই মাত্র সে ঘরে ঢুকেছে; পরনে নক্সা-করা দরবারী পোশাক, ব্রীচেস ও জুতো; বুকে অনেকগুলো তারকা আঁটা; চ্যাপ্টা মুখে গাম্ভীর্যের প্রকাশ। সে কথা বলল সেই চোস্ত ফরাসীতে যে ভাষায় আমাদের পূর্বপুরুষরা শুধু কথাই বলত না, চিন্তাও করত; সমাজের উঁচু মহলে ও দরবারের পরিবেশে মানুষ হওয়া মর্যাদাসম্পন্ন লোকের মত তার কথা বলার

ভঙ্গী। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমো খেয়ে প্রিন্স তার সুগন্ধী, চকচকে টাকটাকে এগিয়ে দিয়ে মৌজ করে একটা সোফায় বসল।

"প্রিয় বান্ধবী, প্রথমেই বলুন আপনি কেমন আছেন। আপনার বন্ধুর মনকে শান্ত করুন," গলার স্বরের কোন রকম পরিবর্তন না করেই প্রিন্স বলল, আপাত ভদ্রতা ও সহানুভূতির অন্তরালে তার কণ্ঠস্বরের নিস্পৃহতা, এমন কি বিদ্রূপটাও চাপা পড়ল না।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "মনের মধ্যে নৈতিক যন্ত্রণা নিয়ে কেউ কি ভাল থাকতে পারে? অনুভূতির বালাই থাকলে এখনকার মত অবস্থায় কেউ কি শান্ত হতে পারে? আশা করি, সারা সন্ধ্যাটাই এখানে কাটাবেন?"

"আর ইংরেজ রাজদূতের ওখানকার উৎসবের কি হবে? আজ বুধবার। একবার তো আমাকে সেখানে দেখা দিতেই হবে," প্রিন্স বলল। "আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আমার মেয়ে আসবে।"

"আমি ভেবেছিলাম আজকের উৎসবটা বাতিল করা হয়েছে। সত্যি বলছি, এই সব উৎসব আর আতসবাজি বড়ই ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে।"

"তারা যদি আপনার এই ইচ্ছাটা জানত তাহলে উৎসবটা অবশ্যই বন্ধ করে দিত," প্রিন্স বলল। দম-দেওয়া ঘড়ির মত অভ্যাসবশত সে এমন সব কথা বলে যা লোকে বিশ্বাস করুক তাও সে চায় না।

"ঠাট্টা করবেন না! আচ্ছা, নভসিল্‌ত্‌সেভ-এর কাগজপত্র সম্পর্কে কি স্থির হয়েছে? আপনি তো সবই জানেন।"

ঠাণ্ডা নিরুৎসাহ গলায় প্রিন্স বলল, "সে খবর কে রাখে? কি স্থির হয়েছে? তারা স্থির করেছে যে বোনাপার্ত তার নৌকোগুলি পুড়িয়ে দিয়েছে, আর আমার বিশ্বাস, আমাদের নৌকোগুলি পোড়াতেও আমরা রাজী।"

প্রিন্স ভাসিলি সব সময়ই পুরনো পার্ট আওড়ানোর মত করে টেনে টেনে কথা বলে। অপর দিকে, চল্লিশ বছর বয়স হলেও আন্না পাভ্‌লভ্‌না শেরার উত্তেজনায় ও আবেগে টগবগ করে। সব সময় উৎসাহে ভরপুর থাকাটাই যেন তার সামাজিক কর্তব্য; আর তাই মনের অবস্থা কখনও সে রকম না থাকলেও পাছে পরিচিত জনকে হতাশ করতে হয় এই ভয়েই তাকে উৎসাহশীল হতে হয়। তার ম্লান মুখের সঙ্গে মানানসই না হলেও তার ঠোঁট দুখানিকে ঘিরে স্মিত হাসির রেখাটি সব সময়ই খেলা করে বেড়ায়; নিজের এই ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন হলেও এটাকে সংশোধন করতে সে চায় না, সংশোধন করতে পারে না। সংশোধন করা প্রয়োজন বলেও মনে করে না।

রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা প্রসঙ্গে আন্না পাভ্‌লভ্‌না হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠল:

"আঃ, অস্ট্রিয়ার কথা আমার কাছে বলবেননা। আমি হয় তো এ সব

ব্যাপার বুঝি না, কিন্তু অস্ট্রিয়া কোন দিন যুদ্ধ চায় নি, আজও চায় না। সে আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! রাশিয়া একাই ইউরোপকে বাঁচাবে। আমাদের মহামান্য সম্রাট এই মহৎ কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, আর সে কর্তব্যে তিনি অবিচলই থাকবেন। এই একটি কথা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের সৎ ও আশ্চর্য সম্রাট এই পৃথিবীতে একটি মহৎ ভূমিকা পালন করবেন, আর তিনি এতই ধার্মিক ও মহান যে ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ কববেন না। তার কর্তব্য তিনি পালন করবেন, এই নবঘাতক শয়তানকে আশ্রয় করে যে সহস্রশীর্ষ সর্পরূপী বিপ্রব আজ ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে তাকে তিনি ধ্বংস করবেন! ভাল মানুষের রক্তের প্রতিশোধ শুধু আমাদেরই নিতে হবে· ·। আর কার উপর আমবা নির্ভর করতে পারি শুনি···? ব্যবসায়ী-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে ইংলণ্ড কখনও সম্রাট আলেক্সান্দারের মহত্ত্বকে বুঝবে না, বুঝতে পারে না। সে তো মাল্টা ছেড়ে আসতেও আপত্তি করেছে। আমাদের সব কাজের মধ্যেই তো সে একটা গোপন অভিসন্ধি খুঁজে বেড়াচ্ছে। নভসিল্‌ত্‌সেভ্‌ কি জবাব পেয়েছে? কিচ্ছু না। আমাদের সম্রাটের আত্ম-ত্যাগকে ইংরেজরা বুঝতে পারে নি, পারবেও না। নিজের জন্য তিনি কিছুই চান না, চান শুধু মানুষের কল্যাণ। আর তারা কি দিচ্ছে? কিচ্ছু না! আর মুখে যেটুকু বা বলছে, কাজে তাও করছে না! প্রাশিয়া তো আগাগোড়াই বলছে, বোনাপার্ত অপরাজেয়, তার সামনে গোটা ইওরোপ অসহায়। হার্ডেনবুর্গ বা হগ্‌উইজ-এর কথার এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। প্রাশিয়ার এই বিখ্যাত নিরপেক্ষতা তো একটা ফাঁদ মাত্র। আমার ভরসা শুধু ঈশ্বরকে, আর আমাদেব পরমারাধ্য সম্রাটের মহৎ নিয়তিকে। ইওবোপকে তিনিই রক্ষা করবেন!"

নিজেব আবেগে হেসে উঠে মহিলাটি হঠাৎ থেমে গেল।

প্রিন্স হেসে বলল, "আমার তো মনে হয়, আমাদের প্রিয় উইন্ত্‌জিন-গেরোদ-এর বদলে আপনাকে যদি পাঠানো হত, তাহলে আপনি হয় তো গায়ের জোরেই প্রাশিয়ার রাজার সম্মতি আদায় করে নিতে পারতেন। আপনার যা গলার জোর। এক কাপ চা কি মিলবে?"

"এখনই।" শান্ত গলায় আবার বলল, "ভাল কথা, আজ রাতে দুজন মজার লোককে আশা করছি। একজন ভাইকোঁত্‌ দ্য মর্তেমার্ত, সেরা ফরাসী পরিবার রোহাঁদের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে; একজন সত্যিকারের সৎ বিদেশী। অপরজন আবে মোরিও। সেই বিদগ্ধ চিন্তাশীল লোকটিকে আপনি চেনেন কি? সম্রাট তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। শুনেছেন কি?"

প্রিন্স বলল, "তাদের সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব। কিন্তু বলুন তো, এ কথা কি সত্যি যে বিধবা সম্রাজ্ঞী ব্যারন ফুংকে-কেই ভিয়েনাতে প্রথম সচিব নিযুক্ত করতে চাইছেন? ব্যারন লোকটি সব দিক থেকেই বড়ই বেচারি।"

প্রিন্স ভাসিলির ইচ্ছা ছিল এই চাকরিটা তার ছেলে পাক, কিন্তু অন্য সকলে বিধবা সম্রাজ্ঞী মারিয়া ফিয়রভ্‌নার কাছে দরবার করছিল যাতে ব্যারনই চাকরিটা পায়।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলল; যেন বোঝাতে চাইল সম্রাজ্ঞী যা ইচ্ছা করেছেন, বা যাতে খুশি হয়েছেন তা নিয়ে সমালোচনা করার অধিকার তারও নেই, বা অন্য কারও নেই।

শুকনো করুণ গলায় সে শুধু বলল, "বিধবা সম্রাজ্ঞীর বোনই ব্যারন ফুংকের নাম তার কাছে সুপারিশ করেছিলেন।"

সম্রাজ্ঞীর নাম করতেই হঠাৎ আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মুখে গভীর ও আন্তরিক অনুরাগ, শ্রদ্ধা ও বিষণ্ণতার একটা মিশ্র ভাব ফুটে উঠল। যতবার সে তার বিখ্যাত কর্ত্রীর নাম উল্লেখ করে ততবারই তার মুখে এই একই ভাব ফুটে ওঠে।

প্রিন্স নীরবে বসে রইল, কেমন একটু উদাসীন ভাব। আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল, "এবার আপনার পরিবারের কথা বলুন। আপনি কি জানেন যে আপনার মেয়েকে দেখে সকলেই মুগ্ধ? সকলেই বলছে, সে তো অপূর্ব সুন্দরী।"

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য প্রিন্স মাথা নীচু করল।

"আমি অনেক সময়ই ভাবি," একটু চুপ করে থেকে প্রিন্সের আরও কাছে ঘেঁষে প্রসন্ন হাসি হেসে তার দিকে তাকিয়ে মহিলাটি বলতে লাগল—"আমি অনেক সময়ই ভাবি, জীবনের সুখগুলিকে অনেক সময় কত অন্যায়ভাবেই না বণ্টন করা হয়ে থাকে। ভাগ্য আপনাকেই এমন দুটি চমৎকার সন্তান উপহার দিয়েছে কেন? একেবারে ছোট আনাতোলের কথা আমি বলছি না। তাকে আমি পছন্দ করি না। এমন চমৎকার দুটি সন্তান। অথচ আপনি তাদের মোটেই ভাল চোখে দেখেন না; তাই তো বলি, এমন সন্তান পাবার হক আপনার নেই।"

একটি স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে।

প্রিন্স বলল, "আমি কিন্তু নিরুপায়। লাভাতের হয় তো বলত, বাপ হবার মত হিম্মৎই আমার নেই।"

"ঠাট্টার কথা নয়; আপনার সঙ্গে গুরুতর কথা আছে। আপনি কি জানেন, আপনার ছোট ছেলেকে নিয়ে আমি খুশি নই? নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, সম্রাজ্ঞীর কাছে তার কথা তোলায় তিনি আপনার জন্য দুঃখ করলেন…"

প্রিন্স কোন কথা বলল না, কিন্তু জবাবের অপেক্ষায় মহিলাটি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। প্রিন্স ভুরু কুঁচকাল।

অবশেষে বলল, "আপনি আমাকে কি করতে বলেন? আপনি তো

জানেন তাদের লেখাপড়া শেখবার জন্য বাবার পক্ষে যা করা দরকার সে সবই আমি করেছি, কিন্তু তারা দুজনই মূর্খ। হিপোলিতে তবু শান্ত মূর্খ, কিন্তু আনাতোল তো দুরন্ত মূর্খ। দুজনের মধ্যে ওইটুকুই যা তফাৎ।" অস্বাভাবিক হাসি হেসে সে কথাগুলি বলল; ফলে তার মুখের চারদিকে যে ভাঁজ পড়ল তাতে একটা অপ্রত্যাশিত কঠোরতা ও ক্ষোভই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

"আপনার মত মানুষের সন্তান হয় কেন? আপনি যদি বাবা না হতেন তাহলে তো আপনার বিরুদ্ধে আমার কিছুই বলার থাকত না," চোখ তুলে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল।

"আমি আপনার অনুগত দাস, আর তাই একমাত্র আপনার কাছেই স্বীকার করছি যে আমার সন্তানরাই আমার জীবনের কলংক। এ দুঃখ আমাকে বয়ে বেড়াতেই হবে। এইভাবেই আমি নিজেকে বোঝাই। এর হাত থেকে রেহাই নেই।"

আর কোন কথা বলল না। একটা বিশেষ অঙ্গভঙ্গী করে নিষ্ঠুর নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণের ভাব প্রকাশ করল শুধু। আন্না পাভ্‌লভ্‌না ভাবতে লাগল।

একসময় বলল, "আপনার অমিতব্যয়ী ছেলে আনাতোলের বিয়ের কথা কখনও ভেবেছেন কি? লোকে বলে, ঘটকালি করাটা বুড়িদের একটা নেশা, যদিও নিজের মধ্যে এখনও সে দুর্বলতা আমি বোধ করি না, তবু একটি ছোট মেয়ের কথা আমি জানি যে তার বাবাকে নিয়ে খুব কষ্টে আছে। সে আপনার আত্মীয়াও বটে—প্রিন্সেস মারি বল্‌কন্‌স্কায়া।"

প্রিন্স ভাসিলি কোন জবাব না দিলেও সাংসারিক লোকের পক্ষে উপযুক্ত ক্ষিপ্র স্মৃতিশক্তির বশে এমনভাবে মাথা নাড়ল যাতে মনে হল যে এ খবরটা সেও ভেবে দেখছে।

অবশেষে মনের বিষণ্ণ চিন্তাস্রোতকে সংযত করতে না পেরে বলে উঠল, "আপনি কি জানেন যে আনাতোলের জন্য বছরে আমার চল্লিশ হাজার রুবল খরচ হয়? আর সে যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে পাঁচ বছরে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? আর বাবাদের এ সবই সহ্য করতে হয়…। আপনার এই প্রিন্সেসটি কি ধনবতী?"

"তার বাবা খুব ধনী ও কঞ্জুষ। গ্রামে থাকেন। তিনিই সুপরিচিত প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি; স্বর্গত সম্রাটের সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়েছেন, সকলে তাকে 'প্রাশিয়ার রাজা' বলেই ডাকে। লোকটি বুদ্ধিমান, কিন্তু ছিটগ্রস্ত ও বিরক্তিকর। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছে। তার একটি ভাই আছে। মনে হয় তাকে আপনি চেনেন, সম্প্রতি লিসা মীনেনকে বিয়ে করেছে। ছেলেটি কুতুজভ্‌-এর এড্‌-ডি-কং; আজ এখানে আসবে।"

হঠাৎ প্রিন্স আন্না পাভ্‌লভ্‌নার হাতটা চেপে ধরে যে কারণেই হোক

হাতটাকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে বলল, "শুনুন প্রিয় আন্নেৎ, এই ব্যবস্থাটা আপনি করে দিন, তাহলে চিরদিন আমি আপনার একান্ত বশংবদ দাস হয়ে থাকব। মেয়েটি ধনী, বংশও ভাল, আর আমিও তাই চাই।"

তারপর তার সুপরিচিত সহজ ভঙ্গীতে মহিলার হাতটি তার ঠোঁটের কাছে তুলে চুমো খেল এবং অন্য দিকে তাকিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে হাতটাকে এদিক-ওদিক দোলাতে লাগল।

একটু ভেবে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "শুনুন। আজ সন্ধ্যায়ই আমি ছোট বল্‌কন্‌স্কির স্ত্রী লিসার সঙ্গে কথা বলব; আশা করি ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে। আপনার পরিবারের পক্ষ নিয়েই আমি ঘটকালির কাজে শিক্ষানবিসী শুরু করে দেব।"

অধ্যায়—২

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বৈঠকখানা ক্রমেই লোকজনে ভরে উঠছে। পিতার্সবুর্গের একেবারে উঁচু মহলটাই সেখানে হাজির: সমবেত লোকজনের মধ্যে বয়স ও চরিত্রের ফারাক বিস্তর, কিন্তু সামাজিক মর্যাদায় সকলেই এক। প্রিন্স ভাসিলির মেয়ে সুন্দরী হেলেন এসেছে তার বাবাকে দূতাবাসের অনুষ্ঠানে নিয়ে যেতে; তার পরনে বলনাচের পোশাক, তাতে প্রধান অতিথির তকমা আঁটা। পিতার্সবুর্গের সব চাইতে মনোরমা তরুণী প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কায়াও এসেছে। গত শীতকালে তার বিয়ে হয়েছে; সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় সে আজকাল বড় জমায়েতে যায় না, শুধু ছোটখাট অনুষ্ঠানেই যোগ দেয়। প্রিন্স ভাসিলির ছেলে হিপোলিৎ এসেছে মর্তেমার্‌কে সঙ্গে নিয়ে; তাকে সে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। মঠাধ্যক্ষ মোরিও এবং আরও অনেকেই এসেছে।

নতুন কেউ এলেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে বলছে, "আমার মাসির সঙ্গে তো আপনার এখনও দেখাই হয় নি," অথবা "আমার মাসিকে কি আপনি চেনেন না?" আর খুব গম্ভীর হয়ে তাকে সেই বৃদ্ধ মহিলাটির কাছে নিয়ে হাজির করছে। টুপিতে মস্তবড় একটা ফিতের "বো" পরে মহিলাটি ঘরের মধ্যে বসে আছে; ধীরে ধীরে প্রতিটি অতিথির নাম ঘোষণা করেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না সেখান থেকে চলে যাচ্ছে।

অতিথিরা কেউই এই বুড়ি মাসিটিকে চেনে না, চিনতে চায় না, তাকে নিয়ে মাথাও ঘামায় না; তবু প্রত্যেকেই তাকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছে, আর আন্না পাভ্‌লভ্‌না নীরবে, বিষণ্ণ আগ্রহের সঙ্গে সেটা লক্ষ্য করছে। মাসিও প্রত্যেকের সঙ্গেই সেই একই কথা বলছে, সেই একই পারস্পরিক স্বাস্থ্যের কথা,

আর মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্যের কথা, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ তিনি অনেকটা ভাল আছেন।" ভদ্রতার খাতিরে বিরক্তি প্রকাশ থেকে বিরত থাকলেও সকলেই এই বিরক্তিকর কর্তব্যটি পালন করে সেখান থেকে সরে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচছে এবং সারা সন্ধ্যা আর সে জায়গা মারাচ্ছে না।

তরুণী প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কায়া জরির কাজ-করা ভেলভেটের থলেতে কিছু কাজের নমুনা নিয়ে এসেছে। তার সুন্দর ছোট ঠোঁটের উপরে ঈষৎ গোঁফের রেখা চোখে পড়ছে ; ঠোঁটটি দাঁতের তুলনায় কিছুটা ছোট হলেও তাতেই তাকে সুন্দর মানিয়েছে ; বিশেষ করে দুটো ঠোঁট যখন মাঝে মাঝে মিলে যায় তখন তাকে বড়ই সুন্দর দেখায়। অন্য সব মনোরমা স্ত্রীর মতই তার এই ত্রুটি—উপরের ঠোঁট ছোট হওয়ার জন্য মুখটা অর্ধেক খুলে থাকা—এই ত্রুটিই যেন তার পক্ষে একটি বিশেষ সৌন্দর্যের লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সুন্দরী তরুণীটিকে দেখে সকলের মুখই জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল—শীঘ্রই তো সে মা হবে, অথচ কেমন প্রাণ-শক্তি ও স্বাস্থ্যে ভরপুর, কেমন অনায়াসে এই ভার সে বহন করে চলেছে। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটালে, তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললে বৃদ্ধ ও মন-মরা যুবকরাও মনে করে তারাও বুঝি তার মতই জীবন ও স্বাস্থ্যে ভরপুর হয়ে উঠেছে। যারাই তার সঙ্গে কথা বলে, প্রতিটি কথার পরে তার উচ্ছল হাসি ও সাদা দাঁতের ঝলকানি দেখতে পায়, তারাই মনে করে যে সে দিনটাতে তাদের মন-মেজাজও ভাল হয়ে উঠেছে।

ছোট্ট প্রিন্সেসটি হাল্কা অথচ দ্রুত পা ফেলে ফেলে কাজের থলেটা হাতে ঝুলিয়ে টেবিলের চারদিকে পাক খেয়ে সুন্দরভাবে পোশাকটা ছড়িয়ে রূপোর সামোভারটার পাশে একটা সোফায় এমনভাবে বসল যেন সে যা কিছু করছে তাতে যেমন সে নিজে, তেমনই অন্য সকলেই খুব খুশি। থলের জিনিসগুলি বের করে সকলকে ডেকে সে ফরাসীতে বলল, "আমার কাজগুলি নিয়েই এসেছি। দেখুন আন্নেৎ, আশা করি আমার সঙ্গে আপনি ইয়ারকি করেন নি। চিঠিতে লিখেছিলেন, নেহাৎই ছোটখাট অনুষ্ঠান হবে, আর তাই দেখতেই পাচ্ছেন কী রকম বাজে পোশাক পরে আমি এসেছি।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না জবাব দিল, "যাই পর না কেন তবু তুমি অন্য সকলের চাইতে সুন্দরী।"

জনৈক জেনারেলের দিকে ফিরে সেই একই সুরে প্রিন্সেস ফরাসীতেই বলল, "আপনি কি জানেন যে আমার স্বামী আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে ? সে তো যাচ্ছে নিজেকে খুন করতে। আপনিই বলুন, এই হতভাগা যুদ্ধে কি লাভ ?" প্রিন্স ভাসিলির দিকে ঘুরে সে জিজ্ঞাসা করল ; তারপর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই সে তার মেয়ে সুন্দরী হেলেনের দিকে মুখ ফেরাল।

প্রিন্স ভাসিলি আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে বলল, "এই ছোট প্রিন্সেসটি কী মিষ্টি!"

তার পরেই এসে হাজির হল মজবুত গড়নের একটি শক্ত-সমর্থ যুবক। চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখে চশমা, পরনে হাল্কা রঙের কেতাদুরুস্ত ব্রীচেস ও বাদামী ড্রেস-কোট। এই যুবকটি ক্যাথারিণের সমকালীন বিখ্যাত জমিদার কাউণ্ট বেজুকভ-এর অবৈধ সন্তান। জমিদারবাবুটি এখন মুমূর্ষু অবস্থায় মস্কোতে দিন কাটাচ্ছে। যুবকটি এখনও সামরিক বা বেসামরিক কোন চাকরিতেই যোগ দেয় নি, কারণ এই সবেমাত্র সে বিদেশ থেকে ফিরেছে; বিদেশেই সে লেখাপড়া শিখেছে; এখানকার সমাজে এই তার প্রথম আবির্ভাব। বৈঠকখানার নিম্নতম মর্যাদার অধিকারী লোকের মতই মাত্র একটুখানি ঘাড নেড়েই আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে অভ্যর্থনা জানাল। কিন্তু এই নীচু মানের অভ্যর্থনা সত্ত্বেও পিয়েরকে ঘরে ঢুকতে দেখেই মহিলাটির মুখের উপর উদ্বেগ ও আতংকের এমন একটা ছায়া নেমে এল যেন সেই মানুষটি এই ঘরের তুলনায় অনেক বড়, যেন এ ঘরে তাকে মানায় না। ঘরে সমবেত অন্য সকলের চাইতে এই যুবকটির চেহারা অবশ্যই বড মাপের; কিন্তু মহিলাটির উদ্বেগের কারণ অন্য; যুবকটির মুখের ভাব লাজুক অথচ সপ্রতিভ, কিন্তু পর্যবেক্ষণশীল ও স্বাভাবিক ভাবটিই তাকে বৈঠকখানার অন্য সকলের চাইতে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

যুবকটিকে মাসির কাছে নিয়ে যেতে যেতে তার সঙ্গে শঙ্কিত দৃষ্টি-বিনিময় করে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "মঁসিয় পিয়ের যে একটি অসহায় পঙ্গু মানুষকে দেখতে এখানে এসেছেন তাতে ভারী খুশি হয়েছি।"

যেন কাউকে খুঁজছে এমনিভাবে চারদিকে তাকাতে তাকাতে পিয়ের বিড় বিড করে কি যে বলল কিছুই বোঝা গেল না। মাসির কাছে যেতে যেতেই সে স্মিত হাসি হেসে মাথা নীচু করে ছোট প্রিন্সেসকে অভিবাদন জানাল; যেন তার সঙ্গে পরিচয়টা বেশ ঘনিষ্ঠ।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার ভয়টা অকারণ নয়; মহামান্যা সম্রাজ্ঞীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে মাসি যে লম্বা বক্তৃতা দিল তার কোন জবাব না দিয়েই পিয়ের তার দিক থেকে মুখটা ঘুরিয়ে নিল। আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে আটকে দিয়ে সভয়ে বলে উঠল:

"আপনি কি মঠাধ্যক্ষ মোরিওকে চেনেন? খুব আমুদে মানুষ।"

"হ্যাঁ, তার শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা আমি শুনেছি; পরিকল্পনাটি আকর্ষণীয়, কিন্তু মোটেই সম্ভবপর নয়।"

গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থেকেও আন্না পাভ্‌লভ্‌না কোন রকমে জবাব দিল, "আপনি তাই মনে করেন বুঝি?" পিয়ের কিন্তু এবার ভদ্রতাবিরুদ্ধ কাজ করে বসল। প্রথমে এক মহিলার কথা শেষ হবার আগেই তার কাছ থেকে চলে এসেছিল, আর এখন যে চলে যেতে চাইছে তাকে ধরে কথা শোনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। মাথা নুইয়ে দুই পা ছড়িয়ে সে বোঝাতে

শুরু করে দিল কেন সে আবে-র পরিকল্পনাকে অলীক কল্পনাবিলাস বলে মনে করে।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না হেসে বলল, "এ নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।"

যুবকটির হাত থেকে ছাড়া পেয়ে সে আবার গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে উঠল। সব দিকে তার চোখ, সর্বত্র তার কান; যেখানেই আলোচনায় ঢিল পড়ছে সেখানেই সে বাড়িয়ে দিচ্ছে তার সাহায্যের হাত। সুতো-কলের ফোরম্যান যেমন কারখানার কাজ চালু করে দিয়ে চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে—কোথায় একটা টেকো থেমে গেছে, বা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করছে, অথবা যতটা শব্দ হওয়া উচিত তার চাইতে বেশী শব্দ করছে, এবং সেখানেই ছুটে গিয়ে যন্ত্রটা পরীক্ষা করে দেখে বা ঠিক মত চালিয়ে দেয়, ঠিক তেমনই আন্না পাভ্‌লভ্‌নাও বৈঠকখানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে, কখনও বা নীরব, আবার কখনও অতিমাত্রায় সরব কোন দলের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং একটা মুখের কথায় অথবা ব্যবস্থার সামান্য রদ-বদল করে আলোচনার যন্ত্রটাকে আবার যথাযথভাবে চালু করে তুলছে। কিন্তু এসব কাজকর্মের মধ্যেও পিয়েরকে নিয়ে তার উদ্বেগটা বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠছে। পিয়ের যখনই মর্তেমার্ৎ-এর দলের কাছে অথবা মঠাধ্যক্ষের দলের কাছে যাচ্ছে তখনই মহিলাটি তার উপর কড়া নজর রাখছে।

পিয়ের লেখা-পড়া শিখেছে বিদেশে; রাশিয়াতে এসে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পার্টিতেই সে প্রথম যোগ দিল। সে জানত, পিতার্সবুর্গের সেরা সব গুণীজনরাই সেখানে হাজির থাকবে, তাই খেলনার দোকানে কৌতূহলী শিশুর মত কোন্ দিকে রেখে কোন্ দিকে যে তাকাবে তাই ঠিক বুঝতে পারছে না, মনে ভয় পাচ্ছে কোন কুশলী আলোচনা ও মন্তব্য না অশ্রুত থেকে যায়। সমবেত সকলের মুখে যে আত্ম-বিশ্বাস ও সুষ্ঠু অভিব্যক্তি তার চোখে পড়েছে তাতে সর্বক্ষণই একটা গম্ভীর কিছু শুনবার আশাই সে করছে। শেষ পর্যন্ত সে মোরিওর কাছে গিয়ে হাজির হল। এখানকার আলোচনাটা তার বেশ মনোগ্রাহী বলে মনে হল; তাই অন্য সব যুবকদের মতই সেও তার নিজের মত প্রকাশ করবার মত একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

অধ্যায়—৩

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পার্টি পুরোদমে চলছে। চারদিকে (সুতো কলের) টেকোগুলো অবিশ্রান্তভাবে গুনগুন্ করে চলেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম মাসিটি। তার চিন্তাক্লিষ্ট শুকনো মুখ এই ঝলমলে জমায়েতের মাঝখানে একান্তই বেমানান। শুধু আর একটি বয়স্কা মহিলা তার পাশে বসে আছে। তাছাড়া

বাকি সব লোক তিনটে দলে ভাগ হয়ে জমে গেছে। একটি দলে প্রধানত পুরুষরাই রয়েছে; তারা বসেছে মঠাধ্যক্ষকে ঘিরে। প্রধানত যুবকদের আর একটা দল প্রিন্স ভাসিলি-র মেয়ে সুন্দরী প্রিন্সেস হেলেন এবং বয়সের তুলনায় একটু মোটাসোটা খুবই সুন্দরী গোলাপবর্ণা ছোট্ট প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কায়াকে ঘিরে বসেছে। তৃতীয় দলটা গড়ে উঠেছে মর্তেমার্ং ও আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে কেন্দ্র করে।

ভাইকোঁত্‌ সুদর্শন যুবক; নরম চোখ-মুখ, মার্জিত আচরণ; নিজেকে খ্যাতিমান মনে করলেও ভদ্রতার খাতিরে যে দলে বসেছে তার সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আন্না পাভ্‌লভ্‌নাও সমবেত অতিথিদের সামনে দর্শনীয় বস্তু হিসাবেই তাকে উপস্থিত করেছে। হোটেলের কুশলী পরিবেশনকারী যেভাবে একটি বিশেষ সুখাদ্য পরিবেশন করে, আন্না পাভ্‌লভ্‌নাও সেইভাবে প্রথমে ভাইকোঁত্‌কে ও পরে মঠাধ্যক্ষকে বিশিষ্ট খাদ্যবস্তু হিসাবে পরিবেশন করছে। মর্তেমার্ং-এর দল সঙ্গে সঙ্গেই ডুক্‌ দ'এন্‌ঘিন-এর হত্যা নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। ভাইকোঁত্‌ বলল যে, ডুক্‌ দ'এন্‌ঘিন তার নিজের উদারতার জন্যই মারা গেছে; তার প্রতি বোনাপার্তের বিদ্বেষেরও তো বিশেষ কারণও ছিল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না খুশি হয়ে বলল, "তা তো বটেই। সে বিষয়ে সব কথা আমাদের বলুন ভাইকোঁত্‌।"

ভাইকোঁত্‌ যে অনুরোধটি রাখতে রাজী সেটা বোঝাবার জন্য সে সহৃদয় হাসি হেসে মাথাটা নোয়ালো। সে কাহিনী সকলকে শোনাবার জন্য আন্না পাভ্‌লভ্‌না সকলকে ডেকে একত্র করল।

জনৈক অতিথির কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "ডুক্‌-এর সঙ্গে ভাইকোঁত্‌-এর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল।" আরেক জনকে বলল, "কথক হিসাবেও ভাইকোঁত্‌ চমৎকার।" আর তৃতীয়জনকে বলল, "একেবারে সেরা মহলে যে তার চলাফেরা।"

গল্প বলবার জন্য তৈরী হয়ে ভাইকোঁত্‌ ঈষৎ হাসল।

"প্রিয় হেলেন, তুমি এখানে এসে বস," যে সুন্দরী তরুণী প্রিন্সেসটি অন্য একটি দলের মধ্যমণি হয়ে কিছুটা দূরে বসেছিল, আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকেও কাছে ডাকল।

প্রিন্সেস হাসল। অপরূপ সুন্দরী নারীর মুখের যে হাসিটি নিয়ে সে প্রথম এই ঘরে ঢুকেছিল সেই অপরিবর্তনীয় হাসিটি মুখে নিয়েই সে উঠে দাঁড়াল। পাট-করা সাদা পোশাকের ঈষৎ খস্‌খস্‌ শব্দ তুলে, শুভ্র কাঁধ, চকচকে চুল, ঝলমলে হীরের দ্যুতি খেলিয়ে, প্রিন্সেস সমবেত পুরুষদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে এল। সকলেই তাকে পথ করে দিল, কিন্তু প্রিন্সেস কারও দিকে না তাকিয়ে শুধু হাসিটি বিতরণ করে এগিয়ে চলল। সেকালের ফ্যাসান অনুসারে নিজের

সুন্দর দেহ, সুঠাম কাঁধ, পিঠ ও বুককে সে এমনভাবে খুলে রেখেছে যাতে সকলেই সে সবের প্রশংসা করবার সুযোগ পায়। দেখে মনে হয়, আন্না পাভ্লভ্নার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে যেন একটা নাচ-ঘরের ঝল্কানি তার সঙ্গে নিয়ে চলেছে। হেলেনের রূপ এতই মোহময়ী যে তার চালচলনে কোনরকম বাচালতার চিহ্ন তো ছিলই না, বরং দেখে মনে হল নিজের সন্দেহাতীত বিজয়িনী রূপ সম্পর্কে সে যেন কিছুটা সংকোচগ্রস্ত। সে চায় তার রূপের প্রভাবকে খাটো করতে, কিন্তু পারে না।

যে তাকে দেখে সেই বলে, "কী চমৎকার!" ভাইকোঁত্-এর বিপরীত দিকের আসনে বসে সে যখন তার দিকে তাকিয়েও সেই অপরিবর্তনীয় হাসিটি হাসল তখন ভাইকোঁত্ এমনভাবে কাঁধ দুটি তুলে দুই চোখ আনত করল যেন একটা অসাধারণ কিছু দেখে সে চমকে উঠেছে।

সহাস্যে মাথাটা কাৎ করে সে বলল, "মাদাম, এ হেন শ্রোতৃবৃন্দের সামনে কিছু বলবার সামর্থ্য সম্পর্কে আমার নিজেরই সন্দেহ আছে।"

প্রিন্সেস তার উন্মুক্ত সুডৌল বাহুখানিকে একটি ছোট টেবিলের উপর রাখল; কোন জবাব দেওয়াই প্রয়োজন মনে করল না। হেসে অপেক্ষা করতে লাগল। যতক্ষণ গল্প বলা চলল ততক্ষণই সে সোজা হয়ে বসে রইল, কখনও চোখ রাখল তার সুডৌল বাহুখানির উপর, আবার কখনও বা সুন্দর বুকের উপর দৃষ্টি রেখে হীরের নেকলেসটিকে ঠিকভাবে বসিয়ে দিল। মাঝে মাঝে পোশাকের ভাঁজগুলোকে ঠিক করে নিল; আর যখনই গল্প বেশ জমে উঠেছে তখনই আন্না পাভ্লভ্নার দিকে তাকাচ্ছে, আর তার মুখের ভাবকে নিজের মুখে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে; তারপর আবার ফিরে যাচ্ছে তার উজ্জ্বল হাসিতে।

ছোট প্রিন্সেসও হেলেনের দেখাদেখি চায়ের টেবিল ছেড়ে চলে এসেছিল।

"একটু অপেক্ষা করুন, আমার সেলাইটা নিয়ে আসছি।...এবার বলুন, কি ভাবছেন?" প্রিন্স হিপোলিতের দিকে ফিরে বলল। "আমার সেলাইয়ের থলেটা নিয়ে এস।"

প্রিন্সেস যখন হাসিমুখে প্রত্যেকের সঙ্গে কথা বলতে এসে বহাল তবিয়তে আসনে বসল সেই সময়টুকুতে সকলেই একবার নড়েচড়ে বসল।

"এখন আমি স্থির হয়ে বসেছি," এই কথা বলে সেলাইটা হাতে নিয়ে সে ভাইকোঁত্‌কে গল্প শুরু করতে বলল।

প্রিন্স হিপোলিৎ সেলাইয়ের থলেটা এনে দিয়ে দলে ভিড়ে গেল এবং একটা চেয়ার টেনে এনে ছোট প্রিন্সেসের গা ঘেঁষে বসল।

হিপোলিৎকে দেখে অবাক হতে হয়। সুন্দরী বোনটির সঙ্গে তার অসাধারণ মিল, অথচ তা সত্ত্বেও সে অত্যন্ত কুৎসিত। বোনের মতই তার চোখ-মুখ, কিন্তু বোনের বেলায় যে মুখ আনন্দে, আত্ম-তৃপ্তিতে, যৌবনে সতত

প্রাণবন্ত, হাসিতে ও আশ্চর্য এক ধ্রুপদী দেহ-সুষমায় উজ্জ্বল, ভাইয়ের বেলায় সেই মুখ অপদার্থতা ও আরোপিত এক বিষণ্ণ আত্ম-বিশ্বাসে ক্লিষ্ট; তার দেহ শীর্ণ ও দুর্বল। তার চোখ, নাক, মুখ, সবই যেন এক অর্থহীন বিষণ্ণ বিকৃতিতে ভরা, হাত ও পায়ের অবস্থান যেন সর্বদাই কেমন অস্বাভাবিক।

"একটা ভূতের গল্প বলবেন না তো?" প্রিন্সেসের পাশে বসে সে বলে উঠল। তাড়াতাড়ি সে তার চশমাটা ঠিক করে নিল, যেন এই যন্ত্রটা ছাড়া সে কিছুই শুনতে পায় না।

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বক্তা বলল, "না, না, তা বলব না।"

"কারণ ভূতের গল্পকে আমি ঘৃণা করি," প্রিন্স হিপোলিত এমন সুরে কথাটা বলল যাতে মনে হয়, নিজের মুখে উচ্চারণ করলে তবেই সে কোন কথার অর্থ বুঝতে পারে। এত বেশী জোর দিয়ে সে কথাটা বলল যে তার বক্তব্যটা খুব বুদ্ধিদীপ্ত না অত্যন্ত বোকা-বোকা সেটাই শ্রোতারা ঠিক বুঝতে পারল না। তার পরিধানে গাঢ় সবুজ রঙের ফ্রক-কোট, হাল্‌কা রঙের ব্রীচেস জুতো ও রেশমী মোজা।

ভাইকোঁত্ সুন্দরভাবে গল্পটি বলল। ঘটনাটি তখন খুব চলতি। ডুক দ'এন্‌ঘিন গোপনে প্যারিতে গিয়েছিল মাদ্‌ময়জেল জর্জের সঙ্গে দেখা করতে, সেখানে বোনাপার্তের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়, বোনাপার্তও ছিল সেই বিখ্যাত অভিনেত্রীটির অনুকম্পার অংশীদার, ডুক-এর উপস্থিতিতেই বোনাপার্ত তার পুরনো মূর্ছারোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, এবং তার ফলে ডুক-এর একেবারে হাতের মুঠোয় এসে পড়ে। কিন্তু সে বোনাপার্তকে ছেড়ে দেয়, আর পরবর্তীকালে বোনাপার্ত মৃত্যু দিয়ে সে উদারতার প্রতিদান দেয়।

গল্পটি যেমন সুন্দর, তেমনি আকর্ষণীয়, বিশেষ করে সেই জায়গাটায় যেখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরকে চিনতে পারে, সেখানটায় মহিলারা খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

ছোট প্রিন্সেসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলে উঠল, "মনোরম!"

"মনোরম!" ফিস্ ফিস্ করে কথাটা বলে ছোট প্রিন্সেসও সেলাইতে একটা ছুঁচের ফোঁড় দিল, যেন গল্পের আকর্ষণে এতক্ষণ সে সেলাইটা করতে পারছিল না।

এই নীরব প্রশংসাকে সাদরে গ্রহণ করে ভাইকোঁত সকৃতজ্ঞ হাসি হেসে পুনরায় গল্প শুরু করতে প্রস্তুত হতেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না লক্ষ্য করল যে সেই যুবকটি মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে অত্যন্ত উদ্ধত ও সোচ্চারভাবে কথা বলে চলেছে; কাজেই সে তাড়াতাড়ি মঠাধ্যক্ষের উদ্ধারে এগিয়ে গেল। শক্তি-সাম্যের সমস্যা নিয়ে পিয়ের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে একটা আলোচনার সূত্রপাত করেছে, আর মঠাধ্যক্ষও যুবকটির সরলতা ও আগ্রহ দেখে নিজের প্রিয় মতবাদটি

তাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে। দুজনই সমান আগ্রহে ও সমান স্বাভাবিকভাবে কথা বলছে ও শুনছে, আর তাতেই আন্না পাভ্‌লভ্‌নার যত আপত্তি।

মঠাধ্যক্ষ তখন বলে চলেছে, "ইওরোপের শক্তি-সাম্য এবং জনগণের অধিকারই···পথ। এখন শুধু প্রয়োজন রাশিয়ার মত কোন শক্তিশালী জাতি —যদিও তাকে বর্বর বলা হয়ে থাকে—নিঃস্বার্থভাবে এসে একটি মিত্র-শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করুক, তার লক্ষ্য হোক ইওরোপে শক্তি-সাম্যকে অক্ষুণ্ণ রাখা ; তাহলেই সে মিত্র-শক্তি পৃথিবীকে রক্ষা করতে পারবে !"

"কিন্তু শক্তি-সাম্য কি ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখবেন ?" পিয়ের বলতে শুরু করল।

সেই মুহূর্তে আন্না পাভ্‌লভ্‌না এসে হাজির হল ; পিয়েরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে ইতালীয় লোকটিকে জিজ্ঞাসা করল, রাশিয়ার আবহাওয়া তার কেমন লেগেছে। মুহূর্তের মধ্যে ইতালীয় লোকটির মুখের ভাব বদলে গিয়ে বেশ মিষ্টি-মিষ্টি হয়ে উঠল , মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার সময় এটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

সে বলল, "যে সমাজে অভ্যর্থনা লাভ করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে সেই সমাজের, বিশেষ করে এখানকার নারী সমাজের বুদ্ধি ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ আমাকে এতই মুগ্ধ করেছে যে আবহাওয়ার কথা ভাববার মত সময় আমি এখনও পাই নি।"

মঠাধ্যক্ষ ও পিয়েরকে পালাবার সুযোগ না দিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাদের উপর নজর রাখবার সুবিধার জন্য দুজনকে বড় দলটার মধ্যে এনে হাজির করল।

অধ্যায়—৪

ঠিক সেই সময় আরও একজন অতিথি বসবার ঘরে ঢুকল : ছোট প্রিন্সেসের স্বামী প্রিন্স আন্দ্রু বল্‌কন্‌স্কি। সুদর্শন যুবক, উচ্চতা মাঝারি, চোখ-নাক-মুখ সুগঠিত। ক্লান্ত, একঘেয়ে মুখের ভাব থেকে শান্ত, পরিমিত পদক্ষেপ পর্যন্ত তার সব কিছুই তার প্রাণবন্ত ছোটখাটো স্ত্রীটির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, সে যে এই ঘরের সকলকেই চেনে তাই শুধু নয়, এরা সকলেই তার কাছে এতই বিরক্তিকর যে তাদের দিকে তাকাতে বা তাদের কথাবার্তা শুনতেও সে ক্লান্তি বোধ করে। আর এই যে সব মুখ তার কাছে এত একঘেয়ে লাগে তাদের মধ্যে সব চাইতে বিরক্তিকর মনে হয় তার সুন্দরী স্ত্রীর মুখখানি। এমন একটা মুখভঙ্গী করে প্রিন্স তার কাছ থেকে সরে গেল যে তার সুন্দর মুখটাও যেন বিকৃত হয়ে উঠল ; আন্না পাভ্‌লভ্‌নার হাতে চুমো খেয়ে সে চোখ কুঁচকে একে একে সমবেত সকলকেই দেখতে লাগল।

"আপনি নাকি যুদ্ধে চলে যাচ্ছেন প্রিন্স?" আন্না পাভ্লভ্না শুধাল।

একজন ফরাসী ভদ্রলোকের মত করে সেনাপতির নামের শেষ অংশের উপর জোর দিয়ে বল্কন্স্কি ফরাসী ভাষায় বলল, "জেনারেল কুতুজভ আমাকে তাঁর এড্-ডি-কং হিসাবে গ্রহণ করেছেন।"···

"আর লিসে, আপনার স্ত্রী?"

"সে দেশের বাড়িতে চলে যাবে।"

"আপনার মনোরমা স্ত্রীটির সঙ্গ থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে আপনার লজ্জা হচ্ছে না?"

যে রকম গায়ে-পড়াভাবে সে অন্য সব পুরুষের সঙ্গেই কথা বলে থাকে তেমনিভাবেই স্বামীকে সম্বোধন করে তার স্ত্রী বলল, "আন্দ্রে, মাদ্ময়জেল জর্জ ও বোনাপার্তকে নিয়ে এমন একটা গল্প ভাইকোঁত্ আমাদের বলছেন!"

প্রিন্স আন্দ্রু চোখ দুটো কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে নিল। প্রিন্স আন্দ্রু ঘরে ঢোকামাত্রই পিয়ের তাকে লক্ষ্য করছিল পরিতুষ্ট সস্নেহ দৃষ্টিতে; এবার সে এগিয়ে এসে তার হাতটা ধরল। প্রিন্স আন্দ্রু এবারও ভুরু কোঁচকাল; যে কেউ তার হাত ধরলেই সে বিরক্তি বোধ করে; কিন্তু পিয়েরের উজ্জল মুখের দিকে তাকিয়ে তার মুখে একটা অপ্রত্যাশিত সদয় স্মিত হাসি ফুটে উঠল।

"এই যে! ···এই বিরাট জমায়েতে আপনিও হাজির দেখছি?" পিয়েরকে বলল।

পিয়ের জবাব দিল, "আমি জানতাম আপনি এখানে আসবেন। নৈশভোজেও আমি আপনার সঙ্গে যোগ দেব। দিতে পারি তো?" যাতে ভাইকোঁতের গল্প বলায় ব্যাঘাত না ঘটে সে জন্য বেশ নীচু গলায় সে কথাটা বলল।

"না, অসম্ভব!" প্রিন্স আন্দ্রু হেসে বলে উঠল; এমনভাবে সে পিয়েরের হাতটা চেপে ধরল যাতে বোঝা যায় যে এ ধরনের প্রশ্ন করবার কোন দরকারই ছিল না। আরও কিছু বলবার ইচ্ছা তার ছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে প্রিন্স ভাসিলি ও তার মেয়ে যাবার জন্য উঠে পড়ায় যুবক দুটিও তাদের পথ করে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

বন্ধুর মত হাত ধরে ফরাসী ভদ্রলোকটিকে বসিয়ে দিয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলল, "প্রিয় ভাইকোঁত্, আমাকে ক্ষমা করবেন। দুর্ভাগ্যবশত দূতাবাসের ভোজসভায় যোগ দিতে হবে বলে এই সুখ থেকে আমাকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে, আর আপনাদের বিঘ্ন ঘটাতেও বাধ্য হচ্ছি। আপনার মনোরম সঙ্গ ত্যাগ করতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত," আন্না পাভ্লভ্নার দিকে ফিরে সে শেষের কথাগুলি বলল।

তার মেয়ে প্রিন্সেস হেলেন পোশাকের ভাঁজগুলোকে আল্তো করে তুলে ধরে চেয়ারের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গেল; তার সুন্দর মুখের উপর একটা উজ্জল

হাসি ঝলমলিয়ে উঠল। তার দিকে চেয়ে পিয়েরের চোখে এমন একটা উচ্ছাস ছড়িয়ে পড়ল যেন সে ভয় পেয়েছে।

"খুব মনোরমা," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"খুব," পিয়ের বলল।

প্রিন্স ভাসিলি যেতে যেতে পিয়েরের হাতটা চেপে ধরে আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে বলল: "আমার হয়ে এই ভালুকটাকে শিখিয়ে পড়িয়ে একটু মানুষ করে তুলুন। একটা পুরো মাস সে আমার কাছে আছে, অথচ এই প্রথম তাকে আমি সমাজে মিশতে দেখলাম। একটি যুবকের পক্ষে চতুরা রমণীদের সাহচর্যের মত দরকারী আর কিছু নেই।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না হেসে কথা দিল, পিয়েরকে সে হাতে নিল। সে জানে প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে তার বাবার যোগাযোগ আছে। যে বয়স্কা মহিলাটি বুড়ি মাসির কাছে বসেছিল সে তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে পাশের ঘরে প্রিন্স ভাসিলিকে ধরে ফেলল। তার মুখে উদ্বেগ ও ভয় ফুটে উঠেছে।

পাশের ঘরে ছুটে গিয়ে সে বলল, "আমার ছেলে বরিস-এর কি হল প্রিন্স? আমি তো আর পিতার্সবুর্গে থাকতে পারছি না। ফিরে গিয়ে বেচারি ছেলেটাকে কি খবর জানাব আমাকে বলে দিন।"

প্রিন্স ভাসিলি অনিচ্ছার সঙ্গেই বয়স্কা মহিলাটির কথা শুনল; তার প্রতি খুব একটা ভদ্র ব্যবহারও করল না, বরং তার আচরণে একটু অধৈর্যই প্রকাশ পেল, তবু মহিলাটি বিগলিত হাসি হেসে তার হাতটা চেপে ধরল, যাতে সে চলে যেতে না পারে।

"সম্রাটকে শুধু একটি কথা যদি বলেন তাহলেই তো সঙ্গে সঙ্গে তাকে রক্ষী বাহিনীতে বদলি করে দেওয়া হবে, আর তাতে তো আপনার কোনই ক্ষতি হবে না," মহিলাটি বলল।

প্রিন্স ভাসিলি জবাব দিল, "বিশ্বাস করুন প্রিন্সেস, আমার পক্ষে যা করা সম্ভব সবই করতে আমি প্রস্তুত; কিন্তু সম্রাটকে কোন অনুরোধ করা আমার পক্ষে শক্ত। আমার কথা শুনুন, প্রিন্স গোলিৎসিন্‌কে দিয়ে রুমিয়ান্ত্‌সেভ-এর কাছে আবেদন রাখুন। সেটাই সব চাইতে ভাল পথ।"

বয়স্কা মহিলাটি ছিলেন প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কায়া, রাশিয়ার একটি সেরা পরিবারের মেয়ে, কিন্তু এখন সে গরীব হয়ে পড়েছে, দীর্ঘদিন সমাজের বাইরে থাকায় আগেকার প্রভাব-প্রতিপত্তিও হারিয়ে ফেলেছে। একমাত্র ছেলের জন্য রক্ষীবাহিনীতে একটা চাকরি যোগাড় করবার জন্যই সে এখন পিতার্সবুর্গে এসেছে। আসলে শুধুমাত্র প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে দেখা করবার জন্যই সে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার এই জমায়েতের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল এবং এতক্ষণ বসে ভাইকোঁতের গল্প শুনেছে। প্রিন্স ভাসিলির কথাগুলি তাকে ভীত করে তুলল, তার একদা সুন্দর মুখের উপর তিক্ততার একটা ছায়া পড়ল; কিন্তু সে মুহূর্তের

জন্য ; পরক্ষণেই আবার হেসে উঠে সে আরও জোরে প্রিন্স ভাসিলির হাতটা চেপে ধরল।

"আমার কথা শুনুন প্রিন্স," সে বলতে লাগল। "আজ পর্যন্ত আপনার কাছে আমি কিছুই চাই নি, আর কখনও চাইবও না ; আমার বাবার সঙ্গে যে আপনার বন্ধুত্ব ছিল সে কথাও কোনদিন আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেই নি. ঈশ্বরের নামে শুধু এই একটিবার আপনাকে অনুরোধ করছি, আমার ছেলের জন্য এটুকু আপনি করুন—আর এ জন্য চিরদিন আপনাকে আমাদের উপকারী বন্ধু বলে মনে করব," সে তাড়াতাড়ি কথাগুলি যোগ করল। "না, আপনি রাগ করবেন না ; আমাকে কথা দিন ! গোলিৎসিন্‌কে বলেছিলাম, তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনি তো চিরদিনই দয়ালুহৃদয়, আমাকে দয়া করুন," চোখে জল ভরে এলেও হাসবার চেষ্টা করে সে কথাগুলি বলল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সুন্দর মাথাটা বেঁকিয়ে নিজের সুডৌল কাঁধের উপর দিয়ে তাকিয়ে প্রিন্সেস হেলেন বলল, "বাপি, আমাদের দেরি হয়ে যাবে।"

সমাজের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তি হচ্ছে মূলধন, সেটাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ব্যয়বাহুল্যকে অবশ্যই ছাঁটাই করতে হবে। প্রিন্স ভাসিলি সে কথা জানে, সে বোঝে, যে যখন চাইবে তার কথা রাখতেই সে যদি সম্রাটকে অনুরোধ করে, তাহলে সে তো নিজের জন্য আর কিছুই চাইতে পারবে না. তাই নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাবার ব্যাপারে সে কিছুটা কৃপণতা অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কায়ার দ্বিতীয় আবেদনের পরে সে যেন কিছুটা বিবেকের দংশন অনুভব করল। একটি সত্য কথাই মহিলাটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, জীবনে উন্নতির প্রথম ধাপের জন্য তার বাবার কাছে সে সত্যি ঋণী। তাছাড়া, তার ভাবভঙ্গী দেখেই সে বুঝতে পেরেছে যে এই মহিলাটি সেই সব নারীদের—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়েদের—একজন যারা একবার মনস্থির করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত থামে না, এবং দরকার হলে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলতে পারে, এমন কি একটা হৈ-চৈ পর্যন্ত বাধাতে পারে। এই শেষ বিবেচনাটিই তাকে বিচলিত করল।

বলল, "প্রিয় আন্না মিখায়লভ্‌না, আপনি যা চাইছেন সে কাজ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ; কিন্তু আপনার প্রতি আমার অনুরাগ এবং আপনার বাবার স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধাকে প্রমাণ করতে সেই অসম্ভব কাজই আমি করব—আপনার ছেলেকে রক্ষীবাহিনীতে বদলি করা হবে। এ কাজ আমি হাতে নিলাম। আপনি খুশি তো ?"

"প্রিয় উপকারী বন্ধু ! আপনার কাছে এইটাই আমি প্রত্যাশা করেছিলাম—আপনার দয়ার কথা আমি জানি !" প্রিন্স ভাসিলি যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।

"দাঁড়ান—মাত্র একটি কথা! সে যখন রক্ষীবাহিনীতে বদলি হবে···," সে একটু থামল, "মাইকেল ইলারিওনেভিচ কুতুজভ-এর সঙ্গে তো আপনার হৃদ্যতা আছেই···তাকে একটু বলবেন যেন বরিসকে তার অ্যাড্‌জুটাণ্ট করে নেন। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হই, আর তার পরে···"

প্রিন্স ভাসিলি হাসল।

"না, সে কথা আমি দিতে পারব না। আপনি জানেন না প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হবার পর থেকে কুতুজভকে কতভাবে বিরক্ত হতে হচ্ছে। সে নিজে আমাকে বলেছে, মস্কোর সব মহিলারা তাদের সব ছেলেকে অ্যাড্‌জুটাণ্ট বানিয়ে দেবার জন্য তার হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্র করেছে।"

"না, আপনাকে কথা দিতেই হবে! আমি আপনাকে ছাড়ব না।···"

সুন্দরী কন্যাটি আগের মত সুরেই বলল, "বাপি, আমাদের দেরি হয়ে যাবে।"

"আচ্ছা, তা হলে আসি! বিদায়! ওর কথা শুনলেন তো?"

"তাহলে কাল আপনি সম্রাটকে বলছেন তো?"

"নিশ্চয়; কিন্তু কুতুজভ-এর ব্যাপারে আমি কথা দিচ্ছি না।"

"কথা দিন, কথা দিন ভাসিলি।" আন্না মিখায়লভ্‌না চীৎকার করে বলল; তার ঠোঁটে সেই বালিকাসুলভ কপট প্রেমের হাসি যা তার পরিণত বয়সের চিন্তাক্লিষ্ট মুখে একান্তই বেমানান।

পরিষ্কার বোঝা যায় সে তার বয়সের কথা ভুলে গেছে; তাই অভ্যাসবশতই নারীসুলভ পুরনো ছলাকলার আশ্রয় নিতে পারছে। কিন্তু প্রিন্স চলে যাওয়ামাত্রই তার মুখে আগেকার নিরুত্তাপ নকল ভাব ফুটে উঠল। আবার সে ভাইকোঁতের গল্প শুনতে দলের মধ্যে ফিরে গেল এবং বাড়ি যাবার সময় না হওয়া পর্যন্ত গল্প শোনার ভাণই করে যাবে। তার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধই হয়ে গেছে।

অধ্যায়—৫

আন্না পাভ্‌লভ্‌না জিজ্ঞাসা করল, "মিলানে রাজ্যাভিষেক—এই সাম্প্রতিক হাসির নাটক সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন? আবার এই যে জেনোয়া ও লুক্কার জনসাধারণ মঁসিয় বোনাপার্তের কাছে তাদের দরখাস্ত পেশ করল এবং সিংহাসনে বসে মঁসিয় বোনাপার্ত জাতিসমূহের দরখাস্ত মঞ্জুর করল—এ হাসির নাটকটি সম্পর্কেই বা আপনি কি মনে করেন? প্রশংসনীয়! একটা মানুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট! দেখেশুনে মনে হয়, গোটা পৃথিবীই বুঝি পাগল হয়ে গেছে।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্স আন্দ্রু সরাসরি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মুখের দিকে তাকাল!

"Dieu me la donne, gare a qui la touche! (ঈশ্বর আমাকে এটি দিয়েছেন, কে এটিকে স্পর্শ করবে সে বিষয়ে তিনিই সাবধান হবেন!)—রাজ্যাভিষেকের সময় বোনাপার্তই কথাগুলি বলেছিল। সকলেই বলছে কথাগুলি সে ভালই বলেছে।" এই মন্তব্য করে প্রিন্স ইতালীয় ভাষাতে কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল: Dio mi la dona, gai a qui la tocca!"

"আশা করি গ্লাসটা ভরে উপচে পড়ার পক্ষে এটাই হবে শেষ জলের ফোঁটা" আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলতে লাগল। "এই লোকটা সব কিছুর পক্ষে ক্ষতিকর; কোন রাষ্ট্র তাকে সহ্য করতে পারবে না।"

"রাষ্ট্র? আমি রাশিয়ার কথা বলছি না," বিনীত অথচ হতাশ গলায় ভাইকোঁত্‌ বলল: "রাষ্ট্রের কথা মাদাম·· চতুর্দশ লুইর জন্য, রাণীর জন্য, মাদাম এলিজাবেথের জন্য, তারা কি করেছে? কিচ্ছু না! ভাইকোঁত্‌ আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। "আমার কথা বিশ্বাস করুন, বুরবনদের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার উচিৎ পুরস্কার তারা পাচ্ছে। আরে, সেই পরস্বাপহারীকে পূজা কবনার জন্য তারা তো রাষ্ট্রদূত পাঠাচ্ছে।"

ঘৃণার সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে সে নড়েচড়ে বসল।

প্রিন্স হিপোলিত কিছুক্ষণ যাবৎ চশমার ভিতর দিয়ে ভাইকোঁত্‌কে দেখছিল; হঠাৎ সে সম্পূর্ণভাবে ছোট প্রিন্সেসের দিকে ঘুরে গেল এবং একটা ছুঁচ চেয়ে টেবিলের উপর একটা কুল-চিহ্ন আঁকতে শুরু করল। এমন গুরুত্বের সঙ্গে সে ছোট প্রিন্সেসকে ব্যাপারটা বোঝাতে লাগল যেন সেই তাকে ওটা আঁকতে বলেছে। আসলে সে কতকগুলি অর্থহীন উদ্ভট কথা আওড়াতে লাগল।

ভাইকোঁত্‌ বলল, "বোনাপার্ত যদি আরও একটি বছর ফ্রান্সের সিংহাসনে থাকে তাহলে অবস্থা আরও অনেক দূর গড়াবে। ষড়যন্ত্র, হিংসা, নির্বাসন, ও মৃত্যুদণ্ডের পথ ধরে ফরাসী সমাজ—আমি বলতে চাই সৎ ফরাসী সমাজ—চিরদিনের মত ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তারপরে···"

ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে সে হাত দুটো বাড়িয়ে ধরল। কথাগুলি ভাল লাগায় পিয়ের কি যেন বলতে চেয়েছিল, কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌নার নজর ছিল তার উপর; সে তাকে বাধা দিল।

রাজ-পরিবারের উল্লেখমাত্রেই তার গলায় যে বিষণ্ণতার স্বর বেজে ওঠে সেই স্বরে সে বলে উঠল, "সম্রাট আলেক্সান্দার ঘোষণা করেছেন, ফরাসী জনগণ কোন্‌ ধরনের সরকার বেছে নেবে সেটা তিনি তাদের উপরেই ছেড়ে দেবেন; আর আমার বিশ্বাস, একবার সেই পরস্বাপহারীর হাত থেকে মুক্তি পেলে সমগ্র জাতি নিশ্চয় প্রকৃত রাজার কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে।"

"সেটা সন্দেহজনক," প্রিন্স আন্দ্রু বলল। "মঁসিয় লা ভাইকোঁত্ যথার্থই ধরেছেন যে ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। আমি তো মনে করি, পুরনো শাসন-ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া কঠিন হবে।"

পিয়ের মুখ লাল করে আলোচনায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, "আমি যতদূর শুনেছি, প্রায় সব অভিজাত লোকরা ইতিমধ্যেই বোনাপার্তের দলে ভিড়ে পড়েছে।"

পিয়েরের দিকে না তাকিয়েই ভাইকোঁত্ বলল, "বোনাপার্তের সমর্থকরাই একথা বলে। এই মুহূর্তে ফরাসী জনমতের প্রকৃত অবস্থা বোঝা শক্ত।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "বোনাপার্তও তাই বলে।"

ভাইকোঁতের দিকে তাকিয়ে কথাগুলি না বললেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে লোকটিকে সে পছন্দ করে না, আর তাকে লক্ষ্য করেই সে মন্তব্যটা করেছে।

কিছু সময় চুপ করে থেকে প্রিন্স আন্দ্রু নেপোলিয়নের কথারই উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে লাগল, "আমি তাদের গৌরবের পথ দেখালাম, কিন্তু তারা সে পথে গেল না। আমি বৈঠকখানা খুলে দিলাম, তারা সেখানেই ভিড় করল।" এ কথা বলবার হক তার ছিল কিনা আমি জানি না।"

"মোটেই ছিল না," ভাইকোঁত্ জবাব দিল। "ডিউকের হত্যার পরে তার অতিবড় পক্ষপাতীও তাকে আর বীর বলে মনে করত না। যদি বা আগে সে কারও কারও কাছে বীর সেজেছিল, ডিউকের হত্যার পরে স্বর্গে বেড়ে গেছে একজন শহীদ, আর মর্ত্যে কমে গেছে একজন বীর।"

আন্না পাভ্লভ্না ও অন্যরা একটু হেসে ভাইকোঁতের মন্তব্যকে প্রশংসা করবার আগেই পিয়ের আবার আলোচনায় বাধা দিল। আন্না পাভ্লভ্না জানত যে সে কোন অনুপযুক্ত কথাই বলবে, তবু তাকে থামাতে পারল না।

মঁসিয় পিয়ের জোর গলায় বলল, "রাজনীতির বিচারে ডুক্ দ এন্‌ঝিন-এর হত্যা ছিল একান্ত প্রয়োজন; আমার তো মনে হয়, সে কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিতে ভয় না করে নেপোলিয়ন আত্মিক মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছে।"

অনুচ্চ ভয়ার্ত স্বরে আন্না পাভ্লভ্না বলে উঠল, "ঈশ্বর! হে আমার ঈশ্বর!"

হেসে সেলাইটাকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে ছোট প্রিন্সেস বলল, "সে কি মঁসিয় পিয়ের···আপনি কি মনে করেন হত্যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পায় আত্মিক মহত্ত্ব?"

"হায়! হায়!" কয়েকজন সোচ্চারে বলল।

"চমৎকার!" প্রিন্স হিপোলিত ইংরেজিতে বলল; তারপর হাতের তালু দিয়ে হাঁটু বাজাতে লাগল।

ভাইকোঁত্ শুধুমাত্র ঘাড় ঝাঁকুনি দিল। পিয়ের চশমার উপর দিয়ে

গম্ভীরভাবে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, "আমি তাই বলছি, কারণ জনসাধারণকে অরাজকতার মধ্যে ফেলে রেখে বুর্‌বনরা বিপ্লবের কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল; একমাত্র নেপোলিয়নই বিপ্লবকে বুঝতে পেরেছিল, তাকে শান্ত করেছিল, আর তাই সকলের মঙ্গলের জন্য একটি মানুষের জীবন বাঁচাতে মাঝপথে থেমে যায় নি।"

"আপনি এবার অন্য টেবিলে চলুন না?" আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল।

তার কথায় কান না দিয়ে পিয়ের বক্তৃতা করেই চলল। অধিকতর আগ্রহের সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "না। নেপোলিয়ন মহান, কারণ সে বিপ্লবের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিল, তার দোষ-ত্রুটিগুলোকে বাদ দিতে পেরেছিল, বিপ্লবের যা কিছু ভাল—সকল নাগরিকের সাম্য, বাক্যের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা—সে সব রক্ষা করেছিল, আর শুধু সেই কারণেই ক্ষমতা তার হাতে এসেছিল।"

"হ্যাঁ, ক্ষমতা হাতে পেয়ে সেই সুযোগে হত্যা না করে সে যদি সেই ক্ষমতাকে প্রকৃত রাজার হাতে তুলে দিত, তাহলে তাকে আমি মহাপুরুষ বলতাম," ভাইকোঁত্ মন্তব্য করল।

"তা সে করতে পারে না। সে যাতে জনসাধারণকে বুর্‌বনদের হাত থেকে বাঁচাতে পারে সেই জন্যই তারা তার হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল, কারণ তারা বুঝেছিল যে সে একজন মহান পুরুষ। বিপ্লব একটি মহান বস্তু!"

"কি? বিপ্লব আর রাজহত্যা মহৎ বস্তু? ···আচ্ছা, তারপর···কিন্তু আপনি অন্য টেবিলে আসুন না?" আন্না পাভ্‌লভ্‌না আর একবার কথাটা বলল।

উপেক্ষার হাসি হেসে ভাইকোঁত্ বলল, "রুশোর Contract Social."

"রাজহত্যার কথা আমি বলছি না, বলছি ধারণার কথা।"

"হ্যাঁ: ডাকাতি, খুন, রাজহত্যার ধারণা," একটি ব্যঙ্গকঠিন কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হল।

"নিঃসন্দেহে সেগুলি চরম ব্যবস্থা, কিন্তু আসল কথা তো তা নয়। আসল কথা হল, মানুষের অধিকার, সংস্কার হতে মুক্তি, নাগরিক সাম্য, আর এ সব ধারণাকেই নেপোলিয়ন পূর্ণ শক্তিতে রক্ষা করেছে।"

ভাইকোঁত্ শেষ পর্যন্ত স্থির করল, এই যুবকের কথাগুলি যে কত অর্থহীন সেটা তাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেবে; তাই একান্ত উপেক্ষার সঙ্গে সে বলল, "স্বাধীনতা ও সাম্য—এসব বড় বড় কথা অনেকদিন বাতিল হয়ে গেছে। স্বাধীনতা ও সাম্য কে না ভালবাসে? আমাদের ত্রাণকর্তা পর্যন্ত স্বাধীনতা ও সাম্য প্রচার করে গেছেন। বিপ্লবের পরে মানুষ কি বেশী সুখী হয়েছে? ঠিক উল্টো। আমরা চেয়েছিলাম স্বাধীনতা, কিন্তু বোনাপার্ত তাকে ধ্বংস করেছে।"

প্রিন্স আন্দ্‌. স্মিত হাসির সঙ্গে পিয়েরের থেকে ভাইকোঁতের দিকে এবং

ভাইকোঁত্ থেকে গৃহকর্ত্রীর দিকে তাকাতে লাগল। পিয়েরের উচ্ছ্বসিত কথাবার্তা শুনে প্রথমটা আন্না পাভ্‌লভ্‌না ভয়ে আঁতকে উঠেছিল। কিন্তু যখন দেখল যে পিয়েরের অশালীন কথাবার্তা শুনে ভাইকোঁত্ মোটেই উত্তেজিত হয় নি এবং নিজেও ভাল করে বুঝতে পারল যে এ যুবকটিকে থামানো অসম্ভব, তখন সে সর্বশক্তি নিয়ে ভাইকোঁতের সঙ্গে যোগ দিয়ে একসঙ্গে বক্তাটিকে কঠোরভাবে আক্রমণ করল।

বলল, "কিন্তু প্রিয় মঁসিয় পিয়ের, একজন মহাপুরুষ যে বিনা বিচারে একজন নিরপরাধ ডিউককে—কিংবা একজন সাধারণ মানুষকে হত্যা করল, তার কি ব্যাখ্যা আপনি দেবেন?"

ভাইকোঁত্ বলল, "আমি কিন্তু জানতে চাই, ১৮তম ব্রুমেয়ার-এর কি ব্যাখ্যা মঁসিয় দেবেন: সেটা কি প্রবঞ্চনা নয়? সে তো একটা জোচ্চুরি; মোটেই একজন মহাপুরুষের মত আচরণ নয়!"

"আর আফ্রিকায় যে বন্দীদের সে খুন করেছে? সে তো ভয়াবহ!" দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে ছোট প্রিন্সেস বলল।

"আপনি যাই বলুন, সে অতি হীন লোক," প্রিন্স হিপোলিত মন্তব্য করল।

কার কথার জবাব দেবে বুঝতে না পেরে পিয়ের সকলের দিকে তাকিয়েই হাসল। তার সে হাসি অন্য লোকের মত আধখানা হাসি নয়। সে হাসলেই তার গম্ভীর মুখে সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে এমন একটি শিশুর মত বরং বলা যায় বোকা-বোকা-ভাব যে মনে হয় সে যেন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে।

যুবকটির সঙ্গে ভাইকোঁতের এই প্রথম সাক্ষাৎ; সেও স্পষ্ট বুঝতে পার যে এই তরুণ জ্যাকোবিনটি মুখে যত বড় বড় কথা বলে আসলে ততটা ভয় নয়। সকলেই চুপচাপ হয়ে গেল।

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "উনি একসঙ্গে আপনাদের সকলের কথার জবাব দেবেন, এটা আপনারা আশা করছেন কেমন করে? তাছাড়া, একজন কূটনীতিকের কাজকর্ম প্রসঙ্গে ব্যক্তি হিসাবে, সেনাপতি হিসাবে ও সম্রাট হিসাবে তার কাজের বিচার তো আলাদা আলাদা ভাবেই করতে হবে। আমার তো তাই মনে হয়।"

নতুন করে একজনের সমর্থন পেয়ে খুশি হয়ে পিয়ের বলে উঠল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, অবশ্যই।"

প্রিন্স আন্দ্রু বলতে লাগল, "এ কথা তো স্বীকার করতেই হবে যে আর্কোলার সেতুর উপরে এবং জাফার হাসপাতালে সে যখন প্লেগ-রোগীদের সেবায় হাত দিয়েছিল, তখন মানুষ হিসাবে নেপোলিয়ন অবশ্যই মহান; কিন্তু ···আবার এমন সব কাজ আছে যাকে সমর্থন করা শক্ত।"

পিয়েরের অপটু মন্তব্যের ধারটাকে একটু নরম করে দেওয়াই ছিল প্রিন্স

আন্দ্রুর আসল উদ্দেশ্য। উঠে দাঁড়িয়ে সে স্ত্রীকে ইঙ্গিতে জানাল, যাবার সময় হয়ে গেছে।

হঠাৎ প্রিন্স হিপোলিত ইঙ্গিতে সকলের মনোযোগ আহ্বান করে সকলকে বসতে বলল; তারপর বলতে শুরু করল:

"আজই একটি চমৎকার মস্কোর গল্প আমি শুনেছি, আর সেটা আপনাদের শোনাতে চাই। ক্ষমা করবেন ভাইকোঁত্, গল্পটা আমি রুশ ভাষায় বলব, অন্যথায় তার মজাই নষ্ট হয়ে যাবে…।" কোন ফরাসী ভদ্রলোক বছরখানেক রাশিয়াতে বাস করবার পরে যে রকম রুশ ভাষা বলে ঠিক তেমনি ভাষায় প্রিন্স হিপোলিত গল্প বলতে শুরু করল। এমন আগ্রহে আর এত বেশী জোরের সঙ্গে সে সকলকে গল্পটা শুনতে বলল যে সকলেই গল্প শুনতে বসে রইল।

"মস্কোতে এক মহিলা বাস করেন; তিনি খুব কৃপণ। তার গাড়ির পিছনে দুজন সহিস থাকা চাই, বেশ বড় গোছের। সেটাই তার পছন্দ। তার একটি পরিচারিকা ছিল, সেও বড়সড়। মহিলাটি বলল…'

এখানে প্রিন্স হিপোলিত থামল; বেশ কষ্ট করে গল্পটাকে মনে মনে গুছিয়ে নিল।

"মহিলাটি বলল…ও হ্যাঁ, বলল, 'দেখ মেয়ে, যখনই আমি কোথাও যাব তখনই ভাল করে তক্‌মা এঁটে গাড়ির পিছনে চড়ে বসবে।'"

শ্রোতারা হাসবার আগেই এখানে প্রিন্স হিপোলিত নিজেই হো-হো করে হেসে উঠল; তার ফলটা বক্তার পক্ষে মোটেই ভাল হল না। অবশ্য বয়স্কা মহিলা ও আন্না পাভ্‌লভ্‌নাসহ কয়েকজন হেসে উঠল।

"মহিলাটি চলেছে। হঠাৎ জোর বাতাস উঠল। মেয়েটির টুপি উড়ে গেল, আর তার লম্বা চুল এলিয়ে পড়ল।"…এখানে সে আর হাসি চাপতে পারল না। হাসির ফাঁকে ফাঁকেই কথা বলতে লাগল: "আর সারা জগৎ জেনে ফেলল…।'

এইভাবে গল্পটা শেষ হল। কেন যে সে গল্পটা বলল, আর কেনই বা রুশ ভাষাতে বলল, তা ঠিক বোঝা গেল না; তবু সে যে এইভাবে বুদ্ধি করে পিয়েরের অপ্রীতিকর ও অশোভন বক্তৃতাটাকে একটা সুন্দর পরিণতিতে টেনে আনতে পেরেছে সেজন্য আন্না পাভ্‌লভ্‌না ও অন্য সকলে প্রিন্স হিপোলিতের প্রশংসাই করল। গল্পটার শেষে আলোচনা অন্য পথে মোড় নিল: আগেকার ও পরবর্তী বল-নাচ, থিয়েটার, কবে ও কোথায় কে কার সঙ্গে দেখা করবে—প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অতি সাধারণ ছোটখাট কথাবার্তা শুরু হল।

অধ্যায়—৬

মনোরম সান্ধ্য আসরের জন্য আন্না পাভ্‌লভ্‌নাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অতিথিরা বিদায় নিতে শুরু করল।

পিয়ের কেমন যেন বেমানান। মজবুত গড়ণ, উচ্চতা সাধারণ, চওড়া শরীর। বড় বড় লাল হাত। কিন্তু কেমন যেন; কথায় বলে, সে না জানে বৈঠকখানায় ঢুকতে, না জানে সেখান থেকে বের হতে; অর্থাৎ বিদায় নেবার আগে দুটো ভাল কথা কেমন করে বলতে হয় তাও জানে না। তার উপর, বে-খেয়াল। বিদায় নিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের টুপির বদলে সে সেনাপতির তিন-কোণা টুপিটা তুলে নিল, এবং সেনাপতি চেয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সেটা নিজের হাতেই রেখে দিল। অবশ্য তার এই খেয়ালের অভাব, ঘরে ঢুকবার বা কথা বলবার আদব-কায়দার অভাব—এ সবই ঢাকা পড়ে যায় তার সদয়, সরল ও বিনীত আচরণে। আন্না পাভ্‌লভ্‌না তার দিকে এগিয়ে খৃস্টান-সুলভ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল: "আশা করি আবার আপনার দেখা পাব; আরও আশা করি আপনার মতামতগুলো আপনি বদলাবেন প্রিয় মঁসিয় পিয়ের।"

পিয়ের কোন জবাব দিল না, শুধু মাথাটা নোয়াল; কিন্তু তার হাসিটি সকলেরই নজরে পড়ল, সে-হাসিতে বুঝি এই কথাটিই শুধু প্রকাশ পেল, "মতে কি আসে যায়, কিন্তু দেখুন তো আমি লোকটি কত সৎ-স্বভাব।" আর সকলেই, এমন কি আন্না পাভ্‌লভ্‌নাও সেটা অনুভব করল।

প্রিন্স আন্দ্রু তখন হল-ঘরে চলে গেছে; জোব্বাটা পরতে পরিচারক তাকে সাহায্য করছে; তার দিকে মুখ ফিরিয়ে সে নিরাসক্তভাবে প্রিন্স হিপোলিতের সঙ্গে তার স্ত্রীর কথাবার্তা শুনতে লাগল। তারা দুজনেও হল-ঘরে চলে এসেছে। সুন্দরী, গর্ভিনী প্রিন্সেসের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রিন্স হিপোলিত চশমার ভিতর দিয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ছোট প্রিন্সেস বলল, "আপনি ভিতরে যান আন্নেৎ, আপনার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে।" তারপর বলল, "তাহলে ঐ কথাই রইল।"

আনাতোল ও ছোট প্রিন্সেসের ননদের সঙ্গে বিয়ের ব্যাপারে আন্না পাভ্‌লভ্‌না ইতিমধ্যেই লিজার সঙ্গে কথা বলেছে।

নীচু গলায় আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আপনার উপর আমার অনেক ভরসা। তাকে চিঠি লিখুন এবং এ ব্যাপারে তার বাবার মতামত আমাকে জানাবেন। বিদায়!"—সে হল-ঘর থেকে চলে গেল।

প্রিন্স হিপোলিত ছোট প্রিন্সেসের কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখটাকে তার খুব কাছে নিয়ে ফিস ফিস করে কি যেন বলল।

উভয়ের পরিচারকই একটা শাল ও একটা জোব্বা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কতক্ষণে তাদের কথা শেষ হবে। ফরাসী ভাষার কথাগুলি তাদের কাছে অর্থহীন হলেও তারা এমনভাবে শুনতে লাগল যেন বুঝতে পারছে, অথচ সেটা তাদের জানতে দিতে চাইছে না। প্রিন্সেস যথারীতি কথা বলছে ঈষৎ হেসে আর কথা শুনে হাসছে হো হো করে।'

প্রিন্স হিপোলিত বলল, "রাষ্ট্রদূতের ওখানে না গিয়ে কী ভালই যে করেছি, কী যে একঘেয়ে ব্যাপার—। সন্ধ্যাটা বড়ই আনন্দে কাটল, তাই না? বড় ভাল!"

ছোট ঠোঁটটি তুলে ধরে প্রিন্সেস বলল, "সকলে বলছে বল-নাচটা খুব ভাল হবে। সমাজের সব সুন্দরীরা সেখানে হাজির হবে।

"সকলে নয়। কারণ আপনি তো সেখানে থাকছেন না; সকলে নয়," সানন্দ হাসি হেসে প্রিন্স হিপোলিত বলল; তারপর পরিচারকের কাছ থেকে শালটা নিয়ে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শালটা প্রিন্সেসের গায়ে জড়িয়ে দিল। ইচ্ছা করেই কি না কে জানে, শালটা জড়িয়ে দেবার পরেও সে অনেকক্ষণ হাত দিয়ে ছোট প্রিন্সেসকে ঘিরে ধরে রাখল, যেন আলিঙ্গন করল।

প্রিন্সেস হাসতে হাসতে বেশ ভদ্রভাবে সেখান থেকে সরে গেল, তার দৃষ্টি তখন স্বামীর উপর। প্রিন্স আন্দ্রুর চোখ দুটি তখন বুজে এসেছে, তাকে ক্লান্ত ও ঘুমকাতর মনে হল।

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি তৈরি তো?"

প্রিন্স হিপোলিত তাড়াতাড়ি জোব্বাটা পরে নিল; আধুনিক ফ্যাশান অনুযায়ী সেটা তার গোড়ালি অবধি ঝুলে পড়ল; ফলে সেটাতে হোঁচট খেতে খেতে সে প্রিন্সেসের পিছন পিছন ফটক পর্যন্ত গেল। একটি পরিচারক তখন প্রিন্সেসকে গাড়িতে তুলে দিচ্ছে।

"প্রিন্সেস, বিদায়,' তার পা এবং জিভ দুইই যেন হোঁচট খেল।

প্রিন্সেস পোশাক তুলে অন্ধকার গাড়িতে তার আসনে উঠে বসল। তার স্বামী তরবারিটা ঠিকমত রাখতে ব্যস্ত। তাদের সাহায্য করতে গিয়ে প্রিন্স হিপোলিত দুজনেরই অসুবিধা ঘটাতে লাগল।

প্রিন্স হিপোলিত তার পথ আটকে দাঁড়িয়ে থাকায় প্রিন্স আন্দ্রু অসন্তুষ্ট গলায় রুক্ষ ভাষায় বলল, "আমাকে করতে দিন. স্যার—" পরে সেই একই লোক ভদ্র সাদর গলায় বলল, "তোমাকে কিন্তু আশা করব পিয়ের।'

ঘোড়া পা তুলল; গাড়ির চাকায় খট্‌খট্ শব্দ উঠল। প্রিন্স হিপোলিত ফটকে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে ভাইকোঁতের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল; তাকে সে বাড়ি পৌঁছে দেবে বলে কথা দিয়েছে।

গাড়িতে হিপোলিতের পাশে বসে ভাইকোঁত্ বলল, "দেখুন প্রিয় বন্ধু, আপনার এই ছোট প্রিন্সেসটি খুব ভাল, পুরোদস্তুর ফরাসী"; সে তার

আঙুলের ডগায় চুমো খেল। হিপোলিত হো-হো করে হেসে উঠল।

ভাইকোঁত্ বলল, "আপনি কি জানেন, যতই ভালমানষেমি দেখান, আসলে আপনি সাংঘাতিক ছেলে। বেচারি স্বামী, সেই ছোট অফিসারটি এমন ভাব দেখায় যেন সে একজন রাজাগজা। তাকে দেখে আমার করুণা হয়।"

হিপোলিত হাসতে হাসতে মুখে থুথু ছিটিয়ে বলল, "আর আপনি বলছিলেন যে রুশ মহিলারা ফরাসীদের সমকক্ষ নয়? তাদের সঙ্গে কি ভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা জানতে হয়!"

অন্য সকলের আগে পৌঁছে পিয়ের স্বচ্ছন্দে প্রিন্স আন্দ্রুর পড়ার ঘরে ঢুকে পড়ল এবং অভ্যাসমত সঙ্গে সঙ্গে একটা সোফায় শুয়ে পড়ে প্রথম যে বইটা হাতে পড়ল (সিজারের "কমেণ্টারিস্') সেটাই তুলে নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে মাঝখান থেকে পড়তে শুরু করল।

ছোট ছোট সাদা হাত দুখানি ঘষতে ঘষতে পড়ার ঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "মাদময়জেল শেরের-এর সঙ্গে তুমি কি করেছ? তিনি তো এখনই অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

পিয়ের গোটা শরীরটাকে মোড় ফেরাল; সোফাটা মচ্‌মচ্ করে উঠল। আগ্রহে প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে হেসে হাতটা নাড়ল।

"মঠাধ্যক্ষটি লোক ভাল, কিন্তু বিষয়টিকে তিনি সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে জানেন না।··· আমার মতে, শাশ্বত শান্তি সম্ভব, কিন্তু—কি ভাবে যে কথাটা বলব বুঝতে পারছি না··· রাজনৈতিক শক্তি-সাম্যের দ্বারা নয়···"

স্পষ্টতই এ ধরনের বিমূর্ত আলোচনায় প্রিন্স আন্দ্রু আগ্রহী নয়।

একটু চুপ করে থেকে সে প্রশ্ন করল, "প্রিয় বন্ধু, মনের সব কথা কেউ সর্বত্র বলতে পারে না। আচ্ছা, শেষ পর্যন্ত তুমি কি কোন সিদ্ধান্তে এসেছ? তুমি কি হতে চাও, সৈনিক না কূটনীতিক?"

পিয়ের উঠে পা ভেঙে সোফার উপর বসল।

"আসলে আমি নিজেই এখনও জানি না। দুটোর কোনটাই আমি পছন্দ করি না।"

"কিন্তু তোমাকে তো একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে! তোমার বাবা সেটাই আশা করেন।"

পিয়েরের যখন দশ বছর বয়স তখন একজন মঠাধ্যক্ষকে গৃহশিক্ষক রূপে সঙ্গে দিয়ে তাকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং বিশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বিদেশেই ছিল। সে যখন মস্কো ফিরে এল তখন তার বাবা মঠাধ্যক্ষকে বিদায় দিয়ে ছেলেকে বলল, "এবার পিতার্সবুর্গে চলে যাও, চারদিক দেখ, নিজের জীবিকা বেছে নাও। তুমি যা করবে তাতেই আমি রাজী। এই নাও প্রিন্স ভাসিলিকে লেখা চিঠি, আর এই নাও টাকা।" তিন মাস ধরে পিয়ের জীবিকা খুঁজেই বেড়াচ্ছে, এখনও কিছুই স্থির করতে পারে নি। জীবিকা

খুঁজে নেবার কথাই প্রিন্স আন্দ্রু বলছিল। পিয়ের কপাল ঘষতে লাগল।

যে মঠাধ্যক্ষটির সঙ্গে সন্ধ্যায় পরিচয় হয়েছিল তার কথা উল্লেখ করে সে বলল, "কিন্তু তিনি তো অবশ্যই ভ্রাতৃসংঘের একজন পরোপকারী লোক।"

প্রিন্স আন্দ্রু পুনরায় তাকে বাধা দিয়ে বলল, "ওসব বাজে কথা রাখ। অশ্বারোহী রক্ষী বিভাগে গিয়েছিলে কি?"

"না, যাই নি; কিন্তু সেই কথাই আমি ভাবছি, আর তোমাকেও বলতে চাই। এখন যুদ্ধ হচ্ছে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে। এটা যদি মুক্তির যুদ্ধ হত তাহলে আমি সেটা বুঝতে পারতাম এবং সকলের আগে সেনাবাহিনীতে ঢুকতাম; কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটির বিরুদ্ধে ইংলণ্ড ও অস্ট্রিয়াকে সাহায্য করা ঠিক কাজ নয়।"

পিয়েরের ছেলেমানুষের মত কথা শুনে প্রিন্স আন্দ্রু শুধু কাঁধ ঝাকুনি দিল। সে এমন ভাব দেখাল যেন এরকম অর্থহীন কথার কোন জবাব দেওয়াই অসম্ভব। কিন্তু এই অতিসরল প্রশ্নের যে জবাব সে দিল তাছাড়া অন্য কোন জবাব দেওয়া সত্যি খুব কঠিন।

সে বলল, "নিজের বিশ্বাসের তাগিদ ছাড়া কেউ যদি যুদ্ধ না করত, তাহলে তো কোন যুদ্ধই হত না।"

"আর সেটাই তো হত চমৎকার," পিয়ের বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

"হয় তো চমৎকারই হত, কিন্তু সেটা কোনদিনই হবে না···।'

"আচ্ছা, তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ কেন?" পিয়ের প্রশ্ন করল।

"কিসের জন্য? জানি না। আমাকে যেতে হবেই। তাছাড়া আমি যাচ্ছি ···" সে থামল। "আমি যাচ্ছি কারণ এখানে আমি যে জীবন যাপন করছি সেটা আমার ভাল লাগছে না!"

অধ্যায়—৭

পাশের ঘরে মেয়েদের পোশাকের খসখস শব্দ শোনা গেল। প্রিন্স আন্দ্রু ঘুম থেকে জেগে ওঠার মত নড়েচড়ে উঠল। আন্না পাভলভ্নার বসবার ঘরে তার মুখে যে ভাব ছিল সেই ভাবটাই ফিরে এল। পিয়ের সোফার উপর থেকে পা নামাল। প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল। সে গাউন ছেড়ে একটা নতুন সুন্দর আটপৌরে পোশাক পরেছে। প্রিন্স আন্দ্রু উঠে বিনীতভাবে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

আরাম কেদারায় ভালভাবে বসে সে যথারীতি ফরাসী ভাষায় বলল, "আন্নেৎ-এর বিয়ে হয় নি কেন? তোমরা পুরুষরা এতই অপদার্থ যে তার

বিয়েটাও দিতে পার নি! এ কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা কর, কিন্তু সত্যি মেয়েদের সম্পর্কে তোমাদের কোন ধারণাই নেই। আপনি তো আচ্ছা তর্কপ্রিয় মানুষ ম'সিয় পিয়ের!"

"এখনও আপনার স্বামীর সঙ্গে আমি তর্ক করছিলাম। কেন যে সে যুদ্ধে যেতে চাইছে তা তো আমি বুঝতে পারি না।" যুবতীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাধারণত যুবকরা যে রকম বিব্রত বোধ করে থাকে তার কোন রকম ধার না ধেরে পিয়ের প্রিন্সেসকে কথাগুলি বলল।

এবার প্রিন্সেস শুরু করল। পিয়েরের কথাগুলি তার মনে খুব লেগেছে।

সে বলল, "আঃ, ঠিক ওই কথাই তো আমিও তাকে বলি! আমিও বুঝতে পারি না। পুরুষ মানুষরা কেন যুদ্ধ ছাড়া থাকতে পারে না সেটা আমি মোটেই বুঝতে পারি না। আমাদের মেয়েদের তো ওসব দরকার হয় না। আপনিই আমাদের কথাগুলি বিচার করুন। আমি সব সময় ওকে বলি: এখানে সে তো খুড়োর এড্-ডি-কং, চমৎকার চাকরি। সকলে তাকে চেনে, সকলে কত প্রশংসা করে। এই তো সেদিন অপ্রাকৃসিনদের বাড়িতে একটি মহিলাকে বলতে শুনলাম: 'ইনিই কি বিখ্যাত প্রিন্স আন্দ্রু?' সত্যি শুনেছি। সর্বত্রই তার কত সমাদর। সে তো অনায়াসেই সম্রাটের এড্-ডি-কং হতে পারে। আপনারা তো জানেন, সম্রাট কত আদর করে তার সঙ্গে কথা বলেন। কেমন করে সে ব্যবস্থাটা করা যায় তা নিয়ে আন্নেৎ ও আমি কথাও বলেছি। আপনি কি মনে করেন?"

পিয়ের বন্ধুর দিকে তাকাল। সে আলোচনাটা পছন্দ করছে না দেখে কোন জবাব দিল না।

জিজ্ঞাসা করল, "আপনারা কবে রওনা হবেন?"

"ওঃ, তার যাবার কথা আর তুলবেন না, মোটেই তুলবেন না। সে কথা শুনতে আমি চাই না। আজ যখনই মনে পড়ছে যে এই সব মধুর মিলন ভেঙে দিতে হবে···আর তারপরে আপনারা তো জানেন আন্দ্রে···(অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকাল) আমার ভয় করছে, আমার ভয় করছে!" ফিসফিস করে সে কথাগুলি বলল; তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে গেল।

পিয়ের ও নিজে ছাড়া আরও একজন ঘরে আছে দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কঠিন অথচ বিনীত গলায় প্রিন্স তাকে বলল:

"কিসে তোমার ভয় করছে লিজে? আমি তো বুঝতে পারছি না।"

"এই তো, পুরুষ মাত্রই কী স্বার্থপর: সব, সব্বাই স্বার্থপর! শুধুমাত্র খেয়ালের বশে সে আমাকে ছেড়ে যাচ্ছে, আমাকে একলা আটকে রেখে যাচ্ছে গ্রামের বাড়িতে।"

"মনে রেখো, আমার বাবা ও বোনের কাছে," প্রিন্স আন্দ্র শান্ত স্বরে বলল।

"তবু তো একাই…বন্ধুবান্ধব ছাড়া…আর সে আশা করে যে আমি ভীত হব না।"

তার গলার স্বর খুঁতখুঁতে; ঠোঁট ওল্টানো; কেমন কাঠবিড়ালীর মত মুখের ভাব। সে থামল; বুঝতে পারল যে পিয়েরের সামনে নিজের গর্ভাবস্থার কথা বলাটা অশোভন হবে, যদিও সেটাই আসল কথা।

স্ত্রীর দিক থেকে চোখ না সরিয়েই প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "আমি এখনও বুঝতে পারছি না কিসে তোমার এত ভয়।"

প্রিন্সেসের মুখ লাল হয়ে উঠল; হতাশার ভঙ্গীতে সে হাত দুটি তুলল।

"না আন্দ্রু, আমি বলতে বাধ্য যে তুমি বদলে গেছ। ওঃ, তুমি কত…"

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "ডাক্তার তোমাকে সকাল-সকাল শুতে বলেছে। তুমি বরং শুতে চলে যাও।"

প্রিন্সেস কোন কথা বলল না; হঠাৎ তার পাতলা লোমশ ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু উঠে দাঁড়াল; কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

পিয়ের অবাক বিস্ময়ে কখনও এর দিকে কখনও ওর দিকে তাকাতে লাগল চশমার উপর দিয়ে। উঠতে গিয়েও মনের ইচ্ছাটা পাল্টে নিল।

"মঁসিয় পিয়ের এখানে আছেন তো কি হয়েছে?" ছোট প্রিন্সেস হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল; উচ্ছ্বসিত কান্নায় তার সুন্দর মুখখানি বিকৃত হয়ে গেল। "অনেক দিন থেকেই তোমাকে বলতে চেয়েছি, আন্দ্রু কেন তুমি আমার প্রতি এতটা বদলে গেছ? আমি তোমার কি করেছি? তুমি যুদ্ধে চলে যাচ্ছ, আমার জন্য তোমার এতটুকু করুণা নেই। কেন? কেন?"

"লিজে!" প্রিন্স আন্দ্রু শুধু এইটুকুই বলল। কিন্তু এই একটি শব্দেই প্রকাশ পেল অনুনয়, শাসানি, এবং এই দৃঢ় প্রত্যয় যে ছোট প্রিন্সেস যা বলেছে তার জন্য তার নিজেরই দুঃখিত হওয়া উচিত। সে কিন্তু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তুমি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কর যেন আমি একজন পঙ্গু, একটা ছোট শিশু। আমি সব বুঝতে পারি! ছ'মাস আগে কি তুমি এ রকম ব্যবহার করতে?"

প্রিন্স আন্দ্রু এবার আরও জোরের সঙ্গে বলল, "লিজে, আমার মিনতি, তুমি থাম।'

এই সব কথাবার্তা শুনে পিয়ের ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠছিল। এবার সে প্রিন্সেসের কাছে এগিয়ে গেল। চোখের জল সে সইতে পারে না; মনে হল বুঝি সে নিজেই কেঁদে ফেলবে।

"শান্ত হোন প্রিন্সেস! আপনার এ-কথা মনে হচ্ছে কারণ…আমি বলছি, এ অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও হয়েছে…আর তাই…কারণ…না, না, আমাকে ক্ষমা করুন! বাইরের কোন লোক এখানে বেমানান…না, আপনি

দুঃখ করবেন না।···বিদায়।"

প্রিন্স আন্দ্রু তার হাতটা ধরে ফেলল।

"দাঁড়াও পিয়ের! এটুকু দয়া প্রিন্সেসের মনে আছে যে আজকের সন্ধ্যাটা তোমার সঙ্গে কাটাবার সুখ থেকে সে আমাকে বঞ্চিত করবে না।"

"না, সে শুধু নিজের কথাটাই ভাবে," বলতে বলতে তীব্র ক্ষোভে প্রিন্সেসের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

"লিজে!" প্রিন্স আন্দ্রু শুকনো গলায় বলল, তার গলা এতদূর চড়েছে যাতে বোঝা যায় যে তার ধৈর্য ফুরিয়ে গেছে।

সহসা প্রিন্সেসের সুন্দর মুখের সেই ক্রুদ্ধ, কাঠবিড়ালী ধরনের ভাব পাল্টে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠল একটা করুণ ভয়ের ভাব। সুন্দর চোখের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে স্বামীর দিকে তাকাল; কুকুর যখন লেজ গুটিয়ে অতি দ্রুত লেজটা নাড়তে থাকে তখন তার মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে ঠিক সেই ভাব ফুটে উঠল প্রিন্সেসের মুখে।

"আমার ঈশ্বর। আমার ঈশ্বর!" বলতে বলতে এক হাতে পোশাকটা তুলে ধরে স্বামীর কাছে এগিয়ে গিয়ে সে তার কপালে চুমো খেল।

"শুভ রাত্রি লিজে," বলে সে এমন ভদ্রভাবে স্ত্রীর হাতে চুমো খেল যেন কোন অপরিচিতাকে চুমো খাচ্ছে।

অধ্যায়—৮

দুই বন্ধু চুপচাপ। কেউ আগে কথা বলতে চাইছে না। পিয়ের বার বার প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকাচ্ছে; প্রিন্স আন্দ্রু ছোট হাতখানি দিয়ে কপাল ঘষছে।

দরজার দিকে যেতে যেতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল, "চল, রাতের খাবারটা খেয়ে নিই।"

নতুন করে সাজানো, রুচিসম্মত, বিলাসবহুল খাবার ঘরে তারা ঢুকল। টেবিল-তোয়ালে থেকে শুরু করে রুপোর, চিনেমাটির ও কাঁচের বাসনপত্র পর্যন্ত সব কিছুতেই নববিবাহিত দম্পতির গৃহস্থালির নতুনত্বের ছাপ। খাবার মাঝপথে প্রিন্স আন্দ্রু টেবিলের উপর কনুই রেখে তার উপর ঝুঁকে এমন একটা স্নায়বিক উত্তেজনাভরা দৃষ্টিতে তাকাল যেটা পিয়ের আগে কখনও দেখে নি; তারপর সে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন কোন একটা কথাকে অনেক দিন ধরে মনের মধ্যে পুষে রেখে হঠাৎ বলবে বলে স্থির করে ফেলেছে।

"কখনও, কখনও বিয়ে করো না হে ভাই! এই আমার পরামর্শ: যতদিন পর্যন্ত না নিজেকে বলতে পারবে যে তোমার যা কিছু কববার সাধ্য আছে তা

শেষ করেছ, যতদিন পর্যন্ত না তোমার মনের মত নারীর প্রতি তোমার ভালবাসার অবসান ঘটেছে এবং তাকে তার স্বরূপে দেখতে পেয়েছ, ততদিন পর্যন্ত কদাপি বিয়ে করো না ; করলে এমন ভুল করবে যা যেমন নির্মম তেমনই অসংশোধনীয়। যখন বুড়ো হবে, অকর্মণ্য হয়ে যাবে, তখন বিয়ে করো—অন্যথায় তোমার মধ্যে যা কিছু ভাল, যা কিছু মহৎ আছে সব নষ্ট হয়ে যাবে। অতি তুচ্ছ জিনিসের জন্য সব কিছু বৃথা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। অমন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিও না। নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন প্রত্যাশা নিয়ে যদি বিয়ে কর তাহলে প্রতি পদক্ষেপে বুঝতে পারবে যে তোমার সব শেষ হয়ে গেছে, একমাত্র নির্বোধ চাটুকারপরিবেষ্টিত বৈঠকখানা ছাড়া আর সব দরজা তোমার সামনে বন্ধ।…কিন্তু তাতে কি লাভ?…” এই বলে সে হাতটা ঘোরাতে লাগল।

পিয়ের চোখ থেকে চশমা খুলে ফেলল ; তাতে তার মুখটা যেন অন্য রকম দেখতে হল ; ভালমানুষি ভাবটা যেন স্পষ্টতর হল। অবাক হয়ে সে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিন্স আন্দ্রু বলতে লাগল, “আমার স্ত্রী চমৎকার মহিলা ; যে বিরল মহিলাদের হাতে পুরুষের মর্যাদা নিরাপদ থাকে সে তাদেরই অন্যতমা ; কিন্তু হা ঈশ্বর, অবিবাহিত থাকবার জন্য আজ আমি কী না দিতে পারি! তুমিই প্রথম ও একমাত্র লোক যার কাছে এ সব কথা বললাম, কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি।”

যে বল্‌কন্‌স্কি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার আরাম কেদারায় শুয়ে আধ-বোজা চোখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে ফরাসী বকুনি আওড়াচ্ছিল, এই কথাগুলি বলার সময় প্রিন্স আন্দ্রু যেন আর সে লোক নেই। তার মুখের প্রতিটি পেশী এখন স্নায়বিক উত্তেজনায় কাঁপছে ; যে চোখ থেকে জীবনের অগ্নিশিখা নিভে গিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, সে চোখ এখন উজ্জ্বল আলোয় ঝলসে উঠেছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সাধারণ অবস্থায় তাকে যত নিষ্প্রাণ মনে হয়, এই সব অসুস্থ বিরক্তির মুহূর্তে সে তত বেশী আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

সে বলতে লাগল, “কেন আমি এ কথা বলছি তা তুমি বুঝতে পারছ না, কিন্তু এটাই জীবনের সমগ্র কাহিনী। তুমি বোনাপার্ত ও তার জীবনের কথা বলেছ (যদিও পিয়ের বোনাপার্তের নাম উল্লেখ করে নি), কিন্তু বোনাপার্ত কার্যক্ষেত্রে ধাপে ধাপে তার লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়েছে। সে ছিল মুক্ত, স্বীয় লক্ষ্য ছাড়া আর কিছু তার ভাববার ছিল না ; তাই সে লক্ষ্যে পৌছতে পেরেছিল। কিন্তু নিজেকে কোন নারীর সঙ্গে বেঁধে ফেললেই শৃংখলিত কয়েদীর মত তুমি সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলবে! আশা করবার, বল পাবার মত যা কিছু তোমার আছে সবই তোমাকে টেনে নামাবে, অনুতাপে দগ্ধ করবে। বৈঠকখানা, গল্পগুজব, বল-নাচ, অহংকার, তুচ্ছতা—এ সব কিছুর

মায়াবী চক্রের হাত থেকে আমার মুক্তি নেই। আমি এখন যুদ্ধে যাচ্ছি, এক বিরাট যুদ্ধ, অথচ আমি কিছুই জানি না, কোন কিছুরই যোগ্য নই। আমি খুব অমায়িক লোক, আমার বুদ্ধি শানিত, আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে সকলে আমার কথা শোনে। আর সেই সব বোকা মানুষের দল যাদের ছাড়া আমার স্ত্রী বাঁচতে পারে না। আর সেই সব নারী…। ঐ সব উঁচু মহলের স্ত্রীলোকরা যে কি, সব নারী সমাজই যে কি তা যদি জানতে। আমার বাবাই ঠিক জানে। স্বার্থপর, অহংকারী, নির্বোধ, সব বিষয়ে অকিঞ্চিৎকর—সত্যস্বরূপে এই হল স্ত্রীজাতির পরিচয়! সমাজে যখন তাদের দেখ তখন মনে হয় তাদের মধ্যে কিছু পদার্থ আছে, কিন্তু কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই, কিচ্ছু নেই! না, প্রিয় বন্ধু, বিয়ে করো না; বিয়ে করো না!" প্রিন্স আন্দ্রু কথা শেষ করল।

পিয়ের বলল, "তুমি, তুমি নিজেকে অক্ষম ভাববে, তোমার জীবনকে ব্যর্থ মনে করবে—এটা আমার কাছে হাস্যকর মনে হয়। তোমার সামনে তো সব আছে, সব কিছু। আর তুমি…।"

সে কথা শেষ করল না, কিন্তু তার কণ্ঠস্বর শুনেই বোঝা গেল বন্ধুর সম্পর্কে তার ধারণা কত উঁচু, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কত আশা সে পোষণ করে।

"এ রকম কথা সে বলে কেমন করে?" পিয়ের ভাবল। বন্ধুকে সে পূর্ণতার প্রতিমূর্তি বলে মনে করে, কারণ যে সব গুণ তার নিজের মধ্যে নেই, প্রিন্স আন্দ্রু পূর্ণমাত্রায় তার অধিকারী; এক কথায় সে গুণাবলীকে বলা যায় ইচ্ছার দৃঢ়তা। সব কিছুকে শান্তভাবে বিচার করবার ক্ষমতা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি; পড়াশুনার ব্যাপকতা (সে পড়েছে সব কিছু, জেনেছে সব কিছু, ভেবেছে সব কিছু), আর সর্বোপরি কাজ করবার ও পড়াশুনা করবার ক্ষমতা—প্রিন্স আন্দ্রুর এই সব ক্ষমতা দেখে পিয়ের সর্বদাই বিস্মিত হয়েছে। আন্দ্রু যে দার্শনিক তত্ত্বালোচনার ক্ষমতা রাখে না এটা দেখে বেশ অবাক হলেও পিয়ের সেটাকেও আন্দ্রুর ত্রুটি মনে না করে বরং তার ক্ষমতার লক্ষণ বলেই মনে করে।

জীবনের সব চাইতে ঘনিষ্ঠ, বন্ধুত্বপূর্ণ ও সরল সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রশংসা ও গুণকীর্তন অপরিহার্য, ঠিক যেমন গাড়ির চাকা ঠিকভাবে চলবার জন্য তৈলাক্ত জিনিস দরকার।

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, 'আমার খেলা সাঙ্গ হয়েছে। আমার কথা বলে আর লাভ কি? এস, তোমার কথা বলা যাক," একটু চুপ করে থেকে সে হেসে বলল।

সঙ্গে' সঙ্গে সে হাসি পিয়েরের মুখে প্রতিফলিত হল।

স্মিত হাসি হেসে পিয়ের বলল, "আমার সম্পর্কেই বা বলবার কি আছে? আমি কে? এক অবৈধ সন্তান!' হঠাৎ তার মুখখানা লাল হয়ে উঠল; পরিষ্কার বোঝা গেল অনেক চেষ্টা করে তবে সে এ কথাটা বলেছে। "আমি

তো নামহীন, উপায়হীন···আর সত্যি সত্যি···" কিন্তু সত্যি সত্যি যে কি তা সে বলল না। "আপাতত আমি মুক্ত, আমি বেশ আছি। শুধু আমি কি করব সে সম্পর্কে আমার এতটুকু ধারণা নেই; আমি চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে পরামর্শ করতে।"

প্রিন্স আন্দ্রু সদয় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল; সে দৃষ্টি বন্ধুত্বপূর্ণ, স্নেহসিক্ত, তবু তার ভিতর দিয়ে ফুটে উঠল তার শ্রেষ্ঠত্বের আভাষ।

"তোমাকে আমার ভাল লাগে, তার বিশেষ কারণ আমাদের সকলের মধ্যে একমাত্র তুমিই জীবন্ত মানুষ। হ্যাঁ, তুমিই সঠিক পথের মানুষ! তুমি যা ইচ্ছা বেছে নাও; সবই সমান। যে কোন জায়গায় তুমি ঠিক খাপ খেয়ে যাবে। কিন্তু একটা কথা : এই সব কুরাগিনদের কাছে এস না, তাদের মত জীবন যাপন করো না। এই ব্যভিচার, লাম্পট্য, এদের যা কিছু—এ সব তোমাকে মানায় না!"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে পিয়ের বলল, "তুমি কি চাও ভাই? নারী, বুঝেছ, নারী!"

প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, "আমি এ সব বুঝি না। যে সব নারীরা ঠিক পথে আছে, তাদের কথা আলাদা, কিন্তু এই কুরাগিনদের মত নারী, "সাকি ও সুরা," এদের আমি বুঝি না।"

প্রিন্স ভাসিলি কুরাগিনদের সঙ্গেই পিয়ের বাস করে, তার ছেলে আনাতোলের ব্যভিচারী জীবনের সেও অংশীদার; প্রিন্স আন্দ্রুর বোনের সঙ্গে সেই ছেলের বিয়ে দিয়ে তার চরিত্র শোধরাবার মতলবই করা হয়েছে।

যেন হঠাৎ একটা সুখের কথা মনে পড়েছে এমনিভাবে পিয়ের বলে উঠল, "তুমি কি জান? সত্যি বলছি, অনেক দিন ধরে আমি এই কথাটাই ভাবছিলাম।···এ ধরনের জীবন যাপন করি বলে আমি কোন কিছু স্থির করতে পারি না, বা সঠিকভাবে ভাবতেও পারি না। মাথার যন্ত্রণা হয়, সব টাকা খরচ হয়ে যায়। আজ রাতে সে আমাকে যেতে বলেছিল, কিন্তু আমি যাব না।"

"আমাকে কথা দিলে যে যাবে না?"

"কথা দিলাম!"

অধ্যায়—৯

পিয়ের যখন বন্ধুর কাছ থেকে চলে গেল তখন একটা বেজে গেছে।

উত্তরাঞ্চলের গ্রীষ্মকালের নির্মেঘ রাত। সোজা বাড়ি যাবার জন্য পিয়ের একটা খোলা গাড়ি নিল। কিন্তু যত বাড়ির কাছে এগোতে লাগল ততই

তার মনে হল যে এ রকম একটা রাত ঘুমিয়ে কাটানো অসম্ভব। যেটুকু আলো আছে তাতে জনহীন রাস্তার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়; মনে হয় এ যেন রাত নয়, সকাল বা সন্ধ্যা। যেতে যেতে পিয়েরের মনে পড়ল, আজ রাতেও আনাতোল কুরাগিন যথারীতি তাস নিয়ে অপেক্ষা করে আছে; তারপর বসবে সুরাপানের আসর; আর সব শেষে এমন জায়গায় যাওয়া হবে যেটা পিয়েরের খুব পছন্দ।

"আমার তো কুরাগিনদের বাড়িই যাওয়া উচিত," সে ভাবল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, সেখানে যাবে না বলে প্রিন্স আন্দ্রুকে কথা দিয়েছে। তারপরই, দুর্বল চরিত্র লোকদের বেলায় যেমন ঘটে থাকে, যে ভ্রষ্টাচারী জীবনে সে অভ্যস্ত তাব প্রতি আকর্ষণ এতই প্রবল হয়ে দেখা দিল যে সে সেখানে যাওয়াই স্থির করল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল যে প্রিন্স আন্দ্রুর কাছে কথা দেওয়ার কোন মানেই হয় না, কারণ প্রিন্স আনাতোলের জমায়েতে যাবে বলে সে আগেই তাকে কথা দিয়ে রেখেছে; তাছাড়া, এই সব কথা দেওয়া তো একটা মামুলি ব্যাপার, তার কোন সঠিক অর্থ নেই; বিশেষ করে যখন ভাবা যায় যে কাল তো যে কোন লোক মরেও যেতে পারে, অথবা এমন কিছু অঘটন ঘটতে পারে যাতে সম্মান-অসম্মান সবই সমান হয়ে দেখা দেবে। নিজের কোন সিদ্ধান্ত ও অভিপ্রায়কে বাতিল করে দেবার স্বপক্ষে এই ধবনের যুক্তির আশ্রয় পিয়ের প্রায়ই নিয়ে থাকে। সে কুরাগিনদের বাড়ির পথে পা বাড়াল।

অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর ব্যারাকের নিকটবর্তী মস্ত বড যে বাড়িটায় আনাতোল থাকে সেখানে পৌঁছে পিয়ের আলোকিত ফটক দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি পেরিয়ে একটা খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল। সামনের ঘরে কেউ ছিল না; খালি বোতল, জোব্বা ও ওভার-শু চারদিকে ছড়ানো; মদের গন্ধ; দূরে নানা কণ্ঠস্বর ও চেঁচামেচি।

তাসের আড্ডা ও নৈশভোজন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু অতিথিরা তখনও বিদায় হয় নি। গায়ের জোব্বাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিয়ের প্রথম ঘরটায় ঢুকল; সেখানে নৈশভোজনের উচ্ছিষ্ট ছড়িয়ে আছে। কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না ভেবে জনৈক পরিচারক গ্লাসে গ্লাসে যে তলানি পড়ে ছিল, তাই গলায় ঢালছিল। তৃতীয় ঘর থেকে ভেসে আসছে হাসির অট্টরোল, পরিচিত গলার চীৎকার। একটা ভালুকের গর্জন, আর সাধারণ হৈ-চৈ। আট ন'টি যুবক একটা খোলা জানালার কাছে ভিড় জমিয়েছে। অপর তিনজন একটা বাচ্চা ভালুককে শিকল ধরে টেনে অপর সকলের দিকে ঠেলিয়ে দিচ্ছে।

"আমি একশ' বাজি ধরছি স্টিভেন্স-এর উপর," একজন চেঁচিয়ে বলল।

"মনে রেখ, কোন কিছু ধরা চলবে না," আর একজন চেঁচিয়ে উঠল।

তৃতীয় জন বলল, "আমি বাজি ধরছি দলোখভ-এর উপর! কুরাগিন,

তুমি আমাদের হাত ছাড়িয়ে দাও।' [রাশিয়ার নিয়ম—বাজি ধরলে দুজন করমর্দন করে, আর অপর একজন তাদের হাত ছাড়িয়ে দেয়।]

"এই যে, ক্রুইনকে ছেড়ে দাও, এদিকে বাজি চলছে।"

"এক চুমুকে শেষ করা চাই, নইলে তার হার," চতুর্থ জন হৈ-চৈ করে বলল।

"জ্যাকব, একটা বোতল নিয়ে আয়," গৃহকর্তার গলা শোনা গেল; লোকটি লম্বা, সুদর্শন, দাঁড়িয়ে আছে দলের মাঝখানে; পরনে কোট নেই, পাতলা সুতির শার্টের বুক খোলা। "একটু সবুর কর বাবাসকল।…পেত্‌য়া এসেছে। এই যে ভালমানুষ!" পিয়েবকে দেখে সে চেঁচিয়ে বলল।

জানালার কাছ থেকে কথা বলল আর একজন। তার উচ্চতা মাঝারি, পরিষ্কার দুটি নীল চোখ; এই সব মাতাল কণ্ঠস্বরের মধ্যে তার গলার স্বরেই কিছুটা সুস্থতার আমেজ; সে বলল, "এখানে এস; বাজির হাত খুলে দাও!" এই হল দলোখভ; সেমেনভ রেজিমেণ্টের অফিসার, বিখ্যাত জুয়াড়ি ও দ্বৈত-যোদ্ধা, আনাতোলের সঙ্গেই থাকে। খুশির চোখে চারদিকে তাকিয়ে পিয়ের হাসল।

"আমি তো বুঝতে পারছি না। এ সব কি হচ্ছে?"

"একটু সবুর কর, তোমার পেটে এখনও মাল পড়ে নি। এখানে একটা বোতল চাই," বলে আনাতোল টেবিল থেকে একটা বোতল নিয়ে পিয়েবের কাছে গেল।

"প্রথমেই তোমাকে এটা খেতে হবে!'

যে সব মাতাল অতিথিরা জানালায় ভিড় করে আছে তাদের দিকে তাকিয়ে আর তাদের গল্প-গুজব শুনতে শুনতে পিয়ের গ্লাসের পর গ্লাস টানতে লাগল। আনাতোল পিয়েরের গ্লাস ভরে দিতে দিতে তাকে বুঝিয়ে বলল যে, নৌ-বিভাগের ইংরেজ অফিসার স্টিভেন্সের সঙ্গে বাজি ধরেছে দলোখভ: তিন-তলার জানালার বাইরের টাকে বসে দুই পা ঝুলিয়ে দিয়ে সে এক বোতল "রাম," খাবে।

শেষ বারের মত গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়ে আনাতোল পিয়েরকে বলল, "চালিয়ে যাও; এর সবটা খেতে হবে, নইলে তোমাকে ছাড়ছি না!"

"না, আর খাব না," বলে আনাতোলকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পিয়ের জানালাটার কাছে গেল।

ইংরেজ ভদ্রলোকের হাত চেপে ধরে দলোখভ স্পষ্ট গলায় বাজির শর্তগুলো আওড়াচ্ছে; তার বিশেষ লক্ষ্য আনাতোল ও পিয়ের।

দলোখভের উচ্চতা মাঝারি, কোকড়া চুল, হাল্কা নীল চোখ। বয়স এক-কুড়ি পাঁচ। পদাতিক বাহিনীর অফিসারদের মতই তারও গোঁফ নেই; ফলে তার সুন্দর মুখমণ্ডলের সবটাই চোখে পড়ছে। মুখের সুগঠিত রেখাগুলি

স্পষ্টভাবে আঁকা ; উপরের ঠোঁটটা নীচের ঠোঁটের উপর চেপে বসেছে ; ঠোঁটের কোণে একটা হাসি সব সময়ই খেলে বেড়াচ্ছে ; তার সঙ্গে মিলেছে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ ; ফলে তার উপর কারও নজর না পড়েই পারে না। দলোখভের আর্থিক সামর্থ্য সামান্য, বড় বড় আত্মীয়স্বজনও নেই। তবু আনাতোল হাজার হাজার রুবল খরচ করলেও দলোখভ তার সঙ্গেই থাকে, আর এমন ভাবে চলে যে তার পরিচিত সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে ; আনাতোলের চাইতেও বেশী শ্রদ্ধা করে। দলোখভ সব রকম খেলা জানে, এবং প্রায় সব সময়ই খেলায় জেতে। যতই মদ খাক, তার মাথা কখনও ঘুরে যায় না। পিতার্সবুর্গের তৎকালীন লম্পট ও দুশ্চরিত্র লোকদের মধ্যে কুরাগিন ও দলোখভ দুজনই নামকরা।

"রাম"-এর বোতলটা আনা হল। জানালার ফ্রেমটার জন্য বাইরের গোবরাটে বসা যায় না বলে দুজন পরিচারক ফ্রেমটা খুলে ফেলছে। ভদ্রলোকরা হৈ-চৈ করে তাদের নানা রকম নির্দেশাদি দিচ্ছে।

আনাতোল হেলতে-দুলতে জানালার কাছে গেল। পরিচারক দুজনকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ফ্রেমটাকে ধরে টানতে লাগল, কিন্তু নড়াতে পারল না। কাঁচটা ভেঙে গেল।

পিয়েরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "তুমি একবার চেষ্টা করে দেখতো হার্কিউলিস।"

পিয়ের এড়োর কাঠটা ধরে টান দিল, আর ওক কাঠের ফ্রেমটা সশব্দে খুলে বেরিয়ে এল।

"ওটাকে একেবারে সরিয়ে দাও, নইলে সকলে ভাববে আমি ওটা ধরে আছি" দলোখভ বলল।

"ইংরেজ ভদ্রলোকের খুব দর্প···না? ঠিক আছে তো?" আনাতোল বলল।

রামের বোতলটা হাতে নিয়ে দলোখভ জানালার দিকে এগিয়ে গেল। জানালা দিয়ে আকাশের আলো চোখে পড়ছে ; সে আলোয় উষার সঙ্গে সূর্যাস্তের আভা মিশে গেছে।

রামের বোতলটা হাতে নিয়ে দলোখভ একলাফে জানালার গোবরাটে চলে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরকার লোকদের ডেকে বলল, "আপনারা শুনুন!" সকলে চুপচাপ শুনতে লাগল।

"আমি পঞ্চাশ ইম্পিরিয়াল (১ ইম্পিরিয়াল=১৫ রুবল) বাজি রাখছি" —ইংরেজ ভদ্রলোক যাতে বুঝতে পারে সেজন্য সে ফরাসীতেই কথাগুলি বলল, যদিও ফরাসী সে ভাল বলতে পারে না। ইংরেজ ভদ্রলোককে সম্বোধন করে আরও বলল, "আমি পঞ্চাশ ইম্পিরিয়াল বাজি রাখছি···আপনি কি চান সেটা একশ' রাখা হোক?"

"না, পঞ্চাশ," সে জবাব দিল।

"ঠিক আছে। পঞ্চাশ ইম্পিরিয়াল···জানালার বাইরে এই জায়গায় বসে মুখ থেকে না সরিয়ে পুরো এক বোতল রাম আমি খেয়ে শেষ করব (নীচু হয়ে সে জানালার বাইরের ঢালু গোবরাটটা দেখাল) আর সে সময় কোন কিছু ধরে থাকব না। ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে,"। ইংরেজটি বলল।

আনাতোল ইংরেজটির দিকে ঘুরে দাঁড়াল; তার কোটের একটা বোতাম ধরে ঝুঁকে পড়ে—ইংরেজটি খর্বকায় মানুষ—ইংরেজিতে বাজির শর্তগুলি আর একবার বলতে লাগল।

"সবুর কর!" সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবার জন্য বোতলটা দিয়ে গোবরাটের উপর আঘাত ক'রে দলোখভ বলল। "একটু সবুর কর কুরাগিন। আপনারা শুনুন! আর কেউ যদি এ কাজটা করতে পারে তাকে আমি একশ' ইম্পিরিয়াল দেব। বুঝলেন?"

ইংরেজটি ঘাড় নাড়ল, কিন্তু সে এই বাজি গ্রহণ করতে রাজী কি না তা বোঝা গেল না। আনাতোল তাকে ছাড়ল না; যদিও সে যে কথাগুলি বুঝতে পেরেছে সেটা বোঝাবার জন্য সে ঘাড় নাড়তে লাগল, তবু আনাতোল দলোখভের কথাগুলিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে শোনাতে লাগল। রক্ষী বাহিনীর হুজার একটি সরুমত ছোকরা জানালার গোবরাটে উঠে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকাল।

জানালা থেকে রাস্তার পাথরগুলো দেখতে পেয়ে সে বলে উঠল, "ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

তাকে জানালা থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দলোখভ চেঁচিয়ে বলল, "চুপ কর!" ছোকরা থতমত খেয়ে লাফ দিয়ে ঘরের মধ্যে নেমে পড়ল।

সহজেই হাতে পাওয়া যায় গোবরাটের উপর এমন জায়গায় বোতলটা রেখে দলোখভ সাবধানে ধীরে ধীরে জানালা বেয়ে উঠে পা ঝুলিয়ে বসল। জানালার দুই দিকে চাপ রেখে সে নিজের আসনে ঠিক হয়ে বসল; হাত দুটি নামিয়ে নিয়ে একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে একটু সরে বসে বোতলটা হাতে নিল। তখন বেশ আলো ফুটেছে, তবু আনাতোল দুটো মোমবাতি এনে গোবরাটের উপর রাখল। দলোখভের সাদা শার্ট-পরা পিঠ ও কোঁকড়া চুলে ভর্তি মাথাটার দু'দিকে আলো পড়ল। সকলেই জানালার কাছে গিয়ে ভিড় করল; ইংরেজটি সকলের আগে। পিয়ের চুপচাপ দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। উপস্থিত সকলের চাইতে একটু বয়স্ক একটি লোক হঠাৎ ভীত ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এবং দলোখভের শার্টটা চেপে ধরতে চেষ্টা করল।

"আমি বলছি, এটা বোকামি! ও তো মরে যাবে," অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান লোকটি বলল।

আনাতোল তাকে থামিয়ে দিল।

"ওকে ছোঁবেন না! আপনি ওকে হকচকিয়ে দেবেন, আর তাহলেই ও মারা পড়বে। অ্যা?... তারপর?... অ্যা?"

দলোখভ মুখটা ফেরাল; দুই হাতে ধরে নিজের জায়গায় ঠিকমত বসল।

চাপা পাতলা ঠোঁট দুটির ভিতর দিয়ে কেটে-কেটে বলল, "আবার যদি কেউ এসে গোলমাল করে তো তাকে আমি নীচে ছুঁড়ে ফেলে দেব। এবার তাহলে!"

এই কথা বলে সে আবার মুখটা ঘোরাল, দুই হাত নামিয়ে বোতলটা তুলে ঠোঁটে লাগাল, মাথাটা পিছনে ঠেলে দিল এবং হাত দুটো তুলে তাল সামলাতে লাগল। একজন পরিচারক ভাঙ্গা কাঁচ কুড়োচ্ছিল; সে আর জানালা থেকে এবং দলোখভের পিঠের দিক থেকে চোখ সরাতে পারল না; সেই অবস্থায়ই তাকিয়ে রইল। আনাতোল খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে রইল। ইংরেজটি বাঁকা চোখে তাকিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। যে লোকটি একাজে বাধা দিতে চেয়েছিল সে ঘরের এক কোণে ছুটে গিয়ে দেয়ালের দিকে মুখ করে একটা সোফায় বসে পড়ল। পিয়ের দুই হাতে মুখ ঢাকল; এতক্ষণ তার মুখে একটা ক্ষীণ হাসি লেগেছিল; এবার সেখানে ফুটে উঠল ভয় ও আতংক। সকলেই স্তব্ধ। পিয়ের চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিল; দলোখভ তখনও একই অবস্থায় বসে আছে; শুধু তার মাথাটা আরও পিছনে সরে আসায় কোঁকড়া চুলগুলি শার্টের কলার ছুঁয়েছে; যে হাতে বোতলটা ধরেছে সেটা ক্রমেই আরও উঁচুতে উঠেছে আর থর্থর্ করে কাঁপছে। বোতলটা ক্রমেই খালি হয়ে আসছে, ক্রমেই আরও উঁচুতে উঠছে, আর মাথাটা ক্রমেই পিছনে হেলে পড়ছে। "এতক্ষণ লাগছে কেন?" পিয়ের ভাবল। তার মনে হল যেন আধ ঘণ্টারও বেশী। সময় পার হয়ে গেছে। হঠাৎ দলোখভের শিরদাঁড়াটা পিছনদিকে সরে এল, তার হাতটা থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল; তার ফলে জানালার ঢালু গোবরাট থেকে তার পুরো শরীরটা বসা অবস্থায়ই পিছলে গেল। যত সে পিছলে নেমে যেতে লাগল ততই তার মাথা ও হাত দুলতে লাগল। একটা হাত যেন দুলে উঠে গোবরাটটাকে চেপে ধরতে গেল, কিন্তু সেটাকে ছুঁল না। পিয়ের আবার চোখ ঢাকল; মনে হল, সে চোখ আর কখনও সে খুলবে না। হঠাৎ তার মনে হল, চারদিকে একটা চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। চোখ মেলে তাকাল: জানালার গোবরাটে দলোখভ দাঁড়িয়ে আছে, তার ম্লানমুখে হাসির ছটা।

"বোতল খালি!"

ইংরেজটিকে লক্ষ্য করে সে বোতলটা ছুঁড়ে দিল; সেও ভালভাবে সেটাকে ধরে নিল। দলোখভ লাফ দিয়ে নীচে নামল। গায়ে রামের তীব্র গন্ধ।

"বেড়ে করেছ! আচ্ছা ছেলে!...বাজি মাৎ করে দিয়েছ!...তোমার

উপর শয়তান ভর করুক!" চারদিক থেকে নানা মন্তব্য ভেসে এল।

ইংরেজটি থলি বের করে টাকা গুণতে লাগল। দলোখভ ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইল, কিছু বলল না। পিয়ের লাফ দিয়ে জানালার গোবরাটে উঠল।

"ভদ্রজনরা, আমার সঙ্গে কে বাজি ধরবেন? এ কাজ আমিও করব!" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলে উঠল। "কেউ বাজি না ধরলেও করব! দেখুন! একটা বোতল আনতে বলুন। আমিও খেলা দেখাব। একটা বোতল এনে দিন!"

"ওকে খেলা দেখাতে দিন, ওকে খেলা দেখাতে দিন, ওকে খেলা দেখাতে দিন," দলোখভ হেসে বলল।

"আর তারপরে? আপনি কি পাগল হয়েছেন?··কেউ আপনার সঙ্গে বাজি ধরবে না!··আরে, আপনার তো সিঁড়িতে চলতেই মাথা ঘোরে," বেশ কিছু লোক চেঁচিয়ে বলতে লাগল।

স্থিরসংকল্পে মাতালের মত টেবিলে একটা থাপ্পড় মেরে পিয়েরও চেঁচিয়ে বলল, "আমিও খাব! এক বোতল রাম চাই!" সে জানালা বেয়ে উঠবার জন্য প্রস্তুত হল।

সকলে তার হাত চেপে ধরল; কিন্তু তার এতই শক্তি যে তার গায়ে যে হাত দিল তাকেই সে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আনাতোল বলল, "না, এ ভাবে ওর সঙ্গে পারবেন না। একটু অপেক্ষা করুন, আমি ব্যবস্থা করছি।···শোন! কাল আমি তোমার সঙ্গে বাজি ধরব, কিন্তু এখন আমরা সকলে যাব—এর বাড়ি।"

"বেশ, তাই চল," পিয়ের চেঁচিয়ে বলল। "তাই চল!·· আর ব্রুইন-কে সঙ্গে নিয়ে চল।"

ভালুকটাকে ধরে দুই হাতে তুলে সে ঘরময় নাচতে শুরু করল।

অধ্যায়—১০

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার নৈশভোজের দিন প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কায়া তার একমাত্র ছেলে বরিসের জন্য অনুরোধ জানালে প্রিন্স ভাসিলি তাকে যে কথা দিয়েছিল সে-কথা সে রেখেছে। ব্যতিক্রম হিসাবেই ব্যাপারটা সম্রাটের গোচরে আনা হয়েছিল এবং কর্ণেলের পদমর্যাদাসহ বরিসকে সেমেনভ রক্ষীবাহিনীতে বদলি করা হয়েছে। তবে আন্না মিখায়লভ্‌নার সব চেষ্টা ও অনুরোধ সত্ত্বেও সে কুতুজভ-এর অধীনে চাকরি পায় নি। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়ির আসরের কিছু পরেই আন্না মিখায়লভ্‌না মস্কোতে ফিরে সোজা চলে এসেছে তার ধনী আত্মীয় রস্তভদের বাড়ি। শহরে এলে সে এই বাড়িতেই থাকে এবং তার

আদরের বরিসও ছেলেবেলা থেকে এখানেই লেখাপড়া শিখেছে এবং বছরের পর বছর থেকেছে। রক্ষীবাহিনী ১০ই আগস্ট তারিখে পিতার্সবুর্গ ছেড়ে চলে গেছে; তার ছেলেটি সাজপোশাকের জন্য এখনও মস্কোতেই আছে, সীমান্ত শহর রাদ্‌জিভিলভ-এ সে তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে।

সে দিনটি সেণ্ট নাতালিয়া দিবস। আবার রস্তভ পরিবারের মা ও কণিষ্ঠা কন্যা দুজনেরই নামকরণ দিবসও বটে; দুজনেরই নাম নাতালি। সকাল থেকেই ছয়-ঘোড়ার গাড়ির অবিরাম আসা-যাওয়া চলেছে; পোভার্স্কায়াতে অবস্থিত ও মস্কোতে সুপরিচিত কাউণ্টেস রস্তভ-এর বড় বাড়িটাতে অতিথির ভীর জমে চলেছে। যে সব অতিথি একের পর এক পালা করে এসে অভিনন্দন জানাচ্ছে তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য কাউণ্টেস স্বয়ং ও তার সুন্দরী বড় মেয়ে বসবার ঘরেই অপেক্ষা করছে।

কাউণ্টেসের বয়স বছর পঁয়তাল্লিশ, পাতলা প্রাচ্যদেশীয় মুখ, সন্তান ধারণের জন্য ভগ্নস্বাস্থ্য—তার সন্তান-সংখ্যা বারো। দুর্বলতার দরুণ তার চলনে ও কথা বলার ধরনে এমন একটা অবসাদ ফুটে ওঠে যার ফলে তার প্রতি একটা শ্রদ্ধার ভাব স্বভাবতই সকলের মধ্যে জেগে ওঠে। এই পরিবারেরই একজন হিসাবে প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্‌না দ্রুবেৎস্কোয়াও বসবার ঘরে হাজির থেকে অতিথিদের অভ্যর্থনা ও আপ্যায়নের কাজে সাহায্য করছে। ছোট ছেলে-মেয়েরা রয়েছে ভিতরের ঘরে, অতিথি-আপ্যায়নের কাজে তাদের কোন প্রয়োজন নেই। কাউণ্ট নিজে অতিথিদের সঙ্গে দেখা করে সকলকেই ডিনারের আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় করছে।

"প্রিয় বন্ধু বা প্রিয় বান্ধবী, আপনার কাছে আমি খুব, খুব কৃতজ্ঞ"—অতিথিরা পদমর্যাদায় তার ছোট হোক কি বড় হোক, কোন রকম ব্যতিক্রম না করে সকলকেই সে 'প্রিয়' বলে সম্বোধন করছে—"আমার নিজের পক্ষ থেকে এবং আমার যে দুটি প্রিয় জনের নামকরণ-দিবস আমরা পালন করছি তাদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, ডিনারে আসা চাই, নইলে আমি অসন্তুষ্ট হব, প্রিয় বান্ধবী! গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে আপনাকে আসতে বলছি, প্রিয় বন্ধু!" এই একই কথা সে প্রত্যেককে বলছে, কারও বেলায় কোন রকম হের-ফের হচ্ছে না; তার পরিষ্কার কামানো হাসিমাখা মুখে একই ভাব, হাতের একই সুদৃঢ় চাপ, আর একই ভাবে বার বার মাথা নোয়ানো। কোন অতিথিকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসেই বসবার ঘরে অপেক্ষমান অতিথিদের একজনের কাছে এসে তার দিকে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসছে, পা দুটোকে ছড়িয়ে হাঁটুর উপর এমনভাবে হাত রাখছে যাতে বোঝানো যায় যে জীবনকে সে ভোগ করছে এবং কেমন করে বাঁচতে হয় তা সে জানে; তারপর মর্যাদার সঙ্গে শরীরটাকে সামনে-পিছনে একটু দোলাচ্ছে, আবহাওয়া সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করছে, অথবা স্বাস্থ্য সম্পর্কে দু'

একটা কথা বলছে, কখনও রুশ ভাষায়, আবার কখনও বা অত্যন্ত খারাপ অথচ আত্মবিশ্বাসে ভরা করাসী ভাষায়, তারপর আবার ক্লান্ত অথচ কর্তব্যপালনে দৃঢ়চিত্ত মানুষের মত আর একজন অতিথিকে বিদায় দিতে উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং টাক মাথার উপর যৎসামান্য পাকা চুল চাপড়ে বসাতে বসাতে তাকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। কখনও বা সামনের ঘর থেকে ফিরবার পথে ভাঁড়ার ঘর ও রান্না ঘরের ভিতর দিয়ে শ্বেত পাথরের মস্ত বড় খাবার ঘরে ঢুকছে; সেখানে আশি জন অতিথির জন্য টেবিল পাতা হচ্ছে; পরিচারকরা রূপোর ও চীনে মাটির বাসনপত্র আনছে, টেবিল সরাচ্ছে, দামাস্কাসের টেবিল-ঢাকনা বিছিয়ে দিচ্ছে। সেই সব দেখতে দেখতে সে দিমিত্রি ভাসিলোভিচকে ডেকে পাঠাচ্ছে; লোকটি সদ্বংশজাত এবং তার সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ম্যানেজার। খুশিমনে প্রকাণ্ড টেবিলটার দিকে তাকিয়ে বলছে: "দেখ দিমিত্রি, যেমন-যেমন হওয়া উচিত সব কিছু যেন ঠিক তেমনটি হয়। ঠিক আছে! আসল কথাই তো পরিবেশন, তাই বটে।" তারপর খুশির নিঃশ্বাস ফেলে সে বসবার ঘরে ফিরে আসছে।

কাউণ্টেসের বিশালবপু পরিচারক বসবার ঘরে ঢুকে গম্ভীর গলায় হাঁক দিল, "মারিয়া লভভ্‌না কারাগিনা ও তার কন্যা!" কাউণ্টেস এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর স্বামীর প্রতিকৃতি আঁকা সোনার নস্যদানি থেকে এক টিপ নস্য নিল।

"অতিথির জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গেলাম। যাই হোক, শুধু এই মহিলার সঙ্গেই দেখা করব, আর নয়। মহিলাটি এত ভনিতা জানেন। তাকে ভিতরে আসতে বল," এমন বিষণ্ণ সুরে পরিচারককে হুকুম করল যেন বলতে চাইল: "খুব ভাল কথা, আমাকে শেষ করে ফেল।"

একটি লম্বা-চওড়া, শক্ত-সমর্থ, গর্বিত-মুখ স্ত্রীলোক একটি গোলমুখ হাস্যময়ী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে পোশাকের খসখস শব্দ তুলে বসবার ঘরে প্রবেশ করল।

"প্রিয় কাউণ্টেস, কী যুগ পড়েছে…বেচারি মেয়েটা একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে…রাজুমভ্‌স্কিদের বল-নাচে…আর কাউণ্টেস এপ্রাক্সিনা…আমি তো খুব খুশি…," পোশাকের খসখস আর চেয়ার টানার ঘসঘস শব্দের সঙ্গে গলা মিশিয়ে এবং পরস্পরের গলার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নানা নারীকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তারপর শুরু হয় সেই সব আলোচনা যা ততক্ষণ পর্যন্ত চলতে থাকে যতক্ষণ না অতিথিরা পোশাক খসখসিয়ে উঠে বলতে থাকে, "আমি খুব খুশি হয়েছি…মামণির স্বাস্থ্য…আর কাউণ্টেস এপ্রাক্সিনা…"; তারপর আবার সেই খসখসানি, সামনের ঘরে গমন, জোব্বা অথবা আলখাল্লা পরিধান এবং প্রস্থান। আলোচনার বিষয়বস্তু সেদিনকার প্রধান ঘটনা: ক্যাথারিণের ধনবান ও খ্যাতিমান প্রেমিক কাউণ্ট বেজুকভের অসুস্থতা এবং তার অবৈধ সন্তান পিয়ের যে নাকি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার ভোজের আসরে অত্যন্ত

খারাপ ব্যবহার করেছে।

অতিথি বলল, “বেচারি কাউন্টের জন্য আমার দুঃখ হয়। একে তার স্বাস্থ্য খারাপ, তার উপর ছেলেকে নিয়ে এই বিরক্তিই তাকে মেরে ফেলবে!”

কাউন্টেস যদিও এর আগেই পনেরো বারের মত কাউন্ট বেজুকভের দুঃখের কথা শুনেছে তবু সে যেন কিছুই জানে না এমনি ভাব দেখিয়ে বলে উঠল, “সে আবার কি?”

অতিথি সোচ্চারে বলল, “আধুনিক শিক্ষার এই তো ফল। মনে হয়, কাউন্ট যখন বিদেশে ছিলেন তখন এই ছেলেটি যেমন খুশি চলাফেরা করত, এখন তো পিতার্সবুর্গে শুনলাম সে এমন সব ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা করে চলেছে যে পুলিশ তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।”

“এমন কথা বলবেন না!” কাউন্টেস বলল।

আন্না মিখায়লভ্‌না গলা মেলাল, “যত সব কুসঙ্গী জুটিয়েছে। প্রিন্স ভাসিলির ছেলে, সে, আর কে এক দলোখভ মিলে কী যে কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছে তা একমাত্র ভগবানই জানেন। আর সেজন্য তাদের কষ্টও ভোগ করতে হয়েছে। দলোখভের পদাবনতি ঘটেছে, আর বেজুকভের ছেলেকে মস্কোতে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে। আনাতোল কুরাগিনের বাবা কোন রকমে ছেলের ব্যাপার-স্যাপার চাপা দিলেও তাকেও পিতার্সবুর্গ ছেড়ে যাবার হুকুম দেওয়া হয়েছে।”

“কিন্তু তারা করেছেটা কি?” কাউন্টেস শুধাল।

অতিথি জবাব দিল, “তারা তো সব রীতিমত গুণ্ডা, বিশেষ করে দলোখভ। সে তো মারিয়া আইভানভ্‌না দলোখভার ছেলে। মহিলা ভালমানুষ, আর তার কপালে এই। তাই ভাবুন। ঐ তিনজন মিলে কোথা থেকে একটা ভালুক যোগাড় করেছে, আর সেটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে দেখা করতে! পুলিশ বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তিন ছোকরা কি করল? পুলিশ ও ভালুকটাকে পিঠে-পিঠ দিয়ে বেঁধে ফেলে দিল ময়লা খালের জলে। আর ভালুকটা সেই পুলিশকে পিঠে নিয়ে সাঁতরাতে লাগল!”

হাসতে হাসতে খুন হয়ে কাউন্ট বলে উঠল, “আহা, পুলিশটার অবস্থা না জানি কী মধুরই হয়েছিল!”

“ওঃ, কী ভয়ংকর! একথা শুনে আপনি হাসতে পারছেন কাউন্ট?”

অথচ মহিলারা নিজেরাও হাসি সংবরণ করতে পারল না।

অতিথি বলতে লাগল, “শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা সে বেচারিকে উদ্ধার করেছিল। আর ভেবে দেখুন, সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ বেজুকভের ছেলে হয়ে সে এমনভাবে মজা করতে পারে! অথচ সকলে বলে সে সুশিক্ষিত ও চতুর! বিদেশী শিক্ষা তো তাকে এই তৈরি করেছে! আশা করি, যতই টাকাপয়সা

থাকুক মস্কোতে কেউ তাকে অভ্যর্থনা জানাবে না। আমার সঙ্গে তার পরিচয় করাতে তারা চেয়েছিল, কিন্তু আমি সোজা ফিরিয়ে দিয়েছি : নিজের মেয়ের কথা তো আমাকে ভাবতে হবে।'

এ কথার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা অমনোযোগের ভাণ করল। তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কাউণ্টেস বলল, "এই যুবককে আপনি এত ধনী বলছেন কেন? তার ছেলেরা তো সকলেই অবৈধ। আমার তো মনে হয় পিয়েরও অবৈধ সন্তান।"

অতিথি হাত নেড়ে একটা ভঙ্গী করে দেখাল।

"আমার তো ধারণা এ রকম সন্তান তার এককুড়ি আছে।"

প্রিন্সেস মিখায়লভ্‌না এবার আলোচনায় যোগ দিল; সে যে উঁচু মহলের মানুষ, আর সমাজে কি চলছে তা যে তার ভালই জানা আছে সেটাই সে বোঝাতে চায়।

অর্থপূর্ণভাবে ফিসফিস করে সে বলল, "আসল ব্যাপার হল কাউণ্ট সিরিলের সুখ্যাতি সকলেরই জানা।…ছেলেমেয়েদের অনেককে তিনি হারিয়েছেন, কিন্তু এই পিয়ের তার খুব প্রিয় ছিল।"

কাউণ্টেস বলল, "মাত্র এক বছর আগেও এই বুড়ো মানুষটি কী সুন্দরই না ছিলেন! তার চাইতে সুন্দর পুরুষ মানুষ আমি আর দেখি নি।"

আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "এখন তিনি অনেক বদলে গেছেন। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, তার স্ত্রীর দিক থেকে প্রিন্স ভাসিলিই তার উত্তরাধিকারী; কিন্তু কাউণ্ট পিয়েরকে খুব ভালবাসেন, তার লেখাপড়ার উপর নজর রাখেন, এমন কি সম্রাটকেও তার কথা লিখেছেন; যাতে তার মৃত্যু হলে—তিনি যে রকম অসুস্থ তাতে যে কোন সময় তার মৃত্যু হতে পারে; ডাঃ লোরাইনও পিতার্সবুর্গ থেকে এসে হাজির হয়েছে—তার প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী কে হবে, পিয়ের না প্রিন্স ভাসিলি, তা কেউ জানে না। চল্লিশ হাজার ভূমিদাস আর লক্ষ লক্ষ রুবল! সব কিছু আমি ভালই জানি, কারণ প্রিন্স ভাসিলি নিজে আমাকে বলেছেন। তাছাড়া, সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ আমার মায়ের সম্পর্কে ভাই হন। তিনি আমার বরি-র ধর্মবাপও বটে।"

"প্রিন্স ভাসিলি গতকাল এখানে এসেছে। শুনেছি, কোন তদন্তের কাজে সে এসেছে" অতিথিটি বলল।

প্রিন্সেস বলল, "তা বটে, তবে নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, ওটা একটা অজুহাত। আসল কথা, কাউণ্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ-এর অসুখের সংবাদ শুনে তার সঙ্গে দেখা করতেই সে এসেছে।"

কাউণ্ট বলে উঠল, "কিন্তু তুমি কি জান গো, সেটা জব্বর রসিকতা হয়েছিল।" কিন্তু বয়স্কা অতিথিটি তার কথা শুনছে না দেখে সে তরুণীদের দিকে ফিরে বলল, "পুলিশটির যে কী হাস্যকর অবস্থা হয়েছিল সেটা আমি

যেন কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি !"

নিজেকে পুলিশের ভূমিকায় কল্পনা করে কাউণ্ট তার হাত দুটো দোলাতে লাগল। যে সব মানুষ ভাল খায়, বিশেষ করে ভাল টানে, তাদের মত উচ্ছ্বসিত হাসিতে কাউণ্টের মোটাসোটা দেহটা দুলে দুলে কাঁপতে লাগল। "অতএব, সকলে আসবেন এবং আমাদের সঙ্গে খাবেন !" সে বলল।

অধ্যায়—১১

সকলে চুপচাপ। অমায়িক হাসির সঙ্গে কাউণ্টেস অতিথিদের দিকে তাকাতে লাগল ; অবশ্য এ সত্য লুকাল না যে এখন তারা সবাই বিদায় নিলে সে মোটেই দুঃখিত হবে না। অতিথির মেয়েটি এর মধ্যেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে পোশাকটা পরিপাটি করে নিচ্ছিল ; এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে অনেক ছেলেমেয়ের দৌড়ে দরজার কাছে যাবার এবং একটা চেয়ার উল্টে যাবার শব্দ শোনা গেল। তেরো বছরের একটি মেয়ে মসলিনের খাটো ফ্রকের ভাঁজে একটা কিছু লুকিয়ে নিয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকে মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল। স্পষ্ট বোঝা গেল, ছুটতে ছুটতে এতদূর চলে আসার ইচ্ছা তার ছিল না। তার পিছন পিছন দরজায় এসে হাজির হল লাল রঙের কোট-কলারওয়ালা একটি ছাত্র, রক্ষীবাহিনীর একজন অফিসার, পনেরো বছরের একটি মেয়ে এবং খাটো জ্যাকেটপরা গোলাপী মুখের একটি মোটাসোটা ছেলে।

কাউণ্ট লাফিয়ে উঠে এ-পাশে হেলে দুই হাত বাড়িয়ে দৌড়ে আসা মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল।

"আঃ, এই যে ধরে ফেলেছি !" হাসতে হাসতে কাউণ্ট বলল। "আমার মামণি, আজ যার নামকরণ দিবস। আদরের মাটি আমার !"

কঠোর হবার ভাণ করে কাউণ্টেস বলল, "সোনামণি, সব কিছুরই সময়-অসময় আছে।" স্বামীর দিকে ফিরে বলল, "তুমিই ওকে নষ্ট করেছ ইলিয়া।"

অতিথিটি বলল, "কেমন আছ সোনা ? তোমার নামকরণ দিবস বার বার ফিরে আসুক এই কামনা করি।" মায়ের দিকে ফিরে বলল, "কী মনোরম মেয়েটি !"

কালো চোখ ও চওড়া মুখের মেয়েটি ঠিক সুন্দরী না হলেও প্রাণশক্তিতে ভরপুর ; দৌড়ে আসার জন্য তার খোলা কাঁধ দুটো উঠছে-নামছে, বডিস্‌টা কাঁপছে। পিছনে ঠেলে-দেওয়া কালো কোঁকড়ানো চুল, সরু খোলা হাত, লেস-লাগানো সরু পাজামা পরা ছোট দুখানি পা, নীচু চটিতে ঢাকা পায়ের পাতা—সব মিলিয়ে মেয়েটি এখন সেই মনোহর বয়সে এসে পৌঁচেছে যখন

মেয়েটি ঠিক শিশুও নেই, আবার শিশুটি এখনও নারী হয়েও ওঠে নি। মায়ের বকুনিকে গ্রাহ্য না করে মেয়েটি বাবার কাছ থেকে পালিয়ে লজ্জারক্ত মুখখানি মায়ের ওড়নার লেসের মধ্যে লুকিয়ে ফেলে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে ভাঙাভাঙা কথায় একটা পুতুলের কথা বুঝিয়ে বলে ফ্রকের ভাঁজের ভিতর থেকে সেটাকে বের করে দেখাল।

"দেখতে পাচ্ছ?…আমার পুতুল…মিমি…দেখ…!" নাতাশা শুধু এইটুকুই বলতে পারল (তার কাছে সব ব্যাপারটাই মজার খেলা)। মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে সে এমন প্রচণ্ডভাবে হো-হো করে হেসে উঠল যে গম্ভীর অতিথিটি পর্যন্ত সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না।

কঠোর হবার ভাণ করে মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে মা বলল, "এবার এখান থেকে পালাও, আর তোমার দস্যিপনাও সঙ্গে নিয়ে যাও।" অতিথির দিকে ফিরে বলল, "এটি আমার ছোট মেয়ে।"

নাতাশা এক মুহূর্তের জন্য মায়ের ওড়না থেকে মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে আবার মুখটা লুকিয়ে ফেলল।

বাধ্য হয়ে এই পারিবারিক দৃশ্যের দর্শক হয়ে অতিথিটি ভাবল, তারও এতে অংশ নেওয়া দরকার।

সে নাতাশাকে বলল, "বল তো সোনা, মিমি তোমার কে হয়? আমার তো মনে হয় মেয়ে, কি বল?'

এ সব ছেলেমানুষি ব্যাপারে অতিথির নাক গলানো নাতাশার পছন্দ হল না; কোন কথা না বলে সে গম্ভীরভাবে তার দিকে তাকাল।

ইতিমধ্যে ছোটদের দল: আন্না মিখায়লভ্‌নার ছেলে অফিসার বরিস; কাউণ্টের বড় ছেলে উপ-স্নাতক নিকোলাস; কাউণ্টের পনেরো বছর বয়সের ভাইঝি সোনিয়া, আর কাউণ্টের ছোট ছেলে পেত্‌য়া (পিতারের ডাক-নাম)—সকলেই বসবার ঘরে জমিয়ে বসেছে এবং তাদের চোখে-মুখে যে উত্তেজনা ও উল্লাস ঝলমল করছে তাকে শোভন ব্যবহারের সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত রাখতে চেষ্টা করছে। স্পষ্টতই পিছনের যে ঘর থেকে তারা ছুটে বেরিয়ে এসেছে সেখানে যে সব আলোচনা চলছিল সেগুলি এই বসবার ঘরের সামাজিক কুৎসা, আবহাওয়া ও কাউণ্টেস এপ্রাক্সিনাকে নিয়ে আলোচনার চাইতে অনেক বেশী মজার। অনেক কষ্টে হাসি চেপে তারা মাঝেমাঝেই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছিল।

ছাত্র ও অফিসার—দুটি যুবকই ছেলেবেলা থেকে বন্ধু; দুজনের এক বয়স, দেখতে এক রকম না হলেও দুজনই সমান সুন্দর। বরিস লম্বা, ফর্সা, তার মুখমণ্ডল শান্ত, সুদর্শন। নিকোলাস ছোটখাট, মাথায় কোঁকড়া চুল, সরল মুখ। উপরের ঠোঁটে ইতিমধ্যেই কালো লোম দেখা দিয়েছে; সারা মুখে আবেগ ও উৎসাহ সুস্পষ্ট। বসবার ঘরে ঢুকে নিকোলাস লজ্জা পেল। কিছু

একটা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। অপর দিকে বরিস সঙ্গে সঙ্গেই পায়ের নীচে মাটি পেয়ে গেল ; শান্তভাবে হাসির মেজাজে সে বলতে লাগল—পুতুল মিমি যখন তরুণী ছিল, যখন তার নাকটা ভাঙে নি, তখন থেকে সে তাকে চেনে ; এই পাঁচ বছরে চোখের সামনে সে কেমন বুড়ি হয়ে গেছে, খুলির মাঝবরাবর তার মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। কথাগুলি বলে সে নাতাশার দিকে তাকাল। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাতাশা তাকাল তার ভাইয়ের দিকে ; নিকোলাস তখন চোখ কুঁচকে চাপা হাসির দমকে কাঁপছে। তা দেখে রাগ সামলাতে না পেরে নাতাশা লাফ দিয়ে উঠে তার দুখানি ছোট পায়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। বরিস হাসল না।

ঈষৎ হেসে সে মাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কোথায় যাবে বলছিলে না মামণি ? তোমাদের কি গাড়িটা চাই ?"

মাও হেসে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও তো, গাড়িটা জুড়তে বল।"

বরিস নিঃশব্দে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল নাতাশার খোঁজে। মোটাসোটা ছেলেটি রেগে তাদের পিছন পিছন ছুটে গেল, তাদের কর্মসূচীতে ব্যাঘাত ঘটায় সে যেন বিরক্ত হয়েছে।

অধ্যায়—১১

তরুণী অতিথিটি এবং কাউণ্টেসের বড় মেয়েকে (বোনের থেকে মাত্র চার বছরের বড় হলেও সে এরই মধ্যে বয়স্কদের মত ব্যবহার করতে শুরু করেছে) না ধরলে এখন বসবার ঘরে অল্প বয়সীদের মধ্যে নিকোলাস আর ভাই-ঝি সোনিয়া। মেয়েটি একহারা, ছোটখাট, সুন্দরী ; দীর্ঘ আঁখিপক্ষে ঢাকা দুই চোখে শান্ত চাউনি, ঘন কালো চুলের বিনুনি মাথাটাকে দু'বার প্যাঁচ দিয়ে রেখেছে, গায়ের রঙে বাদামী আভা, বিশেষ করে সুডৌল ও পেশীবহুল বাহু ও গলার রঙে বাদামীর আভাস। সুললিত চলন, নরম হাত-পায়ের নমনীয়তা, আচরণে একটা বিশেষ লাজনম্রতা ও সংযম—সব মিলে আজ সে একটি সুন্দর, সদ্য বেড়া-ওঠা বিড়ালছানা হলেও অচিরেই একটি সুন্দরী মার্জারী হয়ে উঠবার সম্ভাবনা তার মধ্যে আছে। তার হাসি দেখেই বোঝা যায় যে নিজেকে সে সাধারণ আলোচনার যোগ্য শ্রোতা বলেই মনে করে ; নিজের অজান্তেই দীর্ঘ, ঘন আঁখিপক্ষের নীচ দিয়ে সে সেনাবিভাগে যোগদানকারী জ্ঞাতি-ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছিল ; স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, সুযোগ পেলেই তারা দুজনও নাতাশা ও বরিসের মত বসবার ঘর থেকে পালিয়ে গিয়ে খেলা শুরু করে দেবে।

অতিথিটিকে সম্বোধন করে এবং নিকোলাসকে দেখিয়ে কাউণ্ট বলল, "কি জানেন, তার বন্ধু বরিস অফিসার হয়েছে, কাজেই বন্ধুত্বের খাতিরে সেও বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে, এই বুড়ো বাপকে ছেড়ে সামরিক চাকরিতে ঢুকতে যাচ্ছে। অথচ প্রাচীন সংগ্রহশালা বিভাগে তার জন্য চাকরি এবং সব কিছুই অপেক্ষা করছিল। এই তো খাঁটি বন্ধুত্ব, তাই না?" জিজ্ঞাসার সুরে কাউণ্ট কথাগুলি বলল।

"কিন্তু লোকে তো বলছে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়ে গেছে," অতিথি জবাব দিল।

কাউণ্ট বলল, "তারা তো অনেকদিন ধরেই একথা বলছে, বার বার একথা তারা বলবে, আর তাতেই শেষ হয়ে যাবে। কি জানেন, এই হল বন্ধুত্ব। সে অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দিতে যাচ্ছে।"

কি বলবে বুঝতে না পেরে অতিথি মাথা নাড়ল।

নিকোলাস রেগে বলল, "বন্ধুত্বের জন্য মোটেই নয়। আমি নিজেই বুঝতে পারি যে সেনাবাহিনীই আমার কর্মক্ষেত্র।"

সে তার সম্পর্কিত বোন ও তরুণী অতিথিটির দিকে তাকাল; দুজনই স্মিত হাসিতে তাকে সমর্থন জানাল।

"পাভ্‌লোগ্রাদ হুজার বাহিনীর কর্ণেল শুবার্ট আজ আমাদের এখানেই নৈশভোজন সারবেন। তিনি ছুটিতে এখানে এসেছেন; নিকোলাসকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। কোন উপায় নেই!" কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে কাউণ্ট বলল; কথাটা তার পক্ষে কষ্টকর হলেও সে সহজভাবেই বলল।

ছেলে বলল, "আমি তো আগেই তোমাকে বলেছি বাপি, তুমি যদি আমাকে যেতে দিতে না চাও তো আমি থেকে যাব। কিন্তু আমি জানি, সেনাবাহিনী ছাড়া আর কোথাও আমাকে দিয়ে কিছু হবে না; আমি কূটনীতিকও হতে পারব না, সরকারী করণিকও নয়।—মনের কথা লুকিয়ে রাখতে আমি জানি না।" কথা বলতে বলতেই সে একটি সুন্দর যুবকের প্রেমিকসুলভ দৃষ্টিতে সোনিয়া ও তরুণী অতিথিটির দিকে তাকাতে লাগল।

ছোট্ট বিড়াল ছানাটিও নিকোলাসকে বারবার দেখছে; তাকে দেখে মনে হচ্ছে, যে কোন মুহূর্তে সে আবার লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে তার বিড়ালী স্বভাবকে প্রকাশ করবে।

বুড়ো কাউণ্ট বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে! ও তো সব সময়ই রেগে আছে! ওই বোনাপার্তই ওদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে; সে যে একজন পতাকাবাহী সৈনিক থেকে সম্রাট হয়েছে, এ কথাই ওরা সকলে ভাবে। বেশ তো, বেশ তো, ঈশ্বর যেন তাই করেন।" অতিথির মুখের ব্যঙ্গের হাসি তার নজরে প'ড়ল না।

বড়রা বোনাপার্তকে নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। জুলি কারাগিনা

যুবক রস্তভ-এর দিকে মুখ ফেরাল।

"বড়ই দুঃখের কথা বৃহস্পতিবার দিন তুমি আর্খারভদের বাড়ি যাও নি। তুমি না থাকায় আমার এত খারাপ লাগছিল," মৃদু হেসে জুলি বলল।

যুবকটি খুশি হয়ে প্রেমিকসুলভ হাসি হেসে জুলির আরও কাছে বসে তার সঙ্গে গোপন কথায় মেতে উঠল; সে একবারও খেয়াল করল না যে তার এই হাসি সোনিয়ার বুকে ছুরি বসিয়েছে; সে বেচারি লজ্জায় লাল হয়ে অস্বাভাবিকভাবে হাসছে। আলোচনার ফাঁকে সে একবার সোনিয়ার দিকে তাকাল। সোনিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকাল; তারপর চোখের জল চাপতে না পেরে এবং ঠোঁটের নকল হাসি রাখতে না পেরে উঠে ঘর থেকে চলে গেল। নিকোলাসের সব হৈ-চৈ থেমে গেল। সে আলোচনার মধ্যে একটু ফাঁক খুঁজতে লাগল এবং সুযোগ পাওয়ামাত্রই বিষণ্ণ মুখে সোনিয়ার খোঁজে বেরিয়ে গেল।

"এই সব তরুণ-তরুণীরা কত সহজে মন দেওয়া-নেওয়া করে! Cousinage—dangereux voisinage (সম্পর্কিত ভাই-বোনের পাশাপাশি বাস বড়ই বিপজ্জনক।)"

তরুণ-তরুণীরা এই ঘরটাতে যে উজ্জ্বলতা এনে দিয়েছিল সেটা মিলিয়ে যেতে কাউণ্টেস বলল, "ঠিক; কত দুঃখ, কত উদ্বেগ পার হয়ে তবে না আজ তাদের নিয়ে এত সুখ। অথচ আজও আনন্দের চাইতে উদ্বেগই বেশী। উদ্বেগের আর শেষ নেই! বিশেষ করে ঠিক এই বয়সে, ছেলে মেয়ে উভয়ের পক্ষেই বয়সটা বড় বিপজ্জনক।"

"সবই নির্ভর করে শিক্ষাদীক্ষার উপরে," অতিথিটি মন্তব্য করল।

কাউণ্টেস বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আজ পর্যন্ত আমি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতই ব্যবহার করেছি আর তারাও আমার উপর পুরোপুরি বিশ্বাস রেখেছে।" এ ভুল তো সব বাবা-মাই করে যে ছেলেমেয়েরা তাদের কাছে কিছুই লুকোয় না। "আমি জানি, আমার মেয়ের যদি কোন গোপন কথা থাকে তো আমাকেই তা প্রথমে বলবে, আর আবেগের বশে নিকোলাস যদি কোন ক্ষতি করে বসে (একটি ছেলের পক্ষে সেটা ঘটতেই পারে) তাহলেও সে কখনও ঐ পিতার্সবুর্গের যুবকদের মত হবে না।"

"ঠিক, তারা সব চমৎকার ছেলে, চমৎকার," কাউণ্টও স্বরে স্বর মেলাল; যখনই কোন বিভ্রান্তিকর সমস্যা দেখা দেয় তখনই সব কিছুকে চমৎকার ভেবে নিয়ে সমস্যার সমাধান করাই তার স্বভাব। ভাব তোঃ ও হতে চায় হুজার। কি আর করা যাবে?"

অতিথিটি বলল, "আপনার মেয়েটি কিন্তু খুবই মনোরমা; একটি ছোট আগ্নেয়গিরি!"

কাউন্ট বলল, "হ্যাঁ, একেবারে সত্যিকারের আগ্নেয়গিরি। ঠিক আমার মতই হয়েছে। আর কী কণ্ঠস্বর; মেয়ে হলেও সত্যি কথাই বলব—ও বড় গায়িকা হবে, দ্বিতীয় সালামনি! ওকে গান শেখাবার জন্য একজন ইতালীয় শিক্ষক রেখে দিয়েছি।"

"ওর কি সে বয়স হয়েছে? আমি তো শুনেছি, এত অল্প বয়সে রেওয়াজ করলে গলা খারাপ হয়ে যায়।"

"আহা, না, না, ততটা অল্প বয়স নয়!" কাউন্ট বলল। "আরে, আমাদের মায়েদের তো বারো তেরো বছরেই বিয়ে হয়ে যেত।"

"আর ও তো এর মধ্যেই বরিসের প্রেমে পড়ে গেছে। ভাবুন তো!" বরিসের মায়ের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসির সঙ্গে কাউন্টেস বলল। তারপর মনের কথাটা খুলেই বলে ফেলল: "এখন যদি আমরা খুব কড়া হই, ওদের বাধা দেই···তাহলে ওরা লুকিয়ে কি কাণ্ড করে বসবে তা কে জানে (কাউন্টেসের বক্তব্য যে ওরা চুমো খাবে), কিন্তু ব্যাপার যা চলেছে তাতে মেয়ের সব কথাই আমি জানতে পারি। সন্ধ্যাবেলা ও নিজে থেকেই আমার কাছে ছুটে আসবে আর সব কথা খুলে বলবে। হয় তো আমি ওকে আস্কারা দিচ্ছি, কিন্তু আমার কাছে তো এটাই সেরা পথ বলে মনে হয়। ওর দিদির বেলায় আমি আরও কড়া ছিলাম।"

সুন্দরী বড় মেয়ে কাউন্টেস ভেরা হেসে বলল, "হ্যাঁ, আমাকে অন্যভাবে মানুষ করা হয়েছিল।"

হাসিতে সাধারণত সৌন্দর্য বাড়ে, কিন্তু ভেরার বেলায় তা হল না; বরং একটা অস্বাভাবিক, অপ্রীতিকর ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। ভেরা সুদর্শনা, মোটেই বোকা নয়, বেশ বুদ্ধি আছে, ভাল লেখাপড়া শিখেছে, গলা মিষ্টি; সে যা বলেছে তাও সত্যি ও সঙ্গত; অথচ কী আশ্চর্য, উপস্থিত সকলেই—অতিথি ও কাউন্টেস পর্যন্ত এমনভাবে ভেরার দিকে তাকাল যে তার কথায় তারা অবাক হয়েছে, বিচলিত বোধ করেছে।

অতিথিটি বলল, "প্রথম মেয়েদের বেলায় সকলেই একটু বেশী সতর্ক হয়ে থাকে; তাদের কিছুটা অসাধারণ করে গড়ে তুলতে চায়।"

কাউন্ট বলল, "সে কথা অস্বীকার করে লাভ কি গো? আমাদের কাউন্টেসও তো ভেরার বেলায় একটু বেশী মাত্রায়ই সতর্ক হয়েছিল। আরে, তাতে কি হয়েছে? সে তো চমৎকার উৎরে গেছে।" সে ভেরার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

অতিথিরা উঠে দাঁড়িয়ে বিদায় নিল; কথা দিয়ে গেল আহারের সময় আসবে।

"কী ভদ্রতা! আমি তো ভেবেছিলাম ওরা কোন দিনই উঠবে না এখান থেকে," অতিথিরা চলে গেলে কাউন্টেস বলল।

অধ্যায়—১৩

বসবার ঘর থেকে বেরিয়ে নাতাশা সব্‌জি-ঘর পর্যন্ত গিয়েই থেমে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বসবার ঘরের কথাবার্তা শুনতে শুনতে সে বরিসের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। ক্রমেই সে অধৈর্য হয়ে উঠল, পা ঠুকতে লাগল, বরিস না এলে বুঝি কেঁদেই ফেলবে ; এমন সময় তার সতর্ক পায়ের শব্দ কানে এল ; না দ্রুত, না ধীরে সে আসছে। নাতাশা তাড়াতাড়ি ফুলের টবগুলোর ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

বরিস ঘরের মাঝখানে এসে থামল, চারদিকে তাকাল, পোশাক থেকে একটু ধুলো ঝাড়ল, তারপর আয়নার কাছে গিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানি দেখতে লাগল। সে কি করে দেখবার জন্য নাতাশা লুকিয়ে থেকেই সব কিছু দেখতে লাগল। বরিস কিছুক্ষণ আয়নার সামনে দাঁড়াল, একটু হাসল, তারপর অপর দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। নাতাশা তাকে ডাকতে গিয়েও মনের ইচ্ছাটা পাল্টে ফেলল। ভাবল, "ওই আমাকে খুঁজে বের করুক।" বরিস বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই সোনিয়া এসে হাজির হল। তার মুখ লাল, চোখে জল, মুখে রাগ-রাগ অস্পষ্ট কথা। প্রথমেই তার কাছে ছুটে যাবার যে ইচ্ছাটা নাতাশার মনে এসেছিল সেটাকে চেপে রেখে সে লুকিয়েই রইল, বাইরে কি ঘটছে তাই দেখতে লাগল। একটা অদ্ভুত নতুন অভিজ্ঞতা তার হচ্ছে। আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে সোনিয়া বসবার ঘরের দরজার দিকেই তাকিয়ে আছে। দরজা খুলে নিকোলাস ঘরে ঢুকল।

সোনিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "সোনিয়া, তোমার কি হয়েছে ? তুমি কেমন করে পারলে ?"

"কিছু হয় নি, কিচ্ছু হয় নি ; আমাকে একলা থাকতে দাও !" সোনিয়া ফুঁপিয়ে উঠল।

"আঃ, আমি জানি কি হয়েছে।"

"বেশ তো, জান তো ভালই, তার কাছেই ফিরে যাও।"

"সো-নি-য়া ! এদিকে তাকাও ! বাজে কথা কল্পনা করে কেন তুমি এভাবে আমাকে কষ্ট দিচ্ছ, আর নিজেও কষ্ট পাচ্ছ ?" তার হাত ধরে নিকোলাস বলল।

সোনিয়া হাতটা সরাল না ; তার কান্নাও থেমে গেল। নাতাশা একেবারে চুপ। বুঝি তার নিঃশ্বাসও পড়ছে না। জলজলে চোখ মেলে লুকিয়ে থেকেই সবকিছু দেখতে লাগল। ভাবতে লাগল, "এখন কি ঘটবে ?"

নিকোলাস বলল, "সোনিয়া ! এ জগতে অন্য লোককে নিয়ে আমার কি দরকার ? তুমিই আমার সব। তোমাকে আমি তা প্রমাণ করে দেব !"

"তোমার মুখে এসব কথা আমি শুনতে চাই না।"

"বেশ, তাহলে বলব না ; শুধু তুমি আমাকে ক্ষমা কর সোনিয়া।" কাছে গিয়ে নিকোলাস সোনিয়াকে চুমো খেল।

"আহা, কী সুন্দর," নাতাশা ভাবল। সোনিয়া ও নিকোলাস সব্‌জি-ঘর থেকে চলে গেলে নাতাশাও সেখান থেকে বেরিয়ে বরিসকে ডেকে আনল।

অর্থপূর্ণ চতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "বরিস, এখানে এস। তোমাকে কিছু বলতে চাই। এখানে, এখানে!" বরিসকে নিয়ে সে সব্‌জি-ঘরে সেই টবগুলোর মধ্যে গেল যেখানে সে লুকিয়েছিল।

বরিস হাসতে হাসতে তাকে অনুসরণ করল।

"সেই কিছুটা কি?" বরিস প্রশ্ন করল।

নাতাশা বিচলিত বোধ করল, চারদিকে তাকাল, তারপর একটা টবের উপর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া পুতুলটাকে দেখে সেটাকে তুলে নিল।

"পুতুলটাকে চুমো খাও," সে বলল।

বরিস একদৃষ্টিতে তার উন্মুখ মুখখানির দিকে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না।

নাতাশা বলল, "চাই কি? আচ্ছা, তাহলে এখানে এস।" গাছপালাগুলোর আরও ভিতরে ঢুকে সে পুতুলটাকে ফেলে দিল। ফিসফিসিয়ে বলল, "আরও কাছে, আরও কাছে"

সে তরুণ অফিসারটার হাত চেপে ধরল ; তার সলজ্জ মুখে ফুটে উঠল একটি গম্ভীর ভয়ের ভাব।

"আর আমাকে? আমাকে চুমো খাবে কি?" ভুরুর নীচ দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে উত্তেজনায় প্রায় কেঁদে ফেলে অস্পষ্ট গলায় নাতাশা ফিসফিস করে বলল।

বরিস লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

নাতাশার উপর ঝুঁকে পড়ে আরও লাল হয়ে সে বলল, "আচ্ছা মজার লোক তো তুমি!" কিন্তু সে অপেক্ষা করে রইল, কিছুই করল না।

হঠাৎ নাতাশা লাফ দিয়ে একটা টবের উপর উঠে বরিসের চাইতে উঁচু হয়ে দুটি খোলা হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করল এবং মাথার চুলগুলোকে পিছনে ঠেলে দিয়ে গভীর আশ্লেষে তার ঠোঁটের উপর চুমো খেল।

তারপর টবগুলোর অপর পাশে নেমে নাতাশা ঘাড় কাৎ করে দাঁড়াল।

বরিস বলল, "নাতাশা, তুমি তো জান আমি তোমাকে ভালবাসি, কিন্তু…"

"তুমি আমাকে ভালবাস?" নাতাশা বলল।

"হ্যাঁ, ভালবাসি, কিন্তু দয়া করে এ রকম কাজের মধ্যে আমাদের টেনে নিও না।…আরও চার বছরের মধ্যেই…তখন আমি তোমার পাণি প্রার্থনা করব।"

নাতাশা ভাবতে লাগল।

"তেরো, চোদ্দ, পনেরো, ষোল," সুন্দর ছোট আঙুলে সে গুণতে লাগল। "ঠিক আছে। তাহলে কথা পাকা হল?"

আনন্দ ও তৃপ্তির হাসিতে তার উন্মুখ মুখখানি ঝলমল করে উঠল।

"পাকা হল!" বরিস জবাব দিল।

"চিরদিনের মত?" মেয়েটি বলল। "মৃত্যু পর্যন্ত?"

বরিসের হাতটা ধরে খুশিভরা মুখে নাতাশা তাকে নিয়ে পাশের ছোট ঘরটাতে গেল।

অধ্যায়—১৪

অতিথিদের আপ্যায়ন করে কাউণ্টেস এতই ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে দরোয়ানকে হুকুম দিল যেন আর কাউকে ঢুকতে না দেয়; তবে দরোয়ানকে আরও বলা হল, "অভিনন্দন জানাতে" যারাই আসবে তাদের যেন খাবার নিমন্ত্রণ অবশ্যই জানানো হয়। ছোটবেলাকার বন্ধু প্রিন্সেস মিখায়লভ্‌নার সঙ্গে কিছু গোপন কথা বলার ইচ্ছা হল কাউণ্টেসের; বন্ধুটি পিতার্সবুর্গ থেকে আসার পরে তার সঙ্গে ভাল করে দেখাই হয় নি। আন্না মিখায়লভ্‌না তার চেয়ারটা কাউণ্টেসের চেয়ারের কাছে টেনে নিল।

আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "তোমার সঙ্গে আমি প্রাণ খুলেই কথা বলব। পুরনো বন্ধুদের মধ্যে ক'জনাই বা আর আছি! সেই জন্যই তো তোমার বন্ধুত্ব আমার কাছে এত মূল্যবান।"

ভেরার দিকে তাকিয়ে সে থামল। কাউণ্টেস বন্ধুর হাতে চাপ দিল।

বড় মেয়ে ভেরা তার খুব প্রিয় নয়; তাকে বলল, "ভেরা, তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা এত কম কেন? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে তুমি এখানে থাক এটা আমরা চাইছি না? অন্য মেয়েদের কাছে যাও, না হয়…"

ভেরা তাচ্ছিলোর হাসি হাসল, কিন্তু মোটেই আহত হয়েছে বলে মনে হল না।

নিজের ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি যদি আগেই আমাকে বলতে মামণি, আমি চলে যেতাম।"

ছোট ঘরটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে দেখল দুই যুগল বসে আছে, এক এক জানালায় এক এক যুগল। সে থেমে ঘৃণার হাসি হাসল। সোনিয়া বসেছে নিকোলাসের পাশে; নিকোলাস নিজের লেখা প্রথম কবিতাটি সোনিয়াকে দেবার জন্য সেটা নকল করছে। বরিস ও নাতাশা বসেছিল আর একটা জানালায়; ভেরা ঢুকতেই তারা কথা বন্ধ করল। অপরাধসূচক অথচ

খুশি মুখে সোনিয়া ও নাতাশা ভেরার দিকে তাকাল।

দুটি ছোট মেয়ে প্রেমে পড়েছে—এ দৃশ্য তো সুখকর ; কিন্তু তাদের দেখে ভেরার মনে কোন রকম সুখের ভাব জাগল না।

সে বলল, "কত বার তোমাকে বলি নি যে আমার কোন জিনিস নেবে না ? তোমার তো নিজের একটা ঘর আছে।" নিকোলাসের কাছ থেকে সে দোয়াতটা নিয়ে নিল।

কলমটা ডুবিয়ে নিকোলাস বলল, "এক মিনিট, এক মিনিট।"

ভেরা বলল, "তুমি সব সময়েই অসময়ে কাজ কর। বসবার ঘরে এমন ভাবে ছুটে এসেছিলে যে তোমার জন্য সকলেই লজ্জা পেয়েছিল।"

সে যা বলল সে কথা ঠিকই, হয় তো সেই জন্যই কেউ কোন জবাব দিল না, চারজনই এ-ওর দিকে তাকাতে লাগল। দোয়াতটা হাতে নিয়ে ভেরা ঘরের মধ্যেই রয়ে গেল।

"তোমাদের এই বয়সে নাতাশা ও বরিসের মধ্যে, অথবা তোমাদের দুজনের মধ্যে কী এমন গোপন কথা থাকতে পারে ? যত সব বাজে ব্যাপার !"

"দেখ ভেরা, তাতে তোমার কি ?" আত্মপক্ষ সমর্থনে নাতাশা শান্ত গলায় বলল।

মনে হচ্ছে, আজ সে সকলের প্রতিই দয়ালু ও স্নেহশীল।

"কী বোকামি." ভেরা বলল, "তোমার জন্য আমি লজ্জিত। গোপন কথাই বটে !"

একটু গরম হয়ে নাতাশা বলল, "সকলেরই নিজস্ব কিছু গোপন কথা থাকে। তোমার ও বের্গ-এর ব্যাপারে তো আমরা নাক গলাই না।"

ভেরা বলল, "না গলানোই উচিত, কারণ আমার আচরণে কখনও অন্যায় কিছু থাকে না। কিন্তু বরিসের সঙ্গে তোমার আচরণের কথা আমি এখনই মামণিকে বলে দেব।"

বরিস বলল, "নাতালিয়া ইল্যিনিচ্না আমার প্রতি খুব ভাল ব্যবহারই তো করে। আমার কোন অভিযোগ নেই।"

"থাম বরিস ! তুমি এমনই এক কূটনীতিক যে আমরা বিরক্ত হয়ে উঠেছি," ঈষৎ কাঁপা ক্ষুব্ধ গলায় নাতাশা কথা বলল। ("কূটনীতিক" কথাটা এখন ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুবই চলতি ; একটা বিশেষ অর্থেই সে কথাটা ব্যবহার করল।) আমাকে ও বিরক্ত করে কেন ?" তারপর ভেরার দিকে ফিরে বলল, "এ সব তুমি কোনদিন বুঝবে না, কারণ তুমি কোন দিন কাউকে ভালবাস নি। তোমার হৃদয় বলে কিছু নেই। তুমি একটি মাদাম দ্য জেন্লিস, তার বেশী কিছু নয় (এই ডাক নামটা ভেরাকে দিয়েছে নিকোলাস ; এটাতে যথেষ্ট হুল আছে বলে মনে করা হয়), আর মানুষের প্রতি বিরূপ ব্যবহার করাতেই তোমার সব চাইতে বেশী আনন্দ ! যাও,

বের্গ-এর সঙ্গে যত পার প্রেম-প্রেম খেলা করগে।"

"আর যাই করি আমি কখনও অতিথিদের সামনে একটা ছেলের পিছনে ছুটব না ..."

নিকোলাস বলল, "দেখ, তুমি যা চেয়েছিলে তা করেছ, প্রত্যেককে কতকগুলি অপ্রীতিকর কথা বলেছ, তাদের বিপর্যস্ত করেছ। চল, আমরা নার্সারিতে যাই।"

একদল সন্ত্রস্ত পাখির মত চারজন ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল।

ভেরা বলল, "অপ্রীতিকর কথা আমাকেই বলা হয়েছে, আমি কাউকে বলি নি।"

দরজার পথে অনেকগুলো হাস্যমুখর গলার শব্দ ভেসে এল, "মাদাম দ্য জেন্‌লিস! মাদাম দ্য জেন্‌লিস!"

প্রত্যেককে বিরক্ত করে তুললেও সুন্দরী ভেরা কিন্তু হাসতে লাগল; এ সব কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে আয়নার কাছে গিয়ে সে চুল ও গলবন্ধ ঠিক করতে লাগল। নিজের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সে যেন আরও নির্বিকার ও শান্ত হয়ে উঠল।

* * *

বসবার ঘরে তখনও আলোচনা চলছে।

কাউন্টেস বলছে, "দেখ ভাই, আমার জীবনটাও কিছু শুধুই গোলাপে ছাওয়া নয়। যে ভাবে আমরা জীবন চালাচ্ছি তাতে আমাদের সামর্থ্যে যে বেশীদিন কুলোবে না তা কি আমি জানি না? কেবল ক্লাব আর ক্লাব, আর আলস্যে গা ঢেলে দেওয়া। গ্রামে গিয়েও কি বিশ্রাম আছে? থিয়েটার, শিকার, আর কি যে নয় তা ঈশ্বরই জানেন! কিন্তু আমার কথা থাক; তুমি কেমন চালাচ্ছ তাই বল। তোমাকে দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাই আনেৎ,—এই বয়সেও কেমন করে তুমি গাড়ি হাঁকিয়ে একা মস্কো যাচ্ছ, পিতার্সবুর্গ যাচ্ছ, মন্ত্রী ও বড় বড় সব লোকদের সঙ্গে দেখা করছ, তাদের দিয়ে কার্যোদ্ধার করছ! খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। কেমন করে সব ব্যবস্থা করে ফেললে? আমি সম্ভবত এ কাজ করতে পারতাম না।"

আন্না মিখায়লভ্‌না জবাব দিল, "হায় প্রিয় সখী, ঈশ্বর করুন একটি ছেলেকে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় বিধবা হওয়া যে কি জিনিস তা যেন তোমাকে কখনও জানতে না হয়! সে অবস্থায় পড়লে মানুষকে অনেক কিছু শিখতে হয়। সেই মামলাটা আমাকে অনেক শিখিয়েছে। যখন কোন বড় মানুষের সঙ্গে দেখা করতে হয় তখনই একটা চিঠি লিখি: 'প্রিন্সেস অমুকের ইচ্ছা অমুকের সঙ্গে একবার দেখা করবে,' তারপর একটা গাড়ি নিয়ে দুবার, তিনবার, চারবার—যতক্ষণ কার্যসিদ্ধি না হয় ততক্ষণ নিজেই তার কাছে যাই।"

কাউন্টেস জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, বরির ব্যাপারে তুমি কার কাছে আবেদন জানিয়েছিলে ? দেখ তো, তোমার ছেলে এর মধ্যেই রক্ষীবাহিনীর অফিসার হয়ে গেল, আর আমার নিকোলাস যাচ্ছে সমরশিক্ষার্থী ক্যাডেট হয়ে। তার হয়ে কথা বলবার কেউ নেই। তুমি কাকে ধরেছিলে ?"

"প্রিন্স ভাসিলিকে। তিনি খুব দয়া দেখিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি রাজী হয়ে গেলেন এবং সম্রাটের কাছে ব্যাপারটা তুললেন।" উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাকে যে সব অসম্মান সইতে হয়েছিল তা ভুলে গিয়ে প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্না বেশ উৎসাহের সঙ্গে কথাগুলি বলল।

"প্রিন্স ভাসিলি কি খুব বুড়ো হয়েছেন ?" কাউন্টেস জানতে চাইল। "রুমিয়াস্তসভদের থিয়েটারে একসঙ্গে অভিনয় করার পরে আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। মনে হয় তিনি আমাকে ভুলেই গেছেন। সে সময় কিন্তু আমার দিকে তার নজর ছিল," কাউন্টেস হেসে বলল।

আন্না মিখায়লভ্না জবাব দিল, "তিনি ঠিক আগের মতই আছেন, অমায়িকতায় একেবারে উপচে পড়েন। পদমর্যাদা তার মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেয় নি। আমাকে বললেন, 'প্রিয় প্রিন্সেস, আপনার জন্য মাত্র এইটুকু করতে পারছি বলে আমি দুঃখিত। আপনার কথা আমি সব সময় রাখব।' সত্যি, তিনি চমৎকার লোক, আর খুব দয়ালু আত্মীয়। কিন্তু আমার ছেলেকে আমি কত ভালবাসি তাতো তুমি জান নাতালি: তার সুখের জন্য আমি সব কিছু করতে রাজী! আর আমার সংসারের অবস্থা এখন এত খারাপ যে আমার অবস্থা অতি ভয়ংকর।" আন্না মিখায়লভ্না গলা নামিয়ে বলতে লাগল, "হতভাগা মামলাটার জন্য আমি সর্বস্ব খুইয়েছি, অথচ মামলা ঝুলেই আছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে যে আমার হাতে একটা পেনিও নেই; কি করে যে বরির পোশাক কিনব জানি না।" রুমাল বের করে কাঁদতে শুরু করল। "পাঁচশ' রুবল আমার দরকার আর আছে মাত্র পঁচিশ রুবলের একখানা নোট। এই তো আমার অবস্থা···এখন আমার একমাত্র ভরসা কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ বেজুকভ। তিনি যদি তার ধর্মছেলেকে সাহায্য না করেন—তুমি তো জান তিনি বরির ধর্মবাপ—এবং তার খরচপত্রের জন্য কিছু না দেন, তাহলে আমার সব পরিশ্রমই বৃথা হয়ে যাবে।···তার পোশাকের ব্যবস্থাই আমি করতে পারব না।"

কাউন্টেসের দুই চোখ জলে ভরে গেল। সে নীরবে ভাবতে লাগল।

প্রিন্সেস বলল, "আমি প্রায়ই ভাবি, যদিও হয় তো এ কথা ভাবা পাপ, এই তো কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ একেবারে একা থাকেন···তিনি এত ধনী·· প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী···অথচ তার এ জীবনের কী দাম ? এ তো তার কাছে একটা বোঝা, আর বরি সবে তার জীবন শুরু করতে চলেছে···"

"নিশ্চয়ই তিনি বরিসের জন্য কিছু রেখে যাবেন," কাউন্টেস বলল।

"একমাত্র ঈশ্বরই জানেন ভাই। এই ধনী বুড়োরা বড়ই স্বার্থপর হয়। তবু বরিসকে নিয়ে এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে যাব, আর সোজাসুজি কথাটা তাকে বলব। লোকে আমাকে যা বলে বলুক, আমার ছেলের ভাগ্য যখন বিপন্ন তখন আমার কাছে সবই সমান।" প্রিন্সেস উঠে পড়ল। "এখন দুটো বাজে। তুমি খাবার খাও চারটেয়। তোমার সময় হয়ে গেছে।"

পিতার্সবুর্গের বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মহিলারা সময়ের সদ্ব্যবহার করতে জানে; তাদের মতই আন্না মিখায়লভ্না একজনকে পাঠিয়ে দিল ছেলেকে ডেকে আনতে এবং তাকে নিয়ে সামনের ঘরে গেল।

কাউন্টেস তাদের বিদায় দিতে দরজা পর্যন্ত গেল। ছেলে যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে ফিসফিস করে আন্না মিখায়লভ্না বলল, "বিদায় ভাই, আমার সৌভাগ্য কামনা করো।"

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ঘরে এসে কাউন্ট বলল, "আপনি কি কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচের কাছে যাচ্ছেন? তার শরীর ভাল থাকলে পিয়েরকে বলবেন, সে যেন আমাদের সঙ্গে খাবার খায়। আপনি তো জানেন, সে এ বাড়িতে এসে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নেচেছে। তাকে অবশ্য আমন্ত্রণ জানাবেন। আমরা দেখতে চাই তারাস কেমন করে আজ তার সুনাম রাখে। সে বলে, আমাদের মত ডিনার কাউন্ট অর্লভ কখনও দিতে পারে নি!"

অধ্যায়—১৫

প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্না ও তার ছেলেকে নিয়ে কাউন্টেস রস্তভার গাড়ি খড়-বিছানো রাস্তা ধরে চলতে চলতে কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ বেজুকভের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে ঢুকলে প্রিন্সেস তার পুরনো ঢিলে জামার ভিতর থেকে হাতটা বের করে আদর করে ছেলের কাঁধের উপর রেখে বলল, "বাবা বরিস, তাকে ভক্তি করো। কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ তোমার ধর্মবাপ; তার উপরেই তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এই কথাটা মনে রেখে তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো; আর ভাল ব্যবহার করতে তো তুমি ভালই জান।"

ছেলে নির্বিকার গলায় বলল, "তার ফলে অপমান ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে এমন ভরসা থাকলেও না হয় কথা ছিল। কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিয়েছি, তাই তোমার জন্যই সে কথা আমি রাখব।"

একটা গাড়ি ফটকে দাঁড়িয়ে আছে দেখেও হলের দরোয়ান মা ও ছেলেকে ভাল করে লক্ষ্য করে, বিশেষ করে মহিলাটির পুরনো ঢিলে জামাটার দিকে

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জানতে চাইল তারা কাউন্ট অথবা প্রিন্সেস কার সঙ্গে দেখা করতে চায় এবং যখন শুনল যে তারা কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে চায় তখন বলে দিল যে হিস এক্সেলেন্সির শরীর আজ আরও খারাপ এবং তিনি কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।

"আমাদের ফিরে যাওয়াই ভাল," ছেলে ফরাসীতে বলল।

ছেলেকে শান্ত করার জন্য তার কাঁধের উপর হাতটা রেখে মা অনুনয় করে ডাকল, "বাবা আমার!"

বরিস আর কোন কথা বলল না, কিন্তু জোব্বাটা না খুলেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মার দিকে তাকাল।

আন্না মিখায়লভ্‌না নরম গলায় দরোয়ানকে বলল, "দেখ ভাই, আমি জানি যে কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ খুব অসুস্থ···সেজন্যই আমি এসেছি··· আমি তার আত্মীয়া। তাকে আমি বিরক্ত করব না ভাই···আমি শুধু প্রিন্স ভাসিলি সের্গেভিচের সঙ্গে দেখা করতে চাই: তিনি তো এখানেই আছেন, তাই না? তুমি আমার কথা বল।"

দরোয়ান ঘণ্টাটা টেনে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল; সেটা দোতলায় বেজে উঠল।

সরু ব্রীচেস, জুতো ও চাতক-পাখি-মার্কা কোট-পরা পরিচারক সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে মাঝপথে দাঁড়িয়ে নীচে তাকাতেই দরোয়ান হাঁক দিল, "প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কায়া প্রিন্স ভাসিলি সের্গেভিচের সঙ্গে দেখা করতে চান।

দেয়ালের মস্ত বড় ভেনিসীয় আয়নায় নিজের রং-করা পশমী পোশাকের ভাঁজ ঠিক করে নিয়ে ক্ষয়ে-যাওয়া জুতো পায়ে মা কার্পেটে-মোড়া সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠতে লাগল।

ছেলের কাঁধে হাত রেখে তার মনে জোর আনবার চেষ্টায় মা আবার বলল, "তুমি আমাকে কথা দিয়েছ বাবা!"

চোখ নীচু করে ছেলে নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করে চলল।

একটা বড় হল-ঘরে তারা ঢুকল; সেই হলের একটা দরজা দিয়ে প্রিন্স ভাসিলির ঘরে যেতে হয়।

হলের মাঝখানে পৌঁছে মা ও ছেলে একজন বয়স্ক পরিচারককে সবে জিজ্ঞাসা করতে যাবে তারা কোন্ পথে এগোবে এমন সময় একটা দরজার ব্রোঞ্জের হাতল ঘুরিয়ে বেরিয়ে এল প্রিন্স ভাসিলি—তার বুকের উপর একটি তারা বসানো ভেলভেটের কোট; বাড়িতে এই পোশাক পরাই তার রীতি; প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে একজন সুদর্শন লোক, তার মাথাভর্তি চুল। পিতার্সবুর্গের বিখ্যাত ডাক্তার লোরেন।

প্রিন্স বলল, "তাহলে এটাই নিশ্চিত?"

"প্রিন্স, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়, কিন্তু···" ডাক্তার ফরাসী উচ্চারণে

ল্যাতিন ভাষায় জবাব দিল।

"খুব ভাল, খুব ভাল···।"

আন্না মিখায়লভ্‌না ও তার ছেলেকে দেখে প্রিন্স ভাসিলি মাথা নুইয়ে ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে নীরবে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলে লক্ষ্য করল, হঠাৎ তার মার মুখের উপর গভীর দুঃখের একটা ছায়া নেমে এল। সে ঈষৎ হাসল।

প্রিন্স যে অসন্তোষের চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে সেটা যেন দেখতেই পায় নি এমন ভাব দেখিয়ে প্রিন্সেস বলল, "আহা প্রিন্স, কি দুঃখের মধ্যে আবার আমাদের দেখা হল। আমার প্রিয় রোগী কেমন আছেন?"

প্রিন্স ভাসিলি বিব্রত হয়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহিলা ও বরিসকে দেখতে লাগল। বরিস বিনীতভাবে অভিবাদন করল। প্রত্যভিবাদন না জানিয়েই প্রিন্স ভাসিলি আন্না মিখায়লভ্‌নার দিকে ঘুরে মাথা ও ঠোঁটের ভঙ্গীতেই জানিয়ে দিল যে রোগীর আশা খুব কম।

আন্না মিখায়লভ্‌না বলে উঠল, "এও কি সম্ভব? আহা, কী দুঃখের কথা! ভাবতেও ভয় হয়···এই আমার ছেলে। ও নিজেই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছে।"

বরিস আর একবার সবিনয়ে অভিবাদন করল।

"বিশ্বাস করুন প্রিন্স, আপনি আমাদের জন্য যা করেছেন একটি মায়ের হৃদয় তা কোন দিন ভুলবে না।"

লেসের চুনট ঠিক করতে করতে প্রিন্স ভাসিলি বলল, "প্রিয় আন্না মিখায়লভ্‌না, আপনার একটা কাজ করে দিতে পেরে আমি খুশি হয়েছি।" তারপর শক্ত গলায় বরিসকে বলল, "ভালভাবে কাজ করতে চেষ্টা করবে, নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করবে।··· আমি খুশি হয়েছি···তুমি কি ছুটিতে এসেছ?" তার গলায় নির্বিকার ঔদাসিন্য।

"আমি এখন নতুন রেজিমেণ্টে যোগ দেবার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি ইয়োর এক্সেলেন্সি," বরিস জবাব দিল; তার কথায় বিরক্তিও প্রকাশ পেল না, আবার আলোচনা শুরু করবার আগ্রহও দেখা গেল না; কিন্তু এত শান্ত ও সশ্রদ্ধভাবে সে কথা বলল যে প্রিন্স তাকে বেশ ভাল করে দেখতে লাগল।

"তুমি কি মায়ের কাছেই থাক?"

পুনরায় "ইয়োর এক্সেলেন্সি" কথাটা যোগ করে বরিস জবাব দিল, "আমি কাউণ্টেস রস্তভের বাড়িতে আছি।"

"মানে, ইলিয়া রস্তভের বাড়িতে, যিনি নাতালি শিন্‌শিনাকে বিয়ে করেছেন?"

একই একঘেয়ে গলায় প্রিন্স ভাসিলি বলল, "আমি জানি, আমি জানি। নাতালি যে কি করে সেই আস্ত ভালুকটাকে বিয়ে করতে মনস্থ করল তাতো

আমি বুঝতে পারলাম না! শুনেছি সে একটা অদ্ভুত বোকা লোক, আবার জুয়াড়িও বটে।"

"কিন্তু বড় দয়ালু মানুষ, প্রিন্স," বিষণ্ণ হাসি হেসে আন্না মিখায়লভ্না বলল, যেন সেও জানে যে এ নিন্দা কাউন্ট রস্তভের প্রাপ্য, তবু কেউ যেন বেচারি বুড়ো লোকটার প্রতি অতিরিক্ত কঠোর না হয়। একটু থেমে মুখে আবার দুঃখের ভাব এনে সে বলল, "ডাক্তাররা কি বলছে?"

"তারা বিশেষ কোন আশাই দিচ্ছে না," প্রিন্স জবাব দিল।

"তাইতো আমার ও বরিসের প্রতি যে দয়া তিনি করেছেন সেজন্য খুড়োমশায়কে ধন্যবাদ জানাতে চেয়েছিলাম। বরিস তো তারই ধর্মছেলে।"

প্রিন্স ভাসিলি চিন্তিতভাবে ভুরু কুঁচকালো। আন্না মিখায়লভ্না বুঝতে পারল তাকে কাউন্ট বেজুখভের সম্পত্তির একজন দাবীদার ভেবে প্রিন্স ভয় পেয়ে গেছে; তাই তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "খুড়োমশায়ের প্রতি ভক্তি ও অনুরাগবশতই আমি এসেছি; তার চরিত্র তো আমার জানা: মহৎ, ন্যায়নিষ্ঠ···কিন্তু আপনি তো জানেন একমাত্র প্রিন্সেসরা ছাড়া তার কাছে আর কেউ থাকে না··তারা তো এখনও ছোট···" মাথাটা নীচু করে সে অনুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগল, "তিনি কি শেষ কাজগুলো করেছেন প্রিন্স? সেই শেষ মুহূর্তগুলি কত না অমূল্য! তাতে খারাপ কিছু হবে না, তাই তিনি যখন এতই অসুস্থ তখন তাকে প্রস্তুত করে রাখা তো একান্তই দরকার। দেখুন প্রিন্স, এই কথাগুলি কি ভাবে বলতে হয় তা আমরা মেয়েরাই জানি। আমার পক্ষে যত কষ্টকরই হোক তবু তার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে। কষ্ট সইতে আমি অভ্যস্ত।

স্পষ্টতই প্রিন্স তাকে বুঝতে পেরেছে; আর আন্না পাভ্লভ্নার বাড়ির মতই এখানেও বুঝতে পেরেছে যে আন্না মিখায়লভ্নাকে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত।

সে বলল, "তার সঙ্গে দেখা করাটা কি তার পক্ষে খুব বেশী কষ্টকর হবে না? বরং সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। ডাক্তাররা একটা সংকটের আশংকা করছে।"

"কিন্তু প্রিন্স, এ রকম অবস্থায় তো অপেক্ষা করা চলে না। ভেবে দেখুন, তার আত্মার কল্যাণ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আহা, সেটা বড়ই দুঃখের কথা: একজন খৃস্টানের অবশ্য করণীয়···"

ভিতরকার একটা ঘরের দরজা খুলে কাউন্টের ভাইঝি ঘরে ঢুকল; তার মুখটা কঠিন দেখাচ্ছে। তার খাটো পায়ের তুলনায় শরীরটা অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। প্রিন্স ভাসিলি তার দিকে ফিরল।

"এই যে, তিনি কেমন আছেন?"

"একই রকম; কিন্তু এই সব গোলমালের মধ্যে কি করে আশা করেন···" আন্না মিখায়লভ্নার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস বলল।

কাউণ্টের ভাই-ঝির দিকে একটু এগিয়ে খুশির হাসি হেসে আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "আহা! আমি তো তোমাকে ঠিক চিনি না। আমি এসে পড়েছি, আমার খুড়োমশায়ের সেবার ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত। তোমরা যে কী অবস্থার ভিতর দিয়ে চলেছ সেটা আমি বুঝি।"

প্রিন্সেস কোন জবাব দিল না, একটু হাসল না পর্যন্ত; তৎক্ষণাৎ ঘর থেকে চলে গেল। আন্না মিখায়লভ্‌না হাতের দস্তানা খুলল, বিজিত মর্যাদাকে দখল নেবার জন্য একটা হাতল-চেয়ারে বসে প্রিন্স ভাসিলিকে পাশের আসনে বসতে বলল।

হেসে ছেলেকে বলল, "বরিস, আমার খুড়োমশাই কাউণ্টকে দেখতে আমি ভিতরে যাচ্ছি; ইতিমধ্যে তুমি গিয়ে পিয়েরের সঙ্গে দেখা কর; তাকে রস্তভদের আমন্ত্রণটা জানাতে ভুলো না যেন। তারা তাকে ডিনারে ডেকেছেন।" প্রিন্সের দিকে ঘুরে বলল, "মনে হচ্ছে, পিয়ের আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না, কি বলেন?"

প্রিন্সের মনের অবস্থা ভাল নয়; সে বলল, "ঠিক উল্টো; আপনি যদি সে যুবকটির সঙ্গে থেকে আমাকে রেহাই দেন তাহলেই আমি খুশি হব।... সে এখানে এসেছে, কিন্তু কাউণ্ট তাকে একটি বারও ডেকে পাঠান নি।"

সে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। একটি পরিচারক এসে বরিসকে নিয়ে সিঁড়ির এক ধাপ নেমে আর এক ধাপ উঠে পিয়েরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৬

পিয়ের শেষ পর্যন্ত পিতার্সবুর্গে নিজের জন্য একটা জীবিকা বেছে নিতে পারে নি। হৈ-হট্টগোল করার অপরাধে তাকে সেখান থেকে মস্কোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাউণ্ট রস্তভের বাড়িতে তার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেটা ঠিকই। একজন পুলিশকে ভালুকের সঙ্গে বাঁধার ব্যাপারে তারও হাত ছিল। কয়েকদিন হল সে মস্কোতে এসেছে এবং যথারীতি তার বাবার বাড়িতেই আছে। যদিও সে আশংকা করেছিল যে তার সেই পলায়নের কাহিনী ইতিমধ্যেই মস্কোতে জানাজানি হয়ে গেছে এবং তার বাবার বাড়ির যে মহিলারা কোন দিনই তার প্রতি সদয় ছিল না তারা সে গল্প বলে কাউণ্টকে তার প্রতি বিরূপ করেই রেখেছে, তবু এখানে পৌঁছে প্রথম দিনেই সে বাড়ির বাবার অংশে চলে গেল। প্রিন্সেসরা বসবার ঘরেই বেশীর ভাগ সময় কাটায়। সেই ঘরে ঢুকে সে তাদের সঙ্গে দেখা করল।

তাদের মধ্যে দু'জন সেলাই নিয়ে বসেছিল, আর তৃতীয় জনে গলা ছেড়ে বই পড়ছিল। যে পড়ছিল সেই সকলের বড়—তার সঙ্গেই আন্না মিখায়লভ্নার দেখা হয়েছিল। ছোট দুজন সেলাই করছিল: দুজনই গোলাপী, সুন্দরী; তাদের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য, একজনের ঠোঁটে একটা তিল থাকায় তাকে আরও সুন্দরী দেখায়। তারা পিয়েরের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন সে একটি মরা মানুষ বা কুষ্ঠরোগী। বড় প্রিন্সেস পড়া থামিয়ে ভয়ার্ত্ত চোখে নিঃশব্দে তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; মেজ প্রিন্সেসেরও সেই একই ভাব; কিন্তু ঠোঁটে তিলওয়ালা ছোটটির মেজাজ খুব হাসিখুশি; এই মজার দৃশ্য দেখে হেসে ফেলেই হাসিটা লুকোবার জন্য সে ফ্রেমের উপরে ঝুঁকে বসল। হাসি চাপতে না পেরে যেন একটা প্যাটার্ণ তুলবার চেষ্টা করছে এমনিভাবে সেলাইতে নজর দিল।

“কেমন আছ বোন?” পিয়ের বলল। আমাকে চিনতে পারছ না?”

“খুব ভাল করেই চিনতে পারছি।”

একটু বিব্রত বোধ করলেও না দমে গিয়ে পিয়ের জিজ্ঞাসা করল, “কাউণ্ট কেমন আছেন? তার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?”

“দেহে ও মনে কাউণ্ট খুবই কষ্ট পাচ্ছেন, আর তার মানসিক কষ্ট বৃদ্ধিতে তুমি তো সাধ্যমতই চেষ্টা করেছ।”

“কাউণ্টের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?” পিয়ের আবার জিজ্ঞাসা করল।

“হুম…তাকে যদি মেরে ফেলতে চাও, একেবারেই মেরে ফেলতে চাও তো দেখা করতে পার…ওল্গা, যা তো, দেখে আয় জেঠার গোমাংস-চা তৈরি হয়েছে কি না—সময় তো প্রায় হয়ে গেছে।” কথাগুলি বলে বড় বোন পিয়েরকে বোঝাইতে চাইল যে তারা খুব ব্যস্ত; তারা ব্যস্ত পিয়েরের বাবাকে আরাম দিতে, আর পিয়ের ব্যস্ত তাকে শুধু কষ্ট দিতে।

ওল্গা চলে গেল। পিয়ের বোনদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর মাথা নুইয়ে বলল, “আমি তাহলে আমার ঘরে যাচ্ছি। কখন তার সঙ্গে দেখা করতে পারব আমাকে জানিও।”

সে ঘর থেকে চলে গেল; তিল-সুন্দরী বোনের খিল-খিল হাসি তাকে পিছন থেকে তাড়া করল।

পরদিন প্রিন্স ভাসিলি এসে কাউণ্টের বাড়িতেই উঠল। পিয়েরকে ডেকে বলল: “দেখ, পিতার্সবুর্গে যেভাবে চলাফেরা করেছ এখানেও যদি তাই কর, তো তোমার কপালে দুঃখ আছে, শুধু এইটুকুই তোমাকে বলতে চাই। কাউণ্ট খুব, খুব অসুস্থ; তুমি তার সঙ্গে মোটেই দেখা করবে না।”

তারপর থেকে পিয়েরকে কেউ বিরক্ত করে নি; সারাক্ষণ সে উপরের ঘরেই কাটায়।

বরিস যখন পিয়েরের ঘরের দরজায় পৌঁছল সে তখন ঘরময় পায়চারি করছে ; মাঝে মাঝে এক কোণে থেমে দেয়ালের দিকে এমন অঙ্গভঙ্গী করছে যেন কোন অদৃশ্য শত্রুর বুকে একখানা তলোয়ার ঢুকিয়ে দিচ্ছে, চশমার উপর দিয়ে তাকাচ্ছে হিংস্রভাবে, তারপর আবার পায়চারি করছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে, ঘাড় ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আর অঙ্গভঙ্গী করছে।

অদৃশ্য কারও দিকে আঙুল বাড়িয়ে হাঁক দিল, "ইংলণ্ড শেষ হয়ে গেল। মিঃ পিট জাতির প্রতি, মানুষের অধিকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তার শাস্তি ···' কিন্তু পিটের শাস্তির কথা উল্লেখ করবার আগেই—সেই মুহূর্তে পিয়ের কল্পনা করছিল যে সে নিজেই স্বয়ং নেপোলিয়ন, এইমাত্র বিপজ্জনক ডোভার প্রণালী পার হয়ে লণ্ডন দখল করে নিয়েছে—পিয়ের দেখল একটি সুগঠিত-দেহ সুদর্শন তরুণ অফিসার তার ঘরে ঢুকল। পিয়ের থামল। সে যখন মস্কো ছেড়ে এসেছে বরিস তখন চোদ্দ বছরের ছেলে ; তার কথা পিয়ের সম্পূর্ণ ভুলে গেছে ; কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ আবেগ ও আন্তরিকতার সঙ্গে সে বরিসের হাতটা ধরে বন্ধুত্বপূর্ণ হাসি হেসে উঠল।

স্মিত হেসে বরিস শান্তভাবে বলল, "আমাকে আপনার মনে আছে? আমি মার সঙ্গে এসেছি কাউণ্টকে দেখতে, কিন্তু মনে হয় তিনি সুস্থ নন।"

"হ্যাঁ, মনে হয় তিনি অসুস্থ। সর্বদাই লোকজন তাকে বিরক্ত করছে," যুবকটিকে স্মরণ করবার চেষ্টা করতে করতে পিয়ের বলল।

বরিস বুঝতে পারল, পিয়ের তাকে চিনতে পারে নি, কিন্তু নিজের পরিচয় দেবার দরকারও বোধ করল না। এতটুকু বিব্রত বোধ না করে সে সোজা পিয়েরের মুখের দিকে তাকাল।

পিয়ের একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বরিস বলল, "আজ তাদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দিতে কাউণ্ট রস্তভ আপনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।"

"ওঃ, কাউণ্ট রস্তভ।" পিয়ের আনন্দে চেঁচিয়ে বলল। "তাহলে তুমি তার ছেলে ইলিয়া? কী আশ্চর্য, প্রথম তোমাকে আমি চিনতেই পারি নি। তোমার কি মনে আছে মাদাম জাকোতের সঙ্গে আমরা স্প্যারো পাহাড়ে গিয়েছিলাম?···এমন দিনকাল পড়েছে···"

ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক অথচ বলিষ্ঠ হাসি হেসে বরিস ইচ্ছা করেই বলল, "আপনি ভুল করেছেন। আমি বরিস, প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্না দ্রুবেৎস্কায়ার ছেলে। বাবা রুস্তভই ইলিয়া, তার ছেলের নাম নিকোলাস। কোন মাদাম জাকোৎকে আমি চিনি না।"

যেন মশা বা মৌমাছিতে কামড়াচ্ছে এমনি ভাবে পিয়ের মাথা হাত নাড়তে লাগল।

"আরে, এ সব আমি কি ভাবছি? সবকিছু গুলিয়ে ফেলেছি।

মস্কোতে এত সব আত্মীয়স্বজন বাস করে! তাহলে তুমি বরিস? অবশ্যি। আচ্ছা, এবার বুঝতে পারছি আমরা কোথায় আছি। বোলন অভিযান সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? কি জান, নেপোলিয়ন যদি চ্যানেল পার হয় তাহলে ইংরেজদের বড়ই দুর্দিন। আমি তো মনে করি অভিযানটা খুবই সহজসাধ্য। শুধু যদি ভিলেনুভ্‌ সব কিছু তালগোল পাকিয়ে না ফেলে!"

বরিস বোলন অভিযানের কিছুই জানে না; সে খবরের কাগজ পড়ে না; আর ভিলেনুভের নামও সে এই প্রথম শুনল।

শান্ত বিদ্রূপাত্মক গলায় সে বলল, "এখানে মস্কোতে আমরা রাজনীতির চাইতে ভোজসভা আর কুৎসা রটনা নিয়েই বেশী ব্যস্ত থাকি। এ সব কথা আমি কিছু জানি না, আর ভেবেও দেখিনি। মস্কো প্রধানত গাল-গল্প নিয়েই ব্যস্ত। এই মুহূর্তে তারা আপনার ও আপনার বাবার কথাই বলাবলি করছে।"

পিয়ের ভালমানুষি হাসি হাসল; যেন সঙ্গীটির জন্য তার ভয় হয়েছে পাছে সে এমন কিছু বলে বসে যার জন্য পরে তাকে অনুতাপ করতে হবে। কিন্তু পিয়েরের চোখেব দিকে সোজা তাকিয়ে বরিস স্পষ্ট উচ্চারণে, পরিষ্কার ভাষায়, কঠিন কণ্ঠে কথা বলতে লাগল।

"গাল-গল্প করা ছাড়া মস্কোর আর কোন কাজ নেই। প্রত্যেকেরই ভাবনা, কাউণ্ট তার বিষয়-সম্পত্তি কাকে দিয়ে যাবেন, যদিও তিনি হয় তো আমাদের সকলের চাইতে বেশীদিন বেঁচে যেতেও পারেন; আমার তো আন্তরিক আশা, তাই তিনি বাঁচবেন।…"

পিয়ের বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, এ সবই ভয়ংকর, খুব ভয়ংকর।"

পিয়েরের তখনও ভয় যে এই তরুণ অফিসার হয় তো এমন কিছু বলে ফেলবে যাতে সে নিজেই গোলমালে পড়ে যাবে।

বরিস ঈষৎ লজ্জা পেলেও গলার স্বর বা মনের ভাবের কোন পরিবর্তন না করেই বলল, "আর এটাও আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন যে এই ধনী লোকটির কাছ থেকে সকলেই কিছু হাতাবার চেষ্টা করছে।"

"তাই তো মনে হয়," পিয়ের ভাবল।

"কিন্তু পাছে আপনি ভুল বোঝেন তাই আমি বলতে চাই, আপনি যদি আমাকে বা আমার মাকে সেই দলের লোক বলে মনে করে থাকেন তাহলে আপনি খুবই ভুল করেছেন। আমরা খুব গরীব, কিন্তু অন্তত আমার দিক থেকে বলতে পারি যে যেহেতু আপনার বাবা ধনী লোক শুধু সেই কারণেই নিজেকে তার আত্মীয় বলে আমি মনে করি না, এবং আমি বা আমার মা কোন দিনই তার কাছে কিছু চাইব না, বা নেব না।"

অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারল না; কিন্তু যখন বুঝল তখন সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে কনুইর নীচ দিয়ে বরিসকে জড়িয়ে ধরে বরিসের চাইতেও বেশী লজ্জা পেয়ে লজ্জা ও বিরক্তিব একটা মিশ্র অনুভূতির

সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"আরে, এ তো খুব আশ্চয! তুমি কি মনে কর যে আমি···কে ভাবতে পারত? ···আমি ভালভাবেই জানি···"

কিন্তু বরিস আবার তাকে বাধা দিল।

"সব কথা বলতে পারায় আমি খুশি হয়েছি। আপনার হয় তো ভাল লাগে নি? আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু আশা করি আমি আপনাকে আঘাত দেই নি। খোলাখুলি কথা বলাই আমার রীতি।···আচ্ছা, কি জবাব আমি নিয়ে যাব? রস্তভদের বাড়িতে খেতে যাচ্ছেন তো?"

একটা কর্তব্যের হাত থেকে রেহাই পেয়ে এবং একটা বিসদৃশ পরিস্থিতি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে এনে অন্য একজনকে তার মধ্যে আটকে দিয়ে বরিশ আবারও বেশ খুশি হয়ে উঠল।

একটু শান্ত হয়ে পিয়ের বলল, "না, কিন্তু আমি বলছি, তুমি একটি আশ্চর্য ছেলে! এই মাত্র তুমি যা বললে সেটা ভাল কথা, খুব ভাল কথা। অবশ্য, আমাকে তুমি জান না। দীর্ঘদিন আমাদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ নেই··· ছেলেবেলার পরে আমাদের আর দেখা হয় নি। তুমি হয় তো ভাবতে পার যে আমি···আমি বুঝতে পেরেছি, ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি। আমি নিজে এটা পারতাম না, সে সাহস থাকা উচিতও নয়, কিন্তু এটা চমৎকার। তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়ে খুব খুশি হয়েছি।" একটু থেমে আবার বলল, "তুমি যে আমাকে সন্দেহ করেছ এটা অদ্ভুত!" সে হাসতে শুরু করল। "আরে, তাতে কি হয়েছে! আশা করি আমাদের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হবে।" সে বরিসের হাতে চাপ দিল। "তুমি কি জান, আমি একবারও কাউন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। তিনিও আমাকে ডেকে পাঠান নি। ··মানুষ হিসাবে তার জন্য আমার দুঃখ হয়, কিন্তু আমি কি করতে পারি?"

বরিস হেসে জিজ্ঞাসা করল, "তাহলে আপনি মনে করেন যে নেপোলিয়ন তার বাহিনী নিয়ে ওপারে যেতে পারবে?"

পিয়ের বুঝল যে বরিস প্রসঙ্গটা পাল্টাতে চাইছে; তার নিজেরও তাই ইচ্ছা; সুতরাং সে বোলন অভিযানের সুবিধা-অসুবিধাগুলি বুঝিয়ে বলতে লাগল।

পরিচারক এসে বরিসকে ডাকল—প্রিন্সেস এবার যাবে। বরিসের সঙ্গে আরও বেশী করে পরিচিত হবার জন্য পিয়ের কথা দিল, ডিনারে যাবে; সাদরে তার হাতে চাপ দিয়ে চশমার উপর দিয়ে সস্নেহে বরিসের চোখের দিকে তাকাল। সে চলে গেলে অনেকক্ষণ ধরে সে ঘরের এদিক-ওদিক হেঁটে বেড়াতে লাগল; এখন আর কাল্পনিক তলোয়ার দিয়ে কোন কাল্পনিক শত্রুকে বিঁধছে না; বরং একটি বুদ্ধিমান দৃঢ়চেতা যুবকের কথা স্মরণ করে হাসছে।

প্রথম যৌবনে যেমনটি ঘটে থাকে, বিশেষ করে তার বেলায় যে নিঃসঙ্গ

জীবন যাপন করে, এই যুবকটির প্রতি পিয়ের একটা অদ্ভুত মমতা বোধ করতে লাগল ; সে স্থির করল, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবে ।

প্রিন্স ভাসিলি প্রিন্সেসকে বিদায় জানাতে তার সঙ্গে এল । মহিলাটির চোপে রুমাল, মুখ অশ্রুসিক্ত ।

সে তখন কেবলি বলছে, "ভয়ংকর, ভয়ংকর ! কিন্তু আমার যাই ঘটুক, আমার কর্তব্য আমি করব । এখানে এসে রাতে থাকব । এ ভাবে ফেলে রাখা চলবে না । প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান । ভাই-ঝিরা যে এসব কাজ ফেলে রেখেছে কেন আমি তো ভেবে পাই না । তাকে প্রস্তুত করে তুলবার একটা উপায় বের করতে ঈশ্বরই আমাকে সাহায্য করবেন ! বিদায় প্রিন্স ! ঈশ্বর আপনার সহায় হোন ।…"

"বিদায়," বলে প্রিন্স ভাসিলি চলে গেল ।

গাড়িতে উঠে মা ছেলেকে বলল, "তিনি এক ভয়াবহ অবস্থায় আছেন । কাউকে চিনতে পর্যন্ত পারেন না ।"

"আমি বুঝতে পারছি না মামণি—পিয়েরের প্রতি তার মনোভাব কি ?" ছেলে বলল ।

"সেটা উইল থেকে জানা যাবে বাবা । আমাদের ভাগ্যও তো তার উপরেই নির্ভর করছে ।

"কিন্তু তুমি কেন আশা করছ যে তিনি আমাদের কিছু দিয়ে যাবেন ?"

"ওঃ বাবা, তিনি এত ধনী, আর আমরা এত গরিব !

"যাই বল, সেটা যথেষ্ট কারণ নয় মামণি ।…"

"হা ভগবান ! তিন কত অসুস্থ !" মা উচ্চৈঃস্বরে বলল ।

অধ্যায়—১৭

আন্না মিখায়লভ্‌না ছেলেকে নিয়ে কাউন্ট সিরিল ভ্লাদিমিরভিচ বেজুখভের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পরে কাউণ্টেস রস্তভা অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে রুমাল দিয়ে একা একা বসে রইল । শেষ পর্যন্ত ঘণ্টাটা বাজাল ।

কয়েক মিনিট পরে দাসী এলে তাকে রেগে বলল, "তোমাদের ব্যাপার স্যাপার কি বাপু ? আমার কাজ করবার ইচ্ছা নেই নাকি ? তাহলে অন্য জায়গা খুঁজে দেই ।"

বন্ধুর দুঃখ ও অসম্মানজনক দারিদ্র্যের কথা শুনে কাউণ্টেস খুব বিচলিত হয়ে পড়েছে ; তার মেজাজও বিগড়ে গেছে, এ রকম অবস্থা হলেই সে দাসীকে "বাপু" বলে ডাকে, আর অতিমাত্রায় বিনীতভাবে তার সঙ্গে কথা বলে ।

“আমি খুব দুঃখিত ম্যা'ম,” দাসী উত্তর দিল।

“কাউন্টকে আমার কাছে ডেকে দাও।”

যথারীতি অপরাধীর মত তাকাতে তাকাতে কাউন্ট হেলেদুলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এল।

“কি খবর ছোট কাউন্টেস? কী খেলাই খেললাম গো! তারাসের জন্য হাজার রুবল দেওয়া কিছু খারাপ নয়। সে তার উপযুক্ত!”

হাঁটুর উপর কনুই রেখে স্ত্রীর পাশে বসে সে পাকা চুলে হাত বুলোতে লাগল।

“কি আদেশ কাউন্টেস?”

“দেখ বাপু…ওটার এ অবস্থা কেন?” কাউন্টের ওয়েস্টকোটটা দেখিয়ে সে বলল। তারপর হেসে যোগ করল, “ওটাও সম্ভবত খেলা। দেখ কাউন্ট, আমার কিছু টাকার দরকার।”

'তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

“ওঃ, ছোট কাউন্টেস!…কাউন্ট পকেট-বইটা খুঁজতে লাগল।

“আমার অনেক টাকা চাই কাউন্ট! পাঁচশ' রুবল।” ক্যাম্বিকের রুমালটা বের করে স্বামীর ওয়েস্টকোটটা মুছে দিতে লাগল।

“হ্যাঁ, এখনি, এখনি দিচ্ছি। হেই, কে আছে?” যে সব লোক জানে যে ডাকামাত্রই লোকজন এসে হাজির হবে তাদের মত সুরেই কাউন্ট হাঁক দিল। “দিমিত্রিকে পাঠিয়ে দাও।”

দিমিত্রি ভাল পরিবারের ছেলে; কাউন্টের বাড়িতেই মানুষ হয়েছে। আব এখন তার বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করে। আস্তে পা ফেলে সে ঘরে ঢুকল।

শ্রদ্ধাশীল যুবকটি ঘরে ঢুকলে কাউন্ট বলল, “আমি এই চাই হে বাপু। আমাকে এনে দাও…” একমুহূর্ত ভাবল। “হ্যাঁ সাত-শ' রুবল এনে দাও, হ্যাঁ! কিন্তু দেখো, গত বারের মত ছেঁড়া ময়লা নোটগুলো এনো না; পরিষ্কার নোট এনে কাউন্টেসকে দাও।”

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাউন্টেস বলল, “হ্যাঁ দিমিত্রি, পরিষ্কার নোট দিও।'

“নোটগুলো কখন চাই ইয়োর এক্সেলেন্সি?” দিমিত্রি শুধাল। “আপনাকে জানানো প্রয়োজন…কিন্তু আপনি অস্থির হবেন না,” কাউন্টকে ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলতে দেখে সে কথাটা যোগ করল, কারণ সে জানে যে ওটা আসন্ন রাগের লক্ষণ। “আমি ভুলে গিয়েছিলাম…আপনি কি চান ওটা এখনি এনে দেই?”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই! নিয়ে এস। কাউন্টেসকে দাও।”

যুবকটি চলে গেলে কাউন্ট হেসে বলল, “দিমিত্রি একটি রত্ন ভাণ্ডার। তার কাছে “অসম্ভব” বলে কিছু নেই। সেটাকেই তো আমি ঘৃণা করি।

সব কিছুই সম্ভব।”

“আঃ, টাকা কাউণ্ট, টাকা! এ যে জগতে কত দুঃখের কারণই হয়। কিন্তু এ টাকাটার আমার বড় দরকার,” কাউণ্টেস বলল।

“আমার ছোট্ট কাউণ্টেস, তুমি তো একটি কুখ্যাত উড়ণচণ্ডী,” বলে কাউণ্ট স্ত্রীর হাতে চুমো খেয়ে পড়ার ঘরেই ফিরে গেল।

আন্না মিখায়লভ্‌না যখন কাউণ্ট বেজুখভের বাড়ি থেকে ফিরে এল তখন সব পরিষ্কার নোটে পুরো টাকাটাই কাউণ্টেসের ছোট টেবিলের উপর একখানা রুমালে ঢাকা ছিল। আন্না মিখায়লভ্‌না লক্ষ্য করল, কাউণ্টেস কিছুটা উত্তেজিত।

“তারপর বন্ধু?” কাউণ্টেস শুধাল।

“আঃ, কী ভয়ংকর অবস্থায় যে তিনি আছেন! তিনি এত অসুস্থ যে তাকে চেনাই যায় না! মাত্র কয়েক মুহূর্ত সেখানে ছিলাম, কিন্তু কোন কথাই বলতে পারি নি।…”

“আনেৎ, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি আপত্তি করো না,” কাউণ্টেস বলল; তার শুকনো, মর্যাদাসম্পন্ন, বার্ধক্যজীর্ণ মুখে লজ্জার আভাটুকু বড়ই বিচিত্র দেখাল; রুমালের নীচ থেকে সে টাকাটা তুলে নিল।

আন্না মিখায়লভ্‌না তৎক্ষণাৎ তার ইচ্ছাটা বুঝে নিয়ে উপযুক্ত মুহূর্তে কাউণ্টেসকে আলিঙ্গন করবার জন্য নীচু হল।

“এটা আমি বরিসকে দিলাম, তার পোশাকের জন্য।”

আন্না মিখায়লভ্‌না ততক্ষণে তাকে আলিঙ্গন করে কাঁদতে শুরু করেছে। কাউণ্টেসও কাঁদল। তারা কাঁদল কারণ তারা বন্ধু, কারণ তারা দয়ালু-হৃদয়, কারণ ছোটবেলার বন্ধু হয়েও টাকার মত একটা তুচ্ছ জিনিসের কথা তাদের ভাবতে হয়েছে, আর কারণ তাদের যৌবন পার হয়ে গেছে। কিন্তু এই অশ্রুজল তাদের দু'জনের কাছেই বড় সুখকর।

অধ্যায়—১৮

মেয়েদের নিয়ে এবং বহুসংখ্যক অতিথিকে নিয়ে কাউণ্টেস রস্তভা বসবার ঘরে হাজির। আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের কাউণ্ট নিজেই তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেছে এবং নিজস্ব তুর্কী পাইপের সংগ্রহগুলি তাদের দেখাচ্ছে। মাঝে মাঝেই সে খোঁজ করছে: “সে কি এখনও আসে নি?” সকলেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না আখ্‌সিমভার জন্য অপেক্ষা করছে। সমাজে সে “ভয়ংকরী ড্রাগন” নামে পরিচিত; মহিলাটির খ্যাতি অর্থ বা পদমর্যাদার জন্য নয়, সাধারণ বুদ্ধি ও স্পষ্ট কথার জন্য। রাজ-পরিবার থেকে শুরু করে মস্কো ও পিতার্সবুর্গ শহরের সর্বত্র

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার খ্যাতি ; উভয় শহরই তাকে দেখে বিস্মিত হয়, তার কঠোরতায় গোপনে হাসে, তাকে নিয়ে গল্প বানায়, আবার সেই সঙ্গে সকলেই তাকে শ্রদ্ধা করে, আবার ভয়ও করে।

কাউন্টের ঘরটা তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। একটি ইস্তাহারে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ; তাই সকলে যুদ্ধের কথা ও সৈন্যসংগ্রহের ব্যাপার নিয়েই আলোচনা করছে। ইস্তাহারটি কেউ এখনও চোখে দেখে নি, তবে সকলেই জানে যে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। দু'জন অতিথি ধূমপান করতে করতে গল্প করছে, আর তাদের মাঝখানে বসে আছে কাউণ্ট। সে নিজে ধূমপান করছে না, কথাও বলছে না, কিন্তু একবার এদিকে, একবার ওদিকে মাথা হেলিয়ে পরম সুখে ধূমপায়ীদের দেখছে, তাদের কথাবার্তা শুনছে, আর একজনকে আর একজনের বিরুদ্ধে উস্কে দিচ্ছে।

তাদের মধ্যে একজন সিভিলিয়ান ; ফ্যাকাসে রং, পরিষ্কার কামানো, পাতলা বলীরেখা-ভরা মুখ, এর মধ্যেই বুড়ো হয়ে গেছে, যদিও পোশাক পরেছে একজন কেতাদুরুস্ত যুবকের মত। বেশ আরাম করে সোফার উপর পা তুলে বসেছে। স্ফটিকের পাইপটা মুখের মধ্যে অনেকখানি ঢুকিয়ে কাশতে কাশতে ধূমপান করছে আর চোখ দুটো কুঁচকে যাচ্ছে। এই প্রবীণ অবিবাহিত পুরুষটির নাম শিন্‌শিন্‌, কাউণ্টেসের সম্পর্কে ভাই, মস্কোর সমাজে "কড়া জিহ্বা"র মানুষ বলে পরিচিত। মনে হয় সঙ্গীকে সে কিছুটা কৃপার চোখে দেখে থাকে। অপরজন রক্ষীবাহিনীর গোলাপী অফিসার, ধোপদুরুস্ত, ঝকঝকে পোশাক, বোতাম-আঁটা ; মুখের মাঝখানে পাইপটা ধরে লাল ঠোঁট দিয়ে ধীরে ধীরে ধোঁয়া টানে আর ধোঁয়া ছাড়ে "রিং" বানিয়ে। এই হল লেফ্‌টেন্যাণ্ট বের্গ, সেমেনভ রেজিমেণ্টের অফিসার, এর সঙ্গেই বরিসের সেনাদলে যোগ দিতে যাবার কথা, আর একেই দিদি ভেরার "ভাবী" বলে উল্লেখ করে নাতাশা তাকে ঠুকেছিল। দু'জনের মাঝখানে বসে কাউণ্ট মন দিয়ে তাদের কথা শুনছিল। তার প্রিয় তাসের খেলা "বোস্টন" যখন চলে না, তখন তার মনের মত কাজ হল শ্রোতা সাজা, বিশেষ করে যখন সে দুজন বাক্যবাগীশকে পরস্পরের দিকে লেলিয়ে দিতে পারে।

শিন্‌শিনের কথা বলার বৈশিষ্ট্যই হল অতি সাধারণ রুশ বাক্‌ধারার সঙ্গে বাছা বাছা ফরাসী বাক্য জুড়ে দেওয়া। ব্যঙ্গের হাসি হাসতে হাসতে সেই ভাষাতেই শিন্‌শিন্‌ বলল, "তাহলে মাননীয় বুড়ো আলফোন্স কার্লোভিচ, তুমি সরকারের ঘাড় ভেঙেও মুনাফা লুঠতে চাও, আবার সঙ্গীর কাছ থেকেও কিছু হাতাতে চাও ?"

"না হে পিতর নিকলায়েভিচ ; আমি শুধু দেখতে চাই যে পদাতিক বাহিনীর তুলনায় অশ্বারোহী বাহিনীতে সুযোগ অনেক কম। এই আমার অবস্থাটাই ভেবে দেখ না পিতর নিকলায়েভিচ…।"

বের্গ সর্বদাই কথা বলে ধীরে, সবিনয়ে ও ঠিক ঠিক মেপে। তার কথাবার্তা সব সময়ই নিজেকে নিয়ে; এমন আলোচনা যখন চলে যার সঙ্গে তার নিজের কোন সম্পর্ক নেই তখন সে শান্তভাবে চুপ করে থাকে। কিন্তু যেই তার সম্পর্কে কোন কথা ওঠে অমনি সে খোস মেজাজে কথা বলতে শুরু করে।

“আমার কথাই ভাব পিতর নিকলায়েভিচ। যদি অশ্বারোহী বাহিনীতে থাকতাম তাহলে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদে থেকেও প্রতি চার মাসে আমি দু'শ রুবলের বেশী পেতাম না; কিন্তু এখন আমি পাচ্ছি দু'শ তিরিশ,” শিন্‌শিন্‌ ও কাউণ্টের দিকে তাকিয়ে খুশির হাসি হেসে সে বলল।

সে আরও বলতে লাগল, “তাছাড়া, রক্ষীবাহিনীতে বদলি নিয়ে আমি আরও ভাল পদে যেতে পারব, আর পদাতিক রক্ষীবাহিনীতে চাকরি খালিও হয় অনেক বেশী ঘন ঘন। তাহলেই ভাব, দু'শ তিরিশ রুবলে কী না করা যেতে পারে! এমন কি আমি কিছুটা বাঁচাতে পারি এবং বাবাকেও কিছু পাঠাতে পারি,” এই বলে সে একটা ধোঁয়ার রিং ছাড়ল।

পাইপটাকে মুখের আর এক কোণে ঠেলে দিয়ে কাউণ্টকে চোখ টিপে শিন্‌শিন্‌ বলল, “হিসাব মিলে গেল…প্রবাদ আছে, জার্মানরা পাথরের গা থেকেও চামড়া তুলে নিতে জানে।”

কাউণ্ট হো-হো করে হেসে উঠল। শিন্‌শিন্‌কে কথা বলতে দেখে অন্য অতিথিরাও এগিয়ে এল। বের্গ বলতে লাগল কেমন করে রক্ষীবাহিনীতে বদলি হয়ে সে ইতিমধ্যেই শিক্ষার্থী শিবিরের পুরনো বন্ধুদের চাইতে একধাপ এগিয়ে গেছে; কেমন করে যুদ্ধের সময় কোম্পানী-কম্যাণ্ডার মারা গেলে প্রবীণতার বিচারে সে পদটা সে সহজেই পেয়ে যেতে পারে; রেজিমেণ্টের সকলের সঙ্গেই তার দহরম-মহরম চলে, আর তার বাবাও তাকে নিয়ে খুব খুশি।

সোফা থেকে পা তুলে বের্গের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে শিন্‌শিন্‌ বলল, “দেখ হে বাপু, পায়েই হাঁটো আর ঘোড়াতেই চড়, তুমি যেখানে যাবে সেখানেই মাৎ করবে, এ আমি জোর গলায় বলে দিলাম।”

বের্গ খুশিতে হাসতে লাগল। অতিথিদের সঙ্গে নিয়ে কাউণ্ট বসবার ঘরে গেল।

* * *

তখন বড় ভোজের আগেকার “জাকুস্কার” (ছোট হাজরি) সময়; সমবেত অতিথিরা এ সময় কোন বড় রকমের আলোচনায় জড়িয়ে না পড়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়ায় ও অল্পসল্প কথাবার্তা বলে; যেন দেখাতে চায় যে খাবার জন্য [illegible] মোটেই লালায়িত হয়ে ওঠে নি। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী তখন দরজার দিকে তাকায় আর মাঝে মাঝেই নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে; তা থেকেই অতিথিরা অনুমান করে নেয় তারা কার বা কিসের জন্য অপেক্ষা

করছে—হয় কোন বড় আত্মীয়ের জন্ত, আর না হয় তো এমন কোন খাদ্য-সামগ্রীর জন্ত যা এখনও রেঁধে নামানো হয় নি।

পিয়ের ঠিক খাবার সময়টাতেই এসেছে এবং বসবার ঘরের মাঝখানে প্রথম যে চেয়ারটা পেয়েছে তাতেই এমন অদ্ভুতভাবে বসেছে যাতে অন্ত সকলের পথ আটকে গেছে। কাউণ্টেস তাকে কথা বলাতে চেষ্টা করল, কিন্তু যেন কারও খোঁজ করছে এমনভাবে সে চারদিকে তাকাতে লাগল এবং কাউণ্টেসের সব প্রশ্নেরই এক কথায় জবাব দিল। অতিথিরা অনেকেই ভালুক-ঘটিত ব্যাপারটা জানত বলে কৌতূহলের সঙ্গে তাকে দেখল আর ভাবল যে এরকম একটি বোকা-বোকা বিনীত মানুষ পুলিশের সঙ্গে এমন খেলা খেলল কি করে।

কাউণ্টেস জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি এইমাত্র এলে?"

"হুঁ মাদাম", চারদিক তাকিয়ে সে জবাব দিল।

"আমার স্বামীর সঙ্গে এখনও দেখা কর নি?"

"না মাদাম।" সে শুধু একটু হাসল।

"শুনলাম তুমি সম্প্রতি প্যারিতে ছিলে? আমার তো মনে হয় জায়গাটা খুব মজার।"

"খুব মজার।"

কাউণ্টেস আন্না মিখায়লভ্‌নার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করল। প্রিন্সেস বুঝতে পারল, কাউণ্টেস চাইছে যে সে এই যুবকটির আপ্যায়নের ভার নিক; তাই পিয়েরের পাশে গিয়ে বসে প্রিন্সেস তাকে তার বাবার কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কাউণ্টেসের বেলায় যেমন এখনও তেমনি সে এক কথায়ই জবাব সারল। অন্ত অতিথিরা সকলেই নানা আলোচনায় ব্যস্ত।

"রাজুমভ্‌স্কি-পরিবার···খুব মনোহারী···আপনার খুব দয়া···কাউণ্টেস এপ্রক্সিনা···" চারদিকে এই সব কথা শোনা যাচ্ছে। কাউণ্টেস উঠে নাচ-ঘরে গেল।

সেখান থেকেই ডাকল, "মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না?"

"স্বয়ং" কর্কশ গলায় জবাব এলো; ঘরে ঢুকল মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না।

অবিবাহিতারা সকলে, এমন কি খুব বৃদ্ধা ছাড়া বিবাহিতা মহিলারাও উঠে দাঁড়াল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না দরজায় এসে থেমে গেল। লম্বা, মজবুত গড়ণ কোঁকড়া পাকা চুলভরা মাথাটা পঞ্চাশ বছর বয়সেও বেশ খাড়া। অতিথিদের খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে আস্তিনটাকে ঠিকভাবে গোটাতে লাগল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না সব সময় রুশ ভাষাতেই কথা বলে।

"যার নামকরণ-দিবস আজ আমরা পালন করছি তার ও তার ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করছি," তার গম্ভীর জোরালো গলার শব্দে অন্ত সব শব্দ চাপা পড়ে গেল। কাউণ্ট এসে তার হাতে চুমো খেলে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে

বলল, "এই যে পুরনো পাপী, মস্কোতে নিশ্চয় আপনার একঘেয়ে লাগছে, কি বলেন ? কুকুর নিয়ে শিকারে যাবার জায়গাও নেই তো ? তা আর কি করা যাবে গো বৃদ্ধ ? দেখুন না, এই সব কাচ্চাবাচ্চারা কেমন বড় হয়ে উঠেছে," সে মেয়েদের দেখিয়ে বলল। "এবার ওদের জন্য স্বামীর খোঁজ করতেই হবে, তা সে আপনার ভাল লাগুক আর নাই লাগুক।"

তারপর বলল, "আচ্ছা, আমার কসাক কেমন আছে ?" (মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না নাতাশাকে কসাক বলে ডাকে) নাতাশা নির্ভয়ে এসে তার হাতে চুমো খেলে তার বাহুতে চাপড় মারতে মারতে বলল, "আমি জানি ও খুব দুষ্টু মেয়ে, কিন্তু আমি ওকে পছন্দ করি।"

মস্ত বড় থলি থেকে ন্যাসপাতির মত আকারের এক জোড়া চুনির ইয়ারিং বের করে গোলাপী নাতাশাকে দিল। সেও খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরকে ডাকল।

নরম উঁচু গলায় বলল, "হেই, হেই বন্ধু ! এখানে একটু এস। এস না বন্ধু···" বলতে বলতে সে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ফেলল। শিশুর মত তার দিকে তাকিয়ে পিয়ের এগিয়ে গেল।

"আরও কাছে এস, কাছে এস বন্ধু ! তিনি যখন পক্ষে ছিলেন তখন একমাত্র আমিই তাকে সত্য কথাটা বলেছি, আর তোমার বেলায় এটা তো আমার;অবশ্য কর্তব্য।"

সে থামল। সকলে চুপচাপ ; তারপর কি ঘটে তা দেখতে সকলেই উৎসুক, কারণ এটা তো সূচনামাত্র।

"চমৎকার ছেলে ! আমি বলছি ! সুন্দর ছেলে ! বাবা মৃত্যু-শয্যায় আর উনি ভালুকের সঙ্গে পুলিশকে জুড়ে দিয়ে মজা করেন ! কী লজ্জা মশাই, কী লজ্জা ! এর চাইতে তোমার যুদ্ধে যাওয়া ভাল ছিল।"

মুখ ঘুরিয়ে সে কাউন্টের হাত ধরল , কাউন্ট তখন হাসি চাপতে পারছে না।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলল, "আমাদের খাবার টেবিলে যাবার সময় কি হয় নি ?"

প্রথম গেল কাউন্ট মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাকে নিয়ে , তারপর গেল কাউন্টেস জনৈক হুজার-কর্ণেলের কাঁধে হাত রেখে ; কর্ণেলটির এখন গুরুত্ব অনেক, কারণ তার সঙ্গেই নিকলাস রেজিমেণ্টে যাবে। তারপর গেল আন্না মিখায়লভ্না শিন্শিনের সঙ্গে। বের্গ ধরল ভেরার হাত। হাস্যময়ী জুলি কারাগিন গেল নিকলাসের সঙ্গে। তারপর জোড়ায় জোড়ায় অন্য সকলে এগিয়ে গেল ; গোটা খাবার ঘরটা ভরে গেল ; সকলের শেষে একে একে গেল ছেলেমেয়েরা, গৃহশিক্ষকরা ও গভর্ণেসরা। পরিচারকরা ঘোরাঘুরি শুরু করল, চেয়ারের শব্দ উঠল, গ্যালারিতে ব্যাণ্ড বাজল, অতিথিরা যার যার আসনে

বসল। তারপর কাউণ্টের পারিবারিক ব্যাণ্ডের পরিবর্তে শুরু হল কাটা-চামচের খুট-খাট, অতিথিদের কলগুঞ্জন ও পরিচারকদের মৃদু পদশব্দ। টেবিলের একপ্রান্তে বসল কাউণ্টেস, তার ডান দিকে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না, বাঁয়ে আন্না মিখায়লভ্‌না, তারপরে অন্য মহিলারা। অন্য প্রান্তে বসল কাউণ্ট, বাঁদিকে হুজার-কর্ণেল এবং ডানদিকে শিন্‌শিন্‌ ও অন্য পুরুষ অতিথিরা। লম্বা টেবিলের মাঝামাঝি একদিকে বসল যুবক-যুবতীরা: বের্গের পাশে ভেরা, বরিসের পাশে পিয়ের; অন্য দিকে ছোটরা, শিক্ষকরা, গভর্ণেসরা; স্ফটিকের ডিকেণ্টার ও ফলের পাত্রের আড়াল থেকে স্ত্রীর দিকে ও তার হাল্কা নীল রঙের ফিতে-বাঁধা উঁচু টুপির দিকে চোখ রেখে কাউণ্ট দ্রুতবেগে প্রতিবাসীদের গ্লাসগুলি ভরে দিতে লাগল; অবশ্য নিজের গ্লাসটিকেও উপেক্ষা করল না। ওদিকে কাউণ্টেসও গৃহকর্ত্রীর কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে আনারসের আড়াল থেকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকাচ্ছে; স্বামীর পাকা চুলের তুলনায় তার মুখ ও টাক মাথার রক্তিমাভা কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মহিলাদের দিকটাতে সারাক্ষণ কথার খৈ ফুটছে, আর পুরুষদের গলা ক্রমেই উঁচুতে আরও উঁচুতে উঠছে—বিশেষ করে হুজার-কর্ণেলের গলা; সে যত লাল হচ্ছে ততই বেশী খাচ্ছে আর বেশী টানছে; ফলে কাউণ্ট তাকে অন্য সকলের সামনে আদর্শ হিসাবে তুলে ধরছে। স্মিত হাস্যে বের্গ ভেরাকে বলছে, ভালবাসা মর্ত্যের নয়, স্বর্গের অনুভূতি। বরিস নতুন বন্ধু পিয়েরকে অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে উল্টো দিকে উপবিষ্ট নাতাশার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করছে। পিয়ের কথা বলছে কম, নতুন মুখগুলিকে ভাল করে পরখ করছে, আর এন্তার খেয়ে চলেছে। দু'রকম ঝোলের মধ্যে সুগন্ধি প্যাটিস সহ কাছিমের ঝোলটাই তার বেশী পছন্দ; অবশ্য কোন খাদ্যদ্রব্য বা কোন রকম মদই সে বাদ দিল না; সব চালিয়ে গেল। তেরো বছরের মেয়েরা ভালবাসার মানুষকে, যাকে জীবনের প্রথম চুম্বনটি দিয়েছে, যে চোখে দেখে ঠিক সেই ভাবে নাতাশা বরিসের দিকে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সেই দৃষ্টি পিয়েরের উপরেও পড়ছে; ছটফটে ছোট মেয়েটির চাউনি দেখে তার হাসি পেল, কেন তা সে জানে না।

নিকলাস বসেছে জুলি কারাগিনের পাশে, সোনিয়ার কিছুটা দূরে। সোনিয়ার মুখে হাসি থাকলেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে সে ঈর্ষায় জ্বলছে; এই তার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে, এই লাল হচ্ছে; নিকলাস ও জুলি কি কথা বলছে তা শোনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। গভর্ণেস অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন ছেলেমেয়েদের প্রতি কোন রকম তাচ্ছিল্য দেখলেই প্রতিবাদ করবে। জার্মান গৃহশিক্ষকটি সব রকম খাবার ও মদের নাম মনে রাখতে চেষ্টা করছে যাতে জার্মানীতে তার লোকজনের কাছে এই নৈশভোজের একটা পূর্ণ বিবরণ পাঠাতে পারে। তাই খানসামা যখন একটা বোতলকে তোয়ালে

দিয়ে জড়িয়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল তখন তার খুব রাগ হল। সে চোখ কুঁচকাল ; যেন বোঝাতে চাইল যে কোন মদের প্রতিই তার লোভ নেই ; কিন্তু তৃষ্ণা মেটাবার জন্য বা লোভের জন্য যে সে মদ চাইছে না, চাইছে শুধু জ্ঞান লাভের জন্য—এটা কেউ বুঝল না দেখে সে খুব মর্মাহত হল।

অধ্যায়—১৯

পুরুষদের টেবিলের আলোচনা ক্রমেই জোরদার হয়ে চলেছে। কর্ণেল বলল, যুদ্ধের ঘোষণা ইতিমধ্যেই পিতার্সবুর্গে বেরিয়ে গেছে, তার একটা কপি সে নিজে দেখেছে, কারণ সেইদিনই সংবাদবাহক সেটা এনে প্রধান সেনাপতিকে দিয়েছে।

শিন্‌শিন্ বলল, "কিন্তু আমরা বোনাপার্তের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি কিসের জন্য ? অস্ট্রিয়ার বক্‌বকানি সে থামিয়েছে ; আমার তো ভয় হয় এর পরই আমাদের পালা আসবে।"

কর্ণেল লোকটি শক্ত-সমর্থ, লম্বা, রক্তবহুল জার্মান ; চাকরির প্রতি অনুরক্ত, রুশ দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত। সে শিন্‌শিনের মন্তব্যের প্রতিবাদ করল।

জার্মান উচ্চারণে সে বলে উঠল, "দেখুন মশাই, তার কারণটা সম্রাট ভালই জানেন। ইস্তাহারে তিনি পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন যে, রাশিয়ার সামনে, সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও মর্যাদা এবং মিত্রশক্তির পবিত্রতার সামনে যে বিপদ আসন্ন হয়ে উঠেছে তাকে তিনি উপেক্ষা করতে পারেন না।"

তারপর যে অভ্রান্ত সরকারী স্মৃতিশক্তি তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তার উপর নির্ভর করে সে ইস্তাহারের মুখবন্ধ হতে আবৃত্তি করতে শুরু করল :

"...সুদৃঢ় ভিত্তির উপর ইওরোপের শান্তিকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে বাসনা সম্রাটের একমাত্র নিঃশর্ত লক্ষ্য তারই নির্দেশে তিনি স্থির করেছেন যে সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে বিদেশে পাঠাবেন এবং সেই লক্ষ্য পূরণের অনুকূল একটি নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবেন।"

মর্যাদাসহকারে এক পাত্র মদ খেয়ে কাউণ্টের সমর্থনের আশায় তার দিকে তাকিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল, "জানেন মশাই, এই কারণেই"...

শিন্‌শিন্ ভুরু কুঁচকে হেসে বলল, "'জেরোম, জেরোম, বৃথাই ঘোরা, বাড়িতে বসে চরকা ঘোরা'—এই প্রবাদটি জানেন কি ? ঐ বাক্যটিই আমাদের পক্ষে মোক্ষম খাটি। সুভরভ-এর কথাই ধরুন—তার কি কাজ সে তো ভালই জানত, কিন্তু তারা তো তাকে মেরে একেবারে তক্তা বানিয়ে দিল। আমি শুধু সেই কথাটাই আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি।" লোকটি অনবরত একবার ফরাসী ও একবার রুশ ভাষায় খিচুরি বানিয়ে কথাগুলি বলল।

টেবিলের উপর একটা থাপ্পড় বসিয়ে কর্ণেল বলল, "আমাদের বুকের শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও আমরা যুদ্ধ করব; সম্রাটের জন্য আমরা জীবন দেব, তবেই মঙ্গল হবে; আর এ নিয়ে যথাসম্ভব কম আলোচনা করব। আমরা প্রবীণ হুজাররা এই দৃষ্টিতেই ব্যাপারটাকে দেখছি, আর এটাই শেষ কথা।" তারপর নিকলাসের দিকে ফিরে সে বলল, "আর তুমি তো একজন যুবক, একজন তরুণ হুজার, এ বিষয়ে তোমার কি মত?"

নিকলাস জবাব দিল, "আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা রুশ দেশের মানুষরা হয় মরব, নয় জয় করব।"

জুলি বলল, "চমৎকার বলেছ তুমি!"

নিকলাসের কথাগুলি শুনে সোনিয়ার সারা শরীর কাঁপতে লাগল. তার কান থেকে গলা ও কাঁধ পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল।

পিয়ের কর্ণেলের কথাগুলি মন দিয়ে শুনল; সমর্থনসূচক ঘাড় নেড়ে বলল, "সুন্দর।"

আর একবার টেবিলে থাপ্পড় মেরে কর্ণেল বলে উঠল, "এই যুবক একজন সত্যিকারের হুজার!"

হঠাৎ টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না‌র গম্ভীর গলা শোনা গেল: "ওদিকে আপনারা কি নিয়ে এত সোরগোল তুলেছেন? এমনভাবে টেবিল চাপড়াচ্ছেন কেন? এতটা উত্তেজিতই বা হচ্ছেন কেন? আপনারা কি মনে করছেন যে ফরাসীরা এখানে পৌঁছে গেছে?"

হুজার হেসে জবাব দিল, "আমি সত্য কথাই বলছি।"

কাউণ্ট গলা চড়িয়ে বলল, "যুদ্ধের কথা হচ্ছে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না, আপনি কি জানেন যে আমার ছেলে যুদ্ধে যাচ্ছে? আমার ছেলে যাচ্ছে।"

"আমার চার ছেলে সেনাদলে আছে, কিন্তু আমি তো চেঁচাচ্ছি না। সবই ঈশ্বরের হাতে। আপনি বিছানায় শুয়েই মারা যেতে পারেন, আবার যুদ্ধক্ষেত্র থেকেও ঈশ্বর আপনাকে ফিরিয়ে আনতে পারেন," মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না গম্ভীর গলায় কথাগুলি বলল: টেবিলের সকলেই তার দিকে হেলে পড়ল।

"ঠিক কথা!"

আলোচনা আবার জমে উঠল; মহিলারা এক প্রান্তে, পুরুষরা অন্য প্রান্তে।

নাতাশার ছোট ভাইটি বলল, "তুমি চেয়ো না, আমি জানি, তুমি চাইবে না!"

"আমি চাইব," নাতাশা জবাব দিল।

বিবেচনাহীন ও সানন্দ দৃঢ়তায় তার মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। অর্ধেক দাঁড়িয়ে চোখের ইসারায় পিয়েরকে তার কথা মন দিয়ে শুনবার নির্দেশ জানিয়ে সে মার দিকে ফিরে সরবে ডাকল: "মামণি!"

চমকে কাউণ্টেস বলল, “কি?” কিন্তু পরক্ষণেই মেয়ের চোখেমুখে দুষ্টুমির ঝিলিক দেখে সে সজোরে আঙুল নেড়ে ও মাথা নেড়ে তাকে ভয় দেখাল।

আলোচনা থেমে গেল।

“মামণি! আমরা কি কি মেঠাই পাব?” নাতাশার গলায় আরও বেশী দৃঢ়তা ও স্থির সিদ্ধান্তের ভাব ফুটে উঠল।

কাউণ্টেস চোখ রাঙাতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না মোটা আঙুল নাড়িয়ে ভয় দেখিয়ে ডাকল, “কসাক!”

এই দুষ্টুমিকে তারা কি ভাবে নেবে ঠিক বুঝতে না পেরে অধিকাংশ অতিথি বড়দের দিকে তাকাল।

“তোমার সাবধান হওয়া উচিত!” কাউণ্টেস বলল।

“মামণি! আমরা কী মেঠাই পাব?” নাতাশা আবার চেঁচিয়ে দুষ্টুমিভরা হাসির সঙ্গে বলল; সে জানে তার এই দুষ্টুমিকে সকলে ভালভাবেই নেবে।

সোনিয়া ও মোটাসোটা ছোট্ট পেত্‌য়া হেসে গড়াগড়ি খেতে লাগল।

নাতাশা ফিসফিস করে ছোট ভাই ও পিয়েরকে বলল, “দেখলে তো! আমি ঠিক চেয়েছি।”

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল, “আইস-পুডিং আছে, কিন্তু তুমি একটুও পাবে না।”

নাতাশা বুঝলো ভয় পাবার কিছু নেই, কাজেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকেও সে ভয় পেল না।

“মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না! কেমন আইস-পুডিং? আইস-ক্রিম আমি পছন্দ করি না।”

ক্যারট-আইস।”

“না, কি রকম তাই বল? কি রকম? আমি জানতে চাই!” নাতাশা প্রায় চীৎকার শুরু করল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না ও কাউণ্টেস হো-হো করে হেসে উঠল, অতিথিরা সকলেই সে হাসিতে যোগ দিল। তারা হাসল মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার কথা শুনে নয়, যে ছোট মেয়েটি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার সঙ্গে এ ধরনের ব্যবহার করতে পারল তার অবিশ্বাস্য সাহস ও বুদ্ধি দেখে।

নাতাশাকে যখন বলা হল যে “পাইনঅ্যাপ্‌ল্‌-আইস” আছে তখন সে থামল। আইসক্রিমের আগে সকলকে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হল। আবার ব্যাণ্ড বেজে উঠল, কাউণ্ট ও কাউণ্টেস চুমো খেল, অতিথিরা তাদের আসন ছেড়ে কাউণ্টেসকে “অভিনন্দন” জানাতে এগিয়ে গেল, এবং টেবিলের দুই পাশ থেকে কাউণ্টের সঙ্গে, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ও পরস্পরের সঙ্গে গ্লাস-ঠোকাঠুকি করতে লাগল। আবার শুরু হল পরিচারকদের ছুটাছুটি, চেয়ারের

খস্‌খস্‌ শব্দ, আর ঠিক যেভাবে পর পর সকলে খাবার ঘরে ঢুকেছিল ঠিক সেইভাবে মুখগুলিকে আরও লাল করে নিয়ে বসবার ঘরে ও কাউণ্টের পড়ার ঘরে ফিরে গেল।

অধ্যায়—২০

তাসের টেবিল পাতা হল, "বোস্টন" খেলার জন্য তাস সাজানো হল, কাউণ্টের অতিথিরা সব বসে গেল, কতক দুটো বসবার ঘরে, কতক ভিতরের ঘরে, কতক বা লাইব্রেরিতে।

কাউণ্ট নিজের তাসগুলো পাখার মত করে হাতে ধরে আহারান্তিক ঘুমকে অনেক কষ্টে দু'চোখ থেকে তাড়িয়ে অনবরত হাসছে। কাউণ্টেসের তাড়নায় ছোটরা বাদ্যযন্ত্রের কাছে ভিড় করে দাঁড়াল। সকলের অনুরোধে জুলি প্রথম বাজাল। কিছুক্ষণ বীণা বাজাবার পরে সকলে মিলে নাতাশা ও নিকলাসকে অনুরোধ করল গান গাইতে, গানের ব্যাপারে দুজনেরই সুনাম আছে।

"আমরা কি গাইব?" নাতাশা বলল।

"'ঝর্ণা'টা গাও," নিকলাস প্রস্তাব করল।

"বেশ, তাহলে তাড়াতাড়ি শুরু করে দাও। বরিস, এখানে এস, নাতাশা বলল। "কিন্তু সোনিয়া কোথায়?"

চারদিকে তাকিয়ে বন্ধুকে দেখতে না পেয়ে নাতাশা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে গেল।

সোনিয়ার ঘরে গিয়ে তাকে পেল না, নার্সারিতে গেল, সেখানেও নেই। নাতাশা ভাবল, সে নিশ্চয় দালানের সিন্দুকের উপর আছে; সেটাই রস্তভ পরিবারের ছোট মেয়েদের গোসা-ঘর। সত্যি সত্যি সেখানেই সোনিয়াকে পাওয়া গেল। সিন্দুকের উপর নার্সের নোংরা পালকের বিছানায় সে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে, আঙুল দিয়ে মুখ ঢেকে এমনভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদছে যে তার কাঁধ অবধি কাঁপছে। তা দেখে নাতাশার ঝলমলে মুখটা হঠাৎ বদলে গেল: চোখ দুটো স্থির হয়ে গেল, গলা দিয়ে কেমন একটা কাঁপুনি নামতে লাগল, আর মুখের কোণ দুটো ঝুলে পড়ল।

"সোনিয়া! কি হল?···ব্যাপার কি?···ও···ও···ও!" নাতাশার বড় মুখখানি হাঁ হয়ে গেল, তাকে বেশ কুৎসিত দেখাতে লাগল, একটা ছোট মেয়ের মত সেও কাঁদতে লাগল; অথচ সোনিয়ার কান্না ছাড়া তার কাঁদবার আর কোন কারণই নেই। কথা বলবার জন্য সোনিয়া মাথা তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না, মুখটা আরও বেশী করে বিছানায় গুঁজে দিল। নীল

ডোরা-টানা পালকের বিছানায় বসে বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে নাতাশা কাঁদতে লাগল। অনেক চেষ্টা করে সোনিয়া উঠে বসল ; চোখের জল মুছে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল :

"এক সপ্তাহের মধ্যে নিকলাস চলে যাচ্ছে, তার···কাগজপত্র···এসে গেছে···সেই আমাকে বলেছে···কিন্তু তাহলেও আমার কাঁদা উচিত নয়," এই বলে হাতের কাগজটা তুলে দেখাল—তাতে নিকলাসের লেখা একটা কবিতা, "তাহলেও আমার কাঁদা উচিত নয়, কিন্তু তুমি বুঝবে না···কেউ বুঝবে না···তার হৃদয় কত বড় !"

আবার সে কাঁদতে শুরু করল। কারণ নিকলাসের হৃদয় এত মহৎ।

গায়ে একটু জোর পেয়ে সে আরও বলতে লাগল, "তোমার কপাল কত ভাল···আমি ঈর্ষা করছি না···আমি তোমাকে ভালবাসি, বরিসকেও, সেও কত ভাল···তোমাদের পথে কোন বাধাই নেই···কিন্তু নিকলাস আমার সম্পর্কে ভাই···তাই এ অবস্থায়···স্বয়ং মেট্রোপলিটন (রাশিয়ার গির্জার ব্যবস্থায় সম্পর্কিত ভাই-বোনের বিয়ের জন্য বিশেষ অনুমতি নিতে হয়)·· আবার তাহলেও হবে না। তাছাড়া, ভেরা যদি মামণিকে (সোনিয়া কাউণ্টেসকে মা বলেই মনে করে এবং মা বলেই ডাকে) বলে দেয় যে আমি নিকলাসের জীবনটাকেই নষ্ট করে দিচ্ছি, আমি হৃদয়হীন, অকৃতজ্ঞ, অথচ আসলে·· ঈশ্বর সাক্ষী," সে একটা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, "আমি তাকে কত ভালবাসি, তোমাদের সব্বাইকে ভালবাসি, শুধু ভেরা···কিন্তু কিসের জন্য ? আমি তার কি করেছি ? তোমার কাছে আমি এতদূর কৃতজ্ঞ যে আমি স্বেচ্ছায় সব কিছু ত্যাগ করতে পারি, শুধু আমার তো কিছুই নেই···"

সোনিয়া আর বলতে পারল না, বিছানায় শুয়ে আবার দুই হাতে মুখ ঢাকল। নাতাশা সান্ত্বনা দিতে লাগল, কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা গেল, বন্ধুর বিপদের গুরুত্ব সে ভালই বুঝতে পেরেছে।

যেন এতক্ষণে বন্ধুর দুঃখের আসল কারণটা বুঝতে পেরেছে এমনিভাবে সে হঠাৎ বলে উঠল, "সোনিয়া, আমি নিশ্চিত জানি ডিনারের পরে সোনিয়া নিশ্চয় তোমাকে কিছু বলেছে। তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ, এই কবিতাগুলো নিকলাস নিজে লিখেছে, অন্য কতকগুলি আমি নকল করেছি ; এগুলিকে আমার টেবিলে দেখতে পেয়ে ভেরা বলছে সব মামণিকে দেখাবে, আমি নাকি অকৃতজ্ঞ, আর মামণি কখনও আমার সঙ্গে তার বিয়ে হতে দেবে না, সে নাকি জুলিকে বিয়ে করবে। সে তো সারাটা দিন জুলির সঙ্গেই ছিল।···নাতাশা, আমি এমন কি করেছি যার জন্য আমার কপালে এমনটা ঘটল ?···"

আবার সে আগের চাইতেও বেশী করে ফোঁপাতে লাগল। নাতাশা তাকে তুলল, জড়িয়ে ধরল, এবং চোখের জল ফেলেও হাসতে হাসতে তাকো

সান্ত্বনা দিতে লাগল।

"সোনিয়া, ভেরার কথায় বিশ্বাস করো না ভাই! তার কথায় বিশ্বাস করো না! তোমার কি মনে নেই, রাতের খাবারের পরে ছোট ঘরে বসে নিকলাস ও আমরা কত কথা বলেছি? আরে, কি যে হবে তা তো আমরা আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। সেটা যে কি তা আমার মনে নেই, কিন্তু তোমারও কি মনে নেই, কি চমৎকার ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম? ঐ তো শিন্‌শিন্ খুড়োর ভাই তার নিকট সম্পর্কের এক বোনকে বিয়ে করেছে না? আর আমরা তো দূর সম্পর্কের! আর বরিসও বলেছে যে এটা খুবই সম্ভব। কি জান, তাকে আমি সব কথা বলেছি। আর সে যেমন চালাক-চতুর, তেমনি ভাল! তুমি কেঁদ না সোনিয়া, লক্ষ্মী সোনিয়া!" তাকে চুমো খেয়ে নাতাশা হাসতে লাগল। "ভেরার মনে ঈর্ষা ঢুকেছে; তার কথা ভেবো না! সব ঠিক হয়ে যাবে; সে মামণিকে কিছু বলবে না। নিকলাস নিজেই তাকে বলবে; জুলিকে নিয়ে সে মোটেই মাথা ঘামায় না।"

নাতাশা তার চুলে চুমো খেল।

সোনিয়া উঠে বসল। বিড়ালছানাটি ঝলমলিয়ে উঠল, চোখ চকচক করতে লাগল, মনে হল, এখনই লেজ তুলে নরম থাবা মেলে লাফিয়ে সুতোর বলটা নিয়ে খেলা শুরু করবে, ঠিক যেমনটি বিড়াল বাচ্চা করে।

তাড়াতাড়ি ফ্রক ও চুল ঝেড়ে সোনিয়া বলল, "তোমার তাই মনে হয়? সত্যি? ঠিক বলছ?"

"সত্যি, ঠিক!' নাতাশা জবাব দিল।

দুজনই হেসে উঠল।

"ঠিক আছে, চল, গান করি গে, সেই 'ঝর্ণা'-র গান।"

"চলে এস।"

হঠাৎ থেমে নাতাশা বলল, "তুমি কি জান, আমার উল্টো দিকে যে মোটাসোটা পিয়ের বসেছিল সে কি রকম মজার লোক! আমার খুব খুশি লাগছে!"

সে এক ছুটে দালান পার হয়ে চলে গেল।

কবিতাগুলিকে বুকের মধ্যে গুঁজে নিয়ে সোনিয়াও নাতাশার পিছনে ছুট দিল; তার মুখ লাল, পা দু'খানি খুশিতে হাল্কা। অতিথিদের অনুরোধে তারা সকলে মিলে "ঝর্ণা"র গানটা গাইল। সকলেই শুনে খুশি হল। তার পর নিকলাস একটা সদ্য-শেখা গান গাইল।

রাতের বেলা যবে জ্যোৎস্না হাসে
তখন যদি তুমি ভাবতে পার—
একজন আছে শুধু তোমার পাশে,
আহা কি মিষ্টি সেই স্বপ্ন আরও।

বীণার তারে লেগে তারই ছোঁয়া
মিষ্টি রাগিনী যায় সাগর ছুঁয়ে,
তোমারই লাগি তার এ-গান গাওয়া,
মধুর আবেশে যায় তোমারে ছুঁয়ে।

অমলিন স্বপ্নের দু'একটি দিন,
কিন্তু হায়! ততদিন রব না আমি!

গানের শেষ স্তবকটি শেষ হবার আগেই ছেলেমেয়েরা বড় হলটায় নাচের জন্য তৈরী হতে লাগল; গ্যালারি থেকে ভেসে এল পায়ের শব্দ আর বাজনাদারদের কাশির শব্দ।

* * *

শিন্‌শিন্ বসবার ঘরেই পিয়েরকে আটকে রাখল। সম্প্রতি সে বিদেশ থেকে ঘুরে এসেছে; তাই সে ভদ্রলোক তার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনা জুড়ে দিল, আরও কয়েকজন তাতে যোগ দিল; কিন্তু পিয়ের বিরক্তি বোধ করতে লাগল। বাজনা শুরু হতেই নাতাশা সোজা তার কাছে এসে মুখ লাল করে হেসে বলল:

"মামণি আমাকে বলে দিল, আপনাকে নাচে যোগ দিতে ওখানে নিয়ে যেতে হবে।"

পিয়ের জবাব দিল, "আমি তো নাচের তাল স্রেফ গুলিয়ে ফেলব; তবে তুমি যদি আমার গুরু হও···।" ছোট মেয়েটির দিকে সে হাতখানা বাড়িয়ে দিল।

ওদিকে নাচের জুড়িরা তৈরী হচ্ছে; বাজনাদাররা সুর বাঁধছে; এদিকে পিয়ের তার সঙ্গিনীকে নিয়ে বসে পড়ল। নাতাশা খুব সুখী; এমন একজন "বয়স্ক" লোকের সঙ্গে সে নাচবে যে বিদেশে ঘুরে এসেছে। একটা ভাল জায়গায় বসে সে "বয়স্কা" মহিলার মতই তার সঙ্গে কথা বলছে। অন্য কোন মহিলার দেওয়া একটা পাখা তার হাতে। সমাজে চলতে অভ্যস্ত মহিলাদের মত ভঙ্গী করে (ঈশ্বর জানেন কবে কোথায় সে এ সব শিখেছে) পাখার হাওয়া খেতে খেতে হাসি মুখে সে তার সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

নাচ-ঘর পার হতে গিয়ে নাতাশাকে দেখিয়ে বলে উঠল, "আরে দেখ, দেখ। ওর দিকে তাকাও!"

নাতাশাও হাসল; তার মুখ লাল।

"আচ্ছা মামণি! তুমি ও কথা বলছ কেন? এতে অবাক হবার কি আছে?"

নাচের তখন তৃতীয় পর্যায় চলছে। বিশিষ্ট প্রবীণ অতিথিদের নিয়ে কাউন্ট ও মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না এতক্ষণ ছোট ঘরটাতে তাস খেলছিল।

অনেকক্ষণ একটানা বসে থাকবার পরে এবার তারা আড়মোড়া ভেঙে টাকার থলি ও পকেট-বই ঠিক মত তুলে নিয়ে নাচ-ঘরে ঢুকল। খুশিভরা মুখে প্রথম ঢুকল মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না ও কাউন্ট। কাউন্ট ব্যালে নাচের ভঙ্গীতে হাতটা নুইয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার দিকে এগিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে চলল ; মার্জিত পৌরুষের স্মিত হাসিতে তার মুখটা উজ্জ্বল। নাচ শেষ হতেই বাজনাদারদের লক্ষ্য করে হাততালি দিয়ে সে গ্যালারির দিকে তাকাল ; তারপর প্রথম বেহালাদারকে বলল :

"সাইমেন ! তুমি 'ডানিয়েল কুপার' বাজাতে জান ?"

এটা কাউন্টের প্রিয় নাচ ; যৌবনে এ-নাচ সে অনেক নেচেছে।

"বাপিকে দেখ !" সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাতাশা চেঁচিয়ে উঠল। তার হাসি সারা ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সত্যি সত্যি উপস্থিত সকলেই হাসি মুখে এই আনন্দময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে দেখতে লাগল। দীর্ঘদেহ, শক্তসমর্থ সঙ্গিনী মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকে পাশে নিয়ে ভদ্রলোক তাকে জড়িয়ে ধরল, সময় কাটাতে লাগল, ঘাড় সোজা করল, পা বাড়িয়ে আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগল, হাসির ঝোঁকে চওড়া মুখটাকে আরও চওড়া করে আসন্ন ঘটনার জন্য দর্শকদের প্রস্তুত করে নিল। তারপর "ডানিয়েল কুপার"-এর উত্তেজনাপূর্ণ মধুর বাজনা (অনেকটা পল্লী-নৃত্যের মত) শুরু হতেই হঠাৎ নাচ-ঘরের সবগুলি দরজা বাড়ির দাসদাসীতে একেবারে ভরে গেল—একদিকে পুরুষরা, অন্যদিকে মেয়েরা , তাদের চোখ মুখ চকচক করছে ; মালিকের ফূর্তি দেখতে তারাও হাজির হয়েছে।

একটা দরজায় দাঁড়িয়ে নার্সটি সোচ্চারে বলে উঠল, "মালিককে দেখ ! ঠিক যেন ঈগল পাখিটি !"

কাউন্ট এক সময় ভাল নাচত, নাচতে জানে। তার সঙ্গিনী ভাল নাচতে পারেও না, পারতে চায়ও না। তার প্রকাণ্ড দেহটা সোজা হল, শক্তিশালী হাত দুটো ঝুলে পড়ল, শুধু তার শক্ত সুন্দর মুখখানিই যা নাচে অংশ নিল। কাউন্ট তার মোটা শরীরের সবটা দিয়ে যে ভাব প্রকাশ করছে, মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না শুধু তার উদ্ভাসিত মুখ ও কম্পিত নাক দিয়েই সেই ভাব প্রকাশ করছে। কাউন্ট যেমন তার শরীরটাকে পাক খাইয়ে লঘু পদক্ষেপে নাচতে নাচতে দেহভঙ্গীর অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতা ও নমনীয়তার দ্বারা দর্শকদের মোহিত করছে, তেমনি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাও শরীরের ঈষৎ ঝাঁকুনিতে, ঘুরবার বা পা ফেলবার সময় কাঁধের ও বাহুর সামান্য মোচড়েই দর্শকদের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করতে পারল ; তার দেহের আকার ও বয়সের কঠোরতার কথা ভেবে সকলেই তার প্রশংসা করল। নাচ ক্রমেই জমে উঠল। অন্য সকলে নিজেদের নাচের কথা ভুলে কাউন্ট ও মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকেই দেখতে লাগল। তবু নাতাশা প্রত্যেকের পোশাক বা আস্তিন টেনে ধরে

বলছে, "বাপিকে দেখ!" নাচের বিরতি হতেই কাউণ্ট বাজনাদারদের আরও জোরে বাজাতে বলে। বাজনা দ্রুততর, আরও আরও দ্রুততর হয়: কাউণ্ট আরও, আরও, আরও হাল্কাভাবে ঘুরতে থাকে, মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার চারদিকে উড়তে থাকে, কখনও আঙুলের উপর, কখনও গোড়ালির উপর ভর দিয়ে; শেষ পর্যন্ত সঙ্গিনীকে একটা পাক দিয়ে তাকে তার আসনে পৌঁছে দিয়ে কাউণ্ট তার শেষ খেলা দেখাল: হাল্কা পাটা পিছনে দিয়ে, ঘাম-ঝরা মাথাটাকে নীচু করে, হেসে, দু হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল; নাতাশাসহ সমস্ত দর্শকের প্রশস্তি ও উচ্চহাসিতে ঘর ভরে গেল। দুই নাচের সঙ্গী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল; ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল; কেম্বিকের রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল।

কাউণ্ট বলল, "আমাদের কালে এই রকমই আমরা নাচতাম প্রিয় বান্ধবী।"

আস্তিন গুটিয়ে জোর নিঃশ্বাস ফেলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলল, "একেই তো বলে 'ডানিয়েল কুপার!"

অধ্যায়—২১

রস্তভদের নাচ-ঘরে যখন ছ নম্বর নাচ চলছিল, ক্লান্ত বাজনাদাররা ভুল করছিল, আর শ্রান্ত পরিচারক ও রাঁধুনিরা রাতের খাবারের আয়োজন করছিল, সেই সময় কাউণ্ট বেজুখভের ষষ্ঠবার রোগের আক্রমণ হল। ডাক্তাররা জানিয়ে দিল, নিরাময় অসম্ভব। নীরব "দোষ-স্বীকৃতির" পরে মুমূর্ষু লোকটির শেষ "ভোজনানুষ্ঠান" করা হল, তৈল লেপন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়; এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সময় সাধারণতই যা হয়ে থাকে, বাড়িতে একটা হট্টগোল ও উৎকণ্ঠা চলতে লাগল। বাড়ির বাইরে ফটকের ওপাশে একদল মুর্দাফরাস হাজির আছে; কোন গাড়ি এলেই তারা লুকিয়ে পড়ছে; আসলে একটা ব্যয়বহুল অন্ত্যেষ্টির নির্দেশের আশায় তারা অপেক্ষা করে আছে। মস্কোর সামরিক শাসনকর্তা কাউণ্টের স্বাস্থ্যের খবর নিতে এতদিন পর্যন্ত বরাবর এড্-ডি-কংকেই পাঠিয়ে এসেছে; ক্যাথারিণের দরবারের বিখ্যাত প্রবীণ সদস্য কাউণ্ট বেজুখভকে শেষ বিদায় জানাতে আজ সন্ধ্যায় সে নিজেই এসেছে।

জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা ঘরটিতে ভিড় জমে গেছে। মুমূর্ষু লোকটির পাশে নির্জনে প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়ে সামরিক শাসনকর্তা যখন বেরিয়ে এল তখন সকলেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। কোন রকমে তাদের অভিবাদনকে স্বীকৃতি জানিয়ে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তার, পুরোহিত ও পরিবারের আত্মীয়-স্বজনের স্থির দৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টায় সামরিক শাসনকর্তা চলে

গেল। গত কয়েকদিনেই প্রিন্স ভাসিলি কিছুটা শুকিয়ে গেছে। বিবর্ণ হয়ে গেছে; নীচু গলায় সামরিক শাসনকর্তার কানে কানে বার কয়েক কি যেন বলতে বলতে সে ফটক পর্যন্ত তাকে পৌছে দিল।

সামরিক শাসনকর্তা চলে গেলে প্রিন্স ভাসিলি এক পায়ের উপর অপর পাটা তুলে, হাঁটুর উপর কনুই রেখে হাত দিয়ে মুখটা ঢেকে একাকি নাচ-ঘরের একটা চেয়ারে বসে পড়ল। সেইভাবে কিছুক্ষণ বসে থেকে সে উঠে দাঁড়াল, আর্ত চোখে চারদিকে তাকাল, তারপর অস্বাভাবিক দ্রুত পা ফেলে লম্বা করিডরটা পেরিয়ে বাড়ির পিছন দিককার বড় প্রিন্সেসের ঘরের দিকে চলে গেল।

স্বল্পালোকিত অভ্যর্থনা-ঘরে যারা বসেছিল তারা ফিসফিস করে কথা বলছে। যখনই কেউ মুমূর্ষু লোকটির ঘরে ঢুকছে বা বেড়িয়ে আসছে তখনই তারা দরজা খোলার সামান্য ক্যাঁচ-ক্যাচ শব্দ শুনেই চুপ হয়ে যাচ্ছে, আর কৌতূহল ও প্রত্যাশার দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

"মানব জীবনের সীমা তো···নির্দিষ্ট; তাকে পেরিয়ে যাওয়া সম্ভব নাও হতে পারে," বুড়ো পুরোহিত একজন মহিলাকে বলল, মহিলাটি তার পাশেই বসে সরলভাবে তার কথা শুনছিল।

"তৈললেপন অনুষ্ঠানের' কি বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে না?" মহিলাটি শুধাল।

"আহা মাদাম, সেটা তো খুব বড় অনুষ্ঠান," টাক মাথার যৎসামান্য জট-বাঁধা চুলে হাত বুলোতে বুলোতে পুরোহিত বলল।

ঘরের অপব দিকের কে একজন জিজ্ঞাসা করল, "উনি কে? সামরিক শাসনকর্তা স্বয়ং? কেমন যুবকের মত দেখতে।"

"হ্যাঁ, তার বয়স ষাটের উপর। শুনলাম, কাউণ্ট নাকি এখন কাউকে চিনতে পারছেন না? তারা তো 'তৈললেপন অনুষ্ঠানটা' করে ফেলতে চাইছে।"

"আমি এমন লোকের কথাও শুনেছি যার সাতবার 'তৈললেপন অনুষ্ঠান' হয়েছিল।"

মেজ প্রিন্সেস এইমাত্র রোগীর ঘর থেকে এসেছে। কেঁদে কেঁদে তার চোখ লাল হয়ে গেছে। সে ডাঃ লোরেনের পাশে গিয়ে বসল। ক্যাথারিণের প্রতিকৃতির নীচে টেবিলের উপর কনুইতে ভর দিয়ে ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বসে ছিল।

আবহাওয়া সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বলল, "সুন্দর। আবহাওয়া সুন্দর প্রিন্সেস, তাছাড়া, মস্কোতে থাকলে মনে হয় যেন গ্রাম-দেশেই আছি।"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে প্রিন্সেস বলল, "সত্যি ভাই। তাহলে ওকে কিছু পানীয় দেওয়া যেতে পারে কি?"

লোরেন ভাবতে লাগল।

"ওষুধ খেয়েছেন কি ?"

"হ্যা।"

ডাক্তার ঘড়ি দেখল।

"এক গ্লাস ফুটানো জলের মধ্যে এক চিমটে লবন মিশিয়ে দেবেন,"; এক চিমটে বলতে কি বোঝায় তাও সে দুটো আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বুঝিয়ে দিল।

জনৈক জার্মান ডাক্তার একজন এড্-ডি-কংকে বলল, "তৃতীয় আক্রমণের পর কোন রোগী বেঁচে আছে এরকম দেখা যায় নি।"

এড্-ডি-কং বলল, "অথচ কত হিসাবমত তিনি চলতেন, আর তাঁর শরীরটাও কত ভাল ছিল।" তারপর ফিসফিস করে বলল, "তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে ?"

জার্মানটি হেসে বলল, "তার জন্য লোকের অভাব হবে না।"

লোরেনের নির্দেশ মত পানীয় তৈরী করে মেজ প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল; দরজায় শব্দ হতেই সকলে আর একবার দরজার দিকে চোখ ফেরাল। জার্মান ডাক্তারটি লোরেনের কাছে উঠে গেল।

জার্মানটি খারাপ উচ্চারণে ফরাসী ভাষায় জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি মনে করেন উনি সকাল পর্যন্ত বাঁচবেন ?"

লোরেন ঠোঁট বেঁকিয়ে একটা আঙ্গুলকে না-সূচকভাবে জোরে জোরে নাড়তে লাগল।

নীচু গলায় বলল, "আজ রাতেই, তার পরে নয়।" সে যে রোগীর অবস্থা সঠিক বুঝতে পেরেছে এবং বলতে পেরেছে এই আত্মতৃপ্তিতে শিষ্টাচারসম্মত হাসি হেসে সে সরে গেল।

এদিকে প্রিন্স ভাসিলি দরজা খুলে প্রিন্সেসের ঘরে ঢুকল।

ঘরের ভিতরটা প্রায় অন্ধকার; দেবমূর্তির সামনে দুটো ছোট বাতি শুধু জ্বলছে; ঘরময় ফুল ও ধূপের গন্ধ। ছোট ছোট আসবাব, হোয়াট-নট, ক্যাবার্ড ও ছোট টেবিল ছড়িয়ে আছে। পর্দার ওপাশে একটা উঁচু, সাদা পালকের বিছানা চোখে পড়ছে। একটা ছোট কুকুর ডাকতে শুরু করল।

"কে দাদা ?"

প্রিন্সেস উঠে চুলটা ঠিক করল; অবশ্য তার চুল বেশ পরিপাটিই ছিল।

"কিছু কি ঘটেছে ?" সে জিজ্ঞাসা করল। "আমার এত ভয় করছে।"

ক্লান্তভাবে চেয়ারে বসে পড়ে প্রিন্স আস্তে বলল, "না, কোন পরিবর্তন নেই। আমি এসেছি তোমার সঙ্গে একটু কাজের কথা বলতে কাতিচে। ঘরটা কিন্তু বেশ গরম রেখেছ, সে কথা বলতেই হবে। আরে বস, একটু কথা বলা যাক।"

মুখের কঠোর ভাবের কোন পরিবর্তন না করেই প্রিন্সেস বলল, "আমি

ভাবলাম বুঝি কিছু একটা ঘটেছে। একটু ঘুমোতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না।"

প্রিন্সেসের হাতটা ধরে অভ্যাসমত সেটাকে নীচের দিকে বেঁকিয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলল, "তাহলে বোন?"

এই "তাহলে"'র অর্থ যে দুজনই ভাল বোঝে সেটা বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল।

প্রিন্সেসের শরীর বেশ খাড়া ও শক্ত, পায়ের তুলনায় অস্বাভাবিক রকমের লম্বা। সে প্রিন্স ভাসিলির দিকে সোজাসুজি তাকাল; ভাসা-ভাসা ধূসর চোখে আবেগের কোন চিহ্ন নেই। তারপর মাথাটা নেড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে দেবমূর্তির দিকে তাকাল। এটা দুঃখ ও ভক্তির লক্ষণ হতে পারে, আবার ক্লান্তি ও আসন্ন বিশ্রামের আশার লক্ষণও হতে পারে। প্রিন্স ভাসিলি এটাকে ক্লান্তির লক্ষণ বলেই মনে করল।

বলল, "আর আমি? আমার পক্ষেই কি ব্যাপারটা সহজ বলে মনে কর? ডাক-গাড়ির ঘোড়ার মত আমিও ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছি। তবু তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতেই হবে কাতিচে, খুব গুরুতর কথা।"

সরু হাড় বের-করা হাতে ছোট কুকুরটাকে কোলের উপর ধরে প্রিন্সেস সাগ্রহে প্রিন্স ভাসিলির মুখের দিকে তাকাল; সে স্থির করে ফেলেছে যে প্রথমে কথা বলবে না, তাতে যদি দরকার হয় তো সকাল পর্যন্ত ও অপেক্ষা করে থাকবে।

মনে মনে কিছুটা লড়াই করে প্রিন্স ভাসিলি এবার আসল কথায় এল, "আমার প্রিয় প্রিন্সেস ও বোন ক্যাথারিণ সেমেনভ্না, কি জান এরকম একটা মুহূর্তে সব কিছুই অবশ্য ভাবতে হবে। ভবিষ্যতের কথা, তোমাদের সকলের কথা—সবই ভাবতে হবে।···তুমি তো জান, তোমাদের আমি নিজের ছেলে-মেয়েদের মতই ভালবাসি!"

প্রিন্সেস একইভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল; একটুও নচাচড়া করল না।

তার দিকে না তাকিয়ে ছোট টেবিলটাকে একটু সরিয়ে দিয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলতে লাগল, "তারপর আমার নিজের পরিবারের কথাও অবশ্যই ভাবতে হবে। তুমি তো জান কাতিচে, আমরা—আমরা তিন বোন, মামন্তভ ও আমার স্ত্রী—আমরাই কাউন্টের একমাত্র প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। আমি জানি, এসব বিষয় নিয়ে এখন কথা বলা বা চিন্তা করা যে তোমার পক্ষে কত কঠিন তা আমি জানি। আমার পক্ষেও ব্যাপারটা সহজ নয়; কিন্তু বোন, আমার বয়স তো ষাট হতে চলল, আমাকে তো সব কিছুর জন্যই তৈরী থাকতে হবে। তুমি কি জান, আমি পিয়েরকেও ডেকে পাঠিয়েছি? কাউন্ট," তার ছবিটার দিকে তাকিয়ে, "নিশ্চয় চাইবেন যে তাকেও ডাকা হোক।"

প্রিন্স ভাসিলি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিন্সেসের দিকে তাকাল, কিন্তু সে তার কথাগুলি চিন্তা করছে না শুধুই তাকিয়ে আছে তা বুঝতে পারল না।

প্রিন্সেস জবাব দিল, "দেখ দাদা, ঈশ্বরের কাছে আমি শুধু একটি প্রার্থনাই করছি, তিনি যেন ওকে করুণা করেন, ওর মহান আত্মা যেন শান্তিতে এই পৃথিবী ছেড়ে···"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়ই," ধৈর্য হারিয়ে তার কথায় বাধা দিয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলে উঠল ; টাক মাথাটা ঘষতে ঘষতে যে ছোট টেবিলটাকে সরিয়ে দিয়েছিল বেশ রাগের সঙ্গে সেটাকেই আবার কাছে টেনে আনল। "কিন্তু··· অল্প কথায় ব্যাপারটা এই···তুমি নিজেও জান যে গত শীতের সময় কাউণ্ট একটা উইল করে তার সম্পত্তির প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকার আমাদের না দিয়ে দিয়ে গেছেন পিয়েরকে!"

প্রিন্সেস শান্তভাবে জবাব দিল, "উইল তিনি অনেক করেছেন। কিন্তু পিয়েরকে তিনি সম্পত্তি দিতে পারেন না। পিয়ের তার অবৈধ সন্তান।"

ছোট টেবিলটাকে আঁকড়ে ধরে আরও উত্তেজিতভাবে প্রিন্স ভাসিলি হঠাৎ দ্রুতলয়ে বলতে লাগল, "কিন্তু বোনটি, সম্রাটের কাছে যদি এমন একটা চিঠি লেখা হয়ে থাকে যাতে কাউণ্ট পিয়েরকে বৈধ সন্তান হিসাবে স্বীকৃতির আবেদন জানিয়েছেন ? কাউণ্টের রাজসেবার কথা বিবেচনা করে সে অনুরোধ যে মঞ্জুর হতে পারে তা কি বুঝতে পারছ ?···"

প্রিন্সেস এমনভাবে হাসল যেন সে সবই জানে, এমন কি বক্তার চাইতে বেশীই জানে।

তার হাতটা ধরে প্রিন্স ভাসিলি বলতে লাগল, "তোমাকে আরও বলতে পারি ; চিঠিটা লেখা হয়েছিল কিন্তু পাঠানো হয় নি, কিন্তু সম্রাট সেটা জানেন। একমাত্র কথা হল, সেটা নষ্ট করে ফেলা হয়েছে, অথবা হয় নি ? যদি না হয়ে থাকে, তাহলে যে মুহূর্তে সব শেষ হয়ে যাবে এবং কাউণ্টের কাগজপত্র খোলা হবে তখনই উইল এবং চিঠিটা সম্রাটকে পাঠানো হবে, আর আবেদন অবশ্যই মঞ্জুর হবে। বৈধ সন্তান হিসাবে সব কিছু পাবে পিয়ের।"

"আর আমাদের অংশ ?" ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্সেস এমনভাবে প্রশ্নটা করল যেন সেটা ছাড়াও আরও অনেক কিছু ঘটতে পারে।

"হায় কাতিচে, এটা যে দিনের আলোর মত পরিষ্কার। সেই হবে সব কিছুর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী, আর তোমরা কিছুই পাবে না। তোমাকে তাই জানতেই হবে, উইল ও চিঠি লেখা হয়েছিল কি না, এবং সেগুলি নষ্ট করে ফেলা হয়েছে কি না। আর সেগুলোর কথা যদি কারও মনে না থেকে থাকে, তাহলে তোমাকে জানতে হবে সেগুলো কোথায় আছে, সেগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে, কারণ···"

"তারপর ?" ব্যঙ্গের হাসির সঙ্গে প্রিন্সেস তার কথায় বাধা দিল ; কিন্তু

তার চোখের ভাব একটুও বদলাল না। "আমি স্ত্রীলোক, আর তুমি মনে কর আমরা সব মূর্খ ; কিন্তু আমি এইটুকু জানি : অবৈধ সন্তান সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারে না।··· জারজ!" শেষের কথাটা যোগ করে সে যেন বোঝাতে চাইল যে এই অনূদিত শব্দটা প্রিন্স ভাসিলির বক্তব্যের অসারতাকে ভালভাবেই প্রমাণ করে দেবে।

"সত্যি নাকি কাতিচে! তুমি বুঝতেই পারছ না! তোমার এত বুদ্ধি, অথচ এটা কেন বুঝতে পারছ না যে পিয়েরকে বৈধ সন্তান হিসাবে স্বীকৃতির অনুরোধ জানিয়ে কাউন্ট যদি সম্রাটকে চিঠি লিখে থাকেন, তাহলে পিয়ের আর পিয়ের থাকবে না, সে হবে কাউন্ট বেজুখভ, আর উইল অনুসারে সেই তখন হবে সব কিছুর উত্তরাধিকারী। আর সেই উইল আর চিঠি যদি নষ্ট করে ফেলা না হয় তাহলে কর্তব্যপরায়ণা হবার সান্ত্বনা ও তার ফলাফল ছাড়া তোমাদের আর কিছুই থাকবে না! এটা একেবারে নিশ্চিত।"

"আমি জানি উইল করা হয়েছিল, কিন্তু আরও জানি যে সে উইল অসিদ্ধ ; আর তুমি দাদা হয়েও আমাকে একটা বুদ্ধু বলে ভাব।" প্রিন্সেস বেশ জোর দিয়ে বলল।

অধৈর্য হয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলতে শুরু করল, "প্রিয় প্রিন্সেস ক্যাথারিণ সেমেনভ্‌না, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসি নি, একজন আত্মীয়া, সত্যিকারের ভাল আত্মীয়ার সঙ্গে তার স্বার্থ নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আর এই দশমবারের মত তোমাকে বলছি, সম্রাটের কাছে লেখা চিঠি আর পিয়েরের অনুকূলে তৈরী সেই উইল যদি কাউন্টের কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে তুমি ও তোমার বোনরা কেউই উত্তরাধিকারিণী নও। যদি আমার কথা বিশ্বাস না কর, একজন বিশেষজ্ঞের কথায় বিশ্বাস কর। এইমাত্র আমি দিমিত্রি অনুফ্রিচ (পারিবারিক সলিসিটর)-এর সঙ্গে কথা বলে এসেছি ; তিনিও ঐ একই কথা বলেছেন।"

এই কথা শুনে প্রিন্সেসের মনের ভাব হঠাৎ বদলে গেল ; পাতলা ঠোঁট দুটি সাদা হয়ে গেল, আর চোখের কোন পরিবর্তন না হলেও কথা বলতে গিয়ে তার গলার স্বর এমন বদলে যেতে লাগল যে সে নিজেও তা আশা করে নি।

সে বলল, "সে তো খুব ভাল হবে! আমি কখনও কিছু চাই নি। আর এখনও চাই না।"

কোল থেকে কুকুরটাকে নামিয়ে দিয়ে সে পোশাক পাট করতে লাগল।

"আর এই হল কৃতজ্ঞতা—যারা তার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করেছে এই তাদের স্বীকৃতি!" প্রিন্সেস চীৎকার করে বলল। "এ তো চমৎকার। খুব ভাল! আমি কিছুই চাই না প্রিন্স।"

"ঠিক, কিন্তু তুমি তো একা নও। তোমার বোনরা আছে···," প্রিন্স ভাসিলি বলল।

কিন্তু প্রিন্সেস তার কথায় কান দিল না।

"হ্যাঁ, অনেক আগেই আমি এ সব জানতাম, কিন্তু ভুলে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম, নীচতা, প্রবঞ্চনা, ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র আর অকৃতজ্ঞতা—জঘন্যতম অকৃতজ্ঞতা ছাড়া এ বাড়িতে আর কিছুই আমি আশা করতে পারি না।…"

"উইলটা কোথায় আছে তা তুমি জান কি না?" প্রিন্স ভাসিলি তবু জিজ্ঞাসা করল; তার গাল দুটো আগের চাইতে বেশী কুঁচকে যাচ্ছে।

"হ্যাঁ, সত্যি আমি বোকা ছিলাম! আমি মানুষকে বিশ্বাস করতাম, ভালবাসতাম, নিজেকে বিলিয়ে দিতাম। কিন্তু যারা নীচ, যারা পাপী, তাদেরই জয় হয়! আমি জানি কে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।"

প্রিন্সেস উঠতে যাচ্ছিল, প্রিন্স তাকে হাত ধরে থামাল। প্রিন্সেসের তখন এমন অবস্থা যে গোটা মানব জাতির উপরেই সে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। ক্রুদ্ধ চোখে সে সঙ্গীর দিকে তাকাল।

"এখনও সময় আছে বোন। তোমাকে মনে রাখতে হবে কাতিচে যে এ সবই করা হয়েছিল না ভেবেচিন্তে, একটা রাগের মুহূর্তে, রোগের মধ্যে, আর তার পরে আর কিছুই মনে ছিল না। এখন আমাদের কর্তব্য এই ভুলকে সংশোধন করা, এই অন্যায় কাজ থেকে বিরত করে তার শেষের মুহূর্তগুলিকে শান্তিতে ভরে তোলা; যাতে এই অনুভূতি নিয়ে তাকে মরতে না হয় যে তাদেরই তিনি অসুখী করে রেখে যাচ্ছেন যারা‥"

প্রিন্সেস সুর মিলিয়ে বলল, "যারা তার জন্য সব কিছু ত্যাগ করেছে, যদিও তিনি সে ত্যাগের মূল্য দেন নি। না দাদা, আমি সর্বদা মনে রাখব যে এই জগতে কারও কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়, এ জগতে মর্যাদা বা ন্যায় বলে কিছু নেই। এ জগতে মানুষকে শুধু ধূর্ত নিষ্ঠুর হতে হবে।"

"শোন, শোন, অবুঝ হয়ো না। তোমার মহৎ হৃদয়কে আমি চিনি।"

"না, আমার পাপীর হৃদয়।"

"তোমার হৃদয়কে আমি চিনি," প্রিন্স আবার বলল। "তোমার বন্ধুত্বকে আমি মূল্য দেই, আর আশা করি যে আমার সম্পর্কেও তুমি সেই অভিমতই পোষণ কর। এভাবে ভেঙে পড়ো না; একদিনই হোক, আর এক ঘণ্টাই হোক, এখনও সময় আছে, এস আমরা বুদ্ধির সঙ্গে আলোচনা করি। উইল সম্পর্কে সব কথা আমাকে বল। সব চাইতে বড় কথা সেটা কোথায় আছে। তুমি নিশ্চয় জান। এই মুহূর্তে সেটা নিয়ে কাউন্টকে দেখাও। তিনি নির্ঘাৎ উইলের কথা ভুলেই গেছেন এবং সেটা নষ্ট করে ফেলতে চাইবেন। ঠিক জেনো, তার মনের বাসনাকে ঠিক ঠিক মত পূর্ণ করাই আমার একমাত্র কামনা; শুধু সেই জন্যই আমি এখানে এসেছি। তাকে এবং তোমাকে সাহায্য করতেই আমি এসেছি।"

"এবার আমি সব বুঝতে পারছি। আমি জানি কে ষড়যন্ত্র করছে—

আমি জানি !" প্রিন্সেস চেঁচিয়ে বলে উঠল।

"সেটা আসল কথা নয় বোন।"

"এ তোমাদের সেই আশ্রিতা, সেই মিষ্টি প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কায়া, সেই আন্না মিখায়লভ্না, যাকে আমি বাড়ির দাসী রাখতেও রাজী নই,···কুখ্যাত, নীচ মেয়ে মানুষ !"

"আমাদের এতটুকু সময় নষ্ট করা উচিত নয়···"

"আঃ, আমাকে কিছু বলো না ! গত শীতের সময় মিষ্টি কথায় মন ভুলিয়ে সে এখানে এসেছিল, আমাদের সম্পর্কে, বিশেষ করে সোফির সম্পর্কে এমন সব নীচ, লজ্জাজনক কথা বলেছিল—সে সব কথা আমি মুখেও আনতে পারি না—যার ফলে কাউণ্ট অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, আর এক পক্ষকাল তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করেন নি। আমি জানি তখনই তিনি এই নীচ, ঘৃণ্য কাগজটা লিখেছিলেন ; কিন্তু তখন আমি ভেবেছিলাম এটা অসিদ্ধ।"

"আমাদের শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে—আরও আগে কেন এ কথা আমাকে বল নি ?"

তার প্রশ্নে কান না দিয়ে প্রিন্সেস বলল, "ওটা সেই কারুকার্যকরা পোর্টফোলিওতে আছে যেটা তিনি তাঁর বালিশের তলায় রাখেন। এবার বুঝতে পারছি ! হ্যাঁ ; আমার মনে যদি কোন পাপ থাকে, মহাপাপ, তো সেটা ওই নীচ মেয়ে মানুষটার প্রতি তীব্র ঘৃণা !" প্রিন্সেস প্রায় আর্তনাদ করে উঠল ; এখন সে একেবারেই বদলে গেছে। "কিসের জন্য সে মাকড়শার মত এখানে এসেছিল ? কিন্তু আমি তাকে দেখে নেব। সময় একদিন আসবেই !"

অধ্যায়—২২

অভ্যর্থনা-ঘরে আর প্রিন্সেসের ঘরে যখন এই সব কথাবার্তা হচ্ছিল সেই সময় একখানা গাড়ি পিয়েরের (যাকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল) এবং আন্না মিখায়লভ্না (যে তার সঙ্গে যাওয়াটা দরকারী মনে করেছিল) এই দুজনকে নিয়ে কাউণ্ট বেজুখভের বাড়ির উঠোনে ঢুকল। চাকাগুলো যখন জানালার নীচেকার খড়ের উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরতে লাগল তখন আন্না মিখায়লভ্না সান্ত্বনার কথা বলে সঙ্গীর দিকে মুখ ঘোরাতেই দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে ; মহিলাটি তাকে ডেকে তুলল। জেগে উঠে পিয়ের আন্না মিখায়লভ্নার পিছন পিছন গাড়ি থেকে নামল, আর তখনই তার মনে পড়ল যে এবার তাকে মুমূর্ষু বাবার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে লক্ষ্য করল, সদর ফটকের পরিবর্তে তারা পিছনের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। সে যখন গাড়ির পাদানি থেকে

নামছে সেই সময় কারিগরের মত দেখতে দুটি লোক ফটক থেকে ছুটে গিয়ে বাড়ির দুদিককার ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। একটুক্ষণ থেমে পিয়ের লক্ষ্য করল সেই ধরনের আরও কয়েকজন বাড়িটার দুদিকে ছায়ার আড়ালে লুকিয়ে আছে। কিন্তু তাদের দেখেও আন্না মিখায়লভ্‌না, বা পরিচারক, বা কোচয়ান কেউই তাদের দিকে নজর দিল না। "দেখে তো ভালই মনে হচ্ছে," এই কথা ভেবে পিয়ের মহিলাটিকে অনুসরণ করল। স্বল্পালোকিত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মহিলাটি দ্রুত পায়ে উপরে উঠতে লাগল, পিয়ের একটু পিছিয়ে পড়ায় তাকে ডেকে নিল। কাউন্টের কাছে যাওয়া তার পক্ষে প্রয়োজন কেন তা সে বুঝতে পারছে না; আরও বুঝতে পারছে না কেন সে পিছনের দরজা দিয়ে যাচ্ছে; তবু আন্না মিখায়লভ্‌নার নিশ্চিত ও দ্রুত পদক্ষেপ বিবেচনা করে সে ধরেই নিল যে যাওয়াটা একান্তই প্রয়োজনীয়। সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে গামলাবাহী দুটো লোকের সঙ্গে তাদের প্রায় ধাক্কাধাক্কি হবার যোগাড়; বুট খটখটিয়ে তারা দুজনই দৌড়ে নেমে আসছিল। পিয়ের ও আন্না মিখায়লভ্‌নাকে পথ করে দেবার জন্য লোক দুটি দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়াল; তাদের দুজনকে সেখানে দেখে একটুও অবাক হল না।

আন্না মিখায়লভ্‌না তাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করল, "এটা কি প্রিন্সেসদের ঘরে যাবার পথ?"

যেন এখন সবকিছুই চলতে পারে এমনি ভাব দেখিয়ে পরিচারকটি জোর গলায় বলল, "হ্যাঁ, বাঁদিকের দরজা ম্যা'ম।"

ল্যাণ্ডিং-এ পৌঁছে পিয়ের বলল, "কাউন্ট হয় তো আমাকে ডেকে পাঠান নি। আমি বরং আমার নিজের ঘরেই চলে যাই।"

আন্না মিখায়লভ্‌না তার উঠে আসার অপেক্ষায় একটু দাঁড়াল।

সেদিন বিকেলে ছেলের সঙ্গে কথা বলার সময় যেমনটি করেছিল সেই ভাবে পিয়েরের কাঁধে হাত রেখে মহিলা বলল, "দেখ বাবা, বিশ্বাস কর যে তোমার চাইতে আমার দুঃখটা কিছু কম নয়। কিন্তু মানুষের মত হও!"

চশমার উপর দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "কিন্তু সত্যি বলছি, আমার চলে যাওয়াই ভাল।"

"আহা, তোমার প্রতি যদি অন্যায় কিছু হয়েই থাকে সেটা ভুলে যাও। শুধু ভাব যে তিনি তোমার বাবা···হয় তো এখন তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগছেন।" মহিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "প্রথম থেকেই তোমাকে আমি ছেলের মত ভালবেসেছি। আমার উপর ভরসা রেখো পিয়ের। তোমার স্বার্থ আমি ভুলব না।"

পিয়ের একটা কথাও বুঝল না, কিন্তু এসব যে ঘটতে বাধ্য সেই ধারণা তার মনে দৃঢ়তর হল। বাধ্য ছেলের মত সে আন্না মিখায়লভ্‌নাকে অনুসরণ করল। মহিলা ততক্ষণে দরজাটা খুলে ফেলেছে।

দরজা দিয়ে একটা পিছনের ছোট ঘরে ঢোকা গেল। সেখানে এক কোণে বসে প্রিন্সেসের একটি বুড়ো চাকর মোজা বুনছিল। বাড়ির এ দিকটায় পিয়ের কখনও আসে নি, এ সব ঘরের অস্তিত্বের কথাও সে জানে না। ট্রের উপরে একটা ডিক্যাণ্টার নিয়ে একটি দাসী তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, তাকে আদর করে "সোনা," "মণি" বলে ডেকে আন্না মিখায়লভ্‌না প্রিন্সেসদের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিল; তারপর পিয়েরকে নিয়ে পাথরের দালান ধরে এগিয়ে চলল। বাঁদিকে প্রথম দরজাটা দিয়ে প্রিন্সেসদের মহলে যাবার পথ। ডিক্যাণ্টার হাতে দাসীটি তাড়াতাড়িতে দরজাটা বন্ধ করে যায় নি (সেই সময়ে বাড়িতে সব কিছুতেই একটা তাড়াহুড়া চলছে); পিয়ের ও আন্না মিখায়লভ্‌না যেতে যেতে পাশের সেই ঘরটার দিকেই চোখ ফেলল যেখানে প্রিন্স ভাসিলি ও বড় প্রিন্সেস ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা বলছিল। তাদের যেতে দেখে প্রিন্স ভাসিলি আচমকা সরে বসল। আর প্রিন্সেস লাফ দিয়ে উঠে বেপরোয়াভাবে গায়ের সব জোর দিয়ে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিল।

কাজটা প্রিন্সেসের স্বভাবের পক্ষে এতই বেমানান এবং প্রিন্স ভাসিলির মুখে যে ভয়ের ভাব খেলে গেল সেটাও তার মর্যাদার পক্ষে এতই খাপছাড়া যে পিয়ের থেমে গিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকাল। আন্না মিখায়লভ্‌না কোন রকম বিস্মিত হল না; ঈষৎ হেসে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল মাত্র; যেন বলতে চাইল যে এই রকম কিছুই সে আশা করেছিল।

পিয়েরের চাউনির উত্তরে সে বলল, "মানুষ হতে শেখ বাবা। তোমার স্বার্থ আমি দেখব।" সে আরও দ্রুত পা চালিয়ে দিল।

পিয়ের এসব কিছুই বুঝতে পারছে না; "তার স্বার্থ দেখা"র মানে কি তাও না; কিন্তু সে ধরে নিয়েছে যে যা হচ্ছে তাই হতে বাধ্য। দালান পার হয়ে কাউণ্টের অভ্যর্থনা-ঘরের পাশের একটা বড় স্বল্পালোকিত ঘরে তারা ঢুকল। এ ঘরটা পিয়েরের কাছে পরিচিত; কিন্তু এখানেও দেখা গেল একটা শূন্য স্নানের টব; কার্পেটের উপর জল ছড়িয়ে আছে। ধুনোচি হাতে একজন ডিয়েকন ও একটি চাকরের সঙ্গে তাদের দেখা হল। কিন্তু তাদের লক্ষ্য না করেই দুজন পা টিপে টিপে চলে গেল। তারা অভ্যর্থনা-ঘরে ঢুকল। এ ঘরটা পিয়েরের পরিচিত। দুটো বড় ইতালীয় জানালা সব্‌জি-ঘরের দিকে খোলা, বড় বড় আবক্ষ মূর্তি, আর ক্যাথারিণ দি গ্রেট-এর একটা পূর্ণাবয়ব প্রতিকৃতি। সেই একই সব লোক একই অবস্থায় বসে পরস্পর ফিস-ফিস করে কথা বলছে। সকলে চুপ করে চোখ তুলে তাকাল—তাদের সামনে বিবর্ণা অশ্রুমুখী আন্না মিখায়লভ্‌না আর মাথা নীচু করে ভীরু অনুসরণকারী পিয়েরের শক্ত-সমর্থ দেহ।

আন্না মিখায়লভ্‌নার মুখ দেখেই বোঝা গেল, চরম মুহূর্ত যে সমাগত সে বিষয়ে সে খুবই সচেতন। সে বুঝতে পারছে, যেহেতু এমন একজনকে সঙ্গে

নিয়ে সে এসেছে যার সঙ্গে মুমূর্ষু লোকটি দেখা করতে ইচ্ছুক, কাজেই নিজের প্রবেশ সম্পর্কে সে নিশ্চিত। ঘরের চারদিকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে কাউন্টের "স্বীকৃতি গ্রহণকারী"কে দেখতে পেয়ে সে সেই দিকে এগিয়ে গেল এবং প্রথমে তার ও পরে অপর একজন পুরোহিতের আশীর্বাদ গ্রহণ করল।

একজন পুরোহিতকে সে বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আপনি ঠিক সময়েই এসেছেন। আমরা আত্মীয়স্বজনরা এত উৎকণ্ঠায় কাটাচ্ছি।" আরও নরম গলায় বলল, "এই যুবকটি কাউন্টের ছেলে। কী ভয়ংকর মুহূর্ত!"

এই কথা বলেই সে ডাক্তারের কাছে গেল।

বলল, "প্রিয় ডাক্তার, এই যুবকটি কাউন্টের ছেলে। কোন আশা আছে কি?"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি উপরের দিকে চোখ তুলে নীরবে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। আন্না মিখায়লভ্না কাঁধ ও চোখের সেই একই ভঙ্গী করে একটা নিঃশ্বাস ফেলল; তারপর ডাক্তারের কাছ থেকে পিয়েরের কাছে সরে গেল। বিশেষ শ্রদ্ধায় ও মমতায় বিষণ্ণ গলায় তাকে বলল:

"তাঁর করুণায় বিশ্বাস রেখো!" একটা ছোট সোফা দেখিয়ে তাকে বসতে বলে মহিলা নীরবে দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। সকলেরই দৃষ্টি সেই দরজার দিকে। দরজায় ক্যাঁচ করে একটু শব্দ হল, মহিলা দরজার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিয়ের মনে মনে স্থির করল, তার অভিভাবিকার সব কথাই মেনে চলবে। তাই তার নির্দেশিত সোফাটার দিকে এগিয়ে গেল। আন্না মিখায়লভ্না চলে যাবার পরমুহূর্তেই সে লক্ষ্য করল, ঘরের সবগুলো চোখ তাকেই দেখছে; সে সব চোখে ফুটে উঠেছে কৌতূহল ও সহানুভূতির চাইতেও কিছু বেশী। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে সকলেই ফিসফিস করে কথা বলছে। সকলে তাকে এমন সম্মান দেখাচ্ছে যা সে এর আগে কখনও পায় নি। একটি বিচিত্র মহিলা আসন থেকে উঠে সেই আসনে তাকে বসতে বলল। পিয়েরের হাত থেকে একটা দস্তানা পড়ে যেতেই একজন এড্-ডি-কং এসে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে তার হাতে দিল। ডাক্তার নীরব শ্রদ্ধায় তাকে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াল। পিয়েরও নিঃশব্দে এড্-ডি-কং-এর হাত থেকে দস্তানাটা নিল, এবং হাঁটুর উপর হাত দুটো রেখে মিশরীয় মূর্তির মত মহিলার দেওয়া আসনেই বসল। মনে মনে স্থির করল, এ সবই ভবিতব্য, যা হবার তাই হচ্ছে, আর যাতে মাথাটা ঘুরে না যায় এবং বোকার মত কাজ করে না বসে সেই জন্য আজ রাতে সে নিজের ধারণামত কাজ করবে না, যারা তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের ইচ্ছার উপরেই নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেবে।

তারপর দুমিনিটও যায় নি এমন সময় প্রিন্স ভাসিলি রাজকীয় ভঙ্গীতে মাথা উঁচু করে ঘরে ঢুকল। বুকে তিনটে তারকা লাগানো লং-কোট পরনে।

সকালের তুলনায় অনেকটা শুকনো দেখাচ্ছে; চারদিকে তাকিয়ে সে যখন পিয়েরকে দেখতে পেল, তখন তার চোখ দুটো স্বাভাবিকের চাইতে বড় দেখাল। সে পিয়েরের কাছে এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরল (এ কাজ সে কখনও করে না), এবং হাতটা শক্ত কি না বুঝবার জন্য হাতটাকে নীচের দিকে টেনে নিল।

"সাহস, সাহস চাই বন্ধু! তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। খুব ভাল কথা!" সে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হল।

কিন্তু পিয়েরের মনে হল জিজ্ঞাসা করে: "···কেমন আছেন," কিন্তু ইতস্তত করল; মুমূর্ষু লোকটিকে "কাউণ্ট" বলা উচিত হবে কি না বুঝতে পারল না, আবার "বাবা" বলতেও লজ্জা করল।

"আধ ঘণ্টা আগে তার আর একটা আক্রমণ হয়েছে। সাহস বন্ধু, সাহস,···"

পিয়েরের মনটা এতই বিচলিত ছিল যে "আক্রমণ" কথাটা শুনে কিছুর আঘাতের কথাই তার মনে হল। বিব্রতভাবে সে প্রিন্স ভাসিলির দিকে তাকাল; তবে একটু পরেই সে বুঝতে পারল যে আক্রমণ মানে রোগের আক্রমণ। ভাসিলি যেতে যেতে লোরেনকে কি যেন বলে আঙুলে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। পা টিপে সে ভাল হাঁটতে পারে না, তাই প্রতিটি পদক্ষেপেই তার গোটা শরীরটা কাঁপতে লাগল। বড় প্রিন্সেস তাকে অনুসরণ করল; পুরোহিতরা, ডিয়েকনরা ও কিছু চাকরও দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজা দিয়ে ভিতরে কোন কিছু সরাবার একটা শব্দ শোনা গেল। আর শেষ পর্যন্ত আন্না মিথায়লভ্‌না মুখে কর্তব্য-পালনের সেই একই দৃঢ় ভঙ্গী নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল এবং পিয়েরের কাঁধে আস্তে হাত রেখে বলল:

"ঈশ্বরের করুণা অপরিসীম। 'তৈললেপন অনুষ্ঠান' শুরু হতে চলেছে। চল।"

নরম কার্পেটের উপর পা ফেলে পিয়ের দরজার কাছে গেল। সেই বিচিত্র মহিলা, এড্‌-ডি-কং ও কয়েকটি চাকরও তার পিছন পিছন এল। পিয়েরের মনে হল, সে ঘরে ঢুকতে এখন যেন আর অনুমতির কোন দরকারই নেই।

অধ্যায়—২৩

অনেকগুলি স্তম্ভ ও খিলানে বিভক্ত এবং দেয়ালে-দেয়ালে পারসিক কার্পেট ঝোলানো এই বড় ঘরটি পিয়েরের খুবই পরিচিত। স্তম্ভগুলির পিছনে ঘরের একটি অংশের একপাশে আছে সিল্কের মশারি-ঢাকা একখানি উঁচু মেহগনি খাট; অপর দিকে মস্ত বড় আলমারির উপর দেবমূর্তিগুলোর সামনে উজ্জ্বল

শিখায় লাল আলো জ্বলছে, রুশ গির্জায় সান্ধ্য উপাসনার সময় যেমনটি জ্বলে। আলোকোজ্জ্বল দেবমূর্তিগুলোর নীচে একটা লম্বা ইন্‌ভ্যালিড-চেয়ার পাতা রয়েছে, তাতে সদ্য বদলানো কয়েকটি বরফ-সাদা বালিশ। পিয়ের দেখল, ঝকঝকে সবুজ লেপে কোমর পর্যন্ত ঢেকে সেই চেয়ারে বসে আছে তার বাবা কাউণ্ট বেজুখভের পরিচিত সমুন্নত দেহ ; প্রশস্ত কপালের উপর পাকা চুলের রাশি সিংহের কেশরের কথা মনে করিয়ে দেয় ; সুদর্শন রক্তাভ মুখে অনেক বলীরেখার আল্পনা। মোটা হাত দুখানি লেপের বাইরে রেখে দেবমূর্তিগুলির ঠিক নীচে সে হেলান দিয়ে রয়েছে। তার ডান হাতের পাতায় তর্জনী ও বুদ্ধার মাঝখানে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রেখে একটি চাকর চেয়ারের পিছন থেকে ঝুঁকে মোমবাতিটিকে ঠিকমতভাবে ধরে আছে। পুরোহিতরা চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে ধীর গম্ভীরভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে। ছোট প্রিন্সেস দুটি পিছনে দাঁড়িয়ে রুমালে চোখ মুছছে, আর তাদের বড় বোন কাতিচে কুটিল, স্থির দৃষ্টিতে দেবমূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। মুখে একটি ভীরু, বিষণ্ণ, ক্ষমাসুন্দর ভাব ফুটিয়ে আন্না মিখায়লভ্‌না দরজাটার কাছে সেই বিচিত্র মহিলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্স ভাসিলি বাঁ হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে দরজার সামনে ইন্‌ভ্যালিড-চেয়ারটার কাছে একটা ভেলভেট-মোড়া চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর ডান হাতে যতবার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে ততবারই উপরের দিকে চোখ তুলে কপালটা স্পর্শ করছে। সারা মুখে ফুটে উঠেছে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের একটা বিনীত ভাব। যেন সে বলতে চাইছে, "এসব মনোভাব যদি তুমি বুঝতে পার তো তোমারই কপাল মন্দ !"

তার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে এড্‌-ডি-কং, ডাক্তার ও চাকররা ; গির্জার মতই এখানেও স্ত্রী ও পুরুষরা আলাদা-আলাদা দাঁড়িয়েছে। সকলেই নীরবে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকছে ; শুধু শোনা যাচ্ছে গির্জার অনুষ্ঠান, গম্ভীর অনুচ্চ প্রার্থনা, আর দীর্ঘশ্বাস ও পায়ের খস্‌খস্ শব্দ। আন্না মিখায়লভনা মেঝেটা পেরিয়ে পিয়েরের কাছে গিয়ে তার হাতে একটা মোমবাতি দিল। সেটাকে জ্বালিয়ে সেও মোমবাতি ধরা হাতেই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল।

গোলাপী গাল, হাসিখুশি ছোট প্রিন্সেস সোফি তার দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়েটি হেসে রুমালে মুখ ঢাকল ; কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পরে আবার মুখ তুলে পিয়েরকে দেখে হাসতে লাগল। সে যেন না হেসে তার দিকে তাকাতেই পারছে না, আবার না তাকিয়েও পারছে না : তাই লোভ সংবরণ করবার জন্য নিঃশব্দে একটা স্তম্ভের পাশে সরে গেল। অনুষ্ঠান চলার মাঝপথেই পুরোহিতদের গলা হঠাৎ থেমে গেল, নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল, আর যে বুড়ো চাকরটি কাউণ্টের হাত ধরে ছিল সে উঠে গিয়ে মহিলাদের কি যেন বলল। আন্না মিখায়লভ্‌না এগিয়ে গিয়ে মুমূর্ষু লোকটির উপরে ঝুঁকে পড়ে মুখ ফিরিয়ে

লোরেনকে ইসারায় ডাকল। ফরাসী ডাক্তারটির হাতে মোমবাতি নেই; একটা স্তম্ভের গায়ে হেলান দিয়ে সে সসম্ভ্রম দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন বোঝাতে চাইছে, বিদেশী হলেও এসব অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সে বোঝে এবং তা সমর্থনও করে। এবার সে নিঃশব্দে পা ফেলে রোগীর কাছে এগিয়ে গেল এবং সবুজ লেপের উপর থেকে খালি হাতটা তুলে ধবে তার নাড়িতে হাত রেখে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। রোগীকে কিছু পানীয় দেওয়া হল, সকলের মধ্যে একটা উত্তেজনা দেখা গেল; তারপরই সকলে যে যার জায়গায় চলে গেল; আবার অনুষ্ঠান শুরু হল। এই বিরতির সময় পিয়ের লক্ষ্য করল, প্রিন্স ভাসিলি চেয়ারটা ছেড়ে দিয়েও মুমূর্ষু লোকটির কাছে না গিয়ে তাকে পাশ কাটিয়ে বড় প্রিন্সেসকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের সেইদিকটায় চলে গেল যেখানে সিল্কের মশারিতে ঢাকা উঁচু খাটটা রয়েছে। বিছানার কাছ থেকে প্রিন্স ভাসিলি ও বড় প্রিন্সেস তুজনেই পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং অনুষ্ঠান শেষ হবার আগেই পর পর ঘরে ঢুকে নিজ নিজ জায়গায় দাঁড়াল। পিয়ের এই ঘটনাটির প্রতি অন্য সব ঘটনার চাইতে বেশী মনোযোগ দিল না; সে ধরেই নিয়েছে যে এখানে এই সন্ধ্যায় যা কিছু ঘটছে সবই একান্ত প্রয়োজনীয়।

পুরোহিতদের মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হল; তারা মুমূর্ষু লোকটির শুভ কামনা করল। সে মানুষটি কিন্তু পূর্ববৎই নির্জীব ও নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। চারপাশে সকলেই নড়াচড়া শুরু করল; পায়ের শব্দ ও ফিসফিস শব্দ শোনা গেল; সব চাইতে স্পষ্ট শোনা গেল আন্না মিখায়লভ্‌নার গলা।

পিয়ের তাকে বলতে শুনল:

"ওঁকে অবশ্যই বিছানায় নিয়ে যেতে হবে; এখানে তো অসম্ভব যে⋯"

ডাক্তার বা প্রিন্সেসরা, আর চাকররা রোগীকে এমনভাবে ঘিরে ধরেছে যে পিয়ের এখন আর তার রক্তিমাভ হলুদ মুখ ও সাদা চুল দেখতে পাচ্ছে না,—যদিও অন্য সব মুখের দিকে চোখ থাকলেও এতক্ষণ মুহূর্তের জন্য সে ঐ মুখটার উপর থেকে তার দৃষ্টিকে সরায় নি। সকলের সতর্ক চলাফেরা দেখেই সে বুঝে নিল যে তারা মুমূর্ষু লোকটিকে ইন্‌ভ্যালিড-চেয়ার থেকে তুলে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছে।

সে শুনতে পেল একটি চাকর সভয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল, "আমার হাতটা ধর, নইলে তুমি ওঁকে ফেলে দেবে!" "নীচ থেকে ধর, এখানে!" অনেকের গলা শোনা গেল। বাহকদের ঘন ঘন নিঃশ্বাস ও দ্রুততর পায়ের শব্দে বোঝা গেল, যাকে তারা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার ওজনটা তাদের পক্ষে বড় বেশী ভারী।

বাহকদের মধ্যে আন্না মিখায়লভ্‌নাও একজন; তাদের মাথা ও পিঠের ফাঁক দিয়ে মুহূর্তের জন্য মুমূর্ষু লোকটির উঁচু, মজবুত, খোলা বুক ও ঘাড় এবং কোঁকড়ানো সাদা চুলে ভরা সিংহসদৃশ মাথাটা পিয়েরের দৃষ্টিগোচর হল;

সেই মাথাটি, তার চওড়া ভুরু ও চোয়ালের হাড়, তার সুন্দর, আকর্ষণীয় মুখ, তার নিরুত্তাপ, বিষণ্ণ অথচ মহান ভঙ্গিমা—কোন কিছুর উপরেই আসন্ন মৃত্যুর ছায়া পড়ে নি। তিন মাস আগে কাউণ্ট যখন তাকে পিতার্সবুর্গে ডেকে পাঠিয়েছিল তখন পিয়ের তাকে যেমনটি দেখেছিল সব তেমনই আছে। কিন্তু এখন বাহকদের অসমান পদক্ষেপের ফলে মাথাটি অসহায়ভাবে এপাশ ওপাশ দুলছে; অর্থহীন দৃষ্টি যেন শূন্যে নিবদ্ধ হয়ে আছে।

উঁচু খাটটার পাশে কয়েক মিনিট হৈ-চৈ চলল; তারপরেই বাহকরা ঘর থেকে চলে গেল। পিয়েরের হাতটা ছুঁয়ে আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "এস।" তার সঙ্গে পিয়ের বিছানার কাছে গেল। সদ্যসমাপ্ত অনুষ্ঠানের উপযোগী রাজকীয় ভঙ্গীতে রোগীকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। বালিশ দিয়ে মাথাটাকে উঁচু করে রাখা হয়েছে। হাত দুখানিকে সমানভাবে সিল্কের সবুজ লেপটার উপর রেখে দেওয়া হয়েছে। পিয়ের যখন সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তখন কাউণ্ট সোজা তার দিকে তাকাল, কিন্তু সে দৃষ্টির ভাষা তো কোন মরণশীল মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। হয় সে দৃষ্টি একান্তই অর্থহীন, চোখ আছে বলেই কিছু না কিছু দেখা মাত্র, অথবা সে দৃষ্টি বড় বেশী অর্থবহ। কি করবে বুঝতে না পেরে সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে মহিলাটির দিকে তাকাল। আন্না মিখায়লভ্‌না তাড়াতাড়ি রোগীর হাতের দিকে তাকিয়ে এবং নিজের ঠোঁট নেড়ে ইসারায় তাকে বুঝিয়ে দিল যে চুমো খেতে হবে। পিয়ের সাবধানে এমনভাবে গলাটা বাড়াল যাতে লেপটাকে স্পর্শ করতে না হয়; তারপর মহিলার নির্দেশ মত কাউণ্টের চওড়া-হাড়, মাংসল হাতের উপর ঠোঁট চেপে ধরল। কি কাউণ্টের হাত, কি তার মুখের একটি পেশী—কিছুই এতটুকু কাঁপল না। এবার কি করতে হবে জানবার জন্য পিয়ের আবার আন্না মিখায়লভ্‌নার দিকে তাকাল। মহিলা চোখের ইসারায় বিছানার পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। পিয়ের অনুগতভাবে চেয়ারে বসে মহিলার দিকে তাকাল, যেন জানতে চাইল সে ঠিক কাজ করেছে কি না। আন্না মিখায়লভ্‌না সমর্থনসূচকভাবে ঘাড় নাড়ল। পিয়ের মিশরীয় প্রস্তর-মূর্তির মত চুপচাপ বসে রইল; যেন তার অগোছালো শক্ত শরীরটা ঘরের অনেকখানি জায়গা জুড়ে থাকায় সে বড়ই বিব্রত বোধ করছে এবং নিজেকে যথাসম্ভব ছোট করে রাখতে চেষ্টা করছে। আবার কাউণ্টের দিকে তাকাল। বসবার আগে পিয়েরের মুখটা যেখানে ছুঁয়ে ছিল এখনও সেই জায়গাটাতেই কাউণ্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ। পিতা-পুত্রের মিলনের এই শেষ মুহূর্তগুলির সকরুণ গুরুত্ব সম্পর্কে সে যে সম্পূর্ণ সচেতন আন্না মিখায়লভ্‌না হাবেভাবেই তা বুঝিয়ে দিল। এইভাবে দুমিনিট কাটল; পিয়েরের মনে হল যেন একটি ঘণ্টা। সহসা মুখের চওড়া পেশী ও রেখাগুলি কাঁপতে লাগল। কাঁপনটা বাড়তেই লাগল; সুন্দর মুখখানি একদিকে বেঁকে গেল (এই প্রথম পিয়ের বুঝতে পারল তার বাবা

মৃত্যুর কত কাছে এসে পড়েছে); আর সেই বিকৃত মুখের ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট, কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল। রুগ্ন লোকটি কি চাইছে বুঝবার জন্য আন্না মিখায়লভ্‌না সাগ্রহে তার চোখের দিকে তাকাল; প্রথমে পিয়েরকে দেখাল, তারপরে কিছু পানীয় দেখাল, ফিস্ ফিস্ করে প্রিন্স ভাসিলির নাম করল, লেপটা দেখাল। রোগীর চোখে-মুখে অধৈর্য ফুটে উঠল। খাটের মাথার দিকে যে চাকরটি সর্বক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, রোগী তার দিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

"পাশ ফিরে শুতে চাইছেন," বলে চাকরটি মনিবের ভারী দেহটাকে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে গেল।

তাকে সাহায্য করতে পিয়েরও উঠে গেল।

কাউণ্টকে পাশ ফিরিয়ে দেবার সময় তার একটা হাত এলিয়ে পড়ল; হাতটাকে টেনে তুলতে রোগী বৃথাই চেষ্টা করল। যে রকম আতংকিত দৃষ্টিতে পিয়ের সেই নির্জীব হাতটাকে দেখছিল সেটা লক্ষ্য করেই হোক, অথবা অন্য কোন চিন্তার প্রেরণাতেই হোক, রোগী একবার তার অশক্ত শিথিল হাতটার দিকে, আর একবার পিয়েরের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকাল; আবার সে তাকাল নিজের হাতের দিকে। তখনই তার দুর্বল মুখে একটা দুর্বল, করুণ হাসি খেলে গেল। সে হাসি তার গম্ভীর মুখে বেমানান; মনে হল সে বুঝি নিজের অসহায় অবস্থাকেই ব্যঙ্গ করছে। সে হাসি দেখে পিয়েরের বুকের ভিতরটা অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁপে উঠল, তার নাকটা সুড় সুড় করে উঠল, দুই চোখ জলে ঝাঁপসা হয়ে এল। রোগীকে দেয়ালের দিকে ফিরিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

একটি প্রিন্সেসকে ঘরে ঢুকতে দেখে আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "উনি ঝিমুচ্ছেন। এস আমরা চলে যাই।"

পিয়ের বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—২৪

প্রিন্স ভাসিলি ও বড় প্রিন্সেস ছাড়া অভ্যর্থনা-ঘরে আর কেউ নেই। মহীয়সী ক্যাথারিণের প্রতিকৃতির নীচে বসে তারা সাগ্রহে কথা বলছে। পিয়ের ও তার সঙ্গিনীকে দেখামাত্রই তারা চুপ করে গেল। পিয়েরের মনে হল, বড় প্রিন্সেস কি যেন লুকিয়ে ফেলল, ফিসফিস করে বলল, "ওই মেয়েটিকে আমি সহ্য করতে পারি না।"

প্রিন্স ভাসিলি আন্না মিখায়লভ্‌নাকে বলল, "কাতিচে ছোট বসার ঘরটাতে চায়ের ব্যবস্থা করেছে। সেখানে গিয়ে কিছু খেয়ে নিন আন্না

মিখায়লভ্‌না, নইলে যে ধকল সইতে পারবেন না।"

সে পিয়েরকে কিছু বলল না, শুধু কাঁধের নীচে তার হাতটাকে সহানুভূতির সঙ্গে একটু টিপে দিল। আন্না মিখায়লভ্‌নার সঙ্গে পিয়ের ছোট বসবার ঘরটাতে ঢুকল।

ছোট গোল ঘরটাতে একটা টেবিলে চা ও ঠাণ্ডা খাবার পরিবেশন করা হয়েছে। সেখান থেকে একটা হাতলবিহীন সুদৃশ্য চীনা পেয়ালায় চা নিয়ে লোরেন সোৎসাহে বলে উঠল, "একটি বিনিদ্র রাতের পরে সুস্বাদু রুশ চায়ের মত স্ফূর্তিকর আর কিছু নেই।" সেই রাতে যে সব অতিথি কাউণ্ট বেজুখভের বাড়িতে এসেছিল তারা সকলেই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সেই টেবিলে ভিড় করেছে। আয়না ও ছোট ছোট টেবিলে সাজানো এই ছোট গোল বসার ঘরটার কথা পিয়েরেব খুব ভালই মনে আছে। একটা ছোট টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম ও খাবারের ডিস এলোমেলোভাবে সাজানো রয়েছে। এই মাঝরাতেই একদল লোক সেখানে বসে আছে; ফূর্তি করছে না; গম্ভীরভাবে ফিসফিস করে কথা বলছে; কিন্তু তাদের প্রতিটি কথায়, প্রতিটি ভঙ্গীতেই বোঝা যাচ্ছে যে এখানে কি ঘটছে এবং শোবার ঘরে কি ঘটতে চলেছে সে কথা তারা মোটেই ভুলে যায় নি। খাবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলেও পিয়ের কিছুই খেল না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার অভিভাবিকার দিকে তাকাতে লাগল। সে দেখল, যে অভ্যর্থনা-ঘরে তারা প্রিন্স ভাসিলি ও বড় প্রিন্সেসকে রেখে চলে এসেছে মহিলাটি পা টিপে টিপে সেই ঘরের দিকেই চলেছে। পিয়ের ধরে নিল যে এটাও অবশ্য প্রয়োজনীয়; একটু পরে সেও সেই দিকেই গেল। আন্না মিখায়লভ্‌না বড প্রিন্সেসের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, দুজনই ফিসফিস করে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে।

বড় প্রিন্সেস যে রকম উত্তেজিতভাবে দরজাটাকে সশব্দে বন্ধ করে দিয়েছিল ঠিক সেই রকম উত্তেজনার সঙ্গেই সে বলে উঠল, "কোন্‌টা দরকারী আর কোন্‌টা দরকারী নয় সেটা আমিই ভাল বুঝি প্রিন্সেস।"

শোবার ঘরে যাবার দরজাটা আটকে বড় প্রিন্সেসকে সেখানে যেতে না দিয়ে আন্না মিখায়লভ্‌না সরাসরি জবাব দিল, "কিন্তু প্রিয় প্রিন্সেস, এটা কি খুবই বাডাবাড়ি হবে না? এই মুহূর্তে ওঁর যে বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন। তার আত্মা যখন প্রস্তুত হয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে এই সব পার্থিব আলোচনা…।"

অভ্যস্ত ভঙ্গীতে এক পায়ের উপব আর এক পা তুলে প্রিন্স ভাসিলি একটা আরাম কেদারায় বসে ছিল। তার ভারী গাল দুটো ভীষণভাবে কুঁচকে যাচ্ছে; কিন্তু সে এমন একটা ভাব দেখাচ্ছে যেন এই দুটি মহিলার কথাবার্তার ব্যাপারে তার কোন মাথাব্যথাই নেই।

"দেখুন আন্না মিখায়লভ্‌না, কাতিচে যা করতে চায় তাই করতে দিন। কাউণ্ট যে ওকে কত ভালবাসেন তা তো আপনি জানেন।"

হাতের কারুকার্যকরা পোর্টফোলিওটা প্রিন্স ভাসিলিকে দেখিয়ে বড় প্রিন্সেস বলল, "এই কাগজে কি আছে তাও আমি জানি না। আমি শুধু এইটুকুই জানি যে তার আসল উইলটা রয়েছে লেখার টেবিলে; এ কাগজের কথা তিনি ভুলেই গেছেন।..."

সে আন্না মিখায়লভ্‌নাকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু মহিলাটি একলাফে এগিয়ে এসে তার পথ আটকে দিল।

সে যে সহজে ছেড়ে দেবে না এমনি ভাব দেখিয়ে পোর্টফোলিওটা শক্ত করে চেপে ধরে আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "আমি সব জানি গো দয়ালু প্রিন্সেস। তোমাকে মিনতি করছি, তার প্রতি একটু করুণা কর।"

প্রিন্সেস জবাব দিল না। পোর্টফোলিও নিয়ে টানাটানি ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছে না, তবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে বড় প্রিন্সেস যদি কথা বলে তাহলে সে কথাগুলি আন্না পাভলভ্‌নার পক্ষে শ্রুতিসুখকর হবে না। কিন্তু মহিলাটির কথায় মিষ্টতা ও দৃঢ়তা কোনটারই অভাব নেই।

"পিয়ের, এখানে এস বাবা। এই পারিবারিক পরামর্শের ব্যাপারে ওর যোগদান অবান্তর হবে না বলেই আমি মনে করি; তাই নয় কি প্রিন্স?"

"তুমি কথা বলছ না কেন দাদা?" প্রিন্সেস হঠাৎ এত জোরে চীৎকার করে উঠল যে আশপাশের সকলেই চমকে উঠল। "ঈশ্বর জানেন কে ওকে নাক গলাবার অনুমতি দিয়েছে? একটি মুমূর্ষু মানুষের একেবারে দোরগোড়ায় এরকম গণ্ডগোল পাকাতে কে বলেছে? তুমি চুপ করে আছ কেন?" সর্বশক্তি দিয়ে পোর্টফোলিওটাকে টেনে ধরে সে হিস্‌হিস্‌ করে উঠল, "ষড়যন্ত্রকারিণী!"

কিন্তু আন্না মিখায়লভ্‌না পোর্টফোলিওটাকে দখলে রাখতে এক পা কি দু' পা এগিয়ে হাতটা বদলে নিল।

প্রিন্স ভাসিলি উঠে দাঁড়াল। তিরস্কার ও বিস্ময়ের সুরে বলল, "আঃ! এতো অসহ্য। ছেড়ে দাও বলছি।"

প্রিন্সেস ছেড়ে দিল।

"আপনিও ছেড়ে দিন।"

কিন্তু আন্না মিখায়লভ্‌না তার কথা শুনল না।

"ছেড়ে দিন বলছি! আমি দায়িত্ব নিচ্ছি। আমি নিজে গিয়ে তাকে বলব। আমি! তাহলে আপনি খুশি হবেন তো?"

আন্না মিখায়লভ্‌না বলল, "কিন্তু প্রিন্স, এ রকম একটা পবিত্র অনুষ্ঠানের পরে তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দিন! এই যে পিয়ের, তোমার মতামতটা এদের জানিয়ে দাও।" পিয়ের ততক্ষণে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রিন্স ভাসিলি কঠোর গলায় বলল, "মনে রাখবেন যে এর ফলাফলের

জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে। আপনি কি করছেন তা নিজেই জানেন না।"

আচমকা একলাফে আন্না মিখায়লভ্‌না উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পোর্টফোলিওটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বড় প্রিন্সেস চীৎকার করে বলল, "নীচ মেয়েছেলে!"

প্রিন্স ভাসিলি মাথা নীচু করে দুই হাত ছড়িয়ে দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেই ভয়ংকর দরজাটা—যে দরজার উপর পিয়েরে এতক্ষণ নজর রেখেছিল, যে দরজা এতক্ষণ নিঃশব্দে খুলছিল—এবার সেটা সশব্দে খুলে গিয়ে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল, আর মেজ প্রিন্সেস হাত মোচড়াতে মোচড়াতে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

তীব্রভাবে চীৎকার করে বলল, "তোমরা করছ কি! তিনি মরতে বসেছেন, আর তোমরা আমাকে একা তার কাছে রেখে এসেছ!"

বড় বোন পোর্টফোলিওটা ফেলে দিল। আন্না মিখায়লভ্‌না নীচু হয়ে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে ছুটে গিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বড় প্রিন্সেস ও প্রিন্স ভাসিলিও তার পিছনে ছুটল। কয়েক মিনিট পরে বিবর্ণ, কঠিন মুখে নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে বড় প্রিন্সেস বেরিয়ে এল। পিয়েরকে দেখতে পেয়ে তার মুখে ফুটে উঠল অদম্য ঘৃণা।

বলল, "হ্যাঁ, এবার তুমি খুশি হবে! এর জন্যই তো তুমি অপেক্ষা করে ছিলে!" হঠাৎ কেঁদে উঠে রুমালে মুখ ঢেকে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপরেই ঢুকল প্রিন্স ভাসিলি। যে সোফায় পিয়ের বসেছিল টলতে টলতে সেখানে গিয়ে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সে সেখানে ধপ্‌ করে বসে পড়ল। পিয়ের দেখল, তার মুখটা কালো হয়ে গেছে; তীব্র যন্ত্রণায় তার চোয়াল থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।

পিয়েরের কনুইটা ধরে সে বলল, "হায় বন্ধু আমার!" এখন তার গলায় এমন একটা আন্তরিকতা ও দুর্বলতার স্বর ফুটে উঠেছে যা এর আগে পিয়ের কখনও শোনে নি। প্রিন্স ভাসিলি বলতে লাগল, "আমরা কত পাপ করি, কত লোককে ঠকাই, কিন্তু কিসের জন্য? আমার বয়স প্রায় ষাট হল বন্ধু… আমিও…মৃত্যুতে সবই তো শেষ হয়ে যাবে, সব! মৃত্যু ভয়াবহ…" বলেই সে কেঁদে উঠল।

সব শেষে বেরিয়ে এল আন্না মিখায়লভ্‌না। ধীর, শান্ত পা ফেলে সে পিয়েরের কাছে এগিয়ে গেল।

ডাকল, "পিয়ের!"

পিয়ের সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল। মহিলাটি তার কপালে চুমো খেল; তাকে চোখের জলে ভিজিয়ে দিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, "তিনি ইহজগতে নেই…"

চশমার উপর দিয়ে পিয়ের তার দিকে তাকাল।

"চল। আমি তোমার সঙ্গে যাব। কাঁদতে চেষ্টা কর। চোখের জলের মত সান্ত্বনা আর কিছুই দিতে পারে না।"

মহিলাটি তাকে অন্ধকার বসবার ঘরে নিয়ে গেল। কেউ তার মুখ দেখতে পাচ্ছে না ভেবে পিয়ের খুশি হল। তাকে রেখে আন্না মিখায়লভ্‌না চলে গেল। ফিরে এসে দেখল হাতের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে আন্না মিখায়লভ্‌না পিয়েরকে বলল:

"হ্যাঁ বাবা, এটা আমাদের সকলেরই এক বিরাট ক্ষতি; তোমার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু ঈশ্বর তোমার সহায় হবেন: তুমি যুবক, আর আমি আশা করি তুমি এখন প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী। উইলটা এখনও খোলা হয় নি। তোমাকে আমি ভাল করেই চিনি, তাই নিশ্চিত আশা রাখি যে সম্পত্তি তোমার মাথা ঘুরিয়ে দেবে না; কিন্তু এই সম্পত্তি তোমার উপর অনেক কর্তব্যের ভার চাপিয়েছে; তোমাকে মানুষ হতে হবে।"

পিয়ের নীরব।

"হয় তো পরে তোমাকে বলব বাবা যে আমি সেখানে না থাকলে কি যে ঘটত তা শুধু ঈশ্বরই জানেন! তুমি জান, গতকালের আগের দিনই তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, বরিসকে ভুলবেন না। কিন্তু তিনি তো সময় পেলেন না। আশা করি, তোমার বাবার ইচ্ছা তুমি পুরণ করবে।"

পিয়ের এসব কিছুই বুঝল না; লজ্জায় লাল হয়ে সে নিঃশব্দে প্রিন্সেস আন্না মিখায়লভ্‌নার দিকে তাকাল। পিয়েরের সঙ্গে কথা বলে আন্না মিখায়লভ্‌না রস্তভদের বাড়িতে ফিরে গিয়ে ঘুমতে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে রস্তভ পরিবারকে এবং অন্য পরিচিত লোকদের কাউন্ট বেজুখভের মৃত্যুর বিবরণ বিস্তারিতভাবে শোনাল। বলল, কাউন্ট যে ভাবে মারা গেছে সে-মৃত্যু তার নিজেরও কাম্য; তার পরিণতি শুধু মর্মস্পর্শী নয়, মহান। আর পিতা-পুত্রের শেষ সাক্ষাৎ, সেটি এতই মর্মস্পর্শী যে সে কথা ভাবলেই তার চোখে জল আসে; সেই ভয়ংকর মুহূর্তগুলিতে কার ব্যবহার যে বেশী ভাল হয়েছিল তা সে জানে না—যে পিতা শেষ মুহূর্তেও সব জিনিস ও সব মানুষকে স্মরণে রেখেছিল এবং ছেলেকে এত সব করুণ কথা বলেছিল, সে—না কি পিয়ের যে দুঃখে এতদূর ভেঙে পড়েছিল যে তাকে দেখেও কষ্ট হচ্ছিল, অথচ মুমূর্ষু বাবাকে কষ্ট না দেবার জন্য সে দুঃখকে সে প্রাণপণে চেপে রেখেছিল। "মৃত্যু বেদনাদায়ক, তবু সে মানুষের কল্যাণ করে। বৃদ্ধ কাউন্ট ও তার উপযুক্ত ছেলের মত মানুষকে দেখিয়ে মৃত্যু আমাদের মনকে উন্নত করে," মহিলাটি বলল। বড় প্রিন্সেস ও প্রিন্স ভাসিলির ব্যবহারকে সে সমর্থন করল না, কিন্তু তাদের কথা সে বলল ফিসফিস করে অত্যন্ত গোপন কথার মত।

অধ্যায়—২৫

প্রিন্স নিকলাস আন্দ্রীভিচ বল্‌কন্‌স্কির জমিদারী "বল্ড হিল্‌স্‌"-এ তরুণ প্রিন্স আন্দ্রু ও স্ত্রীর আগমন প্রতিদিনই আশা করা হচ্ছিল, কিন্তু সেই আশার ফলে বৃদ্ধ প্রিন্সের গৃহস্থালীর নিয়মিত কার্য-সূচীর কোন রকম পরিবর্তন ঘটে নি। সম্রাট পল যেদিন তাকে তার গ্রামের জমিদারীতে নির্বাসিত করেছিল সেদিন থেকেই প্রধান সেনাপতি প্রিন্স নিকলাস আন্দ্রীভিচ (সমাজে তার ডাক নাম "প্রাশিয়ার রাজা") মেয়ে প্রিন্সেস মারি ও তার সখী মাদময়জেল বুরিয়ে-কে নিয়ে সেখানেই একটানা বাস করে চলেছে। যদিও নতুন শাসন-ব্যবস্থায় সে ইচ্ছা করলেই রাজধানীতে ফিরে যেতে পারে, তবু সে এখনও গ্রামেই বাস করছে। তার বক্তব্য: কেউ যদি তার সঙ্গে দেখা করতে চায় তা হলে সে তো একশ' মাইল পেরিয়ে মস্কো থেকে বল্ড হিল্‌স্‌-এই আসতে পারে; তার নিজের কাউকেই দরকার নেই, কোন জিনিসেরও দরকার নেই। সে বলে, মানুষের পাপের উৎস দুটি—আলস্য আর কুসংস্কার, আবার সৎগুণও দুটি—কর্ম ও বুদ্ধি। মেয়ের শিক্ষার ভার সে নিজেই নিয়েছে; তার অন্তরে এই দুটি প্রধান গুণকে গড়ে তোলার জন্য তার বিশ বছর বয়স পর্যন্ত প্রিন্স তাকে বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা দিয়েছে এবং এমনভাবে মেয়ের জীবনকে গড়ে তুলেছে যাতে সে সব সময়ই কর্মব্যস্ত থাকতে পারে। প্রিন্স নিজেও সব সময়ই কর্মব্যস্ত: স্মৃতি-কথা লেখা, উচ্চতর গণিতের সমস্যাসমূহের মীমাংসা, যন্ত্রের সাহায্যে নস্যি-দান প্রস্তুত, বাগানে কাজ, আর জমিদারীতে সর্বদাই যে সব বাড়ি তৈরি করা হয় তার তদারকি। যেহেতু নিয়মানুবর্তিতাই কর্ম-সাধনের প্রধান শর্ত, তাই তার গৃহস্থালিতে নিয়মানুবর্তিতাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা হয়ে থাকে। ঠিক একই অবস্থায় সে সব সময় টেবিলে এসে বসে; শুধু একই ঘণ্টায় নয়, একই মিনিট গুণে। মেয়ে থেকে আরম্ভ করে ভূমিদাস পর্যন্ত যারা তাকে ঘিরে থাকে তাদের প্রতি সে বড়ই কঠোর ও অনমনীয়। তাদের প্রতি কঠোর-হৃদয় না হয়েও সে তাদের মনে যুগপৎ ভয় ও শ্রদ্ধা জাগাতে সক্ষম হয়েছে। যদিও এখন সে অবসর জীবন যাপন করছে এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে তার কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, তথাপি তার জমিদারীর অঞ্চলে নিযুক্ত যে কোন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীই তার সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করাটাকে তাদের কর্তব্য বলে মনে করে, এবং পূর্ব-নির্ধারিত যথা সময়ে প্রিন্স স্বয়ং উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত স্থপতি, মালী, অথবা প্রিন্সেস মারির মতই মস্ত বড় দরবার-কক্ষে অপেক্ষা করে থাকে। পড়ার ঘরের অত্যন্ত উঁচু দরজাটা খুলে একটি বৃদ্ধ মানুষের ছোটখাট মূর্তি যখন পাউডার-মাখা পরচুলা, ছোট দুখানি শীর্ণ হাত, ও ঘন পাকা ভুরু নিয়ে হাজির হয়, এবং সেই ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে তার তীক্ষ্ণ, যুবকোচিত উজ্জ্বল চোখের ঝলকানিকে কখনও কখনও ঢেকে

দেয়, তখন সেই দরবার-কক্ষে সমাসীন প্রতিটি মানুষের মনেই সেই একই শ্রদ্ধা, এমন কি ভীতির সঞ্চার হয়।

নবদম্পতির যেদিন আসার কথা সেদিন সকালে প্রিন্সেস মারি ঢুক্ ঢুক্ বুকে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নীরবে প্রার্থনা করতে করতে যথারীতি নির্ধারিত সময়ে প্রাতঃকালীন সাক্ষাৎকারের জন্য দরবার-ঘরে ঢুকল। প্রতিদিন সকালেই সে এইভাবে আসে এবং প্রতিদিন সকালেই প্রার্থনা জানায় যাতে সাক্ষাৎকার-পর্বটি ভালভাবে সমাধা হয়।

যে বুড়ো চাকরটি সেখানে বসেছিল সে উঠে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "দয়া করে ভিতরে আসুন।"

একটা লেদ-যন্ত্রের গুনগুন শব্দ দরজা দিয়ে ভেসে আসছে। প্রিন্সেস ভয়ে ভয়ে দরজাটা খুলল। একটু থামল। প্রিন্স লেদ-এ বসে কাজ করছিল; একবার চারদিক দেখে নিয়ে আবার কাজ করতে লাগল।

ঘরটা নানা জিনিসপত্রে ঠাসা। সবগুলিই সব সময় ব্যবহার করা হয়। বড় টেবিলটায় বই ও নক্সা ছড়ানো, চাবিশুদ্ধ কাঁচ-লাগানো উঁচু বুক-কেস, দাঁড়িয়ে লেখার জন্য উঁচু ডেস্কটায় একখানা খাতা খোলা পড়ে আছে, যন্ত্রপাতিসহ একটা লেদ-যন্ত্র, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম—সব কিছুতেই নানাবিধ অবিশ্রাম ও সুশৃংখল কাজকর্মের চিহ্ন পরিস্ফুট। রূপোর কাজ-করা তাতার বুট-পরা ছোট পায়ের কর্ম-চাঞ্চল্য এবং পেশীবহুল সরু হাতের দৃঢ় চাপ দেখলেই বোঝা যায় এই বৃদ্ধ বয়সেও প্রিন্স তার কাজের ধৈর্য ও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রেখেছে। লেদটাকে আরও কয়েক পাক ঘুরিয়ে সে লেদের পা-দান থেকে পাটা তুলে নিল, বাটালিটাকে মুছে চামড়ার থলেটার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, তারপর টেবিলের দিকে পা বাড়িয়ে মেয়েকে ডাকল। সে কখনও ছেলে-মেয়েদের আশীর্বাদ করে না; শুধু দাড়িসমেত গালটা (এখনও দাড়ি কামানো হয় নি) এগিয়ে দিয়ে সস্নেহে তার দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল:

"ভাল আছ তো? ঠিক আছে, তাহলে বস।" নিজের লেখা জ্যামিতির পাঠের অনুশীলন-খাতাটা হাতে নিয়ে প্রিন্স পা দিয়ে একটা চেয়ার টেনে নিল।

তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠাটা বের করে শক্ত নখ দিয়ে এক প্যারাগ্রাফ থেকে অন্য প্যারাগ্রাফ পর্যন্ত দাগ টেনে বলল, "কালকের জন্য!"

প্রিন্সেস টেবিলের উপরে অনুশীলন-খাতার উপর ঝুঁকে বসল।

"একটু দাঁড়াও, তোমার একটা চিঠি আছে," হঠাৎ টেবিলের উপর দিকে ঝোলানো থলে থেকে মেয়েলি হাতে ঠিকানা লেখা একটা চিঠি বের করে প্রিন্স বলল।

চিঠিটা দেখেই প্রিন্সেসের গালে লালের ছোপ লাগল। তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে তাতে মুখ গুঁজল।

"হেলোস-এর চিঠি?" প্রিন্স হেসে জিজ্ঞাসা করল; তার শক্ত, হলদে

দাঁতগুলো দেখা গেল।

ভীরু চোখে তাকিয়ে ভীরু হাসি হেসে প্রিন্সেস বলল, "হ্যাঁ, জুলির চিঠি।"

প্রিন্স কড়া গলায় বলল, "আরও দুটো চিঠি আমি ছেড়ে দেব, কিন্তু তৃতীয়টা আমি পড়ব। আমার ভয় হচ্ছে যে তোমরা অনেক বাজে কথা লেখ। তৃতীয় চিঠিটা আমি পড়বই।"

"ইচ্ছা করলে এটাও পড়তে পার বাবা," আরও লাল হয়ে প্রিন্সেস চিঠিটা বাড়িয়ে ধরল।

চিঠিটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে প্রিন্স হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "তৃতীয়টা, বললাম না যে তৃতীয়টা পড়ব!" তারপর টেবিলের উপর কনুই রেখে জ্যামিতির নক্সা-আঁকা অনুশীলন-খাতাটা সামনে টেনে নিল।

মেয়ের খুব কাছাকাছি খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে তার চেয়ারের পিছনে হাত রেখে প্রিন্স বলল, "তাহলে মাদাম"; অনেক দিনের পরিচিত বার্ধক্যের ও তামাকের কটুগন্ধ যেন মেয়েকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। "দেখ মাদাম, এই ত্রিভুজগুলো সমান; খেয়াল রাখ যে ত্রিভুজ ক খ গ···"

প্রিন্সেস ভয়ে ভয়ে বাবার চকচকে চোখের দিকে তাকাল; তার মুখের লাল আভা একবার ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়; স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে কিছুই বুঝতে পারছে না; সে এতই ভয় পেয়েছে যে তার বাবা যত ভাল করেই বোঝাক না কেন এই ভয়ের জন্যই সে কিছুই বুঝতে পারবে না। দোষটা শিক্ষকের কি ছাত্রীর কে জানে, আসলে প্রতিদিন এই একই ব্যাপার চলে: প্রিন্সেসের চোখ ঝাঁপসা হয়ে আসে, সে কিছুই দেখতে পায় না, শুনতে পায় না; শুধু বোঝে যে বাবার কঠিন শুকনো মুখটা তার পাশেই আছে, তার নিঃশ্বাস ও গন্ধ সে পাচ্ছে; আর শুধু ভাবে কতক্ষণে নিজের ঘরে গিয়ে শান্তিতে পড়াটা করতে পারবে। বুড়ো মানুষটি চটে যায়, চেয়ারটাকে একবার সামনে, একবার পিছনে ঠেলে, যাতে চটে না যায় সে জন্য নিজেকে সংযত রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু সব সময়ই চটে যায়, বকাঝকা করে, কখনও কখনও খাতাপত্রও ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

প্রিন্সেস একটা ভুল জবাব দিল।

"এই দেখ, কী বোকা মেয়েরে!" প্রিন্স চেঁচিয়ে উঠল; খাতাটাকে ঠেলে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল, চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু পায়চারি করল; তার পরেই আস্তে করে মেয়ের চুলে হাত বুলিয়ে আবার বসে পড়ল।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে আবার বোঝাতে বসল।

প্রিন্সেস মারি যখন খাতাটা নিয়ে সেটাকে বন্ধ করে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল তখন প্রিন্স বলে উঠল, "তা চলবে না প্রিন্সেস, তা চলবে না। গণিতটাই হচ্ছে আসল মাদাম! আমি চাই না যে তুমিও ঐ সব বোকা

মহিলাদের মত হয়ে থাক। অভ্যাস কর, দেখবে তাহলেই সব বুঝতে পারবে।" মেয়ের গালে হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, "গণিত তোমার মাথার ভিতর থেকে সব জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বার করে দেবে।"

মেয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই প্রিন্স ইসারায় তাকে থামতে বলে উঁচু ডেস্ক থেকে একটা আনকোরা নতুন বই নামাল।

"এই 'রহস্যের চাবিকাঠি' বই খানা তোমার হেলোস তোমার জন্য পাঠিয়েছে। ধর্মপুস্তক! কারও ধর্মবিশ্বাসে আমি হাত দেই না।···বইটা আমি দেখেছি। এটা নাও। আচ্ছা, এবার যাও। যাও।"

মেয়ের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে প্রিন্স নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

ভীত, বিষণ্ণ মুখে প্রিন্সেস মারি তার ঘরে ফিরে গেল। এ অবস্থা তার প্রায় সব সময়ই হয়। তার সাদা রোগাটে মুখটা আরও সাদা হয়ে গেছে। লেখার টেবিলে বসল। টেবিলে অনেক ছোট প্রতিকৃতি। বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। বাবা যেমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মেয়ে তেমনি অগোছালো। জ্যামিতির খাতা রেখে সাগ্রহে সে চিঠির সিল ভেঙে ফেলল। তার ছেলেবেলা থেকে সব চাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু জুলির চিঠি। রস্তভ-পরিবারের নামকরণ অনুষ্ঠানে যে জুলি কারাগিন উপস্থিত ছিল এ সেই।

জুলি ফরাসীতে লিখেছে:

"প্রিয় সোনা বন্ধু, বিরহ কি ভয়ংকর, ভয়াবহ! যদিও নিজেকে বলি, আমার অর্ধেক জীবন ও অর্ধেক সুখ তোমাকেই জড়িয়ে আছে, আমাদের মাঝখানে যত দূরত্বই থাকুক, আমাদের দুটি হৃদয় অচ্ছেদ্য বন্ধনে এক সাথে বাঁধা, তবু আমার মন ভাগ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, চারদিকের এত সুখ ও আমোদের মধ্যেও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার পর থেকে যে গোপন দুঃখ আমার মনে বাসা বেঁধেছে তাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। গত গ্রীষ্মকালে তোমার বড় পড়ার ঘরটিতে, নীল সোফার উপরে, সেই গোপন সোফার উপরে, আমরা যে ভাবে মিলিত হয়েছিলাম, সেই ভাবে আবার কেন মিলিত হতে পারছি না? তোমার যে শান্ত, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে আমি এত ভালবাসি, লিখতে বসে এখনও সে দৃষ্টি আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, তিন মাস আগের মত এখনও কেন আমি সেই দৃষ্টি থেকে নতুন করে নৈতিক শক্তি সংগ্রহ করতে পারছি না?"

এই পর্যন্ত পড়ে প্রিন্সেস মারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডান দিককার আয়নাটার দিকে তাকাল। একটি দুর্বল, সাধারণ দেহ ও পাতলা মুখের ছায়া পড়েছে সেখানে। তার বিষণ্ণ চোখ দুটি যেন একান্ত হতাশভাবে আয়নার সেই প্রতিবিম্বের দিকে তাকাল। "ও আমাকে স্তোকবাক্য শোনাচ্ছে," এই কথা ভেবে মুখ ফিরিয়ে সে আবার পড়তে শুরু করল। জুলি কিন্তু বন্ধুকে স্তোকবাক্য বলে নি: প্রিন্সেসের বড় বড়, গভীর, উজ্জ্বল চোখ দুটি এতই সুন্দর যে

তার ফলে তার সাদামাঠা মুখখানিও অন্য যে কোন সুন্দরীর মুখের চাইতে অধিক আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতে তার চোখে যে সুন্দর ভাবটি ফুটে ওঠে প্রিন্সেস নিজে তো কখনও তা দেখতে পায় না। অন্য সকলের মতই আয়নার দিকে তাকাতে গেলেই তার মুখে জোর করে টেনে আনা একটা অস্বাভাবিক ভঙ্গী ফুটে ওঠে। সে পড়তে লাগল :

"সারা মস্কো জুড়ে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কথা নেই। আমার দুই ভাইয়ের একজন ইতিমধ্যেই চলে গেছে, আর একজন রক্ষীবাহিনীতে আছে, শীঘ্রই তারাও সীমান্তের পথে পা বাড়াবে। আমাদের প্রিয় সম্রাট পিতার্সবুর্গ ছেড়ে চলে গেছেন; সকলেরই ধারণা, বহুমূল্য জীবন নিয়ে তিনিও রণক্ষেত্রে দর্শন দেবেন। ঈশ্বর করুন, সর্বশক্তিমান কৃপা করে যে দেবদূতকে আমাদের সম্রাট করে পাঠিয়েছেন তার হাতে যেন ইওরোপের শান্তি ধ্বংসকারী কর্সিকার রাক্ষসটি পর্যুদস্ত হয়! ভাইদের কথা তো বলাই বাহুল্য, এই যুদ্ধ আমার অন্তরের একজন নিকটতম সাথীর সঙ্গ থেকেও আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমি তরুণ নিকলাস রস্তভ-এর কথা বলছি। অন্তরের উৎসাহ তাকে কর্মহীন থাকতে দেয় নি; বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিয়ে সে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ায় আমি প্রচণ্ড কষ্ট পেয়েছি। গত গ্রীষ্মকালে এই যুবকটির কথা তোমাকে আমি বলেছি; সে এতই মহৎ-হৃদয়, সত্যিকারের যৌবনদীপ্তিতে তার মন এতই ভরপুর যে আজকালকার বিশ বছরের বুড়োদের মধ্যে তা কদাচিৎ দেখা যায়। তাছাড়া, সে এত দিলখোলা, এত হৃদয়বান যে কি বলব। সে এত পবিত্র ও কাব্যময় যে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব অল্প দিনের হলেও সেই সম্পর্কের স্মৃতি আমার দীন অন্তরের এক মধুরতম সান্ত্বনার স্থল। আমাদের বিদায়ের কথা, অন্য যে সব কথা তখন হয়েছিল, সব একদিন তোমাকে বলব। সে স্মৃতি এখনও এত তাজা যে বলবার মত নয়। আহা প্রিয় বন্ধু, তুমি কী সুখী যে এই তীব্র আনন্দ ও দুঃখের কথা তোমাকে জানতে হয় নি। তুমি ভাগ্যবতী, কারণ এ সব ক্ষেত্রে দুঃখের মাত্রাটাই বড় বেশী হয়ে থাকে! আমি ভাল করেই জানি যে কাউণ্ট নিকলাস বয়সে এতই তরুণ যে তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অধিক কোন সম্পর্ক আমার হয় নি; কিন্তু এই মধুর বন্ধুত্ব, এই কাব্যময় পবিত্র ঘনিষ্টতা—এর যে আমার বড়ই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এ কথা আর নয়! যে প্রধান সংবাদটি এখন সারা মস্কোর মুখে মুখে ফিরছে সেটি হল বুড়ো কাউণ্ট বেজুখভের মৃত্যু ও তার সম্পত্তির উত্তরাধিকার। ভাবতে পার! তিন প্রিন্সেস পেয়েছে যৎসামান্য, প্রিন্স ভাসিলি কিছুই পায় নি, আর মঁসিয় পিয়ের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তো হয়েছেই, তার উপরে সে বৈধ সন্তান হিসাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে; ফলে সেই এখন কাউণ্ট বেজুখভ এবং রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির মালিক। গুজব যে এ ব্যাপারে প্রিন্স ভাসিলি একটি ঘৃণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন, আর হতাশ হয়ে পিতার্সবুর্গে ফিরে গেছেন।

"স্বীকার করছি, এই সব উইল ও উত্তরাধিকারের ব্যাপার-স্যাপার আমি সামান্যই বুঝি; কিন্তু এটা ভালই জানি, যে যুবকটিকে আমরা এতদিন সাদামাঠা মঁসিয় পিয়ের বলেই জানতাম সে আজ কাউণ্ট বেজুখভ হওয়ায় এবং রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ সম্পত্তির মালিক হওয়ায় তার প্রতি বিবাহযোগ্যা কন্যাদের মামণিদের ও সেই সব কন্যাদের আচার-ব্যবহার ও কথাবার্তায় যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তাতে আমার ভারী মজা লাগছে; অথচ তোমার-আমার মধ্যে বলছি, আমার কিন্তু আগাগোড়াই তাকে একটি বেচারা গোছের লোক বলেই মনে হয়েছে। গত দুবছর ধরে এখানকার লোকজনরা যেমন আমার জন্য স্বামী খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে (যাদের অনেককেই আমি চিনি না পর্যন্ত), তেমনি এখন আবার মস্কোর ঘটক মহলে জোর গুজব যে আমিই নাকি ভাবী কাউণ্টেস বেজুখভা। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে সে পদটির জন্য আমার কোন বাসনা নেই। হ্যাঁ, বিয়ের প্রসঙ্গে বলি: তুমি কি জান যে এই কিছুক্ষণ আগে সেই সার্বজনীন মাসিমা আন্না মিখায়লভ্‌না আমার কাছে এসে একান্ত গোপনীয় রাখবার শর্তে তোমার বিয়ের একটা প্রস্তাবের কথা বলে গেছেন! সেই ভাবীটি প্রিন্স ভাসিলির ছেলে আনাতোল ছাড়া আর কেউ নয়। কোন ধনবতী বিশিষ্ট কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে তারা ছেলের চরিত্রকে সংশোধন করতে ইচ্ছুক, আর সেজন্য তার আত্মীয়স্বজনরা তোমাকেই পছন্দ করেছে। এ বিষয়ে তুমি কি ভাববে আমি জানি না, কিন্তু কথাটা তোমাকে জানানো আমার কর্তব্য বলে মনে করি। শুনেছি সে নাকি খুব সুদর্শন ও ভয়ংকর লম্পট। তার সম্বন্ধে শুধু এইটুকুই জানতে পেরেছি।

"কিন্তু এ সব গালগল্প তো অনেক হল। চিঠির দু'নম্বর পাতা প্রায় শেষ করে এনেছি; আপ্রাক্সিন্‌দের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাবার জন্য মামণির ডাক এসেছে। মরমীয়াবাদের উপর যে বইখানা পাঠালাম পড়ে দেখো; এখানে বইটার প্রচুর সুখ্যাতি। দুর্বল মানুষের পক্ষে অনেক কিছুই বোঝা শক্ত, তবু এই আশ্চর্য বইটি মনকে শান্ত করে, উন্নত করে। বিদায়! তোমার বাবা মঁসিয়কে আমার শ্রদ্ধা জানিও, আর মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ-কে জানিও আমার প্রীতি। তোমাকে জানাই ভালবাসাভরা আলিঙ্গন। —জুলি

পুনশ্চ। তোমার ভাই ও তার মনোরমা ছোট্ট স্ত্রীটির সংবাদ জানিও।"

ঈষৎ হেসে প্রিন্সেস কি যেন ভাবল কিছুক্ষণ; সে হাসিতে তার উজ্জ্বল চোখ দুটি এমনভাবে ঝল্‌মল্ করে উঠল যে তার মুখের চেহারাটাই সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। তারপর হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল, ভারী পা ফেলে টেবিলের কাছে গেল। এক তা' কাগজ নিয়ে তার উপর দ্রুত হাত চালাতে লাগল। চিঠির জবাব লিখে ফেলল ফরাসীতে:

"প্রিয় সোনা বন্ধু,—তোমার ১৩ তারিখের চিঠি আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। রোমান্টিক জুলি আমার, তাহলে এখনও তুমি আমাকে ভালবাস?

যে বিরহকে তুমি এত খারাপ বলে উল্লেখ করেছ তার স্বাভাবিক প্রভাব তো তোমার উপর পড়েছে বলে মনে হয় না। তুমি আমাদের বিরহের নালিশ জানিয়েছ। আমি যদি নালিশ জানাতে পারতাম, তাহলে কি বলতাম? আমি যে সব প্রিয়জনের সঙ্গসুখ হতে বঞ্চিত হয়ে আছি। আঃ, ধর্মের কাছ থেকে যদি সান্ত্বনা না পেতাম, তাহলে যে জীবন বড়ই দুঃখময় হত। সেই যুবকটির প্রতি তোমার অনুরাগকে আমি বিরূপ চোখে দেখব এ-কথা তুমি ভাবলে কেমন করে? এ সব ব্যাপারে আমি শুধু নিজের উপরেই বিরূপ হই। অপরের বেলায় এ ধরনের মনোভাব আমি বুঝতে পারি; নিজের সে অভিজ্ঞতা না থাকায় আমি তাকে সমর্থন করতে পারি না, কিন্তু তাই বলে নিন্দাও তো করতে পারি না। আমার শুধু মনে হয়, একটি যুবকের সুন্দর দুটি চোখ তোমার মত একটি রোমান্টিক প্রেমময়ী যুবতীর অন্তরে যে অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে তার তুলনায় খৃস্টীয় ভালবাসা, প্রতিবাসীকে ভালবাসা, শত্রুকে ভালবাসা অনেক মহত্তর, মধুরতর, শ্রেয়তর।

“তোমার চিঠি আসার আগেই কাউন্ট বেজুখভের মৃত্যু-সংবাদ আমরা পেয়েছি; বাবা তাতে খুবই বিচলিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, কাউন্ট ছিলেন একটি মহান শতাব্দীর একজন ব্যতীত শেষ প্রতিনিধি; এবার তার পালা, কিন্তু সে পালা যাতে যথাসম্ভব দেরিতে আসে সে জন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন। সেই ভয়ংকর দুর্ভাগ্যের হাত থেকে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন!

“পিয়ের সম্পর্কে তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না; শিশুকাল থেকে তাকে আমি চিনি। চিরকালই আমার মনে হয়েছে যে সে একটি মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, আর মানুষের এই গুণটিকেই আমি সব চাইতে বেশী মূল্য দিয়ে থাকি। তার উত্তরাধিকার এবং প্রিন্স ভাসিলির ভূমিকা সম্পর্কে বলি, দুজনের পক্ষেই ব্যাপারটা দুঃখের। হায় প্রিয় বন্ধু, আমাদের স্বর্গীয় উদ্ধারকর্তার সেই বাণী—একটি উট যদি বা ছুঁচের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে যেতে পারে, কোন ধনী কদাপি ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না—যে ভয়ংকরভাবে সত্য। প্রিন্স ভাসিলির জন্য আমার দুঃখ হয়, কিন্তু ততোধিক দুঃখ হয় পিয়েরের জন্য। এত অল্প বয়স আর এত সম্পদের ভার—কত না প্রলোভন তার সামনে হাজির হবে! আমাকে যদি কেউ শুধায়, পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী করে আমি কি চাই তো আমি চাইব—দরিদ্রতম ভিক্ষুকের চাইতেও দরিদ্রতর হতে। প্রিয় বন্ধু, মস্কোতে এত সাফল্যমণ্ডিত যে বইখানি তুমি আমাকে পাঠিয়েছ তার জন্য হাজার ধন্যবাদ। তথাপি যেহেতু তুমি লিখেছ যে অনেক ভাল কথার মধ্যে বইটিতে এমন সব কথা আছে আমাদের দুর্বল মানবিক বুদ্ধি যার নাগাল পায় না, সেইহেতু আমার মনে হয়, যা দুর্বোধ্য এবং সে কারণে ফলপ্রসূ হতে পারে না তা পড়ে সময় নষ্ট করা বৃথা। মরমীয়াবাদ, সংক্রান্ত

বইগুলি মানুষের মনকে শুধু সন্দেহগ্রস্ত করে তোলে, তাদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে ; ফলে খৃস্টীয় সরলতার পরিবর্তে তাদের মনে সব কিছুকে বাড়িয়ে দেখবার একটা প্রবণতা জন্মে। এইভাবে কিছু লোক কেন যে তাদের চিন্তাশক্তিকে গুলিয়ে ফেলতে ভালবাসে আমি তা বুঝতে পারি না। তার চাইতে আমরা কেন 'পত্রাবলী ও সুভাষিতাবলী' পড়ি না। তাদের মধ্যে রহস্যময় যা কিছু আছে তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা যেন আমরা না করি ; আমরা তো শোচনীয় পাপীর দল ; যে রক্ত-মাংসের দেহ আমাদের ও চিরশাশ্বতের মধ্যে একটা দুর্ভেদ্য যবনিকা রচনা করে আছে যতদিন আমরা তার মধ্যে বাস করছি ততদিন ঈশ্বরের সব ভয়ংকর ও পবিত্র গোপন কথাকে আমরা কেমন করে জানব ? তার চাইতে এই মর জগতে আমাদের পথ দেখাবার জন্য স্বর্গীয় পরিত্রাতা যে সব মহৎ বিধান আমাদের জন্য রেখে গেছেন তার পঠন পাঠনের মধ্যে নিজেদের সীমিত রাখাই তো আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। আমাদের চেষ্টা করতে হবে সেই সব বিধান মেনে তাকে অনুসরণ করে চলতে ; আমাদের বুঝতে হবে যে মানুষের দুর্বল মনের সুতোকে আমরা যত অল্প ছাড়ব ততই আমরা ঈশ্বরকে খুশি করতে পারব। যে জ্ঞান ঈশ্বর থেকে আগত নয় তাকে তিনি সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। আর যে রহস্যকে তিনি কৃপা করে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন তাকে পরিমাপ করতে আমরা যত অল্প চেষ্টা করব ততই তিনি তাঁর ঐশ্বরীয় আবির্ভাবের ভিতর দিয়ে সেই রহস্যকে উন্মোচন করবেন।

"আমার বাবা কোন বরের কথা আমাকে বলেন নি, তবে এ কথা বলেছেন যে প্রিন্স ভাসিলির চিঠি তিনি পেয়েছেন এবং আশা করছেন যে প্রিন্স এখানে আসবেন। আমার বিয়ের এই প্রস্তাব সম্পর্কে তোমাকে বলতে চাই যে বিয়েকে আমি এমন একটি ঐশ্বরিক অনুষ্ঠান বলে মনে করি যাকে মেনে চলা কর্তব্য। সর্বশক্তিমান যদি স্ত্রী ও মা হবার কর্তব্য আমার উপর চাপিয়ে দেন তাহলে আমার পক্ষে যত দুঃখদায়কই হোক না কেন সে কর্তব্যকে যথাযথভাবে পালন করতেই আমি চেষ্টা করব ; স্বামী হিসাবে তিনি যাকেই আমার কাছে পাঠাবেন তার প্রতি আমার মনোভাবের কথা বিচার করে নিজেকে বিচলিত করে তুলব না।

"ভাইয়ের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি ; লিখেছে, শিগ্‌গিরই বৌকে নিয়ে বল্ড হিল্‌স্‌-এ আসবে। অবশ্য এ আনন্দ খুবই অল্প দিনের, কারণ এই দুঃখের যুদ্ধে অংশ নিতে সে আবার চলে যাবে। এ যুদ্ধে যে কি ভাবে আর কি কারণে আমরা জড়িয়ে পড়েছি তা ঈশ্বরই জানেন। যে কর্মব্যস্ত জগতের একেবারে মাঝখানে তোমরা রয়েছ শুধু যে সেখানেই যুদ্ধের কথা চলছে তাই নয়, এখানে, এই ক্ষেত-খামারের কাজ ও শান্ত প্রকৃতির মধ্যে—শহরের লোকরা যাকে দেশের মূল বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে—সেখানেও যুদ্ধের গুজব

ছড়াচ্ছে আর আমরা তা মর্মে মর্মে বুঝছি। বাবা তো শুধু অভিযান আর পাল্টা-অভিযানের কথাই বলেন; আমি তার কিছুই বুঝি না। গতকালের আগের দিন গ্রামের পথে দৈনন্দিন ভ্রমণের সময় একটা মর্মভেদী দৃশ্য দেখেছি···আমাদের অঞ্চল থেকে বলপূর্বক সংগৃহীত একদল সৈনিক চলেছে যুদ্ধে যোগ দিতে। যারা যাচ্ছে তাদের মা, বৌ ও ছেলেমেয়েদের অবস্থা যদি দেখতে, তাদের ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না যদি শুনতে! মনে হল, যে স্বর্গীয় ত্রাণকর্তা প্রেম ও ক্ষমার বাণী প্রচার করেছেন তাঁর বিধান বুঝি মানুষ ভুলে গেছে—পরস্পরে হানাহানির কৌশলকে দিচ্ছে সর্বাধিক মূল্য।

"বিদায়, প্রিয় বন্ধু; আমাদের স্বর্গীয় ত্রাণকর্তা ও তাঁর পরম পবিত্র জননী তাদের পবিত্র ও সর্বক্ষম যন্ত্র দিয়ে তোমাকে ঘিরে রাখুন! —মারি।"

"আরে, তুমি একটা চিঠি পাঠাচ্ছ প্রিন্সেস? আমার চিঠি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। চিঠিটা মাকে লিখেছি," হাস্যময়ী মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ দ্রুত লয়ে কথাগুলি বলে গেল। প্রিন্সেস মারির প্রচণ্ড শোক ও বিষণ্ণতা ভরা জগতে সে যেন নিয়ে এল একটা সম্পূর্ণ নতুন হাওয়া—নিশ্চিন্ত, হাল্কা ও আত্মতুষ্ট।

গলা নামিয়ে সে আবার বলল, "তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি প্রিন্সেস, প্রিন্স কিন্তু মাইকেল আইভানভিচকে বকছেন। তাঁর মেজাজ কিন্তু খুব খারাপ। তৈরি থেকো।"

প্রিন্সেস মারি বলল, "দেখ বন্ধু, তোমাকে তো বলেছি আমার বাবার মেজাজ নিয়ে তুমি কখনও আমাকে সাবধান করে দেবে না। আমি নিজে কখনও তার বিচার করি না, আর অন্য কেউ করুক তাও চাই না।"

প্রিন্সেস ঘড়ি দেখল; ক্ল্যাভিকর্ড নিয়ে অনুশীলন শুরু করতে পাঁচ মিনিট দেরি হয়ে গেছে দেখে ভয়ে ভয়ে সে বসবার ঘরে ঢুকল। বারোটা থেকে দুটো পর্যন্ত প্রিন্স বিশ্রাম নেয়, আর প্রিন্সেস ক্ল্যাভিকর্ড বাজায়।"

অধ্যায়—২৬

বড় পড়ার ঘরটাতে প্রিন্স নাক ডাকাচ্ছিল। পাকা-চুল খানসামাটি বসে ঝিমুতে ঝিমুতে সেই নাসিকা-ধ্বনি শুনছিল। বাড়ির একেবারে অন্য প্রান্ত থেকে বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে ভেসে আসছে দুসেক-এর একটা গতের কতকগুলি শক্ত অংশের বার বার আবৃত্তির শব্দ।

ঠিক সেই সময় একখানা ঢাকা গাড়ি ও একখানা খোলা গাড়ি এসে উঠোনে ঢুকল। প্রিন্স আন্দ্রু গাড়ি থেকে নেমে তার স্ত্রীকে নামতে সাহায্য করল এবং নিজের আগেই তাকে বাড়ির ভিতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিল। বুড়ো

তিখন মাথায় পরচুলা এঁটে দরজার ফাঁক দিয়ে মাথাটা বের করে ফিসফিস করে জানিয়ে দিল যে প্রিন্স তখনও ঘুমুচ্ছে ; তারপরই তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিল। তিখন জানে, ছেলেই আসুক আর কোন অসাধারণ ঘটনাই ঘটুক, কিছুতেই নির্দিষ্ট দৈনন্দিন কর্মসূচীর কোন বিঘ্ন ঘটানো চলবে না। তিখনের মতই প্রিন্স আন্দ্রু ও সেকথা জানে। তাই সে এখান থেকে চলে যাবার পরে তার বাবার অভ্যাসগুলোর কোন পরিবর্তন হয়েছে কিনা সেটা বুঝবার জন্য ঘড়িটা একবার দেখল ; যখন বুঝল যে পরিবর্তন কিছু ঘটে নি তখন সে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরাল।

বলল, “বাবা কুড়ি মিনিটের মধ্যেই উঠে পড়বেন। আমরা বরং মারির ঘরেই যাই।”

ছোট প্রিন্সেস এতদিনে একটু শক্ত-পোক্ত হয়েছে ; কিন্তু সে যখন আগেকার মতই খুশি-খুশিভাবে কথা বলতে শুরু করল তখন তার চোখ দুটো আর হাসি-হাসি ঠোঁটটা উল্টে গেল।

চারদিক তাকিয়ে স্বামীকে বলল, “আরে, এ যে রাজপ্রাসাদ গো ! চল, তাড়াতাড়ি চল !” চারদিকে দেখে নিয়ে সে একবার তিখনের দিকে, একবার স্বামীর দিকে, ও পরে পরিচারকের দিকে তাকিয়ে হাসল।

“ঐ তো মারি বাজনা বাজাচ্ছে না ? চল, চুপি চুপি নিয়ে ওকে অবাক করে দেই।”

মুখে একটা ভদ্র অথচ বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু তাকে অনুসরণ করল।

তিখন এগিয়ে এসে তার হাতে চুমো খেল। প্রিন্স বলল, “তুমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছ তিখন।”

যে ঘর থেকে ক্ল্যাভিকর্ড-এর শব্দ আসছিল তারা সে ঘরে পৌছবার আগেই ফরাসী সুন্দরী মাদ্‌য়মজেল বুরিয়েঁ আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে এল।

চেঁচিয়ে বলল, “প্রিন্সেসের কি আনন্দের দিন ! শেষ পর্যন্ত ! ওকে এখনই খবর দিচ্ছি।”

তাকে চুমো খেয়ে ছোট প্রিন্সেস বলল, “না, না, দয়া করে বলো না।··· তুমি তো মাদময়জেল বুরিয়েঁ। তোমার সঙ্গে আমার ননদের বন্ধুত্বের সূত্রে তোমাকে আমি আগেই চিনেছি। আমরা আসব সে কি জানে না ?”

যে ঘর থেকে সোনাতার একই অংশ বার বার বাজাবার শব্দ আসছিল সকলে সেই ঘরের দরজায় উপস্থিত হল। যেন অপ্রীতিকর কিছুর আশংকায় প্রিন্স আন্দ্রু মুখটা বেঁকিয়ে থেমে গেল।

ছোট প্রিন্সেস ঘরে ঢুকল। মাঝপথে বাজনা থেমে গেল, একটা আনন্দের চীৎকার শোনা গেল। তারপরই প্রিন্সেস মারির ভারী পায়ের শব্দ ও চুমো খাবার আওয়াজ। প্রিন্স আন্দ্রু ঘরে ঢুকল। তার বিয়ের সময় মাত্র

অল্প দিনের জন্য এই দুই প্রিন্সেসের দেখা হয়েছিল ! তবু এখন তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে যে যেখানে পারছে অনবরত চুমো খাচ্ছে। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ বুকের উপর হাত চেপে দাঁড়িয়ে আছে ; মুখে অপার্থিব হাসি ; দেখে মনে হয় যে কোন সময়ে সে কেঁদে ফেলবে বা হেসে উঠবে। ভুল বাজনা শুনলে সঙ্গীত-রসিকরা যেমন করে থাকে, প্রিন্স আন্দ্রুও সেই ভাবে ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ভুরু কুঁচকাল। প্রিন্সেসরা পরস্পরকে ছেড়ে দিল ; তারপর বুঝি বা দেরি হয়ে গেছে এই আশংকায় দুজনই দুজনের হাত চেপে ধরে চুমো খেয়ে হাত ছেড়ে দিল ; আবার পরক্ষণেই পরস্পরের মুখে চুমো খেয়ে প্রিন্স আন্দ্রুকে অবাক করে দিয়ে দুজনই কাঁদতে লাগল ও চুমো খেতে লাগল। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁও কাঁদতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু খুবই অস্বস্তি বোধ করল। কিন্তু প্রিন্সেস দুজনের কাছে এই কান্নাটাই একান্ত স্বাভাবিক বলে মনে হল ; তাদের এই সাক্ষাতের সময় তাদের ব্যবহার যে অন্য রকম হতে পারে এটা তাদের মাথায়ই এল না।

“আঃ ! সোনা আমার ! আঃ ! মারি !…” কথাগুলি বলতে বলতে তারা হো-হো করে হেসে উঠল। “কাল রাতেই আমি স্বপ্ন দেখেছি……—” তুমি কি আমাদের আশা কর নি ?…”—“আঃ ! মারি ! তুমি শুকিয়ে গেছ !…”—“আর তুমি খুব মুটিয়েছ !…”

“আমি কিন্তু দেখেই প্রিন্সেসকে চিনতে পেরেছি,” মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ বলল।

“আর আমি তো ভাবতেই পারি নি !…” প্রিন্সেস মারি চেঁচিয়ে বলল। “আরে আন্দ্রু, তোমাকে তো আমি দেখতেই পাই নি।”

প্রিন্স আন্দ্রু ও তার বোন হাত ধরাধরি করে পরস্পরকে চুমো খেল ; প্রিন্স আন্দ্র বোনকে বললে যে সে এখনও সেই ছিঁচকাঁদুনে মেয়েটিই আছে। প্রিন্সেস মারি মুখ ঘুরিয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল ; অশ্রুসজল দুটি উজ্জ্বল চোখ রাখল প্রিন্স আন্দ্রুর মুখের উপর।

ছোট প্রিন্সেস অনবরত বকবক করতে লাগল ; তার লোমশ ছোট উপরের ঠোঁটটা বার বার নীচের ঠোঁটটাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে আর ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, আর তখনি ঈষৎ হাসির সঙ্গে তার চকচকে দাঁতগুলি দেখা যাচ্ছে ; চোখ দুটি ঝিলমিলিয়ে উঠছে। সে বলতে লাগল : স্পাস্কি পাহাড়ে তারা একটা দুর্ঘটনায় পড়েছিল ; তার এই অবস্থায় একটা গুরুতর কিছু ঘটতে পারত ; সব জামা-কাপড় সে পিতার্সবুর্গে রেখে এসেছে, তাই এখানে কি যে পরবে তাই সে জানে না ; আন্দ্রু খুব বদলে গেছে ; কিটি অদিন্ত্‌সভা একটি বুড়োকে বিয়ে করেছে ; মারির জন্য একটি সত্যিকারের বর জুটেছে, তবে সে বিষয়ে পরে কথা হবে। প্রিন্সেস মারি তখনও তার ভাইয়ের দিকেই নীরবে তাকিয়ে আছে ; তার সুন্দর চোখ দুটি ভালবাসা ও বিষণ্ণতায় ভরা। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, তার বৌদি যাই

বলুক না কেন, তার মনের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চিন্তার ধারা বয়ে চলেছে। পিতার্সবুর্গের গত উৎসবের বর্ণনার মাঝখানেই সে ভাইকে বলল :

"তাহলে সত্যি সত্যি তুমি যুদ্ধে যাচ্ছ আন্দ্রু?" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লিজাও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"হ্যাঁ, আর কালই যাচ্ছি," ভাই জবাব দিল।

"ও আমাকে এখানে রেখে যাচ্ছে; ও তো প্রমোশন পেতে পারত, তবু কেন যে আমাকে রেখে যাচ্ছে তা ঈশ্বরই জানেন···"

শেষ পর্যন্ত না শুনে নিজের চিন্তার জের টেনেই প্রিন্সেস মারি ভ্রাতৃবধূর দিকে মুখ ফিরিয়ে শুধাল, "এটা কি ঠিক?"

ছোট প্রিন্সেসের মুখের ভাব বদলে গেল। আবার নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, খুব ঠিক। আঃ! কী ভয়াবহ···"

তার ঠোঁট নেমে এল। ভ্রাতৃবধূর মুখের কাছে মুখ নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে আবার সে কাঁদতে শুরু করল।

প্রিন্স আন্দ্রু ভুরু কুঁচকে বলল, "ওর বিশ্রামের দরকার। তাই না লিজা? ওকে তোমার ঘরে নিয়ে যাও। আমি বাবার কাছে যাচ্ছি। বাবা কেমন আছেন? সেই রকমই?"

"হ্যাঁ ঠিক সেই রকম। যদিও তুমি কি মনে করবে আমি জানি না," প্রিন্সেস খুশি হয়ে বলল।

"আর সেই রকম ঘণ্টা ধরে চলা? পথ দিয়ে বেড়ানো? আর সেই লেদ?" প্রশ্নগুলি করবার সময় প্রিন্স আন্দ্রুর মুখে ঈষৎ হাসি খেলে গেল; বোঝা গেল, বাবার প্রতি যথেষ্ট ভালবাসা ও শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তার দুর্বলতা সম্পর্কেও সে সচেতন।

"ঘণ্টার হিসাব ঠিকই আছে; লেদও; আমার গণিত ও জ্যামিতির পাঠও একভাবেই চলছে," এমন খুশির সুরে প্রিন্সেস মারি কথাটা বলল যেন জ্যামিতিই তার জীবনের সব চাইতে খুশির ব্যাপার।

বিশ মিনিট পরে যখন বুড়ো প্রিন্সের উঠবার সময় হল তখন তিখন এল ছোট প্রিন্সকে তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে। ছেলের আগমনের সম্মানে বুড়ো লোকটি দৈনন্দিন কর্মসূচীর একটু পরিবর্তন ঘটাল : ডিনারের পোশাক পরার সময়ই সে ছেলেকে তার ঘরে নিয়ে আসবার অনুমতি দিল। বুড়ো প্রিন্স সব সময়ই পুরনো ধরনের পোশাক পরে—একটা সেকেলে কোট ও পাউডার-মাখা চুল। প্রিন্স আন্দ্রু যখন বাবার সাজ-ঘরে ঢুকল তখন বুড়ো লোকটি একটা বড় চামড়া-ঢাকা চেয়ারে বসেছিল। তিখন তার মাথায় পাউডার লাগাচ্ছে।

পাউডার মাখা মাথাটা সজোরে নাড়তে নাড়তে বুড়ো লোকটি বলে উঠল, "আঃ! এই যে মহাবীর! বোনাপার্তকে পরাজিত করতে চাও কি? তার

সঙ্গে অন্তত একটু ভালভাবে বোঝাপড়া কর ; নইলে সে যদি এইভাবে চলতে থাকে তো অচিরেই আমাদের সবাইকে তার প্রজা বানিয়ে ছাড়বে। কেমন আছে ?" বলে সে গালটা বাড়িয়ে দিল।

খাবার আগে একটু ঘুমের ফলে বুড়ো লোকটির মেজাজ বেশ ভাল আছে। (বুড়ো প্রিন্স প্রায়ই বলে, "খাবার পরে ঘুম রূপো,—খাবার আগে ঘুম সোনা।") ঘন ভুরুর নীচ দিয়ে সে বাঁকা চোখে ছেলের দিকে তাকাল। প্রিন্স আন্দ্রু এগিয়ে গিয়ে বাবা যেখানটায় দেখিয়ে দিল সেখানে চুমো খেল। সামরিক বিভাগের লোকদের নিয়ে, বিশেষ করে বোনাপার্তকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করা তার বাবার একটা প্রিয় বিষয়। তাই প্রিন্স আন্দ বাবার কথার কোন জবাব দিল না।

সাগ্রহে, সশ্রদ্ধভাবে বাবার মুখের প্রতিটি ভঙ্গীর দিকে নজর রেখে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "হ্যাঁ বাবা, আমি আপনার কাছে এসেছি ; আমার গর্ভবতী স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে ?"

"দেখ বাবা, শুধু বোকা আর লম্পটরাই অসুখে ভোগে। তুমি তো আমাকে জান : সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমি কাজ নিয়ে থাকি। আমি মিতাচারীও ; কাজেই আমি ভালই আছি।"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ," ছেলে হেসে বলল।

"এ ব্যাপারে ঈশ্বরের কিছু করবার নেই!" বলেই সে তার প্রিয় বিষয়বস্তুতে ফিরে গেল ; "যে নতুন বিজ্ঞানকে তোমরা 'রণকৌশল' বল তার সাহায্যে বোনাপার্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা জার্মানরা তোমাদের কি ভাবে শিখিয়েছে বল তো ?"

প্রিন্স আন্দ হাসতে লাগল।

সব ব্যাপারটা বুঝে নিতে আমাকে সময় দিন বাবা," ছেলে হেসে বলল। বোঝা গেল, বাবার চরিত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও ছেলে তাকে ভালবাসে, সম্মান করে। "আহ, আমি তো এখনও গুছিয়ে বসতেই পারি নি!"

বুড়ো লোকটি ছেলের হাত চেপে ধরে সজোরে মাথা নেড়ে বলে উঠল, "বাজে কথা, বাজে কথা! তোমার স্ত্রীর বাড়ি ঠিক করাই আছে। প্রিন্সেস মারি তাকে সেখানে নিয়ে সব বুঝিয়ে দেবে। তারা তো এক কথার জায়গায় দশ কথা বলবে। মেয়েদের স্বভাবই তাই। সে আশায় আমি খুশি হয়েছি। বসে কথা বল। মাইকেলসেন-এর বাহিনীকে আমি বুঝতে পারি, তলস্তয়কেও বুঝি···যুগপৎ অভিযান···কিন্তু দক্ষিণী বাহিনী কি করবে? প্রাশিয়া নিরপেক্ষ···সেটা আমি জানি। অস্ট্রিয়ার ব্যাপারটা কি ?" চেয়ার থেকে উঠে বুড়ো ঘরময় পায়চারি করতে লাগল, আর তিখন যখন যে পোশাকটা তার দরকার সেটা হাতে তুলে দিতে তার পিছন পিছন দৌড়তে লাগল। "সুইডেনেরই বা খবর কি ? তারা পোমেরানিয়া পার হবে কেমন করে ?"

বাবা শুনতেই চাইছে দেখে প্রিন্স আন্দ্রু প্রথমে অনিচ্ছাসত্ত্বেই আসন্ন অভিযানের কার্যক্রম বোঝাতে শুরু করল; কিন্তু ক্রমেই তার আগ্রহ বাড়তে লাগল এবং অভ্যাসবশতই নিজের অজ্ঞাতসারেই রাশিয়া থেকে ফ্রান্সের কথায় চলে গেল। সে বোঝাতে লাগল, নব্বুই হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রাশিয়াকে এমন ভয় দেখাবে যে সে নিরপেক্ষতা ভেঙে বেরিয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য হবে; সেই বিরাট বাহিনীর একটা অংশ স্ট্রাল্‌সুণ্ডএ সুইডিস বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবে; এক লক্ষ রুশ সৈন্যসহ দু'লক্ষ বিশ হাজার অস্ট্রীয় সৈন্য ইতালীতে ও রাইন নদীর তীরে সমবেত হবে; পঞ্চাশ হাজার রুশ ও সমসংখ্যক ইংরেজ সৈন্য নেপল্‌স্‌-এ নামবে; এবং মোট পাঁচ লক্ষ সৈন্য বিভিন্ন দিক থেকে ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করবে। বুড়ো প্রিন্স কিন্তু এই সব বিবরণে তিলমাত্রও উৎসাহ দেখাল না; বরং যেন কিছুই শুনছে না এমনিভাবে হাঁটতে হাঁটতেই পোশাক পরতে লাগল এবং অপ্রত্যাশিতভাবে তিন তিনবার কথার মাঝখানে বাধার সৃষ্টি করল। একবার চেঁচিয়ে বলল: "সাদা পোশাকটা, সাদা পোশাকটা!"

তার মানে যে ওয়েস্টকোটটা সে চাইছিল তিখন সেটা তার হাতে দেয় নি। আর একবার ছেলের কথায় বাধা দিয়ে সে বলল: "শীঘ্রই তাকে সূতিকাঘরে যেতে হবে।" তিরস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল: "এটা খারাপ! বলে যাও, বলে যাও।"

প্রিন্স আন্দ্রু তার বক্তব্য প্রায় শেষ করে এনেছে এমন সময় এল তৃতীয় বাধা। বুড়ো বয়সের ভাঙা গলায় বুড়ো গেয়ে উঠল: "মার্ল্‌বরো যুদ্ধে চলিলেন; ঈশ্বরই জানেন তিনি কবে ফিরিবেন।" (একটি পরিচিত ফরাসী গান।)

ছেলে শুধু হাসল।

বলল, "এ রণ-কৌশল যে আমি সমর্থন করি তা বলছি না। আমি শুধু সত্য কথাটা বলছি। এতদিনে নেপোলিয়নও নিশ্চয় একটা রণ-কৌশল তৈরি করেছে, আর সেটা এর চাইতে খারাপও হবে না।"

"দেখ, তুমি নতুন কথা কিছু বল নি" এই কথা বলেই বুড়ো গরগর করে আওড়াতে লাগল: "Dieu sait Quand rivicndra. এবার খাবার ঘরে চলে যাও।"

অধ্যায়—২৭

দাঁড়ি কামিয়ে পাউডার মেখে প্রিন্স নির্দিষ্ট সময়ে খাবার ঘরে ঢুকল; তার পুত্রবধূ প্রিন্সেস মারি ও মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ তার জন্যই সেখানে অপেক্ষা

করছিল ; বুড়োর স্থপতিও তাদের সঙ্গেই ছিল ; এই নগণ্য লোকটির পক্ষে এ সম্মান আশা করারই কথা নয়, তবু মালিকের একটা অদ্ভুত খেয়ালের ফলে এই টেবিলে তার স্থান হয়েছে। প্রিন্স সাধারণতই সামাজিক মর্যাদাকে কঠোরভাবে মেনে চলে এবং বড় বড় সরকারী কর্মচারিকে পর্যন্ত তার টেবিলে আমন্ত্রণ করে না ; অথচ একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সে মাইকেল আইভানভিচকে (চৌখুপি-কাটা রুমালটায় নাক ঝাড়বার জন্য লোকটি প্রতিবারই ঘরের একেবারে এক কোণে চলে যাচ্ছে) এই টেবিলে ডেকেছে। সে এই কথাই বোঝাতে চায় যে সব মানুষই সমান, আর অনেকবারই মেয়েকে বোঝাতে চেয়েছে যে মাইকেল আইভানভিচ “তোমার বা আমার চাইতে একতিলও ছোট নয়।” খেতে বসে প্রিন্স সাধারণত অন্য অনেক লোক অপেক্ষা স্বল্পভাষী মাইকেল আইভানভিচের সঙ্গেই বেশী কথা বলে থাকে।

এ-বাড়ির অন্য সব ঘরের মতই খাবার ঘরটাও খুব উঁচু। বাড়ির লোকজন এবং পরিচারকরা—প্রত্যেকে এক একটি চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে প্রিন্সের আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। তোয়ালে-কাঁধে খানসামা টেবিল সাজানোটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, পরিচারকদের ইসারা করছে, এবং যে দরজা দিয়ে প্রিন্স ঢুকবে একবার সেদিকে আর একবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে। বল্‌কন্‌স্কি জমিদার-পরিবারের বংশ-লতিকাসম্বলিত মস্তবড় একটা গিল্‌টি-করা ফ্রেমের দিকে তাকিয়ে আছে প্রিন্স আন্দ্রু ; এ জিনিসটি তার কাছে নতুন। তার বিপরীত দিকে আর একটি অনুরূপ ফ্রেম ঝুলছে ; তাতে আঁকা রয়েছে মুকুটধারী কোন প্রিন্সের একটি অত্যন্ত বাজেভাবে আঁকা প্রতিকৃতি (সম্ভবত জমিদারিরই পোষ্য কোন চিত্রকরের হাতে আঁকা) ; জানা যায়, এই প্রিন্সটি রুরিক বংশাবতংশ এবং বল্‌কন্‌স্কি পরিবারের পূর্বপুরুষ। বংশ-লতিকার দিকে আর একবার তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু মাথা নেড়ে হাসতে লাগলো ; মূল মানুষটির সঙ্গে প্রতিকৃতির সাদৃশ্যটা হাস্যকর মনে হলে যে ভাবে কোন মানুষ হাসে ঠিক সেই ভাবে।

প্রিন্সেস মারিকে পাশে দেখে তাকে বলল, “ছবিটা পুরোপুরি ঠিক তার মত!”

প্রিন্সেস মারি অবাক হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকাল। তার হাসির কারণ সে কিছুই বুঝতে পারল না। বাবার সব কাজকেই সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে ; মনে কোন প্রশ্ন রাখে না।

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, “প্রত্যেক লোকেরই ‘দুর্যোধনের উরু’ (Achilles' heel) থাকে। ভাব তো, এত বড় মন নিয়ে তিনি এই বাজে ছবিটা আঁকিয়েছেন!”

ভাইয়ের সমালোচনার এই নির্ভীকতা প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল না ; একটা জবাব দিতে যাবে এমন সময় পড়ার ঘর থেকে প্রত্যাশিত পদশব্দ

ভেসে এল। যেন এ বাড়ির কঠোর নিয়মের সঙ্গে তুলনায় নিজের আচরণের ক্ষিপ্রতাকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য ইচ্ছা করেই প্রিন্স তার স্বভাবমত বেশ স্ফূর্তির সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে ঘরে ঢুকল। ঠিক সেই মুহূর্তে বড় ঘড়িটাতে দুটোর ঘণ্টা বাজল, আর বসার ঘর থেকে আর একটি ঘড়ির কর্কশ শব্দ তার সঙ্গে যুক্ত হল। প্রিন্স স্থির হয়ে দাঁড়াল; ঘন ভুরুর নীচ থেকে দুটি জীবন্ত ঝকঝকে চোখ কঠোর দৃষ্টিতে উপস্থিত সকলকে ভালভাবে দেখে নিয়ে ছোট প্রিন্সেসের উপর গিয়ে স্থির হল। যার ঘরে ঢুকলে সভাসদগণের যেমন হয়, বৃদ্ধ লোকটিকে দেখে ছোট প্রিন্সেসের মনেও সেই রকম ভয় ও শ্রদ্ধার অনুভূতি জাগল। প্রিন্স তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে অদ্ভুতভাবে তার গলার পিছনে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল।

একাগ্র দৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স বলল, "তোমাকে দেখে আমি খুশি হয়েছি, খুব খুশি," তারপর নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল। "বস, বস! মাইকেল আইভানভিচ, তুমিও বস!"

সে পুত্রবধূকে নিজের পাশেই একটা জায়গা দেখিয়ে দিল। পরিচারক তার জন্য একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

তার গোলগাল চেহারার উপর চোখ বুলিয়ে বুড়ো লোকটি বলল, "হো-হো! তুমি বড় বেশী তাড়াহুড়ো করছ। এটা ভাল নয়!"

শুধু ঠোঁট নেড়ে প্রিন্স তার স্বভাবসিদ্ধ রুক্ষ কাষ্ঠ হাসিটি হাসল; চোখে সে হাসি প্রতিফলিত হল না।

শুধু বলল, "তুমি হাঁটবে, যতটা পার হাঁটবে, যতটা পার।"

ছোট প্রিন্সেসের কানে কথাটা গেল না; ইচ্ছা করেই কানে নিল না। চুপ করে রইল; তাকে একটু বিচলিত মনে হল। প্রিন্স তার বাবার কথা জানতে চাইলে ছোট প্রিন্সেসের মুখে হাসি ফুটল; সে কথা বলতে শুরু করল। প্রিন্স পরিচিত লোকজনদের কথা জানতে চাইলে ছোট প্রিন্সেস আরও চাঙ্গা হয়ে উঠল, নানা লোকের অভিনন্দন-বাণী তাকে শোনাতে লাগল, শহরের গল্পগুজবের বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

"বেচারি কাউন্টেস আপ্রাক্সিনা তার স্বামীকে হারিয়েছেন; কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটি গেছে।" পুত্রবধূটির গলা ক্রমেই ঝরঝরে হয়ে উঠল।

প্রিন্সের দৃষ্টিও ক্রমেই কঠোরতর হতে লাগল; তারপরই যেন পুত্রবধূটিকে যথেষ্ট দেখা হয়েছে, তার সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও হয়ে গেছে, এমনিভাবে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে সে মাইকেল আইভানভিচের দিকে মুখ ঘোরাল।

"দেখ মাইকেল আইভানভিচ, আমাদের বোনাপার্তের অবস্থা কিন্তু কাহিল। তার বিরুদ্ধে কতভাবে যে সৈন্যসমাবেশ করা হচ্ছে সে কথা প্রিন্স আন্দ্রুই (ছেলেকে সে এইভাবে ডাকে) আমাকে বলছিল! অথচ তুমি আর আমি তাকে মোটেই পাত্তা দেই নি।"

"তুমি আর আমি"—কখন যে বোনাপার্ত সম্পর্কে এ সব কথা বলেছে সে কথা কিন্তু মাইকেল আইভানভিচ মোটেই জানে না। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে তাকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করে প্রিন্স তার মনের মত বিষয়-বস্তুটির আলোচনা শুরু করতে চাইছে, তখন সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবক প্রিন্সের দিকে তাকাল। এরপর কি হবে তা কে জানে।

স্থপতিকে দেখিয়ে প্রিন্স ছেলেকে বলল, "ইনি একজন খুব বড় দরের রণনীতিবিদ !"

আবার শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ, বোনাপার্ত, সেনাপতি ও কূটনীতিকদের নিয়ে আলোচনা। বুড়ো প্রিন্সের তো বদ্ধমূল ধারণা যে আজকালকার লোকজনরা সব কচি খোকা, যুদ্ধ বা রাজনীতির অ-আ-ক-খ-ও তারা জানে না ; আর ঐ বোনাপার্ত তো একটা বখাটে ফরাসী ছোকরা মাত্র ; তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত কোন পটেম্‌কিন অথবা সুভরভ নেই বলেই তার এত জয়-জয়কার। তাছাড়া, তার আরও ধারণা ইওরোপে কোন সত্যিকারের রাজনৈতিক সংকট নেই, কোন সত্যিকারের যুদ্ধ নেই, যা আছে সেটা এক ধরনের পুতুল খেলা ; সেই খেলা খেলতে বসেই আজকের লোকরা এমন ভাণ করছে যেন সত্যিকারের যুদ্ধই করছে। নতুন যুগের মানুষদের নিয়ে বাবার এই বিদ্রূপকে প্রিন্স আন্দ্রু খুশি মনেই সহ্য করে গেল, মন দিয়ে শুনল।

বলল, "অতীত চিরদিনই মধুর, কিন্তু স্বয়ং সুভরভ্‌ও কি মরো-র পাতা ফাঁদে পড়েন নি ? এবং সে ফাঁদ থেকে বের হবার পথটা পর্যন্ত খুঁজে পান নি ?"

প্রিন্স চেঁচিয়ে বলে উঠল, "এ কথা তোমাকে কে বলেছে ? কে ? সুভরভ্‌ !" বলেই সে খাবার প্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল, আর তিখন সঙ্গে সঙ্গে সেটা ধরে ফেলল। "সুভরভ্‌ !··· ভেবে দেখ প্রিন্স আন্দ্রু ! দুই··· ফ্রেডেরিক ও সুভরভ্‌ ; মরো ! সুভরভ্‌ যদি নিজের ইচ্ছামত চলতে পারত তাহলে মরোকেই বন্দী হতে হত ; কিন্তু তার হাত বাঁধা ছিল অস্ট্রীয় যুদ্ধ পরিষদের কাছে যাদের মাথায় ছিল শুধু তরকারির ঝোল। তাদের পাল্লায় পড়লে শয়তানেরও ধাঁধা লাগে। সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে অস্ট্রীয় যুদ্ধ পরিষদটি কী চিজ্‌ ! সুভরভ্‌ই তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না, তো মাইকেল কুতুজভ কোন্‌ ছাড় ! না হে বাপু, তুমি ও তোমার সেনাপতিরা বোনাপার্তের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না ; তোমাদের ডেকে আনতে হবে ফরাসীদের, যাতে চোরে চোরে লড়াই লেগে যায়। ফরাসী মরোকে ডেকে আনবার জন্য জার্মান পাহ্‌লেন (পিতার্সবুর্গের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল পি. এ. পাহ্‌লেন)-কে পাঠানো হয়েছে আমেরিকার নিউ ইয়র্কে।' সে বছর রাশিয়ায় চাকরি নেবার জন্য যে মরোকে ডাকা হয়েছিল প্রিন্স সেই ঘটনাকেই উল্লেখ করল।··· "চমৎকার ! পোটেম্‌কিন, সুভরভ ও

অর্‌লভরা কি জার্মান ছিল? না হে বাপু, হয় তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে, আর না হয় তো আমাকেই বাহাত্তুরে ধরেছে। ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন, কিন্তু আমরা সব কিছুই দেখে যাব। বোনাপার্ত তো মস্ত বড় সেনাপতি সেজেছে! হুম!…"

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "আমি বলছি না যে আমাদের সব পরিকল্পনাই ভাল, তবে বোনাপার্ত সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে অবাক করেছে। আপনি যত খুশি হাসতে পারেন, কিন্তু তা হলেও বোনাপার্ত একজন জাঁদরেল সেনাপতি!"

স্থপতি লোকটি এতক্ষণ মাংসের রোস্ট নিয়ে ব্যস্ত ছিল; আশা করেছিল যে তার কথা সকলে ভুলেই গেছে। কিন্তু বুড়ো প্রিন্স এবার হাঁক দিল, "মাইকেল আইভানভিচ! আমি তোমাকে বলি নি যে বোনাপার্ত একজন মস্ত বড় রণকুশলী? দেখ, ইনিও সেই একই কথা বলছেন।"

"সে তো ঠিকই ইয়োর এক্সেলেন্সি" স্থপতি জবাব দিল।

প্রিন্স আর একবার হো-হো করে হেসে উঠল।

"মুখে রূপোর চামচে নিয়েই বোনাপার্ত জন্মেছিল। চমৎকার সব সৈন্য সে হাতে পেয়েছে। তাছাড়া, জার্মানদের দিয়েই তার আক্রমণে হাতি খড়ি। আর একমাত্র আলসেরাই জার্মানদের হারাতে পারে না। জগতের শুরু থেকে সকলেই তো জার্মানদের পিটিয়েছে। তারা কিন্তু নিজেদের ছাড়া আর কাউকে পেটাতে পারে না। তাদের সঙ্গেই লড়াই করেই তো বোনাপার্তের যত নাম।"

তারপরেই তার মতে বোনাপার্ত নানা অভিযানে, এমন কি রাজনীতিতেও যে সব মস্ত ভুল করেছে প্রিন্স সেগুলি সব ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। ছেলে কোন প্রত্যুত্তর করল না, কিন্তু স্পষ্ট বোঝা গেল যে যত যুক্তিই দেখানো হোক বাবার মতই সেও নিজের মত সহজে বদলাতে পারে না। কোন রকম জবাব না দিয়ে সে চুপচাপ শুনতে লাগল; এত বছর ধরে একাকি গ্রামে বাস করেও এই মানুষটি কেমন করে যে সাম্প্রতিক ইওরোপের সব সামরিক ও রাজনৈতিক ঘটনার খবর রাখে এবং তা নিয়ে এত সূক্ষ্ম ও তীব্র সমালোচনা করতে পারে সে কথা ভেবে তার বিস্ময়েব সীমা বইল না।

"তোমরা ভাব যে আমি বুড়ো মানুষ, বর্তমানের কোন খোঁজ-খবরই রাখি না," এই বলে বাবা কথা শেষ করল। "কিন্তু এ সব কিছুই আমাকে বিব্রত করে। রাতে আমি ঘুমতে পারি না। এখন বল, তোমাদের এই জাঁদরেল সেনাপতির আসল কেরামতিটা কোথায়?" সে কথা শেষ করল।

"সে কথা বলতে অনেক সময় লাগবে," ছেলে জবাব দিল।

"ঠিক আছে, তোমার বোনাপার্তকে নিয়েই থাকগে। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ, তোমাদের পাউডার-মাখা বাঁদর সম্রাটের এই আর একজন স্তাবক!"

চমৎকার ফরাসীতে প্রিন্স জোর গলায় বলল।

"আপনি তো জানেন প্রিন্স, আমি বোনাপার্তের সমর্থক নই।"

প্রিন্স গুনগুন করে একটা বেসুরো গান গেয়ে ততোধিক বেতালা হাসি হেসে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল।

আলোচনার সময়ে এবং ডিনারের বাকি সময়টাতেও ছোট প্রিন্সেস চুপচাপ বসে থেকে ভীত দৃষ্টিতে একবার শ্বশুরের দিকে ও একবার প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাতে লাগল। সকলে টেবিল থেকে উঠে গেলে সে ননদের হাতটা ধরে তাকে টেনে নিয়ে আর একটা ঘরে চলে গেল।

বলল, "তোমার বাবার কত বুদ্ধি; হয় তো সেই জন্যই তাকে আমার এত ভয়।"

"আঃ, বাবা খুব ভাল মানুষ!" প্রিন্সেস মারি জবাব দিল।

অধ্যায়—২৮

পরদিন সন্ধ্যায় প্রিন্স আন্দ্রু চলে যাবার কথা। দৈনন্দিন কর্ম-সূচীর কোন রকম পরিবর্তন না করে বুড়ো প্রিন্স ডিনারের পরে যথারীতি শুতে চলে গেল। ছোট প্রিন্সেস ননদের ঘরে। স্কন্ধত্রানবিহীন ট্রাভেলিং-কোট গায়ে প্রিন্স আন্দ্রু খানসামাকে নিয়ে তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে জিনিসপত্র প্যাক করছে। নিজে গাড়িটা পরীক্ষা করে তাতে ট্রাংকগুলি তুলে দিয়ে ঘোড়াগুলো জুততে বলল। শুধু নিজের সঙ্গে রাখার জিনিসগুলোই ঘরের মধ্যে পড়ে আছে: একটা ছোট বাক্স, রূপোর প্লেটসহ একটা বড় খাবারের বাক্স, দুটো তুর্কী পিস্তল ও একখানি তরোয়াল—ওচাকভ্ অবরোধের সময় তার বাবা এটা এনেছিল; পরে ছেলেকে উপহার দিয়েছে। প্রিন্স আন্দ্রুর এই সব ভ্রমণ-সঙ্গী জিনিসপত্রই বেশ সাজানো-গোছানো: নতুন, পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ঢেকে ফিতে দিয়ে বাঁধা।

কোথাও যাত্রা করবার আগে অথবা জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঘটাবার সময় চিন্তাশীল লোকরা সাধারণত বেশ গম্ভীর হয়ে যায়। সেই সময় তারা অতীতের পর্যালোচনা করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে। প্রিন্স আন্দ্রুর মুখটাও খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। হাত দুটি পিছনে রেখে সে ঘরের এক কোণ থেকে আর এক কোণে দ্রুত হাঁটছে, আর সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে চিন্তিতভাবে মাথাটা নাড়ছে। তার কি যুদ্ধে যেতে ভয় করছে? নাকি স্ত্রীকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে?—হয় তো দুটোই; কিন্তু সে চায় না যে এ-অবস্থায় কেউ তাকে দেখে ফেলে; তাই বাইরে পায়ের শব্দ শুনেই সে তাড়াতাড়ি পিছনের হাত খুলে সামনে এসে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, যেন ছোট বাক্সের ঢাকনিটা বাঁধছে। তারপরই তার স্বাভাবিক ও দুর্ভেদ্য

মুখের ভাব ফিরিয়ে আনল। প্রিন্সেস মারির ভারী পায়ের শব্দই সে শুনতে পেয়েছিল।

প্রিন্সেস মারি হাঁপাতে হাঁপাতে (সে নিশ্চয় দৌড়ে এসেছে) চেঁচিয়ে বলল, "তুমি নাকি ঘোড়াকে সাজ পরাতে বলেছ? অথচ আমি যে তোমার সঙ্গে একান্তে কত কথা বলতে চেয়েছিলাম! ঈশ্বর জানেন আবার কতদিন আমরা দূরে দূরে থাকব। আমি এসেছি বলে তুমি রাগ কর নি তো? তুমি কত বদলে গেছ আন্দ্রুশা, যেন প্রশ্নটার ব্যাখ্যা হিসাবেই সে কথাটা যোগ করল।

প্রিন্সের প্রিয় নাম "আন্দ্রুশা" বলে ডেকেই মারি হেসে ফেলল। এই রুক্ষ সুদর্শন মানুষটি যে তার ছোটবেলার খেলার সাথী সেই ছোট্ট দুষ্টু ছেলে আন্দ্রুশা হতে পারে সে কথা ভাবতেই সে অবাক হয়ে গেল।

শুধু একটু হেসে বোনের কথার জবাব দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু জিজ্ঞাসা করল, "আর লিজা কোথায়?"

"সে এতই ক্লান্ত যে আমার ঘরে সোফার উপরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওঃ আন্দ্রু! কী সোনা বউই তুমি পেয়েছ," একটা সোফায় বসে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে সে বলল। "ও তো একেবারে ছেলে মানুষ: কী মিষ্টি, হাসি-খুশি মেয়ে। ওকে আমার খুব ভাল লেগেছে।"

প্রিন্স আন্দ্রু চুপ করে রইল; কিন্তু ব্যঙ্গ ও ঘৃণার যে চিহ্ন তার মুখে ফুটে উঠল সেটা প্রিন্সেসের নজর এড়াল না।

"ছোটখাট দোষ-ত্রুটিকে মেনে নিতেই হবে; সেটুকু ত্রুটি কার নেই আন্দ্রু? ভুলে যেয়ো না যে সে একটা উঁচু সমাজে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে; এখানে তার অবস্থা তো খুব সুখকর না হবারই কথা। প্রত্যেকের অবস্থাই তো আমাদের বোঝা দরকার। Tout compendre, c'est tout pardonner, (সকলের অবস্থাটা বুঝতে পারলে সকলকেই ক্ষমা করা যায়।) বেচারির কথাটা একবার ভাব! এতদিনের অভ্যস্ত জীবনকে ছেড়ে, স্বামীকে ছেড়ে, এই অবস্থায় তাকে একাকি একটা গ্রামে থাকতে হবে! এটা খুবই শক্ত।"

যারা নিজেদের সবজান্তা ভাবে তাদের দেখে আমরা যে ভাবে হাসি, বোনের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু ও সেইভাবে হাসল।

বলল, "তুমিও তো গ্রামে থাক; তোমরা তো জীবনকে ভয়ংকর ভাব না।"

"আমি···আমার কথা আলাদা। আমার কথা কেন বলছ? আর কোন জীবন আমি চাই না, চাইতে পারি না, কারণ আর কোন জীবন আমি জানি না। কিন্তু আন্দ্রু, ভেবে দেখ তো: অভিজাত সমাজের একটি তরুণী তার জীবনের সেরা দিনগুলি একাকি কাটাবে এই গ্রামের মাটিতে

মাথা গুঁজে—বাপি তো সব সময়ই ব্যস্ত, আর আমি···তুমি তো জান, অভিজাত সমাজে চলতে অভ্যস্ত একটি মেয়ের মনোরঞ্জন করবার মত কোন বিদ্যাই আমার নেই। আর আছে শুধু মাদময়জেল বুরিয়েঁ···"

"তোমাদের ওই মাদময়জেল বুরিয়েঁকে আমি মোটেই পছন্দ করি না," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"কর না? সে তো খুব ভাল, দয়ালু, তাছাড়া সেও তো করুণার পাত্র। তার তো কেউ কোথাও নেই—কেউ না। সত্যি কথা বলতে কি তাকে আমার কোন দরকারই নেই; বরং সে আমার পথের বাধা। তুমি তো জান, চিরকালই আমি একটু বুনো, এখন তো আরও বুনো হয়ে গেছি। একলা থাকতেই আমি ভালবাসি।··· বাবা ওকে খুব ভালবাসেন। সে আর মাইকেল আইভানভিচ—এই দুজনের প্রতিই বাবা খুব সদয় ও সন্তুষ্ট, কারণ তিনি দুজনেরই আশ্রয়দাতা। স্টার্ণ বলেছেন: 'মানুষ আমাদের কি উপকার করেছে তার জন্য আমরা তাকে তত ভালবাসি না যত ভালবাসি আমরা তাদের কি উপকার করেছি সেই জন্য।' বাবাকে হারিয়ে ও যখন গৃহহারা হয়ে পড়েছিল তখনই বাবা ওকে নিয়ে আসেন। ওর স্বভাবটা খুব ভাল; ওর বই পড়ার ধরন বাবার খুব পছন্দ। সন্ধ্যাবেলা ও বাবাকে পড়ে শোনায়; খুব সুন্দর পড়ে।"

"খোলাখুলি বলতে কি মারি, বাবার চরিত্র অনেক সময় তোমাকে খুব বিপদে ফেলে দেয়, তাই না?" প্রিন্স আন্দ্রু হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল।

এ প্রশ্ন শুনে প্রিন্সেস মারি প্রথমে অবাক হয়ে গেল; পরে ভীষণ ভয় পেল।

"আমাকে? আমাকে? ··আমাকে বিপদে ফেলেন?···" সে বলল।

"তিনি চিরকালই কিছুটা কঠোর; কিন্তু আমার তো ধারণা এখন তিনি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছেন," প্রিন্স আন্দ্রু বলল। বোনকে বোকা বানাতে, বা তাকে পরখ করে দেখতেই সে বাবার সম্পর্কে এ ধরনের লঘু উক্তি করল।

আলোচনার প্রসঙ্গে না গিয়ে নিজের চিন্তাকে অনুসরণ করেই প্রিন্সেস বলল, "তুমি সব দিক থেকেই ভাল আন্দ্রু, কিন্তু তোমার মনে একটা বুদ্ধির অহংকার আছে,—আর সেটা একটা বড় পাপ। কেউ কি বাবাকে বিচার করতে পারে? আর যদি পারেও, তবু তো আমার বাবার মত লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কোন অনুভূতি জাগতে পারে কি? তাকে নিয়ে আমি কত সন্তুষ্ট, কত সুখী। তুমিও আমার মতই সুখী হও, এটাই তো আমার একমাত্র কামনা।"

তার ভাই অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল।

"একটি মাত্র কাজ আমার পক্ষে শক্ত।·· তোমাকে সত্যি কথাই বলব আন্দ,—সেটা হল ধর্মবিষয়ে বাবার আচরণ। যে জিনিস দিনের

আলোর মত পরিষ্কার তা কেমন করে বাবার মত প্রচণ্ড বুদ্ধির অধিকারী মানুষের চোখে পড়ে না, কেমন করে তিনি বিপথে চলে যান আমি তো বুঝতেই পারি না। ঐ একটি মাত্র ব্যাপারে আমি অসুখী। কিন্তু এ ব্যাপারেও আমি আজকাল কিছুটা উন্নতি দেখতে পাচ্ছি। ইদানীং তার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা অনেক কমে গেছে। একজন সন্ন্যাসীকে তিনি বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন; তার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন।"

"হায়! সোনা, আমার ভয় হচ্ছে তুমি আর তোমার ঐ সন্ন্যাসীর সব চেষ্টাই মাঠে মারা যাচ্ছে," মমতামাখা ঠাট্টার সুরে প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে প্রিন্সেস মারি বলল, "ওঃ! আমাদের ভাইটি, আমার শুধু একটিই প্রার্থনা, একটিই আশা যে ঈশ্বর আমার কথা শুনবেন। আন্দ্রু, তোমার কাছে আমি একটা জিনিস চাই।"

"সেটা কি?"

"না—কথা দাও তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেবে না! তাতে তোমার কোন কষ্ট হবে না, সেটা তোমার অযোগ্যও নয়, কিন্তু আমার পক্ষে অনেক সান্ত্বনার। কথা দাও আন্দ্রুশা!…" থলের মধ্যে হাত ঢুকিয়েও তার মধ্যে কি আছে সেটা বের না করে প্রিন্সেস মারি বলল; বোঝা গেল, থলির ভিতরকার জিনিসটিই তার অনুরোধের বস্তু, কিন্তু অনুরোধ মঞ্জুর হবার আগে সেটা সে বের করবে না।

ভীরু চোখ তুলে সে ভাইয়ের দিকে তাকাল।

যেন ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "যদি কষ্টকর ব্যাপারও হত…"

"তুমি যা খুশি ভাবতে পার!… আমি জানি, তুমিও ঠিক বাবার মত। যা খুশি ভাব, তবু আমার জন্য অন্তত এই কাজটি কর। দয়া করে কর! বাবার বাবা, আমাদের ঠাকুর্দা, সব যুদ্ধে এটা পরতেন। (থলের ভিতরকার জিনিসটি সে এখনও বের করল না।) তাহলে কথা দিলে?"

"নিশ্চয়। এটা কি?"

"আন্দ্রু, এই দেবমূর্তি দিয়ে আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি, কিন্তু আমার কাছে তোমাকে কথা দিতে হবে যে কখনও এটা খুলে রাখবে না। কথা দিলে?"

"ওটার ওজন যদি এক হন্দর না হয়, ওটার ভারে যদি আমার ঘাড় না ভাঙে…তো তোমাকে খুশি করতে…" প্রিন্স আন্দ্রু বলল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার ঠাট্টার ফলে বোনের মুখে বেদনার যে ছায়া ফুটে উঠেছে সেটা দেখতে পেয়ে তার অনুশোচনা হল; সে বলে উঠল, "আমি খুব খুশি হয়েছি; সত্যি সোনা, খুব খুশি হয়েছি।"

"তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি তোমাকে রক্ষা করবেন, তোমাকে করুণা

করবেন, নিজের কাছে টেনে নেবেন, কারণ সত্য ও শান্তি একমাত্র তাঁর মধ্যেই অবস্থান করে," আবেগ-কম্পিত স্বরে প্রিন্সেস মারি কথাগুলি বলল ; সুন্দর একটি রূপোর হারের উপর সোনার কাজ-করা ছোট, ডিম্বাকৃতি, অত্যন্ত প্রাচীন একটি ত্রাণকর্তার কালো দেবমূর্তি গম্ভীরভাবে দুই হাতে তুলে ধরল ভাইয়ের সামনে।

ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে, দেবমূর্তিটিকে চুমো খেয়ে সে ভাইয়ের হাতে সেটাকে তুলে দিল।

"দোহাই আন্দ্রু, আমার জন্যে !…"

তার দুটি বড় বড় ভীরু চোখ থেকে শান্ত আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সে আলোয় তার রুগ্ন পাতলা মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে সুন্দর হয়ে উঠল। ভাই দেবমূর্তিটা পরতে গেল, কিন্তু বোন তাকে থামিয়ে দিল। আন্দ্রু বুঝতে পারল, ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, দেবমূর্তিকে চুমো খেল। সেও তখন অভিভূত হয়েছে ; তার চোখে মমতার আভাষ, কিন্তু সেই সঙ্গে তার মুখে দেখা দিল ব্যঙ্গের ঝলকানি।

'ধন্যবাদ, লক্ষ্মী ভাই।" ভাইয়ের কপালে চুমো খেয়ে প্রিন্সেস মারি আবার গিয়ে সোফায় বসল। কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ।

"আগেই বলেছি আন্দ্রু, তুমি যেমন দয়ালু ও উদার ছিলে তেমনি থেকো। লিজার প্রতি কঠোর হয়ো না," প্রিন্সেস মারি বলতে শুরু করল। "সে খুব ভাল, আর এখানে তার অবস্থা বড় সঙীন।"

"আমার স্ত্রী সম্পর্কে তোমার কাছে কোন নালিশ করেছি, বা তাকে দোষ দিয়েছি বলে তো মনে পড়ে না মাশা (মারি-র সংক্ষিপ্ত রূপ)। তাহলে এসব কথা আমাকে বলছ কেন ?"

প্রিন্সেস মারির গালে লালের ছোঁপ লাগল ; অপরাধীর মত সে চুপ করে রইল।

"আমি তোমাকে কিছুই বলি নি, কিন্তু তুমি অনেক কথাই শুনেছ। সে জন্য আমি দুঃখিত।"

প্রিন্সেস মারির কপালে, ঘাড়ে ও গালে লালের ছোপ গাঢ়তর হল। সে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলতে পারল না। তার ভাই ঠিকই অনুমান করেছে : ছোট প্রিন্সেস ডিনারের পরে কেঁদেছে, আসন্ন প্রসবের ব্যাপারে তার মনে যে ভয় ঢুকেছে তা বলেছে, নিজের ভাগ্য, শ্বশুর ও স্বামীর বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বোনের জন্য প্রিন্স আন্দ্রু দুঃখ বোধ করল।

"একটা কথা জেনে রাখ মাশা : কোন ব্যাপারেই আমার স্ত্রীকে আমি বকতে পারি না, কখনও বকি নি, ভবিষ্যতেও বকব না ; তার সম্পর্কিত কোন ব্যাপার নিয়ে নিজেকেও আমি দোষী করতে পারি না ; যে অবস্থায়ই আমি

থাকি না কেন, এই রকমই চলতে থাকবে। কিন্তু তুমি যদি আসল সত্য জানতে চাও…যদি জানতে চাও আমি কি সুখী? না! সে কি সুখী? না! কিন্তু কেন নয় তা আমি জানি না…”

বলতে বলতে ভাই উঠে বোনের কাছে গেল, নীচু হয়ে তার কপালে চুমো খেল। একটা চিন্তাক্লিষ্ট অনভ্যস্ত উজ্জ্বলতায় তার চোখ দুটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল; কিন্তু তখন তার দৃষ্টি বোনের দিকে ছিল না, ছিল খোলা দরজার পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে।

“চল, ওর কাছে যাই। আমাকে তো বিদায় নিতেই হবে। অথবা—তুমি গিয়ে ওর ঘুম ভাঙাও, আমি একটু পরেই যাচ্ছি। পেত্রুশ্‌কা!” সে খানসামাকে ডাকল: “এদিকে এস। এগুলি নিয়ে যাও। এগুলিকে আসনের উপর রাখ, আর এগুলি ডানদিকে।”

প্রিন্সেস মারি উঠে দরজার দিকে পা বাড়াল; তারপর থেমে বলল:

“আন্দ্রু, তোমার যদি বিশ্বাস থাকত তাহলে সেই ভালবাসা তুমি ঈশ্বরের কাছে চাইতে পারতে যা তোমার নেই, আর তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ হত।”

“কি জানি, হতে পারে!” প্রিন্স আন্দ্রু বলল। “তুমি যাও মাশা; আমি এখনি আসছি।”

বোনের ঘরের দিকে যাবার পথেই মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর দেখা হয়ে গেল। তার মুখে মিষ্টি হাসি। একই দিনে এই তৃতীয়বার নির্জন বারান্দায় মুখে সরল বিমুগ্ধ হাসি নিয়ে সে প্রিন্স আন্দ্রুর সম্মুখীন হল।

যে কারণেই হোক মুখ লাল করে চোখ নামিয়ে সে বলল, “ওহো, আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার ঘরেই আছেন।”

প্রিন্স আন্দ্রু কঠোর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। মুখে ফুটে উঠল ক্রোধের আভাষ। কোন কথা না বলে মেয়েটির চোখের বদলে সে তার কপাল ও চুলের দিকে এমন ঘৃণাভরে তাকাল যে ফরাসিনী মুখ লাল করে কোন কথা না বলেই সেখান থেকে চলে গেল। প্রিন্স আন্দ্রু বোনের ঘরে পৌঁছে খোলা দরজা দিয়ে শুনতে পেল, তার স্ত্রী ইতিমধ্যেই উঠে খুশি মনে অনর্গল কথা বলে চলেছে। যথারীতি ফরাসীতেই সে কথা বলছে; মনে হল, দীর্ঘ সংযমের পরে সে বোধ হয় হারানো সময়টুকুর ক্ষতিপূরণ করতে চাইছে।

“আরে না, কিন্তু ভাব তো, বুড়ি কাউন্টেস জুবোভার মাথায় নকল চুল, আর মুখভরা নকল দাঁত, যেন বুড়ো বয়সকে ফাঁকি দেবার চেষ্টা… হা, হা, হা, মারি!”

অন্ত অনেকের সামনে স্ত্রীর মুখে কাউন্টেস জুবোভা সম্পর্কে এই একই কথা এবং এই একই হাসি প্রিন্স আন্দ অন্তত পাঁচবার শুনেছে। ধীর পায়ে সে ঘরে ঢুকল। গোলগাল, গোলাপী ছোট প্রিন্সেস সেলাইটা হাতে নিয়ে একটা আরাম কেদারায় বসে অনর্গল বলে যাচ্ছে বহুবার বলা পিতার্সবুর্গের

স্মৃতি-কথা। প্রিন্স আন্দ্রু কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে পথের ক্লান্তি কেটে গেছে কিনা জানতে চাইল। কথার জবাব দিয়ে ছোট প্রিন্সেস আবার কিচির-মিচির শুরু করে দিল।

ছয়-ঘোড়ার গাড়িটা কটকে দাঁড়িয়ে আছে। হেমন্তের রাত এত অন্ধকার যে কোচয়ান গাড়ির দণ্ডটা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে না। লণ্ঠন হাতে চাকররা ছুটাছুটি করছে। মস্ত বড় বাড়িটার উঁচু জানালা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ছে। বাড়ির ভূমিদাসরা হল-ঘরে ভিড় করেছে। তরুণ প্রিন্সকে বিদায়সম্ভাষণ জানাতে অপেক্ষা করে আছে। বাড়ির লোকজনরা সব জমায়েত হয়েছে অভ্যর্থনা-ঘরে: মাইকেল আইভানভিচ, মাদময়জেল বুড়িয়েঁ, প্রিন্সেস মারি ও ছোট প্রিন্সেস। প্রিন্স আন্দ্রুর ডাক পড়েছে তার বাবার পড়ার ঘরে, কারণ বাবা তাকে আলাদা করে বিদায় দিতে ইচ্ছুক। সকলেই তাদেব দুজনের জন্য অপেক্ষা করছে।

প্রিন্স আন্দ্রু যখন পড়ার ঘরে ঢুকল বুড়ো মানুষটি তখন তার বুড়ো বয়সের চশমাজোড়া ও সাদা ড্রেসিং-গাউন পরে লেখার টেবিলে বসে ছিল। এ পোশাকে একমাত্র ছেলে ছাড়া আর কারও সঙ্গেই সে দেখা করে না। চারদিক তাকিয়ে শুধাল, "যাচ্ছ?" আবার লিখতে শুরু করল।

"আপনার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।"

"এইখানে চুমো খাও," সে নিজের গালটা দেখাল: "ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!"

"ধন্যবাদ দিচ্ছ কেন?"

"গয়ংগচ্ছ না করার জন্য, আর নারীর আঁচল ধরে ঝুলে না থাকার জন্য। সকলের আগে কর্তব্য। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ!" আবার লিখতে শুরু করল; তার পাখের কলম খসখস করে চলতে লাগল। "তোমার যদি কিছু বলার থাকে তো বলে ফেল। এ দুটো জিনিস এক সঙ্গে চলতে পারে," সে আরও বলল।

"আমার স্ত্রীর ব্যাপারে···এভাবে তাকে আপনার হাতে রেখে যাচ্ছি বলে আমি লজ্জিত···"

"কেন বাজে বকছ? কি চাও তাই বল।"

"তার প্রসবেব সময় হলে তাকে মস্কোতে কোন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ···ততদিন সে এখানেই থাকবে···"

বুড়ো প্রিন্স লেখা থামিয়ে কড়া চোখে এমনভাবে ছেলের দিকে তাকাল যেন তার কথাগুলি বুঝতে পারে নি।

কিছুটা বিচলিত হয়ে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "প্রকৃতি তার কাজ না করলে কেউ কিছু করতে পারে না তা আমি জানি। আমি জানি যে লক্ষ জনের মধ্যে মাত্র একজনের বেলায় গোলমাল হতে পারে, কিন্তু এটা ওরও ইচ্ছা,

আমারও ইচ্ছা। সকলেই ওকে নানা কথা বলছে। ওরও একটা স্বপ্ন আছে, আর ভয়ও পাচ্ছে।"

লেখা শেষ করে প্রিন্স বলল, "হুম্…হুম্…। তাই করব।"

সশব্দে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; তারপর হঠাৎ ছেলের দিকে ঘুরে হাসতে লাগল।

"খুব বাজে ব্যাপার, তাই না?"

"কি বাজে বাবা?"

"এই বৌ!" সংক্ষেপে অর্থপূর্ণভাবে বুড়ো প্রিন্স বলল।

"বুঝতে পারছি না!" প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"তা বটে, কিছু করবার নেই বাপু," প্রিন্স বলল। "ওরা সবাই এক; বিয়ে তো আর ফেরৎ দেওয়া যায় না। ভয় পেয়ো না; কাউকে বলব না, কিন্তু তুমি নিজে তো বোঝ।"

ছোট ছোট হাড়-কঠিন আঙুল দিয়ে ছেলের হাতটা চেপে ধরে নাড়া দিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সোজা তার চোখের দিকে তাকাল, তারপর আবার সেই আড়ষ্ট হাসি হাসতে লাগল।

ছেলে নিঃশ্বাস ফেলল, যেন স্বীকার করল যে বাবা তাকে ঠিকই বুঝেছে। বুড়ো চিঠিটা ভাঁজ করে সিল করতে লাগল; অভ্যস্ত দ্রুততার সঙ্গে মোম, সিল ও কাগজকে একবার তুলতে লাগল, একবার নামাতে লাগল।

চিঠিটা সিল করতে করতেই কাটা-কাটা ভাবে বলল, "কি করতে হবে? সে তো ছেলে মানুষ! সব কিছুই আমিই করব। কোন চিন্তা করো না।"

আন্দ্রু কোন কথা বলল না; বাবা যে তার কথা বুঝতে পেরেছে তাতে সে খুশি হয়েছে, আবার অখুশিও বটে। বুড়ো মানুষটি উঠে দাঁড়িয়ে চিঠিটা ছেলের হাতে দিল।

বলল, "শোন! তোমার স্ত্রীর জন্য চিন্তা করো না; সাধ্যমত সবই করা হবে। এখন শোন! এই চিঠিটা মাইকেল ইলারিয়নভিচকে (কুতুজভ) দিও। তাকে লিখে দিলাম, সে যেন তোমাকে যথাযথ স্থানে বসিয়ে কাজে লাগায়; দীর্ঘকাল অ্যাড্‌জুটান্ট করে না রাখে: সেটা খুব বাজে চাকরি! তাকে বলো, তার কথা আমার মনে আছে, তাকে আমি পছন্দ করি। সে তোমাকে কি ভাবে গ্রহণ করে সেটা আমাকে লিখে জানিও। যদি ভাল ব্যবহার করে—কাজ করো।

নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির ছেলেকে কারও অপ্রীতিভাজন হয়ে তার কাছে চাকরি করতে হবে না। এবার এদিকে এস।"

সে এত তাড়াতাড়ি কথা বলছিল যে অর্ধেক কথাই শেষ হচ্ছিল না; কিন্তু ছেলে তার মুখে এ ধরনের কথা শুনে তা বুঝতে অভ্যস্ত। বুড়ো ছেলেকে ডেস্কের কাছে নিয়ে গেল, ডালাটা তুলল, একটা দেরাজ টেনে বের করল, এবং

মোটা মোটা, বড় বড়, ঘন হাতের লেখায় ভরা একখানা খাতা তুলে নিল।

"আমি হয় তো তোমার আগেই মারা যাব। কাজেই মনে রেখো যে এগুলি আমার স্মৃতিকথা; আমার মৃত্যুর পরে এগুলি সম্রাটের হাতে দিও। আর এই একখানা লোম্বার্ড-বণ্ড (কোম্পানির কাগজ) ও একটা চিঠি, সুভরভ্‌দের যুদ্ধের ইতিহাস যে লিখবে এই সম্মান-দক্ষিণাটা তারই প্রাপ্য হবে। এটাকে অ্যাকাডেমিতে পাঠিয়ে দিও। আর এতে কিছু টুকরো-টুকরো লেখা রইল; আমি মরে যাবার পরে তুমি পড়ো। সেগুলো তোমার কাজে লাগবে।"

বাবা যে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে এ কথাটা আন্দ বলল না। তার মনে হল, কথাটা বলা ঠিক হবে না।

"এ সবই আমি করব বাবা," সে বলল।

"বাস, এবার তাহলে বিদায়!" চুমো খাবার জন্য ছেলের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রিন্স তাকে আলিঙ্গন করল। "একটা কথা মনে রেখো প্রিন্স আন্দ্রু, ওরা যদি তোমাকে মেরে ফেলে তাহলে তোমার এই বুড়ো বাবা মনে আঘাত পাবে।" ···অপ্রত্যাশিতভাবে একটু থেমে তারপরই খুঁতখুঁতে মেজাজে চীৎকার করে বলে উঠল: "কিন্তু যদি শুনি যে নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির ছেলের উপযুক্ত আচরণ তুমি কর নি, তাহলে আমি লজ্জা বোধ করব!"

ছেলে হেসে বলল, "এ কথাটা আমাকে না বললেও পারতেন বাবা।"

বৃদ্ধ চুপ করে রইল।

প্রিন্স আন্দ্রু বলতে লাগল, "আরও একটা কথা আপনাকে বলতে চেয়েছিলাম; আমি যদি মারা যাই, আর আমার যদি ছেলে হয়, তাহলে তাকে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যেতে দেবেন না—সে কথা কালও বলেছি··· সে যেন আপনার কাছেই বড় হয়···দেখবেন।"

"তোমার স্ত্রীও যাতে তাকে নিয়ে যেতে না পারে?" বলেই বুড়ো লোকটি হেসে উঠল।

পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে তারা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বুড়ো মানুষটির চোখ দুটি সরাসরি ছেলের চোখের উপর স্থিরনিবদ্ধ। বুড়ো প্রিন্সের মুখের নীচের দিকটা কুঁচকে উঠল।

তারপর দরজাটা খুলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ জোর গলায় সে চেঁচিয়ে বলল, "বিদায় নেওয়া তো হল। চলে যাও!"

দরজার কাছে প্রিন্স আন্দ্রুকে এবং সাদা ড্রেসিং-গাউন পরা, চশমা-চোখে, পরচুলাবিহীন মাথায় বুড়ো লোকটিকে ক্রুদ্ধ গলায় চীৎকার করতে দেখে মুহূর্তের জন্য তাদের দিকে তাকিয়ে দুই প্রিন্সেসই বলে উঠল, "কি হল? কি হল?"

প্রিন্স আন্দ্রু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল; জবাব দিল না।

স্ত্রীর দিকে ফিরে বলল, "আচ্ছা!"

এই "আচ্ছা" শব্দটা বড়ই নিরুত্তাপ ও ব্যঙ্গাত্মক শোনাল; যেন সে বলত চাইছে: "এবার তোমার নাটক শুরু করে দাও।"

"আন্দ্রু, এখনই!" মুখ কালো করে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ছোট প্রিন্সেস বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে আর্তনাদ করে তার কাঁধের উপর অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

খুব সাবধানে কাঁধটাকে সরিয়ে নিয়ে সে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল; তারপর সযত্নে তাকে আরাম-কেদারায় শুইয়ে দিল।

"বিদায় মারি," প্রিন্স আন্দ্রু নরম গলায় বোনকে কথাটা বলে তার হাতটা ধরে চুমো খেল; তারপর দ্রুত পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোট প্রিন্সেস আরাম-কেদারায় শুয়ে রইল; মাদময়জেল বুরিয়েঁ তার কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যে দরজা দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু বেরিয়ে গেল, অশ্রুপূর্ণ চোখে সে দিকে তাকিয়ে থেকেই প্রিন্সেস মারি ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। পড়ার ঘর থেকে বুড়ো মানুষটির রেগে নাক ঝাড়ার শব্দ আসতে লাগল পিস্তলের গুলির শব্দের মত। প্রিন্স আন্দ্রু চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পড়ার ঘরের দরজাটা খুলে গেল; বুড়ো লোকটির সাদা ড্রেসিং-গাউন-পরা শক্ত দেহটা দরজা দিয়ে মুখ বাড়াল।

বলল, "চলে গেছে? খুব ভাল হয়েছে!" অচৈতন্য ছোট প্রিন্সেসের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে মাথা নাড়ল, তারপরই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

দ্বিতীয় পর্ব

অধ্যায়—১

১৮০৫ সালের অক্টোবর মাসে একটি রুশ বাহিনী অস্ট্রীয়ার একটি অঞ্চলের গ্রাম ও শহর দখল করে বসেছিল ; আরও কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য সদ্য সদ্য রাশিয়া থেকে এসে ব্রাউনাউ দুর্গের কাছে শিবির ফেলে স্থানীয় লোকজনদের ঘাড়ে চেপে বসছিল। ব্রাউনাউ প্রধান সেনাপতি কুতুজভ-এর মূল ঘাঁটি।

১৮০৫ সালের ১১ই অক্টোবর একটি পদাতিক রেজিমেণ্ট সবেমাত্র ব্রাউনাউ পৌঁছে শহর থেকে আধ মাইল দূরে প্রধান সেনাপতির পরিদর্শনের জন্য অপেক্ষা করছিল। জায়গাটা এবং তার পরিবেশ—ফলের বাগান, পাথরের বেড়া, টালির ছাদ, দূরে দূরে পাহাড়ের সাড়ি—সব কিছুই দেখতে অ-রুশীয় ; যে সব স্থানীয় অধিবাসী সকৌতুকে সৈন্যদের দেখছিল তারাও রুশীয় নয় ; তবু রেজিমেণ্টটিকে দেখতে রাশিয়ার অভ্যন্তরে পরিদর্শনের জন্য প্রতীক্ষারত যে কোন রুশ রেজিমেণ্টেরই মত।

অভিযানের শেষ দিন সন্ধ্যায় হুকুম এসেছে, যাত্রাপথেই প্রধান সেনাপতি রেজিমেণ্টটি পরিদর্শন করবেন। যদিও হুকুম-নামার কথাগুলি রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কাছে খুব পরিষ্কার নয়, এবং সৈন্যরা অভিযানরত অবস্থায়ই থাকবে কিনা সে প্রশ্নও উঠেছিল, তবু বিভাগীয় সেনাপতিদের মধ্যে পরামর্শক্রমে স্থির হয়েছে, "কিছুটা নাচু হয়ে অভিবাদন জানানোর চাইতে বেশীনীচু হয়ে অভিবাদন জানানোই ভাল"—এই নীতি অনুসরণ করে রেজিমেণ্টকে অভিযানরত অবস্থায় উপস্থিত করাই শ্রেয়। কাজেকাজেই বিশ মাইল মার্চ করে আসার পরেও সৈন্যরা চোখের পাতা না বুজিয়ে সারা রাত ধরে পোশাক-আশাক মেরামত ও পরিষ্কার করল, অ্যাডজুটাণ্ট ও কোম্পানি-কম্যাণ্ডাররা নানা রকম হিসাব-নিকাশ করল, এবং সকাল বেলা দেখা গেল, আগের দিন শেষ অভিযানের পরে রেজিমেণ্টটি যে রকম বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল জনতায় পরিণত হয়েছিল তার পরিবর্তে দেখা দিয়েছে দু হাজার মানুষের একটি সুশৃংখল সমাবেশ—তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থান ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন, প্রতিটি বোতাম ও প্রতিটি পেটি যথাস্থানে রক্ষিত হয়ে পরিচ্ছন্নতায় ঝকঝক করছে। সবকিছু যে বাইরে থেকেই দেখতে সুশৃংখল তাও নয়, প্রধান সেনাপতি যদি ইউনিফর্মের ভিতরটাও পরীক্ষা করে দেখতে চায় তাহলে দেখতে পাবে, প্রতিটি লোকের গায়ে পরিষ্কার সার্ট, আর তাদের কাঁধের প্রতিটি ঝোলায় নির্দিষ্ট সংখ্যক সব জিনিস—সৈনিকদের ভাষায় যাকে বলে "জুতো সেলাইয়ের কাঁটা, সাবান ও সব—মজুত আছে। কেবল একটা বিষয়ে সকলের মনেই অস্বস্তি রয়েছে। সেটা সৈন্যদের বুটের অবস্থা। অর্ধেকের বেশী সৈন্যের.

বুটে ফুটো হয়ে গেছে। কিন্তু এর কারণ রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারদের কোন রকম ত্রুটি নয়; বার বার জানানো সত্ত্বেও অস্ট্রীয় রসদ সরবরাহ বিভাগ বুট পাঠায় নি, আর রেজিমেণ্টটি মার্চ করে এসেছে সাতশ' মাইলের মত।

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার লোকটি বয়স্ক, কোপণস্বভাব, মজবুত গড়ন, অভিজ্ঞ; ভুরু ও জুল্‌ফি ধূসর, এবং ঘাড়-গর্দান অপেক্ষা বুক ও পিঠের দিকটা বেশী চওড়া। পরনে তকতকে নতুন ইউনিফর্ম, তার প্রতিটি ভাঁজ চোখে পড়ে, সোনার মোটা স্কন্ধত্রাণ চওড়া কাঁধের উপর এলিয়ে না পড়ে খাড়া হয়ে আছে। তার ভঙ্গীখানাই এমন যেন মনের হরষে জীবনের একটি গভীর কর্তব্য সে পালন করছে। সে সৈন্যদের সামনে দিয়ে চলাফেরা করছে, আর প্রতিটি পদক্ষেপে পিঠটাকে ঈষৎ বেঁকিয়ে নিজেকে সোজা করে রাখছে। পরিষ্কার বোঝা যায়, কম্যাণ্ডার তার রেজিমেণ্টকে প্রশংসা করে, তাকে নিয়ে তার মন খুব খুশি, সারাটা মন তাকে নিয়েই মেতে আছে; কিন্তু তার গর্বিত চলন দেখে মনে হয়, সামরিক বিষয়াদি ছাড়া সামাজিক স্বার্থ এবং সুন্দরী নারীরাও তার চিন্তার অনেকখানি জুড়ে রয়েছে।

একজন ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডার হাসি মুখে এগিয়ে যাচ্ছিল (দেখে বোঝা যায়, এরা দুজনই বেশ সুখী); তাকে লক্ষ্য করে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার বলল, "আরে, মাইকেল মিত্রিচ, স্যার? কাল রাতে তো হাতে অনেক কাজ ছিল। যাহোক, রেজিমেণ্টটা মন্দ নয়, কি বলেন?"

ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডার হাস্যকর ব্যঙ্গটি ধরতে পেরে হেসে উঠল।

"জারিৎসিন প্রান্তরে একে রণক্ষেত্র থেকে হটিয়ে দেওয়া যাবে না।"

"কি বললেন?" কম্যাণ্ডার প্রশ্ন করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে শহরের দিক থেকে আসবার যে রাস্তায় সংকেত-প্রেরকদের বসানো হয়েছিল সেই রাস্তায় দুটি অশ্বারোহীকে দেখা গেল। তাদের একজন এড্‌-ডি-কং, তার পিছনে একজন কসাক।

আগের দিনের হুকুম-নামায় ভাষার গোলমাল ছিল বলে আজ এড্‌-ডি-কংকে পাঠিয়ে পরিষ্কার করে জানানো হচ্ছে যে, রেজিমেণ্টটি যেভাবে মার্চ করে আসছিল প্রধান সেনাপতি ঠিক সেই অবস্থাতেই সেটাকে পরিদর্শন করতে ইচ্ছুক: পরনে থাকবে গ্রেট-কোট, কাঁধে ঝোলা; কোন রকম তৈরী হওয়া চলবে না।

আগের দিন হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ-এর জনৈক সদস্য ভিয়েনা থেকে এসে কুতুজভ-এর কাছে প্রস্তাব ও দাবী রেখেছে, সে যেন আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড ও ম্যাক-এর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়, আর কুতুজভ এই যোগ দেওয়াটাকে যুক্তিযুক্ত বিবেচনা না করায় অন্যান্য যুক্তির সঙ্গে এটাও স্থির করেছে যে রাশিয়া থেকে আসতে এই সৈন্যদের অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হয়েছে সেটাও অস্ট্রীয় সেনাপতিকে দেখিয়ে দেওয়া হোক। এই উদ্দেশ্য নিয়েই সে রেজিমেণ্ট

পরিদর্শনে আসতে চেয়েছে ; কাজেই রেজিমেণ্টের অবস্থা যত শোচনীয় হবে, প্রধান সেনাপতি ততই খুশি হবে। এড্‌-ডি-কং এসব কথা জানত না ; তবু সে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিল, সৈন্যদের পরনে গ্রেট-কোট থাকবে, আর তারা অভিযানরত অবস্থায় থাকবে ; অন্যথায় প্রধান সেনাপতি অসন্তুষ্ট হবেন। এ কথা শুনে রেজিমেণ্ট-সেনাপতি মাথা নীচু করল, নীরবে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল, সক্রোধে হাত দুটো ছড়িয়ে দিল।

বলে উঠল, "সবই তো তালগোল পাকিয়ে ফেলেছি!"

তিরস্কারের সুরে ব্যাটেলিয়ান-কম্যাণ্ডারকে বলল, "এখন বুঝুন! আমি বলি নি মাইকেল মিত্রিচ যে 'অভিযানরত অবস্থা' মানেই গায়ে গ্রেট-কোট থাকবে?" কয়েক পা এগিয়ে আবার বলল, "হা ঈশ্বর!" তারপর হুকুমে অভ্যস্ত ভঙ্গীতে হাঁক দিল, "কোম্পানি-কম্যাণ্ডারগণ! সার্জেণ্ট মেজরগণ!...কতক্ষণে তিনি এখানে পৌঁছবেন?" সসম্মানে সে এড্‌-ডি-কংকে জিজ্ঞাসা করল।

"তা বলা যায় এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

"পোশাক বদলাবার সময় পাব তো?"

"আমি জানি না, জেনারেল...।"

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার স্বয়ং সৈনিকদের কাছে গিয়ে প্রত্যেককে গ্রেট-কোট পরে নিতে বলল। কোম্পানি-কম্যাণ্ডাররা তাদের সেনাদলের কাছে ছুটল, সার্জেণ্ট মেজররা হৈ-চৈ শুরু করে দিল (গ্রেট-কোটগুলোর অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না), আর সঙ্গে সঙ্গে সেনাদলের মধ্যে যে শৃংখলা ও নীরবতা ছিল তার জায়গায় দেখা দিল ছুটাছুটি আর কলরব। সৈন্যরা চারদিকে ছুটাছুটি শুরু করল, কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথার উপর দিয়ে পট্টি গলিয়ে থলে তুলে নিল, ওভার-কোটের পট্টি খুলে নিয়ে হাত তুলে পট্টির আস্তিন পরতে লাগল।

আধঘণ্টার মধ্যে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার ঝুঁকে পা ফেলে সেনাদলের সামনে হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে সব কিছু দেখে নিল।

"এটা কি হয়েছে? এটা!" চীৎকার করে উঠে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। "তৃতীয় কোম্পানির কম্যাণ্ডার!"

"সেনাপতি তৃতীয় কোম্পানির কম্যাণ্ডারকে চাইছেন!...কম্যাণ্ডার দেখা করুন সেনাপতির সঙ্গে...তৃতীয় কোম্পানি দেখা করুন কম্যাণ্ডারের সঙ্গে।" কথাগুলি সেনাদলের মারফৎ পাঠানো হল, আর অ্যাডজুটাণ্ট নিখোঁজ অফিসারকে খুঁজতে ছুটল।

কথাগুলি যথাস্থানে পৌঁছবার পর নিখোঁজ অফিসারটি তার কোম্পানির পিছন থেকে বেরিয়ে এল। লোকটি মাঝ-বয়সী ; দৌড়নো অভ্যাস নেই ; তবু হোঁচট খেতে খেতে হাস্যকরভাবে সেনাপতির দিকে ছুটতে লাগল।

স্কুলের ছেলেকে না-শেখা পড়া বলতে বললে তার মুখের যে রকম ভাব হয় সেই ভাব ফুটে উঠেছে ক্যাপ্টেনটির মুখে। নাকের উপর দাগ পড়েছে; অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে নাকটা লাল হয়ে উঠেছে; মুখটা বেঁকে-বেঁকে যাচ্ছে। কাছাকাছি এসে আস্তে পা ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে উপস্থিত হলে সেনাপতি মাথা থেকে পা পর্যন্ত ক্যাপ্টেনকে দেখতে লাগল।

“আপনি তো অচিরেই আপনার সৈন্যদের পেটিকোট পরাবেন দেখছি! এ সব কি?” তৃতীয় কোম্পানির নীল কাপড়ের গ্রেট-কোট পরা একটি সৈনিককে দেখিয়ে চোয়াল বের করে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার চীৎকার করে বলল। “কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? প্রধান সেনাপতির আসবার কথা, আর আপনি নিজের জায়গা ছেড়ে চলে গেছেন? অ্যাঁ? প্যারেডে সৈন্যদের কি ভাবে ফ্যান্সি কোটে সাজাতে হয় আপনাকে শিখিয়ে দেব। ...অ্যাঁ...?”

কোম্পানি-কম্যাণ্ডার ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে দুটো আঙ্গুলে টুপিটাকে এমনভাবে চাপতে লাগল যেন সেই চাপের উপরেই তার রক্ষা পাবার একমাত্র আশা নির্ভর করছে।

“কি হল, কথা বলছেন না কেন? হাঙ্গেরীয় পোশাক পরা লোকটাকে কোথা থেকে জোটালেন?” গম্ভীর বিদ্রূপের সুরে কম্যাণ্ডার বলল।

“ইয়োর এক্সেলেন্সি...”

“ইয়োর এক্সেলেন্সি কি? ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সির ব্যাপারটা কি?...কেউ জানে না।”

ক্যাপ্টেন নরম গলায় বলল, “ইয়োর এক্সেলেন্সি, এই অফিসার দলখভকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।”

“আচ্ছা? তা—তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কি ফিল্ড-মার্শালের পদে, না কি একজন সৈনিকের পদে? সৈনিক হলে তো অন্য সকলের মতই নিয়মমাফিক ইউনিফর্মই তারও পরা উচিত।”

“ইয়োর এক্সেলেন্সি, মার্চের সময় সে অনুমতি তো আপনি নিজেই দিয়েছিলেন।”

“অনুমতি দিয়েছিলাম? অনুমতি? আপনার মত যুবকদের মত কথাই বটে,” একটু নরম হয়ে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার বলল। “অনুমতিই বটে... একজন কি বলল আর আপনিও...কি বলেন?” অধিকতর বিরক্ত হয়ে সে বলে উঠল, “মিনতি করে বলছি, আপনার সৈন্যদের একটু ভালভাবে পোশাক পরাবেন।”

অ্যাডজুটাণ্টকে দেখবার জন্য মুখ ঘুরিয়ে কম্যাণ্ডার সেই দিকে পা চালিয়ে দিল। এতটা রাগ দেখাতে পেরে সে নিজেই বেশ খুশি হয়েছে; আরও রাগ দেখাবার একটা অজুহাত পাবার জন্য সে সৈন্যদলের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। ব্যাজটা অপরিষ্কার থাকার জন্য-একজন অফিসারকে এবং লাইনটা

সোজা না থাকার জন্য অপর একজনকে বকুনি দিয়ে সে তৃতীয় কোম্পানির কাছে গিয়ে হাজির হল।

নীল-ধূসর ইউনিফর্ম পরা দলখভ-এর কাছ থেকে পাঁচটি সৈন্যের আগে পৌঁছেই যন্ত্রণা-কাতর গলায় কম্যাণ্ডার চেঁচিয়ে উঠল, “কে-ম-ন ভাবে দাঁড়িয়ে আছ? তোমার পা কোথায়?”

পরিষ্কার উদ্ধত দুটি চোখ সোজা সেনাপতির মুখের উপর রেখে দলখভ ধীরে ধীরে তার বাঁকা হাঁটুটাকে সোজা করল।

“নীল কোট কেন? ওটা খুলে ফেল···সার্জেন্ট-মেজর! ওর কোটটা পাল্টে দিন···রাস্···” কথাটা সে শেষ করল না।

“সেনাপতি, হুকুম মানতে আমি বাধ্য, কিন্তু অপমান···” দলখভ তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলল।

“কোন কথা নয়।···কোন কথা নয়, কোন কথা নয়!”

“অপমান সহ্য করতে বাধ্য নই,” ঝাঁঝালো উচ্চগ্রামে দলখভ তার কথাটা শেষ করল।

সেনাপতি ও সৈনিকের চোখে চোখ পড়ল। সেনাপতি চুপ করে গেল; রেগে আঁটো গলাবন্ধটাকে টেনে নামিয়ে দিল।

মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতে যেতে বলল, “তোমাকে অনুরোধ করে বলছি, কোটটা বদলে ফেল।”

অধ্যায়—২

সেই মুহূর্তে সংকেত-জ্ঞাপক হাঁক দিল, “তিনি আসছেন!”

মুখটা লাল করে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার ছুটে ঘোড়ার কাছে গিয়ে কম্পিত হাতে পা-দানিটা ধরে জিনের উপর উঠে ঠিক হয়ে বসল, তলোয়ারখানা খুলল, এবং খুশি-খুশি দৃঢ় মুখে হাঁক দেবার জন্য প্রস্তুত হল। পরিষ্কার পাখনা-মেলা পাখির মত একবার ঝটপটিয়েই গোটা রেজিমেণ্ট একেবারে চুপ করে গেল।

আত্মা-কাঁপানো গলায় রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার হাঁক দিল, “·।” সে হাঁকে একযোগে ফুটে উঠল তার নিজের আনন্দ, রেজিমেণ্টের কঠোরতা, আর আগতপ্রায় প্রধানের প্রতি অভ্যর্থনা।

চওড়া গ্রাম্য পথের দু'ধারে গাছের সারি; সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছে ছয় ঘোড়ায় দুলকি চালে টানা একটা উঁচু হাল্কা-নীল রঙের ভিয়েনা-গাড়ি। তার পিছনে একদল অশ্বারোহী ও অন্যান্য সৈনিক। কুতুজভ-এর পাশে বসে আছে একজন অস্ট্রীয় সেনাপতি; রুশদের কালো ইউনিফর্মের মধ্যে তার সাদা ইউনিফর্মটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে। রেজিমেণ্টের সামনে এসে গাড়িটা থামল।

কুতুজভ ও অস্ট্রীয় সেনাপতি নীচু গলায় আলাপ করছিল ; কুতুজভ ঈষৎ হেসে ভারী পা ফেলে এমনভাবে গাড়ি থেকে নামল যেন এই যে দু'হাজার লোক রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকে দেখছে তাদের এবং রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কোন অস্তিত্বই নেই ।।

সামরিক নির্দেশ ধ্বনিত হল ; সৈন্যদের অস্ত্রের ঝন্‌ঝনার সঙ্গে গোটা রেজিমেণ্ট আর একবার দুলে উঠল। তারপর মৃত্যু-স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল প্রধান সেনাপতির দুর্বল কণ্ঠস্বর। রেজিমেণ্ট যেন গর্জে উঠল, "ইয়োর এক্স-এ-লে-ন্সি, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি!" তারপর আবার সব নিশ্চুপ। রেজিমেণ্ট চলতে শুরু করল ; কুতুজভ তখনও নিশ্চল দাঁড়িয়ে ; তারপর সাদা ইউনিফর্মধারী সেনাপতিকে সঙ্গে নিয়ে সেও সদলবলে সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল।

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার যে ভাবে চাটুকারের মত এগিয়ে গিয়ে প্রধান সেনাপতিকে অভিবাদন জানাল ও দুই চোখ মেলে তাকে যেন গিলতে লাগল, যে ভাবে ঝুঁকে ঝুঁকে টলতে টলতে এগিয়ে গেল, প্রধান সেনাপতির প্রতিটি কথা ও ভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে ছুটে সামনে গেল, তা থেকেই বোঝা গেল যে কম্যাণ্ডার হিসাবে তার কর্তব্যের চাইতেও একজন অধীনস্থ কর্মচারীর মতই অতিউৎসাহে সে কাজগুলি করছে। রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের কঠোরতা ও প্রগাঢ় মনোযোগকে ধন্যবাদ, সেই সময়ে অন্য যে সব রেজিমেণ্ট ব্রাউনাউতে পৌঁচেছিল তাদের তুলনায় এই রেজিমেণ্টটির অবস্থা ছিল চমৎকার। অসুস্থ ও পিছিয়ে-পড়া সৈন্য ছিল মাত্র ২১৭ জন। একমাত্র বুট ছাড়া আর সবকিছুই ঠিক ঠিক অবস্থায় ছিল।

কুতুজভ সৈন্যদের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলল ; কখনও তুরস্কের যুদ্ধে পূর্ব-পরিচিত অফিসারদের সঙ্গে দু'চারটি বন্ধুত্বপূর্ণ কথা বলল, কখনও বা কথা বলল সৈনিকদের সঙ্গে। তাদের বুটের দিকে তাকিয়ে বার কয়েক দুঃখিতভাবে মাথা নাড়ল ; মুখের এমন ভাব করে সেদিকে অস্ট্রীয় সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করল যেন বলতে চাইল যে সে কাউকেই দোষ দিচ্ছে না, আবার এই শোচনীয় অবস্থাটা লক্ষ্য না করেও পারছে না। পাছে তার রেজিমেণ্ট সম্পর্কে একটি কথাও তার কানকে এড়িয়ে যায় এই ভয়ে সেরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রেই রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার ছুটে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কুতুজভ-এর প্রতিটি কথা যাতে শোনা যায় ততটা দূরত্ব বজায় রেখে দলের প্রায় বিশ জন তার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। প্রধান সেনাপতির সব চাইতে কাছাকাছি চলেছে একজন সুদর্শন অ্যাডজুটাণ্ট। সেই প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি। তার পরেই রয়েছে তার বন্ধু নেস্‌ভিৎস্কি ; লম্বা একজন স্টাফ-অফিসার, খুব শক্ত-সমর্থ, সদা হাসি-ভরা সুন্দর মুখ, আর ভেজা-ভেজা চোখ। তার পাশেই হেঁটে চলেছে একজন কালো-কালো হুস্সার অফিসার ; লোকটির ভাবভঙ্গী দেখে নেস্‌ভিৎস্কি হাসি সামলাতে পারছে না।

হুজারের মুখটা গম্ভীর, হাসি নেই, স্থির দৃষ্টিতে ভাবের কোন পরিবর্তন নেই ; রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের পিঠের দিকে তাকিয়ে সে অনবরত তার চলাফেরার নকল করে চলেছে। কম্যাণ্ডার যতবার ছুটে গিয়ে সামনে ঝুঁকছে, ততবারই হুজারটি অবিকল সেইভাবে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াচ্ছে। নেস্‌ভিৎস্কি হাসছে আর অন্যদের খোঁচা মেরে ভাড়ামিটা দেখাচ্ছে।

কুতুজভ ধীরে ধীরে আলস্য ভরে হেঁটে চলেছে ; তাদের প্রধানকে দেখবার জন্য হাজার হাজার চোখ যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে। তৃতীয় কোম্পানির কাছে পৌঁছে সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দলের লোকেরা এটা আশা করে নি ; তাই তারা আপনা থেকেই তার অনেকটা কাছে এসে পড়ল।

নীল গ্রেটকোটের জন্য যাকে তিরস্কার করা হয়েছিল সেই লাল-নাক ক্যাপ্টেনকে চিনতে পেরে সে বলল, "আরে, তিমখিন !"

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার যখন তিরস্কার করেছিল তখন তিমখিন যতটা টান-টান হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার চাইতে টান-টান হওয়া কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয় বলেই মনে হয়েছিল ; কিন্তু এখন প্রধান সেনাপতি যখন তার সঙ্গে কথা বলল তখন সে এত বেশী টান-টান হল যাতে মনে হল যে প্রধান সেনাপতি কথা চালিয়ে গেলে সে আর তাল রাখতে পারত না। কুতুজভও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবং তার ভাল ছাড়া মন্দ চায় না বলে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে গেল ; তার ক্ষত-চিহ্নিত ফোলা মুখে এক টুকরো হাসি খেলে গেল।

সে বলল, "আর একটি ইসমাইলের বন্ধু। একটি সাহসী অফিসার ! আপনি কি ওকে নিয়ে সন্তুষ্ট ?" সে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করল।

হুজার অফিসার যে পিছন থেকে তাকে আয়নার মত নকল করছে সেটা না বুঝতে পেরে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার সামনে এগিয়ে গিয়ে জবাব দিল : "অত্যন্ত সন্তুষ্ট ইয়োর এক্সেলেন্সি !"

চলে যেতে যেতে কুতুজভ হেসে বলল, "আমাদের সকলেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছেই। এক সময়ে ব্যাকস (রোমের সুরা-দেবতা)-এর প্রতি ওর বিশেষ টান ছিল।

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের ভয় হল, এ দোষে সেও তো দোষী ; তাই কোন জবাব দিল না। ঠিক সেই সময়েই হুজারটি লাল-নাক ক্যাপ্টেনের মুখ ও পেটের দিকে লক্ষ্য করে তার ভাবভঙ্গীর এমন অবিকল নকল করতে লাগল যে নেস্‌ভিৎস্কি না হেসে পারল না। কুতুজভ ঘুরে দাঁড়াল। নিজের মুখের উপর অফিসারটির সম্পূর্ণ দখল ছিল ; তাই কুতুজভ মুখ ফেরাবার আগেই সে একবার মাত্র ভেংচি কেটে মুখে একটা গম্ভীর, শ্রদ্ধাশীল ও সরল ভাব জাগিয়ে তুলতে পারল।

তৃতীয় কোম্পানিটিই শেষ। যেন কোন কিছু মনে করতে চেষ্টা করছে এমনিভাবে কুতুজভ চুপ করে ভাবতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু দলের ভিতর

থেকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ফরাসীতে আস্তে বলল :

"অফিসার দলখভ-এর কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে বলেছিলেন ; এই রেজিমেণ্টেই সেই লোকটির পদাবনতি ঘটানো হয়েছে।"

"দলখভ্ কোথায় ?" কুতুজভ জানতে চাইল।

দলখভ্ ইতিমধ্যেই সৈনিকের ধূসর গ্রেটকোট গায়ে চড়িয়েছে। সে ডাকের অপেক্ষায় রইল না। পরিষ্কার নীল চোখ ও সুন্দর চুল সহ একটি সুগঠিত মূর্তি সেনাদলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে প্রধান সেনাপতির কাছে গিয়ে সশস্ত্র অভিবাদন জানাল।

"তোমার কি কোন নালিশ আছে ?" কুতুজভ ঈষৎ ভ্রূকুটি করে প্রশ্ন করল।

"এই দলখভ্," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"ওঃ !" কুতুজভ বলল। "আশা করি এতেই তোমার শিক্ষা হবে। কর্তব্য করে যাও। সম্রাট উদার, আর তুমি উপযুক্ত হলে আমিও তোমাকে ভুলব না।"

পরিষ্কার, নীল দুটি চোখ যে ভাবে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের দিকে তাকিয়েছিল, ঠিক তেমনি সাহসের সঙ্গে তাকাল প্রধান সেনাপতির দিকেও ; চিরাচরিত প্রথার যে যবনিকাটা প্রধান সেনাপতি ও একটি সাধারণ সৈনিকের মধ্যে এত বড় ব্যবধান সৃষ্টি করে, তার চোখের সেই দৃষ্টি যেন তাকে ছিঁড়ে ফেলতে চাইল।

ইচ্ছা করেই দৃঢ়, অনুরণিত স্বরে দলখভ বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার একটা সুযোগ আমি চাই ; মহামান্য সম্রাট ও রাশিয়ার প্রতি আমার অনুরাগ প্রমাণ করতে চাই।"

কুতুজভ সেখান থেকে সরে গেল। চোখের যে হাসি হেসে সে ক্যাপ্টেন তিমখিন-এর কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, সেই একই হাসি খেলে গেল তার মুখে। মুখটা বেঁকিয়ে সে সরে গেল ; যেন বলতে চাইল, তাকে দলখভ্-এর যা কিছু বলার আছে এবং সে দলখভ্কে যা কিছু বলতে পারে সে সবই তার জানা আছে, সে সব শুনে শুনে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর শুনতে চায় না। মুখ ফিরিয়ে সে গাড়িতে উঠে বসল।

রেজিমেণ্ট নানা দলে ভাগ হয়ে ব্রাউনাউ-য়ের নিকটবর্তী যার যার নির্দিষ্ট বাসাবাড়িতে চলে গেল। আশা আছে, সেখানে তারা বুট পাবে, পোশাক পাবে, কঠোর অভিযানের পরে বিশ্রাম পাবে।

তৃতীয় কোম্পানি বাসাবাড়ির দিকে চলেছে। ঘোড়ায় চেপে তাদের ধরে ফেলে ক্যাপ্টেন তিমখিন-এর কাছে পৌঁছে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার বলল, "তুমি আমার উপর রাগ করো নি তো প্রোখর ইগ্নাতিচ ? (পরিদর্শন ভালভাবে

শেষ হওয়ায় রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের মুখটা অদম্য খুশিতে ঝলমল করছে।) সম্রাটের চাকরির রীতিই এই।…কোন উপায় নেই…প্যারেডের সময় কখনও কখনও কিছুটা তাড়াহুড়া করতেই হয়…আমিই প্রথম ক্ষমা চাইছি, তুমি তো আমাকে চেন! …তিনি খুব খুশি হয়েছেন!" ক্যাপ্টেনের দিকে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"ও কথা বলো না সেনাপতি; অতটা সাহস আমার হত না!" ক্যাপ্টেন জবাব দিল। তার নাকটা আরও লাল হয়ে উঠল; ইসমাইল-এ বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে তার সামনের যে দুটো দাঁত উড়ে গিয়েছিল, হেসে ওঠায় সে জায়গাটা বেরিয়ে পড়ল।

"আর মিঃ দলখভকে বলো তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমি তাঁকে ভুলব না। দয়া করে আমাকে জানিও—আমি নিজেই জানতে চাই—তাঁর আচার-ব্যবহার কেমন থাকে; আর সাধারণভাবে…"

তিমখিন বলল, "চাকরির ক্ষেত্রে লোকটি খুবই খুঁতখুঁতে ইয়োর এক্সেলেন্সি; কিন্তু তার চরিত্র…।"

"চরিত্রের বিষয়ে কি জানতে চাও?" রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার জিজ্ঞাসা করল।

ক্যাপ্টেন জবাব দিল, "সে এক একদিন এক এক রকম। একদিন বেশ বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, সৎস্বভাব। আবার পরের দিনই একটা বুনো জন্তু। …পোল্যাণ্ডে তো একজন ইহুদিকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।"

"আহা, ঠিক আছে, ঠিক আছে!" রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার বলে উঠল। "তথাপি একটি যুবক বিপদে পড়লে তাকে তো দয়া করতেই হবে। তুমি তো জান, অনেক ভাল ভাল লোকের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। …অতএব তুমি শুধু…"

"তা করব ইয়োর এক্সেলেন্সি," তিমখিন বলল; মুখের হাসিটা দিয়েই সে বুঝিয়ে দিল যে কম্যাণ্ডারের মনের ইচ্ছা সে বুঝতে পেরেছে।

"আরে, সে তো বটেই, সে তো বটেই!"

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার সৈন্যদের ভিতর থেকে দলখভকে খুঁজে বের করে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তাকে বলল:

"পরবর্তী ব্যাপারের পরেই…স্কন্ধত্রাণ।"

দলখভ চারদিকে তাকাল, কিছু বলল না, আবার ঠোঁটের বিদ্রূপের হাসিটিও বদলাল না।

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার বলতে লাগল, "আচ্ছা, তাহলে সব ঠিক হয়ে গেল।" তারপর যাতে সৈন্যরা সকলেই শুনতে পায় সেইভাবে বলল, "প্রত্যেক সৈন্যকে এক পেয়ালা ভদ্‌কা আমি দেব। সকলকে ধন্যবাদ। ঈশ্বরের জয় হোক!" ঘোড়া ছুটিয়ে সে কোম্পানিকে পার হয়ে সে পরেরটাকে ধরল।

পাশের অধীনস্থ সাব-অণ্টার্ণকে তিমখিন বলল, "দেখ হে, লোকটি সত্যি

ভাল ; ওর অধীনে কাজ করা চলে।"

"এক কথায়, রাজা লোক⋯" সাব-অন্টার্ণ হেসে বলল (সকলে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারকে "হরতনের রাজা" বলে ডাকে)।

পরিদর্শনের পরে অফিসারদের খুশির মেজাজ সৈন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। সৈন্যরা মনের আনন্দে এগিয়ে চলল।

"অথচ তারা বলেছিল, কুতুজভ-এর এক চোখ কানা?"

"তাই তো! একেবারে কানা!"

"না বন্ধু, তার চোখ তোমার চাইতে অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। বুট, পায়ের পট্টি⋯সব তার নজরে পড়ে।⋯"

"তিনি যখন আমার পায়ের দিকে তাকালেন বন্ধু,⋯আরে, ধরেই ফেললেন যে আমি⋯"

"আর তার সঙ্গী অপর লোকটি, সেই অস্ট্রীয় ভদ্রলোক, দেখলেই মনে হয় যেন খড়ির গুঁড়ো মাখানো—একেবারে ময়দার মত সাদা! আমার মনে হয়, লোকে যেমন বন্দুক পালিশ করে তেমনি তাকেও ঠেসে পালিশ করে।"

"আমি বলি, ফেডেশন! ⋯তিনি কি বললেন যুদ্ধ কখন শুরু হবে? তুমি তো কাছেই ছিলে। সকলেই বলছে, বোনাপার্ত স্বয়ং ব্রাউনাউতে ছিল।"

"বোনাপার্ত স্বয়ং! ওই বোকার কথা তুমি শুনছ! তিনি তো কিছুই জানেন না! এখন প্রাশিয়া যুদ্ধে নেমেছে। অস্ট্রীয়া তাদের ঘায়েল করছে। তারা ঘায়েল হলে তবে বোনাপার্তের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হবে। আর তিনি বলছেন বোনাপার্ত ব্রাউনাউতে হাজির! বোঝা যাচ্ছে, তুমিও মুখ্খু। আরও ভাল করে শোনা উচিত ছিল!"

"এই তদারককারী লোকগুলো কী শয়তান! দেখ, পঞ্চম কোম্পানিটি এর মধ্যেই গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ⋯আমরা বাসাবাড়িতে পৌঁছবার আগেই ওদের সব রান্নাবান্না শেষ হয়ে যাবে।"

"তুমি শয়তান, একটা বিস্কুট তো দাও!"

"কাল কি আমাকে তামাকু দিয়েছিলে? এই রকমই হয় বন্ধু। ঠিক আছে, এই নাও।"

"এখানেই তো থামালে পারত ; নইলে তো না খেয়ে আরও চার মাইল ছুটতে হবে।"

"ঐ জার্মানরা যখন আমাদের গাড়িতে তুলে নিয়েছিল তখন কী মজাই হয়েছিল! চুপচাপ বসে থাক, আর হুটহুট চলে যাও।"

"আরে বন্ধু, এখানকার লোকগুলো একেবারে ভিখারি। সেখানে তারা ছিল পোল—সবাই রাশিয়ার রাজার অধীন—কিন্তু এখানে সকলেই খাস জার্মান।"

ক্যাপ্টেনের হুকুম শোনা গেল : "গায়করা সামনে এস!"

অমনি বিভিন্ন দল থেকে প্রায় বিশজন সামনে এগিয়ে গেল। তাদের নেতা একজন ভেরীবাদক; গায়কদের দিকে মুখ করে সবেগে হাত নেড়ে সে একটা লম্বা সৈনিক-সঙ্গীত শুরু করে দিল। গানের শুরুতে: "সকাল হল, সূর্য উঠল" আর শেষে: "এবার ভাই হো, চল গৌরবের পথে; সামনে মোদের আছে ফাদার কামেন্স্কি।" গানটি রচনা করা হয়েছিল তুর্কী অভিযানের সময়; এখন গাওয়া হচ্ছে অস্ট্রীয়াতে; পরিবর্তনের মধ্যে শুধু "ফাদার কামেন্স্কি'র জায়গায় বসানো হয়েছে "ফাদার কুতুজভ"।

শেষের কথাগুলি এক সঙ্গে ছুঁড়ে দিয়ে এবং যেন কোন কিছু মাটিতে ছুঁড়ে দিচ্ছে এমনিভাবে হাতটা দুলিয়ে ভেরীবাদক কড়া চোখে গায়কদের দিকে চোখ গোল-গোল করে তাকাল। যখন বুঝল যে সকলে একদৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে তখন সে হাত দুটিকে এমনভাবে তুলল যেন কোন অদৃশ্য মূল্যবান জিনিসকে সযত্নে তুলছে, আর তার পরেই হঠাৎ সেটাকে নীচে ছুঁড়ে দিয়ে গান ধরল:

"কুঞ্জবন, আমার কুঞ্জবন···।"

"আমার নতুন কুঞ্জবন···!" আরও বিশ জন তাতে সুর মেলাল; আর মন্দিরাবাদকটি তার ভারী যন্ত্র নিয়ে ছুটে সকলের সামনে এগিয়ে গেল, আর এমনভাবে ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে যন্ত্রটা ঘুরাতে লাগল যেন কাউকে ভয় দেখাচ্ছে। সৈন্যরা দুই হাত দুলিয়ে তালে তালে পা ফেলে চলতে লাগল। সৈন্যদের পিছনে চাকার শব্দ, স্প্রিং-এর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ, আর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা যেতে লাগল। কুতুজভ ও তার দলবল শহরের পথ ধরল। প্রধান সেনাপতি ইসারায় জানাল, সৈন্যরা আরামে মার্চ করে চলুক; গান শুনে ও সৈন্যদের নাচ ও মার্চ দেখে তারা সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করল। ডানদিকে দ্বিতীয় সারিতে একটি নীল-চোখ সৈন্য সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সে দলখভ। গানের তালে তালে সুষম ভঙ্গীতে সে সদর্পে পা ফেলে চলেছে, আর যারা সৈন্যদের সঙ্গে পায়ে হেঁটে না এগিয়ে গাড়িতে চড়ে চলে যাচ্ছে তাদের সকলকেই করুণার চোখে দেখছে। কুতুজভ-এর দলের যে কর্ণেটবাদক হুজার রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারকে নকল করছিল সে ঘোড়া নিয়ে পিছিয়ে এসে দলখভ-এর কাছে হাজির হল।

হুজার কর্ণেটবাদক ঝেরকভ একসময় পিতার্সবুর্গ-এ দলখভ-এর বাউণ্ডুলে দলে ছিল। এর আগেও বিদেশে দলখভ-এর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, কিন্তু তখন তাকে চিনতে পারাটা সে সমীচিন মনে করে নি। কিন্তু যেহেতু এখন কুতুজভ স্বয়ং ভদ্রলোক-সৈনিকটির সঙ্গে কথা বলছে, তাই সেও পুরনো বন্ধুর মতই তার সঙ্গে ডেকে কথা বলল।

"আরে ভাই, কেমন আছ?" ঘোড়াটাকে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে সে বলল।

দলখভ ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল, "কেমন আছি? যেমন তুমি দেখছ।"

"অফিসারদের সঙ্গে কেমন চালাচ্ছ?" ঝেরকভ শুধাল।

"ভাল। সকলেই লোক ভাল। আর তুমি তাদের মধ্যে ঢুকে পড়লে কেমন করে?"

"আমাকে নিয়ে নিল; এখন আমি কর্তব্যরত।"

তু'জনই চুপ করে গেল।

"ডান হাতের চওড়া আস্তিনের ভিতর থেকে সে আকাশে উড়িয়ে দিল বাজপাখিটাকে,"—এই গানের সুরে সৈন্যদের মনে স্বতঃই জাগছে সাহস ও প্রফুল্লতা। এই গানটি না থাকলে তাদের আলোচনা হয় তো অন্য রকম হতো।

"একথা কি সত্যি যে অস্ট্রীয়রা পরাজিত হয়েছে?," দলখভ শুধাল।

"একমাত্র শয়তানই জানে। ওরা তো তাই বলছে।"

গানের সঙ্গে তাল রেখে দলখভ সংক্ষেপে বলল, "আমি খুশি।"

ঝেরকভ বলল, "আমি বলি কি, যেকোন দিন সন্ধ্যায় চলে এস; 'ফারো' খেলা যাবে।"

"সে কি, তোমার কি অনেক টাকা হয়েছে নাকি?"

"এস তো।"

"আমি যেতে পারব না। প্রতিজ্ঞা করেছি। যতদিন পুনর্বহাল না হব ততদিন মদ খাব না, কোন কিছু খেলব না।"

আবার তু'জন চুপ করল।

"কোন কিছু দরকার হলে এস। অফিসাররা অনেক সময়ই কাজে লাগে।"

দলখভ হাসল। "কিচ্ছু ভেবো না। আমার যদি কিছু দরকার হয়, তাহলে ভিক্ষা চাইব না—জোর করে নেব।"

"আরে, কিছু মনে করো না; আমি শুধু…"

"আর আমিও শুধু…"

"বিদায়।"

"তোমার সুস্বাস্থ্য…"

"দূর—আরও দূর পথ,
হে মোর স্বদেশ…"

পায়ের কাঁটা দিয়ে ঝেরকভ ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল; ঘোড়া জোর কদমে গানের তালে তালে ছুটল; সেনাদলকে পার হয়ে গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

অধ্যায়—৩

সৈন্য-পরিদর্শন থেকে ফিরে এসে কুতুজভ অস্ট্রীয় সেনাপতিকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গেল ; এবং অ্যাডজুটাণ্টকে ডেকে পৌছবার পরে সৈন্যদের অবস্থা সংক্রান্ত কাগজপত্র ও অগ্রবর্তী বাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক আর্চডিউক ফার্দিনান্দ-এর কাছ থেকে যে সব চিঠিপত্র এসেছে তাও চেয়ে পাঠাল। সে সব কাগজপত্র নিয়ে ঘরে ঢুকল প্রিন্স আন্দ্রু বল্‌কন্‌স্কি। কুতুজভ ও হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ-এর অস্ট্রীয় সদস্যটি একটা টেবিলের পাশে বসেছিল। টেবিলের উপর একটা পরিকল্পনার নক্সা খোলা।

বল্‌কন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে কুতুজভ বলল, "ওঃ!" এই একটি শব্দের সাহায্যেই অ্যাডজুটাণ্টকে অপেক্ষা করতে বলে সে ফরাসী ভাষায় আলাপ চালিয়ে যেতে লাগল।

অদ্ভুত উচ্চারণে চোস্ত ভাষায় সে বলল, "আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি সেনাপতি, ব্যাপারটা যদি আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর নির্ভর করত তাহলে হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাট ফ্রান্সিসের মনোবাসনা অনেক আগেই পূর্ণ হত। অনেক আগেই আমি আর্চডিউকের সঙ্গে যোগ দিতাম। আমার কথা বিশ্বাস করুন, সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিচালনা-ভার কোন বিজ্ঞতর ও অধিকতর কুশলী সেনাপতির—সে রকম সেনাপতি অস্ট্রীয়ায় অনেকে আছেন—হাতে তুলে দিয়ে এই গুরুদায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেলে ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনেক সময়ই আমাদের চাইতে বেশী শক্তিশালী হয়ে থাকে সেনাপতি।"

কুতুজভ এমনভাবে হাসল যেন বলতে চাইল, "আমার কথা বিশ্বাস না করবার অধিকার তোমার অবশ্যই আছে, আর তুমি বিশ্বাস কর আর না কর তাতে আমার কিছুই যায় আসে না ; কিন্তু সে কথা বলবার কোন কারণ তুমি পাওনি। আর সেটাই মোদ্দা কথা।"

অস্ট্রীয় সেনাপতিকে দেখে অসন্তুষ্ট মনে হল, কিন্তু সেই একই সুরে জবাব দেওয়া ছাড়া তার উপায় ছিল না।

এমন উষ্মা ও প্রতিবাদের সুরে সে কথা বলল যা তার স্তুতিবাচক কথাগুলির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না। সে বলল, "বরং এ যুদ্ধে সম্মিলিত উদ্যোগে ইয়োর এক্সেলেন্সির যোগদানকে হিজ ম্যাজেস্টি খুবই মূল্য দিয়ে থাকেন ; কিন্তু আমরা মনে করি, বর্তমানের এই বিলম্বের ফলে রুশ বাহিনী ও তাদের সেনাপতি সেই জয়ের মালা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন যুদ্ধে যে মালা লাভ করতেই তারা চিরকাল অভ্যস্ত, পূর্ব-চিন্তিত এই পংক্তিটি দিয়েই সে তার বক্তব্য শেষ করল।

কুতুজভ সেই একই হাসি হেসে মাথা নীচু করল।

বলল, "কিন্তু এটাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস; হিজ হাইনেস আর্চডিউক ফার্দিনান্দ সর্বশেষ যে চিঠিখানি লিখে আমাকে সম্মানিত করেছেন সে চিঠিকে বিচার করে আমি আশা করি যে, সেনাপতি ম্যাক-এর মত একজন কুশলী নেতার পরিচালনায় অস্ট্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত জয়লাভের অধিকারী হয়েছে, এবং আমাদের সাহায্যের কোন প্রয়োজনই তাদের আর নেই।"

সেনাপতি ভুরু কুঁচকাল। যদিও অস্ট্রীয়ার পরাজয়ের কোন নির্দিষ্ট সংবাদ এখনও আসে নি, তবু চারদিকে যে সব প্রতিকূল গুজব ছড়িয়েছে তার সমর্থনসূচক কিছু কিছু ঘটনার কথা জানা গেছে; কাজেই অস্ট্রীয়ার জয়লাভের যে আশা কুতুজভ প্রকাশ করল সেটা অনেকটা ব্যঙ্গের মতই শোনাল। কিন্তু কুতুজভ সেই একইভাবে খোলাখুলি হাসতে লাগল; যেন সে বলতে চায়, এ কথা মনে করবার অধিকার তার আছে। বস্তুত, ম্যাক-এর বাহিনীর কাছ থেকে সর্বশেষ যে চিঠিটা সে পেয়েছে তাতে একটা জয়লাভের কথা জানানো হয়েছে; আরও বলা হয়েছে যে, রণ-কৌশলের দিক থেকে সে বাহিনীর অবস্থান বেশ অনুকূল।

প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে কুতুজভ বলল, "সেই চিঠিটা দাও।" "দয়া করে এদিকে একটু দৃষ্টি দিন"—মুখের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়ে কুতুজভ জার্মান ভাষায় লেখা আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ডের চিঠির নিম্নলিখিত অংশটুকু পড়তে লাগল।

"শত্রুপক্ষ যদি লেচ্ অতিক্রম করে আসে তাহলে তাকে আক্রমণ করে পরাস্ত করবার জন্য প্রায় সত্তর হাজার সৈন্যের একটা গোটা বাহিনী আমরা সমাবেশ করেছি। তার উপরে, যেহেতু উল্ম্ আমাদের দখলে, সেজন্য দানিয়ুব নদীর উভয় তীরের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার সুবিধা আমরা অবশ্যই পাব; ফলে শত্রুপক্ষ যদি লেচ্ অতিক্রম নাও করে তাহলেও আমরা দানিয়ুব পার হয়ে তাদের সরবরাহ-ব্যবস্থার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব, আরও ভাঁটিতে গিয়ে পুনরায় নদী পার হতে পারব, এবং শত্রুপক্ষ যদি সর্বশক্তি নিয়ে আমাদের বিশ্বস্ত মিত্রপক্ষকে আক্রমণ করতে চেষ্টা করে তবে তাদের সে বাসনাকেও বানচাল করে দিতে পারব। সুতরাং রুশ সাম্রাজ্য বাহিনী যতদিন সম্পূর্ণ সুসজ্জিত হয়ে না ওঠে ততদিন আমরা গভীর আত্ম-প্রত্যয়ের জন্য অপেক্ষা করব, আর সেই মুহূর্তটি এলেই তাদের সঙ্গে সহযোগিতায় শত্রুপক্ষের যথোচিত ভাগ্য-নির্ধারণের আয়োজন করব।"

অনুচ্ছেদটি পড়া শেষ করে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুতুজভ মনোযোগ সহকারে হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ-এর সদস্যটির দিকে তাকাল।

অস্ট্রীয় সেনাপতিটি এসব ঠাট্টা-বিদ্রূপের ধার ধারে না; সোজা কাজের কথায় যেতে সে বলল, "কিন্তু ইয়োর এক্সেলেন্সি, এই সুবচনটি তো আপনি জানেন, সর্বদাই খারাপ অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকা ভাল।" আপনা থেকেই

সে একবার এড্-ডি-কং-এর দিকে তাকাল।

কুতুজভ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "মাফ করবেন সেনাপতি।" তারপর প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখ হে, কস্লভ্স্কির কাছ থেকে আমাদের স্কাউটদের সব রিপোর্ট নিয়ে এস। এই দুটো কাউন্ট নস্তিজ-এর চিঠি, এটা হিজ হাইনেস আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ডের চিঠি, আর এগুলিও নাও। এই সবগুলি পড়ে অস্ট্রীয় বাহিনীর চলাচলের যে সব খবর আমরা পেয়েছি সে সমস্ত উল্লেখ করে ফরাসীতে একটা পরিষ্কার স্মারক-লিপি তৈরী কর, এবং সেটা হিজ এক্সেলেন্সিকে দিয়ে দাও।"

প্রিন্স আন্দ্রু মাথা নোয়াল, কুতুজভ যা বলল তা সে ভালভাবেই বুঝেছে; এমনকি কুতুজভ তাকে আরও যা বলতে পারত তাও সে বুঝেছে। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে দুজনকেই অভিবাদন জানিয়ে আস্তে আস্তে কার্পেটের উপর পা ফেলে সে প্রতীক্ষালয়ে চলে গেল।

প্রিন্স আন্দ্রু রাশিয়া ছেড়ে এসেছে খুব বেশী দিন হয় নি, কিন্তু এরই মধ্যে সে অনেক বদলে গেছে। মুখের ভাবে ও হাঁটা-চলায় আগেকার সেই আলস্য ও উদাসীনতার লেশমাত্র নেই। তাকে নিয়ে অন্যে কি ভাবছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় এখন তার নেই; সদাসর্বদাই সে কাজ নিয়ে ব্যস্ত। নিজেকে ও আশপাশের লোকজনদের নিয়ে সে যে সন্তুষ্ট তারই আভাষ তার চোখে-মুখে; তার হাসি ও চাউনি আগের চাইতে অনেক বেশী উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়।

পোল্যাণ্ডে এসে সে কুতুজভ-এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। কুতুজভ তাকে সাদরে গ্রহণ করেছে, কথা দিয়েছে তাকে ভুলবে না, অন্য অ্যাডজুটাণ্টদের তুলনায় তাকে উপরে তুলছে, সঙ্গে করে ভিয়েনায় নিয়ে এসেছে, এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার দিয়েছে। ভিয়েনা থেকে কুতুজভ তার পুরনো বন্ধু প্রিন্স আন্দ্রুর বাবাকে চিঠিতে লিখেছে:

"তোমার ছেলে যে একজন বিশিষ্ট অফিসার হতে পারবে তার শ্রমশীলতা, দৃঢ়তা, ও কর্মে প্রবৃত্তিতেই তা বুঝতে পারছি। আমার পাশে এরকম একটি সহকারীকে পেয়ে নিজেকে আমি ভাগ্যবান মনে করছি।"

পিতার্সবুর্গের সমাজে যেমন ছিল, এখানেও কুতুজভ-এর কর্মচারীদের মধ্যে, তার সহকর্মী অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যেও, প্রিন্স আন্দ্রুকে নিয়ে দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত গড়ে উঠেছে। একদল—তারা সংখ্যায় অল্প—তাকে নিজেদের থেকে আলাদা বলে মনে করে, এবং তার কাছ থেকে অনেক বড় কিছু প্রত্যাশা করে, তার কথা মন দিয়ে শোনে, তাকে প্রশংসা করে, অনুকরণ করে; তাদের সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রু বেশ স্বাভাবিকভাবে, খুশিমনে দিন কাটায়। আর একদল—তারা সংখ্যায় বেশী—তাকে অপছন্দ করে,—অহংকারী, উদাসীন ও অপ্রীতিকর মনে করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার

করতে হবে প্রিন্স আন্দ্রু তা জানে; তাই তারাও তাকে শ্রদ্ধা করে, এমন কি ভয়ও করে।

কাগজপত্র নিয়ে প্রতীক্ষালয়ে ঢুকতেই বন্ধু কজ্‌লভ্‌স্কির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কজ্‌লভ্‌স্কি একজন কর্তব্যরত এড্‌-ডি-কং। একটা বই নিয়ে সে জানালায় বসেছিল।

"আরে, প্রিন্স যে?" কজ্‌লভ্‌স্কি বলল।

"আমরা কেন অগ্রসর হচ্ছি না তার কারণ ব্যাখ্যা করে একটা স্মারকলিপি লেখার হুকুম পেয়েছি।"

"কারণটা কি?"

প্রিন্স আন্দ্রু কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"ম্যাক-এর কাছ থেকে কোন খবর এসেছে?"

"না।"

"তার পরাজয়ের খবর সত্যি হলে অবশ্যই আসত।"

বাইরের দরজার দিকে যেতে যেতে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "সম্ভবত।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একজন লম্বা অস্ট্রীয় সেনাপতি সশব্দে দরজাটা ঠেলে দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকল। তার পরনে গ্রেটকোট, গলায় "মারিয়া থেরেসা" সামরিক চিহ্ন, মাথায় একটা কালো ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। বোঝা গেল সে সবেমাত্র পৌঁচেছে। প্রিন্স আন্দ্রু মাঝপথে থেমে গেল।

"প্রধান সেনাপতি কুতুজভ?" দুজনের দিকেই তাকিয়ে ভিতরের দরজার দিকে সোজা এগিয়ে সদ্য আগত সেনাপতিটি কড়া জার্মান উচ্চারণে তাড়াতাড়ি প্রশ্নটা করল।

অতি দ্রুত অপরিচিত সেনাপতির কাছে এগিয়ে তার পথরোধ করে কজ্‌লভ্‌স্কি বলল, "প্রধান সেনাপতি ব্যস্ত আছেন।"

এরা তাকে চিনতে পারে নি দেখে বিস্মিত হয়ে অপরিচিত সেনাপতি খর্বকায় কজ্‌লভ্‌স্কির দিকে ঘৃণার চোখে তাকাল।

কজ্‌লভ্‌স্কি শান্ত গলায় আবার বলল, "প্রধান সেনাপতি ব্যস্ত আছেন।"

সেনাপতির মুখে মেঘ নামল, তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। একটা নোটবই বের কবে তাড়াতাড়ি পেন্সিল দিয়ে কিছু লিখে পাতাটা একটানে ছিঁড়ে কজ্‌লভ্‌স্কিকে দিল; দ্রুত পায়ে জানালার কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে ঘরের লোকদের দিকে এমনভাবে তাকাল যেন বলতে চাইল, "এরা সব আমাকে দেখছে কেন?" তারপর মাথাটা তুলে ঘাড় সোজা করে যেন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু পরমুহূর্তেই গুনগুন করতে শুরু করে দিল। ঘরের দরজা খুলে কুতুজভ দ্বারপথে দেখা দিল। মাথায় ব্যাণ্ডেজ-করা সেনাপতিটি কোন বিপদের হাত থেকে পালাবার ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে তাড়াতাড়ি সরু পা ফেলে কুতুজভএর দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটি ভাঙা গলায় নিজের নামটা বলল।

খোলা দ্বার-পথে দাঁড়িয়ে কুতুজভ-এর মুখটা কয়েক মুহূর্ত সম্পূর্ণ নির্বিকার হয়ে রইল। পরক্ষণে মুখের উপর ঢেউয়ের মত কয়েকটা ভাঁজ পড়ল, কপালটা আবার মসৃণ হল। সশ্রদ্ধভাবে মাথাটা নুইয়ে সে চোখ বুজল, নীরবে ম্যাককে তার আগেই ঘরে ঢুকবার পথ করে দিল, তারপর নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অস্ট্রীয়া পরাজিত হয়েছে এবং গোটা বাহিনী উল্‌ম্‌-এ আত্মসমর্পণ করেছে এই মর্মে যে সংবাদ রটেছিল সেটা ঠিকই। আধ ঘণ্টার মধ্যেই অ্যাডজুটাণ্টদের এই নির্দেশ দিয়ে চারদিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল যে, যে-সব রুশ সৈন্য এতদিন অকর্মন্য হয়ে বসেছিল এবার তাদেরও শত্রুর সম্মুখীন হতে হবে।

প্রিন্স আন্দ্রু সেই সব বিরল অফিসারদের একজন যাদের প্রধান আগ্রহ যুদ্ধের অগ্রগতিকে নিয়ে। ম্যাককে দেখে এবং তার দুর্গতির বিবরণ শুনে সে বুঝতে পারল যে অভিযানের অর্ধেকই হাতছাড়া হয়ে গেছে; রুশ বাহিনীর সামনে যে সব অসুবিধা সমুপস্থিত তাও বুঝতে পারল; আর ভবিষ্যতে তাদের কপালে কি আছে এবং সে অবস্থায় তার কি ভূমিকা হবে তাও সে কল্পনা করে নিল। উদ্ধত অস্ট্রীয়ার এই পরাভবের চিন্তায় এবং একসপ্তাহকালের মধ্যেই সে হয় তো ফরাসীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রথম যুদ্ধটা দেখতে পাবে এবং তাতে অংশও নিতে পারবে এই ভাবনায় সে নিজের অজান্তেই একটা সানন্দ উত্তেজনা অনুভব করল। তার আশংকা হল, বোনাপার্তের প্রতিভা হয় তো রুশ বাহিনীর সব সাহসকেই হার মানাবে; আবার সেই সঙ্গে তার নায়কের পরাজয়কে সে মনে মনে মেনে নিতে পারল না।

এই সব চিন্তায় উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়ে প্রিন্স আন্দ্রু তার ঘরে চলে গেল বাবাকে চিঠি লিখতে। প্রতিদিন সে বাবাকে চিঠি লেখে। বারান্দায় নেস্‌ভিৎস্কির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজন এক ঘরেই থাকে। ভাঁড় ঝের্‌কভও সেখানে ছিল।

প্রিন্স আন্দ্রুর কালো মুখ ও চকচকে চোখ দেখে নেস্‌ভিৎস্কি শুধাল, "তোমার মন খারাপ কেন?"

"খুশি হবার তো কারণ নেই," বল্‌কন্‌স্কি জবাব দিল।

নেস্‌ভিৎস্কি ও ঝের্‌কভ-এর সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর দেখা হতে না হতেই বারান্দার অপর দিক থেকে তাদের দিকে এগিয়ে এল অস্ট্রীয় সেনাপতি স্ট্রচ এবং আগের দিন সন্ধ্যায় আগত হফ্‌ক্রিগ্‌স্রাথ-এর সদস্যটি। স্ট্রচ কুতুজভ-এর অধীনস্থ কর্মচারী, রুশ বাহিনীর খাদ্য ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত। তিনজন অফিসারের পাশ দিয়ে চলে যাবার মত যথেষ্ট জায়গা সেনাপতি দুজনের ছিল, কিন্তু নেস্‌ভিৎস্কিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঝের্‌কভ রুদ্ধশ্বাস গলায় বলল, "ওরা আসছেন! ওরা আসছেন! …সরে দাঁড়াও, পথ ছেড়ে দাও, দয়া করে পথ ছেড়ে দাও!"

সেনাপতি দু'জন পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল; এতটা মনোযোগ তাদের ভাল লাগে নি। এদিকে ভাঁড় ঝের্‌কভ-এর মুখে হঠাৎ একটা দুষ্টুমির হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল, কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না।

এক পা এগিয়ে অস্ট্রীয় সেনাপতিকে লক্ষ্য করে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে অভিনন্দন জানাই।"

মাথাটা নীচু করে নাচের তালিম-নেওয়া ছোট শিশুর মত সে প্রথমে এক পা ও পরে আর এক পা ঘস্টে দাঁড়াল।

হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ-এর সদস্যটি কড়া চোখে তার দিকে তাকাল; কিন্তু তার দুষ্টু হাসির গুরুত্ব লক্ষ্য করে মুহূর্তের জন্য ফিরে তাকাল। চোখ দুটো পাকিয়ে বুঝিয়ে দিল যে সে শুনছে।

"আপনাকে অভিনন্দন জানাই। সেনাপতি ম্যাক এসে গেছেন, ভালই আছেন, তবে এখানটায় একটু ছড়ে গেছে," মাথাটা দেখিয়ে সে খুশির হাসি হাসল।

সেনাপতি ভুরু কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

কয়েক পা গিয়ে রেগে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর, কী সরলতা!"

নেস্‌ভিৎস্কি হেসে প্রিন্স আন্দ্রুকে জড়িয়ে ধরল, কিন্তু বল্‌কন্‌স্কি মুখটাকে আরও কালো করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে ঝের্‌কভ-এর দিকে মুখ ফিরাল। ম্যাক-এর আগমন, তার পরাজয়ের খবর, আর রুশ বাহিনীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তার মনে যে বিরক্তির ভাব জমে উঠেছিল, ঝের্‌কভ-এর বেতালা ঠাট্টায় সেটাই ক্রোধে ফেটে পড়ল।

নীচের চোয়ালটা ঈষৎ কাঁপিয়ে সে কঠোর স্বরে বলে উঠল, "তুমি যদি নিজেকে একটা ভাঁড় বানাতে চাও তো আমি সেটা আটকাতে পারি না; কিন্তু আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার সামনে যদি ভাঁড়ামি করার দুঃসাহস দেখাও তো আমি তোমাকে ভদ্রব্যবহার শিখিয়ে দেব।"

বল্‌কন্‌স্কির এতখানি রাগ দেখে নেস্‌ভিৎস্কি ও ঝের্‌কভ এতই অবাক হয়ে গেল যে তারা হাঁ করে তার দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

"ব্যাপারটা কি? আমি তো ওদের অভিনন্দন জানাচ্ছিলাম মাত্র," ঝের্‌কভ বলল।

"আমি তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি করছি না, দয়া করে চুপ কর।" বল্‌কন্‌স্কি চীৎকার করে বলল; তারপর নেস্‌ভিৎস্কির হাত ধরে চলে গেল। ঝের্‌কভ কি বলবে বুঝতেই পারল না।

তাকে সান্ত্বনা দিতে নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "আরে, কি হল রে বাপু?"

"কি হল?" প্রিন্স আন্দ্রু দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে বলতে লাগল: "তুমি কি বুঝতে পারছ না যে, হয় আমরা আমাদের জার ও আমাদের দেশের সেবায় নিযুক্ত অফিসাররা, যেটা আমাদের সকলের লক্ষ্য তার সাফল্যে আমরা আনন্দ

করব, দুর্ভাগ্যে দুঃখ পাব, আর না হয় তো আমরা সামান্য খানসামা মাত্র, মনিবের সুখ-দুঃখে যাদের কিছুই যায় আসে না। চল্লিশ হাজার সৈন্য খুন হয়ে গেল, আমাদের মিত্র-শক্তি ধ্বংস হয়ে গেল, আর তাই নিয়ে তোমরা ঠাট্টা করছ!" যেন নিজের বক্তব্যকে জোরদার করার জন্যই সে কথাগুলি ফরাসীতে বলল। "ওই যে অকর্মার ধাঁড়িটার সঙ্গে তুমি বন্ধুত্ব পাতিয়েছ এ-কাজ তাকে সাজে, কিন্তু তোমাকে সাজে না, সাজে না। এ ভাবে মজা করা শুধু অকর্মাদেরই সাজে।

কর্ণেলটি কোন জবাব দেয় কি না শুনবার জন্য সে একমুহূর্ত দাঁড়াল, কিন্তু সে মুখটা ঘুরিয়ে বারান্দার পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যায়—৪

পাভ্‌লোগ্রাদ হুজারদের মোতায়েন করা হয়েছে ব্রাউনাউ থেকে দু'মাইল দূরে। যে অশ্বারোহী সেনাদলে নিকলাস রস্তভ শিক্ষার্থী হিসাবে যোগ দিয়েছে তাদের বাসা পড়েছে একটি জার্মান গ্রাম সাল্‌জেনেক-এ। গ্রামের সব চাইতে ভাল বাসাটা দেওয়া হয়েছে অশ্বারোহী সেনাদলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন দেনিসভকে। গোটা অশ্বারোহী বাহিনীতে সে ভাস্কা দেনিসভ নামেই পরিচিত। পোল্যাণ্ডে এসে সেনাদলে যোগ দেবার পর থেকেই ক্যাডেট রস্তভ অধিনায়কের সঙ্গেই থাকে।

১১ই অক্টোবর তারিখে ম্যাক-এর পরাজয়ের খবর নিয়ে হেড-কোয়ার্টারে সকলেই যখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তখনও এই অশ্বারোহী সেনাদলের অফিসারদের শিবির-জীবন যথারীতিই চলেছে। দেনিসভ সারা রাত তাস খেলায় হেরেছে, সে এখনও ঘরে ফেরে নি। খাদ্য-সংগ্রহ অভিযান সেরে রস্তভ সবে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসেছে। ক্যাডেট-ইউনিফর্ম পরিহিত রস্তভ ঘোড়াটাকে একেবারে ফটকে এনে হাজির করল, যৌবনসুলভ সহজ ভঙ্গীতে পাটাকে জিনের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনল, যেন ঘোড়া ছেড়ে নামতে ইচ্ছা করছে না এমনিভাবে পা-দানের উপর একমুহূর্ত দাঁড়াল, আর তারপরেই লাফ দিয়ে নেমে আর্দালীকে ডাকল।

যে হুজারটি এক দৌড়ে ঘোড়ার কাছে এসে হাজির হল তাকে দেখে রস্তভ বলল, "আহা বন্দারেংকো, বন্ধু! ওকে একটু হাঁটা-চলা করাও ভাই।" সৎস্বভাবের যুবকরা মন ভাল থাকলে সকলের সঙ্গেই যেমন ভাই-বেরাদারের মত কথা বলে সেই রকম ভাবেই সে কথাগুলি বলল।

ইউক্রেনীয় হুজারটি খুশিতে মাথা নেড়ে বলল, "করছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"মনে থাকে যেন, বেশ ভালভাবে হাঁটা-চলা করাবে!"

ইতিমধ্যেই আর একটি হুজারও ঘোড়ার কাছে ছুটে এসেছে; কিন্তু বন্দারেংকো ততক্ষণে ঘোড়ার মাথা থেকে রাশটা খুলে ফেলেছে। বোঝা গেল যে এই ক্যাডেটটি বেশ দরাজ হাতেই বকশিস দিয়ে থাকে, তার কাজ করে দিলে লাভ আছে। রস্তভ ঘোড়াটার গলায় ও পিঠে আস্তে আস্তে চাপড় মারতে মারতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল।

একটু হেসে মনে মনে ভাবল, "চমৎকার! একদিন এটা কী ঘোড়াই না হবে! তলোয়ারটাকে উপরের দিকে তুলে সে এক দৌড়ে ফটকের সিঁড়ির কাছে গেল। তার বাড়িওলা ওয়েস্টকোট ও ছুঁচলো টুপি পরে একটা উকনঠেঙা হাতে নিয়ে গোয়াল থেকে গোবর পরিষ্কার করছিল। বাইরে তাকিয়ে রস্তভকে দেখেই তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল। "Schou gut Morgen! Schou gut Morgen! (সুপ্রভাত! সুপ্রভাত!)" বড়ই খুশি হয়ে চোখ মিটমিট করে হাসতে হাসতে সে যুবকটিকে অভ্যর্থনা জানাল।

সেই একই ভাইয়ের মত হাসি হেসে রস্তভ বলল, "এর মধ্যেই কাজে লেগে গেছ!" তারপর জার্মান বাড়িওলাটি প্রায়ই যে কথাগুলি বলে থাকে তারই পুনরাবৃত্তি করে বলে উঠল, "অস্ট্রীয়ার জয় হোক! রাশিয়ার জয় হোক! সম্রাট আলেকজাণ্ডারের জয় হোক!"

জার্মানটি হাসতে হাসতে গোয়াল থেকে বেরিয়ে এল। মাথার টুপি খুলে মাথার উপর নাড়তে নাড়তে চেঁচিয়ে বলল:

Und die ganze Welt hoch! (সারা বিশ্বের জয় হোক!)"

জার্মানটির মত রস্তভও টুপিটাকে মাথার উপর ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল, "Und vivat die ganze Welt! (সারা বিশ্ব জিন্দাবাদ!)" জার্মানটি গোয়াল পরিষ্কার করছে, রস্তভ সবে ফিরেছে খড়-সংগ্রহের কাজ সেরে; দুজনের কারোরই আনন্দ করবার কোন হেতু নেই; তবু তারা ভাইয়ের মত ভালবাসায় খুশি মনে একে অন্যের দিকে তাকাতে লাগল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগের চিহ্নস্বরূপ মাথা নাড়তে লাগল, তারপর হেসে বিদায় নিল; জার্মানটি ফিরে গেল গোয়ালে, আর রস্তভ ফিরে গেল সেই ঘরটিতে যেখানে দেনিসভ-এর সঙ্গে সে থাকে।

দেনিসভ-এর আর্দালি লাভ্রুশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার মনিবের খবর কি?"

লোকটিকে সকলেই পাজি বলেই জানে। সে জবাব দিল, "সন্ধ্যা থেকে তো দেখা নেই। নির্ঘাৎ খেলায় হারছেন। এতদিনে আমি বুঝে ফেলেছি; খেলায় জিতলে তাড়াতাড়ি ফিরে সে কথা সাতকাহন করে বলেন, আর সকাল পর্যন্ত বাইরে কাটালেই বুঝতে পারি, খেলায় হেরেছেন, আর ফিরে এসে তম্বি শুরু করবেন। কফি খাবেন কি?"

"হ্যাঁ, আন।"

দশ মিনিট পরে লাভ্রুশ্‌কা কফি নিয়ে এল। বলল, "তিনি আসছেন! এবার ঝামেলা শুরু হবে!" জানালা দিয়ে তাকিয়ে রস্তভ দেখল, দেনিসভ ফিরছে। ছোটখাট চেহারা, লাল মুখ, কালো চকচকে চোখ, এলোমেলো কালো গোঁফ ও চুল। গায়ের আলখাল্লার বোতাম খোলা, চওড়া ব্রীচেস ভাঁজে-ভাঁজে ঝুলে পড়েছে, মাথার পিছনে একটা তুমড়ানো "শাকো"। বিষণ্ণ মুখে মাথা নীচু করে ফটক পর্যন্ত এল।

রেগে চেঁচিয়ে বলল, "লাভ্রুশ্‌কা! এটা নিয়ে যা, গাধা কোথাকার!"

"নিচ্ছি গো," লাভ্রুশ্‌কার জবাব শোনা গেল।

ঘরে ঢুকে দেনিসভ বলল, "আচ্ছা, তুমি এসে গেছ দেখছি!"

রস্তভ বলল, "অনেকক্ষণ এসেছি। খড় আনতে গিয়েছিলাম, ফ্রলিন মাথিল্ডার সঙ্গে দেখা হল।"

"বটে! আর আমি এদিকে হেরে ভূত, বাওয়া! কাল তো বোকা গাধার মত হেরেছি! কপাল খারাপ! কপাল খারাপ! তুমিও চলে এলে আর অমনি শুরু হল, চলতেই থাকল। এই, কোথায় রে! চা!"

মুখ ফাঁক করে হেসে ছোট ছোট শক্ত দাঁত বের করে সে তার ঘন কালো জট-বাঁধা চুলে আঙুল চালাতে লাগল।

কপালে ও সারা মুখে দুই হাত ঘসতে ঘসতে বলল, "কেন যে মরতে ওই ধেঁড়ে ইঁদুরটার কাছে গিয়েছিলাম? (একজন অফিসারের ডাক নাম "ধেঁড়ে ইঁদুর।) ভেবে দেখ, সে লোকটা আমাকে একটা কানা কড়িও জিততে দেয় নি।"

পাইপটা ধরিয়ে এনে দিলে সেটাকে মুঠোর মধ্যে ধরে মেঝের উপর আছড়াতে শুরু করল। আগুনের ফুলকি যত উড়তে থাকে, সেও তত চেঁচাতে থাকে।

জ্বলন্ত তামাকগুলোকে চারদিকে ছড়িয়ে দিল, পাইপটাকে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠে কালো চকচকে চোখ মেলে রস্তভ-এর দিকে তাকাল।

"অন্তত কিছু মেয়েমানুষও যদি এখানে থাকত; কিন্তু শুধু মদ গেলা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। তাড়াতাড়ি লড়াইতে চলে যেতে পারলেও হত। হেই, কে ওখানে?" ভারী বুটের শব্দ ও পা-দানির ঠুং-ঠাং আওয়াজ এবং একটি সশ্রদ্ধ কাশির শব্দ শুনে দরজার দিকে তাকিয়ে সে বলল।

"সেনাদলের কোয়ার্টার মাস্টার!" লাভ্রুশ্‌কা চেঁচিয়ে বলল।

দেনিসভ-এর মুখটা আরও কুঁচকে উঠল।

"হতভাগা!" বিড় বিড় করে কথাটা বলে কিছু স্বর্ণমুদ্রাসমেত থলিটা ছুঁড়ে দিল। "রস্তভ, ভাই, এর মধ্যে কত আছে দেখে নিয়ে থলিটাকে বালিশের নীচে ঢুকিয়ে দাও তো।" কথা শেষ করে সে কোয়ার্টার মাস্টারের

সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল।

রস্তভ থলি ঝেড়ে নতুন ও পুরনো মুদ্রাগুলোকে আলাদা করে সাজিয়ে গুণতে শুরু করল।

"ওহো! তেলিয়ানিন! কেমন আছ? কাল রাতে ওরা আমার পালক ছাড়িয়ে দিয়েছে," পাশের ঘর থেকে দেনিসভ-এর গলা শোনা গেল।

"কোথায়? সেই ধেঁড়ে ইঁদুর বাইকভ-এর কাছে? ...আমি জানতাম," একটি বাঁশির মত স্বরে জবাব শোনা গেল, আর পরক্ষণেই ঐ একই সেনাদলের একজন খুদে অফিসার লেফ্‌টেন্যাণ্ট তেলিয়ানিন ঘরে ঢুকল।

থলিটাকে বালিশের নীচে গুঁজে দিয়ে রস্তভ তার বাড়ানো ঠাণ্ডা হাতটা ধরে ঝাঁকুনি দিল। যে কারণেই হোক, এই অভিযানের ঠিক আগেই তেলিয়ানিনকে রক্ষীবাহিনী থেকে বদলি করা হয়েছে। রেজিমেণ্টে তার ব্যবহার বেশ ভালই, তবু কেউ তাকে পছন্দ করে না; বিশেষত রস্তভ তাকে খুবই অপছন্দ করে এবং লোকটির প্রতি তার এই অকারণ বিরূপতাকে জয় করতে বা ঢেকে রাখতেও পারে না।

"এই যে তরুণ হুজার, আমার 'রুক'টি কেমন চলছে?" সে জিজ্ঞাসা করল। (তেলিয়ানিন 'রুক' নামক একটা ঘোড়া রস্তভ-এর কাছে বিক্রি করেছিল।)

লেফ্‌টেন্যাণ্টটি যার সঙ্গে কথা বলে কখনও সোজা তার মুখের দিকে তাকায় না; তার চোখ দুটো অনবরত এদিক-ওদিক ঘুরতে থাকে।

"আজ সকালেই তোমাকে ঘোড়ায় চাপতে দেখেছি," সে আরও বলল।

ঘোড়াটার জন্য রস্তভ সাতশ' রুবল দিয়েছিল, কিন্তু সেটার উচিত দাম তার অর্ধেকও হওয়া উচিত নয়। তবু সে জবাবে বলল, "ওঃ, ঘোড়াটা ভালই আছে; বেশ ভাল ঘোড়া। তবে বাঁদিকে সামনের পাটা একটু খুঁড়িয়ে চলতে শুরু করেছে।"

"ক্ষুরটা ফেটে গেছে! ও কিছু না। কি করতে হবে আমি বলে দেব। কি ধরনের কাঁটা ব্যবহার করতে হবে তাও দেখিয়ে দেব।"

"দয়া করে দিও," রস্তভ বলল।

"নিশ্চয় দেব, নিশ্চয় দেব। এটা তো গোপন ব্যাপার কিছু নয়। অবশ্য ঘোড়াটার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিতেই হবে।"

"তাহলে তো ঘোড়াটাকে নিয়ে আসতে হয়," তেলিয়ানিনকে এড়াবার জন্য রস্তভ বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় দেনিসভ চৌকাঠের উপর বসে ছিল, আর সামনে দাঁড়িয়ে কোয়ার্টার মাস্টার কি যেন বুঝিয়ে বলছিল। রস্তভকে দেখে দেনিসভ মুখটা বিকৃত করে ঘাড়ের উপর দিয়ে বুড়ো আঙুলটাকে বেঁকিয়ে যে ঘরে তেলিয়ানিন রয়েছে সেটা দেখিয়ে দিল। তার চোখে-মুখে বিরক্তি ও অস্বস্তি ফুটে উঠল।

কোয়ার্টার মাস্টারের সামনেই বলে উঠল, "উঃ! ঐ লোকটাকে আমি দেখতে পারি না।"

রস্তভ কাঁধটা ঝাঁকুনি দিল; যেন বলতে চাইল; "আমিও দেখতে পারি না, কিন্তু কি করা যাবে?" ঘোড়া আনবার হুকুম করে সে আবার তেলিয়ানিনের কাছে ফিরে গেল।

তেলিয়ানিন সেই একইভাবে নেতিয়ে বসে ছোট সাদা হাত দুটো ঘসছে।

ঘরে ঢুকতেই রস্তভ-এর মনে হল, "সত্যি, কিছু লোক আছে যারা বড়ই বিরক্তিকর।"

উঠে দাঁড়িয়ে ইতস্তত তাকাতে তাকাতে তেলিয়ানিন বলল, "ঘোড়াটাকে আনতে বলেছ তো?"

"বলেছি।"

"চল আমরাই যাই। আমি শুধু কালকের নির্দেশ-নামার কথা দেনিসভ-এর কাছ থেকে জানতে এসেছিলাম। তুমি কি হুকুমটা পেয়েছ দেনিসভ?"

"এখনও পাই নি। কিন্তু তুমি কোথায় চললে?"

"এই যুবকটিকে ঘোড়ার পায়ে নাল লাগানো শিখিয়ে দিতে," তেলিয়ানিন জবাব দিল।

ফটক পেরিয়ে তারা আস্তাবলে ঢুকল। ক্ষুরে কেমন করে কাঁটা মারতে হয় সেটা বুঝিয়ে দিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট তার নিজের বাসায় চলে গেল।

রস্তভ ফিরে গিয়ে টেবিলের উপর এক বোতল ভদ্‌কা ও কিছুটা কাবাব দেখতে পেল। দেনিসভ সেখানে বসে এক তা কাগজে কলম দিয়ে খস্‌খস্‌ করে কি যেন লিখে চলেছে। গম্ভীরভাবে রস্তভ-এর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল:

"তাকে চিঠি লিখছি।"

কলমটা হাতে নিয়ে কনুইতে ভর দিয়ে চিঠির বক্তব্যটা মুখেই রস্তভকে বলতে লাগল।

"দেখ বন্ধু, যখন ভালবাসা না থাকে তখনই আমরা ঘুমোই। আমরা তো মাটির সন্তান·· কিন্তু লোকে তো প্রেমে পড়ে, ঈশ্বর হয়, সৃষ্টির প্রথম দিনের মত পবিত্র হয়···আবার কে এল? তাকে নরকে পাঠিয়ে দাও, আমি এখন ব্যস্ত আছি!' মোটেই ঘাবড়ে না গিয়ে মিক্রুশ্‌কা তার কাছে এসে হাজির হতেই দেনিসভ চীৎকার করে বলে উঠল।

"আবার কে! আপনিই তো ওকে আসতে বলেছিলেন। কোয়ার্টার মাস্টার এসেছে টাকার জন্য।"

দেনিসভ ভুরু কুঁচকে চেঁচিয়ে কি একটা জবাব দিতে গিয়েও থেমে গেল। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, "হতভাগা কাজ! থলিতে কত

আছে ?" রস্তভ-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"সাতটা নতুন আর তিনটে পুরনো বড় মুদ্রা।"

"ওঃ, হতভাগা! আরে, তুমি এখানে কাকতাড়ুয়ার মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? কোয়ার্টার মাস্টারকে ডাক," সে লাভ্রুশ্‌কাকে হেঁকে বলল।

"দেখ দেনিসভ, আমি তোমাকে কিছুটা ধার দিচ্ছি: তুমি জান আমার কিছু আছে," মুখ লাল করে রস্তভ বলল।

"আপন জনের কাছ থেকে ধার করা আমি পছন্দ করি না, মোটেই পছন্দ করি না," দেনিসভ গজরাতে গজরাতে বলল।

"কিন্তু তুমি যদি বন্ধু মনে করে আমার কাছ থেকে টাকা না নাও তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হব। সত্যি, আমার টাকা আছে," রস্তভ আবার বলল।

"না। আমি বলছি, না।"

বালিশের তলা থেকে থলিটা বের করতে দেনিসভ বিছানার কাছে গেল।

"কোথায় রেখেছ রস্তভ?"

"নীচের বালিশের তলায়।"

দেনিসভ দুটো বালিশই মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিল। থলিটা নেই।

"এ তো অলৌকিক ব্যাপার!"

"দাঁড়াও, তুমি ফেলে দাও নি তো? একটা একটা করে বালিশ দুটো তুলে ঝাড়তে ঝাড়তে রস্তভ বলল।

লেপটা তুলে ঝাড়ল। সেখানেও থলি নেই।

"তাই তো ভাই, তাহলে কি আমারই ভুল? না, তুমি যে মূল্যবান সম্পত্তির মত ওটাকে মাথার নীচেই রাখ সে-কথা যে আমি ভেবেছিলাম তাও আমার বেশ মনে পড়ছে," রস্তভ বলল। "ঠিক এখানেই রেখেছিলাম। কোথায় গেল?" সে লাভ্রুশ্‌কাকে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি তো ঘরেই ছিলাম না। আপনি যেখানে রেখেছিলেন সেখানেই তো থাকবে।"

"কিন্তু সেখানে নেই!…"

"তুমি তো সব সময়ই ওই রকম; জিনিসপত্র যেখানে-সেখানে ফেলে রাখ, আর তার পরে ভুলে যাও। নিজের পকেট খুঁজে দেখ।"

রস্তভ বলল, "না, ওটাকে অতটা মূল্যবান আমি ভাবি নি, কিন্তু আমার বেশ মনে আছে, এখানেই রেখেছিলাম।"

লাভ্রুশ্‌কা গোটা বিছানাটা উল্টে পাল্টে দেখল, বিছানার নীচে, টেবিলের নীচে খুঁজল, কোন জায়গা দেখতে বাকি রাখল না; তারপর ঘরের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। দেনিসভ চুপচাপ লাভ্রুশ্‌কার চালচলন দেখল; তারপর সে যখন অবাক হয়ে দুই হাত উপরে তুলে জানাল যে কোথাও সেটা পাওয়া গেল না, তখন রস্তভ-এর দিকে তাকাল।

"রস্তভ, তুমি ইস্কুলের ছেলেদের মত চালাকি করছ না তো…"

দেনিসভ-এর দৃষ্টি যে তার উপর নিবদ্ধ সেটা বুঝতে পেরে রস্তভ চোখ তুলে তাকিয়ে পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল। যে রক্তটা এতক্ষণ গলার নীচে কোথাও জমেছিল সেটা এবার তার মুখে ও চোখে উঠে এল। সে যেন শ্বাস নিতেও পারছে না।

লাভ্রুশ্‌কা বলল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট ও আপনি ছাড়া আর কেউ ঘরে ঢোকে নি। ওটা এখানেই কোথাও থাকবেই।"

"তবে রে ব্যাটা শয়তানের পুতুল! একটু নড়ে-চড়ে খুঁজে দেখ্‌," দেনিসভ হঠাৎ অগ্নিমূর্তি হয়ে চীৎকার করতে করতে আর্দালির দিকে ছুটে গেল। "থলি না পাওয়া গেলে আমি তোকে চাবুক মারব, চাবুক মারব।"

দেনিসভ-এর দিক থেকে চোখ সরিয়ে রস্তভ কোটের বোতাম এঁটে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে টুপিটা মাথায় দিল।

আর্দালিকে ঘাড় ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে দেয়ালের উপর ঠুকে দেনিসভ চেঁচাতে লাগল, "থলিটা আমার চাই, এই তোকে বলে রাখছি।"

দরজার কাছে গিয়ে চোখ না তুলেই রস্তভ বলল, "ওকে ছেড়ে দাও দেনিসভ; আমি জানি থলি কে নিয়েছে।"

দেনিসভ থামল; এক মুহূর্ত কি ভাবল; তারপর রস্তভ-এর ইঙ্গিত বুঝতে পেরে তার হাতটা চেপে ধরল।

"বাজে কথা!" সে চেঁচিয়ে উঠল; তার কপালের ও গলার শিরাগুলো দড়ির মত ফুলে উঠল। "আমি বলছি, তুমি পাগল হয়ে গিয়েছ। এ আমি হতে দেব না। থলি এখানেই আছে! আমি এই শয়তানটাকে জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে নেব, তাহলেই সেটা পাওয়া যাবে।"

"আমি জানি ওটা কে নিয়েছে," কাঁপা গলায় আর একবার কথাটা বলে রস্তভ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তাকে বাধা দিতে দরজার দিকে ছুটে গিয়ে দেনিসভ চীৎকার করে বলল, "আমি বলছি, অমন কাজও করো না।"

কিন্তু রস্তভ তার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এমন ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সোজা তার মুখের দিকে তাকাল যেন দেনিসভ তার সব চাইতে বড় শত্রু।

কাঁপা গলায় বলল, "তুমি যা বলছ তার অর্থ বোঝ? আমি ছাড়া এ ঘরে আর কেউ ছিল না। কাজেই আমি যা ভাবছি তা যদি না হয় তো…"

কথা শেষ না করেই সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"আঃ, শয়তান তোমাদের সকলের মাথায়ই ভর করুক," সর্বশেষ এই কথাগুলিই রস্তভ শুনতে পেল।

রস্তভ গেল তেলিয়ানিনের বাসায়।

তেলিয়ানিনের আর্দালি বলল, "মনিব তো বাড়ি নেই, হেড-কোয়ার্টারে

গেছেন।" তারপর ক্যাডেটের বিক্ষুব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে?"

"না, কিছু না।"

"অল্পের জন্য তাকে ধরতে পারলেন না," আর্দালি বলল।

সাল্‌জেনেক থেকে হেড-কোয়ার্টারের দূরত্ব দু'মাইল। বাড়ি ফিরে না গিয়ে রস্তভ একটা ঘোড়া নিয়ে সেখানেই ছুটল। গ্রামের একটা সরাইখানায় অফিসারদের খুব যাতায়াত ছিল। সেখানে পৌঁছে রস্তভ দেখল, ফটকে তেলিয়ানিনের ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে আছে।

সরাইখানার দু'নম্বর ঘরে লেফ্‌টেন্যাণ্ট বসে আছে এক ডিস কাবাব ও এক বোতল মদ নিয়ে।

হেসে ভুরু তুলে সে বলল, "আরে, তুমিও এসে পড়েছ দেখছি!"

"হ্যাঁ," অনেক কষ্টে কথাটা উচ্চারণ করে সে কাছেই একটা টেবিলে বসল।

দু'জনই চুপচাপ। ঘরে আরও দু'জন জার্মান ও একজন রুশ অফিসার ছিল। কারও মুখে কথা নেই। শুধু ছুরির টুং-টাং আর লেফ্‌টেনাণ্টের চিবনোর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

খাওয়া শেষ করে তেলিয়ানিন পকেট থেকে একটা ডবল থলি বের করল; থলির রিংটা এক পাশে টেনে একটা বড় স্বর্ণমুদ্রা বের করে ভুরু তুলে সেটা পরিচারককে দিল।

বলল, "একটু তাড়াতাড়ি করো।"

মুদ্রাটা নতুন। রস্তভ আসন ছেড়ে তেলিয়ানিনের কাছে গেল।

প্রায় শুনতে পাওয়া যায় না এমনি নীচু গলায় বলল, "তোমার থলিটা একটু দেখি তো।"

তেলিয়ানিন থলিটা তার হাতে দিল।

"হ্যাঁ, থলিটা বেশ ভাল। সত্যি সত্যি," বলেই হঠাৎ তার মুখটা কালো হয়ে গেল। আবার বলল, "চেয়েই দেখ না মশাই।"

রস্তভ থলিটা হাতে নিল, থলিটা ও ভিতরকার মুদ্রাগুলি খুঁটিয়ে দেখল। তারপর তেলিয়ানিনের দিকে তাকাল। তেলিয়ানিন অভ্যাসমতই চারদিকে তাকাচ্ছিল; হঠাৎ সে খুব খুশি হয়ে উঠল।

বলল, "ভিয়েনায় যেতে পারলেই এটাকে হাল্কা করে ফেলব; এই হতভাগা ছোট শহরে তো খরচ করবার জায়গাই নেই। ঠিক আছে, ওটা আমাকে দিয়ে দাও। আমি চলে যাব।"

রস্তভ কথা বলল না।

তেলিয়ানিন বলতে লাগল, "আর তুমি? তুমিও লাঞ্চ খাবে না কি? এখানে এরা কিন্তু খাওয়ায় ভাল। এবার তাহলে ওটা আমাকে দিয়ে দাও।"

থলিটা নেবার জন্য সে হাত বাড়াল। রস্তভও দিয়ে দিল। থলিটা নিয়ে তেলিয়ানিন আলগাভাবে সেটাকে রাইডিং-ব্রীচেসের পকেটে রেখে এমন ভাবে ভুরু দুটো তুলে মুখটাকে ঈষৎ ফাঁক করল যেন বলতে চাইল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার থলি আমি পকেটে পুরলাম; এটা তো একটা সরল ব্যাপার, এ নিয়ে অন্য কারও মাথা ঘামাবার কিছু নেই।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "আচ্ছা, চলি।" ভুরু দুটি তুলে সে রস্তভ-এর দিকে তাকাল।

তেলিয়ানিনের চোখ থেকে একটা বিদ্যুতের ঝিলিক যেন রস্তভ-এর চোখে গিয়ে লাগল, আবার ফিরে এল; মুহূর্তের মধ্যে এমনি বার বার গেল আর ফিরে এল।

"এখানে এস," বলে রস্তভ তেলিয়ানিনের হাত ধরে তাকে প্রায় টানতে টানতেই জানালার কাছে নিয়ে গেল। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, "ও টাকা দেনিসভের; তুমি নিয়ে নিয়েছ···"

"কি? কি? এত সাহস তোমার? কি?" তেলিয়ানিন বলল।

কিন্তু কথাগুলি শোনাল বড় করুণ, হতাশ কান্নার মত, ক্ষমা প্রার্থনার মত। কথাগুলি শুনেই সন্দেহের একটা প্রকাণ্ড বোঝা রস্তভ-এর মন থেকে নেমে গেল। সে খুশি হল, আবার সেই সঙ্গে সম্মুখে দাঁড়ানো দুঃখী লোকটির জন্য করুণাও হল। কিন্তু যে কাজ সে শুরু করেছে সেটা তো শেষ করতেই হবে।

টুপিটা হাতে নিয়ে একটা ছোট খালি ঘরের দিকে যেতে যেতে তেলিয়ানিন আমতা-আমতা করে বলল, "এখানকার লোকগুলো কি মনে করল তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। একটা কিছু তো বোঝাতে হবে···"

"আমি জানি; প্রমাণ করেও দেব," রস্তভ বলল।

"আমি···"

তেলিয়ানিনের ভয়ার্ত মুখের প্রতিটি পেশী কাঁপছে, চোখ দুটো এখনও এদিক-ওদিকে ঘুরলেও সে দৃষ্টি অবনত, রস্তভ-এর মুখের দিকে সে তাকাতে পারছে না; ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দও শোনা যাচ্ছে।

"কাউণ্ট! একটি যুবকের ভবিষ্যৎ নষ্ট করো না···এই নাও সেই হতভাগা টাকা, নাও···" থলিটাকে টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিল। "আমার বুড়ো বাবা আছে, মা আছে!···"

তেলিয়ানিনের চোখের দিকে না তাকিয়ে রস্তভ টাকাটা নিয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজার কাছে গিয়ে আবার ফিরে এল। চোখের জল ফেলে বলল, "হা ঈশ্বর, এ কাজ তুমি করলে কেমন করে?"

তার কাছে গিয়ে তেলিয়ানিন ডাকল, "কাউণ্ট,···"

পিছনে সরে গিয়ে রস্তভ বলল, "আমাকে ছুঁয়ো না। তোমার যদি দরকার

থাকে, টাকাটা নিয়ে নাও"; থলিটা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে রস্তভ ছুটে সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—৫

সেদিন সন্ধ্যায় স্কোয়াড্রন-অফিসারদের মধ্যে একটা উত্তেজিত আলোচনা চলছিল দেনিসভ-এর বাসায়।

"আমি তোমাকে বলছি রস্তভ, কর্নেলের কাছে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে," স্টাফ-ক্যাপ্টেন কারস্তেন কথাটা বলল। লোকটি লম্বা, মাথায় ধূসর চুল, প্রকাণ্ড গোঁফ, আর মুখভর্তি বলী-রেখা। রস্তভ উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে।

স্টাফ-ক্যাপ্টেন কারস্তেন-এর দু'বার পদাবনতি ঘটেছে, আবার দু'বারই কমিশনে পুনর্বহাল হয়েছে।

রস্তভ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "কেউ আমাকে মিথ্যুক বলবে তা আমি হতে দেব না। সে বলেছে আমি মিথ্যা বলেছি, আর আমি বলেছি সে মিথ্যা বলেছে। বাস, ঐ পর্যন্ত। সে আমাকে রোজ ডিউটি করাতে পারে, আমাকে গ্রেপ্তার করাতে পারে, কিন্তু কেউ আমাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াতে পারবে না। কারণ এই রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার হিসাবে সে যদি মনে করে যে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়া তার মর্যাদার পক্ষে হানিকর, তাহলে ···"

স্টাফ-ক্যাপ্টেন তার লম্বা গোঁফে ধীরে ধীরে চাড়া দিয়ে গম্ভীর গলায় কথার মাঝখানেই বলে উঠল, "এক মিনিট থাম; আমার কথাটা শোন। অন্য অফিসারদের সামনে তুমি বলেছ যে একজন অফিসার চুরি করেছে···"

"কথাটা যে অন্য অফিসারদের সামনে শুরু হয়েছিল সেজন্য তো আমি দোষী নই। হয় তো তাদের সামনে কথাটা বলা আমার উচিত হয় নি, কিন্তু আমি তো কূটনীতিবিদ নই। তাই তো অশ্বারোহী বাহিনীতে যোগ দিয়েছি, কারণ আমি ভেবেছিলাম এখানে কোন রকম চাতুরীর দরকার হবে না। সে বলেছে যে আমি মিথ্যাবাদী—কাজেই তাকে আমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হবে···"

"ঠিক আছে। কেউ তোমাকে ভীরু ভাবছে না, কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। একজন ক্যাডেটের পক্ষে একজন রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডারের কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়াটাই অবাস্তব কি না সেটা তুমি বরং দেনিসভকেই জিজ্ঞাসা কর।"

দেনিসভ চুপচাপ বসে গোঁফ কামড়াতে কামড়াতে আলোচনা শুনছিল, তাতে যোগ দেবার ইচ্ছা তার ছিল না। আপত্তিসূচক ঘাড় নেড়েই সে স্টাফ-ক্যাপ্টেনের প্রশ্নের জবাব দিল।

স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলতে লাগল, "অন্য অফিসারদের সামনে এই বাজে

কথাগুলি তুমি কর্নেলকে বলেছ, আর বোগ্‌দানিচ (কর্নেলের নাম) তোমাকে চুপ করিয়ে দিয়েছে।"

"সে আমাকে চুপ করিয়ে দেয় নি, বলেছে আমি মিথ্যা বলেছি।"

"বেশ তো তাই হল ; তুমিও তাকে অনেক বাজে কথা বলেছ, তাই তোমাকে ক্ষমা চাইতেই হবে।"

"কিছুতেই না," রস্তভ চেঁচিয়ে বলল।

স্টাফ-ক্যাপ্টেন এবার গম্ভীর হয়ে কড়া গলায় বলল, "তোমার কাছ থেকে আমি এটা আশা করি নি। ক্ষমা চেয়ে নেবার ইচ্ছা তোমার নেই, কিন্তু বাপু, শুধু তার কাছে নয়, গোটা রেজিমেন্টের কাছে—আমাদের সকলের কাছে—তুমিই তো দোষী। ব্যাপারটা তো এই : তোমার উচিত ছিল সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে ভেবে পরামর্শ নেওয়া ; কিন্তু তা না করে তুমি গিয়ে সকলের সামনে হৈ-চৈ শুরু করে দিলে। এ অবস্থায় কর্নেল কি করবে ? অফিসারের বিচার করে গোটা রেজিমেন্টকে অপমান করবে ? একটা পাজি লোকের জন্য গোটা রেজিমেন্টের অসম্মান করবে ? তুকি কি সেই ভাবে ব্যাপারটাকে দেখেছ ? আমরা সে ভাবে দেখছি না। আর বোগ্‌দানিচও কাঠ-বোকা : সে তোমাকে বলে বসল তুমি মিথ্যা কথা বলছ। ব্যাপারটা সুখের নয়, কিন্তু কি করা যাবে বাপু ? তুমি নিজেই গাড্ডায় পা দিয়েছ। আর এখন, আমরা চাইছি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে, অথচ অহংকারের বশে তুমি ক্ষমা চাইতে নারাজ হয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে জনসাধারণের সামনে হাজির করতে চাইছ। তোমার মনে আঘাত লেগেছে তা বুঝি, কিন্তু একজন প্রবীণ সম্মানিত অফিসারের কাছে ক্ষমা চাইতে দোষ কি ? আর যাই হোক, বোগ্‌দানিচ একজন সম্মানিত, সাহসী, প্রবীণ কর্নেল তো বটে ! তার ব্যবহারে তুমি অসন্তুষ্ট হয়েছ, কিন্তু গোটা রেজিমেন্টের অসম্মানের কথাটা একবারও ভাবলে না !" স্টাফ-ক্যাপ্টেনের গলা কাঁপতে লাগল। "আরে বাপু, তুমি সবে রেজিমেন্টে এসেছ ; আজ এখানে আছ, কালই হয় তো অন্য কোথাও অ্যাডজুটান্ট হয়ে চলে যাবে। সেখানে কেউ যখন বলবে, "পাভ্‌লোগ্রাদ অফিসারদের মধ্যে যত সব চোরের আড্ডা" তখন তুমি তো খুশিতে আঙ্গুল মটকাবে। কিন্তু আমরা তো তা পারব না ! ঠিক বলিনি দেনিসভ ? ব্যাপারটা এক নয় !"

দেনিসভ চুপ করে রইল, কোন রকম নড়াচড়াই করল না, তবে মাঝে মাঝে চকচকে কালো চোখ মেলে রস্তভ-এর দিকে তাকাতে লাগল।

স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলতে লাগল, "নিজের অহংকারই তোমার কাছে বড় হল, তাই তুমি ক্ষমা চাইতে নারাজ ; কিন্তু আমরা প্রবীণরা এই রেজিমেন্টে থেকেই বড় হয়েছি, আর ঈশ্বর করলে এই রেজিমেন্টেই মারাও যাব, তাই তো রেজিমেন্টের সম্মানকে আমরা মূল্য দিই, আর বোগ্‌দানিচ তা জানে। সত্যি

বলছি, আমরা বুড়োরা রেজিমেণ্টকে যথেষ্ট মূল্য দিই ! তাই এ সব ঠিক হচ্ছে না, ঠিক হচ্ছে না ! তুমি কষ্ট পাও বা না পাও, আমি সব সময় সত্যকেই আশ্রয় করি । এ ঠিক হচ্ছে না !"

স্টাফ-ক্যাপ্টেন উঠে রস্তভ-এর কাছ থেকে চলে গেল ।

লাফিয়ে উঠে দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক কথা ! তারপর রস্তভ, তারপর !"

রস্তভ-এর মুখ একবার লাল হচ্ছে, একবার কালো হচ্ছে । সে একবার এ অফিসারের দিকে, একবার ও অফিসারের দিকে তাকাতে লাগল ।

"না, ভদ্রমহোদয়গণ, না···আপনারা ভাববেন না···আমি সব বুঝি। আমার সম্পর্কে আপনাদের এ ধারণা ভুল···আমি·· আঃ, ঠিক আছে, আমি কাজেই তা দেখাব ; আর আমার কাছে পতাকার সম্মান···আচ্ছা, কিছু মনে করবেন না, এ কথাই সত্যি যে আমারই দোষ, সকলের কাছে আমিই দোষী। তারপর, আপনারা আর কি চান ?···"

"এই তো, এই তো সব ঠিক হয়ে গেল কাউণ্ট !" ঘুরে দাঁড়িয়ে মস্ত বড় হাত দিয়ে রস্তভ-এর কাঁধটা চাপড়ে দিয়ে স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলে উঠল ।

দেনিসভও চেঁচিয়ে বলল, "আমি বলছি, এ অতি সজ্জন লোক ।"

স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলল, "এই তো ভাল হল কাউণ্ট । যাও ইয়োর এক্সেলেন্সি, ক্ষমা চেয়ে নাও । হ্যাঁ, যাও !"

মিনতির স্বরে রস্তভ বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ, সব কিছু করতে আমি প্রস্তুত । কারও কাছে আমি একটি কথাও বলব না, কিন্তু ক্ষমা চাইতে পারব না ; ঈশ্বরের দোহাই, আমি তা পারি না ; আপনাদের যা ইচ্ছা করতে পারেন ! কেমন করে আমি ছোট ছেলের মত গিয়ে ক্ষমা চাইব ?"

দেনিসভ হাসতে লাগল ।

"এতে তোমার পক্ষে আরও খারাপ হবে । বোগ্দানিচ প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ ; এই একগুয়েমির ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে" কারস্তেন বলল ।

"না, বিশ্বাস করুন এটা একগুয়েমি নয় ! আমার মনের ভাব আমি বুঝিয়ে বলতে পারছি না । আমি পারি না ··"

স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলল, "ঠিক আছে ; তোমার যেমন অভিরুচি ।" তারপর দেনিসভকে বলল, "আর সে পাজিটার কি হয়েছে ?"

দেনিসভ আমতা-আমতা করে বলল, "সে অসুস্থতার রিপোর্ট করেছে ; কালকের তালিকা থেকে তার নামটা কেটে দিতে হবে ।"

স্টাফ-ক্যাপ্টেন বলল, "অসুস্থতা ছাড়া অন্য কোনভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না ।"

রক্ত-তৃষাতুর স্বরে দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, "অসুখ হোক আর নাই হোক, সে যেন আমার সামনে না আসে । আমি তাকে খুন করে ফেলব !"

ঠিক সেই সময় ঝের্‌কভ ঘরে ঢুকল।

নবাগতের দিকে ফিরে অফিসাররা চীৎকার করে বলল, "তুমি আবার এখানে কেন?"

"মশাইরা, আমাদের যুদ্ধে যেতে হবে! তার পুরো বাহিনী নিয়ে ম্যাক আত্মসমর্পণ করেছে।"

"এ কথা সত্যি নয়!"

"আমি নিজে তাকে দেখেছি!"

"কি? আসল ম্যাককে দেখেছ? সশরীরে?"

"যুদ্ধ! যুদ্ধ !এমন খবর আনার জন্য ওকে একটা বোতল এনে দাও! কিন্তু তুমি এখানে এলে কেমন করে?"

"সেই শয়তান ম্যাক-এর জন্যই আমাকে রেজিমেণ্টে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। একজন অস্ট্রীয় সেনাপতি আমার নামে নালিশ করেছে। ম্যাক এখানে এলে আমি তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলাম। ···ব্যাপার কি রস্তভ? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে এইমাত্র গরম জলে স্নান করে এলে।"

"আরে বাবা, গত দু'দিন যাবৎ আমরা বড়ই গোলমালে কাটাচ্ছি।"

ঘরে ঢুকল রেজিমেণ্ট-অ্যাডজুটাণ্ট; ঝের্‌কভ-এর দেওয়া সংবাদ সেও সমর্থন করল। হুকুম হয়েছে, পরদিনই তাদের যাত্রা শুরু হবে।

"আমরা যুদ্ধে যাচ্ছি মশাইরা!"

"ভালই তো, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! বড় বেশী দিন এখানে বসে আছি।"

অধ্যায়—৬

পথে ইন্‌ নদী (ব্রাউনাউতে) ও ত্রাউন নদীর (লিঞ্জ-এ) সেতুগুলি ধ্বংস করে নিয়ে কুতুজভ ভিয়েনার দিকে পশ্চাদপসরণ করল। ২৩শে অক্টোবর রুশ বাহিনী এন্‌স্‌ নদী পার হচ্ছে। দুপুর বেলা রাশিয়ার মালবাহী ট্রেন, কামান-বন্দুক, ও সেনাদলগুলি সেতুর দুই দিক বরাবর সার বেঁধে এন্‌স্‌ শহরের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

হেমন্তকালের বর্ষণসিক্ত গরম দিন। পাহাড়ের উপরে সজ্জিত রুশ কামানগুলি সেতুটাকে পাহারা দিচ্ছে; সেই পাহাড়ের সামনেকার বিস্তীর্ণ প্রান্তর কখনও তির্যক বৃষ্টিধারার স্বচ্ছ আবরণে ঢেকে যাচ্ছে, আবার পরমুহূর্তেই তার উপর রোদ ছড়িয়ে পড়ছে—বহুদূরবর্তী জিনিসগুলিও নতুন বার্নিশ-করা দ্রব্যের মত পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্‌ করতে দেখা যাচ্ছে। আরও নীচে ছোট শহরটির লাল ছাদওয়ালা সাদা বাড়ি-ঘর, গির্জা ও সেতুটা দেখা যাচ্ছে; সেতুর দুই পাশে রুশ সৈন্যরা সার বেঁধে চলেছে। দানিয়ুব নদীর বাঁকে অনেক

জাহাজ, একটি দ্বীপ, এবং এন্স্‌ ও দানিয়ুব নদীর সঙ্গম থেকে প্রবাহিত জলধারায় বেষ্টিত পার্ক সমেত একটি দুর্গও চোখে পড়ছে। আরও দেখা যাচ্ছে সবুজ তরুশীর্ষ ও নীলাভ গিরিবর্ত্মের রহস্যময় পশ্চাৎপটে পাইন-অরণ্যে ঢাকা দানিয়ুব নদীর বামপার্শ্বস্থ পর্বতমালা। জনহীন পাইন-অরণ্যের ওপারে একটা মঠের চূড়াগুলি চোখে পড়ছে, আর এন্স্‌ নদীর ওপারে বহু দূর থেকে ভেসে আসছে শত্রুপক্ষের অশ্বক্ষুরধ্বনি।

পাহাড়ের একেবারে প্রান্তে কামানশ্রেণীর মাঝখানে পশ্চাৎবর্তী রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি একজন স্টাফ-অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে ফিল্ড-গ্লাসের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলটাকে খুঁটিয়ে দেখছে। প্রধান সেনাপতি এই রক্ষীবাহিনীতেই নেস্‌ভিৎস্কিকে পাঠিয়েছে। একটু পিছনে সেও বসে আছে একটা কামানবাহী গাড়ির পিছন দিকে। তার সঙ্গী জনৈক কসাক একটি ঝোলা ও ফ্লাস্ক তার হাতে তুলে দিয়েছে, আর নেস্‌ভিৎস্কি কয়েকজন অফিসারকে পিঠে ও আসল “ডোপেল-কুমেল’ খাওয়াচ্ছে।

অফিসাররা মনের সুখে তাকে ঘিরে আছে; কেউ হাঁটু ভেঙে বসেছে, কেউ বা তুর্কী কায়দায় ভিজে ঘাসের উপরেই বসে পড়েছে।

নেস্‌ভিৎস্কি বলছে, “সত্যি, অস্ট্রিয়ার যে রাজা এই দুর্গটা বানিয়েছিল সে লোকটি বোকা ছিল না। চমৎকার জায়গাটা! আরে মশাইরা, আপনারা খাচ্ছেন না কেন?”

এ রকম একজন মর্যাদাসম্পন্ন স্টাফ-অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে পারায় খুশি হয়ে একজন অফিসার বলে উঠল, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ প্রিন্স। জায়গাটা ভারী মনোরম! পার্কটার পাশ দিয়ে আসতে আসতে আমরা দুটো হরিণ দেখতে পেয়েছি···আর বাড়িটা কী চমৎকার!”

আর একজন অফিসারের আরও একটা পিঠে খাবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলেও লজ্জায় সে কথা বলতে না পেরে আপাতত গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্য দেখার ভান করে, বলল, “দেখুন, দেখুন প্রিন্স, আমাদের পদাতিক সৈন্যরা এর মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে। ঐ দেখুন, গ্রামের পিছনকার ঐ মাঠটায় তাদের তিনজন কি যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা দুর্গে ঢুকবে।”

“তা তো ঢুকবেই,” নেস্‌ভিৎস্কি বলল। তারপর সুন্দর মুখের ভিজে ঠোঁট দিয়ে একটা পিঠে চাটতে চাটতে সে আরও বলল, “কিন্তু আমার ইচ্ছা করছে, লুকিয়ে ওই হোথায় চলে যেতে।”

হেসে উঠে সে একটা চূড়াওয়ালা সন্ন্যাসিনীদের মঠ দেখাল; তার চোখ দুটো কুঁচকে চকচক করতে লাগল।

“তাহলে ভারী মজা হত মশাইরা!”

অফিসাররা হেসে উঠল।

“সন্ন্যাসিনীদের একটু নাচানো যেত আর কি। শুনেছি ওদের মধ্যে

কয়েকটি ইতালীয় মেয়েও আছে। সত্যি বলছি, এর জন্য জীবনের পাঁচটা বছর দিয়ে দিতে আমি রাজী আছি।”

একজন সাহসী অফিসার হেসে বলল, “ওদেরও তো খুব একঘেয়ে লাগছে।

ইতিমধ্যে সামনে দাঁড়ানো স্টাফ-অফিসারটি সেনাপতিকে কি যেন দেখাতেই সে ফিল্ড-গ্লাসটা চোখে লাগাল।

সেনাপতি ফিল্ড-গ্লাসটা নামিয়ে কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে রেগে বলে উঠল, “হ্যাঁ, ঠিক তাই, ঠিক তাই। ঠিক চৌমাথার কাছে ওদের উপর গুলি ছোঁড়া হবে। ওরা ওখানে অকারণে সময় নষ্ট করছে কেন?”

অপর দিকে এখন খালি চোখেই শত্রুপক্ষকে দেখা যাচ্ছে; তাদের কামানশ্রেণীর উপর থেকে একটা দুধ-সাদা মেঘ উঠে এল। পরক্ষণেই অনেক দূর থেকে একটা গোলার আওয়াজ ভেসে এল, আর আমাদের সৈন্যরা চৌমাথার দিকে ছুটতে লাগল।

নেস্‌ভিৎস্কি হাসতে হাসতে সেনাপতির দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, “ইয়োর এক্সেলেন্সি কি একটু জলযোগ করতে ইচ্ছা করেন?”

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেনাপতি বলল, “যত সব বাজে ব্যাপার; আমাদের সৈন্যরা অকারণে সময় নষ্ট করছে।”

“আমি কি ঘোড়া ছুটিয়ে যাব ইয়োর এক্সেলেন্সি?” নেস্‌ভিৎস্কি শুধাল।

“দয়া করে তাই যাও,” সেনাপতি জবাব দিল; তারপর ইতিমধ্যেই যে হুকুম বিস্তারিতভাবে জারি করা হয়েছে সেটারই পুনরাবৃত্তি করল: “আর হুজারদের বলে দাও তারা যেন সকলের শেষে নদী পার হয় এবং আমার হুকুম মত সেতুটা উড়িয়ে দেয়; আর সেতুর উপরে যে সব দাহ্য পদার্থ আছে সেগুলি অবশ্যই আর একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।”

“খুব ভাল কথা,” নেস্‌ভিৎস্কি জবাব দিল।

সে ঘোড়াসমেত কসাককে ডাকল, ঝোলা ও ফ্লাস্কটা নামিয়ে নিতে বলল, এবং একলাফে ভারী শরীরটা নিয়ে জিনের উপর চেপে বসল।

অফিসাররা সহাস্য বদনে তাকে দেখছিল। “সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে সত্যি দেখা করব,” এই কথা তাদের বলে সে পাহাড়ের ঘোরানো পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গোলন্দাজ-অফিসারের দিকে ফিরে সেনাপতি বলল, “এবার দেখা যাক ক্যাপ্টেন, জল কতদূর গড়ায়। চেষ্টা তো করুন! সময় কাটাতে একটু মজা তো করা যাবে!”

অফিসার হুকুম দিল, “যার যার কামানের কাছে চলে যাও!”

মুহূর্তের মধ্যে সৈন্যরা ক্যাম্প-ফায়ার ছেড়ে খুশিমনে ছুটে গিয়ে কামানে বারুদ ঠাসতে লেগে গেল।

“এক নম্বর!” হুকুম এল।

এক নম্বর লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। কান-কাটানো ধাতব শব্দে কামানটা গর্জে উঠল, আর একটা গোলা সশব্দে আমাদের নীচেকার সৈন্যদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে শত্রুর অনেক আগেই মাটিতে ছিটকে পড়ল; কোথায় পড়ল সেটা বোঝা গেল শুধু কিছুটা ধোঁয়া উড়তে দেখে।

সে শব্দ শুনে অফিসার ও সৈন্যদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে নীচে আমাদের সৈন্যদের চলাচল এবং অনেক দূরের আগুয়ান শত্রুপক্ষের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল। ঠিক সেই সময় সূর্যটা মেঘের আড়াল থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে এল, একটিমাত্র গোলার স্পষ্ট আওয়াজ আর উজ্জ্বল রোদের প্রসন্নতা মিলেমিশে একটি আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করল।

অধ্যায়—৭

ইতিমধ্যেই শত্রুপক্ষের দুটি গোলা সেতু পার হয়ে ছুটে এসে সশব্দে ফেটে পড়েছে। প্রিন্স নেস্‌ভিৎস্কি সেতুর মাঝামাঝি ঘোড়া থেকে নেমে রেলিং ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি ঘোড়ার রাশ ধরে যে কসাকটি তার কয়েক পা পিছনে দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে সে হাসতে লাগল। প্রিন্স নেস্‌ভিৎস্কি যতবার এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে ততবারই সৈনিকরা ও তাদের গাড়িগুলো তাকে ঠেলে রেলিংয়ের গায়ে চেপে ধরছে; ফলে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসা ছাড়া আর কিছুই করবার ছিল না।

পদাতিক সৈন্যরা কসাকটির গাড়ির চাকা ও তার ঘোড়া দুটির উপর একেবারে চেপে এসে পড়েছে; ওদিক থেকে মালগাড়িসহ একটি রক্ষী-সৈনিক তাদের ঠেলে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে দেখে কসাকটি বলে উঠল, "তুমি কেমন লোক হে বাপু! এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করতে পার না! তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না যে সেনাপতি এগিয়ে যেতে চাইছেন?"

রক্ষী-সৈনিকটি কিন্তু "সেনাপতি" কথাটা গ্রাহ্যই করল না, যে সব সৈন্য তার পথ আটকে দিয়েছিল তাদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বলল, "হাই বাপুরা! বাঁদিকে চেপে চল! একটু থাম।" কিন্তু সৈন্যরা এমনভাবে কাঁধে-কাঁধে এক হয়ে জমে গেছে যে তাদের বেয়নেটগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা আটকে গেছে; কাজেই তারা একটিমাত্র ঘন পদার্থের মত সেতুর উপর দিয়ে এগোতে লাগল। রেলিংয়ের উপর দিয়ে নীচে তাকিয়ে প্রিন্স নেস্‌ভিৎস্কি দেখল, এন্‌স্ নদীর ছোট ছোট ঢেউগুলি কুলকুল শব্দে সেতুর স্তম্ভগুলির চারপাশে পাক খেতে খেতে একে অন্যকে ধাওয়া করে ছুটে চলেছে। সেতুর উপরে তাকিয়েও দেখতে পেল সৈন্যদের এক জীবন্ত স্রোত—কাঁধের পট্টি, 'শাকো' পিঠের বোঁচকা, বেয়নেট, লম্বা বন্দুক, এবং 'শাকো'র নীচে চওড়া চোয়াল, বসে-যাওয়া গাল, ক্লান্ত অবসন্ন ভাব; সেতুর কর্দমাক্ত পিচ্ছিল কাঠের উপর

দিয়ে পাগুলো এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে সেই একঘেয়ে সৈন্যপ্রবাহের ফাঁকে ফাঁকে এন্‌স্‌ নদীর ঢেউগুলির বুকে ছুটে-চলা সাদা সাদা ফেনার মত এক একজন অফিসার আলখাল্লায় শরীর ঢেকে সৈন্যদের চাইতে ভিন্ন ধরনের মুখ দেখিয়ে পথ করে এগিয়ে যাচ্ছে; কখনও বা নদীর বুকে পাক-খাওয়া একটুকরো কাঠের মত কোন হুজার, বা আর্দালি, বা নাগরিক পায়ে হেঁটে সেই পদাতিক সৈন্যদের স্রোতে ভেসে চলেছে; আবার কখনও বা নদীর বুকে ভেসে-চলা প্রকাণ্ড কাঠের গুঁড়ির মত অফিসারদের অথবা সৈন্যদের মালপত্রে আকণ্ঠ বোঝাই হয়ে চামড়ায় ঢাকা একটা মালগাড়ি সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

কসাকটি হতাশ হয়ে বলল, "যেন একটা বাঁধ ভেঙেছে। এমন আর কত আসবে হে তোমরা?"

ছেঁড়া কোট পরা একটি রসিক সৈনিক চোখ টিপে জবাব দিল, "একজন কম দশ লাখ হে!" বলতে বলতে সে চলে গেল; তার পিছন পিছন এল একটি বুড়ো।

বিষণ্ণ মুখে সে তার পাশের সৈন্যকে বলল, "ওরা (মানে শত্রুপক্ষ) যদি এখন সেতুর উপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করে তাহলে তোমার গা চুলকানোও ভুলিয়ে দেবে।"

সে চলে গেল; গাড়ির উপর বসে আর একজন এল।

"কী মুস্কিল, আমার পায়ের পট্টিটা কোথায় গেল?" বলতে বলতে একটি আর্দালি গাড়ির পিছনে ছুটতে লাগল।

সে গাড়ি নিয়ে চলে গেলে এল একদল ফুর্তিবাজ সৈন্য; তারা এতক্ষণ মদ খাচ্ছিল।

গ্রেটকোটটাকে ভাল করে গুঁজে নিয়ে একটি সৈন্য জোরে জোরে হাত নেড়ে খুশির সুরে বলল, "তারপর, বুঝলে বুড়ো, বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ওরা ঝাড়ল একখানা তার দাঁতের উপর…"

আর একজন হো-হো করে হেসে বলল, "হ্যাঁ, শুয়োরের মাংসটা ভালই ছিল…" তারাও চলে গেল। কিন্তু নেস্‌ভিৎস্কি বুঝতেই পারল না, কার দাঁত গেল, আর তার সঙ্গে শুয়োরের মাংসরই বা সম্পর্ক কি।

"বাঃ! কী রকম জোর চালাচ্ছে! একটা গোলা ছুঁড়েই ভাবে সব মরে যাবে," জনৈক সার্জেন্ট রেগে গিয়ে ঘৃণার সুরে বলল।

মস্তবড় হাঁ-ওয়ালা একটি তরুণ সৈনিক অনবরত হাসতে হাসতে বলল, "আরে বাবা, ওটা যখন আমার পাশ দিয়ে উড়ে গেল, মানে আমি গোলাটার কথাই বলছি, তখন আমার মনে হল যে আমি ভয়েই মরে যাব। সত্যি বলছি, কী ভীষণ ভয়ই না পেয়েছিলাম!" সে এমনভাবে কথাগুলি বলল যেন ভয় পাওয়াটাও একটা বাহাদুরির ব্যাপার।

সেও চলে গেল। তারপর এল এমন একটা গাড়ি যেটা অন্য গাড়িগুলো থেকে আলাদা। জনৈক জার্মান একটা জার্মান গাড়িকে এক জোড়া ঘোড়ায় টেনে নিয়ে চলেছে; তাতে যতরাজ্যের গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বোঝাই। পালকের বিছানার উপরে বসে আছে স্তন্যপায়ী শিশু কোলে একটি স্ত্রীলোক, একটি বুড়ি ও একটি স্বাস্থ্যবতী লাল-গাল জার্মান মেয়ে। বোঝাই যায়, এই পলাতকরা বিশেষ অনুমতি নিয়েই চলেছে। সৈন্যদের সবগুলি চোখ তাদের দিকেই তাকিয়ে আছে; গাড়িটা পায়ে হাঁটার তালে তালেই এগিয়ে চলেছে; দুটি অল্প বয়স্কাকে ঘিরেই সৈন্যদের মুখে নানা রকম মন্তব্যের খই ফুটতে লাগল। সকলের মুখে একই ধরনের হাসি; তাদের অশোভন চিন্তারই প্রকাশ।

"দেখ, দেখ, জার্মান চাটনিও কেমন পথ চলছে হে!"

জার্মানটিকে লক্ষ্য করে একজন বলল, "কুমারীটিকে আমার কাছে বেচে দাও হে।" লোকটি রাগ করল, আবার ভয়ও পেল; চোখ নাচু করে সে সাধ্যমত পা চালাতে লাগল।

"দেখ, মেয়েটা কেমন সেজেছে! আহারে, শয়তান!"

"এই ফেদতভ, তোমাকে ওদের সঙ্গেই চালান করা দরকার!"

"আরে স্যাঙাৎ, এমন আমি কত দেখেছি!"

"তোমরা কোথায় চলেছ?" একজন পদাতিক অফিসার জিজ্ঞাসা করল। সেও এতক্ষণ আপেল খেতে খেতে মুচকি হেসে সুন্দরী মেয়েটিকেই দেখছিল।

মেয়েটিকে একটা আপেল দিয়ে বলল, "ইচ্ছা করলে এটা নাও।"

মেয়েটি হেসে আপেলটা নিল। সেতুর উপরকার অন্য সকলের মতই নেস্‌ভিৎস্কিও এতক্ষণ এই স্ত্রীলোকদের উপর থেকে একবারও চোখ ফেরায় নি। তারা চলে গেলে সেই একই সৈন্যের স্রোত বয়ে চলল, তাদের মুখে সেই একই ধরনের কথাবার্তা। শেষ পর্যন্ত সকলেই থেমে গেল। যেমন প্রায়ই হয়, সেতুর শেষ প্রান্তে কোন মালগাড়ির ঘোড়াগুলো চঞ্চল হয়ে ওঠে, আর সকলকেই থেমে যেতে হয়।

সৈন্যরা বলে উঠল, "এরা সব থামল কেন? এরকম তো হুকুম ছিল না!" "তুমি কোন্ দিকে এগোচ্ছ? তোমার মাথায় শয়তান চাপুক! একটু অপেক্ষা করতে পার না? ওরা যদি সেতুটা উড়িয়ে দেয় তো বুঝবে মজা। দেখ, দেখ, একজন অফিসারও জ্যাম-জমাট হয়ে গেছে।" নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল; সকলেই চাপ দিয়ে এগোতে চেষ্টা করছে সেতু থেকে বের হবার মুখটার দিকে।

সেতুর নীচে এন্‌স্ নদীর দিকে তাকিয়ে নেস্‌ভিৎস্কি হঠাৎ একটা নতুন ধরনের শব্দ শুনতে পেল; একটা কি যেন দ্রুত এগিয়ে আসছে···বেশ বড়সড় একটা কিছু জল ছিটিয়ে এগিয়ে আসছে।

সেদিকে তাকিয়ে একটি সৈনিক বলল, "দেখ, ওটা কোথায় যাচ্ছে!"

আর একজন অস্বস্তির সঙ্গে বলল, "আমাদের আরও তাড়াতাড়ি চলতে উৎসাহ দিচ্ছে।"

ভিড় আবার এগিয়ে চলল। নেস্‌ভিৎস্কি বুঝতে পারল, ওটা একটা কামানের গোলা। সে হাঁক দিল, "হেই কসাক, আমার ঘোড়া! ···এই, এবার তোমরা সব পথ ছাড়! পথ ছাড়!"

অনেক কষ্টে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে অনবরত চীৎকার করতে করতে সে এগিয়ে চলল। সৈনিকরা জড়সড় হয়ে নিজেরা চেপে তাকে পথ করে দিল; কিন্তু পরক্ষণেই তারা আবার তার পা দুটোকে পর্যন্ত চেপে ধরল; যারা তার কাছে ছিল তাদেরও দোষ দেওয়া চলে না, কারণ পিছন থেকে তাদের উপরেও প্রচণ্ড চাপ পড়ছে।

"নেস্‌ভিৎস্কি! নেস্‌ভিৎস্কি! এই হাঁদারাম!" পিছন থেকে একটা কর্কশ গলা ভেসে এল।

নেস্‌ভিৎস্কি চারদিকে তাকাল; চলন্ত পদাতিক বাহিনীর ওপারে প্রায় পনেরো পা দূরে ভাস্কা দেনিসভকে দেখতে পেল। এলোমেলো লাল চেহারা; টুপিটা কালো মাথার পিছন দিকে পরা, আলখাল্লাটা কাঁধের উপরে ঝুলছে।

"এই শয়তানগুলোকে, এই পিশাচগুলোকে বল, আমার পথ ছেড়ে দিক!" রাগে গর্‌গর্‌ করে দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, তার কয়লা-কালো চোখের রক্ত-লাল সাদা অংশটা ঝিকমিক করে ঘুরছে, মুখের মতই লাল খোলা হাতে সে কোষবদ্ধ তলোয়ারটাকে অনবরত ঘোরাচ্ছে।

নেস্‌ভিৎস্কি খুশি হয়ে জবাব দিল, "আরে, ভাস্কা! হল কি তোমার?'

"আরে, সৈন্যদল এগোতে পারছে না," ভাস্কা দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল; সাদা দাঁতগুলি হিংস্রভাবে বেরিয়ে পড়েছে; কালো আরবি ঘোড়াটার গায়ে বার বার পায়ের কাঁটা দিয়ে ঠুকছে; আর ঘোড়াটাও নাক ডাকিয়ে সাদা ফেনা ছুটিয়ে এমনভাবে ক্ষুর দিয়ে সেতুর কাঠের উপর পা ঠুকছে যেন অশ্বারোহী আপত্তি না জানালে সে রেলিং-এর উপর দিয়ে ঝাঁপ দিতেও রাজী। এবার সত্যি সত্যি খাপ থেকে তলোয়ার খুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সে চেঁচিয়ে উঠল, "এসব কি? যত সব ভেড়ার দল। একেবারে ভেড়া! ভাগ্‌ হিঁয়াসে!·· আমাদের যেতে দে!···এই গাড়িওলা শয়তান, গাড়ি থামা! নইলে দেব তলোয়ারের এক কোপ!"

ভয়ার্ত মুখে একে অন্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জনতা পথ করে দিল। দেনিসভ নেস্‌ভিৎস্কির কাছে এল।

ঘোড়া নিয়ে কাছে এলে নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "কি ব্যাপার, এখনও মাল পেটে পড়ে নি?"

ভাস্কা জবাব দিল, "এক পাত্রও মুখে দেবার সময় পাই নি। সারা দিন রেজিমেন্টকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করছে। ওরা যদি যুদ্ধই চায় তো যুদ্ধ

হোক। কিন্তু এসব কি হচ্ছে তা শয়তানই জানে।”

দেনিসভ-এর নতুন আলখাল্লা আর নিজের কাপড় দেখে নেস্‌ভিৎস্কি বলল, “তোমাকে যে একেবারে ফুলবাবুটি দেখাচ্ছে!”

দেনিসভ হাসল। তলোয়ারের হাতলের নীচ থেকে একটা রুমাল বের করে নেস্‌ভিৎস্কির নাকের কাছে ধরল। রুমালটা গন্ধে ভুরভুর করছে।

“বুঝতেই তো পারছ, যুদ্ধে চলেছি। দাড়ি কামিয়েছি, দাঁত বুরুশ করেছি, গায়ে গন্ধ ঢেলেছি।”

একে নেস্‌ভিৎস্কির দশাসই চেহারা ও তার পিছনে কসাক অনুচর, তার উপর দেনিসভ-এর তলোয়ার ঘোরানো ও অবিশ্রাম চীৎকার—এসব দেখে শুনে ভিড়ের লোকজনরা এতই হকচকিয়ে গেল যে তারা দু'জন ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে সেতুর একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল এবং পদাতিক বাহিনীকে থামিয়ে দিল। সেতুর পাশেই কর্ণেলকে দেখতে পেয়ে নেস্‌ভিৎস্কি হুকুম-নামাটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল।

পথ পরিষ্কার করে নিয়ে দেনিসভ সেতুর শেষ প্রান্তে গিয়ে থামল। ঘোড়ার রাশটা হাতে ধরে সে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, তার অধীনস্থ সেনাদলটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে। সেতুর কাঠের উপর অনেকগুলি ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল; সামনে অফিসাররা ও তাদের পিছনে চারজন করে সৈন্য পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সেনাদল তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

যে পদাতিক বাহিনীকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা সেতুর কাছে কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিদ্বেষ, বিরক্তি ও ঠাট্টার মনোভাব নিয়ে সুশৃংখলভাবে এগিয়ে-চলা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হুজারদের দিকে তাকিয়ে রইল, বিভিন্ন বিভাগের সৈন্যরা সাধারণত এই রকম মনোভাব নিয়েই পরস্পরকে দেখে থাকে।

একজন বলল, “সব ফুলবাবুর দল! যেন মেলা দেখতে চলেছে!”

“কোন্ কাজে লাগবে ওরা? সবই তো কেবল দর্শনধারী।” আর একজন বলল।

ঘোড়ার ক্ষুর থেকে কয়েকটি পদাতিকের গায়ে কাদা ছিটকে দিয়ে একজন হুজার ঠাট্টা করে বলল, “এই পদাতিক, ধুলো উড়িয়ো না!”

হাতের আস্তিন দিয়ে মুখের কাদা মুছতে মুছতে একজন পদাতিক সৈন্য বলল, “কাঁধে বোঁচকা চাপিয়ে তোমাকে দু'দিনের মার্চে পাঠাতে বড়ই ইচ্ছা করে। বাহারে পোশাকের তাহলে বারোটা বেজে যেত। মৌজ করে এমনভাবে বসে আছ যে পক্ষী কি মানুষ তা বোঝা দায়।”

পিঠের বোঝার চাপে নুয়ে-পড়া একটি ছোটখাট সৈন্যকে লক্ষ্য করে কর্পোরাল বলল, “আরে জিকিন, ওদের তো উচিত ছিল তোমাকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নেওয়া।”

একজন হুজার চেঁচিয়ে বলল, "তুই পায়ের ফাঁকে একটা লাঠি ভরে নাও, তাহলেই তো ঘোড়া পেয়ে যাবে!"

অধ্যায়—৮

পদাতিক বাহিনীর শেষ সৈনিকটি পর্যন্ত গায়ে গায়ে লেগে যেন একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে ঢুকছে এমনি ঘন হয়ে সেতুটা পার হয়ে গেল। অবশেষে মালগাড়িগুলোও পার হয়ে গেল, হৈ-চৈ কমে এল, শেষ সেনাদলটিও সেতুর উপর উঠে এল। শুধু দেনিসভ-এর শেষ হুজার দলটি শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করবার জন্য সেতুর এপারে থেকে গেল। অপর তীরের পাহাড়ের উপর থেকে শত্রুপক্ষকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু সেতুর উপর থেকে এখনও তাদের দেখা যাচ্ছে না; কারণ যে উপত্যকাটার ভিতর দিয়ে নদীটা বয়ে চলেছে মাত্র আধ মাইল দূর থেকেই তার বুকে অনেকগুলি ঢিবি গড়ে উঠে দিগন্ত-রেখাটা গড়ে উঠেছে। পাহাড়ের নীচে যে পতিত জমিটা রয়েছে তাতে আমাদেরই কয়েক দল কসাক স্কাউট চলাফেরা করছে। হঠাৎ উঁচু জমির মাথায় কামান-বন্দুক ও নীল ইউনিফর্ম পরা সৈন্যদের দেখা গেল। একদল কসাক স্কাউট জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে নীচে নেমে গেল। দেনিসভ-এর সেনাদলের সব অফিসার ও সৈন্যরা অন্য বিষয়ে কথা বলতে ও অন্য দিকে তাকাতে চেষ্টা করলেও তারা শুধু পাহাড়ের উপরকার কথাই চিন্তা করতে লাগল, এবং দিগন্ত-রেখা বরাবর যে দৃশ্য ফুটে উঠছে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখল, কারণ তারা জানে যে ওরা শত্রুসৈন্য। দুপুরের পর থেকে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে; উজ্জ্বল সূর্য ক্রমেই দানিয়ুব নদী ও চতুর্দিকের কালো পাহাড়ের বুকে নেমে যাচ্ছে। একদিকে সেনাদল, অন্যদিকে শত্রুপক্ষ—এই দুইয়ের মাঝখানটা প্রায় ফাঁকা। দুইয়ের মাঝখানে মাত্র সাত গজের মত ফাঁকা জায়গার ব্যবধান। শত্রুপক্ষ গোলাবর্ষণ থামিয়ে দিয়েছে; তাই দুই বিরোধী সৈন্যদলের মধ্যবর্তী কঠোর, ভয়াল, অগম্য ও স্পর্শাতীত রেখাটি যেন আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমান্তস্বরূপ এই রেখাটি অতিক্রম করে এক পা বাড়ালেই অনিশ্চয়তা, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর রাজত্ব। কি আছে ওখানে? কে আছে ওখানে?—সূর্যের আলোয় আলোকিত ঐ প্রান্তর, ঐ গাছ ও ঐ ছাদের ওপারে? কেউ তা জানে না, কিন্তু সকলেই জানতে চায়। মনে ভয়, তবু ঐ সীমারেখা তুমি পার হতেই চাও, কারণ মৃত্যুর ওপারে কি আছে তা যেমন একদিন তোমাকে অনিবার্যভাবে জানতেই হবে, ঠিক তেমনি তুমি এটাও জান যে আগে হোক পরে হোক ঐ সীমা-রেখা তোমাকে পার হতেই হবে, তার ওপারে কি আছে তাও জানতেই হবে। তবু তুমি শক্তি-

মান, স্বাস্থ্যবান, ফুর্তিবাজ, উত্তেজনাপ্রবণ, আর তোমার চারপাশেও রয়েছে তেমনি সব মানুষের দল। সুতরাং শত্রুপক্ষকে দেখতে পেলেই মনে ভাবনা জাগে, অনুভূতি জাগে, আর সেই অনুভূতি সেই মুহূর্তের সব কিছুকেই একটা নতুন আকর্ষণ ও তীব্রতায় ভরে দেয়।

শত্রুপক্ষ যে উঁচু জায়গাটায় রয়েছে সেখান থেকে কামানের ধোঁয়া উঠল, আর একটা গোলা শোঁ করে হুজার বাহিনীর মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। যে অফিসাররা এক জায়গায় দাঁড়িয়েছিল তারা ঘোড়া ছুটিয়ে যার যার জায়গায় চলে গেল। হুজাররা সতর্কতার সঙ্গে ঘোড়াগুলিকে যথাস্থানে সাজাতে লাগল। গোটা স্কোয়াড্রন যেন থম্‌থম্‌ করছে। সকলেই তাকিয়ে আছে সামনের শত্রুপক্ষের দিকে আর স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের দিকে; কখন হুকুম আসবে তারই প্রতীক্ষায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় গোলাও পাশ দিয়ে উড়ে গেল। লক্ষ্য অবশ্যই হুজাররা, কিন্তু গোলাগুলি দ্রুত সশব্দ গতিতে অশ্বারোহী সৈনিকদের মাথার উপর দিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে পড়ল। হুজাররা পিছন ফিরে তাকাল না, কিন্তু যেমন প্রতিটি গোলার শব্দের সঙ্গে, তেমনি প্রতিটি হুকুমের সঙ্গে, গোটা স্কোয়াড্রনের প্রতিটি মানুষ রুদ্ধশ্বাসে একবার পাদানিতে দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়ল। পরস্পরের মুখের ভাব লক্ষ্য করবার কৌতূহলে প্রতিটি সৈনিক ঘাড় বেঁকিয়ে একে অন্যকে দেখতে লাগল। দেনিসভ থেকে শুরু করে বিউগলবাদক পর্যন্ত প্রতিটি মুখের উপরই একই দ্বন্দ্ব, বিরক্তি ও উত্তেজনার প্রকাশ। কোয়ার্টার মাস্টার ভুরু কুঁচকে এমনভাবে সৈনিকদের দিকে তাকাতে লাগল যেন তাদের শাস্তির ভয় দেখাচ্ছে। যতবার গোলা ছুটছে ক্যাডেট ততবারই মাথাটা নীচু করছে। বাঁদিকে রয়েছে রস্তভ তার খোঁড়া অথচ সুন্দর ঘোড়া 'রুক'-এর পিঠে চড়ে; তার মুখে এমন খুশি-খুশি ভাব যেন কোন স্কুলের ছাত্রকে পরীক্ষার জন্য অনেক লোকের সামনে ডাকা হয়েছে, আর সে নিশ্চিত জানে যে পরীক্ষায় সে ভাল ফল করবেই। পরিষ্কার, উজ্জ্বল চোখ তুলে সে সকলের দিকে তাকাচ্ছে; যেন বলছে, তোমরা দেখ কেমন শান্তভাবে আমি আগুনের নীচে বসে আছি। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও তার মুখেও একটা নতুন ও কঠোর কিছুর আভাষ ফুটে উঠেছে।

"ওখানে কে মাথা নোয়াচ্ছ হে? ক্যাডেট মিরোনভ! না, ওটা ঠিক নয়! আমার দিকে তাকাও," দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল। একজায়গায় চুপ করে থাকতে না পেরে সে স্কোয়াড্রনের সামনে ঘোড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভাস্কা দেনিসভ-এর কালো, লোমশ, থ্যাবড়া নাক, বেঁটে শক্ত শরীর, পেশীবহুল লোমশ হাতের মোটা মোটা আঙুলে খোলা তলোয়ার শক্ত করে ধরা। তাকে ঠিক সেই রকম স্বাভাবিকই দেখাচ্ছে যেরকমটি দেখায়

সন্ধ্যার দিকে দুটো বোতল সাবাড় করবার পরে ; তবে একটু বেশী লাল দেখাচ্ছে এই যা তফাৎ। জলপানরত পাখিদের মত ঝাঁকড়া-চুল মাথাটাকে পিছনে ঠেলে দিয়ে, ভাল ঘোড়া "বেদুইন"-এর পেটে নির্মমভাবে পায়ের কাঁটা ঠুকে, এবং পিছনে ঝুঁকে ঘোড়ার পিঠে বসে সে স্কোয়াড্রনের অন্য পাশে জোর কদমে ছুটে গিয়ে কর্কশ গলায় সৈন্যদের পিস্তলের দিকে চোখ রাখবার হুকুম দিল। তারপর ছুটে গেল কার্স্তেন-এর কাছে। চওড়া-পিঠ ঘোটকিটার পিঠে চেপে স্টাফ-ক্যাপ্টেন তার দিকে এগিয়ে গেল। তার লম্বা মুখখানা যথারীতি বেশ গম্ভীর, শুধু চোখ দুটো একটু বেশী উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

দেনিসভকে বলল, "আরে, এ সব কি হচ্ছে ? যুদ্ধ তো শেষ পর্যন্ত হবেই না। দেখবে—আমরাই সরে যাব।"

দেনিসভ বলল, "ওদের মাথায় যে কি আছে তা শুধু শয়তানই জানে!" রস্তভ-এর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আরে রস্তভ, শেষ পর্যন্ত পেয়েছ তাহলে।"

তাকে হাসতে দেখে রস্তভও খুশি হল। ঠিক সেই সময় কম্যাণ্ডার সেতুর উপর এসে দাঁড়াল। দেনিসভ তার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, আসুন আমরাই আক্রমণ করি! আমিই ওদের তাড়াব।"

যেন একটা বিরক্তিকর মাছি তাড়াচ্ছে এমনিভাবে নাকটাকে উঁচু করে কর্ণেল বিরক্তিকর গলায় বলল, "আক্রমণই বটে! তোমরা এখানে থেমে আছ কেন ? দেখতে পাচ্ছ না, গোলযোগকারীরা পিছনে সরে যাচ্ছে ? তোমার স্কোয়াড্রনকে পিছিয়ে নিয়ে যাও।"

স্কোয়াড্রন সেতু পার হয়ে কামানের পাল্লার বাইরে চলে গেল। একটি সৈনিকও মারা যায় নি। সামনের সারির স্কোয়াড্রনটাও তাদের অনুসরণ করল। শেষ কসাকটিও নদী পেরিয়ে চলে গেল।

দুটি পাভ্‌লোগ্রাদ স্কোয়াড্রন সেতু পার হয়ে একে একে পাহাড়ে উঠে গেল। তাদের কর্ণেল বোগ্‌দানিচ শুবার্ট দেনিসভ-এর স্কোয়াড্রনের কাছে পৌঁছে পায়ে-হাঁটার গতিতে ঘোড়া চালাতে লাগল। রস্তভও কাছাকাছিই চলেছে ; কিন্তু তেলিয়ানিনকে নিয়ে দু'জনের মধ্যে সাক্ষাতের পরে এই তাদের প্রথম দেখা হলেও বোগ্‌দানিচ রস্তভ-এর দিকে ফিরেও তাকাল না। রস্তভও কর্ণেলের চওড়া পিঠ, হাল্কা চুলে ঢাকা ঘাড় ও লাল গলার দিকেই তাকিয়ে রইল। রস্তভ-এর মনে হল, বোগ্‌দানিচ তাকে না দেখার ভান করেছে মাত্র ; ক্যাডেটের সাহস পরীক্ষা করাই তার আসল লক্ষ্য ; তাই সেও নিজেকে সংযত করে খুশি মনে চারদিকে তাকাতে লাগল ; পরক্ষণেই তার আবার মনে হল, নিজের সাহস দেখাবার জন্যই বোগ্‌দানিচ তার

এত কাছাকাছি ঘোড়া চালাচ্ছে। তারপরেই আবার ভাবল, তাকে অর্থাৎ রস্তভকে শাস্তি দেবার জন্যই এই শত্রুটি প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য একটি স্কোয়াড্রনকে পাঠাবে। তারপরেই কল্পনা করল, আক্রমণের পরে সে যখন আহত অবস্থায় পড়ে থাকবে তখন বোগ্‌দানিচ তার কাছে এগিয়ে এসে উদারতার সঙ্গে ব্যাপারটা মিটমাট করে ফেলবে।

ঝেরকভ-এর উঁচু-কাঁধ মূর্তিটা ঘোড়ায় চেপে কর্ণেলের সামনে হাজির হল। হেডকোয়ার্টার থেকে বরখাস্ত হবার পরে ঝেরকভ্ আর রেজিমেণ্টে থাকে নি; তার বক্তব্য, যখন স্টাফে থেকে কিছু না করেই বেশ মোটা বকশিস কামানো যায় তখন যুদ্ধক্ষেত্রে চাকরের খাটুনি খাটবার মত বোকা সে নয়; তাই সে প্রিন্স বাগ্রাশন-এর অধীনে একটা আর্দালি-অফিসারের কাজ বাগিয়ে নিয়েছে। পশ্চাদ্বর্তী রক্ষীদলের কমাণ্ডারের একটা হুকুম বয়েই সে এখন তার প্রাক্তন প্রধানের কাছে এসেছে।

বিষণ্ণ গাম্ভীর্যের ভাব দেখিয়ে চারদিককার সহকর্মীদের দিকে তাকিয়ে রস্তভ-এর শত্রুকে লক্ষ্য করে সে বলল, "কর্ণেল, এখানে থেমে সেতুটাকে গোলা ছুঁড়ে উড়িয়ে দেবার হুকুম হয়েছে।"

"হুকুমটা কার উপর?" কর্ণেল জিজ্ঞাসা করল।

কর্ণেল গম্ভীর গলায় বলল। "কার উপর সেটা আমি নিজেও জানি না; প্রিন্স আমাকে বললেন; 'তুমি গিয়ে কর্ণেলকে বল, হুজাররা যেন তাড়াতাড়ি ফিরে যায় এবং সেতুটাকে উড়িয়ে দেয়'।"

ঝেরকভ-এর ঠিক পরেই সেই দলের একজন অফিসারও সেই একই হুকুম নিয়ে হুজার কর্ণেলের কাছে ছুটে এল। তার পরেই একটা কসাক ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল নেস্‌ভিৎস্কি।

আসতে আসতেই সে চীৎকার করে বলল, "এটা কি হল কর্ণেল? আমি আপনাকে বললাম সেতুটা উড়িয়ে দিতে, আর এদিকে কে একজন গিয়ে সব ভণ্ডুল করে দিয়েছে; সেখানে তারা একেবারে ল্যাজে-গোবরে করে বসেছে; কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।"

কর্ণেল ইচ্ছা করেই রেজিমেণ্টকে থামিয়ে নেস্‌ভিৎস্কির দিকে মুখ ফেরাল। বলল, "আপনি আমাকে দাহ্য পদার্থের কথা বলেছেন, কিন্তু সেতু উড়িয়ে দেবার কথা তো বলেন নি।"

আরও কাছে এসে টুপিটা খুলে হাত দিয়ে ঘামে ভেজা চুলটাকে পাট করতে করতে নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "কিন্তু প্রিয় মহাশয়, দাহ্য পদার্থগুলি যখন যথাস্থানে রাখা হল তখন কি আমি আপনাকে সেতু লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে বলি নি?"

"মিঃ স্টাফ-অফিসার, আমি আপনার 'প্রিয় মহাশয়' নই, আর আপনি আমাকে সেতুটা জ্বালিয়ে দিতে বলেন নি! আমার কাজ আমি বুঝি,

আর কঠোরভাবে হুকুম তামিল করাই আমার রীতি। আপনি বলেছিলেন সেতুটা জ্বালিয়ে দিতে হবে, কিন্তু কে জ্বালাবে সেটা আমি বুঝতে পারি নি।"

নেস্ভিৎস্কি হাত নেড়ে বলল, "আঃ, সব সময় এই হয়ে থাকে!" ঝেরকভ-এর দিকে ঘুরে বলল, "তুমি এখানে এলে কেমন করে?"

"ঐ একই কাজে। কিন্তু তুমি যে ঘামে একেবারে ভিজে গেছ।"

অসন্তুষ্ট গলায় কর্ণেল বলতে লাগল, "মিঃ স্টাফ-অফিসার, আপনি বলছিলেন…"

অফিসারটি বাধা দিয়ে বলল, "কর্ণেল, জলদি করুন, নইলে শত্রুপক্ষ কামান সাজিয়ে ছর্‌রা চালাতে শুরু করবে।"

নীরবে অফিসারের দিকে, স্টাফ-অফিসারের দিকে ও ঝেরকভ-এর দিকে তাকিয়ে কর্ণেল ভুরু কুঁচকাল।

গম্ভীর গলায় বলল, "আমি সেতুটাকে জ্বালিয়ে দেব।" যেন সে বলতে চাইল, যত অপ্রীতিকর অবস্থাই সহ্য করতে হোক না কেন তবু সে সঠিক কর্তব্যই পালন করবে।

যেন ঘোড়াটারই যত দোষ এমনিভাবে পেশীবহুল পা দিয়ে সেটাকে ঠোক্কর মেরে কর্ণেল এগিয়ে গিয়ে হুকুম দিল, যে দুই নম্বর স্কোয়াড্রনে রস্তভ দেনিসভ-এর অধীনে কর্মরত ছিল সেটাকে সেতুর কাছে ফিরে যেতে হবে।

রস্তভ নিজের মনে বলল, "দেখ, আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল।" তার হৃদপিণ্ডটা সংকুচিত হয়ে সব রক্ত মুখে উঠে গেল। "আমি ভীরু কি না সেটা সে ভাল করে দেখুক!" সে ভাবল।

স্কোয়াড্রনের সকলের উজ্জ্বল মুখের উপরেই আবার নেমে এল যুদ্ধকালীন গাম্ভীর্য। রস্তভ বেশ ভাল করে তার শত্রু কর্ণেলকে দেখতে লাগল; কর্ণেল কিন্তু একবারও রস্তভ-এর দিকে তাকাল না; তার মুখ গম্ভীর, কঠোর। তারপরই শোনা গেল হুকুম।

তার চার পাশে কয়েকজন বলে উঠল, "সোজা তাকাও! সোজা তাকাও!" কি করতে হবে বুঝতে না পেরে হাতে তলোয়ার নিয়ে পাদানিতে শব্দ করে হুজাররা তাড়াতাড়ি ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। সৈন্যরা ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। রস্তভ এখন আর কর্ণেলকে দেখছে না; সময় নেই। পাছে সে হুজারদের পিছনে পড়ে যায় এই ভয়ে তার হৃদপিণ্ডটা যেন থমকে থেমে গেছে। আর্দালির হাতে ঘোড়াকে তুলে দেবার সময় তার নিজের হাতই কাঁপতে লাগল; মনে হল, সব রক্ত বুঝি তার হৃদপিণ্ডে এসে জমে যাবে।

দেনিসভ ঘোড়ার পিঠে পিছনে হেলে কি যেন বলতে বলতে চলে গেল। হুজারদের ছাড়া আর কাউকে রস্তভ দেখতে পাচ্ছে না; হুজাররা তার চার পাশে ছুটছে, তাদের পাদানির কাঁটায় শব্দ হচ্ছে, তাদের তলোয়ার বাজছে ঝন্ ঝন্ করে।

"স্ট্রেচার!" পিছন থেকে কে একজন চীৎকার করে উঠল।

স্ট্রেচার ডাকার মানে কি তা চিন্তা না করে রস্তভ ছুটেই চলল; সে চাইছে সকলের আগে যেতে; কিন্তু ঠিক সেতুর মুখে মাটির দিকে চোখ না থাকায় খানিকটা পিচ্ছিল কাদায় তার পা হড়কে গেল; সে হাতের উপর পড়ে গেল। অন্যরা তাকে পেরিয়ে চলে গেল।

"ক্যাপ্টেন, দু'দিক দিয়ে," কর্ণেলের গলা কানে এল। ঘোড়া ছুটিয়ে সেতুর কাছে পৌঁছে সে সহাস্য মুখে থেমে পড়েছে।

কাদা-মাখা হাত দুটো ব্রীচেসে মুছে রস্তভ তার শত্রুর দিকে তাকাল; যতটা এগিয়ে যাওয়া যায় ততই ভাল এই কথা ভেবে আবার দৌড়তে শুরু করবে এমন সময় বোগ্‌দানিচ রস্তভ-এর দিকে না তাকিয়ে বা তাকে না চিনেই চেঁচিয়ে বলল:

"সেতুর মাঝখান দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে কে? ডাইনে যাও। ক্যাডেট, ফিরে এস!" রেগে চীৎকার করে কথাগুলি বলে সে দেনিসভ-এর দিকে মুখটা ফেরাল। দেনিসভ-ও সাহস দেখাবার জন্য সেতুর কাঠের উপর ঘোড়া তুলে দিয়েছে।

সে বলল, "কেন বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ ক্যাপ্টেন? ঘোড়া থেকে নেমে পড়।"

ঘোড়ার পিঠে নড়েচড়ে বসে ভাস্কা দেনিসভ বলল, "আঃ! প্রতিটি বুলেটের বিনিময়ে আছে একখানি প্রেমপত্র।"

ইতিমধ্যে নেস্‌ভিৎস্কি, ঝের্কভ ও অফিসারটি গোলাগুলির পাল্লার বাইরে একত্রে দাঁড়িয়ে সামনে তাকিয়েছিল। একবার দেখল, হলুদ 'শাকো' মাথায়, কর্ড-বসানো গাঢ় সবুজ কুর্তা ও নীল রাইডিং-ব্রীচেস পরা ছোট একদল সৈন্য সেতুর কাছে ভিড় করে আছে; আবার দেখল, দূরে বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে অনেক নীল ইউনিফর্ম অশ্বারোহীর দল; সহজেই চেনা যায় একটা গোলন্দাজ বাহিনী।

"ওরা কি সেতুটাকে জ্বালিয়ে দেবে না? কে ওখানে আগে পৌঁছবে? তারাই আগে গিয়ে সেতুটাকে উড়িয়ে দেবে, নাকি ফরাসীরাই ছর্‌রা গোলার পাল্লার মধ্যে পেয়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে?" সেতুর উপরকার উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে সেনাদলের প্রতিটি মানুষই ভগ্নহৃদয়ে এই একই প্রশ্ন নিজেকে করছে, আর সন্ধ্যার উজ্জ্বল আলোয় দেখছে—একদিকে সেতু ও হুজারদের, এবং অন্যদিকে বেয়নেট ও কামান নিয়ে অগ্রসরমান নীল কুর্তার দলকে।

"আঃ! হুজাররাই মার খাবে! তারা এখন ছর্‌রার পাল্লার মধ্যে এসে গেছে," নেস্‌ভিৎস্কি বলল।

"এত লোক সঙ্গে নেওয়া তার উচিত হয় নি," অফিসারটি বলল।

নেসভিৎস্কি জবাব দিল, "সেটা সত্যি; দুটি চালাক-চতুর ছেলেই এ কাজ ভালভাবে করতে পারত।"

হুজারদের দিকে চোখ রেখে ঝের্কভ্ বলল, "আহা, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনার কি দৃষ্টি! দু'জনকে পাঠাবেন? আর তাহলে কে আমাদের ভ্লাদিমির মেডেল ও ফিতে দিত? আর এখন, ওরা যদি কচুকাটাও হয়ে যায়, তবু হয় তো স্কোয়াড্রনটির নাম খেতাবের জন্য সুপারিশ করা হবে, আর উনি একটা ফিতে পাবেন। কি করে কাজ বাগাতে হয় সেটা আমাদের বোগ্দানিচ জানে।"

অফিসারটি বলল, "ওই দেখুন! ঐ একটা ছর্‌রা গোলা!"

ফরাসীদের কামানের সামনের অংশগুলি খুলে তাড়াতাড়ি সরিয়ে নেওয়া হচ্ছিল। সেটা দেখিয়ে অফিসারটি কথাটা বলল।

ফরাসী পক্ষের কামানবাহী সেনাদলের মধ্যে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখা গেল; তারপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় কুণ্ডলিও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল; আর প্রথম গোলা ফাটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্থ কুণ্ডলিও দেখা গেল। তারপরই পর পর দুটো, ও তৃতীয় শব্দটি শোনা গেল।

"ওঃ! ওঃ!" যেন ভীষণ কষ্ট হচ্ছে এমনিভাবে অফিসারটির হাত চেপে ধরে নেস্‌ভিৎস্কি আর্তনাদ করে উঠল। "দেখুন, একটা সৈন্য পড়ে গেল! পড়ে গেল, পড়ে গেল!"

"আমার মনে হচ্ছে দু'জন।"

"আমি জার হলে কখনও যুদ্ধে যেতাম না," মুখ ফিরিয়ে নেস্‌ভিৎস্কি বলল।

ফরাসী কামানগুলিতে তাড়াতাড়ি নতুন করে গোলা ভরা হল। নীল ইউনিফর্মধারী পদাতিক সৈনিকরা এক দৌড়ে সেতুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিয়মিত বিরতির ফাঁকে ফাঁকে ধোঁয়া উঠতে লাগল, আর ছর্‌রা এসে সেতুর উপর ফাটতে লাগল। কিন্তু এবার ধোঁয়ার ঘন মেঘ উঠছে থাকায় সেখানে কি ঘটছে তা নেস্‌ভিৎস্কি দেখতে পেল না। হুজাররা সেতুতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, আর ফরাসী কামান থেকে তাদের লক্ষ্য করেই গোলা ছুঁড়ছে; তাদের উদ্দেশ্য হুজারদের বাধা দেওয়া নয়; যেহেতু কামান সাজানো হয়েছে এবং কোন একটা লক্ষ্যবস্তুও পাওয়া গেছে তাই গোলা ছোঁড়া হচ্ছে।

হুজাররা যার যার ঘোড়ার কাছে ফিরে আসবার আগেই ফরাসীরা তিন দফা ছর্‌রা ছুঁড়বার মত সময় পেল। দুটোর নিশানা ঠিক হয় নি, গোলাগুলো অনেক উঁচু দিয়ে চলে গেল, কিন্তু তৃতীয় রাউণ্ডটি পড়ল একদল হুজারের মাঝখানে এবং তাদের তিন জনকে ফেলে দিল।

বোগ্‌দানিচের সঙ্গে নিজের সম্পর্কের চিন্তায়ই মগ্ন হয়ে ছিল রস্তভ। কি করবে বুঝতে না পেরে সে সেতুর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। কচুকাটা করবার মত কেউ সেখানে ছিল না, আর সেতুতে আগুন লাগাবার কাজেও সে সাহায্য করতে পাবছিল না, কারণ অন্য সৈন্যদের মত সে আগুন জ্বালাবার খড় সঙ্গে নিয়ে আসে নি। দাঁড়িয়ে চারদিক দেখছিল এমন সময় সেতুর উপর নাট খুলবার মত একটা শব্দ হল আর তার একেবারে কাছের হুজারটি আর্তনাদ করে রেলিং-এর উপর উপুড় হয়ে পড়ল। অন্য সকলের সঙ্গে রস্তভও দৌড়ে তার কাছে গেল। একজন চেঁচিয়ে বলল, "স্ট্রেচার!" চারজন এসে হুজারটিকে ধরে উঁচু করে তুলল।

"উঃ! খৃস্টের দোহাই, আমাকে একা থাকতে দাও!" আহত লোকটি চীৎকার করে বলল। তবু তাকে তুলে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেওয়া হল।

নিকলাস রস্তভ সেখান থেকে সরে গেল। যেন কোন কিছু খুঁজছে এমনিভাবে সে বহুদূরে, দানিয়ুবের জলরাশির দিকে, আকাশের দিকে, সূর্যের দিকে তাকাল। আকাশটা কী সুন্দর দেখাচ্ছে; কত নীল, কত শান্ত, কত গভীর! অস্তগামী সূর্যটা কী উজ্জ্বল ও গৌরবময়! অনেক দূরের দানিয়ুবের জল কী সুন্দর ঝিলমিল করছে! তার চেয়েও বেশী সুন্দর নদীর ওপারের বহুদূরের নীল পর্বতমালা, মঠটা, রহস্যময় গিরিখাদগুলি, আর কুয়াসা ঢাকা পাইনের সারি।···কী শান্তি, কী সুখ। রস্তভ মনে মনে বলল, "ওখানে যেতে পারলে আর কিছুই আমি চাই না, কিছু না। শুধু আমার নিজের মধ্যে, আর ঐ সূর্যের আলোব মধ্যে কত সুখ; কিন্তু এখানে···আর্তনাদ, যন্ত্রণা, আতংক, আর এই অনিশ্চয়তা ও ছুটাছুটি···ঐ— আবার তারা চেঁচাচ্ছে, আবার সকলে ছুটে পালাচ্ছে, আর আমিও তাদের সঙ্গে ছুটব, আর এখানে আমার মাথার উপরে ও চাবদিকে আছে মৃত্যু··· আর একটিমাত্র মুহূর্ত পার হতেই এই সূর্য, এই জল, এই গিরিখাদ—কিছুই আর আমি দেখতে পাব না।···"

ঠিক সেই মুহূর্তে সূর্য মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। রস্তভ দেখল, তার সামনে আরও স্ট্রেচার এসে হাজির হয়েছে। আর মৃত্যু ও স্ট্রেচারের আতংক এবং সূর্য ও জীবনের প্রতি ভালবাসা—সব কিছু মিলে তার মনে একটা দুঃসহ উত্তেজনার অনুভূতি দেখা দিল।

রস্তভ অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগল "হে ঈশ্বর! স্বর্গ হতে তুমি আমাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, আশ্রয় দাও!"

যে লোকগুলো ঘোড়াগুলো ধরে রেখেছিল হুজাররা তাদের কাছে ছুটে গেল; তাদের কণ্ঠস্বর আরও উচ্চে উঠল, স্ট্রেচারগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল।

ভাস্কা দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, "তাহলে বন্ধুরা, বারুদের স্বাদ পেয়েছ তো?"

রস্তভ ভাবল, "এখন সব শেষ ; কিন্তু আমি একটা ভীরু—হ্যাঁ, ভীরু।" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে আর্দালির কাছ থেকে তার ঘোড়া "রুক"কে নিয়ে তাতে চড়তে গেল।

"ওটা কি ছর্‌রা গোলা ছিল ?" দেনিসভ শুধাল।

'হ্যাঁ, তাতে কোন ভুল নেই!" দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল। "তুমি তো একেবারে গবেটের মত কাজ করলে! আক্রমণ তো মজার ব্যাপার! কুকুরগুলোকে তাড়া করা! কিন্তু এটা কি বাজে ব্যাপার হল! তোমাকে নিশানা করে তারা গোলা ছুঁড়ল।"

তত্‌ক্ষণে কর্ণেল, নেস্‌ভিৎস্কি, ঝের্‌কভ্‌ ও অফিসার সকলেই রস্তভ-এর কাছে গিয়ে জুটেছে। দেনিসভও ঘোড়ায় চেপে সেখানে গিয়ে হাজির হল।

রস্তভ ভাবল, "যাকগে, মনে হচ্ছে কেউ খেয়াল করে নি।" কথাটা সত্যি। গোলাগুলির সামনে একজন ক্যাডেটের প্রথম অভিজ্ঞতা কি রকম হয় সেটা সকলেই জানে বলে কেউ রস্তভকে লক্ষ্য করে নি।

ঝের্‌কভ বলল, "তোমাকে একটা খবর বল্‌ছি। আমি যদি সাব-লেফ্‌টেন্যান্ট পদে প্রমোশন না পাই তো কি বলেছি।"

কর্ণেল সগৌরবে খুশি মনে বলল, "প্রিন্সকে বলো, সেতুতে আমিই আগুন ধরিয়েছি।"

"আর তিনি যদি লোকসানের কথা জিজ্ঞাসা করেন ?"

কর্ণেল গম্ভীর গলায় বলল, "যৎসামান্য : দু'জন হুজার আহত হয়েছে, আর একজন পপাত ধরণীতলে।" একটা খুশির হাসি চাপতে না পেরে "পপাত ধরণীতলে" কথাটাকে একটু বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করল।

অধ্যায়—৯

বোনাপার্তের নেতৃত্বে এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত ফরাসী বাহিনীর তাড়া খেয়ে, অমিত্রসুলভ মনোভাবসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে বাস করে, মিত্রশক্তির উপর আস্থা হারিয়ে, রসদ-সরবরাহের স্বল্পতার অসুবিধা ভোগ করে, এবং অদৃষ্টপূর্ব সামরিক পরিবেশে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে, কুতুজভ-এর নেতৃত্বে পরিচালিত পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে গঠিত রুশ বাহিনী দানিয়ুব নদীর তীর বরাবর দ্রুত গতিতে পশ্চাদপসরণ করে চলেছে ; শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলেই থামছে, এবং যতদূর সম্ভব অল্প ক্ষতি স্বীকার করে পশ্চাদপসরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হচ্ছে। ল্যাম্বাক, আম্‌স্টেটেন্‌ ও মেল্‌ক্‌-এ যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু রুশ সৈন্যগণ যত সাহস ও সহিষ্ণুতার সঙ্গেই যুদ্ধ করুক না কেন, তার ফল দ্রুত পশ্চাদপসরণ ছাড়া আর কিছুই হয় নি। উল্‌ম্‌-এর যুদ্ধে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে অস্ট্রীয় বাহিনী ব্রাউনাউতে এসে কুতুজভ-এর সঙ্গে যোগ

দিয়েছিল। এখন তারা আবার আলাদা হয়ে গেছে। কুতুজভ-এর হাতে আছে শুধু তার নিজস্ব দুর্বল ও রণক্লান্ত সৈন্যদল। আধুনিক সমর-বিজ্ঞানের রীতি অনুসারে আক্রমণের যে পরিকল্পনা সযত্নে তৈরি করে অস্ট্রীয় হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ ভিয়েনাতে কুতুজভ-এর হাতে তুলে দিয়েছিল তার পরিবর্তে এখন কুতুজভ-এর পক্ষে প্রায় দুর্লভ একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ম্যাক যে ভাবে উল্‌ম্‌-এ তার সৈন্য নষ্ট করেছে সেটা না করে রাশিয়া থেকে যে নতুন সৈন্যদল আসছে তাদের সঙ্গে মিলিত হওয়া।

২৮শে অক্টোবর তারিখে কুতুজভ সসৈন্যে দানিয়ুব পার হয়ে বাঁ তীরে গিয়ে পৌঁছল এবং এই প্রথম এমনভাবে ঘাঁটি করতে পারল যাতে মূল ফরাসী বাহিনী ও তার মধ্যে নদীটাই ব্যবধান সৃষ্টি করল। ৩০শে তারিখে সে বামতীরবর্তী মর্তিয়ের-এর বাহিনীকে আক্রমণ করে তছনছ করে দিল। এই যুদ্ধে এই প্রথম শত্রুপক্ষের কিছু স্মারক তারা ছিনিয়ে নিতে পারল: নিশান, কামান ও শত্রুপক্ষের দুজন সেনাপতি। পক্ষকাল ধরে পশ্চাদপসরণের পরে এই প্রথম রুশ বাহিনী এক জায়গায় ঘাঁটি করে যুদ্ধে শুধু যে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে তাই নয়, ফরাসী বাহিনীকে হটিয়ে দিতেও পেরেছে। সৈন্যরা যদিও যথেষ্ট সজ্জিত ছিল না, ছিল ক্লান্ত ও অবসন্ন, এবং হত, আহত, রুগ্ন ও পরিত্যক্তের সংখ্যাই ছিল এক-তৃতীয়াংশ; যদিও রুগ্ন ও আহত সৈনিকদের অনেককেই দানিয়ুবের অপর তীরে ফেলে আসা হয়েছে শুধু একখানি চিঠি লিখে যাতে কুতুজভ তাদের তুলে দিয়েছে শত্রুপক্ষের মানবতাবোধের হাতে; এবং যদিও ক্রেম্‌স্‌-এর সব বড় হাসপাতাল ও বাড়িগুলোকে সামরিক হাসপাতালে পরিণত করেও সব রুগ্ন ও আহত সৈন্যদের স্থান-সংকুলান করা যাচ্ছে না, তবু ক্রেম্‌স্‌-এর দৃঢ়তায় এবং মর্তিয়ের-এর বিরুদ্ধে জয়লাভের ফলে সৈন্যদের মনোবল যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা বাহিনীর মধ্যে এবং হেড-কোয়ার্টারেও এমন সব ভুল গুজব মহা আনন্দে ছড়িয়ে পড়েছে যে রাশিয়া থেকে নতুন নতুন সৈন্যদল আসছে, অস্ট্রীয় বাহিনী অনেক জায়গায় বিজয়ী হয়েছে, এবং ভীত বোনাপার্ত পিছু হটতে শুরু করেছে।

যুদ্ধের সময় প্রিন্স আন্দ্রু অস্ট্রীয়ার সেনাপতি শ্‌মিড-এর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। সেনাপতি শ্‌মিড যুদ্ধে মারা গেছে। প্রিন্স আন্দ্রুর ঘোড়াটা চোট পেয়েছে, আর তার নিজের হাতটাও বুলেটে কিছুটা ছড়ে গেছে। প্রধান সেনাপতির বিশেষ অনুগ্রহের প্রতীক হিসাবে যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ দিতে তাকেই পাঠানো হয়েছে অস্ট্রীয়ার রাজ-দরবারে। ফরাসীদের আক্রমণের ভয়ে রাজ-দরবার এখন ভিয়েনা থেকে ব্রুন্‌-এ স্থানান্তরিত হয়েছে। দেখতে রোগা-পটকা হলেও প্রিন্স আন্দ্রু অনেক পেশীবহুল শক্তিমানের চাইতে অনেক বেশী শারীরিক ধকল সহ্য করতে পারে। যুদ্ধের রাতেই দখ্‌তুরভ-এর (একজন রুশ সেনাপতি) কাছ থেকে চিঠিপত্র নিয়ে সে যখন ক্রেম্‌স্‌-এ কুতুজভ-এর

কাছে পৌচেছিল তখনই একটা বিশেষ চিঠি দিয়ে তাকে পাঠানো হল ব্রুন্‌-এ। এই পাঠানোর অর্থ শুধু একটা পুরস্কার প্রাপ্তিই নয়, পদোন্নতির দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপও বটে।

অন্ধকার রাত; কিন্তু আকাশে অনেক তারা। আগের দিন—যুদ্ধের দিন খুব বরফ পড়েছে। সেই বরফের মধ্যে রাস্তাটাকে কালো দেখাচ্ছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধের কথাগুলি তার মনে পড়ছে, জয়ের সংবাদ পৌছে দিলে সেখানে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে খুশি মনে এটা কল্পনা করছে, প্রধান সেনাপতি ও অফিসার-বন্ধুরা তাকে যে ভাবে বিদায়-সম্বর্ধনা জানিয়েছে সে-কথা তার মনে পড়ছে। এই সব ভাবতে ভাবতে প্রিন্স আন্দ্রু একটা ডাক-গাড়িতে চেপে চলেছে। তার মনের ভাবখানা এমন যেন শেষ পর্যন্ত একটা বহু-বাঞ্ছিত সুখের দরজায় সে পৌছতে যাচ্ছে। চোখ বুজলেই তার কানে যেন বাজছে চাকার ঘর্ঘর শব্দ আর জয়ের অনুভূতি। তারপরেই সে কল্পনায় দেখতে পেল, রুশরা ছুটে পালাচ্ছে, আর সে নিজে মারা গেছে; কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা নবীন আনন্দের অনুভূতির মধ্যে জেগে উঠে সে বুঝতে পারল যে ব্যাপারটা সে রকম মোটেই নয়; বরং ফরাসীরাই দৌড়ে পালিয়েছে। জয়ের বিস্তারিত বিবরণগুলি নতুন করে মনে পড়ল; মনে পড়ল যুদ্ধ চলাকালীন তার শান্ত সাহসের কথা; আর নিশ্চিন্তমনে সে ঝিমুতে শুরু করল…তারকা-খচিত কালো রাতের শেষে দেখা দিল উজ্জ্বল, আনন্দময় সকাল। রোদ লেগে বরফ গলতে শুরু করেছে, ঘোড়াগুলি দ্রুত ছুটছে, রাস্তার দুই পাশে নানা রকম জঙ্গল, ক্ষেত ও গ্রামে ছড়িয়ে আছে।

একটা ডাক-ঘাঁটিতে একদল আহত রুশ সৈন্যের সঙ্গে তার দেখা হল। ভারপ্রাপ্ত রুশ অফিসারটি সামনের গাড়িতে আরাম করে হেলান দিয়ে বসে চীৎকার করে একটি সৈন্যকে কাঁচা খিস্তি করতে শুরু করেছে। প্রতিটি লম্বা জার্মান গাড়িতে ছয় বা তার বেশী বিবর্ণ, নোংরা, ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা মানুষ পাথুরে রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে চলেছে। কেউ কেউ কথাবার্তা বলছে (রুশ শব্দ তার কানে এল), কেউ বা রুটি খাচ্ছে; যারা গুরুতর আহত তারা নিঃশব্দে ডাক-গাড়িটির দিকে তাকিয়ে আছে।

প্রিন্স আন্দ কোচয়ানকে গাড়ি থামাতে বলল; একটি সৈনিককে জিজ্ঞাসা করল, "তারা কোন্ যুদ্ধে আহত হয়েছে।" সৈন্যটি জবাব দিল, "গত পরশু, দানিয়ুবের তীরে।" থলে বের করে প্রিন্স আন্দ্রু সৈনিকটিকে তিনটি স্বর্ণমুদ্রা দিল।

অফিসারটি এগিয়ে এসে তাকে বলল, "সকলের জন্যই দিলাম।"

"শিগ্‌গির ভাল হয়ে ওঠ হে ছেলেরা! এখনও অনেক কিছু করবার আছে," সৈন্যদের দিকে ফিরে সে বলল।

"খবর কি স্যার?" কথা বলার আগ্রহে অফিসারটি শুধাল।

"খবর ভাল! ···চলহে!" চেঁচিয়ে কোচয়ানকে বলল। গাড়ি ছুটে চলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর গাড়ি যখন ব্রুন্‌-এর বাঁধানো পথের উপর দিয়ে সশব্দে ছুটতে লাগল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে; চারদিকে উঁচু-উঁচু বাড়ি, দোকানের, ঘর-বাড়ির, ও রাস্তার আলো; ভাল ভাল গাড়ি চলাচল করছে; এককথায় একটা কর্মচঞ্চল বড় শহরের যে পরিবেশ শিবির-জীবন কাটাবার পরে একজন সৈনিকের কাছে খুবই মনোরম লাগে সে সবই উপস্থিত। দ্রুত পথ পরিক্রমা এবং বিনিদ্র রাত কাটানো সত্ত্বেও প্রাসাদ অভিমুখে যেতে যেতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল সে যেন আগের দিনের চাইতে আরও বেশী কর্মঠ ও তৎপর হয়ে উঠেছে। শুধু চোখ দুটি জ্বরাগ্রস্তের মত জ্বালা করছে, আর টুকরো টুকরো চিন্তাগুলি একের পর এক অসাধারণ স্পষ্টতায় ও দ্রুতগতিতে মনের মধ্যে আসাযাওয়া করছে। যুদ্ধের বিবরণগুলি আর একবার অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে তার মনের সামনে ভাসতে লাগল; যেন কল্পনায় দেখতে পেল যে সে নিজেই অত্যন্ত স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত আকারে সম্রাট ফ্রান্সিস-এর কাছে সে বিবরণ নিবেদন করছে। তাকে কি কি প্রশ্ন করা হবে, আর সে তার কি উত্তর দেবে, সেসবও সে কল্পনা করতে লাগল। সে আশা করল যে সঙ্গে সঙ্গেই তাকে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করা হবে। অবশ্য প্রাসাদের প্রধান ফটকে একজন সরকারী কর্মচারি তাকে দেখেই ছুটে এল, এবং সে একজন বিশেষ সংবাদবাহক জানতে পেরে তাকে আর একটা ফটক দেখিয়ে দিল।

"বারান্দা দিয়ে এগিয়ে ডান দিকে Euer Hochgeboren! সেখানেই কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্টকে দেখতে পাবেন। তিনিই আপনাকে যুদ্ধমন্ত্রীর কাছে নিয়ে যাবেন।"

কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্ট প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখেই তাকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে যুদ্ধমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে গেল। পাঁচ মিনিট পরে ফিরে এসে বিশেষ সম্ভ্রমের সঙ্গে অভিবাদন জানিয়ে সে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে নিয়ে একটা বারান্দা দিয়ে যুদ্ধমন্ত্রীর ঘরের দিকে নিয়ে চলল। অ্যাডজুটাণ্টটি এত বেশী শিষ্টাচার দেখাতে লাগল যেন সে চাইছে যে রুশ সংবাদদাতাটি যেন তার সঙ্গে কোনরকম ঘনিষ্টতা স্থাপনের চেষ্টা করতে না পারে।

মন্ত্রীর ঘরের দিকে যেতে যেতেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনের প্রফুল্লতা যেন অনেকটা কমে গেল। সে মনে মনে আহত বোধ করল, আর সঙ্গে সঙ্গেই আহত মনোভাবটি একটা অকারণ ঘৃণায় পরিণত হল। অ্যাডজুটাণ্ট ও মন্ত্রীকে ঘৃণা করবার অধিকার যে তার আছে, তার উর্বর মস্তিষ্ক সেটা তাকেই বুঝিয়ে দিল। সে ভাবল, "এরা হয় তো ভাবে যে গোলা-বারুদের গন্ধ থেকে দূরে থেকে সহজেই যুদ্ধ জয় করা যায়!" তার চোখ দুটি ঘৃণায় সংকুচিত

হয়ে উঠল ; সদর্পে পা ফেলে সে যুদ্ধমন্ত্রীর ঘরে ঢুকল। কিন্তু সে যখন দেখল, একটা মস্ত বড় টেবিলে বসে মন্ত্রীমশাই কাগজপত্র পড়ছে, আর পেন্সিল দিয়ে কি সব লিখছে, অথচ প্রথম দু'তিন মিনিট তার উপস্থিতিটা লক্ষ্যই করল না, তখন তার ঘৃণার ভাবটা আরও বেড়ে গেল। মন্ত্রীর কপালের দুই পাশে কিছুটা পাকা চুল ; বাকি মাথাটায় টাক। টাক মাথার দুই পাশে দুটো মোমবাতি। দরজা খোলার ও পায়ের শব্দে চোখ না তুলেই সে শেষ পর্যন্ত পড়েই চলল।

"এটা নিয়ে দিয়ে দাও," কাগজপত্রগুলি অ্যাডজুটান্টের হাতে দিয়ে মন্ত্রী বলল ; তখনও সে বিশেষ সংবাদদাতার উপস্থিতি খেয়াল করল না।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল, হয় নিজের অন্যান্য কাজকর্মের তুলনায় কুতুজভ-এর সেনাবাহিনীর কাজকর্মের প্রতি যুদ্ধমন্ত্রীর আগ্রহই কম, অথবা রুশ সংবাদদাতাটির কাছে সেই ভাবটিই সে দেখাতে চায়। "কিন্তু সেটা তো আমার প্রতি পুরোপুরি ঔদাসীন্যের সামিল," সে ভাবল। মন্ত্রীমশাই বাকি কাগজপত্র একত্র করল, ভালভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখল, তারপর মাথা তুলল। তার মাথাটি বুদ্ধিমত্তা ও বিশিষ্টতার পরিচয় বহন করে ; কিন্তু প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকানো মাত্রই তার মুখের স্থির, বুদ্ধিদীপ্ত ভাবটি সম্পূর্ণ বদলে গেল ; যেন এটাই তার পক্ষে সহজ ও স্বভাবিক। তার মুখে ফুটে উঠল এমন একটা কৃত্রিম বোকা বোকা হাসি (কৃত্রিমতাকে ঢাকবার চেষ্টা পর্যন্ত নেই) যা শুধু সেই মানুষের মুখেই দেখা যায় যে একের পর এক অনেক আবেদনকারীর সঙ্গে দেখা করতে অভ্যস্ত।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "সেনাপতি ফিল্ড-মার্শাল কুতুজভ-এর কাছ থেকে এসেছেন? আশা করি সংবাদ শুভ? মর্তিয়ের-এর সঙ্গে একটা যুদ্ধ তো হয়েছে? জয় হয়েছে তো? তার সময় তো হয়েছে!"

তাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিঠিটা হাতে নিয়ে মন্ত্রী পড়তে লাগল। তার মুখে শোক-চিহ্ন ফুটে উঠল।

"হা আমার ঈশ্বর! আমার ইশ্বর! শ্‌মিড্‌!" জার্মান ভাষায় সে হাহাকার করে উঠল : "কী বিপদ! কী বিপদ।"

চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল।

"কী বিপদ! আপনারা বলছেন যে চূড়ান্ত জয় হয়েছে? কিন্তু মর্তিয়েরকে বন্দী করা হয় নি।" সে আবার একটু ভাবল। "আপনি শুভ সংবাদ নিয়ে আসায় আমি খুব খুসি হয়েছি, যদিও শ্‌মিড্‌-এর মৃত্যুতে সে জয়লাভের জন্য বড় বেশী দাম দিতে হয়েছে। হিজ ম্যাজেস্টি অবশ্যই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন, কিন্তু আজ নয়। আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার বিশ্রামের দরকার। আগামীকাল প্যারেডের পরে দরবারে হাজির

থাকবেন। অবশ্য, আমি আপনাকে জানাব।"

কথা বলার সময় যে নির্বোধ হাসিটি তার মুখ থেকে চলে গিয়েছিল সেটা আবার ফিরে এল।

মাথাটা নীচু করে সে বলল, "Au revoir! আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। হিজ ম্যাজেস্টি সম্ভবত আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন।"

প্রাসাদ থেকে চলে আসার পথে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল, এই জয়লাভ যে আগ্রহ ও সুখ তাকে এনে দিয়েছিল সব এখন গচ্ছিত রইল যুদ্ধমন্ত্রী ও তার বিনীত অ্যাডজুটান্টের উদাসীন হাতে। তার গোটা চিন্তার ধারাই মুহূর্তে বদলে গেল; মনে হল, যুদ্ধটা যেন বহুদূর অতীতের একটি ঘটনার স্মৃতিমাত্র।

অধ্যায়—১০

ব্রুন-এ প্রিন্স আন্‌দ্রুর থাকবার ব্যবস্থা হল কূটনৈতিক দপ্তরে চাকরিরত তার পরিচিত একজন রুশ ভদ্রলোকের সঙ্গে, নাম বিলিবিন।

বাইরে এসে প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গে দেখা করে বিলিবিন বলল, "আরে, প্রিন্স! আমার কাছে তোমার চাইতে স্বাগত অতিথি কেউ নয়। ফ্রাঞ্জ, প্রিন্সের প্রিয় সামান আমার শোবার ঘরে নিয়ে যাও।" যে চাকরটি বল্‌কন্‌স্কিকে সঙ্গে করে এনেছে তাকেই সে কথাটা বলল। তাহলে তুমি যে জয়ের অগ্রদূত হে? চমৎকার! আর দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি এখানে অসুখ বাধিয়ে বসে আছি।"

হাত-মুখ ধুয়ে সাজপোশাক পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু কূটনীতিকের বিলাসবহুল খাবার ঘরে গিয়ে তার জন্য তৈরি খানা খেতে বসল। বিলিবিন আরাম করে আগুনের পাশে পা ছড়িয়ে বসল।

যুদ্ধের অভিযানে যোগদানের পর থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আরাম এবং জীবনের সব রকম সুখ-সম্ভোগ থেকে প্রিন্স আন্‌দ্রু সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল। তার উপর দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি। তাই শিশুকাল থেকে যে বিলাসবহুল পরিবেশে বাস করতে সে অভ্যস্ত সেই পরিবেশে এসে এখন সে খুবই আরাম বোধ করল। তাছাড়া, অস্ট্রীয়দের অভ্যর্থনার পরে যদিও এখন রুশ ভাষায় কথা বলছে না (তারা কথা বলছে ফরাসীতে), তবু একজন রুশ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে পেরে তার বেশ ভাল লাগছে; কারণ তার ধারণা সেই সময়ে অস্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে রুশদের মধ্যে যে তীব্র বিদ্বেষ মনোভাব ছিল সেটা এই রুশ লোকটির মধ্যেও অবশ্যই থাকবে।

বিলিবিন-এর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর; সে অবিবাহিত এবং প্রিন্স আন্‌দ্রুর একই সমাজের মানুষ। পিতার্সবুর্গে থাকতে পূর্বেই তাদের মধ্যে পরিচয় হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে প্রিন্স আন্‌দ্রু যখন কুতুজভ-এর সঙ্গে ভিয়েনায়

ছিল তখন সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল। প্রিন্স আন্‌দ্রু যেমন প্রথম যৌবনেই সামরিক বিভাগে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার স্বাক্ষর রেখেছিল, তেমনি বিলিবিনও রেখেছিল কূটনৈতিক কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর। এখনও সে বয়সে যুবক, কিন্তু এখন সে আর যুবক কূটনীতিক নয়; কারণ ষোল বছর বয়সে কূটনৈতিক চাকরিতে ঢুকে সে প্যারি ও কোপেনহেগেন-এ ছিল, এবং এখন ভিয়েনায় বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমাদের ভিয়েনাস্থ রাষ্ট্রদূত উভয়েই তাকে চেনে এবং প্রশংসা করে। যে সব কূটনীতিকদের প্রশংসা করা হয় যেহেতু তারা কতকগুলি নেতিবাচক গুণের অধিকারী, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কাজ তারা করে না, এবং ফরাসীতে কথা বলে, বিলিবিন তাদের একজন নয়। সে তাদেরই একজন যারা নিজেদের কাজ পছন্দ করে, সে কাজ করতে জানে, এবং আলস্যপ্রিয়তা সত্ত্বেও কখনও কখনও লেখার টেবিলে বসে সারাটা রাত কাটিয়ে দিতে পারে। কাজ যেমনই হোক, সে কাজ সে সুষ্ঠুভাবেই শেষ করে থাকে। "কিসের জন্য ?" নয়, "কেমন করে ?" এই প্রশ্নটাই তার কাছে আসল। কূটনৈতিক আলোচনার বিষয়বস্তু কি তা নিয়ে সে মাথা ঘামায় না; যেকোন বিষয় নিয়ে সুকৌশলে, তীক্ষ্ণতার সঙ্গে ও সুচারুরূপে ইস্তাহার, স্মারক-লিপি অথবা প্রতিবেদন তৈরি করাতেই তার আনন্দ। শুধু লেখার জন্যই যে বিলিবিনকে মর্যাদা দেওয়া হয় তাই নয়, উঁচু মহলের লোকদের সঙ্গে ব্যবহার ও আলোচনার কুশলতার জন্যও তাকে যথেষ্ট স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

বিলিবিন যেমন কাজ ভালবাসে, তেমনি আলাপ-আলোচনাও ভালবাসে, শুধু সে কাজটি সুষ্ঠু ও বুদ্ধিদীপ্ত হওয়া চাই। সমাজে সে সর্বদাই অপেক্ষা করে থাকে একটা উল্লেখযোগ্য কিছু বলবার সুযোগের জন্য; আর একমাত্র সেটা সম্ভব হলে তবেই সে কোন আলোচনায় যোগ দেয়। তার কথাবার্তার মধ্যে সব সময়ই সকলের পক্ষে বোধগম্য কিছু বুদ্ধিদীপ্ত মৌলিক পরিচ্ছন্ন বাক্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবেই। যেন ইচ্ছা করেই এই সব বাক-ভঙ্গীকে সে মনের গভীর ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে রাখে; যাতে সমাজের অতি সাধারণ মানুষরাও সেগুলিকে এক বৈঠকখানা থেকে আর এক বৈঠকখানায় বয়ে নিয়ে যেতে পারে। বস্তুত, বিলিবিন-এর এই সব রসিক ভাষণ ভিয়েনার বৈঠকখানার ঘরে ঘরে ফেরি করা হয়, এবং নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়ই যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়ে থাকে।

তার শুকনো, বিবর্ণ মুখটা সব সময়ই গভীর ভাঁজে ঢেকে থাকে; অথচ সে মুখ সর্বদাই দেখায় ধোয়া-মোছা, পরিষ্কার, —ঠিক যেন রুশ-স্নানের পরে আঙুলের ডগার মত। মুখের ভাঁজগুলি এমনভাবে নড়েচড়ে যে তাতেই তার মনের ভাবগুলি প্রকাশ হয়ে পড়ে। এই হয় তো তার কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল আর ভুরু দুটো ঠেলে উঠল; আবার হয় তো ভুরু-

দুটো নেমে এল নীচে আর গালে পড়ল অনেকগুলো গভীর ভাঁজ। ছোট দৃঢ়বদ্ধ চোখ দুটো সর্বদাই মিটমিট করে, সোজা সামনে তাকায়।

"আচ্ছা, এবার তাহলে তোমাদের যুদ্ধ জয়ের কথা বল," সে বলল।

একবারেও নিজের নাম উল্লেখ না করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বল্‌কন্‌স্কি যুদ্ধমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা ও তার অভ্যর্থনার একটা বিবরণ দিল।

উপসংহারে বলল, "স্কিট্‌ল্‌ খেলায় লোকে যেভাবে একটা কুকুরকে গ্রহণ করে সেইভাবেই তিনি আমাকে ও আমার সংবাদটিকে গ্রহণ করেছেন।"

বিলিবিন হাসল; তার মুখের ভাঁজগুলি মিলিয়ে গেল।

একটু দূর থেকে নখগুলোর দিকে তাকিয়ে এবং বাঁ চোখের উপরকার চামড়াটা কুঁচকে সে বলল, "কিন্তু প্রিয় বন্ধু, গোঁড়া রুশ বাহিনীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও এ কথা বলতে আমি বাধ্য যে তোমাদের এই জয় আসলে জয়যুক্ত নয়।"

সে ফরাসীতেই কথা বলে চলল; শুধু যে কথাগুলির উপর সে একটু ব্যঙ্গাত্মক জোর দিতে চায় (এক্ষেত্রে "গোঁড়া রুশ বাহিনী") সেগুলিকে রুশ ভাষায় উচ্চারণ করল।

"ভেবে দেখ। তোমাদের সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়লে ভাগ্যহীন মর্তিয়ের ও তার এক ডিভিশন সৈন্যের উপর, আর তা সত্ত্বেও মর্তিয়ের তোমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে গেল! তাহলে জয়টা হল কোথায়?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "কিন্তু গুরুতরভাবে ভাবলে আমরা এটা তো গর্ব না করেই বলতে পারি যে উল্‌ম্‌-এর চাইতে ভাল কাজ আমরা করেছি…"

"একজন, অন্তত একজন মার্শালকে তোমরা বন্দী কর নি কেন?"

"কারণ সব কিছুই আশানুরূপভাবে, অথবা কুচকাওয়াজের মত সহজ, সরলভাবে ঘটে না। তোমাকে তো বলেছি, আমরা আশা করেছিলাম সকাল সাতটার মধ্যেই তাদের পিছন দিকটায় হাজির হতে পারব, কিন্তু বিকেল পাঁচটার মধ্যেও সেখানে পৌঁছতে পারি নি।"

বিলিবিন মৃদু হেসে মন্তব্য করল, "সকাল সাতটায় কেন পৌঁছলে না? সকাল সাতটায়ই তো তোমাদের পৌঁছনো উচিত ছিল।"

সেই একই সুরে প্রিন্স আন্‌দ্রু পাল্টা আঘাত করল, "তোমরাই বা কূটনৈতিক পদ্ধতিতে বোনাপার্তকে বোঝাতে পার নি কেন যে তার পক্ষে জেনোয়া ছেড়ে যাওয়াই ভাল ছিল?"

বিলিবিন বাধা দিয়ে বলল, "আমি জানি, তুমি ভাবছ যে আগুনের পাশে সোফায় বসে মার্শালকে ধরা খুবই সোজা! সে কথা ঠিক, কিন্তু তবু তোমরা তাকে বন্দী করলে না কেন? কাজেই শুধু যুদ্ধমন্ত্রী নন, মহামহিম সম্রাট ও রাজা ফ্রান্সিস তোমাদের জয়লাভে যথেষ্ট পুলকিত না হন তো আমি

অন্তত অবাক হব না।

এমন কি আমি যে রুশ দূতাবাসের একজন নগণ্য সচিব, আমার মনেও বাসনা জাগেনা যে আনন্দের প্রকাশ হিসাবে আমার ফ্রাঞ্জকে একটা রৌপ্য-মুদ্রা দেই, অথবা তাকে একদিন ছুটি দেই।...."

সে সরাসরি প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল ; হঠাৎ তার কপালের ভাঁজগুলি মিলিয়ে গেল।

বল্‌কন্‌স্কি বলল, "প্রিয় বন্ধু, এবার কিন্তু আমার পালা ; তোমাকেও জিজ্ঞাসা করব "কেন ?" স্বীকার করছি আমি ঠিক বুঝি না : হয়তো এখানে এমন কিছু কূটনৈতিক সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে যা আমার ক্ষীণ বুদ্ধির অতীত, কিন্তু আমি সেটা বুঝতে পারি না। ম্যাক একটা গোটা বাহিনী নষ্ট করেছেন, আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড ও আর্চডিউক কার্ল-এর মধ্যে জীবনের কোন লক্ষণই নেই, তারা ভুলের পর ভুল করছেন। কুতুজভই শেষ পর্যন্ত একটা সত্যিকারের জয়লাভ করেছেন, ফরাসীদের অপরাজেয়তার যাদুকে ধ্বংস করেছেন, অথচ যুদ্ধমন্ত্রী তার বিবরণটুকু শুনতেও আগ্রহী নন।"

"ঠিক তাই প্রিয় বন্ধু! বুঝতেই পারছ, জারের পক্ষে, রাশিয়ার পক্ষে, গোঁড়া গ্রীক ধর্মের পক্ষে এটা একটা জয়-গৌরব! এ পর্যন্ত খুব ভাল, কিন্তু এ সব জয়ে আমাদের, আমি বলতে চাই অস্ট্রীয় রাজদরবারের, কি যায় আসে ? আর্চডিউক কার্ল বা ফার্ডিনাণ্ড-এর (তুমি তো জান সব আর্চডিউকই সমান) জয়ের একটা ভাল খবর আমাদের এনে দাও, এমন কি সে জয় যদি বোনাপার্তের একটা ফায়ার-ব্রিগেডের বিরুদ্ধেও হয় সেও ভাল, তাহলেই সেটা হবে কাহিনী, আর আমরাও কামান থেকে গোলা ছুঁড়ব! কিন্তু এ সব তো করা হয় আমাদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়েই। আর্চডিউক কার্ল কিছুই করেন না, আর্চডিউক ফার্ডিনাণ্ড যে কাজ করেছেন তাতে তার নিজেরই লজ্জা। তোমরা ভিয়েনা ছেড়ে গেলে, তার রক্ষা-ব্যবস্থা তুলে নিলে—যেন বলতে চাইলে : "ঈশ্বর আমাদের সহায়, কিন্তু ঈশ্বর তোমাদের ও তোমাদের রাজধানীকে রক্ষা করুন!" শ্‌মিড্‌ই একমাত্র সেনাপতি যাকে আমরা ভালবাসতাম ; তাকে তোমরা বুলেটের মুখে ঠেলে দিলে, আর তারপর এলে জয়লাভ উপলক্ষ্যে আমাদের অভিনন্দন জানাতে! স্বীকার কর যে তোমাদের এই খবরের চাইতে বিরক্তিকর আর কিছু ভাবাই যায় না। মনে হয়, যেন ইচ্ছা করেই এটা করা হয়েছে। তাছাড়া, ধর তোমরা একটা সত্যিকারের জয়লাভই করেছ, এমন কি আর্চডিউক কার্লও যদি জয়লাভ করে থাকে, সাধারণ ঘটনা-প্রবাহের উপর তার কি প্রভাব হবে ? ফরাসী বাহিনী যখন ভিয়েনা দখল করে নিয়েছে তখন এ সব কিছুই তো বড় বেশী বিলম্বে ঘটেছে!"

"কি ? দখল করেছে ? ভিয়েনা দখল করেছে ?"

"শুধু দখল করে নি, বোনাপার্ত শমব্রুন-এ (অস্ট্রীয়ার সম্রাটের ভিয়েনাস্থ গ্রীষ্মাবাস) এসেছে, আর কাউন্ট, আমাদের প্রিয় কাউন্ট ভূব্‌না তার কাছে যাচ্ছেন হুকুম শুনতে।"

পথের ক্লান্তি, তার অভ্যর্থনা, এবং বিশেষ করে আহারাদির পরে বল্‌কন্‌স্কির মনে হল, এসব কথার পুরো অর্থ তার মাথায় ঢুকছে না।

বিলিবিন বলতে লাগল, "কাউন্ট লিচ্‌টেন্‌ফেল্‌স্‌ আজ সকালেই এখানে এসেছিলেন; তিনি আমাকে একটা চিঠি দেখালেন, তাতে ভিয়েনাতে ফরাসীদের কুচকাওয়াজের পূর্ণ বিবরণ লেখা আছে।…বুঝতেই পারছ, তোমাদের জয়লাভে এখানে আনন্দ-উৎসব করার কোন কারণ নেই, আর তোমাকেও ত্রাণকর্তা বলে অভ্যর্থনা জানানো চলে না।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু এতক্ষণে একটু একটু বুঝতে পারছে যে, অস্ট্রীয়ার রাজধানীর পতনের মত এতবড় ঘটনার পরে ক্রেম্‌স্‌ এর যুদ্ধের সংবাদের গুরুত্ব সত্যিই খুব সামান্য। সে বলল, "সত্যি বলছি, তাতে আমার কিছু যায় আসে না, মোটেই না। …কিন্তু ভিয়েনা দখল হল কেমন করে? সেই সেতু, তার বিখ্যাত সেতু-মুখ ও প্রিন্স অয়ের্সপার্গ-এর কি হল তাহলে? আমরা শুনেছিলাম, প্রিন্স অয়ের্সপার্গ ভিয়েনা রক্ষা করছিলেন?"

"প্রিন্স ওয়ের্সপার্গ তো এদিকে, নদীর আমাদের দিকে রয়েছেন; তিনি তো আমাদের রক্ষা করছেন—যদিও সে কাজটা তিনি খুব খারাপভাবেই করছেন, তবু তিনিই আমাদের রক্ষা করছেন। কিন্তু ভিয়েনা তো নদীর ওপারে। না, সেতুটা এখনও বেদখল হয় নি, আর আশা করছি হবেও না, কারণ ওখানে মাইন পাতা আছে। আর ওটাকে উড়িয়ে দেবার হুকুম হয়েছে। নইলে অনেক আগেই আমাদের চলে যেতে হত বোহেমিয়ার পাহাড়ে, আর সসৈন্যে তোমাদের সময় কাটাতে হত দুই অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে।"

"কিন্তু তবু তার অর্থ এই নয় যে অভিযান শেষ হয়ে গেছে," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"দেখ, আমি তো মনে করি শেষ হয়েই গেছে। এখানকার বড় বড় মাথারাও তাই মনে করেন, যদিও সেকথা বলতে সাহস করেন না। যুদ্ধের গোড়াতে আমি যা বলেছিলাম তাই হবে; যুদ্ধের মীমাংসা দুরেনস্তিন-এ তোমাদের কাটাকাটিতেও হবে না, বা গোলাবারুদেও হবে না; যারা যুদ্ধ বাঁধিয়েছে তারাই এব মীমাংশা করবে।" কথা বলতে বলতে বিলিবিন-এর কপালের ভাঁজগুলো মিলিয়ে গেল। একটু থেমে সে আবার বলল, "একমাত্র প্রশ্ন হচ্ছে, সম্রাট আলেকজান্দার ও প্রাশিয়ার রাজার মধ্যে বার্লিনে যে মুলাকাত হবে তার ফলটা কি দাঁড়াবে? প্রাশিয়া যদি মিত্রপক্ষে যোগ দেয় তাহলে অস্ট্রীয়াও যোগ দিতে বাধ্য হবে, এবং যুদ্ধ বাধবে। তা না হলে

নতুন "ক্যাম্পো ফর্মিও"—প্রাথমিক সূত্রগুলি কোথায় রচিত হবে সেটা ঠিক করাই হবে আসল প্রশ্ন।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু সহসা মুষ্টিবদ্ধ হাতে টেবিলের উপর আঘাত করে চেঁচিয়ে উঠল, "কী অসাধারণ প্রতিভা! আর লোকটির কী ভাগ্য!"

একটা মজার কথা কিছু বলতে যাচ্ছে এমনি ভাব দেখিয়ে কপালে ভাঁজ ফেলে বিলিবিন জিজ্ঞাসা করল, "বোনাপার্ত? বোনাপার্ত?" নামের "ইউ" অক্ষরটার উপর জোর দিয়ে সে নামটা দু'বার উচ্চারণ করল। "আমি অবশ্য মনে করি, শন্‌ব্রুন্‌-এ সেই যখন অস্ট্রীয়ার জন্য নিয়ম-কানুন বাতলে দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে আমরা তার নামের "ইউ" টা বাদ দিয়েই দেব। আমি তো একটা নতুন শব্দ প্রবর্তন করে তাকে বনাপার্ত বলেই ডাকব ("ইউ" টা বাদ দিয়ে)।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "ঠাট্টা রাখ; তুমি কি সত্যি মনে কর যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে?"

"আমি তো তাই মনে করি। অস্ট্রীয়াকে বোকা বানানো হয়েছে, আর সে তাতে অভ্যস্ত নয়। সে প্রতিশোধ নেবেই। প্রথমত তাকে বোকা বানানো হয়েছে কারণ তার প্রদেশগুলি তছনছ করা হয়েছে—তারা বলছে যে পবিত্র রুশ বাহিনী ভয়ংকরভাবে লুটতরাজ করেছে—তার সেনাদলকে ধ্বংস করা হয়েছে, তার রাজধানী বেদখল হয়েছে, আর এ সবই হয়েছে হিজ সার্ডিনীয় ম্যাজেস্টির দুটি সুন্দর চোখের জন্য। আর তাই—কথাটা শুধু আমাদের মধ্যেই বলছি—আমি মনে মনে অনুভব করছি যে আমাদেরও ঠকানোর আয়োজন চলছে; আমার মন বলছে, ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচনা, সন্ধির পরিকল্পনা ও আলাদাভাবে একটা গোপন চুক্তির চেষ্টা হচ্ছে।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু চেঁচিয়ে বলল, "অসম্ভব! এত নীচ তারা হতে পারে না!"

"যদি বেঁচে থাকি তো সবই দেখতে পাব," বিলিবিন জবাব দিল। তার মুখ আবার শান্ত হয়ে গেল, বোঝা গেল, আলোচনা শেষ হল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে একটা পরিষ্কার শার্ট পরে গরম, সুগন্ধি বালিশে মাথা রেখে পালকের বিছানায় শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে তার মনে হল, যে যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে সে এসেছে সেটা অনেক অনেক দূরের একটা ব্যাপার। প্রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা, অস্ট্রীয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, বোনাপার্তের নতুন জয়লাভ, আগামীকালের রাজদরবার ও কুচকাওয়াজ ও সম্রাট ফ্রান্সিস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ—এই সব চিন্তার মধ্যেই সে ডুবে গেল।

সে চোখ বুজল। সঙ্গে সঙ্গে কামান-বন্দুকের গর্জন, ও চাকার ঘর্ঘর শব্দ তার কানে বাজতে লাগল; একদল বন্দুকধারী সৈন্য সরু রেখায় পাহাড় বেয়ে নেমে আসছে। ফরাসীরা গোলাগুলি চালাচ্ছে; আর চারদিকে বুলেটের শিসের ভিতর দিয়ে শ্‌মিড্‌-এর পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে

তার হৃদপিণ্ডটা দপ্ দপ্ করছে। বেঁচে থাকার আনন্দ যেন দশগুণ হয়ে তার মনকে ভরে দিল। শৈশবের পরে এরকম অভিজ্ঞতা তার আর কখনও হয়নি।

সে জেগে উঠল……

"হ্যাঁ, এসবই ঘটেছে! শিশুর মত খুশির হাসি হেসে সে নিজেকেই বলল; তারপর যৌবনসুলভ গভীর তন্দ্রায় ঢলে পড়ল।

অধ্যায়—১১

পরদিন অনেক দেরিতে তার ঘুম ভাঙল।

প্রথমেই মনে পড়ল, আজ তাকে সম্রাট ফ্রান্সিস-এর কাছে হাজির হতে হবে; মনে পড়ল যুদ্ধমন্ত্রী, ভদ্র অস্ট্রীয় অ্যাড্জুটাণ্ট, বিলিবিন ও গত রাতের আলোচনার কথা। রাজদরবারে হাজির হবার জন্য কুচকাওয়াজের উপযুক্ত পুরো ইউনিফর্ম পরল; অনেকদিন এ পোশাক সে পরেনি। সেজেগুজে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে বিলবিন-এর পড়ার ঘরে ঢুকল। কূটনীতি বিভাগের চারটি ভদ্রলোক সেখানে হাজির। তার মধ্যে দূতাবাসের সচিব প্রিন্স হিপোলিৎ কুরাগিন-এর সঙ্গে বল্‌কন্‌স্কির আগে থেকেই পরিচয় ছিল। বিলিবিন অন্যদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

বিলিবিন-এর ঘরে সমবেত সকলেই যুবক, ধনী, হাসিখুসি, উঁচুসমাজের লোক; ভিয়েনার মত এখানেও তারা একটা বিশেষ গোষ্ঠি তৈরি করেছে। আর তাদের নেতা বিলিবিন গোষ্ঠিটার নাম দিয়েছে Les notres. এই গোষ্ঠির প্রায় সকলেই কূটনীতিক; যুদ্ধ বা রাজনীতির সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই; তাদের সম্পর্ক উঁচু সমাজ, বিশেষ বিশেষ মহিলা ও পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে। এই ভদ্রজনরা প্রিন্স আন্দ্রুকে নিজেদের একজন হিসাবেই গ্রহণ করল; এ সম্মান তারা বেশী লোককে দেয় না। ভদ্রতাবশত এবং আলোচনার সূত্র হিসাবে তারা সৈন্য ও যুদ্ধ সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন তাকে করল; তারপরেই শুরু হল রসিকতা হাসিঠাট্টা ও গল্পগুজব।

সহযোগী কূটনীতিকের দুর্ভাগ্যের কথা বলতে গিয়ে একজন বলল, কিন্তু সবচাইতে বড় কথা হল, চ্যান্সেলার তাকে সরাসরি বলে দিল যে লণ্ডনে তাকে পাঠানো হচ্ছে প্রমোশন দিয়ে, আর তাকেও এটা সেইভাবেই নিতে হবে। তখন যে তার মুখের অবস্থাটা কেমন হল সে কথা ভাবতে পার ……?"

"কিন্তু মশাইরা, এ ব্যাপারে সবচাইতে শোচনীয় কথা হল—কুরাগিনকে লক্ষ্য করেই বলছি—সেই লোকটা কষ্ট ভোগ করল, আর এই দুষ্টু ডন জুয়ান ভোগ করছে তার সুবিধাটুকু!"

প্রিন্স হিপোলিৎ লাউঞ্জ-চেয়ারের হাতলে পা তুলে দিয়ে আরামে শুয়েছিল। সে হেসে উঠল।

বলল, "সে ব্যাপারটা শুনিয়ে দাও।"

"আরে, তুমি ডন জুয়ান! তুমি বিচ্ছু!" কয়েকজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বিলিবিন বলল, "তুমি তো জান না বল্‌কন্‌স্কি, এই লোকটি মেয়েদের মহলে যা করে বেড়াচ্ছে তার তুলনায় ফরাসী বাহিনীর (প্রায় রুশ বাহিনী বলে ফেলেছিলাম আর কি) নৃশংসতা তো কিছুই না।"

"নারী তো পুরুষের সঙ্গিনী," ফরাসীতে কথাটা বলে হিপোলিৎ তার পায়ের দিকে তাকাতে লাগল।

বিলিবিন ও দলের অন্য সকলে হিপোলিতের মুখের উপর হো-হো করে হেসে উঠল; স্ত্রীর ব্যাপারে প্রিন্স আন্‌দ্রু হিপোলিৎকে কিছুটা ঈর্ষাই করত; সে বুঝতে পারল, এখানে সকলেই এই লোকটার পিছনে লাগছে।

বিলিবিন ফিস্‌ফিস্ করে বল্‌কন্‌স্কিকে বলল। "দেখনা, কিরকম মজা করি! কুরাগিন যখন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে তখন সে অপূর্ব—তার গাম্ভীর্য দেখবার মত।"

সে হিপোলিতের পাশে গিয়ে বসল। কপালে ভাঁজ ফেলে তার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা শুরু করল। প্রিন্স আন্‌দ্রু ও অন্যরা দুজনকে ঘিরে বসল।

একটা কেউ-কেটা ভঙ্গীতে চারদিকে তাকিয়ে হিপোলিৎ শুরু করল, "বার্লিন মন্ত্রীসভা মৈত্রীর কথা বলতেই পারে না⋯যদি না⋯যেমন সর্বশেষ মন্তব্যে বলা হয়েছে⋯বুঝতে পারলে⋯তাছাড়া, মহামান্য সম্রাট যদি আমাদের মৈত্রীর মূলনীতি থেকে সরে না যান⋯"

"দাঁড়ান, আমি এখনও শেষ করি নি⋯" প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতটা চেপে ধরে সে তাকে বলল, "আমি বিশ্বাস করি, হস্তক্ষেপই অ-হস্তক্ষেপ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আর⋯" একটু থেমে, "শেষ কথা হল, আমাদের ১৮ নভেম্বরের চিঠি না পাওয়ার অভিযোগ তো করা চলবে না। এইভাবেই ব্যাপারটা শেষ হবে।" এবার সে বল্‌কন্‌স্কির হাতটা ছেড়ে দিল। বোঝা গেল, এবার তার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয়েছে।

বিলিবিন বলল, "ডেমস্থিনিস, তোমার সোনার মুখে যে সুক্তি ঝরছে তা থেকেই তোমাকে আমি চিনি!" তার মাথার চুল খুসিতে নড়তে লাগল।

সকলেই হেসে উঠল; হিপোলিতের হাসি সকলের চাইতে জোরদার। সে যে কষ্ট পেয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে, কারণ তার শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে, তবু সে অট্টহাসি না হেসে থাকতে পারল না।

বিলিবিন বলল, "দেখ মশাইরা, এই ঘরে, এমন কি ক্রুন্‌-এও বল্‌কন্‌স্কি আমার অতিথি। এখানকার জীবনযাত্রায় যতরকম সুখের আয়োজন আছে সে সবকিছু দিয়ে যথাসাধ্য আমি তার আনন্দ বিধান করতে চাই। আমরা যদি ভিয়েনায় থাকতাম, ব্যাপারটা সহজ হত, কিন্তু এখানে, মোরাভিয়ার

এই হতভাগা গর্তের মধ্যে সেটা খুবই শক্ত। তাই আপনাদের সকলের কাছেই আমি সাহায্য চাইছি। ব্রুন-এর যা কিছু আকর্ষণীয় সব তাকে দেখাতে হবে। তুমি থিয়েটার দেখাবে, আমি এখানকার সমাজটা দেখাব, আর তুমি হিপোলিৎ, তুমি অবশ্য দেখাবে মেয়েমহলটা"

আঙুলের ডগায় চুমো খেয়ে দলের একজন বলল, "এমিলিকে অবশ্যই দেখাতে হবে—সে যে পরমা সুন্দরী!"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "মশাইরা, আপনাদের এই আতিথেয়তার সুযোগ নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না, আমার যাবার সময় হয়ে গেছে।"

"কোথায় যাবেন?"

"সম্রাটের কাছে।"

"ওঃ! ওঃ! ওঃ!"

"আচ্ছা, au revoir, বল্‌কন্‌স্কি! au revoir, প্রিন্স! সকাল সকাল ডিনারে চলে আসবেন," কয়েকজন বলল। "আপনাকেও দলে ভিড়িয়ে নেব।"

বল্‌কন্‌স্কিকে হল পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে বিলিবিন বলল, "সম্রাটের সঙ্গে কথা বলার সময় খাদ্য-সরবরাহ ব্যবস্থা ও পথ-নির্দেশ ব্যবস্থার যতটা সম্ভব প্রশংসা করতে চেষ্টা কর।"

"সেসবের প্রশংসা করাই উচিত, কিন্তু আসল ঘটনা যা তাতে প্রশংসা করা যায় না," বল্‌কন্‌স্কি হেসে জবাব দিল।

"যাই হোক, যত বেশী পার কথা বলো। তিনি কথা বলতে ভালবাসেন, কিন্তু নিজে কথা বলা পছন্দ করেন না, আর কথা বলতেও পারেন না; সে তুমি নিজেই দেখতে পাবে।"

অধ্যায়—১২

রাজদরবারে প্রিন্স আন্‌দ্রু অস্ট্রীয় অফিসারদের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল; সেই রকম নির্দেশই তাকে দেওয়া হয়েছিল। সম্রাট ফ্রান্সিস স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে লম্বা মাথাটা ঈষৎ দোলাল। দরবার শেষ হয়ে গেলে আগের দিনের সেই অ্যাডজুটান্টটি আনুষ্ঠানিকভাবে বল্‌কন্‌স্কিকে জানাল যে সম্রাট তার কথা শুনবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সম্রাট তাকে অভ্যর্থনা জানাল। আলোচনা শুরু হবার আগেই প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে দেখল, যেন কি বলতে হবে বুঝতে না পেরেই সম্রাট বিব্রত হয়ে পড়ল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল।

সে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, "বলুন তো, যুদ্ধ কখন শুরু হয়েছিল?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল। তারপর আবার তেমনি সরল আর একটি

প্রশ্ন: "কুতুজভ ভাল ছিলেন তো? কখন তিনি ক্রেম্‌স্‌ ছেড়ে গেলেন?" ইত্যাদি। সম্রাট এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন কতকগুলি প্রশ্ন করাই তার আসল উদ্দেশ্য, সে সব প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে তার কোন আগ্রহই নেই।

"ঠিক ক'টার সময় যুদ্ধ শুরু হয়েছিল?" সম্রাট শুধাল।

"ঠিক ক'টার সময় রণক্ষেত্রে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল তাতো ইয়োর ম্যাজেস্টিকে আমি জানাতে পারব না, তবে আমি যে ডুরেন্‌স্টিনে ছিলাম সেখানে আমরা আক্রমণ শুরু করেছিলাম বিকেল পাঁচটার পরে, জবাব দিতে গিয়ে বল্‌কন্‌স্কি বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল; তার আশা হল, সে যা কিছু জেনেছে, যা কিছু দেখেছে সে সবের যে বিবরণ তার মনের মধ্যে তৈরি হয়ে আছে এবার তাকে প্রকাশ করবার একটা সুযোগ সে পাবে। কিন্তু সম্রাট মৃদু হেসে তাকে বাধা দিল।

"কত মাইল?"

"কোন্‌ জায়গা থেকে কোন্‌ জায়গা ইয়োর ম্যাজেস্টি?"

"ডুরেন্‌স্টিন থেকে ক্রেম্‌স্‌ পর্যন্ত।"

"সাড়ে তিন মাইল ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

"ফরাসীরা কি বাম তীর ছেড়ে চলে গেছে?"

"স্কাউটদের সংবাদ অনুসারে তার শেষ সৈনিকটিও রাতারাতি ভেলায় চড়ে পার হয়ে গেছে।"

"অশ্বাদির জন্য যথেষ্ট খাবার ক্রেম্‌স্‌-এ আছে তো?"

"যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটা খাদ্য সরবরাহ……"

সম্রাট তাকে বাধা দিল।

"ঠিক ক'টার সময় সেনাপতি শ্‌মিড্‌ নিহত হয়?"

"আমার বিশ্বাস, সাতটার সময়।"

"সাতটার সময়? বড়ই দুঃখের কথা, বড়ই দুঃখের কথা।"

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ধন্যবাদ জানিয়ে সম্রাট মাথা নোয়াল। সেখান থেকে সরে যেতেই সভাসদরা চারদিক থেকে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ঘিরে ধরল। সর্বত্রই বন্ধুত্বপূর্ণ দৃষ্টি বন্ধুত্বপূর্ণ কথা। গতকালের অ্যাড্জুটান্টটি প্রাসাদে না থাকার জন্য তাকে তিরস্কার করল; নিজের বাড়িতে থাকবার প্রস্তাব করল। যুদ্ধ-মন্ত্রী এগিয়ে এসে তৃতীয় শ্রেণীর "মারিয়া থেরেসা অর্ডার" লাভের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাল। সম্রাট তাকে ঐ সম্মানে ভূষিত করেছে। সম্রাজ্ঞীর পরিচারক এসে তাকে আমন্ত্রণ জানাল হার ম্যাজেস্টির সঙ্গে দেখা করতে। আর্চডাচেসও তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক। কার কথার জবাব দেবে বুঝতে না পেরে সে কয়েক সেকেণ্ড ভেবে নিল। তখন রুশ রাষ্ট্রদূত কাঁধে হাত রেখে তাকে জানালার কাছে নিয়ে গিয়ে কথা বলতে শুরু করল।

বিলিবিন যাই বলুক না কেন, যে সংবাদ নিয়ে সে এসেছে সকলেই সেটাকে সানন্দে গ্রহণ করল। একটি ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো, কুতুজভকে "মারিয়া থেরেসা গ্র্যাণ্ড ক্রশ" দেওয়া হল; এবং গোটা বাহিনীকে পুরস্কৃত করা হল। সব জায়গা থেকে বল্‌কন্‌স্কিকে আমন্ত্রণ করা হল; অস্ট্রীয়ার গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেই তার সারা সকালটা কেটে গেল। দেখাসাক্ষাতের পালা শেষ করে বিকেল চারটে পাঁচটা নাগাদ সে বিলিবিনের বাসায় ফিরে যাচ্ছিল। যুদ্ধ ও ব্রুন্ দর্শনের একটি বিবরণ বাবাকে পাঠাবার জন্য সে মনে মনে একটা চিঠির খসরা তৈরি করছিল। দরজায় পৌঁছে দেখল, মালপত্রে অর্ধেক বোঝাই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিলিবিনের চাকর ফ্রাঞ্জ সামনের দরজা দিয়ে একটা পোর্টম্যাণ্টোকে অনেক কষ্টে টেনে বের করছে।

বিলিবিনের বাসায় পৌঁছবার আগে অভিযানের জন্য কয়েকটা বই সংগ্রহ করতে প্রিন্স আন্‌দ্রু একটা বইয়ের দোকানে গিয়েছিল, এবং সেখানে কিছুটা সময় কাটিয়েছিল।

"এ সব কি?" সে শুধাল।

অনেক কষ্টে পোর্টম্যাণ্টোটাকে গাড়িতে তুলতে তুলতে ফ্রাঞ্জ বলল, "ওঃ, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমাদের আরও দূরে সরে যেতে হবে। স্কাউণ্ড্রেলটা আবার আমাদের পিছু নিয়েছে!"

"অ্যাঁ? কি বললে?"

বিলিবিন বেরিয়ে এল। তার স্বভাব-শান্ত মুখে উত্তেজনার আভাষ।

"এই যে এসেছ! এবার স্বীকার কর যে এটা খুব মজার," সে বলল। "ভিয়েনার টাবর সেতুর ব্যাপার হে……বিনা আঘাতেই তারা পার হয়েছে।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বুঝতে পারল না।

"তুমি কোত্থেকে এলে হে? শহরের প্রতিটি কোচয়ান যা জানে সে কথাটা তুমি জান না?"

"আমি আসছি আর্চডাচেসের কাছ থেকে। সেখানে তো কিছু শুনলাম না।"

"সকলেই যে বাঁধাছাঁদা করছে তাও কি চোখে পড়ে নি?"

"না, পড়ে নি।...ব্যাপার কি?" অধৈর্য হয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু জানতে চাইল।

"ব্যাপার কি? আর কি, অয়েস্‌পার্গ যে সেতুটা রক্ষা করছিল ফরাসীরা সেটা পার হয়েছে, আর সেতুটা উড়িয়েও দেওয়া হয় নি: কাজেই মুরাৎ এখন ব্রুন্-এর পথ ধরে ছুটে আসছে, আর দু'এক দিনের মধ্যেই এখানে হাজির হবে।"

"কি? এখানে? কিন্তু মাইন যখন পাতা ছিল তখন তারা সেতুটা উড়িয়ে দিল না কেন?"

"সেই প্রশ্নটা তো আমিও তোমাকে করছি। এ কেন-র উত্তর কেউ জানে না, এমন কি বোনাপার্তও না।"

বল্‌কন্‌স্কি ঘাড় ঝাঁকুনি দিল।

বলল, "কিন্তু সেতুটা পার হওয়া মানে তো সেনাবাহিনীও ধ্বংস হয়েছে! তারা তো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।"

"ঠিক তাই হয়েছে," বিলিবিন জবাব দিল। "শোন! তোমাকে তো বলেছি, ফরাসীরা ভিয়েনায় ঢুকেছে। ভাল কথা। পরদিন, অর্থাৎ গতকাল, ঐ ভদ্রলোকরা, মুরাৎ, লাগেস ও বেলিয়ার্দ ঘোড়ায় চেপে সেতুর কাছে এল। (লক্ষ্য কর যে এরা তিনজনই গ্যাস্কন) একজন বলল, 'মশাইরা, আপনারা কি জানেন যে টাবর সেতুতে মাইন পাতা আছে, ডবল মাইন; সেতুমুখটা সাংঘাতিক রকম শক্ত করে তৈরি, আর পনেরো হাজার সৈন্যের একটি বাহিনীকে হুকুম দেওয়া হয়েছে যে তারা সেতুটা উড়িয়ে দেবে, তবু আমাদের সেতু পার হতে দেবে না? কিন্তু আমরা যদি সেতুটা দখল করতে পারি তো আমাদের সম্রাট নেপোলিয়ন খুসি হবেন; সুতরাং চলুন, আমরা তিনজন এগিয়ে গিয়ে সেতুটা দখল করি।' অন্যরা বলল, 'হ্যাঁ, তাই চলুন।' আর অমনি তারা এগিয়ে এসে সেতুটা দখল করল, পার হয়ে এল, এবং এখন গোটা বাহিনীটা নিয়ে দানিয়ুবের এপারে এসে পৌঁচেছে, —ছুটে আসছে আমাকে, তোমাকে, এবং তোমার সরবরাহ-ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে।"

"ঠাট্টা রাখ," প্রিন্স আন্‌দ্রু গম্ভীরভাবে বলল। সংবাদটা তাকে দুঃখ দিয়েছে। আবার সে খুসিও হয়েছে।

যেই সে জানল রুশ বাহিনী এখন একটা অসহায় অবস্থায় পড়েছে, তখনই তার মনে হল যে, সে বাহিনীকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের দায়িত্ব ভাগ্যই তার হাতে তুলে দিয়েছে; এই সেই তুলোঁ। (তুলোঁর যুদ্ধেই নেপোলিয়ন প্রথম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল) যা তাকে একজন তুচ্ছ অফিসারের পদ থেকে খ্যাতির প্রথম সোপানে প্রতিষ্ঠিত করবে! বিলিবিনের কথা শুনেই সে কল্পনা করে নিয়েছে, সেনাবাহিনীতে ফিরে গিয়েই সে সমর-পরিষদের কাছে এমন একটা প্রস্তাব পেশ করবে একমাত্র যার দ্বারাই রুশ বাহিনী রক্ষা পেতে পারে, আর তার ফলে সেই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করবার দায়িত্বও একমাত্র তার হাতেই তুলে দেওয়া হবে।

সে বলল, "এসব ঠাট্টা রাখ।"

বিলিবিন বলতে লাগল, "আমি ঠাট্টা করছি না। এর চাইতে সত্য, এর চাইতে দুঃখের আর কিছু নেই। এই ভদ্রলোকরা একাকি ঘোড়ায় চেপে সেতুর উপর উঠল, সাদা রুমাল নাড়ল: কর্তব্যরত অফিসারকে নিশ্চিত করে বলল যে তারা মার্শাল, প্রিন্স অয়ের্সপার্গ-এর সঙ্গে আলোচনা করতে

চলেছে। অফিসারও তাদের সেতুর উপরে উঠতে দিল। তারাও হাজার রকম আস্ফালনে তাকে জড়িয়ে ফেলল, বলল—যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, সম্রাট ফ্রান্সিস বোনাপার্তের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করছেন আর তাই তারা প্রিন্স অয়েস´পার্গ-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়, ইত্যাদি। অফিসার অয়েস´পার্গকে খবর পাঠাল; এই ভদ্রলোকরা অফিসারদের সঙ্গে কোলাকুলি করল, হাসি-ঠাট্টা শুরু করল, কামানের উপর বসে পড়ল, আর ওদিকে এক ব্যাটেলিয়ন ফরাসী সৈন্য সকলের অলক্ষ্যে সেতুর কাছে চলে আসে, বিস্ফোরক পদার্থ বোঝাই বস্তাগুলিকে জলে ফেলে দিল, এবং মোক্ষম মুহূর্তে পৌঁছে গেল। অবশেষে এলেন লেফটেন্যান্ট-জেনারেল, আমাদের প্রিয় প্রিন্স অয়েস´পার্গ ভন্ মাতার্ন´ স্বয়ং। 'প্রিয়তম শত্রু! অস্ট্রীয় বাহিনীর সেরা ফুল! তুর্কী যুদ্ধের নায়ক! যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে, এবার আমরা পরস্পর কর-মর্দন করতে পারি...সম্রাট নেপোলিয়ন প্রিন্স অয়েস´পার্গ-এর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। এককথায়, এই ভদ্রলোকরা, প্রকৃতই তারা গ্যাস্কন, মিষ্টি কথায় তাকে এতই অভিভূত করে ফেলল, আর সেও ফরাসী মার্শালদের সঙ্গে দ্রুত ঘনিষ্ঠতার ফলে এতই ফুলে-ফেঁপে উঠল, আর মুরাৎ-এর পরিচ্ছদ ও উটের পালকের স্বপ্নে এতই বিভোর হয়ে পড়ল যে তার ফলে তার চোখ ঝল্সে গেল, শত্রুপক্ষকে যে গোলা বর্ষণের দ্বারা অভ্যর্থনা জানাতে হয় সেকথাই সে ভুলে গেল।" সকলে যাতে তার এই সরস উক্তিকে উপভোগ করতে পারে সেজন্য এ পর্যন্ত বলে বিলিবিন একটু থামতে ভুল করল না। "ফরাসী ব্যাটেলিয়ান বন্দুক উঁচিয়ে সেতুর মুখে ছুটে এল, সেতু দখল করে নিল! কিন্তু সব চাইতে মজার ব্যাপার হল, কামানের ভারপ্রাপ্ত যে সার্জেণ্টটির মাইনে আগুন লাগাবার সংকেত দেবার এবং সেতুটা উড়িয়ে দেবার নির্দেশ দেবার কথা, সে ফরাসী সৈন্যদের সেতুর দিকে ছুটে যেতে দেখে কামান দাগতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু লানেস তার হাতটা থামিয়ে দিল। সার্জেণ্টটি তার সেনাপতির চাইতে বেশী বুদ্ধিমান; সে অয়েস´পার্গ-এর কাছে গিয়ে বলল: 'প্রিন্স, আপনি প্রতারিত হচ্ছেন, এরা যে ফরাসী!' মুরাৎ দেখল, সার্জেণ্টটি যদি সব কথা বলে দেয় তাহলে তো সর্বনাশ; তাই নকল বিস্ময়ে (সে যে সত্যিকারের গ্যাস্কন) অয়েস´বার্গ-এর দিকে ফিরে বলল: 'আপনি যদি একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে এভাবে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দেন তাহলে অস্ট্রীয়ার বিশ্ব-বিখ্যাত শৃংখলাবোধ কোথায় থাকে তাতো আমি বুঝতে পারছি না!' প্রতিভার এক মোক্ষম আঘাত। প্রিন্স অয়েস´পার্গ-এর মনে হল যে তার মর্যাদা তো বিপন্ন; তাই সে সার্জেণ্টকে বন্দী করার হুকুম দিল। বুঝলে হে, তোমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে টাবর সেতুর এই ব্যাপারটা বড়ই মজাদার! এটা ঠিক বোকামি নয়, পেজোমিও নয়..."

প্রিন্স আন্‌দ্রুর চোখের সামনে স্পষ্টভাবে ভাসতে লাগল ধূসর ওভারকোট, আঘাত, বারুদের ধোঁয়া, কামানের গর্জন, আর তার আসন্ন গৌরবের দৃশ্য।

সে বলল, "এটা বিশ্বাসঘাতকতাও হতে পারে।"

বিলিবিন জবাব দিল, "তাও নয়। তাতে যে রাজপরিবারের গায়ে বড় বেশী খারাপ আলো পড়ে। এটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়, পেজোমি নয়, বোকামিও নয়; এটা ঠিক উল্‌ম্‌-এ যা ঘটেছিল···এটা···" —সে একটা সঠিক ভাষা খুঁজতে চেষ্টা করল। "এটা····এটা···খানিকটা ম্যাক-এর মত। ···· আমরা ম্যাকায়িত হয়েছি।" একটা অলংকারসম্মত ভাল শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে ভেবে সে কথা শেষ করল। খুসিতে তার কপালের ভাঁজগুলি মিলিয়ে গেল; ঈষৎ হেসে সে নিজের নখগুলি পরিক্ষা করতে শুরু করে দিল।

হঠাৎ প্রিন্স আন্‌দ্রু উঠে তার ঘরের দিকে পা বাড়াল। তা দেখে সে বলল, "তুমি কোথায় চললে?"

"আমি চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"সেনাবাহিনীতে।"

"কিন্তু তোমার তো আরও দুটো দিন থাকার কথা ছিল?"

"কিন্তু আমি এখনই চলে যাচ্ছি।"

ফিরে যাবার নির্দেশাদি দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু তার ঘরে চলে গেল।

তাকে অনুসরণ করে বিলিবিন বলল, "তুমি কি জান প্রিয় বন্ধু যে আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। কেন তুমি চলে যাচ্ছ?"

তার কথার চূড়ান্ত প্রমাণ স্বরূপ তার মুখ থেকে সবগুলো ভাঁজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল; কোন জবাব দিল না।

"তুমি কেন যাচ্ছ? আমি জানি, যেহেতু তোমার সেনাদল এখন বিপন্ন তাই ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে ফিরে যাওয়াটাকে তুমি তোমার কর্তব্য বলে মনে কর। সেটা আমি বুঝি। প্রিয় বন্ধু, এই তো বীরত্ব!"

"মোটেই না," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"কিন্তু তুমি একজন দার্শনিক, আগাগোড়া তাই থাক, সমস্যাটার অন্য দিকটাও দেখ; তাহলেই দেখতে পাবে যে তোমার কর্তব্য হচ্ছে নিজের কথা ভাবা। যারা আর কোন কাজের উপযুক্ত নয় সব তাদের হাতে ছেড়ে দাও। ···তোমার তো ফিরে যাবার হুকুম দেওয়া হয় নি, আর এখান থেকেও ছুটি দেওয়া হয় নি; সুতরাং তুমি এখানেই থাকতে পার, আর দুর্ভাগ্য আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে আমাদের সঙ্গে সেখানেই যেতে পার। ওরা বলছে, আমরা অল্‌মুজ-এ যাচ্ছি; অল্‌মুজ খুব সুন্দর শহর। তুমি আর আমি

আমার গাড়িতে আরাম করে যাব।"

"দয়া করে ঠাট্টা থামাও বিলিবিন," বল্‌কন্‌স্কি চীৎকার করে উঠল।

"বন্ধুর মত আন্তরিকভাবেই আমি কথা বলছি! ভেবে দেখ! তুমি যখন এখানেই থাকতে পার, তুমি কেন চলে যাচ্ছ? কোথা যাচ্ছ? দুটোর যে কোন একটা পথ তোমার সামনে খোলা আছে," তার বাঁদিকের কপালে আবার ভাঁজ পড়ল, "হয় সন্ধি হবার আগে তুমি তোমার রেজিমেণ্টে পৌঁছতে পারবে না, অথবা কুতুজভ-এর গোটা বাহিনীর সঙ্গে পরাজয় ও অসম্মান বরণ করবে।"

এ উভয়-সংকটের কোন সমাধান নেই বুঝতে পেরে বিলিবিনের কপালের ভাঁজগুলো আবার মুছে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু ঠাণ্ডা গলায় বলল, "এ নিয়ে আমি তর্ক করতে চাই না"; কিন্তু মনে মনে বলল, "কিন্তু সেনাদলকে বাঁচাতে আমি যাবই।"

প্রিয় বন্ধু, তুমি সত্যি বীর!" বিলিবিন বলল।

অধ্যায়—১৩

সেই রাতেই যুদ্ধমন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বল্‌কন্‌স্কি সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিতে যাত্রা করল; অবশ্য সে জানে না কোথায় তাদের সঙ্গে দেখা হবে; আর মনেও ভয় আছে যে ক্রেম্‌স্‌-এর পথে ফরাসীদের হাতে সে বন্দী হতেও পারে।

ব্রুন-এ দরবারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে ব্যস্ত; ইতিমধ্যেই বড় বড় মালগুলি অল্‌মুজ-এ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেজেল্‌ডর্ফে'র কাছে প্রিন্স আন্‌দ্রু বড় রাস্তায় পড়ল। রুশ বাহিনীও সেই পথেই চলেছে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আর অত্যন্ত বিশৃংখলভাবে। রাস্তাটা মালগাড়িতে এতই বোঝাই হয়ে গেছে যে গাড়ি চেপে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। জনৈক কসাক কম্যাণ্ডারের কাছ থেকে একজন কসাকও একটা ঘোড়া নিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু মালগাড়িগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে চলল। ক্ষুধার্ত ও শ্রান্ত অবস্থায় সে খুঁজতে চলল প্রধান সেনাপতি ও তার নিজের মালপত্র। যেতে যেতেই সেনাবাহিনী সম্পর্কে খুব খারাপ খবর তার কানে আসতে লাগল; আর বিশৃংখলভাবে পলায়মান সৈন্যদল সেসব গুজবকে সমর্থনই করল।

"ইংরেজদের সোনার বিনিময়ে পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে যে রুশ বাহিনীকে আনা হয়েছে, আমাদেরও সেই দশাই হবে—(উল্‌ম্‌-এর বাহিনীর দশা।)"। যুদ্ধের একেবারে শুরুতে বোনাপার্ত তার সেনাবাহিনীকে লক্ষ্য করে যে ভাষণ দিয়েছিল তার এই কথাগুলি প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে পড়ল। ফলে তার মনে দেখা দিল তার নায়কের প্রতিভার প্রতি বিস্ময়,

একটা আহত গর্ববোধ, এবং গৌরবের আশা। সে ভাবল, "তাহলে কি মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই? বেশ তো, দরকার হলে অন্য কারও চাইতে হীন কাজ আমি করব না।"

লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, কামান-বন্দুক, মালগাড়ি ও সব রকম যানবাহনের এক বিশৃংখল সীমাহীন শোভাযাত্রার দিকে সে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল; একজন আর একজনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টায় কাদামাখা পথটাকেই বন্ধ করে দিচ্ছে; কখনও বা তিনজন ও চারজনও একসঙ্গে পাশাপাশি যাবার চেষ্টা করছে। সামনে, পিছনে, চারদিকেই যতদূর চোখ যায় শুধু চাকার ঘর্ঘর, মালগাড়ি ও কামান-টানা গাড়ির ক্যাঁচর-ক্যাঁচর, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, চাবুকের হিস্-হিস্, আর সৈনিক আর্দালি ও অফিসারদের বক-বকানি। পথের দুধারে আগাগোড়া কত মরা ঘোড়া পড়ে আছে; কতক ছাল-ছাড়ানো, কতক আস্ত; ভাঙা গাড়ির পাশে কিসের অপেক্ষায় একটি মাত্র সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে; কোথাও বা কিছু সৈন্য দল থেকে ছিটকে বেড়িয়ে আশ পাশের গ্রামে ঢুকে পড়ছে, অথবা ভেড়া, মুরগি, খড়, ও পেট মোটা বস্তা ঘাড়ে করে গ্রাম থেকে ফিরছে। রাস্তার প্রতিটি চড়াই বা উৎরাইয়ের মুখে আরও বেশী ঘন হয়ে ভিড জমছে, আর অবিরাম হৈ-চৈ চীৎকার চেঁচামেচি করছে। সৈনিকরা হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবে নিজেরাই কামান ও গাড়ি ঠেলছে। চাবুকের শপাশপ শব্দ হচ্ছে, ক্ষুর পিছলে যাচ্ছে, ঘোড়ার দড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে, অবিরাম চীৎকারে বুকে হাঁপ ধরছে। অফিসাররা এগিয়ে যাবার পথ করে দিতে গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে ঘোড়া নিয়ে ছুটাছুটি করছে। চারদিকের হৈ-হট্টগোলের মধ্যে তাদের গলা প্রায় শোনাই যাচ্ছে না। তাদের মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এই বিশৃংখলা শুধরে দেবার আশাই তারা ছেড়ে দিয়েছে।

বিলিবিনের কথাগুলি মনে পড়ায় বল্‌কন্‌স্কি ভাবল, "এই তো আমাদের আদরের গোঁড়া রুশ বাহিনী।"

প্রধান সেনাপতিকে খুঁজে বের করার আশায় সে একটা কনভয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল। ঠিক তার উল্টো দিক থেকে একটা অদ্ভুত-দর্শন এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি এল। হাতের কাছে মাল-মশলা যা পাওয়া গেছে তাই দিয়েই সৈনিকরা গাড়িটা বানিয়েছে বলে মনে হয়। একটি সৈনিক গাড়িটা চালাচ্ছে, আর গাড়ির কামড়ার ছইয়ের নীচে শালে গা মুড়ে বসে আছে একটি স্ত্রীলোক। প্রিন্স আন্‌দ্রু এগিয়ে এসে একটি সৈনিকের কাছে খোঁজ নিতে যাবে এমন সময় সেই গাড়ির ভিতর থেকে স্ত্রীলোকটির তীব্র চীৎকার তার কানে এল। সেই গাড়িটা অন্য সকলকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করায় যানবাহনের ভারপ্রাপ্ত একজন অফিসার গাড়ির চালককে মারছে; তার চাবুকের ঘা গিয়ে পড়ছে স্ত্রীলোকটির এপ্রনের উপর। স্ত্রীলোকটি

মর্মভেদী আর্তনাদ করছে। প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখে স্ত্রীলোকটি এপ্রনের ভিতর থেকে ঝুঁকে মুখ বের করে গরম শালের নীচে থেকে সরু সরু হাত নেড়ে চেঁচিয়ে বলল :

মিঃ এড-ডি-কং ! মিঃ এড-ডি-কং ! ………ঈশ্বরের দোহাই ……… আমাকে বাঁচান। আমাদের কি হবে ? আমি সপ্তম………ডাক্তারের স্ত্রী। এরা আমাদের এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না, আমরা পিছনে পড়ে গেছি, আমাদের লোকজনদের হারিয়ে ফেলেছি……।"

ক্রুদ্ধ অফিসার সৈনিকটিকে বলছে, "পিটিয়ে তোমাকে তক্তা বানিয়ে দেব ! ভাঙা গাড়ি নিয়ে পিছিয়ে যাও !"

ডাক্তারের স্ত্রী আর্তকণ্ঠে বলল, "মিঃ এড-ডি কং ! আমাকে সাহায্য করুন ! …….এসবের অর্থ কি ?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু অফিসারটির কাছে গিয়ে বলল, "দয়া করে এই গাড়িটাকে যেতে দিন। দেখছেন না স্ত্রীলোক রয়েছে ?"

অফিসার তার দিকে তাকাল ; কথার জবাব না দিয়ে আবার সৈনিকটির দিকে মুখ ফেরাল। "এগিয়ে আসার শিক্ষা তোমাকে দেব। …পিছিয়ে যাও।"

ঠোঁটে ঠোঁট চেপে প্রিন্স আন্‌দ্রু আবার বলল, "ওদের যেতে দিন। আমি বলছি !"

রেগে লাল হয়ে অফিসার তার দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বলল, "আপনি কে ? আপনি কি এখানকার কম্যাণ্ডার ? অ্যাঁ ? এখানে আমি কম্যাণ্ডার, আপনি নন ! পিছিয়ে যাও, নইলে পিটিয়ে তোমাকে তক্তা করে দেব," সে আবারও বলল। এই কথাগুলি তার খুব মনের মত।

পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল, "খোকা এড-ডি-কংকে খুব রগড়ে দিয়েছেন।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বুঝতে পারল, অফিসারটি রাগে এতই বেহুঁশ হয়ে পড়েছে যে কি বলছে তার অর্থও বুঝতে পারছে না। সে আরও বুঝতে পারল, ঐ অদ্ভুত গাড়ির আরোহিণী ডাক্তারের স্ত্রীর পক্ষ সমর্থন করলে তাকে এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে যাকে সে পৃথিবীতে সব চাইতে বেশী ভয় করে—অর্থাৎ উপহাস ; তবু অন্তরের প্রেরণা তাকে সম্মুখে ঠেলে দিল। অফিসারের কথা শেষ হবার আগেই প্রিন্স আন্‌দ্রু রাগে ফুলতে ফুলতে ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে এগিয়ে গিয়ে হাতের চাবুকটা তুলল।

"দয়া—করে ওদের—যেতে দিন !"

অফিসার হাত তুলে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"স্টাফের এই সব লোকদের জন্যই যতসব ঝামেলা দেখা দেয়," সে বিড় বিড় করে বলল। "যা ইচ্ছা করুন।"

প্রিন্স আন্‌দ্রুও চোখ না তুলেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ডাক্তারের স্ত্রী পিছন

থেকে তাকে রক্ষাকর্তা বলে কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল; কিন্তু সে তাতে কান দিল না। এই অবমাননাকর দৃশ্যটির কথা মনে করে তীব্র বিতৃষ্ণায় সে গ্রামের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; তাকে বলা হয়েছে, প্রধান সেনাপতি সেখানেই আছে।

গ্রামে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে সে সবচাইতে কাছের বাড়িটাতে ঢুকল। মনের ইচ্ছা, কিছু সময় বিশ্রাম নেবে, কিছু খাবে, এবং যেসব হুল ফোটানো যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা তাকে বিচলিত করে তুলেছিল তাকে কিছুটা শান্ত করে নেবে। প্রথম বাড়িটার জানালার দিকে যেতে যেতে সে ভাবল, "এতো সেনা দল নয়, একটা পাজির দঙ্গল," এমন সময় পরিচিত গলায় কে যেন তার নাম ধরে ডাক দিল।

সে ঘুরে দাঁড়াল। ছোট জানলাটা দিয়ে নেস্‌ভিৎস্কির সুন্দর মুখখানি দেখা দিল। যেন কিছু চিবুচ্ছে এমনিভাবে ভেজা ঠোঁট দুটো নাড়তে নাড়তে হাত ঘুরিয়ে নেস্‌ভিৎস্কি তাকে ভিতরে ঢুকতে বলল।

"বল্‌কন্‌স্কি! বল্‌কন্‌স্কি!......শুনতে পাচ্ছ না? এই? তাড়াতাড়ি এস!......" সে চেঁচাতে লাগল।

ঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল, নেস্‌ভিৎস্কি ও অপর একটি অ্যাড্‌জুটাণ্ট কি যেন খাচ্ছে। তাড়াতাড়ি তার দিকে ঘুরে জানতে চাইল, কোন খবর আছে কি না। তাদের চোখে মুখে সে যেন উত্তেজনা ও আতংকের চিহ্ন দেখতে পেল। নেস্‌ভিৎস্কির স্বভাবত হাসিখুসি মুখে সেটা যেন আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল।

"প্রধান সেনাপতি কোথায়?" বল্‌কন্‌স্কি শুধাল।

"এইতো, ঐ বাড়িটাতে," অ্যাড্‌জুটাণ্ট জবাব দিল।

"আচ্ছা, এটা কি সত্যি যে শান্তি ও সন্ধি স্থাপিত হতে চলেছে?" নেস্‌ভিৎস্কি শুধাল।

"আমিই তো তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইছি। আমি যেকোন রকমে এখানে এসে পৌঁচেছি এর বেশী কিছুই আমি জানি না।"

"আর আমরা! আরে বাবা, সেতো ভয়ঙ্কর ব্যাপার! ম্যাককে দেখে হেসে খুব ভুল কবেছিলাম, আমাদের অবস্থা আরও খারাপ," নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "কিন্তু আগে এখানে বস, কিছু খেয়ে নাও।"

অ্যাড্‌জুটাণ্টটি বলল, "এখন আপনার মালপত্র বা অন্য কোন কিছুই পাবেন না প্রিন্স। আর আপনার চাকর পিতার যে কোথায় তা এক ঈশ্বরই জানেন।"

"হেড-কোয়ার্টার এখন কোথায়?"

"আমাদের রাত কাটাতে হবে জ্‌নাইম-এ।"

নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "দেখ, আমার দরকারী জিনিসপত্র সব দুটো ঘোড়ায়

মত করে প্যাক করা হয়েছে। খুব ভালভাবে প্যাক করেছে—তা নিয়ে বোহেমীয় পর্বতমালাও পার হয়ে যাওয়া যাবে। অবস্থা বড়ই খারাপ হে বাপু। কিন্তু তোমার কি হল? এমন কাঁপছ কেন অসুস্থ লোকের মত?" প্রিন্স আন্‌দ্রুকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত কাঁপতে দেখে সে বলল।

"ও কিছু না," প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল।

ডাক্তারের স্ত্রী ও কনভয়-অফিসারের ঘটনাটা হঠাৎ তার মনে পড়ে গিয়েছিল।

"প্রধান সেনাপতি এখানে কি করছেন?" সে শুধাল।

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," নেস্‌ভিৎস্কি বলল।

"দেখ, আমি কিন্তু বুঝতে পারছি যে সবকিছুই ন্যাক্কারজনক, ন্যাক্কারজনক, অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক!" এই কথা বলে প্রিন্স আন্‌দ্রু প্রধান মন্ত্রী যে বাড়িতে আছে সেইদিকে এগিয়ে গেল।

কুতুজভ-এর গাড়ি ও ক্লান্ত ঘোড়াগুলিকে পাশ কাটিয়ে সে এগিয়ে চলল। ঘোড়ার কসাকরা জোরগলায় কথাবার্তা বলছে। সে বারান্দায় উঠল। সে শুনেছে, প্রিন্স ব্যাগ্রেশন ও ওয়েরদারসহ কুতুজভ স্বয়ং এখানেই আছে। ওয়েরদার অস্ট্রীয় সেনাপতি শ্‌মিড্‌-এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। বারান্দায় ছোট্ট কজ্‌লভ্‌স্কি জনৈক করণিকের সামনে হাঁটু ভেঙে বসে আছে। একটা টবকে উল্টো করে পেতে তার উপর কাগজ রেখে করণিকটি হাতের আস্তিন গুটিয়ে তাড়াতাড়ি কি যেন লিখছে। কজ্‌লভ্‌স্কির মুখটাও শুকনো দেখাচ্ছে—স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সেও সারারাত ঘুমোয় নি। সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল, কিন্তু মাথাটাও নাড়ল না।

"দ্বিতীয় ব্যূহ··· লিখেছ?" সে করণিককে বলল। "কিয়েফ্‌ পদাতিক সৈন্যগণ, পোদোলিয়ান···"

"এত তাড়াতাড়ি কেউ লিখতে পারে না, ইয়োর অনার," ক্রুদ্ধ অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে কজ্‌লভস্কির দিকে তাকিয়ে করণিক বলল।

দরজা দিয়ে শোনা গেল কুতুজভ-এর উত্তেজিত, অসন্তুষ্ট গলা; একটি অপরিচিত গলা তাকে বাধা দিচ্ছে। এইসব কণ্ঠস্বর, উদাসীনভাবে কজ্‌লভ্‌স্কি তার দিকে তাকালো, ক্লান্ত করণিকটির অশ্রদ্ধার ভাব, প্রধান সেনাপতির এত কাছে করণিক ও কজ্‌লভ্‌স্কি একটা টবের পাশে বসে থাকা, জানালার কাছেই ঘোড়াগুলোকে ধরে কসাকদের জোরে জোরে হাসা—এসব কিছু দেখে শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল একটা গুরুতর রকমের বিপজ্জনক কিছু ঘটতে চলেছে।

কজ্‌লভ্‌স্কির দিকে ফিরে সে জরুরী প্রশ্ন করতে লাগল।

কজ্‌লভ্‌স্কি বলল, "এই মুহূর্তেই প্রিন্স ব্যাগ্রেশনকে নিয়োগ করা হচ্ছে।"

"সন্ধির খবর কি ?"

"সেরকম কিছুই হয় নি। যুদ্ধের হুকুমই তো ঘোষণা করা হচ্ছে।"

যেখান থেকে কথা শোনা যাচ্ছিল প্রিন্স আন্‌দ্রু সেই দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজাটা খুলতে যাবে এমন সময় শব্দ থেমে গেল, দরজাটা খুলে গেল, আর ঈগল পাখির মত নাক ও ফোলা মুখ নিয়ে কুতুজভ দ্বারপথে দেখা দিল। প্রিন্স আন্‌দ্রু কুতুজভ-এর একেবারে সম্মুখে দাঁড়িয়ে, কিন্তু প্রধান সেনাপতির একটি ভাল চোখের দৃষ্টি দেখেই মনে হল, চিন্তা ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সে এতই ডুবে আছে যে তার উপস্থিতিটাই সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। নিজের অ্যাড্‌জুটাণ্টের মুখের দিকে সোজা তাকিয়েও সে তাকে চিনতে পারে নি।

কজ্‌লভ্‌স্কিকে বলল, "আচ্ছা, তুমি শেষ করেছ ?"

"আর একটু সময়, ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

প্রধান সেনাপতির পিছনেই বেরিয়ে এল ব্যাগ্রেশন; মাঝারি উচ্চতার শক্ত পোক্ত মধ্যবয়স্ক মানুষ, প্রাচ্যসুলভ কঠিন, গম্ভীর মুখ।

কুতুজভ-এর হাতে একটা খাম এগিয়ে দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু একটু জোরেই আর একবার বলল, "আমি আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।"

"ওঃ, ভিয়েনা থেকে ? খুব ভাল। পরে, পরে !"

ব্যাগ্রেশনকে নিয়ে কুতুজভ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

"আচ্ছা, তাহলে বিদায় প্রিন্স," সে ব্যাগ্রেশনকে বলল। "তোমার এই মহৎ প্রচেষ্টায় রইল আমার আশীর্বাদ ; খৃস্ট তোমার সহায় হোক !"

হঠাৎ তার মুখটা নরম হয়ে গেল, চোখ জলে ভরে উঠল। বাঁ হাতে ব্যাগ্রেশনকে কাছে টেনে এনে আংটি-পরা ডান হাতে স্বাভাবিক ভঙ্গীতে তার মাথার উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে ফোলা-ফোলা গালটা তার দিকে এগিয়ে দিল, কিন্তু ব্যাগ্রেশন চুমো খেল তার গলায়।

"খৃস্ট তোমার সহায় হোন !" কথাটা আর একবার বলে কুতুজভ তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। বল্‌কন্‌স্কিকে বলল, "আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠে পড়।"

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি এখানেই কাজ করতে চাই। আমাকে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের সেনাদলের সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিন।"

"উঠে পড়," কুতুজভ বলল ; তবু বল্‌কন্‌স্কি দেরি করছে দেখে সে বলল, "আমি নিজেও ভাল অফিসার চাই, নিজের জন্যই চাই।"

দুজন গাড়িতে উঠল। কয়েক মিনিট নিঃশব্দেই চলতে লাগল।

যেন একটি বৃদ্ধের সহজ বুদ্ধিতে বল্‌কন্‌স্কির মনের অবস্থা বুঝতে পেরে সে বলল, "আমাদের সামনে এখনও অনেক কিছু আছে।" তারপর যেন নিজেকেই বলছে এমনিভাবে বলে উঠল, "তার সেনাদলের দশ ভাগের একভাগও যদি ফিরে আসে তো আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাব।"

মাত্র এক ফুট দূর থেকে প্রিন্স আন্‌দ্রু কুতুজভ-এর মুখের দিকে তাকাল; তার কপালের যেখানটায় একটা ইস্‌মাইল বুলেট ঢুকে খুলি ভেদ করে চলে গিয়েছিল সেই জায়গায় সযত্নে ধোয়া সেলাইয়ের ক্ষত-চিহ্ন এবং তার চোখের শূন্য কোটরের দিকে আপনাথেকেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর দৃষ্টি পড়ল। সে ভাবল, "হ্যাঁ, মানুষের মৃত্যুর কথা এত সহজে বলবার অধিকার তার আছে।"

সে বলল, "সেইজন্যই তো সেই সেনাদলের সঙ্গে আমি যেতে চাইছি।"

কুতুজভ জবাব দিল না। যেন কি বলছিল সেটা ভুলে গিয়ে সে চিন্তায় ডুবে বসে রইল। পাঁচ মিনিট পরে গাড়ির নরম স্প্রিংয়ে দুলতে দুলতে সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে মুখ ফেরাল। তার মুখে উত্তেজনার চিহ্নমাত্র নেই। সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের সুরে সে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল সম্রাটের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বিবরণের কথা, ক্রেম্‌স্‌-এর ব্যাপার সম্পর্কে রাজদরবারে যেসব মন্তব্য শুনেছে তার কথা এবং উভয়ের পরিচিত কিছু মহিলার কথা।

অধ্যায়—১৪

১লা নভেম্বর কুতুজভ একটি গুপ্তচর মারফৎ খবর পেল যে তার অধীনস্থ বাহিনী অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়েছে। গুপ্তচরটি জানিয়েছে, রাশিয়া থেকে যে বাহিনী এগিয়ে আসছে তার ও কুতজভ-এর বাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে ফরাসী বাহিনী ভিয়েনার সেতু পার হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে। এরপরেও যদি কুতুজভ ক্রেম্‌স্‌-এ থেকে যায় তাহলে নেপোলিয়নের এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্যের বাহিনী এসে তাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে, তার চল্লিশ হাজার সৈন্যের বাহিনীকে ঘিরে ফেলবে, এবং তারও অবস্থা হবে উল্‌ম্‌-এ ম্যাকের মত। কুতুজভ যদি স্থির করে থাকে যে রাশিয়া থেকে আগত সৈন্যদলের সঙ্গে "তার যোগাযোগরক্ষাকারী রাস্তাটা সে পরিত্যাগ করবে, তাহলে তাকে যাত্রা করতে হবে বোহেমীয় পর্বতমালার এমন অজ্ঞাত অঞ্চলে যেখানে কোন পথ নেই, পদে পদে তাকে আত্মরক্ষা করে চলতে হবে শত্রুপক্ষের অধিকতর শক্তিশালী সেনাদলের সঙ্গে সংগ্রাম করে, এবং বাক্সহোডেন-এর সঙ্গে মিলিত হবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে। আর কুতুজভ যদি স্থির করে যে, ক্রেম্‌স্‌ থেকে অল্‌মুজ যাবার পথ ধরে পশ্চাদপসরণ করবে, রাশিয়া থেকে আগত সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হবে, তাহলে তাকে মস্ত বড় ঝুঁকি নিতে হবে: ভিয়েনা সেতু পার হয়ে ধেয়ে আসা ফরাসী বাহিনী তার আগেই সেপথে হানা দেবে, তার নিজের মালপত্র ও যানবাহনেই তো সেপথ আটকে আছে; যাত্রাপথেই তার চাইতে তিনগুণ অধিক শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে তাকে যুদ্ধে নামতে হবে, আর তারা দুদিক থেকে তাকে চেপে ধরবে।

কুতুজভ শেষের পথটাই বেছে নিল।

গুপ্তচর সংবাদ দিয়েছে, ফরাসী বাহিনী ভিয়েনা সেতু পার হয়ে জোর কদমে এগিয়ে চলেছে জ্‌নাইম-এর দিকে ; কুতুজভ-এর পশ্চাদপসরণের পথ থেকে সেটা শ'খানেক ভার্স্ট দূরে অবস্থিত। সে যদি ফরাসীদের আগেই জ্‌নাইম পৌঁছতে পারে তাহলে বাহিনীটির বাঁচবার যথেষ্ট আশা থাকবে ; কিন্তু ফরাসী বাহিনী তার আগে সেখানে পৌঁছনো মানেই হয় গোটা বাহিনীকেই উলম্‌-এর মত অসম্মান ভোগ করতে হবে, আর না হয়তো সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে হবে। কিন্তু ফরাসীদের আগে সসৈন্যে সেখানে পৌঁছনো অসম্ভব। ক্রেম্‌স্‌ থেকে জ্‌নাইম পর্যন্ত রাশিয়ানদের যে রাস্তা সেটার তুলনায় ফরাসীদের ভিয়েনা থেকে জ্‌নাইম পর্যন্ত যাবার রাস্তা অনেক সংক্ষিপ্ত ও ভাল।

খবরটা পাবার পরে সেই রাতেই কুতুজভ চার হাজার সৈন্য নিয়ে গড়া ব্যাগ্রেশন-এর অগ্রবর্তী বাহিনীকে পাঠিয়ে দিল পাহাড় ডিঙিয়ে ক্রেম্‌স্‌-জ্‌নাইম থেকে ভিয়েনা-জ্‌নাইম পথের দিকে। কোনরকম বিশ্রাম না নিয়ে ব্যাগ্রেশনকে মার্চ করে এগিয়ে যেতে হবে, এবং জ্‌নাইমকে পিছনে রেখে ভিয়েনার দিকে মুখ করে থামতে হবে। এইভাবে সে যদি ফরাসীদের আগে পৌঁছতে পারে তাহলে যত বেশী সম্ভব তাদের সেখানে আটকে রাখবে। আর কুতুজভ স্বয়ং সব যানবাহন সঙ্গে নিয়ে জ্‌নাইম-এর পথ ধরবে।

ছেঁড়া জুতো পরা ক্ষুধার্ত সৈন্যদের নিয়ে সেই ঝড়ের রাতে পথহীন পাহাড় ডিঙিয়ে ত্রিশ মাইল পথ চলতে গিয়ে এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যকে পথেই ফেলে রেখে ব্যাগ্রেশন ভিয়েনা-জ্‌নাইম পথের হলোব্রুন-এ পৌঁছল ফরাসী বাহিনীর মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ; তারাও তখন ভিয়েনা থেকে হলোব্রুন-এর দিকেই এগিয়ে আসছে। যানবাহনসমেত আরও কয়েক দিনের পথ চললে তবে কুতুজভ ভিয়েনায় পৌঁছতে পারবে। কাজেই শত্রুসৈন্য হলোব্রুন-এ পৌঁছবার পরে চার হাজার ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত সৈন্য নিয়ে ব্যাগ্রেশন-এর কাজ হবে দিনের পর দিন তাদের আটকে রাখা ; আর সে কাজটা একান্তই অসম্ভব। কিন্তু ভাগ্যের খেয়ালে সেই অসম্ভবই সম্ভব হল। যে চালাকির সফলতার ফলে ফরাসীরা বিনা যুদ্ধে ভিয়েনা সেতুকে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল, মুরাৎ সেই একই চালাকির দ্বারা কুতুজভকে ঠকাতে চেষ্টা করল। ব্যাগ্রেশন-এর দুর্বল সেনাদলকে জ্‌নাইম রাস্তায় দেখে মুরাৎ সেটাকেই কুতুজভ-এর গোটা বাহিনী বলে ধরে নিল। তাই সেই সেনাদলকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করবার আশায় তার বাকি যে সৈন্যরা ভিয়েনা থেকে আসছিল তাদের জন্য সে অপেক্ষা করতে লাগল, আর সেই উদ্দেশ্যে এই শর্তে একটা তিন দিনের সন্ধির প্রস্তাব করল যে উভয় পক্ষের সৈন্যরাই যে যেখানে আছে

সেখান থেকে নড়বে না। মুরাৎ জানাল, শান্তি স্থাপনের আলোচনা শুরু হয়ে গেছে, আর তাই অকারণ রক্তপাত বন্ধ করার জন্যই সে এই সন্ধির প্রস্তাব করছে। অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে মোতায়েন অস্ট্রীয় সেনাপতি কাউণ্ট নস্টিজ মুরাতের দূতের এই কথায় বিশ্বাস করে ব্যাগ্রেশন-এর সেনাদলকে অরক্ষিত রেখে রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিল। আর একটি দূত গেল রুশ সেনাদের কাছে শান্তি-আলোচনার কথা জানিয়ে তিনদিনের সন্ধির প্রস্তাব করতে। ব্যাগ্রেশন জবাব দিল, সন্ধির প্রস্তাব স্বীকার করবার অথবা বাতিল করবার ক্ষমতা তার নেই; কাজেই প্রস্তাবটি কুতুজভ-এর কাছে পেশ করবার জন্য সে একজন অ্যাড্‌জুটাণ্টকে পাঠিয়ে দিল।

কিছু বেশী সময় হাতে পাবার পক্ষে সন্ধিই কুতুজভ-এর একমাত্র ভরসা। সময় পাওয়া গেলে ব্যাগ্রেশন-এর ক্লান্ত সৈনিকরা কিছুটা বিশ্রাম পাবে; আবার যানবাহনসহ যে বিরাট কনভয়টির অগ্রগতির খবর ফরাসীদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল তারাও অন্তত আরও কিছুটা বেশী পথ জ্‌নাইম-এর দিকে এগিয়ে যেতে পারবে। তাই সন্ধির প্রস্তাব তার কাছে এনে দিল বাহিনীটিকে বাঁচাবার একান্ত অপ্রত্যাশিত একমাত্র সুযোগ। সংবাদ পাওয়া মাত্রই সে সহযাত্রী অ্যাড্‌জুটাণ্ট-জেনারেল উইন্তজিন্‌গেরোদকে পাঠাল শত্রুপক্ষের শিবিরে। উইন্তজিন্‌গেরোদ সন্ধির প্রস্তাব তো মানবেই, উপরন্তু আত্মসমর্পণের শর্ত সম্পর্কেও একটা প্রস্তাব রাখবে। এদিকে কুতুজভ তার অ্যাডজুটাণ্টদের ফেরৎ পাঠিয়ে দিল, তারা যেন গোটা বাহিনীর মাল-পত্রবাহী গাড়িগুলোকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্রেম্‌স্‌-জ্‌নাইম রাস্তা ধরে ছুটিয়ে নিয়ে আসে। ব্যাগ্রেশন-এর যে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত সেনাদল ছিল গোটা বাহিনী ও যানবাহনের রক্ষায় নিযুক্ত শুধুমাত্র তারাই আটগুণ বেশী শক্তিশালী শত্রুপক্ষের সামনে স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কুতুজভ আশা করেছিল, আত্মসমর্পণের প্রস্তাব (যেটা মোটেই বাধ্যতা-মূলক নয়) যানবাহনের একাংশকে আরও এগিয়ে যাবার সময় দেবে এবং মুরাৎ-এর ভুলটাও অচিরেই ধরা পড়বে। তার সে আশা সত্য প্রমাণিত হল। যেমুহূর্তে বোনাপার্ত (সে তখন ছিল হলোব্রুন থেকে ষোল মাইল দূরবর্তী শন্‌ব্রুন-এ) সন্ধি ও আত্মসমর্পণের প্রস্তাবসহ মুরাৎ-এর চিঠি পেল তখনই সে ফন্দিটা ধরে ফেলল এবং মুরাৎকে নিম্নমত চিঠি লিখল:

শন্‌ব্রুন, ২৬শে ব্রুমেয়ার, ১৮০৫
সকাল আট ঘটিকা

"প্রিন্স মুরাৎকে,

"তোমার কাছে আমার অসন্তোষকে প্রকাশ করবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি তো শুধু আমার অগ্রবর্তী বাহিনীকে পরিচালনা করছ, কাজেই আমার হুকুম ছাড়া কোন যুদ্ধ-বিরতির ব্যবস্থা করার কোন অধিকার

তোমার নেই। তোমার জন্য আমি একটা গোটা অভিযানের ফলকে হারাতে বসেছি। অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ভেঙে দাও এবং শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়। তাকে জানিয়ে দাও, যে সেনাপতি আত্মসমর্পণের চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সে কাজ করবার কোন অধিকার তার নেই, এবং রাশিয়ার সম্রাট ছাড়া অন্য কারও সে অধিকার নেই।

“অবশ্য রাশিয়ার সম্রাট যদি এ চুক্তি সমর্থন করেন তাহলে আমি এটা সমর্থন করব ; কিন্তু এটা একটা চালাকি মাত্র। এগিয়ে যাও, রুশ বাহিনীকে ধ্বংস কর…সে বাহিনীর মালপত্র ও গোলাবারুদ তো তোমার মুঠোর মধ্যে।

“রুশ সম্রাটের এড-ডি-কং একটি জোচ্চোর। ক্ষমতাহীন অফিসাররা তো কিছুই নয় ; এই অফিসারটির কোন ক্ষমতাই ছিল না…ভিয়েনা সেতু পার হবার সময় অস্ট্রীয়রা তোমাদের চালাকির হাতে ধরা দিয়েছিল, তুমিও সম্রাটের এড-ডি-কংয়ের চালাকির হাতে ধরা দিয়েছ।

“নেপোলিয়ন”

এই ভয়ংকর চিঠি নিয়ে নেপোলিয়নের অ্যাড্‌জুটান্ট ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল মুরাৎ-এর কাছে। পাছে তৈরি শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় এই ভয়ে সেনাপতিদের উপর ভরসা না করে রক্ষীবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নেপোলিয়ন স্বয়ং চলল যুদ্ধক্ষেত্রে। আর ব্র্যাগেশন-এর চার হাজার সৈনিক মনের আনন্দে শিবিরে আগুন জ্বালাল, হাত-পা গরম করে আরাম করল, তিন দিনের মধ্যে এই প্রথম পরিজ রান্না করল, অথচ তাদের একজনও জানল না বা কল্পনা করল না তাদের ভাগ্যে কি আছে।

অধ্যায়—১৫

কুতুজভ-এর কাছে অনবরত অনুরোধ জানাবার পরে বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে প্রিন্স আন্দ্রু গ্রুন্থ-এ পৌঁছে ব্যাগ্রেশন্-এর সঙ্গে দেখা করল। বোনাপার্তের অ্যাড্‌জুটান্ট তখনও মুরাৎ-এর কাছে পৌঁছে নি, আর যুদ্ধও শুরু হয় নি। ব্যাগ্রেশন-এর সেনাদলের কেউই প্রকৃত অবস্থার কোন খবরই রাখে না। তারা মুখে শান্তির কথা বললেও শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে না ; যারা যুদ্ধের কথা ভাবছে তারাও বিশ্বাস করে না যে অবিলম্বেই কোন যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হবে। ব্যাগ্রেশন জানে বল্‌কন্‌স্কি একজন প্রিয়পাত্র ও বিশ্বাসী অ্যাড্‌জুটান্ট ; তাকে সে বিশেষ মর্যাদা ও অনুগ্রহের সঙ্গে স্বাগত জানাল ; বুঝিয়ে বলল যে সেইদিন অথবা তার পরদিনই একটা সংঘর্ষ হতে পারে ; যুদ্ধকালে সে ইচ্ছা করলে তার সঙ্গেও থাকতে পারে, অথবা পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চাদপসরণকারীদের উপরেও নজর রাখতে পারে, আর সে কাজটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তারপরেই যেন প্রিন্স আন্‌দ্রুকে নিশ্চিত করবার জন্যই আর একবার বলল, "অবশ্য আজই কোন সংঘর্ষ হবার সম্ভাবনা খুবই কম।"

ব্যাগ্রেশন মনে মনে ভাবল, "সে যদি একজন সাধারণ ফুলবাবু-অফিসারের মত একটা মেডেল গলায় পরবার জন্য এখানে এসে থাকে তাহলে পশ্চাৎ-রক্ষীবাহিনীতে থেকেও সে পুরস্কারটা বাগাতে পারবে, কিন্তু সে যদি আমার সঙ্গে থাকতে চায় তো থাকুক···একজন সাহসী অফিসার হলে সে এখানে অনেক কাজে লাগবে।" প্রিন্স আন্‌দ্রু কোন জবাব দিল না; শুধু চারদিকটা ঘুরে সেনাদলের অবস্থানটা একবার দেখে নেবার অনুমতি চাইল, যাতে যদি কখনও তাকে কোন হুকুম তামিল করতে পাঠানো হয় তখন নিজের অবস্থাটা সে ভালভাবে বুঝে নিতে পারে। কর্তব্যরত একজন অফিসার প্রিন্স আন্‌দ্রুকে সবকিছু ঘুরিয়ে দেখাবার ভার নিল। অফিসারটি সুদর্শন ও সুসজ্জিত; অনামিকায় একটা হীরের আংটি, আর ফরাসীতে কথা বলতে খুব ভালবাসে, যদিও সে-ভাষাটা বলে খুবই বাজে।

চারদিকে তারা দেখতে পেল, বৃষ্টি-ভেজা অফিসাররা ক্লান্ত মুখে কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে, আর সৈন্যরা গ্রাম থেকে দরজা, বেঞ্চি ও বেড়া টেনে নিয়ে আসছে।

সৈন্যদের দেখিয়ে স্টাফ-অফিসারটি বলল, "ঐ দেখুন প্রিন্স। ঐ লোকগুলোকে আমরা থামাতে পারছি না। অফিসাররা তো ওদের কথা ভাবেই না। আর ঐ যে," একটা খাবারওয়ালার তাঁবু দেখিয়ে সে বলল, "ওখানেই সকলে ভিড় করে বসে আছে। আজ সকালেই সবগুলোকে বের করে দিয়েছিলাম, আর এখন দেখুন, আবার ভর্তি হয়ে গেছে। আমাকে একবার যেতেই হবে প্রিন্স, একটু বকুনি দিয়ে আসি। মোটেই সময় লাগবে না।"

প্রিন্স আন্‌দ্রুও এখনও কিছু খাবার সময় করে উঠতে পারে নি; সে বলল, "হ্যাঁ, চলুন ভিতরে যাই; আমিও একটা রুটি ও কিছু পনির কিনব।"

"এ কথা আগে বলেন নি কেন প্রিন্স? আমি আপনাকে কিছু খেতে দিতাম।"

ঘোড়া থেকে নেমে তারা তাঁবুতে ঢুকল। কয়েকজন অফিসার লাল্‌চে, ক্লান্ত মুখে টেবিলে বসে পান-ভোজন করছিল।

একই কথা বার বার বলার মত ভঙ্গীতে তিরস্কারের সুরে স্টাফ-অফিসার বলল, "আচ্ছা, এসরের অর্থ কি মশাইরা? আপনারা জানেন, এভাবে ঘাঁটি ছেড়ে আসতে আপনারা পারেন না। প্রিন্স তো হুকুম জারি করেছেন যে কেউ তার ঘাঁটি ছাড়বেন না। আর আপনি, ক্যাপ্টেন," একটি শুটকো, নোংরা ছোটখাট গোলন্দাজ-অফিসারের দিকে ফিরে সে বলল। অফিসারটির পায়ে বুট নেই, শুধু মোজা (বুট জোড়া খাবারওয়ালাকে দিয়েছে শুকোবার

জন্য) ; তারা ঘরে ঢুকলে সে একটু হেসে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

স্টাফ-অফিসার বলতে লাগল, "আচ্ছা, আপনার কি লজ্জা নেই ক্যাপ্টেন তুশিন? সকলেই মনে করে যে একজন গোলন্দাজ-অফিসার হিসাবে আপনি একটা সৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, অথচ বিনা বুটে আপনি এখানে এসেছেন। বিপদ-সংকেত বেজে উঠলেই তো বিনা জুতোয় আপনি খুব অসুবিধায় পড়ে যাবেন! (স্টাফ অফিসার হাসল।) মশাইরা, দয়া করে যার যার ঘাঁটিতে চলে যান। আপনারা সব্বাই, সব্বাই!" হুকুমের সুরে সে কথা শেষ করল।

গোলন্দাজ-অফিসার তুশিন-এর দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু হেসে ফেলল। নিঃশব্দে হাসতে হাসতে অফিসারটি মোজা-পরা এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ মেলে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে একবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে, একবার স্টাফ-অফিসারের দিকে তাকাতে লাগল।

"সৈনিকরা বলে, বুট ছাড়াই বেশী আরাম হয়," অসুবিধাজনক ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন তুশিন সলজ্জ হাসির সঙ্গে বলল। তার ইচ্ছা ছিল কথায় একটু ঠাট্টার সুর আনে, কিন্তু কথা শেষ করার আগেই সে বুঝতে পারল যে তার পরিহাসকে কেউ মেনে নিচ্ছে না, আর তার কথায়ও সে সুরটি বাজে নি। সে কিছুটা বিব্রত বোধ করল।

নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখার চেষ্টা করে স্টাফ-অফিসার বলল, "দয়া করে যার যার ঘাঁটিতে ফিরে যান।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু আর একবার গোলন্দাজ-অফিসারটির ছোটখাট চেহারার দিকে তাকাল। চেহারাটা কেমন যেন অদ্ভুত, একজন সৈনিকের পক্ষে সম্পূর্ণ বেমানান, বরং কিছুটা ভাঁড়ের মত। অথচ অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

স্টাফ-অফিসার ও প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে চলল।

গ্রাম ছাড়িয়ে বিভিন্ন রেজিমেণ্টের সৈনিক ও অফিসারদের সঙ্গে দেখা করে তাদের ছেড়ে আরও এগিয়ে তারা এক জায়গায় দেখতে পেল, বাঁদিকে একটা খাদ কাটা হচ্ছে আর তার থেকে যে নতুন-কাটা মাটি ফেলা হচ্ছে সেটা দেখতে লাল। ঠাণ্ডা বাতাস সত্ত্বেও কয়েক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য শার্ট গায়ে দিয়ে সেই মাটির বাঁধের উপর সাদা পিঁপড়ের মত ভিড় করে আছে; বাঁধের পিছন থেকে কতকগুলি অদৃশ্য হাত অনবরত কোদাল ভর্তি করে লাল কাদা উপরে ছুঁড়ে ফেলছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ও অফিসারটি ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে খাদগুলো দেখে আবার চলতে লাগল। ঠিক তার পিছনেই তারা দেখতে পেল কয়েক ডজন সৈন্য অনবরত দলের পর দল খাদ থেকে ছুটে এসে সেখানে হাজির হচ্ছে। এই সব পায়খানার বিষাক্ত আবহাওয়ার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্য তারা দুজন নাক চেপে ধরে

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

স্টাফ-অফিসার ফরাসীতে বলল, "শিবির-জীবনের এও একটা সুখ প্রিন্স।"

বিপরীত দিকের পাহাড় বেয়ে তারা উঠতে লাগল। সেখান থেকে ফরাসীদের বেশ দেখা যায়। প্রিন্স আন্‌দ্রু একটু থেমে জায়গাটা ভাল করে দেখতে লাগল।

সব চাইতে উঁচু জায়গাটা দেখিয়ে স্টাফ-অফিসার বলল, "ঐ আমাদের কামান। এগুলো সেই বুটহীন অদ্ভুত লোকটির অধীন। ওখান থেকে আপনি সবকিছু দেখতে পাবেন। চলুন প্রিন্স, ওখানে যাওয়া যাক।"

স্টাফ-অফিসারের সঙ্গ এড়াবার জন্য প্রিন্স বলল, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ; আমি একাই যাব। দয়া করে আপনি আর কষ্ট করবেন না।"

স্টাফ-অফিসার সেখানেই থেকে গেল; প্রিন্স আন্‌দ্রু একাই এগিয়ে গেল।

সে যত শত্রুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, সৈন্যরা ততই সুশৃঙ্খল ও খুসী হয়ে উঠতে লাগল। ফরাসী বাহিনীর কাছ থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত জ্‌নাইম রোড-এ আজ সকালে সে যখন মালবাহী গাড়িগুলিকে পার হয়ে আসছিল তখন সেখানেই দেখেছিল সর্বাধিক বিশৃংখলা ও অবসাদ। গ্রুন্থ-এও কিছুটা আতঙ্ক ও বিপদের শংকা বোঝা গিয়েছিল, কিন্তু প্রিন্স যতই ফরাসী বাহিনীর দিকে এগোতে লাগল আমাদের সৈন্যদের মনে ততই আত্মবিশ্বাস জাগতে লাগল। গ্রেট-কোট পরিহিত সৈন্যরা সব সার দিয়ে দাঁড়াল, সার্জেন্ট-মেজর ও কোম্পানি অফসাররা তাদের গুণতে লাগল; প্রতিটি দলের শেষ সৈনিকটির পাঁজড়ে খোঁচা মেরে তাকে হাত তুলতে বলল। ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে সৈন্যরা কাঠের গুঁড়ি ও ঝোঁপ-জঙ্গল টেনে এনে হাসিমুখে গল্পগুজব করতে করতে ছাউনি বসাচ্ছে; কেউ বা আগুনের পাশে বসে শার্ট ও পায়ের পট্টি শুকোচ্ছে আবার অনেকেই বয়লার ও পরিজ-কুকুরের পাশে জড়ো হয়ে বুট ও ওভারকোট মেরামত করছে। এক দলের ডিনার তৈরি হয়ে গেছে; সৈন্যরা সতৃষ্ণ নয়নে ধূমায়িত রান্নার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করে আছে। কোয়ার্টার মাস্টার-সার্জেন্ট একটা কাঠের বাটি হাতে নিয়ে চলেছে জনৈক অফিসারের কাছে; সে বসে আছে ছাউনির সামনে একটা কাঠের গুঁড়ির উপর; সে খাবারটা চেখে দেখবে তবে সেটা সৈন্যদের পরিবেশন করা হবে।

আর এক কোম্পানি সৈন্যর ভাগ্য খুব ভাল, কারণ সব কোম্পানির ভাগ্যে ভদ্‌কা জোটে না। মুখে দাগওয়ালা চওড়া-কাঁধ একজন সার্জেন্ট-মেজরকে ঘিরে তারা বসেছে। আর একটা ছোট পিপে কাত করে তার দিকে এগিয়ে-ধরা, ক্যান্টিনের কৌটোগুলোকে সে একে একে ভরে দিচ্ছে। সৈন্যরা ভক্তির সঙ্গে সেই টোটাকে ঠোঁটের কাছে তুলে মুখের মধ্যে ভদ্‌কা

ঢেলে কৌটো খালি করে দিয়ে খুসি মুখে ঠোঁট চাটতে চাটতে আর গ্রেট-কোটের আস্তিনে মুখ মুছতে মুছতে সার্জেন্ট-মেজরের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। সকলেরই চোখেমুখে এত গভীর প্রশান্তি যেন শান্তিপূর্ণ শিবির-জীবন শুরু করবার আগে তারা বাড়িতে বসে এসব করছে; তাদের দেখে মনেই হয় না যে এমন একটা আসন্ন যুদ্ধে তারা শত্রুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে যাতে তাদের অন্তত অর্দ্ধেক সৈন্য সেই রণক্ষেত্রেই পড়ে থাকবে। বেশ কিছুদূর এগিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু এক প্লেটুন গোলন্দাজ সৈন্যের সামনে এসে পৌঁছল; তাদের সামনে একটি উলঙ্গ লোক পড়ে আছে। দুটি সৈন্য তাকে ধরে আছে, আর অন্য দুজন ছোট লাঠি ঘুরিয়ে তার খোলা পিঠে আঘাত করে চলেছে। লোকটি অস্বাভাবিক রকমের চীৎকার করছে। একজন মেজর তাতে কোনরকম কান না দিয়ে পায়চারি করছে, আর বার বার চেঁচিয়ে বলছে:

“একজন সৈন্যের পক্ষে চুরি করা অত্যন্ত লজ্জার কথা; একজন সৈন্যকে হতে হবে সৎ, সম্মানিত ও সাহসী; কিন্তু সে যদি তার সহকর্মীদের জিনিস চুরি করে তাহলে তো তার কোন সম্মানই থাকতে পারে না, সে তো একটা বদমাশ। চালাও! চালাও!”

কাজেই লাঠির হিস্ হিস্ শব্দ আর অসহায় তীব্র চীৎকার চলতেই লাগল।

“চালাও, চালাও!” মেজর বলল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় একটি অফিসার বেদনার্ত মুখে সেখান থেকে এগিয়ে এসে অশ্বারোহী অ্যাড্‌জুটান্টের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

অগ্রবর্তী প্রথম সারিতে পৌঁছে প্রিন্স আরও এগিয়ে চলল। ডান ও বাঁদিকে আমাদের সৈন্যদল ও শত্রু সৈন্যের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব থাকলেও আমাদের যে মধ্যবর্তী সেনাদলের ভিতর থেকে সেদিন সকালেই সন্ধির পতাকা নিয়ে একদল সৈন্য এগিয়ে গিয়েছিল তাদের অবস্থানও শত্রুসৈন্যের অবস্থান এতই কাছাকাছি যে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পারে, কথাও বলতে পারে। তাছাড়া উভয় পক্ষেরই প্রহরি সেনাদল ছাড়াও কিছু কৌতূহলী দর্শক সেখানে জমা হয়েছিল যারা হাসি-ঠাট্টা করতে করতে অপরিচিত বিদেশী সৈন্যদের তাকিয়ে দেখছিল।

যদিও খুব সকাল থেকেই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে যে কেউই প্রহরারত সেনাদলের কাছে যেতে পারবে না, তবু অফিসাররা উৎসুক দর্শকদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। আর প্রহরিসেনাদলও সঙের দলের লোকদের মত ফরাসীদের উপর নজর না রেখে কৌতূহলী দর্শকদেরই দেখছে, এবং কখন তাদের বদলি সেনাদল আসবে তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। ফরাসীদের ভাল করে দেখবার জন্য প্রিন্স আন্‌দ্রু সেখানে থামল।

একজন রুশ বন্দুকধারী জনৈক অফিসারের সঙ্গে প্রহরিসেনাদলের কাছে

গিয়ে একটি ফরাসী গোলন্দাজ সৈনিকের সঙ্গে উত্তেজিতভাবে দ্রুত কথা বলছিল। তাকে দেখিয়ে একজন সৈনিক অপরজনকে বলল, "দেখ! ওদিকে দেখ! ওর বকবকানিটা শোন! খুব ভাল, তাই না? ফরাসীরা ওর সঙ্গে শুধু কথার বেলায়ই তাল রাখতে পারে। এদিকে দেখ সিদরভ!"

"থাম; মন দিয়ে শোন। চমৎকার!" সিদরভ বলল; তাকে ফরাসী ভাষায় খুব পটু বলে মনে করা হয়।

যে সৈনিকটির কথা বলে ওরা হাসছিল সে দলকভ। প্রিন্স আন্‌দ্রু তাকে চিনতে পেরে তার বক্তব্য শুনবার জন্য থামল। তাদের রেজিমেণ্টকে বাঁদিকের সারিতে মোতায়েন করা হয়েছে; সেখান থেকেই সে তার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে এসেছে।

অফিসারটি তার কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারছিল না; তবু যাতে একটি কথাও হারিয়ে না যায় এমনিভাবে সামনে ঝুঁকে অফিসারটি তাকে উস্কে দিয়ে বলল, "আরে, চালাও, চালিয়ে যাও। আরও কথা বল: আরও! ও কি বলছে?"

দলস্কভ ক্যাপ্টেনের কথার জবাব দিল না; ফরাসী গোলন্দাজটির সঙ্গে তখন তার খুব বচসা চলছে! স্বভাবতই তারা যুদ্ধ নিয়েই কথা বলছে! অস্ট্রীয় ও রুশদের মধ্যে গোলমাল করে ফরাসীটি প্রমাণ করতে চাইছে যে রুশরা আত্মসমর্পণ করে উল্‌ম্‌ থেকে পালিয়ে গেছে, আর দলখভ বলছে যে রুশরা আত্মসমর্পণ করে নি, উপরন্তু ফরাসীদের হারিয়ে দিয়েছে।

দলখভ বলল, "তোমাদের এখান থেকেও তাড়াবার হুকুম আমরা পেয়েছি, আর তোমাদের তাড়িয়ে দেবও।"

ফরাসী গোলন্দাজটি বলল, "তবে খেয়াল রেখো, কসাকসহ তোমরা সকলে না বন্দী হও!"

ফরাসী শ্রোতা ও দর্শকরা হেসে উঠল।

দলস্কভ বলল, "সুভরভ্‌-এর নেতৃত্বে যেমন করেছিলাম, তেমনি তোমাদের নাচিয়ে ছাড়ব।"

জনৈক ফরাসী শুধাল, "ও আবার কি সুর ধরেছে?"

সে হয়তো আগেকার কোন যুদ্ধের কথা বলছে তাই মনে করে আর একজন বলল, "সে তো প্রাচীন ইতিহাস। সম্রাট অস্ট্রীয়দের যেমন শিক্ষা দিয়েছেন তেমনি তোমাদের সুভারাকেও শিক্ষা দেবেন।"

"বোনাপার্ত………" দলস্কভ কথাটা বলতেই ফরাসী লোকটি তাকে বাধা দিল।

"বোনাপার্ত নয়। তিনি সম্রাট! পবিত্র নাম……।" সে রেগে বলল।

"শয়তান তোমার সম্রাটের ছাল ছাড়িয়ে নিক।"

সৈনিকদের কড়া রুশ ভাষায় একটা খিস্তি করে দলস্কভ বন্দুক কাঁধে

নিয়ে সরে গেল।

ক্যাপ্টেনকে বলল, "আইভান লুকিচ, চলে এস।"

প্রহরি সৈন্যরা বলল, "ফরাসী ভাষা এইভাবেই বলতে হয়। সিদরভ, এবার তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ!"

ফরাসীদের দিকে ঘুরে সিদরভ একবার চোখ টিপল, তারপর খুব তাড়াতাড়ি কতকগুলি অর্থহীন হ-য-ব-র-ল বিশেষ সুর করে আউড়ে যেতে লাগল: "কারি, মালা, তাফা, সাফি, মুতের, কাস্কা।"

"হো! হো! হো! হা! হা! হা! হা! ওঃ! ওঃ!" সৈন্যরা সকলে মিলে এমন অট্টহাসি হেসে উঠল যে তার ছোঁয়াচ ফরাসীদের মনেও ঢেউ তুলল; তারা আর কি করে, গাদা বন্দুকের বারুদ বের করে নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল, এবং অতি দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করল।

বন্দুকগুলি কিন্তু গোলা বারুদ-ভরাই রয়ে গেল; প্রাচীরের ফোঁকড় ও পরিখাগুলি তাকিয়ে রইল তেমনি ভয়ংকর চোখে; আর কামানগুলি আগের মতই পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অধ্যায়—১৬

ঘোড়ার পিঠে চেপে সারিবদ্ধ সেনাদলের ডান দিক থেকে বাঁদিক পর্যন্ত আগাগোড়া চক্কর দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু সোজা এগিয়ে গেল কামান-মঞ্চের দিকে; স্টাফ-অফিসার বলে দিয়েছিল, সেখান থেকেই গোটা রণক্ষেত্রটা দৃষ্টিগোচর হবে। সেখানে ঘোড়া থেকে নেমে চারটি কামানের একেবারে সর্বশেষ কামানটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কামানগুলির সামনে গোলন্দাজ বাহিনীর একজন শান্ত্রী এদিক-ওদিক পায়চারি করছিল; অফিসারকে দেখে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, কিন্তু একটা ইঙ্গিতেই আবার সেই একঘেয়ে পদচারণা শুরু করল। কামানগুলির পিছনে ছিল কয়েকটা রসদ-বাহী গাড়ি, আর তারও পিছনে সৈনিকদের বহ্নুৎসব। তার বাঁদিকে কিছুটা দূরেই বাঁশের কঞ্চি ও বাখারি দিয়ে সদ্য তৈরি একটা চালাঘর; সেখান থেকে অফিসারদের সাগ্রহ আলোচনার শব্দ ভেসে আসছে।

কামান-মঞ্চটার উপর থেকে যে গোটা রুশ বাহিনীর অবস্থিতি এবং শত্রু পক্ষের অবস্থানেরও অনেকটাই চোখে পড়ে সে কথা সত্য। ঠিক সম্মুখেই বিপরীৎ দিককার পাহাড়ের মাথায় শোন্‌গ্রেবার্ন গ্রামটা দেখা যাচ্ছে, এবং তার বাঁ ও ডান দিকে তিনটি স্থানে ক্যাম্প-ফায়ারের ধোঁয়ার মধ্যে ফরাসী বাহিনীকে দেখা যাচ্ছে। ঐ গাঁয়ের বাঁদিকে ধোঁয়ার মধ্যে কামান-মঞ্চের মত একটা কিছু আছে বলেই মনে হয়, কিন্তু এতদূর থেকে খালি চোখে সেটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। আমাদের দক্ষিণ বাহিনী একটা চড়াইয়ের উপর ঘাঁটি গেড়েছে; সেখান থেকে ফরাসী বাহিনীকে আক্রমণ করা সহজ।

সেখানে জমায়েত হয়েছে আমাদের পদাতিক বাহিনী এবং একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে অশ্বারোহী দল। ঠিক মাঝখানে রয়েছে তুশিন-এর কামান-মঞ্চ; সেখানে দাঁড়িয়েই প্রিন্স আন্‌দ্রু সব কিছু পর্যবেক্ষণ করছে; যে ছোট নদীটা শোন্‌গ্রেবার্ন থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাতে নামা-ওঠা করার সবচাইতে সুবিধাজনক স্থানও সেটাই। বাঁদিকে আমাদের সেনাদলের খুব কাছেই একটা জঙ্গল; সৈন্যরা সেখানে গাছ কাটছে; তাদের জ্বালানো আগুনের ধোঁয়াও চোখে পড়ছে। ফরাসী সেনা-ব্যূহ আমাদের চাইতে অনেক বেশী প্রশস্ত; পরিষ্কার বোঝা যায় যে দুদিক থেকেই তারা সহজেই আমাদের কাবু করতে পারে। আমাদের পিছনেই একটা খাড়া উৎরাই; ফলে আমাদের গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে পিছু হটাও খুব শক্ত। একটা কামানের উপর হেলান দিয়ে নোট-বই বের করে প্রিন্স আন্‌দ্রু সেনা-অবস্থানের একটা রেখাচিত্র এঁকে ফেলল। ব্যাগ্রেশনকে বোঝাবার জন্য দুটো বিষয়ে কিছু মন্তব্যও লিখে রাখল। সে ভেবে নিয়েছে, প্রথমে গোলন্দাজ বাহিনীকে মাঝখানে একত্র করবে, তারপর অশ্বারোহী বাহিনীকে উৎরাইয়ের অপর পারে সরিয়ে নেবে। প্রিন্স আন্‌দ্রু সর্বদা প্রধান সেনাপতির কাছাকাছিই থাকে; কাজেই নিজের অজান্তেই আসন্ন যুদ্ধের একটা মোটামুটি খসড়া সে মনে মনে ছকে ফেলল আর সেই চিন্তায়ই মশগুল হয়ে পড়ল। কামানের পাশে দাঁড়িয়ে অফিসারদের সব কথাই সে শুনতে পাচ্ছিল, কিন্তু সাধারণতই যা হয়ে থাকে তাদের সেসব কথার অর্থ সে কিছুই ধরতে পারছিল না। হঠাৎ চালাঘর থেকে ভেসে-আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনে সে সজাগ হয়ে উঠল; সে কণ্ঠস্বর এতই আন্তরিকতায় পূর্ণ যে সে ভাল করে কান পাতল।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল সেই মধুর কণ্ঠস্বর তার পরিচিত। কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "না বন্ধু, আমি বলতে চাই মৃত্যুর পরে কি আছে তা জানা যদি সম্ভব হত তাহলে আমরা কেউই মৃত্যুকে ভয় করতাম না। এটাই ঠিক কথা বন্ধু।"

আর একটি অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সী কণ্ঠস্বর তাকে বাধা দিল:

"ভয় পাও আর নাই পাও, তার হাত থেকে কিন্তু পরিত্রাণ পাবে না।"

তাদের দুজনকেই বাধা দিয়ে একটি তৃতীয় পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর বলল, "যাই বল না কেন, ভয় কিন্তু আছেই! তোমরা খুব চালাক ছেলে। অবশ্য তোমরা গোলন্দাজ সৈন্যরা খুব বুদ্ধিমান, কারণ তোমরা তো ভদ্‌কা আর খাবার দাবার সবই সঙ্গে নিতে পার।"

পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠের অধিকারী পদাতিক বাহিনীর অফিসারটি হেসে উঠল।

পরিচিত কণ্ঠের প্রথম বক্তা বলল, "হ্যাঁ, মানুষ ভয় পায়। আসলে কি জান, অজানাকেই লোকে ভয় করে। আমরা যতই বলি না কেন যে

আত্মা আকাশে চলে যায়………আমরা তো জানি, যে আকাশ বলে কিছু নেই, আছে শুধু হাওয়া।”

পৌরুষ কণ্ঠটি আবার গোলন্দাজ অফিসারকে বাধা দিল।

“বেশ তো, তোমার ঐ কবরেজী-ভদ্‌কা আমাদের খানিকটা খাওয়াও না তুশিন।”

প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, “আরে, এ তো সেই ক্যাপ্টেন যে ভাণ্ডারীর দোকানে পায়ে বুট ছাড়াই দাঁড়িয়ে ছিল।” তার মধুর দার্শনিক কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে তার খুব ভাল লাগল।

তুশিন বলল, “একটু কবরেজী-ভদ্‌কা? নিশ্চয়!………কিন্তু তবু, পরজন্মের কথা………”

তার কথা শেষ হল না। ঠিক সেইসময় বাতাসে একটা শিস শোনা গেল; কাছে—আরও কাছে, আরও দ্রুতগতিতে ও উচ্চ শব্দে একটা কামানের গোলা অমানুষিক শক্তিতে ছুটে এসে চালাঘরটার কাছে ফাটল। অনেকটা মাটি ছড়িয়ে পড়ল। সেই প্রচণ্ড আঘাতে মাটি যেন আর্তনাদ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে মুখের কোণে ছোট পাইপটা নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত মুখখানাকে বিবর্ণ করে তুশিন চালাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। চটপটে পদাতিক অফিসারটিও কোটের বোতাম আটকাতে আটকাতে তাকে অনুসরণ করল।

অধ্যায়—১৭

পুনরায় ঘোড়ায় চেপে প্রিন্স আন্‌দ্রু কামানের পাশে থেকেই দূরের কামানের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। সম্মুখের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দ্রুত চোখ বুলিয়ে শুধু দেখতে পেল, যে ফরাসী সৈনিকরা এতক্ষণ নিশ্চল হয়ে ছিল এবার তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে; তাদের বাঁদিকে সত্যি সত্যি একটা কামান-মঞ্চ রয়েছে। তার উপর থেকে কামানের ধোঁয়া এখনও মিলিয়ে যায় নি। প্রথম গোলার ধোঁয়া মিলিয়ে না যেতেই আর একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল তার গর্জন। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে! প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের খোঁজে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল গ্রুন্থ-এর দিকে। তার পিছন থেকে মুহুর্মুহু কামানের শব্দ ভেসে আসছে। স্পষ্টতই আমাদের কামানগুলিও জবাব দিতে শুরু করেছে। উৎরাইয়ের নীচে যেখানে সৈনিকদের বৈঠক বসেছিল সেখান থেকেও বন্দুকের শব্দ আসছে।

বোনাপার্তের কড়া চিঠি নিয়ে লেমারুয় ঘোড়া ছুটিয়ে সব এসে হাজির হয়েছে, আর পর্যুদস্ত মুরাৎ স্বীয় ত্রুটির প্রায়শ্চিত্ত করতে সঙ্গে সঙ্গে তার বাহিনীকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ঠিক—মাঝখানে আক্রমণ করে রুশ বাহিনীকে

দুদিক থেকে গুটিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে ; তবে মনের আশা সন্ধ্যায় সম্রাট এসে পৌঁছবার আগেই তার সম্মুখস্থ তুচ্ছ বাহিনীটিকে সে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে।

"শুরু হয়ে গেছে। এই তো শুরু!" প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল ; তার বুকের মধ্যে রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। "কিন্তু কখন, কিভাবে আমার তুলোঁ নিজেকে উপস্থিত করবে ?"

সৈন্যদলগুলির ভিতর দিয়ে চলতে চলতে সে দেখল, যেসব সৈন্যরা পনেরো মিনিট আগেই পরিজ ও ভদ্‌কা খাচ্ছিল তারাই এখন দ্রুতগতিতে দলে দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে, বন্দুক তুলে নিচ্ছে ; যে আগ্রহ জেগেছে তার নিজের বুকের মধ্যে তারই প্রকাশ চোখে পড়ছে তাদের প্রত্যেকের মুখে। প্রতিটি সৈনিক, প্রতিটি অফিসারের মুখ যেন একই কথা বলছে! "শুরু হয়ে গেছে! এই তো যুদ্ধ—ভয়ংকর হলেও উপভোগ্য!"

নদীর তীরে পৌঁছবার আগেই হেমন্ত সন্ধ্যার ম্লান আলোয় সে দেখতে পেল, কয়েকজন অশ্বারোহী তার দিকেই এগিয়ে আসছে। সকলের আগে কসাক জোব্বা গায়ে ভেড়ার চামড়ার টুপি মাথায় সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসছে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন। তার এগিয়ে আসার জন্যই প্রিন্স আন্‌দ্রু থেমে গেল ; প্রিন্স ব্যাগ্রেশন ঘোড়ার রাশ টেনে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে চিনতে পেরে মাথা নাড়ল। তার দৃষ্টি তখন সামনের দিকে প্রসারিত ; প্রিন্স আন্‌দ্রু যা কিছু দেখতে পেয়েছে সবই তাকে বলল।

"শুরু হয়েছে! এই তো যুদ্ধ!" —প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের আধ-বোঁজা ঘুম-ঘুম চোখে ও কঠিন বাদামী মুখেও এই একই অনুভূতির আভাষ। প্রিন্স আন্‌দ্রু সাগ্রহ কৌতূহলের সঙ্গে তার অবিচলিত মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল ; তার মনের বাসনা—এই মুহূর্তে এই মানুষটি কি ভাবছে। কি অনুভব করছে তা যদি সে বলতে পারত। "এই অবিচলিত মুখের আড়ালে কোন কথা কি লুকনো আছে ?" প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেকেই প্রশ্ন করল। তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে মাথা নেড়ে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন বলল, "খুব ভাল।" এমন সুরে সে কথাটা বলল যেন যা কিছু ঘটেছে, যা কিছু সে শুনেছে সে সবই সে আগে থেকেই জানত। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে আসার জন্য দম ফুরিয়ে যাওয়ায় প্রিন্স আন্‌দ্রু কথা বলছে তাড়াতাড়ি। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে খুবই ধীরে ধীরে কথা বলছে ; যেন বোঝাতে চাইছে যে তাড়াহুড়া করার কিছু নেই। যাই হোক, সে তুশিন-এর কামান শ্রেণীর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। প্রিন্স আন্‌দ্রু সেই দলকেই অনুসরণ করল। প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের পিছনে চলেছে তার ব্যক্তিগত অ্যাড্‌জুটান্ট, ঝেবুকভ, একজন আর্দালি-অফিসার, কর্তব্যরত স্টাফ-অফিসার, ও জনৈক অসামরিক কর্মচারী ; সে একজন হিসাবরক্ষক, কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে যুদ্ধে আসার অনুমতি সংগ্রহ

করেছে।

হিসাবরক্ষককে দেখিয়ে ঝেরকভ বল্‌কন্‌স্কিকে বলল, "ইনি যুদ্ধ দেখতে চান ; অথচ এর মধ্যেই তার পাকস্থলীতে একটা ব্যথা বোধ করছেন।"

"আহা, যেতে দিন!" চতুর হাসি হেসে হিসাবরক্ষক বলল ; ইচ্ছা করেই সে যেন একটা বোকা-বোকা ভাব দেখাল।

স্টাফ-অফিসার বলল, "সবই বিচিত্র মঁসিয় প্রিন্স।"

ততক্ষণে সকলেই তুশিনের কামানশ্রেণীর কাছে পৌঁছে গেছে ; তাদের ঠিক সামনেই একটা গোলা পড়ে ফাটল।

সরল হাসির সঙ্গে হিসাবরক্ষক শুধাল, "ওটা কি পড়ল?"

"একখানি ফরাসী পিঠে," ঝেরকভ জবাব দিল।

হিসাবরক্ষক বলল, "তাহলে এই দিয়েই ওরা আঘাত হানে? কী ভীষণ।"

সে যেন খুসিতে ডগমগ হয়ে উঠেছে। তার কথা শেষ হতে না হতেই আর একটা প্রচণ্ড শিস্‌ শোনা গেল, আর সেটাও হঠাৎই একটা নরম কিছুর মধ্যে সশব্দে ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের ডাইনে ও হিসাবরক্ষকের পিছনে জনৈক অশ্বারোহী কসাক ঘোড়াসমেত মাটিতে ছিটকে পড়ল। হিসাবরক্ষক কসাকটির সামনে থেমে গিয়ে তাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল, লোকটি মারা গেছে, কিন্তু তার ঘোড়াটা তখনও ছটফট করছে।

প্রিন্স ব্যাগ্রেশন চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকাল ; গোলমালের কারণটা বুঝতে পেরে নির্বিকারভাবে চোখ ফিরিয়ে নিল ; যেন বলতে চাইল ; "এসব তুচ্ছ জিনিসের প্রতি নজর দিয়ে কি হবে?" কুশলী সওয়ারের মত অতি-সহজে ঘোড়ার রাশ টেনে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে সে নিজের তরবারি কোষমুক্ত করল। তরবারিখানা সেকেলে ধরনের, আজকাল কেউ বড় একটা ব্যবহার করে না। প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে পড়ে গেল, সুভরভ্‌ই ইতালিতে ব্যাগ্রেশনকে এই তরবারি দিয়েছিল ; এই মুহূর্তে কথাটা তার বড়ই ভাল লাগল। ততক্ষণে তারা কামান-মঞ্চের কাছে পৌঁছে গেছে।

বারুদের গাড়ির পাশে দাঁড়ানো একটি গোলন্দাজ সৈনিককে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন শুধাল, "এটা কার কোম্পানি?"

মুখে বলল "এটা কার কোম্পানি?" কিন্তু আসলে সে জানতে চাইল, "তুমি কি এখানে ভয় পেয়েছ?" গোলন্দাজটি তার কথা বুঝতে পারল। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখভর্তি দাগওয়ালা লাল-চুল গোলন্দাজটি খুসির সুরে বলল, "ক্যাপ্টেন তুশিনের ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

কি যেন ভাবতে ভাবতেই ব্যাগ্রেশন বিড় বিড় করে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ;" তারপরই কামানশ্রেণীর পাশ দিয়ে একেবারে শেষ কামানটির দিকে এগিয়ে গেল।

কাছাকাছি যেতেই একটা গোলার শব্দ তাদের সকলেরই কানে তালা লাগিয়ে দিল; ধোঁয়ার কুণ্ডলী হঠাৎ কামানটাকে ঢেকে ফেললেও তার ভিতর দিয়েই দেখা গেল, একনম্বর গোলন্দাজটি কামানটাকে আঁকড়ে ধরে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে, আর দুনম্বর কাঁপা হাতে কামানের মুখে বারুদ ভরছে। চওড়া-কাঁধ, ছোটখাট ক্যাপ্টেন তুশিন কামানবাহী শকটের পিছন থেকে লাফিয়ে সামনে এসে সেনাপতির উপস্থিতি খেয়াল না করেই ছোট হাতটা চোখের উপর তুলে সামনে তাকাল।

তার শরীর দুর্বল; গলার স্বরও দুর্বল; তবু যথাসাধ্য কর্তৃত্বের ভঙ্গীতে সে হাঁক দিয়ে বলল, "আরও দুটো ধাপ তুলে দাও, তাহলেই ঠিক হবে। দুনম্বর! মেদ্‌ভেদেভ্‌-এ কামান দাগো।"

ব্যাগ্রেশন তুশিনকে ডাকল; তুশিনও এমন সলজ্জ অদ্ভুত ভঙ্গীতে তিনটে আঙুল টুপিতে ছোঁয়াল যে সামরিক অভিবাদনের বদলে সেটাকে পুরোহিতের আশীর্বাদ বলেই মনে হল। যদিও উপত্যকা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করাই ছিল তুশিনের কামানগুলির উদ্দেশ্য, আসলে সে কিন্তু আগুনে বোমা ছুঁড়ছিল ঠিক সামনের দিককার শোন্‌গ্রেবার্ন গ্রামটিকে লক্ষ্য করে; সেই গ্রামের সামনে দিয়েই একটা মস্ত বড় ফরাসী বাহিনী এগিয়ে আসছে।

কোথায় ও কাকে লক্ষ্য করে কামান দাগা হবে সে হুকুম কেউ তুশিনকে দেয় নি; সার্জেন্ট-মেজর জাখারচেংকোকে সে শ্রদ্ধার চোখে দেখে; তার সঙ্গে পরামর্শ করেই তুশিন স্থির করেছে গ্রামটাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়াটাই ভাল হবে। অফিসারের বিবরণ শুনে ব্যাগ্রেশন বলল, "খুব ভাল"; তারপর সম্মুখে প্রসারিত রণক্ষেত্রটাকে ভাল করে দেখতে লাগল। আমাদের ডানদিকে ফরাসীরা বেশ এগিয়ে এসেছে। যে উঁচু জায়গাটাতে কিয়েভ সেনাদলকে মোতায়েন করা হয়েছে তার নীচে যে খাদের ভিতর দিয়ে ছোট নদীটা বয়ে চলেছে সেখান থেকে বন্দুকের ফট্ ফট্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে এবং ডানদিকে বেশ কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে, একটা ফরাসী বাহিনী আমাদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে। বাঁ দিকে একটা জঙ্গলে দিগন্ত ঢাকা পড়েছে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন হুকুম দিল, ডান দিকের শক্তি বৃদ্ধি করতে মধ্য ভাগ থেকে দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য সেখানে পাঠানো হোক। দলের অফিসারটি সাহস করে প্রিন্সকে বলল, দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য পাঠিয়ে দিলে এখানকার কামানগুলি অরক্ষিত হয়ে পড়বে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন অফিসারটির দিকে মুখ ঘুরিয়ে অর্থহীন চোখ মেলে নিঃশব্দে তার দিকে তাকাল। প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল যে অফিসারটি ঠিক কথাই বলেছে; সত্যি তার কথার কোন জবাব নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে নীচের খাদে মোতায়েন সেনাদলের অধিনায়কের চিঠি নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এল একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট; জানাল, একটা মস্ত বড় ফরাসী বাহিনী তাদের লক্ষ্য করে নেমে আসছে, তাদের সেনাদলে বিশৃংখলা দেখা

দিয়েছে, তারা কিন্তু গোলন্দাজদের দিকে সরে যাচ্ছে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল। ডান দিকে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে একজন অ্যাড্‌জুটাণ্টকে অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে পাঠিয়ে হুকুম জানাল, তারা যেন ফরাসীদের আক্রমণ করে। কিন্তু আধ ঘণ্টা পরে সেই অ্যাড্‌জুটাণ্টটি ফিরে এসে খবর দিল, শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে অকারণে সৈন্যরা মারা পড়ছিল বলে অশ্বারোহী বাহিনীর অধিনায়ক ইতিমধ্যেই খাদ পেরিয়ে সরে গেছে এবং গুলি চালাবার জন্য কিছু সৈন্যকে জঙ্গলের ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছে।

"খুব ভাল," ব্যাগ্রেশন বলল।

সেখান থেকে চলে আসবার সময় বাঁদিক থেকেও গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল; নিজে সেখানে যেতে না পারায় প্রিন্স ব্যাগ্রেশন ঝের্কভকে পাঠিয়ে হুকুম দিল, সেখানকার অধিনায়ক যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাদের পিছন দিকে সরে যায়, কারণ ব্যূহের দক্ষিণ অংশও আর বেশী সময় শত্রুপক্ষের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। তুশিন ও তার কামানরক্ষী সেনাদলের কথা তারা বেমালুম ভুলে গেল। সব কিছু দেখেশুনে প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল; সে বুঝল, কোন কিছুই সেনাপতির ইচ্ছানুসারে ঘটছে না, ঘটছে ঘটনাচক্রে; অথচ ব্যাগ্রেশন এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তার উপস্থিতি অত্যন্ত মূল্যবান। অফিসাররা বিচলিত হয়ে তার সামনে এসে শান্ত হয়ে যাচ্ছে; সৈনিক ও অফিসাররা তাকে সানন্দে অভিনন্দিত করছে, তার উপস্থিতিতে উৎফুল্ল হয়ে উঠছে, তার সামনে নিজেদের সাহসের পরিচয় দিতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছে।

অধ্যায়—১৮

প্রিন্স ব্যাগ্রেশন আমাদের দক্ষিণ ব্যূহের সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছবার পর এবার নীচে নামতে শুরু করল। সেখান থেকে বন্দুকের আওয়াজ আসছে, কিন্তু ধোঁয়ার জন্য কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তারা খাদের দিকে যত এগোচ্ছে ততই সবকিছু ধোঁয়ায় বেশী করে ঢেকে যাচ্ছে। আর ততই তারা বেশী করে বুঝতে পারছে যে সত্যিকারের যুদ্ধক্ষেত্র আরও কাছে এগিয়ে আসছে। এবার আহত সৈনিকদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, একজনের মাথা বেয়ে রক্ত পড়ছে; মাথায় টুপি নেই; অন্য দুটি সৈনিক তাকে জড়িয়ে ধরে টেনে নিয়ে চলেছে। তার গলার মধ্যে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছে, রক্ত-বমি হচ্ছে। তার গলায় অথবা মুখে গুলি লেগেছে। আর একজন নিজেই হেঁটে যাচ্ছে; হাতে বন্দুক নেই, একটা হাত ঝুলিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলেছে; ঐ হাতটাতেই গুলি লেগেছে; যেন খোলা বোতলের ভিতর থেকে রক্ত বেরিয়ে তার গ্রেটকোট বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এইমাত্র সে আহত হয়েছে; যন্ত্রণা অপেক্ষা ভয়ই তার মুখে বেশী করে ফুটে

উঠছে। একটা রাস্তা পার হয়ে খাড়া উৎরাই বেয়ে নামতে নামতে তারা দেখল, কয়েকজন মাটিতে শুয়ে আছে; একদল সৈনিকের সঙ্গেও তাদের দেখা হল; সৈনিকদের কেউ কেউ অক্ষত দেহেই আছে। অনেক কষ্টে শ্বাস টানতে টানতে তারা পাহাড় বেয়ে উঠছে; সেনাপতির উপস্থিতি সত্ত্বেও তারা জোর গলায় কথা বলছে, নানা রকম অঙ্গভঙ্গী করছে। তাদের সামনে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে সারি সারি ধূসর জোব্বা চোখে পড়ল। একজন অফিসার ব্যাগ্রেশনকে দেখতে পেয়ে পশ্চাদপসরণকারী সৈনিকদের ডাকতে ডাকতে তাদের দিকে ছুটে গিয়ে তাদের ফিরে দাঁড়াবার হুকুম দিল। ব্যাগ্রেসন ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেল; এখানে-ওখানে গোলাগুলির শব্দে সৈন্যদের চেঁচামেচি ও হুকুমের শব্দ চাপা পড়ে গেল। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ। ধোঁয়া লেগে সৈনিকদের মুখগুলো কালো হয়ে গেছে। কেউ কামানে বারুদ ভরছে, কেউ শিক দিয়ে বারুদ ঠাসছে, কেউ বা গোলা ছুঁড়ছে, যদিও কাকে লক্ষ্য করে কামান দাগছে ধোঁয়ার জন্য সেটাই দেখতে পাচ্ছে না। মাঝে মাঝেই একটা মধুর গুঞ্জন ও বুলেটের শন্‌-শন্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। সৈন্যদের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "এটা কি? এটা তো আক্রমণ হতে পারে না, কারণ সৈনিকরা নড়ছে না; এটা কোন বাগানও হতে পারে না, কারণ সৈন্যদের সেভাবে জমায়েৎ করা হয় নি।"

রেজিমেণ্টের অধিনায়ক একহারা চেহারার দুর্বলদর্শন এক বৃদ্ধ; মুখে স্মিত হাসি, চোখের পাতা নেমে এসে চোখের প্রায় অর্ধেক ঢেকেফেলেছে। ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে গিয়ে সে ব্যাগ্রেশনকে স্বাগত জানাল—ঠিক যেন কোন গৃহস্বামী স্বাগত জানাল তার সম্মানিত অতিথিকে। সে জানাল, ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনী তার রেজিমেণ্টকে আক্রমণ করেছিল; সে আক্রমণ এখন প্রতিহত হয়েছে, কিন্তু তার অর্ধেকেরও বেশী সৈন্য যুদ্ধে মারা গেছে। সে মুখে বলল বটে আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে, কিন্তু আসলে এই আধ ঘণ্টা সময়ে তার সৈন্যদের কি হাল হয়েছে তা সে নিজেই জানে না; আর আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে না কি তার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়েছে সে কথাও সে নিশ্চিত করে বলতে পারে না। সে শুধু এইটুকুই জানে যে, যুদ্ধের শুরুতে তার রেজিমেণ্টের মাথায় গোলাগুলি সমানে উড়তে আরম্ভ করেছিল, আঘাতের পর আঘাত হানছিল; তারপরেই একজন চেঁচিয়ে বলল 'অশ্বারোহী বাহিনী!' আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সৈন্যরাও কামান দাগতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা এখনও গোলাগুলি ছুঁড়ছে, কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনীকে লক্ষ্য করে নয়, কারণ তারা সরে গেছে; এখন গুলির লক্ষ্য ফরাসী পদাতিক বাহিনী যারা খাদে নেমে আমাদের সৈন্যদের দিকে গুলি ছুঁড়ছে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন এমনভাবে মাথাটা নীচু করলে যেন ঠিক এটাই ছিল তার বাসনা ও প্রত্যাশা। অ্যাড্‌জুটাণ্টের দিকে ফিরে সে হুকুম দিল, ষষ্ঠ পদাতিক বাহিনীকে (Chasseur) এখানে

নামিয়ে আনা হোক। এই মুহূর্তে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের মুখের ভাবের পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল। গ্রীষ্মের দিনে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে শেষ বারের মত দৌড়বার সময় কোন লোকের মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে সেই সংহত আনন্দিত সিদ্ধান্তের ভাবটি ফুটে উঠেছে তার মুখে। তার মুখে তখন না আছে সেই ঘুম-ঘুম ভাব, না আছে গভীর চিন্তার প্রকাশ। যদিও তার পদক্ষেপ এখনও ধীর ও মাপা, তবু কোন কিছুর উপর ভর না রেখেই বাজপাখির মত স্থির দৃষ্টি মেলে সে সাগ্রহে এবং ঘৃণার সঙ্গে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

রেজিমেণ্টের অধিনায়ক প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের দিকে ঘুরে তাকে ফিরে যেতে অনুরোধ করল, কারণ জায়গাটা খুবই বিপজ্জনক। সে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই ইয়োর এক্সেলেন্সি, দয়া করে এখানে থাকবেন না!" চারদিক থেকে ছুটে-আসা বুলেটের হিস্‌-হিস্‌ শন্‌-শন্‌ শব্দের প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করে বলল, "ঐ দেখুন!" কোন ভদ্রলোক তার কুড়ুলটা হাতে নিলে ছুতোর যে অনুনয় ও তিরস্কারের সুরে বলে, "আমরা এতে অভ্যস্ত মশায়, কিন্তু আপনার হাতে ফোস্কা পড়বে" ঠিক তেমনই সুরে সে কথাগুলি বলল। এমনভাবে বলল যেন বুলেটে তার মৃত্যু হতে পারে না; তার আধ-বোঁজা চোখ দুটি বুঝি বা তার কথাগুলিকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। স্টাফ-অফিসারও কর্ণেলের সঙ্গে সুর মেলাল, কিন্তু ব্যাগ্রেশন কোন জবাব দিল না; শুধু গোলাবর্ষণ বন্ধ করার হুকুম দিয়ে সৈন্যদের এমনভাবে নতুন করে সাজাতে বলল যাতে নতুন দুটি ব্যাটেলিয়নকে জায়গা করে দেওয়া যায়। কথা বলতে বলতেই বাতাসের বেগে ধোঁয়ার পর্দাটা ডান থেকে বাঁয়ে সরে যেতে লাগল, যেন কোন অদৃশ্য হাত পর্দাটাকে সরিয়ে দিল, আর বিপরীত দিককার পাহাড়ের উপর ফরাসীদের গতিবিধি চোখের সামনে দৃশ্যমান হয়ে উঠল। সৈনিকদের লোমের টুপিগুলি দেখা যাচ্ছে, অফিসার ও সৈনিকদের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছে, দণ্ডের মাথায় পতাকাটিকেও উড়তে দেখা যাচ্ছে।

ব্যাগ্রেশনের দলের একজন বলে উঠল, "ওদের মার্চটা চমৎকার।"

সেনাদলের মাথার দিকটা ইতিমধ্যেই খাদের মধ্যে নেমে গেছে। খাদের এপাশেই সংঘর্ষ ঘটত ····

আমাদের যুদ্ধরত রেজিমেণ্টের অবশিষ্ট সৈন্যরা তাড়াহুড়ি নতুন করে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে ডানদিকে এগিয়ে গেল; পিছন থেকে শৃঙ্খলার সঙ্গে এগিয়ে এল ষষ্ঠ পদাতিক বাহিনী। বাঁদিক থেকে ব্যাগ্রেশনের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল সেই কোম্পানি-কম্যাণ্ডারটি যে চালাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। সেনাপতির পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজেকে যতদূর সম্ভব করিৎকর্মা লোক হিসাবে প্রমাণিত করাই এই মুহূর্তে তার একমাত্র চিন্তা।

নবাগত ব্যাটেলিয়নের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন বলল, "বহুৎ

আচ্ছা, ছেলেরা !”

সৈনিকদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠল, “সাধ্যমত কাজ করতে পেরে আমরাও খুসি ইয়োর এক্স-লেন-সি !” একটি বিমর্ষ সৈনিক মার্চ করতে করতেই ব্যাগ্রেশনের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, “আমরাও সেটা জানি !” অপর একজন চোখ না ফিরিয়েই মুখটা হাঁ করে জয়ধ্বনি দিয়ে এগিয়ে গেল।

থেমে গিয়ে কাঁধের গাঠরি নামাবার হুকুম দেওয়া হল।

সেনাদলকে ভাল করে দেখে নিয়ে ব্যাগ্রেশন ঘোড়া থেকে নামল। হাতের রাশটা একজন কসাকের হাতে দিয়ে ফেল্ট কোটটা খুলে সেটাও তার হাতে দিল, তারপর পা দুটো টান করে টুপিটা ঠিকমত মাথায় বসিয়ে নিল। অফিসারবৃন্দ পরিচালিত ফরাসী বাহিনীর মাথার দিকটা পাহাড়ের নীচ থেকে বেরিয়ে এল।

মুহূর্তের জন্য প্রথম সারির দিকে মুখ ফিরিয়ে ব্যাগ্রেশন বলল, “আগে বাড় ! ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন !” তারপর দুই হাত ঈষৎ দোলাতে দোলাতে অশ্বারোহীর অদ্ভুত ভঙ্গীতে সে অসমান মাঠের উপর দিয়ে এগিয়ে চলল। প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল, একটি অদৃশ্য শক্তি তাকে সামনের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ; সে মনে মনে খুব খুসি হল।

ফরাসীরা ইতিমধ্যেই যেন এগিয়ে এসেছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ব্যাগ্রেশনের পাশে পাশেই হাঁটছে ; ফরাসী সৈন্যদের চামড়ার কোমরবন্ধ, তাদের লাল স্কন্ধত্রাণ, এমন কি তাদের মুখগুলো পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন আর কোন রকম হুকুম না দিয়ে সৈন্যদের আগে আগে নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে। হঠাৎ ফরাসীদের একটার পর একটা গুলি এসে পড়তে লাগল ; চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে গেল ; বন্দুকের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। আমাদের কয়েকজন মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু প্রথম গুলির শব্দ শোনামাত্রই ব্যাগ্রেশন চারদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল “হুর্‌রা !”

সৈনিকদের ভিতর থেকেও উঠল তার দীর্ঘায়ত প্রতিধ্বনি “হুর্‌রা—আ—আ !” ব্যাগ্রেশনকে পার হয়ে তারা মহা উৎসাহে দলে দলে বিশৃঙ্খল শত্রু-বাহিনীর দিকে ছুটে চলল।

অধ্যায়—১৯

ষষ্ঠ পদাতিক বাহিনীর আক্রমণের ফলে আমাদের ব্যূহের দক্ষিণ প্রান্তবর্তী সৈন্যরা পশ্চাদপসরণের সুযোগ পেল। মাঝখানে তুশিনের যে গোলন্দাজ বাহিনী শোন্ গ্রেবার্ণ গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল তারা ফরাসীদের অগ্রগতিকে বিলম্বিত করে দিল। বাতাসের বেগে আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ছে দেখে ফরাসী সৈন্যরা আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আর তার ফলে আমাদের সৈন্যরা পশ্চাদপসরণের সময় পেয়ে গেল।

কেন্দ্রস্থ সৈন্যরা অতি দ্রুত খাদের অপর পারে সরে গেল, কিন্তু একদল অন্য দলের সঙ্গে মিশে গেল না। কিন্তু আমাদের বাঁ দিকে আজভ্‌ ও পদলস্ক পদাতিক বাহিনী এবং পাভ্‌লোগ্রাদ অশ্বারোহী বাহিনী লানেস-এর অধীনস্থ বিরাট ফরাসী বাহিনীর যুগপৎ আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়ল। অবিলম্বে পশ্চাদপসরণের হুকুম দিয়ে ব্যাগ্রেশন সেখানে পাঠিয়ে দিল ঝেরকভকে।

টুপি থেকে হাত না সরিয়ে ঝেরকভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু ব্যাগ্রেশনের কাছ থেকে সরে যেতে না যেতেই তার সাহসে ভাটা পড়ল। ভয় তাকে পেয়ে বসল; বিপদ যেখানে ঘন হয়ে উঠেছে সেখানে যাবার সাহসই তার হল না।

ব্যূহের বাঁ দিকে পৌঁছে সে গোলাগুলির ভয়ে সামনের সারির দিকে না এগিয়ে অধিনায়ক ও তার সহকারীদের যেখানে থাকবার কথা নয় সেখানেই তাদের খুঁজতে লাগল এবং স্বভাবতই সেনাপতির হুকুমটা জানাতেই পারল না। ব্রাউনাউতে কুতুজভ যে রেজিমেন্টটা পরিদর্শন করেছিল এবং যার সঙ্গে যুক্ত ছিল দলখভ তার অধিনায়কের উপরেই পড়েছে ব্যূহের বাঁ দিককার বাহিনীর পরিচালনভার। কিন্তু বাঁ দিককার একেবারে শেষ প্রান্তবর্তী সেনাদলটির পরিচালনভার পড়েছে পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেন্টের অধিনায়কের উপর, আর সেই রেজিমেন্টেই আছে রস্তভ। ফলে দুই রেজিমেন্টের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হল। দুই অধিনায়কই একে অন্যের উপর চটে গেল এবং দক্ষিণ ব্যূহে আক্রমণ চালিয়ে ফরাসীরা যখন বেশ এগিয়ে এসেছে তখনও তারা আলোচনায় মেতে উঠে একে অপরকে আঘাত করতেই ব্যস্ত। অশ্বারোহী এবং পদাতিক কোন রেজিমেন্টই আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতই হয় নি। সাধারণ সৈনিক থেকে অধিনায়ক পর্যন্ত কেউ যুদ্ধের কথা ভাবছেই না; তারা শান্তিতে দিন কাটাচ্ছে, অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়াদের দানাপানি খাওয়াচ্ছে, আর পদাতিক সৈন্যরা কাঠ যোগাড় করছে।

কিন্তু তখন আর নষ্ট করবার মত সময় নেই। তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে। কামান ও বন্দুক একযোগে দক্ষিণ ও মধ্যভাগে আক্রমণ শুরু করেছে; লানেস্‌-এর নিপুণ গোলন্দাজরা মিলের বাঁধটা পার হয়ে বন্দুকের পাল্লার দ্বিগুণ দূরত্বের মধ্যে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। পদাতিক বাহিনীর অধিনায়ক ঘোড়ায় চেপে পাভ্‌লোগ্রাদ অধিনায়কের কাছে গেল। দুই অধিনায়কই বিনম্র অভিবাদন জানাল, কিন্তু তাদের মনের মধ্যে তখনও ফুঁসছে গোপন বিদ্বেষ।

অধিনায়ক বলল, "আর একবার বলছি কর্নেল, অর্ধেক সৈন্যকে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে আমি এখান থেকে সরে যেতে পারি না। আপনাকে মিনতি করছি, মিনতি করছি, যথাযথভাবে সেনাসমাবেশ করে আক্রমণের

জন্য প্রস্তুত হোন।"

অশ্বারোহী বাহিনীর জার্মান কর্ণেল বিরক্ত হয়ে বলল, "আমিও আপনাকে অনুরোধ করছি, যেটা আপনার কাজ নয় তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। আপনি যদি অশ্বারোহী বাহিনীতে থাকতেন····"

"আমি অশ্বারোহী বাহিনীর লোক নই, কিন্তু আমি একজন রুশ অধিনায়ক, আর আপনি যদি এ বিষয়ে সচেতন না হয়ে থাকেন····"

ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে মুখটা লাল করে কর্ণেল হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি খুব সচেতন ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনি কি দয়া করে সামনে এগিয়ে একবার নিজের চোখে দেখে আসবেন যে এ জায়গাটা মোটেই ভাল নয়? আপনার সুখের জন্য আমার লোকগুলোকে তো আমি মেরে ফেলতে পারি না।"

"আপনি নিজেকে ভুলে যাচ্ছেন কর্ণেল। আমি নিজের সুখের কথা ভাবছি না, আর সে কথা কেউ বললে তা সহ্য করব না।"

কর্ণেলের কথাগুলিকে তার সাহসের প্রতি কটাক্ষ বলে ধরে নিয়ে অধিনায়কটি বুক ফুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল; যেন বুলেটের ভিতর দিয়েই তাদের বিরোধের মীমাংসা হবে। দুজনই সামনের সারিতে পৌঁছে গেল, কয়েকটা বুলেটও তাদের উপর দিয়ে উড়ে গেল। নীরবেই তারা থামল। সেখান থেকে নতুন কিছু দেখবার ছিল না, কারণ ঝোপঝাড়ের মধ্যে ও অসমান জমিতে অশ্বারোহীদের পক্ষে কিছু করা অসম্ভব; তাছাড়া ফরাসীরা বাঁ দিক থেকে আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সংঘর্ষের জন্য অপেক্ষমান দুটো লড়ায়ে মোরগের মত অধিনায়ক ও কর্ণেল অর্থপূর্ণ কঠোর দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকাল; বৃথাই একে অন্যের চোখে ভীরুতার চিহ্ন খুঁজতে লাগল। দুজনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হল। কারও কিছু বলার নেই, গুলির পাল্লার ভিতর থেকে আগে সরে যাবার অপবাদ কেউ মাথায় নিতে রাজী নয়; কাজেই একজন অপরজনের সাহসকে পরীক্ষা করবার জন্য তারা হয়তো দীর্ঘ সময় সেখানেই অপেক্ষা করে থাকত, কিন্তু ঠিক সেই সময় তাদের পিছনে জঙ্গলের ভিতর থেকে বন্দুকের গুলির আওয়াজ ও একটা হল্লার শব্দ কানে এল। যে সৈন্যরা জঙ্গলের মধ্যে কাঠ যোগাড় করছিল ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করেছে। পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করা এখন আর হুজার-বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। ফরাসীরা বাঁ দিক থেকে এসে তাদের পশ্চাদপসরণের পথটা কেটে দিয়েছে। জায়গাটা ঘাঁটি হিসাবে যতই অসুবিধাজনক হোক না কেন, নিজেদের বেরিয়ে যাবার একটা পথ করে নেবার জন্য এখন আক্রমণ করতেই হবে।

রস্তভ যে অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত তারা ঘোড়ায় চড়ারও সময় পেল না; তার আগেই তাদের শত্রু-সৈন্যের মুখোমুখি হতে হল। এন্‌স্‌

সেতুর মতই আর একবার এই সেনাদল ও শত্রুপক্ষের মধ্যে আর কোন বাধাই নেই ; আর একবার তাদের মাঝখানে আছে শুধু অনিশ্চয়তা ও ভয়ের এক ভয়ংকর সীমারেখা—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমারেখারই মত। সেই অদৃশ্য সীমারেখার কথা সকলেই জানে ; সে সীমারেখা পার হবে কি হবে না, এবং কেমন করেই বা পার হবে, এই চিন্তাই তাদের বিচলিত করে তুলেছে।

ঘোড়া ছুটিয়ে কর্ণেল সকলের সামনে এগিয়ে গেল, সক্রোধে অফিসারদের প্রশ্নের জবাব দিল এবং একগুঁয়ে লোকের মত একটা হুকুম জারি করল। মুখে কেউ স্পষ্ট করে কিছু বলল না, কিন্তু আক্রমণের গুজব সেনাদলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। শ্রেণীবদ্ধ হবার হুকুম ঘোষিত হল, আর কোষমুক্ত তরবারি ঝনঝনিয়ে উঠল। তবু কেউ এগিয়ে গেল না। পদাতিক ও হুজার বাম প্রান্তের সকল সৈন্যই বুঝতে পারছে যে অধিনায়ক নিজেই জানে না কি করতে হবে ; তার এই অস্থির মানসিকতা সৈনিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে।

এতকাল হুজার-বন্দুকের মুখে প্রত্যক্ষ আক্রমণের আনন্দময় অভিজ্ঞতার যেসব কথা সে শুনে এসেছে এই প্রথম সে সুযোগ তার সামনে এসেছে এ কথা মনে করে রস্তভ ভাবল, "এরা যদি আর একটু তাড়াতাড়ি করত !"

দেনিসভ-এর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল, "আগে বাড়ো ! ঈশ্বর তোমাদের সহায় বাছারা ! এগিয়ে যাও কদমে !"

সামনে ডান দিকে তাকিয়ে রস্তভ তার হুজারদের প্রথম সারিটা দেখতে পেল ; আরও সামনে একটা কালো রেখা চোখে পড়লেও সেটাকে সে পরিষ্কার দেখতে পেল না ; তবু সেটাকেই শত্রুপক্ষের সৈন্য বলে ধরে নিল। গুলির শব্দ শোনা যাচ্ছে, তবে বেশ কিছুটা দূর থেকে।

হুকুম হল "আরও জোরে !" রস্তভ সবেগে তার ঘোড়া রুককে কদমে ছুটিয়ে দিল।

ঘোড়ার তীব্র গতিবেগ রস্তভকে ক্রমেই উল্লসিত করে তুলল। তার সামনে একটা নির্জন গাছ ছিল। যে রেখাটা অত্যন্ত ভয়ংকর মনে হয়েছিল গাছটা ছিল তার ঠিক মাঝখানে—এবার সেই গাছটাকে সে পেরিয়ে গেল ; সেখানে ভয়ংকর কিছু তো চোখে পড়লই না, বরং সমস্ত কিছুই ক্রমেই আরও আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে হতে লাগল। তরবারির হাতল চেপেধরে রস্তভ ভাবল, "আঃ, তাকে একখানা মার যা মারব !"

"হুররা-আ-আ-আহ্ !" বহু কণ্ঠের গর্জন উঠল। "আসুক না কেউ আমার সামনে"—এই কথা ভেবে রস্তভ জোর কদমে রুককে ছুটিয়ে অন্য সকলকে ছাড়িয়ে চলে গেল। সামনে শত্রুপক্ষকে এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সহসা বার্চ গাছের ঝাঁটার মত একটা কিছু সৈন্যদলের মাথার উপর দিয়ে উড়ে এল। রস্তভ আঘাত করবার জন্য তরবারি তুলল, কিন্তু সেই মুহূর্তে অশ্বারোহী নিকিতেংকো তীরগতিতে তাকে ছাড়িয়ে চলে গেল, আর রস্তভের

মনে হল স্বপ্নের ঘোরে সে যেন অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র গতিতে সম্মুখে ছিটকে এগিয়ে গেল, অথচ যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। আর এক পরিচিত হুজার বন্দারচুক পিছন থেকে এসে তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। বন্দারচুকের ঘোড়া পাশ কাটিয়ে জোর কদমে ছুটে গেল।

"একি? আমি এগোচ্ছি না কেন? আমি পড়ে গেছি, আমি মরে গেছি!" প্রশ্ন করে রস্তভ নিজেই সঙ্গে সঙ্গে তার জবাব দিল। মাঠের মধ্যে সে একা। চলন্ত ঘোড়া ও হুজারদের পিঠের বদলে তার সামনে দেখতে পাচ্ছে শুধু নিশ্চল মাটি আর খড়ের নাড়া। তার বগলের নীচে গরম রক্তের স্পর্শ। "না, আমি আহত হয়েছি, আর আমার ঘোড়াটা মারা গেছে।" সামনের পায়ে ভর দিয়ে রুক উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করল, কিন্তু সওয়ারের পায়ের উপর চেপে পড়ে গেল। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছে; অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু উঠতে পারল না। রস্তভও উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু পড়ে গেল, তার তরবারির চামড়ার কোষ ঘোড়ার জিনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। আমাদের সৈন্যরা কোথায় আছে, কোথায়ই বা আছে ফরাসীরা, সে কিছুই জানে না। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

পাটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। "কোথায় কোন্‌দিকে সেই রেখাটি যা দুটি বাহিনীকে পরিষ্কার দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছে?" সে প্রশ্ন করল, কিন্তু জবাব দিতে পারল না। "আমার কি খারাপ কিছু হয়েছে?" উঠে দাঁড়িয়ে সে ভাবল; আর সেই মুহূর্তে তার মনে হল, তার অবশ বাঁ হাত থেকে একটা অপ্রয়োজনীয় কিছু ঝুলছে। মনে হল, কব্জিটা বুঝি তার নিজের নয়। হাতটা ভাল করে দেখল, কিন্তু তাতে রক্তের দাগ দেখতে পেল না। কিছু লোককে তার দিকে দৌড়ে আসতে দেখে সে সানন্দে ভাবল, "আঃ, ঐ তো লোকজন আসছে। ওরা আমাকে সাহায্য করবে।" প্রথমে এগিয়ে গেল "শাকো" টুপি ও নীল জোব্বা পরা একটি লোক; মোটাসোটা শরীর, রোদে পোড়া মুখ, বাঁকা নাক। পরে আরও দুজন এল; তাদের পিছনে আরও অনেকে দৌড়ে এল। তাদের একজন অদ্ভুত কিছু বলল; ভাষাটা অবশ্যই রুশ নয়। পিছনদিককার "শাকো" পরিহিত আরও অনেকের মধ্যে একজন রুশ হুজারও রয়েছে। দুই হাত ধরে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে; তার ঘোড়াটাকেও পিছনে হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে।

"ও নিশ্চয়ই আমাদের কেউ, বন্দী হয়েছে। হ্যাঁ। তাহলে এরা কি আমাকেও বন্দী করবে? এরা কারা?" রস্তভ ভাবতে লাগল; নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না। "ওরা কি ফরাসী?" সে আর একবার এগিয়ে-আসা ফরাসীদের দিকে তাকাল। "ওরা কারা? ওরা ছুটে আসছে কেন? ওরা কি আমার দিকে আসছে? কিন্তু কেন? আমাকে

মেরে ফেলতে? অথচ আমাকে তো সকলেই কত ভালবাসে?" মায়ের ভালবাসা, পরিবারের লোকজনদের ভালবাসা, বন্ধুদের ভালবাসার কথা তার মনে পড়ল; তার মনে হল, শত্রুপক্ষ তাকে মেরে ফেলতে চাইবে এটা একেবারেই অসম্ভব। "কিন্তু হয়তো তাই তারা করবে!" পরিস্থিতি বুঝতে না পেরে দশ সেকেণ্ডেরও বেশী সময় সে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বাঁকা-নাক ফরাসীটি ততক্ষণে এত কাছে এসে পড়েছে যে তার মুখের ভাব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লোকটির উত্তেজিত বিরূপ মুখ, পাশে ঝোলানো বেয়নেট, তার রুদ্ধশ্বাস গতি—এসব দেখে রস্তভ ভয় পেল। সে পিস্তলটা চেপে ধরল, কিন্তু গুলি না করে সেটাকে ফরাসী লোকটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সে যথাসাধ্য দ্রুতগতিতে জঙ্গলের দিকে ছুটে গেল। এন্‌স্‌ সেতু ধরে দৌড়বার সময় তার মনে যে সন্দেহ ও সংঘাত ছিল এখন সেসবের কিছুই নেই; এখন সে ছুটছে শিকারী কুকুরের তাড়া-খাওয়া খরগোসের মত। শুধুমাত্র নিজের সুখী তরুণ জীবনকে হারাবার আতংকই তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে প্রাণপণে মাঠ ভেঙ্গে ছুটছে আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে। তার শরীরের ভিতর দিয়ে ত্রাসের একটা শিহরণ বয়ে গেল; "না, পিছনে না তাকানোই ভাল।" তবু জঙ্গলের কাছে পৌঁছে সে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল। ফরাসীরা পিছিয়ে পড়েছে; সকলের আগের লোকটি দৌড়নোর বদলে এবার হাঁটতে শুরু করেছে; মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে আরও পিছনের জনৈক সহকর্মীকে সে যেন কি বলল। রস্তভ থামল। ভাবল, "না তো, কিছু ভুল হয়েছে। ওরা আমাকে খুন করতে চায় নি।" কিন্তু সেইসঙ্গে তার এটাও মনে হল যে তার বাঁ হাতটা এত ভারী বোধ হচ্ছে যেন একটা পাঁচ স্টোন ওজনের বোঝা তাতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। সে আর দৌড়তে পারছে না। ফরাসীরাও থেমে গিয়ে তাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলল। রস্তভ চোখ বুজে উপুড় হল। প্রথমে একটা বুলেট, তারপর আর একটা হিস্‌ করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। অবশিষ্ট শক্তিতে ভর করে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতটাকে চেপে ধরে সে জঙ্গলে পৌঁছে গেল। তার ঠিক পিছনেই আছে কিছু রুশ বন্দুকধারী।

অধ্যায়—২০

যেসব পদাতিক সেনাদল জঙ্গলের বহিঃপ্রান্তে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিল তারা ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেছে; বিভিন্ন কোম্পানির সৈন্য একসঙ্গে মিশে গিয়ে বিশৃংখলভাবে পশ্চাদপসরণ করেছে। একটি সৈন্য আতংকে চেঁচিয়ে উঠেছিল, "আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি!" রণক্ষেত্রে এ আতংক বড় সাংঘাতিক; অচিরেই তা ছড়িয়ে পড়ল সব সৈন্যদের মনে।

"আমাদের ঘিরে ফেলেছে! আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি! আমাদের

সর্বনাশ উপস্থিত!" পলায়নপর সৈন্যরা চীৎকার করতে লাগল।

পিছন থেকে গুলির শব্দ ও চীৎকার কানে আসামাত্রই সেনাপতি বুঝতে পারল তার রেজিমেণ্টে একটা ভয়ংকর কিছু ঘটেছে; সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, অনেক বছর ধরে অফিসার হিসাবে তার কার্যকলাপ একটি দৃষ্টান্তস্থল, তার কোন কাজে কখনও কোন ত্রুটি হয় নি; অথচ এবার হয়তো কর্তব্যে অবহেলা বা অযোগ্যতার দরুন হেড-কোয়ার্টারে তাকেই দোষী করা হবে। এই চিন্তা তাকে এতই বিচলিত করে তুলল যে অশ্বারোহী বাহিনীর অবাধ্য কর্ণেলের কথা-ভুলে গিয়ে, সেনাপতি হিসাবে স্বীয় মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে, এমনকি সমূহ বিপদ ও আত্মরক্ষার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে সে তার রেজিমেণ্টের উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। চারদিকে মুষলধারে গুলিবর্ষণ চলছে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কোন গুলিই তার গায়ে লাগে নি। তার একমাত্র বাসনা প্রকৃত অবস্থা জেনে নিয়ে নিজের কোন ভুল হয়ে থাকলে তাকে সংশোধন করা বা তার প্রতিকার করা; যাতে বাইশ বছরের চাকরি-জীবনে যে কখনও নিন্দিত হয় নি সেই অফিসার হয়েও তাকে কোনরকম দোষের ভাগী না হতে হয়।

ফরাসীদের ভিতর দিয়ে নিরাপদে ঘোড়া ছুটিয়ে সে জঙ্গলের পশ্চাদবর্তী একটা মাঠে পৌঁছে দেখল, সব হুকুমকে উপেক্ষা করে সৈন্যরা ছুটছে, উপত্যকার দিকে নেমে যাচ্ছে। যে নৈতিক সংকল্প-শিথিলতা একটা যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকে সেই মুহূর্তটি সমাসন্ন। এই বিশৃংখল সৈন্যরা কি তাদের অধিনায়কের কথা শুনবে, না কি তাকে উপেক্ষা করেই পালাতে থাকবে? তার অবিরাম চীৎকার, তার ক্রুদ্ধ, বিকৃত, রক্তাভ মুখছবি, হাতের কোষমুক্ত উদ্যত তরবারি—সবকিছু সত্ত্বেও সৈনিকরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে শূন্যে গুলি ছুঁড়ে সব হুকুম অমান্য করে পালাতেই থাকল। যুদ্ধের ভাগ্য-নির্ধারক নৈতিক সংকল্প-শিথিলতা পরিণত হয়েছে সর্বগ্রাসী আতংকে।

অবিরাম চীৎকার ও বারুদের ধোঁয়ার ফলে কাশতে কাশতে সেনাপতি হতাশ হয়ে থেমে গেল। সবই বুঝি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আক্রমণকারী ফরাসীরা হঠাৎ যেন বিনা কারণেই পশ্চাদপসরণ করে জঙ্গল-প্রান্ত থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একদল বন্দুকধারী। এরা তিমোখিন-এর অধীনস্থ সেনাদল; একমাত্র এরাই জঙ্গলের মধ্যে সুশৃংখল অবস্থায় ছিল এবং একটা নালার মধ্যে আত্মগোপন করে থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে ফরাসীদের উপর আক্রমণ হেনেছে। একখানি মাত্র তরবারি হাতে নিয়ে তিমোখিন এমন বেপরোয়া চীৎকার ও উন্মত্ত সংকল্পের সঙ্গে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ফরাসীরা

বন্দুক ফেলেই পালিয়েছে। তিমোখিনের পাশে ছুটে গিয়ে দলখভ খুব কাছে থেকে একজন ফরাসীকে হত্যা করল এবং আত্মসমর্পণকারী ফরাসী অফিসারের কলার চেপে ধরল। আমাদের পলায়নপর সৈন্যরা ফিরে এল, ব্যাটেলিয়নগুলিকে নতুন করে সাজানো হল, আর যে ফরাসীরা আমাদের বাঁ দিককার ব্যূহটাকে প্রায় ভেদ করে ফেলেছিল তাদের তখনকার মত পর্যুদস্ত করা হল। আমাদের সংরক্ষিত সেনাদলও এসে যোগ দিল; যুদ্ধ শেষ হল। রেজিমেণ্ট কম্যাণ্ডার ও মেজর একনমভ একটা সেতুর পাশে দাঁড়িয়ে সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করছিল। এমন সময় একটি সৈনিক এসে কম্যাণ্ডারের প্রায় গা ঘেঁসে তার ঘোড়ার রেকাব ধরে দাঁড়াল। লোকটির পরনে নীল্‌চে রঙের কোট, কাঁধে বোঁচকা, বা মাথায় টুপি নেই, মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আর কাঁধে ঝুলছে ফরাসীদের একটা বারুদের থলে। তার হাতে একখানা অফিসারের তরবারি। সৈনিকটির মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি উদ্ধত, ঠোঁটে হাসি। মেজর একনমভকে কিছু নির্দেশ দেবার কাজে ব্যস্ত থাকায় কম্যাণ্ডার সৈনিকটির দিকে নজর না দিয়ে পারল না।

ফরাসী তরবারি ও বারুদের থলেটা দেখিয়ে দলখভ বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, এই নিন দুটো বিজয়-স্মারক। একজন অফিসারকে আমি বন্দী করেছি। কোম্পানিকে আটকে দিয়েছি।" দলখভ ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে; কথা বলছে কেটে কেটে। "গোটা কোম্পানিই সাক্ষী দেবে। ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছে আমার অনুরোধ, এ কথাটা মনে রাখবেন!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বলে কম্যাণ্ডার মেজর একনমভ-এর দিকে মুখ ফেরাল।

দলখভ কিন্তু চলে গেল না; মাথায় বাঁধা রুমালখানার গিঁট খুলে নামিয়ে নিয়ে চুলের ভিতর জমাট-বাঁধা রক্তের দাগ দেখাল।

"বেয়নেটের আঘাত। আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। মনে রাখবেন ইয়োর এক্সেলেন্সি!"

* * *

তুশিনের গোলন্দাজ বাহিনীর কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিল; যুদ্ধের একেবারে শেষকালে তখনও ব্যূহের মধ্যভাগে কামান-গর্জনের শব্দ শুনে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন প্রথমে স্টাফ-অফিসার ও পরে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে পাঠিয়েছিল তার সৈন্যগণকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পশ্চাদপসরণের হুকুম জানাতে। তুশিনের কামানগুলোর রক্ষক-সৈনিকদের যখন কারও হুকুমে ব্যূহের মধ্যভাগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, তখনও কামানগুলো থেকে সেখানে গোলা ছোঁড়া চলতে লাগল। তাদের বন্দী করা দূরে থাক, ফরাসীরা ভাবতেই পারে নি যে সম্পূর্ণ অরক্ষিত চারটি কামান থেকে গোলাবর্ষণের দুঃসাহস কারও হতে পারে। উপরন্তু তাদের গোলাবর্ষণের রকম দেখে ফরাসীরা ধরে নিয়েছিল যে

এখানে—ব্যূহের মধ্যভাগে—মূল রুশ সেনাপতির সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ছবার তারা এই অংশটার উপর আঘাত হানবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পাহাড়ের উপরকার চারটিমাত্র কামানের ছর্‌রা গোলার আঘাতে প্রতিবারই প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।

প্রিন্স ব্যাগ্রেশন তাকে ছেড়ে যাবার পরেই তুশিন শোন্‌ গ্রেবার্ণে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

"দেখ, ওরা ছুটে পালাচ্ছে! গ্রামটা জ্বলছে! ঐ দেখ ধোঁয়া! চমৎকার! সাবাস! ঐ দেখ ধোঁয়া, ধোঁয়া!" মহা উৎসাহে গোলন্দাজরা চীৎকার করে উঠেছিল।

হুকুমের জন্য অপেক্ষা না করেই সবগুলো কামান থেকে সেই জলন্ত গ্রাম লক্ষ্য করে গোলা ছোঁড়া চলতে লাগল। প্রতিটি গোলার সঙ্গে সঙ্গেই একজন সৈনিক অপর জনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল: "সুন্দর! খুব ভাল! ···তাকিয়ে দেখ। ···চমৎকার!" বাতাসে ভর করে আগুন ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। যে ফরাসী সেনাদলটি গ্রাম ছাড়িয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা ফিরে গেল, কিন্তু হয় তো এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যই শত্রুপক্ষ দশটা কামানকে গ্রামের ডান দিকে বসিয়ে তুশিনের কামান লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়তে লাগল।

দুর্বল পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গীতে ছুটে ছুটে ছোট্ট তুশিন বার বার আর্দালিকে বলছে, "আমার পাইপটায় তামাক ভরে দাও"; তারপর পাইপ থেকে আগুনের ফুল্‌কি ছড়িয়ে ছোট হাতটা চোখের উপর তুলে ফরাসীদের দিকে দৃষ্টি রেখে সে সামনে ছুটে গেল। কামানের চাকা চেপে ধরে নিজেই ইস্ক্রুপ ঘুরিয়ে বলতে লাগল, "পেটাও হে বাছারা, পেটাও!"

এমন সময় তার মাথার উপর থেকে একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর হাঁক দিল: "ক্যাপ্টেন তুশিন! ক্যাপ্টেন!"

তুশিন ঘুরে দাঁড়াল। এ সেই স্টাফ-অফিসারের কণ্ঠস্বর যে তাকে গ্রুন্থ-এর ঘর থেকে বের করে দিয়েছিল। ধরা গলায় সে হাঁক দিয়ে বলল:

"আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন? আপনাকে দু'বার পিছিয়ে যেতে বলা হয়েছে, আর আপনি···"

ঊর্ধ্বতন অফিসারকে দেখতে পেয়ে তুশিন সভয়ে ভাবল: "এরা আমাকে নিয়ে পড়ল কেন?"

দুটো আঙুল টুপি পর্যন্ত তুলে সে তো-তো করে বলল, "আমি···জানতাম না··· আমি···"

কিন্তু স্টাফ-অফিসার তার বক্তব্য শেষ করতে পারল না; একটা গোলা খুব কাছ দিয়ে উড়ে আসায় সে ঘোড়ার পিঠেই মাথা নামিয়ে গোলাটাকে এড়িয়ে গেল। একটু থেমে আবার কিছু বলবার চেষ্টা করতেই আর একটা

গোলা এসে তাকে থামিয়ে দিল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে কদমে ছুটল।

দূর থেকে হাঁক দিল, "পিছিয়ে এস! সকলে পিছিয়ে এস!"

সৈন্যরা হেসে উঠল। মুহূর্তকাল পরে সেই একই হুকুম নিয়ে এল জনৈক অ্যাড্জুটান্ট।

প্রিন্স আন্দ্রু। তুশিনের কামানগুলো যেখানে বসানো ছিল সেখানে পৌঁছে প্রথমেই তার চোখে পড়ল, জিন-খোলা পা-ভাঙ্গা একটা ঘোড়া মাটিতে পড়ে কাৎড়াচ্ছে। তার পা থেকে ফোয়ারার মত রক্ত বেরুচ্ছে। কামান-শকটগুলোর মাঝে মাঝে কয়েকজন মরে পড়ে আছে। একটার পর একটা গোলা ছুটে যাচ্ছে; তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ নেমে গেল। কিন্তু ভয়ের চিন্তাই তাকে নতুন করে উদ্বুদ্ধ করে তুলল। "আমি ভয় পেতে পারি না'" এই কথা ভেবে সে ধীরে ধীরে ঘোড়া থেকে নামল। হুকুম জারি করেও সেখান থেকে নড়ল না। স্থির করল, সে উপস্থিত থেকেই কামানগুলিকে সেখান থেকে সরিয়ে বসাবার ব্যবস্থা করবে। ফরাসীদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যেই তুশিনকে সঙ্গে নিয়ে সে কামানগুলি সরাবার কাজের তদারিক করতে লাগল।

জনৈক গোলন্দাজ প্রিন্স আন্দ্রুকে বলল, "একজন স্টাফ-অফিসার এক মিনিট আগে এখানে এসেই পালিয়ে গেছেন। তিনি আপনার মত নন!"

প্রিন্স আন্দ্রু তুশিনকে কিছুই বলল না। দুজনই এত ব্যস্ত যে কেউ কারও দিকে নজরই দিচ্ছে না। চারটি কামানের মধ্যে অক্ষত দুটোকে ঠিকমত বসিয়ে তারা পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। তখন প্রিন্স আন্দ্রু ঘোড়া ছুটিয়ে তুশিনের কাছে গেল।

তুশিনের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, আবার দেখা হবে..."

তুশিন বলল, "বিদায় বন্ধু। বিদায় হে প্রিয় বন্ধু।" কি এক অজ্ঞাত কারণে তার দুই চোখ হঠাৎ জলে ভরে গেল।

অধ্যায়—২১

বাতাস পড়ে গেছে; কালো মেঘের দল বারুদের ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যুদ্ধক্ষেত্রের দিগন্তের উপর নীচু হয়ে ঝুলে আছে। অন্ধকার হয়ে আসছে; দুটো অগ্নিকাণ্ডের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কামানের গর্জন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু পিছনে ও ডান দিকে মাঝে মাঝেই বন্দুকের শব্দ ক্রমেই কাছে শোনা যাচ্ছে। গুলির পাল্লার বাইরে চলে গিয়ে তুশিন খাদের মধ্যে নেমে গেল, আর সেখানেই স্টাফ-অফিসার ও ঝেরকভ-এর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। তাদের দুজনকেই দু'বার তুশিনের কামানের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তারা সেখানে পৌঁছতে পারে নি। যে পদাতিক অফিসারটি

যুদ্ধের ঠিক আগে তুশিনের চালাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল পেটে বুলেটবিদ্ধ হয়ে সে এখন একটা কামান-শকটে শুয়ে আছে। পাহাড়ের পাদদেশে এক হাত দিয়ে আর একটা হাত চেপে ধরে জনৈক বিবর্ণ হুজার-শিক্ষার্থী তুশিনের কাছে এসে একটা আসনের জন্য প্রার্থনা জানাল।

ভীরু গলায় বলল, "ঈশ্বরের দোহাই ক্যাপ্টেন! আমার হাতে আঘাত লেগেছে। ঈশ্বরের দোহাই···আমি হাঁটতে পারছি না। ঈশ্বরের দোহাই।"

বোঝা গেল, শিক্ষার্থীটি গাড়িতে একটা জায়গার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বিফল হয়েছে। তাই সকরুণ ইতস্তত গলায় সে অনুরোধ করছে।

"ঈশ্বরের দোহাই, ওদের বলুন আমাকে একটু জায়গা দিতে।"

তুশিন বলল, "ওকে একটা আসন দাও। বসবার জন্য একটা জোব্বা বিছিয়ে দাও। আহত অফিসারটি কোথায়?"

"তাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি মারা গেছেন," কে যেন জবাব দিল।

"ওকে উঠতে সাহায্য কর। বসে পড় বাপু, বসে পড়। আন্তনভ, জোব্বাটা বিছিয়ে দাও।"

শিক্ষার্থীটি রস্তভ। এক হাত দিয়ে আর একটা হাত ধরে আছে; মুখটা ফ্যাকাসে, চোয়াল কাঁপছে, সারা শরীরে যেন জ্বরের খিঁচুনি। মৃত অফিসারকে যে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেখানেই তাকে জায়গা দেওয়া হল। জোব্বাটা রক্তে ভিজে থাকায় তার ব্রীচেশ ও হাতে রক্তের ছোপ লাগল।

রস্তভের দিকে এগিয়ে এসে তুশিন বলল, "আরে, তুমিও আহত হয়েছ নাকি বাপু?"

"না, একটু মচকে গেছে।"

"তাহলে কামান-শকটে এ রক্ত কিসের?" তুশিন শুধাল।

কোটের আস্তিন দিয়ে রক্তটা মুছে দিয়ে গোলন্দাজ সৈনিকটি বলল, "ইয়োর অনার, সেই অফিসারটির শরীর থেকে রক্ত পড়েছে।"

পদাতিক বাহিনীর সহায়তায় কামানগুলোকে উপরে ঠেলে তুলে গ্রুন্তার্সদর্ফ গ্রামে পৌঁছে তারা থামল। অন্ধকার গাঢ় হয়ে এসেছে, দশ পা দূরের সৈনিককেও দেখা যাচ্ছে না, গুলির শব্দও মিলিয়ে আসছে। সহসা ডান দিকে খুব কাছে পুনরায় হৈচৈ ও গুলির শব্দ শোনা গেল। অন্ধকারে দেখা গেল গুলির ঝিলিক। এটাই ফরাসীদের শেষ আক্রমণ; গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে যে সৈনিকরা আশ্রয় নিয়েছিল তারাই সে আক্রমণের মোকাবিলা করল। তারা আবার গ্রাম থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, কিন্তু তুশিনের কামানের চাকা অচল হয়ে পড়েছে; তাই গোলন্দাজ সৈনিকরা, তুশিন ও শিক্ষার্থীটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ভাগ্যের জন্য অপেক্ষা করে

রইল। গুলির শব্দ থেমে গেল; সাগ্রহে কথা বলতে বলতে সৈনিকরা গলি-পথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল।

"তুমি আঘাত পাওনি তো পেত্রভ?" একজন শুধাল।

"আরে বাবা, আচ্ছা ঠেঙানি ওদের দিয়েছি। ওরা আর এদিকে পা বাড়াবে না," আর একজন বলল।

"একটা জিনিস তোমরা দেখনি। নিজেদের দিকেই ওরা কীরকম গুলি ছুঁড়ছিল। কিছুই তো দেখা যাচ্ছিল না। গাঢ় অন্ধকার রে ভাই! গলা ভেজাবার কিছু আছে কি?"

ফরাসীদের আক্রমণ শেষবারের মত প্রতিহত হল। গমনরত পদাতিক বাহিনী পরিবৃত হয়ে তুশিনের কামানগুলো একটু একটু করে সামনে এগোতে লাগল।

অন্ধকারে সকলে এগিয়ে চলল। মনে হল, ফিস্-ফিস্ গুঞ্জণ ও ঘোড়ার ক্ষুর ও গাড়ির চাকার শব্দের সঙ্গে একটা অদৃশ্য বিষণ্ণ নদী যেন একই দিকে বয়ে চলেছে। তারই মধ্যে শোনা যাচ্ছে আহতদের আর্তনাদ ও কণ্ঠস্বর। কিছুক্ষণ পরে সেই চলমান জনতা বিচলিত হয়ে উঠল; সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কে একজন সদলে তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল; যেতে যেতেই বলল; "তিনি কি বললেন? এখন কোন্ দিকে? বিরতি কি? তিনি কি আমাদের ধন্যবাদ দিয়েছেন?" নানা দিক থেকে এমনি সব সাগ্রহ প্রশ্ন শোনা গেল। চলমান জনতা ক্রমেই কাছাকাছি এগিয়ে এল; একটা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল যে তাদের যাত্রা বিরতির হুকুম জারি হয়েছে; সামনের সারির সৈনিকরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। কর্দমাক্ত রাস্তার মাঝখানে যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল।

আগুন জ্বালানো হয়েছে। কথাবার্তা আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। সন্তদের যথাযথ নির্দেশাদি দিয়ে ক্যাপ্টেন তুশিন একজন সৈনিককে পাঠাল শিক্ষার্থীটির জন্য কোন ড্রেসিং স্টেশন অথবা ডাক্তারের খোঁজে। তারপর রাস্তার উপরে সৈন্যরা যেখানে আগুন জ্বেলেছে সেইখানে গিয়ে বসল। রস্তভও নিজেকে টেনে নিয়ে সেখানেই গেল। যন্ত্রণায়, ঠাণ্ডায় ও স্যাঁৎসেঁতে আবহাওয়ায় তার সারা শরীর কাঁপছে। একটা অনিবার্য তন্দ্রার ভাব যেন তাকে পেয়ে বসেছে; শুধু বাহুতে একটা সূঁচ বেঁধার মত যন্ত্রণার ফলেই সে জেগে আছে; হাতটাকে কোনভাবে রেখেই স্বস্তি হচ্ছে না। একবার চোখ বুঁজছে, আবার আগুনের দিকে ও তুশিনের চওড়া-কাঁধ মূর্তির দিকে তাকাচ্ছে। তুশিনের বুদ্ধিদীপ্ত ছুটি বড় বড় চোখ সহানুভূতি ও সমবেদনায় রস্তভের উপর নিবদ্ধ; রস্তভও বুঝতে পারছে যে সমস্ত অন্তর দিয়ে তুশিন তাকে সাহায্য করতে চাইছে, কিন্তু পারছে না।

চারদিকেই পদাতিক বাহিনীর পায়ের শব্দ ও আলোচনা শোনা যাচ্ছে;

তারা কেউ হাঁটছে, কেউ ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে, আবার কেউ বসে আছে। নানা কণ্ঠস্বর, কাদার ভিতর দিয়ে চলমান ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ, জ্বলন্ত কাঠের ফট্‌-ফট্‌ আওয়াজ—সব মিলেমিশে একটা ঐকতান গড়ে তুলেছে।

সেনাদলকে এখন আর অন্ধকারে একটি অদৃশ্য প্রবহমান নদী বলে মনে হচ্ছে না; মনে হচ্ছে, একটা উদ্বেলিত অন্ধকার সমুদ্র ঝড়ের পরে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসছে। রস্তভ উদাসীনভাবে চারদিকে তাকাল; কান পেতে সব কিছু শুনতে লাগল। একটি পদাতিক সৈন্য আগুনের কাছে এসে গোড়ালির উপর বসে আগুনের দিকে দুই হাত বাড়িয়ে মুখটা ঘুরিয়ে নিল।

তুশিনকে বলল, "কিছু মনে করছেন না তো ইয়োর অনার? আমার কোম্পানিটা হারিয়ে ফেলেছি। কোথায় যে আছে তাও জানি না···· মন্দ ভাগ্য আর কি!"

সৈনিকটির সঙ্গে গালে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি পদাতিক অফিসারও আগুনের কাছে এসে তুশিনকে বলল, কামানগুলোকে একটু সরিয়ে তাদের গাড়িটাকে যাবার মত জায়গা যেন করে দেওয়া হয়। তারা চলে যাবার পরে দুটি সৈন্য আগুনের কাছে ছুটে এল। দুজনই একটা বুটকে চেপে ধরে সেটাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য মরীয়া হয়ে লড়াই করছে।

"তুমি এটা কুড়িয়ে পেয়েছ? ···আমি বলছি! তুমি খুব চালাক!" একজন কর্কশগলায় চেঁচিয়ে বলল।

তারপরই রক্তাক্ত পায়ের পট্টি দিয়ে গলায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একটি ফ্যাকাসে, শুট্‌কো সৈনিক এসে রাগত গলায় গোলন্দাজ সৈন্যদের কাছে জল চাইল।

বলল, "এইভাবে কুকুরের মত মরতে হবে না কি?"

তুশিন লোকটিকে জল দিতে বলল। তারপর একটি হাসি-খুসি সৈনিক এসে পদাতিক বাহিনীর জন্য একটু আগুন চাইল।

একটা জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে অন্ধকারে যেতে যেতে সে বলল, "পদাতিক বাহিনীর জন্য সুন্দর একটা জলন্ত মশাল পেয়েছি। আগুনের জন্য ধন্যবাদ—সুদসমেত একদিন ফিরিয়ে দেব।"

তারপর একটা জোব্বার উপরে ভারী কিছু বয়ে নিয়ে চারটি সৈনিক আগুনের পাশ দিয়ে চলে গেল। একজন হোঁচট খেল।

"কোন্‌ শয়তান পথের মাঝখানে কাঠ ফেলে রেখেছে!" সে খেঁকিয়ে উঠল।

"এ তো মরে গেছে—কেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছি?" আর একজন বলল।

"থাম!"

বোঝা নিয়ে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুশিন ফিস্‌ফিস্‌ করে রস্তভকে বলল, "এখনও যন্ত্রণা হচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

একজন গোলন্দাজ এসে তুশিনকে বলল, "ইয়োর অনার, সেনাপতি আপনাকে ডাকছেন। তিনি ওই কুড়ে ঘরে আছেন।"

"যাচ্ছি বন্ধু।"

তুশিন উঠল; গ্রেট-কোটের বোতাম লাগিয়ে শরীরটাকে টান-টান করে আগুনের কাছ থেকে চলে গেল।

গোলন্দাজ বাহিনীর জ্বালানো আগুনের অনতিদূরে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের জন্য একটা কুড়ে ঘর তোলা হয়েছে। সেখানেই সে ডিনারে বসেছে; সমাগত কয়েকজন অধিনায়ক-অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। ছোটখাট বৃদ্ধটি চোখ অর্ধেক বুজে সাগ্রহে একটা হাড় চিবুচ্ছে, বাইশ বছর ধরে নিখুঁৎভাবে চাকরি করা সেনাপতিটি এক গ্লাস ভদ্‌কা খেয়ে লাল হয়ে উঠেছে; সেখানে আর আছে মোহরাংকিত আংটি হাতে স্টাফ-অফিসারটি; ঝেরকভ অস্বস্তির সঙ্গে সকলকে দেখছে; প্রিন্স আন্দ্রু ঝকঝকে চোখ মেলে ঠোঁট দুটো চেপে ধরেছে।

ঘরের কোণে দাঁড় করানো রয়েছে ফরাসীদের কাছ থেকে দখল করা একটা পতাকা; সরল-মুখ হিসাবরক্ষকটি হাত দিয়ে সেটার বুনট পরীক্ষা করে দেখে বিচলিতভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল—হয়তো পতাকাটা তার ভাল লেগেছে, হয় তো নিজে ক্ষুধার্ত হয়েও ডিনারে অংশ নিতে না পারায় সেই সব ভোজ্য-দ্রব্য দেখা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। পাশের কুড়ে ঘরে আছে একজন বন্দী ফরাসী কর্ণেল। আমাদের অফিসাররা সেখানে ভিড় করেছে। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন প্রতিটি অধিনায়ককে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ ও আমাদের হিসাব নিচ্ছিল। যে অধিনায়কের রেজিমেণ্টটি ব্রাউনাউতে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল সে প্রিন্সকে জানাল, যুদ্ধ শুরু হওয়া মাত্রই সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে, তার যেসব সৈন্য কাঠ কাটছিল তাদের একত্রে ডেকে আনে, এবং ফরাসীদের পাশ কাটিয়ে যেতে দিয়ে দুই ব্যাটেলিয়ন বেয়নেটধারী সৈন্য নিয়ে তাদের আক্রমণ করে হটিয়ে দেয়।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, যখন দেখলাম তাদের প্রথম ব্যাটেলিয়নটি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে তখন রাস্তার উপর থেমে গিয়ে ভাবলাম; 'ওদের এগিয়ে আসতে দিয়ে গোটা ব্যাটেলিয়ন নিয়ে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব'—আর তাই আমি করেছি।"

আসলে অধিনায়ক সেটাই করতে চেয়েছিল, আর সেটা করতে না পারায় সে এত বেশী দুঃখিত হয়েছে যে তার মনে হচ্ছে বুঝি সেই কাজটিই সে করতে পেরেছে। নাকি সত্যি সত্যি কি তাই ঘটেছিল? কি ঘটেছিল আর কি কি ঘটেনি—এই ডামাডোলের মধ্যে তা কি কেউ ঠিক-ঠিক জানে?

সে আরও বলল, "ভাল কথা ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনাকে জানাতে

চাই যে, দলখভ নামক যে অফিসারটির পদাবনতি ঘটেছিল, আমার উপস্থিতিতেই সে একজন ফরাসী অফিসারকে বন্দী করে নিজেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।"

প্রিন্স ব্যাগ্রেশন বৃদ্ধ কর্ণেলের দিকে ঘুরে বলল: মহাশয়গণ, আপনাদের সকলকেই ধন্যবাদ; পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ—সব সৈন্যই সাহসের পরিচয় রেখেছেন। কিন্তু ব্যূহের মাঝখানে দুটো কামান পরিত্যক্ত হল কেমন করে? যেন কোন একজনের খোঁজ করেই সে প্রশ্নটা করল। তারপর কর্তব্যরত স্টাফ অফিসারের দিকে ফিরে বলল, "মনে হচ্ছে আপনাকেই আমি পাঠিয়েছিলাম?"

স্টাফ-অফিসার জবাব দিল, "একটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল; অন্যটার কথা আমি জানি না। সারাক্ষণই আমি সেখানে দাঁড়িয়েই হুকুম জারি করছিলাম, আর সবেমাত্র স্থানত্যাগ করেছি……একথা ঠিক যে জায়গাটা তখন বেশ গরম হয়ে উঠেছিল," সে বিনীতভাবে যোগ করল।

একজন জানাল, ক্যাপ্টেন তুশিন গ্রামের কাছেই কোথাও রাত কাটিয়েছে; তাকে ডাকতে লোক গেছে।

প্রিন্স আন্দ্রুকে লক্ষ্য করে প্রিন্স ব্যাগ্রেসন বলল, "ওঃ, কিন্তু তুমি তো সেখানে ছিলে?"

বলকন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে স্টাফ-অফিসার বলল, "তা তো বটেই; তবে ঘটনাচক্রে আমাদের দুজনের দেখাটা হয়নি।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু দুম্ করে বলে ফেলল, "আপনার সঙ্গে দেখা করবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।"

সকলেই চুপচাপ। দরজায় তুশিনকে দেখা গেল। ভীরু পায়ে সে অধিনায়কদের পিছন থেকে এগিয়ে এল। উর্ধ্বতন অফিসারদের সামনে সে সব সময়েই বিব্রত বোধ করে; এখনও তাই হল; খেয়ালের অভাবে পতাকা-দণ্ডটাকে পায়ে মাড়িয়ে দিল। কয়েকজন হেসে উঠল।

যারা হাসল তাদের মধ্যে সব চাইতে উচ্চকণ্ঠ ছিল ঝেরূকভ। যত না ক্যাপ্টেনের দিকে তার চাইতে বেশী যারা হেসেছিল তাদের দিকে ভ্রুকুটি করে ব্যাগ্রেশন প্রশ্ন করল, "একটা কামান পরিত্যক্ত হল কেমন করে?"

কঠোর কর্তৃপক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে দুটো কামান ফেলে এসেও এখনও বেঁচে থাকার অপরাধ ও লজ্জা এই প্রথম তুশিনের কাছে অত্যন্ত ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল। সে এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে এ কথাটা এতক্ষণ তার মনেই পড়ে নি। ব্যাগ্রেশনের সামনে দাঁড়িয়ে তার নীচের চোয়াল কাঁপতে লাগল; কোনরকমে তো-তো করে বলল:

"আমি জানি না……ইয়োর এক্সেলেন্সি……আমার সৈন্য ছিল না ……ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"সাহায্যকারী সৈনিকদের ভিতর থেকে কয়েকজনকে তুমি নিতে পারতে।"

সত্য হলেও এ-কথাটা তুশিন বলতে পারল না যে সাহায্যকারী কোন সৈনিক ছিল না। তার ভয় হল, পাছে অন্য কোন অফিসার বিপদে পড়ে যায়। ভুল করে স্কুলের ছাত্র যেভাবে পরীক্ষকের দিকে তাকায় তেমনিভাবে সে একদৃষ্টিতে ব্যাগ্রেশনের দিকে তাকিয়ে রইল।

বেশ কিছুক্ষণ সকলেই চুপচাপ। প্রিন্স ব্যাগ্রেশন কঠোর হতে চায়নি; তারও আর কিছু বলার ছিল না; অন্য কেউও কিছু বলতে সাহস করল না। প্রিন্স আন্দ্রু ভুরুর নীচ দিয়ে তুশিনের দিকে তাকাল; তার আঙুলগুলো আপনা থেকেই কুঁকড়ে আসছে।

সেই নীরবতা ভেঙে প্রিন্স আন্দ্রু হুম্ করে বলে উঠল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি! আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে ক্যাপ্টেন তুশিনের কামান-মঞ্চে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখলাম, দুই-তৃতীয়াংশ সৈন্য ও ঘোড়া মারা গেছে, দুটো কামান নষ্ট হয়েছে, আর কোনরকম সাহায্যই পাওয়া যায় নি।"

চাপা উত্তেজনার সঙ্গে বল্‌কন্‌স্কি কথাগুলি বলে গেল; প্রিন্স ব্যাগ্রেশন ও তুশিন সমান আগ্রহে শুনতে লাগল।

সে বলতে লাগল, "আর ইয়োর এক্সেলেন্সি যদি আমার কথা শোনেন তো বলি, ওই ক'টি কামান এবং ক্যাপ্টেন তুশিন ও তার দলের সাহসিকতাপূর্ণ কাজই আজকের জয়লাভের প্রধান কারণ" কথা শেষ করে কোন জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই প্রিন্স আন্‌দ্রু টেবিল ছেড়ে উঠল।

তুশিনের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন মাথাটা নুইয়ে বলল, সে যেতে পারে। তাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বেরিয়ে গেল।

তুশিন বলল, "তোমাকে ধন্যবাদ; তুমি আমাকে রক্ষা করেছ প্রিয় বন্ধু!"

প্রিন্স আন্দ্রু চোখ তুলে তাকাল; কিছু না বলেই চলে গেল। মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। সব কিছুই যেন অদ্ভুত; যেমনটি সে আশা করেছিল তেমনটি ঘটল না।

"এরা কারা? এরা এখানে কেন? এরা কি চায়? কতক্ষণে এ সব কিছু শেষ হবে?" সামনের চলমান ছায়াগুলোর দিকে তাকিয়ে রস্তভ ভাবতে লাগল। তার বাহুর যন্ত্রণা ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। একটা দুর্বার তন্দ্রার ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, লাল বৃত্তগুলি নাচছে চোখের সামনে, শারীরিক যন্ত্রণার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে একটা নির্জনতাবোধ। আহত ও অক্ষত এই সব সৈনিকরাই তার পেশীগুলোকে চেপে ধরে মুচড়ে দিচ্ছে, তার মচকে-যাওয়া হাত ও ঘাড়ের মাংস ঝলসে দিচ্ছে। এদের হাত থেকে রেহাই

পাবার জন্য সে চোখ বুজল।

মুহূর্তের জন্য সে ঝিমুতে লাগল; কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই অসংখ্য জিনিস স্বপ্নের মধ্যে তার সামনে হাজির হল; মায়ের মুখ ও লম্বা সাদা হাত, সোনিয়ার ছোট কাঁধ, নাতাশার চোখ ও হাসি, দেনিসভের কণ্ঠস্বর ও গোঁফ আর তেলিয়ানিন এবং বগ্‌দানিচের যত সব কাণ্ড-কারখানা।

সে চোখ মেলে তাকাল। কাঠকয়লার আগুনের গজখানেক উপরে নেমে এসেছে রাতের কালো তন্দ্রাতপ। সে আগুনে পড়ন্ত বরফের টুকরোগুলো ঝল্‌সে উঠছে। তুশিন ফিরে আসে নি; ডাক্তারও আসে নি। এখন সে একা; শুধু একটি সৈনিক আদুল গায়ে আগুনের ওপাশে বসে তার সরু হলুদ শরীরটাকে গরম করছে।

রস্তভ ভাবল, "কেউ আমাকে চায় না! আমাকে সাহায্য করবার, একটু করুণা দেখাবার কেউ নেই। অথচ একদিন আমি সুস্থ ছিলাম, আমার শক্তি ছিল, সুখ ছিল, সকলে আমাকে ভালবাসত।" দীর্ঘশ্বাস ফেলতে গিয়ে আপনা থেকেই সে আর্তনাদ করে উঠল।

"এই, তোমার কষ্ট হচ্ছে কি?" সৈনিকটি শুধাল; তারপর জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই অসন্তুষ্ট গলায় বলল "কত লোক যে আজ পঙ্গু হয়েছে—ভয়াবহ!"

রস্তভ তার কথায় কান দিল না। আগুনের উপরে ঝলসানো বরফের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে তার মনে পড়ে গেল রাশিয়ার শীতকালের একটি আতপ্ত উজ্জ্বল গৃহকোণের কথা, তার পুরু লোমের কোট, দ্রুতগতি স্লেজ-গাড়ি, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ এবং পরিবারের সকলের স্নেহ ও যত্নের কথা। অবাক হয়ে ভাবল, "কেন আমি এখানে এলাম?"

ফরাসীরা পরদিন আর নতুন করে আক্রমণ করল না। ব্যাগ্রেশনের অবশিষ্ট সৈন্যরা কুতুজভের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হল।

[দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত]

তৃতীয় পর্ব

অধ্যায়—১

ভেবেচিন্তে পরিকল্পনা করে সেই মত কাজ করার লোক প্রিন্স ভাসিলি নয়। নিজের সুবিধার জন্য অন্যের ক্ষতি করার কথাও সে ভাবতে পারে না। সে একজন সাধারণ সংসারী লোক; এগিয়ে চলতে চলতে এগিয়ে চলাটাই তার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। নিজে থেকে কোন পরিকল্পনা সে করে না, কোন কৌশলও উদ্ভাবন করে না; পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও মানুষজনের ভিতর থেকেই তার পরিকল্পনা ও কৌশল গড়ে ওঠে। এই ধরনের পরিকল্পনা শুধু একটি-দুটি নয়, ডজন ডজন তার মাথায় ঘোরে, কতকগুলি সবে গড়ে উঠছে, কতকগুলি বাস্তবে রূপায়িত হবার পথে। আবার কতকগুলি নষ্ট হবার পথে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সে কখনও নিজের মনে বলে না! "এই লোকটির প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে, তার বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব আমাকে অর্জন করতে হবে, এবং তাকে দিয়ে একটা বিশেষ কাজ গুছিয়ে নিতে হবে।" অথবা এ কথাও সে বলে না; "পিয়ের ধনী লোক, তাকে ভুলিয়ে আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিতে হবে, এবং তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় চল্লিশ হাজার রুবল ধার নিতে হবে।" কিন্তু কোন পদস্থ লোকের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তার মা তাকে বলে দেয় যে এই লোকটি কাজে লাগতে পারে, আর অমনি আগে থেকে কিছু না ভেবেচিন্তেই প্রিন্স ভাসিলি প্রথম সুযোগেই তার বিশ্বাস অর্জন করে, তাকে খোসামোদ করে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটা অনুরোধ পেশ করে।

মস্কোতে পিয়েরকে হাতের কাছে পেয়ে সে তাকে "শয়ন-কক্ষের ভদ্রজন" পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করে দিয়ে রাষ্ট্রীয় কাউন্সিলের মর্যাদা পাইয়ে দিল এবং যুবটিকে ধরে বসল, তার সঙ্গে পিতাসবুর্গে গিয়ে তার বাড়িতেই বাস করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে আপন-ভোলা হলেও সে যে ঠিক কাজটি করছে সে বিষয়ে একান্ত নিশ্চিত হয়েই প্রিন্স ভাসিলি সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল যাতে পিয়ের তার মেয়েকে বিয়ে করে। আগে থেকে পরিকল্পনা করে নিলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন মর্যাদার লোকদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে সে কখনও এত বেশী সহজ, স্বাভাবিক ও অবিচলিত হতে পারত না। এমন একটা কিছু আছে যা তাকে সর্বদাই অধীকতর ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকদের দিকে টানে; আর সেই সব লোকদের দিয়ে কাজ গুছিয়ে নেবার শুভক্ষণটিকে আঁকড়ে ধরবার একটা বিরল দক্ষতাও তার অধিগত।

কিছুদিন আগেও পিয়ের ছিল নিঃসঙ্গ মানুষ, কোন চিন্তা-ভাবনা তার ছিল না; কিন্তু এখন অপ্রত্যাশিতভাবে কাউণ্ট বেজুখভও মস্তবড় ধনী মানুষ হয়ে যাওয়ায় তার ঝুট-ঝামেলা ও কাজকর্ম এত বেড়ে গেছে যে রাতে শোবার আগে সে আর নিজেকে খুঁজে পায় না। অনেক কাগজপত্রে সই করতে হয়, উদ্দেশ্য না জেনেই সরকারী আপিসে হাজিরা দিতে হয়, প্রধান নায়েবের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হয়, মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারি দেখতে যেতে হয়, আর এমন সব লোককে স্বাগত জানাতে হয় যারা আগে তার অস্তিত্বের খবরটাও রাখত না, অথচ এখন তাদের সঙ্গে দেখা না করলে তারা অসন্তুষ্ট হবে, ক্ষুব্ধ হবে। এই সমস্ত লোকজন ব্যবসায়ী, আত্মীয় ও পরিচিত জন—সকলেই এই তরুণ উত্তরাধিকারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কামনা করে তার স্তাবকতা করে; সকলেরই দৃঢ় ধারণা যে পিয়ের বহু সদ্গুণের অধিকারী। এমন কি যে সব লোক আগে তার প্রতি বিরূপ ছিল, তার সঙ্গে অমিত্রসুলভ আচরণ করত; তারাও এখন তার প্রতি অনুরক্ত ও স্নেহশীল হয়ে উঠেছে। এমন কি সেই কোপনস্বভাবা বড় রাজকুমারীও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে পিয়েরের ঘরে এসেছিল। চোখ নামিয়ে বারবার মুখটা লাল করে সে তাকে বলেছেঃ অতীতের ভুল-বোঝাবুঝির জন্য সে খুবই দুঃখিত, সে জানে যে পিয়েরের কাছে কোন কিছু চাইবার অধিকার তার নেই, তবু যে বাড়িকে সে এত ভালবাসে, যে বাড়িতে সে অনেক কিছু ত্যাগ করেছে, সেই বাড়িতে আরও কয়েক সপ্তাহ থাকবার অনুমতি সে চাইছে। বলতে বলতে সে কেঁদে ফেলল। প্রস্তর-মূর্তিটির মত অবিচল এই রাজকুমারীর এতাদৃশ পরিবর্তন দেখে পিয়ের তার হাতটি ধরে তার কাছে ক্ষমা চাইল; অথচ কিসের জন্য ক্ষমা তা সে জানে না। সেদিন থেকেই পিয়েরের প্রতি বড় রাজকুমারীর মনোভাব সম্পূর্ণ বদলে গেল; সে পিয়েরের জন্য একটা ডোরা-কাটা স্কার্ফ বুনতে শুরু করল।

রাজকুমারীর উপকারের জন্য একটা দলিল সই করাতে সেটা পিয়েরের হাতে দিয়ে প্রিন্স ভাসিলি বলল, "আমার জন্য তুমি এটা কর বাবা; আর যাই হোক, মৃত ব্যক্তিটির জন্য সে অনেককিছু সহ্য করেছে।"

কারুকার্যখচিত পোর্টফোলিওতে যা রয়েছে তাতে নিজের অংশ সম্পর্কে রাজকুমারী যাতে কোন প্রশ্ন না তোলে সেজন্য এই হাড়ের টুকরো—তিরিশ হাজার রুবলের একটা বিল—তাকে দেওয়াই সমীচীন—অনেক ভেবে প্রিন্স ভাসিলি এই সিদ্ধান্তেই এসেছে। পিয়ের দলিলে সই করে দিল, আর তার পর থেকে রাজকুমারী তার প্রতি আরও সদয় হয়ে উঠল। ছোট রাজকুমারীরাও তার প্রতি সদয় হয়ে উঠল; বিশেষ করে গালে তিলওয়ালী একেবারে ছোট সুন্দরীটির হাসি তো প্রায়ই তাকে বিব্রত করে তোলে, আবার পিয়েরের সঙ্গে দেখা হলেই সে নিজেও বিব্রত হয়ে পড়ে।

সকলে যে তাকে ভালবাসে সেটা পিয়েরের কাছে এতই স্বাভাবিক ঘটনা বলে মনে হয়েছে যে চারদিককার লোকজনের আন্তরিকতায় বিশ্বাস না করে সে পারে নি। আসলে এই লোকগুলি আন্তরিক কি না সে প্রশ্ন করবার সময়ই তার ছিল না। সে সদাই ব্যস্ত, সর্বদাই তার সময় কাটছে একটা মধুর নেশার মধ্যে।

প্রথম দিকে অন্য সকলের তুলনায় প্রিন্স ভাসিলিই পিয়েরের বিধি-ব্যবস্থা এবং স্বয়ং পিয়েরকে বেশী করে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। কাউন্ট বেজুখভের মৃত্যুর পর থেকে সে কখনও এই ছেলেটিকে হাতছাড়া হতে দেয় নি, সে এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কাজকর্মের চাপে অত্যন্ত শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত হলেও পুরনো বন্ধুর ছেলেও প্রভূত অর্থের অধিকারী এই অসহায় যুবকটিকে সে ভাগ্যের খেয়ালখুসি ও দুষ্ট লোকের চক্রান্তের হাতে ছেড়ে দিতে পারে না। কাউন্ট বেজুখভের মৃত্যুর পরে যে ক'টা দিন সে মস্কোতে ছিল তখন সে হয় পিয়েরকে ডেকে পাঠাত, আর না হয়তো নিজেই তার কাছে যেত এবং ক্লান্ত গলায় কর্তব্য সম্পর্কে তাকে নানা রকম নির্দেশ দিত; প্রতিবারই সে যেন বলত: "তুমি তো জান কাজকর্ম নিয়ে আমি একেবারে ডুবে আছি, আর শুধু তোমার ভালর জন্যই তোমার কথা ভাবছি; তুমি তো ভাল করেই জান যে আমি যা বলছি একমাত্র সেটাই হওয়া সম্ভব।"

"দেখ বাপু, কাল তাহলে আমরা রওনা হচ্ছি," একদিন প্রিন্স ভাসিলি চোখ বুজে পিয়েরের কনুইতে হাত বুলোতে বুলোতে এমন সুরে কথা বলতে লাগল যেন এ ব্যাপারটা অনেক আগেই স্থির হয়ে আছে এবং এখন আর তার কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে না। "কাল আমরা রওনা হচ্ছি আর আমার গাড়িতে তোমার জন্য একটা জায়গাও রেখেছি। আমি খুব খুসি হয়েছি। এখানে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির ব্যবস্থা হয়ে গেছে; অনেক আগেই আমার এখান থেকে যাওয়া উচিত ছিল। এটা পেয়েছি চ্যান্সেলরের কাছ থেকে। তোমার জন্য তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম, তোমাকে কূটনৈতিক বিভাগে নিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং "শয্যা-কক্ষের ভদ্রজন"-এর পদ দেওয়া হয়েছে।"

পিয়ের কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে প্রিন্স ভাসিলি আবার বলল, "না হে বাপু, যা করেছি নিজের জন্যই করেছি, আমার বিবেককে পরিতুষ্ট করতেই করেছি, সেজন্য ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই। ভালবাসার বাড়াবাড়ির কোন অভিযোগ আজ পর্যন্ত কেউ করে নি; তাছাড়া, তুমি ইচ্ছা করলেই কাল সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার। কিন্তু পিতার্সবুর্গে গেলে সব কিছুই তো নিজের চোখে দেখতে পারবে। এখানকার ভয়ংকর স্মৃতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তোমার এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে।" প্রিন্স ভাসিলি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা। আমার খানসামা তোমার গাড়িতে যেতে পারবে। আরে, আমি তো প্রায় ভুলেই

গিয়েছিলাম। তুমি তো জান বাবা, তোমার বাবার সঙ্গে আমার কিছু দেনা-পাওনার ব্যাপার ছিল, আর তাই রিয়াজান জমিদারি থেকে পাওনাটা আমি নিয়ে নিয়েছি; ওটা আমার কাছেই থাকবে; তোমার ওটা দরকার হবে না। হিসাব-নিকাসটা পরে করা হবে।"

"রিয়াজান জমিদারি থেকে পাওনা" বলতে প্রিন্স ভাসিলি চাষীদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েক হাজার রুবল খাজনার কথাই বলতে চাইল; টাকাটা সে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছে।

যেমন মস্কোতে তেমনি পিতার্সবুর্গেও পিয়েরে সেই একই ভদ্রতা ও স্নেহের পরিবেশই পেল। প্রিন্স ভাসিলি তারজন্য যে চাকরি, বরং বলা যায় পদমর্যাদার (কারণ তাকে কিছুই করতে হয় না) ব্যবস্থা করে দিয়েছে সেটাকে সে অস্বীকার করতে পারেনি; ফলে নানাবিধ আমন্ত্রণ ও সামাজিক বাধ্যবাধকতা এত বেশী বেড়ে গেছে যে অবিরাম হৈ-হল্লায় সে বড়ই বিব্রত বোধ করতে লাগল।

তার আগেকার পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই এখন পিতার্সবুর্গে নেই। রক্ষীবাহিনী রণক্ষেত্রে চলে গেছে; দলখভের পদাবনতি ঘটেছে; আমাতোল যুদ্ধে যোগ দিয়ে মফস্বলে কোথাও চলে গেছে; প্রিন্স আন্‌দ্রু বিদেশে; কাজেই পিয়েরে ইচ্ছামত রাত কাটাবার সুযোগ পাচ্ছে না, বা কোন শ্রদ্ধা-ভাজন বন্ধুর কাছে মন খুলে কথা বলতেও পারছে না। ডিনারে আর বল-নাচেই তার সবটা সময় চলে যাচ্ছে; তার দিন কাটছে প্রধানত প্রিন্স ভাসিলির বাড়িতে তার স্ত্রী, সুন্দরী কন্যা হেলেন ও রাজকুমারীর সাহচর্যে।

সমাজে অন্য সকলের মতই পিয়েরের প্রতি আন্না পাভ্‌লভ্‌না শেরের-এর মনোভাবেরও পরিবর্তন ঘটেছে।

আগেকার দিন আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সামনে গেলেই পিয়েরের মনে হত সে যা কিছু বলছে সেটাই অবান্তর, বুদ্ধিহীন ও বেমানান, অথচ পিহোলিতের অত্যন্ত বোকা-বোকা কথাগুলিও কত চতুর ও মানানসই। এখন তো পিয়ের যা কিছু বলে তাই সুন্দর।

১৮০৫-৬-এর শীতকালের গোড়ার দিকে পিয়ের আন্না পাভ্‌লভ্‌নার একখানা গোলাপি চিঠি পেল; তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সে লিখেছে: "যাকে দেখলেই মন ভরে সেই সুন্দরী হেলেনকে এখানে পাবে।"

চিঠি পড়ে পিয়ের এই প্রথম অনুভব করল যে তার ও হেলেনের মধ্যে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠেছে; এই চিন্তা একদিন তাকে ভীত করে তুলল, কারণ এমন একটা দায় যেন তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে যা সে পূর্ণ করতে পারবে না, আর এতে সে খুসিও হল, কারণ প্রস্তাবটা সুখকর বটে।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার এবারকার "স্বাগত অনুষ্ঠান"টিও ঠিক আগেকার অনুষ্ঠানেরই অনুরূপ; শুধু অতিথিদের সম্মুখে এবার যে নতুন ব্যক্তিটিকে সে

উপস্থিত করেছে সে মর্তেমার্ত নয়, বার্লিন থেকে সদ্য আগত একজন কূটনীতিবিদ; সম্রাট আলেকজান্দারের পৎস্‌দাম পরিভ্রমণ এবং মানব জাতির মহাশত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে দুই সম্মানিত বন্ধুর মধ্যে অবিচ্ছেদ্য মৈত্রীর প্রতিশ্রুতির বিবরণ সংগ্রহ করে নিয়েই সে এখানে এসেছে। কাউণ্ট বেজুখভের মৃত্যুতে সম্প্রতি পিয়েরের যে ক্ষতি হয়েছে সেটা স্মরণ করেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না ঈষৎ বিষণ্ণতার সঙ্গে পিয়েরকে স্বাগত জানাল। এতে পিয়েরের মন বেশ খুসিই হল। স্বাভাবিক কুশলতার সঙ্গেই আন্না পাভ্‌লভ্‌না বিভিন্ন দলকে তার বসবার ঘরে আলাদা আলাদা ভাবে বসিয়েছে। বড় দলটাতে বসেছে প্রিন্স ভাসিলি, সেনাপতিরা, এবং নবাগত কূটনীতিবিদ। আর একটা দল বসেছে চায়ের টেবিলে। পিয়েরের ইচ্ছা ছিল বড় দলটাতেই যোগ দেয়, কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌না তাকে দেখতে পেয়েই আঙুল দিয়ে তার আস্তিনটা চেপে ধরে বলল:

"একটু সবুর কর, আজ সন্ধ্যায় তোমাকে একটা জিনিস দেখাব। (হেলেনের দিকে চোখ ফিরিয়ে সে হাসল।) প্রিয় হেলেন, আমার বেচারি মাসির প্রতি একটু সদয় হও; সে তোমাকে ভালবাসে। দশ মিনিট তার কাছে গিয়ে বস। আর সেখানে যাতে তোমার একঘেয়ে না লাগে সে-জন্য আমাদের প্রিয় কাউণ্ট তোমাকে সঙ্গ দিতে আপত্তি করবে না।"

সুন্দরী হেলেন মাসির কাছে চলে গেল, কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌না পিয়েরকে আটকে রাখল; মনে হল তাকে কিছু চূড়ান্ত ও প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবার আছে।

অপস্রিয়মান সুন্দরীকে দেখিয়ে সে পিয়েরকে বলল, "খুব সুন্দরী নয় কি? আর কি আচার-আচরণ! এত অল্প বয়সে আচরণের কী মহৎ পরিপূর্ণতা! সবই যেন অন্তর থেকে উৎসারিত হচ্ছে! এ মেয়েকে যে জয় করবে সে সুখী হবে! তাকে সঙ্গিনী পেলে সংসারের অতি সাধারণ মানুষও সমাজে উজ্জ্বল আসনের অধিকারী হবে। তোমারও কি তাই মনে হয় না? আমি শুধু চেয়েছিলাম তোমার অভিমতটা জানতে," এই কথা বলে আন্না পাভ্‌লভ্‌না পিয়েরকে ছেড়ে দিল।

পিয়েরও জবাবে হেলেনের আচরণের পূর্ণতা সম্পর্কে তার সঙ্গে ঐক্যমতই প্রকাশ করল। অবশ্য হেলেনের কথা ভাবতে গিয়ে তার রূপ ও নিঃশব্দ মর্যাদা প্রকাশের উল্লেখযোগ্য নৈপুণ্যের কথাই তার মনে পড়েছে।

বৃদ্ধা মাসি দুটি যুবক-যুবতীকে তার ঘরে স্বাগত জানালেও মনে হল সে যেন হেলেনের প্রশংসা করার বদলে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার প্রতি ভীতিকে প্রকাশ করতেই অধিক ইচ্ছুক। বোন-ঝির দিকে তাকিয়ে সে যেন জানতে চাইল, এদের নিয়ে সে কি করবে। যাবার আগে আর একবার পিয়েরের আস্তিন ধরে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আশা করি তুমি বলবে না যে আমার

বাড়িটা বড় একঘেয়ে লাগে।" সে আর একবার হেলেনের দিকে তাকাল।

হেলেন হাসল ; তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে চাইল, তাকে যে দেখবে সেই মজবে—এটা সম্ভব বলে সে মনে করে না। মাসি কাশল, ঢোক গিলল, ফরাসীতে বলল যে হেলেনকে দেখে সে খুব খুসি হয়েছে; তারপর পিয়েরের দিকেঘুরে সেই একইভাবে তাকিয়ে একই অভ্যর্থনা জানাল। কথাবার্তার মাঝখানে হেলেন উজ্জল সুন্দর হাসি হেসে পিয়েরের দিকে তাকাল। পিয়ের এ ধরনের হাসিতে অভ্যস্ত ; তার কাছে এ হাসি অর্থহীন ; তাই সেদিকে সে নজরই দিল না। মাসি পিয়েরের বাবা কাউন্ট বেজুখভের নস্যি-দানির সংগ্রহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে নিজের নস্যি-দানিটা তাদের দেখাল। প্রিন্সেস হেলেন নস্যি-দানির ঢাকনাতে মাসির স্বামীর প্রতিকৃতিটা দেখাতে বলল।

অন্য টেবিলের আলোচনায় কান রেখেই টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে নস্য-দানিটা নেবার জন্য হাত বাড়িয়ে পিয়ের একজন বিখ্যাত ক্ষুদ্রচিত্রশিল্পীর নাম উল্লেখ করে বলল, "এটা বোধ হয় ভিনেসের হাতের কাজ।"

চলে যাবার জন্য কিছুটা উঠে দাঁড়াতেই মাসি হেলেনের পিঠের পিছন দিয়ে নস্য-দানিটা পিয়েরের দিকে বাড়িয়ে দিল। জায়গা করে দেবার জন্য একটু ঝুঁকে হেলেন ছোট্ট করে হাসল। তৎকালীন কেতা অনুযায়ী সান্ধ্য মজলিসে যাবার মত সামনে-পিছনে খুবই নীচু-কাটের পোশাক হেলেন পরেছে। তার শরীরটা পিয়েরের কাছে সবসময়ই মর্মরমূর্তি বলে মনে হয় ; এখন সে পিয়েরের এত কাছে এসেছে যে তার স্বল্প-দৃষ্টি চোখদুটিতেও ধরা পড়েছে হেলেনের গলা ও কাঁধের জীবন্ত আকর্ষণ ; সেগুলো তার ঠোঁটের এত কাছে যে মাথাটা একটু নোয়ালেই তাদের ছোঁয়া যায়। তার দেহের উত্তাপ, নির্বাসের গন্ধ ও পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ সম্পর্কে সে এখন সম্পূর্ণ সচেতন।

হেলেন যেন বলতে চাইছে, "তাহলে কি তুমি আগে খেয়াল কর নি যে আমি কত সুন্দরী ? হ্যাঁ, আমিই এক নারী যে যে-কোন পুরুষের হতে পারে—তোমারও," তার চোখের দৃষ্টি যেন এই কথাই বলছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিয়ের বুঝতে পারল, হেলেন যে তার স্ত্রী হতে পারে, তাই শুধু নয়, হেলেনকে তার স্ত্রী হতেই হবে, এর অন্যথা হতে পারে না।

এই মুহূর্তে তার নিশ্চিতরূপে মনে হল, তারা দু'জন যেন পবিত্র বেদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আসলে সেটা কিভাবে ঘটবে তা সে জানেনা, সেটা যে ভাল কাজ হবে তাও সে জানে না। এমন কি বিনা কারণেই তার মনে হয় যে সেটা খারাপ কাজই হবে, কিন্তু এটা সে জানে যে এ-ঘটনা ঘটবেই।

পিয়ের চোখ নামাল আবার চোখ তুলল ; তার ইচ্ছা করছে নিজের

থেকে অনেক দূরে এক দূরবর্তী সুন্দরী হিসাবে সে হেলেনকে দেখবে ; এই মুহূর্তের আগে পর্যন্ত সেইভাবেই তো দেখেছে, কিন্তু এখন আর সেভাবে দেখতে পারছে না। হেলেন যে তার বড় বেশী কাছে এসে গেছে। সে তাকে অভিভূত করেছে, তাদের দুজনের মধ্যে নিজের বাসনার প্রাচীর ছাড়া আর কোন প্রাচীর এখন নেই।

"বেশ তো, তোমাদের এখানেই রেখে যাচ্ছি," আন্না পাভ্‌লভ্‌নার গলা শোনা গেল। "এখানে তো তোমরা ভালই আছ দেখতে পাচ্ছি।"

সে নিন্দনীয় কিছু করে বসেছে কি না বুঝবার জন্য পিয়ের সলজ্জ ভঙ্গীতে চারদিকে তাকাল। তার মনে হল, তার যা ঘটেছে সেটা যেমন সে নিজে জেনেছে তেমনই অন্য সকলেও জেনেছে।

একটু পরে সে যখন বড় দলটার কাছে গেল তখন আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "শুনছি তুমি নাকি তোমাদের পিতার্সবুর্গের বাড়িটাকে নতুন করে সাজিয়ে তুলছ ?"

কথাটা সত্য। স্থপতি জানিয়েছে সেটা করা দরকার, আর কেন দরকার সেটা না জেনেই পিয়ের তাদের পিতার্সবুর্গের মস্ত বড় বাড়িটার মেরামতের কাজে হাত দিয়েছে।

"খুব ভাল কথা, কিন্তু প্রিন্স ভাসিলির কাছ থেকে চলে যেয়ো না। প্রিন্সের মত বন্ধু থাকা ভাল," প্রিন্স ভাসিলির দিকে তাকিয়ে মহিলাটি বলল। "আমি সে ব্যাপারে কিছু কিছু জানি। কি বল ? আর তুমি এখনও যুবক। তোমার পরামর্শের প্রয়োজন। বুড়িদের ক্ষমতা খাটাচ্ছি বলে আমার উপর রাগ করো না।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না থামল ; বয়সের উল্লেখ করে সব নারীই একটা কিছু শোনবার আশায় চুপ করে যায়। একদৃষ্টিতে দুজনকে দেখে নিয়ে সে আবার বলল, "যদি বিয়ে কর সেটা আলাদা ব্যাপার। "পিয়ের হেলেনের দিকে তাকাল না ; হেলেনও তাকাল না তার দিকে। কিন্তু সে তখন পিয়েরের মারাত্মক কাছে এসে পড়েছে। পিয়ের অস্পষ্টভাবে কি যেন বলে লজ্জায় লাল হয়ে গেল।

যা ঘটে গেল সে কথা ভেবে বাড়িতে ফিরেও পিয়ের অনেকক্ষণ ঘুমতে পারল না। কি ঘটে গেল ? কিছুই না। সে শুধু এইটুকু বুঝেছে যে এই নারী তার হতে পারে।

"কিন্তু সে তো বোকা। আমি নিজেই বলেছি সে বোকা।" পিয়ের ভাবতে লাগল। "সে আমার মনে যে অনুভূতি জাগিয়েছে সেটা তো কদর্য, সেটা তো অন্যায়। আমি শুনেছি যে তার ভাই আনাতোল তার প্রেমে পড়েছিল, তাই নিয়ে একটা কেলেংকারি হয়েছিল, আর সেইজন্যই আনাতোলকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হিপোলিৎ তার ভাই…প্রিন্স

ভাসিলি তার বাবা……এটা খারাপ……” সে ভাবল। কিন্তু এই চিন্তার পাশাপাশি আর একটা চিন্তা মনে আসায় তার মুখে হাসি দেখা দিল। হেলেনের অযোগ্যতার কথা ভাবতে গিয়ে সে আবার এ স্বপ্নও দেখতে লাগল যে সে হবে তার স্ত্রী, সে তাকে ভালবাসবে, সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে উঠবে, এবং তার সম্পর্কে সে যা কিছু শুনেছে সব হয়তো মিথ্যা হয়ে যাবে। সে আবার হেলেনের দিকে তাকাল, প্রিন্স ভাসিলির মেয়ে হিসাবে নয়, একটি ধূসর পোশাকে ঢাকা একটা গোটা মানুষের দিকে। “কিন্তু না! এ চিন্তা কেন আগে আমার মাথায় আসে নি?” পুনরায় সে নিজেকে বলল যে এটা অসম্ভব, এ বিয়ে একটা অস্বাভাবিক, এমন কি অসম্মানজনক ব্যাপারই হবে। কিন্তু হেলেনের সম্পর্কে যত কিছুই সে ভাবুক, সেই সঙ্গেই তার মনের আর এক কোণে হেলেনের মূর্তি নারী সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দেখা দিল।

অধ্যায়—২

১৮০৫-এর নভেম্বর মাসে ভাসিলিকে চারটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে যেতে হল পরিদর্শন উপলক্ষ্যে। এই পরিদর্শনের ব্যবস্থাটা সে নিজেই করে নিয়েছিল যাতে সেই সঙ্গে তার উপেক্ষিত জমিদারিগুলোকে একবার দেখে আসতে পারে এবং সেখানে রেজিমেন্টে কর্মরত ছেলে আনাতোলকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করে সেই ধনী বৃদ্ধের মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়েটাকেও পাকা করতে পারে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে এবং এই সব ব্যবস্থায় হাত দেবার আগে প্রিন্স ভাসিলিকে পিয়েরের ব্যাপারটাও পাকা করতে হবে। একথা ঠিক যে ইদানীং সে বাড়িতে, অর্থাৎ প্রিন্স ভাসিলির বাড়িতেই সারাটা দিন কাটায়, হেলেনের সামনে এলেই কেমন যেন কিম্ভূত, উত্তেজিত ও বোকা-বোকা হয়ে ওঠে (প্রেমিকরা যেরকম হয়ে থাকে) কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে নি।

একদা সকালে দুঃখের সঙ্গে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে প্রিন্স ভাসিলি মনে মনে বলল, “এসবই তো ভাল লক্ষণ, কিন্তু ব্যাপারটা তো পাকাপাকি করে ফেলা দরকার; তার মনে হল, তার কাছে অনেকরকম বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে পিয়েরের আচরণ ঠিক হচ্ছে না। “যৌবন, হাল্কামেজাজ…… বেশ তো, ঈশ্বর তার সহায় হোন, কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত তো করা চাই। আগামী-পরশু লেলিয়ার (হেলেনের আদরের নাম) নামকরণ দিবস। সেদিন দু'তিনজনকে নিমন্ত্রণ করব, তখনও যদি পিয়ের তার করণীয় না করে, তখন সে দায় আমিই নেব—হ্যাঁ, তাই নেব, আমি তার বাবা।”

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার “স্বাগত অনুষ্ঠানে'র এবং যে বিচিত্র রজনীতে পিয়ের স্থির করেছিল যে হেলেনকে বিয়ে করাটা একটা দুর্ঘটনার ব্যাপার হবে আর তাই তাকে এড়িয়ে তার এখান থেকে চলে যাওয়াই উচিত, তারপরে

ছ' সপ্তাহ কেটে গেলেও সে এখনও প্রিন্স ভাসিলির বাড়ি ছেড়ে যায় নি; বরং সে সভয়ে লক্ষ্য করছে যে যত দিন যাচ্ছে ততই লোকের চোখে সে হেলেনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে, হেলেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আর যত ভয়ংকরই হোক হেলেনের ভাগ্যের সঙ্গেই নিজের ভাগ্যকে জড়াতেই হবে। হয়তো সে নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারত, কিন্তু আজকাল এমন একটা দিনও যায় না যেদিন একটা সান্ধ্য মজলিসের ব্যবস্থা করে প্রিন্স ভাসিলি পিয়েরকে সেখানে ডেকে না পাঠায়। আর দেখা হলেই কোন বিশেষ মুহূর্তে প্রিন্স ভাসিলি পিয়েরের হাতখানি ধরে নীচের দিকে নামিয়ে নেয়, অথবা অন্যমনস্কভাবে নিজের বলিরেখাংকিত পরিষ্কার কামানো মুখখানা এগিয়ে ধরে পিয়েরেব চুম্বনলাভের জন্য, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে: "কাল আবার দেখা হবে," অথবা "ডিনারে এস কিন্তু, নইলে তোমার মুখদর্শন করব না," অথবা "তোমার জন্যই তো এখানে রয়ে গেছি," ইত্যাদি। যদিও দেখা হলে প্রিন্স ভাসিলি কদাচিৎ তার সঙ্গে দু'একটা কথা বলে, তবু তাকে হতাশ করবার শক্তি পিয়েবের নেই। প্রতিদিন সে নিজেকে একই প্রশ্ন করে: "হেলেনকে বুঝবার, তার স্বরূপ সম্পর্কে মনস্থির করবার সময় এসেছে। আমি কি আগেই ভুল করেছিলাম, না কি এখন ভুল করছি? না, সে তো নির্বোধ নয়, সে চমৎকার মেয়ে; সে কখনও ভুল করে না, বোকার মত কথা বলে না। সে কথা কম বলে, কিন্তু যেটুকু বলে তা সহজ, সরল, কাজেই সে নির্বোধ নয়। সে তো কখনও লজ্জা পেত না, এখনও লজ্জা পায় না, কাজেই সে খারাপ মেয়েমানুষ হতে পারে না!" যখনই সে কথা বলে তখনই তার মুখে ফুটে ওঠে উজ্জ্বল হাসি। পিয়ের জানে, সকলেই অপেক্ষা করে আছে কবে সে মুখ খুলবে, কবে একটা বিশেষ সীমারেখা সে পার হবে; সে আরও জানে, আগে হোক পরে হোক সীমারেখা তাকে পার হতেই হবে, আর সেকথা ভাবলেই একটা দুর্বোধ্য আতংক তাকে পেয়ে বসে। এই দেড় মাস যাবৎ হাজারবার তার মনে হয়েছে যে সে ক্রমাগত একটা ভয়ংকর গহ্বরের দিকে এগিয়ে চলেছে, আর ভেবেছে: "এ আমি কি করছি? আমার চাই স্থিরসংকল্প। তা কি আমার নেই?

হেলেনের নামকরণ দিবসে নিজেদের লোকজনের একটা ছোট দল প্রিন্স ভাসিলির বাড়িতে নৈশভোজে মিলিত হল। সব বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেই সন্ধ্যায়ই একটি তরুণীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। অতিথিরা সকলেই নৈশভোজে বসেছে। একদা সুন্দরী প্রিন্সেস কুরাগিনা বসেছে প্রধানার আসনে; তার দুই পাশে বসেছে অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন অতিথিরা—জনৈক বৃদ্ধ সেনাপতি ও তার স্ত্রী এবং আন্না পাভ্‌লভ্‌না শেরার। টেবিলের অপর প্রান্তে বসেছে অন্য সব অতিথি, তরুণ-তরুণীরা, এবং পরিবারের লোকজন; পিয়ের ও হেলেন বসেছে পাশা-

পাশি। প্রিন্স ভাসিলি নিজে নৈশভোজনে যোগ দেয় নি: খুসি মনে সে টেবিলের চারধারে ঘুরছে, কখনও এর পাশে কখনও ওর পাশে একটু বসছে। গোটা টেবিলকে সে জমিয়ে রেখেছে। মোমবাতিগুলো জ্বলছে; রুপোর ও কাঁচের বাসনপত্র ঝলমল করছে; মহিলাদের সাজপোশাক এবং পুরুষদের সোনা ও রুপোর স্কন্ধত্রাণগুলিও ঝলমল করছে; লাল উর্দিপরা চাকররা ঘুরছে, আর চিনেমাটির পাত্র, ছুরি-কাঁটা ও গ্লাসের টুং-টাং-এর সঙ্গে মিলে-মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে নানা আলোচনার প্রাণবন্ত গুঞ্জন-ধ্বনি।””

এই পরিবেশের মধ্যে বসে পিয়ের পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে এসব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু সে নিজে, আর তাতেই সে যুগবৎ তুষ্ট ও বিব্রত বোধ করছে। সে যেন একটা কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। কোনকিছুই সে দেখছে না, শুনছে না, বা স্পষ্ট করে বুঝছে না।

সে ভাবল, "এবার সব শেষ। আর কেমন করে এটা ঘটল? এত দ্রুত! এখন বুঝতে পারছি, শুধু তার জন্য নয়, শুধু আমার জন্যও নয়, কিন্তু এখানকার প্রত্যেকের জন্যই সেটা অনিবার্যভাবেই ঘটবে। তারা সকলেই এটা আশা করছে, এটা যে ঘটবেই সে সম্পর্কে তারা এতই সুনিশ্চিত যে আমি তাদের হতাশ করতে পারি না, পারি না। কিন্তু কেমন করে ঘটবে? আমি জানি না, কিন্তু অবশ্যই ঘটবে!"

অথবা হঠাৎই সে যেন লজ্জিত হয়ে উঠল, অথচ সে-লজ্জার কারণ সে জানে না। এই যে সকলেরই মনোযোগ তার দিকেই আকৃষ্ট হয়েছে, সকলেই তাকে ভাগ্যবান ভাবছে, এবং তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে হেলেনবিজয়ী প্যারিস-এর মত—এটাই তার কাছে অদ্ভুত লাগছে। "কিন্তু এবিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই যে এইরকমই হয়ে থাকে, আর অবশ্যই হবে!" এই বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিল। "তাছাড়া এটা ঘটাতে আমি আর কি করছি? কোথায় এর সূচনা? প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে আমি মস্কো থেকে এখানে এসেছি। তখন তো কিছুই ছিল না। কাজেই তার বাড়িতে আমি থাকব না কেন? তারপর হেলেনের সঙ্গে তাস খেলেছি, তার থলিটা হাতে নিয়ে তার সঙ্গে গাড়িতে চেপে বেড়াতে গেছি। কিন্তু এ ব্যাপারটা শুরু হল কখন, আর কেমন করেই বা ঘটল?" আর আজ সে তার পাশেই বসে আছে তার বাকদত্ত স্বামীরূপে; তাকে দেখছে, তার কথা শুনছে, তার সান্নিধ্য, তার নিঃশ্বাস, তার চলন, তার রূপ উপভোগ করছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর দ্বিতীয়বার তাকে কি যেন বলল। কিন্তু পিয়ের এতই আত্মমগ্ন হয়ে পড়েছিল যে সে-কথার কোন অর্থই তার কাছে বোধগম্য হল না।

প্রিন্স ভাসিলি তৃতীয়বার বলল, "আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম বল্‌কন্‌স্কির কাছ থেকে শেষ চিঠি তুমি কবে পেয়েছ? তুমি কেমন যেন

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছ।"

প্রিন্স ভাসিলি হাসল; পিয়ের লক্ষ্য করল, তাকে ও হেলেনকে দেখে সকলেই হাসছে। সে মনে মনে বলল, "বেশ তো, আপনারা যদি সব জেনেই থাকেন, তাতে হলটা কি? কথাটা তো সত্যি!" শিশুর মত সরল হাসি ফুটল তার মুখে; হেলেনও হাসল।

"তুমি কবে চিঠি পেয়েছ? চিঠিটা কি ওল্‌মুজ্‌ থেকে লেখা?" একটা বিতর্কের মীমাংসা করার জন্যই যেন প্রিন্স ভাসিলি কথাটা জানতে চাইল।

পিয়ের ভাবল, "এইসব তুচ্ছ কথা মানুষ বলেই বা কেমন করে আর ভাবেই বা কেমন করে?" একটা নিঃশ্বাস ফেলে জবাব দিল, "হ্যাঁ, ওল্‌মুজ্‌ থেকে।"

নৈশ ভোজনের পরে সঙ্গিনীকে নিয়ে পিয়ের অন্য সকলের সঙ্গে বসবার ঘরে গেল। অতিথিরা চলে যেতে শুরু করল; কেউ কেউ হেলেনের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই চলে গেল কেউ বা মুহূর্তের জন্য তার সঙ্গে দেখা করেই তাড়াতাড়ি বিদায় নিল। বিষণ্ণ নিঃশব্দের মধ্যে কূটনীতিবিদ বসবার ঘর ছেড়ে গেল। তার মনে হল, পিয়েরের সুখের তুলনায় তার কূটনৈতিক সাফল্যের গর্ব কত অর্থহীন। বৃদ্ধ সেনাপতির স্ত্রী যখন জানতে চাইল তার পা কেমন আছে তখন সে খেঁকিয়ে উঠল। মনে মনে বলল, "হায় নির্বোধ বুড়ি! পঞ্চাশ বছর বয়সেও প্রিন্সেস হেলেন এমনি সুন্দরীই থাকবে।"

বৃদ্ধা প্রিন্সকে চুমো খেয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না তার কানে কানে বলল, "মনে হচ্ছে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে পারি। মাথার যন্ত্রণাটা না দেখা দিলে আরও কিছুক্ষণ থেকে যেতে পারতাম"

বৃদ্ধা প্রিন্সেস জবাব দিল না; নিজের মেয়ের সুখের প্রতি ঈর্ষায় তার অন্তর জ্বলছে।

অতিথিরা একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেল। হেলেনকে সঙ্গে নিয়ে পিয়ের সারাক্ষণ ছোট বসবার ঘরটাতেই কাটিয়ে দিল। গত ছ' সপ্তাহ ধরে অনেক সময়ই সে হেলেনের সঙ্গে একা কাটিয়েছে, কিন্তু কোন সময়ই তাকে ভালবাসার কথা বলে নি। এখন সে জেনেছে যে সেটা অনিবার্য, তবু চূড়ান্ত পদক্ষেপ করবার জন্য সে মনস্থির করতে পারছে না। সে লজ্জা পেল; তার মনে হল, হেলেনের পাশের অন্য কারও আসন সে দখল করতে চলেছে। একটা অন্তর্নিহিত কণ্ঠস্বর যেন তাকে চুপি চুপি বলছে, "এ সুখ তোমার জন্য নয়। তোমার মধ্যে যা রয়েছে তা যাদের মধ্যে নেই এ সুখ তাদেরই জন্য।"

কিন্তু কিছু তো বলতেই হবে; তাই হেলেনকে সে জিজ্ঞাসা করল, আজকের ভোজসভায় সে খুসি হয়েছে কি না। হেলেন জবাবে জানাল যে নামকরণ দিবসের অনুষ্ঠান তার খুবই ভাল লাগে।

কিছু কিছু নিকট আত্মীয় এখনও চলে যায় নি। সকলেই বড় বসবার

ঘরটায় বসে আছে। অবসন্ন পায়ে প্রিন্স ভাসিলি পিয়েরের কাছে এগিয়ে এল। পিয়ের উঠে দাঁড়াল। প্রিন্স ভাসিলি কঠোর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কিন্তু তারপরেই মুখের ভাব বদলে পিয়েরের হাত ধরে তাকে বসিয়ে দিয়ে সস্নেহে হাসল।

সঙ্গে সঙ্গেই মেয়ের দিকে ফিরে আদর করে বলল, "এই যে লেলিয়া ?" পরমুহূর্তেই পুনরায় পিয়েরের দিকে ফিরে অস্ফুট স্বরে কি যেন বলে হঠাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিয়েরের মনে হল, প্রিন্স ভাসিলি খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়েছে ; তাতে সেও দুঃখিত হল ; হেলেনের দিকে তাকিয়ে মনে হল সেও মনে কষ্ট পেয়েছে ; তার চোখ যেন বলতে চাইছে : "দেখ, এটা তোমার দোষ।"

পিয়ের ভাবল, "চূড়ান্তভাবে পা ফেলতেই হবে, কিন্তু আমি পারছি না, পারছি না।"

বসবার ঘরে ফিরে গিয়ে প্রিন্স ভাসিলির কানে এল তার স্ত্রী জনৈকা বর্ষীয়সী মহিলাকে পিয়েরের কথাই বলছে।

"অবশ্য এটা একেবারে রাজ-যোটক, কিন্তু সুখের কথা কেউ………"

মহিলাটি বলল, "বিয়ে তো বিধাতার হাতে।"

না শোনার ভান করে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রিন্স ভাসিলি ঘরের একেবারে এককোণে একটা সোফায় গিয়ে বসল। দুই চোখ বুজে যেন ঝিমুতে লাগল। মাথাটা সামনে ঝুঁকে পড়তেই আবার সজাগ হয়ে উঠল।

স্ত্রীকে বলল, "এলিন, যাওতো, দেখে এস ওরা কি করছে।"

প্রিন্স দরজাটা পার হয়ে ছোট ঘরটার দিকে তাকাল। পিয়ের ও হেলেন আগের মতই বসে কথা বলছে।

সে স্বামীকে বলল, "সেই একই অবস্থা।"

প্রিন্স ভাসিলির চোখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল, মুখটা বেঁকে গেল, গাল দুটো কাঁপতে লাগল, মুখে দেখা দিল একটা কর্কশ অসন্তোষের ভাব। গা ঝাড়া দিয়ে উঠে মাথাটাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে মহিলাদের পাশ কাটিয়ে সে ছোট বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। দ্রুত পায়ে সানন্দে সে পিয়েরের কাছে গেল। তার মুখের অস্বাভাবিক জয়োল্লাসের দীপ্তি লক্ষ্য করে পিয়ের সভয়ে উঠে দাঁড়াল।

প্রিন্স ভাসিলি বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ! আমার স্ত্রী আমাকে সব কথাই বলেছে ! — (এক হাত দিয়ে সে পিয়েরকে জড়িয়ে ধরল, অন্য হাতে জড়িয়ে ধরল মেয়েকে।) বাবা…লেলিয়া…আমি খুব খুশি হয়েছি। (তার গলার স্বর কাঁপছে।) তোমার বাবাকে আমি ভালবাসতাম…স্ত্রী হিসাবে ওকে তোমার ভালই লাগবে…ঈশ্বর তোমাদের আশীর্বাদ করুন !…"

সে মেয়েকে আলিঙ্গন করল ; তারপর পিয়েরকেও—দুর্গন্ধ মুখে তাকে

চুমোও খেল। সত্যিকারের চোখের জলেই তার দুই গাল ভিজে গেল।

চীৎকার করে ডাকল, "প্রিন্সেস, এখানে এস !"

বৃদ্ধা প্রিন্সেস এল; সেও কেঁদে ফেলল। বর্ষিয়সী মহিলাটিও চোখে রুমাল চাপা দিল। পিয়েরকে চুমো খাওয়া হল; সেও বারকয়েক সুন্দরী হেলেনের হাতে চুমো খেল। কিছুক্ষণ পরে আবার তাদের একা রেখে সকলেই চলে গেল।

পিয়ের ভাবল, "এ সবই ভবিতব্য, এর অন্যথা হতে পারত না; কাজেই এটা ভাল কি মন্দ সে প্রশ্ন বৃথা। এটা ভালই, কারণ এটা স্পষ্ট, আর এর ফলে একটা যন্ত্রণাদায়ক সন্দেহের অবসান ঘটল।" নিঃশব্দে বাকদত্তার হাতখানি ধরে পিয়ের তার সুন্দর বুকের ওঠা-নামা দেখতে লাগল।

"হেলেন !" একবার ডেকেই সে থেমে গেল।

তার মনে হল, "এসব ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বলতে হয়," কিন্তু লোকে কি বলে তা স্মরণ করতে পারল না। হেলেনের মুখের দিকে তাকাল। হেলেন আরও কাছে সরে এল। তার মুখ লজ্জায় রাঙা।

পিয়েরের চশমা জোড়া দেখিয়ে হেলেন বলে উঠল, "আঃ, ওটা খুলে ফেল····ওটা····"

পিয়ের চশমা খুলে ফেলল। হেলেনের হাতের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে চুমো খেতে উদ্যত হল, কিন্তু একটা দ্রুত, জান্তব গতিতে মাথাটা সরিয়ে নিয়ে হেলেন তার ঠোঁট দুটিকে থামিয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল। তার মুখের পরিবর্তিত, উত্তেজিত ভাব দেখে পিয়ের অবাক হয়ে গেল।

"এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে, কাজ শেষ; তাছাড়া, আমি ওকে ভালবাসি," পিয়ের ভাবল।

এইসব মুহূর্তে কি বলতে হয় সেটা তার মনে পড়ে গেল; সে বলল, "আমি তোমাকে ভালবাসি !" কিন্তু নিজের কণ্ঠস্বরের দুর্বলতায় সে নিজেই লজ্জা পেল।

ছয় সপ্তাহ পরে তার বিয়ে হয়ে গেল; কাউন্ট বেজুখভের নতুন করে আসবাবপত্রে সাজানো পিতার্সবুর্গের মস্ত বড় বাড়িতে বিখ্যাত সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে এবং লক্ষ টাকার মালিক হয়ে সে সুখের সংসার পাতল।

অধ্যায়—৩

১৮০৫-এর নভেম্বর মাসে বৃদ্ধ প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি প্রিন্স ভাসিলির একটা চিঠি পেল; সে জানিয়েছে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করতে আসছে। লিখেছে, "আমি পরিদর্শনের কাজে যাচ্ছি; কাজেই আমার সম্মানিত হিতসাধকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাড়তি সত্তর মাইল পথ পরিক্রমা করতে আমার

কোন আপত্তি থাকতে পারে না ; সেনাবাহিনীতে যোগদানের পথে আমার ছেলে আনাতোলও আমার সঙ্গে যাবে তাই আমি আশা করি, বাবার দেখাদেখি সেও আপনার প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করে সেটা যাতে সে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে আপনাকে জানাতে পারে সে অনুমতি আপনি দেবেন।"

খবরটা শুনে ছোট প্রিন্সেস হঠাৎই বলে ফেলল, "মনে হচ্ছে মেরিকে আর বাইরে বের করতে হবে না? পাণিপ্রার্থীরা নিজেদের তাগিদেই আমাদের কাছে আসছে।"

প্রিন্স নিকলাসের চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল ; মুখে কিছু বলল না।

চিঠি পাবার পক্ষকাল পরে একদিন সন্ধ্যায় প্রিন্স ভাসিলির চাকর-বাকররা আগাম এসে হাজির হল ; সে আর তার ছেলে এল পরদিন।

প্রিন্স ভাসিলির চরিত্র সম্পর্কে বুড়ো বল্‌কন্‌স্কির ধারণা কোনদিনই ভাল নয় ; সম্প্রতি সেটা আরও খারাপ হয়েছে কারণ পল এবং আলেক্সান্দারের নতুন রাজত্বে প্রিন্স ভাসিলি উচ্চ পদে ও সম্মানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। এখন চিঠি থেকে এবং ছোট প্রিন্সেসের উক্তি থেকে সে বুঝতে পারল হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে, আর তার খারাপ ধারণার পরিবর্তে দেখা দিল একটা ঘৃণার মনোভাব। প্রিন্স ভাসিলির কথা মনে হতেই সে যেন খেঁকিয়ে উঠতে লাগল। যেদিন প্রিন্স ভাসিলির আসার কথা সেদিন প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির মন-মেজাজ বিশেষ রকম খিঁচড়ে রইল। প্রিন্স ভাসিলি আসছে বলে তার মন খারাপ হোক, আর তার মন খারাপ বলেই প্রিন্স ভাসিলির আগমনে তার মেজাজ তিরিখ্যি হোক, এটা ঠিক যে তার মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে আছে, আর সকালেই তিখোন স্থপতিকে সাবধান করে দিল সে যেন প্রিন্সের কাছে না যায়।

প্রিন্সের পায়ের শব্দের দিকে স্থপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিখোন বলল, "ওর হাঁটার ধরণটা শুনতে পাচ্ছেন? গোড়ালির উপর ভর দিয়ে পা ফেলছেন—ওর অর্থ আমরা ভালই জানি····"

যাইহোক, সকাল ন'টায় ভেলভেট কোট ও কালো কলার ও টুপি চাপিয়ে প্রিন্স যথারীতি বেড়াতে বেরিয়ে গেল। আগেরদিন বরফ পড়েছে ; বাগানের যে কাঁচের ঘরটার পাশ দিয়ে প্রিন্সের বেড়ানো অভ্যাস তার উপর দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে গেছে : বরফের মধ্যে গাছ-গাছড়াগুলো দেখা যাচ্ছে ; পথের দুপাশের উঁচু বরফের এক পাশে একটা বেলচা আটকে রয়েছে। অগত্যা ভুরু কুঁচকে প্রিন্স নিঃশব্দে সব্জি-ঘর, ভূমিদাসদের বাসস্থান ও বহির্বাটির ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেল।

বাড়ি ফিরবার সময় ওভারসীয়ার তার সঙ্গী হল ; লোকটি আচার-আচরণে তার মনিবের মতই শ্রদ্ধাস্পদ। প্রিন্স তাকে শুধাল, "একটা স্লেজ

যেতে পারবে কি ?"

"ইয়োর অনার, বরফ বেশ পুরু হয়ে পড়েছে। পথটা ঝাঁটা দেওয়াবার ব্যবস্থা করছি।"

মাথাটা নুইয়ে প্রিন্স ফটক পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ওভারসীয়ার ভাবল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে ঝড়টা থেমে গেছে !"

মুখে বলল, "গাড়ি চালিয়ে যাওয়া খুব শক্ত হত ইয়োর অনার। শুনলাম, একজন মন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন।"

প্রিন্স ওভারসীয়ারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ; ভুরু কুঁচকে একদৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে।

"কি ? মন্ত্রী ? কোন্ মন্ত্রী ? কে হুকুম দিল ?" কর্কশ গলায় প্রিন্স বলল। "রাস্তাটা আমার মেয়ের জন্য ঝাঁটা না দিয়ে দেওয়া হল একজন মন্ত্রীর জন্য ! আমার কাছে মন্ত্রী বলে কেউ নেই !"

"ইয়োর অনার, আমি ভেবেছিলাম···"

"তুমি ভেবেছিলে !" প্রিন্স চেঁচিয়ে উঠল। "যতসব রাস্কেল ! বদমাস !··· ভাবনা কাকে বলে তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি !" লাঠিটা তুলে এমনভাবে ঘোরাল যে ওভারসিয়ার আল্‌পাতিচ হঠাৎ সরে না গেলে তার গায়েই লাগত। "ভেবেছিলাম···বদমাসের দল···" প্রিন্স সমানে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু আঘাতকে এড়িয়ে যাওয়ার দুঃসাহসের জন্য ভয় পেলেও আল্‌পাতিচ্ মাথা নীচু করে প্রিন্সের কাছেই এগিয়ে গেল, আর হয়তো সেই কারণেই মুখে "বদমাস ! ···রাস্তার উপর আবার বরফ ছড়িয়ে দাও" বলে চেঁচালেও প্রিন্স দ্বিতীয়বার লাঠিটা না তুলে দ্রুত পায়ে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেল।

ডিনারের আগে প্রিন্সেস মারি ও মাদময়জেল বুরিয়েঁ প্রিন্সের বদমেজাজের খবর পেয়ে তার আসার অপেক্ষায়ই আগে থেকে এসে দাঁড়িয়ে ছিল ; মাদময়জেল বুরিয়েঁর উজ্জ্বল মুখ যেন বলছে : "আমি কিছুই জানি না, আমি আগের মতই আছি," আর প্রিন্সেস মারির মুখখানি বিষণ্ণ, ভীত, চোখ দুটি আনত।

মেয়ের ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স বলল, "বোকা···ন্যাকি পুতুল !"

"আর অপরটি এখানে আসেই নি, কত রকম কথাই যে এরা রটাচ্ছে," খাবার ঘরে ছোট প্রিন্সেকে না দেখে সে ভাবল।

প্রশ্ন করল, "প্রিন্সেস কোথায় ? গা-ঢাকা দিয়েছে ?"

উজ্জ্বল হাসি হেসে মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "তার শরীরটা ভাল নেই। সে আসতে পারবে না। এ অবস্থায় সেটাই স্বাভাবিক।"

"হুম। হুম !" বসতে বসতে প্রিন্স বিড় বিড় করে বলল।

প্লেটটা যথেষ্ট পরিষ্কার মনে না হওয়ায় একটা দাগ দেখিয়ে প্রিন্স সেটা

ছুঁড়ে ফেলে দিল। তিখোন সেটা ধরে নিয়ে একজন পরিচারকের হাতে দিল। ছোট প্রিন্সেস অসুস্থ হয়নি, কিন্তু প্রিন্সের বদমেজাজের খবর পেয়ে এতই ভয় পেয়েছে যে এখানে আসবে না বলেই স্থির করেছে।

মাদময়জেল বুরিয়েঁকে বলেছে, "বাচ্চার জন্যই আমি ভয় পাচ্ছি; ভয় থেকে যে কী হতে পারে তা ঈশ্বরই জানেন।"

বল্ড হিল্‌স্‌-এ ছোট প্রিন্সেস সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকে; সেই সঙ্গে বুড়ো প্রিন্সের প্রতি তার মনে একটা বিরূপতার ভাবও আছে। আবার তার প্রতিও এই বিরূপতার ভাব আছে বুড়ো প্রিন্সেরও মনে, যদিও বিরূপতার চাইতে ঘৃণার ভাবই তার মনে বেশী। বল্ড হিল্‌স্‌-এর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হবার পর থেকেই মাদময়জেল বুরিয়েঁকে ছোট প্রিন্সেসের খুব ভাল লেগেছে। তার সঙ্গেই সারাটা দিন কাটায়, নিজের ঘরে তাকে শুতে বলেছে, প্রায়ই বুড়ো প্রিন্স সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা বলে, সমালোচনা করে।

গোলাপী আঙুল দিয়ে সাদা তোয়ালের ভাঁজ খুলতে খুলতে মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "তাহলে কিছু অতিথি আসছেন, তাই না প্রিয় প্রিন্স? শুনলাম হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্স ভাসিলি কুরাগিন ও তার ছেলে আসছেন?" সপ্রশ্ন স্বরে সে বলল।

"হুম্‌!—হিজ এক্সেলেন্সি খুব দেমাকি ··· অথচ আমিই তার চাকরি করে দিয়েছিলাম।" প্রিন্স ঘৃণার সঙ্গে বলল। "তার ছেলে যে কেন আসছে বুঝতে পারছি না। হয়তো প্রিন্সেস এলিজাবেথ ও প্রিন্সেস মারি জানে। কেন যে সে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আসছে তা তো জানি না। তাকে আমি চাই না। (লজ্জিত মেয়ের দিকে তাকাল।) আজ কি তোমার শরীর খারাপ? অ্যাঁ? আল্‌পাতিচ আজ সকালে যাকে 'মন্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছে তার জন্য ভয় পেয়েছ নাকি?"

"না বাপি।"

ডিনার শেষ করে প্রিন্স পুত্রবধূকে দেখতে গেল। ছোট প্রিন্সেস একটা ছোট টেবিলের পাশে বসে দাসী মাশার সঙ্গে গল্প করছিল। শ্বশুরকে দেখে তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

সে অনেক বদলে গেছে। সুন্দরী হওয়ার পরিবর্তে তার চেহারা এমন সাদাসিদে হয়ে গেছে। গাল বসে গেছে, ঠোঁট ঠেলে উঠেছে, আর চোখ নেমে এসেছে।

প্রিন্স যখন জানতে চাইল তার শরীর কেমন আছে তখন সে বলল, "হ্যাঁ, একটা কষ্ট হচ্ছে।"

"তোমার কি কিছু দরকার আছে?"

"না তো।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রিন্স বিশ্রাম-ঘরে গেল; সেখানে আল্‌পাতিচ মাথা নীচু করেই দাঁড়িয়েছিল।

“বেলচা মেরে সব বরফ আবার পথে ছড়ানো হয়েছে কি?”

“হ্যাঁ ইয়োর এক্সেলেন্সি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ক্ষমা করুন ……ওটা আমারই বোকামি।”

বাধা দিয়ে প্রিন্স বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে;” তারপর অস্বাভাবিক উচ্চ হাসি হেসে হাতটা আলপাতিচের দিকে বাড়িয়ে দিল চুমো খাবার জন্য; তারপর পড়ার ঘরের দিকে চলে গেল।

সেই সন্ধ্যায়ই প্রিন্স ভাসিলি এল। পথেই কোচয়ান ও পরিচারক তার সঙ্গে দেখা করল এবং ইচ্ছা করে ছড়িয়ে রাখা বরফের উপর দিয়ে হৈ হৈ করতে করতে তার স্লেজটাকে টেনে নিয়ে গেল।

প্রিন্স ভাসিলি ও আনাতোলের জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হল।

ওভারকোটটা খুলে রেখে আনাতোল কোণের একটা টেবিলে দুই হাত মুড়ে বসে হাসিমুখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তার মনে হল, সারা জীবনটাই একটা অবিরাম আনন্দের ব্যাপার; যেকারণেই হোক কেউ না কেউ তারজন্য সে আনন্দের যোগান দিয়েই যাবে। একজন রুক্ষ-প্রকৃতির বৃদ্ধ আর একটি ধনবতী কুৎসিত উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে দেখা করতে আসাটাকেও সে সেই দৃষ্টিতে দেখছে। সবকিছুই হয়তো একটা মজার ব্যাপার হয়ে উঠবে। সে ভাবল, “মেয়েটি যখন এত টাকার মালিক তখন তাকে বিয়ে করতে আপত্তি কিসের? ক্ষতি তো কিছু হবে না।

সে দাড়ি কামাল; অভ্যাস মতই সযত্নে ও সুচারুরূপে গন্ধ মাখল এবং সুন্দর মাথাটা উঁচু করে স্বাভাবিক বিজয়ীর ভঙ্গীতে বাবার ঘরে ঢুকল। প্রিন্স ভাসিলির দুটি খানসামা তার সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত; ছেলেকে দেখে সে খুসি মনে ঘাড় নাড়ল, যেন বলতে চাইল, হাঁ, তোমাকে এইরকম দেখতেই আমি চাই।”

যেন পূর্ব আলোচনার জের টেনেই আনাতোল প্রশ্ন করল, “ঠাট্টা নয় বাবা, সত্যি আমি জানতে চাইছি মেয়েটি কি কদাকার?”

“খুব হয়েছে! কী বাজে কথা বলছ! যাই কর, বুড়ো প্রিন্সের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় সাবধান থেকো, শ্রদ্ধাশীল হয়ো।”

প্রিন্স আনাতোল বলল, “হৈচৈ বাধালে আমি কিন্তু কেটে পড়ব। ঐ সব বুড়োদের আমি সইতে পারি না, হ্যাঁ।”

“মনে রেখো, এর উপরেই তোমার সবকিছু নির্ভর করছে।”

এদিকে দাসীমহলে সকলেই জেনে গেছে যে মন্ত্রী ও ছেলে পৌঁছে গেছে; তাদের চেহারার ছবি নিয়ে খুঁটিনাটি বর্ণনাও চলেছে। প্রিন্সেস

মারি নিজের ঘরে একলা বসে বৃথাই মনের উত্তেজনা চাপবার চেষ্টা করছে।

আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "ওরা কেন চিঠি লিখল, লিজাই বা এ-কথা আমাকে বলল কেন? এখন আমি বসবার ঘরে ঢুকব কেমন করে? তাকে যদি পছন্দও হয় তবু তো তার সামনে আমি সহজ হতে পারব না।" বাবার চাউনির কথা মনে হতেই সে ভয়ে সারা হল। ছোট প্রিন্সেস ও মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ইতিমধ্যেই দাসী মাশার কাছ থেকে মন্ত্রীপুত্রের সব খবরই পেয়ে গেছে—সে কি সুন্দর, গোলাপী গাল, ঘন ভুরু; বাবা যখন পা টেনে টেনে দোতলায় উঠছিল, ছেলে তখন তার পিছন পিছন ঈগল পাখির মত এক এক করে তিনটে করে ধাপ পেরিয়ে যাচ্ছিল। এই খবর শুনেই তারা দুজন খল্‌বল্‌ করতে করতে প্রিন্সেস মারিয়ার ঘরে ঢুকল।

ঢুকেই একটা হাতল-চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে ছোট প্রিন্সেস বলল, "তারা এসেছে সে-খবর শুনেছ কি মারি?"

সকালে সাধারণত যে ঢিলে গাউনটা সে পরে তার বদলে এখন পরেছে একটা খুব ভাল পোশাক। চুল সযত্নে পাট করা, মুখখানি উজ্জ্বল। তবু তার সাদাসিদে পোশাক দেখে মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলে উঠল, "একি! প্রিয় সখি, তুমি কি এইরকমই থাকবে নাকি? এখনই তো ভদ্রলোকদের বসবার ঘরে ঢোকার কথা ঘোষণা করা হবে, আর আমাদেরও নীচে নামতে হবে, অথচ তুমি মোটেই সাজগোজ কর নি।"

ছোট প্রিন্সেস উঠে দাসীকে ডাকবার জন্য ঘণ্টা বাজাল, আর প্রিন্সেস মারিকে কিভাবে সাজানো হবে তাড়াতাড়ি তার একটা পরিকল্পনা করে ফেলল। একজন পাণিপ্রার্থীর আগমনে সে যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এতে প্রিন্সেস মারির আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। সে যদি এখন বলে যে নিজের ও তাদের দুজনের ব্যবহারে সে লজ্জা বোধ করছে তাহলে তার নিজের উত্তেজনাটাই ধরা পড়বে, আবার তাদের সাজপোশাকের ব্যাপারে বাধা দিলেও তারা সামনে ঠাট্টা-তামাসা করতে থাকবে। সে লজ্জা পেল, সুন্দর চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এল, মুখে লালের ছোপ লাগল; মাদময়জেল বুরিয়েঁ ও ছোট প্রিন্সেসের হাতে পড়লেই তার মুখে এই রকম আকর্ষণীয় শহিদসুলভ ভাব ফুটে ওঠে। দুই সখী কিন্তু আন্তরিকভাবেই তাকে সুন্দরী করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল। ভাল সাজসজ্জা যেকোন মুখকে সুন্দর করে তুলতে পারে মেয়েদের এই দৃঢ় ধারণার বশেই তারা আন্তরিকতার সঙ্গেই প্রিন্সেস মারিকে সাজাতে বসল।

একটু দূর থেকে প্রিন্সেস মারিকে নজর করে লিজা বলল, "সত্যি ভাই, তোমার এ পোশাকটা মোটেই ভাল নয়। তোমার যে লাল রঙের পোশাকটা

আছে সেটা আনাও। সত্যি! তুমি তো বোঝ তোমার গোটা ভাগ্যই এর উপর নির্ভর করছে। কিন্তু এ পোশাকটা বড় বেশী হাল্কা, তোমাকে ঠিক মানাচ্ছে না।"

কিন্তু লাল পোশাকটা পরিয়ে চুল-বাঁধার ঢং বেশ খানিকটা পাল্টে দেবার পরেও ব্যবস্থাটা তার ঠিক মনঃপুত হল না। দুই হাত এক করে সে বলল, "না, এটাও চলবে না। না মারি, এ পোশাকটাও তোমাকে মানাচ্ছে না। তোমার সেই রোজকার পরার ছোট ধূসর পোশাকটাই ভাল মনে হচ্ছে। দয়া করে সেটাই পর। কাতি, যাও তো প্রিন্সেসের ধূসর পোশাকটা নিয়ে এস। তুমি দেখো মাদময়জেল বুরিয়েঁ, কী রকম একখানা সাজিয়ে দি।"

কিন্তু কাতি যখন নির্দিষ্ট পোশাকটা এনে দিল প্রিন্সেস মারি তখনও আয়নার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল; আয়নার মধ্যেই সে দেখতে পেল, তার চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে, মুখটা কাঁপছে, যেকোন সময় সে কান্নায় ভেঙে পড়বে।

মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "এদিকে এস তো প্রিন্সেস, আর একটু কষ্ট কর।"

ছোট প্রিন্সেস দাসীর হাত থেকে পোশাকটা নিয়ে প্রিন্সেস মারির কাছে গিয়ে বলল, "দেখে নিও, এবার একটা মানানসই অথচ সহজ সরল সাজেই তোমাকে সাজিয়ে দেব।"

প্রিন্সেস মারি বলল, "না, আমাকে রেহাই দাও।"

তার কণ্ঠস্বরে এতখানি গাম্ভীর্য ও বিষণ্ণতা ফুটে উঠল যে অন্যদের তরল কণ্ঠের কলকাকলি তৎক্ষণাৎ থেমে গেল। বড় বড়, চিন্তান্বিত ও অশ্রুপূর্ণ সুন্দর চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে তারা বুঝতে পারল যে এ নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করা নিরর্থক, নিষ্ঠুরতাও বটে।

ছোট প্রিন্সেস বলল, "অন্তত কেশ-বিন্যাসটা পাল্টে নাও!" মাদময়জেল বুরিয়েঁর দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি আগেই বলিনি, এ ধরনের চুলবাঁধা মারির মুখে মানায় না। মোটেই মানায় না! দয়া করে ওটা বদলে দাও।"

চোখের জল না ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করে জবাব এল, "আমাকে ছেড়ে দাও, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে সবই সমান।"

মাদময়জেল বুরিয়েঁ ও ছোট প্রিন্সেস দুজনই নিজেদের কাছে স্বীকার করল যে এ সাজে প্রিন্সেস মারিকে স্বাভাবিক অবস্থার চাইতেও খারাপ দেখাচ্ছে, কিন্তু এখন আর কিছু করার নেই। চিন্তান্বিত, বিষণ্ণ যে-দৃষ্টিতে সে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে তাকে তারা চেনে। প্রিন্সেস মারির মুখের এই ভাব দেখে তারা ভয় পেল না, কিন্তু তারা জানে যে এ ভাব যখন তার মুখে ফুটে ওঠে তখন সে মূক হয়ে যায়, তাকে কোনমতেই সংকল্পচ্যুত করা যায় না।

লিজা বলল, "তুমি কি এটা পাল্টাবে না?" প্রিন্সেস মারি কোন জবাব না দেওয়াতে সে ঘর থেকে চলে গেল।

প্রিন্সেস মারি ঘরে একা রইল। অসহায়ভাবে হাত দুটো ঝুলিয়ে চোখ নীচু করে বসে সে ভাবতে লাগল। তার কল্পনায় ভেসে উঠল একটি শক্তিমান, প্রভাবশালী, আশ্চর্য সুন্দর পুরুষের ছবি যে হবে তার স্বামী; তার সঙ্গে সে যেন চলে গেল এক খুসির জগতে। একটি শিশুর ছবি ফুটে উঠল তার কল্পনায়, তার নিজের সন্তান—আগেরদিন যেমনটি সে দেখেছিল তার নার্সের মেয়ের কোলে—রয়েছে তার কোলে, আর পাশে দাঁড়িয়ে স্বামী তাদের দুজনকে দেখছে। অমনি তার মনে হল, "না, এ অসম্ভব, আমি যে বড় বেশী কুৎসিত।"

দরজায় দাসীর গলা শোনা গেল, "দয়া করে চা খেতে আসুন। প্রিন্স এখনই তার ঘর থেকে বের হবেন।"

সে উঠে দাঁড়াল। নিজের চিন্তায় নিজেই শংকিত হল। নীচে নামবার আগে সে পাশের ঘরে গেল। সেখানে সব দেবমূর্তি ঝোলানো রয়েছে। ত্রাণকর্তার একটি বড় মূর্তির কালো মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুই হাত জোড় করে সে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। একটা বেদানার্ত সন্দেহে তার মন ভরে উঠল। ভালবাসার আনন্দ, একটি পুরুষের প্রতি পার্থিব ভালবাসার আনন্দ কি তার ভাগ্যে আছে? বিয়ের কথা ভাবতে গেলেই প্রিন্সেস মারি সুখের স্বপ্ন দেখে, সন্তানের স্বপ্ন দেখে, কিন্তু অন্তরের গভীরে যে প্রবল বাসনাকে সে লুকিয়ে রেখেছে তার লক্ষ্য পার্থিব ভালবাসা। নিজের কাছ থেকে, অন্যের কাছ থেকে এই বাসনাকে সে যতই লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে ততই সেটা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। সে বলল, "হে ভগবান, অন্তরের এই শয়তানী লোভকে আমি কেমন করে চেপে মারব? শান্তির পথে তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করবার জন্য এই নীচ কল্পনাকে আমি কেমন করে চিরতরে পরিত্যাগ করতে পারব?" প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই ঈশ্বর তার মনের মধ্যেই একটা উত্তরও দিয়ে দিল। "নিজের জন্য কিছুই কামনা করো না, কিছুই খুঁজো না, উদ্বেগ বা ঈর্ষাকে মনে স্থান দিও না। মানুষের ভবিষ্যৎ আর তোমার ভাগ্য তোমার কাছে লুকনোই থাকবে, কিন্তু সব সময় সব কিছুর জন্য প্রস্তুত থেকো। বিবাহের কর্তব্য পালনের ভিতর দিয়ে তোমাকে পরীক্ষা করাই যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, তো তার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে প্রস্তুত থেকো।" মনের মধ্যে এই সান্ত্বনার বাণী শুনে প্রিন্সেস মারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নীচে নেমে গেল; নিজের গাউন বা চুল-বাঁধার কথা, অথবা কেমন করে সে চলবে ও কি কথা বলবে সে-কথাও সে একবারও ভাবল না। আর যে ঈশ্বরের চেষ্টা ভিন্ন মানুষের মাথায় একটা চুলও পড়তে পারে না তাঁর ইচ্ছার তুলনায় এ সবের মূল্যই বা কতটুকু?

অধ্যায়—৪

প্রিন্সেস মারি নীচে নেমে দেখল বসবার ঘরে প্রিন্স ভাসিলি ও তার ছেলে ছোট প্রিন্সেস ও মাদময়জেল বুরিয়েঁর সঙ্গে কথা বলছে। ভারী পা ফেলে সে ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক দুটি ও মাদময়জেল বুরিয়েঁ উঠে দাঁড়াল, আর ছোট প্রিন্সেস তাকে দেখিয়ে ভদ্রলোকদের বলল: "এই হল মারি।" প্রিন্সেস মারি সকলকেই বেশ ভালভাবেই দেখল। দেখল প্রিন্স ভাসিলির মুখ, প্রথমে গম্ভীর, কিন্তু একটু পরেই মুখে হাসি; মারি অতিথিদের মনের উপর কতটা দাগ কাটতে পেরেছে সেইদিকেই ছোট প্রিন্সেসের কড়া নজর। সে দেখল, মাদময়জেল বুরিয়েঁর ফিতে-বাঁধা মুখ ও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দৃষ্টি যুবকটির উপর নিবদ্ধ, কিন্তু সে নিজে তাকে দেখতে পাচ্ছে না, সে শুধু দেখল একটা মস্তবড়, উজ্জ্বল ও সুন্দর কিছু তার দিকে এগিয়ে আসছে। প্রথমে এগিয়ে এল প্রিন্স ভাসিলি; প্রিন্সেস মারি তার ঝুঁকে-পড়া টাকওয়ালা কপালে চুমো খেল, আর তার প্রশ্নের উত্তরে জানাল যে তাকে তার ভাল-ভাবেই মনে আছে। তারপর এগিয়ে এল আনাতোল। এখনও সে তাকে দেখতে পেল না। শুধু অনুভব করল একটা নরম হাত তার হাতটাকে চেপে ধরল, আর সে একটি সাদা কপালে তার ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল; সে-কপালের উপরকার হাল্কা বাদামী রঙের চুলে পমেডের গন্ধ। তার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারি তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ইউনিফর্মের একটা বোতামের নীচে ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি রেখে সে দাঁড়িয়ে আছে; প্রশস্ত বুক, পিঠটা একটু বাঁকানো; একটা পা ঈষৎ দোলাতে দোলাতে মাথাটাকে একটু নুইয়ে উজ্জ্বল মুখে সে প্রিন্সেসের দিকে তাকাল, কিন্তু কোন কথা বলল না, বরং মনে হল তার কথা সে ভাবছেই না। আনাতোল খুব তাড়াতাড়ি কিছু বুঝতে পারে না, আলাপ-পরিচয়ের ব্যাপারেও সে পটু নয়। প্রিন্সেস সেটা বুঝতে পেরে তার বাবার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু আসর জমিয়ে তুলল ছোট প্রিন্সেস লিজা। প্রিন্স ভাসিলির কাছে গিয়ে সে চপলতার সঙ্গে এমন সব পুরনো ঠাট্টা ও মজার স্মৃতির উল্লেখ করতে লাগল যা কোনদিন ঘটে নি। আনাতোলাকেও সে এই আলোচনায় ডেকে আনল। মাদময়জেল বুরিয়েঁ তাদের সঙ্গে যোগ দিল। এমন কি প্রিন্সেস মারিও এবার পিছিয়ে রইল না।

ছোট প্রিন্সেস ফরাসীতে প্রিন্স ভাসিলিকে বলল, "প্রিয় প্রিন্স, এখানে অন্তত আপনাকে একান্তভাবে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। আনেৎ-এর প্রীতিভোজ থেকে কিন্তু আপনি সর্বদাই পালিয়ে বেড়াতেন। প্রিয় আনেৎকে নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে!"

"ওঃ, কিন্তু আনেৎ-এর মত তুমিও আবার রাজনীতির কথা শুরু করবে না তো!"

"আর আমাদের সেই ছোট্ট চায়ের আসর!"

"ওঃ, হ্যাঁ।"

ছোট প্রিন্সেস আনাতোলকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কেন কখনও আনেৎ-এর বাড়ি যেতেন না?" একটা চতুর কটাক্ষে হেসে সে বলল, "আহা আমি জানি, আমি জানি। আপনার ভাই হিপোলিৎ আমাকে সব বলেছে। আহা, এমন কি প্যারিসে আপনার কাণ্ড-কারখানার কথাও আমি শুনেছি।"

প্যারিসের কথা শুনেই মাদময়জেল বুরিয়েঁ সুযোগমত আলোচনায় যোগ দিল। সে জানতে চাইল, আনাতোল কি অনেক দিন হল প্যারিস ছেড়ে এসেছে, আর সে শহরটাই বা তার কেমন লেগেছে। আনাতোল সঙ্গে সঙ্গে এই ফরাসিনীর কথার জবাব দিল এবং সহাস্যে তার দিকে তাকিয়ে তার স্বদেশ সম্পর্কে নানা কথা বলতে লাগল। সুন্দরী বুরিয়েঁকে দেখে আনাতোলের মনে হল, বল্ড হিল্স্ তাহলে খুব একঘেয়ে লাগবে না। তাকে ভাল করে দেখে নিয়ে ভাবল, "মোটেই খারাপ নয়! এই ছোট্ট সঙ্গিনীটি মোটেই খারাপ নয়। আশা করি আমাদের বিয়ের পরে প্রিন্সেস একেও সঙ্গে নিয়ে যাবে; এই ছোট্ট সুন্দরীটি মনোহারিণী বটে!"

বুড়ো প্রিন্স তার পড়ার ঘরে ধীরে সুস্থে সাজগোজ করতে লাগল; চোখ কুঁচকে ভাবতে লাগল, সে কি করবে। এই দুটি অতিথির আগমনে সে বিরক্ত হয়েছে। "প্রিন্স ভাসিলি ও তার ছেলে আমার কে? প্রিন্স ভাসিলি একটা বাজে দাম্ভিক লোক; অবশ্য তার ছেলেটি ভাল!" যে অমীমাংসিত প্রশ্নটাকে সে সব সময় চেপে রাখতে চেয়েছে, নিজেকে সব সময় ঠকিয়েছে, এদের দুজনের আগমনে সেই প্রশ্নটা নতুন করে তার মনে জেগেছে বলেই তার এত রাগ। প্রশ্নটা হল, সে কি কোনদিন মেয়েকে বিদায় দিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠাতে পারবে। প্রিন্স কখনও প্রশ্নটাকে সরাসরি নিজের কাছে করে নি, কারণ সে জানে তাকে উচিত জবাবই দিতে হবে, আর সে উচিত জবাব যে শুধু তার মনকেই আঘাত করবে তাই নয়, আঘাত করবে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনার মূলে। তার কাছে প্রিন্সেস মারির মূল্য যত অল্পই হোক, তবু তাকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা সে যে ভাবতেই পারে না। সে ভাবতে লাগল, "আর সে বিয়ে করবে কেন? অসুখী যে হবে সেটা তো নিশ্চিত। এই তো লিজার বিয়ে হয়েছে আন্দ্রুর সঙ্গে—আজকের দিনে তারচাইতে একটি ভাল স্বামীর কথা ভাবাই যায় না—কিন্তু নিজের ভাগ্য নিয়ে সে কি খুসি? আর ভালবেসে মারিকে বিয়ে করবে কে? কথাটা তো যেমন সরল তেমনি অদ্ভুত! তার উচ্চ বংশ ও সম্পত্তির কথা ভেবেই তারা তাকে গ্রহণ করবে। পৃথিবীতে কি অবিবাহিতা নারী কেউ নেই, আর তারা কি সুখী নয়?" পোশাক পরতে পরতে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি এই কথাগুলিই ভাবছিল; অথচ যে প্রশ্নটিকে সে এতদিন চাপা দিয়ে রেখেছিল আজ তার জবাব দেবার সময় এসেছে। বিয়ের প্রস্তাব করতেই প্রিন্স ভাসিলি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে

এসেছে; আজ হোক কাল হোক, সে তো একটা জবাব চাইবেই। তার জন্ম, তার সামাজিক মর্যাদা তো খারাপ নয়। "এর বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই, প্রিন্স নিজের মনেই বলল," কিন্তু তাকে আমার মেয়ের যোগ্য হতে হবে। আর সেটাই আমাদের ভাল করে দেখতে হবে।"

"সেটাই আমাদের দেখতে হবে! সেটাই আমাদের দেখতে হবে!" সে উচ্চকণ্ঠে বার বার বলতে লাগল।

যথারীতি সতর্ক পদক্ষেপে দ্রুত চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে বসবার ঘরে ঢুকল। ছোট প্রিন্সেসের পোশাকের পরিবর্তন, মাদময়জেল বুরিয়েঁর ফিতে, প্রিন্সেস মারির বেমানান কেশ-বিন্যাস, মাদময়জেল বুরিয়েঁ ও আনাতোলের হাসি, আর চার পাশের কলগুঞ্জনের মধ্যে তার মেয়ের নিঃসঙ্গতা—এ সব কিছুই তার দৃষ্টি এড়াল না। বিরক্ত হয়ে তার দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, "কেমন বোকার মত সেজেছে! ওর লজ্জা নেই, আর ছেলেটিকেও উপেক্ষা করেছে!"

সে সোজা প্রিন্স ভাসিলির দিকে এগিয়ে গেল।

"আরে! কেমন আছেন? কেমন আছেন? আপনাকে দেখে খুসি হলাম!"

প্রিন্স ভাসিলি তার স্বভাবসিদ্ধ দ্রুত, আত্মবিশ্বাসেভরা স্বরে বলল, "বন্ধুত্বের টান দূরত্বকে উপহাস করে। এই আমার দ্বিতীয় পুত্র; দয়া করে তাকে ভালবাসবেন, তার বন্ধু হবেন"

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি আনাতোলকে ভাল করে দেখতে লাগল।

বলল, "বড় ভাল ছেলে! বড় ভাল ছেলে! এসেছ, আমাকে চুমো-খাও।" সে গালটা বাড়িয়ে দিল।

আনাতোল বৃদ্ধকে চুমো খেল; কৌতূহল ও পরিপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল; বাবার মুখে তার যেসব খামখেয়ালের কথা শুনেছে না জানি কতক্ষণে সেগুলো প্রকাশ পাবে।

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি সোফার এককোণে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে একটা হাতল-চেয়ার টেনে নিয়ে প্রিন্স ভাসিলিকে ইঙ্গিতে বসতে বলে নানা রাজনৈতিক ব্যাপার ও সংবাদ সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। প্রিন্স ভাসিলির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেও সে বারবার প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাতে লাগল।

প্রিন্স ভাসিলির শেষের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করে সে বলল, "তাহলে তারা ইতিমধ্যেই পট্‌স্‌ডাম থেকে লিখতে শুরু করেছে?" তারপরই হঠাৎ সে মেয়ের কাছে চলে গেল।

বলল, "তুমি কি অতিথিদের জন্যই এরকম সেজেছ, অ্যাঁ? ভাল, খুব ভাল! অতিথিদের জন্য তুমি নতুন কেতায় চুল বেঁধেছ; তাই তাদের

সামনেই বলছি, ভবিষ্যতে আমার অনুমতি ছাড়া তুমি কখনও তোমার সাজগোজের পরিবর্তন করতে পারবে না।"

ছোট প্রিন্সেস সলজ্জভাবে বাধা দিয়ে বলল, "দোষটা আমার।"

পুত্রবধূর সামনে মাথাটা নুইয়ে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি বলল, "তুমি যা খুসি তাই করতে পার, কিন্তু ও তো নিজেকে তোমার হাতের পুতুল বানাতে পারে না; এমনিতেই তো ও সাদাসিদে মানুষ।"

মেয়ের দিকে আর না তাকিয়ে সে নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল; মেয়েটির চোখে জল এসেছে।

প্রিন্স ভাসিলি বলল, "বরং আমি তো দেখছি এই চুল বাঁধাটা প্রিন্সেস-কে খুব ভাল মানিয়েছে।"

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি আনাতোলের দিকে ঘুরে বলল, "এই যে তরুণ প্রিন্স, তোমার নামটা কি? এদিকে এস; তোমার সঙ্গে কথা বলি, পরিচয় করি।"

হেসে বুড়ো প্রিন্সের পাশে বসে আনাতোল ভাবল, "এই খেলা শুরু হল।"

"দেখ বাপু, শুনেছি তুমি বিদেশে শিক্ষা পেয়েছ, তোমার বাবা ও আমার মত ডিয়েকনের কাছে লিখতে ও পড়তে শেখ নি। এখন বল তো বাপু, তুমি কি অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীতে কাজ করছ?"

কোনরকমে হাসি চেপে আনাতোল বলল, "না, আমাকে শিবিরে বদলি করা হয়েছে।"

"আঃ! খুব ভাল কথা। তাহলে বাবা, জারকে ও দেশকেই তো তুমি সেবা করতে চাও? এখন যুদ্ধের সময়। আচ্ছা, তুমি কি সীমান্তে যাচ্ছ?"

"না প্রিন্স, আমাদের রেজিমেণ্ট সীমান্তে চলে গেছে, কিন্তু আমি যুক্ত রয়েছি……কিসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি বাপি?" হেসে বাবার দিকে ফিরে আনাতোল বলল।

"চমৎকার সৈনিক, চমৎকার! 'আমি কিসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি!' হা হা, হা!" প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি হেসে উঠল। আরও জোরে হেসে উঠল আনাতোল। হঠাৎ প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

"তুমি যেতে পার," সে আনাতোলকে বলল।

আনাতোল হেসে মহিলাদের মধ্যে চলে গেল।

"আপনি তো ওকে বিদেশে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তাই না প্রিন্স ভাসিলি?" বুড়ো প্রিন্স প্রশ্নটা করল।

"আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, আর আপনাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি যে সেখানকার শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের চাইতে অনেক ভাল।"

"হ্যাঁ, আজকাল সবকিছুই অন্য রকম হয়ে গেছে, সবকিছুই বদলে গেছে। ছেলেটি খুব সুন্দর। খুব সুন্দর, এখন আমার সঙ্গে আসুন।" প্রিন্স ভাসিলির হাত ধরে বুড়ো প্রিন্স নিজের পড়ার ঘরে নিয়ে গেল। ঘরে যখন শুধু তারাই দুজন তখনই প্রিন্স ভাসিলি তার আশা ও বাসনার কথা জানাল।

বুড়ো প্রিন্স সক্রোধে বলল, "আপনি কি মনে করেন আমি মেয়েকে বাধা দেব, তাকে ছাড়া থাকতে পারব না? কী যে ধারণা সব! বিয়ের জন্য আমি কালই প্রস্তুত! শুধু বলতে চাই, আমার জামাতাকে আমি ভাল করে জানতে চাই। আমার নীতি তো আপনি জানেন—সবকিছুই খোলাখুলি! আপনার সামনেই কাল মেয়েকে জিজ্ঞেস করব; মেয়ে যদি রাজী থাকে তো আপনার ছেলে এখানে থাকুক। সে থাকুক, আমিও সবকিছু দেখি।" নাক ঝাড়ার শব্দ করে বুড়ো প্রিন্স আরও বলল, "সে বিয়ে করুক না, আমার কাছে সবই সমান!" নিজের ছেলের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় যে মর্মভেদী স্বর ফুটেছিল তার গলায় সেই-রকম আর্তস্বরেই সে কথাটা বলল।

এরকম একজন তীক্ষ্ণদৃষ্টির মানুষের কাছে চালাকি করে কোন ফল হবে না বুঝতে পেরে প্রিন্স ভাসিলি বলল, "সব কথাই খোলাখুলিভাবে আপনাকে বলব। আপনি তো সবই বোঝেন, মানুষের ভিতরটা পর্যন্ত আপনি দেখতে পান। আনাতোল প্রতিভাধর নয়, কিন্তু সে সৎ ও উদার অন্তঃকরণের ছেলে; পুত্র হিসাবে, আত্মীয় হিসাবে সে চমৎকার।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, দেখাই যাক।"

যেসব নারী দীর্ঘদিন পুরুষসমাজ থেকে দূরে থাকে তাদের বেলায় সাধারণত যা ঘটে থাকে এক্ষেত্রেও তাই ঘটল; আনাতোলের আবির্ভাবে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির পরিবারের তিনটি নারীরই মনে হল, এতদিন তারা সত্যিকারের জীবনের স্বাদ পায় নি। তাদের চিন্তার, অনুভূতির ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা সঙ্গে সঙ্গে দশগুণ বেড়ে গেল; তাদের যে জীবন এতদিন কেটেছে অন্ধকারে সহসা তা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে পরিপূর্ণ তাৎপর্যের উজ্জ্বল আলোয়।

নিজের মুখ ও চুল বাঁধার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেল প্রিন্সেস মারি। যে লোকটি তার স্বামী হতে পারে তার সুন্দর মুখের চিন্তায় সে বিভোর হয়ে রইল। তার মনে হল, এই মানুষটি দয়ালু, সাহসী, স্থিরসংকল্প, পুরুষোচিত ও উদার। সেবিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই। তার কল্পনায় ভেসে বেড়াতে লাগল অনাগত পারিবারিক জীবনের হাজার স্বপ্ন। সে তাদের মন থেকে তাড়িয়ে দিল, লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করল।

প্রিন্সেস ভাবল, "কিন্তু আমি কি তার প্রতি বড় বেশী উদাসীন হই নি? আমি গম্ভীর হতে চেষ্টা করছি, কারণ অন্তরের গভীরে ইতিমধ্যেই আমি তার বড় বেশী কাছে এসে পড়েছি; কিন্তু আমার মনের কথা তো সে জানতে পারবে না, হয়তো ভাববে আমি তাকে পছন্দ করি না।"

প্রিন্সেস মারি নতুন অতিথিটির প্রতি সদয় হতে চেষ্টা করল, কিন্তু পেরে উঠল না। আনাতোল ভাবল, বেচারি, মেয়েটি জঘন্য রকমের কুৎসিত!"

মাদময়জেল বুরিয়েঁর চিন্তা অন্যরকমের। প্রিন্স বল্‌কন্‌কির বাড়িতে সারাজীবন কাটাবার ইচ্ছা তার মোটেই নেই। অনেকদিন ধরে সে অপেক্ষা করে আছে কবে একটি রুশ প্রিন্স এসে তাকে একনজর দেখেই এই সাদাসিদে, বিশ্রী সাজসজ্জার রুশ প্রিন্সেসটির তুলনায় তার শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করতে পারবে, তার প্রেমে পড়বে এবং তাকে নিয়ে চলে যাবে; আর অবশেষে এই তো এসেছে সেই রুশ প্রিন্স—এসেছে গল্পের রাজপুত্র। সে তাকে নিয়ে যাবে, তাকে বিয়ে করবে। আনাতোলের সঙ্গে প্যারিস শহর নিয়ে আলোচনার মুহূর্ত থেকেই এই ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি তার মাথায় ঢুকেছে। তার মনেও বাসনা জাগল আনাতোলকে খুসি করবে, আর যথাসম্ভব সেই চেষ্টাই সে করতে লাগল।

বুড়ো যুদ্ধের ঘোড়া যেমন ভেরীর বাজনা শুনলেই টগবগিয়ে ওঠে ছোট প্রিন্সেসও নিজের অবস্থা ভুলে সম্পূর্ণ অচেতনভাবেই পরিচিত পূর্বরাগের জোড় কদমের তালিম দিতে শুরু করল। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আত্মদ্বন্দ্বের প্রেরণায় নয়, সরল ও হাল্কা আমোদের ছলেই সে ছলাকলায় মন দিল।

আনাতোল যদিও নারী সমাজে বহু-আকাংখিত ক্লান্ত পুরুষের ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকে, তবু তিনটি নারীর উপর তার প্রভাব লক্ষ্য করে সে গর্বে ডগমগ হয়ে উঠল। তাছাড়া, সুন্দরী ও উত্তেজনাময়ী মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর প্রতি তার মনে জাগতে শুরু করেছে সেই দুর্বার পাশবিক কামনা যা তাকে সহসা গ্রাস করে বসবে এবং অত্যন্ত রূঢ় বেপরোয়া কাজের পথে তাকে টেনে নিয়ে যাবে।

চায়ের পরে সকলে বসবার ঘরে গেল, আর সেখানে প্রিন্সেস মারিকে ক্লাভিকর্ড (বাদ্যযন্ত্র) বাজাতে বলা হল। আনাতোল খোশ মেজাজে হাসতে হাসতে এগিয়ে গিয়ে তার মুখোমুখি এবং মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর পাশে কনুইতে ভর দিয়ে দাঁড়াল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারির মনে জাগল বেদনাময় আনন্দের অনুভূতি। তার প্রিয় সোনাতা তাকে নিয়ে গেল এক অতিপরিচিত কাব্যের জগতে; আনাতোলের চোখের দৃষ্টি সে-জগৎকে করে তুলল আরও কাব্যময়। কিন্তু আনাতোলের চোখ তার উপরে

থাকলেও তার মন পড়ে ছিল মাদময়জেল বুরিয়েঁর ছোট্ট পা-খানির গতিবিধির উপর ; ক্ল্যাভিকর্ডের নীচ দিয়ে সে তখন নিজের পা দিয়ে মাদময়জেল বুরিয়েঁর পা-খানি ছুঁয়েছিল। মাদময়জেল বুরিয়েঁও তাকিয়ে আছে প্রিন্সেস মারির দিকে, কিন্তু তার মধুর দুটি চোখে তখন ফুটে উঠেছে যে বেদনাময় আনন্দ ও আশা সেটা প্রিন্সেসের কাছে একান্তই নতুন।

প্রিন্সেস মারি ভাবল, "সে আমাকে কত ভালবাসে! এখন আমি কত সুখী, আর এরকম একটি বন্ধুকে নিয়ে, স্বামীকে নিয়ে আমি কত সুখীই না হতে পারব! স্বামী? তা কি সম্ভব হবে?"

নৈশভোজনের পরে সকলের যখন শুতে যাবার সময় হল তখন আনাতোল প্রিন্সেস মারির হাতে চুমো খেল। প্রিন্সেস মারি জানে না এ-সাহস সে কোথায় পেল, কিন্তু একখানি সুন্দর মুখ যখন তার স্বপ্ন-দৃষ্টি চোখ দুটির কাছে এগিয়ে এল তখন সে সোজাসুজি সেই মুখের দিকে তাকাল। প্রিন্সেস মারির কাছ থেকে সরে গিয়ে আনাতোল মাদময়জেল বুরিয়েঁর হাতে চুমো খেল। (এটা শিষ্টাচারসম্মত নয়, কিন্তু সব কাজই সে করে সরলভাবে, নিশ্চয়তার সঙ্গে।) মাদময়জেল বুরিয়েঁ লাজরক্ত হয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে প্রিন্সেসের দিকে তাকাল।

প্রিন্সেস ভাবল, "কী বিনয়! আমার প্রতি এমেলির (মাদময়জেল বুরিয়েঁ) অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগের কোন মূল্য না দিয়ে আমি তাকে ঈর্ষা করব, একথা তার পক্ষে ভাবাও কি সম্ভব?" তার কাছে এগিয়ে গিয়ে গভীর আবেগে তাকে চুমো খেল। ছোট প্রিন্সেসকে চুমো খাবার জন্য আনাতোল তার দিকে এগিয়ে গেল।

"না! না! না! তোমার বাবা যখন আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন যে তোমার স্বভাব ভাল হয়েছে তখনই তোমাকে আমার হাতে চুমো খেতে দেব। তার আগে নয়!" ছোট প্রিন্সেস বলে উঠল। হেসে আনাতোলকে লক্ষ্য করে একটা আঙুল তুলে সে ঘর থেকে চলে গেল।

অধ্যায়—৫

সকলে যার যার মত চলে গেল। বিছানায় শোয়ামাত্রই আনাতোল ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু বাকি সকলেই সে-রাতটা অনেকক্ষণ জেগে কাটাল।

"এই যে লোকটি অপরিচিত হয়েও এত সদয়—হ্যাঁ, সদয় হওয়াটাই বড় কথা—সে কি সত্যি আমার স্বামী হবে"—এই কথাটি ভাবতেই প্রিন্সেস মারির মনে ভয় দেখা দিল। চারদিকে তাকাতেও তার ভয়—তার মনে হল যেন ঘরের অন্ধকার কোণে পর্দার আড়ালে একজন কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সেই একজন "সে"—শয়তান—আবার সাদা কপাল, কালো ভুরু ও লাল ঠোঁটের এই মানুষটিও "সে"।

ঘণ্টা বাজিয়ে দাসীকে ডাকল ; তাকে বলল তার ঘরে এসে ঘুমোতে।

সেই রাতে মাদময়জেল বুরিয়েঁ বৃথাই একজনের প্রত্যাশায় দীর্ঘ সময় সজ্জি-ঘরে পায়চারি করে বেড়াল।

ছোট প্রিন্সেস দাসীকে বকুনি দিল; বিছানাটা ঠিকমত করা হয় নি। না উপুড় হয়ে না এক পাশে—কোনভাবেই সে শুতে পারছে না। যেভাবে শোবার চেষ্টা করছে তাতেই অস্বস্তি বোধ হচ্ছে। ড্রেসিং-গাউন ও রাত-টুপি পরে সে একটা হাতল-চেয়ারে বসে রইল, আর ঘুম-ঘুম চোখে গজ্‌গজ্‌ করতে করতে কাতি তৃতীয়বার তার পালকের বিছানাটা ঠিকঠাক করে দিল।

ছোট প্রিন্সেস আরও একবার বলল, "তোমাকে তো বলেছি, বিছানার কোথাও ফুলে উঠেছে, কোথাও নীচু হয়েছে। আমি তো ঘুমতে পারলেই খুসি হই, কাজেই দোষটা আমার নয়।" ক্রন্দনমুখী শিশুর মত তার গলাটা কাঁপছে।

বুড়ো প্রিন্সও ঘুমতে পারল না। আধা ঘুমের মধ্যে তিখোন শুনতে পেল, সে সক্রোধে ঘরময় পায়চারি করছে আর গড়্‌ গড়্‌ করছে। তার মনে হচ্ছে, মেয়ের জন্য সে অপমানিত হয়েছে। সে অপমান তাকে আরও বেশী বেজেছে কারণ অপমানটা তার নয়, তার মেয়ের, আর সেই মেয়েকে সে নিজের অধিক ভালবাসে। সে বার বার নিজেকে বলতে লাগল, সমস্ত ব্যাপারটা ভেবে দেখতে হবে, কোন্‌টা ঠিক আর তার কি করা উচিত তাও স্থির করতে হবে; কিন্তু তার বদলে সে ক্রমাগত উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল।

"প্রথম একটা পুরুষ মানুষকে দেখল—অমনি বাবাকে ভুলে গেল, সবকিছু ভুলে গেল; ছুটে উপরে গিয়ে চুল বেঁধে ল্যাজ নাড়তে লাগল, আর একেবারেই বদলে গেল! বাবাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েই খুসি! আর সে জানে যে সবই আমার নজরে পড়ে! ফ্র···ফ্র···ফ্র····! আমি কি দেখতে পাচ্ছি না যে সে বোকাটার নজর পড়েছে বুরিয়েঁর উপর—তাকে এবার তাড়াতে হবে। আর এটা বুঝবার মত আত্মমর্যাদাও কি তার নেই? নিজের মর্যাদা-বোধ যদি নাও থাকে, আমার মর্যাদাটাও তো রাখতে হবে! তাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে যে ওই মুখ্‌খুটা তার কথা মোটেই ভাবছে না, সে আছে বুরিয়েঁর তালে। না, তার কোন মর্যাদাবোধই নেই··· কিন্তু আমি তাকে দেখিয়ে দেব····"

বুড়ো প্রিন্স জানে, সে যদি মেয়েকে বলে দেয় যে সে ভুল করছে, আনাতোল চাইছে মাদময়জেল বুরিয়েঁর সঙ্গে পূর্বরাগ জমাতে, তাহলেই প্রিন্সেস মারির আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে আর তারও কার্যোদ্ধার হবে। এই কথা ভেবে মনকে শান্ত করে সে তিখোনকে ডেকে পোশাক খুলতে লাগল।

তিখোন যখন তার শুকনো বুড়ো শরীর আর পাকা চুলে ভর্তি বুকটাতে নাইট-শার্ট পরাতে ব্যস্ত তখন সে ভাবতে লাগল, "কেন যে মরতে ওরা এখানে এসেছে? আমি তো নেমন্তন্ন করে আনি নি। তারা এসে আমার

জীবনটাকে বিরক্তিতে ভরে তুলেছে—আর সে জীবনের ক'দিনই বা বাকি আছে।”

“ওরা উচ্ছন্নে যাক!” শার্টে মাথাটা ঢাকা অবস্থায়ই সে বলে উঠল।

মনিবের এই সোচ্চার চিন্তার ব্যাপারটা তিখোনের জানা আছে, তাই সহজভাবেই সে মনিবের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে তাকাল।

“শুতে গেছে কি?” প্রিন্স শুধাল।

সব ভাল খানসামার মতই তিখোনও মনিবের চিন্তার হদিস রাখে। সে ধরেই নিল যে মনিব প্রিন্স ভাসিলি ও তার ছেলের কথাই বলছে।

“তারা দুজনই শুতে গেছেন, আর ঘরের বাতিও নিভিয়ে দিয়েছেন ইয়োর অনার।”

“বাজে···বাজে·····” দ্রুত লয়ে কথা বলতে বলতে প্রিন্স চটিতে পা গলিয়ে দিল এবং ড্রেসিং-গাউনের আস্তিনে হাত ঢুকিয়ে ঘুমোবার কোচটির দিকে এগিয়ে গেল।

মুখে কোন কথা না হলেও আনাতোল ও মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ নিজেদের পূর্বরাগের প্রথম অংশের কথা ভালই বুঝেছে; তারা বুঝতে পেরেছে, দুজনের মধ্যে একান্তে আরও অনেক কথা হওয়া দরকার। তাই তারা সকাল থেকেই দুজন একত্র হবার সুযোগ খুঁজছে। যথাসময়ে প্রিন্সেস মারি যখন তার বাবার ঘরে ঢুকল তখন মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ও আনাতোল সব্জি-ঘরে গিয়ে মিলিত হল।

সেদিন সকালে বুড়ো প্রিন্স মেয়ের সঙ্গে খুবই সস্নেহ ও সদয় ব্যবহার করল। কিন্তু বাবার মুখের এই কষ্টের ভাব প্রিন্সেস মারি ভালই জানে। তার মুখের এই ভাব সে অনেক দেখেছে—সে যখন গণিতের কোন অংক বুঝতে পারত না তখন এমনি মুখ করে বাবা শুকনো হাত দিয়ে তার হাতটা চেপে ধরত, একই কথা বার বার বলতে বলতে চেয়ার থেকে উঠে হাঁটতে থাকত।

সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক হাসি হেসে বুড়ো প্রিন্স বলল, “তোমার ব্যাপারে একটা প্রস্তাব এসেছে। আশা করি তুমি এটা বুঝতে পেরেছ যে আমার সুন্দর চোখের জন্য প্রিন্স ভাসিলি তার ছাত্র আনাতোলকে (যে কারণেই হোক প্রিন্স বল্‌কনস্কি আনাতোলকে 'ছাত্র' বলে উল্লেখ করল) সঙ্গে নিয়ে এখানে আসেন নি। গত রাতে তিনি তোমার বিয়ের প্রস্তাব করেছেন, আর আমার রীতিনীতি তো তুমি জানই, তাই সে প্রস্তাব আমি তোমার কাছে রাখছি।”

প্রথমে বিবর্ণ ও পরে লজ্জারক্ত হয়ে প্রিন্সেস বলল, “তোমার ইচ্ছা কি বাপি?”

“আমার ইচ্ছা কি!” বাবা রেগে বলল। “পুত্রবধূ হিসাবে প্রিন্স

ভাসিলির তোমাকে পছন্দ হয়েছে; তাই তার ছাত্রের পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রস্তাব করেছেন। ব্যাপার তো এই!” আমার ইচ্ছা কি! …সেটাই তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি!”

প্রিন্সেস অস্ফুটে বলল, “তুমি কি ভাবছ তাতো আমি জানি না বাবা।”

“আমি? আমি? আমার কথা কেন? আমাকে ছেড়ে দাও। বিয়েটা তো আমার হচ্ছে না। তোমার কথা কি? সেটাই আমি জানতে চাই।”

প্রিন্সেস বুঝল এ ব্যাপারে তার বাবার সায় নেই, কিন্তু সেইমুহূর্তেই তার মনে হল যে এখনই যদি তার ভাগ্য নির্ধারিত না হয় তো আর কখনও হবে না।

“আপনার ইচ্ছামত কাজ করতেই আমি চাই, তবে যদি আমার ইচ্ছাই ব্যক্ত করতে হয়…” সে কথা শেষ করতে পারল না। বুড়ো প্রিন্স বাধা দিল।

“চমৎকার!” সে চেঁচিয়ে উঠল। “সে তোমাকে নেবে যৌতুকসহ, আর মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁকে নেবে ফাউ হিসেবে। সেই হবে স্ত্রী, আর তুমি…”

প্রিন্স থামল। মেয়ের উপর এই কথাগুলির ফল সে দেখতে পেল। মেয়ে মাথা নীচু করল; এখনই তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়বে।

প্রিন্স বলল, “আরে, আরে, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম? একটা কথা মনে রেখো প্রিন্সেস, স্বামী নির্বাচনের পরিপূর্ণ অধিকার মেয়ের আছে—এই নীতিই আমি সমর্থন করি। আমি তোমাকে স্বাধীনতা দিলাম। শুধু মনে রেখো, তোমার সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করছে তোমার জীবনের সুখ। আমার কথা ভেবো না।”

“কিন্তু আমি তো বুঝতে পারছি না বাবা!”

“আমার বলার তো কিছু নেই। সে হুকুম পেয়েছে, তোমাকে হোক যাকে হোক বিয়ে করবে; কিন্তু পছন্দ করে নেবার স্বাধীনতা তোমার আছে। …তোমার ঘরে যাও, ভাল করে ভেবে দেখ, আর এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরে এসে তার সামনেই আমাকে বলে দাও: হ্যাঁ কি না। আমি জানি এ নিয়ে তুমি প্রার্থনা করতে বসবে। ইচ্ছা হয় প্রার্থনা করো, কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখো। যাও! হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ কি না, হ্যাঁ কি না!” কুঁয়াসার মধ্যে পথ হারাবার মত অনিশ্চিত পা ফেলে প্রিন্সেস পড়ার ঘর থেকে চলে গেল।

তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে; ভালই হয়েছে। কিন্তু মাদময়জেল বুরিয়েঁ সম্পর্কে তার বাবা যা বলল সেটা যে ভয়ংকর। কথাটা অবশ্যই মিথ্যা, তবু বড় ভয়ংকর; সে চিন্তাটাকে সে মন থেকে সরাতে পারল না। কোনদিকে না তাকিয়ে কোন কিছুতে কান না দিয়ে সে সোজা চলে যাচ্ছিল সজ্জিবরের ভিতর দিয়ে, এমন সময় হঠাৎ মাদময়জেল বুরিয়েঁর পরিচিত

ফিস্ ফিস্ গলা শুনে সে সজাগ হয়ে উঠল। চোখ তুলে দু' পা দূরেই দেখতে পেল, আনাতোল ফরাসিনীকে জড়িয়ে ধরে তার কানে কানে কি যেন বলছে। আতংকিত মুখে আনাতোল প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল, কিন্তু মাদময়জেল বুরিয়েঁ এখনও তাকে দেখতে পায় নি; সেও সঙ্গেসঙ্গেই তার কোমর থেকে হাত তুলে নিল না।

আনাতোলের মুখের ভাব দেখে মনে হল সে যেন বলতে চায়: "কে ওখানে? কিসের জন্য? একমুহূর্ত অপেক্ষা কর!" প্রিন্সেস মারি নিঃশব্দে তাদের দিকে তাকাল। সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। অবশেষে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ আর্তনাদ করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। প্রিন্সেস মারির দিকে তাকিয়ে আনাতোল মৃদু হেসে মাথা নোয়াল, যেন এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে তাকেও হাসতে বলল; তারপর কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

একঘণ্টা পরে তিখোন এল প্রিন্সেস মারিকে ডাকতে; সে আরও জানাল যে প্রিন্স ভাসিলিও সেখানে আছে। তিখোন ঘরে ঢুকে দেখল, প্রিন্সেস মারি তার সোফায় বসে ক্রন্দনরতা মাদময়জেল বুরিয়েঁকে জড়িয়ে ধরে তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। গভীর মমতা ও করুণায় বিগলিত উজ্জ্বল দুটি সুন্দর চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"না প্রিন্সেস, তোমার স্নেহ আমি চিরদিনের মত হারিয়েছি," মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "তা কেন? আমি তোমাকে আগের চাইতেও বেশী ভালবাসি, আর তোমার সুখের জন্য সব কিছুই করতে চেষ্টা করব।"

"কিন্তু তুমি আমাকে ঘৃণা কর। তোমার হৃদয় পবিত্র, তাই কামনার টানে মানুষ যে কতদূর যেতে পারে তা তুমি বুঝতে পারবে না"

বিষণ্ণ হাসি হেসে প্রিন্সেস মারি বলল, "আমি খুব বুঝতে পারি। তুমি শান্ত হও। আমি বাবার কাছে যাচ্ছি।" সে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্স ভাসিলি পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে একটা নস্য-দানি হাতে নিয়ে বসেছিল। তার মুখে গভীর আবেগের হাসি। এমন সময় প্রিন্সেস মারি ঢুকল। সেও তাড়াতাড়ি একটিপ নস্য নিল।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেস মারির হাত দুটি ধরে বলে উঠল, "এই যে সোনা আমার, এস।" তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "আমার ছেলের ভাগ্য এখন তোমার হাতে। তোমাকে তো চিরদিন মেয়ের মতই দেখে এসেছি; এবার তুমি মনস্থির করে ফেল।"

সে ফিরে দাঁড়াল; তার চোখে সত্যিকারের অশ্রুবিন্দু।

"ফ্রু……ফ্রু……", প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির নাকের শব্দ হল। "প্রিন্স তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করছেন তার ছাত্রের—মানে তার ছেলের—নামে।

তুমি কি প্রিন্স আনাতোল কুরাগিনের স্ত্রী হতে চাও, না চাও না? জবাব দাও; হ্যাঁ কি না; তবেই আমার নিজের মতামত আমি জানাব।" প্রিন্স ভাসিলির দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তার অনুরোধভরা দৃষ্টির জবাবে সে আবার বলল, "হ্যাঁ। আমার মতামত, একমাত্র আমার মতামত। বল, হ্যাঁ কি না?"

"বাবা, আমার ইচ্ছা কোনদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না, তোমার জীবন থেকে আমার জীবনকে আলাদা করব না। আমি বিয়ে করতে চাই না," সুন্দর চোখ দুটি মেলে প্রিন্স ভাসিলিও বাবার দিকে তাকিয়ে সে স্পষ্ট জবাব দিল।

"ফাঁকি। অর্থহীন! ফাঁকি, ফাঁকি, ফাঁকি!" প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি চেঁচিয়ে উঠল। মেয়ের হাত দুটি চেপে ধরল, কিন্তু তাকে চুমো খেল না, শুধু নিজের কপালটাকে তার কপালের কাছে নিয়ে আস্তে ছুঁইয়ে দিল, আর হাতটাতে এত জোরে চাপ দিল যে মেয়ে আর্তনাদ করে উঠল।

প্রিন্স ভাসিলি উঠে পড়ল।

"সোনা আমার, আমাকে বলতেই হবে যে এই মুহূর্তটিকে আমি ভুলব না, কোনদিন ভুলব না। কিন্তু সোনা, কিছু আশাও কি তুমি আমাকে দেবে না? অন্তত বল 'হয় তো'……ভবিষ্যৎ তো অনেক দীর্ঘ। বল, 'হয় তো'।"

"প্রিন্স, যা আমার অন্তরের কথা তাই আপনাকে বলেছি। আপনার প্রস্তাবের জন্য ধন্যবাদ কিন্তু আমি কোনদিনই আপনার পুত্রবধূ হব না।"

বুড়ো প্রিন্স বলল, "তাহলে তো ও পাট চুকেই গেল। আপনার দেখা পেয়ে খুব খুসি হয়েছি। খুব খুসি! প্রিন্সেস, তোমার ঘরে যাও। যাও!" প্রিন্স ভাসিলিকে আলিঙ্গন করে সে পুনরায় বলল, "আপনার দেখা পেয়ে খুব, খুব খুসি হয়েছি।"

প্রিন্সেস মারি ভাবতে লাগল, "আমার কর্তব্য সম্পূর্ণ পৃথক। অন্য এক ধরনের সুখ, ভালবাসা ও আত্মোৎসর্গের যে সুখ তার ভিতর দিয়ে সুখী হওয়াই আমার আদর্শ। যে মূল্যই দিতে হোক, বেচারি এমেলির সুখের ব্যবস্থা আমি করব। আমাকে সে কত ভালবাসে; আজ তার অনুতাপের অন্ত নেই। তাদের দুজনের বিয়ের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যুবকটি যদি ধনী না হয়, আমি তাকে অর্থ দেব; বাবাকে বলব, আন্‌দ্রুকে বলব। সে যখন এই যুবকের স্ত্রী হবে তখন আমি খুব খুসি হব। সে বড় ভাগ্যহীনা, অপরিচিতা, একলা, অসহায়! হে ঈশ্বর, আজকের কথা ভুলতে পারলে সে আমাকে কত না ভালবাসবে! হয়তো আমিও এই করতাম! ……" প্রিন্সেস মারি ভাবতে লাগল।

অধ্যায়—৬

অনেকদিন হয়ে গেল রস্তভ পরিবারের কাছে নিকলাসের কোন খবর আসে নি। অবশেষে শীতের মাঝামাঝি সময়ে কাউণ্টের হাতে এল একটা চিঠি, ছেলের নিজের হাতে তার ঠিকানা লেখা। চিঠিটা পেয়েই সকলের নজর এড়াবার জন্য সভয়ে অতিদ্রুত পা টিপেটিপে সে তার পড়ার ঘরে ঢুকল; দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

আন্না মিখায়লভ্‌না এ-বাড়ির সব খবরই জানতে পারে। চিঠি এসেছে শুনেই সে মৃদু পায়ে ঘরে ঢুকে দেখল, চিঠি হাতে নিয়ে কাউণ্ট যুগপৎ কাঁদছে ও হাসছে।

নিজের অবস্থার উন্নতি হলেও আন্না মিখায়লভ্‌না এখনও রস্তভদের বাড়িতেই আছে।

সহানুভূতি জানাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে সে বিষণ্ণ গলায় শুধাল, "কি হয়েছে বন্ধু?"

কাউণ্ট আরও বেশী করে কেঁদে উঠল।

"নিকোলেংকা (নিকলাসের আদরের নাম) ···একটা চিঠি···আ···হ···ত···হয়েছে···আদরের খোকা···কাউণ্টেস···অফিসার পদে উন্নীত হয়েছে··· ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ···ছোট কাউণ্টেসকে কেমন করে বলব!"

আন্না মিখায়লভ্‌না তার পাশে বসল; নিজের রুমাল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিল, চিঠির উপর যে চোখের জল পড়েছিল তাও মুছিয়ে দিল; তারপর নিজের চোখ মুছে কাউণ্টকে সান্ত্বনা দিতে লাগল। স্থির হল, ডিনারের সময় থেকে চায়ের সময় পর্যন্ত সে কাউণ্টেসের মনকে ঠিক করে তারপর চায়ের পরে ঈশ্বরকে সহায় করে তাকে খবরটা জানাবে।

ডিনারে বসে আন্না মিখায়লভ্‌না সারাক্ষণ যুদ্ধের খবর ও নিকোলেংকার খবরের কথাই বলতে লাগল; দুবার জিজ্ঞাসা করল তার শেষ চিঠি কবে এসেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে বলল যে আজ হয়তো তার একটা চিঠি আসতে পারে। এসব শুনে কাউণ্টেস যেই মাত্র উৎকণ্ঠিতভাবে কাউণ্ট ও আন্না মিখায়লভ্‌নার দিকে তাকাতে থাকে তখনই সে সুকৌশলে আজেবাজে কথা পেড়ে বসে। নাতাশা কিন্তু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। এদের কথাবার্তার ভাবভঙ্গী থেকে তার নিশ্চিত ধারণা হল যে তার বাবা ও আন্না মিখায়লভ্‌না একটা কিছু গোপন করতে চাইছে আর সেটা নিশ্চয় তার দাদার প্রসঙ্গে। ডিনার শেষ হতে না হতেই সে আন্না মিখায়লভ্‌নার পিছু পিছু ছুট দিল এবং ছোট বসবার ঘরটায় তাকে ধরে ফেলে একেবারে তার কাঁধের উপর ঝুলে পড়ল।

"মিস্টি মাসি, আমাকে বল কি হয়েছে?"

"কিছু তো হয় নি মামণি।"

"না। না; মিস্টি মাসি, মধু মাসি, আমি তোমাকে ছাড়ছি না—আমি জানি তুমি কিছু জান।"

আন্না মিখায়লভ্‌না মাথা নাড়তে লাগল।

"তুমি দেখছি খুব চালাক," সে বলল।

আন্না মিখায়লভ্‌নার মুখের দিকে তাকিয়েই নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "নিকোলেংকার চিঠি এসেছে! আমি জোর করে বলতে পারি।"

"ঈশ্বরের দোহাই, খুব সাবধান, তুমি তো বোঝ একথা শুনলে তোমার মার অবস্থা কি হবে।"

"আমি জানি, তবু আমাকে বল! বলবে না? বেশ, তাহলে আমি এখনই গিয়ে বলে দিচ্ছি।"

নাতাশা কাউকে বলবে না এই শর্তে আন্না মিখায়লভ্‌না অল্প কথায় চিঠির মর্ম তাকে বলে দিল।

"কথা দিচ্ছি কাউকে বলব না," ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে নাতাশা বলল। "কাউকে বলব না!" সঙ্গে সঙ্গে সে এক দৌড়ে সোনিয়ার কাছে চলে গেল।

বিজয়গর্বে সে ঘোষণা করে দিল, "নিকোলেংকা…আহত হয়েছে…একটা চিঠি।"

"নিকলাস!" বলেই সোনিয়া সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

দাদার আহত হবার সংবাদ শুনে সোনিয়ার এই অবস্থা দেখে সংবাদের দুঃখের দিকটা এই প্রথম সে অনুভব করল।

সোনিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সে নিজেও কাঁদতে শুরু করল।

"আঘাত সামান্য, কিন্তু তাকে অফিসার করা হয়েছে; এখন সে ভাল আছে, নিজেই চিঠি লিখেছে," চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলল।

বড় বড় পা ফেলে ঘরময় পায়চারি করতে করতে পেত্‌য়া বলে উঠল, "এই দেখ! দেখছি তোমরা মেয়েরা সব্বাই কাঁদুনে খুকি। আমি কিন্তু খুব খুসি হয়েছি, দাদার এই উন্নতির কথা শুনে সত্যি খুসি হয়েছি। তোমরা শুধু কাঁদতেই জান, কিছু বোঝ না।"

নাতাশা চোখের জলের মধ্যেও হেসে ফেলল।

"তুমি তো চিঠিটা পড় নি?" সোনিয়া শুধাল।

"না, কিন্তু মাসি বলেছে সব ঠিক হয়ে গেছে, আর এখন সে একজন অফিসার।"

ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে সোনিয়া বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কিন্তু মাসি হয় তো তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে। চল মামণির কাছে যাই।"

পেত্‌য়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পায়চারি করে একসময় বলে উঠল, "নিকোলেংকার জায়গায় যদি আমি হতাম তাহলে আরও অনেক বেশী ফরাসীকে মেরে ফেলতাম। তারা তো সব ঘৃণ্য জানোয়ার! আমি তাদের এত বেশী মারতাম যে মৃতদেহের স্তূপ হয়ে যেত।"

"চুপ কর পেত্‌য়া ; কি হাঁসের মত প্যাক-প্যাক করছ !"

পেত্‌য়া বলল, "হাঁস আমি নই, যারা তুচ্ছ ব্যাপারে কাঁদে তারাই হাঁস।"

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে নাতাশা হঠাৎ প্রশ্ন করল, "তার কথা তোমার মনে আছে ?"

সোনিয়া হাসল।

"নিকলাসকে মনে আছে কি না ?"

"তা নয় সোনিয়া, কিন্তু তার সবকিছু ঠিক ঠিক মনে আছে কি না ?" একটা বিশেষ ভঙ্গী করে নাতাশা বলল। "নিকোলেংকাকে আমারও মনে আছে, ভালভাবেই মনে আছে। কিন্তু বরিসের কথা মনে নাই। তাকে একটুও মনে পড়ে না।"

"সে কি ! বরিসকে তোমার মনে পড়ে না ?" সোনিয়া সবিস্ময়ে বলল।

"মনে পড়ে না তা ঠিক নয়—তার চেহারাটা মনে আছে, কিন্তু নিকোলেংকাকে যেভাবে মনে আছে ঠিক তেমনটি নয়। তাকে—চোখ বুজলেই দেখতে পাই, কিন্তু বরিস…না ! (সে চোখ বন্ধ করল।) না ! কিছু নেই।"

"আঃ, নাতাশা !" উচ্ছ্বাসভরে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে সোনিয়া বলে উঠল।

দুটি বিস্মিত চোখ তুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নাতাশা সোনিয়ার দিকে তাকাল, মুখে কিছুই বলল না। সোনিয়ার মনের কথা সে জানে ; সে তার দাদাকে ভালবাসে। এ ভালবাসার অভিজ্ঞতা আজও নাতাশার হয় নি। সে বিশ্বাস করে ভালবাসা আছে, কিন্তু বুঝতে পারে না।

"তুমি কি তাকে চিঠি লিখবে ?" নাতাশা শুধাল।

সোনিয়াকে চিন্তিত দেখাল। নিকলাসকে কি লিখবে, লেখা উচিত কি না, এই সব প্রশ্ন তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আজ সে অফিসার হয়েছে, আহত নায়ক হয়েছে, তাকে এখন নিজের কথা বলা, স্বেচ্ছায় স্বীকৃত দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে ?"

সলজ্জভাবে জবাব দিল, "আমি জানি না। মনে করি, সে যদি লেখে তো আমিও লিখব।"

"তাকে চিঠি লিখতে তোমার লজ্জা করবে না ?"

সোনিয়া হাসল।

"না।"

"আর আমার কিন্তু বরিসকে চিঠি লিখতে লজ্জা করবে। আমি লিখছি না।"

"লজ্জা করবে কেন ?"

"তা জানি না। ব্যাপারটা যেন কেমন ; আমার লজ্জা করবে।"

নাতাশার আগের মন্তব্যে অসন্তুষ্ট হয়ে পেত্‌য়া বলল, "আমি জানি ও কেন লজ্জা পাবে। কারণ সেই চশমা-পরা মোটকার সঙ্গে ও প্রেমে পড়েছিল

(নতুন কাউণ্ট বেজুখভকে পেত্‌য়া এইভাবেই বর্ণনা করে), আর এখন প্রেম করছে সেই গায়কের (নাতাশার ইতালীয় সঙ্গীত-শিক্ষক) সঙ্গে ; তাই ওর এত লজ্জা !"

"পেত্‌য়া, তুমি ভারী দুষ্টু !" নাতাশা বলল।

একজন প্রধান ব্রিগেডিয়ারের ভঙ্গীতে নয় বছরের পেত্‌য়া বলল, "তোমার চাইতে বেশী দুষ্টু নই মাদাম।"

ডিনারের সময় আন্না মিখায়লভ্‌নার ইঙ্গিত থেকেই কাউণ্টেস নিজের মনকে তৈরি করে নিয়েছে। নিজের ঘরে ফিরে একটা হাতল-চেয়ারে বসে নস্যদানির ঢাকনার উপর আঁকা ছেলের ছোট প্রতিকৃতিটির দিকে সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ; দুই চোখ জলে ভরে উঠছে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে আন্না মিখায়লভ্‌না পা টিপে কাউণ্টেসের দরজার কাছে এসে থামল।

বুড়ো কাউণ্টও তার পিছনেই আসছিল ; তাকে বাধা দিয়ে বলল, "এখন নয়, পরে আসবেন।" সে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

কাউণ্ট চাবির গর্তে চোখ রেখে কান পাতল।

প্রথমে অসংলগ্ন কিছু শব্দ, তারপর আন্না মিখায়লভ্‌নার দীর্ঘ একক বক্তৃতা, তারপর কান্না, নীরবতা, তারপর খুসি গলায় দুজনের কথা, তারপর পায়ের শব্দ। আন্না মিখায়লভ্‌না দরজা খুলে দিল। একটা শক্ত অস্ত্রোপচার শেষ করে আসা সার্জনের গর্বিত ভঙ্গী তার মুখে।

বিজয়গর্বে কাউণ্টেসকে দেখিয়ে সে কাউণ্টকে বলল, "কাজ শেষ !" এক হাতে প্রতিকৃতিসহ নস্যদানি এবং অন্য হাতে চিঠিটা ধরে সে বসে আছে, আর একবার এটাকে আর একবার ওটাকে ঠোঁটে ছোঁয়াচ্ছে।

কাউণ্টকে দেখে সে দুই হাত বাড়িয়ে তার টাক মাথাটাকে জড়িয়ে ধরল ; মাথার উপর দিয়ে আর একবার চিঠি ও ছবির দিকে তাকাল এবং পুনরায় সে দুটোকে ঠোঁটের উপর চেপে ধরবার জন্য টাক মাথাটাকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিল। এবার ভেরা, নাতাশা, সোনিয়া ও পেত্‌য়া ঘরে ঢুকল এবং চিঠি পড়া শুরু হল। যে অভিযানে ও দুটি যুদ্ধে সে অংশগ্রহণ করেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে এবং তার পদোন্নতির উল্লেখ করে নিকলাস বাবা ও মার হাতে চুমো খাবার কথা জানিয়ে তাদের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছে এবং ভেরা, নাতাশা ও পেত্‌য়াকেও চুমো খেয়েছে। তাছাড়া ম'সিয় শেলিং, মাদাম শোস ও বুড়ি নার্সকে শুভকামনা জানিয়ে তাদের বলেছে তার হয়ে প্রিয় সোনিয়াকে চুমো খেতে ; তাকে সে আগের মতই ভালবাসে, তার কথা ভাবে। একথা শুনে লজ্জায় সোনিয়ার চোখে জল এসে গেল ; চারদিক থেকে সকলের দৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে নাচ-ঘরে চলে গেল, পূর্ণ গতিতে এমনভাবে ঘুরতে লাগল যে তার পোশাকটা বেলুনের মত উড়তে লাগল, তারপর হাসতে হাসতে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল। কাউণ্টেস তখনও

কাঁদছে।

ভেরা শুধাল, "তুমি কাঁদছ কেন মামণি? সে যা লিখেছে তাতে তো খুসি হওয়া উচিত, কাঁদার কথা তো নয়।"

কথাটা সত্যি, কিন্তু কাউণ্ট, কাউণ্টেস ও নাতাশা তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে তাকাল। কাউণ্টেস ভাবল, "ও আবার কার পিছনে ঘুরছে?"

নিকলাসের চিঠিটা একশ' বারের বেশী পড়া হল; চিঠি শোনার উপযুক্ত বলে যাদের বিবেচনা করা হল তারা সকলেই কাউণ্টেসের কাছে এসে শুনে গেল, কারণ চিঠিটা হাত ছাড়া করতে সে নারাজ। শিক্ষকরা এল, নার্সরা এল, দিমিত্রি এল, এল আরও অনেক পরিচিত জন; কাউণ্টেস প্রতিবারই নতুন আনন্দে চিঠি পড়ে শোনাল, আর প্রতিবারই চিঠিতে নিকোলেংকার নতুন নতুন গুণ আবিষ্কার করতে লাগল।

চিঠি পড়তে পড়তে সে বলে ওঠে, "লেখার কী ভঙ্গী! বিবরণ কত আকর্ষণীয়! আর কী তার মন! নিজের সম্পর্কে একটা কথাও বলে নি…একটা কথাও না! কি এক দেনিসভ ও অন্য অনেকের কথা লিখেছে, কিন্তু আমি জোর গলায় বলতে পারি তাদের চাইতে সে অনেক বেশী সাহসী। নিজের দুঃখকষ্টের কথা কিছুই লেখে নি। কী অন্তঃকরণ! এ তো তারই উপযুক্ত! আর কী সুন্দর সকলকেই মনে রেখেছে। কাউকে ভোলে নি। তার এতটুকু বয়স থেকে আমি এসেছি—সব সময় বলে এসেছি…"

এক সপ্তাহের বেশী সময় ধরে প্রস্তুতি চলল; নিকলাসকে লেখা বাড়ির সকলের চিঠির খসড়া তৈরি করা হল, সেগুলি নকল করা হল, এবং কাউণ্টেসের তত্ত্বাবধানে ও কাউণ্টের উদারতায় নতুন পদোন্নত অফিসারের ইউনিফর্ম ও অন্যান্য জিনিসের জন্য টাকা তোলা হল। আন্না মিখায়লভ্‌নার চেষ্টায় স্থির হল, চিঠি ও টাকা গ্র্যাণ্ড ডিউকের পত্রবাহক মারফৎ পাঠানো হবে বরিসকে, আর বরিস সেগুলি পাঠাবে নিকলাসকে। চিঠি লিখল বুড়ো কাউণ্ট, কাউণ্টেস, পেত্‌য়া, ভেরা, নাতাশা ও সোনিয়া; আর শেষপর্যন্ত বুড়ো কাউণ্ট ছেলেকে পাঠাল পোশাকের জন্য ছ'হাজার রুবল ও টুকিটাকি নানা জিনিস।

অধ্যায়—৭

১২ই অক্টোবর তারিখে ওল্‌মুজ-এর সামনে শিবির ফেলে অবস্থানরত কুতুজভের সেনাবাহিনী পরিদর্শনের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত ছিল; রাশিয়া ও অস্ট্রীয়ার দুই সম্রাট পরদিন বাহিনী পরিদর্শনে আসবে। রাশিয়া থেকে আগত রক্ষীবাহিনী ওল্‌মুজ থেকে দশ মাইল দূরে রাত কাটিয়ে পরদিন সকাল দশটায় সোজা চলে আসবে ওল্‌মুজ প্রান্তরে।

নিকলাস রস্তভ, সেইদিনই বরিসের একটা চিঠি পেল; সে লিখেছে,

ইস্‌মায়লভ রেজিমেণ্ট ওল্‌মুজ থেকে দশ মাইল দূরে রাতের মত ঘাঁটি পেতেছে; তার ইচ্ছা নিকলাস তার সঙ্গে দেখা করে, কারণ তার চিঠি ও টাকা এসেছে বরিসের কাছে। রস্তভেরও তখন টাকার খুবই দরকার; যুদ্ধক্ষেত্রে কিছুদিন কাটাবার পরে সৈন্যরা এখন ওল্‌মুজ-এ ঘাঁটি করেছে; অনেকরকম জিনিসপত্র নিয়ে ভাণ্ডারীরা শিবিরে এসে ভীড় জমিয়েছে, অস্ট্রীয় ইহুদিরা এসেছে নানারকম মনোহারী মালপত্র নিয়ে। অভিযানে নানা রকম পুরস্কার পাওয়ায় পাভ্‌লোগ্রাদরা ভোজসভার পর ভোজসভা দিচ্ছে মাঝে মাঝেই তারা ওল্‌মুজ-এ গিয়ে ক্যারোলিন নামক জনৈক হাঙ্গেরীয়র সম্প্রতি খোলা রেস্তোরাঁতে ভিড় করছে! মেয়েরাই সেখানে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে। রস্তভও কর্ণেটপদে উন্নীত হওয়া উপলক্ষ্যে একটা ভোজসভায় আয়োজন করেছে, দেনিসভের ঘোড়া বেদুইনকে কিনেছে এবং তার ফলে বন্ধুবান্ধব ও ভাণ্ডারীদের কাছে অনেক টাকা ধার করে বসেছে। বরিসের চিঠি পেয়েই একজন সহকর্মী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সে ওল্‌মুজ-এর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; সেখানে আহারাদি সেরে, এক বোতল মদ গলায় ঢেলে পুরনো খেলার সাথীর সঙ্গে দেখা করতে একাকি রক্ষী-শিবিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

বরিস ও বের্গ তখন শিবিরে বসে দাবা খেলছিল।

বরিস বলল, "এই নাও; দেখি এবার কেমন করে পার পাও?"

"চেষ্টা তো করতে হবে," একটা ঘুঁটিতে হাত রেখে কথাটা বলেই বের্গ হাতটা সরিয়ে নিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে দরজাটা খুলে গেল।

রস্তভ চীৎকার করে বলল, "শেষপর্যন্ত দেখা পেলাম! আর বের্গও আছে! আরে, ছোট ছেলেরা, শুতে যাও, ঘুমিয়ে পড়!" ছোটবেলায় তার রুশ নার্স ফরাসীতে এই কথাগুলি বলত। আর তা শুনে সে ও বরিস হো-হো করে হাসত।

"আরে বাস্, তুমি কত বদলে গেছ!"

বরিস খেলা রেখে রস্তভের দিকে এগিয়ে গেল; নিকলাস এড়িয়ে যেতে চাইলেও বরিস বন্ধুর মত শান্তভাবে তাকে আলিঙ্গন করল, তিনবার চুমো খেল।

প্রায় ছ'মাস তাদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ নেই; যে বয়সে মানুষ জীবনের পথে প্রথম পদক্ষেপ করে সেই বয়সে পৌঁছে দুজনেই দুজনের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করল; যে সমাজে তারা পা রেখেছে তারই প্রভাব পড়েছে তাদের উপর।

নিজের কাদামাখা ব্রীচেস দেখিয়ে রস্তভ বলল, "আরে, তোমরা তো ফুলবাবুর দল! এত তাজা যে দেখে মনে হয় কোন উৎসব থেকে ফিরেছ;

সম্মুখ সমরে রত আমাদের মত পাপীদের মত মোটেই নয়।" রস্তভের চড়া-গলা শুনে জার্মান বাড়িউলিটি দরজায় মুখ বাড়াল।

"আরে, বেশ সুন্দরী, কি বল ?" চোখ টিপে সে বলল।

বরিস বলল, "অত চেঁচাচ্ছ কেন ? ওদের ভয় পাইয়ে দেবে যে। তুমি আজই আসবে আশা করি নি। কুতুজভের অ্যাডজুটান্ট বল্‌কন্‌স্কি আমার বন্ধু ; তার হাত দিয়ে মাত্র গত কালই তো তোমাকে চিঠিটা পাঠিয়েছি। সে যে এত তাড়াতাড়ি তোমাকে চিঠিটা পৌঁছে দেবে তা ভাবি নি। ···তারপর, কেমন আছ ? এর মধ্যেই গোলাগুলির মুখে পড়েছ ?"

কোন জবাব না দিয়ে ইউনিফর্মের সঙ্গে আটকানো সৈনিকদের সেণ্ট জর্জ ক্রুশটা নেড়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা দেখিয়ে রস্তভ একটু হেসে বের্গের দিক তাকাল।

"দেখতেই তো পাচ্ছ," মুখে বলল।

"বটে ? হ্যাঁ ! হ্যাঁ !" বরিসও হেসে বলল। "আর আমরাও একটা চমৎকার যাত্রার ভিতর দিয়ে এসেছি। তুমি নিশ্চয়ই জান, হিজ ইম্পিরিয়াল হাইনেস সারাক্ষণই আমাদের রেজিমেণ্টের সঙ্গে অশ্বারোহণে এসেছেন ; কাজেই সবরকম আরাম ও সুবিধা আমরা পেয়েছি। পোল্যাণ্ডে সে কী অভ্যর্থনার ঘটা ! কী সব ডিনার ও বল-নাচ ! তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না। আর জারেভিচও আমাদের অফিসারদের উপর খুবই সদয় ছিলেন।"

দুই বন্ধুই নিজের নিজের কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগল ; একজন বলল হুজার জীবনের হৈ-হল্লা ও রণক্ষেত্রের জীবনযাত্রার কথা, আর অপরজন শোনাল রাজপরিবারের সদস্যদের অধীনে চাকরি করার সুখ-সুবিধার কথা।

রস্তভ বলল, "আরে, রক্ষীবাহিনীর কথাই আলাদা ! এখন কিছু মদ আনাও দেখি।"

বরিস মুখটা বাঁকাল।

বলল, "তুমি যদি সত্যি চাও।"

বরিস বিছানার কাছে গিয়ে পরিষ্কার বালিশটার নীচ থেকে টাকার থলি বের করে মদ আনতে পাঠাল।

তারপর বলল, "ও হ্যাঁ, তোমাকে দেবার জন্য আমার কাছে কিছু টাকা ও চিঠি আছে।"

রস্তভ চিঠিটা নিল ; টাকাটা সোফার উপর ছুঁড়ে দিয়ে দুই হাত টেবিলে রেখে পড়তে লাগল। কয়েক লাইন পড়েই রাগত দৃষ্টিতে বের্গের দিকে তাকাল ; তারপর তার চোখে চোখ পড়তেই চিঠির আড়ালে মুখ লুকাল।

ভারী থলেটার দিকে তাকিয়ে বের্গ বলল, "আরে, ওরা বেশ মোটা টাকাই পাঠিয়েছে। আমাদের কথা যদি বল কাউণ্ট, আমাদের বেতনের

টাকাতেই চালাতে হয়। নিজের কথা তোমাকে বলতে পারি…”

রস্তভ বলে উঠল, “আমি বলছি বের্গ, বাড়ি থেকে যখন তোমার কোন চিঠি আসে এবং নিজের এমন কোন লোক আসে যার সঙ্গে তোমার অনেক কথা বলার থাকে, তখন আমি সেখানে হাজির থাকলে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে যাই। …যে কোন জায়গায়, যেখানে খুসি চলে যাও…উচ্ছন্নে যাও!” চেঁচিয়ে কথাগুলি বলেই তৎক্ষণাৎ তার ঘাড়ে হাত রেখে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজের রুক্ষ স্বরকে নরম করাব চেষ্টায় সে বলল, “কষ্ট পেয়ো না ভাই; তুমি তো জান পুরনো বন্ধুর কাছে আমি প্রাণ খুলেই কথা বলি।”

“ও কথা বলোনা কাউণ্ট! আমি সব জানি,” বের্গ বলল।

বরিস তাকে বলল, “বাড়ির কর্তাদের কাছে যাও; তারা তোমাকে নেমন্তন্ন করেছে।”

বের্গ সব চাইতে পরিষ্কার একটা কোট গায়ে চড়াল; কোটে একটা দাগ নেই, একবিন্দু ধূলো নেই। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সম্রাট আলেক্সান্দারের মত চুলগুলোকে কপাল থেকে উপরের দিকে ব্রাশ করে নিল, এবং কোটটা যে রস্তভের নজরে পড়েছে তার চাউনি থেকে সেটা বুঝতে পেরে স্মিত হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চিঠি পড়তে পড়তে রস্তভ অস্ফুটে বলল, “আহারে, আমি একটা জানোয়ার।”

“কেন?”

আমি একটা শুয়োর, নইলে এতদিনে তাদের একটাও চিঠি লিখি নি, তাদের এত ভয় পাইয়ে দিয়েছি! আঃ, আমি একটা শুয়োর!” মুখ লাল করে সে আর একবার কথাটা বলল। “ভাল কথা, গেব্রিয়েলকে মদের জন্য পাঠিয়েছ তো? ঠিক আছে, একটু মদ খাওয়া যাক!”

বাবা-মার চিঠির সঙ্গে ব্যাগ্রেশনের বরাবর একখানা প্রশংসা-পত্র জুড়ে দেওয়া ছিল; আন্না মিখায়লভ্‌নার পরামর্শক্রমে কোন পরিচিত লোক মারফৎ সেটা যোগাড় করে কাউণ্টেস ছেলেকে পাঠিয়ে দিয়েছে; সে যেন প্রশংসা-পত্রখানি যথাস্থানে পৌঁছে দেয় ও তার সদ্ব্যবহার করে।

“যত সব বাজে! এ সবের আমার থোরাই দরকার!” বলে রস্তভ কাগজটা টেবিলের নীচে ফেলে দিল।

“ওটা ফেলে দিলে কেন?” বরিস শুধাল।

“একখানা প্রশংসা-পত্র…ওটা আমার কোন কাজে লাগবে!”

চিঠিটা তুলে ঠিকানাটা পড়ে বরিস বলল, “ও কথা কেন বলছ? চিঠিটা তোমার অনেক কাজে লাগতে পারে।”

“আমার কিছুই চাই না; আমি কারও অ্যাডজুটাণ্টও হব না।”

"কেন হবে না ?" বরিস শুধাল।

"ওটা তো খানসামার চাকরি !"

মাথা নেড়ে বরিস বলল, "তুমি দেখছি সেই একই স্বপ্নদর্শীই রয়ে গেছ।"

"আর তুমি সেই একই কূটনীতিবিদ ! কিন্তু সেটা কথা নয়। ...তারপর, বল কেমন আছ ?" রস্তভ শুধাল।

"তা যেমন দেখছ। এখনও পর্যন্ত সবই ঠিক আছে, কিন্তু আমি স্বীকার করছি, আমি অ্যাডজুটান্ট হতেই চাই, রণক্ষেত্রে থাকতে চাই না।"

"কেন ?"

"কারণ একবার যদি কেউ সামরিক চাকরিতে ঢোকে তাহলে জীবনে যথাসম্ভব সাফল্যলাভের চেষ্টা করাই তার পক্ষে উচিত।"

"ওঃ, এই কথা !" রস্তভ বলল ; তার মনে তখন অন্য চিন্তা।

বুড়ো গ্রেব্রিয়েল মদ নিয়ে এল।

বরিস শুধাল, "এখন কি বের্গকে ডেকে পাঠাতে পারি ? সে তোমার সঙ্গে মদ খেতে পারবে। আমি খাই না।"

"বেশ, ডেকে পাঠাও। ...তারপর এই জার্মানটির সঙ্গে কেমন চলছে ?" তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে রস্তভ বলল।"

"সে খুব, খুব ভাল ; সৎ ও মনের মত লোক," বরিস জবাব দিল।

রস্তভ আর একবার একদৃষ্টিতে বরিসের চোখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বের্গ ফিরে এলে এক বোতল মদ নিয়ে বসে তিন অফিসারের মধ্যে প্রাণবন্ত আলোচনা শুরু হল। রক্ষীবাহিনীর দুই অফিসার শোনাল তাদের অভিযানের কথা, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও অন্যত্র তাদের প্রশংসার কথা। তাদের সেনাপতি গ্র্যাণ্ড ডিউকের নানা উক্তি ও কাজের ফিরিস্তি দিল, তার দয়া-দাক্ষিণ্য ও খিটখিটে মেজাজের নানা গল্প বলল। তারপর এল রস্তভের পালা। কথা বলতে বলতে সেও ক্রমেই উৎসাহিত হয়ে উঠল। রস্তভ সত্যবাদী যুবক ; সে কখনও ইচ্ছা করে মিথ্যা বলে না। সেইভাবে প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা দিয়েই সে তার কাহিনী শুরু করল, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই আপনা থেকে কখন যে মিথ্যা এসে তার কথার মধ্যে জুড়ে বসল তা সে বুঝতেই পারল না। আসলে সে যদি আগাগোড়া সত্য কথাই বলে যেত তাহলে হয় শ্রোতারা তাকে বিশ্বাস করত না, আর না হয় তো এ ধরনের খেলো বিবরণের জন্য রস্তভকেই দোষী সাব্যস্ত করত।

যাই হোক, তার গল্পের মাঝখানেই প্রিন্স আন্দ্রু ঘরে ঢুকল ; বরিস তাকে আশাও করছিল। প্রিন্স আন্দ্রু যুবকদের সাহায্য করতে ভালবাসে ; বরিস যেচে তার সহায়তা প্রার্থনা করায় সে খুব খুশি হয়েই এখানে এসেছে।

জারেভিচের জন্য কিছু কাগজপত্র দিয়ে কুতুজভ তাকে পাঠিয়েছে। সে আশা করেছিল বরিসকে একলা পাবে। কিন্তু এখানে এসে যখন দেখল যুদ্ধক্ষেত্রের জনৈক হুজার তার সামরিক কার্যকলাপের বিবরণ শোনাচ্ছে (এ ধরনের মানুষকে প্রিন্স আন্‌দ্রু সহ্য করতে পারে না), তখন স্মিত হাসির সঙ্গে বরিসের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে আধ-বোজা চোখে তাকাল রস্তভের দিকে, ক্লান্তভাবে মাথাটা ঈষৎ নোয়াল, তারপর আলস্যবশত সোফায় গিয়ে বসল। এ ধরনের বাজে দলের মধ্যে এসে পড়ায় তার মেজাজ বিগড়ে গেল। সেটা লক্ষ্য করে রস্তভ উত্তেজিত হল, কিন্তু তাকে আমল দিল না; লোকটি নেহাৎই অপরিচিত। বরিসের দিকে তাকিয়ে দেখল, যুদ্ধক্ষেত্রের একজন হুজারকে নিয়ে সেও যেন লজ্জায় পড়েছে।

বরিস পরিচিত সকলের খবর জানতে চাইল এবং সুবিবেচকের মত যুদ্ধের কথা যতটা জানতে চাওয়া উচিত সে সম্পর্কে কিছু প্রশ্নও করল।

“হয়তো আমরা আরও এগিয়ে যাব,” একজন অপরিচিত লোকের সামনে এর চাইতে বেশী কিছু বলতে বল্‌কন্‌স্কি স্বভাবতই অনিচ্ছুক।

এই সুযোগে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে বের্গ জানতে চাইল, অফিসারদের ঘোড়ার খাদ্য বাবদ ভাতা দ্বিগুণ হবে বলে যে গুজব রটেছে সেটা সত্য কি না। তাতে প্রিন্স আন্‌দ্রু হেসে জানাল, এ রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ সরকারী নির্দেশ সম্পর্কে কোন মতামত সে দিতে পারে না। তা শুনে বের্গ খুসিতে হেসে উঠল।

বরিসকে উদ্দেশ করে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, “আপনার কাজের ব্যাপারে আমরা পরে কথা বলব (মুখ ঘুরিয়ে সে রস্তভের দিকে তাকাল)। পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন, যা সম্ভব তা আমি অবশ্যই করব।”

ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু রস্তভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল:

“মনে হল আপনি শোন্‌ গ্রেবার্ণের কথা বলছিলেন? আপনি কি সেখানে ছিলেন?”

যেন এড্‌-ডি-কংকে অপমান করবার জন্যই রস্তভ রাগের সঙ্গে বলল, “আমি সেখানে ছিলাম।”

হুজারটির মনের অবস্থা লক্ষ্য করে বল্‌কন্‌স্কির মজা লাগল। ঈষৎ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল:

“হ্যাঁ, সেখানকার ব্যাপার নিয়ে এখন অনেক গল্পই বলা হচ্ছে!”

“হ্যাঁ, অনেক গল্প,” জোর গলায় রস্তভ কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। তার চোখ দুটো হঠাৎ জ্বলে উঠল; সে একবার বরিসের দিকে একবার বল্‌কন্‌স্কির দিকে তাকাল। “হ্যাঁ, অনেক গল্প! কিন্তু আমাদের গল্প সেই সব মানুষের গল্প যারা শত্রুপক্ষের গোলাগুলির সামনে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের গল্পগুলি

ওজনে ভারী, যেসব কর্মচারী কিছু না করেই পুরস্কার পায় তাদের গল্পের মত নয়!"

শান্ত, উদার হাসি হেসে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "যাদের দলের আমি একজন বলে আপনি মনে করেন?"

সেই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত ক্রোধ এবং এই লোকটির আত্মসংযমের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব মিলে-মিশে রস্তভের মনে একাকার হয়ে গেল।

সে বলল, "আপনার কথা আমি বলছি না। আপনাকে আমি চিনি না, আর সত্যি কথা বলতে কি, চিনতে চাইও না। আমি সাধারণভাবে বেসামরিক কর্মচারীদের কথাই বলছি।"

তাকে বাধা দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু শান্ত কর্তৃত্বের সুরে বলল, "আর আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি আমাকে অপমান করতে চাইছেন, আর এবিষয়ে আপনার সঙ্গে একমত হতে আমি রাজী যে আপনার যথেষ্ট আত্মমর্যাদাবোধ না থাকলে সে কাজটা করা খুবই সহজ হত, কিন্তু এটা জেনে রাখুন যে আপনি স্থান ও কালটা বড়ই খারাপ বেছে নিয়েছেন। দু'একদিনের মধ্যেই আমাদের আরও অনেক বড় ও অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ একটা লড়াইতে অংশ নিতে হবে; তাছাড়া, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার মুখটা দেখেই যে আপনি অখুসি হয়েছেন সেজন্য আপনার পুরনো বন্ধু দ্রুবেৎস্কয় মোটেই দোষী নয়। যাইহোক," সে উঠে দাঁড়িয়ে আবার বলতে লাগল, "আমার নাম আপনি জানেন, আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তাও জানেন, কিন্তু একটা কথা ভুলে যাবেন না যে আমাকে বা আপনাকে এতটুকু অপমান করা হয়েছে বলে আমি মনে করি না, আর আপনার চাইতে বয়সে বড় বলেই আমার পরামর্শ শুনুন, এ ব্যাপারটার উপর এখানেই ইতি টেনে দিন। আচ্ছা, তাহলে শুক্রবারে পরিদর্শনের পরে আমি আপনাকে আশা করব দ্রুবেৎস্কয়। অ রিভোয়া!" সোচ্চারে কথাটা বলে দুজনকেই অভিবাদন জানিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্স আন্দ্রু চলে যাবাব পরে রস্তভ বুঝতে পারল তার কি কথা বলা উচিত ছিল। আর সেকথা বলতে না পারায় এখনও তার রাগ গেল না। তক্ষুণি ঘোড়া আনবার হুকুম দিয়ে কোনরকমে বরিসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সে কি পরের দিন হেডকোয়ার্টারে গিয়ে এই দাম্ভিক অ্যাডজুটান্টের মোকাবিলা করবে, নাকি এখানেই ব্যাপারটাকে শেষ হতে দেবে, সারাটা পথ এই প্রশ্নই তাকে বিব্রত করে তুলল। রাগের মাথায় একবার মনে হল, তার পিস্তলের পাল্লার মধ্যে পড়ে এই ছোটখাট ভঙ্গুর লোকটির ভীত অবস্থা দেখলে সে কত না খুশি হবে; কিন্তু পরক্ষণেই সে সবিস্ময়ে অনুভব করল, যে অ্যাডজুটান্টটিকে সে এত ঘৃণা করে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে তার যত সাধ পরিচিত লোকজনদের অন্য কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার ততখানি সাধ তার মনে নেই।

অধ্যায়—৮

রস্তভ যেদিন বরিসের সঙ্গে দেখা করতে যায় তার পরদিনই অস্ট্রীয় এবং রুশ সৈন্যদের একটি অভিপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। যেসব সৈন্য রাশিয়া থেকে নতুন এসেছে এবং যারা কুতুজভের অধীনে অনেক দিন থেকে অভিযান চালিয়েছে—এই দুই দলই সে অনুষ্ঠানে ছিল। রুশ সম্রাট তার উত্তরাধিকারী জারেভিচকে সঙ্গে নিয়ে এবং অস্ট্রীয় সম্রাট আর্চডিউককে সঙ্গে নিয়ে মিত্রপক্ষের আশি হাজার সৈন্যের কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করে।

খুব সকাল থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চটপটে সৈনিকদের চলাফেরা শুরু হয়ে যায়; দুর্গের সম্মুখস্থ মাঠে তারা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ে। বেলা দশটা নাগাদ সব ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয়ে যায়। প্রকাণ্ড মাঠে সৈন্যরা সমবেত হয়েছে। গোটা বাহিনীকে তিনটি সারিতে সাজানো হয়েছে: সকলের আগে অশ্বারোহী বাহিনী, তার পিছনে গোলন্দাজ বাহিনী এবং তারও পরে পদাতিক বাহিনী।

প্রতি দুই সারি সৈন্যের মাঝখানে রাস্তার মত চওড়া একটা জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে। সেনাবাহিনীর তিনটি অংশকে পরিষ্কার আলাদাভাবে চেনা যাচ্ছে: কুতুজভের যুদ্ধরত সেনাদল (পাভ্‌লোগ্রাদ্‌রা রয়েছে সামনের সারির ডান দিকে); রক্ষীবাহিনী ও সেনাবারিকের রেজিমেণ্টসহ যেসব সৈন্য সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছে তারা এবং অস্ট্রীয় সেনাদল। কিন্তু সকলেই দাঁড়িয়েছে একই সারিতে, একই সেনাপতির অধীনে, এবং একই পর্যায়ক্রমে।

গাছের পাতার উপর বাতাসের মত একটা উত্তেজিত গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল: "তারা আসছেন! তারা আসছেন!" শোনা গেল অনেক আতংকিত কণ্ঠস্বর; গোটা বাহিনী চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে দুলে উঠল।

তাদের সম্মুখে ওল্‌মুৎজের দিক থেকে একটা দলকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা দমকা হাওয়া সেনাবাহিনীর উপর দিয়ে বয়ে যাওয়ায় তাদের বর্শার ফলাগুলি ঝিলমিল করে উঠল, খোলা পতাকাগুলি দণ্ডের গায়ে লেগে পৎ পৎ করতে লাগল। মনে হল যেন গোটা বাহিনীটিই নড়েচড়ে দুই সম্রাটের আগমনে আনন্দ প্রকাশ করছে। শোনা গেল একটি উচ্চ কণ্ঠস্বর: "সামনে তাকাও!" তারপর সূর্যোদয়ের কালে মোরগের ডাকের মত নানা দিক থেকে সেই একই কথার প্রতিধ্বনি করা হল। আবার সব চুপচাপ।

সেই মৃত্যু-স্তব্ধতার মধ্যে শোনা যেতে লাগল শুধু অশ্বক্ষুরের ধ্বনি। সম্রাটদ্বয়ের দল এগিয়ে আসছে। দুই সম্রাট অশ্বারোহণে এগিয়ে এল; প্রথম অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের ভেরী বেজে উঠল। মনে হল, এ যেন ভেরীর বাদ্য নয়, সম্রাটদ্বয়ের আগমনে উৎফুল্ল গোটা বাহিনীই বুঝি সঙ্গীতে মেতে উঠেছে। তারই মধ্যে শোনা গেল সম্রাট আলেক্সান্দারের যৌবনদীপ্ত কণ্ঠস্বর। সকলকে সে জানাল সাদর সম্ভাষণ, আর প্রথম রেজিমেণ্ট গর্জে উঠল "হুররা!" সে

গর্জন কানে তালা লাগিয়ে একটানা চলতে লাগল, আর তা শুনে বুঝি সৈনিকরাও ভয় পেয়ে গেল।

রস্তভ দাঁড়িয়েছিল কুতুজভের বাহিনীর সামনের সারিতে। জার সেই দিকেই প্রথম এগিয়ে এল। সেনাদলের অন্য প্রতিটি লোকের মতই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল রস্তভের: আত্মবিস্মৃতির অনুভূতি, শক্তির গর্বিত চেতনা, আর এই জয়-গৌরবের মূলাধার মানুষটির প্রতি সানুরাগ আকর্ষণ।

তার মনে হল, এই লোকটির একটিমাত্র কথায় এই বিরাট জনতা ছুটে যাবে আগুন ও জলের পথে, অপরাধ করবে, মরবে, না হয় চরম বীরত্ব প্রদর্শন করবে। তাই তার শরীর কেঁপে উঠল, সেই কথাটি শুনবার প্রত্যাশায় তার অন্তর স্তব্ধ হয়ে রইল।

চারদিক থেকে বজ্রের গর্জন উঠল "হুর্‌রা! হুর্‌রা! হুর্‌রা!" রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট সম্রাটকে সম্ভাষণ জানিয়ে বলতে লাগল "হুর্‌রা!" আবার এগিয়ে চলল সকলে; আবার "হুর্‌রা! হুর্‌রা!" সে শব্দ ক্রমাগতই আরও জোরদার, আরও পরিপূর্ণ, আরও কান-ফাটানো।

অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর ইউনিফর্ম পরিহিত টুপি মাথায় সুদর্শন যুবক সম্রাট আলেক্সান্দার সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

রস্তভ ছিল ভেরীবাদকদের কাছাকাছি। জারকে চিনতে পেরে সে তার আগমনের উপর নজর রাখল। জার যখন তার থেকে বিশ পায়ের মধ্যে এসে গেল তখন নিকলাস তার সুদর্শন, খুসিভরা মুখের প্রতিটি রেখা পরিষ্কার দেখতে পেল; সঙ্গে সঙ্গে এক অজ্ঞাতপূর্ব মমতায় ও উচ্ছ্বাসে তার মন ভরে গেল। জারের প্রতিটি আচরণ, প্রতিটি চলন তাকে মুগ্ধ করল।

পাভ্‌লোগ্রাদদের সামনে থেমে জার ফরাসীতে অস্ট্রীয় সম্রাটকে একটা কিছু বলে ঈষৎ হাসল।

সে হাসি দেখে রস্তভও আপনা থেকেই হেসে ফেলল; সম্রাটের জন্য একটা প্রবল ভালবাসার স্রোত বয়ে গেল তার অন্তরে। তার ইচ্ছা হল, সে ভালবাসাকে বাইরে প্রকাশ করে! কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব জেনে তার কাঁদতে ইচ্ছা করল। রেজিমেন্টের কর্ণেলকে ডেকে জার তার সঙ্গে কিছু কথা বলল।

রস্তভ ভাবল, "হা ভগবান, সম্রাট আমার সঙ্গে কথা বললে না জানি কি হত! আমি বুঝি সুখে মরেই যেতাম!"

অফিসারদের উদ্দেশে জার বলল: "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনাদের সকলকেই আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, সমস্ত অন্তর দিয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।" রস্তভের মনে হল, প্রতিটি কথা যেন স্বর্গ থেকে ভেসে এল। এই মুহূর্তে জারের জন্য সে সানন্দে মরতেও প্রস্তুত!

"আপনারা সেন্ট জর্জের পতাকা লাভ করেছেন; আশা করি তার

উপযুক্ত হবেন।"

"আহা, তারজন্য মরনেও সুখ!" রস্তভ ভাবল।

জার আরও কি যেন বলল; সেটা রস্তভ শুনতে পেল না; সৈন্যরা চীৎকার করে উঠল "হুর্‌রা!"

জিনের উপর উপুর হয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে রস্তভও চীৎকার করে বলল "হুর্‌রা!"

জার কয়েক মিনিট হুজারদের সামনে দাঁড়াল; যেন কি করবে বুঝতে পারছে না।

রস্তভ ভাবল, "সম্রাট কি করে ইতস্তত করতে পারেন?"

সে ইতস্ততভাব মাত্র মুহূর্তের জন্য। ছুঁচলো-মুখ বুট পরিহিত জারের পা তার ঘোড়ার পেটে খোঁচা মারল, তার সাদা দস্তানা-ঢাকা হাতে তুলে নিল রাশ, আর এড্-ডি-কং বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে জার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অন্য সব রেজিমেণ্টের সামনে থামতে থামতে সে দূর থেকে দূরে চলে গেল; শেষপর্যন্ত রস্তভের চোখের সামনে ভাসতে লাগল শুধু তার টুপির সাদা পালকগুলো।

সে দলে রস্তভ দেখতে পেল বল্‌কন্‌স্কিকেও। গতকালের ঝগড়ার কথাটা রস্তভের মনে পড়ে গেল; বল্‌কন্‌স্কিকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করা উচিত কি না সে প্রশ্নও মনে জাগল। এখন ভাবল, "নিশ্চয়ই না। এই কি এ কথা ভাবার বা বলার উপযুক্ত সময়? এমন ভালবাসা, এমন উন্মাদনা, এমন আত্মত্যাগের মধ্যে আমাদের ঝগড়া-বিবাদের কি দাম আছে? এখন আমি সকলকেই ভালবেসেছি, ক্ষমা করেছি।"

সম্রাট যখন প্রায় সবগুলি রেজিমেণ্টকে পার হয়ে গেল তখন সৈন্যরা তার সামনে শুরু করল আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ। বেদুইনের পিঠে চেপে রস্তভও তাতে যোগ দিল।

সম্রাট বলল, "পাভ্‌লোগ্রাদগণ! আপনারা খুব ভাল!"

"হা ভগবান, এই মুহূর্তে তিনি যদি আমাকে আগুনে ঝাঁপ দিতে বলতেন তাহলে আমি কত সুখী হতাম!" রস্তভ ভাবল।

কুচকাওয়াজ শেষ হবার পরে নবাগত অফিসার ও কুতুজভের অফিসাররা দলে দলে ভাগ হয়ে নানা পুরস্কারের কথা, অস্ট্রীয় সৈন্যদল ও তাদের ইউনিফর্মের কথা, বোনাপার্তের কথা, এখন যদি "এসেন" বাহিনী এসে পড়ে আর প্রাশিয়া আমাদের পক্ষে যোগ দেয় তাহলে বোনাপার্তের অবস্থা যে কাহিল হয়ে পড়বে—এইসব নানা কথা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কিন্তু প্রতিটি দলের আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল সম্রাট আলেক্সান্দার। একান্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে তার প্রতিটি কথা, প্রতিটি চলনের বিবরণ চলতে লাগল সকলের মুখে মুখে।

সকলেরই মনে একটিমাত্র বাসনা : সম্রাটের আদেশ যত শীঘ্র সম্ভব শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। সম্রাট স্বয়ং নেতৃত্ব দিলে তারা কাউকে পরাজিত করতে পশ্চাৎপদ হবে না, তা সে যেই হোক না কেন : এই কথাই ভাবতে লাগল রস্তভ, ভাবতে লাগল অধিকাংশ অফিসার।

দুটো যুদ্ধে জয়লাভ করলেও যতটা না হত এখন তারা যুদ্ধজয় সম্পর্কে তার চাইতে বেশী নিশ্চিত বোধ করছে।

অধ্যায়—৯

কুচকাওয়াজের পরদিন সেরা ইউনিফর্মটি গায়ে চাপিয়ে বন্ধু বের্গের শুভেচ্ছা নিয়ে ঘোড়ায় চেপে বরিস গেল ওল্‌মুজ-এ বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতে। মনের ইচ্ছা, তার বন্ধুত্বকে কাজে লাগিয়ে একটা ভাল চাকরি বাগিয়ে নেবে—কোন বিখ্যাত লোকের অ্যাডজুটান্ট হতে পারলেই ভাল হয়, কারণ সেনাবাহিনীতে ঐ চাকরিটাই তার বেশী পছন্দ। "রস্তভের বাবা একসময় দশ হাজার রুবল পাঠাতে পারে, তাই তার পক্ষে কারও খানসামা না হওয়ার কথা বলা শোভা পায়, কিন্তু আমার তো মাথার ঘিলু ছাড়া আর কিছু নেই, আমাকে তো জীবনে উন্নতি করতেই হবে; কাজেই আমি কোন সুযোগই হারাতে পারি না; সুযোগের সদ্ব্যবহার আমাকে করতেই হবে!" সে ভাবল।

সেদিন সে ওলমুজ-এ প্রিন্স আন্দ্রুর দেখা পেল না; কিন্তু যে শহরে তাদের প্রধান ঘাঁটি ও কূটনৈতিক দপ্তর অবস্থিত, দুই সম্রাট যেখানে সদলে বাস করছে, রয়েছে নানা বাড়িঘর ও আদালত, সেখানকার চেহারা দেখে সেই জগতের বাসিন্দা হবার বাসনা তার মনে প্রবলতর হল।

কাউকে সে চেনে না; তার রক্ষীবাহিনীর শোভন ইউনিফর্ম সত্ত্বেও রাজকীয় সভাসদ ও সামরিক কর্মচারীসহ যেসব পদস্থ ব্যক্তি পালক, ফিতে ও পদকে সজ্জিত হয়ে সুন্দর সুন্দর গাড়িতে চেপে পথ দিয়ে চলেছে তারা সকলেই তার মত একজন তুচ্ছ অফিসারের তুলনায় এত বেশী উঁচু মহলের লোক যে তারা যে তাকে দেখে শুভকামনাও জানাল না তাই নয়, তার অস্তিত্বকেই বুঝি স্বীকার করল না। প্রধান সেনাপতি কুতুজভের আপিসে বল্‌কন্‌স্কির খোঁজ করতে গেলে সেখানকার অ্যাডজুটান্টরা, এমন কি আর্দালিরা পর্যন্ত, এমনভাবে তার দিকে তাকাতে লাগল যেন তারা বলতে চাইছে, আরে বাপু, তোমার মত কত অফিসার এখানে হামেশাই আসা-যাওয়া করছে, তাদের নিয়ে আমাদের এতটুকু মাথাব্যথা নেই। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, অথবা হয়তো এই কারণেই, পরদিন ১৬ই নভেম্বর ডিনারের পরেই সে আবার ওল্‌মুজ-এ গেল এবং যে বাড়িটা কুতুজভ দখল করেছিল সেখানে পৌঁছে বল্‌কন্‌স্কির খোঁজ করল। প্রিন্স আন্দ্রু ভিতরেই ছিল; বরিসকে

একটা বড় হলে নিয়ে যাওয়া হল। হলটা আগে বোধহয় নাচের জন্য ব্যবহার করা হত, কিন্তু এখন সেখানে পাঁচটা বিছানা পাতা রয়েছে, আর আছে রকমারি আসবাব: একটা টেবিল, চেয়ার ও একটা ক্ল্যাভিকর্ড। একজন অ্যাডজুটাণ্ট পারসিক ড্রেসিং-গাউন পরে দরজার কাছে বসে লিখছে। আর একজন লাল নেস্‌ভিৎস্কি হাতের উপর মাথা রেখে বিছানায় শুয়ে পাশে বসা জনৈক অফিসারের সঙ্গে হাসাহাসি করছে। তৃতীয়জন ক্ল্যাভিকর্ডে ভিয়েনিজ ওয়াল্‌জ্‌ বাজাচ্ছে, আর চতুর্থজন ক্ল্যাভিকর্ডের উপর শুয়ে গান গাইছে। বল্‌কন্‌স্কি সেখানে ছিল না। বরিসকে দেখে ভদ্রলোকরা কেউই নড়েচড়ে বসল না। যে লিখছিল সে বরিসের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়ে দিল, বল্‌কন্‌স্কি এখন কাজে ব্যস্ত আছে, তার সঙ্গে দেখা করতে হলে দরজা পেরিয়ে অভ্যর্থনা ঘরে যেতে হবে। অভ্যর্থনা-ঘরে গিয়ে বরিস জনাদশেক অফিসার ও অধিনায়ককে দেখতে পেল।

প্রিন্স আন্দ্রু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চোখ নামিয়ে পদকসজ্জিত একজন বুড়ো রুশ সেনাপতির কথা শুনছিল। প্রায় আঙুলের উপর খাড়া দাঁড়িয়ে বুড়ো সেনাপতিটি রক্তিম মুখে একজন সাধারণ সৈনিকের তোষামোদী ভঙ্গী ফুটিয়ে কি যেন বলছে।

কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে হলেই প্রিন্স আন্দ্রু ফরাসী উচ্চারণে কথা বলে; এখনও সেইভাবেই বলল, "খুব ভাল কথা, তাহলে অপেক্ষাই করুন"; আর তখনই বরিসকে দেখতে পেয়ে সে মাথা নেড়ে স্মিত হাসির সঙ্গে তার দিকে এগিয়ে গেল। বুড়ো রুশ সেনাপতিটি তবু আরও কিছু কথা শোনাবার জন্য মিনতি জানাতে জানাতে তার পিছনে চলতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রু বরিসকে বলল, "কাল তোমার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আমি খুবই দুঃখিত। সারাদিন জার্মানদের সঙ্গে হৈচৈ করেই কেটেছে। ···যাই হোক, তুমি কি এখনও অ্যাডজুটাণ্ট হতে চাও? তোমার কথাই ভাবছিলাম।"

"হ্যাঁ, প্রধান সেনাপতির কাছে কথাটা তুলব বলে ভাবছিলাম। আমার ব্যাপারে তিনি প্রিন্স কুরাগিনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছেন।"

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "বেশ তো, বেশ তো। পরে এ নিয়ে কথা হবে। আগে এই ভদ্রলোকের কাজের কথাটা শুনে আসি, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব।"

লাল-মুখ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা শেষ করে দুজনে বড় হল ঘরটাতে গেলে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "দেখ ভাই, তোমার কথা আমি ভেবেছি। তোমার প্রধান সেনাপতির কাছে যাবার কোন দরকার নেই। তিনি অনেক ভাল ভাল কথা বলবেন, তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করবেন, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না। শীঘ্রই আমাদের মত এড্‌-ডি-কং ও অ্যাডজুটাণ্টদের নিয়ে

একটা সেনাদল গড়ে তোলা হবে। কিন্তু আমরা যা করব তা হল: আমার একটি ভাল বন্ধু আছে—অ্যাডজুটান্ট-জেনারেল প্রিন্স দল্‌গরুকভ; আর তুমি না জানলেও আসল সত্য হল, এখন সপারিষদ কুতুজভ ও আমাদের কোন প্রভাবই নেই। সবকিছুই হচ্ছে সম্রাটকে কেন্দ্র করে। কাজেই আমরা দল্‌গরুকভ-এর কাছেই যাব; এমনিতেই তার কাছে আমাকে যেতে হত, আর তোমার কথা তাকে বলেও রেখেছি। দেখা যাক সে তোমাকে তার দলে নিয়ে নিতে পারে কি না, অথবা সূর্যের কাছাকাছি কোন স্থানে তোমাকে বসাতে পারে কি না।

কোন যুবককে জাগতিক সাফল্য লাভের ব্যাপারে সাহায্য করতে প্রিন্স সর্বদাই প্রস্তুত। অহংকারবশত যে কাজ সে নিজের জন্য করতে কখনও রাজী নয়, অপরের জন্য সেই জাগতিক সাফল্য লাভের চেষ্টা করতে গিয়ে সে উপর মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, কারণ সেইসব মহলের লোকজন তাকেও আকর্ষণ করে। সে খুব সহজেই বরিসের দায়টা মাথায় নিল এবং তাকে নিয়ে দল্‌গরুকভ-এর কাছে গেল।

ওল্‌মুজ-এর যে প্রাসাদে দুই সম্রাট ও তার দলবল বাস করছিল সেখানে তারা যখন ঢুকল তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। সেইদিনই সমর-পরিষদের একটা বৈঠক হয়ে গেছে; হফ্‌ক্রিগ্‌স্‌রাথ-এর সমস্ত সদস্য এবং দুই সম্রাট তাতে অংশ গ্রহণ করেছে। সেই বৈঠকে বৃদ্ধ সেনাপতি কুতুজভ ও প্রিন্স শোয়ার্ত্‌জেন্‌বের্গ-এর আপত্তি সত্ত্বেও স্থির হয়েছে যে অবিলম্বে অগ্রসর হয়ে বোনাপার্তের সঙ্গে যুদ্ধে নামতে হবে। সমর-পরিষদের বৈঠক সবে শেষ হয়েছে এমন সময় দল্‌গরুকভের সঙ্গে দেখা করতে প্রিন্স আন্‌দ্রু বরিসকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদে ঢুকল। বৈঠকের প্রভাবে তখনও সকলেই আচ্ছন্ন; সেখানে তরুণদের দলই জয়লাভ করেছে। যারা বিলম্ব করার পরামর্শ দিয়েছিল, যারা বলেছিল এখনই অগ্রসর না হয়ে অন্য কিছুর জন্য অপেক্ষা করা হোক, তাদের এমনভাবে সম্পূর্ণ চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের সব যুক্তিকে এমন অকাট্যভাবে খণ্ডন করা হয়েছে যে আসন্ন যুদ্ধ এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে জয়লাভ করাটাকে এখন আর কেউ ভবিষ্যতের ব্যাপার বলে মনে করছে না—সেটা যেন অতীতের ঘটনা। সব রকম সুবিধাই তো আমাদের পক্ষে। নেপোলিয়নের সৈন্যদের তুলনায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতর আমাদের সৈন্যরা সংখ্যায় প্রচুর, তারা সকলে একজায়গায় কেন্দ্রীভূত হয়েছে, আর সম্রাটের উপস্থিতিতে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা যুদ্ধ শুরু করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। যেখানে যুদ্ধটা হবে তার সমরকৌশলগত অবস্থানের প্রতিটি বিবরণ অস্ট্রীয় সেনাপতি ওয়েরদার-এর পরিচিত: সৌভাগ্যক্রমে যে প্রান্তরে এবার ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে ঠিক সেখানেই আগের বছর অস্ট্রীয় বাহিনীকে পরিচালিত করা হয়েছিল; কাছাকাছি এলাকাগুলিও পরিচিত

এবং মানচিত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখানো হয়েছে। ওদিকে বোনাপার্ত এখন অপেক্ষাকৃত দুর্বল, আর নতুন কোন উদ্যোগও সে নিচ্ছে না।

আক্রমণ-প্রস্তাবের অন্যতম প্রধান সমর্থক দল্‌গরুকভ সবেমাত্র পরিষদের বৈঠক থেকে ফিরেছে; শ্রান্ত, ক্লান্ত হলেও জয়ের আনন্দে তার গর্বের অন্ত নেই। প্রিন্স আন্দ্রু তার সঙ্গে বরিসের পরিচয় করিয়ে দিল, কিন্তু প্রিন্স দল্‌গরুকভ তাকে কিছুই বলল না; শুধু বিনীত অথচ দৃঢ়ভাবে প্রিন্স আন্দ্রুর হাতটা চেপে ধরে নিজের মনের কথাটা চেপে না রাখতে পেরে ফরাসীতে বলল:

"আহা, কী যুদ্ধই না আমরা জয় করেছি! ঈশ্বর করুন, এর ফলে সত্যিকারের যে যুদ্ধ হবে তাতেও যেন আমরা বিজয়ী হতে পারি! আজকের মত আমাদের অনুকূল পরিস্থিতি কোনদিন হবে না। অস্ট্রীয়দের সূক্ষ্ম ও সঠিক জ্ঞানের সঙ্গে রুশদের সাহসের সমন্বয়-এর বেশী আর কি চাওয়া যায়?"

"তাহলে আক্রমণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত?" বল্‌কন্‌স্কি শুধাল।

"আপনি জানেন কি না জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হয় বোনাপার্তের সাহসে ভাটা পড়েছে; সম্রাটের কাছে লেখা তার একটা চিঠিও আজ পাওয়া গেছে," অর্থপূর্ণ হাসি হেসে দল্‌গরুকভ বলল।

"তাই নাকি? তিনি কি লিখেছেন?" বল্‌কন্‌স্কি জানতে চাইল।

"কি আর লিখবেন? ত্রা-দি-রি-দি-রা আর কি…কোনরকমে সময় কাটানো। কিন্তু সবচাইতে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের চিঠিতে পাঠ কি লেখা হবে সেটাই আমরা বুঝতে পারছি না! যদি 'কন্সাল' না লেখা হয়, 'সম্রাট' তো মোটেই না, আমার মনে হয় 'সেনাপতি বোনাপার্ত, হওয়াই উচিত।"

"কিন্তু তাকে সম্রাট বলে স্বীকার না করে সেনাপতি বোনাপার্ত বলা—এ দুইয়ের মধ্যে তো তফাৎ আছে।" বল্‌কন্‌স্কি বলল।

দল্‌গরুকভ হেসে উঠে তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক কথা! আপনি তো বিলিবিনকে চেনেন—ভারী চতুর মানুষ। সে প্রস্তাব করেছে পাঠ লেখা হোক 'রাজ্যাপহারক ও মানবতার শত্রু'।"

দল্‌গরুকভ নিজের খুসিতেই হেসে উঠল।

"শুধুই এই?" বল্‌কন্‌স্কি বলল।

"যাই হোক, বিলিবিনই একটা উপযুক্ত পাঠ খুঁজে বের করেছে। সে যেমন জ্ঞানী তেমনই চতুর।"

"সেটা কি?"

"ফরাসী সরকারের প্রধান সমীপেষু: Au chef du governement francais." গম্ভীর আত্মতুষ্টির সঙ্গে দল্‌গরুকভ বলল। "ভাল, তাই না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তিনি তো এটা খুবই অপছন্দ করবেন?" বল্‌কন্‌স্কি বলল।

“তা তো বটেই, খুবই অপছন্দ হবে! আমার দাদা তাকে চেনে, সে তো বর্তমান সম্রাটের সঙ্গে খানাও খেয়েছে; দাদাই আমাকে বলেছে, তার মত ধূর্ত ও সূক্ষ্মবুদ্ধি কূটনীতিক সে আর দেখে নি—জানেন তো, লোকটি ফরাসী নিপুণতা ও ইতালীয় অভিনয়-দক্ষতার এক অপূর্ব সমন্বয়! তার ও কাউণ্ট মার্কভ-এর গল্পটা জানেন তো? কাউণ্ট মার্কভই একমাত্র লোক যে তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারত! রুমালের গল্পটা জানেন তো। ভারী মজার!”

একবার বরিসের দিকে একবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে ফিরে ফিরে বাচাল দল্‌গরুকভ বলতে লাগল, আমাদের রাষ্ট্রদূত মার্কভকে পরীক্ষা করবার জন্য বোনাপার্তি ইচ্ছা করে তার সামনে নিজের রুমালটা ফেলে দিয়ে মার্কভের দিকে তাকাল; হয়তো সে আশা করেছিল যে মার্কভ তার রুমালটা তুলে দেবে; কিন্তু মার্কভ সঙ্গে সঙ্গে নিজের রুমালটাকে তার রুমালের পাশে ফেলে দিয়ে নিজেরটা তুলে নিল, কিন্তু বোনাপার্তের রুমালটা স্পর্শও করল না।

বল্‌কন্‌স্কি বলল, “খুব মজার গল্প! কিন্তু প্রিন্স, আমি আপনার কাছে এসেছি এই যুবকের হয়ে একটা আবেদন নিয়ে। দেখুন…” প্রিন্স আন্‌দ্রু কথা শেষ করবার আগেই সম্রাটের কাছ থেকে একজন এড্‌-ডি-কং এল দল্‌গরুকভকে ডাকতে।

“আঃ, কত যে ঝামেলা।” তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু ও বরিসের হাতে চাপ দিয়ে দল্‌গরুকভ বলল। “জানেন তো আপনার জন্য ও এই যুবকটির জন্য আমার সাধ্যমত কিছু করতে পারলে আমি খুব খুসি হব। কিন্তু দেখতেই তো পাচ্ছেন…অন্য সময় হবে!”

উচ্চ ক্ষমতাশালী লোকদের এত কাছাকাছি আসার চিন্তায় বরিস তখন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। প্রিন্স দল্‌গরুকভের পিছন পিছন তারা দুজনও বারান্দায় বেরিয়ে এল। সম্রাটের ঘরের যে দরজা দিয়ে প্রিন্স দল্‌গরুকভ ঢুকল, সেই দরজা দিয়েই বেরিয়ে এল বেসরকারী পোশাক পরা একটি ছোটখাট মানুষ; তার চতুর মুখ ও বেরিয়ে-আসা চোয়ালে ফুটে উঠেছে একটা সজীব ও চটপটে ভাব। দল্‌গরুকভকে দেখে লোকটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত মাথাটা নাড়ল, তারপর ঠাণ্ডা, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকিয়ে সোজা এগিয়ে এল; স্পষ্টতই সে আশা করেছিল যে প্রিন্স আন্‌দ্রু তাকে অভিবাদন করবে, আর না হয় তো তার পথের সামনে থেকে সরে যাবে। প্রিন্স আন্‌দ্রু কোনটাই করল না: তার মুখে দেখা দিল শত্রুতার ভাব; ছোট লোকটিও মুখ ঘুরিয়ে বারান্দার অন্য দিকে সরে গেল।

“লোকটি কে?” বরিস শুধাল।

“ইনি হচ্ছেন অত্যন্ত বিখ্যাত, কিন্তু আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর—পররাষ্ট্র মন্ত্রী আদম জারতরিস্কি; এদের মত লোকরাই জাতির ভাগ্যবিধাতা,” প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্‌কনস্কি বলল।

পরদিন শুরু হল সেনাবাহিনীর অভিযান; সেই থেকে একেবারে অস্তারলিজ যুদ্ধ পর্যন্ত বরিস কি প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গে, কি দল্‌গরুকভের সঙ্গে আর একটিবারও দেখা করতে পারল না; ততদিন সে এস্‌মেলভ রেজিমেণ্টেই থেকে গেল।

অধ্যায়—১০

১৬ই নভেম্বর ভোরে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের অধীনস্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত দেনিসভের অশ্বারোহী সেনাদল (এই সেনাদলে আছে নিকলাস রস্তভ) রাতটা কাটিয়ে পূর্বব্যবস্থামত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে চলল। প্রায় এক ভার্স্ট পথ অন্য সেনাদলের পিছন পিছন চলবার ,পরে বড় রাস্তায় দেনিসভের সেনাদলকে থামিয়ে দেওয়া হল। রস্তভ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, কসাকরা, ও পরে প্রথম ও দ্বিতীয় হুজারবাহিনী, পদাতিক বাহিনী ও গোলন্দাজ বাহিনী একে একে তাদের ফেলে এগিয়ে গেল; তারপর সেনাপতি ব্যাগ্রেশন ও সেনাপতি দল্‌গরুকভও তাদের অ্যাডজুটাণ্টদের সঙ্গে নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। যুদ্ধ শুরু হবার আগেকার আতংক, সে আতংককে জয় করবার মানসিক দ্বন্দ্ব, যুদ্ধে একজন প্রকৃত হুজার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্ন—সবই বৃথা হয়ে গেল। তাদের সেনাদলকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হল, আর রস্তভকে পুরো দিনটা কাটাতে হল শোচনীয় একঘেয়েমির মধ্যে। সকাল নটায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এল, শোনা গেল হুরুরা ধ্বনি, কিছু কিছু আহত সৈন্যকে বয়ে আনা হল; এবং শেষপর্যন্ত কসাকদের পাহারায় একটা পুরো ফরাসী অশ্বারোহী সেনাদলকে নিয়ে আসা হল। বোঝা গেল, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এবং বড় মাপের যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধে তাদেরই জয় হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে সৈনিক ও অফিসাররা বলতে শুরু করল উজ্জ্বল সাফল্যের কথা, উইশাউ শহর দখলের কথা, এবং একটা পুরো ফরাসী অশ্বারোহী সেনাদলকে বন্দী করার কথা। রাতের তীব্র বরফপাতের পরে সারাদিনটা বেশ উজ্জ্বল ও রৌদ্রস্নাত, হেমন্তের দিন যেন খুসিতে ঝলমল; তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে জয়লাভের কাহিনী ফিরছে সকলের মুখে মুখে; রস্তভের পাশ দিয়ে আসতে-যেতে সাধারণ সৈনিক থেকে আরম্ভ করে অফিসার, সেনাপতি ও অ্যাডজুটাণ্ট সকলেই বলছে যুদ্ধজয়ের কথা। আর সে যুদ্ধের আগেকার সব আতংক সহ্য করেও এই শুভদিনটিকে কাটিয়েছে নিষ্কর্মার মত, আর তার ফলে তার মন-মেজাজ আরও খারাপ হয়ে উঠেছে।

একটা ফ্লাস্ক ও কিছু খাবার নিয়ে রাস্তার পাশে বসেছিল দেনিসভ। সে চেঁচিয়ে ডাকল, "এদিকে এস হে রস্তভ। এস আমাদের সব দুঃখ গলায় ঢেলে দি!"

অফিসাররা দেনিসভকে ঘিরে পান-ভোজনে মেতে উঠল।

দুটি কসাক জনৈক বন্দী ফরাসী অশ্বারোহীকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; তাকে দেখিয়ে একজন অফিসার বলে উঠল, "ঐ দেখ! ওরা আর একজনকে ধরে আনছে!"

বন্দীর কাছ থেকে কেড়ে-নেওয়া একটা সুন্দর বড় ঘোড়ার লাগাম ছিল একজন কসাকের হাতে।

দেনিসভ কসাকদের বলল, "ও ঘোড়াটা আমাদের কাছে বেচে দাও।"

"হুজুরদের পছন্দ হলে নিয়ে নিন!"

কসাকরা দুটি স্বর্ণমুদ্রার বদলে ঘোড়াটা দিয়ে দিল আর সেটা কিনে নিল রস্তভ, কারণ এখন তার হাতে অনেক টাকা।

তার হাতে ঘোড়াটা তুলে দেওয়া হলে ফরাসী অশ্বারোহীটি বলল, "আমার ঘোড়াটিকে কষ্ট দেবেন না যেন!"

রস্তভ হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে দামটা দিয়ে দিল।

বন্দীর হাত ধরে কসাকটি বলল, "চল হে, চল।"

হঠাৎ হুজারদের মধ্যে সোরগোল উঠল, "সম্রাট! সম্রাট!"

সকলেই হৈ-চৈ ছুটাছুটি শুরু করে দিল; রস্তভ দেখল, সাদা পালক গোঁজা টুপি মাথায় কয়েকজন অশ্বারোহী পিছন দিক থেকে এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে প্রত্যেকেই যার যার জায়গা নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

কখন সে যে ছুটে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসেছে রস্তভ তা জানে না, মনে করতেও পারে না। যুদ্ধে যোগ দিতে না পারার দুঃখ ও অপ্রসন্ন মেজাজ, এমন কি নিজেকে নিয়ে সব ভাবনাচিন্তা মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল। সম্রাটের কাছাকাছি আসতে পারার আনন্দেই মন ভরে উঠল। মনে হল, এই কাছে আসতে পারাতেই তার সারাদিনের দুঃখ মিটে গেল। মিলনের বহুবাঞ্ছিত মুহূর্তটি সমাগত হলে প্রেমিকের মনে যে সুখের সঞ্চার হয় সেই সুখ জেগেছে তার মনে। চারদিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই: তার মনে শুধু একটি আনন্দের উচ্ছ্বাস—তিনি আসছেন! রস্তভের কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসছে সেই সূর্য, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার নরম মহনীয় অথচ সরল আলোকরশ্মি! চারদিকের মৃত্যু-স্তব্ধতার মধ্যে শোনা গেল সম্রাটের কণ্ঠস্বর।

"পাভ্‌লোগ্রাদ অশ্বারোহীদল কি?" সম্রাট শুধাল।

"রিজার্ভ সেনাদল স্যার!" উত্তর এল পূর্ব কণ্ঠস্বরের তুলনায় একটি সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরে।

সম্রাট এসে থামল রস্তভের পাশে। তিনদিন আগেকার কুচকাওয়াজ দেখা মুখের চাইতেও আজ আলেক্সান্দারের মুখ অনেক বেশী সুন্দর দেখাচ্ছে। সে মূর্তি যেন একটি ফুটফুটে চোদ্দ বছরের বালকের, অথচ সে মুখ মহামান্য সম্রাটের। অশ্বারোহী দলটিকে পর্যবেক্ষণের সময় ঘটনাক্রমেই সম্রাটের চোখ

পড়ল রস্তভের চোখে; দুই সেকেণ্ডের জন্য সেখানেই স্থির হয়ে রইল। রস্তভের মনের মধ্যে তখন কি হচ্ছে সম্রাট তা বুঝল কি না কে জানে (রস্তভের মনে হল সম্রাট সব বুঝতে পেরেছে), তার দুটি নীল চোখ দুই সেকেণ্ড সময় রস্তভের মুখের দিকেই তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টিতে ঝরে পড়ল একটি শান্ত, মৃদু আলো। তারপর হঠাৎই ভুরু তুলে পা দিয়ে ঘোড়ার পেটে খোঁচা মেরে সে জোর কদমে ছুটে চলে গেল।

পাঁচ মিনিট পরেই পাভ্‌লোগ্রাদ সেনাদলকে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল। ছোট জার্মান শহর উইশাউতে রস্তভ আর একবার সম্রাটকে দেখল। সম্রাট আসার ঠিক আগেই বার্জার অঞ্চলে বেশ কিছুটা গোলাগুলি চলেছিল; কিছু নিহত ও আহত সৈনিক তখনও সেখানে পড়েছিল; সরিয়ে নেবার মত সময় পাওয়া যায় নি। অফিসার ও সভাসদ পরিবৃত হয়ে একটা লেজ-কাটা বাদামী ঘোটকির পিঠে চড়ে চলেছে সম্রাট। একদিকে ঝুঁকে সোনা-বাঁধানো কাঁচটাকে আস্তে চোখের সামনে ধরে সে দেখল, একটি সৈনিক উপুড় হয়ে পড়ে আছে; তার খোলা মাথাটা রক্তে মাখামাখি। আহত সৈনিকটি এত নোংরা, তাকে দেখলে এমনভাবে গা ঘিন-ঘিন করে যে সম্রাটকে তার এত কাছাকাছি দেখে রস্তভ মনে কষ্ট পেল। রস্তভ দেখল, সম্রাটের কাঁধ দুটি এমনভাবে কাঁপছে যেন তার শীত করছে; বাঁ পায়ের পাদানি দিয়ে সে ঘোড়ার পেটটা আস্তে আস্তে ঠুকতে লাগল, আর সুশিক্ষিত ঘোড়াটাও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। একটা স্ট্রেচার আনা হল। একজন অ্যাডজুটাণ্ট ঘোড়া থেকে নেমে দুই হাতে সৈনিকটিকে তুলে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। সৈনিকটি আর্তনাদ করে উঠল।

"আস্তে, আস্তে; আর একটু আস্তে তুলে ধরতে পার না?" এমনভাবে সম্রাট কথাটা বলল যেন মুমূর্ষু সৈনিকটির চাইতে তারই বেশী কষ্ট হচ্ছে। তারপরই সম্রাট ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

রস্তভ দেখল, সম্রাটের চোখ জলে ভরে উঠেছে। যেতে যেতেই সে জার-তরিস্কিকে বলছে: "এই যুদ্ধ কী ভয়ংকর: কত ভয়ংকর!"

অগ্রবর্তী সৈনিকদের প্রতি সম্রাটের কৃতজ্ঞতা ঘোষণা করা হল, নানা রকম পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, সৈনিকদের দেওয়া হল ভদকার দ্বিগুণ রেশন। সশব্দে জলল শিবির-আগুন, সৈনিকদের গান ধ্বনিত হল আগের রাতের চাইতে অধিকতর আনন্দের সুরে। মেজর পদে উন্নীত হওয়ায় দেনিসভ একটা অনুষ্ঠান করল, আর সেখানেই প্রচুর মদ খেয়ে রস্তভ সম্রাটের স্বাস্থ্য কামনা করতে উঠে বলল, "আমি বলব না 'আমাদের সার্বভৌম সম্রাট' যা বলা হয়ে থাকে সরকারী ভোজসভায়, আমি স্বাস্থ্য পান করব 'আমাদের সার্বভৌম, সৎ, মোহময়, মহান পুরুষের'! আসুন আমরা পান করি তাঁর স্বাস্থ্য এবং ফরাসীদের নিশ্চিত পরাজয় কামনা করি!"

সে আরও বলল, "যদি ফরাসীদের অগ্রসর হতে না দিয়ে শোন্ গ্রেবার্ণের মত আমরা আগেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতাম, তাহলে এখন তিনি যখন রণক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে হাজির হয়েছেন তখন আমরা কী না করতাম? তাঁর জন্য আমরা খুসি হয়ে মৃত্যু বরণ করতাম। তাই নয় কি ভদ্রজনরা? হয়তো আমি কথাটা ঠিক মত বলতে পারছি না, বড় বেশী মদ গিলেছি—কিন্তু এটাই আমার মনের কথা, আর আপনাদেরও! প্রথম আলেক্সান্দারের স্বাস্থ্য কামনায়! হুর্‌রা!"

অফিসাররাও সোৎসাহে চীৎকার করে উঠল, "হুর্‌রা!"

বাইশ বছর বয়সের রস্তভের মতই সমান উৎসাহে ও আন্তরিকতায় চেঁচিয়ে উঠল অশ্বারোহী বাহিনীর বৃদ্ধ ক্যাপ্টেন কিসতেন।

অফিসাররা যখন নিজ নিজ গ্লাস খালি করে আছড়ে ভেঙে ফেলল, কিসতেন তখন অন্য গ্লাস ভর্তি করে নিয়ে শার্ট ও ব্রীচেস পরেই সৈনিকদের শিবির-আগুনের কাছে এগিয়ে গেল, এবং দীর্ঘ পাকা গোঁফ ও বুকখোলা শার্টের নীচে সাদা বুক ফুলিয়ে উদ্যত হাত দোলাতে দোলাতে মহনীয় ভঙ্গীতে আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "ওহে ছোকরারা! আমাদের সার্বভৌম সম্রাট ও শত্রুর উপর জয়লাভের উদ্দেশে এই গ্লাস! হুর্‌রা!"

হুজাররা চারদিকে ভিড় করে উচ্চ চীৎকারে তাকে সমর্থন করল।

সেদিন অনেক রাতে সকলে চলে গেলে দেনিসভ তার প্রিয় রস্তভের ঘাড়ে আস্তে আস্তে চাপড় দিতে লাগল।

বলল, "যেহেতু সমরাভিযানের সময় প্রেমে পড়বার মত কাউকে পাওয়া যায় না, তাই সে জারের প্রেমেই পড়েছে।"

রস্তভ চেঁচিয়ে বলল, "দেনিসভ, এ নিয়ে ঠাট্টা করো না। এ অনুভূতি বড় মহৎ, বড় সুন্দর, এমন একটা…।"

"আমি তা বিশ্বাস করি বন্ধু, বিশ্বাস করি; আমিও তো এর অংশীদার, সমর্থক…."

"না, তুমি কিছু বোঝ না!"

রস্তভ উঠে শিবির-আগুনের পাশ দিয়ে হাঁটতে লাগল; তার চোখে একই স্বপ্ন—সম্রাটের জীবন রক্ষার জন্য নয় (সেকথা সে ভাবতেও পারে না), শুধু তার চোখের সামনে মরতে পারলেই কত না সুখ সে পেত! সত্যি, জারের প্রতি, রুশ বাহিনীর গৌরবের প্রতি, ভবিষ্যৎ বিজয়ের আশার প্রতি সে প্রেমে পড়েছে। আর অস্তারলিজ যুদ্ধের আগেকার সেই স্মরণীয় দিনগুলিতে এ অভিজ্ঞতা শুধু তার একার হয় নি; রুশ বাহিনীর দশ ভাগের নয় ভাগ লোক তখন জারের এবং রুশ বাহিনীর গৌরবের প্রেমে পড়েছিল।

অধ্যায়—১১

পরদিন সম্রাট উইশাউতে থামল; তার ডাক্তার ভিলিয়েরকে বারবার ডাকা হল। প্রধান ঘাঁটিতে এবং আশপাশের সৈন্যদের মধ্যে খবর রটে গেল যে সম্রাট অসুস্থ। আশপাশের লোকরা জানাল, সম্রাট কিছু খায় নি, আর রাতে ভাল ঘুমও হয় নি। নিহত ও আহতদের দৃশ্য তার স্পর্শকাতর মনের উপর এত বেশী চাপ সৃষ্টি করেছে যে তার ফলেই সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

১৭ তারিখ ভোরবেলা সন্ধির পতাকা নিয়ে একজন ফরাসী অফিসার এল রুশ সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে। অফিসারটির নাম সাভারি। সম্রাট তখন সবে ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই সাভারিকে অপেক্ষা করতে হল। দুপুরে তাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যাওয়া হল, আর এক ঘণ্টা পরেই প্রিন্স দল্‌গরুকভকে সঙ্গে নিয়ে সে ফরাসী বাহিনীর অগ্রবর্তী ঘাঁটির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গুজব রটে গেল, নেপোলিয়নের সঙ্গে আলেক্সান্দারের একটি সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব করতেই সাভারিকে পাঠানো হয়েছিল। গোটা বাহিনীকে আনন্দিত ও গর্বিত করে সাক্ষাৎকারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হল; সকলের ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এই আলোচনার প্রস্তাব যদি সত্যসত্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা থেকেই উদ্ভূত হয়ে থাকে সেই আশায় স্থির করা হয়েছে, স্বয়ং সম্রাটের পরিবর্তে উইশাউ যুদ্ধের বিজয়ী নায়ক দল্‌গরুকভকে পাঠানো হোক নেপোলিয়নের সঙ্গে আলোচনায় বসতে।

সন্ধ্যার দিকে দল্‌গরুকভ ফিরে এল, সোজা গেল জারের কাছে, এবং দীর্ঘসময় তার সঙ্গে একলা কাটাল।

১৮ই ও ১৯শে নভেম্বর সেনাবাহিনী দুদিনের পথ অতিক্রম করল, এবং ছোটখাট গুলি-বিনিময়ের পর শত্রুপক্ষ ঘাঁটি ছেড়ে পিছিয়ে গেল। ১৯ তারিখ দুপুর থেকে সেনাবাহিনীর উচ্চতম মহলে তীব্র উত্তেজনাপূর্ণ কর্মব্যস্ততা শুরু হল এবং সেটা চলল ২০ তারিখ সকাল পর্যন্ত; তখনই শুরু হল অস্তারলিজের স্মরণীয় যুদ্ধ।

১৯শে দুপুর পর্যন্ত সবরকম কর্মব্যস্ততা সীমাবদ্ধ ছিল সম্রাটের প্রধান ঘাঁটিতে। কিন্তু সেইদিন বিকেল থেকেই তা ছড়িয়ে পড়ল কুতুজভের প্রধান ঘাঁটিতে ও সেনাদলের অধিনায়কদের মধ্যে। সন্ধ্যা নাগাদ সব অ্যাডজুটাণ্টরা ছড়িয়ে পড়ল সেনাবাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এবং ১৯শে থেকে ২০শে রাত্রিতে মিত্র বাহিনীর আশি হাজার সৈন্য রাতের ঘুম থেকে জেগে উঠল কলগুঞ্জনের মধ্যে; ছ মাইল দীর্ঘ একটা সুসংহত বাহিনী এগিয়ে চলল স্রোতধারার মত।

সকালে সম্রাটের প্রধান ঘাঁটিতে যে সুসংহত কর্মধারার সূচনা হয়েছিল এবং গোটা অভিযানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল তাকে তুলনা করা চলে একটা প্রকাণ্ড দুর্গ-ঘড়ির প্রধান চাকার গতির সঙ্গে। একটা চাকা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল, তার থেকে চলতে লাগল আর একটা চাকা, তারপর তৃতীয় চাকা,

গতি হতে লাগল দ্রুত থেকে দ্রুততর, দণ্ডযন্ত্র ও দাঁতওয়ালা চাকাগুলো চলতে শুরু করল, ঘণ্টা বাজতে লাগল, সংখ্যাগুলো দেখা দিল, আর এই সব কিছুর ফলে কাঁটা দুটো নিয়মিত গতিতে এগিয়ে চলল।

একটা ঘড়ির কলকজার বেলায় যেমন একটি সামরিক যন্ত্রের কলকজার বেলায়ও তেমনই একবার কাজ শুরু হলেই চূড়ান্ত ফল পর্যন্ত সেটা এগিয়ে চলে। একটা ঘড়ির বেলায় যেমন অসংখ্য চাকা ও কপিকলের জটিল নড়াচড়ার ফলে কাঁটাগুলি ধীর ও নিয়মিত গতিতে চলে সময় নির্দেশ করে, ঠিক তেমনই ১৬০,০০০ রুশ ও ফরাসী বাহিনীর জটিল কর্মধারা—তাদের আবেগ, বাসনা, অনুশোচনা, লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা, এবং অহংকার, আতংক ও উৎসাহ—সব কিছুর একটিমাত্র ফল হল অস্তারলিজের যুদ্ধের অর্থাৎ তথাকথিত তিন সম্রাটের যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি—অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের ডায়ালের উপর একটি কাঁটার ধীরগতিতে সঞ্চরণ।

সন্ধ্যা ছটায় কুতুজভ গেল সম্রাটের প্রধান ঘাঁটিতে, অতি অল্প সময় জারের সঙ্গে কাটিয়ে সে গেল রাজসভার গ্র্যাণ্ড মার্শাল কাউণ্ট তলস্তয়ের সঙ্গে দেখা করতে।

এই সুযোগে বল্‌কন্‌স্কি গেল দল্‌গরুকভের সঙ্গে দেখা করে আসন্ন যুদ্ধের কিছু বিবরণ সংগ্রহ করতে। সে বুঝতে পেরেছে, কোন ব্যাপারে কুতুজভ বিচলিত ও অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং প্রধান ঘাঁটিতে সকলেই তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে।

দল্‌গরুকভ বিলিবিনের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছিল। বলল, "আরে, আপনার খবর কি? এ চায়ের ব্যবস্থাটা আগামীকালের উদ্দেশে। আপনাদের বুড়ো মানুষটির খবর কি? মেজাজ খারাপ?"

"মেজাজ খারাপ বলব না, কিন্তু আমার মনে হয় তার কথা শোনা উচিত ছিল বলেই তার ধারণা।"

"কিন্তু সমর-পরিষদে তো সকলে তার কথা শুনেছিল, আর তিনি যখন যুক্তিপূর্ণ কথা বলবেন তখন আবার তার কথা শোনা হবে, কিন্তু এই মুহূর্তে যখন নেপোলিয়ন একটা সার্বিক যুদ্ধ ছাড়া আর কোন কিছুকেই ভয় করে না তখন কালহরণ করা ও একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করে থাকা একেবারেই অসম্ভব।"

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "আচ্ছা, আপনি তাকে দেখেছেন? বোনাপার্ত দেখতে কেমন? তাকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছে?"

দল্‌গরুকভ উত্তরে আর একবার বলল, "হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি; আমার দৃঢ় ধারণা একটা সার্বিক যুদ্ধকে সে যত ভয় করছে তেমন আর কোন কিছুকেই নয়। সে যদি যুদ্ধকে ভয়ই না করবে তাহলে সেই সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা জানিয়েছিল কেন? আলোচনাই বা কেন? আর তার চাইতেও বড় কথা, পশ্চাদপসরণ যখন তার যুদ্ধ-পরিচালনা রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত তখন সে

পশ্চাদপসরণই বা করল কেন ? আমাকে বিশ্বাস করুন, সে ভয় পেয়েছে, একটা বড় মাপের যুদ্ধকে সে ভয় পেয়েছে। তার দিন ফুরিয়েছে। আমার কথা শুনে রাখুন।”

প্রিন্স আনন্ড্রু আবার বলল, “কিন্তু আমাকে বলুন লোকটি দেখতে কেমন ?”

“পরনে ধূসর ওভারকোট, আমার মুখে ‘ইয়োর ম্যাজেস্টি’ ডাক শুনতে খুবই উদ্‌গ্রীব, কিন্তু তার বড়ই দুঃখ যে আমার কাছ থেকে সে-খেতাবটি পায় নি! এই ধরনের লোক আর কি, এর বেশী কিছু নয়।” বিলবিনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে দল্‌গরুকভ বলল।

সে বলতেই লাগল, “বৃদ্ধ কুতুজভের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আমি বলব, বোনাপার্তকে মুঠোর মধ্যে পেয়েও আমরা যদি অকারণে কালক্ষেপ করে তাকে পালাবার সুযোগ করে দেই অথবা আমাদের ফাঁকি দেবার সুযোগ দেই, তাহলে আমাদের জবাব হয় না। না, সুভরভ ও তার রাজনীতিকে আমরা ভুলতে পারি না—শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আক্রমণ কর। আমাকে বিশ্বাস করুন, যুদ্ধের ব্যাপারে বুড়ো ‘কাংটেটর’-দের (অকারণ কালক্ষেপকারী) অভিজ্ঞতা অপেক্ষা যুবকদের কর্মোৎসাহই শ্রেয়তর পথপ্রদর্শক।”

“কিন্তু আমরা তাকে কোন্ পথে আক্রমণ করব ? আজই আমি ঘাঁটি-গুলি দেখে এসেছি, কিন্তু তার প্রধান সেনাদল যে কোথায় আছে সেটা বলা একেবারেই অসম্ভব,” প্রিন্স আনন্ড্রু বলল।

সে নিজে আক্রমণের যে পরিকল্পনাটা করেছে সেটাই দল্‌গরুকভকে বোঝাতে চাইল।

“ওঃ, সে তো একই ব্যাপার,” তাড়াতাড়ি এই কথা বলে দল্‌গরুকভ টেবিলের উপর একটা মানচিত্র বিছিয়ে দিল। “যা কিছু ঘটা সম্ভব সবই খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। সে যদি ব্রুন-এর সামনে থাকে…”

খুব দ্রুতলয়ে কিছুটা অস্পষ্টভাবে দল্‌গরুকভ ওয়েরদার-এর আক্রমণের ছকটা বুঝিয়ে বলল।

জবাব দিতে গিয়ে প্রিন্স আনন্ড্রু নিজের ছকটা পেশ করে ওয়েরদারের ছকের দোষত্রুটি ও নিজের ছকের গুণের কথা বলতেই প্রিন্স দলগরুকভের মনোযোগ কেটে গেল; টেবিলের মানচিত্রের দিকে না তাকিয়ে অন্যমনস্ক-ভাবে তাকাল প্রিন্স আনন্ড্রুর মুখের দিকে।

“আজ রাতে কুতুজভের শিবিরে সমর-পরিষদের বৈঠক বসবে; এসব কথা আপনি সেখানেই বলতে পারবেন,” দল্‌গরুকভ বলল।

মানচিত্রের কাছ থেকে সরে গিয়ে প্রিন্স আনন্ড্রু বলল, “তাই করব।”

এতক্ষণ পর্যন্ত বিলিবিন মৃদু হাসির সঙ্গে দুজনের আলোচনা শুনছিল,

এবার ঠাট্টার সুরে বলে উঠল, "মশাইরা কি নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন? আগামীকাল জয়ই হোক আর পরাজয়ই হোক, রুশ বাহিনীর গৌরব কিন্তু নিরাপদ। একমাত্র আপনাদের কুতুজভ ছাড়া সেনাপতিপদে একজনও রুশ ভদ্রলোক নেই! সেনাপতিরা হলেন: হের জেনারেল উইম্‌ফেন লে কোঁৎ দ্য ল্যাগারোঁ, লে প্রিন্স দ্য লিচ্‌তাঁর্তে, লে প্রিন্স দ্য হোয়েঁলোহে, আর সবশেষে প্রিশ্‌প্রিশ্‌ এবং আরও সব পোলিশ নামধারী কর্তারা।"

দলগরুকভ বলল, "তুমি চুপ কর হে নিন্দুক! তোমার কথা সত্যি নয়; এখন আছেন দুজন রুশ, মিলোরাদভিচ ও দখ্‌তুরভ, আরও একজন আসছেন কাউণ্ট আরাকৃচীভ, অবশ্য যদি তার স্নায়ুর শক্তিতে কুলোয়।"

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "যাই হোক, আমার মনে হয় জেনারেল কুতুজভ বেরিয়ে এসেছেন। মশাইরা, আমি আপনাদের সৌভাগ্য ও সাফল্য কামনা করি।" দল্‌গরুকভ ও বিলিবিনের সঙ্গে করমর্দন করে সে বেরিয়ে গেল।

ফিরবার পথে কুতুজভ চুপচাপ প্রিন্স আন্দ্রুর পাশেই বসেছিল; কালকের যুদ্ধ সম্পর্কে সে কি ভাবছে এ-প্রশ্নটা প্রিন্স আন্দ্রু তাকে না করে পারল না।

কুতুজভ কঠোর দৃষ্টিতে তার অ্যাড্‌জুটান্টের দিকে তাকাল; তারপর একটু থেমে বলল, "আমি মনে করি যুদ্ধে আমাদের হার হবে; কাউণ্ট তলস্তয়কেও আমি সেই কথা বলেছি, আর তাকে অনুরোধ করেছি কথাটা সম্রাটকে বলতে। কিন্তু তিনি কি জবাব দিলেন ভাবতে পার? 'প্রিয় সেনাপতি, ভাত ও কাটলেট নিয়ে আমি বড় ব্যস্ত, যুদ্ধের ব্যাপারটা আপনিই দেখুন!' হ্যাঁ— সেই জবাবই আমি পেয়েছি!"

অধ্যায়—১২

রাত নটার একটু পরেই ওয়েরদার তার পরিকল্পনাটা নিয়ে কুতুজভের শিবিরে গেল; সেখানেই সমর-পরিষদের বৈঠক বসবে। সব দলীয় অধিনায়কদেরই প্রধান সেনাপতির কাছে ডাকা হয়েছিল; একমাত্র ব্যাগ্রেশন ছাড়া আর সকলেই নির্ধারিত সময়ে এসে হাজির হল। প্রস্তাবিত যুদ্ধের উপর এখন ওয়েরদারের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব; সে যেমন উৎসুক, তেমনই চটপটে; আর সমর-পরিষদের সভাপতি হওয়া সত্ত্বেও অসন্তুষ্ট ও তন্দ্রালু কুতুজভ তার একেবারে বিপরীত। ওয়েরদার বুঝতে পেরেছে, এ যুদ্ধের গতি এখন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সে যেন একটা ভারী গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া ঘোড়ার মত সবেগে পাহাড় থেকে নীচে নামছে। সে গাড়িটাকে টানছে, না গাড়িটাই তাকে ঠেলে দিচ্ছে তা সে জানে না, কিন্তু সে সবেগে ছুটে নামছে—এ গতি তাকে কোথায় নিয়ে যাবে সেকথা ভাববার সময়ও তার নেই। সে রাতে সে দুবার শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করেছে, দুবার রুশ ও

অস্ট্রীয় দুই সম্রাটের সঙ্গে দেখা করে তার প্রতিবেদন রেখেছে, আর দুবার গেছে প্রধান ঘাঁটিতে সব বিলি-ব্যবস্থা করতে; তাই এখন ক্লান্ত হয়ে কুতুজভের বৈঠকে এসেছে।

কুতুজভ অস্ত্রালিজের কাছাকাছি কোন সম্ভ্রান্ত লোকের একটি ছোটখাট দুর্গ দখল করে বাস করছে। যে বড় বসবার ঘরটা এখন প্রধান সেনাপতির আপিস হয়েছে সেখানে হাজির হয়েছে স্বয়ং কুতুজভ, ওয়েরদার এবং সমর-পরিষদের সদস্যগণ। চা খেতে খেতে তারা প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের আসার জন্য অপেক্ষা করছে। অবশেষে ব্যাগ্রেশনের আর্দালি এসে খবর দিল প্রিন্স বৈঠকে আসতে পারবে না। প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘরে ঢুকে খবরটা প্রধান সেনাপতিকে দিল এবং কুতুজভের পূর্ব অনুমতিক্রমে বৈঠকে যোগ দিতে থেকে গেল।

তাড়াতাড়ি আসন থেকে উঠে টেবিলের উপর মেলে রাখা ব্রুন-এর একটা ভৌগোলিক মানচিত্রের কাছে গিয়ে ওয়েরদার বলল, "প্রিন্স ব্যাগ্রেশন যখন আসছে না তখন আমরা শুরু করে দিতে পারি।"

কুতুজভ প্রায় ঘুমন্ত অবস্থায় একটা নীচু চেয়ারে বসে ছিল; তার ইউনিফর্মের বোতাম খোলা থাকায় মোটা গলাটা কলারের উপর দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে পড়েছে। ওয়েরদারের কথায় অনেক চেষ্টা করে একটা চোখ খুলে সে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার যেমন ইচ্ছা! ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গেছে।" বলেই সে আবার মাথাটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজল।

সমর-পরিষদের সদস্যরা প্রথমে ভেবেছিল কুতুজভ ঘুমের ভান করে পড়ে আছে, কিন্তু প্রস্তাব পড়বার সময় তার নাক দিয়ে যে ধ্বনি নির্গত হতে লাগল তাতে বোঝা গেল যে সেই মুহূর্তে প্রধান সেনাপতি নিদ্রার দুর্বার মানবিক প্রয়োজন মেটাবার কাজেই একান্তভাবে ব্যস্ত আছে। যাতে একমুহূর্ত সময়ও নষ্ট না হয় এমনি ভঙ্গী করে ওয়েরদার কুতুজভের দিকে তাকাল, এবং সে যে ঘুমিয়ে পড়েছে সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে একটা কাগজ তুলে নিয়ে একঘেয়ে গলায় উচ্চগ্রামে আসন্ন যুদ্ধের বিলি-বন্দোবস্তের কথা পড়তে শুরু করল:

"১৮০৫-এর ৩০শে নভেম্বর তারিখে কোবেল্‌নিজ ও সোকোল্‌নিজ-এর পশ্চাদ্বর্তী শত্রুপক্ষের ঘাঁটির উপর আক্রমণের পরিকল্পনা।"

পরিকল্পনাটি যেমন জটিল তেমনই শক্ত। মনে হল সেনাপতিরা একান্ত অনিচ্ছায়ই মনোযোগ দিয়ে সেটা শুনছে। দীর্ঘদেহ জেনারেল বাক্সহোদেন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে একটা জ্বলন্ত মোমবাতির দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; মনে হচ্ছে সে কিছুই শুনছে না, শুনবার ইচ্ছাও নেই। ওয়েরদারের ঠিক উল্টো দিকে চকচকে চোখ মেলে তাকিয়ে আর গোঁফ-জোড়াকে উপরের দিকে বাঁকিয়ে সামরিক ভঙ্গীতে ঘাড় উঁচু করে বসে আছে লাস্‌চে মিলোরাদভিচ। সারাক্ষণ সে ওয়েরদারের দিকে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইল। ওয়েরদারের ঠিক পাশেই বসেছিল কাউণ্ট ল্যাঁগারোঁ; তার

খাঁটি দক্ষিণ ফরাসী মুখে একটা সূক্ষ্ম হাসি লেগেই আছে; সারাক্ষণ সে ছবিওয়ালা একটা নস্যদানিকে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে সেইদিকেই তাকিয়ে রইল। একটা দীর্ঘ বাক্যের মাঝখানে নস্যদানি ঘোরানো থামিয়ে মাথাটা তুলে ওয়েরদারকে বাধা দিয়ে কিছু বলতে চাইল। অস্ট্রীয় সেনাপতি কিন্তু পড়েই চলল; রেগে ভ্রূকুটি করল, কনুই দুটোতে ঝাঁকুনি দিল; যেন বলতে চাইল: "তোমার মতামত আমাকে পরে বলো; এখন ভাল ছেলের মত মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে আমার কথায় কান দাও।"

"কী ভূগোলের পড়ারে বাবা!" স্বগতোক্তি মনে হলেও অপরের শোনবার পক্ষে যথেষ্ট জোরেই ল্যাঁগারোঁ বলল।

ওয়েরদারের উল্টো দিকে বসেছিল আর একটি ছোটখাট মানুষ—দখ্‌তুরভ; খোলা মানচিত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে সে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও অপরিচিত জায়গাটাকে বোঝবার চেষ্টা করছিল। যে কথাগুলি সে ভালভাবে শুনতে পাচ্ছে না সেগুলির এবং গ্রামের খটমট নামগুলির পুনরাবৃত্তি করতে সে ওয়েরদারকে বারকয়েক অনুরোধ করল। ওয়েরদার অনুরোধ রাখল, আর দখ্‌তুরভ সেগুলি লিখে নিল।

এইভাবে একসময় ওয়েরদারের একঘেয়ে কণ্ঠস্বর যখন থামল তখন কুতুজভ চোখ মেলল; যাঁতার ঘুম-পাড়ানি গুনগুনানি থামলে যেমন যাঁতাওয়ালার ঘুম ভেঙে যায় ঠিক সেইরকম। ততক্ষণে ল্যাঁগারোঁ তার হাতের নস্যদানি ঘোরানো থামিয়ে ওয়েরদারের যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে কি যেন বলতে শুরু করেছে। তা শুনে কুতুজভ বলে উঠল, "আপনি তাহলে এখনও ওই বাজে ব্যাপার নিয়েই আছেন!" বলেই সে আবার চোখ বুজল; তার মাথাটা আরও ঢলে পড়ল।

ওয়েরদারের যুদ্ধ-পরিকল্পনাকে সাধ্যমত তীব্রভাবে আক্রমণ করে ল্যাঁগারোঁ যুক্তি দেখাল: আক্রান্ত হবার পরিবর্তে বোনাপার্ত তো অনায়াসে নিজেই আক্রমণ করতে পারে, আর সেক্ষেত্রে পুরো পরিকল্পনাটাই তো অকেজো হয়ে যাবে। ওয়েরদারও দৃঢ়তা ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই সব আপত্তি খণ্ডন করতে লাগল; যেন আগে থেকেই এ সব যুক্তির জন্য সে তৈরি হয়েই এসেছে।

বলল, "সে যদি আমাদের আক্রমণ করতে পারত তাহলে তো আজই করত।"

"তাহলে আপনি মনে করেন সে শক্তিহীন?" ল্যাঁগারোঁ বলল।

কোন বৃদ্ধা স্ত্রী যখন ডাক্তারকে বলে চিকিৎসার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে তখন তার মুখে যে হাসি দেখা দেয় সেইরকম হাসি হেসে ওয়েরদার বলল, "তার তো আছে বড় জোর চল্লিশ হাজার সৈন্য।"

"সেক্ষেত্রে আমাদের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করে থেকে সে তো নিজের

সর্বনাশই ডেকে আনছে," সূক্ষ্ম ব্যঙ্গের হাসি হেসে কথাটা বলে সে সমর্থনের আশায় মিলোরাদোভিচের দিকে তাকাল।

মিলোরাদোভিচ হয়তো অন্য কিছু ভাবছিল; সে শুধু বলল, "ধর্মত; বলছি, কাল যুদ্ধক্ষেত্রেই তো আমরা সব কিছু দেখতে পাব।"

ওয়েরদার পুনরায় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, "শত্রু সব আগুন নিভিয়ে দিয়েছে; তার শিবির থেকে একটা একটানা শব্দ শোনা যাচ্ছে। এর অর্থ কি? হয় সে পশ্চাদপসরণ করছে—একমাত্র সেটাকেই আমাদের ভয়—আর না হয়তো সে স্থান পরিবর্তন করছে। (তার মুখে ব্যঙ্গের হাসি।) সে যদি তুয়েরাসাতেও ঘাটি বানায়, তাহলে তো আমাদেরই অনেক ঝামেলা মিটে যাবে, আর আমাদের ব্যবস্থা সব যেমন আছে তেমনি থাকবে।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু অনেকক্ষণ থেকেই সন্দেহ প্রকাশের একটা সুযোগের জন্য অপেক্ষা করেছিল; এবার সে বলল, "সেটা কি রকম?"

এবার কুতুজভ জেগে উঠল, জোরে জোরে কাশতে কাশতে সেনাপতিদের দিকে তাকাল।

বলল, "ভদ্রজনরা, আগামীকালের—বরং বলা যায় আজকের, কারণ মধ্যরাত্রি পার হয়ে গেছে—ব্যবস্থা তো আর এখন পাল্টানো যাবে না। সবই তো আপনারা শুনলেন, আর আমরাও আমাদের কর্তব্য করব। কিন্তু একটা যুদ্ধের আগে সবচাইতে বেশী জরুরী…" সে একটু থামল, "একটি ভাল ঘুম।"

সে উঠবার জন্য গা ঝাড়া দিল। সেনাপতিরা অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল। মধ্যরাত পার হয়ে গেছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু বেরিয়ে গেল।

সমর-পরিষদে প্রিন্স আন্‌দ্রু তার বক্তব্যকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে নি; কিন্তু সেখানকার একটা অস্পষ্ট ও অস্বস্তিকর প্রভাব পড়েছিল তার মনের উপর। কাদের কথা ঠিক—দল্‌গরুকভ ও ওয়েরদারের, নাকি যুদ্ধ-বিরোধী কুতুজভ ও ল্যাঁগারোঁর—তা সে জানে না। "কিন্তু নিজের মতামত পরিষ্কারভাবে সম্রাটকে জানানো কি কুতুজভের পক্ষে সত্যি সম্ভব ছিল না? এও কি সম্ভব যে রাজ-দরবারের জন্য, ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনার জন্য হাজার হাজার মানুষের জীবনকে আমার জীবন, 'আমার' জীবনকে বিপন্ন করতে হবে?"

সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, এটা তো খুবই সম্ভব যে আগামীকালই আমার মৃত্যু ঘটবে। মৃত্যুর এই কথা মনে হতেই পর পর অনেক স্মৃতি, বহুদূরের ও অত্যন্ত ব্যক্তিগত অনেক স্মৃতি তার কল্পনায় ভিড় করল: তার মনে পড়ল বাবা ও স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায়ের দৃশ্য; মনে পড়ল স্ত্রীকে ভালবাসার প্রথম

দিনগুলির কথা। স্ত্রীর গর্ভবতী হবার কথা, মনে হতেই স্ত্রীর জন্য ও নিজের জন্য তার দুঃখ হল ; আবেগাপ্লুত মনে সে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনেই পায়চারি করতে লাগল।

কুয়াসা পড়েছে, আর সেই কুয়াসার ভিতর দিয়ে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে রহস্যজনকভাবে। সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, আগামীকাল, আগামীকাল! কালই আমার সব কিছু শেষ হয়ে যেতে পারে! এইসব স্মৃতি মিলিয়ে যাবে, আমার কাছে তাদের কোন অর্থই থাকবে না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে, এই প্রথম আমার যা কিছু দেখাবার আছে তা কালই দেখাতে হবে। সে যেন কল্পনায় দেখতে পেল—এই যুদ্ধ, তার ক্ষয়-ক্ষতি, যুদ্ধটাকে একটিমাত্র স্থানে কেন্দ্রায়িত করা, আর অধিনায়কদের ইতস্তত মনোভাব। তারপর এল সেই সুখের মুহূর্ত, এল তুলোঁ যার জন্য সে এতকাল অপেক্ষা করে ছিল। দৃঢ়তার সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় নিজের অভিমত সে জানাল কুতুজভকে, ওয়েরদারকে, সম্রাটকে। তার মতের সত্যতায় সকলেই অভিভূত হল, কিন্তু কেউ সেটাকে রূপায়িত করতে এগিয়ে এল না, তাই একটা রেজিমেণ্টকে, এক ডিভিশন সেনাদলকে সে একটা চূড়ান্ত স্থানে পরিচালিত করে একাই জয়লাভ করল। অপর একটি কণ্ঠস্বর বলে উঠল, "কিন্তু মৃত্যু ও যন্ত্রণা?" সে-প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু জয়ের স্বপ্নেই বিভোর হয়ে রইল। পরবর্তী যুদ্ধের পরিকল্পনা সে একাই রচনা করল। সে নামেই কুতুজভের অ্যাডজুটাণ্ট, আসলে সে একাই সব কিছু করে। পরের যুদ্ধটাও সে একাই জিতল। কুতুজভকে সরিয়ে সেখানে তাকে বসানো হল। অপর কণ্ঠস্বর বলল, "আচ্ছা, তারপর? যদি তার আগেই তুমি দশবার আহত বা নিহত না হও, বা তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করা হয়, বেশ তো···· তারপর? ····প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেই জবাব দিল, "তারপর, তারপর কি হবে আমি জানি না, জানতে চাই না, চাইতে পারি না, কিন্তু আমি যদি এটাই চাই—গৌরব চাই, লোকের কাছে পরিচিত হতে চাই, তাদের ভালবাসা পেতে চাই, তাহলে সেটা তো আমার অপরাধ নয় ; শুধু সেইজন্যই তো আমি বেঁচে আছি। হ্যাঁ, শুধু সেইজন্য! সেকথা কাউকে কোনদিন বলব না, কিন্তু হে ঈশ্বর! আমি যদি খ্যাতি ও মানুষের ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই না চাই তাহলে আমি কি করব? মৃত্যু, আঘাত, পরিবারের ক্ষতি—কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না। যারা আমার একান্ত আপন—বাবা, বোন, স্ত্রী—তারা আমার কাছে যতই মূল্যবান ও প্রিয় হোক, তবু ভয়ংকর ও অস্বাভাবিক মনে হলেও একটি মুহূর্তের গৌরবের জন্য, মানুষের উপর জয়লাভের জন্য, পরিচিত ও অপরিচিত মানুষদের ভালবাসা পাবার জন্য এই মুহূর্তে সেসব কিছু ত্যাগ করতে আমি রাজী আছি।" কুতুজভের উঠোনে কিছু লোকের কথাবার্তা তার কানে এল ; জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে

করতে আর্দালিরা কথা বলছে; সম্ভবত কোচম্যানটি কুতুজভের বুড়ো রাঁধুনিটির পিছনে লেগেছে। প্রিন্স আন্দ্রু তাকে চেনে, নাম "তিত"। সে বলছে, "তিত, আমি বলছি তিত!"

"আচ্ছা?" বুড়োটি বলল।

"যাও তিত, গাওগে গীত!" রসিক লোকটি বলল।

"আরে, সব উচ্ছন্নে যা!" বুড়ো বলল; আর্দালি ও চাকরদের হাস্যরোলে তার কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল।

"যাই হোক না কেন, সকলের উপর জয়লাভকেই আমি ভালবাসি, মূল্য দেই। এই কুয়াসার মধ্যে আমার মাথার উপরে যে অলৌকিক শক্তি ও গৌরব ভেসে বেড়াচ্ছে তাকেই আমি মূল্য দেই।"

অধ্যায়—১৩

সেই রাতে ব্যাগ্রেশনের সেনাদলের সামনে একটা খণ্ডযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল একটি পল্টনসহ রস্তভের উপর। তার হুজারদের দুজন করে সারি দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, আর নিজের তন্দ্রার ভাবটা কাটাবার জন্য সে স্বয়ং অশ্বারোহণে চলেছে তাদের পাশে পাশে। কুয়াসার মধ্যেও আমাদের শিবির-আগুনের অস্পষ্ট আলোয় চোখে পড়ছে পিছনকার বিস্তৃত প্রান্তর; সামনে কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার। অনেক চেষ্টা করেও সেই কুয়াসার ভিতর দিয়ে রস্তভ দূরের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না: কখনও মনে হচ্ছে সাদা কিছু চকচক করছে, কখনও দেখা যাচ্ছে কালো-কালো কিছু, কখনও আলোর ফুটকি দেখে মনে হচ্ছে ওখানে শত্রুরা রয়েছে, আবাব পরক্ষণেই মনে হচ্ছে সেটা তার চোখের ভুল। চোখ বুজে আসতেই কল্পনায় ভেসে উঠল—এই সম্রাট, এই দেনিসভ, এই মস্কোর কত স্মৃতি—তাড়াতাড়ি চোখ খুলতেই দেখতে পেল শুধু নিজের ঘোড়ার মাথা ও কান, হুজারদের কালো কালো মূর্তি, আর অনেক দূরে সেই একই কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকার। রস্তভ ভাবতে লাগল: "কেন হয় না? ····এরকম তো সহজেই ঘটতে পারে যে সম্রাট আমার সঙ্গে দেখা করে বলবেন: 'যাও তো, দেখে এস ওখানে কি আছে।' এরকম ঘটনাক্রমে সম্রাটের সঙ্গে কোন অফিসারের পরিচয় হল আর তিনি তাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন—সম্রাট সম্পর্কে এরকম গল্প তো অনেক আছে। তিনি যদি আমাকেও তার পাশে একটু স্থান দেন তো দোষ কি? আঃ, আমি তাকে ভালভাবে পাহারা দেব, তাকে সত্য কথা জানাব, তার প্রতারকদের মুখোস খুলে দেব।" হঠাৎ দূরের একটা হট্টগোলে তার তন্দ্রা ভেঙে গেল। চমকে উঠে সে চোখ খুলল।

চোখ খুলতেই তার কানে এল হাজার কণ্ঠের একটানা চীৎকার। দূরে একটা আগুন জ্বলে উঠেই নিভে গেল, তারপর আবার আগুন; পাহাড়ের

উপরে ফরাসী বাহিনীর রেখা বরাবর আগুন জ্বলে উঠল ; তাদের হৈ-হল্লা ক্রমেই বাড়তে লাগল। ফরাসীদের কথাবার্তা রস্তভের কানে এল, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে পারল না। নানা কণ্ঠস্বর মিলেমিশে একাকার ; সে শুধু শুনতে পেল : "আহাহা !" আর "ররর !"

রস্তভ পাশের হুজারকে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি ? তুমি কিছু বুঝতে পারছ ? ওটা নিশ্চয় শত্রুপক্ষের শিবির !"

হুজার জবাব দিল না।

জবাবের জন্য অপেক্ষা করে রস্তভ পুনরায় শুধাল, "সেকি, তুমি শুনতে পাচ্ছ না ?"

হুজার অনিচ্ছার সঙ্গে জবাব দিল, "কে বলতে পারে ইয়োর অনার ?"

রস্তভ পুনরায় বলল, "যেদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে শত্রুই হবে।"

হুজার তো-তো করে বলল, "হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। যা অন্ধকার····এই, স্থির হ !" নিজের চঞ্চল ঘোড়াটাকে সে বলল।

রস্তভের ঘোড়াটাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে ; জমাট বরফের উপর পা ঠুকছে, শব্দ শুনে কান খাড়া করে আছে, আর চোখ রেখেছে আলোর দিকে। চীৎকার ক্রমেই বাড়তে বাড়তে এমন একটা প্রচণ্ড গর্জন উঠল যা একমাত্র কয়েক হাজার সৈন্যের পক্ষেই করা সম্ভব। আলোগুলোও ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। রস্তভ এখন আর ঘুমিয়ে পড়তে চায় না শত্রুবাহিনীর উল্লসিত জয়সূচক চীৎকার তাকে নতুন প্রেরণা জুগিয়েছে। "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোন ! সম্রাট !" এবার সে স্পষ্ট শুনতে পেল।

"ওরা খুব বেশী দূরে নয়, হয়তো নদীটার ঠিক ওপারেই," রস্তভ বলল পার্শ্ববর্তী হুজারকে।

হুজার জবাব না দিয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, রাগতভাবে কাশল। জোর কদমে ছুটে আসা ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শোনা গেল ; কুয়াসা-ঢাকা অন্ধকারের ভিতর থেকে হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করল জনৈক হুজার সার্জেন্টের মূর্তি ; তাকে দেখাচ্ছে একটা হাতির মত অতিকায়।

রস্তভের পাশে এসে সার্জেন্ট বলল, "ইয়োর অনার, সেনাপতিরা !"

রস্তভ তখনও আগুন ও হৈ-হল্লার দিকেই তাকিয়ে ছিল। রস্তভ সার্জেন্টের সঙ্গে কয়েকজন অশ্বারোহীর সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেল। শত্রু-শিবিরে আলো ও হল্লার এই বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে এসেছে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন ও প্রিন্স দল্‌গরুকভ অ্যাডজুটান্টদের সঙ্গে নিয়ে। রস্তভ ব্যাগ্রেশনের দিকে এগিয়ে যুদ্ধের অবস্থা জানাল, এবং পরে সেনাপতিদের বক্তব্য শুনবার জন্য অ্যাডজুটান্টদের সঙ্গে মিলিত হল।

প্রিন্স দল্‌গরুকভ ব্যাগ্রেশনকে বলল, "বিশ্বাস করুন, এটা একটা চালাকি ছাড়া আর কিছুই না ! সে নিজে পিছিয়ে গেছে, আর পশ্চাদ্বর্তী রক্ষী-

বাহিনীকে হুকুম দিয়েছে আমাদের ঠকাতে আগুন জ্বেলে হৈ-হল্লা করতে।

ব্যাগ্রেশন বলল, "তা নয়। আজ সন্ধ্যায় তাদের আমি ঐ গোল পাহাড়টার উপর দেখেছিলাম; পশ্চাদপসরণ করলে তারা ওখান থেকেও সরে যেত। ······অফিসার!" ব্যাগ্রেশন রস্তভকে বলল, "শত্রুপক্ষের সীমান্ত-রক্ষীরা কি এখনও ওখানে আছে?"

"সন্ধ্যায় তারা ওখানে ছিল, কিন্তু এখনকার কথা আমি জানি না ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমার হুজারদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে দেখে আসব কি?" রস্তভ জবাব দিল।

ব্যাগ্রেশন থামল; জবাব দেবার আগে কুয়াসার মধ্যে রস্তভের মুখটা দেখতে চেষ্টা করল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, "আচ্ছা, তাই যাও, দেখে এস।"

"যাচ্ছি স্যার"।

রস্তভ ঘোড়ার পেটটা ঠুকে দিল; সার্জেন্ট ফেদ্‌চেংকো ও অপর দুজনকে বলল তাকে অনুসরণ করতে এবং জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। যে রহস্যময় ও বিপজ্জনক দূরবর্তী অঞ্চলে তার আগে আর কেউ যায় নি, মাত্র তিনজন হুজারকে সঙ্গে নিয়ে একাকি সেখানে যেতে পারায় সে যুগপৎ ভীত ও পরিতুষ্ট বোধ করল। ব্যাগ্রেসন পাহাড়ের উপর থেকে ডেকে বলল সে যেন নদী পেরিয়ে না যায়, কিন্তু রস্তভ সে কথা না শোনার ভান করে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়েই চলল। একছুটে নীচে নামবার পরে আমাদের অথবা শত্রুপক্ষের আগুন কোনটাই তার চোখে পড়ল না, কিন্তু ফরাসীদের চীৎকার আরও স্পষ্ট হয়ে তার কানে এল। উপত্যকায় পৌঁছে তার মনে হল সামনে একটা নদী আছে, কিন্তু কাছে গিয়ে দেখল সেটা একটা রাস্তা। রাস্তায় নেমে সে লাগামে টান দিল; রাস্তা ধরেই এগিয়ে যাবে, নাকি রাস্তা পার হয়ে কালো মাঠ ধরে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যাবে তা ভেবে ইতস্তত করল। কুয়াসার মধ্যে চকচকে সাদা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলাই অধিকতর নিরাপদ হত কারণ পথ ধরে কেউ এগিয়ে এলে সেটা সহজেই নজরে পড়বে। "আমার পিছনে এস," বলে সে রাস্তাটা পার হয়ে পাহাড়ের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল—সন্ধ্যাবেলা ফরাসী রক্ষীদল যেখানে ছিল সেইদিক লক্ষ্য করে।

"ইয়োর অনার, ওরা এসে পড়েছে!" পিছন থেকে একজন হুজার চীৎকার করে বলল। কুয়াসার ভিতর থেকে হঠাৎ যে কালো মূর্তিটা বেরিয়ে এসেছে সেটা যে কি রস্তভ তা বুঝে উঠবার আগেই একটা আগুনের ঝিলিক দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা আওয়াজ হল, আর একটা বুলেট সোঁ সোঁ শব্দে উপরে উঠে একটানা বিষণ্ণ শব্দের মধ্যে মিলিয়ে গেল। বন্দুকের আর একটা গুলির ঝিলিক দেখা গেল। রস্তভ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে

চলল। কিছুক্ষণ পরে পরেই আরও চারটে গুলির আওয়াজ হল, আর কুয়াসার মধ্যে নানারকম সুর তুলে বুলেটগুলো ছুটে গেল। উত্তেজনায় রস্তভ ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরল, ধীরে ধীরে ফিরে চলল। "আরও কয়েকটা! আরও কয়েকটা!" তার বুকের মধ্যে একটা খুসির কণ্ঠ বেজে উঠল। কিন্তু আর কোন গুলি ছুটল না।

একেবারে ব্যাগ্রেশনের কাছাকাছি এসে রস্তভ আবার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং এক হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে সেনাপতির কাছে পৌঁছে গেল।

দল্‌গরুকভ তখনও বাববারই বলছে যে ফরাসীরা ফিরে গেছে, আগুন জ্বেলেছে শুধু আমাদের ঠকাতে।

রস্তভ এসে পৌঁছবার পরেও সে বলল, "তাতে কি প্রমাণ হল? তারা তো রক্ষীদের রেখেও পশ্চাদপসরণ করতে পারে।"

ব্যাগ্রেশন বলল, "কিন্তু প্রিন্স, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তারা সকলে এখনও চলে যায় নি। কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক, কালই সব কিছু জানা যাবে।"

অভিবাদনের ভঙ্গীতে এক হাত তুলে সামনে ঝুঁকে রস্তভ বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, রক্ষীবাহিনী সন্ধ্যায় যেখানে ছিল এখনও সেখানেই আছে।"

ব্যাগ্রেশন বলল, "খুব ভাল, খুব ভাল। ধন্যবাদ অফিসার।"

রস্তভ বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, একটা অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারি কি?"

"কি অনুগ্রহ?"

"আগামীকাল আমাদের অশ্বারোহী সেনাদলটিকে রিজার্ভে রাখা হবে। সেটাকে প্রথম অশ্বারোহী সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত করার অনুরোধ কি করতে পারি?"

"তোমার নাম কি?"

"কাউণ্ট রস্তভ।"

"ওঃ, বেশ তো, তুমি আমার সঙ্গেই থাকতে পার।"

"কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভের ছেলে?" দল্‌গরুকভ শুধাল।

কিন্তু রস্তভ জবাব দিল না।

"তাহলে আমি ভরসা করতে পারি তো ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

"আমি হুকুম প্রচার করব।"

রস্তভ মনে মনে বলল, "কোন সংবাদ দিয়ে কাল হয়তো আমাকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হবে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

শত্রুপক্ষের আগুন জ্বালানো ও হল্লা করার আসল কারণ হল, নেপোলিয়নের ঘোষণাপত্রটি যখন সৈন্যদের পড়ে শোনানো হচ্ছিল তখন সম্রাট স্বয়ং

ঘোড়া ছুটিয়ে গেল ঘুমন্ত সৈন্যদের মধ্যে। তাকে দেখেই সৈন্যরা খড়ে আগুন দিয়ে তার পিছন পিছন ছুটতে ছুটতে চীৎকার করতে লাগল, "সম্রাট দীর্ঘজীবী হোক!" নেপোলিয়নের ঘোষণাটি ছিল :

"সৈন্যগণ! উল্‌ম-এ অস্ট্রীয় বাহিনীর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে রুশ বাহিনী তোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যে সেনাদলকে তোমরা হোলাব্রুন-এ (একেই তলস্তয় শোন্‌গ্রেবার্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। দুটো জায়গা পাশাপাশি অবস্থিত।) পর্যুদস্ত করেছিলে তারাই আবার এসেছে। আমাদের ঘাঁটি খুবই শক্তিশালী, তারা যখন ডানদিক থেকে আমাকে ঘিরে ধরবার জন্য এগিয়ে আসবে তখন তাদের একটা অংশ আমার সামনে পড়ে যাবে। সৈন্যগণ! আমি নিজে তোমাদের পরিচালনা করব। তোমাদের স্বাভাবিক শৌর্যের দ্বারা তোমরা যদি শত্রুসৈন্যদের মধ্যে বিশৃংখলা ও গোলযোগ সৃষ্টি করতে পার, তাহলে আমি থাকব যুদ্ধ থেকে দূরে, কিন্তু যদি মুহূর্তের জন্যও জয় সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয় তাহলে দেখতে পাবে শত্রুর প্রথম আঘাতের সামনে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে তোমাদের সম্রাট, কারণ জয়লাভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না, বিশেষ করে আজকের দিনে যখন আমাদের জাতির সম্মানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ফরাসী পদাতিক বাহিনীর সম্মান বিপন্ন।

"আহতদের সরিয়ে নেবার অজুহাতে তোমাদের ব্যূহ ভেঙে ফেলো না! প্রতিটি সৈনিক যেন এই চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয় যে আমাদের জাতির প্রতি ঘৃণায় অনুপ্রাণিত ইংলণ্ডের এই ভাড়াটে বাহিনীকে পরাস্ত করতেই হবে! এই জয়েই আমাদের অভিযানের সমাপ্তি হবে, আমরা ফিরে যেতে পারব আমাদের শীতকালীন বাসস্থানে; সেখানে ফ্রান্সে নতুন করে গড়ে তোলা ফরাসী বাহনী আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, আর যে সন্ধি আমি করব তা হবে আমার জনগণের, তোমাদের, এবং আমার নিজের যোগ্য।

নেপোলিয়ন।"

অধ্যায়—১৪

সকাল পাঁচটা। এখনও বেশ অন্ধকার। মধ্যবর্তী সেনাদল, রিজার্ভ সেনাদল এবং ব্যাগ্রেশনের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সেনাদল এখনও চলতে শুরু করে নি; কিন্তু বাম পার্শ্বস্থ যে পদাতিক, অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ সেনাদলের প্রথমে পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে ফরাসী বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব আক্রমণ করবার এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের বোহেমিয়া পর্বতমালার দিকে ঠেলে নিয়ে যাবার কথা তারা ইতিমধ্যেই জেগে উঠে নড়াচড়া শুরু করে দিয়েছে। যত কিছু বাড়তি জিনিস শিবির-আগুনে ফেলে দেওয়ার ফলে ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করছে। বাইরে ঠাণ্ডা ও অন্ধকার। অফিসাররা তাড়াহুড়া করে

চাখাচ্ছে, প্রাতরাশ খাচ্ছে ; সৈন্যরা বিস্কুট চিবুচ্ছে, শরীর গরম করবার জন্য পা দিয়ে তাল ঠুকছে। চেয়ার, টেবিল, চাকা, বালতি, চালাঘরের অবশিষ্ট অংশ—এককথায় যা কিছু তাদের দরকার নেই অথবা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না সে সবই তারা আগুনের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। যেই একজন অস্ট্রীয় অফিসারকে দেখা গেল কম্যাণ্ডিং অফিসারের বাসস্থানের সামনে, অমনি রেজিমেণ্টটা চঞ্চল হয়ে উঠল : সৈন্যরা আগুনের কাছ থেকে ছুটে গেল, পাইপগুলো ঢুকিয়ে দিল বুটের মধ্যে, থলেগুলো তুলে দিল গাড়িতে, বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে সার বেঁধে দাঁড়াল। অফিসাররা কোটের বোতাম আটকাল, কোমরের পেটিতে তরবারি ঝোলাল, তারপর চীৎকার করতে করতে সৈন্যদের সঙ্গে চলতে লাগল। গাড়ির চালক ও আর্দালিরা গাড়িতে ঘোড়া জুড়ল, মালবোঝাই করল, সব কিছু বেঁধেছেদে নিল। অ্যাডজুটাণ্ট ও অধিনায়করা ঘোড়ায় চেপে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, চূড়ান্ত নির্দেশ ও হুকুম জারি করল। তারপর শুরু হল সেনাদলের যাত্রা ; কোথায় চলেছে তা জানে না ; ধোঁয়া ও ক্রমবর্ধমান কুয়াসার জন্য যে জায়গা ছেড়ে যাচ্ছে তাও দেখতে পাচ্ছে না, আবার যেখানে চলেছে তাও দেখতে পাচ্ছে না।

কুয়াসা এত ঘন হয়ে উঠেছে যে আলো ফোটা সত্ত্বেও দশ পা দূরের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঝোপগুলোকে দেখাচ্ছে মস্তবড় গাছের মত, সমান জমিকে দেখাচ্ছে উঁচু-নীচু। যেকোন জায়গায় যেকোন দিকে দশ পা দূরেই অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেনাদলগুলি দীর্ঘ সময় ধরে একই রকম কুয়াসার মধ্যে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে, বাগান-বেড়া এড়িয়ে, নতুন নতুন অজানা জমির উপর দিয়ে এগিয়ে চলল, কোথাও শত্রুর মুখোমুখি হল না। উপরন্তু সৈন্যরা বুঝতে পারল, সামনে পিছনে সব দিকেই অন্য সব রুশ সৈন্যরাও একই দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রতিটি সৈন্য একথা জেনে খুসি হল, যে অচেনা জায়গায় সে চলেছে সেখানে আমাদেরই আরও অনেক সৈন্য চলেছে।

তারা বলাবলি কবছে, "ঐ দেখ, কুর্স্কিরাও আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।"

"কী আশ্চর্য দেখ, আমাদের কত সৈন্য এখানে জমায়েত হয়েছে! কাল রাতে আমি শিবির-আগুনের দিকে তাকিয়েছিলাম, তার যেন আর শেষ নেই। মনে হল, বুঝি খাস মস্কোতেই আছি!"

ঘন কুয়াসার মধ্যে প্রায় একঘণ্টা চলবার পরে অধিকাংশ সৈন্যকে থামতে হল ; ফলে অস্বস্তির সঙ্গে সকলের মনে হল, কোথাও একটা বিভ্রান্তি ও গোলমাল ঘটেছে। এ ধারণা কেমন করে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল তা বলা শক্ত, কিন্তু অজান্তেই অতি দ্রুত ধারণাটা ছড়িয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সকলে ধরে নিল যে বোকা জার্মানদের (রুশ সৈন্যদের চোখে অস্ট্রীয় ও অন্য

সব অ-রুশ সৈন্যই "জার্মান") জন্যই এই গোলযোগ ঘটেছে ; সকলেরই দৃঢ় ধারণা যে ঐ মাংসখেকোরাই একটা সাংঘাতিক বিপদের সূত্রপাত করেছে।

"আমরা থেমে গেলাম কেন ? রাস্তা বন্ধ না কি ? অথবা আমরা কি ফরাসীদের মুখোমুখি হয়েছি ?"

"তা নয়, তাদের কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। তারা হলে গুলি চালাত।"

"তাড়াহুড়া করে তো আমাদের রওনা করিয়ে দেওয়া হল, আর এখানে মাঠের মাঝখানে বেকার আমাদের থামিয়ে দেওয়া হল। ঐ পাজী জার্মানরাই যত নষ্টের গোড়া ! বোকা শয়তানের দল !"

"হ্যাঁ, আমি হলে ওদের সামনে ঠেলে দিতাম ; কিন্তু কোন ভয় নেই, তারা পিছনে ভিড় করে আছে। আর এখানে আমরা ক্ষিধেয় মরছি।"

একজন অফিসার বলল, "আমি বলি, পথ কি শিগ্‌গির খুলবে ? সকলে বলছে, অশ্বারোহী বাহিনী পথ আটকে দিয়েছে।"

"আ, পাজী জার্মানরা ! নিজেদের দেশকেও ওরা চেনে না !"

ঘোড়া ছুটিয়ে এসে একজন অ্যাডজুটাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "আপনারা কোন্ ডিভিশনের ?"

"অষ্টাদশ।"

"তাহলে আপনারা এখানে কেন? আরও অনেক আগেই তো আপনাদের এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল ; এখন আর সন্ধ্যার আগে সেখানে পৌঁছতে পারবেন না।"

"কী সব বাজে হুকুম ! কি যে করছে তা নিজেরাই জানে না !" বলে অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

তারপর একজন অধিনায়ক সক্রোধে অ-রুশ ভাষায় কি যেন বলতে বলতে পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

তার কথার নকল করে একজন সৈন্য বলে উঠল, "তাফা-লাফা ! কি যে বিড়বিড় করে বলে গেল কিছুই বোঝা গেল না। শয়তানদের গুলি করা উচিত।"

"হুকুম হয়েছিল ন'টার আগে সেখানে পৌঁছতে হবে, কিন্তু এখনও আমরা আধাপথও পার হই নি। চমৎকার হুকুম !" চারদিক থেকে নানা কণ্ঠে কথাগুলি ধ্বনিত হতে লাগল।

গোলমালের আসল কারণ হল, অস্ট্রীয় অশ্বারোহী বাহিনী যখন আমাদের বাঁ দিক দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল তখন আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দেখতে পেল যে আমাদের কেন্দ্রবর্তী সেনাদল ডান দিকবার সেনাদল থেকে অনেকটা সরে গেছে, আর তাই অশ্বারোহী বাহিনীকে হুকুম করা হল, তারা যেন ডান দিকে ঘুরে যায়। কয়েক হাজার অশ্বারোহী পদাতিক বাহিনীর সামনে দিয়ে চলতে শুরু করল, আর তাই পদাতিক বাহিনীকে থেমে পড়তে হল।

যাইহোক, এক ঘণ্টা আটক থাকবার পর শেষ পর্যন্ত তারা পাহাড় বেয়ে নামতে শুরু করল। পাহাড়ের উপরে কুয়াসা সরতে শুরু করলেও নীচে আরও ঘন হয়ে নেমেছে। সেই কুয়াসার মধ্যে সামনে একটা গুলির আওয়াজ শোনা গেল, তারপর আর একটা, প্রথমে অনিয়মিতভাবে কিছুক্ষণ পরে পরে··· ট্রাটা···টাট্‌—তারপর আরও নিয়মিতভাবে দ্রুততর গতিতে; গোল্ডবাক নদীর তীরে শুরু হল যুদ্ধ।

তারা ভাবেনি নদীর তীরে শত্রুর সঙ্গে দেখা হবে, কুয়াসার মধ্যে হঠাৎ শত্রুর একেবারে মুখে এসে পড়েছে, অধিনায়করাও কোন উৎসাহের বাণী শোনাচ্ছে না, সকলের মনেই একটা ধারণা জন্মেছে যে তারা অনেক দেরি করে ফেলেছে, তার উপরে ঘন কুয়াসায় তারা কোথাও কিছু দেখতেও পাচ্ছে না—এই সব কারণে রুশ সৈন্যরা ধীরে সুস্থে কিছু গুলি ছুঁড়ল, কিছুটা এগিয়ে গেল, আবার থামল। অফিসার অথবা অ্যাডজুটান্টদের কাছ থেকেও সময়মত কোন নির্দেশ এল না, কারণ এই অপরিচিত পরিবেশে তারাও কুয়াসার মধ্যে ইতস্তত ঘুরছে, কার রেজিমেণ্ট কোথায় আছে কিছুই বুঝতে পারছে না। এই-ভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেনাদল যুদ্ধে নেমে পড়ল, কারণ তারা নীচের উপত্যকায় নেমে এসেছে। কুতুজভসহ চতুর্থ সেনাদল প্রাৎজেন পাহাড়ের উপরেই দাঁড়িয়ে রইল।

নীচে যেখানে যুদ্ধ শুরু হয়েছে সেখানটা এখনও ঘন কুয়াসায় ঢাকা; উপরের দিকটা পরিষ্কার হয়ে এলেও সামনে কি ঘটছে তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শত্রু সৈন্যরা সকলেই মাইল ছয়েক দূরে আছে, (যেটা আমাদের ধারণা), না কি এই কুয়াসার সমুদ্রে তারা নিকটেই কোথাও আছে, বেলা আটটার আগে তা কেউ জানতে পারল না।

সকাল নটা। নীচে একটা কুয়াসা তখনও অখণ্ড সমুদ্রের মত পড়ে আছে, কিন্তু আরও উঁচুতে শ্লাপ্লানিজ গ্রামে তখন আবহাওয়া বেশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। মার্শালদের সঙ্গে নিয়ে নেপোলিয়ন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তার মাথার উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ, কুয়াসার সাদা সমুদ্রের বুকে সূর্যের প্রকাণ্ড বৃত্তটা কাঁপছে একটা মস্ত বড়, ফাঁপা, রক্তিম নৌকোর মত। সকোল্‌-নিজ ও শ্লাপ্লানিজ গ্রাম দুটির পিছনকার যেসব নদী ও খাঁড়ির পাশে ঘাঁটি স্থাপন করে আমরা যুদ্ধ শুরু করতে চেয়েছিলাম গোটা ফরাসী বাহিনী, এমন কি নেপোলিয়ন নিজেও দলবল নিয়ে সেখানে ছিল না; তারা সকলেই রয়েছে এই পাশে আমাদের সেনাদলের এত কাছে যে খালি চোখেই নেপোলিয়ন একজন ঘোড়সওয়ার ও একজন পদাতিককে আলাদা করে চিনতে পারছে। ইতালি অভিযানের সময় নেপোলিয়ন যে নীল জোব্বাটা পরত সেটা পরেই একটা ছোট ধূসর আরবি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে সে মার্শালদের কিছুটা সামনে রয়েছে। নিঃশব্দে সে পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে আছে; মনে হচ্ছে

সেগুলো যেন কুয়াসার সমুদ্র থেকে জেগে উঠেছে ; সেখানে অনেক দূরে রুশ সৈন্যরা চলাফেরা করছে ; নীচের উপত্যকায় গুলির আওয়াজ সে কান পেতে শুনছে। তার শীর্ণ মুখের একটা মাংসপেশীও কাঁপছে না। ঝকঝকে চোখ দুটি একটা জায়গার উপরেই স্থির নিবদ্ধ। তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হতে চলেছে। রুশ বাহিনীর একটা অংশ ইতিমধ্যেই উপত্যকায় নেমে পুকুর ও হ্রদগুলোর দিকে এগিয়ে চলেছে, আর বাকি অংশও প্রাৎজেন পাহাড় শ্রেণী ছেড়ে যাচ্ছে। নেপোলিয়নেরও মনের বাসনা ওই পাহাড় শ্রেণীকেই আক্রমণ করবে, কারণ ঘাঁটি হিসাবে ওটাই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। কুয়াসার উপর দিয়ে সে দেখতে পেল, প্রাৎজেন গ্রামের নিকটবর্তী দুটো পাহাড়ের ভিতরকার খাড়িটা ধরে রুশ বাহিনী দলে দলে এগিয়ে চলেছে ; তাদের বেয়নেটগুলো ঝিকমিক করছে ; একের পর এক তারা উপত্যকার দিকেই অবিরাম এগিয়ে চলেছে এবং কুয়াসার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আগেরদিন সন্ধ্যায় সে যে সব খবর পেয়েছে, সারারাত অগ্রবর্তী ঘাঁটিগুলিতে চাকার ও পায়ের যেসব আওয়াজ শুনেছে, এবং রুশ সেনাদলের যে বিশৃংখল গতিবিধি তার চোখে পড়েছে—এইসব থেকে সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে মিত্রশক্তির বিশ্বাস যে সে রয়েছে তাদের সামনের দিকে অনেক দূরে, যে সেনাদলগুলি প্রাৎজেনের কাছাকাছি চলাফেরা করছে তারাই রুশ বাহিনীর কেন্দ্র, এবং সফল আক্রমণের পক্ষে সে কেন্দ্র ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। তথাপি নেপোলিয়ন যুদ্ধ শুরু করল না।

আজ তার কাছে একটা মস্ত বড় দিন—তার রাজ্যাভিষেকের বার্ষিকী দিবস। ভোরের আগে সে ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়েছে ; তারপরে উৎসাহে, উদ্যমে ভরপুর হয়ে খোশ মেজাজে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ছুটে এসেছে এখানে ; তার মনে এখন সেই সুখের হাওয়া যাতে মনে হয় যে সব কিছুই সম্ভব, সব কিছুই সাফল্যে ভরা। কুয়াসার উপর দিয়ে পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল ; তার নিরুত্তাপ মুখে আত্ম-বিশ্বাস ও আত্ম-তৃপ্তির সেই বিশেষ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে যা দেখা যায় মধুর ভালবাসায় বিভোর কোন বালকের মুখে। মার্শালরা তার পিছনে দাঁড়িয়ে রইল ; তার মনোযোগে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে সাহস পেল না। সে তাকাচ্ছে একবার প্রাৎজেন পাহাড় শ্রেণীর দিকে, আবার কুয়াসার ভিতর থেকে ভেসে আসা সূর্যের দিকে।

সূর্য যখন কুয়াসার ভিতর থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এল, এবং চারদিকের মাঠ ও কুয়াসা উজ্জ্বল আলোয় ঝল্‌মল্ করে উঠল, তখন—যেন এইজন্যই সে যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে অপেক্ষা করেছিল—সে সুগঠিত হাত থেকে দস্তানা খুলে মার্শালদের উদ্দেশে কি যেন ইসারা করে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দিল। অ্যাডজুটাণ্টদের সঙ্গে নিয়ে মার্শালরা ঘোড়া ছুটিয়ে নানা দিকে ছুটে গেল

এবং কয়েক মিনিট পরেই ফরাসী বাহিনীর প্রধান সেনাদল দ্রুতগতিতে প্রাৎজেন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলল ; ওদিকে রুশ সেনাদল তখন ক্রমাগত নীচের উপত্যকায় নেমে যাওয়ায় প্রাৎজেন পাহাড় জনশূন্য হয়ে পড়ছে।

অধ্যায়—১৫

আটটার সময় চতুর্থ সেনাদলের অধিনায়ক হিসাবে কুতুজভ সসৈন্যে এগিয়ে গেল প্রাৎজেনে। সম্মুখবর্তী রেজিমেণ্টের সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়ে সে তাদের যাত্রা শুরু করার নির্দেশ দিল ; তাদের বুঝিয়ে দিল যে সে নিজেই তাদের পরিচালনা করবে। প্রাৎজেন গ্রামে পৌঁছে সে থামল। প্রধান সেনাপতির দলবলের মধ্যে তার পিছনেই ছিল প্রিন্স আন্দ্রু। তার মনে চাপা উত্তেজনা ও বিরক্তি ; দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত মুহূর্ত আসন্ন হওয়ায় আজ সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে বেঁধে রেখেছে। তার একান্ত বিশ্বাস, আজকের দিনটিই তার কাছে হবে তুলোঁ, অথবা আর্কোলার সেতু (১৭৯৬ সালে এটাই ছিল নেপোলিয়নের এক উজ্জ্বল সাফল্যের ঘটনাস্থল)। সে ঘটনা কোন পথে ঘটবে তা সে জানে না, কিন্তু তার নিশ্চিত ধারণা যে তাই ঘটবে।

নীচে কুয়াসার মধ্যে বাঁদিক থেকে অদৃশ্য সৈন্যদের বন্দুকের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রুর ধারণা, যুদ্ধটা সেখানেই কেন্দ্রীভূত হবে। সে ভাবল, ওখানেই আমরা বিপদের সম্মুখীন হব, আর একটা ব্রিগেড বা ডিভিশন দিয়ে ওখানেই আমাকে পাঠানো হবে, আর ওখানেই পতাকা হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে যাব, যা কিছু আমার সামনে পড়বে তাকেই ভেঙে চুরমার করে দেব।"

অগ্রসরমান সৈনিকদের হাতের পতাকার দিকে সে শান্ত মনে তাকাতে পারছিল না ; তার কেবলই মনে হচ্ছিল, "হয়তো ঐ পতাকাটি হাতে নিয়েই আমি সেনাদলকে পরিচালনা করব।"

রাতের ঘন কুয়াসা এখন সকাল বেলায় পাহাড়ের উপরে জমাট হিমানী-কণা থেকে শিশিরে পরিণত হয়েছে, কিন্তু নীচের উপত্যকায় এখন কুয়াসাকে দেখাচ্ছে দুগ্ধশুভ্র সমুদ্রের মত। উপত্যকার বাঁদিকে আমাদের সৈন্যরা নেমে গেছে, আর সেখান থেকেই আসছে গুলির শব্দ ; কিন্তু সেখানকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পাহাড়ের উপরে পরিষ্কার আকাশ ; ডানদিকে সূর্যের প্রকাণ্ড বৃত্ত। সম্মুখে কুয়াসা-সমুদ্রের ওপারে দেখা যাচ্ছে গাছপালায় ঢাকা কয়েকটা পাহাড় ; শত্রুসৈন্য সম্ভবত সেখানেই আস্তানা নিয়েছে, কারণ ওখানে কিছু একটা চোখে পড়ছে। ডান দিকে রক্ষীবাহিনী কুয়াসা-ঢাকা অঞ্চলে ঢুকে গেল ; কানে এল তাদের ঘোড়ার ক্ষুরের ও চাকার শব্দ ; চোখে পড়ল তাদের বেয়নেটের ঝিলিক ; বাঁদিক থেকেও অনুরূপ একটি অশ্বারোহী বাহিনী এসে কুয়াসার সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে গেল ; সামনে ও পিছনে চলাকেরা

করছে পদাতিক বাহিনী। প্রধান সেনাপতি দাঁড়িয়ে আছে গাঁয়ের শেষ প্রান্তে; সৈনিকরা তার পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। সেই সকালে কুতুজভকে শ্রান্ত ও বিরক্ত মনে হচ্ছে। তার সামনে দিয়ে চলতে চলতে পদাতিক বাহিনী বিনা হুকুমেই হঠাৎ থেমে গেল; মনে হল সামনে কোন কিছুতে বাধা পেয়েছে।

একজন অশ্বারোহী অধিনায়ক সেখানে হাজির হলে কুতুজভ রেগে বলল, "হুকুম দিন, সারিবদ্ধভাবে ওরা গ্রামটাকে ঘুরে এগিয়ে যাক। আপনি কি বুঝতে পারছেন না ইয়োর এক্সেলেন্সি প্রিয় মহাশয় যে শত্রুর বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার সময় সংকীর্ণ গ্রামের পথে আপনি দলছুটভাবে এগিয়ে চলতে পারেন না?"

অধিনায়ক জবাব দিল, "গ্রামে ঢোকার মুখেই আমি ওদের শ্রেণীবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

কুতুজভ তিক্ত হাসি হেসে উঠল।

"শত্রুপক্ষের চোখের সামনে ভাল দৃষ্টান্তই রেখেছেন! খুব ভাল!"

শত্রুপক্ষ এখনও অনেক দূরে রয়েছে ইয়োর এক্সেলেন্সি। সেনাসমাবেশের চিত্র অনুসারে…"

"সেনাসমাবেশ!" কুতুজভ চীৎকার করে উঠল। "কে আপনাকে এ-কথা বলেছে? …দয়া করে হুকুমমত কাজ করুন।"

"ঠিক আছে স্যার।"

প্রিন্স আন্দ্রুর কানে কানে নেস্‌ভিৎস্কি বলল, "বুড়ো দেখছি কুকুরের মত ক্ষেপে গেছে।"

টুপিতে সবুজ পালক গোঁজা সাদা ইউনিফর্ম-পরিহিত জনৈক অস্ট্রীয় অফিসার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সম্রাটের নামে কুতুজভকে জিজ্ঞাসা করল, চতুর্থ সেনাদল যুদ্ধে নেমেছে কি না।

কোন জবাব না দিয়ে মুখ ঘোরাতেই তার চোখ পড়ল পাশে দাঁড়ানো প্রিন্স আন্দ্রুর উপর। তাকে দেখে কুতুজভের মুখের ভাব কিছুটা নরম হল; তবু অস্ট্রীয় অ্যাডজুটান্টের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সে বল্‌কন্‌স্কিকে বলল, "দেখে এস তো তৃতীয় সেনাদলটি গ্রাম ছেড়েছে কি না। তাদের থামতে বল, তারা যেন আমার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে।"

প্রিন্স আন্দ্রু যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে তাকে থামিয়ে দিল।

"দক্ষ বন্দুকবাজদের কাজে লাগানো হয়েছে কিনা তাও জেনে এস। ওরা কি করছে?" অস্ট্রীয় অফিসারকে কিছু না বলে কুতুজভ নিজের মনেই বলতে লাগল।

হুকুম তামিল করতেই প্রিন্স আন্দ্রু ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অগ্রসরমান সেনাদলকে ধরে ফেলে তাদের থামিয়ে সে প্রথমেই বুঝে নিল

যে আমাদের সেনাদলের সামনের সারিতে কোন দক্ষ বন্দুকবাজ নেই। প্রধান সেনাপতির হুকুম শুনে রেজিমেণ্ট-অধিনায়ক খুবই অবাক হয়ে গেল। তার নিশ্চিত ধারণা, তার সামনে অন্যদল রয়েছে, আর শত্রুপক্ষ রয়েছে অন্তত ছ'মাইল দূরে। ঘন কুয়াসায় ঢাকা অনুর্বর উতরাই ছাড়া সামনে আর কিছুই চোখে পড়ছে না। প্রধান সেনাপতির নামে ভুল সংশোধনের হুকুম দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে গেল। কুতুজভ তখনও সেই একই জায়গায় বয়সের ভারে ক্লান্ত ভারী দেহ নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চেপে বসে চোখ বুজে হাই তুলছে। সৈন্যরা এখন আর এগিয়ে যাচ্ছে না; বন্দুকের কুঁদো মাটিতে ছুঁইয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"খুব ভাল, খুব ভাল!" প্রিন্স আন্দ্রুকে কথাটা বলে সে পাশে দাঁড়ানো ঘড়ি-হাতে অধিনায়কের দিকে ফিরে তাকাল; সে বলতে লাগল, যেহেতু বাঁদিককার সেনাদল নীচে নেমে গেছে, এবার তাদের যাত্রা শুরু করবার সময় হয়েছে।

হাই তুলতে তুলতেই কুতুজভ অস্ফুটে বলল, "অনেক সময় আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি।" সে আবারও বলল, "যথেষ্ট সময় আছে।"

ঠিক সেই সময় কুতুজভের পিছন দিক থেকে রেজিমেণ্টের অভিবাদনের শব্দ শোনা গেল; সে শব্দ অগ্রসরমান রুশ সেনাদলের একদিক থেকে আর একদিক ব্যেপে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগল। বোঝা গেল সৈন্যরা যাকে অভিবাদন জানাচ্ছে সে অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে। কুতুজভের ঠিক সম্মুখবর্তী সৈন্যরা যখন সে আওয়াজে যোগ দিল তখন সে একপাশে সরে গিয়ে ভুরু কুঁচকে চারদিক তাকাতে লাগল। প্রাৎজেন থেকে আসবার রাস্তা ধরে বিভিন্ন ইউনিফর্ম পরিহিত একদল অশ্বারোহী জোর কদমে ছুটে আসছে। তাদের দুজন আসছে পাশাপাশি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে। একজনের পরনে কালো ইউনিফর্ম, টুপিতে পালক গোঁজা, বাদামী রঙের ঘোড়া; অপর জনের সাদা ইউনিফর্ম, কালো রঙের ঘোড়া। দুই সম্রাট আসছে, পিছনে দলবল। অভিজ্ঞ সৈনিকের ভঙ্গীতে কুতুজভ হাঁক দিল, "সাবধান।" তারপর এগিয়ে গিয়ে সম্রাটকে অভিবাদন জানাল। তার গোটা চেহারা ও ভাবভঙ্গী হঠাৎ পাল্টে গেল। বিনা তর্কে বশংবদ হবার ভঙ্গী তার চোখে মুখে। তার এই বশংবদ শ্রদ্ধার ভাবে আলেক্সান্দার কিন্তু খুসি হল না।

অবশ্য সে অখুসির ভাবটা নির্মল আকাশের বুকে একটুকরো মেঘের মত সম্রাটের যৌবনদীপ্ত মুখের উপর মুহূর্তের জন্য ভেসে উঠেই মিলিয়ে গেল। ওল্মুজ যুদ্ধক্ষেত্রে বল্কন্স্কি যখন তাকে দেশের বাইরে প্রথম দেখেছিল, সে তুলনায় অসুখের পরে আজ তাকে অপেক্ষাকৃত কৃশ দেখাচ্ছে; কিন্তু তার দুটি সুন্দর চোখে এখনও রয়েছে মহিমা ও কোমলতার সেই যাদুকরী সংমিশ্রণ, পাতলা ঠোঁট দুখানিতে রয়েছে বিচিত্র ভাবপ্রকাশের সেই ক্ষমতা,

আর সহৃদয় নির্দোষ যৌবনের সেই একই চেহারা।

দুই সম্রাটের সঙ্গীদলে রয়েছে রুশ ও অস্ট্রীয় বাহিনীর রক্ষীদল ও রেজিমেণ্টের যত সব বাছাই-করা যুবক অফিসার। জানালা খুলে দিলে যেমন বাইরের খোলা হাওয়ায় ঘরের গুমোট ভাব কেটে যায়, তেমনই এই সব প্রদীপ্ত যুবকদের আগমনে কুতুজভের নিরানন্দ সেনাদলের মধ্যে যেন যৌবন, উৎসাহ ও সাফল্যের আশ্বাসের খোলা হাওয়া বয়ে গেল।

সৌজন্যের সঙ্গে সম্রাট ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে সম্রাট আলেক্সান্দার তাড়াতাড়ি কুতুজভকে বলল, "আপনি কেন যাত্রা করছেন না মাইকেল ইলারিওনভিচ?"

শ্রদ্ধায় আনত হয়ে কুতুজভ জবাব দিল, "আমি অপেক্ষা করছি ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

ঈষৎ ভ্রূকুটি করে সম্রাট এমনভাবে কান পাতল যেন ঠিক শুনতে পায় নি।

"অপেক্ষা করছি ইয়োর ম্যাজেস্টি," কুতুজভ পুনরায় বলল। (প্রিন্স আন্দ্রু লক্ষ্য করল, 'অপেক্ষা করছি' কথাটা বলার সময় কুতুজভের উপরের ঠোঁটটা অস্বাভাবিকভাবে কেঁপে উঠল।) "সবগুলি সেনাদল এখনও ঠিকমত সাজানো হয় নি ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

সম্রাট শুনল, কিন্তু জবাবটা তার পছন্দ হল না; ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে নিকটস্থ নভসিল্‌ৎসেভ-এর দিকে তাকাল।

"আপনি তো জানেন মাইকেল ইলারিওনভিচ, যে সম্রাজ্ঞীর মাঠে সৈন্যরা সমবেত না হওয়া পর্যন্ত কুচকাওয়াজ শুরু হয় না এখন আমরা সেখানে নেই" পুনরায় সম্রাট ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে জার কথাগুলি বলল, যেন তার ইচ্ছা তাকে সমর্থন না করলেও সম্রাট তার কথাগুলি অন্তত শুনুক। কিন্তু সম্রাট ফ্রান্সিস চারদিকটা দেখতেই ব্যস্ত, তার কথায় কান দিল না।

সম্রাট যাতে শুনতে পায় সেজন্য কুতুজভ এবার জোর গলায় বলল, "ঠিক সেই কারণেই আমি যাত্রা শুরু করি নি স্যার, কারণ এখানে আমরা কুচকাওয়াজও করছি না, আর সম্রাজ্ঞীর মাঠেও দাঁড়িয়ে নেই।"

সম্রাটের দলবল দ্রুত দৃষ্টি-বিনিময় করে নিজেদের অসন্তোষ ও তিরস্কার প্রকাশ করতে লাগল। তাদের সে-দৃষ্টির অর্থ, "বুড়ো মানুষ হলেও এভাবে কথা বলা তার উচিত হয় নি।"

একাগ্র পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে কুতুজভের চোখের দিকে তাকিয়ে জার অপেক্ষা করতে লাগল, সে আরও কিছু বলে কি না তাই শুনবার জন্য। কিন্তু কুতুজভও সশ্রদ্ধভাবে মাথা নুইয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় এক-মিনিট দুজনই নীরব।

তারপর মাথা তুলে কুতুজভ বলল, "অবশ্য আপনি যদি হুকুম করেন

ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

ঘোড়াটাকে ছুঁয়ে অধিনায়ক মিলোরাদভিচকে ডেকে সে যাত্রা শুরুর নির্দেশ দিল।

সেনাদল চলতে শুরু করল; নভ্‌গরদ ও আপ্‌শেরন রেজিমেণ্টের দুই দল সৈন্য সম্রাটের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল।

লাল মুখ মিলোরাদভিচ দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সম্রাটের সামনে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে তাকে অভিবাদন জানাল।

সম্রাট বলল, "ঈশ্বর আপনার সহায় হোন সেনাপতি।"

সানন্দে সে ফরাসীতে জবাব দিল, "সত্যি স্যার, যা কিছু করা সম্ভব সবই আমরা করব।" তার মুখে কাঁচা ফরাসী ভাষা শুনে জারের দলের ভদ্রজনরা ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

মিলোরাদভিচ হঠাৎ তার ঘোড়ার মুখটা ঘুরিয়ে দিয়ে সম্রাটের ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁক দিল, "বাছারা, শুধু এ গ্রামটা নয়, আরও অনেক গ্রাম তোমাদের দখল করতে হবে।"

"সাধ্যমত চেষ্টা করব," সৈন্যরা হাঁক দিল।

এই আকস্মিক চীৎকারে সম্রাটের ঘোড়াটা চমকে উঠল।

ঈষৎ হেসে জনৈক অনুগামীর দিকে তাকিয়ে সম্রাট নির্ভীক অপ্‌শেরন সৈনিকদের দেখিয়ে কি যেন বলল।

অধ্যায়—১৬

অ্যাডজুটাণ্টদের সঙ্গে নিয়ে কুতুজভ হাল্কা বন্দুকধারীদের পিছনে পায়ে-হাঁটা চালে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল।

আধ মাইল পথ যাবার আগেই একটা নির্জন, পরিত্যক্ত বাড়ির সামনে সে থামল; বাড়িটা সম্ভবত একসময় সরাইখানা ছিল; সেখান থেকে দুটো রাস্তা দু'দিকে চলে গেছে। দুটো রাস্তাই পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেছে, আর দুটো রাস্তা ধরেই সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে।

কুয়াসা কেটে যাচ্ছে; উল্টো দিকের পাহাড়ের উপর মাইল দেড়েক দূরবর্তী শত্রুসৈন্যদের অস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। নীচে বাঁদিক থেকে গুলির আওয়াজ আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কুতুজভ থেমে জনৈক অস্ট্রীয় অধিনায়কের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাদের পিছনে কিছুটা দূরে থেকে প্রিন্স আন্দ্রু তাদের লক্ষ্য করছিল; একজন অ্যাডজুটাণ্টের দিকে ঘুরে সে ছোট দূরবীনটা চাইল।

দূরের সৈন্যদের দিকে না তাকিয়ে সামনের পাহাড়ের উতরাইয়ের দিকে তাকিয়ে অ্যাডজুটাণ্টটি বলে উঠল, "দেখুন, দেখুন, ঐ তো ফরাসীরা!"

দুই অধিনায়ক ও অ্যাডজুটাণ্ট দূরবীনটা ধরে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল।

তাদের সকলের মুখেই হঠাৎ আতংকের ভাব ফুটে উঠল। এতক্ষণ মনে করা হচ্ছিল যে ফরাসীরা মাইল দেড়েক দূরে রয়েছে, কিন্তু হঠাৎ একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে তারা আমাদের ঠিক সামনে এসে পড়েছে।

"ওরা কি শত্রুসৈন্য ?""না !""হ্যাঁ, তাই বটে ! ""নির্ঘাৎ""কিন্তু তা কি করে হবে ?" নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল।

খালি চোখে নীচে ডান দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল, কুতুজভ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পাঁচ শ' পায়ের মধ্যেই একটি ঘনসন্নিবিষ্ট ফরাসীসেনাদল আপ্‌শেরন বাহিনীর সঙ্গে মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসছে।

"এই তো এসেছে ! এসেছে চূড়ান্ত মুহূর্তটি ! এবার আমার পালা !" এই কথা ভেবে প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘোড়া ছুটিয়ে কুতুজভের সামনে হাজির হল।

চেঁচিয়ে বলল, "আপ্‌শেরনদের থামাতেই হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি।" কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে একটা ধোঁয়ার মেঘ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, খুব কাছেই শোনা গেল গোলার শব্দ, আর প্রিন্স আন্‌দ্রুর দু'পা দূর থেকেই একটি আতংকিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল : "ভাইসব ! সব গেল !" আর সেই স্বর শুনে যেন সেনাপতির নির্দেশ পেয়েছে এমনিভাবে সকলেই ছুটতে শুরু করল।

বিপর্যস্ত ক্রমবর্ধমান জনতা ছুটতে ছুটতে সেইদিকে ফিরে চলল যেখানে মাত্র পাঁচ মিনিট আগে তারা সম্রাটের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। সে জনতার গতিরোধ করা শক্ত তো বটেই, এমনকি তার চাপে নিজেও পিছিয়ে না গিয়ে উপায় ছিল না। বল্‌কন্‌স্কি বিমূঢ়ভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল ; তার সামনে কি যে ঘটছে তা বুঝতেও পারছে না। নেস্‌ভিৎস্কি রাগে মুখ লাল করে কুতুজভকে চেঁচিয়ে বলছে, সে যদি এই মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে না যায় তাহলে তাকে নির্ঘাৎ বন্দী হতে হবে। কুতুজভ এক জায়গায়ই দাঁড়িয়ে রইল ; কোন জবাব না দিয়ে একটা রুমাল বের করল। তার গাল থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ছুটে তার কাছে এগিয়ে গেল।

নীচের চোয়ালটা কাঁপাতে কাঁপাতে সে শুধাল, "আপনি কি আহত ?"

রক্তাক্ত গালের উপর রুমালটা চেপে ধরে পলায়মান সৈন্যদের দেখিয়ে কুতুজভ বলল, "আঘাতটা এখানে নয়, ওখানে ! ওদের থামাও !" সঙ্গে সঙ্গে ওদের থামানো যে অসম্ভব সেটা বুঝতে পেরে নিজেই ডান দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পলায়মান জনতার আর একটা ঢেউ তাকে ঘিরে ধরে পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে গেল।

সৈন্যরা এত ঘন হয়ে ছুটছে যে একবারে তাদের মধ্যে পড়ে গেলে বেরিয়ে আসা খুবই শক্ত। একজন হাঁক দিল, "এগিয়ে চল ! আমাদের বাধা দিচ্ছ কেন ?" আর একজন ঘুরে দাঁড়িয়ে আকাশ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল ; আর

একজন কুতুজভের ঘোড়াটাকেই আঘাত করতে লাগল। অনেক কষ্টে সেই বন্যাস্রোতের মত জনতার ভিতর থেকে বাঁদিক দিয়ে বেরিয়ে অর্ধেকের বেশী সঙ্গীদের হারিয়ে কুতুজভ একটা গোলার শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। প্রিন্স আন্দ্রুও জোর করে সেই পলাতক বাহিনীর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে কুতুজভের কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করতে লাগল, এবং দেখতে পেল, পাহাড়ের ঢালুর উপর থেকে রুশ কামানশ্রেণী তখনও গোলাবর্ষণ করে চলছে, আর ফরাসীরা সেইদিকে ছুটে যাচ্ছে। আরও উপরে দাঁড়িয়ে আছে কিছু রুশ পদাতিক; কামানশ্রেণীকে রক্ষা করতে তারা সামনেও এগিয়ে যাচ্ছে না, আবার পলায়মান জনতার সঙ্গে পিছুও হটছে না। একজন অশ্বারোহী অধিনায়ক পদাতিক বাহিনীর ভিতর থেকে বেরিয়ে কুতুজভের কাছে এগিয়ে এল। কুতুজভের দলবলের মধ্যে মাত্র চারজন তার সঙ্গে আছে। তারা সকলেই বিষণ্ণ মুখে নীরবে পরস্পরকে দেখছে।

পলায়মান সৈনিকদের দেখিয়ে কুতুজভ কোনরকমে রেজিমেণ্ট-অধিনায়ককে বলল, "ঐ হতভাগাদের থামান!" কিন্তু ঠিক সেইসময় বুঝিবা ঐ কথাগুলির শাস্তি হিসাবেই শত্রুর বুলেট এক ঝাঁক ছোট পাখির মত রেজিমেণ্ট ও কুতুজভের দলের উপর দিকে হিস্ হিস্ শব্দে ছুটতে লাগল।

ফরাসীরা কামানশ্রেণীকে আক্রমণ করেছে; কুতুজভকে দেখতে পেয়ে তাকে লক্ষ্য করেও গুলি ছুঁড়ছে। এই গোলাগুলির সামনে রেজিমেণ্ট-অধিনায়কটি পা চেপে ধরে বসে পড়ল; জনাকয় সৈন্য পড়ে গেল, এবং একজন দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্টের হাত থেকে পতাকাটা পড়ে গেল। পতাকাটা পড়বার সময় নিকটস্থ সৈন্যদের বন্দুকের মাথায় জড়িয়ে গেল। বিনা হুকুমেই সৈন্যরা গুলি ছুঁড়তে শুরু করে দিল।

চারদিকে তাকিয়ে কুতুজভ হতাশভাবে আর্তনাদ করে উঠল, "ওঃ! ওঃ! ওঃ!" …বয়সের ভারে কাঁপা গলায় ফিস্ ফিস্ করে ডাকল, "বল্‌কন্‌স্কি! বল্‌কন্‌স্কি!" তারপর বিশৃংখল সেনাদল ও শত্রুদের দেখিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, "ও সব কি?"

তার কথা শেষ হবার আগেই লজ্জা ও ক্রোধের কান্নায় রুদ্ধবাক্ অবস্থায় প্রিন্স আন্দ্রু ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পতাকাটির দিকে ছুটে গেল।

ছোট শিশুর মত তারস্বরে চীৎকার করে বলল, "বাছারা, আগে বাড়!"

পতাকার দণ্ডটি চেপেধরে ভাবল, "এই তো পেয়েছি।" তাকে লক্ষ্য করে ছুটে আসা বুলেটের শব্দ শুনে সে খুসিই হল। কয়েকটি সৈন্য পড়ে গেল।

প্রিন্স আন্দ্রু হাঁক দিল, "হুর্‌রা!" কোনরকমে ভারী পতাকাটিকে তুলে ধরে সম্মুখে ছুটে চলল; তার মনে দৃঢ় প্রত্যয়, গোটা বাহিনী তাকে অনুসরণ করবে।

সত্যি সত্যি মাত্র কয়েকটি পা সে একাকি এগিয়ে গেল। প্রথমে একটি

সৈন্য, তারপর আরেকটি এগিয়ে এল, আর দেখতে দেখতে গোটা বাহিনী "হুররা" বলে হুংকার তুলে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলল। প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতে ভারী পতাকাটি হেলে পড়ছে দেখে একজন সার্জেন্ট ছুটে এসে সেটা ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হল। প্রিন্স আন্‌দ্রু পুনরায় পতাকা-দণ্ডটি ধরে সেটাকে টানতে টানতে সেনাদলের সঙ্গে ছুটতে লাগল। সামনেই গোলন্দাজ সৈন্যদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; তাদের কয়েকজন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, আর অপর কয়েকজন কামান ফেলে তার দিকে ছুটে আসছে। সে আরও দেখল, ফরাসী পদাতিক সৈন্যরা তাদের ঘোড়াগুলোকে দখল করে কামানের মুখ ঘুরিয়ে ধরেছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ও সেনাদল তখন কামানশ্রেণীর বিশ পায়ের মধ্যে পৌঁছে গেছে। মাথার উপরে অবিশ্রাম গুলির শব্দ কানে আসছে; ডাইনে-বাঁয়ে একের পর এক সৈন্যরা আর্তনাদ করে ঢলে পড়ছে। কিন্তু তাদের দিকে সে তাকাল না: তার দৃষ্টি শুধু সামনে যা ঘটছে তার দিকে—কামানশ্রেণীর দিকে। এবার সে পরিষ্কার দেখতে পেল দুমড়ানো টুপি মাথায় একটি লাল-চুল গোলন্দাজ একটা ন্যাকড়ার একদিক ধরে আছে, আর একজন ফরাসী সৈন্য সেটার অন্যদিক ধরে টানছে। দুজনের মুখেই একটা হতবুদ্ধিকর অথচ বিমূঢ় ভাব ফুটে উঠেছে; তারা যে কি করছে তা নিজেরাই জানে না।

সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "ওরা কি করছে? লাল-চুল গোলন্দাজটির হাতে যখন অস্ত্র নেই তখন সে পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? ফরাসীটাই বা তার বুকে বেয়নেট বসিয়ে দিচ্ছে না কেন? বেয়নেটের কথা মনে হতেই ফরাসী সৈন্যটি সেটা ওর বুকে বসিয়ে দেবে, তার আগে ওর নড়বার লক্ষণ দেখছি না····"

সত্যি সত্যি আর একটি ফরাসী সৈনিক বন্দুক উঁচিয়ে লোক দুটির দিকে ধেয়ে এল; লাল-চুল গোলন্দাজটির কপালে যা লেখা আছে এখনই তা ঘটে যাবে। কিন্তু সে ঘটনা প্রত্যক্ষ করা প্রিন্স আন্‌দ্রুর হল না। তার মনে হল, পার্শ্ববর্তী একটি লোক সজোরে তার মাথায় মুগুর দিয়ে আঘাত করল। আঘাত সামান্যই লাগল, কিন্তু যন্ত্রণায় কাতর হয়ে সে যা দেখবার জন্য অপেক্ষা করছিল সেটা আর দেখা হল না।

"এ কি হল? আমি কি পড়ে যাচ্ছি? পা দুটো খাড়া রাখতে পারছি না," ভাবতে ভাবতেই সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। চোখ খুলল; দেখতে চাইল, ফরাসী সৈনিক ও গোলন্দাজের লড়াইটা কিভাবে শেষ হল, লাল-চুল গোলন্দাজটি মারা গেল কি না, কামানটা বেদখল হল না রক্ষা পেল। কিন্তু কিছু সে দেখতে পেল না। মাথার উপরে শুধুই আকাশ—উঁচু আকাশ, অস্পষ্ট হলেও অসীম উঁচু আকাশ, তার বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের দল। "কী শান্ত, স্তব্ধ, গম্ভীর, আমরা যখন ছুটছিলাম মোটেই তখনকার

মত নয়, "প্রিন্স আন্দ্রু ভাবতে লাগল—"লড়াই করতে করতে আর চীৎকার করতে করতে আমরা যখন ছুটছিলাম, ভীত ক্রুদ্ধ মুখে গোলন্দাজ ও ফরাসীটি যখন একটুকরো নেকড়ার জন্য ঝগড়া করছিল, মোটেই তখনকার মত নয়: অসীম উঁচু আকাশের বুকে মেঘেদের এই ভেসে চলা তার থেকে কত আলাদা! এই উঁচু আকাশটা আগে কেন আমার চোখে পড়ে নি? শেষ পর্যন্ত ঐ আকাশকে দেখতে পেয়ে আমি কত খুসি! হ্যাঁ! ঐ অসীম আকাশ ছাড়া সবই বৃথা, সবই মিথ্যা। ও ছাড়া আর কিছুই নেই, কিছু নেই। এমন কি ঐ আকাশও নেই, স্তব্ধতা ও শান্তি ছাড়া আর কিছু নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!…"

অধ্যায়—১৭

ব্যাগ্রেশন পরিচালিত আমাদের দক্ষিণ ব্যূহে বেলা নটায়ও যুদ্ধ শুরু হয় নি। দল্‌গরুকভ যুদ্ধ শুরু করার যে দাবী জানিয়েছিল তার সঙ্গে একমত না হওয়ায় এবং নিজের দায়িত্ব এড়াবার জন্য প্রিন্স ব্যাগ্রেশন প্রধান সেনাপতির কাছে লোক পাঠিয়ে তার মতামত জানবার প্রস্তাব করল। ব্যাগ্রেশন জানত, সেনাবাহিনীর দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী দূরত্ব ছ' মাইলেরও বেশী, দূত যদি পথে নিহত না হয় (হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী), আর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে যদি তার সাক্ষাৎ হয় (যেটা খুবই শক্ত), তাহলেও সন্ধ্যার আগে সে ফিরে আসতে পারবে না।

ব্যাগ্রেশন বড় বড় ভাবলেশহীন ঘুম-ঘুম চোখে দলের লোকদের দিকে তাকাল; প্রথমেই তার চোখ পড়ল উত্তেজনায় ও আশায় রুদ্ধশ্বাস রস্তভের বালকসুলভ মুখের উপর। তাকেই সে পাঠাল।

টুপিতে হাত তুলে রস্তভ বলল, "আর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা হবার আগেই যদি সম্রাটের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায় ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

ব্যাগ্রেশনকে বাধা দিয়ে দল্‌গরুকভ বলল, "তাহলে সংবাদটা হিজ ম্যাজেস্টিকেই দিতে পার।"

পাহারার কাজে ছুটি পেয়ে ভোরের আগেই রস্তভ ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে নিয়েছিল; তাই এখন তার শরীর ও মন দুইই বেশ ঝরঝরে ও তাজা হয়ে আছে। তাছাড়া সকাল থেকে তার সব আশাই পূর্ণ হয়েছে: আজকের যুদ্ধে সে অংশ নিতে যাচ্ছে, তারচাইতেও বড় কথা, সবচাইতে সাহসী অধিনায়কের সঙ্গীরূপে সে যাচ্ছে; সংবাদবাহক হিসাবে তাকেই পাঠানো হচ্ছে কুতুজভের কাছে, এমনকি হয় তো সম্রাটের কাছেও। আলো ঝলমল সকাল, তার ঘোড়াটাও ভাল, মনটা আনন্দে ও খুসিতে ভরপুর। নির্দেশ হাতে নিয়ে ঘোড়ার মুখে লাগাম পরিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। প্রথমে পার হল ব্যাগ্রেশনের সেনাদলকে; তারা যুদ্ধে না নেমে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তারপর

পার হল উভারভ-এর অশ্বারোহী বাহিনী; সেখানে চলেছে যুদ্ধের আয়োজন ও চাঞ্চল্য। তারপরেই সামনে থেকে ভেসে এল কামান-বন্দুকের শব্দ; সে শব্দ ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগল।

প্রকৃত অবস্থাটা চোখে দেখবার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে রস্তভ ঘোড়া থামাল; কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারল না; ধোঁয়ার মধ্যে কিছু লোক চলাফেরা করছে, সামনে-পিছনে চলাফেরা করছে সেনাদল; কিন্তু তারা কারা, কোথায় যাচ্ছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এসব দেখেশুনে তার মনে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল না; বরং তার উৎসাহ ও দৃঢ়তা আরও বেড়ে গেল।

"এগিয়ে চল! এগিয়ে চল! সংবাদটা পৌঁছে দাও!" মনে মনে বলতে বলতে সে ঘোড়া ছুটিয়ে ক্রমেই যুদ্ধের দিকে এগিয়ে চলতে লাগল।

"ওখানকার অবস্থা কেমন আমি জানি না, কিন্তু নিশ্চয় সবই ভাল," রস্তভ ভাবল।

কিন্তু অস্ট্রীয় সৈনিককে পেরিয়েই সে দেখতে পেল, রক্ষীবাহিনীর একটা অংশে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

তার মন বলল, "ভালই হল! কাছে থেকে সব কিছু দেখতে পাব।"

অগ্রবর্তী সেনাদলের বরাবর সে এগিয়ে চলল। মুষ্টিমেয় কিছু সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকে এগিয়ে এল। আমাদের পক্ষের এই উল্‌হানরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছে। রস্তভ তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াল; এমনিতেই তার চোখে পড়ে গেল যে তাদের একজনের শরীর থেকে রক্ত ঝডছে। রস্তভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"এসব আমার ব্যাপারই নয়," সে ভাবল। কয়েক শ' গজ চলবার পরেই তার চোখে পড়ল, বাঁদিক থেকে কালো ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে একটা মস্ত বড অশ্বারোহী দল তার পথের দিকেই দ্রুত ছুটে আসছে। আক্রমণোদ্যত ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর মোকাবিলা করতে ছুটে চলেছে আমাদের অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনী।

রস্তভ পরিষ্কারভাবে তাদের চোখ-মুখ দেখতে পাচ্ছে; শুনতে পাচ্ছে তাদের হুকুম: "আক্রমণ কর!" পাছে তাদের অগ্রগতির মুখে পড়ে ঘোড়াসমেত সে নিজেও চুরমার হয়ে যায়, বা তাদের ধাক্কায় ফরাসীদের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়, তাই সে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেও তাদের সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারল না।

অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর শেষ সৈনিকটির সঙ্গে রস্তভের সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠল। প্রকাণ্ড দেহ এই রক্ষীসৈনিকটির মুখভর্তি বসন্তের দাগ। ভ্রূকুটিকুটিল চোখে সক্রোধে সে রস্তভের দিকে তাকাল। রস্তভের মনে হল, এই বিরাটকায় মানুষগুলি ও তাদের ঘোড়াগুলির তুলনায় সে বড়ই ক্ষুদ্রকায় ও দুর্বল; লোকটি হয়তো তাকে ও বেদুইনকে ধরাশায়ী করেই ছুটে যেত

যদি না সময়মত রস্তভ রক্ষীটির ঘোড়ার চোখের সামনে তার চাবুকটাকে সশব্দে আস্ফালন করত। ষোল হাত উঁচু কালো ভারী ঘোড়াটা কান খাড়া করে থমকে দাঁড়াল, আর রক্ষীটি সজোরে পাদানি দিয়ে তার পেটে খোঁচা মেরে দ্রুততর গতিতে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর আর কিছুই সে দেখতে পেল না, কারণ সঙ্গে সঙ্গেই কামান গর্জে উঠল আর ধোঁয়ায় সবকিছু ঢেকে গেল।

সেই মুহূর্তে রস্তভের মনে দ্বিধা দেখা দিল, সে রক্ষীবাহিনীকে অনুসরণ করবে, না কি তাকে যেখানে পাঠানো হয়েছে সেখানেই যাবে। পরবর্তীকালে সে শুনেই ভয় পেয়েছিল যে সেই বিরাটদেহ রক্ষীসৈনিকদের বিরাট দলটির মধ্যে সেদিনকার যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছিল মাত্র আঠারো জন।

"ওদের আমি ঈর্ষা করব কেন? আমার সুযোগ তো চলে যায় নি; হয় তো এক্ষুণি সম্রাটের সঙ্গেই আমার দেখা হয়ে যাবে!" এই কথা ভেবে রস্তভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পদাতিক রক্ষীবাহিনীর একটি রেজিমেণ্টের পিছন দিক দিয়ে চলতে চলতে সে শুনতে পেল কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে।

"রস্তভ!"

বরিসের কণ্ঠস্বর চিনতে না পেরে সে জবাব দিল, "কি?"

"আমি বলছি, আমরা একেবারে প্রথম সারিতে রয়েছি! আমাদের রেজিমেণ্ট আক্রান্ত হয়েছে!" বরিস বলল; তার মুখে সেই খুসির হাসি যা দেখা দেয় সেই সব যুবকদের মুখে জীবনে যারা প্রথম গোলাগুলির সামনে দাঁড়ায়।

রস্তভ থামল।

বলল, "তাই নাকি? আচ্ছা, কেমন হল বল তো?"

"তাদের হটিয়ে দিয়েছি!" উৎসাহে বরিস মুখর হয়ে উঠল। "কল্পনা করতে পার?" বরিস নিজেদের কার্যকলাপের বিবরণ দিতে শুরু করল। তার কথা শেষ হবার আগেই রস্তভ ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল।

"কোথায় যাচ্ছ?" বরিস শুধাল।

"হিজ ম্যাজেস্টির কাছে একটা চিঠি নিয়ে যাচ্ছি।"

রস্তভ সম্ভবত "হিজ হাইনেস" বলতে চেয়েছে এ-কথা ভেবে গ্র্যাণ্ড ডিউককে দেখিয়ে বরিস বলল, "ঐ তো তিনি!"

"কিন্তু উনি তো গ্র্যাণ্ড ডিউক, আমি চাই প্রধান সেনাপতিকে অথবা সম্রাটকে," বলেই রস্তভ ঘোড়া ছোটাতে উদ্যত হল।

অপরদিক থেকে ছুটে এসে বের্গ চেঁচিয়ে ডাকল, "কাউণ্ট! কাউণ্ট! আমার ডান হাতে আঘাত লেগেছে (রুমাল দিয়ে বাঁধা রক্তাক্ত ডান হাতটা দেখাল), তবু আমি যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম। বাঁ হাতে তরবারি ধরেছি কাউণ্ট।

আমাদের পরিবারে সকলেই—সব ভন বের্গরাই—নাইট ছিলেন !"

সে আরও কিছু বলতে লাগল, কিন্তু সেকথা শুনবার জন্য রস্তভ অপেক্ষা করল না, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

সহসা খুব কাছে নিজের সামনে ও আমাদের সৈন্যদের পিছনে সে বন্দুকের শব্দ শুনতে পেল ; সে ভাবতেই পারে নি যে সেখানে শত্রুসৈন্য থাকতে পারে।

ভাবল, "এটা কি হল ? আমাদের বাহিনীর পিছনে শত্রুসৈন্য ? অসম্ভব !" আর হঠাৎই নিজের জন্য এবং গোটা যুদ্ধের ফলাফলের জন্য তার মন আতংকে শিউরে উঠল। কিন্তু যাই হোক না কেন, এখন আর ঘুরে যাবার উপায় নেই। এখানেই প্রধান সেনাপতির খোঁজ করতে হবে, আর যদি সর্বনাশই ঘটে তাহলে সকলের সঙ্গে আমাকেও মরতে হবে।"

প্রাৎজেন গ্রামটা এখন নানা ধরনের সৈন্যে পরিপূর্ণ ; সেই গ্রামটা ছাড়িয়ে সে যত এগিয়ে যেতে লাগল ততই সেই বিপদের আশংকা ঘনীভূত হতে লাগল।

তার পথের উপর দিয়ে বিশৃংখলভাবে ছুটে আসা রুশ ও অস্ট্রীয় সৈন্যদের দেখে রস্তভ প্রশ্ন করতে লাগল, "এসবের অর্থ কি ? এটা কি হচ্ছে ? তারা কাকে গুলি করছে ? কে গুলি ছুঁড়ছে ?"

রুশ, জার্মান ও চেক ভাষায় পলায়মান জনতা বলতে লাগল, "শয়তানই জানে ! তারা সব্বাইকে মারছে ! সব শেষ !" অবশ্য কি যে হচ্ছে বা হয়েছে তার কিছুই তারা কেউ জানে না।

একজন হেঁকে বলল, "জার্মানদের মার !"

"বিশ্বাসঘাতকের দল—ওদের শয়তানে ধরুক !"

"রুশদের ফাঁসিতে ঝোলাও !" একজন জার্মান অস্ফুট স্বরে বলল।

পথ বেয়ে কয়েকজন আহত সৈনিক চলে গেল ; চারদিকে গোলমালের মধ্যে শোনা যেতে লাগল তিরস্কার, চেঁচামেচি, আর্তনাদ ; তারপর গোলাগুলি থেমে গেল। রস্তভ পরে জানতে পেরেছিল, রুশ ও অস্ট্রীয় সৈন্যরা পরস্পরকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল।

সে ভাবল, "হা ভগবান ! এসবের অর্থ কি ? আর এখানে, যেখানে সম্রাট যেকোন মুহূর্তে তাদের সামনে হাজির হতে পারেন···কিন্তু না। এ কাজ বড়জোর জনাকয় বদমাস করতে পারে। অচিরেই এ অবস্থা কেটে যাবে, ওরকম হতে পারে না, হতে পারে না ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদের পার হয়ে যেতে হবে !"

পরাজয় ও পলায়নের চিন্তা রস্তভের মাথায় ঢোকে নি। প্রাৎজেন পাহাড়ের উপর ফরাসী কামান ও ফরাসী সৈন্যদের সে দেখতে পেয়েছে ; তার উপর নির্দেশ আছে, ওখানেই প্রধান সেনাপতিকে খুঁজতে হবে ; কিন্তু সেকথা সে বিশ্বাস করতে পারল না, বিশ্বাস করতে চাইল না।

অধ্যায়—১৮

রস্তভের উপর নির্দেশ ছিল প্রাৎজেন গ্রামের কাছাকাছি কুতুজভ ও সম্রাটের খোঁজ করতে হবে। কিন্তু না, তাদের দুজনের কাউকে, না কোন একটি অধিনায়ক-অফিসারকে, কেউ নেই সেখানে; সেখানে শুধু নানা ধরনের বিশৃংখল জনতার ভিড়। ক্লান্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে সে খুব তাড়াতাড়ি এই ভিড়কে পার হয়ে যেতে চাইল, কিন্তু যত এগোতে লাগল সেনাদলকে ততই বিশৃংখল অবস্থায় দেখতে পেল। প্রাৎজেন পাহাড়ের উপর থেকে ফরাসী কামান থেকে গোলা বর্ষণের ফলে সকলের মধ্যেই একটা হৈ-চৈ হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

যাকে পাচ্ছে রস্তভ তাকেই জিজ্ঞাসা করছে, "সম্রাট কোথায়? কুতুজভ কোথায়?" কিন্তু কেউ কোন জবাব দিচ্ছে না।

অবশেষে একটি সৈন্যের কলার চেপে ধরে তাকে জবাব দিতে বাধ্য করল।

কি জানি কেন হেসে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সৈন্যটি বলল, "এঃ দাদা, তারা সব অনেক আগেই পালিয়েছে!"

স্পষ্টই বোঝা গেল সৈনিকটি মদ গিলেছে। তাকে ছেড়ে একজন পদস্থলোকের সহিসের ঘোড়া থামিয়ে রস্তভ তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। সে জানাল, ঘণ্টাখানেক আগে এই রাস্তা দিয়েই একখানা দ্রুতগামী গাড়িতে জারকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে; জার সাংঘাতিক আহত।

রস্তভ বলে উঠল' "এ হতেই পারে না! নিশ্চয় সে অন্য কেউ।"

উপহাসের হাসি হেসে লোকটি জবাব দিল, "আমি নিজে তাকে দেখেছি। পিতার্সবুর্গে সম্রাটকে এতবার দেখেছি যে তাকে চেনা আমার উচিত। ঠিক যেমন আপনাকে দেখছি, তেমনই তাকে দেখেছি। ···অত্যন্ত ম্লান মুখে তিনি গাড়িতে বসেছিলেন। চারটে কালো ঘোড়াকে কী ছুটিয়েই না দিল! খটাখট্ শব্দে আমাকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল! ততক্ষণে আমি রাজকীয় গাড়ির ঘোড়া ও ইলিয়া আইভানিচকে চিনতে পেরেছিলাম। আমার তো মনে হয় না ইলিয়া জার ভিন্ন অন্য কারও গাড়ি চালায়।"

রস্তভ ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে গমনোদ্যত হতেই তাকে পাশ কাটিয়ে চলতে গিয়ে জনৈক আহত অফিসার তাকে জিজ্ঞাসা করল:

"আপনি কাকে চান? প্রধান সেনাপতিকে? একটা কামানের গোলায় তার মৃত্যু হয়েছে—আমাদের রেজিমেণ্টের সামনে তার বুকে গোলা লেগেছিল।

আর একজন অফিসার তার কথাটা সংশোধন করে বলল, "মারা যান নি—আহত হয়েছেন!"

"কে? কুতুজভ?" রস্তভ শুধাল।

"কুতুজভ নয়, কিন্তু কি যেন তার নামটা—ঠিক আছে···বেশী লোক তো বেঁচে নেই। এই পথে চলে যান, ঐ গ্রামে, অধিনায়করা সব ওখানেই

আছেন," এই কথা বলে হস্‌জেরাডেক গ্রামটা দেখিয়ে দিয়ে অফিসারটি চলে গেল।

রস্তভ হেঁটে চলার গতিতে ঘোড়ার পিঠে এগিয়ে চলল; কেন যাচ্ছে, কার কাছে যাচ্ছে, সেসব না বুঝেই চলতে লাগল। সম্রাট আহত, যুদ্ধে হার হয়েছে। এখন এতে সন্দেহ করাও অসম্ভব। তাড়াতাড়িরই বা কি আছে? জার বা কুতুজভ যদি বেঁচে থাকে, যদি অক্ষতই থাকে, তাহলেই বা এখন সে তাদের কি বলবে?

একটি সৈনিক হাঁক দিয়ে বলল, "ইয়োর আনার, এ পথ দিয়ে যান; ও পথে গেলে সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়বেন! তারা আপনাকে খুন করে ফেলবে!"

আর একজন বলল, "আঃ, কি সব বকছ? উনি কোথায় যাবেন? এই পথেই তো কাছে হবে।"

রস্তভ একটু ভাবল, তারপর যেপথে গেলে সে মারা যাবে বলে ওরা বলেছিল সেই পথেই এগিয়ে গেল।

"এখন তো সবই সমান। সম্রাট যদি আহত হয়ে থাকেন, তাহলেও কি আমি নিজেকে বাঁচাতে সচেষ্ট হব?" ভাবতে ভাবতে সেইদিকেই সে এগিয়ে চলল যেখানে প্রাৎজেন থেকে পালাতে গিয়ে সবচাইতে বেশী সংখ্যক লোক মারা গেছে। ফরাসীরা এখনও সে অঞ্চলটা দখল করে নি; অক্ষত ও সামান্য আহত রুশরাও অনেক আগেই সে জায়গা ছেড়ে চলে গেছে। সারা মাঠ জুড়ে প্রতি দু'একর জমিতে দশজন করে নিহত ও আহত সৈনিক পড়ে আছে। তাদের চীৎকার ও আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। এইসব যন্ত্রণাকাতর লোকগুলিকে যাতে না দেখতে হয় সেজন্য রস্তভ জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; তার ভয় করতে লাগল—ভয়টা নিজের জীবনের জন্য নয়, এই হতভাগ্যদের দেখেও মন স্থির রাখতে যে সাহসের দরকার তার অভাব ঘটবার ভয়।

নিহত ও আহত সৈনিকে ভর্তি মাঠে গুলি করার মত কেউ না থাকায় ফরাসীরা গুলি বন্ধ করে দিয়েছিল; একজন অ্যাডজুটাণ্টকে ঘোড়ায় চেপে মাঠ দিয়ে যেতে দেখে তারা রস্তভকে লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল। গুলির ভয়ংকর শন্-শন্ শব্দ আর চার পাশের মৃতদেহের অনুভূতি একত্রে মিলে রস্তভের মনে দেখা দিল নিজের জন্য ত্রাস ও করুণার অনুভূতি। মায়ের শেষ চিঠিটার কথা মনে পড়ল। সে ভাবল, "এইভাবে কামানের তাক করা অবস্থায় আমাকে দেখলে মার কি মনে হত?"

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে এসে রুশ সৈন্যরা হস্‌জেরাদেক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। ফরাসী কামান সেখানে পৌঁছচ্ছে না; বন্দুকের শব্দও ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। এখানে সকলেই পরিষ্কার বুঝেছে ও বলছে যে যুদ্ধে হার হয়েছে। রস্তভ অনেককেই জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু সম্রাট বা কুতুজভের খবর কেউ

বলতে পারল না। কেউ বলল, সম্রাটের আহত হবার খবরটা ঠিক, আবার কেউ বলল ওটা মিথ্যা গুজব। একজন অফিসার জানাল, গ্রামের পিছনে বাঁদিকে প্রধান ঘাঁটির একজন কাউকে সে দেখেছে। অগত্যা রস্তভ সেই দিকেই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে দিল। প্রায় দু মাইল পথ চলার পরে শেষে রুশ সেনাদলকেও পার হয়ে চারদিক ঘুরিয়ে নালা কাটা একটা সব্জি-বাগানের কাছে নালার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো দুজন অশ্বারোহীকে সে দেখতে পেল। একজনের টুপিতে সাদা পালক গোঁজা; রস্তভের মনে হল, লোকটিকে সে চেনে; অপর জন সওয়ার হয়েছে একটা সুন্দর বাদামী রঙের ঘোড়ার পিঠে (রস্তভের মনে হল ঘোড়াটাকে সে আগে দেখেছে); দ্বিতীয় লোকটি নালা পর্যন্ত এগিয়ে এসে আস্তে লাফিয়ে নালাটার কাছে এল এবং মুখ ঘুরিয়ে সাদা পালক পরা লোকটিকেও হাসতে তাই করতে বলল। দ্বিতীয় অশ্বারোহী মাথা ও হাত নেড়ে আপত্তি জানাল, আর তা থেকেই রস্তভ সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল তার পূজনীয় সম্রাটকে।

রস্তভ ভাল, "কিন্তু এই জনশূন্য মাঠের মধ্যে একাকি, এ লোক তিনি নন, হতে পারেন না।" সেই মুহূর্তে আলেক্সান্দার মাথাটা ফেরাল, আর রস্তভ দেখতে পেল সেই প্রিয় মূর্তি যার স্মৃতি গভীরভাবে আঁকা আছে তার মনে। সম্রাটের মুখ বিবর্ণ, গাল ভেঙে গেছে, চোখ বসে গেছে, কিন্তু মুখের মাধুরী যেন তাতে আরও বেড়েছে। সম্রাটের আহত হওয়ার গুজবটা যে মিথ্যা সেটা জেনে রস্তভের খুব ভাল লাগল। তাকে দেখে তাই সে খুসি। সে বুঝল, সোজা গিয়ে দল্‌গরুকভের চিঠিটা সে সম্রাটের হাতে দিতে পারে, দেওয়াই উচিত।

কিন্তু কোন প্রেমিক যুবকের সামনে যখন বহু-আকাংখিত মুহূর্তটি আসে এবং প্রেমিকার সঙ্গে নির্জনে দেখা হয়, তখন সে যেমন কাঁপতে থাকে, তার স্নায়ু অবশ হয়ে পড়ে; রাতের পর রাত যে কথাগুলি বলার স্বপ্ন দেখেছে তা উচ্চারণও করতে পারে না, বরং সাহায্যের আশায় অথবা পালিয়ে যাওয়ার এক সুযোগের জন্য চারদিকে তাকাতে থাকে, সেইরকম রস্তভও এতকাল ধরে যে সুযোগটি পৃথিবীর অন্য যে কোন জিনিসের চাইতে বেশী করে কামনা করেছে সেই সুযোগ যখন তার সামনে এসে হাজির হয়েছে তখন বুঝতেই পারছে না কেমন করে সম্রাটের কাছে এগিয়ে যাবে; আর এ কাজ করা তার পক্ষে কেন অসুবিধাজনক, অশোভন, ও অসম্ভব তারই হাজার যুক্তি তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে রস্তভ যখন বিষণ্ণ মনে সেখান থেকে সরে যেতে লাগল তখন ক্যাপ্টেন ভনটোল্‌ হঠাৎই ঘোড়ায় চেপে সেখানে এসে হাজির হল এবং সম্রাটকে দেখে এগিয়ে এসে তাকে ধরে নামিয়ে পায়ে হেঁটে নালাটা পার হতে সাহায্য করল। কিছুটা অসুস্থ বোধ করায় সম্রাট বিশ্রাম

নেবার জন্য একটা আপেল গাছের তলায় বসল ; ভন টোল্‌ও তার পাশেই রইল। ঈর্ষায় ও অনুতাপে বিদ্ধ হয়ে রস্তভ দূর থেকে দেখতে পেল, ভন-টোল্ অনেকক্ষণ ধরে ঘনিষ্ঠভাবে সম্রাটের সঙ্গে কথা বলছে, আর সম্রাট কাঁদতে কাঁদতে এক হাতে নিজের চোখ ঢেকে অন্য হাতে ভন টোল্-এর হাতটা চেপে ধরেছে।

“তার জায়গায় তো আমিও হতে পারতাম!” এই কথা ভেবে সম্রাটের প্রতি করুণায় উদ্গত চোখের জল কোনরকমে চেপে একান্ত হতাশায় রস্তভ ঘোড়া চালিয়ে এগিয়ে গেল—কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে তা সে জানে না।

নিজের দুর্বলতাই যে তার এই দুঃখের কারণ এই অনুভূতিই তার হতাশাকে আরও বাড়িয়ে তুলল।

সম্রাটের কাছে সেও তো এগিয়ে যেতে পারত……পারত নয়, যাওয়াই উচিত ছিল। সম্রাটের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের একটা অনবদ্য সুযোগ এসেছিল তার সামনে। সে সুযোগ সে নিতে পারে নি।……“আমি কি করেছি?” সে ভাবল। ঘোড়ার মুখটা ঘুড়িয়ে সে ফিরে গেল সেই নালার ধারে যেখানে সে দেখেছিল সম্রাটকে। কিন্তু এখন সেখানে কেউ নেই। শুধু কিছু মালগাড়ি ও যাত্রী-গাড়ি চলেছে। একজন কোচয়ানের কাছে সে জানতে পারল, কুতুজভের দলবল বেশী দূরে নেই, কাছের সেই গ্রামেই গাড়িগুলো যাচ্ছে। রস্তভ তাদের পিছু নিল।

সন্ধ্যা পাঁচটার আগে সব যুদ্ধক্ষেত্রেই পরাজয় হল। একশ'রও বেশী কামান ইতিমধ্যেই ফরাসীদের হাতে পড়েছে।

একটি সেনাদল অস্ত্র ত্যাগ করেছে। অন্যগুলি অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে বিশৃংখলভাবে ইতস্তত সরে পড়ছে।

ল্যাঁগারোঁ ও দখ্‌তুরভের মিলিত সেনাদল অগেস্‌দ্‌ গ্রামের নিকটবর্তী বাঁধ ও পুকুরের ধারে ভিড় করেছে।

পাঁচটার পর থেকে একমাত্র অগেস্‌দ্‌ বাঁধের উপরই ফরাসীদের কামান থেকে জোর গোলাগুলি চলছে আমাদের পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যদের লক্ষ্য করে। এদিক থেকে দখ্‌তুরভ আরও কয়েকদল সেনাসমাবেশ করে পশ্চাদ্ধাবনকারী ফরাসী অশ্বারোহীদের লক্ষ্য করে বন্দুক চালাচ্ছে।

দলখভ এখন অফিসার হয়েছে; তার হাতে-পায়ে আঘাত লেগেছে। তার সঙ্গে আছে ঘোড়সওয়ার রেজিমেন্ট-কম্যাণ্ডার ও তার দলের জনা দশেক সৈন্য। গোটা রেজিমেন্টের এই কয়জনই অবশিষ্ট আছে। একটা কামানের গোলা লেগে তাদের পিছনে একজনের মৃত্যু হল; সামনেও একজন মারা পড়ল; রক্ত ছিটকে পড়ল দলখভের গায়ে। অসহায়ভাবে সামনে ছুটতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে সকলে জট পাকিয়ে গেল, কয়েক পা এগিয়েই ভিড় থেমে

গেল।

প্রত্যেকেই ভাবছে, "একশ' গজ এগোতে পারলেই নির্ঘাৎ বেঁচে যাব; আরও দুমিনিট এখানে থাকলেই অবধারিত মৃত্যু।"

ভিড়ের ভিতর থেকে বাঁধের ধারে যাবার জন্য জোর করে পথ করে নিতে গিয়ে দলখভ দুটি সৈন্যকে ছিটকে ফেলে দিল এবং কারখানার পুকুরের উপরকার পিছল বরফের দিকে ছুটে গেল।

পায়ের নীচে বরফ সশব্দে গুঁড়ো হয়ে যেতে লাগল। সেই অবস্থায়ই সে হেঁকে বলল, "এদিকে ঘুরে যাও! এদিকে!"

সে দাঁড়িয়ে আছে বরফের উপর। বরফ একটু একটু করে দুলছে, শব্দ করছে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কামান অথবা ভিড়ের চাপে এ বরফ তো ভেঙে পড়বেই, এমন কি তার নিজের ভারও বেশীক্ষণ বইতে পাববে না। সৈনিকরা তার দিকে তাকিয়ে তীরের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বরফের উপর পা ফেলতে ইতস্তত করতে লাগল। অশ্বারোহী অধিনায়কটি বাঁধের মুখে পৌঁছে হাত তুলে দলখভের উদ্দেশে কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল। হঠাৎ একটা কামানের গোলা এত নীচু হয়ে হিস্-হিস্ শব্দে ছুটে গেল যে সকলেই মাথা নীচু করল। গোলাটা এসে একটা ভিজে কিছুর উপর পড়ল, আর অধিনায়কটি ঘোড়ার উপর থেকে ছিটকে পড়ল রক্তের ডোবার মধ্যে। কেউ তার দিকে ফিরে চাইল না। বা তাকে তুলে নেবার কথাও ভাবল না।

"বরফের উপর উঠে যাও, বরফের উপরে! চল! ঘুরে চল! শুনতে পাচ্ছ না? এগিয়ে চল!" অধিনায়কটি গোলায় আহত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য কণ্ঠস্বর চীৎকার করে উঠল; কেন যে তারা চীৎকার করছে, কিসের জন্য, তাও তারা জানে না।

যেসব গোলন্দাজ বাঁধের দিকে যাচ্ছিল তাদের একেবারে শেষের সৈনিকটি বরফের দিকে ঘুরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা দলে দলে বাঁধ থেকে ছুটতে লাগল জমাট পুকুরের দিকে। একেবারে প্রথম সৈনিকটির পায়ের চাপেই বরফের চাঁই ভেঙে পড়ল; তার একটা পা জলে পড়ে গেল। পা তুলবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে কোমর পর্যন্ত জলে ডুবে গেল। কাছাকাছি সৈন্যরা পিছিয়ে গেল, কামান-চালক তার ঘোড়াটাকে থামাল, কিন্তু পিছন থেকে তখনও সমানে চীৎকার চলছে: "বরফের উপর উঠে যাও, থামলে কেন? এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও!" ভিড়ের মধ্যে উঠল আর্ত চীৎকার। খোঁচা খেয়ে ঘোড়াগুলো চলতে শুরু করল। যে বরফ পায়ের চাপে কোনরকমে টিকেছিল, এবার সেটা অনেকটা জায়গা জুড়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল, আর সামনে পিছনে চল্লিশ জনের মত সৈন্য সেই ধাক্কাধাক্কিতে জড়াজড়ি করে ডুবে গেল।

কামানের গোলা তখনও হিস্-হিস্ শব্দে ছুটে এসে পড়ছে বরফের উপর,

জলের মধ্যে, আর সবচাইতে ঘন ঘন পড়ছে বাঁধের উপর, পুকুরের মধ্যে ও তার তীরে ভিড়-করা মানুষের উপর।

অধ্যায়—১৯

প্রিন্স আন্দ্রু বল্‌কন্‌স্কি পতাকাদণ্ড হাতে নিয়ে প্রাৎজেন পাহাড়ের মাথায় যেখানে পড়ে গিয়েছিল সেখানেই পড়ে আছে। তার শরীর থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। অচেতন অবস্থায় সে করুণ স্বরে শিশুর মত আর্ত-নাদ করছে।

সন্ধ্যার দিকে তার আর্তনাদ থেমে গেল; একেবারেই চুপচাপ হয়ে গেল। এইভাবে কতক্ষণ অচেতন ছিল তাও সে জানে না। হঠাৎ তার মনে হল সে এখনও বেঁচে আছে; মাথার ভিতরে কাটা ঘায়ের একটা জ্বালা-করা যন্ত্রণা হচ্ছে।

"যে উঁচু আকাশটাকে আগে কখনও চিনতাম না, শুধু আজই দেখলাম সেটা কোথায়?" এই প্রশ্নই তার প্রথম মনে হল। "এ রকম যন্ত্রণাও কখনও পাই নি। হ্যাঁ, আজকের আগে আমি কিছুই জানতাম না, কিছু না। কিন্তু আমি কোথায় আছি?"

সে কান পাতল; ঘোড়ার পায়ের শব্দ ও ফরাসী ভাষার কথাবার্তা কানে এল। চোখ খুলল। মাথার উপর আবার সেই উঁচু আকাশ, সেই মেঘ আরও উঁচুতে ভাসতে ভাসতে চলেছে, আর তার ফাঁকে ফাঁকে ঝিল্‌মিল্ করছে অনন্ত নীলিমা। ক্ষুরের শব্দ ও গলার স্বর শুনে বুঝতে পারল কারা যেন ঘোড়ায় চড়ে এসে তার পাশেই থেমেছে; সে কিন্তু মাথা ফেরাল না, তাদের দিকে তাকালও না।

দুজন এড্-ডি-কংসহ স্বয়ং নেপোলিয়ন এসেছে। ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাজির হয়ে নেপোলিয়ন চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়েছে, অগেসৃদ্ বাঁধের উপর গোলা-বর্ষণকারী কামানের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে, আর নিজে ঘুরে ঘুরে তাদের দেখছে যারা নিহত ও আহত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে আছে।

একটি মৃত রুশ বোমানিক্ষেপকারী উপুড় হয়ে পড়ে আছে; মাথা ও কালো ঘাড়টা মাটির মধ্যে ঢুকে গেছে, শক্ত হাতটা টান-টান হয়ে ছড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়ন বলল, "চমৎকার সৈনিক এরা!"

গোলাবর্ষণকারী কামানশ্রেণীর কাছ থেকে ছুটে এসে একজন অ্যাডজুটান্ট বলল, "এই কামানগুলোর বারুদ ফুরিয়ে গেছে, ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

নেপোলিয়ন বলল, "রিজার্ভ থেকে কিছুটা আনিয়ে নাও।" কয়েক পা এগিয়ে প্রিন্স আন্দ্রুর সামনে থেমে গেল। সে চীৎ হয়ে পড়ে আছে; তার পাশেই পড়ে রয়েছে পতাকাদণ্ডটা। (জয়ের স্মারক হিসাবে পতাকাটা

ফরাসীরা নিয়ে গেছে।)

বল্‌কন্‌স্কির দিকে তাকিয়ে থেকে নেপোলিয়ন বলল, "বড় চমৎকার মৃত্যু!"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বুঝল তাকে লক্ষ্য করেই কথাটা বলা হয়েছে, আর বলেছে নেপোলিয়ন। বক্তাকে যে "স্যার" বলে সম্বোধন করা হয়েছে সেটা সে শুনেছে। কিন্তু কথাগুলি তার কানে এসেছে মাছির গুঞ্জনের মত। সে কোন আগ্রহ দেখাল না, খেয়ালও করল না, সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গেল। মাথার ভিতরটা জ্বলছে; মনে হচ্ছে, রক্তক্ষরণের ফলে তার মৃত্যু এগিয়ে আসছে; মাথার উপর দেখতে পেল সেই সুদূর, সুউচ্চ, চিরন্তন আকাশ। সে বুঝতে পারল এই লোকটিই নেপোলিয়ন—তার আদর্শ—কিন্তু সেই মুহূর্তে চলমান মেঘসহ ঐ সুউচ্চ অসীম আকাশ ও নিজের মধ্যে যে লীলা চলেছে তার তুলনায় নেপোলিয়নকে বড়ই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ বলে মনে হল। কে তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, কে তার সম্পর্কে কি বলছে, এই মুহূর্তে সেসবই তার কাছে অর্থহীন; এই যেসব লোকজন তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাতেই সে খুসি; সে শুধু চাইছে যে বেঁচে উঠতে তারা তাকে সাহায্য করুক; জীবন তার কাছে আজ নতুন করে অর্থবহ হয়ে উঠেছে, সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছে। সর্বশক্তি একত্র করে সে একটু নড়তে চেষ্টা করল, কিছু বলতে চাইল। আস্তে আস্তে পাটা ছড়িয়ে এমন দুর্বল রুগ্ন কণ্ঠে সে আর্তনাদ করে উঠল যে তার নিজেরই করুণা হল।

নেপোলিয়ন বলে উঠল, "আহা! এ যে বেঁচে আছে! এই যুবককে তুলে নিয়ে কোন ড্রেসিং-স্টেশনে পৌঁছে দাও।"

এই কথা বলে নেপোলিয়ন মার্শাল ল্যানেস-এর সঙ্গে দেখা করতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, মার্শালও টুপিটা হাতে নিয়ে হাসি মুখে এগিয়ে এসে জয়লাভের জন্য সম্রাটকে অভিনন্দন জানাল।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর আর কিছুই মনে নেই: স্ট্রেচারে তোলার ভয়ংকর যন্ত্রণায়, বয়ে নিয়ে যাওয়ার ঝাঁকুনিতে, এবং ড্রেসিং-স্টেশনে ক্ষতস্থান কাটাছেঁড়ার ফলে সে জ্ঞান হারাল। দিনের শেষে অন্য বন্দী রুশ অফিসারদের সঙ্গে তাকেও যখন একটা হাসপাতালে পাঠিয়ে দিল তখন তার জ্ঞান ফিরে এল। নিয়ে যাওয়ার পথে সে কিছুটা বল ফিরে পেল; চারদিকে তাকাতে, এমন কি কথা বলতেও পারল।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে প্রথমেই সে শুনতে পেল একজন ফরাসী কনভয়-অফিসারের কথা; সে দ্রুতলয়ে বলছে:

"এখানেই আমাদের থামতে হবে: এখনই সম্রাট এখান দিয়ে যাবেন; এই বন্দী ভদ্রলোকদের দেখলে তিনি খুসি হবেন।"

আর একজন অফিসার বলল, "আজ এত বেশী লোক বন্দী হয়েছে, বলতে

গেলে গোটা রুশ বাহিনী, যে সম্রাট সম্ভবত বন্দীদের ব্যাপারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

সাদা ইউনিফর্মধারী একজন রুশ অফিসারকে দেখিয়ে প্রথম অফিসার বলল, "ঠিক আছে! শুনেছি, এই লোকটি সম্রাট আলেক্সান্দারের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক।"

বল্‌কন্‌স্কি প্রিন্স রেপ্‌নিনকে চিনতে পারল; পিতার্সবুর্গের উঁচু মহলে তার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। তার পাশেই অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর আর একজন আহত অফিসার দাঁড়িয়েছিল; তার বয়স মাত্র উনিশ বছর।

বোনাপার্ত জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে থামল।

বন্দীদের দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্রধান কে?"

তারা কর্ণেল প্রিন্স রেপ্‌নিন-এর নাম করল।

"আপনি সম্রাট আলেক্সান্দারের অশ্বারোহী রক্ষী রেজিমেণ্টের অধিনায়ক?" নেপোলিয়ন শুধাল।

"আমি একটি ছোট দল পরিচালনা করি," রেপ্‌নিন জবাব দিল।

নেপোলিয়ন বলল, "আপনার রেজিমেণ্ট সসম্মানে নিজ কর্তব্য পালন করেছে।"

রেপ্‌নিন বলল, "একজন মহান অধিনায়কের প্রশংসাই একটি সৈনিকের কাছে সবচাইতে বড় পুরস্কার।"

নেপোলিয়ন বলল, "সানন্দে আপনাকে সে পুরস্কার দিলাম। আপনার পাশে এই যুবকটি কে?"

প্রিন্স রেপ্‌নিন লেফ্‌টেন্যাণ্ট সুখ্‌তেলেন-এর নাম করল।

তার দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়ন হাসল।

"আমাদের কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার পক্ষে সে বড় বেশী তরুণ।"

ধরা গলায় সুখ্‌তেলেন বলল, তারুণ্য তো সাহসের পথে বাধা নয়।"

নেপোলিয়ন বলে উঠল, "চমৎকার জবাব! যুবক, তুমি অনেকদূর এগিয়ে যেতে পারবে!"

প্রিন্স আন্দ্রুকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হল। তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখার কথা নেপোলিয়নের মনে পড়ে গেল; তাকেও "যুবক" বলে সম্বোধন করে বলল, "তারপর, সাহসী যুবক, তুমি কেমন আছ?"

যে সৈনিকরা তাকে এখানে বয়ে এনেছে পাঁচ মিনিট আগেও প্রিন্স আন্দ্রু তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলেছে, কিন্তু এখন নেপোলিয়নের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে চুপ করে রইল। …'যে মহান, নিরপেক্ষ, সদয় আকাশকে সে আজ দেখেছে, তার অর্থ বুঝেছে, তার সঙ্গে তুলনায় এই মুহূর্তে নেপোলিয়নের সব কর্মকাণ্ডকে তার কাছে এতই অকিঞ্চিৎকর মনে হল, তার আদর্শ নায়কের তুচ্ছ অহংকার ও জয়ের আনন্দ তার কাছে এতই ছোট মনে হল,

যে নেপোলিয়নের প্রশ্নের কোন জবাবই সে দিতে পারল না।

রক্তক্ষরণজনিত দুর্বলতা, যন্ত্রণা ও মৃত্যুর নৈকট্য তার মনে যে কঠোর, গম্ভীর চিন্তাকে জাগিয়ে তুলেছে তার তুলনায় এখন সব কিছুই তুচ্ছ ও অর্থহীন মনে হচ্ছে। নেপোলিয়নের চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আনদ্রু শুধু ভাবতে লাগল মহত্ত্বের অর্থহীনতা, যে জীবন বুদ্ধির অতীত তার গুরুত্বহীনতা, এবং যে মৃত্যুর অর্থ জীবিত মানুষের বুদ্ধি ও ব্যাখ্যার অতীত তার অধিকতর গুরুত্বহীনতার কথা।

জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সম্রাট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল; যেতে যেতেই জনৈক অফিসারকে বলল:

"এইসব ভদ্রলোকদের উপযুক্ত সেবাযত্ন ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও; ডাক্তার ল্যারে ওদের পরীক্ষা করুক। অ রিভোয়া প্রিন্স রেপ্‌নিন!" বলে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আত্মতুষ্টি ও খুসিতে তার মুখটা জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগল।

যে সৈনিকরা প্রিন্স আনদ্রুকে বয়ে এনেছিল তারা তার বোনের নিজের হাতে পরিয়ে দেওয়া সোনার ছোট দেবমূর্তিটা দেখতে পেয়ে গলা থেকে খুলে নিয়েছিল, কিন্তু সম্রাট বন্দীদের প্রতি যে অনুগ্রহ দেখিয়ে গেল তাতে তারা তাড়াতাড়ি সেটা ফিরিয়ে দিল।

কে যে কেমন করে ছোট দেবমূর্তিটা তার গলায় পরিয়ে দিল সেটা প্রিন্স আনদ্রু দেখতে পায় নি, কিন্তু এখন বুঝতে পারল যে সোনার চেনসহ মূর্তিটাকে হঠাৎই ইউনিফর্মের উপর দিয়ে তার বুকের উপর রেখে দেওয়া হয়েছে।

বোনের দেওয়া দেবমূর্তিটির দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আনদ্রু ভাবল, "মারির কাছে সবকিছুই যেমন পরিষ্কার ও সরল মনে হয়, আসলে তা হলে কতই না ভাল হত! বেঁচে থাকতে কার কাছে সাহায্যের প্রার্থনা জানাতে হবে, আর কবরের ওপারে গিয়েই বা কি আশা করতে হবে, তা জানতে পারলে কতই না ভাল হত! এখন যদি বলতে পারতাম: 'হে প্রভু, আমাকে দয়া কর!' তাহলে আমি কত না সুখী, কত না শান্ত হতে পারতাম! ···কিন্তু কাকে সে কথা বলব? হয় এমন কোন সংজ্ঞার অতীত জ্ঞানের অতীত শক্তিকে যাকে সম্বোধন করতে আমি জানি না, ভাষায় প্রকাশ করতেও পারি না—সেই মহান অদ্বৈত অথবা শূন্য—অথবা সেই ঈশ্বরকে মারি যাকে এই রক্ষা-কবচের সঙ্গে সেলাই করে দিয়েছে! কিছুই তো নিশ্চিত নয়। আমি যা কিছু বুঝি তার গুরুত্বহীনতা এবং অজ্ঞেয় অথচ একান্ত গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর মহত্ত্ব ছাড়া আর সব কিছুই অনিশ্চিত।

স্ট্রেচারগুলো এগিয়ে চলল। প্রতিটি ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে সে আবার অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতে লাগল; জ্বরভাবটা বেড়ে গেল; বিকারগ্রস্ত হয়ে

পড়ল। বাবা, স্ত্রী, বোন ও ভাবী পুত্রের ছবি, যুদ্ধের আগের রাত্রির কোমল অনুভূতি, ছোট্ট নেপোলিয়নের সাধারণ মূর্তি, আর সবার উপরে ঐ সুউচ্চ আকাশ—বিকারের ঘোরে এসবই তার মনে ভিড় করতে লাগল।

চোখের সামনে ভেসে উঠল শান্ত পারিবারিক জীবন ও বল্ড হিল্‌সের শান্তিপূর্ণ সুখের ছবি। এই সুখেই সে বিভোর হয়ে ছিল, এমন সময় ছোট্ট নেপোলিয়ন সহসা এসে হাজির হল অপরের দুঃখদুর্দশায় তার সহানুভূতিহীন ও অদূরদর্শী আনন্দ নিয়ে; তারই ফলে তার মনে জাগল সন্দেহ ও যন্ত্রণা; এখন একমাত্র স্বর্গই দিতে পারে প্রতিশ্রুত শান্তি। সকলের দিকে এইসব স্বপ্ন মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল অচৈতন্য ও বিস্মৃতির এক বিশৃংখল অন্ধকারে। নেপোলিয়নের ডাক্তার ল্যারের মতে, এ অবস্থার পরিণামে আরোগ্য নয়, মৃত্যুর সম্ভাবনাই অধিক।

ল্যারে বলল, "সে স্নায়বিক দুর্বলতা ও পিত্তবিকারে ভুগছে; আর কখনও সুস্থ হবে না।"

এদিকে মারাত্মকভাবে আহত অন্য সকলের সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রুকেও রেখে দেওয়া হল স্থানীয় অধিবাসীদের আশ্রয়ে।

[তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত]

চতুর্থ পর্ব

অধ্যায়—১

১৮০৬ সালের গোড়ার দিকে নিকলাস রস্তভ ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। দেনিসভ তার বাড়ি ভরোনেঝেই যাচ্ছিল; রস্তভ অনেক বলে-কয়ে তার সঙ্গে মস্কো পর্যন্ত যেতে এবং সেখানে তার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাতে রাজী করাল। মস্কোর আগে শেষ ডাক-ঘাঁটির আগেকার ঘাঁটিতে জনৈক সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় দেনিসভ তার সঙ্গে বসে তিন বোতল মদ গিলেছিল; তাই বরফ-ঢাকা পথের ঝাঁকুনি সত্ত্বেও মস্কোর পথে একটি বারের জন্যও তার ঘুম ভাঙল না; রস্তভের পাশে স্লেজের তলাতে শুয়েই কাটিয়ে দিল; মস্কোর যত কাছাকাছি এগোতে লাগল রস্তভ ততই অধৈর্য হয়ে উঠল।

শহরের ফটকে তাদের ছুটির অনুমতি-পত্র পাশ হবার পরে মস্কোতে ঢুকতেই রস্তভ ভাবতে লাগল, "আর কতদূর? আর কতদূর? আঃ, যতসব অসহ্য রাস্তাঘাট, দোকানপাট, রুটিওয়ালাদের সাইনবোর্ড, রাস্তার বাতি আর স্লেজগাড়ি!"

পুরো শরীরটা নিয়ে সামনে ঝুঁকে সে বলে উঠল, "দেনিসভ! আমরা এসে পড়েছি! ও দেখছি ঘুমিয়ে পড়েছে।"

দেনিসভ জবাব দিল না।

"ওই তো চৌ-মাথার মোড়; ওখানেই তো কোচয়ান জাখারের আস্তানা; ওই তো জাখার স্বয়ং, আর সেই ঘোড়াটাই আছে! ওই তো সেই ছোট দোকানটা যেখান থেকে আমরা আদার বিস্কুট কিনতাম! তাড়াতাড়ি চলতে পারছ না? এই তো!"

"কোন্ বাড়িটা?" কোচয়ান শুধাল।

"কেন, ওই যে ডানদিকে শেষ বাড়িটা, ওই বড়টা। দেখতে পাচ্ছ না? ওটাই আমাদের বাড়ি," রস্তভ বলল। "অবশ্যই ওটা আমাদের বাড়ি। দেনিসভ, দেনিসভ, আমরা পৌঁছে গেছি!"

দেনিসভ মাথা তুলে কাশল, কথা বলল না।

কোচবাক্সের উপর বসে থাকা খানসামাকে ডেকে রস্তভ বলল, "দিমিত্রি, ওই আলোগুলো তো আমাদের বাড়ির, তাই না?"

"হ্যাঁ স্যার, আর ওই আলোটা আপনার বাবার পড়ার ঘরের।"

"তাহলে তারা এখনও শুতে যায় নি? তোমার কি মনে হয়? ভাল কথা, আমার নতুন কোটটা বের করতে ভুলো না কিন্তু," নতুন গোঁফে আঙুল

বুলিয়ে রস্তভ বলল। তারপর কোচয়ানকে হাঁক দিয়ে বলল, "আরে, চালাও।" দেনিসভের দিকে ফিরে বলল, "উঠে পড় ভাস্কা!" তাদের দরজার তিনটে বাড়ি আগে পৌঁছতেই রস্তভ আবার হেঁকে বলল "চালাও—ভদকার জন্য তিন রুবল পাবে।" তার মনে হল, ঘোড়াগুলো মোটেই নড়ছে না। শেষ পর্যন্ত স্লেজটা ডাইনে ঘুরে একটা ফটকের সামনে থামল; রস্তভ মাথার উপরে দেখতে পেল খানিকটা প্ল্যাস্টার ভাঙা পরিচিত কার্নিসটা, ফটকটা, ফুটপাথের থামটা। স্লেজটা থামবার আগেই সে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে হল-ঘরে ঢুকল। বাড়িটা নির্বিকার, নিশ্চুপ, যেন কে এসেছে সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। হলে কেউ নেই। "হা ঈশ্বর! সকলে ভাল আছে তো?" মুহূর্তের জন্য থেমে সে ভাবল, আর পরক্ষণেই পরিচিত সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। দরজার অতি-পরিচিত সেই পুবনো হাতলটা তেমনই সহজেই ঘুরে গেল। ছোট ঘরটাতে একটিমাত্র চর্বি-বাতি জ্বলছে।

বুড়ো মাইকেল সিন্দুকের উপর ঘুমিয়ে আছে। পরিচারক প্রকফি খোলা দরজার দিকে তাকাল, আর অমনি তাব মুখের ঘুমন্ত উদাসীনতার বদলে সেখানে ফুটে উঠল সানন্দ বিস্ময়।

তরুণ মনিবকে চিনতে পেরে সে চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ভগবান! ছোট কাউন্ট যে! এও কি হতে পারে? মানিক আমার!" উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে সে বসবার ঘরের দরজার দিকে ছুটে গেল, সম্ভবত তার আসার কথা জানাতেই, কিন্তু সে ইচ্ছা ত্যাগ করে ফিরে এসে যুবকটির কাঁধে চুমো খাবার জন্য ঝুঁকে দাঁড়াল।

"সকলে ভাল তো?" রস্তভ শুধাল।

"হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! হ্যাঁ! এইমাত্র সকলের খাওয়া শেষ হয়েছে। আপনাকে একবার ভাল করে দেখি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"সত্যি, সকলে ভাল আছে তো?"

"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সকলেই ভাল।"

দেনিসভের কথা রস্তভ একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। তার আসার কথাটা অন্য কেউ আগে থেকে জেনে ফেলুক এটা সে চায় না; তাই লোমের কোটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলনাচের ঘরটার ভিতর দিয়ে পা টিপে টিপে ছুট দিল। সব কিছু আগের মতই আছে: সেই পুরনো তাসের টেবিল, সেই ঢাকনা-দেওয়া ঝাড়-লণ্ঠন; কিন্তু একজন এর মধ্যেই নতুন মনিবটিকে চিনে ফেলেছে; সে বসবার ঘরে পৌঁছবার আগেই পাশের দরজা দিয়ে কে যেন ঝড়ের গতিতে ছুটে এসেই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে লাগল। তারপর আর একজন, আরও একজন দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল; আরও বেশী করে আদর, বেশী করে চুমো খাওয়া, হৈ-চৈ, আনন্দাশ্রু। রস্তভ বুঝতেই পারছে না কে বাপি, কে নাতাশা, আর কে পেত্য়া। সকলেই এক

সঙ্গে হৈচৈ করছে, কথা বলছে, চুমো খাচ্ছে। তার খেয়াল হল, শুধু মা আসে নি।

“আমি কি জানতাম না····নিকলাস···সোনা আমার··· !”

“এই তো এসেছে···আমাদের আপনজন···কলিয়া, সোনা···ও কেমন বদলে গেছে !····মোমবাতিগুলো কোথায় ?····চা !····”

“আর আমি, আমাকে চুমো খাও !”

“সোনারে····আর আমি !”

সোনিয়া, নাতাশা, পেত্‌য়া, আন্না মিখায়লভ্‌না, ভেরা ও বুড়ো কাউন্ট সকলেই তাকে আদর করতে লাগল ; ভূমিদাস, চাকর-বাকর, দাসীরা সকলেই ঘরের মধ্যে ভিড় করে হৈ-চৈ শুরু করে দিল।

পেত্‌য়া অনবরত চেঁচাচ্ছে, “আর আমাকেও !”

চারদিকে ভালবাসা-মাখা চোখগুলি আনন্দের অশ্রুজলে চিকচিক করছে ; চারদিকে সবগুলি ঠোঁটেই চুম্বনের আহ্বান।

গোলাপ-রাঙা সোনিয়াও হাত চেপে ধরে একদৃষ্টিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বয়স এখন ষোল, সে সুন্দরী, বিশেষত এই আনন্দঘন মুহূর্তে। বুড়ি কাউন্টেস এখনও আসেনি। দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল ; সে শব্দ এত দ্রুত যে তার মায়ের পায়ের শব্দ হতে পারে না।

কিন্তু মাই এসেছে ; পরনে একটা নতুন গাউন ; এটা সে দেখে যায় নি। তার চলে যাবার পরে তৈরি করা হয়েছে। রস্তভ মার কাছে ছুটে গেল। মা তার বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা মুখ তুলতেও পারছে না, ছেলের হুজার-জ্যাকেটের উপর মুখটা চেপে ধরে আছে। সকলের অলক্ষ্যে দেনিসভ সেখানে এসে দাঁড়িয়েছিল ; এই দৃশ্য দেখে সেও চোখ মুছতে লাগল।

কাউন্টের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির উত্তরে আত্ম-পরিচয় দিয়ে দেনিসভ বলল, “আমি ভাসিলি দেনিসভ, আপনার ছেলের বন্ধু।”

দেনিসভকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে কাউন্ট বলল, “এ বাড়িতে তুমি সুস্বাগত ! আমি জানি, আমি জানি। নিকলাস আমাদের লিখেছিল। ···নাতাশা ভেরা, দেখ ! এই দেনিসভ !”

খুসিতে ডগমগ মুখগুলি দেনিসভের দিকে ঘুরে গেল।

একলাফে দেনিসভের কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেয়ে নাতাশা আনন্দে অধীর হয়ে বলল, “প্রিয় দেনিসভ !” তার এই দুরন্তপনায় সকলেই বিব্রত বোধ করল। দেনিসভ লজ্জা পেলেও হেসে নাতাশার হাতটা ধরে তাতে চুমো খেল।

দেনিসভকে তারজন্য নির্দিষ্ট ঘরটা দেখিয়ে দেওয়া হল ; আর রস্তভ পরিবারের সকলেই বসবার ঘরে গিয়ে নিকলাসকে ঘিরে বসল।

বুড়ি কাউন্টেস ছেলের হাতটা ধরেই আছে; প্রতি মুহূর্তে তাতে চুমো খাচ্ছে। ভাই-বোনরা তার কাছাকাছি বসবার জন্য ঠেলাঠেলি করছে; কে তারজন্য চা, রুমাল ও পাইপ এনে দেবে তাই নিয়ে ঝগড়া করছে।

সকলের এই ভালবাসায় রস্তভ খুব খুসি।

পরদিন সকালে পথশ্রান্ত যাত্রী দুজন বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটাল। পাশের ঘরে তলোয়ার, থলে, তলোয়ারের খাপ, খোলা পোর্টম্যান্টো, নোংরা জুতা সব ছড়িয়ে আছে। দু জোড়া নতুন পালিশ-করা জুতো এইমাত্র দেয়ালের পাশে এনে রাখা হয়েছে। চাকররা হাজির হল জগ ও বেসিন, দাঁড়ি কামাবার গরম জল ও ব্রাশ-করা পোশাক নিয়ে। ঘরময় তামাকের গন্ধ।

ভাসিলি দেনিসভের ফ্যাঁসফেঁসে গলা শোনা গেল, "আরে, গিয়িশ্‌কা—আমার পাইপ! হেই রস্তভ, উঠে পড়!"

রস্তভ চোখ রগড়াতে রগড়াতে গরম বালিশের উপর থেকে এলোমেলো মাথাটা তুলল।

"আরে, অনেক দেরি হয়ে গেছে না কি?"

"দেরি! এখন তো প্রায় দশটা বাজে," নাতাশার গলা শোনা গেল। পাশের ঘর থেকে ভেসে এল মাড়-দেওয়া পেটিকোটের খসখস ও অনেক মেয়ের হাসি ও ফিস্‌ ফিস্‌ শব্দ। সশব্দে দরজাটা খুলে গেল; নীল ফিতে, কালো চুল ও হাসি মুখের ঝিলিক দেখা দিল দরজায়। দু'জন ঘুম থেকে উঠেছে কিনা তাই দেখতে এসেছে নাতাশা, সোনিয়া ও পেত্‌য়া।

নাতাশার গলা আবার শোনা গেল, "নিকলাস! উঠে পড়!"

"এক্ষুণি উঠছি!"

এদিকে বাইরের ঘরে তরবারি দেখে সেটা হাতে নিয়ে পেত্‌য়া শোবার ঘরের দরজাটা খুলে ফেলল; পোশাক ছাড়ার সময় মেয়েদের যে পুরুষদের দেখতে পাওয়াটা শোভন নয় সে-কথা সে একেবারেই ভুলে গেল। হাঁক দিয়ে বলল, "এটা কি তোমার তলোয়ার?"

মেয়েরা লাফ দিয়ে একপাশে সরে গেল। সাহায্যের জন্য ভীত মুখে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে দেনিসভ তাড়াতাড়ি তার লোমশ পা দুটি কম্বলের নীচে লুকিয়ে ফেলল। পেত্‌য়া ঘরে ঢুকতেই দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। ওপার থেকে হাসির হর্‌রা উঠল।

"নিকলাস! ড্রেসিং-গাউনটা পরে বেরিয়ে এস।" নাতাশার গলা শোনা গেল।

পেত্‌য়া বলল, "এটা কি তোমার তলোয়ার? না কি তোমার?" পরের প্রশ্নটা করল কালো গোঁফওয়ালা দেনিসভকে।

রস্তভ তাড়াতাড়ি একটা কিছু পায়ে গলিয়ে ড্রেসিং-গাউনটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে এল। সকলে মিলে বসবার ঘরে গিয়ে আড্ডা জমাল। হাজার তুচ্ছ

কথা নিয়ে চলল প্রশ্ন আর উত্তরের পালা। প্রতিটি কথায় উছলে পড়তে লাগল নাতাশার হাসি। যা শোনে তাতেই সে বলে, "আঃ, কী সুন্দর, কী চমৎকার!"

ভালবাসার এই উষ্ণ আলোর প্রভাবে রস্তভ মনে মনে বুঝতে পারল, বাড়ি থেকে চলে যাবার পর থেকে যে শিশুসুলভ হাসি একদিনের জন্যও ফোটে নি তার মুখে, আঠারো মাস পরে এই প্রথম সে হাসি আবার তার অন্তরকে, তার মুখকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

নাতাশা বলল, "না, আমার কথা শোন। তুমি তো এখন একটা পুরুষ মানুষ হয়ে উঠেছ, না কি বল? তুমি আমার দাদা এ-কথা ভাবতেও ভাল লাগছে।" নাতাশা তার গোঁফজোড়া স্পর্শ করল। তোমরা পুরুষরা কি রকম হয়ে ওঠ জানতে ইচ্ছা করে। আমাদের মতই কি? না?"

"সোনিয়া পালিয়ে গেল কেন?" রস্তভ শুধাল।

"তাই তো! সে অনেক কথা! ওকে তুমি কি বলে ডাকবে—তুই, না তুমি?"

"সে যা হয় হবে," রস্তভ বলল।

"না, ওকে 'তুমি' বলে ডেক, বুঝলে! পরে তোমাকে সব বলব। না, এখনই বলছি। তুমি তো জান, সোনিয়া আমার প্রিয়তম বন্ধু। এমন বন্ধু যে তারজন্য আমার হাতটাই পুড়িয়েছি। এই দেখ।"

মসলিনের আস্তিনটা তুলে নাতাশা দেখাল, সুন্দর হাতটার কনুইয়ের উপরে একটা লাল দাগ।

"ওকে যে ভালবাসি সেটা প্রমাণ করতেই হাতটা পুড়িয়ে দিয়েছি। একটা রুল-কাঠি আগুনে গরম করে এখানে চেপে ধরেছিলাম!"

রস্তভ ব্যাপারটা বুঝতে পারল; মোটেই অবাক হল না। প্রশ্ন করল, "বাস, এই সব?"

"আমরা দুজন এত ঘনিষ্ঠ বন্ধু! রুল-কাঠির ব্যাপারটা অবশ্য খুবই বাজে, কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব চিরদিনের। ও যদি কাউকে ভালবাসে তো সারা জীবনের জন্যই ভালবাসে, কিন্তু আমি ও ব্যাপারটা বুঝি না, তাড়াতাড়িই ভুলে যাই।"

"বেশ তো, তারপর?"

"দেখ, আমাকে ও তোমাকে ও সেইভাবেই ভালবাসে।"

নাতাশা হঠাৎ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

"কেন, চলে যাবার আগের কথা তো তোমার মনে আছে?···দেখ, ও বলছে তুমি যেন সেসব ভুলে যাও। শুধু বলে: 'আমি তাকে চিরদিন ভালবাসব, কিন্তু সে মুক্ত থাকুক।' এটা কি মধুর ও মহৎ নয়! সত্যি, খুব মহৎ, কি বল?"

রস্তভ ভাবতে লাগল।

বলল, "আমি কখনও কথার খেলাপ করি না। তাছাড়া, সোনিয়া এতই মনোহারিণী যে একমাত্র কোন নির্বোধই সে সুখ বিসর্জন দেবে।"

নাতাসা চেঁচিয়ে বলল, "না, না। আমরা দুজন এ-কথা আলোচনা করেছি। আমরা জানতাম, তুমি এই কথাই বলবে। কিন্তু তা চলবে না, কারণ ভেবে দেখ, তুমি যদি এ-কথা বল—তুমি যদি মনে কর যে তুমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ—তাহলে মনে হবে যে এটা সোনিয়ার মনের কথা নয়। এতে মনে হবে যে বাধ্য হয়েই তুমি তাকে বিয়ে করছ, কিন্তু সেটাই চলবে না।"

রস্তভ বুঝল, ব্যাপারটা নিয়ে এরা ভালভাবেই ভাবনা-চিন্তা করেছে। আগেরদিন সোনিয়ার রূপ দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে। আজ এক ঝলক দেখেই তাকে আরও মনোরমা মনে হয়েছে। সে এখন ষোড়শী সুন্দরী; তাকে একান্তভাবে ভালবাসে (এবিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ নেই) আজ কেন সে তাকে ভালবাসবে না, বিয়ে করবে না? কিন্তু এই মুহূর্তে তার সামনে রয়েছে আরও অনেক সুখ, অনেক আকর্ষণ! সে ভাবল, "হ্যাঁ, ওরা যথাযথ সিদ্ধান্তই নিয়েছে। আমাকে মুক্ত থাকতেই হবে।"

বলল, "বেশ তো, তাই ভাল। পরে এবিষয়ে কথা হবে। আঃ, তোমাদের কাছে পেয়ে কী ভাল যে লাগছে!"

তারপর বলল, "আচ্ছা, বরিসের প্রতি এখনও তোমার সেই মনোভাব আছে তো?"

নাতাশা হেসে উঠল, "আঃ, যত বাজে কথা! তার কথা, বা অন্য কারও কথাই আমি ভাবি না; ওরকম কোন ব্যাপারেই আমি নেই।"

"তাই বুঝি! তাহলে এখন তোমার মনটা কোথায় আছে?"

"এখন?" নাতাশার মুখে খুসির হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল। "তুমি দুপোর্তকে দেখেছ?"

"না।"

"বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী দুপোর্তকে দেখ নি? তাহলে বুঝবে না। আমার মনটা সেখানেই আছে।"

হাত দুটি দুলিয়ে নাতাশা ঘাঘরাটাকে নাচিয়েদের মত তুলে ধরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল, ঘুরে দাঁড়াল, নাচের ভঙ্গীতে ছোট পা দুটোকে একত্র জুড়ে একেবারে আঙুলের ডগায় ভর করে কয়েক পা এগিয়ে গেল।

বলল, "দেখ, কেমন দাঁড়িয়ে আছি! দেখ! আমার মন এখন এতেই পড়ে আছে! কাউকেই আমি বিয়ে করব না, আমি হব নৃত্য শিল্পী। এ-কথা কাউকে বলো না যেন।"

রস্তভ হো-হো করে হেসে উঠল; নাতাশাও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারল না। সে পুনরায় বলল, "না, কিন্তু ব্যাপারটা বেশ মজার নয় কি?"

"মজা! তাহলে এখন আর তুমি বরিস্‌কে বিয়ে করতে চাও না?"

নাতাশা অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল। "কাউকেই আমি বিয়ে করতে চাই না। তার সঙ্গে দেখা হলে তাকেও এই কথাই বলে দেব।"

"বেচারী!" রস্তভ বলল।

নাতাশার মুখে কথার ফোয়ারা, "যত সব বাজে! আর দেনিসভ খুব ভাল, তাই না?"

"হ্যাঁ, সত্যি ভাল।"

"ওঃ, ঠিক আছে, চলি: যাও, পোশাক পরে এস। সে কি খুব ভয়ংকর, মানে দেনিসভ?"

নিকলাস বলল, "ভয়ংকর কেন? না, ভাস্কা চমৎকার মানুষ।"

"তুমি তাকে ভাস্কা বল? মজার তো! সে কি খুব ভাল!"

"খুব।"

"ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি কর। আমরা একসঙ্গে প্রাতরাশে বসব।"

নাতাশা উঠল; ব্যালে-নর্তকীর মত আঙুলের উপর ভর দিয়ে বেরিয়ে গেল; তার মুখে সেই হাসি যা একমাত্র সুখী পঞ্চদশীরাই হাসতে পারে। বসবার ঘরে সোনিয়ার সঙ্গে দেখা হতেই রস্তভের মুখ লাল হয়ে উঠল। সোনিয়ার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে বুঝতে পারছে না। কাল সন্ধ্যায় প্রথম দর্শনের খুসির মুহূর্তে পরস্পরকে চুমো খেয়েছিল, কিন্তু এখন তার মনে হল, সেটা করা যাবে না। সে সোনিয়ার হাতে চুমো খেল, তাকে "তুমি" বলে সে সম্বোধন করল। কিন্তু তাদের চোখে-চোখে মিলন হল, চোখের ভাষা বলল "তুই", চোখে-চোখেই হল চুম্বন-বিনিময়। নাতাশার মারফৎ সে রস্তভকে তার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, চোখের চাউনি দিয়েই সে ক্ষমা চেয়ে নিল, তাকে ভালবাসার জন্য রস্তভকে ধন্যবাদও জানাল। রস্তভও তার চাউনি দিয়ে নিজের মুক্তির জন্য সোনিয়াকে ধন্যবাদ জানাল, তাকে জানিয়ে দিল যেভাবেই হোক সে কোনদিন তাকে ভালবাসা থেকে বিরত হবে না, কারণ সেটা অসম্ভব।

সকলে চুপ করলে একসময় ভেরা সুযোগ বুঝে বলে উঠল, "কী আশ্চর্য যে সোনিয়া ও নিকলাস আজ পরস্পরকে বলছে 'তুমি', আর মিলিত হচ্ছে অপরিচিতের মত।"

অন্য সবসময়ের মতই এখনও ভেরা খাঁটি কথাটিই বলল, কিন্তু তাতে সকলেই কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল; শুধু সোনিয়া, নিকলাস ও নাতাশাই নয়, বুড়ি কাউন্টেস পর্যন্ত ভয় পেল যে এই প্রেমের ব্যাপারটা হয় তো নিকলাসের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে; তাই ছোট মেয়ের মত সেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

রস্তভকে অবাক করে দিয়ে দেনিসভ ঘরে ঢুকল; তার চুলে পমেড

মাখানো, শরীরে আতর ছিটোনো, পরনে নতুন ইউনিফর্ম। যুদ্ধযাত্রার সময় যেমন চটপটে ছিল এখনও তাকে তেমনি দেখাচ্ছে; উপস্থিত মহিলা ও ভদ্রজনদের সঙ্গে সে এমন অমায়িক ব্যবহার শুরু করল যা রস্তভ তার কাছ থেকে আশাই করে নি।

অধ্যায়—২

সেনাবাহিনী থেকে মস্কো ফিরে এলে নিকলাস রস্তভকে নানাভাবে স্বাগত জানানো হল। বাড়ির লোকরা তাকে স্বাগত জানাল শ্রেষ্ঠ সন্তান, বীর ও তাদের প্রিয় নিকোলেংকারূপে; আত্মীয়-স্বজনরা স্বাগত জানাল একটি মনোহর, আকর্ষণীয় ভদ্র যুবকরূপে; আর পরিচিতজনরা স্বাগত জানাল একজন সুদর্শন হুজার-লেফটেন্যান্ট, ভাল নাচিয়ে ও শহরের শ্রেষ্ঠ ভাবী বররূপে।

রস্তভরা মস্কোতে সকলকেই চেনে। সব সম্পত্তি নতুন করে মর্টগেজ রাখায় বুড়ো কাউণ্টের হাতে যথেষ্ট টাকা এসেছে। তাই দিয়ে মনের মত একটা ঘোড়া কিনে, অতি আধুনিক ছাটকাটের পোশাকপত্র বানিয়ে নিকলাস বেশ ফুর্তিতেই দিন কাটাতে লাগল। পুরনো জীবনযাত্রার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে কিছুদিন কাটাবার পরেই বাড়িতে বাস করাটা তার কাছে আবার বেশ প্রীতিপ্রদ হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল, তার বয়স বেড়েছে, চরিত্রে পরিপক্কতা এসেছে। সে এখন একজন হুজার-লেফ্‌টেন্যান্ট, গায়ে রূপোর ফিতে বসানো কুর্তা, যুদ্ধে সাহসিকতার জন্য প্রদত্ত সেণ্ট জর্জ ক্রশ লাগানো বুকের উপর; এখন সে নিজের ঘোড়া নিয়ে রেসের শিক্ষানবীশী করছে পরিচিত, প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় রেসুড়েদের কাছে। কোন মহিলার সঙ্গে রাজপথে পরিচয় হলে সে একদা সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। আর্খারভদের বল-নাচে সে মাজুর্কা নেচেছে, ফিল্ড-মার্শাল কামেন্‌স্কির সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করেছে, ইংলিশ ক্লাবে গিয়েছে, দেনিসভের পরিচিত চল্লিশ বছরের জনৈক কর্ণেলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছে।

মস্কোতে আসার পরে সম্রাটের প্রতি অনুরাগে কিছুটা ভাটা পড়েছে। তবু প্রায়ই সে সম্রাটের কথা ও তার প্রতি নিজের ভালবাসার কথা বলে। মস্কোতে এখন সকলেই সম্রাটকে "দেবদূতের অবতার" বলে থাকে; সে মনোভাবের সেও একজন অংশীদার।

সোনিয়ার সঙ্গে এখন আর সে বেশী মেলামেশা করে না, বরং একটু দূরে দূরেই থাকে। তার কথা মনে হলেই সে নিজেকে বোঝায়, "আঃ, এরকম মেয়ে তো কোথাও না কোথাও আরও অনেক আছে, আরও অনেক থাকবে। ইচ্ছা যখন হবে তখন ভালবাসার কথা ভাববার অনেক সময় পাওয়া যাবে, কিন্তু এখন আমার সময় নেই।" তাছাড়া, তার ধারণা মহিলাদের সমাজ

তার মনুষ্যত্বের পক্ষে অসম্মানকর। সে যে বল-নাচে বা মহিলাদের মহলে যাতায়াত করে সেটা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই করে। অবশ্য ঘোড়দৌড়, ইংলিশ ক্লাব, দেনিসভের সঙ্গে গিয়ে ফূর্তিকরা, কোন একটি বিশেষ বাড়িতে যাতায়াত —সেসব অন্য ব্যাপার; একজন উঠ্তি হুজারের পক্ষে সেগুলি দরকার।

মার্চের গোড়াতে প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের সম্মানে ইংলিশ ক্লাবে একটা ডিনারের ব্যাবস্থাপনার কাজে বুড়ো কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ড্রেসিং-গাউনটা পরে হলঘরে পায়চারি করতে করতে কাউন্ট ক্লাবের ভাণ্ডারী ও প্রধান রাঁধুনিকে ডিনারের খাদ্যতালিকার নির্দেশ দিচ্ছে। রাঁধুনি ও ভাণ্ডারীও খুসি মনে মনোযোগসহকারে সব শুনছে, কারণ তারা জানে যে কয়েক হাজার রুবল ব্যয় করে কাউন্ট যে ডিনার দেবে এবং তাতে তাদের যে মোটা অংকের লাভ হবে অন্য কোথাও তেমনটি হবে না।

এমন সময় দরজায় হাল্কা পায়ের শব্দ ও বুটের খট্খট্ আওয়াজ শোনা গেল। ঘরে ঢুকল ছোট কাউন্ট। সুদর্শন চেহারা, গোলাপী রং, কালো ছোট গোঁফ: মস্কোর নিরুপদ্রব জীবনের প্রতিচ্ছবি যেন।

ছেলের সামনে কিছুটা বিব্রত বোধ করে স্মিত হাসির সঙ্গে বুড়ো কাউন্ট বলল, "এস বাবা, আমার মাথাটা ঘুরছে! তুমি যদি একটু সাহায্য কর। গায়কদের ব্যবস্থাও তো আমাকে করতে হবে। আমার অর্কেস্ট্রা তো থাকছেই, কিন্তু জিপ্সি গায়কদের আনা কি উচিত নয়? তোমরা মিলিটারি মানুষরা তো আবার ওসবই পছন্দ কর।"

ছেলেও হেসে বলল, "সত্যি বাপি, আমার তো বিশ্বাস তোমাকে এখন যতটা চিন্তিত দেখছি, শোন্ গ্রেবার্ন যুদ্ধের আগে স্বয়ং প্রিন্স ব্যাগ্রেশনও ততটা চিন্তিত হন নি।"

বুড়ো কাউন্ট রাগের ভান করল।

"হ্যাঁ, মুখেই বলা যায়, একবার চেষ্টা করে দেখ না!"

কাউন্ট রাঁধুনির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, "আজকালকার ছেলেরা কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে দেখছ ফিয়োক্তিস্ত? খালি বুড়োদের নিয়ে ঠাট্টা!"

"যা বলেছেন হুজুর; ওদের কাজ শুধু ভাল ভাল খানা খাওয়া; কিন্তু সে সবের ব্যবস্থা করা, পরিবেশন করা, সেটা ওদের কাজ নয়।"

কাউন্ট চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক, ঠিক!" তারপর দুই হাতে ছেলেকে ধরে খুসিভরে বলল, "এবার তোমাকে পেয়েছি; এখনই স্লেজ ও ঘোড়া ঠিক কর, বেজুকভের বাড়িতে গিয়ে তাকে বলবে, "কাউন্ট ইলিয়া তোমাকে পাঠিয়েছে স্ট্রবেরি ও তাজা আপেলের জন্য। অন্য কারও কাছ থেকে ওগুলো নেওয়া চলবে না। তিনি এখন বাড়ি নেই, কাজেই তোমাকে ভিতরে গিয়ে

প্রিন্সেসকে বলতে হবে। সেখান থেকে যাবে রাসগুল্যায়—কোচয়ান ইপাৎকা সব জানে—জিপ্‌সি ইলিউশ্‌কাকে খুঁজে বের করবে; তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে সাদা কসাক কোট পরে সে কাউণ্ট অর্লভ্‌-এর বাড়িতে নেচেছিল; তাকে সঙ্গে করেই নিয়ে আসবে।"

নিকলাস হেসে বলল, "জিপ্‌সি মেয়েগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে আসব না কি? কী যে বল তুমি⋯"

ঠিক সেই সময় নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঢুকল আন্না মিখায়লভ্‌না। আস্তে চোখ বুজে সে বলল, "কিছু ভাববেন না কাউণ্ট। আমি নিজে যাব বেজুখভের বাড়ি। পিয়ের এসে পড়েছে; এখন আমরা তার সব্জি-ঘর থেকে সব কিছুই পাব। তার সঙ্গে তো আমাকে দেখা করতেই হবে। বরিসের একটা চিঠি সে আমাকে পাঠিয়েছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তার এখন পদোন্নতি হয়েছে।"

আন্না মিখায়লভ্‌না একটা কাজের ভার নেওয়ায় কাউণ্ট খুসি হল; তারজন্য ছোট ঢাকা গাড়িটা আনতে বলে দিল।

"বেজুখভকে আসতে বলে দেবেন। তার নামটা লিখে নিচ্ছি। তার স্ত্রীও কি সঙ্গে এসেছে?"

আন্না মিখায়লভ্‌না চোখ তুলে তাকাল; গভীর বিষণ্ণতা আঁকা তার মুখে।

বলল, "কি জানেন, সে বড়ই দুর্ভাগা। যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ভয়ংকর কথা। তার সুখে আমরা যখন নৃত্য করছিলাম তখন তো এ-কথা স্বপ্নেও ভাবি নি। আর তরুণ বেজুখভের মত এমন দেবদূতের মত মহৎ যার মন। সত্যি, তার জন্য আমার করুণা হয়; সাধ্যমত সান্ত্বনা তাকে দেব।"

ছোট ও বড় রস্তভ দুজনেই জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি?"

আন্না মিখায়লভ্‌না বড় করে নিঃশ্বাস ফেলল।

অস্ফুট রহস্যময় স্বরে বলল, "সকলে বলছে, মারি আইভানভ্‌নার ছেলে দলখভ মেয়েটিকে সম্পূর্ণ কব্জা করে ফেলেছে। পিয়ের তাকে সঙ্গে করে পিতার্সবুর্গে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল, আর এখন⋯মেয়েটি এখানে এসেছে আর সেই দুঃসাহসী লোকটাও তার পিছু নিয়েছে।" আন্না মিখায়লভ্‌না কথাগুলি বলল পিয়েরের প্রতি সহানুভূতি জানাতে, কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই তার কথায় প্রকাশ পেল "দুঃসাহসী" দলখভের প্রতি সহানুভূতি।" লোকে বলছে, এই দুর্ভাগ্যের ফলে পিয়ের একেবারেই ভেঙে পড়েছে।

"আহা, আহা! কিন্তু তবু তাকে ক্লাবে আসতে বলবেন—ওসব কিছু উড়ে যাবে। যা দারুণ একটা ভোজসভা হবে না!"

পরদিন ৩রা মার্চ একটার পর থেকেই ইংলিশ ক্লাবের আড়াই শ' সদস্য

ও পঞ্চাশজন নিমন্ত্রিত অতিথি অস্ট্রীয়া অভিযানের নায়ক ও সম্মানিত অতিথি প্রিন্স ব্যাগ্রেশনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল।

অস্তারলিজ যুদ্ধের খবর যখন প্রথম এল তখন মস্কো একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সেসময় রুশ জনসাধারণ জয়লাভে এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে অনেকে পরাজয়ের খবরটা বিশ্বাসই করল না; আবার অনেকে এরকম একটা অদ্ভুত খবরের নানা রকম অসাধারণ ব্যাখ্যা দিতে শুরু করল। রাশিয়ার পরাজয়ের এই অবিশ্বাস্য, অশ্রুতপূর্ব ও অসম্ভব ঘটনার কারণ খুঁজে বের করা হল, সকলেই সব কিছু বুঝে ফেলল, আর মস্কোর মোড়ে মোড়ে একই কথা বলা হতে লাগল। সে কারণগুলি হল অস্ট্রীয়দের বিশ্বাসঘাতকতা, কমিসারিয়েটের ত্রুটি-বিচ্যুতি, পোল সেনাপতি প্রেবিজেউস্কি ও ফরাসী ল্যাঁগারোঁর বিশ্বাসঘাতকতা, কুতুজভের অক্ষমতা, এবং (এ কথাটা বলা হল চুপি চুপি) সম্রাটের অল্প বয়স ও অভিজ্ঞতার অভাব—যার ফলে সে যত সব অযোগ্য ও তুচ্ছ লোকদের উপর বড় বেশী ভরসা করেছিল। কিন্তু একটা কথা সকলেই সমস্বরে ঘোষণা করল—সেনাদল—রুশ সেনাদল—অসাধারণ; তাদের সাহস অঘটন ঘটিয়েছে। কি সৈনিক, কি অফিসার, কি সেনাপতি, সকলেই বীর। কিন্তু সব বীরের সেরা বীর প্রিন্স ব্যাগ্রেশন; শোন্‌গ্রেবার্নের ঘটনা এবং অস্তারলিজ থেকে পশ্চাদপসরণ তাকে বিখ্যাত করেছে। ভল্‌তেয়ারের উক্তির নকল করে রসিক শিন্‌শিন্ বলল, "ব্যাগ্রেশন নামে যদি কেউ না থাকত তো একজন ব্যাগ্রেশনকে আবিষ্কার করা দরকার হত।" কুতুজভের নাম কেউ মুখেই আনল না; শুধু কেউ কেউ চুপি চুপি গালাগাল দিয়ে তাকে বলল চঞ্চলমতি এক ভ্রষ্টচরিত্র যক্ষবিশেষ।

সারা মস্কো জুড়ে লোকের মুখে মুখে ফিরতে লাগল দল্‌গরুকভের উক্তি; "অনবরত যদি মূর্তি গড়া চলতে থাকে তাহলে তো হাতে কাদামাটি লাগবেই।" অস্তারলিজে আমাদের অফিসার ও সৈনিকদের ব্যক্তিগত সাহসিকতার নতুন নতুন ঘটনার কথা শোনা যেতে লাগল। একজন পতাকাকে রক্ষা করেছে, একজন মেরেছে পাঁচজন ফরাসীকে, কেউ বা এক হাতে পাঁচটা কামানে বারুদ ঠেসেছে। বের্গকে যারা চেনে না তারা বলতে লাগল, ডান হাতে আঘাত লাগলে সে বাঁ হাতে তরবারি নিয়ে সামনে ছুটে গিয়েছিল। বল্‌কন্‌স্কির কথা কিছুই শোনা গেল না; শুধু যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানত তারা দুঃখ করতে লাগল—আসন্নপ্রসবা স্ত্রীকে ছিটগ্রস্ত বাবার কাছে রেখে বেচারি বড় অকালেই মারা গেল।

অধ্যায়—৩

৩রা মার্চ ইংলিশ ক্লাবের সবগুলি ঘর বসন্তকালের মৌমাছিদলের গুঞ্জনের মত নানা মানুষের কলগুঞ্জনে ভরে উঠল। ক্লাবের সদস্য ও অতিথিরা

এখানে-ওখানে ঘুরছে, বসছে, দাঁড়াচ্ছে, একত্র হচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে; কারও পরনে ইউনিফর্ম, কারও বা সান্ধ্যপোশাক, আবার এখানে-ওখানে কেউ বা চুলে পাউডার মেখে গায়ে রুশ কাফ্‌তান চড়িয়েছে। উপস্থিত লোকদের মধ্যে অধিকাংশই প্রবীণ সম্ভ্রান্ত মানুষ, আত্মবিশ্বাসে ভরা চওড়া মুখ, মোটা আঙুল এবং দৃঢ় অঙ্গভঙ্গী ও কণ্ঠস্বর। কিছু কিছু সাময়িক অতিথিও এসেছে; তারা অধিকাংশই যুবক, যেমন দেনিসভ, রস্তভ ও দলখভ।

নেস্‌ভিৎস্কি সেখানে এসেছে ক্লাবের পুরনো সদস্য হিসাবে। স্ত্রীর হুকুমে পিয়ের বড় বড় চুল রেখেছে, চশমা পরা ছেড়ে দিয়েছে। কেতামাফিক পোশাক পরে সে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে বড়ই বিষণ্ণ ও নির্জীব দেখাচ্ছে।

কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ ব্যস্তসমস্ত হয়ে নরম জুতো পায়ে একবার খাবার ঘর একবার বসবার ঘর করছে; সাধারণ ও অসাধারণ সকল পরিচিত জনকেই সমানভাবে সাদরে অভ্যর্থনা করছে, আর বার বার ছেলের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপছে। ছোট রস্তভ দলখভকে নিয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে; সম্প্রতি দলখভের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, আর সে পরিচয়কে সে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করে। বুড়ো কাউণ্ট তাদের কাছে এগিয়ে এসে দলগভের হাতটা চেপে ধরল।

"দয়া করে আমাদের বাড়িতে এস…আমার সাহসী ছেলেকে তুমি তো চেন…সেখানে তো একসঙ্গে ছিলে…দুজনই তো বীর…আরে, ভাসিলি ইগ্‌নাতভিচ যে…কেমন আছেন?" একটি বুড়ো মানুষকে দেখে কথাটা বলতে না বলতেই সকলে চঞ্চল হয়ে উঠল, আর পরিচারক ভীত মুখে ঘোষণা করল: "তিনি এসে গেছেন!"

ঘণ্টা বেজে উঠল, নায়েব-গোমস্তারা ছুটে বেরিয়ে গেল, নানা ঘরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অতিথিরা বড় বসবার ঘরে এসে নাচ-ঘরের দরজার কাছে ভিড় করল।

দ্বারপথে ব্যাগ্রেশনের আবির্ভাব হল; মাথায় টুপি নেই, হাতে তলোয়ার নেই; ক্লাবের রীতি অনুসারে সেগুলি দরোয়ানের হাতে দিয়ে এসেছে। তার পরনে একটা নতুন আঁটসাট ইউনিফর্ম, তাতে রুশ ও বিদেশী সম্মান-স্মারক এবং সেণ্ট জর্জ তারকা লাগানো। দেখেই বোঝা যায় ডিনারে আসবার আগে সে চুল ও জুলফি ছেটেছে; তাতে তাকে আরও খারাপই দেখাচ্ছে। অদ্ভুত সলজ্জ ভঙ্গীতে সে অভ্যর্থনা-কক্ষের কাঠের কাজ-করা মেঝের উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল; হাত দুটোকে নিয়ে যে কি করবে বুঝে উঠছে না; শোন্‌গ্রেবার্ণে কুর্স্ক রেজিমেণ্টের প্রধান হিসাবে যেমন গোলাবর্ষণের ভিতর দিয়ে চষা ক্ষেত পেরিয়ে তাকে ছুটতে হয়েছিল তেমন চলাতেই সে অভ্যস্ত—সেটাই তার পক্ষে সহজতর। কমিটির সদস্যরা দরজাতেই ব্যাগ্রেশনকে ঘিরে ধরল;

এমন একজন মহামান্য অতিথিকে দেখতে পেয়ে তারা তাদের আহ্লাদের কথা শোনাতে লাগল। এদিকে কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ হাসতে হাসতে বারবার "পথ ছেড়ে দাও বাবা! পথ ছাড়! পথ ছাড়!" বলতে বলতে সোৎসাহে ভিড় ঠেলে অতিথিদের ভিতরে ঢুকিয়ে মাঝখানের সোফাটায় তাকে বসিয়ে দিল। তারপরেই কাউণ্ট ইলিয়া ভিড় ঠেলে বেরিয়ে গেল এবং এক মিনিট পরে একটা মস্ত বড় রূপোর থালা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে থালাটা প্রিন্স ব্যাগ্রেশনকে উপহার দিল। সেই থালায় রয়েছে বীরের সম্মানে রচিত ও মুদ্রিত কয়েকটি কবিতা। রূপোর থালার দিকে তাকিয়ে ব্যাগ্রেশন সভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল, যেন কারও সাহায্য খুঁজছে। কিন্তু সকলের চোখেই এক কথা—ওটা গ্রহণ করা হোক। অগত্যা দুই হাত বাড়িয়ে সে থালাটা নিল এবং সেটা উপহার দেবার জন্য কঠোর তিরস্কারের দৃষ্টিতে কাউণ্টের দিকে তাকাল। একজন কেউ থালাটা তার হাত থেকে নিয়ে কবিতাগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "ওঃ, এগুলো তাহলে পড়তে হবে!" মুখে না বললেও ব্যাগ্রেশনের ভাবভঙ্গীতে এইরকমই মনে হল। কিন্তু কবি স্বয়ং কবিতাগুলি তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে পড়তে শুরু করল। ব্যাগ্রেশন মাথা নীচু করে শুনতে লাগল:

"আলেক্সান্দারের শাসনকালকে তুমি গৌরবে ভরিয়ে তোল,
সিংহাসনে রক্ষা কর আমাদের টাইটাসকে,
পাত্ররূপে তুমি ভয়ংকর, আবার মানুষ হিসাবে দয়ার অবতার,
স্বদেশে তুমি হ্রুকিউস, আর রণক্ষেত্রে তুমি সীজার!
এমন কি ভাগ্যবান যে নেপোলিয়ন
সেও অভিজ্ঞতায় তোমাকে চিনেছে ব্যাগ্রেশন,
তাই তো হারকিউলিসসদৃশ রুশদের ঘাটাতে সে সাহস করে না…"

পড়া শেষ হবার আগেই ঘোষণা করা হল, ডিনার তৈরি! দরজা খুলে গেল, আর খাবার ঘর থেকে ভেসে এল পলোনেস-এর সুর:

জয়ের আনন্দের বজ্রনিনাদে তোমরা জাগো,
বীর রুশগণ, জয়-গৌরবে হও অগ্রসর!…

কবির দিকে সক্রোধে তাকিয়ে কাউণ্ট রস্তভ ব্যাগ্রেশনকে অভিবাদন করল। কবিতার চাইতে ডিনার অধিক মূল্যবান—এটা বুঝতে পেরে সকলেই উঠে পড়ল। ব্যাগ্রেশন সকলের আগে আগে খাবার ঘরে ঢুকল।

ডিনারের ঠিক আগে কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ ছেলেকে ব্যাগ্রেশনের সামনে উপস্থিত করল। ব্যাগ্রেশন তাকে চিনতে পেরে কয়েকটা অসংলগ্ন কথা বলল, আর কাউণ্ট ইলিয়া সানন্দে ও সগর্বে চারদিকে তাকাতে লাগল।

দেনিসভ ও নবপরিচিত দলখভকে সঙ্গে নিয়ে নিকলাস রস্তভ বসল টেবিলের প্রায় মাঝখানে। তাদের মুখোমুখি প্রিন্স নেস্‌ভিৎস্কির পাশে বসল

পিয়ের। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ বসল ব্যাগ্রেশনের দিকে মুখ করে এবং মস্কো-আতিথেয়তার মূর্ত প্রতীক হিসাবে প্রিন্সের প্রতি সম্মান দেখাতে লাগল।

তার প্রচেষ্টা বৃথা গেল না। ডিনারটা চমৎকার হল, তবু খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেন তার স্বস্তি নেই। সবই ভালয় ভালয় শেষ হল। অবশেষে পরিচারক গ্লাসে গ্লাসে শ্যাম্পেন ঢালতে শুরু করল। কমিটির সদস্যদের সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে নিজের গ্লাসটা হাতে নিয়ে কাউন্ট উঠে দাঁড়াল। তার কথা শুনবার জন্য সকলেই চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল।

“আমাদের সার্বভৌম সম্রাটের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে,” চেঁচিয়ে কথাগুলি বলতে গিয়ে আনন্দে ও উৎসাহে তার চোখ দুটি ভিজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ড বেজে উঠল “জয়ের আনন্দের বজ্রনিনাদে তোমরা জাগো”র সুরে। সকলে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, “হুর্‌রা!” ব্যাগ্রেশনও উঠে দাঁড়াল; যে কণ্ঠস্বরে শোন্‌গ্রেবার্গের রণক্ষেত্রে চীৎকার করেছিল সেই স্বরেই বলে উঠল “হুর্‌রা!” তিনশ' মানুষের গলাকে ছাপিয়ে শোনা গেল ছোট রস্তভের উচ্ছ্বাসপূর্ণ কণ্ঠস্বর। তার প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম হল। সগর্জনে বলল, “আমাদের সার্বভৌম সম্রাটের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে! হুর্‌রা!” এক চুমুকে নিজের গ্লাসটা খালি করে সেটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল। অনেকেই তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল; হৈ-চৈ চীৎকার চলল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। সেটা থামলে পরিচারক মেঝে থেকে ভাঙা কাঁচের টুকরো সরিয়ে নিল; সকলে আবার আসনে বসে পড়ল। বুড়ো কাউন্ট আবার উঠে দাঁড়াল, থালার পাশে রাখা কাগজের দিকে তাকাল, তারপর বলল, “আমাদের বিগত অভিযানের নায়ক প্রিন্স পিতর আইভানভিচ ব্যাগ্রেশনের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে।” তার নীল চোখ দুটো আবার ভিজে উঠল। তিনশ' কণ্ঠস্বরে আবার ধ্বনি উঠল “হুর্‌রা!” এবার কিন্তু ব্যাণ্ড বাজল না; তার পরিবর্তে একদল গায়ক পল আইভানভিচ কুতুজভের (প্রধান সেনাপতি কুতুজভ নয়) রচনা একটি গীতি-কাব্য গাইতে শুরু করল:

“রুশগণ! সব বাধাকে পায়ে দলে চল এগিয়ে!
সাহসই তো জয়ের প্রতিশ্রুতি;
আমাদের কি ব্যাগ্রেশন নেই?
তার সম্মুখে শত্রু চিরপদানত……” ইত্যাদি

গান শেষ হতেই একের পর এক স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব হতে লাগল। আর কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ ক্রমেই অধিকতর চঞ্চল হতে লাগল, বেশী করে গ্লাস ভাঙা হল, চীৎকার হতে লাগল উচ্চ থেকে উচ্চতর। উপস্থিত সকলেরই স্বাস্থ্য পান করা হল; আর শেষ পর্যন্ত ভোজসভার উদ্যোক্তা হিসাবে আলাদাভাবে স্বাস্থ্যপান করা হল কাউন্ট ইলিয়া রস্তভের। সেইসময়ে কাউন্ট তার রুমালটা বের করে মুখ ঢেকে সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল।

অধ্যায়—৪

পিয়ের বসেছে দলখভ ও নিকলাস রস্তভের উল্টোদিকে। যথারীতি যথেষ্ট আগ্রহের সঙ্গে সে প্রচুর ভোজ্য ও পানীয় খেয়েছে। কিন্তু যারা তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানে তারা বুঝতে পারল যে সেদিন তারমধ্যে একটা মস্তবড় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সারাক্ষণ সে নীরবে চারদিকে তাকাল, অথবা স্থির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে নাকের নীচু জায়গাটা ঘসতে লাগল। তার মুখ বিষণ্ণ, গম্ভীর। চারদিক যা কিছু চলছে তার কিছু যেন তার চোখেও পড়ছে না, কানেও ঢুকছে না। মনে হল, যেন একটা দুঃখদায়ক অমীমাংশিত সমস্যার মধ্যেই সে ডুবে আছে।

মস্কোতে আসার পরে তার বোন প্রিন্সেস তার স্ত্রীর সঙ্গে দলখভের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে, এবং আজই সকালে একটা বেনামী চিঠি সে পেয়েছে যাতে বেনামী চিঠির স্বাভাবিক নীচ রসিকতার সঙ্গে বলা হয়েছে যে চশমার ভিতর দিয়ে দেখে বলে সে ঠিকমত না দেখতে পেলেও দলখভের সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্কটা একমাত্র তার কাছে ছাড়া আর কারও কাছেই গোপন নেই—এটাই হচ্ছে সেই অমীমাংশিত সমস্যা যা তাকে কষ্ট দিচ্ছে। প্রিন্সেসের ইঙ্গিত এবং বেনামী চিঠি দুটোকেই পিয়ের সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করছে, কিন্তু এখন দলখভের দিকে তাকাতে তার ভয় করছে। যতবার দলখভের সুন্দর উদ্ধত চোখ দুটির দিকে চোখ পড়ছে ততবারই একটা ভয়ংকর দানবীয় কিছু তার মনের মধ্যে মাথা তুলছে, আর অতি দ্রুত সে চোখ সরিয়ে নিয়েছে। তার স্ত্রীর অতীত জীবন এবং দলখভের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করে পিয়ের পরিষ্কার বুঝতে পারল যে চিঠিতে যা বলা হয়েছে তা সত্যি হতেও পারে, অন্তত "তার স্ত্রীর" ব্যাপার না হলে সত্যি বলে মনে হতে পারত।

পিয়ের ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, সে খুবই সুদর্শন; আমি তাকে চিনি। যেহেতু আমি তার উপকার করেছি, তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি, তাকে সাহায্য করেছি, তাই আমার নামে কলঙ্ক লেপন করতে, আমাকে পরিহাসের পাত্র করে তুলতে তার তো মজা লাগবেই। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আমাকে ঠকাবার আনন্দটা যে কত মশলাদার হবে সেটা তো আমি জানি, বুঝি। হ্যাঁ, যদি এটা সত্যি হয়, কিন্তু আমি এটা বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করার কোন অধিকার আমার নেই, বিশ্বাস করতে আমি পারি না।" রস্তভ বারবার পিয়েরের দিকে তাকাচ্ছিল এবং তার অন্যমনস্কতা ও তাকে না চিনতে পারার জন্য পিয়েরের উপর বিরক্ত হচ্ছিল। এমন কি যখন সম্রাটের স্বাস্থ্য পান করা হচ্ছিল তখনও পিয়ের চিন্তায় ডুবে ছিল; উঠেও দাঁড়াল না, গ্লাসটাও তুলে ধরল না।

বেপরোয়া হয়ে রস্তভ চেঁচিয়ে বলল, "তোমার কি হয়েছে? শুনতে পাচ্ছ না হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাটের স্বাস্থ্যপান করা হচ্ছে?"

পিয়ের দীর্ঘশ্বাস ফেলল, মাথা নীচু করে উঠে দাঁড়াল, গ্লাসটা শেষ করল,

তারপর সকলে বসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে সদয় হাসি হেসে রস্তভের দিকে মুখ ফেরাল।

বলল, "আরে, আমি তো তোমাকে চিনতেই পারি নি!" কিন্তু রস্তভ তখন অন্য কাজে ব্যস্ত; সে "হুর্‌রা" বলে চেঁচাচ্ছে।

দলখভ রস্তভকে বলল,"পরিচয়টা নতুন করে ঝালিয়ে নাও না কেন?"

"লজ্জা পাবে, ও একটা মুখ্‌খু!" রস্তভ বলল।

সুন্দরী রমণীদের স্বামীর সঙ্গে দহরম-মহরম রাখা উচিত," দেনিসভ বলল।

এই সব কথাবার্তা ধরতে না পারলেও পিয়ের বুঝল যে তার কথাই হচ্ছে। মুখ লাল করে সে সরে গেল।

"আচ্ছা, এবার তাহলে সুন্দরী নারীদের স্বাস্থ্যের উদ্দেশ্যে," মুখখানা গম্ভীর হলেও ঠোঁটের কোণে একটুকরো হাসি ফুটিয়ে দলখভ গ্লাসটা নিয়ে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "পিতারকিন, এ গ্লাস মনোরমা নারীদের স্বাস্থ্যের উদ্দেশে—আর তাদের প্রেমিকদেরও!"

দলখভের দিকে না তাকিয়ে বা তার কথার জবাব না দিয়ে পিয়ের চোখ নামিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। পরিচারক কুতুজভের গীতি-কাব্যের পুস্তিকাটি বিলি করছিল; অন্যতম প্রধান অতিথি হিসাবে পিয়েরের সামনেও একখানা রাখল। পিয়ের হাত বাড়াবার আগেই দলখভ ঝুঁকে পড়ে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিল। দলখভের দিকে তাকিয়ে পিয়ের চোখ নামাল। যে ভয়ংকর দানবীয় কিছু এতক্ষণ তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল সেটা আবার মাথা তুলে তাকে পেয়ে বসল। টেবিলের উপর সম্পূর্ণ ঝুঁকে পড়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কোন্‌ সাহসে তুমি ওটা নিলে?"

সে চীৎকার শুনে এবং কাকে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরে নেস্‌ভিৎস্কি ও পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোক সভয়ে বেজুকভের দিকে মুখ ঘোরাল।

ভীত গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "ওরকম করবেন না! করবেন না! আপনার হল কি?"

নিষ্ঠুর খুসি-খুসি চোখে দলখভ পিয়েরের দিকে তাকাল; তার সেই বিশেষ হাসিটি যেন বলতে চাইছে, "আহা! এই তো আমি চাই।"

পরিষ্কার গলায় বলল, "এটা তুমি পাবে না!"

পিয়েরের মুখ কালো হয়ে গেছে; ঠোঁট কাঁপছে। পুস্তিকাটি সে একটানে ছিনিয়ে নিল।

হুংকার দিয়ে বলল...., "তুমি····! তুমি··· তুমি শয়তান। আমি তোমাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করছি!" চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীর দোষের যে প্রশ্নটা সারা

দিন তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে তার একটি চরম ও নিঃসন্দেহে সমর্থনসূচক উত্তর যেন সে পেয়ে গেল। মনে জাগল স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা; চিরদিনের মত তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখনকার মত পিয়ের বাড়ি ফিরে গেল, কিন্তু দলখভ ও দেনিসভকে নিয়ে রস্তভ আরও অনেক সময় ক্লাবেই থাকল, জিপসি ও অন্যান্যদের গান শুনল।

ক্লাবের ফটকে রস্তভের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় দলখভ বলল, "আচ্ছা, তাহলে কাল দেখা হচ্ছে সকোলনিকিতে।"

"তোমার মন বেশ শান্ত আছে তো?" রস্তভ শুধাল।

দলখভ একটু চুপ করে থেকে তারপর কথা বলল।

"দেখ, দুটো কথায় তোমাকে দ্বৈত যুদ্ধের সব গোপন তথ্য বলে দিচ্ছি। দ্বৈত যুদ্ধে না মরবার আগে তুমি যদি একটা উইল কর, বাবা-মাকে মমতা ভরা চিঠি লেখ, যদি মনে কর তুমি মারা যাবে, তাহলে তুমি একটা মূর্খ, তোমার পরাজয় অনিবার্য। তুমি যুদ্ধে যাবে এই দৃঢ় অভিপ্রায় নিয়ে যে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তুমি প্রতিপক্ষকে মেরে ফেলবে; বাস, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। কস্ত্রমা-য় আমাদের ভালুক-শিকারী বলত, 'সকলেই ভালুককে ভয় করে, কিন্তু ভালুককে সামনাসামনি দেখামাত্রই তোমার সব ভয় চলে যাবে, তোমার একমাত্র চিন্তা হবে সেটাকে ছেড়ে না দেওয়া!" আমিও ঠিক তাই বলি। A demain, mon cher. (প্রিয় বন্ধু কাল দেখা হবে।)

পরদিন সকাল আটটায় পিয়ের ও নেস্‌ভিৎস্কি ঘোড়ায় চড়ে সকোলনিকি বনে পৌঁছে দেখল, দলখভ, দেনিসভ ও রস্তভ আগেই সেখানে হাজির হয়েছে। পিয়েরের বিপর্যস্ত মুখটা হল্‌দে হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে, রাতে সে ঘুমোতে পারে নি। দুটো চিন্তায় সে সম্পূর্ণ ডুবে আছে: এক, তার স্ত্রীর দোষ—বিনিদ্র রাত কাটাবার পরে এ সম্পর্কে তার মনে তিলমাত্র সন্দেহ নেই, আর দুই, দলখভের নির্দোষিতা। পিয়ের ভাবছে, 'তার জায়গায় হলে আমিও তো এই করতাম। তাহলে কেন এই দ্বৈতযুদ্ধ, এই হত্যা? হয় আমি তাকে হত্যা করব, না হয় সে আমার মাথায়, কনুইতে বা হাঁটুতে আঘাত করবে। আমি কি এখান থেকে চলে যেতে পারি, দৌড়ে পালাতে পারি, কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারি?" আবার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও করছে, "আর কত দেরি? সব প্রস্তুত তো?"

যখন সব ব্যবস্থা হয়ে গেল, সীমানা-নির্ধারণের জন্য বরফের মধ্যে তরবারি পোতা হল, পিস্তলে গুলি ভরা হল, তখন নেস্‌ভিৎস্কি গেল পিয়েরের কাছে।

ভীরু গলায় সে বলল, "এই সংকটকালে, অতীব সংকট-মুহূর্তে আপনাকে যদি পুরো সত্য কথাটা না বলি তাহলে আমার কর্তব্যে ত্রুটি ঘটবে, আমাকে

আপনার সমর্থক নির্বাচন করে যে বিশ্বাস ও সম্মান আপনি আমাকে দেখিয়েছেন তার প্রতি অবিচার করা হবে। এই ব্যাপারের, এবং এ নিয়ে রক্তপাত ঘটাবার যথেষ্ট কারণ নেই বলেই আমি মনে করি। ···আপনি ঠিক কাজ করেন নি···আবেগের বশে আপনি···"

"সত্যি, খুবই বোকার মত কাজ করেছি," পিয়ের বলল।

নেসৃভিৎস্কি বলল, "তাহলে আপনার এই আক্ষেপের কথাটা প্রকাশ করার অনুমতি দিন, আমার বিশ্বাস আপনার প্রতিপক্ষও সেটা মেনে নেবেন। আপনি তো বোঝেন কাউন্ট, কোন ব্যাপার সংশোধনের অতীত হয়ে যাবার আগেই ভুলটাকে স্বীকার করা অনেক বেশী সম্মানজনক। তাতে কোন পক্ষেরই অপমান নেই। তাহলে অনুমতি করুন, ওদের বলি···"

পিয়ের বলে উঠল, "না! বলাবলির কি আছে? সবই সমান···সব প্রস্তুত তো? শুধু বলে দাও কোথায় যেতে হবে, কোথায় গুলি ছোঁড়া হবে?" অস্বাভাবিক শান্ত হাসির সঙ্গে সে বলল।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে সে ঘোড়া টেপার ব্যাপারে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল, কারণ এর আগে সে কখনও হাত দিয়ে পিস্তল ধরে নি—অথচ সে কথাটা স্বীকার করার ইচ্ছা নেই।

"ওঃ, হ্যাঁ, এইভাবে, আমি জানি, তবে ভুলে গিয়েছিলাম," সে বলল।

"ক্ষমা চাইবার প্রশ্নই ওঠে না," দেনিসভের মিটমাটের প্রস্তাবের উত্তরে এই কথা বলে দলখভও নির্দিষ্ট জায়গার দিকে এগিয়ে গেল।

দ্বৈত যুদ্ধের স্থান নির্বাচিত হয়েছে রাস্তা থেকে আশী পা দূরে। পাইনের বনের মধ্যে একটা পরিষ্কার ছোট জায়গা, বরফে ঢাকা; গত কয়েকদিন হল বরফ গলতে শুরু করেছে। পরিষ্কার জায়গাটার একপ্রান্তে গিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী চল্লিশ পা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বরফ গলার ফলে জায়গাটা কুয়াশায় ঢেকে গেছে; চল্লিশ পা দূরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তিন মিনিট হয়ে গেল সকলেই প্রস্তুত, কিন্তু সকলেই দেরি করতে লাগল, সকলেই নিশ্চুপ।

অধ্যায়—৫

দলখভ বলল, "তাহলে শুরু হোক!"

"ঠিক আছে," একইভাবে হেসে পিয়ের বলল।

বাতাসে একটা ত্রাসের অনুভূতি ছড়িয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছে, হাল্কাভাবে শুরু হলেও ব্যাপারটাকে এখন আর এড়ানো যাবে না; মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করে ঘটনা এখন নিজের পথেই এগিয়ে চলেছে। দেনিসভই প্রথম সীমানায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল:

"প্রতিপক্ষরা যখন মিটমাট করতে রাজী হলেন না, তখন কাজ শুরু হোক। আপনাদের পিস্তল তুলে নিন, আর "তিন" বলার সঙ্গে সঙ্গে

অগ্রসর হোন।"

"এ-ক, দু-ই, তি-ন!" চীৎকার করে বলেই সে একপাশে সরে গেল।

দুই প্রতিপক্ষ এগিয়ে চলল, ক্রমাগতই একে অপরের কাছাকাছি হতে লাগল, কুয়াসার ভিতর দিয়ে পরস্পরকে দেখতে পেল। সীমানার কাছে পৌঁছে যেকোন সময় গুলি ছুঁড়বার অধিকার তাদের আছে। দলখভ পিস্তল না তুলেই ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল; তার উজ্জ্বল ঝকঝকে নীল চোখ একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখের দিকে।

"তাহলে আমি যখন খুসি গুলি করতে পারি!" পিয়ের বলল। "তিন" বলার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট পথ ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে যেতে গিয়ে তার পা পড়ল পুরু বরফের মধ্যে। দু' পা এগিয়ে সে আবার বরফের মধ্যে পা ফেলল; নিজের পায়ের দিকে তাকাল; তারপরেই অতিদ্রুত দলখভের দিকে তাকিয়ে আঙুল বাঁকিয়ে ঘোড়া টিপল। পিস্তলের শব্দ যে এত বেশী হবে তা সে বুঝতে পারে নি; শব্দ শুনে কেঁপে উঠে পরমুহূর্তেই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কুয়াশায় আরও বেশী ঘন হওয়া ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে প্রথমে সে কিছুই দেখতে পেল না; যে দ্বিতীয় গুলির শব্দটা সে আশা করেছিল তাও শোনা গেল না। শুধু শুনতে পেল দলখভের দ্রুত পায়ের শব্দ, ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তার মূর্তিটা চোখে পড়ল। এক হাতে বাঁ দিকটা চেপে ধরেছে, অন্য হাতে ধরে আছে হেলে-পড়া পিস্তলটা। মুখটা বিবর্ণ। রস্তভ ছুটে গিয়ে কি যেন বলল।

"না-আ-আ!" দলখভ দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথাটা উচ্চারণ করল, "না, এখনও শেষ হয় নি!" টলতে টলতে আরও কয়েক পা এগিয়ে একেবারে তলোয়ারের কাছে পৌঁছে সে বরফের উপর এলিয়ে পড়ল। বাঁ হাতটা রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে; হাতটাকে কোটের উপর মুছে তার উপরেই শরীরের ভার রাখল। ভ্রূকুঞ্চিত বিবর্ণ মুখখানা কাঁপছে।

"দয়া……" দলখভ কথাটা পুরো উচ্চারণ করতে পারল না।

অনেক চেষ্টার পর বলল, "দয়া কর।"

কোনরকমে কান্না চেপে পিয়ের দলখভের দিকে ছুটে গেল; কিন্তু সীমানা পেরিয়ে যাবার আগেই দলখভ চীৎকার করে উঠল, "তোমার সীমানায় ফিরে যাও!"

তার কথার অর্থ বুঝতে পেরে পিয়ের নিজের তরবারির কাছেই থেমে গেল। দুজনের মাঝখানে মাত্র দশ পায়ের ব্যবধান। দলখভ বরফের উপর মাথাটা নোয়ালো, লোভীর মত তাতে কামড় বসাল, তারপর মাথাটা তুলে কোনরকমে উঠে বসল। চুষে চুষে ঠাণ্ডা বরফটা গিলে ফেলল; ঠোঁট কাঁপতে লাগল; কিন্তু দুই চোখে তখনও হাসির ঝিলিক। অবশিষ্ট শক্তি একত্র করে পিস্তলটা তুলে নিশানা স্থির করল।

"পাশে সরে যান! নিজেকে পিস্তল দিয়ে আড়াল করুন!" নেস্‌ভিৎস্কি চেঁচিয়ে বলল।

করুণা ও অনুতাপের মৃদু হাসি হেসে, হাত ও পা অসহায়ভাবে ছড়িয়ে দিয়ে, পিয়ের তার চওড়া বুকটা দলখভের দিকে সোজা করে মেলে ধরে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। দেনিসভ, রস্তভ ও নেস্‌ভিৎস্কি চোখ বুজল। ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের কানে এল গুলির আওয়াজ ও দলখভের ক্রুদ্ধ চীৎকার।

"ফস্কে গেল!" বলেই দলখভ অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে বরফের উপর পড়ে গেল।

পিয়ের নিজের কপাল চেপে ধরে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে ঘন বরফের উপর দিয়ে বনের দিকে ছুটতে ছুটতে অসংলগ্নভাবে বলতে লাগল:

"বোকামি···বোকামি! ····মিথ্যা কথা·····"

নেস্‌ভিৎস্কি তাকে থামিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল।

আহত দলখভকে নিয়ে রস্তভ ও দেনিসভও ফিরে গেল।

দলখভ চোখ বুজে নীরবে স্লেজের মধ্যে শুয়ে রইল, কোন প্রশ্নেরই জবাব দিল না। কিন্তু মস্কোতে ঢুকেই সহসা সে যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, একটু চেষ্টা করে মাথাটা তুলে রস্তভের হাতটা চেপে ধরল।

রস্তভ বলল, "আচ্ছা? কেমন বোধ করছ?"

"খারাপ! কিন্তু সেকথা থাক বন্ধু—" হাঁপাতে হাঁপাতে দলখভ বলল। "আমরা এখন কোথায়? মস্কোতে তা জানি। আমার কি হল তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু তাকে আমি মেরে ফেললাম, মেরে ফেললাম···এ আঘাত সে সইতে পারবে না! সে বাঁচবে না····"

"কে?" রস্তভ শুধাল।

"আমার মা! আমার মা, আমার স্বর্গের দেবী, আমার আরাধ্যা জননী!" রস্তভের হাতে চাপ দিয়ে দলখভ কেঁদে ফেলল।

একটু শান্ত হয়ে সে রস্তভকে বুঝিয়ে বলল, সে এখন মার কাছেই আছে, তাকে এভাবে মরতে দেখলে মা বাঁচবে না। রস্তভকে অনুরোধ করল, সে যেন আগেই গিয়ে তার মাকে প্রস্তুত করে তোলে।

সেই কথামত কাজ করতে রস্তভ এগিয়ে গেল। আর সবিস্ময়ে জানতে পারল যে ঝগড়াটে দলখভ, ষণ্ডামার্কা দলখভ মস্কোতে থাকে তার বুড়ি মা ও কুঁজী বোনের সঙ্গে; তার মত স্নেহময় সন্তান ও ভাই দ্বিতীয়টি হয় না।

অধ্যায়—৬

ইদানীং স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনে পিয়েরের বড় একটা দেখাসাক্ষাৎ ঘটে না। কি পিতার্সবুর্গে, কি মস্কোতে, তাদের বাড়িটা সব সময়ই অতিথি সমাগমে

ভরে থাকে। দ্বৈত যুদ্ধের পরে সে-রাতে সে তার শোবার ঘরে গেল না, অন্য অনেক দিনের মতই তার বাবার ঘরেই রইল—সেই বড় ঘরটা যেখানে কাউন্ট বেজুখভ মারা গিয়েছিল।

সোফায় শুয়ে পড়ল; ভাবল, ঘুমিয়ে পড়লেই সবকিছু ভুলে যাবে, কিন্তু ঘুমতে পারল না। এতসব ভাব, চিন্তা ও স্মৃতি ঝড়ের বেগে সহসা মনের মধ্যে ঢুকতে লাগল যে সে ঘুমতে পারল না, এমন কি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতেও পারল না, লাফ দিয়ে উঠে ঘরময় অতিদ্রুত পায়চারি করতে লাগল।

নিজেকে প্রশ্ন করল, "কি ঘটেছে? তার প্রেমিককে, আমার স্ত্রীর প্রেমিককে আমি খুন করেছি। হ্যাঁ, ঠিক তাই! কিন্তু কেন? কেন এ কাজ করলাম?" —ভিতর থেকে কে যেন জবাব দিল, "কারণ তুমি তাকে বিয়ে করেছ।"

"কিন্তু আমার দোষটা কোথায়?" সে শুধাল। "ভাল না বেসে তাকে বিয়ে করায়; নিজেকে ও তাকে ঠকানোতে।" প্রিন্স ভাসিলির বাড়িতে নৈশভোজনের ঠিক পরের সেই মুহূর্তটি স্পষ্টভাবে তার মনে পড়ে গেল যখন কোনরকমে সে বলতে পেরেছিল: "আমি তোমাকে ভালবাসি।" সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, "সেখান থেকেই শুরু; তখনই এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম এটা ঠিক হচ্ছে না, একাজ করার কোন অধিকার আমার ছিল না। আর আজ সেটাই সত্য হয়ে উঠেছে।"

"আনাতোল প্রায়ই আমার স্ত্রীর কাছে আসত টাকা ধার করতে, তার খোলা কাঁধে চুমো খেতে। সে তাকে টাকা দিত না, কিন্তু চুমো খেতে দিত। তার বাবা ঠাট্টা করে তার মনে ঈর্ষা জাগাতে চাইত, কিন্তু সে শান্ত হাসির সঙ্গে জবাব দিত যে ঈর্ষান্বিত হবার মত বোকা সে নয়: 'তার যা ইচ্ছা করুক,' আমার সম্পর্কে সে বলত। একদিন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, গর্ভাবস্থার কোন লক্ষণ সে বুঝতে পারছে কি না। তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে জবাব দিল, সন্তান কামনা করবার মত বোকা সে নয়, আমার সন্তানকেও সে গর্ভে ধারণ করবে না।"

তখনই তার মনে পড়ে গেল স্ত্রীর নীচু স্তরের চিন্তার কথা, তার ভাষার গ্রাম্যতার কথা, অথচ বেশ উঁচু মহলেই সে লালিত-পালিত হয়েছিল।

"আমি তেমন বোকা নই। ···চেষ্টা করেই দেখ না। ···তুমি এ ব্যাপারে নাক গলাতে এস না," সে প্রায়ই বলত। যুবক, বৃদ্ধ ও নারীদের সঙ্গে স্ত্রীর চালচলনের সাফল্য দেখে পিয়ের কিছুতেই বুঝতে পারত না কেন সে তার স্ত্রীকে ভালবাসে না।

সে নিজেকে বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আমি তাকে কোনদিন ভালবাসি নি; আমি জানতাম সে চরিত্রহীনা, তবু নিজের কাছে সেটা স্বীকার করবার সাহস আমার ছিল না। আর এখন জোর-করা হাসির সঙ্গে বরফের উপর

বসে দলখণ্ড মরতে বসেছে, আর নকল সাহসিকতার সঙ্গে আমার মনস্তাপকে উপভোগ করছে।”

“সব, সব আমার স্ত্রীর দোষ, কিন্তু তাতে কি হল? তার ব্যাপারে আমি কেন অন্ধ হয়ে ছিলাম? না, দোষ আমার, আমাকেই ভুগতে হবে। ...কি? আমার নামে কলঙ্ক লাগবে? আমার জীবনে দুর্ভাগ্য দেখা দেবে? আঃ, যত সব বাজে কথা।”

পিয়েরের মাথায় নতুন চিন্তা দেখা দিল: “ষোড়শ লুই-র মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল কারণ লোকে বলে সে ছিল সম্মানের অযোগ্য ও অপরাধী, আর তাদের দিক থেকে তারা ঠিকই বলে; আবার যারা তাকে মহাপুরুষ বলে মনে করে তারজন্য শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিল তারাও তো ঠিকই বলে। পরে রোবেস পিয়েরের মাথা কাটা গেল সে স্বেচ্ছাচারী বলে। কে ঠিক, আর কার ভুল? কেউ না! যতক্ষণ বেঁচে আছ—বেঁচে থাক; কালই তো তুমিও মরে যেতে পার, যেমন একঘণ্টা আগে আমিও মরতে পারতাম। অনন্তকালের তুলনায় মানুষ যখন মাত্র একটি মুহূর্তের জীবনের অধিকারী তখন অনুশোচনার যন্ত্রণায় সময় কাটানো চলে কি?”

সেই রাতেই খানসামাকে ডেকে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে বলল,—সে পিতার্সবুর্গে চলে যাবে। স্ত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার কথা সে ভাবতেই পারল না। স্থির করল, পরদিনই সে চলে যাবে; একটা চিঠি লিখে তাকে জানিয়ে যাবে যে চিরদিনের মত সে তাকে ত্যাগ করতে চায়।

পরদিন সকালে কফি নিয়ে ঘরে ঢুকে খানসামা দেখল, একখানা খোলা বই হাতে নিয়ে পিয়ের অটোমানের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। জেগে উঠে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল; সে যে কোথায় আছে সেটাই বুঝতে পারছে না।

খানসামা বলল, “কাউণ্টেস আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বাড়িতে আছেন কি না।”

পিয়ের স্ত্রীকে কি বলে পাঠাবে সেটা স্থির করার আগেই রূপোর কাজকরা সাদা সাটিনের ড্রেসিং-গাউন পরে কাউণ্টেস নিজেই ঘরে ঢুকল। তার শান্ত, গম্ভীর মুখের মর্মরসদৃশ ভুরুর উপর একটা ক্রোধের ভাঁজ পড়েছে শুধু। খানসামার সামনে সে কোন কথা বলল না। দ্বৈত যুদ্ধের খবর সে জেনেছে, আর তা নিয়ে কথা বলতেই এসেছে। খানসামা কফির সরঞ্জাম সাজিয়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করে রইল। পিয়ের চশমার ফাঁক দিয়ে ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকাল; শিকারী কুকুরপরিবৃত খরগোসের মত সে বই পড়াটাই চালিয়ে যেতে চেষ্টা করল। কিন্তু সে কাজটা যেমন অর্থহীন তেমনই অসম্ভব বুঝতে পেরে সে পুনরায় ভীরু চোখে স্ত্রীর দিকে তাকাল। স্ত্রী কিন্তু বসল না, তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে তার দিকে তাকিয়ে

খানসামার চলে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তারপর কঠিন স্বরে বলল, "আচ্ছা, এসব কি হচ্ছে? আমি জানতে চাই তুমি এসব কি করে বেড়াচ্ছ?"

"আমি? আমি কি…" পিয়ের তো-তো করে বলল।

"তাহলে বোঝা যাচ্ছে তুমি এখন মহাবীর, কি বল? শোন, কি নিয়ে এ দ্বৈত যুদ্ধ হল? কি প্রমাণ করতে চাও? কি? তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

অটোমানের উপর ঘুরে পিয়ের মুখ খুলল, কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

হেলেনই আবার কথা বলল, "তুমি যদি জবাব না দাও তো আমিই বলি। …লোকে যা বলে তুমি তাই বিশ্বাস কর। লোকে বলল…" হেলেন হেসে উঠল, "…দলখভ আমার প্রেমিক আর তুমি তাই বিশ্বাস করলে! আচ্ছা, তুমি কি প্রমাণ করলে? এই দ্বৈত যুদ্ধে কি প্রমাণ হল? প্রমাণ হল যে তুমি একটা বোকা, কিন্তু সেকথা তো সকলেই জানে। এর ফল কি হবে? সারা মস্কো আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে, সকলেই বলবে যে মাতাল হয়ে, কি করছ না বুঝেই বিনা কারণে একটা মানুষের প্রতি ঈর্ষাবশত তুমি তাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করেছ।" হেলেনের গলা ক্রমেই চড়তে লাগল; সে ক্রমেই উত্তেজিত হয়ে উঠল, "অথচ সে মানুষটি সব দিক থেকেই তোমার চাইতে অনেক ভাল…"

তার দিকে না তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে পিয়ের গর্-গর্ করে শুধু বলল, "হুম্… হুম্…!"

"আর তুমিই বা কি করে বিশ্বাস করলে যে সে আমার প্রেমিক? কেন? কারণ তার সঙ্গ আমার ভাল লাগে? তুমি যদি আরও বুদ্ধিমান হতে, আরও প্রীতিপ্রদ হতে, তাহলে তো তোমার সঙ্গই আমার ভাল লাগত।"

"আমাকে কিছু বলো না…তোমাকে মিনতি করছি," কর্কশ গলায় পিয়ের তো-তো করে বলল।

"কেন বলব না? আমার যা খুসি তাই বলব; তোমাকে খোলাখুলিই বলছি, তোমার মত স্বামীর স্ত্রী হয়েও অন্য প্রেমিকে আসক্ত হয় নি এরকম স্ত্রীর সংখ্যা খুব বেশী নয়, কিন্তু সে কাজও আমি করি নি।"

পিয়ের কি যেন বলতে চাইল, এমন চোখ তুলে তাকাল যার অর্থ হেলেন বুঝতে পারল না, তারপর আবার শুয়ে পড়ল। সেই মুহূর্তে তার শারীরিক কষ্ট হচ্ছে; বুকের উপর যেন একটা বোঝা চেপে বসেছে, শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে।

ভাঙা গলায় তো-তো করে বলল, "আমাদের আলাদা হওয়াই ভাল।"

"আলাদা! খুব ভাল, অবশ্য তুমি যদি আমাকে সম্পত্তি দিয়ে দাও," হেলেন বলল। "আলাদা! এই কথা শুনিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে চাও!"

লাফ দিয়ে সোফা থেকে উঠে পিয়ের টলতে টলতে তার দিকে ছুটে গেল।

টেবিলের উপর থেকে শ্বেতপাথরের কাগজ-চাপাটাকে সজোরে চেপে ধরে সেটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে আরও কয়েক পা এগিয়ে পিয়ের চেঁচিয়ে বলল, “আমি তোমাকে খুন করব !”

হেলেনের মুখটা ভয়ংকর হয়ে উঠল ; আর্তনাদ করে সে লাফিয়ে এক পাশে সরে গেল। পিয়েরের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল তার বাবার প্রকৃতি। সে অনুভব করল বিকৃত মনের আকর্ষণ ও উল্লাস। পাথরটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল ; সেটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল ; দুই হাত বাড়িয়ে হেলেনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ংকর স্বরে চীৎকার করে বলল “বেরিয়ে যাও!” যে সারা বাড়িটাই সভয়ে সে কথাটা শুনতে পেল। হেলেন যদি ঘর থেকে পালিয়ে না যেত তাহলে সেই মুহূর্তে সে যে কি করে বসত তা ঈশ্বরই জানেন।

* * *

এক সপ্তাহ পরে তার সম্পত্তির বড় অংশ বৃহত্তর রাশিয়ার সব জমিদারির পূর্ণ কর্তৃত্ব স্ত্রীকে দিয়ে পিয়ের একাকি পিতার্সবুর্গ যাত্রা করল।

অধ্যায়—৭

অস্তারলিজের যুদ্ধ ও প্রিন্স আন্দ্রুর নিখোঁজ হবার খবর বল্ড হিল্‌স্‌-এ পৌঁছবার পরে দু'মাস কেটে গেছে ; দূতাবাসের মারফৎ চিঠিপত্র পাঠানো এবং নানাবিধ খোঁজখবর সত্ত্বেও তার কোন খবরই পাওয়া যায় নি ; বন্দীর তালিকাতেও তার নাম নেই। তার আত্মীয়স্বজনের পক্ষে যেটা সব চাইতে খারাপ সেটা হল, এখনও এমন একটা সম্ভাবনা আছে যে স্থানীয় লোকরা হয়তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেছে এবং সে হয়তো এখনও অপরিচিত লোকদের মধ্যে শয্যাশায়ী হয়ে হয় ভাল হয়ে উঠছে আর না হয়তো মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে, অথচ নিজের কোন খবর পাঠাতে পারছে না। যে গেজেট থেকে বুড়ো প্রিন্স অস্তারলিজে পরাজয়ের খবর প্রথম জেনেছিল তাতে যথারীতি খুব সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল যে চমৎকার যুদ্ধ করার পরে রুশদের পশ্চাদপসরণ করতে হয় এবং তারা সুশৃংখলভাবে সরে যেতে পেরেছে। এই সরকারী প্রতিবেদন থেকেই বুড়ো প্রিন্স বুঝতে পারে যে আমাদের বাহিনী পরাজিত হয়েছে। অস্তারলিজের যুদ্ধের গেজেট প্রকাশিত প্রতিবেদনের পরে কুতুজভের কাছ থেকে পাওয়া একটা চিঠিতে বুড়ো প্রিন্স ছেলের ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা জানতে পেরেছে।

কুতুজভ লিখেছে, “একটি রেজিমেন্টের প্রধান হিসাবে পতাকা হাতে নিয়ে আপনার পুত্র আমার চোখের সামনেই মাটিতে পড়ে গেল—পিতা ও পিতৃভূমির উপযুক্ত সন্তান হিসাবে একটি বীরের মতই মাটিতে পড়ল। আমার পক্ষে এবং সমগ্র বাহিনীর পক্ষে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে সে বেঁচে আছে

কিনা সেটাই এখনও অনিশ্চিত। আমার ও আপনার কাছে এই আশাই একমাত্র সান্ত্বনা যে আপনার পুত্র জীবিত আছে, কারণ অন্যথায় সন্ধির পতাকার সঙ্গে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত অফিসারদের যে তালিকা আমাকে পাঠানো হয়েছে তাতে তার উল্লেখ অবশ্যই থাকত।"

সন্ধ্যার বেশ কিছু পরে এই সংবাদ যখন আসে বুড়ো প্রিন্স তখন তার পড়বার ঘরে একাই ছিল; পরদিন সকালে সে যথারীতি বেড়াতে বের হল; কিন্তু নায়েব, মালী ও স্থপতির কাছে চুপ করেই থাকল; তাকে খুব গম্ভীর দেখালেও কাউকে কিছুই বলল না।

প্রিন্সেস মারি যখন নির্দিষ্ট সময়ে তার ঘরে গেল তখনও সে লেদযন্ত্রে কাজে ব্যস্ত ছিল, এবং যথারীতি মুখ ঘুরিয়ে তাকে চেয়েও দেখে নি।

হঠাৎ বাটালিটা ফেলে দিয়ে অস্বাভাবিক গলায় ডাকল, "আঃ, প্রিন্সেস মারি!"

মারি তার কাছে এগিয়ে গেল, তার মুখের দিকে তাকাল, বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল। বাবার মুখের ভাবে দুঃখ নয়, ভেঙে পড়ার লক্ষণ নয়, ছিল শুধু ক্রোধ ও অস্বাভাবিকতা। সেই মুখ দেখেই মারি বুঝতে পারল, একটা ভয়ংকর দুর্ভাগ্য তার মাথার উপর ঝুলছে, তাকে বিচূর্ণ করতে উদ্যত হয়েছে; তার জীবনে এসেছে সেই চরমতম দুর্ভাগ্য যা আগে কখনও তার অভিজ্ঞতায় ধরা দেয় নি, যা অপূরণীয় ও সকল বোধের অতীত—প্রিয়জনের মৃত্যু।

"বাবা! আন্‌দ্রু!—" এমন অবর্ণনীয় দুঃখ ও আত্ম-বিস্মৃতির সঙ্গে বিচলিত প্রিন্সেস কথা দুটি বলল যে তার বাবা মেয়ের চোখের দিকে তাকাতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে দূরে সরে গেল।

"দুঃসংবাদ! বন্দীদের মধ্যেও তার নাম নেই, নিহতদের মধ্যেও নেই! কুতুজভ লিখেছেন····"এমন মর্মন্তুদ স্বরে সে আর্তনাদ করে উঠল যেন সেই আর্তনাদের দ্বারাই সে প্রিন্সেসকে জানিয়ে দিতে চাইল····"নিহত!"

প্রিন্সেস মাটিতে পড়ে গেল না বা মূর্ছিত হল না। তার মুখ আগেই বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এই কথাগুলি শোনার পরে তার মুখটা বদলে গেল, সুন্দর চোখ দুটিতে কি যেন ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। যেন কোন আনন্দ—জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত এক পরম আনন্দ—তার অন্তরের চরম দুঃখকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বাবাকে ঘিরে যত ভয় সব সে ভুলে গেল, তার কাছে এগিয়ে গেল, তার হাত ধরল, তাকে নীচু করে দুই হাতের শীর্ণ অস্থিসার গলাটা জড়িয়ে ধরল।

বলল, "বাবা, আমাকে দূরে ঠেলে দিও না, এস আমরা একসঙ্গে কাঁদি।"

"পাজীর দল! বদমাসের দল!" মেয়ের কাছ থেকে মুখটা ঘুরিয়ে বুড়ো আর্তনাদ করে উঠল। "সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করল, মানুষগুলোকে মারল!

কিন্তু কেন? যাও, যাও, লিজেকে বল।”

অসহায়ভাবে পাশের হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়ে প্রিন্সেস কাঁদতে লাগল। দাদা যখন তার ও লিজার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল ঠিক সেই চেহারাটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল: চোখের দৃষ্টি কোমল অথচ সগর্ব।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে সে বলল, “বাবা, কেমন করে এটা ঘটল আমাকে বল।”

“যাও! যাও! যুদ্ধে মারা গেছে, সেই যুদ্ধে যেখানে রাশিয়ার সব সেরা মানুষদের আর রাশিয়ার গৌরবকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। যাও প্রিন্সেস মারি। যাও, লিজেকে বল। আমি পরে যাচ্ছি।”

প্রিন্সেস মারি যখন বাবার কাছ থেকে ফিরে গেল, ছোট প্রিন্সেস তখন বসে বসে কাজ করছিল। প্রিন্সেস মারির দিকে না তাকিয়ে সে তাকিয়েছিল মনের মধ্যে…নিজের মধ্যে…সেখানে আনন্দময় ও রহস্যময় যা ঘটে চলেছে সেইদিকে।

সেলাইটা সরিয়ে রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, “তোমার হাতটা দাও।” তারপর ননদের হাতটা ধরে কোমরের নীচে রাখল।

তার চোখে প্রত্যাশার হাসি, লোমশ ঠোঁটটা একটু তুলল, শিশুর মত হাসি ফুটিয়ে তেমনই তুলেই রাখল।

প্রিন্সেস মারি তার পাশে হাঁটু ভেঙে বসে তার পোশাকের ভাঁজের মধ্যে মুখ লুকাল।

“এখানে, এখানে! বুঝতে পারছ? আমার এমন অদ্ভুত লাগে। তুমি কি জান মারি, ওকে আমি খুব ভালবাসব।” খুসিভরা উজ্জ্বল চোখ মেলে তাকিয়ে লিজা বলল।

প্রিন্সেস মারি মাথা তুলতে পারল না, সে কাঁদছে।

“কি হয়েছে মারি?”

“কিছু না…আমার বড় খারাপ লাগছে…আন্‌দ্রুর জন্য মন কেমন করছে,” চোখের জল মুছে মারি বলল।

সারাটা সকাল প্রিন্সেস মারি বারকয়েক চেষ্টা করল লিজার মনটাকে প্রস্তুত করতে, কিন্তু প্রতিবারই শুধু কাঁদতে লাগল। ছোট প্রিন্সেসের খেয়াল কিছু কম; তবু কারণ না বুঝলেও এই কান্না দেখে সেও বিচলিত বোধ করল। মুখে কিছুই বলল না; কিন্তু চারদিকে কি যেন খুঁজে বেড়াতে লাগল।

ডিনারের আগে বুড়ো প্রিন্স তার ঘরে এল। লিজা তাকে সব সময়ই ভয় পায়। কেমন যেন অস্থিরভাবে সে ঘরে ঢুকল। আবার কোন কথা না বলেই বেরিয়ে গেল। দেখেশুনে হতভম্ব হয়ে ছোট প্রিন্সেস হঠাৎ কাঁদতে

শুরু করল।

বলল, "আন্‌দ্রুর কোন খবর এসেছে কি?"

"না, তুমি তো জান খবর আসার সময় এখনও হয় নি। কিন্তু আমার বাবা চিন্তিত হয়ে পড়েছে, আর তাই আমারও ভয় করছে।"

"তাহলে কোন খবর আসে নি?"

"না," প্রিন্সেস মারি একদৃষ্টিতে লিজার দিকে তাকিয়ে বলল।

সে স্থির করেছে সন্তান প্রসবের আগে এই দুঃসংবাদ তাকে জানাবে না; বাবাকেও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করেছে সব কথা গোপন রাখতে। প্রিন্সেস মারি ও বুড়ো প্রিন্স নিজের মত করে তাদের দুঃখ সহ্য করতে লাগল। বুড়ো প্রিন্স মনের মধ্যে কোন আশাই পোষণ করে না; সে স্থির বুঝে নিয়েছে যে প্রিন্স আন্‌দ্রু নিহত হয়েছে; ছেলের খোঁজ করতে একজন কর্মচারিকে অস্ট্রীয়ায় পাঠালেও এদিকে মস্কোতে একটা স্মৃতিস্তম্ভ তৈরির নির্দেশও পাঠিয়ে দিয়েছে; ছেলের স্মৃতিরক্ষার্থে সেটাকে তার নিজের বাগানে প্রতিষ্ঠা করবে; সকলকেই সে বলে বেড়াতে লাগল যে তার ছেলে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। সে চেষ্টা করতে লাগল যাতে তার আগেকার জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন না ঘটে, কিন্তু শক্তিতে কুলোল না। তার বেড়ানো কমে গেল, আহার কমে গেল, ঘুম কমে গেল, দিন-দিন শরীর দুর্বল হতে লাগল। প্রিন্সেস মারির মনে তবু আশা। জীবিত দাদার জন্যই সে প্রার্থনা করে চলল; তার প্রত্যাবর্তনের সংবাদের জন্য অপেক্ষা করে রইল।

অধ্যায়—৮

১৯শে মার্চ সকালে প্রাতরাশের সময় ছোট প্রিন্সেস ডাকল, "সোনা আমার!" পুরনো অভ্যাসবশেই ছোট ঠোঁটটা উপরে ঠেলে উঠল, কিন্তু যেহেতু সেই দুঃসংবাদ আসার পর থেকে এ বাড়ির প্রতিটি কথায়, এমন কি প্রতিটি পায়ের শব্দে ফুটে উঠছে দুঃখের আভাষ, তাই ছোট প্রিন্সেসের হাসিও সকলকে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই একই দুঃখের স্মৃতি।

"সোনা আমার, আমার ভয় হচ্ছে আজ সকালের 'ক্রুস্তিক' (কথাটা আসলে ক্রুস্তুক=প্রাতরাশ)—রাঁধুনি ফুকা যেভাবে বলে আর কি—আমার ঠিক সহ্য হয় নি।"

ছুটে তার কাছে গিয়ে প্রিন্সেস মারি সভয়ে বলল, "তোমার কি হয়েছে সোনা আমার? তোমাকে ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে। আঃ, তুমি খুব ফ্যাকাসে হয়ে গেছ।"

একটি দাসী কাছেই ছিল; সে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, মারি বগ্‌দানভ্‌নাকে কি ডেকে পাঠানো উচিত নয়? (মারি বগ্‌দানভ্‌না একজন ধাত্রী; পাশের শহরে থাকে; গত পক্ষকাল ধরে বল্ড হিল্‌স্‌-এ আছে।)

প্রিন্সেস মারি সম্মতি জানাল, "হ্যাঁ, হয়তো সেই ব্যাপারই হবে। আমি যাই। মনে সাহস আন পরী আমার।" লিজাকে চুমো খেয়ে সে যাবার জন্য পা বাড়াল।

"না, না, না!" বিবর্ণতা ও শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়াও ছোট প্রিন্সেসের মুখে ফুটে উঠল অপরিহার্য যন্ত্রণার একটা শিশুসুলভ ভীতি।

"না, এটা বদহজম মাত্র····। তুমি বল যে এটা বদহজম; বল মারি! বল····" যন্ত্রণাকাতর শিশুর মত ছোট প্রিন্সেস নিজের খেয়ালেই কাঁদতে শুরু করে দিল। প্রিন্সেস মারি বগ্‌দানভ্‌নাকে আনার জন্য দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যেতে যেতেই তার কানে এল, "ঈশ্বর আমার! ঈশ্বর আমার! ওঃ!"

ধাত্রী ছোট মোটা দুটি হাত ঘসতে ঘসতে নিজের থেকেই আসছিল। তাকে দেখেই প্রিন্সেস মারি সভয়ে বলল, "মারি বগ্‌দানভ্‌না, মনে হচ্ছে শুরু হয়ে গেছে"

একইভাবে হাঁটতে হাঁটতে মারি বগ্‌দানভ্‌না বলল, "আচ্ছা; প্রভুকে ধন্যবাদ দিন প্রিন্সেস। তবে আপনাদের মত তরুণীদের তো এসব জানবার কথা নয়।"

"কিন্তু মস্কো থেকে ডাক্তার এখনও এলেন না কেন?" প্রিন্সেস বলল।

"ঠিক আছে প্রিন্সেস, ঘাবড়াবেন না। ডাক্তার ছাড়াই আমরা ভালভাবে সামাল দিতে পারব।"

পাঁচ মিনিট পরে তার ঘর থেকেই প্রিন্সেস মারি একটা ভারী কিছু বয়ে নিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পেল। সে বাইরে তাকাল। প্রিন্স আন্‌দ্রুর পড়ার ঘরের বড় চামড়ার সোফাটাকে চাকররা শোবার ঘরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের মুখ শান্ত ও গম্ভীর।

প্রিন্সেস মারি নিজের ঘরে একলা বসে বাড়ির নানারকম শব্দ শুনতে পাচ্ছে, আর কেউ সেখান দিয়ে গেলেই দরজা খুলে দেখছে। হঠাৎ তার দরজাটা আস্তে খুলে গেল, আর তার বুড়ি নার্স প্রাস্কোভ্‌য়া সাবিশ্‌না মাথায় একটা শাল জড়িয়ে চৌকাঠের উপর দেখা দিল। বুড়ো প্রিন্স নিষেধ করায় আজকাল সে এ-ঘরে বড় একটা আসে না।

বুড়ি বলল, "তোমার কাছে একটু বসতে এলাম মাশা। প্রিন্সের সন্তের সামনে জ্বালিয়ে দেবার জন্যে তার বিয়ের মোমবাতিগুলো নিয়ে এসেছি।" সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

"ওঃ নার্স, আমি খুব খুসি হলাম!"

"ছোট্ট পাখিটি, ঈশ্বর করুণাময়।"

নার্স দেবমূর্তির সামনে মোমবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিল; তারপর সেলাই নিয়ে দরজার পাশে বসল। প্রিন্সেস মারি একটা বই নিয়ে পড়তে শুরু

করল। কোন পায়ের শব্দ বা গলার স্বর শুনলেই তারা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে; প্রিন্সেস উৎকণ্ঠার সঙ্গে নানা প্রশ্ন করছে, আর নার্স তাকে সাহস দিচ্ছে।

দাসীদের বড় হল-ঘরে হাসির শব্দ নেই। চাকরদের হলে সকলেই নীরবে সতর্ক হয়ে অপেক্ষা করে বসে আছে। বাইরে ভূমিদাসদের ঘরে ঘরে মশাল ও মোমবাতি জ্বলছে; কেউ ঘুমোয় নি। বুড়ো প্রিন্স পড়ার ঘরে পা টিপে টিপে পায়চারি করছে; সংবাদ জানবার জন্য তিখোনকে পাঠাল মারি বগ্‌দানভ্‌নার কাছে—"গিয়ে শুধু বল্‌বি 'প্রিন্স আমাকে জানতে পাঠিয়েছেন' তারপর সে কি জবাব দেয় আমাকে এসে বলবি।"

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তারদিকে তাকিয়ে মারি বগ্‌দানভ্‌না বলল, "প্রিন্সকে গিয়ে বল, প্রসব-বেদনা শুরু হয়েছে।"

তিখোন সে-কথা প্রিন্সকে জানাল।

"খুব ভাল!" বলে প্রিন্স দরজাটা বন্ধ করে দিল; তারপরে পড়ার ঘর থেকে এতটুকু শব্দ আর তিখোন শুনতে পেল না।

কিছুক্ষণ পরে মোমবাতির পল্‌তে কেটে দেবার জন্য তিখোন আবার ঘরে ঢুকে দেখল প্রিন্স সোফায় শুয়ে আছে; তার ক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে তিখোন মাথাটা নাড়ল, তার কাছে গিয়ে নিঃশব্দে তার কাঁধে চুমো খেল, তারপর সল্‌তে না কেটে বা কাউকে কিছু না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পৃথিবীর সবচাইতে পবিত্র রহস্য তার পথেই এগিয়ে চলল। সন্ধ্যা পার হল, রাত নামল, সেই অতলস্পর্শের মুখোমুখি হয়ে কারও অন্তরের উৎকণ্ঠা ও দুর্বলতা এতটুকু হ্রাস পেল না, বরং বেড়েই চলল। কারও চোখে ঘুম নেই।

* * * *

এ রাতটাও মার্চ মাসের সেইসব রাতের অন্যতম যখন মনে হয় শীত বুঝি নতুন করে শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছে, প্রচণ্ড বেগে ছড়িয়ে দিয়েছে তার শেষ বরফ ও ঝড়। বড় রাস্তার বিভিন্ন ঘাঁটিতে পরপর পাঠানো হয়েছে অনেকগুলো ঘোড়া মস্কো থেকে আগত জার্মান ডাক্তারকে আনবার জন্য; যে কোন মুহূর্তে তার এসে পড়ার কথা; লণ্ঠন হাতে ঘোড়সওয়ারদের পাঠানো হয়েছে গ্রামের ছোট রাস্তার খানাখন্দ ও বরফ-ঢাকা ডোবা পেরিয়ে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসতে।

প্রিন্সেস মারি অনেকক্ষণ হল বই রেখে চুপচাপ বসে আছে। নার্স সাভিশ্‌না বলল, "ঈশ্বর করুণাময়, কখনও ডাক্তারের দরকার হয় না।"

হঠাৎ একটা বাতাসের ঝাপ্টা প্রচণ্ড বেগে এসে জানালার পাল্লার উপর আছড়ে পড়ল। জানালা থেকে ডবল ফ্রেমগুলো খুলে ফেলা হয়েছে; বুড়ো প্রিন্সের হুকুমে ভরত পাখির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিটি ঘরের একটা করে জানালার ফ্রেম খুলে ফেলা হয়েছে। (রাশিয়ার বাড়িতে শীতকালে

ডবল জানালা থাকে। যেহেতু তাতে হাওয়া চলাচলে বাধা হয় সেজন্য আবহাওয়া একটু ভাল হলেই দুটোর একটা ফ্রেম খুলে ফেলাই ভাল।) হাওয়ার দাপটে ঢিলে ছিটকানিটা খুলে যাওয়ায় ঠাণ্ডা বাতাসে ঘরের দামাস্কাস পর্দাগুলো উড়তে লাগল, মোমবাতিগুলো নিভে গেল। প্রিন্সেস মারি শিউরে উঠল; তার নার্স সেলাইটা রেখে জানালার কাছে গেল এবং বাইরে ঝুঁকে পড়ে জানালার পাল্লাটা ধরতে চেষ্টা করল। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তার মাথার রুমালের কোণ ও সাদা চুল উড়তে লাগল।

পাল্লাটা ধরে বন্ধ না করেই সে বলল, "সোনা প্রিন্সেস, পথে কে যেন গাড়ি ছুটিয়ে আসছে। সঙ্গে লণ্ঠন। খুব সম্ভব ডাক্তার।"

"হে ভগবান! তোমাকে ধন্যবাদ!" প্রিন্সেস মারি বলল। "আমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনি তো রুশ ভাষা জানেন না।"

মাথার উপর একটা শাল জড়িয়ে নবাগতের সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রিন্সেস মারি ছুটে বেরিয়ে গেল। যেতে যেতেই সামনের ঘরের জানালা দিয়ে দেখল, লণ্ঠনসহ একটা গাড়ি ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। সে সিঁড়ির দিকে গেল।

সিঁড়ির বাঁকে নামতেই পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পরিচিত একটা গলার স্বরও যেন কানে এল।

কণ্ঠস্বর বলছে, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আর বাবা?"

নায়েব দেমিয়ানের গলায় জবাব শোনা গেল, "শুতে গেছেন।"

তখন সেই কণ্ঠস্বর আরও কিছু বলল, দেমিয়ান তার জবাব দিল; সিঁড়িতে পায়ের শব্দ দ্রুততর হল।

"এ কি আন্দ্রু!" প্রিন্সেস মারি ভাবল। "না, তা হতে পারে না, সেটা বড় বেশী অসাধারণ ব্যাপার হয়ে যাবে।" এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়ির চাতালে দেখা দিল প্রিন্স আন্দ্রুর মুখ ও মূর্তি। বরফে ঢাকা মোটা কলারের একটা লোমের জোব্বা তার গায়ে। মোমবাতি হাতে জনৈক পরিচারক সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। হ্যাঁ, এই তো সেই মুখ, বিবর্ণ, শীর্ণ, ঈষৎ পরিবর্তিত। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে সে বোনকে জড়িয়ে ধরল।

"তোমরা আমার চিঠি পাও নি?" বলেই উত্তরের অপেক্ষা না করে—অপেক্ষা করলেও উত্তর পেত না, কারণ প্রিন্সেসের তখন কথা বলার মত অবস্থা ছিল না—সে ঘুরে দাঁড়াল এবং ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে (শেষ ডাক-ঘাঁটিতে তাদের দেখা হয়েছিল) আবার দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে হল-ঘরে ঢুকল। সেখানে বোনকে আর একবার আলিঙ্গন করল।

"কী বিচিত্র ভাগ্যরে মাশা!" জোব্বা ও বুট ছেড়ে সে ছোট প্রিন্সেসের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—৯

ছোট প্রিন্সেস বালিশে ভর দিয়ে শুয়ে আছে। মাথায় একটা ছোট টুপি (ব্যথাটা সবেমাত্র চলে গেছে); ঘামে-ভেজা গালের উপর কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে, সুন্দর গোলাপী মুখের উপরের ঠোঁটটি খোলা, খুসির হাসি মুখে লেগে রয়েছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘরে ঢুকল; সোফাটার পায়ের কাছে থেমে স্ত্রীর দিকে তাকাল। শিশুর মত ভয় ও উত্তেজনায় ভরা দুটি চোখ মেলে সেও স্বামীর দিকে তাকাল। সে চোখ যেন বলছে, "আমি তো তোমাদের সব্বাইকে ভালবাসি, কারও কোন ক্ষতি করি নি; তাহলে আমি এত কষ্ট পাচ্ছি কেন? আমাকে বাঁচাও!" প্রিন্স আন্‌দ্রু সোফাটা ঘুরে গিয়ে তার কপালে চুমো খেল।

"সোনা আমার!" সে বলল—এ কথাটি সে আগে কখনও বলে নি। "ঈশ্বর করুণাময়……"

ছোট প্রিন্সেস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল; তার চোখে শিশুসুলভ তিরস্কার।

"তোমার কাছে আমি সাহায্য পাব আশা করেছিলাম, কিছুই পাই নি!" তার চোখ যেন বলতে চাইছে। প্রিন্স আন্‌দ্রুর আগমনে সে অবাক হয় নি; সে যে এসেছে এটাই বুঝতে পারছে না প্রিন্স আন্‌দ্রুর আসার সঙ্গে তার যন্ত্রণার বা তার উপশমের কোন সম্পর্কই নেই। আবার ব্যথা শুরু হল; মারি বগ্‌দানভ্‌না প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ঘর থেকে চলে যেতে বলল।

ডাক্তার ঢুকল। প্রিন্স আন্‌দ্রু বেরিয়ে গেল। প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা হওয়ায় দুজনে ফিস্‌ ফিস্‌ করে কথাবার্তা বলতে লাগল; কিন্তু মাঝে মাঝেই কথা থামিয়ে তারা কান পেতে অপেক্ষা করতে থাকল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "তুমি যাও দাদা।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু গিয়ে স্ত্রীর পাশের ঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। একটি স্ত্রীলোক ভয়ার্ত মুখে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখতে পেয়ে থতমত খেয়ে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু দুই হাতে মুখটা ঢেকে কয়েক মিনিট সেইভাবেই কাটাল। দরজা দিয়ে ভেসে আসছে করুণ, অসহায়, জান্তব আর্তনাদ। প্রিন্স আন্‌দ্রু উঠে দরজার কাছে গেল; দরজাটা খুলতে চেষ্টা করল। কে যেন সেটাকে আটকে ধরে আছে।

ভিতর থেকে ভয়ার্ত কণ্ঠে কে যেন বলল, "আপনি ভিতরে আসবেন না! আসবেন না!"

সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। আর্তনাদ থেমে গেল। কয়েক সেকেণ্ড পার হয়ে গেল। তারপর একটা ভয়ংকর চীৎকার ভেসে এল শোবার ঘর থেকে—এ চীৎকার তো তার হতে পারে না, এরকম চীৎকার করতে সে পারে না। প্রিন্স আন্‌দ্রু দরজার কাছে ছুটে গেল; আর্তনাদ থেমে গেছে;

সে শুনতে পেল শিশুর কান্না।

প্রথম সেকেণ্ডে প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "একটি শিশুকে ওরা এখানে এনেছে কিসের জন্য? একটি শিশু? কোন্ শিশু....? ওখানে শিশু কেন? অথবা শিশুটি কি জন্ম নিল?"

তখনই সহসা সেই কান্নার আনন্দময় অর্থটি তার হৃদয়ঙ্গম হল; তার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হল; জানালার গোবরাটে কনুই রেখে সে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। দরজা খুলে গেল। ডাক্তার বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার গায়ে কোট নেই, হাতের আস্তিন গোটানো, মুখ বিবর্ণ, চোয়াল কাঁপছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু তার দিকে মুখ ঘোরাল, কিন্তু ডাক্তার বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে চলে গেল। একটি স্ত্রীলোক ছুটে বেরিয়ে এসে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখে ইতস্তত করে চৌকাঠের উপরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রিন্স আন্‌দ্রু স্ত্রীর ঘরে ঢুকল। পাঁচ মিনিট আগে যে অবস্থায় দেখে গিয়েছিল তার মৃত স্ত্রী সেইভাবেই শুয়ে আছে; দৃষ্টি স্থির এবং গাল দুটি নিষ্প্রভ হলেও মনোরম শিশুর মত মুখখানিতে সেই একই ভাব ফুটে আছে।

তার সুন্দর, করুণ, মরা মুখখানি যেন বলছে, "আমি তো তোমাদের সব্বাইকে ভালবাসি, কারও কোন ক্ষতি করি নি; আর তুমি আমার জন্য কি করেছ?"

ঘরের এককোণে মারি বগ্‌দানভ্‌নার কাঁপা দুটি সাদা হাতের মধ্যে একটা লাল ক্ষুদে কি যেন তারস্বরে চীৎকার করে চলেছে।

দু'ঘণ্টা পরে আস্তে পা ফেলতে ফেলতে প্রিন্স আন্‌দ্রু তার বাবার ঘরে গেল। ইতিমধ্যে বুড়ো মানুষটি সবই জানতে পেরেছে। সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়েছিল; দরজা খুলতেই তার কর্কশ বার্ধক্যজীর্ণ হাত দুটি সাঁড়াশীর মত ছেলের গলা জড়িয়ে ধরল; কোন কথা না বলে সে শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

* * * *

তিন দিন পরে ছোট প্রিন্সেসকে কবর দেওয়া হল। তাকে বিদায়-চুম্বন দিতে প্রিন্স আন্‌দ্রু শবাধারের কাছে উঠে গেল। শবাধারের মধ্যে সেই একই মুখ, যদিও চোখ দুটি বোজা। সে চোখ যেন বলছে, "আঃ, আমার প্রতি তুমি কি ব্যবহার করেছ?" প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল, তার বুকটা ভেঙে যাচ্ছে, এমন একটা পাপ সে করেছে যার কোন প্রতিকার সে করতে পারবে না, যা সে ভুলতেও পারবে না। কাঁদতেও পারল না। বুড়ো মানুষটিও উঠে এসেছে; বুকের উপর স্থির হয়ে থাকা দুখানি মোমের মত ছোট হাতে সেও চুমো খেল; সেই মুখ যেন তাকেও বলল: "আঃ, তুমি আমার কি করেছ, কেন করেছ?" আর সে দৃশ্য দেখে বুড়ো মানুষটি রেগে সেখান থেকে চলে গেল।

আরও পাঁচদিন কেটে গেল ; ছোট্ট প্রিন্স নিকলাস আন্দ্রীভিচ-এর দীক্ষা হল। দাই তার থুত্‌নি দিয়ে ঢাকনাটা চেপে ধরল, আর পুরোহিত একটা হাঁসের পালক দিয়ে বালকের লাল পায়ের পাতায়ও হাতের তালুতে তেল মাখিয়ে দিল।

ঠাকুর্দাই হল তার ধর্মবাপ ; পাছে শিশুকে ফেলে দেয় এই ভয়ে কাঁপা হাতে শিশুকে ঘুরিয়ে এনে ধর্মমা প্রিন্সেস মারির হাতে তুলে দিল। প্রিন্স আন্‌দ্রু আর একটা ঘরে অনুষ্ঠানের সমাপ্তির অপেক্ষায় বসে রইল। নার্স তাকে নিয়ে এলে সে খুসি হয়ে তার দিকে তাকাল, আর নার্স যখন বলল যে শিশুর চুলের মোম জলে ডুবে না গিয়ে ভেসেই ছিল (জলে ডুবে যাওয়াটা দুর্ভাগ্যের লক্ষণ) তখন সে ধীরে ধীরে মাথাটা নাড়তে লাগল।

অধ্যায়—১০

বুড়ো কাউন্টের চেষ্টায় বেজুখভের সঙ্গে দলখভের দ্বৈত যুদ্ধে রস্তভের অংশ গ্রহণের ব্যাপারটা চেপে দেওয়া হল, এবং তার পদাবনতি ঘটবে বলে যে আশংকা করা হয়েছিল তার পরিবর্তে সে মস্কোর গভর্ণর-জেনারেলের অ্যাডজুটান্টের পদে নিযুক্ত হল। ফলে পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে সে গ্রামের বাড়িতে যেতে পারল না, নতুন কর্তব্যের খাতিরে সারা গ্রীষ্মকালটা তাকে মস্কোতেই কাটাতে হল। দলখভ সুস্থ হয়ে উঠল, আর ভাল হয়ে ওঠার সময়টাতে রস্তভের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। অসুস্থ অবস্থায় দলখভ তার মায়ের কাছেই ছিল ; আদরের ফেদিয়ার বন্ধু হিসাবে রস্তভও মারি আইভানভ্‌নার খুব প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল। প্রায়ই তার সঙ্গে ছেলেকে নিয়ে অনেক কথা হয়।

মা বলে, "সত্যি কাউন্ট, আজকের চরিত্রভ্রষ্টতার যুগে ছেলে আমার বড় ভাল, পবিত্রহৃদয়, এখন কেউ গুণের আদর করে না, সকলের কাছেই সেটা যেন দোষের ব্যাপার। তুমিই বল কাউন্ট, বেজুখভের পক্ষে কাজটা কি ঠিক হয়েছে, সম্মানজনক হয়েছে ? আর ফেদিয়া তো এখনও তাকে ভালবাসে, তার বিরুদ্ধে একটা কথাও বলে না। পিতার্সবুর্গে একজন পুলিশকে নিয়ে ওরা যখন মজা করেছিল, তখনও কি দুজনে মিলেই সে কাজ করে নি ? আর দেখ ! বেজুখভ বেকসুর খালাস পেয়ে গেল, আর যত দোষ চাপল ফেদিয়ার ঘাড়ে। একবার ভাবতো, তাকে কত হুজ্জুতি পোয়াতে হয়েছিল ! একথা সত্যি যে সে তার স্বপদেই বহাল হয়েছিল, কিন্তু তা না করে কি তাদের উপায় ছিল ? তার মত এমন সাহসী দেশভক্ত ছেলে তো বেশী মেলে না। আর এখন—এই দ্বৈত যুদ্ধ ! এ মানুষগুলোর কি মনের বালাই নেই ? সম্মান বলে কিছু নেই ? একমাত্র ছেলে জেনেও তাকে দ্বৈত যুদ্ধে আহ্বান করা হল, সোজা গুলি করা হল। তবু রক্ষা যে ঈশ্বর আমাদের করুণা করেছেন। আর

এসব কিসের জন্য ? একটু-আধটু গোপন প্রেম আজকাল কে না করে ? আরে, তার মনে যদি এতই ঈর্ষা তো সেটা আগে দেখালেই হত ; তা নয়, মাসের পর মাস সেটা চলতে দিয়ে তারপর একেবারে যুদ্ধের ডাক। ফেদিয়া তার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল, কাজেই সে যে যুদ্ধ করবে না এটা তো জানাই ছিল। কী নীচতা! প্রিয় কাউণ্ট, আমি জানি তুমি ফেদিয়াকে ঠিক বুঝতে পার। কিন্তু লোকে তাকে বোঝে না। সে এত মহৎ, তার অন্তর এত স্বর্গীয়!"

দলখভও মাঝে মাঝে রস্তভের কাছে এমন সব কথা বলে যা কেউ তার কাছ থেকে আশা করে না।

সে বলে, "আমি জানি লোকে আমাকে খারাপ বলে! বলুক! যাদের আমি ভালবাসি তারা ছাড়া আর যে যাই বলুক তাতে আমার কিছুই যায়-আসে না। আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারি, বাকিরা আমার পথের বাধা হলে তাদের আমি পায়ে দলি। আমার মা আছে, তাকে আমি পূজা করি, সে আমার অমূল্য রত্ন ; আর আছে দু' তিনটি বন্ধু—তাদের মধ্যে তুমি একজন, বাকিদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই কারণ আমার পক্ষে হয় তারা ক্ষতিকর, আর না হয় উপকারী। আর বেশীর ভাগই ক্ষতিকর, বিশেষত স্ত্রীলোকরা। সত্যি হে বাপু, স্নেহশীল, মহৎ, উচ্চ অন্তঃকরণের পুরুষ আমি দেখেছি, কিন্তু এমন একটি মেয়ে মানুষও দেখি নি—কাউণ্টেস থেকে রাঁধুনি পর্যন্ত—যে দুশ্চরিত্রা নয়। মেয়েদের মধ্যে যে স্বর্গীয় পবিত্রতা ও আন্তরিকতা আমি খুঁজে বেড়াই আজ পর্যন্ত তার দেখা পাইনি। যদি পেতাম তারজন্য জীবন দিতেও রাজী হতাম। কিন্তু ওরা!....."সে একটা ঘৃণাসূচক অঙ্গভঙ্গী করল।" কিন্তু বিশ্বাস কর, আজও যে আমার কাছে জীবনের মূল্য আছে তার কারণ আমি এখনও আশা রাখি যে এমন কোন স্বর্গীয় প্রাণীর সঙ্গে আমার দেখা হবেই যে আমাকে নতুন করে গড়ে তুলবে, পবিত্র করবে, উন্নত করবে। কিন্তু আমার কথা তুমি বুঝতে পারবে না।"

"ওঃ, হ্যাঁ, তোমাকে খুব বুঝতে পারি," রস্তভ বলল ; নতুন বন্ধুটির প্রভাব পড়েছে তার মনে।

* * *

হেমন্তকালে রস্তভ-পরিবার মস্কোতে ফিরে এল। শীতের গোড়ায় দেনিসভও ফিরে এল তাদের কাছে। ১৮০৬ সালের শীতের অর্ধেকটা সময় রস্তভ মস্কোতে কাটাল। তার কাছে এবং গোটা পরিবারের কাছে এ সময়টা অত্যন্ত সুখের, অত্যন্ত আনন্দের দিন। নিকলাসের সঙ্গে অনেক যুবক তাদের বাড়িতে আসত। ভেরা তখন বিশ বছরের সুন্দরী ; সোনিয়া ষোল বছরের ফুটন্ত ফুলটি ; নাতাশা অর্ধেক তরুণী, অর্ধেক বালিকা।

যেসব যুবকদের রস্তভ এ বাড়ির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল তাদের প্রথম

সারির একজন হল দলখভ ; নাতাশা ছাড়া বাড়ির আর সকলেরই তাকে ভাল লাগল। দলখভকে নিয়ে সে তো দাদার সঙ্গে প্রায় ঝগড়া করে আর কি। নাতাশা বার বার বলতে লাগল, সে খারাপ লোক, বেজুখভের সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধের ব্যাপারে পিয়ের নির্দোষ, দোষ দলখভের ; তাছাড়া সে কেমন যেন বিরক্তিকর ও অস্বাভাবিক।

দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সে চেঁচিয়ে বলে, "আমার বোঝবার কিছু নেই ; লোকটি দুষ্ট, হৃদয়হীন। বরং তোমার দেনিসভকে আমি পছন্দ করি ; লম্পটই হোক আর যাই হোক, তবু তাকে আমি পছন্দ করি ; তাহলেই দেখতে পাচ্ছ আমি সব বুঝি। কথাটা কিভাবে বলব ঠিক বুঝতে পারছি না⋯এই লোকটি সবকিছুতেই হিসাবমাফিক চলে, আর সেটাই আমি পছন্দ করি না। কিন্তু দেনিসভ⋯"

নিকলাস বলে উঠল, "ওঃ, দেনিসভ অন্য ধরনের মানুষ ; দলখভের মধ্যে যে একটা মন আছে সেটা তোমাকে বুঝতে হবে ; তোমার উচিত তার মায়ের সঙ্গে তাকে দেখা। কী হৃদয় !"

"দেখ, ওসব আমি জানি না, কিন্তু তার সঙ্গ আমার কাছে অস্বস্তিকর। আর তুমি কি জান সে সোনিয়ার প্রেমে পড়েছে ?"

"কী বাজে কথা⋯"

"আমি ঠিকই বলছি, দেখে নিও।"

নাতাশার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হল। দলখভ সাধারণত মেয়েদের এড়িয়েই চলে, কিন্তু এ-বাড়িতে সে প্রায়ই আসতে লাগল, আর কেউ মুখে না বললেও সে যে কার জন্য আসে সেটাও অচিরেই বোঝা গেল। সোনিয়ার জন্যই সে আসে। মুখে না বললেও সোনিয়াও সেটা জানে, আর দলখভকে দেখলেই তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

বোঝা গেল এই বিচিত্র চরিত্রের শক্তিমান লোকটি এই মনোরমা মেয়েটির দুর্নিবার আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে ; তারা পরস্পরকে ভালবাসে।

১৮০৬-এর হেমন্তকালে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের কথা আবার নতুন করে সকলের মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহের হুকুম জারি হয়ে গেছে,—নিয়মিত সেনাদলে প্রতি হাজারে দশজন, আর স্বদেশরক্ষী সেনাদলে (militia) প্রতি হাজারে ন'জন। সর্বত্র বোনাপার্তকে শাপশাপান্ত করা হতে লাগল, আর সারা মস্কো জুড়ে আসন্ন যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন কথা রইল না। এই যুদ্ধায়োজনে রস্তভ পরিবারের একমাত্র চিন্তা নিকলাসকে নিয়ে ; সে তো কারও কথায়ই মস্কোতে থাকবে না, বড়দিনের পরে দেনিসভের ছুটি ফুরিয়ে গেলেই তাকে নিয়ে রেজিমেণ্টে ফিরে যাবে। কিন্তু আসন্ন বিদায়ের জন্য তার হাসিখুসিতে কোনরকম বাধা হল না, বরং সে আরও প্রাণ খুলে আসর জমাতে লাগল। ডিনারে, পার্টিতে ও

বল-নাচেই সে বেশীর ভাগ সময় বাড়ির বাইরে কাটাতে লাগল।

অধ্যায়—১১

বড়দিনের পরবর্তী তৃতীয় দিনে নিকলাস বাড়িতেই ডিনার খেল; ইদানীং এ কাজটা সে বড় একটা করে নি। একটা বড় মাপের বিদায়-ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল, কারণ "এপিফেনি" পর্বের পরেই সে ও দেনিসভ রেজিমেণ্টে যোগ দিতে যাত্রা করবে। দেনিসভ ও দলখভ সহ প্রায় বিশজন তাতে উপস্থিত হয়েছিল।

এবারকার ছুটির সময়টাতে বাতাসে যেভাবে ভালবাসা ছড়িয়ে পড়েছিল, রস্তভদের বাড়িতে প্রেমের যে জোরালো আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনটি আগে কখনও হয় নি। "সুখের মুহূর্তটাকে আঁকড়ে ধরে, ভালবাস, ভালবাসা পাও! পৃথিবীতে এটাই তো একমাত্র সত্য। আর সবই বোকামি। এখানে এটাই তো আমাদের একমাত্র আকর্ষণ"—এই বাণীই যেন সর্বত্র শোনাতে লাগল।

নানান জায়গায় দেখাসাক্ষাৎ উপলক্ষ্যে ছুটোছুটি করে খুবই ক্লান্ত নিকলাস সেদিন বাড়ি ফিরল ডিনারের ঠিক আগে। বাড়িতে ঢুকে বাড়ির প্রেমের আবহাওয়ায় কেমন যেন একটা টান-টান ভাব লক্ষ্য করল। সোনিয়া, দলখভ এমন কি বুড়ি প্রিন্সেস এবং কিছুটা নাতাশাকেও যেন বিচলিত মনে হল। সে বুঝতে পারল, সোনিয়া ও দলখভের মধ্যে একটা কিছু ঘটেছে। সেদিন সন্ধ্যায়ই একটা বল-নাচের আসর বসবে; নৃত্যশিক্ষক ইয়োগেল ছুটির মধ্যে তার ছাত্রছাত্রীর জন্ত এই নাচের আয়োজন করেছে।

নাতাশা বলল, "নিকলাস, তুমি ইয়োগেলের ওখানে যাচ্ছ তো? দয়া করে যেও! সে তোমাকে যেতে বলেছে; ভাসিলি দিমিত্রিচও (দেনিসভ) যাচ্ছে।"

দেনিসভ বলে উঠল, "কাউণ্টেসের হুকুম হলে আমি কোথায় না যেতে পারি! এমন কি pas de chale নাচতেও রাজী আছি।"

নিকলাস জবাব দিল, "যদি সময় পাই। কিন্তু আমি যে আর্খারভদের কথা দিয়েছি; তাদের একটা পার্টি আছে।"

"আর তুমি?" সে দেনিসভকে শুধাল, কিন্তু প্রশ্নটা করেই তার মনে হল কাজটা ঠিক হয় নি।

সোনিয়ার দিকে তাকিয়ে দলখভ রাগত নিরুত্তাপ গলায় জবাব দিল, "হয়তো।"

"নিশ্চয় একটা কিছু ঘটেছে," নিকলাস ভাবল। তার এই সিদ্ধান্ত আরও পাকা হল যখন ডিনারের পরেই দলখভ সেখান থেকে চলে গেল। নাতাশাকে ডেকে জানতে চাইল ব্যাপারটা কি।

ছুটে এসে নাতাশা বলল, "আমি তোমাকেই খুঁজছিলাম।" বিজয়িনীর ভঙ্গীতে বলল, "আমি তো বলেছিলাম, তুমি বিশ্বাস কর নি। সে সোনিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে।"

নিকলাস ইদানীং সোনিয়াকে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না, তবু খবরটা শুনে তার মনের কোথায় যেন একটা ধাক্কা লাগল। একটি যৌতুকহীনা, বাপ-মা-হারা মেয়ের পক্ষে দেনিসভ তো সত্যি উপযুক্ত এবং কোন কোন বিষয়ে খুবই ভাল বর। বুড়ি কাউন্টেস ও সমাজের দিক থেকেও সোনিয়ার পক্ষে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই খবরটা শুনে প্রথমেই নিকলাসের মনে সোনিয়ার প্রতি রাগ দেখা দিল। ······সে বলতে চাইল "এতো চমৎকার; ছেলেমানুষী প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে এ প্রস্তাব গ্রহণ করাই তো তার উচিত," কিন্তু সে-কথা বলার আগেই নাতাশা আবার শুরু করে দিল।

"আর ভাব তো! সে পরিষ্কারভাবে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে!" একটু থেমে আবার বলল, "তাকে বলে দিয়েছে ও নাকি আর কাউকে ভালবাসে।"

"ঠিক, আমার সোনিয়া এ ছাড়া আর কিছু করতে পারে না!" নিকলাস ভাবল।

"মামণি এত পীড়াপীড়ি করল, সে কিছুতেই শুনল না; আমি জানি, সে যখন একবার না বলেছে তখন আর মত বদলাবে না···"

"মামণি তাকে চাপ দিয়েছিল?" নিকলাসের গলায় তিরস্কারের সুর।

নাতাশা বলল, "হ্যাঁ। তুমি কি জান নিকলাস— রাগ করো না—কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি যে তুমি তাকে বিয়ে করবে না।"

নিকলাস বলল, "না, সেকথা তুমি মোটেই জান না। কিন্তু আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। সোনিয়া কত ভাল মেয়ে!" সে হেসে বলল।

"আঃ, সত্যি সে বড় ভাল মেয়ে! আমি তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার কাছে।"

দাদাকে চুমো খেয়ে নাতাশা ছুটে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট পরে সোনিয়া এল; তার চোখে-মুখে ভয় ও অপরাধের ভাব। নিকলাস এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমো খেল। ফিরে আসার পরে এই প্রথম তারা নির্জনে তাদের ভালবাসার কথা বলতে লাগল।

প্রথমে ভীরু গলায় তারপর ক্রমাগত সাহসের সঙ্গে নিকলাস বলতে লাগল, "সোফি, যে লোকটি শুধু যে ভাল ও সুবিধাজনক বর তাই নয়, যে অত্যন্ত চমৎকার ও মহান··· সে আমার বন্ধু···তাকে যদি তুমি ফিরিয়ে দিতে চাও···"

সোনিয়া বাধা দিল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমি তো আগেই ফিরিয়ে দিয়েছি।"

"যদি আমার জন্য ফিরিয়ে দিয়ে থাক তো আমার আশংকা হচ্ছে আমি⋯⋯"

সোনিয়া আবার বাধা দিল। ভয়ার্ত, মিনতিভরা চোখে তার দিকে তাকাল।

"নিকলাস, ও কথা আমাকে বলো না" সোনিয়া বলল।

"না, আমাকে বলতেই হবে। এটা আমার অহংকার বলে মনে হতে পারে, তবু একথা বলাই ভাল। আমার জন্য যদি তুমি তাকে ফিরিয়ে দিয়ে থাক তাহলে সব কথা আমাকে বলতেই হবে। আমি তোমাকে ভালবাসি, আর আমি মনে করি অন্য সকলের চাইতে তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি⋯⋯"

"আমার কাছে সেটাই যথেষ্ট," লজ্জায় লাল হয়ে সোনিয়া বলল।

"না, কিন্তু আমি হাজার বার প্রেমে পড়েছি, আবারও প্রেমে পড়ব, কিন্তু তোমার মত এমন করে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও ভালবাসার বাঁধনে আর কারও সঙ্গে বাঁধা পড়ি নি। তাছাড়া আমার বয়স অল্প। মামণির এটা ইচ্ছা নয়। এক কথায়, আমি কোন কথা দিতে পারছি না। আমি মিনতি করছি ; দলখভের প্রস্তাবটা তুমি আর একবার বিবেচনা করে দেখ," অনেক কষ্টে বন্ধুর নামটি উচ্চারণ করে সে বলল।

"আমাকে ও-কথা বলো না! আমি কিছু চাই না। তোমাকে আমি দাদার মত ভালবাসি, চিরদিন তাই বাসব। এর বেশী কিছু চাই না।"

"তুমি একটি দেবদূত : আমি তোমার উপযুক্ত নই, কিন্তু আমার ভয় হয় পাছে তোমাকে ভুলপথে নিয়ে যাই।"

নিকলাস আর একবার তার হাতে চুমো খেল।

অধ্যায়—১২

মস্কোতে ইয়োগেলের নাচের আসর খুবই উপভোগ্য হল। ছেলেমেয়েদের নতুন-শেখা নাচ দেখে মায়েরা সে-কথা বলল ; যারা অক্লান্তভাবে নেচে গেল সেই তরুণ-তরুণীরাও সে-কথা বলল ; আর যেসব বয়স্ক যুবক-যুবতীরা যেন কৃপা করেই নাচের আসরে এসেছিল তাদেরও খুবই ভাল লাগল। বেজুখভের বাড়ির নাচ-ঘরটাই ইয়োগেল নিয়েছিল, আর সকলেই বলল যে আসরটা খুবই সফল হয়েছে। যেসব সুন্দরী সেখানে হাজির হয়েছিল রস্তভ পরিবারের দুই মেয়েই তাদের মধ্যে সেরা সুন্দরী।

নাচ-ঘরে ঢুকেই নাতাশা যেন প্রেমে পড়ে গেল। বিশেষ করে কোন এক জনের প্রেমে নয়, সকলের প্রেমে। যাকে দেখছে সেই মুহূর্তের জন্য তারই প্রেমে পড়ছে।

সোনিয়ার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "আঃ, কী মজা!"

পৃষ্ঠপোষকের সদয় দৃষ্টিতে নাচিয়েদের দেখতে দেখতে নিকলাস ও দেনিসভ

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিল।

দেনিসভ বলে উঠল, "কী মিষ্টি দেখতে,—বড় হলে সত্যিকারের রূপসী হবে!"

"কে?"

"কাউণ্টেস নাতাশা," দেনিসভ জবাব দিল। একটু থেমে বলল, "আর কী নাচে! কী কমনীয়তা!"

"কার কথা বলছ?"

"তোমার বোনের," দেনিসভ রেগে জবাব দিল।

রস্তভ হাসল।

নিকলাসের কাছে এসে ইয়োগেল বলল, "কাউণ্ট, তুমি ছিলে আমার সেরা ছাত্রদের একজন,—তোমাকে নাচতেই হবে। দেখ, কত সব সুন্দরী মেয়ে এসেছে—"দেনিসভকেও সে ওই একই অনুরোধ জানাল; সেও তার প্রাক্তন ছাত্র।

"না বাবা, আমি কাগজের ফুল," দেনিসভ বলল। "আপনার কি মনে নেই আপনার শিক্ষার কি হাল আমি করেছি?"

"আরে না, না, তুমি একটু অমনোযোগী ছিলে এই যা, কিন্তু তোমার ক্ষমতা ছিল,—আরে হ্যাঁ, তোমার মধ্যে ক্ষমতা ছিল!"

সদ্য প্রচলিত মাজুর্কার সুরে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। নিকলাস ইয়োগেলের প্রস্তাব ফেরাতে পারল না। সোনিয়াকে তার সঙ্গে নাচতে বলল। দেনিসভ বয়স্কা মহিলাদের দলে ভিড়ে তলোয়ারে ভর দিয়ে পায়ে তাল দিতে দিতে নানা মজার কথা বলতে লাগল। ইয়োগেল ও তার গর্বের সেরা ছাত্রী নাতাশাই নাচের প্রথম জুটি হল। দেনিসভ তার উপর থেকে চোখ ফেরাল না, তলোয়ার ঠুকে এমনভাবে তাল দিতে লাগল যেন সে বোঝাতে চাইছে সে যে নাচছে না সেটা সে নাচতে পারে না বলে নয়, নাচতে চায় নি বলে। নাচের ফাঁকে একসময় সে রস্তভকে ডেকে বলল:

"এ তো মোটেই হচ্ছে না। এটা কী ধরনের পোলিশ মাজুর্কা? নাতাশা কিন্তু চমৎকার নাচে।"

নিকলাস জানে, পোল্যাণ্ডেও মাজুর্কা নাচে দেনিসভের খুব নাম আছে; নাতাশার কাছে ছুটে গিয়ে বলল, "এবার দেনিসভকে জুটি কর। সে সত্যিকারের নাচিয়ে, অপূর্ব!"

জুটি নির্বাচনের সময় এলে নাতাশা পায়ে পায়ে দেনিসভের কাছে এগিয়ে গেল। নিকলাস দেখল, দেনিসভ ও নাতাশা হেসে হেসে কথা কাটাকাটি করছে; দেনিসভ আপত্তি করলেও খুসিতে হাসছে। সে তাদের কাছে ছুটে গেল।

নাতাশা বলছে, "ভাসিলি দিমিত্রিচ, দয়া করে আসুন।"

"না, না, আমাকে ছেড়ে দিন কাউন্টেস," দেনিসভ জবাবে বলছে।

"এবার ভাস্কা," নিকলাস বলল।

দেনিসভ তামাসা করে বলল, "এরা আমাকে এমনভাবে পিঠ চাপড়ায় যেন আমি একটা বিড়ালছানা ভাসকা!"

নাতাশা বলল, "আমি আপনাকে সারা সন্ধ্যা গান শোনাব।"

"আঃ, স্বর্গের পরী! আমাকে নিয়ে এ দেখছি যা খুসি তাই করতে পারে!"

দেনিসভ তলোয়ার খুলে ফেলল। চেয়ারের পিছন থেকে এগিয়ে এসে শক্ত করে সঙ্গিনীর হাতটা চেপে ধরে সে নাচের তালে ফেলবার অপেক্ষায় পাটা তুলল। দেখতে ছোটখাট হলেও ঘোড়ার পিঠে আর মাজুর্কার আসরে দেনিসভকে মোটেই ছোট মনে হয় না; তখন সে সুদর্শন যুবাপুরুষটি।

যদিও ইয়োগেল তাদের নাচকে আসল মাজুর্কা বলে স্বীকার করল না, তবু দেনিসভের কলাকৌশল দেখে সকলেই খুসি হল, বার বার তার কাছে নাচের জুটি হবার ডাক এল, আর বুড়োরা হেসে হেসে পোল্যাণ্ড ও পুরনো সুদিনের কথা বলতে লাগল। মাজুর্কার শেষে পরিশ্রমে লাল হয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে দেনিসভ নাতাশার পাশে গিয়ে বসল; বাকি সময়টা একবারও তাকে ছেড়ে গেল না।

অধ্যায়—১৩

তারপর দুদিন পর্যন্ত রস্তভ দলখভের দেখাই পেল না—না তার বাড়িতে, না দলখভের বাড়িতে। তৃতীয় দিনে তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল:

"যেহেতু তোমাদের বাড়িতে এখন আর আমি যেতে চাই না—কারণটা তুমি জান—এবং যেহেতু আমি রেজিমেণ্টেই ফিরে যাচ্ছি, তাই আজ রাতে বন্ধুদের জন্য একটা বিদায়-ভোজের আয়োজন করেছি—ইংলিশ হোটেলে এসো।"

পরিবারের লোকজন ও দেনিসভকে নিয়ে রস্তভ থিয়েটার দেখতে গিয়েছিল। প্রায় দশটা নাগাদ সেখান থেকে সোজা চলে গেল ইংলিশ হোটেলে। তাকে সবচাইতে ভাল ঘরটা দেখিয়ে দেওয়া হল। একটা টেবিলকে ঘিরে জনবিশেক লোক একত্র হয়েছে; দুটো মোমবাতির মাঝখানে দলখভ বসে আছে। টেবিলের উপর একগাদা স্বর্ণমুদ্রা ও নোট; সবটাই তার হেপাজতে। তার বিয়ের প্রস্তাবও সোনিয়ার প্রত্যাখ্যানের পরে তার সঙ্গে রস্তভের দেখা হয় নি; তাই রস্তভের কিছুটা অস্বস্তি হতে লাগল।

দলখভ কিন্তু রস্তভ ঘরে ঢুকতেই নির্বিকার চোখে তার দিকে তাকাল।

বলল, "অনেকদিন আমাদের দেখা হয়নি। এসেছ বলে ধন্যবাদ। তাসটা এখনই শেষ হবে, তারপরই শুরু হবে ইলিউশ্‌কার সমবেত সঙ্গীত।"

রস্তভ একটু লাল হয়ে বলল, "দু'একবার তোমার বাড়িতেও ঢুঁ মেরেছি।"

দলখভ কোন জবাব দিল না।

শুধু বলল, "তুমিও খেলতে পার।"

সেই মুহূর্তে দলখভের একটা আশ্চর্য কথা রস্তভের মনে পড়ে গেল; সে বলেছিল, "একমাত্র বোকারা ছাড়া আর কেউ তাসের ভাগ্যে বিশ্বাস করে না।"

যেন রস্তভের মনের কথাটা ধরতে পেরেই দলখভ এবার বলল, "নাকি আমার সঙ্গে খেলতে তোমার ভয় করছে?"

রস্তভ অস্বস্তি বোধ করল। দলখভের কথার জবাবে একটা ঠাট্টা করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। কিন্তু সে কিছু ভেবে উঠবার আগেই দলখভ বলল, "ঠিক আছে, তোমার না খেলাই ভাল।" এক প্যাকেট নতুন তাস "শাফল্" করে বলল: "মশাইরা, টাকা ছাড়ুন!"

সে তাস বাটতে শুরু করল। রস্তভ তার পাশে বসল, প্রথমে খেলায় যোগ দিল না। দলখভ বারবার তার দিকে তাকাতে লাগল।

আর কি আশ্চর্য, নিকলাসও একটা তাস তুলে নিয়ে অল্প কিছু বাজি রেখে খেলতে শুরু করল।

বলল, "আমার সঙ্গে টাকা নেই।"

"তোমাকে আমি বিশ্বাস করি।"

রস্তভ একটা তাসের উপর পাঁচ রুবল বাজি ধরে হেরে গেল, আবার বাজি ধরল, আবার হেরে গেল। রস্তভের দশখানা তাস দলখভ "মেরে" দিল।

খেলা চলতে লাগল; ওয়েটারও শ্যাম্পেন পরিবেশন করে চলল।

রস্তভের সব তাস মার খেল; তার হিসাবে লেখা পড়ল আটশ' রুবল। একটা তাসের উপর সেও লিখল "৮০০ রুবল," কিন্তু ওয়েটার তার গ্লাসটা ভর্তি করে দিতেই সে মত পাল্টে বিশ রুবল বাজির কথাটাই লিখল।

রস্তভের দিকে না তাকিয়েই দলখভ, "ওটা ছেড়ে দাও, অচিরেই তুমি সবটাই জিততে পারবে। আমি অন্যের কাছে হারি, কিন্তু তোমার কাছে জিতে যাই। না কি তুমি আমাকে ভয় কর?" প্রশ্নটা সে আর একবার করল।

রস্তভ তার কথা শুনল। আটশ' বাজি ধরাই স্থির করল। কোণা ছেঁড়া একটা হরতনের সাতকরা মেঝে থেকে তুলে নিয়ে সে টেবিলের উপর রাখল। এই সাতকরাটার কথা তার অনেককাল পর্যন্ত মনে ছিল। একটুকরো ভাঙা চক দিয়ে সেই সাতকরার উপরে সে পরিষ্কার অক্ষরে লিখল "৮০০ রুবল"। হাতের শ্যাম্পেনের গ্লাসটা খালি করে দলখভের কথায় একটু হাসল, তারপর একখানা সাতকরা দেখার আশায় দলখভের হাতের প্যাকেটের দিকে তাকিয়ে ভগ্নহৃদয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। এই হরতনের সাতকরার হার-জিতের উপর রস্তভের অনেককিছু নির্ভর করছে। আগের রবিবারে বুড়ো কাউন্ট

ছেলেকে দু'হাজার রুবল দিয়ে বলেছে, মে মাসের আগে আর কোন টাকা সে দিতে পারবে না, কাজেই রস্তভ যেন হিসাব করে চলে। নিকলাস তখন বলে দিয়েছে, এই টাকাই এখন যথেষ্ট, বসন্তকালের আগে সে আর টাকা চাইবে না। সে টাকার মাত্র বারো শ' রুবল অবশিষ্ট আছে: কাজেই তার কাছে এই হরতনের সাতকরার অর্থ এখন শুধু ষোল শ' রুবল হার নয়, নিজের কথারও খেলাপ।

দলখভ আর একবার বলল, "তাহলে আমার সঙ্গে খেলতে তোমার ভয় নেই?" তারপর যেন একটা ভাল কথা শোনাতে যাচ্ছে এমনিভাবে তাসটা নামিয়ে রেখে চেয়ারে হেলান দিয়ে ইচ্ছা করেই একটু হেসে বলতে শুরু করল:

"দেখুন ভদ্রজনরা, আমি শুনেছি মস্কোতে জোর গুজব যে আমি একজন তাসের জুয়াড়ি, কাজেই আপনাদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি।"

"এবার তাসটা বাট!" রস্তভ হুংকার দিল।

"ওঃ, যতসব মস্কোই গুজব!" বলে দলখভ হেসে তাস তুলে নিল।

"আ-আ!" দুই হাত মাথায় তুলে রস্তভ প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। যে সাতকরাটা তার দরকার সেটা রয়েছে সকলের উপরে—প্যাকেটের প্রথম তাস। যতটা দেবার ক্ষমতা আছে তার বেশী সে হেরেছে।

তাস বাটতে বাটতে বাঁকা চোখে রস্তভের দিকে তাকিয়ে দলখভ বলল, "এখনও সময় আছে, নিজের সর্বনাশ করো না।"

অধ্যায়—১৪

ঘণ্টা দেড়েক পরে অধিকাংশ খেলুড়ের নিজেদের খেলায় কোন আগ্রহ রইল না।

সমস্ত আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হল রস্তভের উপর। ষোল শ' রুবলের পরিবর্তে তার নামে টাকার অংকের একটা লম্বা ফিরিস্তি বসে গেল; তার দশ হাজার পর্যন্ত সে গুণেছিল, কিন্তু তার ধারণা এখন সেটা পনেরো হাজার দাঁড়িয়েছে। আসলে অংকটা ইতিমধ্যেই বিশ হাজার রুবল ছাড়িয়ে গেছে। দলখভ এখন আর কোন গল্প শুনছেও না বলছেও না, সে শুধু লক্ষ্য রাখছে রস্তভের হাতের উপর, আর মাঝে মাঝে তার নামের পাশে লেখা টাকার অংকগুলোর উপর বুলিয়ে নিচ্ছে। স্থির করেছে, অংকটা তেতাল্লিশ হাজারে না ওঠা পর্যন্ত সে খেলা চালিয়ে যাবে। এই সংখ্যাটা বেছে নেবার কারণ, তেতাল্লিশ হচ্ছে তার ও সোনিয়ার বয়সের যোগফল। দুই হাতের উপর মাথা রেখে রস্তভ টেবিলের পাশে বসে আছে; টেবিলের উপর ছড়িয়ে আছে নানা সংখ্যা, ছিটনো রয়েছে মদ, আর ছড়িয়ে আছে তাস। একটা যন্ত্রণাদায়ক চিন্তা কিছুতেই তার মন থেকে যাচ্ছে না: ঐ যে দুটি চওড়া-হাড়ের লালচে হাত

যার লোমশ কব্জি শার্টের আস্তিনের নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে, যে হাত দুটিকে সে ভালবাসে, ঘৃণা করে, তার কবল থেকে সে মুক্তি পাবে না।

রস্তভ বসে বসে ভাবতে লাগল : "সে তো জানে আমার কাছে এই হারের অর্থ কি। আমার সর্বনাশ হোক সেটা নিশ্চয় সে চায় না। একসময় সে কি আমার বন্ধু ছিল না? আমি কি তাকে ভালবাসতাম না? কিন্তু এটা তো তার দোষ নয়। ভাগ্য এত খারাপ হলে সেই বা কি করবে? …আবার আমারও তো দোষ নয়। আমি তো কোন অন্যায় করিনি। আমি কি কাউকে খুন করেছি, অপমান করেছি, কারও ক্ষতি করতে চেয়েছি? তাহলে আমার এই ভয়ংকর দুর্ভাগ্য হল কেন? কখন এর শুরু? আমি তো এই কথা মনে করেই টেবিলে বসেছিলাম যে মামণির নামকরণ দিবসের উপহার হিসাবে একটা অলংকারের বাক্স কিনবার জন্য একশ' রুবল জিতেই এখান থেকে বাড়ি চলে যাব। আমি কত সুখী ছিলাম, কত স্বাধীন ছিলাম, মেজাজ কত হাল্কা ছিল! কখন তা শেষ হয়ে গেল, আর কখনই বা শুরু হল এই ভয়ংকর অবস্থা? এখনও তো আমি সুস্থ ও সবল আছি, তবু তো এভাবে এখানেই বসে আছি। না, এ হতে পারে না! নিশ্চয় এ সব কিছুই বৃথা হয়ে যাবে!"

ঘরটা মোটেই গরম নয়, তবু সে ঘেমে নেয়ে উঠল। তার মুখটা ভয়ংকর ও করুণ হয়ে উঠেছে।

তার নামের পাশের অংকটা দুর্ভাগা তেতাল্লিশ হাজারে পৌঁছে গেল। আর অমনি তাসের প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দলখভ তাড়াতাড়ি রস্তভের ঋণের অংকটা যোগ করতে বসল, এবং মোটা মোটা অক্ষরে লিখতে গিয়ে চকটাই ভেঙে ফেলল।

"রাতের খাবার, রাতের খাবারের সময় হয়েছে! আর এই যে জিপ্‌সিরাও এসে পড়েছে!"

জিপ্‌সি ভাষায় কি যেন বলতে বলতে কতকগুলি কালো কালো পুরুষ ও নারী ঘরে ঢুকল। নিকলাস বুঝল, সব শেষ হয়ে গেল; নির্বিকার গলায় বলল, "আর খেলবে না? আমার হাতে যে একটা চমৎকার তাস এসেছিল।"

সে ভাবল, "সব শেষ! আমার সর্বনাশ হয়েছে! এখন শুধু মস্তিষ্কের ভিতর দিয়ে একটা বুলেট চলে যাবে—এছাড়া আমার জন্য আর কিছুই বাকি নেই!" অথচ সঙ্গে সঙ্গেই সে খুসির সুরে বলে উঠল, "আরে এস, শুধু এই ছোট তাসটা!"

যোগটা শেষ করে দলখভ বলল, "ঠিক আছে! একুশ রুবল!" যোগফলের অংকটা তেতাল্লিশ হাজার থেকে একুশ রুবল বেশী হয়েছে। সে তাসের প্যাকেটটা হাতে নিল। যদিও রস্তভের ইচ্ছা ছিল ছ'হাজার লিখবে, তবু দলখভের কথামত তাসটার একটা কোণ বাঁকিয়ে স্পষ্ট করে লিখল একুশ

রুবল।

বলল, "আমার কাছে সবই সমান। আমি শুধু দেখতে চাই তুমি আমাকে এই দশকরাটা জিততে দাও কি না।"

দলখভ গম্ভীরভাবে তাস বাটতে শুরু করল।…দশকরাটা তার ভাগ্যেই পড়ল।

"তুমি আমার কাছে তেতাল্লিশ হাজার ধার কাউণ্ট," বলে দলখভ শরীরটা টান-টান করে টেবিল থেকে উঠল। "এতক্ষণ বসে থাকলে বড়ই ক্লান্ত লাগে।"

"হ্যাঁ, আমিও খুব ক্লান্ত," রস্তভ বলল।

দলখভ তাকে থামিয়ে দিল ; যেন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে তার পক্ষে এটা ঠাট্টা করার সময় নয়।

"টাকাটা কখন পাচ্ছি কাউণ্ট ?"

লজ্জায় লাল হয়ে রস্তভ টানতে টানতে দলখভকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

"সবটা তো এক্ষুণি দিতে পারছি না। তুমি কি একটা I.Q.U. নেবে ?" সে বলল।

হেসে রস্তভের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে দলখভ বলল, "তুমি তো প্রবাদটা জান—'ভালবাসার ভাগ্য যার ভাল, তার তাসের ভাগ্য খারাপ'। আমি জানি সোনিয়া তোমাকে ভালবাসে।"

"তোমার সম্পর্কিত বোন…" দলখভ কথাটা শুরু করতেই নিকলাস তাকে বাধা দিল। হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার সে বোনের সঙ্গে এ সবের কোন সম্পর্ক নেই, আর তার নাম উল্লেখেরও কোন প্রয়োজন দেখি না ?"

"তাহলে টাকাটা কখন পাচ্ছি ?"

"কাল," বলেই রস্তভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৫

আত্মমর্যাদার অনুকূল সুরে "কাল" বলাটা শক্ত নয়, কিন্তু একাকি বাড়ি ফিরে যাওয়া, বোন, ভাই, মা ও বাবার সঙ্গে দেখা করা, সব কথা স্বীকার করা, এবং কথা দেবার পরেও টাকা চাওয়া—সে বড় ভয়ংকর।

বাড়িতে তখনও কেউ শুতে যায় নি। ছোটরা থিয়েটার থেকে ফিরে রাতের খাওয়া সেরে ক্লাভিকর্ডকে ঘিরে জমে গেছে। এবার শীতকালে রস্তভ-পরিবারে ভালবাসার যে কাব্যিক আবহাওয়া ছড়িয়ে আছে, ঘরে ঢোকামাত্রই সেই আবহাওয়া রস্তভকে ঘিরে ধরল ; কিন্তু এখন দলখভের বিয়ের প্রস্তাব ও ইয়োগেলের নাচের আসরের পরে সেই আবহাওয়া ঝড়ের

আগেকার বাতাসের মত সোনিয়া ও নাতাশাকে ঘিরে ঘন হয়ে নেমেছে। তারা দুজন ক্ল্যাভিকর্ডের পাশে দাঁড়িয়ে খুসিতে হাসছে। বসবার ঘরে ভেরা শিন্‌শিনের সঙ্গে দাবা খেলছে। স্বামী ও পুত্রের ফিরে আসার প্রতীক্ষায় বুড়ি কাউণ্টেস আর একটি বুড়ির সঙ্গে পেশেন্স খেলছে। ঝিল্‌মিল্‌ চোখও এলোমেলো চুল নিয়ে দেনিসভ ক্ল্যাভিকর্ডে বসে তারে আঙুল নাড়ছে আর "যাদুকরী" শীর্ষক নিজের রচিত কবিতায় সুর দিয়ে গাইতে চেষ্টা করছে।

"বল যাদুকরী, আমার পরিত্যক্ত বীণায়
কোন্‌ যাদু শক্তি আজও আমাকে ডাকে ?
কোন্‌ শিখা আগুন জ্বেলেছে আমার অন্তরে,
আর কোন্‌ সে আনন্দে শিউরে উঠছে আমার অঙ্গুলি ?"

ভীত ও আনন্দিত নাতাশার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গে সে গেয়ে চলেছে।

নাতাশা বলে উঠল, "অপূর্ব ! চমৎকার ! আর একটা কবিতা হোক।" নিকলাসের উপস্থিতি তার নজরে পড়ে নি।

নিকলাস ভাবল, "এরা সকলেই আগের মতই আছে।"

"আরে, নিকলাস এসেছে !" বলতে বলতে নাতাশা তার কাছে ছুটে গেল।

"বাপি বাড়ি ফিরেছে ?" সে শুধাল।

তার কথার জবাব না দিয়ে নাতাশা বলল, "তুমি আসায় খুব খুসি হয়েছি। আমরা কত মজা করছি ! ভাসিলি দিমিত্রিচ আমার জন্যই একদিন বেশী থাকছে ! তুমি জানতে ?"

"না, বাপি এখনও ফেরেনি ," সোনিয়া বলল।

বসবার ঘর থেকে বুড়ি কাউণ্টেস ডেকে বলল, "নিকলাস এসেছ ? এখানে এস সোনা !"

নিকলাস মার কাছে গেল, তার হাতে চুমো খেল, পাশে বসে নীরবে হাতের তাসগুলো দেখতে লাগল। নাচ-ঘর থেকে ভেসে এল হাসির হর্‌রা ; সকলে নাতাশাকে গাইতে বলছে।

দেনিসভ চেঁচিয়ে বলছে, "ঠিক আছে ! ঠিক আছে। ওজুহাত দেখালে চলবে না। এবার তোমার গাইবার পালা—আমি মিনতি করছি !"

কাউণ্টেস ছেলের দিকে তাকাল।

"ব্যাপার কি ?" সে শুধাল।

অনবরত একই প্রশ্ন শুনে ক্লান্ত হয়ে নিকলাস বলল, "ও কিছু না। বাপি কি শিগ্‌গিরই ফিরবে ?"

"আশা তো করছি।"

"এরা সেইরকমই আছে। এ ব্যাপারে কিছুই জানে না। আমি কোথায়

যাই ? ভাবতে ভাবতে নিকলাস আবার নাচের ঘরেই ফিরে গেল।

সোনিয়া ক্ল্যাভিকর্ডে বসে দেনিসভের একটা প্রিয় সুর বাজাচ্ছে। নাতাশা গানের জন্য তৈরি হচ্ছে। মুগ্ধ চোখে দেনিসভ তার দিকে তাকিয়ে আছে।

নিকলাস পায়চারি করতে লাগল।

"ওরা কেন ওকে গাইতে বলছে ? ও কেমন করে গাইবে ? খুসি হবার তো কোন কারণ নেই," নিকলাস ভাবতে লাগল।

সোনিয়ার হাতে প্রথম সুর বেজে উঠল।

"হে ঈশ্বর, আমি তো সর্বস্বান্ত, সম্মানহীন একটা মানুষ ! আমার জন্য তো আছে শুধু মাথাটাকে বুলেটে বিদ্ধ করা—গান নয় !" তার চিন্তার গতি দ্রুততর হল। "চলে যাও ! কিন্তু কোথায় যাব ? সব সমান—ওদের গাইতে দাও !"

বিষণ্ণ চোখে দেনিসভও মেয়েদের দিকে তাকিয়ে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

সোনিয়ার চোখ তার উপর নিবদ্ধ; সে যেন জানতে চাইছে: "নিকোলেংকা, ব্যাপার কি ?" আর সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া বুঝতে পারল তার একটা কিছু ঘটেছে।

নিকলাস তার কাছ থেকে সরে গেল। নাতাশাও নিজের থেকেই বুঝতে পারল তার দাদার অবস্থা। কিন্তু ব্যাপারটা খেয়াল করলেও তার নিজের মন-মেজাজ তখন খুসির এতই উচ্চগ্রামে বাঁধা যে অন্যের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তার নেই। সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেকে বোঝাল: "না, আমারই ভুল, সেও নিশ্চয় আমার মতই খুসি।"

নাতাশা গাইতে শুরু করল, তার গলাটা ফুলে উঠল, বুক দুলে উঠল, চোখের দৃষ্টিতে গাম্ভীর্য দেখা দিল। সেই শীতকালেই নাতাশা প্রথম আন্তরিকতার সঙ্গে গাইতে শুরু করল, কারণ তার গান দেনিসভের বড় ভাল লাগে। এখন আর সে শিশুর মত গায় না, তার গানে আগেকার মত ছেলেমানুষী হাস্যকর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না; কিন্তু তাই বলে সে যে এখন ভাল গায় তাও নয়; সঙ্গীতজ্ঞ যে মানুষই তার গান শোনে সেই বলে: "গলায় কাজ নেই কিন্তু স্বরটা বড় ভাল, তালিম নেওয়া দরকার।"

চোখ মেলে তার গান শুনতে শুনতে নিকলাস ভাবল, "এটা কি ব্যাপার ? ওর হয়েছে কি ? আজ কী সুন্দর গাইছে !" আর সহসা সারা জগৎ যেন তার সঙ্গে এক হয়ে পরবর্তী সুরলহরীর জন্য প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে উঠল; সারা জগৎ যেন তিনটে তালে ভাগ হয়ে গেল: এক, দুই, তিন···এক, দুই, তিন ! নিকলাসের মনে হল, "আঃ, আমাদের জীবন কত অর্থহীন ! এই দুঃখকষ্ট, এই টাকাপয়সা, আর দলখভ, ক্রোধ, সম্মান—সবই অর্থহীন ! ···কিন্তু এই তো সত্য···এই নাতাশা···আদরের নাতাশা !"

তারের কি রণণ-ঝনন, আর রস্তভের অন্তরের মধ্যে যা কিছু সূক্ষ্ম তার কী আলোড়ন! আর এই যা কিছুই তো পৃথিবীর অন্য সব কিছু থেকে আলাদা, সব কিছুর উপরে। "হার-জিত, দলখত, প্রতিশ্রুতি—সে সবের কী মূল্য? …সব অর্থহীন! খুন করে, ডাকাতি করেও মানুষ সুখী হতে পারে…"

অধ্যায়—১৬

সেদিন রস্তভ সঙ্গীত থেকে যে সুখ পেল অনেকদিন তা পায় নি। কিন্তু নাতাশার মুখে নৌকোর গান শেষ হতে না হতেই আবার মাথা তুলল কঠিন বাস্তব। কোন কথা না বলে সে সিঁড়ি বেয়ে নিজের ঘরে নেমে গেল। পনেরো মিনিট পরে বুড়ো কাউণ্ট ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরল খুসি মন নিয়ে। তার গাড়ির শব্দ শুনে নিকলাস তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

আনন্দে ও গর্বে হাসতে হাসতে বুড়ো কাউণ্ট বলল, "এই—বেশ ভাল কাটল তো?"

নিকলাস "হ্যাঁ" বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; প্রায় কেঁদে ফেলবার মত অবস্থা হল তার। কাউণ্ট তখন পাইপটা ধরাচ্ছিল, ছেলের অবস্থা তার চোখে পড়ল না।

প্রথম ও শেষবারের মত নিকলাস ভাবল, "না, একথা এড়ানো যাবে না!" আর যেন কথা প্রসঙ্গে হঠাৎই বলে উঠল, "বাপি, আমি একটা কাজে এসেছি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমার কিছু টাকার দরকার।"

বাবার মেজাজ বেশ খুসি ছিল; বলল, "বাপু হে, আমি তো বলেছিলাম ওতে হবে না। কত চাই?"

"অনেক," নিকলাস লজ্জায় লাল হয়ে বোকার মত হেসে বলল, "আমি কিছু টাকা হেরেছি, মানে বেশকিছু, অনেক টাকা—তেতাল্লিশ হাজার।"

"কী! কার কাছে? …যতসব!" কাউণ্ট চেঁচিয়ে বলল; বুড়োদের যেমন হয়ে থাকে, হঠাৎ তার গলা ও ঘাড়ের নীচটা লাল হয়ে উঠল।

"আমি কথা দিয়েছি কাল টাকাটা দেব," নিকলাস বলল।

দুই হাত ছড়িয়ে অসহায়ভাবে সোফার উপর বসে পড়ে বুড়ো কাউণ্ট বলল, "বটে! …"

"কোন উপায় ছিল না! সকলেরই এরকম ঘটে," জোরালো সহজ সুরে ছেলে কথাটা বলল, যদিও মর্মে মর্মে সে বুঝতে পারছে যে সে একটা অক্ষম শয়তান, সারা জীবনেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে করতে পারবে না। তার ইচ্ছা হল বাবার হাতে চুমো খায়, নতজানু হয়ে তার মার্জনা ভিক্ষা করে, কিন্তু উদাসীন রুক্ষ গলায় বলে ফেলল, "এমন তো সকলেরই ঘটে!"

ছেলের কথা শুনে বুড়ো কাউণ্ট চোখ নামাল, ব্যস্ত হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগল।

তো-তো করে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক ; কিন্তু আমার আশংকা হচ্ছে এত টাকা যোগাড় করা শক্ত হবে⋯সকলেরই ঘটে! ঠিক, এ কাজ কে না করেছে ?"

ছেলের মুখের দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাউন্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ⋯নিকলাস একটা প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিল, এটা সে আশা করে নি।

"বাপি! বা—পি!" ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে ডাকতে ডাকতে সে বাবার পিছু নিল, "আমাকে ক্ষমা কর!" বাবার হাতটা চেপে ধরে নিজের ঠোঁটের উপর ছুঁইয়ে সে কেঁদে ফেলল।

* * *

বাবা ও ছেলের মধ্যে যখন বোঝাপড়া চলছে, তখন মা ও মেয়ের মধ্যেও চলছে আর একটা গুরুতর ব্যাপার।

"মামণি! ⋯মামণি! ⋯সে আমার কাছে⋯"

"তোমার কাছে কি ?"

"আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে মামণি! মামণি!" মেয়ে বলল।

কাউণ্টেস নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। দেনিসভ বিয়ের প্রস্তাব করেছে। কার কাছে? এই ছেলেমানুষ নাতাশার কাছে যে এই সেদিনও পুতুল নিয়ে খেলেছে, যে এখনও লেখাপড়া শিখছে।

মেয়ে তামাসা করছে ভেবে সে বলল, "ও-কথা বল না নাতাশা! যত সব বাজে কথা!"

"বাজে কথা! বটে! আমি খাঁটি কথাই বলছি," নাতাশা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল।

"তোমার কাছে এলাম আমি কি করব তা জানতে, আর তুমি বলছ বাজে কথা!"

কাউণ্টেস কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"মঁসিয়ে দেনিসভ যদি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করে থাকে তো তাকে বলে দিও সে একটি মূর্খ, বাস্!"

"না, সে মূর্খ নয়!" নাতাশা ক্ষোভের সঙ্গে জবাব দিল।

বেশতো, তুমি কি চাও? আজকাল দেখছি তোমরা সকলেই প্রেম করছ। বেশ তো, তুমি যদি তাকে ভালবেসে থাক তো বিয়ে করে ফেল!" বিরক্তির হাসি হেসে কাউণ্টেস বলল। "তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হোক!"

"না মামণি, আমি তার প্রেমে পড়ি নি, আমার মনে হয় আমি তার প্রেমে পড়িনি।"

"বেশ তো, সেই কথা তাকে বলে দাও।"

"মামণি, তুমি রাগ করেছ? রাগ করো না! এটা কি আমার দোষ?"

"না, কিন্তু ব্যাপারটা কি সোনা? তুমি কি চাও যে আমি গিয়ে তাকে বলি?" কাউণ্টেস হেসে বলল।

"না, যা করার আমিই করব, তুমি শুধু বলে দাও কি বলব " নাতাশাও হেসে বলল, "তুমি কত ভাল মামণি। সে যে কিভাবে কথাটা বলেছে সেটা তুমি দেখলে ভাল হত। আমি জানি এ-কথা সে বলতে চায় নি, হঠাৎই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে।"

"সে যাই হোক, তুমি তাকে ফিরিয়ে দাও।"

"না, তা পারব না। তারজন্য আমার দুঃখ হয়। সে কত ভাল!"

"বেশ তো, তার প্রস্তাব গ্রহণ কর। তোমার তো বিয়ের বয়সই হয়েছে," কঠিন বিদ্রূপের সুরে কাউণ্টেস বলল।

"না মামণি, তারজন্য আমি দুঃখিত। কি করে তাকে কথাটা বলব আমি জানি না।"

"তোমার বলারও কিছু নেই। আমি নিজেই তাকে বলব।" ছোট্ট নাতাশার সঙ্গে ওরা প্রাপ্তবয়স্কার মত ব্যবহার করেছে দেখে কাউণ্টেস ক্ষুব্ধ হয়েছে।

"না। কোন মতেই না! আমি নিজেই তাকে বলব, আর তুমি দরজা থেকে শুনবে।"

নাতাশা একদৌড়ে বসবার ঘর পেরিয়ে নাচ-ঘরে ঢুকল। দেনিসভ তখনও দুই হাতের উপর মাথা রেখে ক্লাভিকর্ডের পাশে চেয়ারে বসে আছে।

হাল্কা পায়ের শব্দ শুনে সে লাফিয়ে উঠল।

দ্রুত পায়ে নাতাশার দিকে এগিয়ে বলল, "নাতালী, আমার ভাগ্য স্থির কর। সবই তোমার হাতে।"

"ভাসিলি দিমিত্রিচ। তোমার জন্য আমি দুঃখিত!…না, তুমি এত ভাল …কিন্তু এ হয় না……না……কিন্তু বন্ধু হিসাবে আমি চিরদিন তোমাকে ভালবাসব।"

দেনিসভ তার হাতের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল; নাতাশার কানে এমন সব বিচিত্র শব্দ এল যার অর্থ সে বুঝল না। দেনিসভের কোঁকড়া কালো চুলে ভর্তি মাথায় সে চুমো খেল। সেই মুহূর্তে তারা কাউণ্টেসের পোশাকের খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেল। কাউণ্টেস দুজনের দিকে এগিয়ে গেল।

"ভাসিলি দিমিত্রিচ, এই সম্মান দেওয়ার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই" বিব্রত গলায় কাউণ্টেস বলল, যদিও দেনিসভের কানে তা কঠোর শোনাল "কিন্তু আমার মেয়ের বয়স এত অল্প, আর আমি মনে করি আমার ছেলের বন্ধু হিসাবে প্রস্তাবটা আগে আমার কাছে পেশ করাই তোমার উচিত ছিল। তাহলে আর তোমাকে এভাবে প্রত্যাখ্যান জানাবার সুযোগ আমাকে দিতে হত না।"

অপরাধীর মত মুখ করে চোখ নামিয়ে দেনিসভ বলল, "কাউণ্টেস…।" সে আরও কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না।

তার এই অবস্থা দেখে নাতাশা শান্ত থাকতে পারল না; ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অস্থির গলায় দেনিসভ বলতে লাগল, "কাউন্টেস, আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনার মেয়েকে ও আপনাদের পরিবারের সকলকে আমি শ্রদ্ধা করি যে দরকার হলে দু'বার জীবন দিতেও···সে কাউন্টেসের দিকে তাকাল, কিন্তু তার কঠোর মুখ দেখে বলল, "আচ্ছা, তাহলে বিদায় কাউন্টেস;" কাউন্টেসের হাতে চুমো খেয়ে দেনিসভ স্থির দ্রুত পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, নাতাশার দিকে ফিরেও তাকাল না।

* * *

পরদিন রস্তভ দেনিসভকে বিদায় দিল। আর একটা দিনও দেনিসভ মস্কোতে থাকতে চাইল না। তার সব মস্কোর বন্ধুরা তাকে একটা বিদায় সম্বর্ধনা জানাল জিপসিদের আস্তানায়, আর তার ফলে কিভাবে তাকে স্লেজে তুলে দেওয়া হল অথবা যাত্রাপথের প্রথম তিনটে ঘাঁটি কিভাবে পার হল—সে সবকিছুই সে পরবর্তীকালে মনে করতে পারত না।

দেনিসভ চলে যাবার পরে রস্তভ আরও এক পক্ষকাল মস্কোতে কাটাল; কখনও বাড়ি থেকে বের হল না, বাবা টাকাটা সঙ্গে সঙ্গে যোগাড় করতে না পারায় টাকাটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, এবং বেশীর ভাগ সময় কাটাতে লাগল মেয়েদের ঘরে।

তার প্রতি সোনিয়ার আদর ও অনুরাগ আগের চাইতেও বেড়েছে। সে যেন রস্তভকে বোঝাতে চায় তার অনেক ক্ষতি হয়েছে বলেই সোনিয়া তাকে আরও বেশী ভালবাসছে, কিন্তু নিকলাস ভাবছে এখন সে সোনিয়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

কবিতায় ও গানে সে মেয়েদের অ্যাল্‌বামগুলি ভরে দিল, এবং শেষ পর্যন্ত পুরো তেতাল্লিশ হাজার রুবল দলখভকে পাঠিয়ে দিয়ে একটা রসিদ নিয়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে পরিচিত কারও কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে সে তার রেজিমেণ্টটাকে ধরবার জন্য যাত্রা করল। রেজিমেণ্ট ইতিমধ্যেই পোল্যাণ্ডে পৌঁছে গেছে।

চতুর্থ পর্ব সমাপ্ত

পঞ্চম পর্ব

অধ্যায়—১

স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পরেই পিয়ের পিতার্সবুর্গ যাত্রা করল। তর্ঝ'ক ডাক-ঘাঁটিতে হয় ঘোড়া ছিল না, আর না হয় তো ঘাঁটিদার তাকে ঘোড়া দিতে রাজী হল না। বাধ্য হয়ে পিয়েরকে অপেক্ষা করতে হল। পোশাক না ছেড়েই সে গোল টেবিলটার সামনে একটা চামড়ার সোফায় শুয়ে পড়ল: ওভার-বুট পরা পা দুটো টেবিলের উপর তুলে দিয়ে ভাবতে লাগল।

খানসামা এসে বলল, "আপনার পোর্টম্যাণ্টোটা ভিতরে এনে দেব কি? আর বিছানাটা ঠিক করে চা এনে দেব কি?"

পিয়ের জবাব দিল না, কারণ কোন কথাই তার কানে ঢোকে নি, বা কিছুই সে চোখেও দেখে নি। শেষ ঘাঁটি থেকেই সে ভাবতে শুরু করেছে এবং সেই একই কথা এখনও ভাবছে—কথাটা এতই গুরুতর যে চারদিকের কোন কিছুই তার খেয়াল নেই। পিতার্সবুর্গে পৌছতে দেরি হবে কি না, এ-ঘাঁটিতে থাকার ব্যবস্থা জুটবে কি না, সে ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন তো বটেই, এমন কি তার মনের মধ্যে এখন যেসব চিন্তা চলেছে তার তুলনায় তাকে এখানে আরও কয়েক ঘণ্টাই থাকতে হোক আর বাকি জীবনটাই কাটাতে হোক তাতে তার সামান্যই যায়-আসে।

ঘাঁটিদার, তার স্ত্রী, খানসামা ও তর্ঝ'ক-এর সূচের কাজ-করা পোশাক বিক্রেতা একটি চাষী স্ত্রীলোক—সকলেই ঘরে ঢুকে তার কিছু কাজ করে দিতে চাইল। নিজের নিস্পৃহ মনোভাবের কোনরকম পরিবর্তন না করে পিয়ের চশমার ভিতর দিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল, সে যেন বুঝতেই পারছে না তার নিজের এতবড় একটা সমস্যার মীমাংসা না হওয়া সত্ত্বেও তারা বেঁচে আছে কেমন করে। দ্বৈত যুদ্ধের পরে সকোলনিকি থেকে ফিরে এসে প্রথম যন্ত্রণাদগ্ধ বিনিদ্র রাত কাটাবার পর থেকে এই একই চিন্তার মধ্যে সে ডুবে আছে। কিন্তু এখন যাত্রাপথের নির্জনতার সুযোগে সেই চিন্তা যেন আরও জোরে তাকে চেপে ধরেছে। যাই ভাবুক না কেন, বারে বারে সেই একই সমস্যায় সে ফিরে আসছে যার কোন মীমাংসা করতে পারছে না, অথচ তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তাও ছাড়তে পারছে না। এখন যে মূল স্ক্রুটা তার জীবনকে একত্রে ধরে রেখেছে তার খাঁজটা কেটে গেছে, আর তার ফলে স্ক্রুটা না ভিতরে ঢুকছে, না বেরিয়ে আসছে, একই জায়গায় বৃথাই ঘুরে মরছে।

ঘাঁটিদার এসে সবিনয়ে জানাল, হিজ এক্সেলেন্সি আর মাত্র দুটি ঘণ্টা অপেক্ষা করুন, তাহলেই যেমন করে হোক সে তাকে দুটো ডাক-ঘোড়া জুটিয়ে দেবে। পরিষ্কার বোঝা গেল, লোকটা মিথ্যে কথা বলছে; সে শুধু চাইছে যাত্রীর কাছ থেকে আরও কিছু টাকা বাগাতে।

পিয়ের নিজেকেই প্রশ্ন করল, "এটা কি ভাল, না মন্দ? আমার পক্ষে ভাল, আর অপর একটি যাত্রীর পক্ষে মন্দ, আর তার নিজের পক্ষে এটা অনিবার্য, কারণ খাদ্য-সংগ্রহের জন্য তার টাকার দরকার; লোকটি বলেছে, একবার কোন যাত্রীকে ডাক-ঘোড়া দেওয়ার জন্য একজন অফিসার তাকে পিটুনি দিয়েছিল। অফিসার পিটুনি দিয়েছিল কারণ গন্তব্যস্থানে যাবার তার তাড়া ছিল। আবার আমি দলখভকে গুলি করেছিলাম কারণ আমার মনে আঘাত লেগেছিল, আর ষোড়শ লুইকে মেরে ফেলা হয়েছিল কারণ সকলে তাকে অপরাধী মনে করেছিল, আবার এক বছর পরে যারা তাকে মেরেছিল তাদেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল—অথচ কারণটা একই। কি মন্দ? কি ভাল? কাকে ভালবাসব, আর কাকে ঘৃণা করব? কিসের জন্য বেঁচে থাকা? আর আমিই বা কি? জীবন কি, আর মৃত্যু কি? কোন্ সে মহাশক্তি যা সকলকে শাসন করে?"

একটি ভিন্ন এসব প্রশ্নের আর কোন জবাব নেই, আর সেটাও কোন যুক্তি-সঙ্গত জবাব নয়, অথবা এসব প্রশ্নের কোন জবাবই নয়। জবাবটা হল: "তোমার মৃত্যু হবে, আর সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। তুমি মরবে, আর সবকিছু জানবে অথবা সব প্রশ্ন থেমে যাবে।" কিন্তু মৃত্যুও তো ভয়ংকর।

ফেরিওয়ালী কর্কশ গলায় তার মালপত্র বিশেষ করে ছাগলের চামড়ার একজোড়া চটি তাকে দেখাল। পিয়েরের মন বলল: "আমার একশ' রুবল, আর তা দিয়ে কি করব তা আমি জানি না, আর এই মেয়েটি ছেঁড়া পোশাক পরে সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আর কেন সে টাকা চাইছে? একচুল সুখ বা মনের শান্তিও তো এ টাকায় সে পাবে না। জগতের কোন কিছুই কি ওকে বা আমাকে পাপ ও মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে? —যে মৃত্যুতে সবকিছু শেষ হয়ে যায় এবং আজ হোক কাল হোক যে মৃত্যু আসবেই—আর যাই হোক, অনন্ত কালের তুলনায় মুহূর্তের মধ্যেই আসবে।" বার বার সে খাঁজ কেটে-যাওয়া স্ক্রুটাকে ঘোরাতে লাগল, আর বার বার সেটা একই জায়গায় বৃথাই ঘুরতে লাগল।

মাদাম দ্য সুজার লেখা একটা উপন্যাস চাকর তাকে দিয়ে গেল। আর সেও জনৈকা এমিলি দ্য মাঁসফেল্দ-এর যন্ত্রণা ও সংগ্রামের কাহিনীটা পড়তে শুরু করল। ভাবতে লাগল: "যে প্রেমিক তাকে ভুলিয়ে এনেছিল তাকে যখন সে ভালই বাসত তাহলে তাকে বাধা দিল কেন? ঈশ্বর নিশ্চয়ই তার অন্তরে তার ইচ্ছাবিরুদ্ধ কোন আবেগকে ঢুকিয়ে দেন নি। আমার স্ত্রী—

একদিন তাই সে ছিল—কিন্তু বাধা দেয় নি, আর হয় তো সেই ঠিক কাজ করেছে। ""কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় নি, কিছু আবিষ্কার করা যায় নি। আমরা শুধু এইটুকুই জানতে পারি যে আমরা কিছুই জানি না। মানুষের জ্ঞানের সেটাই উচ্চতম সীমা।"

তার ভিতরে-বাইরে যাকিছু সবই মনে হচ্ছে গোলমেলে, অর্থহীন, পাল্টা আঘাতকারী। তবু সবকিছুর প্রতি এই ঘৃণার মধ্যেই যেন পিয়ের এক-ধরনের আশা-নিরাশাভরা সন্তুষ্টি খুঁজে পেল।

ঘাঁটিদার ঘরে ঢুকল; তার সঙ্গে অপর একজন যাত্রী; ঘোড়ার অভাবে সেও আটকা পড়েছে। সে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সিকে অনুরোধ করছি, এই ভদ্রলোকের দিকে একটু মুখ তুলে তাকান।"

নবাগত লোকটি ছোটখাট দেখতে, হাড়গুলো মোটা, মুখটা হল্‌দে, বলীরেখায় ভর্তি, ঘন সাদা ভুরু উজ্জ্বল ধূসর চোখ দুটির উপর ঝুলে পড়েছে।

পিয়ের টেবিলের উপর থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল, তারপর বিছানায় শুয়ে নবাগত লোকটির দিকে মাঝে মাঝে তাকাতে লাগল। নবাগত যাত্রীটির হাড়-বেরকরা সরু পায়ে বুট পরা, গায়ে কাপড়ে ঢাকা ছাগলের চামড়ার জীর্ণ কোট; সোফার উপর বসে মস্তবড় মাথাটাকে পিছনে হেলান দিয়ে সে বেজুকভের দিকে তাকাল। তার কঠোর, তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি পিয়েরকে বিচলিত করে তুলল। নবাগত লোকটির সঙ্গে তার কথা বলার ইচ্ছা হল, কিন্তু রাস্তা সম্পর্কে কিছু জানতে মুখ খুলবার আগেই সে তার চোখ দুটি বুজে ফেলল। তার পাকানো হাত দুটো ভাঁজ করা; এক হাতের আঙুলে যমের মুণ্ডু খোদাই করা একটা ঢালাই লোহার বড় আংটি পিয়েরের নজরে পড়ল। লোকটি চুপচাপ বসে রইল; হয় বিশ্রাম নিচ্ছে, আর না হয় তো কোন গভীর চিন্তায় ডুবে আছে। তার চাকরটিরও হল্‌দে চেহারা, বলীরেখাংকিত মুখ, দাড়ি বা গোঁফ কোনটাই নেই; মুখটা যে কামানো তা নয়, আসলে দাড়ি-গোঁফই গজায় নি। বুড়ো চাকরটি রান্নার সরঞ্জাম বের করে চা তৈরি করতে ব্যস্ত। নিয়ে এল একটা ফুটন্ত সামোভার। সব তৈরি। আগন্তুক চোখ মেলে টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল, একটা গ্লাসে নিজের জন্য চা ঢালল, আর দাড়িগোফবিহীন বুড়ো মানুষটির দিকে এগিয়ে দিল আর একটা চা-ভর্তি গ্লাস। পিয়ের কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল; মনে হল এই অপরিচিত লোকটির সঙ্গে কথাবার্তা বলা শুধু দরকারীই নয়, একেবারে অনিবার্য হয়ে উঠেছে।

চাকরটি তার গ্লাসটা উপুড় করে একটুকরো চিনি সহ সেটা ফিরিয়ে দিয়ে (রুশ ভূমিদাস ও চাষীদের মধ্যে এটাই প্রচলিত প্রথা।) জানতে চাইল, আর কিছু চাই কি না।

আগন্তুক বলল, "না। বইটা দাও।"

চাকর একটা বই এগিয়ে দিল। যাত্রীটিও তার মধ্যে ডুবে গেল। পিয়েরের মনে হল বইখানা ভক্তিমূলক। সে লোকটির দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক একটা পৃষ্ঠা-নির্দেশিকা রেখে বইটা বন্ধ করল, এবং সোফার উপর দুই হাত রেখে তার উপর মাথাটা হেলিয়ে আগের মতই চোখ বন্ধ করে বসে রইল। পিয়ের তার দিকেই তাকিয়ে রইল। বুড়ো লোকটি চোখ মেলল; স্থির, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরের মুখের দিকে তাকাল।

পিয়ের বিচলিত বোধ করল; সে-দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে চাইল; কিন্তু সে দুটি উজ্জ্বল প্রবীণ চোখের দৃষ্টির আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য।

অধ্যায়—২

"আমার যদি ভুল না হয়ে থাকে তো আমি নিশ্চয় কাউণ্ট বেজুখভের সঙ্গেই কথা বলছি," আগন্তুক ইচ্ছা করেই উঁচু গলায় বলল।

পিয়ের নিঃশব্দে চশমার উপর দিয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

আগন্তুক আবার বলল, "আপনার কথা, আপনার দুর্ভাগ্যের কথা আমি শুনেছি স্যার।" লোকটি শেষের কথাটার উপরেই জোর দিল।

পিয়েরের মুখ লাল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে পা নামিয়ে জোর করে ঈষৎ হেসে বুড়োটির দিকে ঝুঁকে বসল।

"নেহাৎ কৌতূহল বশেই আমি এ-কথা বলছি না স্যার, বলার গুরুতর কারণ আছে।"

লোকটি থামল; তার দৃষ্টি তখনও পিয়েরের উপর নিবদ্ধ; যেন তাকে নিজের পাশে বসবার ইঙ্গিত দিতেই লোকটি সোফার এক পাশে সরে বসল। বুড়ো মানুষটির সঙ্গে আলাপ জমাবার ইচ্ছা পিয়েরের ছিল না, তবু অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তার ইচ্ছামতই উঠে গিয়ে তার পাশে বসল।

আগন্তুক বলতে লাগল, "আপনি বড়ই দুঃখী স্যার। আপনি যুবক আর আমি বৃদ্ধ। সাধ্যমত আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই।"

জোর করে হেসে পিয়ের বলল, "তা বেশ তো! আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ। কোথা থেকে আসছেন?"

আগন্তুকের মুখটা সদয় নয়, বরং নিস্পৃহ ও কঠোর, কিন্তু তা সত্ত্বেও নব-পরিচিত লোকটির মুখ ও কথা পিয়েরকে দুর্বার শক্তিতে আকর্ষণ করল।

বুড়ো বলল, "কিন্তু যেকোন কারণেই হোক আমার সঙ্গে আলাপ করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তো বলুন।" সহসা তার মুখে একটা অপ্রত্যাশিত পিতৃসুলভ হাসি ফুটে উঠল।

"না, না, মোটেই তা নয়! বরং আপনার সঙ্গে পরিচয় ঘটায় আমি খুব খুসি হয়েছি।" পিয়ের আর একবার লোকটির আঙুলের মাথার খুলি খোদাই-

করা আংটিটার দিকে তাকাল—খোদাইটা ভ্রাতৃসংঘের প্রতীক।

সে বলল, "মাফ করবেন, আপনি কি একজন সংঘ-সদস্য ?"

"হ্যাঁ, স্বাধীন ভ্রাতৃসংঘের আমি একজন," পিয়েরের চোখের আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করে আগন্তুক বলল। "আর তাদের হয়ে, আমার নিজের হয়ে এই ভ্রাতৃত্বের হাত আপনার দিকে বাড়িয়ে ধরলাম।"

এই লোকটির ব্যক্তিত্ব তাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আবার ভ্রাতৃসংঘের ধ্যান-ধারণাগুলিকে উপহাস করতেই সে অভ্যস্ত ; এই দুই মনোভাবের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় পিয়ের হেসে বলল, "আমার ভয় হচ্ছে আপনাদের আমি ঠিক বুঝতে—কিভাবে যে কথাটা বলব—আমার ভয় হচ্ছে, জগতের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গী আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীর এতই বিপরীত যে আমরা পরস্পরকে বুঝতেই পারব না।"

লোকটি বলল, "আপনার দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমি জানি ; আর যে জীবনযাত্রার কথা আপনি বলছেন, যাকে আপনার মানসিক প্রচেষ্টার ফল বলে আপনি মনে করেন, অধিকাংশ মানুষ সেই জীবন-পথেরই পথিক, আর সেটা অহংকার, আলস্য ও অজ্ঞতারই অনিবার্য ফল। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার, তবে এ-কথা নিজে না জানলে কখনও আপনাকে বলতাম না। জীবন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিকোণ একটি শোচনীয় ভ্রান্তি মাত্র।"

মৃদু হেসে পিয়ের বলল, "ঠিক যেরকম আমি মনে করি যে আপনি ভ্রান্ত।"

"আমি সত্যকে জেনেছি এ-কথা বলার স্পর্ধা আমার নেই," লোকটি বলল ; তার কথার যাথার্থ্য ও দৃঢ়তা ক্রমেই পিয়েরের মনের উপর বেশী করে দাগ কাটতে শুরু করেছে। "নিজের চেষ্টায় কেউই সত্যে পৌঁছতে পারে না। আদি পুরুষ আদমের কাল থেকে শুরু করে আমাদের এই কাল পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমবেত প্রচেষ্টায় একটার পর একটা পাথর বসিয়ে তবে তৈরি হয় সেই মন্দির যেখানে পাতা হবে মহান ঈশ্বরের যোগ্য পাদপীঠ," দুই চোখ বুজে লোকটি বলল।

সত্য কথাটা বলা উচিত মনে করেই যেন দুঃখের সঙ্গে পিয়ের বলল, "আমি বলতে চাই যে ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই···আমি···"

লোকটি পিয়েরের দিকে তাকিয়ে করুণার হাসি হাসল ; বলল, "ঠিক কথা, আপনি তাঁকে জানেন না স্যার। তাঁকে জানতে আপনি পারেন না। আর তাঁকে জানেন না বলেই আপনি দুঃখী।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দুঃখী," পিয়ের কথাটা মেনে নিল। "কিন্তু আমি কি করব ?"

"আপনি তাঁকে জানেন না স্যার, আর তাই আপনি এত দুঃখী। আপনি তাঁকে চেনেন না, কিন্তু তিনি এখানেই আছেন, আছেন আমার মধ্যে, আছেন আমার কথায়, আছেন আপনার মধ্যে, এমন কি এইমাত্র যে পাপ

কথাগুলি আপনি উচ্চারণ করলেন তার মধ্যেও তিনি আছেন !" কঠিন কম্পিত কণ্ঠে লোকটি ঘোষণা করল ।

লোকটি থামল ; নিজেকে শান্ত করবার জন্যই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ।

তারপর শান্তভাবে বলতে লাগল, "দেখুন স্যার, তিনি যদি না থাকতেন তাহলে তো আপনি-আমি তাঁর কথা বলতাম না । কি কথা, কার কথা আমরা বলছি ? কাকে আপনি অস্বীকার করছেন ? তিনি যদি নাই থাকবেন, তো কে তাঁকে আবিষ্কার করল ? বুদ্ধির অতীত এরকম একটি সত্তার অস্তিত্বের কল্পনা এল কোথা থেকে ? এরকম একটি বুদ্ধির অগোচর সত্তা, যিনি সর্বশক্তিমান, শাশ্বত, অসীম গুণের অধিকারী, তাঁর অস্তিত্বের কল্পনা আপনি কেন করেছেন—কেন করেছে সারা জগৎ ?…"

লোকটি থামল ; অনেকক্ষণ চুপ করে রইল ।

পিয়ের সে নীরবতা ভাঙতে পারল না, ভাঙতে চাইল না ।

পিয়েরের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে উত্তেজনাবশে কম্পিত হাতে বইটার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে লোকটি আবার বলতে লাগল, "তিনি আছেন, কিন্তু তাঁকে জানা বড় শক্ত । …আমি তো তুচ্ছ মানুষ, তাঁর সর্বশক্তিমত্তা, তাঁর অসীমতা অন্ধজীবের প্রতি তাঁর করুণা—এসব আমি কেমন করে দেখাব ?" সে আবার থামল । "আপনিই বা কে ? আপনি স্বপ্ন দেখছেন যে আপনি খুব জ্ঞানী, কারণ ঐ পাপ কথাগুলি আপনি উচ্চারণ করতে পারছেন । কিন্তু যে ছোট ছেলেটি সুকৌশলে তৈরি একটা ঘড়ি নিয়ে খেলা করতে করতে বলতে পারে যে যেহেতু ঘড়িটার ব্যবহার সে জানে না তাই যে ঐ ঘড়িটা তৈরি করেছে তাকে সে বিশ্বাস করে না, আপনিও তারই মত নির্বোধ ও যুক্তিহীন । তাঁকে জানা বড় শক্ত…আদি পিতা আদম থেকে আজকের দিন পর্যন্ত যুগের পর যুগ আমরা সে জ্ঞানলাভে প্রয়াসী হয়েছি, কিন্তু আজও পড়ে আছি আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে । …এই বুঝতে না পারার মধ্যেই তো দেখতে পাচ্ছি আমাদের দুর্বলতা আর তাঁর বিরাটত্ব…"

পিয়ের উদ্বেলিত হৃদয়ে সব শুনল ; লোকটির কথায় বাধা দিল না, তাকে কোন প্রশ্ন করল না, সমস্ত অন্তর দিয়ে তার কথাগুলিকে বিশ্বাস করল । তার কথার জ্ঞানগর্ভ যুক্তিকেই মানুষ বিশ্বাস করুক, আর শিশুর মত বক্তার কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা ও আন্তরিকতাকেই বিশ্বাস করুক—একটা কথা ঠিক যে সমস্ত অন্তর দিয়ে পিয়ের তার কথা বিশ্বাস করতে চাইল, বিশ্বাস করল, এবং সান্ত্বনা, উজ্জীবন ও জীবনে প্রত্যাবর্তনের একটা আনন্দ অনুভূতিতে তার মন ভরে উঠল ।

লোকটি আবার বলল, "তাঁকে বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না, জানতে হয় জীবন দিয়ে ।"

মনের মধ্যে নতুন করে সন্দেহ দেখা দেওয়ায় বিষণ্ণ গলায় পিয়ের বলল,

“আমি বুঝতে পারছি না, যে জ্ঞানের কথা আপনি বলছেন মানুষের মন কেন তাকে লাভ করতে পারবে না ?”

পিতৃসুলভ মৃদু সস্নেহ হাসি ফুটল লোকটির মুখে।

বলল, “পরমপ্রজ্ঞা ও সত্য হল বিশুদ্ধ তরল পদার্থের মত। একটা অবিশুদ্ধ পাত্রে বিশুদ্ধ তরল ঢেলে কি তার বিশুদ্ধতা বিচার করা যায় ? একমাত্র নিজের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে পারলে তবেই আমার মধ্যে সেই তরলের বিশুদ্ধতাকে অন্তত কিছুটা রক্ষা করতে পারব।”

পিয়ের সানন্দে বলে উঠল, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই।”

“পরমপ্রজ্ঞা কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন প্রভৃতি সব জাগতিক বিজ্ঞানের উপরেও প্রতিষ্ঠিত নয়। পরমপ্রজ্ঞা এক। তার একটিমাত্র বিজ্ঞান—ভূমার বিজ্ঞান—যে বিজ্ঞান গোটা সৃষ্টি ও সেখানে মানুষের স্থান নির্ণয় করে। সে বিজ্ঞানকে জানতে হলে আগে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করতে হবে, তার উজ্জীবন ঘটাতে হবে ; সে জ্ঞান অর্জন করতে হলে প্রয়োজন বিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধি। আর সে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন সেই আলোকশিখার যাকে বিবেক বলে, যাকে ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বপন করেছেন।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ,” পিয়ের স্বীকার করল।

“তাহলে মনের চোখ দিয়ে নিজের অন্তরাত্মাকে দেখুন, নিজেকেই প্রশ্ন করুন, আপনি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট কি না। কেবলমাত্র বুদ্ধির উপর ভরসা করে কি পেয়েছেন ? আপনি কি ? আপনি যুবক, আপনি ধনী, আপনি কুশলী, আপনি সুশিক্ষিত। এই সব সৎগুণ নিয়ে আপনি কি করেছেন ? নিজেকে নিয়ে নিজের জীবনকে নিয়ে কি আপনি সন্তুষ্ট ?”

মুখ বেঁকিয়ে পিয়ের তো-তো করে বলল, “না, জীবনকে আমি ঘৃণা করি।”

“আপনি জীবনকে ঘৃণা করেন। তাহলে এ জীবনকে বদলে দিন, নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তুলুন ; আর পরিশুদ্ধ হলেই প্রজ্ঞা লাভ করতে পারবেন। নিজের জীবনের দিকে তাকান স্যার। কিভাবে জীবন কাটিয়েছেন ? উচ্ছৃংখল মদ্যপানে ও ব্যভিচারে ; সমাজের কাছ থেকে নিয়েছেন সবকিছু, কিন্তু তাকে ফিরিয়ে দেন নি কিছুই। সম্পত্তির মালিক হয়েছেন ; তাকে কিভাবে ব্যবহার করেছেন ? আপনার প্রতিবেশীর জন্য কি করেছেন ? আপনার হাজার হাজার ক্রীতদাসের কথা কখনও ভেবেছেন ? শারীরিক কি নৈতিক কোন দিক থেকে তাদের সাহায্য করেছেন ? না। তাদের পরিশ্রমের ফসলকে ভোগ করে যাপন করেছেন উচ্ছৃংখল জীবন। তাই তো করেছেন। এমন কোন কাজে কি কখনও আত্মনিয়োগ করেছেন যেখান থেকে আপনার প্রতিবেশীর উপকার করতে পারেন ? না। জীবন অতিবাহিত করেছেন চরম আলস্যে। তারপর আপনি বিয়ে করেছেন স্যার—একটি তরুণীকে

চালিয়ে নেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, কিন্তু কি করেছেন? সত্যের পথ খুঁজে নিতে তাকে সাহায্য করেন নি, ঠেলে দিয়েছেন প্রতারণা ও দুঃখের অতলস্পর্শ গহ্বরে। কোন লোক আপনাকে আঘাত করলেই আপনি তাকে গুলি করেছেন, আর এখন বলছেন আপনি ঈশ্বরকে জানেন না, নিজের জীবনকে ঘৃণা করেন। এর মধ্যে তো অবাক হবার কিছু নেই স্যার!"

দীর্ঘ বাক্যালাপে ক্লান্ত হয়ে লোকটি পুনরায় সোফার পিছনে মাথা রেখে চোখ বুজল। পিয়েরের সেই প্রবীণ, কঠোর, নিশ্চল, মৃতবৎ মুখখানির দিকে তাকিয়ে ঠোঁট দুটি নাড়ল, কিন্তু কোন শব্দ উচ্চারিত হল না। সে বলতে চেয়েছিল, "হ্যাঁ, একটি নীচ, আলস্যপরায়ণ পাপের জীবন!" কিন্তু সে নীরবতা ভাঙবার সাহস তার হল না।

বুড়োদের মত গলা খাঁকারি দিয়ে লোকটি চাকরকে ডাকল।

পিয়েরের দিকে না তাকিয়েই শুধাল, "ঘোড়ার কি হল?"

চাকর জবাব দিল, "বদলি ঘোড়া এইমাত্র এসে গেছে। আপনি কি এখানে বিশ্রাম করবেন না?"

"না; ওদের ঘোড়া যুতভে বলুন।"

"আমাকে সব কথা না বলে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না দিয়েই কি আমাকে একলা ফেলে উনি সত্যি সত্যি চলে যাবেন?" দাঁড়িয়ে মাথাটা নীচু করে পিয়ের ভাবল; মাঝে মাঝে লোকটির দিকে তাকিয়ে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। "হ্যাঁ, এ-কথা কখনও ভাবি নি, ঘৃণ্য উচ্ছৃংখল জীবনই আমি যাপন করেছি, যদিও সে জীবন আমার পছন্দ ছিল না, সেভাবে জীবন কাটাতে আমি চাই নি। কিন্তু এই মানুষটি সত্যকে জানে আর ইচ্ছা করলে তা আমার কাছে প্রকাশ করতে পারত।"

পিয়ের এই কথাটা লোকটিকে বলতে চাইল, কিন্তু সাহসে কুলোল না। অভ্যস্ত হাতে যাত্রীটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে কোটের বোতাম আঁটতে লাগল। সে-কাজ শেষ করে বেজুখভের দিকে ফিরে নিস্পৃহ ভদ্রতার সুরে বলল:

"আপনি এখন কোথায় চলেছেন স্যার?"

শিশুর মত দ্বিধাগ্রস্ত গলায় পিয়ের জবাব দিল, "আমি?··· আমি পিতার্সবুর্গ যাচ্ছি। আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার সব কথার সঙ্গে আমি একমত। কিন্তু আমাকে অতটা খারাপ ভাববেন না। আপনি আমাকে যা হতে বললেন মনে-প্রাণে তাই আমি হতে চাই, কিন্তু কখনও কারও কাছ থেকে কোন সহায়তা আমি পাইনি।···কিন্তু সবকিছুর জন্য আমিই দোষী। আমাকে সাহায্য করুন, শিখিয়ে পড়িয়ে নিন, তাহলে হয় তো আমি····"

পিয়ের আর বলতে পারল না। ঢোঁক গিলে ঘুরে দাঁড়াল।

লোকটি অনেকক্ষণ চুপ করে রইল; কি যেন ভাবতে লাগল।

তারপর বলল, "সাহায্য করতে পারেন একমাত্র ঈশ্বর, তবে আমাদের সংঘ থেকে যতটা সাহায্য করা সম্ভব তা আপনি পাবেন স্যার। আপনি তো পিতার্সবুর্গ যাচ্ছেন। এটা কাউণ্ট উইলার্স্কির হাতে দেবেন। (নোট-বইটা বের করে চার-ভাঁজ করা একখানা লম্বা কাগজে কয়েকটা কথা সে লিখল।) যদি কিছু মনে না করেন তো একটা পরামর্শ দিই। রাজধানীতে পৌঁছে প্রথমেই নির্জনে আত্ম-সমীক্ষায় কিছুটা সময় কাটাবেন, আর আগেকার মত জীবনযাত্রায় ফিরে যাবেন না। আপনার যাত্রা শুভ হোক···সফল হোক।"

ঘাঁটিদারের খাতা থেকে পিয়ের জানতে পারল যে এই লোকটি হচ্ছে জোসেফ আলেক্সীভিচ বাজ্‌দীভ, ভ্রাতৃসংঘের একজন বিখ্যাত সদস্য ও সুপরিচিত মার্তিনপন্থী। সে চলে যাবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিয়ের শুতে গেল না বা ঘোড়ার জন্যও তাগাদা দিল না; ঘরময় পায়চারি করতে করতে অতীত জীবনের কথা ভাবতে লাগল, এবং অতি সহজলভ্য একটি আনন্দময় অনিন্দ্যনীয় পুণ্যময় জীবনের পথে নতুন করে পা ফেলবার সম্ভাবিত আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল। তার মনে হল, ধার্মিক হওয়া যে কত ভাল সেটা ভুলে গিয়েছিল বলেই এতদিন সে পাপের পথে ঘুরে মরেছে। আগেকার সন্দেহের তিলমাত্র চিহ্ন আর তার অন্তরে রইল না। তার মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখা দিল যে ধর্মের পথে পরস্পরকে সাহায্য করবার লক্ষ্যে মানব ভ্রাতৃসংঘের প্রতিষ্ঠা খুবই সম্ভব; ভ্রাতৃসংঘের এই ছবিই তার মনে আঁকা পড়েছে।

অধ্যায়—৩

পিতার্সবুর্গে পৌঁছে পিয়ের কাউকে তার আসার কথা জানাল না, কোথাও গেল না, কোন অজ্ঞাত লোক কর্তৃক পাঠানো টমাস ও কেম্পিস-এর একখানা বই পড়ে দিনগুলো কাটাতে লাগল। বইটা পড়তে পড়তে একটি সত্য সে ক্রমেই বেশী করে উপলব্ধি করতে লাগল: পরিপূর্ণতা অর্জনের সম্ভাবনা এবং মানুষে মানুষে সক্রিয় ভ্রাতৃপ্রেমের সম্ভাবনার যে সত্য যোসেফ আলেক্সীভিচ তার কাছে প্রকাশ করেছিল তাতে বিশ্বাস করবার এক অজ্ঞাতপূর্ব আনন্দের উপলব্ধি। আসার একসপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যায় পিতার্সবুর্গ সমাজে পিয়েরের স্বল্পপরিচিত উইলার্স্কি নামক জনৈক তরুণ পোলিশ কাউণ্ট মহাসমারোহসহকারে তার ঘরে এল এবং দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যখন বুঝল যে ঘরে আর কেউ নেই তখন পিয়েরকে উদ্দেশ করে বলল:

"আমি আপনার কাছে এসেছি একটি বাণী ও একটি প্রস্তাব নিয়ে। আমাদের ভ্রাতৃসংঘের খুবই উচ্চপদস্থ কোন লোক আপনার পক্ষ হয়ে একখানি দরখাস্ত করেছেন যাতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই আপনাকে আমাদের

সংঘে ভর্তি করে নেওয়া হয় এবং আমাকেই আপনার হয়ে উদ্যোগ নেবার প্রস্তাবও করেছেন। সেই লোকটির ইচ্ছা পূরণ করাটাকে আমি আমার পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। আপনি কি আমার উদ্যোগে ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক ?"

পিয়ের ইতিপূর্বে এই লোকটিকে সব বলনাচের আসরেই দেখেছে সুন্দরী মেয়েদের মহলে হাসিমুখে ঘুরে বেড়াতে ; তাই লোকটির নিস্পৃহ গম্ভীর কণ্ঠস্বর শুনে সে অবাক হয়ে গেল।

বলল, "হ্যাঁ, আমি ইচ্ছুক।"

উইলার্স্কি মাথা নোয়াল।

বলল, "আর একটি প্রশ্ন আছে কাউণ্ট ; আমার মিনতি, সংঘের ভাবী সদস্যরূপে নয়, একজন সৎ মানুষ হিসাবে আন্তরিকভাবেই সে-প্রশ্নের জবাব দিন : আপনার আগেকার প্রত্যয়কে কি আপনি পরিত্যাগ করেছেন—আপনি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন ?"

পিয়ের ভাবল।

"হ্যাঁ···হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি," সে বলল।

"সেক্ষেত্রে····" উইলার্স্কি শুরু করতেই পিয়ের তাকে বাধা দিয়ে পুনরায় বলল, "হ্যাঁ, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।"

উইলার্স্কি বলল, "সেক্ষেত্রে আমরা যেতে পারি। আমার গাড়িটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।"

উইলার্স্কি চুপচাপ গাড়িতে বসে রইল। তাকে কি করতে হবে, কি বলতে হবে—পিয়েরের এই সব প্রশ্নের জবাবে সে শুধু বলল, তার থেকেও যোগ্যতর দাদারা তাকে পরীক্ষা করবে, আর পিয়েরের একমাত্র কাজ হবে সত্য কথা বলা।

একটা বড় বাড়িতে ভ্রাতৃসংঘের কার্যালয়। সে বাড়ির উঠোনে ঢুকে একটা অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠে তারা একটা আলোকিত ছোট ঘরে প্রবেশ করে চাকরের সাহায্য ছাড়াই নিজেদের জোব্বাগুলো ছেড়ে ফেলল। সেখান থেকে তারা আর একটা ঘরে গেল। দ্বারপথে দেখা দিল বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত একটি লোক। উইলার্স্কি তার দিকে এগিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে ফরাসী ভাষায় কি যেন বলল : তারপর একটা ছোট সাজঘরে গেল ; সেখানে পিয়ের এমন সব পোশাক আশাক দেখতে পেল যা সে আগে কখনও দেখে নি। কাবার্ড থেকে একটা রুমাল তুলে নিয়ে উইলার্স্কি পিয়েরের চোখ দুটো বেঁধে দিয়ে এমনভাবে কিছু চুলশুদ্ধ তাতে গিঁট দিল যে পিয়েরের বেশ কষ্ট হল। তারপর তার মুখটাকে টেনে নামিয়ে চুমো খেয়ে তার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চলল। চুল শুদ্ধ গিঁট দেওয়ায় পিয়েরের বেশ কষ্ট হচ্ছে ; তার মুখে ফুটে উঠেছে

যন্ত্রণা ও সলাজ হাসির রেখা। অনিশ্চিত ভীরু পদক্ষেপে সে উইলার্স্কির পিছনে এগিয়ে চলল।

প্রায় দশ পা এগিয়ে লোকটি থামল।

বলল, "আমাদের সংঘে যোগদান করতে আপনি যদি কৃতসংকল্প হয়ে থাকেন, তাহলে, যাকিছু ঘটুক সাহসের সঙ্গে তাকে সহ্য করবেন। (পিয়ের মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।) দরজায় একটা শব্দ শুনলেই চোখের বাঁধন খুলে ফেলবেন। আপনার সাহস ও সাফল্য কামনা করি;" পিয়েরের হাতে একটু চাপ দিয়ে লোকটি চলে গেল।

পিয়ের একা একা একইভাবে হাসতে লাগল। দু'একবার কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে চোখের বাঁধন খুলে ফেলবার জন্য হাতও তুলল, কিন্তু আবার হাত নামিয়ে নিল। চোখ বাঁধা অবস্থায় পাঁচ মিনিট কাটাতেই তার কাছে এক ঘণ্টা বলে মনে হল। হাত দুটো অসার হয়ে এল, পা দুটো ভেঙে পড়তে চাইছে, মনে হল সে বড়ই ক্লান্ত, অবসন্ন। নানা রকমের জটিল চিন্তা মনের মধ্যে পাক খেতে লাগল। মনে ভয়, না জানি কি হবে; তারও চেয়ে ভয় পাছে সে-ভয় ধরা পড়ে যায়। দরজায় জোর শব্দ শোনা গেল। চোখের বাঁধন খুলে পিয়ের চারদিকে তাকাল। কালো আঁধারে ঘরটা ঢাকা; একটা সাদা কিছুর মধ্যে শুধু একটা ছোট বাতি জ্বলছে। কাছে গিয়ে পিয়ের দেখতে পেল, কালো টেবিলের উপর বাতিটা জ্বলছে, আর তার পাশে রয়েছে একখানা খোলা বই। বইটা যীশুর উপদেশাবলী, আর যে সাদা জিনিসটার মধ্যে বাতিটা জ্বলছে সেটা একটা মানব করোটি। "আদিতে ছিল শব্দ, আর সে শব্দ ছিল ঈশ্বরের" উপদেশাবলীর এই প্রথম কথা ক'টি পড়েই পিয়ের টেবিলের ওপাশে ঘুরে গিয়ে দেখল একটা বড় খোলা বাক্সের মধ্যে কি যেন রয়েছে। সেটা একটা হাড়ভর্তি শবাধার। এসব দেখে সে মোটেই বিস্মিত হল না। পূর্ব জীবন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটা নতুন জীবনে প্রবেশের প্রত্যাশায় সে ধরেই নিয়েছে যে সবকিছুই অস্বাভাবিক হবে, এমন কি যাকিছু সে দেখছে তার চাইতেও বেশী অস্বাভাবিক। একটা করোটি, একটা শবাধার, একখানি উপদেশাবলী—তার মনে হল এসব কিছুই, এমন কি এর চাইতে বেশী কিছুই সে আশা করেছিল। মনের আবেগকে প্রখরতর করে তুলতে সে চারদিকে তাকাল। "ঈশ্বর, মৃত্যু, প্রেম, মানব-ভ্রাতৃসংঘ"—এই কথাগুলিকে অস্পষ্ট অথচ আনন্দময় ধারণার সঙ্গে যুক্ত করে সে মনে মনে সেগুলি আওড়াতে লাগল। দরজা খুলে গেল; কে যেন ঘরে ঢুকল।

ঘরের আবছা আলোয় একটি ছোটখাট লোককে দেখতে পেল। আলো থেকে অন্ধকারে আসার দরুণ লোকটি থামল, সতর্ক পদক্ষেপে টেবিলটার কাছে গেল, তারপর চামড়ার দস্তানা পরা ছোট হাত দুটি টেবিলের উপর রাখল।

সাদা চামড়ার এপ্রণে লোকটির বুক ও পায়ের কিছুটা অংশ ঢাকা পড়েছে ; গলায় নেকলেসের মত একটা জিনিস থেকে সাদা আলো বিচ্ছুরিত হওয়ায় তার লম্বাটে মুখখানা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

পিয়েরের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নবাগত শুধাল, "কেন এখানে এসেছ ? তুমি তো আলোর সত্যে বিশ্বাস কর না, তুমি তো আলো দেখ নি, তাহলে এখানে এসেছ কেন ? আমাদের কাছে তুমি কি চাও ? প্রজ্ঞা, সংগুণ, আলো ?"

যেমুহূর্তে দরজা খুলে অপরিচিত লোকটি ঘরে ঢুকেছে তখন থেকেই তার প্রতি একটা ভয় ও সম্ভ্রম জেগেছে পিয়েরের মনে ; তার মনে হয়েছে, সামাজিক দৃষ্টিতে লোকটি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু মানব-ভ্রাতৃত্ব বোধের দিক থেকে সে তার কাছের মানুষ। রুদ্ধশ্বাসে দুরু দুরু বুকে সে "রেটর"-এর (কোন নবাগতকে সংঘে অভিষেককারীকে ঐ নামেই ডাকা হয়) দিকে এগিয়ে গেল। কাছে গিয়েই সে চিনতে পারল "রেটর" তার পূর্বপরিচিত—নাম স্মোলিয়ানিনভ। এতে সে দুঃখিত হল, কারণ সে তাকে চেয়েছিল শুধুই দাদা ও ধর্মগুরুরূপে, একজন পরিচিত মানুষরূপে নয়। অনেকক্ষণ সে কোন কথাই বলতে পারল না ; ফলে রেটর আবার সেই একই প্রশ্ন করল।

অনেক কষ্টে পিয়ের জবাব দিল, "হ্যাঁ""আমি···আমি চাই নবজন্ম।"

স্মোলিয়ানিনভ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "ঠিক আছে। আমাদের পবিত্র সংঘ কিভাবে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করতে পারে সেবিষয়ে তোমার কোন ধারণা আছে কি ?"

পিয়ের কাঁপা গলায় বেশ কষ্ট করে বলল, "আমি···চাই""পথের নির্দেশ··· সাহায্য""নবজন্ম।"

"আমাদের ভ্রাতৃসংঘ সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ?"

"আমার ধারণা ভ্রাতৃসংঘ ধর্মপথযাত্রী মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারের সংঘ," পিয়ের জবাব দিল ; এই মুহূর্তে তার কথায় যে গাম্ভীর্য থাকা উচিত ছিল তার অভাবের জন্য সে লজ্জা পেল। "আমার ধারণা···"

রেটর কিন্তু তার জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ভাল ! তুমি কি ধর্মের মধ্যে তোমার অভিষ্ট লাভের পথ কখনও খুঁজেছ ?"

"না, সে পথকে ভুল মনে করেই সে পথে যাই নি," পিয়ের বলল ; এত আস্তে সে কথাগুলি বলল যে রেটর শুনতেই পেল না। তার প্রশ্নের উত্তরে পিয়ের বলল, "আমি নাস্তিক ছিলাম।"

একমুহূর্ত থেমে রেটর বলল, "জীবনের সত্যের বিধানকে মেনে চলতে চাও বলেই তুমি সত্যের সন্ধান করছ, আর তাই প্রজ্ঞা ও সংগুণের সন্ধান করছ। তাই নয় কি ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," পিয়ের সম্মতি জানাল।

গলাটা পরিষ্কার করে দস্তানা-পরা হাত দুটি বুকের উপর আড়াআড়িভাবে

রেখে রেটর কথা বলতে শুরু করল।

"আমাদের সংঘের প্রধান আদর্শের কথা এবার তোমাকে বলব; যদি সে আদর্শ তোমার আদর্শের সঙ্গে মেলে তবেই আমাদের ভ্রাতৃসংঘে প্রবেশ করে তুমি লাভবান হবে। আমাদের সংঘের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য—যে ভিত্তির উপর এই সংঘ প্রতিষ্ঠিত এবং কোন মানুষের শক্তি যাকে কোন দিন ধ্বংস করতে পারবে না—হল একটি নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ রহস্যকে রক্ষা করা ও অনাগত প্রজন্মের হাতে তাকে তুলে দেওয়া···সে রহস্য আমাদের কাছে এসেছে বহুদূর অতীত যুগ হতে—হয় তো গোটা মানবজাতির ভাগ্যই নির্ভর করছে সেই রহস্যের উপর। কিন্তু যেহেতু সেই রহস্যের স্বরূপটিই এমন যে পরিশ্রম-সাধ্য দীর্ঘ আত্মশুদ্ধির পথে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে না পারলে কোন মানুষের পক্ষেই তাকে জানা বা ব্যবহার করা সম্ভব নয়, তাই সকলেই তাকে দ্রুত আয়ত্তে আনার আশা করতে পারে না। তাই আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব আমাদের সদস্যদের অন্তরের সংস্কার করা, তাদের মনকে শুদ্ধ ও আলোকিত করে তোলা, এবং তাদের সেই রহস্যকে গ্রহণ করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা।

"তৃতীয়ত, আমাদের সদস্যদের পরিশুদ্ধ করে, নবজীবনের দীক্ষা দিয়ে আমরা চেষ্টা করি তাদের ভিতর দিয়ে ভগবৎভক্তি ও সংগুণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সমগ্র মানব জাতিকে উন্নত করতে, যে অশুভ শক্তি আজ পৃথিবীকে শাসন করছে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। এই কথাগুলি ভাল করে ভেবে দেখ; আমি আবার আসব।"

"যে অশুভ শক্তি আজ পৃথিবীকে শাসন করছে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে,···" পিয়ের মনে মনে বলল, আর সঙ্গে সঙ্গে এই পথে তার ভবিষ্যৎ কর্মধারার একটা ছবি তার মনের পটে ভেসে উঠল। রেটর যে তিনটি লক্ষ্যের কথা বলল তার মধ্যে শেষেরটি, মানবজাতির উন্নতি সাধনই তার মনকে বিশেষ করে নাড়া দিল।

আধ ঘণ্টা পরে ফিরে এসে রেটর তাকে সলোমনের মন্দিরের সাতটি সিঁড়ির অনুরূপ সাতটি সংগুণের কথা শুনিয়ে বলল, ভ্রাতৃসংঘের প্রতিটি মানুষকেই নিজের অন্তরে এই সপ্ত সংগুণের অনুশীলন করতে হবে। সপ্ত সংগুণ হল: ১। বিচক্ষণতা, সংঘের মন্ত্রগুপ্তি। ২। সংঘের ঊর্ধ্বতন সদস্যদের প্রতি আনুগত্য। ৩। নৈতিকতা। ৪। মানবপ্রেম। ৫। সাহস। ৬। উদারতা। ৭। মৃত্যুপ্রীতি।

রেটর বলল, "সপ্তমত, অবিরাম মৃত্যুচিন্তার দ্বারা মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করবে চেষ্টা করবে যাতে মৃত্যুকে ভয়ংকর শত্রুরূপে না দেখে তাকে এমন বন্ধুরূপে দেখবে যে এই দুঃখময় পৃথিবীতে ধর্মের পথ-পর্যটনে ক্লান্ত আত্মাকে মুক্ত করে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার ও শান্তির পথে পরিচালিত

করবে।"

কথা শেষ করে পিয়েরকে নির্জনে আত্মসমীক্ষার সুযোগ দিয়ে রেটর ঘর থেকে চলে গেলে পিয়ের ভাবল, "হ্যাঁ, তাই করতে হবে। কিন্তু আমি এখনও এতই দুর্বল যে, যে-জীবনের অর্থ একটু একটু করে আমার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাকেই আমি ভালবাসি।"

তৃতীয়বার রেটর আরও তাড়াতাড়ি ফিরল এবং জানতে চাইল পিয়ের এখনও সংকল্পে স্থির আছে কি না।

পিয়ের বলল, "আমি সবকিছুর জন্য প্রস্তুত।"

রেটর বলল, "তোমাকে আগেই জানিয়ে রাখি, আমাদের সংঘ কেবলমাত্র কথার মাধ্যমে তার বাণীকে প্রচার করে না, এমন আরও অনেক পন্থার আশ্রয় নেয় ধর্মপিপাসুর মনের উপর যার প্রভাব আরও অনেক বেশী হয়। আরও গূহ্য দীক্ষার পরে তুমি নিজেই উজ্জীবনের সে সব পথের সঙ্গে পরিচিত হবে। যে সব প্রাচীন সমিতি মূর্তিলিপির সাহায্যে তাদের বাণী প্রচার করত আমাদের সংঘ তাদেরই অনুসরণ করে থাকে। মূর্তিলিপি এমন কিছুর প্রতীক যাকে ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা যায় না, অথচ তা মূর্তির অনুরূপ গুণাবলীর অধিকারী।"

মূর্তিলিপির অর্থ পিয়ের খুব ভাল করেই জানে, কিন্তু সেকথা বলবার সাহস তার হল না। সে নীরবে রেটরের কথাগুলি শুনল; মনে মনে বুঝল, তার অগ্নিপরীক্ষার লগ্ন সমাগত।

পিয়েরের আরও কাছে এসে রেটর বলল, "তুমি যদি কৃতসংকল্প হও তো তোমার দীক্ষার কাজ শুরু করব। উদারতার চিহ্নস্বরূপ তোমাকে বলছি, তোমার যাকিছু মূল্যবান সামগ্রী সব আমাকে দাও।"

পিয়ের উত্তর দিল, "কিন্তু এখানে তো কিছুই নেই।"

"যা তোমার সঙ্গে আছে: ঘড়ি, টাকা, আংটি...."

সঙ্গে সঙ্গে পিয়ের তার টাকার থলি ও ঘড়ি বের করে দিল, কিন্তু মোটা আঙুল থেকে বিয়ের আংটিটা খুলতে কিছুটা সময় লাগল। সেটা হয়ে গেলে রেটর বলল:

"আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ বলছি, পোশাক ছেড়ে ফেল।"

রেটরের নির্দেশমত পিয়ের কোট, ওয়েস্টকোট ও বাঁ পায়ের বুট খুলে ফেলল। গুরুভাইটি তখন পিয়েরের বাঁদিকের বুকের উপর থেকে শার্টটা সরিয়ে ফেলল এবং উপুড় হয়ে তার বাঁ পায়ের ট্রাউজারটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে ফেলল। লোকটিকে আর কষ্ট না দিয়ে পিয়ের এবার নিজেই ডান পায়ের বুটটা খুলে ট্রাউজারের ডান পাটাকে গুটিয়ে ফেলতে চাইল, কিন্তু লোকটি জানাল যে তার কোন প্রয়োজন নেই, বলেই সে বাঁ পায়ের জন্য একপাটি চটি এগিয়ে দিল। বিব্রত ও সন্দিহান শিশুর মত ঈষৎ হেসে পিয়ের

হাত দুটি ঝুলিয়ে পা দুটি ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গুরুভাইয়ের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

গুরুভাই বলল, "সরলতার চিহ্ন-স্বরূপ এবার তোমাকে বলছি, তোমার প্রধান রিপুকে আমার কাছে প্রকাশ কর।"

"আমার রিপু! সে তো অনেক আছে," পিয়ের উত্তর দিল।

গুরুভাই বলল, "সেই রিপু অন্য সকলের চাইতে যে তোমাকে ধর্মের পথে অধিকতর বিভ্রান্ত করেছে।"

পিয়ের চুপ করে একটা উত্তর খুঁজতে লাগল।

"মদ? ঔদরিকতা? আলস্য? শ্রমবিমুখতা? কোপনস্বভাব? ক্রোধ? নারী?" নিজের সবগুলো দোষ সে মনে মনে আউড়ে গেল, কিন্তু কোন্‌টাকে প্রাধান্য দেবে তা বুঝতে পারল না।

প্রায় অশ্রুত নীচু স্বরে বলল, "নারী।"

গুরুভাই একটুও নড়ল না, অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোন কথাই বলল না। অবশেষে পিয়েরের কাছে গিয়ে টেবিল থেকে রুমালটা তুলে নিয়ে আবার তার চোখ বেঁধে দিল।

"শেষবারের মত তোমাকে বলছি—সমস্ত মনোযোগ নিজের উপর নিবদ্ধ কর, ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত কর, সুখের সন্ধান কর নিজের অন্তরে, রিপুর তৃপ্তিতে নয়…"

অনেকক্ষণ আগে থেকেই পিয়ের নিজের মধ্যে একটা আনন্দের উৎসকে খুঁজে পেয়েছিল, এবার সে আনন্দের অনুভূতি তার সারা অন্তরে ছড়িয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৪

এর কিছু পরেই পিয়েরকে নিয়ে যেতে রেটরের পরিবর্তে সেই অন্ধকার ঘরে ঢুকল তার উদ্যোগকর্তা উহলার্স্কি; গলা শুনেই পিয়ের তাকে চিনতে পারল। তার সংকল্পের দৃঢ়তা সম্পর্কে নতুন করে প্রশ্ন করা হলে পিয়ের জবাব দিল, "হ্যা, হ্যাঁ, আমি রাজী; তারপর শিশুর মত উজ্জ্বল হাসি হেসে খোলা বুকে, এক পায়ে বুট ও অন্য পায়ে চটি পরে অসমান পদক্ষেপে এগিয়ে চলল, আর উইলার্স্কি একখানা তরোয়াল ঠেকিয়ে রাখল তার খোলা বুকে। সেই ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে একবার এগিয়ে একবার পিছিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে সংঘ-কক্ষের দরজায় হাজির করা হল। উইলার্স্কি কাশল, ভিতর থেকে হাতুড়ির শব্দে জবাব এল, দরজা খুলে গেল। একটি অনুচ্চ স্বরে তাকে প্রশ্ন করা হল (তখনও পিয়েরের চোখ বাঁধা) সে কে, কবে কোথায় তার জন্ম হয়েছিল, ইত্যাদি। চোখ বাঁধা অবস্থায়ই আবার তাকে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হল; যেতে যেতেই তাকে শোনানো হল তার তীর্থযাত্রার পরিশ্রমের

তাৎপর্যের কথা, পবিত্র বন্ধুত্বের কথা, বিশ্বের শাশ্বত সৃষ্টিকর্তার কথা, সাহসের সঙ্গে সব পরিশ্রম ও বিপদকে সহ্য করবার কথা। তারপর সকলে তার ডান হাতটা ধরে একটা জিনিসের উপর রাখল, অপর হাতে একজোড়া দিকনির্ণয় যন্ত্র বাঁ দিকের বুকের উপর চেপে ধরে একজনের উঁচু স্বরে স্বর মিলিয়ে সংঘের বিধানাবলীর প্রতি আনুগত্যের শপথ উচ্চারণ করতে তাকে বলা হল। তারপর মোমবাতিগুলো নিভিয়ে দেওয়া হল ; শুঁকেই পিয়ের বুঝতে পারল কোন সুরাসার জ্বালানো হল ; তাকে বলা হল, এবার সে ছোট আলোটা দেখতে পাবে। তার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল, আর জ্বলন্ত সুরাসারের আবছা আলোয় পিয়ের যেন স্বপ্নের ঘোরে দেখতে পেল, রেটরের মত এপ্রন পরা কয়েকটি লোক হাতের তলোয়ার তার বুকের দিকে উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মধ্যে একজনের সাদা শার্টে রক্তের দাগ। তা দেখে পিয়ের তলোয়ারগুলোর দিকে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে গেল ; যেন বলতে চাইল, মারো আমাকে। কিন্তু তলোয়ারগুলো তার দিক থেকে সরিয়ে নেওয়া হল, আর সঙ্গে সঙ্গে আবার তার চোখ বেঁধে দেওয়া হল।

একটি কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হল, "এবার তুমি ছোট আলোটা দেখতে পেয়েছ।" তখন মোমবাতিগুলো আবার জ্বেলে দেওয়া হল ; তাকে বলা হল, এবার সে পুরো আলোটাই দেখতে পাবে ; আবার তার চোখের বাঁধন খুলে দেওয়া হল, আর দশের অধিক কণ্ঠ একসঙ্গে বলে উঠল : Sic transit gloria mundi : (পার্থিব গৌরব এমনি করেই শেষ হয়ে যায়)।

ধীরে ধীরে পিয়েরের সম্বিৎ ফিরে এল ; ঘরের চারদিকে তাকিয়ে সে উপস্থিত লোকজনদের দেখতে লাগল। কালো কাপড়ে ঢাকা একটা লম্বা টেবিলকে ঘিরে জন বারো লোক বসে আছে ; তাদের পরিধেয় আগেকার লোকগুলির মতই। তাদের কিছু লোককে পিয়ের পিতার্সবুর্গ সমাজেও দেখেছে। সভাপতির আসনে বসে আছে একটি অপরিচিত যুবক ; তার গলায় ঝুলছে একটা অদ্ভুত ধরনের ক্রুশ। তার ডাইনে বসে আছে সেই ইতালীয় মঠাধ্যক্ষ দু'বছর আগে পিয়ের যাকে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে দেখেছিল। সেখানে আরও উপস্থিত ছিল একজন অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও জনৈক সুইস্ ভদ্রলোক যে একসময় কুরাগিন পরিবারে গৃহশিক্ষক ছিল। গম্ভীর নৈঃশব্দ্যের মধ্যে সকলে সভাপতির কথা শুনতে লাগল ; সভাপতির হাতে একটি হাতুড়ি। দেয়ালের ভিতরে একটি তারকাকৃতি আলো জ্বলছে। টেবিলের একপাশে নানারকম মূর্তিখচিত একখানি ছোট কার্পেট পাতা, এবং অন্যপাশে একটি বেদীর উপর রাখা হয়েছে টেস্টামেণ্ট ও করোটি। গির্জায় যেমন হয়ে থাকে বেদীটাকে ঘিরে সাতটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। ভাইদের ভিতর থেকে দু'জন পিয়েরকে বেদীর কাছে নিয়ে গেল, তার পা দুটিকে সমকোণে রেখে তাকে শুয়ে পড়তে বলে ঘোষণা করা হল, মন্দির-দ্বারে

তাকে ষাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতে হবে।

“প্রথমেই ওকে খনিত্র গ্রহণ করতে হবে,” এক ভাই ফিস্‌ফিস্ করে বলল। “আঃ, চুপ, চুপ!” আর একজন বলল।

বিব্রত পিয়ের কারও কথা না শুনে স্বল্পদৃষ্টি চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। সহসা তার মন সন্দেহে দুলে উঠল। “আমি কোথায় এসেছি? আমি কি করছি? ওরা কি আমাকে দেখে হাসাহাসি করছে না? ভবিষ্যতে একথা স্মরণ করে আমি কি লজ্জা পাব না?” কিন্তু সন্দেহ ক্ষণিকের জন্য। পিয়ের চারদিককার গম্ভীর মুখগুলোর দিকে তাকাল, এতক্ষণ যাকিছু করেছে সব তার মনে পড়ল, বুঝল যে মাঝপথে আর থামা চলে না। এই দোলাচলচিত্ততায় ভীত হয়ে আগেকার ভক্তির ভাবটা ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় সে মন্দির-দ্বারে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সত্যি সত্যি ভক্তিভাবটা আরও বেশী জোরালো হয়ে তার মনে ফিরে এল। এবার তাকে উঠতে বলা হল, অন্য সকলের মত একটা সাদা এপ্রন তার গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হল, একটি খনিত্র ও তিনজোড়া দস্তানাও তাকে দেওয়া হল, আর তারপরেই মহাপ্রভু (Grand Master) তাকে উদ্দেশ করে কথা বলল। বলল, সে যেন কখনও এমন কিছু না করে যাতে শক্তি ও পবিত্রতার প্রতীক এই শ্বেত অঙ্গাবরণের গায়ে কলংক লাগতে পারে; খনিত্রটি সম্পর্কে বলল, স্বীয় অন্তর থেকে সব পাপকে উৎপাটিত করতে এই খনিত্র হাতে তাকে কাজ করতে হবে এবং স্বেচ্ছায় প্রতিবেশীর অন্তরকেও পাপমুক্ত করতে হবে। পুরুষের ব্যবহারের উপযোগী প্রথম দস্তানা জোড়া সম্পর্কে সে বলল, কোন তাৎপর্য না জেনেই পিয়েরকে সে দস্তানা জোড়া রেখে দিতে হবে। পুরুষের ব্যবহার-উপযোগী দ্বিতীয় দস্তানা জোড়া পিয়েরকে পরতে হবে সভা-সমিতিতে। আর নারীর ব্যবহারের উপযোগী তৃতীয় দস্তানা জোড়া সম্পর্কে সে বলল: “প্রিয় ভাই, এই নারীর দস্তানা জোড়াও তোমারই। যে নারীকে তুমি সবচাইতে বেশী সম্মান করবে তাকেই এ দুটি দেবে। ভ্রাতৃসংঘে যে নারীকে তুমি তোমার যোগ্য সহযোগিনী বলে মনে করবে এই দান হবে তার প্রতি তোমার অন্তরের পবিত্রতার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ।” একটু থেমে সে আবার বলল: “কিন্তু খুব সাবধান হে প্রিয় ভাই, এইসব দস্তানা যেন কোন অপবিত্র হাতে শোভা না পায়।” মহাপ্রভুর এই শেষের কথাগুলো শুনে পিয়ের বেশ বিব্রত বোধ করতে লাগল। সে ভাব ক্রমেই বাড়তে লাগল, তার মুখটা ছোট ছেলের মত রক্তিম হতে হতে একসময় দুই চোখ জলে ভরে উঠল, অস্বস্তির সঙ্গে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। কেমন যেন একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধতা নেমে এল।

জনৈক ভাই সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করল। পিয়েরকে সামনে নিয়ে গিয়ে একখানা হাতে-লেখা পুথি থেকে কার্পেটের উপরকার মূর্তিগুলোর ব্যাখ্যা পড়ে শোনাতে লাগল: সূর্য, চন্দ্র, হাতুড়ি, ওলন, খনিত্র, একটা অমসৃণ

পাথর, একটা চৌকো পাথর, একটা স্তম্ভ, তিনটে জানালা, ইত্যাদি। তারপর পিয়েরকে একটা আসন দেওয়া হল, সংঘ-গৃহের প্রতীক-চিহ্নটা দেখানো হল, প্রবেশ-সংকেতটা বলে দেওয়া হল, এবং শেষ পর্যন্ত বসবার অনুমতি দেওয়া হল। মহাপ্রভু বিধানাবলী পড়তে শুরু করল। সেই দীর্ঘ পাঠের অর্থ বুঝবার মত মনের অবস্থা তখন পিয়েরের ছিল না। কোনরকমে প্রতিটি বিধানের শেষ কথাগুলি সে বুঝতে চেষ্টা করল, আর সেগুলিই তার মনের মধ্যে রয়ে গেল।

মহাপ্রভু পড়তে লাগল, "আমাদের মন্দিরে পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য আমরা স্বীকার করি না। সাম্যকে লংঘন করতে পারে এ রকম কোন পার্থক্যের কথা থেকে সর্বদা সতর্ক থাকবে। যেকোন ভাইয়ের সাহায্যেই ছুটে যাবে, কেউ ভুলপথে গেলে তাকে ফিরিয়ে আনবে, কেউ পড়ে গেলে তাকে তুলে ধরবে, কখনও কোন ভাইয়ের প্রতি ঈর্ষা বা দ্বেষ পোষণ করবে না। সকলের প্রতি সদয় ও বিনয়ী হবে। সকলের অন্তরে জ্বালাবে পুণ্যের শিখা। নিজের সুখকে প্রতিবেশীর সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করবে, ঈর্ষা যেন কদাপি সে আনন্দের পবিত্রতাকে নষ্ট করতে না পারে। শত্রুকে ক্ষমা করবে, তার উপকার করা ছাড়া অন্য কোনভাবে তার প্রতি প্রতিশোধ নেবে না। এইভাবে সর্বোচ্চ বিধানকে মেনে চললে সেই প্রাচীন মর্যাদা তুমি ফিরিয়ে আনতে পারবে যা তোমরা হারিয়ে ফেলেছ।"

কথা শেষ করে মহাপ্রভু দাঁড়িয়ে পিয়েরকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করল; অশ্রুসিক্ত চোখে পিয়ের চারদিকে তাকাতে লাগল; চারদিক থেকে সকলে যেভাবে তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল তার জবাবে সে কি বলবে তা বুঝতেই পারল না। এখানে সকলেই তার ভাই; তাদের সঙ্গে একযোগে কাজ শুরু করতে সে অধৈর্য হয়ে উঠল।

মহাপ্রভু হাতুড়িটা ঠুকল। সব ভাই যার যার জায়গায় বসে পড়ল, আর তাদের একজন পড়ে শোনাতে লাগল বিনয়ের প্রয়োজনীয়তার কথা।

মহাপ্রভু প্রস্তাব করল, এবার শেষ কর্তব্যটি পালন করতে হবে, আর "ভিক্ষা সংগ্রাহক" উপাধিধারী সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি সব ভাইদের কাছে ঘুরতে লাগল। পিয়েরের ইচ্ছা হল তার যা কিছু আছে সব দিয়ে দেবে, কিন্তু পাছে সেটা অহংকারের মত দেখায় তাই অন্য সকলে যা দিল সেও তাই দিল।

সভার কাজ শেষ হল। বাড়ি ফিরে পিয়েরের মনে হল, দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় অনেক অনেক বছর কাটিয়ে সে ফিরে এসেছে, সে সম্পূর্ণ বদলে গেছে, আগেকার জীবনযাত্রা ও অভ্যাসগুলিকে অনেক অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।

অধ্যায়—৫

পরদিন বাড়িতে বসে পিয়ের একটা বই পড়তে পড়তে চতুষ্কোণটির তাৎপর্য বুঝবার চেষ্টা করছিল; সেটার একদিকে ঈশ্বরের প্রতীক, অন্যদিকে নীতিবিষয়ক প্রতীক, তৃতীয় দিকে জাগতিক বস্তুর প্রতীক, আর চতুর্থ দিকে এই তিনের একত্র সমাবেশ। তার মন মাঝে মাঝেই বই ও চতুষ্কোণটা থেকে সরে যাচ্ছে; কল্পনায় সে জীবনের একটা নতুন পরিকল্পনা রচনা করছে। আগের দিন রাতে সে শুনেছে যে তার দ্বৈত যুদ্ধের খবর সম্রাটের কানে পৌঁচেছে এবং তার পক্ষে এখন পিতার্সবুর্গ থেকে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তাই সে ···ভাবছে, দক্ষিণাঞ্চলের জমিদারিতে চলে যাবে এবং সেখানে তার ভূমিদাসদের কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করবে। সানন্দে এই নতুন জীবনের পরিকল্পনা করছে এমন সময় হঠাৎ প্রিন্স ভাসিলি ঘরে ঢুকল।

ঢুকতে ঢুকতেই প্রিন্স ভাসিলি বলল, "দেখ বাপু, মস্কোতে তুমি কি সব কাণ্ড করেছ? তুমি ভুল বুঝেছ। এ ব্যাপারে আমি সব জানি, তাই জোর দিয়েই তোমাকে বলছি যে ইহুদিদের কাছে খৃস্ট যেরকম নির্দোষ ছিলেন, তোমার কাছে হেলেনও তেমনই নির্দোষ।"

পিয়ের জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু প্রিন্স ভাসিলি তাকে বাধা দিল।

বলল, "তুমি বন্ধুর মত সোজা কেন আমার কাছে এলে না? আমি এ ব্যাপারে সব জানি, সব বুঝি। যে মানুষ নিজের সম্মানকে মূল্য দেয় তার মত কাজই তুমি করেছ; হয়তো একটু তড়িঘড়ি করে ফেলেছ, কিন্তু সে-কথা থাক।" একটু নীচু গলায় বলল, "কিন্তু একবার ভেবে দেখ তো, সমাজের চোখে, এমন কি আদালতের চোখে তুমি তাকে ও আমাকে কোথায় এনে ফেলেছ। সে আছে মস্কোতে, আর তুমি আছ এখানে। কিন্তু মনে রেখ বাবা, এটা নেহাৎই একটা ভুল-বোঝাবুঝির ব্যাপার। আশা করি তুমি নিজেও তা বুঝতে পেরেছ। এস না, এখনই আমরা তাকে একটা চিঠি লিখি, তাহলেই সে এখানে চলে আসবে, আর সব কথাই তাকে বুঝিয়ে বলা হবে; কিন্তু বাবা, তা যদি না কর তো আমি বলছি পরে তোমাকে এ জন্য দুঃখ পেতে হবে।"

প্রিন্স ভাসিলি অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল।

"বিশ্বস্তসূত্রে আমি জানতে পেরেছি, বিধবা সম্রাজ্ঞী এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তুমি তো জান, হেলেনের প্রতি তিনি খুবই সদয়।"

পিয়ের বারকয়েক কথা বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু একদিকে প্রিন্স ভাসিলি যেমন তাকে কথা বলতেই দিল না, অন্যদিকে তেমনই শশুরের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে তার মতের বিরুদ্ধে যাবার যে সংকল্প সে করেছে সেভাবে কথা বলতে সে নিজেও কিছুটা ভয় পেল। তাছাড়া, "সকলের প্রতি সদয় ও বিনয়ী হও" ভ্রাতৃসংঘের এই বিধানটিও তার মনে পড়ে গেল। সে চোখ

কুঁচকাল, তার মুখটা লাল হয়ে উঠল, উঠে দাঁড়াল, আবার বসে পড়ল। একজন লোকের মুখের উপর একটা অপ্রিয় কথা বলা, তার কাছে অপ্রত্যাশিত কিছু বলা—জীবনের এই সবচাইতে কঠিন কাজটি করার জন্য সে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগল। প্রিন্স ভাসিলির কথা মেনে চলতে সে এতই অভ্যস্ত যে তার মনে হল, তার দিক থেকে এই অপ্রিয় আপত্তিটা এখন সে সহ্য করতে পারবে না; তার আরও মনে হল, সে এখন যা বলবে তার উপরেই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ—সেই পুরনো পথেই সে চলবে, নাকি সংঘ-ভাইরা যে নতুন পথের সন্ধান তাকে দিয়েছে যা তাকে নতুন জীবন দান করবে বলে সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সেই পথেই চলবে।

প্রিন্স ভাসিলি বলল, "দেখ বাবা, তুমি 'হ্যাঁ' বলে দাও, আমি নিজেই তাকে চিঠি লিখে দিচ্ছি, বাস, সব গোলমাল মিটে যাক।"

কিন্তু প্রিন্স ভাসিলির কথা শেষ হবার আগেই তার দিকে না তাকিয়ে পিয়েরের বাবার মতই রুক্ষ অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল:

"প্রিন্স, আমি আপনাকে এখানে আসতে বলি নি। দয়া করে চলে যান!" লাফ দিয়ে উঠে সে দরজাটা খুলে দিল।

"চলে যান!" সে আবার বলল; প্রিন্স ভাসিলির মুখের বিচলিত, ভীত দৃষ্টি দেখে সে বেশ খুসি হয়ে উঠল।

"তোমার কি হয়েছে? তুমি কি অসুস্থ?"

"চলে যান!" কাঁপা গলায় সে আর একবার বলল। অগত্যা প্রিন্স ভাসিলিকে চলে যেতেই হল।

এক সপ্তাহ পরে নতুন বন্ধু ও সংঘ-ভাইদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এবং ভিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ তাদের হাতে দিয়ে পিয়ের নিজের জমিদারিতে চলে গেল। নতুন ভাইরা তার হাত দিয়ে কিয়েভ এবং ওডেসার ভ্রাতৃসংঘের কাছে চিঠি লিখে দিল; কথা দিল, তাকে চিঠি লিখবে, নতুন কর্ম-সাধনায় তাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

অধ্যায়—৬

পিয়ের ও দলখভের দ্বৈত যুদ্ধের ব্যাপারটা মিটে গেছে; সে সময় দ্বৈত যুদ্ধ সম্পর্কে সম্রাটের যথেষ্ট কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও দুই যোদ্ধা ও তাদের সমর্থক কারও কোন শাস্তি হল না। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে পিয়েরের সম্পর্কচ্ছেদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে সেই দ্বৈত যুদ্ধের গল্প সমাজের সর্বত্রই আলোচিত হতে লাগল। পিয়ের যখন অবৈধ সন্তান ছিল তখন সকলেই তাকে করুণা করত; আবার সে যখন রাশিয়ার সেরা বর হয়ে দেখা দিল তখন সকলেই তার খোসামোদ করতে শুরু করল; আবার বিয়েটা হয়ে যাবার পরে সকলের কাছেই তার দাম কমে গেল—কারণ বিবাহযোগ্য মেয়েদের ও তাদের মায়েদের আর তার

কাছে কিছুই আশা করবার রইল না। যা ঘটেছে সেজন্য এখন সকলে তাকেই দোষ দিচ্ছে, সকলেই বলছে ঈর্ষার বশে তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বাবার মতই রাক্ষুসে রাগ তাকেও ভর করেছে। আর পিয়েরের চলে যাবার পরে হেলেন যখন পিতার্সবুর্গে ফিরে এল তখন পরিচিতজনরা তাকে সাদরে বরণ করে নিল, এমন কি তার দুর্ভাগ্যের জন্য তাকে কিছুটা সমীহও দেখাতে লাগল। স্বামীর কথা উঠলেই হেলেন এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন কারও উপর দোষারোপ না করেই সে স্বামীর দেওয়া এই দুঃখের বোঝা নীরবে বয়ে বেড়াবে। প্রিন্স ভাসিলি অবশ্য খোলাখুলিভাবেই তার মনের কথা প্রকাশ করল। পিয়েরের কথা উঠলেই দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের কপাল দেখিয়ে বলতে লাগল:

"একটু লেগেছে—একথা তো আগাগোড়াই বলেছি।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আমি তো গোড়াতেই বলেছিলাম। অন্য কেউ বলবার আগেই বলেছি, আজকের দিনের বাজে ভাবনাচিন্তাগুলোই নির্বোধ যুবকটির মাথা খেয়েছে। সকলেই যখন ওকে নিয়ে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছিল, ও যখন সবে বিদেশ থেকে ফিরে আমার বাড়ির এক মজলিসেই এমনভাবে দেখাল যেন সেও একজন মারাৎ, তখনই আমি এ-কথা বলেছিলাম। আর এখানেই কি শেষ হয়ে যাবে? আমি তো তখনই এ বিয়ের বিরুদ্ধে ছিলাম, আর আজ যা কিছু ঘটেছে সবই আগে থেকে বলেও দিয়েছিলাম।"

১৮০৬ সালের শেষের দিকে। জেনা ও অয়েস্টাড-এ নেপোলিয়নের হাতে প্রাশিয়ান বাহিনীর সম্পূর্ণ পরাজয় ও প্রাশিয়ার অধিকাংশ দুর্গের আত্মসমর্পণের শোচনীয় খবরগুলি যখন পুরোপুরি এসে গেছে, আমাদের বাহিনী যখন প্রাশিয়াতে ঢুকেছে এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু হতে চলেছে, তখন আন্না পাভ্‌লভ্‌না আবার একটা মজলিসের ব্যবস্থা করল। "সত্যিকারের উঁচু মহলের যারা সেরা মানুষ" তাদের মধ্যে ছিল স্বামীপরিত্যক্তা মনোরমা হেলেন, মর্তেমার্ত, ভিয়েনা থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রিন্স হিপোলিৎ, দুজন কূটনীতিক, বুড়ি মাসি, ও আরও অনেকে।

সেদিন সন্ধ্যায় আন্না পাভ্‌লভ্‌না যে নতুন রত্নটিকে অতিথিদের সামনে হাজির করল সে হল বরিস দ্রুবেৎস্কয়; প্রাশীয় বাহিনীর বিশেষ দূত হিসাবে সে সম্প্রতি এসেছে; কোন একজন ভি-আই-পির সে এড্‌-ডি-কং।

অতিথিরা সকলেই এসে গেছে; আন্না পাভ্‌লভ্‌নার নেতৃত্বে আলোচনা চলছে অস্ট্রীয়ার সঙ্গে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্কে ও তার সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হবার বিষয় নিয়ে; এমন সময় বরিস ঘরে ঢুকল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না চুমো খাবার জন্য তার কুঁচকে-যাওয়া হাতটা বরিসের দিকে এগিয়ে দিল, অপরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে

দিল, অস্ফুট স্বরে তাদের কিছু কিছু বিবররণও শুনিয়ে দিল।

"প্রিন্স হিপোলিৎ কুরাগিন—চমৎকার যুবক ; এম. ক্রংকা, কোপেনহাগেনের রাষ্ট্রদূত, প্রগাঢ় পণ্ডিত মানুষ ; মি: শিতভ বহুগুণের অধিকারী।"

নতুন পরিবেশে বরিস নিজেকে বেশ মানিয়ে নিল। সুন্দরী হেলেনের পাশে তার জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে বসে সে মন দিয়ে সকলের আলোচনা শুনতে লাগল।

ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত বলল, "ভিয়েনার মতে প্রস্তাবিত সন্ধির মূল কথাগুলি এতই ধরা ছোঁয়ার বাইরে যে অবিরাম চেষ্টা চালিয়েও তাদের নাগাল পাওয়া যাবে না, আর তাই সেবিষয়ে ভিয়েনা যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করে। ভিয়েনা মন্ত্রীসভার এটাই আসল বক্তব্য।"

মর্তেমার্ত বলল, "ভিয়েনা মন্ত্রীসভা এবং অস্ট্রীয়ার সম্রাটের মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য আছে। অস্ট্রীয়ার সম্রাট কখনও এ ধরনের কথা ভাবতে পারেন না, এটা শুধুমাত্র মন্ত্রীসভার কথা।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "দেখুন ভাইকোঁত, য়ুরোপ (আন্না এটাকেই ইওরোপের ফরাসী উচ্চারণ বলে মনে করে এবং ফরাসীদের সঙ্গে আলোচনাকালে এই উচ্চারণই করে থাকে) কখনও আমাদের আন্তরিক মিত্র হবে না।

বরিস মনোযোগ সহকারে সকলের বক্তব্যই শুনল ; সেই ফাঁকে মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তিনী সুন্দরী হেলেনের দিকেও নজর দিল ; হেলেনের চোখ দুটিও স্মিত হাসির সঙ্গে বারকয়েক এই সুদর্শন যুবক এড-ডি-কংটির চোখের উপর পড়ল।

প্রাশিয়ার অবস্থার কথা বলতে গিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না স্বাভাবিকভাবেই বরিসকে অনুরোধ করল, তার গ্লোগাউ অভিযান ও সেখানকার তৎকালীন প্রাশীয় বাহিনীর অবস্থার কথা কিছু বলতে। বরিসও বেশ ভেবেচিন্তে সেনাবাহিনী ও দরবারের কিছু কিছু আকর্ষণীয় বিবরণ শুনিয়ে দিল। সকলেরই মনোযোগ তার প্রতি আকৃষ্ট হল; কিন্তু সবচাইতে বেশী আগ্রহ দেখাল হেলেন। বেশ কয়েকটি প্রশ্নও সে করল। কথা শেষ হতেই সে হেসে বরিসের দিকে মুখ ফেরাল।

বলল, "আপনি অতি অবশ্যই এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। মঙ্গলবার আটটা থেকে নটার মধ্যে। আপনি এলে ভারী খুসী হব।"

তার ইচ্ছাপূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বরিস সবে তার সঙ্গে আলাপ শুরু করেছে এমন সময় আন্না পাভ্‌লভ্‌না মাসি তাকে ডেকেছে এই অজুহাতে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না চোখ টিপে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে হেলেনকে দেখিয়ে বলল, "ওর স্বামীকে তো তুমি নিশ্চয়ই চেন? আহা, বেচারির ভাগ্যটাই

খারাপ! ওর সামনে স্বামীর কথা তুলো না—দয়া করে তুলো না! তাতে ও বড় ব্যথা পাবে!"

অধ্যায়—৭

বরিস ও আন্না পাভ্‌লভ্‌না যখন ফিরে এল তখন অন্য সকলেই প্রিন্স হিপোলিতের কথা শুনতে ব্যস্ত। হাতল-চেয়ারে বসে সামনে ঝুঁকে সে বলল ঃ "প্রাশিয়ার রাজা!" আর তার পরেই হেসে উঠল। সকলেই তার দিকে মুখ ঘোরাল।

"প্রাশিয়ার রাজা?" সপ্রশ্ন ভঙ্গীতে কথাটা বলেই হিপোলিত আর একবার হেসে উঠল; তারপর শান্ত, গম্ভীরভাবে চেয়ারে হেলান দিল। তার কথা শুনবার জন্য আন্না পাভ্‌লভ্‌না কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল; কিন্তু সে যখন আর মুখ খুলল না তখন সে নিজেই বলতে শুরু করল পটস্‌ডাম এ পাপিষ্ঠ বোনাপার্ত কর্তৃক মহান ফ্রেডেরিকের তরবারি চুরির কথা।

"মহান ফ্রেডেরিকের তরবারির কথাই আমি······" সে বলতে শুরু করতেই হিপোলিত তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল "প্রাশিয়ার রাজা···" তারপর সকলে তার দিকে মুখ ফেরাতেই সে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মুখ বন্ধ করল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার ভুরু কুঞ্চিত হল। হিপোলিতের বন্ধু মর্তেমার্ত কড়াগলায় বলল: "এই যে, 'প্রশিয়ার রাজা'-র কথার কি হল?"

হিপোলিত এমনভাবে হাসল যেন হাসিটাই লজ্জার ব্যাপার।

"ও কিছু না। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম····'প্রাশিয়ার রাজার জন্য' (ফরাসীতে কথাটাতে বোঝায় 'বাজে জিনিস') যুদ্ধ করাটাই আমাদের ভুল হয়েছিল।"

বরিস বেশ বুদ্ধি করে ঈষৎ হাসল। অন্য সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

শুকনো আঙুল উঁচিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "তোমার ঠাট্টাটা বড়ই খারাপ হল; কথাটা সরস হলেও অন্যায়।

সে আরও বলল, "আমরা তো 'প্রাশিয়ার রাজার জন্য' যুদ্ধ করি নি। করেছি ন্যায়-নীতির জন্য। আঃ, প্রিন্স হিপোলিত কী দুষ্টু!"

আলোচনাটা একসময় রাজনৈতিক সংবাদের দিকে মোড় নিল। ক্রমে সম্রাট যেসব পুরস্কার বিতরণ করেছে সেই প্রসঙ্গ উঠল।

"প্রগাঢ় পণ্ডিত" লোকটি বলল, "আপনারা জানেন গত বছর এন—এন—পেয়েছিলেন প্রতিকৃতিখচিত একটা নস্যিদান, তাহলে এস—এস—অনুরূপ সম্মান পাবেন না কেন?"

কূটনীতিক বলে উঠল, "মাফ করবেন! সম্রাটের প্রতিকৃতিখচিত নস্যিদান একটা পুরস্কার মাত্র, কোন সম্মান নয়—একটা উপহারও বলতে পারেন।

“কিন্তু এরকম দৃষ্টান্ত আছে; আমি শোয়ার্জেনবের্গ-এর কথা উল্লেখ করতে পারি।

অপর একজন বলল, “এ অসম্ভব।”

“বাজি রাখবে? সম্মানসূচক ফিতে একটা আলাদা ব্যাপার…”

সকলে উঠে পড়ল। সারা সন্ধ্যা হেলেন সামান্যই কথা বলেছে। এবার সে বরিসের দিকে ঘুরে তাকে মঙ্গলবারে আসার কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল।

স্মিত হেসে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার দিকে ঘুরে হেলেন বলল, “আমার কাছে এটা খুব বড় কথা।” আন্না পাভ্‌লভ্‌নাও যথারীতি বিষণ্ণ হাসি হেসে তাকে সমর্থন জানাল।

কিন্তু মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হেলেনদের চমকপ্রদ বসবার ঘরে এসে বরিস বুঝতেই পারল না তার এখানে আসাটা কেন এত দরকারী ছিল। আরও কিছু অতিথি উপস্থিত ছিল, আর কাউণ্টেসও তার সঙ্গে সামান্য কথাই বলল। কিন্তু বিদায় নেবার সময় সে যখন কাউণ্টেসের হাতে চুমো খেল তখন সে বিচিত্র গম্ভীর মুখে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল: “আগামী কাল ডিনারে এস…সন্ধ্যায়। আসতেই হবে…এস কিন্তু!”

পিতার্স্‌বুর্গে অবস্থানকালে কাউণ্টেসের পরিবারের সঙ্গে বরিস বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৮

যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে; ক্রমেই এগিয়ে আসছে রুশ সীমান্তের দিকে। সকলের মুখেই “মানবজাতির শত্রু” বোনাপার্তের প্রতি অভিশাপ। গ্রামে গ্রামে চলেছে সামরিক ও বেসামরিক সৈন্য-সংগ্রহের অভিযান; রণস্থল থেকে আসছে নানা পরস্পরবিরোধী সংবাদ; যথারীতি সেগুলি মিথ্যা, আর তাই তাদের ব্যাখ্যাও নানা রকম।

বুড়ো প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি, প্রিন্স ও প্রিন্সেস মারির জীবনযাত্রা ১৮০৫ সাল থেকে অনেক বদলে গেছে।

সারা রাশিয়া জুড়ে সৈন্য-সংগ্রহের যে অভিযান চলেছে তার তত্ত্বাবধানের জন্য যে আটজন প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়েছে ১৮০৬ সালে, বুড়ো প্রিন্স তাদের অন্যতম। যে সময়ে সে ভেবেছিল যে ছেলে যুদ্ধে মারা গেছে তখন থেকেই তার দেহে বার্ধক্যের দুর্বলতা প্রকট হয়ে উঠেছে। তবু সম্রাট স্বয়ং যে কর্তব্যের ভার তাকে দিয়েছে তাকে অস্বীকার করাটাকে সে সঙ্গত মনে করে নি; বরং কাজ করবার এই নতুন সুযোগ তাকে এনে দিয়েছে নতুন উৎসাহ ও শক্তি। যে তিনটি প্রদেশের ভার তার উপর পড়েছে সেখানে সে অনবরত টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সগর্বে নিজ কর্তব্য পালন করছে, অধীনস্থ লোকজনদের কঠোর হাতে পরিচালিত করছে, সবকিছুর উপরেই পুংখানু-

পুংখ নজর রাখছে। প্রিন্সেস মারি বাবার কাছে গণিতের পাঠ নেওয়া বন্ধ করেছে; বুড়ো প্রিন্স যখন বাড়িতে থাকে তখনও দাই ও ছোট্ট প্রিন্স নিকলাসকে (ঠাকুর্দা তাকে ঐ নামেই ডাকে) নিয়ে সে বাবার পড়ার ঘরে যায়। প্রিন্সেস মারি দিনের বেশীর ভাগ সময় নার্সারিতেই কাটায়, যতদূর সম্ভব ছোট্ট ভাই-পোটির প্রতি মায়ের মতই ব্যবহার করতে চেষ্টা করে। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁও বাচ্চাটিকে খুবই ভালবাসে, কোলে-পিঠে নিয়ে আদর করে।

বল্ড হিল্‌স্‌-এর গির্জার বেদীর কাছে ছোট প্রিন্সেসের সমাধির উপর একটা প্রার্থনা-কক্ষ তৈরি করে ইতালি থেকে শ্বেত পাথরের একটি স্মারক এনে সেখানে বসানো হয়েছে: যেন উড়ে যাবার ভঙ্গীতে পাখা মেলে একটি দেবদূত দাঁড়িয়ে আছে। দেবদূতের উপরের ঠোঁটটি যেন আসন্ন হাসির জন্য একটু উঁচু হয়ে আছে। একদিন প্রার্থনা-কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে প্রিন্স আন্‌দ্রু ও প্রিন্সেস মারি দুজনই পরস্পরের কাছে স্বীকার করেছে যে দেবদূতের মুখের সঙ্গে ছোট প্রিন্সেসের মুখের একটা বিস্ময়কর মিল আছে। আরও বিস্ময়ের কথা, মুখ ফুটে বোনকে না বললেও প্রিন্স আন্‌দ্রু যেন সেই মুখে দেখতে পেয়েছে সেই মৃদু তিরস্কার যা তার মৃত স্ত্রীর মুখে ফুটে উঠেছিল যখন সে বলেছিল: "আঃ, আমার প্রতি তুমি এ ব্যবহার করলে কেন?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু ফিরে আসার পরেই বুড়ো প্রিন্স বল্ড হিল্‌স্‌ থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে অবস্থিত বগুচারোভোর মস্ত বড় জমিদারিটা তাকে হস্তান্তরিত করে দিল। বল্ড হিল্‌সের সঙ্গে একটা বিষণ্ণ স্মৃতি জড়িয়ে থাকায়, প্রিন্স আন্‌দ্রু সবসময় বাবার খামখেয়ালিপনাকে বরদাস্ত করে চলতে না পারায়, এবং তার পক্ষে নির্জনে থাকাটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ায়, প্রিন্স আন্‌দ্রু বগুচারোভো-তে বাড়ি তৈরি করতে শুরু করে দিল, এবং সেখানেই বেশী সময় কাটাতে লাগল।

অস্তারলিজ অভিযানের পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু স্থির করেছিল সামরিক চাকরিতে আর যোগ দেবে না; তাই পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলে যখন সকলকেই তাতে যোগ দিতে হল তখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধকে এড়াবার জন্য সে সৈন্য-সংগ্রহের ব্যাপারে বাবার অধীনেই একটা কাজ জুটিয়ে নিল। ১৮০৫ সালের অভিযানের পর থেকে পিতা-পুত্র যেন তাদের ভূকিকাকেই পাল্টে ফেলেছে। কর্মে উদ্দীপ্ত বুড়ো মানুষটি নতুন অভিযান থেকে আশা করছে সেরা সুফল, আর প্রিন্স আন্‌দ্রু যুদ্ধে কোন অংশ তো নিচ্ছেই না, বরং মনে মনে দুঃখবোধ করছে, আর এই অভিযানের শুধু খারাপ দিকটাই দেখছে।

১৮০৭-এর ২৬ শে ফেব্রুয়ারি বুড়ো প্রিন্স কার্যোপলক্ষ্যে বাড়ি থেকে চলে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু বাবার অনুপস্থিতির দরুণ যথারীতি বল্ড হিল্‌সেই থেকে গেল। চারদিন যাবৎ ছোট নিকলাস অসুস্থ। বুড়ো প্রিন্সকে শহরে পৌঁছে

দিয়ে কোচয়ান প্রিন্স আন্দ্রুর জন্য কিছু কাগজপত্র ও চিঠি নিয়ে ফিরে এল।

ছোট প্রিন্সকে তার পড়ার ঘরে না পেয়ে খানসামা চিঠিগুলো নিয়ে প্রিন্সেস মারির ঘরে গেল, কিন্তু সেখানেও তাকে পেল না। শুনল, প্রিন্স নার্সারিতে গেছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বাচ্চাদের ছোট চেয়ারে বসে ভুরু কুঁচকে কাঁপা হাতে অর্ধেক জলভর্তি একটা মদের গ্লাসে ফোঁটা ফোঁটা করে ওষুধ ঢালছিল। জনৈকা দাসী চিঠিগুলো এনে বলল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি, পেত্রুশা এই কাগজপত্রগুলো এনেছে।"

"এগুলো কি?" সে বিরক্ত হয়ে বলল, আর তার হাতটা কেঁপে গিয়ে কয়েক ফোঁটা বেশী ওষুধ গ্লাসে পড়ে গেল। ওষুধটা মেঝেয় ফেলে দিয়ে আরও জল আনতে বলল। দাসী জল এনে দিল।

ঘরে আসবাবের মধ্যে আছে একটা বাচ্চাদের খাটিয়া, দুটো বাক্স, দুটো হাতল-চেয়ার, একটা টেবিল, একটা বাচ্চাদের টেবিল, আর একটা ছোট চেয়ার যেটাতে প্রিন্স আন্দ্রু বসে আছে। পর্দাগুলো নামানো, টেবিলের উপর একটা মোমবাতি জ্বলছে, আলোটা যাতে খাটিয়ার উপর না পড়ে সেজন্য একখানা বাঁধানো গানের বই দিয়ে মোমবাতিটাকে আড়াল করে রাখা হয়েছে।

খাটিয়ার পাশে দাঁড়ানো প্রিন্সেস মারি দাদাকে উদ্দেশ করে বলল, "বরং একটু অপেক্ষা কর···পরে····"

যেন বোনকে আঘাত দেবার জন্যই প্রিন্স আন্দ্রু বিরক্ত গলায় ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "আঃ, ছাড় তো, তুমি তো সব সময় বাজে কথা বল আর কাজ ফেলে রাখ—আর তার তো এই ফল হয়!"

প্রিন্সেস মিনতির সুরে বলল, "সত্যি বলছি দাদা···ওকে না জাগানোই ভাল···ও ঘুমিয়ে পড়েছে।"

প্রিন্স আন্দ্রু উঠে দাঁড়াল, মদের গ্লাসটা হাতে নিয়েই পা টিপে টিপে ছোট খাটিয়াটার দিকে এগিয়ে গেল।

ইতস্তত করে বলল, "হয়তো ওকে না জাগানোই ভাল।"

প্রিন্সেস মারি বলল, "তোমার যেমন ইচ্ছা···সত্যি····আমার তো তাই মনে হয়···· তবে তোমার যেমন ইচ্ছা। দাসীটি ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রিন্স আন্দ্রুকে ডাকায় প্রিন্সেস মারি সেদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

আজ দু'রাত দুজনের কেউই ঘুমোয় নি; ছেলেটির জ্বর খুব বেশী থাকায় তার উপর নজর রেখেছে। পরিবারের ডাক্তারের উপর ভরসা না করে শহর থেকে অন্য ডাক্তারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে; ইতিমধ্যে এই দুটি রাত তারা একটার পর একটা ওষুধ দিয়ে যাচ্ছে। অনিদ্রা ও উদ্বেগে ক্লান্ত হয়ে তারা একে অন্যের ঘাড়ে কষ্টের বোঝা চাপাচ্ছে আর ঝগড়া করছে।

দাসী অস্ফুট গলায় বলল, "পেত্রুশা আপনার বাবার কাছ থেকে কাগজপত্র নিয়ে এসেছে।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বেরিয়ে গেল।

"সব উচ্ছন্নে যাক!" সে তো-তো করে বলল; বাবা মুখে-মুখে যেসব নির্দেশ পাঠিয়েছে তা শুনে নিয়ে এবং বাবার চিঠি ও অন্য কাগজপত্র হাতে নিয়ে আবার নার্সারিতে ফিরে গেল।

"কেমন?" শুধাল।

"একই রকম। ঈশ্বরের দোহাই, অপেক্ষা কর। কার্ল আইভানিচ সব সময়ই বলেন, ঘুমটাই সবচাইতে বড় কথা," একটা নিঃশ্বাস ফেলে প্রিন্সেস মারি অনুচ্চগলায় বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু ছেলের কাছে গিয়ে কপালে হাত রাখল। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

"তোমার আর তোমার কার্ল আইভানিচের কথা থাক!" ওষুধ মেশানো গ্লাসটা নিয়ে সে আবার খাটিয়ার কাছে গেল।

"আন্‌দ্রু, ও কাজ করো না!" প্রিন্সেস মারি বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু রেগে বোনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে গ্লাসটা হাতে নিয়ে ছেলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

বলল, "কিন্তু এটা আমার ইচ্ছা। তোমাকে মিনতি করছি—ওষুধটা খাইয়ে দাও।"

কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেও প্রিন্সেস মারি দাদার কথামত গ্লাসটা নিল এবং নার্সকে ডেকে ওষুধটা খাওয়াতে লাগল। বাচ্চাটি কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল। প্রিন্স আন্‌দ্রু একটু পিছিয়ে গেল, মাথাটা চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, এবং পাশের ঘরে একটা সোফায় বসে পড়ল।

সবগুলো চিঠি তখনও তার হাতে। যন্ত্রচালিতের মত সেগুলো খুলে সে পড়তে শুরু করল। বুড়ো প্রিন্স মাঝে মাঝে সংক্ষিপ্ত শব্দ ব্যবহার করে নীল কাগজে বড় বড় লম্বা লম্বা হরফে লিখেছে:

"বিশেষ দূতের মারফৎ এইমাত্র একটা খুবই আনন্দের সংবাদ পেয়েছি—এখন সেটা মিথ্যা না হলেই হয়। আইলো—তে বেনিংসেন বোনাপার্তের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ জয়লাভ করেছে। পিতার্সবুর্গে সকলেই আনন্দ করছে আর সেনাবাহিনীকে অসংখ্য পুরস্কার পাঠানো হচ্ছে। যদিও সে জার্মান—তবু তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। কর্চেভোর অধিনায়ক—কে এক খান্দ্রিকভ—। যে কি করছে কিছুই বুঝতে পারছে না; এখন পর্যন্ত বাড়তি সৈন্য এবং খাদ্যদ্রব্য এসে পৌঁছয় নি। এই মুহূর্তে ঘোড়া ছুটিয়ে গিয়ে তাকে বলে দাও, এক সপ্তাহের মধ্যে সবকিছু এখানে না এলে আমি তার মুণ্ডুটাই কেটে ফেলব। প্রাশিস্ক—আইলো যুদ্ধ সম্পর্কে আর একটা চিঠি পেয়েছি পেতেংকার

কাছ থেকে—সে ঐ যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল—আর এ সবই সত্যি। দুষ্কৃতকারীরা হস্তক্ষেপ না করলে একজন জার্মান পর্যন্ত বোনাপার্তকে পরাস্ত করতে পারে। সে নাকি লেজে-গোবরে হয়ে পালাচ্ছে। মনে থাকে যেন, অবিলম্বে ঘোড়া ছুটিয়ে কর্চেভো চলে যাও এবং আমার নির্দেশ পালন কর!”

প্রিন্স আন্দ্রু দীর্ঘশ্বাস ফেলে আর একখানা খামের সিল ভাঙল। দুই পাতা ভর্তি ঠাসা লেখা বিলিবিনের চিঠি। না পড়েই সে চিঠিটা ভাঁজ করে রাখল এবং বাবার চিঠিটাই আর একবার পড়ল; একেবারে শেষে লেখা শেষ হয়েছে: “অবিলম্বে ঘোড়া ছুটিয়ে কর্চেভো চলে যাও, এবং আমার নির্দেশ পালন কর!”

দরজার কাছে গিয়ে নার্সারির মধ্যে দৃষ্টি ফেলে সে ভাবল, “না, আমাকে ক্ষমা কর, ছেলে একটু ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমি যাব না।”

প্রিন্সেস মারি তখনও খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বাচ্চাটিকে দোল দিচ্ছে।

বাবার চিঠির কথা মনে হতে প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, “হ্যাঁ, তিনি অপ্রীতিকর আর কি যেন বলেছেন? হ্যাঁ, বোনাপার্তের বিরুদ্ধে আমাদের জয় হচ্ছে, ঠিক যখন আমি সেনাদলে নেই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি তো সব সময়ই আমাকে ঠাট্টা করেন···তা বেশ! ঠাট্টাই করতে থাকুন!” সে ফরাসী ভাষায় লেখা বিলিবিনের চিঠিটা পড়তে শুরু করল। তার অর্ধেকের অর্থ না বুঝেই পড়ে ফেলল, দীর্ঘ সময় ধরে অন্য সবকিছু ভুলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে যে কথা সে ভাবছে অন্তত মুহূর্তের জন্যও তাকে ভুলে থাকবার জন্যই সে চিঠিটা পড়তে লাগল।

অধ্যায়—৯

বিলিবিন এখন সেনাবাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে কূটনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত; যদিও সে লিখেছে ফরাসী ভাষায়, ব্যবহার করেছে ফরাসী রঙ্গরস ও ফরাসী বাকভঙ্গী, তবু গোটা অভিযানকে সে বর্ণনা করেছে খাঁটি রুশীয় আত্ম-সমালোচনা ও আত্ম-বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। বিলিবিন লিখেছে, কূটনৈতিক স্বাধীনতার বাধ্যবাধকতা তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে; তাই প্রিন্স আন্দ্রুর মত এমন একজন নির্ভরযোগ্য পত্রালাপী পেয়ে সে খুসি যার কাছে সেনাবাহিনীর কাজকর্ম স্বচক্ষে দেখার ফলে পেটের মধ্যে যত পিত্ত জমা হয়েছে তাকে উদ্ধার করে ফেলে দেওয়া যায়। চিঠিটা পুরনো, লেখা হয়েছিল প্রুশিস্ক্‌—আইলো যুদ্ধের আগে।

বিলিবিন লিখেছে, “তুমি তো জান বন্ধু প্রিন্স, অস্তারলিজের যুদ্ধে আমাদের চমৎকার সাফল্যের পরে আমি কখনও প্রধান ঘাঁটি ছেড়ে যাই নি। যুদ্ধের প্রতি অবশ্যই আমার একটা আগ্রহ জন্মেছে, আর আমার পক্ষে সেটা

ভালই হয়েছে; গত তিন মাসে আমি যা দেখেছি তা অবিশ্বাস্য।

প্রথম থেকেই শুরু করছি। তুমি জান, 'মানব জাতির শত্রুটি' প্রাশীয়দের আক্রমণ করল। প্রাশীয়রা আমাদের বিশ্বস্ত মিত্র হয়েও তিন বছরে তিনবার আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা তাদের পক্ষ সমর্থন করি, আর দেখা যায় যে 'মানবজাতির শত্রুটি' আমাদের ভাল বক্তৃতায় কোনরকম কান না দিয়ে তার নিজস্ব কঠোর, বর্বর পন্থায় প্রাশীয়দের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদের আরব্ধ কুচকাওয়াজটা শেষ করবার সময়টুকুও দেয় না, আর হাতের দুই মোচড়ে তাদের ভেঙে টুকরো টুকরো করে পট্‌স্‌ডাম-এর প্রাসাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে।

"প্রাশিয়ার রাজা বোনাপার্তকে লিখলেন, 'আমার একান্ত বাসনা যে মাননীয় মহাশয়কে আপনার পছন্দমতভাবে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব ভালভাবে আমার প্রাসাদে স্বাগত জানাই ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করি, আর সেই উদ্দেশ্যে সবরকম ব্যবস্থাই আমি গ্রহণ করেছি। আমার প্রচেষ্টা যেন সফল হয়!' প্রাশীয় সেনাপতিরা ফরাসীদের প্রতি প্রদর্শিত ভদ্রতার জন্য অবশ্যই গর্ব বোধ করতে পারেন, কারণ প্রথম হুমকিতেই তারা অস্ত্রত্যাগ করেছেন।

"দশ হাজার সৈন্য নিয়ে গ্লোগেট দুর্গের অধিপতি প্রাশিয়ার রাজার কাছে জানতে চাইলেন, তাকে আত্মসমর্পণ করতে বলা হলে তিনি কি করবেন। ....এ সবই সম্পূর্ণ সত্য কথা।

"সংক্ষেপে, একটা যুদ্ধের মনোভাব নিয়ে সব ব্যাপারের মীমাংসা করবার আশা নিয়ে আমরা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি, আর সে যুদ্ধ আমাদের নিজেদের সীমান্তে এবং প্রাশিয়ার রাজার সঙ্গীরূপে ও তারই জন্য। আমাদের সবকিছু ভাল, শুধু একটা ছোট জিনিসের অভাব, অর্থাৎ একজন প্রধান সেনাপতি। যেহেতু মনে করা হল যে আমাদের প্রধান সেনাপতির বয়স অত অল্প না হলে অস্তারলিজের সাফল্য আরও চূড়ান্ত হতে পারত তাই আমাদের সব অশীতিবর্ষবয়স্কদের কথা আর একবার ভাবা হল এবং প্রজরোভ্‌স্কি ও কামেন্‌স্কির মধ্যে শেষোক্তকে বেছে নেওয়া হল। আমাদের সেনাপতি সুভরভ-এর মতই একটা কিবিৎকা-তে (পুরনো কালের কাঠের ঢাকা গাড়ি) চেপে এলেন, আর সকলে সমবেত জয়ধ্বনির সঙ্গে তাকে অভ্যর্থনা করল।

"৪ঠা তারিখে পিতার্সবুর্গ থেকে প্রথম পত্রবাহক এল। ডাক নিয়ে যাওয়া হল ফিল্ড-মার্শালের ঘরে, কারণ সব কাজ নিজে করাটাই তিনি পছন্দ করেন। আমাকে ডাকা হল চিঠিগুলো ভাগ করে আমাদের চিঠিগুলো নিয়ে নিতে। ফিল্ড-মার্শাল নিজের চিঠির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার চিঠি একটাও পেলাম না। ফিল্ড-মার্শাল অধৈর্য হয়ে

নিজেই হাত লাগালেন এবং কাউণ্ট টি., প্রিন্স ভি. ও অন্যদের কাছে লেখা সম্রাটের চিঠি পেলেন। তখন তিনি সকলের প্রতি, সবকিছুর প্রতি রাগে ফেটে পড়লেন, সব চিঠি হাতে নিয়ে খুলতে লাগলেন এবং অন্যদের কাছে লেখা সম্রাটের চিঠিগুলো পড়তে লাগলেন। "আচ্ছা! তাহলে আমার প্রতি এই ব্যবহার! আমার উপর কোন আস্থা নেই! আচ্ছা, আমার উপর নজর রাখার নির্দেশ! খুব ভাল কথা! সেইভাবেই চলতে থাকুন!" আর তখনই তিনি জেনারেল বেনিংসেনকে লিখলেন সেদিনকার বিখ্যাত হুকুমনামা:

"আমি আহত, ঘোড়ায় চড়তে পারি না, ফলে সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করতে পারছি না। আপনার বাহিনীকে সরিয়ে পুল্‌তুস্ক-এ নিয়ে এসেছেন: সেখানে তারা অরক্ষিত, না আছে জালানি না আছে রসদ; কাজেই একটা কিছু করতেই হবে, এবং গতকাল আপনি নিজেই কাউণ্ট বাক্সহোদেন-এর কাছে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন তাতে মনে হয় আমাদের সীমান্তে সরে আসার কথাই আপনি ভাবছেন—সে কাজটি আজই সম্পন্ন করুন।'

"তিনি সম্রাটকে লিখলেন, 'অনবরত অশ্বারোহণের ফলে আমার জিনক্ষত হয়েছে; আমি ঘোড়ায় চড়তেই পারছি না এবং এত বড় একটা বাহিনীর পরিচালনা-ভারও নিতে পারছি না; তাই পদাধিকারবলে আমার পরবর্তী সেনাপতি কাউণ্ট বাক্সহোদেন-এর উপর আমি সেনাধ্যক্ষের ভার অর্পণ করেছি, আমার সব কর্মচারি ও জিনিসপত্র তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি; পরামর্শ দিয়েছি, রুটির অভাব ঘটে থাকলে তিনি যেন প্রাশিয়ার আরও ভিতরে ঢুকে যান, কারণ রুটির রেশন মাত্র একদিনের অবশিষ্ট আছে, ডিভিশন-কম্যাণ্ডার অস্তারমান ও সেদ্‌মোরেজ্‌কির প্রতিবেদন অনুসারে কোন কোন রেজিমেণ্টে তাও নেই, চাষীদের কাছে যা ছিল তাও খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। ভাল না হয়ে ওঠা পর্যন্ত আমি নিজে অস্ত্রলেংকার হাসপাতালেই থাকব। আমি খবর পেয়েছি, সেনাবাহিনী যদি আরও একপক্ষকাল বর্তমান শিবিরে থেকে যায় তাহলে আগামী বসন্তকাল নাগাদ একটি মানুষও সুস্থ থাকবে না; সেই খবরের উপর ভিত্তি করেই আমার এই বিনীত প্রতিবেদন পাঠালাম।

'যে মহৎ ও গৌরবময় কর্তব্য পালনের জন্য এই বৃদ্ধ মানুষটিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল তা পূর্ণ করতে না পারায় লোকচক্ষে সে হেয় প্রতিপন্ন হয়েছে; তাই তাকে তার পল্লীভবনে গিয়ে অবসর যাপনের অনুমতি দিন। আপনার সানুগ্রহ অনুমতির জন্য হাসপাতালেই আমি অপেক্ষা করব, যাতে সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডার হয়েও সেক্রেটারির ভূমিকায় আমাকে নামতে না হয়। সেনাবাহিনী থেকে আমার অপসারণের ফলে তিলমাত্র বিক্ষোভ হবে না—

চলে যাবে তো একটি অন্ধ মানুষ। আমার মত হাজার হাজার লোক রাশিয়াতে আছে।'

"সম্রাটের উপর রাগ করে ফিল্ড-মার্শাল শাস্তি দিলেন আমাদের সকলকে, এটাই কি ন্যায়সঙ্গত নয়?

"এ তো হল প্রথম অংক। এর পরের ঘটনা আরও আকর্ষণীয়, আরও মজাদার। ফিল্ড-মার্শালের বিদায় গ্রহণের পরে মনে হল আমরা শত্রুর মুখোমুখি এসে গেছি, যুদ্ধ করতেই হবে। বাক্সহোদেন এখন প্রধান সেনাপতি, কিন্তু জেনারেল বেনিংসেন-এর সেটা মনঃপূত নয়; তিনি চান এই সুযোগে 'নিজের হাতে' (জার্মানরা এই ভাষাই ব্যবহার করে) লড়াইটা চালিয়ে কিছুটা মুনাফা লুটে নেবেন। তাই তিনি করলেন। এটাই পুল্‌তুস্ক-এর যুদ্ধ; সেটাকে একটা বিরাট জয় বলে মনে করা হলেও আমার মতে সেরকম কিছু নয়। যাই হোক, যুদ্ধের পরে আমরা পশ্চাদপসরণ করলাম, কিন্তু দূত মারফৎ পিতার্সবুর্গে খবর পাঠালাম যে আমাদের জয় হয়েছে। এদিকে জয়লাভের পুরস্কার স্বরূপ পিতার্সবুর্গে থেকে প্রধান সেনাপতির পদটা পাবার আশায় জেনারেল বেনিংসেন সৈন্য-পরিচালনার দায়িত্ব জেনারেল বাক্সহোদেনের হাতে ফিরিয়ে দিলেন না। ফলে দুই সেনাপতির মধ্যে রেশারেশি শুরু হল। দুজনই রেগে লাল, আর তার ফলে বাক্সহোদেন এটাকে গ্রহণ করলেন চ্যালেঞ্জ হিসাবে, আর বেনিংসেন সন্ন্যাস-রোগীর মত ক্ষেপে গেলেন। আর ঠিক সেই সংকট-মুহূর্তে আমাদের দূত পিতার্সবুর্গ থেকে ফিরে এল বেনিংসন-এর প্রধান সেনাপতিরূপে নিয়োগের খবর নিয়ে। আমাদের প্রথম শত্রু বাক্সহোদেন পরাজিত হল; এবার দ্বিতীয় শত্রু বোনাপার্তের দিকে আমরা মন দিতে পারব। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঠিক সেইমুহূর্তে একটি তৃতীয় শত্রু আমাদের সামনে মাথা তুলে দাঁড়াল—গোড়া রুশ সৈন্যদল সরবে দাবী জানাল রুটি চাই, মাংস চাই, বিস্কুট চাই, ঘোড়ার দানাপানি চাই, চাই অনেক কিছু! ভাণ্ডার শূন্য, পথঘাট চলাচলের অযোগ্য। গোড়ায় সৈন্যরা এমনভাবে লুঠতরাজ শুরু করে দিল যা তুমি ভাবতেও পারবে না। অর্ধেক রেজিমেণ্ট ডাকাত সেজে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে গিয়ে আগুন ও তলোয়ারের মুখে সবকিছু ধ্বংস করতে লাগল। অধিবাসীরা সর্বস্বান্ত হল, হাসপাতালে রোগী উপচে পড়তে লাগল, সর্বত্র দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। দু'দুবার তারা আমাদের প্রধান ঘাঁটির উপর পর্যন্ত আক্রমণ চালাল, আর তাদের তাড়াতে প্রধান সেনাপতিকে আর এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য ডাকতে হল। সেই আক্রমণের সময় তারা আমার শূন্য পোর্টম্যাণ্টো ও ড্রেসিং-গাউনটাও নিয়ে গেল। সম্রাট প্রস্তাব করলেন, ডিভিশন-কম্যাণ্ডাররা ইচ্ছা করলেই লুঠেরাদের গুলি করতে পারবে, কিন্তু আমার তো আশংকা হয় তার ফলে সৈন্যদের এক অংশই অপর অংশের প্রতি গুলি চালাতে বাধ্য হবে।"

চিঠিটা এই পর্যন্ত পড়ে প্রিন্স আন্দ্রু সেটাকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। চিঠির কথাগুলিতে সে বিরক্ত হয় নি, তার বিরক্তির কারণ—যে জীবনের সঙ্গে তার এখন আর কোন সম্পর্কই নেই তার কথা জেনে সে বিচলিত বোধ করছে। যেন চিঠির বক্তব্য থেকে মনটাকে সরাবার জন্যই সে চোখ বুজল, কপালটা ঘসতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল দরজা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। পাছে ছেলের কিছু হয়ে থাকে এই আশংকায় সে ভীত হয়ে পড়ল। পা টিপে টিপে নার্সারির দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল।

ভিতরে ঢুকতেই তার চোখে পড়ল, ভয়ার্ত চোখে দাই যেন তার কাছ থেকে কিছু লুকিয়ে ফেলল। প্রিন্সেস মারিও তখন খাটিয়ার পাশে ছিল না।

“দাদা” তার পিছন থেকে বোন অস্ফুট স্বরে ডাকল।

দীর্ঘ অনিদ্রা ও উদ্বেগের পরে প্রায়ই যেমন হয়ে থাকে, প্রিন্স আন্দ্রুর মনে একটা অকারণ আতংক দেখা দিল—তার মনে হল শিশুটি মারা গেছে। সে যা কিছু দেখল ও শুনল তাতে এই আতংকই বুঝি প্রমাণিত হয়েছে।

“সব শেষ,” সে ভাবল ; তার কপালে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল। বিচলিতভাবে সে খাটিয়ার দিকে এগিয়ে গেল ; তার নিশ্চিত ধারণা খাটিয়াটাকে শূন্য দেখতে পাবে, দাই মৃত শিশুটিকেই লুকিয়ে ফেলেছে। পর্দাটা সরিয়ে দিল ; কিছুক্ষণের জন্য তার ভয়ার্ত অস্থির চোখ দুটি শিশুটিকে দেখতে পেল না। অবশেষে তাকে দেখতে পেল : গোলাপী শিশুটি বালিশের নীচে মাথা রেখে শুয়ে আছে ; ঘুমের মধ্যে ঠোঁট চাটছে আর সমতালে শ্বাস টানছে।

ছেলেকে সেই অবস্থায় দেখে প্রিন্স আন্দ্রু এতই খুসি হয়ে উঠল যেন সে তাকে সত্যি সত্যি হারিয়েছিল। বোনের শিক্ষামত ছেলের উপর ঝুঁকে ঠোঁট দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল জ্বর আছে কি না। নরম কপালটা ভিজে উঠেছে। প্রিন্স আন্দ্রু মাথায় হাতটা বুলাল ; এত বেশী ঘেমেছে যে শিশুর চুল অবধি ভিজে গেছে। ছেলে মারা যায় নি, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে সংকট কেটে গেছে, এখন সে ধীরে ধীরে সেরে উঠেছে। প্রিন্স আন্দ্রু পিছনে একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শুনতে পেল ; খাটিয়ার পর্দার নীচে একটা ছায়া দেখা দিল। সে ছায়া প্রিন্সেস মারির, নিঃশব্দ পায়ে সে খাটিয়ার কাছে এসেছে। পর্দাটা একবার তুলেই আবার ফেলে দিল। না তাকিয়েই তাকে চিনতে পেরে প্রিন্স আন্দ্রু হাতটা বাড়িয়ে দিল। প্রিন্সেস মারি হাতটা চেপে ধরল।

“ও ঘামছে,” প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

“সেকথা বলতেই আমি আসছিলাম।”

শিশুটি ঘুমের মধ্যেই একটু নড়ে উঠল, হাসল, বালিশে কপালটা ঘসল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বোনের দিকে তাকাল। পর্দার আবছা ছায়া পড়ে বোনের আনন্দাশ্রুসিক্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি আরও জ্বল্ জ্বল্ করছে। খাটিয়ার পর্দাটায় হাত রেখে সে ঝুঁকে পড়ে দাদাকে চুমো খেল। কিছুক্ষণের জন্য পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই নির্জনতার মধ্যে তিনজনই যেন আটকা পড়ে থাকতে চাইল। পর্দার মসলিনে মাথা ঘসতে ঘসতে প্রিন্স আন্‌দ্রুই প্রথম সেখান থেকে সরে গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, "হ্যাঁ, এখন তো আমার এই একটিই অবলম্বন।"

অধ্যায়—১০

ভ্রাতৃসংঘে ভর্তি হবার কিছুদিন পরেই পিয়ের কিয়েভ প্রদেশে চলে গেল। সেখানেই তার ভূমিদাসের সংখ্যা সবচাইতে বেশী। জমিদারিতে গিয়ে সে কি কি কাজ করবে তার একটা পূর্ণ নির্দেশ-নামা সে নিজেই লিখে সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

কিয়েভ পৌঁছেই সেসব নায়েব-গোমস্তাদের ডেকে পাঠাল এবং তার অভিপ্রায় ও ইচ্ছার কথা তাদের বুঝিয়ে বলল। বলল, অবিলম্বে ভূমিদাসদের মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করতে হবে,—যতদিন তা না হয় ততদিন তাদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপানো হবে না, যেসব স্ত্রীলোকদের কোলে শিশু আছে তাদের কাজে পাঠানো হবে না, যথাযথ সাহায্য দিতে হবে, শাস্তি হবে মুখের কথায়, দৈহিক নয়, সব জমিদারিতে হাসপাতাল, আশ্রয়-শিবির ও স্কুল খুলতে হবে।

কাউন্ট বেজুকভের প্রচুর সম্পত্তি। তার হাতে এসেছে বার্ষিক পাঁচ লাখ রুবলের আয়ের অংক। তথাপি পিয়েরের মনে হল, বাবা যখন তার জন্য দশ হাজার রুবল ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল তার চাইতে আজ সে অনেক বেশী গরীব হয়ে পড়েছে। নিম্নলিখিত বাজেটের একটা খসড়া তার চোখে ভাসতে লাগল :

সব জমিদারি মিলিয়ে ভূমিরাজস্ব ব্যাংকে জমা দিতে হল ৮০,০০০ ; মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারির ও শহরের বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তিন প্রিন্সেসের ভাতা বাবদ প্রায় ৩০,০০০ ; পেন্সন বাবদ ১৫,০০০ এবং প্রায় সমপরিমাণ আশ্রয়-শিবিরের দরুণ ; খোরপোষ বাবদ কাউণ্টেসকে পাঠানো হল ১৫০,০০০ ; ঋণের টাকার সুদ বাবদ গেল ৭০,০০০। নির্মীয়মান নতুন গির্জাটি শেষ করতে গত দুই বছরে খরচ হল প্রতি বছরে ১০,০০০ করে, এবং আরও প্রায় ১০০,০০০ রুবল যে কিসে খরচ হল তা সে জানে না ;

প্রতি বছরই তাকে বাধ্য হয়ে ধার কর্জ করতে হয়।

প্রতিদিন সে বড় নায়েবের সঙ্গে জমিদারি নিয়ে আলোচনা করল; কিন্তু তাতে অবস্থার কোন সুরাহা হল বলে মনে হয় না। সে বুঝতে পারল, এই সব আলোচনার সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার কোন যোগ নেই, এতে প্রকৃত অবস্থার কোন হেরফেরও হবে না। বড় নায়েব বলে নতুন খরচের কথা, আর পিয়ের বলে ভূমিদাসদের মুক্তির কথা। নায়েব সেটাকে অসম্ভব কাজ বলে না, তার তা করতে হলে নদীর ভাঁটিতে কস্ত্রোমা প্রদেশের জঙ্গল এবং ক্রিমিয়ার জমিদারি বেচে দিতে হবে: অথচ সে কাজের সঙ্গে এতকিছু জটিলতা জড়িত,—যেমন নিষেধাজ্ঞা, আবেদন, অনুমতি, ইত্যাদি খারিজ করা—যে পিয়ের একেবারেই থেই হারিয়ে বলে ওঠে: "বেশ তো, বেশ তো, তাই করুন।"

কিয়েভ-এ কিছু পরিচিত লোকের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হল; অপরিচিত লোকরাও প্রদেশের সবচাইতে বড় জমিদার এই সম্পদশালী নবাগত লোকটির সঙ্গে পরিচয় করতে সাগ্রহে এগিয়ে এল এবং তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাল। পিয়েরের সবচাইতে বড় দুর্বলতার প্রলোভন সেখানে এত বেশী যে সেগুলিকে সে প্রতিরোধ করতে পারল না। তার জীবনের দিন, সপ্তাহ ও মাসগুলি হৈ-হৈ করে কেটে যেতে লাগল; সান্ধ্য আসর, ডিনার, লাঞ্চ ও বল-নাচ নিয়ে সে এতই মেতে উঠল যে ভাবনা-চিন্তার কোন ফুরসুৎই সে পায় না। যে নতুন জীবন যাপনের আশা নিয়ে সে এসেছিল তার পরিবর্তে নতুন পরিবেশে সেই একই পুরনো জীবনই সে যাপন করতে লাগল।

১৮০৭-এর বসন্তকালে সে স্থির করল পিতার্সবুর্গে ফিরে যাবে। পথে তার ইচ্ছা হল সবগুলি জমিদারি পরিদর্শন করে নিজের চোখে দেখে যাবে তার আদেশ কতদূর কার্যকরী হয়েছে, যে ভূমিদাসদের ঈশ্বর তার হাতে তুলে দিয়েছেন এবং যাদের কল্যাণ সে করতে চায় তারা কি অবস্থায় আছে।

বড় নায়েব মনে করে যুবক মনিবের এই সব প্রচেষ্টা পাগলামিরই নামান্তর; কি তার নিজের, কি কাউণ্ট ও ভূমিদাসদের, কারওই এতে কোন লাভ হবে না; তবু মনিবের নির্দেশমত কিছু কিছু কাজ সে করতে লাগল। ভূমিদাসদের মুক্তির ব্যাপারটাকে অবাস্তব মনে করলেও মনিবের আসার আগেই সেসব জমিদারিতে স্কুল, হাসপাতাল ও আশ্রয়-শিবিরের জন্য অনেক বড় বড় বাড়ি তৈরি করে ফেলল। সর্বত্র তার ভালরকম অভ্যর্থনারও আয়োজন করল।

দক্ষিণাঞ্চলের বসন্তের আবহাওয়া, ভিয়েনা-গাড়িতে আরামদায়ক দ্রুত ভ্রমণ, পথের নির্জনতা—সবকিছু মিলিয়ে পিয়েরের মনকে খুসিতে ভরে তুলেছে। একটার পর একটা নতুন জমিদারি দেখছে আর ক্রমেই সেগুলো আরও বেশী করে ভাল লাগছে; মনে হল ভূমিদাসদের অবস্থার উন্নতি

ঘটছে; জমিদারের দেওয়া সুখ-সুবিধার জন্য তারা খুবই কৃতজ্ঞ। সর্বত্রই অভ্যর্থনার আয়োজন; তাতে বিব্রত বোধ করলেও মনে মনে পিয়ের বেশ খুসি হয়ে উঠল। এক জায়গায় চাষীরা তাকে উপহার দিল রুটি ও নুন এবং সেণ্ট পিতর ও সেণ্ট পলের মূর্তি। মনিবের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সন্তগুরু পিতর ও পলের সম্মানে নিজেদের ব্যয়ে গির্জার প্রাঙ্গণে একটা নতুন ভজনালয় নির্মাণের অনুমতিও তারা চেয়ে নিল। বাচ্চা কোলে নিয়ে স্ত্রীলোকরা এল তাকে ধন্যবাদ জানাতে। তৃতীয় এক জমিদারিতে একজন পুরোহিত ক্রুশ হাতে নিয়ে একদল ছেলেমেয়ে পরিবৃত হয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এল; কাউণ্টের উদারতার ফলেই সে ছেলেমেয়েদের লিখতে-পড়তে শেখাচ্ছে, তাদের ধর্মশিক্ষা দিচ্ছে। পিয়ের নিজের চোখেই দেখল সব জমিদারিতে হাসপাতাল স্কুল ও শিক্ষাকেন্দ্রের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে।

কিন্তু পিয়ের জানতেও পারল না, যেখানে চাষীরা তাকে রুটি ও নুন উপহার দিল এবং পিতর ও পলের সম্মানে একটা ভজনালয় গড়ে তুলতে চাইল সেটা গ্রামের বাজার; সেণ্ট পিতর দিবস উপলক্ষ্যে সেখানে তখন একটা মেলা চলছে; ধনীরা ও চাষীরা মিলে অনেক আগেই সেখানে একটা ভজনালয় তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে; আর সে গ্রামের দশ ভাগের ন'ভাগ চাষী চরম দারিদ্র্যের মত দিন কাটাচ্ছে। সে আরও জানল না, সেসব মায়েরা এখন তার জমিতে কাজ করতে যায় না, বাড়িতে নিজেদের জমিতে তাদের আরও অনেক বেশী পরিশ্রম করতে হয়। সে এ কথাও জানল না, যে পুরোহিতটি ক্রুশ হাতে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল সে চাষীদের কাছ থেকে জোর করে টাকা আদায় করে, আর ছেলেমেয়েদের জোর করে পড়াতে নিয়ে যায় বলে তাদের বাবা-মা চোখের জল ফেলে, মোটা টাকা দিয়ে তাদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। সে জানল না, পাকা বাড়িগুলো তৈরি হচ্ছে ভূমিদাসদেরই কায়িক পরিশ্রমে; তাই কাগজপত্রে তাদের কাজের বোঝা কম দেখানো হলেও আসলে সেটা আরও বেড়ে গেছে। এইভাবে জমিদারি পরিদর্শন কবে পিয়ের খুব খুসি হল, মানবপ্রেমে তার মন ভরে উঠল, এবং "গুরুভাই" কে ("মহাপ্রভু" কে সে এই নামেই ডাকে) উৎসাহভরা চিঠিপত্র লিখল।

মনে মনে বলল. "কত সহজে, কত অল্প চেষ্টায় কত ভাল কাজ করা যায়, অথচ সেদিকে আমরা কত অল্প মনোযোগ দিই!"

সকলের কাছ থেকে এত কৃতজ্ঞতা পেয়ে সে খুসি হল, আবার লজ্জাও পেল। এই কৃতজ্ঞতা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল, এইসব সরল সদয় লোকগুলির জন্য আরও কত বেশী সে করতে পারত।

বড় নায়েবটি যেমন দুষ্টু তেমনই ধূর্ত। সরল বুদ্ধিমান কাউণ্টটিকে সে ভালই চিনে নিয়েছে; তাকে নিয়ে হাতের পুতুলের মত খেলছে; মনিবের

খোশ মেজাজ লক্ষ্য করে সে তাকে আরও বেশী করে বোঝাতে লাগল যে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়া যেমন অসম্ভব তেমনই অদরকারী, কারণ বর্তমান ব্যবস্থাতেই তারা বেশ সুখে আছে।

মনে মনে পিয়েরও নায়েবের সঙ্গে একমত ; এদের চাইতে অধিকতর সুখী লোকের কল্পনা করাও শক্ত, মুক্তি পেলে এদের অবস্থা যে কি দাঁড়াবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তবু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে যে কাজকে সঠিক বলে মনে করে তার উপরেই জোর দিতে লাগল। নায়েবও কথা দিল, কাউণ্টের ইচ্ছাপূরণের জন্য সে সাধ্যমত চেষ্টা করবে। জমি ও জঙ্গল বিক্রির সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না এবং ভূমিরাজস্ব ব্যাংক থেকে জমি খালাসের চেষ্টা করা হয়েছে কি না সেটা যে কাউণ্ট কোনদিনই বুঝতে পারবে না সে কথা নায়েব ভাল করেই জানে। সে আরও জানে, এ ব্যাপারে কাউণ্ট হয়তো আর কোন খোঁজই করবে না এবং নতুন তৈরি বাড়িগুলো যে খালি পড়ে থাকবে এবং ভূমিদাসরা অন্য সব জমিদারির ভূমিদাসদের মতই টাকা ও শ্রম দিয়ে যেতে থাকবে—অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে সবকিছু নিঙড়ে নেওয়া হবে,—তাও সে কোনদিনই জানতে পারবে না।

অধ্যায়—১১

খুসি মনে দক্ষিণ রাশিয়া হয়ে জমিদারি পরিদর্শন শেষ করে বাড়ি ফিরেই পিয়ের স্থির করল বন্ধু বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। দু'বছর তার সঙ্গে দেখা হয় নি।

একটা সমতল একঘেয়ে গ্রামাঞ্চলে বোগুচারোভো অবস্থিত। চারদিকে মাঠ এবং ফার ও বার্চ গাছের জঙ্গল ; তার কিছু অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। নতুন-কাটা জল-ভর্তি একটা পুকুরের পিছনে বাড়িটা অবস্থিত। পুকুর-পারে এখনও ঘাস গজায় নি। বড় রাস্তা বরাবর এগিয়ে গেলে গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে কয়েকটা ছোট ফার গাছের ঝোপের মধ্যে বাড়িটা চোখে পড়ে।

বাস্তুভিটেতে আছে একটা ঝাড়াই-উঠোন, বহির্বাটি, আস্তাবল, স্নান-ঘর, আর একটা বড় পাকা বাড়ি—তার অর্ধবৃত্তাকার সম্মুখভাগটা এখনও তৈরি হচ্ছে। বাড়ির চারদিকে একটা নতুন বানানো বাগান। বেড়া ও গেট নতুন ও মজবুত। চালাঘরে রয়েছে সবুজ রং করা দুটো আগুন-পাম্প ও একটা জলের গাড়ি। রাস্তাগুলো সোজা, আর সেগুলো শক্ত ও রেলিং-বসানো। সবকিছুতেই একটা ছিমছাম সুব্যবস্থার আভাষ। আন্তন নামে একটি লোক ছেলেবেলায় প্রিন্স আন্‌দ্রুর দেখাশুনা করত; সেই পিয়েরকে গাড়ি থেকে নামতে সাহায্য করল এবং একটা পরিচ্ছন্ন ছোট ঘরে নিয়ে বসাল।

পিতার্সবুর্গে যে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে বন্ধুর সঙ্গে তার শেষ দেখা হয়েছিল তারপরে এই পরিচ্ছন্ন অথচ ছোটখাট বাড়ি দেখে পিয়ের অবাক

হয়ে গেল।

সে দ্রুতপায়ে অভ্যর্থনা-ঘরে ঢুকে গেল। ঘরটার কাঠের দেয়ালে এখনও পলস্তরা পড়ে নি। আন্তন তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল।

"আরে, কি হল ?" একটা তীক্ষ্ণ, অসন্তুষ্ট গলা শোনা গেল।

"একজন দর্শনার্থী," আন্তন জবাব দিল।

"তাকে অপেক্ষা করতে বল," একটা চেয়ার পিছনে ঠেলে দেবার শব্দ হল।

পিয়ের দ্রুতপায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেল; তার চোখে ভ্রূকুটি, বেশ বয়স্ক দেখাচ্ছে। পিয়ের তাকে জড়িয়ে ধরল, চশমা তুলে বন্ধুর গালে চুমো খেয়ে ভালভাবে তাকে দেখতে লাগল।

"আচ্ছা, আমি তো তোমাকে আশাই করি নি, খুব খুসি হয়েছি," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

পিয়ের কিছুই বলল না; অবাক হয়ে একদৃষ্টিতে বন্ধুকে দেখতে লাগল। তার পরিবর্তনটাই তার চোখে পড়ছে। তার কথাগুলি সহৃদয়, ঠোঁটে ও মুখে হাসিটি লেগে আছে, কিন্তু চোখ দুটি একঘেয়ে ও প্রাণহীন। প্রিন্স আন্‌দ্রু অনেকটা শুকিয়ে গেছে, মলিন হয়ে গেছে, আরও বেশী বয়স্ক দেখাচ্ছে, কিন্তু পিয়ের সবচাইতে অবাক হল তার নিষ্ক্রিয়তা ও ভুরুর উপরকার ভাঁজটা দেখে; দেখলেই মনে হয় একটা চিন্তার মধ্যে সে যেন বড় বেশী ডুবে আছে।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে দেখা হলে যেমনটি হয়ে থাকে, আলোচনা একটা সঠিক রূপ নিতে বেশ কিছুটা সময় লাগল। এ-কথা সে-কথার পরে পিয়েরের মনে একটা দুর্নিবার ইচ্ছা জাগল; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে বন্ধুকে জানিয়ে দিতে চায় যে পিতার্সবুর্গে সে যা ছিল এখন সে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পিয়ের হয়ে উঠেছে।

"তখন থেকে আমি যে কত পথ পেরিয়ে এসেছি তা তোমাকে বলতে পারব না। এখন নিজেই নিজেকে চিনতে পারি না।"

"ঠিক কথা, আমরা অনেক বদলে গেছি, অনেক বেশী বদলে গেছি," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"আচ্ছা, তুমিও ? তোমার পরিকল্পনাটা কি ?"

"পরিকল্পনা ?" প্রিন্স আন্‌দ্রু ব্যঙ্গের সুরে কথাটা পুনরাবৃত্তি করল। আমার পরিকল্পনা ? দেখতেই তো পাচ্ছ, বাড়ি তৈরি করছি। আগামী বছরেই এখানে পুরোপুরি বাসা বাঁধব…"

পিয়ের নীরবে সন্ধানী চোখে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখের দিকে তাকাল।

"না, আমি বলতে চাইছি…" পিয়ের কথা শুরু করতেই প্রিন্স আন্‌দ্রু তাকে বাধা দিল।

"কিন্তু আমার কথা কেন ? …আমাকে বল, হ্যাঁ, আমাকে বল তোমার

ভ্রমণের কথা, জমিদারিতে গিয়ে কি করেছ সেইসব কথা।"

পিয়ের জমিদারিতে গিয়ে যেসব কাজ করেছে তা বলতে শুরু করল, অবশ্য সেইসব উন্নতির ব্যাপারে নিজের ভূমিকার কথা যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখতেই চেষ্টা করল। প্রিন্স আন্‌দ্রু কোনরকম আগ্রহ না দেখালেও তার কথা শুনতে লাগল। কিরকম যেন অস্বস্তি বোধ করায় একসময় পিয়ের চুপ করে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আমি আর কি বলব ভাই। এখানে কোনরকমে দিন কাটাচ্ছি, আর সবে চারদিকে তাকাবার অবসর পেয়েছি। আজই আমার বোনের কাছে ফিরে যাব। তার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। অবশ্য তুমি তো তাকে চেনই। ডিনারের পরেই আমরা যাব। আমাদের জায়গাটা ঘুরে দেখবে নাকি?"

দুজন বেরিয়ে গেল; ডিনারের সময় পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক খবর ও পরিচিত লোকদের নিয়ে আলোচনা করল। নিজের বাড়ি তৈরির কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল:

"এসব কথা মোটেই ভাল লাগবার মত নয়। চল, ডিনার শেষ করেই যাত্রা করি গে।"

খেতে বসে পিয়েরের বিয়ের কথা উঠল।

"সেকথা শুনে আমি তো খুবই অবাক হয়েছিলাম," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

পিয়েরের মুখ যথারীতি লাল হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি বলল:

"কি করে কি হল সব তোমাকে একসময় বলব। কিন্তু তুমি তো জান সেসব চুকে গেছে, চিরদিনের মত চুকে গেছে।"

"চিরদিনের মত?" প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল। "কোন কিছুই চিরন্তন নয়।"

"কিন্তু কিভাবে সব শেষ হল তা তো তুমি জান, তাই না? দ্বৈত যুদ্ধের কথা তো শুনেছ?"

"তাহলে সে-পথেও হেঁটেছ?"

"লোকটাকে যে মেরে ফেলি নি সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই," পিয়ের বলল।

"তা কেন?" প্রিন্স আন্‌দ্রু শুধাল। "একটা পাপাশয় কুকুরকে মারা তো সত্যিকারের ভাল কাজ।"

"না, একটা মানুষকে মারা খারাপ—অন্যায়।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু তবু বলল, "অন্যায় হবে কেন? কি ন্যায় আর কি অন্যায় সেটা জানা মানুষের কর্ম নয়। মানুষ চিরকাল ভুল করে এসেছে, চিরকাল ভুল করবে—বিশেষ করে ন্যায়-অন্যায়ের বিচারের বেলায়।"

পিয়ের বলল, "যা অন্যের ক্ষতি করে তাই খারাপ।"

"অন্যের পক্ষে কি খারাপ সেটা তোমাকে কে বলে দিয়েছে?"

পিয়ের সোচ্চারে বলে উঠল, "খারাপ! খারাপ! কি যে খারাপ তা আমরা নিজেরাই বুঝতে পারি।"

"হ্যাঁ, তা বুঝতে পারি, কিন্তু যে ক্ষতি সম্পর্কে আমি নিজে সচেতন সেটাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে পারি না," পিয়েরের কাছে নিজের নতুন দৃষ্টিভঙ্গীটাকে প্রকাশ করবার ইচ্ছায় আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রু বলল। বলল ফরাসীতে। জীবনে সত্যিকারের দুটি পাপের কথা আমি জানি: অনুতাপ ও অসুস্থতা। এই দুইয়ের অনুপস্থিতিই একমাত্র কল্যাণ। এই দুই পাপকে পরিহার করে নিজের জন্য বাঁচাই এখন আমার জীবনদর্শন।"

পিয়ের বলে উঠল, "আর প্রতিবেশীকে ভালবাসা, আত্মত্যাগ? না, তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। পাপ করব না, অনুতাপ করব না—শুধু তেমন করে বাঁচাটাই যথেষ্ট নয়। আমি সেইভাবেই বেঁচে ছিলাম, নিজের জন্য বেঁচেছিলাম, আর তাতেই জীবনটাকে নষ্ট করেছি। আর এখন জীবনটাকে চালাচ্ছি, অন্তত চালাবার চেষ্টা করছি অপরের জন্য, আর তাই এখন পেয়েছি জীবনের সব সুখের আস্বাদ। না, তোমার সঙ্গে আমি একমত হব না, আর তুমিও মুখে যা বলছ আসলে তা বিশ্বাস কর না।"

ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্স আন্দ্রু নীরবে পিয়েরের দিকে তাকাল।

বলল, "আমার বোন প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা হলে বুঝবে তার সঙ্গে তোমার মিলবে ভাল। হয়তো তোমার দিক থেকে তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু প্রত্যেকেই তো নিজের মত করে বাঁচতে চায়। তুমি নিজের জন্য বাঁচতে চেয়েছ, আর বলছ যে জীবনটাকে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছি, এবং অন্যের জন্য বাঁচতে শুরু করে তবেই সুখের স্বাদ পেয়েছ। আমার অভিজ্ঞতা ঠিক উল্টো। আমি বেঁচেছি গৌরবের জন্য।—আর শেষ পর্যন্ত গৌরব কাকে বলে? সেই একই- অন্যকে ভালবাসা, তাদের জন্য কিছু করার বাসনা, তাদের সমর্থন লাভের বাসনা।—সুতরাং আমিও পরের জন্যই বেঁচেছি, আর সম্পূর্ণ না হলেও জীবনটাকে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছি। আর যখন থেকে কেবলমাত্র নিজের জন্যই বাঁচতে শুরু করেছি তখনই পেয়েছি কিছুটা শান্তি।"

উত্তেজিত হয়ে পিয়ের শুধাল, "কিন্তু নিজের জন্য বাঁচা বলতে তুমি কি বোঝাতে চাও? তোমার ছেলে, তোমার বোন, তোমার বাবা—তাদের কি হবে?"

"কিন্তু তারা তো আমারই লোক—অন্য লোক নয়," প্রিন্স আন্দ্রু বুঝিয়ে বলল। "অন্য লোক, প্রতিবেশীর দল, তারাই তো যত নষ্টের গুরু। ঐ যে তোমার কিয়েভ চাষীরা যাদের তুমি ভাল করতে চাও।"

ঠাট্টার ভঙ্গীতে সে পিয়েরের দিকে তাকাল।

আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে পিয়ের জবাব দিল, "তুমি ঠাট্টা করছ।

আমি যদি কারও ভাল করতে চাই, এমন কি কিছু ভাল করেও থাকি, তাতে দোষের বা অন্যায়ের কি থাকতে পারে? আমাদের ভূমিদাসদের মত, আমাদের নিজেদের মত যেসব হতভাগ্য মানুষ এতকাল আচার-অনুষ্ঠান ও অর্থহীন প্রার্থনার বাইরে ঈশ্বর ও সত্য সম্পর্কে কিছু না জেনেই জন্মেছে ও আজ যদি তাদের আমরা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি, নৈতিক উজ্জীবনের প্রতি, সান্ত্বনার প্রতি বিশ্বাসের দীক্ষা দিয়ে থাকি তাতে দোষের কি থাকতে পারে? যেসব মানুষ বিনা সাহায্যে অসুখে মারা যাচ্ছিল অথচ যাদের অনায়াসেই কিছু বাস্তব সাহায্য দেওয়া যেত, তাদের যদি আমি আজ ডাক্তার ও হাসপাতাল দিয়ে, বৃদ্ধদের আশ্রয়-শিবির দিয়ে সাহায্য করে থাকি, তাতে দোষের বা ভুলের কি থাকতে পারে?…আর খুব খারাপভাবে ও ছোট করে হলেও সে কাজই আমি করেছি। আসল কথা হল, আমি জেনেছি, নিশ্চিতভাবেই জেনেছি যে এই সব ভাল কাজ থেকেই আসে জীবনের একমাত্র নিশ্চিত সুখ।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "হ্যাঁ, এভাবে যদি কথাটা বল তো সেটা আলাদা ব্যাপার। আমি বাড়ি তৈরি করছি, বাগান করছি, আর তুমি হাসপাতাল তৈরি করছ। এদুটো পথেই অবসর বিনোদন করা যায়। কিন্তু কোন্‌টা ঠিক আর কোন্‌টা ভাল সে বিচার সেই করতে পারে যে সবকিছু জানে, আমরা নই। বেশ তো, তর্ক করতে চাও তো চলে এস।"

টেবিল থেকে উঠে দুজন গিয়ে বারান্দায় বসল। তারপর দুজনের মধ্যে তর্কের ঝড় উঠল, আর একসময় উঠল যুদ্ধের প্রসঙ্গ।

পিয়ের প্রশ্ন করল, "তুমি যুদ্ধে যোগ দিলে না কেন?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বিষণ্ণ স্বরে বলল, "অস্তারলিজের পরেও! না, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনদিন সক্রিয়ভাবে রুশ বাহিনীতে ঢুকব না। না, কখনও না—এমন কি বোনাপার্ত যদি এই স্মোলেন্‌স্ক-এ এসে বল্ড-হিল্‌স্‌কে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়—তবু আমি রুশ বাহিনীতে চাকরি করব না! এখন তো সৈন্য-সংগ্রহের পালা চলছে। তিন নম্বর জেলার প্রধান কর্তা আমার বাবা, আর আমার পক্ষে যুদ্ধে যাওয়া থেকে রেহাই পাবার একমাত্র পথ তার অধীনে কাজ করা।"

"তাহলে তাই করছ?"

"করছি।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

"সে কাজই বা করছ কেন?"

"কেন, কারণটা তো বললাম। আমার বাবা সেকালের একজন বিখ্যাত লোক। কিন্তু তার বয়স বাড়ছে, আর ঠিক নিষ্ঠুর না হলেও তিনি খুবই উদ্যমশীল। অসংযত ক্ষমতায় তিনি এতই অভ্যস্ত যে অনেক সময় তিনি

ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। এখন তো সম্রাট তাকে দিয়েছেন সৈন্য-সংগ্রহের প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা। পক্ষকাল আগে আমি যদি পৌঁছতে দু'ঘণ্টা দেরি করতাম তাহলে ইয়ুখনভাতে একজন করণিককে তিনি ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতেন।" প্রিন্স আন্দ্রু হাসল। "তাই আমি তার সঙ্গে কাজ করছি, কারণ একমাত্র আমার কথাই তিনি শোনেন; তাই মাঝে মাঝে এমন সব কাজ করা থেকে তাকে বিরত করতে পারি যার জন্য পরে তাকে কষ্ট পেতে হত।"

"তবেই বুঝতে পারছ।"

"বুঝতে ঠিকই পারছি, তবে তুমি যা ভাবছ তা নয়। ঐ পাজি করণিকটা নতুন সৈন্যদের বুট চুরি করেছিল; তারজন্য আমার মোটেই মাথা ব্যথা ছিল না, এখনও নেই। সে ফাঁসিতে ঝুললেই আমি খুসি হতাম, কিন্তু আমার দুঃখ আমার বাবার জন্য—আর সেটা তো আমার নিজের জন্যই হল।"

প্রিন্স আন্দ্রু ক্রমেই উজ্জীবিত হতে লাগল। তার কাজকর্মের মধ্যে প্রতিবেশীর ভাল করার বাসনা যে তার ছিল না এটা প্রমাণ করতে গিয়ে তার চোখ দুটি যেন তীব্র আবেগে জ্বলতে লাগল।

সে বলতে লাগল, "এই যে তুমি তোমার ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে চাইছ, এটা খুব ভাল কাজ, কিন্তু তোমার পক্ষে নয়—তুমি যে কখনও কাউকে চাবুক মেরেছ বা সাইবেরিয়ায় পাঠিয়েছ তা আমি মনে করি না—তোমার ভূমিদাসদের পক্ষে তো মোটেই নয়। তাদের যদি মারা হয়ে থাকে, কশাঘাত করা হয়ে থাকে, সাইবেরিয়ায় পাঠানো হয়ে থাকে, তাতে তাদের অবস্থা কিছু বেশী খারাপ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। সাইবেরিয়াতে গিয়ে তারা সেই একই পশুর জীবন যাপন করে, শরীরের আঘাতের দাগ শুকিয়ে যায়, তারা আগের মতই সুখে দিন কাটায়। কিন্তু মালিকদের পক্ষে এটা ভাল কাজ, কারণ ন্যায়ভাবেই হোক অন্যায়ভাবেই হোক, অন্যকে শাস্তি দিতে পারার জন্য তাদের উপর নেমে আসে নৈতিক বিনষ্টি, তারা অনুতাপে দগ্ধ হয়, আর সে অনুতাপকে চেপে রেখে ক্রমে নির্বিকার হয়ে ওঠে। সেই মানুষগুলোর জন্যই আমার করুণা হয়, আর তাদের ভালর জন্যই আমি ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে চাই। তুমি হয়তো দেখ নি, কিন্তু আমি দেখেছি, কেমন করে সীমাহীন ক্ষমতার ঐতিহ্য লালিত-পালিত এইসব ভাল মানুষরা ক্রমেই আরও বেশী খিট্খিটে হয়ে ওঠে, নির্মম ও কঠোর হয়ে ওঠে, সে সম্পর্কে সচেতন হয়েও নিজেদের সংযত করতে না পেরে ক্রমে আরও বেশী শোচনীয় অবস্থায় পড়ে।"

প্রিন্স আন্দ্রু এমন আন্তরিকভাবে কথাগুলি বলল যে পিয়ের কিছুতেই না ভেবে পারল না যে তার বাবাকে দেখেই কথাগুলি তার মনে এসেছে।

সে কোন জবাব দিল না।

"অতএব আমার দুঃখের কারণ—মানবিক মর্যাদা, মনের শান্তি, পবিত্রতা, ভূমিদাসদের পিঠ ও কপাল নয়; যতই মার, যতই কামিয়ে দাও, সে-পিঠ, সে-কপাল সেই একই থাকে।"

"না, না! হাজারবার না! তোমার সঙ্গে আমি কোনদিন একমত হব না," পিয়ের বলল।

অধ্যায়—১২

সন্ধ্যার দিকে আন্‌দ্রু ও পিয়ের একটা খোলা গাড়িতে চেপে বল্ড হিল্‌স্‌-এ চলে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু মাঝে মাঝেই পিয়েরের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যাতে বোঝা গেল যে তার মেজাজ বেশ ভাল আছে।

মাঠের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে চাষবাসের ব্যাপারে যে সব উন্নতি করেছে তা বলতে লাগল।

পিয়ের চুপচাপ বসে রইল, হুঁ-হাঁ করে জবাব সেরে নিজের চিন্তার মধ্যেই ডুবে রইল।

সে ভাবছে, প্রিন্স আন্‌দ্রু খুব দুঃখী, সে ভুল পথে চলেছে, সত্যিকারের আলো দেখতে পাচ্ছে না, আর তাই পিয়েরের উচিত তাকে সাহায্য করা, আলো দেখানো এবং তুলে ধরা। কিন্তু কি বলা উচিত সে-কথা ভাবতেই তার মনে হল যে প্রিন্স আন্‌দ্রু তো এককথায়, একটি যুক্তিতে তার সব বক্তব্য নস্যাৎ করে দেবে; কাজেই সে কোন কথা বলতে সাহস পেল না।

তারপরই হঠাৎ একসময় মাথাটা নীচু করে আক্রমণোদ্যত ষাঁড়ের মত বলে উঠল, "না, কিন্তু তুমি এ-কথা ভাবছ কেন? এরকম ভাবা তোমার উচিত নয়।"

"ভাবছি? কি ভাবছি?" প্রিন্স আন্‌দ্রু সবিস্ময়ে শুধাল।

"জীবনের কথা, মানুষের ভাগ্যের কথা। এরকম তো হতে পারে না। নিজের সম্পর্কেও আমি এইরকম ভাবতাম, কিন্তু কে আমাকে বাঁচিয়েছে জান? ভ্রাতৃসংঘ। না, হেসো না। আমি যা ভাবতাম ভ্রাতৃসংঘ সেরকম কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নয়: ভ্রাতৃসংঘ মানবতার শ্রেষ্ঠ, শাশ্বত স্বরূপের এক শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।"

সে ভ্রাতৃসংঘের ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে শুরু করল। ভ্রাতৃসংঘ শেখায় রাষ্ট্র ও গির্জার বন্ধন থেকে মুক্ত খৃস্টধর্মের বাণী, শেখায় সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও প্রেম।

পিয়ের বলতে লাগল, "আমাদের পবিত্র ভ্রাতৃত্বই জীবনের একমাত্র প্রকৃত তত্ত্ব, আর সবই স্বপ্ন। কি জান ভাই, এই সংঘের বাইরে যাকিছু সবই প্রতারণা ও মিথ্যায় ভরা; আমি তোমার সঙ্গে একমত যে, অপরের কোন ক্ষতি না করে তোমার মত শুধু নিজের জন্য বাঁচবার চেষ্টা করা ছাড়া একটি বুদ্ধিমান সৎ লোকের জীবনে আর কিছুই করার নেই। কিন্তু আমাদের মূল-

বিশ্বাসকে গ্রহণ কর, আমাদের ভ্রাতৃসংঘে যোগ দাও, আমাদের পথে চল, সঙ্গে সঙ্গে তুমি বুঝতে পারবে, যেমন আমি নিজে বুঝেছি, যে অদৃশ্য শৃংখলের আদি লুকিয়ে আছে স্বর্গে তুমিও তারই একটা অংশ।

প্রিন্স আন্দ্রু সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে নীরবে পিয়েরের কথা শুনতে লাগল। যখনই গাড়ির চাকার শব্দে পিয়েরের কথাগুলি শোনা যাচ্ছে না তখনই সে কথাগুলি আর একবার বলতে বলছে, আর তার চোখের দীপ্তি ও নীরবতা দেখে পিয়ের বুঝতে পারছে যে তার কথাগুলি বৃথা যায় নি; প্রিন্স আন্দ্রু আর তার কথায় বাধা দেবে না বা শুনে হাসবে না।

দুকূল ভাসানো একটা নদীর তীরে পৌঁছে তারা ফেরিতে নদীটা পার হল। গাড়ি ও ঘোড়াকে ফেরিতে তোলা হলে তারাও উঠে পড়ল।

প্রিন্স আন্দ্রু ফেরির রেলিং-এ ভর দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিক-মিক করা জলরাশির দিকে নীরবে তাকিয়ে রইল।

পিয়ের শুধাল, "আচ্ছা, এ বিষয়ে কি ভাবছ তুমি? এত চুপচাপ আছ কেন?"

"আমি কি ভাবছি? আমি তো তোমার কথা শুনছি। সবই ভাল⋯তুমি বলছ: আমাদের ভ্রাতৃসংঘে যোগ দাও, জীবনের লক্ষ্য, মানুষের ভাগ্য, যে সব বিধান পৃথিবীকে শাসন করে—সে সব আমরা তোমাকে দেখিয়ে দেব। কিন্তু এই 'আমরা' কারা? মানুষ। তোমরাই বা সব কিছু জানলে কেমন করে? তোমরা যা দেখেছ একমাত্র আমিই বা তা দেখতে পাই না কেন? তোমরা পৃথিবীতে দেখছ সৎ ও সত্যের শাসন, কিন্তু আমি তা দেখতে পাই না।"

পিয়ের তাকে বাধা দিল।

"তুমি কি পরলোকে বিশ্বাস কর?" সে শুধাল।

"পরলোক?" প্রিন্স আন্দ্রু কথাটা পুনরায় উচ্চারণ করল, কিন্তু এই পুনরাবৃত্তিকে অস্বীকৃতি বলে ধরে নিয়ে তাকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই পিয়ের বলে উঠল, "তুমি বলছ, পৃথিবীতে সৎ ও সত্যের শাসন তুমি দেখতে পাও না। আমিও পেতাম না, আমাদের এই জীবনকেই যতক্ষণ পর্যন্ত সব কিছুর পরিণতিরূপে দেখা হবে ততক্ষণ কেউই তা দেখতে পারে না। এই পৃথিবীতে, এখানে এই পৃথিবীতে (চারদিকের মাঠ দেখিয়ে) সত্য বলে কিছু নেই, সবই মিথ্যা ও অসৎ; কিন্তু এই বিশ্বে, সমগ্র বিশ্বে, রয়েছে সত্যের রাজত্ব, আর আমরা যারা এই পৃথিবীর সন্তান, আমরাই তো অনন্ত কাল ধরে এই বিশ্বেরও সন্তান। অন্তরে অন্তরে আমিও কি অনুভব করি না যে আমি সেই বিরাট একেরই একটি অংশ? আমি অনুভব করি যে আমি মুছে যাব না; কারণ পৃথিবীতে কিছুই মুছে যায় না, আমি চিরদিন আছি, চিরদিন থাকব। আমি অনুভব করি, আমাকে ছাড়িয়ে আমার উপরে আছে আত্মা,

আর এই জগতে আছে সত্য।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল না। গাড়ি ও ঘোড়াকে অনেকক্ষণ ওপারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দিগন্তে সূর্য অর্ধেক ডুবে গেছে, একটা সান্ধ্য কুয়াসা ফেরিটাকে ঘিরে আছে। কিন্তু পিয়ের ও আন্‌দ্রু তখনও ফেরিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে দেখে পরিচারক, কোচয়ান ও ফেরিচালক সকলেই অবাক হয়ে গেছে।

"যদি ঈশ্বর থাকেন, পরকাল থাকে, তাহলে সত্য ও সৎও আছে, আর তাকে লাভ করার সাধনাতেই আছে মানুষের সর্বোচ্চ সুখ। আমাদের বাঁচতে হবে, ভালবাসতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে একটুকরো পৃথিবীতে শুধু আজকের জন্যই আমরা বেঁচে নেই, আমরা বেঁচে আছি, চিরকাল বেঁচে থাকব ওখানে ওই ভূমার মধ্যে," আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে পিয়ের বলল।

রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু মন দিয়ে পিয়েরের কথাগুলি শুনল। নীল জলরাশির উপর সূর্যের রক্তিম ঝিলমিলের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। চারদিকে পরম প্রশান্তি। পিয়েরও চুপ করল। ফেরিটা থেমে আছে; ঢেউ এসে ধীরে ধীরে তার গায়ে পড়ছে। ঢেউগুলি যেন তার কানে কানে বলছে:

"এ কথাই সত্য, বিশ্বাস কর।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে পিয়েরের মুখের দিকে তাকাল।

বলল, "ঠিক বলেছ; আহা, তাই যেন হয়! যাই হোক, এবার নামতে হবে।"

ফেরি থেকে নেমে এসে প্রিন্স আন্‌দ্রু আকাশের দিকে তাকাল। অস্তারলিজের রণক্ষেত্রে শুয়ে যে শাশ্বত আকাশকে দেখেছিল অনেক দিন পরে এই প্রথম আর একবার সেই আকাশকে দেখতে পেল। একটা কিছু যা এতদিন তার মধ্যে ঘুমিয়েছিল, যা তার অন্তরের সেরা সম্পদ, তাই যেন সহসা জেগে উঠল তার যৌবনদীপ্ত আনন্দময় অন্তরের মধ্যে। চিরাচরিত জীবনযাত্রায় ফিরে আসা মাত্রই সে ভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, কিন্তু সে এটা বুঝতে পারল যে ভাবটা তার মধ্যে আছে। পিয়েরের সঙ্গে এই দেখা তার জীবনের একটা যুগান্তকারী ঘটনা। যদিও বাইরে সে একই পুরনো জীবনের পথেই চলতে লাগল, তবু তার অন্তরে শুরু হল এক নতুন জীবন।

অধ্যায়—১৩

প্রিন্স আন্‌দ্রু ও পিয়ের যখন বল্ড হিল্‌সের সামনের ফটকে পৌছল

তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাড়ির কাছাকাছি হতে প্রিন্স আন্‌দ্রু মৃদু হেসে পিছনের বারান্দায় একটা গোলমালের প্রতি পিয়েরের মনোযোগ আকর্ষণ করল। বয়সের ভারে নুয়েপড়া ঝোলা পিঠে একটি স্ত্রীলোক এবং কালো পোশাকপরা একটি লম্বা চুল বেঁটে যুবক গাড়িটাকে দেখেই ফটকে ছুটে এল। তাদের পিছনে আরও দুটি স্ত্রীলোক ছুটে এল। গাড়িটার চারদিক দেখে নিয়ে চারজনই বিষন্ন মনে পিছনের বারান্দার সিঁড়ির দিকে দৌড়ে চলে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "এরা সব মারির 'ভাল মানুষ'। ওরা আমাকে বাবা বলে ভুল করেছে। এই একটা ব্যাপারে মারি বাবাকে অমান্য করে চলে। বাবার হুকুম, এই তীর্থযাত্রীদের তাড়িয়ে দিতে হবে, কিন্তু মারি তাদের সাদরে ডেকে আনে।"

"কিন্তু 'ভাল মানুষ' মানে কি?" পিয়ের শুধাল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দেবার সময় পেল না। চাকররা বেরিয়ে এল, আর সে তাদের কাছে জানতে চাইল, বুড়ো প্রিন্স কোথায় গেছে এবং শিগ্‌গির ফিরে আসবে কি না।

বুড়ো প্রিন্স শহরে গেছে; যেকোন সময় ফিরতে পারে।

প্রিন্স আন্‌দ্রু পিয়েরকে নিয়ে নিজের ঘরে গেল; তারজন্য ঘরটা সব সময়ই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়। তারপরেই সে নিজে চলে গেল নার্সারিতে।

ফিরে এসে পিয়েরকে বলল, "চল, আমার বোনের সঙ্গে দেখা করে আসি। এখনও তাকে দেখতে পাই নি; হয়তো কোথাও লুকিয়ে তার 'ভালমানুষদের' সঙ্গে বসে আছে। কাজেই তার 'ভাল মানুষ'দেরও দেখতে পাবে। সত্যি আজব ব্যাপার।"

"ভাল মানুষ' ব্যাপারটা কি?" পিয়ের শুধাল।

"এস, নিজেই দেখতে পাবে।"

তারা ঘরে ঢুকলে প্রিন্সেস মারি সত্যি বিব্রত হয়ে পড়ল; তার গালে লালের ছোপ পড়ল। আরামদায়ক ঘরটিতে দেবমূর্তির সামনে বাতি জ্বলছে। লম্বা নাক ও লম্বা চুলওয়ালা একটি যুবক সন্ন্যাসীদের জোব্বা পরে তার পাশেই সোফায় বসে আছে; তাদের কাছেই হাতল-চেয়ারে বসে আছে পাকানো শুকনো শরীরের একটি বুড়ি, তার মুখে শিশুর সরলতা মাখা।

ছানাদের সামনে মুরগির মত তীর্থযাত্রীর সামনে উঠে দাঁড়িয়ে প্রিন্সেস মারি মৃদু ভর্ৎসনার সুরে বলল, "আন্‌দ্রু, তুমি আমাকে আগেই সতর্ক করে দাও নি কেন?"

পিয়ের তার হাতে চুমো খেলে সে ফরাসীতে বলল, "তোমাকে দেখে

আনন্দিত হলাম। তোমাকে দেখে খুব খুসি হলাম।” প্রিন্সেস শিশুকালে তাকে চিনত; এখন আন্‌দ্রুর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব, স্ত্রীর ব্যাপারে তার দুর্ভাগ্য, আর বিশেষ করে তার সহজ সরল মুখখানির জন্য পিয়েরকে তার খুব ভাল লাগল। উজ্জ্বল চোখ মেলে তার দিকে তাকাল; যেন বলতে চাইল, “তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি, কিন্তু দয়া করে আমার লোকদের দেখে হেসো না।”

তরুণ তীর্থযাত্রীটির দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলে উঠল, “আহা, ইভানুশ্‌কাও এখানে আছে দেখছি!”

প্রিন্সেস মারি অনুনয়ের সুরে বলল, “আন্‌দ্রু!”

প্রিন্স আন্‌দ্রু পিয়েরকে বলল, “তোমার জানা দরকার যে ইনি একজন নারী।”

“আন্‌দ্রু, ঈশ্বরের দোহাই!” প্রিন্সেস মারি বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, “দেখ ‘বন্ আমি,’ এই যুবকটির সঙ্গে তোমার ঘনিষ্টতার কথাটা বুঝিয়ে বলেছি বলে তোমার তো বরং আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”

সকৌতুক গাম্ভীর্যের সঙ্গে ইভানুশ্‌কার মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, “সত্যি?” আর নারীটিও চপল চোখ মেলে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

নিজের লোকদের জন্য প্রিন্সেস মারির বিব্রত হবার কোন কারণই ছিল না। তারা কিন্তু মোটেই লজ্জা পায় নি।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বুড়িকে জিজ্ঞাসা করল, “কোথায় গিয়েছিলে গো? কিয়েভএ?”

বুড়ি অমনি গর্‌গর্ করে বলতে শুরু করল, “তাই তো গিয়েছিলাম গো মশায়। খৃস্টমাসের সময়ে সন্তের থানে যে পবিত্র ও স্বর্গীয় অনুষ্ঠান হয়ে গেল আমাকেই তো তাতে যোগদানের উপযুক্ত মানুষ বলে গ্রাহ্য করা হয়েছিল। তবে মনিব, এখন আমি আসছি কোলিয়াজিন থেকে; সেখানে একটি মহৎ ও আশ্চর্য করুণা প্রকাশ পেয়েছে।”

“আর ইভানুশ্‌কা তোমার সঙ্গেই ছিল?”

মোটা গলায় কথা বলার চেষ্টা করে ইভানুশ্‌কা বলল, “আমি একাই যাই কর্তা। শুধু ইয়ুকনভো-তে পেলাগেয়ার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল…”

পেলাগেয়া সঙ্গীকে বাধা দিয়ে বলল, “মনিব, কোলিয়াজিন-এ এক আশ্চর্য করুণা প্রকাশ পেয়েছে।”

“সেটা কি? কোন নতুন স্মারক?” প্রিন্স আন্‌দ্রু শুধাল।

প্রিন্সেস মারি বলল, “আন্‌দ্রু, এখান থেকে যাও তো। পেলাগেয়া, ওকে কিছু বলো না।”

“না…কেন বলব না, কেন? ওকে আমি ভালবাসি। উনি দয়ালু,

ঈশ্বর প্রেরিত লোক, উনি উপকারী, একসময় আমাকে দশ রুবল দিয়েছিলেন আমি তা ভুলি নি। যখন কিয়েভ-এ ছিলাম তখন পাগল সিরিল (তিনিও ঈশ্বরের আপন জন, শীত-গ্রীষ্মে খালি পায়ে চলেন) আমাকে বলেছিলেন, ‘তুমি কেন জায়গামত যাচ্ছ না? কোলিয়াজিন-এ চলে যাও, সেখানে পবিত্র ঈশ্বর-জননীর একটি অদ্ভুতকর্মা মূর্তি আত্মপ্রকাশ করেছে।’ এই কথা শুনে ধর্মাত্মাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এসেছি।”

সকলেই চুপ, শুধু তীর্থযাত্রিনী শ্বাস টেনে আবার বলতে শুরু করল।

“তাই তো আমি এলাম মনিব, আর লোকে আমাকে বলল: ‘একটি মহৎ করুণা প্রকাশ পেয়েছে, পবিত্র জননীর গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে পবিত্র তৈলধারা’...”

প্রিন্সেস মারি বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, সেসব কথা তো পরেও বলতে পারবে।”

পিয়ের বলল, “আমাকে প্রশ্ন করতে দাও। তুমি নিজের চোখে দেখেছ?”

“অবশ্য দেখেছি মনিব। কী সৌভাগ্য আমার। মুখের উপর স্বর্গীয় আলো ঝল্‌মল্‌ করছে আর পবিত্র জননীর দুই গাল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে....”

পিয়ের সরাসরি বলে উঠল, “কিন্তু বাবু, সেটা তো ফাঁকিবাজিও হতে পারে!”

“ওঃ মনিব, এ আপনি কী বলছেন?” আতংকিত পেলাগেয়া কথাগুলি বলে সমর্থনের আশায় প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল।

পিয়ের আবার বলল, “ওরা লোককে ধোঁকা দেয়।”

ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে বলল, “হা প্রভু যীশুখৃস্ট! ওকথা বলবেন না মালিক। একজন অবিশ্বাসী সেনাপতি একবার বলেছিল, ‘সন্ন্যাসীরা ধোঁকা দেয়,’ আর সঙ্গে সঙ্গে সে অন্ধ হয়ে গেল। সে স্বপ্নে দেখল, কিয়েভ সমাধিক্ষেত্রের পবিত্র কুমারী মাতা তাকে বলছেন, ‘আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমি তোমাকে ভাল করে দেব।’ তখন সেনাপতি সকলকে অনুরোধ করল, ‘আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চল, তাঁর কাছে নিয়ে চল।’ আপনাকে সত্যি কথাই বলছি, আমার নিজের চোখে দেখা। একেবারে অন্ধ অবস্থায় তাকে মাতার কাছে নিয়ে যাওয়া হল; তাঁর কাছে উপুড় হয়ে পড়ে সে বলল, ‘আমাকে ভাল করে দাও, জার আমাকে যা দিয়েছেন তাই আমি তোমাকে দেব।’ আমি নিজের চোখে দেখেছি মালিক, একটা তারা মূর্তির গায়ে আটকে গেল। তারপর কি হল বলুন তো? সে তার দৃষ্টি ফিরে পেল! ওসব বলাও পাপ। ঈশ্বর আপনাকে শাস্তি দেবেন,” পিয়েরের দিকে ফিরে সে বলল।

“তারাটা ঘরের মধ্যে এল কেমন করে?” পিয়ের শুধাল।

"আর পবিত্র জননী কি সেনাপতির পদটি পেয়েছিলেন ?" প্রিন্স আন্দ্রু হেসে বলল।

সহসা পেলাগেয়া মুখটা কালো করে নিজের হাত দুটো এককরে চেপে ধরল।

"হায় মালিক, মালিক, এ কী পাপ! অথচ আপনার ছেলে আছে!" হঠাৎ মুখটা লাল করে সে বলতে শুরু করল। "এ আপনি কি বললেন মালিক ? ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা করুন !" সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। "প্রভু ওকে ক্ষমা করুন ! এ সবের অর্থ কি ?" সে প্রিন্সেস মারিকে শুধাল। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে সে ঝোলাঝুলি গোছাতে শুরু করল। বোঝা গেল সে ভয় পেয়েছে, যে বাড়িতে এ ধরনের কথা বলা হয় সেখানে আশ্রয় নেবার জন্য লজ্জা পেয়েছে, আবার বাড়ি ছেড়ে যেতেও কষ্ট হচ্ছে।

প্রিন্সেস মারি বলল, "কেন এমন কাজ করলে ? কেন তুমি আমার কাছে এলে ?....."

পিয়ের বলল, "শোন পেলাগেয়া, আমি ঠাট্টা করছিলাম। তুমি বিশ্বাস কর প্রিন্সেস, ওকে আঘাত দিতে আমি চাই নি। কিছু মনে করে কথাটা বলি নি। একটু ঠাট্টা করেছি মাত্র। সবই আমার দোষ, আন্দ্রুও ঠাট্টাই করেছে।"

সন্দিহান চিত্তে পেলাগেয়া থামল, কিন্তু পিয়েরের মুখে এমন আন্তরিক অনুতাপের ভাব ফুটে উঠল এবং প্রিন্স আন্দ্রু এমন ভীরু চোখে একবার তার দিকে একবার পিয়েরের দিকে তাকাতে লাগল যে পেলাগেয়া ধীরে ধীরে তাদের কথায় আশ্বস্ত হল।

অধ্যায়—১৪

তীর্থযাত্রিনীটি শান্ত হল ; নতুন করে কথা বলার উৎসাহ পেয়ে সে এম্ফিলোকাস বাবার একটা দীর্ঘ বিবরণ দিতে লাগল। এম্ফিলোকাস বাবা এত পবিত্র জীবন যাপন করে যে তার হাত দিয়ে ধুনোর গন্ধ বেরোয় ; কিয়েভ ভ্রমণের সময় কয়েকজন পরিচিত সন্ন্যাসী তাকে ভূগর্ভস্থ সমাধিগুলোর চাবি দিয়েছিল, আর সেও কিছু শুকনো রুটি সঙ্গে নিয়ে দুটো দিন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সেই সব সমাধিতে কাটিয়েছে। "একস্থানে কিছুক্ষণ প্রার্থনা করে অন্যস্থানে বসে ভেবেছি, তারপর আর একস্থানে গিয়েছি। একটু ঘুমিয়ে নিয়ে আবার গিয়েছি, পুরাবস্তুগুলিতে চুমো খেয়েছি। চারদিকে সে কী শান্তি, কী আনন্দ! সেখান থেকে স্বর্গের আলোতেও বেরিয়ে আসতে ইচ্ছা করে না।"

পিয়ের গম্ভীর মুখে সব শুনল। প্রিন্স আন্দ্রু বেরিয়ে গেল। "ঈশ্বরের লোকদের" চায়ের পাট শেষ করতে দেখে প্রিন্সেস মারি পিয়েরকে নিয়ে বসবার ঘরে গেল।

বলল, "তোমার খুব দয়া।"

"সত্যি, ওদের প্রাণে আঘাত দিতে আমি চাই নি। ওদের আমি খুব ভাল করেই জানি, আর খুবই শ্রদ্ধা করি।"

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারি সানুরাগ হাসি হাসল।

"তুমি তো জান অনেকদিন থেকে আমি তোমাকে চিনি, দাদার মতই তোমাকে ভালবাসি। আন্‌দ্রুকে কেমন দেখছ? ওর জন্য বড়ই চিন্তায় আছি। শীতকালে ওর স্বাস্থ্যটা ভাল ছিল, কিন্তু গত বসন্তকালে ঘাটা আবার দেখা দিয়েছে, ডাক্তার বলছে আরোগ্যের জন্য কোথাও চলে যেতে। তার মানসিক অবস্থার কথা ভেবেও আমার বড় ভয় করছে। ও তো মেয়েদের মত নয়; কষ্ট পেলে আমরা কেঁদে সে কষ্ট ভুলতে চেষ্টা কবি, কিন্তু ও তো সব মনের মধ্যে চেপে রাখে। আজ সে বেশ হাসিখুসি ও খোস মেজাজে আছে, কিন্তু সে তো তুমি এসেছ বলে—সচরাচর সে এমন থাকে না। দেখ তো, তুমি ওকে বিদেশে যেতে রাজী করাতে পার কি না! ওর দরকার কাজে ডুবে থাকা, এই শান্ত নিয়মিত জীবন ওর পক্ষে খুব খারাপ। অন্যরা সেটা বুঝতে পারে না, কিন্তু আমি পারি।"

দশটা নাগাদ বুড়ো প্রিন্সের গাড়ির আওয়াজ পেয়ে চাকরবাকররা ফটকের দিকে ছুটে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু ও পিয়েরও বারান্দায় গেল।

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই পিয়েরকে দেখতে পেয়ে বুড়ো প্রিন্স শুধাল, "ও কে?"

তার পরিচয় শুনে বলল, "আঃ! খুব খুসি হলাম! আমাকে চুমো খাও।"

বুড়ো প্রিন্সের মেজাজ ভাল ছিল; পিয়েরের প্রতিও খুবই সদয়।

নৈশ ভোজনের আগে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল গৃহস্বামী ও অতিথির মধ্যে তুমুল তর্ক চলেছে। পিয়ের বলছে, এমন একদিন আসবে যখন যুদ্ধ বলে কিছু থাকবে না, আর বুড়ো প্রিন্স কোনরকম রাগ না দেখিয়েই তার তীব্র প্রতিবাদ করছে।

"মানুষের শিরা থেকে সব রক্ত বের করে নিয়ে সেখানে জল ঢেলে দাও, তবে যুদ্ধ বন্ধ হবে! যতসব বুড়িদের অর্থহীন কথা!" বুড়ো প্রিন্স মুখে প্রতিবাদ করলেও সস্নেহে পিয়েরের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রুর টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলে তখন শহর থেকে আনা বাবার কাগজপত্রগুলো দেখছিল। বুড়ো প্রিন্স তার কাছে গিয়ে কাজের কথা শুরু করল।

"কাউন্ট রস্তভ একজন মার্শাল হয়েও তার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যার অর্ধেক লোকও পাঠান নি। শহরে এসে তিনি আমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করতে চেয়েছিলেন—আমি তাকে আচ্ছা ডিনার খাইয়েছি! ...যাক সে কথা। তোমার এই বন্ধুটি খুব ভাল ছেলে—আমার ভাল লেগেছে। সে আমাকে নাড়া দিতে পেরেছে। অন্যরা ভাল ভাল কথা বলে, কিন্তু কান পেতে কোন কথা শোনে

না, কিন্তু এ বাজে কথা বললেও মনকে নাড়া দিতে পারে। আচ্ছা, এখন এস। হয়তো নৈশভোজনের সময় আমিও তোমাদের সঙ্গে বসে যাব। তখন আর একপ্রস্থ তর্ক হবে।" যেতে যেতে সে পিয়েরকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমার বোকা মেয়েটার সঙ্গে বন্ধুত্ব করো হে।"

প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে বন্ধুত্বের যে কত শক্তি ও আকর্ষণ পিয়ের সেটা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে এবার বল্ড হিল্‌সে বেড়াতে এসে। সে আকর্ষণ বন্ধুর সঙ্গে সম্পর্কের বেলায় যত না প্রকাশ পেয়েছে তার চাইতে বেশী প্রকাশ পেয়েছে তার পরিবার ও বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে। কঠোর চরিত্র বুড়ো প্রিন্স এবং মৃদু ও ভীরু প্রিন্সেস মারিকে তার মনে হচ্ছে পুরনো বন্ধুর মত। তারাও ইতিমধ্যেই তার প্রতি অনুরাগী হয়ে উঠেছে। শুধু প্রিন্সেন মারিই নয়, এক বছরের "প্রিন্স নিকলাস" এবং মাইকেল আইভানভিচ ও মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁও স্মিত হাসি হেসে তার দিকে তাকায়।

বুড়ো প্রিন্স নৈশ ভোজে যোগ দিতে এল; আর সেটা স্পষ্টতই পিয়েরের জন্য। মাত্র দুদিন হল সে এখানে এসেছে, এরই মধ্যে সে বুড়ো প্রিন্সের প্রিয় হয়ে উঠেছে; সে তাকে আবার আসবার আমন্ত্রণও জানিয়েছে।

পিয়ের চলে যাবার পরে বাড়ির লোকরা যখনই একত্র হয় তখনই পিয়ের সম্পর্কে যার যার মতামত প্রকাশ করে। কোন নতুন লোক বাড়িতে এসে চলে গেলে এটা হামেসাই ঘটে থাকে; কিন্তু এক্ষেত্রে এটাই ব্যতিক্রম যে কেউই তার সম্পর্কে ভাল ছাড়া মন্দ কিছু বলে না।

অধ্যায়—১৫

ছুটি থেকে ফিরে আসার সময় রস্তভ এই প্রথম অনুভব করল, দেনিসভ ও গোটা রেজিমেণ্টের সঙ্গে তার বন্ধন কত ঘনিষ্ঠ।

মস্কোতে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছবার সময় তার যে মনোভাব হত, রেজিমেণ্টের কাছাকাছি পৌঁছে সেই একই ভাব জাগল তার মনে। তার রেজিমেণ্টের বোতামখোলা ইউনিফর্ম পরা প্রথম হুজারটিকে যখন সে দেখতে পেল, যখন চিনতে পারল লাল-চুল দেমেন্তিয়েভকে, যখন লাভ্রুশ্‌কা সানন্দে তার মনিবকে ডেকে বলল, "কাউণ্ট এসে গেছেন!" আর দেনিসভ হঠাৎ ঘুমভেঙে জেগে উঠে অগোছাল অবস্থায় মাটির ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল এবং অফিসাররা সকলেই তাকে অভ্যর্থনা করতে এসে জড় হল, তখন রস্তভের বুকের মধ্যে সেই অনুভূতিই জাগল যা জেগেছিল তখন যখন তার মা, বাবা ও বোন তাকে আলিঙ্গন করেছিল; আনন্দের অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল; একটা কথাও বলতে পারল না। রেজিমেণ্টও

তো একটা বাড়ি, তার বাপ-মায়ের বাড়ির মতই প্রিয় ও দামী।

আর একবার সৈনিক জীবনের সুনির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করে রস্তভ বিশ্রামরত ক্লান্ত মানুষের মতই আনন্দ ও স্বস্তি অনুভব করতে লাগল। এবারকার অভিযানকালে সৈনিক-জীবন তার কাছে অধিকতর প্রীতিপদ মনে হল এই কারণে যে দলখভের কাছে হারবার পরে সে মনস্থির করেছে, আগেকার মত না চলে সে তার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করবে, একজন সত্যিকারের প্রথম শ্রেণীর কমরেড ও অফিসারের মত আচরণ করবে—এক-কথায় সে হয়ে উঠবে একটি পরিপূর্ণ চমৎকার মানুষ, যা হওয়া বাইরের জগতে খুবই শক্ত মনে হলেও রেজিমেণ্টে খুবই সম্ভব।

অনেক টাকা হারবার পরে সে প্রতিজ্ঞা করেছে, পাঁচ বছরের মধ্যে বাবার সব দেনা শোধ করে দেবে। বছরে সে দশ হাজার রুবল পায়, কিন্তু স্থির করেছে এখন থেকে শুধু দু'হাজার নেবে আর বাকিটা রেখে দেবে বাবার ঋণ শোধ করার জন্য।

* * *

উপর্যুপরি পশ্চাদপসরণ ও অগ্রগমন এবং পুলতস্ক ও প্রেশিস্ক্-আইলোর যুদ্ধের পরে আমাদের বাহিনী বার্তেনস্তিন-এর কাছে একত্র হয়েছে। সম্রাটের আগমন ও নতুন অভিযান শুরুর জন্য সকলেই অপেক্ষা করে আছে।

সেনাবাহিনীর যে অংশটা ১৮০৫-এর অভিযানের সঙ্গে যুক্ত ছিল তার অন্তর্ভুক্ত পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেণ্ট রাশিয়াতে পুরোদমে নতুন সৈন্য সংগ্রহ করে এত দেরিতে এসে হাজির হল যে অভিযানের প্রথম দিককার যুদ্ধে তারা কোন অংশই নিতে পারল না। তারা না ছিল পুল্‌তুস্ক-এ, না ছিল প্রেশিস্ক-আইলোতে; অভিযানের দ্বিতীয়ার্ধে এসে তারা যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দিল তখন তাদের প্লাতভ-এর ডিভিশনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল।

প্লাতভ-এর ডিভিশন মূল বাহিনী থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করছিল। পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেণ্টের একটা অংশ কয়েকবার শত্রুদের সঙ্গে গুলি-বিনিময় করেছে, শত্রুসৈন্যদের বন্দী করেছে, এমন কি একবার মার্শাল ওদিমো র গাড়িগুলোকে পর্যন্ত আটক করেছে। এপ্রিল মাসে একটা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত জার্মান গ্রামের কাছে প্রাভ্‌লোগ্রাদদের কয়েক সপ্তাহ ধরে চুপচাপ বসিয়ে রাখা হয়েছে।

বরফ গলতে শুরু করেছে, যেমন কাদা তেমনই ঠাণ্ডা, নদীতে বরফের চাই ভাঙতে শুরু করেছে, রাস্তাঘাট চলাচলের অযোগ্য। দিনের পর দিন না আসছে সৈন্যদের খাবার, না আসছে ঘোড়ার খাবার। গাড়ি-ঘোড়া কিছুই আসতে পারছে না দেখে সৈন্যরা নির্জন পরিত্যক্ত গ্রামে গ্রামে ঢুকে আলুর খোঁজ করতে লাগল, কিন্তু তাও জোটে না।

সবকিছু খেয়ে শেষ করে ফেলেছে; গ্রামবাসীরা সকলেই পালিয়েছে—

যারা এখনও আছে তারা ভিখারীরও অধম; তাদের কাছ থেকে নেবার কিছুই নেই; এমনকি যে সৈন্যরা সাধারণত নির্মমই হয়ে থাকে তারাও তাদের কাছ থেকে নেবার পরিবর্তে প্রায়ই নিজেদের শেষ রেশনটুকুও তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেণ্টের মাত্র দুটি সৈন্য যুদ্ধে আহত হয়েছে, কিন্তু ক্ষুধায় ও রোগে মারা গেছে প্রায় অর্ধেক সৈন্য। হাসপাতালে মৃত্যু এতই অবধারিত হয়ে উঠল যে যে-সব সৈন্য জ্বরে ভুগছে অথবা অখাদ্য খেয়ে রোগে ভুগছে তারাও কর্তব্যরত থাকাটাই বেছে নিত এবং হাসপাতালে যাওয়ার বদলে পা টেনে টেনে রণক্ষেত্রে যাওটাই পছন্দ করত। বসন্তকাল এলে সৈন্যরা দেখতে পেল যে শতমূলীর মত দেখতে কোন গাছ—যাকে তারা যে কারণেই হোক "মাশ্‌কার মিষ্টি মূল" বলত মাটির ভিতর থেকে একটুখানি মাথা তুলেছে। সে গাছের স্বাদ খুব তেতো, কিন্তু তারই খোঁজে তারা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াত, এবং অনিষ্টকর গাছড়া হিসাবে সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তারা তলোয়ার দিয়ে মাটি থেকে তুলে সেই গাছড়া খেত। সেই বসন্তকালেই সৈন্যদের মধ্যে একটা নতুন রোগ দেখা দিল; হাত, পা, মুখ সব ফুলতে আরম্ভ করল, আর ডাক্তাররা বলল যে এ রোগ ঐ গাছড়া খাওয়ারই ফল। কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেনিসভের সেনাদল প্রধানত "মাশ্‌কার মিষ্টি মূল" খেয়েই দিন কাটাতে লাগল, কারণ জনপ্রতি আধ পাউণ্ড করে বিস্কুট শেষবারের মত বরাদ্দ করার পরে দ্বিতীয় সপ্তাহ কেটে গেছে এবং সর্বশেষ যে আলু এসেছিল তাতে অংকুর গজিয়েছে এবং জমে গেছে।

একপক্ষকাল ধরে ঘোড়াগুলো চালের খড় খেয়ে বেঁচে আছে; ভয়ংকরভাবে শুকিয়ে গেছে।

এই অভাবের মধ্যেও সৈনিক ও অফিসাররা স্বাভাবিক কাজকর্ম করে চলেছে। ফোলা মুখ আর ছেঁড়া ইউনিফর্ম নিয়ে হুজাররা নাম-ডাকের সময় সারি দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে, ঘোড়াগুলোর তদারক করছে, অস্ত্রশস্ত্র মেজে-ঘসে পরিষ্কার রাখছে, চাল থেকে খড় এনে ঘোড়াকে খাওয়াচ্ছে, এবং ফুটন্ত কড়াইয়ের পাশে গোল হয়ে খেতে বসে ক্ষিধে নিয়ে উঠে পড়ছে আর বাজে খাবার ও ক্ষিধে নিয়ে নানারকম ঠাট্টা তামাশা করছে। যথারীতি অবসর সময়ে তারা আগুন জ্বালাচ্ছে, জামা খুলে শরীর গরম করছে, ধূমপান করছে, পচা আলু খুঁড়ে বের করে পুড়িয়ে খাচ্ছে, এবং পোটেম্‌কিন, সুভরভ-এর অভিযান, চতুর আলেশার কাহিনী অথবা পুরোহিতের মজুর মিকল্‌কা-র গল্প বলছে ও শুনছে।

অফিসাররা যথারীতি আধ-ভাঙা ছাদহীন ঘরে দু'জন তিনজন করে বাস করছে। প্রধানরা খড় ও আলু এবং সৈনিকদের জন্য খাবারের যোগাড়

করছে। তরুণরা আগের মতই তাস খেলছে (খাদ্য না থাক, টাকার তো অভাব নেই), কেউ বা অন্য ধরনের নির্দোষ খেলা খেলছে। অভিযানের কথা কেউ বড় একটা বলে না, কারণ স্পষ্ট করে কিছু জানাও যাচ্ছে না, আর সকলেরই ধারণা যে গতিক বড় ভাল নয়।

রস্তভ আগের মতই দেনিসভের সঙ্গে বাস করছে; ছুটি কাটিয়ে আসার পর থেকে তাদের বন্ধুত্ব আরও প্রগাঢ় হয়েছে। দেনিসভ কখনও রস্তভ পরিবারের কথা বলে না, কিন্তু অধিনায়কটি তার প্রতি যেরকম বন্ধুত্ব দেখাচ্ছে তাতেই রস্তভ বুঝতে পেরেছে যে নাতাশার প্রতি ব্যর্থ প্রবীণ হুজারের ব্যর্থ প্রেমই তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে দৃঢ়তর করেছে। দেনিসভ সবসময়ই চেষ্টা করে রস্তভকে যতদূর সম্ভব বিপদ থেকে দূরে রাখতে; একটা যুদ্ধের পরে সে নিরাপদে ফিরে এলে দেনিসভ তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। আর একবার একটি অসহায় পোলিশ মেয়ে সম্পর্কে অশোভন উক্তি করায় রস্তভ বন্ধুদের উপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিল। দেনিসভ মাঝখানে পড়ে কোনরকমে ঝগড়া থামায়। পরে এই নিয়ে রস্তভকে তিরস্কার করলে রস্তভ জবাব দিল:

"আপনার যা খুসি বলতে পারেন···সে আমার বোনের মত, তাই আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছি···কারণ···দেখুন, সেই জন্যই·····"

দেনিসভ তার পিঠটা চাপড়ে দিয়ে রস্তভের দিক তাকিয়ে অতি দ্রুত ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। গভীর আবেগের মুহূর্তে এইরকম করাই তার স্বভাব।

সে তো-তো করে বলল, "আঃ, তোমরা রস্তভরা একেবারে পাগল!" রস্তভ লক্ষ্য করল, তার চোখের নীচে জল চিকচিক করছে।

অধ্যায়—১৬

এপ্রিল মাসে সম্রাটের আগমনের সংবাদে সৈন্যরা উৎসাহিত হয়ে উঠল, কিন্তু বার্তেন্‌স্তিন-এ অনুষ্ঠিত সেনা-সমাবেশে উপস্থিত থাকবার সুযোগ রস্তভের হল না, কারণ সেইসময় পাভ্‌লোগ্রাদরা ছিল সেখান থেকে অনেক দূরের একটা ঘাঁটিতে।

তারা তখন খোলা জায়গায় দিন কাটাচ্ছে। দেনিসভ ও রস্তভ বাস করছে মাটির ঘরে; সৈন্যরাই সে ঘর মাটি কেটে তৈরি করে দিয়েছে, ছাদ বানিয়েছে গাছের ডাল ও মাটির চাপড়া দিয়ে। তৎকালে প্রচলিত ব্যবস্থা-মতই ঘরটা এইভাবে তৈরি করা হয়েছে। সাড়ে তিন ফুট চওড়া, চার ফুট আট ইঞ্চি গভীর ও আট ফুট লম্বা একটা ট্রেঞ্চ কাটা হয়েছে। ট্রেঞ্চের এক

প্রান্তে সিঁড়ি বানানো হয়েছে; সেটাই ঘরের প্রবেশ-দ্বার ও বারান্দা। ট্রেঞ্চটাই হল ঘর; স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডারের মত ভাগ্যবানদের জন্য সেখানে একটা পাটাতন পেতে টেবিল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ট্রেঞ্চের দুই পাশে আড়াই ফুট চওড়া করে মাটি কেটে তাই দিয়ে খাট ও কোচের কাজ চালান হচ্ছে। ছাদটা এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ট্রেঞ্চের মাঝখানে একজন মানুষ দাঁড়াতে পারে, এমন কি বিছানার উপর বসতেও পারে। স্কোয়াড্রনের সৈনিকরা দেনিসভকে ভালবাসে, তাই সে তো রাজার হালে আছে; ছাদের কোণে ভাঙা কাঁচ জুড়ে তার জন্য একটা জানালা পর্যন্ত বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এপ্রিল মাসে রস্তভ আর্দালির কাছে নিযুক্ত ছিল। একদিন বিনিদ্র রাত কাটিয়ে সকাল সাতটা থেকে আটটা নাগাদ ফিরে এসে সে কাঠ আনবার জন্য লোক পাঠাল, বৃষ্টিভেজা জামাকাপড় পাল্টে নিল, প্রার্থনা করল, চা খেয়ে শরীর গরম করে নিল, এবং টেবিলের জিনিসপত্র গুছিয়ে তার নিজের কোণটিতে গিয়ে মাথার নীচে দুই হাত রেখে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল; পরনে শুধু একটা শার্ট; ঠাণ্ডা বাতাস লেগে মুখটা চকচক করছে। খুসি মনে অচিরেই একটা পদোন্নতির কথা ভাবতে ভাবতে সে দেনিসভের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ তার কানে এল, ঘরের পিছন দিকে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে দেনিসভ কাঁপা গলায় চীৎকার করছে। "আমি নিজের চোখে দেখেছি ল্যাজারচুক ওগুলো মাঠ থেকে তুলে এনেছে। কিন্তু আমি তো হুকুম দিয়েছি কেউ যেন 'মাশ্‌কা মূল' না খায়।"

"আমিও তো বার বার হুকুম জারি করেছি ইয়োর অনার, কিন্তু ওরা কথা শোনে না," কোয়ার্টারমাস্টার জবাব দিল।

রস্তভ আবার শুয়ে পড়ল; নিজের মনে বলল: "ওরা হুল্লোড় করতে থাকুক, আমার কাজ শেষ করে শুয়ে পড়েছি—চমৎকার!"

দূর থেকে দূরে দেনিসভের গলা শোনা গেল। "ঘোড়ার পিঠে জিন লাগাও! দ্বিতীয় প্লাটুন!"

"ওরা কোথায় যাচ্ছে?" রস্তভ ভাবল।

পাঁচ মিনিট পরে দেনিসভ ঘরে ঢুকল, কাদামাখা বুট পরেই বিছানায় উঠল, পাইপটা ধরাল, জিনিসপত্র এখানে-ওখানে ছুঁড়ে ফেলে দিল, শিসে-ভরা চাবুকটা হাতে নিল, তরবারিসহ পেটিটা কোমরে বাঁধল, তারপর বেরিয়ে গেল। সে কোথায় যাচ্ছে রস্তভের এই প্রশ্নের জবাবে বিরক্ত হয়ে জানাল, তার কাজ আছে।

যেতে যেতেই দেনিসভ বলল, "ঈশ্বর ও আমাদের মহান সম্রাট পরে যেন আমার বিচার করেন।" কাদার ভিতর দিয়ে ছুটন্ত কয়েকটা ঘোড়ার খুরের শব্দ রস্তভের কানে এল। দেনিসভ কোথায় গেল তা নিয়ে সে মোটেই

মাথা ঘামাল না। ঘরের গরমে সে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল; ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা নাগাদ। দেনিসভ তখনও ফেরে নি। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে; পাশের ঘরের কাছে দুজন অফিসার ও একটি শিক্ষার্থী "স্বেকা" খেলতে খেলতে হাসাহাসি করছে। রস্তভ তাদের সঙ্গে যোগ দিল। খেলার মাঝখানে অফিসাররা দেখল, কয়েকটা মালগাড়ি আসছে; তার পিছনে হাড়-জিরজিরে ঘোড়ায় চেপে আসছে জনা পনেরো হুজার। হুজারদের পাহারায় গাড়িগুলো পিকেট-দড়ির কাছে পৌঁছতেই একদল হুজার তাদের ঘিরে ধরল।

রস্তভ বলল, "এই তো, দেনিসভের কী দুশ্চিন্তা, এই তো খাবার এসে গেছে।"

অফিসাররাও বলল, "তাই তো! সৈনিকরা এবার খুসি হবে।"

হুজারদের একটু পরে এল দেনিসভ; সঙ্গে দুজন পদাতিক অফিসার।

রস্তভ তাদের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেল।

একটি বেঁটে সরু অফিসার অত্যন্ত রাগের সঙ্গে বলল, "আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি ক্যাপ্টেন।"

"আমি কি আপনাকে বলি নি যে ওগুলো ছেড়ে দেব না?" দেনিসভ জবাব দিল।

"এর জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে ক্যাপ্টেন। এ তো বিদ্রোহ—নিজের সেনাবাহিনীর যানবাহন আটক করা। দুদিন আমাদের সৈন্যরা কিছু খেতে পায় নি।"

"আর আমার সৈন্যরা না খেয়ে আছে দু সপ্তাহ ধরে," দেনিসভ বলল।

পদাতিক অফিসারটি গলা চড়িয়ে বলল, "এ তো ডাকাতি! এর জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে স্যার!"

দেনিসভ হঠাৎ মেজাজ গরম করে চেঁচিয়ে বলল, "কেন আমাকে বিরক্ত করছেন? জবাবদিহি করতে হয় করব, কিন্তু আপনার কাছে নয়। এখানে মেলা বকবক করবেন না, তাতে ফল ভাল হবে না। দূর হোন! চলে যান!"

ক্ষুদে অফিসারটি ভয় পেল না; চলেও গেল না। চীৎকার করে বলল, "খুব ভাল কথা! আপনি যখন ডাকাতি করতে কৃতসংকল্প তাহলে আমিও……"

"আপনি জাহান্নামে যান! নিরাপদ ও সুস্থ থাকতে থাকতে পালান!" দেনিসভ তার দিকে ঘোড়ার মুখ ফেরাল।

"ঠিক আছে, ঠিক আছে!" ধমকের সুরে কথা বলে অফিসারটি ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ছুটে চলে গেল।

দেনিসভ হো-হো করে হাসতে হাসতে রস্তভের কাছে গিয়ে বলল, "পদাতিক বাহিনীর কাছ থেকে জোর করে গাড়িগুলো ধরে নিয়ে এসেছি। যাই হোক না কেন, আমার লোকগুলোকে তো না খেয়ে মরতে দিতে

পারি না।”

পরদিন রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার দেনিসভকে ডেকে পাঠাল; তার চোখের সামনে আঙুলগুলো মেলে ধরে বলল:

“আমি ব্যাপারটাকে এইভাবে দেখছি: এবিষয়ে আমি কিছুই জানি না, আর এ নিয়ে বিচার-বিতর্কও করতে চাই না, কিন্তু আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, ওদের কাছে গিয়ে কমিসারিয়েট বিভাগ থেকে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন, আর সম্ভব হলে অমুক-অমুক জিনিস পেয়েছি বলে একটা রসিদ সই করে দিন। অন্যথায় যেহেতু জিনিসপত্রগুলো পদাতিক রেজিমেণ্টের নামে বুক করা ছিল সেইহেতু একটা হৈচৈ হবে এবং তাতে ফল খারাপও হতে পারে।”

রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের পরামর্শমত কাজ করার আন্তরিক ইচ্ছা নিয়েই দেনিসভ পদাতিক বিভাগের উদ্দেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সন্ধ্যাবেলায় যে অবস্থায় সে ভূগর্ভস্থ ঘরে ফিরে এল রস্তভ আগে কখনও তাকে সে অবস্থায় দেখে নি। দেনিসভ তখন কথা বলতে পারছে না, হাঁসফাঁস করছে। রস্তভ যখন জানতে চাইল ব্যাপার কি তখন সে শুধু দুর্বল কর্কশ গলায় কতকগুলি অসংলগ্ন দিব্যি করল আর কাকে যেন শাপান্ত করতে লাগল।

“ডাকাতির দায়ে আমার বিচার করবে⋯⋯ওঃ! জল দাও⋯করুক বিচার, কিন্তু আমি শয়তানদের শায়েস্তা করবই⋯⋯সম্রাটকে বলব⋯⋯বরফ⋯⋯সে তোতো করে বলতে লাগল।

রেজিমেণ্টের ডাক্তার এসে বলল, দেনিসভের রক্তমোক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। তার লোমশ বাহু থেকে একপাত্র ভর্তি রক্ত নেওয়া হল, আর তবেই সে সব কথা খুলে বলতে পারল।

“সেখানে তো গেলাম। তারপর, তোমাদের বড়কর্তার বাসাটা কোথায়? দেখিয়ে দিল। ‘দয়া করে অপেক্ষা করুন।’ ‘আমি বিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছি, বিস্তর কাজ পড়ে আছে, অপেক্ষা করার সময় নেই। আমার কথা বল গে।’ খুব ভাল, বড় চোর বেরিয়ে এলেন, আর এসেই বক্তৃতা শুরু করে দিলেন: এ তো ডাকাতি!’ —আমি বললাম, ‘যে মানুষ তার সৈন্যদের খাবার যোগাতে খাদ্যদ্রব্য আটক করে ডাকাতি সে করে না, ডাকাতি করে সে যে তার নিজের পকেট ভর্তি করে!’ ‘আপনি কি দয়া করে চুপ করবেন?’ ‘খুব ভাল কথা।’ তখন তিনি বললেন। ‘তাহলে যান, কমিশনারের হাতে একটা রসিদ দিন, কিন্তু আপনার এই ব্যাপার প্রধান ঘাঁটিতে পাঠানো হবে।’ গেলাম কমিশনারের কাছে। ঢুকলাম, আর দেখি টেবিলে⋯⋯কি ব্যাপার বলতো? না। একটু অপেক্ষা কর! ⋯‘আমাদের না খাইয়ে রেখেছে কে সেই লোক?’ দেনিসভ চীৎকার করে বলল, আর সদ্য রক্ত-নেওয়া হাতের মুঠি দিয়ে এত জোরে টেবিলের উপর

আঘাত করল যে টেবিলটা প্রায় ভাঙবার উপক্রম হল আর তার উপরকার গ্লাসগুলো উল্টে পড়ল। 'তেলিয়ানন! সে কি? তাহলে তুমিই আমাদের না খাইয়ে মারতে চাও? তাই নাকি? তাহলে এই নাও, এই নাও!' তার নাকে-মুখে ঘুসি চালালাম....আঃ, সে যে কি....সে যে কি....মানে, খুব মজা হল আর কি! সকলে তাকে সরিয়ে না নিয়ে গেলে হয় তো খুন করেই ফেলতাম!"

রস্তভ বলল, "কিন্তু আপনি চেঁচাচ্ছেন কেন? শান্ত হোন। আপনার বাহু থেকে নতুন করে রক্ত বেরুচ্ছে। দাঁড়ান, আবার বেঁধে দিই।"

নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে দেনিসভকে শুইয়ে দেওয়া হল। শান্ত ও খুসি মেজাজ নিয়েই পরদিন তার ঘুম ভাঙল।

কিন্তু দুপুরবেলা রেজিমেণ্টের অ্যাড্‌জুটাণ্ট গম্ভীর মুখে তাদের ভূগর্ভস্থ ঘরে ঢুকে দুঃখের সঙ্গে মেজর দেনিসভকে লেখা রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের একটা চিঠি দেখাল; তাতে গত দিনের ঘটনা সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাওয়া হয়েছে। সে আরও বলল যে ব্যাপারটা খুব খারাপ মোড় নিতে পারে; একটা সামরিক আদালত নিযুক্ত করা হয়েছে, আর এখন এসব ব্যাপারে যেরকম কড়াকড়ি চলছে তাতে পদাবনতির চাইতে ভাল কিছু আশাই করা যায় না। ফরিয়াদী পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, যানবাহন আটক করার পরে মেজর দেনিসভ মাতাল অবস্থায় কোয়ার্টারমাস্টারের কাছে গিয়ে বিনা প্ররোচনায় তাকে চোর বলে, আঘাত করবে বলে শাসায় এবং সেখান থেকে বের করে দিলে আপিসে ঢুকে দুজন কর্মচারিকে ধোলাই দেয় এবং একজনের হাত ভেঙে দেয়।

রস্তভের প্রশ্নের জবাবে দেনিসভ হেসে বলল, যতসব বাজে কথা; যেকোন বিচারকে সে মোটেই ভয় করে না, আর সেই শয়তানগুলো যদি তাকে আক্রমণ করতে আসে তো সে তাদের এমন জবাব দেবে যে সহজে তারা তা ভুলতে পারবে না।

দেনিসভ গোটা ব্যাপারটাকে তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চাইলেও রস্তভ বুঝতে পারল যে মনে মনে সে সামরিক আদালতকে ভয় করে এবং তা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। প্রতিদিন আদালত থেকে নানারকম চিঠি ও নোটিস আসতে লাগল, এবং পয়লা মে তারিখে হুকুম হল, পরবর্তী প্রধান অফিসারের হাতে স্কোয়াড্রনের ভার দিয়ে দেনিসভকে তার ডিভিশনের সামনে হাজির হয়ে কমিসারিয়েট আপিসে মারধোর করার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। আগের দিন দুটো কসাক রেজিমেণ্ট ও দুই স্কোয়াড্রন হুজারকে সঙ্গে নিয়ে প্লাতভ প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বেরিয়েছিল। তার যেমন স্বভাব, দেনিসভ সাহস দেখাবার জন্য ঘাঁটিগুলির সম্মুখ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একজন ফরাসী বন্দুকধারীর গুলি এসে লাগল তার পায়ের মাংসল জায়গায়।

অন্য সময় হলে দেনিসভ হয়তো এই সামান্য ক্ষতের জন্য রেজিমেণ্ট ছাড়ত না, কিন্তু এই অজুহাতে সকলের সামনে হাজির হওয়া থেকে রেহাই পাবার সুযোগ পেয়ে সে হাসপাতালে চলে গেল।

অধ্যায়—১৭

ফ্রিডল্যাণ্ড-এর যুদ্ধ হল জুন মাসে; পাভ্‌লোগ্রাদরা তাতে কোন অংশ নেয় নি; তারপরেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল। রস্তভ বন্ধুর অনুপস্থিতিটা খুবই অনুভব করছিল; চলে যাওয়ার পর থেকে তার কোন সংবাদ না পেয়ে এবং তার ক্ষত সম্পর্কে ও বিচার সম্পর্কে উদ্বেগ বোধ করায় যুদ্ধবিরতির সুযোগে সে ছুটি নিয়ে হাসপাতালে দেনিসভের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

প্রাশিয়ার একটা ছোট শহরে হাসপাতালটা অবস্থিত; রুশ ও ফরাসী সৈন্যরা দু'দুবার শহরকে ধ্বংস করে রেখে গেছে। তখন গ্রীষ্মকাল, বাইরের মাঠঘাটের দৃশ্য কত সুন্দর, কিন্তু এই ছোট শহরটার কী বিষণ্ণ চেহারা: ছাদ ও বেড়াগুলো ভাঙা, রাস্তাঘাট দুর্গন্ধে ভরা, অধিবাসীদের পরনে জীর্ণ পোশাক, রুগ্ন ও মাতাল সৈন্যরা এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একটা পাকা বাড়িতে হাসপাতাল করা হয়েছে; তার কিছু কিছু জানালার ফ্রেম ও কাঁচ ভেঙে গেছে; উঠোনের কাঠের বেড়াটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। কিছু ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা সৈন্যরা উঠোনের রোদে বসে আছে; কেউ বা হেঁটে বেড়াচ্ছে।

দরজা দিয়ে ঢুকতেই একটা পচা গন্ধ ও হাসপাতালের বাতাস রস্তভের নাকে লাগল। সিঁড়িতে একজন রুশ সামরিক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল; তার মুখে একটা চুরুট; সঙ্গে একজন সহকারী।

ডাক্তার বলছে, "আমি তো নিজেকে টুকরো টুকরো করে ভাগ করতে পারি না। সন্ধ্যায় মাকার আলেক্সীভিচ-এর কাছে এস। আমি সেখানে থাকব।"

সহকারী আরও কিছু প্রশ্ন করল।

"আঃ, যা পার তাই কর! সবই তো এক।" উঠে-আসা রস্তভের দিকে ডাক্তারের চোখ পড়ল।

বলল, "আপনি কি চান স্যার? বুলেট তো লাগে নি দেখছি, তাহলে কি সান্নিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা করাবেন? এটাই মহামারী-ভবন স্যার।"

"তার মানে?" রস্তভ শুধাল।

"সান্নিপাতিক জ্বরবিকার স্যার। এখানে ঢুকলেই মৃত্যু। শুধু আমরা দুজন, মাকীভ ও আমি (সহকারীকে দেখিয়ে) চালিয়ে যাচ্ছি। এখানেই আমাদের পাঁচটি ডাক্তার মারা গেছে। নতুন কেউ এলে এক সপ্তাহের মধ্যেই সাবাড়। প্রুশীয় ডাক্তারদের এখানে ডাকা হয়েছে, কিন্তু বন্ধুদের এটা

মোটেই পছন্দ নয়।"

রস্তভ জানাল, সে আহত হুজার দেনিসভের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

আমি চিনি না। আপনাকে বলতে পারব না স্যার। শুধু একবার ভাবুন! চার শ'র বেশী রোগী ও তিনটে হাসপাতালের দায় আমার একার ঘাড়ে। দানশীলা প্রুশীয় মহিলারা প্রতিমাসে দু'পাউণ্ড কফি ও লিণ্ট পাঠান তাই রক্ষা, নইলে আমাদের হয়ে যেত!" সে হেসে উঠল। "চারশ' স্যার, তার উপর আবার নতুন রোগী আসছে তো আসছেই। চারশ'ই তো আছে, কি বল?" সে সহকারীকে শুধাল।

সহকারীটির মাথা ধরে গেছে। ডাক্তারের বক্‌বকানি শুনে শুনে সে বিরক্ত ও অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

রস্তভ আবার বলল, "মেজর দেনিসভ। মোলিতেন-এ আহত হয়েছেন।"

সহকারীটি অবশ্য ডাক্তারের কথায় সায় দিল না।

"তিনি কি লম্বা? মাথার চুল লাল?" ডাক্তার শুধাল।

রস্তভ দেনিসভের চেহারার বর্ণনা দিল।

খুসি-খুসি ভাব দেখিয়ে ডাক্তার বলল, "ওরকম একজন ছিলেন বটে। মনে হচ্ছে তিনি মারা গেছেন। যাই হোক, একবার তালিকাটা দেখে নেব। আমাদের একটা তালিকা ছিল। তুমি সেটা পেয়েছ কি মাকীভ?"

সহকারী জবাব দিল, "সেটা মাকার আলেক্সীভিচ-এর কাছে আছে।" রস্তভের দিকে ফিরে বলল, "কিন্তু আপনি যদি অফিসার্স ওয়ার্ডে যান তাহলে তো নিজেই দেখে আসতে পারেন।"

ডাক্তার বলে উঠল, "আপনার না যাওয়াই ভাল স্যার; গেলে হয় তো আপনাকেই এখানে থেকে যেতে হবে।"

ডাক্তারকে অভিবাদন জানিয়ে রস্তভকে পথটা দেখিয়ে দিতে বলল।

ডাক্তার পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে কিন্তু দোষ দেবেন না।"

রস্তভ ও সহকারী অন্ধকার বারান্দায় গেল। সেখানে গন্ধটা এত কড়া যে রস্তভ নাক চেপে ধরে একটু থেমে শক্তি সঞ্চয় করে তবে আবার এগোতে লাগল। ডান দিকে একটা খোলা দরজা। খালি পা ও শুধুমাত্র তলবাস পরা একটি শুট্‌কো লোক ক্রাচে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেরিয়ে এল; দরজায় হেলান দিয়ে ঈর্ষাকাতর ঝকঝকে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজায় উঁকি মেরে রস্তভ দেখল, রুগ্ন ও আহত মানুষগুলো খড় ও ওভারকোটের উপর শুয়ে আছে।

"আমি কি ভিতরে ঢুকে দেখতে পারি?"

"দেখার কি আছে?" সহকারী বলল।

কিন্তু যেহেতু সহকারীটির ইচ্ছা নয় যে সে ভিতরে ঢোকে তাই রস্তভ সৈনিকদের ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ল। বাতাসের দুর্গন্ধ এখানে আরও বেশী।

বড় বড় জানালা দিয়ে সূর্যের আলো এসে পড়ায় লম্বা ঘরটা বেশ আলোকিত। দেয়ালের দিকে মাথা রেখে রুগ্ন ও আহতরা দুই সারিতে শুয়ে আছে; মাঝখানে যাতায়াতের পথ। তাদের মধ্যে অনেকেই অচেতন, নবাগতদের দিকে ফিরেও তাকাল না। যাদের চেতনা রয়েছে তারা উঠে বসল, না হয় শুকনো হলুদে মুখ তুলে একাগ্র দৃষ্টিতে রস্তভের দিকে তাকাল; সকলের মুখেই আশা, স্বস্তি, তিরস্কার ও অপরের স্বাস্থ্যের প্রতি ঈর্ষার সেই একই ভাব। ঘরের মাঝখানে গিয়ে পাশের আরও দুটি ঘরের দিকে তাকিয়েও রস্তভ সেই একই দৃশ্য দেখতে পেল। এরকম দৃশ্য যে দেখতে হবে তা সে আশা করে নি। তার ঠিক সামনে একটি রুগ্ন লোক শুয়ে আছে। চুল কাটার ধরন দেখে মনে হয় লোকটি কসাক। বড় বড় হাত-পা ছড়িয়ে লোকটি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। মুখটা রক্তবর্ণ, চোখ দুটো এমনভাবে পাকিয়ে আছে যে কেবলমাত্র সাদা অংশটাই দেখা যাচ্ছে, লাল হাত-পায়ের শিরাগুলো দড়ির মত ফুলে উঠেছে। মাথাটা মেঝের উপর ঠুকতে ঠুকতে কর্কশ গলায় সে বারবার কি যেন বলছে। ভাল করে কান পেতে রস্তভ কথাগুলো ধরতে পারল। সে বলছে, "জল, জল, একটু জল!" চারদিকে তাকিয়ে রস্তভ এমন একটি লোককে খুঁজতে লাগল যে এই মানুষটিকে জায়গামত শুইয়ে একটু জল এনে দেবে।

সহকারীটিকে জিজ্ঞাসা করল, "এখানে রোগীদের দেখাশুনা করে কে?"

ঠিক সেইসময় হাসপাতালের আর্দালি জনৈক কমিসারিয়েট-সৈনিক পাশের ঘর থেকে সেখানে এল।

রস্তভের দিকে তাকিয়ে তাকে হাসপাতালের কর্তৃপক্ষদের একজন বলে ভুল করে বলল, "শুভদিন ইয়োর অনার!"

কসাকটিকে দেখিয়ে রস্তভ বলল, "ওকে ঠিকমত শুইয়ে দিয়ে একটু জল এনে দাও।"

"ঠিক আছে ইয়োর অনার," শান্তভাবে জবাব দিয়ে সৈনিকটি চোখ দুটো-কে পাকিয়ে আরও খাড়া হয়ে দাঁড়াল, কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না।

"না, এখানে কিছু করা অসম্ভব?" চোখ নীচু করে এই কথা ভেবে রস্তভ বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ডান দিকে একটি লোক একাগ্র স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে সে ঘুরে দাঁড়াল। একেবারে কোণের দিকে পাকা দাঁড়িওয়ালা কংকালসার একটি বুড়ো সৈনিক ওভারকোটের উপর বসে একদৃষ্টিতে রস্তভের দিকে তাকিয়ে আছে। রস্তভের মনে হল বুড়োটি তাকে কিছু বলতে চাইছে। আরও কাছে গিয়ে সে দেখল, বুড়োর একটা পা ভাঁজ করা রয়েছে। আর অন্য পাটা হাঁটুর উপর থেকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পার্শ্ববর্তী যে লোকটি মাথাটা চিৎকরে চুপচাপ পড়ে আছে সে একটি যুবক সৈনিক। মোমের মত বিবর্ণ মুখে ফুট-ফুট দাগ, চোখ দুটো ওল্টানো। যুবক

সৈনিকটির দিকে তাকাতেই রস্তভের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

সহকারীটির দিকে ফিরে বলল, "একি, মনে হচ্ছে এ তো⋯"

চোয়াল কাঁপতে কাঁপতে বুড়ো সৈনিকটি বলল, "আমরা কত করে মিনতি করছি ইয়োর অনার। সকাল থেকে লোকটা মরে পড়ে আছে। কিন্তু আমরা তো মানুষ, কুকুর নই।"

সহকারী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এখনই কাউকে পাঠাচ্ছি। ওকে নিয়ে যাবে। —এক্ষুণি নিয়ে যাবে। আসুন ইয়োর অনার।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলুন" রস্তভ দ্রুত কথাটা বলল; চোখ নামিয়ে অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে দুইসারি ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টির অগোচরে সে সেখান থেকে চলে যেতে চেষ্টা করল, একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৮

বারান্দা বরাবর এগিয়ে সহকারীটি রস্তভকে নিয়ে অফিসার্স ওয়ার্ডে ঢুকল। মোট তিনটি ঘর, সব দরজা খোলা। ঘরে বিছানা আছে; রুগ্ন ও আহত অফিসাররা কেউ শুয়ে আছে, কেউ বসে আছে। হাসপাতালের ড্রেসিং-গাউন পরে কেউ কেউ ঘরের মধ্যেই হেঁটে বেড়াচ্ছে। অফিসার্স ওয়ার্ডে রস্তভের প্রথম দেখা হল একহাত কাটা একটি ছোটখাট শীর্ণ লোকের সঙ্গে। নৈশ-টুপি মাথায় দিয়ে হাসপাতালের ড্রেসিং-গাউন পরে দাঁতের ফাঁকে একটা পাইপ ধরে সে এক নম্বর ঘরের মধ্যেই হাঁটছে। তাকে দেখেই রস্তভ স্মরণ করতে চেষ্টা করল, কোথায় যেন আগে তাকে দেখেছে!

ছোট লোকটি বলল, "আরে, দেখ কোথায় এসে আবার দেখা হয়ে গেল! তুশিন, তুশিন, তোমার মনে নেই শোন্‌গ্রেবার্ণ-এ তোমাকে গাড়িতে তুলে নিয়েছিলাম? দেখতেই তো পাচ্ছ, আমার উপর একটু কাটা-ছেঁড়া হয়েছে," ড্রেসিং-গাউনের খালি আস্তিনটা দেখিয়ে সে হেসে বলল। তারপর রস্তভের প্রশ্নের জবাবে বলল, ভাসিলি দিমিত্রিচ দেনিসভকে খুঁজছ? আমার প্রতিবেশী। এদিকে, এদিকে," তুশিন তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। সেখান থেকে বেশ কয়েকজনের উচ্চহাসির শব্দ ভেসে এল।

আগের দৃশ্যগুলো ও পচা মাংসের গন্ধের কথা মনে পড়ায় রস্তভ ভাবল, "কেমন করে এখানে ওরা হাসতে পারে, এমন কি বেঁচে থাকতে পারে?"

এখন প্রায় দুপুর, তবু দেনিসভ তার বিছানায় কম্বলে মাথা ঢেকে ঘুমিয়ে ছিল।

"আরে, রস্তভ! কেমন আছ, কেমন আছ?" রেজিমেন্টে থাকার সময়ের মতই জোর গলায় দেনিসভ বলে উঠল, কিন্তু রস্তভ অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করল, তার এই স্বভাবসিদ্ধ স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎসাহের অন্তরালে রয়েছে

এমন একটি নতুন, অশুভ গোপন অনুভূতি যা দেনিসভের মুখের ভঙ্গীতে ও গলার স্বরে ফুটে উঠেছে।

তার ক্ষত খুবই সামান্য, কিন্তু ছয় সপ্তাহ পরে এখনও সেটা সারে নি। হাসপাতালের অন্য রোগীদের মতই তার মুখেও সেই একই ফোলা-ফোলা হল্‌দে ভাব। কিন্তু তাতে রস্তভ অবাক হয় নি। দেনিসভ যে তাকে দেখে খুসি হয় নি, সে যে তার দিকে তাকিয়ে অস্বাভাবিকভাবে হাসছে—এটা দেখেই সে অবাক হয়েছে। সে নিজে থেকে তাকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করল না, এমন কি রস্তভ নিজে যখন কথা বলতে লাগল তখনও তাতে ভাল করে কান দিল না।

এমন কি রস্তভ লক্ষ্য করল, রেজিমেণ্টের কথা এবং হাসপাতালের মুক্ত জীবনের কথা কেউ তাকে স্মরণ করিয়ে দিক সেটাও দেনিসভ চায় না। পুরনো জীবনকে ভুলে গিয়ে শুধুমাত্র কমিসারিয়েট-অফিসারদর ব্যাপারে নিয়েই সে মেতে থাকতে চায়। রস্তভ যখন সেই ব্যাপারটার কথা জানতে চাইল সঙ্গে সঙ্গে সে বালিশের তলা থেকে বের করল কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি এবং তার জবাবের যে খসড়া সে করেছে সেটা। সেটা পড়তে পড়তে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল; বিশেষ করে তার জবাবে শত্রুপক্ষের প্রতি যেসব কড়া কড়া কথা সে লিখেছে সেগুলির প্রতি সে রস্তভের মনোযোগ আকর্ষণ করল। তার যে সব হাসপাতালের সঙ্গী নবাগত রস্তভকে ঘিরে সেখানে জমায়েত হয়েছিল এবার তারা একে একে সরে পড়তে লাগল। তাদের মুখ দেখেই রস্তভ বুঝতে পারল, এইসব ভদ্রলোকরা দেনিসভের চিঠির গল্প বার বার শুনে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। শুধু তার পাশের বিছানার শক্ত-সমর্থ উহ্‌লানটি ভুরু কুঁচকে পাইপ টানতে টানতে বিছানায়ই বসে রইল, আর এক হাতওয়ালা তুশিন তখনও তার পড়া শুনতে শুনতে আপত্তিসূচক ঘাড় নাড়তে লাগল। পড়ার মাঝখানে দেনিসভকে বাধা দিয়ে উহ্‌লানটি কথা বলতে শুরু করল।

রস্তভের দিকে ঘুরে সে বলল, "আমি বলি কি, ক্ষমা প্রার্থনা করে সম্রাটের কাছে দরখাস্ত পাঠানোই সবচাইতে ভাল।

"আমি দরখাস্ত পাঠাব সম্রাটকে!" দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল। পুরনো শক্তি ও তেজের সঙ্গে কথাটা বলতে চাইলেও সেটা শোনালো অক্ষমের বিরক্তি-সূচক উক্তির মত। "কেন? কিসের জন্য? আমি যদি ডাকাত হতাম তো করুণা চাইতাম, কিন্তু আমাকে কোর্ট-মার্শাল করা হচ্ছে ডাকাতদের ধরিয়ে দেবার জন্য। তারা আমার বিচারই করুক, আমি কাউকে ভয় করি না। সম্মানের সঙ্গে আমি আমার জারের, আমার দেশের সেবা করেছি, চুরি তো করিনি! আর আমাকেই নীচে নামিয়ে দেবে? ···শোন, আমি তাদের সোজা লিখে দিচ্ছি। লিখেছি: 'আমি যদি রাজকোষ লুঠ করতাম···"

তুশিন বলল, "লেখাটা নিশ্চয়ই খুব ভাল হয়েছে, কিন্তু সেটা তো কথা নয় ভাসিলি দিমিত্রিচ।" রস্তভকে বলল, "মেনে চলাই উচিত, কিন্তু ভাসিলি দিমিত্রিচ তা চান না। তুমি তো জান, অডিটার বলেছে যে ব্যাপার ভাল নয়।"

"বেশ তো, খারাপই হোক," দেনিসভ বলল।

তুশিন বলতে লাগল, "আপনার জন্য অডিটর একটা আবেদন-পত্র লিখে দিয়েছে, সেটাতে স্বাক্ষর করে এই ভদ্রলোককে সেটা নিয়ে যেতে বলা আপনার উচিত। (রস্তভকে দেখিয়ে) ওর নিশ্চয়ই উপর মহলে জানাশুনা আছে। এর চাইতে ভাল সুযোগ আর পাবেন না।"

"আমি তো বলেছি, কারও সামনে বুকে হাঁটতে পারব না, কথাটা বলে দেনিসভ আবার তার কাগজটা পড়তে লাগল।

রস্তভ বুঝতে পারল যে তুশিন ও অন্য অফিসাররা যে উপায় বাৎলেছে সেটাই সবচাইতে নিরাপদ, আর দেনিসভের কোন কাজে লাগতে পারলে সেও খুসি হবে, কিন্তু দেনিসভকে বোঝাবার সাহস তার হল না। তার কঠিন ইচ্ছাশক্তি ও কড়া মেজাজের কথা সে জানে।

এক ঘণ্টারও বেশী সময় ধরে দেনিসভের তীব্র জবাবটা পড়া শেষ হলে রস্তভ কিছুই বলল না, বিষণ্ণ চিত্তে দেনিসভের হাসপাতালের বন্ধুদের সঙ্গেই দিনের বাকি সময়টা কাটিয়ে দিল। সারাটা সন্ধ্যা দেনিসভ চুপচাপ থাকল।

একটু রাত হলে বিদায় নেবার আগে রস্তভ দেনিসভকে জিজ্ঞাসা করল, তার কিছু করণীয় আছে কি না।

"আছে, একটু অপেক্ষা কর," অফিসারদের সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেনিসভ বালিশের তলা থেকে কাগজপত্র বের করে নিয়ে জানালার কাছে চলে গেল। সেখানে একটা দোয়াত ছিল; সে বসে লিখতে শুরু করল।

জানালার কাছ থেকে এসে বড় একটা খাম রস্তভকে দিয়ে বলল, "আমার মনে হয়, দেয়ালে মাথা ঠুকে কোন লাভ নেই।" সেই খামে অডিটর কর্তৃক খসড়া-করা সম্রাটকে লেখা দরখাস্তটা ছিল; তাতে কমিসারিয়েট অফিসারদের দোষের কথা উল্লেখ না করে দেনিসভ সরাসরি ক্ষমা প্রার্থনা করেছে।

"এটা হাতে হাতে দিও। মনে হচ্ছে……"

দেনিসভ কথাটা শেষ করল না; একটা বেদনাদায়ক অস্বাভাবিক হাসি তার মুখে দেখা দিল।

অধ্যায়—১৯

রেজিমেণ্টে ফিরে গিয়ে কম্যাণ্ডারকে দেনিসভের ব্যাপারটা জানিয়ে রস্তভ ঘোড়ায় চেপে তিল্‌জিত্‌ চলে গেল সম্রাটকে চিঠিটা দিতে।

১৩ই জুন ফরাসী ও রুশ সম্রাটদ্বয় তিল্‌জিত্‌-এ এল। বরিস দ্রুবেৎস্কয়

তার উপরওয়ালাকে বলল, তিল্‌জিত্‌-এ যারা থাকবে তাদের তালিকায় যেন তার নামটাও রাখা হয়।

"এই মহাপুরুষটিকে দেখার খুব ইচ্ছা আমার," নেপোলিয়নের প্রসঙ্গে সে কথাটা বলল, যদিও অন্য সকলের মতই এতকাল সেও তাকে বোনাপার্ত বলেই ডাকত।

সেনাপতি হেসে শুধাল, "তুমি কি বোনাপার্তের কথা বলছ ?"

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সেনাপতির দিকে তাকিয়েই বরিস বুঝতে পারল যে তাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সে জবাব দিল, "আমি সম্রাট নেপোলিয়ানের কথা বলছি প্রিন্স।" সেনাপতি ঈষৎ হেসে তার কাঁধ চাপড়ে দিল।

"তুমি অনেকদূর যাবে," সেনাপতি বলল; তাকে সঙ্গে নিয়েই তিল্‌জিত্‌ গেল।

দুই সম্রাটের মধ্যে যেদিন সাক্ষাৎ হল সেদিন নিয়েমেন-এ যে ক'জন উপস্থিত ছিল বরিসও তাদের একজন।

নাম-ফলকে সজ্জিত ভেলাটা সে দেখল, নদীর অপর পারে ফরাসী রক্ষীবাহিনীর সামনে দিয়ে নেপোলিয়নকে যেতে দেখল, নিয়েমেন নদীর তীরে একটা হোটেলে নেপোলিয়নের আগমনের জন্য প্রতীক্ষারত সম্রাট আলেক্সান্দারের নীরব বিষণ্ণ মুখখানি দেখল, দুই সম্রাটকে নৌকোয় উঠতে দেখল; আরও দেখল দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে আলেক্সান্দারের সঙ্গে দেখা করল, তার দিকে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল, এবং দুজনই তাঁবুর ভিতর চলে গেল।

ইতিমধ্যেই বরিস উঁচু মহলে চলাফেরা করতে শুরু করেছে; সবকিছু মনোযোগ দিয়ে দেখার ও লিখে রাখার অভ্যাসও গড়ে তুলেছে। তিল্‌জিত্‌-এর সেই সাক্ষাৎকারের সময় নেপোলিয়নের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের নাম, তাদের ইউনিফর্মের বিবরণ সবকিছুই সে জেনে নিল, এবং বড় বড় লোকেরা যাকিছু বলতে লাগল সব মন দিয়ে শুনল। সম্রাটরা যেই তাঁবুতে ঢুকল অমনি সে ঘড়ি দেখল, আর অ্যালেক্সান্দার ফিরে এলেও সে ঘড়ি দেখতে ভুলল না। সাক্ষাৎকারটা চলেছে এক ঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট। এই সময়টার একটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে মনে করে অন্য সব ঘটনার সঙ্গে এটাকেও সে টুকে রেখে দিল।

অপর এক অ্যাড্‌জুটান্ট পোলিশ কাউন্ট ঝিলিন্‌স্কির সঙ্গে বরিস এক ঘরেই থাকে। ঝিলিন্‌স্কি জাতিতে পোল, ধনী, ফরাসীদের খুব ভক্ত। তিল্‌জিত্‌-এ থাকার সময় প্রায় প্রতিদিনই রক্ষীবাহিনী ও ফরাসী প্রধান ঘাঁটির অফিসাররা তার সঙ্গে ও বরিসের সঙ্গে দিনে ও রাতে সর্বদাই খানাপিনা করত।

২৪ শে জুন সন্ধ্যায় কাউন্ট ঝিলিন্‌স্কি ফরাসী বন্ধুদের একটি নৈশভোজ-

সভায় আমন্ত্রণ করল। সেখানে সম্মানিত অতিথি হল নেপোলিয়নের এক-জন এড্-ডি-কং, আর ছিল রক্ষীবাহিনীর কয়েকজন ফরাসী অফিসার ও নেপোলিয়নের একটি বালক-ভৃত্য, প্রাচীন অভিজাত এক ফরাসী পরিবারের ছেলে। রাতের অন্ধকারে অসামরিক পোশাকে কেউ তাকে চিনতে পারবে না এই ভরসায় সেইদিনই রস্তভ তিল্‌জিত্‌ পৌঁছে বরিস ও ঝিলিন্‌স্কির বাসস্থানে এসে হাজির হল।

দরজা দিয়ে জনৈক অফিসারকে মুখ বাড়াতে দেখেই শত্রুপক্ষকে দেখে রুশ ভাষায় জিজ্ঞাসা করল দ্রুবেৎস্কয় সেখানে থাকে কিনা। বাইরের ঘরে অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে বরিস বেরিয়ে এল। রস্তভকে চেনামাত্রই তার মুখের উপর মুহূর্তের জন্য একটা বিরক্তির ছায়া পড়ল।

অবশ্য হাসি মুখে তার দিকে এগিয়ে বরিস বলল, "আরে, তুমি? তোমাকে দেখে খুব, খুব খুসি হলাম।" কিন্তু তার প্রথম প্রতিক্রিয়াটা রস্তভ লক্ষ্য করেছিল। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "মনে হচ্ছে বড় অসময়ে এসে পড়েছি। আসা উচিত ছিল না কিন্তু দরকারে পড়েই এসেছি।"

"তা নয়। আমি শুধু অবাক হচ্ছি, তোমার রেজিমেণ্ট ছেড়ে এলে কেমন করে? এক মিনিট, এখনই আসছি।" কে যেন তাকে ডাকল, তাই বরিস শেষের কথাগুলি বলল।

"মনে হচ্ছে তোমাদের কাজে বিঘ্ন ঘটাচ্ছি," রস্তভ আবার বলল।

বরিসের মুখের উপর থেকে বিরক্তির ভাবটা এর মধ্যেই মিলিয়ে গেছে; নিঃশব্দে রস্তভের হাত ধরে তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

"আরে এস, তুমি আসবে তার আবার সময় অসময় কি!" বলতে বলতে বরিস তাকে যে ঘরটাতে নিয়ে গেল সেখানে নৈশভোজনের টেবিল সাজানো হয়েছে; অতিথিদের সঙ্গে রস্তভের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, সে অসামরিক লোক নয়, একজন হুজার অফিসার, তার পুরনো বন্ধু।

অতিথিদের নাম করে করে বলল "কাউণ্ট ঝিলিন্‌স্কি—লে কোঁত এন. এন.—লে কাপ্তান এস. এস." রস্তভ ভ্রূ কুঁচকে ফরাসী ভদ্রলোকদের দিকে তাকাল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা নোয়ালো, তারপর চুপচাপ বসে রইল।

স্পষ্টতই ঝিলিন্‌স্কি এই নবাগত রুশ লোকটিকে খুসি মনে নিজেদের দলে অভ্যর্থনা করে নিল না, তার সঙ্গে কথাও বলল না। ফরাসীদের সহজাত ভদ্রতার সঙ্গে অপর একজন ফরাসী রস্তভের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলল, সম্ভবত সে সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতেই তিল্‌জিত্‌-এ এসেছে।

রস্তভ সংক্ষেপে জবাব দিল, "না, আমি একটা কাজে এসেছি।"

বরিসের মুখে অসন্তোষের ভাবটা লক্ষ্য করা থেকেই রস্তভের মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। সে উঠে বরিসের কাছে নীচু গলায় বলল, "যাই বল, আমি এসে তোমাদের কাজে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। কাজের কথাটা সেরে নিয়েই

আমি চলে যাব।"

বরিস বলল, "না, না, তা হয় না। বরং তুমি যদি পরিশ্রান্ত হয়ে থাক তো আমার ঘরে চল, কিছুক্ষণ শুয়ে বিশ্রাম নাও।"

"হ্যাঁ, সত্যি…"

যে ছোট ঘরটাতে বরিস ঘুমোয় তারা সেখানে গেল। রস্তভ কিন্তু বসল না, তখনই দেনিসভের ব্যাপারটা খুলে জানতে চাইল, তার সেনাপতির মারফৎ সম্রাটের কাছে দরবার করে দেনিসভের আবেদনপত্রটা সম্রাটের হাতে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা সে করতে পারবে কিনা। বরিস পায়ের উপর পা তুলে ডান হাতের আঙুল দিয়ে বাঁ হাতের উপর টোকা মারতে মারতে সেনাপতি যেভাবে অধস্তন কর্মচারীর প্রতিবেদন শোনে ঠিক সেই-ভাবে একবার এ-পাশে, একবার সোজা রস্তভের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাগুলি শুনতে লাগল। আর প্রতিবারই রস্তভ অস্বস্তি বোধ করায় মুখটা নামিয়ে নিল।

"এ রকম ঘটনার কথা আমি আগেও শুনেছি; আমি জানি, মহামান্য সম্রাট এসব ব্যাপারে খুবই কড়া। আমার মনে হয়, এ ব্যাপারটা সম্রাটের কাছে না নিয়ে সেনাদলের অধিনায়কের কাছে আবেদন করাই ভাল। …তবে সাধারণভাবে আমি মনে করি…"

"তার মানে তুমি কিছু করতে চাও না? বেশ তো, তাই বলে দাও!" বরিসের মুখের দিকে না তাকিয়েই রস্তভ চেঁচিয়ে বলে উঠল।

বরিস হাসল।

"তা নয়। বরং আমি যতটা পারি তা করব। শুধু আমার মনে হল…"

ঠিক সেই সময় ঝিলিন্স্কি বরিসকে ডাকল।

"ওই তো, যাও, যাও, যাও…" রস্তভ বলল। সে খাবার টেবিলেও গেল না, ছোট ঘরটাতে একাই রইল; পাশের ঘরের ফরাসী ভাষায় হাল্কা কথা-বার্তা শুনতে শুনতে অনেকক্ষণ ধরে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

অধ্যায়—২০

রস্তভ এমন একটা দিনে তিল্‌জিত্‌ এসেছিল যেটা দেনিসভের আবেদন-পত্র পেশ করার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত ছিল না। সেনাপতির কাছে সে নিজে যেতে পারল না কারণ সে এসেছে সাদা পোশাকে আর তাও এসেছে কোন-রকম অনুমতি না নিয়ে; আবার ইচ্ছা থাকলেও বরিস পরের দিন তার সঙ্গে দেখা করতে পারত না। পরের দিন অর্থাৎ ২৭শে জুলাই সন্ধির প্রাথমিক কাগজপত্রে সই-সাবুদ করা হল। সম্রাটদ্বয় পদক-বিনিময় করল: আলেক্সান্দার গ্রহণ করল "লিজিয়ন অব অনার ক্রুশ" আর নেপোলিয়ন পেল "প্রথম ডিগ্রির সেণ্ট আনড্রু অর্ডার"; সন্ধ্যায় একটা ভোজসভার আয়োজন করা হল; উভয়

সম্রাটই তাতে যোগ দিল।

বরিসের সঙ্গ রস্তভের কাছে এতই অস্বস্তিকর মনে হল যে ভোজন সেরে সে যখন ফিরে এল রস্তভ তখন ঘুমের ভান করে পড়ে রইল এবং পরদিন সকালে বরিসের সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল। বেসামরিক পোশাকে গেলে টুপি মাথায় দিয়ে সে শহরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল; রাজপথে ইউনিফর্মপরা ফরাসীকে দেখল, যেসব বাড়িতে রুশ ও ফরাসী সম্রাটরা আছে তা দেখল। একটা স্কোয়ারে দেখল ভোজসভার জন্য টেবিল পাতা হয়েছে, রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশ রুশ ও ফরাসী পতাকা দিয়ে সাজানো হয়েছে, তাতে বড় বড় হরফে এ. ও এন. লেখা। বাড়ির দরজায়-দরজায়ও নিশান টাঙানো হয়েছে।

নিকলাস ভাবতে লাগল, "বরিস আমাকে সাহায্য করতে চায় না, আমিও তাকে সাহায্যের কথা বলতে চাই না। আমাদের মধ্যে সব চুকে-বুকে গেছে, কিন্তু দেনিসভের জন্য যা করা সম্ভব তা না করে, বিশেষ করে তার চিঠিটা সম্রাটের কাছে পৌঁছে না দিয়ে আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। সম্রাট! ···তিনি তো এখানেই আছেন!" আলেক্সান্দারের বাসভবনের সামনে এসে পড়ায় কথাটা রস্তভের মনে এল।

সুসজ্জিত ঘোড়াগুলি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। লোকজন হাজির হয়েছে। সম্রাটের বের হবার সময় হয়েছে।

রস্তভ ভাবতে লাগল: "যেকোন মুহূর্তে তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। চিঠিটা সরাসরি তার হাতে দিয়ে যদি বলি···অসামরিক পোশাকের জন্য তারা কি সত্যি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারে? নিশ্চয়ই না! ন্যায়ের পাল্লা কার দিকে সেটা তিনি বুঝতে পারবেন। তার মত ন্যায়বান, উদারচিত্ত আর কে হতে পারে? আর এখানে এসেছি বলে তারা যদি আমাকে গ্রেপ্তারই করে, তাতেই বা কি?···লোকজন তো ভিতরে যাচ্ছেই···যতসব বাজে কথা! ভিতরে গিয়ে নিজের হাতেই চিঠিটা সম্রাটের হাতে তুলে দেব।" সঙ্গে সঙ্গে একটা অপ্রত্যাশিত দৃঢ়তা রস্তভকে পেয়ে বসল; পকেটের চিঠিটাকে চেপে ধরে সে সোজা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল।

সে ভাবল: "অস্তারলিজে যে সুযোগ হারিয়েছে সে সুযোগ আজ আর হারাব না। তার পায়ের উপর পড়ে মিনতি করব। তিনি আমাকে তুলে ধরবেন, আমার কথা শুনবেন, এমন কি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন। 'কারও ভাল করতে পারলে আমি খুসি হই, আর অন্যায়ের প্রতিকারই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সুখ,' রস্তভ কল্পনায় যেন সম্রাটের কথাগুলি শুনতে পেল। অনেক লোকজনকে কাটিয়ে সে সম্রাটের ভবনের বারান্দায় পৌঁছে গেল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, "কি চাই?"

কাঁপা গলায় নিকলাস বলল, "একটা চিঠি, একটা আবেদন-পত্র সম্রাটের

হাতে দিতে চাই।"

"আবেদন-পত্র? এইদিকে, ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে চলে যান (নীচে যাবার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিল), তবে ওটা কেউ নেবে না।"

তার নির্বিকার কণ্ঠস্বরে রস্তভ ভয় পেয়ে গেল; ভাবল সেখান থেকে চলে যাবে, কিন্তু ততক্ষণে লোকটি দরজাটা খুলে ধরেছে, আর রস্তভও ভিতরে ঢুকে গেল।

সাদা ব্রীচেস, উঁচু বুট ও সুতীর শার্ট পরা বছর তিরিশ বয়সের একটি হ্রস্বকায় জোয়ান লোক ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, আর তার খানসামা ব্রীচেসের বোতাম এঁটে দিচ্ছে।

"এটা কি? আবেদন-পত্র?"

"আবার আবেদন-পত্র?"

"ওকে পরে আসতে বলে দাও। তিনি এখুনি বেরিয়ে আসবেন, আমাদের যেতে হবে।"

"পরে""পরে। কাল। অনেক দেরি হয়ে গেছে…"

রস্তভ মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ব্রীচেস্-পরা লোকটি তাকে থামাল।

"আপনি কার কাছ থেকে এসেছেন? আপনি কে?"

"আমি এসেছি মেজর দেনিসভের কাছ থেকে," রস্তভ জবাব দিল।

"আপনি কি একজন অফিসার?"

"লেফ্‌টেন্যাণ্ট কাউণ্ট রস্তভ।"

"কী ঔদ্ধত্য! ওটা আপনার কম্যাণ্ডারের মারফৎ পাঠাবেন। এবার চলে যান…চলে যান;" খানসামার হাত থেকে ইউনিফর্মটি নিয়ে সে পরতে লাগল।

রস্তভ হল-ঘরে ফিরে গেল। প্যারেড-ইউনিফর্মে সজ্জিত অনেক অফিসার ও সেনাপতি সেখানে ভিড় করেছে। চোখ নীচু করে তাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই একটি পরিচিত কণ্ঠ তার নাম ধরে ডাকল, একটি হাত তার পথ আটকে দিল।

"অসামরিক পোশাকে আপনি এখানে কি করছেন স্যার?"

লোকটি অশ্বারোহী বাহিনীর একজন সেনাপতি; এই অভিযানে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছে; আগে রস্তভের সঙ্গে একই সেনাদলে ছিল।

তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে রস্তভ সব কথা খুলে বলল; দেনিসভের ব্যাপারে তার সাহায্য চাইল। সব কথা শুনে সেনাপতিটি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগল।

"ভাল মানুষটির জন্য আমি দুঃখিত, খুবই দুঃখিত,। চিঠিটা দিন।"

রস্তভ সবে চিঠিটা তার হাতে দিয়ে দেনিসভের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছে

এমন সময় সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল; সেনাপতিটি তাকে রেখে বারান্দায় এগিয়ে গেল। সম্রাটের পর্ষদরা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে এসে যার যার ঘোড়ার কাছে চলে গেল। সম্রাটের ঘোড়ার পরিচিত পদশব্দ রস্তভের কানে এল। ধরা পড়ে যাওয়ার বিপদকে ভুলে গিয়ে কয়েকজন কৌতূহলী নাগরিকের সঙ্গে রস্তভও বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল; দুই বছর পরে আর একবার দেখতে পেল তার সেই প্রিয় মূর্তি; সেই একই মুখ, একই দৃষ্টি, একই পদক্ষেপ, মহিমা ও নম্রতার সেই একই সহাবস্থান···সম্রাটের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগের সেই পুরনো অনুভূতি নতুন করে জাগল রস্তভের অন্তরে। প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্টের ইউনিফর্ম—সাদা শ্যাময়-চামড়ার ব্রীচেস ও উঁচু বুট—পরে বুকে একটা "স্টার" লাগিয়ে সম্রাট বারান্দায় নেমে এল; হাতে দস্তানা পরা, বগলের নীচে টুপি। থেমে একবার চারদিকে তাকাল; তার দৃষ্টিপাতে সবকিছু যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কয়েকজন সেনাপতির সঙ্গে কিছু কথা বলে রস্তভের সেনাদলের প্রাক্তন কম্যাণ্ডারকে চিনতে পেরে সম্রাট হেসে ইসারায় তাকে কাছে ডাকল।

দলের অন্য সকলে সরে গেল; রস্তভ দেখল, সেনাপতিটি কিছু সময় সম্রাটের সঙ্গে কথাবার্তা বলল।

তার সঙ্গে কথা শেষ করে সম্রাট ঘোড়ার দিকে এক পা এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার পর্ষদবর্গ ও পথের দর্শনার্থীরা সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে জিনটা ধরে সম্রাট অশ্বারোহী বাহিনীর সেনাপতির দিকে মুখ ফেরাল; যাতে সকলে শুনতে পায় সেইভাবে উচ্চকণ্ঠে বলল:

"এ-কাজ আমি করতে পারি না সেনাপতি। আমি পারি না, তাছাড়া আইন আমার চাইতেও বেশী শক্তিমান। সম্রাট পা-দানিতে পা দিল।

সেনাপতি সম্মানে মাথা নোয়াল; সম্রাট ঘোড়ার পিঠে চেপে জোরকদমে রাজপথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। উৎসাহে আত্মহারা হয়ে জনতার সঙ্গে সঙ্গে রস্তভও তার পিছন পিছন ছুটতে লাগল।

অধ্যায়—২১

ঘোড়ায় চেপে সম্রাট স্কোয়ারে গিয়ে হাজির হল। সেখানে দুই দল সৈন্য মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে; প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক রেজিমেণ্টের দলটি ডাইনে, আর ভালুকচামড়ার টুপি পরা ফরাসী রক্ষীবাহিনীর সেনাদলটি বাঁ দিকে।

জার কাছে আসতেই সেনাদল তাকে অভিবাদন জানাল; সেই সময়ই আর একদল অশ্বারোহী এগিয়ে এল; রস্তভ চিনল তাদের সকলের আগে নেপোলিয়ন। আর কেউ হতে পারে না। সে এগিয়ে এল দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে, মাথায় ছোট টুপি, পরনে সাদা কুর্তার উপর নীল ইউনিফর্ম, কাঁধের উপর সেণ্ট এণ্ড্রুজ ফিতেটি ঝোলানো। জরির কাজ-করা লাল রঙের জিনে সাজানো

একটা ভাল জাতের আরবি ঘোড়ায় চেপে সে এসেছে। আলেক্সান্দারের কাছে গিয়ে নেপোলিয়ন মাথার টুপিটা তুলল। সৈন্যরা চীৎকার করে উঠল "হুররা!" —"ভিভা ল' এম্পোরিয়র!" দুজনে কোন কথা হল না; দুই সম্রাট ঘোড়া থেকে নেমে পরস্পরের হাত ধরল। নেপোলিয়নের মুখে অপ্রীতিকর কৃত্রিম হাসি, আলেক্সান্দারের মুখে শিষ্টাচারের বাণী।

রস্তভ যখন দেখল আলেক্সান্দার বোনাপার্তের সঙ্গে সমকক্ষের মত ব্যবহার করছে, আর নেপোলিয়নও এমন সহজভাবে জারের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে যেন সম্রাটের সঙ্গে এ ধরনের মেলামেশাটা তার কাছে প্রাত্যহিক ঘটনারই মত, তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আলেক্সান্দার ও নেপোলিয়ন ভিড়ের একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল। সমবেত জনতা তখন অপ্রত্যাশিতভাবে দুই সম্রাটের এত কাছাকাছি এসে পড়েছে যে প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে রস্তভের ভয় হল যে তার পরিচয় হয়তো প্রকাশ পেয়ে যাবে।

"মহাশয়, আপনার সৈন্যদের মধ্যে যে সবচাইতে সাহসী তাকে সম্মান-পদকে ভূষিত করবার অনুমতি দিন," প্রতিটি শব্দকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথাগুলি বলা হল।

আলেক্সান্দারের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কথাগুলি বলল হ্রস্বকায় নেপোলিয়ন। কথাগুলি মনোযোগ দিয়ে শুনে আলেক্সান্দার মাথা নীচু করে মধুর হাসি হাসল।

সম্মুখে দণ্ডায়মান রুশ সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে প্রতিটি শব্দকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে নেপোলিয়ন আরও বলল, "বিগত যুদ্ধে যে সবচাইতে অধিক সাহসের পরিচয় দিয়েছে তাকে....."

ইয়োর ম্যাজেস্টি কি কর্ণেলের সঙ্গে একটা পরামর্শ করতে দেবেন?" এই কথা বলে আলেক্সান্দার অতি দ্রুত পা ফেলে ভারপ্রাপ্ত কম্যাণ্ডার প্রিন্স কজ্‌লভ্‌স্কির দিকে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বোনাপার্ত হাতের দস্তানা খুলতে গিয়ে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিল। জনৈক এড্‌-ডি-কং পিছন থেকে ছুটে এসে সেটা তুলে নিল।

সম্রাট আলেক্সান্দার নীচু গলায় কজ্‌লভ্‌স্কিকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কাকে দেওয়া যায়?"

"ইয়োর ম্যাজেস্টি যাকে দিতে বলবেন।"

অসন্তোষের সঙ্গে দুটো ভুরুকে এক করে পিছনে তাকিয়ে সম্রাট বলল:

"কিন্তু ওকে তো একটা জবাব দিতে হবে।"

কজ্‌লভ্‌স্কি পুংখানুপুংখভাবে সৈন্যদের বিচার করতে লাগল; রস্তভও সে বিচারের মধ্যে পড়ল।

"আমাকে কি?" রস্তভ ভাবল।

ভুরু কুঁচকে কর্ণেল হাঁকল, "লাজারেভ!" সারির প্রথম সৈনিকটি দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।

"কোথায় চললে? এখানেই দাঁড়াও! কয়েকজন ফিসফিস করে লাজারেভকে বলল। কোথায় যেতে হবে বুঝতে না পেরে লাজারেভ থেমে গেল; সভয়ে তাকাল কর্ণেলের দিকে। তার মুখটা কুঁচকে উঠছে।

নেপোলিয়ন মাথাটা একটু সরাল, যেন কোন কিছু নেবার জন্য ফোলা ছোট হাতটা পিছন দিকে বাড়িয়ে দিল। সে কি চাইছে বুঝতে পেরে পর্ষদরা হাতে হাতে একটা জিনিস এগিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে পরস্পরকে কি যেন বলল, আর শেষ পর্যন্ত বালক-ভৃত্যটি—গতকাল সন্ধ্যায় রস্তভ যাকে বরিসের বাসায় দেখেছিল—দৌড়ে এগিয়ে গেল এবং বাড়ানো হাতটাকে সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করে লাল ফিতেয় বাঁধা সম্মান-চিহ্নটি হাতের উপর রেখে দিল। নেপোলিয়ন না তাকিয়েই দুই আঙুলের ফাঁকে সেটাকে ধরে নিল। তারপর সে লাজারেভের দিকে এগিয়ে গেল, সম্রাট আলেক্সান্দারের দিকে একবার তাকাল এবং সম্মান-চিহ্ন সহ ছোট হাতখানি লাজারেভের একটি বোতামকে স্পর্শ করল। নেপোলিয়ন ক্রুশটিকে লাজারেভের বুকের উপর শুধু রেখে দিল, তারপর হাতটা নামিয়ে আলেক্সান্দারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল; যেন সে নিশ্চিত জানে যে ক্রুশটা সেখানেই আটকে থাকবে। আর সত্যি সত্যি তাই থাকল।

রুশ ও ফরাসী কর্মচারিরা সঙ্গে সঙ্গে ক্রুশটিকে ধরে তার ইউনিফর্মে আটকে দিল। লাজারেভ বিষণ্ণ চোখে ছোট মানুষটিকে একবার দেখে নিয়ে আলেক্সান্দারের চোখে চোখ রাখল; যেন জানতে চাইল, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে, না চলে যাবে, না অন্য কিছু করবে। কিন্তু কোন হুকুম না পেয়ে সেখানেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্রাটদ্বয় পুনরায় ঘোড়ায় চেপে চলে গেল। প্রিয়োব্রাঝেনস্ক সৈন্যরা দল ভেঙে ফরাসী রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে মিশে গিয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়ল।

লাজারেভ বসল সম্মানের আসনে। রুশ ও ফরাসী অফিসাররা তাকে আলিঙ্গন করল, অভিনন্দন জানাল, তার হাত চেপে ধরল। দলে দলে অফিসার ও নাগরিকরা শুধু তাকে দেখার জন্য ভিড় করল। হাসি ও গল্পে টেবিল জমে উঠল। দুজন খুসি-খুসি অফিসার রস্তভের পাশ দিয়ে চলে গেল।

একজন বলল, "জিনিস কি রকম বলে মনে হয়? সবটাই রুপোর পাতের উপর। লাজারেভকে দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"শুনলাম প্রিয়োব্রাঝেন্স্কিরা না কি কাল তাকে ডিনার দেবে।"

"হ্যাঁ, কিন্তু লাজারেভের কী কপাল! আজীবন বারো শ' ফ্রাঁ পেনসন।"

জনৈক প্রিয়োব্রাঝেন্স্কি সৈনিক একটা ফরাসী টুপি মাথায় দিয়ে চেঁচিয়ে

বলল, "ছেলেরা, এই একটা টুপি !"

"খুব ভাল জিনিস ! একেবারে সেরা !"

রক্ষীবাহিনীর জনৈক অফিসার আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করল, "সাংকেতিক শব্দটা শুনেছ কি ? গত পরশু ছিল 'নেপোলিয়ন, ফ্রান্স, ত্রভুরে' ; গতকাল ছিল 'আলেক্সান্দ্র, রুশি, গ্রাঁদিয়র'। একদিন আমাদের সম্রাট ওটা দেন, পরের দিন দেব নেপোলিয়ন। কাল আমাদের সম্রাট একটি সেণ্ট জর্জ ক্রুশ পাঠাবেন ফরাসী রক্ষীবাহিনীর সবচাইতে সাহসী বীরের জন্য। তা তো করতেই হবে। দানের প্রতিদান তো দিতেই হবে।"

বন্ধু ঝিলিন্স্কিকে নিয়ে বরিসও এসেছিল প্রিয়োব্রাঝেন্স্কিদের ভোজসভা দেখতে। ফিরবার পথে দেখল, একটা বাড়ির কোণে রস্তভ দাঁড়িয়ে আছে।

"রস্তভ ! কেমন আছ ? আর তো আমাদের দেখাই হয় নি," সে বলল। রস্তভের মুখটা এতই বিষণ্ণ ও চিন্তাগ্রস্ত ছিল যে বরিস তার কারণ জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

"কিছু না, কিছু না," রস্তভ জবাব দিল।

"আবার আমাদের দেখা হবে তো ?"

"হ্যাঁ, হবে।"

সেই কোণটাতে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে রস্তভ দূর থেকে ভোজসভাটা দেখতে লাগল। তার মনের মধ্যে একটা ব্যথার ধারা বয়ে চলেছে। তার শেষ নেই। ভয়ংকর সব সন্দেহ জেগেছে তার অন্তরে। তার মনে পড়ল দেনিসভের পরিবর্তন, তার কথা, গোটা হাসপাতাল, দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত-পা, আবর্জনা ও রোগ। হাসপাতালের পচা মাংসের দুর্গন্ধ এত তীব্র হয়ে তার মনে পড়ল যে সে-দুর্গন্ধ কোথা থেকে আসছে জানবার জন্য সে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপরেই মনে এল আত্মতুষ্ট বোনাপার্তের কথা, যে আজ সম্রাট হয়েছে, আলেক্সান্দারও যাকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। তাহলে কেন এইসব বিচ্ছিন্ন হাত-পা, আর মৃত মানুষের ভিড় ? ···আবার মনে এল পুরস্কৃত লাজারেভ এবং দেনিসভের কথা—যে শাস্তি পেল, ক্ষমা পেল না। এমন সব চিন্তা তার মাথায় ঢুকতে লাগল যে সে ভয় পেয়ে গেল।

প্রিয়োব্রাঝেন্স্কিদের খাদ্যের গন্ধে তারও খিদে পেয়ে গেল ; এখান থেকে যাবার আগে কিছু খাওয়া দরকার। একটা হোটেলে গেল। সেখানে আরও অনেক লোক খেতে এসেছে। নিকলাস নিঃশব্দে পান-ভোজন (বিশেষ করে প্রথমটা) শেষ করল। একাই দু'বোতল মদ সাবাড় করল। মনের মধ্যেকার সেই চিন্তাগুলো এখনও তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। না পারছে তাকে প্রকাশ করতে, না পারছে তাকে মন থেকে তাড়াতে। হঠাৎ একজন অফিসার যেই বলে উঠল যে ফরাসীদের দিকে তাকানোটাই অসম্মানকর অমনি রস্তভ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল যে অন্য অফিসাররা অবাক বনে

গেল।

চোখ-মুখ লাল করে সে চেঁচিয়ে বলল, "কি ভাল তার আপনারা কি বোঝেন? সম্রাটের কাজের সমালোচনা করবার আপনারা কে? কি অধিকার আপনাদের? সম্রাটের লক্ষ্য বা তার কাজকর্মকে বুঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই!"

"আমি তো সম্রাটের সম্পর্কে একটা কথাও বলি নি!" অফিসারটি বলল। রস্তভের এই রাগের কারণ বুঝতে না পেরে সে ধরে নিল যে রস্তভ মাতলামি শুরু করেছে।

কিন্তু রস্তভ তার কথায় কান দিল না।

বলতে লাগল, "আমরা তো কূটনীতিক কর্মচারি নই, আমরা সৈনিক, তার বেশী কিছু নই। আমাদের যদি মরতে হুকুম দেওয়া হয় তো আমাদের মরতেই হবে। যদি শাস্তি দেওয়া হয় তো বুঝতে হবে যে শাস্তি আমাদের প্রাপ্য, বিচারের ভার আমাদের হাতে নয়। সম্রাট যদি বোনাপার্তকে সম্রাট বলে মেনে নেন, তার সঙ্গে যদি সন্ধি করে থাকেন, তো বুঝতে হবে যে সেটাই সঠিক কাজ। একবার যদি আমরা সবকিছু নিয়ে বিচার করতে, তর্ক করতে শুরু করি, তাহলে পবিত্র বলে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না! সেপথে গেলে আমরা বলতে শুরু করব যে ঈশ্বর নেই—কিছুই নেই" টেবিলে ঘুষি মেরে নিকলাস চীৎকার করে বলতে লাগল।

"আমাদের কাজ কর্তব্য পালন করা, যুদ্ধ করা, চিন্তা ভাবনা করা নয়! বাস, তাহলেই হল·····" সে বলল।

জনৈক অফিসার আপোষে বলল, "আর মদ খাওয়া।"

"হ্যাঁ, মদ খাওয়া," নিকলাস কথাটা মেনে নিল। "এই, কে আছিস! আর এক বোতল!" সে হাঁক দিয়ে বলল।

অধ্যায়—২২

১৮০৮ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের সঙ্গে নতুন করে সাক্ষাৎ করতে সম্রাট আলেক্সান্দার এর্ফুর্ত-এ গেল। পিতার্সবুর্গের উপর মহলে এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকারের অনেক জাঁকজমকের কথা শোনা গেল।

১৮০৯ সালে "পৃথিবীর দুই সালিস"—নেপোলিয়ন ও আলেক্সান্দারকে এইভাবেই উল্লেখ করা হত—এর মধ্যে এতই ঘনিষ্ঠতা জন্মাল যে নেপোলিয়ন যখন অস্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল তখন আমাদের প্রাক্তন মিত্র অস্ট্রীয়ার সম্রাটের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাক্তন শত্রু বোনাপার্তের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য একটি রুশ সৈন্যদল সীমান্ত পার হয়ে গেল, এবং দরবার মহলে নেপোলিয়নের সঙ্গে আলেক্সান্দারের এক বোনের বিয়ের সম্ভাবনার কথাও আলোচিত হতে লাগল। কিন্তু বৈদেশিক নীতির কথা ছাড়াও সেই সময় সরকারের বিভিন্ন

বিভাগে যেসব আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন করা হচ্ছিল তার প্রতিও রুশ সমাজের সকলেরই তীক্ষ্ণ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল।

ইতিমধ্যে জীবনের ধারা—সত্যিকারের জীবন, তার স্বাস্থ্য ও রোগ, পরিশ্রম ও বিশ্রাম, চিন্তায়, বিজ্ঞানে, কাব্যে, সঙ্গীতে, ভালবাসায়, বন্ধুত্বে, বিদ্বেষে ও আবেগে তার যে বৌদ্ধিক আগ্রহ—সবকিছুকে নিয়ে যে জীবনের ধারা তা স্বাভাবিক গতিতেই বয়ে চলতে লাগল ; নেপোলিয়নের রাজনৈতিক বন্ধুত্ব বা শত্রুতা এবং পুনর্গঠনের সবরকম পরিকল্পনার স্পর্শ থেকে দূরে থেকে স্বাধীনভাবেই বয়ে চলল।

[প্রথম খণ্ড সমাপ্ত]

দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ পর্ব

অধ্যায়—১

প্রিন্স আন্দ্রু একটানা দুটো বছর গ্রামে কাটাল।

পিয়েরে তার জমিদারিতে যেসব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল—এবং অনবরত একটা ছেড়ে অন্যটায় হাত দেবার ফলে কোনটাই সমাধা করতে পারে নি—প্রিন্স আন্দ্রু কোনরকম বহ্বাড়ম্বর না করে কোনরকম আপাত অসুবিধা ছাড়াই সেগুলিকে কার্যে রূপায়িত করে তুলতে লাগল।

তারমধ্যে বাস্তব কর্ম-তৎপরতা এত বেশী পরিমাণে ছিল—সেটা পিয়েরের মধ্যে একেবারেই ছিল না—যেকোনরকম হৈ-হট্টগোল ছাড়াই কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চলতে লাগল।

তার একটা জমিদারিত তিন শ' ভূমিদাসকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে; এখন তারা স্বাধীন ক্ষেতমজুর হয়ে কাজ করছে—রাশিয়াতে এ ধরনের প্রথম দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। অন্য সব জমিদারিতেও কিছু অর্থের বিনিময়ে ভূমিদাসদের বাধ্যতামূলক শ্রমদান মকুব করা হয়েছে। তার নিজের খরচে বোগুচারোভো-র জন্য একজন শিক্ষাপ্রাপ্ত ধাত্রীকে নিয়োগ করা হয়েছে, আর চাষী ও পারিবারিক ভূমিদাসদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্য একজন পুরোহিতকে মাইনে দেওয়া হচ্ছে।

প্রিন্স আন্দ্রু অর্ধেক সময় কাটায় বল্ড হিল্‌স্‌-এ তার বাবা ও ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি এখনও ধাত্রীর হাতেই মানুষ হচ্ছে। বাকি সময়টা কাটায় "বোগুচারোভো আশ্রমে"; প্রিন্স আন্দ্রুর জমিদারিকে তার বাবা ওই নামেই ডাকে। পিয়েরের কাছে জাগতিক ব্যাপার সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রকাশ করলেও সে কিন্তু বেশ পরিশ্রমসহকারেই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর নজর রাখে; তার কাছে অনেক বইপত্রও আসে; আর জীবনের ঘূর্ণাবর্তস্বরূপ পিতার্সবুর্গ থেকে তার কাছে বা তার বাবার কাছে যেসব অতিথি আসে দেশের এবং বিদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাদের জ্ঞান তার চাইতে এত কম যে তা দেখে প্রিন্স আন্দ্রুর বিস্ময়ের অবধি থাকে না; অথচ সে তো গ্রাম ছেড়ে কোথাও যায় না।

জমিদারির কাজে ব্যস্ত থাকা এবং নানা ধরনের বই পড়া ছাড়াও এই সময়ে আমাদের দুটি দুর্ভাগ্যজনক বিগত অভিযান সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণাত্মক

জরিপের কাজ নিয়েও প্রিন্স আন্দ্রু খুবই ব্যস্ত রয়েছে; সামরিক বিধি-বিধান সংস্কারের একটা খসড়াও সে তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে।

১৮০৯-এর বসন্তকালে সে ছেলের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া রিয়াজান জমিদারি দেখতে সেখানে গেল।

বসন্তের আতপ্ত রোদে বসে চোখ মেলে সে দেখছিল নতুন ঘাস, বার্চ গাছের ডালে ডালে নতুন পাতা, আর পরিষ্কার নীল আকাশে ভেসে-চলা বসন্তের সাদা মেঘের দল। কোন কিছু নিয়েই সে ভাবছে না; অন্যমনস্ক-ভাবে আনন্দিত মনে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সবকিছু দেখছে।

আগের বছর যেখানে দাঁড়িয়ে পিয়েরের সঙ্গে তার কথা হয়েছিল সেখানেই তারা ফেরিটা পার হল। কর্দমাক্ত রাস্তা ধরে ঝাড়াই উঠোন ও শীতকালীন গমের সবুজ ক্ষেত পেরিয়ে, কখনও সেতুর কাছে বরফ-জমা পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে, কখনও বা বৃষ্টিতে গলে-যাওয়া কাদার চড়াই ভেঙে, ফসল-কাটা মাঠ পেরিয়ে, সবুজের ছোপ-লাগা ঝোপ-ঝাড় ডিঙিয়ে রাস্তার দুই পাশে গজিয়ে-ওঠা বার্চের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। বনের মধ্যে বেশ গরম, বাতাসের ছোঁয়াও লাগছে না। কাঠির মত সবুজ পাতাওয়ালা বার্চ-গাছগুলি নিশ্চল, লিলাক-রঙের ফুল আর সবুজ ঘাসের প্রথম শিসগুলি মাথা তুলেছে। বার্চগাছের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে ছড়ানো ছোট ছোট চিরসবুজ ফারগাছগুলি শীতের অপ্রীতিকর স্মৃতিকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। জঙ্গলে ঢুকে ঘোড়াগুলি নাক ডাকাতে লাগল; তাদের শরীরও ঘেমে উঠেছে।

পরিচারক পিতর কোচয়ানকে কি যেন বলল; সেও তাতে সায় দিল। কিন্তু বোঝা গেল যে কোচয়ানের সহানুভূতিকে যথেষ্ট মনে না করে পিতর বক্সের উপর থেকেই মনিবের দিকে ফিরে সশ্রদ্ধ হাসির সঙ্গে বলল, "কী চমৎকার ইয়োর এক্সেলেন্সি!"

"কি?"

"বড় চমৎকার ইয়োর এক্সেলেন্সি!"

প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, "ও কিসের কথা বলছে? মনে হচ্ছে, বসন্তের কথা। সত্যি, এর মধ্যেই সবকিছু কেমন সবুজ হয়ে উঠেছে।....এত আগে থেকেই! বার্চ, চেরি ও অ্যাল্ডার গাছের পাতা বেরিয়েছে....কিন্তু ওক গাছের এখনও দেখা নেই। আরে, এই তো একটা ওক!"

পথের প্রান্তেই একটা ওক গাছ দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত এই বার্চের জঙ্গলের চাইতে বয়সে দশগুণ বড় এই ওক গাছটা ওগুলোর চাইতে দশগুণ মোটা এবং দুইগুণ উঁচু। গাছটা প্রকাণ্ড, একটা লোক যতটা জড়িয়ে ধরতে পারে তার দ্বিগুণ এর বেড়টা, অনেকদিন আগেই ডালপালা অনেক ভেঙে গেছে, অনেক বাকল কেটে তুলে নেওয়া হয়েছে। মস্ত বড় বড় বিশ্রী

ডালপালাগুলো এলোমেলোভাবে বেড়ে উঠেছে। কেমন গিঁট-পাকানো হাত ও আঙুল; দেখে মনে হয়, হাসি-হাসি বার্চগাছগুলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে কঠোর ও ঘৃণ্য এক বুড়ো দানব। কেবলমাত্র জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কিছু মরার মত দেখতে ফারগাছ এবং এই ওক গাছটাই যেন বসন্তের মাধুর্যের কাছে হার মানতে চাইছে না, চাইছে না বসন্ত ও তার রোদকে চোখ মেলে দেখতে।

ওকটা যেন বলতে চাইছে, "বসন্ত, ভালবাসা, সুখ! এইসব অর্থহীন, ফাঁকা বুলি অনবরত শুনতে কি তোমাদের ক্লান্তি আসে না? সব সময়ই সেই এক কথা, সর্বদাই ফাঁকি! এখানে বসন্ত নেই, সূর্য নেই, সুখ নেই! এই কুঁকড়ে-যাওয়া মরা ফারগুলোকে দেখ, চিরদিন একই আছে; আমাকে দেখ, কখনও পিঠ থেকে কখনও পাশ থেকে যেমন খুসি গজিয়ে ওঠা আমার এই ভাঙা, বাকল-ঢাকা আঙুলগুলো বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি: এগুলো যেমন গজিয়েছে আমিও তেমনি দাঁড়িয়ে আছি; তোমাদের আশা, তোমাদের মিথ্যাকে আমি বিশ্বাস করি না।"

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে প্রিন্স আন্দ্রু বার বার ফিরে ফিরে ওক গাছটার দিকে তাকাতে লাগল, যেন তার কাছ থেকে কিছু আশা করছে। ওক গাছটার নীচেও ফুল ও ঘাস রয়েছে, কিন্তু তাদের মাঝখানেই গাছটা দাঁড়িয়ে আছে সেই একই কঠিন, বিকৃত, রূঢ় আকৃতি নিয়ে।

প্রিন্স আন্দ্রু মনে মনে বলল, "হাঁ, ওকের কথাই ঠিক, হাজার বার ঠিক! অন্যরা—যুবকরা—এই ফাঁকির কাছে নতুন করে মাথা নোয়াক, কিন্তু আমরা তো জীবনকে চিনেছি, আমাদের জীবন তো শেষ হয়ে গেছে।"

এই গাছটাকে ঘিরে তার মনের মধ্যে আশাহীন কিন্তু শোচনীয়ভাবে প্রীতিপ্রদ নতুন চিন্তার স্রোত বইতে লাগল। এই যাত্রাকালে সে যেন নতুন করে জীবনকে দেখতে শিখল; আশাহীনতার মধ্যেও সেই পুরনো শান্তিময় সিদ্ধান্তে উপনীত হল; তার দিক থেকে নতুন করে শুরু করার কিছু নেই—কিন্তু তাকে বেঁচে থাকতে হবে; কারও কোন ক্ষতি না করে, নিজেকে বিব্রত না করে, বা কোন কিছু কামনা না করেই খুসি থাকতে হবে।

অধ্যায়—২

যে রিয়াজান জমিদারির সে একজন অছি তার ব্যাপারেই এ জেলার "মার্শাল অব দি নবিলিষ্ট"এর সঙ্গে দেখা করতেই প্রিন্স আন্দ্রু এসেছে। কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভই সেই মার্শাল। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রিন্স আন্দ্রু তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

বসন্তকালের গরম আবহাওয়া। গোটা জঙ্গলটা এর মধ্যেই সবুজে ঢেকে গেছে। ধুলো উড়ছে; আর এত গরম পড়েছে যে পথের পাশে জল দেখলেই

ডুব দিতে ইচ্ছা করছে।

মার্শালের সঙ্গে কি কথা বলবে সেইকথা ভাবতে ভাবতে বিষণ্ণ মনে প্রিন্স আন্‌দ্রু অত্রাদনুতে অবস্থিত রস্তভদের বাড়ির সামনে দিয়েই গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল। ডান দিকে গাছের ওপারে কিছু মেয়েলি গলার খুসির কথা-বার্তা কানে এল; সে দেখতে পেল একদল মেয়ে তার গাড়ির সামনে দিয়ে পথটা পার হবার জন্য ছুটে আসছে। সকলের আগে আগে আসছে একটি সুন্দরী মেয়ে; কালো চুল, ছিপ-ছিপে চেহারা, হলুদ ছিটকাপড়ের পোশাক, মাথায় জড়ানো সাদা রুমালের নীচে ঝুলে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। মেয়েটি চীৎকার করে কি যেন বলছে, কিন্তু যখন বুঝল যে সে অপরিচিত লোক তখন তার দিকে না তাকিয়েই হাসতে হাসতে ছুটে গেল।

হঠাৎ কি জানি কেন সে একটা যন্ত্রণা বোধ করল। দিনটা সুন্দর, সূর্য ঝলমল করছে, চারদিকে খুসির আমেজ, কিন্তু ওই ছিপছিপে সুন্দর মেয়েটি, তার অস্তিত্বের কথাটাই জানল না জানতে চাইল না, নিজের উজ্জ্বল ও সুখী—হয় তো বা নির্বোধ—জীবনটা নিয়েই সে পরিতুষ্ট, খুসি। "কি নিয়ে সে এত খুসি? সে কি ভাবছে? নিশ্চয়ই সামরিক আইন-কানুন অথবা রিয়াজান-এর ভূমিদাসদের ব্যবস্থার কথা নয়। তাহলে সে কি ভাবছে? কেন সে এত সুখী?" সহজাত কৌতূহলবশেই প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল।

কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ এবারেও আগেকার বছরগুলোর মতই অত্রাদনুতে বাস করছিল; অর্থাৎ আগের মতই গোটা প্রদেশকে শিকারে, থিয়েটারে, ডিনারে ও গান-বাজনায় একেবারেই মাতিয়ে তুলেছে। কোন নতুন অতিথি এলেই সে খুসি হয়; প্রিন্স আন্‌দ্রুকে পেয়েও খুসি হল; রাতটা থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আসন্ন নাম-দিবস উপলক্ষ্যে বুড়ো কাউন্টের বাড়িটা তখন লোকে ভর্তি। সারাটাদিন বাড়ির বয়স্ক লোকজন ও গণ্য-মান্য অতিথিদের নিয়ে কাটালেও প্রিন্স আনন্দ্রু বার বার নাতাশার দিকে তাকাতে লাগল। মেয়েটি তার দলবল নিয়ে হাসাহাসি করছে, খুসিতে ফেটে পড়ছে। প্রতিবারই প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবছে, "সে কি ভাবছে? ও এত খুসি কেন?"

রাতের বেলা নতুন পরিবেশে একেবারে একলা হওয়ায় অনেকক্ষণ তার ঘুম এল না। কিছুক্ষণ পড়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল; আবার জ্বালাল। ঘরের ভিতরকার খড়খড়িগুলো বন্ধ থাকায় ঘরটা বেশ গরম। বোকা বুড়ো-টার (রস্তভকে সে ঐ বলেই ডাকত) উপর সে বিরক্ত হয়ে উঠল; শহর থেকে কিছু দরকারী কাগজপত্র না আসায় সেই তাকে রাতটা এখানে থেকে যেতে বলেছে। এখানে থেকে যাবার জন্য সে নিজের উপরেও বিরক্ত হল।

বিছানা থেকে উঠে জানালাটা খুলে দিতে গেল। খড়খড়ি খোলামাত্রই

চাঁদের আলো হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ল যেন এইজন্যই এতক্ষণ অপেক্ষা করে ছিল। পাল্লাও খুলে দিল। বাইরে উজ্জ্বল, শান্ত রাত। জানালার ঠিক সামনেই একসারি পোর্লাড গাছ; তার একদিকে অন্ধকার, অপর দিকে রূপোলি আলোর ঝিলিক। গাছগুলোর ঠিক নীচে একধরনের ভিজে-ভিজে ঘন ঝোপ-ঝাড়; সেগুলির পাতায় ও বোঁটায় রূপোলি আলো পড়ে ঝিলমিল করছে। কালো গাছগুলোর পিছনে একটা ছাদের উপর শিশিরের কণাগুলি ঝিকমিক করছে; ডানদিকে উজ্জ্বল সাদা কাণ্ড ও ডালপালা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাতাভরা গাছ। আর প্রায় তারকাবিহীন পাণ্ডুর বসন্তের আকাশে পূর্ণ চাঁদের আলো এসে পড়েছে গাছটার মাথায়। জানালার গোবরাটে কনুই রেখে প্রিন্স আন্‌দ্রু সেই আকাশের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল।

তার ঘরটা দোতলায়। উপরের ঘরের সব লোকজনও জেগে আছে। মাথার উপরে অনেক মেয়েলি গলার স্বর তার কানে এল।

"ঠিক আর একবার," একটি মেয়েলি গলা শুনেই প্রিন্স আন্‌দ্রু চিনতে পারল।

"কিন্তু তুমি কখন ঘুমতে যাবে?" অন্য কণ্ঠস্বর বলল।

"আমি ঘুমব না, ঘুমতে পারছি না, কি হবে ঘুমিয়ে? শেষবারের মত এস।"

দুটি মেয়েলি গলায় গানের কলি ফুটল—কোন গানের শেষ অংশ।

"আঃ কী সুন্দর! এবার ঘুমুতে যাও। এখানেই শেষ হোক।"

জানালার আরও কাছে এসে প্রথম কণ্ঠস্বর বলল, "তুমি ঘুমতে যাও, আমি ঘুমতে পারব না।" মেয়েটি নিশ্চয় বাইরে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছে, কারণ তার পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ, এমন কি শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে। সবকিছুই পাথরের মত স্তব্ধ, ঠিক ওই চাঁদ, তার আলো ও ছায়াগুলির মত। পাছে তার অনিচ্ছাকৃত উপস্থিতি ধরা পড়ে সেই ভয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রুও সরে যেতে সাহস করল না।

"সোনিয়া! সোনিয়া!" আবার সেই কণ্ঠস্বর। "আঃ, তুমি যে কি করে ঘুমচ্ছ? শুধু একবার চেয়ে দেখ কী অপরূপ! আঃ, কী অপরূপ! উঠে পড় সোনিয়া!" তার গলা থেকে যেন কান্না ঝড়ে পড়ল। "এমন মধুর রাত আগে তো কখনও আসে নি, কোনদিন না।"

সোনিয়া একান্ত অনিচ্ছায় কি যেন জবাব দিল।

"একবার বাইরে এসে দেখ কী একখানা চাঁদ!…আঃ, কী মধুর! এখানে এস।…লক্ষ্মী, সোনামণি, এখানে এস! মনে হচ্ছে এইভাবে দুই হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে যথাসম্ভব জোরে চেপে ধরে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসি, আর তারপরেই উড়ে চলে যাই! ঠিক এইভাবে…"

“আরে সাবধান, বাইরে পড়ে যাবে যে।”

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ কানে এল; কানে এল সোনিয়ার আপত্তিভরা গলা: “একটা বেজে গেছে।”

“আঃ, তুমি শুধু বরবাদ করতেই জান। ঠিক আছে, যাও, চলে যাও।”

আবার সব চুপচাপ; কিন্তু আন্‌দ্রু জানে মেয়েটি তখনও সেখানেই বসে আছে। মাঝে মাঝে একটা মৃদু খস্‌খস্‌, একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ সে শুনতে পেল।

হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, “হে ঈশ্বর! এর অর্থ কি? বেশ, তাহলে শুতেই যাই, যেতেই যখন হবে!” সশব্দে জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল।

তার গলা শুনতে শুনতেই প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, “তার কাছে তো আমার কোন অস্তিত্বই নেই”। যে কারণেই হোক সে আশা করছে যে মেয়েটি তার সম্পর্কে কিছু বলুক, আবার তাতে ভয়ও পাচ্ছে। “ঐ তো সে আবার এসেছে! কোন মতলব নিয়েই এসেছে!”

সহসা তার মনের মধ্যে যৌবনসুলভ ভাবনা ও প্রত্যাশার এমন এক অপ্রত্যাশিত বিভ্রাট দেখা দিল যা তার সমস্ত জীবনযাত্রার পরিপন্থী; নিজের কাছেই নিজের এই অবস্থার কোন ব্যাখ্যা দিতে না পেরে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৩

পরদিন সকালে একমাত্র কাউণ্ট ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা না করে এবং মহিলাদের কারও জন্য অপেক্ষা না করেই প্রিন্স আন্‌দ্রু বাড়ির পথে পা বাড়াল।

জুন মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। ফিরবার পথে সেই বার্চ গাছের জঙ্গলে সে পৌঁছে গেল যেখানে বুড়ো ওক গাছটা তার মনে একটা অদ্ভুত স্মরণীয় দাগ কেটেছিল। জঙ্গলে ঢোকার পরে জোয়ালের ঘণ্টাগুলো ছয় সপ্তাহ আগের তুলনায় আরও অনেক বেশী অস্পষ্ট স্বরে বাজতে লাগল, কারণ জঙ্গলটা এখন আরও বেশী ঘন ও ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে, আর ইতস্তত ছড়ানো নতুন ফার গাছগুলো এখানকার সৌন্দর্যের কোনরকম হানি না ঘটিয়ে বরং তাদের সতেজ সবুজ ডালপালা মেলে দিয়ে পরিবেশের সঙ্গে আরও বেশী করে মিলে-মিশে গেছে।

সারাদিনটাই খুব গরম ছিল। কোথায় একটা ঝড় জমে উঠেছে, কিন্তু এখানে শুধু একটুকরো মেঘ থেকে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে রাস্তাটাকে ও নতুন পাতাগুলোকে ভিজিয়ে দিয়েছে। জঙ্গলের বাঁদিকটা ছায়ায় অন্ধকার; ডান দিকটাতে রোদ ঝিলমিল করছে; ভেজা পাতাগুলো চিকচিক করছে; বাতাসে একটুও নড়ছে না। গাছে গাছে ফুল ফুটেছে, নাইটিঙ্গেল পাখিরা

ডাকছে; তাদের স্বর দূরে ও কাছে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "হ্যাঁ, যে ওক গাছটার সঙ্গে আমি একাত্ম হয়েছিলাম সেটা এখানেই ছিল। সেটা গেল কোথায়?" রাস্তার বাঁ দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে সে অবাক হয়ে গেল, আর চিনতে না পেরে যে ওক গাছটাকে সে খুঁজছিল সেটার দিকেই অবাক চোখে তাকিয়ে রইল। বুড়ো ওক গাছটা বদলে গেছে; গাঢ় সবুজ নতুন পাতার চাঁদোয়া ছড়িয়ে একমনে দাঁড়িয়ে আছে, আর অস্তসূর্যের আলোয় ঈষৎ কাঁপছে। সেই গাঁটওয়ালা আঙুলও নেই, বাকলে সেই পুরনো ক্ষতও নেই, পুরনো সন্দেহ ও দুঃখকষ্টের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। শতাব্দীকালের প্রাচীন বাকল থেকে একটা ডালও গজায় নি, অথচ তাতেই এত পাতা গজিয়েছে যে এই বুড়ো গাছটাই যে সেগুলির জনক সেটা বিশ্বাস করাই শক্ত।

"হ্যাঁ, এই তো সেই ওক গাছটা," একথা ভাবতেই একটা অকারণ বসন্তকালীন আনন্দ ও পুনরুজ্জীবনের অনুভূতি প্রিন্স আন্‌দ্রুকে একেবারে পেয়ে বসল। সহসা স্মৃতির পথ ধরে ভেসে এল জীবনের সবগুলি শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। অস্তারলিজের উঁচু আকাশটা, তার স্ত্রীর অনুযোগ ভরা মৃত মুখখানি, ফেরিঘাটে পিয়েরের উপস্থিতি, রাতের সৌন্দর্য দেখে বিহ্বল মেয়েটি, সেই রাতটি ও তার চাঁদটি, আর····সহসা সেসব কিছু তার মনের মধ্যে এসে ভিড় করল।

হঠাৎ প্রিন্স আন্‌দ্রু একটা চিরদিনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে বসল: "না, একত্রিশ বছর বয়সে জীবন শেষ হতে পারে না! আমাদের মধ্যে কি আছে সেটা জানাই যথেষ্ট নয়—সকলকেই সেটা জানাতে হবে: পিয়ের, আর সেই যে মেয়েটি আকাশে উড়তে চেয়েছিল, তারা সকলেই আমাকে জানুক, যাতে আমার জীবনটা শুধুমাত্র আমার জীবন হয়েই অন্য সকলের থেকে দূরে না থাকে, যাতে তাদের সকলের মধ্যে আমার জীবনটা প্রতিফলিত হতে পারে, যাতে তারা এবং আমি এক হয়ে বাঁচতে পারি।"

বাড়িতে পৌঁছে প্রিন্স আন্‌দ্রু স্থির করল হেমন্তকালেই সে পিতার্সবুর্গে যাবে, আর এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে সবরকম যুক্তি বের করতে লাগল। একগাদা অর্থপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কারণ তাকে বলে দিল যে পিতার্সবুর্গে যাওয়া তার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন; এমন কি আবার চাকরিতে ঢোকার কথাও তার মনটাকে দোলা দিতে লাগল। এখন সে বুঝতেই পারল না কেমন করে জীবনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাকে সে একদিন সন্দেহ করেছিল, ঠিক যেমন একমাস আগেও সে বুঝতে পারত না যে শান্ত গ্রাম্য জীবনকে ছেড়ে আসার কথা কেমন করে তার মাথায় আসতে পারে। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে যে কোনরকম কাজে নিজেকে নিয়োজিত না করলে এবং আবার জীবনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ না করলে তার জীবনের

সমস্ত অভিজ্ঞতাই অর্থহীনভাবে নষ্ট হয়ে যাবে। রিয়াজান পরিভ্রমণের পরে গ্রাম্য জীবনটাই তার কাছে একঘেয়ে মনে হতে লাগল ; আগেকার কাজকর্মে সে আর তেমন আগ্রহ বোধ করে না ; অনেক সময়ই নিজের পড়ার ঘরে একলা বসে থাকতে থাকতে সে উঠে দাঁড়ায়, আয়নার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নিজের মুখের দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেইসব মুহূর্তে কেউ তার ঘরে ঢুকলে সে অতিশয় কঠোর ও কঠিন হয়ে ওঠে, এমন কি অপ্রীতিকর রকমের যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে।

হয়তো সেইরকম কোন মুহূর্তে ঘরে ঢুকে প্রিন্সেস মারি বলল, "দেখ দাদা, ছোট্ট নিকলাস আজ বাইরে যাবে না ; দিনটা বড় ঠাণ্ডা।"

তখন প্রিন্স আন্‌দ্রু হয়তো রুক্ষ গলায় বোনকে বলে বসল, "যদি গরম হত তাহলে সে বাইরে বের হত ঢিলে জামা পরে, কিন্তু আজ যেহেতু ঠাণ্ডা তাই তাকে গরম পোশাক পরতে হবে ; সেইজন্যই তো ওগুলো বানানো হয়েছে। আজ ঠাণ্ডা পড়েছে বলে ছেলে ঘরের মধ্যে থাকবে এটা তো কোন যুক্তি হতে পারে না।"

সেইসব মুহূর্তে প্রিন্সেস মারি হয়তো ভাবত, বুদ্ধিগত কাজকর্মের ফলে মানুষ কত নীরসই না হয়ে যেতে পারে।

অধ্যায়—৪

১৮০৯-এর অগস্ট মাসে প্রিন্স আন্‌দ্রু পিতার্সবুর্গে পৌঁছল। সেসময়ে যৌবনদীপ্ত স্পেরান্‌স্কি খ্যাতির একেবারে শিখরে অধিষ্ঠিত ; প্রচণ্ড উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে চলেছে তার সংস্কার-কার্য। সেই অগস্ট মাসেই সম্রাট তার গাড়ি থেকে পড়ে যায়, তার পায়ে চোট লাগে, তিন সপ্তাহ তাকে পিতরহপ-এ থাকতে হয়, প্রতিদিন একমাত্র স্পেরান্‌স্কি ছাড়া আর কারও সঙ্গে সম্রাট দেখা করত না। সেই সময় এমন দুটি বিখ্যাত বিধান তৈরি করা হচ্ছিল যা সমাজকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল—আদালতের বিভিন্ন মর্যাদার স্তরভেদ রহিত করা এবং কলেজিয়েট এসেসর ও স্টেট কাউন্সিলর পদের জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন করা ; শুধু এই দুটিই নয়, রাশিয়ার তৎকালীন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য গোটা রাষ্ট্রীয় কাঠামোটাকেই পাল্টে দেওয়া: রাষ্ট্রীয় পরিষদ থেকে জেলা বিচার-পদ্ধতি পর্যন্ত আইন, শাসন ও অর্থনৈতিক স্তরে পরিবর্তন সাধন করা। যেসব অস্পষ্ট উদারনৈতিক স্বপ্ন নিয়ে সম্রাট আলেক্সান্দার সিংহাসনে আরোহণ করেছিল এবং সহযোগী জারতোরিস্কি, নভসিল্‌ৎসেভ, কোচুবে ও স্ত্রোগানভের সাহায্যে তাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করছিল, সেগুলি ক্রমে স্পষ্ট আকার নিয়ে বাস্তবায়িত হতে চলছিল।

এখন অসামরিক দিক থেকে এইসব লোকের স্থান দখল করেছিল

স্পেরান্‌স্কি, আর সামরিক দিক থেকে আরাক্‌চীভ। পৌঁছবার অনতি পরেই প্রিন্স আন্‌দ্রু সম্রাটের দরবারে হাজির হল। আগে দু'বার দেখা হওয়া সত্ত্বেও সম্রাট অনুগ্রহ করে তাকে একটি কথাও বলল না। প্রিন্স আন্‌দ্রুর আগাগোড়াই মনে হয়েছে যে সম্রাটের প্রতি তার সহানুভূতি নেই, পরবর্তীকালে তার মুখ এবং ব্যক্তিত্ব কোনটাই সে পছন্দ করত না, আর আজ সম্রাটের এই নিরুত্তাপ, প্রতিরোধী দৃষ্টিপাতের ফলে তার সে ধারণা আরও দৃঢ় হল। তার প্রতি সম্রাটের এই তাচ্ছিল্যকে সভাসদরা এই বলে ব্যাখ্যা করল যে ১৮০৫ সাল থেকে বল্কন্‌স্কি সেনাদলের চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় হিজ ম্যাজেস্টির অসন্তুষ্টিই এর আসল কারণ।

প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "কারও ভাল লাগা মন্দ লাগার উপর যে মানুষের হাত থাকে না সেকথা আমি নিজেও জানি ; কাজেই সামরিক বিধিবিধান সংস্কারের জন্য আমি যে প্রস্তাব তৈরি করেছি সেটা ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটের হাতে দিলেই কোন কাজ হবে না, কিন্তু আমার প্রকল্পের গুণই তাকে গ্রহণযোগ্য করে তুলবে।"

সে যা লিখে এনেছে তার কথা বাবার বন্ধু জনৈক বৃদ্ধ ফিল্ড-মার্শালকে বলল। ফিল্ড-মার্শাল তার সঙ্গে দেখা করার একটা সময় স্থির করে দিল, তাকে সাদরে অভ্যর্থনা করল এবং কথা দিল যে সম্রাটকে জানাবে। কয়েক দিন পরেই প্রিন্স আন্‌দ্রু একটা চিঠি পেল, যুদ্ধমন্ত্রী কাউন্ট আরাক্‌চীভ-এর সঙ্গে তাকে দেখা করতে হবে।

নির্দিষ্ট দিনে সকাল ন'টায় প্রিন্স আন্‌দ্রু কাউন্ট আরাক্‌চীভ-এর প্রতীক্ষা-কক্ষে ঢুকল।

সে ব্যক্তিগতভাবে আরাক্‌চীভকে চেনে না, আগে কখনও তাকে দেখে নি, কিন্তু তার সম্পর্কে যেসব কথা শুনেছে তাতে লোকটির প্রতি তার মনে কোন শ্রদ্ধাই জাগে নি।

"তিনি যুদ্ধমন্ত্রী, সম্রাটের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, তার ব্যক্তিগত গুণাগুণ বিচার করার কোন দরকার আমার নেই ; আমার প্রকল্পটি বিচার করে দেখার ভার তার উপর পড়েছে, কাজেই একমাত্র তিনিই এটাকে গ্রহণ করতে পারেন," অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কাউন্ট আরাক্‌চীভ-এর প্রতীক্ষা-কক্ষে বসে প্রিন্স আন্‌দ্রু এই কথাগুলিই ভাবতে লাগল।

যেমুহূর্তে দরজাটা খুলে গেল তখনই উপস্থিত ছোট-বড় সকলের মুখে একটিমাত্র অনুভূতিই প্রকাশ পেল—ভয়ের অনুভূতি। প্রিন্স আন্‌দ্রু কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্টকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করল তার নামটা এগিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু একটা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টি হেনে অ্যাডজুটাণ্ট জানিয়ে দিল যথাসময়েই তার পালা আসবে। কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্ট আরও কয়েকজনকে মন্ত্রীর ঘরে

ঢুকিয়ে দেওয়া ও বের করে আনার পরে সেই ভয়ংকর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেওয়া হল এমন একটি অফিসারকে যার মর্যাদাহীন ভীত ভাবভঙ্গী দেখে প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল। অফিসারটির সাক্ষাৎকার দীর্ঘ সময় ধরে চলল। তারপর হঠাৎ দরজার ওপাশে একটা কর্কশ কণ্ঠের কঠোর শব্দ শোনা গেল এবং পাণ্ডুর মুখ ও কাঁপা ঠোঁট নিয়ে অফিসারটি ঘর থেকে বেরিয়ে এল—দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে প্রতীক্ষা-কক্ষের ভিতর দিয়ে বাইরে চলে গেল।

তারপরেই কর্তব্যরত অফিসারটি প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, "ডান দিকে, জানালার কাছে।"

একটা পরিচ্ছন্ন সাদামাঠা ঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল বছর চল্লিশের একটি লোক টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে; তার কোমর লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল, কপালে অনেকগুলি ভাঁজ, সবুজ-বাদামী চোখের উপর ভ্রূকুটি-কুটিল ভুরু, ঝোলানো রক্তিম নাক। না তাকিয়েই আরাক্‌চীভ মাথাটা তার দিকে ঘোরাল।

"আপনার কিসের আবেদন?" আরাক্‌চীভ প্রশ্ন করল।

"আমি কোন আবেদন রাখছি না ইয়োর এক্সেলেন্সি," প্রিন্স আন্‌দ্রু শান্তভাবে জবাব দিল।

আরাক্‌চীভ-এর চোখ দুটি তার দিকে ঘুরল।

বলল, "বসুন। প্রিন্স বল্‌কনস্কি?"

"কোন ব্যাপারে আবেদন জানাতে আমি আসি নি। আমার একটা প্রকল্প মহামান্য সম্রাট আপনার কাছে পাঠিয়েছেন……"

"দেখুন মশায়, আপনার প্রকল্পটা আমি পড়েছি," প্রথম কথাগুলি বেশ ভদ্রভাবে উচ্চারণ করেই আরাক্‌চীভ পুনরায় প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে না তাকিয়েই একটা বিরক্তিপূর্ণ ঘৃণার সুরে ফিরে গেল। "আপনি নতুন সামরিক আইনের প্রস্তাব করেছেন? আইন তো অনেক রয়েছে, কিন্তু পুরনো আইনকে কাজে লাগাবার মত লোকেরই তো অভাব। আজকাল তো সকলেই আইন তৈরি করেন; কাজ করার চাইতে লেখাটা অনেক সহজ।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বিনীতভাবে বলল, "আমি যে স্মারকলিপিটা পাঠিয়েছি সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানবার জন্য মহামান্য সম্রাটের ইচ্ছানুসারেই আমি ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছে এসেছি।"

"আপনার স্মারকলিপির উপর একটা প্রস্তাব অনুমোদন করে সেটা কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি এটা সমর্থন করি না," উঠে দাঁড়িয়ে লেখার টেবিল থেকে একখানা কাগজ তুলে আরাক্‌চীভ বলল, "এই নিন!" কাগজটা সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতে দিল।

বড় হাতের অক্ষর ব্যবহার না করে, ভুল বানানে, যতি-চিহ্ন ছাড়াই

আড়াআড়িভাবে কাগজটার উপর লেখা হয়েছে; "রচনা সুষ্ঠু হয় নি কারণ ফরাসী সামরিক বিধির নকল বলে মনে হয় আর সমর-বিধি থেকে অপ্রয়োজনে সরে যাওয়া হয়েছে।"

"কোন্ কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে?" প্রিন্স আন্দ্রু জানতে চাইল।

"সেনাবাহিনী-সংক্রান্ত কমিটির কাছে; আমি সুপারিশ করেছি, মহাশয়কে একজন সদস্য মনোনীত করা উচিত, কিন্তু বিনা বেতনে।"

প্রিন্স আন্দ্রু হাসল।

"আমি চাই না।"

"বিনা বেতনে সদস্য" আরাকৃচীভ পুনরায় কথাটা বলল। "আমি বলছি……এই! পরবর্তী লোককে ডাক! আর কে আছে?" প্রিন্স আন্দ্রুকে অভিবাদন জানিয়ে সে চীৎকার করে বলল।

অধ্যায়—৫

কমিটিতে নিজের মনোনয়নের ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করে থাকার ফাঁকে প্রিন্স আন্দ্রু পূর্বপরিচিত লোকজনদের খোঁজ করতে লাগল, বিশেষ করে যারা এখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে এবং যাদের সহায়তা তার কাজে লাগবে।

কাউণ্ট আরাকৃচীভ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পরদিন প্রিন্স আন্দ্রু সন্ধ্যাটা কাটাল কাউণ্ট কোচুবের বাড়িতে। কাউণ্ট আরাকৃচীভ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কথাও তাকে বলল।

"দেখুন মশায়, এক্ষেত্রেও মাইকেল মিখায়লভিচ স্পেরান্স্কিকে ছাড়া আপনার চলবে না। সবকিছুই তো তার হাতে। আমি তার সঙ্গে কথা বলব। আজ সন্ধ্যায়ই তার আসার কথা আছে।"

"সামরিক বিধি-বিধানের সঙ্গে স্পেরান্স্কির কি সম্পর্ক থাকতে পারে?" প্রিন্স আন্দ্রু শুধাল।

কোচুবে হেসে মাথা নাড়তে লাগল, যেন বল্‌কনস্কির সরলতা দেখে সে অবাক হয়েছে।

সে বলতে লাগল, "কয়েকদিন আগেই আপনার সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছে; আপনার স্বাধীন চাষীর ব্যাপারটা নিয়েও কথা হয়েছে।"

ক্যাথারিনের সময়কার একজন বুড়ো মানুষ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বল্‌কনস্কির দিকে ঘুরে বলে উঠল, "ওঃ, তাহলে আপনিই ভূমিদাসদের মুক্তি দিয়েছেন প্রিন্স?"

বুড়ো মানুষটি যাতে অকারণে বিরক্ত না হয় সেজন্য নিজের কাজটাকে

ছোট করে দেখাতে প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল, "জমিদারীটা ছিল খুব ছোট; বিশেষ কোন লাভ হত না।"

কোচুবের দিকে তাকিয়ে বুড়ো বলল, "আমার হয়তো দেরি হয়ে যাচ্ছে....." আরও বলল, "একটা কথা আমি বুঝতে পারি না। তাদের যদি মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে জমি চাষ করবে কারা? আইন লেখা সহজ, কিন্তু শাসন করা বড় শক্ত.....ঠিক যেরকম এখন—আপনাকেই শুধাই কাউণ্ট—সকলকেই যদি পরীক্ষা পাশ করতে হয় তাহলে বিভাগীয় প্রধান হবে কারা?

পায়ের উপর পা রেখে চারদিকে তাকিয়ে কোচুবে জবাব দিল, "মনে হয় যারা পরীক্ষা পাশ করবে তারাই।"

"দেখুন, প্রিয়ানিচ্‌নিকভ আমার অধীনে কাজ করে; চমৎকার লোক, দামী লোক, কিন্তু বয়স ষাট। সে কি এখন পরীক্ষা দিতে যাবে?"

"হ্যাঁ, সেটা একটা অসুবিধা বটে, শিক্ষাটা তো সাধারণ ব্যাপার নয়, কিন্তু কাউণ্ট কোচুবে কথা শেষ না করেই আসন ছেড়ে উঠে প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতে চাপ দিয়ে লম্বা টাক-মাথা একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে এগিয়ে গেল। এইমাত্র সে ঘরে ঢুকেছে। তার বয়স প্রায় চল্লিশ বছর, মস্তবড় খোলা কপাল, অস্বাভাবিক সাদা লম্বাটে মুখ। নবাগতের পরনে চাতক পাখির লেজওয়ালা নীল রঙের কোট, গলা থেকে একটা ক্রুশ ঝুলছে, বাঁ দিকের বুকে একটা তারকা। লোকটি স্পেরান্‌স্কি। প্রিন্স আন্‌দ্রু সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল, তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল; জীবনের সংকট-মুহূর্তে এইরকমই হয়ে থাকে। এর কারণ কি শ্রদ্ধা, ঈর্ষা, না প্রত্যাশা তা সে জানে না। স্পেরান্‌স্কির চেহারায় এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে তাকে সহজেই চেনা যায়। প্রিন্স আন্‌দ্রু যে সমাজে বাস করে সেখানে সে এমন কাউকে কখনও দেখে নি যে একাধারে কিম্ভূত ও বিশ্রী অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে এমন প্রশান্তি ও আত্মপ্রত্যয়ের অধিকারী; ঐ দুটি আধ-বোজা সজল চোখের মত দৃঢ় অথচ শান্ত ভাব অথবা এমন ভাবলেশহীন কঠিন হাসি সে কখনও দেখে নি; এমন সরল, নরম, সুচারু কণ্ঠস্বরও কখনও শোনে নি; সর্বোপরি প্রশস্ত, অতি স্থূল ও নরম মুখের ও হাতের এমন সূক্ষ্ম সাদা রংও সে কখনও দেখে নি। দীর্ঘদিন হাসপাতালে-থাকা সৈনিকদের মুখেই শুধু এরকম সাদা রং ও নরম ভাব প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখেছে। এই হল স্পেরান্‌স্কি, স্বরাষ্ট্র-সচিব, সম্রাটের প্রতিবেদক, এবং এরফুর্ত-এ সম্রাটের সঙ্গী; সেখানে একাধিকবার সম্রাটের সঙ্গে দেখা করেছে, নেপোলিয়নের সঙ্গে কথা বলেছে।

অনেক লোকের মধ্যে ঢুকে লোকে সাধারণত যা করে থাকে স্পেরান্‌স্কি সেইভাবে একমুখ থেকে অন্য মুখের উপর দৃষ্টি ফেরাতে লাগল না। কথা শুরু করার ব্যাপারেও তাড়াহুড়া করল না। কথা বলল ধীরে ধীরে, সকলেই যে তার কথা শুনবে সে বিশ্বাস তার আছে, আর যখন যার সঙ্গে কথা বলছে

একমাত্র তার দিকেই তাকাচ্ছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বিশেষ মনোযোগসহকারে স্পেরান্স্কির প্রতিটি কথা ও প্রতিটি চলাকে অনুসরণ করতে লাগল। কোন নতুন মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই—বিশেষ করে স্পেরান্স্কির মত লোক যার সুখ্যাতি সে শুনেছে—সে সব সময় তার ভিতরকার মানবিক গুণগুলোকে পুরোপুরি আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে।

স্পেরান্স্কি কোচুবেকে বলল, আরও আগে আসতে না পারার জন্য সে দুঃখিত, কারণ সে রাজপ্রাসাদে আটকা পরেছিল। সম্রাট যে তাকে আটকে রেখেছিল সেকথা সে বলল না; প্রিন্স আন্দ্রু তার এই অতিবিনয়টুকু লক্ষ্য করল। কোচুবে যখন প্রিন্স আন্দ্রুর পরিচয় দিল তখন স্বভাবসিদ্ধ হাসির সঙ্গে স্পেরান্স্কি ধীরে ধীরে বল্‌কন্‌স্কির দিকে চোখ দুটো ফেরাল, নীরবে তার দিকে তাকাল।

"আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুসি হলাম। সকলের মত আমিও আপনার কথা শুনেছি," একটু থেমে সে বলল।

আরাক্‌চীভ যেভাবে বল্‌কন্‌স্কিকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে অল্প কয়েকটি কথায় কোচুবে তার উল্লেখ করল। স্পেরান্স্কি আরও স্পষ্ট করে হাসল।

প্রতিটি শব্দ ও শব্দাংশের উপর জোর দিয়ে সে বলল, "সেনাবাহিনীর বিধিসংক্রান্ত কমিটির সভাপতি মঁসিয় মাগ্‌নিৎস্কি আমার বিশিষ্ট বন্ধু। আপনি চান তো তার সঙ্গে আপনার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারি।" একটু থেমে বলল, "আশা করি তিনি আপনাকে সহানুভূতি দেখাবেন এবং যুক্তিসঙ্গত যেকোন ব্যবস্থায় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন।"

অচিরেই স্পেরান্‌স্কিকে ঘিরে একটা চক্র গড়ে উঠল; যে বুড়োমানুষটি তার অধীনস্থ প্রিয়ানিচ্‌নিকভের কথা বলছিল সে স্পেরান্‌স্কিতে একটা প্রশ্ন করল।

আলোচনায় যোগ না দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু স্পেরান্‌স্কির প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল: কিছুদিন আগেও এই লোকটি ছিল ধর্মশাস্ত্রের একজন নগণ্য ছাত্র, আর আজ তার হাতের মুঠোয়—ঐ দুটো স্থূল, সাদা হাতে—রাশিয়ার ভাগ্য বিধৃত। যেরকম অসাধারণ ঘৃণার সঙ্গে স্পেরান্‌স্কি বুড়ো লোকটি প্রশ্নের জবাব দিল তা শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল। বুড়ো লোকটি যখন উঁচু গলায় কথা বলতে শুরু করল স্পেরান্‌স্কি তখন হেসে বলল, সম্রাট কিসে খুসি হবেন তার সুবিধা-অসুবিধার কথা বিচার করবার অধিকার তার নেই।

সকলের সঙ্গে সাধারণভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে স্পেরান্‌স্কি প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে এগিয়ে গিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরের এককোণে চলে গেল। পরিষ্কার বোঝা গেল, বল্‌কন্‌স্কির প্রতি সে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

ঈষৎ বিদ্রূপের হাসি হেসে সে বলল, "ঐ সম্মানিত ভদ্রলোকটি যে উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে আমাকে জড়িয়ে রেখেছিল তাতে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাই নি প্রিন্স।" এই স্তুতি-বচনে প্রিন্স আন্‌দ্রু খুসি হয়ে উঠল। "আপনার কথা আমি অনেক আগেই শুনেছি: প্রথমত ভূমিদাসদের ব্যাপারে আপনার কাজের কথা শুনেছি; এই প্রথম দৃষ্টান্তটির আরও অনেক অনুকরণকারী থাকা বাঞ্ছনীয়; আর দ্বিতীয়ত, আপনি সেই সব ভদ্রলোকদের একজন যারা সভাসদদের পদমর্যাদাসংক্রান্ত নতুন বিধানে আঘাত পান নি, অথচ তা নিয়ে গল্প-গুজব ও হৈ-চৈর অন্ত নেই।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "না, আমার বাবা চান নি যে সেসব সুবিধার সুযোগ আমি নেই। একেবারে নীচু পদ থেকেই আমি চাকরি শুরু করেছিলাম।"

"আপনার বাবা বিগত শতাব্দীর মানুষ; যে ব্যবস্থা স্বাভাবিক ন্যায়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠামাত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করছে যেসব সম্প্রতিকালের মানুষ তিনি স্বভাবতই তাদের অনেক উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত।"

স্পেরান্‌স্কির প্রভাব সম্পর্কে সচেতন হয়ে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টায় প্রিন্স আন্‌দ্রু পাল্টা জবাব দিল, "অবশ্য আমি মনে করি যে এই বিরুদ্ধাচরণের স্বপক্ষেও কিছু যুক্তি আছে।" স্পেরান্‌স্কির সব কথার সঙ্গে একমত হতে সে চায় না, প্রতিবাদ করার একটা ইচ্ছা জাগল তার মনে। সাধারণতঃ সে সহজে ও ভালভাবেই কথা বলতে পারে, কিন্তু এখন স্পেরান্‌স্কির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে সে কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে লাগল। এই বিখ্যাত লোকটির ব্যক্তিত্বকে পর্যবেক্ষণ করার কাজে সে বড় বেশী ডুবে গিয়েছিল।

"ব্যক্তিগত উচ্চাকাংখা কারণ হতে পারে," স্পেরান্‌স্কি শান্তভাবে বলল।

"আর কতকটা রাষ্ট্রের স্বার্থও বটে," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

চোখ নামিয়ে স্পেরান্‌স্কি শান্তভাবে শুধাল, "আপনি কি বলতে চান?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল, "মঁতেস্কুকে আমি শ্রদ্ধা করি, আর তার ধারণা যে 'অভিজাত শ্রেণীর কতকগুলি অধিকার ও সুযোগ-সুবিধাকে আমি তর্কাতীত বলে মনে করি' তাকেও আমি সমর্থন করি।"

স্পেরান্‌স্কির সাদা মুখের উপর থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। সম্ভবত প্রিন্স আন্‌দ্রুর চিন্তাধারা তার ভাল লেগেছে।

"প্রশ্নটাকে আপনি যদি সেদিক থেকে বিচার করেন," ফরাসীতে কথাগুলি বলতে স্পেরান্‌স্কির যথেষ্ট অসুবিধা হলেও সে বেশ শান্তভাবে কথাগুলি বলল। তার যুক্তিগুলি সংক্ষিপ্ত, সরল ও স্পষ্ট। কিন্তু আলোচনাটা তার সঙ্গীকে বিব্রত করে তুলেছে দেখে তার উপর ইতি টেনে স্পেরান্‌স্কি বলল,

"আপনি যদি দয়া করে বুধবারে আমার সঙ্গে দেখা করেন, তাহলে ইতিমধ্যে মাগ্‌নিৎস্কির সঙ্গে কথা বলে নিয়ে আপনাকে সব কথা জানিয়ে দেব এবং আরও খোলাখুলিভাবে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে আনন্দ লাভ করব।"

চোখ দুটি বন্ধ করে সে ফরাসী কায়দায় অভিবাদন জানাল, এবং বিদায় না নিয়ে যথাসম্ভব অল্প মনোযোগ আকর্ষণ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—৬

পিতার্সবুর্গে অবস্থিতির প্রথম কয়েক সপ্তাহেই প্রিন্স আন্‌দ্রু বুঝতে পারল, নিভৃত জীবন-যাপনের দিনগুলিতে যে চিন্তাধারা তার মনে গড়ে উঠেছিল এই শহরের ছোট ছোট চিন্তাভাবনাগুলি তাকে একেবারেই চাপা দিয়ে ফেলেছে।

সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে নিজের নোট-বইতে চার পাঁচটি দরকারী দেখা-সাক্ষাতের বিষয় ও নির্দিষ্ট সময় সে টুকে রাখে। জীবনের যান্ত্রিক গতি, সর্বত্র যথাসময়ে উপস্থিত হবার দৈনন্দিন ব্যবস্থা—এতেই তার কর্মশক্তির বেশীর ভাগ ব্যয় হতে লাগল। সে কিছুই করে না, চিন্তা পর্যন্ত করে না, অথবা চিন্তা করার সময়ই পায় না, কিন্তু গ্রামে থাকতে যা কিছু ভেবেছে শুধু তাই নিয়ে কথা বলে, সাফল্যের সঙ্গে কথা বলে।

সে যে বিভিন্ন মহলে একই দিকে একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে সেটা বুঝতে পেরে মাঝে মাঝেই তার মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু দিনের পর দিন সে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় সে যে কোন কিছু ভাবতে পর্যন্ত পারছে না—এ কথাটা বুঝবার মত সময়ও তার নেই।

কোচুবের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে যেমন ঘটেছিল তেমনই বুধবারেও স্পেরান্‌স্কি যখন নিজের বাড়িতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখোমুখি বসে তার সঙ্গে একান্তে দীর্ঘ সময় ধরে কথাবার্তা বলল তখনও প্রিন্স আন্‌দ্রুর উপর তার প্রভাব বেশ বড় হয়েই দেখা দিল।

বল্‌কন্‌স্কির কাছে বেশীর ভাগ লোককেই এত বেশী ঘৃণার্হ ও তুচ্ছ বলে মনে হয়, আর যে পূর্ণতার আদর্শের জন্য সে সংগ্রাম করছে একটি মানুষের মধ্যে সেই পূর্ণতার জীবন্ত আদর্শকে দেখবার বাসনা তার মনে এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে সে সহজেই বিশ্বাস করে বসল যে স্পেরান্‌স্কির মধ্যেই সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী ও ধার্মিক মানুষের সেই আদর্শকে সে খুঁজে পেয়েছে। স্পেরান্‌স্কি যদি তার নিজের সমাজ থেকেই উঠে আসত এবং সেই একই পরিবেশে মানুষ হত তাহলে হয়তো বল্‌কন্‌স্কি অচিরেই তার দুর্বলতা, মানবিকতার দিকগুলিকে আবিষ্কার করে ফেলত; কিন্তু আসলে অবস্থা যা দাঁড়াল তাতে স্পেরান্‌স্কির বিচিত্র যুক্তিবাদী মনটাই তার মনে আরও বেশী করে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলল, কারণ সে তাকে ঠিকমত বুঝতেই পারত না।

তার উপর সঙ্গীটির ক্ষমতার জন্যই হোক আর তাকে নিজের দলে টানবার জন্যই হোক, স্পেরান্‌স্কি বেশ সূক্ষ্মভাবে প্রিন্স আন্‌দ্রুর স্তুতিগানও করত।

বুধবার সন্ধ্যায় দুজনের দীর্ঘ আলোচনা প্রসঙ্গে স্পেরান্‌স্কি একাধিকবার মন্তব্য করল: "চিরাচরিত প্রথার সাধারণ স্তরের ঊর্ধ্বে যা কিছু আছে তাকেই আমরা শ্রদ্ধা করি···," অথবা একটু হেসে: "কিন্তু আমরা চাই নেকড়েও তার খাদ্য পাক আবার মেষটাও নিরাপদ থাকুক"···আবার: "তারা এটা বুঝতে পারে না"···আর এ সবই এমনভাবে বলে যেন সে বলতে চায়: "তারাই বা কি আর আমরাই বা কি—এ কথা তো বুঝি শুধু আমরা—আপনি এবং আমি।"

স্পেরান্‌স্কির সঙ্গে এই প্রথম দীর্ঘ আলোচনার ফলে প্রথম সাক্ষাৎকারে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল সেটাই দৃঢ়তর হল। তার মধ্যে সে এমন একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্পষ্ট চিন্তার মানুষকে দেখতে পেল যার প্রচণ্ড ধীশক্তি, কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় তাকে ক্ষমতার শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছে, আর সেই ক্ষমতাকে সে ব্যবহার করছে কেবলমাত্র রাশিয়ার কল্যাণে। প্রিন্স আন্‌দ্রুর চোখে স্পেরান্‌স্কিই সেই মানুষ যা সে নিজে হতে চেয়েছে—জীবনের সব ঘটনাকে সে বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে জানে। সবই ঠিক আছে, সব কিছুই যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমনটিই হয়েছে: শুধু একটা জিনিস প্রিন্স আন্‌দ্রুকে অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফেলেছে। সেটা স্পেরান্‌স্কির নিরাসক্ত, মুকুরসদৃশ দৃষ্টি যার ভিতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না, আর তার সাদা চারু হাতদুখানি, যে হাতের দিকে প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও এমনভাবে তাকায় যেভাবে লোকে তাকায় ক্ষমতাসীন লোকের হাতের দিকে। এই মুকুরসদৃশ দৃষ্টি আর ঐ দুটি চারু হাত প্রিন্স আন্‌দ্রুকে বিব্রত করে; কেন করে তা সে জানে না।

সাধারণভাবে বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি ও কর্তৃত্বের উপর একান্ত ও অনড় বিশ্বাস—স্পেরান্‌স্কির মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যই প্রিন্স আন্‌দ্রুকে সবচাইতে বেশী প্রভাবিত করেছে। তার সঙ্গে পরিচয়ের প্রথম পর্বে বল্‌কন্‌স্কি তার প্রতি সেই আবেগাপ্লুত শ্রদ্ধা অনুভব করেছিল যা সে একসময় বোনাপার্তের জন্য অনুভব করত। স্পেরান্‌স্কি যে একজন গ্রাম্য পুরোহিতের ছেলে আর নীচ কুলে জন্ম বলে বোকা লোকগুলি যে তাকে ঘৃণা করতে পারত (আসলে অনেকেই তা করে) এই বোধই প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে তার প্রতি বড় বেশী আবেগের সৃষ্টি করেছে এবং তার নিজের অজ্ঞাতেই সেটা বেড়ে চলেছে।

বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে কাটানো সেই প্রথম সন্ধ্যায়ই আইন পুনর্বিন্যাস কমিটির কথা উল্লেখ করে স্পেরান্‌স্কি বিদ্রূপ করে বলল যে এই দেড়শ'বছরের জীবনে কমিশন লাখ লাখ খরচ করেছে, অথচ বিভিন্ন আইন বিষয়ক পরিচ্ছেদগুলিতে রোজেন্‌কামস-এর হাতে কতকগুলি লেবেল আঁটা ছাড়া আর কিছুই

করে নি।

সে বলল, "লাখ লাখ খরচ করে সরকার শুধু এইটুকুই করেছে। তাই আমরা সেনেটের হাতে আইনানুগ ক্ষমতা দিতে চাই, কিন্তু সেরকম কোন আইন আমাদের নেই। আর সেই কারণেই এসময়ে আপনার মত লোকদের কাজ না করাও একটা পাপ।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, সে কাজের জন্য যে আইনের শিক্ষা প্রয়োজন সেটা তার নেই।

"সে শিক্ষা তো কারও নেই, কাজেই আপনি বা পাবেন কোথায়? কিন্তু এই পাপ-চক্র থেকে আমাদের তো বেরিয়ে আসতেই হবে।"

এক সপ্তাহ পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু সামরিক-বিধি কমিটির একজন সদস্য হয়ে গেল, এবং—যেটা সে মোটেই আশা করে নি—তাকে আইন পুনর্বিন্যাস কমিটির একটা শাখার সভাপতিও করা হল। স্পেরান্‌স্কির অনুরোধে অসামরিক বিধির খসড়ার প্রথম অংশটা সে নিজের হাতে নিল, এবং "কোড নেপলিয়ন" ও "জাস্টিনীয় ইন্সটিট্যুট"-এর সাহায্যে "ব্যক্তিগত অধিকার" সংক্রান্ত ধারা রচনার কাজ শুরু করে দিল।

অধ্যায়—৭

এর ঠিক দু'বছর আগে ১৮০৮-এ জমিদারি পরিদর্শন করে ফিরবার পরে পিয়ের আপনা থেকেই পিতর্সবুর্গ ভ্রাতৃসংঘের প্রথম সারিতে নিজের আসন পেয়ে গিয়েছিল। তখন সে ভোজন ও অন্ত্যেষ্টি সভার আয়োজন করল, নতুন সদস্য সংগ্রহ করল, এবং বিভিন্ন আশ্রমকে একত্র করে নির্ভরযোগ্য বিধান তৈরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করল। মন্দির নির্মাণের জন্য টাকা দিল, এবং অধিকাংশ সদস্যের অনিয়মিত প্রচেষ্টায় যে ভিক্ষা সংগৃহীত হয় তাতে সাধ্যমত নিজের দান যোগ করে দিল। সংঘ পিতার্সবুর্গে যে দরিদ্রাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিল একক প্রচেষ্টায়ই সেটাকে সে চালাতে লাগল।

ইতিমধ্যে তার জীবনযাত্রা আগের মত সেই একই মোহ ও আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে কাটাতে লাগল। ভাল খেতে ও পান করতে সে ভালবাসত; নীতি-বিরুদ্ধ ও অসম্মানকর মনে করলেও যে অবিবাহিতদের মহলে সে চলাফেরা করত তার প্রলোভন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারত না।

অবশ্য এই সব কাজকর্ম ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যেই বছরখানেক পরে পিয়েরের মনে হল, ভ্রাতৃসংঘের মাটির উপর যতই ভরসা করতে চেষ্টা করছে ততই সে মাটি তার পায়ের তলা থেকে সরে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে সে এটাও অনুভব করতে লাগল যে তার পায়ের তলা থেকে যত বেশী মাটি সরে যাচ্ছে

ততই সে ভ্রাতৃসংঘের হাতে বেশী করে বাঁধা পড়ছে। ভ্রাতৃসংঘে যোগদান করার সময় তার মনে হয়েছিল, গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে একটা জলাভূমির মসৃণ বুকের উপর পা রাখতে চলেছে। কিন্তু সেখানে পা রাখামাত্রই পা যে ডুবে যাচ্ছে। মাটিটা যে সত্যি শক্ত সেবিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্য সে আর একটা পাও তার উপর রাখল, আরও গভীরে ডুবে গেল, এবং নিজের অজ্ঞাতেই জলাভূমির হাঁটু-জলে চলতে লাগল।

যেকাজ সে করছে তা নিয়ে ক্রমেই তার মনে অসন্তোষ জমতে লাগল। ভ্রাতৃসংঘের কাজকর্ম যতটা সে দেখেছে তাতে তার মনে হয়েছে এর সবটাই বাহ্যিক আড়ম্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে ভ্রাতৃসংঘের কাজকর্মে সন্দেহ করার কথা তার মনে আসে নি, তবে তার মনে হচ্ছে যে রুশ ভ্রাতৃসংঘ ভুল পথে চলেছে এবং মূল নীতিগুলি থেকে দূরে সরে গেছে। আর তাই বছরের শেষ দিকে সংঘের উচ্চতর মন্ত্রগুপ্তির সন্ধানে সে বিদেশে যাত্রা করল।

১৮০৯ সালের গ্রীষ্মকালে পিয়ের পিতার্সবুর্গে ফিরে এল। আমাদের ভ্রাতৃসংঘের লোকরা পত্র মারফৎ জানতে পারল যে বিদেশে গিয়ে বেজুখভ অনেক উচ্চপদস্থ লোকের বিশ্বাস অর্জন করেছে, তার পদোন্নতি হয়েছে, এবং এমনকিছু সে সঙ্গে নিয়ে আসছে যাতে রাশিয়াতে ভ্রাতৃসংঘের কাজকর্মের অনেক সুবিধা হবে। পিতার্সবুর্গের ধর্ম-ভাইরা সকলেই তার সঙ্গে দেখা করতে এল, তার সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করল; তাদের মনে হল সে তাদের জন্য একটা কিছু তৈরি করছে আর সেটা লুকিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর আশ্রমবাসীদের একটা গুরুগম্ভীর সভা ডাকা হল; সংঘের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে পিয়ের তাদের জন্য যা নিয়ে এসেছে সেই সভাতেই পিতার্সবুর্গের ভাইদের তা জানিয়ে দেওয়া হবে। সভা লোকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যথারীতি সব আচার-অনুষ্ঠান হয়ে গেলে পিয়ের উঠে দাঁড়িয়ে ভাষণ শুরু করল।

লজ্জায় আরক্ত হয়ে তো-তো করে লিখিত ভাষণটি হাতে নিয়ে সে বলতে শুরু করল।

"প্রিয় ভাইসব, আশ্রমের নির্জন ঘরের মধ্যে আমাদের রহস্যময় কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করাটাই যথেষ্ট নয়—আমাদের কাজ করতে হবে—কাজ! আমরা ঘুমে ঢুলছি, কিন্তু আমাদের কাজ করতে হবে।" নোট-বইটা তুলে ধরে পিয়ের পড়তে শুরু করল।

"নিষ্কলুষ সত্যের প্রচার এবং ধর্মের জয় প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষের মন থেকে ভুল ধারণাকে মুছে ফেলতে হবে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে ঐক্যের নীতিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, যুবকদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব নিতে হবে, বিজ্ঞতম মানুষদের সঙ্গে নিজেদের বাঁধতে হবে ঐক্যের অচ্ছেদ্য বন্ধনে,

সাহসের সঙ্গে, সুবিবেচনার সঙ্গে কুসংস্কার, অবিশ্বাস ও নির্বুদ্ধিতাকে জয় করতে হবে, এবং আমাদের প্রতি যারা অনুরক্ত তাদের নিয়ে একই উদ্দেশ্যের সূত্রে গ্রথিত একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

“এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাপের উপর পুণ্যের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে; এমন প্রচেষ্টা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে যাতে সৎ লোকরা তাদের পুণ্যকর্মের জন্য এই জগতেই স্থায়ী পুরস্কার লাভ করতে পারে। কিন্তু এই মহৎ প্রচেষ্টার পথে আমাদের সবচাইতে বড় বাধা আজকের দিনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। এ অবস্থায় কি করতে হবে? বিপ্লবকে সমর্থন করা, সবকিছু উৎখাত করা, শক্তি দিয়ে শক্তির প্রতিরোধ করা? ···না! আমরা থাকব সে পথ থেকে অনেক দূরে। প্রতিটি সশস্ত্র সংস্কার অবশ্যই নিন্দনীয়, কারণ তাতে পাপের প্রতিকার হয় না, মানুষ যা ছিল তাই থাকে; তাছাড়া, জ্ঞানের কখনও হিংসার দরকার হয় না।

“একই প্রত্যয়ের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ দৃঢ়চিত্ত পুণ্যবান মানুষ তৈরি করা; পাপ ও নির্বুদ্ধিতার শাস্তি বিধান করা; প্রতিভা ও ধর্মের পোষকতা করা; উপযুক্ত লোকদের পথের ধুলো থেকে তুলে এনে আমাদের ভ্রাতৃসংঘের সঙ্গে যুক্ত করা—এই ধারণার উপরেই গড়ে উঠেছে আমাদের সংঘের গোটা পরিকল্পনা। একমাত্র তখনই আমাদের সংঘ সেই অপ্রতিহত শক্তির অধিকারী হবে যার দ্বারা বিশৃংখলাসৃষ্টিকারীদের হাত বেঁধে ফেলে তাদের অজ্ঞাতেই তাদের বশ করা যাবে। এককথায়, এমন একটি সার্বভৌম সরকার আমাদের গঠন করতে হবে যার কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে। এই একই লক্ষ্য ছিল খৃস্টধর্মের। এ ধর্ম মানুষকে শিখিয়েছে জ্ঞানী হতে, সৎ হতে, নিজেদের কল্যাণের জন্যই শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম মানুষদের দৃষ্টান্ত ও উপদেশকে অনুসরণ করতে।

“যে মুহূর্তে প্রতিটি রাজ্যে আমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক সমর্থ লোক পাব, আবার তারা প্রত্যেকে দুজনকে শিক্ষিত করে তুলবে, এবং সকলে ঐক্যবদ্ধ হবে, তখনই আমাদের সংঘের পক্ষে সবকিছু সম্ভব হবে। মানবজাতির কল্যাণের জন্য সেকাজ ইতিমধ্যেই গুপ্তভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।”

বক্তৃতাটি সকলকে যথেষ্ট প্রভাবিত তো করলই, উপরন্তু আশ্রমে যথেষ্ট উত্তেজনারও সৃষ্টি হল। অধিকাংশ গুরুভাইরা এর মধ্যে অলৌকিকতার বিপদ দেখতে পেয়ে যেরকম নিরাসক্তভাবে কথাগুলি শুনল তাতে পিয়ের অবাক হয়ে গেল। মহাপ্রভু তাকে প্রশ্ন করতে শুরু করল, আর সেও অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে তার মতবাদকে গড়ে তুলতে লাগল। এরকম বিক্ষুব্ধ সভা অনেককাল হয় নি। একদল পিয়েরের বিরুদ্ধে অলৌকিকতার অভিযোগ তুলল, আর একদল তাকে সমর্থন করল। সেই সভায় মানুষের মনের সীমাহীন বৈচিত্র্য লক্ষ্য করে পিয়েরের মনে এই প্রথম খুব আঘাত পেল; সে

বুঝল, যেকোন দুজন মানুষের কাছে সত্য একই স্বরূপে উপস্থিত হতে পারে না।

সভার শেষে প্রচণ্ড আবেগের জন্য মহাপ্রভু বেজুকভকে ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় তিরস্কার করে বলল যে শুধুমাত্র ধর্মের প্রতি ভালবাসার জন্য নয়, সংগ্রামের প্রতি ভালবাসাই তাকে এই বিতর্কের মধ্যে টেনে নামিয়েছে। পিয়ের তার কথার কোন জবাব না দিয়ে সংক্ষেপে জানতে চাইল, তার প্রস্তাবটি গৃহীত হবে কি না। তাকে যখন বলা হল যে হবে না, তখন প্রথাগত অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা না করেই সে আশ্রম ছেড়ে বাড়ি চলে গেল।

অধ্যায়—৮

যে মানসিক অবসাদকে পিয়ের এত ভয় করে সেটাই তাকে আবার পেয়ে বসল। আশ্রমে বক্তৃতা দেবার পর তিন তিনটে দিন বাড়িতে সোফায় শুয়ে কাটাল; কারও সঙ্গে দেখা করল না, বাইরে কোথাও গেল না।

ঠিক সেইসময় সে স্ত্রীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেল; তার সঙ্গে দেখা করতে সে পিয়েরকে অনুরোধ করেছে; তার জন্য সে যে কত কষ্ট পাচ্ছে এবং সারা জীবন তার সেবা করবার তার যে কত ইচ্ছা সে-কথাও জানিয়েছে।

চিঠির শেষে সে পিয়েরকে আরও জানিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যেই সে বিদেশ থেকে পিতার্সবুর্গে ফিরবে।

এই চিঠির পরে পরেই একজন গুরুভাই জোর করে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। এই গুরুভাইটিকে সে মোটেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করত না। গুরুভাইটি পিয়েরেব বৈবাহিক ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুরু কবে ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের পরামর্শ প্রসঙ্গে বলল যে স্ত্রীর প্রতি এরূপ কঠোর আচরণ করে সে অন্যায় করেছে এবং অনুতপ্তা স্ত্রীকে ক্ষমা না করে সে ভ্রাতৃসংঘের অন্যতম প্রধান নির্দেশকেই লঙ্ঘন করেছে।

সেইসময়ে তার শাশুড়ি প্রিন্স ভাসিলির স্ত্রীও তাকে অনুরোধ করে পাঠাল। একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারে আলোচনার জন্য সে যেন কয়েক মিনিটের জন্য হলেও একবার তার কাছে যায়। পিয়ের বুঝতে পারল, তার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে; তারা চাইছে স্ত্রীর সঙ্গে তার পুনর্মিলন ঘটাতে; আর তখন তার যা মনের অবস্থা তাতে এটা তার কাছে খুব অপ্রীতিকরও নয়। তার তো কিছুতেই কিছু যায়-আসে না। এ জীবনে তার কাছে কোন কিছুই খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়, আর মানসিক অবসাদের প্রভাবে স্ত্রীকে শাস্তি দেবার জন্য সে তার স্বাধীনতা অথবা সংকল্প কোনটাকেই খুব মূল্য দিল না।

ভাবল, "কেউ সঠিক নয়, আর কারও দোষ নেই; কাজেই তার স্ত্রীকেও দোষ দেওয়া চলে না।"

স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলনের স্বপক্ষে যে সে তখনই মত দিল না তার একমাত্র কারণ তার তখনকার অবসাদগ্রস্থ মানসিক অবস্থায় কোন পদক্ষেপের শক্তিই তার ছিল না। স্ত্রী যদি তার কাছে এসে হাজির হত তাহলে সে তাকে ফিরিয়ে দিত না। তখন তার মনের যা অবস্থা তাতে সে স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছে কি করছে না সেটা কি খুবই তুচ্ছ ব্যাপার নয়?

স্ত্রীর বা শাশুড়ির চিঠির কোন জবাব না দিয়ে একদিন গভীর রাতে পিয়ের যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল এবং জোসেফ আলেক্সিভীচ-এর সঙ্গে দেখা করতে মস্কো রওনা হল। দিনপঞ্জীর পাতায় লিখল:

"মস্কো, ১৭ই নভেম্বর।

এইমাত্র আমার হিতকারীর কাছ থেকে ফিরেছি; সঙ্গে সঙ্গেই লিখতে বসেছি আমার অভিজ্ঞতার কথা। যোসেফ আলেক্সিভীচ দরিদ্রের মত বাস করছেন, তিন বছর যাবৎ মূত্রাশয়ের একটা যন্ত্রণাদায়ক রোগে ভুগছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তার মুখে একটা আর্তনাদ বা অভিযোগের বাণী শোনে নি। একমাত্র অতি সাধারণ খাদ্যটুকু গ্রহণ করার সময় ছাড়া সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বিজ্ঞানের কাজে ব্যস্ত থাকেন। তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন এবং যে বিছানায় শুয়েছিলেন তার উপরেই আমাকে বসালেন। প্রাচ্য দেশের ও জেরুজালেমের মহাবীরদের মত ইঙ্গিত আমি করলাম, আর তিনিও সেইভাবেই জবাব দিলেন; মৃদু হেসে জানতে চাইলেন, প্রুশীয় ও স্কটিশ আশ্রমগুলিতে আমি কি শিখেছি, কি পেয়েছি। যথাসাধ্য সব তাকে বললাম, পিতার্সবুর্গের আশ্রমে কি প্রস্তাব রেখেছি, তাদের কাছ থেকে যে খারাপ ব্যবহার পেয়েছি এবং গুরুভাইদের সঙ্গে আমার মতবিরোধ—সবই তাকে জানালাম। বেশ কিছুক্ষণ নীরব ও চিন্তান্বিত অবস্থায় থেকে যোসেফ আলেক্সিভীচ এ ব্যাপারে তার অভিমত আমাকে বললেন, আর তার ফলে আমার সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যতে যেপথে আমি চলব সব আমার সামনে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল। তিনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন সংঘের ত্রিবিধ আদর্শ: (১) রহস্যের সংরক্ষণ ও অনুশীলন, (২) তাকে গ্রহণ করবার জন্য নিজের পরিশুদ্ধি ও ও সংস্কারসাধন এফ্‌ (৩) সেই পরিশুদ্ধির প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে মানব জাতির উন্নতি বিধান—এই আদর্শের কথা আমার মনে আছে কিনা, তখন আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই তিনটির মধ্যে কোন্‌টি প্রধান? অবশ্যই আত্ম-সংস্কার ও আত্ম-শুদ্ধি। কেবলমাত্র সেই আদর্শের লক্ষ্যেই আমরা পরিস্থিতির নিরপেক্ষভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতে পারি। এদিক থেকে বিচার করে যোসেফ আলেক্সিভিচ আমার ভাষণ ও কাজকর্মের নিন্দা করলেন, আর অন্তরের গভীরে তার সঙ্গে আমি একমত হলাম। আমার

পারিবারিক কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, নিজেকে পূর্ণ করে তোলাই একজন খাঁটি সংঘ-সদস্যের প্রধান কর্তব্য। আমরা প্রায়ই মনে করি যে জীবনের সব বাধা-বিঘ্নকে দূর করলেই আমরা দ্রুত সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারব, কিন্তু প্রিয় মহাশয়, একমাত্র জাগতিক জ্বালা যন্ত্রণার ভিতর দিয়েই তিনটি প্রধান লক্ষ্যে পৌছতে পারি : (১) আত্ম-জ্ঞান—কারণ শুধুমাত্র তুলনার দ্বারাই মানুষ নিজেকে জানতে পারে। (২) আত্ম-পূর্ণতা—শুধুমাত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়েই তা অর্জন করা যায়, এবং ( ) প্রধান গুণ মৃত্যুকে ভালবাসাকে অর্জন করা। একমাত্র জীবনের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েই তার অসারতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি এবং তার ফলে জন্ম নেয় মৃত্যুকে ভালবাসা অথবা নবজন্ম পরিগ্রহণের প্রতি ভালবাসা।" তিনি আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন পিতার্সবুর্গ গুরুভাইদের যোগাযোগ এড়িয়ে না যাই, কিন্তু আশ্রমে শুধুমাত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর পদে অধিষ্ঠিত থেকে গুরুভাইদের অহংকারের পথ থেকে সরিয়ে আত্ম-জ্ঞান ও আত্ম-পূর্ণতার সঠিক পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা করি। এছাড়া তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে পরামর্শ দিলেন, আমি যেন নিজের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখি, এবং সেই উদ্দেশ্যে আমাকে একটা নোট-বই দিলেন; সেই নোট-বইতে আমি এখন লিখছি এবং ভবিষ্যতে আমার সব কাজের কথা লিখব।"

"পিতার্সবুর্গ, ২৩শে নভেম্বর।

"আবার আমি স্ত্রীর সঙ্গে বাস করছি। শাশুড়ি আমার কাছে এসে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন হেলেন এখানে এসেছে, সে মিনতি জানিয়েছে আমি যেন তার কথাগুলি শুনি; সে নির্দোষ, সে দুঃখী; আরও অনেক কথা। আমি জানতাম একবার যদি তাকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দেই তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেবার শক্তি আমার হবে না। এই বিপদে কার কাছে সাহায্য চাইব, পরামর্শ চাইব তাও বুঝতে পারি নি। আমার হিতকারী যদি এখানে থাকতেন তাহলে তিনিই আমাকে বলে দিতেন কি করতে হবে। আমার ঘরে ঢুকে যোসেফ আলেক্সিভীচের চিঠিগুলি আর একবার পড়লাম, তার সঙ্গে যা কথা হয়েছিল সেগুলি স্মরণ করলাম, আর তা থেকে এই সিদ্ধান্ত করলাম, যে মানুষ সবিনয়ে প্রার্থনা জানাচ্ছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত হবে না, প্রত্যেকের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করাই আমার কর্তব্য—বিশেষ করে যে আমার সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ বাঁধনে বাঁধা—আমার ক্রুশ আমাকে বহন করতেই হবে। কিন্তু ঠিক কাজ করার খাতিরে তাকে যদি ক্ষমাই করি, তাহলে আত্মিক উদ্দেশ্যেই তার সঙ্গে মিলনও হোক। এই সিদ্ধান্ত করে যোসেফ আলেক্সিভীচকেও তাই জানিয়ে দিলাম। স্ত্রীকে বললাম, সে যেন অতীতকে ভুলে যায়, তার প্রতি যদি কোন অন্যায় করে থাকি তাহলে সে যেন আমাকে ক্ষমা করে, আর আমার

ক্ষমা করার কিছুই নেই। তাকে একথা বলতে পেরে আনন্দ পেলাম। তার সঙ্গে আবার দেখা করা যে আমার পক্ষে কত কঠিন সেটা আর তার জেনে দরকার নেই। এই বড় বাড়িটার দোতলাতেই আমি বাসা নিয়েছি; লাভ করছি নবজন্মের এক সুখের অনুভূতি।"

অধ্যায়—৯

যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে, সেইসময়ই দরবারে সমবেত সর্বোচ্চ মহলে এবং বড় বড় বল নাচের আসরে সকলেই যার যার নিজস্ব মেজাজে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বসতে লাগল। তার মধ্যে আবার সবচাইতে বড় দলটি ছিল নেপোলিয়ন-অনুরাগী ফরাসী দলটি, অর্থাৎ কাউন্ট রুমিয়াস্ত্‌সেভ ও কলাইকুর্ত-এর দল। স্বামীকে নিয়ে পিতার্সবুর্গে বসবাস শুরু করেই হেলেনও এই দলের একজন চাঁই হয়ে উঠল। ফরাসী দূতাবাসের সদস্যবর্গ এবং বুদ্ধি ও পরিচ্ছন্ন আচার-আচরণের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ঐ মহলের অনেকেই সবসময় তার কাছে আসা-যাওয়া শুরু করে দিল।

দুই সম্রাটের বিখ্যাত সাক্ষাৎকারের সময় হেলেন এরফুর্তেই ছিল, এবং নেপোলিয়ন-অনুরাগী বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে সেখানেই তার যোগাযোগ ঘটেছিল। এরফুর্তে সে খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। থিয়েটারে স্বয়ং নেপোলিয়নের নজরে সে পড়েছিল; তার সম্পর্কে নেপোলিয়ন বলেছিল: "C'est un superbe animal. (ঐ একটি অপূর্ব জীব)।" সুন্দরী রুচিসম্পন্ন নারী হিসাবে তার এই সাফল্যে পিয়ের অবাক হয় নি, কারণ সে এখন আগের চাইতেও বেশী সুন্দরী হয়েছে। সে অবাক হয়েছে এটা লক্ষ্য করে যে এই বিগত দুই বছরে তার স্ত্রী "যেমন বুদ্ধিমতী তেমনই সুন্দরী একটি মনোরমা নারী" হবার সুখ্যাতি অর্জন করতে পেরেছে। বিশিষ্ট প্রিন্স দ্য লিগ্‌নে তাকে আট-পাতা চিঠি লিখেছে। বিলিবিন তার সরস কবিতাগুলি জমিয়ে রেখেছে কাউণ্টেস বেজুকভের সামনে উপস্থিত করবে বলে। কাউণ্টেস বেজুকভের দরবারে উপস্থিত হতে পারাটাকেই বুদ্ধির তকমা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। তার দরবারে যাতে কিছু বলা যায় সেই উদ্দেশ্যে হেলেনের সান্ধ্য বাসরে যোগ দেবার আগে যুবকরা পুথিপত্র পড়ে নেয়। দূতাবাসের সচিবরা, এমন কি রাষ্ট্রদূতরা পর্যন্ত কূটনৈতিক গোপন কথা হেলেনকে বিশ্বাস করে বলে দেয়। কাজেই হেলেন একটা শক্তি-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। স্ত্রীর বোকামির কথা পিয়ের জানে; তাই স্ত্রীর সান্ধ্য বাসরে এবং ডিনার-পার্টিতে যখন রাজনীতি, কাব্য ও দর্শনের আলোচনা চলে তখন পিয়ের ভয় ও সংশয়ের একটা বিচিত্র মিশ্র অনুভূতি নিয়ে কখনও কখনও সেখানে উপস্থিত থাকে। একজন যাদুকর যখন আশংকা করে যে তার কলা-কৌশল যেকোন মুহূর্তে ধরা পড়ে যেতে পারে তখন তার যেরকম মনের অবস্থা হয় ঠিক সেই মনের

অবস্থা নিয়েই পিয়ের ঐ সব পার্টিতে যোগ দেয়। কিন্তু যে কারণেই হোক হেলেন ধরা পড়ে না; বরং মনোরমা এক চতুর নারী হিসাবে হেলেন বেজুখভের সুখ্যাতি এতই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ল যে তার অত্যন্ত ফাঁকা ও বোকা-বোকা বুলি শুনেও তার প্রতিটি কথায়ই সকলে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে এবং সেগুলির এমন সব গভীর তাৎপর্য খুঁজতে থাকে যার তিলমাত্র ধারণাও তার নিজের মনে কখনও ছিল না।

পিয়ের এখন উঁচু মহলের একটি মহিলার পক্ষে প্রয়োজনীয় স্বামীমাত্র। সে একজন উদাসীন খেয়ালী মানুষ, এমন একটি "পরম মহাশয়" স্বামী যে কারও সাতে-পাঁচে থাকে না, বসবার ঘরের উচ্চগ্রামের ভাবস্রোতকে ক্ষুণ্ণ করে না, সুন্দরী ও কুশলী স্ত্রীর সুবিধাজনক পশ্চাৎপট হয়ে থাকাই তার একমাত্র কাজ। লোকে যেভাবে থিয়েটারে ঢোকে, সেও সেইভাবেই স্ত্রীর বসবার ঘরে ঢোকে, সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করে, সকলকে দেখেই সমান খুসি হয়, আর সকলের প্রতিই সমান উদাসীন। "পিতার্সবুর্গের অত্যন্ত বিশিষ্ট এই মহিলাটির বিচিত্র স্বামী হিসাবে তার পরিচয় এতদূর প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে তার এই খামখেয়ালী কেউই বিশেষ গুরুত্ব দেয় না।

যেসব যুবক প্রায়ই হেলেনের বাড়িতে হানা দেয় তাদের মধ্যে সামরিক চাকরিতে সুপ্রতিষ্ঠিত বরিস ক্রবেৎস্কয়ই এখন বেজুখভ-পরিবারের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছে। হেলেন তাকে বলে "প্রিয় সেবক," তাকে দেখে শিশুর মত। সকলের জন্যই সে একই হাসি হাসে, তবু হেলেন যখন বরিসকে দেখে হাসে তখন পিয়ের অস্বস্তি বোধ করে। বরিসও পিয়েরকে একটা বিশেষ মর্যাদা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে। এই শ্রদ্ধার ভাবটাও পিয়েরকে বিরক্ত করে। তিন বছর আগে স্ত্রীর কাছ থেকে সে এত যন্ত্রণা ভোগ করেছে যে এখন সে যন্ত্রণার পুনরাবৃত্তি থেকে সে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে চায়; আর সেজন্য প্রথমত সে স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের দাবী খাটায় না; দ্বিতীয়ত নিজের মনে কোন সন্দেহকে বাসা বাঁধতে দেয় না।

পিয়ের নিজেকে বোঝায়, "না, সে এখন বিদূষী হয়ে উঠেছে, কাজেই আগেকার সব মোহই সে কাটিয়ে উঠেছে। বিদূষী মহিলারা হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে গা ভাসিয়েছে এরকম কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।" অথচ কী আশ্চর্য, বরিস তার স্ত্রীর বসবার ঘরে হাজির হলেই (এবং সে হাজিরা প্রায় সব সময়ই চলে) পিয়েরের শরীরটাই যেন কেমন হয়ে যায়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি কেমন সংকুচিত হয়ে ওঠে, তার চলাফেরার অচেতন স্বাধীনতা নষ্ট হয়ে যায়।

পিয়ের ভাবে, "কী আশ্চর্য বিরূপতা! অথচ একসময় বরিসকে কত ভালবাসতাম।"

পৃথিবীর চোখে পিয়ের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক, এক বিশিষ্ট স্ত্রীর অন্ধ ও

অবুঝ স্বামী, এমন একটি খেয়ালী মানুষ যে কিছুই করে না, কারও ক্ষতিও করে না, প্রথম শ্রেণীর একজন ভালমানুষ। কিন্তু পিয়েরের মনের মধ্যে সারাক্ষণই আভ্যন্তরীণ অগ্রগতির এমন একটা জটিল ও কঠিন কাজ চলতে লাগল যাতে অনেককিছুই তার কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল, আর তার ফলে অনেক আত্মিক সংশয় ও আনন্দ তার মধ্যে দেখা দিল।

অধ্যায়—১০

পিয়েরের দিনপঞ্জী লেখা চলতেই থাকল; এই সময়ে সে লিখল:

"২৪ শে নভেম্বর।

"আটটায় ঘুম থেকে উঠলাম, ধর্ম-পুস্তক পড়লাম, তারপর কাজে গেলাম। (যোসেফ আলেক্সিভীচ-এর পরামর্শক্রমে পিয়ের সরকারী চাকরিতে ঢুকেছে এবং একটা কমিটিতে কাজ করছে।) খাওয়ার জন্য বাড়ি ফিরে একলাই খেলাম—কাউণ্টেসের এমন সব অতিথি ছিল যাদের আমি পছন্দ করি না। নিয়মমত পান-ভোজন সেরে গুরুভাইদের জন্য কয়েকটি অনুচ্ছেদ লিখলাম। সন্ধ্যায় কাউণ্টেসের কাছে গিয়ে বি, সম্পর্কে একটা মজার গল্প বললাম, আর তা শুনে সকলেই যখন হো-হো করে হেসে উঠল একমাত্র তখনই মনে পড়ল যে কাজটা করা উচিত হয় নি।

"শান্ত সুখী মন নিয়ে শুতে চলেছি। মহান ঈশ্বর, তোমার পথে চলতে আমাকে সাহায্য কর; (১) প্রশান্তি ও সুবিবেচনার দ্বারা ক্রোধকে জয় করতে, (২) আত্মসংযম ও প্রতিরোধের দ্বারা কামনাকে পরাভূত করতে, (৩) সংসার থেকে দূরে সরে থাকতে, কিন্তু (ক) রাষ্ট্রের সেবা, (খ) পারিবারিক কর্তব্য, (গ) বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক, এবং (ঘ) নিজের কাজ-কর্মের ব্যবস্থাকে পরিহার না করতে।

"২৭ শে নভেম্বর।

"অনেক দেরিতে উঠেছি। ঘুম থেকে জেগেও আলস্যবশতঃ অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েছিলাম। হে ঈশ্বর, তোমার পথে চলতে আমাকে সাহায্য কর, শক্তি দাও। ধর্ম-পুস্তক পড়লাম, কিন্তু মনে ভাব জাগল না। ভাই উরুসভ এসে পার্থিব বিষয়ের কথা বলতে লাগল। সম্রাটের নতুন প্রকল্পের কথা বলল। আমি সেগুলির সমালোচনা করতে লাগলাম। আমার জিহ্বাই আমার শত্রু। ভাই জি. ভি. এবং ও. আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। একটি নতুন ভাইকে স্বাগত জানাবার ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনা হল। আমার উপর তারা দীক্ষার কাজটা চাপিয়ে দিল। নিজেকে বড়ই দুর্বল ও অক্ষম মনে হয়। তারপরেই শুরু হল মন্দিরের সাতটি স্তম্ভ ও সাতটি সিঁড়ির ধাপ, সাত বিজ্ঞান, সাত সদগুণ, সাত পাপ, এবং পবিত্র আত্মার সাত দানের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা। ভাইও খুব ভাল বলতে পারেন। সন্ধ্যায়

স্বাগত-অনুষ্ঠানটি হল। বরিস দ্রুবেৎস্কয়কে সংঘে নেওয়া হল। আমি তাকে মনোনীত করে দীক্ষা দিলাম। একটা অন্ধকার ঘরে যখন তাকে নিয়ে আমি একা ছিলাম তখন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে তোলপাড় করে তুলল। তার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব আমার মনের মধ্যে জমে আছে বুঝতে পেরে সেটাকে দূর করতে সচেষ্ট হলাম। আমার মনে হল, আশ্রমের সদস্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার এবং তাদের করুণা পাবার জন্যই বরিস সংঘে প্রবেশ করতে এসেছে। কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা তাকেও বলতে পারলাম না, গুরুভাইদের এবং মহাপ্রভুকেও বলতে পারলাম না। প্রকৃতির মহান রূপকার, মিথ্যার গোলকধাঁধা থেকে বের হবার সত্য পথ আবিষ্কার করতে সাহায্য কর!"

"৩ রা ডিসেম্বর।

"দেরিতে ঘুম ভেঙেছে, ধর্মগ্রন্থ পড়েছি, কিন্তু সেদিকে মন যায় নি। তারপর বড় হলটায় গিয়ে পায়চারি করেছি। ইচ্ছা হল ধ্যানে বসি, কিন্তু তার পরিবর্তে কল্পনায় ভেসে উঠল চার বছর আগেকার একটি ঘটনার ছবি: দ্বৈরথের পরে মস্কোতে আমার সঙ্গে দেখা করে দলখভ বলেছিল, আমার স্ত্রীর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও আমি বেশ খোশমেজাজে আছি বলেই সে আশা করছে। তখন তাকে কোন জবাব দেইনি। এখন সেই সাক্ষাৎকারের প্রতিটি বিবরণ আমার মনে পড়ল—মনে মনে অনেক বিদ্বেষপূর্ণ তিক্ত জবাব তাকে দিয়েছিলাম। যখন দেখলাম আমার ভিতরটা রাগে জ্বলছে তখনই নিজেকে সংযত করে সে চিন্তাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। তারপর বরিস দ্রুবেৎস্কয় এসে নানা অভিযানের কথা বলতে লাগল। গোড়া থেকেই তার আসায় আমি বিরক্তিবোধ করছিলাম; কিছু অপ্রীতিকর কথাও তাকে বললাম। সে জবাব দিল। আমিও জ্বলে উঠলাম, এমনকিছু বললাম যা তার পক্ষে অপ্রীতিকর, এমন কি রূঢ়। সে চুপ করে রইল, আমিও নিজেকে সংযত করলাম। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। হে ঈশ্বর, আমি তার সঙ্গে চলতেই পারছি না। এর কারণ আমার অহংবোধ। নিজেকে তার উপরে বসাই বলেই তার চাইতে এত ছোট হয়ে যাই, কারণ আমার রূঢ়তার প্রতি সে উদার, আর তার প্রতি আমি পোষণ করি ঘৃণা। হে ঈশ্বর, তার সামনে আমি যাতে আমার নীচতাকে বুঝতে পারি; যাতে আমার আচরণে তারও কল্যাণ হয় সেই ব্যবস্থাই কর। আহারের পরে ঘুমিয়ে পড়লাম, আর ঘুমের মধ্যেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম কে যেন আমার বাঁ কানে বলছে, "তোমার দিন!"

"স্বপ্নে দেখলাম আমি অন্ধকারে হাঁটছি; হঠাৎ একদল কুকুর আমাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু কোনরকম ভয় না পেয়ে আমি চলতে লাগলাম। হঠাৎ একটা ছোটখাট কুকুর দাঁত দিয়ে আমার বাঁ উরুটা কামড়ে ধরল, কিছুতেই ছাড়ল না। দুই হাতে সেটার গলা টিপে ধরলাম। সেটাকে ছাড়িয়ে দিতে

না দিতেই বড় গোছের আর একটা কুকুর আমাকে কামড়াতে শুরু করল। সেটাকে তুলে ধরলাম, কিন্তু যত উপরে তুলি সেটা ততই বড় আর ভারী হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ ভাই এ. এসে আমার হাত ধরে একটা পাকা বাড়িতে নিয়ে চলল। সেবাড়িতে ঢুকবার মুখে আমাদের একটা সরু তক্তার উপর দিয়ে যেতে হল। সেটার উপর পা দিতেই তক্তাটা বেঁকে ভেঙে গেল ; আমি একটা বেড়া বেয়ে উঠতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু হাত বাড়িয়ে কিছুতেই যেন তার নাগাল পেলাম না। অনেক চেষ্টা করে নিজেকে টেনে তুললাম ; আমার পা দুটো ঝুলে রইল একদিকে আর শরীরটা রইল অন্যদিকে। ফিরে তাকিয়ে দেখলাম ভাই এ. বেড়াটার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর আঙুল দিয়ে বাইরে একটা চওড়া রাজপথ ও বাগান দেখাচ্ছে ; সেই বাগানে রয়েছে একটা সুন্দর বড় বাড়ি। ঘুম ভেঙে গেল। হে প্রভু, হে প্রকৃতির মহান রূপকার, এই কুকুরগুলোর—এই সব কামনা-বাসনার—হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে আমাকে সাহায্য কর ; বিশেষ করে এই শেষ কুকুরটির হাত থেকে যার মধ্যে আগেকার অন্য সবগুলির শক্তি একত্রিত হয়েছে ; স্বপ্নের মধ্যে যে ধর্ম-মন্দিরের ছবি আমি দেখেছি সেখানে ঢুকতে আমাকে সাহায্য কর।

"৭ই ডিসেম্বর।

"স্বপ্ন দেখলাম যোসেফ আলেক্সিভিচ আমার বাড়িতে বসে আছেন, আর আমি খুসি হয়ে তাকে আপ্যায়িত করতে চাইছি। মনে হল, আমি যেন অন্য সকলের সঙ্গে অবিশ্রাম বকে চলেছি আর হঠাৎ মনে পড়ে গেল যে এতে উনি খুসি হবেন না ; আমার ইচ্ছা হল তার আরও কাছে যাই, তাকে আলিঙ্গন করি। কিন্তু কাছে যেতেই দেখলাম তার মুখটা বদলে গিয়ে যুবকের মত হয়ে গেল ; আমাদের সংঘের শিক্ষা সম্পর্কে তিনি শান্তভাবে কিছু বলতে লাগলেন, কিন্তু এত আস্তে বললেন যে আমি কিছুই শুনতে পেলাম না। তারপরেই মনে হল যেন আমরা সকলেই ঘর থেকে চলে গেলাম এবং একটা আশ্চর্য কিছু ঘটল। আমরা মেঝেতে শুয়ে বা বসে আছি। তিনি যেন আমাকে কিছু বলছেন, আর আমি চাইছি আমার বোধশক্তি তাকে দেখাতে ; তার কথায় কান না দিয়ে আমার ভিতরকার মানুষটার কথা এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদে তার পুতঃ হবার কথাই আমি ভাবতে লাগলাম। আমার চোখে জল এল, আর সেটা তার নজরে পড়ায় আমি খুসি হলাম। কিন্তু বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েই তিনি বকে দিলেন, তার কথায় ছেদ পড়ল। আমি লজ্জা পেয়ে জানতে চাইলাম তিনি আমার ব্যাপারে কিছু বলছিলেন কি না। কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না, সদয় দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন ; তারপরেই হঠাৎ দেখলাম আমরা রয়েছি আমার শোবার ঘরে, আর সেখানে একটি দুজনের মত বিছানা পাতা আছে। তিনি বিছানার

এক প্রান্তে শুয়ে পড়লেন, আর তাকে আদর করবার জ্বলন্ত বাসনায় আমিও শুয়ে পড়লাম। আর তিনি বললেন, "আমাকে খোলাখুলি বলতো কি তোমার প্রধান প্রলোভন? তা কি তুমি জান? আমি মনে করি তুমি তা জান।" এ প্রশ্নে লজ্জা পেয়ে বললাম, আলস্যই আমার প্রধান প্রলোভন। তিনি অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়লেন; আরও লজ্জা পেয়ে বললাম, তার পরামর্শমত আমার স্ত্রীর সঙ্গে বাস করলেও আমি তার সঙ্গে স্বামীর মত বাস করছি না। এতে তিনি বললেন, স্ত্রীকে আলিঙ্গন থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়; তিনি আমাকে বোঝালেন যে সেটাই আমার কর্তব্য। কিন্তু আমি জবাব দিলাম যে সেকাজ করতে আমার লজ্জা হওয়া উচিত, আর সহসা সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল। আমারও ঘুম ভেঙে গেল; মনে পড়ল "সুসমাচার"-এর পাঠ: "জীবনই মানুষের আলোকস্বরূপ। সে আলো অন্ধকারে কিরণ দেয়; অন্ধকার তাকে ঢেকে দিতে পারে না।" যোসেফ আলেক্সিভীচের মুখখানা আরও যুবকের মত উজ্জল দেখাতে লাগল। সেইদিনই আমার হিতকারীর কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম; তাতে তিনি "দাম্পত্য কর্তব্যে"র কথা লিখেছেন।

"৯ই ডিসেম্বর।"

"একটা স্বপ্ন দেখে যখন ঘুম ভেঙে গেল তখন বুকটা টিপ্‌ টিপ্‌ করছিল। দেখলাম, আমি রয়েছি মস্কোতে নিজের বাড়িতে, বড় বসবার ঘরটাতে, আর যোসেফ আলেক্সিভীচ বেরিয়ে এলেন বৈঠকখানা ঘর থেকে। মনে হল, আমি যেন সেইমুহূর্তে জেনে ফেলেছি যে তার মধ্যে পুনর্জন্মের কাজ শুরু হয়ে গেছে; তার দিকে ছুটে গেলাম। তাকে আলিঙ্গন করলাম, হাত দুটিতে চুমো খেলাম; তিনি বললেন, "তুমি কি লক্ষ্য করেছ যে আমার মুখটা বদলে গেছে?" তখনও তাকে জড়িয়ে ধরেই ছিলাম; মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখটা একজন যুবকের, কিন্তু তার মাথায় চুল নেই, আর মুখটা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমি বললাম, "হঠাৎ দেখা হয়ে গেলেও আপনাকে আমি চিনতে পারতাম"; নিজের মনে ভাবলাম, "আমি কি সত্য কথা বলছি?" আর সহসা দেখলাম তিনি একজন মরা মানুষের মত শুয়ে আছেন; তারপর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আমার সঙ্গে আমার পড়ার ঘরে গেলেন; আঁকার কাগজের একটা বড় বই তার হাতে। বললাম, "ওগুলো আমি এঁকেছি;" মাথাটা নুইয়ে তিনি জবাব দিলেন। বইটা খুললাম; সবগুলো পাতায়ই চমৎকার সব আঁকা। আমার স্বপ্ন থেকেই জেনেছিলাম, প্রিয়তমার সঙ্গে আত্মার ভালবাসার অভিযান নিয়েই ছবিগুলি আঁকা। পাতায় পাতায় দেখতে পেলাম, স্বচ্ছ দেহকে স্বচ্ছ পোশাকে আবৃত করে আকাশে উড়েচলা একটি নারীর সুন্দর প্রতিকৃতি। আর আমার যেন মনে হল এটা পরমা সঙ্গীতের প্রতিকৃতি ছাড়া আর কিছু নয়। সেই

ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে স্বপ্নের মধ্যেও আমার মনে হল যে আমি অন্যায় করছি, কিন্তু সেগুলির উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে পারলাম না। প্রভু, আমার সহায় হও! ঈশ্বর আমার, আমাকে পরিত্যাগ করাই যদি তোমার কাজ হয় তো তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক; কিন্তু আমি নিজে যদি এর কারণ হই তাহলে আমাকে বলে দাও আমার কি করা উচিত! তুমি যদি আমাকে একেবারেই পরিত্যাগ কর তাহলে আমার ব্যভিচারই আমাকে ধ্বংস করবে!"

অধ্যায়—১১

দুটো বছর গ্রামে কাটিয়েও রস্তভদের আর্থিক অবস্থার কোনরকম উন্নতি হল না।

যদিও নিকলাস রস্তভ তার সংকল্পে অটল থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে একটা নগন্য রেজিমেণ্টে খুব সাদাসিধেভাবে দিন কাটাচ্ছে, ওদিকে অত্রাদ্‌নু-র জীবনযাত্রা—বিশেষ করে মিতিংকার গৃহস্থালি—এমনভাবে চলছে যাতে প্রতিবছরই ঋণের পরিমাণ অনিবার্যভাবেই বেড়ে চলেছে। একটা সরকারি পদের জন্য আবেদন করাই তখন বুড়ো কাউণ্টের সামনে একমাত্র পথ আর তার খোঁজেই সে পিতার্স্‌বুর্গে এসেছে; আর এই ফাঁকে মেয়েরাও শেষবারের মত একটু আমোদ-আহ্লাদ করে নিতে পারবে।

পিতার্স্‌বুর্গে আসার কিছুদিন পরেই বের্গ ভেরাকে বিয়ের প্রস্তাব করে এবং তা গৃহীত হয়।

মস্কোর মত পিতার্স্‌বুর্গেও রস্তভ পরিবার সেই একই আতিথেয়তার রীতি বজায় রেখেই চলেছে; তাদের নৈশভোজনে নানা ধরনের লোক এসে মিলিত হয়। অত্রাদ্‌নু-র পল্লী অঞ্চলের প্রতিবেশীরা, দুস্থ অবস্থার প্রাচীন জমিদার ও তাদের কন্যারা, সম্ভ্রান্ত মহিলা পেরোন্‌স্কায়া, পিয়ের বেজুখভ, আর তাদের জেলা পোষ্টমাস্টারের পিতার্স্‌বুর্গে চাকরিরত ছেলেটি। পুরুষদের মধ্যে যারা অচিরেই রস্তভদের পিতার্স্‌বুর্গের বাড়ির নিয়মিত অতিথি হয়ে উঠল তাদের মধ্যে রয়েছে বরিস, পিয়েরকে তো কাউণ্ট রাস্তায় দেখতে পেয়ে জোর করেই বাড়িতে টেনে এনেছে, আর বের্গ সারাটাদিন রস্তভদের বাড়িতেই কাটায় এবং বড় মেয়ে কাউণ্টেস ভেরার প্রতি সেইরকম মনোযোগ দিয়ে চলে একটি যুবক বিয়ের প্রস্তাব করার আগে ভাবী কনের প্রতি যতটা মনোযোগ দিয়ে থাকে।

বের্গ যে অস্তারলিজে আহত ডান হাতটা সকলকেই দেখিয়ে বেড়ায় এবং একটা সম্পূর্ণ অদরকারী তলোয়ার বাঁ হাতে নিয়ে চলে সেটাও বৃথা যায় নি। সেই ঘটনাকে সে এতবার বলেছে আর এমন গুরুত্বের সঙ্গে বলেছে যে সকলেই তার সেই কাজটির গুণ ও প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করেছে। অস্তারলিজের জন্য সে দুটো সম্মান-চিহ্নও পেয়েছে।

কিছু কিছু নিন্দুক বের্গের গুণাবলীর কথা শুনে হাসলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে সে একজন পরিশ্রমী ও সাহসী অফিসার, ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার সম্পর্ক চমৎকার, আর একজন সচ্চরিত্র যুবক হিসাবে তার সামনে আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সমাজে একটি সুনিশ্চিত আসন।

চার বছর আগে মস্কোর একটি থিয়েটারের স্টলে জনৈক জার্মান সহকর্মীর সঙ্গে দেখা হলে বের্গ ভেরা রস্তভাকে দেখিয়ে তাকে জার্মান ভাষায় বলেছিল, "ঐ মেয়েটি আমার ভাবীবধূ," আর সেই মুহূর্ত থেকেই সে স্থির করেছে যে ভেরাকেই বিয়ে করবে। এবার পিতার্সবুর্গে এসে রস্তভদের অবস্থা ও নিজের অবস্থা বিবেচনা করে সে স্থির করল যে এবার বিয়ের প্রস্তাব করার সময় এসেছে।

প্রথমে বিয়ের প্রস্তাব শুনে কিছুটা বিব্রত বোধ করলেও নিজেদের আর্থিক অবস্থা ও ভেরার চব্বিশ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে রস্তভরা শেষপর্যন্ত এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিল।

প্রায় একমাস হয়ে গেল বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে; বিয়ের আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি, কিন্তু যৌতুকের ব্যাপারে কাউন্ট এখনও মনস্থির করতে পারে নি, বা স্ত্রীকে এ সম্পর্কে কিছু বলে নি। একসময়ে কাউন্ট ভেবেছিল, রিয়াজান জমিদারিটা মেয়েকে দিয়ে দেবে, বা একটা জঙ্গল বিক্রি করে দেবে; আবার কখনও ভেবেছে হ্যাণ্ড-নোটে টাকা ধার করবে। বিয়ের দিনকয়েক আগে একদিন সকালে বের্গ কাউন্টের পড়ার ঘরে ঢুকে স্মিত হাসির সঙ্গে সশ্রদ্ধভাবে ভাবী শ্বশুরের কাছে জানতে চাইল ভেরাকে কিরকম যৌতুক দেওয়া হবে। এই দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত প্রশ্নে কাউন্ট এতই বিব্রত হয়ে পড়ল যে কোন কিছু না ভেবেই প্রথম যে জবাবটা মাথায় এল সেটাই বলে ফেলল। "এ ব্যাপারে তুমি যে পাকা ব্যবসায়ীর মত কথা বলেছ তাতে আমি খুসি হয়েছি····এটাই আমি পছন্দ করি। তুমি যাতে সন্তুষ্ট হও তাই····"

আলোচনায় ইতি টানবার ইচ্ছায় বের্গের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে কাউন্ট উঠে পড়ল। বের্গ কিন্তু স্মিত হাসির সঙ্গে বলল, "ভেরা কতটা কি পাবে সেটা নিশ্চিত করে না জানতে পারলে এবং যৌতুকের একটা অংশ আগাম না পেলে তাকে হয়তো সমস্ত ব্যবস্থাটাই ভেঙে দিতে হবে। কারণ, ভেবে দেখুন কাউন্ট, স্ত্রীর ভরণপোষণের যথেষ্ট ব্যবস্থা ছাড়াই আমি যদি এখন বিয়ে করে বসি তাহলে কাজটা খুবই খারাপ হবে—"

কাউন্ট আর কথা না বাড়িয়ে জানিয়ে দিল যে আশি হাজার রুবলের একটা হ্যাণ্ড-নোট সে দেবে। বের্গ বিনীতভাবে হেসে কাউন্টের কাঁধে চুমো খেয়ে জানাল যে সে খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করছে, কিন্তু তিরিশ হাজার নগদে না পেলে তার পক্ষে নতুন জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করা অসম্ভব। তারপর বলল, "অন্তত বিশ হাজার কাউন্ট, আর পরে মাত্র ষাট হাজারের হ্যাণ্ড-নোট।"

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে। শুধু আমাকে ক্ষমা কর বাবা, আমি তোমাকে বিশ হাজারও দেব, আবার আশি হাজারের হ্যাণ্ড-নোটও দেব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে চুমো খাও!"

অধ্যায়—১২

নাতাশার বয়স এখন ষোল, আর এটা সেই ১৮০৯ সাল, চার বছর আগে পরস্পরকে চুমো খাবার পর থেকে যে বছরটার জন্য বরিসের সঙ্গে সে'ও আঙুল গুণে চলেছে। সেই থেকে সে একদিনের জন্যও বরিসকে দেখে নি। সোনিয়াও তার মার সামনে কথাপ্রসঙ্গে বরিসের নাম উঠলে সে এমন সহজভাবে সে সম্পর্কে কথা বলে যেন সেটা একটা অনেকদিন আগে ভুলে-যাওয়া ছেলেমানুষী ব্যাপার, সেটাকে মনে করে রাখার কোন মনেই হয় না। কিন্তু বরিসের সেই বিয়ের প্রস্তাব একটা ঠাট্টামাত্র, না কি একটা গুরুতর প্রতিশ্রুতি এই প্রশ্ন মনের গভীর গহনে তাকে অনবরত যন্ত্রণা দিয়ে চলেছে।

১৮০৫ সালে বরিস যখন সেনাদলে যোগ দিতে মস্কো থেকে চলে গিয়েছিল তারপরে রস্তভদের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। বারকয়েক সে মস্কো এসেছে, অত্রাদ্‌নু-র কাছ দিয়েও গেছে, কিন্তু কখনও তাদের সঙ্গে দেখা করতে যায় নি।

কখনও কখনও নাতাশার মনে হয়েছে যে বরিস আর তার সঙ্গে দেখা করতে চায় না; বড়রাও তার সম্পর্কে যে সুরে কথা বলে তাতেও তার এই অনুমানই সমর্থিত হয়।

বরিসের কথা উঠলেই কাউণ্টেস বলে, "আজকাল পুরনো বন্ধুদের কেউ মনে রাখে না।"

আন্না মিখায়লভ্‌নাও আজকাল আগের তুলনায় অনেক কম আসে, সবসময় একটা গাম্ভীর্য বজায় রেখে চলে, এবং ছেলের গুণপনা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা নিয়েই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। রস্তভরা পিতার্সবুর্গে এলে বরিস তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল।

বেশ উত্তেজনা নিয়েই সে তাদের বাড়ি গেল। নাতাশার স্মৃতি তার কাছে খুবই কাব্যময়। কিন্তু এই দৃঢ় সংকল্প নিয়েই সে গেল যে নাতাশাকে ও তার বাবা-মাকে বুঝিয়ে দেবে, নাতাশার সঙ্গে তার ছেলেমানুষী সম্পর্কটা দুজনের কারও পক্ষেই বাধ্যতামূলক হতে পারে না। কাউণ্টেস বেজুখভের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার দৌলতে সমাজে সে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত, একজন পদস্থ ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতার দৌলতে চাকরিক্ষেত্রেও তার সম্ভাবনা সুউজ্জ্বল, এবং পিতার্সবুর্গের জনৈকা অন্যতম ধনী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করার ব্যবস্থাও সে শুরু করে দিয়েছে, আর সে ব্যবস্থা সহজেই বাস্তবে রূপায়িত হতে পারবে। সে যখন রস্তভদের বসবার ঘরে ঢুকল তখন নাতাশা ছিল তার নিজের ঘরে।

বরিসের আসার সংবাদ পেয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে মধুর হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে দৌড়ে সেখানে এসে হাজির হল।

বরিস চার বছর আগে নাতাশাকে যেমনটি দেখেছিল, সেই খাটো পোশাক পরা, কোঁকড়া চুলের নীচে উজ্জ্বল দুটি কালো চোখ, সেই ছেলে-মানুষী উচ্ছল হাসি, নাতাশার সেই চেহারাটাই এখনও তার মনে আছে। কাজেই যখন সম্পূর্ণ আলাদা এক নাতাশা এসে ঘরে ঢুকল তখন সে যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, একটা উচ্ছ্বসিত বিস্ময় ফুটে উঠল তার মুখে।

কাউন্টেস শুধাল, "আচ্ছা, তোমার সেই ছোট্ট পাগলী খেলার সাথীটিকে চিনতে পারছ কি?"

নাতাশার হাতে চুমো খেয়ে বরিস বলল তার এই পরিবর্তন দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

"তুমি কত সুন্দর হয়েছ!"

"তাই তো মনে হয়!" নাতাশার হাসিভরা চোখ দুটি জবাব দিল।

বলল, "পাপা কি খুব বড় হয়েছে?"

নাতাশা বসল; কাউন্টেসের সঙ্গে বরিসের কথাবার্তায় যোগ না দিয়ে সে নীরবে তার ছেলেবেলাকার প্রণয়ীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বরিসও সেটা বুঝতে পেরে বার বার নাতাশার দিকে তাকাতে লাগল।

বরিসের ইউনিফর্ম, কাঁটা-মারা জুতো, টাই, চুল ব্রাশ করার ভঙ্গী, সবই একেবারে হাল-ফ্যাশনের। সবই নাতাশার নজরে পড়ল। কাউন্টেসের পাশের হাতল চেয়ারটায় সে আরাম করে বসেছে, ডান হাত দিয়ে পরিষ্কার দুটি দস্তানাকে এমনভাবে পরল যেন সে দুটি হাতের চামড়াই হয়ে গেল, ঠোঁট দুটিকে সুন্দরভাবে চেপে পিতার্সবুর্গের উঁচু মহলের আমোদ-প্রমোদের কথা বলছে, আর মৃদু বিদ্রূপের সঙ্গে মস্কোর পুরনো দিনের কথা ও পরিচিত লোকজনদের কথাও উল্লেখ করছে।

বরিস দশ মিনিটের বেশী সেখানে থাকল না; আসন থেকে উঠে বিদায় নিল। দুটি সপ্রশ্ন, ঠাট্টাভরা দৃষ্টি তখনও তার দিকে তাকিয়ে আছে। এই প্রথম সাক্ষাতের পরে বরিস নিজেকে বোঝাল, নাতাশা তাকে আগের মতই আকর্ষণ করেছে, কিন্তু এই আকর্ষণের কাছে ধরা দিলে চলবে না, কারণ সম্পত্তিহীন এই মেয়েটিকে বিয়ে করা মানেই তার ভবিষ্যৎ উন্নতির সর্বনাশ করা, আবার তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা না থাকলেও তার সঙ্গে নতুন করে ভাব জমানোটা অসম্মানজনক। বরিস স্থির করল নাতাশার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করবে না; কিন্তু সে সংকল্প সত্ত্বেও কয়েকদিন পরেই আবার দেখা করতে গেল এবং প্রায়ই দেখা করতে লাগল এবং রস্তভদের বাড়িতে সারাটাদিন কাটাতে লাগল। তার মনে হল, নাতাশার সঙ্গে তার একটা বোঝাপড়া হওয়া দরকার, তাকে জানানো দরকার যে পুরনো দিনের কথা ভুলে যেতে

হবে, যত যাই হোক···সে তার স্ত্রী হতে পারে না, তার কোন সামর্থ্য নেই, আর নাতাশার বাবা-মাও তার সঙ্গে নাতাশার বিয়ে দেবে না। কিন্তু সে-কথা সে বলতে পারল না; এ ধরনের আলোচনা তুলতেই পারল না। দিনের পর দিন সে ক্রমেই জড়িয়ে পড়তে লাগল। তার মার ও সোনিয়ার মনে হল, নাতাশা আগের মতই বরিসকে ভালবাসে। সে বরিসকে তার প্রিয় গানগুলি গেয়ে শোনায়, নিজের ছবির অ্যালবাম তাকে দেখায়, বরিসকে দিয়ে তাতে কিছু লিখিয়ে নেয়, পুরনো কথা তুলতেই দেয় না, বর্তমান যে কত সুখের শুধু সেই কথাই বলে; প্রতিদিনই সেই একই কুয়াসার মধ্যে সে বিদায় নেয়, যা বলতে চায় তা বলা হয় না; কি করছে, কেন এখানে আসছে, কোথায় এর শেষ—তাও সে জানে না। হেলেনের সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দিল, প্রতিদিনই তার কাছ থেকে তিরস্কারপূর্ণ চিঠি পেতে লাগল, তবু তার দিনগুলি কাটতে লাগল রস্তভদের বাড়িতেই।

অধ্যায়—১৩

একদিন রাতে বুড়ি কাউণ্টেস যখন রাত-টুপি ও ড্রেসিং-জ্যাকেট পরে কম্বলের উপর হাঁটু ভেঙে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে আর্তনাদ করছিল আর মেঝেতে উপুড় হয়ে প্রার্থনা করছিল, তখন তার ঘরের দরজাটা ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ করে উঠল এবং ড্রেসিং-জ্যাকেট গায়ে ও খালি পায়ে চটি পরে নাতাশা দৌড়ে এসে ঘরে ঢুকল। কাউণ্টেসের প্রার্থনার মেজাজ চলে গেল; ভুরু কুঁচকে চারদিকে তাকাল। "এও কি হতে পারে যে এই কোচটিই হবে আমার সমাধি?" —এই শেষ প্রার্থনাটিই কাউণ্টেস শেষ করতে যাচ্ছিল। মাকে প্রার্থনা করতে দেখে নাতাশা হঠাৎ ছোটা বন্ধ করে অর্ধেক বসার ভঙ্গীতে নিজের অজ্ঞাতেই জিভটা বের করল, যেন নিজেকেই তিরস্কার করতে চাইল। যখন দেখল মা প্রার্থনা করেই চলেছে তখন সে পা টিপে টিপে বিছানায় গেল এবং তাড়াতাড়ি এক পা দিয়ে অন্য পায়ের চটি খুলে ফেলে দিয়ে একলাফে বিছানায় উঠে গেল—একটু আগেই কাউণ্টেস আশংকা করেছিল যে এই বিছানাটাই বুঝি তার সমাধি হবে। কোচটা উঁচু, পালকের গদি ও পাঁচটা বালিশ, প্রত্যেকটা নীচেরটার চাইতে কিছু ছোট। লাফ দিয়ে উঠেই নাতাশা পালকের গদিতে ডুব দিল, পাক খেয়ে দেয়ালের দিকে সরে গেল, বিছানার চাদর নিয়ে খেলতে শুরু করে দিল; একবার আপাদ-মস্তক ঢেকে ফেলল, আবার মুখ বের করে মার দিকে তাকাল। প্রার্থনা শেষ করে কাউণ্টেস কঠিন মুখে বিছানার কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু নাতাশার মাথাটা ঢাকা দেওয়া থাকায় তার মুখে দেখা দিল সদয়, দুর্বল হাসি।

বলল, "এই—এই!"

নাতাশা বলল, "মামণি, একটু কথা বলতে পারি? পারি তো? এবার

তাহলে তোমার গলায় একটা, আর…এতেই হবে!" মার গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

বালিশগুলো ঠিকঠাক করে দিয়ে দুজনে লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার পরে মা বলল, "আরে, আজ রাতে এসব কি হচ্ছে?"

কাউণ্ট ক্লাব থেকে ফিরে আসার আগে রাতে নাতাশার একবার করে মার কাছে আসাটা মা ও মেয়ে দুজনের কাছেই একটা বড় আনন্দের ব্যাপার।

"আজ রাতে এসব কি? —কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই…"

নাতাশা মার মুখের উপর হাতটা রাখল।

গম্ভীর গলায় বলল, "বরিসের কথা তো…আমি জানি। সেইজন্যই তো এসেছি। কিছু বলো না—আমি জানি। না, আমাকে বল!" নাতাশা হাতটা সরিয়ে নিল। "বল মামণি! সে খুব ভাল, নয়?"

"নাতাশা, তোমার বয়স ষোল। তোমার বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। তুমি বলছ বরিস ভাল। সে খুব ভাল, আমি তাকে ছেলের মত ভালবাসি। কিন্তু তাতে কি? তুমি কি ভেবেছ? তার মুণ্ডুটা যে একেবারেই ঘুরিয়ে দিয়েছ তা তো দেখতেই পাচ্ছি…"

বলতে বলতে কাউণ্টেস মেয়ের দিকে তাকাল। খাটের এক কোণে মেহগেনি কাঠের উপর খোদাই-করা স্ফিন্‌ক্স্‌-এর মূর্তিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে নাতাশা শুয়ে ছিল। কাজেই কাউণ্টেস মেয়ের মুখের রেখাচিত্রটাই শুধু দেখতে পেল। সে মুখের কঠিন গম্ভীর ভাব দেখে সে অবাক হল।

নাতাশা কি যেন ভাবছে।

বলল, "বেশ, তারপর?"

"তার মুণ্ডুটা তো একেবারে ঘুরিয়ে দিয়েছ, কিন্তু কেন? তাকে নিয়ে কি করতে চাও? তুমি তো জান তাকে বিয়ে করতে পারবে না।"

"কেন নয়?" একভাবে শুয়ে থেকেই নাতাশা বলল।

"কারণ তার বয়স অল্প, কারণ সে গরীব, কারণ সে আত্মীয়…এবং কারণ তুমি নিজেও তাকে ভালবাস না।"

"কি করে জানলে?"

"আমি জানি। এটা ঠিক নয় বাছা!"

"কিন্তু আমি যদি চাই…" নাতাশা বলল।

"বাজে কথা রাখ," কাউণ্টেস বলল।

"কিন্তু আমি যদি চাই…"

"নাতাশা, আমি কিন্তু আন্তরিকভাবেই…"

নাতাশা তাকে কথাটা শেষ করতে দিল না। কাউণ্টেসের হাতটা টেনে নিয়ে তার পিঠে চুমো খেল, তারপর তালুতে চুমো খেল; আবার হাতটাকে উল্টে নিয়ে প্রথমে একটা গাঁটে চুমো খেল, তারপর দুই গাঁটের মাঝখানের

জায়গাটাতে, তারপর পরের গাঁটে, আর ফিস্‌ফিস্ করে বলতে লাগল, "জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে। বল মামণি, তুমি কিছু বলছ না কেন? কথা বল!"

"এ চলবে না বাছা! ছেলেবেলাকার এই বন্ধুত্বকে সকলে বুঝবে না। তার সঙ্গে তোমার এই ঘনিষ্ঠতা দেখলে অন্য যেসব যুবক আমাদের বাড়িতে আসে তাদের মনে আঘাত লাগতে পারে। সবচাইতে বড় কথা, অকারণেই সেও কষ্ট পাবে। হয়তো ইতিমধ্যেই তার একটা ভাল অর্থকরী বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আর এখন সে তো আধা পাগল হয়ে উঠেছে।"

"পাগল?" নাতাশা কথাটা আবার বলল।

"আমার নিজের কথা কিছুটা তোমাকে বলছি। আমার একটি জ্ঞাতি-ভাই ছিল…"

"আমি জানি! সিরিল মাৎভিচ…তিনি তো বুড়ো।"

"চিরদিন সে বুড়ো ছিল না। কিন্তু আমি এই করব নাতাশা, বরিসের সঙ্গে একবার কথা বলব। এত ঘন ঘন তার আসার দরকার নেই…"

"কিন্তু কেন, সে যদি আসতে চায়…"

"কারণ আমি জানি যে শেষপর্যন্ত এতে কিছুই লাভ হবে না…"

"তুমি কি করে জান? না মামণি, তার সঙ্গে কথা বলো না! যত সব বাজে কথা!" নাতাশা এমনভাবে কথা বলল যেন একটা সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। "বেশ তো, আমি তাকে বিয়ে করব না, কিন্তু আসতে যদি তার ভাল লাগে, আমারও ভাল লাগে, তাহলে তাকে আসতে দাও।" নাতাশা হেসে মার দিকে তাকাল। "বিয়ে নয়, কিন্তু ঠিক বিয়ের মত" সে যোগ করল।

"বিয়ের মত, সেটা কি বাছা?"

"বিয়ের মত। তাকে বিয়ে করার কোন দরকার নেই। কিন্তু…বিয়ের মত।"

"বিয়ের মত, বিয়ের মত," কথাটা বারকয়েক আউড়ে কাউণ্টেস হঠাৎ খোশ মেজাজে, অপ্রত্যাশিতভাবে, বুড়োদের মত করে হেসে উঠল।

"হেসো না, থাম!" নাতাশা চেঁচিয়ে বলল। "গোটা বিছানাটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছ! তুমি একেবারে আমার মত, ঠিক আমারই মতই আর এক হাসির হর্‌রা।…দাঁড়াও…" কাউণ্টেসের দুই হাত ধরে সে কড়ে আঙুলের গাঁটে চুমো খেয়ে বলল, "জুন"; তারপর অন্য হাতে চুমো খেতে খেতে বলল, "জুলাই, অগস্ট…কিন্তু মামণি, সে কি খুবই প্রেমে পড়েছে? তোমার কি মনে হয়? কেউ কি কোনদিন তোমার এতখানি প্রেমে পড়েছিল? সে তো খুব ভাল, খুব, খুব ভাল। শুধু ঠিক আমার মনের মত নয়—তার মনটা এত সংকীর্ণ, ঠিক খাবার ঘরের ঘড়িটার মত…বুঝতে পারলে

না? সংকীর্ণ, জান তো—ধূসর, হাল্কা ধূসর....”

“কী বাজে কথা বলছ!” কাউণ্টেস বলল।

নাতাশা বলেই চলল:

“তুমি সত্যি বুঝতে পারছ না? নিকলাস হলে বুঝত···বেজুখভ এখন নীল, গাঢ় নীল ও লাল (শরীরতত্ত্ববিদরা জানেন, শব্দ মানুষের কাছে রঙের তাৎপর্য বহন করে থাকে), আর সে তো সরল মানুষ।”

কাউণ্টেস হেসে বলল, “তুমি তো তার সঙ্গেও ঢলাঢলি কর।”

“না, সে যে ভ্রাতৃসংঘের সদস্য সেটা আমি জেনে ফেলেছি। সে ভাল মানুষ, গাঢ় নীল ও লাল····তোমাকে কেমন করে যে বোঝাব?”

দরজার ওপাশ থেকে কাউণ্টের গলা শোনা গেল, “ছোট কাউণ্টেস! ঘুমিয়ে পড নি তো?” নাতাশা লাফ দিয়ে উঠে চটি হাতে নিয়ে এক-দৌড়ে খালি পায়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার ঘুম এল না। সে ভাবতে লাগল, সে যা বোঝে, তার মধ্যে যাকিছু আছে তা কেউ বুঝতে পারে না।

চেরুবিনির লেখা তার প্রিয় অপেরার একটুকরো গুন গুন করতে করতে সে বিছানায় এলিয়ে পড়ল; অচিরেই ঘুম আসবে এই মধুর চিন্তায় হাসতে লাগল। দাসী দুনিয়াশাকে ডেকে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিতে বলল, আর দুনিয়াশা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই সে নিজে চলে গেল আর এক সুখের স্বপ্ন-জগতে যেখানে সবকিছুই হাল্কা আর সুন্দর, হয়তো আলাদা বলেই আরও বেশী সুন্দর।

পরদিন বরিসকে একান্তে ডেকে কাউণ্টেস তার সঙ্গে কথা বলল। তারপর থেকেই সে রস্তভদের বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিল।

অধ্যায়—১৪

১৮১০-এর নববর্ষের পূর্ব সায়াহ্ন ৩১শে ডিসেম্বরে ক্যাথারিনের সময়কার এক বুড়ো জমিদার একটি বল-নাচ ও মধ্যরাত্রিক ভোজনের আয়োজন করল। কূটনৈতিক মহলের ব্যক্তিরা এবং সম্রাট স্বয়ং সেখানে হাজির হবে।

ইংলিশ জাহাজঘাটার উপর অবস্থিত জমিদারের বিখ্যাত প্রাসাদটি অসংখ্য আলোয় ঝলমল করছে। উজ্জ্বলরূপে আলোকিত ফটকে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে, সেখানে পাতা হয়েছে লাল কার্পেট, আর শুধু সৈনিকরা নয়, ডজন-ডজন পুলিশ-অফিসার এমন কি স্বয়ং পুলিশ-মাস্টার পর্যন্ত ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ি থেকে নামছে ইউনিফর্ম, তারকা ও ফিতেয় সজ্জিত পুরুষের দল, আর মহিলারা সাটিন ও সাদা লোমের পোশাক পরে গাড়ি থেকে সাবধানে নেমেই দ্রুত অথচ নিঃশব্দ পায়ে কার্পেটের উপর

দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে।

যতবার একটা নতুন গাড়ি আসছে প্রায় ততবারই ভিড়ের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠছে, আর সকলেই টুপি খুলছে।

"সম্রাট কি? ···না, একজন মন্ত্রী···প্রিন্স····রাষ্ট্রদূত। পালক দেখছ না?" ···জনতার কণ্ঠে ফিস্ ফিস্ কথা।

অন্য সকলের চাইতে বেশী সুসজ্জিত একজন অতিথি তো উচ্চপদস্থ অনেকেরই নাম ধরে ডাকতে লাগল; মনে হল সে প্রায় সকলকেই চেনে।

অতিথিদের এক-তৃতীয়াংশ এর মধ্যেই এসে গেছে, কিন্তু রস্তভরা এখনও সাজগোজ নিয়েই ব্যস্ত।

এই বল-নাচকে কেন্দ্র করে রস্তভ পরিবারে অনেক আলোচনা ও প্রস্তুতি চলেছে। হয়তো আমন্ত্রণই আসবে না, পোশাক-পরিচ্ছদই হয় তো তৈরি হবে না, অথবা যেমনটি হওয়া উচিত তেমন ব্যবস্থাটি করা যাবে না।

নাতাশা এই প্রথম বড় মাপের বল-নাচে যাচ্ছে। সকাল আটটায় সে ঘুম থেকে উঠেছে; সারাটা দিন প্রবল উত্তেজনা ও কাজকর্মের মধ্যে কেটেছে। সকাল থেকে একটা ব্যাপারেই তার সকল শক্তি নিয়োগ করেছে; তারা সকলেই—সে নিজে, মামণি ও সোনিয়া—যেন যথাসম্ভব ভালভাবে সেজেগুজে যেতে পারে। সোনিয়া ও মামণি তো তার হাতেই নিজেদের সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে। সোনিয়া সাজগোজ করে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। একটা পিন আটকাতে গিয়ে তার সুন্দর আঙুলে লাগতেই সে চেঁচিয়ে উঠল।

"ওভাবে নয় সোনিয়া, ওভাবে নয়!" মাথাটা ঘুরিয়ে নাতাশা চেঁচিয়ে বলল। "বো-টা ঠিক হয় নি। এখানে এস!"

সোনিয়া বসে পড়ল; নাতাশা অন্যভাবে পিন দিয়ে ফিতেটা আটকে দিল।

দাসী নাতাশার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। সে বলল, "আমাকে দেখিয়ে দাও মিস্! আমি ওভাবে করতে পারি না।"

"আহা বাপু! তাহলে অপেক্ষা কর। ঠিক আছে সোনিয়া।"

"তোমরা এখনও তৈরি হও নি? প্রায় দশটা বাজে," কাউণ্টেসের গলা শোনা গেল।

"এই হয়ে গেলো! এই হয়ে গেলো। আর তুমি মামণি?"

"আমার শুধু টুপিটা আটকানো বাকি।"

নাতাশা বলল, "ওটা আমাকে ছাড়া করো না। তুমি ঠিকমত পারবে না।"

"কিন্তু দশটা যে বাজে।"

"তোমরা কখন তৈরি হবে?" দরজার কাছে এসে কাউণ্ট শুধাল। "এই

যে আতরটা নাও। পেরোন্‌স্কায়া নিশ্চয় বসে বসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।” কাউণ্টেসের বান্ধবী পেরোন্‌স্কায়াকে পথে তুলে নিয়ে যাবার কথা আছে।

নাতাশা পোশাক পরতে শুরু করল।

কাউণ্ট দরজাটা খুলতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, “এক মিনিট! এক মিনিট! বাপি, ভিতরে এস না!”

সোনিয়া সশব্দে দরজাটা ঠেলে দিল। এক মিনিট পরে কাউণ্টকে ঢুকতে দিল। তার পরনে নীল রংয়ের চাতক পাখির লেজওয়ালা কোট, জুতো, মোজা; গায়ে আতর মেখেছে, আর চুলে পমেড।

জামার ভাঁজ পালিশ করতে করতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নাতাশা বলে উঠল, “আঃ, বাপি! তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! চমৎকার!”

ঠিক সেইমুহূর্তে আস্তে পা ফেলে সলজ্জ ভঙ্গীতে কাউণ্টেস ঘরে ঢুকল; মাথায় টুপি, পরনে ভেলভেট গাউন।

“উ-উ, সুন্দরী আমার!” কাউণ্ট উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, “একে তো তোমাদের সকলের চাইতে ভাল দেখাচ্ছে!”

কাউণ্ট হয় তো তাকে জড়িয়ে ধরত, কিন্তু পাছে পোশাক কুঁচকে যায় এই ভয়ে কাউণ্টেস লজ্জায় সরে গেল।

সাজপোশাক সেরে শেষ পর্যন্ত সওয়া দশটার সময় তারা গাড়িতে চেপে রওনা হল। এখনও “তরিদা বাগান” থেকে পেরোন্‌স্কায়াকে তুলে নেওয়া বাকি আছে।

পেরোন্‌স্কায়া তৈরি হয়েই ছিল। বয়স হলেও সেও রস্তভদের মত ওই প্রথায় সাজগোজ করেছে। কুশ্রী বুড়ো শরীরটাকে ধোয়ামোছা করেছে, আতর মেখেছে, পাউডার ঘসেছে। বান্ধবী তার সাজপোশাকের প্রশংসা করল। সেও রস্তভদের সাজগোজের প্রশংসা করল। সকলের চুলের বিনুনি ও পোশাক আর একবার ঠিকঠাক করে নিয়ে এগারোটার সময় তারা গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিল।

অধ্যায়—১৫

ভোর থেকে নাতাশার একমুহূর্ত সময় হাতে ছিল না, আর তার সামনে কি অপেক্ষা করে আছে সে একবারও ভাববার সময় পায় নি।

বাইরের ঠাণ্ডা ভিজে হাওয়ায় এবং ভিতরে লোকে-ঠাসা গাড়ির দুলুনিতে এই সে প্রথম পরিষ্কার করে ভাববার সময় পেল সেখানে বল-নাচের আসরে—গান, ফুল, নাচ, সম্রাট, এবং পিটার্সবুর্গের সব ঝকঝকে যুবকদের মধ্যে সেই সব আলোকিত উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে তার ভাগ্যে কি ঘটতে পারে। সেখানে যেসব ভাল ঘটনা ঘটতে পারে তা এই ঠাণ্ডা অন্ধকার আর গাড়ির

ভিড়ের সঙ্গে বেমানান যে বিশ্বাস করাই শক্ত। ফটকের লাল কার্পেটের উপর পা ফেলে সে যখন হল-ঘরে ঢুকল, লোমের জোব্বাটা খুলে ফেলল, এবং সোনিয়াকে পাশে নিয়ে মার আগে আগে উজ্জ্বল আলোকিত সিঁড়ির ফুলে-ঢাকা ধাপগুলিতে পা দিতেই সে যেন বুঝতে পারল বল-নাচে তাকে কিভাবে চলতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবেশে যে গাম্ভীর্যপূর্ণ ভঙ্গিমা একটি মেয়ের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে হল নিজের আচরণে সেই ভঙ্গিমাটি ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হল।

নাতাশা আয়নায় নিজেকে দেখতে পেল, কিন্তু অন্যের প্রতিচ্ছবি থেকে নিজেকে আলাদা করে চিনতেই পারল না। সব যেন মিলেমিশে একটা মিছিলের সামিল হয়ে গেছে। নাচঘরে ঢুকে লোকের কলগুঞ্জন, পায়ের শব্দ, আর আপ্যায়নে তার কানে তালা লেগে গেল; আলোর ঝলমলানি তার চোখকে আরও বেশী করে ধাঁধিয়ে দিল। গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী আধ-ঘণ্টা ধরে দরজায় দাঁড়িয়ে একই কথা "আপনাকে দেখে খুসি হলাম" বলে সকলকেই অভ্যর্থনা করছে; সেই একইভাবে রস্তভদের ও পেরোন্‌স্কায়াকেও অভ্যর্থনা জানাল।

নাচঘরে অতিথিরা সম্রাটের প্রতীক্ষায় দরজার কাছে ভিড় জমিয়েছে। কাউণ্টেস নিজের জন্য ভিড়ের একেবারে সামনের সারিতে একটা জায়গা করে নিয়েছে। সব দেখেশুনে নাতাশা বুঝতে পারল, বেশ কয়েকজন তার কথা জিজ্ঞাসা করছে, তাকে দেখছে। সে আরও বুঝল, যারা তাকে দেখছে তারাই তাকে পছন্দ করছে; এতে তার মন বেশ শান্ত হল।

ভাবল, "কেউ কেউ আমাদেরই মত, আবার কেউ বা খারাপ।"

পেরোন্‌স্কায়া নাচের আসরে সমবেত বড় বড় লোকদের দিকে আঙুল বাড়িয়ে কাউণ্টেসকে দেখাচ্ছে।

"দেখতে পাচ্ছ? উনি হচ্ছেন হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত! ঐ যে পাকাচুল মাথায় লোকটি।"

হেলেনকে দেখিয়ে বলল, "এই তো এসে পড়েছে পিতার্সবুর্গের রাণী কাউণ্টেস বেজুখভা। কী সুন্দর! একেবারে মারিয়া আন্তনভ্‌নার সমকক্ষ। দেখ, যুবক-বৃদ্ধ সকলেই তাকে সম্মান দেখাচ্ছে। যেমন সুন্দরী, তেমনি চট-পটে·····লোকে বলে প্রিন্স—তার জন্য একেবারে পাগল। আর ঐ দুটিকে দেখ, দেখতে সুশ্রী না হলেও অনেকেই ওদের পিছনে ছোটে।"

সাদাসিধে পোশাকের মেয়েকে নিয়ে একটি মহিলা ঘরটা পার হয়ে গেল, তাদের দেখিয়েই পেরোন্‌স্কায়া শেষের কথাগুলি বলল।

কলাইকুর্তকে দেখিয়ে কাউণ্টেস তার পরিচয় জানতে চাইলে পেরোন্‌স্কায়া বলল, "আরে, উনি তো স্বয়ং ফরাসী রাষ্ট্রদূত! দেখ না, ঠিক যেন রাজা। যাই বল, ফরাসীরা মনোরম, খুব মনোরম। আর—এই তো

তিনি—সকলের সেরা সুন্দরী আমাদের মারিয়া আন্তনভ্না! কী সাদাসিধে পোশাক! চমৎকার! আর চশমা-পরা ঐ শক্তসমর্থ মানুষটি," পিয়েরকে দেখিয়ে সে বলতে লাগল, "উনি হলেন ভ্রাতৃসংঘের সদস্য। স্ত্রীর পাশে ওকে দাঁড় করিয়ে দেখ, মনে হবে যেন একটি ভাঁড়।"

নাতাশা সানন্দে পিয়েরের পরিচিত মুখের দিকে তাকাল। সে জানে, পিয়ের তাদেরই খোঁজ করছে, বিশেষ করে তার। সে কথা দিয়েছে, বল-নাচে উপস্থিত থেকে তার নাচের জুটি ঠিক করে দেবে।

কিন্তু তাদের কাছে আসবার আগেই পিয়ের একটি সুদর্শন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। লোকটির উচ্চতা মাঝারি, গায়ের রং গাঢ়, পরনে সাদা ইউনিফর্ম; জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে তারকা ও ফিতেয় সজ্জিত একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। সাদা ইউনিফর্মের বেঁটে যুবকটিকে দেখেই নাতাশা চিনতে পারল: সে বল্‌কন্‌স্কি; নাতাশার মনে হল সে আগের চাইতে আরও কমবয়সী, আরও সুখী, এবং আরও সুদর্শন হয়ে উঠেছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখিয়ে নাতাশা বলল, "দেখতে পাচ্ছ মামণি, আরও একজনকে আমরা চিনি—বল্‌কন্‌স্কি? তোমার মনে আছে অত্রাদ্‌নুয়-তে একটা রাত সে আমাদের বাড়িতে কাটিয়েছিল?"

পেরোন্‌স্কায়া বলল, "আরে, তোমরা ওকে চেন? আমি ওকে সহ্য করতে পারি না। এখন তো ভাল-মন্দ আবহাওয়া সবই ওর উপর নির্ভর করে। লোকটি বড়ই অহংকারী। ঠিক বাবার মত। স্পেরোন্‌স্কির সঙ্গে খুব দহরম-মহরম, কোন-না-কোন প্রকল্প লেখার কাজ নিয়েই আছে। দেখ না, মহিলাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে। যেই কেউ কথা বলতে যাচ্ছে অমনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আমার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলে ঢিট করে দিতাম।"

অধ্যায়—১৬

হঠাৎ সকলে নড়েচড়ে উঠল, কথা বলতে শুরু করল, একবার এগিয়ে গেল, আবার পিছিয়ে এল, এবং এইভাবে সমবেত সকলে দুই দিকে সরে যাওয়ায় তার ভিতর দিয়ে সম্রাট প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে বাজনা শুরু হয়ে গেল। তার পিছনেই প্রবেশ করল গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রী। একবার ডাইনে, একবার বাঁয়ে মাথা নোয়াতে নোয়াতে সম্রাট দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল, যেন অভ্যর্থনার প্রাথমিক মুহূর্তগুলিকে তাড়াতাড়ি শেষ করাই তার ইচ্ছা। "আলেক্সান্দার, এলিসাবেতা, আমাদের সকলের হৃদয় আপনি হরণ করেছেন" —এই কথার তালে তালে তৎকালে প্রচলিত পলোনেস-এর ব্যাণ্ড বাজতে লাগল। সম্রাট বসবার ঘরে চলে গেল; একদল লোক উত্তেজিত মুখে সেখানে ঢুকেই আবার পিছিয়ে এল। সাজপোশাকের ক্ষতি হবে জেনেও

কিছু মহিলা ভদ্রতার সীমা ভুলে গিয়ে সেইদিকে এগিয়ে গেল। এদিকে পুরুষরা যার যার জুটি বেছে নিয়ে পলোনেস-নাচের জন্য জায়গা বেছে নিতে শুরু করে দিল।

সকলে সরে দাঁড়াল; গৃহকর্ত্রীর হাত ধরে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল সম্রাট; তার পা তখন আর বাজনার তালে তালে পড়ছে না। তাদের পিছনে গৃহকর্তা ঢুকল মারিয়া আন্তনভ্না নারিস্কিনাকে সঙ্গে নিয়ে; তারপর একে একে ঢুকল যত রাষ্ট্রদূত, মন্ত্রী ও সেনাপতির দল; পেরোন্স্কায়া অনেক কষ্টে তাদের প্রত্যেকের নাম বলে যেতে লাগল। বেশীর ভাগ মহিলা ইতিমধ্যে তাদের জুটি বেছে নিয়ে পলোনেস-নাচের জন্য তৈরি হয়ে গেছে। নাতাশার মনে হল, কেউ তাকে নাচে ডাকবে না; যে অল্পকিছু মহিলা দেয়ালের কাছে ভিড় করে আছে মা ও সোনিয়াকে নিয়ে তাকেও সেখানেই পড়ে থাকতে হবে। দুর্বল হাত দুটি নামিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল, তার অনুন্নত বুকটা নিয়মিত উঠছে-নামছে, রুদ্ধশ্বাসে ভীত, চকিতদৃষ্টি সম্মুখে প্রসারিত করে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন চূড়ান্ত সুখ বা দুঃখের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছে। সম্রাটকে নিয়ে, অথবা যেসব মহারথীদের নাম পেরোন্স্কায়া ঘোষণা করছে তাদের নিয়ে তার কোন মাথাব্যথা নেই—তার মনে একটিমাত্র চিন্তা: "এও কি সম্ভব যে কেউ আমাকে ডাকবে না, প্রথম যারা নাচবে তাদের একজন আমি হতে পারব না? এও কি সম্ভব যে এত লোকের মধ্যে একজনও আমার দিকে নজর ফেরাবে না? মনে হচ্ছে, তারা যেন আমাকে দেখতেই পাচ্ছে না, অথবা দেখতে পেলেও তারা এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন বলতে চাইছে: আহা, আমি যাদের খুঁজছি এ তো তাদের কেউ নয়, কাজেই তার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই! না, এ অসম্ভব। নাচবার যে আমার কত ইচ্ছা, আমি যে কী চমৎকার নাচতে পারি, আমার সঙ্গে নাচলে তাদের যে কত ভাল লাগবে, এসব তাদের জানাতেই হবে।"

পলোনেস এর যে সুর অনেকক্ষণ ধরে বাজছে এবার যেন সেটা নাতাশার কানে দুঃখের স্মৃতি হয়ে বাজতে শুরু করেছে। তার কান্না পেল। পেরোন্স্কায়া তাদের রেখে অন্যত্র গেছে। কাউন্ট গেছে ঘরের অপর কোণে। সে, কাউন্টেস ও সোনিয়া যেন একলা দাঁড়িয়ে আছে একটা গভীর জঙ্গলের মধ্যে, চারদিকে অপরিচিত মানুষের ভিড়, তাদের প্রতি কারও কোন আগ্রহ নেই, কেউ তাদের চাইছে না। একটি মহিলাকে নিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু পাশ দিয়ে চলে গেল, তাদের চিনতেই পারল না। সুদর্শন আনাতোল সঙ্গিনীকে বাহুবন্ধনে ধরে তার সঙ্গে কথা বলছে, আর এমনভাবে নাতাশার দিকে তাকাচ্ছে যেন সে একটা দেয়ালমাত্র। বরিস দুবার তাদের পাশ দিয়ে গেল, প্রতিবারই মুখটা ঘুরিয়ে নিল। বের্গ ও তার স্ত্রী তাদের দিকে এগিয়ে এল।

এই পারিবারিক জমায়েতটা নাতাশার কাছে অসম্মানকর মনে হতে

লাগল—যেন কথা বলবার জন্য তাদের এখানে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভেরা নিজের সবুজ পোশাকটা সম্পর্কে কি যেন বলছিল, নাতাশা তাতে কানই দিল না।

অবশেষে সম্রাট তার শেষ কুটির পাশে থেমে গেল (তিনজনের সঙ্গে তার নাচ হয়ে গেছে) ; সঙ্গে সঙ্গে বাজনাও থেমে গেল। একজন বিব্রত এড্-ডি-কং রস্তভদের কাছে ছুটে এসে তাদের আরও পিছনে সরে যেতে বলল, অথচ তারা তখন প্রায় দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। গ্যালারি থেকে ভাল্স্-এর মধুর সুর ভেসে এল। সম্রাট হাসিমুখে নাচঘরের দিকে তাকাল। এক মিনিট পার হয়ে গেল, কিন্তু কেউ নাচ শুরু করল না। একজন এড্-ডি-কং কাউণ্টেস বেজুখভার কাছে গিয়ে তাকে নাচতে বলল। সেও হেসে তার কাঁধে হাত রাখল, একবার ফিরেও দেখল না সে কে। এড্-ডি-কংটি নাচের ব্যাপারে খুব ওস্তাদ; সঙ্গিনীটির কোমরটাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রথমে ধীরে ধীরে বৃত্তের প্রান্ত ঘেঁসে একপাক ঘুরে নিয়ে ঘরের একটা কোণে গিয়ে হেলেনের বাঁ হাতটা ধরে তাকে ঘুরিয়ে দিল; দ্রুততালের বাজনার শব্দ ছাড়া একমাত্র শব্দ শোনা যেতে লাগল তার কাঁটা-মারা জুতোর অনায়াস সহজ গতির সুরেলা ঠুক-ঠুক আওয়াজ, আর প্রতি তৃতীয় তালটির সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গিনীটি ঘুরে যেতে লাগল এবং তার ভেলভেটের পোশাক বাতাসে উড়তে লাগল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নাতাশার কান্না পেয়ে গেল, কারণ "ভাল্স্"-নাচের প্রথম নাচটাও তার কপালে জুটল না।

অশ্বারোহী কর্ণেলের সাদা ইউনিফর্ম, মোজা ও নাচের জুতো পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু রস্তভদের থেকে অনেক দূরে দীপ্ত মুখে একেবারে সামনের সারিতেই দাঁড়িয়েছিল। পরের দিন রাষ্ট্রীয় পরিষদের যে প্রথম অধিবেশন বসবে সে সম্পর্কে ব্যারণ ফিবুহপ তার সঙ্গে কথা বলছিল। প্রিন্স আন্‌দ্রু কিন্তু ফিবুহপের কথায় কান না দিয়ে একবার সম্রাটকে, আর একবার নাচে অংশগ্রহণেচ্ছু লোকদেরই দেখছিল।

পিয়ের এগিয়ে এসে তার হাত ধরল।

"তুমি তো সর্বত্রই নাচ। এখানে আমার একটি পরিচিতা আছে—তরুণী রস্তভা। তাকে ডেকে নাও," সে বলল।

"কোথায় তিনি?" বল্‌কন্‌স্কি শুধাল; তারপর ব্যারণের দিকে ঘুরে বলল, "মাফ করবেন—ও আলোচনাটা অন্য সময় শেষ করা যাবে—বলনাচে এসে নাচটাই আগে।" পিয়েরের ইঙ্গিতে সে এগিয়ে গেল। নাতাশার মুখের হতাশ, বিষণ্ণ ভাবটা তার চোখে পড়ল। সে নাতাশাকে চিনতে পারল, তার মনের কথাটা অনুমানে বুঝে নিল, বুঝল যে এ ধরনের আসরে এই তার প্রথম আবির্ভাব, জানালার পাশে তার কথাগুলি মনে পড়ল, মুখে

একটা খুসির ভাব ফুটিয়ে সে কাউন্টেস রস্তভার দিকে এগিয়ে গেল।

কাউন্টেস বলল, "আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

তার কঠোর ব্যবহার সম্পর্কে পেরোন্‌স্কায়ার মন্তব্যকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণ করে দিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথাটা নীচু করে অভিবাদন জানিয়ে বলল, "কাউণ্টেসের যদি স্মরণ থেকে থাকে তো বলি, পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার আগেই হয়েছে।" নাতাশার দিকে এগিয়ে গিয়ে নাচের আমন্ত্রণ জানানোর কাজটা শেষ না করেই সে নাতাশার কোমর জড়িয়ে ধরবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল। "ভাল্‌স্‌" নাচের আমন্ত্রণ। নাতাশার মুখের কাঁপা ভাবটা সরে গিয়ে হঠাৎ সেখানে ফুটে উঠল সকৃতজ্ঞ খুসির শিশুর মত হাসি।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাঁধে হাতটা রাখতে গিয়ে শংকার চোখের জলের পরিবর্তে যে হাসি সে হাসল তা যেন বলতে চাইল, "তোমার জন্য আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছি।" নাচের আসরে প্রবেশকারী তারাই দ্বিতীয় জুটি। প্রিন্স আন্‌দ্রু সেসময়কার শ্রেষ্ঠ নাচিয়েদের একজন, আর নাতাশাও চমৎকার নাচে। সাটিনের নাচের জুতো পরা তার ছোট পা দু'খানি দ্রুত লয়ে, হাল্কা চালে নাচতে লাগল, আর তার মুখটা উচ্ছ্বসিত আনন্দে ঝলমল করতে লাগল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু নাচতে ভালবাসে; রাজনৈতিক ও চটুল আলোচনায় সকলে তাকে যেভাবে ঘিরে ধরেছিল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার হাত থেকে পালাবার জন্যই সে নাচতে শুরু করেছে, আর পিয়ের নাতাশাকে দেখিয়ে দিয়েছে বলেই সে তাকে বেছে নিয়েছে; তাছাড়া, এই সুন্দরী মেয়েটিই প্রথম তার চোখেও পড়েছে; কিন্তু তার সেই নরম, ক্ষীণ তনুটিকে জড়িয়ে ধরে, তার দেহের নৈকট্য অনুভব করে ও এত কাছে থেকে তাকে হাসতে দেখে নাতাশার আকর্ষণের সুরা যেন একেবারে তার মাথায় উঠে গেল, এবং নাচের শেষে তাকে ছেড়ে দিয়ে সে যখন জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অন্যদের নাচ দেখতে লাগল তখন তার মনে হল সে বুঝি নতুন জন্ম, নবীন যৌবন লাভ করেছে।

অধ্যায়—১৭

প্রিন্স আন্‌দ্রুর পরে বরিস এসে নাতাশাকে তার সঙ্গে নাচতে বলল, তারপর এল সেই এড্‌-ডি-কং যে আসরের উদ্বোধন করেছিল, আর তারপরে আরও কয়েকটি যুবক; ফলে বাড়তি জুটিদের সোনিয়াকে দিয়ে রক্তিম মুখে, খুসিভরা মনে নাতাশা সারাটা সন্ধ্যা একটানা নেচে গেল। অন্য কে কি করল না করল সে-দিকে সে চোখ-কান কিছুই দিল না। আহারের আগে একটা মজার সমবেত নাচে প্রিন্স আন্‌দ্রু আবার তার জুটি হল। সেইসময় প্রিন্স

আন্‌দ্রু নাতাশাকে স্মরণ করিয়ে দিল, অত্রাদ্‌নুর পথে তাদের প্রথম দেখা হয়েছিল, সেই জ্যোৎস্না রাতে নাতাশা একটুও ঘুমতে পারে নি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তার সব কথা সে লুকিয়ে শুনে ফেলেছিল। সেসব কথা মনে পড়ায় নাতাশার মুখ লাল হয়ে উঠল, যেন এর মধ্যে লজ্জা পাবার মত কিছু আছে।

যেসব পুরুষ মানুষ সমাজের উঁচু মহলের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে তাদের সকলের মতই প্রিন্স আন্‌দ্রুও এমন কাউকেই পছন্দ করে যার উপর তথা-কথিত সমাজের ছাপ পড়ে নি। ঠিক তেমনি মেয়ে নাতাশা; তার বিস্ময়, তার খুসি, তার লজ্জা, এমন কি তার ভুল করে ফরাসী বলাটাও আন্‌দ্রুর পছন্দ। বিশেষ যত্ন ও আদরের সঙ্গে সে নাতাশার সঙ্গে ব্যবহার করল, তার পাশে বসে খুব সরল ও সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করল, তার চোখের দৃষ্টি ও মুখের হাসির সানন্দ উজ্জ্বলতার প্রশংসা করল। অপর একজন নাচিয়ে যখন তাকে বেছে নিয়ে ঘরময় নাচতে লাগল তখনও প্রিন্স আন্‌দ্রু তার সলজ্জ মাধুর্যের প্রশংসা করতে লাগল। মজলিসের মাঝামাঝি সময়ে নাতাশা যখন হাঁপিয়ে উঠে তার আসনে ফিরে যাচ্ছিল তখন আর একটি নাচিয়ে এসে তাকে নাচতে ডাকল। নাতাশা তখন ক্লান্ত, হাঁপাচ্ছে, একবার ভাবল লোকটিকে ফিরিয়ে দেবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হেসে লোকটির কাঁধে হাত রাখল।

"আপনার পাশে বসে একটু বিশ্রাম নিতে পারলে খুসি হতাম: আমি ক্লান্ত; কিন্তু দেখছেন তো সকলেই আমাকে নাচতে ডাকছে, আর সেটা আমার ভালই লাগছে। আমি খুসি, সকলকেই ভালবাসি, আপনি আর আমিই তো একথা জানি।" মুখের কথার চাইতে তার হাসিটিই অনেক বেশী কথা বলল। সঙ্গীটি চলে গেলে সে দুটি মহিলাকে বেছে নিতে ছুটে গেল।

"সে যদি প্রথমে তার জ্ঞাতি দিদির কাছে যায় এবং তারপরে যায় অন্য মহিলাটির কাছে তাহলে সে আমার স্ত্রী হবে," মনে মনে কথাটা বলেই প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল। নাতাশা কিন্তু প্রথমে দিদির কাছে গেল না।

"এক এক সময় কী যে আজেবাজে কথা মাথার মধ্যে ঢোকে!" প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "কিন্তু একটা কথা ঠিক যে মেয়েটি এতই মনোরমা, এতই কচি যে একমাস নাচবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যাবে⋯⋯ওর মত মেয়ে এখানে বিরল।" বডিসের উপর থেকে খসেপড়া গোলাপটাকে ঠিক জায়গায় আটকাতে আটকাতে নাতাশা তার পাশেই এসে বসল।

মজলিস শেষ হয়ে গেলে বুড়ো কাউন্ট তার নীল কোট পরে নাচিয়েদের কাছে এল। প্রিন্স আন্‌দ্রুকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাল, আর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল তার বেশ ভাল লেগেছে কি না। নাতাশা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না, শুধু মুখ তুলে হাসল; সে হাসি যেন তিরস্কার করে

বলল : "এরকম প্রশ্ন তুমি করলে কেমন করে ?"

মুখে বলল, "এত ভাল আগে আর কখনও লাগে নি !" প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল, তার সরু হাত দুটি বাবাকে আলিঙ্গন করতে উঠেই আবার তৎক্ষণাৎ নেমে গেল। আজ নাতাশা যত সুখী হয়েছে এমনটা জীবনে আর কখনও হয় নি। সেই সুখের স্বর্গে সে উঠে গেছে যেখানে গেলে মানুষ সম্পূর্ণরূপে সদয় ও সৎ হয়ে ওঠে ; পাপ, সুখের অভাব অথবা দুঃখের সম্ভাবনাকে পর্যন্ত বিশ্বাস করে না।

দরবার মহলে তার স্ত্রীর যে স্থান তা দেখে এই বল-নাচেই পিয়েরের সব-প্রথম খুব অপমানিত বোধ করল। সে যেন কেমন বিষণ্ণ ও উদাসীন হয়ে পড়ল। তার কপাল জুড়ে একটা গভীর খাঁজ দেখা দিল ; জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সে চশমার ফাঁক দিয়ে দূরে তাকিয়ে রইল, কিন্তু কারও দিকে নজর দিল না।

খেতে যাবার পথে নাতাশা তার পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়েরের বিষণ্ণ, দুঃখী দৃষ্টি দেখে থমকে দাঁড়াল। পিয়েরকে সাহায্য করবার, নিজের সুখের প্রাচুর্য দিয়ে তাকে ঢেকে রাখবার বাসনা জাগল মনে।

বলল, "কী সুখের ব্যাপার ! তাই না কাউন্ট ?"

তার কথার অর্থ না বুঝেই পিয়ের অন্যমনস্কভাবে হাসল।

"হ্যাঁ, আমি খুব খুসি," সে বলল।

নাতাশা ভাবল, "কোনকিছু নিয়ে মানুষ অখুসি হয় কেমন করে ? বিশেষ করে বেজুখভের মত এমন একজন বড়দরের মানুষ !" নাতাশার চোখে নাচের আসরের সব মানুষই সমান ভাল, দয়ালু ও সহৃদয় ; সকলেই পরস্পরকে ভালবাসে ; কেউ কারও ক্ষতি করতেই পারে না—আর তাই সকলেরই সুখী হওয়া উচিত।

অধ্যায়—১৮

পরদিন প্রিন্স আন্‌দ্রু বল-নাচের কথা চিন্তা করতে লাগল, কিন্তু সে চিন্তা বেশীক্ষণ তার মনে থাকল না। "হ্যাঁ, নাচের আসরটা চমৎকার হয়েছিল, আর তার পরেই…"হ্যাঁ, ছোট্ট রস্তভা খুবই মনোরমা। তার মধ্যে এমন কিছু তাজা, কচি ও পিতার্সবুর্গ-অসুলভ ভাব আছে যেটা একান্তভাবে তারই বৈশিষ্ট্য।" গতকালের নাচের ব্যাপারে তার ভাবনা-চিন্তা ওই পর্যন্তই ; তার পরেই সকালের চা খেয়ে সে কাজে মন দিল।

কিন্তু ক্লান্তির জন্যই হোক আর অনিদ্রার জন্যই হোক, কাজে মন বসল না ; ফলে কোন কাজই হল না। সে বসে বসে নিজের কাজের সমালোচনা শুরু করল, আর ঠিক তখনই কারও আসার শব্দ শুনে খুসি হয়ে উঠল।

আগন্তুক বিৎস্কি; লোকটি নানা কমিটিতে কাজ করে, পিতার্সবুর্গের সব-রকম মহলে চলাফেরা করে, নতুন ধ্যান-ধারণা ও স্পেরান্‌স্কির একজন অনুরাগী ভক্ত, এবং পিতার্সবুর্গের পরিশ্রমী সংবাদসংগ্রাহকদের একজন। কোনরকমে টুপিটা রেখেই সে ছুটে গেল প্রিন্স আন্‌দ্রুর ঘরে; সঙ্গে সঙ্গে বক্‌বক্‌ করতে শুরু করল। রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রাতঃকালীন অধিবেশন ও সম্রাট কর্তৃক উদ্বোধনের কথা সে এইমাত্র শুনে এসেছে; সেই কথাই সে সবিস্তারে বলতে লাগল। সম্রাট একটি অসাধারণ ভাষণ দিয়েছে। এ রকম ভাষণ একমাত্র নিয়মতান্ত্রিক সম্রাটরাই দিতে পারে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আজকের ঘটনা একটি যুগান্তের সূচনা করেছে, এটি আমাদের ইতিহাসের সবচাইতে যুগান্তকারী ঘটনা," এই বলে সে শেষ করল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু মন দিয়ে সব কথা শুনল। একটা খুব সহজ চিন্তা তার মনে এল: "রাষ্ট্রীয় পরিষদে সম্রাট দয়া করে কি বললেন তাতে আমার বা বিৎস্কির কি যায়-আসে? এতে কি আমার সুখ বাড়বে, না ভাল কিছু হবে?"

এই সহজ চিন্তাটি সহসা আসন্ন সংস্কার-প্রচেষ্টাগুলি সম্পর্কে প্রিন্স আন্‌দ্রুর সব আগ্রহকে নষ্ট করে দিল। সেদিন সন্ধ্যায় অল্প কয়েকজন বন্ধুসহ তার স্পেরান্‌স্কির বাড়িতে খাবার কথা আছে। যে মানুষটিকে সে এত শ্রদ্ধা করে তার গৃহ-পরিবেশে এই ভোজনের ব্যবস্থার প্রতি প্রিন্স আন্‌দ্রুর অপরিসীম আগ্রহ ছিল, বিশেষত আজ পর্যন্ত সে স্পেরান্‌স্কিকে তার পারিবারিক পরিবেশে কখনও দেখে নি, কিন্তু এখন তার মনে সেখানে যাবার ব্যাপারে একটা অনিচ্ছা দেখা দিল।

যাইহোক, নির্দিষ্ট সময়ে সে স্পেরান্‌স্কির "তারিদা গার্ডেন্স"-এর সাধারণ বাড়িটাতে হাজির হল। বাড়িটা ছোট হলেও খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (একটা মঠের কথা মনে করিয়ে দেয়)। প্রিন্স আন্‌দ্রুর একটু দেরি হয়ে গেছে; সে যখন ঢুকল ততক্ষণে পাঁচটা নাগাদ পরিচিত বন্ধুজনরা এসে গেছে। স্পেরান্‌স্কির ছোট মেয়ে ও তার শিক্ষয়িত্রী ছাড়া অন্য কোন মহিলা সেখানে ছিল না। বাইরের ঘরে থাকতেই উঁচু গলার কথাবার্তা এবং একটা উচ্চ-গ্রামের হাসি—যে ধরনের হাসি রঙ্গমঞ্চেই শোনা যায়—প্রিন্স আন্‌দ্রুর কানে এল। কে যেন—গলাটা স্পেরান্‌স্কির বলেই মনে হল—হো-হো করে হাসছে। স্পেরান্‌স্কির বিখ্যাত হাসি প্রিন্স আন্‌দ্রু আগে কখনও শোনে নি; একজন কূটনীতিকের গলায় এমন কলকণ্ঠ, জোরালো হাসি তার মনে একটা অদ্ভুত ভাবের সৃষ্টি করল।

সে খাবার ঘরে ঢুকল। দুটো জানালার মাঝখানে ছোট টেবিলটাকে ঘিরে সকলেই দাঁড়িয়ে আছে।

হাসতে হাসতেই স্পেরান্‌স্কি তার নরম সাদা হাতটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর

দিকে বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আপনাকে দেখে খুসি হলাম প্রিন্স। এক মিনিট···" অন্যদের দিকে ফিরে সে বলল, "আমরা একমত যে এই ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে আমোদ-প্রমোদের জন্য, কাজকর্মের একটা কথাও এখানে বলা হবে না!" এই বলে সে আবার হাসতে লাগল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বিস্ময়, বিষাদ ও মোহভঙ্গের সঙ্গে হাস্যমুখর স্পেরান্‌স্কিকে দেখতে লাগল। তার মনে হল এ যেন স্পেরান্‌স্কি নয়, অন্য কেউ। এর আগে স্পেরান্‌স্কির যাকিছু তার কাছে মনে হত রহস্যময় ও আকর্ষণীয়, হঠাৎ সে সবকিছুই অতি সাধারণ হয়ে উঠল, তার কোন আকর্ষণই রইল না।

খাবার সময় মুহূর্তের জন্যও কথার বিরাম ঘটল না; মনে হল কোন হাসি তামাসার বইয়ের পাতা থেকে বুঝি সকলেই কথা বলছে। প্রিন্স আন্‌দ্রুও বারকয়েক আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার কথাগুলিকে প্রতিবারই একপাশে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। তাদের মত করে তামাসা করতে সে জানে না।

ডিনারের পরে স্পেরান্‌স্কির মেয়ে ও তার শিক্ষয়িত্রী উঠে পড়ল। সাদা হাতে মেয়ের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সে তাকে চুমো খেল। এ ভঙ্গীটাও প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে অস্বাভাবিক ঠেকল।

অন্য সকলে টেবিলেই বসে থাকল সামনে পোর্টের বোতল নিয়ে—এটাই ইংরেজী কেতা। নেপোলিয়নের স্পেনসংক্রান্ত ব্যাপারের আলোচনায় সকলেই তাকে সমর্থন করলেও প্রিন্স আন্‌দ্রু ভিন্ন মত প্রকাশ করল। স্পেরান্‌স্কি একটু হাসল, আর আলোচনাটা যাতে অপ্রীতিকর হয়ে না উঠতে পারে সেজন্য এমন একটা গল্প বলতে শুরু করল যার সঙ্গে পূর্বের আলোচনার কোন সম্পর্কই ছিল না। কয়েক মিনিট সকলেই চুপচাপ রইল।

আরও কিছুক্ষণ টেবিলে বসে থেকে কথা বলতে বলতে সকলে বসবার ঘরে গেল। জনৈক পত্রবাহক দুটো চিঠি দিল স্পেরান্‌স্কির হাতে। চিঠি নিয়ে সে পড়ার ঘরে চলে গেল। অতিথিরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে লাগল।

ফিরে এসে স্পেরান্‌স্কি বলল, "এবার আবৃত্তি হোক!" সঙ্গে সঙ্গে ম্যাগ্‌নিৎস্কি নামক অতিথিটি পিতার্সবুর্গের নানা খ্যাতনামা লোকদের নিয়ে ফরাসীতে তার নিজের লেখা হাসির কবিতাগুলো পর পর আবৃত্তি করতে লাগল। প্রশংসা-ধ্বনিতে বার বার তার আবৃত্তিতে বাধা পড়ল। আবৃত্তি শেষ হলে প্রিন্স আন্‌দ্রু স্পেরান্‌স্কির কাছে গিয়ে চলে যাবার অনুমতি চাইল।

"আপনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন কেন?" স্পেরান্‌স্কি শুধাল।

"একটা অভ্যর্থনা-সভায় যাব বলে কথা দিয়েছি।"

কেউ কিছু বলল না। সেই আয়নার মত স্বচ্ছ অথবা দুর্ভেদ্য চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে হল স্পেরান্‌স্কির কাছ থেকে বড় কিছুর প্রত্যাশা করাই তার ভুল হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই নিরানন্দ উচ্চহাসি তার কানে বাজতে লাগল।

বাড়ি পৌছে প্রিন্স আন্‌দ্রু গত চার মাসের পিতার্সবুর্গের জীবনের কথা ভাবতে বসল, যেন এটা তার কাছে একটা নতুন অভিজ্ঞতা। নিজের নানাবিধ সংস্কার-প্রচেষ্টা ও গণ্যমান্য লোকদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কথা মনে পড়ল। তারপর স্পষ্টরূপে মনে করতে চেষ্টা করল বোগুচারোভোর কথা, গ্রামে গিয়ে তার কাজকর্মের কথা, রিয়াজান যাত্রার কথা, সেখানকার চাষী ও গ্রাম-প্রধান দ্রোন-এর কথা। আর সঙ্গে সঙ্গে এখানে এইসব অদরকারী কাজে এত সময় কাটিয়েছে ভেবে সে অবাক হয়ে গেল।

অধ্যায়—১৯

পরদিন প্রিন্স আন্‌দ্রু এমন কয়েকটা বাড়িতে দেখা করতে গেল যেখানে আগে যাওয়া হয় নি। রস্তভদের বাড়িতেও গেল; বল-নাচের আসরে তাদের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় হয়েছে। ভদ্রতার খাতিরেও একবার যাওয়া দরকার, তাছাড়াও যে কচি মেয়েটি তার মনে একটা মধুর প্রভাব ছড়িয়েছে তার নিজের বাড়িতে তার সঙ্গে দেখা করার একটা ইচ্ছাও তার হল।

নাতাশার সঙ্গেই প্রথম দেখা হল। তার পরনে ছিল গাঢ় নীল রঙের ঘরোয়া পোশাক, তাতে এখন তাকে বল-নাচের পোশাক থেকেও ভাল লাগছে। সে ও রস্তভ পরিবারের অন্য সকলেই তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। যে পরিবারটিকে আগে সে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিল এখন তাদের সকলকেই চমৎকার, সরল, সদয় মানুষ বলে মনে হল। বুড়ো কাউণ্টের আতিথেয়তা ও সুন্দর স্বভাব প্রিন্স আন্‌দ্রুর এতই ভাল লাগল যে ডিনারে যোগদানের প্রস্তাবকে সে প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। মনে মনে বলল, "এরা চমৎকার লোক, কিন্তু নাতাশা যে কী বস্তু সেবিষয়ে ধারণাই এদের নেই। জীবন-রসে টই-টম্বুর এই কাব্যময়ী মনোরমা মেয়েটির উপযুক্ত পরিবেশই তারা রচনা করে আছে!"

ডিনারের পরে প্রিন্স আন্‌দ্রুর অনুরোধে নাতাশা ক্ল্যাভিকর্ডে গিয়ে গান গাইতে শুরু করল। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে প্রিন্স আন্‌দ্রু গান শুনতে লাগল। একটা কথার মাঝখানে সে হঠাৎ থেমে গেল, হঠাৎ তার মনে হয় কান্নায় গলা আটকে আসছে, অথচ সে জানত যে তার পক্ষে এটা অসম্ভব। সে তাকিয়ে নাতাশাকে গান গাইতে

দেখছে, আর একটা নতুন, আনন্দময় কি যেন তার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠছে। যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ তাকে আচ্ছন্ন করে দিল। কাঁদবার কোন কারণই ছিল না, অথচ কাঁদতেই সে চায়। কিসের জন্য? প্রাক্তন প্রিয়ার জন্য? ছোট প্রিন্সেসের জন্য? নিজের স্বপ্নভঙ্গের জন্য? ···ভবিষ্যতের জন্য? ···হ্যাঁ এবং না। এ অবস্থার প্রধান কারণ নিজের অন্তরের অসীম ও অন্তহীন মহত্ত্বের সঙ্গে তার, এমন কি নাতাশারও সীমিত ও বাস্তব সত্বার মধ্যে এক প্রচণ্ড বিরোধ। এই বিরোধই তার মনের উপর চেপে বসেছে, আবার গান শুনতে শুনতে তাকে উৎফুল্ল করে তুলেছে।

গান শেষ করে নাতাশা তার কাছে গিয়ে শুধাল, গলাটা তার কেমন লাগল। প্রশ্নটা করেই কেমন যেন বিব্রত বোধ করল, মনে হল প্রশ্নটা করা উচিত হয় নি। প্রিন্স আন্দ্রু তার দিকে তাকিয়ে হাসল; বলল, গান খুব ভাল লেগেছে; তার সবকিছুই তার ভাল লাগছে।

রস্তভদের বাড়ি থেকে বেশ দেরি করেই প্রিন্স আন্দ্রু বাড়ি ফিরল। অভ্যাসবশতই শুতে গেল, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল যে ঘুম আসবে না। মোমবাতি জ্বালিয়ে বিছানায় উঠে বসল, তারপর উঠল, আবার শুয়ে পড়ল: ঘুম আসছে না বলে মনে কোন কষ্টই নেই: তার মনটা এতই তাজা ও আনন্দে ভরপুর যেন একটা দমবন্ধ-করা ঘর থেকে ঈশ্বরের খোলা হাওয়ায় সে পা ফেলেছে। সে যে নাতাশার প্রেমে পড়েছে সেকথা তার মাথায়ই ঢোকে নি, নাতাশার কথাই সে ভাবছে না, নিজের মনে শুধু তার ছবি আঁকছে, আর তাতেই তার সারা জীবন নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে। নিজের মনেই বলল, "একটা জীবন, একটা গোটা জীবন যখন এত আনন্দ নিয়ে আমার সামনে অবারিত রয়েছে, তখন এই সংকীর্ণ, বদ্ধ দেহের খাঁচার মধ্যে কেন আমি পরিশ্রম করছি, সংগ্রাম করছি?" আর দীর্ঘকালের মধ্যে এই প্রথম সে ভবিষ্যতের মধুর পরিকল্পনা রচনায় মেতে উঠল। স্থির করল, একজন শিক্ষক জোগাড় করে ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবে, তারপর চাকরি থেকে অবসর নিয়ে বিদেশে যাত্রা করবে, দেখবে ইংলণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড ও ইতালি। মনে মনে বলল, "এত শক্তি ও যৌবন যখন আমার মধ্যে রয়েছে তখন আমি স্বাধীনভাবেই চলব। পিয়ের যথার্থই বলে যে সুখী হতে হলে সুখের সম্ভাবনায় বিশ্বাস রাখতেই হবে; এখন তার সেকথা আমি বিশ্বাস করি। যাকিছু মৃত তা কবরে যাক, যার জীবন এখনও আছে সে বাঁচুক, সুখী হোক!"

অধ্যায়—২০

পিয়েরের পরিচিত কর্ণেল অ্যাডল্‌ফ্‌ বের্গ একদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে এল। তার পরনে আনকোরা নতুন ইউনিফর্ম, পমেড মাখানো

চুল সম্রাট আলেক্সান্দারের কেতায় পিছন দিকে বুরুশ করা।

একটু হেসে বলল, "এইমাত্র আপনার স্ত্রী কাউণ্টেসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দুঃখের বিষয় তিনি আমার অনুরোধ রাখলেন না, কিন্তু আমি আশা করি আপনার বেলায় আমার ভাগ্য প্রসন্নই হবে।"

"আপনি কি চান কর্ণেল? আপনার সেবায় আমি প্রস্তুত।"

"দেখুন কাউণ্ট, সবেমাত্র আমার নতুন বাসায় স্থিতি হয়ে বসেছি, তাই আমার ইচ্ছা আমার নিজের ও আমার স্ত্রীর বন্ধুদের নিয়ে একটা ছোট পার্টির আয়োজন করি। কাউণ্টেসকে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি যেন চায়ে ও নৈশভোজে যোগ দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেন।"

বের্গদের মত লোকদের নীচু জগতের লোক মনে করে তাদের আমন্ত্রণকে প্রত্যাখ্যান করার মত নিষ্ঠুরতা একমাত্র কাউণ্টেস হেলেনের পক্ষেই সম্ভব। বের্গের সব কথা শুনে পিয়ের আপত্তি করতে পারল না, যাবে বলে কথা দিল।

"কিন্তু দেরি করবেন না কাউণ্ট; যদি অভয় দেন তো বলি: দয়া করে আটটা বাজবার দশ মিনিট আগেই আসুন। এক 'রাবার' খেলা হতে পারবে। আমাদের সেনাপতিও আসছেন। তিনি আমার প্রতি খুব সদয়। রাতের খাবার ব্যবস্থাও থাকবে। কাজেই এটুকু অনুগ্রহ আমাকে করবেন।"

কোথাও যেতে পিয়ের সাধারণতই দেরি করে থাকে, কিন্তু সেদিন সে বের্গদের বাড়িতে পৌঁছল আটটার দশ মিনিট নয়, পনেরো মিনিট আগে।

পার্টির সব উদ্যোগ-আয়োজন শেষ করে বের্গ-দম্পতি অতিথিদের আগমনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। ছোট ছোট আবক্ষ মূর্তি, ছবি ও আসবাবে সুসজ্জিত নতুন ও পরিচ্ছন্ন পড়ার ঘরে বের্গ ও তার স্ত্রী বসেছিল। বোতাম আটকানো নতুন ইউনিফর্ম পরে স্ত্রীর পাশে বসে বের্গ তাকে বোঝাচ্ছিল, মাথার উপরকার লোকদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করাই উচিত, কারণ একমাত্র তাতেই আলাপ-পরিচয়ে মজাটা ভোগ করা যায়।

"সেখানে তুমি কিছু জানতে পার, কিছু চাইতে পার। এই দেখ না, আমার প্রথম পদোন্নতিটা কিভাবে বাগিয়েছি (বের্গ জীবনটাকে মাপে পদোন্নতি দিয়ে, বছর দিয়ে নয়)। আমরা সহকর্মীরা এখনও কিছুই হতে পারি নি, অথচ একটা রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার হবার জন্য আমি শুধু একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছি, আর তোমার স্বামী হবার সুখলাভ করেছি। এসব কি করে পেলাম? প্রধানত কাদের সঙ্গে পরিচয় করব সেটা জানি বলেই। অবশ্য উপরে উঠতে হলে যে বিবেকবান ও শৃংখলাপরায়ণ হতে হবে সেকথা তো বলাই বাহুল্য।"

সে যে এই দুর্বল নারীটির অনেক উপরের মানুষ একথা ভেবে বের্গ একটু হাসল; ভাবল, তার এই দুর্বল স্ত্রীটি জানেই না মানুষের মর্যাদা কাকে বলে,

কাকে বলে মানুষ হওয়া। ওদিকে বিবেকবান স্বামীর তুলনায় সে যে অনেক উপরের মানুষ একথা ভেবে ভেরাও হাসতে লাগল; ভাবল, সব পুরুষ মানুষের মতই সেও জীবনটাকে ভুলই বুঝেছে। স্ত্রীকে দিয়ে বিচার করে বের্গ মনে করে যে সব নারীই দুর্বল ও নির্বোধ। স্বামীকে দিয়ে বিচার করে ভেরাও মনে করে যে যদিও পুরুষরা কিছুই বোঝে না, যদিও তারা দাম্ভিক ও স্বার্থপর, তবু ভাবে যে একমাত্র তারাই সাধারণ বুদ্ধির অধিকারী।

বের্গ উঠে সযত্নে স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল, তার ঠোঁটে চুমো খেল।

অবচেতন মনের একটা চিন্তার জের টেনে বলল, "একমাত্র কথা হল অচিরেই আমাদের সন্তানলাভ করা চাই।"

ভেরা জবাব দিল, "আমি সেটা মোটেই চাই না। আমাদের বাঁচতে হবে সমাজের জন্য।"

স্ত্রীর ত্রিকোণ গলবন্ধটা দেখিয়ে খুসির হাসি হেসে বের্গ বলল, "প্রিন্সেস ইউসুপোভাও ঠিক এইরকম একটা পরেছিল।"

ঠিক তখনই কাউণ্ট বেজুখভের আগমন ঘোষণা করা হল। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে তাকাল, আত্মসন্তুষ্ট ভঙ্গীতে দুজনই হাসল, প্রত্যেকেই মনে মনে এই আগমনের সম্মানটা দাবী করল।

তারা নতুন ছোট বসার ঘরে বেজুখভকে স্বাগত জানাল। অনতিবিলম্বেই এসে হাজির হল বের্গের পুরনো সহকর্মী বরিস। বের্গ ও ভেরার প্রতি তার আচরণে কিছুটা করুণা প্রকাশ পেল। বরিসের পরেই কর্ণেলকে সঙ্গে নিয়ে একটি মহিলা এল, তারপর স্বয়ং সেনাপতি এবং তারও পরে এল রস্তভরা। আর সব মিলিয়ে এ মজলিসটা হয়ে উঠল অন্য যেকোন সান্ধ্যমজলিসেরই মত। সেনাপতি বসল কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভের পাশে। বুড়োরা বসল বুড়োদের দলে, যুবকরা যুবকদের দলে, আর গৃহকর্ত্রী বসল চায়ের টেবিলে; সে টেবিলেও অন্য সব মজলিসের মতই রূপোর ঝুড়িতে সেই একইরকম কেক। অন্য সর্বত্র যেমনটি হয়ে থাকে এখানেও সববিছু ঠিক সেইরকম।

অধ্যায়—২১

অন্যতম প্রধান অতিথি হিসাবে কাউণ্ট রস্তভ, সেনাপতি ও কর্ণেলের সঙ্গে পিয়েরকেই বস্টন-এর (একধরনের তাসখেলা, অনেকটা ব্রীজ খেলার মত) টেবিলে বসতে হল। তাসের টেবিলে ঘটনাক্রমে তাকে বসতে হল নাতাশার একেবারে মুখোমুখি। সেদিনের বল-নাচের পরে আজ তার পরিবর্তন লক্ষ্য করে পিয়ের অবাক হয়ে গেল। সে চুপচাপ বসে আছে, চেহারায়ও সে জৌলুস নেই, আর সবকিছুতেই কেমন যেন উদাসীন।

তার দিকে তাকিয়ে পিয়ের ভাবল, "ওর হয়েছে কি?" চায়ের টেবিলে সে দিদির পাশে বসেছে; পাশেই বসেছে বরিস; তার প্রশ্নের জবাবে তার

দিকে না তাকিয়েই একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে নাতাশা কি যেন একটা জবাব দিল। খেলার মাঝখানে পিয়ের আর একবার নাতাশার দিকে তাকাল।

আরও অবাক হয়ে পিয়ের ভাবল, "ওর হয়েছে কি ?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু তার সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন বলছে। নাতাশাও মুখ তুলে তার দিকে তাকাল ; তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল ; শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হল। ভিতরের একটা চাপা আগুন যেন নতুন করে জ্বলে উঠল। নাতাশা সম্পূর্ণ বদলে গেল ; একটা সাধারণ মেয়ের পরিবর্তে আবার সেই নাচের আসরের মেয়েটি হয়ে উঠল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু পিয়েরের কাছে এগিয়ে গেল ; পিয়ের দেখল বন্ধুর মুখে নতুন যৌবনের দীপ্তি উঠেছে।

খেলতে খেলতে পিয়ের বার বার আসন বদল করল ; একবার বসল নাতাশার দিকে পিঠ দিয়ে, তারপর তার মুখোমুখি, কিন্তু পুরো ছ'টা "রাবার" খেলার সময় সে নাতাশা ও বন্ধুর উপর নজর রাখল।

সে ভাবল, "ওদের দুজনের মধ্যে একটা গুরুতর কিছু ঘটছে" ; সঙ্গে সঙ্গে একাধারে খুসির ও বেদনার একটা অনুভূতি দেখা দিল তার মনে ; খেলার দিকে তার মন রইল না।

ছটা "রাবার" খেলার পরে সেনাপতি খেলা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ; বলল, এভাবে খেলে কোন লাভ নেই ; পিয়েরও মুক্তি পেল। একদিকে নাতাশা কথা বলছিল সোনিয়া ও বরিসের সঙ্গে, আর সূক্ষ্ম হাসি হেসে ভেরা কি যেন বলছিল প্রিন্স আন্‌দ্রুকে। পিয়ের বন্ধুর দিকে এগিয়ে গেল এবং তারা কোন গোপন কথা বলছে কিনা জানতে চেয়ে তাদের পাশেই বসে পড়ল। সে লক্ষ্য করল ভেরা তার নিজের কথা নিয়েই মশ্‌গুল হয়ে আছে, আর প্রিন্স আন্‌দ্রুকে কেমন যেন বিব্রত মনে হচ্ছে, অথচ তার বেলায় এরকমটা বড় একটা ঘটে না।

বাঁকা হাসি হেসে ভেরা বলল, "আপনি কি মনে করেন প্রিন্স ? একবার দেখেই তো আপনি মানুষের চরিত্র এত ভাল বুঝতে পারেন। নাতালির ব্যাপারে আপনি কি মনে করেন ? তার অনুরাগ কি স্থায়ী হবে ? অন্য নারীর মত (সে যেন নিজেকেই বোঝাতে চাইছিল) সে কি কোন পুরুষকে চিরদিনের মত ভালবাসতে পারে, চিরকাল তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে ? আমি তো সেটাকেই সত্যিকারের ভালবাসা বলে মনে করি। আপনি কি বলেন প্রিন্স ?"

ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি হেসে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আপনার বোনকে আমি এত অল্প জানি যে এধরনের কোন সূক্ষ্ম প্রশ্নের মীমাংসা করা সম্ভব নয় ; তাছাড়া আমি দেখেছি একটি নারী যত কম আকর্ষণীয়া হয় সে তত বেশী বিশ্বস্ত হয়ে থাকে।" এই কথা বলে সে পিয়েরের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ভেরা বলতে লাগল, "হ্যাঁ, সেকথা ঠিক প্রিন্স। আমাদের একালে মেয়েরা এত স্বাধীনতা ভোগ করে যে পূর্বরাগের আনন্দ অনেক সময়ই তাদের অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়। আর একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে নাতালি খুবই স্পর্শকাতর।" নাতালির প্রসঙ্গ ওঠায় প্রিন্স আন্‌দ্রুর ভুরু দুটি অস্বস্তিতে জুড়ে গেল; সে উঠতেই যাচ্ছিল, কিন্তু ভেরা আবার কথা বলতে শুরু করল।

"আমি তো মনে করি তার সঙ্গে যত মানুষ ভাব জমাতে আসে তেমন আর কারও বেলায় ঘটে নি, তবু ইদানীংকাল পর্যন্ত কারও দিকে তার মন সেভাবে ঢলে নি।" তারপর পিয়েরকে বলল, "কি জানেন কাউন্ট, নিজেদের মধ্যে বলেই বলছি, এই যে আমাদের আদরের ভাই বরিস এতদূর এগিয়ে গেছে····"

প্রিন্স আন্‌দ্রু ভুরু কুঁচকে চুপ করে রইল।

"তার সঙ্গে তো আপনার খুব বন্ধুত্ব, তাই না?" ভেরা শুধাল।

"হ্যাঁ, আমি তাকে চিনি····"

"আশা করি নাতাশার প্রতি ছেলেমানুষী ভালবাসার কথা সে আপনাকে বলেছে?"

অপ্রত্যাশিতভাবে লজ্জায় লাল হয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "ওহো, ওটা তাহলে একটা ছেলেমানুষী ভালবাসা?"

"হ্যাঁ, আপনি তো জানেন জ্ঞাতি ভাই-বোনের ঘনিষ্ঠতা অনেকসময় ভালবাসা হয়ে দেখা দেয়। জ্ঞাতি ভাই-বোনের কাছাকাছি থাকাটা বড়ই বিপজ্জনক।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলে উঠল, "হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে!" তারপরেই হঠাৎ অস্বাভাবিক তৎপরতার সঙ্গে মস্কোর পঞ্চাশ বছর বয়সের জ্ঞাতি বোনদের সম্পর্কে সতর্ক হবার জন্য পিয়েরকে ঠাট্টা করতে শুরু করল এবং সেইসব ঠাট্টার কথা বলতে বলতেই পিয়েরের হাত ধরে তাকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল।

বন্ধুর মুখ-চোখের উদ্দীপনাপূর্ণ ভাব দেখে এবং সে যে বারবার নাতাশার দিকে তাকাচ্ছে সেটা লক্ষ্য করে পিয়ের শুধাল, "ব্যাপার কি?"

"তোমাকে···তোমাকে একটা কথা বলা দরকার," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।" "আমি···কিন্তু না, পরে বলব।" তার চোখে একটা বিচিত্র আলো ফুটে উঠল; চালচলনে কেমন যেন একটা অস্থিরতা। প্রিন্স আন্‌দ্রু নাতাশার কাছে গিয়ে তার পাশে বসল। পিয়ের দেখল, প্রিন্স আন্‌দ্রু নাতাশাকে কি যেন বলল, আর জবাব দিতে গিয়ে তার চোখমুখ লাল হয়ে উঠল।

ঠিক সেইমুহূর্তে বের্গ এসে পিয়েরকে বলল, "স্পেনের ব্যাপার নিয়ে সেনাপতি ও কর্ণেলের মধ্যে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে তাতে তাকে অবশ্যই যোগ

দিতে হবে।

বের্গ যেমন খুসি, তেমনই সুখী। তার মুখের উপর থেকে খুসির হাসিটুকু কখনই মিলিয়ে যাচ্ছে না। তার মজলিসটা অন্য সব মজলিসের মতই খুব সফল হয়েছে। আর সবই যেমনটি হয়ে থাকে ঠিক তেমনটি হয়েছে। শুধু পুরুষদের মধ্যে জোর গলায় আলোচনা এবং একটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্কেরই অভাব ছিল এতক্ষণ। এবার সেনাপতি সেই বিতর্কের সূত্রপাত করেছে, আর তাই বের্গ এসে পিয়েরকে সেখানে টেনে নিয়ে গেল।

অধ্যায়—২২

পরদিন কাউণ্টের আমন্ত্রণে প্রিন্স আন্দ্রু রস্তভদের সঙ্গে আহার করল এবং সারাটা দিন সেখানেই কাটাল।

প্রিন্স আন্দ্রু কার জন্য এসেছে বাড়ির সকলেই সেটা বুঝতে পেরেছে, আর সেও সেটা না লুকিয়ে সারাদিন নাতাশার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতে চেষ্টা করল। ভীত অথচ সুখী ও উচ্ছ্বসিত নাতাশার অন্তরেই শুধু নয়, সারা বাড়িটাতেই এমন একটা ভীতির অনুভূতি দেখা দিল যে একটা গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রু যখনই নাতাশার সঙ্গে কথা বলছে তখনই কাউণ্টেস বিষণ্ণ, রূঢ় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে এবং তার চোখে চোখ পড়লেই যেকোন একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করছে। সোনিয়ার ভয়—নাতাশা তাকে ছেড়ে যাবে। মুহূর্তের জন্য প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে একলা হলেই প্রত্যাশার আতংকে নাতাশার মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রুর ভীরুতা তাকে বিস্মিত করছে। সে বুঝতে পারছে, প্রিন্স আন্দ্রু তাকে কিছু বলতে চাইছে, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

সন্ধ্যায় প্রিন্স আন্দ্রু চলে গেলে কাউণ্টেস নাতাশার কাছে গিয়ে চুপিচুপি বলল: "তারপর, কি হল?"

"মামণি! ঈশ্বরের দোহাই, এখন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করো না। সেকথা কেউ মুখে বলতে পারে না," নাতাশা বলল।

তাসত্ত্বেও সেদিন রাতে কখনও উত্তেজিত, কখনও ভীত মনে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে মায়ের বিছানায় শুয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রিন্স আন্দ্রু যে তার প্রশংসা করেছে, নিজের বিদেশে যাবার কথা বলেছে, গ্রীষ্মকালটা তারা কোথায় কাটাতে যাবে সেকথা জানতে চেয়েছে, এবং বরিস সম্পর্কেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে—এ সবই সে একে একে মাকে বলল।

আরও বলল, "কিন্তু এরকম···এরকম···কখনও আমার হয় নি। সে কাছে এলেই আমার কেমন ভয় করে। তার কাছে থাকলেই ভয় করে। তার অর্থ কি? তার কি এই অর্থ যে এটাই আসল জিনিস? কি বল? ঘুমিয়ে

পড়লে মামণি ?"

"না বাছা ; আমি নিজেও ভয় পাচ্ছি," মা জবাব দিল। "এবার যাও !"

"যাই বল, আমি ঘুমতে পারব না। ঘুমিয়ে পড়াটা কী বোকামি ! মামণি ! মামণি ! আগে কখনও তো আমার এরকম হয় নি। আমরা কি কখনও ভাবতে পারতাম !…"

নাতাশার মনে হতে লাগল, অত্রাদ্‌নু-তে প্রথম যখন প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখেছিল তখনই তাকে ভালবেসেছিল। যাকে সে সেদিনই পছন্দ করেছিল তার সঙ্গেই আবার দেখা হওয়ার এবং সেই মানুষটিকে তার প্রতি অনুরক্ত দেখার এই অপ্রত্যাশিত বিচিত্র সুখটাকেই যেন তার যত ভয়।

"আমরা যখন এখানে এলাম তখনই যে সেও বিশেষ করে পিতার্সবুর্গেই আসবে এটাই ঘটতে বাধ্য। বল-নাচে তার সঙ্গে আমাদের যে দেখা হবে সেটাও ঘটতে বাধ্য। এটাই নিয়তি। স্পষ্টত এটাই নিয়তি, সবকিছুর এখানেই পরিণতি ! যখনই তাকে দেখলাম তখনই একটা অদ্ভুত অনুভূতি জাগল আমার মনে।"

"সে তোমাকে আর কি বলেছে ? কবিতাগুলোই বা কিসের ? সেগুলি পড় তো…" প্রিন্স আন্‌দ্রু নাতাশার এল্‌বামে যে কবিতাগুলি লিখে দিয়েছে তার কথাই মা বলল।

"মামণি, সে যে বিপত্নীক তা নিয়ে কি লজ্জা পাবার কিছু আছে ?"

"লজ্জা পাবে কেন নাতাশা ! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর। বিয়ের ব্যবস্থা স্বর্গে বসে তিনিই করেন।" মা বলল।

"লক্ষ্মী মামণি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি ! আমি কত সুখী !" নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, তারপর আনন্দে ও উত্তেজনায় চোখের জল ফেলতে ফেলতে মাকে জড়িয়ে ধরল।

ঠিক সেই সময়েই প্রিন্স আন্‌দ্রু পিয়েরের সঙ্গে বসে তাকে বলতে লাগল, নাতাশাকে সে ভালবাসে, তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে সে দৃঢ়সংকল্প।

সেদিনই কাউন্টেস হেলেনের বাড়িতে একটা মজলিসের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিল ফরাসী রাষ্ট্রদূত, জনৈক বিদেশী প্রিন্স এবং অনেক উঁচুমহলের ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক। পিয়ের নীচের তলায় এসে এ-ঘরে ও-ঘরে বেড়াতে লাগল ; তার উদাসীন, মনমরা ভাব সকলেরই চোখে পড়ল।

বল-নাচের পর থেকেই তার মধ্যে একটা স্নায়বিক অবসন্নতা দেখা দিয়েছে ; সেটাকে প্রতিরোধ করতে সেও আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রাজবংশের প্রিন্সের সঙ্গে স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতার পর থেকেই পিয়েরের মনে এই বিষণ্ণতা দেখা দিয়েছে ; মানবজীবনের সবকিছুই বৃথা—এই অশুভ চিন্তা প্রায়ই তাকে

পেয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নাতাশা ও প্রিন্স আন্‌দ্রুর পারস্পরিক সম্পর্কের কথা ভেবে এবং তার ও বন্ধুর অবস্থার পার্থক্যের কথা ভেবে তার এই বিষণ্ণতা যেন আরও বেড়ে ওঠে। স্ত্রীর চিন্তা এবং নাতাশা ও প্রিন্স আন্‌দ্রুর চিন্তা এড়িয়ে চলতেই সে চেষ্টা করে; তখনই অনন্তকালের তুলনায় সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়; সেই একই প্রশ্ন: তাহলে কিসের জন্য? আবারও মনের সামনে ভেসে ওঠে; আর তখনই সে বেশী করে ভ্রাতৃসংঘের কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চেষ্টা করে; সেই অশুভ শক্তিটাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। মধ্যরাতে কাউন্টেসের বাসা থেকে বেরিয়ে এসে তার তামাকের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নীচু ঘরের টেবিলে বসে একটা নোংরা ড্রেসিং-গাউন পরে সে যখন স্কটিস আশ্রমের মূল কাগজপত্র নকল করার কাজ শুরু করল তখন কে যেন ঘরে ঢুকল। প্রিন্স আন্দ্রু।

"আরে, তুমি!" অসন্তুষ্ট গলায় পিয়ের বলল। "আর দেখতেই তো পাচ্ছ, আমি বড়ই ব্যস্ত," পাণ্ডুলিপির খাতাটা দেখিয়ে বলল।

প্রিন্স আন্দ্রুর চোখ-মুখ নতুন জীবনের উচ্ছ্বাসে ঝলমল করছে। পিয়েরের সামনে দাঁড়িয়ে তার বিষণ্ণ দৃষ্টিটা লক্ষ্য না করে নিজের আনন্দেই সে হাসতে লাগল।

বলল, "দেখ প্রাণের বন্ধু, কালই তোমাকে ব্যাপারটা বলতে চেয়েছিলাম, আজ বলতেই এসেছি। আগে কখনও এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয় নি। আমি প্রেমে পড়েছি বন্ধু!"

হঠাৎ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পিয়ের তার ভারী দেহটা সোফায় এলিয়ে দিল।

বলল, "নাতাশা রস্তভার সঙ্গে, কি বল?"

"ঠিক, ঠিক! সে ছাড়া আর কে হবে? একথা আমি বিশ্বাস করতেই পারতাম না, কিন্তু প্রেম যে আমার চাইতে বেশী শক্তিশালী। কাল যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়েছি, কিন্তু পৃথিবীর কোন কিছুর সঙ্গেই সে যন্ত্রণাকে আমি বদল করতে চাই না। এতদিন যেন আমি বেঁচেই ছিলাম না, অবশেষে বেঁচে উঠেছি, কিন্তু তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না! কিন্তু সে কি আমাকে ভালবাসবে? ···তার কাছে আমি যেন বড় বেশী বুড়ো···তুমি কথা বলছ না কেন?"

"আমি? আমি? আমি তোমাকে কি বলেছি?" হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পিয়ের বলল, আর তারপরেই ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। একথা আমি আগেই ভেবেছি···মেয়েটি একটি রত্ন···এরকম মেয়ে দেখা যায় না···প্রিয় বন্ধু, তোমাকে মিনতি করছি, কোনরকম চিন্তা করো না, সংশয় করো না, বিয়ে কর, বিয়ে কর, বিয়ে কর···নিশ্চিত করে বলছি, তোমার চাইতে সুখী কেউ হবে না।"

"কিন্তু তার কথা ?"

"সে তোমাকে ভালবাসে।"

হেসে পিয়েরের চোখে চোখ রেখে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "বাজে কথা বলো না…"

পিয়ের হিংস্র গলায় বলে উঠল, "সে ভালবাসে, আমি জানি।"

পিয়েরের হাত চেপে ধরে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "কিন্তু মন দিয়ে শোন। আমি কি অবস্থায় আছি তা কি তুমি জান ? তা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতেই হবে।"

"বলে যাও, বলে যাও। আমি খুব খুসি," পিয়ের বলল। এবার সত্যি তার মুখটা বদলে গেল, ভুরু সমান হয়ে গেল, খুসি মনে সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর কথা শুনতে লাগল। দেখে মনে হল, প্রিন্স আন্‌দ্রু সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ নতুন এক মানুষ হয়ে গেছে ; আসলেও তাই হয়েছে। কোথায় গেল তার ঈর্ষা, তার জীবনের প্রতি ঘৃণা, তার মোহভঙ্গ ? পিয়েরই একমাত্র লোক যার কাছে সে খোলাখুলি সব কথা বলবে বলে স্থির করল ; আর মনের সব কথাই তাকে বলল। এবার সে বহুদূর প্রসারিত ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে ফেলল, জানাল যে বাবার খেয়ালের জন্য সে নিজের সুখকে বিসর্জন দিতে পারবে না ; হয় সে এ বিয়েতে বাবার সম্মতি আদায় করে নাতাশাকে ভালবাসবে, অথবা তার সম্মতি ছাড়াই যা করবার তা করবে।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আমি যে এভাবে ভালবাসতে পারি একথা অন্য কেউ বললে আমি বিশ্বাস করতাম না। অতীতে যা আমি জানতাম এটা মোটেই সেরকম অনুভূতি নয়। আমার কাছে গোটা জগৎটাই এখন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে : তার একভাগ নাতাশা, সেখানে শুধুই আনন্দ, আশা ও আলো : আর অন্য ভাগে আছে সবকিছু যেখানে সে নেই, সেখানে শুধু দুঃখ ও অন্ধকার…"

"অন্ধকার ও দুঃখ," পিয়ের কথাটা আর একবার উচ্চারণ করল ; "ঠিক, ঠিক, আমি সব বুঝতে পারি।"

"আলোকে ভাল না বেসে আমি পারি না। সেটা তো আমার দোষ নয়। আর আমি কত সুখী ! আমার কথা বুঝতে পারছ ? আমি জানি, আমার জন্য তুমিও খুসি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," বন্ধুর দিকে ব্যথিত, বিষণ্ণ দৃষ্টি মেলে পিয়ের কথাটা মেনে নিল। তার চোখে প্রিন্স আন্‌দ্রুর কপাল যত উজ্জ্বল হতে লাগল, তার নিজের কপাল হয়ে উঠল ততই বিষণ্ণতর।

অধ্যায়—২৩

বিয়েতে বাবার সম্মতি প্রয়োজন ; তাই সম্মতি পাবার জন্য প্রিন্স আন্‌দ্রু

পরদিনই দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল।

তার বাবা ভিতরে রাগ ও বাইরে শান্ত ভাব নিয়ে ছেলের সব কথা শুনল। সে বুঝতে পারল না, নিজের জীবনই যখন শেষ হয়ে এসেছে তখন সে কেমন করে সে জীবনের পরিবর্তন ঘটাতে অথবা কোন নতুন কিছু সেখানে প্রবর্তন করতে ইচ্ছুক হতে পারে। বুড়ো মানুষটি ভাবল, "শুধু তারা যদি আমার ইচ্ছামত আমার দিনগুলোকে কাটাতে দেয় তাহলে তারা যা খুসি তাই করুক।" অবশ্য ছেলের সঙ্গে সে সেই চালটি দিল যা সে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্য তুলে রাখে; শান্ত গলায় সব ব্যাপারটা নিয়ে সে আলোচনা করল।

প্রথমত জন্ম, সম্পত্তি ও পদমর্যাদার বিচারে বিয়েটা খুব একটা ভালকিছু নয়। দ্বিতীয়ত, এখন আর সে আগের মত যুবকটি নয়, তার স্বাস্থ্যও খারাপ, আর মেয়েটি তরুণী। তৃতীয়ত, তার একটি ছেলে আছে যাকে ঐ প্রতারক মেয়েটির হাতে তুলে দিলে সেটা খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে। চতুর্থত এবং শেষ কথা, "বিয়েটা তুমি এক বছর বন্ধ রাখ: বিদেশে যাও, আরোগ্য লাভ কর, এবং যেমনটি চেয়েছিলে প্রিন্স নিকলাসের জন্য একজন জার্মান শিক্ষক সংগ্রহ কর। তোমার ভালবাসা, বা কামনা, বা একগুঁয়েমি—যা খুসি বলতে পার—যদি তখনও আজকের মতই জোরদার থাকে তো বিয়ে করো! আর এব্যাপারে এটাই আমার শেষ কথা। মনে রেখো, শেষ কথা!" কাউন্ট এমন গলায় কথাটা শেষ করল যাতে বোঝা গেল যেকোন অবস্থাতেই তার এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটবে না।

প্রিন্স আন্‌দ্রু পরিষ্কার বুঝতে পারল, বুড়ো আশা করছে যে তার মনোভাব অথবা তার বাকদত্তার মনোভাব এক বছরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না, অথবা তার আগেই সে (বুড়ো প্রিন্স স্বয়ং) নিজেই মারা যাবে; কাজেই বাবার ইচ্ছাটাকে মেনে নেওয়াই সে স্থির করল—বিয়ের প্রস্তাব করে এক বছরের জন্য বিয়েটাকে স্থগিত রাখবে।

রস্তভদের সঙ্গে শেষ সন্ধ্যাটা কাটাবার তিন সপ্তাহ পরে প্রিন্স আন্‌দ্রু পিতার্সবুর্গে ফিরে গেল।

মার সঙ্গে সেরাতের কথাবার্তার পরের দিন নাতাশা সারাটা দিন বল্‌কন্‌স্কির জন্য অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু সে এল না। দ্বিতীয় দিন ও তৃতীয় দিনেও সেই একই অবস্থা। পিয়েরও আর আসেনি; প্রিন্স আন্‌দ্রু যে বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেছে সেকথা জানত না বলে তার অনুপস্থিতির কারণ নাতাশা কিছুই বুঝতে পারল না।

এইভাবে তিন সপ্তাহ পার হয়ে গেল। নাতাশা বাইরে কোথাও যায় না, ছায়ার মত এ-ঘর থেকে ও-ঘরে ঘুরে বেড়াত; রাতে গোপনে চোখের জল ফেলে;

সন্ধ্যায় মার কাছেও যায় না। অনবরত চোখ-মুখ লাল করে থাকে; মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠেছে। তার মনে হয়, সকলেই তার এই হতাশার কথা জানে, তাকে দেখে হাসে, করুণা করে। একে মনোকষ্টের অন্ত নেই, তার উপর এভাবে অহংকারে আঘাত লাগায় তার কষ্ট আরও বেড়ে গেছে।

একসময় মার কাছে গেল, কিছু বলতে চেষ্টা করল; তারপর হঠাৎ কেঁদে ফেলল।

কাউন্টেস নাতাশাকে সান্ত্বনা দিল; কিছুক্ষণ মার কথা কান পেতে শুনে হঠাৎ সে বাধা দিয়ে বলল, "ওকথা থাক মামণি। ওনিয়ে আমি ভাবি না, ভাবতে চাই না। সে এসেছিল, চলে গেছে, চলে গেছে⋯⋯"

তার গলা কাঁপতে লাগল; প্রায় কেঁদে ফেলার উপক্রম; কিন্তু কোনরকমে নিজেকে সংযত করে বলল:

"আমি মোটেই বিয়ে করতে চাই না। তাকে আমি ভয় করি: এবার আমি শান্ত হয়েছি, একেবারে শান্ত হয়েছি।"

পরদিন নাতাশা সেই পুরনো পোশাকটা পড়ল যেটা পড়লে, তার বিশ্বাস, সকাল বেলায় মন প্রফুল্ল থাকে; আর সেদিন থেকেই আবার সে পুরনো জীবনযাত্রায় ফিরে গেল যেটা সে বল-নাচের দিন থেকে ছেড়ে দিয়েছিল। সকালের চা খাওয়া শেষ করে সে তার নাচের ঘরে চলে গেল এবং গান গাইতে শুরু করল।

হলের ফটকটা খুলে গেল; কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "বাড়ি আছে?" তারপরেই পায়ের শব্দ শোনা গেল। নাতাশা তখন আয়নার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু নিজেকে দেখছিল না। তার কান ছিল হলের শব্দের দিকে। যখন নিজেকে দেখতে পেল, তার মুখটা ম্লান হয়ে গেছে। সে এসেছে। বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে কণ্ঠস্বরের সামান্য আঁচ পেলেও সে ঠিক বুঝতে পেরেছে।

উত্তেজিত, বিবর্ণ মুখে নাতাশা বসবার ঘরে ছুটে গেল।

বলল, "মামণি! বল্‌কন্‌স্কি এসেছে! মামণি, এ যে ভয়ংকর, এ যে অসহ্য! আমি আর⋯যন্ত্রণা ভোগ করতে চাই না। আমি কি করব?⋯"

কাউন্টেস জবাব দেবার আগেই প্রিন্স আন্‌দ্রু উত্তেজিত, গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকল। নাতাশাকে দেখামাত্রই তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে কাউন্টেসের ও নাতাশার হাতে চুমো খেল; সোফার পাশে বসল।

"অনেকদিন হল তোমার দেখা⋯⋯"কাউন্টেস বলতে শুরু করামাত্রই প্রিন্স আন্‌দ্রু তাকে বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি তার প্রশ্নের জবাবটাই দিয়ে দিল।

"এতদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারি নি, কারণ আমি বাবার কাছে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। সবে গতকাল রাতেই ফিরেছি।" একটু থেমে আবার বলল, "আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই কাউন্টেস।"

কাউণ্টেস চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অস্পষ্ট গলায় বলল, "বল, আমি শুনছি।"

নাতাশা বুঝতে পারল যে তার চলে যাওয়া উচিত, কিন্তু যেতে পারল না; কিসে যেন তার গলা চেপে ধরল; তারপর আচরণের নিয়মকানুন না মেনেই বড় বড় চোখ মেলে সোজা প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল।

"এখনই? এই মুহূর্তে!···না, তা হতে পারে না!" সে ভাবল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু আবার নাতাশার দিকে তাকাল; সেই দৃষ্টি থেকেই নাতাশার ধারণা দৃঢ়তর হল যে সে ভুল বোঝে নি। হ্যাঁ, এখনই, এইমুহূর্তেই তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যাক।

কাউণ্টেস চুপি চুপি বলল, "যাও নাতাশা! আমি তোমাকে ডাকব।"

প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে ও মায়ের দিকে ভীত, অনুনয়ভরা চোখে তাকিয়ে নাতাশা বেরিয়ে গেল।

"আমি এসেছি কাউণ্টেস, আপনার মেয়ের পাণি প্রার্থনা করতে," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

কাউণ্টেসের মুখ গরম হয়ে উঠল, কিন্তু মুখে কিছুই বলল না।

অবশেষে গম্ভীর গলায় বলতে শুরু করল, "তোমার প্রস্তাবে···" প্রিন্স আন্‌দ্রু নীরব। "তোমার প্রস্তাব আমাদের কাছে গ্রহণীয় এবং···আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করছি। আমি খুসি হয়েছি। আর আমার স্বামীও···আশা করি···কিন্তু সবকিছু নির্ভর করছে নাতাশার উপর···"

"আপনার সম্মতি পেলেই আমি তার সঙ্গে কথা বলব।···আপনি সম্মতি দিলেন তো?" প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"হ্যাঁ," কাউণ্টেস জবাব দিল। সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল, আর প্রিন্স যখন সেই হাতে চুমো খাবার জন্য নীচু হল তখন বিরোধ ও মমতার মিশ্র অনুভূতির সঙ্গে তার কপালে ঠোঁট দুটি স্পর্শ করল। ইচ্ছা হল, ছেলের মত তাকে ভালবাসে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে হল যে তার কাছে প্রিন্স একটি অপরিচিত ও ভয়ংকর লোক। "আমি নিশ্চিত যে আমার স্বামী সম্মতি দেবেন, কিন্তু তোমার বাবা···"

"বাবাকে সব কথা বলেছি; তিনি এই সুস্পষ্ট শর্তে সম্মতি দিয়েছেন যে বিয়েটা হবে এক বছর পরে। আর সে কথাই আপনাকে বলতে এসেছি," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"একথা ঠিক যে নাতাশা এখনও ছেলেমানুষ, কিন্তু—তাই বলে এত দেরি?···"

"এটা অনিবার্য," দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

"মেয়েকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি," এই কথা বলে কাউণ্টেস ঘর থেকে চলে গেল।

মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে বার বার বলল, "প্রভু আমাদের করুণা করুন !"

সোনিয়া বলল, "নাতাশা তার শোবার ঘরেই আছে। ম্লান মুখে শুকনো চোখে বিছানার উপর বসে নাতাশা একদৃষ্টিতে দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে এবং অতিদ্রুত ক্রুশ চিহ্ন আঁকতে আঁকতে ফিসফিস করে কি যেন বলছে। মাকে দেখেই সে লাফ দিয়ে যেন উড়ে তার কাছে চলে এল।

"এই যে মামণি ?⋯⋯তারপর ?⋯⋯"

"যাও, তার কাছে যাও। সে তোমার পাণি প্রার্থনা করেছে," কাউন্টেসের কথাগুলি নাতাশার কানে কেমন যেন উদাসীন শোনাল। বিষণ্ণ স্বরে, কিছুটা তিরস্কারের ভঙ্গীতেই মা আবার বলল, "যাও⋯⋯যাও ;" মেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

কেমন করে সে যে বসবার ঘরে ঢুকেছিল নাতাশা তা মনেও করতে পারে না ভিতরে ঢুকে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখেই সে থমকে দাঁড়াল। "এও কি সম্ভব যে এই অপরিচিত লোকটিই এখন আমার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে ?" নিজেকে প্রশ্ন করে সঙ্গে সঙ্গেই সে জবাব দিল, "হ্যাঁ, সর্বস্ব ! জগতের সবকিছু অপেক্ষা সেই এখন আমার প্রিয়তর।" চোখ দুটি নত করে প্রিন্স আন্‌দ্রু তার দিকে এগিয়ে গেল।

"প্রথম দেখার মুহূর্ত থেকেই তোমাকে আমি ভালবেসেছি। আমি কি আশা করতে পারি ?"

নাতাশার দিকে তাকিয়ে তার মুখের গম্ভীর আবেগহীনভাব দেখে প্রিন্স আন্‌দ্রু অবাক হয়ে গেল। তার মুখ বলছে : "কেন জিজ্ঞাসা করছ ? যা তুমি জেনেছ তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছ কেন ? মনের কথা যখন কথায় প্রকাশ করা যায় না, তখন কথা বলছ কেন ?"

তার কাছে এগিয়ে নাতাশা থেমে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু তার হাতখানা ধরে তাতে চুমো খেল।

"তুমি আমাকে ভালবাস ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," যেন বিরক্ত হয়েই অনুচ্চ কণ্ঠে নাতাশা বলল। তারপর সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত শ্বাস টানতে টানতে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

"একি হল ? ব্যাপার কি ?"

"ওঃ, আমি কত সুখী !" নাতাশা জবাব দিল, চোখের জলের ভিতর দিয়ে হাসি ফুটিয়ে তার আরও কাছে এগিয়ে গেল, একমুহূর্ত থেমে যেন জানতে চাইল সে কাজটা করতে পারে কি না, তারপরই তাকে চুমো খেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু তার হাত দুটি ধরল, চোখে চোখ রাখল, কিন্তু নিজের অন্তরে নাতাশার প্রতি আগেকার ভালবাসাকে খুঁজে পেল না। তার মধ্যে কি যেন হঠাৎ বদলে গেছে ; আগেকার সেই কাব্যময় ও রহস্যময় বাসনার মোহ যেন আর নেই, শুধু আছে নাতাশার নারীসুলভ, শিশুসুলভ দুর্বলতার প্রতি করুণা, তার অনুরাগ ও বিশ্বস্ততার জন্য ভয়, আর আছে একটি আনন্দময়

কর্তব্যবোধ যা তাকে চিরকালের মত এই মেয়েটির সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে। এখনকার এই অনুভূতি আগেকার মত উজ্জ্বল ও কাব্যময় না হলেও তারচাইতে অধিক শক্তিশালী ও গুরুতর।

তখনও নাতাশার চোখের দিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "তোমার মা কি বলেছেন যে বিয়েটা এক বছরের মধ্যে হতে পারছে না?"

নাতাশা ভাবল, "এও কি সম্ভব যে এখন আমি এই অপরিচিত, প্রিয়, চৌকোস লোকটির স্ত্রী ও সমকক্ষ হব, অথচ আমার বাবা পর্যন্ত একে উঁচু নজরে দেখে? একি সত্যি হতে পারে? একি সত্যি হতে পারে যে এখন থেকে আর জীবন নিয়ে খেলা করা চলবেনা, আমি এখন বড় হয়েছি, আমার প্রতিটি কথা ও কাজের দায়িত্ব এখন আমার নিজের? হ্যাঁ, কিন্তু সে আমাকে কি বলল?"

প্রিন্স আন্‌দ্রুর প্রশ্নটা বুঝতে না পেরেই সে জবাব দিল, "না।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আমাকে ক্ষমা কর। কিন্তু তুমি এখনও এত ছোট, আর আমি জীবনের কত পথ পার হয়ে এসেছি। তোমার জন্য আমার ভয় হয়, এখনও তুমি নিজেকেই চেনো না।"

গভীর মনোযোগের সঙ্গে নাতাশা কথাগুলি শুনল, কিন্তু চেষ্টা করেও তার অর্থ বুঝতে পারল না।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলতে লাগল, "এই যে একটা বছর আমার সুখকে বিলম্বিত করে দিল সেটা খুবই কঠোর, তবু এই এক বছর তুমি নিজে নিশ্চিত হবার সময় পাবে। আমি অনুরোধ করছি, এক বছর পরে তুমি আমাকে সুখী করবে, কিন্তু তুমি থাকবে মুক্ত: আমাদের বাকদান গোপন থাকবে, আর তুমি যদি বোঝ যে আমাকে ভালবাস না, অথবা যদি ভালবাস…" অস্বাভাবিক হাসির সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল।

নাতাশা তাকে বাধা দিল, "ও কথা কেন বলছ? তুমি তো জান, প্রথম যেদিন অত্রাদ্‌নু-তে এসেছিলে সেদিন থেকেই তোমাকে ভালবেসেছি।"

"এক বছরের মধ্যে তুমি নিজেকে জানতে শিখবে…"

"একটা পুরো বছর!" নাতাশা হঠাৎ কথাটা বলল, যেন এইমাত্র সে বুঝতে পেরেছ যে বিয়েটা একবছর পিছিয়ে দিতে হবে।" কিন্তু এক বছর কেন? এক বছর কেন?…"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বিলম্বের কারণটা বুঝিয়ে বলতে লাগল, কিন্তু নাতাশা কিছুই শুনল না।

সে শুধু শুধাল, "এটাকে কি বদলানো যায় না?" প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল না, কিন্তু তার মুখই বলে দিল যে এ সিদ্ধান্ত বদলানো অসম্ভব।

"এযে ভয়ংকর! ওঃ, এযে ভয়ংকর! ভয়ংকর!" নাতাশা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। "এক বছর অপেক্ষা করতে হলে আমি

মরে যাব : এ অসম্ভব, এ ভয়ংকর!" প্রেমিকের মুখের দিকে তাকিয়ে সেখানে দেখতে পেল সহানুভূতি ও বিচলিত ভাবের মিশ্র দৃষ্টি।

হঠাৎ চোখের জল সংবরণ করে সে বলে উঠল, "না, না, আমি সব করব! আমি আজ কত সুখী!"

বাবা ও মা ঘরে ঢুকে বাকদত্ত দম্পতিকে আশীর্বাদ করল।

সেদিন থেকে প্রিন্স আন্দ্রু নাতাশার বাকদত্ত প্রেমিকরূপেই রস্তভ পরিবারে আসা-যাওয়া শুরু করল।

অধ্যায়—২৪

কোনরকম বাকদান অনুষ্ঠান হল না; বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে নাতাশার বিয়ের কথা ঘোষণা করাও হল না; প্রিন্স আন্দ্রু এটাই চেয়েছিল। সে বলল, যেহেতু বিলম্বের জন্য সেই দায়ী, সেইহেতু সবটা বোঝা তাকেই বইতে হবে; সে কথা দিয়েছে, চিরজীবনের মত নিজেকে বেঁধেছে, কিন্তু নাতাশাকে সে বাঁধতে চায় না, সে তাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। ছ'মাস পরে সে যদি বোঝে যে আমাকে ভালবাসে না, তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবার পূর্ণ অধিকার নাতাশার থাকবে। স্বভাবতই নাতাশা বা তার বাবা-মা এ কথা শুনতে চাইল না, কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু সংকল্পে অটল। সে রোজ রস্তভদের বাড়িতে আসে, কিন্তু নাতাশার সঙ্গে বাকদত্ত প্রেমিকের মত আচরণ করে না; তাকে ঘনিষ্ঠ নামে ডাকে না, চুমো খায় শুধু তার হাতে। তাদের দেখে মনে হয় যেন এর আগে তাদের মধ্যে কোন পরিচয়ই ছিল না। যখন তারা কেউ কারও বিশেষ কিছু ছিল না তখন তারা পরস্পরকে যে চোখে দেখত সেকথা স্মরণ করতে দুজনই ভালবাসে; এখন তারা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ বলে মনে করে: তখন তারা ছিল কৃত্রিম, এখন তারা স্বাভাবিক ও আন্তরিক। প্রথম দিকে প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গে চলাফেরা করতে রস্তভ পরিবার বেশ অসুবিধা বোধ করত। ধীরে ধীরে তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠল এবং তার উপস্থিতিতেই অসংকোচে নিজেদের জীবনযাত্রা অব্যাহত রেখে চলতে লাগল, আর প্রিন্স আন্দ্রুও তাতে অংশ নিতে লাগল।

একটি বাকদত্ত দম্পতির উপস্থিতিতে বাড়িতে যেধরনের কাব্যিক একঘেয়েমি ও প্রশান্তি বিরাজ করে এ বাড়িতেও সেই আবহাওয়া চলতে লাগল। অনেক সময়ই সকলে একসঙ্গে বসেও প্রত্যেকেই চুপচাপ থাকে। কখনও বা সকলে সেখান থেকে চলে যায়, ওরা দুজনে একলা থাকে, কিন্তু তবু চুপচাপ বসে থাকে। ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ওরা কদাচিৎ বলে। সেসব কথা বলতে প্রিন্স আন্দ্রুর ভয় করে, সে লজ্জা পায়। অন্য সবকিছুর মতই নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রুর এই মনোভাবেরও অংশীদার হয়। একবার নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রুকে তার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে যথারীতি লজ্জায় লাল

হয়ে উঠল,—তার এই ভাবটা নাতাশার খুব পছন্দ—বলল যে ছেলে তাদের সঙ্গে থাকবে না।

“কেন থাকবে না?” নাতাশা সভয়ে জানতে চাইল।

“তার ঠাকুরদার কাছ থেকে তাকে সরিয়ে নিতে আমি পারব না, আর তাছাড়া…”

তার মনের কথা বুঝে নিয়ে নাতাশা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, “আমি তাকে কত ভালবাসতাম! কিন্তু আমি জানি আমাদের দোষ ধরবার যেকোন কারণকে তুমি এড়িয়ে চলতে চাও।”

কখনও বা বুড়ো কাউণ্ট নিজে এসে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে চুমো খায়, পেত্‌য়ার লেখাপড়া বা নিকলাসের সম্পর্কে তার পরামর্শ চায়। তাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ি কাউণ্টেস দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সোনিয়ার মনে সবসময়ই ভয় পাছে সে দুজনের মিলনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, আর তাই যেকোন ছুতো-নাতায় সে তাদের একলা রেখে সরে পড়ে। প্রিন্স আন্‌দ্রু যখন কথা বলে (সে খুব ভাল গল্প বলতে পারে) নাতাশা তখন গর্বের সঙ্গে তা শোনে; আর নাতাশা লক্ষ্য করে যে যখনই সেকথা বলে তখনই প্রিন্স আন্‌দ্রু গভীর মনোযোগের সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। বিব্রত হয়ে সে নিজেকেই প্রশ্ন করে: “আমার মধ্যে সে কি খোঁজে? আমার দিকে তাকিয়ে কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছে কি! যা খুঁজছে তা যদি না পায়?” প্রিন্স আন্‌দ্রু কদাচিৎ হাসে, কিন্তু যখন হাসে তখন মন-প্রাণ ঢেলে দিয়ে হাসে, আর সেই হাসির পরেই নাতাশার মনে হয় সে যেন তার আরও অনেক কাছে এসে গেছে। নাতাশার এই সুখ ষোলকলায় পূর্ণ হত যদি না তাদের আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তা তাকে শংকিত করে তুলত; সেই একই চিন্তায় প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখটাও বিবর্ণ ও কঠিন হয়ে ওঠে।

পিতার্সবুর্গ থেকে চলে যাবার প্রাক্কালে প্রিন্স আন্‌দ্রু একদিন পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে এল; বল-নাচের পরে পিয়ের একদিনও রস্তভদের বাড়ি আসে নি। তাকে খুবই বিষণ্ণ ও বিব্রত মনে হল। সে কাউণ্টেসের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল। নাতাশা ও সোনিয়া একটা ছোট দাবার ছক নিয়ে বসেছিল। তাদের ডাক শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুও সেখানে গেল।

বলল, “বেজুখভকে তো তুমি অনেকদিন ধরেই চেন। তাকে কেমন লাগে?”

“হ্যাঁ, সে ভাল, তবে খুবই খেয়ালী।”

পিয়েরের কথা বলতে গিয়ে তার অন্যমনস্কতার অনেক কাহিনী সে বলে গেল; এমন কি কিছু বানিয়েও বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, “তুমি কি জান আমাদের গোপন কথা সবই তাকে বিশ্বাস করে বলেছি? ছেলেবেলা থেকেই তাকে আমি

চিনি। তার মনটা সোনা দিয়ে গড়া। তোমাকে মিনতি করছি নাতালি…… আমি তো চলে যাচ্ছি, কি যে ঘটবে তা ঈশ্বরই জানেন। হয়তো তোমার ভালবাসা……ঠিক আছে, আমি জানি সেটা আমার বলার কথা নয়। শুধু এইটুকু: আমি যখন এখানে থাকব না তখন তোমার যাই ঘটুক না কেন……”

“কি ঘটতে পারে?”

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলতে লাগল, “যত বিপদই আসুক, তোমাকে মিনতি করছি মাদময়জেল সোফি, যাই ঘটুক না কেন, পরামর্শ ও সাহায্যের জন্য একমাত্র তার দিকেই হাত বাড়িয়ো! সে খুবই অন্যমনস্ক ও খেয়ালী মানুষ, কিন্তু তার অন্তরটা সোনা দিয়ে গড়া।”

প্রেমিকের কাছ থেকে এই বিচ্ছেদ নাতাশার উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে সেটা কেউ বুঝতে পারে নি—তার বাবা নয়, মা নয়, সোনিয়া নয়, এমন কি প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেও নয়। মুখ লাল করে উত্তেজিতভাবে সে সারাদিন বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল, তুচ্ছ জিনিস নিয়ে সময় কাটাতে লাগল। বিদায় নিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু যখন তার হাতে চুমো খেল তখন সে কাঁদল না পর্যন্ত। শুধু এমন স্বরে বলল “যেও না!” যে প্রিন্স আন্‌দ্রু সবিস্ময়ে ভাবল তার এখান থেকে যাওয়াটা উচিত কি না; অনেকদিন পর্যন্ত সে স্বর তার মনে পড়ত। সে চলে যাবার পরেও নাতাশা কাঁদল না; কিন্তু কয়েকদিন ধরেই শুকনো চোখে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকে, কোন কিছুতেই মন দেয় না, শুধু মাঝে মাঝেই বলে ওঠে, “আঃ, কেন সে চলে গেল?”

কিন্তু প্রিন্স আন্‌দ্রু চলে যাবার পক্ষকাল পরে আশপাশের সকলকে অবাক করে দিয়ে অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই সেই মানসিক বিষণ্ণতাকে কাটিয়ে উঠে নাতাশা আবার তার আগেকার অবস্থায় ফিরে গেল, কিন্তু তার মধ্যে একটা নৈতিক পরিবর্তন দেখা দিল, ঠিক যেরকমভাবে দীর্ঘ রোগ ভোগের পরে কোন শিশুর মুখের ভাবের পরিবর্তন ঘটে।

অধ্যায়—২৫

ছেলে চলে যাবার পর থেকেই প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির স্বাস্থ্য ও মেজাজ আরও খারাপ হয়ে পড়ল। সে আরও খিটখিটে হয়ে উঠল, আর প্রায়ই তার অকারণ ক্রোধের ঝাপ্টা এসে পড়ত প্রিন্সেস মারির উপরেই। বেছে বেছে প্রিন্সেস মারির মনের নরম জায়গাগুলির উপরেই সে কঠোরভাবে আঘাত করত। প্রিন্সেস মারির জীবনে দুটোই আকর্ষণ আর দুটোই আনন্দ—ভাইপো ছোট্ট নিকলাস, আর ধর্ম—আর এই দুটিই হয়ে উঠল প্রিন্সের আক্রমণ ও ঠাট্টার প্রিয় বিষয়বস্তু। যে কথাই উঠুক সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বয়স্কা কুমারীদের কুসংস্কার এবং ছেলেমেয়েদের আদর দিয়ে নষ্ট করার প্রসঙ্গে

চলে যেত। বলত, "তুমি তো ওকে—ছোট নিকলাসকে—তোমার মতই বুড়ি বানাতে চাইছ! কী দুঃখের কথা! প্রিন্স আন্‌দ্রু চাইছে একটি ছেলে, আর তুমি ওকে বানাচ্ছ একটা বুড়ি!" অথবা মাদময়জেল বুরিয়েঁর দিকে ফিরে প্রিন্সেস মারির সামনেই তাকে জিজ্ঞাসা করত গ্রাম্য পুরোহিত ও দেবমূর্তিগুলিকে তার পছন্দ কি না; তাদের নিয়ে অনেকরকম ঠাট্টা-রসিকতাও করত।

সে অনবরতই প্রিন্সেস মারির মনে আঘাত দেয়, তাকে যন্ত্রণা দেয়, সে কিন্তু সহজভাবেই প্রিন্সকে ক্ষমা করে। তার বাবা তাকে ভালবাসে; সে কি তাকে কষ্ট দিতে পারে, তার প্রতি অবিচার করতে পারে? ন্যায়বিচার কি? "ন্যায়বিচার" এই গর্বিত শব্দটার কথা প্রিন্সেস কখনও ভাবে নি। তার কাছে মানুষের সব জটিল আইনকানুনই একটিমাত্র স্পষ্ট ও সরল আইনে কেন্দ্রায়িত—ভালবাসা ও আত্মত্যাগের আইন: নিজে ঈশ্বর হয়েও যিনি মানুষকে ভালবেসে তার জন্য নির্যাতন ভোগ করেছেন এ আইন তিনিই শিখিয়েছেন। অন্য মানুষের ন্যায়-অন্যায় দিয়ে সে কি করবে? তার কাজ সহ্য করা, ভালবাসা, আর তাই সে করে চলেছে।

শীতকালে প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্ড হিল্‌স্‌-এ ফিরে এল; এবার সে অনেকবেশী হাসিখুসি, শান্ত ও স্নেহশীল হয়েছে; প্রিন্সেস মারি অনেকদিন তাকে এরকমটা দেখে নি। সে বুঝল যে একটাকিছু ঘটেছে, কিন্তু প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজে কিছুই বলল না। বাড়ি থেকে যাবার আগে কি নিয়ে যেন সে বাবার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করল; প্রিন্সেস মারি লক্ষ্য করল, যাবার আগে দুজনই পরস্পরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রু চলে যাবার পরেই প্রিন্সেস মারি পিতার্সবুর্গে বন্ধু জুলি কারাগিনকে চিঠি লিখল। তাকে সে স্বপ্নে দেখেছে (সব মেয়েরাই এরকম স্বপ্ন দেখে)। তুরস্কে দাদার মৃত্যু হওয়ায় বেচারি এখন শোকে দিন কাটাচ্ছে। চিঠিতে দাদার সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাবের কথাই সে লিখল।

"প্রিয় মিষ্টি বন্ধু জুলি, মনে হয় দুঃখ আমাদের সকলেরই ললাট-লিখন।

"তোমার এ ক্ষতি এতই ভীষণ যে নিজের কাছে আমি এর শুধু একটা ব্যাখ্যাই খুঁজে পাই—তোমাকে ও তোমার মাকে ভালবেসে তোমাদের পরীক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর এই বিশেষ ব্যবস্থাটি করেছেন। হায় বন্ধু! ধর্ম, একমাত্র ধর্মই পারে—আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে বলব না—হতাশা থেকে আমাদের রক্ষা করতে। মানুষ যা বুঝতে পারে না একমাত্র ধর্মই তা বুঝিয়ে দিতে পারে: কেন, কি কারণে, যেসব দয়ালু মহৎ লোক জীবনে সুখলাভে সক্ষম—যারা শুধু যে অন্যের ক্ষতি করে না তাই নয়, অনেক সুখের পক্ষে একান্ত দরকারী—তাদেরই ডাক আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে, অথচ যে সব নিষ্ঠুর, অদরকারী, ক্ষতিকর মানুষ শুধু নিজেদেরই নয় অন্যের পক্ষেও

বোঝাস্বরূপ তাদেরই বাঁচতে দেওয়া হয়। জীবনে প্রথম যে মৃত্যু আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যা আমি কোনদিন ভুলব না—আমার আদরের বৌদির মৃত্যু—সেই মৃত্যুই আমাকে একথা শিখিয়েছে। তুমি যেমন নিয়তিকে প্রশ্ন করছ, কেন তোমার এমন চমৎকার দাদাকে মরতে হল, তেমনই আমিও প্রশ্ন করেছিলাম, দেবদূতের মত যে লিজা কখনও কারও প্রতি অন্যায় করে নি, কোন অশুভ চিন্তা কখনও যার মনে আসে নি, তাকে কেন মরতে হল। প্রিয় বন্ধু, তোমার কি মনে হয়? তারপরে পাঁচটি বছর কেটে গেছে, এর মধ্যেই আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি কেন তাকে মরতে হয়েছিল, কি ভাবে সেই মৃত্যু স্রষ্টিকর্তার অসীম কল্যাণময়তারই প্রকাশমাত্র, আমাদের কাছে দুর্বোধ্য হলেও যাঁর প্রতিটি কাজ জীবের প্রতি তাঁর অসীম ভালবাসারই প্রকাশ। প্রায়ই ভাবি, তার দেবদূতের মত নির্দোষ স্বভাবের পক্ষে মায়ের সব কর্তব্য পালনের মত শক্তিই তার ছিল না। তরুণী বধূ হিসাবে সে নিন্দার অতীত; হয়তো বা মা হিসাবে সে তা নাও হতে পারত। যাই হোক, সে আমাদের ছেড়ে গেছে, বিশেষ করে ছেড়ে গেছে প্রিন্স আন্‌দ্রু; রেখে গেছে শুধু দুঃখ আর স্মৃতি; কিন্তু সম্ভবত সেখানে সে এমন একটি আসন পাবে যেটা পাবার আশা আমি নিজে করতে পারি না। কিন্তু শুধু তার কথাই বা বলি কেন; যত দুঃখই পেয়ে থাকি তবু সেই ভয়ংকর অকাল মৃত্যু আমার ও দাদার জীবনে অতীব কল্যাণময় প্রভাব বিস্তার করেছে। তখন সেই ক্ষতির মুহূর্তে এসব চিন্তা আমার মনে আসে নি: তখন হয় তো এসব চিন্তাকে সভয়ে দূরে ঠেলে দিতাম, কিন্তু সে চিন্তা এখন আমার কাছে স্পষ্ট ও নিশ্চিত। প্রিয় বন্ধু, সুসমাচারের যে সত্যবাণী আমার জীবনের মন্ত্র হয়ে দেখা দিয়েছে তার সত্যতায় তোমাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তোমাকে এত কথা লিখলাম: তাঁর ইচ্ছা ভিন্ন আমাদের মাথার একগাছি চুলও পড়তে পারে না। আর তাঁর ইচ্ছা তো পরিচালিত হয় একমাত্র আমাদের প্রতি অসীম ভালবাসার দ্বারা, আর তাই আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে আমাদের ভালর জন্যই ঘটে।

"তুমি জানতে চেয়েছ আগামী শীতকালটা আমরা মস্কোতে কাটাব কি না। তোমাকে দেখার অনেক ইচ্ছা সত্ত্বেও তা হবে বলে মনে করি না, আর আমি তা চাইও না। শুনে অবাক হবে যে বোনাপার্টই এর কারণ! ব্যাপারটা এই: বাবার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে, আমার কোন প্রতিবাদই তিনি সহ্য করতে পারেন না, ক্রমেই খিটখিটে হয়ে উঠছেন। তুমি তো জান, রাজনৈতিক সমস্যাই এর কারণ। ইয়োরোপের সব রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে, বিশেষ করে মহান ক্যাথারিনের পৌত্র আমাদের সম্রাটের সঙ্গে বোনাপার্ত যে সমমর্যাদায় সন্ধির আলোচনা করছে—এটা বাবা কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। তুমি জান, রাজনীতির দিকে আমার কোন আগ্রহ

নেই কিন্তু বাবার কথাবার্তা এবং মাইকেল আইভানভিচের সঙ্গে তার আলোচনা থেকে পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে সবই আমি জানতে পারি—বিশেষ করে বোনাপার্তের উপর যেসব সম্মান বর্ষিত হয়েছে সেকথা তো বটেই। আমার তো মনে হয়, সারা পৃথিবীতে একমাত্র বল্ড হিল্‌স-এই তাকে মহাপুরুষ তো দূরের কথা, ফ্রান্সের সম্রাট বলেও স্বীকার করা হয় না। বাবা এসব সহ্যই করতে পারেন না। আমার তো মনে হয়, রাজনৈতিক মতামতের জন্যই বাবা মস্কো যাবার কথা বলতে অনিচ্ছুক; কারণ তিনি জানেন যে কারও তোয়াক্কা না করে নিজের মতামত প্রকাশ করলেই সেখানে সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। বোনাপার্তকে নিয়ে বিতর্ক তো অনিবার্য, আর তার ফলে চিকিৎসায় যেটুকু ভাল ফল হবে তাও বিফলে যাবে। যাই হোক, শীঘ্রই এব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

"আমার দাদা আন্‌দ্রুর অনুপস্থিতি ছাড়া আমাদের পারিবারিক জীবন আগেকার মতই চলছে। তোমাকে আগের চিঠিতেও লিখেছি, ইদানীং সে খুব বদলে গেছে। সেই দুঃখের পরে এবছরই তাকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেখলাম। ছেলেবেলায় তাকে যেমন দেখেছি: দয়ালু, স্নেহশীল, সোনায় মোড়া অদ্বিতীয় অন্তরের অধিকারী, আবার সে ঠিক সেইরকমটি হয়েছে। মনে হচ্ছে, সে বুঝতে পেরেছে যে তার জীবন শেষ হয়ে যায় নি। কিন্তু মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক দিক থেকে সে আরও অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে। অনেক শুকিয়ে গেছে, স্নায়ু দুর্বল হয়েছে। তাকে নিয়ে উদ্বেগে আছি, তবে সুখের বিষয় অনেক আগেই ডাক্তাররা তাকে বিদেশে যাবার যে পরামর্শ দিয়েছিল এতদিনে সে কাজটা সে করছে। আশা করছি, এবার সে ভাল হয়ে উঠবে। তুমি লিখেছ, পিতার্সবুর্গে সকলেই বলে সে একজন সক্রিয়, সংস্কৃতিসম্পন্ন, সক্ষম যুবক। আত্মীয় হিসাবে আমার অহংকার ক্ষমা কর, কিন্তু এবিষয়ে কোনদিনই আমার কোন সন্দেহ ছিল না। এখানকার চাষী থেকে ভদ্রজন পর্যন্ত সকলের যে উপকার সে করেছে তা অপরিমেয়। পিতার্সবুর্গে পৌঁছে সে তার প্রাপ্যটুকুই পেয়েছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি গুজব কত তাড়াতাড়ি পিতার্সবুর্গ থেকে মস্কোতে ছড়াতে পারে, বিশেষ করে যে মিথ্যাগুজবের কথা তুমি লিখেছ—ছোট্ট রস্তভার সঙ্গে দাদার বাকদানের কথাই আমি বলছি। আমার তো মনে হয় না দাদা আর কখনও বিয়ে করবে, সে মেয়েকে তো কিছুতেই নয়, আর তার কারণ: প্রথম, আমি জানি যদিও সে হারানো স্ত্রীর কথা কদাচিৎ বলে থাকে, তবু সেই হারানোর ব্যথা তার অন্তরের এত গভীরে প্রবেশ করেছে যে তার জায়গায় অন্য কাউকে বসানো এবং আমাদের ছোট্ট দেবদূতের জন্য একজন সৎ-মা এনে দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। দুই, আমি যতদূর জানি, তাকে খুসি করার মত মেয়ে সে নয়। তাই আমি মনে করি না যে তাকে সে স্ত্রীরূপে

বেছে নেবে, আর সত্যি কথা বলতে কি আমিও সেটা চাই না। কিন্তু চিঠিটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে; দ্বিতীয় পাতার শেষে পৌঁছে গেছি। বিদায় বন্ধু। ঈশ্বর তাঁর পবিত্র ও সবল স্নেহে তোমাকে রক্ষা করুন। প্রিয় বন্ধু, মাদময়জেল বুরিয়েঁও তোমাকে চুম্বন পাঠাচ্ছে।

"মারি"

অধ্যায়—২৬

গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি প্রিন্সেস মারি সুইজারল্যাণ্ড থেকে প্রিন্স আন্দ্রুর একটা অপ্রত্যাশিত চিঠি পেল। সে চিঠিতে একটা বিচিত্র ও বিস্ময়কর সংবাদ সে জানিয়েছে। নাতাশা রস্তভার সঙ্গে তার বিয়ের সংবাদ দিয়েছে। সারা চিঠিতে বাকদত্তার প্রতি প্রেমের উচ্ছ্বাস এবং বোনের প্রতি মমতা ছড়িয়ে আছে। লিখেছে, এমন ভাল সে কাউকে কোনদিন বাসে নি; জীবন যে কি তা সে শুধু এখনই বুঝেছে ও জেনেছে। শেষবারের মত বল্ড হিল্‌স্‌-এ গিয়ে তাকে এই সংকল্পের কথা জানায় নি বলে সে বোনের কাছে ক্ষমা চেয়েছে; যদিও একথা সে বাবাকে তখনই জানিয়েছে। বোনকে এই ভয়ে বলে নি যে প্রিন্সেস মারি তাহলে বাবার সম্মতি চাইত, তাকে বিরক্ত করে তুলত, তার অসন্তুষ্টির ধাক্কা সইত, অথচ লাভ কিছুই হত না। লিখেছে, তাছাড়া, তখন ব্যাপারটা এখনকার মত পাকা হয় নি। বাবা তখন একবছর অপেক্ষা করার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিলেন; এখন তার অর্ধেক সময় ছ' মাস পার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার সংকল্প আগের চাইতে দৃঢ়তর হয়েছে। ডাক্তাররা যদি আমাকে আর এখানে আটকে না রাখে তাহলেই আমার রাশিয়াতে ফিরে যাওয়ার কথা, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে আরও তিন মাস আমাকে এখানে থাকতে হবে। আমাকে তুমি চেন, বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্কও তুমি জান। তার কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না। চিরদিন স্বাধীন ছিলাম, আর তাই থাকব; কিন্তু হয়তো আর বেশীদিন তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন না, তাই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে তার বিরাগ-ভাজন হলে আমার সুখের অর্ধেকটাই নষ্ট হয়ে যাবে। সেইকথা নিয়ে তাকেও একটা চিঠি লিখছি; আমার মিনতি, একটা ভাল সময় বুঝে চিঠিটা তার হাতে দিও, এবং আমাকে জানিও সমস্ত ব্যাপারটাকে তিনি কিভাবে নিয়েছেন এবং সময়টা চার মাস কমিয়ে আনতে তিনি সম্মতি দিতে পারেন এরকম কোন আশা আছে কি না।"

অনেক ইতস্তত, সন্দেহ ও প্রার্থনার পরে প্রিন্সেস মারি চিঠিটা বাবার হাতে দিল। পরদিন বুড়ো প্রিন্স তাকে শান্তভাবে বলল:

"তোমার দাদাকে লিখে জানিয়ে দিও যেন আমার মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে…বেশী দিন লাগবে না—অচিরেই আমি তাকে মুক্তি দেব।"

প্রিন্সেস জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাবা তাকে কথাই বলতে দিল না,

উত্তরোত্তর গলা চড়িয়ে চীৎকার করে বলল: "বিয়ে কর, বিয়ে কর বাপু।.... ভাল পরিবার! ···চমৎকার লোক, অ্যাঁ? ধনী, অ্যাঁ? হ্যাঁ, ছোট্ট নিকলাস সুন্দর একটি সৎ-মা পাবে। চিঠি লিখে তাকে জানিয়ে দাও, ইচ্ছা করলে সে কালই বিয়ে করতে পারে। সে হবে ছোট্ট নিকলাসের সৎ-মা, আর আমি বিয়ে করব বুরিয়েঁকে!.... হা, হা, হা! তারও তো একজন সৎ-মা থাকা চাই। শুধু একটা কথা, আমার বাড়িতে আর মেয়েমানুষের দরকার নেই—বিয়ে করে সে যেন নিজের মত বাস করে। তুমি হয়তো তার কাছে গিয়েই থাকবে?" প্রিন্সেস মারির দিকে ফিরে বলল। "ঈশ্বরের দোহাই, তাই যাও! বেরিয়ে যাও তুষার-ঝড়ের মধ্যে···তুষার-ঝড়···তুষার-ঝড়!"

এই চেঁচামেচির পরে প্রিন্স এ নিয়ে আর একটি কথাও বলে নি। কিন্তু ছেলের এই আচরণের দরুণ চাপা বিরক্তি প্রকাশ পেতে লাগল মেয়ের প্রতি ব্যবহারে। আগেকার ঠাট্টা-বিদ্রূপের সঙ্গে একটা নতুন বিষয় যুক্ত হল—সৎ-মার কথা এবং মাদময়জেল বুরিঁয়ের নম্র স্বভাবের কথা।

মেয়েকে শুধায়, "আমি কেন তাকে বিয়ে করব না? সে তো একটি চমৎকার প্রিন্সেস হবে!"

বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে প্রিন্সেস মারি লক্ষ্য করতে লাগল যে ইদানীং তার বাবা সেই ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে খুবই দহরম-মহরম শুরু করে দিয়েছে। চিঠিটার ভাগ্যে যা ঘটেছে সে-কথা প্রিন্স আন্দ্রুকে সে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, তবে তাকে এই আশা দিয়ে সান্ত্বনা জানাল যে বাবা মত করে দিতে পারবে।

ছোট্ট নিকলাস ও তার লেখাপড়া, দাদা আন্দ্রু এবং ধর্ম—এই হল প্রিন্সেস মারির আনন্দ ও সান্ত্বনা; কিন্তু এছাড়াও, প্রত্যেক মানুষেরই যেমন কতকগুলি ব্যক্তিগত আশা থাকে তেমনই প্রিন্সেস মারিও তার অন্তরের গভীরতম কোণে এমন একটি গোপন স্বপ্ন ও আশাকে লালন করে যা তার জীবনের প্রধান সান্ত্বনা। এই সান্ত্বনাভরা স্বপ্ন ও আশা তাকে এনে দেয় ঈশ্বরের আপনজনরা—সেইসব আধ-পাগলা ও অন্ধ তীর্থযাত্রীর দল যারা প্রিন্সের অজ্ঞাতসারে তার সঙ্গে দেখা করে। যত বেশীদিন সে বাঁচছে, জীবনের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ যত বাড়ছে, ততই সেইসব স্বল্পদৃষ্টি মানুষকে দেখে সে বেশী অবাক হচ্ছে যারা এই পৃথিবীতেই আনন্দ ও সুখের খোঁজ করছে: সেই অসম্ভব, অবাস্তব, পাপপূর্ণ সুখকে পাবার জন্য পরিশ্রম করছে, যন্ত্রণা ভোগ করছে, সংগ্রাম করছে এবং পরস্পরের ক্ষতি করছে। প্রিন্স আন্দ্রু স্ত্রীকে ভালবাসল, সে মারা গেল, কিন্তু তাও যথেষ্ট হল না, আর একটি মেয়েমানুষের সঙ্গে সে নিজের সুখকে বাঁধতে চাইল। বাবা এতে আপত্তি করলেন, কারণ আন্দ্রুর জন্য তিনি চান আরও খ্যাতি ও অর্থসম্পন্না একটি কনে। আর এমন কিছুকে পাবার জন্য তারা সকলেই লড়াই করল, কষ্ট পেল, একে

অন্যকে যন্ত্রণা দিল, তাদের আত্মাকে, শাশ্বত আত্মাকে ক্ষত-বিক্ষত করল, যা একান্তই ক্ষণস্থায়ী। একথা যে আমরা নিজেরাও জানি তাই শুধু নয়, ঈশ্বর-পুত্র খৃস্টও পৃথিবীতে নেমে এসে আমাদের বললেন যে এই জীবন মুহূর্তের খেলাঘরমাত্র; তথাপি আমরা একেই আঁকড়ে ধরে থাকি, এই জীবনেই সুখের খোঁজ করি। প্রিন্স মারি ভাবল, "একথা কেউ বোঝে না কেন? বোঝে শুধু ঈশ্বরের সেইসব ঘৃণিত আপনজনরা, ঝোলা পিঠে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে যারা আমার কাছে আসে পাছে প্রিন্স তাদের দেখে ফেলেন এই ভয়ে; তার কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পাবার ভয়ে নয়, পাছে তার পাপ হয় সেই ভয়ে। পরিবার, বাড়িঘর ও পার্থিব সুখের সব চিন্তা ছেড়ে, কোন কিছুকে আঁকড়ে না ধরে শানের কম্বলে শরীর ঢেকে একটা নতুন নাম নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, কারও কোন ক্ষতি না করে যারা তাড়িয়ে দেয় আর যারা আশ্রয় দেয় তাদের সকলের জন্যই প্রার্থনা কর: এই জীবন ও সত্যের চাইতে মহত্তর কোন জীবন বা সত্য নেই!"

একটি তীর্থযাত্রী প্রিন্সেস মারির বড়ই প্রিয়; নাম থিয়োদসিয়া, বয়স পঞ্চাশ বছর, ছোটখাট শান্ত মানুষটি, মুখভর্তি দাগ; খালি পায়ে ভারী শিকল পরে তিরিশ বছরের অধিককাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদা একটা ঘরে দেবমূর্তির সামনে জ্বালানো স্বল্পালোকিত বাতির নীচে বসে থিয়োদসিয়া যখন তার জীবনের কথা বলছিল তখন একমাত্র থিয়োদসিয়াই যে জীবনের সত্য পথের সন্ধান চেয়েছে সহসা এই চিন্তা এত তীব্রভাবে প্রিন্সেস মারির মনে জেগে উঠল যে সে স্থির করল নিজেও তীর্থযাত্রী হয়ে যাবে। থিয়োদসিয়া ঘুমতে চলে গেলে প্রিন্সেস মারি অনেকক্ষণ এ নিয়ে ভাবল, এবং শেষপর্যন্ত মনস্থির করে ফেলল যে যত অদ্ভুতই মনে হোক সে তীর্থযাত্রায় বের হবেই। কেবলমাত্র তার দীক্ষাগুরু সন্ন্যাসী আকিন্ফি বাবার কাছেই এই সিদ্ধান্তের কথা জানাল আর সেও তার অভিপ্রায়কে সমর্থন করল। তীর্থযাত্রীদের উপহার দেবার অছিলা করে সে নিজের জন্য একপ্রস্থ তীর্থযাত্রীর পোশাক তৈরি করাল; মোটা কাপড়ের একটা আলখাল্লা, কাঠের জুতো, মোটা কাপড়ের কোট ও কালো রুমাল। যে সিন্দুকটাতে তার নিজস্ব গোপন অর্থাদি আছে বারকয়েক সেটার কাছে গিয়েও প্রিন্সেস মারি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল; পরিকল্পনামত কাজ করবার সময় হয়েছে কি না তা নিয়ে ইতস্তত করতে লাগল।

যাত্রীদের কাহিনী শুনতে বসে তাদের সরল কথাবার্তায় প্রায়ই সে এত বেশী উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে অনেকবারই সবকিছু ছেড়েছুড়ে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে উদ্যত হয়েছে। কল্পনায় সে যেন দেখতে পায়, মোটা কম্বলে দেহ জড়িয়ে হাতে একটা লাঠি নিয়ে পিঠে বোঁচকা ফেলে থিয়োদসিয়ার

পাশে পাশে হাঁটতে হাঁটতে সে এক সন্তের স্থান থেকে অন্য সন্তের স্থানে এগিয়ে চলেছে ; মন থেকে বিদায় নিয়েছে যত ঈর্ষা-দ্বেষ, জাগতিক ভালবাসা ও কামনা এবং অবশেষে পৌঁছে গেছে সেই স্থানে যেখানে দুঃখ নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই, আছে শুধু শাশ্বত সুখ ও পরমানন্দ।

প্রিন্সেস মারি ভাবে: "এক জায়গায় গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করব ; সেখানে থাকতে অভ্যস্ত হবার বা সে জায়গাটাকে ভালবাসবার আগেই আরও এগিয়ে যাব। যতদিন পা চলে ততদিনই এগিয়ে চলবো, তারপর কোন এক জায়গায় শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মরে যাব এবং শেষপর্যন্ত পৌঁছে যাব সেই শাশ্বত, শান্ত আবাসে যেখানে কোন দুঃখ নেই, দীর্ঘশ্বাস নেই…।"

কিন্তু পরক্ষণেই বাবাকে দেখল, বিশেষ করে ছোট্ট কোকোকে (নিকলাস) দেখলেই তার মন দুর্বল হয়ে পড়ে। সে নীরবে চোখের জল ফেলে, আর ভাবে সে তো পাপী, সে যে বাবাকে আর ছোট্ট ভাইপোটিকে ঈশ্বরের চাইতেও বেশী ভালবাসে।

ষষ্ঠ পর্ব সমাপ্ত

সপ্তম পর্ব

অধ্যায়—১

বাইবেলের কাহিনীতে বলে, মহাপতনের পূর্বে প্রথম মানুষের পরমানন্দের অন্যতম অবস্থাই ছিল পরিশ্রমের অভাব—আলস্য। পতিত মানুষ তাই আজও আলস্যপ্রিয়তাকে বজায় রেখেছে, কিন্তু মানব জাতির মাথায় অভিশাপটি এখনও চেপে বসে আছে, তার কারণ শুধু এই নয় যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমাদের রুটির যোগাড় করতে হয়, আসল কারণ হল আমাদের নৈতিকস্বভাবই এমনযে আমরা যুগপৎ অলস ও সুখী হতে পারি না। ভিতর থেকে কে যেন বলে দেয়, অলস হলেই আমরা অন্যায় করব। মানুষ যদি সেরকম একটা অবস্থা খুঁজে পায় যেখানে সে বুঝতে পারবে যে অলস হয়েও সে তার কর্তব্য পালন করছে, তাহলেই মানুষের আদিম পরমানন্দের একটা অবস্থা সে পেয়ে যাবে। আর এ ধরনের একটা বাধ্যতামূলক ও অনিন্দ্যনীয় আলস্যই এক শ্রেণীর মানুষের নিয়তি—তারা হল সামরিক শ্রেণী। এই বাধ্যতামূলক ও অনিন্দ্যনীয় আলস্যই সামরিক চাকরির প্রধান আকর্ষণ আছে এবং থাকবে।

১৮০৭ সালের পরে নিকলাস রস্তভ যখন পাভ্‌লোগ্রাদ রেজিমেন্টের চাকরিতেই থেকে গেল, তখনই সে এই আনন্দময় অবস্থার অভিজ্ঞতা লাভ করল। ততদিনে সে দেনিসভের কাছ থেকে পাওয়া সেনাদলের পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেছে।

মস্কোর পরিচিতজনরা রস্তভকে কিছুটা খারাপ মনে করলেও তার সহকর্মীরা, অধীনস্থ কর্মচারি ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষরা তাকে পছন্দ করে, শ্রদ্ধা করে। এ জীবন নিয়ে সে নিজেও সন্তুষ্ট। ইদানীংকালে, ১৮০৯ সালে, সে বাড়ির চিঠিতে প্রায়ই মার কাছ থেকে অভিযোগ পাচ্ছে যে তাদের অবস্থা ক্রমশই গোলমেলে হয়ে উঠছে এবং এবার বাড়িতে ফিরে গিয়ে বুড়ো বাবা-মাকে সুখী করা, তাদের আরাম দেওয়ার সময় এসেছে।

এইসব চিঠি পড়ে নিকলাসের ভয় হয়েছে, জীবনের সবরকম জটিলতা থেকে মুক্ত হয়ে যে পরিবেশে এত শান্তভাবে সে বাস করছে তারা চাইছে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। সে বুঝতে পারছে, আগে হোক পরে হোক আবার তাকে জীবনের সেই ঘূর্ণি-স্রোতে ঢুকতে হবে—সেখানে আছে নানান জটিলতা ও কাজকর্ম, নায়েবদের সঙ্গে হিসাবপত্র করা, ঝগড়া করা, নানা রকম ষড়যন্ত্র, বন্ধন, সমাজ, সোনিয়ার ভালবাসা এবং তাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি। এসবই ভয়ানক রকমের শক্ত ও জটিল ; তাই মার কাছে সম্পূর্ণ

আনুষ্ঠানিকভাবে ফরাসী ভাষায় লেখা চিঠির শুরুতে লিখল "প্রিয় মামণি", আর শেষে লিখল "তোমার বিশ্বস্ত ছেলে", কিন্তু কবে বাড়ি ফিরবে সে-বিষয়ে কিছুই জানাল না। ১৮১০-এ বাবা-মার কাছ থেকে যে চিঠি পেল তাতে তারা জানাল যে বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে নাতাশার বিয়ে পাকা হয়েছে, এবং বুড়ো প্রিন্স বাগড়া দেওয়ায় বিয়েটা বছরখানেক পিছিয়ে গেছে। চিঠি পেয়ে নিকলাস দুঃখ পেল, মর্মাহত হল। সেইবছর বসন্তকালেই সে মার একটা চিঠি পেল; বাবার অগোচরে লেখা সেই চিঠিতে তাকে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়েছে। মা লিখেছে, সে যদি বাড়ি এসে সমস্ত ব্যাপারটা হাতে না নেয় তাহলে তাদের সমস্ত সম্পত্তি নীলামে বিক্রি হয়ে যাবে এবং তাদের সকলকেই ভিক্ষা করতে হবে। কাউন্ট এত দুর্বল, মিতেংকাকে এত বেশী বিশ্বাস করে এবং এতই ভালমানুষ যে সকলেই তার সুযোগ নিচ্ছে এবং অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে চলেছে। কাউন্টেস লিখেছে, "মিনতি করে বলছি, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে এবং গোটা পরিবারকে যদি বিপাকে ফেলতে না চাও তো অবিলম্বে চলে এস।"

চিঠিটা পেয়ে নিকলাসের মন নরম হল। বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতেই সে বুঝতে পারল তার কি করা উচিত।

চাকরি থেকে অবসর না নিলেও অন্ততপক্ষে ছুটি নিয়ে বাড়িতে যাওয়াই এখন তার পক্ষে সঠিক কাজ। কেন যে তাকে যেতেই হবে তা সে জানে না; কিন্তু খাবার পরে একটু ঘুমিয়ে উঠেই সে "মার্স'কে জিন পরাতে হুকুম দিল এবং ঘর্মাক্ত ঘোড়াটাকে নিয়ে ফিরে এসে লাভ্রুশ্‌কাকে (দেনিসভের চাকরটি তার সঙ্গেই রয়ে গেছে) এবং সহকর্মীদের জানাল যে সে ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে, এবং শীঘ্রই বাড়ি চলে যাচ্ছে। এক সপ্তাহ পরে তার ছুটি মঞ্জুর হয়ে এল। তার হুজার সহকর্মীরা রস্তভের সম্মানে একটা ডিনারের আয়োজন করল; তাতে জনপ্রতি চাঁদা ধার্য করা হল পনেরো রুবল এবং দুটো ব্যাণ্ড ও দু'দল গায়কের ব্যবস্থা করা হল। মেজর বাসভ-এর সঙ্গে রস্তভ ত্রেপার্ক নাচল; নেশায় বুঁদ হয়ে অফিসাররা রস্তভকে দোলাল, আলিঙ্গন করল, তারপর নীচে ফেলে দিল; তৃতীয় স্কোয়াড্রনের সৈনিকরাও তাকে দোলাল, "হুররা!" বলে চীৎকার করল, আর তারপরে তাকে স্লেজে চাপিয়ে প্রথম ডাক-ঘাঁটি পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

ক্রেমেনচুগ থেকে কিয়েভ পর্যন্ত যাত্রার প্রথম অংশটায় স্বভাবতই সে পিছনে ফেলে আসা সৈনিক জীবনের কথাই ভাবতে লাগল। কিন্তু যতই বাড়ির দিকে এগোতে লাগল ততই বাড়ির কথাই বেশী করে মনে পড়তে লাগল। অত্রাদ্‌নু-র আগেকার ডাক-ঘাঁটিতেই কোচয়ানকে তিন রুবল বকশিস দিল এবং গন্তব্যস্থানে পৌঁছেই ছোট ছেলের মত বাড়ির সিঁড়ি বেয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল।

প্রথম মিলনের উচ্ছ্বাস কেটে যাবার পরে নিকলাস তার পুরনো পারিবারিক জগতে স্থিতু হতে শুরু করল। বাবা ও মা প্রায় সেইরকমই আছে—একটু বুড়ো হয়েছে মাত্র। তাদের মধ্যে যেটা নতুন চোখে পড়ছে সেটা হচ্ছে কিছুটা অস্বস্তি ও সাময়িক বাদবিসম্বাদ; এটা আগে ছিল না, আর নিকলাসও অচিরেই বুঝতে পারল যে আর্থিক অবস্থা খারাপ হবার জন্যই এটা ঘটছে। সোনিয়ার বয়স প্রায় বিশ হতে চলল; সে আগের চাইতে আর বেশী সুন্দরী হয়ে ওঠে নি, যা হয়েছে তার চাইতে বেশীকিছু হবে বলে মনে হয় না, তবে সেটাই যথেষ্ট। নিকলাস আসার পর থেকেই সে চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে সুখ ও ভালবাসা; এই মেয়েটির বিশ্বস্ত, অপরিবর্তনীয় ভালবাসা নিকলাসকেও সুখী করেছে। নিকলাসকে সবচাইতে বেশী অবাক করেছে পেত্‌য়া ও নাতাশা। পেত্‌য়া তেরোয় পা দিয়েছে, যেমন চটপটে তেমনই বুদ্ধিমান ও দুষ্টু; গলার স্বর এরমধ্যেই ভাঙতে শুরু করেছে। আর নাতাশা, অনেকদিন পর্যন্ত নিকলাস তাকে দেখলেই অবাক হয় আর হাসে।

বলে, "তুমি আর আগের মত নেই।"

"সে কি? আমি কি আরও কুৎসিত হয়েছি?"

"বরং অনেক মহিমান্বিতা হয়েছ! ঠিক যেন রাজকুমারী!" রস্তভ তার কানে কানে বলল।

"ঠিক ঠিক!" নাতাশা সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে পূর্বরাগের কথা, তার অত্রাদ্‌নুতে আসার কথা সবই তাকে বলল; তার শেষ চিঠিটাও দেখাল।

"আচ্ছা, তুমি খুসি তো?" নাতাশা বলল। "এখন আমি কত শান্তিতে ও সুখে আছি।"

নিকলাস বলল, "খুব খুসি। সে তো খুব ভাল ছেলে···খুবই প্রেমে পড়েছ নাকি?"

নাতাশা জবাব দিল, "কি করে যে বোঝাব? আমি তো বরিস, আমার মাস্টারমশাই এবং দেনিসভের প্রেমেও পড়েছিলাম, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ আলাদা। আমি শান্তিতে আছি, সুখে আছি। আমি জানি তার চাইতে ভাল মানুষ হয় না, আর তাই আমি এখন শান্ত ও সন্তুষ্ট। আগের মত মোটেই নয়।"

বিয়েটা একবছর স্থগিত রাখার ব্যাপারটা নিকলাস সমর্থন করল না, কিন্তু নাতাশা হৈ-হৈ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করল যে এছাড়া গত্যন্তর ছিল না, আর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা পরিবারে প্রবেশ করাটাও ঠিক নয়; তাই সে নিজেই এটা চেয়েছিল।

বলল, "তুমি মোটেই বুঝতে পারছ না।"

নিকলাস চুপ করল; তার সঙ্গে একমত হল।

তার দিকে তাকিয়ে দাদা অবাক হয়ে যায়। তাকে দেখে মনেই হয় না যে এই মেয়ে প্রেমে পড়েছে এবং বাকদত্ত স্বামীর বিরহে দিন কাটাচ্ছে। আগের মতই খোশ মেজাজে শান্ত ও হাসিখুসিই আছে। নিকলাস দেখেশুনে অবাক হয়ে গেল; এমন কি বল্‌কন্‌স্কির পূর্বরাগ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠল। তার সবসময়ই মনে হয়, এই প্রস্তাবিত বিয়ের ব্যাপারে কোথায় যেন একটা খটকা আছে।

“এই বিলম্ব কেন? বাকদান অনুষ্ঠান হল না কেন?” সে ভাবল। এ বিষয়ে মার সঙ্গে কথা বলেও সে বুঝতে পারল যে এই বিয়ের ব্যাপারে তার মনেও সন্দেহ রয়েছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রুর একটা চিঠি দেখিয়ে মা বলল, “এই দেখ, সে লিখেছে ডিসেম্বরের আগে সে আসবে না। কিসের বাধা? হয় তো অসুখ! তার স্বাস্থ্য খুবই খারাপ। নাতাশাকে বলো না। ও যে এত হাসিখুসি আছে তার উপরেও বেশী গুরুত্ব দিও না; সে এখন বালিকা বয়সের শেষের দিনগুলির ভিতর দিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রত্যেকবার ছেলেটির চিঠি পেলে সে যে কি রকম হয়ে যায় তা তো আমি জানি! যাই হোক, ঈশ্বর করুন সবই যেন ভালয় ভালয় শেষ হয়! (সব সময়ই এই কথাগুলি দিয়ে সে বক্তব্য শেষ করে) ছেলেটি সত্যি চমৎকার!”

অধ্যায়—২

বাড়ি পৌঁছে প্রথমদিকে নিকলাস গম্ভীর হয়ে থাকত; কোন কিছু ভাল লাগত না। যেজন্য মা তাকে বাড়িতে ডেকে এনেছে অচিরেই সেই সব বাজে সাংসারিক কাজকর্মে হাত লাগাতে হবে এই চিন্তাই তাকে বিব্রত করে তুলল। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই বোঝা ঝেড়ে ফেলবার জন্য তৃতীয় দিনেই রেগেমেগে, চেঁচামেচি করে কাউকে কিছু না বলে সে মিতেংকার বাড়ি চলে গেল এবং সবকিছুর হিসাব চেয়ে বসল। কিন্তু সবকিছুর হিসাব বলতে যে কি বোঝায় সেবিষয়ে ভীত ও বিভ্রান্ত মিতেংকার চাইতেও নিকলাসের জ্ঞান অল্প। মিতেংকার সঙ্গে বসে কথা-বার্তা বলতে ও হিসাবপত্র দেখতে বেশী সময় লাগল না। বারান্দায় অপেক্ষমান গ্রাম-প্রধান, একজন কৃষক প্রতিনিধি, ও গ্রাম্য কেরাণিকটি ভয় ও আনন্দের সঙ্গে তরুণ কাউন্টের গলা শুনতে লাগল—প্রথমে গর্জন ও ধমক ক্রমেই উচ্চ হতে উচ্চতর হতে লাগল, তারপরই গালাগালি, ভয়ংকর সব শব্দ একের পর এক ঠিকরে বেরিয়ে আসতে লাগল।

“ডাকাত!···অকৃতজ্ঞ হতভাগা!···কুকুরটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলব! আমি বাবা নই!···আমাদের লুঠ করছ!···” এমনি আরও অনেককিছু।

তারপর একইরকম ভয় ও খুসির সঙ্গে তারা দেখল, মিতেংকার গলার নলি ধরে টানতে টানতে ছোট কাউন্ট তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল ; তার মুখ লাল, দুই চোখ দিয়ে যেন রক্ত ফুটে বেরুবে ; কথার ফাঁকে ফাঁকে সুবিধামত সময়ে তাকে লাথি ও গুঁতো মারতে মারতে চীৎকার করে বলল, “বেরিয়ে যাও ! শয়তান, আর কোনদিন যেন আমাকে তোমার মুখদর্শন করতে না হয় !”

মিতেংকা লাফিয়ে ছ’টা সিঁড়ি পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল। মিতেংকার স্ত্রী ও শালী দরজার ফাঁক দিয়ে ভয়ার্ত মুখ বের করে সব দেখছিল। ছোট কাউন্ট সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে দৃঢ় পদক্ষেপে বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

দাসীদের মুখে সব কথা শুনে কাউন্টেস এই ভেবে শান্ত হল যে এবার তাদের বিষয় সম্পত্তির উন্নতি হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার একটা দুশ্চিন্তা হল যে এই উত্তেজনার ফলে ছেলের ক্ষতি হতে পারে। পা টিপে টিপে সে বার-কয়েক তার দরজায় গিয়ে কান পাতল, আর ওদিকে ছেলে একটার পর একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগল।

পরদিন বুড়ো কাউন্ট ছেলেকে একান্তে ডেকে নিয়ে বিব্রত মুখে বলল, “কিন্তু বোঝ তো বাবা, এটা খুবই দুঃখের যে তুমি এতটা উত্তেজিত হয়েছিলে ! মিতেংকা আমাকে সব কথাই বলেছে।”

নিকলাস ভাবল, “আমি জানতাম এই পাগলা সংসারে আমি কোনদিন কিছু বুঝতে পারব না।”

“ঐ সাত শ’ রুবল খাতায় লেখে নি বলে তুমি রাগ করেছ। কিন্তু সে টাকাটা জের টানা হয়েছিল—আর তুমিও পরের পাতাটা উল্টে দেখ নি।”

“বাপি, ও তো একটা ঠগ ও চোর ! আমি ওকে চিনি ! আমি যা করেছি তা করেছি ; তবে তুমি যদি চাও তো আর কোনদিন তার সঙ্গে কথা বলব না।”

“না বাবা, না ; আমি তোমাকে কাজকর্ম দেখতে অনুরোধ করছি। আমি বুড়ো হয়েছি। আমি…”

“না বাপি, আমি যদি তোমার অসন্তোষের কারণ হয়ে থাকি সেজন্য আমাকে ক্ষমা কর। এসব আমি তোমার চাইতে অনেক কম বুঝি।”

“এইসব চাষীদের ব্যাপার আর টাকাপয়সার ব্যাপার, এক পাতা থেকে আর এক পাতায় জের টানা—সব উচ্ছন্নে যাক,” সে ভাবতে লাগল। “তাস খেলার টুকিটাকি আমি বুঝি, কিন্তু আর এক পাতায় জের টানাটা বুঝি না। কিচ্ছু বুঝি না।” সেই থেকে সে আর বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে নাক গলাত না। কিন্তু একদিন কাউন্টেস ছেলেকে ডেকে বলল, “আন্না মিখায়লভ্‌নার কাছ থেকে সে দু’হাজার রুবলের একটা হাত-চিঠা পেয়েছে ; এখন

সেটা নিয়ে কি করা যায়।

নিকলাস জবাব দিল, "এটা তো! তুমি বলছ এটা আমার উপর নির্ভর করছে। দেখ, আমি আন্না মিখায়লভ্‌নাকেও পছন্দ করি না, বরিসকেও পছন্দ করি না, কিন্তু তারা আমাদের বন্ধু, তারা গরীব। বেশ তো, তাহলে এই"—বলেই সে হাত-চিঠাটা ছিঁড়ে ফেলল, আর তা দেখে বুড়ো কাউণ্টেস আনন্দে কেঁদে ফেলল। তারপর থেকে ছোট রস্তভ আর কখনও বিষয়সম্পত্তির ব্যাপারে কোনরকম অংশ নিত না, কিন্তু পরিপূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে একটা নতুন কাজে আত্মনিয়োগ করল—শিকার—সে ব্যাপারে তার বাবা একটা মস্ত বড় ব্যবস্থা সব সময়ই তৈরি রাখত।

অধ্যায়—৩

এর মধ্যেই আবহাওয়ায় শীতের ছোঁয়া লেগেছে; হেমন্তের বর্ষণসিক্ত ভোরের কুয়াসা মাটির উপর ঘন হয়ে নেমেছে। মাঠের সবুজ রং আরও ঘন হয়েছে; গোবৎসাদির পায়ে মাড়ানো শীতকালীন ফসলের বাদামী ফালি এবং বসন্তকালীন ফসলের হলুদেটে ডাঁটা ও গমের লালচে ফালির পশ্চাৎপটে মাঠের উজ্জ্বল সবুজের আভা আরও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। জঙ্গলে ঢাকা খাঁড়ি ও ঝোপঝাড়গুলো আগস্টের শেষভাগে কালো মাঠ ও ডাঁটাগুলোর মাঝে মাঝে সবুজ দ্বীপের মত শোভা পাচ্ছে; এখন শীতকালীন গমের সবুজের মাঝখানে সেগুলিকে সোনালী ও উজ্জ্বল লাল রঙের দ্বীপ বলে মনে হচ্ছে। খরগোসরা এর মধ্যেই গ্রীষ্মকালীন আবরণ অর্ধেক পাল্টে ফেলেছে, শেয়ালের বাচ্চাগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়েছে, আর নেকড়ের বাচ্চাগুলো কুকুরের চাইতে বড় হয়ে উঠেছে। শিকারের পক্ষে বছরের এটাই সেরা সময়।

শিকারী কুকুরগুলোকে সারা দিন বাড়িতেই বেঁধে রাখা হল। সন্ধ্যার দিকে আকাশ কুয়াসায় ঢেকে গেল, ধীরে ধীরে বরফ পড়তে শুরু করল। ১৫ তারিখে ছোট রস্তভ ড্রেসিং-গাউন চাপিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখতে পেল শিকারের পক্ষে এমন সুন্দর সকাল বুঝি আর হয় না: মনে হল আকাশ যেন গলে গলে পড়ছে আর মাটিতে ডুবে যাচ্ছে। এতটুকু বাতাস নেই; ছোট ছোট তুষারবিন্দু ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। স্বচ্ছ তুষারবিন্দুগুলির ভারে বাগানের পত্রবিহীন শাখাগুলি হেলে পড়েছে; সদ্য খসে-পড়া পাতার উপর তুষারবিন্দুগুলি টুপটাপ করে ঝরছে। নিকলাস বাইরের স্যাঁৎসেতে কর্দমাক্ত ফটকে বেরিয়ে এল। বাতাসে পচা পাতা ও কুকুরের গন্ধ। কাল ফুটকিওয়ালা কুকুর মিলুকা মনিবকে দেখে পিছনের পা দুটি ছড়িয়ে দিল, কিছুক্ষণ খরগোসের মত শুয়ে থাকল, তারপর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে তার নাক গোঁফ চেটে দিল। আর একটা কুকুর লেজ তুলে ছুটে এসে

তার পায়ে গা ঘসতে লাগল।

"ও-হয়!" ঠিক সেইমুহূর্তে ভেসে এল শিকারীদের অননুকরণীয় ডাক এবং মোড়ের মুখে দেখা দিল প্রধান শিকারী ও প্রধান কুকুর-রক্ষক দানিয়েল; মুখভর্তি বলীরেখা, ইউক্রেনীয় কেতায় কপালের উপর থেকেই চুল ছাঁটা, হাতে একটা লম্বা বাঁকা চাবুক, দুই চোখে শিকারীসুলভ স্বাতন্ত্র্য ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি। মাথার টুপিটা তুলে সে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকাল। মনিব কিন্তু সে তাচ্ছিল্যকে দোষের মনে করল না। নিকলাস জানে, যতই সকলকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুক, যতই নিজেকে সকলের চাইতে বড় মনে করুক, তবু সে তারই ভূমিদাস ও শিকারী।

নিকলাস ডাকল, "দানিয়েল!"

"কি হুকুম ইয়োর এক্সেলেন্সি?" গম্ভীর গলায় শিকারী বলল; দুটি জ্বলন্ত কালো চোখ তুলে মনিবের দিকে তাকাল।

"দিনটা খুব ভাল, না? শিকার ও ঘোড়দৌড়ের পক্ষে, কি বল?" মিল্‌কার কানের পিছনটা চুলকে দিতে দিতে নিকলাস প্রশ্ন করল।

দানিয়েল জবাব দিল না, শুধু চোখ কুঁচকাল।

এক মিনিট চুপ করে থাকার পরে তার গম্ভীর গলার হুংকার শোনা গেল, "ভোরেই আমি উভার্কাকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, বাচ্চাদের নিয়ে তিনি অত্রাদ্‌নু-র জঙ্গলের দিকে গেছেন। সেখানে তারা ডাকাডাকি করছে।" (অস্যার্থ: একটা নেকড়ে বাঘিনী বাচ্চাদের নিয়ে অত্রাদ্‌নু-র ঝোপে ঢুকেছে--জায়গাটা এ বাড়ি থেকে দুই ভার্স্ট দূরে।)

"আমাদের যাওয়া উচিত; তোমার কি তাই মনে হয় না?" নিকলাস বলল। "উভার্কাকে নিয়ে চলে এস।"

"আপনার যেমন ইচ্ছা!"

"তাহলে এখনকার মত খাওয়ানো বন্ধ রাখ।"

"ঠিক আছে স্যার।"

পাঁচ মিনিট পরেই দানিয়েল ও উভার্কা নিকলাসের বড় পড়ার ঘরে এসে হাজির হল। দানিয়েল বড়-সর গোছের মানুষ নয়, কিন্তু তাকে একটা ঘরের মধ্যে দেখা মানেই মানুষের ব্যবহার্য আসবাবপত্রের মাঝখানে ও সেই পরিবেশে একটা ঘোড়া বা ভাল্লুককে দেখা। দানিয়েল নিজেও সেটা বোঝে, তাই যথারীতি দরজার ঠিক মুখেই সে দাঁড়িয়েছে, পাছে মনিবের ঘরের কিছু ভেঙে ফেলে এই ভয়ে নড়াচড়া না করে আস্তে কথা বলতে চেষ্টা করছে এবং যাতে ছাদের নীচ থেকে বেরিয়ে তাড়াতাড়ি খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়াতে পারে সেইজন্য দরকারী কথাগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছে।

কথাবার্তা শেষ করে নিকলাস ঘোড়ার পিঠে সাজ পরাতে বলল। দানিয়েল সবে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে ঠিক সেইসময় নাতাশা দ্রুত পা

ফেলে এসে হাজির হল; চুল বাঁধা হয় নি, সাজ-পোশাক শেষ হয় নি, বুড়ি নার্সের বড় শালটা জড়িয়েই চলে এসেছে। সেইসময়ই পেত্‌য়াও দৌড়ে এল।

নাতাশা শুধাল, "তুমি যাচ্ছ? আমি জানতাম তুমি যাবে! সোনিয়া বলেছিল তুমি যাবে না, কিন্তু আমি জানতাম আজকের মত দিনে তুমি কখনও না গিয়ে পারবে না।"

"হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি," নিকলাস অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল, কারণ তার ইচ্ছা আজ খুব ভাল করে শিকার করবে, আর তাই নাতাশা ও পেত্‌য়াকে সঙ্গে নেবে না। "আমরা যাচ্ছি শুধু নেকড়ে শিকার করতে; সে তোমাদের ভাল লাগবে না।"

নাতাশা বলল, "তুমি জান ওতেই আমার সবচাইতে বেশী আনন্দ; এটা উচিত হয় নি; তুমি নিজে যাচ্ছ, ঘোড়ার সাজ পরিয়েছ, অথচ আমাদের কিছুই বল নি।"

পেত্‌য়া বলল, "কোন বাধাই একজন রুশকে রুখতে পারে না'—আমরাও যাব!"

নিকলাস নাতাশাকে বলল, "কিন্তু তা হয় না। মামণি বলেছে তোমাদের যাওয়া চলবে না।"

নাতাশা দৃঢ় গলায় বলল, "হ্যাঁ, আমি যাবই। নিশ্চয় যাব। দানিয়েল, ওদের বল আমাদের জন্য ঘোড়া তৈরি করতে। আর মাইকেল চলুক আমার কুকুরগুলো নিয়ে।"

দানিয়েলের মনে হল, কোন ঘরে ঢোকাই তার পক্ষে বিরক্তিকর ও অনুচিত, আর কোন তরুণীর ব্যাপারে থাকা তো একেবারেই অসম্ভব। চোখ নামিয়ে সে এমনভাবে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল যাতে অসাবধানে তরুণীটি কোনভাবে আঘাত না পায়।

অধ্যায়—৪

বুড়ো কাউণ্ট সবসময়ই শিকারের একটা বড় আয়োজন, লোকজন ও জিনিসপত্র তৈরি রাখত; এখন সেগুলো সম্পূর্ণরূপে ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর সে খুব খোশ মেজাজে ছিল, আর তাই শিকারীদলের সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই শিকারের পুরো দলটা ফটকে হাজির হল। নাতাশা ও পেত্‌য়া নিকলাসকে কি যেন বলতে চাইল, কিন্তু সেসব বাজে কথা শুনবার সময় এখন নিকলাসের নেই, সে তাদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। শিকারের সব আয়োজন একবার দেখে নিল, শিকারের সন্ধানে একদল কুকুর ও শিকারীকে আগে পাঠিয়ে দিল, বাদামী রঙের দোনেক্‌স-এর পিঠে সওয়ার হল এবং শিস দিয়ে ইঙ্গিতে কুকুরগুলোকে এগিয়ে যেতে বলে

অত্রাদনু-র জঙ্গলের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বুড়ো কাউণ্টের ঘোটকিটাকে নিয়ে চলল একজন সহিস আর সে নিজে চলল একটা ছোট গাড়িতে চেপে।

তাদের সঙ্গে চলল চুয়ান্নটি শিকারী কুকুর আর ছ'জন অনুচর ও সহকারী। পরিবারের লোকজন ছাড়া সঙ্গে গেল আটজন কুকুর-রক্ষী এবং চল্লিশ জনের বেশী চাকরবাকর।

প্রায় এক ভার্স্ট পথ যাবার পরে কুকুরসহ আরও পাঁচটি অশ্বারোহী কুয়াসার ভিতর থেকে বেরিয়ে রস্তভদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের সামনে মস্তবড় সাদা গোঁফওয়ালা একটি সাম্যদর্শন বৃদ্ধ।

বুড়ো মানুষটি আরও কাছে এলে নিকলাস বলল, "শুভ সকাল খুড়ো!"

"তাই বল। এগিয়ে এস! ....আমি এটা ঠিক জানতাম," খুড়ো বলতে শুরু করল। (লোকটি রস্তভদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, স্বল্পবিত্ত ও প্রতিবেশী।) "আমি জানতাম এ আকর্ষণ তোমরা এড়াতে পারবে না; ভালই হল যে তোমরাও চলেছ। তাই বল! এগিয়ে এস! (এই কথাগুলো খুড়োর মুদ্রাদোষ।) এখনই চলে যাও। আমার গির্চিক বলছে, ইলগিনরা কুকুর সঙ্গে নিয়ে কর্নিকিতে পৌঁছে গেছে। তাই বল, এগিয়ে এস! ....নইলে তোমাদের নাকের ডগা দিয়ে তারা বাঘের বাচ্চাগুলোকে নিয়ে যাবে।"

"আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমরা তোমার দলে যোগ দেব কি?"

সব শিকারী কুকুরগুলোকে একদলে যুক্ত করে দেওয়া হল, আর খুড়ো ও নিকলাস ঘোড়ায় চেপে পাশাপাশি চলতে লাগল। নাতাশা সারা শরীর শালে জড়িয়ে জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাদের সঙ্গে মিলিত হল। তার পিছন পিছন এল পেত্‌য়া, শিকারী মাইকেল ও তাকে দেখাশুনা করবার জন্য নিযুক্ত একটি সহিস।

খুড়ো মুখটা ঘুরিয়ে অসম্মতিসূচক দৃষ্টিতে পেত্‌য়া ও নাতাশার দিকে তাকাল। শিকারের মত একটা গুরুতর ব্যাপারকে সে ছেলেমানুষের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলতে চায় না।

পেত্‌য়া চীৎকার করে বলল, "শুভ সকাল খুড়ো! আমরাও যাচ্ছি!"

"শুভ সকাল! শুভ সকাল! কিন্তু কুকুরগুলোকে ছাড়িয়ে যেয়ো না," খুড়ো কঠোর স্বরে বলল।

নাতাশা বলল, "আমরা তোমার পথের বিঘ্ন হব একথা ভেবো না খুড়ো। আমরা ঠিক আমাদের পথ ধরে চলব, একটু এদিক-ওদিক যাব না।"

খুড়ো বলল, "খুব ভাল কথা ছোট্ট কাউণ্টেস, শুধু খুব সাবধান, ঘোড়ার পিঠ থেকে যেন পড়ে যেয়ো না, কারণ—তাই বল, চলে এস! —ধরবার মত কিছুই তো হাতের কাছে নেই।"

অত্রাদনুদের জঙ্গলের ভিতরকার মরুস্থানটি শ' দুই গজ দূর থেকেই চোখে পড়ল, শিকারীরা তার কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে। খুড়োর সঙ্গে কথা বলে

রস্তভ ঠিক করে ফেলেছে কুকুরগুলোকে কোথায় লেলিয়ে দেবে ; তারপর নাতাশা কোথায় দাঁড়াবে সেটা দেখিয়ে দিয়ে সে ঘুরে খাঁড়ির উপরে উঠে গেল।

খুড়ো বলল, "দেখ ভাইপো, একটা বড় নেকড়ে ধরতে যাচ্ছ। দেখো যেন পালাতে না পারে!"

"দেখা যাক কি হয়," রস্তভ জবাব দিল। "ক্যারা, এখানে আয়!" দুর্দান্ত বুড়ো কুকুরটাকে ডেকেই যেন সে খুড়োর কথার জবাবটা শেষ করল। সকলেই যার যার জায়গা বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অন্তরের দিক থেকে একজন অনুরাগী শিকারী না হলেও কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ শিকারের আইন-কানুন ভালই জানে ; জঙ্গলের একপ্রান্তে পৌঁছে সে বাঁশ হাতে নিল, ভাল করে আসনে বসল এবং সবরকমে তৈরি হয়ে স্মিত হেসে চারদিকে তাকাল।

তার পাশেই রয়েছে খাস খানসামা সাইমন চেক্‌মার ; লোকটির বয়স হয়েছে, মনিব ও তার ঘোড়ার মতই তার শরীরেও মেদ জমেছে। জঙ্গলের ধার বরাবর শ' খানেক পা দূরে রয়েছে কাউণ্টের অপর সহিস মিৎকা ; লোকটা দুঃসাহসী ঘোড়সওয়ার এবং শিকারী কুকুরের খুব ভাল পরিচালক। রীতি অনুযায়ী কাউণ্ট রূপোর কাপভর্তি ব্র্যাণ্ডি টেনেছে, অল্পস্বল্প কিছু খেয়েছে, এবং আধ বোতল প্রিয় পানীয় বোর্দ্‌ গলায় ঢেলে সেটাকে পাকস্থলীতে পাঠিয়েছে।

মদের প্রভাবে এবং এতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসার দরুণ কাউণ্টের মুখ কিছুটা লাল হয়েছে। চোখ দুটো ভিজে চকচক করছে। লোমের কোটে শরীরটা জড়িয়ে জিনে বসা অবস্থায় এখন তাকে বেড়াতে বের-হওয়া ছোট ছেলের মত দেখাচ্ছে।

সবকিছু ঠিকঠাক করে নিয়ে গাল-বসা শুটকো চেহারার চেক্‌মার বার বার মনিবের দিকে তাকাচ্ছে। তিরিশ বছর সে এই মনিবের সঙ্গে ঘর করছে, তাই তার হালহকিকৎ সে ভালই বোঝে; সে জানে, মনিব এখনই একটু গাল-গল্প শুরু করবে। একটি তৃতীয় ব্যক্তি বনের পথে ঘুরে এসে কাউণ্টের পিছনে ঘোড়া থামাল। লোকটি বুড়ো, মুখময় সাদা দাড়ি, পরনে মেয়েদের জোব্বা, মাথায় গাধার টুপি। লোকটি ভাঁড়, মেয়েদের চলতিনাম নাস্তাসিয়া আইভান্‌ভনা বলেই সকলে তাকে ডাকে।

তার দিকে চোখ টিপে কাউণ্ট ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "দেখ নাস্তাসিয়া আইভান্‌ভনা, তুমি যদি ভয় দেখিয়ে শিকারকে তাড়িয়ে দাও তাহলে দানিয়েল কিন্তু মজাটা টের পাইয়ে দেবে।"

"টের পাওয়াতে আমিও একটু-আধটু জানি," নাস্তাসিয়া আইভান্‌ভনা বলল।

"চুপ!" বলেই সাইমনের দিকে ফিরে কাউন্ট শুধাল, "ছোট কাউন্টেসকে দেখেছ কি? সে কোথায়?"

"তিনি ছোট কাউন্ট পিতরের সঙ্গে আছেন," সাইমন হেসে জবাব দিল। "মহিলা হলেও তার খুব শিকারের শখ।"

কাউন্ট বলল, "আর সে কিরকম ঘোড়া চালায় দেখেছ সাইমন? এ ব্যাপারে সে অনেক পুরুষেরই সমকক্ষ!"

"সে তো বটেই! চমৎকার। যেমন সাহস, তেমনই সহজ।"

"আর নিকলাস? সে কোথায়? লিয়াদভ-এ কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথায় জায়গা নিতে হবে তিনি ভালই জানেন। ব্যাপারটা তিনি এত ভাল বোঝেন যে দানিয়েল ও আমি অনেক সময় অবাক হয়ে যাই," মনিবকে খুসি করবার জন্যই সাইমন বলল।

"ঘোড়ায় চড়তেও ভালই জানে, কি বল? আর ঘোড়ার পিঠে তাকে দেখায়ও সুন্দর, কি বল?"

"একেবারে ছবি! সেদিন জাভারিন্‌স্ক ঝোপের কাছে একটা শেয়ালকে কিরকম তাড়া করেছিলেন! সেগুলো যখন গর্ত থেকে বেরিয়ে ছুট দিল, সে কী দৃশ্য! ···ঘোড়াটার দামই হাজার রুবল, আর সওয়ারটি তো সবরকম দামের ঊর্ধ্বে! ···সত্যি, এরকম চটপটে আর একজনকে খুঁজতে হলে অনেক পথ পার হতে হবে!"

যেন সাইমনের প্রশংসাটা যথেষ্ট হয় নি এমনিভাবে কাউন্ট বলল, "অনেক পথ পার হতে হবে····" তারপরই নস্যিদানটা খুঁজতে লাগল।

কি যেন বলতে গিয়েই সাইমন থেমে গেল; বাতাসে শিকারের শব্দ ভেসে এল। মাথা নীচু করে কান পেতে সে আঙুল নেড়ে মনিবকে সতর্ক করে দিল। ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ওরা বাচ্চাগুলোর গন্ধ পেয়েছে, ঠিক লিয়াদভ উঁচু জমিটাতে।"

হাতের নস্যিদান হাতেই রইল, কাউন্ট সোজা সামনের দিকে তাকাল। কুকুরগুলোর চীৎকারের পরেই ভেসে এল দানিয়েলের শিকারী-শিঙার গম্ভীর নেকড়ের ডাক। সবগুলো কুকুর একসঙ্গে মিলে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। সে ডাক শুনে বোঝা গেল ওরা নেকড়েটার পিছু নিয়েছে। কুকুর রক্ষীরা এবার "উল্যাল্যু" বলে চেঁচাতে লাগল, আর সেসব কিছু ছাপিয়ে ভেসে এল দানিয়েলের কণ্ঠস্বর—কখনও গম্ভীর, কখনও কর্কশ। সে কণ্ঠস্বর সারা জঙ্গলকে ভরে তুলে বাইরের প্রান্তরে অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

চুপচাপ কান পেতে কয়েক মিনিট শুনে কাউন্ট ও তার অনুচররা বুঝতে পারল যে কুকুরগুলো দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে; একদলের শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, আর একদল কাউন্টদের পাশ কাটিয়ে জঙ্গলের পাশ দিয়ে চলে গেল; এই দলেই দানিয়েলের গলায় শোনা গেল—"উল্যাল্যু"। দুই দলের

আওয়াজ মিশে গিয়ে দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

সাইমন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। হাতের নস্যদানটার দিকে নজর পড়ায় কাউন্ট সেটা খুলে একটিপ নস্য নিল। একটা কুকুরকে টেনে ধরে সাইমন চীৎকার করে উঠল, "ফিরে আয়!" কাউন্ট চমকে উঠল; তার হাত থেকে নস্যদানটা পড়ে গেল। নাস্তাসিয়া আইভানভ্‌না ঘোড়া থেকে নেমে সেটা তুলে দিল। কাউন্ট ও সাইমন তার দিকে তাকাল।

তারপরই অপ্রত্যাশিতভাবে, যদিও এরকমটা প্রায়ই ঘটে থাকে, শিকারীদের শব্দটা হঠাৎ তাদের খুব কাছেই শোনা গেল; মনে হল দানিয়েল "উলুল্যু" বলে যেন একেবারে সামনেই চেঁচাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে কাউন্ট দেখল তার ঠিক ডাইনে মিৎকা এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে যেন তার চোখ দুটো মাথা থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসবে; মাথার টুপি খুলে সে অন্য দিকে কি যেন দেখাচ্ছে।

"ঐ দেখুন!" এমন স্বরে সে চেঁচিয়ে বলল যেন অনেকক্ষণ ধরেই কথাটা বলবার চেষ্টা সে করছিল; এখন কুকুরের বাসাটা ছেড়ে দিয়ে সে কাউন্টের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

কাউন্ট ও সাইমনও ঘোড়া ছুটিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল; বাঁদিকে তাকিয়েই দেখতে পেল, একটা নেকড়ে ধীরে ধীরে এ-পাশ ও-পাশ করে নিঃশব্দে ঠিক সেইদিকপানে লাফ দিল যেখানে তারা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। ক্রুদ্ধ কুকুরটা ছাড়া পেয়ে ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে নেকড়েটার দিকে ছুটে গেল।

নেকড়েটা থামল, অদ্ভুতভাবে ভারী কপালটা কুকুরগুলোর দিকে ফেরাল, শরীরটাকে বারকয়েক এদিক-ওদিকে দোলাল, দুটো লাফ দিল, আর তারপরেই লেজের একটা ঝাপ্টা মেরে বনের প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ঠিক সেইমুহূর্তে প্রায় আর্তনাদের মত সুরে চীৎকার করতে করতে একটার পর একটা কুকুরের গোটা দলটাই বিপরীত দিকের জঙ্গল থেকে এলোপাথারিভাবে লাফাতে লাফাতে মাঠ পেরিয়ে ঠিক সেই জায়গাটার দিকে গেল যেখান থেকে নেকড়েটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। হ্যাজেলের ঝোপকে দু'ভাগ করে ঘামে ভিজে বেরিয়ে এল দানিয়েলের বাদামী ঘোড়াটা। দানিয়েল সামনে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বসে আছে; মাথায় টুপি নেই, ঘর্মাক্ত লাল মুখে ছড়িয়ে পড়েছে এলোমেলো লম্বা সাদা দাড়ি।

চীৎকার করে বলছে, "উলুল্যু!..." কাউন্টকে দেখেই তার চোখ স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠল।

শাসনের ভঙ্গীতে চাবুকটা কাউন্টের দিকে তুলে চেঁচিয়ে বলল, "জাহান্নামে যান! নেকড়েটাকে পালিয়ে যেতে দিলেন! ...কীরকম শিকারী!" তারপর যেন ভীত, লজ্জিত কাউন্টকে অধিক কথা বলতে ঘৃণা-

বোধ করেই সক্রোধে ঘোড়ার পেটে চাবুক কসিয়ে কুকুরগুলোর পিছন পিছন ছুটে চলে গেল। স্কুলের দণ্ডিত ছাত্রের মত কাউণ্ট চারদিকে তাকাতে লাগল; এই অসহায় অবস্থায় সাইমনের সহানুভূতি পাবার আশায় একটু হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু সাইমনও তখন সেখানে নেই। সেও ঝোপঝাড়ের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে; সকলেই নেকড়েটাকে ধরতে চাইছে, কিন্তু তার আগেই নেকড়েটা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

অধ্যায়—৫

এদিকে নিকলাস রস্তভ তখনও নেকড়ের অপেক্ষায় তার জায়গায়ই রয়েছে। শিকার যেভাবে এগোচ্ছে ও পিছিয়ে যাচ্ছে, পরিচিত গলায় কুকুরগুলো যেভাবে ডাকছে, শিকারীদের গলা যেভাবে এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে ও উঠছে, তা থেকেই সে বুঝতে পারছে ঝোপের ভিতরে কি ঘটছে। সে বুঝতে পেরেছে, ধাড়ি ও বাচ্চা নেকড়েগুলো সেখানেই আছে, কুকুরগুলো দুই দলে ভাগ হয়ে গেছে, কোন এক জায়গায় নেকড়েটাকে তাড়া করা হচ্ছে, আর কোথাও একটা কোন গোলমাল হয়েছে। সে আশা করছে, যেকোন মুহূর্তে নেকড়েটা তার দিকেই আসবে। কোথায় এবং কোন্‌দিক থেকে জন্তুটা আসবে, আর সেই বা কিভাবে সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে,—এ নিয়ে হাজার রকমের মতলব তার মাথায় ঘুরতে লাগল। কখনও আশা, কখনও হতাশা। বারকয়েক ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল, নেকড়েটা যেন তার পথ দিয়েই আসে। ঈশ্বরকে বলল, "আমার জন্য এটুকু করা তোমার পক্ষে আর কি? আমি জানি তুমি অনেক বড়, তোমার কাছে এত তুচ্ছ প্রার্থনা জানানো পাপ, কিন্তু দোহাই তোমার, বুড়ি নেকড়েটাকে আমার দিকে এনে দাও আর 'কারা' সেটার উপর লাফিয়ে পড়ুক—ওখানে দাঁড়িয়ে খুড়ো তো সবই দেখছে, তাই তার চোখের সামনেই এটা ঘটুক—এবং মরণ-কামড় দিয়ে সেটার টুঁটি চেপে ধরুক।"

তারপরেই রস্তভ ভাবল, "না, সে সৌভাগ্য আমার হবে না, অথচ হলে কী ভালই না হত! এ হবার নয়! কি তাসে কি যুদ্ধে, সর্বত্রই আমার ভাগ্য খারাপ।" অস্তারলিজ ও দলখভের স্মৃতি অতি দ্রুত তার মনের পটে স্পষ্ট ফুটে উঠল। "জীবনে শুধু একবার একটা ধাড়ি নেকড়েকে কব্জা করতে চাই, শুধু এইটুকুই চাই!"

আবার সে ডান দিকে তাকাল; পরিত্যক্ত মাঠ পেরিয়ে কি যেন তার দিকেই ছুটে আসছে। "না, এ হতে পারে না!" দীর্ঘদিনের আশার পরে কিছু পেলে মানুষ যেরকম করে সেইভাবেই একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে রস্তভ ভাবল। চরম সুখের ক্ষণটি সমাগত—কিন্তু এসেছে এত সহজে, কোনরকম সতর্ক না করে, শব্দ না করে, আড়ম্বর না করে, যে রস্তভ নিজের চোখকেই

বিশ্বাস করতে পারল না, এক সেকেণ্ডের উপর সন্দেহেই কাটল। নেকড়েটা ছুটে এল, একলাফে একটা নালা পার হল। নেকড়েটা বুড়ি, তার পিঠটা ধূসর, লম্বা পেটটা লাল। ছুটছে ধীরেসুস্থে; সে জানে যে কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছে না। দমবন্ধ করে রস্তভ কুকুরগুলোর দিকে তাকাল। সেগুলো কতক দাঁড়িয়ে, কতক শুয়ে আছে; তারা নেকড়েটাকে দেখতে পায় নি, তাই পরিস্থিতিটাও বুঝতে পারছে না। বুড়ো 'কারা' মাথাটা ঘুরিয়ে রেগে মেগে হলদে দাঁত বের করে মাছি ধরবার তাল করছে।

রস্তভ ঠোঁট ফুলিয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "উল্যুল্যুল্যু!" কুকুরগুলো কান খাড়া করে লাফিয়ে উঠল। 'কারা' পাছা চুলকানো বন্ধ করে কান খাড়া করল, লেজ নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল।

জঙ্গলের ভিতর থেকে নেকড়েটাকে আসতে দেখে নিকলাস নিজের মনেই বলল, "আমি কি ওগুলোকে ছেড়ে দেব, না ধরব?" সহসা নেকড়েটার চেহারাটাই পাল্টে গেল; যা হয় তো আগে কখনও দেখে নি—একটি মানুষ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে—তা দেখে সে কেঁপে উঠল এবং রস্তভের দিকে মাথাটা একটু বাড়িয়ে থেমে গেল।

"এগোব না পিছোব? আঃ, যা হয় হবে, এগিয়েই যাব।" নেকড়েটা যেন মনে মনে এই কথা বলেই চারদিকে না তাকিয়ে গুটি গুটি পায়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

নিকলাস চীৎকার করে উঠল "উল্যুল্যুল্যু!" কিন্তু সে কণ্ঠস্বর যেন তার নিজের নয়; সঙ্গে সঙ্গে তার ঘোড়াটা নিজে থেকেই নালার পর নালা লাফিয়ে পার হয়ে পাহাড় বেয়ে তীরবেগে নামতে লাগল; তার উদ্দেশ্য নেকড়েটাকে এড়িয়ে যাওয়া; কুকুরগুলোও আরও জোরে ছুটতে লাগল। নিজের চীৎকারও নিকলাসের কানে গেল না, সে যে জোর কদমে ছুটছে তাও সে জানে না, কুকুরগুলোকে অথবা যে মাটির উপর দিয়ে সে ছুটছে তাও সে দেখতে পাচ্ছে না: সে দেখছে শুধু নেকড়েটাকে; ক্রমেই দ্রুততর গতিতে নেকড়েটাও সেই একইদিকে ছুটছে। প্রথমেই নিকলাসের চোখে পড়ল, মিল্‌কা ক্রমেই নেকড়েটার দিকে এগিয়ে চলেছে। কাছে, আরও কাছে··· মিল্‌কা ক্রমেই নেকড়েটাকে ধরে ফেলছে; কিন্তু নেকড়েটা হঠাৎ মুখটা ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়াল, আর মিল্‌কাও হঠাৎ থেমে গিয়ে লেজ তুলে সামনের পা দুটো শক্ত করে ফেলল।

"উল্যুল্যুল্যু!" নিকলাস চীৎকার করে উঠল।

মিল্‌কার পিছন থেকে ছুটে এল লালচে রঙের ল্যুবিম্‌ম; লাফ দিয়ে নেকড়েটার উপর পড়ে তার পাছাটা কামড়ে ধরল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে ছিটকে সরে গেল। নেকড়েটা মাটিতে উপুড় হয়ে বসল, দাঁতে দাঁত ঘসতে লাগল, তারপরেই আবার উঠে সামনে ছুটতে লাগল। কুকুরগুলো ফুট দুই

দূরে থেকে তার পিছনে ছুটতে লাগল।

কর্কশ গলায় চীৎকার করতে করতে নিকলাস ভাবল, "ওটা ঠিক বেরিয়ে যাবে! না, এ অসম্ভব!"

এখন তার একমাত্র ভরসা বুড়ো কুকুরটা। সেটাকেই সে খুঁজতে লাগল। এই বয়সে যতটা শক্তি এখনও আছে তাই দিয়েই কারা তার শরীরটাকে যথাসম্ভব টান-টান করে নেকড়েটার পাশাপাশি জোরে ছুটছে তার পথটা আটকে দিতে। কিন্তু নেকড়ের দ্রুতগতির তুলনায় কুকুরের শ্লথ গতির বিচারে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কারা হিসাবে ভুল করেছে। নিকলাস দেখতে পাচ্ছে, জঙ্গলটা আর বেশী দূরে নেই; একবার সেখানে পৌছতে পারলেই নেকড়েটা নির্ঘাৎ পালিয়ে যাবে। তখনই সে দেখতে পেল, কয়েকটা কুকুর ও একজন শিকারী সোজা ছুটে যাচ্ছে নেকড়েটার দিকে। এখনও আশা আছে। আর একটা হলুদেটে কুকুর সামনের দিক থেকে ছুটে এসে নেকড়েটাকে একধাক্কায় প্রায় উল্টে দিল। কিন্তু নেকড়েটাও অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সঙ্গে লাফ দিয়ে উঠেই দাঁত কড়মড় করে কুকুরটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর কুকুরটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল; তার পেটের পাশ থেকে রক্ত ঝরতে লাগল।

নিকলাস আর্তকণ্ঠে ডাকল, "কারা। বুড়ো বাছারে!…"

নেকড়েটা এভাবে বাধা পাওয়ায় বুড়ো কুকুরটা তার পাঁচ পায়ের মধ্যে পৌছে গেল। যেন বিপদ বুঝতে পেরেই নেকড়েটা কারার দিকে ঘুরে তাকাল এবং লেজ গুটিয়ে দ্রুততর গতিতে ছুটতে শুরু করল। ঠিক এইসময় নিকলাস শুধু দেখতে পেল, 'কারা'র একটা কিছু ঘটেছে—হঠাৎ সে নেকড়েটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, আর তারপবই ঠিক তার সামনেই একটা নালার মধ্যে পড়ে দুজনেই গড়াগড়ি খেতে লাগল।

ঠিক সেইমুহূর্তে নিকলাস যখন দেখতে পেল নেকড়েটা নালার মধ্যে পড়ে কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই করছে, এবং কুকুরগুলোর তলা থেকে তার ধূসর লোম, টান-টান করা পিছনের পা এবং ভীত, রুদ্ধশ্বাস মাথাটা শুধু দেখা যাচ্ছে ('কারা' নেকড়েটার টুটি চেপে ধরেছে), তখনকার মত সুখ সে জীবনে কখনও পায় নি। ঘোড়ার জিনে হাত রেখে লাফিয়ে নেমে নেকড়েটাকে ছুরিকাহত করতে যাবে এমন সময় হঠাৎ নেকড়েটা আবার কুকুরগুলোর মাঝখান থেকে মাথাটা বের করল এবং সামনের দুটো থাবা দিয়ে নালার উপরটা আঁকড়ে ধরল। দাঁতে দাঁত ঘসে (তার গলা থেকে তখন তার দাঁত সরে গেছে) পিছনের পায়ে ভর করে এক লাফে নালার ভিতর থেকে উঠে পড়ল এবং কুকুরগুলোর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে লেজ গুটিয়ে আবার সামনের দিকে ছুট দিল। 'কারা'র গায়ের লোম এলোমেলো হয়ে গেছে, শরীরটা অনেক জায়গায় কেটে গেছে; অনেক কষ্টে সে নালার ভিতর থেকে

উঠে এল।

নিকলাস হতাশায় চেঁচিয়ে উঠল, "হায় ঈশ্বর ! একি হল ?"

খুড়োর শিকারী ততক্ষণে অপর দিক থেকে নেকড়েটার পথের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে এল, আর তার কুকুরটা আর একবার নেকড়েটাকে বাধা দিল। সেটা আটকা পড়ে গেল।

নিকলাস ও তার অনুচর এবং খুড়ো ও তার শিকারী—সকলেই "উল্যাল্যু" বলে চীৎকার করতে করতে জন্তুটাকে ঘিরে ধরল। বার বার সেটা ছুটে বেরিয়ে যেতে চাইছে জঙ্গলের দিকে, কিন্তু কিছুতেই পারছে না।

ওদিকে "উল্যাল্যু" ধ্বনি শুনে দানিয়েলও জঙ্গলের ভিতর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। নিঃশব্দে সে ঘোড়া ছুটিয়ে এল ; বাঁ হাতে খাপ-খোলা ছুরি, আর ডান হাতের চাবুক অনবরত পড়ছে ঘোড়াটার পেটে।

বাদামি ঘোড়াটা হাঁপাতে হাঁপাতে ভারী নিঃশ্বাস ফেলে তার পাশ দিয়ে চলে যাবার আগে নিকলাস দানিয়েলকে দেখতে পায় নি, তার কথাও কানে যায় নি। এবার একটা শরীরের ধপাস্ করে মাটিতে পড়ার শব্দ শুনে সে তাকিয়ে দেখল, কুকুরগুলোর মাঝখানে দানিয়েল নেকড়েটার পিঠের উপর চেপে বসে তার কান দুটো পাকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। কুকুরগুলো, শিকারীরা, এমন কি নেকড়েটাও বুঝতে পেরেছে যে সব শেষ হয়ে গেছে। ভয়ার্ত নেকড়েটা কানদুটো নামিয়ে উঠতে চেষ্টা করল, কিন্তু কুকুরটা তাকে চেপে ধরে আছে। দানিয়েল একটুখানি উঠে এক পা এগিয়ে সমস্ত শরীরের ভর দিয়ে নেকড়েটার উপর শুয়ে পড়ে তার কান দুটো চেপে ধরল। নিকলাস ছুরি দিয়ে আঘাত করতে যাচ্ছিল, কিন্তু দানিয়েল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ও কাজ করবেন না ; আমরা ওটার মুখ বন্ধ করে দিচ্ছি !" সে সরে গিয়ে নেকড়েটার গলার উপর পা রাখল। তার চোয়ালের ভিতর দিয়ে একটা লাঠি ঢুকিয়ে দিয়ে একটা চাবুক দিয়ে সেটাকে লাগামের মত করে বাঁধা হল। পাগুলোকেও একত্র করে বেঁধে দানিয়েল দু'একবার সেটাকে এ-পাশ থেকে ও-পাশে উল্টে দিল।

ক্লান্ত, খুসি মুখে সকলে নেকড়েটাকে জ্যান্ত অবস্থায় একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল ; কুকুরগুলো তার দিকে তাকিয়ে ভেউ-ভেউ করতে লাগল ; আর সেটাকে এনে হাজির করা হল সকলের সামনে। কুকুরগুলো পাঁচটা বাচ্চাকেই মেরে ফেলেছে। সকলেই যাব যার বীরত্বের কাহিনী বলতে লাগল। জোয়ালে বাঁধা অবস্থায় মাথাটা ঝুলিয়ে নেকড়েটা চকচকে চোখ মেলে সকলকে দেখতে লাগল। তাকে ছোঁয়ামাত্রই বাঁধা পাগুলোতে ঝাঁকুনি দিয়ে সে লক্ষ্যহীনভাবে সকলের দিকে তাকাতে লাগল। বুড়ো কাউণ্ট রস্তভও এসে নেকড়েটার গায়ে হাত রাখল।

বলল, "আঃ, কী দুর্ধর্ষ জীব ! কাছে দাঁড়ানো দানিয়েলকে বলল, "দুর্ধর্ষ

জীব, কি বল ?"

তাড়াতাড়ি মাথার টুপিটা তুলে দানিয়েল জবাব দিল, "হ্যাঁ ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

নেকড়েটাকে ছেড়ে দেওয়া এবং দানিয়েলের সঙ্গে দেখা হওয়ার কথাটা কাউণ্টের মনে পড়ে গেল।

"কিন্তু তুমি বড় কড়া মানুষ হে বন্ধু!" কাউণ্ট বলল।

একটি সলজ্জ, শিশুসুলভ, খুসির হাসি দিয়েই দানিয়েল তার জবাব দিল।

অধ্যায়—৬

বুড়ো কাউণ্ট বাড়ি চলে গেল ; নাতাশা ও পেত্য়া কথা দিল শিগ্গিরই ফিরবে, কিন্তু তখনও সময় থাকাতে শিকার চলতে লাগল। দুপুরবেলা কুকুরগুলোকে ছোট ছোট গাছে ঢাকা একটা খাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে দিল, আর নিকলাস হল্দে মাঠটার মধ্যে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখল।

তার সামনে শীতকালীন গমে ভর্তি মাঠ ; তার নিজের শিকারীটি হ্যাজেল ঝোপের পিছনে একাকি দাঁড়িয়ে আছে। কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেওয়ামাত্রই একটা কুকুর ডেকে উঠল। অন্য কুকুরগুলোও তাতে যোগ দিল। এক মুহূর্ত পরেই সোরগোল শোনা গেল যে জঙ্গলে ঢাকা খাঁড়ির মধ্যে একটা শেয়ালকে পাওয়া গেছে। অমনি সকলে সেইদিকে ছুটল। নিকলাস দাঁড়িয়ে রইল।

তার চোখের সামনে দিয়ে লাল টুপি পরা কুকুর-রক্ষীরা খাঁড়ি বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে গেল ; সে কুকুরগুলোকেও দেখতে পেল ; আশা করে রইল, উল্টো দিকের গমের ক্ষেতে যেকোন মুহূর্তে শেয়ালটার দর্শন পাবে।

শিকারীটি এগিয়ে গিয়ে তার কুকুরটাকে ছেড়ে দিল। নিকলাস দেখতে পেল, একটা ছোট পা-ওয়ালা অদ্ভুত লাল শেয়াল মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল। কুকুরটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবগুলো কুকুর তাকে ঘিরে ধরায় শেয়ালটা এঁকেবেঁকে কুকুরগুলোর মাঝখান দিয়ে গলে যেতে লাগল। এমন সময় একটা অপরিচিত সাদা কুকুর কোথা থেকে ছুটে এল ; তার পিছনে এল আর একটা কালো কুকুর ; সবকিছুই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হল দুজন শিকারী ; একজনের মাথায় লাল টুপি, অপর জনের টুপি সবুজ ; সে লোকটি অপরিচিত।

নিকলাস ভাবল, "এটা কি হল ? এ শিকারী কোথেকে এল ? এ তো খুড়োর লোক নয়।"

শিকারীরা শেয়ালটাকে ধরে ফেলল, কিন্তু সেটাকে নিজের সঙ্গে না বেঁধে সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগল। ঘোড়াগুলোও সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল, আর কুকুরগুলো শুয়ে পড়ল। শিকারীরা হাত ঘুরিয়ে শেয়ালটাকে কি যেন

করল। তারপরই একটা শিঙার শব্দ শোনা গেল ; একটা যুদ্ধ করা স্থির হলেই এধরনের শিঙাধ্বনি করা হয়।

নিকলাসের সহিস বলল, "ইলাগিন-এর শিকারীরা আমাদের আইভান-এর সঙ্গে একটা গোলমাল বাঁধিয়েছে।"

নিকলাস একজনকে পাঠিয়ে দিল নাতাশা ও পেত্য়াকে ডেকে আনতে ; নিজে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

নাতাশা ও পেত্য়াও ঘোড়ায় চড়ে এসে পড়ল। নিকলাস ঘোড়া থেকে নামল। ব্যাপারটা কিভাবে শেষ হয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। যে শিকারিটি লড়াই করছিল সে ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ; ঘোড়ার পিঠে শেয়ালটাকে বেঁধে নিয়ে তরুণ মনিবের পাশে এসে দাঁড়াল। কিছুটা দূরে থেকেই মাথার টুপিটা খুলে ফেলল, সসম্মানে কিছু বলতেও চেষ্টা করল ; কিন্তু তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, দম আটকে আসছে, রাগে মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। একটা চোখে কালসিটে পড়ে গেছে, কিন্তু সে হয়তো সেটা বুঝতেও পারছে না।

"কি হয়েছে?" নিকলাস শুধাল।

"যা হয়ে থাকে, আমাদের কুকুর যে শেয়ালটাকে শিকার করেছে তাকেই ওরা মেরে ফেলেছে! অথচ আমার ধুসর রঙের মাদিটাই এটাকে ধরেছিল! আইন করতে যাব, বটে! ···শেয়ালটাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল। শেয়ালের সঙ্গে আচ্ছা করে একখানা দিয়েছি! এই তো শেয়ালটা আমার জিনের সঙ্গে বাঁধা! ওটারও একটুখানি স্বাদ পাবার ইচ্ছা আছে কি? ...." যেন এখনও সে শত্রুর সঙ্গেই কথা বলছে এমনিভাবে ছোরাটা দেখিয়ে শিকারী বলল।

লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই নিকলাস বোন ও পেত্য়াকে অপেক্ষা করতে বলে যেখানে শত্রুপক্ষের, অর্থাৎ ইলাগিন-এর শিকারীরা আছে সেইদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বিজয়ী শিকারীটি মাঠের মধ্যে সকলের সঙ্গে মিলিত হলে সকলেই তাকে ঘিরে ধরল, আর যুদ্ধ জয়ের কাহিনী শোনাতে লাগল।

ঘটনাটা এইরকম: পুরনো ঝগড়া নিয়ে ইলাগিন-এর সঙ্গে রস্তভদের মামলা চলছে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে যে সমস্ত জায়গা রস্তভদের মালিকানাধীন ইলাগিন সেইসব জায়গায় শিকার করে থাকে। আজও রস্তভরা যে জঙ্গলে শিকার করতে এসেছে ইলাগিন ইচ্ছা করেই সেখানে তার লোকজনদের পাঠিয়ে দিয়েছে এবং রস্তভদের কুকুরের তাড়াখাওয়া একটা শেয়ালকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

নিকলাস কথনও ইলাগিনকে চোখে দেখে নি, তবু লোকের মুখে তার খাম-খেয়ালি ও অত্যাচারের কাহিনী শুনেই সে তাকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে

এবং তাকে একজন মহাশত্রু বলে মনে করে। রাগে ফুলতে ফুলতে চাবুকটা কঠিন হাতে চেপে ধরে সে এগিয়ে চলল; শত্রুকে কঠোরভাবে শাস্তি দিতে সে কৃতসংকল্প।

জঙ্গলের একটা কোণ পার হবার আগেই কুচকুচে কালো একটা সুন্দর ঘোড়ায় চেপে একজন শক্ত সমর্থ ভদ্রলোক তার দিকে এগিয়ে এল; তার মাথায় লোমের টুপি, সঙ্গে দুটি শিকারী-ভৃত্য।

শত্রুর পরিবর্তে ইলাগিন-এর মধ্যে নিকলাস দেখতে পেল একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে; ছোট কাউণ্টের সঙ্গে পরিচিত হতে সে বিশেষ আগ্রহী। নিকলাসের সামনে এগিয়ে এসে ইলাগিন টুপিটা খুলে জানাল যে যা ঘটেছে সেজন্য সে দুঃখিত এবং যে লোকটি অন্যের কুকুরের শিকারকে ছিনিয়ে নিয়েছে তাকে যথোচিত শাস্তি দেওয়া হবে। কাউণ্টের সঙ্গে তার আরও ভাল করে পরিচয় হবে বলেই সে আশা করে।

নাতাশা ভয় পেয়েছিল যে তার দাদা হয় তো ভয়ংকর একটাকিছু করে বসবে; তাই সে উত্তেজিত হয়ে তার পিছু নিয়েছিল। দুই শত্রু পরস্পরকে বন্ধুভাবে অভ্যর্থনা করছে দেখে সে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। নাতাশাকে দেখে ইলাগিন তার বীবর লোমের টুপিটা আরও উঁচুতে তুলে ধরল এবং স্মিত হাসি হেসে বলল যে ছোট প্রিন্সেসের শিকার-প্রীতি ও রূপের কথা সে অনেক শুনেছে; দুদিকের বিচারেই সে ডায়নার সমতুল্যা।

নিজের শিকারীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে ইলাগিন রস্তভদের তার নিজস্ব উঁচু জমিতে নিয়ে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল; আরও জানাল যে সেখানে অনেক খরগোসের মেলা। নিকলাস রাজী হয়ে গেল; শিকারের দলবল দ্বিগুণ হয়ে এগিয়ে চলল।

মাঠটা পেরিয়ে যেতে হবে। শিকার-ভৃত্যরা দল বেঁধে চলল। খুড়ো, রস্তভ ও ইলাগিন চলল পাশাপাশি ঘোড়ায় চেপে।

নানারকম মজলিসি কথাবার্তার ফাঁকে একসময় ইলাগিন বলল, “কিছু কিছু শিকারী কেন যে শিকার ও কুকুর নিয়ে এত মাতামাতি করে আমি তা বুঝতে পারি না। আমি ভালবাসি শিকার করতে, তাই নয় কি কাউণ্ট? কারণ আমি মনে করি…।”

“আ—তু!” একজন কুকুর-রক্ষীর একটানা ডাক ভেসে এল। ফসল-কাটা মাঠের মধ্যে একটা উঁচু জমিতে দাঁড়িয়ে হাতের চাবুকটা তুলে ধরে সে আবার হাঁক দিল, “আ—তু!” (এই ডাক ও তুলে-ধরা চাবুকের অর্থ সে একটা খরগোস দেখতে পেয়েছে!)

“আরে, মনে হচ্ছে সে একটা দেখতে পেয়েছে,” ইলাগিন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল। “চলুন, আমরাও এগিয়ে যাই কাউণ্ট।”

“হ্যাঁ, চলুন।”

খুড়ো ও ইলাগিনকে সঙ্গে নিয়ে নিকলাস খরগোসটার দিকে এগিয়ে চলল্।

তারপর শুরু হল খরগোস শিকার। খুড়ো তার প্রিয় কুকুর রুগাউশ্‌কাকে নিয়ে শিকার থেকে সরে দাঁড়াল। ইলাগিন-এর কুকুর এরজ়া ও নিকলাসের কুকুর মিল্‌কা খরগোসটাকে তাড়া করতে লাগল। ইলাগিন, নিকলাস, নাতাশা ও খুড়ো ছুটোছুটি করে কুকুর-খরগোসের দৌড় ঝাঁপ দেখতে লাগল, মুহূর্তের জন্যও তারা এ দৃশ্যটাকে চোখের বাইরে চলে যেতে দিতে চায় না।

নিকলাস সগর্বে ডাকে, "মিলাশ্‌কা, সোনা!"

ইলাগিন ডাকে, "এরজ়া মাণিক!"

দুই কুকুর প্রাণপণে তাড়া করছে; খরগোসটাও এঁকেবেঁকে, কখনও থেমে কখনও ছুটে তাদের এড়িয়ে যাচ্ছে। একসময় খরগোসটা শীতকালীন গমের ক্ষেত ও ফসল-কাটা মাঠের মাঝখানের আলের উপর দিয়ে ছুটতে লাগল। এরজ়া ও মিল্‌কাও পাশাপাশি ছুটছে গাড়ি-টানা ঘোড়ার মত; কিন্তু কিছুতেই খরগোসটার সঙ্গে পেরে উঠছে না।

ঠিক সেইসময় একটা তৃতীয় কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "রুগা, রুগা-উশ্‌কা। ঠিক আছে, ছুটে যাও!" আর সঙ্গে সঙ্গে খুড়োর লাল রঙের কুকুরটা পিঠ বেঁকিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় ছুটে সামনের কুকুর দুটোকে পার হয়ে খরগোসটাকে ধরে ফেলল; একধাক্কায় সেটাকে আলের উপর থেকে গমের ক্ষেতের মধ্যে ফেলে দিয়ে হাঁটু পর্যন্ত কাদায় ডুবিয়ে নিজেও ক্ষেতের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তারপর শুধু দেখা গেল; কুকুর ও খরগোস কাদার মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্ছে। চারদিক থেকে কুকুরগুলো এসে তাদের ঘিরে ধরল। মুহূর্তকাল পরে সকলেই এসে সেখানে গোল হয়ে দাঁড়াল। একমাত্র খুড়োই মহানন্দে ঘোড়া থেকে নামল, খরগোসের একটা থাবা কেটে নিল; রক্তাক্ত খরগোসের দেহটা থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। কাকে বলছে, কেন বলছে, সেসব না বুঝেই খুড়ো বলে উঠল, "এই তো চাই! এই তো কুকুরের মত কুকুর! ....হাজার রুবল দাম থেকে শুরু করে এক রুবল দামের কুকুর—সবক'টাকে হারিয়ে দিয়েছে!"

তারপর খরগোসের কাদা-মাখা থাবাটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "রুগা, এই থাবাটা তোমার জন্য। এটা তোমার পাওনা; ঠিক আছে, চলে এস!"

অনেকক্ষণ ধরে সকলেই লাল রুগাকে দেখতে লাগল। কাদামাখা পিঠটা বেঁকিয়ে খুড়োর ঘোড়ার পিছু পিছু চলতে লাগল বিজয়ীর গম্ভীর ভঙ্গীতে।

সে যেন বলতে চাইছে, "যতক্ষণ শিকারের প্রশ্ন দেখা না দেয় ততক্ষণ আমি অন্য যেকোন কুকুরেরই মত, কিন্তু শিকারের সময় হলে, দেখতেই তো পাচ্ছ আমি কি!"

আরও বেশকিছুক্ষণ পরে খুড়ো যখন নিকলাসের কাছে এসে আলাপ

করতে শুরু করল তখন এই ভেবে সে গর্ববোধ করল যে এত কাণ্ডের পরেও খুড়ো নিজে এসে তার সঙ্গে কথা বলছে।

অধ্যায়—৭

সন্ধ্যার দিকে ইলাগিন নিকলাসের কাছ থেকে বিদায় নিল; নিকলাস যখন বুঝতে পারল যে তারা বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছে তখন শিকারের দল রাতটা তাদের ছোট গ্রাম মিথায়লভ্‌নাতেই কাটিয়ে যাক খুড়োর এই প্রস্তাব সে মেনে নিল।

খুড়ো বলল, "আপনারা যদি আমার বাড়িতে থাকেন তো আরও ভাল হয়। ঠিক আছে, তাই চলে আসুন। দেখুন, আবহাওয়াটা স্যাঁতসেঁতে; তাই আপনারা এখানেই বিশ্রাম করুন আর একটা ছোট গাড়িতে ছোট কাউণ্টেসকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোক।"

ছোট-বড় মিলিয়ে জনা পাঁচেক পারিবারিক ভূমিদাস মনিবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য ফটকে এসে হাজির হল। শিশু, যুবতী মিলিয়ে কুড়িখানেক ভূমিদাসী খিড়কি-দরজা দিয়ে উঁকি মেরে শিকারীদের দেখতে লাগল। নাতাশার উপস্থিতি—একটি মেয়ে, একটি মহিলা ঘোড়ায় চড়েছে—তাদের মনে এত বেশী কৌতূহল জাগিয়েছে যে সকলেই এগিয়ে এসে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, আর এমন সব মন্তব্য করল যেন সে একটি আশ্চর্য দর্শনীয় বস্তু, তাদের কথাবার্তা শুনবার বা বুঝবার মত মানুষমাত্র নয়।

"আরিংকা দেখ, উনি কেমন একদিকে বসেছেন! ঘাঘরা ঝুলে পড়েছে।....দেখ, দেখ, সঙ্গে একটা শিকারী-শিঙাও রয়েছে!"

"কী আশ্চর্য! ওর ছুরিটা দেখছ?"

"ঠিক যেন একটি তাতারনী!"

একটি সাহসিকা তো নাতাশাকে সোজাসুজিই প্রশ্ন করল, "আপনি উল্টে পড়ে না গিয়ে বসে থাকেন কেমন করে?"

চারদিকে বাগান দিয়ে ঘেরা ছোট কাঠের বাড়িটার ফটকে এসে খুড়ো ঘোড়া থেকে নামল। দাসদাসীদের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ গলায় বলল, বাড়তি লোকরা সব কেটে পড়, আর অতিথি-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার যথোচিত আয়োজন কর।

ভূমিদাসরা চলে গেল। খুড়ো নাতাশাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে তাকে সঙ্গে করে ফটকের কাঠের সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল। ঘরের কাঠের দেয়ালে পলস্তরা নেই, তাই খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু তাই বলে চোখে পড়বার মত নোংরাও নয়। ঘরে ঢুকতেই তাজা আপেলের গন্ধ নাকে এল; চারদিকে নেকড়ে ও শেয়ালের চামড়া ঝোলানো।

সামনের ঘর ও বসবার ঘর পেরিয়ে সকলে খুড়োর নিজস্ব ঘরে ঢুকল।

সেখানে রয়েছে একটা ছেঁড়া সোফা, পুরনো কার্পেট, সুভরভ-এর ছবি, গৃহস্বামীর বাবা ও মার ছবি এবং সামরিক পোশাক পরিহিত তার নিজের ছবি। পড়ার ঘরটাতে তামাক ও কুকুরের তীব্র গন্ধ। অতিথিদের সেখানে বসে আরাম করতে বলে খুড়োর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিঠময় কাদা নিয়ে ঘরে ঢুকল রুগা; সোফায় শুয়ে পড়ে জিভ ও দাঁত দিয়ে নিজেকে পরিষ্কার করতে লাগল। পড়ার ঘরের বারান্দার ওধারে দেখা যাচ্ছে একটা ছেঁড়া পর্দার আড়াল। তার পিছন থেকে মেয়েদের হাসি ও ফিস্‌ফিসানি শোনা যাচ্ছে। নাতাশা, নিকলাস ও পেত্‌য়া চাদর খুলে সোফায় বসে পড়ল। কনুইতে ভর দিয়ে পেত্‌য়া সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। নাতাশা ও নিকলাস চুপচাপ। তাদের মুখ লাল; যেমন ক্ষিধে পেয়েছে, তেমনই হাসিখুসি। পরস্পরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ দুজনই অকারণে খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠল।

কিছুক্ষণ পরে খুড়ো ঘরে ঢুকল। পরনে কসাক কোট, নীল ট্রাউজার ও টপ-বুট। নাতাশার মনে পড়ল অত্রাদ্‌হুতে এই পোশাকেই খুড়োকে দেখে তার খুব মজা লেগেছিল, কিন্তু এখন তার মনে হল চাতকপাখি—লেজ কোট বা ফ্রক কোটের তুলনায় এটা মোটেই খারাপ পোশাক নয়। খুড়োর মেজাজও খুব শরিফ, ভাই-বোনের এই হাসিতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট না হয়ে (তারা যে তার জীবন-যাত্রার নমুনা দেখে হাসতে পারে এটা খুড়োর মাথায়ই আসে নি) নিজেও তাদের হাসিতে যোগ দিল।

“এই তো চাই ছোট কাউণ্টেস, এই তো চাই; চলে আসুন! এর মত কোন মেয়ে আমি আগে দেখি নি,” নিকলাসের দিকে একটা পাইপ এগিয়ে দিয়ে সে বলল। “সারা দিন একজন পুরুষ মানুষের মত ঘোড়া ছুটিয়েছেন, অথচ এখনও কেমন তাজা আছেন!”

একটু পরেই খালি পায়ের শব্দ শুনে দরজাটা খুলে দেওয়া হল; ঘরে ঢুকল বছর চল্লিশ বয়সের একটি সুদর্শনা নারী; তার থুঁতনিতে ভাঁজ পড়েছে, ঠোঁট দুটি রক্তিম; হাতে খাবার-ভর্তি একটা মস্ত বড় ট্রে। গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা ও আতিথেয়তার সঙ্গে সকলের দিকে স্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে সশ্রদ্ধভাবে মাথা নোয়াল। অস্বাভাবিক লম্বা-চওড়া চেহারা সত্ত্বেও স্ত্রীলোকটি হাল্কা পায়ে ছুটে এল। টেবিলে সকলের জন্য নানা রকম খাদ্য-পানীয় সাজিয়ে দিয়ে সে একপাশে সরে গিয়ে দরজার কাছে দাঁড়াল। মুখে তখনও হাসিটি লেগেই আছে। রস্তভের মনে হল সে যেন বলতে চাইছে, “এই তো আমি এসেছি। আমিই সেই! এবার “খুড়োকে” চিনলেন তো?” না চিনে আর উপায় কি? শুধু নিকলাসই নয়, আনিসিয়া ফেদরভ্‌না ঘরে ঢুকতেই তার বাঁকা ভুরু আর ঠোঁটের স্মিত হাসির অর্থ নাতাশাও বুঝতে পেরেছে।

খাদ্য-পানীয় সবই আনিসিয়া ফেদরভ্‌নার নিজের হাতে তৈরি; স্বাদে ও

গন্ধে সবকিছুতেই আনিসিয়া ফেদরভ্‌নার স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে ; সেই রসের ছোঁ'য়া, সেই পরিচ্ছন্নতা ও স্মিত হাসি।

নাতাশাকে একটার পর একটা খাবার পরিবেশন করে সে বার বার বলতে লাগল, "এটা নিন ছোট্ট লেডি কাউণ্টেস !"

নাতাশা সবকিছুই খেল ; তার মনে হল এমন খাবার সে কখনও খায় নি। আনিসিয়া ফেদরভ্‌না চলে গেল।

নৈশাহারের পরে রস্তভ ও খুড়ো চেরি ব্র্যাণ্ডি সামনে নিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের শিকার এবং রুগা ও ইলাগিনের কুকুর নিয়ে গল্প শুরু করে দিল। নাতাশা সোফার উপরে সোজা হয়ে বসে চকচকে চোখ মেলে সব কথা শুনতে লাগল। পেত্‌য়াকে কিছু খাওয়াবার জন্য বারকয়েক তাকে ঘুম থেকে তুলতে চেষ্টা করল, কিন্তু সে শুধু বিড়বিড় করে কি যেন বলল, মোটেই উঠল না। এই নতুন পরিবেশে নাতাশার মনটা এতই হাল্কা ও খুসি হয়ে উঠেছে যে তার ভয় হল গাড়িটা বুঝি বড় বেশী তাড়াতাড়ি এসে পড়বে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে খুড়ো বলল, "দেখতেই তো পাচ্ছেন। এই-ভাবেই আমার দিন শেষ হয়ে আসছে···মৃত্যু তো আসবেই। ঠিক আছে, আসুক। কিছুই তো থাকবে না। তাহলে মানুষের ক্ষতি করে কি লাভ ?"

কথাগুলি বলতে বলতে খুড়োর মুখটা আরও অর্থবহ, আরও সুন্দর হয়ে উঠল। আপনা থেকেই রস্তভের মনে পড়ে গেল, একজন সম্মানিত ও নিঃস্বার্থ খেয়ালী লোক হিসাবে গোটা প্রদেশ জুড়ে খুড়োর একটা সুনাম আছে।

"তুমি চাকরিতে ঢোক না কেন খুড়ো ?"

"একসময় ঢুকেছিলাম, ছেড়ে দিয়েছি। ঠিক আছে, চলে আসুন ! চাকরির মাথামুণ্ডু আমি ভাল বুঝি না। ওসব আপনাদের জন্যে—আমার মাথায় যথেষ্ট ঘিলু নেই। আর শিকার একটা আলাদা ব্যাপার—ঠিক আছে। চলে আসুন ! ···আরে, দরজাটা খুলে দাও। ওটা বন্ধ করেছ কেন ?"

কারও খালি পায়ে দ্রুত এগিয়ে আসার শব্দ শোনা গেল ; একটা অদৃশ্য হাত শিকারী ভৃত্যদের ঘরের দরজাটা খুলে দিল। ভেসে এল বালালায়কার (স্প্যানিশ গীটারের মত একটা বাদ্যযন্ত্র) সুর। বাজিয়ের হাতটা খুব ভাল। নাতাশা কিছুক্ষণ ধরেই সুরটা শুনছিল, এবার ভাল করে শুনবার জন্য বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

খুড়ো বলল, "আমার কোচয়ান মিংকা···একটা ভাল বালালায়কা তাকে কিনে দিয়েছি। বাজনাটা আমার বড় প্রিয়।"

নিকলাস বলে উঠল, "খুব ভাল ! সত্যি খুব ভাল !"

দাদার গলায় ভাসা-ভাসা প্রশংসার স্বর শুনে নাতাশা ঈষৎ তিরস্কারের সুরে বলল, "খুব ভাল ? খুব ভাল নয়—যাকে বলে মন-মাতানো !"

খুড়োর দেওয়া খাদ্য-পানীয় যেমন নাতাশার কাছে মনে হয়েছে পৃথিবীর সেরা, তেমনই এই মুহূর্তে এ বাজনাটা মনে হচ্ছে পরম আনন্দময়।

বালালায়কা থামতেই নাতাশা দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "আরও, আরও বাজাও!" মিৎকা নতুন প্রেরণায় বালালায়কায় "মাই লেডি"র সুর-মূর্ছনা ফুটিয়ে তুলল। সকলেই বার বার সেটা শুনতে লাগল; শুনে যেন কারও ক্লান্তি নেই। আনিসিয়া ফেদরভ্‌না ভিতরে ঢুকে দরজার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

খুড়োর মত করেই হেসে নাতাশাকে বলল, "শুনতে ভাল লাগছে? লোকটা খুব ভাল বাজায়।"

খুড়ো হঠাৎ সোৎসাহে বলে উঠল, "এই জায়গাটা ঠিক হল না! এখানে একেবারে ফেটে পড়া উচিত—ঠিক আছে, চলে আসুন! ফেটে পড়া উচিত।"

"তুমিও বাজাও বুঝি?" নাতাশা শুধাল।

খুড়ো জবাব দিল না, একটু হাসল।

"আনিসিয়া, গিয়ে দেখ তো আমার গীটারের তারগুলো ঠিক আছে কি না। অনেকদিন তো ওটা ছুঁই নি। ঠিক আছে—চলে আসুন! বাজনা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি।"

আনিসিয়া ফেদরভ্‌না সানন্দে হাল্কা পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং গীটারটা নিয়ে ফিরে এল।

কারও দিকে না তাকিয়ে খুড়ো বাদ্যযন্ত্রটার ধুলো ঝাড়ল, শক্ত আঙুলে ঠুকে ঠুকে গীটারে সুর বাঁধল, তারপর হাতল-চেয়ারটায় আরাম করে বসল। আনিসিয়া ফেদরভ্‌নার দিকে চোখ টিপে শুরু করল বাজনা; "মাই লেডি" নয়, বাজাতে লাগল বিখ্যাত গান "পথ বেয়ে এস হে সুন্দরী"-র সুর।

বাজনা শেষ হতেই নাতাশা চেঁচিয়ে উঠল, "মনোরম, মনোরম! বাজাও খুড়ো, বাজিয়ে যাও!" লাফিয়ে উঠে খুড়োকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল। দাদার দিকে ঘুরে বলল, "নিকলাস, নিকলাস!" যেন তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাইল: "আমি এত চঞ্চল হয়ে উঠেছি কেন?"

খুড়োর বাজনা নিকলাসেরও ভাল লেগেছে; খুড়ো সুরটা আর একবার বাজাল। দরজায় আবারও আনিসিয়া ফেদরভ্‌নার মুখটা দেখা গেল। তার পিছনে আরও অনেক মুখ…খুড়ো আবার বাজাতে শুরু করল—

"পরিষ্কার মিষ্টি জল আনছ তুমি কন্যা,
দোহাই তোমার, এ কাজ রাখ, তুমি যে অনন্যা—"

হঠাৎ ঘাড়টা ঝাঁকি দিয়ে বাজনা থামাতেই নাতাশা যেন আর্তনাদ করে উঠল, "বাজিয়ে যাও খুড়ো"; যেন এই বাজনার উপর তার জীবনটাই নির্ভর করছে।

খুড়ো উঠে দাঁড়াল। মনে হল তার ভিতরে যেন দুটি মানুষের বাস:

একজন তাকে দেখে গম্ভীরভাবে হাসছে, অপরজন একটা পল্লী-নৃত্যের জন্য তৈরি হচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে খুড়ো উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, "এবার তাহলে আসুন ভাইঝি!"

কাঁধের উপর থেকে শালটা ফেলে দিয়ে নাতাশা ছুটে গিয়ে খুড়োর মুখোমুখি হল, দুই হাত মুড়ে নাচের ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

কবে কোন্ ফরাসী শিক্ষয়িত্রীর কাছে সে রুশ পল্লী-নৃত্য শিখেছিল কে জানে, আজ কিন্তু সে চমৎকার নাচতে লাগল। নিকলাস ও অন্য সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল।

নাচ শেষ করে খুড়ো আনন্দে হাসতে হাসতে বলল, "আচ্ছা ছোট কাউণ্টেস! ঠিক আছে—চলে আসুন! খুব ভাল নেচেছেন ভাই-ঝি! এবার আপনার জন্য একটি ভাল বর খুঁজতে হবে। ঠিক আছে—চলে আসুন!"

নিকলাস হেসে বলল, "বর খোঁজা হয়ে গেছে।"

"আচ্ছা?" বলে খুড়ো জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নাতাশার দিকে তাকাল; খুসির হাসি হেসে সেও মাথা নাড়ল।

খুড়ো আর একটা গান বাজাল; তারপর একটু থেমে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে তার প্রিয় শিকার-সঙ্গীতটি গাইল:

"কালকে রাতে আঁধার যখন এল ঘন হয়ে
হাল্কা বরফ ঝরল যখন ঝিরি ঝিরি লয়ে·····"

খুড়ো গাইল চাষীদের মত করে; তার দৃঢ় প্রত্যয় যে একটা গানের অর্থ নিহিত থাকে তার বাণীতে, সুর আপনি আসে; বাণী ছাড়া সুর থাকতে পারে না; বাণীকে রূপ দেবার জন্যই সুরের অস্তিত্ব। ফলে পাখির গানের মত তার গানও হল অসাধারণ ভাল। নাতাশা খুড়োর গানেও সমান মোহিত। মনে মনে স্থির করল; সে আর বীণা বাজাবে না, কেবল গীটারই বাজাবে।

ন'টার পরে দু'খানা ছোট গাড়ি ও তিনজন অশ্বারোহী এল নাতাশা ও পেত্য়াকে নিয়ে যেতে। তারা যে এতক্ষণ কোথায় ছিল তা না জানতে পেরে কাউণ্ট ও কাউণ্টেস খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল।

পেত্য়াকে কুকুরের মত তুলে নিয়ে বড় গাড়িটায় শুইয়ে দেওয়া হল। নাতাশা ও নিকলাস উঠল অপর গাড়িতে। খুড়ো নাতাশার গায়ে শালটা জড়িয়ে দিল, একটা নতুন মমতায় তাকে বিদায় দিল। হাঁটতে হাঁটতে সে সেতুটা পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গেল; তারপর লণ্ঠন হাতে তিনজন অশ্বারোহী শিকারীকে তাদের সঙ্গে দিল আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে।

"বিদায় গো ভাই-ঝি", অন্ধকারের ভিতর থেকে তার গলা ভেসে এল—

কিন্তু এ স্বর যেন নাতাশার চেনা আগেকার স্বর নয়, এ সেই স্বর যাতে গাওয়া হয়েছিল "কালকে রাতে আঁধার যখন এল ঘন হয়ে।"

বড় রাস্তায় পড়ে নাতাশা বলল, "খুড়ো কী ভাল মানুষ!"

নিকলাস বলল, "সত্যি। তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না তো?"

"না, আমি খুব, খুব ভাল আছি। এত ভাল লাগছে।" নিজের মন নিয়েই সে যেন বিব্রত। অনেকক্ষণ তারা চুপচাপ চলল। রাতটা অন্ধকার, ঠাণ্ডা। ঘোড়াগুলোও চোখে পড়ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে কাদার মধ্যে তাদের পায়ের শব্দ।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে হঠাৎ নাতাশার গলায় "কালকে রাতে আঁধার যখন এল ঘন হয়ে" গানটার সুর গুনগুনিয়ে উঠল—সারা পথ এই সুরটাই সে ধরতে চেষ্টা করছিল, এতক্ষণে তা ধরা দিল।

"তুলতে পারলে তাহলে?" নিকলাস বলল।

নাতাশা শুধাল, "এইমুহূর্তে তুমি কি ভাবছিলে নিকলাস?"

এই প্রশ্নটা একে-অন্যকে করতে তারা খুব ভালবাসে।

মনে করবার চেষ্টা করে নিকলাস বলল, "আমি? দেখ, প্রথমে ভেবেছিলাম লাল কুকুর রুগা ঠিক খুড়োর মত; সেটা যদি মানুষ হত তাহলে খুড়োকে সব সময়ে কাছে কাছে রাখত। খুড়ো কী চমৎকার মানুষ! তোমার কি তাই মনে হয় না? কি বল?"

"আমি? দাঁড়াও, দাঁড়াও। হ্যাঁ, প্রথমে ভাবলাম যে বাড়ির দিকে চলেছি, কিন্তু অন্ধকারে কোথায় যে চলেছি তা শুধু ঈশ্বরই জানেন, হয় তো হঠাৎ আমরা যেখানে পৌঁছে যাব সেটা অত্রাদ্‌নু নয়, পরীদের দেশ। তারপর ভাবলাম····না, আর কিছু না।"

পরে হেসে বলল, "আমি জানি তুমি তার কথাই ভাবছিলে।"

যদিও সত্যি সত্যি সে প্রিন্স আন্‌দ্রুর কথাই ভাবছিল, তবু নাতাশা বলল, "না। আমি শুধু ভাবছিলাম আনিসিয়া কেমন সুন্দরভাবে সবকিছু চালিয়ে নিচ্ছে। তুমি কি জান, কিন্তু আমি জানি যে আর কখনও আমি আজকের মত শান্ত ও সুখী হতে পারব না।"

"বাজে কথা, অর্থহীন কথা, বাগাড়ম্বর।" নিকলাস চেঁচিয়ে বলল। তারপর ভাবল, "আমার এই নাতাশা কত ভাল! তার মত বন্ধু আমার কেউ নেই, কোনদিন হবে না। কেন ও বিয়ে করবে? এমনিভাবেই তো আমরা একসঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতে পারি!"

নাতাশাও ভাবল, "কত ভাল আমার এই নিকলাস!"

রাতের ভেজা-ভেজা চকচকে অন্ধকারের মধ্যে বাড়ির জানালার আলোগুলি দেখিয়ে নাতাশা বলল, "আঃ, বসার ঘরে এখনও আলো জ্বলছে!"

অধ্যায়—৮

কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ "মার্শাল অব দি নবিলিটি"র পদটা ছেড়ে দিয়েছে, কারণ ঐ পদে থাকার দরুণ তার অনেক খরচ হচ্ছিল, অথচ তার বৈষয়িক অবস্থার কোনরকম উন্নতি হয় নি। নাতাশা ও নিকলাস প্রায়ই লক্ষ্য করে বাবা-মা কি নিয়ে যেন উদ্বেগের সঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে; কখনও কখনও শুনতে পায় রস্তভদের মস্কোর নিকটবর্তী চমৎকার বাড়ি ও জমিদারি বেচে দেবার প্রস্তাব চলছে। মার্শাল থাকার সময়ে বাড়িতে যেরকম অবাধ জনসমাগম ছিল এখন আর সেটা নেই; অত্রাদ্‌নুর জীবনযাত্রা আগের তুলনায় অনেক চুপচাপ হয়ে এসেছে; কিন্তু তবু মস্তবড় বাড়িটা ও তার ঘরগুলো লোকজনে ভর্তি; প্রতিদিন বিশ জনেরও বেশী লোক টেবিলে খেতে বসে। এরা সকলেই আপন জন, পরিবারের লোকদের মতই এ বাড়িতে বসবাস করছে; আবার কেউ বা বাধ্য হয়ে এখানে রয়েছে। যেমন বাজনাদার ডিমলার ও তার বৌ, বুড়ি মহিলা বেলোভা, এবং পেত্‌য়ার শিক্ষয়িত্রী, মেয়েদের প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী, প্রভৃতির মত এমন আরও অনেকে যারা নিজেদের বাড়ির চাইতে কাউন্টের বাড়িতে থাকাটাই অধিকতর সুবিধাজনক বলে মনে করে। আগেকার মত তত অতিথি সমাগম এখন আর হয় না, কিন্তু জীবনযাত্রার যে পুরনো অভ্যাসগুলি ছেড়ে দিয়ে বেঁচে থাকার কথাই কাউন্ট ও কাউন্টেস ভাবতেই পারে না সেটা এখনও অব্যাহতই আছে। শিকারের একটা বড় মাপের আয়োজন এখনও আছে, বরং নিকলাস সেটাকে আরও বাড়িয়েছে, আস্তাবলে সেই পঞ্চাশটা ঘোড়া ও পনেরোটা সহিসই আছে, নামকরণ-দিবসে সেই ব্যয়বহুল ভোজসভা ও উপহারের রেওয়াজই চলেছে; কাউন্টের হুইস্ট ও বোস্টন খেলাও আগের মতই চলছে; এখনও সকলকে হাত দেখিয়ে সেই একইভাবে ছড়িয়ে তাস মেলে ধরে কাউন্ট প্রতিদিন প্রতিবেশীদের কাছে শয়ে-শয়ে রুবল হারে, আর তারাও উপার্জনের একটা লাভজনক উপায় হিসাবে কাউন্ট রস্তভের সঙ্গে এক রাবার খেলার সুযোগ খুঁজে ফেরে।

বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে কাউন্ট যেন একটা মস্তবড় জালের ভিতরে পড়েছে; সে জালে সে যে আটকে পড়ছে এটা সে যতই বিশ্বাস করতে না চায় প্রতি পদক্ষেপে ততই বেশী করে জড়িয়ে পড়ছে; না পারছে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে, না পারছে ধৈর্য ধরে জালের বাঁধন খুলতে। কাউন্টেস মর্মে মর্মে বুঝতে পারছে যে তার ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ ঘটছে, কিন্তু সেটা কাউন্টের দোষ নয়, কারণ একদিন সে যা ছিল তার থেকে সরে আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়; নিজের ও সন্তানদের আসন্ন সর্বনাশ সম্পর্কে কাউন্ট নিজেও সচেতন। মেয়েলি দৃষ্টিকোণ থেকে এ সমস্যা-সমাধানের একটিমাত্র পথই

কাউণ্টেসের চোখে পড়ছে, অর্থাৎ নিকলাস যদি কোন বিত্তশালিনীকে বিয়ে করে। সে বোঝে এটাই তাদের শেষ আশা, আর নিকলাস যদি তার পছন্দ-করা মেয়েকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে তাহলে সংসারের অবস্থার উন্নতির আশাই তাকে ছেড়ে দিতে হবে। মেয়েটি হচ্ছে জুলি কারাগিনা, বাবা-মা যেমন ধার্মিক তেমনই ভাল মানুষ, শিশুকাল থেকেই রস্তভরা মেয়েটিকে চেনে, সম্প্রতি তার সর্বশেষ ভাইটিরও মৃত্যু ঘটায় সেই এখন প্রভূত বিত্তের উত্তরাধিকারিণী।

ছেলের বিয়ের প্রস্তাব করে কাউণ্টেস ইতিমধ্যেই মস্কোতে জুলির মাকে চিঠি লিখেছে; তার কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাবও এসেছে। কারাগিনা জানিয়েছে, তার নিজের এতে মত আছে, তবে সবকিছুই নির্ভর করছে মেয়ের ইচ্ছার উপরে। কারাগিনা নিকলাসকে মস্কোতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছে।

চোখের জল ফেলে কাউণ্টেস বারকয়েক ছেলেকে বলেছে যে এখন তার দুই মেয়েই সংসারী হয়েছে, তাই তার একমাত্র বাসনা ছেলের বিয়ে দেওয়া। সে বাসনা পূর্ণ হলেই সে শান্তিতে কবরে শুতে পারে। আরও বলেছে, একটি চমৎকার মেয়েকে সে চেনে, কাজেই এখন ছেলের মতটা পাওয়া দরকার।

মায়ের কথাগুলো কোন্‌দিকে চলেছে সেটা বুঝতে পেরে একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে মাকে সব কথা খোলাখুলি বলতে বলল। মাও জানিয়ে দিল যে, তাদের বৈষয়িক সমস্যা-সমাধানের সবটাই এখন নির্ভর করছে জুলি কারাগিনের সঙ্গে তার বিয়ের উপরে।

"কিন্তু মামণি, ধর আমি এমন একটি মেয়েকে ভালবাসি যার কোন বিষয়-সম্পত্তি নেই, তাহলে তুমি কি চাও যে টাকার জন্য আমি আমার ভালবাসা ও সম্মানকে বিসর্জন দেব?" প্রশ্নটার নিষ্ঠুরতাটুকু উপলব্ধি না করে শুধু নিজের মহানুভবতা দেখাতেই সে মাকে কথাটা বলল।

কি বলবে বুঝতে না পেরে মা বলল, "না, তুমি আমার কথা বুঝতে পার নি নিকোলেংকা। তোমার সুখই আমি চাই।" কিন্তু সে যে সত্যি কথা বলে নি, এবং তার ফলে নিজেই জড়িয়ে পড়েছে সেটা বুঝতে পেরে মা কাঁদতে লাগল।

"কেঁদ না মামণি। তুমি শুধু বল কি চাও; তুমি তো জান, তোমাকে সুখী করতে আমি জীবন দিতে পারি, সবকিছু দিতে পারি। তোমার জন্য আমি সব বিসর্জন দেব—এমন কি আমার ভালবাসাকেও।"

কিন্তু সেভাবে তো কাউণ্টেস কথাটা বলতে চায় নি: ছেলের আত্মত্যাগ সে চায় না বরং সে চায় ছেলের জন্য নিজে ত্যাগ স্বীকার করতে।

চোখের জল মুছে বলল, "না, তুমি আমাকে বুঝতে পার নি; এ কথা

এখন থাক।"

নিকলাস নিজের মনে বলল, "হতে পারে যে একটি গরীব মেয়েকে আমি ভালবাসি। টাকার জন্য কি আমার ভালবাসাকে, আমার সম্মানকে বিসর্জন দেব? মামণি কি করে একথা আমাকে বলতে পারল আমি ভেবে পাই না। সোনিয়া গরীব বলেই আমি তাকে ভালবাসব না, তার বিশ্বস্ত, আন্তরিক ভালবাসার প্রতিদান দেব না? অথচ একটা পুতুলের মত জুলির চাইতে তাকে নিয়েই তো আমি বেশী সুখী হতে পারব। পরিবারের কল্যাণে আমার মনকে বলি দিতে পারি, কিন্তু তার উপর জোর খাটাতে তো পারি না। সোনিয়াকে যদি আমি ভালবাসি তো সে ভালবাসা আমার কাছে অন্য সব-কিছুর চাইতে শক্তিশালী, সবকিছুর উপরে।"

মায়ের প্রস্তাবমত নিকলাস মস্কো গেল না, আর কাউণ্টেসও তার কাছে আর বিয়ের কথা তুলল না। দুঃখের সঙ্গে, কখনও বিরক্তির সঙ্গে, সে লক্ষ্য করতে লাগল সম্পত্তিহীনা সোনিয়ার সঙ্গে তার ছেলের ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

নিকলাস তখন ছুটির শেষের দিনগুলি বাড়িতেই কাটাচ্ছিল। রোম থেকে প্রিন্স আন্দ্রুর লেখা চতুর্থ চিঠিটা তার হাতে এসেছে। সে লিখেছে, গরম আবহাওয়ায় তার ক্ষতস্থানটা অপ্রত্যাশিতভাবে পুনরায় পেকে না উঠলে অনেক আগেই সে রাশিয়ায় ফিরে যেত; বর্তমান অবস্থায় নববর্ষ পর্যন্ত তাকে সেখানেই থাকতে হবে। নাতাশা এখনও তার বাকদত্তর প্রতি সমান অনুরক্ত, সেই অনুরাগই তার জীবনের সান্ত্বনা; কিন্তু তাদের বিরহের চার মাসের শেষের দিকে তার মন মাঝে মাঝেই অবসাদে ভেঙে পড়তে লাগল। নিজের জন্যই তার দুঃখ হতে লাগল; দুঃখ এই জন্য যে বৃথাই সে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, কারও কোন কাজে লাগছে না—অথচ ভালবাসবার ও ভালবাসা পাবার কত শক্তিই না তার মধ্যে আছে।

রস্তভদের বাড়ির আবহাওয়া তখন মোটেই সুখপ্রদ নয়।

অধ্যায়—৯

বড়দিন এল। কিছু প্রথামাফিক অনুষ্ঠান, প্রতিবেশী ও চাকরদের কাছ থেকে কিছু গম্ভীর ও ক্লান্তিকর অভিনন্দন, এবং প্রত্যেকের জন্য নতুন পোশাক, এ ছাড়া বিশেষ কোন উৎসবের আয়োজন করা হল না, যদিও বিশ ডিগ্রি রিউমার (ফারেনহাইট অনুসারে শূন্য তাপাঙ্কের ১৩ ডিগ্রি নীচে) আবহাওয়ার শান্ত বরফপাত, দিনের চোখ-ধাঁধানো রোদ ও শীতের রাতের তারার আলো—এসব কিছুর মধ্যেই ছিল বিশেষ আনন্দ-অনুষ্ঠানের আহ্বান।

বড়দিন সপ্তাহের তৃতীয় দিন; মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বাড়ির লোকজন

সকলেই যার যার ঘরে চলে গেছে। দিনের মধ্যে এটাই সবচাইতে একঘেয়ে সময়। নিকলাস সকালে কিছু প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়েছিল; এখন সে বসবার ঘরের সোফায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বুড়ো কাউণ্ট পড়ার ঘরে বিশ্রাম করছে। সোনিয়া গোল টেবিলটার পাশে বসে একটা সূচি-কর্মের নক্সা নকল করছে। কাউণ্টেস পেশেন্স খেলছে। ভাঁড় নাস্তাসিয়া আইভানভ্‌না দুটি বৃদ্ধা মহিলাকে নিয়ে বিরস বদনে জানালার ধারে বসে আছে। নাতাশা ঘরে ঢুকল, সোনিয়ার কাছে গিয়ে একপলক তার কাজটা দেখল, তারপর মার কাছে গিয়ে কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বলল, "একঘরের মত এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? কি চাও?"

"তাকে⋯আমি চাই তাকে⋯এখনই, এই মুহূর্তে! আমি চাই তাকে!" নাতাশা বলল। তার চোখ দুটি ঝক্‌ঝক্ করছে; ঠোঁটে হাসির চিহ্ন নেই।

কাউণ্টেস মাথা তুলে মেয়ের দিকে তাকাল।

"আমার দিকে তাকিও না মামণি! তাকিও না; আমি কেঁদেই ফেলব।"

"আমার কাছে একটু বস," কাউণ্টেস বলল।

"মামণি, আমি তাকে চাই। কেন এভাবে নিজেকে ক্ষয় করব মামণি?"

তার গলা ধরে এল, চোখে নামল অশ্রুর প্লাবন, সেটা লুকোতে তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

বসার ঘরে ঢুকে সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল, তারপর দাসীদের ঘরে গেল। একটি বুড়ি দাসী একটি মেয়েকে বকছিল। এইমাত্র ঠাণ্ডার মধ্যে ভূমিদাসদের বাসা থেকে ছুটে এসেছে বলে মেয়েটি হাঁপাচ্ছে।

বুড়ি বলল, "খেলা থামাও—সবকিছুরই একটা সময় আছে।"

নাতাশা বলল, "ওকে ছেড়ে দাও কন্দ্রাতেভ্‌না। যা মাভ্‌রুশা, চলে যা।"

মাভ্‌রুশাকে ছাড়িয়ে দিয়ে নাতাশা নাচ-ঘর পেরিয়ে বারান্দায় গেল। সেখানে এক বুড়ো ও দুটি যুবক চাকর তাস খেলছিল। তাকে ঢুকতে দেখেই তারা উঠে দাঁড়াল।

"এদের নিয়ে কি করা যায়?" নাতাশা ভাবল।

"এই যে, নিকিতা, দয়া করে যাও⋯একে কোথায় পাঠাই? ⋯ঠিক আছে, যাও তো, উঠোন থেকে একটা মোরগ ধরে নিয়ে এস; আর তুমি মিশা, কিছুটা যই নিয়ে এস।"

"অনেকটা যই?" মিশা খুসি হয়ে বলল।

"তাড়াতাড়ি যা," বুড়ো লোকটি বলল।

"আর তুমি থিয়োডোর, তুমি আমাকে একটুকরো চক এনে দাও।"

খানসামার ভাঁড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাকে বলল সামোভারটা উনুনে চাপিয়ে দিতে, যদিও এখনও চায়ের সময় মোটেই হয় নি।

আসলে সকলকে ব্যস্ত করে তুলতেই নাতাশা ভালবাসে। সবসময়ই

কোন না কোন কাজে তাদের সে পাঠাবেই। সে যেন যাচাই করে দেখতে চায় তার হুকুম শুনে রাগ করে কি না অথবা বিরক্ত হয় কি না। কিন্তু ভূমিদাসদাসীরাও তার হুকুমই তড়িঘড়ি পালন করে থাকে। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল, "এবার কি করি? কোথায় যাই?"

মেয়েলি জামা পরে ভাঁড়কে সেইদিকে আসতে দেখে বলল, "বল তো নাস্তাসিয়া আইভানভ্‌না, আমার কিরকম ছেলেপুলে হবে?"

ভাঁড় জবাব দিল, "কেন, মাছি, ঝিঁঝিঁ পোকা, কাঠ-ফড়িং।"

"হা প্রভু, হা প্রভু, এ যে সেই একই মূর্তি! আঃ, কোথায় যে যাই? নিজেকে নিয়ে কি যে করি?"

গোড়ালি খুট্‌খুট্ করে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। সেখানে ভোগেল, তার স্ত্রী ও দুজন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে দেখা করে চলে গেল ভাই পেত্‌য়ার কাছে। সে তখন একটি চাকরের সঙ্গে বসে রাতে পোড়াবার জন্য বাজি তৈরি করছে।

ভাইকে ডেকে বলল, "পেত্‌য়া! পেত্‌য়া! আমাকে পিঠে করে নীচে নিয়ে চল।"

সত্যি সত্যি ভাইয়ের পিঠে চেপে সে নীচে নেমে গেল। এইভাবে নিজের গোটা সাম্রাজ্যকে পরিদর্শন করে সে নাচ-ঘরে গিয়ে ঢুকল। একটা গীটার হাতে নিয়ে বুক-কেসটার পিছনে একটা অন্ধকার কোণ বেছে নিয়ে সেখানে বসে গীটারের তারে আঙুল বুলিয়ে পিতার্সবুর্গে প্রিন্স আন্দ্রুর পাশে বসে শোনা অপেরার একটা গানের সুর বাজাতে লাগল। গীটারে যে সুর সে তুলল অন্য কেউ তার মাথামুণ্ডু হয় তো কিছুই বুঝত না, কিন্তু সেই শব্দের ঝংকার তার মনে অনেক স্মৃতি বয়ে নিয়ে এল। সেই মুহূর্তগুলি তার মনে পড়ে গেল যখন সে ছিল পাশে, আর তার দিকে তাকিয়েছিল প্রেমিকের দৃষ্টিতে।

"আঃ, সে যদি একটু তাড়াতাড়ি আসত! আমার ভয় হচ্ছে। সে বুঝি কোনদিনই আসবে না! আরও খারাপ লাগছে, আমি যে বুড়ি হয়ে যাচ্ছি—সেটাই তো আসল কথা! আমার মধ্যে আজ যা আছে তা তো থাকবে না। কিন্তু হয়তো সে আজই আসবে, এখনই আসবে। হয়তো সে এসে গেছে, বাইরের ঘরে বসে আছে। হয়তো সে গতকালই এসেছে, আমি সেটা ভুলে গেছি।" গীটারটা রেখে দিয়ে সে বসার ঘরে চলে গেল।

শিক্ষক, গভর্নেস, অতিথি—পুরো পারিবারিক দলটাই চায়ের টেবিলে হাজির। চাকররা টেবিলটা ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে,—কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু সেখানে নেই। জীবন আগেকার মতই চলেছে।

নাতাশাকে ঢুকতে দেখেই বুড়ো কাউণ্ট বলে উঠল, "আরে, এই তো এসেছে! বস, আমার পাশে বস।" কিন্তু নাতাশা মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে

চারদিকে তাকাতে লাগল; যেন কাউকে খুঁজছে।

নাতাশা বলল, "মামণি! তাকে এনে দাও, তাকে এনে দাও মামণি! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!" আবারও অনেক কষ্টে সে চোখের জল থামাল।

টেবিলে বসে সে বড়দের আলোচনা শুনতে লাগল। নিকলাসও সেখানে হাজির। "হায় ঈশ্বর, সেই একই মুখ, সেই একই কথা! হাতে পেয়ালা নিয়ে বাপি সেই একইভাবে কথা বলে চলেছে!" গোটা সংসারের এই একঘেয়েমি লক্ষ্য করে নাতাশা যেন শিউরে উঠল।

চায়ের পরে নিকলাস, সোনিয়া ও নাতাশা বসার ঘরের সেই প্রিয় কোণটাতে গিয়ে বসল যেখানে তাদের সব গোপন আলোচনা হয়ে থাকে।

অধ্যায়—১০

নাতাশা দাদাকে বলল, "তোমার কি কখনও এরকম মনে হয় যে আর কিছু পাবার নেই—কিছু না; যাকিছু ভাল সব শেষ হয়ে গেছে? আর ঠিক একঘেয়ে নয়, কেমন যেন বিষণ্ণ লাগে?"

নিকলাস জবাব দিল, "তা হয় বটে! যখন সবকিছুই ঠিক ঠিক মত চলছে, সকলেই হাসিখুসি, তখন এ ধরনের ভাব আমারও হয়েছে। মনে হয়েছে আমি যেন বড় ক্লান্ত, আমরা সকলেই মরে যাব। রেজিমেণ্টে থাকতে একবার আমি গানের মজলিসে যাই নি…আর হঠাৎ এমন খারাপ হয়ে গেল…"

নাতাশা বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি জানি! খুব ছোট বেলায় আমার ওরকম হত। তোমার মনে আছে একবার স্কুলের ব্যাপারে আমাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল? তোমরা সকলে নাচছিলে, আর স্কুলের ঘরে বসে আমি ফুঁপিয়ে কাঁদছিলাম? সে-কথা আমি কোনদিন ভুলব না: আমার খুব খারাপ লাগছিল, নিজের জন্য ও অন্য সকলের জন্য কেমন যেন দুঃখ পাচ্ছিলাম। অথচ আমি ছিলাম নির্দোষ—সেটাই তো আসল কথা। তোমার মনে আছে?"

নিকলাস জবাব দিল, "মনে আছে। পরে তোমার কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু কেমন যেন লজ্জা করছিল। তখন আমরা ভয়ংকর অবুঝ ছিলাম। আমার একটা মজার পুতুল ছিল, সেটা তোমাকে দিতে চেয়েছিলাম। তোমার মনে আছে?"

বিষণ্ণ হাসি হেসে নাতাশা শুধাল, "আর তোমার কি মনে পড়ে, অনেক কাল আগে, যখন আমরা খুব ছোট ছিলাম, তখন কাকা আমাদের পড়ার ঘরে ডেকেছিলেন—সেই পুরনো বাড়িতে—তখন অন্ধকার হয়ে এসেছিল—আমরা ভিতরে ঢুকলাম আর অমনি সেখানে হাজির হল…"

খুসির হাসি হেসে নিকলাস গলা মেলাল, "একটি নিগ্রো। খুব মনে

আছে। অবশ্য আমি এখনও জানি না সত্যি একজন নিগ্রো এসেছিল, না কি আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম, না কেউ আমাদের তার কথা বলেছিল।"

"তোমার নিশ্চয় মনে আছে তার মাথার চুল ছিল সাদা, দাঁতও সাদা; আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে আমাদের দিকে তাকাল…"

"সোনিয়া, তোমার মনে পড়ে?" নিকলাস শুধাল।

সোনিয়া নরম স্বরে জবাব দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারও কিছু কিছু মনে আছে।"

নাতাশা বলল, "জান, বাপিকে ও মামণিকে আমি নিগ্রোটার কথা জিজ্ঞাসাও করেছিলাম, কিন্তু তারা বলল যে কোন নিগ্রোই সেখানে ছিল না। কিন্তু তুমি তো দেখেছ, তোমার তো মনে আছে!"

"নিশ্চয় মনে আছে। তার দাঁতগুলো এত স্পষ্ট মনে আছে যেন এই-মাত্র দেখলাম।"

"কী আশ্চর্য! ঠিক যেন একটা স্বপ্ন! আমার খুব ভাল লাগে।"

"আবার—তোমার কি মনে আছে নাচ-ঘরে শক্ত করে সেদ্ধ করা ডিম গড়িয়ে দিয়ে আমরা খেলা করছি, আর হঠাৎ দুই বুড়ি এসে কার্পেটের উপর ঘুরতে লাগল? সেটা কি সত্যি, না স্বপ্ন? তোমার মনে আছে কী মজাটাই না হয়েছিল?"

"হ্যাঁ, তোমার মনে আছে নীল রঙের ওভার কোটটা পরে বাপি একবার ফটকে দাঁড়িয়ে বন্দুক ছুঁড়েছিল?"

এইভাবে হাসিখুসিতে মশ্‌গুল হয়ে তারা অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল।

কথাবার্তার মাঝখানে একটি দাসী অপর দিকের দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "মিস, ওরা মোরগটা এনেছে।"

"ওটার আর দরকার নেই পোলিয়া। ওদের ওটা নিয়ে যেতে বল," নাতাশা বলল।

ঘরে ঢুকল ডিম্‌লার। এক কোণে দাঁড় করানো বীণাটার কাছে গিয়ে কাপড়ের ঢাকনাটা খুলে ফেলল। বীণার তারে একটা কর্কশ আওয়াজ উঠল।

বসার ঘর থেকে বুড়ি কাউন্টেসের গলা শোনা গেল, "মি ডিমলার, দয়া করে আমার প্রিয় সুর 'নিশীথে প্রান্তরে' বাজান।"

একটা তারে ঝংকার তুলে নাতাশা, নিকলাস ও সোনিয়ার দিকে ফিরে ডিমলার বলল, "তোমরা কত শান্ত!"

"হ্যাঁ, আমরা দার্শনিক আলোচনা করছি," কথাটা বলে নাতাশা আবার তাদের আলোচনায় যোগ দিল। তারা তখন স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা করছে।

ডিম্‌লার বাজাতে শুরু করল।

নাতাশা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "তোমারা কি জান, অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে একসময় লোকের মনে পড়ে যায় সেইসব ঘটনার কথা যা এই পৃথিবীতে আসার আগে ঘটেছিল⋯"

সোনিয়া লেখাপড়ায় খুব ভাল ; সবকিছু তার মনে থাকে। সে বলল, "ওটা জন্মান্তরবাদের ব্যাপার। মিশরীয়রা বিশ্বাস করে যে আমাদের আত্মা একসময় জন্তুদের দেহে বাস করত এবং পুনরায় জন্তুদের দেহেই ফিরে যাবে।"

নাতাশা বলল, "না, আমরা কোনদিন জন্তু ছিলাম সেটা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু এটা আমি নিশ্চিত জানি যে ওই সুদূরে কোথাও আমরা দেবদূত হয়ে ছিলাম, তারপর এখানে এসেছি, আর সেইজন্যই আমাদের মনে পড়ে⋯"

"আলোচনায় যোগ দিতে পারি কি ?" ডিম্‌লার নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে তাদের পাশে বসে বলল।

নিকলাস বলল, "আমরা যদি দেবদূতই ছিলাম, তাহলে আমাদের পতন ঘটল কেন ? না, তা হতে পারে না !"

"পতন তো হয় নি ; কে বলল আমরা নীচে নেমে গেছি ?⋯আগে আমি কি ছিলাম সেটা জানব কেমন করে ?" নাতাশা দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে উঠল। "আত্মা অমর—সেক্ষেত্রে আমাকে যদি চিরদিন বাঁচতে হয় তাহলে তো আগেও বাঁচতে হয়, অনন্ত কাল ধরেই বাঁচতে হয়।"

এবার ডিম্‌লার কথা বলল, "ঠিক কথা, কিন্তু অনন্ত কালের কল্পনা করা আমাদের পক্ষে কঠিন কাজ।"

নাতাশা বলল, "অনন্ত কালের কল্পনা কঠিন হবে কেন ? এখন তো আজ চলছে, আবার কাল হবে, চিরকাল তাই হয়, তারও আগে গতকাল ছিল, তার আগের দিন ছিল⋯"

এইসময় কাউণ্টেসের গলা শোনা গেল, "নাতাশা ! এবার তোমার পালা।" আমাদের কিছু গেয়ে শোনাও। ষড়যন্ত্রকারীদের মত তোমরা ওখানে বসে আছ কেন ?"

নাতাশা বলল, "মামণি, আমার মোটেই গাইতে ইচ্ছা করছে না।" তবু সে উঠে পড়ল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেই উঠল। নিকলাসও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ক্ল্যাভিকর্ড-এ গিয়ে বসল। ডিম্‌লারও অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

যথারীতি হলের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে যেখান থেকে গলার স্বর সবচাইতে ভাল খুলবে সেই জায়গাটা বেছে নিয়ে নাতাশা মার প্রিয় গানটা শুরু করল।

সে বলেছিল বটে গান গাইতে তার ইচ্ছা করছে না, কিন্তু সেসন্ধ্যায় যে গান সে গাইল তেমনকরে অনেক দিন সে গায় নি, এবং অনাগত অনেক

দিনের মধ্যেও তেমন করে গাইতে পারবে বলে মনে হয় না। বুড়ো কাউন্ট পড়ার ঘরে বসেই কান পেতে সে গান শুনল; বার বার তার কাজে ভুল হতে লাগল। নিকলাস বোনের উপর থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। বুড়ি কাউন্টেস শুনতে শুনতে সানন্দ অথচ বিষন্ন হাসি হাসতে লাগল, তার দুই চোখে জল এল, মাঝে মাঝে মাথা নাড়তে লাগল।

কাউন্টেসের পাশে বসে ডিমলারও চোখ বুঁজে গান শুনছিল।

অবশেষে বলল, "আহা, কাউন্টেস, এতো এক ইওরোপীয় প্রতিভা, ওর আর শিখবার কিছু নেই—কী সরসতা, কী কমনীয়তা, আর কী বলিষ্ঠতা…"

"আহা, ওকে নিয়ে আমার কত যে ভয়, কত যে ভয়!" কাকে বলছে খেয়াল না করেই কাউন্টেস কথাগুলি বলল। মায়ের মন দিয়েই সে বুঝতে পেরেছে যে নাতাশার মধ্যে অনেককিছু আছে, আর সেইজন্যই সে সুখী হতে পারবে না।

নাতাশার গান শেষ হবার আগেই চৌদ্দ বছরের পেত্‌য়া ছুটে এসে জানাল যে কয়েকজন বহুরূপী এসে হাজির হয়েছে।

নাতাশা হঠাৎ থেমে গেল।

"মূর্খ!" ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে কথাটা বলেই নাতাশা দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ারে উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে কান্না থামল না।

"ও কিছু নয় মামণি, সত্যি কিছু নয়; কেবল পেত্‌য়া আমাকে চমকে দিয়েছিল," হাসবার চেষ্টা করে নাতাশা বলল, কিন্তু তার চোখ দিয়ে তখনও জল গড়িয়ে পড়ছে, চাপা কান্নায় গলা আটকে আসছে।

বাড়ির ভূমিদাসদেরই কয়েকজন বহুরূপী সেজে এসেছে; ভালুক, তুর্কী, সরাইওয়ালা ও মহিলা সেজে সকলকে ভয় পাইয়ে মজা করতেই তারা এসেছে। প্রথমে সলজ্জ পায়ে নাচ-ঘরে ঢুকে ক্রমে ক্রমে খুসিতে ডগমগ হয়ে তারা নাচতে, গাইতে ও বড়দিনের নানা খেলা খেলতে শুরু করে দিল। একটু পরেই তাদের চিনতে পেরে কাউন্টেস বসার ঘরে চলে গেল। কাউন্ট সেখানে বসে থেকেই অভিনেতাদের বাহবা দিতে লাগল। অল্পবয়সীরা ততক্ষণ উধাও হয়ে গেছে।

আধ ঘণ্টা পরে অন্য বহুরূপীদের সঙ্গে নাচ-ঘরে ঢুকল ঝোলানো ঘাঘরা-পড়া এক বৃদ্ধা মহিলা—সে নিকলাস। পেত্‌য়া সেজেছে তুর্কী মেয়ে। ডিমলার সেজেছে ভাঁড়। নাতাশা সেজেছে হুজার আর পোড়া কর্কের গোঁফ ও ভুরু লাগিয়ে সোনিয়া সেজেছে সির্কাসীয় যুবক।

যারা কিছু সাজে নি তাদের বিস্মিত হতে দেখে, তারা চিনতে না পারায় এবং নানাভাবে প্রশংসা করায় অল্পবয়সীরা ভাবল যে তাদের সাজসজ্জা খুব ভাল হয়েছে, আর তাই অন্যত্রও সেটা দেখানো দরকার।

তখন রাস্তাঘাটের অবস্থা খুব ভাল ; তাই নিকলাস প্রস্তাব করল, আধা-ডজন ভূমিদাস-বহুরূপীদের সঙ্গে তাদের সব্বাইকে ত্রয়কায় চাপিয়ে খুড়োর বাড়িতে নিয়ে যাবে।

কাউণ্টেস বলল, "না, বুড়ো মানুষটিকে কেন বিরক্ত করবে ? তাছাড়া, সেখানে চলাফেরা করার মত যথেষ্ট জায়গাও তোমরা পাবে না। যদি যেতেই হয় তো মেলিয়ুকভদের বাড়িতে যাও।"

মেলিয়ুকভ বিধবা ; পরিবারের লোকজন ও তাদের শিক্ষক ও গভর্ণেসদের নিয়ে রস্তভদের বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরে বাস করে।

"তুমি ঠিক বলেছ গো," বুড়ো কাউণ্ট সুরে সুর মেলাল। "আমি এখনই পোশাক পরে আসছি। ওদের সঙ্গেই যাব। পাশেৎ-এর চোখ খুলে দিয়ে আসব।"

কিন্তু কাউণ্টেস তার যাওয়ায় বাধা দিল ; গত তিনদিন যাবৎ তার পায়ের ব্যথা চলছে। স্থির হল, কাউণ্টের যাওয়া হবে না, আর লুইসা আইভানভ্না (মাদাম শোস) তাদের সঙ্গে গেলে তবেই ছোট মেয়েরা মেলিয়ুকভদের বাড়ি যেতে পারবে। সোনিয়াও লুইসা আইভানভ্নাকে ধরে বসল, সে যেন যেতে আপত্তি না করে।

সোনিয়ার সাজটাই হয়েছে সবচাইতে ভাল। তার গোঁফ ও ভুরু অসম্ভব মানিয়েছে। সকলেই বলছে, তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে ; ফলে তার মেজাজও বেশ হাসিখুশি হয়ে উঠেছে।

লুইসা আইভান্ভনা যেতে রাজী হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছোট-বড় ঘণ্টা ঝোলানো চারখানার ত্রয়কা-স্লেজ লোকজনসহ ফটকে এসে হাজির হল।

চারখানার মধ্যে দুখানা ত্রয়কা বাড়ির সাধারণ স্লেজ ; তৃতীয়খানা বুড়ো কাউণ্টের নিজস্ব গাড়ি ; আর চতুর্থখানা নিকলাসের নিজের গাড়ি। নাতাশা, সোনিয়া, মাদাম শোস ও দুটি দাসী উঠল নিকলাসের স্লেজে ; ডিমলার, তার বৌ, ও পেত্য়া উঠল বুড়ো কাউণ্টের স্লেজে, আর বাকি বহুরূপীরা অপর দুটি স্লেজে চেপে বসল।

"তুমি এগিয়ে যাও জাখার!" নিকলাস বাবার কোচয়ানকে চেঁচিয়ে বলল ; তার ইচ্ছা, পিছন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে মেরে বেরিয়ে যাবে।

চারটে স্লেজে ব্যাং-ব্যাং শব্দে বরফের উপর দিয়ে ছুটে চলল।

"একটা খরগোসের চলার পথ, অনেক পথের দাগ!" তুষার-ভেজা বাতাসে নাতাশার গলা ভেসে এল।

"কী চমৎকার আলো, নিকলাস!" সোনিয়ার গলা শোনা গেল।

নিকলাস মুখ ঘুরিয়ে সোনিয়ার দিকে তাকাল ; তার মুখটা আরও ভাল করে দেখবার জন্য মাথাটা নীচু করল। কালো ভুরু ও গোঁফে একখানি নতুন মিষ্টি মুখ যেন চাঁদের আলোয় তার দিকে তাকাল—এত কাছে, অথচ

এত দূরে।

"এই তো সোনিয়া," নিকলাস তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

"কি দেখছ নিকলাস?"

"কিছু না," বলেই নিকলাস আবার ঘোড়ার দিকে মুখ ফেরাল।

নিকলাস প্রথম স্লেজটাকে ধরে ফেলল। পাহাড়ের উৎড়াই বেয়ে নামতে নামতে তারা নদীর ধারে মাঠের ভিতরে একা চওড়া পায়ে-চলা পথে এসে পড়ল।

মনে মনে বলল, "আমরা কোথায় এসেছি? মনে হচ্ছে এটাই কসর মাঠ। কিন্তু না—এটা তো নতুন জায়গা; এটাকে তো আগে কখনও দেখি নি। এটা কসর মাঠ নয়, দেম্‌কিন পাহাড়ও নয়; ঈশ্বরই শুধু জানেন এটা কি! এটা নতুন এবং মনোমুগ্ধকর। যাকগে, যা হয় হোক…"ঘোড়াগুলোর উদ্দেশে হাঁক দিয়ে সে প্রথম স্লেজটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে জাখার মুখ ফেরাল; সাদা বরফে তার ভুরু পর্যন্ত ঢেকে গেছে।

নিকলাস লাগামে ঢিল দিতেই জাখারও হাত বাড়িয়ে গলায় একটা শব্দ করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

চেঁচিয়ে বলল, "এবার তাকিয়ে দেখুন মনিব!"

দুটো ত্রয়কা পাশাপাশি থেকে আরও দ্রুত ছুটতে লাগল। নিকলাস একটু এগিয়ে যাচ্ছে।

লাগামশুদ্ধ একটা হাত তুলে জাখার বলল, "না, আপনি পারবেন না মনিব!"

নিকলাস সবগুলো ঘোড়াকে জোর কদমে ছুটিয়ে জাখারকে ছাড়িয়ে গেল। ঘোড়ার পা থেকে ছিটকেআসা বরফের টুকরো যাত্রীদের মুখেচোখে লাগতে লাগল।

পুনরায় ঘোড়ার গতি সংযত করে নিকলাস চারদিকে তাকাল। তারকাখচিত আকাশের নীচে জ্যোৎস্নাবিধৌত রহস্যময় প্রান্তর চারদিকে প্রসারিত।

নিকলাস ভাবল, "জাখার বলছে বাঁদিকে যেতে, কিন্তু বাঁদিকে কেন? আমরা কি মেলিয়ুকভদের বাড়ির কাছে এসে গেছি? এটাই কি মেলিয়ুকভ্‌কা? ঈশ্বরই জানেন আমরা কোথায় চলেছি, ঈশ্বরই জানেন আমাদের কপালে কি আছে, —কিন্তু যাই হোক না কেন জায়গাটা বড় সুন্দর।" মুখ ঘুরিয়ে সে স্লেজের ভিতরে চোখ ফেরাল।

সুন্দর ভুরু ও গোঁফওয়ালা অপরিচিত লোকটি বলে উঠল, "দেখ, দেখ, ওর গোঁফ ও চোখের পাতা সব একেবারে সাদা হয়ে গেছে!"

নিকলাস ভাবল, "মনে হচ্ছে এই নাতাশা, আর উনি মাদাম শোস্‌, কিংবা তা নাও হতে পারে; আর এই গোঁফওয়ালা সিরকাসীয় যুবকটিকে আমি

চিনি না, কিন্তু ভালবাসি।"

"তোমাদের ঠাণ্ডা লাগছে না তো?" সে প্রশ্ন করল।

কেউ জবাব দিল না; হাসতে লাগল। পিছনের স্লেজ থেকে ডিম্‌লার কিছু একটা বলল—হয় তো কোন মজার কথা—কিন্তু তারা কেউ সেকথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারল না।

কয়েকজন হেসে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক!"

নিকলাস ভাবছে, "এ তো দেখছি এক রূপকথার অরণ্য; কালো কালো ছায়ারা চলাফেরা করছে, হীরাগুলি ঝিকমিক করছে, শ্বেত পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে; রূপকথার বাড়িতে রূপোর ছাদ, আর কতরকম জন্তুর কর্কশ ডাক। আর এটা যদি সত্যি মেলিয়ুকভা হয় তাহলে তো কাহা কাহা মুল্লুক ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমরা মেলিয়ুভাতেই পৌঁছে গেছি।"

জায়গাটা সত্যি মেলিয়ুকভা; দাস-দাসীরা হাসিমুখে মোমবাতি হাতে নিয়ে ফটকে দাঁড়িয়েছে।

"এরা কারা?" কে একজন শুধাল।

"কাউণ্টের বাড়ি থেকে বহুরূপীরা এসেছে। ঘোড়া দেখেই আমি চিনতে পেরেছি," কে একজন জবাব দিল

অধ্যায়—১১

পেলাগেয়া দানিলভ্‌না মেলিয়ুকভা বেশ শক্তসমর্থ কর্মক্ষম মহিলা; চোখে চশমা। একটা ঢিলে পোশাক পরে মেয়েদের নিয়ে বাইরের ঘরে বসে ছিল। মেয়েরা চুপচাপ বসে মোম গলিয়ে বরফের উপর ফোঁটা ফেলছিল এবং দেয়ালের উপর তার ছায়াগুলি দেখছিল। এমন সময় বারান্দায় নবাগতদের পায়ের শব্দ ও গলার স্বর তাদের কানে এল।

অশ্বারোহী, মহিলা, ডাইনি, ভাঁড় ও ভালুকের দল মুখ থেকে বরফের টুকরো ঝেড়ে ফেলে গলা খাঁকারি দিয়ে বসার ঘরে ঢুকল। তাড়াতাড়ি সবগুলো মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল। ভাঁড়—ডিম্‌লার—একটি মহিলা—নিকলাস—সকলেই নাচতে শুরু করে দিল। ছোট ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি শুরু করে দিল; বহুরূপীরা মুখ ঢেকে, গলার স্বর পাল্টে ফেলে গৃহকর্ত্রীকে অভিবাদন জানাতে জানাতে যার যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কী ব্যাপার! কাউকে যে চিনতেই পারা যাচ্ছে না! আরে নাতাশা! দেখ, ওকে যেন কার মত দেখাচ্ছে! সত্যি, ওকে দেখে আমার যেন কার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু হের হিমলার—ইনিও ভাল সেজেছেন! আমি একে চিনি না! আর কী সুন্দর নাচছেন! আরে, এ যে এক সিরকাসীয় যুবক। সত্যি, সোনিয়াকে কী সুন্দর মানিয়েছে। আর ও কে? খুব আনন্দ দিলে আমাদের! নিকিতা ও ভানিয়া—টেবিলটা পরিষ্কার করে

ফেল। আরে, আমরা এত চুপচাপ কেন? হা, হা, হা!...হুজার, হুজার! ঠিক যেন একটি ছেলে। আর পাগুলি!...আমি তো তার দিকে তাকাতেই পারছি না..." নানাজনে নানা মন্তব্য করতে লাগল।

যুবক মেলিয়ুকভের প্রিয়জন নাতাশা সকলকে নিয়ে পিছনের ঘরে চলে গেল। সেখানে নানারকম ড্রেসিং-গাউন ও পুরুষের পোশাক আনা হল। দশ মিনিট পরে মেলিয়ুকভ পরিবারের ছেলেমেয়েরাও এসে বহুরূপীদের দলে যোগ দিল।

অতিথিদের জন্য ঘরগুলো পরিষ্কার করে দেবার এবং সকলের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা করার হুকুম দিয়ে পেলাগেয়া দানিলভ্‌না চশমা না খুলেই বহুরূপীদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল; চাপা হাসির সঙ্গে তাদের মুখের উপর তীক্ষ্ণ নজর দিয়েও তাদের কাউকেই চিনতে পারল না। শুধু যে ডিমলার ও রস্তভদের চিনতে পারল না তাই নয়, নিজের মেয়েদের এবং পরলোকগত স্বামীর ড্রেসিং-গাউন ও সামরিক পরিচ্ছদ পর্যন্ত চিনতে পারল না।

একটি মেয়ে কাজান—তাতারের সাজে সেজেছে; তার মুখের দিকে নজর করে মহিলা গভর্নেসকে শুধাল, "এটি কে? আমার তো মনে হয় রস্তভদের বাড়ির কেউ হবে! আচ্ছা, মিঃ হুজার, তুমি কোন্‌ রেজিমেণ্টে আছ?" সে নাতাশাকে শুধাল। খাদ্যপরিবেশনরত খানসামাকে বলল, "এখানে, এই তুর্কীকে খানিকটা ফলের জেলি দাও। ওদের আইনে ওটা নিষিদ্ধ নয়।"

তারপর হাসতে হাসতে বলল, "আমার ছোট্ট সাশা! সাশাকে দেখ!"

রুশ পল্লী-নৃত্য ও সমবেত নৃত্যের পরে পেলাগেয়া দানিলভ্‌না ভূমিদাস ও ভদ্রজনদের একসঙ্গে গোল করে দাঁড় করিয়ে দিল: একটা চাকা, একটুকরো দড়ি ও একটা রৌপ্য রুবল আনিয়ে দেবার পরে সকলে একসঙ্গে খেলা শুরু করল।

এক ঘণ্টার মধ্যেই সাজপোশাকগুলি এলোমেলো হয়ে পড়ল, পোড়া কর্ক লাগানো ভুরু ও গোঁফ ঘামে গলে যেতে লাগল। তখন পেলাগেয়া দানিলভ্‌না বহুরূপীদের চিনতে পারল, তাদের বহুরূপী সাজার কৌশলের প্রশংসা করল, এবং এমন সুন্দরভাবে সকলকে আনন্দ দেবার জন্য ধন্যবাদ জানাল। অতিথিদের বসার ঘরে নৈশ-ভোজে আমন্ত্রণ করা হল, আর ভূমিদাসদের খাবার দেওয়া হল নাচ-ঘরে।

খাবার সময় মেলিয়ুকভদের এক বুড়ি দাসী বলল, "জনশূন্য স্নান-ঘরে কারও ভাগ্য বলে দেওয়াটা খুব ভয়ের ব্যাপার।"

মেলিয়ুভকদের বড় মেয়ে শুধাল, "কেন?"

"তোমরা যেতেই চাইবে না, খুব সাহস থাকা দরকার..."

"আমি যাব," সোনিয়া বলল।

মেজ মেয়ে বলল, "সেই তরুণীটির কি হল তা বল।"

⁂

দাসী বলতে লাগল, "একবার এক তরুণী বাইরে গিয়ে একটা মোরগ ধরে এনে দুজনের মত একটা টেবিল পেতে বসে পড়ল। কিছুক্ষণ বসে থাকার পরে হঠাৎ সে শুনতে পেল কে যেন আসছে…ঘণ্টার শব্দ করতে করতে একটা স্লেজ এসে দাঁড়াল; একজনের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। ঠিক পুরুষের আকৃতিতে, ঠিক একজন অফিসারের মত সে ভিতরে এল—ভিতরে এসে টেবিলে বসল।"

ভয়ে চোখ গোল-গোল করে নাতাশা চেঁচিয়ে উঠল, "আ! আ!"

"সত্যি? কেমন করে…সে কি কথা বলল?"

"হ্যাঁ, ঠিক মানুষের মত। সব ঠিকঠাক চলতে লাগল; লোকটি তাকে প্রভাবিত করতে লাগল; তরুণীটির উচিত ছিল মোরগ ডাকা পর্যন্ত লোকটিকে দিয়ে কথা বলানো, কিন্তু সে ভয় পেয়ে গেল, ভয় পেয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল। আর তখনি সে তরুণীটিকে জড়িয়ে ধরল। ভাগ্য ভাল ঠিক সেই সময় দাসীরা সব ছুটে এল…"

পেলাগেয়া দানিলভ্‌না বলল, "কেন ওদের ভয় দেখাচ্ছ?"

মেয়ে বলল, "মামণি, তুমিও তো ভাগ্য জানবার চেষ্টা করেছ…"

সোনিয়া শুধাল, "আচ্ছা, গোলাবাড়িতে এ কাজটা কিভাবে করা হয়?"

"এই ধর না, তুমি গোলাবাড়িতে গিয়ে কান পাতলে। তুমি কি শুনতে পাও তার উপরেই সবকিছু নির্ভর করে; হাতুড়ির শব্দ ও দরজায় ধাক্কার শব্দ যদি শোন—সেটা খারাপ; ফসল চালার শব্দ শোনাটা ভাল; অনেকসময় তাও শোনা যায়।"

"মামণি, গোলাবাড়িতে তোমার কি ঘটেছিল আমাদের বল।"

পেলাগেয়া দানিলভ্‌না হাসল।

"আরে, সেসব ভুলেই গেছি। …কিন্তু তোমরা কেউ সেখানে যাবে না তো?"

"হ্যাঁ, আমি যাব পেলাগেয়া দানিলভ্‌না। আমাকে যেতে দিন। আমি যাব।" সোনিয়া বলল।

"বেশ তো, তুমি যদি ভয় না পাও…"

"লুইসা আইভানভ্‌না, আমিও যেতে পারি কি?" সোনিয়া শুধাল।

খেলা-ধূলা যখন যাই চলতে থাকুক, নিকলাস কিন্তু সোনিয়ার সঙ্গ ছাড়ল না; একটা নতুন চোখে তাকে দেখতে লাগল। তার মনে হল, পোড়া কর্কের গোঁফকে ধন্যবাদ, এই প্রথম সে সোনিয়াকে পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে। সত্যি, সেদিন সন্ধ্যায় সোনিয়াকে যত উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও সুন্দরী দেখাচ্ছিল তেমনটি নিকলাস আগে কখনও দেখে নি।

সোনিয়ার চোখ দুটি ঝল্‌মল্ করছে, গোঁফের নীচে ঠোঁট দুটির উচ্ছ্বসিত হাসির ফলে দুই গালে টোল পড়েছে; এমন হাসি সে আগে কখনও দেখে

নি। তারদিকে তাকিয়ে নিকলাস ভাবল, "এই তো তার আসল রূপ ; এতদিন আমি কী বোকাই ছিলাম!"

সোনিয়া বলল, "আমি কোন কিছুতেই ভয় পাই না। আমি কি এখনই যেতে পারি?" সে উঠে দাঁড়াল।

তারা বলে দিল, গোলাবাড়িটা কোথায়, কেমন করে তাকে কান পেতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, এবং একটা লোমের জোব্বা তার হাতে তুলে দিল। জোব্বাটা মাথা ও কাঁধের উপর ফেলে সে নিকলাসের দিকে তাকাল।

নিকলাস ভাবল, "আহা, মেয়েটি কত আপন! অথচ আজ পর্যন্ত আমি কী ধারণা নিয়েই না ছিলাম?"

গোলবাড়িতে যাবার জন্য সোনিয়া বারান্দায় গেল। নিকলাসও তাড়াতাড়ি সামনের ফটকে চলে গেল ; বলল, ঘরের মধ্যে বড়ই গরম লাগছে। ভিড়ের জন্য ঘরটা সত্যি গুমোট হয়ে উঠেছে।

বাইরে সেই একই শান্ত নিস্তব্ধতা, সেই একই চাঁদ, বুঝি বা আগের চাইতে উজ্জ্বলতর। আলো এত বেশী এবং তারার আলো পড়ে বরফ এত বেশী ঝিকমিক করছে যে আকাশের দিকে তাকাতে কারও ইচ্ছা করছে না ; সত্যিকারের তারাগুলো কারও চোখে পড়ছে না। আকাশ কালো ও বিষণ্ন, অথচ পৃথিবী আনন্দময়।

"আমি বোকা! বোকা! কিসের জন্য অপেক্ষা করে আছি?" নিকলাস ভাবল। ফটক থেকে বেরিয়ে একদৌড়ে বাড়িটা ঘুরে সে খিড়কির ফটকে চলে গেল। সে জানত, সোনিয়া এই পথেই যাবে।

খিড়কির ফটক থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার হাল্কা পায়ের শব্দ এল। একেবারে নীচের ধাপে বরফ জমেছিল ; তার উপর পা পড়ে মচ-মচ শব্দ হল। সে শুনতে পেল বুড়ি দাসীটা বলছে, "সোজা, সোজা পথ ধরে মিস। শুধু পিছন ফিরে তাকিও না।"

"আমি ভয় পাই নি," সোনিয়া জবাব দিল ; পায়ের হাল্কা জুতোর আওয়াজ তুলে সোনিয়া নিকলাসের দিকেই এগিয়ে আসছে।

সোনিয়ার শরীর জোব্বায় ঢাকা। মাত্র দু'পা দূর থেকে সে নিকলাসকে দেখতে পেল ; তারও মনে হল যে-নিকলাসকে সে চিনত, যাকে সব সময়ই একটু ভয় করত, এ সে নিকলাস নয়। তার পরনে মেয়েদের পোশাক, চুলে বেণী বাঁধা, মুখে ঈষৎ হাসি। সোনিয়ার কাছে এ সবই নতুন। সে দ্রুত নিকলাসের দিকে এগিয়ে গেল।

চাঁদের আলো পড়েছে সোনিয়ার সারা মুখে ; সে মুখ দেখে নিকলাস ভাবল, "সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অথচ সেই এক।" সোনিয়ার জোব্বার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে নিকলাস তাকে জড়িয়ে ধরল, কাছে টেনে নিল, তার ঠোঁটে চুমো খেল ; তার গোঁফে পোড়া কর্কের গন্ধ। সোনিয়াও নিকলাসের ঠোঁট

ভরে চুমো খেল, ছোট হাত দুখানি বের করে নিকলাসের গালের উপর চেপে ধরল।

"সোনিয়া!"…"নিকলাস!"…তাদের মুখে শুধু এই দুটি নামই উচ্চারিত হল। তারা গোলাবাড়িতে ছুটে গেল, আবার ফিরে এল; একজন বাড়িতে ঢুকল সামনের ফটক দিয়ে, আর একজন ঢুকল খিড়কির ফটক দিয়ে।

অধ্যায়—১২

সবসময় সবকিছুর উপর নাতাশার নজর থাকে। তাই পেলাগেয়া দানিলভ্‌নার বাড়ি থেকে ফিরবার পথে ব্যবস্থা করল যে সে নিজে ও মাদাম শোস্‌ ফিরবে ডিমলারের সঙ্গে একটা স্লেজে, আর অন্য দাসীদের নিয়ে সোনিয়া ও নিকলাস ফিরবে অন্য স্লেজে।

ফিরবার সময় খুব জোরে না চালিয়ে নিকলাস ধীরেসুস্থে গাড়ি চালাতে লাগল, আর বার বার সেই সব-ভুলানো আশ্চর্য আলোয় সোনিয়ার মুখের দিকে তাকাতে লাগল এবং ভুরু ও গোঁফের অন্তরালবর্তী সেই সোনিয়াকে খুঁজতে লাগল যার কাছ থেকে আর কোন দিন সে দূরে সরে যাবে না বলে মনস্থির করে ফেলেছে। দেখতে দেখতে একসময় সে পুরনো ও নতুন দুই সোনিয়াকেই চিনতে পারল, এবং পোড়া কর্কের গন্ধে চুম্বনের পুলকানুভূতির কথা মনে পড়ায় তুষার-ভেজা বাতাসকে বুক ভরে টেনে নিল; পায়ের নীচের অপস্রিয়মান মাটি ও মাথার উপরকার ঝকমকে আকাশের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল আবার সে রূপকথার দেশে ফিরে এসেছে।

মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "সোনিয়া, তুমি ভাল আছ?"

"হ্যাঁ; আর তুমি?" সোনিয়া শুধাল।

বাড়ির অর্ধেক পথে পৌঁছে লাগামটা কোচয়ানের হাতে দিয়ে নিকলাস একমুহূর্তের জন্য ছুটে গিয়ে নাতাশার স্লেজের পাশে দাঁড়াল।

ফরাসীতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "নাতাশা! তুমি কি জান যে সোনিয়ার ব্যাপারে আমি মনস্থির করে ফেলেছি!"

আনন্দে উল্লসিত হয়ে নাতাশা জানতে চাইল, "ওকে বলেছ কি?"

"আঃ, ওই গোঁফ ও ভুরুতে তোমাকে কিরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে! …নাতাশা—তুমি খুসি হয়েছ?"

"খুব, খুব খুসি হয়েছি! তোমাকে নিয়ে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। তোমাকে বলি নি, কিন্তু ওর সঙ্গে তুমি খারাপ ব্যবহার করছিলে। নিকলাস, কী অন্তর ওর! সোনিয়া সুখী নয়, অথচ আমি সুখী, এতে মাঝে মাঝে আমি খুব লজ্জা বোধ করতাম। এখন আমি কত খুসি হলাম! যাও, ওর কাছে ছুটে যাও।"

"না, একটু সবুর কর…আঃ, তোমাকে কী মজার দেখাচ্ছে!" নিকলাস

চেঁচিয়ে বলল; বোনের মুখে আজ সে এমনকিছু নতুন, অস্বাভাবিক ও আকর্ষণীয় দেখতে পেয়েছে যা আগে কখনও দেখে নি। "নাতাশা, এ যে যাদুর খেলা, তাই নয়?"

নাতাশা জবাব দিল, "হ্যাঁ। তুমি চমৎকার খেলা দেখিয়েছ।"

নিকলাস ভাবল, "এই মূর্তিতে ওকে যদি আগে দেখতে পেতাম তাহলে অনেক আগেই ওকে জিজ্ঞাসা করতাম আমার কি করা উচিত, আর ও যা বলত আমি তাই করতাম; তাতে সকলেরই ভাল হত।"

"তাহলে তুমি খুসি হয়েছ? আমি ঠিক কাজই করেছি?"

"একেবারে ঠিক! কিছুদিন আগে এ নিয়ে মামণির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। মামণি বলেছিল, ও তোমাকে খেলাচ্ছে। মামণি যে কেমন করে একথা বলতে পারল! আমি তো মামণির উপর রাগে একেবারে ফেটে পড়েছিলাম। সোনিয়ার সম্পর্কে কেউ খারাপ কিছু বললে আমি তা সহ্য করব না, কারণ ওর মধ্যে খারাপ কিছুই নেই।"

"তাহলে তো সব ঠিকই হয়েছে?" এই বলে সে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। তার পায়ের নীচে বরফ মচ-মচ করে উঠল। একদৌড়ে স্লেজে গিয়ে উঠল। সির্কাসীয় যুবকটি গোঁফ নাচিয়ে তেমনই হাসছে; ওড়নার নীচ থেকে চোখ দুটো তেমনই জ্বলছে; ঐ সির্কাসীয় যুবকই তো সোনিয়া, আর ওই সোনিয়াই তো তার সুখী ও প্রেমময়ী ভাবী স্ত্রী।

বাড়িতে পৌঁছে মেলিয়ুকভদের বাড়িতে কিরকম কাটিয়েছে সেকথা মাকে বলে মেয়েরা তাদের শোবার ঘরে চলে গেল। পোশাক খুলল, কিন্তু কর্কের গোঁফ তখনই ধুয়ে ফেলল না; বসে বসে অনেকক্ষণ ধরে নিজেদের সুখের কথাই বলতে লাগল। বিয়ের পরে তারা কিভাবে চলবে, তাদের স্বামীদের মধ্যে কিরকম বন্ধুত্ব হবে, তারা কত সুখী হবে—তাই নিয়েই যত কথা। নাতাশার টেবিলে দুটো আয়না রাখা ছিল; দুনিয়াশা আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

আয়নার কাছে যেতে যেতে নাতাশা বলল, "সেদিন যে কবে আসবে? আমার তো ভয় হয় কোনদিন আসবে না···এত ভাল কি সইবে!"

"বসে পড় নাতাশা; হয় তো তাকেই দেখতে পাবে," সোনিয়া বলল।

আয়নার প্রত্যেক দিকে একটা করে মোমবাতি জ্বালিয়ে নাতাশা সেটার সামনে বসল।

নিজের মুখটা দেখতে পেয়ে বলল, "আমি তো গোঁফওয়ালা একজনকে দেখছি।"

দুনিয়াশা বলল, "হেসো না মিস।"

অনেকরকম করে তাকিয়েও কিছু না দেখতে পেয়ে নাতাশা চোখ মিট মিট করে আয়নার কাছ থেকে সরে গেল।

বলল, "অন্যরা দেখতে পায়, অথচ আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ? তুমি বস তো সোনিয়া। আজ রাতে তোমাকে বসতেই হবে! অন্তত আমার খাতিরে⋯আজ আমার বড় ভয় করছে!"

সোনিয়া আয়নার সামনে গিয়ে বসল; ঠিক জায়গামত বসে তাকাতে লাগল।

দুনিয়াশা ফিসফিসিয়ে বলল, "এবার মিস সোনিয়া নিশ্চয় কিছু দেখতে পাবে। আর তুমি তো খালি হাসতেই পার।"

সোনিয়া এ কথাটা শুনতে পেল। নাতাশার ফিসফিস কথাও তার কানে এল:

"আমি জানি সে দেখতে পাবে। গতবছরও সে কিছু দেখেছিল।"

প্রায় তিন মিনিট সকলেই চুপচাপ।

"ও নিশ্চয় দেখতে পাবে!" নাতাশা ফিসফিস্ করে বলল, কিন্তু কথা শেষ করতে পারল না⋯সহসা হাতের আয়নাটা সরিয়ে রেখে সোনিয়া দুই হাতে চোখ ঢেকে ফেলল।

"ওঃ, নাতাশা!" সে কেঁদে ফেলল।

আয়নাটা তুলে নিয়ে নাতাশা বলে উঠল, "দেখতে পেয়েছ? দেখতে পেয়েছ? কি দেখলে?"

সোনিয়া কিছুই দেখতে পায় নি। সেও চোখ মিটমিট করতে চাইল, কিন্তু দুনিয়াশা বা নাতাশা কাউকেই সে হতাশ করতে চায় নি, অথচ এভাবে চুপচাপ বসে থাকাও শক্ত। চোখ দুটো ঢাকবার সময় কেন যে সে চেঁচিয়ে ওঠে নি তা সে নিজেই জানে না।

তার হাতটা চেপে ধরে নাতাশা শুধাল, "তাকে দেখেছ?"

"হ্যা, একটু সবুর কর⋯আমি⋯তাকে দেখেছি," সোনিয়া কথাটা না বলে পারল না, যদিও "তাকে" বলতে নাতাশা কাকে বুঝিয়েছে—নিকলাসকে, না প্রিন্স আন্দ্রুকে—তাও সে এখনও জানে না।

"কিন্তু কেন আমি বলব না যে কিছু দেখেছি? অন্যরা তো দেখতে পায়! তাছাড়া, আমি কিছু দেখেছি কি দেখি নি তাই বা কে বলতে পারে?" এই সব কথাই সোনিয়ার মনের সামনে ভাসতে লাগল।

"হ্যা, আমি তাকে দেখেছি," সোনিয়া বলল।

"কেমন দেখলে? বসা, না শোয়া?"

"না, আমি দেখলাম⋯প্রথমে কিছুই দেখতে পেলাম না, তারপর দেখলাম সে শুয়ে আছে।"

"আন্দ্রু শুয়ে আছে? সে কি অসুস্থ?" ভয়ার্ত দুটি চোখ বন্ধুর মুখের উপর রেখে নাতাশা শুধাল।

"না, না, ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো! তার মুখটা প্রফুল্ল, আমার দিকে

ফিরে তাকাল।" কথাগুলো বলতে গিয়ে তার কেমন যেন মনে হল সে যা বলছে সত্যি সত্যি তাই দেখেছে।

"তারপর সোনিয়া ?…"

"তারপর কি যে দেখলাম বুঝতেই পারলাম না ; কিছু নীল, লাল…"

"সোনিয়া। সে কবে ফিরে আসবে ? কবে তাকে দেখতে পাব ! হে ঈশ্বর, তাকে নিয়ে, আমাকে নিয়ে, সবকিছু নিয়েই যে আমার ভয়ের অন্ত নেই !…" নাতাশা বলতে লাগল ; সোনিয়ার সান্ত্বনার কথার কোন জবাব না দিয়ে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল ; মোমবাতিটা নিভিয়ে দেবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপচাপ শুয়ে থেকে তুষার-ঢাকা জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে চাঁদের আলোর দিকে খোলা চোখে তাকিয়ে রইল।

অধ্যায়—১৩

বড়দিনের ছুটির কিছুদিন পরেই সোনিয়ার প্রতি তার ভালবাসা এবং তাকে বিয়ে করার দৃঢ়সংকল্পের কথা নিকলাস মাকে জানাল। কাউণ্টেস অনেকদিন ধরেই তাদের ব্যাপার লক্ষ্য করেছে এবং এইরকম একটা ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করেই ছিল ; সে ছেলেকে জানিয়ে দিল, যাকে খুসি সে বিয়ে করতে পারে, তবে সে নিজে বা নিকলাসের বাবা এ বিয়েতে আশীর্বাদ জানাবে না। প্রথমে নিকলাসের মনে হল মা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে এবং তাকে যত ভালই বাসুক কিছুতেই নিজের মত পাল্টাবে না। অত্যন্ত নির্বিকারভাবে ছেলের দিকে একবারও না তাকিয়ে সে স্বামীকে ডেকে পাঠাল এবং স্বামী এলে ছেলের সামনেই সবকথা তাকে সংক্ষেপে বলতে চেষ্টা করল ; কিন্তু নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে বিরক্তিতে কেঁদে ফেলে ঘর থেকে চলে গেল। বুড়ো কাউণ্ট নিকলাসকে বকুনি দিয়ে এই সংকল্প ত্যাগ করতে বলল। নিকলাস জবাবে জানাল, সে কথার খেলাপ করতে পারবে না ; তখন বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল ; তারপর কাউণ্টেসের কাছে চলে গেল। ছেলের সঙ্গে যখনই কোন বাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয় তখনই বুড়ো কাউণ্ট নিজের দোষ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, কারণ তার হাতেই তো পারিবারিক সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, কাজেই একটি ধনী কন্যাকে বিয়ে না করে ছেলে যদি যৌতুকহীনা সোনিয়াকে পছন্দ করে তো সেজন্য তার প্রতি সে রাগ করতে পারে না। এক্ষেত্রে তো কাউণ্ট আরও বেশী সচেতন যে তার বৈষয়িক অবস্থায় এই গোলযোগ দেখা না দিলে নিকলাসের জন্য সোনিয়ার চাইতে ভাল মেয়ের কথা তো তারা ভাবতই না, আর পরিবারের অর্থনৈতিক দুর্গতির জন্য তো সে নিজেই দায়ী।

বাবা-মা কেউই আর এ নিয়ে ছেলের সঙ্গে কোন কথা বলল না ; কিন্তু কয়েকদিন পরেই কাউণ্টেস সোনিয়াকে ডেকে পাঠাল এবং অত্যন্ত

অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই বলে তাকে বকতে লাগল যে সোনিয়াই নিকলাসকে ধরবার জন্য জাল পেতেছে, পরিবারের প্রতি সে অকৃতজ্ঞ। সোনিয়া নীরবে আনত চোখে কাউণ্টেসের নিষ্ঠুর কথাগুলি শুনল, কিন্তু সে যে কি করবে তা বুঝে উঠতে পারল না। যারা তার উপকার করেছে তাদের জন্য সবকিছু ছাড়তে সে প্রস্তুত। আত্মত্যাগই তো তার চিরদিনের আদর্শ; কিন্তু এক্ষেত্রে সে বুঝতে পারছে না কি ত্যাগ করবে, কার জন্য ত্যাগ করবে। কাউণ্টেসকে, গোটা রস্তভ পরিবারকে সে ভাল না বেসে পারে না, আবার নিকলাসকে ভাল না বেসেও তো তার উপায় নেই; সে তো জানে এই ভালবাসার উপরেই নির্ভর করছে নিকলাসের সব সুখ। বিষণ্ণ চিত্তে সে চুপ করে রইল, কথা বলল না। এই অসহ্য অবস্থার একটা বোঝাপড়া করতে নিকলাস মার সঙ্গে দেখা করতে গেল। প্রথমে তাকে ও সোনিয়াকে ক্ষমা করে এ বিয়েতে সম্মতি জানাতে অনুরোধ করল, তারপর ভয় দেখিয়ে বলল, মা যদি সোনিয়ার উপর অত্যাচার করে তাহলে সে এক্ষুণি গোপনে সোনিয়াকে বিয়ে করবে।

কাউণ্টেস নির্বিকার গলায় বলল, তার বয়স হয়েছে, প্রিন্স আন্দ্রু যেমন বাবার মত ছাড়াই বিয়ে করছে তেমনই সে-ও তাই করতে পারে, কিন্তু কাউণ্টেস কখনও সেই ষড়যন্ত্রকারিণীকে মেয়ে বলে গ্রহণ করবে না।

"ষড়যন্ত্রকারিণী" কথাটা শুনেই নিকলাস রাগে ফেটে পড়ল; গলা চড়িয়ে বলল, সে কখনও ভাবতে পারে নি যে মা তাকে ভালবাসা বিক্রি করতে বাধ্য করবে, আর তাই যদি হয় তাহলে এই শেষবারের মত সে বলে দিচ্ছে …কিন্তু তার মুখের যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য মা সভয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, যার স্মৃতি চিরদিনের মত দুজনের কাছেই এক নিষ্ঠুর স্মৃতি হয়ে থাকত, সে-কথা বলার সময় তার হল না। সময় হল না তার কারণ বিবর্ণ কঠিন মুখে নাতাশা ঘরে ঢুকল। দরজায় দাঁড়িয়ে সে সবই শুনেছে।

"নিকলাস, তুমি বাজে বকছ! শান্ত হও, শান্ত হও, আমি বলছি শান্ত হও!"…নিকলাসের গলা ছাপিয়ে নাতাশা আর্তকণ্ঠে বলে উঠল।

মাকে বলল, "মামণি, লক্ষ্মীটি, ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়…মিষ্টি মামণি আমার।" মা বুঝতে পারছিল যে তারা বিচ্ছেদের একেবারে তীরে এসে দাঁড়িয়েছে; তাই সভয়ে সে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে; অথচ মনে মনে সেও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে কিছুতেই হার মানবে না।

নাতাশা বলল, "নিকলাস, পরে সব তোমাকে বুঝিয়ে বলব। এখন চলে যাও! শোন মামণি সোনা।"

নাতাশার কথাগুলি অসংলগ্ন হলেও তার উদ্দেশ্য সফল হল।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কাউণ্টেস মেয়ের বুকে মুখ লুকাল, আর নিকলাস মাথাটা চেপে ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নাতাশা একটা মিটমাটের চেষ্টায় লেগে গেল এবং এতটা পর্যন্ত করতে পারল যে, মা নিকলাসকে কথা দিল সোনিয়ার উপর কোনরকম অত্যাচার করা হবে না, আর নিকলাসও কথা দিল যে বাবা-মার অজ্ঞাতসারে সে কিছু করবে না।

রেজিমেণ্টে নিজের ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে নিয়ে সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করবে এবং বাড়ি ফিরে সোনিয়াকে বিয়ে করবে—এই দৃঢ়সংকল্প নিয়ে বাবা-মার সঙ্গে মতান্তরের জন্য দুঃখিত ও গম্ভীর চিত্তে নিকলাস জানুয়ারির গোড়ার দিকেই রেজিমেণ্টে যোগ দিতে চলে গেল।

নিকলাস চলে যাবার পর থেকে রস্তভ পরিবারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল; মানসিক উত্তেজনার ফলে কাউণ্টেস অসুস্থ হয়ে পড়ল।

নিকলাসের বিরহে সোনিয়ার মনে সুখ নেই; তার উপরে কাউণ্টেসের গলার স্বর তার ব্যাপারে মোটেই নরম হয় নি। বিষয়সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে কাউণ্ট আগের থেকেও বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছে; যাহোক একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। মস্কোর নিকটবর্তী শহরের বাড়ি ও সম্পত্তি বেচে দেওয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছে, আর সেজন্য তাদের মস্কো যেতেই হবে। কিন্তু কাউণ্টেসের স্বাস্থ্যের জন্য দিনের পর দিন তাদের যাত্রা পিছিয়ে যেতে লাগল।

প্রথম দিকে বাকদত্ত স্বামীর বিরহকে নাতাশা কিছুটা হাল্কাভাবে হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিল, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে ততই সে উত্তেজিত ও অধৈর্য হয়ে উঠছে। জীবনের যে শ্রেষ্ঠ দিনগুলিকে সে স্বামীর ভালবাসায় কাটিয়ে দিতে পারত বৃথাই তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এই চিন্তাই তাকে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে। তার চিঠি পেলেও নাতাশা বিরক্ত হয়ে ওঠে। একথা ভাবতেও তার কষ্ট হয় যে সে যখন স্বামীর চিন্তাকে সম্বল করেই বেঁচে আছে তখন তার স্বামী সত্যিকারের জীবন কাটাচ্ছে, নতুন নতুন জায়গা দেখছে, নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে মিশছে। চিঠিগুলি যত বেশী মজাদার হয় ততই সে অধিকতর বিরক্তি বোধ করে। স্বামীর চিঠি তাকে সান্ত্বনা তো দেয়ই না, পরন্তু সেগুলিকে তার মনে হয় ক্লান্তিকর ও কৃত্রিম এক দায়ভাগ। সে চিঠিপত্রও লিখতে পারে না, কারণ কথায়, হাসিতে ও চাউনিতে যা সে প্রকাশ করতে পারে তার হাজার ভাগের একভাগও চিঠিতে প্রকাশ করার কথা সে কল্পনাই করতে পারে না। সে তাকে লেখে একঘেয়ে, শুকনো, প্রথামাফিক চিঠি; সে চিঠির উপর সে নিজেই কোন গুরুত্ব দেয় না; তার চিঠির খসড়াতে যেসব বানান ভুল থাকে কাউণ্টেসই সেগুলো শুধরে দেয়।

কাউণ্টেসের স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হল না, অথচ মস্কো যাত্রা আর পিছিয়ে দেওয়া চলে না। নাতাশার বিয়ের পোশাক তৈরি করতে দেওয়া হবে; বাড়িটাও বিক্রি করে দিতে হবে। তাছাড়া, বুড়ো প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি

মস্কোতেই শীতকালটা কাটাচ্ছে, কাজেই প্রিন্স আন্দ্রুরও সেখানেই থাকবার কথা; নাতাশার নিশ্চিত বিশ্বাস, এর মধ্যেই সে এসে গেছে।

কাজেই কাউণ্টেস দেশের বাড়িতে রয়ে গেল, আর সোনিয়া ও নাতাশাকে সঙ্গে নিয়ে জানুয়ারির শেষ দিকে কাউণ্ট মস্কো চলে গেল।

[সপ্তম পর্ব সমাপ্ত]

অষ্টম পর্ব

অধ্যায়—১

নাতাশার সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর বিয়ের কথা পাকা হবার পরেই পিয়েরর হঠাৎ যেন অকারণেই অনুভব করতে লাগল যে আগের মত জীবনযাপন করা একেবারেই অসম্ভব। উপকারী লোকটি তার কাছে যে সত্য প্রকাশ করেছে সে সম্পর্কে তার প্রত্যয় যথেষ্ট দৃঢ়, নিজের ভিতরকার মানুষটিকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গেই আত্মনিয়োগ করে সে সুখও পাচ্ছে—তথাপি আন্দ্রু ও নাতাশার বাক্‌দানের পর থেকেই সে জীবনের সব রস যেন শুকিয়ে গেছে; বিশেষ করে ঠিক সেইসময়ে যোসেফ আলেক্সীভিচ-এর মৃত্যু-সংবাদ তাকে আরও বিচলিত করে তুলেছে। এখন অবশিষ্ট রয়েছে জীবনের একটি কঙ্কাল মাত্র: নিজের বাড়ি, জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তির প্রণয়ভাজন সুন্দরী স্ত্রী, গোটা পিতার্সবুর্গের সঙ্গে পরিচয়, আর রাজ-দরবারের চাকরির একঘেয়ে গতানুগতিকতা। সহসা এ জীবন পিয়েরের কাছে অপ্রত্যাশিত রকমের ঘৃণ্য মনে হতে লাগল। সে দিনপঞ্জী রাখা ছেড়ে দিল, গুরুভাইদের কাছে যাওয়া বন্ধ করল, আবার ক্লাব-এ যেতে শুরু করল, প্রচুর মদ খেতে লাগল এবং অবিবাহিতদের দলে ভিড়ে এমন সব কাণ্ডকারখানা শুরু করে দিল যে কাউণ্টেস হেলেন তা নিয়ে কটু কথা শোনানো প্রয়োজন বোধ করল। পিয়ের বুঝল তার স্ত্রী ঠিকই বলেছে, আর তাই তার অসুবিধা না ঘটিয়ে মস্কোতে সরে পড়ল।

মস্কো পৌঁছে সে নিজেদের বিরাট বাড়িটাতে ঢুকল; ম্লান হতে ম্লানতর হয়ে যাওয়া প্রিন্সেসরা সখীদলবল নিয়ে তখনও সেখানে বাস করছে; শহরের ভিতর দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে যখন দেখতে পেল আইবেরীয় তীর্থে দেবমূর্তিগুলির সামনে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে, ক্রেমলিন স্কোয়ারের বরফ গাড়ির চাকায় ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে না, বা সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাঝক-এর (মস্কোর বস্তি-অঞ্চল) ভাঙা-চোরা বাড়িগুলো তার শান্তি বিঘ্নিত করছে না; যখন সে নতুন করে দেখল মস্কোর প্রাচীন মহিলাদের, দেখল মস্কোর বল-নাচ ও ইংলিশ ক্লাব, তখন যেন একটা নিরাপদ আশ্রয়ে এসে সে বড়ই আরাম বোধ করতে লাগল। মস্কোতে পৌঁছে সেই শান্তি ও আরাম সে পেল যা পাওয়া যায় একটা পুরনো ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে, যেটা একাধারে গরম ও নোংরা।

মস্কো সমাজের বৃদ্ধা থেকে ছেলেমেয়ে পর্যন্ত সকলেই পিয়েরকে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত অতিথি হিসাবেই স্বাগত জানাল। মস্কো সমাজের পক্ষে পিয়েরই

সবচাইতে সুন্দর, দয়ালু, বুদ্ধিমান, হাসিখুসি ও দিলখোলা মানুষ: প্রাচীন রুশ ভদ্রসমাজের প্রতিভূস্বরূপ। তার টাকার থলে সর্বদাই শূন্য থাকে, কারণ সেটা সকলের জন্যই খোলা।

জনকল্যাণমূলক অনুষ্ঠান, বাজে ছবি, মূর্তি, জনসেবক প্রতিষ্ঠান, জিপসিদের নাচ, বিদ্যালয়, চাঁদা তোলার ভোজসভা, কৌতুক-অনুষ্ঠান, ভ্রাতৃসংঘ, গির্জা, পুথিপত্র—কাউকে বা কোন কিছুকেই সে ফিরিয়ে দেয় না; দুটি বন্ধু যদি তার কাছ থেকে মোটা টাকা ধার করে তাকে নিজেদের হেপাজতে না রাখত তাহলে হয় তো সব টাকাই সে বিলিয়ে দিত। তাকে ছাড়া কোন ভোজসভা বা আমোদ-আহ্লাদ অনুষ্ঠিত হয় না। কি বিবাহিতা, কি অবিবাহিতা সব মহিলাই তাকে পছন্দ করে, কারণ কাউকে ভালবাসা না জানালেও সকলের প্রতিই সে সমান উদারতা দেখিয়ে থাকে, বিশেষ করে নৈশভোজনের পরে। সকলেই বলে, "সে কী মনোরম; তার কাছে নারী-পুরুষ ভেদ নেই।"

সাত বছর আগে সে যখন প্রথম বিদেশ থেকে এসেছিল তখন যদি তাকে বলা হত যে কোন কিছু খুঁজে বেরাবার অথবা কোন পরিকল্পনা করার কোন দরকারই তার নেই, চিরন্তন এক পূর্বনির্দিষ্ট পথ তার জন্য অনেক আগেই কাটা হয়ে আছে, শরীরটাকে যতই এদিক-ওদিক করুক না কেন, তাকেও অন্য সকলের মতই হতে হবে, তাহলে কী সন্ত্রস্তই না সে হত। সে-কথা সে বিশ্বাসই করতে পারত না! একসময় সে সর্বান্তঃকরণে রাশিয়াতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় নি; চায় নি নেপোলিয়ন হতে; একজন দার্শনিক ও কূটনীতিক হতে, এবং তারপরে নেপোলিনবিজয়ী হতে? সে কি একান্তমনে কামনা করে নি পাপী মানবজাতির পুনরভ্যুত্থান এবং নিজের জন্য পরিপূর্ণতা অর্জন? সে কি বিদ্যালয় ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে নি? তার ভূমিদাসদের মুক্তি দেয় নি?

কিন্তু সেসব কিছুর পরিবর্তে—আজ সে কি হয়েছে? এক অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর ধনী স্বামী, জনৈক অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রলোক, পানে ও ভোজনে বিলাসী, মস্কো ইংলিশ ক্লাবের একজন সদস্য, এবং মস্কো সমাজের একজন সর্বজনপ্রিয় মানুষ। সাত বছর আগে যেধরনের মানুষকে সে এত ঘৃণা করত আজ যে সে নিজেই মস্কোর সেই অবসরপ্রাপ্ত ভদ্রজনদের একজন হয়েছে এ-সত্যটাকে সে অনেকদিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারে নি।

কখনও কখনও এই বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিত যে মাত্র সাময়িকভাবেই সে এ জীবন কাটাচ্ছে; কিন্তু তার পরেই এখন তার মনে পড়ে যেত যে তারই মত আরও যারা এই জীবনযাত্রার পথে ও ইংলিশ ক্লাবে সাময়িকভাবে ঢুকেছিল সবগুলো দাঁত ও চুল নিয়ে, তারাই যখন এখান থেকে বিদায় নিয়েছে তখন কারও না ছিল একটা দাঁত, আর না ছিল একগুছি চুল।

যাইহোক, এনিয়ে গভীর হতাশা, বিষণ্ণতাবোধ ও জীবনবিতৃষ্ণায় না ভুগলেও আত্ম-অনুসন্ধিৎসার কতকগুলো প্রশ্ন নিয়তই তাকে বিব্রত করে। "কিসের জন্য? কেন? এ পৃথিবীতে কি সব চলছে?" দিনের মধ্যে অনেকবারই সে নিজেকে এই প্রশ্নগুলি করে এবং জীবনের তাৎপর্য নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করতে থাকে। কিন্তু অতীত অভিজ্ঞতা থেকে যখন বুঝতে পারে যে এসব প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া যাবে না, তখনই সেসব চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে একটা বই নিয়ে বসে, অথবা ক্লাবের দিকে পা চালিয়ে দেয়, অথবা শহরের নানা গুজব নিয়ে অ্যাপলোন নিকলায়েভিচের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে।

সে সবরকম সমাজে যাতায়াত করে, প্রচুর মদ খায়, ছবি কেনে, বাড়ি তৈরি করে এবং সবসময় পড়ে।

সে পড়ে, যা হাতে আসে তাই পড়ে। বাড়ি ফিরলে খানসামারা যখন তার পোশাক খুলতে থাকে তখনও সে একটা বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। পড়া শেষ করে ঘুমতে যায়, ঘুম থেকে উঠে ক্লাব-ঘরের গল্প-গুজবে মেতে ওঠে, গাল-গল্প শেষ করে মদ ও মেয়েমানুষ নিয়ে মেতে ওঠে; তারপর আবার মদ থেকে গাল-গল্প, পড়া। মদ্যপান ক্রমেই তার পক্ষে দৈহিক ও নৈতিক প্রয়োজন হয়ে উঠল। ডাক্তাররা যত সাবধান করছে, ততই তার মদ খাওয়া বাড়ছে।

সকালে যতক্ষণ পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে না ততক্ষণই পুরনো প্রশ্নগুলিকে মীমাংশার অতীত ও ভয়ংকর বলে মনে হয়; তখন পিয়ের তাড়াতাড়ি একটা বই টেনে নেয়; আর তখন কেউ দেখা করতে এলে খুসি হয়।

কখনও তার মনে পড়ে, কোথায় যেন শুনেছে যুদ্ধরত সৈন্যরা যখন শত্রুর গোলাবর্ষণের মুখে ট্রেঞ্চে আটকা পড়ে তখন কোন কিছু করার না থাকলে সেই বিপদকে সহ্য করতে একটা কাজ খুঁজে নিতে আপ্রাণ চেষ্টা করে। পিয়েরের মনে হয় সব মানুষই সেই সৈন্যদের মত, জীবন থেকে সরে এসে একটা আশ্রয় খোঁজে: কেউ উচ্চাকাংখায়, কেউ তাস খেলায়, কেউ আইন প্রণয়নে, কেউ মেয়েমানুষ, কেউ খেলায়, কেউ ঘোড়ায়, কেউ রাজনীতিতে, কেউ খেলাধূলায়, কেউ মদে, আর কেউ সরকারী কাজকর্মে। পিয়ের মনে করে, "কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়, সব সমান—শুধু যথাসম্ভব আত্মরক্ষা করে চলা। শুধু জীবনকে, সেই ভয়ংকর জীবনকে না দেখা!"

অধ্যায়—২

শীতের গোড়াতেই প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি ও তার মেয়ে মস্কোতে এল। সেসময়ে সম্রাট আলেক্সান্দারের রাজত্বের প্রতি উৎসাহে ভাঁটা পড়েছে, চারদিকে ফরাসীবিরোধী দেশপ্রেমের হাওয়া বইছে; তার সঙ্গে তার

অতীত ইতিহাস, বুদ্ধির প্রখরতা ও মৌলিকতা মিলিয়ে প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি মস্কোতে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং সরকারবিরোধী মস্কোপন্থীদের কেন্দ্রমণি হয়ে উঠল।

এক বছরেই প্রিন্স অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়া, সাম্প্রতিক ঘটনাকে ভুলে যাওয়া ও দূর অতীতের ঘটনাকে মনে রাখা, এবং শিশুসুলভ গর্বের সঙ্গে মস্কোর সরকারবিরোধী দলের প্রধানের ভূমিকা গ্রহণ করা—প্রভৃতি বার্ধক্যের সব লক্ষণই তার মধ্যে প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বৃদ্ধ লোকটি সকলেরই সশ্রদ্ধ অনুরাগের পাত্র হয়ে উঠল। বড় বড় আয়না, প্রাকবিপ্লব যুগের আসবাবপত্র ও সুসজ্জিত পরিচারকদলসহ এই সেকেলে প্রকাণ্ড বাড়ি, এবং মনোরমা কন্যা ও শ্রদ্ধাশীলা সুন্দরী ফরাসী নারীপরিবৃত এই কঠোরদর্শন তীক্ষ্ণবুদ্ধি বৃদ্ধ ভদ্রলোক (সে নিজেও বিগত শতাব্দীর এক ধ্বংসস্তূপ) সকলের চোখেই একটি মহৎ ও প্রীতিপ্রদ দর্শনীয় বস্তু হয়ে দেখা দিল। অতিথিরা একবারও ভাবত না, যে দুঘণ্টা কাল মাত্র তারা এই গৃহস্বামীটিকে দেখতে পেত, তার বাইরেও প্রতিদিন বাইশটি ঘণ্টা এ বাড়িতে আরও একটি ঘনিষ্ঠ পারিবারিক জীবনধারা বয়ে চলে।

সম্প্রতি সেই পারিবারিক জীবন প্রিন্সেস মারির পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বল্ড হিল্‌স্‌-এ থাকতে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে আলোচনায় ও সেখানকার নির্জনতায় তার মন বেশ তাজা থাকত; মস্কোতে এসে জীবনের সেই শ্রেষ্ঠ আনন্দ থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে; অথচ শহর-জীবনের কোন সুখ-সুবিধাই তার নেই। সে সমাজে যায় না; সকলেই জানে, নিজের সঙ্গে ছাড়া প্রিন্স মেয়েকে কোথাও যেতে দেবে না, আর নিজের ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্য প্রিন্সের পক্ষে বাইরে যাওয়াও সম্ভব নয়; কাজেই কেউই প্রিন্সেস মারিকে ডিনারে এবং সান্ধ্য মজলিসে আমন্ত্রণ করে না। বিয়ের আশাও সে ছেড়ে দিয়েছে। তার সম্ভাবিত পাণিপ্রার্থী যেসব যুবক মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসে তাদের প্রতি বুড়ো প্রিন্সের উদাসীনতা ও বিরূপ মনোভাব সে লক্ষ্য করেছে। তার কোন বান্ধবীও নেই; এবারকার মস্কো ভ্রমণে এসে দুটি ঘনিষ্ঠ বন্ধুই তাকে হতাশ করেছে। মাদময়জেল বুরিয়েঁকে এখন আর তার ভাল লাগে না, নানা কারণেই প্রিন্সেস মারি তাকে এড়িয়ে চলে। যে জুলির সঙ্গে গত পাঁচ বছর ধরে তার পত্রালাপ চলছিল মস্কোতে দেখা হবার পরে সেও কেমন যেন তার প্রতি বিরূপ হয়ে পড়েছে। ভাইদের মৃত্যুর ফলে জুলি এখন মস্কোর ধনবতী উত্তরাধিকারিণীদের শ্রেষ্ঠতমা; সে এখন উঁচু মহলের সুখের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সবসময়ই সে যুবকদলপরিবৃত হয়ে থাকে; তার নিজের ধারণা এই যুবকরা এতদিনে তার মূল্য বুঝতে শিখেছে। ফলে মস্কোতে প্রিন্সেস মারির কথা বলার মত কেউ নেই, চিঠি লিখবার মত কেউ নেই, দুঃখের কথা বলবার মতও কেউ নেই, আর ঠিক এই

সময়েই অনেক দুঃখ নেমে এল তার কপালে ; প্রিন্স আন্দ্রুর ফিরে আসা ও বিয়ের সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছে, কিন্তু সেজন্য বাবাকে প্রস্তুত রাখতে সে যে অনুরোধ জানিয়েছিল তা তো এখনও কার্যে পরিণত করা হয় নি ; বস্তুত অবস্থা খুবই নৈরাশ্যজনক, কারণ কাউণ্টেস রস্তভার কথা উঠলেই বুড়ো প্রিন্সেস একেবারে ক্ষেপে যায়। সম্প্রতি তার সঙ্গে আর একটা নতুন দুঃখ যোগ হয়েছে। ছয় বছর বয়সের ভাই-পোকে পড়াতে বসে সে সভয়ে লক্ষ্য করছে যে ছোট্ট নিকলাস সম্পর্কে তার মনেও তার নিজের বাবার খিটখিটে মেজাজের লক্ষণগুলি প্রকাশ পাচ্ছে। যতবারই সে মনে করে যে ভাই-পোকে পড়াবার সময় কিছুতেই মেজাজ খারাপ করবে না, ততবারই সবকিছু তাড়াতাড়ি শেখাবার উগ্র বাসনায় মেজাজ খারাপ করে বসে, ছেলেটির হাত ধরে তাকে ঘরের এককোণে বসিয়ে দেয়। কিন্তু প্রিন্সেস মারির সবচাইতে বেশী দুঃখ বাবার খিটখিটে মেজাজ নিয়ে। বুড়ো প্রিন্স চিরদিনই তার উপর চটা, কিন্তু সম্প্রতি সে মেজাজ যেন নিষ্ঠুরতার পর্যায়ে পৌঁচেছে। বাবা যদি সারা রাত তাকে মাটিতে শুইয়ে রাখত, তাকে মারধোর করত, তাকে দিয়ে জল ও কাঠ বইয়ে আনত, তাহলেও সে নিজের অবস্থাকে কষ্টকর মনে করত না ; কিন্তু এই স্বেচ্ছাচারী প্রিয়জনটি শুধু যে তাকে আঘাত করতে ও অপমান করতে জানে তাই নয়, প্রতিটি ব্যাপারে একমাত্র সেই যে দোষী সেটা সাব্যস্ত করতেও জানে। সম্প্রতি বাবার আচরণে এমন একটা লক্ষণ দেখা দিয়েছে যেটা প্রিন্সেস মারিকে সবচাইতে বেশী কষ্ট দিচ্ছে ; সেটা হচ্ছে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর সঙ্গে বাবার ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা। ছেলের বিয়ের অভিপ্রায় জানবার প্রথম মুহূর্তে যে ধারণাটা পরিহাসের সূত্রে তার মনে এসেছিল—অর্থাৎ আন্দ্রু যদি বিয়ে করে তাহলে সেও বুরিয়েঁকে বিয়ে করবে—সেই ধারণা যেন ক্রমেই সুখের মূর্তি ধরে তার কাছে দেখা দিচ্ছে ; সম্প্রতি বুড়ো প্রিন্স বুরিয়েঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে এবং বুরিয়েঁর প্রতি ভালবাসা দেখিয়ে যেন মেয়ের প্রতি অসন্তোষকেই প্রকাশ করতে চাইছে। অন্তত প্রিন্সেস মারির তাই ধারণা।

মস্কোতে একদিন প্রিন্সেস মারির সামনেই বুড়ো প্রিন্স মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর হাতে চুমো খেল এবং তাকে কাছে টেনে নিয়ে সাদরে আলিঙ্গণ করল। প্রিন্সেস মারির মুখ লাল হয়ে উঠল ; সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কয়েক মিনিট পরে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ হাসতে হাসতে প্রিন্সেস মারির ঘরে ঢুকে সুললিত স্বরে মজার মজার কথা বলতে লাগল। প্রিন্সেস মারি অতিক্রুত চোখের জল মুছে ফেলল, কি করছে না বুঝেই ভাঙা গলায় তারস্বরে চীৎকার করে উঠল : তার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে…কী সাংঘাতিক, নীচ, অমানুষিক"…"সেকথা শেষ করতে পারল না ; "আমার ঘর থেকে চলে যাও," বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পরদিন প্রিন্স মেয়ের সঙ্গে একটা কথাও বলল না, কিন্তু মেয়ে লক্ষ্য করল যে ডিনারের সময় সে হুকুম দিল, মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁকে সকলের আগে খাবার পরিবেশন করা হোক। ডিনারের পরে কফি পরিবেশন করতে এসে পরিচারক যখন অভ্যাসবশত প্রিন্সেসকে দিয়ে শুরু করল, তখন প্রিন্স হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ফিলিপকে লক্ষ্য করে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে মারল, এবং তক্ষুণি নির্দেশ দিল যে তাকে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হবে।

প্রিন্স চীৎকার করে বলল, "লোকটা কথার অবাধ্য…দু'বার বলেছি…কিন্তু সে শোনে নি! এ-বাড়িতে এই মহিলাই প্রধানা; সেই আমার শ্রেষ্ঠ বান্ধবী।" তারপর এই প্রথম প্রিন্সেস মারিকে সম্বোধন করে বলল, "কাল যেমন করেছ আর কখনও যদি ওর সামনে নিজের অবস্থার কথা ভুলে যাও তাহলে আমিই তোমাকে বুঝিয়ে দেব এ-বাড়ির কর্তাকে। চলে যাও! আর যেন তোমাকে দেখতে না হয়; ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও!"

প্রিন্সেস মারি মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর কাছে ক্ষমা চাইল এবং নিজের জন্য ও পরিচারক ফিলিপের জন্য বাবার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নিল।

সেই সব মুহূর্তে ত্যাগের একটা গর্বের ভাব প্রিন্সেস মারির মনে সঞ্চিত হল। আর হঠাৎ হয় তো সেই বাবা তারই সামনে চশমা জোড়া খুঁজতে লাগল, চশমার কাছেই হাতড়েও সেটাকে দেখতে পেল না, অথবা দুর্বল পায়ে ভুল করে পা ফেলল, অথবা তার চাইতেও যা খারাপ, হয়তো ডিনারে বসে সঙ্গীসাথীর অভাবে সেখানেই হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ল, তোয়ালেটা নীচে পড়ে গেল, আর মাথাটা কাঁপতে কাঁপতে প্লেটের উপরেই এলিয়ে পড়ল। সেইসব মুহূর্তে নিজের উপরেই রাগ করে সে ভাবল, "মানুষটি বুড়ো হয়েছে, দুর্বল হয়েছে আর আমি কিনা তাকেই শাস্তি দিচ্ছি!"

অধ্যায়—৩

১৮১১ সালে মস্কোতে একজন ফরাসী ডাক্তার—মেতিভিয়ের—বাস করত। তখন তার খুব নামডাক। লোকটি অত্যন্ত দীর্ঘকায়, সুদর্শন, ফরাসীদের মতই অমায়িক, এবং মস্কোশুদ্ধ লোক বলে সে অসাধারণ চতুর। সব বড় বড় বাড়িতেই তার ডাক পড়ে, শুধু ডাক্তার হিসাবেই নয়, সমপর্যায়ের একজন মানুষ হিসাবে।

প্রিন্স নিকলাস চিরকাল ওষুধপত্রকে ঠাট্টা করে এসেছে, কিন্তু ইদানীং মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর পরামর্শক্রমে এই ডাক্তারটিকে তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করার অনুমতি দিয়েছে এবং তার সঙ্গে চলাফেরায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মেতিভিয়ের সপ্তাহে দুদিন প্রিন্সকে দেখতে আসে।

৬ই ডিসেম্বর—সেণ্ট নিকলাস দিবস এবং প্রিন্সের নামকরণ দিবস উপলক্ষ্যে গোটা মস্কো প্রিন্সের সদর ফটকে এসে হাজির হল, কিন্তু সে কাউকে ঢুকবার অনুমতি দিল না; শুধু অল্প কয়েকজনকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করার অনুমতি দিল, আর তাদের নামের একটা তালিকা প্রিন্সেস মারির হাতে তুলে দিল।

মেতিভিয়ের সকালেই প্রিন্সকে শুভকামনা জানাতে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। ঘটনাক্রমে নামকরণ দিবসের সেই সকালবেলাটায় প্রিন্সের মেজাজ ছিল ভয়ানক তিরিক্ষি। সারাটা সকাল বাড়িময় ঘুরে ঘুরে প্রিন্স কেবলই সকলের দোষ খুঁজে বেড়াতে লাগল। প্রিন্সেস মারি বাবার এ মেজাজকে ভালরকমই চেনে—একটা ঝড়ের পূর্বাভাষ: যেকোন সময় ঝড় উঠতে পারে। সারাটা সকাল পিন্সেস মারি যেন একটা গুলি-ভরা কামানের মুখে অনিবার্য বিস্ফোরণের অপেক্ষায় কাটাতে লাগল। ডাক্তার না আসা পর্যন্ত সকালটা ভালোয়-ভালোয়ই কাটল। ডাক্তারকে স্বাগত জানিয়ে প্রিন্সেস মারি একটা বই নিয়ে বসার ঘরের দরজার কাছেই বসল; পড়ার ঘরের সব কথাবার্তাই সেখান থেকে শোনা যায়।

প্রথমে শোনা গেল শুধু মেতিভিয়েরের গলা, তারপর বাবার গলা, তারপর একসঙ্গে দুজনের গলা; দরজাটা হাঁ-হাঁ করে খুলে গেল, আর চৌকাঠের উপর দেখা গেল ভয়ার্ত মেতিভিয়েরের সুদর্শন মূর্তি এবং ড্রেসিং-গাউন ও ফেজ পরা প্রিন্সকে; রাগে তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেছে, চোখের মণি দুটো নীচের দিকে ঘুরছে।

প্রিন্স চীৎকার করে বলছে, "তোমরা কেন বুঝতে পার না? কিন্তু আমি সব বুঝি! ফরাসী গুপ্তচর, বোনাপার্তের কেনা গোলাম, গুপ্তচর, আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও! আমি বলছি, চলে যাও…" সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

চীৎকার শুনে মাদময়জেল বুরিঁয়ে পাশের ঘর থেকে ছুটে এসেছে। কাঁধ ঝাঁকুনি দিতে দিতে মেতিভিয়ের তার দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "প্রিন্সের শরীরটা ভাল নেই: পিত্তাধিক্য ও রক্তেরচাপ। চুপচাপ থাকুন, কাল আমি আবার আসব।" ঠোঁটের উপর আঙুল তুলে সে দ্রুত প্রস্থান করল।

পড়ার ঘর থেকে ভেসে এল চটি পায়ে হাঁটার শব্দ ও চীৎকার: "গুপ্তচর বিশ্বাসঘাতক, সর্বত্র বিশ্বাসঘাতক। বাড়িতে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি নেই!"

মেতিভিয়ের চলে যাবার পরে প্রিন্স মেয়েকে তার ঘরে ডাকল, আর সব রাগ গিয়ে পড়ল তার ঘাড়ে। একটা গুপ্তচরকে বাড়িতে ঢোকাবার দোষ তো তারই। সে কি মেয়েকে বলে নি, হ্যাঁ, বলে নি যে একটা তালিকা তৈরি করতে হবে, এবং সে তালিকার বাইরে কাউকে ডাকা চলবে না? তাহলে

ওই শয়তানটাকে ঢুকতে দেওয়া হল কেন? সব দোষ তার। এই মেয়েটার জন্যই তার একমুহূর্তও শান্তি নেই, সে শান্তিতে মরতেও পারছে না।

"না ম্যা'ম! এবার আমাদের আলাদা হতে হবে, হতেই হবে! সেটা বুঝতে পেরেছ, এটা বুঝতে পেরেছ! আমি আর সইতে পারছি না," এই কথা বলে প্রিন্স ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে এসে শান্ত ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বলল, "মনেও করো না যে কথাটা আমি রাগের মাথায় বলেছি। ঠাণ্ডা মাথায় ভেবেচিন্তেই বলেছি, আর সেইভাবেই কাজ হবে—এবার আমাদের ছাড়াছাড়ি হতেই হবে; কাজেই নিজের জন্য একটা জায়গা দেখে নাও।" ····কিন্তু নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না; হাতের মুঠি পাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে—সে তীক্ষ্ণতা শুধু যে ভালবাসে, ভালবেসে দুঃখ পায়, তার কণ্ঠেই ফুটতে পারে—বলে উঠল: "আঃ, যেকোন মূর্খও যদি ওকে বিয়ে করত!" তারপরেই দরজা বন্ধ করে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁকে ডেকে পাঠাল।

দুটোর সময় ছ'জন মনোনীত অতিথি ডিনারের জন্য হাজির হল।

অতিথিরা—বিখ্যাত কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন, প্রিন্স লোপুখিন ও তার ভাই-পো, প্রিন্সের সামরিক জীবনের সহকর্মী জেনারেল চাত্‌রভ, এবং তরুণদের মধ্যে পিয়ের ও বরিস দ্রুবেৎস্কয়—সকলেই প্রিন্সের জন্য অপেক্ষা করছে।

অল্প কয়েকদিন হল বরিস ছুটি নিয়ে মস্কো এসেছে। প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা তার খুবই প্রবল, আর সেই উদ্দেশ্যে নানা ছুতোয় প্রিন্সের এত কাছাকাছি আসতে পেরেছে যে নিজের বাড়িতে অবিবাহিতদের আমন্ত্রণ না করার যে নীতি বুড়ো প্রিন্স সর্বদা মেনে চলে তার বেলায় সে নীতির ব্যতিক্রম ঘটানো হয়েছে।

ডিনারে বসে সর্বশেষ রাজনৈতিক সংবাদ নিয়ে আলোচনা চলল: নেপোলিয়ন কর্তৃক ওল্ডেনবুর্গের ডিউকের রাজ্য দখল করা এবং তার বিরুদ্ধে যে রুশ মন্তব্য সব ইওরোপীয় রাজদরবারে পাঠানো হয়েছে তার কথা।

ইতিপূর্বে আরও অনেকবার উচ্চারিত একটি মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন বলল, "কোন জলদস্যু একটা জাহাজ দখল করলে তার প্রতি যে আচরণ করে নেপোলিয়ন ইওরোপকে নিয়ে সেইরকমই আচরণ করছে। শুধু অবাক হতে হয় মুকুটধারীদের দীর্ঘদিনের যন্ত্রণা ও অন্ধত্ব দেখে। এবার পোপের পালা এসেছে, ক্যাথলিক গির্জার প্রধানকে পদচ্যুত করতেও নেপোলিয়নের বিবেকে বাঁধেনি—অথচ সকলেই চুপচাপ! একমাত্র আমাদের সম্রাটই ওল্ডেনবুর্গের ডিউকের রাজ্য দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন···· এমন কি," এর বেশী আর কিছু বলা ঠিক হবে না বুঝতে পেরে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন থেমে গেল।

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি বলল, "ওল্ডেনবুর্গ রাজ্যের পরিবর্তে অন্য রাজ্য দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে। আমি যেরকম আমার ভূমিদাসদের বল্ড হিল্‌স্ থেকে

বণ্ডচারোভো অথবা আমার রিয়াজান জমিদারিতে বদলি করতে পারি তেমনই বোনাপার্তও ডিউকদের ইচ্ছামত বদলি করতে চায়।"

সসম্মানে আলোচনায় যোগ দিয়ে বরিস বলল, "ওল্ডেনবুর্গের ডিউক কিন্তু প্রশংসনীয় চারিত্রিক দৃঢ়তার সঙ্গে তার এই দুর্ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন।"

প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি যুবকটির দিকে তাকাল, যেন কিছু বলতে চাইল, কিন্তু তাকে বড় বেশী ছেলেমানুষ মনে করে সে ইচ্ছা ত্যাগ করল।

"ওল্ডেনবুর্গের ব্যাপার নিয়ে আমাদের প্রতিবাদ-পত্রটা আমি পড়েছি; চিঠিটার শব্দ-প্রয়োগ এতই খারাপ যে আমি অবাক হয়ে গেছি," যেন একটা অতিপরিচিত বিষয় নিয়ে কথা বলছে এমনই সুরে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন মন্তব্য করল।

পিয়ের অবাক বিস্ময়ে রস্তপ্‌চিনের দিকে তাকাল; চিঠির খারাপ শব্দ-প্রয়োগ নিয়ে তার এত মাথাব্যথা কেন সেটা তার মাথায় ঢুকল না।

মুখে বলল, "দেখুন কাউণ্ট, চিঠিটার বক্তব্য যখন বেশ জোরালো তখন তার শব্দ-প্রয়োগে কি যায় আসে?"

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন জবাব দিল, "না হে মশাই, আমাদের সৈন্যসংখ্যা যখন পাঁচ লক্ষ তখন একজন ভাল লিখিয়ে পাওয়া আরও সহজ হওয়া উচিত।"

চিঠির শব্দ-প্রয়োগ নিয়ে কাউণ্টের অসন্তুষ্টিটা এবার পিয়ের বুঝতে পারল।

বুড়ো প্রিন্স বলল, "ভাল কলমচি গজিয়ে ওঠা উচিত তো ছিলই। পিতার্সবুর্গে তারা তো সর্বদাই লিখে চলেছে—শুধু চিঠিপত্র নয়, নতুন নতুন আইন পর্যন্ত। আমার আন্দ্রু তো সেখানে রাশিয়ার জন্য আইনের একটা গোটা বইই লিখে ফেলেছে। এখন তো তারা সব সময়ই লেখে!" কাউণ্ট অস্বাভাবিকভাবে হেসে উঠল।

আলোচনায় সাময়িকভাবে ছেদ পড়ল; সেই ফাঁকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে বুড়ো সেনাপতি গলাটা পরিষ্কার করে নিল।

"পিতার্সবুর্গে সেনা-পরিদর্শন কালের শেষ ঘটনাটা শুনেছেন কি? নতুন ফরাসী রাজদূতের আচরণটি বড়ই শোচনীয় হয়েছিল।"

"অ্যা? হ্যাঁ, কিছুটা শুনেছি: সম্রাটের উপস্থিতিতে তিনি বোধহয় অদ্ভুত কিছু বলেছিলেন।"

সেনাপতি বলতে লাগল, "সম্রাট বোমারু বাহিনীর প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, কিন্তু মনে হল রাজদূতটি সেটা খেয়াল না করে হুট করে বলে ফেললেন: 'ফ্রান্সে আমরা এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মনোযোগ দেই না।' সম্রাট কোন কথাই বললেন না। পরবর্তী সেনা-পরিদর্শনকালে সম্রাট তার সঙ্গে একটা কথাও বলেন নি।"

সকলেই চুপচাপ। ব্যক্তিগতভাবে সম্রাটকে নিয়ে যেখানে কথা সেখানে

কোনরকম মতামত প্রকাশ করাই অসম্ভব।

প্রিন্স বলল, "বেয়াদবের দল! মেতিভিয়েরকে চেনেন তো? আজ সকালেই তাকে আমার বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছি।" রাগত দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "তাদের যেন ঢুকতে না দেওয়া হয় এ অনুরোধ জানানো সত্ত্বেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল।"

ফরাসী ডাক্তারটির সঙ্গে তার যেসব কথা হয়েছিল সব সবিস্তারে বর্ণনা করে মেতিভিয়ের যে একজন গুপ্তচর সে ধারণার স্বপক্ষে তার যুক্তিগুলোও শুনিয়ে দিল। যদিও যুক্তিগুলো খুবই অসার এবং অপ্রতুল, তবু তা নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না।

খাবার পরে শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হল। অতিথিরা দাঁড়িয়ে বুড়ো প্রিন্সকে অভিনন্দিত করল। প্রিন্সেস মারিও তার কাছে এগিয়ে গেল।

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বুড়ো প্রিন্স চুমো খাওয়ার জন্য তার পরিষ্কার কামানো বলীরেখায় ভর্তি গালটা এগিয়ে দিল। বাবার মুখের ভাব দেখেই মেয়ে বুঝতে পারল, সকালের কোন কথাই সে ভোলে নি, তার সিদ্ধান্ত বলবৎই আছে, শুধু অতিথিদের উপস্থিতির জন্য এখন সে-কথাগুলি বলতে পারল না।

সেখান থেকে সকলে বসার ঘরে গেল; সেখানে কফি দেওয়া হল।

প্রিন্স নিকলাস অধিকতর উৎসাহভরে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তার মতামত প্রকাশ করল।

বলল, "অস্ট্রীয়ার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের যুদ্ধ করা উচিত নয়। আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ সবটাই পূর্বাঞ্চলে, আর বোনাপার্তের ব্যাপারে আমাদের একমাত্র কাজ হল একটা সশস্ত্র সীমান্ত রক্ষা করা এবং একটা দৃঢ় নীতি অনুসরণ করা; তাহলে আর ১৮০৭ সালের মত রুশ সীমান্ত লংঘন করার সাহস তার হবে না!"

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন বলল, "কিন্তু প্রিন্স, ফরাসীদের সঙ্গে আমরা যুদ্ধ করব কেমন করে? আমাদের শিক্ষক ও ধর্মগুরুদের বিরুদ্ধে কি আমরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে পারি? আমাদের যুবকদের দিকে তাকান, মহিলাদের দিকে তাকান! ফরাসীরা তো আমাদের ভগবান: প্যারিস তো আমাদের স্বর্গরাজ্য!"

প্রত্যেককে শোনাবার জন্য সে ক্রমেই গলা চড়িয়ে কথা বলতে লাগল।

"ফরাসী পোশাক, ফরাসী ভাবধারা, ফরাসী অনুভূতি! এই তো, আপনি মেতিভিয়েরকে ঘাড় ধরে বের করে দিলেন কারণ সে একটা ফরাসী শয়তান, কিন্তু আমাদের মহিলারা তো নতজানু হয়ে তার পিছনে ছোটেন! গত রাতে আমি একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম; সেখানে প্রতি পাঁচজন মহিলার মধ্যে তিনজন রোম্যান ক্যাথলিক, তারা প্রতি রবিবার উল

বোনার জন্য পোপের অনুগ্রহ পেয়ে থাকেন। অথচ যদি অনুমতি করেন তো বলি, তারা সকলেই বসে ছিলেন সাধারণ স্নান-ঘরের সাইন-বোর্ডের মত প্রায় উলঙ্গ হয়ে। উঃ, আমাদের যুবকদের দেখলে কি মনে হয় জানেন প্রিন্স, মনে হয় যাদুঘর থেকে মহান পিতরের পুরনো মুগুরটা তুলে এনে তাদের সবাইকে রুশ পদ্ধতিতে এমন ধোলাই দিই যাতে এইসব দুর্বুদ্ধি তাদের মাথা থেকে পালিয়ে যায়!"

সকলেই চুপ। বুড়ো প্রিন্স রস্তপ্‌চিনের দিকে তাকিয়ে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়তে লাগল।

রস্তপ্‌চিন উঠে দাঁড়াল; প্রিন্সের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আচ্ছা, তাহলে বিদায় ইয়োর এক্সেলেন্সি; ভালভাবে থাকবেন!"

"'বিদায় বন্ধু'''তার কথাগুলি যেন সঙ্গীত; তার কথা শুনলে কদাপি ক্লান্তি আসে না! হাতটা চেপে ধরে গালটা এগিয়ে দিয়ে বুড়ো প্রিন্স বলল।

রস্তপ্‌চিনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যরাও উঠে পড়ল।

অধ্যায়—৪

প্রিন্সেস মারি বসে বসে বুড়ো মানুষগুলির কথাবার্তা ও অন্যের দোষ ধরার ব্যাপারগুলি শুনছিল, কিন্তু যা শুনল তার কিছুই বুঝল না; তার একমাত্র চিন্তা, তার প্রতি বাবার এই বিরূপ মনোভাব অতিথিদের চোখে পড়েছে কি না। ডিনারের সময় বরিস দ্রুবেৎস্কয় যে তার দিকে বিশেষভাবে নজর দিচ্ছিল তাও সে খেয়াল করে নি। বরিস দ্রুবেৎস্কয় ইতিমধ্যেই তিনবার তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

বুড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। অতিথিরাও চলে গেছে। ঘরে শুধু প্রিন্সেস মারি ও পিয়ের। টুপিটা হাতে নিয়ে হাসিমুখে পিয়ের বলল, "আমি আরও কিছুক্ষণ থাকতে পারি কি?" বলতে বলতেই সে পাশের হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়ল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "নিশ্চয়।" তার চোখের দৃষ্টি যেন বলতে চাইল, "আপনি কি কিছুই দেখেন নি?"

তখন পিয়েরের মেজাজ খুব ভাল। সোজা সামনে তাকিয়ে একটু হেসে শুধাল, "ওই যুবকটিকে কি আপনি অনেকদিন থেকে চেনেন প্রিন্সেস?"

"কে?"

"দ্রুবেৎস্কয়।"

"না, বেশী দিন নয়...."

"ওকে আপনার ভাল লাগে?"

"হ্যাঁ, বেশ ভাল লোক। কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

"কারণ আমি লক্ষ্য করে দেখেছি কোন যুবক যখন ছুটি নিয়ে পিতার্সবুর্গ

থেকে মস্কোতে আসে তখন সাধারণত কোন ধনবতী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্য নিয়েই আসে।"

"আপনি তাও লক্ষ্য করেছেন ?" প্রিন্সেস মারি বলল।

পিয়ের হেসে জবাব দিল, "হ্যাঁ। এই যুবকটিকেও দেখছি যেখানেই কোন ধনবতী উত্তরাধিকারিণী সেখানেই তিনি। বইয়ের পাতার মতই তার মনের কথা আমি পড়তে পারছি। বর্তমানে কাকে পাকড়াও করবে তাই নিয়ে সে ইতস্তত করছে—আপনাকে, না মাদময়জেল জুলি কারাগিনাকে। তার দিকেও যুবকটির কড়া নজর পড়েছে।"

"তিনি সেখানেও যান ?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই যান। পূর্বরাগের নতুন বিধির খবর কিছু রাখেন কি ?" মজার হাসি হেসে পিয়ের বলল।

"না," প্রিন্সেস মারি জবাব দিল।

"মস্কোর মেয়েদের খুসি করতে হলে আজকাল খুব মন-মরা ভাব দেখাতে হয়! মাদময়জেল কারাগিনার কাছে সে খুবই বিষণ্ণচিত্তে ঘুরে বেড়ায়।" পিয়ের বলল।

পিয়েরের সদয় মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, "মনের কথা কাউকে বলতে পারলে স্বস্তি পেতাম। সবকিছুই পিয়েরকে বলা দরকার। সে খুব দয়ালু ও উদার। কিছুটা স্বস্তি পাব। সে আমাকে সদুপদেশ দেবে।"

"আপনি কি তাকে বিয়ে করবেন ?"

"হায় ভগবান, কাউণ্ট, এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন মনে হয় যে কোন লোককে বিয়ে করে ফেলি," অশ্রুসিক্ত গলায় উচ্চস্বরে কথাটা বলে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলতে লাগল, "হায়রে, আপনজন কাউকে ভালবেসেও যদি বোঝা যায় যে তারজন্য আমি কিছুই করতে পারি না, শুধু তাকে দুঃখ দিতেই পারি, কোন কিছুই বদলাতেও পারি না, সে যে কী কষ্ট! তখন তো একটিমাত্র পথই খোলা থাকে—কোথাও চলে যাওয়া, কিন্তু আমি যাবই বা কোথায় ?"

"ব্যাপার কি পিন্সেস ? কি হয়েছে ?"

কথা শেষ না করেই প্রিন্সেস মারি কেঁদে ফেলল।

"আজ যে আমার কি হয়েছে তা আমি নিজেই জানি না। এসব মনে রাখবেন না—যা বলেছি ভুলে যান!"

পিয়েরের মনের প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ উবে গেল। সাগ্রহে প্রিন্সেসকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল, সব কথা খুলে বলে মনের দুঃখ অকপটে জানাতে অনুরোধ করল; কিন্তু প্রিন্সেস মারি বার বার শুধু একই কথা বলতে লাগল: সে যা বলেছে তা যেন পিয়ের ভুলে যায়, সে যে কি বলেছে 'তাও তার মনে নেই, একটিমাত্র বিপদ ছাড়া আর কোন বিপদ তার নেই—সেটা হচ্ছে, প্রিন্স

আন্‌দ্রুর বিয়েকে কেন্দ্র করে পিতা-পুত্রে একটা সংঘাতের আশংকা দেখা দিয়েছে।

আলোচনার বিষয় পাল্টাবার জন্য প্রশ্ন করল, "রস্তভদের কোন খবর জানেন কি? শুনেছিলাম তারা শীঘ্রই আসছেন। আমিও আশা করছি, আন্‌দ্রু যেকোন দিন এসে পড়বে। এখানে সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হোক সেটাই আমি চাই।"

বুড়ো প্রিন্স সম্পর্কে পিয়ের জানতে চাইল, "তিনি এখন ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখছেন?"

প্রিন্সেস মারি মাথা নাড়ল।

"কি যে করি? কয়েক মাসের মধ্যেই তো বছর শেষ হয়ে যাবে। এ যে অসম্ভব। আমি শুধু চাই প্রথম ধাক্কাটা থেকে দাদাকে বাঁচাতে। আমি চাই তারা তাড়াতাড়ি এসে পড়ুক। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই। আপনি তো তাদের অনেক দিন থেকে চেনেন। সব কথা আমাকে সত্যি করে বলুন তো: মেয়েটি কেমন, আর তার সম্পর্কে আপনার ধারণাই বা কি?—প্রকৃত সত্যই জানতে চাই, কারণ আপনি তো জানেন, বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অনেক ঝুঁকি নিয়েই আন্‌দ্রু এ কাজ করছে, আর তাই আমি জানতে চাই⋯⋯"

অকারণেই লজ্জায় লাল হয়ে পিয়ের বলল, "আপনার প্রশ্নের কি জবাব যে দেব বুঝতে পারছি না। আমি সত্যি জানি না তিনি কিরকম মেয়ে; তাকে বিশ্লেষণ করা তো দূরের কথা। তবে তিনি মনোহারিণী, কিন্তু কিসের জন্য মনোহারিণী তাও জানি না। তার সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলতে পারি।"

প্রিন্সেস মারি দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তার মুখের ভাবই বলল: "হ্যাঁ, আমিও এই আশা করেছিলাম, এই আশংকা করেছিলাম।"

"মেয়েটি কি চালাক-চতুর?" প্রিন্সেস মারি শুধাল।

"তা মনে করি না; তবে—তাও বটে। ⋯⋯না, না, তিনি শুধুই মনোহারিণী।"

প্রিন্সেস মারি পুনরায় অসম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

"আঃ, তাকে পছন্দ করাটাই তো আমি চাই! আমার আগেই যদি তার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তো এই কথাটা তাকে বলবেন।"

পিয়ের বলল, "শুনেছি তারা খুব শিগ্‌গিরই এসে পড়বেন।"

প্রিন্সেস মারি পিয়েরকে তার পরিকল্পনার কথা জানাল; রস্তভরা পৌঁছবার পরেই সে ভাবী বৌদির সঙ্গে ভাব জমিয়ে তুলবে এবং বুড়ো প্রিন্সকে তার প্রতি সদয় করে তুলতে চেষ্টা করবে।

অধ্যায়—৫

পিতার্সবুর্গে কোন ধনী যোগাড় করতে না পেরে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই

বরিস মস্কোতে এসেছে। সেখানে দুই ধনবতী উত্তরাধিকারিণী জুলি ও প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে সে টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে গেছে। সাদাসিদে আচরণ সত্ত্বেও জুলির তুলনায় প্রিন্সেস মারিকেই তার বেশী আকর্ষণীয় বলে মনে হয়েছে; অথচ যে কারণেই হোক তার সঙ্গে ঠিকমত পূর্বরাগ জাগিয়ে তুলতে সে পারে নি। বুড়ো প্রিন্সের নামকরণ-দিবসে তাদের সর্বশেষ সাক্ষাতের দিনেও বরিস যতই আবেগের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছে, প্রিন্সেস মারি যেন তা শুনতেই পায় নি, আর শুনতে পেলেও কালে-ভদ্রে জবাব দিয়েছে।

আর একটু অদ্ভুতভাবে হলেও জুলি সঙ্গে সঙ্গেই তার মনোযোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

জুলির বয়স সাতাশ বছর। ভাইদের মৃত্যুর পরে সে এখন প্রচুর সম্পত্তির মালিক। দশ বছর আগে সে যখন ছিল সপ্তদশী বালিকামাত্র তখন যেকেউ প্রত্যহ সে বাড়িতে যেতে ভয় পেত পাছে মেয়েটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং সে নিজেও বাঁধা পড়ে যায়; কিন্তু এখন সে সাহসে ভর করে প্রতিদিনই সেবাড়িতে যেতে পারে এবং তাকে ভাবী বিয়ের কনে হিসাবে না দেখে তার সঙ্গে যৌনসম্পর্কহীন পরিচয় গড়ে তুলতে পারে।

সেই শীতকালটা কারাগিনদের বাড়িটাই ছিল মস্কো শহরের সবচাইতে প্রীতিপ্রদ ও আতিথেয়তার কেন্দ্র। আনুষ্ঠানিক ভোজসভা ছাড়াও অনেক মানুষ, প্রধানত পুরুষ, প্রতিদিন সেখানে জমায়েত হয়, মধ্যরাত পর্যন্ত খানা-পিনা করে, এবং সকাল তিনটে পর্যন্ত কাটায়। জুলি কখনও কোন নাচের আসর, প্রমোদ-ভ্রমণ বা নাটক বাদ দেয় না। তার পোশাকও একেবারে হাল ফ্যাশনের। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তার মনে কোন মোহ নেই, সকলকেই সে বলে বেড়ায় যে বন্ধুত্বে বা ভালবাসায় অথবা জীবনের অন্য কোন আনন্দে সে বিশ্বাস করে না, তার একমাত্র প্রত্যাশা "ওপারের" শান্তি। ফলে বাড়িতে যত অতিথি আসে সকলেই তার এই জীবন-বৈরাগ্যের গুণকীর্তন করে এবং তার পরে নানা রকম গল্প-গুজব, নাচ গান, বুদ্ধির খেলা ও কবিতার লড়াইয়ে মেতে ওঠে। কারাগিন-পরিবারে এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটির খুব প্রচলন। একমাত্র বরিস এবং অপর কয়েকটি যুবকই জুলির এই বিষণ্নতাবাদী মনোভাব নিয়ে কথা বলে, জুলিও জাগতিক ব্যাপারের তুচ্ছতা নিয়ে দীর্ঘ সময় তাদের সঙ্গে আলোচনা করে, নানা শোকসূচক রেখাচিত্র, প্রবাদ-বচন ও কবিতায় ভরা অ্যাল্‌বামগুলো তাদের দেখায়।

বরিসের প্রতি জুলি একটু বিশেষ রকমের সুরে। জীবনের প্রথম পর্বেই যে-ভাবে তার স্বপ্ন ভঙ্গ ঘটেছে তা নিয়ে জুলি দুঃখপ্রকাশ করল, নিজে অনেক দুঃখ পেয়েছে বলে সাধ্যমত বন্ধুত্বপূর্ণ সান্ত্বনা দেবার প্রস্তাব করল, এবং নিজের অ্যাল্‌বামটা তার হাতে তুলে দিল। বরিস অ্যাল্‌বামে দুটো গাছের ছবি

এঁকে তার নীচে লিখল : "পল্লীবৃক্ষ, তোমার কালো কালো শাখা আমার উপর ছড়িয়ে দিয়েছে বিষণ্ণ অন্ধকার।"

আর একটা পাতায় একটা সমাধি এঁকে তাতে লিখল :

"মৃত্যু স্বস্তি দেয়, মৃত্যু শান্তিময়।
যন্ত্রণার হাত থেকে অন্য আর কি আছে আশ্রয়!"

জুলি বলল, এটা চমৎকার হয়েছে।

একটা বই থেকে লিখে রাখা একটি অনুচ্ছেদের আক্ষরিক পুনরাবৃত্তি করে জুলি বলল, বিষাদের হাসিতে আছে এক মনোহারিণী শক্তি। সে যেন অন্ধকারে আলোর শিখা, দুঃখ ও নৈরাশ্যের মধ্যে ক্ষণিকের অবসর, যা দেখায় সান্ত্বনার সম্ভাবনা।"

উত্তরে বরিস নীচের পংক্তিগুলি লিখল :

"প্রিয় বিষাদ, স্পর্শকাতর মনের কাছে তুমি বিষময় পুষ্টি,
তোমাকে না পেলে আমার কাছে সুখ হত অসম্ভব,
হায়, তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাও,
আমার ছায়াচ্ছন্ন অবসরের যন্ত্রণাকে তুমি শান্ত কর,
আমার চোখের জলের স্রোতে মিশিয়ে দাও এক ফোঁটা গোপন মাধুর্য।"

আন্না মিখায়লভ্না প্রায়ই কারাগিনদের বাড়িতে যায়। জুলির মায়ের সঙ্গে তাস খেলতে বসে হাসতে হাসতে জুলির যৌতুক সম্পর্কে কৌশলে খোঁজখবর নেয় (সে পাবে পেঞ্জার দুটো জমিদারি এবং মিঝেগোরদ-এর জঙ্গল)।

মেয়েকে বলল, "প্রিয় জুলি, তুমি সর্বদাই মনোরমা ও বিষাদময়ী।" মাকে বলল, "বরিস বলে, আপনার বাড়িতে এলে তার আত্মা শান্তি পায়। জীবনে সে অনেক ব্যর্থতা সহ্য করেছে। তার মনটা বড়ই নরম।" ছেলেকে বলল, "দেখ বাবা, জুলিকে আমি যে কতখানি ভালবেসে ফেলেছি তা বলতে পারি না। কিন্তু তাকে না ভালবেসে কি থাকা যায়? সে যে দেবদূত! আহা, বরিস, বরিস!—" একটু থেমে আবার শুরু করল, "তার মাকে দেখে আমার বড় কষ্ট হয়। আজ তিনি আমাকে পেঞ্জা থেকে আসা হিসাব ও চিঠিপত্র দেখালেন। আহা বেচারি, তাকে সাহায্য করবার কেউ নেই; সকলেই তাকে কত ঠকাচ্ছে!"

মার কথা শুনতে শুনতে বরিস তার অলক্ষ্যে হাসল। মাঝে মাঝে পেঞ্জা ও নিঝেগোরদ জমিদারি সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদও করল।

জুলি আশা করেছিল, বরিস নিজেই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করবে, আর করলেই সে প্রস্তাব সে গ্রহণ করবে; কিন্তু নানা কারণে বরিস মুখ খুলল না। এদিকে তার ছুটি ফুরিয়ে আসছে। প্রতিটি দিন সারাক্ষণই সে কারাগিনদের বাড়িতে কাটায়, আর প্রতিদিনই মনে মনে সমস্ত বিষয়টা

ভেবে নিয়ে নিজেকেই বলে, আগামীকাল বিয়ের প্রস্তাব করবে। কিন্তু জুলির সামনে দাঁড়িয়ে তার লাল মুখ ও থুৎনি, তার ভেজা-ভেজা চোখ, বিবাহিত জীবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের মধ্যে ঝাঁপ দেবার উদগ্র বাসনা—এসবকিছু দেখে বরিস কিছুতেই শেষ কথাটি উচ্চারণ করতে পারে না, যদিও অনেক দিন আগে থেকেই সে কল্পনায় নিজেকে পেঞ্জা ও নিঝে-গোরদ-এর জমিদারির মালিক বলে ভেবে রেখেছে, এবং তার থেকে আয়ের টাকা কিভাবে কোন্ কোন্ খাতে খরচ করবে তাও ঠিক করে রেখেছে। বরিসের এই ইতস্ততভাবে জুলির নজর এড়াল না; কখনও কখনও এ চিন্তাও তার মাথায় এল যে সে বরিসকে আকর্ষণ করতে পারছে না, কিন্তু নারীর সহজাত আত্ম-প্রতারণা সঙ্গে সঙ্গে তাকে এই বলে সান্ত্বনা দিল যে তার প্রতি ভালবাসার জন্যই কথাটা বলতে বরিস লজ্জা বোধ করছে। কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই সে বিরক্ত হয়ে উঠল; তাই বরিসের যাত্রার কিছু দিন আগেই সে একটা সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল। বরিসের ছুটি ফুরোবার ঠিক আগেই আনাতোল কুরাগিন মস্কোতে এসে হাজির হল এবং কারাগিনদের বসার ঘরেও দর্শন দিল; আর জুলিও হঠাৎ সব বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে হাসিখুসিভাবে কুরাগিনের প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠল।

আন্না মিখায়লভ্না ছেলেকে বলল, "দেখ বাবা, আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি, জুলির সঙ্গে বিয়ে দিতেই প্রিন্স ভাসিলি ছেলেকে মস্কো পাঠিয়েছেন। জুলিকে আমি এত ভালবাসি যে তারজন্য আমার দুঃখ হচ্ছে। তুমি কি বল বাবা?"

তাকে এভাবে বোকা বানানো হচ্ছে, একটা মাস জুলির পিছনে ঘোরাটা এভাবে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে, পেঞ্জার জমিদারির সব আয় হাতছাড়া হয়ে গিয়ে উঠছে সেই বোকা আনাতোলের হাতে—এতে বরিসের কষ্টও কম নয়। সে তখনই কারাগিনদের বাড়িতে ছুটে গেল বিয়ের প্রস্তাব করতে। জুলি কেমন যেন গা-ছাড়াভাবে তার সঙ্গে কথা বলল, বরিস কবে রওনা হচ্ছে সে সম্পর্কে খোঁজখবর করল। যদিও নরম সুরে ভালবাসার কথা বলার ইচ্ছা নিয়েই বরিস এসেছে, তবু বিরক্তিভরা গলায় মেয়েদের চরিত্রের চটুলতার কথাই বার বার বলতে লাগল। জুলিও অসন্তুষ্ট হয়ে জবাব দিল, মেয়েরা সত্যি সত্যি বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী; একই জিনিসের পুনরাবৃত্তিতে তারা ক্লান্তি বোধ করে।

জুলিকে আঘাত করার ইচ্ছা মনে জাগলেও বরিস নিজেকে সংযত করে নিল। বলল, "তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি আসিনি। বরং····"

বরিস জুলির মুখের দিকে তাকাল। তার মুখ থেকে কখন সরে গেছে বিরক্তির ছায়া, লোভাতুর প্রত্যাশায় সে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বরিসের দিকে। তার মুখের দিকে চোখ তুলে বরিস বলল, "তোমার প্রতি আমার

মনের কথা তো তুমি জান।"

আর কিছু বলার দরকার হল না: জয়ের আনন্দে ও আত্মতুষ্টিতে জুলির মুখখানি জল্ জল করে উঠল; কিন্তু এক্ষেত্রে যা কিছু বলা হয়ে থাকে সব সে বরিসের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিল—বরিস তাকে ভালবাসে, অন্য কোন নারীকে সে কোনদিন তার মত করে ভালবাসে নি। জুলি জানে, পেঞ্জার জমিদারি ও নিঝেগোরদের জঙ্গলের বিনিময়ে এটুকু সে দাবী সে মিটিয়েই নিল।

বাকদত্ত দুই তরুণ-তরুণী এখন আর বলে না যে গাছেরা তাদের জীবনে অন্ধকার বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দেয়, পিতার্সবুর্গে একটা চমৎকার বাড়ি নেবার পরিকল্পনায় তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকছে, নানা লোকজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছে, আর একটি সাড়ম্বর বিয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

অধ্যায়—৬

জানুয়ারির শেষের দিকে বুড়ো কাউণ্ট রস্তভ নাতাশা ও সোনিয়াকে নিয়ে মস্কো চলে গেল। কাউণ্টেস তখনও অসুস্থ, বিদেশে চলাফেরা করতে অক্ষম, অথচ তার সুস্থ হয়ে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করাও অসম্ভব। প্রিন্স আন্দ্রু যে কোনদিন মস্কো পৌঁছে যাবে, বিয়ের পোশাকের ব্যবস্থা করতে হবে, মস্কোর নিকটস্থ জমিদারিটা বিক্রি করে দিতে হবে; তাছাড়া বুড়ো প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি মস্কোতে থাকতে থাকতেই ভাবী পুত্রবধূটিকে একবার দেখিয়ে দেবার সুযোগটাও হাতছাড়া করা যায় না। সেবার শীতকালে রস্তভদের মস্কোর বাড়িটা গরম রাখার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি, আর যেহেতু তারা খুব অল্প দিনের জন্যই এসেছে এবং কাউণ্টেসও তাদের সঙ্গে আসে নি, তাই কাউণ্ট স্থির করল মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না অখ্‌রসিমভার বাড়িতেই উঠবে; অনেকদিন ধরে মহিলা এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করছিল।

একদা সন্ধ্যার রস্তভদের চারখানি স্লেজ মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার পুরনো কোনিউশেনী স্ট্রীটের বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না একলাই থাকে। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে, আর ছেলেরা সকলেই চাকরি করে।

মহিলাটি এখনও বেশ খাড়া আছে, নিজের মতামত সকলকেই স্পষ্ট ভাষায় সোচ্চারে শুনিয়ে দেয়, কারও কোনরকম দুর্বলতা, আবেগ বা প্রলোভনকে কখনও ক্ষমা করে না।

রস্তভরা যখন এসে পৌঁছল তখনও মহিলাটি শুতে যায় নি। নাকের উপর চশমাটা ঝুলিয়ে মাথাটাকে পিছন দিকে হেলিয়ে হল-ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সে কঠোর, কঠিন দৃষ্টিতে নবাগতদের দিকে তাকাল। তাকে দেখে যেকেউ ভাবতে পারত যে যাত্রীদের উপর সে খুব রেগে গেছে এবং এখনই

তাদের তাড়িয়ে দেবে ; কিন্তু দেখা গেল সে চাকরদের ডেকে অতিথিদের থাকবার ও তাদের জিনিসপত্র রাখবার ব্যবস্থা করে দেবার নির্দেশ দিল।

কাউকে কোনরকম স্বাগত না জানিয়ে পোর্টম্যাণ্টোটা দেখিয়ে বলল, "কাউণ্টের মালপত্র ? ওগুলো এখানে নিয়ে এস। ছোট মেয়েরা ? তাদের বাঁ দিকে নিয়ে যাও।" দাসীদের বলল, "এখানে ঘোরাঘুরি করছ কেন ? যাও, সামোভারটা তৈরি কর।" নাতাশাকে কাছে টেনে বলল, "তুমি তো বেশ মোটাসোটা হয়েছ, আরও সুন্দরী হয়েছ।" কাউণ্টকে দেখে চেঁচিয়ে বলল, "ফুঃ! আপনি দেখছি ঠাণ্ডা হয়ে গেছেন! তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে নিন! এযে দেখছি অর্ধেক জমে গেছেন। চায়ের সঙ্গে দেবার জন্য খানিকটা রাম নিয়ে এস!…সোনিয়া সোনা, বঁজুর!"

পোশাক-আশাক পাল্টে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সকলে যখন চা খেতে এল তখন মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না পর পর সকলকেই চুমো খেল।

নাতাশার দিকে অর্থপূর্ণ চোখে তাকিয়ে বলল, "তোমরা যে এখানে এসেছ এবং আমার বাড়িতেই থাকছ সেজন্য আমি আন্তরিক খুসি হয়েছি। এই আসার মত সময়!…বুড়ো মানুষটি এসেছেন, তার ছেলেও যেকোন দিন এসে পড়বে। তার সঙ্গেও তো পরিচয় করতে হবে।" এই সময় সোনিয়ার দিকে চোখ পড়ায় তার সামনে এবিষয়ে কথা বলা ঠিক নয় বুঝতে পেরে বলে উঠল, "যাক গে, এসব কথা পরে হবে।…কাউণ্ট, এবার আপনি শুনুন। কাল আপনি কি চান? কাদের ডাকতে চান? শিন্‌শিন্?" সে একটা আঙুল বাঁকাল। নাকে-কাঁদুনি আন্না মিখায়লভ্না? তাহলে হল দুই। সঙ্গে তার ছেলেটিও আছে। তার তো বিয়ে! তারপর বেজুখভ, কি বলেন? সেও সস্ত্রীক এখানে এসেছে। সে তো বৌয়ের কাছ থেকে পালিয়ে এসেছিল, কিন্তু বৌও পিছু পিছু এসে হাজির। বুধবারে সে আমার সঙ্গে ডিনার খেয়েছে।" তারপর মেয়েদের দেখিয়ে বলল, "আর ওরা—ওদের আমি প্রথমে নিয়ে যাব ঈশ্বর-জননীর আইবেরীয় তীর্থে এবং সেখান থেকে "মহাবাটপাড়"দের (সম্ভবত দর্জির কথা বলা হয়েছে) যাবে। তোমার তো সবকিছুই নতুন চাই। আমাকে দেখে বিচার করো না: আজকাল আস্তিন এই মাপেরই হয়! এই তো সেদিন তরুণী প্রিন্সেস আইরিনা ভাসিলেভ্না আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল; সে একখানা দৃশ্য বটে—দেখে মনে হল যেন দুই হাতে দুটো পিপে পরেছে। তোমরা তো জান, প্রতিদিনই একটা না একটা নতুন ফ্যাশান দেখা দিচ্ছে।" তারপর কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করল, "আর আপনি নিজে কি করবেন?"

"কাজের উপর কাজ চেপে আছে: কাউণ্টেসের জন্য কম্বল কিনতে হবে, এদিকে আবার মস্কোর জমিদারি ও বাড়ির একজন ক্রেতা এসে হাজির। আপনি যদি অনুমতি করেন তো মেয়েদের আপনার কাছে রেখে আমি

একটা দিনের জন্য জমিদারি থেকে ঘুরে আসব।"

"ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমার কাছে তারা নিরাপদেই থাকবে। যেখানে তাদের যাওয়া দরকার সেখানে নিয়ে যাব, একটু-আধটু বকুনি দেব, আবার ভালও বাসব।"

পরদিন মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না মেয়েদের নিয়ে ঈশ্বর-জননীর পবিত্র স্থানে গেল এবং সেখান থেকে গেল "মহাবাটপাড়"-এর দোকানে; সে লোকটি মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকে এতই ভয় করে যে তাড়াতাড়ি তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য লোকসান দিয়েও তার পোশাক বানিয়ে দেয়। বিয়ের পুরো পোশাকটাই সেখানে বানাতে দেওয়া হল। বাড়ি ফিরে অন্য সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না নাতাশাকে নিজের কাছে রেখে দিল; তারপর নিজের হাতল-চেয়ারে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, "এবার আমরা কথা বলি। তোমার ভাবীবরের জন্য তোমাকে অভিনন্দন জানাই। একটি ভাল ছেলেকেই বরশিতে গেঁথেছ! তোমাকে নিয়ে আমি খুসি, এই এত্তটুকু বয়স থেকে তাকে আমি চিনি।" মাটি থেকে ফুট দুই উঁচুতে হাত রেখে সে বলল। নাতাশার মুখ সুখে আরক্তিম হয়ে উঠল। "তাকে এবং তার পরিবারের সকলেই আমি পছন্দ করি। এবার শোন! তুমি তো জান, বুড়ো প্রিন্স নিকলাস ছেলের বিয়েটা পছন্দ করছে না। বুড়ো একটু গোলমেলে মানুষ! অবশ্য প্রিন্স আন্‌দ্রু ছেলেমানুষ নয়, তাকে ছাড়াই সে চলতে পারে, কিন্তু বাবার অমতে কোন পরিবারে ঢোকাটা তো ভাল কথা নয়। লোকে শান্তিতে, ভালবাসার ভিতর দিয়েই সে কাজটা করতে চায়। তুমি তো বুদ্ধিমতী মেয়ে, কিভাবে কি করতে হয় তাও জান। দয়ালু হও, বুদ্ধি খরচ কর। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নাতাশা চুপ করে রইল; প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ভালবাসার ব্যাপারে অপর কেউ হস্তক্ষেপ করুক এটা সে পছন্দ করে না।

"দেখ, প্রিন্স আন্‌দ্রুকে আমি অনেকদিন থেকে জানি, তোমার ভাবী-ননদ মারিও আমার প্রিয়। 'ননদীরা কুটিলাই হয়ে থাকে', কিন্তু এটি একটা মাছির গায়েও কখনও হাত তুলবে না। সেই আমাকে বলেছে তোমাদের দুজনকে দেখা করিয়ে দিতে। কাল বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে। তার সঙ্গে খুব ভাল ব্যবহার করো: তুমি তো বয়সে তার থেকে ছোট। পরে 'সে' এসে দেখবে তার বোন ও বাবার সঙ্গে তোমার আগেই পরিচয় হয়েছে, আর তোমাকে তারা পছন্দ করেছে। ঠিক বলছি কি না? সেটাই কি ভাল হবে না?"

"হ্যাঁ, সেটাই ভাল হবে," নাতাশা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জবাব দিল।

অধ্যায়—৭

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার পরামর্শমত কাউণ্ট রস্তভ পরদিনই নাতাশাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতে গেল। কাউণ্ট কিন্তু খুসিমনে বাড়ি থেকে বের হল না, তার মনে যথেষ্ট ভয় ছিল। সৈন্যদলভুক্তিকরণের সময় বুড়ো প্রিন্সের সঙ্গে তার সর্বশেষ যে সাক্ষাৎ হয়েছিল তখনকার কথা তার খুব ভালই মনে আছে; প্রিন্সকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানালে তার জবাবে তারজন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের নাম না পাঠানোর জন্য তাকে প্রিন্সের সক্রোধ বকুনি শুনতে হয়েছিল। নাতাশার মেজাজ কিন্তু খুব খুসি; সব সেরা গাউনটি পরে মনে মনে ভাবছে: "তারা আমাকে পছন্দ না করেই পারে না; সকলেই তো সবসময় আমাকে পছন্দ করে; তারা যা চাইবে আমি তাই করব: তার বাবাকে ভালবাসব, তার বোনকে ভালবাসব; কাজেই তাদের তো আমাকে পছন্দ না করার কোন কারণ থাকতে পারে না····"

পুরনো বাড়িটার গাড়ি-বারান্দায় ঢুকেই কাউণ্ট আধা রসিকতা ও আধা আন্তরিকতার সঙ্গে বলে উঠল, "প্রভু আমাদের করুণা করুন।" কিন্তু নাতাশা লক্ষ্য করল, তার বাবা কেমন যেন ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছে; অত্যন্ত ভীরু গলায় জিজ্ঞাসা করল, প্রিন্স ও প্রিন্সেস বাড়ি আছে কি না।

তাদের নাম ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই চাকরদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। পরপর কয়েকজন পরিচারকের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের পরে শেষপর্যন্ত একটি বিরূপদর্শন বুড়ো পরিচারক রস্তভদের জানিয়ে দিল যে প্রিন্স কারও সঙ্গে দেখা করছে না, তবে তাদের এগিয়ে যেতে অনুরোধ করেছে। অতিথিদের প্রথম অভ্যর্থনা করল মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে। বাবা ও মেয়েকে বিশেষ ভদ্রতাসহকারে স্বাগত জানিয়ে তাদের প্রিন্সেসের ঘরে নিয়ে গেল। প্রিন্সেসকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল; মুখের এখানে-ওখানে লালের ছোপ ধরেছে; ছুটে এসে অতিথিদের সঙ্গে দেখা করল। প্রথম দৃষ্টিতে নাতাশাকে প্রিন্সেস মারির ভাল লাগল না। মনে হল, মেয়েটির পোশাক বড় বেশী কেতাদুরুস্ত, আচরণ বড় বেশী উচ্ছ্বসিত, একটু বা দাম্ভিকও। নাতাশার রূপ, যৌবন ও সুখের প্রতি নারীসুলভ ঈর্ষা ছাড়াও এই মুহূর্তে তার প্রতি প্রিন্সেস মারির মনোভাব প্রসন্নও ছিল না। কারণ তাদের আসার কথা শুনেই বুড়ো প্রিন্স চীৎকার করে বলে দিয়েছে সে তাদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না; প্রিন্সেস মারির ইচ্ছা হলে সে দেখা করতে পারে, কিন্তু তাদের যেন কোনমতেই হাজির করা না হয়। সে দেখা করাই স্থির করেছে, কিন্তু তার মনে সর্বক্ষণই আশংকা রয়েছে, প্রিন্স রস্তভদের আগমনে এতই চটে আছে যার ফলে যেকোন সময়ে সে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসতে পারে।

"লক্ষ্মী প্রিন্সেস, এই নাও, আমার গায়ক পাখিটিকে তোমার কাছে এনে

দিলাম," পাছে বুড়ো প্রিন্স এসে হাজির হয় এই ভয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে মাথা নুইয়ে কাউণ্ট বলল। "তোমাদের যে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হতে চলেছে এতে আমি কত যে খুসি হলাম···বড়ই দুঃখের কথা যে প্রিন্স এখনও অসুস্থ।" এই ধরনের আরও কিছু মামুলি কথা বলে সে উঠে দাঁড়াল। "প্রিন্সেস, তুমি যদি অনুমতি কর তো নাতাশাকে মিনিট পনেরোর জন্য তোমার কাছে রেখে যাই। আমি গাড়িটা নিয়ে একবার আন্না সেমেনভ্‌নার সঙ্গে দেখা করে আসব, এই কাছেই, ডগ'স্‌ স্কোয়ারে, তারপর ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব···"

পরে কাউণ্ট মেয়েকে বলেছিল যে তাদের দুজনকে মন খুলে কথাবার্তা বলার সুযোগ করে দিতেই সে এই চালটি চেলেছিল, কিন্তু আসলে সে যে বুড়ো প্রিন্সের সঙ্গে দেখা হবার ভয়েই কেটে পড়েছিল সে সত্যি কথাটা মেয়ের কাছে বলে নি। যাই হোক, প্রিন্সেস কাউণ্টকে জানাল যে আনন্দের সঙ্গে সে নাতাশাকে তার কাছে রাখবে, আর কাউণ্ট যেন যতক্ষণ ইচ্ছা আন্না সেমেনভ্‌নার সঙ্গে কাটিয়ে আসে। কাউণ্ট চলে গেল।

প্রিন্সেস মারি নাতাশার সঙ্গে একটু নিভৃতেই কথাবার্তা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ সেই ঘরেই বসে রইল এবং মস্কোর আমোদ-প্রমোদ ও থিয়েটার নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিল। নাতাশার মনে হল প্রিন্সেস যেন দয়া করে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছে; তাই তাকে তার মোটেই ভাল লাগল না। হঠাৎ সে যেন নিজের মধ্যে কেমন গুটিয়ে গেল, আর তাতে প্রিন্সেস মারির মেজাজও খিচড়ে গেল। মিনিট পাঁচেক বিরক্তিকর আলোচনার পরেই তারা শুনতে পেল চটি-পরা পায়ের জোরালো শব্দ। প্রিন্সেস মারি ভয় পেয়ে গেল। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল বুড়ো প্রিন্স, পরনে ড্রেসিং-গাউন, মাথায় সাদা নৈশ-টুপি।

ঢুকেই সে বলতে শুরু করল, "আহা, মাদাম!···মাদাম, কাউণ্টেস···কাউণ্টেস রস্তভা, অবশ্য আমার যদি না হয়ে থাকে···দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর···আমি জানতাম না মাদাম। ঈশ্বর সাক্ষী, তুমি যে দর্শন দিয়ে আমাদের সম্মানিত করেছ তা আমি জানতাম না; এ পোশাকে এসেছি শুধু আমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে···অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ঈশ্বর সাক্ষী, আমি জানতাম না—" ঈশ্বর শব্দটার উপর এমন অস্বাভাবিক ও অপ্রীতিকরভাবে জোর দিয়ে সে বার বার কথা বলতে লাগল যে প্রিন্সেস মারি আনত চোখে দাঁড়িয়ে রইল—না পারল বাবার দিকে তাকাতে, না নাতাশার দিকে।

নাতাশা দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানাল বটে, কিন্তু তারপর যে কি করবে তা বুঝতে পারল না। শুধু মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর মুখে স্মিত হাসির রেখা দেখা দিল।

"দয়া করে আমাকে ক্ষমা কর, ক্ষমা কর! ঈশ্বর সাক্ষী, আমি জানতাম

না," বলতে বলতে নাতাশাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুড়ো কাউন্ট বেরিয়ে গেল।

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁই প্রথম এই ভূত-দেখার আতংক কাটিয়ে উঠতে পারল। সে প্রিন্সের অসুস্থতার কথা বলতে লাগল। নাতাশা ও প্রিন্সেস মারি নিঃশব্দে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল, আর যা বলতে চাইছে তা বলতে না পেরে যত বেশীক্ষণ সেভাবে থাকল ততই পরস্পরের প্রতি বিরূপতা বেড়েই চলল।

কাউন্ট ফিরে এলে নাতাশা চলে যাবার জন্য দৃষ্টিকটু রকমের তাড়াতাড়ি করতে লাগল; সেইমুহূর্তে বয়স্কা প্রিন্সেসটির প্রতি তার মনে ঘৃণা দেখা দিল; আধ ঘণ্টার আলোচনার মধ্যে সে একবারও প্রিন্স আন্দ্রুর নামটা পর্যন্ত উল্লেখ করল না। নাতাশা ভাবল, "এই ফরাসী মহিলাটির সামনে আমি তো তার কথা তুলতে পারি না।" সেই একই চিন্তা প্রিন্সেস মারিকেও বিঁধছিল। নাতাশাকে কি বলা উচিত ছিল তা সে জানে, কিন্তু সেকথা সে বলতে পারে নি, কারণ মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ তাতে বাদ সেধেছে। যেকারণেই হোক, বিয়ের কথাটা সে তুলতে পারে নি।

কাউন্ট যখন ঘর থেকে চলে যাচ্ছে তখন প্রিন্সেস মারি তাড়াতাড়ি নাতাশার কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল:

"দাঁড়াও, আমি বলতে চাই⋯⋯"

অকারণেই নাতাশা বিদ্রূপের চোখে তার দিকে তাকাল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "প্রিয় নাতালি, আমি তোমাকে বলতে চাই, দাদা যে তোমাকে পেয়ে সুখী হয়েছে তাতে আমি খুসি⋯"

সে থামল; তার মনে হল, সে সত্যি কথা বলছে না। নাতাশা সেটা লক্ষ্য করল; তার কারণও অনুমান করল।

চোখের জলে গলা আটকে এলেও বাহ্যিক মর্যাদার গুরুত্বের সঙ্গে নির্বিকার স্বরে সে বলল, "আমি মনে করি প্রিন্সেস, সেকথা বলার মত সময় এটা নয়।"

কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তার মনে হল, "এ আমি কি বললাম—এ আমি কি করলাম?"

সেদিন ডিনারের সময় সকলেই নাতাশার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। নিজের ঘরে বসে সে শিশুর মত কাঁদছে; নাক ঝাড়ছে আর ফোঁপাচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে সোনিয়া তার চুলে চুমো খাচ্ছে।

সে শুধাল, "নাতাশা, কেন এমন করছ? তাদের নিয়ে তোমার কি যায়-আসে? এসব কেটে যাবে নাতাশা।"

"কিন্তু তুমি যদি জানতে সেটা কতবড় দোষের ব্যাপার⋯আমি যেন⋯⋯"

"ও কথা বলো না নাতাশা। সেটা তো তোমার দোষ নয়, তাহলে তুমি কেন ভাবছ? আমাকে চুমো খাও," সোনিয়া বলল।

নাতাশা মুখ তুলে বন্ধুর ঠোঁটে চুমো খেয়ে নিজের ভেজা মুখটা তার মুখের উপর চেপে ধরল।

বলল, "আমি বলতে পারছি না, আমি জানি না। কারও দোষ নেই, সব দোষ আমার। কিন্তু এ আঘাত যে ভয়ংকর। ওঃ, কেন সে আসছে না?....."

চোখ লাল করে সে ডিনারে এল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না সবই জানত; তবু সে এমন ভান করতে লাগল যেন নাতাশার এই বিপর্যস্তভাব তার চোখেই পড়ে নি; সে গলা ছেড়ে কাউন্ট ও অন্য অতিথিদের সঙ্গে হাসি-তামাসা শুরু করে দিল।

অধ্যায়—৮

সেদিন সন্ধ্যায় রস্তভরা অপেরায় গেল; মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না আগে থেকেই একটা বক্সের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

নাতাশা যেতে চায় নি, কিন্তু মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারল না। সেজেগুজে নাচ-ঘরে এসে বাবার জন্য অপেক্ষা করতে করতে বড় আয়নাটার দিকে তাকিয়ে দেখল সে তো সুন্দরী, খুব সুন্দরী; সঙ্গে সঙ্গে তার দুঃখ আরও বেড়ে গেল, কিন্তু সে দুঃখ বড় মধুর, বড় মিষ্টি।

"হে ঈশ্বর, সে যদি এখানে থাকত তাহলে আমি ওরকম আচরণ করতাম না, ভিন্ন রকম আচরণ করতাম,। বোকার মত সবকিছুতে ভয় পেতাম না, শুধু তাকে আলিঙ্গন করতাম, তাকে জড়িয়ে ধরতাম, জিজ্ঞাসু চোখ মেলে সে আমাকে দেখত, আর আগেকার মতই হাসত। আর তার চোখ দুটি—সে চোখ যেন আমি দেখতে পাচ্ছি!" নাতাশা ভাবতে লাগল। "তার বাবা ও বোনকে নিয়ে আমার কিসের মাথাব্যথা? আমি শুধু তাকেই ভালবাসি, তাকে, তাকে, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই হাসি, পুরুষসুলভ অথচ শিশুর মত।...না, না, তার কথা এখন ভাবব না; শুধু ভাবব না নয়, তাকে ভুলে থাকব, আপাতত সম্পূর্ণ ভুলে থাকব। এই অপেক্ষা করে থাকা আর সহ্য করতে পারছি না; এখনই কেঁদে ফেলব!" অনেক কষ্টে কান্না চেপে সে আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

গাড়িতে বাবার পাশে বসে বিষণ্ন চিত্তে সে দেখতে লাগল রাস্তার বাতিগুলো বরফ-ঢাকা জানালার উপর ঝিকমিক করছে; দেখতে দেখতে তার দুঃখ আরও বেড়ে গেল, ভালবাসার চিন্তায় আরও বেশী করে ডুবে গেল; কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে যাচ্ছে তাও ভুলে গেল। অন্য সব গাড়ির মাঝখানে পড়ে তাদের গাড়িটাও বরফের উপর দিয়ে খচ্‌-মচ্‌ করে এগিয়ে চলল।

থিয়েটারে পৌঁছে নাতাশা ও সোনিয়া পোশাক উঁচু করে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে নেমে পড়ল। পরিচারকরা কাউণ্টকে ধরে নামিয়ে দিল। বারান্দা পার হয়ে অন্য দর্শকদের সঙ্গে তারা তিনজনও প্রথম সারির বক্সগুলোর দিকে এগিয়ে গেল। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে বাজনার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটি পরিচারক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বক্সের দরজা খুলে দিল। বাজনা উচ্চতর হল। এখনও যবনিকা ওঠে নি; বাজনা বাজছে।

সোনিয়া বলল, "ঐ দেখ, আলেনিয়া ও তার মা, তাই না?"

কাউণ্ট বলল, "আরে, মাইকেল কিরিলভিচ দেখছি আরও শক্ত-সমর্থ হয়েছে!"

"আন্না মিখায়লভ্‌নাকে দেখ—চুল বাঁধার কী ছিরি!"

"ঐ তো কুরাগিনরা, জুলি—আর তাদের সঙ্গে বরিস। দেখলেই বোঝা যায় যে ওদের পূর্বরাগ চলছে…"

"দ্রুবেৎস্কয় কি বিয়ের প্রস্তাব করেছে?"

"হ্যাঁ, আজই তো শুনলাম," রস্তভদের বক্সে এসে শিন্‌শিন্‌ বলে উঠল।

একটি লম্বা, সুন্দরী নারী পাশের বক্সটাতে ঢুকল। তার মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ চুলের বিনুনি, ফোলা-ফোলা সাদা গলা ও ঘাড়ের অনেকখানি খোলা, তাতে দুই লহর বড় বড় মুক্তোর মালা জড়ানো। ভারী রেশমী পোশাকের খস্‌ খস্‌ আওয়াজ তুলে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে সে তার বক্সে জাঁকিয়ে বসল।

নাতাশার দৃষ্টি আপনা থেকেই মহিলাটির গলা, ঘাড় ও মুক্তোগুলোর উপর পড়ল। দ্বিতীয়বার সেদিকে তাকাতেই মহিলাটিও ঘাড়টা ফেরাল, এবং কাউণ্টের সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় মাথা নেড়ে হাসল। মহিলাটি পিয়েরের স্ত্রী কাউণ্টেস বেজুখভা। কাউণ্ট সমাজের সকলকেই চেনে; ঝুঁকে পড়ে মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

"কাউণ্টেস কি এখানে অনেক দিন এসেছেন? যাব, যাব, আপনার হাতে চুমো খেতে যাব! এখানে একটা কাজে এসেছি, সঙ্গে আমার মেয়েরাও এসেছে। ওরা বলল, সেমেনভ্‌না আশ্চর্য অভিনয় করেন। কাউণ্ট পিয়ের তো কখনও আমাদের কথা ভোলেন না। তিনিও কি এখানে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, তারও আসার কথা," জবাবটা দিয়ে হেলেন মনোযোগের সঙ্গে নাতাশার দিকে তাকাল।

কাউণ্ট রস্তভ ভালভাবে আসনে বসল।

নাতাশার কানে কানে বলল, "সুন্দরী, তাই না?"

নাতাশা জবাব দিল, "আশ্চর্য! এমন নারীর সঙ্গে সহজেই প্রেমে পড়া যায়।

ঠিক সেই সময় বাজনা থেমে গেল। বিলম্বে আগত দর্শকরা তাড়াতাড়ি আসনে বসে পড়ল। যবনিকা উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে বক্সের ও স্টলের সকলেই একেবারে চুপ হয়ে গেল। যুবক ও বৃদ্ধ, ইউনিফর্মধারী ও সান্ধ্য পোশাকে সজ্জিত সকল পুরুষ, এবং খালি গলায় ও বুকে মণিমুক্তা ছড়ানো সকল নারী সাগ্রহ কৌতূহলে মঞ্চের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করল। নাতাশাও সেইদিকেই দৃষ্টি ফেরাল।

অধ্যায়—৯

রঙ্গমঞ্চের মেঝেটা মসৃণ বোর্ড দিয়ে তৈরি; দুই পাশেও গাছপালা আঁকা কার্ডবোর্ড, আর পিছনে বোর্ডের উপর পর্দা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের মাঝখানে লাল বডিস ও সাদা স্কার্ট পরা কতকগুলি মেয়ে বসে আছে। সাদা রেশমী পোশাক পরা একটি মোটাসোটা মেয়ে একপাশে একটা নীচু বেঞ্চিতে বসে আছে; বেঞ্চিটার পিছনে একটুকরো সবুজ কার্ডবোর্ড আঠা দিয়ে আটকে দেওয়া হয়েছে। তারা সকলে কি যেন গাইছে। গান শেষ হলে শ্বেতবসনা মেয়েটি প্রম্পটারের বক্সের দিকে এগিয়ে গেল, আর আঁটোসাটো রেশমী ট্রাউজার পরা একটা লোক পালক ও ছুরি হাতে নিয়ে মেয়েটির কাছে এসে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে গান গাইতে লাগল।

প্রথমে লোকটি একা গাইল, তারপর মেয়েটি গাইল, তারপর দুজনই থামল আর অর্কেস্ট্রা বাজতে লাগল। তারপর দুজনে একসঙ্গে গাইতে লাগল, আর থিয়েটারের প্রতিটি লোক হাততালি দিয়ে হৈ-চৈ করে উঠল; পুরুষ ও মেয়েটি হাসতে হাসতে দুই হাত ছড়িয়ে অভিবাদন জানাল।

নাতাশা একে গ্রাম থেকে এসেছে, তার উপর বর্তমানে তার মনের যা অবস্থা, তাতে এসব কিছুই নাতাশার কাছে অদ্ভুত ও বিস্ময়কর মনে হল। সে অপেরাটা বুঝতেই পারল না, বাজনাও তার কানে গেল না, সে শুধু দেখতে লাগল বিচিত্র পোশাক পরা কিছু নরনারী মঞ্চের উজ্জ্বল আলোয় চলাফেরা করছে। রঙিন কার্ডবোর্ডগুলোও তার চোখে পড়ল। সে তো জানে এ সবই মিথ্যা ও অস্বাভাবিক; তাই প্রথমে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জন্য লজ্জা বোধ করলেও পরে তার বেশ মজা লাগল।

একসময়ে গান শুরু হবার আগে সকলেই যখন চুপচাপ এমন সময় মস্তভদের বক্সের কাছাকাছি দিকের স্টলে ঢুকবার দরজাটা ক্যাঁচ-কাঁচ শব্দ করে খুলে গেল, আর একজন বিলম্বে আগত দর্শকের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শিন্‌শিন্ ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ঐ কুরাগিন এলেন!" কাউণ্টেস বেজুখভা নবাগতের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল; নাতাশা তাকিয়ে দেখল, একজন অসাধারণ সুদর্শন অ্যাড্‌জুটাণ্ট তাদের বক্সের দিকেই এগিয়ে আসছে। অনেকদিন আগে পিতার্সবুর্গের একটি বল-নাচের আসরে নাতাশা আনাতোল কুরাগিনকে দেখেছে। এখন তার পরিধানে অ্যাড্‌জুটাণ্টের ইউনিফর্ম, তাতে একটি স্কন্ধত্রান ও একটি স্কন্ধ-গিঁট বসানো। তখন

অভিনয় চলছে; তরবারি ও জুতোর স্পুরের শব্দ তুলে কার্পেট-পাতা পথের উপর দিয়ে সে এগিয়ে এল। নাতাশার দিকে একবার তাকিয়ে সে তার বোনের কাছে গেল, দস্তানা-পরা হাতটা তার বক্সের কোণায় রেখে মাথাটা নেড়ে নাতাশাকে দেখিয়ে কি যেন জিজ্ঞাসা করল। তারপর স্টলের প্রথম সারিতে দলখভের পাশে বসে বন্ধুর মত কনুই দিয়ে তাকে একটা গুঁতো মারল।

কাউণ্ট বলল, "বোন আর ভাই ঠিক একরকম দেখতে। দুজনই কী সুন্দর!"

প্রথম অংক শেষ হল। স্টলের দর্শকরা নড়াচড়া শুরু করে দিল, কেউ বাইরে গেল, কেউ ঢুকল।

বরিস রস্তভদের বক্সে এল; তাদের অভিনন্দনকে সহজভাবে গ্রহণ করল; ভুরু দুটো তুলে অন্যমনস্ক হাসির সঙ্গে নাতাশা ও সোনিয়াকে বিয়েতে তার বাকদত্তার আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখান থেকে সরে গেল। যে বরিসের সঙ্গে নাতাশা একদিন প্রেমে পড়েছিল তারই আসন্ন বিয়ে উপলক্ষ্যে নাতাশা তাকে অভিনন্দন জানাল।

স্বল্পবাসপরিহিতা হেলেন তার পাশেই বসে প্রত্যেককে দেখে একই হাসি হাসছে; বরিসকেও সেই একই হাসি সে উপহার দিল।

দ্বিতীয় অংকে একটা কবরখানার দৃশ্য দেখা গেল। ক্যানভাসের মধ্যে একটা গোল গর্ত করে চাঁদের আদল আনা হয়েছে; পাদপ্রদীপের আলোগুলো ঢেকে দেওয়া হয়েছে; শিঙার গম্ভীর শব্দের তালে তালে কালো জোব্বা পরা একদল লোক ছুরি হাতে নিয়ে দু'দিক থেকে মঞ্চে ঢুকল। তারপর আরও কিছু লোক এখন হাল্কা নীল পোশাক পরা সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে টানতে টানতে ছুটে এল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তাকে টেনে নিয়ে গেল না, অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে গান করল, তারপর তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। দৃশ্যের অন্তরালে তিনবার ধাতব শব্দ হল এবং প্রত্যেকে নতজানু হয়ে প্রার্থনা-সঙ্গীত গাইতে লাগল। আর এসব কিছুর মাঝে মাঝেই শোনা গেল শ্রোতাদের সোৎসাহ চীৎকার।

দ্বিতীয় অংক শেষ হবার পরে কাউণ্টেস বেজুখভা রস্তভদের বক্সের কাছে এগিয়ে গেল—তার বুকটা সম্পূর্ণ খোলা—বুড়ো কাউণ্টকে দস্তানা-পরা আঙুলে ইসারা করে অন্য কারও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে লাগল।

বলল, "আপনার মনোরমা কন্যাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিন। সারা শহর তো তাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অথচ আমি তাদের চিনিও না।"

নাতাশা দাঁড়িয়ে কাউণ্টেসকে অভিবাদন জানাল। এই সুন্দরীর প্রশংসায় তার মুখটা খুসিতে লাল হয়ে উঠেছে।

হেলেন বলল, "এখন তো আমিও মস্কোপন্থী হতে চাই। কিন্তু এমন সব মণিমুক্তোকে গ্রামের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছেন এতে আপনার লজ্জা করে না?"

আকর্ষণীয় নারীত্বের খ্যাতি কাউণ্টেস বেজুখভার আছে। যা তার মনের কথা নয়—বিশেষত সেটা স্তুতিবচন হয়—সেটাকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে সে বলতে পারে।

"প্রিয় কাউণ্ট, আমি কিন্তু আপনার মেয়েদের দেখাশুনার ভার নিলাম। যদিও এ যাত্রায় আমি এখানে বেশীদিন থাকছি না—আপনারাও থাকছেন না—তবু তাদের খুসি রাখতে চেষ্টা করব।" চিরাচরিত মধুর হাসি হেসে নাতাশাকে বলল, "পিতার্সবুর্গে তোমার কথা অনেক শুনেছি; তখন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা। তোমার কথা দ্রুবেৎস্কয়ার কাছেও শুনেছি। তুমি কি শুনেছ সে বিয়ে করছে? তাছাড়া, আমার স্বামীর বন্ধু, বল্‌কন্‌স্কি, প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্‌কন্‌স্কির কাছেও শুনেছি।"

তৃতীয় অংকে একটি রাজপ্রাসাদের দৃশ্য: অনেক মোমবাতি জ্বলছে, আর দেয়ালে ছোট দাঁড়িওয়ালা অনেক নাইটের ছবি ঝুলছে। মাঝখানে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সম্ভবত রাজা ও রাণী। ডান হাত দুলিয়ে খারাপ সুরে একটা গান গেয়ে রাজা লাল রঙের সিংহাসনে বসে পড়ল। যে কন্যাটি প্রথমে সাদা পোশাক ওপরে হাল্কানীল পোশাক পরেছিল, এখন তার পরনে শুধু একটা ঢিলে জামা। চুল ছড়িয়ে দিয়ে সে সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাণীকে উদ্দেশ করে সে একটা করুণ গান করল, কিন্তু রাজা কঠোরভাবে হাত নাড়তেই দু'দিক থেকে ছুটে এল নরনারীর দল, এবং সকলে একসঙ্গে নাচতে লাগল। তারপর কর্কশ সুরে বেহালা বেজে উঠল, আর মোটা পা ও শুকনো হাতওয়ালা একটি স্ত্রীলোক হঠাৎ উইংসের পাশে চলে গেল, এবং বডিসটা ঠিক করে নিয়ে আবার মঞ্চের মাঝখানে এসে এক পায়ের উপর আরেক পা ঠুকে লাফাতে শুরু করে দিল। স্টলের প্রতিটি লোক হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "সাবাস!" তখন একটি লোক মঞ্চের এককোণে চলে গেল। অর্কেস্ট্রার করতাল ও শিঙা আরও উচ্চ নিনাদে বাজতে লাগল, আর সেই লোকটি খালি পায়ে লাফ দিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে অতি দ্রুত পা দুটো দোলাতে লাগল। (লোকটি দুপোর্ত; এই খেলাটা দেখাবার জন্য বছরে সে ষাট রুবল পায়।) স্টলে, বক্সে, ও গ্যালারিতে সকলেই হাততালি দিয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল, আর লোকটি থেমে হাসতে হাসতে সকলকে অভিনন্দন জানাল। তারপর রাজা বাজনার তালে তালে চীৎকার করে উঠতেই সকলে গান ধরল। কিন্তু তখনই হঠাৎ ঝড় উঠল, অর্কেস্ট্রায় ভীষণ-মধুর সুর বাজতে লাগল, সকলে ছুটে চলে গেল; যবনিকা নেমে এল। শ্রোতাদের মধ্যে আবার হৈ-হট্টগোল শুরু হল; সকলের মুখেই উচ্ছ্বসিত চীৎকার: "দুপোর্ত! দুপোর্ত! দুপোর্ত!" নাতাশার কাছে এখন আর

এসব বিস্ময়কর মনে হচ্ছে না। আনন্দে হাসতে হাসতে খুসি মুখে সে চারদিকে তাকাতে লাগল।

"দুপোর্ত খুব মজাদার নয়?" হেলেন শুধাল।

"হ্যাঁ," নাতাশা জবাব দিল।

অধ্যায়—১০

বিরতির সময় হেলেনের বক্সে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এল, দরজাটা খুলে গেল, ঘরে ঢুকল আনাতোল।

অস্বস্তির সঙ্গে নাতাশার উপর থেকে চোখ সরিয়ে আনাতোলের দিকে তাকিয়ে হেলেন বলল, "আমার ভাইয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।"

নাতাশা মুখ ঘুরিয়ে সুন্দর যুবক অফিসারটির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তার পাশেই বসে পড়ে আনাতোল জানাল, এই পরিচয়ের সৌভাগ্যের জন্য অনেকদিন থেকেই সে অপেক্ষা করে ছিল। অভিনয় সম্পর্কে নাতাশার অভিমত জানতে চেয়ে কুরাগিন আরও জানাল, আগের একটা অভিনয়কালে সেমেনভ্‌না মঞ্চের উপর পড়ে গিয়েছিল।

তারপরই হঠাৎ পুরনো পরিচিত বন্ধুর মত সুরে বলে উঠল, "জানেন কাউণ্টেস, আমরা একটা সাজগোজ—প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি; আপনাকে তাতে অবশ্যই যোগ দিতে হবে! খুব মজা হবে। আমরা সব্বাই কারাগিনদের বাড়িতে মিলিত হব। দয়া করে আপনিও আসুন! না! সত্যি?"

কথা বলার সময় সে কিন্তু একটি মুহূর্তের জন্যও নাতাশার মুখ, গলা ও খোলা বাহুর উপর থেকে সহাস্য চোখ দুটি সরাল না। নাতাশা নিশ্চিত জানে, তাকে দেখে আনাতোল মুগ্ধ হয়েছে। এতে সে খুসি হল, কিন্তু তার উপস্থিতিতে কেমন যেন বিব্রতবোধ করতে লাগল।

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ। সেই নীরবতা ভাঙতে নাতাশাই জিজ্ঞাসা করল, মস্কো তার কেমন লাগছে। প্রশ্নটা করেই সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। সারাক্ষণই তার মনে হল যে এই লোকটির সঙ্গে কথা বলে সে অনুচিত কাজ করছে। আনাতোল কিন্তু তাকে উৎসাহ দেবার জন্য হাসতে লাগল।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নাতাশার দিকে তাকিয়ে বলল, "প্রথম প্রথম খুব ভাল লাগে নি, কারণ একটা শহর তো ভাল লাগে তার সুন্দরীদের জন্য, তাই নয় কি? সাজগোজ-প্রতিযোগিতায় আসছেন তো কাউণ্টেস? অবশ্যই আসবেন!" তারপর গলা নামিয়ে বলল, "সেখানে আপনিই হবেন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা। প্রিয় কাউণ্টেস, অবশ্যই আসবেন, আর প্রতিশ্রুতি হিসাবে আপনার ফুলের স্তবকটা আমাকে দিন!"

তার কথাগুলি নাতাশা ঠিক বুঝতে পারল না, কিন্তু এটা বুঝল যে তার এই দুর্বোধ্য কথাগুলির একটা অশুভ অভিপ্রায় আছে। কি বলবে বুঝতে না পেরে যেন কথাগুলি শুনতেই পায় নি এমনিভাবে সে মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু মুখ ফেরানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে হল, লোকটি তো সেখানেই আছে, তার পিছনেই আছে, খুব কাছেই আছে।

"এখন তার মনের কি ভাব? সে কি বিচলিত? ক্রুদ্ধ? আমার কি উচিত শুধরে নেওয়া?" নিজেকেই প্রশ্নগুলি করে সে আবার মুখটা না ফিরিয়ে পারল না। সে সোজা আনাতোলের চোখের দিকে তাকাল, আর তার নৈকট্য, আত্ম-প্রত্যয় ও মধুর হাসি নাতাশাকে জয় করে নিল। আনাতোলের মত নাতাশাও তার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। আর পুনরায় সে সভয়ে অনুভব করল যে তাদের মধ্যে আর কোন ব্যবধান রইল না।

আবার যবনিকা উঠল। শান্ত, খুসি মনে আনাতোল চলে গেল। যে পৃথিবীতে সে এখন আছে তাকে মেনে নিয়ে নাতাশা বাবার পাশে আর একটা বক্সে গিয়ে বসল। তার মনে হল, এই মুহূর্তে তার চোখের সামনে যা ঘটছে সেটাই একান্ত স্বাভাবিক, কিন্তু অপরদিকে তার বাকদত্ত প্রণয়ী, প্রিন্সেস মারি, বা গ্রামের জীবনের আগেকার চিন্তা-ভাবনাগুলি মোটেই তার মনে পড়ল না, বরং তার মনে হল সেসব যেন কোন্ দূর অতীতের ঘটনা।

চতুর্থ অংকে একটা শয়তান এসে হাত দুলিয়ে নাচতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত পায়ের নীচ থেকে বোর্ডটা সরিয়ে নেওয়া হলে সে মঞ্চের নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। চতুর্থ অংকের মাত্র এই অংশটাই নাতাশা দেখতে পেল; সে তখন উত্তেজনায় ও যন্ত্রণায় অভিভূত, আর তার কারণ কুরাগিন; নাতাশা তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারছিল না। থিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আনাতোল এগিয়ে এসে গাড়ি ডেকে দিল, তাদের গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল। নাতাশাকে তুলে দেবার সময় সে নাতাশার কনুইয়ের উপর বাহুতে চাপ দিল। উত্তেজিত ও লজ্জিত হয়ে নাতাশা ঘুরে দাঁড়াল। আনাতোল মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাড়িতে ফিরে তবে নাতাশা সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার করে ভাবতে পারল। হঠাৎ প্রিন্স আন্দ্রুর কথা স্মরণ করে সে আতংকিত হয়ে উঠল। অপেরা থেকে ফিরে সকলেই চা খেতে বসেছিল। নাতাশা হঠাৎ চীৎকার করে উঠে মুখলাল করে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নিজের মনেই বলল, "হা ঈশ্বর! আমার সর্বনাশ হয়েছে! কেমন করে তাকে আস্কারা দিলাম?" দুই হাতে মুখ ঢেকে অনেকক্ষণ বসে রইল। কিন্তু তার মাথায় কিছুই আসছে না। সবকিছুই অন্ধকার, অস্পষ্ট, ভয়ংকর।

উজ্জ্বল আলোকিত থিয়েটারে বসে ডুপোর্ত-এর অভিনয় দেখতে দেখতে যাকে মনে হয়েছিল সহজ, সরল, এখন একাকি বসে তাকেই মনে হচ্ছে দুর্বোধ্য। "এটা কি ? তার সম্পর্কে যে আতংক আমি বোধ করেছিলাম সেটাই বা কি ? এখন এই যে বিবেকের দংশন অনুভব করছি এটাই বা কি ?" সে ভাবতে লাগল।

রাতে বিছানায় শুয়ে মনের সব কথা শুধু মাকেই খুলে বলা যায়। সোনিয়াকে বলে কোন লাভ নেই ; হয় সে কিছুই বুঝবে না, আর না হয় তো সব কথা শুনে আতংকে শিউরে উঠবে। কাজেই নাতাশা নিজের এই যন্ত্রণার কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।

"নিজেকে কি আন্দ্রুর ভালবাসার অনুপযুক্ত করে তুলেছি ?" নিজেকে প্রশ্নটা করেই সান্ত্বনা খুঁজতে আবার নিজেই জবাব দিল : "আমি কী বোকা যে এই প্রশ্ন করছি। আমার কি হয়েছে ? কিছু হয় নি। আমি কিছুই করি নি, তাকে মোটেই আস্কারা দেই নি। কেউ কিছু জানবে না, আমিও আর কখনও তার সঙ্গে দেখা করব না।…কাজেই একটা কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে কিছুই ঘটে নি, অনুশোচনা করবারও কিছু নেই, আর আন্দ্রে এখনও আমাকে ভালবাসতে পারে। কিন্তু "এখনও" কথাটা বলছি কেন ? হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, সে কেন এখানে নেই ?" মুহূর্তকাল নিজেকে শান্ত রাখলেও পুনরায় কে যেন তাকে বলতে লাগল যে এসব কিছু সত্য হলেও, কিছু না ঘটে থাকলেও, প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি তার ভালবাসার সেই পবিত্রতার মৃত্যু ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার যেন সে কল্পনায় কুরাগিনের সঙ্গে তার কথাবার্তার সবটাই শুনতে পেল, এবং সেই সাহসী সুদর্শন মানুষটি যখন তার বাহুতে চাপ দিয়েছিল তার তখনকার সেই মুখ, সেই ভঙ্গী, সেই মিষ্টি হাসি সবই সে আবার দেখতে পেল।

অধ্যায়—১১

আনাতোল কুরাগিন এখন মস্কোতে বাস করছে কারণ তার বাবাই তাকে পিতার্সবুর্গ থেকে এখানে পাঠিয়েছে। পিতার্সবুর্গে সে বছরে নগদে খরচ করছিল বিশ হাজার রুবল, এবং সমপরিমাণ আরও যেসব ধার-কর্জ করছিল ঋণ দাতারা সে টাকাটা তার বাবার কাছেই দাবী করছিল।

বাবা তাকে জানিয়ে দিয়েছে, এই শেষবারের মত তার ঋণের অর্ধেক টাকা সে শোধ করে দেবে, তবে এক শর্তে যে প্রধান সেনাপতির অ্যাড্জুটান্ট হয়ে তাকে মস্কো চলে যেতে হবে—এ চাকরিটাও বাবাই যোগাড় করে দিয়েছে—এবং সেখানে একটি ভাল মেয়ের খোঁজ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে বাবা প্রিন্সেস মারি ও জুলি কারাগিন-এর নামও উল্লেখ করেছে।

বাবার কথা মেনে নিয়ে আনাতোল মস্কো চলে এসেছে এবং পিয়েরের

বাড়িতে উঠেছে। পিয়ের প্রথমে অনিচ্ছা সত্ত্বেই তাকে স্বাগত জানিয়েছিল, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে; এমন কি কখনও কখনও তার সঙ্গে পান-ভোজন করতেও যায়, এবং ঋণের নামে তাকে টাকাও যোগায়।

শিন্‌শিন্ তো আগেই বলেছে, এখানে এসেই আনাতোল মস্কোর মহিলাদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিয়েছে; বিশেষকরে তাদের অবজ্ঞা করে এবং তাদের পরিবর্তে জিপ্‌সি মেয়েদের ও ফরাসী অভিনেত্রীদের সঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিয়ে—শোনা যায় অভিনেত্রী-প্রধানা মাদ্‌ময়জেল জর্জেসের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নাকি একটু বেশী ঘনিষ্ঠ। কোন পান-ভোজনের আসর সে বাদ দেয় না, সারা রাত মদ খায়, উঁচু মহলের সব বল-নাচের আসরে ও পার্টিতে সর্বদা হাজির থাকে। কোন কোন মহিলার সঙ্গে তার গোপন মেলামেশার কথাও উঠেছে। কিন্তু সে কখনও অবিবাহিতা মেয়েদের, বিশেষ করে ধনবতী উত্তরাধিকারিণীদের পিছনে ছোটে না। তার একটা বিশেষ কারণও আছে। দু'বছর আগেই তার একটা বিয়ে হয়েছিল—ঘটনাটা জানে শুধু তার অতিঘনিষ্ঠ বন্ধুরা। সেসময় রেজিমেন্টের সঙ্গে পোল্যাণ্ডে থাকাকালে স্বল্পবিত্ত এক পোলিশ জোত্‌দার তাকে বাধ্য করেছিল তার মেয়েকে বিয়ে করতে। আনাতোল অবশ্য অচিরেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে এবং শশুরকে একটা টাকা পাঠাতে রাজী হয়ে এমন বন্দোবস্ত পাকা করে নিয়েছে যাতে সে নিজেকে অবিবাহিত বলে চালিয়ে যেতে পারে।

আনাতোল সবসময়ই নিজের অবস্থা নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, অন্য সবাইকে নিয়ে সন্তুষ্ট। এটা তার সহজাত দৃঢ়বিশ্বাস যে সে যেভাবে কাটাচ্ছে তাছাড়া অন্য কোনভাবে জীবন কাটানো তার পক্ষে অসম্ভব, আর জীবনে কোনদিন সে কোন নীচ কাজ করে নি। তার একান্ত ধারণা, হাঁস যেমন জলে বাস করতে বাধ্য তেমনি ঈশ্বর তাকে এমনভাবেই সৃষ্টি করেছেন যে বছরে ত্রিশ হাজার রুবল খরচ করতে এবং সমাজে একটা গণ্যমান্য আসনে অধিষ্ঠিত হতে সে বাধ্য। এত দৃঢ়তার সঙ্গে সে এটা বিশ্বাস করে যে তার দিকে তাকিয়ে অন্যরাও সেটা বিশ্বাস করে এবং সমাজে তাকে একটা গণ্যমান্য আসন দিতে অথবা টাকা ধার দিতে আপত্তি করে না; আর সেও যত্রতত্র টাকা ধার করে বেড়ায়, কিন্তু কোনদিন শোধ করে না।

সে জুয়াড়ি নয়, অন্তত টাকা জেতার দিকে তার নজর নেই। সে অহংকারীও নয়। উচ্চাকাংখার অভিযোগও তার বিরুদ্ধে আনা যাবে না। সে নীচ নয়, কেউ কিছু চাইলে তাকে ফিরিয়ে দেয় না। সে চায় শুধু আমোদ প্রমোদ আর মেয়ে মানুষ, আর যেহেতু তার বিবেচনায় এর মধ্যে অসম্মানের কিছু নেই, সেইহেতু তার এই বাসনাপরিতৃপ্তির ফলে অন্যের কি হল না হল তা সে ভাবেই না; সে সত্যি নিজেকে অনিন্দনীয় বলে মনে করে, শয়তান ও খারাপ লোকদের আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে এবং শান্ত বিবেক নিয়ে

মাথা উঁচু করে চলে।

দেশ থেকে নির্বাসন এবং পারস্য দেশে দুঃসাহসিক কার্যকলাপের পরে দলখভ সেইবছরই মস্কো ফিরে এসেছে এবং পিতার্সবুর্গের পুরনো দোস্ত কুরাগিনের সঙ্গে মিশে বিলাস, জুয়া ও লাম্পট্যের জীবন চালিয়ে যাচ্ছে, আর তারজন্য কুরাগিনকেই দোহন করে চলেছে।

কুরাগিনের উপর নাতাশার প্রভাব খুব বেশী করেই পড়েছে। অপেরার পরে চা খেতে বসে দলখভের কাছে নাতাশার বাহু, কাঁধ, পা ও চুলের বর্ণনা দিয়ে বলল যে সে তার সঙ্গে প্রেম করবে। এ ধরনের ভালবাসাবাসির ফল কি দাঁড়াবে সেবিষয়ে কোন ধারণাই আনাতোলের নেই, কারণ কখনও কোন কাজের ফলাফল নিয়ে সে মাথা ঘামায় না।

দলখভ বলল, "ও মেয়ে প্রথম শ্রেণীর ভায়া, কিন্তু আমাদের জন্য নয়।"

আনাতোল বলল, "আমার বোনকে বলব তাকে ডিনারে ডাকতে, কি বল?"

"ওর বিয়েটা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে পারতে⋯⋯"

আনাতোল বলল, "তুমি তো জান ছোট মেয়েদের আমি ভালবাসি; সঙ্গে সঙ্গেই তাদের মুণ্ডু ঘুরে যায়।"

দলখভ কুরাগিনের বিয়ের খবরটা জানত; বলল, "এর মধ্যেই কিন্তু একটি 'ছোট মেয়ের' ফাঁদে পড়েছিলে। খুব সাবধান।"

দিল-খোলা হাসি হেসে আনাতোল বলল, "আরে, সে জিনিস দুবার ঘটতে পারে না! কি বল?"

অধ্যায়—১২

অপেরার পরের দিন রস্তভরা কোথাও বের হল না; তাদের সঙ্গে দেখা করতেও কেউ এল না। নাতাশাকে লুকিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না কাউন্টের সঙ্গে কি নিয়ে যেন কথাবার্তা বলল। নাতাশা অনুমান করল, তারা বুড়ো প্রিন্স সম্পর্কে কথা বলছে এবং একটা কোন মতলব আঁটছে; এতে সে মনে মনে অসন্তুষ্ট হল। সে আশা করছে প্রিন্স আন্দ্রু যেকোন সময় এসে পড়বে; সে এসেছে কি না জানবার জন্য দু'বার সে চাকরটাকে ভজ্‌দ্ভিজেংকা পাঠিয়েছে। সে আসে নি। মস্কোর প্রথম দিনগুলোর তুলনায় এখন সে বেশী কষ্ট পাচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রুর জন্য অধৈর্য প্রতীক্ষা ছাড়াও প্রিন্সেস মারি ও বুড়ো প্রিন্সের সঙ্গে সাক্ষাতের অপ্রীতিকর স্মৃতি তাকে কষ্ট দিচ্ছে। সে কেবলই ভাবছে, হয় প্রিন্স আন্দ্রু আসবেই না, আর নয় তো তার আসার আগেই নাতাশার নিজের একটা কিছু ঘটে যাবে। প্রিন্স আন্দ্রুর কথা ভাবতে গেলেই তার মনে পড়ে যায় বুড়ো প্রিন্স, প্রিন্সেস মারি, থিয়েটার, ও কুরাগিনের কথা। বার বার সেই একই প্রশ্ন তার সামনে এসে হাজির

হচ্ছে : সে কি দোষী নয়, সে কি প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লোকটির প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী, মুখের প্রতিটি ভাব তার মনে পড়ে যাচ্ছে। পরিবারের সকলেই নাতাশাকে আগের চাইতে চটপটে ভাবলেও আসলে তার মনের সুখ ও শান্তি আগের চাইতে অনেক কমে গেছে।

একদিন মাদাম "মহাবাটপাড়"-এর কাছ থেকে একজন দর্জি এল রস্তভদের বাড়ি। নাতাশা মহা খুসি হয়ে বসার ঘরের পাশের ঘরটাতে ঢুকল নতুন পোশাক পরীক্ষা করে দেখতে। হাতাবিহীন একটা বডিস্ গায়ে দিয়ে পিঠের দিকটা মাপসই হয়েছে কিনা দেখবার জন্য আয়নার দিকে মুখ ঘোরাতেই তার কানে এল বাবা ও অন্য একটি স্ত্রীলোকের উচ্ছ্বসিত গলা। স্ত্রীলোকটি হেলেন। নাতাশা বডিসটা খুলে ফেলবার আগেই দরজাটা খুলে গেল, আর লাল ভেলভেটের উঁচু কলারের একটা গাউন পরে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল কাউণ্টেস বেজুখভা।

লজ্জারাঙা নাতাশাকে দেখেই চেঁচিয়ে বলল, "হায় মায়াবিনী! চমৎকার! না, এর তুলনা হয় না প্রিয় কাউণ্ট।" কাউণ্ট রস্তভ তার সঙ্গেই ঘরে ঢুকেছে। "আপনারা মস্কোতে আছেন, অথচ কোথাও যাচ্ছেন না কেন? না, আমি আপনাদের ছাড়ছি না! আজ রাতে মাদ্‌ময়জেল জর্জেস আমার বাড়িতে আবৃত্তি করে শোনাবেন; কিছু লোকজনও আসবে; আপনি যদি আপনার এই সুন্দরী মেয়েদের—এরা তো মাদ্‌ময়জেল জর্জেসের চাইতেও সুন্দরী—নিয়ে না আসেন, তো আপনার সঙ্গে আমার আড়ি! আমার স্বামী এখন ভিতরে আছে, নইলে আপনাদের নিয়ে যেতে তাকে পাঠাতে পারতাম। আপনাকে আসতেই হবে। অতি অবশ্য আসবেন। আটটা থেকে ন'টার মধ্যে।"

দর্জিটি হেলেনের পরিচিত; তার দিকে একবার মাথাটা নাড়ল; দর্জিও সশ্রদ্ধভাব অভিবাদন জানাল। হেলেন অনবরত কথা বলে চলল, বিশেষভাবে নাতাশার রূপ-কীর্তন। নাতাশার নতুন পোশাকের প্রশংসা করে "ধাতুবস্ত্রের" তৈরি নিজের পোশাকের প্রশংসা করে জানাল, পোশাকটা প্যারিস থেকে এসেছে, আর নাতাশাকেও ঐরকম একটা পোশাক আনবার পরামর্শ দিল।

বলল, "অবশ্য তোমাকে তো সবকিছুতেই মানায় গো মায়াবিনী!"

নাতাশার মুখে খুসির হাসি খেলে গেল। কাউণ্টেস বেজুখভার প্রশংসার ছোঁয়ায় সে যেন নতুন করে ফুটে উঠেছে।

"আমার ভাই কাল আমার সঙ্গে ডিনার খেয়েছে—হাসতে হাসতে মরি আর কি—সে তো কিছু খেল না, শুধু তোমার জন্যই হা-হুতাশ করল গো মায়াবিনী! তোমার প্রেমে সে তো একেবারে পাগল হয়ে গেছে সোনা!"

একথা শুনে নাতাশার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

হেলেন বলল, "আহা, কতই লজ্জা তোমার সুন্দরী! তুমি কিন্তু অবশ্যই আসবে। একজনকে ভালবাস বলেই ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকতে হবে তার কি মানে আছে। যদি বিয়ের কথাও হয়ে থাকে, তাহলেও তোমার মনের মানুষটি নিশ্চয় চাইবে ঘরের একঘেয়েমি ছেড়ে তুমি সমাজে একটু চলাফেরা কর।"

"তাহলে আমাদের বিয়ের কথাও এ জানে; ইনি ও আমার স্বামী—ভাল মানুষ পিয়ের—তা নিয়ে কথা বলেছে, হাসাহাসি করেছে। তাহলে তো সবই ঠিক আছে।" দুটি বিস্মিত চোখ মেলে নাতাশা হেলেনের দিকে তাকাল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না গম্ভীর মুখে চুপচাপ এসে ডিনারে বসল; বোঝাই যাচ্ছে বুড়ো প্রিন্সের কাছে সে হেরে গেছে। এখনও তার উত্তেজনা কাটে নি; শান্তভাবে কথা বলতেও পারছে না। কাউণ্টেসের প্রশ্নের জবাবে জানাল, সব ঠিক আছে, কাল সব বলবে। কাউণ্টেস বেজুখভারও আগমন ও সন্ধ্যার আমন্ত্রণের সংবাদ শুনে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল:

"বেজুখভার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমি রাখতে চাই না; তোমাকেও সেই পরামর্শই দিচ্ছি; যাই হোক, তুমি যখন কথা দিয়েছ—যাও। এতে তোমার মনটাও অন্য দিকে যাবে," সে নাতাশাকে উদ্দেশ করে বলল।

অধ্যায়—১৩

কাউণ্ট রস্তভ মেয়েদের নিয়ে কাউণ্টেস বেজুখভার বাড়ি গেল। সেখানে বেশ লোকজন এসেছে, কিন্তু প্রায় সকলেই নাতাশার অপরিচিত। যেসব স্ত্রী-পুরুষ এসেছে তাদের প্রায় সকলেরই স্বাধীনভাবে চলাফেরার খ্যাতি আছে—এটা দেখে কাউণ্ট রস্তভের মন বিরূপ হয়ে উঠল। মাদ্‌ময়জেল জর্জেস যুবকবৃন্দ পরিবৃত হয়ে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে আছে। মেতিভিয়ের-সহ বেশ কয়েকজন ফরাসী ভদ্রলোকও সেখানে হাজির। হেলেন মস্কো আসার পর থেকেই মেতিভিয়ের তার বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। কাউণ্ট স্থির করল, তাস খেলতে বসবে না, বা মেয়েদের চোখের বাইরে যেতে দেবে না, এবং মাদ্‌ময়জেল জর্জেস-এর আবৃত্তি শেষ হওয়ামাত্রই চলে যাবে।

রস্তভদের খোঁজেই আনাতোল দরজায় দেখা দিল। কাউণ্টকে অভ্যর্থনা জানিয়েই সে নাতাশাকে অনুসরণ করল। তাকে দেখামাত্র অপেরার সেই মনোভাব নাতাশাকে পেয়ে বসল—আনাতোলের প্রশংসায় পরিতুষ্ট অহংকার এবং দুজনের মধ্যে একটা নৈতিক ব্যবধানের অনুপস্থিতিজনিত আতংক।

হেলেন সানন্দে নাতাশাকে স্বাগত জানিয়ে তার রূপ ও পোশাকের

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। পোশাক বদলাবার জন্য মাদ্‌ময়জেল জর্জেস পাশের ঘরে চলে গেল। বসার ঘরের চেয়ারগুলো সাজিয়ে নিয়ে সকলে বসে পড়ল। নাতাশার জন্য একটা চেয়ার নিয়ে এসে আনাতোল নিজে তার পাশেই বসতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাউণ্টের নজর ছিল মেয়ের উপর, সে তাড়াতাড়ি এসে তার পাশে বসে পড়ল। আনাতোল বসল তার পিছনে।

কঠোর বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে মাদ্‌ময়জেল জর্জেস কিছু ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল; সে কবিতায় ছেলের প্রতি নিষিদ্ধ প্রেমের বর্ণনা। কখনও তার গলা চড়ছে, কখনও বা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে, কখনও সগৌরবে মাথাটা তুলে ধরছে, আবার কখনও থেমে গিয়ে চোখ পাকিয়ে কর্কশ কণ্ঠে আবৃত্তি করছে।

চারদিক থেকে রব উঠল, "প্রশংসনীয়! স্বর্গীয়! মনের মত!"

নাতাশা মোটা অভিনেত্রীটির দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু তার সামনে যা ঘটছে তার কিছুই সে দেখল না, শুনল না, বুঝল না। তার শুধু মনে হল এমন একটা আশ্চর্য অর্থহীন জগতে সে এসে পড়েছে—যে জগৎ তার পুরনো জগৎ থেকে অনেক দূরে—যে জগতে কি ভাল আর কি মন্দ, কি যুক্তিপূর্ণ আর কি যুক্তিহীন তা জানা অসম্ভব। তার পিছনেই বসে আছে আনাতোল; তার সান্নিধ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার ফলে তার মনে জেগেছে প্রত্যাশার একটা শংকিতবোধ।

প্রথম একক আবৃত্তির পরে সকলেই এগিয়ে গিয়ে মাদ্‌ময়জেল জর্জেসকে ঘিরে উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগল।

কাউণ্টও ভিড়ের ভিতর দিয়ে অভিনেত্রীটির দিকেই এগিয়ে চলল। নাতাশা তাকে বলল, "উনি কী সুন্দরী!"

পিছন থেকে আনাতোল বলল, "আপনাকে দেখলে কিন্তু তা মনে হয় না!" কথাটা সে এমনভাবে বলল যে শুধু নাতাশাই সেটা শুনতে পেল।" আপনি মনোহারিণী…যে মুহূর্তে আপনাকে দেখেছি তখন থেকেই…"

"চলে এস নাতাশা," মুখ ফিরিয়ে কাউণ্ট বলল।

কয়েকটা আবৃত্তি করে মাদ্‌ময়জেল জর্জেস চলে গেলে কাউণ্টেস বেজুখভা অতিথিদের নাচ-ঘরে আমন্ত্রণ জানাল।

কাউণ্ট বাড়ি ফিরতে চাইল, কিন্তু হেলেন অনুরোধ করল তারা যেন আজকের বল-নাচটা মাটি করে না দেয়; অগত্যা রস্তভরা থেকে গেল। আনাতোল ভাল্‌স্‌-নাচে নাতাশাকে ডাকল এবং নাচের সময় তার কোমরে ও হাতে চাপ দিয়ে বলল, সে একটি কুহকিনী, তাকে সে ভালবাসে। পরে দুজনে একটা একোসাসেও নাচল, তখন কিন্তু আনাতোল কিছুই বলল না, শুধু নাতাশার দিকে তাকিয়ে রইল। নাতাশা ভীরু চোখ তুলে তার দিকে তাকাল, কিন্তু যা বলতে চেয়েছিল তা বলতে পারল না। চোখ নামিয়ে

নিল।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাকে ওসব কথা বলবেন না। আমি বাকদত্তা, অন্যকে ভালবাসি।" সে আবার আনাতোলের দিকে তাকাল।

তার কথায় আনাতোল বিচলিত হয় নি, দুঃখও পায় নি।

আনাতোল বলল, "আমাকে ওকথা বলবেন না। আমি কি করব? শুধু বলতে পারি, আপনার ভালবাসায় আমি পাগল, পাগল হয়ে গেছি! আপনি যে এত মায়াবিনী সেটা কি আমার দোষ? ···এবার আমাদের পালা।"

নাতাশা উত্তেজিত, উজ্জীবিত; ভীত চোখ মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল; খুসিতে ভরপুর। সেই সন্ধ্যায় যা ঘটল তার কিছুই সে বুঝল না। একত্রে তারা একোসাস নাচল, গ্রোসৃভাতের নাচল। বাবা বলল, বাড়ি চল, কিন্তু সে আরও থাকতে চাইল। সে যেখানে যায়, যার সঙ্গেই কথা বলে, আনাতোলের চোখ দুটি সর্বদাই তার উপর স্থিরনিবদ্ধ।

সাজঘর থেকে পোশাক ঠিক করে বেরিয়ে আসার পরে তার হাতখানি ধরে নরম গলায় আনাতোল বলল, "আমি তো আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারি না, কিন্তু আর কোন দিন আপনাকে দেখতে পাব না তাও কি সম্ভব? আপনার ভালবাসায় আমি পাগল। আমি কি কোন দিন···?" পথ আটকে দিয়ে আনাতোল নিজের মুখটা তার মুখের খুব কাছাকাছি নিয়ে এল।

আনাতোলের বড় বড় চকচকে দুটি পুরুষসুলভ চোখ নাতাশার চোখের এত কাছাকাছি এসেছে যে সেই দুটি চোখ ছাড়া আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

"নাতালি?" আনাতোল ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কিন্তু নাতাশা বুঝতে পারল তার হাতের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে: "নাতালি?"

"আমি জানি না। আমার কিছু বলার নেই," নাতাশার চোখ দুটি বলল।

জলন্ত ঠোঁটের চাপ পড়ল তার ঠোঁটে, আর ঠিক সেইমুহূর্তে সে মুক্তি পেল; হেলেনের পায়ের শব্দ ও পোশাকের খস্‌খস্ শব্দ শোনা গেল। নাতাশা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল, তারপর লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভয়ার্ত চোখে আনাতোলের দিকে তাকিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল।

"একটা কথা, শুধু একটা, ঈশ্বরের দোহাই!" আনাতোল চেঁচিয়ে বলল।

নাতাশা থামল। তার একটা কথাই সে শুনতে চায়।

"নাতালি, শুধু একটা কথা, শুধু একটা!" আনাতোল বার বার বলতে লাগল। কি বলবে বুঝতে না পেরে হেলেন তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত

আনাতোল একই কথা বলতে লাগল।

হেলেন নাতাশাকে নিয়ে বসার ঘরে ফিরে গেল। নৈশভোজনের জন্য অপেক্ষা না করেই রস্তভরা চলে গেল।

বাড়িতে পৌঁছে নাতাশা সারা রাত ঘুমতে পারল না। সে কাকে ভালবাসে—আনাতোলকে, না প্রিন্স আন্দ্রুকে, এই মীমাংশার অতীত প্রশ্নেই তাকে যন্ত্রণা দিতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রুকে সে ভালবাসে—গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু আনাতোলকেও যে ভালবাসে তাতেও তো কোন সন্দেহ নেই। "না হলে এসব ঘটল কেমন করে? এরপরেও যদি বিদায় নেবার সময় তার হাসি আমি ফিরিয়ে দিয়ে থাকি, ব্যাপারটাকে এতদূর পর্যন্ত গড়াতে দিয়ে থাকি, তার অর্থ গোড়া থেকেই আমি তাকে ভালবেসেছি। তার অর্থ, সে দয়ালু, মহৎ, চমৎকার, তাকে ভাল না বেসে আমি পারি নি। আমি যদি তাকে ভালবেসে থাকি, এবং আর একজনকেও ভালবেসে থাকি, তাহলে আমি কি করব?" এইসব ভয়ংকর প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল।

অধ্যায়—১৪

নানা চিন্তাভাবনা ও কর্মব্যস্ততা নিয়ে সকালে এল। সকলে ঘুম থেকে উঠল, চলাফেরা শুরু করল, কথা বলতে লাগল। দর্জিরা আবার এল, মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না হাজির হল। প্রাতরাশে সকলের ডাক পড়ল।

প্রাতরাশের পরে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তার হাতল-চেয়ারটায় বসে নাতাশা ও কাউন্টকে ডেকে আনাল।

তারপর বলতে শুরু করল, "শুনুন, সমস্ত ব্যাপারটা আমি ভাল করে ভেবে দেখেছি আর এই আমার পরামর্শ। আপনি জানেন, কাল আমি প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে কিছু কথাও হয়েছে⋯হঠাৎ কি মাথায় ঢুকল তিনি চীৎকার শুরু করলেন, কিন্তু চীৎকার শুনে ঘাবড়াবার বান্দা আমি নই। আমার যা বলার ছিল তা বলেছি।"

"আচ্ছা, আর তিনি?" কাউন্ট জিজ্ঞাসা করল।

"তিনি? তিনি তো আধা পাগল⋯আমার কোন কথাই শুনবেন না। কিন্তু কথা বাড়িয়ে লাভ কি? মেয়েটা তো এদিকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল," মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল। "আমার পরামর্শ শুনুন, এখানকার কাজ শেষ করে অত্রাদ্‌নুর বাড়িতে চলে যান⋯সেখানে অপেক্ষা করুন।"

"না, না।" নাতাশা জোর গলায় বলে উঠল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল, "হ্যাঁ, ফিরে যাও, সেখানেই অপেক্ষা কর। তোমার ভাবী বর যদি এখানে আসে—তাহলে একটা ঝগড়াঝাঁটি কিছুতেই এড়ানো যাবে না। কিন্তু বুড়োকে একা পেলে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে

তারপর সে তোমাদের কাছে যেতে পারবে।"

কাউন্ট রস্তভ এ পরামর্শের যুক্তিবত্তার প্রশংসা করে এটাকে মেনে নিল। বুড়োর মতিগতি যদি ফেরে তো তখন মস্কোতে অথবা বল্ড হিল্‌স্‌-এ তার সঙ্গে দেখা করাই ভাল হবে; আর তা যদি না হয়, তার অমতেই যদি বিয়েটা হয়, তাহলে তো সে বিয়ে একমাত্র অত্রাদ্‌নুতেই হতে পারে।

বুড়ো কাউন্ট বলল, "খুব সত্যি কথা। মেয়েকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম বলে আমি দুঃখিত।"

"না, না, দুঃখ করছেন কেন? এখানে যখন এসেছেন তখন তাকে শ্রদ্ধা জানানো আপনার কর্তব্য। কিন্তু তিনি যদি তা না চান—সেটা তার ব্যাপার," মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল। "তাছাড়া, বিয়ের পোশাক তৈরি হয়ে গেছে, কাজেই আর কিসের জন্য এখানে অপেক্ষা করবেন; যা এখনও তৈরি হয় নি, সেগুলো আমি পরে পাঠিয়ে দেব। আপনাদের ছেড়ে দিতে মন চাইছে না, তবু এটাই সেরা ব্যবস্থা। কাজেই ঈশ্বরের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে চলে যান।"

হাতের থলের ভিতর থেকে একটা চিঠি বের করে নাতাশার হাতে দিল। প্রিন্সেস মারির চিঠি।

"তোমাকে লিখেছে। বেচারি, নিজেকে কত কষ্ট দিচ্ছে! তুমি হয় তো ভেবেছ সে তোমাকে পছন্দ করে নি—তাই নিয়েই তার যত ভয়।"

"কিন্তু সে তো আমাকে সত্যি পছন্দ করে না," নাতাশা বলল।

"বাজে কথা বলো না," মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না চেঁচিয়ে উঠল।

"আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, আমি জানি সে আমাকে পছন্দ করে না," চিঠিটা নিয়ে নাতাশা সাহসের সঙ্গে বলল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল, "লক্ষ্মী মেয়ে, ওভাবে কথার জবাব দিতে নেই। আমি যা বলছি সেটাই ঠিক! চিঠির একটা জবাব লিখে দাও!"

নাতাশা কোন জবাব দিল না, প্রিন্সেস মারির চিঠিটা পড়বার জন্য নিজের ঘরে চলে গেল।

প্রিন্সেস মারি লিখেছে, তাদের দুজনের মধ্যে যে ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে সেজন্য সে খুব হতাশ হয়ে পড়েছে। তার বাবার মনোভাব যাই হোক, নাতাশা যেন বিশ্বাস করে যে তার দাদা যাকে পছন্দ করেছে, তাকে সে ভালবাসবেই, কারণ দাদার সুখের জন্য সে সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

লিখেছে, "অবশ্য মনে করো না যে আমার বাবা তোমার প্রতি বিরূপ। তিনি এখন বৃদ্ধ, অথর্ব, কাজেই ক্ষমার্হ; কিন্তু তিনি ভাল মানুষ, উদার হৃদয়, এবং তার ছেলেকে যে সুখী করতে পারবে তাকেই তিনি ভালবাসবেন।" প্রিন্সেস মারি অনুরোধ করেছে, নাতাশা যেন এমন একটা সময় ঠিক করে দেয় যখন সে এসে নাতাশার সঙ্গে আবার দেখা করতে পারে।

চিঠি পড়া শেষ করে নাতাশা তার জবাব লিখতে লেখার টেবিলে গিয়ে বসল। "প্রিয় প্রিন্সেস," যান্ত্রিকভাবে তাড়াতাড়ি ফরাসীতে এটুকু লিখেই সে থামল। আগের দিন সন্ধ্যায় যা সব ঘটেছে তারপরেও সে আর কি লিখবে? চিঠিটা সামনে নিয়ে বসে সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ! যা কিছু ঘটেছে, আর এখন তো' সবই বদলে গেছে।…তার সঙ্গে কি সব সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলব? সত্যি ফেলব? সে যে ভয়ংকর…" এইসব ভয়াবহ চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে সোনিয়ার কাছে গেল।

ডিনারের পরে নাতাশা আবার তার ঘরে গিয়ে প্রিন্সেস মারির চিঠিটা হাতে নিল। ভাবতে লাগল, "এও কি হতে পারে যে সব শেষ হয়ে গেছে? এ কি হতে পারে যে এত তাড়াতাড়ি এই ঘটনাগুলো ঘটার ফলে আগেকার সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে?" আগেকার সবটুকু অন্য তীব্রতা নিয়েই প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি ভালবাসার কথা তার মনে পড়ল, আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝল যে সে কুরাগিনকে ভালবাসে। সে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নিজেকে দেখতে পেল প্রিন্স আন্দ্রুর স্ত্রীরূপে, তার সঙ্গে যে সুখের ছবিগুলি সে এতদিন কল্পনায় এঁকেছে সেসবই তার মনে পড়ল; আবার সেইসঙ্গে গতকাল আনাতোলের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা স্মরণ করে উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠল।

সম্পূর্ণ বিমূঢ় হয়ে সে নিজেকেই প্রশ্ন করল, "সেটাই ভাল হতে পারে না কেন? একমাত্র তাহলেই আমি সম্পূর্ণ সুখী হতে পারতাম; কিন্তু আমাকে যে বেছে নিতে হবে, অথচ তাদের যেকোন একজনকে বাদ দিয়ে আমি সুখী হতে পারি না। কিন্তু যা ঘটেছে সেকথা প্রিন্স আন্দ্রুকে বলা বা তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা দুটোই সমান অসম্ভব। সেই একজনকে পেলে কিছুই হারায় না। কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রুর যে ভালবাসার মধ্যে আমি এতকাল বেঁচেছিলাম তার আনন্দ কি আমাকে সত্যি সত্যি চিরদিনের মত বিসর্জন দিতে হবে?"

একটা রহস্যময় ভঙ্গী করে ঘরে ঢুকে একটি দাসী ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "শুনুন মিস, একটি লোক এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বলল।" দাসী চিঠিটা নাতাশার হাতে দিল।

নাতাশা কোন কিছু না ভেবে যন্ত্রচালিতের মত চিঠির সিল ভেঙে যা পড়ল সেটা আনাতোলের প্রেম-পত্র; চিঠির একটা শব্দও না বুঝেই সে এটুকু বুঝতে পারল যে এ চিঠি যার কাছ থেকে এসেছে তাকে সে ভালবাসে। হ্যাঁ, তাকে সে ভালবাসে, অন্যথায় যা ঘটেছে তা ঘটল কেমন করে? তার প্রেম-পত্রই বা তার হাতে এল কেমন করে?"

আনাতোলের হয়ে দলখভ কর্তৃক খসড়া করা সেই আবেগ-ভরা প্রেম-পত্র কম্পিত হাতে তুলে ধরে পড়তে পড়তে সে তার মধ্যে নিজের মনের কথার

প্রতিধ্বনিই যেন শুনতে পেল।

"গতকাল সন্ধ্যা থেকে আমার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে: তোমার ভালবাসা পাওয়া অথবা মৃত্যুকে বরণ করা। আমার সামনে আর কোন পথ নেই," এইভাবে চিঠি শুরু হয়েছে। তারপর লিখেছে, সে জানে নাতাশার বাবা-মা তাকে তার হাতে তুলে দেবেন না—এমন কিছু গোপন কারণ আছে যা শুধু নাতাশার কাছেই সে বলতে পারে—কিন্তু নাতাশা যদি তাকে ভালবাসে তাহলে সে শুধু একবার বলুক "হ্যাঁ," তাহলে কোন মানুষের শক্তি নেই তাদের সুখে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। প্রেম সর্বজয়ী। সে নাতাশাকে চুরি করে পৃথিবীর শেষ প্রান্তে নিয়ে যাবে।

চিঠিটা বিশবার পড়ে, প্রতিটি শব্দের মধ্যে একটা গভীর অর্থ আবিষ্কার করে নাতাশা ভাবল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবাসি!"

সেদিন সন্ধ্যায় মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার আখারভদের বাড়ি যাবার কথা; মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করতে নাতাশা মাথা ধরার কথা বলে বাড়িতেই থেকে গেল।

অধ্যায়—১৫

সন্ধ্যার পরে একটু দেরি করে বাড়ি ফিরে সোনিয়া নাতাশার ঘরে গেল। নাতাশা তখনও পোশাক-পরা অবস্থায়ই সোফার উপর ঘুমিয়ে আছে দেখে সে অবাক হল। তার পাশেই টেবিলের উপর আনাতোলের চিঠিটা খোলা পড়ে আছে। সোনিয়া চিঠিটা তুলে পড়ল্‌।

পড়তে পড়তেই ঘুমন্ত নাতাশার দিকে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল সে যা পড়ছে তার কোন আভাষ নাতাশার মুখে আছে কি না, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। মুখখানি শান্ত, নম্র, সুখী। পাছে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় এই ভয়ে বুকটা চেপে ধরে ভয়ে ও উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে হাতল-চেয়ারটায় বসে পড়েই সোনিয়া হু হু করে কেঁদে উঠল।

"কিছুই আমার চোখে পড়ে নি? এতদূর গড়ালই বা কেমন করে? সে কি আর প্রিন্স আন্দ্রুকে ভালবাসে না? আর কুরাগিনকেই বা সে এতটা আস্কারা দিল কেমন করে? সে যে একটা প্রতারক, শয়তান সেটা তো পরিষ্কার! একথা শুনলে নিকলাস, মহৎ নিকলাস কি করবে? আচ্ছা, গত পরশু, গতকাল, ও আজ তার চোখে-মুখে যে উত্তেজিত, কঠিন, অস্বাভাবিকভাব দেখেছি এটাইতার অর্থ।" সোনিয়া ভাবতে লাগল। "কিন্তু সেই লোকটাকে নাতাশা ভালবাসে এ তো হতেই পারে না! সম্ভবত কার চিঠি না জেনেই সে চিঠিটা খুলেছে। হয় তো চিঠি পড়ে মনে আঘাত পেয়েছে। একাজ সে করতেই পারে না!"

চোখের জল মুছে সোনিয়া পা টিপে টিপে নাতাশার দিকে এগিয়ে গেল।

কোনমতে শোনা যায় এমনভাবে ডাকল, "নাতাশা !"

নাতাশা জেগে উঠেই সোনিয়াকে দেখতে পেল।

"আচ্ছা, তোমরা ফিরে এসেছ ?"

তারপরই সোনিয়ার বিমূঢ় ভাব দেখে তার মনেও সন্দেহ দেখা দিল।

জানতে চাইল, "সোনিয়া, তুমি চিঠিটা পড়েছ ?"

"হ্যাঁ," সোনিয়া মৃদু গলায় বলল।

নাতাশা উচ্ছ্বসিতভাবে হেসে উঠল।

"না সোনিয়া, আমি আর পারছি না। তোমার কাছ থেকে আর লুকিয়ে রাখতে পারছি না। জান, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি! সোনিয়া, সোনা, সে লিখেছে…"

যেন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছে না এমনিভাবে সোনিয়া চোখ বড় বড় করে নাতাশার দিকে তাকাল।

"আর বল্‌কন্‌স্কি ?" সে শুধাল।

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "আঃ, সোনিয়া, যদি জানতে আমি এখন কত সুখী! ভালবাসা যে কি জিনিস তা তুমি জান না…"

"কিন্তু নাতাশা, সেসবই কি শেষ হয়ে যেতে পারে ?"

যেন প্রশ্নটা বুঝতে পারছে না এমনিভাবে বিস্ফারিত চোখে নাতাশা সোনিয়ার দিকে তাকাল।

"তুমি কি তাহলে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে প্রত্যাখ্যান করছ ?" সোনিয়া বলল।

"আঃ, তুমি কিছু বোঝ না! বাজে কথা বলো না, শোন।" সাময়িক বিরক্তির সঙ্গে নাতাশা বলল।

সোনিয়া তবু বলতে লাগল, "কিন্তু এ যে আমি বিশ্বাস করতেই পারছি না। বুঝতেও পারছি না। এ কি করে হতে পারে যে তুমি একটা বছর ধরে একজনকে ভালবাসলে, আর হঠাৎ…আর, তাকে তো তুমি মাত্র তিন দিন দেখেছ! নাতাশা, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না, তুমি ঠাট্টা করছ! তিন দিনে সব ভুলে গিয়ে…"

নাতাশা বলল, "তিন দিন ? মনে হচ্ছে একশ' বছর ধরে তাকে আমি ভালবেসেছি। মনে হচ্ছে তার আগে কাউকে ভালবাসি নি। তুমি এসব বুঝতে পারবে না। সোনিয়া, একটু সবুর কর, এখানে বস।" নাতাশা তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

"এরকম যে ঘটে তা আমি শুনেছি, তুমিও নিশ্চয় শুনেছ, কিন্তু এই প্রথম এ ভালবাসার স্বাদ পেলাম। এ ভালবাসা আগেকার মত নয়। তাকে দেখামাত্রই মনে হল সে আমার প্রভু আর আমি তার দাসী; তাকে না ভালবেসে থাকতে পারলাম না। হ্যাঁ, তার দাসী! সে যা হুকুম করবে আমি তাই করব। সেসব তুমি বুঝতে পারবে না। আমি কি করতে পারি

সোনিয়া ? আমি কি করতে পারি ?" চোখে মুখে সুখের অথচ ভয়ের ভাব ফুটিয়ে নাতাশা বলতে লাগল।

সোনিয়াও উঁচু গলায় বলল, "কিন্তু তুমি কি করছ সেটা ভেবে দেখ। আমি তো হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না। এই গোপন চিঠিপত্র···· তাকে এতদূর যেতে দিলে কেমন করে ?"

নাতাশা জবাব দিল, "বলেছি তো আমার নিজের কোন ইচ্ছা নেই। তুমি কেন বুঝতে পারছ না ? আমি তাকে ভালবাসি !"

"তাহলে আমি এ হতে দেব না।···আমি বলে দেব !" চোখের জল ফেলে সোনিয়া বলল।

"কি বলতে চাও তুমি ? ঈশ্বরের দোহাই····যদি বলে দাও তো তুমি আমার শত্রু !" নাতাশা ঘোষণা করল। "তুমি চাও আমি দুঃখ পাই, তুমি চাও আমাদের ছাড়াছাড়ি হোক····"

নাতাশার এই ভীতি লক্ষ্য করে সোনিয়া বন্ধুর জন্য লজ্জায় ও করুণায় কেঁদে ফেলল।

প্রশ্ন করল, "কিন্তু তোমাদের দুজনের কি হয়েছে ? সে তোমাকে কি বলেছে ? সে কেন এ বাড়িতে আসে না ?"

এসব প্রশ্নের কোন জবাব নাতাশা দিল না। মিনতি করে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই সোনিয়া, কাউকে কিছু বলো না, আমাকে কষ্ট দিও না। মনে রেখো, এসব ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় ! তোমাকে বিশ্বাস করে সব বললাম····"

তবু সোনিয়া বলল, "কিন্তু এই গোপনীয়তা কেন ? কেন সে এ বাড়িতে আসে না ? কেন প্রকাশ্যে তোমার পাণিপ্রার্থনা করছে না ? তুমি তো জান প্রিন্স আন্দ্রু তোমাকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে—তাই যদি সত্য হয় ; কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করি না ! নাতাশা, তুমি কি ভেবে দেখেছ এই গোপন কারণগুলি কি হতে পারে ?"

নাতাশা অবাক হয়ে সোনিয়ার দিকে তাকাল। এই প্রথম এ প্রশ্নটা তার মনে এসেছে, কি জবাব দেবে তা সে জানে না।

"কারণগুলি কি তা আমি জানি না। কিন্তু নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে !"

সোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মাথা নাড়তে লাগল।

"যদি কোন কারণ থাকে····"সোনিয়া বলতে শুরু করল।

তার সন্দেহটা বুঝতে পেরে নাতাশা সভয়ে তাকে বাধা দিল।

"সোনিয়া, তাকে সন্দেহ করা যায় না ! যায় না, যায় না ! বুঝতে পারছ না ?"

"সে তোমাকে ভালবাসে ?"

বন্ধুর বুদ্ধির অভাব দেখে করুণার হাসি হেসে নাতাশা তার কথাটারই

পুনরাবৃত্তি করল, "সে আমাকে ভালবাসে কি না? সে কি, তুমি তো এই চিঠিটা পড়েছ, তাকে দেখেছ।"

"কিন্তু সে যদি সম্মানবোধহীন হয়?"

"সে! সম্মানবোধহীন? শুধু যদি জানতে!" নাতাশা উচ্ছ্বসিত গলায় বলল।

"সে যদি সম্মানিত লোক হয় তো তার উচিত মনের কথা প্রকাশ্যে বলা, অথবা তোমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ করা; আর তুমি যদি একাজ না কর তো আমি করব। আমি তাকে চিঠি লিখব, বাপিকে বলব!" সোনিয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলল।

"কিন্তু তাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না!" নাতাশা বলল।

"নাতাশা, আমি তোমাকে বুঝতে পারছি না। আর তুমি এসব কি বলছ! তোমার বাবার কথা, নিকলাসের কথা ভাব।"

"আমি কাউকে চাই না, তাকে ছাড়া কাউকে ভালবাসি না। তাকে সম্মান-জ্ঞানহীন বলবার সাহস তোমার হল কেমন করে?" নাতাশা আর্তনাদ করে উঠল।

"চলে যাও সোনিয়া। আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাই না, কিন্তু তুমি চলে যাও, ঈশ্বরের দোহাই, চলে যাও! দেখছ আমি কত কষ্ট পাচ্ছি!" নাতাশা সক্রোধে চেঁচিয়ে বলল; হতাশা ও চাপা বিরক্তি তার গলায়। সোনিয়া ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে ছুটে চলে গেল।

নাতাশা টেবিলে গিয়ে বসল এবং মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে সারা সকাল যে কথা লিখতে পারে নি প্রিন্সেস মারির চিঠির জবাবে সেই কথাই লিখে ফেলল। চিঠিতে সে লিখল, তাদের মধ্যে সব ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে; বিদেশে যাবার সময় তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে গেছে তারই সুযোগ নিয়ে সে প্রিন্সেস মারিকে মিনতি করছে, সে যেন সবকিছু ভুলে যায়, তার প্রতি সে যদি কোন অন্যায় করে থাকে তো তাকে যেন ক্ষমা করে, কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রুর স্ত্রী হতে সে পারবে না। সেইমুহূর্তে নাতাশার কাছে এসবকিছুই একান্ত সহজ, সরল, স্পষ্ট বলে মনে হল।

শুক্রবারে রস্তভদের দেশে ফিরে যাবার কথা, কিন্তু বুধবারেই একজন ভাবী ক্রেতাকে সঙ্গে নিয়ে কাউণ্ট তার মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে চলে গেল।

কাউণ্ট যেদিন চলে যায় সেইদিনই কারাগিনদের বাড়ির একটা বড় ডিনার-পার্টিতে সোনিয়া ও নাতাশার নিমন্ত্রণ হল; মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না দুজনকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেল। সেই পার্টিতে আনাতোলের সঙ্গে নাতাশার আবার দেখা হল। সোনিয়া লক্ষ্য করল, তারা এমনভাবে কথা

বলছে যাতে অন্য কেউ শুনতে না পায়, আর আগাগোড়াই নাতাশাকে আগের চাইতেও বেশী উত্তেজিত মনে হচ্ছে। বাড়ি ফিরে নাতাশা নিজের থেকেই প্রসঙ্গটা তুলল।

ছেলেমানুষি আত্মতুষ্টির স্বরে বলল, "এই তো সোনিয়া, তার সম্পর্কে কত আজেবাজে কথাই তুমি বলেছ। আজ সব বোঝাপড়া হয়ে গেল।"

"আচ্ছা, কি হল? সে কি বলল? তুমি যে আমার উপর রাগ কর নি সেজন্য আমি খুব খুসি হয়েছি নাতাশা! আমাকে সবকথা বল—পুরো সত্যটা বল। সে কি বলেছে?"

নাতাশা চিন্তিত হল।

"আঃ, সোনিয়া, আমার মত করে তুমি যদি তাকে জানতে! সে বলেছে…সে আমার কাছে জানতে চাইল, বল্‌কন্‌স্কিকে আমি কি কথা দিয়েছি। তাকে প্রত্যাখ্যান করার স্বাধীনতা যে আমার আছে তাতে সে খুসি হয়েছে।"

সোনিয়া সক্ষেদে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

বলল, "কিন্তু তুমি তো বল্‌কন্‌স্কিকে প্রত্যাখ্যান কর নি?"

"হয় তো করেছি। হয় তো আমার ও বল্‌কন্‌স্কির মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। তুমি আমাকে এত খারাপ ভাবছ কেন?"

"আমি কিছুই ভাবছি না, শুধু এটা বুঝতে পারছি না……"

"একটু সবুর কর সোনিয়া, সব বুঝতে পারবে। সে যে কী মানুষ তা দেখতে পাবে! আমাকে বা তাকে খারাপ ভেব না। আমি কাউকে খারাপ ভাবি না: সকলকেই আমি ভালবাসি, করুণা করি। কিন্তু আমি কি করব?"

নাতাশার মিষ্টি কথায় সোনিয়া ভুলল না। নাতাশার মুখ যত বেশী আবগে আপ্লুত হয়ে উঠল, সোনিয়ার মুখ তত বেশী গম্ভীর ও কঠিন হয়ে উঠল।

বলল, "নাতাশা, তুমিই আমাকে বলেছিলে তোমার সঙ্গে কথা না বলতে, কিন্তু এখন তুমিই কথাটা তুলেছ। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না নাতাশা। এই গোপনীয়তা কেন?"

"আবার! আবার!" নাতাশা বাধা দিল।

"নাতাশা, তোমার জন্য আমার ভয় হয়!"

"কিসের ভয়?"

"ভয় হচ্ছে তুমি নিজের সর্বনাশ করতে চলেছ," দৃঢ়কণ্ঠে সোনিয়া বলল, আর নিজের কথায় নিজেই আতংকিত হয়ে উঠল।

নাতাশার মুখে পুনরায় ক্রোধের প্রকাশ দেখা দিল।

"সর্বনাশের পথেই আমি যাব, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যাব! সেটা তোমার ব্যাপারে নয়। কষ্ট তো তুমি পাবে না, পাব আমি। আমাকে

একা থাকতে দাও, একা থাকতে দাও! তোমাকে আমি ঘৃণা করি!"

সোনিয়ার সঙ্গে নাতাশা আর একটি কথাও বলল না, তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। সেই একই ক্ষুব্ধ বিস্ময় ও অপরাধবোধ নিয়ে সে বাড়িময় ঘুরে বেড়াতে লাগল; এই একটা কাজে হাত দেয়, আবার আর একটা কাজে হাত দেয়, তারপর সেটাও ছেড়ে দেয়।

এ অবস্থা সোনিয়ার পক্ষে কষ্টদায়ক, সে বন্ধুর উপর নজর রাখল, কখনও তাকে চোখের আড়ালে যেতে দিল না।

কাউন্ট ফিরে আসার আগের দিন নাতাশা সারা সকালবেলাটা বসার ঘরের জানালার পাশে বসে রইল, যেন কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করছে; বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় জনৈক অফিসারকে কিছু ইঙ্গিতও করল; সোনিয়ার ধারণা লোকটি আনাতোল।

সোনিয়া বন্ধুর উপর আরও কড়া নজর রাখল; লক্ষ্য করল, ডিনারের সময় এবং সারাটা সন্ধ্যা নাতাশা একটা অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে কাটাল। কোন কিছু জিজ্ঞাসা করলে কদাচিৎ জবাব দেয়, কথা শুরু করে শেষ করে না, সবকিছুতেই হাসতে থাকে।

চায়ের পরে সোনিয়া দেখল, একটি দাসী ভিতরে ঢুকবার অপেক্ষায় সভয়ে নাতাশার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। নাতাশা দরজা খুলে দাসীকে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল। সোনিয়া দরজায় কান পেতে বুঝতে পারল, আরও একটা চিঠি দেওয়া হল।

সহসা সে পরিষ্কার বুঝতে পারল, সেদিন সন্ধ্যায় নাতাশা একটা কোন ভয়ংকর মতলব এঁটেছে। সে দরজায় টোকা দিল। নাতাশা দরজা খুলল না।

সোনিয়া ভাবল, "ওরা পালিয়ে যাবে! নাতাশা সব পারে। আজ তার মুখটা অতিশয় করুণ ও কঠোর দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক তাই, সে আনাতোলের সঙ্গে পালিয়ে যাবে, কিন্তু এখন আমি কি করি? কাউন্ট বাইরে গেছেন। আমি কি করি? কুরাগিনকে চিঠি লিখে কৈফিয়ৎ চাইব? কিন্তু তাকে জবাব দিতে বাধ্য করব কি দিয়ে? পিয়েরকে চিঠি লিখব? প্রিন্স আন্দ্রু তো বলে গিয়েছে কোন দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটলে তাকেই জানাতে।···কিন্তু সে হয় তো ইতিমধ্যেই বল্‌কন্‌স্কিকে প্রত্যাখ্যান করেছে—গতকালই সে প্রিন্সেস মারিকে চিঠি লিখেছে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নাকে একথা জানানোও সোনিয়ার কাছে ভয়ংকর বলে মনে হল। অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সোনিয়া ভাবতে লাগল: "যাই হোক না কেন, এই পরিবারের উপকারের কথা যে আমার মনে আছে, নিকলাসকে যে আমি ভালবাসি, সেকথা যদি আজ প্রমাণ করতে না পারি তো আর কোনদিনই পারব না। হ্যাঁ, তিনটে রাতও যদি ঘুমতে না পারি তবু এই বারান্দা ছেড়ে যাব

না। তাকে জোর করে ধরে রাখব, পরিবারের মুখে কলংক লাগতে দেব না।”

অধ্যায়—১৬

আনাতোল ইদানীং দলখভদের সঙ্গেই আছে। কয়েক'দিন আগেই নাতালি রস্তভাকে অপহরণের মতলব ভাঁজা হয়েছে, আর দলখভই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি করেছে; নাতাশার দরজায় কান পেতে সব কথা শুনে সোনিয়া যেদিন সংকল্প নিল যে তাকে রক্ষা করবেই, সেইদিনই ওই মতলব হাসিল করার কথা। নাতাশা কথা দিয়েছে রাত দশটার সময় সে খিড়কির দরজায় কুরাগিনের সঙ্গে মিলিত হবে। কুরাগিন একটা ত্রয়কা প্রস্তুত রাখবে এবং নাতাশাকে তাতে চড়িয়ে চল্লিশ মাইল দূরের কামেংকা গ্রামে পৌঁছবে, আর সেখানেই তাদের বিবাহ-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য একজন পুরোহিতকে হাজির রাখা হবে। কামেংকা থেকে পর পর ঘোড়া পাল্টিয়ে তারা ওয়ারস-এর বড় রাস্তায় পৌঁছবে এবং সেখান থেকে ডাক-ঘোড়ায় চেপে দ্রুত বিদেশে পাড়ি দেবে।

আনাতোলের একটা পাশপোর্ট আছে, ডাক-ঘোড়ার হুকুম-নামা আছে, বোনের দেওয়া দশ হাজার রুবল আছে, এবং দলখভের সাহায্যে কর্জ-করা আরও দশ হাজার আছে।

এই নকল বিয়ের দুই সাক্ষী খ্‌ভস্তিকভ ও মাকারিন দলখভের সামনের ঘরে বসে চা খাচ্ছে। খ্‌ভস্তিকভ একজন অবসরপ্রাপ্ত ক্ষুদে কর্মচারি, দলখভের জুয়াখেলার সহযোগী; আর মাকারিন একজন অবসরপ্রাপ্ত হুজার, দুর্বলচিত্ত ভাল মানুষ, কুরাগিনের প্রতি তার অসীম স্নেহ।

দলখভ বড় পড়ার ঘরটাতে একটা খোলা ডেস্কের সামনে বসেছিল। ঘরের দেয়াল জুড়ে ঝুলছে পারসিক কম্বল, ভালুকের চামড়া ও অস্ত্রশস্ত্র। দলখভের পরনে ভ্রমণোপযোগী জোব্বা ও উঁচু বুট। ডেস্কের উপরে রয়েছে একটা গণনা-ফলক ও কয়েক বাণ্ডিল নোট। ইউনিফর্মের বোতাম খোলা অবস্থায়ই আনাতোল তিনটে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে: একঘরে সাক্ষীরা বসে আছে, পড়ার ঘর, এবং পিছনের ঘর যেখানে তার ফরাসী খানসামা ও অন্যরা মিলে তার শেষ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে।

দলখভ বলল, “তাহলে, খ্‌ভস্তিকভকে দিতে হবে দু'হাজার।”

“তাহলে দিয়ে দাও,” আনাতোল বলল।

“মাকার্কা (মাকারিনের ডাক-নাম) বিনা পারিশ্রমিকেই তোমার জন্য যে-কোন বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত। কাজেই আমাদের সব হিসাব মিটে গেল।” দলখভ কাগজটা দেখিয়ে বলল। “ঠিক আছে তো?”

“নিশ্চয় আছে,” দলখভের কথায় কান না দিয়েই আনাতোল হাসিমুখে

বলল ; সে হাসিটি তার মুখে লেগেই আছে।

দলখভ সশব্দে ডেস্কের ডালাটা বন্ধ করে আনাতোলের দিকে ফিরে বলল, "বুঝে দেখ। এসব ঝামেলা না করাই ভাল। এখনও সময় আছে।"

আনাতোল পাল্টা জবাব দিল, "মূর্খ! বাজে কথা বল না! শুধু যদি জানতে····শয়তানই শুধু জানে!"

দলখভ বলল, "না, সত্যি বলছি, এ মতলব ছেড়ে দাও। আমি মন থেকেই বলছি। যে মতলব আমরা ভেঁজেছি সেটা তামাসার ব্যাপার নয়।"

আনাতোল মুখ ভেংচে বলল, "আবার বিরক্ত করছ? তুমি উচ্ছন্নে যাও। তোমার এইসব বোকা তামাসার সময় এটা নয়।" সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দলখভের মুখে ঘৃণা ও করুণার হাসি দেখা দিল।

আনাতোলকে ডেকে বলল, "একটু অপেক্ষা কর। আমি ঠাট্টা করছি না। কাজের কথাই বলছি। এখানে এস, এখানে এস।"

আনাতোল ফিরে এল। দলখভের দিকে তাকিয়ে রইল।

"এবার আমার কথা মন দিয়ে শোন। এই শেষবারের মত বলছি। এ নিয়ে ঠাট্টা করব কেন? আমি কি তোমাকে বাধা দিয়েছি? সব ব্যবস্থা কে করেছে? কে পুরোহিত খুঁজে এনেছে, কে পাশপোর্ট পাইয়ে দিয়েছে? কে টাকা তুলেছে? সব আমি করেছি।"

"বেশ তো সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। তুমি কি মনে কর আমি যথেষ্ট কৃতজ্ঞ নই?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আনাতোল দলখভকে আলিঙ্গন করল।

"আমি তোমাকে সাহায্য করছি, কিন্তু তবু তোমাকে সত্য কথাটা বলা দরকার। এ বড় বিপজ্জনক কাজ; একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে—কাজটা বোকামি। দেখ, তুমি যদি তাকে হরণ করে আন—ঠিক আছে! কিন্তু তারা কি সেখানেই ব্যাপারটাকে থামতে দেবে? তোমার যে আগেই বিয়ে হয়েছে সেটাও জানাজানি হয়ে যাবে। তাহলে, তারা তোমাকে ফৌজদারি আদালতে নিয়ে তুলবে····"

"আঃ, যত বাজে কথা, বাজে কথা!" আনাতোল আর একবার মুখ ভেংচাল। "আমি কি তোমাকে সব কথা বুঝিয়ে বলি নি?" একটা আঙুল বাঁকিয়ে সে বলে চলল, "তোমাকে কি বুঝিয়ে বলি নি যে এই সিদ্ধান্তে আমি এসেছি: এই বিয়ে যদি অসিদ্ধ হয়, তাহলে আমার কৈফিয়ৎ দেবার কিছুই থাকবে না; কিন্তু বিয়েটা যদি সিদ্ধ হয়, তাহলে তো কোন কথাই নেই! বিদেশে এবিষয়ে কেউ কিছু জানতে পারবে না। তাই নয় কি? কাজেই এ নিয়ে আমাকে কিছু বলো না, বলো না, বলো না!"

"সত্যি বলছি, এ মতলব ছেড়ে দাও। এর ফলে তুমি অনেক গোলমালে

জড়িয়ে পড়বে।"

"তুমি উচ্ছন্নে যাও!" চীৎকার করে উঠে মাথা চুল চেপে ধরে আনাতোল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; আবার সঙ্গেসঙ্গেই ফিরে এসে দলখভের সামনেকার হাতল-চেয়ারে দুই পা মুড়ে বসে পড়ল। "স্বয়ং শয়তান বাসা বেঁধেছে। কি বুঝছ? দেখ, কেমন ঢিপ্-ঢিপ্ করছে!" দলখভের হাতটা নিজের বুকে রাখল। "ভাইরে, কী সে পা! কী চাউনি! দেবী!" সে ফরাসীতে বলল। "কি?"

দলখভ নিরাসক্ত হাসি হেসে দুটি সুন্দর চোখ মেলে তার দিকে তাকাল—যেন তার কাছ থেকে আরও কিছুটা মজা পেতে চাইছে।

"বেশ তো, কিন্তু যখন টাকা ফুরিয়ে যাবে তখন?"

"তখন আবার কি? অ্যাঁ?" ভবিষ্যতের চিন্তায় আনাতোল বিব্রত বোধ করল। "তখন কি হবে?···তখন, আমি জানি না।""কিন্তু কেন বাজে কথা বলছ!" সে ঘড়ি দেখল! "সময় হয়ে গেছে!"

আনাতোল ভিতরের ঘরে চলে গেল।

চাকরদের ধমক দিয়ে বলল, "এতক্ষণে! প্রায় তৈরি? তোমরা সব ঘুরে বেড়াচ্ছ!"

দলখভ টাকাটা সরিয়ে রেখে একটি পরিচারককে পাঠাল যাত্রার আগে কিছু খাদ্য-পানীয় আনতে। তারপর যে ঘরে খ্ভস্তিক ও মাকারিন বসে আছে সেখানে গেল।

কনুইতে ভর দিয়ে আনাতোল একটা সোফায় শুয়ে আছে। মুখে বিষণ্ণ হাসি; সুন্দর ঠোঁট দুটি নাড়িয়ে আপন মনেই কি যেন বলছে।

পাশের ঘর থেকে দলখভ হাঁক দিল, "এস, কিছু খেয়ে নাও। একচুমুক পান কর।"

আনাতোল হেসে জবাব দিল, "আমার ইচ্ছা করছে না।"

"এস! বলগা এসেছে।"

আনাতোল উঠে খাবার ঘরে গেল। বলগা একজন বিখ্যাত ত্রয়কা চালক। দলখভ ও আনাতোলের সঙ্গে তার ছ' বছরের পরিচয়; ত্রয়কা নিয়ে তাদের অনেক সেবা সে করেছে। আনাতোলের রেজিমেণ্ট যখন তিভারে ছিল তখন একাধিকবার সে তাকে রাতে তিভার থেকে ত্রয়কায় তুলে ভোরে মস্কো পৌঁছে দিয়েছে, আবার পরদিন রাত্রে তাকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে। কেউ পিছু নিলে একাধিকবার সে দলখভকে পালাতে সাহায্য করেছে। তাদের নিয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে মস্কোর রাজপথে অনেকবার সে পদযাত্রীদের চাপা দিয়েছে, অনেক গাড়ি উল্টে দিয়েছে, আর সবসময়ই "আমার ভদ্রলোকদের" দ্বারা ফলাফলের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। তাদের সেবায় তার একাধিক ঘোড়া নষ্ট হয়েছে। একাধিকবার তারা তাকে প্রহার করেছে, আবার

একাধিকবার তাকে শ্যাম্পেন ও মাদিরাও খাইয়েছে। আবার দুজনের প্রত্যেকেরই এমন একাধিক কথা সে জানে যা যেকোন সাধারণ মানুষকে অনেককাল আগেই সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে ছাড়ত। তারাও প্রায়ই বলগাকে তাদের নরকে ডেকে আনে, মদ গেলায়, জিপ্‌সিদের সঙ্গে নাচায়; তাদের একাধিক হাজার রুবল তার হাত দিয়েই খরচ হয়েছে। তাদের সেবায় বছরে বিশবার করে তার গায়ের চামড়া ও জীবনকে বিপন্ন করেছে, আর এত বেশী ঘোড়া নষ্ট করেছে যা তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকায় কিনতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাদের দুজনকে সে ভালবাসে; ঘণ্টায় বারো মাইল বেগে পাগলের মত ত্রয়কা চালাতে ভালবাসে; অন্য চালককে উল্টে দিতে, কোন পদযাত্রীকে চাপা দিতে, এবং মস্কোর রাজপথে জোরকদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে ভালবাসে। তাদের দুজনকে সে “সত্যিকারের ভদ্রলোক” বলে মনে করে।

আনাতোল ও দলখভও বলগাকে পছন্দ করে তার চমৎকার ত্রয়কা চালানোর জন্য; তাছাড়া আরও একটা কারণ আছে—তারা যা পছন্দ করে বলগারও তাই পছন্দ। অন্যদের বেলায় বলগা দরদাম করে, দুঘণ্টার পথ যেতে পঁচিশ রুবল ভাড়া হাঁকে, নিজে বড়একটা চালায় না, যুবকদের ত্রয়কায় বসিয়ে দেয়। কিন্তু “তার ভদ্রলোকদের” বেলায় সবসময় নিজে চালায়, কাজের জন্য কখনও কিছু দাবী করে না। শুধু বছরে দু'বার—যখন খানসামাদের কাছ থেকে খবর পায় যে তাদের হাতে টাকা আছে—তখন একদিন সকালে বহালতবিয়তে আসে, অনেকটা মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে কিছু সাহায্য ভিক্ষা করে। ভদ্রলোকরাও সবসময়ই তাকে আদর করে বসতে দেয়।

সে বলে, “এ বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করুন আইভানিচ স্যার”, অথবা বলে “ইয়োর এক্সেলেন্সি, বড়ই ঘোড়ার অনটন চলছে। মেলায় যাবার জন্য যা পারেন কিছু দিন।”

আর আনাতোল ও দলখভও হাতে টাকা থাকলে এক হাজার বা দু' হাজার রুবল দিয়ে দেয়।

বলগার মাথায় সুন্দর চুল, বেঁটেখাটো, চ্যাপ্টা নাক, লাল মুখ, সরু লাল গলা, চকচকে ছোট চোখ, ছোট দাড়ি; বছর সাতাশ বয়সের একজন চাষী। পরনে রেশমী পাড় বসানো গাঢ় নীল রংয়ের সুন্দর সুতীর কোট; তার নীচে একটা ভেড়ার চামড়া।

এখন ঘরে ঢুকে সে প্রথমে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; তারপর ছোট কালো হাতটা বাড়িয়ে দলখভের দিকে এগিয়ে গেল।

অভিবাদন করে বলল, “থিয়োদর আইভানিচ!”

“কেমন আছ হে বন্ধু? এই যে, তুমিও এসে পড়েছ!”

আনাতোল ঘরে ঢুকল। তারদিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলগা বলল,

"শুভদিন, ইয়োর এক্সেলেন্সি !"

লোকটির কাঁধে হাত রেখে আনাতোল বলল, "আচ্ছা বলগা, আমার কথা কি তুমি ভাব, না ভাব না? অ্যাঁ? দেখ, আমার একটা কাজ করে দিতে হবে···কোন্ কোন্ ঘোড়া নিয়ে এসেছ?"

"আপনার লোক যেমন হুকুম করেছে, আপনার বিশেষ দুই জন্তু", বলগা জবাব দিল।

"শোন বলগা। তিনটে ঘোড়াকেই ছুটিয়ে মেরে ফেললেও তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিতেই হবে। বুঝেছ?"

বলগা চোখ টিপে বলল, "ওরা মরে গেলে আমি কাকে চালাব?"

হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে আনাতোল চেঁচিয়ে উঠল, "মনে থাকে যেন, তোমার মুখ ভেঙে দেব! ঠাট্টা করো না!"

চালকটি হেসে বলল, "ঠাট্টার কি হল? আমার ভদ্রলোকদের কোন্ কাজটা না করে দিয়েছি! ঘোড়ার পক্ষে যত তাড়াতাড়ি ছোটা সম্ভব তত তাড়াতাড়িই আমরা ছুটব!"

আনাতোল বলল, "আঃ! ঠিক আছে, বস।"

দলখভও বলল, "হ্যাঁ, বস!"

"আমি দাঁড়িয়েই থাকব থিয়োদর আইভানিচ।"

"বসে পড়; যত বাজে কথা! একটু টেনে নাও!" বলে একটা বড় গ্লাসে মদিরা ভর্তি করে আনাতোল তার দিকে এগিয়ে দিল।

মদ দেখেই কোচয়ানের চোখ দুটো জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল। ভব্যতার খাতিরে একটু আপত্তি জানিয়ে সবটা শেষ করে পকেট থেকে একটা লাল রেশমী রুমাল বের করে মুখটা মুছে নিল।

"কখন রওনা হতে হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

"তা····" আনাতোল ঘড়ি দেখল। "এখনই রওনা হব। মনে রেখ বলগা। ঠিক সময়ে পৌঁছনো চাই। বুঝলে?"

বলগা জবাব দিল, "সেটা কপালের উপর নির্ভর করে, অন্যথায় ঠিক সময়ে পৌঁছব না কেন? সাত ঘণ্টায় আপনাকে কি তিভার পৌঁছে দেই নি? আশা করি সে-কথা ইয়োর এক্সেলেন্সির মনে আছে?"

সেকথা মনে পড়ায় হেসে মাকারিনের দিকে ফিরে আনাতোল বলল, "একবার বড়দিনের সময় আমি তিভার থেকে গাড়িতে যাচ্ছিলাম। আপনি কি বিশ্বাস করবেন মাকার্কা, এত জোরে গাড়িটা ছুটছিল যে দম বন্ধ হবার উপক্রম। একসারি বোঝাই স্লেজ সামনে পড়ায় দুটোর উপর দিয়েই ত্রয়কা চালিয়ে দিয়েছিলাম।"

বলগা শেষটা বলে দিল, "সে ছিল ঘোড়ার মত ঘোড়া!" দলখভের দিকে ঘুরে বলল, "আপনি কি বিশ্বাস করবেন থিয়োদর আইভানিচ, ঘোড়াগুলো

ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল ছুটেছিল ? আমি তাদের ধরে রাখতে পারছিলাম না, তুষারপাতের ফলে আমার হাত অবশ হয়ে আসছিল, শেষপর্যন্ত লাগাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠলাম—"আপনি লাগাম ধরুন ইয়োর এক্সেলেন্সি !" ঘোড়াগুলোকে ছোটাবার কোন ব্যাপারই ছিল না, গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার আগে তাদের ধরে রাখাই যায় নি। শয়তানরা তিন ঘণ্টায় আমাদের সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল ! সেযাত্রায় শুধু একটা মারা গিয়েছিল।"

অধ্যায়—১৭

আনাতোল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আবার কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এল। এখন তার পরনে লোমের কোট, রুপোর বেল্ট দিয়ে আঁটা, একটা লোমের টুপি কাৎ করে মাথার একপাশে বসানো ; সুন্দর মুখের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে।

আয়নায় মুখটা দেখে সেই একই ভঙ্গীতে দলখভের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে একটা মদের গ্লাস তুলে নিল।

বলল," আচ্ছা, তাহলে বিদায় থিয়োদর। সবকিছুর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।" মাকারিন ও অন্যদের দিকে ফিরে একমুহূর্ত কি ভেবে বলল, "আমার যৌবনের সহকর্মী ও বন্ধুগণ, বিদায় !"

যদিও সকলেই তার সঙ্গেই যাচ্ছে, তবু আনাতোল সহকর্মীদের প্রতি ভাষণের ভিতর দিয়ে মর্মস্পর্শী ও গম্ভীর একটা কিছু করতে চাইল। বুকটাকে সামনে ঠেলে দিয়ে একটা পা দোলাতে দোলাতে উঁচু গলায় ধীরে ধীরে কথাগুলি বলল।

"সকলেই গ্লাস তুলে নিন ; বলগা, তুমিও নাও। হে আমার যৌবনের সহকর্মী ও বন্ধুরা, আমরা একসঙ্গে অনেকদিন কাটিয়েছি, ফুর্তি করেছি। না কি ? এবার, কতদিনে আবার দেখা হবে ? আমি তো বিদেশে যাচ্ছি। অনেকদিন সুখে কাটিয়েছি—এবার বিদায় বাছারা ! আমাদের স্বাস্থ্য পান করছি ! হুর্‌রা !…" চীৎকার করে বলে গ্লাসটা খালি করে আনাতোল সেটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে দিল।

"আপনার স্বাস্থ্য পান করছি," বলে বলগাও তার গ্লাসটা খালি করে রুমালে মুখ মুছল।

সাশ্রু নয়নে মাকারিন আনাতোলকে আলিঙ্গন করল।

"আহা প্রিন্স, আপনাকে বিদায় দিতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে !"

"এবার যাওয়া যাক ! যাওয়া যাক !" আনাতোল চেঁচিয়ে বলল।

বলগা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

আনাতোল বলল, "না, থাম ! দরজাটা বন্ধ করে দাও ; আগে সকলকে একসঙ্গে বসতে হবে। সেটাই প্রথা।"

দরজা বন্ধ করে সকলেই বসে পড়ল। (এটা একটা রুশ প্রথা।)

আনাতোল দাঁড়িয়ে বলল, "এবার দ্রুত যাত্রা শুরু, বাছারা!"

খানসামা যোসেফ কোষবদ্ধ তরবারি তার হাতে তুলে দিল; সকলে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

দলখভ শুধাল, "লোমের জোব্বাটা কোথায়? হেই ইগ্‌নাৎকা! মাত্রেনা মাত্রেভ্‌নার কাছ থেকে লোমের জোব্বাটা চেয়ে আন।" চোখ টিপে বলতে লাগল, "পালিয়ে যাওয়া যে কী জিনিস তা অনেক শুনেছি। আরে, সে তো পড়ি-মরি করে যা পরা থাকবে তাই নিয়েই ছুটে বেরিয়ে আসবে; যদি একটু দেরি করেছ কি অমনি শুরু হবে চোখের জল, আর 'বাপি' ও 'মামণি', আর সেও এক মিনিটেই জমে বরফ হয়ে ফিরে যাবে—কিন্তু প্রথম সুযোগেই লোমের জোব্বা দিয়ে ঢেকে তাকে একেবারে স্লেজে এনে তুলে দাও।"

খানসামা মেয়েদের ব্যবহারের শেয়ালের চামড়ার পটি দেওয়া একটা জোব্বা এনে দিল।

"মূর্খ! বললাম না লোমের জোব্বা! হেই মাত্রেনা, লোমের জোব্বা!" তার কণ্ঠস্বর ঘরে ঘরে ধ্বনিত হতে লাগল।

একটি ক্ষীণ তনু, সুদর্শনা জিপ্‌সি মেয়ে কালো চোখ ও নীল-কালো চুল নাচিয়ে একটা লাল শাল পরে ছুটে বেরিয়ে এল; তার হাতে একটা লোমের জোব্বা।

দলখভ কোন কথা না বলে জোব্বাটা মাত্রেনার গায়ে জড়িয়ে দিল। তারপর বলল, "এইভাবে, আর তার পরে এইভাবে"; কলারটা মাত্রেনার মাথা পর্যন্ত তুলে দিয়ে শুধু মুখের একটুখানি খোলা রাখল। "আর তার পরে এইভাবে, দেখতে পাচ্ছ?" আনাতোলের মাথাটাকে সে এমনভাবে এগিয়ে ধরল যাতে কলারের ফাঁক দিয়ে মাত্রেনার উজ্জ্বল হাসিটুকু দেখা যায়।

মাত্রেনাকে চুমো খেয়ে আনাতোল বলল, "আচ্ছা, বিদায় মাত্রেনা। এখানকার লীলা-খেলা তো সাঙ্গ হল। স্তেশ্‌কাকে আমার কথা বলো। তাহলে বিদায়! বিদায় মাত্রেনা, আমার সৌভাগ্য কামনা করো!"

জিপ্‌সি-উচ্চারণে মাত্রেনা বলল, "প্রিন্স, ঈশ্বর আপনাকে পরম সৌভাগ্য দান করুন!"

ফটকের সামনে দুটো ত্রয়কা দাঁড়িয়ে আছে; দুটি যুবক কোচয়ান ঘোড়াগুলোকে ধরে আছে। বলগা সামনের ত্রয়কাতে উঠে বসল, হাত উঁচু করে লাগাম তুলে নিল। আনাতোল ও দলখভ তার গাড়িতে উঠল। মাকারিন, খ্‌ভস্তিকভ ও একটি খানসামা উঠল অপর স্লেজটাতে।

"তোমরা প্রস্তুত?" বলগা শুধাল।

"চালাও।" হাতের লাগাম ঘুরিয়ে সে চেঁচিয়ে বলল; নিকিৎস্কি বুলভার্দ ধরে ত্রয়কা তীরবেগে ছুটল।

"তপ্রু! তফাৎ যাও! হাই!...তপ্রু!...বলগার গলা আর বক্সে উপবিষ্ট জোয়ানটির গলা ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না। আর্বাৎ স্কোয়ারে ত্রয়কাটা একটা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগাল; একটা কিছু ভাঙার শব্দ হল, হৈ-চৈ শোনা গেল, ত্রয়কাটা আর্বাৎ স্ট্রীট ধরে উড়ে চলল।

পদনভিন্স্কি বুলভার্দ বরাবর মোড় ঘুরে বলগা লাগামে টান দিল, পিছন ফিরে পুরনো কোনিউশেনি স্ট্রীটের মোড়ে ত্রয়কা থামাল।

জোয়ানটি বক্স থেকে লাফিয়ে নেমে ঘোড়াগুলোকে ধরল। আনাতোল ও দলখভ পথ ধরে এগিয়ে গেল। ফটকে পৌঁছে দলখভ শিস দিল। শিসের জবাব শোনা গেল, একটি দাসী ছুটে বেরিয়ে এল।

বলল, "উঠোনে ঢুকে পড়ুন, নইলে ওরা আপনাদের দেখে ফেলবে; তিনি এখুনি এসে পড়বেন।"

দলখভ ফটকেই রইল; আনাতোল দাসীকে অনুসরণ করে উঠোনে পড়ে মোড় ঘুরে দৌড়ে বারান্দায় উঠে পড়ল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার ষণ্ডামার্ক পরিচারক গেব্রিয়েলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

পালাবার পথ আটকে দাঁড়িয়ে গেব্রিয়েল বলল, "দয়া করে কর্ত্রীঠাকরুণের কাছে চলুন।"

"কোন্ কর্ত্রীঠাকরুণ? তুমি কে?" রুদ্ধশ্বাস অস্পষ্ট স্বরে আনাতোল বলল।

"দয়া করে ভিতরে চলুন। আপনাকে ভিতরে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।"

দলখভ চীৎকার করে বলল, "কুরাগিন! ফিরে এস! বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে! ফিরে এস!"

আনাতোল ভিতরে ঢুকে যাবার পরে দলখভ ছোট দরজাটার কাছে দাঁড়িয়েছিল; দরোয়ান দরজায় তালা লাগাবার চেষ্টা করতেই সে তার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিল। প্রাণপণ চেষ্টায় দলখভ দরোয়ানকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতেই আনাতোলও ছুটে বেরিয়ে এল আর দলখভ তার হাতটা চেপে ধরে ছোট দরজাটার ভিতর দিয়ে টানতে টানতে ত্রয়কাটার কাছে ছুটে গেল।

অধ্যায়—১৮

সোনিয়াকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তার মুখ থেকে সব কথা জেনে নিয়ে নাতাশার চিঠিটা পড়ে সেটা হাতে নিয়েই নাতাশার ঘরে গেল।

বলল, "নির্লজ্জ অকর্মার ধাড়ি! তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।"

নাতাশা অশ্রুহীন বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকাল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তাকে ঘরের মধ্যে তালাবন্ধ করে রেখে দরোয়ানকে হুকুম দিল, সন্ধ্যাবেলা যারা আসবে তাদের যেন ঢুকতে দেয়, কিন্তু আর বের হতে না দেয়; তারপর পরিচারককে তাদের তার কাছে নিয়ে আসার হুকুম করে বসার ঘরে অপহরণকারীদের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

গ্রেবিয়েল এসে যখন খবর দিল যারা এসেছিল তারা পালিয়ে গেছে, তখন সে ভুরু কুঁচকে উঠে দাঁড়াল, দুই হাত পিছনে জুড়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে অনেকক্ষণ ধরে কি করবে তাই ভাবতে লাগল। মাঝরাতে পকেটের মধ্যে চাবিটা নাড়তে নাড়তে নাতাশার ঘরে ঢুকল। সোনিয়া বারান্দায় বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বলল, "মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না, ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে ওর কাছে যেতে দিন!" তার কথার কোন জবাব না দিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। ···"বিরক্তিকর, শোচনীয়··· আমার বাড়িতে···ভয়ংকর মেয়ে, পাজি মেয়ে! আমার দুঃখ শুধু ওর বাবার জন্য! ....যত শক্তিই হোক, সকলকেই জিভ্‌ বন্ধ রাখতে বলে দেব, কাউণ্টের কাছে সবকিছু লুকিয়ে রাখতে হবে।" দৃঢ় পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর ঢুকল। দুই হাতে মুখ ঢেকে নাতাশা সোফায় শুয়ে আছে; একটুও নড়ল না। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তাকে যেভাবে রেখে গিয়েছিল সেইভাবেই আছে।

"ভাল মেয়ে! খুব ভাল!" মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না বলল। "আমার বাড়িতে প্রেমিকের সঙ্গে মুলাকাত! ভান করে পড়ে থেক না, আমি যা বলছি কান পেতে শোন।" নাতাশার হাতে হাত রাখল। "আমার কথাগুলি শোন! অত্যন্ত বাজে মেয়ের মত তুমি নিজের অসম্মান ডেকে এনেছ। তোমাকে ঢিট করতে পারতাম, কিন্তু তোমার বাবার জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে, তাই তার কাছ থেকে সব কথা গোপন রাখব।"

নাতাশা একটুও নড়ল না; নিঃশব্দ চাপা কান্নায় তার সমস্ত শরীর ফুলে ফুলে উঠছে, গলা আটকে আসছে। সোনিয়ার দিকে একবার তাকিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না নাতাশার পাশে সোফায় বসল।

কঠিন স্বরে বলল, "তার ভাগ্য ভাল যে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছে; কিন্তু আমি তাকে খুঁজে বের করবই! ···আমি যা বলছি তা কি কানে যাচ্ছে, না যাচ্ছে না?"

নাতাশার মুখের নীচে হাত রেখে মুখটাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। নাতাশার মুখের দিকে তাকিয়ে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না ও সোনিয়া দুজনই চমকে উঠল। শুকনো চোখ দুটো চক্‌চক্ করছে, ঠোঁট দুটো চেপে আছে, গাল বসে গেছে।

একঝটকায় মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার সোফায় এলিয়ে পড়ে নাতাশা বলে উঠল, "যা হয় হোক! ···তাতে

আমার কি? ···আমি মরে যাব!"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলল, "নাতালি, আমি তোমার ভালই চাই। চুপচাপ শুয়ে থাক, আমি তোমাকে ছোঁব না। কিন্তু আমার কথা শোন। তুমি যে কত বড় দোষ করেছ তা তোমাকে বলব না। সেটা তুমি নিজেই জান। কিন্তু কাল যখন তোমার বাবা ফিরে আসবেন—তাকে আমি কি বলব? অঁ্যা?"

চাপা কান্নায় আবার নাতাশার শরীরটা দুলে উঠল।

"ধর তিনি যদি জানতে পারেন, আর তোমার দাদা, তোমার ভাবী স্বামী?"

"আমার কোন স্বামী নেই: আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করেছি!" নাতাশা চেঁচিয়ে বলল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না বলল, "একই কথা। একথা শুনে তারা কি চুপ করে বসে থাকবে? তাকে, তোমার বাবাকে আমি চিনি···তিনি যদি তাকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করেন, সেটা কি ভাল হবে? কি বল?"

"আঃ, আমাকে একা থাকতে দিন। আপনি নাক গলাচ্ছেন কেন? কেন? কেন? কে আপনাকে ডেকে এনেছে?" সোফার উপর উঠে বসে ঘৃণার দৃষ্টিতে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নার দিকে তাকিয়ে নাতাশা বলল।

এবার মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাও রেগে গেল; জোর গলায় বলল, "কিন্তু তুমিই বা কি চেয়েছিলে? তোমাকে কি তালা-চাবি দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল? কে তাকে এ বাড়িতে আসতে বাধা দিয়েছিল? কেন জিপ্সি গাইয়ে মেয়েদের মত তোমাকে হরণ করতে এসেছিল? ···তুমি কি ভেবেছ তারা তোমাকে খুঁজে পেত না? তোমার বাবা, দাদা, বাকদত্ত স্বামী? আর সে তো একটা শয়তান, হতভাগা—তা তো সকলেই জানে!"

নাতাশা দাঁড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, "সে আপনাদের মত যেকোন লোকের চাইতে ভাল! আপনি বাধা না দিলে···ওঃ, ঈশ্বর! এসব কি হল? কি হল? সোনিয়া, তুমি কেন···? চলে যাও!"

নিজের হাতে-গড়া বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে মানুষ যেভাবে আর্তনাদ করে সেইরকম হতাশাভরা তীব্রতায় নাতাশা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না পুনরায় কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নাতাশা চীৎকার করে উঠল:

"চলে যান! চলে যান! চলে যান! আপনারা সকলেই আমাকে ঘৃণা করেন, তুচ্ছ মনে করেন!" সে আবার সোফায় শুয়ে পড়ল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না আরও কিছুক্ষণ ধরে তাকে বকল; তারপর বলল, নাতাশা যদি সব কথা ভুলে যায় এবং হাবভাবে কাউকে বুঝতে না দেয় যে একটা কিছু ঘটেছে, তাহলে সবকথাই তার বাবার কাছ থেকে গোপন রাখা হবে এবং কেউ কিছু জানতে পারবে না। নাতাশা কোন জবাব দিল না,

কাঁদলও না, কিন্তু কেমন যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল, শরীরটা কাঁপতে লাগল। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তার মাথার নীচে একটা বালিশ গুঁজে দিল, দুটো লেপ চাপা দিল, নিজেই কিছুটা লেবুর জল এনে দিল, কিন্তু নাতাশা কোনরকম সাড়া দিল না।

নাতাশা ঘুমিয়ে পড়েছে মনে করে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "ঠিক আছে, ওকে ঘুমোতে দাও।"

নাতাশা কিন্তু ঘুমোয় নি; বিবর্ণ মুখে খোলা চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। সারারাত সে ঘুমোল না, কাঁদল না, সোনিয়া বারকয়েক তার ঘরে গেলে তার সঙ্গেও কথা বলল না।

পরদিন কাউণ্ট রস্তভ কথামতই লাঞ্চের আগে মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারি থেকে ফিরে এল। তার মেজাজ খুব ভাল, ক্রেতার সঙ্গে কথাবার্তা ভালভাবেই এগিয়েছে, কাউণ্টেসকে ফেলে তাকে আর বেশীদিন মস্কোতে থাকতে হবে না। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তার সঙ্গে দেখা করে জানাল, গতকাল নাতাশা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, ডাক্তারকে ডাকা হয়েছিল, কিন্তু এখন সে অনেকটা ভাল আছে। সকালে নাতাশা ঘর থেকে বের হল না। শুকনো ঠোঁট চেপে ধরে, শুকনো স্থির দৃষ্টি মেলে জানালায় বসে বাইরের লোকজনের চলাফেরা দেখতে লাগল। কেউ ঘরে ঢুকলে চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকে দেখছে। তার মনে আশা, আনাতোলের খবর পাবে; হয় নিজে আসবে, না হয় চিঠি লিখবে।

কাউণ্ট তার সঙ্গে দেখা করতে এলে পায়ের শব্দ শুনেই সে সাগ্রহে মুখ ফেরাল, কিন্তু পরক্ষণেই তার মুখে ফুটে উঠল নিরাসক্ত, হিংস্র ভাব। বাবাকে অভ্যর্থনা জানাতে উঠেও দাঁড়াল না।

"তোমার কি হয়েছে সোনা মেয়ে? তুমি কি অসুস্থ?" কাউণ্ট শুধাল।

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে নাতাশা জবাব দিল: "হ্যাঁ, অসুস্থ।"

কাউণ্ট উদ্বেগের সঙ্গে প্রশ্ন করল, তাকে এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন, তার বাকদত্ত স্বামীর কি কিছু হয়েছে; নাতাশা শুধু বলল, কিছুই হয় নি, বাবা যেন কোনরকম চিন্তা না করে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনাও নাতাশার কথা সমর্থন করে বলল, কিছুই হয় নি। কিন্তু অসুস্থতার ভান, মেয়ের মনমরা ভাব, সোনিয়া ও মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার বিব্রত মুখ—সব কিছু দেখে কাউণ্ট পরিষ্কার বুঝতে পারল যে তার অনুপস্থিতিতে কিছু অঘটন ঘটেছে; কিন্তু তার আদরের মেয়ের গায়ে কলঙ্ক লাগতে পারে সেরকম কিছু ভাবা তার পক্ষে এতই ভয়ঙ্কর, আর নিজের আনন্দময় প্রশান্তিকে সে এতই বড় করে দেখে, যে আর কোন প্রশ্ন না করে নিজেকে সে এটাই বোঝাতে চেষ্টা করল যে বিশেষ কিছুই ঘটে নি; শুধু মেয়ের অসুস্থতার জন্য তাদের দেশে ফেরাটা যে পিছিয়ে গেল তাতেই তার মন অখুসি হয়ে উঠল।

অধ্যায়—১৯

স্ত্রী মস্কোতে আসার পর থেকেই তার কাছাকাছি না হবার জন্যই পিয়ের কোথাও চলে যাবার কথা ভাবছিল। রস্তভরা মস্কোতে আসার কিছুদিন পরেই নাতাশা তার মনের উপর যে প্রভাব ফেলেছে তার ফলেই সে আরও তাড়াতাড়ি মনের সে ভাবনাকে কার্যে রূপায়িত করে ফেলল। যোসেফ আলেক্সিভিচের বিধবার সঙ্গে দেখা করার জন্য সে তিভারে চলে গেল; বিধবাটি অনেকদিন আগেই তাকে কথা দিয়েছিল, পরলোকগত স্বামীর কিছু কাগজপত্র তার হাতে তুলে দেবে।

মস্কোতে ফিরে এসেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার একটা চিঠি তার হাতে এল; আন্দ্রু বল্‌কন্‌স্কি ও তার বাকদত্তার সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাকে দেখা করতে অনুরোধ করা হয়েছে। পিয়ের নাতাশাকে এড়িয়েই চলছিল, কারণ তার মনে হয়েছে, বন্ধুর প্রেমিকার প্রতি একজন বিবাহিত পুরুষের মনোভাব যা হওয়া উচিত নাতাশার প্রতি তার অনুরাগ তার চাইতে অনেক বেশী হয়ে দেখা দিয়েছে। অথচ ভাগ্য বারবার তাদের দুজনকে একত্রে ঠেলে দিচ্ছে।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার কাছে যাবার জন্য পোশাক পরতে পরতে সে ভাবল: "কি ঘটে থাকতে পারে? আমাকে দিয়ে তাদের কি দরকার হতে পারে? প্রিন্স আন্দ্রু যদি তাড়াতাড়ি এসে বিয়েটা করে ফেলত!" পথে যেতে যেতে সে ভাবতে লাগল।

তিভারস্কয় বুলভার্দে একটি পরিচিত কণ্ঠ তাকে ডাকল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "পিয়ের! অনেকদিন হল ফিরেছ নাকি?" পিয়ের মাথাটা তুলল। দুই ঘোড়ার একটা স্লেজে চেপে আনাতোল ও তার চিরসঙ্গী মাকারিন দ্রুত তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আনাতোল সোজা হয়ে বসে আছে সামরিক বাবুদের চিরাচরিত ভঙ্গীতে, বীভার-কলারে মুখের নীচের দিকটা ঢাকা পড়েছে, মাথাটা ঈষৎ হেলানো। মুখটা তাজা ও গোলাপী, সাদা পালক লাগানো টুপিটা একদিকে বাঁকানো, তার ফাঁক দিয়ে চূর্ণ বরফ ছিটানো কোঁকড়া, পমেড-মাখানো চুলগুলি দেখা যাচ্ছে।

পিয়ের ভাবল, "হ্যাঁ, এই সত্যিকারের সন্ন্যাসী। ক্ষণিকের সুখ ছাড়া আর কোনদিকে তার নজর নেই, কোনকিছুতেই সে দুঃখ পায় না, কাজেই সে সর্বদাই হাসিখুসি, সন্তুষ্ট, প্রশান্ত। ওর মত হবার জন্য আমি তো সব কিছু ছাড়তে রাজী!"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার বাইরের ঘরে তার লোমের কোটটা খুলতে সাহায্য করে পরিচারক জানাল, কর্ত্রীঠাকরুণ তাকে নিজের শোবার ঘরেই ডেকেছে।

নাচ-ঘরের দরজা খুলতেই পিয়ের দেখতে পেল, নাতাশা বিষণ্ণ, ঘৃণাভরা

মুখে জানালায় বসে আছে। পিয়েরের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উদাস মর্যাদার ভঙ্গীতে নাতাশা ঘর থেকে চলে গেল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার ঘরে ঢুকে পিয়ের শুধাল, "কি হয়েছে?

"খুব ভাল কাজ!" মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না জবাব দিল, "পঞ্চাশ বছর এ পৃথিবীতে বেঁচে আছি, কিন্তু এরকম লজ্জার কথা কখনও শুনি নি।"

তাকে যা বলা হবে তা নিয়ে সে কারও কাছে মুখ খুলবে না—পিয়েরের কাছ থেকে এই কথা আদায় করে মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তাকে জানাল, বাবা-মার অজ্ঞাতসারেই নাতাশা প্রিন্স আন্‌দ্রুকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এ-সবের কারণ আনাতোল কুরাগিন, পিয়েরের স্ত্রীও তাদের সমাজেই ভিড়েছে, আর গোপনে বিয়ে করার জন্ত বাবার অনুপস্থিতিতে নাতাশা বাড়ি থেকে পালাবার চেষ্টা করেছিল।

পিয়ের হা করে সব কথা শুনল; কিন্তু নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। যে বাকদত্তা স্ত্রীকে প্রিন্স আন্‌দ্রু এত গভীরভাবে ভালবাসে সে—সেই মনোরমা নাতাশা রস্তভা—বল্‌কন্‌স্কিকে ছেড়ে বিয়ে করবে সেই মূর্খ আনাতোলকে যে ইতিমধ্যেই গোপনে বিয়ে করেছে (পিয়ের কথাটা জানে), তাকে সে এতই ভালবেসেছে যে তার সঙ্গে পালিয়ে যেতেও সম্মত হয়েছে—এসব কথা পিয়ের যেন ভাবতেও পারছে না, কল্পনাও করতে পারছে না।

তার মনে পড়ে গেল নিজের স্ত্রীর কথা। খারাপ মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার মত দুর্ভাগ্য শুধু তার একারই হয় নি একথা চিন্তা করে সে নিজের মনেই বলল, "এরা সব সমান!" তবু প্রিন্স আন্‌দ্রুর প্রতি করুণায় তার চোখে জল এসে গেল, তার আহত গর্বের প্রতি মনে সহানুভূতি দেখা দিল, আর বন্ধুকে যতই করুণা করতে লাগল ততই নাতাশার প্রতি ঘৃণা ও বিরক্তি বেড়ে চলল। এইমাত্র নাচ-ঘর থেকে চলে যাবার সময় নাতাশার চোখে সে দেখেছে উদাস মর্যাদার দৃষ্টি। সে জানত না যে নাতাশার অন্তর তখন হতাশা, লজ্জা ও পরাজয়ের গ্লানিতে ভরে উঠেছে; তার মুখের সেই উদাস মর্যাদা ও কঠোরতার দোষও তার নয়।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার কথার জবাবে পিয়ের বলল, "কিন্তু বিয়ে হবে কেমন করে? সে তো বিয়ে করতে পারে না—সে যে বিবাহিত!"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা সক্ষোভে বলে উঠল "এ যে প্রতি ঘণ্টায় অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে! চমৎকার ছেলে! কী শয়তান! আর ও কি না তারই আশায় বসে আছে—বসে আছে গতকাল থেকে! সব ওকে বলতে হবে। তাহলে অন্তত তার আশা ছেড়ে দেবে।"

পিয়েরের মুখে আনাতোলের বিয়ের বিস্তারিত বিবরণ শুনে, আনাতোলকে অনেকরকম বকুনি দিয়ে মনের ঝাল মিটিয়ে মারিয়া

দিমিত্রিয়েভনা কেন পিয়েরকে ডেকে এনেছে সেকথা জানাল। তার ভয় হচ্ছে, কাউন্ট বা বল্‌কন্‌স্কি—যেকোন মুহূর্তে সে এসে পড়তে পারে—যদি এ ব্যাপারে জানতে পারে (যদিও তাদের কাছ থেকে ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখতে পারবে বলেই সে আশা করে) তাহলে আনাতোলকে হয় তো দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করে বসবে ; সুতরাং পিয়ের যেন তার নাম করে তার শ্যালককে মস্কো ছেড়ে চলে যেতে বলে, যাতে আর কোনদিন আনাতোলের মুখ তাকে দেখতে না হয়। এতক্ষণে বুড়ো কাউন্ট, নিকলাস ও প্রিন্স আন্‌দ্রুর বিপদটা উপলব্ধি করে পিয়ের কথা দিল সে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার ইচ্ছামত কাজই করবে। নিজের ইচ্ছার কথা পিয়েরকে সংক্ষেপে ও সঠিকভাবে বুঝিয়ে দিয়ে সে তাকে বসার ঘরে যেতে দিল।

বলল, "মনে রেখ, কাউন্ট কিছুই জানেন না। এমনভাব দেখাবে যেন তুমিও কিছুই জান না। এদিকে আমি গিয়ে মেয়েকে বলছি যে তার জন্য অপেক্ষায় থেকে কোন লাভ নেই! মন চায় তো ডিনার পর্যন্ত থেকে যেয়ো!"

কাউন্টের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হল। তাকে খুবই বিচলিত ও দুর্বল মনে হল। সকালেই নাতাশা তাকে বলে দিয়েছে যে সে বল্‌কন্‌স্কিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

সে পিয়েরকে বলল, "গোলমাল, বড়ই গোলমাল হে বাপু! মা কাছে না থাকলে মেয়েদের নিয়ে যে কত গোলমালই পোয়াতে হয়! এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়েছে। তোমার কাছে খোলাখুলিই সব বলছি। তুমি কি শুনেছ, কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই সে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে? একথা সত্য যে এ বিয়েতে আমার খুব মত ছিল না। অবশ্য ছেলেটি খুব ভাল, কিন্তু তাহলেও বাবার অমতে বিয়ে করে তারা সুখী হত না, আর নাতাশার তো বরের অভাব হত না। তথাপি ব্যাপারটা তো অনেকদিন ধরে চলে আসছে, আর এখন বাবা-মার সম্মতি ছাড়াই এরকম একটা কাজ! এখন তো তার মাও অসুস্থ ; কি যে হবে ঈশ্বরই জানেন! কি জান কাউন্ট, মায়ের অনুপস্থিতিতে মেয়েদের নিয়ে চলা বড়ই শক্ত…"

পিয়ের বুঝল, কাউন্ট খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে ; সে প্রসঙ্গটা বদলাতে চাইল, কিন্তু কাউন্ট তার নিজের বিপদের কথাই বলতে লাগল।

উত্তেজিত মুখে সোনিয়া ঘরে ঢুকল।

"নাতাশার শরীর ভাল নয় ; সে তার ঘরেই আছে, আপনাকে একবার দেখতে চাইছে। মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা তার কাছেই আছেন। তিনিও আপনাকে যেতে বলেছেন।"

"হ্যাঁ, তুমি তো বল্‌কন্‌স্কির বড় বন্ধু ; নিশ্চয়ই সে তাকে একটা খবর পাঠাতে চাইছে। হায়রে! তাহলে কী সুখের ব্যাপারই না হত!"

কপালের অল্প কয়েকগাছি পাকা চুল মুঠো করে ধরে কাউণ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা যখন নাতাশাকে বলল যে আনাতোল বিবাহিত, তখন নাতাশা সেকথা বিশ্বাস করতে চায় নি; বার বার বলল, পিয়ের নিজে এসে কথাটা বলুক। নাতাশার ঘরের দিকে যেতে যেতে সোনিয়া সংবাদটা পিয়েরকে জানাল।

বিবর্ণ, রুক্ষ নাতাশা মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার পাশেই বসেছিল; দুটি চোখে জ্বরতপ্ত উজ্জ্বলতা। পিয়ের ঘরে ঢুকতেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। হাসল না, মাথা নাড়ল না, শুধু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল; তার দৃষ্টিতে শুধু একটি জিজ্ঞাসা: সে কি আনাতোলের বন্ধু, না কি অন্য সকলের মতই তার শত্রু? তার কাছে পিয়েরের যেন কোন অস্তিত্বই নেই।

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা পিয়েরকে দেখিয়ে নাতাশাকে বলল, "ইনি সব জানেন। আমি সত্যি কথা বলেছি কিনা ওর মুখেই শোন।"

পশ্চাদ্ধাবনকারী কুকুর ও শিকারীর দিকে আহত জন্তু যেভাবে তাকায় সেই দৃষ্টিতে নাতাশা একের পর অন্যের দিকে তাকাতে লাগল।

করুণায় আনত চোখে পিয়ের বলতে শুরু করল "নাতালিয়া ইলিনিচ্না, এটা সত্য কি মিথ্যা তাতে আপনার কিছু যায় আসে না, কারণ…"

"তাহলে সে বিবাহিত একথা সত্য নয়?"

"হ্যাঁ, সত্য।"

"বিয়েটা কি অনেকদিন আগে হয়েছে? আপনার দিব্যি…"

পিয়ের দিব্যি করেই বলল।

নাতাশা তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, "সে কি এখনও এখানে আছে?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র আমি তাকে দেখেছি।"

নাতাশা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল; হাত দিয়ে ইসারা করে জানিয়ে দিল, তাকে যেন একলা থাকতে দেওয়া হয়।

অধ্যায়—২০

পিয়ের ডিনারের জন্য অপেক্ষা করল না; ঘর থেকে বেরিয়ে তখনই চলে গেল। সে শহরময় আনাতোল কুরাগিনকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। তার কথা মনে হতেই সব রক্ত হৃদ্‌পিণ্ডে ছুটে এল, শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। কুরাগিন বরফ-পাহাড়ে নেই, জিপ্‌সিদের আড্ডায় নেই, কোমোনেনোদের কাছেও নেই। পিয়ের ক্লাবে গেল। ক্লাবে সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলেছে। একে একে সদস্যরা সকলেই এসে হাজির হল। সে জনে-জনে আনাতোলের কথা জিজ্ঞাসা করল। কেউ বলল এখনও আসে নি; কেউ বলল ডিনারে আসবে। কিন্তু আনাতোল এল না। অগত্যা ডিনারের

জন্য অপেক্ষা না করে পিয়ের বাড়ি ফিরে গেল।

সেদিন আনাতোল ডিনার খেল দলখভের সঙ্গে। এই দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপারটার কি প্রতিকার করা যায় তাই নিয়ে আলোচনা করল। তার মনে হল, নাতাশার সঙ্গে একবার দেখা করা একান্ত দরকার। সন্ধ্যায় সে বোনের কাছে গেল, নাতাশার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে। সারা মস্কোতে ঢুঁ মেরে পিয়ের যখন বাড়ি ফিরল তখন খানসামা খবর দিল, প্রিন্স আনাতোল কাউন্টেসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কাউন্টেসের বসার ঘর তখন অতিথিতে ভর্তি।

ফিরে আসার পর থেকে স্ত্রীর সঙ্গে তার দেখাই হয়নি। এখনও তার সঙ্গে দেখা না করেই সে বসার ঘরে ঢুকল এবং আনাতোলকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

স্বামীর কাছে এগিয়ে এসে কাউন্টেস বলল, "আরে, পিয়ের, তুমি তো জান না আমাদের আনাতোলের কি অবস্থা····"

পিয়ের স্ত্রীকে বলল, "যেখানে তুমি সেখানেই অধর্ম ও পাপ!" তারপর ফরাসীতে আনাতোলকে বলল, "আনাতোল, আমার সঙ্গে এস; তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

আনাতোল মুখ ফিরিয়ে বোনের দিকে তাকাল, তারপর পিয়েরকে অনুসরণ করতে উঠে দাঁড়াল। পিয়ের তার হাতটা ধরে কাছে টেনে এনে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করল।

হেলেন ফিসফিস করে বলল, "যদি আমার বসার ঘরে যেতে চাও····", কিন্তু কোন জবাব না দিয়ে পিয়ের বেরিয়ে গেল।

আনাতোল স্বাভাবিক পটুতার সঙ্গে পা ফেলে তার পিছু নিল, কিন্তু তার মুখে উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল।

পড়ার ঘরে ঢুকে পিয়ের দরজাটা বন্ধ করে দিল; তারপরে আনাতোলের দিকে না তাকিয়েই তাকে উদ্দেশ করে বলল:

"তুমি কাউন্টেস রস্তভাকে কথা দিয়েছিলে তাকে বিয়ে করবে এবং তাকে হরণ করে আনার উদ্যোগও করেছিলে, এ কথা ঠিক?"

"প্রিয় বন্ধু," আনাতোল জবাব দিল (পুরো সংলাপটাই ফরাসীতে হল), "এরকম সুরে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই।"

পিয়েরের বিবর্ণ মুখ ক্রোধে বিকৃত হয়ে উঠল। আনাতোলের ইউনিফর্মের কলারটা চেপে ধরে তাকে এ-পাশ থেকে ও-পাশে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। ক্রমে আনাতোলের চোখে-মুখে আতংক ফুটে উঠল।

"যখন বলেছি তোমার সঙ্গে কথা বলব, তখন বলবই!" ····পিয়ের আবার বলল।

"ছাড়, কি বোকামি করছ। কি হয়েছে?" একটুকরো কাপড়সহ কলারের

একটা বোতাম খুলে পড়ায় সেটা নাড়তে নাড়তে আনাতোল বলল।

"তুমি একটা শয়তান, একটা বদ্‌মাস; এটা দিয়ে কেন যে তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছি না তা জানি না,’ পিয়ের ফরাসীতেই বলল।

একটা ভারী কাগজ-চাপা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে দেবার ভঙ্গীতে সেটাকে তুলে ধরে আবার যথাস্থানে রেখে দিল।

"তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছিলে ?"

"আমি…আমি…আমি সেকথা ভেবে দেখি নি। কখনও কোন কথা দেই নি, কারণ…"

পিয়ের বাধা দিল।

আনাতোলের দিকে এগিয়ে বলল, "তার কোন চিঠি তোমার কাছে আছে ? কোন চিঠি ?"

তারদিকে তাকিয়ে আনাতোল তৎক্ষণাৎ পকেটে হাত ঢুকিয়ে নোট-বইটা টেনে বের করল।

আনাতোলের দেওয়া চিঠিটা হাতে নিয়ে টেবিলটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে পিয়ের সোফায় গিয়ে বসল।

আনাতোলকে ভয় পেতে দেখে পিয়ের বলল, "ভয় পেয়ো না, আমি হিংসার আশ্রয় নেব না। প্রথমত, চিঠিগুলো," এমনভাবে বলল যেন পড়া মুখস্ত করছে। "দ্বিতীয়ত," কিছুক্ষণ থেমে সে বলল; আবার দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করে বলল, "কাল তুমি অবশ্যই মস্কো ছেড়ে চলে যাবে।"

"কিন্তু তা কি করে…?"

তার কথায় কান না দিয়ে পিয়ের বলেই চলল, "তৃতীয়ত, তোমার ও কাউণ্টেস রস্তভার মধ্যে যা ঘটেছে ঘুণাক্ষরেও কখনও কারও কাছে তা বলবে না। আমি জানি, তোমার বলা বন্ধ করতে আমি পারব না, কিন্তু বিবেকের কণামাত্রও যদি তোমার মধ্যে থাকে…" পিয়ের নিঃশব্দে বারকয়েক ঘরময় ঘুরে বেড়াল।

আনাতোল একটা টেবিলের পাশে বসে ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে লাগল।

"যাই বল না কেন, তোমাকে এটা বুঝতেই হবে যে তোমার সুখ ছাড়াও অন্য মানুষের সুখ ও শান্তি বলে একটা কথা আছে, অথচ নিজের ফুর্তির জন্য তুমি একটা গোটা জীবন বরবাদ করতে চলেছ। ফুর্তি করতে হয় আমার স্ত্রীর মত মেয়ে মানুষদের নিয়ে ফুর্তি কর,—সেখানে তোমার অধিকার স্বীকৃত, কারণ তারা জানে তাদের কাছে তুমি কি চাও। তোমার মত একই লাম্পট্যের অভিজ্ঞতার বর্মে তারাও সুসজ্জিত; কিন্তু একটি কুমারীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া…তাকে প্রতারিত করা, হরণ করা…তুমি কি বুঝতে পারছ না যে একটি বৃদ্ধ বা শিশুকে প্রহার করার মতই এটা অতীব

নীচ কাজ? ...”

পিয়ের থামল; আনাতোলের দিকে তাকাল; তার চোখে এখন রাগের বদলে জিজ্ঞাসার প্রকাশ।

পিয়ের ক্রোধ সংবরণ করেছে দেখে আনাতোল কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরে পেল। সে বলল, “অতকথা আমি জানি না, জানতে চাইও না, কিন্তু আমার প্রতি তুমি এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছ—‘নীচ’ ইত্যাদি—যেটা একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে আমি কাউকে ব্যবহার করতে দিতে পারি না।”

আনাতোল কি চায় বুঝতে না পেরে পিয়ের অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আনাতোল বলতে লাগল, “যদিও এটা নিভৃত আলোচনা, তবু না...”

পিয়ের বিদ্রূপ করে বলল, “তুমি কি ক্ষতিপূরণ চাও?”

“অন্তত তোমার কথাগুলো তো ফিরিয়ে নিতে পার। কি বল? আমি তোমার ইচ্ছামত কাজ করি সেটাই যদি চাও, তা হলে?”

পিয়ের বলে উঠল, “কথা ফিরিয়ে নিলাম, ফিরিয়ে নিলাম! তোমার কাছে ক্ষমাও চাইছি। ...আর তোমার যাত্রার জন্য যদি টাকার প্রয়োজন হয়....”

আনাতোল হাসল। সেই নীচ, তোষামুদে হাসি স্ত্রীর কল্যাণে যা পিয়ের খুব ভালই চেনে; সে হাসি দেখে পিয়ের ক্ষেপে গেল।

“আঃ, নীচ, হৃদয়হীন পশু!” আর্তকণ্ঠে কথাটা বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন আনাতোল পিতার্সবুর্গ যাত্রা করল।

অধ্যায়—২১

পিয়ের মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার বাড়িতে গেল তাকে খবর দিতে যে তার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে, আনাতোলের মস্কো থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্ত বাড়িটা আতংকে ও উত্তেজনায় থম্‌থম্‌ করছে। নাতাশা খুবই অসুস্থ; মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌না তাকে গোপনে জানাল, আনাতোল যে বিবাহিত এ খবর জানবার পরে সেইরাতেই নাতাশা গোপনে আর্সেনিক সংগ্রহ করে সেই বিষ খেয়েছিল। কিছুটা খেয়েই সে খুব ভয় পেয়ে যায় এবং সোনিয়াকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে সবকথা খুলে বলে। যথাসময়ে প্রয়োজনীয় প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করায় বিপদ কেটে গেলেও এখন সে এত দুর্বল যে তাকে গ্রামে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, আর তাই কাউন্টেসকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠানো হয়েছে। বিপর্যস্ত কাউন্ট ও সোনিয়ার সঙ্গেও পিয়েরের দেখা হল; তখনও তাদের মুখে চোখের জলের দাগ লেগে আছে; কিন্তু সে নাতাশার সঙ্গে দেখা করতে পারল না।

সেদিন পিয়ের ক্লাবেই ডিনার খেল। সেখানে সর্বত্রই রস্তভার অপহরণের গুজব শোনা গেল। সে অবশ্য গুজবের তীব্র প্রতিবাদ করে প্রত্যেককে জানিয়ে দিল যে, তার শ্যালক নাতাশার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু তা গৃহীত হয় নি। এর বেশী কিছুই ঘটে নি। পিয়েরের মনে হল, সমস্ত ব্যাপারটা চাপা দিয়ে নাতাশার সুনামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তার কর্তব্য।

সে অত্যন্ত ভয়ের সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রুর আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল; ত'র খবরের জন্য প্রতিদিনই একবার করে বুড়ো প্রিন্সের কাছে যেতে লাগল।

বুড়ো প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি শহরে প্রচারিত সব গুজবই মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর কাছ থেকে শুনতে পেল; প্রিন্সেস মারির কাছে লেখা যে চিঠিতে নাতাশা বিয়েটা ভেঙে দিয়েছে সেটাও সে পড়েছে। এতে তার মন-মেজাজ বেশ খুসি হয়ে উঠল; গভীর অধৈর্যের সঙ্গে সে ছেলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আনাতোল চলে যাবার কয়েকদিন পরে পিয়ের প্রিন্স আন্‌দ্রুর একটা চিঠি পেল; তাতে নিজের যাবার কথা জানিয়ে তাকে দেখা করতে বলেছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রু মস্কোতে পৌছনোমাত্রই বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে দিয়ে নাতাশা প্রিন্সেস মারিকে যে চিঠিটা লিখেছিল সেই চিঠি বাবা তার হাতে তুলে দিল (মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ প্রিন্সেস মারির কাছ থেকে চিঠিটা চুরি করে বুড়ো প্রিন্সকে এনে দিয়েছিল) এবং কিছু ডালপালা ছড়িয়ে নাতাশার অপহরণের কাহিনীও তাকে শুনিয়ে দিল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু পৌছল সন্ধ্যায়, আর পিয়ের তার সঙ্গে দেখা করতে এল পরদিন সকালে। বসার ঘরে ঢুকেই সে শুনতে পেল প্রিন্স আন্‌দ্রু পড়ার ঘরে উত্তেজিত চড়া গলায় পিতার্সবুর্গের কোন ষড়যন্ত্র নিয়ে কথা বলছে। বুড়ো প্রিন্সের গলা এবং অপর একজনের গলা মাঝে মাঝেই তাকে বাধা দিচ্ছে। প্রিন্সেস মারি পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে এল। যে ঘরে প্রিন্স আন্‌দ্রু ছিল তার দরজার দিকে তাকিয়ে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তার মুখ দেখেই পিয়ের বুঝতে পারল, যা ঘটেছে তা নিয়ে এবং নাতাশার বিশ্বাসহীনতার সংবাদটাকে তার দাদা যেভাবে নিয়েছে তা নিয়েও সে যেন বেশ খুসিই হয়েছে।

প্রিন্সেস মারি বলল, "দাদা বলেছে সে এইরকমই আশা করেছিল। আমি জানি, আত্মগর্বই তাকে তার মনের আসল কথা প্রকাশ করতে দেবে না, তবু সে যেরকম ভালভাবে খবরটাকে নিয়েছে ততটা আমি আশা করি নি। স্পষ্টতই এই রকমটাই ঘটার কথা…"

"কিন্তু এও কি সম্ভব যে সবকিছু সত্যি শেষ হয়ে গেছে?" পিয়ের প্রশ্ন করল।

প্রিন্সেস মারি অবাক হয়ে তারদিকে তাকাল। এরকম একটা প্রশ্ন যে পিয়ের কেমন করে করল তাই সে বুঝতে পারে নি। পিয়ের পড়ার ঘরে ঢুকল। প্রিন্স আন্দ্রু অনেক বদলে গেছে। স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে, কিন্তু দুই ভুরুর মাঝখানে একটা সমান্তরাল ভাঁজ পড়েছে। অসামরিক পোশাকে সে তার বাবা ও প্রিন্স মেশ্‌চেরেস্কির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। আলোচনা চলছিল স্পেরান্স্কিকে নিয়ে—তার আকস্মিক নির্বাসন এবং রাজদ্রোহের অভিযোগের সংবাদ সবেমাত্র মস্কোতে পৌঁচেছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বলছে, "একমাস আগেও তাকে নিয়ে যারা নাচানাচি করছিল তারাই আজ তার নিন্দা করছে, তাকে অভিযুক্ত করছে। অনুগ্রহ-বঞ্চিত কোন লোককে বিচার করা এবং অন্য লোকের ভুলের সব দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা খুব সোজা, কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই শাসন-কালে যদি কোন ভাল কাজ হয়ে থাকে তো সেটা তিনিই করেছেন—আর কেউ নয়।"

পিয়েরকে দেখে সে থামল। তার মুখটা কেঁপে উঠল, সেখানে একটা প্রতিহিংসার ভাব দেখা দিল।

"উত্তরপুরুষ তার প্রতি ন্যায়বিচার করবে," এই বলে বক্তব্য শেষ করে সে সঙ্গে সঙ্গে পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"আরে, কেমন আছ? আরও মোটাসোটা হয়েছ দেখছি?" চটপট কথাগুলি বললেও তার কপালের নতুন ভাঁজটা গভীরতর হল। "হ্যাঁ, আমি ভাল আছি," পিয়েরের প্রশ্নের উত্তরে কথাটা বলে সে হাসল।

পিয়েরের মনে হল সে হাসি যেন স্পষ্ট করে বলছে: "আমি ভাল আছি, কিন্তু আমার স্বাস্থ্য তো এখন আর কারও কোন কাজে লাগবে না।"

পোলিশ সীমান্তের খারাপ রাস্তা, সুইজারল্যাণ্ডে পিয়েরের পরিচিত যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, ও মঁসিয় দেসালে যাকে সে ছেলের গৃহ-শিক্ষকরূপে বিদেশ থেকে নিয়ে এসেছে—এইসব বিষয় পিয়েরের সঙ্গে অল্প কয়েকটি কথা বলেই আবার সে স্পেরান্স্কি-প্রসঙ্গের আলোচনায় সাগ্রহে যোগ দিল।

সে বলতে লাগল, "যদি রাজদ্রোহ থেকে থাকে, নেপোলিয়নের সঙ্গে গোপন সম্পর্কের কোন প্রমাণ যদি থাকে, তাহলে সেগুলো সাধারণের কাছে প্রকাশ করা উচিত ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি স্পেরান্স্কিকে পছন্দ করি না, কখনও করতাম না, কিন্তু আমি চাই ন্যায়বিচার।"

এতক্ষণে পিয়ের বন্ধুর একটি অতি পরিচিত প্রয়োজনের কথা বুঝতে পারল: তার মনের মধ্যে অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক যে চিন্তাগুলি ঘোরাফেরা করছে তাদের চাপা দেবার জন্য বাইরের ব্যাপার নিয়ে উত্তেজিত আলোচনায় মেতে থাকা তার পক্ষে এখন বড় দরকারি।

প্রিন্স মেশ্‌চেরেস্কি চলে যাবার পরে প্রিন্স আন্দ্রু পিয়েরের হাত ধরে তাকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট ঘরটাতে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বিছানা পাতা হয়েছে, আর আছে কয়েকটা খোলা পোর্টমেন্টো। তারই একটার ভিতর থেকে একটা বাক্স বের করে তার ভিতর থেকে প্রিন্স আন্দ্রু কাগজে-মোড়া একটা প্যাকেট তুলে নিল। নিঃশব্দে বেশ তাড়াতাড়ি কাজটা করল। উঠে দাঁড়িয়ে একটু কাশল। তার মুখটা বিষণ্ণ, ঠোঁট দুটি চাপা।

"তোমাকে কষ্ট দেবার জন্য আমাকে ক্ষমা কর…"

পিয়ের বুঝল প্রিন্স আন্দ্রু এবার নাতাশার প্রসঙ্গ তুলবে; তার মুখে করুণা ও সহানুভূতির চিহ্ন ফুটে উঠল। তা দেখে প্রিন্স আন্দ্রু বিরক্ত হল; কঠিন, কর্কশ, অপ্রীতিকর স্বরে সে বলতে লাগল:

"কাউণ্টেস রস্তভার কাছ থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি, তাতে সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, আর তোমার শ্যালক যে তার পাণিপ্রার্থনা করেছে বা ঐরকম একটাকিছু ঘটেছে তার বিবরণও আমি শুনেছি। কথাগুলি কি সত্য?"

"সত্যও বটে, অসত্যও বটে," পিয়ের বলা শুরু করতেই প্রিন্স তাকে বাধা দিল।

"এই তার সব চিঠি ও একটা প্রতিকৃতি," সে বলল।

টেবিল থেকে প্যাকেটটা তুলে পিয়েরের হাতে দিল।

"এটা কাউণ্টেসকে দিও…যদি তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়।"

"সে খুব অসুস্থ," পিয়ের বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "তাহলে সে কি এখনও এখানেই আছে?" সঙ্গে সঙ্গে যোগ করল, "আর প্রিন্স কুরাগিন?"

"কুরাগিন অনেক আগেই চলে গেছে। কাউণ্টেস তো যমের দুয়ার পর্যন্ত গিয়েছিল।"

"তার অসুস্থতার জন্য আমি দুঃখিত," বলে প্রিন্স আন্দ্রু তার বাবার মতই নিরাসক্ত, বিদ্বেষপূর্ণ হাসি হাসল।

"তাহলে মঁসিয় কুরাগিন কাউণ্টেস রস্তভার পাণিগ্রহণ করে তাকে সম্মানিত করেন নি?" বলে প্রিন্স আন্দ্রু বারকয়েক নাক ঝাড়ল।

পিয়ের বলল, "সে বিয়ে করতে পারে নি, কারণ আগেই তার বিয়ে হয়েছে।"

প্রিন্স আনন্দ্রু পুনরায় এমনভাবে হেসে উঠল যাতে তার বাবার কথাই মনে পড়ে যায়।

"তোমার শ্যালকটি এখন কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?" সে বলল।

"সে চলে গেছে পিতার্স…কিন্তু আমি ঠিক জানি না," পিয়ের বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "ঠিক আছে; তাতে কিছু যায়-আসে না। কাউণ্টেস রস্তভাকে বলে দিও, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল এবং আছে, আর আমি তার কল্যাণই চাই।"

পিয়ের প্যাকেটটা নিল। আরও কিছু বলবার আছে কি না স্মরণ করতে চেষ্টা করে প্রিন্স আন্‌দ্রু তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

পিয়ের বলল, "আমি বলি কি, পিতার্সবুর্গে আমাদের যে আলোচনা হয়েছিল তা কি তোমার মনে আছে?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু অতিদ্রুত জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম পতিতা মেয়েমানুষকে ক্ষমা করা উচিত, কিন্তু ওকে ক্ষমা করতে পারব একথা তো বলি নি। আর পারবও না।"

পিয়ের বলল, "কিন্তু এ তুলনা করা কি চলে?⋯"

প্রিন্স আন্‌দ্রু তাকে বাধা দিয়ে চীৎকার করে বলল:

"হ্যাঁ, আবার তার পাণিপ্রার্থনা কার, উদারতা দেখাই, এই তো? ⋯হ্যাঁ, সেটা খুবই মহান ব্যাপার হত, কিন্তু সেই ভদ্রলোকের পদাংক অনুসরণ করতে আমি পারব না। যদি আমার বন্ধুত্ব চাও তো আর কখনও একথা আমাকে বলো না⋯কোন কথা নয়! আচ্ছা, বিদায়। তাহলে প্যাকেটটা তাকে দিচ্ছ?"

ঘর থেকে বেরিয়ে পিয়ের বুড়ো প্রিন্স ও প্রিন্সেস মারির কাছে গেল।

বুড়ো মানুষটিকে আগের চাইতে হাসিখুসি মনে হল। প্রিন্সেস মারি সর্বদাই একরকম, তবু দাদার প্রতি সহানুভূতির অন্তরালে পিয়েরের নজরে পড়ল যে এই বিয়ে ভেঙে যাওয়ায় সে খুসিই হয়েছে। তাদের দিকে তাকিয়ে পিয়ের বুঝতে পারল, রস্তভদের প্রতি তাদের সকলের মনেই কী ঘৃণা ও বিরূপতা বাসা বেঁধেছে। সে আরও বুঝতে পারল, যে মেয়ে অন্য কারও জন্য প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ত্যাগ করতে পারে এদের সামনে তার নাম উচ্চারণ করাও অসম্ভব।

ডিনারের সময় আসন্ন যুদ্ধ নিয়েই আলোচনা চলল। প্রিন্স আন্‌দ্রু অনবরত কথা বলতে লাগল; কখনও বাবার সঙ্গে তর্ক করছে, কখনও বা সুইস শিক্ষক দেসালের সঙ্গে; তার সব কথাতেই একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনার প্রকাশ; আর তার কারণটা পিয়ের খুব ভালই জানে।

অধ্যায়—২২

তার উপর যে কাজের ভার দেওয়া হয়েছে সেটা শেষ করার জন্য সেদিন সন্ধ্যায়ই পিয়ের রস্তভদের বাড়িতে গেল। নাতাশা বিছানায় শুয়ে, কাউণ্ট ক্লাবে গেছে; চিঠিগুলো সোনিয়াকে দিয়ে পিয়ের মারিয়া দি.মত্রিয়েভ্‌নার কাছে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু খবরটাকে কিভাবে নিয়েছে সেটা জানতে সে

খুবই আগ্রহী। দশ মিনিট পরে সোনিয়া মারিয়া দিমিত্রিয়েভনার কাছে এল।

বলল, "কাউণ্ট পিতর কিরিলেভিচের সঙ্গে দেখা করার জন্য নাতাশা পীড়াপীড়ি করছে।"

"কিন্তু তা কি করে হয়? ওকে কি তার কাছে নিয়ে যাব? ঘরটা যে এখনও পরিষ্কার করা হয় নি।"

সোনিয়া বলল, "না, সে পোশাক বদলে বসার ঘরে চলে গেছে।"

মারিয়া দিমিত্রিয়েভনা শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিল।

"ওর মা যে কবে আসবেন! আমাকে তো জালিয়ে মারছে!" পিয়েরকে বলল, "দেখুন, ওকে যেন সব কথা বলবেন না! ওকে দেখলে বড়ই করুণা হয়, ওকে বকুনি দিতেও মন সায় দেয় না।"

নাতাশা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক শুকিয়ে গেছে, মুখটা কঠিন, বিবর্ণ, কিন্তু পিয়ের যেরকম আশা করেছিল মোটেই সেরকম লজ্জায় সংকুচিত নয়।

পিয়েরই তার দিকে এগিয়ে গেল। ভাবল, নাতাশা যথারীতি হাতটা এগিয়ে দেবে; কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই সে থামল, দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল, দুটো হাত মরার মত দুই পাশে ঝুলে পড়ল।

তারপর তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, "পিতর কিরিলোভিচ, প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি আপনার বন্ধু ছিলেন—বন্ধু আছেন। একসময় সে আমাকে বলেছিল আপনাকে⋯"

তারদিকে তাকিয়ে পিয়ের নাকটা টানল, কিন্তু কোন কথা বলল না। তখনও পর্যন্ত তার মনে ছিল নাতাশার প্রতি তিরস্কার, সে চেষ্টা করেছে তাকে ঘৃণা করতে, কিন্তু এইমুহূর্তে নাতাশার জন্য সে এত বেশী দুঃখ বোধ করল যে তাকে তিরস্কার করার মনই রইল না।

"সে তো এখন এখানেই আছে: তাকে বলবেন⋯মানে⋯আমাকে যেন ক্ষমা করে!"

কি যে বলবে পিয়েরের মাথায় এল না।

নাতাশা তাড়াতাড়ি বলতে লাগল, "না, আমি জানি সব শেষ হয়ে গেছে। শুধু তার প্রতি যে অন্যায় করেছি সেই যন্ত্রণাই আমাকে দগ্ধ করছে। তাকে বলবেন, তার কাছে আমার একটি ভিক্ষা, সে যেন সবকিছুর জন্য আমাকে ক্ষমা করে, ক্ষমা করে, ক্ষমা করে⋯"

নাতাশার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

একটা অজ্ঞাতপূর্ব করুণায় পিয়েরের অন্তর উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

বলল, "বলব, সব কথাই তাকে আর একবার বলব। কিন্তু⋯একটা কথা আমি জানতে চাই⋯"

"কি জানতে চান ?" নাতাশার চোখে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল।

"আমি জানতে চাই আপনি কি ভালবাসতেন সেই……" পিয়ের বুঝতে পারছে না আনাতোলের কথাটা কিভাবে তুলবে, তার কথা মনে হতেই পিয়েরের মুখ লাল হয়ে উঠেছে—"আপনি কি ভালবাসতেন সেই খারাপ লোকটিকে ?"

নাতাশা বলল, "তাকে খারাপ লোক বলবেন না ! কিন্তু আমি জানি না, কিছুই জানি না……"

নাতাশা কেঁদে ফেলল ; আর করুণা, মমতা, ও ভালবাসার অনুভূতি যেন পিয়েরের অন্তরে আরও বেশী করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে বুঝতে পারল তার চশমার নীচ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে ; তবু আশা করল যে তা কারও নজরে পড়বে না।

"এ নিয়ে আমরা আর কোন কথা বলব না," পিয়ের বলল ; তার দরদী, নরম কণ্ঠস্বর সহসা নাতাশার কাছে অদ্ভুত ঠেকল।

"এ নিয়ে আমরা আর কথা বলব না—তাকে সব কথাই বলব ; কিন্তু আপনার কাছে আমার একটা মিনতি, আমাকে আপনার বন্ধু বলেই মনে করবেন, যদি কোন সাহায্য বা পরামর্শ চান, যদি কারও কাছে মনের কথা খুলে বলতে চান—এখন নয়, পরে যখন আপনার মন পরিষ্কার হবে—তখন আমার কথা মনে করবেন।" নাতাশার হাতখানি টেনে নিয়ে সে তাতে চুমো খেল। "আমার ক্ষমতায় যদি কোন কিছু করা সম্ভব হয় তাহলে আমি খুসি হব।"

"ওভাবে কথা বলবেন না, আমি তার উপযুক্ত নই !" বলেই নাতাশা ঘর থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়াল, কিন্তু পিয়ের তার হাতটা ধরে ফেলল। সে জানত তার আরও কিছু বলার আছে। কিন্তু সেকথা যখন বলা হল তখন নিজের কথায় সে নিজেই অবাক হয়ে গেল।

পিয়ের নাতাশাকে বলল, "দাঁড়ান, দাঁড়ান ! সারাটা জীবন আপনার সামনে পড়ে আছে।"

"আমার সামনে ? না ! আমার সব শেষ হয়ে গেছে," লজ্জা ও আত্ম-ধিক্কারের সুরে সে বলল।

"সব শেষ ?" পিয়ের কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। "আমি যদি এই আমি না হতাম, যদি হতাম পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর, বুদ্ধিমান ও শ্রেষ্ঠ মানুষ, যদি আমার স্বাধীনতা থাকত, তাহলে এইমুহূর্তে আমি নতজানু হয়ে আপনার হাত ও আপনার ভালবাসা প্রার্থনা করতাম !"

অনেকদিন পরে এই প্রথম নাতাশার দুই চোখ বেয়ে কৃতজ্ঞতা ও মমতার ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল ; পিয়েরের দিকে তাকিয়ে সে ঘর থেকে চলে গেল।

সে চলে যাওয়ামাত্রই পিয়েরও ছুটে পাশের ঘরে চলে গেল, মমতা ও আনন্দের উদ্গত অশ্রুকে কোনরকমে সংযত করল, এবং জোব্বার আস্তিন খুঁজে না পেয়ে সেটাকে কাঁধের উপর ফেলেই স্লেজে উঠে পড়ল।

কোচয়ান জানতে চাইল, "এবার কোথায় যাব ইয়োর এক্সেলেন্সি?"

পিয়ের নিজেকে শুধাল, "কোথায় যাব? এখন কোথায় যেতে পারি? নিশ্চয়ই ক্লাবে যাব না, কারও সঙ্গে দেখা করতেও নয়?" মমতা ও ভালবাসার যে অভিজ্ঞতা তার হয়েছে, চোখের জলের ভিতর দিয়ে নাতাশা যে নরম, মমতাময় শেষ দৃষ্টি তাকে উপহার দিয়েছে, তার সঙ্গে তুলনায় সব মানুষকেই এখন করুণার পাত্র বলে মনে হচ্ছে।

"বাড়ি!" পিয়ের জবাব দিল; তারপর দশ ডিগ্রি তুষারপাত সত্ত্বেও চওড়া বুকের উপর থেকে ভালুকের চামড়ার জোব্বাটা সরিয়ে সানন্দে খোলা বাতাসে শ্বাস টানতে লাগল।

আবহাওয়া পরিষ্কার; তুষার পড়ছে। স্বল্পালোকিত নোংরা রাস্তা আর কালো কালো ছাদের উপরে অন্ধকার তারকাখচিত আকাশ বহুদূরে প্রসারিত। এইমাত্র তার আত্মা যে ঊর্ধ্বলোকে বিচরণ করছে তার সঙ্গে তুলনায় পার্থিব সবকিছুই কত নীচ ও তুচ্ছ—এই চিন্তাই এতক্ষণ পিয়েরকে পেয়ে বসেছিল; এখন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে অনুভূতি তার মন থেকে দূর হয়ে গেল। আর্বাত স্কোয়ারে ঢোকার মুখে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটা অন্ধকার তারকাখচিত আকাশ তার সামনে দেখা দিল। ঠিক তার মাঝখানে, প্রেশিস্তেংকা বুল্ভার্দের উপরে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা তারাদলের ভিতরে থেকেও পৃথিবীর নৈকট্য, তার সাদা আলো ও দীর্ঘ ঊর্ধ্বায়িত পুচ্ছের দরুণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সম্পূর্ণ পৃথক ১৮১২ সালের প্রকাণ্ড ও উজ্জ্বল ধূমকেতুটি জল্ জল্ করছে—সকলেই বলেছে, এই ধূমকেতুটি সবরকম দুঃখ দুর্দশা ও পৃথিবীর ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করে এনেছে। কিন্তু দীর্ঘ উজ্জ্বল পুচ্ছসমন্বিত এই ধূমকেতুটি পিয়েরের মনে কোন ভয়ের অনুভূতি জাগাল না। বরং এই উজ্জ্বল ধূমকেতুটির দিকে সে আনন্দের সঙ্গে অশ্রুজলে ভেজা চোখে তাকিয়ে রইল: ধারণার অতীত দ্রুতগতিতে অপরিমেয় মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে স্বীয় কক্ষপথে চলতে চলতে এইমুহূর্তে সহসা ধূমকেতুটিকে মনে হচ্ছে—পৃথিবী-বিদ্ধকারী একটা তীরের মত—সে যেন একটা বিশেষ স্থানে এসে স্থির হয়ে গেছে, অসংখ্য ঝিকিমিকি তারাদলের মাঝখানে স্বীয় পুচ্ছটিকে সবেগে উচে তুলে তার সাদা আলোর শিখাগুলিকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। পিয়েরের মনে হল, তার নিজের দয়ার্দ্র ঊর্ধ্বায়িত যে আত্মা এখন একটা নতুন জীবনের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে, এই ধূমকেতু যেন তারই পরিপূর্ণ প্রতিধ্বনি।

অষ্টম পর্ব সমাপ্ত

নবম পর্ব

অধ্যায়—১

১৮১১ সালের শেষের দিক থেকেই পশ্চিম ইওরোপীয় বাহিনীর সমর-সজ্জা ও সেনাসমাবেশের তৎপরতা বৃদ্ধি পেতে লাগল ; ১৮১২ সালে সেই বাহিনী পশ্চিম থেকে পূবে রুশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে গেল ; অবশ্য ১৮১১ সাল থেকে রুশ বাহিনী আগে থেকেই সেখানে জমায়েত হয়েছিল। ১৮১২ সালের ১২ই জুন পশ্চিম ইওরোপীয় সেনাদল রুশ সীমান্ত অতিক্রম করল ; শুরু হল যুদ্ধ, অর্থাৎ শুরু হল এমন একটি ঘটনা যা মানুষের বুদ্ধি ও স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। লক্ষ লক্ষ মানুষ পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন অসংখ্য অপরাধ, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, চৌর্যবৃত্তি, জালিয়াতি, নকল টাকার প্রচলন, সিঁধেলচুরি, অগ্নিকাণ্ড ও নরহত্যায় প্রবৃত্ত হল যার উল্লেখ একটা পুরো শতাব্দীকালে সারা জগতের আদালতের ইতিহাসেও মেলে না, অথচ সে-কাজ যারা করেছে তারা সেইসময়ে তাকে অপরাধ বলেই গণ্য করে নি।

এই অসাধারণ ঘটনা কিসের ফলশ্রুতি ? কি এর কারণ ? ইতিহাসকাররা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে এর কারণ ওল্ডেনবুর্গের প্রতি কৃত অন্যায়, ইওরোপীয় নিষেধাজ্ঞাকে (contivental system) লংঘন নেপোলিয়নের উচ্চাকাংখা, আলেক্সান্দারের দৃঢ়তা, কূটনীতিকদের ভ্রান্তি ; ইত্যাদি।

অতএব মেটারুনিস, রুমিয়াস্ত্‌সেভ অথবা ট্যালোণ্ড যদি দরবার ও সান্ধ্য মজলিসের ফাঁকে একটু কষ্ট স্বীকার করে আরও খোলাখুলিভাবে একটা চিঠি লিখত, অথবা নেপোলিয়ন যদি আলেক্সান্দারকে লিখত : শ্রদ্ধেয় ভাই আমার, ওল্ডেনবুর্গের ডিউককে তার জমিদারি ফিরিয়ে দিতে আমি রাজী,” —তাহলেই আর যুদ্ধ হত না।

আমরা বুঝতে পারি যে সমসাময়িক লোকদের কাছে ব্যাপারটা এই-রকমই মনে হয়েছিল। স্বভাবতই নেপোলিয়ন মনে করেছিল যে ইংলণ্ডের ষড়যন্ত্রই এই যুদ্ধের কারণ (বস্তুত সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ন নিজেই এ কথা বলেছিল)। স্বভাবতই ইংলিশ পার্লামেণ্টের সদস্যরা মনে করেছিল যে নেপোলিয়নের উচ্চাকাংখাই এ যুদ্ধের কারণ ; ওল্ডেনবুর্গের ডিউক মনে করেছিল তার প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে তাই এ যুদ্ধের কারণ ; ব্যবসায়ীদের মতে যে “ইওরোপীয় নিষেধাজ্ঞা” ইওরোপকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল সেটাই এ যুদ্ধের কারণ ; সেনাপতি ও প্রধান সৈনিকদের মতে তাদের চাকরি দেবার প্রয়োজনই এ যুদ্ধের কারণ ; তৎকালীন কূটনীতিকদের মতে, ১৮০৯ সালের রুশ-অস্ট্রীয়া মৈত্রীর সংবাদটি

নেপোলিয়নের কাছ থেকে ভালভাবে লুকিয়ে না রাখা, এবং ১৭৮নং স্মারকলিপির অদ্ভুত ভাষা এ যুদ্ধের কারণ। এটা খুবই স্বাভাবিক যে এইসব এবং আরও অসংখ্য ও সীমাহীন কারণ তৎকালীন মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল; আমরা, উত্তরকালের মানুষরা যারা এই ঘটনাকে তার বিরাট পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছি এবং তার ভয়ংকর তাৎপর্যকে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছি, আমাদের কাছে কিন্তু এইসব কারণ মোটেই যথেষ্ট নয়। নেপোলিয়নের উচ্চাকাংখা ছিল, বা আলেক্সান্দার কঠোর ছিল, অথবা ইংলণ্ডের নীতি চাতুর্যপূর্ণ ছিল,—বা ওল্ডেনবুর্গের ডিউকের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল,—তাই বলে লক্ষ লক্ষ খৃস্টভক্ত মানুষ পরস্পরকে হত্যা করল, নির্যাতন করল, একথাটা আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। বাস্তবক্ষেত্রে যে নরহত্যা ও হিংসাত্মক ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল তার সঙ্গে এইসব ঘটনার কি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটা আমাদের মাথায় আসে না: ডিউকের প্রতি অন্যায় করা হয়েছিল বলে ইওরোপের অপর প্রান্ত থেকে আগত হাজার হাজার মানুষ কেন স্মোলেন্‌স্ক-এর অধিবাসীদের হত্যা করল, তাদের ধ্বংস করল এবং তাদের হাতে নিহত হল!

কিন্তু আমাদের মত তাদের যেসব বংশধর ইতিহাসকার নই এবং গবেষণার মনোভাবদ্বারা পরিচালিত নই বলে এই ঘটনাটিকে পরিচ্ছন্ন সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারি, তাদের কাছে কিন্তু অগণিত কারণ আপনা থেকেই এসে হাজির হয়। সেইসব কারণ অনুসন্ধান করতে আমরা যত বেশী গভীরে প্রবেশ করি ততই তারা বেশী সংখ্যায় প্রকাশ পায়; এবং আমাদের কাছে প্রতিটি স্বতন্ত্র কারণ অথবা গোটা কারণ-সমষ্টিকেই মনে হয় সমানভাবে যথার্থ ও ঘটনাবলীর বিরাটত্বের বিচারে সমানভাবে মিথ্যা, এতবড় ঘটনাপ্রবাহকে ঘটাবার পক্ষে একান্তই অনুপযুক্ত। আমাদের কাছে অমুক বা তমুক ফরাসী কর্পোরালের দ্বিতীয়বার চাকরি নেবার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা যেমন কারণ বলে গণ্য হতে পারে, তেমনই নেপোলিয়ন কর্তৃক ভিশ্চুলার ওপারে তার সৈন্য সরিয়ে নেওয়া এবং ওল্ডেনবুর্গের জমিদারি ফিরিয়ে দেওয়ার অনিচ্ছাও কারণ বলে গণ্য হতে পারে; কারণ সে যদি যুদ্ধে যোগ দিতে না চাইত, এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সহস্রতম কর্পোরাল ও সৈনিকও যদি আপত্তি জানাত, তাহলে নেপোলিয়নের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা অনেক কমে যেত এবং তার ফলে যুদ্ধই হত না।

নেপোলিয়নকে ভিশ্চুলার ওপারে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে এই দাবী শুনে সে যদি অসন্তুষ্ট না হত এবং সৈন্যদের অগ্রসর হবার হুকুম না দিত, তাহলেও যুদ্ধ হত না; আবার তার সব সার্জেন্টরা যদি দ্বিতীয়বার যুদ্ধে যোগ দিতে আপত্তি জানাত তাহলেও যুদ্ধটা না ঘটতে পারত। অথবা যদি ইংরেজরা ষড়যন্ত্র না করত, বা ওল্ডেনবুর্গের ডিউক বলে কেউ না থাকত, আলেক্সান্দার

যদি অপমানিত বোধ না করত, রাশিয়াতে যদি স্বৈরতন্ত্রী শাসন-ব্যবস্থা না থাকত, অথবা ফ্রান্সে যদি বিপ্লব না ঘটত, পরবর্তীকালে একনায়কত্ব ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হত, অথবা ফরাসী বিপ্লবের অনুকূল কোন পরিস্থিতিই দেখা না দিত,—তাহলেও তো যুদ্ধই হত না। এদের প্রতিটি কারণের অনুপস্থিতি ঘটলে কিছুই ঘটত না। কাজেই এইসব কারণ—লক্ষ লক্ষ কারণ—একত্র মিলিত হয়েই যুদ্ধটা ঘটিয়েছে। কাজেই কোন একটি কারণে এ যুদ্ধ হয় নি ; কিন্তু যুদ্ধটা ঘটতে বাধ্য বলেই ঘটেছে। ঠিক যেভাবে কয়েক শতাব্দী আগে দলে দলে লোক পূর্ব থেকে পশ্চিমে এসে মানুষকে হত্যা করেছিল, সেইভাবেই এবারও লক্ষ লক্ষ মানুষ মানবিক অনুভূতি ও বিচার-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে মানুষ খুন করতে এসেছিল পশ্চিম থেকে পূর্বে।

যেসব সৈনিকদের ভাগ্য-পরীক্ষার দ্বারা অথবা বাধ্যতামূলক সৈন্যদল-ভুক্তির বিধানের দ্বারা এই অভিযানের সামিল করা হয়েছিল তাদের যেমন এ ব্যাপারে কোনরকম স্বাধীন ইচ্ছা ছিল না, তেমনই যে নেপোলিয়ন এবং আলেক্সান্দারের ঘাড়ে যুদ্ধটাকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে তাদেরও কোন ইচ্ছার স্বাধীনতা ছিল না। যা ঘটেছে তার অন্যথা হতেই পারত না, কারণ নেপোলিয়ন এবং আলেক্সান্দারের মনোবাসনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এমন অসংখ্য ঘটনার সমাবেশ প্রয়োজন ছিল যাদের যেকোন একটিকেই বাদ দিলেই এ ঘটনাটি ঘটতেই পারত না। যে লক্ষ লক্ষ লোকের হাতে ছিল প্রকৃত ক্ষমতা—যে সৈনিকরা গোলাগুলি চালিয়েছিল, অথবা যারা বয়ে নিয়ে গিয়েছিল রসদ ও কামান-বন্দুক—তারাই তো এই দুর্বল ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করেছিল, এবং নানারকমের অসংখ্য জটিল কারণের দ্বারা সেকাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

বুদ্ধির অতীত ঘটনাবলীর ব্যাখ্যার জন্য আমরা নিয়তিবাদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হই। ইতিহাসের সেইসব ঘটনাকে যতই আমরা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চাই ততই সেগুলি আমাদের কাছে আরও বেশী করে বিচার ও বুদ্ধির অতীত বলে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে।

প্রতিটি মানুষ নিজের মত করে বাঁচে, ব্যক্তিগত লক্ষ্য পূরণের জন্য স্বাধীনভাবে কাজ করে, মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে এখন সে এ-কাজ বা সে-কাজ করতেও পারে, আবার না করতেও পারে ; কিন্তু যেমুহূর্তে কাজটি করা হয়ে গেল তখনই একটি বিশেষ মুহূর্তে সংঘটিত সেই কাজটি হয়ে ওঠে অপরিবর্তনীয় ও ইতিহাসের অধীন ; সেখানে ঐ ঘটনার কোন স্বাধীন সত্তা নেই, তার তাৎপর্য তখন নিয়তি-নির্ধারিত।

প্রতিটি মানুষের জীবনেই দুটি দিক থাকে ; একদিকে তার ব্যক্তিগত জীবন, সেখানে তার স্বার্থ যত বিমূর্ত সেও ততই স্বাধীন ; আর একদিকে তার দলগত মৌমাছি-জীবন, সেখানে নিয়তির অনিবার্য বিধানকে মেনে

চলতে সে বাধ্য।

মানুষ নিজের জন্য বাঁচে সচেতনভাবে, কিন্তু মানবতার ঐতিহাসিক ও সার্বিক লক্ষ্যসাধনের ক্ষেত্রে সে একটি অচেতন যন্ত্র মাত্র। একটা কাজ একবার করা হয়ে গেলে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না; মহাকালের যাত্রাপথে আরও অসংখ্য মানুষের কর্মধারার সঙ্গে মিলেমিশে সেই কাজটিই একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য লাভ করে। একটি মানুষ সামাজিক মর্যাদার সোপানের যত বেশী উঁচুতে অধিষ্ঠিত থাকে, যত বেশী মানুষের সঙ্গে সে যুক্ত থাকে, এবং অন্যের উপর তার প্রভাব যত বেশী থাকে, ততই তার প্রতিটি কাজ হয়ে ওঠে নিয়তি-নির্দিষ্ট ও অনিবার্য।

"রাজার হৃদয় তো প্রভুরই হাতে।"

রাজা তো ইতিহাসের ক্রীতদাস।

ইতিহাস, অর্থাৎ মানব জাতির অচেতন, সাধারণ, মৌমাছি-জীবন, রাজার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

যদিও ১৮১২ সালের সেইসময়ে নেপোলিয়নের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে verser (ou ne pas verser) le sang de ses peuples (জনগণের রক্তপাত করা হবে কি হবে না)—নেপোলিয়নকে লেখা শেষ চিঠিতে আলেক্সান্দার এই ভাষাই ব্যবহার করেছিল—সেটা তার উপরেই নির্ভর করছে, তথাপি তখনও সে ছিল নিয়তির অনিবার্য দৃঢ় মুষ্টিতেই আবদ্ধ; স্বাধীন ইচ্ছামত কাজ করছি ভাবলেও আসলে তখনও তাকে কাজ করতে হয়েছিল মৌমাছি-জীবনের জন্যই— অর্থাৎ ইতিহাসের তাগিদেই।

পশ্চিমের মানুষরা পূবে এল অন্য মানুষদের হত্যা করতে, আর সহ-অবস্থানের বিধানেই হাজার হাজার ছোট ছোট কারণ এসে তার সঙ্গে মিলে ঘটিয়ে তুলল এই যুদ্ধ: "ইওরোপীয় নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থা" লংঘনের দরুণ তিরস্কার, ওল্ডেনবুর্গের ডিউকের প্রতি অন্যায়, প্রশিয়াতে সৈন্য চালনা:—(নেপোলিয়নের মতো) যেটা করা হয়েছিল অস্ত্রের দ্বারা সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে—, জনগণের প্রবণতার সঙ্গে ফরাসী সম্রাটের যুদ্ধপ্রীতি ও যুদ্ধের অভ্যাসের মিল ঘটে যাওয়া, সমরায়োজনের জাঁকজমকের প্রলোভন, তজ্জনিত ব্যয়বহুলতার ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রয়োজন, ড্রেসডেন-এ প্রাপ্ত প্রভূত সম্মানের নেশা, সেইসব কূটনৈতিক আলোচনা সমকালীনদের মতে যা চলানো হয়েছিল শান্তি স্থাপনের আন্তরিক বাসনায়, কিন্তু আসলে যা উভয় পক্ষের আত্ম-রতিকেই আঘাত করেছিল,—এইসব এবং আরও লক্ষ লক্ষ কারণ একসঙ্গে মিলেমিশে এই কাণ্ডটি ঘটিয়েছিল।

একটি আপেল যখন পেকে গাছ থেকে পড়ে, তখন সেটা নীচে পড়ে

কেন? তার কারণ কি পৃথিবীর আকর্ষণ, না তার বোঁটাটা শুকিয়ে যাওয়া, না কি সূর্যের উত্তাপে রসহীন হওয়া, না কি সেটার ভার বেড়ে যাওয়া, না কি বাতাসের নাড়া খাওয়া, না কি গাছের নীচে দাঁড়ানো ছেলেটির ফল খাবার ইচ্ছা?

কোনটাই কারণ নয়। এইসবই সেইসব শর্তের একত্র সমাবেশ যার ফলে সব গুরুত্বপূর্ণ জৈব ও প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি ঘটে। যে উদ্ভিদবিজ্ঞানী মনে করে যে আপেলের কোষ-তন্তুগুলি নষ্ট হয়ে যাবার ফলেই আপেলটা মাটিতে পড়ে তার কথাও ঠিক; আবার গাছের নীচে দাঁড়িয়ে যে ছেলেটি মনে করে যে সে আপেলটা খাবার ইচ্ছায় প্রার্থনা করেছে বলেই সেটা মাটিতে পড়েছে তার কথাও, ঠিক। যে লোক বলে যে ইচ্ছা হয়েছিল বলেই নেপোলিয়ন মস্কো গিয়েছিল, আর যে লোক বলে যে লক্ষ লক্ষ টন ওজনের একটা গুপ্ত পাহাড় ধ্বসে পড়েছে কারণ শেষ মজুরটি তার খন্তা দিয়ে সেটাকে শেষবারের মত আঘাত করেছে—দুজনের কথাই সমান সত্য বা সমান ভুল। ঐতিহাসিক ঘটনার বেলায় তথাকথিত মহাপুরুষরা ঘটনার নামকরণের জন্য প্রয়োজনীয় লেবেলমাত্র, আর লেবেলের মতই ঘটনাটির সঙ্গে তাদের যোগসূত্রটিও নামমাত্র।

যে সমস্ত কাজকে তারা তাদের ইচ্ছাধীন কাজ বলে মনে করে তার প্রতিটি কাজই ঐতিহাসিক অর্থে অনিচ্ছাপ্রসূত, ইতিহাসের যাত্রাপথের সঙ্গে যুক্ত এবং অনাদিকাল থেকে পূর্বনির্দিষ্ট।

অধ্যায়—২

২৯শে মে নেপোলিয়ন ড্রেসডেন ত্যাগ করল; সেখানে সে তিনটি সপ্তাহ কাটিয়েছে এমন একটি দরবার-পরিবৃত হয়ে যার মধ্যে ছিল প্রিন্স, ডিউক, রাজন্যবর্গ, এমনকি একজন সম্রাট পর্যন্ত। ড্রেসডেন ছাড়বার আগে নেপোলিয়ন অনুগ্রহ দেখাল সেইসব রাজা ও প্রিন্সদের যাদের প্রতি সে প্রসন্ন, আর যাদের প্রতি অপ্রসন্ন তাদের ভাগ্যে জুটল তিরস্কার; নিজস্ব মণি-মুক্তো-হীরে—অর্থাৎ যেগুলি সে পেয়েছে অন্য রাজাদের কাছ থেকে—উপহার দিল অস্ট্রীয়ার সাম্রাজ্ঞীকে; ইতিহাসকারদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, যে সাম্রাজ্ঞী মারি লুই প্যারিসে নোপোলিয়নের এক স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তাকেই নিজের স্বামী বলে মনে করত গভীর মমতায় তাকে আলিঙ্গন করে নেপোলিয়ন যখন বিদায় নিল তখন সে দুঃখ সম্রাজ্ঞীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। যদিও কূটনীতিবিদরা তখনও দৃঢ়ভাবে সন্ধির সম্ভাবনায় বিশ্বাস করে মহাউৎসাহে সেই উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে, যদিও স্বয়ং সম্রাট নেপোলিয়ন আলেক্সান্দারকে Morisieur mon frzre বলে সম্বোধন করে তাকে চিঠি লিখেছে এবং আন্তরিক আশ্বাস জানিয়েছে যে সে যুদ্ধ চায়

না, আর তাকে চিরদিন ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে—তথাপি নেপোলিয়ন তার সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিতে যাত্রা করল, আর প্রতিটি ঘাঁটিতে নতুন করে হুকুম জারি করল যাতে পশ্চিম থেকে পূব দিকে সৈন্য-চলাচল আরও বৃদ্ধি করা হয়। চাকর-বাকর, এড্-ডি-কং ও একজন পথ-প্রদর্শককে পরিবৃত হয়ে একটা ছয়-ঘোড়ার ভ্রমণোপযোগী গাড়িতে সে যাত্রা করল পোসেন, থর্ণ, ডান্‌জিগ ও কোনিগ্‌স্‌বের্গ-এর পথে। প্রতিটি শহরে হাজার হাজার মানুষ উত্তেজনা ও উৎসাহসহকারে তার সঙ্গে দেখা করল।

সেনাদল এগিয়ে চলেছে পশ্চিম থেকে পূবে, আর ছয়টি ঘোড়াও বদলাবদলি করে সেই একইদিকে নেপোলিয়নকে নিয়ে এগিয়ে চলল। ১০ই জুন সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে রাত্রিবাস করল ভিল্কাভিস্কি অরণ্যে জনৈক পোলিশ কাউণ্টের জমিদারিতে তারজন্য তৈরি একটা বাড়িতে।

পরদিন সেনাদলকে পেরিয়ে একটা গাড়িতে চেপে সে নিয়েমেক-এ হাজির হল এবং পার হবার উপযুক্ত একটা স্থান বেছে নেবার জন্য পোলিশ ইউনিফর্ম পরে নদীর তীরে পৌঁছে গেল।

নদীর অপর তীরে কিছু কসাককে দেখা গেল; আর দূর-বিস্তার তৃণভূমির মাঝখানে দেখা গেল মস্কোর পবিত্র শহর (Moscou, la ville sainte), যে সিথিয়া রাজ্যে একদা মহান আলেক্সান্দার প্রবেশ করেছিল তেমনই এক রাজ্যের রাজধানী—তারপরেই একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে এবং রণ-কৌশল ও কূটনৈতিক বিবেচনাকে উপেক্ষা করে নেপোলিয়ন সেনাদলকে অগ্রসর হবার হুকুম দিল এবং পরদিনই তার সেনাদল নিয়েমেন অতিক্রম করতে আরম্ভ করল।

নিয়েমেন-এর বাঁ তীরের উত্তরাইতে সেইদিনই তারজন্য যে শিবিরে স্থাপন করা হয়েছিল, ১২ই জুন খুব সকালে সেই শিবির থেকে বেরিয়ে এসে নেপোলিয়ন চোখে একটা স্পাই-গ্লাস (ছোট দূরবীন) লাগিয়ে দেখতে পেল, তার সৈন্যরা জলস্রোতের মত ভিল্কাভিস্কি অরণ্য থেকে বেরিয়ে এসে নদীর উপরকার তিনটি সেতু-পথ ধরে ছুটে চলেছে। সৈনিকরা সম্রাটের উপস্থিতির কথা জানত; তাই তাকে খুঁজতে গিয়ে পাহাড়ের উপরে শিবিরের সম্মুখে ওভারকোট ও টুপি পরিহিত একটি মূর্তিকে অন্য সকলের চাইতে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা নিজ নিজ টুপি তুলে চীৎকার করে উঠল: Vive' L Empereur! তারপর যে বিরাট জঙ্গলের মধ্যে তারা আত্মগোপন করেছিল একে একে অবিশ্রাম স্রোতধারার মত সেখান থেকে বেরিয়ে এসে তিন ভাগে ভাগ হয়ে তিনটে সেতুর উপর দিয়ে অপর তীর লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

"এবার আমরা যুদ্ধে নামব। আঃ, তিনি নিজে যখন কাজটা হাতে নেন তখন সবকিছুই গরম হয়ে ওঠে⋯ঈশ্বর সাক্ষী!⋯ঐ তো তিনি!⋯Vive' L

Empereur ! তাহলে এই সেই এশিয়ার তৃণভূমি ! যাই বল, দেশটা খুব নোংরা। অ রিভোয়া, বুচে ; তোমার জন্য মস্কোর সেরা প্রাসাদটা রেখে দেব ! অ রিভোয়া। শুভেচ্ছ জানাই !····সম্রাটকে দেখেছ ? Vive' L Empereur !—দেখ জেরার্ড, আমাকে যদি ভারতবর্ষের শাসনকর্তা করা হয়, তাহলে তোমাকে করব কাশ্মীরের মন্ত্রী—কথা একেবারে পাক্কা। Vive' L Empereur ! হুর্‌রা ! হুর্‌রা ! হুর্‌রা ! কসাকের দল—রাস্কেলরা—দেখ কেমন দৌড়চ্ছে ! Vive' L Empereur ! ঐ তো তিনি, দেখতে পাচ্ছ ? ঠিক তোমাকে যেমন দেখছি, এইভাবে দু'বার তাকে দেখছি। ছোট্ট কর্পোরাল। ···একজন প্রবীণকে তিনি ক্রুশ উপহার দিলেন ; তাও দেখেছি। ····Vive' L Emeperuor !" যুবক ও বৃদ্ধ, নানা চরিত্রের ও সামাজিক মর্যাদার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হল একই কথা। সকলেরই চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দীর্ঘ-প্রত্যাশিত অভিযান শুরু করার আনন্দ, আর যে মানুষটি ধূসর কোট গায়ে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতি আবেগমথিত অনুরাগ।

১৩ই জুন নেপোলিয়নের জন্য একটা ছোট আরবি ঘোড়া আনা হল। তার পিঠে চেপে সে ছুটল নিয়েমেন-এর উপরকার একটা সেতুর দিকে। চারদিকে সৈনিকদের চীৎকার ও জয়ধ্বনিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম। যুদ্ধের চিন্তায় মগ্ন মন তাতে বিরক্তি বোধ করলেও নেপোলিয়ন সে চীৎকার সহ্য করেই চলেছে, কারণ সে জানে যে সৈনিকদের এখন থামতে বলা বৃথা। একটা জনাকীর্ণ ভাসমান সেতুকে পার হয়ে সে হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় ঘুরে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল কভ্‌নোর দিকে। আনন্দে রুদ্ধশ্বাস অশ্বারোহী রক্ষীদল আগে আগে চলেছে ভিড়ের ভিতর দিয়ে তার জন্য রাস্তা পরিষ্কার করে দিয়ে। প্রশস্ত ভিলিয়া নদীর তীরে পৌঁছে সেখানে অবস্থানকারী একটি পোলিশ উহ্‌লাম রেজিমেন্টের কাছে গিয়ে সে থামল।

তাকে দেখবার জন্য পোলদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল ; সকলে সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠল, Vivat ! (জিন্দাবাদ !)

নদীটার এদিক-ওদিক ভাল করে দেখে নেপোলিয়ন ঘোড়া থেকে নেমে নদীর তীরে একটা কাঠের উপর বসল। তার নির্বাক ইসারায় একটা দূরবীন এনে দেওয়া হল। এগিয়ে আসা একটা চাকরের পিঠে সেটাকে রেখে সে নদীর ওপারে দৃষ্টি ফেরাল। তারপর কাঠের উপর মেলে-ধরা একখানা মানচিত্রের মধ্যে ডুবে গেল। মাথা না তুলে দুজন এড্-ডি-কংকে কি যেন বলতেই তারা ঘোড়া ছুটিয়ে পোলিশ উহ্‌লানদের কাছে এগিয়ে গেল।

একজন এড্-ডি-কং পৌঁছতেই পোলিশ উহ্‌লানদের মধ্যে গুঞ্জন শোনা গেল, "কি ? তিনি কি বলছেন ?"

হুকুম হয়েছে, হেঁটে পার হওয়া যায় এরকম একটা জায়গা খুঁজে বের করে নদীটা পার হতে হবে। পোলিশ উহ্‌লানদের কর্ণেল জনৈক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ

উত্তেজনায় রক্তিম হয়ে থেমে থেমে জিজ্ঞাসা করল, সেরকম জায়গার খোঁজ না করে সে কি উহ্‌লানদের নিয়ে সাঁতরে নদী পার হতে পারে। এড্‌-ডি-কং উত্তর দিল, এই অতি-উৎসাহ দেখে সম্রাট অসন্তুষ্ট নাও হতে পারে।

এড্‌-ডি-কং কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই গোঁফওয়ালা বুড়ো অফিসারটির চোখ-মুখ খুসিতে ঝকমকিয়ে উঠল; হাতের তলোয়ার তুলে চীৎকার করে উঠল, 'ভাইভাত্‌!' তারপর উহ্‌লানদের অনুসরণ করতে হুকুম দিয়ে নদীর জলে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শত শত উহ্‌লান তার পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। নদীর মাঝখানে স্রোত খুব বেশী; যেমন ঠাণ্ডা তেমনই ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়া কষ্টকর; ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে উহ্‌লানরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরল। কিছু ঘোড়া ও সৈনিক ডুবে গেল; কেউবা জিনের উপরে থেকে অথবা ঘোড়ার কেশর ধরে সাঁতরাতে লাগল। মাত্র আধ ভার্স্ট দূরেই একটা শুকনো খাদ থাকা সত্বেও দূরে কাঠের উপর উপবিষ্ট লোকটির চোখের সামনে নদীতে সাঁতরাতে এবং ডুবে যেতে পারায় তারা গর্ববোধ করতে লাগল, যদিও সে লোকটি তাদের এই কার্যকলাপ একবার তাকিয়েও দেখল না। এড্‌-ডি-কং ফিরে এসে যখন সুযোগমত সম্রাটের প্রতি পোলদের এই অনুরাগের কথা জানাল তখন ধূসর ওভারকোট পরিহিত লোকটি উঠে দাঁড়াল, এবং বেথিয়ারকে ডেকে এনে নদীর তীরে পায়চারি করতে করতে তাকে নানা নির্দেশ দিতে লাগল, আর মাঝে মাঝে ডুবন্ত উহ্‌লানদের দিকে আপত্তিসূচক দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

আফ্রিকা থেকে মস্কোভির তৃণভূমি পর্যন্ত পৃথিবীর যেকোন স্থানে তার উপস্থিতিই যে মানুষের বাকরোধ করা এবং তাদের উন্মত্ত আত্ম-বিলুপ্তির পথে ঠেলে দেবার পক্ষে যথেষ্ট—এ সত্য তার কাছে মোটেই নতুন নয়। ঘোড়া আনতে বলে সে নিজের বাসস্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

তাদের সাহায্যের জন্য নৌকা পাঠানো সত্বেও প্রায় চল্লিশ জন উহ্‌লান নদীতে ডুবে গেল। বাকি অধিকাংশ সৈনিক অনেক কষ্টে যে তীর থেকে যাত্রা করেছিল সেখানেই ফিরে এল। শুধু অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে কর্নেল স্বয়ং নদী পেরিয়ে কোনরকমে ওপারে উঠল। তীরে উঠেই ভেজা পোশাক-সমেত তারা চীৎকার করে উঠল, 'ভাইভাত্‌!' তারপর সোৎসাহে সেইখানে তাকাল যেখানে নেপোলিয়ন বসেছিল, কিন্তু এখন আর নেই; তবু তারা সেইমুহূর্তে মনে মনে খুসি হল।

সেদিন সন্ধ্যায় নেপোলিয়ন দুটো আদেশ জারি করল: প্রথম, রাশিয়াতে চালাবার জন্য যেসব জাল রুশ নোট বানানো হয়েছে যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলো বাজারে ছেড়ে দেওয়া হোক; দ্বিতীয়, যে স্যাক্সনটির কাছে ফরাসী বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হুকুম সংক্রান্ত তথ্যসম্বলিত চিঠি পাওয়া গেছে তাকে গুলি করে মারা হোক। আর এই দুই হুকুমের ফাঁকে নেপোলিয়ন আরও নির্দেশ

দিল, যে পোলিশ কর্ণেল অকারণে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল তাকে "সম্মানিত সেনাদল"-এর তালিকাভুক্ত করা হোক; সে সেনাদলের প্রধান স্বয়ং নেপোলিয়ন।

Quos vult perdere dementat. (ঈশ্বর যাদের ধ্বংস করতে চান তাদেরই পাগল করে দেন।)

অধ্যায়—৩

ইতিমধ্যে রাশিয়ার সম্রাট সেনা পরিদর্শন করতে এবং নানারকম কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করতে একমাসের উপর ভিল্‌নাতে কাটাচ্ছে। প্রত্যাশিত যুদ্ধের কোনরকম প্রস্তুতিই নেওয়া হয় নি, আর সেই প্রস্তুতির জন্যই সম্রাট চলে এসেছে পিতার্সবুর্গ থেকে। যুদ্ধের কোন সঠিক পরিকল্পনাই করা হয়নি। বিভিন্ন পরিকল্পনার যেসব প্রস্তাবমাত্র করা হয়েছিল একমাস যাবৎ সম্রাট প্রধান ঘাঁটিতে হাজির হবার ফলে তা বরং আরও বেড়ে গেছে। তিনটি বাহিনীরই নিজ নিজ প্রধান সেনাপতি আছে, কিন্তু সমগ্র রুশবাহিনীর কোন সর্বাধিনায়ক নেই, আর সম্রাট নিজেও সে দায়িত্বভার গ্রহণ করে নি।

সম্রাট যত বেশীদিন ভিল্‌নায় কাটাল, যুদ্ধের প্রস্তুতি ততই যেন হ্রাস পেতে লাগল। যারা সর্বদা সম্রাটকে ঘিরে রইল তাদের সকলেরই একমাত্র চেষ্টা হল সম্রাটের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা; যুদ্ধ যে আসন্ন সেকথা তারা ভুলেই গেল।

পোলিশ প্রধানগণ, সভাসদগণ, এবং স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক আয়োজিত অনেকগুলি বল-নাচ ও ভোজনোৎসবের পরে জুন মাসে জনৈক পোলিশ এড্‌-ডি-কংএর খেয়াল হল যে, সম্রাটের সম্মানে এড্‌-ডি-কংদের তরফ থেকেও একটা ডিনার ও বল-নাচের আয়োজন করা উচিত। প্রস্তাবটা সকলেরই মনে ধরল। সম্রাটও সম্মতি দিল। চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহ করা হল। সম্রাটের প্রিয়পাত্রী জনৈক মহিলাকে প্রধান অভ্যর্থনাকারিণী হিসাবে আমন্ত্রণ করা হল। কাউন্ট বেনিংসেন ভিল্‌না প্রদেশের জমিদার; উৎসবের জন্য সে তার গ্রামের বাড়িটা ছেড়ে দিল। স্থির হল, ১৩ই জুন তারিখে কাউন্ট বেনিংসেনের জমিদারি জাক্রেৎ-এ বল-নাচ, ডিনার, নৌকা বাইচ ও আতসবাজি পোড়ানো হবে।

নেপোলিয়ন যেদিন নিয়েমেন নদী পার হবার হুকুম জারি করল এবং তার অগ্রবর্তীবাহিনী কসাকদের তাড়িয়ে রুশ সীমান্ত অতিক্রম করল, সেই সন্ধ্যাটা আলেক্সান্দার কাটাল বেনিংসেনের পল্লীভবনে এড্‌-ডি-কংদের সঙ্গে খানাপিনায়।

বড়ই চমৎকার ঝলমলে সে উৎসব। উদ্যোক্তারা জানাল, এক জায়গায় এতগুলি সুন্দরীর সমাবেশ কদাচিৎ ঘটে থাকে। সম্রাটের সঙ্গে যেসব রুশ

মহিলারা পিতার্সবুর্গ থেকে ভিল্‌নায় এসেছিল তাদের মধ্যে কাউণ্টেস বেজুকভাও ছিল; তার তথাকথিত রুশ সৌন্দর্যের ধাক্কায় রুচিশীলা পোলিশ মহিলাদের সে একেবারে কাৎ করে দিল। সম্রাটের নজরও তার উপর পড়ল; তার সঙ্গে নেচে সম্রাট তাকে সম্মানিত করল।

বরিস দ্রুবেৎস্কয় স্ত্রীকে মস্কোতে রেখে এসেছে; বর্তমানে সে en gracon (অবিবাহিত)-এর মতই বাস করছে; এড্‌-ডি-কং না হলেও সেও এই উৎসবের ব্যয়বাবদ মোটা টাকা চাঁদা দিয়েছে। এখন সে একজন ধনী লোক, সম্মানের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত; এখন আর সে কারও অনুগ্রহভিখারী নয়, সমবয়স্কদের মধ্যে যারা উঁচুতে উঠেছে তাদের সঙ্গে সে সমানতালে পা ফেলে চলে। অনেকদিন পরে ভিল্‌নাতে হেলেনের সঙ্গে তার দেখা হল। হেলেন এখন বড় বড় লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে; বরিসও সম্প্রতি বিয়ে করেছে; তাই অনেকদিনের পুরনো বন্ধুর মতই তারা চলতে লাগল।

মধ্যরাত। নাচ তখনও চলছে। মনের মত জুটি না পেয়ে হেলেন বরিসের সঙ্গেই মাজুরকা নাচের প্রস্তাব করল। তারাই তৃতীয় জুটি। জরির কাজকরা কালো গাউনের তলা থেকে বেরিয়ে-আসা হেলেনের ঝকঝকে খোলা কাঁধের দিকে তাকিয়ে পূর্ব-পরিচিতদের কথা বলতে বলতে বরিস সারাক্ষণ সম্রাটের দিকেই চোখ ফিরিয়ে রইল। সম্রাট তখন নিজে নাচছে না; দরজায় দাঁড়িয়ে একের পর এক নাচের জুটিদের থামিয়ে এমন মিষ্টি করে কথা বলছে যা একমাত্র তার পক্ষেই সম্ভব।

মাজুরকা শুরু হলে বরিস লক্ষ্য করল, সম্রাটের অতিপ্রিয় অনুগামীদের অন্যতম অ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল বলাশেভ সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেল এবং সম্রাট একটি পোলিশ মহিলার সঙ্গে আলাপনে রত থাকলেও শিষ্টাচার-বিরোধীভাবে তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল। কথা শেষ করে সম্রাট তার দিকে তাকাল; যখন বুঝতে পারল যে কোন গুরুতর কারণেই সে এ সময়ে এখানে এসেছে, তখন সম্রাট মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ঘাড়টা ঈষৎ দুলিয়ে বলাশভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। বলাশেভ কি যেন বলতে না বলতেই সম্রাটের মুখে ফুটে উঠল অপার বিস্ময়। বলাশভের হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে সাত গজ চওড়া একটা পথ করে নিয়ে সম্রাট তাকে নিয়ে ঘরটা পার হয়ে গেল। তা দেখে আরাকচীভের উত্তেজিত মুখের ভাবটা বরিসের নজর এড়াল না। ভুরুর নীচ থেকে সম্রাটের দিকে তাকিয়ে আরাকচীভ লাল নাকটা ঝেড়ে ভিড়ের ভিতর থেকে কয়েক পা এগিয়ে গেল; মনে আশা, সম্রাট হয় তো তাকে ডেকে কথা বলবে।

কিন্তু আরাকচীভের দিকে না তাকিয়েই সম্রাট ও বলাশেভ্‌ আলোকিত বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। তলোয়ার হাতে নিয়ে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে আরাকচীভ প্রায় বিশ পা দূরে থেকে তাদের অনুসরণ করল।

মাজুরকা নাচের নানা মুদ্রার মাঝেও বরিসের মনে একই দুশ্চিন্তা দেখা দিল, বলাশেভ্ কি সংবাদ এনেছে, আর কেমন করে অন্য সকলের আগে সেটা জানা যায়। নাচের মাঝখানেই সে বাগানের দরজার কাছে চলে গেল এবং সম্রাট ও বলাশেভ্‌কে বারান্দায় উঠে আসতে দেখে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন সরে যাবার আর সময় নেই এমনিভাব দেখিয়ে সে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল।

ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত হবার মত উত্তেজিত স্বরে সম্রাট তখন এই শেষ কথাগুলি বলছে:

"যুদ্ধ ঘোষণা না করেই রাশিয়ার ভিতরে অনুপ্রবেশ! যতদিন একটি সশস্ত্র শত্রুসৈন্য আমার দেশে থাকবে ততদিন আমি কিছুতেই সন্ধি করব না!"

বরিসের মনে হল, কথাগুলি বলতে পেরে সম্রাট যেন খুসি হয়েছে; কিন্তু বরিস সেটা শুনে ফেলায় অসন্তুষ্টও হয়েছে।

ভ্রূকুটি করে সম্রাট বলল, "একথা যেন কেউ জানতে না পারে!"

বরিস বুঝল, শেষের কথাগুলি তাকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। চোখ বুজে সে মাথাটা একটু নোয়ালো। সম্রাট পুনরায় নাচ-ঘরে ঢুকে আরও আধ ঘণ্টা সময় সেখানে কাটিয়ে দিল।

এইভাবে বরিসই প্রথম জানতে পারল যে ফরাসী বাহিনী নিয়েমেন পার হয়েছে। এই ঘটনাটিকে ধন্যবাদ, কারণ এতে প্রমাণ হল যে অন্য কেউ জানে না এমন অনেক খবরই সে রাখে, আর এতে তাদের চোখে বরিসের মর্যাদা আরও বেড়ে গেল।

মাসাধিক কালের অপূর্ণ প্রত্যাশার পরে একটা বল-নাচের আসরে ফরাসী বাহিনীর নিয়েমেন অতিক্রম করার এই অপ্রত্যাশিত সংবাদ সকলকেই চমকে দিল। সংবাদটা প্রথম জানবার পরেই সক্ষোভ প্রতিবাদে সম্রাটের মুখ দিয়ে যে কথাটি উচ্চারিত হল সেটা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। সেদিন রাত দুটোয় বাড়িতে ফিরেই সম্রাট-সচিব শিশ্‌কভকে ডেকে পাঠাল; তাকে বলল সৈন্যদের উদ্দেশে একটি হুকুম-নামা লিখে পাঠাতে এবং ফিল্ড-মার্শাল প্রিন্স সল্‌তিকভকে তার একটি অনুলিপি পাঠিয়ে দিতে; তাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হল যে সেই হুকুম-নামায় যেন লেখা থাকে—যতদিন একটি সশস্ত্র ফরাসীও রাশিয়ার মাটিতে থাকবে ততদিন সম্রাট কোনরকম সন্ধি করবে না।

পরদিন নিম্নলিখিত চিঠিখানি নেপোলিয়নকে পাঠানো হল:

"মঁসিয় প্রিয় ভাই,

গতকাল জানতে পারলাম, ইয়োর ম্যাজেস্টির সঙ্গে আমার যেকথা হয়েছিল একান্ত আনুগত্যের সঙ্গে আমি তা রক্ষা করে চলা সত্ত্বেও, আপনার সৈন্যরা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করেছে, আর এইমাত্র পিতার্সবুর্গ থেকে আমি

যে চিঠিটা পেয়েছি তাতে কাউন্ট লরিস্তন এই সীমান্ত লংঘনের কারণ হিসাবে আমাকে জানিয়েছে, প্রিন্স কুরাকিন যেদিন পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেছিলেন তখন থেকেই ইয়োর ম্যাজেস্টি নিজেকে আমার সঙ্গে যুদ্ধরত বলে মনে করে এসেছেন। ডুক্ দ্য বাসানো যেসব কারণে তাকে পাসপোর্ট দিতে অস্বীকার করেছিল তার মধ্যে এমনকিছু ছিল না যাতে আমি মনে করতে পারি যে সেটাকে আক্রমণের একটা অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। বস্তুত সেই রাষ্ট্রদূত নিজেই একথা জানিয়েছেন যে ওটা দাবী করার কোন অধিকার তার ছিল না, এবং খবরটা জানা মাত্রই আমি তাকে বলে দিয়েছিলাম যে আমিও ওটা সমর্থন করি না, আর তাই তাকে স্বস্থানে থাকারই নির্দেশ দিয়েছিলাম। এরকম একটা ভুল বোঝা-বুঝির জন্য আমার লোকজনের রক্তপাতের বাসনা যদি ইয়োর ম্যাজেস্টির না থাকে, এবং আপনি যদি রুশ অঞ্চল থেকে আপনার সেনাদলকে সরিয়ে নিতে রাজী থাকেন, তাহলে আমি ধরে নেব যে যা ঘটেছে তা মোটেই ঘটে নি, এবং আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে তোলা এখনও সম্ভব হবে। অন্যথায়, ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমার দিক থেকে কোন উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টা না থাকা সত্ত্বেও যে আক্রমণ আপনি শুরু করেছেন তাকে প্রতিহত করতে আমি বাধ্য হব। আর একটি যুদ্ধের বিপদ থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ইয়োর ম্যাজেস্টির উপরেই নির্ভর করছে।

আমি ইত্যাদি
(স্বাক্ষর) আলেক্সান্দার।"

অধ্যায়—৪

১৪ই জুন সকাল দুটোয় বলাশেভ্‌কে ডেকে এনে সম্রাট নেপোলিয়নকে লেখা চিঠিটা তাকে পড়ে শোনাল, আদেশ দিল সে যেন নিজেই চিঠিটা নিয়ে গিয়ে ফরাসী সম্রাটের হাতে দেয়। তাকে পাঠাবার সময় সম্রাট আর একবার বলে দিল, যতদিন একটিও সশস্ত্র শত্রু-সৈন্য রাশিয়ার মাটিতে থাকবে ততদিন সে সন্ধি করবে না; তাকে বলে দিল, এই কথাগুলি যেন নেপোলিয়নকে শুনিয়ে দেওয়া হয়। নেপোলিয়নকে লেখা চিঠিতে আলেক্সান্দার এই কথাগুলি লেখে নি, কারণ তার মনে হয়েছে যে মিটমাটের একটা শেষ চেষ্টা যখন করা হচ্ছে তখন এই কথাগুলি লেখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; কিন্তু সম্রাট বলাশেভ্‌কে স্পষ্ট নির্দেশ দিল, সে যেন এই কথাগুলি নেপোলিয়নকে অতি অবশ্য জানিয়ে দেয়।

একজন বিউগলবাদক ও দুজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে ১৪ই তারিখ শেষ রাতে যাত্রা করে বলাশেভ নিয়েমেন নদীর রাশিয়ার দিককার রাইকন্তি গ্রামের ফরাসী ঘাঁটিতে পৌছল ভোর-ভোর সময়ে। অশ্বারোহী ফরাসী

শান্ত্রীরা সেখানেই তাকে থামিয়ে দিল।

লাল ইউনিফর্ম ও লোমশ টুপি পরিহিত জনৈক সনদবিহীন ফরাসী হুজার-অফিসার চীৎকার করে বলাশেভ্‌কে থামতে বলল। বলাশেভ্‌ সঙ্গে সঙ্গে না থেমে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলল।

সনদবিহীন অফিসারটির চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল; অস্ফুটে কিছু গালাগালি ছুঁড়ে দিয়ে তার ঘোড়ার বুকটা বলাশেভের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তলোয়ারে হাত রেখে রুশ সেনাপতিকে লক্ষ্য করে রুক্ষ গলায় বলে উঠল: সে কি কালা যে যা বলা হচ্ছে তা কানে ঢুকছে না? বলাশেভ নিজের পরিচয় দিল। রুশ সেনাপতির দিকে না তাকিয়ে অফিসারটি সহকর্মীদের সঙ্গে সেনাদলসংক্রান্ত আলোচনা শুরু করে দিল।

উচ্চতম কর্তৃত্ব ও শক্তিতে অধিষ্ঠিত থাকার পরে, মাত্র তিন ঘণ্টা আগেই সম্রাটের সঙ্গে কথাবার্তা বলার পরে, এবং স্বীয় পদমর্যাদার দরুণ সাধারণভাবেই শ্রদ্ধা লাভে অভ্যস্ত থাকার পরে, রাশিয়ার মাটিতেই তার প্রতি এই শত্রুভাবাপন্ন, এমন কি শ্রদ্ধাহীন, পশু-শক্তির প্রয়োগ দেখে বলাশেভ্‌ খুবই অবাক হয়ে গেল।

মেঘের আড়াল থেকে সবে সূর্য উঠছে; বাতাস তাজা ও শিশিরস্নাত। গ্রাম থেকে একদল গরু-মোষ রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে; জলের বুকে বুদ্‌বুদের মত একটার পর একটা ভরত পক্ষী আকাশের বুকে ডাকতে ডাকতে উড়ে চলেছে।

বলাশেভ চারদিকে তাকিয়ে গ্রাম থেকে কোন অফিসারের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, রুশ কসাক ও বিউগ্‌লবাদক এবং ফরাসী হুজাররা মাঝেমাঝেই একে অন্যের দিকে তাকাচ্ছে।

সবেমাত্র বিছানা ছেড়ে একজন ফরাসী হুজার-কর্নেল একটা সুন্দর ধূসর ঘোড়ায় চেপে দুজন হুজারকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে এসে হাজির হল। অফিসার, সৈনিক ও ঘোড়া সকলকেই বেশ চটপটে ও সুস্থ বলে মনে হল।

যেকোন অভিযানের প্রথমদিকে সৈন্যরা শান্তিকালীন কুচকাওয়াজের মতই ছিমছাম থাকে; তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে একটা যুদ্ধকালীন গমক দেখা দেয়; চলাফেরায় ও মনোভাবে ফুটেওঠে একটা সানন্দ উৎসাহের লক্ষণ।

ফরাসী কর্নেল কষ্ট করে একটা হাই চাপল; কিন্তু তার আচরণ ভদ্র; সম্ভবত বলাশেভের পদমর্যাদা সে বুঝতে পেরেছে। তাকে নিয়ে ঘাঁটি পেরিয়ে এগিয়ে গেল; বলল, তার সম্রাটের সামনে উপস্থিত হবার বাসনা অবিলম্বেই হয় তো পূর্ণ করা যাবে, কারণ তার বিশ্বাস সম্রাটের বাসস্থান এখান থেকে বেশী দূরে নয়।

রাইকন্তি গ্রামের ভিতর দিয়ে তারা এগিয়ে চলল। দু'পাশ থেকে হুজার, শান্ত্রী ও সৈনিকরা তাদের কর্নেলকে অভিবাদন জানাল, আর রুশ

ইউনিফর্মধারীর দিকে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। গ্রামের অপর প্রান্তে তারা পৌঁছে গেল। কর্ণেল বলল, সেনাদলের কম্যাণ্ডার সেখান থেকে সোয়া মাইল দূরে থাকে; বলাশেভ্‌কে সঙ্গে নিয়ে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবে।

এতক্ষণে সূর্য উঠেছে; উজ্জ্বল বনভূমির উপর তার কিরণরাশি ছড়িয়ে পড়েছে।

সরাইখানাটা পেরিয়ে একটা পাহাড়ের উপর উঠতেই তারা সামনে দেখতে পেল, একদল অশ্বারোহী তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দলের আগে কালো ঘোড়ায় চেপে আসছে একটি দীর্ঘদেহ মানুষ; তার টুপিতে পালক গোঁজা, কালো কোঁকড়া চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে একটা লাল আবরণী, পা দুটি ফরাসী কায়দায় সামনের দিকে বাড়ানো। লোকটি কদমে বলাশেভের দিকে এগিয়ে এল; জুন মাসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে তার পালক উড়ছে, মণিমুক্তো ও সোনালী ফিতে ঝল্‌মল্ করছে।

ব্রেসলেট, পালক, নেকলেস ও জরির পোশাক পরা অশ্বারোহী থেকে মাত্র দুই ঘোড়ার দূরত্বে থাকতেই ফরাসী কর্ণেল জুল্‌নার বলাশেভের কানে কানে বলল: "নেপল্‌সের রাজা!" আসলে লোকটি মুরাৎ, এখন সকলে বলে "নেপল্‌সের রাজা!" কেন যে তাকে নেপল্‌সের রাজা বলা হয় সেটা বুদ্ধির অতীত হলেও সে কিন্তু নিজেও কথাটা বিশ্বাস করে এবং বেশ একটা গুরু-গম্ভীরভাব নিয়ে চলাফেরা করে। সে যে সত্যি নেপল্‌সের রাজা এবিষয়ে সে এতই নিশ্চিত যে সে শহর থেকে চলে আসার আগে একদিন যখন স্ত্রীকে নিয়ে রাজপথে হাঁটছিল তখন কয়েকজন ইতালীয় তাকে দেখেই বলে উঠল: "Viva il ra!" (রাজা দীর্ঘজীবী হোন!), আর সেও স্ত্রীর দিকে ফিরে বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল: "বেচারিরা! ওরা জানে না যে কালই আমি ওদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি!"

যদিও সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে সে নেপল্‌সের রাজা, এবং তার চলে যাওয়ার জন্য প্রজাবৃন্দের দুঃখকে করুণার চোখেই দেখত, তবু পরবর্তীকালে যখন সামরিক চাকরিতে ফিরে যাবার হুকুম এল, বিশেষ করে ডান্‌জিগ-এ নেপোলিয়নের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকারের সময় মহামান্য ভগ্নিপতিটি যখন তাকে বলল: "আমি তোমাকে রাজা করে পাঠিয়েছিলাম যাতে তুমি আমার মত করে রাজ্য শাসন কর, তোমার মত করে নয়!"—তখন সে আমাদের সঙ্গেই তার পরিচিত কাজে ফিরে গেল এবং যথাসম্ভব দামী ও চিত্র-বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে মনের সুখে পোলাণ্ডের রাজপথে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল—কেন যাচ্ছে বা কোথায় যাচ্ছে তা না জেনেই।

রুশ সেনাপতিকে দেখেই সে রাজকীয় ভঙ্গীতে মাথাটা পিছনে হেলিয়ে দিল; জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ফরাসী কর্ণেলের দিকে। কর্ণেল বলাশেভের

নামটি উচ্চারণ করতে না পারলেও তার আগমনের উদ্দেশ্যটি সসম্মানে হিজ ম্যাজেস্টিকে জানিয়ে দিল।

রাজা বলল, "দ্য বল-মাচেভ! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে মোহিত হলাম সেনাপতি!" তার ভঙ্গীতে রাজকীয় করুণা প্রদর্শনের ভাবটাই ফুটে বেরুল।

কিন্তু রাজা যেই উচ্চৈস্বরে তাড়াতাড়ি কথা বলতে শুরু করল। তখনই তার রাজকীয় মর্যাদাটি বিদায় নিল; সেদিকে খেয়াল না রেখেই সে তার পরিচিত স্বাভাবিক ভাল-মানুষী কণ্ঠস্বরে ফিরে গেল। বলল: "দেখুন সেনাপতি, দেখে তো ব্যাপারটাকে যুদ্ধ বলেই মনে হচ্ছে।"

বলাশেভ্ জবাব দিল, "ইয়োর ম্যাজেস্টি, আমার প্রভু সম্রাট যুদ্ধ চান না, আর যেহেতু আপনার প্রভু মনে করেন…"

"মঁসিয় দ্য বলাচফ-এর কথা শুনতে শুনতে মুরাৎ-এর মুখ নির্বোধ তুষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু রাজকীয় দায়িত্ব বলেও তো একটা কথা আছে! তার মনে হল, রাজা হিসাবে আলেক্সান্দারের দূতের সঙ্গে রাজকীয় বিচার নিয়ে আলোচনা করা তার কর্তব্য। ঘোড়া থেকে নেমে বলাশেভের হাত ধরে নিজের দলবল রেখে কিছুটা দূরে এগিয়ে গিয়ে পায়চারি করতে করতে বেশ ভারিক্কী চালে কথাবার্তা বলতে লাগল। সে জানাল, প্রাশিয়া থেকে সৈন্য অপসারণের যে দাবী করা হয়েছে তাতে সম্রাট নেপোলিয়ন ক্ষোভ প্রকাশ করেছে, বিশেষকরে সেই দাবী যখন সাধারণভাবে জানাজানি হয়ে গেছে এবং তার ফলে ফ্রান্সের মর্যাদায় আঘাত লেগেছে।

বলাশেভ উত্তরে জানাল, এই দাবীর মধ্যে তো ক্ষুব্ধ হবার মত কিছু নেই, কারণ…কিন্তু মুরাৎ তাকে বাধা দিল।

সদয় ও নির্বোধ হাসি হেসে সে অপ্রত্যাশিতভাবে বলে উঠল, "তাহলে কি আপনি সম্রাট আলেক্সান্দারকে আক্রমণকারী বলে মনে করেন না?"

বলাশেভ কি কারণে নেপোলিয়নকেই যুদ্ধের সূচনাকারী বলে মনে করে সেইকথাই সে বুঝিয়ে বলল।

মুরাৎ আবার তাকে বাধা দিয়ে বলল, "দেখুন প্রিয় সেনাপতি, সর্বান্তঃকরণে আমি চাই যে দুই সম্রাটের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যাক, এবং আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা শেষ হয়ে যাক!"

তারপর সে গ্রাণ্ড ডিউক ও তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নিল, নেপল্‌সে থাকাকালে তার সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে যে দিনগুলি কেটেছিল তার স্মৃতি-রোমন্থন করল। তারপরই যেন সহসা তার রাজকীয় মর্যাদার কথা স্মরণ করে মুরাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল, এবং রাজ্যাভিষেকের সময় যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেই ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে ডান হাতটা নেড়ে বলতে লাগল:

"আপনাকে আর আটকে রাখব না সেনাপতি। আপনার উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি," এই কথা বলেই কাজ-করা লাল আবরণী, উঁচু পালক ও ঝকমকে অলংকারসহ সে সশ্রদ্ধভাবে দূরে অপেক্ষমান দলের লোকদের কাছে ফিরে গেল।

অচিরেই তাকে স্বয়ং নেপোলিয়নের কাছে হাজির করা হবে, মুরাতের কথাবার্তা থেকে এটাই ধরে নিয়ে বলাশেভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কিন্তু তার পরিবর্তে পরবর্তী গ্রামে দাভুৎ-এর পদাতিক বাহিনীর শান্ত্রীরা তাকে আটক করল এবং জনৈক অ্যাডজুটাণ্ট এসে তাকে মার্শাল দাভুৎ-এর গ্রামে নিয়ে চলল।

অধ্যায়—৫

আলেক্সান্দারের যেমন আরাক্‌চীভ, নেপোলিয়নের তেমনই দাভুৎ—আরাক্‌চীভ-এর মত ভীরু না হলেও তারই মত সঠিক, তারই মত নিষ্ঠুর, এবং তারই মত নিষ্ঠুরতা ছাড়া সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অন্য কোন ভাষা জানে না।

প্রকৃতির জীব-রাজ্যে যেমন নেকড়ের প্রয়োজন আছে, তেমনই রাষ্ট্র-দেহেও এ ধরনের লোকের প্রয়োজন আছে; তাদের উপস্থিতি ও ঘনিষ্ঠতা রাষ্ট্র-প্রধানের পক্ষে যতই বেমানান হোক, তারা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে, এবং চিরকাল তাদের কাজ করে যাবে। আলেক্সান্দার নিজে উদার, মহৎ ও শান্ত চরিত্রের লোক হওয়া সত্ত্বেও যে নিষ্ঠুর আরাক্‌চীভ নিজের হাতে একজন গোলন্দাজের গোঁফ ছিঁড়ে ফেলতে পারে, স্নায়ুর দুর্বলতার জন্য যে লোক কোন বিপদের সম্মুখীন হতে পারে না, যে শিক্ষিতও নয় সভাসদও নয়, সেই লোক কেমন করে আলেক্সান্দারের পাশে দাঁড়িয়ে এতবড় ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে,—তার ব্যাখ্যা একমাত্র এই অনিবার্যতার মধ্যেই পাওয়া যায়।

বলাশেভ দেখল, একটি চাষীর কুঁড়ে ঘরে পিপের উপর বসে দাভুৎ কি যেন লিখছে—সে তখন হিসাবপত্র পরীক্ষা করছে। তারজন্য আরও ভাল বাসা পাওয়া যেতে পারত। কিন্তু মার্শাল দাভুৎ তাদেরই একজন যারা গম্ভীর হয়ে থাকার যৌক্তিকতা স্বরূপ ইচ্ছা করেই অত্যন্ত শোচনীয় পরিবেশে বাস করতে চায়। সেই একই কারণে তারা সর্বদাই কর্মব্যস্ত ও তাড়াহুড়ার মধ্যে থাকে। তার মুখের ভাব যেন সবসময়ই বলতে চায়: "দেখতেই তো পাচ্ছ, একটা পিপের উপর বসে এই নোংরা চালার মধ্যে কাজ করছি; এর পরেও জীবনের ভাল দিকের কথা আমি কেমন করে ভাবব?" রুশ সেনাপতি ঘরে ঢুকলে সে ইচ্ছা করেই আরও বেশী করে কাজের মধ্যে ডুবে গেল; চশমার ভিতর দিয়ে চোখ তুলে বলাশেভের মুখের দিকে তাকাল; সকাল বেলাকার সৌন্দর্যে আর মুরাৎ-এর সঙ্গে কথাবার্তায় তার মুখে একটা সজীবতা

ফুটে উঠেছে ; তা দেখে দাভুৎ না উঠে দাঁড়াল, না নড়েচড়ে বসল ; বরং ভুরু দুটো আরও বেশী করে কুঁচকে বিদ্বেষবশেই আরও বেশী করে নাকটা সিঁটকাল।

যখন বলাশেভের মুখ দেখে বুঝল যে এই অভ্যর্থনায় সে অসন্তুষ্ট হয়েছে তখন মাথা তুলে দাভুৎ ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল সে কি চায়।

সে যে সম্রাট আলেক্সান্দারের অ্যাডজুটান্ট-জেনারেল এবং তার দূত হিসাবেই নেপোলিয়নের কাছে এসেছে, একথা জানে না বলেই দাভুৎ তাকে এভাবে অভ্যর্থনা করেছে মনে করে বলাশেভ তাড়াতাড়ি তাকে নিজ পদমর্যাদা ও কার্যভারের কথা জানিয়ে দিল। কিন্তু ফল হল তার প্রত্যাশার বিপরীত ; তার কথা শুনে দাভুৎ আরও রূঢ় ও রুক্ষ হয়ে উঠল।

বলল, "আপনার কাগজপত্র কোথায় ? সেগুলি আমাকে দিন। আমি সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

বলাশেভ জবাবে বলল, তার উপর নির্দেশ আছে সেগুলি সম্রাটকে হাতে-হাতে দিতে হবে।

দাভুৎ বলল, "আপনার সম্রাটের নির্দেশ আপনাদের সৈন্যদের উপর চলে, কিন্তু এখানে আপনাকে যা বলা হবে তাই আপনাকে করতে হবে।"

এবং সে যে বিচারবিহীন শক্তির উপর কতখানি নির্ভরশীল রুশ সেনাপতিকে সেবিষয়ে আরও বেশী সচেতন করে তুলবার জন্যই যেন কর্তব্যরত অফিসারকে ডেকে আনবার জন্য দাভুৎ একজন অ্যাডজুটান্টকে পাঠিয়ে দিল।

সম্রাটের চিঠিসম্বলিত প্যাকেটটা বের করে বলাশেভ সেটা টেবিলের উপর রাখল (দুটো পিপে পাশাপাশি রেখে তার উপর কব্জাসমেত একটা দরজার পাল্লা পেতে টেবিলটা বানানো হয়েছে)। দাভুৎ প্যাকেটটা নিয়ে লেখাটা পড়ল।

বলাশেভ আপত্তি জানিয়ে বলল, "আমাকে শ্রদ্ধা করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা আপনার আছে ; কিন্তু দয়া করে এটুকু জেনে রাখুন যে আমি হিজম্যাজেস্টি রুশ সম্রাটের অ্যাড্‌জুটান্ট-জেনারেল…"

দাভুৎ নিঃশব্দে তার মুখের দিকে তাকাল ; সেখানে উত্তেজিত ও বিব্রত হবার লক্ষণ দেখে যেন খুসিই হল।

"আপনার উপযুক্ত ব্যবহারই করা হবে," বলে দাভুৎ প্যাকেটটা পকেটে পুরে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এক মিনিট পরে মার্শালের অ্যাড্‌জুটান্ট দ্য কাস্ত্রে এসে বলাশেভের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় তাকে নিয়ে গেল।

সেদিন পিপের উপর পাতা সেই একই টেবিলে সে মার্শালের সঙ্গে খানা খেল।

পরদিন খুব ভোরেই দাভুৎ ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল ; হুকুমের সুরে

বলাশেভকে কাছে ডেকে বলল সে যেন এখানেই থাকে, হুকুম এলে যেন মাল-গাড়ির সঙ্গে চলে যায়, এবং মঁসিয় দ কাস্ত্রে ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে যেন কথা না বলে।

চারদিন ধরে নির্জনতা, অবসাদ ও নিজের অক্ষমতা ও তুচ্ছতার চেতনার ভিতর দিয়ে কাটিয়ে, এবং মার্শালের মালপত্র ও ফরাসী বাহিনীর সঙ্গে গোটা জেলাটা চষে ফেলে তবে বলাশেভ ভিল্‌নাতে গিয়ে পৌঁছল—আর পৌঁছল ঠিক সেই ফটক দিয়ে চারদিন আগে সে যে ফটকটা পার হয়ে গিয়েছিল।

পরদিন রাজকীয় অভ্যর্থনাকারী কোঁৎ দ্য তুরেন বলাশেভকে জানাল, সম্রাট নেপোলিয়ন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে রাজী হয়েছে।

যে বাড়িতে বলাশেভকে এনে রাখা হয়েছিল চারদিন আগে সে বাড়ির সামনে মোতায়েন ছিল প্রিয় ব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেন্টের শান্ত্রীরা; আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে বুক-খোলা নীল ইউনিফর্ম-পরা লোমের টুপি মাথায় দুজন ফরাসী গোলন্দাজ, হুজার ও উহ্‌লানদের একটি পথপ্রদর্শক দল, এবং এড্‌-ডি-কং-এর চাকর ও সেনাপতিদের একটি বাছাই দল; সকলেই নেপোলিয়নের আগমনের প্রতীক্ষায় তার জিন-আঁটা ঘোড়া ও ক্রীতদাস রুস্তানকে ঘিরে গোল হয়ে ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। ভিল্‌নার যে বাড়িটা থেকে আলেক্সান্দার বলাশেভকে দৌত্যকর্মে পাঠিয়েছিল ঠিক সেই বাড়িতেই নেপোলিয়ন তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

অধ্যায়—৬

রাজকীয় জাঁকজমকে অভ্যস্ত হলেও নেপোলিয়নের রাজদরবারের বিলাসবাহুল্য ও আড়ম্বর দেখে বলাশেভ অবাক হয়ে গেল।

কোঁৎ দ্য তুরেন তাকে বড় অভ্যর্থনা-কক্ষে নিয়ে বসাল। সেখানে অনেক সেনাপতি, অভ্যর্থনাকারী ও পোল্যাণ্ডের শীর্ষস্থানীয় লোকজন—তাদের কয়েকজনকে বলাশেভ রুশ সম্রাটের দরবারেও দেখেছে—আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তুরেন জানাল, অশ্বারোহণে যাবার আগেই নেপোলিয়ন রুশ সেনাপতিকে অভ্যর্থনা জানাবে।

কয়েক মিনিট পরে একজন অভ্যর্থনাকারী এসে বিনীতভাবে অভিবাদন করে বলাশেভকে বলল তাকে অনুসরণ করতে।

বলাশেভ ছোট অভ্যর্থনা-ঘরে গেল; সে ঘরের একটা দরজা দিয়ে সেই পড়ার ঘরটাতে যাওয়া যায় যেখান থেকে রুশ সম্রাট তাকে এই দৌত্যকর্মে পাঠিয়েছিল। দু'এক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকেই কেটে গেল। দরজার ওপারে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল; দরজার দুটো পাল্লাই খুলে দেওয়া হল; সব চুপচাপ; তারপরেই শোনা গেল সদর্প দৃঢ় পদক্ষেপ—নেপোলিয়ন আসছে।

সবেমাত্র অশ্বারোহণের সাজসজ্জা শেষ হয়েছে; নীল রঙের ইউনিফর্মের বুকটা খোলা, তার নীচেকার সাদা ওয়েস্টকোটটা এত লম্বা যে বর্তুলাকার পেটটি তাতে ঢাকা পড়েছে; সাদা চামড়ার ব্রীচেস্ বেঁটে পায়ের মোটা ঊরুর উপর চেপে বসেছে; পায়ে হেসিয়ান বুট। ছোট ছোট চুল সবে ব্রুশ করা হয়েছে, কিন্তু চওড়া কপালের মাঝখানে একগুচ্ছ চুল ঝুলে আছে। ইউনিফর্মের কালো কলারের উপর দিয়ে মোটা সাদা গলাটা ঠেলে উঠেছে; গায়ে ইউ-ডি-কলোনের গন্ধ। উঁচু চিবুকসহ যৌবন-সুলভ মুখে রাজকীয় অভ্যর্থনার অনুকম্পামিশ্রিত গাম্ভীর্যের প্রকাশ।

প্রতিটি পদক্ষেপে শরীরটাকে ঈষৎ দুলিয়ে মাথাটাকে সামান্য পিছনে ঠেলে দিয়ে দ্রুতপায়ে সে ঘরে ঢুকল। বেঁটে, মোটা শরীর, চওড়া কাঁধ, বুক ও পেট সামনে প্রসারিত; সবকিছু মিলিয়ে আরামে-থাকা চল্লিশ বছরের মানুষের চিত্তাকর্ষক, মহিমান্বিত চেহারা। আরও বোঝা গেল, আজ তার মেজাজ খুব ভাল আছে।

বলাশেভের আনত সশ্রদ্ধ অভিবাদনের উত্তরে নেপোলিয়ন মাথাটা নেড়ে তার কাছে এসেই এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যাতে বোঝা যায় যে তার প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান, আর নিজের বক্তব্যকে গুছিয়ে বলার কোন প্রয়োজন তার হয় না, কারণ সে জানে যে সঠিক কথাটাই সে বলবে, আর সেটা বেশ ভালভাবেই বলবে।

সে বলল, "শুভদিন সেনাপতি। সম্রাট আলেক্সান্দারের কাছ থেকে যে চিঠি আপনি এনেছেন সেটা আমি পেয়েছি, আর আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুসি হয়েছি।" বড় বড় চোখ মেলে বলাশেভের মুখের দিকে একবার তাকিয়েই তার দৃষ্টি তাকে ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল।

পরিষ্কার বোঝা গেল, বলাশেভের ব্যক্তিত্বের প্রতি তার কোন আগ্রহ নেই; তার একমাত্র আগ্রহ নিজের মনকে নিয়ে। নিজের বাইরের কোন-কিছুরই কোন অর্থ তার কাছে নেই, কারণ তার মতে পৃথিবীর সবকিছুই সম্পূর্ণভাবে তার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে।

সে বলতে লাগল, "আমি যুদ্ধ চাই না, কখনও চাইনি, কিন্তু যুদ্ধ আমার উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমন কি এখনও (শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে) আপনার যেকোন কৈফিয়ৎ মেনে নিতে আমি প্রস্তুত।"

তারপরেই রুশ সরকারের প্রতি তার অসন্তুষ্টির কারণগুলি সংক্ষেপে ও বিশদভাবে বুঝিয়ে বলতে লাগল। যেরকম শান্তগলায় মৈত্রীসূচক সুরে ফরাসী সম্রাট কথাগুলি বলল তাতে বলাশেভের দৃঢ় ধারণা হল যে সে শান্তি চায়, এবং আলোচনায় বসতে রাজী আছে।

কথা শেষ করে নেপোলিয়ন যখন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে রুশ দূতের দিকে তাকাল তখন বলাশেভ অনেক আগে থেকে তৈরি করা ভাষণটি বলতে

শুরু করল: "মহাশয়, আমার মনিব সম্রাট…" কিন্তু তার উপর ঝুঁকে-পড়া সম্রাটের চোখের দিকে তাকিয়েই সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। বলাশেভের ইউনিফর্ম ও তরবারির দিকে তাকিয়ে প্রায় অদৃশ্য হাসি হেসে সে যেন বলছে: "আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন—শান্ত হোন!"

বলাশেভের সম্বিত ফিরে এল; সে আবার বলতে শুরু করল। কুরাকিনের পাসপোর্টের দাবীকে সম্রাট আলেক্সান্দার যুদ্ধের যথেষ্ট কারণ বলে মনে করে না; সম্রাটের সম্মতি ছাড়াই কুরাকিন নিজের থেকেই কাজটা করেছে; সম্রাট আলেক্সান্দার যুদ্ধ চায় না; আর ইংলণ্ডের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

"এখন পর্যন্ত নেই!" নেপোলিয়ন বাধা দিয়ে বলল; কিন্তু পাছে তার রাগ ধরা পড়ে তাই ভুরু কুঁচকে মাথাটা ঈষৎ নেড়ে ইঙ্গিতে বলাশেভকে তার কথা চালিয়ে যেতে বলল।

তাকে যা ব[illegible]ব নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সেসব কথা শেষ করে বলাশেভ আরও জানাল, "[illegible] আলেক্সান্দার শান্তি চায়, কিন্তু কোনরকম আলোচনায় বসবার আগে তার একটি শর্ত আছে…"এখানে বলাশেভ ইতস্তত করল: সেই কথাগুলি তার [illegible] পড়ে গেল যেগুলি সম্রাট আলেক্সান্দার তার এই চিঠিতে লেখে নি, কিন্তু সল্‌তিকভকে পাঠানো অনুলিপিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এবং বলাশেভকে বলে দিয়েছে নেপোলিয়নের সামনে সেগুলির পুনরাবৃত্তি করতে। কথাগুলি বলাশেভের মনে আছে: "যতদিন পর্যন্ত একটিও সশস্ত্র শত্রু রাশিয়ার মাটিতে থাকবে," কিন্তু কিছু জটিল মনোভাব তাকে বাধা দিল। ইচ্ছা থাকলেও সে কথাগুলি সে বলতে পারল না। ক্রমেই বিচলিত হয়ে বলল: "শর্তটি এই যে ফরাসী বাহিনী নিয়েমেনের ওপারে সরে যাবে।"

শেষের কথাগুলি বলার সময় বলাশেভের বিমূঢ়ভাব নেপোলিয়নের নজর এড়াল না: তার মুখটা বেঁকে গেল, আর বাঁ পায়ের গুলিটা তালে তালে কাঁপতে লাগল। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে না সরে সে আরও জোর গলায় আরও দ্রুত কথা বলতে লাগল। কথার ফাঁকে ফাঁকে বলাশেভ চোখ নামিয়ে দেখতে গেল, নেপোলিয়নের গলা যত চড়ছে তার বাঁ পাটা তত বেশী কাঁপছে।

সে বলতে লাগল, "শান্তি প্রতিষ্ঠার বাসনা সম্রাট আলেক্সান্দারের চাইতে আমার কম নয়। শান্তির জন্য গত আঠারো মাস ধরে আমি কি সবকিছু করি নি? কৈফিয়তের জন্য আমি আঠারো মাস অপেক্ষা করেছি। কিন্তু আলোচনা শুরু করার জন্য আমার কাছে কি দাবী করা হল?"

বলাশেভ জবাব দিল, "আপনার বাহিনীকে নিয়েমেনের ওপারে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে মহাশয়।"

"নিয়েমেন?" নেপোলিয়ন কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। "তাহলে এখন আপনারা চাইছেন আমাকে নিয়েমেন থেকে সরে আসতে হবে—শুধু

নিয়েমেন ?" বলাশেভের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে নেপোলিয়ন কথাটা আরও একবার বলল।

বলাশেভ সসম্মানে মাথা নোয়াল।

চার মাস আগেকার পোমেরানিয়া থেকে সরে আসার দাবীর পরিবর্তে এখন দাবী করা হচ্ছে শুধুমাত্র ইয়েমেন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার। নেপোলিয়ন দ্রুত মুখ ফিরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

"আপনি বলছেন, আলোচনা শুরু করার আগে আমাকে নিয়েমেন ছেড়ে আসতে হবে—এটাই আপনাদের দাবী; কিন্তু দু'মাস আগে ঠিক এইভাবেই দাবী করা হয়েছিল যে আমাকে ভিশ্চুলা ও ওডার থেকে সরে আসতে হবে; তথাপি আপনারা আলোচনা চালাতে ইচ্ছুক।"

নেপোলিয়ন নিঃশব্দে ঘরের এককোণ থেকে অপর কোণে চলে গেল; আবার এসে বলাশেভের সামনে থামল। বলাশেভ লক্ষ্য করল, তার বাঁ পাটা আগের চাইতেও দ্রুততর গতিতে কাঁপছে, তার মুখটা পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে। এইভাবে বাঁ পা কাঁপার ব্যাপারটা নেপোলিয়নও জানত। পরবর্তীকালে সে নিজেই বলেছে, "বাঁ পায়ের গুলি কাঁপাটা আমার একটা বড় লক্ষণ।"

"ভিশ্চুলা এবং ওডার থেকে পশ্চাদপসরণের দাবী বাদেনের প্রিন্সের কাছে করা চলতে পারে, আমার কাছে নয়!" প্রায় আর্তনাদ করার মত এমনভাবে নেপোলিয়ন কথাগুলি বলল যে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। "আপনারা আমাকে পিতার্সবুর্গ এবং মস্কো দিয়ে দিলেও এমন শর্ত আমি মানতে পারতাম না। আপনারা বলছেন, এ যুদ্ধ আমি শুরু করেছি! কিন্তু কে প্রথম সৈন্যদলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল? সম্রাট আলেক্সান্দার, আমি নই! আর আমি যখন লাখ লাখ টাকা খরচ করে ফেলেছি, যখন ইংলণ্ডের সঙ্গে আপনারা বন্ধুত্ব করেছেন, যখন আপনাদের অবস্থা খুব খারাপ, তখন আপনারা আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। আলোচনার প্রস্তাব! ইংলণ্ডের সঙ্গে আপনাদের মৈত্রীর উদ্দেশ্য কি? ইংলণ্ড আপনাদের কি দিয়েছে?" নেপোলিয়ন দ্রুতবেগে কথা বলে চলল। স্পষ্টতই সন্ধির সুবিধা এবং তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করবার কোন চেষ্টাই সে করছে না; সে শুধু চাইছে নিজের নির্দোষিতা ও শক্তি এবং আলেক্সান্দারের ভ্রান্তি ও চাতুরি প্রমাণ করতে।

গোড়ার দিকে তার কথার মধ্যে নিজের সুবিধাজনক অবস্থা প্রমাণ করা এবং তৎসত্ত্বেও সন্ধির আলোচনার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছিল; কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করে সে যত বেশী কথা বলছে ততই কথার উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছে।

এখন তার বক্তব্যের একমাত্র মর্মার্থ নিজেকে বড় করা এবং আলে-

ক্সান্দরকে অপমান করা—অথচ সাক্ষাৎকারের শুরুতে এ ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না।

"শুনেছি আপনারা তুরস্কের সঙ্গে সন্ধি করেছেন ?"

বলাশেভ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

বলতে শুরু করল, "সন্ধি হয়েছে…"

কিন্তু নেপোলিয়ন তাকে কথা বলতে দিল না। সব কথা সে নিজেই বলতে চাইছে। এমন একধরনের উচ্ছ্বাস ও অনিয়ন্ত্রিত আঘাত দিয়ে সে কথা বলতে লাগল যা উচ্ছন্নে যাওয়া মানুষকেই সাজে।

"হ্যাঁ, আমি জানি মল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া না পেয়েই আপনারা সন্ধি করেছেন; যেমন ফিনল্যাণ্ড দিয়েছি, তেমনই ও দুটো প্রদেশও আপনার সম্রাটকে আমি দিয়ে দিতাম! হ্যাঁ, আমি কথা দিয়েছিলাম, এবং মল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া সম্রাট আলেক্সান্দারকে অবশ্যই দিতাম। কিন্তু এখন অমন দুটি ভাল প্রদেশ তিনি পেলেন না। অথচ ওই দুটি প্রদেশকে তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করে মাত্র একটি শাসনকালেই রাশিয়ার সীমাকে বোথ্‌নিয়া উপসাগর থেকে দানিয়ুবের মোহনা পর্যন্ত প্রসারিত করতে পারতেন। মহীয়সী ক্যাথারিনও এর চাইতে বেশী কিছু করতে পারতেন না।" কথা বলতে বলতে ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হয়ে নেপোলিয়ন ঘরময় পায়চারি করতে করতে সেই কথাগুলিই বলাশেভকে শোনাতে লাগল যা সে তিল্‌জিত্‌-এ সম্রাট আলেক্সান্দারকে শুনিয়েছিল। "আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে এসবই তার হত! আঃ, সে কী চমৎকার রাজত্ব!" কথাটা বারকয়েক উচ্চারণ করে একটু থেমে পকেট থেকে সোনার নস্যিদানি বের করল, এবং সেটাকে নাকের কাছে তুলে ধরে সজোরে শ্বাস টানল।

"সম্রাট আলেক্সান্দারের রাজত্বকাল কী চমৎকারই না হতে পারত!"

করুণার দৃষ্টিতে সে বলাশেভের দিকে তাকাল; কিন্তু যেমনই বলাশেভ কিছু বলতে চেষ্টা করল সঙ্গেসঙ্গেই সে তাকে আবার থামিয়ে দিল।

বিচলিতভাবে দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রশ্ন করল, "এমন কি তিনি চাইতে পারতেন যা আমার বন্ধুত্বের সূত্রে পেতে পারতেন না? কিন্তু না, আমার শত্রুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাটাই তিনি পছন্দ করলেন। তারা কারা? স্তীন, আর্মফেল্ট, বেনিংসেন ও উইন্‌স্ত্‌জিন্‌-জেরোদদের দল! স্তীন তো নিজের দেশ থেকে বিতরিত একটা বিশ্বাসঘাতক; আর্মফেল্ট, একটা লম্পট ও ষড়যন্ত্রকারী; উইন্‌স্ত্‌জিন্‌ জেরোদ তো পলাতক ফরাসী প্রজা; বেনিংসেন তবু খানিকটা সৈনিকের মত মানুষ, কিন্তু তাহলেও কোন কাজের নয়; ১৮০৭ সালে সে তো কিছুই করতে পারে নি; আবার তাকে দেখে তো সম্রাট আলেক্সান্দারের মনে ভয়ঙ্কর স্মৃতি জেগে ওঠা উচিত। …যদি ধরেই নি যে তারা উপযুক্ত লোক, তাদের কাজে লাগানো যেতে পারে,—কিন্তু না,

মোটেই তারা তা নয়! যুদ্ধ বা শান্তি কোনটারই উপযুক্ত তারা নয়! বার্কলে তাদের মধ্যে সবচাইতে সক্ষম লোক একথা বলা হয়, কিন্তু তার প্রাথমিক গতিবিধি দেখে আমি সেকথা বলতে পারি না। আর এরা, এইসব সভাসদরাই বা কি করছে? ফুয়েল এককথা বলে তো আর্মফেল্ট বলে আর; বেনিংসেন শুধু ভাবে, আর বার্কলেকে কোন কাজ করতে বললে সে যে কি করবে তাই স্থির করতে পারে না; ফলে সময় চলে যায়, ফল কিছুই হয় না। একমাত্র ব্যাগ্রেশনই সামরিক লোক। সে বোকা, কিন্তু তার অভিজ্ঞতা আছে, দ্রুত দেখার ক্ষমতা আছে, স্থিরসঙ্কল্প আছে···আর এই ভূতদের ভিড়ে আপনাদের তরুণ সম্রাট কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করছেন? তারা তো তাকেই অসুবিধায় ফেলেছে, যাকিছু ঘটছে তার সব দায়িত্ব তার কাঁধেই চাপিয়ে দিচ্ছে। সেনাপতি না হয়ে রাজার কখনও সেনাদলের সঙ্গে থাকা উচিত নয়!" যেন সম্রাটকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েই নেপোলিয়ন কথাগুলি উচ্চারণ করল। রণক্ষেত্রে সেনাপতি হবার বাসনা যে আলেক্সান্দারের খুবই ছিল সেটা সে জানত।

"মাত্র এক সপ্তাহ হল অভিযান শুরু হয়েছে; এরইমধ্যে আপনারা ভিল্না রক্ষা করতেও পারেন নি। আপনাদের দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করে পোলিশ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। আপনাদের সৈন্যদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।"

বলাশেভকে যা বলে দেওয়া হয়েছিল তা সে ভুলে গেল; এই কথার ফুলঝুরি ঠিক বুঝতে না পেরে বলে উঠল, "কিন্তু ইয়োর ম্যাজিস্টি, সৈন্যদল তো উৎসাহে উজ্জীবিত..."

নেপোলিয়ন তাকে বাধা দিল, "আমি সব জানি। আমি সব জানি। আপনাদের ব্যাটেলিয়ানের সংখ্যা কত তাও জানি, ঠিক যেমন জানি আমার ব্যাটেলিয়ানের সংখ্যা। আপনাদের তো দু' লক্ষ সৈন্যও নেই, আর আমার সৈন্য-সংখ্যা তার তিন গুণ। আমি আপনাকে বলছি, ভিশ্চুলার এপারেই আছে আমার পাঁচ লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য। তুর্কীরা আপনাদের কোন কাজে লাগবে না; তাদের কোন মূল্যই নেই, আর আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করে তারা সেটাই প্রমাণ করেছে। আর সুইডদের কথা—পাগলা রাজাদের দ্বারা শাসিত হওয়াই তাদের বিধিলিপি। ওদের রাজা ছিল পাগল, তাই তার জায়গায় এনে বসাল আর একজনকে—বার্ণাদোত্‌কে—অচিরেই সেও পাগল হয়ে গেল—কারণ পাগল না হলে কেউ রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে না।"

ঘৃণায় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে নেপোলিয়ন আর একবার নস্যিদানিটা নাকের কাছে তুলে ধরল।

নেপোলিয়নের প্রতিটি মন্তব্যের কি জবাব হয় তা বলাশেভ জানে; বার-

বার সেকথা বলতে চেষ্টাও করল, কিন্তু প্রতিবারই নেপোলিয়ন তাকে বাধা দিতে লাগল। নেপোলিয়ন এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে সে যা বলছে সেটাই যে ঠিক সেকথা নিজেকে বোঝাবার জন্যই তাকে অনবরত কথা বলে যেতে হচ্ছে। বলাশেভ ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করছে: দূত হিসাবে তার আশঙ্কা হচ্ছে যে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, এসব কথার জবাব দেওয়া দরকার; আবার মানুষ হিসাবে নেপোলিয়নের এই অকারণ ক্রোধের সামনে সে যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে। সে জানে; নেপোলিয়নের এসব কথার কোন অর্থই নেই; সম্বিত ফিরে এলে সে নিজেই এজন্য লজ্জাবোধ করবে। বলাশেভ চোখ নীচু করে নেপোলিয়নের শক্ত পা দুটোর গতিবিধি দেখতে লাগল; তার চোখের দৃষ্টিকে এড়িয়ে চলতে চাইল।

নেপোলিয়ন বলতে লাগল, "কিন্তু আপনাদের বন্ধুদের তোয়াক্কা আমি করি না। আমারও বন্ধু আছে—পোলরা। তারাও সংখ্যায় আশি হাজার; তারা লড়াই করে সিংহের মত! চিরেই তারা সংখ্যায় দু' লক্ষ হবে।"

হয়তো নিজের ওই নির্জলা মিথ্যায় নিজেই বিব্রত হয়ে এবং বলাশেভ এখনও ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে দেখে, হঠাৎ সম্পূর্ণ ঘুরে গিয়ে নেপোলিয়ন বলাশেভের মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, এবং সাদা হাত দুটো ঘোরাতে ঘোরাতে প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল:

"ঠিক জানবেন, আপনারা যদি প্রাশিয়াকে আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন তাহলে সে দেশকে আমি ইওরোপের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে দেব!" রাগে নেপোলিয়নের মুখ বিবর্ণ ও বিকৃত; এক হাত দিয়ে আর একটা হাত ঠুকছে। "হ্যাঁ, আমি আপনাদের দিনা ও নিপারের ওপারে ছুঁড়ে ফেলে দেব, এবং অন্যায়ভাবে অন্ধের মত ইওরোপ যে প্রাচীরটাকে (অর্থাৎ একটি বড় পোলিশ রাজ্য) ধ্বংস হতে দিয়েছিল সেটাকে নতুন করে গড়ে তুলব। হ্যাঁ, আপনাদের ভাগ্যে তাই ঘটবে। আমার সঙ্গে শত্রুতা করে এই তো আপনাদের লাভ!" নিঃশব্দে সে বারকয়েক ঘরের এদিক থেকে ওদিকে হাঁটতে লাগল।

নস্যিদানিটা ওয়েস্টকোটের পকেটে ভরল, আবার বের করল, বারকয়েক নাকের কাছে তুলে ধরল, তারপর বলাশেভের সামনে থামল। একটু চুপ করে থেকে ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে সোজা বলাশেভের চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল:

"অথচ আপনার মনিব কী চমৎকার শাসনকার্যই না পেতে পারতেন!"

একটা জবাব দেওয়া অবশ্য কর্তব্য মনে করেই, বলাশেভ বলল যে, রাশিয়ার দৃষ্টিতে কিন্তু অবস্থাটা এত শোচনীয় বলে মনে হচ্ছে না। রাশিয়া আশা করছে, যুদ্ধের ফল খুব ভালই হবে। নেপোলিয়ন মাথা নাড়ল; যেন বলতে চাইল, "আমি জানি একথা বলা আপনার কর্তব্য, কিন্তু আপনি

নিজেই কথাটা বিশ্বাস করেন না। আমি আপনাকে আমার মতেই আনতে পেরেছি।"

বলাশেভের কথা শেষ হলে নেপোলিয়ন আবার নস্যিদানিটা বের করল, এক টান নিল, তারপর ইঙ্গিত স্বরূপ দুবার মেঝেতে পা ঠুকল। দরজা খুলে গেল, জনৈক অভ্যর্থনাকারী সসম্মানে নত হয়ে সম্রাটের টুপি ও দস্তানা তার হাতে তুলে দিল, আর একজন এনে দিল একটা রুমাল। তাদের দিকে না তাকিয়ে নেপোলিয়ন বলাশেভের দিকে ঘুরে দাঁড়াল:

"আমার হয়ে সম্রাট আলেক্সান্দারকে আশ্বাস দিয়ে বলবেন যে আমি আগের মতই তার প্রতি অনুরক্ত আছি; আমি তাকে ভালভাবেই চিনি, তার মহৎ গুণাবলীকে খুবই শ্রদ্ধা করি। আর আপনাকে আটকে রাখব না সেনাপতি; সম্রাটকে লেখা আমার চিঠি আপনি পাবেন।"

নেপোলিয়ন দ্রুত দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অভ্যর্থনা-ঘরের প্রতিটি লোক ছুটে এসে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল।

অধ্যায়—৭

যেসব কথা নেপোলিয়ন তাকে বলেছে—সেইসব ক্রুদ্ধ আস্ফালন এবং নীরস গলায় উচ্চারিত শেষ কথাগুলি: "আর আপনাকে আটকে রাখব না সেনাপতি; আমার চিঠি আপনি পাবেন," তা থেকে বলাশেভের ধারণা হয়েছিল যে নেপোলিয়ন আর তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক নয়, একজন অপমানিত দূত হিসাবে তাকে এড়িয়েই চলবে। কিন্তু দুরক-এর মারফৎ সেইদিনই সম্রাটের সঙ্গে ডিনারের নিমন্ত্রণ পেয়ে বলাশেভ খুবই অবাক হয়ে গেল।

বেসিয়েরে, কলাইকুর্ত ও বের্থিয়েরেও ডিনারে উপস্থিত ছিল।

ভিল্‌নার ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসার পরে সম্রাটের মেজাজ এখন খুব ভাল। সেখানে জনতা তাকে ভিড় করে সোৎসাহে অভ্যর্থনা জানিয়েছে, তাকে অনুসরণ করেছে। যে পথ দিয়ে সে এসেছে তার দুই দিককার জানালায় পতাকা ও তার প্রতীক-চিহ্ন প্রদর্শিত হয়েছে; পোলিশ মহিলারা তাকে লক্ষ্য করে রুমাল উড়িয়েছে।

ডিনারে বলাশেভকে পাশে বসিয়ে নেপোলিয়ন যে তার সঙ্গে মধুর ব্যবহার করল তাই নয়, এমন ব্যবহার করল যেন সে তারই অন্যতম সভাসদ, তার প্রতি সহানুভূতিশীল, এবং তার সাফল্যে আনন্দ করতে প্রস্তুত। আলোচনা প্রসঙ্গে সে মস্কোর কথা উল্লেখ করল, রুশ রাজধানী সম্পর্কে বলাশেভকে নানা প্রশ্ন করল।

"মস্কোর অধিবাসী-সংখ্যা কত? কত বাড়িঘর আছে? একথা কি সত্য যে মস্কোকে 'পবিত্র মস্কো' বলা হয়? মস্কোতে কতগুলি গির্জা আছে?"

ছ'শ'র বেশী গির্জা আছে শুনে বলল, "এত গির্জা কেন ?"

"রুশরা খুব ধার্মিক" বলাশেভ জবাব দিল।

"কিন্তু মঠ ও গির্জার সংখ্যাধিক্য তো জনসাধারণের অনুন্নত অবস্থারই লক্ষণ," কথাটা বলে প্রশংসা পাবার আশায় নেপোলিয়ন কলাইকুর্তের দিকে তাকাল।

বলাশেভ শ্রদ্ধার সঙ্গে ফরাসী সম্রাটের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করল।

বলল, "সব দেশেরই একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে।"

"কিন্তু ইওরোপের আর কোথাও তো এরকমটা নেই," নেপোলিয়ন বলল।

বলাশেভ পাল্টা জবাব দিল, "ইয়োর ম্যাজেস্টি আমাকে ক্ষমা করবেন, রাশিয়া ছাড়া স্পেনেও অনেক গির্জা ও মঠ আছে।"

বলাশেভের এই উক্তির মধ্যে সম্প্রতি স্পেনে ফরাসীদের পরাজয়ের ইঙ্গিত থাকায় উপস্থিত কেউই কথাটা খেয়াল করল না। নেপোলিয়নও তার কথায় কান না দিয়ে শুধাল, সেখান থেকে মস্কো যাবার সোজা রাস্তা কোন্‌টা। ডিনারের সময় বলাশেভ আগাগোড়াই বেশ সতর্ক ছিল; সে জবাব দিল, সব রাস্তা যেমন রোমে যায়, তেমনই সব রাস্তাই মস্কোতে যায়: রাস্তা অনেক আছে, তারমধ্যে পল্‌তাভার ভিতর দিয়ে যাবার যে রাস্তাটা দ্বাদশ চার্লস বেছে নিয়েছিল সেটাও আছে। মুখের মত জবাব দিতে পারার খুসিতে বলাশেভের মুখটা লাল হয়ে উঠল। কিন্তু কলাইকুর্ত সঙ্গে সঙ্গে অন্য প্রসঙ্গ তুলে পিতার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাবার রাস্তার দুর্গতি এবং তার পিতার্সবুর্গের স্মৃতির কথা বলতে শুরু করে দিল।

ডিনারের পরে কফি খেতে তারা নেপোলিয়নের পড়ার ঘরে গেল। চারদিন আগে এটাই ছিল সম্রাট আলেক্সান্দারের পড়ার ঘর। নেপোলিয়ন বসল; সেভার্স কফি-পেয়ালাটা নাচতে নাচতে পাশের চেয়ারটায় বলাশেভকে বসতে বলল। ডিনার-পরবর্তীকালের মৌজে থাকায় এখন বলাশেভকেও তার বন্ধু ও অনুরাগী বলে মনে হল। ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মক খুসির হাসি হেসে তাকে বলল, "এই ঘরেই নাকি সম্রাট আলেক্সান্দার থাকতেন? কী আশ্চর্য, তাই না সেনাপতি?"

বলাশেভ কোন জবাব দিতে পারল না, নিঃশব্দে মাথাটা নীচু করল।

সেই একই ব্যঙ্গাত্মক আত্মপ্রত্যয়শীল হাসির সঙ্গে নেপোলিয়ন বলতে লাগল, "হ্যাঁ। চারদিন আগে এই ঘরেই উইন্‌ৎসিন্‌জেরোদ ও স্তিন আলোচনায় বসেছিল। সম্রাট আলেক্সান্দার কেন যে আমার ব্যক্তিগত শত্রুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন সেটাই আমি বুঝতে পারি না। বুঝতে···· পারি না। একথা কি তিনি একবারও ভাবেন নি যে আমিও ঠিক তাই করতে পারি?" জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে বলাশেভের দিকে তাকাল; সকাল-বেলাকার রাগটা যেন আবার তার মনে পড়ে গেল।

পেয়ালাটা ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন বলল, "তিনি জেনে রাখুন যে সেই কাজই আমি করব। তার সব উর্তেম্বের্গ, বাদেন ও উইমারের আত্মীয়দের আমি জার্মেনি থেকে তাড়িয়ে দেব⋯হ্যাঁ। তাড়িয়ে দেব। তিনি যেন রাশিয়াতে তাদের জন্য একটা আশ্রয়-শিবির বানিয়ে রাখেন।"

বলাশেভ এমনভাবে মাথটা নোয়াল যেন সে বলতে চাইল যে এবার সে বিদায় নিতে চায়। কিন্তু নেপোলিয়ন সেটা বুঝতে পারল না। সমানেই কথা বলে চলল।

"কেনই বা সম্রাট আলেক্সান্দার নিজের হাতে সৈন্য-পরিচালনার ভার নিয়েছেন? তাতে কি লাভ হবে? যুদ্ধ আমার কাজ, তার কাজ রাজ্যশাসন করা, সৈন্য পরিচালনা নয়! কেন তিনি এ দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়েছেন?"

নেপোলিয়ন আবার নস্যিদানিটা বের করল, নিঃশব্দে বারকয়েক পায়চারি করল, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ বলাশেভের কাছে এগিয়ে গেল এবং যেন এমন একটা কাজ করছে যেটা শুধু গুরুত্বপূর্ণই নয়, বলাশেভের পক্ষে প্রীতিদায়কও বটে এমনিভাবে আত্মপ্রত্যয়ের হাসি হেসে চল্লিশ বছর বয়সের রুশ সেনাপতির মুখের কাছে হাতটা তুলে তার কানটা ধরে মৃদু টান দিল; তার ঠোঁটে তখন মৃদু হাসির রেখা।

সম্রাট কারও কান ধরে টানলে ফরাসী রাজ-দরবারে সেটাকে সর্বোচ্চ সম্মান ও অনুগ্রহের লক্ষণ বলে মনে করা হয়।

"ওহে সম্রাট আলেক্সান্দারের ভক্ত ও সভাসদ, আপনি কিছু বলছেন না কেন?" নেপোলিয়ন বলল; যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে অন্য কারও ভক্ত ও সভাসদ হওয়াটাই হাস্যকর। বলাশেভের অভিবাদনের জবাবে মাথাটাকে ঈষৎ নুইয়ে বলল. "সেনাপতির ঘোড়া তৈরি তো? তাকে আমার ঘোড়াটাই দাও। অনেকদূর পথ পাড়ি দিতে হবে!"

বলাশেভ্ যে চিঠিটা নিয়ে গেল আলেক্সান্দারকে লেখা নেপোলিয়নের সেটাই শেষ চিঠি। সাক্ষাৎকারের বিবরণ সবিস্তারেই রুশ সম্রাটকে জানানো হয়েছে। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল⋯

অধ্যায়—৮

মস্কোতে পিয়েরের সঙ্গে দেখা হবার পরে প্রিন্স আন্দ্রু পিতার্সবুর্গ চলে গেল। বাড়িতে বলে গেল সেখানে কাজ আছে, কিন্তু আসলে গেল আনাতোল কুরাগিনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে। পিতার্সবুর্গে পৌঁছে সে কুরাগিনের খোঁজ করল, কিন্তু কুরাগিন ততদিনে শহর ছেড়ে চলে গেছে। পিয়ের আগেই শ্যালককে সতর্ক করে দিয়েছিল যে প্রিন্স আন্দ্রু তার খোঁজ করছে। আনাতোল কুরাগিন তখনই সমর দপ্তর থেকে একটা চাকরি পেয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে মল্দাভিয়াতে চলে গেছে। পিতার্সবুর্গে তার

প্রাক্তন কম্যাণ্ডার কুতুজভের সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দেখা হয়ে গেল। কুতুজভ বরাবরই তাকে সুনজরে দেখে; তাই সে প্রস্তাব করল, প্রিন্স আন্‌দ্রু তার সঙ্গে মল্‌দাভিয়া চলুক; বর্তমানে সে সেখানকার প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছে।

চিঠি লিখে কুরাগিনকে দ্বৈতযুদ্ধে আহ্বান করাটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে সমীচীন বলে মনে হয় নি। সে ভাবল, কোন নতুন কারণ ছাড়াই যদি সে তাকে যুদ্ধে আহ্বান করে তাহলে কাউণ্টেস রস্তভা তাতে জড়িয়ে পড়তে পারে; কাজেই সে চাইল, নিজে কুরাগিনের সঙ্গে দেখা করে দ্বৈতযুদ্ধের একটা অজুহাত খুঁজে নেবে। কিন্তু তুরস্কে ও কুরাগিনের সঙ্গে তার দেখা হল না; প্রিন্স আন্‌দ্রু সেখানে পৌঁছবার অনতিপরেই সে রাশিয়াতে ফিরে গেছে। নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে, প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে জীবনটা কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠল। বাকদত্তা বধূর বিশ্বাসভঙ্গের পরে সেই একই পারিবেশে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। অস্তারলিজের রণক্ষেত্রে আকাশের দিকে তাকিয়ে যে চিন্তা তার মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল, আজ আর সে চিন্তা তার মনে আসে না; বরং সে চিন্তাকে আজ সে ভয় করে। সুদূর আকাশের যে অসীম চন্দ্রাতপ একদিন তার চোখের সামনে গড়ে উঠেছিল, সহসা সেটা একটা নীচু নীরেট ভূগর্ভ-প্রকোষ্ঠ হয়ে তাকে যেন চেপে ধরেছে; আজ সেখানে সবকিছুই অত্যন্ত স্পষ্ট, রহস্যের ছায়ামাত্র সেখানে নেই।

তার সামনে যেসব কাজের সুবিধা তখন ছিল তার মধ্যে সামরিক চাকরিই সবচাইতে সরল ও পরিচিত। কুতুজভের অধীনস্থ কর্তব্যরত সেনাপতি হিসাবে এত উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সে কাজ করতে লাগল যে কুতুজভও তা দেখে অবাক হয়ে গেল। তুরস্কে কুরাগিনের সঙ্গে দেখা না হলেও প্রিন্স আন্‌দ্রু তক্ষুনি তার খোঁজে রাশিয়ায় ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না। কিন্তু সেইসঙ্গে সে এটাও জানত, যত দেরিতেই হোক, কুরাগিনের সঙ্গে যেদিন তার দেখা হবে সেদিন তার মুখোমুখি দাঁড়াবার লোভ সে সামলাতে পারবে না, ঠিক যেমন একটা ক্ষুধার্ত মানুষ খাবার সামনে পেলে সেটা ছিনিয়ে নেবার লোভ সামলাতে পারে না। অপমানের প্রতিশোধ এখনও নেওয়া হয় নি, সব বিদ্বেষই বুকের মধ্যে জমা হয়ে আছে—এই চেতনাই তার বুকের উপর সারাক্ষণ চেপে বসে আছে; তুরস্কে এসে অবিশ্রাম কাজের টানে এবং উচ্চাকাংখার প্রেরণায় যে কৃত্রিম শান্তির সন্ধান সে পেয়েছে, তাকে সারাক্ষণ বিষাক্ত করে তুলছে।

১৮১২ সালে নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের খবর যখন বুখারেস্টে এসে পৌঁছল—সেইসময় কুতুজভ্ দু'মাস যাবৎ একটি ওয়ালাচিয়ান স্ত্রীলোকের সঙ্গে বুখারেস্টেই রাতদিন কাটাচ্ছিল—তখন প্রিন্স আন্‌দ্রু কুতুজভকে অনুরোধ করলতাকে, পশ্চিম সেনাদলে বদলি করা হোক। কুতুজভ সঙ্গে সঙ্গে সে

প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেল এবং তাকে বার্কলে দ্য তলি-র সেনাদলে পাঠিয়ে দিল।

তখন মে মাস। পশ্চিম সেনাদল শিবির ফেলেছে দ্রিসা-তে। সেখানে যাবার পথেই মাত্র তিন ভার্স্ট দূরে বল্ড হিল্‌স্ পড়ায় পশ্চিম সেনাদলে যোগ দেবার আগে প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্ড হিল্‌সে গেল। বিগত তিন বছরে তার জীবনে এত বেশী পরিবর্তন এসেছে, এত বেশী কথা সে ভেবেছে, এত বেশী সুখ-দুঃখ অনুভব করেছে, এবং পূবে ও পশ্চিমে এত বেশী দেশ দেখেছে, যে বল্ড হিল্‌সে পৌঁছে যখন দেখল, সেখানকার জীবনযাত্রা ঠিক আগেকার মতই আছে। তার এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি, তখন এই অভিজ্ঞতা তার কাছে যেমন বিস্ময়কর তেমনই অপ্রত্যাশিত বলে মনে হল। পাথরের থামওয়ালা ফটকের ভিতর দিয়ে ঢুকে তরু-বীথির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল সে যেন একটা ঘুমন্ত স্বপ্নপুরীতে প্রবেশ করছে। সেই একই গাম্ভীর্য, একই পরিচ্ছন্নতা, সর্বত্র একই নিস্তব্ধতা; বাড়ির ভিতরে সেই একই আসবাব-পত্র, একই দেয়াল, শব্দ ও গন্ধ, আর সেই একই ভীরু সব মুখ, শুধু তাদের বয়স কিছু বেড়েছে। প্রিন্সেস মারি যা ছিল তাই আছে; ভয় ও দুঃখ-ভোগের ভিতর দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটিয়ে চলেছে। মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে সেই একই ছটফটে, আত্মতুষ্ট নারী; জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সে আনন্দের ভিতর দিয়ে কাটাচ্ছে, আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও মনে আছে আনন্দের প্রত্যাশা। শুধু তার আত্মবিশ্বাসটা আরও বেড়েছে। যে শিক্ষকটিকে সে নিজে সুইজারল্যাণ্ড থেকে নিয়ে এসেছিল সেই দেসাল্লেস নামক ভদ্রলোক রুশ ছাটের একটা কোর্ট পরে ভাঙা রুশ ভাষায় চাকরদের সঙ্গে কথা বলছে; সেই একই সংকীর্ণ বুদ্ধির অধিকারী, বিবেকবান, ও পণ্ডিতমন্য শিক্ষক। একটা দাঁত পড়ে যাওয়ায় বুড়ো প্রিন্সের চেহারায় কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু চরিত্রে সেই একই আছে, শুধু আরও একটু খিটখিটে ও সন্দেহবাদী হয়ে পড়েছে। একমাত্র পরিবর্তন হয়েছে ছোট্ট নিকলাসের। বড় হয়েছে, আরও গোলাপী হয়েছে, চুল ঘন কালো ও কোঁকড়া হয়েছে; হাসবার সময় উপরের ঠোঁটটা একটু ঠেলে ওঠে, ঠিক ছোট প্রিন্সেসের মত। কিন্তু বাইরে আগেকার মত থাকলেও এইসব মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। গোটা সংসারটা দুটো বিরোধী শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে। এক শিবিরে আছে বুড়ো প্রিন্স, মাদময়জেল বুরিঁয়ে ও স্থপতি; অন্য শিবিরে আছে প্রিন্সেস মারি, দেসাল্লেস, ছোট্ট নিকলাস, এবং বুড়ি নার্স ও দাসীরা।

পরিবারের সকলে একসঙ্গেই ডিনারে বসে, কিন্তু সকলেই কেমন যেন অস্বস্তিতে কাটায়। প্রিন্স আন্‌দ্রু বুঝতে পারল, এখন সে এখানে অতিথি বলেই এই ব্যবস্থাটা চালু করা হয়েছে, আর তার উপস্থিতি সকলকেই অস্বস্তিতে ফেলেছে। প্রথম দিন ডিনারে বসেই এটা বুঝতে পেরে সে চুপ

করে গেল, আর সেটা লক্ষ্য করে বুড়ো প্রিন্সও মুখ বুজে ডিনার সেরে সঙ্গে সঙ্গে তার ঘরে চলে গেল। সন্ধ্যার পরে প্রিন্স আন্দ্রু যখন তার ঘরে গিয়ে কাউণ্ট কামেন্‌স্কির অভিযানের কথা বলতে শুরু করল, বুড়ো প্রিন্স তখন অপ্রত্যাশিতভাবে প্রিন্সেস মারির কথা তুলল, এবং তার কুসংস্কার ও মাদময়জেল বুরিঁয়ের প্রতি বিরূপতার জন্য তার উপর দোষারোপ করতে লাগল; অথচ তার মতে একমাত্র সেই মানুষটিই তার প্রতি সত্যি সত্যি অনুরক্ত।

বুড়ো প্রিন্স বলল, তার অসুখের জন্য প্রিন্সেস মারিই দায়ী: ইচ্ছা করে সে তাকে বিরক্ত করে, যন্ত্রণা দেয়, এবং বেশী আদর দিয়েও আজে-বাজে কথা বলে ছোট্ট প্রিন্স নিকলাসকেও নষ্ট করছে। তারপরই সে ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগল কেন মেয়ের অযৌক্তিক আচরণকে সে মেনে নিতে পারছে না।

চোখ না তুলেই প্রিন্স আন্দ্রু বলল (জীবনে এই প্রথম সে বাবার কাজের নিন্দা করছে), "এবিষয়ে কথা বলার ইচ্ছা আমার ছিল না, কিন্তু তুমি যখন জানতে চাইছ তখন আমার যা মত তা খোলাখুলিই বলব। তোমার ও মারির মধ্যে যদি কোন ভুল-বোঝাবুঝি ও বিরোধ ঘটে থাকে তবে সেজন্য আমি মোটেই তাকে দোষ দিতে পারি না। আমি জানি সে তোমাকে ভালবাসে, ভক্তি করে। তুমি জিজ্ঞাসা করলে বলেই বলছি, কোন ভুল-বোঝাবুঝি যদি ঘটে থাকে তারজন্য দায়ী শুধু ঐ অযোগ্যা স্ত্রীলোকটি—আমার বোনের সহচরী হবার যোগ্যতা তার নেই।"

বুড়ো প্রথমে স্থিরদৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকাল; একটা অস্বাভাবিক হাসিতে তার ফোকলা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল।

"কোন্ সহচরী হে বাপু? অ্যা? তুমি আবার ঐ কথা তুলেছ?"

তিক্ত, কঠোর কণ্ঠে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "আমি তো বিচার করতে চাই নি বাবা, তুমি আমাকে বলতে বাধ্য করেছ, আর তাই আমি বলছি, চিরদিন বলব, যে মারির কোন দোষ নেই, কাউকে যদি দোষ দিতে হয়—একজনকেও যদি দোষ দিতে হয়—তো সে ওই ফরাসী নারী।"

"আরে, এও দেখি রায় দিতে বসেছে…রায় দিচ্ছে!" বুড়ো মানুষটি নীচু গলায় বলল; প্রিন্স আন্দ্রুর মনে হল তার কণ্ঠে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠেছে; কিন্তু পরক্ষণেই হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে বলল: "চলে যাও, চলে যাও! তোমার চিহ্নমাত্র যেন এখানে না থাকে!…"

প্রিন্স আন্দ্রু তখনই চলে যেতে চাইল, কিন্তু প্রিন্সেস মারির পীড়াপীড়িতে আরও একদিন থেকে গেল। সেদিনটা সে বাবার সঙ্গে দেখা করল না; বুড়ো প্রিন্সও তার ঘর থেকে বের হল না, এবং মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ও তিখন ছাড়া আর কাউকে ঘরে ঢুকতে দিল না; তবে ছেলে চলে গেছে কিনা

বারকয়েক সে খবর নিল। পরদিন যাবার আগে প্রিন্স আন্দ্রু ছেলের ঘরে গেল। মায়ের মতই ছেলেটির মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল। ছেলে তার হাঁটুর উপর বসল, আর সেও ছেলেকে "নীল দাঁড়িওয়ালা"-র গল্প বলতে শুরু করল। কিন্তু গল্প শেষ না করেই একটা দিবাস্বপ্নে ডুবে গেল। ছেলের বদলে নিজের কথা ভাবতে লাগল।

ছেলে বলল, "তারপর? বলে যাও!"

কোন জবাব না দিয়ে ছেলেকে হাঁটু থেকে নামিয়ে দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"তাহলে তুমি যাবেই স্থির করেছ আন্দ্রু?" বোন শুধাল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমি যেতে পারছি! কিন্তু আমার দুঃখ যে তুমি তা পারছ না।"

প্রিন্সেস মারি বলল, "সেকথা বলছ কেন? বাবার এই বুড়ো বয়সে তুমি এই ভয়ংকর যুদ্ধে চলে যাচ্ছ? মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে বলছে, বাবা তোমার খোঁজ করছিল…"

সেকথা বলতে গিয়েই তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল, চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রিন্স আন্‌দ্রু মুখ ঘুরিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

"ওঃ, ঈশ্বর! ঈশ্বর! কত তুচ্ছ কারণেই যে মানুষ দুঃখ পেতে পারে সে-কথা ভাবাও যায় না!" এমন বিদ্বেষভরা গলায় সে কথাগুলি বলল যে প্রিন্সেস মারি শংকিত হয়ে উঠল।

সে বুঝতে পারল, "তুচ্ছ" বলতে সে শুধু মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ের কথাই বলে নি, বলেছে তার কথাও যে তার জীবনের সব সুখ নষ্ট করেছে।

জলে ভেজা চকচকে চোখে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকিয়ে তার কনুই ধরে প্রিন্সেস মারি বলল, "আন্‌দ্রু! তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা, একটি মিনতি আছে। তোমাকে আমি বুঝি। কখনও ভেবো না যে দুঃখ মানুষের সৃষ্টি। মানুষ তো তাঁর হাতের যন্ত্রমাত্র। দুঃখ তিনিই পাঠান, মানুষ নয়। মানুষ তার হাতের যন্ত্র, তাদের কোন দোষ নেই। যদি মনে কর কেউ তোমার প্রতি অন্যায় করেছে, সেকথা ভুলে যাও, তাকে ক্ষমা কর! শাস্তি দেবার অধিকার আমাদের নেই। তাহলেই ক্ষমার যে কী আনন্দ তা তুমি জানতে পারবে।"

"আমি মেয়ে মানুষ হলে এই কথাই বলতাম মারি। ওটা তো নারীর ধর্ম। কিন্তু পুরুষ মানুষ ক্ষমা করতে পারে না, ভুলে যেতে পারে না," প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল। যদিও সেইমুহূর্তে কুরাগিনের কথা তার মনে আসে নি, তবু সহসা দুর্বার ক্রোধে তার বুকটা ভরে উঠল।

প্রিন্সেস মারি তাকে আরও একটা দিন থেকে যেতে অনুরোধ করল; বলল, বাবার সঙ্গে একটা মিটমাট না করে সে যদি চলে যায় তাহলে বাবা

বড়ই দুঃখ পাবে। কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, হয় তো শিগ্‌গিরই সে সেনাদল থেকে ফিরে আসবে, বাবার কাছে নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে, কিন্তু এখন যত বেশী দিন সে এখানে থাকবে তাদের সম্পর্ক ততই তিক্ততর হবে।

বোনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় তার এই শেষ কথাগুলিই প্রিন্স আন্দ্রুর কানে এল: "বিদায় আন্দ্রু! মনে রেখো দুর্ভাগ্য আসে ঈশ্বরের কাছ থেকে; মানুষের কোন দোষ নেই।"

বল্ড হিল্‌সের বাড়ি থেকে যেতে যেতে প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, "তাহলে তাই হবে!...বেচারি নির্দোষ মানুষটি এখানে থেকে এমন একটি বৃদ্ধের নির্যাতনের শিকার হবে যার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটেছে। বুড়ো জানে যে দোষ তারই, কিন্তু নিজেকে বদলাতে পারে না। আমার ছেলে বড় হচ্ছে, তার জীবনে আনন্দ আছে; সেও হয় প্রতারণা করবে, আর না হয় প্রতারিত হবে। আর আমি চলেছি সৈন্যদলে। কেন? তা আমি নিজেই জানি না। যে লোকটাকে আমি ঘৃণা করি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, আমাকে হত্যা করে আমাকে দেখে হাসবার একটা সুযোগ তাকে দিতে চাই।"

জীবনের এই অবস্থাগুলি আগেও ছিল, কিন্তু তখন সব ছিল সুসংবদ্ধ, এখন সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। প্রিন্স আন্দ্রুর মনের সামনে একের পর এক ভেসে আসতে লাগল যতসব অর্থহীন, অসংবদ্ধ ছবি।

অধ্যায়—৯

জুনের শেষভাগে প্রিন্স আন্দ্রু সেনাদলের প্রধান ঘাঁটিতে পৌঁছে গেল। স্বয়ং সম্রাটসহ প্রথম সেনাদল তখন দ্রিসার সুরক্ষিত শিবিরে অবস্থান করছে; দ্বিতীয় সেনাদল পশ্চাদপসরণ করছে; একটা বড় ফরাসী বাহিনীদ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা তখন প্রথম সেনাদলের সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করছে। রুশ বাহিনীর অবস্থা নিয়ে সকলেই অসন্তুষ্ট, কিন্তু ফরাসীরা মূল রুশ ভূখণ্ড আক্রমণ করবে এ আশংকা তখনও কারও মনে দেখা দেয় নি; কেউ ভাবে নি যে পশ্চিমাঞ্চলের পোলিশ ভূখণ্ড (রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত) ছাড়িয়ে যুদ্ধ আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

দ্রিসার তীরেই বার্কলে দ্য তলির সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর দেখা হয়ে গেল; তার সেনাদলে যোগ দিতেই সে এসেছে। শিবিরের কাছাকাছি কোন শহর বা বড় গ্রাম না থাকায় সেনাদলের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য সেনাপতি ও সভাসদরা নদীর দুই তীরবর্তী বিভিন্ন গ্রামের ভাল ভাল বাড়িগুলোতে বাস করছে; বার্কলে দ্য তলির বাসস্থানটি সম্রাটের বাসভবনের প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বার্কলে কিছুটা রুক্ষ ও নিরাসক্তভাবেই তাকে গ্রহণ করল; বলল, তার চাকরি সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নিতে সে সম্রাটকে বলবে, তবে আপাতত সে তার সঙ্গেই থাকবে। আনাতোল কুরাগিনকে এখানেও

পাওয়া গেল না। সে পিতার্সবুর্গ চলে গেছে, কিন্তু একথা শুনে প্রিন্স আন্দ্রু খুশি হল। কুরাগিনের চিন্তা থেকে অব্যাহতি পেয়ে এখানকার এই বিরাট যুদ্ধের আয়োজনের মধ্যেই সে ডুবে গেল। প্রথম চারদিন হাতে কোন কাজ না থাকায় সে সুরক্ষিত শিবিরটাকে ঘুরে ঘুরে দেখল এবং নিজের জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞদের কথাবার্তা থেকে এই যুদ্ধ সম্পর্কে একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে তুলতে লাগল। সে ধারণাটা নিম্নরূপ।

সম্রাট ভিল্‌নাতে থাকতেই সেনাবাহিনীকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দল বার্কলে দ্য তলির অধীন, দ্বিতীয় দল ব্যাগ্রেশনের অধীন, এবং তৃতীয় দলের কম্যাণ্ডার তর্মাসভ। সম্রাট প্রথম দলে থাকলেও প্রধান সেনাপতি হিসাবে ছিল না। প্রচারিত হুকুমনামায় বলা হয়েছিল, সম্রাট সৈন্যপরিচালনার ভার নেবে না, শুধু তাদের সঙ্গে থাকবে। তদুপরি প্রধান সেনাপতির কর্মচারীবৃন্দের পরিবর্তে সম্রাটের সঙ্গে ছিল রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দ। তার সঙ্গে আর ছিল রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দের প্রধান কোয়ার্টার-মাস্টার-জেনারেল প্রিন্স ভল্‌কন্‌স্কি এবং সেনাপতিগণ, রাজকীয় এড্-ডি-কংগণ, কূটনৈতিক কর্মচারীবৃন্দ ও বহুসংখ্যক বিদেশী, শুধু ছিল না সামরিক বিভাগের কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়া কোন বিশেষ পদে নিযুক্ত না হয়েও ছিল: প্রাক্তন সমর-মন্ত্রী আরাকচীভ; মর্যাদায় প্রধান সেনাপতি কাউন্ট বেনিংসেন; গ্র্যাণ্ড ডিউক জায়রেভিচ কন্‌স্তান্তিন পাভ্‌লভিচ; চ্যান্সেলর কাউন্ট রুমিয়ান্ত্‌সেভ; প্রাক্তন প্রাশীয় মন্ত্রী স্তিন; সুইডিস সেনাপতি আর্মফেল্ট; অভিযান-পরিকল্পনার প্রধান রচয়িতা প্‌ফুয়েল; সার্দিনিয়া থেকে এসে বসবাসকারী অ্যাড্‌জুটাণ্ট-জেনারেল পলুচি; ভল্‌যোগেন—এবং আরও অনেকে। এটা বাইরের চিত্র, কিন্তু সম্রাট ও এইসব লোকের উপস্থিতির আসল তাৎপর্য হল এই: প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ না করেও সম্রাটই সমস্ত সৈন্য পরিচালনা করত, আর এইসব লোক ছিল তার সহকারী। হুকুম তামিল করার ভার ছিল আরাকচীভের উপর; সম্রাটের দেহরক্ষীর কাজও সে করত। বেনিংসেন ভিল্‌না অঞ্চলের একজন জমিদার; আসলে একজন ভাল সেনাপতি ও পরামর্শদাতা; প্রয়োজন হলে তাকে বার্কলের জায়গায় বসানো যেতে পারে। গ্র্যাণ্ড ডিউক দলে ছিল নিজেরই প্রয়োজনে। প্রাক্তন মন্ত্রী স্তিন ছিল কারণ তার পরামর্শ খুব দরকারী, আর সম্রাট আলেক্সান্দার তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর্মফেল্ট নেপোলিয়নকে ভীষণভাবে ঘৃণা করে; সেনাপতি হিসাবেও সে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, আর সেই গুণেই সে সম্রাটের প্রিয়পাত্র। পলুচি স্থান পেয়েছে সাহস ও বাগ্মিতার জন্য। অ্যাড্‌জুটাণ্ট-জেনারেলরা তো সবসময় সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে; আর সকলের শেষে প্‌ফুয়েল দলে এসেছে কারণ নেপোলিয়ন-বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনাটি তারই রচনা এবং সে ব্যাপারে সেই সরেস।

প্রিন্স আন্‌দ্রু আরও লক্ষ্য করল যে এই কর্মচঞ্চল প্রকাণ্ড জগৎটাকে নানান ধ্যান-ধারণার নিরিখে সরাসরি আটটা দলে ভাগ করা যায়। তার মধ্যে সাতটি দল গড়ে উঠেছে নানা সেনাপতি ও প্রভাবশালী লোকদের কেন্দ্র করে। প্রতিটি দলই একে অন্যের বিরোধী ও নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। কিন্তু তাদের তুলনায় সবচাইতে বড় হচ্ছে অষ্টম দলটি; অন্য দলের তুলনায় তাদের সংখ্যার আনুপাতিক হার নিরানব্বই জনে একজন: তারা যুদ্ধ বা শান্তি কোনটাই চায় না, সৈন্যদল অগ্রসর হোক অথবা দ্রিসা বা অন্য কোথাও শিবিরে বসে থাকুক তাতেও তাদের কিছু যায়-আসে না; বার্কলে বা সম্রাট, প্‌ফুয়েল বা বেনিংসেন—কাউকে নিয়ে তাদের কোন আগ্রহ নেই; তাদের একমাত্র লক্ষ্য—নিজেদের জন্য যত বেশী সম্ভব সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। পারস্পরিক বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের যে ঘূর্ণ-স্রোত তখন সম্রাটের প্রধান ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছিল তার ভিতর থেকে ফায়দা তোলা এখন যতটা সম্ভব অন্য সময় তা কল্পনাও করা যায় না। সকলেই নানা ফন্দি-ফিকিরে যার যার কাজ গুছাতেই ব্যস্ত।

এই দলের লোকজনরা সকলেই রুবল, সামরিক সম্মান ও পদোন্নতি হাতাতেই ব্যস্ত, আর সেই উদ্দেশ্যে সবসময়ই নজর রাখে সম্রাটের দাক্ষিণ্যের বায়ু-পাখির দিকে; সেটা যখন যেদিকে ঘোরে সেনাদলের এই মৌমাছি-দল তখন সেদিকেই সদলে ঝুঁকে পড়ে, আর তার ফলে সেটাকে অন্য কোনদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া সম্রাটের পক্ষেও কঠিন হয়ে পড়ে। চারদিককার অনিশ্চয়তা, আসন্ন বিপদের আশংকা, ষড়যন্ত্র, স্বার্থপরতা ও ধ্যান-ধারণার সংঘাত, এবং এইসব মানুষের স্বার্থসিদ্ধির দৌড়—এইসবের কেন্দ্রস্থল হিসাবে অষ্টম ও বৃহত্তম দলটিই পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো ও অনিশ্চিত করে তুলেছে। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয় তখনই এই দলটি ঝাঁক বেঁধে এসে সেখানে গুনগুন শুরু করে দেয়, এবং যারা সরল মনে কোন বিতর্ক তুলতে চায় তাদের কণ্ঠস্বর সেই গুঞ্জনে চাপা পড়ে যায়।

ঠিক যে সময় প্রিন্স আন্‌দ্রু সেনাদলে গিয়ে পৌঁছল তখন এইসব দলের ভিতর থেকে আরও একটা নবম দল সবে গড়ে উঠে গলা তুলতে শুরু করেছে। সেটা হচ্ছে প্রবীণ, অভিজ্ঞ ও রাষ্ট্রীয় কর্মপরিচালনায় দক্ষ লোকদের দল; এই সব দলগুলির সঙ্গে যুক্ত না থেকে দলটি প্রধান ঘাঁটির কাজকর্মকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পারে এবং এই অস্থিরতা, জটিলতা ও দুর্বলতার হ-য-ব-র-ল থেকে উদ্ধারের একটা উপায় বলে দিতে জানে।

এই দলের লোকরা এই কথাই ভাবতে লাগল ও বলতে চাইল যে সামরিক দরবারসহ সম্রাটের সেনাদলে উপস্থিতিই সব দোষের মূল কারণ; এ ধরনের ব্যবস্থা রাজ-দরবারে চলে, কিন্তু সেনাদলের পক্ষে ক্ষতিকর; সম্রাটের কাজ রাজ্য শাসন করা, সৈন্য-পরিচালনা নয়; এই পরিস্থিতি থেকে

উদ্ধার লাভের একমাত্র পথ সম্রাটের দলবলসহ সেনাবাহিনীকে ছেড়ে চলে যাওয়া; যে পঞ্চাশ হাজার লোক সম্রাটের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজন একমাত্র সম্রাটের উপস্থিতির ফলেই তাদের সব কর্মক্ষমতা পঙ্গু হয়ে যায়, এবং সবচাইতে বাজে প্রধান সেনাপতিও যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে তাহলে সেও সম্রাটের উপস্থিতি ও কর্তৃত্বের দ্বারা শৃংখলিত একজন সেরা প্রধান সেনাপতির চাইতে ভালভাবে কাজ চালাতে পারে।

ঠিক যে সময় প্রিন্স আন্‌দ্রু বেকার হয়ে দ্রিসাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখনই এই দলের একজন প্রধান প্রতিনিধি ও স্বরাষ্ট্র-সচিব শিশ্‌কভ সম্রাটকে একটা চিঠি লিখল; আরাকচীভ ও বলাশেভও তাতে সই করতে রাজী হল। রাজধানীর লোকদের মধ্যে একটা যুদ্ধকালীন মনোভাব গড়ে তোলা সম্রাটের দিক থেকে খুবই দরকারী কাজ—এই ওজুহাত দেখিয়ে ওই চিঠিতে শিশ্‌কভ সসম্মানে প্রস্তাব করল যে সম্রাটের উচিত সেনাদল ছেড়ে চলে যাওয়া।

সম্রাট কর্তৃক জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা, তাদের প্রতি দেশ রক্ষার আহ্বান জানানো—মস্কোতে জারের ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে এইভাবে যে অনুপ্রেরণার সৃষ্টি হবে সেটাই রাশিয়ার জয়লাভের প্রধান কারণ হবে—সম্রাট কর্তৃক সেনাদল পরিত্যাগের ওজুহাত হিসাবে তার কাছে এই প্রস্তাবই রাখা হল এবং সম্রাটও সে প্রস্তাব মেনে নিল।

অধ্যায়—১০

চিঠিটা তখনও সম্রাটের হাতে দেওয়া হয় নি এমন সময় একদিন ডিনারে বসে বার্কলে বল্‌ন্‌কস্কিকে জানাল, সম্রাট স্বয়ং তার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তুরস্ক সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় এবং সেদিন সন্ধ্যা ছ'টায় প্রিন্স আন্‌দ্রু যেন বেনিংসেনের বাসায় হাজির থাকে।

প্রিন্স আনদ্রু যথাসময়ে বেনিংসেনের বাসভবনে হাজির হল; নদীর একেবারে তীর ঘেঁসে জনৈক গ্রাম্য ভদ্রলোকের একটা মোটামুটি আকারের বাড়িতে বেনিংসেনের অস্থায়ী আস্তানা। বেনিংসেন বা সম্রাট কেউ সেখানে নেই; সম্রাটের এড্‌-ডি-কং চের্নিশেভ তাকে অভ্যর্থনা করে জানাল, জেনারেল বেনিংসেন ও মার্কুইস্‌ পলুচিকে সঙ্গে নিয়ে সম্রাট দ্বিতীয়বার দ্রিসা শিবিরের রক্ষা-ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখতে গেছেন, কারণ সেখানকার রক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে গুরুতর সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

একটা ফরাসী উপন্যাস হাতে নিয়ে চের্নিশেভ প্রথম ঘরের জানালার পাশে বসে ছিল। ঘরটা সম্ভবত গানের ঘর ছিল; এককোণে একটা অর্গ্যান রয়েছে; তার উপর কতকগুলি কম্বল স্তূপ করে রাখা হয়েছে; আর কোণে আছে বেনিংসেনের অ্যাড্‌জুটান্টের ভাঁজ-করা খাটটা। কাজের ফলে বা ভোজনের ফলে ক্লান্ত হয়ে অ্যাডজুটান্টটি গোল-করা বিছানার উপর বসে

ঝিমুচ্ছে। ঘরের দুটো দরজা; একটা দিয়ে বসার ঘরে যাওয়া যায়, ডান দিককার দরজাটা দিয়ে যাওয়া যায় পড়ার ঘরে। প্রথম দরজাটা দিয়ে জার্মান ভাষায় এবং মাঝে মাঝে ফরাসী ভাষায় আলোচনার শব্দ ভেসে আসছে। বসার ঘরে একটা সভা বসেছে; ঠিক সামরিক পরিষদ নয়, এমন কয়েকজন জমায়েত হয়েছে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সম্রাট যাদের মতামত জানতে ইচ্ছুক। এই আধা-পরিষদে আমন্ত্রিত হয়েছে সুইডিশ জেনারেল আর্মফেল্ট, অ্যাড্‌-জুটাণ্ট-জেনারেল ওল্‌যোগেন, উইন্স্‌জেরোদ, মিচঁ, তোল, কাউণ্ট স্তিন ও প্‌ফুয়েল স্বয়ং। প্রিন্স আন্‌দ্রু আগেই শুনেছে যে এই লোকটিই নাটের গুরু। তাকে ভাল করে দেখবার একটা সুযোগ প্রিন্স আন্‌দ্রু পেয়ে গেল, কারণ তার ঠিক পরেই সে এসেছে এবং বসার ঘর পার হয়ে যাবার সময় মিনিটখানেক থেকে চের্নিশেভের সঙ্গে কিছু কথা বলে গেছে।

প্‌ফুয়েলের শরীরটা বেঁটে ও সরু হলেও তার হাড় মোটা, গড়ন বলিষ্ঠ, উরু চওড়া ও কাঁধ উঁচু। মুখে অনেকগুলো ভাঁজ, চোখ গর্তে বসা। মাথার চুল তাড়াতাড়ি বুরুশ করা; কপালের উপর পরিপাটি, কিন্তু পিছনে এলোমেলো। চঞ্চল ও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাতে তাকাতে সে ঘরে ঢুকল, যেন সবকিছুকেই তার ভয়। অদ্ভুতভাবে তলোয়ারে হাত রেখে চের্নিশেভকে ডেকে জার্মান ভাষায় জানতে চাইল সম্রাট কোথায়। চের্নিশেভের জবাব শুনে ব্যঙ্গের হাসি হেসে অস্ফুটে কি যেন বলে উঠল। প্রিন্স আন্‌দ্রু তার কথা কিছুই বুঝল না; সে হয়তো চলেই যেত, কিন্তু চের্নিশেভ প্‌ফুয়েলের কাছে তার পরিচয় দিয়ে বলল যে প্রিন্স আন্‌দ্রু তুরস্ক থেকে সবে ফিরেছে, আর সেখানকার যুদ্ধটাও বেশ ভালভাবেই শেষ হয়েছে। কোনরকমে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে প্‌ফুয়েল হেসে বলল, "সেটা অবশ্যই রণ-কৌশলঘটিত একটি চমৎকার যুদ্ধ"; বলেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে সে বসার ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো খুঁতখুঁতে গম্ভীর গলা তার কানে এল।

অধ্যায়—১১

প্রিন্স আন্‌দ্রু প্‌ফুয়েলের দিকেই তাকিয়েছিল, এমন সময় দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল কাউণ্ট বেনিংসেন। বল্‌কন্‌স্কিকে দেখে মাথা নাড়ল, কিন্তু দাঁড়াল না; অ্যাড্‌জুটাণ্টকে কিছু নির্দেশ দিয়ে পড়ার ঘরে ঢুকে গেল। সম্রাট আসছে; তাই বেনিংসেন তাড়াতাড়ি চলে এসেছে কিছু প্রস্তুতি নিয়ে সম্রাটকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি হয়ে নিতে। চের্নিশেভ ও প্রিন্স আন্দ্রু ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। সম্রাট তখন ঘোড়া থেকে নামছে। তাকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। মার্কুইস পলুচি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে কি যেন বলছে, আর সম্রাট মাথাটা বাঁদিকে কাৎ করে অসন্তোষের ভঙ্গীতে তার কথাগুলি শুনছে। কথায় ইতি টানবার জন্যই সম্রাট সামনের দিকে এগিয়ে

গেল, কিন্তু ইতালীয় ভদ্রলোকটি উত্তেজনাবশে ভদ্রতার রীতিনীতি ভুলে গিয়ে তার পিছন পিছন এগিয়ে অনবরত কথা বলতে লাগল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখে সম্রাট তার অপরিচিত মুখটার দিকে ভাল করে তাকাল; ওদিকে পলুচি তখনও বলেই চলেছে, "এই শিবির, দ্রিসার শিবির গড়বার পরামর্শ যে লোক দিয়েছিল স্যার, তারজন্য আমি তো পাগলা গারদ অথবা ফাঁসি-কাঠ ছাড়া আর কোন বিকল্প দেখি না।"

ইতালীয় লোকটির শেষের কথায় কান না দিয়ে, এমন কি সেকথা যেন শুনতেই পায় নি এমনি ভাব দেখিয়ে সম্রাট এবার বল্‌কন্‌স্কিকে চিনতে পেরে বলল:

"তোমাকে দেখে খুব খুশি হলাম। যেখানে সকলে অপেক্ষা করছে সেখানে যাও; আমার জন্য অপেক্ষা কর।"

সম্রাট পড়ার ঘরে গেল। তার পিছন পিছন ঢুকল প্রিন্স পিতর মিখায়লভিচ ভল্‌কন্‌স্কি ও ব্যারন স্তিন; দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। সম্রাটের অনুমতির সুযোগ নিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু পলুচির সঙ্গেই বসার ঘরে ঢুকল। সেখানেই পরিষদের সভা বসেছে।

প্রিন্স পিতর মিখায়লভিচ ভল্‌কন্‌স্কি যে আসনটি দখল করল তাতে মনে হল সেই বুঝি সম্রাটের পরিষদবর্গের প্রধান। কয়েকটা মানচিত্র টেবিলের উপর মেলে ধরে সে নানারকম প্রশ্ন করে উপস্থিত ভদ্রলোকদের মতামত শুনতে চাইল। ঘটনাটা হল: আগের দিন রাতে খবর এসেছে (যদিও পরবর্তীকালে খবরটা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে) যে ফরাসীরা দ্রিসা শিবির ভেদ করে অগ্রসর হচ্ছে।

প্রথমে কথা বলল জেনারেল আর্মফেল্ট; অপ্রত্যাশিতভাবে সে প্রস্তাব করল যে এই বিপদের মোকাবিলা করতে পিতার্সবুর্গ ও মস্কোর রাস্তা থেকে দূরে কোথাও নতুন ঘাঁটি করা হোক, আর সেইখানে সব সেনাদল মিলিত হয়ে শত্রুর জন্য অপেক্ষা করে থাকুক। কেউ তার প্রস্তাবের বিরোধিতা করল, আবার কেউ বা সমর্থন করল। তরুণ কাউন্ট তল্‌ আপত্তি জানিয়ে একটা নতুন পরিকল্পনা পেশ করল। তার জবাবে পলুচি প্রস্তাব করল, অগ্রসর হয়ে আগেই আক্রমণ করা হোক, তাহলেই এই অনিশ্চয়তা ও ফাঁদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব। এইসব আলোচনার সময় প্‌ফুয়েল ও তার ভাষ্যকার ভল্‌যোগেন চুপ করে থাকল। কাজেই সভাপতি প্রিন্স ভল্‌কন্‌স্কি যখন তার মতামত চাইল তখন সে শুধু বলল:

"আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? জেনারেল আর্মফেল্ট তো চমৎকার প্রস্তাব দিয়েছেন—পিছন অরক্ষিত রেখে নতুন ঘাঁটি বানানো হোক; আর এই ইতালীয় ভদ্রলোকের আক্রমণের প্রস্তাবই বা নয় কেন—সেটাও তো ভাল, অথবা পশ্চাদপসরণ, তাও ভাল। আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

আরে, আপনারা তো সবকিছুই আমার চাইতে ভাল জানেন।"

কিন্তু ভল্‌কন্‌স্কি যখন ভ্রূকুটি করে বলল যে সম্রাটের নামেই সে তার মতামত জানতে চেয়েছে তখন প্‌ফুয়েল উঠে দাঁড়িয়ে সহসা উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করল :

"সব ভেস্তে গেছে, জগা-খিচুড়ি হয়ে গেছে, সকলেই ভাবল তারা আমার চাইতে বেশী জানে, আর এখন আপনি এসেছেন আমার কাছে! কেমন করে অবস্থা সামাল দেওয়া যায়? সামাল দেবার আর কিছু নেই।" হাড়-সর্বস্ব আঙুল দিয়ে টেবিলটা বাজিয়ে সে বলে উঠল, "আমি যে বিধান দিয়েছি সেটাকেই কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কিন্তু তাতে অসুবিধা কি? অর্থহীন, ছেলেমানুষ!"

মানচিত্রের কাছে গিয়ে দ্রুতলয়ে কথা বলে সে প্রমাণ করতে লেগে গেল যে, কোন অবস্থাতেই দ্রিসা শিবিরের সুরক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে না, সবকিছুই আগে থেকে খতিয়ে দেখা হয়েছে এবং শত্রুপক্ষ যদি তাকে ভেদ করতে চেষ্টা করে তাহলে তার ধ্বংস অনিবার্য।

পলুচি জার্মান জানে না; সে প্রশ্ন করতে লাগল ফরাসীতে। ওল্‌যোগেন তার প্রধানকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল; সে অত্যন্ত খারাপ ফরাসী বলে। মাঝে মাঝেই প্‌ফুয়েলের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, "তাই নয় কি ইয়োর এক্সেলেন্সি?" তা শুনে প্‌ফুয়েল চটে উঠে বলে, "তা তো বটেই; একথা এত বেশী করে বুঝিয়ে বলার কি আছে?"

পলুচি ও মিচদ দুজনই একযোগে ওল্‌যোগেনকে ফরাসীতে আক্রমণ করতে লাগল। আর্মফেল্ট প্‌ফুয়েলের সঙ্গে কথা বলতে লাগল জার্মান ভাষায়, আর তল্‌ ভল্‌কন্‌স্কিকে বোঝাতে লাগল রুশ ভাষায়। প্রিন্স আন্‌দ্রু চুপচাপ শুনতে লাগল।

আলোচনা চলল অনেকক্ষণ ধরে; যত সময় যেতে লাগল বিতর্ক ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠল, শেষপর্যন্ত হৈ-হট্টগোল ও গালাগালিতে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সম্ভাবনা ক্রমেই কমতে লাগল। সব কিছু শুনতে শুনতে একটা পুরনো চিন্তাই নতুন করে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মাথায় এল, সামরিক বিভাগে কাজ করতে করতে প্রায়ই তার মনে হয় যে সমর-বিজ্ঞান বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না, আর তাই সামরিক প্রতিভা বলেও কিছু নেই; এ চিন্তাটা এখন স্পষ্ট সত্য হয়ে তার কাছে ধরা পড়ল। "যে বিষয়ের পরিবেশ ও অবস্থান সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও সংজ্ঞাতীত, এবং বিরোধী শক্তিগুলির কর্মক্ষমতা যখন আগে থেকে নিরূপণ করা যায় না, তখন সে-বিষয়ে কোন মতবাদ এবং বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে উঠবে? একটা দিনের মধ্যে আমাদের অথবা শত্রুপক্ষের সেনাদলের অবস্থা কি দাঁড়াবে তাই তো কেউ আগে থেকে বুঝতে পারে না; যেকোন একটি সেনাদলের সত্যিকারের

শক্তি নির্ণয়ই তো কেউ করতে পারে না। আর লোকে 'সামরিক প্রতিভার' কথাই বা বলে কেন? যে লোক ঠিকসময়ে রুটি পরিবেশনের হুকুম দিতে পারে, এবং কে ডাইনে যাবে আর কে বাঁয়ে যাবে সেকথা বলে দিতে পারে সেই কি প্রতিভা? বরং আমি যেসব সেরা সেনাপতিদের জানি তারা হয় নির্বোধ, না হয় তো মনভোলা। এদিক থেকে ব্যাগ্রেশন তো সেরা, আর নেপোলিয়ন নিজেই একথা স্বীকার করেছে। আসলে সামরিক ক্রিয়া-কলাপের সাফল্য তাদের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে তাদের উপর যারা সেনাদলের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলে 'আমরা হেরে গেলাম' অথবা 'হুর্‌রা!' যুদ্ধক্ষেত্রে একমাত্র সেখানে থেকেই কাজের কাজ করা যায়।"

সকলের কথাবার্তা শুনতে শুনতে প্রিন্স আন্‌দ্রু এই কথাই ভাবছিল। সকলে চলে যেতে শুরু করলে প্‌লুচি যখন তাকে ডাকল তখনই তার সম্বিত ফিরে এল।

পরদিন সেনা-পরিদর্শনের সময় সম্রাট জানতে চাইল সে কোথায় কাজ করতে চায়, আর সম্রাটের কাছাকাছি থাকবার প্রার্থনা না জানিয়ে সেনাদলে কাজ করার অনুমতি ভিক্ষা করে প্রিন্স আন্‌দ্রু রাজদরবারে আসন লাভের সুযোগটা চিরদিনের মত হারিয়ে ফেলল।

অধ্যায়—১২

অভিযান শুরু হবার আগে রস্তভ বাবা-মার কাছ থেকে একটা চিঠি পেল; তাতে সংক্ষেপে নাতাশার অসুখ এবং প্রিন্স আন্‌দ্রুর সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে যাবার কথা জানিয়ে (তারা জানিয়েছে যে নাতাশাই বিয়েটা বাতিল করে দিয়েছে) তাকে সেনাদল থেকে অবসর নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বলা হয়েছে। চিঠি পেয়ে নিকলাস ছুটি নেবার অথবা অবসর নেবার কোন চেষ্টাই করল না; বাবা-মাকে লিখল, নাতাশার অসুখ ও বিয়েটা ভেঙে যাবার সংবাদে সে খুব দুঃখিত হয়েছে, এবং তাদের ইচ্ছামত কাজ করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। সোনিয়াকে আলাদা চিঠি লিখল।

লিখল: আত্মার আত্মীয় বন্ধু আমার! সম্মানের প্রশ্ন না থাকলে আমার বাড়ি ফিরে যাওয়া কেউ রুখতে পারত না। কিন্তু এখন অভিযান শুরুর মুখে আমি যদি পিতৃভূমির প্রতি ভালবাসা ও কর্তব্যের চাইতে নিজের সুখটাকেই বড় করে দেখি তাহলে শুধু যে সহকর্মীদের চোখেই আমার সম্মানহানি ঘটবে তাই নয়, আমার নিজের কাছেও আমি ছোট হয়ে যাব। কিন্তু এটাই আমাদের শেষ বিরহ। বিশ্বাস কর, যুদ্ধ শেষ হওয়ামাত্রই, আমি যদি তখন বেঁচে থাকি এবং তোমার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ থাকে, আমি সবকিছু ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছেই উড়ে যাব, চিরদিনের মত তোমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রাখব।"

বস্তুত, অভিযান শুরু হওয়াতেই রস্তভ কথামত বাড়ি ফিরতে এবং সোনিয়াকে বিয়ে করতে পারল না। হেমন্তকালে অত্রাদ্‌নুতে শিকার, শীতকালে বড়দিনের উৎসব ও সোনিয়ার ভালবাসা—এই দুয়ে মিলে পল্লীজীবনের সুখ-শান্তির যে উদার অবকাশ তার সামনে মেলে ধরেছিল তেমনটি সে আগে কখনও দেখে নি; আর তাই সে সুখ-শান্তির স্বপ্ন এখনও তার মনকে টানছে। "চমৎকার একটি স্ত্রী, সন্তান, একদল শিকারী কুকুর, কৃষিকাজ, প্রতিবেশী, নির্বাচনে জয়লাভ…" এইসব চিন্তাই তার মনকে জুড়ে ছিল। কিন্তু এবার তো শুরু হবে অভিযান, আর তাকেও রেজিমেণ্টেই থাকতে হবে। আর থাকতে যখন হবেই তখন নিজের স্বভাবমতই নিকলাস রস্তভ এই রেজিমেণ্ট-জীবনকেই মেনে নিল, এবং সেই জীবনের মধ্যেই সুখের সন্ধান করতে লাগল।

ছুটি থেকে ফিরে এলে সহকর্মীরা তাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জানাল, তাকে ঘোড়া বেছে আনতে পাঠানো হল, আর সেও ইউক্রেন থেকে ভাল ঘোড়া এনে সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। এদিকে তার অনুপস্থিতির সময়েই তাকে ক্যাপ্টেনের পদে উন্নীত করা হয়েছিল; এখন যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় রেজিমেণ্টের সৈন্যসংখ্যা বাড়াবার ফলে তাকে তার পুরনো স্কোয়াড্রনেই যুক্ত করে দেওয়া হল।

অভিযান শুরু হল। দ্বিগুণ বেতন নিয়ে রেজিমেণ্ট পোল্যাণ্ডে ঢুকল, নতুন অফিসাররা এল, এল নতুন সৈন্য ও ঘোড়া, আর সকলেই যুদ্ধ শুরু হবার সময়কার আনন্দ ও উত্তেজনার ভিতর দিয়ে দিন কাটাতে লাগল।

রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও সমর কৌশলগত নানাবিধ কারণে ভিল্‌না থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া হল। পশ্চাদপসরণের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রধান ঘাঁটিতে নানা জটিলতা ও বিতর্ক দেখা দিল; কিন্তু পাভ্‌লোগ্রাদ হুজারদের দলে সব কিছুই শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে চলতে লাগল।

১৩ই জুলাই তারিখে পাভ্‌লোগ্রাদরা প্রথম একটা বড়রকমের যুদ্ধে অংশ নিল।

যুদ্ধের আগের দিন ১২ই জুলাই বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি হল। ১৮১২ সালের গ্রীষ্মকালটায় সাধারণভাবেই খুব ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল।

দুটো পাভ্‌লোগ্রাদ স্কোয়াড্রন একটা যইয়ের খেতে সাময়িক আস্তানা পাতল। সবে তখন ফসল পাকতে শুরু করেছে; কিন্তু গবাদি পশু ও ঘোড়ার পায়ের চাপে সব একেবারে ছত্রছান হয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। রস্তভ ও তার অধীনস্থ ইলিন নামক একটি তরুণ শিক্ষানবীশ অফিসার তাড়াহুড়া করে বানানো একটা চালাঘরে বসে আছে। তাদের রেজিমেণ্টের একজন লম্বা গোঁফওয়ালা অফিসার বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে ঘোড়া নিয়ে তাদের আশ্রয়ে এসে উঠল।

"আমি সদর থেকে আসছি কাউণ্ট। রায়েভ্‌স্কির যুদ্ধজয়ের কথা শুনেছেন কি?"

অফিসারটি সাল্‌তানভ্‌ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল।

রস্তভ পাইপ টানতে টানতে ছাদ থেকে গড়ানো বৃষ্টির জল এড়াবার জন্য মাথাটা সরিয়ে অন্যমনস্কভাবে তার কথা শুনতে লাগল। ইলিন তার আরও কাছে ঘেঁসে বসল। অফিসারটির বয়স ষোল; সবে রেজিমেন্টে যোগ দিয়েছে; সাত বছর আগে দেনিসভের সঙ্গে নিকলাসের যে সম্পর্ক ছিল, এখন তারও নিকলাসের সঙ্গে ঠিক সেই সম্পর্ক। সে সব ব্যাপারে রস্তভকে নকল করে, একটি মেয়ের মত তাকে মনে মনে পূজা করে।

লম্বা গোঁফওয়ালা অফিসারটি সাল্‌তানভ বাঁধের যুদ্ধকে "রাশিয়ার থার্মোপিলি" বলে বর্ণনা করে অনেক বড় বড় কথা বানিয়ে বলতে লাগল। রস্তভ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে যে এর অনেক কথাই মিথ্যা। তাই এসব শুনতে তার মোটেই ভাল লাগছে না।

সেটা লক্ষ্য করে ইলিন বলে উঠল, "না, আর টেকা যাচ্ছে না। আমার মোজা আর শার্ট···আর সমানে বৃষ্টি পড়ে সব ভিজিয়ে দিচ্ছে। বাইরে বেরিয়ে দেখি কোথাও একটু আশ্রয় পাওয়া যায় কি না। বৃষ্টিটা একটু কমেছে বলে মনে হচ্ছে।

ইলিন বেরিয়ে গেল। গোঁফওয়ালা অফিসারটিও ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পাঁচ মিনিট পরে কাদার ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে ইলিন ফিরে এল।

"হুর্‌রা! রস্তভ, তাড়াতাড়ি এস! পেয়ে গেছি! প্রায় দু'শ' গজ দূরে একটা সরাইখানা আছে; আমাদের লোকজন সব সেখানে জমে গেছে; সেখানে গেলে অন্ততপক্ষে একটু গরম তো হতে পারব। তাছাড়া মারি হেন্‌রিখভ্‌না সেখানে আছে।"

মারি হেন্‌রিখভ্‌না রেজিমেন্টের ডাক্তারের স্ত্রী; সুন্দরী জার্মান তরুণী; পোল্যাণ্ডে তাদের বিয়ে হয়েছে। কোন ব্যবস্থা করতে না পারার জন্যই হোক, আর তরুণী বধূকে ছেড়ে থাকতে পারে নি বলেই হোক, ডাক্তারটি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই হুজার রেজিমেন্টের সঙ্গে আগাগোড়া চলাফেরা করছে; আর তার সন্দেহ ও ঈর্ষা নিয়ে তামাসা করাটা হুজার অফিসারদের মধ্যে প্রায় দৈনন্দিন ঘটনায় দাঁড়িয়ে গেছে।

জোব্বাটা কাঁধের উপর ফেলে এবং লাভ্রুশ্‌কাকে জিনিসপত্র নিয়ে তাদের সঙ্গে আসতে বলে রস্তভ সেই পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে ইলিনকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অন্ধকারে দূরে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

"রস্তভ, তুমি কোথায়?"

"এখানে! কী বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে!" তারা পরস্পরকে হাঁক দিয়ে কথা বলতে লাগল।

অধ্যায়—১৩

সবাইয়ের সামনে ডাক্তারের চাকা-গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে আছে পাঁচজন অফিসার।

সামনের কোণে বসে আছে সুন্দরী জার্মান তরুণী মারি হেক্রিখভ্না। পরনে ড্রেসিং-জ্যাকেট, মাথায় নৈশ টুপি। তার স্বামী ডাক্তারটি তার পিছনে ঘুমিয়ে আছে। রস্তভ ও ইলিন ঘরে ঢুকতেই সকলে হৈ-হৈ করে তাদের অভ্যর্থনা জানাল।

রস্তভ হেসে বলল, "আরে, বেশ মজায়ই আছ দেখছি!"

"তুমিই বা ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?"

"কী রকম মুটিয়েছে দেখ! আরে, ওদের গায়ে যে স্রোত বইছে! আমাদের বসার ঘরটাকে ভিজিয়ে দিও না।"

অন্যরা চেঁচিয়ে বলল, "মারি হেন্ত্রিখভ্নার পোশাকটা মাটি করে দিও না।"

রস্তভ ও ইলিন একটা কোণ বেছে নিল, যাতে মারি হেন্ত্রিখভ্নার শালীনতায় আঘাত না দিয়েও তারা শুকনো পোশাক পরে নিতে পারে। মারি হেন্ত্রিখভ্না নিজের পেটিকোটটা তাদের ধার দিল; সেটাকেই পর্দা হিসাবে ব্যবহার করে রস্তভ ও ইলিন লাভ্রুশ্কার সাহায্যে ভেজা পোশাক বদলে শুকনো পোশাক পরে নিল।

ইটের ভাঙা স্টোভটায় আগুন জ্বালানো হল। একখানা কাঠ পেতে তার উপর সামোভার ও আধ বোতল রাম রাখা হল। মারি হেন্ত্রিখভ্নাকে সভানেত্রীর আসনে বসিয়ে সকলে তার চারদিকে গোল হয়ে বসল। সুন্দর হাত দুখানি মুছবার জন্য একজন এগিয়ে দিল একটা রুমাল, যাতে তার পায়ে ঠাণ্ডা না লাগে সেজন্য একজন পায়ের নীচে একটা কুর্তা পেতে দিল, বৃষ্টির ছাট আটকাবার জন্য আর একজন তার কোটটা জানালায় ঝুলিয়ে দিল, পাছে তার স্বামীর ঘুম ভেঙে যায় সেজন্য অপর একজন তার মুখের উপর থেকে মাছি তাড়াতে লাগল।

খুসির হাসি হেসে মারি হেন্ত্রিখভ্না বলল, "ওকে একা থাকতে দাও। সারারাত ঘুম হয়নি, তাই এখন অঘোরে ঘুমচ্ছে।"

জনৈক অফিসার জবাব দিল, "আরে না, না মারি হেন্ত্রিখভ্না, ডাক্তারের দেখাশোনা তো করতেই হবে। যেদিন আমার পা বা হাত কেটে বাদ দিতে হবে সেদিন হয় তো তিনি একটু দয়াধর্ম করবেন।"

গ্লাস আছে মাত্র তিনটে। জল এত ঘোলা যে চাটা কড়া হয়েছে কি পাতলা হয়েছে তা বোঝবার উপায় নেই। সামোভারেও জল ধরে মাত্র ছ' গ্লাস। প্রবীণ তার বিচারে একের পর এক মারি হেন্ত্রিখভ্নার পরিষ্কার হাত থেকে গ্লাস নিয়ে পর পর চা খেতে তাদের যেন খুশির সীমা নেই। সেই সন্ধ্যায় প্রতিটি অফিসারেরই মনে হল সে বুঝি জার্মান মহিলাটির প্রেমে

পড়ছে। যে ক'জন অফিসার বেড়ার ওধারে তাস খেলছিল এবার তারাও এখানে এসে মারি হেন্রিখভ্‌নার তোয়াজ করতে শুরু করল। এতগুলি বিনীত ও ভদ্র যুবকের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তার চোখ-মুখ খুশিতে ঝলমল করতে লাগল; যতবার তার স্বামী ঘুমের মধ্যে নড়ে উঠছে ততবারই সে ভয় পাচ্ছে, পাছে তার ঘুম ভেঙে যায়।

চিনি পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও চামচ মাত্র একটা, আর চিনিটা গলতেও অনেক সময় লাগছে; তাই সকলে স্থির করল, মারি হেন্রিখভ্‌নাই পর পর সকলের চিনিটা নেড়ে দেবে। রস্তভ তার গ্লাসটা নিয়ে তাতে খানিকটা রাম ঢেলে মহিলাটিকে নেড়ে দিতে বলল।

“কিন্তু আপনি চিনি ছাড়াই খান না?” মহিলাটি হাসতে হাসতে বলল; যেন সে নিজে যা বলছে এবং অন্য সকলে যা বলছে সবই মজার কথা, সবই দ্ব্যর্থবোধক।

“আমি তো চিনি চাই না, শুধু চাই আপনার ছোট্ট হাতখানি দিয়ে আমার চাটা নেড়ে দিন।”

মারি হেন্রিখভ্‌না রাজী হয়ে চামচটা খুঁজতে লাগল ও এই ফাঁকে আর একজন সেটা নিয়ে নিয়েছে।

রস্তভ বলে উঠল, “আপনার আঙুলটাই ব্যবহার করুন মারি হেন্রিখভ্‌না, সেটা আরও ভাল হবে।”

খুশিতে লাল হয়ে সে জবাব দিল, “বড় বেশী গরম যে!”

একবালতি জলে কয়েক ফোঁটা রাম ঢেলে সেটাকে মারি হেন্রিখভ্‌নার দিকে এগিয়ে দিয়ে ইলিন বলল, “এটাই আমার পেয়ালা; আপনার আঙুলটা এতে ডুবিয়ে দিন, আমি সবটাই খেয়ে নেব।”

সামোভার খালি করে রস্তভ এক প্যাক তাস এনে মারি হেন্রিখভ্‌নাকে নিয়ে “রাজা—রাজা” খেলার প্রস্তাব করল। তার প্রস্তাব মতই আরও স্থির হল, যে “রাজা” হবে সেই মারি হেন্রিখভ্‌নার হাতে একটা চুমো খাবার অধিকার লাভ করবে, আর যে “বোকা” হবে, ডাক্তার ঘুম থেকে উঠলে তার-জন্য সামোভারটা গরম করার ভার তাকেই নিতে হবে।

“কিন্তু ধর, মারি হেন্রিখভ্‌নাই যদি ‘রাজা’ হন?” ইলিন বলল।

“এমনিতেই তো তিনি ‘রাণী’; তার কথাই আইন!”

খেলা সবে শুরু হয়েছে এমন সময় ডাক্তারের এলোমেলো মাথাটা মারি হেন্রিখভ্‌নার পিছন থেকে উঁকি দিল। কিছুক্ষণ আগেই তার ঘুম ভেঙেছে; এদের কথাবার্তা সে শুনেছে; কিন্তু তার মধ্যে মজাদার কিছু সে খুঁজে পায়নি। তার মুখটা বিষণ্ণ ও বিমর্ষ। অফিসারদের সঙ্গে কোন কথা না বলে তাদের পথটা ছেড়ে দিতে বলল। সে ঘর থেকে চলে যেতেই অফিসাররা সকলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল; লজ্জায় লাল হতে হতে মারি হেন্রিখভ্‌নার চোখে

জল এসে গেল ; তাতে তাকে সকলের আরও ভাল লাগল। উঠোন থেকে ফিরে এসে ডাক্তার স্ত্রীকে বলল, বৃষ্টি থেমে গেছে ; এখন তাদের ঢাকা-গাড়িতে গিয়েই ঘুমতে হবে, নইলে মালপত্র সব চুরি হয়ে যাবে।

রস্তভ বলল, "আমি বরং একজন আর্দালি পাঠিয়ে দিচ্ছি"'দুজন পাঠাচ্ছি! কি বলেন ডাক্তার !"

"আমি নিজেই পাহারা দেব," ইলিন বলল।

"না হে ভদ্রমশায়রা, আপনারা তো ভালভাবে ঘুমিয়েছেন, আমি দু'রাত ঘুমতে পারি নি," এই কথা বলে ডাক্তার বিমর্ষ মুখে স্ত্রীর পাশে বসে খেলা শেষ হবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

তাকে স্ত্রীর দিকে ভ্রূকুটি করতে দেখে অফিসাররা আরও মজা পেয়ে গেল ; কেউ কেউ নানা ওজুহাত দেখিয়ে হাসতে লাগল। ডাক্তার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকা-গাড়িতে চলে গেলে অফিসাররা ভিজে জোব্বায় গা ঢেকে সরাইখানাতেই শুয়ে পড়ল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ ঘুমল না। কখনও ডাক্তারের অস্বস্তি ও তার স্ত্রীর খুশি-খুশি ভাব নিয়ে মন্তব্য-বিনিময় করল, আবার কখনও বা ফটকে ছুটে গিয়ে সেখানে ঢাকা-গাড়িতে কি হচ্ছে তার বিবরণ দিল। মাথাটা ঢেকে রস্তভ কয়েকবার ঘুমোতে চেষ্টা করল, কিন্তু কারও না কারও কথায় ঘুম ভেঙে যেতে সেও আলোচনায় যোগ দিল, আর অকারণ ফুর্তিতে ছোট শিশুর মত হাসতে লাগল।

অধ্যায়—১৪

প্রায় তিনটে বাজে। এখনও কেউ ঘুমোয় নি। কোয়ার্টার-মাস্টার এসে হুকুম জানিয়ে গেল, স্কোয়াড্রনকে ছোট শহর অস্ত্রভ্‌নায় যেতে হবে।

হেসে হেসে কথা বলতে বলতেই অফিসাররা তৈরি হতে লাগল। সামোভারে আবার খোলা জল ফুটতে লাগল। রস্তভ চায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই স্কোয়াড্রনে চলে গেল। দিনের আলো ফুটছে ; বৃষ্টি থেমেছে ; মেঘ কেটে যাচ্ছে। পোশাক তখনও ভিজে থাকায় স্যাঁৎসেঁতে, ঠাণ্ডা লাগছে। ভোরের আবছা আলোয় সরাইখানা থেকে যেতে যেতে রস্তভ ও ইলিন ডাক্তারের গাড়ির বৃষ্টি-ভেজা চামড়ার চকচকে ঢাকনাটার নীচ দিয়ে দেখতে পেল, ডাক্তারের পা দুটো এপ্রোনের নীচ দিয়ে বেরিয়ে আছে, আর তার মাঝখানে স্ত্রীর টুপিটা দেখা যাচ্ছে। ঘুমের মধ্যে স্ত্রীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও শোনা যাচ্ছে।

রস্তভ পিছন ফিরে ইলিনকে বলল, "সত্যি, মেয়েটি বড় ভাল।"

ষোল বছরের ছেলের পক্ষে যতটা সম্ভব গম্ভীর গলায় ইলিন বলল, "মনোরমা নারী।"

আধ ঘণ্টা পরে গোটা স্কোয়াড্রন রাস্তায় সার দিয়ে দাঁড়াল। ঘোড়ায়

চড়ার নির্দেশ শোনা যেতেই সকলে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে ঘোড়ায় চাপল। সকলের সামনে ঘোড়ায় চেপে রস্তভ হুকুম দিল "আগে বাড়!" সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রের ঝন্‌ঝন ও মৃদু গুঞ্জন এবং কাদার মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের ছপ-ছপ শব্দ তুলে হুজাররা চারজন করে সারি বেঁধে চওড়া রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। দুই পাশে বার্চগাছের সারি। সামনে চলেছে পদাতিক বাহিনী ও কামানের গাড়ি।

ছেঁড়া-ছেঁড়া নীল-লাল মেঘের দল পূবের আকাশকে রাঙিয়ে দিয়ে বাতাসের আগে ভেসে চলেছে। ক্রমেই বেশী করে আলো ফুটছে। গ্রাম্য পথের দু'ধারে রাতের বৃষ্টিতে ভেজা কোঁকড়া ঘাসগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে; বৃষ্টিতে বার্চগাছের ডালগুলি নুয়ে পড়েছে; বাতাসের দোলা লেগে জলের ফোঁটাগুলি ঝরে পড়ছে। সৈন্যদের মুখগুলি ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে। ইলিনকে পিছনে নিয়ে রস্তভ এগিয়ে চলেছে বার্চ-বীথির মাঝখান দিয়ে। সে ভাবছে ঘোড়াটার কথা, সকাল বেলাটার কথা, ডাক্তারের স্ত্রীর কথা, কিন্তু আসন্ন বিপদের কথা একবারও ভাবছে না।

আগে যুদ্ধে যাবার সময় রস্তভের ভয় করত, কিন্তু এখন তার মনে এতটুকু ভয় হয় না। গোলাগুলির সম্মুখীন হতে অভ্যস্ত হয়েছে বলে যে সে নির্ভয় হয়েছে তা নয়, তার নির্ভয় হবার কারণ বিপদে পড়ে নিজের চিন্তাকে কেমন করে সংযত রাখতে হয় সেটা সে শিখে ফেলেছে। ইলিনের চোখে-মুখে উত্তেজনা ফুটে উঠেছে; গভীর উত্তেজনায় সে অনবরত কথা বলছে; তার দিকে তাকিয়ে রস্তভের করুণা হল।

একখণ্ড পরিষ্কার আকাশে মেঘের আড়াল থেকে সূর্য দেখা দিতেই বাতাস পড়ে গেল; যেন ঝড়ের পরে গ্রীষ্মের সকাল বেলাকার সৌন্দর্যটাকে মাটি করবার সাহস তার হয় নি; বৃষ্টির ফোঁটাগুলি সোজাসুজি মাটিতে পড়ছে; চারদিক নিস্তব্ধ। দিগন্তে গোটা সূর্যটা একবার দেখা দিয়েই একটা লম্বা, সরু মেঘের ফালির নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল। কয়েকমিনিট পরেই সেই মেঘের আঁচল ছিঁড়ে উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে সূর্য আবার দেখা দিল। সবকিছুই উজ্জ্বল, ঝল্‌মল্ করে উঠল। আর সেই আলোর সঙ্গে সঙ্গে, বুঝি বা তারই প্রত্যুত্তরে সামনে থেকে ভেসে এল বন্দুকের শব্দ।

বন্দুকের শব্দ কতটা দূর থেকে এসেছে সেটা ভাববার এবং স্থির করবার আগেই কাউণ্ট অস্তারমান—তলস্তয়ের অ্যাডজুটাণ্ট ঘোড়া ছুটিয়ে বিতেবস্ক থেকে এসে হুকুম জানিয়ে দিল, তাদের জোরকদমে এগিয়ে যেতে হবে।

অগ্রবর্তী পদাতিক বাহিনীও কামানের গাড়িকে দ্রুতগতিতে পার হয়ে স্কোয়াড্রনটি একটা পাহাড় বেয়ে নীচে নেমে জনশূন্য পরিত্যক্ত গ্রাম পার হয়ে আবার চড়াই ভেঙে উঠতে লাগল। ঘোড়ার গায়ে মুখে ফেনা জমে গেল, মানুষগুলোর মুখ লাল হয়ে উঠল।

"থাম! পোশাক ঠিক করে নাও!" সামনে শোনা গেল রেজিমেন্ট-

কম্যাণ্ডারের হুকুম। "বাঁদিক ধরে এগিয়ে যাও। হাঁটো, আগে বাড়!"

হুজাররা আমাদের উহ্‌লানদের পাশে থেমে গেল। ডানদিকে ঘন-সন্নিবেশে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের পদাতিক বাহিনী: তারা সংরক্ষিত সেনাদল। পাহাড়ের আরও উপরে প্রায় দিগন্ত-রেখায় প্রাতঃসূর্যের তির্যক কিরণে ঝলসিত আমাদের কামানগুলো চোখে পড়ছে। সম্মুখে একটা খোলা প্রান্তরের ওপারে শত্রু-সেনা ও তাদের কামানও দেখা যাচ্ছে। আমাদের অগ্রবর্তী সৈন্যরা যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে; প্রান্তরে অবস্থিত শত্রুদের সঙ্গে তাদের গুলি-বিনিময় চলছে।

দীর্ঘদিন অনভ্যস্ত এই শব্দ শুনে খুসির গান শোনার মত রস্তভের মনটা চনমন করে উঠল। ট্রাপ-টা-টা-টাপ! গুলি-গোলা ছুটছে কখনও এক-যোগে, কখনও অতি দ্রুত একটার পর একটা। আবার সব চুপচাপ। আবার সেই শব্দ; কেউ যেন বিস্ফোরকের উপর পা ফেলে ফেলে সেগুলো ফাটিয়ে দিচ্ছে।

প্রায় এক ঘণ্টা হুজাররা এক জায়গায়ই রইল। কামানের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ চলল। কাউণ্ট অস্তারমান দলবল নিয়ে উপরে উঠে গেল, সেখানে থেমে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারকে কি যেন বলল, তারপর পাহাড় বেয়ে কামানের কাছে চলে গেল।

অস্তারমান চলে যাবার পরেই উহ্‌লানদের লক্ষ্য করে হুকুম ঘোষিত হল:

"সার বেঁধে দাঁড়াও! কামান দাগতে প্রস্তুত হও!"

সামনের পদাতিক বাহিনী অশ্বারোহীদের পথ করে দেবার জন্য দুইদিকে সরে গেল। উহ্‌লানদের যাত্রা শুরু হল; তাদের উদ্যত বর্শা ঝিকমিকিয়ে উঠল; ঘোড়া ছুটিয়ে তারা নীচের বাঁ দিকে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল।

উহ্‌লানরা পাহাড় বেয়ে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হুজারদের উপর হুকুম হল, পাহাড়ের উপরে উঠে কামানশ্রেণীকে সুরক্ষিত রাখ। তারা যার যার জায়গায় দাঁড়াতেই সম্মুখ থেকে শাঁ-শাঁ করে ছুটে এল বুলেট, সেগুলো মাটিতে পড়ল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না।

অনেকদিন পরে এইসব শব্দ শুনে রস্তভের মন নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। একটা ভাল জায়গা নিয়ে পাহাড়ের উপর থেকে সে সামনে প্রসারিত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাল; সমস্ত অন্তর দিয়ে উহ্‌লানদের গতিবিধি দেখতে লাগল। তারা সবেগে ফরাসী অশ্বারোহীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে গেল; পাঁচ মিনিট পরে উহ্‌লানরা ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরতে লাগল, যে স্থানটা তারা দখল করেছে সেদিকে নয়, আরও কিছুটা বাঁদিকে; আর বাদামী রঙের ঘোড়ার উপর কমলা রঙের উহ্‌লানদের মধ্যে এবং তাদের

পিছনে একটা বড় দলে ধূসর ঘোড়ার উপর নীল পোশাকের ফরাসী অশ্বারোহীদের দেখা গেল।

অধ্যায়—১৫

খেলোয়াড়সুলভ চোখের দৌলতে আরও কয়েকজনের সঙ্গে রস্তভই প্রথম দেখতে পেল যে নীল পোশাক-পরা ফরাসী অশ্বারোহী সৈন্যরা আমাদের উহ্‌লানদের পিছু নিয়েছে। উহ্‌লানরা ক্রমেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে, আর ফরাসী অশ্বারোহীরা তাদের তাড়া করছে। পাহাড়ের পাদদেশে লোকগুলিকে কত ছোট ছোট দেখাচ্ছে; হাত তুলে বাতাসে তলোয়ার ঘুরিয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করছে।

শিকারী যেভাবে শিকারকে দেখে রস্তভও সেইভাবে নীচের ঘটনাবলীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে, হুজাররা যদি এখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ফরাসী অশ্বারোহীদের আঘাত করে তাহলে সে আঘাত তারা সইতে পারবে না; কিন্তু সে আঘাত এখনই, এই মুহূর্তে করতে হবে, অন্যথায় অনেক দেরি হয়ে যাবে। সে চারদিকে তাকাল। তার পাশে দাঁড়িয়ে একজন ক্যাপ্টেনও সেই একইভাবে নীচের অশ্বারোহী বাহিনীর দিকে তাকিয়ে আছে।

রস্তভ বলল, "আন্দ্রে সেবাস্তিয়ানিচ, আপনি তো বোঝেন, ওদের আমরা পিষে মারতে পারতাম····"

ক্যাপ্তেন বলল, "সে তো খুবই ভাল হত! আর সত্যি····"

রস্তভ তার কথা শুনবার জন্য অপেক্ষা করল না; ঘোড়ার পিঠে চেপে তার স্কোয়াড্রনের সামনে ছুটে গেল, আর তার হুকুম ঘোষণা শেষ হবার আগেই গোটা স্কোয়াড্রন তারই মত উদ্বুদ্ধ হয়ে তাকে অনুসরণ করল। কেন বা কেমন করে সে একাজ করছে তা রস্তভ নিজেও জানে না। শিকারের সময়ের মতই কোনকিছু না ভেবে, না বিচার করেই সে কাজটা করছে। সে দেখল, ফরাসী অশ্বারোহীরা অনেক কাছে এসে পড়েছে; তারা ছুটছে বিশৃংখলভাবে; সে জানে, আক্রমণ করলে তারা তা সামলাতে পারবে না—সে আরও জানে, একটিমাত্র মুহূর্ত সময় তার হাতে আছে, আর সেটি হাতছাড়া হলে আর ফিরে আসবে না। চারদিকে শাঁ শাঁ করে গোলাগুলি ছুড়ছে, তার ঘোড়াটাও ছুটে যেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে; সে আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ঘোড়ার পিঠে হাতটা রাখল, মুখে হুকুম জারি করল, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্কোয়াড্রনের ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল পাহাড়ের নীচে ফরাসী অশ্বারোহী বাহিনীকে লক্ষ্য করে। পাহাড়ের নীচে পৌঁছবার আগেই তাদের গতি ক্রমেঃ দ্রুততর হতে লাগল। ক্রমেই তারা উহ্‌লানদের ও তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী ফরাসী-

দের আরও কাছে পৌঁছে গেল। ফরাসীরা একেবারে হাতের কাছে এসে গেল। আমাদের হুজারদের দেখেই যে সকলের আগে ছিল সে ঘুরে দাঁড়াল, আর পিছনের বাকিরা থেমে গেল। যে মনোভাব নিয়ে সে একটা নেকড়ের পথ আটকে দিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দেয় ঠিক সেইভাবে রস্তভ দোনেৎ-এর রাশ আল্‌গা করে দিয়ে বিশৃংখল ফরাসীদের পথটা আটকে দিল। প্রায় সব ফরাসী অশ্বারোহীই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে জোড় কদমে ছুটতে লাগল। জনৈক ধূসর ঘোড়ার সওয়ারকে বেছে নিয়ে রস্তভ তার দিকে ছুটে গেল। পথে একটা ঝোপ পড়ল; তার সাহসী ঘোড়াটা একলাফে সেটা পেরিয়ে গেল; পুনরায় নিজের উপর ভালভাবে বসেই সে বুঝতে পারল যে এই মুহূর্তেই সে তার আকাংখিত শত্রুটিকে ধরে ফেলতে পারবে। ফরাসীটির ইউনিফর্ম দেখেই বোঝা যায় সে একজন অফিসার; ঘোড়ার পিঠে উপুড় হয়ে বসে সে তলোয়ার দিয়ে সেটাকে খোঁচা মেরে আরও জোরে ছুটিয়ে নিচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে রস্তভের ঘোড়া নিজের বুক দিয়ে ফরাসী অফিসারের ঘোড়ার পাছায় একটা ধাক্কা মেরে সেটাকে প্রায় উল্টে ফেলে দিল, আর ঠিক সেইমুহূর্তে কিছু না বুঝেই রস্তভ তার তলোয়ার তুলে ফরাসী অফিসারটিকে আঘাত করল।

কাজটা করার সঙ্গে সঙ্গেই রস্তভের সব উদ্দীপনা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। অফিসারটি পড়ে গেল—তার আঘাতের ফলে যতটা নয়—কারণ আঘাতে হাতের কনুইয়ের উপরে খানিকটা কেটে গেছে মাত্র—যতটা তার ঘোড়ার ধাক্কায় ও ভয়ে। রস্তভ ঘোড়ার রাস টেনে ধরল; তার চোখ দুটি তাকাল শত্রুর দিকে, যাকে পরাজিত করেছে তাকে একবার দেখতে। ফরাসী অফিসারটির একটা পা ঘোড়ার রেকাবে আটকে যাওয়ায় সে আর এক পায়ে মাটিতে লাফাচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে তলোয়ারের আর একটা কোপ নেমে আসতে পেরে এই ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে সে রস্তভের দিকে তাকাল। বিবর্ণ কাদামাখা মুখখানি বড় সুন্দর, থুতনিতে একটা টোল পড়েছে, চোখ দুটি হাল্কা নীল—এ মুখ যেন রণক্ষেত্রের কোন শত্রুকে মানায় না, অত্যন্ত সাধারণ একখানি পারিবারিক মুখ। রস্তভ তাকে নিয়ে কি করবে স্থির করার আগেই অফিসারটি চীৎকার করে বলল, "আমি আত্মসমর্পণ করছি!" রেকাব থেকে পাটা ছাড়িয়ে নিতে অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না; ভয়ার্ত নীল চোখ দুটোকেও রস্তভের মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিল না। কয়েকজন হুজার ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তার পাটা ছাড়িয়ে দিল, তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপতে সাহায্য করল। চারদিকেই হুজাররা ফরাসীদের নিয়ে ব্যস্ত; একজন আহত হয়েছে, মুখ বেয়ে রক্ত ঝরছে, তবু ঘোড়াটা ছাড়ছে না; আর একজনকে পিছমোড়া করে বেঁধে একজন হুজারের পিছনে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর একজনকেও ঘোড়ায় তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্মুখে ফরাসী পদাতিক সৈন্যরা পালাতে পালাতেও যুদ্ধ করে যাচ্ছে। হুজাররা বন্দীদের নিয়ে তাড়াতাড়ি

ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বাকিদের নিয়ে রস্তভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিল; একটা অপ্রীতিকর অনুভূতির কাঁটা বুকের মধ্যে যেন অনবরত ফুটছে। অফিসারটিকে আঘাত করা এবং বন্দী করার পর থেকেই একটা অস্পষ্ট বিচলিতভাব তাকে পেয়ে বসেছে, অথচ তার কোন কারণ সে বুঝতে পারছে না।

হুজাররা ফিরে এলে কাউণ্ট অস্তারমান-তলস্তয় তাদের সঙ্গে দেখা করল, রস্তভকে ডেকে আনল, তাকে ধন্যবাদ দিল, আরও বলল যে তার এই দুঃসাহসী কাজের কথা সে সম্রাটকে জানাবে এবং তার জন্য "সেণ্ট জর্জ ক্রস"-এর সুপারিশ করবে। এই আনন্দের সংবাদেও কিন্তু রস্তভের মন থেকে সেই অস্বস্তিকর ভাবটা গেল না। সেনাপতির কাছ থেকে ফিরবার পথে সে ভাবতে লাগল, "কেন আমার এরকম অস্বস্তি বোধ হচ্ছে? ইলিন? না, সে তো নিরাপদেই আছে। আমি কি নিজের অসম্মান করেছি? না, তাও তো নয়। ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, থুতনিতে টোল-খাওয়া সেই ফরাসী অফিসারটি। এখন মনে পড়ছে, হাতটা তুলতে গিয়ে কেমন যেন থেমে গিয়েছিল।"

রস্তভ তাকিয়ে দেখল, বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। থুত্‌নিতে টোল-খাওয়া ফরাসীটিকে দেখবার জন্য সে তাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। বিদেশী ইউনিফর্ম পরে একজন হুজারের মালবাহী ঘোড়ার পিঠে চেপে সে উদ্বেগের সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে। তার হাতে তলোয়ারের যে কোপ লেগেছিল তাকে ক্ষত বলা যায় না। নকল হাসি হেসে সে রস্তভের দিকে তাকাল, হাত তুলে তাকে অভ্যর্থনা জানাল। রস্তভের মনে তখনও সেই লজ্জাকর অনুভূতি।

সারাটা দিন এবং পরদিনও তার বন্ধু ও সহকর্মীরা লক্ষ্য করল যে রস্তভ কেমন যেন চুপচাপ, চিন্তিত ও অন্যমনস্ক হয়ে আছে। মদ খাচ্ছে অনিচ্ছায়, একলা থাকতে চেষ্টা করছে, আর মনের মধ্যে কি নিয়ে যেন নাড়াচাড়া করছে।

নিজের সেই বিশেষ সাফল্যের কথাই সে সবসময় ভাবে; তারই ফলে সে "সেণ্ট জর্জ ক্রস" লাভ করেছে, সাহসী হিসাবে তার সুখ্যাতি হয়েছে, এবং আরও কি যে হয়েছে তা সে মোটেই বুঝতে পারে না। সে ভাবে; "তাহলে অন্যরা আমার চাইতেও ভীরু! তাহলে একেই বলে বীরত্ব! আর একাজ কি আমার দেশের জন্য করেছি? আর সেই গালে টোল-খাওয়া নীল চোখের লোকটিরই বা দোষ কি? সে কী ভয়ই না পেয়েছিল! ভেবেছিল আমি তাকে মেরে ফেলব। কেন তাকে মারব? আমার হাত কাঁপল। অথচ তারা আমাকে দিল 'সেণ্ট জর্জের ক্রস'। এসব আমি বুঝতে পারি না।"

নিকলাস যখন এইসব কথা ভাবছে, আর সমস্যার কোন মীমাংসা খুঁজে পাচ্ছে না, ওদিকে তখন চাকরি-ক্ষেত্রে ভাগ্যের চাকা তার পক্ষেই ঘুরে গেল। অস্ত্রভ্‌নার ঘটনার পরে তার উপর সকলের নজর পড়ল, সে একটা

হুজার ব্যাটেলিয়নের সেনাপতির পদ পেল, আর সাহসী অফিসারের প্রয়োজন হলেই তাকে মনোনীত করা হতে লাগল।

অধ্যায়—১৬

কাউণ্টেস এখনও সম্পূর্ণ সেরে ওঠে নি; এখনও বেশ দুর্বল; তবু নাতাশার অসুখের সংবাদ পেয়ে পেত্য়া এবং বাকি লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে কাউণ্টেস মস্কোতে চলে এল; ফলে গোটা পরিবার মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্‌নার বাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বাড়িতে উঠে গেল এবং শহরেই সংসার পেতে বসল।

নাতাশার অসুখটা এতই গুরুতর হয়েছিল যে তার আচরণ, বিয়ের প্রস্তাব ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি অসুস্থতার কারণগুলি চাপা পড়ে গিয়েছে; আর নাতাশা ও তার বাবা-মার পক্ষে সেটা ভালই হয়েছে। সে তখন এতই অসুস্থ যে এ ব্যাপারে তার দোষ কতটা সে বিচার করাটাই তখন অসম্ভব হয়ে পড়ল। সে কিছু খেতে পারে না, ঘুমতে পারে না, ক্রমেই শুকিয়ে যাচ্ছে, কাশছে, আর ডাক্তারের ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিপদের কথা। এ অবস্থায় তাকে সাহায্য করা ছাড়া আর কোন কথা কারও মনেই এল না। ডাক্তাররা তাকে দেখতে আসে; কখনও একা, কখনও দল বেঁধে, ফরাসী, জার্মান ও লাতিন ভাষায় অনেক কথা বলে, একে অন্যকে দোষ দেয়, তারা যতরকম রোগের কথা জানে সেসবেরই ওষুধ বাত্‌লে দেয়; কিন্তু এই সহজ কথাটা কখনও তাদের মনে আসে না যে নাতাশা যে রোগে কষ্ট পাচ্ছে তার খবর তারা জানে না, কারণ একজন সুস্থ মানুষ যে রোগে ভোগে তার খবর জানা যায় না; সে রোগ চিকিৎসা-শাস্ত্রের অজানা; সে রোগ ফুসফুসের নয়, যকৃতের নয়, ত্বকের নয়, হৃদপিণ্ডের নয়, স্নায়ুর নয়; চিকিৎসা-শাস্ত্রে উল্লেখিত কোন রোগই নয়; সে রোগ এইসব দেহযন্ত্রের বিকারের অসংখ্য সম্ভাবিত যোগ-বিয়োগের অন্যতম একটি ফলমাত্র। এই সরল কথাটা ডাক্তারদের মাথায় ঢোকে না, কারণ তাদের জীবনের কাজই হচ্ছে রোগ নিরাময় করা, সেজন্য তারা টাকা নেয়, আর সেই কাজেই তারা জীবনের শ্রেষ্ঠ বৎসরগুলি অতিবাহিত করেছে।……

ডাক্তার রোজ আসে, নাড়ি দেখে, জিভ দেখে, তার দুঃখ-জর্জর মুখ দেখেও তার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করে। কিন্তু সে যখনই অন্য ঘরে চলে যায় এবং কাউণ্টেস তাড়াতাড়ি তাকে অনুসরণ করে তখনই হঠাৎ তার মুখটা গম্ভীর হয়ে যায়, চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে বলে, যদিও বিপদ আছে তবু সে আশা করছে যে এই শেষ ওষুধটাতে কাজ হবে; তবে অপেক্ষা তো করতেই হবে, রোগটা তো প্রধানত মানসিক, কিন্তু…আর কাউণ্টেসও তার হাতে একটা স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত মনে রোগীর কাছে ফিরে যায়।

নাতাশার রোগের লক্ষণ হল—সে খায় কম, ঘুমোয় কম, কাশে, আর সবসময় মন-মরা হয়ে থাকে। ডাক্তাররা বলল, চিকিৎসা চালিয়েই যেতে হবে ; কাজেই তাকে শহরের দম-বন্ধকরা আবহাওয়ার মধ্যেই রেখে দেওয়া হল ; ১৮১২ র গ্রীষ্মকালে রস্তভ-পরিবার গ্রামে ফিরে গেল না।

নাতাশাকে অনেক বড়ি খেতে হল ; ছোট ছোট বোতল ও বাক্স থেকে অনেক ফোঁটা, অনেক গুঁড়ো ব্যবহার করতে হল ; মাদাম শোস্ সেগুলো সংগ্রহ করে রাখল ; আর যে পল্লী-জীবন নাতাশার এত প্রিয় তার থেকে তাকে বঞ্চিত করে রাখা হল। তবু যৌবনেরই জয় হল। দৈনন্দিন জীবনের প্রভাবে নাতাশার দুঃখ চাপা পড়তে লাগল, মনের উপর দুঃখের চাপ কমে গেল, ক্রমে সবকিছুই অতীতের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল ; নাতাশার শরীরও সারতে শুরু করল।

অধ্যায়—১৭

নাতাশা আগের চাইতে শান্ত হয়েছে, কিন্তু সুখী হয় নি। বল-নাচ, প্রমোদ-ভ্রমণ, কনসার্ট, থিয়েটার প্রভৃতি বাহ্যিক আমোদ-প্রমোদ তো ত্যাগ করেছেই, এমন কি যখন হাসে তখন সে হাসিতেও যেন চোখের জলের ছোঁয়া লাগে। গাইতেও পারে না। যখনই হাসতে বা গাইতে চেষ্টা করে তখনই কান্নায় গলা আটকে যায় : বিষাদের কান্না, স্মৃতির কান্না, সুন্দর জীবনকে অকারণে নষ্ট করায় বিরক্তির কান্না। এই দুঃখের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসি ও গানকে অন্যায় বলে মনে হয়। সে মুখে বলে, অন্তরেও অনুভব করে, কোন মানুষই তার কাছে আজ ভাঁড় নাতাসিয়া আইভানভ্নার চাইতে বেশী কিছু নয়। কোন প্রহরী যেন ভিতর থেকে সবরকম আনন্দ থেকে তাকে নিবৃত্ত রাখে।

সে যে পৃথিবীর আর কারও চাইতে ভাল তো নয়ই, বরং অনেক, অনেক বেশী খারাপ—এই চিন্তা থেকেই সে সান্ত্বনা পায়। কিন্তু সেটাই তো যথেষ্ট নয়। সে নিজেকেই প্রশ্ন করে, "তারপরে কি ?" কিন্তু ভবিষ্যতের কোন আশাই তো নেই। জীবনে কোন আনন্দ নেই, অথচ জীবন বয়েই চলেছে। বাড়ির সকলের কাছ থেকে সে দূরে সরে থাকে, শুধু ভাই পেত্যার কাছেই কিছুটা স্বস্তি পায়। অন্য সকলের চাইতে তার কাছে থাকতেই ভালবাসে, তার কাছে একা থাকলে কখনও কখনও হাসে। বাড়ি থেকে কদাচিৎ বের হয় ; যারা বাড়িতে আসে তাদের মধ্যেও একমাত্র পিয়েরকে দেখেই তার সুখ। কাউন্ট বেজুকভের চাইতে বেশী যত্ন-আত্তি আর কেউ করতে পারে না, আর সেটা বোঝে বলেই তার সঙ্গেই নাতাশা বেশী সুখ পায়। এর কারণ এই নয় যে পিয়ের বিবাহিত ; আসল কারণ—কুরাগিনের বেলায় যে নৈতিক ব্যবধানের অভাব ছিল এক্ষেত্রে নাতাশা সেই ব্যবধানটাই খুব বেশী করে

বোধ করে ; একথা কখনও তার মনে হয় না যে তাদের দুজনের সম্পর্কটা কখনও তার দিক থেকে ভালবাসার পথ ধরতে পারে, অথবা মমতাময়, আত্ম-সচেতন, রোম্যান্টিক বন্ধুত্বের সেই পথ ধরতে পারে নর-নারীর যে সম্পর্কের অভিজ্ঞতা তার জীবনে কয়েকবারই হয়েছে। পিয়েরের দিক থেকে সে সম্ভাবনা তো আরও কম।

সেণ্ট পিতরের উপবাসের শেষের দিকে আগ্রাফেনা আইভানভ্‌না বেলোভা নামের জনৈকা গ্রামের প্রতিবেশিনী মস্কো এল মস্কোর সন্তদের উদ্দেশে ভক্তি নিবেদন করতে। সেই পরামর্শ দিল, পবিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি নেওয়া ও উপবাস করা নাতাশার পক্ষে ভাল হবে। নাতাশা সানন্দে সে পরামর্শ গ্রহণ করল। ডাক্তার তাকে ভোরে বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেছে, তবু নাতাশা উপবাস ও প্রস্তুতির জন্য পীড়াপীড়ি করতে শুরু করল। রস্তভ-পরিবারে নিজেদের বাড়িতেই তিনবার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হয় ; নাতাশা কিন্তু তার পরিবর্তে আগ্রাফেনা আইভানভ্‌নার মত এক সপ্তাহ ধরে প্রতিদিন গির্জায় যেতে লাগল এবং কোন অনুষ্ঠানই বাদ দিল না।

নাতাশার এই উৎসাহ দেখে কাউণ্টেসও খুশি হল ; ডাক্তারি চিকিৎসায় ভাল ফল না হওয়ায় কাউণ্টেস মনে মনে এই আশাই পোষণ করত যে চিকিৎসার চাইতে প্রার্থনাতেই তার মেয়ের বেশী উপকার হবে। তাই ডাক্তারকে না জানিয়ে সে নাতাশার ইচ্ছার সঙ্গে একমত হয়ে তাকে বেলোভার হাতে ছেড়ে দিল। আগ্রাফেনা আইভানভ্‌না সকাল তিনটের সময় নাতাশাকে ঘুম থেকে জাগাতে আসে, কিন্তু সাধারণত তাকে জেগে থাকতেই দেখে। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে সবচাইতে বাজে পোশাকটা পরে ভোরের খোলা হাওয়ায় কাঁপতে কাঁপতে নাতাশা ঊষার পরিষ্কার আলোয় আলোকিত নির্জন পথে নেমে যায়। আগ্রাফেনা আইভানভ্‌নার পরামর্শ মতই তারা নিজেদের পল্লীর গির্জায় না গিয়ে কিছুটা দূরের আর একটা গির্জায় যায়, কারণ আগ্রাফেনা আইভানভ্‌নার মতে সেই গির্জার পুরোহিতটি খুব কড়া ও আদর্শবাদী মানুষ। সেখানে যেসব প্রার্থনায় তারা যোগ দেয় সেগুলি প্রায় সবই অনুশোচনামূলক। খুব ভোরে বাড়ি ফিরবার পথে তাদের সঙ্গে দেখা হয় শুধু রাজমিস্ত্রি আর ঝাড়ুদারদের সঙ্গে ; দু'পাশের বাড়িতে তখন সকলেই ঘুমে অচেতন। সেই পরিবেশে নাতাশার মনের মধ্যে একটা নতুন অনুভূতি জেগে ওঠে ; জেগে ওঠে নিজের দোষ সংশোধনের সম্ভাবনার চিন্তা ; একটি নতুন, পরিচ্ছন্ন, সুখের জীবনের সম্ভাবনার আশা।

একটি সপ্তাহ সে এইভাবে কাটাল ; আর প্রতিটি দিনই এই একই অনুভূতি জাগল তার মনে। খৃস্টের নৈশ ভোজনপর্বে অংশ নেওয়ায় তার মনে এত বেশী আনন্দের ঢেউ খেলে গেল যে নাতাশার মনে হল সে বুঝি পবিত্র

রবিবার পর্যন্ত বাঁচবে না।

কিন্তু সেই সুখের দিনটি এল। সেই স্মরণীয় রবিবারে নৈশ ভোজনপর্বে যোগদান করে সে যখন সাদা মসলিনের পোশাকে সজ্জিত হয়ে বাড়ি ফিরল তখন বিগত কয়েকমাসের মধ্যে এই প্রথম সে তার মনের শান্তি ফিরে পেল; ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তার কোন ভার সেখানে রইল না।

সেদিন তাকে দেখতে এসে ডাক্তার বলল, পক্ষকাল আগে যে গুঁড়োটা খাবার ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছিল সেটা আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে হবে।

নিজের সাফল্যে পরিতুষ্ট হয়ে বলল, "সকাল-সন্ধ্যা অতিঅবশ্য এটা চালিয়ে যেতে হবে। দয়া করে এদিকে বিশেষ নজর রাখবেন।"

স্বর্ণমুদ্রাটা হাত পেতে নিয়ে খুসির মেজাজে বলল, "মনকে শান্ত করুন। মেয়ে অচিরেই গাইতে ও লাফাতে শুরু করবে। শেষের ওষুধটা খুব ভাল কাজ করেছে। মেয়ে তো অনেক তাজা হয়ে উঠেছে।"

কাউণ্টেসের মুখে হাসি দেখা দিল; নিজের নখের দিকে তাকিয়ে সৌভাগ্যের আশায় একটু থুথু ফেলে (রুশ প্রথা) সে বৈঠকখানায় চলে গেল।

অধ্যায়—১৮

জুলাইয়ের শুরুতেই যুদ্ধের নানারকম অস্বস্তিকর খবর মস্কোতে ছড়াতে লাগল; সকলেই বলাবলি করতে লাগল, সম্রাট জনসাধারণের কাছে আবেদন রেখেছে, এবং নিজে সেনাদল ছেড়ে মস্কোতে আসছে। কিন্তু ১১ই জুলাই পর্যন্ত কোন ইস্তাহার বা আবেদন না পাওয়ায় সে সম্পর্কে এবং রাশিয়ার অবস্থা সম্পর্কে অতিশয়োক্তিভরা নানা সংবাদ প্রচারিত হতে লাগল। সকলে বলতে লাগল, সেনাদলের বিপদ বুঝেই সম্রাট তাদের ছেড়ে আসছে, স্মোলেন্স্ক্ আত্মসমর্পণ করেছে, নেপোলিয়নের সৈন্য-সংখ্যা দশ লক্ষে পৌঁচেছে, এবং একমাত্র অঘটন ছাড়া রাশিয়ার বাঁচার কোন আশা নেই।

১১ই জুলাই, শনিবার। ইস্তাহার পাওয়া গেল, কিন্তু তাও ছাপানো নয়। পিয়ের তখন রস্তভদের বাড়িতেই ছিল; সে কথা দিল পরদিন রবিবারে সে ডিনারে আসবে এবং কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের কাছ থেকে ইস্তাহার ও আবেদনের কপি নিয়ে আসবে।

সেই রবিবারে রস্তভরা যথারীতি রাজুমভস্কিদের ভজনালয়ে গেল। জুলাই মাসের গরম দিন। এমন কি বেলা দশটার সময় রস্তভরা যখন গাড়ি থেকে ভজনালয়ের সামনে নামল তখন বাইরের গরম হাওয়া, ফেরিওয়ালাদের চীৎকার; জনসাধারণের গ্রীষ্মকালীন হাল্কা পোশাক, রাজপথে শুকনো পাতার ছড়াছড়ি, ব্যাণ্ডের তালে তালে সাদা ট্রাউজারপরিহিত সৈন্যদের প্যারেড, পাথুরে রাস্তায় চাকার ঘর্ঘর শব্দ, আর উজ্জ্বল, উত্তপ্ত রোদ—সব কিছুর মধ্যেই সেই গ্রীষ্মকালীন অবসন্নতা, বর্তমানকে নিয়ে সেই সন্তোষ ও

অসন্তোষ, যা যেকোন উজ্জ্বল, উত্তপ্ত দিনে শহরবাসীরা বড় বেশী করে অনুভব করে। ""তকমা-পরা পরিচারক ভিড় হটিয়ে পথ করে দিচ্ছে; সেই পথ দিয়ে মার পাশে হাঁটতে হাঁটতে নাতাশার কানে এল একটি যুবক বেশ জোরেই ফিস্‌ফিস্‌ করে তার কথা বলছে।

"ঐ হলেন রস্তভা, যিনি""

"অনেক শুকিয়ে গেছেন, কিন্তু তাহলেও কত সুন্দরী!"

সে শুনল, অথবা শুনল বলে তার মনে হল, কুরাগিন ও বল্‌কন্‌স্কির নামও উল্লেখ করা হল। সে তো সবসময় তাদের কথাই ভাবে। তার মনে হল, তাকে দেখলেই লোকে তাকে কেন্দ্র করে যা ঘটেছে সেই কথাই বলে। একথা মনে হতেই তার মন খারাপ হয়ে গেল। রবিবারের কথা স্মরণ করে সে ভাবতে লাগল: "আবার সেই রবিবার এসেছে—একটা সপ্তাহ কেটে গেছে, অথচ সেই একই জীবন যেটা কোন জীবনই নয়, সেই একই পরিবেশ যেখানে বেঁচে থাকা কত সহজই না ছিল। আমি সুন্দরী, আমি তরুণী, আমি জানি এখন আমি ভাল হয়ে গেছি। খারাপ ছিলাম, কিন্তু আমি তো জানি এখন আমি ভাল হয়েছি, অথচ আমার শ্রেষ্ঠ দিনগুলি চলে যাচ্ছে, কারও কোন কাজে লাগছে না।" মার পাশে দাঁড়িয়ে সে পরিচিত জনকে দেখলেই মাথা নাড়ছে।

একটি সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ অনুষ্ঠান পরিচালনা করছে; তার মৃদু গাম্ভীর্য সমবেত ভক্তগণের মনে শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে। পর্দার ও-পাশ থেকে একটি রহস্যময় মৃদু কণ্ঠস্বর কি যেন উচ্চারণ করে চলেছে। অকারণেই উদ্বেলিত অশ্রুধারায় নাতাশার বুকটা ফুলে-ফুলে উঠছে; একটা আনন্দময় অথচ চাপা অনুভূতি তাকে চঞ্চল করে তুলেছে।

সে বলতে লাগল, "আমাকে শিখিয়ে দাও আমি কি করব, কেমন করে বাঁচব, কেমন করে চিরকালের মত ভাল হয়ে উঠতে পারব!"

বেদীর পর্দার সম্মুখস্থ উঁচু জায়গাটায় এসে দাঁড়াল ডিয়েকন। বুড়ো আঙুলটা বাড়িয়ে বুকের উপর ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে গম্ভীর উদাত্তকণ্ঠে সে প্রার্থনার বাণী উচ্চারণ করতে লাগল"

"আসুন আমরা শান্তিতে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি।"

"এক সম্প্রদায়রূপে, শ্রেণীনির্বিশেষে, কারও প্রতি শত্রুতা পোষণ না করে, ভ্রাতৃপ্রেমে সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে—আসুন আমরা প্রার্থনা করি!" নাতাশা ভাবল।

"ঊর্ধ্বলোক হতে আসে যে শান্তি তার জন্য আর আমাদের আত্মার উদ্ধারের জন্য।"

"দেবদূতদের জগতের জন্য, আর যে ঊর্ধ্বলোকে সব আত্মারা থাকে তার জন্য," নাতাশা প্রার্থনা জানাল।

যখন সকলে যোদ্ধাদের জন্য প্রার্থনা করল তখন নাতাশার মনে পড়ল তার ভাই ও দেনিসভের কথা। স্থলপথে ও জলপথে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের জন্য যখন প্রার্থনা করা হল তখন তার মনে পড়ল প্রিন্স আন্দ্রুকে, সে তারজন্য প্রার্থনা করল, ঈশ্বরকে মিনতি জানাল, প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি যত অন্যায় সে করেছে ঈশ্বর যেন তা ক্ষমা করেন। যারা আমাদের ভালবাসে তাদের জন্য যখন প্রার্থনা করা হল তখন সে প্রার্থনা করল নিজের পরিবারের লোকজনদের জন্য, বাবা, মা ও সোনিয়ার জন্য; এই প্রথম সে যেন বুঝতে পারল তাদের প্রতি কত অন্যায় সে করেছে। যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের জন্য যখন প্রার্থনা করা হল, তখন নিজের শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করতে সে তাদের খুঁজতে লাগল। অন্য অনেকের সঙ্গে তার মনে পড়ল আনাতোলকে। তার জন্যও সে প্রার্থনা করল।

প্রার্থনা-অনুষ্ঠান শেষ করে ডিয়েকন চাদরটা বুকের উপর আড়াআড়িভাবে রেখে বলল,

"আসুন, আমাদের সমগ্র জীবনকে প্রভু খৃস্টের কাছে উৎসর্গ করি!"

নাতাশা নিজের মনেই আবৃত্তি করতে লাগল, "ঈশ্বরের কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি। ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছার কাছেই নিজেকে নিবেদন করলাম। আমি কিছুই চাই না, আমার কোন বাসনা নেই; শুধু আমাকে শিখিয়ে দাও আমি কি করব, কেমন করে আমার বাসনাকে ব্যবহার করব। তুমি আমাকে গ্রহণ কর, গ্রহণ কর!"

কাউণ্টেস বারকয়েক মেয়ের নরম মুখ ও উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল তার সাহায্যের জন্য।

অপ্রত্যাশিতভাবে প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের ঠিক মাঝখানে ডিয়েকন একটা ছোট টুল নিয়ে এল এবং পর্দার সামনে সেটাকে বসিয়ে দিল। লাল ভেল্‌ভেটের পাগ্‌ড়ি মাথায় দিয়ে পুরোহিত বেরিয়ে এল, মাথার চুল ঠিক করে নিয়ে টুলের সামনে অনেক চেষ্টা করে নতজানু হয়ে বসল। তার অনুকরণ করে প্রত্যেকেই বিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল। তারপরই শুরু হল "সাইনড" থেকে সদ্যপ্রাপ্ত প্রার্থনা-অনুষ্ঠান—শত্রুর আক্রমণ থেকে রাশিয়াকে উদ্ধার করার প্রার্থনা।

পুরোহিত প্রার্থনা শুরু করল: "হে শক্তিমান ঈশ্বর, আমাদের উদ্ধারকর্তা ঈশ্বর! আজকের দিনে তোমার ক্ষীণ জনগণের দিকে করুণা ও আশীর্বাদের দৃষ্টিতে তাকাও, দয়া করে আমাদের প্রার্থনা শোন, আমাদের রক্ষা কর, আমাদের করুণা কর! সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংস করার বাসনা নিয়ে এই শত্রুরা তোমারই দেশে এসে আমাদের আক্রমণ করেছে; এই আইনবিরোধী লোকগুলি সম্মিলিত হয়েছে তোমার রাজ্যের পতন ঘটাতে, তোমার প্রিয় জেরুজালেমকে, তোমার প্রিয় রাশিয়াকে ধ্বংস করতে: তোমার মন্দিরকে

অপবিত্র করতে, তোমার পূজা-বেদীকে উচ্ছেদ করতে, আমাদের পবিত্র তীর্থগুলিকে কলুষিত করতে। হে প্রভু, কতকাল, আর কতকাল দুষ্টরা বিজয়ী হবে? কতকাল তাদের হাতে থাকবে বে-আইনী ক্ষমতা?

"প্রভু ঈশ্বর! তোমার কাছে আমাদের এই প্রার্থনা তুমি শোন; তোমার শক্তি দিয়ে আমাদের পরম দয়ালু অধিপতি প্রভু সম্রাট আলেক্সান্দার পাভ্‌লভিচ্‌কে তুমি শক্তিশালী করে তোল; তার ন্যায়নিষ্ঠা ও নম্র স্বভাবের কথা স্মরণ রেখে তাকে যথাযথভাবে পুরস্কৃত কর, যাতে আমরা ও তোমার প্রিয় ইজরায়েল রক্ষা পায়! সম্রাটের উপদেশ, তার প্রচেষ্টা, তার কার্যাবলীকে তুমি আশীর্বাদ কর; তোমার সর্বশক্তিমান হাত বাড়িয়ে তার রাজ্যকে শক্তিশালী কর; আর ঠিক যেভাবে তুমি আমালেক-এর উপর মোজেসকে, মিদিয়ানের উপর গিদিয়নকে, এবং গোলিয়াথের উপর ডেভিডকে বিজয়ী করেছিলে তেমনি করেই শত্রুর উপরে তাকে বিজয়ী করে দাও। তার বাহিনীকে রক্ষা কর, তোমার নাম নিয়ে যারা অস্ত্রসজ্জায় সেজেছে তাদের হাতে তুলে দাও পিতলের ধনুক, যুদ্ধের উপযোগী শক্তি দিয়ে তাদের কটিদেশকে বস্ত্রাবৃত কর। বর্শা ও বর্ম নিয়ে আমাদের সাহায্যে উঠে দাঁড়াও। আমাদের বিরুদ্ধে যারা পাপের হাত তুলেছে তাদের তুমি ব্যর্থ করে দাও, লজ্জার মধ্যে নিক্ষেপ কর; তোমার বিশ্বস্ত যোদ্ধাদের সামনে তারা যেন ঝড়ের মুখে ধূলোর মত উড়ে যায়; তোমার শক্তিমান দেবদূত যেন তাদের বিহ্বল করে দিয়ে পালাতে বাধ্য করে; নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা যেন পাশবদ্ধ হয়, গোপনে যে ষড়যন্ত্র তারা করেছে তা যেন তাদেরই প্রত্যাঘাত করে, তারা যেন তোমার সেবকের পায়ে এসে পড়ে আর আমাদের সৈন্যদের হাতে পর্যুদস্ত হয়। প্রভু, তুমি তো ছোট-বড় সকলেরই ত্রাণকর্তা; তুমি তো ঈশ্বর; মানুষ কখনও তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না!

"হে আমাদের পিতৃপুরুষের ঈশ্বর! পুরাকাল থেকে তোমার যে প্রভূত করুণা ও সপ্রেম দয়া আমরা পেয়ে এসেছি সেকথা স্মরণে রেখো; আমাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, আমাদের অযোগ্যতাকে তুমি ক্ষমা করো, তোমার মহান সততায় ও অসীম করুণায় আমাদের সব ত্রুটি ও বিচ্যুতি ভুলে যেও! আমাদের হৃদয়কে পবিত্র কর, আমাদের অন্তরে সধর্মকে প্রতিষ্ঠা কর, তোমার প্রতি বিশ্বাসে আমাদের শক্তিমান কর, আমাদের আশাকে কর সুরক্ষিত, পরস্পরের প্রতি ভালবাসাকে কর জাগ্রত, যে উত্তরাধিকার তুমি আমাদের ও আমাদের পিতৃপুরুষকে দিয়েছ তাকে রক্ষা করতে একপ্রাণ করে আমাদের গড়ে তোল; যাদের তুমি পবিত্র করেছ তাদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে দুষ্টশক্তির রাজদণ্ডকে বিজয়ী হতে দিও না।

নিজের মত করে নাতাশাও সে প্রার্থনায় যোগ দিল। সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাল, সকলকে ক্ষমা কর, শান্তি দাও, সুখ দাও; তার মন বলল, ঈশ্বর সে প্রার্থনা শুনেছে।

অধ্যায়—১৯

নাতাশার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিকে বুকের মধ্যে নিয়ে রস্তভদের বাড়ি থেকে চলে আসার পরে পিয়ের যেদিন আকাশের একটি স্থির ধূমকেতুর দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছিল যে তারা নিজের দিগন্তে নতুন কোন কিছুর আবির্ভাব ঘটতে চলেছে—সেদিন থেকেই পার্থিব সবকিছুর অহংকার ও তুচ্ছতার যে সমস্যা তাকে প্রতিনিয়ত পীড়িত করছিল তার অবসান ঘটেছে। প্রতিটি কাজের মধ্যে "কেন ?" "কোথা হতে ?" রূপী যে ভয়ংকার প্রশ্ন সবসময় তার সামনে হাজির হত, এবার তার জায়গায় দেখা দিল, অন্য আর একটি প্রশ্ন যা সেই প্রশ্নের জবাব নয়, দেখা দিল নাতাশার ছবি। যখনই কোন তুচ্ছ আলোচনা তার কানে আসে, অথবা সে স্বয়ং তাতে অংশ নেয়, যখনই মানুষের নীচতা বা মূর্খতার কথা পড়ে বা শুনতে পায় তখন আর সে আগের মত আতংকে শিউরে ওঠে না, নিজেকে প্রশ্ন করে না যে সবকিছুই যখন ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বোধ্য তখন তা নিয়ে মানুষ এত লড়াই করে কেন—এখন তার মনে পড়ে যায় নাতাশার শেষবারের মত দেখা ছবিটি, আর সব সন্দেহ দূরে মিলিয়ে যায়—যে প্রশ্ন তাকে তাড়া করত তার জবাব যে সে পেয়ে গেছে তা নয়, আসলে নাতাশার যে মূর্তি তার মনে গড়ে উঠেছে তাই তাকে মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে যায় আর একটি উজ্জ্বলতর আধ্যাত্মিক কর্মের জগতে যেখানে ভাল-মন্দর বিচার নেই—যে সৌন্দর্য ও প্রেমের জগতে বেঁচে থাকাটাই আসল কথা। যে-কোন জাগতিক নীচতার সম্মুখীন হলেই সে নিজেকে বলে :

"ধরা যাক, এন. এন. দেশকে ও জারকে ঠকিয়েছে, আর দেশ ও জার তাকেই সম্মানে ভূষিত করেছে, কিন্তু তাতে কি হয়েছে ? গতকাল সে আমার দিকে তাকিয়ে হেসেছে, আমাকে আবার যেতে বলেছে, আর আমি তাকে ভালবাসি, এবং সেকথা কেউ কোনদিন জানবে না।" সঙ্গে সঙ্গে তার মন শান্ত হয়ে যায়।

পিয়ের এখনও সমাজে আসা-যাওয়া করে, আগের মতই মদ খায়, সেই একই অলস, ইন্দ্রিয়াসক্ত জীবন যাপন করে, কারণ রস্তভদের বাড়িতে যতটা সময় সে কাটায় তারপরেও অনেক সময় তার হাতে থাকে ; আর মস্কোতে থেকে যেসব অভ্যাস ও পরিচয় সে গড়ে তুলেছে তাদের স্রোত দুর্বার বেগে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যতই বেশী করে খারাপ সংবাদ আসতে লাগল, আর নাতাশার স্বাস্থ্য যতই ভাল হতে থাকল, ততই তার প্রতি সযত্ন করুণা ও অবিরাম চঞ্চলতায় ভাটা পড়তে লাগল। তার কেবলই মনে হতে লাগল, যে অবস্থায় সে আছে সেটা দীর্ঘদিন চলতে পারে না, এমন একটা দুর্বিপাক আসছে যা তার সমগ্র জীবনটাকেই বদলে দেবে, আর সেই আসন্ন দুর্বিপাকের লক্ষণই সে সর্বত্র খুঁজে বেড়াতে লাগল। একজন গুরুভাই "সন্ত জন-এর প্রত্যাদেশ" থেকে নেপোলিয়ন সম্পর্কে নিম্নলিখিত ভবিষ্যদ্বাণী পিয়েরের কাছে প্রকাশ করেছে।

(নিউ টেস্টামেন্ট-এর শেষ পর্ব) অ্যাপোক্যালিপ্স-এর ১৩ অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে বলা হয়েছে :

এই তো জ্ঞানের কথা। যার বুদ্ধি আছে সে পশুর সংখ্যাটা গণনা করুক : কারণ সেটাই তো মানুষের সংখ্যা ; আর তার সংখ্যা হল ছয়শত তিনকুড়ি ছয়।

আর সেই একই অধ্যায়ের পঞ্চম শ্লোকে আছে :

আর তাকে একটা মুখ দেওয়া হয়েছিল মহৎ বাণী ও অপবিত্র বাণী উচ্চারণ করতে ; আর তাকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল চল্লিশ ও দুই মাস চলবার।

ফরাসী বর্ণমালা যদি হিব্রুদের সংখ্যাগত মূল্য অনুসারে এমনভাবে লেখা যায় যেখানে প্রথম নটি অক্ষর একককে বোঝায় এবং বাকিগুলো দশককে বোঝায়, তাহলে তার তাৎপর্য দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	20	30	40

o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160

L'Empereur Napoleon শব্দগুলি যদি সংখ্যা দিয়ে লেখা যায় তাহলে তাদের যোগফল দাঁড়াবে ৬৬৬, আর তাহলে নেপোলিয়নই হল সেই পশু যার কথা অ্যাপোক্যালিপ্স-এ আগেই বলে দেওয়া হয়েছে। (Empereur-এর আগেকার Le শব্দ থেকে e অক্ষরের বিলোপ ঘটানোর ফলে তার দরুণ ৫ ধরে নিয়ে।) তাছাড়া, যে পশুকে "একটা মুখ দেওয়া হয়েছিল মহৎ বাণী ও অপবিত্র বাণী উচ্চারণ করতে" তাকে বোঝাবার জন্য যে quarante-deux (বিয়াল্লিশ) শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে তার উপরেও ঐ একই পদ্ধতি প্রয়োগ করলে সেই একই ৬৬৬ সংখ্যাটাই পাওয়া যায় ; তার থেকে এটাই ধরে নেওয়া যায় যে নেপোলিয়নের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার শেষ সীমা সেই ১৮১২ সাল যখন ফরাসী সম্রাটের বয়স হবে বিয়াল্লিশ। এই ভবিষ্যদ্বাণীতে পিয়ের খুবই খুশি হল ; কেমন করে সেই পশু অর্থাৎ নেপোলিয়নের ক্ষমতার অবসান ঘটবে—এই প্রশ্নটা সে প্রায়ই নিজেকে করতে লাগল, এবং তাই নিয়েই মেতে রইল।

পিয়ের রস্তভদের কথা দিয়েছিল যে জনসাধারণের কাছে আবেদন ও সেনাদলের সর্বশেষ সংবাদ সে কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের কাছ থেকে এনে দেবে। সেই উদ্দেশ্যে রবিবার সকালে রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে সেখানে সেনাদল থেকে সদ্য-আগত একজন সংবাদ-বাহকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে

গেল। লোকটি তার পরিচিত ; মস্কোর অনেক বল-নাচে সে অংশ নিয়েছে।

সংবাদ-বাহকটি বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, দয়া করে আমার কিছু কাজ হাল্কা করে দিন। বাবা-মাদের জন্য আমি এক বস্তাভর্তি চিঠি নিয়ে এসেছি।"

সেই চিঠিগুলির মধ্যে একটা চিঠি নিকলাস রস্তভ লিখেছে তার বাবাকে। পিয়ের সে চিঠিটা নিল ; রস্তপ্‌চিন তাকে দিল সত্মমুদ্রিত সম্রাটের আবেদন-পত্র, সেনাবাহিনীর প্রতি সর্বশেষ হুকুমনামা, এবং একেবারে সাম্প্রতিক একটা সংবাদ-বুলেটিন। সেনাবাহিনীর হুকুমনামায় চোখ বুলিয়ে পিয়ের দেখতে পেল, নিহত, আহত ও পুরস্কৃতদের তালিকায় রয়েছে নিকলাস রস্তভের নাম ; অস্ত্রভ্‌নার যুদ্ধে সাহস প্রদর্শনের জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে চতুর্থ শ্রেণীর সেণ্ট জর্জের ক্রস। সেখানে প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্‌কন্‌স্কির নামও আছে ; তাকে অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের কম্যাণ্ডার-পদে নিযুক্ত করা হয়েছে। রস্তভ-পরিবারে বল্‌কন্‌স্কির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সে চায় না ; অবশ্য ছেলের সম্মান লাভের সুখবরটা তাদের না জানিয়ে সে পারবে না। তাই সেনাদলের মুদ্রিত হুকুমনামা এবং নিকলাসের চিঠিটা সে রস্তভদের কাছে পাঠিয়ে দিল, আর আবেদন-পত্র, বুলেটিন ও অন্য হুকুমনামাগুলি নিজের কাছেই রেখে দিল ; ডিনারে যাবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে আলোচনাকালে তার কণ্ঠস্বরের উদ্বেগ, সংবাদ-বাহিনীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সেনাদলের খারাপ অবস্থা সম্পর্কে তার মন্তব্য, মস্কোতে গুপ্তচর আবিষ্কারের গুজব, এমন একটি বিজ্ঞপ্তির ব্যাপক প্রচার যাতে বলা হয়েছে যে নেপোলিয়ন হেমন্তকালের মধ্যেই রাশিয়ার উভয় রাজধানীতে পদার্পণ করতে কৃতসংকল্প, আর ঠিক পরদিনই সম্রাটের এখানে আসার কথা—এইসব কিছু মিলিয়ে পিয়েরের মনে আবার নতুন করে সেই উত্তেজনা ও প্রত্যাশাকে জাগিয়ে তুলল যা তার সচেতন অন্তরে জেগে আছে ধূমকেতুর আবির্ভাবের দিন থেকে, বিশেষ করে যেদিন যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে সেইদিন থেকে।

অনেকদিন থেকেই সে নিজেও সেনাদলে যোগদানের কথা ভাবছে ; হয় তো এতদিনে যোগ দিত যদি না কতকগুলি বাধা এসে দাঁড়াত। প্রথম, যে ভ্রাতৃসঙ্ঘের সদস্য হিসাবে সে তাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার মূলমন্ত্রই হচ্ছে নিরবধি শান্তি ও যুদ্ধ বর্জন ; দ্বিতীয়, ইউনিফর্ম পরিহিত মস্কোপন্থীদের মুখে দেশপ্রেমের বুলি শুনে সেপথে হাঁটতে তার বড়ই লজ্জাবোধ হয়েছে। কিন্তু সে যে সেনাদলে যোগদানের অভিপ্রায়কে কার্যে পরিণত করতে পারে নি তার প্রধান কারণ ঐ পশুর সংখ্যা ৬৬৬ ; যে পশুটি মহৎ বাণী ও অপবিত্র বাণী উচ্চারণ করতে পারে তার ক্ষমতার একটা সময়-সীমা নির্ধারণের মহৎ কর্মে তার ভূমিকা যখন অনাদিকাল থেকেই নিয়তি-নিয়ন্ত্রিত হয়ে আছে, সেই

হেতু সে ব্যাপারে তার কোন উদ্যোগ নেওয়াই উচিত নয়, যা অবশ্যম্ভাবী তারজন্য অপেক্ষা করে থাকাই তার কর্তব্য।

অধ্যায়—২০

সব রবিবারেই যেরকম হয়ে থাকে, সেদিনও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর রস্তভদের সঙ্গে ডিনারে যোগ দেবার কথা।

তাই তাদের একলা পাবার জন্য পিয়ের একটু আগেই সেখানে হাজির হল।

এবছর সে এতই মোটাসোটা হয়েছে যে সে যদি লম্বা না হত তাহলে তাকে অস্বাভাবিক দেখাত।

বিড় বিড় করতে করতে সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল। তার কোচয়ান জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করল না সে অপেক্ষা করবে কি না। সে জানে, রস্তভদের বাড়িতে এলে তার মনিবটি মাঝরাত পর্যন্ত সেখানে থাকে। রস্তভদের পরিচারক ছুটে এসে তার জোব্বা, টুপি ও লাঠি হাতে নিল। ক্লাবের অভ্যাস মত পিয়ের সব সময়ই টুপি ও লাঠি বাইরের ঘরে রেখে যায়।

প্রথমেই দেখা হল নাতাশার সঙ্গে। দেখা হবার আগে জোব্বা খুলবার সময়ই তার গলা সে শুনেছে। গানের ঘরে সে গলা সাধছিল। পিয়ের জানে, অসুখ হবার পর থেকে নাতাশা গান করে না। তাই তার গলা শুনে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হল। আস্তে দরজাটা খুলে তাকে দেখতে পেল; লিলাক-রঙের পোশাক পরে গান গাইতে গাইতে সে ঘরময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। দরজা খোলার সময় নাতাশার পিঠ ছিল পিয়েরের দিকে, কিন্তু দ্রুত ঘুরতে গিয়ে তার বিস্মিত মুখটা দেখেই নাতাশা আরক্ত মুখে তার কাছে ছুটে এল।

কৈফিয়তের সুরে বলল, "আমি আবার গান করতে চাই; তবু তো একটা কিছু করা হবে।"

"চমৎকার কথা!"

"আপনি আসায় কত খুশি হয়েছি! আজ আমি খুব সুখী।" নাতাশার এমন সজীবতা পিয়ের অনেকদিন দেখে নি। "আপনি কি জানেন, নিকলাস সেণ্ট জর্জের ক্রস পেয়েছে? তাকে নিয়ে আমার কত গর্ব।"

"হ্যাঁ, ঘোষণাটা আমিই পাঠিয়েছি। কিন্তু আপনাকে আর বাধা দেব না," বলেই পিয়ের বৈঠকখানায় চলে যাচ্ছিল।

নাতাশা তাকে থামাল।

সলজ্জভাবে বলল, "কাউণ্ট, গান করা কি অন্যায়?"

"না....তা কেন হবে? বরং....কিন্তু আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন?"

নাতাশা তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "আমি নিজে ঠিক বুঝতে পারি না,

কিন্তু আপনার অমতে কোন কাজ করতে আমি চাই না। আপনাকে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। আপনি যে আমার কাছে কত বড়, আমার জন্য যে কত করেছেন তা আপনি জানেন না…" তাড়াতাড়ি কথাগুলি বলতে থাকায় একথা শুনে পিয়েরের মুখ যে লাল হয়ে উঠেছে সেটা নাতাশার নজরে পড়ে নি। "সেই সামরিক হুকুমনামাই আমি দেখেছি যে সে, বল্‌কন্‌স্কি (অতি দ্রুত ফিস্‌ফিস্‌ করে সে নামটা বলল) রাশিয়াতেই আছে, এবং আবার সেনাদলেই যোগ দিয়েছে। আপনি কি মনে করেন? সে কি কোনদিন আমাকে ক্ষমা করবে? আমার প্রতি কি সবসময়ই তিক্ত মনোভাব পোষণ করবে না? আপনি কি মনে করেন? আপনি কি মনে করেন?"

পিয়ের জবাব দিল, "আমি মনে করি…তার ক্ষমা করার কিছু নেই…তার জায়গায় যদি আমি হতাম…"

ভাবানুষঙ্গক্রমে পিয়ের তৎক্ষণাৎ সেই দিনটিতে ফিরে গেল যেদিন নাতাশাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলেছিল, সে যদি নিজে না হয়ে পৃথিবীর একজন সেরা লোক হত, স্বাধীন হত, তাহলে নতজানু হয়ে সে তার পানিপ্রার্থনা করত; সেই একই করুণা, মমতা ও ভালবাসার অনুভূতি আজও তাকে পেয়ে বসেছে, আর সেই একই কথা তার ঠোঁটের আগায় এসেছে। কিন্তু সে কথাগুলি বলার অবসর নাতাশা তাকে দিল না।

সে বলে উঠল, "হ্যাঁ, আপনি…আপনি…সেকথা স্বতন্ত্র। আপনার চাইতে দয়ালু, উদার ও ভাল লোক আমি দেখি নি; কেউ তা হতেও পারে না! সেদিন যদি আপনি না থাকতেন, বা এখনও না থাকতেন, তাহলে আমার যে কী হত তা আমি জানি না, কারণ…"

হঠাৎ তার চোখে জল এসে গেল; মুখটা ঘুরিয়ে গানটাকে চোখের সামনে মেলে ধরে সে আবার গাইতে শুরু করল, আবার ঘরময় হাঁটতে লাগল।

ঠিক সেইসময় পেত্‌য়া বৈঠকখানা থেকে ছুটে এল।

পনেরো বছরের সুন্দর ছেলেটি; মুখখানি গোলাপী, ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল, দেখতে নাতাশার মত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার জন্য তৈরি হচ্ছে, কিন্তু সম্প্রতি সে ও তার বন্ধু অবলেন্‌স্কি স্থির করেছে হুজার-বাহিনীতে যোগ দেবে।

এবিষয়ে পিয়েরের মতামত জানবার জন্যই সে ছুটে এসেছে।

তার হাতটা ধরে পেত্‌য়া বলল, "আচ্ছা, আমার মতলবটা কেমন? ঈশ্বরের দোহাই পিতর কিরিলিচ! আপনি আমার একমাত্র ভরসা!"

"ওঃ হ্যাঁ, তোমার সেই মতলব। হুজার-বাহিনীতে যোগ দেওয়া তো? আজই বলব, সব কথা তুলব।"

বুড়ো কাউণ্ট বলল, "আচ্ছা বাবা, তোমার কাছে কি ইস্তাহারটা আছে? কাউণ্টেস রাজুমভ্‌স্কির প্রার্থনা অনুষ্ঠানে গিয়েছিল; সেখানেই নতুন প্রার্থনাটা

শুনে এসেছে। সে তো বলল খুব ভাল হয়েছে।"

পিয়ের বলল, "হ্যাঁ, আমার কাছে আছে। সম্রাট কাল এখানে আসছেন। ···ভদ্রজনদের একটা বিশেষ সভা হবে; শোনা যাচ্ছে, প্রতি হাজারে দশ জনের যুদ্ধে যোগদান করা বাধ্যতামূলক হবে। ওঃ হ্যাঁ, আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! আচ্ছা, যুদ্ধের সংবাদ কি?"

"আমরা আবার পশ্চাদপসরণ করছি। শোনা যাচ্ছে, এরমধ্যেই আমরা স্মোলেন্স্কের কাছে এসে গেছি," পিয়ের জবাব দিল।

"হে প্রভু, প্রভু হে!" কাউন্ট বলে উঠল। "ইস্তাহারটা কোথায়?"

"সম্রাটের আবেদন? ঠিক আছে!"

পিয়ের পকেট হাতড়াতে লাগল, কিন্তু পেল না। সেইসময় কাউণ্টেস ঘরে ঢুকল। পিয়ের তার হাতে চুমো খেল।

"কী মুস্কিল, কোথায় যে সেটা রাখলাম," পিয়ের বলল।

"এই এক ছেলে, সবসময় সব কিছু হারায়," কাউণ্টেস বলল।

নাতাশা ঘরে ঢুকল। নীরবে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে বসল। সে ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পিয়েরের বিষণ্ণ মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল; ইস্তাহারটা খুঁজতে খুঁজতেই বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল।

"না, সত্যি! এখনই বাড়ি যাচ্ছি, নিশ্চয় সেখানে ফেলে এসেছি। এখনই যাচ্ছি····"

"কিন্তু তোমার যে খেতে দেরি হয়ে যাবে।"

"তাই তো! আর আমার কোচয়ানও তো চলে গেছে।"

কাগজপত্র খুঁজতে বাইরের ঘরে গিয়ে সোনিয়া সেগুলি পেয়ে গেছে। পিয়ের সেগুলি যত্ন করে তার টুপির লাইনিং-এর ভিতর গুঁজে রেখেছিল। ইস্তাহারটা হাতে নিয়ে পিয়ের সেটা পড়তে গেল।

বুড়ো কাউণ্ট বাধা দিয়ে বলল, "না, ডিনারের পরে।" তার ইচ্ছা, বেশ আরাম করে খবরটা শুনবে।

ডিনারের সময় সেণ্ট জর্জের নতুন বীরের উদ্দেশ্যে শ্যাম্পেন পান করা হল; শিন্‌শিন্ সবিস্তারে শহরের সংবাদ পরিবেশন করল: জর্জিয়ার বৃদ্ধা প্রিন্সেসের অসুখ, মস্কো থেকে মেতিভিয়ের-এর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, ফরাসী "টিকটিকি" সন্দেহে জনৈক জার্মানকে ধরে রস্তপ্‌চিনের কাছে নিয়ে আসা, আর রস্তপ্‌চিন কর্তৃক তাকে ছেড়ে দিয়ে জনসাধারণকে এই বলে আশ্বাস দেওয়া যে "লোকটা মোটেই টিকটিকি নয়, একটা জার্মান হাভাতেমাত্র।"

কাউণ্ট বলল, "লোকজনকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। আমি তো কাউণ্টেসকে বলে দিয়েছি, অত বেশী ফরাসী বলা ভাল নয়। ওসবের সময় এখন নয়।"

শিন্‌শিন্ শুধাল, "আর শুনেছেন কি? রুশ ভাষা শেখার জন্য প্রিন্স গলিৎসিন একজন মাস্টার রেখেছেন। রাজপথে ফরাসীতে কথা বলা এখন বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।"

বুড়ো কাউন্ট পিয়েরকে সম্বোধন করে বলল, "তোমার কি খবর কাউন্ট পিতর কিরিলিচ? তারা যদি বেসরকারী সৈনিকদের ডাক দেয় তাহলে তো তোমাকেও ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হতে হবে।"

পিয়ের আপন মনে কি যেন ভাবছিল। কথাটা বুঝতে না পেরে কাউন্টের দিকে তাকাল।

তারপর বলল, "ওঃ, হ্যাঁ, যুদ্ধের কথা। না! আমি আর কি যুদ্ধ করব? তবু এখন তো সবকিছুই অদ্ভুত, কী অদ্ভুত! আমি ঠিক বুঝতে পারি না। আমি জানিও না। যুদ্ধ-বিগ্রহ আমার মোটেই ভাল লাগে না। কিন্তু আজকের দিনে কারও নিজের কথা তো চলবে না।"

ডিনারের পরে কাউন্ট আরাম-কেদারায় আরাম করে বসে সোনিয়াকে বলল আবেদনটা পড়তে। সোনিয়া চমৎকার পড়তে পারে।

"আমাদের প্রাচীন রাজধানী মস্কোর প্রতি!

"অসংখ্য সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষ রুশ সীমান্তে ঢুকে পড়েছে। সে আসছে আমাদের প্রিয় স্বদেশকে ধ্বংস করতে।" সোনিয়া গলা চড়িয়ে পড়ছে। কাউন্ট চোখ বুজে শুনছে আর মাঝে মাঝে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে।

নাতাশা সোজা হয়ে বসে একবার বাবার দিকে, একবার পিয়েরের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

রাশিয়ার আসন্ন বিপদ, মস্কোর উপর, বিশেষ করে তার সম্ভ্রান্ত সমাজের উপর সম্রাটের ভরসার কথা পড়া শেষ করে সোনিয়া কাঁপা-কাঁপা গলায় শেষের কথাগুলি পড়তে শুরু করল: "জনসাধারণের সঙ্গে পরামর্শ করতে এবং লেভির নির্দেশ জানাতে রাজধানীতে এবং রাজ্যের অন্যসব অঞ্চলে গিয়ে হাজির হতে আমরা বিলম্ব করব না। আমাদের ধ্বংস করবার যে আশা নিয়ে শত্রু আসছে সে ধ্বংস তার নিজের মাথায়ই যেন পড়ে; দাসত্বমুক্ত ইওরোপ যেন রাশিয়ার নামে গৌরব বোধ করে!"

কাউন্ট ভেজা চোখ খুলে বার বার নাক ঝেড়ে বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক তাই! সম্রাট শুধু মুখের কথাটি বলুন, তাহলেই আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করব, কোন কিছুতেই পিছ-পা হব না।"

কাউন্টের দেশপ্রেমের উপর শিন্‌শিন্ একটা তামাসার কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই নাতাশা লাফিয়ে উঠে একদৌড়ে বাবার কাছে গেল।

"বাপি কী ভাল!" বলে সে বাবাকে চুমো খেল; তারপর নিজের অজান্তেই লাস্যময় চোখে পিয়েরের দিকে তাকাল।

"এই যে! এই তোমাদের আর এক দেশভক্ত!" শিনশিন্ বলল।

"দেশভক্ত মোটেই নয়, কিন্তু সোজা কথায়···"আহত স্বরে নাতাশা জবাব দিল। "আপনার সবকিছুতেই ঠাট্টা, কিন্তু এটা মোটেই ঠাট্টার ব্যাপার নয়···"

কাউন্ট বলল, "ঠাট্টাই বটে! ওকে ওর কথা বলতে দাও, আমরা সকলেই যাব···আমরা তো জার্মান নই!"

"কিন্তু কথাটা লক্ষ্য করেছেন কি? 'পরামর্শ করতে'?" পিয়ের বলল।

"তা সে যেজন্যই হোক···"

এতক্ষণ পেত্য়ার দিকে কেউ নজর দেয় নি। এবার সে মুখটা লাল করে বাবার কাছে এগিয়ে গেল; কখনও গম্ভীর, কখনও কর্কশ ভাঙা গলায় বলল:

"দেখ বাপি, তোমাকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, মামণিকেও বলছি, তোমরা যা খুশি মনে করতে পার, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলে দিচ্ছি, আমাকে সেনাদলে যেতে দিতেই হবে, কারণ তা না হলে···বাস, আর কিছু না···"

কাউন্টেস দুই হাত জোড় করে সভয়ে আকাশের দিকে তাকাল; তারপর সক্রোধে স্বামীর দিকে মুখ ঘোরাল।

বলল, "এই তো তোমার কথাবার্তার ফল!"

কিন্তু ততক্ষণে কাউন্ট তার উত্তেজনা কাটিয়ে উঠেছে।

বলল, "হয়েছে, হয়েছে! একজন যোদ্ধা বটে! না! যতসব বাজে কথা! তোমার এখন লেখাপড়ার বয়স!"

"মোটেই বাজে কথা নয় বাপি! ফেদিয়া অবলেন্স্কি আমার চাইতে বয়সে ছোট, আর সেও তো যাচ্ছে। তাছাড়া, আর যাই হোক, এ সময় আমি তো লেখাপড়া নিয়ে থাকতে পারি না যখন···" পেত্য়া থেমে গেল; তার মুখ লাল হতে হতে ঘাম ঝরতে লাগল, তবু সে কোনরকমে বলল, "যখন আমার পিতৃভূমি বিপন্ন।"

"খুব হয়েছে, খুব হয়েছে—যতসব···"

"কিন্তু তুমি তো নিজেই বললে সবকিছু ত্যাগ করবে।"

"পেত্য়া! থাম। আমি বলছি, থাম!" স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কাউন্ট বলল; বিবর্ণ মুখে কাউন্টেস ছেলের দিকেই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

"আর আমি বলছি—এখানে উপস্থিত পিতর কিরিলিচও তোমাকে বলবেন···"

"আমি বলছি, সব বাজে কথা। এখনও তোমার মুখ থেকে মায়ের দুধ শুকোয় নি, আর তুমি কিনা যুদ্ধে যেতে চাও! আমি বলছি, ওসব ছাড়।" ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য কাউন্ট উঠে দাঁড়াল। কাগজপত্রগুলো নিয়েই গেল; হয়তো পড়ার ঘরে ঘুমোবার আগে আর একবার পড়ার ইচ্ছা আছে।

বলল, "ওহে পিতর কিরিলিচ, চল, একটু ধূমপান করা যাক।"

পিয়ের উত্তেজিত ও অস্থির। নাতাশার উজ্জ্বল চোখের সাদর আহ্বানই তার এই অবস্থা করেছে।

"না, ভাবছি এবার বাড়ি যাব।"

"বাড়ি? সেকি, তোমার তো সন্ধ্যাটা এখানেই কাটাবার কথা।··আজকাল তো তুমি আর ঘন ঘন আস না, অথচ তুমি এলেই আমার এই মেয়েটির চোখমুখ ঝল্‌মল্‌ করে ওঠে।"

পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "তা ঠিক. আমি ভুলেই গিয়েছিলাম···· আমাকে বাড়ি যেতেই হবে···কাজ···"

"আচ্ছা, তাহলে অ রিভোয়া!" বলে কাউণ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিয়েরের চোখের দিকে সদর্পে তাকিয়ে নাতাশা শুধাল, "কেন আপনি চলে যাচ্ছেন? কেন এত বিচলিত হয়েছেন?"

পিয়ের বলতে চাইল, "কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি!" কিন্তু সে-কথা বলল না; মুখটা লাল হতে হতে চোখে জল এসে গেল; সে চোখ নামিয়ে নিল।

"কারণ আরও কমদিন আসাই আমার পক্ষে ভাল····কারণ····না, আমার কাজ আছে তাই····"

"সে কি? না, আমাকে বলুন!" দৃঢ়তার সঙ্গে শুরু করেও নাতাশা হঠাৎ থেমে গেল।

বিষণ্ণ, বিব্রত মুখে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। পিয়ের হাসতে চাইল, কিন্তু পারল না: তার হাসিতে কষ্টই প্রকাশ পেল; নিঃশব্দে নাতাশার হাতে চুমো খেয়ে বেরিয়ে গেল।

পিয়ের মনে মনে স্থির করল, আর কোনদিন রস্তভদের বাড়ি যাবে না।

অধ্যায়—২১

চূড়ান্ত আপত্তির কথা শোনার পরে পেত্‌য়া নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে অনেক কাঁদল। সে যখন নিঃশব্দে চা খেতে এল তখনও তার মুখ বিষণ্ণ, তাতে চোখের জলের দাগ; প্রত্যেকেই তাকে না দেখার ভান করল।

পরদিন সম্রাট মস্কোয় এল; রস্তভ-বাড়ির কয়েকজন ভূমিদাস তাকে দেখতে যাবার জন্য অনুমতি চেয়ে নিল। সেদিন সকালে পেত্‌য়া অনেকক্ষণ ধরে সাজ-পোশাক পরল, চুল ও কলার ঠিক করল, যাতে তাকে বেশ বয়স্ক দেখায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করল, অঙ্গভঙ্গী করল, কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, এবং শেষ পর্যন্ত কাউকে কিছু না বলে টুপিটা নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে স্থির করেছে, সোজা সম্রাটের কাছে চলে যাবে এবং তার কোন পরিষদকে বুঝিয়ে বলবে যে, ছেলেমানুষ হলেও সে,

কাউন্ট রস্তভ, দেশের সেবা করতে চায়; তার অল্পবয়স রাজভক্তির পথে বাধা হতে পারে না…পোশাক পরতে পরতে পরিষদকে বলবার মত অনেক কথাই সে মনে মনে ঠিক করে নিল।

পেত্‌য়া যতই ক্রেমলিনের দিকে এগোতে লাগল ততই ভিড় বাড়তে লাগল। ত্রিমূর্তি ফটকের ভিতরে ঢুকবার পরে ভিড়ের চাপে সে এমনভাবে দেয়ালের দিকে সরে গেল যে সে বাধ্য হয়ে থেমে গেল, আর গাড়িগুলো সশব্দে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে লাগল। পেত্‌য়ার পাশে দাঁড়িয়েছিল একটি চাষী রমণী, একটি পরিচারক, দুজন ব্যবসায়ী ও একজন বরখাস্ত সৈনিক। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরে পেত্‌য়া আবার এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল এবং কনুই তুলে পথ করতে লাগল। কিন্তু তার ঠিক সামনেই ছিল চাষী রমণীটি; কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে সে রেগে চীৎকার করে উঠল:

"ধাক্কাধাক্কি করছ কেন ছোটকর্তা? দেখতে পাচ্ছ না আমরা সকলেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি? তাহলে ঠেলছ কেন?"

"যেকেউই ঠেলতে পারে," এই কথা বলে পরিচারকটি একধাক্কায় পেত্‌য়াকে একটা নোংরা জায়গায় ফেলে দিল।

পেত্‌য়া হাত দিয়ে মুখের ঘাম মুছল; অনেক যত্ন করে পরা ভেজা কলারটা তুলে দিল।

সে বুঝতে পারল, এখন তাকে যেরকম দেখাচ্ছে তাতে তাকে সম্রাটের কাছে হাজির করা যাবে না। তার ভয় হল, পরিষদের কাছে যেতে পারলেও এ অবস্থায় সে তাকে সম্রাটের কাছে নিয়ে যেতে রাজী হবে না। অথচ এই ভিড়ের মধ্যে নিজের সাজপোশাক ঠিক করা বা অন্য কোথাও যাওয়াও সম্ভব নয়। ক্রমে সবগুলি গাড়ি চলে গেলে ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে পেত্‌য়াও ক্রেম্‌লিন স্কোয়ারে ঢুকে পড়ল। ক্রেম্‌লিন স্কোয়ার তখন লোকে লোকারণ্য। লোক যে শুধু স্কোয়ারেই ভিড় করেছে তাই নয়, আশপাশের ঢালু জায়গায় ও বাড়ির ছাদেও লোকের পর লোক।

কিছুক্ষণের জন্য ভিড় একটু পাতলা হল। তারপরেই হঠাৎ সকলে মাথার টুপি খুলে একসঙ্গে একই দিকে ছুটতে লাগল। সকলে পেত্‌য়াকে এমনভাবে চেপে ধরল যে তার শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম। সকলেই চেঁচাচ্ছে "হুর্‌রা! হুর্‌রা! হুর্‌রা!" পেত্‌য়া গোড়ালির উপরে ভর করে দাঁড়িয়েও চারদিকে শুধু মানুষ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

সকলের চোখে-মুখেই একই উত্তেজনা ও উৎসাহের প্রকাশ। পেত্‌য়ার পাশে দাঁড়িয়ে একটি বণিক-পত্নী ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল; তার গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

আঙুল দিয়ে চোখের জল মুছে সে বারবার বলছে, "বাবা! দেবদূত! মানিক!"

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে জনতা আবার সামনে ছুটতে লাগল। অন্য সকলের সঙ্গে পেত্‌য়াও দাঁতে দাঁত চেপে, হিংস্রভাবে চোখ ঘুরিয়ে, কনুইয়ের ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে যেতে চীৎকার করে বলতে লাগল "হুর্‌রা!" মনে হল, সেইমুহূর্তে সে বুঝি অন্য সকলকে, এমন কি নিজেকেও খুন করতে প্রস্তুত।

পেত্‌য়া ভাবতে লাগল, "তাহলে এই হচ্ছেন সম্রাট! না, তার কাছে আমি নিজে কোন আবেদন রাখতে পারব না,—সেটা হবে খুবই দুঃসাহসের কাজ।" কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে মরিয়া হয়ে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য লড়াই করতে লাগল। একসময় অপ্রত্যাশিতভাবে পেত্‌য়ার বুকে ও পাঁজরে এত জোরে একটা আঘাত লাগল, আর চারদিককার ভিড় তাকে এমনভাবে চেপে ধরল যে হঠাৎ তার চোখের সামনে সবকিছু কেমন ধোঁয়াটে হয়ে গেল; সে জ্ঞান হারাল। যখন সম্বিৎ ফিরে এল তখন সে দেখল, মাথার পিছনে একগুচ্ছ পাকা চুল আর পরনে একটা নোংরা নীল জোব্বা পাদরির মত দেখতে একটি লোক একহাতে তাকে তুলে ধরে অন্য হাতে ভিড়ের চাপকে ঠেকিয়ে রাখছে।

পাদরি বলছে, "এই ছেলেমানুষ ভদ্রলোকটিকে আপনারা যে পিষে মেরে ফেলছেন! কী করছেন আপনারা? আস্তে!··· এরা ওকে পিষে ফেলবে, পিষে ফেলবে!"

সম্রাট গির্জায় প্রবেশ করল। ভিড়টা আবার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পাদরি রুদ্ধশ্বাস, বিবর্ণ পেত্‌য়াকে জার-কামানের কাছে বয়ে নিয়ে গেল। পেত্‌য়ার জন্য অনেকেই দুঃখ প্রকাশ করল। যারা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল তারা তার সেবা করতে লাগল, কোটের বোতাম খুলে দিল, কামানের উঁচু বেদীর উপর তাকে বসিয়ে দিল, যারা তাকে পিষে ধরেছিল তাদের বকতে লাগল।

"এরকম অবস্থায় পড়লে তো মানুষ মরতেই পারে! এসবের অর্থ কি? মানুষকে খুন করা! আহা বেচারি, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে!"—নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল।

অচিরেই পেত্‌য়া আত্মস্থ হল; তার মুখের রং ফিরে এল, ব্যথাটা চলে গেল; বরং সেই সাময়িক কষ্টের মূল্যে কামানের পাশে এমন একটা জায়গা পেয়ে গেছে যেখান থেকে ফিরবার পথে সে সম্রাটকে দেখতে পাবে। এখন আর পেত্‌য়া আবেদন পেশ করার কথা ভাবছে না। সম্রাটকে যদি একটিবার দেখতে পায় তাহলেই সে খুশি!···

সহসা নদীর তীর থেকে কামানের গর্জন শোনা গেল। তুর্কীদের সঙ্গে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর উপলক্ষ্যে উৎসব শুরু হচ্ছে। সে দৃশ্য দেখতে সকলেই নদীর দিকে ছুটে গেল। হয়তো পেত্‌য়াও যেত, কিন্তু সেই পাদরি তাকে থামিয়ে

দিল। কামানের গর্জন তখনও চলেছে। অফিসার, সেনাপতি ও পারিষদের দলও গির্জা থেকে ছুটে বেরিয়ে এল; তাদের পিছনে অন্যরা এল ধীরেসুস্থে: আবার সকলেই মাথার টুপি খুলে সেইখানে ফিরে এল। অবশেষে ইউনিফর্ম ও চাদর গায়ে চারটি লোক গির্জার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। পুনরায় ভিড়ের ভিতর থেকে চীৎকার উঠল "হুর্‌রা! হুর্‌রা!"

"তিনি কোন্ জন? কোন্ জন?" অশ্রুসিক্ত গলায় পেত্‌য়া আশেপাশের লোকদের জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউ জবাব দিল না; সকলেই সমান উত্তেজিত। আনন্দের অশ্রুতে দুই চোখ ভরে আসায় ভাল করে দেখতে না পেলেও সেই চারজনের একজনের উপর স্থির দৃষ্টি রেখে—যদিও আসলে সে লোকটি সম্রাট নয়—পেত্‌য়া মহা উৎসাহে পাগলের মত চীৎকার করে উঠল "হুর্‌রা!" মনে মনে সংকল্প করল, যাই ঘটুক না কেন আগামীকাল সে সেনাদলে যোগ দেবেই।

জনতা সম্রাটের পিছনে ছুটতে লাগল, রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করল, তারপর যার যার মত সরে পড়তে লাগল। বেলা অনেক হয়েছে। পেত্‌য়া কিছুই খায় নি, শরীর ঘামে ভিজে গেছে; তবু সে বাড়ি না ফিরে তখনও প্রাসাদের সামনে যে ভিড় জমেছিল তাদের সঙ্গেই রয়ে গেল। সম্রাট তখন ডিনার খাচ্ছে। সে প্রাসাদের জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। কিসের আশায় তা সে নিজেই জানে না। সম্রাটের সঙ্গে ডিনার খেতে বিশিষ্ট ব্যক্তি যারা ফটক দিয়ে ঢুকছে, তাদের দেখে আর দরবারের যেসব পরিচারক খাবার পরিবেশন করছে জানালাপথে চকিতে তাদের দেখে সমবেত জনতার সঙ্গে পেত্‌য়ার মনেও কেমন যেন ঈর্ষা দেখা দিল।

সম্রাট ডিনার খাচ্ছে। সেইসময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ভালুয়েভ বলল:

"ওরা এখনও ইয়োর ম্যাজেস্টিকে আর একবার দেখবার আশায় রয়েছে।"

একটা বিস্কুট চিবুতে চিবুতে সম্রাট উঠে গিয়ে ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়াল। পেত্‌য়াসহ ভিড়ের লোকরা সকলেই ব্যাল্‌কনির দিকে ছুটল।

"দেবদূত! সোনা-মানিক! হুর্‌রা! বাবা!"…জনতা চীৎকার করে উঠল। পেত্‌য়াও গলা মেলাল। যেসব নরনারী দুর্বলচিত্ত তারা আনন্দে আবার কেঁদে ফেলল। পেত্‌য়াও তাদেরই একজন।

বিস্কুটের যে বড় টুকরোটা সম্রাটের হাতে ছিল সেটা ভেঙে প্রথমে ব্যাল্‌কনির আল্‌সেতে এবং পরে মাটিতে পড়ে গেল। যে কোচয়ানটি খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল সে একলাফে সামনে গিয়ে সেটা তুলে নিল। ভিড়ের ভিতর থেকে আরও কয়েকজন কোচয়ানের দিকে ছুটে গেল। তা দেখে সম্রাট এক প্লেটভর্তি বিস্কুট আনিয়ে সেগুলো ছুঁড়ে দিতে লাগল। পেত্‌য়ার চোখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল; জনতার চাপে পিষ্ট হবার বিপদের কথা ভেবে আরও

বেশী উত্তেজিত হয়ে সেও বিস্কুটের দিকে ছুটে গেল। কেন যে গেল তা সে জানে না; কিন্তু জারের হাতের একটা বিস্কুট তাকে পেতেই হবে; কোন মতেই সে হার মানবে না। একটি বুড়ি একটা বিস্কুট ধরতে যাচ্ছিল; এক লাফে এগিয়ে গিয়ে পেত্‌য়া তাকে ফেলে দিল; মাটিতে পড়ে গিয়েও বুড়ি হার মানল না—বিস্কুট নেবার জন্য হাত বাড়াল, কিন্তু তার হতে বিস্কুট পর্যন্ত পৌছল না। পেত্‌য়া হাঁটু দিয়ে বুড়ির হাতটা সরিয়ে দিয়ে একটা বিস্কুট আঁকড়ে ধরল, এবং পাছে বেশী দেরি হয়ে যায় এই আশংকায় আবার চেঁচিয়ে বলল "হুর্‌রা!" তখন তার গলার স্বর কর্কশ হয়ে উঠেছে।

সম্রাট ভিতরে চলে গেল। ভিড়ও পাতলা হয়ে গেল।

"হল তো! বলেছিলাম না অপেক্ষা করলেই—আর তাই তো হল!" অনেকেই খুশিভরা গলায় বলতে লাগল।

পেত্‌য়াও খুব খুশি। কিন্তু আজকের মত সব আনন্দ শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে এবং এবার বাড়ি ফিরে যেতে হবে ভেবে তার মন খারাপ হয়ে গেল। ক্রেম্‌লিন থেকে সে সোজা বাড়ি ফিরে গেল না; বন্ধু অবলনস্কির সঙ্গে দেখা করতে গেল; তার বয়স পনেরো; সেও রেজিমেণ্টে যোগ দিচ্ছে। বাড়ি ফিরে পেত্‌য়া দৃঢ়স্বরে জানিয়ে দিল, তাকে যদি সেনাদলে ঢুকতে না দেওয়া হয় তাহলে সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবে। আর পরদিনই কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ—ব্যাপারটা পুরোপুরি মেনে না নিলেও—পেত্‌য়ার চাকরির ব্যবস্থা কোথায় করতে পারলে বিপদের সম্ভাবনা সবচাইতে কম হবে সেই খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—২২

দু'দিন পরে ১২ই জুলাই তারিখে স্লবোদা প্রাসাদের বাইরে প্রচুর গাড়ির ভিড় দেখা গেল।

বড় হলটা লোকে ভর্তি। প্রথমত, ইউনিফর্ম’পরিহিত সম্রান্ত ও ভদ্রজনরা, দ্বিতীয়, নীল কাপড়ের পুরো ঝুলের কোটপরিহিত, মেডেলশোভিত দাড়িওয়ালা বণিকের দল। সম্রান্তজনদের হলে অনবরত চলাফেরা ও গুঞ্জন-ধ্বনি চলেছে। প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সম্রাটেব প্রতিকৃতির নীচে বড় টেবিলটা ঘিরে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারগুলোতে বসেছে, কিন্তু ভদ্রজনরা বেশীরভাগই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ক্লাবে অথবা তাদের নিজ নিজ বাড়িতে এইসব সম্রান্ত লোকদের সঙ্গে পিয়েরের রোজই দেখা হয়। আজ তারা সকলেই ইউনিফর্মে সজ্জিত—কেউ পরেছে ক্যাথারিনের সময়কার পোশাক, কেউ বা সম্রাট পলের সময়কার, আবার কারও পরিধানে আলেকসান্দারের সময়কার নতুন ইউনিফর্ম। ক্ষীণদৃষ্টি, দন্তবিহীন, টাকমাথা, হলদে ও ফুলো-ফুলো, অথবা কৃশকায় ও ভাঁজ-

পড়া চামড়ার বুড়োরাই বেশী করে চোখে পড়ছে। তাদের বেশীর ভাগই চুপচাপ আসনে বসে আছে, আর হাঁটাচলা ও কথাবার্তার সময়ও অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সীদের সঙ্গে মিশছে। তাদের সকলের মুখেই একটা বিচিত্র পরস্পর-বিরোধীভাব: সাধারণভাবে একটা গুরুগম্ভীর ঘটনার প্রত্যাশায়, আবার সেইসঙ্গে দৈনন্দিন জীবনের তাসের বোস্টন-খেলা, রাঁধুনি পিতর, জিনাইদা দিমিত্রিয়েভ্‌নার স্বাস্থ্য ইত্যাদির প্রতি আগ্রহ।

সম্রাটের ইস্তাহার পড়া হল। সকলের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। তারপর শুরু হল আলোচনা। সম্রাট যখন ঢুকবে তখন মার্শালরা কোথায় দাঁড়াবে, সম্রাটের সম্মানে কখন একটা বল-নাচের আয়োজন করা হবে, তারা জেলা-ওয়াড়ি ভাগ হবে না, প্রদেশওয়াড়ি, ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা হল। কিন্তু যেই যুদ্ধের কথা উঠল, অমনি আলোচনার জোয়ারে ভাঁটা পড়ল; সকলেই বক্তা হবার বদলে শ্রোতা হতে চাইল।

পিয়েরের কিছু বলার ইচ্ছা হল। সে সবে মুখ খুলবে এমন সময় জনৈক দন্তবিহীন সেনেটর তাকে বাধা দিয়ে নীচু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলতে শুরু করল:

“মহাশয়, আমি মনে করি, বর্তমান মুহূর্তে বাধ্যতামূলক সৈন্যকরণ সাম্রাজ্যের পক্ষে ভাল, না বেসরকারী বাহিনী ডাকা হয় নি। আমাদের প্রতি যে আবেদন রেখে মহামান্য সম্রাট আমাদের সম্মানিত করেছেন তার জবাব দিতেই আমাদের ডাকা হয়েছে। বাধ্যতামূলক সৈন্যকরণ না বেসরকারী বাহিনী—এর মধ্যে কোন্‌টা শ্রেয় সে বিচার আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হাতেই ছেড়ে দিতে পারি…”

হঠাৎ পিয়ের তার উত্তেজনা প্রকাশের একটা পথ পেয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে বক্তাকে বাধা দিল। কি বলবে তা সে এখনও জানে না, কিন্তু সাগ্রহে বলতে শুরু করল—কখনও ফরাসীতে, কখনও পুঁথিগত রুশ ভাষায়।

সে বলতে শুরু করল, “ক্ষমা করবেন ইয়োর এক্সেলেন্সি। (সেনেটরটি তার পরিচিত হলেও তার মনে হল যে এখানে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বোধন করাই প্রয়োজন।) যদিও আমি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একমত নই…তার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি…তবু আমি মনে করি, কেবলমাত্র সহানুভূতি ও উদ্দীপনা প্রকাশের জন্যই এতগুলি সম্ভ্রান্ত মানুষকে এখানে ডাকা হয় নি, সেইসঙ্গে কিভাবে আমরা পিতৃভূমিকে সাহায্য করতে পারি সে উপায়ের কথাও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। আমি মনে করি, সম্রাট নিশ্চয়ই চান না যে আমরা শুধু কতকগুলি ভূমিদাসের মালিক হিসাবে সম্রাটের সেবায় তাদের নিয়োজিত করব এবং নিজেদেরও কামানের মুখে উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকব; তিনি অবশ্যই চান যে আমরা তাকে সুপরামর্শ দেব।”

পিয়ের আরও বলল, “আমি মনে করি, এইসব প্রশ্ন আলোচনা করার

আগে আমাদের সম্রাটকে জিজ্ঞাসা করা উচিত—হিজ ম্যাজেস্টির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করা উচিত—বর্তমানে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা কত এবং এই মুহূর্তে আমাদের সেনাদল কি অবস্থায় আছে; তারপরে····"

পিয়েরের মুখ থেকে এই কথাগুলি উচ্চারিত হবার সঙ্গেসঙ্গেই তিনদিক থেকে আক্রমণ শুরু হল। সবচাইতে প্রচণ্ড আক্রমণ এল তার একজন পূর্বপরিচিতের কাছ থেকে। এই বোস্টন-খেলোয়াড়টির সঙ্গে আগাগোড়াই তার খুব প্রীতির সম্পর্ক। নাম স্তেপান স্তেপানভিচ আদ্রাকৃসিন। নিজের বয়স্ক মুখের উপর একটা আকস্মিক বিদ্বেষের ভাব ফুটিয়ে আদ্রাকৃসিন চীৎকার করে পিয়েরকে বলল:

"প্রথমত, আমি আপনাকে বলতে চাই যে এবিষয়ে সম্রাটকে প্রশ্ন করবার কোন অধিকার আমাদের নেই; দ্বিতীয়ত, রুশ সম্ভ্রান্ত মহলের যদি সে অধিকার থাকেও তবু এ ধরনের প্রশ্নের কোন জবাব সম্রাট দিতে পারেন না। সৈন্য চলাচল করে শত্রুপক্ষের চলাচলের সঙ্গে তাল রেখে, আর সৈন্য সংখ্যাও বাড়ে-কমে····"

এবার ধ্বনিত হল জনৈক সম্ভ্রান্ত লোকের কণ্ঠস্বর। তার বয়স বছর চল্লিশের মত, উচ্চতা মাঝারি; কোন একসময় জিপ্‌সিদের আড্ডায় তার সঙ্গে পিয়েরের দেখা হয়েছিল; তাস-খেলুড়ে হিসাবে খুবই বাজে। সেই লোকটি পিয়েরের পাশে এসে আদ্রাকৃসিনের কথায় বাধা দিল।

বলতে লাগল, "হ্যাঁ, এটা আলোচনার সময় নয়, কাজের সময়: রাশিয়াতে যুদ্ধ চলেছে! শত্রু এগিয়ে আসছে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে, আমাদের পিতৃপুরুষদের সমাধিকে অপবিত্র করতে, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের অপহরণ করতে।" লোকটি বুকে করাঘাত করতে লাগল। "আমাদের পিতা জারের পক্ষে আমরা জেগে উঠব, প্রত্যেকে এগিয়ে যাব!" রক্তবর্ণ চোখ ঘুরিয়ে সে চীৎকার করে বলল। ভিড়ের ভিতর থেকে সমর্থন-সূচক ধ্বনি উঠল। "আমরা রুশ; আমাদের ধর্ম আমাদের সিংহাসন, আমাদের পিতৃভূমি রক্ষায় রক্ত ঢেলে দিতে আমরা পশ্চাৎপদ হব না। আমরা যদি পিতৃভূমির সন্তান হই তাহলে প্রলাপ বকা বন্ধ করতে হবে! ইওরোপকে দেখাতে হবে, রাশিয়া কেমন করে পিতৃভূমিকে রক্ষা করে।"

পিয়ের জবাব দিতে চাইল, কিন্তু কথা খুঁজে পেল না। সে বলতে চাইল, তার অর্থ, তার লোকজন, অথবা নিজেকেও উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত, শুধু অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য প্রকৃত অবস্থাটা তার জানা দরকার; কিন্তু কিছুই সে বলতে পারল না। অনেক কণ্ঠস্বর একসঙ্গে সোচ্চার হয়ে ওঠায় কাউন্ট রস্তভও তার সমর্থন জানাবার সময় পেল না। পিয়েরের বক্তৃতা যে বিফলে গেল তাই শুধু নয়, তাকে নির্মমভাবে বাধা দেওয়া হল, ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল, আর সকলে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেল। তার বক্তব্য যে তাদের

অখুশি করেছে তা নয়, আসলে জনতা হাতের কাছে এমনকিছু চায় যাকে ভালবাসা যায় এবং ঘৃণা করা যায়। পিয়ের শেষের দলে পড়ে গেল। উত্তেজিত লোকটির পরে আরও অনেক বক্তা ওই একই সুরে কথা বলল। অনেকেই বাকপটুতার সঙ্গে নতুন কথাও বলল।

"রাশিয়ান মেসেঞ্জার"-এর সম্পাদক বলল, "নরক দিয়ে নরককে প্রতিরোধ করতে হবে"; বিদ্যুতের চমক দেখে ও বজ্রের গর্জন শুনে সে একটি শিশুকে হাসতে দেখেছে, কিন্তু "আমরা সেই শিশু হব না।"

ভিড়ের পিছনের সারি থেকে সমর্থনসূচক আওয়াজ উঠল, "ঠিক, ঠিক, বজ্রের গর্জনের সামনে!"

সকলে বড় টেবিলটার কাছে গিয়ে জমায়েত হল। সেখানে বসে আছে সত্তর বছরের বৃদ্ধ অভিজাতরা; কারও মাথায় পাকা চুল, কারও বা টাক; পরনে ইউনিফর্ম ও চাদর; তাদের প্রায় সকলকেই পিয়ের তাদের বাড়িতে দেখেছে ভাঁড়দের সঙ্গে, অথবা ক্লাবে দেখেছে বোস্টন খেলতে। অবিরাম কলগুঞ্জনের সঙ্গে সেই ভিড় টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ভিড়ের চাপে উঁচু পিঠওয়ালা চেয়ারের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে বক্তারা একের পর এক বলে যেতে লাগল, কখনও দুজন একই সঙ্গে বলছে। পিয়েরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। অন্য সকলের কণ্ঠস্বরকে ছাপিয়ে বলে উঠল, "আমি শুধু বলেছি, কি প্রয়োজন সেটা জানা থাকলে ত্যাগের উদ্দেশ্যটা আরও কার্যকরী হতে পারে।"

তার কাছাকাছি একটি বৃদ্ধ ঘুরে তাকাল; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের অন্য দিক থেকে কে যেন চীৎকার করে ওঠায় তার মনোযোগ সেইদিকে ঘুরে গেল।

একজন চেঁচিয়ে বলল, "ঠিক, মস্কো আত্মসমর্পণ করবে। সেই হবে আমাদের প্রায়শ্চিত্ত!"

অন্য একজন বলে উঠল, "লোকটি মানবজাতির শত্রু। আমাকে বলতে দিন…" "ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা আমাকে চেপে মেরে ফেলছেন!…"

অধ্যায়—২৩

সেইমুহূর্তে উঁচু থুত্‌নি ও সতর্ক চোখ নিয়ে কাউন্ট রস্তপ্‌চিন ঘরে ঢুকল; ইউনিফর্ম পরা, কাঁধের উপর চাদর। দ্রুতপায়ে সে ভদ্রজনদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, "আমাদের সর্বাধীপ সম্রাট এখনই এসে পড়বেন। রাজপ্রাসাদ থেকেই আমি সোজা চলে এসেছি। যে অবস্থার মধ্যে আমরা আছি তাতে আলোচনার কিছুটা প্রয়োজন আছে। সম্রাট অনুগ্রহ করে আমাদের ও বণিকদের এখানে আহ্বান করেছেন।" বণিকদের হলটা দেখিয়ে বলল, "ওখান থেকে লক্ষ লক্ষ আসবে, কিন্তু আমাদের কাজ মানুষ সরবরাহ করা,

তাই বলে নিজেদের রেহাই দেওয়া নয়····এটুকু আমাদের করতেই হবে!"

টেবিলে উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটা বৈঠক বসল। আলোচনা-পর্ব শান্তিতেই চুকে গেল। এতক্ষণের হৈ-হল্লার পরে তাদের বার্ধক্যজীর্ণ গলায় "আমি রাজী" অথবা বড় জোর "আমারও ঐ একই মত" প্রভৃতি কথাগুলি কেমন যেন শোকাবহ শোনাল।

মস্কোর সম্রান্ত মহল এবং ভদ্রমহল প্রস্তাব নিয়েছে যে, স্মোলেন্স্ক ভদ্রমহলের মতই তারাও প্রতি এক হাজার ভূমিদাসের দরুণ দশজন করে সশস্ত্র সৈনিক সরবরাহ করবে। এই প্রস্তাবটি সচিবকে লিখে নিতে বলা হল। বৈঠক সেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভদ্রমহোদয়রা সশব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠল এবং জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরাধরি করে ঘরময় পায়চারি করতে করতে কথা বলতে লাগল।

"সম্রাট! সম্রাট!" একটা আকস্মিক চীৎকারে হলগুলি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। সকলেই ফটকের দিকে ছুটে গেল।

দুই সারি সম্রান্তজনের মাঝখান দিয়ে সম্রাট হলে প্রবেশ করল। প্রত্যেকের মুখে সশ্রদ্ধ, ভয়চকিত কৌতূহল। পিয়ের অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল, সম্রাটের সব কথা সে শুনতে পেল না। যতটুকু শুনল তাতে বুঝল যে, সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ এবং মস্কোর সম্রান্ত মহলের উপর তার ভরসার কথাই সম্রাট বলল। প্রত্যুত্তরে সদ্যগৃহীত প্রস্তাবটির কথা তাকে জানিয়ে দেওয়া হল।

সম্রাট কম্পিত গলায় বলল, "ভদ্রমহোদয়গণ! রুশ সম্রান্তজনের অনুরাগে আমি কখনও সন্দেহ করি নি, কিন্তু আজ তাদের অনুরাগ আমার প্রত্যাশাকে ছাড়িয়ে গেছে। পিতৃভূমির নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি! ভদ্রমহোদয়গণ, আসুন, আমরা কাজে নেমে পড়ি! সময় বড়ই মূল্যবান····"

সমাট থামল। সকলে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। সকলের মুখেই আনন্দের উচ্ছ্বাস।

কাউন্ট রস্তভ ফুঁপিয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ, বড়ই মূল্যবান···সম্রাটের মতই কথা।" সে পিছনে দাঁড়িয়েছিল. কিছুই শুনতে না পেলেও নিজের মত করেই সে সবকিছু বুঝে নিয়েছে।

সম্রান্ত মহলের হল থেকে সম্রাট বণিকদের হলে ঢুকল। সেখানে প্রায় দশ মিনিট কাটাল। অন্য অনেকের সঙ্গে পিয়েরও দেখল, বণিকদের হল থেকে বেরিয়ে আসার সময় সম্রাটের চোখ থেকে আবেগে জল ঝরছে। পরে জানা গেল, সেখানে ভাষণ শুরু করতে না করতেই তার চোখে অশ্রু ঝরতে শুরু করে আর কম্পিত গলায় তার ভাষণটি শেষ হয়। পিয়ের যখন সম্রাটকে বেরিয়ে আসতে দেখল তখন তার সঙ্গে ছিল দুজন বণিক; তাদের একজনকে

পিয়ের চেনে—এক পেটমোটা ot Kupshchik (মদের দোকানের মালিক)। অপরজন মেয়র—ছুঁচলো পাণ্ডুর মুখ, সরু দাড়ি। দুজনই কাঁদছে। সরু লোকটির দুই চোখ জলে ভরেছে, আর মোটা Otkupshchik শিশুর মত ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বারবার বলছে:

"আমাদের জীবন, আমাদের সম্পত্তি—সব আপনি গ্রহণ করুন ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

সেইমুহূর্তে পিয়েরের মনেও একটিমাত্র বাসনা—সেও দেখাতে চায় যে সবকিছু করতে, সর্বস্ব উৎসর্গ করতে সে প্রস্তুত। নিজের বক্তৃতার নিয়মতান্ত্রিক সুরের জন্য এখন তার লজ্জা হচ্ছে, সুযোগ পেলেই সে তা মুছে ফেলতে চায়। কাউণ্ট মামোনভ একটা রেজিমেণ্ট পাঠাবে শুনে বেজুখভ সঙ্গে সঙ্গে রস্তপ্‌চিনকে জানিয়ে দিল যে সে একহাজার সৈনিক ও তাদের খরচ দেবে।

চোখের জল না ফেললেও তার মনে যে কি হচ্ছে বুড়ো রস্তভ সেকথা তার স্ত্রীকে বলতে পারল না। তক্ষুণি পেত্‌য়ার অনুরোধ মেনে নিয়ে সে নিজে গিয়ে ছেলের নাম লিখিয়ে দিল।

পরদিন সম্রাট মস্কো ছেড়ে চলে গেল। সমবেত সম্ভ্রান্তজনরা তাদের ইউনিফর্ম খুলে ফেলে যার যার বাড়িতে ও ক্লাবে ফিরে গেল; মনের মধ্যে কিছুটা আর্তনাদ চেপে রেখে নায়েবদের সৈন্যসংগ্রহের হুকুম জারি করল; আর নিজেদের কাজে নিজেরাই অবাক হয়ে গেল।

[নবম পর্ব সমাপ্ত]

দশম পর্ব

অধ্যায়—১

নেপোলিয়ন রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেছে কারণ সে ড্রেস্‌ডেন-এ না গিয়ে পারে নি, যে সম্মান সে পেয়েছে তাতে মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, একটা পোলিশ ইউনিফর্ম গায়ে না চড়িয়ে পারে নি, জুন মাসের সকালবেলাকার উত্তেজক প্রভাবকে এড়াতে পারে নি, এবং কুরাকিন ও পরে বলাশেভের উপর রাগে ফেটে না পড়ে পারে নি।

আলেক্সান্দার আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছে কারণ সে ব্যক্তিগতভাবে অপমানিত বোধ করেছে। বার্কলে দ্য তলি সাধ্যমত সৈন্যপরিচালনা করতে চেষ্টা করেছে কারণ স্বীয় কর্তব্য পালন করে সেনাপতি হিসাবে সুনাম অর্জন করতে চেয়েছে। রস্তভ ফরাসীদের আক্রমণ করেছে কারণ সমতল মাঠের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাবার লোভ সে সামলাতে পারে নি। ঠিক সেই একইভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অসংখ্য মানুষ প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য, অভ্যাস, পরিবেশ ও উদ্দেশ্য অনুসারে কাজ করেছে। তারা কাজ করেছে ভয় অথবা অহংকারের বশে, কখনও উল্লসিত হয়েছে বা ক্ষুব্ধ হয়েছে, মনে মনে কল্পনা করেছে যে নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মত স্বাধীনভাবেই তারা কাজ করেছে, কিন্তু আসলে তারা সকলেই ইতিহাসের হাতের পুতুল, যে কাজ তারা করেছে তার আসল চেহারা তাদের কাছে ছিল লুকনো, আর আজ আমাদের কাছে স্পষ্ট ও পরিষ্কার। কর্মবীর মানুষদের এটাই অনিবার্য নিয়তি ; সামাজিক মর্যাদার যত উঁচু ধাপে তারা অধিষ্ঠিত থাকে ততই তাদের স্বাধীনতা কমতে থাকে।

১৮১২-র অভিনেতারা অনেকদিন হল রঙ্গমঞ্চও ছেড়ে চলে গেছে, তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে, একমাত্র ঐতিহাসিক ফলাফল ছাড়া সেকালের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

যে মানুষগুলো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী হয়েছিল বিধাতাপুরুষ তাদের বাধ্য করেছে এমন একটি প্রচণ্ড উদ্দেশ্য সাধন করতে যা তারা কেউ আশা করে নি—নেপোলিয়ন নয়, আলেক্সান্দার নয়, এমন কি সত্যিকারের যুদ্ধ যারা করেছিল তারাও নয়।

১৮১২-তে ফরাসী বাহিনী কেন বিধ্বস্ত হয়েছিল তার কারণ আজ আমাদের কাছে পরিষ্কার। এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না যে সে কারণ একদিকে যেমন একটা যুদ্ধকালীন অভিযানের কোনরকম প্রস্তুতি না নিয়ে রাশিয়ার একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়া, অন্যদিকে তেমনই রাশিয়ার সব

শহরগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে রুশ জনসাধারণের মনে শত্রুর প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলে যুদ্ধের চরিত্রটাকেই বদলে দেওয়া। কিন্তু সেসময় এটা কেউই বুঝতে পারে নি (এখন সেটা খুবই পরিষ্কার) যে একমাত্র এই পথেই শ্রেষ্ঠ সেনাপতির দ্বারা পরিচালিত পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আট লক্ষ সৈন্য নিয়ে গঠিত একটি বাহিনী তার অর্ধেক সৈন্য নিয়ে গঠিত এবং অনভিজ্ঞ সেনাপতিদের দ্বারা পরিচালিত রুশ বাহিনীর কাছে বিধ্বস্ত হয়ে যেতে পারে। শুধু যে কেউ এটা বুঝতে পারে নি তাই নয়, রাশিয়ার দিক থেকে একমাত্র যে পথে রাশিয়া বাঁচতে পারত সেইপথ রোধ করবার সর্বপ্রকার চেষ্টাই করা হয়েছিল, আর ফ্রান্সের দিক থেকে নেপোলিয়নের অভিজ্ঞতা এবং তথাকথিত সামরিক প্রতিভা সত্ত্বেও গ্রীষ্মের শেষে মস্কোর দিকে অগ্রসর হবার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল, অর্থাৎ ঠিক সেই কাজটি করা হয়েছিল যার ফল অনিবার্য ধ্বংস হতে বাধ্য।

১৮১২ সাল সম্পর্কে লিখিত নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থে ফরাসী লেখকরা বলে যে নেপোলিয়ন সীমান্ত সম্প্রসারণের বিপদ বুঝতে পেরেছিল, সে যুদ্ধই চেয়েছিল, তার মার্শালরা তাকে পরামর্শ দিয়েছিল সোলেন্‌স্ক্‌-এ থেমে যেতে; এই ধরনের আরও অনেক কথা বলে তারা প্রমাণ করতে চায় যে রুশ অভিযানের বিপদ তারা তখনই বুঝতে পেরেছিল। রুশ লেখকরাও আমাদের বোঝাতে ব্যগ্র যে নেপোলিয়নকে রাশিয়ার একেবারে ভিতরে টেনে আনবার মত একটা সিদীয় রণ-পরিকল্পনা অভিযানের একেবারে গোড়াতেই করা হয়েছিল; তাদের কেউ এই পরিকল্পনার রচয়িতা হিসাবে প্‌ফুয়েলের নাম করে, কেউ বা একজন বিশেষ ফরাসী ভদ্রলোকের, কেউ তল্‌-এর, আবার কেউ বা স্বয়ং আলেক্সান্দারের নাম উল্লেখ করে—এমন সব মন্তব্য, প্রকল্প ও চিঠিপত্রের কথা বলে যাতে এ ধরনের কর্মপন্থার ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও রাশিয়া উভয় তরফ থেকেই এইসব ইঙ্গিতের উল্লেখ করা হয় যেহেতু সেগুলো ঘটনার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। কিন্তু সেই ঘটনাটি না ঘটলে সেসব ইঙ্গিতের কথা লোকে ভুলে যেত, ঠিক যেমন ভুলে গেছে অন্য সম্ভাবনা সংক্রান্ত হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মন্তব্য ও প্রত্যাশা যা সেসময় প্রচলিত থাকলেও এখন লোকে ভুলে গেছে কারণ ঘটনাক্রমে সেগুলি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

সীমান্ত সম্প্রসারণের বিপদ সম্পর্কে নেপোলিয়ন সচেতন ছিল, এবং (রাশিয়ার দিক থেকে) শত্রুপক্ষকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করা হয়েছিল—এসব ভাবনা-চিন্তা ঐ একই ধরনের; নেপোলিয়ন ও তার মার্শালদের উপর ঐসব চিন্তা-ভাবনা আরোপ করতে, অথবা রুশ সেনাপতিদের উপর ঐসব পরিকল্পনা আরোপ করতে হলে ঐতিহাসিকদের কল্পনাকে বড় বেশী টানতে হবে। যা কিছু ঘটেছে সবই ও ধরনের অনুমানের ঘোর বিরোধী। যতদিন যুদ্ধ চলেছিল ততদিন ফরাসীদের রাশিয়ার ভিতরে টেনে

আনবার কোন বাসনা তো রাশিয়ার ছিলই না, বরং রাশিয়ার ভিতরে ফরাসীবাহিনীর প্রথম পদক্ষেপের সময় থেকেই তাদের থামিয়ে দিতে সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। আর নেপোলিয়নও তার অগ্রবর্তী সীমান্ত সম্প্রসারণে ভয় পাওয়া দূরে থাক, প্রতিটি পদক্ষেপকেই জয়ের লক্ষণ হিসাবে স্বাগত জানিয়েছে; যুদ্ধের উদ্যোগ নিয়ে থাকলেও সেটা নিয়েছে আলস্যভরে, পূর্বেকার অন্য অভিযানের মত আগ্রহের সঙ্গে নয়।

যুদ্ধের শুরুতে আমাদের সেনাদল ছিল বিভক্ত, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা, যদিও পশ্চাদপসরণ করে শত্রুকে দেশের ভিতরে প্রবেশ করতে প্রলুব্ধ করাই যদি আমাদের লক্ষ্য হত তাহলে সেদিক থেকে সেনাদলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করায় কোনরকম সুবিধা হবার কথা নয়। পশ্চাদপসরণ না করে রাশিয়ার মাটির প্রতিটি ইঞ্চিকে রক্ষা করার কাজে উৎসাহ যোগানোর জন্যই আমাদের সম্রাট স্বয়ং সেনাদলে যোগ দিয়েছিলেন। প.ফুয়েলের পরিকল্পনা মতই প্রকাণ্ড দ্রিসা শিবির গড়ে তোলা হয়েছিল, তখনও পশ্চাদপসরণের এতটুকু অভিপ্রায় ছিল না। পশ্চাদপসরণের প্রতিটি ধাপে সম্রাট প্রধান সেনাপতিদের তিরস্কার করেছে। শত্রুসৈন্যকে স্মোলেন্স্ক্-এ ঢুকতে দেবার চিন্তাই ছিল তার কাছে অসহ্য; মস্কোকে জ্বালিয়ে দেবার কথা তো সে ভাবতেই পারে না; আর আমাদের বিচ্ছিন্ন সেনাদলগুলি যখন সম্মিলিত হল তখন বিনা যুদ্ধে স্মোলেন্স্ক ছেড়ে আসায় ও তাকে অগ্নিদগ্ধ হতে দেওয়ায় সম্রাট খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

সম্রাটের চিন্তার ধারাটা এইরকমই ছিল; আমাদের সৈন্যরা ক্রমেই দেশের ভিতরে সরে যাচ্ছে দেখে রুশ সেনাপতিরা এবং সৈন্যরা আরও বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছিল।

আমাদের সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করে নেপোলিয়ন দেশের অনেকটা ভিতরে ঢুকে গেল; যুদ্ধ বাধাবার বেশ কয়েকটা সুযোগ তার হাতছাড়া হয়ে গেল। অগস্টে সে ছিল স্মোলেন্স্ক্-এ; তখন তার একমাত্র চিন্তা কেমন করে আরও এগিয়ে যাওয়া যায়; যদিও এখন আমরা জেনেছি যে এই অগ্রাভিযানই তার ধ্বংস ডেকে এনেছিল।

ঘটনাবলীর ধারা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মস্কোর দিকে অগ্রসর হবার বিপদ সম্পর্কে নেপোলিয়ন মোটেই অবহিত ছিল না, আর আলেক্সান্দার অথবা রুশ সেনাপতিরাও তখন তাকে ভুলিয়ে ভিতরে নিয়ে আসার কথা ভাবে নি; বরং সবটাই ছিল তার বিপরীত। নেপোলিয়নকে ভুলিয়ে দেশের ভিতরে নিয়ে আসাটা কোন পরিকল্পনার ফলশ্রুতি নয়, কারণ তখন কেউই এটাকে সম্ভব বলে মনে করত না; যুদ্ধে যারা যোগদান করেছিল অথচ অনিবার্য পরিণাম সম্পর্কে অথবা রাশিয়াকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় সম্পর্কে কোন ধারণাই যাদের ছিল না, তাদের ষড়যন্ত্র, উচ্চাভিলাষ ও

অভিপ্রায়ের জটিল ঘাত-প্রতিঘাতই তার প্রকৃত কারণ; সবকিছুই ঘটেছে আকস্মিকভাবে, অভিযানের গোড়ায় রুশ বাহিনী ছিল নানা দলে বিভক্ত। যুদ্ধ শুরু করবার উদ্দেশ্য নিয়েই আমরা বিভক্ত সেনাদলকে একত্র করতে চেষ্টা করলাম, শত্রুপক্ষের অগ্রগতিকে বাধা দিতে চাইলাম; কিন্তু অধিকতর শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধকে এড়িয়ে আমাদের সেনাদলকে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় তাদের একটা সূক্ষ্ম কোণে সরিয়ে নিতে গিয়ে ফরাসীদের স্মোলেন্স্ক্‌ যাওয়ার পথকে আমরাই পরিষ্কার করে দিলাম। ফরাসীরা আমাদের দুটো সেনাদলের মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হল বলেই যে আমরা একটা সূক্ষ্ম কোণে সরে গেলাম তা কিন্তু নয়; সে কোণ্‌টি ক্রমেই সূক্ষ্মতর হতে লাগল এবং আমরা আরও পিছনে সরে গেলাম, কারণ একজন অবাঞ্ছিত বিদেশী হিসাবে বার্কলে দ্য তলি ছিল ব্যাগ্রেশন-এর না-পছন্দ লোক (ব্যাগ্রেশনকে তার অধীনে থাকতে হত), আর ব্যাগ্রেশনও দ্বিতীয় সেনাদলের অধিনায়ক হিসাবে যতদিন সম্ভব সেনাদলকে যুক্ত করা ও তার নিজের বার্কলের অধীনস্থ হওয়াটাকে ঠেকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকল। তার কার্যকলাপ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে অবাঞ্ছিত বিদেশী বার্কলের অধীনস্থ না হবার সবরকম ফন্দি-ফিকিরই সে করেছিল, কারণ পদমর্যাদায় বার্কলে ছিল তার নীচে।

সম্রাট সেনাবাহিনীতে এসেছিল তাকে উৎসাহ দিতে, কিন্তু কোন্‌ পথে যাওয়া উচিত সে সম্পর্কে তার অজ্ঞতা এবং পরিকল্পনা ও পরামর্শদাতার আধিক্যের ফলে প্রথম সেনাদলের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল; তারা সরে গেল।

ইচ্ছা ছিল দ্রিসা শিবিরে ঘাঁটি করা হবে, কিন্তু নিজে প্রধান সেনাপতি হবার বাসনায় পলুচি অপ্রত্যাশিতভাবে আলেক্সান্দারকে এমনভাবে প্রভাবিত করল যে প্‌ফুয়েলের গোটা পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হল, আর সেনাপতিত্বের ভার পড়ল বার্কলের উপর। কিন্তু বার্কলের উপর ততটা ভরসা না থাকায় তার ক্ষমতা রইল সীমিত। সেনাবাহিনীকে ছোট ছোট দলে ভাগ করা হল, নেতৃত্বের ঐক্য রইল না, আর বার্কলে জনপ্রিয়তা হারাল; কিন্তু সেই ডামাডোল, সেনা-বিভাজন ও বিদেশী প্রধান সেনাপতির জনপ্রিয়তার অভাবের যা স্বাভাবিক পরিণতি তাই ঘটল; একদিকে, স্থির সিদ্ধান্তের অভাব ও যুদ্ধ পরিহার এবং অন্যদিকে, বিদেশীদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান ক্ষোভ ও স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাসবৃদ্ধি।

শেষপর্যন্ত সম্রাট সেনাবাহিনী ছেড়ে চলে গেল; তার এই ফিরে যাওয়ার একমাত্র সুবিধাজনক অজুহাত হিসাবে স্থির করা হল যে দেশের জন্য এই যুদ্ধে রাজধানীর লোকদের অনুপ্রাণিত করা এবং গোটা জাতিকে জাগ্রত করে তোলা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। সম্রাটের মস্কো পরিদর্শনের ফলে রুশ বাহিনীর শক্তি তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

সেনাবাহিনীর উপর প্রধান সেনাপতির অবিভক্ত নিয়ন্ত্রণ যাতে বাধা না

পায় সেই উদ্দেশ্যে, এবং যুদ্ধের স্বপক্ষে আরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাতে সম্ভব হয় এই আশায়ই সম্রাট চলে গেল, কিন্তু সৈন্যপরিচালনার ক্ষেত্রে আরও বিশৃঙ্খলা, আরও বেশী দুর্বলতা দেখা দিল। বেনিংসন, জার্রেভিচ, এবং একগাদা অ্যাড্‌জুটাণ্ট-জেনারেল থেকেই গেল প্রধান সেনাপতির উপর নজর রাখতে ও তাকে উৎসাহ দিতে, আর "সম্রাটের এইসব চক্ষুর সামনে" থাকার দরুণ বার্কলের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে লাগল, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সে আরও সতর্ক হয়ে উঠল, আর তার ফলে সেও যুদ্ধকে এড়িয়ে চলল।

বার্কলে সতর্কতার প্রতিমূর্তি। জারেভিচ বিশ্বাসঘাতকতার ইঙ্গিত করে সর্বাত্মক যুদ্ধের দাবী জানাল। লুবোমির্স্কি, ব্রনিৎস্কি, হলোকি এবং ঐ দলের অন্য সবাই মিলে এমন গোলমাল পাকিয়ে তুলল যে সম্রাটের কাছে গোপন কাগজপত্র পাঠাবার অছিলায় বার্কলে এইসব পোলিশ অ্যাড্‌জুটাণ্ট-জেনারেলদের পিতার্সবুর্গে পাঠিয়ে দিল এবং বেনিংসেন ও জারেভিচের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংঘাতে অবতীর্ণ হল।

ব্যাগ্রেশন যতই অপছন্দ করুক, শেষপর্যন্ত স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ সেনাদলগুলি একত্রিত হল।

একটা গাড়ি নিয়ে ব্যাগ্রেশন বার্কলের বাসা-বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। চাদর জড়িয়ে বার্কলে বাইরে এসে ঊর্ধ্বতন অফিসার হয়েও উদারতার এই প্রতিযোগিতায় ব্যাগ্রেশন বার্কলের নির্দেশ গ্রহণ করল, কিন্তু এই পর্যন্তই, এরপর থেকে সে কখনও বার্কলের সঙ্গে একমত হয় নি। সম্রাটের হুকুমেই ব্যাগ্রেশন সরাসরি তার কাছে এসেছিল। সম্রাটের বিশ্বাসভাজন আরাক্‌চিভকে সে লিখল; "আমার সম্রাটের যেমন অভিরুচি তাই হবে, কিন্তু এই মন্ত্রীটির (অর্থাৎ বার্কলে) সঙ্গে আমি কাজ করতে পারব না। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে অন্য কোথাও পাঠান, যদি কোন রেজিমেণ্টের সেনাপতি হিসাবে হয় তবু। এখানকার পরিবেশ আমার সহ্য হচ্ছে না। প্রধান-ঘাঁটিতে এত বেশী জার্মানদের ভিড় যে ক'জন রুশও এখানে টিঁকতে পারে না; এখানে সবকিছুই অর্থহীন। ভেবেছিলাম, আমার সম্রাট ও পিতৃভূমির সেবা করতেই এখানে এসেছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সেবা করছি বার্কলের। আমি কবুল করছি, এ সেবা করতে আমি চাই না।"

ব্রনিৎস্কি ও উইন্তসিন্‌ গেরোদদের দলবল প্রধান সেনাপতির সঙ্গে সম্পর্কটাকে তিক্ততর করে তুলল; ফলে ঐক্য বিঘ্নিত হল। স্মোলেন্‌স্কের আগেই ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সেখানকার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য একজন সেনাপতিকে পাঠানো হল। বার্কলের প্রতি ঘৃণাবশতঃ সেই সেনাপতি ঘোড়ায় চেপে তার জনৈক কোর-কম্যাণ্ডার বন্ধুর কাছে চলে গেল এবং সারাটাদিন তার কাছে কাটিয়ে ফিরে এসে বার্কলেকে

জানাল, রণক্ষেত্র হিসাবে সে জায়গাটা সবদিক থেকেই অনুপযুক্ত, যদিও জায়গাটা সে চোখেও দেখে নি।

এইভাবে ভবিষ্যৎ রণক্ষেত্র নিয়ে যখন বিতর্ক ও ষড়যন্ত্র চলছে, ফরাসীদের সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ না রেখে আমরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছি, তখন ফরাসীরা নেভেরভ্স্কির সেনাদলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে স্মোলেন্স্ক্-এর প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।

আমাদের যোগাযোগের পথগুলোকে রক্ষা করার জন্যই এই অপ্রত্যাশিত যুদ্ধে আমাদের নামতে হল। যুদ্ধ হল, আর উভয় পক্ষেরই হাজার হাজার লোক মারা গেল।

সম্রাটের এবং দেশের মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই স্মোলেন্স্ক্ পরিত্যক্ত হল। কিন্তু শাসনকর্তা কর্তৃক ভুল বোঝানোর ফলে স্মোলেন্স্ক্-এর অধিবাসীরাই শহরটা জ্বালিয়ে দিল। আর সেইসব সর্বস্বান্ত অধিবাসীরা রুশদের সামনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে মস্কো চলে গেল; শুধু নিজেদের ক্ষতির কথা ভেবেই তারা সকলের মনে শত্রুর প্রতি বিদ্বেষের আগুন জ্বালিয়ে তুলল। নেপোলিয়ন যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমরা ততই পিছিয়ে যেতে লাগলাম, এবং শেষ পর্যন্ত যে পরিণতি ঘটল তাতেই তার ধ্বংস হল

অধ্যায়—২

ছেলে চলে যাবার পরদিন প্রিন্স নিকলাস প্রিন্সেস মারিকে তার পড়ার ঘরে ডেকে পাঠাল।

বলল, "এবার? খুশি হয়েছ তো? ছেলের সঙ্গে আমার ঝগড়া বাঁধিয়ে দিয়েছ! এখন খুশি তো? এই তো তুমি চেয়েছিলে! খুব সন্তুষ্ট? ···কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি, খুব কষ্ট পাচ্ছি! আমি বুড়ো, আমি দুর্বল, আর এই তো তুমি চেয়েছিলে। বেশ তো, এবার প্রাণভরে দেখ! প্রাণভরে দেখ!"

তারপর থেকে একটা পুরো সপ্তাহ প্রিন্সেস মারি বাবার সঙ্গে দেখা করে নি। বাবা অসুস্থ; পড়ার ঘর থেকে বের হয় না।

প্রিন্সেস মারি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, এই অসুখের সময় বুড়ো প্রিন্স যে শুধু তাকেই ঘর থেকে দূরে রেখেছে তাই নয়, মাদময়জেল বুরিয়েঁকেও ঘরে ঢুকতে দেয় নি। শুধু তিখনই তার দেখাশুনা করেছে।

একসপ্তাহ পরে প্রিন্স আবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল এবং আগেকার জীবনযাত্রা শুরু করল; বাড়িঘর তৈরি ও বাগানের কাজ নিয়েই মেতে রইল। মাদময়জেল বুরিয়েঁর সঙ্গেও সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। মেয়ের প্রতি তার দৃষ্টি, তার নিরাসক্ত কণ্ঠস্বর যেন বলতে চাইছে: পেলে তো? তুমি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে, ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিয়ে প্রিন্স আন্দ্রুকে মিথ্যা কথা বলেছ, তার সঙ্গে আমার ঝগড়া বাঁধিয়েছ, কিন্তু এখন

দেখছ তো আমার কাউকে দরকার নেই—তাকেও না, তোমাকেও না!"

প্রিন্সেস মারি দিনের অর্ধেকটা সময় কাটায় ছোট্ট নিকলাসের সঙ্গে, তার পড়াশুনা দেখে, নিজেই রুশ ভাষা ও গান শেখায়, দেসালেস-এর সঙ্গে গল্প করে; দিনের বাকি সময়টা কাটায় বই নিয়ে, বুড়ি নার্সের সঙ্গে অথবা তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে।

যুদ্ধ সম্পর্কে প্রিন্সেস মারির ভাবনা-চিন্তা অন্যসব স্ত্রীলোকদেরই মত। তার যত ভয় যুদ্ধরত ভাইয়ের জন্য; যে বিস্ময়কর নিষ্ঠুরতায় একজন মানুষ আর একজন মানুষকে খুন করে তা দেখে সে স্তম্ভিত হয়, আতংকিত হয়; কিন্তু আগেকার অন্যসব যুদ্ধের মতই এ যুদ্ধেরও কোন অর্থ সে খুঁজে পায় না। দেসালেস তার সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনা করে, তীর্থযাত্রীটি এসে যুদ্ধ সংক্রান্ত নানারকম গুজব শোনায়, জুলি (এখন প্রিন্সেস দ্রুবেৎস্কয়া) মাঝেমাঝেই তাকে দেশাত্মবোধক চিঠি লেখে মস্কো থেকে।

জুলি তার ফরাসীপ্রভাবিত রুশ ভাষায় লিখেছে, "প্রিয় বান্ধবী, আমি তোমাকে রুশ ভাষাতেই লিখছি, কারণ ফরাসীদের আমি ঘৃণা করি, আর সেই একই ঘৃণাবশত ফরাসী ভাষা শোনাটাও সমর্থন করি না…আমাদের পূজ্যপাদ সম্রাটের জন্য মস্কোতে আমরা সকলেই উচ্ছ্বসিত আনন্দ বোধ করি।

"আমার বেচারা স্বামীটি ইহুদিদের সরাইখানায় কষ্ট ও ক্ষুধা সহ্য করছে, কিন্তু তার যে সংবাদ আমি পাই তাতেই আমি অনুপ্রাণিত হয়ে উঠি।

"তুমি হয় তো রায়েভ্‌স্কির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের কথা শুনেছ; দুই ছেলেকে জড়িয়ে ধরে সে বলেছে: 'এদের নিয়ে আমি মরব, তবু আমরা এতটুকু কাঁপব না।' সত্যি তো, শত্রুপক্ষ আমাদের চাইতে দ্বিগুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আমরা স্থির, অচঞ্চল রয়েছি। অন্য সময় আমরা যেমন খুশি চলি, কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধের মত! প্রিন্সেস আলিন ও সোফি সারাদিন আমার কাছেই বসে থাকে, আর জীবন্ত মানুষদের অসুখী বিধবা আমরা নানারকম আলোচনায় মেতে থাকি, শুধু তোমার মত বন্ধুকেই কাছে পাই না…" ইত্যাদি।

প্রিন্সেস মারি যে এই যুদ্ধের পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারে না তার কারণ বুড়ো প্রিন্স কখনও যুদ্ধের কথা বলে না, যুদ্ধকে স্বীকারই করে না, আর ডিনারের সময় দেসালেস যুদ্ধের কথা তুললেও হেসে উড়িয়ে দেয়। প্রিন্সের কণ্ঠস্বর এতই শান্ত ও আত্মপ্রত্যয়শীল যে প্রিন্সেস মারি অসংকোচেই তার কথা বিশ্বাস করে।

সারা জুলাই মাস বুড়ো প্রিন্স অতিমাত্রায় কর্মতৎপর, এমন কি উজ্জীবিতভাবে কাটাল। আরও একটা বাগানের পরিকল্পনা নেওয়া হল, পারিবারিক ভূমিদাসদের জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি শুরু হল। কিন্তু একটা ব্যাপারে তাকে নিয়ে প্রিন্সেস মারি উদ্বেগ বোধ করতে লাগল; আজকাল বুড়ো প্রিন্স

খুব অল্প সময় ঘুমোয়, আর আগেকার মত পড়ার ঘরে না ঘুমিয়ে প্রতিদিন ঘুমের জায়গা পাল্টে নেয়। একদিন হয়তো হুকুম করল, তার শিবির-শয্যা পেতে দিতে হবে কাঁচ-ঘরে, আর একদিন হয়তো বৈঠকখানার কোচে বা লাউঞ্জ-চেয়ারেই পোশাক না ছেড়ে ঝিমুতে লাগল; আর মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর বদলে একটি ভূমিদাস বালক এখন তাকে পড়ে শোনায়। আবার কখনও হয়তো খাবার ঘরেই রাতটা কাটায়।

প্রিন্স আন্দ্রুর দ্বিতীয় চিঠি এল ১লা অগস্ট। বাড়ি থেকে চলে গিয়েই সে প্রথম যে চিঠিটা লিখেছিল তাতে সে যা বলেছিল তার জন্য বাবার ক্ষমা চেয়ে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করেছিল। বুড়ো প্রিন্স একান্ত স্নেহে সে চিঠির জবাব দিয়েছে, এবং সেই থেকেই ফরাসী মেয়েটিকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। প্রিন্স আন্দ্রু দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছিল ভিতেব্‌স্ক্‌ শহরের কাছাকাছি জায়গা থেকে; শহরটা তখন ফরাসীরা দখল করে নিয়েছে। সেই চিঠিতে গোটা অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ তার নিজের আঁকা একটা মানচিত্র পাঠিয়েছে এবং যুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুটা পূর্বাভাষ দিয়েছে। চিঠিতে সে আরো লিখেছে, যেহেতু বল্ড্‌ হিল্‌স্‌ রণাঙ্গনের অত্যন্ত কাছে এবং সৈন্যদের যাতায়াতের একেবারে পথের উপর অবস্থিত সেইজন্য সেখানে থাকাটা এখন বিপজ্জনক; আর তাই সে তাকে মস্কো চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছে।

সেদিন ডিনারের সময় দেসালেস যখন জানাল যে ফরাসীরা ভিতেব্‌স্ক্‌ শহরে ঢুকে পড়েছে, তখন ছেলের চিঠির কথা বুড়ো প্রিন্সের মনে পড়ে গেল।

প্রিন্সেস মারিকে বলল, "আজ প্রিন্স আন্দ্রুর একটি চিঠি এসেছে; তুমি কি চিঠিটা পড় নি?"

"না বাবা," মেয়ে ভীত গলায় জবাব দিল।

পড়া তো দূরের কথা, চিঠি যে এসেছে তাই তো সে জানে না।

যুদ্ধের কথা বলতে গেলেই বিদ্রূপের হাসি হাসাটা প্রিন্সের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। তেমনই হাসির সঙ্গে সে বলল, "এই যুদ্ধের কথাই সে লিখেছে।"

দেসালেস বলল, "চিঠিটা নিশ্চয়ই খুব মনোগ্রাহী হবে। প্রিন্স আন্দ্রুর তো সবই জানবার কথা…"

"হ্যাঁ, খুবই মনোগ্রাহী।" মাদময়জেল বুরিয়েঁ বলল।

বুড়ো প্রিন্স তাকেই বলল, "যাও তো, চিঠিটা নিয়ে এস। জানই তো—ছোট টেবিলে কাগজ-চাপাটার নীচেই আছে।"

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠল।

"না, যেয়ো না!" বুড়ো প্রিন্সের চোখে ভ্রূকুটি।…"তুমি যাও মাইকেল আইভানভিচ।"

মাইকেল আইভানভিচ পড়ার ঘরে চলে গেল। কিন্তু সে ঘর থেকে

বেরিয়ে যেতেই বুড়ো প্রিন্স অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিয়ে নিজেই উঠে পড়ল।

বিড় বিড় করে বলল, "এরা কিছু করতে পারে না···সবসময় তালগোল পাকিয়ে ফেলে।"

সে বেরিয়ে যেতেই প্রিন্সেস মারি, দেসালেস, মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ, এমন কি ছোট্ট নিকলাস পর্যন্ত নিঃশব্দে দৃষ্টি-বিনিময় করল। চিঠি ও মানচিত্রটা নিয়ে মাইকেল আইভানভিচকে সঙ্গে করে বুড়ো প্রিন্স দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল। সেগুলোকে নিজের পাশেই রেখে দিল—ডিনারের সময় কাউকে পড়তে দিল না।

বৈঠকখানায় গিয়ে চিঠিটা প্রিন্সেস মারির হাতে দিল; নতুন বাড়ির প্ল্যানটা মেলে ধরে সেটার উপর চোখ রেখে প্রিন্সেস মারিকে চিঠিটা পড়তে বলল। চিঠি পড়া শেষ করে প্রিন্সেস মারি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকাল। বুড়ো প্রিন্স তখন প্ল্যানটা পরীক্ষা করে দেখতেই ব্যস্ত।

"এবিষয়ে আপনি কি মনে করেন প্রিন্স?" দেসালেস সাহস করে জিজ্ঞাসা করল।

"আমি? আমি?····" বাড়ির প্ল্যান থেকে চোখ না সরিয়েই প্রিন্স অসন্তুষ্ট গলায় বলল।

"খুব সম্ভব রণক্ষেত্র আমাদের এত কাছে সরে আসবে যে····"

"হা হা হা! রণক্ষেত্র!" প্রিন্স বলল। "আগেও বলেছি, এখনও বলছি, রণক্ষেত্র হচ্ছে পোল্যাণ্ড, আর শত্রু কখনও নিয়েমেন পেরিয়ে আসবে না।"

শত্রু যখন নীপার-এর তীরে পৌঁছে গেছে তখনও নিয়েমেনের কথা বলায় দেসালেস অবাক হয়ে প্রিন্সের দিকে তাকাল। প্রিন্সেস মারি নিয়েমেনের ভৌগোলিক অবস্থান ভুলে গিয়ে ভাবল যে তার বাবার কথাই ঠিক।

"বরফ যখন গলবে তখন পোল্যাণ্ডের জলাভূমিতেই তারা ডুবে মরবে। শুধু তারা সেটা বুঝতে পারছে না," সম্ভবত ১৮০৭ সালের অভিযানের কথা ভেবেই প্রিন্স বলতে লাগল। "বেনিংসেনের উচিত ছিল আরও আগে প্রাশিয়াতে ঢোকা, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যদিকে মোড় নিত····"

দেসালেস ভয়ে ভয়ে বলল, "কিন্তু প্রিন্স, চিঠিতে তো ভিতেব্‌স্ক্‌-এর কথা বলা হয়েছে····"

"ওঃ, চিঠি? হ্যাঁ····" প্রিন্স রেগে জবাব দিল। "হ্যাঁ···হ্যাঁ····" হঠাৎ তার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল। থামল। "হ্যাঁ, সে লিখেছে, ফরাসীদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে····কোথায়····কি যেন নদীটা?"

দেসালেস চোখ নীচু করল।

সবিনয়ে বলল, "প্রিন্স তো সেসম্পর্কে কিছু লেখেন নি।"

"লেখে নি? কিন্তু আমি তো মন থেকে ওটা বানাই নি।"

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

হঠাৎ মাথাটা তুলে বাড়ির প্ল্যানটা দেখিয়ে প্রিন্স বলে উঠল, "হ্যাঁ··· হ্যাঁ···আচ্ছা মাইকেল আইভানভিচ, বল তো কিভাবে এটাকে তুমি বদলাতে চাও····"

মাইকেল আইভানভিচ প্ল্যানটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রিন্স নতুন বাড়ি সম্পর্কে তার সঙ্গে কথা বলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে প্রিন্সেস মারি ও দেসালেসের দিকে তাকিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যাবেলা মাইকেল আইভানভিচ প্রিন্সের কথামত প্রিন্সেস মারির কাছে এসে প্রিন্স আন্দ্রুর চিঠিটা চাইল। চিঠিটা তার হাতে দিয়ে কাজটা অপ্রীতিকর হলেও জানতে চাইল, তার বাবা এখন কি করছে।

"সবসময়ই তো ব্যস্ত," সশ্রদ্ধ অথচ বিদ্রূপের হাসি হেসে মাইকেল আইভানভিচ বলল; তা দেখে প্রিন্সেস মারির মুখটা কালো হয়ে গেল। "নতুন বাড়িটা নিয়ে খুবই চিন্তায় আছেন। একটু-আধটু পড়াশুনা করেন, তবে এখন"—গলা নামিয়ে বলল—"এখন ডেস্কেই বসেছেন, মনে হচ্ছে উইল করতে ব্যস্ত আছেন।"

"আর আল্‌পাতিচকে স্মোলেন্স্ক্‌-এ পাঠানো হচ্ছে?" প্রিন্সেস মারি শুধাল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে তো যাত্রা করার জন্যই অপেক্ষা করছে।"

অধ্যায়—৩

মাইকেল আইভানভিচ যখন চিঠিটা নিয়ে পড়ার ঘরে ফিরে গেল তখন বুড়ো প্রিন্স চশমা পরে চোখের উপর একটা ঢাকা দিয়ে দেরাজ-খোলা টেবিলের সামনে বসে ছিল। টেবিলে একটা ঢাকা-দেওয়া মোমবাতি জলছে। হাতে একটা কাগজ নিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা পাণ্ডুলিপি পড়ছে। তার ভাষায় এটা তার "মন্তব্য।" তার মৃত্যুর পরে এটাকে সম্রাটের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে।

যে কাগজটা সে পড়ছে সেটা যেসময়ে লেখা হয়েছিল তখনকার স্মৃতি মনে পড়ায় প্রিন্সের দুই চোখ জলে ভরে উঠেছে। মাইকেল আইভানভিচের হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে পকেটে রাখল, কাগজটা ভাঁজ করল, তারপর আল্‌পাতিচকে ডাকল; সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আছে।

স্মোলেন্স্ক্‌ থেকে অনেকগুলো জিনিস কিনে আনতে হবে। আল্‌পাতিচ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রিন্স ঘরময় হাঁটতে হাঁটতে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে।

"প্রথমত, চিঠির কাগজ—শুনতে পাচ্ছ? আট দিস্তে, ঠিক এইরকম,

পাশে সোনালী জল লাগানো…ঠিক যেন এই নমুনা কাগজটার মত হয়। বার্নিশ, মোহর করার মোম, যেমন যেমন মাইকেল আইভানভিচের ফর্দে লেখা আছে।”

হাঁটতে হাঁটতেই হাতের চিঠিটাতে চোখ বুলিয়ে নিল।

“তারপর দলিলসংক্রান্ত চিঠিটা স্বয়ং শাসনকর্তার হাতে দেবে।”

তারপর নতুন বাড়ির জন্য ছিটকিনি কিনতে হবে; তার নিজের আঁকা নক্সার মত হওয়া চাই; আর উইল রাখবার জন্য একটা বাঁধানো খাপ তৈরি করতে দিতে হবে।

এতেই দু'ঘণ্টার উপর কেটে গেল, তবু প্রিন্স তাকে রেহাই দিল না। প্রিন্স বসে পড়ে চিন্তায় ডুবে গেল, তার চোখ বুজে এল, সে ঢুলতে লাগল। আল্‌পাতিচ একটু নড়াচড়া করল।

“আরে, চলে যাও, চলে যাও! যদি আর কিছু দরকার হয় পরে লোক পাঠাব।”

আল্‌পাতিচ বেরিয়ে গেল। প্রিন্স টেবিলে ফিরে গিয়ে টানার ভিতরে কাগজটা নাড়াচাড়া করল, আবার সেটা বন্ধ করে শাসনকর্তাকে চিঠি লিখতে টেবিলে বসল।

চিঠি সিল করে যখন উঠল তখন রাত অনেক হয়েছে। ঘুমোবার ইচ্ছা হল, কিন্তু প্রিন্স জানে যে ঘুম আসবে না; বিছানায় শুলেই যতরাজ্যের বিষণ্ণ চিন্তা এসে মাথার মধ্যে ভিড় করবে। তিখনকে ডেকে তাকে নিয়ে কোথায় রাতের মত বিছানা করতে হবে সেটা দেখিয়ে দিতে ঘরের পর ঘর পার হতে লাগল। সব জায়গাই তার না-পছন্দ। বিশেষ করে খারাপ লাগল যে কোচটাতে সে সাধারণত শোয়। সেটা ভয়ংকর মনে হবার কারণ হয়তো সেটাতে শুয়েই যতরাজ্যের দুশ্চিন্তা তার মাথায় ভিড় করেছিল। কোন জায়গাই তার পছন্দ হয় না, কিন্তু বৈঠকখানার পিয়ানোর পিছনকার কোণটা তবু কিছুটা ভাল মনে হল, কারণ সেখানে সে আগে কখনও ঘুমোয় নি।

একজন পরিচারককে নিয়ে তিখন খাটটা সেখানে নিয়ে এসে বিছানা পাততে লাগল।

“ঠিক হচ্ছে না! ঠিক হচ্ছে না!” বলে প্রিন্স নিজেই সেটাকে কোণ থেকে কয়েক ইঞ্চি টেনে এনে আবার ঠেলে দিল।

“যাহোক, শেষ পর্যন্ত কাজটা হয়েছে; এবার বিশ্রাম করব।” প্রিন্স চুপ করে দাঁড়াল; তিখন তার পোশাক খুলতে লাগল।

কোট ও ট্রাউজার খুলতে শরীরে যেটুকু টান লাগল তাতেই ভুরু কুঁচকে প্রিন্স ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ল, এবং নিজেই শুকিয়ে যাওয়া হল্‌দে পা দুটোর দিকে তাকিয়ে যেন ধ্যান করতে লাগল। পা দুটো টেনে বিছানায়

তোলাই শক্ত কাজ। "উঃ, কী শক্ত কাজ! আঃ, কবে যে এ কষ্টের শেষ হবে! কবে যে তুমি আমাকে মুক্তি দেবে!" ভাবতে ভাবতে দুই ঠোঁট চেপে ধরে বিশ হাজারতমবার সেই একই চেষ্টা করে কোনরকমে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে বিছানাটা সামনে পিছনে দুলতে লাগল, যেন বিছানাটাই জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে আর ঝাঁকুনি দিচ্ছে। প্রায় প্রতি রাত্রেই এই একই ঘটনা ঘটে। চোখ দুটো সবে বুজে আসছে এমন সময় আবার চোখ মেলল।

"শান্তি নেই! সব উচ্ছন্নে যাক!" সে বিড়বিড় করতে লাগল; কার উপর যে রাগ করছে তা সে নিজেই জানে না। "হ্যাঁ, কি যেন দরকারি কাজের কথা বাকি আছে। সিটকিনি? না, সেকথা তো তাকে বলেছি। না, কি যেন একটা বৈঠকখানা ঘরেরই কিছু। প্রিন্সেস মারি বাজে বকছিল। আর সেই গাধা দেসালেসও কি যেন বলল। আমার পকেটের কিছু—ঠিক মনে করতে পারছি না। তিখন, ডিনারের সময় আমরা কি নিয়ে কথা বলছিলাম?"

"প্রিন্স মাইকেল····"

"চুপ কর! চুপ কর!" প্রিন্স টেবিলের উপর একটা থাপ্পড় মারল। "হ্যাঁ, মনে পড়েছে, প্রিন্স আন্‌দ্রুর চিঠি! প্রিন্সেস মারি চিঠিটা পড়ল। দেসালেস ভিতেব্‌স্ক্‌ সম্পর্কে কি যেন বলল। এবার আমি সেটা পড়ব।"

পকেট থেকে চিঠিটা বের করিয়ে আনল। একগ্লাস লেমোনেড ও ঘোরানো মোমবাতি সমেত টেবিলটা বিছানার আরও কাছে আনল, তারপর চশমাটা পরে চিঠি পড়তে লাগল। রাত্রির এই নিস্তব্ধতার মধ্যে সবুজ ঢাকনার নীচে আবছা আলোয় যেন মুহূর্তের জন্য চিঠিটার অর্থ সে ধরতে পারল।

"ফরাসীরা ভিতেব্‌স্ক্‌-এ এসে গেছে; আর চার দিনের মধ্যেই স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ এসে পড়তে পারে; হয়তো ইতিমধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেছে! তিখন!" তিখন লাফ দিয়ে উঠল। "না, না, আমার কিছু চাই না!" প্রিন্স চেঁচিয়ে বলল।

মোমবাতিদানের নীচে চিঠিটা রেখে সে চোখ বুজল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল উজ্জ্বল মধ্যাহ্নের দানিয়ুব নদী: শরবন, রুশ শিবির, আর নিজের যৌবনদীপ্ত সেনাপতির মূর্তি; রক্তিম মুখে একটাও ভাঁজ পড়ে নি; সদর্প, সতর্ক পা ফেলে সে ঢুকল পোতমেকিন-এর রঙীন তাঁবুতে; সেদিনের মতই এই "প্রিয় মানুষটি"র প্রতি একটা ঈর্ষার শিখা যেন আজও তার মনে জ্বলে উঠল। তার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে যে কথাগুলি বলেছিল তাও মনে পড়ে গেল। তার সম্মুখে এসে দাঁড়াল মোটাসোটা, ঈষৎ পাংশু মুখ, বলিষ্ঠ একটি নারী, সাম্রাজ্ঞী-জননী; মুখে প্রথম সাদর অভ্যর্থনার মধুর হাসি ও বাণী; তারপরেই ভেসে উঠল কাঠের সমাধিতে শায়িত সেই একই মুখ, এবং তার হাতে চুমো খাবার অধিকার লাভের জন্য তারই শবাধারকে ঘিরে

জুবভ্-এর সঙ্গে তার যুদ্ধের দৃশ্য।

"ওঃ, দ্রুত, আরও দ্রুত! ফিরে চল সেইকালে, যাকিছু বর্তমান সব শেষ হয়ে যাক! দ্রুত, আরও দ্রুত—তারা আমাকে শান্তিতে থাকতে দিক।"

অধ্যায়—৪

প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির জমিদার-বাড়ি বল্ড হিল্‌স্ স্মোলেন্‌স্ক্ থেকে চল্লিশ মাইল পূর্বে এবং মস্কো যাবার বড় সড়কের দু'মাইল দূরে অবস্থিত।

যে সন্ধ্যায় প্রিন্স তার নির্দেশাদি দিয়ে আল্‌পাতিচকে পাঠাল সেই সন্ধ্যায়ই দেসালেস প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা করে বলল, প্রিন্সের শরীর ভাল যাচ্ছে না, আর নিজের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থাও করছে না; এদিকে প্রিন্স আন্দ্রুর চিঠি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে বল্ড হিল্‌স্-এ থাকাটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে; কাজেই আলপাতিচকে দিয়ে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হোক যুদ্ধের অবস্থা কি এবং বল্ড হিল্‌স্-এর বিপদের সম্ভাবনা কতখানি। শাসনকর্তার কাছে চিঠিটা দেসালেসই লিখে দিল; প্রিন্সেস মারি তাতে সই করল; আর আল্‌পাতিচের হাতে চিঠিটা দিয়ে তাকে বলে দেওয়া হল, সে যেন চিঠিটা শাসনকর্তার হাতে দেয় এবং কোনরকম বিপদ বুঝলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসে।

সবরকম হুকুম নিয়ে আল্‌পাতিচ সপরিবারে বেরিয়ে পড়ল। মাথায় সাদা রঙের বীভার-লোমের টুপি-প্রিন্সের দেওয়া উপহার—আর হাতে প্রিন্সের মতই একটা ছড়ি।

গাড়ির বড় ঘণ্টার শব্দ কমিয়ে রাখা ছিল, আর ছোট ঘণ্টাগুলি ছিল কাগজ দিয়ে জড়ানো। প্রিন্স কাউকেই ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়ি চালাতে দিত না, কিন্তু এই দীর্ঘ ভ্রমণে আল্‌পাতিচের ঘণ্টাগুলি বাজাবার সখ হল। তার অনুরাগীবৃন্দ—যেমন বড় করণিক, হিসাব ঘরের করণিক, বাসন ধোয়ার ঝি, রাঁধুনি, দুই বুড়ি, বাচ্চা চাকর, কোচয়ান ও পারিবারিক ভূমিদাসরা—সকলেই এসে তাকে বিদায় দিল।

তার মেয়ে এনে দিল ছিট কাপড়ের ওড়-লাগানো দুটি কুশন—একটা বসার, একটা হেলান দেবার। তার বুড়ি শ্যালিকা এনে দিল একটা ছোট পুটুলি, আর একজন কোচয়ান তাকে গাড়িতে তুলে দিল।

"এই তো! এই তো! মেয়েরাই যত গণ্ডগোল বাঁধায়! মেয়েরা! মেয়েরা!" প্রিন্সের মতই দ্রুতগতিতে কথাগুলি বলে আল্‌পাতিচ গাড়িতে উঠে বসল।

করণিককে কাজের নির্দেশাদি দিয়ে আল্‌পাতিচ টাক মাথা থেকে টুপিটা তুলে তিনবার ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

যুদ্ধ ও শত্রুপক্ষের গুজবের কথা উল্লেখ করে তার স্ত্রী চেঁচিয়ে বলল, "যদি সেরকম কিছু দেখ···তো ফিরে এসো। খৃস্টের দোহাই, আমাদের কথা মনে রেখো।"

"মেয়েরা, মেয়েরা! মেয়েরাই যত গণ্ডগোল বাঁধায়!" বিড় বিড় করতে করতে আল্‌পাতিচ যাত্রা শুরু করল।

যেতে যেতে দুই পাশের চমৎকার ফসলের দিকে খুশিমনে তাকিয়ে সে মনে মনে হিসাব কষতে লাগল কিরকম বীজ বোনা হয়েছিল আর ফসল কিরকম পাওয়া যাবে। প্রিন্স যেসব জিনিসের হুকুম করেছে সেসব মনে আছে কিনা তাও একবার ভেবে নিল।

পথে ঘোড়াগুলিকে দু'বার দানা-পানি দিয়ে ৪ঠা অগস্ট সন্ধ্যার দিকে সে শহরে পৌঁছল।

পথে মালগাড়ি ও সৈন্যদের সঙ্গে তার অনেকবারই দেখা হয়েছে। স্মোলেন্‌স্কের কাছাকাছি আসতে অনেক দূরের কামানের শব্দও কানে এসেছে। কিন্তু সে সবকে সে বিশেষ আমল দেয় নি। যেটা খুব বেশী করে তার নজরে পড়েছে সেটা হল, একটা চমৎকার যবের ক্ষেতে তাঁবু খাটানো হয়েছে, আর সৈন্যরা ঘোড়ার খাবার জন্য সব ফসল কেটে ফেলছে। কিন্তু নিজের কাজের কথায় মন দিতে গিয়ে অচিরেই সে-দৃশ্যটা সে ভুলে গেল।

ত্রিশ বছরের অধিককাল ধরে তার জীবনের সব স্বার্থ ও আগ্রহই প্রিন্সের ইচ্ছার দড়িতে বাধা; কখনও সে-সীমানা সে পার হয়ে যায় নি। প্রিন্সের হুকুমের সঙ্গে যে জিনিসের সম্পর্ক নেই তার প্রতি তারও কোন আগ্রহ নেই।

৪ঠা অগস্ট সন্ধ্যায় স্মোলেন্‌স্ক-এ পৌঁছে সে নীপার নদী পার হয়ে গাচিনা শহরতলিতে ফেরাপন্তভ-এর সরাইখানায় উঠল। গত ত্রিশ বছর ধরে সেখানেই সে ওঠে। বছর ত্রিশেক আগে আল্‌পাতিচের পরামর্শেই ফেরাপন্তভ প্রিন্সের কাছ থেকে একটা জঙ্গল কিনে ব্যবসা শুরু করেছিল; আজ সেখানে তার একটা বাড়ি, একটা সরাইখানা ও একটা ফসল কেনা-বেচার দোকান হয়েছে। শক্ত শরীর, লাল মুখ, বছর চল্লিশ বয়স, পুরু ঠোঁট, থ্যাবড়া নাকের উপর একটা আব, কালো ভুরুর উপর আরও কয়েকটা আব, পেটটি নাদা।

সুতীর শার্টের উপর ওয়েস্টকোট পরে ফেরাপন্তভ দোকানের সামনে রাস্তার উপরেই দাঁড়িয়েছিল। আল্‌পাতিচকে দেখে এগিয়ে গেল।

বলল, "এস, এস ইয়াকভ আল্‌পাতিচ। সকলে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর তুমি শহরে এলে।"

"শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন?" আল্‌পাতিচ শুধাল।

"আমিও তাই বলি। লোকগুলো বোকার ডিম! ফরাসীদের ভয়েই মরে।"

"মেয়েরাই যত গণ্ডগোল বাঁধায়!" আল্‌পাতিচ বলল।

"আমিও তাই মনে করি ইয়াকভ আল্‌পাতিচ। আমি বলি: হুকুম হয়ে গেছে তাদের ঢুকতে দেওয়া হবে না, বাস, সব ঠিক হ্যায়। আর চাষীরা সব গাড়ির ভাড়া হাঁকছে তিন রুবল—এটা খৃস্টানের মত কাজ নয়!"

ইয়াকভ আল্‌পাতিচ কথাগুলি শুনল, কিন্তু মন দিল না। নিজের জন্য একটা সামোভার আর ঘোড়ার জন্য খড় চাইল; তারপর চা খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সারারাত সরাইখানার পাশ দিয়ে সৈন্য চলতে লাগল। পরদিন সকালে গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে আল্‌পাতিচ কাজে বেরিয়ে গেল। সকালেই রোদ উঠেছে; আটটা বাজতেই বেশ গরম বোধ হতে লাগল। আল্‌পাতিচ ভাবল, ফসল কাটার পক্ষে বড় ভাল দিন।"

খুব সকাল থেকেই শহর থেকে দূরে গুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। আটটা বাজতেই বন্দুকের গুলির সঙ্গে যুক্ত হল কামানের গর্জন। রাস্তায় লোকজনের ব্যস্ত চলাফেরা, অনেক সৈন্যও চলছে, আবার গাড়ি-ঘোড়াও ছুটছে, দোকানি দোকানে বসেছে, গির্জায়-গির্জায় যথারীতি প্রার্থনা হচ্ছে। আল্‌পাতিচ দোকানে গেল, সরকারি আপিসে গেল, ডাকঘরে গেল, শাসনকর্তার ভবনে গেল। আপিসে, দোকানে, ডাকঘরে সর্বত্রই লোকে সৈন্যদের কথা ও আক্রমণকারী শত্রুদের কথাই বলাবলি করছে, কি করা উচিত জানতে চাইছে, আর পরস্পরকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে।

শাসনকর্তার বাসভবনের সামনে আল্‌পাতিচ দেখতে পেল অনেক লোকের ভিড়, কসাকরাও আছে, শাসনকর্তার দূর পাল্লার গাড়িটিও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফটকে দুজন ভূস্বামীর সঙ্গে তার দেখা হল। তাদের একজনকে সে চেনে। পুলিশের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন সেই লোকটি রেগে বলছে:

"জানেন এটা ঠাট্টার কথা নয়। আপনি যদি একা হন তো কোন কথা নেই। কথায় বলে, 'একজনের বিপদ হলে একজনই যাবে', কিন্তু এ যে তেরোজনের একটা পরিবার ও সমস্ত সম্পত্তির ব্যাপার। ....এরা আমাদের সর্বনাশ করে দিল! কেমনধারা শাসনকর্তা এরা সব? এদের ফাঁসি দেওয়া উচিত—ডাকাতের দল! ...."

"হয়েছে, হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে!" আর একজন বলল।

"শুনুক না! আমি কার তোয়াক্কা করি? আমরা তো কুকুর নই," কথাগুলি বলে পুলিশের প্রাক্তন ক্যাপ্টেন মুখ ঘোরাতেই আল্‌পাতিচকে দেখতে পেল।

"আরে, ইয়াকভ আল্‌পাতিচ, তুমি কিজন্য এসেছ?"

"হিজ এক্সেলেন্সির হুকুম, শাসনকর্তার সঙ্গে দেখা করতে হবে," কোটের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে আল্‌পাতিচ সগর্বে জবাব দিল। ...."তিনি হুকুম

করেছেন, আসল অবস্থাটা জেনে যেতে হবে।"

"তাই যাও, জেনে এস," ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বলল। "এরা সব এমন হাল করে তুলেছে যে না আছে একটা গাড়ি, না কিছু! ""ওই যে আবার শুনতে পাচ্ছ? যেদিক থেকে গুলির শব্দ ভেসে এল সেইদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল।

"আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়ল···ডাকাতের দল!" বলতে বলতে সে ফটকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

আল্‌পাতিচ মাথা দুলিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। প্রতীক্ষা-ঘরে ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক ও কর্মচারীরা নিঃশব্দে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। শাসনকর্তার ঘরের দরজা খুলল; সকলেই এগিয়ে গেল। জনৈক কর্মচারী দৌড়ে বেরিয়ে এসে একজন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলল, গলায় ক্রুশ-ঝোলানো একজন কর্মচারী ভিতরে আসতে বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আল্‌পাতিচ সামনে এগিয়ে গেল, এবং কর্মচারীটি আবার বেরিয়ে আসতেই একটা হাত বোতাম-আঁটা কোটের উপর রেখে তাকে ডেকে দুটো চিঠি তার হাতে দিল।

"প্রধান সেনাপতি প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির কাছ থেকে হিজ অনার ব্যারন আশ-কে", এমন গম্ভীরভাবে সে কথাগুলি বলল যে কর্মচারীটি তার দিকে ঘুরে চিঠি দুখানা নিল।

কয়েকমিনিট পরেই আল্‌পাতিচকে ভিতরে ডেকে শাসনকর্তা তাড়াতাড়ি করে তাকে বলল:

"প্রিন্স ও প্রিন্সেসকে জানিও যে আমি কিছুই জানতাম না; সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতই আমি কাজ করেছি—এই নাও..." একটা কাগজ আল্‌পাতিচের হাতে দিল। "তবু প্রিন্স যখন অসুস্থ তখন আমার পরামর্শ হল, তাদের মস্কো চলে যাওয়াই উচিত। আমিও এখনই রওনা হচ্ছি। তাদের বলে দিও····"

শাসনকর্তার কথা শেষ হল না; ধূলিধূসরিত, ঘর্মাক্তদেহে জনৈক কর্মচারী ছুটে ঘরে ঢুকে ফরাসীতে শাসনকর্তাকে কি যেন বলল। শাসনকর্তার মুখে ত্রাসের চিহ্ন ফুটে উঠল।

আল্‌পাতিচের দিকে মাথা নেড়ে "চলে যাও" বলেই সে কর্মচারীটিকে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

আল্‌পাতিচ বেরিয়ে আসতে সকলেই উৎসুক, ভয়ার্ত, অসহায় দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। গুলি গোলার শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। আল্‌পাতিচ দ্রুতগতি সরাইখানায় ফিরে গেল। শাসনকর্তা তাকে যে কাগজখানা দিয়েছে তাতে লেখা আছে:

"আপনাকে নিশ্চিত করে বলছি, এখনও পর্যন্ত স্মোলেন্স্ক্-এর তিলমাত্র বিপদ নেই, আর কোনরকম বিপদ ঘটবার সম্ভাবনাও নেই। একদিক থেকে

আমি আর অন্যদিক থেকে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন এগিয়ে আসছে স্মোলেন্স্ক্‌-এর আগেই একত্রে মিলিত হতে ; ২২ তারিখেই সে মিলন ঘটবে ; যে প্রদেশের নিরাপত্তার ভার আপনার উপর ন্যস্ত আছে সেখানকার সহকর্মী বন্ধুদের রক্ষা করতে সেনাদলের সম্মিলিত শক্তি ততদিন পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে যতদিন শত্রুসৈন্য আমাদের পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত না হবে, অথবা আমাদের সাহসী সেনাদলের শেষ যোদ্ধাটির মৃত্যু না হবে। এর থেকেই বুঝতে পারবেন যে স্মোলেন্স্ক্‌-এর অধিবাসীদের আশ্বাস দেবার সম্পূর্ণ অধিকার আপনার আছে, কারণ এমন দুটি সাহসী সেনাদলের দ্বারা সুরক্ষিত থেকে তারা জয়লাভ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে।" (১৮১২ সালে স্মোলেন্স্ক্‌-এর অসামরিক শাসনকর্তা ব্যারন আশকে প্রেরিত বার্কলে দ্য তলির নির্দেশ।)

লোকজন উদ্বেগের সঙ্গে রাজপথে ঘুরছে।

গৃহস্থালির বাসনপত্র, চেয়ার ও কাবার্ডে বোঝাই গাড়িগুলো উঠোনের ফটক দিয়ে বেরিয়ে রাস্তা বরাবর এগিয়ে চলেছে। ফেরাপন্তভ-এর পাশের বাড়ির সামনেও মালপত্র বোঝাই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; বিদায় নেবার কালে মেয়েরা হা-হুতাশ করে কাঁদতে লাগল। একটা ছোট কুকুর ঘেউ-ঘেউ করতে করতে ঘোড়ার সামনে ছুটে চলল।

আল্‌পাতিচ দ্রুততর পায়ে সরাইখানার উঠোনে ঢুকে যেখানে তার ঘোড়া ও গাড়ি রয়েছে সেখানে গেল। কোচয়ানটি ঘুমিয়ে আছে। তাকে ডেকে তুলে ঘোড়া জুড়তে বলে বারান্দায় উঠে গেল। গৃহকর্তার ঘর থেকে ভেসে এল একটি শিশুর কান্না, একটি স্ত্রীলোকের হতাশ চাপা আর্তনাদ, আর ফেরাপন্তভ-এর ক্রুদ্ধ চীৎকার। আল্‌পাতিচ ঢুকতেই রাঁধুনিটি ভয়ার্ত মুরগির মত ছুটাছুটি করতে লাগল।

"লোকটি বৌকে মেরে ফেলল। কর্ত্রীকে মেরে ফেলল। ···খুব মারছে··· এইভাবে টানতে টানতে নিয়ে গেছে!····"

"কিসের জন্য?" আল্‌পাতিচ শুধাল।

"এখান থেকে চলে যেতে চাইছে। মেয়ে মানুষ তো! সে বলছে, 'আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল; ছোট ছোট বাচ্চাগুলি সমেত আমাকে মেরে ফেলো না। সকলেই তো চলে যাচ্ছে, তাহলে তুমি যাবে না কেন?' আর অমনি কর্তা তাকে মারতে মারতে এইভাবে টানতে টানতে নিয়ে গেল!"

একথা শুনে আল্‌পাতিচ এমনভাবে ঘাড় নাড়ল যেন কাজটা সে সমর্থনই করছে। লোকটার কথায় কান না দিয়ে সে সরাইওয়ালার ঘরের উল্টো দিকের ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল; যেসব জিনিস সে কিনেছে সব সেখানেই রাখা হয়েছে।

"তুমি পশু, তুমি খুনী," বলতে বলতে একটি শুকনো, বিবর্ণ স্ত্রীলোক

দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি ভেঙে উঠোনে নেমে এল। তার কোলে একটি বাচ্চা, মাথার রুমাল ছেড়া।

তার পিছন পিছন বেরিয়ে এল ফেরাপন্তভ; কিন্তু আল্‌পাতিচকে দেখে ওয়েস্টকোটটা টেনে তুলে মাথার চুল ঠিক করে একটা হাই তুলল, তারপর আল্‌পাতিচকে অনুসরণ করে উল্টো দিকের ঘরটাতে ঢুকল।

"এরই মধ্যে যাচ্ছ?"

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে আল্‌পাতিচ জানতে চাইল তার কত পাওনা হয়েছে।

"হিসাব করে দেখতে হবে। আচ্ছা, তুমি তো শাসনকর্তার বাড়ি গিয়েছিলে? কি স্থির হল?" ফেরাপন্তভ শুধাল।

আল্‌পাতিচ জবাব দিল, "শাসনকর্তা স্পষ্ট করে কিছু বলে নি।"

ফেরাপন্তভ বলল, "এইসব ব্যবসাপত্তর গুটিয়ে আমরা কেমন করে চলে যাব বল? দরগোবুঝ্‌ পর্যন্ত একটা বোঝাই গাড়ি নিতে দিতে হবে সাত রুবল। আমিও বলে দিয়েছি, যারা এত টাকা দাবী করে তারা খৃস্টান নয়। এদিকে গত বৃহস্পতিবারে সেলিভানভ আচ্ছা একটা দাও মেরেছে—বস্তাপ্রতি ন' রুবল দামে সেনাদলের কাছে ময়দা বিক্রি করে দিয়েছে। একটু চা খাবে তো?"

চা খেতে খেতে তারা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। তৃতীয় কাপ শেষ করে উঠতে উঠতে ফেরাপন্তভ বলল, "আচ্ছা, এখন যেন অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। আমাদের সৈন্যরা নিশ্চয় একহাত নিয়েছে। হুকুম ছিল, শত্রুকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। কাজেই মনে হচ্ছে""লোকে বলছে, এই তো সেদিন ম্যাথু আইভানিচ প্লাতভ তাদের একেবারে মারিনা নদী পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে একদিনে আঠারো হাজারকে ডুবিয়ে মেরেছে।"

পোটলা-পুটুলি একত্র করে আল্‌পাতিচ সেগুলি কোচয়ানের হাতে তুলে দিল; তারপর সরাইওয়ালার সঙ্গে হিসাব করতে বসল। একটা ছোট গাড়ি ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল; তার চাকা, ক্ষুর ও ঘণ্টার শব্দ শোনা গেল।

বেলা পড়ে এসেছে। রাস্তার অর্ধেকটার উপর ছায়া পড়েছে, বাকি অর্ধেকটা রোদে ঝলমল করছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আল্‌পাতিচ দরজার কাছে গেল। হঠাৎ অনেক দূর থেকে একটা বিচিত্র শিসের শব্দ ভেসে এল; শোনা গেল ধপ্‌-ধপ্‌ শব্দ; তার ঠিক পরেই শোনা গেল কামানের গর্জন; ঘরের জানালাগুলো খট্‌-খট্‌ করে উঠল।

সে বাইরে গিয়ে পথে নামল। দুটি লোক ছুটতে ছুটতে তার পাশ দিয়ে সেতুর দিকে চলে গেল। নানা দিক থেকে সেই শিস এবং কামানের গোলা ফাটার ও গোলার টুকরোগুলো শহরের উপর ছিটকে পড়ার শব্দ আসতে লাগল। কিন্তু শহরের বাইরে গোলাগুলির যে শব্দ হচ্ছে তার তুলনায়

এ শব্দ এতই অস্পষ্ট যে তা লোকজনের কানেই গেল না। নেপোলিয়নের হুকুমে চারটের পর থেকে যে একশ' ত্রিশটা কামান আনা হয়েছে তা থেকেই শহরের উপর বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে। লোকজনরা প্রথমে এই গোলাবর্ষণের অর্থ বুঝতে পারে নি।

প্রথমে গোলা ও বোমা পড়ার শব্দে লোকজন শুধু কৌতূহলই বোধ করছিল। চালার নীচে দাঁড়িয়ে ফেরাপন্তভের বৌ এতক্ষণ পর্যন্ত কান্নাকাটি চালিয়ে এবার চুপ করল ; বাচ্চাকে কোলে নিয়ে ফটকের কাছে গিয়ে নীরবে লোকজনদের দিকে তাকিয়ে সেই শব্দ শুনতে লাগল।

রাঁধুনি ও দোকানের সহকারীটিও ফটকে এসে দাঁড়াল। মাথার উপর দিয়ে যে গোলাগুলিগুলো ধনুকের মত বাঁকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে একান্ত কৌতূহলের সঙ্গে সকলেই সেগুলোকে একবার দেখতে চেষ্টা করছে। কয়েকটি লোক মোড় ঘুরে কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল।

একজন বলল, "কী শক্তি দেখেছ! বাড়ির ছাদ ও সিলিং উড়িয়ে একেবারে ছাতু করে দিল।"

আর একজন বলল, "মাটিটাকে খুঁড়ে ফেলল শুয়োরের মত।"

প্রথম লোকটি হেসে উঠল, "ভারী চমৎকার ; এতে মনে সাহস আসে। ভাগ্য ভাল যে তুমি লাফ দিয়েছিলে, নইলে তো তোমাকে একেবারে সাফ করে দিত!"

আরও লোক এসে জড় হল। নানা আলোচনা হতে লাগল। ইতিমধ্যে আরও বেশী সংখ্যায় কামানের গোলা ও খোল শোঁ শোঁ শব্দে মাথার উপর দিয়ে অনবরত উড়ে যেতে লাগল ; কোনটাই তাদের কাছাকাছি পড়ল না, সবই উড়ে চলে গেল ; আল্‌পাতিচ গাড়িতে উঠছে। সরাইওয়ালা ফটকে দাঁড়িয়ে আছে।

রাঁধুনিটি লাল ঘাঘরা পরে আস্তিন গুটিয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে সকলের কথাবার্তা শুনছিল। তাকে ধমক দিয়ে সরাইওয়ালা বলল, "ওখানে হাঁ করে কি দেখছ?"

"কী আশ্চর্য ব্যাপার!" বলে চেঁচিয়ে উঠেই মনিবের গলা শুনে আস্তিন নামিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আবার সেই শিসের শব্দ, কিন্তু এবার খুব কাছে, একটা ছোট পাখির মত শোঁ করে নীচে নেমে এল ; রাস্তার মাঝখানে একটা আগুনের শিখা ঝিলিক দিল, একটাকিছু ফাটল, রাস্তাটা ধোঁয়ায় ঢেকে গেল।

"হারামজাদী! ওখানে কি হচ্ছে?" সরাইওয়ালা রাঁধুনির দিকে ছুটে গেল।

ঠিক সেইমুহূর্তে নানা দিক থেকে নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ ভেসে এল, বাচ্চাটা ভয় পেয়ে কান্না জুড়ে দিল, ভিড়ের লোকজনরা পাংশুমুখে রাঁধুনিকে

ঘিরে দাঁড়াল। তার চীৎকারই সবচাইতে জোরে শোনা যাচ্ছে।

"ও-হো-হো! বাছারা আমার, বাবারা আমার! আমাকে মেরে ফেলো না! বাবারা আমার!…"

পাঁচ মিনিট পরে রাস্তায় একটি লোকও রইল না। বোমার টুকরো লেগে রাঁধুনিটির উরু ভেঙেছে। তাকে রান্নাঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আল্‌পাতিচ, তার কোচয়ান, ফেরাপন্তভের বৌ ও ছেলেমেয়েরা, বাড়ির কুলি—সকলেই মদের ঘরে বসে কান পেতে আছে। কামানের গর্জন, উড়ন্ত গোলার ফুল্‌কি, রাঁধুনিটির করুণ আর্তনাদ,—একমুহূর্তও এসবের বিরাম নেই।

সন্ধ্যার দিকে কামানের গর্জন থেমে এল। আল্‌পাতিচ ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় দাঁড়াল। সন্ধ্যার পরিষ্কার আকাশ ধোঁয়ায় ঢেকে আছে; তার ভিতর দিয়ে অনেক উঁচুতে কাস্তের মত নতুন চাঁদটাকে আশ্চর্য দেখাচ্ছে। গোলাগুলির শব্দ থেমে যাওয়ায় শহরটা কেমন যেন চুপ হয়ে গেছে; শুধু মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ, আর্তনাদ, দূরাগত চীৎকার, আর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়া আগুনের ফট্‌-ফট্‌ শব্দ। রাঁধুনিটির আর্তনাদও জমেছে। নানারকম পোশাকধারী সৈন্যরা পথে পথে হাঁটছে বা ইতস্তত ছুটছে—ভাঙা পিঁপড়ের ঢিবি থেকে পিঁপড়েগুলো যেভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঠিক সেই-ভাবে। আল্‌পাতিচের চোখের সামনেই কয়েকটি সৈনিক ফেরাপন্তভের উঠোনে ঢুকে গেল। আল্‌পাতিচ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। একটা পশ্চাদপসরণকারী রেজিমেণ্ট এসে ভিড় করে রাস্তাটাই আটকে ফেলল।

আল্‌পাতিচকে দেখে একজন অফিসার বলল: "শহর পরিত্যক্ত হচ্ছে। পালাও, পালাও!" তারপর সৈন্যদের দিকে ফিরে বলল: "লোকের উঠোনে ঢোকার মজাটা দেখাচ্ছি!"

আল্‌পাতিচ বাড়ির ভিতর ফিরে গিয়ে কোচয়ানকে ডেকে তখনই যাত্রা করতে বলল। ফেরাপন্তভের গোটা পরিবারটিও তাদের পিছন পিছনই বেরিয়ে এল। মেয়েরা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, হঠাৎ গোধূলির অস্পষ্ট আলোয় আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পেয়ে নতুনকরে কান্না জুড়ে দিল, আর যেন তারই জবাব দিতে রাজপথের নানাদিক থেকে ভেসে এল আর্তকণ্ঠস্বর। চালার ভিতর আল্‌পাতিচ ও কোচয়ান কাঁপা হাতে ঘোড়াগুলোকে গাড়িতে যুত্‌তে লাগল।

ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে আল্‌পাতিচ দেখতে পেল, জনাদশেক সৈন্য ফেরাপন্তভের খোলা দোকানে ঢুকে গলা ছেড়ে কথা বলছে আর তাদের থলেয় ও বস্তায় ভরছে ময়দা আর সূর্যমুখীর বীচি। ঠিক তখনই ফেরাপন্তভ বাইরে থেকে ফিরে দোকানে ঢুকল। সৈন্যদের দেখে চীৎকার করতে গিয়েও হঠাৎ সে থেমে গেল, তারপর নিজের মাথার চুল টেনে ধরে একই সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে ও হাসতে হাসতে বলে উঠল:

"লুট কর, সব লুট কর বাছারা! ঐ শয়তানরা যেন কিছু না পায়!" বলতে বলতে সে নিজেই কয়েকটা বস্তা রাস্তায় ফেলে দিল।

কয়েকটি সৈনিক ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল; অন্যরা থলেভর্তি করার কাজেই ব্যস্ত রইল। আল্‌পাতিচ্‌কে দেখতে পেয়ে ফেরাপন্তভ তার দিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে বলল:

"রাশিয়ার হয়ে গেল! আমি নিজেই জ্বালিয়ে দেব। আমরাও শেষ হয়ে গেলাম!……" ফেরাপন্তভ উঠোনের দিকে ছুটে গেল।

সৈন্যরা জলস্রোতের মত পথ এগিয়ে চলেছে; ফলে রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ আটকে গেছে; বের হতে না পেরে আল্‌পাতিচ অপেক্ষা করতে লাগল। ফেরাপন্তভের বৌ ও ছেলেমেয়েরাও একটা গাড়িতে বসে অপেক্ষা করছে, কতক্ষণে পথ খুলবে কে জানে।

রাত হল। আকাশে তারা ফুটল। ধোঁয়ার আড়াল থেকে নতুন চাঁদ উঁকি দিল। সারি সারি সৈন্য ও অন্য যানবাহনের ফাঁকে ফাঁকে এগিয়ে এসে আল্‌পাতিচের গাড়ি এবং সরাইওয়ালার বৌর গাড়ি নীপার নদীর উৎরাইয়ের মুখে পৌঁছে থেমে গেল। চৌমাথার মোড়ের কাছে একটা গলিতে একটা বাড়ি ও কয়েকটা দোকান পুড়ছে। আগুন প্রায় নিভে এসেছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড় ও হৈ-হল্লা। গাড়িটা বেশকিছুক্ষণ এগোতে পারবে না বুঝতে পেরে আল্‌পাতিচ গাড়ি থেকে নেমে অগ্নিকাণ্ড দেখতে এগিয়ে গেল। সৈনিকরা অনবরত যাওয়া-আসা করছে। দুটি সৈনিক ও পশমী কোট-পরা একটি লোক একটা জ্বলন্ত কড়ি-কাঠকে টানতে টানতে রাস্তার ওপারের উঠোনে নিয়ে যাচ্ছে; অন্যরা নিয়ে যাচ্ছে আঁটি-আঁটি খড়।

ওদিকে একটা উঁচু গোলাবাড়ি জ্বলছে। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। আল্‌পাতিচ সেইদিকে এগিয়ে গেল। দেয়ালগুলো জ্বলছে, পিছনের দেয়ালটা ভেঙে পড়েছে, কাঠের ছাদটা পড়-পড়, বরগাগুলিও জ্বলছে। ভিড়ের লোকজন ছাদটা ভেঙে পড়ার জন্যই অপেক্ষা করছে; আল্‌পাতিচও তাই দেখছে।

"আল্‌পাতিচ!" হঠাৎ পরিচিত গলায় কে যেন বুড়ো মানুষটিকে ডাকল।

ছোট প্রিন্সের গলা চিনতে পেরে আল্‌পাতিচ সঙ্গে সঙ্গে বলল, "আমাদের বাঁচান! ইয়োর এক্সেলেন্সি!"

ভিড়ের পিছনে ঘোড়ার পিঠে বসে প্রিন্স আন্দ্রু আল্‌পাতিচের দিকে তাকিয়ে ছিল।

"তুমি এখানে কেন?" সে শুধাল।

"আপনার……ইয়োর এক্সেলেন্সি," বিড়-বিড় করে কথা বলতে গিয়েই আল্‌পাতিচ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। "সত্যি কি আমাদের সর্বনাশ হয়েছে?

কর্তা !…”

প্রিন্স আন্দ্রু আবার বলল, “তুমি এখানে কেন ?”

ঠিক সেইসময় আগুনটা জ্বলে ওঠায় তরুণ মনিবের ক্লান্ত, বিবর্ণ মুখটা সে দেখতে পেল। কেন সে এখানে এসেছে, আর এখন যেতে পারছে না সেই কথাই সে বুঝিয়ে বলল।

তার কথার কোন জবাব না দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু একটা নোট-বই বের করল, একটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে হাঁটুটা উঁচু করে তার উপর রেখে পেন্সিল দিয়ে লিখতে লাগল। বোনকে লিখল :

“স্মোলেন্স্ক্ আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। একসপ্তাহের মধ্যেই শত্রুরা বল্ড হিলস্ দখল করে নেবে। অবিলম্বে মস্কো যাত্রা কর। কখন রওনা হচ্ছ আমাকে জানাও। বিশেষ দূত মারফৎ উস্ভিয়াঝ্-এ খবর দাও।”

লেখা শেষ করে কাগজটা আল্পাতিচের হাতে দিয়ে প্রিন্সেস, তার ছেলে ও ছেলের শিক্ষকের যাত্রার কি ব্যবস্থা করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কোথায় তাকে জানিয়ে দিতে হবে সব কথা প্রিন্স আন্দ্রু তাকে বুঝিয়ে বলে দিল। কথা শেষ করার আগেই সেনাদলের জনৈক প্রধান কর্তা দলবলসহ ঘোড়া এসে হাজির হল।

প্রধান কর্তাটি জার্মান উচ্চারণে চেঁচিয়ে বলল, “আপনি না একজন কর্ণেল ?” দলের আর একজন বলল, “আপনার চোখের সামনে বাড়িঘর পুড়ছে, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ! এর অর্থ কি ? আপনাকে এর কৈফিয়ৎ দিতে হবে !” কথাগুলি বলল বের্গ ; সে এখন প্রধান কর্তার সহকারী হয়েছে ; বের্গ-এর মতে পদটি “মনের মত আর সকলের নজরে পড়বার মতও বটে।”

প্রিন্স আন্দ্রু চোখ তুলে তাকাল ; কোন জবাব না দিয়ে আল্পাতিচের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল।

“তাদের বলো, ১০ই পর্যন্ত তাদের খবরের জন্য অপেক্ষা করব ; যদি ১০ইর মধ্যে তাদের যাত্রার খবর না পাই তাহলে সব ফেলে রেখে আমি নিজেই বল্ড হিল্‌স্ এ চলে যাব।”

প্রিন্স আন্দ্রুকে চিনতে পেরে বের্গ বলল, “প্রিন্স, কথাগুলি আমাকে বলতে হল কারণ আমাকে হুকুম মেনে চলতে হয়, কারণ আমি সবসময়ই ঠিক ঠিক মত হুকুম মেনেই চলি…তুমি আমাকে মাফ করো।”

আগুনের মধ্যে কি যেন ফাটল। মুহূর্তের জন্য আগুনটা কমে গেল, ছাদের নীচ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে লাগল। আর একটা শব্দ করে একটা ভারী কিছু ভেঙে পড়ল।

গোলাবাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ার শব্দের প্রতিধ্বনি করে সকলে চেঁচিয়ে উঠল : “উ-রু-রু !” পোড়া ফসলের একটা মিঠে-মিঠে গন্ধ পাওয়া গেল। আবার আগুনের শিখা জ্বলে উঠল ; উজ্জীবিত, আনন্দিত, ক্লান্ত মুখগুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পশমীকোট-পরা লোকটি দুই হাত তুলে চীৎকার করে বলল: "ভালই হল হে বাছারা! আবার জ্বলে উঠেছে। চমৎকার!"

"আরে, এ যে মালিক স্বয়ং," কয়েকজন চেঁচিয়ে বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু আল্পাতিচকে বলল, "আচ্ছা, তাহলে যেমন যেমন বললাম তেমনটি তাদের বলে দিও।" বের্গ চুপচাপ পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল; তাকে একটি কথাও না বলে সে গলি-পথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অধ্যায়—৫

স্মোলেন্স্ক্ থেকে সৈন্যরা পশ্চাদপসরণ করছে; পিছন থেকে তাড়া করছে শত্রু। ১০ই অগস্ট প্রিন্স আন্দ্রুর নেতৃত্বাধীন সেনাদলটি বল্ড হিল্স্-এ যাবার পথকে পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে। তিন সপ্তাহের বেশী হয়ে গেল গরম ও অনাবৃষ্টি সমানে চলেছে। প্রত্যেকদিন পেঁজা তুলোর মত মেঘ আকাশে ভেসে বেড়ায়, মাঝে মাঝে সূর্যকে ঢেকে ফেলে, কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আকাশ আবার পরিষ্কার হয়ে যায়, লাল-বাদামী কুয়াশার মধ্যে সূর্য অস্ত যায়। রাতের ভারী শিশিরপাতে ধরণী সতেজ হয়ে ওঠে। মাঠের ফসল রোদে পুড়ছে, বীজগুলি ঝরে পড়ছে। বিল-বাওর শুকিয়ে গেছে। রোদে-পোড়া মাঠে খাবার না পেয়ে গরু-মোষরা খিদেয় হাম্বা-হাম্বা ডাকছে। একমাত্র রাতের বেলা যখন জঙ্গলে শিশির পড়ে তখন একটা সতেজ-ভাব চোখে পড়ে; কিন্তু যে বড় রাস্তা ধরে সৈন্যরা মার্চ করে চলেছে সেখানে তিলমাত্র সজীবতা চোখে পড়ে না: ছ' ইঞ্চিরও বেশী ধূলোয় ঢাকা পথে সজীবতার চিহ্নমাত্র নেই; দিনের শুরু হতেই মার্চ শুরু হয়ে যায়। কামান-বাহী গাড়ি ও মালবাহী গাড়িগুলো সেই ঘন ধূলোর ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে, গাড়ির চাকা পর্যন্ত ধূলো ওড়ে; পদাতিকবাহিনী সেই নরম, দম-বন্ধকরা গরম ধূলোর ভিতর গোড়ালি পর্যন্ত ডুবিয়ে এগিয়ে চলে; ধূলোর সে গরম রাতেও ঠাণ্ডা হয় না। সূর্য যত উপরে উঠতে থাকে, সেই ধূলোর মেঘও ততই উপরে উঠতে থাকে; গরম ধূলোর পর্দার ভিতর দিয়ে খালি চোখেও সূর্যের দিকে তখন তাকানো যায়; মেঘহীন আকাশে সূর্যটাকে দেখায় একটা রক্তবর্ণ গোলকের মত। বাতাস নেই; সেই নিশ্চল আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসে। নাক ও মুখের উপর রুমাল বেঁধে সৈন্যরা এগিয়ে চলে। যখনই কোন গ্রামের পাশে পৌঁছয় তখন সকলে কুয়োর ধারে ছুটে যায়, জলের জন্য মারামারি করে, জলে টান পড়ে কাদা পর্যন্ত নেমে যায়।

একটা রেজিমেন্টের ভার প্রিন্স আন্দ্রুর ঘাড়ে; তাদের বিধি-ব্যবস্থা করা, ভাল-মন্দের দিকে লক্ষ্য রাখা, হুকুম নেওয়া ও হুকুম দেওয়া—এই নিয়েই সে ডুবে থাকে। স্মোলেন্স্ক্ জ্বালিয়ে দিয়ে তাকে ছেড়ে আসা তার জীবনের একটা যুগান্তকারী ঘটনা। শত্রুর প্রতি এক বিচিত্র ক্রোধের

অনুভূতি তাকে ভুলিয়ে দিয়েছে নিজের দুঃখ। রেজিমেণ্টের কাজেই সে নিবেদিতপ্রাণ, নিজের সৈন্য ও অফিসারদের প্রতি সে সুবিবেচক ও সদয়। রেজিমেণ্টে সকলে তাকে বলে "আমাদের প্রিন্স," তারজন্য গর্ববোধ করে, তাকে ভালবাসে। কিন্তু রেজিমেণ্টের তিমোখিনদের মত শুধু সেইসব লোকদের প্রতিই সে সদয় ও ভদ্র যারা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন, অন্য জগতের মানুষ, যারা তার অতীতকে জানে না এবং বোঝে না। কিন্তু যেই কোন পরিচিত লোকের সঙ্গে অথবা কর্মচারিদের কারও সঙ্গে তার দেখা হয়; সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ে যেন কাঁটা ফুটে ওঠে, তার মনে দেখা দেয় বিদ্বেষ, বিদ্রূপ, আর ঘৃণা। যাকিছু অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয় তাই তার কাছে অবাঞ্ছিত; কাজেই পূর্ব-পরিচিতদের সঙ্গে ব্যবহারে সে চেষ্টা করে শুধু নিজের কর্তব্যটুকু পালন করতে, তাদের প্রতি অসঙ্গত ব্যবহার না করতে।

বস্তুত, প্রিন্স আন্দ্রুর চোখে সবকিছুই অন্ধকার ও বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে; বিশেষকরে সেইদিন থেকে যেদিন ৬ই অগস্ট তারিখে সে স্মোলেন্‌স্ক্‌ ছেড়ে এসেছে (তার ধারণা শহরটা রক্ষা করা যেত এবং রক্ষা করাই উচিত ছিল), এবং যেদিন তার নিজের হাতেগড়া বড় আদরের বল্ড হিল্‌স্‌-কে লুণ্ঠনকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তার রুগ্ন বাবাকে মস্কো পালিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রেজিমেণ্টকেই ধন্যবাদ যে অন্তত তার ভাবনা নিয়েই সে সময় কাটাতে পারছে। দুদিন আগেই সে খবর পেয়েছে যে তার বাবা, ছেলে ও বোন মস্কো রওনা হয়ে গেছে। তাই বল্ড হিল্‌স্‌-এ কিছু করার না থাকলেও যেন নিজের দুঃখকে বাড়িয়ে তুলতেই প্রিন্স আন্দ্রু স্থির করল, তাকে একবার সেখানে যেতেই হবে।

ঘোড়াকে জিন পরাতে বলে এবং রেজিমেণ্টকে মার্চ করার হুকুম দিয়ে সে তার বাবার সেই বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল যেখানে সে জন্মেছে, শৈশব কাটিয়েছে। পাথরের ফটকে একটাও লোক দেখতে পেল না; দরজাটা খোলা পড়ে আছে। বাগানের পথে এর মধ্যেই ঘাস গজিয়েছে; কাঁচ-ঘরের কিছু কিছু কাঁচ ভেঙেছে, গাছের টবগুলি কিছু উল্টে পড়েছে, কিছু শুকিয়ে গেছে। মালী তারাসকে ডাকল, কেউ সাড়া দিল না। ছেলেবেলায় প্রিন্স আন্দ্রু একটা বুড়ো চাষীকে প্রায়ই ফটকে বসে থাকতে দেখত; এখন সে বাগানের একটা সবুজ আসনে বসে বাকলের জুতো তৈরী করছে।

লোকটা কালা, তাই প্রিন্স আন্দ্রুর ঘোড়ার শব্দ শুনতে পায় নি। যে আসনে বুড়ো প্রিন্স বসতে ভালবাসত লোকটা সেই আসনটিতেই বসেছে; তার পাশে ম্যাগ্‌নোলিয়ার একটা ভাঙা শুকনো ডালে অনেকগুলো বাকলের টুকরো ঝুলছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। পুরনো বাগানের বেশ কয়েকটা গাছ কেটে ফেলা হয়েছে; একটা ছিট-ছিট ঘোড়া ও তার বাচ্চা সামনের

গোলাপ বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাত্র একটা খোলা জানালা ছাড়া অন্য সব খড়খড়ি বন্ধ। একটি ভূমিদাস ছেলে তাকে দেখেই বাড়ির মধ্যে ছুটে গেল। পরিবারের সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে আল্‌পাতিচ একাই বল্ড হিল্‌স্‌-এ আছে; ভিতরে বসে "সন্ত জীবনী" পড়ছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু এসেছে শুনে নাকের উপর চশমা ঝুলিয়ে কোটের বোতাম আঁটতে আঁটতে সে সিঁড়ি বেয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এল; একটা কথাও না বলে কাঁদতে কাঁদতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাঁটুতে চুমো খেতে লাগল।

তারপর নিজের দুর্বলতায় নিজেই বিরক্ত হয়ে সব কথা খুলে বলতে শুরু করল। মূল্যবান সামগ্রি যাকিছু সবই বোগুচারভোতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সত্তর কোয়ার্টার (১ কোয়ার্টার = একের চার হন্দর) ফসলও গাড়ি বোঝাই করে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ বছর ফসল খুবই ভাল হয়েছিল, কিন্তু পাকবার আগেই সৈন্যরা এসে সব কেটে নিয়ে গেছে। চাষীদের সর্বনাশ হয়েছে; অনেকেই বোগুচারভোতে চলে গেছে; কয়েকজন মাত্র এখানে আছে।

তার কথা শেষ হবার আগেই প্রিন্স আন্‌দ্রু শুধাল, "আমার বাবা ও বোন কবে গেল?" সে মস্কো যাবার কথাই বলল। কিন্তু আল্‌পাতিচ সেটাকে বোগুচারভো যাবার দিন বলে ধরে নিয়ে জানাল যে তারা ৭ই তারিখে গেছে, এবং তারপরে জমিদারি সংক্রান্ত কথাতেই ফিরে গেল।

জানতে চাইল, "একটা রসিদ নিয়ে সব যই কি সৈন্যদের দিয়ে দেব? এখনও ছ'শ' কোয়ার্টার রয়েছে।"

বুড়ো মানুষটির টাকের উপর সূর্যের আলো পড়ে চকচক করছে; তার মুখের ভাব দেখেই বোঝা যায়, এসব প্রশ্নের সময় যে এখন নয় এবং নিজের দুঃখ লাঘব করার জন্যই সে কথাগুলি বলছে সেটা সে নিজেও বুঝতে পারছে। তাই প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাবল, "একে কি বলি?"

মুখে বলল, "হ্যাঁ, তাই দাও।"

আল্‌পাতিচ বলল, "বাগানে কিছু বিশৃংখলা আপনার চোখে পড়েছেই, কিন্তু ওটা বন্ধ করা অসম্ভব। তিন রেজিমেণ্ট সৈন্য এখানে রাত কাটিয়ে গেছে; তাদের অধিকাংশই অশ্বারোহী। তাদের কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম ও পদমর্যাদা আমি টুকে রেখেছি; একটা নালিশ পেশ করতে হবে।"

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আচ্ছা, তুমি এখন কি করবে? সৈন্যরা যদি জায়গাটা দখল করে নেয় তাহলেও কি এখানেই থাকবে?"

আল্‌পাতিচ প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে মুখ ফেরাল; হঠাৎ গম্ভীরভাবে দুই হাত উর্ধ্বে তুলল। সোচ্চারে বলল:

"তিনিই আমার আশ্রয়! তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

একদল চাষী খালি মাথায় মাঠ পার হয়ে প্রিন্সের দিকেই আসছে।

আল্‌পাতিচের উপর ঝুঁকে পড়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "আচ্ছা, বিদায়!

তুমিও চলে যাও, যা নিতে পার সঙ্গে নিয়ে যাও, আর ভূমিদাসদের বল রিয়াজান জমিদারিতে অথবা মস্কোর নিকটস্থ জমিদারিতে চলে যেতে।"

প্রিন্স আন্‌ক্রুর পা জড়িয়ে ধরে আল্‌পাতিচ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তার হাত থেকে ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রিন্স আন্‌ক্রু ঘোড়ার পেটে খোঁচা মেরে ছায়াবীথি ধরে জোড়কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বুড়ো মানুষটি তখনও সাজানো বাগানেই বসে আছে। দুটি ছোট মেয়ে কাঁচ-ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। তাদের ঘাঘরার কোঁচড়ে কতকগুলি কুড়নো ফুল। তারা প্রিন্স আন্‌ক্রুর একেবারে সামনে পড়ে গেল। ছোট মনিবকে দেখে বুড়ো লোকটি ভয়ার্ত চোখে মেয়ে দুটিকে টেনে নিয়ে একটা বার্চ গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

সে যে তাদের দেখতে পেয়েছে সেটা বুঝতে না দিয়ে প্রিন্স আন্‌ক্রু চকিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ভীত ছোট মেয়েটির জন্য তার দুঃখ হল, তার দিকে তাকাতেও ভয় পেল, তবু তাকে দেখবার একটা দুর্বার বাসনা তাকে পেয়ে বসল। মেয়ে দুটিকে দেখে সে যেন অনুভব করল, তার স্বার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানবিক স্বার্থও জগতে আছে, আর সেগুলির দাবী তার নিজের স্বার্থের দাবীর মতই সঙ্গত; সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তি ও সান্ত্বনার একটা নতুন অনুভূতি জাগল তার মনে। সে আর একবার তাদের দিকে ফিরে তাকাল। নিজেদের বিপদ কেটে গেছে বুঝে লুকোবার জায়গা থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে তাবা কিচির-মিচির করতে করতে ঘাঘরা তুলে মাঠের ঘাসের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে।

এতক্ষণে ধূলি-ধূসরিত বড় রাস্তা ছেড়ে চলবার জন্য প্রিন্স কিছুটা আরাম বোধ করছে। বল্ড হিল্‌স্‌-এর অদূরেই বড় রাস্তায় পড়ে কিছুটা এগিয়ে একটা ছোট পুকুরের বাঁধের পাশে বিশ্রামরত সৈন্যদের সে ধরে ফেলল। একটা বেজে গেছে। লাল বলের মত সূর্যটা কালো কোটের ভিতর দিয়ে এসে তার পিঠটাকে যেন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে। গুঞ্জনরত সৈন্যদের মাথার উপরে ধূলোর মেঘ যেন নিশ্চল হয়ে ঝুলে আছে। বাতাস নেই। বাঁধটা পার হতেই পুকুরের তাজা সোঁদা গন্ধ প্রিন্স আন্‌ক্রুর নাকে এল। যত নোংরাই হোক তবু তার ইচ্ছা হল জলে নামে, সে পুকুরের চারদিকটা ভাল করে তাকিয়ে দেখল। সৈনিকদের বিবস্ত্র, সাদা শরীর, তাদের ইট-লাল হাত, গলা ও মুখ জলের মধ্যে হুটোপাটি করায় পুকুরের ঘোলা সবুজ জল বাঁধ উপচে ফুট খানেকের বেশী উঠে গেছে। হাসি ও হুল্লোরে উন্মত্ত এই সব সাদা, বিবস্ত্র মানুষগুলি নোংরা পুকুরের জলে বোতলে ভর্তি মাছের মত এমনভাবে হুটোপাটি করছে যে তার নিজের ফূর্তির ইচ্ছাটাকে কেমন যেন শোচনীয় মনে হতে লাগল।

নদীর তীরে, বাঁধের উপর, পুকুরের মধ্যে—সর্বত্রই সুস্থ, সবল, শ্বেতকায়

নরদেহের মেলা। অফিসার তিমোখিন বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে একটা তোয়ালে দিয়ে গা মুছছিল; প্রিন্সকে দেখে কিছুটা বিব্রত হলেও তাকে ডেকে কথা বলাটাই সে স্থির করল।

বলল, "ভারী সুন্দর ইয়োর এক্সেলেন্সি, চলে আসুন না!"

মুখ বেঁকিয়ে প্রিন্স আন্‌দ্রু বলল, "বড় নোংরা!"

"আপনার জন্য এক মিনিটের মধ্যেই পরিষ্কার করে দিচ্ছি," বলে তিমোখিন সেই অবস্থায়ই এগিয়ে গেল।

"প্রিন্স স্নান করতে চাইছেন।"

"কোন্ প্রিন্স? আমাদের" বলেই সকলে এত তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে পড়ল যে প্রিন্স তাদের বাধা দেবারও সময় পেল না। সে স্থির করল, গোলাবাড়িতেই গাটা ধুয়ে নেবে।

"মাংস, দেহ, কামানের খাদ্য!" কথাগুলি ভেবে নিজের বিবস্ত্র দেহের দিকে তাকিয়ে সে নিজেই শিউরে উঠল; ঠাণ্ডায় নয়, নোংরা পুকুরের জলে ছটোপাটি করতে ব্যস্ত এইসব মানুষগুলিকে দেখে তার মনে কেমন যেন একটা দুর্বোধ্য বিরক্তি ও আতংকের ভাব দেখা দিল।

৭ই অগস্ট স্মোলেন্‌স্ক্ সড়কের উপর তার বাসস্থান থেকে প্রিন্স ব্যাগ্রেশন এইরকম লিখল:

"প্রিয় কাউন্ট আলেক্সিস আন্দ্রীভিচ,"—(চিঠিটা আরাক্‌চিভকে লিখলেও সে জানে যে সম্রাট চিঠিটা পড়বে, তাই প্রতিটি শব্দ সে সাধ্যমত মেপে মেপে বসাতে লাগল।)

"আশাকরি মন্ত্রীটি (বার্কলে দ্য তলি) ইতিমধ্যেই শত্রুর হাতে স্মোলেন্‌স্ক্ তুলে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন। এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে আসাটা খুবই করুণ ও দুঃখদায়ক; এতে গোটা বাহিনীই হতাশ হয়ে পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম, শেষপর্যন্ত চিঠিও লিখেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাকে সম্মত করতে পারলাম না। আমার সম্মানের দোহাই দিয়ে বলছি, এর আগে নেপোলিয়ন কখনও এরকম বিপদে পড়ে নি, তার অর্ধেক সৈন্য খুইয়েও সে স্মোলেন্‌স্ক্ দখল করতে পারত না। আমাদের সৈন্যরা যেভাবে যুদ্ধ করেছে, এখনও করছে, তেমন যুদ্ধ তারা আগে কখনও করে নি। পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে আমি পঁয়ত্রিশ ঘণ্টা শত্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছি, তাকে পরাস্ত করেছি; কিন্তু তিনি চৌদ্দ ঘণ্টাও যুদ্ধ করতে রাজী হলেন না। এটা লজ্জাকর, আমাদের সৈন্যদের পক্ষে কলংকস্বরূপ, আর আমার তো মনে হয় এরপরেও তার বেঁচে থাকাই উচিত নয়। তিনি যদি জানিয়ে থাকেন যে আমাদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে, তো সেটা সত্যি নয়; হয়তো চার হাজার, তার বেশী নয়, এমন কি তাও নয়; কিন্তু যদি দশ হাজারই হত, তাতেই বা কি, এটা

তো যুদ্ধ! কিন্তু শত্রুপক্ষের ক্ষতি হয়েছে স্তূপাকার⋯⋯"

"আর দুদিন যুদ্ধ চালালে তার কী এমন ক্ষতি হত? তারা নিজেরাই পিছিয়ে যেত, কারণ তাদের কাছে জলই ছিল না—সৈন্যদের নয়, ঘোড়ারও নয়। তিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন পশ্চাদপসরণ করবেন না, কিন্তু হঠাৎ হুকুম পাঠালেন, সেই রাতেই পিছু হটবেন। এভাবে যুদ্ধ চালানো যায় না; হয়তো অচিরেই আমরা শত্রুকে মস্কো পর্যন্ত ডেকে নিয়ে আসব⋯⋯"

"একটা গুজব রটেছে যে আপনি সন্ধির কথা ভাবছেন। আমাদের এত ত্যাগ, এই পাগলের মত পশ্চাদপসরণের পরেও আপনি সন্ধি করবেন—ঈশ্বরের ইচ্ছায় তা যেন না ঘটে! গোটা রাশিয়া তাহলে আপনার উপর ক্ষেপে যাবে, সৈনিকের পোশাক পরতে আমরা প্রত্যেকে লজ্জাবোধ করব। এই যদি অবস্থা হয়ে থাকে—রাশিয়া যতদিন পারবে, যতদিন রাশিয়ার একটি মানুষেরও দাঁড়াবার শক্তি থাকবে ততদিন আমরা যুদ্ধ করব।

সৈন্য পরিচালনার ভার একজনের উপর থাকা উচিত, দুজনের উপর নয়। আপনাদের মন্ত্রীটি মন্ত্রী হিসাবে ভাল হতে পারেন, কিন্তু সেনাপতি হিসাবে তিনি যে খারাপ তাই শুধু নয়, তিনি জঘন্য, অথচ তার হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গোটা দেশের ভাগ্য। ⋯সত্যি, বিরক্তিতে আমি পাগল হয়ে গেছি: আমার এই দুঃসাহসিক লেখার জন্য ক্ষমা করবেন। একথা খুবই পরিষ্কার, যে লোক সন্ধির কথা বলছে, মন্ত্রীর উপর সৈন্য পরিচালনার ভার দিতে বলছে, সে লোক আমাদের সম্রাটকে ভালবাসে না, সে চায় আমাদের সকলের সর্বনাশ। তাই আমি খোলাখুলি লিখছি: বেসরকারী বাহিনী (militia) কে ডাকুন। কারণ মন্ত্রীটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই আগন্তুকদের মস্কোর পথে নিয়ে চলেছেন। সম্রাটের এড-ডি-কং উল্‌যোগেন সম্পর্কে প্রতিটি সৈন্যের মনে সন্দেহ জেগেছে। আমি যে তার প্রতি ভদ্র ব্যবহার করি তাই শুধু নয়, তার চাইতে প্রবীণ হয়েও কর্পোরালের মত আমি তাকে মান্য করি। এটা আমার পক্ষে বেদনাদায়ক, তবু আমার আশ্রয়দাতা ও সম্রাটকে ভালবেসেই আমি তাকে মান্য করি। শুধু আমাদের মত এমন একটা সৈন্যবাহিনীকে তার মত লোকের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন বলে সম্রাটের জন্য আমার দুঃখ হয়। ভেবে দেখুন, পশ্চাদপসরণের পথে মোট পনেরো হাজারের বেশী সৈনিককে আমরা হয় হারিয়েছি, না হয় তো হাসপাতালে রেখে এসেছি; অথচ আমরা যদি আক্রমণ করতাম তাহলে এমনটি ঘটত না। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বলুন এরকম ভয় পাবার জন্য রাশিয়া, জননী রাশিয়া আমাদের কি বললে? এরকম একটা ইতর লোকের হাতে কেন আমাদের সৎ ও সাহসী পিতৃভূমিকে আমরা ছেড়ে দিচ্ছি? কেন আমাদের প্রজাদের মনে বিদ্বেষ ও লজ্জার বীজ বপন করছি? আমাদের এত ভয়, এত ত্রাস কাকে? এই অস্থিরমতি মন্ত্রীকে আমি দোষ দেই না; সে তো ভীরু'

পুরু চামড়া, দীর্ঘসূত্রী—সর্বপ্রকার বদ্‌গুণের আধার। সমস্ত বাহিনী আজ শোকমগ্ন ; সকলেই তাকে অভিশাপ দিচ্ছে⋯⋯”

অধ্যায়—৬

মানুষের জীবনকে যে অসংখ্য নীতি অনুযায়ী ভাগ করা চলে তার মধ্যে একটি হল—যাদের মধ্যে বস্তুর প্রাধান্য আর যাদের মধ্যে আকারের প্রাধান্য। গ্রাম, মফস্বল, প্রদেশ, এমন কি মস্কোর জীবন থেকেও আলাদা করে এই শেষের শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে পিতার্সবুর্গের জীবনকে, বিশেষ করে তার অভিজাত জীবনকে। সে জীবনের কোন পরিবর্তন নেই। ১৮০৫ সাল থেকে আমরা বোনাপার্তের সঙ্গে সন্ধি করেছি আবার লড়াইও করেছি, শাসনতন্ত্র রচনা করেছি আবার বাতিল করেছি, কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌না ও হেলেনের অভ্যর্থনা—কক্ষগুলির চেহারা যেমন ছিল একটি সাত বছর আগে, অপরটি পাঁচ বছর আগে—তেমনই আছে। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার অভ্যর্থনা-কক্ষে সকলে আগের মতই দুশ্চিন্তার সঙ্গে বোনাপার্তের সাফল্য নিয়ে আলোচনা করে, এবং সবকিছুর মধ্যেই রাজ-দরবার মহলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-পূর্ণ ষড়যন্ত্রের ছায়া দেখতে পায়। আবার হেলেনের অভ্যর্থনা-কক্ষে ১৮১২-তেও ১৮০৮ সালের মতই সেই “মহান জাতি” ও “মহান পুরুষটি” সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত আলোচনা চলে, ফ্রান্সের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

সম্প্রতি সেনাবাহিনী থেকে সম্রাটের ফিরে আসার পর থেকে এই দুই পরস্পরবিরোধী মহলে কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, পরস্পরের প্রতি বিদ্রূপতার কিছু কিছু প্রকাশও ঘটেছে, কিন্তু প্রতিটি মহলই স্বীয় বৈশিষ্ট্যে অটল রয়েছে। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মহলে শুধু সেইসব ফরাসীদেরই প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় যারা গোঁড়া রুশভক্ত, যারা মনে করে যে কারওই ফরাসী থিয়েটারে যাওয়া উচিত নয়, কারণ একটা ফরাসী শিল্পীদলকে পুষতে যে খরচ হয় তা একটা সেনাদল পোষার খরচেরই অনুরূপ। তারা আগ্রহের সঙ্গে যুদ্ধের অগ্রগতির উপর নজর রাখে এবং যেসব প্রতিবেদনে আমাদের প্রশস্তি থাকে শুধু সেইগুলিই প্রচার করে। ওদিকে হেলেন ও রুমিয়াস্ত্‌সেভের ফরাসী মহলে শত্রুপক্ষের এবং যুদ্ধের নিষ্ঠুরতার প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করা হয়, আর নেপোলিয়নের সন্ধি-প্রচেষ্টাগুলির আলোচনা করা হয়।

প্রিন্স ভাসিলি এখনও নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছে : এই দুটি মহলের মধ্যে সেই একমাত্র যোগসূত্র। সে “প্রিয় বন্ধু” আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে যেমন দেখা করতে যায়, তেমনই মেয়ের “কূটনৈতিক অভ্যর্থনা-কক্ষেও” তার যাতায়াত আছে। অবশ্য অনবরত দুই শিবিরে যাতায়াতের ফলে অনেকসময় সে সব ব্যাপারটাই গুলিয়ে ফেলে এবং আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মহলে যেটা বলা উচিত সেটাই বলে ফেলে হেলেনের সভায়, আবার তার

উল্টোও ঘটে।

সম্রাটের ফিরে আসার অনতি পরেই প্রিন্স ভাসিলি আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে যুদ্ধসংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে কঠোর ভাষায় বার্কলে দ্য তলির নিন্দা করলেও কাকে যে প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা উচিত সেবিষয়ে কিছু বলল না। "বহুগুণের আধার" বলে বর্ণিত জনৈক অতিথি কিন্তু যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে প্রস্তাব করল যে কুতুজভই একমাত্র উপযুক্ত লোক।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, সম্রাটকে বিরক্ত করা ভিন্ন আর কিছুই কুতুজভ করে নি।

প্রিন্স ভাসিলি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "পরিষদের সভায় আমি বার বার বলেছি, কিন্তু তারা আমার কথা শোনে নি। আমি বলেছি, অসামরিক বাহিনীর প্রধান হিসাবে কুতুজভের নির্বাচনে সম্রাট খুশি হবেন না। তারা আমার কথা শোনে নি।"

সে বলতে লাগল, "রাশিয়ার প্রবীণতম সেনাপতি হলেও কাউন্ট কুতুজভের পক্ষে ট্রাইবুনালের সভাপতিত্ব করাটা কি ঠিক হবে? এতকষ্টের বিনিময়ে তিনি তো কিছুই পাবেন না! যে লোক ঘোড়ায় চড়তে জানে না, পরিষদে বসে ঘুমিয়ে পড়ে, যার নৈতিক চরিত্র অতীব খারাপ, সেরকম লোককে কেমন করে প্রধান সেনাপতি করা যেতে পারে! বুখারেস্টে তার কী সুখ্যাতি হয়েছিল! সেনাপতি হিসাবে তার যোগ্যতার বিষয় আমি কিছু বলছি না, কিন্তু আজকের মত দিনে একটি ন্যুব্জদেহ, অন্ধ, সত্যিকারের অন্ধ, বৃদ্ধ মানুষকে কেমন করে ওই পদে নিয়োগ করা চলতে পারে? অন্ধ সেনাপতি ব্যাপারটা মন্দ নয়! তিনি তো চোখেই দেখেন না। এ কি কানামাছি খেলা? তিনি তো দেখতেই পান না!"

তার কথার কেউ কোন জবাব দিল না।

২৪শে জুলাই তারিখে কথাটা ঠিকই ছিল। কিন্তু ২৯শে জুলাই তারিখে কুতুজভ প্রিন্স উপাধি পেল। এরমধ্যে তাকে বাতিল করার একটা ইঙ্গিত থাকতেও পারে; কাজেই প্রিন্স ভাসিলির কথাটা সেদিনও ঠিকই ছিল, যদিও সেকথা সে সাততাড়াতাড়ি বলে বেড়ায় নি। কিন্তু ৮ই অগস্ট তারিখে যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনার জন্য ফিল্ড-মার্শাল সাল্‌তিকভ, আরাকৃচীভ, ভিয়াজ্‌মিতিনভ, লপুখিন ও কচুবে-কে নিয়ে গঠিত কমিটির একটা বৈঠক বসল। কমিটিতে সিদ্ধান্ত হল, নেতৃত্বের ঐক্যের অভাবই আমাদের পরাজয়ের কারণ, আর কুতুজভের প্রতি সম্রাটের বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে কমিটির সদস্যগণ সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও তারা প্রধান সেনাপতি পদে কুতুজভের নিয়োগের ব্যাপারে সুপারিশ করতে একমত হল। আর সেইদিনই সেনাদলের উপর এবং অধিকৃত সমস্ত অঞ্চলের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্বসহ কুতুজভ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হল।

৯ই অগস্ট তারিখে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে সেই "বহুগুণের আধার" লোকটির সঙ্গে আবার প্রিন্স ভাসিলির দেখা হয়ে গেল। তরুণীদের একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হবার বাসনায় সে ভদ্রলোক তখন আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সঙ্গে খুবই দহরম-মহরম চালাচ্ছে। স্বীয় বাসনার সিদ্ধিতে বিজয়ীর ভঙ্গিমায় প্রিন্স ভাসিলি ঘরে ঢুকল।

"আরে, মস্ত সংবাদটা আপনারা শুনেছেন কি? প্রিন্স কুতুজভ এখন ফিল্ড-মার্শাল! সব প্রতিবাদের অবসান ঘটেছে! আমি খুব খুশি, খুব আনন্দিত! শেষ পর্যন্ত একটা মানুষ পাওয়া গেল!"

ডিরেক্টরের পদপ্রার্থী হওয়া সত্ত্বেও "বহু গুণাধার" লোকটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ছাড়ল না যে আগে প্রিন্স ভাসিলির মতটা অন্যরকম ছিল। প্রিন্স ভাসিলির নিজের কথায়ই সে বলল, "কিন্তু প্রিন্স, লোকে যে বলে তিনি অন্ধ!"

"এঃ? বাজে কথা! তিনি চোখে বেশ ভালই দেখেন," একটু কেশে গম্ভীর গলায় ভাসিলি বলল; বুঝি গলার স্বর ও কাশি দিয়েই সে তার অস্বস্তিকে চাপা দিতে চায়। "তিনি চোখে বেশ ভালই দেখেন। আমি আরও খুশি হয়েছি এইজন্য যে সম্রাট তাকে সব সেনাদল এবং সমগ্র অঞ্চলের উপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব দিয়েছেন—আগে কোন প্রধান সেনাপতির এত ক্ষমতা ছিল না। তিনি হলেন দ্বিতীয় সর্বময় কর্তা, বিজয়ীর হাসি হেসে সে কথা শেষ করল।

"ঈশ্বর করুন তাই যেন হয়! তাই যেন হয়!" আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল।

"বহু গুণাধার" লোকটি দরবার-মহলের রীতিনীতিতে এখনও অনভিজ্ঞ; এ ব্যাপারে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পূর্বেকার অভিমতকে সমর্থন করে তার প্রশস্তি-কীর্তনের উদ্দেশ্যে সে বলল:

"লোকে বলছে, কুতুজভকে এইসব ক্ষমতা দেবার ইচ্ছা সম্রাটের ছিল না। লোকে বলে, কোন কুমারীর কাছে 'ফোকোঁদ' (অশ্লীল কাব্যগ্রন্থ) পড়লে সে যেরকম লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে সম্রাটও তেমনইভাবে হেসে কুতুজভকে বলেছেন: 'তোমার সম্রাট ও পিতৃভূমি এই সম্মান তোমাকে দিচ্ছে।'

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "হয় তো অন্তর থেকে তিনি কথাটা বলেন নি।"

প্রিন্স ভাসিলি সোৎসাহে বলে উঠল, "ওঃ, না, না! সেটা অসম্ভব, কারণ আমাদের সম্রাট তো আগেও তার গুণের প্রশংসা করেছেন।"

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ঈশ্বর করুন প্রিন্স কুতুজভ যেন সত্যিকারের ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন, কেউ যেন তাঁর কাজের মধ্যে নাক গলাতে না পারে।"

মহিলা কার কথা বলতে চাইছে সেটা বুঝতে পেরে প্রিন্স ভাসিলি চুপি

চুপি বলল :

"আমি ভাল করেই জানি, কুতুজভ এ ব্যবস্থা একেবারেই পাকা করে নিয়েছেন যে জারেভিচ সেনাদলের সঙ্গেই থাকবে না। আপনি কি জানেন, সম্রাটকে তিনি কি বলেছেন?"

কুতুজভ সম্রাটকে যে কথাটা বলতে পারে সেটা অনুমান করেই প্রিন্স ভাসিলি তার পুনরাবৃত্তি করল। "তিনি অন্যায় করলেও আমি শাস্তি দিতে পারব না, আবার ঠিক কাজ করলেও পারব না পুরস্কৃত করতে।"

"ওঃ, প্রিন্স কুতুজভ খুবই জ্ঞানী লোক! আমি তাকে অনেকদিন থেকেই চিনি।"

"বহুগুণাধার" লোকটি মন্তব্য করল, "লোকে আরও বলছে, হিজ এক্সেলেন্সি আরও একটি শর্ত করিয়ে নিয়েছেন যে সম্রাট নিজেও সেনাদলের সঙ্গে থাকতে পারবেন না।"

তার এই উক্তির সঙ্গেসঙ্গেই প্রিন্স ভাসিলি ও আন্না পাভ্‌লভ্‌না তার পাশ থেকে সরে গিয়ে লোকটির এই অতিসরলতায় বিষণ্ণ চোখে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

অধ্যায়—৭

পিতার্সবুর্গে যখন এইসব ঘটছে ততক্ষণে ফরাসী বাহিনী স্মোলেন্‌স্ক্‌ পার হয়ে ক্রমাগত মস্কোর দিকে এগিয়ে চলেছে। নেপোলিয়নের অপরাপর ইতিহাসকারের মত ইতিহাসকার থিয়ের্স ও তার নায়কের সমর্থনে লিখেছে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই নেপোলিয়নকে মস্কো প্রাচীরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার মধ্যে যারা ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা খোঁজে থিয়ের্স-এর অভিমতও তাদের মতই সত্য; যে রুশ ইতিহাসকাররা লিখেছে যে রুশ সেনাপতিদের কৌশলের ফলেই নেপোলিয়ন মস্কোর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল, থিয়ের্স-এর অভিমত তাদের মতই সত্য। একজন দাবাড়ু যখন একটা খেলায় হারে তখন সে একান্তভাবে বিশ্বাস করে যে নিজের ভুলের জন্যই তার হার হয়েছে, আর সেই ভুলকে সে খোঁজে খেলার গোড়ার দিকে, কিন্তু সে ভুলে যায় যে খেলার প্রতিটি ধাপেই সে আরও ভুল করেছে এবং তার কোন চালটাই সঠিক হয় নি। যেহেতু প্রতিপক্ষ তার ভুলের সুযোগটাই নিয়েছে তাই শুধু সেই ভুলটাই তার নজরে পড়ে। যুদ্ধের খেলা তো দাবা খেলার চাইতে অনেক বেশী জটিল; সে খেলা ঘটে একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমার মধ্যে; সেখানে কোন একটিমাত্র ইচ্ছাশক্তি নির্জীব পদার্থকে পরিচালিত করে না; নানা ইচ্ছাশক্তির অসংখ্য সংঘাতেরই ফলশ্রুতি একটি যুদ্ধ।

স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর পরে প্রথমে দরগোবুঝ ছাড়িয়ে ভিয়াজ্‌মাতে এবং পরে

জারেভো—জেমিশেতে নেপোলিয়ন একটা যুদ্ধ ঘটাতে চেয়েছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অসংখ্য ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রুশরা সেখানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে নি; ফরাসী বাহিনী মস্কো থেকে সত্তর মাইল দূরবর্তী বরদিনোতে পৌঁছে গেল। ভিয়াজ্‌মা থেকে নেপোলিয়ন সরাসরি মস্কো-অভিযানের হুকুম জারী করল।

মহান সাম্রাজ্যের এসিয়াস্থ রাজধানী মস্কো, আলেক্সান্দারের প্রজাদের পবিত্র নগরী মস্কো, চৈনিক প্যাগোডার মত অসংখ্য গীর্জা শোভিত মস্কো—এই মস্কোর স্বপ্ন নেপোলিয়নের কল্পনাকে থামতে দিল না। ভিয়াজ্‌মা থেকে জারেভো-জেমিশে অভিযানে রক্ষীদল, দেহরক্ষী, অনুচরবৃন্দ ও এড-ডি-কংদের সঙ্গে নিয়ে নেপোলিয়ন এগিয়ে চলল তার লেজ-ছাঁটা হাল্কা রঙের ঘোড়ায় চেপে। তার কর্মচারী-প্রধান বের্থিয়ের পিছনে থেমে রইল অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে বন্দী জনৈক রুশ বন্দীকে জেরা করার জন্য। পরে জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে সে নেপোলিয়নকে ধরে ফেলল।

"কি খবর?" নেপোলিয়ন শুধাল।

"প্লাতভ-এর অধীনস্থ জনৈক কসাক বলছে, প্লাতভ-এর সেনাদল মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। আর কুতুজভ প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছে। লোকটি খুবই বিচক্ষণ আর অতিভাষী।"

নেপোলিয়ন হেসে বলল, একটি ঘোড়া দিয়ে কসাকটিকে তার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সে নিজে তার সঙ্গে কথা বলতে চায়। কয়েকজন অ্যাড্‌জুটান্ট ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একঘণ্টা পরে আর্দালির কুর্তা গায়ে লাভ্রুশ্‌কা এসে হাজির হল। এই ভূমিদাসটিকেই দেনিসভ দিয়েছিল রস্তভকে। নেপোলিয়ন তাকে পাশাপাশি ঘোড়া চালাবার নির্দেশ দিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করল।

"তুমি একজন কসাক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি কসাক ইয়োর অনার।"

এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে থিয়ের্স লিখেছে, "নেপোলিয়নের সাদাসিধে পোশাকে সম্রাটের উপস্থিতিজ্ঞাপক কোন লক্ষণ না থাকায় তাকে চিনতে না পেরে কসাকটি সরল মনে যুদ্ধের বর্ণনা দিতে লাগল।" আসলে আগের দিন মদের নেশায় বেহুঁস হয়ে মনিবকে ডিনার না খাইয়েই সে মুরগির খোঁজে একটা গ্রামে গিয়ে সেখানে লুটতরাজ শুরু করে এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসীদের হাতে বন্দী হয়।

লাভ্রুশ্‌কা ভাল করেই জানত যে এই নেপোলিয়ান, কিন্তু তাকে দেখে সে মোটেই ভয় পেল না, বরং নতুন মনিবকে খুশি করতে সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল। এই লোকটিই যে নেপোলিয়ন সেটা ভালভাবে বুঝেও সে মোটেই ভয় পেল না, ঠিক যেরকম সে রস্তভকে বা অন্য কোন সার্জেন্ট-

মেজরের লাঠিকেও ভয় করত না, কারণ তার তো এমন কিছুই নেই যা থেকে কি নেপোলিয়ন আর কি সার্জেন্ট-মেজর কেউই তাকে বঞ্চিত করতে পারে।

কাজেই সে অবিরাম বক্‌বক্‌ করে চলল; আর্দালিদের কাছে যত গুজব শুনেছে সব ঢালতে লাগল। তার অনেকটাই সত্য। কিন্তু নেপোলিয়ন যখন জানতে চাইল, বোনাপার্তকে পরাজিত করতে পারবে কি না সেবিষয়ে রুশরা কি ভাবছে, তখন লাভ্রুশ্‌কা ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগল।

এই প্রশ্নটার মধ্যে সে সূক্ষ্ম চাতুরির আভাষ পেল; তার মত লোকরা সব কিছুর মধ্যেই চাতুরির আভাষ পেয়ে থাকে; তাই সে ভুরু কুঁচকাল; সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না।

চিন্তিতভাবে বলল, "ব্যাপারটা অনেকটা এইরকম; অচিরেই যদি কোন যুদ্ধ হয় তো আপনার জয় হবে। সেটা ঠিক। কিন্তু যদি তিনটে দিন পার হয়ে যায়, তো তার পরে, মানে সেক্ষেত্রে সেই যুদ্ধই সহজে শেষ হবে না।"

মেজাজ ভাল থাকা সত্ত্বেও এ কথায় নেপোলিয়ন হাসল না, কথাগুলি আর একবার বলতে বলল।

সেটা লক্ষ্য করে তাকে খুশি করতে এবং নেপোলিয়নকে না চেনার ভান করে লাভ্রুশ্‌কা বলল, "আপনি তো জানেন যে আপনাদের নেপোলিয়ন আছেন, আর তিনি তো পৃথিবীর সকলকেই পরাজিত করেছেন, কিন্তু আমরা তো ভিন্ন ধাতুতে গড়া....." —এটুকু দেশাত্মবোধের গর্ব যেন কেমন করে মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল তা সে নিজেই জানে না।

নেপোলিয়ন হাসল। থিয়ের্স লিখেছে, "তরুণ কসাকটি তার শক্তিমান প্রশ্নকর্তাকে হাসিয়ে ছাড়ল।" কয়েক কদম নিঃশব্দে এগিয়ে বের্থিয়ের-এর দিকে ঘুরে নেপোলিয়ন বলল, সে দেখতে চায় এই "ডন-শাবক" যদি জানতে পারে যে সে স্বয়ং নেপোলিয়নের সঙ্গে কথা বলছে, কথা বলছে সেই সম্রাটের সঙ্গে যার অবিস্মরণীয় দিগ্বিজয়ী নাম পিরামিডের গায়ে-গায়ে ক্ষোদাই করা হয়েছে, তাহলে তার অবস্থাটা কি দাঁড়ায়।

তাকে বিচলিত করে তুলবার জন্যই যে কথাটা তাকে বলা হয়েছে এবং নেপোলিয়ন যে আশা করছে সে খুব ভয় পেয়ে যাবে সেটা বুঝতে পেরে লাভ্রুশ্‌কা নতুন মনিবকে খুশি করতে ভীত ও বিস্মিত হবার ভান করল, দুই চোখ বিস্ফারিত করে মুখে এমন ভাব ফুটিয়ে তুলল যেটা সে সাধারণত করে থাকে চাবুক খাবার আগের মুহূর্তে। থিয়ের্স লিখেছে, "যেমুহূর্তে নেপোলিয়নের দোভাষী কথাগুলি বলল তৎক্ষণাৎ কসাকটি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, একটা কথাও না বলে ঘোড়া চালাতে চালাতে সেই দিগ্বিজয়ীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল যার খ্যাতি প্রাচ্যের তৃণাঞ্চলকে পেরিয়ে তার কানে এসে পৌঁচেছে। তার সব প্রগলভতা হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল, দেখা দিল একটা

অতি সরল, নীরব বিস্ময়ের অনুভূতি। কসাকটিকে একটি উপহার দিয়ে নেপোলিয়ন তাকে ছেড়ে দিল—বন্দী বিহঙ্গ যেন মুক্তি পেল তার নিজস্ব প্রান্তরে।"

যে মস্কো নেপোলিয়নের কল্পনাকে উদ্দীপিত করে তারই স্বপ্ন দেখতে দেখতে সে এগিয়ে চলল; "যে পাখিটি তার নিজস্ব প্রান্তরে মুক্তি পেল" সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল আমাদের সীমান্ত-ঘাঁটির দিকে, আর মনে মনে এমন সব কাহিনীর জাল বুনতে লাগল যা আদপেই না ঘটে থাকলেও সে তার সহকর্মীদের শোনাবে বলে স্থির করেছে। যা ঘটেছে তা তো আর বলার মত কিছু নয়, কাজেই সে কথা সে বলতেও চায় না। কসাকদের সঙ্গে দেখা হতে খোঁজ-খবর করতে করতে সন্ধ্যা নাগাদ মনিব নিকলাস রস্তভের খোঁজ পেল; সে তখন ইয়াংকভোতে বাস করছে। রস্তভ তখন ইলিনকে সঙ্গে নিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি ঘুরে দেখবার জন্য ঘোড়া নিয়ে বের হবার জন্য প্রস্তুত; লাভ্রুশ্‌কাকে আর একটা ঘোড়া দিয়ে সে তাকেও সঙ্গে নিয়ে গেল।

অধ্যায়—৮

প্রিন্সেস মারির বিপদ কেটে গেছে, এবং প্রিন্স আন্‌দ্রুর ধারণা এখন সে মস্কোতে নেই।

আল্‌পাতিচ স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে ফিরে আসার পরেই বুড়ো প্রিন্স যেন সহসা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল। বিভিন্ন গ্রামের বেসরকারী সৈনিকদের প্রতি রণসাজে সাজবার আহ্বান জানিয়ে প্রধান সেনাপতিকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিল, শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বল্ড হিল্‌স্‌-এ থেকে তাকে রক্ষা করতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, প্রধান সেনাপতি বল্ড হিল্‌স্‌ রক্ষার কোন ব্যবস্থা করবে কি না, রাশিয়ার অন্যতম বৃদ্ধ সেনাপতি গ্রেপ্তার বা খুন হবে কি না, সেটা প্রধান সেনাপতিরই বিচার্য বিষয়; পরিবারের সকলকেও সে জানিয়ে দিল যে সে নিজে বল্ড হিল্‌স্‌-এই থেকে যাবে।

নিজে থেকে গেলেও প্রিন্সেস, দেসালেস ও ছোট্ট প্রিন্সকে বোগুচারভোতে এবং সেখান থেকে মস্কো পাঠাবার সব ব্যবস্থাই সে করে দিল। আগেকার বীতরাগের পরে বাবার এই বিনিদ্র কঠোর পরিশ্রম দেখে প্রিন্সেস মারি ভয় পেয়ে গেল; বাবাকে একলা রেখে যেতে তার ভরসা হল না; আর জীবনে এই প্রথম সে বাবার অবাধ্য হল। সে চলে যেতে অস্বীকার করায় বাবার রাগ প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে তার উপর ভেঙে পড়ল। সবরকম অন্যায় নির্যাতন চলল তার উপর। মেয়েকে শাস্তি দেবার জন্য বাবা তাকে জানিয়ে দিল, তার জন্যই সে জ্বলেপুড়ে মরছে, সেই ছেলের সঙ্গে তার ঝগড়া বাঁধিয়েছে, তার জীবনকে বিষময় করে তুলবার জন্য তার বিরুদ্ধে হীন সন্দেহ পোষণ করেছে; এই বলে মেয়েকে পড়ার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিল যে সে যাক বা

না যাক তাতে তার কিছুই যায়-আসে না। বাবা আরও বলল, মেয়ের অস্তিত্বের কথাও সে আর মনে রাখতে চায় না, আর মেয়েও যেন তাকে আর মুখ না দেখায়। প্রিন্সেস মারির আশংকা ছিল, বাবা হয়তো তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেবে ; তা না করে বাবা যে শুধু তার মুখ দেখতে চাইল না তাতেই প্রিন্সেস মারি খুশি হল। সে বুঝতে পারল, দূরে চলে না গিয়ে সে যে বাড়িতেই থেকে গেল এতে মনের গভীরে বাবা যে খুশিই হয়েছে এটাই তার প্রমাণ।

ছোট্ট নিকলাস চলে যাবার পরদিন সকালে বুড়ো প্রিন্স পুরো ইউনিফর্ম চাপিয়ে প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করার জন্য প্রস্তুত হল। দরজায় গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। প্রিন্সেস মারি দেখল, ইউনিফর্ম ও সম্মানসূচক পদকাদি পরে বাবা পায়ে হেঁটে বাগানের দিকে গেল সশস্ত্র চাষাদের ও পারিবারিক ভূমিদাসদের পরিদর্শন করতে। জানালায় বসেই বাগানে বাবার কথাবার্তা শুনবার জন্য সে কান পেতে রইল। হঠাৎ কয়েকটি লোক ভয়ার্ত মুখে বাগানের পথ ধরে ছুটে এল।

ফুলের কেয়ারি করা পথ পেরিয়ে তরু-বীথির পথ ধরে প্রিন্সেস মারি ফটকের দিকে ছুটে গেল। বেসরকারী সৈনিক ও পারিবারিক ভূমিদাসদের একটা বড় দল তার দিকেই এগিয়ে আসছে ; তাদের মাঝখানে কয়েকজন লোক ইউনিফর্মধারী, পদকাদি সজ্জিত একটি ছোটখাট বৃদ্ধকে বগলের নীচে হাত ঢুকিয়ে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। প্রিন্সেস মারি ছুটে গেল ; তরু-বীথির ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে যেসব বৃত্তাকার ছোট ছোট আলোর ফুটকি এসে পড়েছে তাতে বাবার মুখের পরিবর্তনটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। সে শুধু এইটুকু দেখতে পেল, আগেকার কঠোর, স্থির-প্রতিজ্ঞ মুখে দেখা দিয়েছে ভীরুতা ও আত্মসমর্পণের ভঙ্গী। মেয়েকে দেখে সে অসহায় ঠোঁট দুটি নাড়ল, একটা কর্কশ শব্দ বেরিয়ে এল। সে যে কি চাইছে তা বোঝা অসম্ভব। তাকে তুলে নিয়ে পড়ার ঘরে যাওয়া হল ; যে কোচটাকে ইদানীং সে এত ভয় পেত তার উপরেই তাকে শুইয়ে দেওয়া হল।

সেইরাতেই ডাক্তার ডাকা হল, রক্তমোক্ষণ করা হল ; ডাক্তার বলল, প্রিন্সের হৃদযন্ত্র আক্রান্ত হওয়ায় তার দক্ষিণ অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছে।

বল্ড হিলস্-এ থাকা ক্রমেই অধিকতর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ; পরদিনই প্রিন্সকে বোগুচারভোতে স্থানান্তরিত করা হল। ডাক্তারও সঙ্গে গেল।

তারা বোগুচারভো পৌঁছবার আগেই দেসালেস ও ছোট্ট প্রিন্স মস্কো রওনা হয়ে গেছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বোগুচারভোতে যে নতুন বাড়ি তৈরি করেছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে বুড়ো প্রিন্স তিন সপ্তাহ সেখানেই শয্যাশায়ী অবস্থায় কাটাল ; তার অবস্থার কোন হেরফের ঘটল না। অচৈতন্য অবস্থায় একটা বিকৃত

শবদেহের মত সে পড়ে রইল। অনবরত বিড়বিড় করছে, ভুরু ও ঠোঁট কুঁচকে যাচ্ছে, চারদিকে যাকিছু ঘটছে তা বুঝতে পারছে কি না তাও বলা শক্ত। একটা জিনিস খুবই নিশ্চিত—সে খুব কষ্ট পাচ্ছে, আর কি যেন বলতে চাইছে। কিন্তু সেটা যে কি তা কেউ বলতে পারে না: একটি রুগ্ন, আধ-পাগল মানুষের কোন খেয়াল হতে পারে, সরকারী কাজকর্মের কথা হতে পারে, অথবা পারিবারিক ব্যাপারও হতে পারে।

ডাক্তার বলল, এই অস্থিরতা থেকে কিছুই বোঝা যায় না, শারীরিক কারণেই এটা ঘটছে; কিন্তু প্রিন্সেস মারির ধারণা, বাবা তাকে কিছু বলতে চাইছে; সে উপস্থিত থাকলেই যে বাবার অস্থিরতাটা বাড়ে তাতেই তার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে।

দেহ ও মন দুদিক থেকেই সে অসুস্থ। নিরাময়ের কোন আশাই নেই। তাকে নিয়ে দেশভ্রমণে যাওয়া অসম্ভব; লোকটিকে তো পথের মধ্যে মরতে দেওয়া যায় না। প্রিন্সেস মারি অনেকসময় ভাবে, "শেষের দিনটা একটু তাড়াতাড়ি এলেই কি ভাল হয় না?" দিনরাত সে বাবার উপর নজর রাখে। ঘুমায় কদাচিৎ। শুনতে খারাপ লাগলেও বাবার শরীরে উন্নতির লক্ষণ দেখার আশা সে করে না, বরং শেষ পরিণতির লক্ষণই সে আশা করে।

নিজের মনের এই বিচিত্র অনুভূতিকে স্বীকার করতে না চাইলেও সেটা কিন্তু সত্য। তার কাছে যেটা আরও বেশী ভয়ংকর হয়ে দেখা দিচ্ছে সেটা হল—যেসব ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, অথবা তার মনের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল, বাবার অসুখের সময় থেকেই সেগুলি যেন নতুন করে জেগে উঠেছে। যেসব চিন্তা অনেক বছর ধরে তার মনেও আসে নি—বাবার ভয় থেকে মুক্ত স্বাধীন জীবনের চিন্তা, এমন কি ভালবাসা ও পারিবারিক জীবনের সম্ভাবনার চিন্তা—তারাই যেন শয়তানের প্রলোভনের মত অনবরত তার কল্পনায় ভাসতে শুরু করেছে। মন থেকে যতই সরিয়ে দিতে চেষ্টা করুক, "সেই ঘটনা" ঘটে যাবার পরে কেমন করে সে তার জীবনকে চালাবে সেই চিন্তাই বার বার তার মনে আসছে। এসবই যে শয়তানের প্রলোভন প্রিন্সেস মারি তা জানে। সে জানে এর বিরুদ্ধে একমাত্র অস্ত্র প্রার্থনা, আর তাই সে প্রার্থনা করতেই চায়। কিন্তু সে প্রার্থনা করতে পারে না, কাঁদতে পারে না, জাগতিক দুশ্চিন্তা তার মনকে চেপে ধরেছে।

বোগুচারভোতে বাস করা ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। চারদিক থেকে ফরাসীদের অগ্রগতির সংবাদ আসছে; বোগুচারভো থেকে দশ মাইল দূরে একটা গ্রামে ফরাসী লুঠেরা একটা বাড়ি লুঠ করেছে।

ডাক্তার প্রিন্সকে সরিয়ে দিতে বলছে; প্রাদেশিক "মার্শাল অব দি নবিলিটি" প্রিন্সেস মারিকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যেতে বলছে, গ্রাম্য পুলিশের বড়কর্তা বোগুচারভোতে এসেও সেই কথাই বলে

গেছে; বলেছে, ফরাসীরা মাত্র পঁচিশ মাইলের মধ্যে পৌঁছে গেছে, গ্রামে গ্রামে ফরাসীদের ফরমান জারি করা হচ্ছে; প্রিন্সেস যদি ১৫ই তারিখের মধ্যে তার বাবাকে এখান থেকে সরিয়ে না নেয় তো ফলাফলের জন্য সে দায়ী থাকবে না।

প্রিন্সেস স্থির করল ১৫ই তারিখে চলে যাবে। সারাটাদিন তারই উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত থাকল। ১৪ই রাতটাও একইভাবে কাটল। যে ঘরে প্রিন্স শুয়ে থাকে পোশাক না ছেড়েই তার পাশের ঘরেই সে রাতটা কাটাল। বারকয়েক ঘুম ভেঙে সে শুনতে পেল বাবা আর্তনাদ করছে, বিড় বিড় করে কথা বলছে, বিছানায় নড়াচড়ার শব্দ হচ্ছে, তিখন ও ডাক্তার ঘরে এসে তাকে পাশ ফিরিয়ে দিচ্ছে। প্রিন্সেস ঘুমতে পারে না, বারবার দরজার কাছে গিয়ে কান পাতে, ঘরে ঢুকতে ইচ্ছা করে, কিন্তু ঢুকবে কি না বুঝতে পারে না। সে জানে, রাত করে তার ঘরে ঢুকলে বাবা বিরক্ত হবে।

কিন্তু আগে কখনও সে বাবার জন্য এত কষ্টবোধ করে নি, তাকে হারাবার ভয় এমনকরে তাকে পেয়ে বসে নি। বাবার সঙ্গে কাটানো সারাটা জীবনের কথা তার মনে পড়ে যায়; তার প্রতিটি কথা ও কাজের মধ্যে আজ সে দেখতে পায় তার ভালবাসার প্রকাশ। মাঝে মাঝে এইসব স্মৃতির ভিতর থেকে শয়তানের প্রলোভন কল্পনায় উত্তাল হয়ে ওঠে: বাবার মৃত্যুর পরে কি ঘটবে, তার নতুন মুক্ত জীবন কিভাবে চলবে—এমনি সব চিন্তা। একান্ত বিরক্তির সঙ্গে সেসব চিন্তাকে সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলল। সকালের দিকে মন শান্ত হয়ে এলে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

অনেক দেরিতে ঘুম ভাঙল। তখনই মনে পড়ল, বাবার অসুস্থতাই তার প্রধান চিন্তার বিষয়। দরজার কাছে গিয়ে কান পেতে শুনল বাবা তখনও গোঙাচ্ছে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, অবস্থা একরকমই আছে।

"কিন্তু আর কি ঘটতে পারত? আমি কি চেয়েছি? আমি কি তার মৃত্যু চাই!" নিজের প্রতি ঘৃণায় সে চেঁচিয়ে বলল।

হাত-মুখ ধুয়ে, পোশাক বদলে, প্রার্থনা সেরে সে ফটকের দিকে গেল। ফটকের সামনে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; তাতে মালপত্র বোঝাই করা হচ্ছে।

আতপ্ত, ধূসর সকাল। প্রিন্সেস মারি ফটকে থামল। নিজের আধ্যাত্মিক হীনতায় নিজেই শিউরে উঠল; বাবার কাছে যাবার আগে নিজের চিন্তাকে গুছিয়ে নিতে চেষ্টা করল।

ডাক্তার নীচে নেমে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

বলল, "আজ তিনি একটু ভাল আছেন। আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম। তার কথার অর্থ যেন কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। আজ তার মাথা অনেকটা পরিষ্কার আছে। ভিতরে চলুন, তিনি আপনার খোঁজ করছেন…"

একথা শুনে প্রিন্সেস মারির বুকের ভিতরটা এত প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল যে তার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল, পাছে পড়ে যায় সেই ভয়ে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার সমস্ত সত্তা যখন সেইসব ভয়ঙ্কর অশুভ চিন্তায় ডুবে আছে ঠিক তখনই বাবাকে দেখতে হবে, তার সঙ্গে কথা বলতে হবে, তার চোখ দুটি স্থিরনিবদ্ধ থাকবে তার উপরে—এ যে হর্ষ ও বিষাদের এক যুগপৎ যন্ত্রণা।

“আসুন”, ডাক্তার বলল।

প্রিন্সেস মারি বাবার ঘরে ঢুকে তার বিছানার পাশে গেল। বালিশের উপর পিঠটা উঁচু করে হেলান দিয়ে সে শুয়ে আছে; দুখানি শীর্ণ, হাড়-বেরকরা, জট-পাকানো রক্তিম শিরা ভর্তি হাত বালিশের উপর এলিয়ে পড়ে আছে; ডান চোখটা একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে; ডান চোখটা টেঁরা হয়ে আছে; ভুরু ও ঠোঁট দুটি নিশ্চল। তাকে কত শীর্ণ, কত ছোট, কত করুণ দেখাচ্ছে। প্রিন্সেস মারি এগিয়ে গিয়ে তার হাতে চুমো খেল। বাবার বাঁ হাত তার হাতটাকে চেপে ধরল; প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল, তার আসার জন্যই বাবা অপেক্ষা করেছিল। সে মেয়ের হাতটা মুচড়ে দিল; তার ভুরু ও ঠোঁট রাগে কাঁপতে লাগল।

বাবা কি চায় তা বুঝতে চেষ্টা করে সে বিপন্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সে যখন এমন একটা জায়গায় দাঁড়াল যেখানে বাবার বাঁ চোখটা তাকে দেখতে পায় তখনই বাবার মুখটা শান্ত হয়ে এল; কয়েক সেকেণ্ড সে চোখটা সরাল না। তারপরই তার ঠোঁট ও জিভ নড়তে লাগল, শব্দ বেরিয়ে এল, অনুরোধ-ভরা ভীরু দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে সে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন তার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা আছে যে মেয়ে হয়তো তার কথা বুঝতে পারবে না।

সব শক্তি এক করে প্রিন্সেস মারি তার দিকে তাকাল। বাবার জিভ নাড়ার হাস্যকর প্রচেষ্টা দেখে সে চোখ নামিয়ে নিল, উদ্গত অশ্রুকে অনেক কষ্টে চেপে রাখল। একই কথা বারবার উচ্চারণ করে প্রিন্স কিছু একটা বলল। প্রিন্সেস তা বুঝতে পারল না, তবু অনুমান করতে চেষ্টা করল এবং তার কথাগুলিই আর একবার উচ্চারণ করল।

“Mmm....ar....ate....ate....” এই কথাগুলিই প্রিন্স বারকয়েক বলল।

এই কয়টি শব্দ থেকে কিছুই বোঝা গেল না। ডাক্তার একটা অনুমান করে তাকেই প্রশ্ন করল: “Mary, are you afraid? (মারি, তুমি ভয় পেয়েছ?)” প্রিন্স মাথা নেড়ে ঐ একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করল।

প্রিন্সেস মারি প্রশ্ন করল, “My mind, my mind aches? (আমার মনে, আমার মনে বড় কষ্ট?)”

এবার প্রিন্স একটা সমর্থনসূচক শব্দ করে প্রিন্সেস মারির হাতটা নিয়ে বুকের নানা জায়গায় চেপে ধরতে লাগল, যেন সঠিক জায়গাটা খুঁজতে চেষ্টা

করছে।

মেয়ে যে তার কথা বুঝতে পেরেছে সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এবার বুড়ো প্রিন্স স্পষ্টতর কণ্ঠে বলল, "শুধু ভাবনা···তোমাকে নিয়ে···ভাবনা···"

উদ্গত চাপা কান্না ও চোখের জল লুকোবার চেষ্টায় প্রিন্সেস মারি বাবার হাতের উপর মাথাটা চেপে ধরল।

বুড়ো প্রিন্স মেয়ের চুলে হাত বুলোতে লাগল।

"সাররাত তোমাকে ডেকেছি," কোনরকমে তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল।

চোখের জলে ভেসে মেয়ে বলল, "আমি যদি একটুও বুঝতে পারতাম··· ঘরে ঢুকতে আমার ভয় হচ্ছিল···"

বাবা মেয়ের হাতটা চেপে ধরল।

"তুমি কি ঘুমোও নি?"

মাথা নেড়ে মেয়ে জবাব দিল, "না, ঘুমোতে পারি নি।"

নিজের অজ্ঞাতেই সে বাবার অনুকরণে যথাসম্ভব আকারে-ইঙ্গিতে নিজের মনের কথা প্রকাশ করতে চেষ্টা করল; তারও যেন জিভটা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে।

"সোনা···লক্ষ্মীসোনা···" বাবার কথার অর্থ বুঝতে না পারলেও তার গলার সোহাগের সুরটা ধরতে তার অসুবিধা হল না। "কেন তুমি আমার ঘরে এলে না?"

প্রিন্সেস ভাবল, "আর আমি, আমি এই মানুষের মৃত্যু কামনা করেছি!"

বুড়ো প্রিন্স কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"ধন্যবাদ···সোনা মেয়ে! ···সকলের জন্য, সকলের জন্য···ক্ষমা! ···ধন্যবাদ! ···ক্ষমা! ···ধন্যবাদ! ···" তার দুই চোখে জল ঝরতে লাগল। হঠাৎ সে বলে উঠল, "আন্দ্রুকে ডাক!" শিশুসুলভ ভীরু সন্দেহের একটা আভাষ ফুটে উঠল তার মুখে।

সে যা বলছে তা যে অর্থহীন সেকথা বুড়ো প্রিন্স নিজেও জানে। অন্তত প্রিন্সেস মারির তাই মনে হল।

বলল, "তার একটা চিঠি পেয়েছি।"

অবাক হয়ে বাবা তার দিকে তাকাল।

"সে কোথায় আছে?"

"সেনাবাহিনীতে আছে বাবা, স্মোলেন্স্ক্-এ।"

বুড়ো প্রিন্স চোখ বুজে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। অবশেষে যেন সবকিছু বুঝতে পেরেছে, সবকিছু মনে পড়েছে এমনিভাবে মাথা নেড়ে আবার চোখ মেলল।

মৃদু স্পষ্ট গলায় বলল, "ঠিক। রাশিয়ার মৃত্যু হয়েছে। ওরা তাকে ধ্বংস করেছে।"

সে আবার ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল; দুই চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে

লাগল। প্রিন্সেস মারি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল।

বুড়ো প্রিন্স আবার চোখ বুজল। কান্না থামিয়ে সে চোখ দুটো দেখাল। তার অর্থ বুঝতে পেরে তিখন চোখের জল মুছিয়ে দিল।

সে আবার চোখ মেলে তাকাল; কি যেন বলল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার কোন অর্থই বুঝতে পারল না। অবশেষে তিখন কথাটা বুঝতে পেরে পুনরায় উচ্চারণ করল। প্রিন্সেস মারির মনে হল, সে হয়তো রাশিয়া, প্রিন্স আন্‌দ্রু, তার নিজের কথা, নাতি, অথবা বুড়োর নিজের মৃত্যুর কথাই বলতে চেয়েছে।

আসলে সে বলেছে, "তোমার সাদা পোশাকটা পর। আমার খুব ভাল লাগে।"

কথাটা বুঝতে পেরে প্রিন্সেস মারি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ডাক্তার হাত ধরে তাকে বারান্দায় নিয়ে সান্ত্বনা দিল, যাত্রার জন্য তৈরি হতে বলল। মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে প্রিন্স আবার কথা বলতে শুরু করল। ভুরু কুঁচকে কর্কশ গলা চড়িয়ে নিজের ছেলে, যুদ্ধ ও সম্রাট সম্পর্কে কথা বলতে বলতেই তার দ্বিতীয় ও চরম স্ট্রোকটা হল।

প্রিন্সেস মারি তখন বারান্দায়। আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছে; দিনটা গরম ও রোদে ভরা। সে কিছুই বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না, অনুভব করতে পারছে না; তার সারা মন জুড়ে আছে বাবার প্রতি এক তীব্র ভালবাসা যা এইমুহূর্তের আগে সে কখনও বোধ করে নি। ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে ছুটে বাগানে চলে গেল; প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতে লাগানো লেবু-বীথির ভিতর দিয়ে পুকুর পারে গিয়ে হাজির হল।

"হ্যাঁ····আমি····আমি···আমি তার মৃত্যু কামনা করেছিলাম! হ্যাঁ, আমি চেয়েছিলাম শেষের দিনটা যেন তাড়াতাড়ি আসে!····শান্তি পেতে চেয়েছিলাম···আর এখন আমার কি হবে? বাবাই যদি না থাকে তো আমি শান্তি দিয়ে কি করব?" বুকটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে বাগানে হাঁটতে হাঁটতে প্রিন্সেস মারি অস্ফুটে কথাগুলি বলল। চাপা কান্নার আবেগে তার বুকটা টিপ্‌টিপ্‌ করছে।

হাঁটতে হাঁটতে সে আবার বাড়িতে ফিরে এল। দেখল, একজন অপরিচিত লোককে সঙ্গে নিয়ে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটি জেলার "মার্শাল অব্ দি নবিলিটি;" প্রিন্সেসের যে অবিলম্বে যাত্রা করা দরকার সেটা বলবার জন্য সে নিজেই এসেছে। প্রিন্সেস মারি সবই শুনল, কিন্তু কিছুই তার কানে গেল না। সে লোকটিকে ঘরে নিয়ে গেল, আহারের ব্যবস্থা করল, পাশে বসে কথা বলল। তারপর ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বুড়ো প্রিন্সের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। উত্তেজিত মুখে

ডাক্তার বেরিয়ে এল ; তাকে ঘরে ঢুকতে নিষেধ করল।

"চলে যান প্রিন্সেস! চলে যান""চলে যান!"

প্রিন্সেস মারি বাগানে ফিরে গেল। পুকুরের পাড়ে ঢালুতে গিয়ে বসল ; সেখান থেকে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। কতক্ষণ সেখানে বসেছিল তা সে জানে না। দ্রুত এগিয়েআসা একটি স্ত্রীলোকের পায়ের শব্দে তার খেয়াল হল। উঠে দাঁড়িয়েই সে দাসী দুনিয়াশাকে দেখতে পেল ; সে তাকেই খুঁজছে। তাকে দেখেই দাসীটি সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"শিগ্‌গির চলুন প্রিন্সেস…প্রিন্স…" দুনিয়াশা ভাঙা গলায় বলল।

"এক্ষুণি যাচ্ছি, এক্ষুণি!" কথা বলেই প্রিন্সেস মারি বাড়ির দিকে দৌড়তে লাগল।

বাড়ির দরজায় তাকে দেখতে পেয়ে মার্শাল বলল, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রিন্সেস! সবকিছুর জন্যই আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।"

প্রিন্সেস রেগে বলল, "আমাকে একা থাকতে দিন ; এ হতে পারে না!"

ডাক্তার তাকে থামাতে চেষ্টা করল। তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সে বাবার দরজার দিকে ছুটে গেল। মনে মনে বলল, "এই লোকগুলি ভয়ার্ত মুখে আমাকে থামাতে চাইছে কেন? তাদের কাউকে আমি চাই না! এখানে তারা কি করছে?" দরজা খুলে ফেলল ; যে ঘরটাকে অন্ধকার করে রাখা হয়েছিল সেটাকে আলোকোজ্জ্বল দেখে সে চমকে উঠল। ঘরে তার নার্স ও অন্য মেয়েরা রয়েছে। সকলে বিছানার কাছ থেকে সরে গিয়ে তাকে পথ করে দিল। বুড়ো প্রিন্স আগের মতই বিছানায় শুয়ে আছে, কিন্তু তার শান্ত মুখের কঠোর ভঙ্গী দেখেই প্রিন্সেস মারি চৌকাঠের উপর থেমে গেল।

"না, বাবা মরে নি,—এ অসম্ভব!" নিজের মনে কথাগুলি বলে সে এগিয়ে গেল ; মনের আতংক চেপে রেখে তার গালের উপর ঠোঁট রাখল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যে অন্তরের সব মমতা কোথায় হারিয়ে গেল, সেখানে দেখা দিল একটা আতংকের অনুভূতি। "না, সে আর নেই! সে নেই, কিন্তু কোথায় গেছে তা কেউ জানে না ; সে এক ভয়ংকর, ভয়াবহ রহস্য!" দুই হাতে মুখ ঢেকে প্রিন্সেস মারি ডাক্তারের হাতের মধ্যেই এলিয়ে পড়ল। ডাক্তার তাকে তুলে ধরল।

তিখন ও ডাক্তারের উপস্থিতিতে মেয়েরা প্রিন্সের গা ধুইয়ে দিল, হাঁ-করা মুখটা যাতে শক্ত হয়ে না যায় সেজন্য একটা রুমাল দিয়ে মাথাটা বেঁধে দিল, আর একটা রুমাল দিয়ে দুটো পাকে একত্র করে বেঁধে দিল। তারপর সম্মান-পদকাদিসহ ইউনিফর্ম পরিয়ে তার কোঁকড়ানো ছোট শরীরটাকে টেবিলের উপর শুইয়ে দিল। এসব যে কখন কিভাবে করা হল তা ঈশ্বরই জানেন, কিন্তু সবই যেন আপনা থেকেই করা হয়ে গেল। রাতের দিকে

শবাধারের চারদিকে মোমবাতি জ্বালিয়ে দেওয়া হল, একটা আবরণ বিছিয়ে দেওয়া হল, সবুজ জুনিপারে মেঝেটা ছেয়ে গেছে, একটা ছাপানো ফিতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে মাথার নীচে, আর ঘরের কোণে বসে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে চলেছে।

একটা মরা ঘোড়াকে ঘিরে ঘোড়ার দল যেমন সলজ্জ ভঙ্গীতে নাক ঝাড়ে, ঠিক তেমনই বৈঠকখানায় শবাধারকে ঘিরে ভিড় করেছে বাড়ির লোকজন ও অতিথিরা—মার্শাল, গ্রাম-প্রধান, চাষী মেয়েরা—সকলেই ভীত চোখে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে মাথা নুইয়ে বুড়ো প্রিন্সের ঠাণ্ডা, শক্ত হাতে চুমো খাচ্ছে।

অধ্যায়—৯

প্রিন্স আন্‌দ্রু বোগুচারভোতে বসবাস করার আগে তার মালিকরা সেখানে থাকতই না, আর সেখানকার চাষীরাও ছিল বল্ড হিল্‌স্‌-এর চাষীদের চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক চরিত্রের লোক। কথাবার্তায়, পোশাকপরিচ্ছদে এবং স্বভাবে তারা ছিল আলাদা। তাদের বলা হয় তৃণাঞ্চল-চাষী। ফসল কাটা অথবা পুকুর ও নালা কাটার সময় তারা যখন বল্ড হিল্‌স্‌-এ আসত তখন তাদের কাজের অধ্যবসায়ের জন্য বুড়ো প্রিন্স তাদের পছন্দ করত, কিন্তু তাদের অভদ্র আচরণ তার মনঃপূত ছিল না।

সর্বশেষ বোগুচারভোতে থাকার সময় প্রিন্স আন্দ্রু সেখানে স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছিল, চাষীদের খারিজ-কর হ্রাস করে দিয়েছিল; কিন্তু তাতে তাদের স্বভাবের পরিবর্তন না হয়ে বরং বুড়ো প্রিন্স যাকে অভদ্রতা বলত তাদের স্বভাবের সেই বৈশিষ্ট্যটাই আরও জোরদার হয়ে উঠেছিল। সবসময়ই কতকগুলো অস্পষ্ট গুজব তাদের মধ্যে চলিত থাকত: কখনও গুজব রটত তাদের সকলকেই কসাক-তালিকাভুক্ত করা হবে; কখনও বলা হত একটা নতুন ধর্মে তাদের দীক্ষিত করা হবে; কখনও বা গুজব রটত জারের সেই ঘোষণার এবং ১৭৯৭ সালে জার পলের কাছে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতির কথা যে প্রসঙ্গে গুজব রটনা করা হত যে তাদের সবাইকে মুক্তি দেওয়া হলেও ভূস্বামীরাই সেটা আটকে দিয়েছে; কখনও বলা হত, সাত বছরের মধ্যেই পিতর ফেদরভিচ সিংহাসনে ফিরে আসবে এবং সকলকেই মুক্তি দেওয়া হবে, কারও উপর কোন বিধি-নিষেধ থাকবে না। বোনাপার্তের সঙ্গে যুদ্ধ এবং তার আক্রমণের গুজবের সঙ্গেও জড়িয়ে থাকত খৃস্টবিরোধী ধারণা, পৃথিবীর অবলুপ্তি ও "সার্বিক মুক্তি"র মত অস্পষ্ট ধারণা।

বুড়ো প্রিন্সের মৃত্যুর কিছুদিন আগেই আল্‌পাতিচ বোগুচারভোতে এসেছে। এসেই সে বুঝতে পারল, এখানকার চাষীদের মধ্যে একটা আন্দোলন শুরু হয়েছে। বল্ড হিল্‌স্‌ জেলার ষাট ভার্স্ট ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত সব চাষীরাই তাদের গ্রামগুলোকে কসাকদের হাতে ধ্বংসের মুখে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে

যাচ্ছে, অথচ গুজব শোনা যাচ্ছে যে বোগুচারভোর চতুষ্পার্শ্বস্থ তৃণাঞ্চলের চাষীরা ফরাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে, তাদের ইস্তাহার হাতে হাতে বিলি হচ্ছে, কেউ দেশ ছেড়ে যাচ্ছে না। বিশ্বস্ত পারিবারিক ভূমিদাসদের কাছ থেকে সে জানতে পেরেছে, গ্রাম-সভার প্রভাবশালী সদস্য চাষী কার্প সম্প্রতি সরকারী গাড়ির চালক হিসাবে বাইরে থেকে সংবাদ এনেছে যে কসাকরা পরিত্যক্ত গ্রামগুলি ধ্বংস করছে, কিন্তু ফরাসীরা তাদের কোনই ক্ষতি করছে না। আল্‌পাতিচ আরও জেনেছে, আগের দিব ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত গ্রাম ভিস্‌লুখভো থেকে জনৈক চাষী ফরাসী সেনাপতির একখানা ইস্তাহার পর্যন্ত নিয়ে এসেছে; তাতে বলা হয়েছে, অধিবাসীদের কোনরকম ক্ষতি করা হবে না, এবং তারা যদি গ্রামেই থেকে যায় তো তাদের সবরকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। প্রমাণস্বরূপ চাষীটি ভিস্‌লুখভো থেকে তার খড়ের আগাম বাবদ এক শ' রুবলের নোটও নিয়ে এসেছে (সে জানে না যে নোটগুলো সবই জাল)।

আরও গুরুত্বপূর্ণ খবরও আল্‌পাতিচ পেয়েছে। যেদিন সে গ্রামপ্রধানকে হুকুম দিয়েছে যে প্রিন্সেসের মালপত্র নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি যোগাড় করতে হবে, সেইদিনই গ্রামের সভায় স্থির হয়েছে যে কেউ গ্রাম ছেড়ে যাবে না, সকলেই অপেক্ষা করে থাকবে। অথচ আর সময় নষ্ট করা চলে না। বুড়ো প্রিন্সের মৃত্যুর দিন ১৫ই তারিখে মার্শাল এসে প্রিন্সেস মারিকে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করতে পীড়াপীড়ি করতে লাগল, কারণ পরিস্থিতি ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সে আরও বলল, ১৬ তারিখের পরে যদি কিছু ঘটে তো সেজন্য সে দায়ী থাকবে না। বুড়ো প্রিন্সের মৃত্যুর দিন সন্ধ্যায় ফিরে যাবার সময় সে বলে গেল, শোকানুষ্ঠানে যোগ দিতে সে পরদিন আবার আসবে। কিন্তু সে আর আসতে পারল না, কারণ সে খবর পেল যে ফরাসীরা অপ্রত্যাশিতভাবে এগিয়ে এসেছে, কাজেই নিজের পরিবার ও মূল্যবান জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলার মত সময়ও তার হাতে ছিল না।

গত ত্রিশ বছর ধরে গ্রাম-প্রধান দ্রোণই বোগুচারভো গ্রামটিকে চালিয়ে এসেছে। বুড়ো প্রিন্স তাকে আদর করে ডাকত "দ্রোমুশ্‌কা" বলে।

দ্রোণ শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে কর্মক্ষম সেইসব চাষীদের অন্যতম যারা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বড বড় দাড়ি রাখে এবং ষাট কি সত্তর বছর পর্যন্ত যাদের কোনরকম পরিবর্তন ঘটে না; একটু চুল পাকে না, একটা দাঁত পড়ে না; ষাট বছরেও ত্রিশ বছরের মতই খাড়া ও শক্ত থাকে।

বুড়ো প্রিন্সের শোভাযাত্রার দিনই বিধ্বস্ত বল্ড হিল্‌স্ জমিদারি থেকে এসে আল্‌পাতিচ দ্রোণকে ডেকে পাঠাল এবং প্রিন্সেসের গাড়ির জন্য বারোটা ঘোড়া এবং বোগুচারভো থেকে মালপত্র সরাবার জন্য আঠারোখানা গাড়ি যোগাড় করতে বলল। আল্‌পাতিচ ভেবেছিল, তার এই হুকুম তামিল

করায় কোন অসুবিধা হবে না, কারণ বোগুচারভোতে ত্রিশটি পরিবার বাস করে, আর চাষীরা সকলেই বেশ সম্পন্ন। কিন্তু তার হুকুম শুনে দ্রোণ চোখ নামিয়ে চুপ করে রইল। আল্‌পাতিচ এমন কয়েকজন চাষীর নামও করল যাদের কাছ থেকে সে গাড়ি নিতে পারবে।

দ্রোণ জবাব দিল, সেইসব চাষীর ঘোড়াগুলো গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে। আল্‌পাতিচ অন্যদের নাম করল, কিন্তু দ্রোণের মতে তাদের ঘোড়াও পাওয়া যাবে না কতকগুলি সরকারী গাড়িতে ভাড়া খাটতে গেছে, বাকিগুলি খুবই দুর্বল, আর অন্যগুলি দানাপানির অভাবে মরে গেছে। সব শুনে মনে হল, গাড়ির জন্যই ঘোড়া পাওয়া যাবে না, মালের জন্য তো নয়ই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দ্রোণের দিকে তাকিয়ে আল্‌পাতিচ ভুরু কুঁচকাল। দ্রোণ যত বড় আদর্শ গ্রাম-প্রধানই হোক না কেন, আল্‌পাতিচও বৃথাই বিশ বছর ধরে প্রিন্সের জমিদারি চালায় নি। দ্রোণের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল যে জবাবগুলো তার নিজস্ব নয়, বোগুচারভো গ্রাম-পঞ্চায়েতের অভিমতেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু সে জানে, অনেক সম্পত্তি করেছে বলে গ্রাম-পঞ্চায়েত দ্রোণকে ঘৃণা করে, আর তাই মালিক-পক্ষ ও ভূমিদাস-পক্ষ এই দুই শিবিরের মধ্যে সে টালবাহানা করছে। দ্রোণের চোখে এই ইতস্তত-ভাব লক্ষ্য করে সে ভুরু কুঁচকে তার আরও কাছে এগিয়ে গেল।

বলল, "শোন হে দ্রোমুশ্‌কা, আমাকে বাজে কথা বলো না। হিজ এক্সেলেন্সি প্রিন্স আন্‌দ্রু আমাকে হুকুম করেছেন সব্বাইকে সরিয়ে দিতে হবে, শত্রুর মুখে তাদের রাখা চলবে না; এই মর্মে জারের হুকুম-নামাও আছে। যে এখানে থেকে যাবে সেই হবে জারের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। শুনছ?"

"শুনছি," চোখ না তুলেই দ্রোণ বলল।

এ জবাবে আল্‌পাতিচ খুশি হল না।

মাথা নেড়ে বলল, "উঁহু, এর ফল কিন্তু খারাপ হবে।"

দ্রোণ বিষণ্ণ গলায় বলল, "তোমার হাতে তো ক্ষমতা আছেই।"

বুকের কাছ থেকে হাতটা তুলে দ্রোণের পায়ের কাছে মেঝেটা দেখিয়ে আল্‌পাতিচ বলল, "দেখ দ্রোণ, এসব ছাড়! তোমার ভিতরটা তো বটেই, তোমার পায়ের তলাকার মাটির তিন গজ পর্যন্ত আমি দেখতে পাই।"

দ্রোণ বিচলিত বোধ করল; বাঁকা চোখে আল্‌পাতিচের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ নামাল।

"এসব বাজে মতলব ছাড়; লোকজনদের বল বাড়িঘর ছেড়ে মস্কো যাবার জন্য প্রস্তুত হোক, এবং প্রিন্সেসের জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য কাল সকালেই গাড়ি ঠিক করুক। আর নিজে কোন সভায় যেও না, বুঝলে?"

দ্রোণ হঠাৎ তার সামনে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

"ইয়াকভ আল্‌পাতিচ, তুমি আমাকে বরখাস্ত কর! আমার কাছ থেকে

সব চাবি নিয়ে নাও, খৃস্টের দোহাই, আমাকে বরখাস্ত কর!"

"থাম!" আল্‌পাতিচ রুক্ষ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলল। "তুমি এবং তোমার পায়ের তলাকার তিন গজ মাটি আমার নখদর্পণে।" সে জানে, মৌমাছি পালনের কলাকৌশল, যই ফসল বোণার ঠিক-ঠিক সময়ের জ্ঞান, বিশ বছর ধরে বুড়ো প্রিন্সের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকার দক্ষতা—এসবকিছু মিলিয়ে অনেকদিন থেকেই সে যাদুকরের খ্যাতি অর্জন করেছে, আর মাটির তিন গজ নীচে পর্যন্ত দেখতে পারার ক্ষমতা যাদুকরদেরই একটা বিশেষ গুণ।

দ্রোণ উঠে দাঁড়িয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, আল্‌পাতিচ তাকে বাধা দিল।

"তোমার মাথায় কি ঢুকেছে বল তো?⋯⋯তুমি কি ভেবেছ হে?"

দ্রোণ বলল, "এইসব লোকদের নিয়ে আমি কি করব? তারা যে খেই হারিয়ে ফেলেছে। আমি তাদের বলেছি⋯⋯"

"তুমি বলেছ তা আমি জানি," আল্‌পাতিচ বলল। তারপরই সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তারা কি মদ খাচ্ছে?"

"একেবারেই আত্মহারা হয়ে পড়েছে ইয়াকভ আল্‌পাতিচ; আরও এক পিপে আনিয়েছে।"

"ঠিক আছে; তাহলে শোন। আমি পুলিশ অফিসারের কাছে যাচ্ছি; তুমি তাদের সেকথা বলো; তারা যেন এসব বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে তৈরি থাকে।"

"বুঝেছি।"

আল্‌পাতিচ আর কিছু বলল না। অনেককাল ধরে সে মানুষ চড়াচ্ছে; সে জানে, তারা যে দরকার হলে আদেশ অমান্য করতেও পারে সে সন্দেহকে প্রকাশ না করাই হচ্ছে তাদের আজ্ঞাধীন করে রাখার প্রধান উপায়। যদিও সে জানে যে সৈন্যদের সহায়তা ছাড়া গাড়ি-ঘোড়া আসবে না, তবু দ্রোণের মুখ থেকে "বুঝেছি" কথাটা বের করেই সে আপাতত সন্তুষ্ট থাকল।

আসলেও তাই ঘটল; সন্ধ্যাবেলায় কোন গাড়ি এল না। গ্রামে মদের দোকানের বাইরে আর একটা সভা বসল, আর সেখানে স্থির হল যে ঘোড়াগুলোকে জঙ্গলে তাড়িয়ে দেওয়া হবে এবং গাড়ি পাঠানো হবে না। এ ব্যাপারে প্রিন্সেসকে কিছু না বলে বল্ড হিল্‌স্ থেকে যেসব গাড়ি এসেছে তার ভিতর থেকে আল্‌পাতিচ নিজের জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে রাখল এবং প্রিন্সেসের গাড়িগুলোর জন্য সেই ঘোড়াগুলোকে কাজে লাগাল। ইতিমধ্যে সে নিজে চলে গেল পুলিশ কর্তৃপক্ষের কাছে।

অধ্যায়—১০

বাবার শেষ কৃত্যের পরে প্রিন্সেস মারি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল; কাউকে ঢুকতে দিল না। দাসী দরজায় এসে জানাল, আল্‌পাতিচ যাত্রার হুকুমের জন্য অপেক্ষা করছে। (এটা দ্রোণের সঙ্গে কথা বলার

আগের ঘটনা)। প্রিন্সেস মারি সোফার উপর উঠে বসে বন্ধ দরজার ওপাশ থেকেই জবাব দিল যে সে এখান থেকে যাবে না, আর তাকে একটু শান্তিতে থাকতে দেওয়া হোক।

যে ঘরে সে শুয়েছিল তার জানালাগুলো পশ্চিমমুখো। দেয়ালের দিকে মুখ করে সোফায় শুয়ে সে চামড়ার কুশনের বোতামগুলি নাড়াচাড়া করছে; কুশনটা ছাড়া অন্য কোনদিকেই তার দৃষ্টি নেই; এলোমেলো চিন্তাগুলো একই বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভূত—মৃত্যুর অপরিহার্যতা এবং তার আত্মিক নীচতা; যে নীচতার সন্দেহ কোনদিন তার মনে জাগে নি, অথচ বাবার অসুখের সময় যা তার কাছে প্রকট হয়ে উঠেছিল। প্রার্থনা করবার ইচ্ছা হল, কিন্তু সাহস হল না; মনের বর্তমান অবস্থায় ঈশ্বরকে ডাকবার সাহস তার হল না। একইভাবে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল।

সূর্য বাড়িটার অপর দিকে চলে গেছে; তার বাঁকা রশ্মিগুলো খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে ঘরটাকে এবং মরক্কো চামড়ার কুশনটাকে আলোকিত করে তুলেছে। হঠাৎ তার চিন্তার স্রোত থেমে গেল। নিজের অজ্ঞাতেই উঠে বসল, চুল ঠিক করে দাঁড়াল, জানালার কাছে গিয়ে সন্ধ্যার তাজা বাতাস টেনে নিল প্রশ্বাসের সঙ্গে।

“হ্যাঁ, এবার তুমি সন্ধ্যাটা উপভোগ করতে পার! সে তো চলে গেছে, আর কেউ তোমাকে বাধা দেবে না,” নিজের মনেই কথাগুলি বলে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল; মাথাটা এলিয়ে পড়ল জানালার গোবরাটে।

বাগান থেকে কে যেন নরম মমতাভরা গলায় তার নাম ধরে ডাকল, তার মাথায় চুমো খেল। চোখ তুলে তাকাল। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ। পরনে কালো পোশাক ও শোকজ্ঞাপন সাদা পট্টি। আস্তে প্রিন্সেস মারির কাছে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তাকে চুমো খেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে শুরু করল। প্রিন্সেস চোখ তুলে তাকাল। দুজনের মধ্যে আগেকার সব বিবাদ ও নিজের ঈর্ষার কথা মনে পড়ে গেল। আরও মনে পড়ল, মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর প্রতি সেই মানুষটির মনোভাব কীরকম বদলে গিয়েছিল, তাকে একেবারেই দেখতে পারত না; তাতেই তো বোঝা যায় যে এই মেয়েটির প্রতি মনে মনে যত তিরস্কার সে করেছে সবই কত অন্যায়। “তাছাড়া, যে আমি তার মৃত্যু কামনা করেছি তার পক্ষে কি কাউকে নিন্দা করা সাজে?”

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর জন্য তার দুঃখ হল; শান্ত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে হাতটা বাড়িয়ে দিল। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ সঙ্গে সঙ্গে আবার কাঁদতে শুরু করল, তার হাতে চুমো খেল, প্রিন্সেস মারির দুঃখের কথা বলে তার অংশীদার হতে চাইল। বলল, প্রিন্সেস যদি নিজের দুঃখের ভাগ তাকে নিতে দেয় তবেই সে সান্ত্বনা পাবে; এই চরম দুঃখের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাদের

ভুল-বোঝাবুঝি যেন তুচ্ছ হয়ে যায়; উপরে বসেই তিনি তার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা দেখতে পাচ্ছেন। প্রিন্সেস কথাগুলি শুনল।

একটু থেমে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "প্রিয় প্রিন্সেস, তোমার অবস্থা তো দুদিক থেকে ভয়ংকর। আমি জানি, তুমি নিজের কথা ভাবতে পারতে না, ভাবতে জান না, কিন্তু তোমাকে ভালবাসি বলেই সেকাজ আমাকেই করতে হবে। ···আল্‌পাতিচ কি তোমার কাছে এসেছিল? এখান থেকে চলে যাবার কথা কি সে কিছু বলেছে?"

প্রিন্সেস মারি কোন জবাব দিল না। কে যাবে, কোথায় যাবে তাই যেন সে বুঝতে পারে নি। "এখন কি কোন কিছু ভাবা সম্ভব? এখন কি সবই সমান নয়?" এই কথা ভেবে সে কোন জবাব দিল না।

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "চেরে মারি, তুমি তো জান যে আমাদের খুব বিপদ—ফরাসীরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এখন বের হওয়াও বিপজ্জনক। বের হলেই আমরা বন্দী হয়ে যাব, আর ঈশ্বর জানেন····"

সঙ্গিনীর কথা বুঝতে না পেরে প্রিন্সেস মারি তার দিকে তাকাল।

বলল, "হায়, এখন যে আমার কোনকিছুতেই ক্ষতিবৃদ্ধি নেই তা যদি কেউ বুঝত! অবশ্য, কোন কারণেই আমি বাবার কাছ থেকে দূরে চলে যেতে চাই না··আল্‌পাতিচ যাবার কথা কি যেন বলেছিল···তাকে বলে দিও, আমি কিছুই করতে পারব না, কিছু না, আর আমি চাই না····"

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ বলল, "তার সঙ্গে কথা বলেছি। সে আশা করছে, আমরা আগামীকাল যাত্রা করার জন্য তৈরি হতে পারব, কিন্তু আমি মনে করি এখানে থাকাই আমাদের পক্ষে ভাল। কারণ তুমিও নিশ্চয় স্বীকার করবে চেরে মারি যে সৈন্যদের হাতে অথবা উচ্ছৃংখল চাষীদের হাতে পড়লে অবস্থা খুবই খারাপ হবে।"

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ তার থলে থেকে জেনারেল রামু-র একখানা ইস্তাহার (সাধারণ রুশ কাগজে ছাপা নয়) বের করল। তাতে বলা হয়েছে, জনসাধারণ যেন তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে না যায়; ফরাসী কর্তৃপক্ষ তাদের রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করবে। ইস্তাহারখানা প্রিন্সেসের হাতে দিল।

বলল, "আমি মনে করি সেনাপতির কাছে আবেদন করাটাই সবচাইতে ভাল; আমার নিশ্চিত ধারণা তোমার প্রতি যোগ্য সম্মান দেখানো হবে।"

প্রিন্সেস মারি কাগজটা পড়ল; চাপা কান্নার আবেগে তার মুখটা কাঁপতে লাগল।

"কার কাছে এটা পেলে?"

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ সলজ্জ ভঙ্গীতে জবাব দিল, "আমার নাম শুনেই তারা হয়তো চিনতে পেরেছে যে আমি একজন ফরাসী।"

প্রিন্সেস মারি ইস্তাহারটা হাতে নিয়ে জানালা থেকে উঠল; ম্লান মুখে

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রিন্স আন্দ্রুর পড়ার ঘরে ঢুকল।

বলল, "দুনিয়াশা, আল্পাতিচ বা দ্রোহ্নুশ্কা বা অন্য কাউকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।" মাদ্ময়জেল বুরিয়েঁর গলা শুনতে পেয়ে বলল, "মাদ্ময়জেল বুরিয়েঁকে বলে দাও সে যেন আমার কাছে না আসে।" ফরাসীদের হাতে পড়বার ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, "আমাদের এক্ষুণি চলে যেতে হবে, এক্ষুণি!"

"প্রিন্স আন্দ্রু যদি শোনে যে আমি ফরাসীদের খপ্পরে পড়েছি! আমি, প্রিন্স নিকলাস বল্কন্স্কির মেয়ে, জেনারেল রামুর কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করেছি, তার অনুগ্রহ নিয়েছি!" এই চিন্তা তাকে আতংকিত করে তুলল, সে শিউরে উঠল, লজ্জা পেল, আর ক্রোধ ও অহংকার এমনভাবে তার মাথায় চড়ে গেল যা আগে কখনও হয় নি। নানা দুঃখকর ও অসম্মানকর চিন্তা তার মাথায় বাসা বাঁধল। "তারা, ঐ ফরাসীরা এই বাড়িতে বাস করবে: ম. ল জেনারেল রামু প্রিন্স আন্দ্রুর পড়ার ঘরটা দখল করবে, তার চিঠি ও কাগজপত্র পড়ে মজা করবে। মাদ্ময়জেল বুরিয়েঁ তাকে সসম্মানে অভ্যর্থনা করবে। করুণা করে আমাকে একটা ছোট ঘর দেওয়া হবে; সৈন্যরা বাবার ক্রুশ ও তারকা চুরি করার জন্য তার নতুন সমাধিকে তচনচ করবে, রুশদের উপর তাদের জয়লাভের কাহিনী শোনাবে, আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখাবার ভান করবে।"

উত্তেজনায় লাল হয়ে সে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল; কখনও মাইকেল আইভানভিচকে, কখনও তিখনকে বা দ্রোণকে ডেকে পাঠাতে লাগল। মাদ্ময়জেল বুরিয়েঁর কথা কতটা ঠিক তা দুনিয়াশা বা অন্য দাসীরা কেউই বলতে পারল না। আল্পাতিচ বাড়ি নেই, থানায় গেছে। স্থপতি মাইকেল আইভানভিচও ঘুম-ঘুম চোখে এসে কিছুই বলতে পারল না। পুরনো খানসামা তিখনের চোখ দুটো বসে গেছে, মুখ শুকিয়ে গেছে, সে মুখে সান্ত্বনাবিহীন দুঃখের ছাপ। প্রিন্সেস মারির সব প্রশ্নের একটিমাত্র জবাবই সে দিতে পারল: "হ্যাঁ প্রিন্সেস," আর ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অবশেষে গ্রাম প্রধান দ্রোণ ঘরে ঢুকল। আভূমি নত হয়ে দরজার পাশেই থেমে গেল।

প্রিন্সেস মারি হেঁটে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল।

"দ্রোনুশ্কা, আমাদের এই দুর্ভাগ্যের দিনে⋯⋯" সে আর বলতে পারল না।

দ্রোণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "সবই ঈশ্বরের হাত।"

কিছুক্ষণ দুজনই চুপচাপ।

"দ্রোহ্নুশ্কা, আল্পাতিচ কোথায় যেন গেছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করার মত কেউ নেই। তারা যে বলছে আমি এখন চলে যেতেও পারব না সে

কথা কি ঠিক ?"

দ্রোণ বলল, "কেন যেতে পারবেন না ইয়োর এক্সেলেন্সি ? নিশ্চয় যেতে পারবেন।"

"আমাকে বলছে যে পথে শত্রুর দিক থেকে বিপদ ঘটতে পারে। দেখ বন্ধু, আমি তো কিছুই করতে পারছি না। কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কেউ নেই। আজ রাতে অথবা কাল ভোরেই আমি চলে যেতে চাই।"

দ্রোণ চুপ করে রইল। প্রিন্সেস মারির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলল, "কোন ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না, সেকথা আল্‌পাতিচকে বলেছি।"

"পাওয়া যাচ্ছে না কেন ?" প্রিন্সেস মারি শুধাল।

দ্রোণ বলল, "সবই ঈশ্বরের অভিশাপ। যা ঘোড়া আমাদের ছিল হয় সেনাবাহিনী নিয়ে গেছে, নয় তো মরে গেছে—এ বছরটাই এইরকম! ঘোড়াকে খাওয়াব কি—নিজেরাই হয়তো না খেতে পেয়ে মরে যাব! যা দিনকাল, কেউ হয়তো তিনদিন না খেয়ে আছে। আমাদের কিছু নেই, সব শেষ হয়ে গেছে।"

প্রিন্সেস মারি মন দিয়ে তার কথা শুনল।

জানতে চাইল, "চাষীরা শেষ হয়ে গেছে ? তাদের রুটিও নেই ?"

দ্রোণ বলল, "তারা অনাহারে মরছে। গাড়ি চালাবে কি।"

"এ কথা আমাকে বল নি কেন দ্রোনুশ্‌কা ? তাদের কি কোনরকম সাহায্য করা যায় না ? আমি সাধ্যমত যা পারি তা করব…"

এই মুহূর্তে তার অন্তর যখন দুঃখে ভারাক্রান্ত তখনও যে ধনী-গরীব থাকতে পারে, তখনও যে ধনীরা গরীবকে সাহায্য না করে থাকতে পারে সেটাই প্রিন্সেস মারির কাছে আশ্চর্য মনে হল। সে শুনেছে "জমিদারের ফসল" বলে একটা জিনিস আছে, আর সেটা কখনও কখনও চাষীদের দেওয়া হয়। সে জানে, তার বাবা বা দাদা কেউই দরকারের সময় চাষীদের সাহায্য করলে তাতে আপত্তি করত না। সে দ্রোণের কাছে চাষীদের প্রয়োজনের কথা এবং বোগুচারভোতে জমিদারের ফসল কি আছে তা জিজ্ঞাসা করতে লাগল।

দ্রোণ সগর্বে বলল, "জমিদারের ফসল সবটাই নিরাপদে আছে। আমাদের প্রিন্স তা বেচতে দেন নি :"

"সেগুলি চাষীদের দিয়ে দাও ; যার যা দরকার সব নিক। দাদার নামে আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম।"

দ্রোণ কিছু বলল না, গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল শুধু।

"যথেষ্ট ফসল জমা থাকলে তা দিয়ে দাও। সব বিলিয়ে দাও। দাদার নামে আমি হুকুম দিলাম ; তাদের বল, আমাদের যাকিছু আছে সবই তাদের। তাদের সবকিছু দিতেও আমাদের আপত্তি নেই। একথা

তাদের বলে দাও।"

প্রিন্সেস যখন কথাগুলি বলছে তখন দ্রোণ একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

"ঈশ্বরের দোহাই ছোটমা, আমাকে বরখাস্ত করুন! আমার কাছ থেকে সব চাবি নিয়ে নেবার হুকুম দিন। তেইশ বছর ধরে চাকরি করছি, কখনও কোন অন্যায় করি নি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে বরখাস্ত করুন!"

তার কাছে লোকটি কি চাইছে, কেনই বা সে বরখাস্ত হতে চাইছে, কিছুই প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল না। বলল, তার সেবায় সে কখনও সন্দেহ করে নি; তারজন্য এবং চাষীদের জন্য সবকিছু করতে সে প্রস্তুত।

অধ্যায়—১১

একঘণ্টা পরে দুনিয়াশা এসে প্রিন্সেসকে জানাল, দ্রোণ এসেছে, আর প্রিন্সেসের হুকুমে চাষীরা গোলাবাড়িতে এসে জমা হয়েছে; তারা প্রিন্সেসের সঙ্গে কথা বলতে চায়।

প্রিন্সেস মারি বলল, "কিন্তু আমি তো তাদের আসতে বলি নি। শুধু দ্রোণকে তাদের ফসল দিতে বলেছি।"

দুনিয়াশা বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, লক্ষ্মী প্রিন্সেস, তাদের চলে যেতে বলে দিন। তাদের সঙ্গে দেখা করবেন না। এসবই চালাকি। ইয়াকভ আল্‌পাতিচ ফিরে এলেই আমরা এখান থেকে চলে যাব। ···দয়া করে যাবেন না···"

"কিসের চালাকি?" প্রিন্সেস মারি অবাক হয়ে শুধাল।

"আমি জানি এটা একটা চাল; ঈশ্বরের দোহাই, আমার কথা শুনুন। নার্সকেও জিজ্ঞাসা করুন। ওরা বলছে, আপনার হুকুমমত ওরা বোগুচারভো ছেড়ে যাবে না।"

"তুমি ভুল করছ। আমি তাদের চলে যেতে বলি নি। দ্রোনুশ্‌কাকে ডাক।"

দ্রোণ এসে দুনিয়াশার কথাই সমর্থন করল; প্রিন্সেসের হুকুমেই চাষীরা এসেছে।

প্রিন্সেস বলল, "কিন্তু আমি তো ওদের ডাকি নি। তুমি নিশ্চয় আমার কথা ভুল করে বলেছ। আমি শুধু তোমাকে বলেছি ওদের ফসল দিতে।"

উত্তরে দ্রোণ শুধু একটা নিঃশ্বাস ফেলল।

বলল, "আপনি হুকুম করলে ওরা চলে যাবে।"

"না, না, আমি বাইরে ওদের কাছে যাব," প্রিন্সেস মারি বলল। নার্স ও দুনিয়াশার বাধা সত্ত্বেও সে ফটকে চলে গেল। দ্রোণ, দুনিয়াশা, নার্স ও মাইকেল আইভানভিচ তাকে অনুসরণ করল।

প্রিন্সেস মারি ভাবল, "ওরা হয়তো ভেবেছে ফসল ঘুষ দিয়ে ওদের এখানে থাকতে বলে ফরাসীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি নিজে এখান থেকে চলে যাব। মস্কোর জমিদারিতে আমি ওদের জন্য মাসিক রেশন ও বাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। আমি নিশ্চিত জানি আন্দ্রু থাকলে আরও বেশী করত।" কথাগুলি ভাবতে ভাবতে গোধূলির আলোয় সে গোলাবাড়ির মাঠে দাঁড়ানো ভিড়ের মানুষগুলোর দিকে এগিয়ে গেল।

লোকগুলি আরও কাছে এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি টুপি খুলে ফেলল। প্রিন্সেস মারি চোখ নামিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। বৃদ্ধ ও যুবকের কত বিচিত্র চোখ তার উপর নিবদ্ধ, আর কত বিচিত্র মুখ; একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করা যায় না; তাই সে ঠিক করল সকলকে একসঙ্গে ডেকে কথা বলবে, কিন্তু কি যে বলবে তা জানে না। এবারও সে যে তার বাবার ও দাদার প্রতিনিধি এই চিন্তাই তাকে সাহস দিল; দৃঢ়তার সঙ্গে সেকথা বলতে শুরু করল।

সে চোখ তুলল না; বুকের মধ্যে একটা ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ হচ্ছে। বলতে লাগল, "তোমরা আসায় আমি খুব খুশি হয়েছি। দ্রোনুশ্‌কা আমাকে বলেছে, যুদ্ধ তোমাদের সর্বনাশ করেছে। সেটা আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য; তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করতে আমি কসুর করব না। এ স্থানটা বিপজ্জনক বলেই আমি নিজে চলে যাচ্ছি⋯শত্রু কাছে এসে পড়েছে⋯কারণ⋯বন্ধুগণ, আমি তোমাদের সবকিছু দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের সব ফসল, যাতে তোমাদের কোন অভাব না হয়। আর যদি তোমাদের কেউ বলে থাকে যে তোমাদের এখানে আটকে রাখার জন্য আমি এই ফসল দিচ্ছি—তো সেটা সত্য নয়। বরং আমি তোমাদের বলছি, সব মালপত্র নিয়ে তোমরা আমাদের মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে চলে যাও; কথা দিচ্ছি, সেখানে তোমাদের যাতে কোন অভাব না হয় সেটা আমি দেখব। সেখানে তোমরা আহার ও বাসস্থান পাবে।"

প্রিন্সেস থামল। ভিড়ের ভিতর থেকে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল।

সে বলতে লাগল, "আমার নিজের পক্ষ থেকে একাজ করছি না, করছি আমার মৃত পিতা, আমার দাদা ও তার ছেলের পক্ষ হয়ে।"

সে আবার থামল। কেউ নিস্তব্ধতা ভাঙল না।

সম্মুখের মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে সে তার বক্তব্য শেষ করল, "এটা আমাদের সকলের দুর্ভাগ্য, সকলেই তা ভাগ করে নেব। আমার যাকিছু আছে সবই তোমাদের।"

সকলের চোখ তার উপরেই নিবদ্ধ; সকলের মুখে একই ভাব। সেটা কৌতূহল, অনুরাগ, কৃতজ্ঞতা, না কি আশংকা ও অবিশ্বাস—সে পরিমাপ সে করতে পারল না; কিন্তু সকলের মুখে একইভাবের প্রকাশ।

ভিড়ের পিছন থেকে একজন বলল, "আপনার দানের জন্য আমরা খুবই

কৃতজ্ঞ, কিন্তু জমিদারের ফসল আমরা নিতে পারব না।"

"কেন পারবে না ?" প্রিন্সেস শুধাল।

কেউ জবাব দিল না। ভিড়ের চারদিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারি দেখল, যার চোখে সে চোখ রাখছে সেই চোখ নামিয়ে নিচ্ছে।

সে আবার শুধাল, "কেন তোমরা নিতে চাও না ?"

কেউ জবাব দিল না।

নিস্তব্ধতা যেন প্রিন্সেসকে চেপে ধরছে; যেকোন একজনের চোখে চোখ রাখতে সে চেষ্টা করল।

তার ঠিক সামনে লাঠিতে ভর দিয়ে একটি খুব বুড়ো মানুষ দাঁড়িয়েছিল। প্রিন্সেস তাকেই জিজ্ঞাসা করল, "তোমরা কথা বলছ না কেন ? তোমরা যদি মনে কর যে আরও কিছু বেশী চাও তো সেটা বল! সবকিছু করতে আমি প্রস্তুত।"

যেন এ কথায় তার রাগ হয়েছে এমনিভাবে মাথাটা আরও নীচু করে সে বিড়বিড় করে বলল, "আমরা একমত হব কেন ? ফসল আমরা চাই না।"

"কেন আমরা সবকিছু ত্যাগ করব ? আমরা একমত নই। কেউ একমত হয়ো না···আপনার জন্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু আমরা অনিচ্ছুক। আপনি চলে যান, একাকি····" ভিড়ের ভিতর থেকে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

ভিড়ের সবগুলি মুখে আর একবার একইভাব ফুটে উঠল; যদিও এবার সেভাব কৌতূহল বা কৃতজ্ঞতার নয়, সেভাব ক্রুদ্ধ সংকল্পের।

বিষন্ন হাসি হেসে প্রিন্সেস মারি বলল, "কিন্তু তোমরা আমার কথা বুঝতে পার নি। কেন তোমরা যেতে চাইছ না ? আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের ঘর দেব, খাওয়াব, আর এখানে শত্রুরা তোমাদের ধ্বংস করবে····"

কিন্তু ভিড়ের কণ্ঠস্বরে তার কণ্ঠস্বর ডুবে গেল।

"আমরা ইচ্ছুক নই। তারাই আমাদের ধ্বংস করুক! আপনার ফসল আমরা নেব না। আমরা রাজী নই!"

প্রিন্সেস মারি পুনরায় কোন একজনের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করল, কিন্তু ভিড়ের ভিতর থেকে একটি চোখও তার দিকে তাকাল না; সকলেই তার চোখকে এড়াতে চেষ্টা করছে। তার কিরকম অদ্ভুত লাগছে।

ভিড়ের ভিতর থেকে নানা কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে: "হ্যাঁ, খুব চাল চেলেছে! ওর সঙ্গে গিয়ে দাসত্বের খাঁচায় ঢুকি আর কি! নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে ক্রীতদাস হতে চল! আমি ঠিকই বলছি! উনি বলছেন, 'তোমাদের ফসল দেব,' বটেই তো!"

নত মস্তকে ভিড়কে পিছনে রেখে প্রিন্সেস মারি বাড়িতে ফিরে গেল। পরদিন সকালে যাত্রার জন্য ঘোড়া প্রস্তুত রাখতে দ্রোণকে হুকুম দিয়ে সে তার ঘরে ঢুকল; সেখানে একাকি ডুবে গেল নিজের চিন্তায়।

॥ প্রথম ভাগ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

লেভ্‌ নিকোলায়েভিচ্‌ তলস্তয়

দ্বিতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books

প্রধান ঘটনাবলীর তারিখ

॥ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

১৮১২

১লা সেপ্টেম্বর	···	কুতুজভের নির্দেশে মস্কো থেকে যাত্রা
৬ই অক্টোবর	···	তারুতিনোর যুদ্ধ
	···	ফরাসীদের মস্কো ত্যাগ
১২ই ,,	···	মালো-ইয়ারো স্লাভেতের যুদ্ধ
২১শে ,,	···	ভিয়াজ্‌মায় সংঘর্ষ
১৮শে ,, —		
২রা নভেম্বর	···	স্মোলেনস্ক-এ ফরাসী বাহিনী
৪ঠা—৮ই ,,	···	ক্রাস্‌নুর যুদ্ধ
৯ই ,,	···	সসৈন্যে নে-র ওর্শা আগমন
১৪ই—১৬ই ,,	···	বেরেজিনা অতিক্রম
২৬শে ,,	···	স্মোর্‌গনি থেকে নেপোলিয়নের যাত্রা
৬ই ডিসেম্বর	···	নেপোলিয়নের প্যারিসে প্রত্যাবর্তন

The Online Library of Bangla Books

সংগ্রাম ও শান্তি

War and Peace

লেভ, নিকোলায়েভিচ, তলস্তয়

দ্বিতীয় পর্ব

The Online Library of Bangla Books

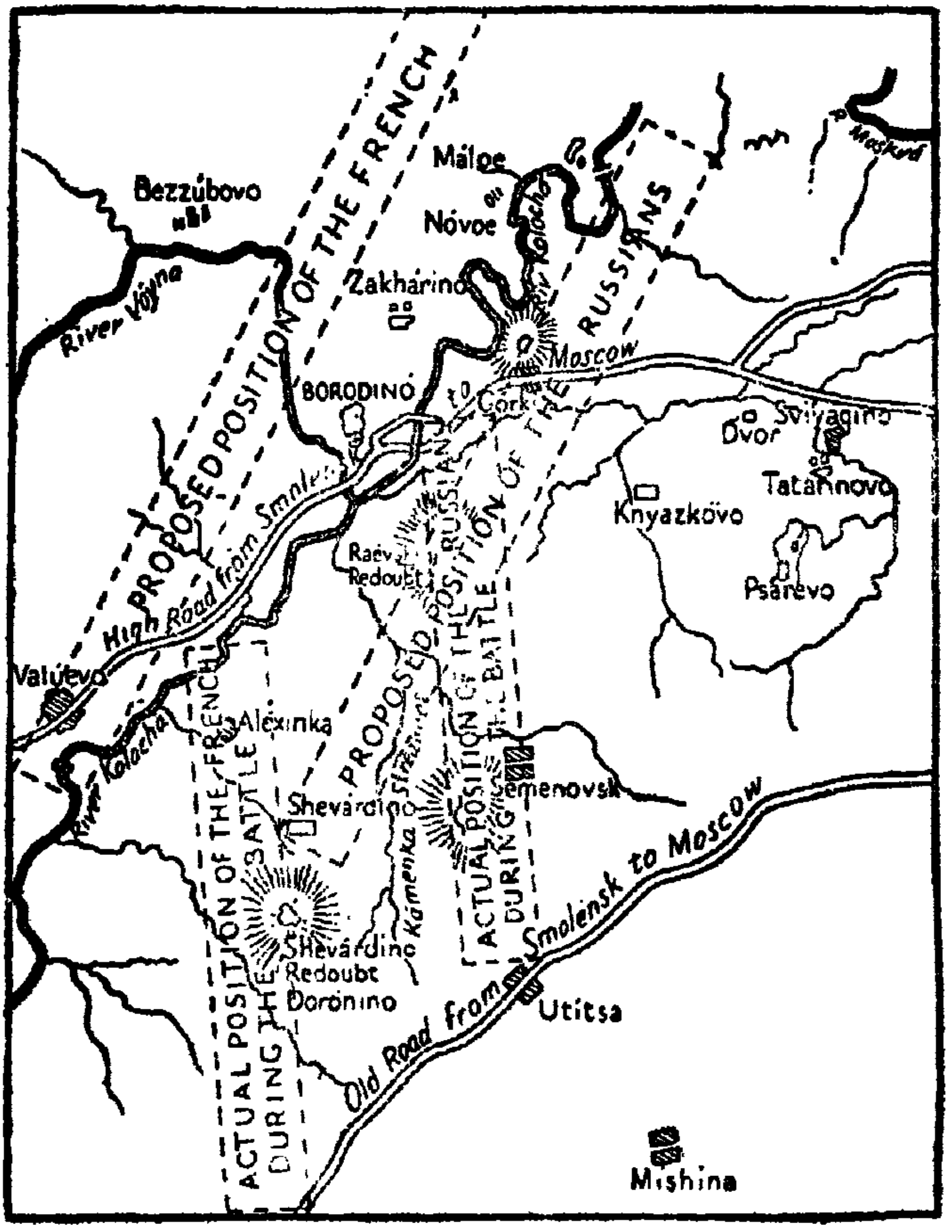
PROPOSED POSITION OF THE FRENCH
THE RUSSIANS
Maloe
Novoe
Bezzubovo
River Vojna
Zakharino
Riv. Kolocha
Moskva
Moscow
BORODINO
Gorki
Svivagino
Dvor
Tatarinovo
Knyazkovo
Psarevo
High Road from Smolensk
Raevski Redoubt
PROPOSED POSITION OF THE RUSSIANS
ACTUAL POSITION OF THE RUSSIANS DURING THE BATTLE
Valuevo
River Kolocha
Alexinka
ACTUAL POSITION OF THE FRENCH DURING THE BATTLE
Shevardino
Kamenka Stream
Semenovsk
Shevardino Redoubt
Doronino
Old Road from Smolensk to Moscow
Utitsa
Mishina

বরদিনো যুদ্ধের মানচিত্র

(দ্বিতীয় খণ্ড দশম পর্ব, অধ্যায়—১৯)

The Online Library of Bangla Books

অধ্যায়—১২

সেদিন রাতে প্রিন্সেস মারি খোলা জানালার পাশে বসে অনেক সময় কাটিয়ে দিল। অনেক দূরের গ্রাম থেকে চাষীদের গলা কানে আসছে, কিন্তু তাদের কথা সে ভাবছে না। সে বুঝতে পেরেছে, যতই ভাবুক না কেন তাদের সে বুঝতে পারবে না। সে ভাবছে নিজের দুঃখের কথা। বর্তমান দুশ্চিন্তার ফলে সে দুঃখ যেন এখন অতীতের বস্তু হয়ে গেছে। এখন সে-কথা মনে করে সে কাঁদতে পারে, প্রার্থনাও করতে পারে।

সূর্যাস্তের পরে বাতাস পড়ে গেছে। রাতটা শান্ত ও সতেজ মনে হচ্ছে। মাঝ রাতের দিকে দূরাগত কণ্ঠস্বর থেমে গেল, মোরগের ডাক ভেসে এল, লেবু গাছের আড়াল থেকে ভরা চাঁদ দেখা দিল, একটা সাদা শিশিরভেজা কুয়াশা সবে উঠতে শুরু করেছে, সমস্ত গ্রাম ও বাড়িটার উপর নেমে এসেছে একটা শান্ত স্তব্ধতা।

নিকট অতীতের ছবিগুলি—বাবার অসুখ ও শেষ মুহূর্তগুলি—একের পর এক স্মৃতির পাতায় ভেসে উঠল। শোকাকুল আনন্দের সঙ্গে সেই সব ছবি সে দেখতে লাগল। শেষ ছবিটা তার মনকে আঘাত করল—বাবার মৃত্যুর ছবি; মনে হল, রাতের এই কুয়াশাচ্ছন্ন স্তব্ধ মুহূর্তে কল্পনায়ও সে ছবি সে আঁকতে পারত না। ছবিগুলি এখন এত স্পষ্ট হয়ে তার কাছে দেখা দিল যে সেগুলিকে কখনও মনে হয় বর্তমানের। কখনও অতীতের, আবার কখনও ভবিষ্যতের।

প্রথম স্ট্রোকের মুহূর্তটা স্পষ্টভাবে তার মনে পড়ল। বল্ড হিলসের বাগানের পথ দিয়ে সকলে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে আসছে, অসহায় জিভটা নেড়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছে, পাকা ভুরু দুটি কুঁচকে গেছে, অস্বস্তি ও ভয়ের সঙ্গে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

সে ভাবতে লাগল, "মৃত্যুর দিন বাবা আমাকে যেকথা বলেছিল সেই-দিনও সেই কথাটাই বলতে চেয়েছিল। সেই কথাই সে বরাবর ভেবে এসেছে।" সেরাতে সে ঘুমোতে পারে নি, পা টিপে টিপে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গিয়েছিল, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতেছিল। যন্ত্রণা-কাতর ক্লান্ত গলায় তিখনের সঙ্গে কথা বলছিল, বলছিল ক্রিমিয়া ও তার আতপ্ত রাতের কথা, সাম্রাজ্ঞীর কথা। তাকে বুঝি কথায় পেয়েছিল। "তাহলে কেন আমাকে ডাকল না? তিখনের বদলে আমাকে কেন ঘরে ঢুকতে দিল না?" এই কথাটা প্রিন্সেস মারি অনেকবার ভেবেছে, এখনও ভাবল। "তার মনের মধ্যে যেকথা ছিল তা তো এখন আর কাউকে বলতে পারবে না। যেকথা সে বলতে চেয়েছিল সেকথা বলবার মুহূর্তটি তো তার বা আমার জীবনে আর কোনদিন আসবে না; তিখন পারে নি, কিন্তু আমি তো তার কথা শুনতে পারতাম, বুঝতে পারতাম। তাহলে কেন আমি ঘরে ঢুকলাম না? "মৃত্যুর দিন যেকথা আমাকে বলেছিল,

হয়তো সেইদিনই সেকথা আমাকে বলত। তিখনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দুবার সে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। সে আমাকে দেখতে চেয়েছিল, অথচ দরজার বাইরে কত কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। মনে পড়ছে, লিজা সম্পর্কে বাবা এমনভাবে কথা বলছিল যেন সে বেঁচে আছে—সে যে মরে গেছে সেকথা বাবা ভুলেই গিয়েছিল—তিখন্ যখন মনে করিয়ে দিল যে লিজা বেঁচে নেই সে তখন চেঁচিয়ে বলেছিল, 'মূর্খ!' তার খুব কষ্ট হয়েছিল। দরজার পিছন থেকে আমি শুনতে পেলাম একটা আর্তনাদ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে সে চেঁচিয়ে বলেছিল 'হা ঈশ্বর!' কেন তখন ভিতরে গেলাম না? গেলে বাবা আমার কি করত? কি হারাতাম আমি? হয় তো বাবা সান্ত্বনা পেত, সেই কথাটা আমাকে বলত।" "সোনা আমার"—বাবার সেই আদরের কথাটা উচ্চারণ করে প্রিন্সেস মারি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। চোখের জলে তার মন কিছুটা শান্ত হল। বাবার মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। শিশুকাল থেকে যে মুখ সে চিনেছে, যে মুখ সে দেখেছে দূর থেকে সে-মুখ নয়, এই সেই ভীরু, দুর্বল মুখ যা সে সেইদিন প্রথম দেখেছিল খুব কাছে থেকে যেদিন তার কথাটা বুঝবার জন্য সে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল বাবার মুখের উপর।

"সোনা আমার," কথাটা সে আর একবার বলল।

"এই কথাটা বলবার সময় বাবা কি ভাবছিল? এখনই বা সে কি ভাবছে?" প্রশ্নটা হঠাৎই তার মনে এল, আর ঠিক তার জবাবেই সে যেন চোখের সামনে বাবাকে দেখতে পেল—সাদা রুমাল দিয়ে থুত্নি বাঁধা অবস্থায় শবাধারে শুয়ে তার মুখে যে ভাব ফুটে উঠেছিল ঠিক সেই ভাব নিয়ে। তখন যে ভয় তাকে পেয়ে বসেছিল এখনও সেই ভয় আবার তাকে চেপে ধরল। অন্য কিছু ভাববার ও প্রার্থনা করবার চেষ্টা সে করল, কিন্তু কোনটাই করতে পারল না। দুই বিস্ফারিত চোখ মেলে চাঁদের আলো ও ছায়ার দিকে তাকিয়ে রইল; প্রতিটি মুহূর্তেই মনে আশা যে বাবার সেই মৃত মুখটা দেখতে পাবে। তার মনে হতে লাগল, যে নিস্তব্ধতা বাড়িটার বাইরে ও ভিতরে ছড়িয়ে আছে তা যেন তাকেও চেপে ধরেছে।

ফিস্ ফিস্ করে ডাকল, "দুনিয়াশা।" আর্তনাদ করে বলল, "দুনিয়াশা!" তারপর সেই নিস্তব্ধতাকে ছিঁড়ে ফেলে ছুটে গেল চাকরদের মহলে। বুড়ি নার্স ও দাসীদের সঙ্গে দেখা করতে; তারাও ছুটে এল তার দিকে।

অধ্যায়—১৩

১৭ই অগস্ট তারিখে বন্দীদশা থেকে সদ্য খালাস পাওয়া লাভ্রুশ্কা ও একটি হুজার আর্দালিকে সঙ্গে নিয়ে রস্তভ ও ইলিন বোগুচারভো থেকে দশ মাইল দূরবর্তী ইয়াংকভোর আস্তানা থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল—ইলিন

যে নতুন ঘোড়াটা কিনেছে সেটাতেও চড়া হবে, আবার গ্রামে কিছু খড় পাওয়া যায় কি না সে খোঁজও করা হবে।

গত তিন দিন যাবৎ দুটি বিরুদ্ধ সেনাদলের মাঝখানে পড়ে বোগুচারভোর দিন কাটছে; ফলে রুশ বাহিনীর পিছনের অংশ আর ফরাসী বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ দুইয়ের পক্ষেই সেখানে পৌঁছনো সমান সহজ; তাই একজন সতর্ক স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার হিসাবে রস্তভ ঠিক করেছে ফরাসীদের হাতে পড়বার আগেই সে বোগুচারভোর অবশিষ্ট রসদপত্র সংগ্রহ করে নেবে।

রস্তভ ও ইলিন বেশ খোস মেজাজে আছে। লাভ্রুশ্‌কাকে নেপোলিয়ন সম্পর্কে নানান প্রশ্ন করে তার গাল-গল্প শুনে হাসতে হাসতে তারা ইলিনের ঘোড়াটাকে পরীক্ষা করার জন্য দৌড়-প্রতিযোগিতা শুরু করে দিল।

রস্তভের কোন ধারণাই নেই যে তার বোনের সঙ্গে যে বল্‌কন্‌স্কির বিয়ের কথা হয়েছে তাদের গ্রাম ও জমিদারিতেই তারা ঢুকতে যাচ্ছে।

ইলিনকে মেরে দিয়ে রস্তভের ঘোড়াই গ্রামের পথে প্রথম পা ফেলল।

"তুমিই প্রথম," মুখ লাল করে ইলিন বলল।

"হ্যাঁ, সব সময়ই প্রথম—কি তৃণভূমিতে, কি এখানে," দোনেৎ-এর উত্তপ্ত পিঠে চাপড় দিতে দিতে রস্তভ বলল।

নিজের লোমশ গাড়ি-টানা ঘোড়াটাকে দেখিয়ে লাভ্রুশ্‌কা পিছন থেকে বলল, "আমার এই ফরাসিনীকে নিয়েই আমি জিততে পারতাম ইয়োর এক্সেলেন্সি, শুধু আপনি দুঃখ পাবেন বলেই তা করিনি।"

পায়ে হাঁটা গতিতে তারা গোলাবাড়িতে পৌঁছল; সেখানে অনেক চাষী ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কেউ কেউ মাথার টুপি খুলল, আবার অনেকে টুপি না খুলে নবাগতদের দেখতে লাগল। বলিরেখায় ভরা মুখ আর পাতলা দাঁড়িওয়ালা দুই ঢ্যাঙা বুড়ো সরাইখানা থেকে বেরিয়ে হাসতে হাসতে, টলতে টলতে, অসংলগ্ন গান গাইতে গাইতে অফিসারদের দিকে এগিয়ে গেল।

রস্তভ হেসে বলল, "খাসা লোক সব! এখানে কিছু খড় মিলবে কি?"

"দুটি যেন মাণিক-জোড়," ইলিন বলল।

খুশির হাসি হেসে একটি চাষী গেয়ে উঠল, "ব-ড় খু-শি-খুশি আ-জ…"

ভিড়ের ভিতর থেকে একজন রস্তভের দিকে এগিয়ে গেল।

বলল, "আপনারা কোন্ পক্ষের?"

ইলিন তামাশা করে বলল, "ফরাসীদের, আর ইনি স্বয়ং নেপোলিয়ন"—লাভ্রুশ্‌কাকে দেখিয়ে দিল।

"তাহলে আপনারা রুশ?" চাষীটি আবার শুধাল।

একটি বেঁটে লোক এগিয়ে গিয়ে বলল, "আপনাদের বেশ বড় একটা দল এখানে আছে তো?"

"খুব বড়," রস্তভ জবাব দিল। "কিন্তু তোমরা এখানে জড় হয়েছ কেন? আজ কি ছুটির দিন?"

চাষীটি যেতে যেতে বলল, "বুড়োরা সব কম্যান নিয়ে কথা বলতে জড় হয়েছে।"

ঠিক সেইসময় বড় বাড়িটার রাস্তা ধরে দুটি স্ত্রীলোক ও সাদা টুপিধারী একটি পুরুষকে আসতে দেখা গেল।

দুনিয়াশকাকে তার দিকেই ছুটে আসতে দেখে ইলিন বলল, "যার পরনে পাটল রঙের পোশাক সেটি আমার, অতএব দূর হটো!"

"আমাদের সকলের," লাভ্রুশ্‌কা চোখ টিপে বলল।

ইলিন হেসে বলল, "তোমার কি চাই সুন্দরী?"

"প্রিন্সেস আপনাদের রেজিমেন্টের নাম ও আপনাদের নাম জানতে আমাকে পাঠিয়েছেন।"

"ইনি কাউন্ট রস্তভ, স্কোয়াড্রন-কম্যাণ্ডার, আর আমি তোমার বশংবদ ভৃত্য।"

ইলিনের কথা শুনে স্বর্গীয় হাসি হেসে মাতাল চাষীটি জোর গলায় বলে উঠল, "কো—ম্পা—নি!" দুনিয়াশার পিছন থেকে আল্‌পাতিচ এগিয়ে এসে কিছুটা দূর থেকেই টুপিটা খুলে ফেলল।

বুকের ভিতরে একটা হাত ঢুকিয়ে তরুণ অফিসারটির প্রতি শ্রদ্ধা অথচ ঈষৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "আপনাকে একটু বিরক্ত করছি ইয়োর অনার। এ মাসের ১৫ই তারিখে পরলোকগত জেনারেল-ইন-চিফ প্রিন্স নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির কন্যা আমার বর্তমান মনিব এইসব লোকদের"—চাষীদের দেখিয়ে—"অভদ্রতায় বিপন্ন বোধ করে আপনাদের তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন।""আপনারা কি দয়া করে ঘোড়া নিয়ে আর একটু এগিয়ে""কারণ এই সব লোকদের সামনে…" ঘোড়ার গায়ে মাছির মত যে দুটি চাষী তার গায়ের কাছে এসে হাজির হয়েছে তাদের দেখিয়ে বলল।

খুশি মনে তার দিকে তাকিয়ে চাষীরা বলে উঠল, "আহা!…আল্‌পাতিচ…আহা ইয়াকভ আল্‌পাতিচ""চমৎকার…খৃস্টের দোহাই, আমাদের ক্ষমা কর। কি বল?"

মাতাল চাষীদের দিকে তাকিয়ে রস্তভ হাসল।

আল্‌পাতিচ গম্ভীর মুখে বলল, "আপনি হয়তো ওদের দেখে একটু মজা পাচ্ছেন ইয়োর অনার?"

"না, এখানে মজা পাবার মত কিছু নেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি?" রস্তভ বলল।

"যদি অভয় দেন তো বলি, এই দুষ্ট চাষীরা আমাদের কর্ত্রীকে জমিদারি থেকে চলে যেতে দিচ্ছে না, গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নেবে বলে ভয়

দেখাচ্ছে; তাই সকাল থেকে মালপত্র গাড়িতে বোঝাই করেও হার এক্সেলেন্সি বাড়ি থেকে বের হতে পারছে না।"

"অসম্ভব!" রস্তভ চেঁচিয়ে বলল।

"আমি সত্যি কথাই বলছি," আল্পাতিচ বলল।

রস্তভ ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়ার ভার আর্দালির হাতে দিয়ে আলপাতিচের পিছন পিছন বাড়িটার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিল। দ্রোণ শেষ পর্যন্ত চাবির গোছা ফেরৎ দিয়ে চাষীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে, আল্পাতিচ ডেকে পাঠানো সত্ত্বেও আসে নি, এবং সকালে প্রিন্সেস যাত্রার জন্য তৈরি হলে চাষীরা সদলবলে গোলাবাড়িতে এসে খবর পাঠিয়েছে যে প্রিন্সেসকে যেতে দেওয়া হবে না: গ্রাম ছেড়ে না যাবার হুকুম এসেছে, তাই তারা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নেবে। আল্পাতিচ তাদের বকুনি দিতে বেরিয়ে এলে তাকেও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে (ভিড়ের মধ্যে দ্রোণকে দেখা যায় নি, কথাবার্তা বলেছে মূলতঃ কার্প) তারা প্রিন্সেসকে যেতে দিতে পারে না, হুকুম এসেছে গ্রামে থাকতে; তবে প্রিন্সেস যদি বাড়িতে থেকে যায় তাহলে তারা আগের মতই তার কাজ করবে, সব ব্যাপারে তাকে মেনে চলবে।

রস্তভও ইলিনকে ঘোড়ার পিঠে আসতে দেখে তাদের ফরাসী সৈন্য মনে করে কোচয়ান গাড়ি ফেলে পালিয়ে গেল, আর বাড়ির মধ্যে মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে দিল।

রস্তভ যখন বাইরের ঘর পেরিয়ে ভিতরে ঢুকল তখন নানা কণ্ঠে ধ্বনি উঠল: "বাবা! উদ্ধারকর্তা! ঈশ্বরই আপনাকে পাঠিয়েছেন!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অসহায় প্রিন্সেস মারি বড় বসবার ঘরটায় বসে ছিল। রস্তভকে সেখানেই নিয়ে আসা হল। লোকটি কে, কেনই বা এসেছে, তার নিজেরই বা কি হবে—সে কিছুই বুঝতে পারল না। কিন্তু তার রুশসুলভ মুখ, তার চলার ভঙ্গী এবং প্রথম কথাগুলি শুনেই বুঝতে পারল সে তারই সমশ্রেণীর মানুষ; গভীর উজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকাল; আবেগকম্পিত গলায় কথা বলতে শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে এই সাক্ষাৎটি রস্তভের কাছে একটি রোম্যান্টিক ঘটনা হয়ে দেখা দিল। প্রিন্সেসের দিকে তাকিয়ে তার ভীরু কাহিনী শুনতে শুনতে সে ভাবতে লাগল: "শোকাভিভূত একটি অসহায় মেয়ে উচ্ছৃংখল রূঢ় চাষীদের করুণার পাত্রী হয়ে পড়েছে! আর বিচিত্র নিয়তিই আমাকে এখানে এনে ফেলেছে! তার আকৃতি ও প্রকৃতিতে কী শান্ত সুষমা ও মহত্ত্ব!"

এ সব কিছুই ঘটেছে বাবার শেষকৃত্যের ঠিক পরের দিন—এই কথাটা বলতে গিয়ে প্রিন্সেসের গলাটা কাঁপতে লাগল। সে চোখ তুলে দেখল রস্তভের চোখেও জল। মারির চোখে ফুটে উঠল যে কৃতজ্ঞতার আভাস

তাতে তার মুখের সাধারণ ভাবটা চাপা পড়ে গেল।

রস্তভ বলল, "ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময়ই আমি যে এখানে এসে পড়েছি এবং আপনার কাজে লাগতে পারছি সেজন্য আমি যে কত খুশি হয়েছি তা বোঝাতে পারব না। আপনি যেখানে খুশি চলে যান; আমি কথা দিচ্ছি কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে সাহস করবে না; শুধু আমাকে আপনার সঙ্গে থাকবার অনুমতি দিন।" যেন কোন রাজ-পরিবারের মহিলাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে এমনিভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে রস্তভ দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তার সশ্রদ্ধ কণ্ঠস্বরই বলে দিল, যদিও প্রিন্সেস মারির সঙ্গে পরিচিত হতে পারলে সে খুবই সুখী হবে, তবু তার দুর্ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে সে কোনরকম জোর খাটাবে না।

প্রিন্সেস মারিও সেটা বুঝতে পেরে খুশি হল।

ফরাসীতে বলল, "আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, কিন্তু আমি আশা করছি যে এ সবটাই ভুল বোঝাবুঝির ফল, এতে কারও কোন দোষ নেই।" হঠাৎ সে কেঁদে ফেলল।

"আমাকে ক্ষমা করবেন!" সে বলল।

ভুরু কুঁচকে আর একবার মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে রস্তভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৪

"আচ্ছা, খুবই সুন্দরী কি? আরে বন্ধু—আমার গোলাপীটি তো উপাদেয় বস্তু; তার নাম দুনিয়াশা....."

কিন্তু রস্তভের দিকে চোখ পড়তেই ইলিন থেমে গেল। বুঝতে পারল, তার নায়ক ও কম্যাণ্ডারের চিন্তার ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে বইছে।

সক্রোধ দৃষ্টিতে ইলিনের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে রস্তভ দ্রুত পা ফেলে গ্রামের দিকে এগিয়ে চলল।

মনে মনে বলল, "ওদের দেখিয়ে দেব; শিক্ষা দিয়ে দেব, ডাকাতের দল!"

আলপাতিচ অনেক কষ্টে তার গতির সঙ্গে তাল রেখে পাশে পাশে চলল।

একসময় বলল, "আপনি কি সিদ্ধান্ত করলেন?"

রস্তভ থেমে গেল; হঠাৎ ঘুষি পাকিয়ে আলপাতিচের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"সিদ্ধান্ত? কি সিদ্ধান্ত? অকর্মা বুড়ো.....?" সে চেঁচিয়ে উঠল। "তুমি কি করছিলে? অ্যা? চাষীরা হাঙ্গামা করছে, আর তুমি তার কোন ব্যবস্থা করতে পারছ না? তুমি নিজেও বিশ্বাসঘাতক! আমি তোমাকে

চিনি। জ্যান্ত তোমার চামড়া তুলে নেব।" "নিজেই অকারণে রাগ করছে বুঝতে পেরে সে আল্‌পাতিচকে ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে চলল। আল্‌পাতিচ মনের ক্ষোভ চেপে রেখে প্রায় দৌড়বার ভঙ্গীতে তার পাশে পাশে চলতে চলতে কৈফিয়ৎ দিতে লাগল। চাষীরা বড়ই একগুঁয়ে, আর বর্তমান পরিস্থিতিতে সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া ওদের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করাটাও যুক্তিযুক্ত নয়; কাজেই সর্বাগ্রে "মিলিটারি" ডাকাই ভাল নয় কি?"

যুক্তিহীন জান্তব ক্রোধে রুদ্ধশ্বাস হয়ে রস্তভ বলে উঠল, "সশস্ত্র বাহিনীই দেব ব্যাটাদের···বাড়াবাড়িই করব!"

কি করবে না ভেবেচিন্তেই সে দৃঢ় পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে চলল ভিড়কে লক্ষ্য করে। যতই তাদের কাছে যাচ্ছে ততই আল্‌পাতিচের মনে হচ্ছে যে এই যুক্তিহীন কাজের ফলটা ভালই হবে। রস্তভের দৃঢ় পদক্ষেপ ও ভ্রূকুঞ্চিত মুখ দেখে ভিড়ের মধ্যে চাষীদের মন কিছুটা দমে গেল।

হুজাররা গ্রামে আসায় এবং রস্তভ প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ায় চাষীদের মধ্যে কিছুটা গোলমাল ও মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। কিছু চাষী বলল, নবাগতরা নিশ্চয়ই রুশ, আর কর্ত্রীকে আটক করায় তারা রুষ্ট হতে পারে। দ্রোণেরও তাই মত; কিন্তু সেকথা বলামাত্রই কার্প ও অন্য কেউ-কেউ প্রাক্তন গ্রাম-প্রধানের উপর চটে উঠল।

কার্প চেঁচিয়ে বলল, "কম্যুনের পয়সায় কত বছর ধরে পেট মোটা করেছ? তোমার আর কি! মাটি খুঁড়ে টাকার ঘড়া তুলবে আর তাই নিয়ে পগার পার হবে। ···আমাদের বাড়ি ঘর থাকল কি গেল তাতে তোমার কি যায়-আসে?"

"আমাদের হুকুম তামিল করতে বলা হয়েছে, কাউকে বাড়িঘর ছেড়ে যেতে বা এক দানা শস্য নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না; বাস, ফুরিয়ে গেল!"

একটি ছোটখাট বুড়ো হঠাৎ দ্রোণকে আক্রমণ করে বলল, "তোমার ছেলেকে সেনাদলে নেবার পালা ছিল, কিন্তু তোমার ভয় কি! তোমার হোৎকা ছেলেটা পার পেয়ে গেল, আর তারা আমার ভাংকাকে নিয়ে গেল মাথা মুড়িয়ে সৈন্য বানাতে! কিন্তু মরতে আমাদের সকলকেই হবে।"

দ্রোণ বলল, "ঠিক বলেছ, আমাদের সকলকেই মরতে হবে। আমি তো কম্যুনের বিপক্ষে নই।"

"হয়েছে—বিপক্ষে নই! নিজের পেট মোটা করেছ····"

ঢ্যাঙা চাষী হুটোরও কি যেন বলার ছিল। কিন্তু ইলিন, লাভ্রুশ্‌কা ও আল্‌পাতিচকে সঙ্গে নিয়ে রস্তভ কাছে এসে পড়াতে কার্প কোমরবন্ধের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে ঈষৎ হেসে এগিয়ে গেল। দ্রোণ সরে গেল পিছনের দিকে। আর জনতা আরও ঘন হয়ে এল।

দ্রুত পায়ে ভিড়ের কাছে এসে রস্তভ চীৎকার করে বলল, "এখানে

তোমাদের গ্রাম-প্রধান কে ? অ্যা ?"

"গ্রাম-প্রধান ? তাকে আপনার কি দরকার ? ····" কার্প জানতে চাইল।

কিন্তু তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই তার মাথার টুপিটা উড়ে গেল, আর একটা প্রচণ্ড ঘুষি লেগে তার মাথাটা একদিকে বেঁকে গেল।

"মাথার টুপি খুলে ফেল বিশ্বাসঘাতকের দল!" ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রস্তভ গর্জে উঠল। "গ্রাম-প্রধান কোথায় ?"

"গ্রাম-প্রধান···গ্রাম-প্রধানকে চাইছেন···দ্রোণ জাখারিচ, তুমি!" ভিড়ের ভিতর থেকে নানান ভীরু ও ব্যতিব্যস্ত কণ্ঠ শোনা গেল ; সকলেই টুপি খুলে ফেলল।

"আমরা তো গোলযোগ করছি না, হুকুম তামিল করছি।" কার্প কথাগুলি বলতেই আর কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "বৃদ্ধরা এই সিদ্ধান্তই নিয়েছে—হুকুম করার মালিকতো আপনারা অনেকেই।"

"কথার উপর কথা! বিদ্রোহ! ····ডাকাতের দল! বিশ্বাসঘাতক!" কার্পের কলার চেপে ধরে রস্তভ এমন অর্থহীনভাবে চীৎকার করে উঠল যেন সে কণ্ঠস্বর তার নিজের নয়। "ওকে বেঁধে ফেল! বেঁধে ফেল!" লাভ্রুস্কা ও আল্পাতিচ ছাড়া অন্য কেউ সেখানে নেই জেনেও সে কথাটা বলল।

যাইহোক, লাভ্রুশ্‌কা ছুটে গিয়ে পিছন থেকে কার্পের হাত চেপে ধরল। বলল, "পাহাড়ের ওপার থেকে সৈন্যদের ডেকে আনব কি ?"

চাষীদের দিকে ঘুরে আল্পাতিচ হুকুম দিল, দুজন এসে কার্পকে বেঁধে ফেলুক। তারাও বিনীতভাবে ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এসে নিজেদের কোমরবন্ধ খুলতে শুরু করল।

"গ্রাম-প্রধান কোথায় ?" রস্তভের চড়া গলা।

বিবর্ণ ভ্রূকুটির মুখে দ্রোণ ভিড়ের ভিতর থেকে এগিয়ে এল।

"তুমিই গ্রাম-প্রধান ? লাভ্রুশ্‌কা, একেও বেঁধে ফেল!" রস্তভ চীৎকার করে বলল ; যেন এ হুকুমকে বাধা দেবারও কেউ নেই।

সত্যি সত্যি আরও দুটি চাষী দ্রোণকে বাঁধতে শুরু করল ; যেন তাদের সাহায্য করতে দ্রোণ নিজের কোমরবন্ধটাই খুলে দিল।

তখন রস্তভ চাষীদের বলল, "তোমরা সকলেই শোন! এই মুহূর্তে যার যার বাড়ি চলে যাও ; তোমাদের কারও গলা যেন আর না শুনি।"

"কেন ? আমরা তো কোন ক্ষতি করি নি। স্রেফ বোকার মত কাজ করেছি। যতসব বাজে ঝামেলা····আমি তখনই বলেছিলাম কাজটা ঠিক হচ্ছে না," পরস্পরের প্রতি দোষারোপের ভাষায় শোনা গেল।

এতক্ষণে আল্পাতিচ আবার স্বমূর্তি ধারণ করল। বলল, "হল তো ? আমি কি বলেছিলাম ? এটা অন্যায় বাপধনরা!"

"সবই আমাদের বোকামি আল্‌পাতিচ," বলতে বলতে সকলে কেটে পড়ল।

যে দুটি লোককে বাঁধা হয়েছে তাদের মনিবের বাড়িতে নিয়ে চলল। মাতাল দুটিও তাদের পিছু নিল।

একজন কার্পকে বলল, "আহা, তোমাকে দেখে দুঃখ হচ্ছে!"

অপরজন বলল, "মনিবের সঙ্গে কখনও ওভাবে কথা বলতে আছে? তুমি কি ভেবেছিলে হে বোকারাম? খাঁটি বোকা!"

দু'ঘণ্টা পরে। বোগুচারভো ভবনের সামনে গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে। চাষীরা মালিকের মালপত্র বয়ে এনে গাড়িতে বোঝাই করছে। প্রিন্সেস মারির ইচ্ছানুসারে দ্রোণের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে সেও তদারক করছে।

দাসীর হাত থেকে একটা গহনার বাক্স নিয়ে একটি চাষী বলল, "এটাকে এমন হেলাফেলা করে রেখো না। জান এর জন্য কত টাকা খরচ হয়েছে! ওভাবে দড়ির নীচে যে রাখছ, ওটার গায়ে ঘসা লাগবে না? এরকম কাজ আমি পছন্দ করি না। সব কাজ নিয়মমাফিক কর। এই দেখ, এটা বাকলের মাদুরের নীচে রেখে খড় দিয়ে ঢেকে দাও—এইভাবেই এসব জিনিস রাখতে হয়!"

প্রিন্স আন্‌দ্রুর লাইব্রেরির কাবার্ডটা এনে আর একটি চাষী বলল, "আরে বই, বই! ধাক্কা দিও না। এটা খুব ভারী—বইয়ে একেবারে ঠাসা।"

উপরের অভিধানগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে অর্থপূর্ণভাবে চোখ টিপে গোল-মুখ ঢ্যাঙা চাষীটি বলল, "হ্যাঁ, ওরা তো সারাদিন কাজ করেন, মোটেই খেলাধুলা করেন না!"

প্রিন্সেসের সঙ্গে গায়েপড়ে ভাব করার অনিচ্ছায় রস্তভ বল্‌কন্‌স্কি ভবনে ফিরে না গিয়ে গ্রামেই প্রিন্সেসের যাত্রার জন্য অপেক্ষা করে রইল। প্রিন্সেসের গাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে রস্তভও ঘোড়ায় চেপে বোগুচারভো থেকে আট মাইল পর্যন্ত তার সঙ্গে সঙ্গে গেল। সেখান থেকেই রাস্তাটা আমাদের সেনাদলের দখলে। ইয়ংকভো সরাইখানাতে সে সশ্রদ্ধভাবে প্রিন্সেসের কাছ থেকে বিদায় নিল এবং এই সর্বপ্রথম তার হাতে চুমো খেল।

তাকে উদ্ধার করার জন্য প্রিন্সেস মারির কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উত্তরে রস্তভ রক্তিম মুখে বলল, "একথা কেন বলছেন! যেকোন পুলিশ অফিসারই তো একাজটা করত। আমাদের যদি অনবরত চাষীদের সঙ্গেই লড়াই করতে হয় তাহলে শত্রুপক্ষকে এতদূর আসতে দেওয়া উচিত হয় নি। আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়ে খুশি হয়েছি। বিদায় প্রিন্সেস!

আপনার সুখ ও সান্ত্বনা কামনা করি ; আশা করি মধুরতর পরিবেশে আবার আমাদের দেখা হবে। আমাকে যদি লজ্জা দিতে না চান তো দয়া করে ধন্যবাদ দেবেন না!"

কথায় ধন্যবাদ না জানালেও প্রিন্সেস কিন্তু ধন্যবাদ জানাল কৃতজ্ঞতা ও মমতায় উজ্জ্বল মুখের ভাব দিয়ে। তাকে ধন্যবাদ জানাবার কিছু নেই একথা প্রিন্সেস বিশ্বাস করে না ; বরং সে নিশ্চিত বোঝে যে রস্তভ না এলে সে বিদ্রোহী চাষী ও ফরাসীদের হাতে মারা পড়ত, তাকে বাঁচাতে এই মানুষটি ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিল ; উচ্চ আদর্শ ও মহৎ অন্তরের এই মানুষটি তার অবস্থা, তার দুঃখকে উপলব্ধি করতে পেরেছে। নিজের ক্ষতির কথা বলতে গিয়ে সে নিজে যখন কাঁদছিল, তখন এই মানুষটির সদয়, অশ্রুভরা চোখ দুটির স্মৃতি সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

রস্তভের কাছে বিদায় নিয়ে সে যখন একলা দাঁড়িয়েছিল তখন হঠাৎ তার চোখ জলে ভরে এল, আর তখনই এই প্রথম একটা বিচিত্র প্রশ্ন তার মনে দেখা দিল : সে কি রস্তভকে ভালবেসেছে?

মস্কোর পথে চলতে চলতে প্রিন্সেস মারি ভাবল : "আচ্ছা ধরা যাক আমি তাকে ভালবাসি, তাহলে?"

যে মানুষ কোনদিন তাকে ভালবাসবে না সে যে তারই প্রেমে পড়েছে এ-কথা নিজের কাছে স্বীকার করাও যে লজ্জার ; তবু এই কথা ভেবে সে সান্ত্বনা পেল যে একথা কেউ কোনদিন জানবে না ; এ-কথা কাউকে কোন দিন না জানিয়েও জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মত যাকে সে ভালবেসেছে তাকে যদি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালবেসে যায় তাহলে তো কেউ তাকে দোষ দিতে পারবে না।

মাঝে মাঝে যখনই রস্তভের চাউনি, তার সহানুভূতি, তার কথাগুলি মনে পড়ে, তখনই সুখের আস্বাদন তার কাছে অসম্ভব বলে মনে হয় না।

সে ভাবতে লাগল : "ঠিক সেইমুহূর্তে নিয়তিই কি তাকে বোগুচারভোতে এনে হাজির করে নি? নিয়তির বশেই কি তার বোন আমার দাদাকে প্রত্যাখ্যান করে নি?, "(নাতাশা যদি প্রিন্স আন্দ্রুকে বিয়ে করত তাহলে সেটা হত 'মারি ও নিকলাসের বিয়ের পথে বিঘ্নস্বরূপ।) সবকিছুর মধ্যেই প্রিন্সেস মারি বিধাতার নির্দেশ দেখতে পেল।

রস্তভেরও প্রিন্সেসকে ভাল লেগেছে। তার কথা মনে হলেই সে আনন্দ পায়। তার বোগুচারভো অভিযানের কাহিনী শুনে সহকর্মীরা যখন বলতে শুরু করল যে খড় খুঁজতে গিয়ে সে রাশিয়ার সবচাই ধনবতী উত্তরাধিকারিণীকে খুঁজে পেয়েছে, তখন তার রাগ হল। তার রাগের কারণ, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করার কথা একাধিকবার তার মাথায় এসেছে। নিকলাস ব্যক্তিগতভাবে তার চাইতে ভাল স্ত্রী কামনা করে না :

তাকে বিয়ে করলে তার মা কাউণ্টেস সুখী হবে, তার বাবার সাংসারিক বিপদ কেটে যাবে, এমন কি প্রিন্সেস মারির সুখও নিশ্চিত হবে।

কিন্তু সোনিয়া? আর তার বাক্‌দান? সহকর্মীদের কথায় এই জন্যই রস্তভ রাগ করেছিল।

অধ্যায়—১৫

প্রধান সেনাপতির কার্যভার হাতে নিয়েই কুতুজভের মনে পড়ল প্রিন্স আন্‌দ্রুকে; তাকে খবর পাঠাল প্রধান ঘাঁটিতে এসে তার সঙ্গে দেখা করতে।

জারেভো-জ্যামেশিতে কুতুজভ যেদিন প্রথম সেনাদল পরিদর্শন করল ঠিক সেইদিনই প্রিন্স আন্‌দ্রু সেখানে এল। গ্রাম্য পুরোহিতের যে বাড়িটার সামনে প্রধান সেনাপতির গাড়ি দাঁড়িয়েছিল প্রিন্স আন্‌দ্রু সেই বাড়িতেই থামল; ফটকের বেঞ্চিটাতে বসে অপেক্ষা করতে লাগল "প্রশান্ত মহামহিম"-এর জন্য—সকলে এখন ঐ নামেই কুতুজভকে ডাকে। গ্রামের অদূরের মাঠ থেকে কখনও ভেসে আসছে সেনাদলের বাজনার শব্দ, কখনও বা নতুন প্রধান সেনাপতির প্রতি বহু কণ্ঠের "হুররা!" ধ্বনি। দু'জন আর্দালি, একজন সংবাদবাহক ও একজন প্রধান ভাণ্ডারী কাছেই প্রিন্স আন্‌দ্রুর দশ পা দূরে দাঁড়িয়ে আছে। একজন বেঁটে, মোটা হুজার লেফ্‌টেন্যাণ্ট কর্ণেল ঘোড়া ছুটিয়ে এল; মুখে ঘন গোঁফ ও গালপাট্টা; প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্রশান্ত মহামহিম" সেখানেই থাকেন কিনা এবং শীঘ্রই ফিরবেন কি না।

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল, সে "প্রশান্ত মহামহিমের" স্টাফের লোক নয়, এখানে নতুন এসেছে। লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল একজন আর্দালির দিকে এগিয়ে গেল। সে জবাব দিল, "কে? প্রশান্ত মহামহিম? আশা করছি তিনি অচিরেই এসে পড়বেন। আপনার কি চাই?"

হুজার লেফটেন্যাণ্ট-কর্ণেল আর্দালিটির গলার স্বরে গোঁফের নীচে একটুখানি হেসে ঘোড়া থেকে নামল, ঘোড়াটাকে সহিসের জিম্মায় দিয়ে মাথাটা ঈষৎ নুইয়ে বল্‌কন্‌স্কির দিকে এগিয়ে গেল। বল্‌কন্‌স্কি বেঞ্চিতে একটু জায়গা করে দিল; লোকটি তার পাশে বসে পড়ল।

লোকটি বলল, "আপনিও প্রধান সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করছেন? লোকে বলে তিনি সকলের সঙ্গেই দেখা করেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! ঐ মাংসখেকোদের নিয়েই যত বিপদ! এতদিনে রুশদের একটা হিল্লে হবে। এতদিন যে কি হচ্ছিল তা শুধু শয়তানই জানে। আমরা তো পিছিয়েই চলেছি। আপনি কি অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু জবাব দিল, "শুধু যে পশ্চাদ্‌পসরণে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়েছে তাই নয়, সেই পশ্চাদ্‌পসরণের কালে আমার যা কিছু প্রিয় সব

হারিয়েছি—শুধু জমিদারি ও জন্ম-ভিটের কথাই বলছি না—হারিয়েছি আমার বাবাকে; শোকের আঘাতেই তিনি মারা গেছেন। আমি স্মোলেন্স্ক্ প্রদেশের লোক।"

"ওঃ! আপনি প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী খুশি হলাম! আমি লেফ্‌টেন্যাণ্ট-কর্ণেল দেনিসভ, 'ভাস্কো' নামেই অধিক পরিচিত," প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতটা চেপে ধরে বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেনিসভ বলল। "হ্যাঁ, আমি শুনেছি।···আর, এই সিদীয় যুদ্ধ। যুদ্ধ ভাল জিনিস—শুধু যাদের গলায় চেপে বসে তাদের পক্ষে তা নয়। তাহলে আপনিই প্রিন্স আন্‌দ্রু বল্‌কন্‌স্কি? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারী খুশি হলাম!" বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে সে আবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর হাতটা চেপে ধরল।

প্রথম প্রণয়ী সম্পর্কে নাতাশা তাকে যা বলেছে দেনিসভ সম্পর্কে প্রিন্স ততটুকুই জানে। এই স্মৃতি তাকে হর্ষ ও বিষাদে ভরা সেই বেদনাময় দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে গেল যার কথা সে ইদানীং আর ভাবে না, অথচ মন থেকেও মুছে যায় নি। সম্প্রতিকালে এত সব নতুন ও গুরুতর ঘটনা তার জীবনে ঘটেছে—যেমন স্মোলেন্স্ক থেকে পশ্চাদ্‌পসরণ, বল্ড হিল্‌স্‌-এ প্রত্যাবর্তন, ও বাবার মৃত্যু-সংবাদ এবং এত বিচিত্র অনুভূতির অভিজ্ঞতা তার হয়েছে যে দীর্ঘদিন সেই সব অতীত স্মৃতি তার মনেই পড়ে নি। দেনিসভের দিক থেকেও বল্‌কন্‌স্কির নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে যে অতীত স্মৃতি তার মনে জেগে উঠেছে তাও তো এক দূর অতীতের রোমাণ্টিক স্মৃতিমাত্র—যখন নৈশভোজনান্তে নাতাশার গান শেষ হলো সে যে কি করছে তা না বুঝেই একটি পঞ্চদশী মেয়ের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল। সেকথা মনে হতেই মৃদু হেসে দেনিসভ বর্তমান অভিযান প্রসঙ্গে তার একটা নতুন পরিকল্পনার কথা তুলল। সমস্ত ব্যাপারটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর কাছে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলল, "সবগুলো সীমান্ত তারা রক্ষা করতে পারবে না। সেটা অসম্ভব। তাদের ব্যূহ আমি ভেদ করবই। আমাকে পাঁচশ' সৈন্য দিন, আমি ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যাব। এটা একেবারে নিশ্চিত কথা! আমাদের সামনে একটি মাত্র পথ আছে—গেরিলা যুদ্ধ!"

দেনিসভ যখন বল্‌কন্‌স্কির কাছে নিজের পরিকল্পনা বোঝাতে গিয়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে চলেছে, তখনই কানে এল সৈন্যদের হৈ-হল্লা আর গান-বাজনার শব্দ। চেঁচামেচি ও ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ক্রমেই গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে।

ফটকে দাঁড়ানো একটি কসাক চেঁচিয়ে উঠল, "তিনি আসছেন। তিনি আসছেন!"

বলকন্‌স্কি ও দেনিসভ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। তারা দেখতে পেল,

একটা ছোট ঘোড়ায় চেপে এগিয়ে আসছে কুতুজভ। তার পিছনে আসছে অশ্বারোহী সেনাপতির একটা বড় দল। ঠিক পিছনেই আসছে বাক্‌লে। একদল অফিসার ছুটতে ছুটতেই চীৎকার করছে "হুর্‌রা!"

চারদিকের "হুর্‌রা! হুর্‌রা!" ধ্বনির মধ্যে কুতুজভ প্রিন্স আন্‌দ্রু ও দেনিসভের পাশ কাটিয়ে উঠোনে ঢুকল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু যখন তাকে শেষবারের মত দেখেছিল কুতুজভ এখন তার চাইতেও বেশী মোটা হয়েছে, গায়ের চামড়া আরও ঝুলে পড়েছে। কিন্তু চোখের সাদা তারা, ক্ষতের দাগ ও ক্লান্তির ছাপ আগের মতই আছে। মাথায় অশ্বরক্ষীর সাদা টুপি ও মিলিটারি ওভারকোট; কাঁধের উপর ঝুলছে সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা চাবুক। ছোট ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসে দুলে দুলে চলছে।

উঠোনে ঢুকেই শিস্‌ দিল "হু-হু হু!" মুখে ফুটে উঠল স্বস্তির আভাষ। রেকাব থেকে বাঁ পাটা তুলে গোটা শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে অনেক কষ্টে জিনের উপর রেখে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পিছলে নীচে নেমে গেল, আর অপেক্ষমান অ্যাড্‌জুটান্ট ও কসাকরা তাকে যেন কোলে করে নামিয়ে দিল।

শরীরটাকে সোজা করে চোখ কুঁচকে চারদিকে তাকাতে কুতুজভের নজর পড়ল প্রিন্স আন্‌দ্রুর উপর; কিন্তু তাকে চিনতে না পেরে দুলতে দুলতে সামনে এগিয়ে গেল। "হু···হু···হু" শিস্‌ দিতে দিতে আর একবার প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল। বুড়ো মানুষদের বেলায় যেমন হয়ে থাকে, তারও প্রিন্স আন্‌দ্রুকে চিনতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল।

"আরে, কেমন আছ হে প্রিন্স? কেমন আছ বাবা? এস, এস···" বলে কুতুজভ বারান্দায় উঠে গেল। তার দেহের ভারে বারান্দাটা কঁকিয়ে উঠল।

কোটের বোতাম খুলে সে বারান্দার বেঞ্চিতে বসল।

"তোমার বাবা কেমন আছেন?"

প্রিন্স আন্‌দ্রু সরাসরি জবাব দিল, "গতকালই বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছি।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে কুতুজভ তার দিকে তাকাল: তারপর টুপি খুলে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।

"তিনি স্বর্গরাজ্য লাভ করুন! আমাদের সকলের জন্যই ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!" কুতুজভ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল; তার বুকটা ওঠা-নামা করতে লাগল; বেশ কিছুক্ষণ সে চুপ করে রইল। "আমি তাকে ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, সমস্ত অন্তর দিয়ে তোমাকে সহানুভূতি জানাচ্ছি।"

প্রিন্সকে আলিঙ্গন করে তার স্থূল বুকের উপর তাকে জড়িয়ে ধরল, বেশ

কিছুক্ষণ ছেড়ে দিল না। ছাড়া পেয়ে প্রিন্স আন্দ্রু দেখল, তার মোটা ঠোঁট দুটি কাঁপছে, দুই চোখে টলমল করছে অশ্রুর বিন্দু। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াবার জন্য দুই হাতে বেঞ্চির উপর চাপ দিল।

"এস, আমার সঙ্গে এস; কথা আছে," কুতুজভ বলল।

ঠিক সেইমুহূর্তে দেনিসভ বারান্দার সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল; অ্যাড্‌জুটাণ্টদের ক্রুদ্ধ ফিস্‌ ফিস্‌ কথায় বাধা মানল না।

আসনের উপর হাত রেখেই কুতুজভ চোখ কুঁচকে তার দিকে তাকাল। নিজের নাম ঘোষণা করে দেনিসভ জানাল যে দেশের কল্যাণের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে "প্রশান্ত মহামহিমকে" জানাতেই সে এসেছে। কুতুজভ ক্লান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তিসূচক ভঙ্গীতে দুই হাত তুলে পরে পেটের উপর ভাঁজ করে রেখে বলল, "আমাদের দেশের কল্যাণের জন্য? ব্যাপার কি? বল!" মুখটা মেয়ের মত লজ্জায় লাল হয়ে উঠলেও সে স্মোলেন্স্ক ও ভিয়াজমার ভিতর দিয়ে শত্রু পক্ষের ব্যূহভেদ করার পরিকল্পনাটা সাহসের সঙ্গে বুঝিয়ে বলতে শুরু করল। দেনিসভ এই অঞ্চলেরই মানুষ, কাজেই দেশটাকে সে ভালই চেনে। তার পরিকল্পনাটা সত্যি ভাল; বিশেষত যেরকম দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সেটাকে সে বুঝিয়ে বলল তাতে সেটাকে সত্যি ভাল মনে হল। কুতুজভ নিজের পায়ের দিকে তাকাল, মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী ঘরটার দিকেও তাকাতে লাগল, যেন সেখান থেকে অপ্রীতিকর কিছু বেরিয়ে আসার আশংকা আছে তার মনে। দেনিসভের কথার মাঝখানেই সেই কুঁড়েঘর থেকে বেরিয়ে এল একজন জেনারেল; তার বগলে একটা পোর্টফোলিও।

কুতুজভ বলে উঠল, "সে কি? তুমি এত শীঘ্র তৈরি হয়েছ?"

সেনাপতি উত্তর দিল, "আমি তৈরি প্রশান্ত মহামহিম।"

কুতুজভ এমনভাবে মাথা নাড়ল যেন বলতে চাইল; "একটা মানুষ এত সব সামাল দেবে কেমন করে?" তারপর দেনিসভের কথায় মন দিল।

দেনিসভ বলতে লাগল, "একজন রুশ অফিসার হিসাবে আমি কথা দিচ্ছি, নেপোলিয়নের যোগাযোগ-সূত্রটা আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারব।"

তার কথায় বাধা দিয়ে কুতুজভ শুধাল, "ইণ্টেণ্ড্যাণ্টজেনারেল কিরিল আন্দ্রীভিচ দেনিসভ তোমার কে হন?"

"তিনি আমার খুড়োমশাই প্রশান্ত মহামহিম।"

"আচ্ছা,. আমরা দুজনতো বন্ধু," কুতুজভ সানন্দে বলল। "ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধু, আজ এখানে থাক, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে।"

দেনিসভের দিকে মাথাটা নেড়ে সে কাগজপত্রগুলির জন্য কনভ্‌নিৎসিন-এর দিকে হাত বাড়াল।

অসন্তুষ্ট গলায় কর্তব্যরত জেনারেল বলল, 'প্রশান্ত মহামহিম কি ভিতরে

আসবেন ? পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে, কিছু কাগজপত্রে সই করতে হবে।"

একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট বেরিয়ে এসে জানাল, ভিতরে সবকিছু প্রস্তুত। কুতুজভ কিন্তু কাজ শেষ না করে ভিতরে যেতে চাইল না। মুখটা বিকৃত করল…

"না হে বাপু, ওদের বল একটা ছোট টেবিল এখানেই নিয়ে আসুক। এখানে বসেই কাগজপত্রগুলো দেখব।" প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, "তুমি যেয়ো না।"

এইসব কথাবার্তা যখন চলছে তখন প্রিন্স আন্দ্রু দরজার পিছনে নারীকণ্ঠের ফিস্‌ফিসানি ও রেশমী পোশাকের খসখসানি শুনতে পেল। বারকয়েক সেদিকে তাকিয়ে সে দরজার পিছনে একটি গোলগাল, গোলাপী সুদর্শনাকে দেখতে পেল; পরনে গোলাপী পোশাক, মাথায় লিলাক-রঙের রুমাল বাঁধা। একটা থালা হাতে নিয়ে প্রধান সেনাপতির জন্য অপেক্ষা করে আছে। কুতুজভের অ্যাড্‌জুটাণ্ট প্রিন্স আন্দ্রুর কানে কানে বলল, এই মহিলা বাড়ির মালিক পুরোহিতের স্ত্রী; প্রশান্ত মহামহিমকে রুটি ও লবন দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। তার স্বামী প্রশান্ত মহামহিমকে গির্জায় স্বাগত জানিয়েছে ক্রুশ দিয়ে, আর স্ত্রী তাকে স্বাগত জানাবে বাড়িতে। মহিলাটি খুবই সুন্দরী" অ্যাড্‌জুটাণ্ট ঈষৎ হেসে কথা শেষ করল। কথাগুলো কানে আসতেই কুতুজভ ঘুরে দাঁড়াল। প্রিন্স আন্দ্রু প্রধান সেনাপতির মুখের দিকে ভালভাবে তাকাল; তার চোখে পড়ল শুধু বিরক্তি, মেয়েদের ফিস্‌ফিস্ কথাবার্তা সম্পর্কে কৌতূহল এবং ভদ্রতা রক্ষা করে চলার বাসনা। জেনারেলের প্রতিবেদনের পাণ্ডিত্য অথবা দেনিসভের পরিকল্পনার দেশাত্মবোধ—কোনটার প্রতিই তার বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল না। প্রতিবেদনের যে জায়গায় রুশ সৈনিকদের লুটতরাজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে একমাত্র সে সম্পর্কেই কুতুজভ নিজের থেকে একটা স্পষ্ট নির্দেশ দিল। প্রতিবেদনের শেষে কুতুজভের স্বাক্ষরের জন্য একটা কাগজ জেনারেল তার সামনে মেলে ধরল; সৈন্যরা যেসমস্ত তাজা যই ফসল ক্ষেত থেকে কেটে নিয়ে গেছে জমির মালিকরা তার দরুণ ক্ষতিপূরণ দাবী করে দরখাস্ত করায় সেনাবাহিনীর কম্যাণ্ডাররা যেসব টাকা ব্যয় করেছে কাগজটাতে তারই উল্লেখ করা হয়েছে।

সব ব্যাপারটা শুনে কুতুজভ ঠোঁট দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে মাথা নাড়তে লাগল।

মুখে বলল, "উনুনে ফেলে দাও…আগুনে পুড়িয়ে দাও! শেষবারের মত তোমাদের বলে দিচ্ছি, এ সবকিছু আগুনে পুড়িয়ে দাও! তারা খুশি মত ফসল কাটবে, কাঠ কেটে আগুন জালাবে! সেরকম কোন হুকুম আমি

দিচ্ছি না, সেধরনের কাজ হোক তাও চাই না, কিন্তু ক্ষতিপূরণের দাবীও চলবে না। এ ছাড়া চলতে পারে না। 'কাঠ যখন কাটা হবে তখন টুকরো চাকলা তো উড়বেই।" সে আবার কাগজটার দিকে তাকাল। মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে বলল, "ওঃ, যত সব জার্মান কেতা।"

অধ্যায়—১৬

শেষ দলিলটা সই করে কুতুজভ বলল, "বাস। সব শেষ।" তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গলার ভাঁজগুলো সমান করে খুশি মনে দরজার দিকে পা বাড়াল।

পুরোহিতের স্ত্রী লজ্জায় আরও লাল হয়ে নীচু হয়ে অভিবাদন করে থালাটা কুতুজভের দিকে এগিয়ে দিল।

কুতুজভ চোখ ঘুরিয়ে একটু হাসল; তার থুতনিটা তুলে ধরে বলল, "আঃ, কী সুন্দর। অনেক ধন্যবাদ মিষ্টি মেয়ে।"

ট্রাউজারের পকেট থেকে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করে থালার উপরে রাখল। তারপর তার জন্য নির্দিষ্ট ঘরের দিকে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, সব খবর ভাল তো?" পুরোহিতের স্ত্রী হাসল, তার গালে একটা টোল পড়ল, কুতুজভকে অনুসরণ করে সেও ঘরে ঢুকল। অ্যাড্জুটান্ট বেরিয়ে এসে প্রিন্স আন্দ্রুকে তার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে ডাকল। আধ ঘণ্টা পরে আবার কুতুজভের ঘরে প্রিন্স আন্দ্রুর ডাক পড়ল। কুতুজভ একটা হাতল-চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে; তখনও সেই বোতাম-খোলা ওভারকোটটাই গায়ে রয়েছে। হাতে একখানা ফরাসী বই। প্রিন্স আন্দ্রু ঘরে ঢুকতে বইটা বন্ধ করে একটা ছুরি দিয়ে জায়গাটা নির্দিষ্ট করে রাখল। প্রচ্ছদ দেখে প্রিন্স আন্দ্রু বুঝল বইটা মাদাম দ জেঁলি-র "শেভালিয়েঁর্স দু সাই নে।"

কুতুজভ বলল, "বস হে, এখানে বস। কিছু কথা বলা যাক। দুঃখের, খুবই দুঃখের কথা। কিন্তু মনে রেখো বাবা আমিও তোমার বাবার মত, দ্বিতীয় পিতা…"

বাবার মৃত্যু সম্পর্কে যা জানত, বল্ড হিল্স্-এর ভিতর দিয়ে আসবার সময় যাকিছু দেখেছে প্রিন্স আন্দ্রু সেসব কথাই কুতুজভকে বলল।

"কোথায়…আমাদের ওরা কোথায় নিয়ে এসেছে!" কুতুজভ হঠাৎ উত্তেজিত গলায় চীৎকার করে বলল; রাশিয়ার বর্তমান ছবিটা যেন স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। "কিন্তু আমাকে সময় দাও, সময় দাও!" তারপরই এই উত্তেজিত আলোচনায় ইতি টেনে বলল, "তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি আমার কাছে রাখব বলে।"

"অনেক ধন্যবাদ প্রশান্ত মহামহিম, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে দপ্তরে কাজ করার মত যোগ্যতা এখন আর আমার মধ্যে নেই," উত্তর দেবার সময়

প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখের হাসিটুকু কুতুজভের দৃষ্টি এড়াল না।

সে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিন্স আন্‌দ্রুর দিকে তাকাল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু বলতে লাগল, "কিন্তু সবচাইতে বড় কথা, রেজিমেন্টে থাকাটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, সেখানকার অফিসারদের আমি ভালবাসি, সৈনিকদেরও আপনজনের মতই দেখি। রেজিমেণ্ট ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট হবে। আপনার সঙ্গে থাকতে পারার সম্মানকে যদি ফিরিয়ে দেই, তো বিশ্বাস করুন·····"

একটা কঠোর, সদয়, অথচ সূক্ষ্ম ব্যঙ্গাত্মকভাব ফুটে উঠল কুতুজভের ফোলা-ফোলা মুখে। সে বল্‌কন্‌স্কিকে থামিয়ে দিল।

"আমি দুঃখিত, কারণ তোমাকে আমার দরকার। কিন্তু তুমি ঠিক বলেছ, ঠিক বলেছ! এখানে মানুষের কোন দরকার নেই। পরামর্শ দেবার লোক অনেক আছে, কিন্তু মানুষ নেই। ভাবী পরামর্শদাতারা যদি সেনাদলে কাজ করত তাহলে রেজিমেণ্ট অন্যরকম হয়ে যেত। অস্তারলিজে তোমাকে আমার মনে আছে····মনে আছে, হ্যাঁ, পতাকা হাতে তোমার সেই মূর্তি আমার মনে আছে!" কুতুজভের মুখে কথাগুলি শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখটা আনন্দে রক্তিম হয়ে উঠল।

তার হাত ধরে নীচে টেনে নামিয়ে কুতুজভ চুমো পাবার জন্য গালটা বাড়িয়ে দিল; আর একবার প্রিন্স আন্‌দ্রু দেখল বুড়ো মানুষটির চোখে জল এসেছে। যদিও প্রিন্স আন্‌দ্রু জানে কুতুজভের চোখে সহজেই জল আসে, তার সাম্প্রতিক ক্ষতির জন্য লোকটি তার প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল, তবু অস্তারলিজের কথা মনে করিয়ে দেওয়াটা তার কাছে যেমন আনন্দের, তেমনই গর্বের।

"তুমি তোমার পথেই চলে যাও; ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। আমি জানি, সম্মানের পথই তোমার পথ!" একটু থেমে কুতুজভ আবার বলল, "বুখারেস্টে তোমার অভাব আমি খুবই অনুভব করেছি, কিন্তু পাঠাবার মত একজন লোকের যে আমার বড়ই দরকার হয়ে পড়েছিল।" প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্য তুর্কী যুদ্ধ ও সন্ধির কথা বলতে শুরু করল। বলল, "হ্যাঁ, যুদ্ধ ও সন্ধি দুইয়েরই জন্য আমাকে দোষী করা হয়েছে। ····কিন্তু ঠিক সময়ে ঠিক কাজটিই করা হয়েছে। একটা দুর্গ দখল করা কিছু শক্ত কাজ নয়, শক্ত একটা অভিযান জয় করা। আর সেজন্য দরকার—দুর্গ দখল ও আক্রমণ নয়, দরকার ধৈর্য ও সময়। এই দুটোরই আশ্রয় আমি নিয়েছিলাম, আর তাই কামেন্‌স্কির চাইতে অনেক বেশী দুর্গ দখল করেছি, আর তুর্কীদের ঘোড়ার মাংস খেতে বাধ্য করেছি! ···বিশ্বাস কর, ফরাসীদেরও সেই অবস্থা হবে, তাদেরও আমি ঘোড়ার মাংসই খাওয়াব!" চোখের জলে আবার তার দৃষ্টি আবছা হয়ে উঠল।

"কিন্তু যুদ্ধ তো আমাদের করতেই হবে," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"সকলে যদি চায় তো তাই হবে; কোন উপায় নেই···কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস কর বাবা, ধৈর্য ও সময়ের চাইতে শক্তিশালী আর কিছু নেই, যা কিছু করার এরাই করে। এ অবস্থায় আমাদের কি করা উচিত? আমি বলছি কি করা দরকার।" একটি ফরাসী প্রবাদ উদ্ধৃত করে বলল: "সন্দেহ যখন দেখা দেয়, মন্ চের, তখন কিছুই করো না।"

"আচ্ছা, তাহলে বিদায়; মনে রেখো, সমস্ত অন্তর দিয়ে আমিও তোমার দুঃখের অংশীদার, আর তোমার কাছে আমি প্রশান্ত মহামহিম নই, প্রিন্স নই, প্রধান সেনাপতিও নই, আমি শুধু পিতা। কখনও কোন দরকার হলে সোজা আমার কাছে চলে এসো। বিদায় বাবা!"

আর একবার প্রিন্স আন্দ্রুকে আলিঙ্গন করে তাকে চুমো খেল; কিন্তু সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই কুতুজভ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অসমাপ্ত উপন্যাস মাদাম দ জেঁলিস-এর "লে শেভালিয়ের্স দু সাইনে"তে মনোনিবেশ করল।

এটা কেমন করে ঘটল বা কেন ঘটল তা বুঝিয়ে বলতে না পারলেও কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে প্রিন্স আন্দ্রু এই নিশ্চিত ধারণা নিয়ে রেজিমেন্টে ফিরে গেল—যে লোকটির উপর সব ভার পড়েছে সে যোগ্য লোক। সে ভাবল, "তিনি নিজের কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করবেন না। কোন উপায় উদ্ভাবন করবেন না অথবা সেইভাবে কাজও করবেন না। কিন্তু তিনি সব কথা শুনবেন, সব কথা মনে রাখবেন, সব কিছুকেই যথাযোগ্য স্থানে রাখবেন। কোন দরকারী কাজে বাধা দেবেন না, আবার কোন ক্ষতিও হতে দেবেন না। তিনি জানেন যে তার নিজের ইচ্ছার চাইতে শক্তিশালী ও গুরুতর কিছু আছে—ঘটনার অনিবার্য গতি; সে গতিকে তিনি বুঝতে পারেন, তার তাৎপর্যকে ধরতে পারেন, এবং ধরতে পারেন বলেই তাতে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকেন।···সব চাইতে বড় কথা, জেঁলিস-এর উপন্যাস ও ফরাসী প্রবাদ সত্ত্বেও তিনি রুশ বলে লোকে তাকে বিশ্বাস করে; বিশ্বাস করে তার আরও কারণ তিনি যখন বললেন: 'আমাদের ওরা কোথায় নিয়ে এসেছে!' তখন তার গলা কাঁপছিল, আর যখন তিনি বললেন: 'ওদেরও ঘোড়ার মাংস খাইয়ে ছাড়ব!' তখনও তার গলা কান্নায় ভিজে উঠেছিল।"

এই অনুভূতি কম-বেশী প্রায় সকলেরই; তাই দরবারী প্রভাব সত্ত্বেও সর্বসম্মত সাধারণ স্বীকৃতির সঙ্গেই প্রধান সেনাপতি পদে কুতুজভের নির্বাচনকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অধ্যায়—১৭

সম্রাট মস্কো থেকে চলে যাবার পরে সেখানকার জীবনযাত্রা আবার

স্বাভাবিক খাতেই বইতে শুরু করেছে; আর সেটা এত বেশী স্বাভাবিক যে সম্প্রতি যে দেশপ্রেমের এতবড় একটা উচ্ছ্বাস ও উন্মাদনা দেখা দিয়েছিল আজ সেটা মনে করাই শক্ত হয়ে উঠেছে; একথা বিশ্বাস করাও আজ শক্ত যে রাশিয়া আজ সত্য সত্যই বিপন্ন, আর ইংলিশ ক্লাবের সদস্যরা সকলেই দেশের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত পিতৃভূমির সন্তান। শুধু একটা ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের উন্মাদনা সমান তালেই চলতে লাগল; সেটা হল, সৈন্য ও অর্থ সরবরাহের আহ্বান; যেমুহূর্তে সেইসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তখন থেকেই সেটা আইনগত সরকারী রূপ নিয়ে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে।

শত্রু যতই মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে আসন্ন বিপদ সম্পর্কে মস্কোপন্থীদের হেলাফেলার ভাবটা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। নানা ধরনের ইস্তাহার ছাপিয়ে ফরাসীদের সম্পর্কে হাল্কা রসিকতা করা হয়েছে, আর ক্লাবে-রেস্তোরাঁতে তাই নিয়ে সরস আলোচনা চলছে। ইংলিশ ক্লাবের কোণের ঘরটাতে সদস্যরা তেমনি একটা ইস্তাহার পড়ে শোনাচ্ছে। রস্তপ্‌চিনের ইস্তাহারে জনৈক রুশ নাগরিক ফরসীদের ঠাট্টা করে বলছে: "রাশিয়ার বাঁধাকপি খেয়ে তাদের পেটমোটা হবে, তাদের যবের পরিজ খেয়ে পেট ফাটবে, আর বাঁধাকপির ঝোল খেয়ে দমবন্ধ হবে। তারা তো সব বেঁটে-বামন, একটা চাষী মেয়েই খড়ের কাঁটা দিয়ে তাদের তিনজনকে ঠেঙাবে।" কেউ কেউ বা এ সুরটা পছন্দ করছে না; বলছে, এটা বড়ই বোকা-বোকা আর ইতর মনের পরিচায়ক।

জুলি পরদিনই মস্কো ছেড়ে যাবে; সেই উপলক্ষ্যে একটা বিদায়-সভার আয়োজন করা হয়েছে। অন্য অনেক কথার সঙ্গে রস্তভদের প্রসঙ্গও আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

জুলি বলল, "শুনেছি তাদের অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আর লোকটি এত অবিবেচক, মানে আমি স্বয়ং কাউণ্টের কথা বলছি। রাজুমভ্‌স্কিরা তার মস্কোর উপকণ্ঠস্থ বাড়ি ও জমিদারি কিনতে চেয়েছিল, কিন্তু দরাদরির আর শেষ হচ্ছে না। তিনি বড় বেশী দর হেঁকেছেন।

একজন বলল, "না না, আমার তো মনে হয় কয়েকদিনের মধ্যেই বিক্রি পাকা হয়ে যাবে। যদিও এখন মস্কোর কোন কিছু কেনাই পাগলামি।"

জুলি শুধাল, "কেন? আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে মস্কো বিপন্ন?"

"তাহলে আপনি মস্কো ছেড়ে যাচ্ছেন কেন?"

"আমি? এটা কি প্রশ্ন হল? আমি যাচ্ছি কারণ⋯কারণ সকলেই যাচ্ছে; আর তাছাড়া—আমি তো জোয়ান অব আর্ক বা আমাজন নই।"

"তাতো বটেই, তাতো বটেই।"

রস্তভের কথা উল্লেখ করে জনৈক বেসরকারী অফিসার বলল, "সবকিছু ভালভাবে চালাতে পারলে তিনি সব ঋণ পরিশোধ করে দিতে পারবেন।"

"বুড়ো মানুষ ভাল, তবে কাজের লোক নয়। আর এত দীর্ঘকাল তারা মস্কোতেই বা আছেন কেন? অনেক আগেই তো তাদের দেশে ফিরে যাবার কথা। নাতালি তো এখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে, তাই না?" সবজান্তা হাসি হেসে জুলি পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল।

পিয়ের জবাব দিল, "তারা ছোট ছেলের জন্য অপেক্ষা করে আছে। ছেলেটি ওবোলেন্‌স্কির কসাকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বেলায়া জেবকভ-এ চলে গেছে; সেখানে একটা রেজিমেণ্ট গড়া হচ্ছে। এখন তারা চেষ্টাচরিত্র করে ছেলেটিকে আমার রেজিমেণ্টে বদলি করিয়েছে; আশা করছে, যেকোন সময়ে সে এসে পড়বে। কাউণ্ট অনেক আগেই চলে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছেলে না ফেরা পর্যন্ত কাউণ্টেস কিছুতেই মস্কো ছেড়ে যাবেন না।"

"গত পরশু আর্‌খারভদের বাড়িতে তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। নাতালি সুস্থ হয়ে উঠেছে; মুখও অনেক উজ্জ্বল হয়েছে। একটা গানও গাইল। কত সহজেই মানুষ সবকিছু ভুলে যেতে পারে!"

"কি আবার ভুলে গেল?" অসন্তুষ্ট চোখে পিয়ের শুধাল।

জুলি হাসল।

"কি জানেন কাউণ্ট, আপনার মত নাইটদের শুধু মাদাম দ সুজার উপন্যাসেই পাওয়া যায়।"

"কোন্ ধরনের নাইট? আপনি কি বলতে চাইছেন?" সলজ্জ ভঙ্গীতে পিয়ের শুধাল।

"ঠিক আছে কাউণ্ট, ঠিক আছে। আপনি তো সবই জানেন!"

"আমি কিছু জানি না," পিয়ের বলল।

"আমি জানি নাতালির সঙ্গে আপনার বন্ধুত্ব ছিল, আর তাই...কিন্তু আমার বন্ধুত্ব ছিল ভেরার সঙ্গে—আদরের ভেরা।"

অসন্তোষভরা গলায় পিয়ের বলতে লাগল, "না মাদাম, নাতালি রস্তভার নাইটের ভূমিকা আমি কখনও গ্রহণ করি নি, আর প্রায় এক মাস তাদের বাড়িতেও যাই নি। কিন্তু আমি বুঝতে পারি না এই নিষ্ঠুরতা...."

"কৈফিয়ৎ দেওয়া মানেই দোষ স্বীকার করা।" জুলি হাত নেড়ে হেসে বলল। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টে শেষ কথাটি বলল, "আর আজ কি শুনে এসেছি জানেন? বেচারি মারি বল্‌কন্‌স্কায়া গতকাল মস্কো এসেছেন। আপনি কি জানেন তিনি বাবাকে হারিয়েছেন?"

"সত্যি? তিনি কোথায় আছেন? তার সঙ্গে একবার অবশ্য দেখা করতে হবে," পিয়ের বলল।

"গতকাল সন্ধ্যা বেলাটা তার সঙ্গেই কাটিয়েছি। আজ বা কাল সকালেই ভাই-পোকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে যাবেন।"

"আচ্ছা, তিনি কেমন আছেন?" পিয়ের শুধাল।

"ভালই আছেন, তবে মন খারাপ। কিন্তু জানেন কি কে তাকে উদ্ধার করেছে? সে এক রোমান্টিক ব্যাপার। নিকলাস রস্তভ। সকলে তাকে ঘিরে ধরেছিল, খুনই করে ফেলত, তার কিছু লোক আহতও হয়েছে। নিকলাস রস্তভ ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে।…"

বেসরকারী অফিসারটি বলল, "আবার একটা রোমাঞ্চ। সত্যি, এই সঠিক পলায়নের সুযোগ সব বয়স্কা কুমারীদেরই বিয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এদিকে কাতিচে, আর ওদিকে প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কায়া।"

"আপনি কি জানেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস তিনি এই যুবকের কিঞ্চিৎ প্রেমে পড়েছেন' ?"

"আবার ফরাসী ভাষা? জরিমানা দিন!"

"কিন্তু একথা কি রুশ ভাষায় বলা যায়?"

অধ্যায়—১৮

পিয়ের বাড়ি ফিরলেই সেদিনের আনা রস্তপ্‌চিনের দু'খানা ইস্তাহার তার হাতে দেওয়া হল।

প্রথম ইস্তাহারে বলা হয়েছে, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন জনসাধারণকে মস্কো ত্যাগ করতে নিষেধ করেছে বলে যে খবর রটেছে সেটা মিথ্যা; বরং মহিলারা ও ব্যবসায়ীদের স্ত্রীরা শহর ছেড়ে চলে যাওয়ায় সে খুশিই হয়েছে। ইস্তারে বলা হয়েছে, "এবার ত্রাস কমে যাবে, গুজবও কম ছড়াবে; কিন্তু আমার জীবনটাকে পণ রেখে বলছি, সেই শয়তান কোনদিনই মস্কোতে প্রবেশ করতে পারবে না।" এই কথাগুলি থেকেই পিয়ের সর্বপ্রথম পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারল যে ফরাসীরা মস্কোতে ঢুকবে। দ্বিতীয় ইস্তাহারে বলা হয়েছে, আমাদের প্রধান ঘাঁটি ভিয়াজ্‌মাতে সরিয়ে আনা হয়েছে, কাউণ্ট উইৎগেন্‌স্তিন ফরাসীদের হটিয়ে দিয়েছে; কিন্তু মস্কোর অনেক বাসিন্দাই অস্ত্রসজ্জিত হতে ইচ্ছুক, তাই রাজকীয় অস্ত্রাগারে তাদের জন্য সব রকম অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখা হয়েছে: তলোয়ার, পিস্তল, বন্দুক সবই কম দামে পাওয়া যাবে। পিয়ের দুটো ইস্তাহার নিয়েই কিছুক্ষণ ভাবল। যে ভয়ংকর ঝড়ো মেঘকে সে সর্বান্তঃকরণে কামনা করছিল সেটা আসন্ন হয়ে উঠেছে।

"আমি কি সেনাদলে চাকরি নেব, না অপেক্ষা করব?" শততম বারের জন্য সে নিজেকে প্রশ্নটা করল। টেবিলের উপর থেকে তাসের প্যাকেটটা নিয়ে পেশেন্স" খেলার আয়োজন করল।

তাসগুলো বেটে হাতে নিয়ে মাথাটা তুলে ভাবল, "পেশেন্স খেলাটা যদি মিলে যায় তাহলে বুঝব…কি বুঝব?"

এ প্রশ্নের কোন মীমাংসা করার আগেই বড় প্রিন্সেস দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল, সে ঘরে ঢুকতে পারে কি না।

"তাহলে বুঝব যে আমাকে সেনাদলে যেতেই হবে," নিজের মনে কথাটা বলে সে প্রিন্সেসের উদ্দেশ্যে বলল, "এস, এস।"

একমাত্র বড় প্রিন্সেসই এখনও পিয়েরের বাড়িতে বাস করছে। উত্তেজিত গলায় সে বলল, "তোমার কাছে আসার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। তুমি তো জান, একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে। কি ঘটবে কে জানে? সকলেই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। লোকজনরা দাঙ্গা শুরু করেছে। অথচ আমরা এখনও এখানেই বসে আছি কেন?"

ঈষৎ ঠাট্টার সুরে পিয়ের বলল, "বরং সব কিছু তো ভালই মনে হচ্ছে দিদি।"

"ভালই বটে! খুব ভাল! আমাদের সৈন্যরা যা খেল দেখাচ্ছে সেকথা বারবারা আইভানভ্‌না আজই আমাকে বলেছে। এসবই নিশ্চয় তাদের কৃতিত্বের পরিচায়ক। এদিকে লোকজনরা তো বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে—কেউ কথা শুনছে না, আমার দাসীটি পর্যন্ত রুক্ষ ব্যবহার শুরু করেছে। এরকম চলতে থাকলে অচিরেই তারা আমাদের মার লাগাতে শুরু করবে। রাস্তায় পর্যন্ত বের হওয়া যাচ্ছে না। সবচাইতে বড় কথা, ফরাসীরা যেকোনদিন এখানে এসে হাজির হবে; তাহলে আমরা এখানে অপেক্ষা করে আছি কিসের জন্য? তোমার কাছে আমার একটিই অনুরোধ ভাই, আমার পিতার্সবুর্গ যাবার ব্যবস্থা করে দাও। আমি যেই হই না কেন, বোনাপার্তের শাসনাধীনে বাঁচতে চাই না।"

"আহা, আমার কথাটাই শোন দিদি। এসব খবর তুমি কোথায় পেলে? বরং…"

"নেপোলিয়নের বশ্যতা আমি স্বীকার করব না! অন্যরা যা খুশি করুক… তুমি যদি ব্যবস্থা করে দিতে না চাও…"

"ব্যবস্থা অবশ্যই করব; এই মুহূর্তে হুকুম দিচ্ছি।"

রাগ দেখাবার মত কাউকে না পাওয়াই যেন প্রিন্সেসের রাগের কারণ। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে সে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

পিয়ের বলতে লাগল, "কিন্তু তুমি ভুল খবর পেয়েছ। শহর এখন খুব শান্ত, তিলমাত্র বিপদ কোথাও নেই। শোন! এইমাত্র পড়ছিলাম…" সে ইস্তাহারটা দেখাল। "কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন লিখেছেন, শত্রু যাতে মস্কোতে ঢুকতে না পারে সেজন্য তার জীবনটাই তিনি পণ রাখছেন।"

প্রিন্সেস বিদ্বেষভরা গলায় বলল, "ওঃ, তোমাদের সেই কাউণ্ট তো! সে তো একটা ভণ্ড, সেই তো লোকদের দিয়ে দাঙ্গা বাধিয়েছে। এইসব বাজে ইস্তাহারে সে কি একথা লেখেনি যে 'সে যেই হোক চুলের মুঠি ধরে তাকে হাজতে নিয়ে যেতে হবে? (কী বোকার মত কথা!) আর তাকে যে গ্রেপ্তার করবে তাকে দেওয়া হবে সম্মান ও গৌরব।' তার চাটুবাদই তো

আমাদের এত নীচে টেনে নামিয়েছে! বারবারা আইভানভ্‌না আমাকে বলেছে, সে ফরাসীতে কিছু বলেছিল বলে উচ্ছৃংখল জনতা তাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল।"

"ওঃ, কিন্তু অবস্থা তো…তুমি সব কিছুতেই এত ভেঙে পড়," এই কথা বলে পিয়ের পেশেন্স খেলায় মন দিল।

খেলাটা না মিললেও পিয়ের সেনাদলে যোগ দিতে গেল না, সেই একই উত্তেজিত, অস্থিরচিত্ত, শংকিত মনেই জনবিরল পরিত্যক্ত মস্কোতে রয়ে গেল; একটা ভয়ংকর কিছুর সানন্দ প্রতীক্ষায় দিন কাটাতে লাগল।

পরদিন সন্ধ্যায় প্রিন্সেস রওনা হয়ে গেল। বড় নায়েব এসে খবর দিল, একটা জমিদারি না বেচলে তার রেজিমেণ্টের সাজ-সরঞ্জাম কেনার পয়সা জুটবে না। সে পরিষ্কার করেই জানিয়ে দিল যে একটা রেজিমেণ্ট গড়ে তোলার পরিকল্পনাই তার সর্বনাশ ডেকে আনবে। পিয়ের কান পেতে শুনল; তবু ঠোঁটের হাসিটা চাপতে পারল না।

বলল, "বেশ তো, বেচে দিন। কি আর করা যাবে? এখন তো আর কথা ফেরানো চলে না!"

অবস্থা যত খারাপ হতে লাগল, বিশেষ করে তার নিজের অবস্থা, পিয়ের যেন ততই খুশি হয়ে উঠল: ততই সে যেন নিশ্চিত হল যে তার প্রত্যাশিত বিপদটি আসন্ন হয়ে উঠেছে। তার পরিচিত কেউই শহরে নেই। জুলি চলে গেছে, প্রিন্সেস মারিও। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আছে শুধু রস্তভরা; কিন্তু সে তাদের সঙ্গে দেখা করতেও যায় না।

মনকে অন্যদিকে সরিয়ে নেবার জন্য একদিন সে ভরন্ত্‌শোভো গ্রামে গেল; শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য সেখানে লেপ্‌পিচ নামক যে বড় বেলুনটা তৈরি হচ্ছে সেটা দেখতে এবং পরদিন যে পরীক্ষামূলক ওড়ানো হবে সেটাও বেলুনটাকে দেখতে। বেলুন তৈরি এখনও শেষ হয় নি; পিয়ের শুনল যে সম্রাটের ইচ্ছানুসারেই সেটা তৈরি হচ্ছে। সম্রাট কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনকে লিখেছে:

"লেপ্‌পিচ প্রস্তুত হওয়া মাত্রই তার গাড়ির জন্য একদল নির্ভরযোগ্য বুদ্ধিমান লোক যোগাড় করবেন এবং জেনারেল কুতুজভকে খবরটা জানাতে একজন সংবাদবাহককে তার কাছে পাঠাবেন। আমি তাকে ব্যাপারটা জানিয়েছি।

"লেপ্‌পিচ প্রথম কোথায় অবতরণ করবে সেবিষয়ে যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়; সেটা যেন ভুল করে শত্রুর হাতে না পড়ে। প্রধান সেনাপতির গতিবিধির সঙ্গে তার গতিবিধির মিল থাকা একান্ত দরকার।"

ভরন্ত্‌সোভো থেকে বাড়ি ফিরবার পথে বলোৎনুপ্লেস-এর পাশ দিয়ে যাবার সময় পিয়ের দেখল লোব্‌নুপ্লেস-এ (মস্কোর মৃত্যুদণ্ড দেবার জায়গা; সেকালে জায়গাটি ছিল ক্রেম্‌লিনের সম্মুখবর্তী রেড স্কোয়ারে।) অনেক

লোকের ভিড় জমেছে। সে গাড়ি থামিয়ে সেখানেই নেমে পড়ল। গুপ্তচর-বৃত্তির অভিযোগে একজন রাঁধুনিকে চাবুক মারা হচ্ছে। দণ্ডদান শেষ করে জল্লাদ সেই শক্ত-সমর্থ লোকটির বাঁধন খুলে দিচ্ছে। লোকটিব মুখে লাল গোঁফ, পরনে নীল মোজা ও সবুজ কুর্তা। সে করুণ স্বরে আর্তনাদ করছে। শুকনো, বিবর্ণ অপর অপরাধী কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। মুখ দেখেই বোঝা যায়, দুজনই ফরাসী।

শুট্‌কো ফরাসী লোকটির মুখের মত ভয়ার্ত, যন্ত্রণাদীর্ণ ভাব ফুটে উঠল পিয়েরের মুখে। ভিড় ঠেলে অগ্রসর হতে হতে সে প্রশ্ন করতে লাগল: "কি হয়েছে? লোকটি কে? কেন এই শাস্তি?"

ভিড়ের মধ্যে সমবেত ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সকল ধরনের মানুষই তখন লোব্‌নু প্লেস-এর কার্যকলাপ দেখতে এতই ব্যস্ত যে কেউ তার প্রশ্নেব জবাব দিল না। শক্ত-সমর্থ লোকটি উঠে দাঁড়াল, ভুরু কুঁচকাল, কোনদিকে না তাকিয়ে গায়ের কুর্তাটা খুলতে লাগল; তার পরেই হঠাৎ তার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগল, সে কাঁদতে শুরু করল। ভিড়ের মানুষরা এতক্ষণে গলা ছেড়ে কথা বলতে লাগল; পিয়েরের মনে হল, নিজেদের করুণার অনুভূতিকে চাপা দেবার জন্যই তারা এমন করছে।

"লোকটা কোন প্রিন্সের রাঁধুনি।"

"আর মঁসিয়, রুশ সজি ফরাসীদের জিভে টকই লাগে।...একেবারে দাঁতে দাঁত লেগে গেছে!" পিছন থেকে একজন করণিক বলে উঠল।

তার কথা শুনে কেউ কেউ হাসল, কেউবা জল্লাদের দিকেই তাকিয়ে থাকল।

পিয়েরের গলা বন্ধ হয়ে আসছে, মুখ কুঁচকে গেছে; তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে গাড়িতে চাপল। যেতে যেতেই তার শরীর শিউরে উঠতে লাগল; আপন মনেই বারকয়েক এত জোরে কথা বলল যে কোচয়ান জিজ্ঞাসা করল:

"কিছু বলছেন হুজুর?"

কোচয়ানকে লুবিয়াংকা স্ট্রীট ধরে গাড়ি চালাতে দেখে পিয়ের চীৎকার করে বলল, "কোথায় চলেছ?"

"আপনার হুকুম মত শাসনকর্তার বাড়িতে," কোচয়ান বলল।

"মূর্খ! নির্বোধ!" পিয়ের চীৎকার করে কোচয়ানকে বকুনি দিল—একাজটা সে কদাচিৎ করে থাকে।" তোমাকে তো বলেছি বাড়ি যেতে! আরও জোরে চালাও, মাথামোটা কোথাকার!" নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলল, "আজই আমি চলে যাব।"

লোব্‌নু প্লেস-এ নির্যাতিত ফরাসীটিকে ও ভিড়ের লোকগুলিকে দেখে পিয়ের এতই স্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে সে আর একদণ্ডও এখানে থাকবে না। সেইদিনই সেনাদলে যোগ দিতে যাত্রা করবে, যে তার মনে

মনে হয় সে নিজেই কোচয়ানকে সেকথা বলেছে, অথবা নিজের থেকেই সেটা বুঝতে পারা কোচয়ানের উচিত ছিল।

বাড়ি পৌঁছেই পিয়ের বড় কোচয়ান এভ্‌স্তাফেকে হুকুম করল, সেই রাতেই সে মোঝায়েস্ক-এ সেনাদলে যোগ দিতে যাত্রা করবে; কাজেই তার ঘোড়াগুলোকে যেন সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এভ্‌স্তাফে যখন জানাল যে একটা দিনের মধ্যে এতসব ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তখন সে বাধ্য হয়ে পরের দিন পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রাখল।

একটানা বৃষ্টির পরে ২৪ তারিখে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। ডিনারের পরে পিয়ের মস্কো ত্যাগ করল। সেদিন রাতে পের্খুশ্‌কভোতে ঘোড়া বদল করবার সময় সে জানতে পারল, সেদিন সন্ধ্যায়ই সেখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হয়ে গেছে। (এটাই শেভার্দিনোর যুদ্ধ।) তাকে বলা হল, গোলাবর্ষণের ফলে পের্খুশ্‌কভোর মাটি কেঁপে উঠেছিল, কিন্তু যুদ্ধে কে জিতেছে এ-প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারল না। পরদিন ভোরেই পিয়ের মোঝায়েস্ক-এর কাছে পৌঁছে গেল।

মোঝায়েস্ক-এর প্রতিটা বাড়িতেই সৈন্যরা আস্তানা পেতেছে; যে হোস্টেলে তার সহিস ও কোচয়ানের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হল সেখানে একটা ঘরও পাওয়া গেল না। সব ঘরই অফিসারে ভর্তি।"

মোঝায়েস্ক-এ এবং তাকে ছাড়িয়ে অনেক দূর পর্যন্ত সৈন্যরা হয় আস্তানা পেতেছে, নয়তো চলাচল করছে। সর্বত্র চোখে পড়ছে পদাতিক ও অশ্বারোহী কসাক, মালগাড়ি, বারুদের গাড়ি আর কামান। 'পিয়ের' যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এগিয়ে চলল; মস্কো যত দূরে সরে যেতে লাগল ততই সে যেন ডুবে যেতে লাগল সেনা-সমুদ্রে, আর ততই এমন একটা অশান্ত উত্তেজনা ও সানন্দ অনুভূতি তার মনে জাগতে লাগল যার অভিজ্ঞতা আগে কখনও তার হয় নি। সম্রাটের পরিদর্শনকালে স্লবোদা প্রাসাদে যে অনুভূতি তার হয়েছিল এখনকার অনুভূতি ঠিক তারই অনুরূপ—কোন কিছু করার এবং কোন কিছু ত্যাগ করার অনিবার্য প্রয়োজনের অনুভূতি। তার মনে এই সানন্দ চেতনা জাগল যে মানুষের সুখের যত কিছু উপকরণ—জীবনের আরাম, অর্থ, এমন কি জীবনটা পর্যন্ত—সবই তুচ্ছ; এমন কিছু আছে যার তুলনায় এসব কিছু ছুঁড়ে ফেলাও আনন্দের···কিন্তু সেটা কি? সেকথা পিয়ের বলতে পারল না; কার জন্য এবং কিসের জন্য সব কিছু ত্যাগ করাতে এই আনন্দ সেটা বুঝতেও সে চেষ্টা করল না। কিসের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার সে প্রশ্ন তার মনেই এল না; ত্যাগটাই তাকে এনে দিল সম্পূর্ণ নতুন এক আনন্দময় অনুভূতি।

অধ্যায়—১৯

২৪শে আগস্ট হল শেভার্দিনো দুর্গের যুদ্ধ, ২৫শে তারিখে কোন পক্ষ থেকেই একটিও গুলিবর্ষণ করা হল না, আর ২৬শে তারিখে হল বরদিনোর যুদ্ধ।

শেভার্দিনো আর বরদিনোতে কেন যুদ্ধ করা হল, আর কেমন করেই বা সেটা ঘটল ? বরদিনোর যুদ্ধটাই বা হল কেন ? ফরাসী বা রুশ কারও দিক থেকেই এ যুদ্ধের কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। রুশদের পক্ষে এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হল—আর সেটাই হতে বাধ্য—মস্কো ধ্বংস হওয়ার আরও কাছাকাছি আমরা এসে পড়লাম, অথচ পৃথিবীতে সেটাকেই আমরা ভয় করেছি সবচাইতে বেশী ; আবার ফরাসীদের পক্ষে এ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফল হল, তাদের গোটা বাহিনীর ধ্বংসের আরও কাছাকাছি তারা এসে পড়ল—অথচ পৃথিবীতে সেটাকেই তারাও ভয় করেছে সবচাইতে বেশী। ফল যে কি হবে তা জানাই ছিল, তবু নেপোলিয়ন সে যুদ্ধে এগিয়ে এল, আর কুতুজভ সে যুদ্ধের আহ্বানকে গ্রহণ করল।

দুই সেনাপতি যদি যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হত তাহলে নেপোলিয়নের পরিষ্কার বোঝা উচিত ছিল যে তেরো শ' মাইল ভিতরে ঢুকে মোট সৈন্যের এক-চতুর্থাংশকে হারাবার সম্ভাবনা নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকেই এগিয়ে চলেছে ; আবার কুতুজভেরও সমান পরিষ্কারভাবে বোঝা উচিত ছিল যে এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এক-চতুর্থাংশ সৈন্য হারাবার ঝুঁকি নিলে সেও নিশ্চিতভাবেই মস্কোকে হারাবে। কুতুজভের কাছে এটা তো গাণিতিক হিসাবের মতই পরিষ্কার ; যেমন ড্রাফ্‌ট্‌স্ খেলায় (একরকম দাবা খেলা) আমার যদি একটা ঘুঁটি কম থাকে এবং তারপরেও আম যদি ক্রমাগত ঘুঁটি পাল্টা-পাল্টি করি তাহলে শেষ পর্যন্ত আমার হার হবেই, আর তাই পাল্টা-পাল্টি করা আমার পক্ষে উচিত নয়। যখন প্রতিপক্ষের আছে ষোলটি ঘুঁটি আর আমার আছে চৌদ্দটি, তখন তার তুলনায় আমার দুর্বলতা আট ভাগের এক ভাগ, কিন্তু আম যদি আরও তেরোটি ঘুঁটি বদল করি, তাহলে সে হবে আমার চাইতে তিনগুণ বেশী শক্তিশালী।

বরদিনো যুদ্ধের আগে ফরাসীদের তুলনায় আমাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মোটামুটি ছয়জনে পাঁচজন, কিন্তু ঐ যুদ্ধের পরে সেটা দাঁড়াল দুজনে একজন : অর্থাৎ যুদ্ধের আগে আমাদের সৈন্য ছিল এক শ' বিশ হাজারের বিরুদ্ধে একশ' হাজার এবং যুদ্ধের পরে সেটা দাঁড়াল একশ' হাজারের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার। তথাপি অভিজ্ঞ, ঝানু কুতুজভ সে যুদ্ধকে গ্রহণ করল, আর প্রাতভাদীপ্ত সেনাপতি বলে বর্ণিত নেপোলিয়ন সেই যুদ্ধ করে হারাল এক-চতুর্থাংশ সৈন্য এবং তার যোগাযোগ ব্যবস্থা হল আরও অনেক বেশী দীর্ঘ। বলা হয়ে থাকে, ভিয়েনা দখল করেই যেভাবে আগেকার অভিযানে ইতি টানা

হয়েছিল, ঠিক সেইভাবে মস্কো দখল করেই এ অভিযানকে শেষ করার ইচ্ছাই নেপোলিয়নের ছিল। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমাণ অন্য কথাই বলে। নেপোলিয়নের ইতিহাসকাররা নিজেরাই বলেছে, স্মোলেন্‌স্ক্‌ পার হবার পর থেকেই নেপোলিয়ন থামতে চেয়েছে, যুদ্ধের পরিধি ব্যাপকতর করার বিপদ সম্পর্কে সে অবহিত ছিল, সে জানত যে মস্কো দখল করলেই অভিযান শেষ হবে না, কারণ স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর বেলায়ই তো দেখেছে কিভাবে রুশ শহরগুলিকে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, বারবার সন্ধির আলোচনার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রুশদের পক্ষ থেকে কোনরকম সাড়া পাওয়া যায়নি।

বরদিনোতে যুদ্ধের প্রস্তাব করা এবং সে প্রস্তাবকে গ্রহণ করা—উভয় ক্ষেত্রেই কুতুজভ কাজ করেছে সম্পূর্ণ ইচ্ছাশক্তি রহিতভাবে, যুক্তিবিবর্জিত ভাবে। কিন্তু পরবর্তীকালে ইতিহাসকাররা ঘটনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুকৌশলে সেনাপতিদের দূরদৃষ্টি ও প্রতিভার স্বপক্ষে নানা সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করেছে, অথচ ইতিহাসের হাতে অন্যসব অন্ধ যন্ত্রের মতই তারাও ছিল অতিমাত্রায় শৃংখলিত ও ইচ্ছাশক্তিরহিত।

প্রাচীনকালের মানুষরা আমাদের জন্য এমন অনেক বীরত্বব্যঞ্জক আদর্শ কাব্য-কাহিনী রেখে গেছে যেখানে নায়করাই কাহিনীর মূল কেন্দ্র; আর আমরাও আজ পর্যন্ত এ সত্যকে মেনে নিতে পারি নি যে আমাদের যুগে সে ধরনের ইতিহাস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

অন্যদিকে, বরদিনোর যুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী শেভার্দিনোর যুদ্ধ কিভাবে হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা আছে তা সুস্পষ্ট ও সুপরিচিত হলেও সম্পূর্ণ মিথ্যা। সব ইতিহাসকারই সে ঘটনার নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছে:

"রুশ বাহিনী স্মোলেনস্ক থেকে পশ্চাদপসরণের পথে যুদ্ধের পক্ষে সবচাইতে উপযুক্ত একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সেটা পেয়ে গেল বরদিনোতে।

"মস্কো থেকে স্মোলেনস্ক যাবার বড় রাস্তার বাঁ দিকে এবং তার সঙ্গে সমকোণে অবস্থিত বরদিনো থেকে উতিৎসা যাবার পথের পাশে ঠিক সেই জায়গাটাকে আগে থেকেই সুরক্ষিত করে রাখল যেখানে পরে যুদ্ধটা হয়েছিল।

"সেই ঘাঁটির ঠিক সামনে শত্রুপক্ষের উপর নজর রাখবার জন্য শেভার্দিনো স্তূপের উপর একটা সুরক্ষিত ফাঁড়ি গড়ে তোলা হল। ২৪শে তারিখে নেপোলিয়ন সেই অগ্রবর্তী ঘাঁটিটাকে আক্রমণ করে দখল করে নিল এবং ২৬শে তারিখে বরদিনো রণক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষারত গোটা রুশ বাহিনীকেই আক্রমণ করল।"

ইতিহাস এই কথাই বলে, কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল, আর প্রকৃত সত্য জানতে আগ্রহী যেকোন লোক সহজেই সেটা বুঝতে পারে।

রুশরা কোন ভাল ঘাঁটিরই খোঁজ করে নি; বরং পশ্চাদপসরণের পথে

বরদিনোর চাইতে অনেক ভাল ভাল জায়গা পার হয়ে গিয়েছিল। তারা যে সেসব কোন জায়গাতেই থামে নি তার অনেকগুলি কারণ: নিজের পছন্দ ছাড়া অন্য কোথাও ঘাঁটি তৈরির ইচ্ছা কুতুজভের ছিল না; জনসাধারণের যুদ্ধের দাবী তখনও যথেষ্ট জোরদার হয়ে প্রকাশ পায় নি; মিলোরাদভিচ তখনও অসামরিক বাহিনী নিয়ে এসে হাজির হয় নি; এরকম আরও অনেক কারণ ছিল। আসলে বরদিনোর ঘাঁটি (যেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল) সুরক্ষিত তো ছিলই না, বরং তাকে একটা ঘাঁটিই বলা যায় না; রুশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রের বুকে বিনা ভাবনা-চিন্তায় যেখানে একটা পিন ফুটিয়ে দেওয়া যায় সেই স্থানটিকেই ঘাঁটি হিসাবে বরদিনোর চাইতে ভাল বলা যেতে পারে।

বরদিনোর রণক্ষেত্রে রুশরা যে কোনরকম শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলেনি তাই শুধু নয়, ১৮১২-র ২৫শে অগাস্টের আগে তারা ভাবেই নি যে সেখানে একটা যুদ্ধ হতে পারে। নানা ঘটনা থেকেই এটা বোঝা যায়। প্রথমত, ২৫ তারিখের আগে সেখানে কোন পরিখাই কাটা হয় নি, আর ২৫শে তারিখে যেসব পরিখা কাটা শুরু করা হয়েছিল তাও শেষ করা হয় নি; দ্বিতীয়ত, শেভার্দিনো দুর্গের অবস্থান। যে স্থানটা যুদ্ধের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তার ঠিক সামনে ওরকম একটা দুর্গ গড়া একেবারেই অর্থহীন। অন্য সব ঘাঁটি থেকে সেটাকেই বা বেশী শক্তিশালী করা হয়েছিল কেন? ২৪ তারিখ গভীর রাত পর্যন্ত সেটাকে রক্ষা করতে গিয়ে কেন সব শক্তি নিঃশেষ করা হল? কেনই বা ছ'হাজার সৈন্যকে বিসর্জন দেওয়া হল? শত্রুর উপর নজর রাখার জন্য একটা কসাক রক্ষীদলই তো যথেষ্ট ছিল। তৃতীয়ত, যুদ্ধটা কোথায় হবে সেটা যে আগে থেকে জানা ছিল না এবং শেভার্দিনো দুর্গটা যে অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিল না তার প্রমাণস্বরূপ আমরা জানি যে ২৫শে তারিখ পর্যন্ত বার্ক্‌লেদ তলি এবং ব্যাগ্রেশনের ধারণা ছিল যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল সেই ঘাঁটির বাম ব্যূহ, আর যুদ্ধের পরে তাড়াতাড়িতে লিখিত প্রতিবেদনে কুতুজভ নিজেই বলেছে যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল ঘাঁটির বাম ব্যূহ। অনেককাল পরে যখন ধীরে সুস্থে অবসর সময়ে বরদিনো যুদ্ধের প্রতিবেদন লিখিত হল তখন (সম্ভবত অভ্রান্ত প্রধান সেনাপতির ভুল-ভ্রান্তিগুলিকে সমর্থন করার জন্যই) এই মর্মে অসত্য ও অসাধারণ বিবৃতিগুলি আবিষ্কার করা হল যে শেভার্দিনো দুর্গ ছিল একটা অগ্রবর্তী ঘাঁটি এবং আমরা বরদিনোর যুদ্ধ করেছিলাম পূর্বনির্বাচিত একটা পরিখা-বেষ্টিত রণক্ষেত্রে, অথচ আসলে যুদ্ধটা হয়েছিল এমন একটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত জায়গায় যেখানে কোনরকম পরিখাই ছিল না।

আসলে ব্যাপারটা ঘটেছিল এই রকম: কলোচা নদী যেখানে বড় রাস্তাটাকে কেটে বেরিয়েছে সমকোণে নয়, একটা সূক্ষ্ম কোণ সৃষ্টি করে—

সেখানে কলোচা নদীর তীর বরাবর একটা জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছিল ; ফলে ঘাঁটির বাম ব্যূহ ছিল শেভার্দিনোতে, দক্ষিণ ব্যূহ ছিল নভু নামক একটা গ্রামের কাছে, আর কেন্দ্র ছিল কলোচা ও ভয়না নদীর সঙ্গমস্থলে বরদিনোতে।

২৪শে তারিখে অশ্বারোহণে ভালুভো-র দিকে যেতে যেতে উতিৎসা থেকে বরদিনো পর্যন্ত কোথাও রুশদের কোন ঘাঁটি নেপোলিয়নের চোখে পড়ে নি (ইতিহাসের বইতে অবশ্য লেখা হয়েছে যে নেপোলিয়ন তা দেখেছিল), বা কোন অগ্রবর্তী ঘাঁটিও সে দেখে নি (দেখা সম্ভব নয় কারণ তাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না) ; কিন্তু পশ্চাৎবর্তী রুশ বাহিনীকে অনুসরণ করে নেপোলিয়ন শেভার্দিনো দুর্গে রুশ ঘাঁটির বাম ব্যূহের সামনে এসে পড়ে এবং রুশদের পক্ষে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে কলোচা নদীর তীর বরাবর সৈন্যদের পরিচালিত করে। এদিকে একটা যুদ্ধ শুরু করবার মত সময় হাতে না থাকায় রুশরা তাদের বাম ব্যূহটাকে সরিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় ঘাঁটি করল যেটা আগে ভাবাই হয় নি এবং ফলে যেখানে কোনরকম রক্ষা-ব্যবস্থাই ছিল না। কলোচা নদী পার হয়ে বড় রাস্তার বাঁ দিকে পৌঁছে নেপোলিয়ন আসন্ন যুদ্ধটাকেই ডান দিক থেকে বাঁ দিকে (রুশদের দৃষ্টিকোণ থেকে) সরিয়ে উতিৎসা, সেমেনভ্‌স্ক্‌ ও বরদিনোর মধ্যবর্তী এমন একটা প্রান্তরে নিয়ে গেল—রণক্ষেত্র হিসাবে যেটা রাশিয়ার অন্য যে-কোন প্রান্তরের চাইতে সুবিধাজনক কিছু নয়—এবং সেখানেই ২৬শে তারিখের পুরো যুদ্ধটা হল। যে যুদ্ধের কথা ভাবা হয়েছিল এবং বাস্তবক্ষেত্রে যেখানে যুদ্ধটা হয়েছিল তার একটা রেখা-চিত্র সংযোজিত হল।

নেপোলিয়ন যদি ২৪শে তারিখ সন্ধ্যায় অশ্বারোহণে কলোচা নদীতীরে না পৌঁছত এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্গ আক্রমণের নির্দেশ না দিত, তাহলে হয় তো আমাদের পরিকল্পনা মতই যুদ্ধটা হত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমাদের পশ্চাদ্বর্তী বাহিনীর পশ্চাদপসরণের পরে সেই সন্ধ্যায়ই আমাদের বাম ব্যূহের উপর আক্রমণ হওয়ায় এবং ২৪শে তারিখ সন্ধ্যায়ই একটা যুদ্ধে লিপ্ত হবার মত বাসনা বা সময় কোনটাই রুশ সেনাপতিদের না থাকায় ২৪ তারিখেই বরদিনোর যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান সংঘর্ষে আমাদের হার হল এবং স্বভাবতই ২৬শে তারিখের যুদ্ধেরও সেই একই ফল হল।

শেভার্দিনো দুর্গ হাতছাড়া হবার পরে ২৫শে তারিখ সকালে আমাদের বাম ব্যূহের কোন ঘাঁটি না থাকায় সেটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেকোন একটা স্থানে পরিখা কেটে তাড়াতাড়ি সেখানে ঘাঁটি বনানো হল।

২৬শে তারিখে রুশ বাহিনী যে অসম্পূর্ণ ও দুর্বল একটা পরিখা দ্বারা রক্ষিত ছিল তাই শুধু নয়, আমাদের সৈন্যদের আরও অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল রুশ সেনাপতিদের অজ্ঞতার জন্য—আমাদের বাম ব্যূহের ঘাঁটি কে

হাতছাড়া হয়ে গেছে এবং আসল যুদ্ধের গোটা রণক্ষেত্রই যে ডান থেকে বাঁ দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে সেটা পুরোপুরি বুঝতে না পারায় তারা নোভু থেকে উতিৎসা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ঘাটিটাই রক্ষা করতে চেষ্টা করল এবং তার ফলে যুদ্ধ চলার সময়েই তাদের সৈন্যদের ডান থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিতে হল। ফল এই দাঁড়াল যে যুদ্ধের সময় আগাগোড়াই রুশ বাহিনীকে গোটা ফরাসী বাহিনীর মোকাবিলা করতে মাত্র অর্ধেক সৈন্য নিয়ে। কাজেই বরদিনোর যুদ্ধের যে বিবরণ আমরা পাই আসলে যুদ্ধটা মোটেই সেভাবে হয় নি। কাজেই কোন পূর্ব-নির্বাচিত পরিখা-বেষ্টিত রণক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তুলনায় সামান্য দুর্বল সৈন্যশক্তি নিয়ে আমরা বরদিনোর যুদ্ধে লড়াই করি নি; শেভার্দিনো দুর্গ হারাবার ফলে রাশিয়াকে সে যুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে ফরাসী সৈন্যসংখ্যার অর্ধেক সৈন্য নিয়ে প্রায়-পরিখাবিহীন একটি উন্মুক্ত প্রান্তরে; অর্থাৎ লড়াই হয়েছিল এমন পরিস্থিতিতে যাতে দশ ঘণ্টা লড়াই চালানো এবং ফলাফলকে অমীমাংসিত রাখাটা যে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার তাই শুধু নয়, তিন ঘণ্টার জন্যও একটি সেনাদলকে সম্পূর্ণ বিপর্যয় ও পলায়নের হাত থেকে রক্ষা করাটাও অচিন্ত্যনীয়।

অধ্যায়—২০

২৫শে সকালে পিয়ের মোঝায়েস্ক থেকে যাত্রা করল। খাড়া পাহাড়টার উৎরাইয়ের মুখে একটা আঁকাবাঁকা রাস্তা যেখানে গির্জাটাকে ডাইনে রেখে শহর থেকে বাইরের দিকে চলে গেছে সেখানে তখন গির্জায় প্রার্থনা চলছে, ঘণ্টা বাজছে। গাড়ি থেকে নেমে পিয়ের পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। তার পিছনে একটা অশ্বারোহী রেজিমেণ্ট গায়কদের সামনে নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। আগের দিনের যুদ্ধে আহত সৈনিকদের নিয়ে এক সার গাড়ি তার দিকেই উঠে আসছে। চাষীরা হৈ-হৈ করতে করতে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসিয়ে রাস্তা পারাপার করছে। প্রতিটি গাড়িতে তিন বা চারজন আহত সৈনিক শুয়ে-বসে আছে। খাড়া উৎরাইয়ের উপর পাথর বিছিয়ে রাস্তার মত যা তৈরি করা হয়েছে তাতে ঠোক্কর খেয়ে গাড়িগুলো টালমাটাল হয়ে চলেছে। ছেঁড়া ন্যাকরা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা আহত সৈনিকদের গাল বিবর্ণ, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা, কুঁচকানো ভুরু দুটো একসঙ্গে জুড়ে আছে। পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বাঁচাতে তারা গাড়ির পাশগুলো চেপে ধরে আছে। প্রায় সকলেই শিশুসুলভ সরল কৌতূহলে পিয়েরের সাদা টুপি ও সবুজ চাতক-লেজ কোটের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

পিয়েরের কোচয়ান রেগে চীৎকার করে আহত সৈনিকদের গাড়িগুলোকে একদিকে সরে যেতে বলল। গায়কবৃন্দসহ অশ্বারোহী রেজিমেণ্টটি নেমে এসে পিয়েরের গাড়িটাকে ঘিরে ধরল; রাস্তাটা বন্ধ হয়ে গেল। পিয়ের

থামল। আহত সৈনিকদের একটা গাড়ি পিয়েরের ঠিক পাশেই থেমে গেল। বাকলের জুতো পরা গাড়োয়ানটি তখনও হাঁপাচ্ছে; টায়ারবিহীন পিছনের চাকার নীচে একটা পাথর বসিয়ে সে ছোট ঘোড়াটার পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

একটি আহত বুড়ো সৈনিক ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত নিয়ে গাড়ির পিছন পিছন হেঁটে আসছিল। ভাল হাতটা দিয়ে গাড়িটাকে ধরে সে পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

"বলুন তো দেশের মানুষ, এরা কি আমাদের এখানে ছেড়ে দেবে, নাকি মস্কো নিয়ে যাবে?" লোকটি শুধাল।

পিয়ের তখন এত বেশী চিন্তামগ্ন যে প্রশ্নটা শুনতে পেল না। সে একবার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টের দিকে তাকাচ্ছে, আবার পাশের গাড়িটাকে দেখছে। গাড়িতে দুটি আহত লোক বসে আছে, ও অপর একজন শুয়ে আছে। যে দুজন বসে আছে তাদের একজনের গালে আঘাত লেগেছে। মাথাটা ন্যাকড়ায় জড়ানো, আর গালটা ফুলে একটি শিশুর মাথার মত হয়েছে। তার নাক ও মুখ একপাশে বেঁকে গেছে। সে গির্জার দিকে তাকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকছে। অপরটি বয়সে তরুণ; শীর্ণ মুখখানি এত সাদা যে মনে হয় তাতে রক্তের লেশমাত্র নেই। সে হেসে পিয়েরের দিকে তাকাল। যে শুয়ে আছে তার মুখটা দেখা যাচ্ছে না। অশ্বারোহী গায়করা পাশ দিয়ে চলে গেল:

"হায় হারিয়ে গেলাম। একেবারেই হারিয়ে গেলাম···
মাথায় তীব্র ব্যথা,
যেন বিদেশে বাস করছি···"

তারা সৈনিকদের নাচের গান গাইছে।

বুঝিবা সেই গানেরই প্রত্যুত্তরে মাথার উপরে ঘণ্টা বাজছে ধাতব শব্দ করে। সূর্যের আতপ্ত কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে উল্টো দিকের উৎরাইয়ের মাথায়।

গাল-ফোলা সৈনিকটি সক্রোধে অশ্বারোহী গায়কদের দিকে তাকাল। ঘৃণাভরে বিড়বিড় করে বলল, "আঃ, ভাঁড়ের দল।"

গাড়ির পিছনে দাঁড়ানো সৈনিকটি বিষণ্ণ হাসি হেসে পিয়েরকে উদ্দেশ করে বলল, "শুধু সৈনিকরাই নয়, আজ আমি চাষীদেরও দেখেছি··· চাষীরা—তাদেরও চলে যেতে হচ্ছে। আজকাল কোন বাছ-বিচার নেই। ···তারা চায় যে গোটা জাতি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক—, এককথায়, এই তো মস্কো। তারা এর অবসান ঘটাতে চায়।"

সৈনিকটির কথার অস্পষ্টতা সত্ত্বেও সে যে কি বলতে চায় তা বুঝতে পেরে পিয়ের সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল।

রাস্তাটা আবার পরিষ্কার হয়েছে। পাহাড়ের নীচে নেমে পিয়ের ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পরিচিত মুখের সন্ধানে সে পথের দুই দিক দেখতে দেখতে চলল; কিন্তু সর্বত্রই নানা বিভাগের সামরিক কর্মীদের মুখই তার নজরে পড়ল। তারা সকলেই সবিস্ময়ে তার সাদা টুপি ও লেজওয়ালা সবুজ কোটের দিকে তাকিয়ে দেখছে।

প্রায় তিন মাইল চলবার পরে একজন পরিচিত লোককে দেখে সাগ্রহে তাকে ডাকল। সমর-বিভাগের একজন বড় ডাক্তার। সে যাচ্ছে একটা ঢাকা গাড়িতে; তার পাশে বসে আছে একটি যুবক সার্জন; পিয়েরকে চিনতে পেরে সে চালকের আসনে উপবিষ্ট কসাককে গাড়ি থামাতে বলল।

ডাক্তার বলল, "কাউণ্ট! ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি এখানে এলেন কেমন করে?"

"আরে, কি জানেন, আমি দেখতে চাই…"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখবার মত কিছু অবশ্যই পাবেন…"

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পিয়ের কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তারকে তার যুদ্ধে অংশ গ্রহণের ইচ্ছার কথা জানাল।

ডাক্তার তাকে সরাসরি কুতুজভের কাছে আবেদন করার পরামর্শ দিল।

তরুণ সঙ্গীটির সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করে বলল, "যুদ্ধের মধ্যে কেন যেখানে-সেখানে ছিটকে পড়বেন? আর যাই হোক, প্রশান্ত মহামহিম তো আপনাকে চেনেন, সাদরেই গ্রহণ করবেন। সেটাই আপনার করা উচিত।"

ডাক্তারকে দেখে মনে হল সে ক্লান্ত; তাড়া আছে।

পিয়ের বলল, "আপনি তাই মনে করেন? …আচ্ছা, আমি আরও জানতে চাই যে আমাদের ঘাঁটি এখন ঠিক কোথায়?"

ডাক্তার বলল, "ঘাঁটি? দেখুন, ওটা আমার এক্তিয়ার নয়। তাতারিনভা ছাড়িয়ে চলে যান, অনেক খোঁড়াখুঁড়ি দেখতে পাবেন। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেই সব দেখতে পাবেন।"

"সেখান থেকে দেখা যাবে? …আপনি যদি…"

কিন্তু তার কথায় বাধা দিয়ে ডাক্তার তার গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিজের গলা দেখিয়ে বলল, "আপনার সঙ্গে যেতাম, কিন্তু বিশ্বাস করুন, কাজের চাপ আমার গলা পর্যন্ত ঠাসা। একটা কোম্পানির কম্যাণ্ডারের কাছে চলেছি। অবস্থা কি রকম? আপনি তো জানেন কাউণ্ট, আগামীকাল একটা যুদ্ধ হবে। এক লক্ষ সৈন্যের অন্তত বিশ হাজার আহত হবে, অথচ আমাদের হাতে যা স্ট্রেচার, বাংক, ড্রেসার অথবা ডাক্তার আছে তা ছ' হাজারের পক্ষেও যথেষ্ট নয়। দশ হাজার গাড়ি আমাদের আছে, কিন্তু অন্যসব জিনিসও তো চাই—যতদূর সম্ভব একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে।"

হাজার হাজার যুবক ও বৃদ্ধ যারা অবাক বিস্ময়ে তার টুপিটার দিকে তাকিয়েছিল তাদের মধ্যে বিশ হাজারের অনিবার্য নিয়তি আঘাত ও মৃত্যু —এই চিন্তাই পিয়েরকে বিস্মিত করে তুলল।

"তারা তো কালই মরতে পারে; তাহলে মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছু তারা ভাবছে কেন? অশ্বারোহী সৈন্যরা ঘোড়া ছুটিয়ে যুদ্ধে চলেছে, আহতদের দেখেও মুহূর্তের জন্য নিজেদের ভাগ্যের কথা ভাবছে না, আহতদের দিকে চোখ টিপে এগিয়ে চলেছে। অথচ এদের ভিতরেই বিশ হাজারের অনিবার্য নিয়তি মৃত্যু, আর তারা কি না টুপি দেখে অবাক হচ্ছে। আশ্চর্য!" ভাবতে ভাবতে পিয়ের তাতারিনভার দিকে এগিয়ে চলল।

রাস্তার বাঁদিকে একটি জমিদার বাড়ির সামনে অনেক গাড়ি, মালগাড়ি, আর্দালি ও সেপাই-শান্ত্রীর ভিড়। প্রধান সেনাপতি সেই বাড়িতেই বাসা নিয়েছে, কিন্তু পিয়ের যখন সেখানে পৌঁছল তখন সে ভিতরে ছিল না, পদস্থ কর্মচারিও কেউ নেই—সকলেই গির্জায় গেছে। পিয়ের গোর্কির দিকে গাড়ি চালাল।

পাহাড়ের মাথায় উঠে একটা গ্রাম্য রাস্তায় পড়ে সে এই প্রথম একদল অসামরিক চাষী সৈনিককে দেখতে পেল। সাদা শার্ট পরে টুপিতে ক্রুশচিহ্ন এঁটে তারা হেসে গল্প করতে করতে উত্তেজিত ও ঘর্মাক্ত দেহে ঘাসে-ঢাকা একটা বড় গোল পাহাড়ের উপর কাজ করছে।

কেউ মাটি কাটছে, কেউ মাটি সরাচ্ছে, কেউ বা কিছুই করছে না।

গোল পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অফিসার কাজের তদারক করছে। মনে হচ্ছে, সৈনিক জীবনের অভিনবত্বে চাষীরা খুবই মজা পেয়েছে। পিয়েরের মনে পড়ে গেল মোঝায়েস্ক-এর আহত সৈনিকদের কথা; একটি সৈনিক যে বলেছিল: "ওরা চাইছে গোটা জাতিটাই ওদের পিছনে চলুক" তার অর্থটা সে এবার বুঝতে পারল। যুদ্ধক্ষেত্রে কর্মরত এই সব দাড়িওয়ালা চাষীদের দেখে, তাদের বিশ্রী নোংরা বুট, ঘর্মাক্ত গলা, বুক খোলা শার্টের ফাঁকে বেরিয়ে পড়া রোদে পোড়া কণ্ঠাস্থি দেখে পিয়েরের মনে এই মুহূর্তটি যে-রকম গাম্ভীর্য ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল তেমনটি সে আগে কখনও দেখেও নি, শোনেও নি।

অধ্যায়—২১

পিয়ের গাড়ি থেকে নামল; অসামরিক সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে গোল পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল, ডাক্তার বলেছে, সেখান থেকেই যুদ্ধক্ষেত্রটা দেখা যাবে।

বেলা প্রায় এগারোটা। সূর্য তার কিছুটা বাঁয়ে ও পিছনে পড়েছে; দূরপ্রসারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

সেই দৃশ্যপটকে দ্বিখণ্ডিত করে স্মোলেনস্ক বড় রাস্তাটা উপর থেকে বাঁদিকে এঁকেবেঁকে একটা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলে গেছে; গোল পাহাড়ের নীচে শ' পাঁচেক পা সামনে একটা সাদা গির্জা দেখা যাচ্ছে। এই গ্রামটাই বরদিনো। গ্রামের নীচে রাস্তাটাই একটা সেতুর উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে অনেক চড়াই-উৎড়াই কাটিয়ে উপরে উঠতে উঠতে প্রায় চার মাইল দূরবর্তী ভালুভো গ্রামের দিকে চলে গেছে। সেখানেই তখন নেপোলিয়নের ঘাঁটি। ভালুভো পেরিয়ে রাস্তাটা দিগন্তের কোলে একটা হলুদ বনের মধ্যে হারিয়ে গেছে। রাস্তার ডানদিকে অনেক দূরের বার্চ ও ফার গাছের জঙ্গলের মধ্যে কলোচা মঠের ক্রুশ ও ঘণ্টা-ঘরটা সূর্যের আলোয় চকচক করছে। জঙ্গল ও রাস্তার ডাইনে ও বাঁয়ে গোটা নীল প্রান্তর জুড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমাদের ও শত্রুপক্ষের ধূমায়মান শিবিরের আগুন আর অসংখ্য সৈন্য। কলোচা ও মস্কভা নদীর তীর বরাবর ডানদিকের মাঠ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ও পর্বতসংকুল। তার খাঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূরে দেখা যাচ্ছে বেজুবভা ও জাখারিনো গ্রাম দুটি। বাঁদিকে মাঠ অনেক বেশী সমতল, সেখানে ফসলের ক্ষেত আছে; অগ্নিদগ্ধ ধূমায়মান সেমেনভস্ক্ গ্রামটাও দেখা যাচ্ছে।

বাঁদিকে অথবা ডানদিকে পিয়ের যা কিছু দেখতে পেল তাতে তার প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। যে রণক্ষেত্র দেখার আশা সে করেছিল তা কোথাও দেখা গেল না, শুধুই মাঠ, প্রান্তর, সেনাদল, জঙ্গল, শিবির-আগুনের ধোঁয়া, গ্রাম, স্তূপ, আর নদী নালা; অনেক চেষ্টা করেও সেখানে কোন সামরিক ঘাঁটি তার চোখে পড়ল না; এমন কি আমাদের ও শত্রুপক্ষের সৈন্যদেরও সে আলাদা করে চিনতে পারল না।

"সবকিছু জানে এরকম কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাক," এই কথা ভেবে পিয়ের একজন অফিসারের দিকে এগিয়ে গেল। অফিসারটি তার অসামরিক মূর্তির দিকে সকৌতূহলে তাকিয়ে ছিল।

"সামনে ওটা কোন্ গ্রাম জানতে পারি কি?"

একজন সঙ্গীর দিকে ফিরে অফিসারটি বলল, "বুদিনো, তাই না?"

"বরদিনো," সঙ্গীটি কথাটা শুধরে দিল।

কথা বলার একটি লোক পেয়ে অফিসারটি খুশি মনে পিয়েরের কাছে এগিয়ে এল।

"ওখানে ওরা কি আমাদের সৈন্য?" পিয়ের শুধাল।

অফিসার বলল, "হ্যাঁ, আর ঐ দূরে আছে ফরাসীরা। ঐ যে অনেক দূরে দেখতে পাচ্ছেন।"

"কোথায়? কোথায়?" পিয়ের শুধাল।

"খালি চোখেই তো দেখা যাচ্ছে...কেন ঐ তো!"

বাঁদিকে নদীর ওপারে যে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সেইদিকে হাত বাড়িয়ে অফিসারটি বলল।

বাঁদিকের গোল পাহাড়ে কিছু সৈন্য দেখতে পেয়ে পিয়ের বলল, "আচ্ছা, তাহলে ওরাই ফরাসী। ঐ যে দূরে?"

"ওরা আমাদের সৈন্য!"

"ওঃ আমাদের! আর ওই ওখানে?...." দূরে আর একটা গোল পাহাড় দেখিয়ে পিয়ের বলল। পাহাড়টার উপরে একটা বড় গাছ; সেখানেও কিছু শিবির—আগুনের ধোঁয়া ও কালো কালো কি যেন দেখা যাচ্ছে।

অফিসার বলল, "ওটা আবার 'তার' হয়ে গেছে। (ওটাই শেভার্দিনো দুর্গ) কালও আমাদেরই ছিল, কিন্তু এখন 'তার'।"

"তাহলে আমাদের ঘাঁটি কোথায়?"

"আমাদের ঘাঁটি?" আত্মতুষ্টির হাসি হেসে অফিসারটি জবাব দিল। "সব আপনাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলছি, কারণ প্রায় সবগুলি পরিখাই আমি কাটিয়েছি। ওই যে, দেখতে পাচ্ছেন? ঠিক ওখানেই বরদিনোতে আমাদের কেন্দ্রীয় ঘাঁটি", সামনের সাদা গির্জাওয়ালা গ্রামটা দেখিয়ে সে বলল। "ওখানেই কালোচা নদী পার হতে হয়। নীচে ওই যে একসারি খড় পড়ে আছে ওখানেই রয়েছে সেতুটা। ওটাই আমাদের কেন্দ্র। আমাদের দক্ষিণ ব্যূহটা ওইদিকে" —সে ডান দিকটা দেখাল। "ওখানেই আছে মস্ক্‌ভা নদী, ওখানেই আমরা তিনটে দুর্গ গড়েছি—খুব শক্ত-পোক্ত করেই গড়া হয়েছে। আর বাম ব্যূহটা...." এইখানে অফিসারটি থামল। "কি জানেন, এটা বোঝানো একটু শক্ত....গতকাল আমাদের বাম ব্যূহ ছিল ওইখানে শেভার্দিনোতে; ওই যে, যেখানে ওক গাছটা দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু আজ আমাদের বাম ব্যূহটা সরিয়ে আনা হয়েছে—এখন সেটা আছে ওখানে, ওই যে একটা গ্রাম আর ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছেন? ওটাই সেমেনভ্‌স্ক্‌; হ্যাঁ, ওই যে," সে রায়েভ্‌স্কি পাহাড়টা দেখাল। "কিন্তু যুদ্ধটা ওখানে হবে না 'তারা সেনাদল সরিয়ে নেওয়ায় ওটা একটা ফন্দিমাত্র; 'সে' হয় তো ঘুরে মস্ক্‌ভা নদীর ডান দিকে চলে যাবে। কিন্তু যুদ্ধ যেখানেই হোক, কাল অনেক লোক হারিয়ে যাবে।"

একজন বয়স্ক সার্জেণ্ট এগিয়ে এসে তার কথাগুলি শুনছিল; এইখানে অফিসারের বক্তব্য মনোমত না হওয়ায় সে তাকে বাধা দিল।

কঠোরকণ্ঠে বলল, "মাটির ঝুড়ির ব্যবস্থা করতে হবে।"

অফিসারটি অপ্রস্তুত বোধ করল; সে বুঝতে পারল, কাল কত সৈন্য হারিয়ে যাবে সেটা জানা থাকলেও বলা উচিত নয়।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "বেশ তো, তিন নম্বর কোম্পানিকে পাঠিয়ে দিন।"

"আর আপনি, আপনি কি একজন ডাক্তার ?"

"না, আমি নিজের থেকেই এসেছি," বলে পিয়ের পাহাড় বেয়ে নেমে গেল।

যে লোকগুলি কাজ করছে তাদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে নাক চেপে ধরে অফিসারটি অস্ফুটে বলে উঠল, "আ, যত সব বাজে লোকের ভিড় !"

"ওরা আসছে···তাঁকে নিয়ে আসছে···ওই তো দেখা যাচ্ছে····এক মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে পড়বে," হঠাৎ নানা কণ্ঠস্বর শোনা গেল ; অফিসার, সৈনিক, ও অসামরিক লোকজনরা রাস্তায় ছুটে চলল।

বরদিনো থেকে গির্জার একটা শোভাযাত্রা পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে। ধুলোভরা রাস্তায় প্রথমে এল পদাতিক দল। তাদের পিছন থেকে ভেসে এল গির্জার সঙ্গীত।

সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা পিয়েরকে পাশ কাটিয়ে খালি মাথায় শোভাযাত্রার দিকে ছুটে গেল।

"ওরা তাঁকে নিয়ে আসছে, আমাদের রক্ষাকারিণীকে ! ···আইবেরীয় ঈশ্বর-জননী !" কে একজন চেঁচিয়ে বলল।

আর একজন তাকে শুধরে দিয়ে বলল, "স্মোলেনস্ক ঈশ্বর-জননী।"

বেসরকারী লোকজন যারা গ্রামে ছিল এবং যারা ঘাঁটিতে কাজ করছিল সকলেই কোদাল ফেলে গির্জার শোভাযাত্রা দেখতে ছুটে গেল। সৈনিকদের পিছন পিছন এল পরিচ্ছদধারী পুরোহিতরা—মাথায় পাগড়ি বাঁধা একটি ছোটখাট বুড়ো মানুষ এল অনুচর ও গায়কদের সঙ্গে নিয়ে। তাদের পিছনে সৈনিক ও অফিসাররা বয়ে নিয়ে এল খোদাই-করা ধাতুর ঢাকনা দেওয়া একটি মস্ত বড় কালো-মুখ দেবমূর্তি। এই দেবমূর্তিটিকেই নিয়ে আসা হয়েছে স্মোলেনস্ক থেকে এবং সেই থেকে সেনাবাহিনীর সঙ্গেই আছে। পিছনে, সামনে, দুইপাশে অসামরিক লোকগুলো খালি মাথায় হাঁটছে, আর মাটিতে মাথা ঠুকছে।

পাহাড়ের মাথায় উঠে দেবমূর্তিসমেত সকলেই থামল। সূর্যের আতপ্ত রশ্মি তির্যকভাবে মাটিতে এসে পড়ছে, একটা মৃদু বাতাস এসে খোলা মাথাগুলির চুল ও দেবমূর্তির সাজসজ্জার ফিতেগুলো নিয়ে খেলা করছে। গান সমানভাবেই চলেছে। অফিসার, সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা খালি মাথায় দেবমূর্তিকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। গায়করা ক্লান্তকণ্ঠে গেয়ে চলেছে : "হে ঈশ্বর-জননী, তোমার সেবকদের এই বিপদ থেকে রক্ষা কর" ; সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত ও ডিয়েকন সুর ধরল : "কারণ ঈশ্বরের পরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও আশ্রয়স্বরূপ তোমার কাছেই আমরা এসেছি।" সকলের মুখেই আর একবার জলে উঠল আসন্ন মুহূর্তের গাম্ভীর্য সম্পর্কে সেই সচেতন ভাব যা পিয়ের একটু আগেই দেখেছে মোঝায়েস্ক পাহাড়ের নীচে অনেক লোকের

মুখে এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও আজ সকাল থেকে যাদের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তাদের সকলেরই মুখে।

হঠাৎ দেবমূর্তির চারদিককার ভিড় সরে গিয়ে পিয়েরকে চেপে ধরল। যেরকম ক্রততার সঙ্গে পথ করে দেওয়া হল তাতেই বোঝা গেল যে একজন খুবই বড় মাপের মানুষ দেবমূর্তির দিকে আসছে।

লোকটি কুতুজভ। ঘাঁটি পরিদর্শন করে তাতারিমোভা ফিরবার পথে সে এখানে একবার থেমেছে। তাকে দেখেই পিয়ের চিনতে পারল; তার চেহারার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যই তাকে অন্যের থেকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়।

তার বিরাট বৃষস্কন্ধ দেহটা লম্বা ওকারকোটে ঢাকা, সাদা মাথাটা অনাবৃত, ফোলা মুখের নষ্ট হওয়া চোখের সাদা মণিটা দেখা যাচ্ছে। দুলতে দুলতে ভিড়ের ভিতর দিয়ে হেঁটে কুতুজভ পুরোহিতের পিছনে এসে থামল। অভ্যস্ত ভঙ্গীতে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল, ঝুঁকে পড়ে মাটিতে হাত রাখল এবং সাদা মাথাটা নুইয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কুতুজভের পিছনে বেনিংসেন ও দলবল। প্রধান সেনাপতির উপস্থিতি উর্ধ্বতন অফিসারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও অসামরিক লোকজন ও সৈনিকরা তার দিকে নজর না দিয়ে তাদের প্রার্থনাতেই মেতে রইল।

অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে কুতুজভ দেবমূর্তির কাছে এগিয়ে গেল, ভারী শরীর নিয়ে নতজানু হয়ে চেপে বসল, আভূমি নত হল, এবং পুনরায় উঠবার জন্য অনেক্ষণ ধরে বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু দুর্বলতা ও দেহের বোঝার জন্য উঠতে পারল না। উঠবার চেষ্টায় সাদা মাথাটা কাঁপতে লাগল। শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁড়াল, শিশুর মত ঠোঁট ফুলিয়ে দেবমূর্তিকে চুমো খেল এবং পুনরায় মাথা নুইয়ে হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। অন্য সেনাপতিরা তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল; তারপর অফিসাররা, এবং তারপরে সৈনিক ও অসামরিক লোকজনরা উত্তেজিত মুখে ঠেলাঠেলি করতে করতে ভিড় করে এগিয়ে গেল।

অধ্যায়—২২

ভিড়ের মধ্যে ধাক্কা খেতে খেতে পিয়ের চারদিকে তাকাতে লাগল।

"কাউণ্ট পিতর কিরিলেভিচ! তুমি এখানে কেমন করে এলে?" একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পিয়ের চারদিকে তাকাল। হাত দিয়ে হাঁটু ঝেড়ে (সম্ভবত দেবমূর্তির সামনে নতজানু হওয়ায় হাঁটুতে ধুলো লেগেছে) বরিস দ্রুবেৎস্কয় হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। বরিসের পরনে রুচিসম্মত পোশাক, তাতে অভিযানের উপযোগী একটা সামরিক কেতার ছোঁয়াও লেগেছে। গায়ে একটা লং কোট; কুতুজভের মতই একটা চাবুক কাঁধ থেকে ঝোলানো।

ইতিমধ্যে কুতুজভ গ্রামে পৌঁছে কাছাকাছি একটা বাড়ির ছায়াতে বসেছে। একজন কসাক দৌড়ে একটা বেঞ্চি এনে দিল, আর একজন তাড়াতাড়ি তার উপর একটা কম্বল বিছিয়ে দিল। চারদিক থেকে দলবল তাকে ঘিরে ধরল।

ভিড়সহ দেবমূর্তিকে আরও দূরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বরিসের সঙ্গে কথা বলতে বলতে পিয়ের কুতুজভের কাছ থেকে প্রায় ত্রিশ পা দূরে থেমে পড়ল।

যুদ্ধে উপস্থিত থেকে ঘাঁটি দেখবার বাসনা সে জানাল।

বরিস বলল, "সেটাই তো তোমার করা উচিত। তোমার থাকার ব্যবস্থা আমিই করে দেব। কাউন্ট বেনিংসেন যেখানে থাকবেন সেখান থেকেই সবকিছু ভালভাবে দেখতে পাবে। তুমি তো জান আমি তার দলেই আছি; তাকে তোমার কথা বলব। কিন্তু যদি ঘাঁটিটা ঘুরে দেখতে চাও তো আমাদের সঙ্গে চল। আমরা এখনই বাম ব্যূহে যাচ্ছে। ফিরে এসে রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাবে; তাস খেলার ব্যবস্থাও করা যাবে। তুমি তো দিমিত্রি সেগিভিচকে চেন? ঐ তো তার বাসস্থান।" আঙুল বাড়িয়ে গোর্কি গাঁয়ের তৃতীয় বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

"কিন্তু আমি দেখতে চাই দক্ষিণ ব্যূহটা। সকলে বলছে সেটা খুব শক্তপোক্ত। আমার ইচ্ছা মস্ক্‌ভা নদী থেকে শুরু করে ঘোড়ায় চেপে চারদিকটা চক্কর দেই।"

"বেশ তো, সেটা পরেও করতে পারবে, কিন্তু আসল চিজ হচ্ছে বাম ব্যূহটা।"

"ঠিক, ঠিক। কিন্তু প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কির রেজিমেন্টটা কোথায়? সেটা দেখাতে পার কি?"

"প্রিন্স আন্‌দ্রুর তো? আমরা সেখান দিয়েই যাব। তোমাকে তার কাছেও নিয়ে যাব।

"বাম ব্যূহের কি হবে?" পিয়ের শুধাল।

গোপন কথা বলার মত গলা নামিয়ে বরিস বলল, "তোমাকে সত্যি কথাটাই বলছি; বাম ব্যূহের অবস্থা যে কি তা শুধু ঈশ্বরই জানেন। কাউন্ট বেনিংসেন যা চেয়েছিলেন তা মোটেই ঘটে নি। গোল পাহাড়টাকে তিনি অন্যভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু·····" বরিস দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, "কিন্তু প্রশান্ত মহামহিমের তা ইচ্ছা নয়, অথবা অন্য কেউ তাকে সেই রকমই বুঝিয়েছে। দেখ···" বরিসের কথা শেষ হবার আগেই কুতুজভের অ্যাডজুটান্ট কেসারভ পিয়েরের কাছে এসে হাজির হল। কোনরকম বিচলিত না হয়ে বরিস তাকে বলল, "আরে, কেসারভ! আমাদের অবস্থাটা কাউন্টকে বুঝিয়ে বলছিলাম। প্রশান্ত মহামহিম যে কেমন করে আগে

থেকেই ফরাসীদের অভিপ্রায় বুঝতে পেরেছিলেন সেটাই আশ্চর্য!"

"আপনি বাম ব্যূহের কথা বলছেন কি?" কেসারভ শুধাল।

"হ্যাঁ, ঠিক তাই; এখন তো বাম ব্যূহ খুবই শক্তিশালী।"

কুতুজভ সব অপ্রয়োজনীয় কর্মচারিদের বরখাস্ত করলেও বরিস এখনও কায়দা করে প্রধান ঘাঁটিতেই টিকে আছে। কাউন্ট বেনিংসেনের কাছে সে তার আসন পাকা করে নিয়েছে; যখন যার অধীনে কাজ করেছে সেই তরুণ প্রিন্স রুবেৎস্কয়কে মহামূল্যবান বলে মনে করেছে।

উপর মহলে এখন দুটো পরিষ্কার আলাদা দল হয়েছে: কুতুজভের দল আর বেনিংসেনের দল। বরিস শেষোক্ত দলের লোক; কিন্তু কুতুজভের প্রতি দাসসুলভ ভক্তি দেখিয়েও সে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি করেছে যে বুড়োটা কোন কর্মের নয়, বেনিংসেনই সবকিছু করেছে, সেটা সে ছাড়া আর কেউ পারত না। এখন তো যুদ্ধের চরম পর্যায় সমুপস্থিত; এবার কুতুজভের পতন হবে, আর সব ক্ষমতা যাবে বেনিংসেনের হাতে; এমন কি যুদ্ধে কুতুজভের জয় হলেও সকলে মনে করবে যে যা কিছু করার সব বেনিংসেনই করেছে। অবস্থা যাই হোক, কালকের যুদ্ধের জন্য অনেক বড় বড় পুরস্কার দিতে হবে, আর রণক্ষেত্রে আসবে অনেক নতুন মানুষ। কাজেই আজ সারাটাদিন বরিস খুবই খুশি-খুশি।

দূর থেকে পিয়েরকে দেখতে পেয়ে কুতুজভ বলল, "ওকে আমার কাছে ডাক।"

অ্যাডজুটান্টই প্রশান্ত মহামহিমের ইচ্ছাটা পিয়েরকে জানাল; সেও কুতুজভের বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জনৈক অসামরিক লোক তার আগেই সেখানে পৌঁছে গেল। লোকটি দলখভ।

"ও লোকটা এখানে এল কেমন করে?" পিয়ের শুধাল।

"ও জীবটি সব জায়গাতেই নাক গলাতে পারে!" জবাব এল। "আপনি তো জানেন, ওর পদাবনতি ঘটেছিল। ও আবার ফুলে উঠতে চাইছে। এটা-ওটা নানা রকম ফন্দিফিকিরের কথা বলছে; রাতের বেলা শত্রুর পিকেট-লাইনেও হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছে…লোকটি সাহসী।"

পিয়ের টুপি খুলে সশ্রদ্ধভাবে কুতুজভকে অভিবাদন জানাল।

তখনও দলখভ বলছে, "আমি স্থির করলাম, প্রশান্ত মহামহিমের সঙ্গে দেখা করে সব কথা বললে আপনি আমাকে দূরে পাঠিয়ে দিতে পারেন, অথবা এও বলতে পারেন যে আমি যা বলছি তা আপনি আগেই জানতেন, কিন্তু যাই হোক না কেন তাতে আমার তো কোন ক্ষতি নেই…"

"ঠিক, ঠিক।"

"কিন্তু আমার কথা যদি ঠিক হয় তাহলে আমার পিতৃভূমির এমন একটা কাজ করা হবে যার জন্য মরতেও আমি প্রস্তুত।"

"ঠিক, ঠিক।"

"আর প্রশান্ত মহামহিমের যদি এমন একটি লোকের প্রয়োজন হয় যে তারজন্য নিজের চামড়া খুলে দিতেও দ্বিধা করবে না তাহলে দয়া করে আমার কথাটা মনে রাখবেন‥‥হয়তো প্রশান্ত মহামহিমের কিছু দরকারে আমি লাগতে পারব।"

"ঠিক…ঠিক…" কুতুজভ বার বার একই কথা বলল; পিয়েরের দিকে তাকিয়ে তার হাস্যময় চোখটা ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

ঠিক তখনই পারিষদসুলভ দক্ষতার সঙ্গে বরিস কুতুজভের কাছেই পিয়েরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে গলা না চড়িয়ে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করল যেন আগেকার কোন আলোচনারই জের টানছে।

"অসামরিক বাহিনী তো সাদা শার্ট পরে জান দিতেও প্রস্তুত। কী বীরত্ব, কাউণ্ট!"

প্রশান্ত মহামহিম যাতে শুনতে পায় তেমনভাবেই কথাগুলি বলা হল। সে জানতো এই কথাগুলি কুতুজভের মনোযোগ আকর্ষণ করবেই।

কুতুজভ বরিসকে শুধাল, "অসামরিক বাহিনী সম্পর্কে কি বলছ হে?"

"প্রশান্ত মহামহিম, পরিষ্কার সাদা শার্ট পরে ওরা কালকের জন্য—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।"

"ওঃ! ‥‥আশ্চর্য, অতুলনীয় মানুষ ওরা!" বলে কুতুজভ চোখ বুজে মাথা দোলাতে লাগল। "অতুলনীয় মানুষ!" দীর্ঘশ্বাস ফেলে কথাটা আবার বলল।

তারপর পিয়েরকে বলল, "তাহলে তুমিও বারুদের গন্ধ শুঁকতে চাও? ভাল, খুব ভাল গন্ধ। তোমার স্ত্রীর প্রশংসাকারীদের মধ্যে আমিও আছি। সে ভাল আছে তো? আমার বাসস্থানের দরজা তোমার জন্য খোলাই আছে।"

বুড়ো মানুষদের বেলায় যেমন সচরাচর ঘটে থাকে, যা কিছু বলার বা করার ছিল সব ভুলে গিয়ে কুতুজভ অন্যমনস্কভাবে ইতস্তত তাকাতে লাগল।

তারপর হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় অ্যাডজুটাণ্টের ভাই আন্দ্রে কেসারভকে ইসারায় কাছে ডাকল।

"সেই কবিতা…মারিন-এর সেই কবিতা‥‥আহা, কি যেন লাইনগুলো? জেরাকভ সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন: 'সৈনিকদের জন্য লিখিত ভাষণ'… আবৃত্তি কর, সেগুলি আবৃত্তি কর!" বলে সে যেন হাসবার জন্য তৈরি হল।

কেসারভ আবৃত্তি করতে লাগল। ‥‥কুতুজভ হেসে কবিতার তালে তালে মাথা নাড়তে লাগল।

পিয়ের কুতুজভের কাছ থেকে সরে গেলে দলখভ তার কাছে এসে হাতটা

ধরল।

অপরিচিত লোকদের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করেই সে উঁচু গলায় বলল, "এখানে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুব খুশি হয়েছি কাউন্ট। আমাদের দুজনের মধ্যে কে যে বেঁচে থাকবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন; তাই আজকের দিনে তোমাকে বলছি যে আমাদের মধ্যে যে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল সেজন্য আমি দুঃখিত, আর আমার ইচ্ছা যে তুমিও আমার প্রতি কোনরকম বিরূপ মনোভাব পোষণ করো না। আজ তোমাকে এই কথাটা বলার সুযোগ পেলাম বলেও আমি খুশি। আমার মিনতি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

কি বলবে বুঝতে না পেরে পিয়ের দলখভের দিকে তাকিয়ে হাসল। অশ্রুভেজা চোখে দলখভ তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

বরিস তার সেনাপতিকে কি যেন বলল; কাউন্ট বেনিংসেন পিয়েরের দিকে ঘুরে তাকেও অশ্বারোহণে তাদের অনুগামী হতে বলল।

"তোমার ভাল লাগবে," সে বলল।

"হ্যাঁ, খুব ভাল লাগবে," পিয়ের বলল।

আধ ঘণ্টা পরে কুতুজভ তাতারিনভাব উদ্দেশে যাত্রা করল, আর বেনিংসেন পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে সদলবলে রণক্ষেত্র বরাবর ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অধ্যায়—২৩

গোর্কি থেকে বেনিংসেন সেতুর দিকে যাবার বড় রাস্তায় নামল। সেতু পেরিয়ে বরদিনো গ্রামে ঢুকে তারা বাঁ দিকে মোড় নিল, অসংখ্য সৈন্য ও কামান পার হয়ে সেই উঁচু গোল পাহাড়টায় পৌঁছল যেখানে অসামরিক লোকজনরা পরিখা খুঁড়ছে। সেটাও একটা দুর্গ, এখনও নামকরণ না হলেও পরবর্তীকালে সেটা রায়েভ্স্কি দুর্গ নামেই খ্যাত হয়েছিল। পিয়ের সেটার দিকে বিশেষ নজর দিল না। সে তো জানত না যে গোটা বরদিনো প্রান্তরের মধ্যে সেই জায়গাটাই একদিন তার কাছে সবচাইতে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

একটা খাড়ি পার হয়ে তারা সেমেনভ্স্ক্-এ পৌঁছল। সেখানে সৈন্যরা কুঁড়েঘর ও গোলাবাড়ি থেকে শেষ কাঠের গুঁড়িগুলোও টেনে বের করছে। তারপর সৈন্যদের পায়ে-পায়ে দুমড়ানো জই-ক্ষেতের ভিতর দিয়ে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তারা যেখানে পৌঁছল সেখানে তখনও পরিখা খোঁড়ার কাজ চলছে।

বেনিংসেন পরিখার পাশে থামল; উল্টো দিকের শেভার্দিনো দুর্গের দিকে তাকাল; আগেরদিনও সেটা আমাদেরই ছিল; কয়েকজন অশ্বারোহী সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসাররা বলল, নেপোলিয়ন বা মুরাৎ দুজনের যেকোন একজন সেখানে আছে। সকলে সাগ্রহে সেদিকে তাকাতে লাগল। শেষ

পর্যন্ত অশ্বারোহীরা স্তূপ থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেনিংসেন জনৈক সেনাপতিকে আমাদের সৈন্যদের অবস্থান ও গতিবিধি বুঝিয়ে বলতে লাগল। পিয়ের মনোযোগ দিয়ে সব শুনল, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারল না। পিয়ের তার কথা শুনছে দেখে কথা থামিয়ে বেনিংসেন হঠাৎ তাকে বলল, "এসব কথা তোমার ভাল লাগছে বলে মনে হয় না।"

মনের কথা না বলে পিয়ের উত্তরে বলল, "বরং আমার খুবই ভাল লাগছে।"

খাঁড়ি থেকে আরও বাঁ দিকে এগিয়ে তারা যে পথটা ধরল সেটা ছোট ছোট বার্চ গাছের ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। মাইল দেড়েক চলার পরে তারা জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে গেল। সেখানে তুচ্‌কভের সেনাদলকে মোতায়েন করা হয়েছে বাম ব্যূহ রক্ষার জন্য।

ব্যূহের একেবারে শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বেনিংসেন খুব উত্তেজিতভাবে অনেক কথা বলে গেল। পিয়েরের মনে হল, সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নির্দেশও দেওয়া হল। তুচ্‌খভের সৈন্যদের সামনে কিছুটা উঁচু জমি রয়েছে; সেখানে কোন সৈন্য মোতায়েন করা হয় নি। এই ভুলের তীব্র সমালোচনা করে বেনিংসেন বলল, চারদিকে নজর রাখা যায় এরকম একটা উঁচু জায়গাকে অরক্ষিত রেখে তার নীচে সেনা সমাবেশ করা তো পাগলামি। কয়েকজন সেনাপতিও সেই অভিমত প্রকাশ করল। একজন তো সামরিক উত্তাপের সঙ্গে বলে উঠল যে তাদের ওখানে রাখা হয়েছে খুন হবার জন্যই। বেনিংসেন নিজের কর্তৃত্ববলেই হুকুম দিল, ঐ উঁচু জায়গায় সেনাসমাবেশ করা হোক।

বামব্যূহের এই সব ব্যবস্থা দেখে সামরিক বিধি-ব্যবস্থা বুঝবার ব্যাপারে নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে পিয়েরের সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যে লোকটি সৈন্যদের পাহাড়ের নীচে মোতায়েন করেছিল সে যে এতবড় একটা সহজ-বোধ্য ভুল কেমন করে করেছিল তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি।

পিয়ের মোটেই জানত না যে বেনিংসেনের অনুমানমত ঐ সৈন্যদের ঘাঁটি রক্ষার জন্য সেখানে রাখা হয় নি, তাদের সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল অতর্কিত আক্রমণের জন্য, যাতে কোন অগ্রসরমান শত্রুকে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করতে পারে। বেনিংসেন সেটা জানত না এবং ব্যাপারটা প্রধান সেনাপতির গোচরে না এনেই নিজের ধারণামত সৈন্যদের সামনের দিকে সরিয়ে দিল।

অধ্যায়—২৪

সেদিন ২৫শে অগস্টের উজ্জ্বল সন্ধ্যায় প্রিন্স আন্দ্রু তার সেনা-শিবিরের একেবারে শেষ প্রান্তে কনিয়াজকোভো গ্রামের একটা ভাঙা চালাঘরে

কনুইতে ভর দিয়ে শুয়েছিল। ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল, ত্রিশ বছরের পুরনো একসারি বার্চ গাছের নীচু ডালগুলি সব কেটে ফেলা হয়েছে, মাঠের বুকে জইয়ের স্তূপগুলো দাঁড়িয়ে আছে, কতকগুলি ঝোঁপ-ঝাড়ের পাশ থেকে সৈনিকদের রান্নাঘরের ধোঁয়া উঠছে।

এই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছে জীবনটা সংকীর্ণ, বোঝাস্বরূপ ও প্রয়োজনহীন। সাত বছর আগে অস্তারলিজে যেমন মনে হয়েছিল আজও যুদ্ধের প্রাক্কালে তার তেমনই উত্তেজিত ও বিরক্ত বোধ হচ্ছে।

পরদিনের যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ সে পেয়েছে এবং প্রচার করেছে, এখন আর নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু নিজের চিন্তার হাত থেকে—সরলতম, স্পষ্টতম ও ভয়ংকরতম চিন্তার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। সে জানে, এতদিন যত যুদ্ধে সে যোগ দিয়েছে তার মধ্যে কালকের যুদ্ধই হবে সবচাইতে ভয়ংকর, আর জীবনে এই প্রথম সে মৃত্যুর সম্ভাবনার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে—সে সম্ভাবনা যেমন স্পষ্ট ও ভয়ংকর, তেমনই নিশ্চিত। সহসা সারাটা জীবন ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবির মত তার সামনে একে একে ভেসে উঠতে লাগল। বিশেষ করে জীবনের তিনটি মহৎ দুঃখ তার সামনে বড় হয়ে ফুটে উঠল: একটি নারীর প্রতি ভালবাসা, বাবার মৃত্যু, আর অর্ধেক রাশিয়ার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ফরাসী আক্রমণ। "ভালবাসা! ····ছোট্ট মেয়েটি কী রহস্যময় শক্তিতে একেবারে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল! হ্যাঁ, আমি তাকে ভালবেসেছিলাম। তাকে নিয়ে ভালবাসার ও সুখের কত পরিকল্পনাই করেছিলাম! আঃ, আমি কী ছেলেমানুষই ছিলাম!" তিক্তকণ্ঠে সে বলে উঠল। "হায়রে! এমন এক আদর্শ ভালবাসার উপর আমি ভরসা করেছিলাম যা আমার একটি বছরের অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তাকে আমার প্রতি বিশ্বস্ত রাখবে! উপকথার ভীরু কপোতীর মত আমার বিরহে সে কাঁদবে····কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কত সরল····কত সরল আর কত ভয়ংকর।

"বাবা যখন বল্ড হিল্‌স্ গড়ে তুলেছিল তখন সে ভেবেছিল জায়গাটা তার—তার জমি, তার বাতাস, তার চাষীর দল। ' কিন্তু নেপোলিয়ন এল, আর পথের খড়কুটোর মত তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল; তার বল্ড হিল্‌স্, তার সারাটা জীবন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। প্রিন্সেস মারি বলে, এটা উপরওয়ালার পরীক্ষা। কিন্তু বাবাই যখন রইল না, আর কখনও ফিরে আসবে না, তখন কিসের জন্য এই পরীক্ষা? বাবা তো নেই! তাহলে কার জন্য এই পরীক্ষা? পিতৃভূমি ও মস্কোর ধ্বংস! আর কাল আমি নিহত হব, হয়তো কোন ফরাসীর হাতেও নয়, হয়তো আমাদেরই কোন সৈনিক আমার কানের পাশ থেকে বন্দুক দাগবে, কাল তো সেই ঘটনাই একটা ঘটেছে, আর পাছে তাদের চোখের সামনে আমি মরে যাই সেই ভয়ে

ফরাসীরা এসে হাত-পা ধরে আমাকে একটা গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। গড়ে উঠবে জীবনের নতুন পরিবেশ, অপরের কাছে সেটা খুবই সহজ ও সাধারণ বলে মনে হবে, অথচ সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানব না। আমি তো থাকবই না।"

সূর্যকিরণে ঝলসিত বার্চ গাছগুলোর দিকে সে তাকাল; তাদের নিথর সবুজ পাতা ও সাদা বাকল চোখে পড়ল। "মরে যাব…কালই মরে যাব… আমার কোন অস্তিত্ব থাকবে না…এসবকিছুই থাকবে, থাকব না শুধু আমি…"

আলো-ছায়ায় ঘেরা বার্চ গাছেরা, কুণ্ডলি পাকানো মেঘের দল, শিবির-আগুনের ধোঁয়া, চারদিকে যা কিছু আছে, সব যেন মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল, ভয়াল, ভয়ংকর হয়ে দেখা দিল। একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। তাড়াতাড়ি উঠে চালাঘরের বাইরে গিয়ে সে ইতস্তত হাঁটতে লাগল।

আবার ভিতরে এসে শুনতে পেল বাইরে কারা যেন কথা বলছে। "কে ওখানে?" সে চেঁচিয়ে বলল।

লাল-নাক ক্যাপ্টেন তিমোখিন একজন অ্যাডজুটান্ট ও একজন তবিলদারকে সঙ্গে নিয়ে সলজ্জভাবে ঘরে ঢুকল।

সব কাজের কথা শুনে প্রিন্স আন্দ্রু তাদের আরও কিছু নির্দেশ দিল, এমন সময় ঘরের পিছন থেকে একটা অস্পষ্ট গলা শোনা গেল।

কোন কিছুতে ঠোক্কর খেয়ে কে যেন বলে উঠল, "জাহান্নামে যাও!"

ঘর থেকে বেরিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু দেখল একটা কাঠের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে পিয়ের প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। পিয়েরকে দেখে প্রিন্স আন্দ্রুর মন অপ্রসন্ন হয়ে উঠল; শেষবারের মস্কো ভ্রমণের বেদনাময় স্মৃতি তার মনে পড়ে গেল।

"তুমি? কী আশ্চর্য! তুমি এখানে কেন এসেছ? এ যে অপ্রত্যাশিত!"

বলতে বলতে প্রিন্স আন্দ্রুর চোখে-মুখে যে ভাব দেখা দিল তা নিস্পৃহতারও বেশী—তাতে প্রকাশ পেল বিরূপ মনোভাব, আর সেটা পিয়েরের নজর এড়াল না।

"আমি এসেছি…শুধু…কি জান…এসেছি…এসব দেখতে আমার ভাল লাগে…আমি যুদ্ধ দেখতে চাই," পিয়ের বলল।

প্রিন্স আন্দ্রু ঠাট্টা করে বলল, "আচ্ছা, তা যুদ্ধ সম্পর্কে তোমার সংঘ-ভাইরা কি বলে? তারা কোন্ পথে এ যুদ্ধ থামাতে চায়? …যাকগে, মস্কোর খবর কি বল? আর আমার লোকজনরা? তারা কি মস্কো পৌঁচেছে?"

"হ্যাঁ, পৌঁচেছে। জুলি দ্রুবেৎস্কয়া আমাকে সেইরকমই বলেছে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখা হয় নি। তারা তোমাদের মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে চলে গেছে।"

অধ্যায়—২৫

অফিসারদের বিদায় নেবার সময় হল, কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু বন্ধুকে নিয়ে একা থাকতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাদের আরও কিছুক্ষণ থেকে চা খেয়ে যেতে বলল। বসার আসন ও চা এল। অফিসাররা অবাক হয়ে পিয়েরের লম্বা-চওড়া চেহারার দিকে তাকিয়ে তার মুখ থেকে মস্কোর কথা এবং সদ্য-দেখা আমাদের ঘাঁটির অবস্থার কথা শুনতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু চুপচাপ বসে থাকল; তার মুখের বিরূপভাব দেখে পিয়ের প্রধানত ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডার ভাল মানুষ তিমোখিনকে উদ্দেশ করেই কথা বলতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রু বাধা দিয়ে বলল, "তুমি তাহলে আমাদের সৈন্যদের অবস্থানটা ভালই বুঝতে পেরেছ?"

পিয়ের জবাব দিল, "হ্যাঁ—আচ্ছা, তুমি কি বলতে চাও? আমি তো সামরিক বিভাগের লোক নই, কাজেই ব্যাপারটা পুরোপুরি বুঝেছি এমন কথা বলতে পারি না, কিন্তু মোটামুটি বুঝে নিয়েছি।"

"আচ্ছা, তুমি তো তাহলে অন্য অনেকের চাইতে বেশী বুঝেছ," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

বিব্রতভাবে প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "ওঃ! আচ্ছা, কুতুজভের নিয়োগ সম্পর্কে তুমি কি মনে কর?"

"আমি তো শুধু এই জানি যে তার নিয়োগে আমি খুব খুশি হয়েছি," প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল।

"আর বার্ক্‌লে দ্য তলি সম্পর্কে তোমার মতামতটাও বল। মস্কোতে তার সম্পর্কে যে কী বলা হচ্ছে তা ঈশ্বরই জানেন····তার সম্পর্কে তুমি কি মনে কর?"

অফিসারদের দেখিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, "ওদের জিজ্ঞাসা কর।"

সপ্রশ্ন হাসির সঙ্গে পিয়ের তিমোখিনের দিকে তাকাল।

কর্ণেলের দিকে বার বার তাকাতে তাকাতে তিমোখিন ভীরু গলায় বলল, "মহামহিমের নিয়োগের ফলে আমরা আবার আলো দেখতে পাচ্ছি।"

"কি রকম?" পিয়ের শুধাল।

"দেখুন, কেবলমাত্র জ্বালানি-কাঠ ও খড়ের ব্যাপারটাই আপনাকে বলছি। আমরা যখন স্বেন্ত্‌সিয়ানি থেকে হটে আসছিলাম, তখন একটা কঞ্চি, বা একটা খড়ের ডাঁটা, বা কোন কিছুতে হাত দেবার সাহসই আমাদের ছিল না। কি জানেন, আমরা চলে যাচ্ছিলাম, আর সে সব জিনিসই পড়ছিল 'তার' হাতে (রুশরা শত্রুকে 'তার' বলেই উল্লেখ করে); তাই নয় কি ইয়োর এক্সেলেন্সি?" তিমোখিন আবার প্রিন্সের দিকে তাকাল। "সে সাহসই আমাদের ছিল না। ঐ ধরনের কাজের জন্য আমাদের রেজিমেণ্টের দুজন অফিসারকে কোর্ট-মার্শাল করা হয়েছে। কিন্তু মহামহিম যখন সর্বেসর্বা হয়ে এলেন তখন সব ব্যাপারটাই সহজ হয়ে এল। এখন

আমরা আলো দেখতে পাচ্ছি…”

“তাহলে সেটা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কেন ?”

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে তিমোথিন বিচলিতভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল। সেই একই প্রশ্ন পিয়েরও প্রিন্স আন্দ্রুকে করল।

“কেন ? যে দেশকে আমরা শত্রুর হাতে রেখে যাচ্ছি সেটা যাতে নষ্ট হয়ে না যায়,” তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্র জবাব দিল। “নীতি হিসাবে এটা তো ভালই : একটা দেশ লুণ্ঠিত হবে এবং সৈন্যরা লুটেরা হয়ে যাবে সেটা তো চলতে দেওয়া যায় না। স্মোলেনস্ক—এও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে যেহেতু ফরাসী সেনাবাহিনী ছিল আমাদের চাইতে অনেক বড় তাই তারা হয় তো আমাদের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারত। কিন্তু এই কথাটা তিনি বুঝতে পারেন নি,” নিজের অজ্ঞাতেই প্রিন্স আন্দ্রুর কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে উঠল, “যে এই প্রথম আমরা রাশিয়ার মাটিতে যুদ্ধ করছিলাম, সৈন্যদের মধ্যে সেদিন যে মনোবল গড়ে উঠেছিল তেমনটি আগে কখনও দেখি নি, দু’দিন পর্যন্ত ফরাসীদের আমরা রুখে দিয়েছিলাম, আর সেই সাফল্যের ফলে আমাদের শক্তি দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি পশ্চাদ-সরণের হুকুম দিলেন, আর আমাদের সব প্রচেষ্টা, সব ক্ষয়-ক্ষতি বিফলে গেল। আমাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার কথা তিনি ভাবেন নি, সাধ্যমত ভাল করতেই চেষ্টা করেছেন, সবকিছু ভেবেচিন্তেই করেছেন, আর সেই কারণেই তিনি অনুপযুক্ত। এখনও তিনি অনুপযুক্ত, শুধু এই কারণে যে অন্য সব জার্মানের মতই তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও সঠিকভাবে পরিকল্পনা করেন। কেমন করে যে বোঝাই ? …আচ্ছা, ধর তোমার বাবার একজন জার্মান খানসামা আছে ; লোকটি খানসামা হিসাবে চমৎকার, তোমার বাবার সব প্রয়োজন তোমার চাইতেও ভালভাবে মেটাতে পারে, কাজেই তাকে সে কাজ করতে দেওয়াই সমীচিন। কিন্তু তোমার বাবা যদি মারাত্মক অসুখে পড়েন, তখন খানসামাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে তুমিই তোমার বাবার সেবা করবে এবং একজন কুশলী অপরিচিত লোকের চাইতে তাকে বেশী শান্তি দিতে পারবে। বার্কলের ব্যাপারটাও সেইরকম। রাশিয়া যখন সুস্থ ছিল তখন একজন বিদেশী তার সেবা করতে পারে, একজন চমৎকার মন্ত্রীও হতে পারে ; কিন্তু যেমুহূর্তে রাশিয়া বিপন্ন হয়ে পড়েছে তখন থেকেই তার প্রয়োজন নিজের লোককে। কিন্তু তোমাদের ক্লাবে তাকে বিশ্বাসঘাতক বানানো হচ্ছে ! বিশ্বাসঘাতক বলে তাকে নিন্দা করছে ; আর তার একমাত্র ফল হবে পরবর্তীকালে এই মিথ্যা অভিযোগের জন্য লজ্জিত হয়ে তারাই তাকে বানাবে নায়ক অথবা প্রতিভাধর, আর সেটাই হবে আরও বেশী অন্যায়। তিনি একজন সৎ ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান জার্মান।”

“সকলেই বলে যে তিনি একজন কুশলী সেনাপতি” পিয়ের যোগ করল।

প্রিন্স আন্দ্রু বিদ্রূপের সুরে বলল, "'কুশলী সেনাপতি' বলতে কি বোঝায় আমি ঠিক বুঝতে পারি না।"

পিয়ের উত্তরে বলল, "কুশলী সেনাপতি ? কেন, যে ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি আগে দেখতে পায়…এবং প্রতিপক্ষের অভিপ্রায়ও আগে থেকে ধরতে পারে।"

যেন কথাটা নির্ধারিত সত্য এমনইভাবে প্রিন্স আন্দ্রু বলে উঠল, "কিন্তু সে তো অসম্ভব।"

পিয়ের সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল।

মন্তব্য করল, "অথচ তারাই বলে যে যুদ্ধ হচ্ছে দাবা খেলার মত।"

প্রিন্স আন্দ্রু জবাব দিল, "ঠিক কথা, কিন্তু একটু তফাৎ আছে। দাবা খেলায় একটা চাল নিয়ে তুমি যতক্ষণ খুশি ভাবতে পার, তোমার সময়ের অভাব থাকে না; তাছাড়া, মন্ত্রী সব সময়ই বড়ের চাইতে বেশী শক্তিশালী, আর দুটো বড়ে সব সময়ই একটা বড়ের চাইতে বেশী শক্তিশালী। কিন্তু যুদ্ধের বেলায় একটা ব্যাটেলিয়ন কখনও একটা ডিভিশনের চাইতে বেশী শক্তিশালী, আবার কখনও একটা কোম্পানির চাইতে দুর্বল হতে পারে। সেনাদলের আপেক্ষিক শক্তির কথা আগে থেকে কেউ জানতে পারে না। …বিশ্বাস কর, সবকিছু যদি কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করত, তাহলে আমি সেখানে থেকে ব্যবস্থাই করতাম, কিন্তু তার পরিবর্তে আমি রেজিমেণ্টে চলে এসেছি এই ভদ্রলোকদের সঙ্গে কাজ করতে; আর আমি মনে করি যে কালকের যুদ্ধটা নির্ভর করবে আমাদের উপর, সেই সব লোকদের উপর নয়…সৈন্যসমাবেশ, সমরসজ্জা, এমন কি সৈন্য-সংখ্যার উপরেও সাফল্য নির্ভর করে না, ঘাঁটির উপর তো নয়ই।"

"তাহলে কিসের উপর নির্ভর করে ?"

তিমোখিনকে দেখিয়ে সে বলল, "আমার মধ্যে, ওর মধ্যে, এবং প্রতিটি সৈন্যের মধ্যে যে অনুভূতি কাজ করে তার উপর।"

প্রিন্স আন্দ্রু তিমোখিনের দিকে তাকাল; সভয়ে ও একান্ত বিহ্বলতায় সে তার কম্যাণ্ডারের দিকে তাকাল। প্রিন্স আন্দ্রু এতক্ষণ ছিল সংযত, স্বল্পবাক; এবার সে উত্তেজিত হয়ে উঠল। সহসা যে চিন্তার স্রোত তার মনে জেগেছে তাকে প্রকাশ না করে সে পারল না।

"যুদ্ধ জয়ের দৃঢ় সংকল্প যারা গ্রহণ করে তারাই যুদ্ধ জয় করে। অস্তারলিজের যুদ্ধে কেন আমাদের হার হল? ফ্রান্সের ক্ষয়-ক্ষতি আমাদের প্রায় সমানই হয়েছিল, কিন্তু গোড়া থেকেই আমরা বলে আসছিলাম যে আমরা হারতে বসেছি, আর সেই হারই আমাদের হল। আর সেকথা আমরা বলেছিলাম কারণ সেখানে যুদ্ধ করবার মত কিছুই আমাদের ছিল না, যত শীঘ্র সম্ভব যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতেই আমরা চেয়েছিলাম। 'আমরা

হেরে গেছি, অতএব ছুটে পালাও', আমরা ছুটে পালিয়েছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত যদি সেকথা আমরা না বলতাম, তাহলে কী না ঘটতে পারত তা ঈশ্বর জানেন। কিন্তু কাল আমরা সেকথা বলব না। তোমরা আমাদের ব্যূহ রচনার কথা বলছ, বলছ যে বাম ব্যূহ দুর্বল, আর দক্ষিণ ব্যূহ বড় বেশী প্রসারিত; সেসবই বাজে কথা; সেরকম কিছুই ঘটে নি। কিন্তু কাল আমাদের কপালে কি আছে? আছে লক্ষ লক্ষ বিচিত্র সম্ভাবনা যেটা নির্ধারিত হবে আমাদের সৈন্য বা তাদের সৈন্যরা পালাবে কি পালাবে না তার দ্বারা; এ-লোক বা সে-লোকের মৃত্যু হবে কি না তার দ্বারা; কিন্তু বর্তমানে যা কিছু করা হচ্ছে সবই তো ছেলেখেলা। আসল কথা হল, যাদের নিয়ে তোমরা সবকিছু ঘুরে দেখে এলে তারা আমাদের কাজের সহায়ক না হয়ে বরং বিঘ্নের সৃষ্টি করছে। তারা সকলেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত।"

"এই সংকট-মুহূর্তেও?" পিয়ের অনুযোগের সুরে বলল।

"এই সংকট-মুহূর্তেও!" প্রিন্স আন্দ্রু কথাটার পুনরাবৃত্তি করল। "তাদের কাছে এই মুহূর্তটা কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করে একটা বাড়তি ক্রুশ বা ফিতে পাবার সুযোগ এনে দিয়েছে মাত্র। আর আমার কাছে আগামী কালের অর্থ হল: এক লক্ষ সৈন্যের রুশ বাহিনী এবং এক লক্ষ সৈন্যের ফরাসী বাহিনী রণক্ষেত্রে পরস্পরের মুখোমুখি হবে, দুই লক্ষ সৈন্য যুদ্ধ করবে, এবং যে পক্ষ ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে অধিকতর তীব্রতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে সেই জিতবে। আর তুমি যদি চাও তো আমি বলছি, যাই ঘটুক না কেন, উপরওয়ালারা যতই ভণ্ডুল করুক না কেন, আগামীকালের যুদ্ধে আমরা জিতবই। যাই ঘটুক না কেন, আগামীকাল আমরা জিতবই!"

তিমোখিন বলে উঠল, "ঠিক বলেছেন ইয়োর এক্সেলেন্সি! এটাই সত্য কথা, খাঁটি কথা। আজকের দিনে কে দূরে সরে থাকবে? বিশ্বাস করুন, আমার ব্যাটেলিয়নের সৈন্যরা আজ ভদ্‌কা খাবে না। তারা বলছে, ভদ্‌কা খাবার দিন আজ নয়!'"

সকলেই চুপ। অফিসাররা উঠে দাঁড়াল। অ্যাড্‌জুটাণ্টকে চূড়ান্ত নির্দেশ জানিয়ে প্রিন্স আন্দ্রুও তাদের সঙ্গে চালাঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারা চলে গেলে পিয়ের প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে এগিয়ে গেল; তার সঙ্গে নতুন করে আলোচনা শুরু করতে যাবে এমন সময় অদূরে তিনটে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ তাদের কানে এল; সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু জনৈক কসাকসহ ওল্‌যোগেন ও ক্লজউইৎজ্‌কে চিনতে পারল। পাশাপাশি ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে তারা নিজেদের মধ্যে ফরাসীতে যা বলাবলি করছে আপনা থেকেই প্রিন্স আন্দ্রু তা শুনতে পেল:

"রণক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতেই হবে," একজন বলল।

অপরজন বলল, "ঠিক বলেছ; শত্রুপক্ষকে দুর্বল করে দেওয়াটাই একমাত্র লক্ষ্য; এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভাবলে চলবে না।"

তারা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলে প্রিন্স আন্দ্রু তর্জন করে বলে উঠল, "রণক্ষেত্রকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে হবে। ওই 'প্রসারিত করা'র মধ্যে ছিল আমার বাবা, ছেলে, বোন, বল্ড হিল্‌স্। ওর কাছে সবই সমান! এই কথাই তোমাকে বলছিলাম—ওই জার্মান ভদ্রলোকরা কালকের যুদ্ধ জিততে পারবে না, তারা সবকিছু তালগোল পাকিয়ে দেবে, কারণ তাদের জার্মান খুলির মধ্যে তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নেই, আর সে তত্ত্বের মূল্য একটা খালি ডিমের খোলাও নয়; কালকের যুদ্ধে যে বস্তুটির প্রয়োজন, যা তিমোখিনের আছে, তা ওদের হৃদয়ে নেই। ওরা গোটা ইয়োরোপকে 'তার' হাতে সঁপে দিয়ে এখন এসেছে আমাদের শেখাতে। বেড়ে শিক্ষক সব!" তার কণ্ঠস্বর আবার কর্কশ হয়ে উঠল।

পিয়ের শুধাল, "তাহলে তুমি মনে কর যে কালকের যুদ্ধে আমাদের জয় হবে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ," প্রিন্স আন্দ্রু অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল। তারপর বলতে শুরু করল, "আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি একটা কাজ করতাম, কাউকে বন্দী করতাম না। কেন বন্দী করব? তাতে বীরত্ব প্রকাশ হতে পারে! কিন্তু ফরাসীরা আমার বাড়ি ধ্বংস করেছে, ছুটে চলেছে মস্কো ধ্বংস করতে, আমাকে অপমান করেছে, প্রতিটি মুহূর্ত অপমান করে চলেছে। তারা আমার শত্রু। আমার মতে তারা সকলেই অপরাধী। তিমোখিন এবং গোটা সৈন্যদলও তাই মনে করে। তাদের হত্যা করতে হবে। তিলজিটে যাই বলা হোক না কেন, যেহেতু তারা আমার শত্রু, তাই তারা আমার বন্ধু হতে পারে না।"

চকচকে চোখে প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "ঠিক ঠিক। তোমার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।"

মোঝায়েস্ক পাহাড়ে এবং সারাটাদিন ধরে যে প্রশ্নটা পিয়েরকে বিব্রত করে তুলছিল এবার যেন সেটা তার কাছে বেশ পরিষ্কার হয়ে উঠেছে; প্রশ্নটার মীমাংসাও সে খুঁজে পেয়েছে। এই যুদ্ধের এবং আসন্ন সংঘর্ষের তাৎপর্য ও গুরুত্ব এবার সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সারাদিন সে যা কিছু দেখেছে, যেতে যেতে নানা জনের মুখে যে অর্থপূর্ণ কঠিনভাব দেখেছে, সেসব কিছুই একটা নতুন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। তার দেখা এইসব লোকদের মধ্যে দেশপ্রেমের যে সুপ্ত উত্তাপ (পদার্থবিদ্যার ভাষায়) রয়েছে তার সন্ধান সে পেয়েছে; আর তার ফলেই বুঝতে পেরেছে কেন তারা সকলেই শান্ত অথচ সহজভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে প্রস্তুত হতে পেরেছে।

প্রিন্স আন্দ্রু বলতে লাগল, "কাউকে বন্দী করব না। শুধু তাহলেই গোটা যুদ্ধের চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে যাবে, তার নিষ্ঠুরতাও হ্রাস পাবে। এখন যা চলছে সেটা তো যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা—আর সেটাই জঘন্য। আমরা মহত্ত্ব ও অনুরূপ গুণাবলী নিয়ে খেলা করি। এই মহত্ত্ব ও স্পর্শকাতরতা হচ্ছে সেই মহিলাটির মহত্ত্ব ও স্পর্শকাতরতার মত যিনি একটি গো-বৎসকে মারতে দেখে মূর্ছা যান: তিনি এতই দয়ালু-হৃদয় যে রক্ত দেখতে পারেন না, কিন্তু সেই গো-বৎসের মাংস যখন সজ্জিসহকারে পরিবেশন করা হয় তখন বেশ রসিয়ে রসিয়ে খান। তারা তো অনেক কথাই বলে—যুদ্ধের রীতিনীতি, বীরত্ব, সন্ধির পতাকা, হতভাগ্যদের প্রতি করুণা, কত কি। সবই তো অর্থহীন। এই বীরত্ব ও সন্ধির পতাকা আমি দেখেছি ১৮০৫-এ; তারা আমাদের ধোঁকা দিয়েছে, আমরা তাদের ধোঁকা দিয়েছি। তারা অন্য লোকের ঘরবাড়ি লুঠ করে, নকল টাকার নোট ছড়ায়, আর সবচাইতে যেটা খারাপ আমার সন্তান ও পিতাকে হত্যা করে, এবং তারপরে যুদ্ধের রীতিনীতি ও শত্রুর প্রতি উদারতার বুলি আওড়ায়! কাউকে বন্দী করো না, মার এবং মর। আমার মতই দুঃখ-যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে যারা এই সিদ্ধান্তে এসেছে…"

হঠাৎ প্রিন্স আন্দ্রুর গলা আটকে গেল। নিঃশব্দে বারকয়েক পায়চারি করল; তার চোখ দুটি চকচক করছে; ঠোঁট কাঁপছে।

"যুদ্ধে যদি এই উদারতার ব্যাপারটা না থাকত, তাহলে একমাত্র তখনই আমরা যুদ্ধে যেতাম যখন আজকের মতই বুঝতাম যে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাওয়াটাও অবশ্য কর্তব্য। তাহলে পল আইভানভিচ মাইকেল আইভানভিচকে দুঃখ দিয়েছে বলেই একটা যুদ্ধ বেধে যেত না। আর আজকের মতই যুদ্ধ হলে সেটা যুদ্ধই হত! তখন সৈন্যদের সংকল্প হত সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেক্ষেত্রে ওয়েস্টফেলিয়া ও হেসিয়ার যেসব মানুষদের নেপোলিয়ন আজ রণক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তারা তার পিছু পিছু রাশিয়াতে ঢুকত না, আর আমরাও কিছু না জেনেশুনেই অস্ট্রিয়া ও প্রুশিয়াতে যুদ্ধ করতে যেতাম না। যুদ্ধ একটা ভদ্রতার ব্যাপার নয়, যুদ্ধ জীবনের এক ভয়ংকর সত্য; আর সেটাই আমাদের বুঝতে হবে, যুদ্ধ নিয়ে ছেলেখেলা করা চলবে না। কঠোরভাবে, গুরুত্বের সঙ্গে এই ভয়ংকর অনিবার্যতাকে স্বীকার করে নিতে হবে। আসল ব্যাপারটা সেখানেই; মিথ্যার মোহকে ছিঁড়ে ফেল; যুদ্ধটা যুদ্ধই হোক, খেলা নয়। এখন যা চলছে তা তো যুদ্ধ নয়, যেন অলস ও বাকসর্বস্বদের একটা মজার খেলামাত্র। সামরিক চাকরি অত্যন্ত সম্মানজনক পদ।

"কিন্তু যুদ্ধ কি? যুদ্ধে সাফল্যলাভের জন্য কি দরকার? সামরিক লোকদের কাজ কি? যুদ্ধের লক্ষ্যই তো হত্যা; যুদ্ধের পথ হচ্ছে গুপ্তচরবৃত্তি, বিশ্বাসঘাতকতা, একটা দেশের অধিবাসীদের ধ্বংস, সেনাদলের খাদ্যসংস্থানের

জন্য লুট ও চুরি; জালিয়াতি ও মিথ্যাচরণই তো সামরিক কৌশলের অপর নাম। সামরিক লোকদের স্বভাব হচ্ছে স্বাধীনতার অভাব, অর্থাৎ শৃংখলা, আলস্য, অজ্ঞতা, নিষ্ঠুরতা, লাম্পট্য ও মাতলামি। আর এসব সত্ত্বেও তারাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় উচ্চতম শ্রেণী। একমাত্র চীনারা ছাড়া আর সব রাজারাই সামরিক পোশাক পরেন; যে লোক যত বেশী মানুষ মারতে পারে সেই পায় সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

"কাল যেমন আমরা মুখোমুখি হব, তেমনি তারাও পরস্পরের মুখোমুখি হয় একে অন্যকে খুন করতে; তারা হাজার হাজার লোককে খুন করে, পঙ্গু করে, তারপর এত এত মানুষ (এমন কি তারা সংখ্যাটাকে বাড়িয়ে বলে) খুন করার জন্য ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়; যত বেশী মানুষ তারা খুন করবে ততই তাদের কৃতিত্ব বাড়বে এটা ধরে নিয়েই একটা জয়ের কথা ঘোষণা করা হয়। মাথার উপর থেকে ঈশ্বর তাদের কোন্ চোখে দেখেন বা তাদের কথা শোনেন?" প্রিন্স আন্দ্রুর কণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ ও কর্কশ হয়ে উঠল। "হায় বন্ধু, ইদানীং বেঁচে থাকাটাই আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারছি যে আমি বড় বেশী বুঝতে শুরু করেছি। পাপ-পুণ্যের জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খাওয়া মানুষের পোষায় না। ...যাই হোক, আর বেশী দিন নয়!"

তারপরেই হঠাৎ বলে উঠল, "যাই হোক, তোমার ঘুম পাচ্ছে, আমারও ঘুমের সময় হয়েছে। গোর্কিতে ফিরে যাও।"

ভয়ার্ত, সহৃদয় চোখে তারদিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "না, না।"

"যাও, যাও। যুদ্ধের আগে ঘুমটা ভাল হওয়া চাই," প্রিন্স আন্দ্রু আবার বলল।

তাড়াতাড়ি পিয়েরের কাছে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে চুমো খেল।

চেঁচিয়ে বলল, "বিদায়, কেটে পড়! আবার আমাদের দেখা হবে কি হবে না..." মুখটা ঘুরিয়ে দ্রুত পায়ে সে চালাঘরে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার হয়ে এসেছে; তাই পিয়ের বুঝতে পারল না প্রিন্স আন্দ্রুর মুখে কোন্ ভাব ফুটেছে—ক্রোধের, না মমতার।

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ভাবল, তার পিছু নেবে না চলে যাবে? শেষ পর্যন্ত স্থির করল, "না। সেটা তার ইচ্ছা নয়। আমি জানি, এটাই আমাদের শেষ দেখা।" গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে গোর্কির দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

চালাঘরে ঢুকে প্রিন্স আন্দ্রু একটা কম্বলের উপর শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুমোতে পারল না।

চোখ বুজল। কল্পনায় একটার পর একটা ছবি ভেসে উঠল। একটা ছবি নিয়ে আনন্দের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটাল। পিতার্সবুর্গের একটা সন্ধ্যার কথা খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ল। প্রাণবন্ত, উত্তেজিত মুখে নাতাশা তাকে

বলেছিল, আগের গ্রীষ্মকালে ব্যাঙের ছাতা কুড়তে গিয়ে কেমন করে সে বনের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিল। এলোমেলোভাবে সে বলছিল জঙ্গলের গভীরতার কথা, তার অনুভূতির কথা; একজন মৌমাছি-পালকের সঙ্গে দেখা হবার কথা; আর সেসব বলার ফাঁকে ফাঁকে বারবারই বলেছিল: "না, আমি পারছি না, ঠিক মত বলা হচ্ছে না; না, তুমি ঠিক বুঝছ না।" নিজের কথায় নাতাশা নিজেই খুশি হতে পারে নি: সে বুঝতে পারছিল, সেদিন তার মনে যে আবেগময় কাব্যভাব জেগেছিল সেটাকে সে ঠিকমত প্রকাশ করতে পারছে না। উত্তেজনায় লাল হয়ে সে বলেছিল, "না, আমি ঠিকমত বলতে পারছি না। ···বুড়ো মানুষটি এত ভাল ছিল, আর জঙ্গলের ভিতরটা ছিল এত অন্ধকার ···না, ঠিক হচ্ছে না।" প্রিন্স আন্‌দ্রুর মুখে সেদিনকার মতই খুশির হাসি দেখা দিল। ভাবল, "আমি তাকে ঠিক বুঝেছিলাম। শুধু যে বুঝেছিলাম তাই নয়, তার ভিতরকার সেই আত্মিক শক্তি, সেই আন্তরিকতা, আত্মার সেই সংকোচবিহীনতা—তার যে আত্মা দেহের বন্ধনে আবদ্ধ—সেই আত্মাকেই আমি ভালবেসেছিলাম···কত যে ভালবেসেছিলাম আর কত যে সুখী হয়েছিলাম···হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল কেমন করে একদিন সে ভালবাসার অবসান হল। "সেই লোকটার তো সেরকম কিছুর প্রয়োজন ছিল না। সে জিনিস সে তো দেখেও নি, বোঝেও নি। সে লোকটা তার মধ্যে দেখেছিল শুধু একটি সুন্দরী, তাজা যুবতীকে; কিন্তু সে নিজে তো তার সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়াতে চায় নি। আর আমি? ···অথচ সেই লোকটা আজও বেঁচে আছে, ফূর্তিতে আছে!"

যেন আগুনের ছ্যাঁকা লেগেছে এমনিভাবে লাফিয়ে উঠে প্রিন্স আন্‌দ্রু চালাঘরটার সামনে পায়চারি করতে শুরু করল।

অধ্যায়—২৬

বরদিনো যুদ্ধের প্রাক্কালে ২৫শে অগস্ট তারিখে ফরাসী সম্রাটের রাজপ্রাসাদের প্রিফেক্ট ম. দ্য বুসে কর্ণেল ফেবিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে ভালুভো ঘাঁটিতে নেপোলিয়নের কাছে এসে হাজির হল; প্রথমজন এল প্যারিস থেকে, আর দ্বিতীয়জন মাদ্রিদ থেকে।

দরবারের পোশাকে সজ্জিত ম. দ্য বুসে হুকুম দিল, সম্রাটের জন্য যে বাক্সটা আনা হয়েছে সেটা তার সামনে হাজির করা হোক। নেপোলিয়নের শিবিরের প্রথম ঘরটাতে ঢুকে নেপোলিয়নের এডি-কংদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে বাক্সটা খুলতে লাগল।

ফেবিয়ের শিবিরে না ঢুকে ফটকে দাঁড়িয়েই পরিচিত সেনাপতিদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

সম্রাট নেপোলিয়ন তখনও তার শোবার ঘরেই বেশবাস নিয়ে ব্যস্ত।

ঈষৎ বিরক্তির সঙ্গে কখনও পিঠ, কখনও লোমশ ফোলা বুকটা এগিয়ে দিচ্ছে, আর খানসামা তাকে ব্রুশ করছে। আর একটি খানসামা একটা বোতলের মুখে আঙুল রেখে সম্রাটের সারা শরীরে ইউ-ডি-কলোন ছিটিয়ে দিচ্ছে; তার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন একমাত্র সেই জানে সম্রাটের শরীরের কোথায় কতটা ইউ-ডি-কলোন ছিটাতে হবে। নেপোলিয়নের মাথার ছোট ছোট চুলগুলি ভেজা, কপালের উপর চেপে বসানো; ফোলা-ফোলা হলদেটে মুখে দৈহিক তৃপ্তির আমেজ। খানসামাকে বলছে, "চালাও, আরও জোরে ব্রুশ চালাও!" যে এড্-ডি-কংটি গতকালের যুদ্ধে বন্দীদের সংখ্যা জানাতে ঘরে ঢুকেছিল, ফিরে যাওয়ার নির্দেশের অপেক্ষায় সে দরজার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। ভুরু কুঁচকে নেপোলিয়ন তারদিকে তাকাল।

এড্-ডি-কং-য়ের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলল, "কেউ বন্দী হয় নি! ওদের নির্মূল করতে ওরা আমাদের বাধ্য করছে। রুশ সৈন্যদের কপালই মন্দ। ···জোরে চালাও···আরও জোরে!" পিঠটা কুঁজো করে মোটা গর্দান এগিয়ে দিয়ে বলে উঠল।

তারপর এড্-ডি-কং-য়ের দিকে মাথা নেড়ে বলল, "ঠিক আছে। মঁসিয় দ্য বুসেকে আসতে বল। ফেরিয়েরকেও।"

"ঠিক আছে স্যার," এড্-ডি-কং শিবিরের দরজা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। দুই খানসামা দ্রুত হাতে হিজ ম্যাজেস্টির প্রসাধন শেষ করল; রক্ষী-বাহিনীর নীল ইউনিফর্ম পরে সম্রাট দ্রুতপায়ে অভ্যর্থনাকক্ষে ঢুকল।

সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে যে উপহার নিয়ে এসেছে সেগুলিকে দরজার ঠিক সামনে দুটো চেয়ারে সাজিয়ে রাখার কাজেই তখন দ্য বুসে খুব ব্যস্ত। পোশাক-পরা শেষ করে নেপোলিয়ন এত অপ্রত্যাশিত দ্রুতগতিতে বেরিয়ে এসেছে যে দ্য বুসে তখনও উপহারগুলি সাজিয়ে শেষ করতে পারে নি।

তাদের কাজকর্ম দেখেই নেপোলিয়ন বুঝতে পারল তারা কি করছে এবং সেকাজ তখনও শেষ হয় নি। তাকে অবাক করে দিয়ে নিজেরা যাতে খুশি হতে পারে সেই সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে নেপোলিয়নের মন চাইল না; কাজেই দ্য বুসেকে না দেখতে পাবার ভান করে সে ফেরিয়েরকে কাছে ডাকল এবং ইওরোপের অপর প্রান্তে সালামাংকার যুদ্ধে ফরাসী সৈন্যদলের বীরত্ব ও আন্তরিকতার কাহিনী শুনতে লাগল নিঃশব্দে ভুরু কুঁচকে। ফেরিয়ারের মনে একটিই চিন্তা—সম্রাটের উপযুক্ত হওয়া, তার মনে একটিই ভয়—তাকে খুশি করতে না পারা। সে যুদ্ধের ফল হয়েছে শোচনীয়। ফেরিয়ারের বিবরণ শুনতে শুনতে নেপোলিয়ন এমন সব মন্তব্য করতে লাগল যেন তার অনুপস্থিতিতে ব্যাপারটা যে অন্যরকম হতে পারে না তা সে জানত।

বলল, "সে ক্ষতি আমি মস্কোতে পূরণ করব। ঠিক আছে, পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।" তারপর দ্য বুসেকে ডাকল। উপঢৌকন

সাজানো শেষ করে সেগুলোকে চেয়ারের উপর রেখে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে।

দ্য বুসে নীচু হয়ে অভিবাদন জানাল। সেধরনের দরকারি অভিবাদন একমাত্র বুরবনদের আমলের পুরনো কর্মচারিরাই করতে জানে। সে এগিয়ে এসে সম্রাটের হাতে একটা খাম দিল।

নেপোলিয়ন খুশি হয়ে তার কানটা টেনে দিল।

"তুমি খুব তাড়াতাড়ি এসেছ। আমি খুব খুশি হয়েছি। আচ্ছা, প্যারিস কি বলছে?" হঠাৎ তার মুখের কঠোরতা সরে গিয়ে দেখা দিল প্রসন্নতা।

দ্য বুসে জবাব দিল, "স্যার, আপনার অনুপস্থিতিতে সারা প্যারিস দুঃখিত।"

কথাটা মিথ্যা হলেও দ্য বুসে যে এই কথাই বলবে নেপোলিয়ন তা জানত; তবু তার মুখ থেকে কথাটা শুনে সে খুশি হল; আবার তার কান ছুঁয়ে তাকে সম্মানিত করল।

বলল, "তোমাকে এতদূর টেনে এনেছি বলে আমি খুবই দুঃখিত।"

দ্য বুসে উত্তর দিল, "আমি তো আশা করেছিলাম মস্কোর ফটকেই আপনার সঙ্গে দেখা হবে।"

নেপোলিয়ন হাসল; অন্যমনস্কভাবে মাথাটা তুলে ডাইনে তাকাল। জনৈক এড্-ডি-কং এগিয়ে এসে একটা সোনার নস্যদানি তার হাতে দিল।

খোলা নস্যর কৌটোটা নাকের কাছে ধরে বলল, "হ্যাঁ, তোমার ভাগ্য ভাল যে সেটাই ঘটছে। তুমি তো ভ্রমণ করতে ভালবাস, আর তিনদিনের মধ্যেই মস্কো দেখতে পাবে। এসিয়ার সেই রাজধানীটা দেখার আশা তুমি নিশ্চয়ই কর নি। তোমার যাত্রাপথটাও সুখেই কাটবে।"

ভ্রমণ-অনুরাগের এই গুণগান শুনে (যদিও সে নিজে বিষয়টা সম্পর্কে ঠিক অবহিত ছিল না) দ্য বুসে সকৃতজ্ঞচিত্তে মাথা নোয়াল।

কাপড় দিয়ে ঢাকা কোন জিনিসের দিকে পারিষদরা সকলেই তাকিয়ে আছে দেখে নেপোলিয়ন শুধাল, "আরে, এটা কি?"

দ্য বুসে দরবারি কায়দায় অর্ধেকটা ঘুরে কিন্তু সম্রাটের দিকে পিছন না ফিরে দু' পা পিছিয়ে গেল এবং কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে বলল, "সম্রাজ্ঞীর কাছ থেকে ইয়োর ম্যাজেস্টির জন্য কিছু উপঢৌকন।"

একখানি প্রতিকৃতি; জেরার্ড কর্তৃক উজ্জ্বল রঙে আঁকা। অস্ট্রীয়ার সম্রাটের কন্যার গর্ভে নেপোলিয়নের যে ছেলে হয়েছে তারই ছবি; যে কারণেই হোক সকলেই ছেলেটিকে "রোমের রাজা" বলে ডাকে।

মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল সুন্দর ছেলেটি; চোখে সিস্টাইন ম্যাডোনার আঁকা খৃস্টের দৃষ্টি; লাঠি ও বল নিয়ে ক্রীড়ারত ভঙ্গীতে তাকে আঁকা হয়েছে।

বলটি যেন ভূ-গোলক, আর অন্য হাতের লাঠিটা রাজদণ্ড।

তথাকথিত "রোমের রাজা" কে লাঠি দিয়ে পৃথিবীকে বিদ্ধকারী ভঙ্গিমায় এঁকে শিল্পী কি বোঝাতে চেয়েছে সেটা স্পষ্ট না হলেও প্যারিসে যারা যারা ছবিটা দেখেছে তাদের মত নেপোলিয়নের কাছেও ছবির রূপকার্যটি খুবই পরিষ্কার ও মনের মত বলেই মনে হল।

একটা মনোরম ভঙ্গী করে প্রতিকৃতিটির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নেপোলিয়ন বলে উঠল, "রোমের রাজা! ···প্রশংসনীয়!"

ইচ্ছামত মুখেরভাব বদলাবার সহজাত ইতালীয় ক্ষমতার বলে সে ছবিটার আরও কাছে এগিয়ে গিয়ে মুখে একটা বিষণ্ণ মমতার ভাব ফুটিয়ে তুলল। সে বুঝতে পেরেছে, এইমুহূর্তে সে যা বলবে বা করবে সেটা ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করবে, আর তাই এই মুহূর্তে তার পক্ষে সব চাইতে ভাল হবে রাজকীয় জাঁকজমকের—যে জাঁকজমক তার সন্তানকে দিয়েছে ভূগোলক নিয়ে খেলা করার শক্তি—পরিবর্তে অতি সহজ, সরল পিতৃসুলভ মমতা দেখানো। তার দৃষ্টি ঝাঁপসা হয়ে এল, কিছুটা এগিয়ে ছবিটার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। তার একটিমাত্র ইঙ্গিতে সকলেই পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, সেখানে রইল শুধু ভাববিহ্বল মহাপুরুষটি।

কিছুক্ষণ বসে থেকে কিছু না বুঝেই সে ছবির সবচাইতে উজ্জ্বল রংয়ের জায়গাটা ছুঁয়ে উঠে দাঁড়াল; দ্য বুসে ও কর্তব্যরত অফিসারকে ডেকে পাঠাল। প্রতিকৃতিটিকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবার হুকুম হল; শিবিরের চারপাশে মোতায়েন রক্ষীদল যেন তাদের পূজনীয় সম্রাটের পুত্র ও উত্তরাধিকারী "রোমের রাজা"র দর্শন থেকে বঞ্চিত না হয়।

ম. দ্য বুসের সঙ্গে প্রাতরাশে বসেই তারা শুনতে পেল ওল্ড গার্ডের অফিসার ও সৈনিকরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে চীৎকার করতে করতে প্রতিকৃতিটি দেখবার জন্য ছুটে যাচ্ছে।

"ভি ভে ল' এম্পেরিয়র! ভি ভে লে রয় দ্য রোম! ভি ভে ল' এম্পেরিয়র!"

প্রাতরাশের পরে দ্য বুসের উপস্থিতিতেই সে সেনাবাহিনীর প্রতি সেদিনকার হুকুমের শ্রুতলিখনটি বলতে লাগল।

কোনরকম সংশোধন ছাড়াই সেকাজটা শেষ করে একবার পড়ে সে বলল, "সংক্ষিপ্ত ও উৎসাহবর্ধক!" হুকুমটা এইরকম:

"সৈন্যগণ, এই যুদ্ধের আশাতেই তোমরা এতদিন ছিলে। তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে বিজয়-গৌরব। এ যুদ্ধ আমাদের পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন; আমাদের যা কিছু দরকার সবই এই যুদ্ধ আমাদের দেবে—আরামদায়ক বাসস্থান এবং দ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তন। অস্তারলিজ, ফ্রিডল্যাণ্ড, ভিতেবস্ক্‌ ও স্মোলেনস্ক-এ যে আচরণ তোমরা করেছ, এখনও তাই করবে।

আমাদের দূরতম প্রজন্মও যেন তোমাদের আজকের সাফল্যকে গর্বের সঙ্গে স্মরণ করতে পারে। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তারা যেন বলতে পারে : মস্কোর সম্মুখের মহাযুদ্ধে তিনি ছিলেন।"

"মস্কোর সম্মুখে!" নেপোলিয়ন কথাটা আর একবার উচ্চারণ করল, "তারপর ভ্রমণপ্রিয় ম. দ্য বুসেকে অশ্বারোহণে তার সঙ্গী হবার আমন্ত্রণ জানিয়ে সে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল।

সম্রাটের সঙ্গী হবার আমন্ত্রণের উত্তরে দ্য বুসে বলল, "ইয়োর ম্যাজেস্টির অনেক দয়া!" তার তখন ঘুম পেয়েছে, ঘোড়ায় চড়তেও সে জানে না, তাই খুব ভয়ও করছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের ইসারায় দ্য বুসেকে ঘোড়ায় চাপতেই হল। নেপোলিয়ন শিবির থেকে বেরিয়ে এলে তার ছেলের ছবির সামনে সমবেত রক্ষীদের চীৎকার আরও উচ্চকণ্ঠ হল। নেপোলিয়নের চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

রাজকীয় ভঙ্গীতে ছবিটা দেখিয়ে বলল, "ওকে সরিয়ে নিয়ে যাও! যুদ্ধক্ষেত্র দেখবার সময় ওর এখনও হয় নি।"

সম্রাটের কথাগুলি যে তার কাছে কত মূল্যবান সেটা বোঝাবার জন্য দ্য বুসে চোখ বুজে মাথাটা নুইয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অধ্যায়—২৭

ইতিহাসকারদের কাছ থেকে আমরা শুনেছি, ২৫শে অগস্ট সারাটা দিন নেপোলিয়ন অশ্বপৃষ্ঠেই কাটিয়েছে; গোটা অঞ্চল পরিদর্শন করেছে, মার্শালরা যেসব পরিকল্পনা দাখিল করেছে সেগুলি নিয়ে ভেবেছে, সেনাপতিদের জানিয়েছে ব্যক্তিগত নির্দেশ।

২৪শে তারিখে শেভার্দিনো দুর্গ দখলের ফলে কলোচা নদী বরাবর রুশবাহিনীর সীমান্তটি বিপর্যস্ত হয়ে গেছে, আর তার কতকাংশকে—বামব্যূহটি—পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। সীমান্তের সেই অংশটি পরিখাবেষ্টিত নয়, আর তার সম্মুখস্থ মাঠটি অনেকটা খোলা এবং অন্য জায়গার তুলনায় সমতল। কাজেই সামরিক বা সাধারণ যেকোন লোকের কাছেই এটা স্পষ্ট যে ফরাসীরা সেখান দিয়েই আক্রমণ করবে। স্বভাবতই এটা মনে হতে পারে যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবার জন্য কোন বিশেষ বিচার-বিবেচনার দরকার ছিল না, সম্রাট বা তার মার্শালদেরও এ নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাবারও দরকার ছিল না, এবং সাধারণ মানুষ নেপোলিয়নকে যে প্রতিভার অধিকারী বলে মনে করে সেরকম কোন বিশেষ মহৎ গুণের প্রয়োজনও সেখানে ছিল না; অথচ যে ইতিহাসকাররা পরবর্তীকালে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে, যারা সেইসময় নেপোলিয়নকে ঘিরে ছিল, এমন কি নেপোলিয়ন স্বয়ং কিন্তু অন্য-

রকমটাই মনে করেছিল।

সমতলভূমিতে ঘোড়া চালাতে চালাতে নেপোলিয়ন গম্ভীর নীরবতার সঙ্গে অঞ্চলটা ঘুরে দেখল, কখনও ঘাড় নাড়ল সম্মতিসূচকভাবে, কখনও বা সন্দিগ্ধচিত্তে, এবং যে গুরুগম্ভীর চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে সে তার সিদ্ধান্তে উপনীত হল সে সম্পর্কে সঙ্গী সেনাপতিদের কিছুমাত্র না জানিয়ে তাদের শুনিয়ে দিল তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলিকে হুকুমের আকারে।

শেভার্দিনো দুর্গের বিপরীত দিককার অঞ্চলটা ভাল করে পরীক্ষা করে নেপোলিয়ন নীরবে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর কয়েকটা জায়গা দেখিয়ে রুশদের পরিখা খননে বাধা দেবার জন্য আগামীকালের মধ্যে সেখানে দুটো কামানশ্রেণী এবং তার সঙ্গে সমান্তরাল রেখায় গোলন্দাজ-বাহিনী সন্নিবেশের নির্দেশ দিল।

এইসব নির্দেশাদি দিয়ে সে শিবিরে ফিরে গেল এবং তার শ্রুতিলিপি অনুসারেই যুদ্ধের বিলি-ব্যবস্থার বিবরণ লেখা হল।

যে বিলি-ব্যবস্থার বিবরণ ফরাসী ইতিহাসকাররা লিখেছে মহা উৎসাহে এবং অন্য ইতিহাসকাররা লিখেছে গভীর শ্রদ্ধায় তা হল:

"প্রিন্স দ্য এককমুহ্‌ল কর্তৃক অধিকৃত প্রান্তরে রাতের মধ্যেই যে দুটি কামানশ্রেণী স্থাপিত হয়েছে প্রত্যূষেই বিপরীত দিকে অবস্থিত শত্রুপক্ষের দুটি কামানশ্রেণীর উপর তা থেকে গোলা বর্ষণ করা হবে।

"ঠিক একই সঙ্গে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রথম কোরের কম্যাণ্ডার জেনারেল পার্নেত্তি কাম্পাঁ ডিভিসনের ত্রিশটি কামান এবং দেসায়িকস্‌ ও ফ্রিয়াঁং ডিভিসনের হাল্কা কামান নিয়ে অগ্রসর হবে, গোলাবর্ষণ করবে এবং নিম্নলিখিত শক্তি নিয়ে শত্রুপক্ষের কামানের গোলাবর্ষণকে স্তব্ধ করে দেবে:

২৪ কামান—গোলন্দাজ রক্ষী বাহিনীর
৩০ কামান—কাম্পাঁ ডিভিসনের
ও ৮ কামান—ফ্রিয়াঁং ও দেসায়িকস্‌ ডিভিশনের
মোট ৬২ কামান

"গোলন্দাজ বাহিনীর তৃতীয় কোরের কম্যাণ্ডার জেনারেল ফুচে তৃতীয় ও অষ্টম কোরের মোট ষোলটি হাল্কা কামানকে রাখবে সেই কামানশ্রেণীর পাশে যা থেকে বাঁ দিকের পরিখা লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করা হবে এবং যার বিরুদ্ধে তাক করে সাজানো রয়েছে চল্লিশটা কামান।

"গোলন্দাজ রক্ষীবাহিনীর হাল্কা কামানগুলি নিয়ে যেকোন একটি পরিখা-খননকারী দলের বিরুদ্ধে প্রথম হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হবার জন্য জেনারেল সোর্বিয়েরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

"গোলাবর্ষণ চলাকালে প্রিন্স পোনিয়াতোস্কি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে গ্রামে পৌঁছে শত্রুর সেনাসমাবেশের মুখটা ঘুরিয়ে দেবে।

"প্রথম রক্ষা-ব্যবস্থাকে দখল করে নেবার জন্য জেনারেল কাম্পাঁ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হবে।

"এইভাবে অগ্রসর হবার পরে শত্রুর গতিবিধি অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়া হবে।

"ডানদিককার কামানের গর্জন শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বাম ব্যূহের উপর গোলাবর্ষণ শুরু হবে। দক্ষিণ ব্যূহের উপর আক্রমণ শুরু হতে দেখলেই মোর্যাঁদ-এর ডিভিসন এবং উপরাজার ডিভিসনের (মুরাত-এর কথা বলা হচ্ছে) নিপুণ গোলন্দাজরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে দেবে।

"উপরাজা গ্রামটি (বরদিনো) দখল করবে এবং তিনটে সেতুপথে নদী পেরিয়ে মোর্যাঁদ ও জেরার্দ ডিভিসনের সমান উচ্চতায় উঠে যাবে; তার নেতৃত্বে ঐ দুটি ডিভিসনও দুর্গটিকে আক্রমণ করবে এবং অবশিষ্ট সেনাদলের সঙ্গে একসারিতে এসে যোগ দেবে।

এসব কিছুই করতে হবে সেনাদলকে যতদূর সম্ভব রিজার্ভে রেখে অত্যন্ত শৃংখলার সঙ্গে।

"মোঝায়েস্ক-এর নিকটবর্তী রাজকীয় শিবির,
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮১২"

নেপোলিয়নের প্রতিভার প্রতি একান্ত ভীতি পোষণ না করে যদি এইসব অস্পষ্ট ও গোলমেলে বিলি-ব্যবস্থার বিচার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে নেপোলিয়ন চারটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে চারটি নির্দেশ দিয়েছিল। তার কোনটিই কার্যকর করা হয় নি, করা যেত না।

বরদিনো পার হয়ে যাবার পরে উপরাজাকে কলোচা নদী পর্যন্ত হটিয়ে দেওয়া হল, সে আর অগ্রসর হতে পারল না; মোর্যাঁদ ও জেরার্দ-এর ডিভিসনগুলিও দুর্গটা দখল করতে পারল না, বরং তাদেরও হটিয়ে দেওয়া হল; অবশ্য যুদ্ধের একেবারে শেষে অশ্বারোহী বাহিনী সেটা দখল করেছিল। (এ ঘটনাটা হয়তো নেপোলিয়ন আগে দেখতেও পায়নি, শোনেওনি।) কাজেই তার বিলি-ব্যবস্থার একটি নির্দেশও কার্যকর হয় নি, করা যেতও না। কিন্তু বিলি-ব্যবস্থার মধ্যেই বলা আছে "এইভাবে যুদ্ধ শুরু হবার পরে শত্রুর গতিবিধি অনুসারে নতুন নির্দেশ দেওয়া হবে"; কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে যুদ্ধ চলাকালীন সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেপোলিয়নই করবে। কিন্তু তা করা হয় নি, করা যেতও না, কারণ গোটা যুদ্ধের সময় নেপোলিয়ন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এত দূরে ছিল যে তার পক্ষে যুদ্ধের গতিবিধি জানাও সম্ভব ছিল না, আর সেইসময়ে তার কোন নির্দেশও কার্যকর করা সম্ভব হয় নি।

অধ্যায়—২৮

অনেক ইতিহাসকার বলে থাকে, নেপোলিয়নের সর্দি লেগেছিল বলেই ফরাসীরা বরদিনোর যুদ্ধ জিততে পারে নি ; যদি তার সর্দিটা না হত তাহলে যুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধ চলাকালে যেসব হুকুম সে জারি করেছিল তাতে তার প্রতিভার স্পর্শ আরও বেশী করে লাগত, রাশিয়া হেরে যেত, আর পৃথিবীর মুখটাই বদলে যেত। যেসব ইতিহাসকাররা বিশ্বাস করে যে রাশিয়া গড়ে উঠেছিল একটিমাত্র লোকের—মহান পিতরের—ইচ্ছাশক্তিতে, এবং একটি মানুষের-নেপোলিয়নের-ইচ্ছাশক্তিতেই ফ্রান্স প্রজাতন্ত্র থেকে সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং ফরাসীবাহিনী রাশিয়াতে গিয়েছিল, যারা বলে যে ২৪শে অগস্ট নেপোলিয়নের নিদারুণ সর্দি লেগেছিল বলেই রাশিয়া স্বীয় শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাদের কথা যুক্তিসম্মত ও বিশ্বাসযোগ্য মনে হতে পারে বটে।

বরদিনোর যুদ্ধ করা না করা যদি নেপোলিয়নের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকে, যদি এটা-ওটা ব্যবস্থাও তার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে থাকে, তাহলে তো স্পষ্টতই তার ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণকারী একটা সর্দিই রাশিয়াকে রক্ষা করেছিল, এবং তদনুসারে যে খানসামাটি ২৪শে তারিখে নেপোলিয়নের ওয়াটারপ্রুফ-বুট জোড়াটা তাকে এনে দিতে ভুলে গিয়েছিল সেই ছিল রাশিয়ার ত্রাণকর্তা। এই চিন্তার ধারা অনুসরণ করলে তো এধরনের সিদ্ধান্ত একেবারেই সন্দেহের অতীত ; ভল্‌তেয়ার যখন ঠাট্টা করে বলেছিল যে নবম চার্লসের পেটের গোলমালের জন্যই সেণ্ট বার্থোলোমিউ-র হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল তখন তার সেই সিদ্ধান্তও ছিল অনুরূপভাবেই সন্দেহের অতীত। কিন্তু একথা যারা স্বীকার করে না যে একটি লোকের—প্রথম পিতরের—ইচ্ছায় গড়ে উঠেছিল রাশিয়া, অথবা একটি লোকের—নেপোলিয়নের—ইচ্ছায় গড়ে উঠেছিল ফরাসী সাম্রাজ্য এবং শুরু হয়েছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ, তাদের কাছে এই যুক্তি অসত্য ও বুদ্ধিবিরোধী তো বটেই, উপরন্তু সর্বপ্রকার মানবিক বাস্তবতার বিরোধী। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী কিসে ঘটে সে প্রশ্নের আর একটা জবাব হল : মানবিক ঘটনাবলীর গতি নির্ধারিত হয় উপর থেকে—তা নির্ভর করে সেই ঘটনায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষের সম্মিলিত ইচ্ছার উপরে ; এইসব ঘটনার উপর একজন নেপোলিয়নের প্রভাব সম্পূর্ণ বাহ্যিক ও অলীক।

প্রথম দৃষ্টিতে যদিও এটা খুবই বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে নবম চার্লসের ইচ্ছানুসারে সেণ্ট বার্থোলোমিউ-র হত্যাকাণ্ডটি ঘটে নি, যদিও সে ঘটনার হুকুমটা সেই দিয়েছিল এবং সে ভেবেছিল যে সেই হুকুমমতই হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে ; আবার এটাও খুব বিস্ময়কর মনে হতে পারে যে নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারে বরদিনোতে আশি হাজার মানুষ খুন হয় নি, যদিও যুদ্ধ শুরু

ও পরিচালনার হুকুমটা সেই দিয়েছিল এবং ভেবেছিল যে তার হুকুমমতই কাজটা করা হয়েছে ; এইসব ধারণা যত বিস্ময়করই মনে হোক, তথাপি যে মানবিক মর্যাদাবোধ আমাকে শিখিয়েছে যে আমরা কেউই মানুষ হিসাবে মহান নেপোলিয়ন অপেক্ষা বড় না হলেও ছোট নই সেই মানবিক মর্যাদাবোধই দাবী করছে যে সমস্যাটার এই সমাধানই গ্রহণযোগ্য, আর ঐতিহাসিক গবেষণাও সেটাকেই যথাযথভাবে প্রমাণ করেছে।

বরদিনোর যুদ্ধে নেপোলিয়ন কাউকে লক্ষ্য করে একটা গুলিও ছোঁড়ে নি, একটা মানুষকেও মারে নি। সেকাজ সবটাই করেছে সৈন্যরা। কাজেই সে তো মানুষ মারে নি।

ফরাসী সৈন্যরা যে বরদিনোর যুদ্ধে গিয়েছিল মারতে এবং মরতে সেটা নেপোলিয়নের হুকুমে নয়, নিজেদের ইচ্ছায়। গোটা বাহিনী—ফরাসী, ইতালীয়, পোলিশ ও ওলন্দাজ—সকলেই তখন ক্ষুধার্ত, ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, অভিযানে ক্লান্ত ; তারা যখন দেখল যে আর একটা বাহিনী মস্কোর পথ অবরোধ করেছে তখন তাদের মনে হল যে সামনে মদ রয়েছে আর সেটা পান করতেই হবে। তখন যদি নেপোলিয়ন তাদের রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে নিষেধ করত, তাহলে তারা তাকেই হত্যা করে রুশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এগিয়ে যেত, কারণ সেটা ছিল অনিবার্য।

যুদ্ধে পঙ্গুত্ব ও মৃত্যুর ক্ষতিপূরণস্বরূপ তারা পাবে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশংসা-বাণী—নেপোলিয়নের এই ঘোষণা শুনে তারা চীৎকার করে উঠেছিল "ভিভে ল' এম্পেরিয়র!" যে বালকটি খেলনা লাঠি দিয়ে ভূ-গোলককে বিদ্ধ করছে তার ছবি দেখেও তারা একইভাবে চীৎকার করেছিল "ভি ভে, ল' এম্পেরিয়র!" আর তখন তাদের যেকোন অর্থহীন কথা শোনালেই তারা চীৎকার করে বলত, ভিভে ল' এম্পেরিয়র!" "ভিভে ল' এম্পেরিয়র" বলে চীৎকার করতে করতে খাদ্য ও আশ্রয় পাবার আশায় বিজয়ীর বেশে মস্কো প্রবেশের জন্য যুদ্ধ করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোন পথ খোলা ছিল না। কাজেই তারা যে তাদেরই সমগোত্রীয় ভাইদের হত্যা করেছিল তার কারণ নেপোলিয়নের হুকুম নয়।

আর সে যুদ্ধের গতিও নেপোলিয়নের নির্দেশে চলে নি, কারণ তার কোন হুকুমই কার্যকর করা হয় নি, আর যুদ্ধ চলাকালে সে জানতও না তার সামনে কি ঘটে চলেছে। কাজেই এই লোকগুলি যেভাবে একে অন্যকে মেরেছে সেটা নেপোলিয়নের ইচ্ছায় স্থির হয় নি, সেটা ঘটেছে তাকে ছাড়াই—যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সেই যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদের সকলের ইচ্ছা অনুসারে। শুধু নেপোলিয়নের মনে হয়েছিল যে সবই তার ইচ্ছামত ঘটেছে। কাজেই তার সর্দি হয়েছিল কি হয় নি সে প্রশ্নটার কোন ঐতিহাসিক গুরুত্বই নেই।

অনেক লেখক একথাও বলে থাকেন যে সর্দি লাগার জন্যই তার এ যুদ্ধের

বিলি-ব্যবস্থাগুলি আগেকার যুদ্ধের মত সুপরিকল্পিত হতে পারে নি। এ কথাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। উপরে যে বন্দোবস্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা তো আগেকার এমন অনেক যুদ্ধের বন্দোবস্ত অপেক্ষা অনেক ভাল, যেখানে নেপোলিয়ন জয়লাভ করেছিল। যুদ্ধকালে যেসব হুকুম সে প্রচার করেছে সেগুলো তো আগের সব যুদ্ধের হুকুমের চাইতে খারাপ কিছু নয়, একই রকমের। আসলে এইসব হুকুম ও বন্দোবস্ত যে আগেকার চাইতে খারাপ মনে হয়েছে তার কারণ বরদিনোর যুদ্ধই প্রথম যুদ্ধ যেটা নেপোলিয়ন জিততে পারে নি। যে যুদ্ধে পরাজয় ঘটে সে যুদ্ধের অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ও চমৎকার বন্দোবস্ত ও হুকুমগুলিও খারাপ বলে মনে হয়, এবং প্রত্যেক সমরবিশেষজ্ঞ পণ্ডিতই গম্ভীরভাবে সেগুলির সমালোচনা করে থাকে; আবার যে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে সে যুদ্ধের অত্যন্ত বাজে বন্দোবস্ত ও হুকুমও খুব ভাল মনে হয়, এবং সেসবের গুণকীর্তন করে পণ্ডিতরা মোটা মোটা বই লিখে ফেলে।

অস্তারলিজ যুদ্ধের বিলি-ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা ওয়েরদার রচনা করেছিল সেটা ছিল পূর্ণতার আদর্শস্বরূপ, কিন্তু তবু তার সমালোচনা করা হয়েছিল—তার পূর্ণতা এবং অত্যধিক পুঙ্খানুপুঙ্খতার জন্যই সমালোচনা করা হয়েছিল।

অন্যসব যুদ্ধের মতই, এমন কি তার চাইতে ভালভাবেই, নেপোলিয়ন বরদিনোর যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল। যুদ্ধের অগ্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর কিছুই সে করে নি; যুক্তিসঙ্গত মতামতের দিকেই ঝুঁকেছে, কোনরকম গোলমাল সৃষ্টি করে নি, স্ববিরোধী কোন কাজ করে নি, ভয় পায় নি, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায় নি; বরং তার নিজস্ব নিপুণ কুশলতা ও সামরিক অভিজ্ঞতায় শান্ত মর্যাদার সঙ্গে সেনাপতির কাজ পরিচালনা করেছে।

অধ্যায়—২৯

দ্বিতীয়বার সেনাদল পরিদর্শন করে ফিরে এসে নেপোলিয়ন মন্তব্য করল:
"দাবার ঘুঁটি সাজানো হয়েছে, কাল খেলা শুরু হবে।"

পঞ্চ-পানীয় পাঠাবার নির্দেশ দিয়ে দ্য বুসেকে ডেকে এনে সে প্যারিসের ব্যাপারে এবং সম্রাজ্ঞীর গৃহস্থালিতে কিছু পরিবর্তনের ব্যাপারে তার সঙ্গে কথা বলল। দরবার সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তির বহর দেখে প্রিফেক্টটি অবাক হয়ে গেল।

পঞ্চ-পানীয়ের দ্বিতীয় গ্লাসটি শেষ করে পরের দিনের গুরুতর কাজের আগে সে বিশ্রাম নিতে চলে গেল। সে কাজে অতিআগ্রহের ফলে সে ঘুমোতে পারল না; সন্ধ্যার ভিজে আবহাওয়ায় সর্দিটা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও সজোরে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে তিনটের সময় শিবিরের বড় অংশটায় গেল। রুশরা সরে গেছে কিনা প্রশ্ন করায় তাকে বলা হল, শত্রুপক্ষের আগুন একই

জায়গায় আছে।

কর্তব্যরত অ্যাডজুটাণ্ট শিবিরে ঢুকল।

নেপোলিয়ন শুধাল, "আচ্ছা রাপ্, তুমি কি মনে কর আজ আমাদের কাজকর্ম বেশ ভালই চলবে?"

"সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই স্যার," রাপ্ জবাব দিল।

নেপোলিয়ন তার দিকে তাকাল।

রাপ্ আবার বলল "স্মোলেন্স্ক্-এ আপনি দয়া করে আমাকে কি বলেছিলেন তা কি আপনার মনে আছে স্যার? "মদ তৈরি, পান করতেই হবে।"

নেপোলিয়ন ভুরু কুঁচকাল; হাতের উপর মাথা রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

হঠাৎ বলে' উঠল, "বেচারা সৈন্যরা! স্মোলেন্স্ক্-এর পরে তাদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। সত্যি, ভাগ্য এক বারাঙ্গনা রাপ্। কথাটা আমি আগাগোড়াই বলে এসেছি, এখন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারছি। কিন্তু রাপ্, রক্ষীবাহিনী তো অটুট আছে?"

"হ্যাঁ স্যার," রাপ্ উত্তর দিল।

নেপোলিয়ন একটা লজেন্স নিয়ে মুখে পুরল, তারপর ঘড়ি দেখল। চোখে ঘুম নেই; এখনও সকাল হয় নি। সময় কাটাবার জন্য এখন আর নতুন করে কোন হুকুম জারি করা অসম্ভব, কারণ সব হুকুমই দেওয়া হয়ে গেছে, এখন সেগুলি তামিল করার পালা।

নেপোলিয়ন রুক্ষ গলায় শুধাল, "রক্ষী রেজিমেণ্টদের কি বিস্কুট ও চাল দেওয়া হয়েছে?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"চালও?"

রাপ্ উত্তরে জানাল যে চাল সম্পর্কে সম্রাটের আদেশ সে জারি করেছে। কিন্তু তার সে হুকুম যে তামিল করা হয়েছে সেটা বিশ্বাস না করে নেপোলিয়ন মাথা নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল। পঞ্চ-পানীয় নিয়ে একজন অনুচর ঢুকল। রাপের জন্য আর এক গ্লাস আনতে বলে নিঃশব্দে নিজের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

গ্লাসটা শুঁকে বলল, "স্বাদ-গন্ধ কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। এ সর্দি বড়ই ক্লান্তিকর। লোকে ওষুধের কথা বলে—ওষুধে যখন সর্দিই সারে না তখন ওষুধ দিয়ে কি হবে! কর্ভিসার্ট (নেপোলিয়নের বিখ্যাত চিকিৎসক) এই লজেন্সগুলো দিয়েছে, কিন্তু এতেও কোন কাজ হচ্ছে না। ডাক্তাররা রোগ কি সারাবে? কেউ কিছু সারাতে পারে না। আমাদের দেহটাই বাঁচবার যন্ত্র। সেইভাবেই এটাকে গড়া হয়েছে, এর স্বভাবেই আছে বেঁচে থাকার

যন্ত্র। জীবনকে অব্যাহতগতিতে চলতে দাও, সে নিজেই নিজেকে রক্ষা করুক, ওষুধ দিয়ে দেহটাকে পঙ্গু করার চাইতে তাতে অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে। একটা ভাল ঘড়ির মতই আমাদের শরীর একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঠিকভাবে চলে; ঘড়িওয়ালা সেটাকে খুলতে পারে না, কাঁপা হাতে অন্ধের মত কিছুটা ঠিকঠাক করতে পারে মাত্র···হ্যা, আমাদের শরীর বাঁচবার যন্ত্রস্বরূপ; সেটাই শেষ কথা।"

কোন কিছুর সংজ্ঞা দেওয়াটা নেপোলিয়নের প্রিয় কাজ; অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ সে একটা নতুন সংজ্ঞা দিল।

"তুমি কি জান রাপ্, সমর-কলা কাকে বলে? কোন একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে শত্রুপক্ষ অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হওয়াই সমর-কলা। আর কিছু নয়।"

রাপ্ জবাব দিল না।

নেপোলিয়ন বলল, "কাল আমাদের লড়তে হবে কুতুজভের সঙ্গে। দেখা যাক! তোমার কি মনে আছে, ব্রাউনাউতে তিনি তিন সপ্তাহ ধরে সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন কিন্তু পরিখাগুলি পরিদর্শন করতে একটিবারও ঘোড়ায় চাপেন নি···দেখাই যাক!"

আবার ঘড়ি দেখল। সবে চারটে বাজে। ঘুম পাচ্ছে না। পঞ্চ-পানীয় ফুরিয়ে গেছে। করারও কিছু নেই। উঠল, এদিক ও-দিক হাঁটল, গরম ওভারকোট ও টুপিটা নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গেল। রাতটা অন্ধকার, স্যাঁতসেতে, প্রায় অলক্ষ্য একটা ভিজে বাতাস উপর থেকে নেমে আসছে। কাছেই ফরাসী রক্ষীদলের শিবির-আগুন ধিকি-ধিকি জ্বলছে; দূরে রুশদের শিবির-আগুন ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। আবহাওয়া শান্ত; যার যার ঘাঁটি নিতে অগ্রসরমান ফরাসীসৈন্যদের পোশাকের খস্‌খস্ ও পায়ের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শিবিরের সামনে হাঁটতে হাঁটতে নেপোলিয়ন আগুনের দিকে তাকাল, কান পেতে সব শব্দ শুনতে লাগল। লোমশ টুপি-পরা যে লম্বা শাস্ত্রীটি শিবিরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল সম্রাটকে দেখে সে একটা কালো স্তম্ভের মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেপোলিয়ন তার সামনেই থামল।

শুধাল, "তুমি কোন্ বছর চাকরিতে ঢুকেছ?"

লোকটি জবাব দিল।

"ওহো! তুমি তা হলে পুরনো লোকদের একজন! তোমার রেজিমেন্ট চাল পেয়েছে কি?"

"পেয়েছে ইয়োর ম্যাজেস্টি।"

নেপোলিয়ন মাথা নেড়ে এগিয়ে গেল।

সাড়ে পাঁচটায় নেপোলিয়ন ঘোড়ায় চেপে শেভার্দিনো গ্রামে গেল।

আলো ফুটেছে। আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। শুধু পুবের আকাশে একখণ্ড মেঘ দেখা যাচ্ছে। সকালের ম্লান আলোয় পরিত্যক্ত শিবির-আগুনগুলো নিভে আসছে।

ডানদিকে কামানের একটিমাত্র গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মিলিয়ে গেল। কয়েক মিনিট কেটে গেল। কামানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় গর্জনে বাতাস কেঁপে উঠল; তারপরেই ডানদিকে কাছেই গর্জে উঠল চতুর্থ ও পঞ্চমবার।

প্রথম গর্জনের প্রতিধ্বনি থামবার আগেই আরও অনেক কামান গর্জে উঠল; নানা গর্জনের শব্দে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

সদলবলে শেভার্দিনো দুর্গে পৌঁছে নেপোলিয়ন ঘোড়া থেকে নামল। খেলা শুরু হয়ে গেছে।

অধ্যায়—৩০

প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে দেখা করে গোর্কিতে ফিরে এসে পিয়ের সহিসকে হুকুম করল ঘোড়া তৈরি রাখতে এবং খুব সকালে তাকে ডেকে দিতে। তারপর বেড়ার পিছনে যে কোণটা বরিস তাকে ছেড়ে দিয়েছে সেখানে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ভালভাবে ঘুম ভাঙবার আগেই অন্য সকলে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ছোট ছোট জানালার কাঁচের পাল্লায় খট্ খট্ শব্দ হচ্ছে, আর সহিস তাকে ঝাঁকুনি দিচ্ছে।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি!" পিয়েরের ঘুম ভাঙবার সব আশা ছেড়ে দিয়ে তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সহিসটি নাছোড়বান্দার মত তাকে ডাকছে।

জেগে উঠে পিয়ের শুধাল, "কি হল? শুরু হয়ে গেছে? সময় হয়ে গেল?"

বরখাস্ত-সৈনিক সহিসটি বলল, "কামানের গর্জন শুনতে পাচ্ছেন না। ভদ্রলোকরা সকলেই বেরিয়ে গেছেন; প্রশান্ত মহামহিম তো অনেকক্ষণ আগেই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন।"

তাড়াতাড়ি পোশাক পরে পিয়ের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে সবকিছুই উজ্জ্বল, তাজা, শিশিরসিক্ত, আনন্দময়। মেঘের আড়াল থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা সূর্যের কিরণরাশি ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপারের ছাদের উপর, পথের শিশির-ভেজা ধুলোর উপর, বাড়ির প্রাচীরে, জানালায়, বেড়ায়, এবং সামনে দাঁড়ানো পিয়েরের ঘোড়াগুলোর উপরে। বাইরে কামানের গর্জন আরও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে

জনৈক অ্যাডজুটান্ট জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

অ্যাডজুটাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "সময় হয়ে গেছে কাউণ্ট; সময় হয়ে গেছে!"

সহিসকে ঘোড়া নিয়ে পিছনে আসতে বলে পিয়ের পথে নেমে সেই গোল পাহাড়ে গেল যেখান থেকে সে আগেরদিন যুদ্ধক্ষেত্রটাকে দেখেছিল। সেখানে একদল সামরিক লোক জড় হয়েছে, কর্মচারিরা ফরাসীতে বলছে, লাল ফিতে লাগানো সাদা টুপি-পরা কুতুজভের সাদা মাথাটা দেখা যাচ্ছে, তার গলার নীচটা কাঁধের মধ্যে ডুবে গেছে। একটা ছোট দূরবীনের ভিতর দিয়ে সে বড় রাস্তাটার উপর দৃষ্টি রেখেছে।

সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের উপরে উঠে সামনের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে তার সৌন্দর্যে পিয়ের মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। গোটা অঞ্চল সৈন্যে ঠাসা, কামানের ধোঁয়ার মেঘে আচ্ছন্ন, উজ্জ্বল সূর্যের তির্যক কিরণরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দৃশ্যাবলীর একেবারে শেষপ্রান্তে অবস্থিত অরণ্যকে মনে হচ্ছে হলুদ-সবুজ মূল্যবান পাথরে খোদাই-করা ছবি; তার আন্দোলিত রেখাটিকে মনে হচ্ছে দিগন্তের প্রেক্ষাপটে একখানি সিলুয়েট; সৈন্যপরিবৃত স্মোলেন্স্ক্ বড় রাস্তাটা ভালুভোর ওপাশে তাকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। সম্মুখে, বাঁয়ে, ডাইনে, সর্বত্রই শুধু সৈন্য আর সৈন্য। এসব কিছুই স্পষ্ট, মহনীয়, অপ্রত্যাশিত; কিন্তু পিয়েরের মনকে সবচাইতে বেশী করে আকর্ষণ করল রণক্ষেত্র, বরদিনো, এবং কলোচার দুই তীরবর্তী খাঁড়ির দৃশ্যগুলি।

"পুফ্! —হঠাৎ একটা ঘন গোলাকার ধোঁয়ার মেঘ বেগুনি থেকে ধূসর ও দুধ-সাদা হয়ে দেখা দিল, আর এক সেকেণ্ড পরেই "বুম!" করে একটা গর্জন শোনা গেল।

"পুফ্ পুফ্!" দুটো অনুরূপ মেঘ এসে পরস্পরকে ঠেলা মারল, আর চোখে যা দেখা গেল কানে তারই গর্জন শোনা গেল "বুম্! বুম্!"

পিয়ের প্রথম মেঘটার দিকে তাকাল; একটা ঘন গোল বল যেন; পরমুহূর্তেই তার জায়গায় দেখা দিল ভাসমান ধোঁয়ার বেলুন আর "পুফ্! পুফ্! পুফ্"—প্রথমে তিনটে ও তারপরে চারটে দেখা দিল এবং তাদের প্রত্যেকটা থেকে একই সময়ের ব্যবধানে —"বুম্—বুম্—বুম্!" শব্দে এল তার জবাব। মনে হল, সেই ধোঁয়ার মেঘগুলো কখনও ছুটছে, কখনও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর মাঠ-ঘাট-জঙ্গল আর ঝক্‌ঝকে বেয়নেটগুলো তাদের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। বাঁদিকে মাঠ ও ঝোপের ভিতর থেকেও ধোঁয়ার বড় বড় বলগুলি অনবরত ছুটে আসছে, আর তাদের পিছন পিছন আসছে গম্ভীর গর্জন; এদিকে আরও কাছে, খাঁড়ি ও জঙ্গল থেকে আসছে গাদা বন্দুকের ছোট ছোট মেঘ; সেগুলি বলের আকার ধরছে না, কিন্তু ছোট ছোট ধ্বনি-প্রতিধ্বনি ঠিকই হচ্ছে। "ট্রাক্-টা-টা-টাট্!" গাদা বন্দুকের অনিয়মিত শব্দ প্রায়ই আসছে, কিন্তু কামান-গর্জনের তুলনায় সেগুলি খুবই দুর্বল।

সেই ধোঁয়া, সেই ঝকৃঝকে বেয়নেট, সেই চলাফেরার মধ্যে থাকতে পিয়েরের ভাল লাগছে। নিজের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে নেবার জন্ম সে কুতুজভ ও তার দলবলের দিকে তাকাল। তারাও তার মতই যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকিয়ে আছে; মনে হল, তাদের মনোভাবও তারই অনুরূপ।

"যাও বন্ধু, এগিয়ে যাও" খৃস্ট তোমার সহায় হোন!" যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চোখ না সরিয়েই কুতুজভ পাশে দাঁড়ানো একজন জেনারেলকে কথাগুলি বলল।

হুকুম শুনে জেনারেলটি পিয়েরের পাশ দিয়ে গোল পাহাড় থেকে নেমে গেল।

সে কোথায় চলেছে এই প্রশ্নের জবাবে জেনারেল কঠিন, ঠাণ্ডা গলায় বলল, "মোহনার দিকে!"

"আমিও সেখানেই যাব," এই কথা ভেবে পিয়ের তার পিছু নিল।

কসাক একটা ঘোড়া এনে দিলে জেনারেল তাতে সওয়ার হল। পিয়ের সহিসের দিকে এগিয়ে গেল; কোন্ ঘোড়াটা সবচাইতে শান্ত জেনে নিয়ে সেটাতে সওয়ার হল, তার ঘাড়ের লোম চেপে ধরে গোড়ালি দুটো ছড়িয়ে ঘোড়ার পেটে চাপ দিতেই সে ছুটতে শুরু করল। পিয়েরের মনে হল তার চশমা বুঝি খুলে পড়বে; কিন্তু তখন আর ঘোড়ার লোম ও হাতের রাশ কোনটাই ছাড়া সম্ভব নয়; জেনারেলের পিছনে সেও জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। গোল পাহাড়ের উপর থেকে অফিসাররা তাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

অধ্যায়—৩১

যে জেনারেলটিকে পিয়ের অনুসরণ করছিল পাহাড় থেকে নেমে সে হঠাৎ বাঁদিকে ঘুরে গেল; পিয়ের তাকে আর দেখতে পেল না; অগত্যা সে ঘোড়া ছুটিয়ে কিছু পদাতিক সৈন্যের মধ্যে গিয়ে পড়ল। সে চেষ্টা করল তাদের আগে অথবা বাঁয়ে বা ডাইনে দিয়ে চলে যাবে, কিন্তু সব জায়গায়ই সৈন্য আর সৈন্য, আর সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। সকলেই সেই একই অসন্তুষ্ট, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাদা টুপি মাথায় এই শক্ত-সমর্থ মানুষটির দিকে তাকাচ্ছে; সকলেই যেন ভয় পাচ্ছে যে এই লোকটি তার ঘোড়ার ক্ষুরের নীচে তাদের মাড়িয়ে চলে যাবে।

একজন চীৎকার করে বলল, "ব্যাটেলিয়নের মাঝখান দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিয়েছেন কেন?"

আর একজন তো বন্দুকের কুঁদো দিয়ে তার ঘোড়াকে একটা খোঁচাই দিয়ে বসল; পিয়ের ঘোড়ার পিঠে ঝুঁকে পড়ে সামান্য একটু জায়গা পেয়ে সেই ফাঁক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল।

সামনেই একটা সেতু; সৈন্যরা সেখান থেকে গুলি চালাচ্ছে। পিয়ের তাদের দিকে এগিয়ে গেল। না জেনেই সে গোর্কি ও বরদিনোর মধ্যবর্তী জায়গায় কলোচা নদীর সেতুর কাছে এসে পড়েছে; বরদিনো দখল করার পরে যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ফরাসীরা এই সেতুটার উপরেই আক্রমণ চালিয়েছে। পিয়ের দেখল তার সামনেই একটা সেতু, সেতুর দুই পারে এবং মাঠের মধ্যে সৈন্যরা কি যেন করছে; অনবরত গোলাগুলি চলা সত্ত্বেও সে বুঝতেই পারে নি যে এটাই রণক্ষেত্র। হিস্-হিস্ শব্দে অনবরত গুলি ছুটছে, বাঁকা হয়ে গোলা ছুটছে মাথার উপর দিয়ে, কিন্তু তার খেয়ালই নেই; নদীর অপর পারে শত্রুদেরও সে দেখতে পায় নি; আশেপাশে অনেক সৈন্য মাটিতে পড়লেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নিহত ও আহতদেরও লক্ষ্য করে নি। তার মুখের হাসিটি তখনও লেগেই আছে।

"এই লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কেন?" তাকে দেখে কে একজন চেঁচিয়ে বলল।

সৈন্যরা তাকে বলল, "বাঁদিকে যান! ···ডাইনে যান!"

পিয়ের ডানদিকে এগিয়ে গেল, আর অপ্রত্যাশিতভাবে রায়েভ্স্কির একজন পরিচিত অ্যাড্জুটান্টের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। অ্যাড্জুটাণ্ট ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল, চীৎকার করে কিছু বলতেই যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে চিনতে পেরে মাথাটা নাড়ল।

"আপনি এখানে কেমন করে এলেন?" বলেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

পিয়ের বুঝল এটা তার জায়গা নয়, এখানে তার কিছু করারও নেই, আর পাছে আবার কারও পথ আগলে দেয় এই ভয়ে অ্যাডজুটান্টের পিছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

"ওখানে কি হচ্ছে? আমি কি আপনার সঙ্গে যেতে পারি?" সে শুধাল।

"এক মুহূর্ত, এক মুহূর্ত!" বলে অ্যাডজুটাণ্ট মাঠের ভিতর দাঁড়ানো জনৈক কর্ণেলের কাছে গিয়ে তার হাতে কিছু সংবাদ দিয়ে ফিরে এসে পিয়েরকে বলল, "আপনি এখানে কেন এসেছেন কাউণ্ট? এখনও তেমনি কৌতূহলীই আছেন?"

"তা ঠিক," পিয়ের স্বীকার করল।

অ্যাডজুটাণ্ট ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে চলল।

"এখানটা তো তবু চলনসই, কিন্তু বাম ব্যূহে ব্যাগ্রেশনের দিকে তারা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।"

"সত্যি?" পিয়ের বলল। "সেটা কোথায়?"

"আমার সঙ্গে পাহাড়ের উপরে চলুন। সেখান থেকেই সব দেখতে পাব, আর আমাদের কামানশ্রেণীতে অবস্থা এখনও সহ্যের মধ্যেই আছে। যাবেন কি?"

"হ্যাঁ, যাব," বলে সহিসের খোঁজে সে চারদিকে তাকাল।

এতক্ষণে তার নজরে পড়ল আহত সৈন্যরা হয় টলতে টলতে চলেছে, নয় তো তাদের স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কাল যে মাঠের উপর দিয়ে সে ঘোড়া চালিয়ে এসেছে সেখানেও একটি সৈন্য বিসদৃশভাবে চিৎ হয়ে পড়ে আছে।

"ওকে সরিয়ে নিয়ে যায় নি কেন ?" পিয়েরের প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু অ্যাডজুটান্টের মুখের কঠিনভাব দেখে নিজেকে সংযত করল।

সহিসের দেখা না পেয়ে পিয়ের অ্যাডজুটান্টের সঙ্গে খাঁড়ির ভিতর দিয়ে রায়েভস্কি দুর্গের দিকে এগিয়ে চলল। তার ঘোড়াটা অনেক পিছিয়ে পড়েছে। সেও ঘোড়ার পিঠে বার বার ঠোক্কর খাচ্ছে।

"মনে হচ্ছে আপনার ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস নেই কাউন্ট ?" অ্যাডজুটান্ট বলল।

পিয়ের বিচলিত গলায় বলল, "ঠিক তা নয়, তবে ঘোড়াটা বড়ই হোঁচট খাচ্ছে।"

"আরে⋯ঘোড়াটা তো আঘাত পেয়েছে!" অ্যাডজুটান্ট বলল। "সামনের পায়ের হাঁটুর উপরে। একটা বুলেট যে তাতে সন্দেহ নেই। গুলির প্রথম অভিষেকের জন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই কাউন্ট!"

গোলাগুলির শব্দে কানে তালা লাগবার যোগাড়। তারই ভিতর দিয়ে ষষ্ঠ কোরের ধোঁয়া পেরিয়ে তারা একটা ছোট জঙ্গলে পৌঁছে গেল। সে জায়গাটা শান্ত, ঠাণ্ডা, হেমন্তের আমেজে ভরা। পিয়ের ও অ্যাডজুটান্ট ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

উপরে উঠে অ্যাডজুটান্ট শুধাল, "জেনারেল কি এখানে আছেন ?"

ডানদিকটা দেখিয়ে একজন উত্তর দিল, "একমিনিট আগেও তিনি এখানেই ছিলেন, এইমাত্র ওদিকে গেলেন।"

অ্যাডজুটান্ট এমনভাবে পিয়েরের দিকে তাকাল যেন তাকে নিয়ে কি করা যায় সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

পিয়ের বলল, "আমার জন্য চিন্তা করবেন না। পারলে আমি নিজেই গোল পাহাড়ে উঠে যাব কি ?"

"হ্যাঁ, তাই যান। সেখানে থেকে সবকিছুই দেখতে পাবেন, আর সেখানে বিপদও কম। পরে আপনাকে নিতে আসব।"

পিয়ের কামানশ্রেণীর দিকে চলে গেল, আর অ্যাডজুটান্ট ঘোড়া ছেড়ে দিল। তাদের আর দেখা হয় নি; তবে অনেক পরে পিয়ের জানতে পেরেছে যে সেইদিনই তার একটা হাত কাটা গেছে।

যে গোল পাহাড়ে পিয়ের উঠে গেল সেটাই সেই বিখ্যাত পাহাড় যেটাকে পরবর্তীকালে রুশরা বলত "গোল পাহাড় কামানশ্রেণী" অথবা

"রায়েভ্স্কি দুর্গ," আর ফরাসীরা বলত **la grande redoute, la fatale redoute, la redoute du centre**; তাকে ঘিরেই হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে, আর ফরাসীরা তাকেই মনে করে সমস্ত ঘাঁটির চাবিকাঠিস্বরূপ।

এই শিবিরের তিনদিকে পরিখা কাটা হয়েছিল। সেই পরিখার ভিতরে ছিল দশটা কামান, আর মাটির দেয়ালের ভিতরকার ফাঁক দিয়ে সেই কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল।

গোল পাহাড়ের একই সারিতে দুই দিকে সাজানো অন্য সব কামান থেকেও অনবরত গোলাবর্ষণ করা হচ্ছিল। কামানের পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল পদাতিক বাহিনী। গোলপাহাড় বেয়ে উঠবার সময় পিয়ের ভাবতেই পারে নি যে কয়েকটা পরিখা কেটে যেখান থেকে মাত্র কয়েকটা কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে সেটাই এই যুদ্ধের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

বরং যেহেতু সে নিজে সেখানে উপস্থিত হতে পেরেছে ঠিক সেই কারণেই সেই স্থানটিকে তার মনে হয়েছে সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ।

পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে পিয়ের পরিখার এক প্রান্তে বসে চারদিক দেখতে লাগল; অকারণেই একটা খুশির হাসি ফুটল তার মুখে। কামান থেকে একটার পর একটা গোলাবর্ষণ অনবরত চলেছে; কানে তালা লেগে যাচ্ছে; বারুদের ধোঁয়ায় চারদিক ঢেকে যাচ্ছে।

সাহায্যকারী পদাতিক বাহিনীর মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হলেও একটা পরিখার দ্বারা তাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে কয়জন সৈনিক কামান দাগতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত তাদের মনে কাজ করছে একটা পারিবারিক প্রীতির উদ্দীপনা।

পিয়েরের সাদা টুপিওয়ালা অসামরিক মূর্তির উপস্থিতিকে প্রথমে তারা ভাল চোখে দেখল না। তার পাশ দিয়ে আসতে-যেতে সৈনিকরা কিছুটা বিস্ময়ে, কিছুটা সভয়ে তার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। একজন প্রবীণ গোলন্দাজ অফিসার একেবারে শেষপ্রান্তের কামানটির কাজকর্ম দেখবার জন্য পিয়েরের দিকে এগিয়ে এল। তাঁর একটা পা নেই, মুখময় দাগভর্তি। সে কৌতূহলের সঙ্গে পিয়েরের দিকে তাকাল।

একটি গোল-মুখ তরুণ অফিসার সবে ক্যাডেট কলেজ থেকে বেরিয়েছে; এখনও একেবারেই ছেলেমানুষ; দুটি কামান চালাবার ভার পেয়ে সে খুবই গর্বিত।

রুক্ষ স্বরে সে পিয়েরকে বলল, "স্যার, দয়া করে একটু সরে দাঁড়ান। এখানে আপনার থাকা উচিত নয়।"

সৈন্যরাও পিয়েরের দিকে তাকিয়ে আপত্তিসূচকভাবে ঘাড় নাড়তে লাগল। কিন্তু যখন তারা বুঝতে পারল যে সাদাটুপিওয়ালা এই লোকটি

তাদের কোন ক্ষতি করছে না, সলজ্জ হাসিমুখে পরিখার পাশে চুপচাপ বসে আছে, বিনীতভাবে সৈন্যদের পথ ছেড়ে দিচ্ছে, যেন কোন বুলভার্দে হাঁটছে এমনই শান্তভাবে গর্জনমুখর কামানের নীচ দিয়ে হাঁটছে, তখন তাদের সেই বিরূপ মনোভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে তার পরিবর্তে দেখা দিল একধরনের করুণাপরবশ সহানুভূতি যা সৈন্যরা সাধারণতই পোষণ করে তাদের কুকুর, মোরগ, ছাগল ও অন্য সব প্রাণীর প্রতি যারা রেজিমেণ্টের সঙ্গেই চলাফেরা করে। সৈন্যরা ক্রমে পিয়েরকে তাদের পরিবারের একজন বলেই মেনে নিল, তাকে একটা ডাক নাম ("আমাদের ভদ্রলোক") দিল, এবং তাকে নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাসাও করতে লাগল।

পিয়েরের হাত দুই দূরে একটা গোলা ফাটল ; তার ফলে তার পোশাকে যে ধুলো-মাটি লাগল সেটা ঝাড়তে ঝাড়তে সে চারদিকে তাকাল।

লালমুখ, চওড়া-কাঁধ একটি সৈনিক পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, "সে কি স্যার, এতেও আপনি ভয় পেলেন না ?" সৈনিকটি একটু হাসল ; দুই পাটি সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।

"তাহলে কি আপনি ভয় পেয়েছেন ?" পিয়ের শুধাল।

"তাছাড়া আর কি আশা করতে পারেন ?" সৈনিকটি জবাব দিল। "জানেন তো তিনি বড়ই নিষ্ঠুরা! তিনি যখন সরবে ধেয়ে আসেন তখন আপনার সব জাড়িজুড়ি উবে যায়! ভয় না পেয়ে উপায় আছে!" সৈনিকটি হাসতে লাগল।

কয়েকটি সৈনিক পিয়েরের পাশে এসে দাঁড়াল। একজন বলল, "এটা আমাদের মত সৈনিকদের ব্যাপার। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের পক্ষে এ আচরণ খুব আশ্চর্য! একজন ভদ্রলোক বটে!"

সেই সৈনিকদের উদ্দেশ করে তরুণ অফিসারটি বলল, "প্রত্যেকে যার যার জায়গায়!"

গোটা যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে কামানের গর্জন ও বন্দুকের শব্দ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে ; বিশেষ করে যেখানে ব্যাগ্রেশনের সেনাদল অবস্থিত ; আর পিয়ের যেখানে আছে সে জায়গাটা ধোঁয়ায় এমন ঢেকে গেছে যে কোন কিছুই ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না।

দশটা নাগাদ প্রায় বিশ জনকে কামানশ্রেণীর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ; দুটো কামান ধ্বংস হয়েছে, আর কামানের গোলা আরও বেশী সংখ্যায় এসে পড়ছে, হুস্-হুস্ শব্দে চারদিকে বুলেট উড়ছে। কিন্তু কামানশ্রেণীর সৈনিকদের সেদিকে কোন খেয়ালই নেই ; চারদিকে শোনা যাচ্ছে হাসিখুশি ও ঠাট্টা-তামাসার শব্দ।

একটা গোলা শাঁ শাঁ করে এগিয়ে এলে একটি সৈনিক চেঁচিয়ে বলল, "একেবারে ডাকা!"

গোলাটা পাশ কাটিয়ে সহায়ক পদাতিকদের মধ্যে পড়ায় আর একজন বলে উঠল, "এদিকে আসে নি। পদাতিক বাহিনীর দিকে গেছে।"

একটা গোলা উপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখে একটি চাষী মাথাটা নীচু করায় তাকে ঠাট্টা করে একজন বলে উঠল, "তুমি কি বন্ধুকে অভিবাদন করছ নাকি হে?"

সামনে কি ঘটছে দেখবার জন্য কয়েকজন সৈন্য এসে পরিখার প্রাচীরের পাশে দাঁড়াল।

তারা বলল, "ওরা অগ্রবর্তী দলটাকে সরিয়ে নিয়েছে।"

বুড়ো সার্জেন্টটি চেঁচিয়ে বলল, "নিজেদের কাজে মন দাও গে। তারা যদি সরে গিয়ে থাকে তো বুঝতে হবে পিছনের দিকে তাদের অনেক কাজ রয়েছে।"

সার্জেন্ট একটি সৈনিকের ঘাড় ধরে হাঁটু দিয়ে একটা গুঁতো মারল। অন্য সকলে হো-হো করে হেসে উঠল।

একদিক থেকে চীৎকার শোনা গেল, "পাঁচ নম্বর কামানে যাও। চাকা ঘোরাও।"

"এবার সকলে একসঙ্গে, মাঝিদের মত!" যারা কামানটাকে নাড়াচ্ছিল তাদের উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

লাল-মুখ রসিক লোকটি পিয়েরকে দেখিয়ে দাঁত বের করে বলল, "আমাদের ভদ্রলোকের টুপিটা প্রায় উড়িয়ে দিয়েছিল!" গোলাটা কামানের চাকা ও একটি সৈনিকের পায়ের উপর পড়ায় সে বলে উঠল, "যতসব বাচাল মেয়ে মানুষ!"

আহতদের সরিয়ে নেবার জন্য জনকয়েক অসামরিক লোক মাথা নীচু করে কামানশ্রেণীর মধ্যে ঢুকে পড়ায় তাদের দেখিয়ে হাসতে হাসতে আর একজন বলল, "আরে, এই তো শেয়াল মশাইরা এসে পড়েছে!"

একটি সৈনিকের একটা পা উড়ে গেছে। অসামরিক লোকগুলি তার সামনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করায় আর একজন হেসে বলল, "আচ্ছা, এখানা তাহলে তোমাদের পছন্দ হচ্ছে না? আঃ, যতসব কাকের দল! তোমরা ভয় পেয়েছ!"

চাষীদের অনুকরণ করে বলল, "এই যে বাছারা……ওঃ, ওঃ! এসব ওদের মোটেই পছন্দ নয়।"

পিয়ের লক্ষ্য করল যতবার শিবিরের উপর গোলা এসে পড়ছে, যতবার কেউ হতাহত হচ্ছে, ততই যেন এদের উদ্দীপনা বেড়ে যাচ্ছে।

বজ্রগর্ভ মেঘ যত এগিয়ে আসে তার ভিতরকার আগুনের শিখা যেমন ততই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়, ঠিক তেমনি এই সব মানুষের অন্তরে লুকানো আগুনের শিখা ক্রমাগত তীব্রতর হয়ে তাদের চোখে-মুখে জ্বল্ জ্বল্ করছে।

পিয়ের এখন আর যুদ্ধক্ষেত্র দেখছে না, সেখানে কি ঘটছে তাতে তার কোন আগ্রহ নেই ; যে আগুন ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে জ্বলছে, নিজের আত্মার মধ্যে যার প্রতিফলন সে উপলব্ধি করছে, সমস্ত মন দিয়ে এখন সে তাকেই শুধু দেখছে।

যে পদাতিক সেনাদল কামানশ্রেণীর সম্মুখস্থ ঝোপের মধ্যে কামেংকা ঝর্ণার তীর বরাবর আস্তানা পেতেছিল তারা পশ্চাৎপসরণ করল। পাহাড়ের উপর থেকেই দেখা গেল আহতদের বয়ে নিয়ে তারা দৌড়ে পিছিয়ে যাচ্ছে। একজন জেনারেল সদলবলে কামানশ্রেণীর কাছে এসে কর্ণেলের সঙ্গে কিছু কথা বলে পিয়েরের দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকাল ; গোলাগুলির হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবার জন্য কামানশ্রেণীর পিছন দিককার সাহায্যকারী পদাতিক সৈন্যদের শুয়ে পড়বার হুকুম দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল। তারপরেই কামানশ্রেণীর ডান দিককার পদাতিক সেনাদলের মধ্য থেকে ঢাকের বাজনা ও হুকুমের চীৎকার শোনা গেল ; তারা সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

পিয়ের পরিখার দেয়ালের উপর দিয়ে তাকাল ; একটি বিবর্ণ তরুণ অফিসার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ; তরবারিটা ঝুলিয়ে পিছনে হাঁটতে হাঁটতে সে অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাচ্ছে।

পদাতিক সেনাদল ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, কিন্তু তাদের দীর্ঘায়ত চীৎকার ও বন্দুকের শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই আহত সৈনিক ও স্ট্রেচারবাহকরা দলে দলে সেইদিক থেকে আসতে লাগল। কামানের গোলা অর্ধচক্রাকারে ছুটে এসে আরও ঘন ঘন পড়তে লাগল। কয়েকটি সৈনিক এখানে-ওখানে পড়ে আছে ; তাদের এখনও সরানো হয় নি। কামানকে ঘিরে লোকজন দ্রুততর গতিতে ছুটাছুটি করছে। এখন আর কেউ পিয়েরকে দেখছে না। দু' একবার পথের সামনে পড়ায় তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে। ঊর্ধ্বতন অফিসারটি ভ্রূকুটিকুটিল মুখে বড় বড় পা ফেলে একটা কামান থেকে আরেকটা কামানের দিকে ছুটে যাচ্ছে। তরুণ অফিসারটি আগের মতই মুখ লাল করে হুকুম জারি করে চলেছে। সৈন্যরা কামানে বারুদ ভরছে আর সচেষ্ট ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা এমনভাবে ছোট ছোট লাফ দিচ্ছে যেন তাদের পায়ের নীচে স্প্রিং লাগানো আছে।

মাথার উপরে ঝড়ো মেঘ দেখা দিল। সকলের মুখে পিয়ের যে অগ্নিশিখা জ্বলতে দেখেছিল সেটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। তরুণ অফিসারটি টুপিতে হাত রেখে উপরওয়ালার দিকে ছুটে গেল।

"স্যার, আমি জানাতে এসেছি যে আর মাত্র আট রাউণ্ড গুলি আছে। আমরা কি গুলি চালিয়েই যাব ?" সে শুধাল।

পরিখার দেয়ালের উপর দিয়ে তাকিয়ে ঊর্ধ্বতন অফিসারটি চীৎকার

করে বলল, "ছর্রা গুলি!"

হঠাৎ কি যেন ঘটল; তরুণ অফিসারটি একবার ঢোক গিলেই ডানায় গুলি-খাওয়া পাখির মত উপুড় হয়ে বসে পড়ল। পিয়েরের চোখে সবকিছুই কেমন যেন বিস্ময়কর, গোলমেলে ও কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

একটার পর একটা কামানের গোলা হিস্-হিস্ শব্দে ছুটে আসছে, আর মাটি, সৈন্য, অথবা কামানের উপরে আছড়ে পড়ছে। পিয়ের আগে কখনও এরকম শব্দ শোনে নি, আর এখন এই শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে একট গোলা ঠিক সেখানে পড়ায় কিছুটা মাটি ধ্বসে পড়ল; একটা কালো গোলা তার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে কোন কিছুর উপর আছড়ে পড়ল। কিছু অসামরিক লোক কামানশ্রেণীর দিকে যাচ্ছিল, তারা ছুটে পালাল।

অফিসারটি চীৎকার করে বলল, "সকলেই ছর্-রা চালাও!"

একজন সার্জেন্ট আফসারের কাছে ছুটে এসে ভয়ার্ত গলায় ফিস্‌ফিস্ করে জানাল যে গুলি ফুরিয়ে গেছে।

"বদমায়েশের দল! তারা সব কী করছে!" পিয়েরের দিকে ঘুরে অফিসারটি চেঁচিয়ে উঠল।

অফিসারটির মুখ রক্তবর্ণ, ঘর্মাক্ত; কুটিল ভুরুর নীচে চোখ দুটো জলছে।

পিয়েরের উপর থেকে চোখ সরিয়ে সে সৈনিকদের হুকুম দিল, "রিজার্ভ বাহিনীতে চলে যাও, সেখান থেকে গুলি-গোলার বাক্সগুলো নিয়ে এস!"

"আমি যাব," পিয়ের বলল।

তার কথার জবাব না দিয়ে অফিসার বিপরীত দিকে এগিয়ে গেল।

চেঁচিয়ে বলল, "গুলি চালিও না···অপেক্ষা কর!"

যে লোকটি গোলাগুলি আনতে যাচ্ছিল পিয়েরের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল।

"আঃ, স্যার, এটা আপনার জায়গা নয়," বলেই সে ছুটে নেমে গেল।

তরুণ অফিসারটি যেখানে বসেছিল তাকে এড়িয়ে পিয়ের সৈনিকটির পিছনে ছুটে গেল।

একটার পর একটা কামানের গোলা তার সামনে, পিছনে, দুই পাশে পড়তে লাগল। সবুজ রংয়ের গোলা-বারুদের গাড়ির সামনে পৌঁছে হঠাৎ সে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করল, "আমি কোথায় চলেছি?" ফিরে যাবে না এগিয়ে যাবে বুঝতে না পেরে সে থেমে গেল। হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত তাকে মাটিতে ফেলে দিল। ঠিক সেইমুহূর্তে একটা আগুনের ঝিলিক তার চোখ ঝলসে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে কানে তালা-লাগানো একটা গর্জনে তার কান দুটো ঝন্ ঝন্ করে উঠল।

যখন সম্বিত ফিরে এল তখন দুই হাতে ভর দিয়ে সে মাটিতে বসে আছে;

গোলা-বারুদের গাড়িটা সেখানে নেই; পোড়া ঘাসের উপর ইতস্তত ছড়িয়ে আছে সবুজ পোড়া কাঠ ও ছেঁড়া কাপড়ের স্তূপ। একটা ঘোড়া গাড়ির জোয়ালের ভাঙা টুকরো নিয়েই তার পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল, আর অন্য ঘোড়াটা পিয়েরের মতই মাটিতে পড়ে হৃদয়বিদারক স্বরে একটানা চীৎকার করে চলেছে।

অধ্যায়—৩২

আতংকে দিশেহারা হয়ে লাফিয়ে উঠে পিয়ের ছুটতে ছুটতে কামানশ্রেণীর কাছেই ফিরে গেল; চারদিকের ভয়াবহতার মধ্যে সেটাই যেন একমাত্র আশ্রয়স্থল।

মাটির দেয়ালের আড়ালে ঢুকে দেখল, সেখানে লোকজনরা কি যেন করছে, কিন্তু কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হচ্ছে না। এই লোকগুলি কারা সেটা বুঝবার মত সময়ও তার ছিল না। সে দেখল, প্রবীণ অফিসারটি উপুড় হয়ে শুয়ে আছে; যেন নীচের কোন কিছু পরীক্ষা করছে; একটি সৈনিক "ভাইসাব!" বলে চীৎকার করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে এবং যারা তার হাত চেপে ধরেছে তাদের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চেষ্টা করছে। তাছাড়া আরও এমন কিছু সে দেখল যা সত্যি অদ্ভুত।

কিন্তু এটা বুঝবার সময় তার ছিল না যে কর্ণেলটি যুদ্ধে মারা গেছে, যে সৈনিকটি "ভাই" বলে চেঁচাচ্ছে সে বন্দী হয়েছে, এবং আর একটি সৈনিককে তার চোখের সামনেই বেয়নেটে গেঁথে ফেলা হয়েছে; কারণ সে দুর্গে ঢুকবার আগেই একটি ফ্যাকাসে-মুখ, ঘর্মাক্তদেহ, শুটকো লোক নীল ইউনিফর্ম পরে কি যেন বলতে বলতে তলোয়ার হাতে নিয়ে ছুটে এল। পরস্পরকে দেখবার আগেই তারা দুজনই পূর্ণ গতিতে পাশাপাশি ছুটছিল; সেই সুযোগে পিয়ের হাত বাড়িয়ে সেই লোকটির (একজন ফরাসী অফিসার) কাঁধটা চেপে ধরল এবং অন্য হাতে চেপে ধরল তার গলা। অফিসারও তলোয়ার ফেলে দিয়ে পিয়েরের কলার চেপে ধরল।

কয়েক সেকেণ্ড তারা দুজনই ভয়ার্ত দৃষ্টিতে পরস্পরের অপরিচিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইল; তারা কি করেছে এবং পরে কি করবে তা ভেবে দুজনই বিচলিত বোধ করল। দুজনই ভাবতে লাগল: "আমিই কি বন্দী হয়েছি, না কি তাকে বন্দী করেছি?" কিন্তু ভয়ের তাড়নায় পিয়ের ফরাসী অফিসারের গলাটা ক্রমেই এত বেশী শক্ত করে চাপতে লাগল যে তার মনে হতে লাগল যে সেই বন্দী হয়েছে। ফরাসীটি কি যেন বলতে যাচ্ছিল এমন সময় একটা কামানের গোলা তাদের মাথার একেবারে উপর দিয়ে এমন ভয়ংকরভাবে হিস্‌-হিস্‌ শব্দ করে ছুটে গেল আর ফরাসী অফিসারটিও এত তাড়াতাড়ি মাথাটা নামিয়ে নিল যে পিয়েরের মনে হল বুঝি তার মাথাটাই উড়ে

চলে গেল।

পিয়েরও মাথাটা নীচু করে হাত দুটো নামিয়ে নিল। কে কাকে বন্দী করেছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ফরাসীটি সোজা কামানশ্রেণীর দিকে ছুটে গেল, আর পিয়ের নিহত ও আহত সৈনিকদের ডিঙিয়ে উৎরাই বেয়ে ছুটে নেমে গেল; প্রতি পদক্ষেপে তার মনে হল নিহত ও আহতরা যেন তার পা টেনে ধরছে। কিন্তু গোল পাহাড়ের নীচে পৌঁছবার আগেই রুশ সৈন্যদের একটা বড় দলের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল; খুশিতে চীৎকার করতে করতে বেপরোয়াভাবে হোঁচট খেতে খেতে তারা পাহাড় বেয়ে উঠছে। (রুশ সেনাদলের এই আক্রমণের পূর্ণ কৃতিত্ব দাবী করেছে এর্মোলভ। তার সাহস ও সৌভাগ্যের বলেই একাজ সম্ভব হয়েছে; শোনা যায়, এই আক্রমণের সময় সে নাকি পকেট থেকে বের করে বেশ কয়েকটা সেণ্ট জর্জের ক্রুশ কামানশ্রেণীর মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল, যাতে যে সেখানে আগে পৌঁছবে সেই সেটা কুড়িয়ে নিতে পারে।)

যে ফরাসীরা কামানশ্রেণী দখল করেছিল তারা পালিয়ে গেল, আর আমাদের সৈন্যরা "হুর্-রা" বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এতদূর পর্যন্ত তাদের তাড়া করে গেল যে তাদের ডেকে ফেরানো গেল না।

বন্দীদের নীচে নামিয়ে আনা হল; তাদের মধ্যে একজন আহত ফরাসী জেনারেলও আছে; অফিসাররা তাকে ঘিরে ধরল। দলে দলে পিয়েরের পরিচিত ও অপরিচিত রুশ ও ফরাসী আহত সৈনিক বা যন্ত্রণায় বিকৃত মুখে কেউ বা হেঁটে, কেউ বা হামাগুড়ি দিয়ে কামানশ্রেণীর কাছ থেকে নামতে লাগল; অনেককে স্ট্রেচারে করে বয়ে আনা হল। পিয়ের আবার গোলপাহাড়ের মাথায় উঠে গেল; এক পরিবারের মত যাদের সঙ্গে সে এক ঘণ্টার উপর কাটিয়েছে তাদের একজনকেও সেখানে দেখতে পেল না। যারা মরে পড়ে আছে তাদের সে চেনে না, আবার কয়েকজনকে চিনতেও পারল। তরুণ অফিসারটি রক্তের পুকুরের মধ্যে সেই একইভাবে দেয়ালের একপ্রান্তে উপুড় হয়ে বসে আছে। লাল-মুখ লোকটি তেমনি খাবি খাচ্ছে, কিন্তু কেউ তাকে বয়ে নিয়ে গেল না।

পিয়ের আবার উৎরাই বেয়ে ছুটে নেমে গেল।

রণক্ষেত্র থেকে আগত একদল স্ট্রেচার-বাহকের দিকে উদ্দেশ্যহীনভাবে এগিয়ে যেতে যেতে সে ভাবল, "এবার ওরা এসব থামাবে, এবার ওরা বুঝবে কি ভয়ংকর কাজ করেছে!"

ধোঁয়ার আবরণের পিছনে সূর্য তখনও মাথার উপরে; কামানের গর্জন ও বন্দুকের শব্দ তখনও থামে নি, বরং ক্লান্ত মানুষ যেমন অবশিষ্ট সব শক্তি নিয়ে একবার আর্তনাদ করে ওঠে ঠিক তেমনি গোলাগুলি যেন বেপরোয়াভাবে আরও বেড়ে গেছে।

অধ্যায়—৩৩

একদিকে বরদিনো আর অন্যদিকে ব্যাগ্রেশনের সৈন্য-সীমান্ত—তার মধ্যবর্তী সাত হাজার ফুট জায়গাতেই বরদিনো যুদ্ধের মূল কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল। তার বাইরে একদিকে উভারভ-এর অশ্বারোহী বাহিনীসহ রুশরা কুচকাওয়াজ করেছিল দুপুরবেলা, আর অন্যদিকে উতিৎসার ওপারে পনিয়াতোস্কির একটা সংঘর্ষ হয়েছিল তুচ্‌কভের সঙ্গে; কিন্তু যুদ্ধের মূল কেন্দ্রে যা ঘটেছে তার তুলনায় এসব খুবই বিক্ষিপ্ত ও দুর্বল ঘটনা। দিনের আসল যুদ্ধটা জঙ্গলের পাশের যে খোলা জায়গাটাতে হয়েছে সেটা দুদিক থেকেই বেশ ভালভাবে দেখা যায়, আর যুদ্ধটাও হয়েছে অত্যন্ত সরল ও কৌশলবিহীনভাবে।

দু'পক্ষ থেকে কয়েকশ' কামানের গোলাবর্ষণ দিয়ে যুদ্ধটা শুরু হয়েছিল।

তারপর যুদ্ধক্ষেত্রটা যখন ধোঁয়ায় ঢেকে গেল তখন ডাইনের ফরাসীদের পক্ষ থেকে এগিয়ে এল কাম্পাঁ ও দেসিয়াক্স-এর সেনাদল, আর বাঁদিক থেকে এগিয়ে এল মুরাৎ-এর সেনাদল।

নেপোলিয়ন দাঁড়িয়েছিল শেভার্দিনো দুর্গে; সেখান থেকে ব্যাগ্রেশনের ঘাঁটির দূরত্ব এক ভার্স্ট, আর বরদিনোর দূরত্ব দুই ভার্স্ট; কাজেই সেখানে যে কি ঘটছে নেপোলিয়ন তা দেখতেই পায় নি, বিশেষত ধোঁয়া আর কুয়াশা মিলে সমস্ত অঞ্চলটাকেই ঢেকে ফেলেছিল। এই ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে কালো কালো কি যেন দেখা যাচ্ছিল,—হয় তো তারা সৈনিক,—মাঝে মাঝে বেয়নেটের ঝিলিকও চোখে পড়ছিল; কিন্তু তারা এগিয়ে চলেছে না স্থির হয়ে আছে, তারা ফরাসী না রুশ, শেভার্দিনো দুর্গ থেকে সেসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

উজ্জ্বল রোদ ছড়িয়ে সূর্য উঠেছে; চোখের উপর হাত রেখে নেপোলিয়ন ঘাঁটির দিকে তাকিয়েছিল; সূর্যের বাঁকা রশ্মি সোজা এসে পড়ল তার মুখে। সম্মুখে ধোঁয়ার আবরণ ছড়িয়ে পড়ছে; কখনও মনে হচ্ছে ধোঁয়াই এগিয়ে চলেছে, আবার কখনও মনে হচ্ছে সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে চীৎকার শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে কি যে হচ্ছে তা বলা অসম্ভব।

পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন একটা ছোট দূরবীনে চোখ রাখল; তার বৃত্তের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল ধোঁয়া আর সৈন্য, কিছু তার নিজের, কিছু রুশদের; কিন্তু পুনরায় যখন খালি চোখে তাকাল তখন আর বুঝতেই পারল না সে যা কিছু দেখছিল তা এখন কোথায়।

পাহাড় থেকে নেমে সেখানেই পায়চারি করতে লাগল।

মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছে, গোলাগুলির শব্দ শুনছে, আবার একদৃষ্টিতে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাচ্ছে

যে সমস্ত অ্যাডজুটান্টদের সে পাঠিয়েছে তারা এবং তার মার্শালদের আর্দালিরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনবরত ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে আর নেপোলিয়নকে

যুদ্ধের সর্বশেষ বিবরণ দিচ্ছে; কিন্তু সেসব বিবরণই মিথ্যা, কারণ সেই প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্যে কখন কি ঘটছে সেইমুহূর্তে সেটা বলা অসম্ভব; অ্যাডজুটাণ্টদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে না গিয়ে অন্যের কাছে যা শুনেছে তাই এসে বলছে; তাছাড়া, একজন অ্যাডজুটাণ্ট যতক্ষণে দুই ভার্স্ট পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে ততক্ষণে অবস্থা সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে এবং যে সংবাদ সে বয়ে আনছে সেটা মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। সেইভাবে একজন অ্যাডজুটাণ্ট মুরাত-এর কাছ থেকে খবর নিয়ে এল যে বরদিনো দখল করা হয়েছে, আর কলোচা নদীর সেতু ফরাসীদের হাতে এসে পড়েছে। অ্যাডজুটাণ্ট নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করল, সৈন্যরা নদী পার হবে কি? নেপোলিয়ন হুকুম দিল, সৈন্যরা শেষপ্রান্তে সমবেত হয়ে অপেক্ষা করুক। কিন্তু সে হুকুম দেবার আগেই—আসলে অ্যাডজুটাণ্টটি বরদিনো ত্যাগ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—রুশরা সেতুটা পুনরায় দখল করে পুড়িয়ে দিয়েছে।

একজন অ্যাড্‌জুটাণ্ট ঘোড়া ছুটিয়ে এসে বিবর্ণ, ভয়ার্ত মুখে জানাল যে তাদের আক্রমণ প্রতিহত হয়েছে, কাম্পাঁ আহত হয়েছে, আর দাভুৎ নিহত হয়েছে; অথচ অ্যাড্‌জুটাণ্টকে যখন এইসব খবর বলা হয়েছিল ঠিক তখনই ফরাসীরা অপর পক্ষের ঘাঁটি আবার দখল করেছে, আর দাভুৎ বেঁচে আছে, তার শরীর সামান্য ছড়ে গেছে মাত্র। এইসব অনির্ভরযোগ্য বিবরণের ভিত্তিতেই নেপোলিয়ন হুকুম জারি করছিল, আর তার ফলে যা হয় হুকুম পাবার আগেই সেকাজটা করা হয়ে গেছে, আর না হয় তো সে হুকুম তামিল করাই সম্ভব হয় নি।

যেসব মার্শাল বা জেনারেলরা যুদ্ধক্ষেত্রের আরও কাছাকাছি ছিল তারাও নেপোলিয়নের মতই নিজেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নি, শুধু মাঝে মধ্যে বন্দুকের আওতার মধ্যে গেছে; তারাও নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা না করেই কোথায় ও কোনদিকে আক্রমণ চালানো হবে, কোথায় অশ্বারোহী বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে যাবে, আর কোথায় ছুটে যাবে পদাতিক বাহিনী সে সম্পর্কে হুকুম জারি করেছে। কিন্তু নেপোলিয়নের মতই তাদের হুকুমও কদাচিৎ কার্যকর করা হয়েছে, আর যদি হয়ে থাকে তাও আংশিকভাবে হয়েছে। অধিকাংশক্ষেত্রে হুকুমের বিপরীত ঘটনাই ঘটেছে। যে সৈন্যদের এগিয়ে যেতে বলা হয়েছে ছর্‌-রা গুলির মুখে পড়ে তারা পিছু হটেছে; যে সৈন্যদের স্বস্থানে থাকতে বলা হয়েছে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে রুশদের সামনে দেখে হঠাৎ হয় ছুটে পিছিয়ে গেছে, নয় তো এগিয়ে গেছে সামনে, আর অশ্বারোহী বাহিনী বিনা হুকুমেই পলায়মান রুশদের পশ্চাদ্ধাবন করেছে। কামানগুলো কখন, কোথায় সরিয়ে নেওয়া হবে, গুলি করবার জন্য কখন পদাতিক বাহিনীকে পাঠানো হবে, আর কখনই বা অশ্বারোহীদের পাঠানো হবে রুশ পদাতিক সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে—এ-

ধরনের সব হুকুমই অফিসাররা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি থেকে ঘোষণা করেছে—নে, অথবা দাভুৎ, অথবা মুরাতকে জিজ্ঞাসা না করেই—নেপোলিয়নকে জিজ্ঞাসা করার তো কথাই ওঠে না। হুকুম পালন না করার জন্য অথবা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করার জন্য যে বিপদ হতে পারে তাকে তারা মোটেই ভয় করে নি, কারণ যুদ্ধে ঝুঁকি নিতে হয় সবচাইতে প্রিয় বস্তুটির—সেটা নিজের জীবন; কখনও মনে হয় পিছিয়ে যাওয়াই নিরাপদ, আর কখনও মনে হয় এগিয়ে যাওয়াই নিরাপদ; তাই যুদ্ধক্ষেত্রের একেবারে বুকের উপর যারা কর্মরত তারা সেই মুহূর্তের মর্জিমতই কাজ করেছে। অবশ্য বাস্তবক্ষেত্রে এই এগিয়ে যাওয়া অথবা পিছিয়ে যাওয়ার ফলে সেনাবাহিনীর অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটে নি। একের অপরের দিকে ছুটে যাওয়া অথবা ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়ার ফলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি; পঙ্গু হওয়া অথবা মৃত্যু ঘটার যে ক্ষতি সেটা ঘটেছে ছুটে-আসা কামানের গোলা আর বন্দুকের গুলিতে। উড়ন্ত গোলা-গুলি যেখানে ছুটছে, যেমুহূর্তে সৈন্যরা সেখান থেকে পালিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্বতন অফিসাররা পিছন থেকে এসে তাদের নতুন করে গড়ে তুলেছে, তাদের মধ্যে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছে, এবং পুনরায় তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গেছে যুদ্ধের আগুনের মধ্যে; মৃত্যু-ভয়ের তাড়নায় আবার তারা শৃংখলা ভেঙেছে এবং ভিড়ের প্রেরণায় যে যেদিকে পেরেছে ছুটে গেছে।

অধ্যায়—৩৪

দাভুৎ, নে ও মুরাত—নেপোলিয়নের এই তিন সেনাপতি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের খুব কাছে, অনেকসময় তারা যুদ্ধের মধ্যেও ঢুকেছে; বারবার তারা বড় রকমের সুশৃংখল ও সুগঠিত সেনাদলকে যুদ্ধরত সৈন্যদের সাহায্যার্থে পাঠিয়েছে। কিন্তু আগেকার যুদ্ধগুলিতে যেরকমটা ঘটেছিল এবার ঘটেছে তার বিপরীত ঘটনা; প্রত্যাশামত শত্রুপক্ষের পলায়নের পরিবর্তে এবার সেই সব সুগঠিত সেনাদলই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে বিশৃংখল, আতংকিত জনতার রূপ নিয়ে। সেনাপতিরা নতুন করে তাদের সংবদ্ধ করেছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস পেয়েছে। দিনের মাঝামাঝি সময়ে মুরাত তার অ্যাডজুটান্টকে পাঠাল নেপোলিয়নের কাছে, চেয়ে পাঠাল নতুন সৈন্য-শক্তি।

গোলপাহাড়ের নীচে বসে নেপোলিয়ন পঞ্চ-পানীয়ে চুমুক দিচ্ছে। তখনই মুরাত-এর অ্যাডজুটান্ট ঘোড়া ছুটিয়ে এসে নেপোলিয়নকে আশ্বাস দিল যে হিজ ম্যাজেস্টি যদি তাকে আর এক ডিভিশন সৈন্য পাঠায় তাহলে রুশ বাহিনীকে হটিয়ে দিতে পারবে।

“নতুন সৈন্য ?” রুদ্ধ বিস্ময়ে নেপোলিয়ন বলল। অ্যাড্জুটান্ট সুদর্শন

তরুণ; মুরাতের মতই লম্বা কোঁকড়া চুল। যেন তার কথাগুলি বুঝতেই পারে নি এমনিভাবে নেপোলিয়ন তার দিকে তাকাল।

সে নিজের মনেই ভাবল, "নতুন সৈন্য! অর্ধেক বাহিনীকে তো ইতি-মধ্যেই একটি দুর্বল, পরিখাবিহীন রুশ সেনাদলের বিরুদ্ধে পাঠানো হয়েছে, তাহলে তাদের নতুন সৈন্য লাগবে কেন?"

কঠোর কণ্ঠে বলল, "নেপলসের রাজাকে গিয়ে বল এখনও দুপুর হয় নি, আর আমার দাবার ছকটাকেও এখনও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি না। চলে যাও!…"

লম্বা-চুল, সুদর্শন, বালক—অ্যাড্‌জুটাণ্টটি টুপি থেকে হাত না সরিয়েই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল; তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে নরমেধ যজ্ঞাগারে ফিরে গেল।

নেপোলিয়ন উঠে দাঁড়াল। কলাইকুঁর্ত ও বের্থিয়েরকে ডেকে এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে শুরু করল যার সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই।

আলোচনাটা নেপোলিয়ন বেশ উপভোগ করছে; কিন্তু তার মাঝখানেই বের্থিয়েরের চোখে পড়ল, ঘর্মাক্ত ঘোড়ায় চেপে একটি সেনাপতি পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে আসছে। লোকটি বেলিয়ার্দ। ঘোড়া থেকে নেমে সে দ্রুত পদক্ষেপে সম্রাটের দিকে এগিয়ে গেল এবং জোর গলায় আর একদল সৈন্য পাঠাবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে লাগল। প্রতিশ্রুতি দিল, সম্রাট যদি আর এক ডিভিসন সৈন্য পাঠায় তাহলে রুশদের একেবারে শেষ করে দিতে পারবে।

নেপোলিয়ন কাঁধে ঝাঁকুনি দিল; কোন জবাব না দিয়ে পায়চারি করতে লাগল।

একসময় বেলিয়ার্দের কাছে গিয়ে বলল, "তুমি খুব চটে আছ বেলিয়ার্দ। যুদ্ধের উত্তাপের মধ্যে থেকে ভুল করাটা খুবই সহজ। ফিরে গিয়ে আর একবার ভাল করে দেখ, তারপর আমার কাছে এসো।"

বেলিয়ার্দ দৃষ্টির বাইরে যাবার আগেই রণক্ষেত্রের আর একপ্রান্ত থেকে আর একটি সংবাদবাহক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল।

অনবরত বিরক্ত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে নেপোলিয়ন বলল, "এই যে, তুমি আবার কি চাও?"

"স্যার, প্রিন্স……" অ্যাড্‌জুটাণ্টটি বলতে শুরু করল।

ক্রুদ্ধ অঙ্গভঙ্গী করে নেপোলিয়ন বলল, "নতুন সৈন্য চান, এই তো?"

অ্যাড্‌জুটাণ্ট সম্মতিসূচকভাবে মাথা নুইয়ে যুদ্ধের সংবাদ বলতে লাগল; সম্রাট তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে কয়েক পা সরে গেল, থামল, ফিরে এসে বের্থিয়েরকে ডাকল।

দুটি হাত ঈষৎ ফাঁক করে বলল, "রিজার্ভ বাহিনীতে হাত দিতেই হবে। ওখানে কাদের পাঠানো যায় বলতো?" (তার সম্পর্কেই নেপোলিয়ন পরবর্তীকালে বলেছিল 'একটা রাজহাঁসের বাচ্চাকে আমি ঈগল পাখি

বানিয়েছি'।)

সবগুলি ডিভিসন, রেজিমেণ্ট ও ব্যাটেলিয়নের খবর বেথিয়েরের মুখস্থ ; সে বলল, "ক্লাপারেদ্ ডিভিশনকে পাঠান স্যার।"

নেপোলিয়ন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

অ্যাড্‌জুটাণ্ট ক্লাপারেদ্ ডিভিসনের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। কয়েক-মিনিট পরেই পাহাড়ের পিছন থেকে "ইয়ং গার্ড" ডিভিসন যাত্রা শুরু করল। নেপোলিয়ন নিঃশব্দে সেইদিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ সে বেথিয়েরকে বলল, "না! ক্লাপারেদ্ ডিভিসনকে পাঠাতে পারি না। ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসনকে পাঠাও।"

ক্লাপারেদ-এর বদলে ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসনকে পাঠানোর বিশেষ কোন সুবিধাই ছিল না, আর এই পরিবর্তনের ফলে যথেষ্ট বিলম্ব ও অসুবিধারই সৃষ্টি হল, তবু সেই হুকুমই ঠিক ঠিক তামিল করা হল। নেপোলিয়ন খেয়ালই করল না যে সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সেই ডাক্তারের ভূমিকায়ই সে অভিনয় করল যে ওষুধ পাল্টাবার ফলে রোগ-নিরাময়কেই বিলম্বিত করে—অথচ এই ভূমিকার কথা সে ভালই জানত এবং তার নিন্দাও করত।

অন্যসব ডিভিসনের মতই ফ্রিয়াঁৎ-এর ডিভিসন ও যুদ্ধক্ষেত্রের ধোঁয়ার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। চারদিক থেকে অ্যাড্‌জুটাণ্টরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসে যেন সলা-পরামর্শ মত একই কথা বলতে লাগল। সকলেই নতুন সৈন্য-সাহায্যের প্রার্থনা জানিয়ে বলতে লাগল যে রুশরা তাদের ঘাঁটিতে অটুট থেকে এমন নারকীয় বোমাবর্ষণ শুরু করেছে যে ফরাসী বাহিনী একেবারে জল হয়ে গলে যাচ্ছে।

শিবিরের একটা টুলে বসে নেপোলিয়ন চিন্তায় ডুবে গেল। ভ্রমণপ্রিয় ম. দ্য বুসে সকাল থেকে না খেয়ে আছে ; সম্রাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে সশ্রদ্ধভাবে লাঞ্চ খাবার প্রস্তাব করল।

বলল, "আশাকরি এখন জয়লাভের জন্য ইয়োর ম্যাজেস্টিকে অভিনন্দন জানাতে পারি ?"

নেপোলিয়ন নীরবে নেতিবাচকভাবে মাথাটা নাড়ল। লাঞ্চের প্রস্তাবে নয়, শুধু জয়লাভের কথাতেই তার আপত্তি ধরে নিয়ে ম. দ্য বুসে সাহস করে পরিহাসের সুরে বলে বসল যে লাঞ্চ হাতের কাছে এলে সেটা গ্রহণ না করার কোন মানেই হয় না।

"চলে যাও এখান থেকে···" হঠাৎ বিষণ্ণ কণ্ঠে কথাটা বলে নেপোলিয়নই সেখান থেকে সরে গেল।

দুঃখ, অনুতাপ ও উচ্ছ্বাসের একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল ম. দ্য বুসের মুখে ; সেও ধীর পায়ে অন্য সেনাপতিদের খোঁজে চলে গেল।

একজন চিরভাগ্যবান জুয়াড়ি যখন বেপরোয়াভাবে টাকা ঢেলে সর্বদা

জিতে যাবার পরে হঠাৎ যখন দেখে যে তার হারের পর হার হচ্ছে তখন তার মনে যে অবসাদ আসে তেমনি অবসাদ দেখা দিয়েছে নেপোলিয়নের মনে।

সেই একই সৈন্য, একই সেনাপতি, একই প্রস্তুতি, একই বিলি-বন্দোবস্ত, নিজেও তো সেই একই মানুষই আছে, বরং সে এখন আগের চাইতে আরও বেশী অভিজ্ঞ ও রণকুশল হয়েছে। এমন কি শত্রুপক্ষ অস্তারলিৎস ও ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডে যা ছিল তাই আছে—অথচ কী এক প্রচণ্ড আঘাতে তার ডান হাতটা আজ অলৌকিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছে।

যেসব পুরনো পদ্ধতি অব্যর্থভাবে জয়যুক্ত হয়েছে : কামান শ্রেণীকে এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত করা, শত্রুর ব্যূহ ভেদ করতে রিজার্ভ বাহিনীর আক্রমণ, "লৌহকঠিন সৈন্যদের দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীর আক্রমণ—এইসব পদ্ধতিই তো প্রয়োগ করা হয়েছে অথচ জয়লাভ করা তো দূরের কথা, চারদিক থেকে শুধু একই সংবাদ আসছে—সেনাপতিরা নিহত ও আহত হয়েছে, নতুন সৈন্য দরকার, রুশসৈন্যকে বিতাড়িত করা অসম্ভব, নিজের সৈন্যরা বিশৃংখল হয়ে পড়ছে।

আগে দুটি কি তিনটি হুকুম দেওয়া হলে, মুখের কয়েকটা কথা বের করলেই মার্শাল ও অ্যাডজুটাণ্টরা ঘোড়া ছুটিয়ে এসেছে খুশি মুখের অভিনন্দন-বার্তা নিয়ে, শুনিয়েছে জয়লাভের কথা। কত শত্রু বন্দী হয়েছে তার হিসাব, সঙ্গে এনেছে বস্তা-বোঝাই শত্রুপক্ষের ঈগল-চিহ্ন ও পতাকা, কামান ও খাদ্য-ভাণ্ডার আর মুরাত শুধু চেয়েছে মালগাড়ি সংগ্রহ করতে অশ্বারোহী বাহিনী পাঠাবার অনুমতি। লোদি, মারেঙ্গো, আর্কোলা, জেনা, অস্তারলিজ, ওয়াগ্রাম প্রভৃতি সর্বত্র এই একই জিনিস ঘটেছে। কিন্তু এবার তার সৈন্যদের মধ্যে নতুন কিছু ঘটছে।

আক্রমণকারীদল আট ঘণ্টা ধরে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও যখন জয়লাভ করতে পারে না তখন তার অর্থ যে কি দাঁড়াল সেটা যুদ্ধের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে নেপোলিয়ন ভালই জানে। কে জানে, এখন যেকোন একটা ছোটখাট দুর্ঘটনাই তার ও তার বাহিনীর ধ্বংস ডেকে আনতে পারে।

যখন সে মনে মনে চিন্তা করছে যে এই বিচিত্র রাশিয়া অভিযানে একটা যুদ্ধেও তার জয় হয় নি, দুই মাসের মধ্যে একটা পতাকা, একটা কামান, অথবা একটা সেনাদলও তার দখলে আসে নি, চারদিকের সকলের মুখেই দেখছে একটা চাপা অবসন্নতার ভাব, অনবরত সংবাদ আসছে যে রুশরা এখনও তাদের ঘাঁটি আগলে রেখেছে—তখন দুঃস্বপ্নের মত একটা ভয়ংকর অনুভূতি তাকে চেপে ধরেছে; যেসব দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার ফলে তার ধ্বংস এগিয়ে আসতে পারে তারাই তার মনকে ঘিরে ধরেছে। রুশরা তার বাম ব্যূহের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তার ব্যূহের কেন্দ্রকে ভেদ করতে পারে,

একটা বিক্ষিপ্ত কামানের গোলা এসে তাকে মেরে ফেলতে পারে। এসবই তো সম্ভব। আগেকার সব যুদ্ধে সে ভাবত শুধু জয়ের নানা সম্ভাবনার কথা, আর এখন দুর্ভাগ্যের অসংখ্য সম্ভাবনা তার সামনে এসে হাজির হচ্ছে, সে সব কিছুই ঘটতে পারে বলেই তার বিশ্বাস। হ্যাঁ, তার অবস্থা এখন সেই মানুষটির মতই যে স্বপ্ন দেখছে, একটা গুণ্ডা তাকে আক্রমণ করতে আসছে, গুণ্ডাটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে সে হাত তুলেছে, কিন্তু হঠাৎ তার মনে হল যে তার উদ্যত হাতটা যেন একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রের মত অসহায় পঙ্গু হয়ে ঢলে পড়ছে, আর অনিবার্য ধ্বংসের আতংকে তাকে অসহায়ভাবে চেপে ধরেছে।

রুশরা ফরাসী বাহিনীর বামব্যূহের উপর আক্রমণ চালিয়েছে—এই সংবাদ নেপোলিয়নকে আতংকিত করে তুলেছে। হাঁটুর উপর কনুই রেখে মাথা নীচু করে সে পাহাড়ের নীচে একটা টুলের উপর চুপচাপ বসে আছে। বের্থিয়ের এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল, প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করতে তাদের একবার সেনাদল পরিদর্শন করতে যাওয়া উচিত।

"কি? কি বললে তুমি?" নেপোলিয়ন শুধাল। "হ্যাঁ, আমার ঘোড়া আনতে বল।"

ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে সে সেমেনভ্স্ক-এর দিকে এগিয়ে গেল।

মাথার উপর থেকে বারুদের ধোঁয়া ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে; পায়ের নীচে রক্তের স্রোতে ভাসছে ঘোড়া ও মানুষ,—কোথাও একক, কোথাও বা স্তূপ হয়ে। এমন একটা ছোট জায়গায় এত বেশী লোকের মৃত্যু অথবা এমন ভয়ংকর দৃশ্য নেপোলিয়ন অথবা তার কোন সেনাপতি আগে কখনও দেখে নি। সেমেনভ্স্ক্-এর উঁচু জায়গাটাতে উঠে ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে নেপোলিয়ন অপরিচিত রংয়ের ইউনিফর্মধারী অনেক সৈন্য দেখতে পেল। তারা রুশ সৈন্য।

এখন আর যুদ্ধ হচ্ছে না: চলেছে এমন এক অবিরাম হত্যাকাণ্ড যাতে ফরাসী বা রুশ কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই। নেপোলিয়ন ঘোড়া থামাল; আবার ডুবে গেল দিবাস্বপ্নের মধ্যে; সে স্বপ্ন ভাঙাল বের্থিয়ের। তার সামনে ও চারদিকে যা ঘটছে তাকে সে থামাতে পারে না, অথচ এ কাণ্ডকারখানা তারই নির্দেশে চলেছে, আর তার উপরেই নির্ভর করছে। এত করেও সাফল্য লাভ করতে না পারায় এই প্রথম তার মনে হল যে, এ ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় ও ভয়াবহ।

একজন সেনাপতি নেপোলিয়নের কাছে এগিয়ে এসে সাহস করে প্রস্তাব করল, সে নিজেই যেন "ওল্ড গার্ডস্"-কে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করে নিয়ে যায়। নোও বের্থিয়ার নেপোলিয়নের কাছেই দাঁড়িয়েছিল; সেনাপতিটির অর্থহীন প্রস্তাব শুনে তারা দৃষ্টি-বিনিময় করল, বিদ্রূপের হাসি

হাসল।

নেপোলিয়ন মাথা নীচু করে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল।

“ফ্রান্স থেকে আটশ' লীগ (১ লীগ=২½ মাইল) দূরে এসে আমার “গার্ডস্'কে ধ্বংস হতে আমি দেব না।” এই কথা বলে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সে শেভার্দিনোতে ফিরে গেল।

অধ্যায়—৩৫

যে কম্বল-বিছানো বেঞ্চে কুতুজভকে সকালে দেখেছিল পিয়ের, সেখানেই সে বসে আছে; সাদা মাথাটা ঝুলে পড়েছে, ভারী শরীরটা এলিয়ে পড়েছে। নিজে কোন হুকুম দিচ্ছে না, শুধু অপরের কথায় সায় দিচ্ছে, নয় তো আপত্তি জানাচ্ছে।

অনেককে বলছে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই কর”; আবার কাউকে বলছে, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, একবার যাও তো বাপু, গিয়ে দেখে এস”; অথবা বলছে, “না, তা করো না; বরং অপেক্ষাই করা হোক!” যেসমস্ত প্রতিবেদন আসছে সেগুলি মন দিয়ে শুনছে; অধীনস্থ লোকরা কোন নির্দেশ চাইলে তাও দিচ্ছে; কিন্তু তার আসল আগ্রহ শোনা কথাগুলির দিকে নয়, অন্য কিছুতে—যারা কথা বলছে তাদের মুখের ভাব ও গলার স্বরের দিকে। বহু বছরের সামরিক অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, পরিণত বয়সের জ্ঞানে সে বুঝেছে, হাজার হাজার মানুষ যেখানে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সেখানে একজন মানুষের পক্ষে তাদের পরিচালনা করা অসম্ভব; সে জানে, একজন প্রধান সেনাপতির হুকুম, অথবা সৈন্যসমাবেশের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন, বা কামানের সংখ্যাধিক্য ও নরহত্যার সংখ্যা দিয়ে একটা যুদ্ধের ফলাফল নির্ধারিত হয় না; ফলাফল নির্ধারিত হয় এমন একটা শক্তির দ্বারা যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, যাকে বলা হয় সেনাদলের মনোভাব, আর কুতুজভ চেষ্টা করে সেই শক্তির উপর নজর রেখে সাধ্যমত তাকে পরিচালিত করতে।

কুতুজভের চেহারায় ফুটে উঠেছে একটা সংহত শান্ত মনোযোগ; তার মুখে ফুটে উঠেছে অতিরিক্ত পরিশ্রমের আভাষ, যেন বৃদ্ধ বয়স ও দুর্বল শরীরের ক্লান্তিকে সহ্য করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

এগারোটার সময় খবর এল ফরাসীরা যেসব ঘাঁটি দখল করে নিয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু প্রিন্স ব্যাগ্রেশন আহত হয়েছে। কুতুজভ আর্তনাদ করে মাথাটা দোলাতে লাগল।

একজন অ্যাডজুটান্টকে বলল, “ঘোড়া ছুটিয়ে প্রিন্স পিতর আইভানভিচ-এর (ব্যাগ্রেশন) কাছে চলে যাও, সঠিক খবর নিয়ে এস”। তারপর পাশে দাঁড়ানো উর্তেমবুর্গের ডিউকের দিকে ফিরে বলল, “ইয়োর হাইনেস দয়া করে ‘প্রথম বাহিনী’র দায়িত্ব গ্রহণ করবেন কি?”

ডিউক চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই—সে হয়তো তখনও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এ পৌঁছেওনি—তার অ্যাডজুটান্ট সেখান থেকে এসে কুতুজভকে জানাল যে ডিউক আরও সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে।

কুতুজভ মুখটা বেঁকিয়ে দখ্‌তুরভ-এর কাছে খবর পাঠাল সে যেন "প্রথম বাহিনী"র দায়িত্ব গ্রহণ করে, আর ডিউককে অনুরোধ করে পাঠাল সে যেন ফিরে আসে, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে তাকে ছেড়ে দেওয়া চলে না। আবার যখন খবর এল যে মুরাত বন্দী হয়েছে, আর কর্মচারীরা যখন তাকে অভিনন্দিত করল, তখন কুতুজভ একটু হাসলমাত্র।

বলল, "একটু অপেক্ষা করুন মশাইরা। যুদ্ধে যখন জয় হয়েছে তখন মুরাতের বন্দী হওয়াটা কিছু অসাধারণ ব্যাপার নয়। তথাপি আনন্দ করবার আগে আরও একটু অপেক্ষা করা ভাল।"

কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে খবরটা প্রচার করে দেবার জন্য সে একজন অ্যাডজুটান্টকে পাঠিয়ে দিল।

কুতুজভ ছিল গোর্কিতে, রুশ ঘাঁটির কেন্দ্রস্থলের নিকটে। আমাদের বামব্যূহের উপর নেপোলিয়নের আক্রমণ অনেকবার প্রতিহত হয়েছে। মধ্যস্থলে ফরাসীরা বরদিনোর ওপারে যেতে পারে নি, আর তাদের বামব্যূহের উপর আক্রমণ হেনে উভারভ-এর অশ্বারোহী বাহিনী ফরাসীদের পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।

তিনটে নাগাদ ফরাসীদের আক্রমণ বন্ধ হল। যারা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এসেছে আর তার চারপাশে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের সকলের মুখেই কুতুজভ একটা প্রচণ্ড চাপ লক্ষ্য করল। দিনের সাফল্যে সে খুশি হয়েছে—এ সাফল্য একান্তই আশাতীত; কিন্তু বৃদ্ধ মানুষটির শক্তিতে আর কুলিয়ে উঠছে না। তার মাথাটা বারকয়েক এমনভাবে ঝুলে পড়ল যে মনে হল সে বুঝি পড়ে যাবে। সে ঢুলতে লাগল। ডিনার পরিবেশন করা হল।

এমন সময় অ্যাডজুটান্ট-জেনারেল ওল্‌যোগেন এসে হাজির হল। এই লোকটিই প্রিন্স আন্দ্রুর পাশ দিয়ে যাবার সময় বলেছিল "রণক্ষেত্রটাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়া উচিত"; ব্যাগ্রেশনও এই লোকটিকে অপছন্দ করে। বামব্যূহের অবস্থার কথা জানাতেই সে এসেছে বার্ক্‌লে দ্য তলির কাছ থেকে। আহত সৈনিকদের ছুটে পিছিয়ে যেতে দেখে এবং সেনাবাহিনীর পিছনের দিকে বিশৃংখল অবস্থা দেখে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বার্কলে দ্য তলি সবকিছু বিচার করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে যুদ্ধে হার হয়েছে, আর সেই সংবাদ জানাতেই তার প্রিয় অফিসারটিকে পাঠিয়েছে প্রধান সেনাপতির কাছে।

কুতুজভ অনেক কষ্টে একটুকরো সিদ্ধ মুরগির মাংস চিবুচ্ছিল। ভাঁজ-পড়া চোখের পাতার নীচ দিয়ে ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে সে ওল্‌যোগেনের দিকে তাকাল।

কোনরকমে টুপির মাথাটা ছুঁয়ে ওল্‌যোগেন উদাসভাবে পা দুটো টান্‌ টান্‌ করে আধা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কুতুজভের দিকে এগিয়ে গেল।

প্রশান্ত মহামহিমের প্রতি কিছুটা ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য দেখিয়ে ওল্‌যোগেন যেন বোঝাতে চাইছে যে একজন সুশিক্ষিত সামরিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে সে রাশিয়ার লোকদের সুযোগ দিয়েছে যাতে তারা এই অকর্মণ্য বৃদ্ধ লোকটিকে নিয়ে নাচানাচি করতে পারে; আসলে এই বৃদ্ধের সব পরিচয়ই সে রাখে। ওল্‌যোগেন ভাবল, "Der alte Herr (জার্মানরা নিজেদের মধ্যে এই নামেই কুতুজভকে ডাকে) বেশ আরামেই আছে। সাগ্রহে কুতুজভের সামনে রাখা থালাটার দিকে তাকিয়ে বার্ক্‌লের হুকুমমতই বামব্যূহের বিবরণ "এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে" শোনাতে লাগল।

"আমাদের ঘাঁটির সবগুলো প্রান্তই শত্রুপক্ষের হাতে চলে গেছে; সৈন্যের অভাবে তাদের বেদখল করা যাচ্ছে না; সৈন্যরা পালাচ্ছে; তাদের থামানো অসম্ভব।"

কুতুজভ চিবুনো বন্ধ করল; লোকটা কি বলছে বুঝতে না পেরে অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। "বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির" বিচলিতভাব লক্ষ্য করে ওল্‌যোগেন হেসে বলল, "আমি যা দেখেছি সেটা 'প্রশান্ত মহামহিমের' কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আমি সঙ্গত মনে করি নি। সৈন্যরা একেবারেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে…"

"আপনি দেখেছেন? আপনি দেখেছেন?…" ভুরু কুঁচকে কুতুজভ চীৎকার করে উঠল। তাড়াতাড়ি উঠে ওল্‌যোগেনের দিকে এগিয়ে গেল।

"আপনার…আপনার এতবড় সাহস…" চীৎকার করতে গিয়ে তার গলা আটকে গেল; কাঁপা হাত তুলে ভয় দেখাবার ভঙ্গী করে বলল, "আমার কাছে একথা বললেন কোন্‌ সাহসে? এ ব্যাপারে আপনি কিছুই জানেন না। আমার এই কথা জেনারেল বার্ক্‌লেকে গিয়ে বলুন যে তার সংবাদ ভুল; যুদ্ধের সত্যিকারের খবর তার চাইতে আমি ভাল জানি; আমি প্রধান সেনাপতি।"

ওল্‌যোগেন কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুতুজভ তাকে থামিয়ে দিল।

"বামব্যূহে শত্রুকে প্রতিহত করা হয়েছে, আর দক্ষিণ ব্যূহে তাকে পরাস্ত করা হয়েছে। দেখুন স্যার, আপনি যদি ভুল দেখে থাকেন, তাহলে যা জানেন না তা আমাকে বলবেন না। ভাল মানুষের মত জেনারেল বার্কলের কাছে ফিরে যান, আর তাকে আমার এই দৃঢ় অভিপ্রায় জানিয়ে দিন যে আগামীকাল শত্রুকে আক্রমণ করা হবে।" কঠোর স্বরে কুতুজভ কথাগুলি বলল।

সব চুপ। শুধু শোনা যাচ্ছে বৃদ্ধ সেনাপতির ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

"সর্বত্র তারা প্রতিহত হয়েছে; সেজন্য ধন্যবাদ জানাই ঈশ্বরকে আর

আমার সাহসী সৈন্যদের! শত্রু পরাস্ত হয়েছে, কাল আমরা তাদের তাড়িয়ে দেব রাশিয়ার পবিত্র মাটি থেকে।" বলতে বলতে কুতুজভ ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল; তার দুই চোখ জলে ভরে এল।

দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে, ঠোঁট দুটি বেঁকিয়ে ওল্‌যোগেন নীরবে এক পাশে সরে গেল। "বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি"র নির্বোধ আত্মপ্রবঞ্চনা দেখে সে অবাক হয়ে গেছে।

একটি সৌম্য, সুদর্শন জেনারেলকে পাহাড় বেয়ে উঠে আসতে দেখে কুতুজভ বলে উঠল, "এই তো, এই তো এসেছে, আমার নায়ক এসেছে!"

লোকটি রায়েভ্‌স্কি; আজ সারাটাদিন সে কাটিয়েছে বরদিনো যুদ্ধক্ষেত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে।

রায়েভ্‌স্কি জানাল, আমাদের সৈন্যরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘাঁটি আগলে রেখেছে; ফরাসীরা আর আক্রমণ করতে সাহস পাচ্ছে না।

তার কথা শুনে কুতুজভ ফরাসীতে বলল, "তাহলে অন্য কারও কারও মত তুমি মনে কর না যে আমাদের পশ্চাদপসরণ করতেই হবে?"

রায়েভ্‌স্কি উত্তর দিল, "ঠিক উল্টো ইয়োর হাইনেস; চূড়ান্ত যুদ্ধের আগে যারা অনমনীয় থাকে তারাই জয়লাভ করে। আর আমার মতে…"

কুতুজভ তার অ্যাড্‌জুটান্টকে ডাকল, "কেসারভ! এখানে কালকের হুকুমটা লিখে ফেল।" অন্য একজনকে উদ্দেশ করে বলল, "আর তুমি ঘোড়া ছুটিয়ে রণক্ষেত্রে চলে যাও; ঘোষণা করে দাও যে কাল আমরা আক্রমণ করব।"

কুতুজভ যখন রায়েভ্‌স্কির সঙ্গে কথা বলছিল এবং, সেদিনের ঘোষণাটা বলে যাচ্ছিল, তখন ওল্‌যোগেন বার্ক্‌লের কাছ থেকে ফিরে এসে জানাল, জেনারেল বার্ক্‌লে দ্য তলির ইচ্ছা, ফিল্ড-মার্শাল যে হুকুম জারি করেছেন সেটা তাকে লিখিতভাবে জানানো হোক।

ওল্‌যোগেনের দিকে না তাকিয়েই কুতুজভ প্রাক্তন প্রধান সেনাপতির ইচ্ছামত হুকুমটা লিখে দেবার নির্দেশ দিল।

যে রহস্যময় সংজ্ঞাতীত বন্ধন গোটা বাহিনীর মধ্যে একই মনোভাব অক্ষুণ্ণ রাখে, যাকে বলা হয় সেনাবাহিনীর মনোবল, এবং যেটা যুদ্ধের প্রধান শক্তিস্বরূপ, তারই সাহায্যে কুতুজভের কথাগুলি, পরের দিনের যুদ্ধের হুকুম-নামা, সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জানাজানি হয়ে গেল।

কিন্তু সেনাবাহিনীর দূরতম প্রান্ত পর্যন্ত যে একই কথা অথবা একই হুকুম পৌঁছে গেল তা কিন্তু নয়। মুখে মুখে যেকথা নানা প্রান্তে পৌঁছে গেল তার সঙ্গে কুতুজভের কথার কোন মিলই রইল না, কিন্তু তার যা বক্তব্য সেটা সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ল, কারণ তার বক্তব্যটা কোনরকম সুকৌশল হিসাবের

কল নয়, বরং এমন একটা অনুভূতির ব্যাপার যা প্রধান সেনাপতি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটি রুশ-এর মনে সমানভাবে বিদ্যমান।

আগামীকাল শত্রুকে আক্রমণ করা হবে একথা জেনে, এবং যেটা তাদের মনের কথা উচ্চতম মহল থেকে তারই সমর্থন শুনতে পেয়ে, ক্লান্ত ও অস্থিরচিত্ত সৈনিকরা নতুন করে সান্ত্বনা পেল, উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৩৬

রিজার্ভ বাহিনীর অন্যতম প্রিন্স আন্দ্রুর রেজিমেণ্টটি বেলা একটার পর পর্যন্তও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এর পিছনে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মধ্যেও নিষ্ক্রিয় হয়ে অবস্থান করছিল। দু'শ'র বেশী সৈন্যকে হারিয়ে বেলা দুটো নাগাদ সেই রেজিমেণ্টকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল সেমেনভ্‌স্ক ও গোলপাহাড় কামান-শ্রেণীর মধ্যবর্তী একটা পায়ে পায়ে চষে ফেলা যইয়ের ক্ষেতে। সেদিন একটা থেকে দুটোর মধ্যে শত্রুপক্ষের কয়েক শ' কামান থেকে প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে, আর হাজার হাজার সৈন্য মারা পড়েছে।

সেই জায়গা থেকে না নড়ে এবং একটিও গুলি না চালিয়ে রেজিমেণ্টের এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য মারা গেল। সম্মুখ থেকে, এবং বিশেষ করে ডান দিক থেকে, ধোঁয়ার ভিতর হতে গর্জে উঠছে কামান, আর সেই রহস্যময় ধোঁয়ার রাজ্য থেকে দ্রুত শব্দে ছুটে আসছে কামানের গোলা, আর ধীর গতিতে ছুটে আসছে বন্দুকের গুলি। যেন তাদের একটু বিশ্রাম দেবার জন্যই গোলাগুলি ছুটছে মাথার উপর দিয়ে, কিন্তু কখনও কখনও মাত্র এক মিনিটের মধ্যেই বেশ কয়েকজন সৈন্যকে ছিনিয়ে নিচ্ছে রেজিমেণ্টের ভিতর থেকে, আর আহতদের বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং নিহতদের টেনে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।

রেজিমেণ্টের অন্য সকলের মতই বিবর্ণ, বিষণ্ণ মুখে প্রিন্স আন্দ্রু একটা যইক্ষেতের পার্শ্ববর্তী মাঠের শেষ প্রান্তে পায়চারি করছে। মাথাটা নুয়ে পড়েছে, দুটো হাত রেখেছে পিছনের দিকে। তার কিছুই করার নেই, দেবার মত হুকুমও কিছু নেই। সবই চলছে আপনা থেকে। নিহতদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আহতদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, সৈনিকরা আরও ঘন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কোন সৈন্য পিছিয়ে পড়লেও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এগিয়ে আসছে। প্রথমে প্রিন্স আন্দ্রু মনে করেছিল যে সৈন্যদের মনে সাহস যোগানো এবং তাদের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তার কর্তব্য; তাই সে সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটছিল; কিন্তু অচিরেই সে বুঝতে পারল যে এসবের কোন দরকারই নেই; সৈন্যদের শেখাবার মত কিছুই তার আয়ত্তে নেই। পা টেনে টেনে, ঘাসের বুকে খস্‌ খস্‌ শব্দ তুলে, বুটের উপর জমে ওঠা ধুলোর দিকে তাকিয়ে সে মাঠ ধরে হাঁটতে লাগল। আগের দিনের কোন চিন্তাই তার মনে নেই। সে কিছুই ভাবছে না। ক্লান্ত শ্রবণে শুধু শুনছে অবিশ্রাম

শব্দের স্রোত ; অর্ধবৃত্তাকার হিস্‌-হিস্‌ শব্দ থেকে বোমার গর্জনকে আলাদা করে চিনতে পারছে। "এই একটা আসছে…ঠিক আমাদের দিকেই আসছে।…আবার একটা ! আবার ! ঠিক আঘাত করেছে।" একটু থেমে সৈন্যদের দিকে তাকাল। "না, উপর দিয়ে চলে গেল। কিন্তু এটা ঠিক আঘাত করেছে। গো-ও-ও ধপ্‌ ! তার থেকে পাঁচ পা দূরে পড়ে একটা কামানের গোলা কিছুটা শুকনো ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামল। আবার সৈন্যদের দিকে তাকাল। সম্ভবত অনেকের আঘাত লেগেছে—দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের কাছে মস্ত বড় ভিড় জমেছে।

সে চেঁচিয়ে বলল, "অ্যাডজুটাণ্ট ! ওদের ভিড় করতে নিষেধ কর।"

তার নির্দেশ মত কাজ করে অ্যাডজুটাণ্ট প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে এগিয়ে এল। অন্য দিক থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এল জনৈক ব্যাটেলিয়ন কম্যাণ্ডার।

"ওই দেখ !" একটি ভীত সৈনিক আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, আর একটা গোলা দ্রুতবেগে উড়তে নীচের দিকে নেমে আসা পাখির মত প্রায় নিঃশব্দে এসে পড়ল প্রিন্স আন্দ্রুর দুই পা দূরে, ব্যাটেলিয়ন-কম্যাণ্ডারের ঘোড়াটার একেবারে কাছে। ঘোড়াটা নাকের শব্দ করে এমনভাবে লাফিয়ে একপাশে সরে গেল যে মেজরের ছিটকে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঘোড়ার ভয় সৈনিকদের মধ্যেও সঞ্চারিত হল।

সপাটে মাটিতে শুয়ে পড়ে অ্যাডজুটাণ্ট চেঁচিয়ে বলল, "শুয়ে পড় !"

প্রিন্স আন্দ্রু ইতস্তত করল। ধূমায়মান গোলাটা তার ও শুয়ে-পড়া অ্যাডজুটাণ্টের মাঝখানে লাট্টুর মত ঘুরতে লাগল।

ঘূর্ণায়মান কালো গোলকটা থেকে যে ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে উঠছে সেদিকে তাকিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, "এই কি মৃত্যু ? আমি মরতে পারি না, মরতে চাই না। জীবনকে আমি ভালবাসি—ভালবাসি এই পৃথিবী, এই ঘাস, এই বাতাস…" এইসব ভাবতে ভাবতেই তার মনে পড়ল যে সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে।

অ্যাডজুটাণ্টকে বলল, "এটা লজ্জার কথা ! কি…"

তার কথা শেষ হল না। ঠিক সেইমুহূর্তে একই সঙ্গে ভেসে এল একটা বিস্ফোরণের শব্দ, জানালার ভাঙা কাঁচের মত ছিটকে-আসা বোমার টুকরোর হিস্‌ হিস্‌ শব্দ, আর দমবন্ধকরা বারুদের গন্ধ ; হাত তুলে একপাশে সরে গিয়েই প্রিন্স আন্দ্রু উপুড় হয়ে পড়ে গেল। কয়েকজন অফিসার ছুটে এল। তলপেটের ডান দিক থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ঘাসের অনেকটা জায়গা লাল করে দিল।

অসামরিক কর্মীরা স্ট্রেচার নিয়ে এসে অফিসারদের পিছনে দাঁড়াল। প্রিন্স আন্দ্রু ঘাসের উপর মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ; ঘর্ঘর শব্দে তার নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

"অপেক্ষা করছ কিসের জন্য? এগিয়ে এস!"

চাষীরা এগিয়ে গিয়ে কাঁধ ও পা ধরে তাকে তুলল; সে করুণকণ্ঠে আর্তনাদ করতে লাগল; পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করে চাষীরা আবার তাকে নামিয়ে দিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, "ওকে ধরে তোল! যা হয় হোক!"

আবার তাকে কাঁধ ধরে তুলে স্ট্রেচারে শুইয়ে দেওয়া হল।

"হা ঈশ্বর!"—অফিসারদের মুখে নানা কথা শোনা গেল।

একজন অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমার কানের একেবারে পাশ ঘেঁসে বেরিয়ে গেল।"

স্ট্রেচার কাঁধে নিয়ে চাষীরা দ্রুতপায়ে ড্রেসিং-স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।

"একতালে পা ফেল! আঃ···এই চাষীরা অসমান পা ফেলে চাষীরা হাঁটার দরুণ স্ট্রেচারটা দুলছিল; তাই তাদের কাঁধের উপর হাতের চাপ দিয়ে একজন অফিসার চেঁচিয়ে তাদের সংযত করল।

সামনের দিককার চাষীটি বলল, "একতালে পা ফেল ফেদর···আমি বলছি ফেদর!"

পিছন থেকে আর একটি চাষী পায়ে পা মিলিয়ে বলল, "এবার ঠিক হয়েছে!"

দিমোখিন ছুটে এসে স্ট্রেচারের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় বলে উঠল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি! অ্যাঁ, প্রিন্স!"

প্রিন্স আন্দ্রু চোখ মেলে তারদিকে তাকাল; আবার তার চোখের পাতা নেমে এল।

অসামরিক কর্মীরা প্রিন্স আন্দ্রুকে জঙ্গলের পাশে অবস্থিত ড্রেসিং-স্টেশনে নিয়ে গেল। বার্চ গাছের জঙ্গলের এক প্রান্তে তিনটে তাঁবু খাটিয়ে ড্রেসিং-স্টেশনটা তৈরি করা হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যে অনেক গাড়ি-ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়াগুলো চলমান বালতি থেকে যই খাচ্ছে; যে দানাগুলো নীচে পড়ছে চড়ুইগুলো উড়ে উড়ে তাই খুটে খুটে খাচ্ছে। রক্তের গন্ধ পেয়ে কিছু কাক বার্চ গাছের মধ্যে উড়তে উড়তে অধৈর্য হয়ে কা-কা করে ডাকছে। তাঁবুর চারদিকে পাঁচ একরের বেশী জমি জুড়ে নানা পোশাকপরা রক্তমাখা সৈনিকরা শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আছে। আহতদের ঘিরে স্ট্রেচার-বাহক সৈনিকরা বিষণ্ণ মুখে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। অফিসাররা তাদের বৃথাই সরে যেতে বলছে; তারা দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে আহতদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাঁবুর ভিতর থেকে কখনও ভেসে আসছে ক্রুদ্ধ চীৎকার, কখনও যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ। মাঝে মাঝে ড্রেসাররা ছুটে বেরিয়ে আসছে; কেউ জল আনতে যাচ্ছে, কেউ বা জানাচ্ছে কে তার পরে যাবে। নিজ নিজ

পাবার জন্য অপেক্ষমান সৈনিকরা আর্তনাদ করছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, কাঁদছে, কাতরাচ্ছে, অভিশাপ দিচ্ছে, আবার ভদ্‌কাও চাইছে। কারও বা বিকার দেখা দিয়েছে। প্রিন্স আন্‌দ্রুর বাহকরা আহত সৈনিকদের ডিঙিয়ে রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডার হিসাবে তাকে নিয়ে একটা তাঁবুর একেবারে কাছে গিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় থেমে গেল। প্রিন্স আন্‌দ্রু চোখ মেলল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতেই পারল না চারদিকে কি হচ্ছে। তার মনে পড়ল সেই মাঠ, সেই জঙ্গল, সেই ঘূর্ণায়মান কাল গোলক, আর জীবনের প্রতি সেই আকস্মিক উচ্ছ্বসিত ভালবাসা। তার থেকে দুই পা দূরে গাছের ডালে হেলান দিয়ে মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা একজন সুদর্শন, দীর্ঘদেহ নন-কমিশন অফিসার সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করে জোর গলায় কথা বলছে। তার মাথায় ও পায়ে বুলেটের আঘাত লেগেছে। সাগ্রহে তার কথা শুনতে আহত সৈনিক ও স্ট্রেচার-বাহকরা তাকে ঘিরে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে।

জ্বরের জন্য তার চোখ দুটো চকচক করছে; চারদিকে তাকিয়ে সে বলছে, "সেখান থেকে তাকে লাথি মেরে দূর করে দিলাম; স্বয়ং রাজাকেও চেপে ধরেছিলাম! সেইমুহূর্তে যদি রিজার্ভরা পৌছে যেত, তাহলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকত না হে বাপুরা! আমি সত্যি বলছি…"

অনেক সকলের মতই প্রিন্স আন্‌দ্রুও চকচকে চোখে তার দিকে তাকিয়ে কিছুটা সান্ত্বনা পেল। সে ভাবল, "এখন কি সবই সমান নয়? সেখানেই বা কি হবে, আর এখানেই বা কি ছিল? জীবনকে ছেড়ে যেতে কেন আমি এত অনিচ্ছুক হয়েছিলাম? এই জীবনে এমন কিছু ছিল যা আমি বুঝিনি এবং এখনও বুঝি না…"

অধ্যায়—৩৭

রক্তমাখা এপ্রন পরে একজন ডাক্তার বেরিয়ে এল। যাতে চুরুটে রক্ত না লাগতে পারে সেইজন্য চুরুটটা ধরা আছে তার এক হাতের বুড়ো ও কনিষ্ঠার ফাঁকে। আহতদের মাথার উপর দিয়ে সে চারদিকে তাকাতে লাগল। আসলে তার একটু বিশ্রাম দরকার। কিছুক্ষণের জন্য ডান দিক থেকে বাঁ দিকে মাথাটাকে ঘুরিয়ে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে নীচে তাকাল।

জনৈক ড্রেসার প্রিন্স আন্‌দ্রুকে দেখিয়ে দিলে ডাক্তার বলল, "ঠিক আছে, এক্ষুণি"। তারপর লোকজনদের বলল তাকে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে যেতে।

অপেক্ষারত আহতদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠল।

একজন বলে উঠল, "দেখা যাচ্ছে পরপারে যাবার পথেও একমাত্র ভদ্রজনরাই আগে সুযোগ পাবে!"

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে ভিতরে নিয়ে সদ্য ধুয়ে-দেওয়া একটা টেবিলে শুইয়ে দেওয়া হল। তাঁবুর ভিতরে কি আছে প্রিন্স আন্‌দ্রু ভাল করে দেখতে পাচ্ছে

না। চারদিকের করুণ আর্তনাদ, আর নিজের উরু, পাকস্থলী ও পিঠের তীব্র যন্ত্রণার জন্য অন্য কোনদিকে সে মন দিতে পারছে না। সে যা কিছু দেখতে পেল সব মিলেমিশে একাকার হয়ে তার মনে হল নীচু তাঁবুটা যেন রক্তাক্ত উলঙ্গ মানবদেহে ভর্তি হয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ আগে অগস্ট মাসের এক উত্তপ্ত দিনে ঠিক এই দৃশ্যই সে দেখেছিল স্মোলেন্স্ক রোডের পাশে একটা নোংরা পুকুরের মধ্যে।

তাঁবুর মধ্যে তিনটে অপারেশন টেবিল। দুটোতে লোক ছিল, তৃতীয়টাতে প্রিন্স আন্দ্রুকে শুইয়ে দেওয়া হল। তার একেবারে কাছের টেবিলে বসে আছে একটি তাতার। পাশে খুলে রাখা ইউনিফর্ম দেখে মনে হল সে একজন কসাক। চারজন সৈনিক তাকে ধরে আছে, আর চশমা চোখে একজন ডাক্তার তার পেশীবহুল বাদামী পিঠে ছুরি চালাচ্ছে।

"উঃ, উঃ, উঃ!" উঁচু চোয়ালের হাড় ও থ্যাবড়া নাকওয়ালা কালো মুখটা তুলে সবগুলো সাদা দাঁত বের করে সে অবিরাম আর্তনাদ করছে আর শরীরটাকে এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে নাড়ছে। আর একটা টেবিলে একটি লম্বা, ভুঁড়িওয়ালা লোক চিৎ হয়ে পড়ে আছে। তার কোঁকড়া চুল, মুখের রং ও মাথার আকৃতি দেখে তাকে প্রিন্স আন্দ্রুর বেশ পরিচিত বলে মনে হল। কয়েকজন ড্রেসার বুকের উপর চাপ দিয়ে তাকে ধরে রেখেছে। দুজন ডাক্তার তার একটা রক্তাক্ত পা নিয়ে কি যেন করছে। তাতারটির কাজ শেষ হলে একটা ওভারকোট দিয়ে তাকে ঢেকে রেখে চশমা-চোখে ডাক্তারটি হাত ধুয়ে প্রিন্স আন্দ্রুর কাছে এগিয়ে এল।

প্রিন্স আন্দ্রুর মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সে দ্রুত পায়ে সরে গেল।

"ওর পোশাক খুলে ফেল! কিসের জন্য দেরি করছ?" ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে ড্রেসারদের বলল।

ড্রেসাররা যখন আস্তিন গুটিয়ে অতিক্রত বোতাম খুলে তার পোশাক খুলতে লাগল তখন প্রিন্স আন্দ্রুর চোখের সামনে ভেসে উঠল শৈশবের দূরতম স্মৃতিগুলি। ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কাকে যেন ইসারায় কি বলল, আর তলপেটের তীব্র যন্ত্রণায় প্রিন্স আন্দ্রু জ্ঞান হারাল। যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন উরুর ভাঙা হাড়গুলো বের করে ফেলা হয়েছে, ছেঁড়া মাংসটা কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে। তার চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রিন্স আন্দ্রু চোখ খুলতে ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে তাকে নিঃশব্দে চুমো খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল।

অনেক যন্ত্রণা সহ্য করার পরে এখন প্রিন্স আন্দ্রুর এমন ভাল লাগছে যে দীর্ঘকাল সেরকম সুখের অনুভূতি তার হাসি। জীবনের সবচাইতে সেরা সুখের মুহূর্তগুলি—বিশেষ করে প্রথম শৈশবের সেই দিনগুলি যখন পোশাক

খুলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হত, তার উপর ঝুঁকে পড়ে নার্স তাকে ঘুম-পাড়ানি গান শোনাত, আর বালিশে মাথা ডুবিয়ে দিয়ে জীবনটাকে সে বড় বেশী করে ভালবাসত—তার স্মৃতিতে ফিরে এল ; সে স্মৃতি যেন অতীতের নয়, বর্তমানের ঘটনা।

যে আহত লোকটির মাথাটা প্রিন্স আন্‌দ্রুর পরিচিত বলে মনে হয়েছিল এবার ডাক্তাররা তাকে নিয়ে পড়ল : তুলে ধরে তারা তাকে শান্ত করতে চেষ্টা করছে।

"আমাকে ওটা দেখান···ওঃ, উঃ···ওঃ! উঃ!" তার ভয়ার্ত আর্তনাদ ও চাপা কান্না কানে এল।

সে কান্নার শব্দ শুনে প্রিন্স আন্‌দ্রুরও কান্না পেল। অগৌরবে তার মৃত্যু হচ্ছে বলে, অথবা জীবনকে ছেড়ে যেতে তার কষ্ট হচ্ছে বলে, অথবা শৈশবের স্মৃতিগুলি ফিরে এসেছে বলে, অথবা সে যন্ত্রণা ভোগ করছে, অন্যরা যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর এই মানুষটি এমন করুণভাবে আর্তনাদ করছে বলে,—কারণ যাই হোক না কেন তারও ইচ্ছা হল শিশুর মত একটু কাঁদতে।

জমাট রক্তমাখা বুট-পরা কাটা পাটা সেই আহত লোকটিকে দেখানো হল।

"ওঃ! ওঃ, উঃ!" সে মেয়েমানুষের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পাশে দাঁড়ানো ডাক্তারটি চলে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজের মনেই বলল, "হাঁ ঈশ্বর! এসব কি? কেন সে এখানে এল?"

এইমাত্র যে লোকটির পা কেটে বাদ দেওয়া হল তাকে সে চিনতে পেরেছে। লোকটি আনাতোল কুরাগিন। সকলে কোলে তুলে নিয়ে তাকে এক গ্লাস জল খাওয়াতে চাইছে, কিন্তু তার ফুলে-ওঠা কাঁপা ঠোঁট জলে চুমুক দিতে পারছে না। আনাতোল যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে কাঁদছে। "হ্যাঁ, সেই তো বটে! হাঁ, এই লোকটির সঙ্গে আমার সম্পর্কে বড়ই ঘনিষ্ঠ, বড়ই বেদনার। কিন্তু আমার শৈশবের সঙ্গে, আমার জীবনের সঙ্গে লোকটির কিসের সম্পর্ক?" নিজেকে প্রশ্ন করে সে কোন জবাব পেল না। সহসা একটা অপ্রত্যাশিত নতুন স্মৃতি শৈশবের আনন্দময় ভালবাসার রাজ্য থেকে তার সামনে এসে হাজির হল। ১৮১০-এ একটা বল-নাচের আসরে প্রথম যেদিন নাতাশাকে দেখেছিল সেদিনের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণে তার মনে পড়ল, এই যে লোকটি অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে তার সঙ্গে কিসের সম্পর্কে সে বাঁধা। সবকিছুই তার মনে পড়ে গেল, আর লোকটির প্রতি উচ্ছ্বসিত করুণায় ও ভালবাসায় তার মনটা ভরে গেল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু নিজেকে আর সংযত রাখতে পারল না ; পার্শ্ববর্তী লোকটির জন্য, নিজের জন্য, নিজের ও অন্য সকলের ভুলের জন্য তার দুই চোখ জলে

ভরে উঠল।

"সহমর্মিতা, ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা, যারা আমাদের ভালবাসে আর যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের প্রতি ভালবাসা, শত্রুকে ভালবাসা; হ্যাঁ, যে ভালবাসার কথা ঈশ্বর পৃথিবীতে প্রচার করেছেন আর প্রিন্সেস মারি আমাকে শিখিয়েছে অথচ আমি বুঝিনি—সেই ভালবাসার জন্যই জীবনকে ছেড়ে যেতে আমি দুঃখবোধ করেছি, বেঁচে থাকলে সেটাই হবে আমার অবলম্বন। কিন্তু এখন যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তা আমি জানি!"

অধ্যায়—৩৮

নিহত ও আহতদের দেহে সমাকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর দৃশ্য, ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত জনবিশেক সেনাপতির নিহত বা আহত হবার সংবাদ এবং নিজের একদা শক্তিমান বাহুর অক্ষমতার চেতনা—সবকিছু মিলিয়ে নেপোলিয়নের উপর একটা অপ্রত্যাশিত চাপ সৃষ্টি হয়েছে; অথচ সাধারণত নিহত ও আহতদের দেখতে তার ভালই লাগে; তার বিচারে তাতে মনের শক্তি-পরীক্ষা হয়। মনের যে শক্তিকে সে তার কৃতিত্ব ও মহত্বের আকর বলে মনে করে, আজ কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়ংকর রূপটা তার সেই মনোবলকেই পর্যুদস্ত করে তুলেছে। দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শেভার্দিনো গোলপাহাড়ে ফিরে গেল, বিবর্ণ, ফোলা, ফ্যাকাসে মুখে একটা টুলের উপর বসে পড়ল; চোখ দুটি আবছা, নাকটা লাল, কণ্ঠস্বর কর্কশ; চোখ নীচু করে অনিচ্ছাসত্বেও কান পেতে শুনছে গোলাগুলির শব্দ। বেদনার্ত অবসন্নতায় সে নিজের কাজের পরিণতির জন্যই অপেক্ষা করছে; এ কাজের সেই হোতা, অথচ তার গতিরোধ করতে সে অক্ষম। জীবনের যে কৃত্রিম অপচ্ছায়াকে সে এতকাল সেবা করে এসেছে, মুহূর্তের জন্য হলেও একটা ব্যক্তিগত মানবিক অনুভূতি তার জায়গা দখল করে নিল। যুদ্ধক্ষেত্রে যে যন্ত্রণা ও মৃত্যুকে সে প্রত্যক্ষ করেছে, নিজের মধ্যেই তাকে যেন অনুভব করল। মাথার ও বুকের উপর যে বোঝা চেপে আছে তা যেন নিজের যন্ত্রণা ও মৃত্যুর সম্ভাবনাকেই স্মরণ করিয়ে দিল। সেইমুহূর্তে মস্কো, বা জয়, বা গৌরব—কোন কিছুই সে কামনা করল না (আরও গৌরবের কী প্রয়োজন তার আছে?) তার একমাত্র কামনা বিশ্রাম, প্রশান্তি ও মুক্তি।

একটি অ্যাডজুটাণ্ট এসে খবর দিল, তার হুকুমমত দু'শ কামান থেকে একযোগে রুশদের উপর গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে, কিন্তু তবু তারা ঘাঁটি আগলে রেখেছে।

অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমাদের গোলা বর্ষণে কাটা ফসলের মত ওরা সারি সারি ঢলে পড়ছে, কিন্তু তবু লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে।"

"আরও মৃত্যু তারা চায়!" নেপোলিয়ন কর্কশ গলায় বলল।

কথাটা শুনতে না পেয়ে অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "স্যার ?"

ভুরু কুঁচকে নেপোলিয়ন বলল, "আরও মৃত্যু তারা চায়। তাই তারা পাবে !

যারা এই ঘটনাবলীর অংশীদার তাদের মধ্যে এব্যাপারে যার দায়িত্ব সবচাইতে বেশী সেই মানুষটির মন ও বিবেক যে শুধু এই দিনটিতে ও এই সময়েই অন্ধকারে ঢেকে গেল তা কিন্তু নয়। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে বুঝতে পারে নি সত্য, শিব ও সুন্দর কাকে বলে, বুঝতে পারে নি কি তার এইসব কাজের তাৎপর্য যা একান্তভাবে সত্য ও শিবের বিপরীত, যা সর্বপ্রকার মানবিকতা থেকে এতদূরে অবস্থিত যে তার তাৎপর্য সে কোনদিন উপলব্ধি করতে পারে নি। অর্ধেক পৃথিবীর দ্বারা প্রশংসিত স্বীয় কর্মধারাকে সে কখনও অস্বীকার করতে পারে নি, আর তাই সত্য, শিব ও মানবতাকেই সে অস্বীকার করেছে।

নিহত ও পঙ্গু মানুষের দেহে আকীর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে শুধু সেই একটি দিনই সে হিসাব করে নি যে তাদের মধ্যে প্রতি একজন ফরাসীর জন্য কতজন রুশ সেখানে পড়ে আছে, এবং মাত্র সেই একটি দিনই এই হিসাবের মধ্যে মিথ্যা করে আনন্দের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করে নি যে প্রতি একজন ফরাসীর বিনিময়ে পাঁচজন রুশ সেখানে পড়ে আছে। শুধু সেই একটি দিনই সে প্যারিসে লিখিত চিঠিতে বলে নি যে "যুদ্ধক্ষেত্রটি অপূর্ব," কারণ সেখানে পড়ে আছে হাজার হাজার মৃতদেহ ; কিন্তু সেণ্ট হেলেনা দ্বীপের শান্ত নির্জনতার মধ্যে সে যখন স্থির করল যে জীবনে যেসব মহৎ কর্ম সে করেছে তার বিবরণ লিখেই সে অবসরের দিনগুলি কাটিয়ে দেবে, তখনও সে লিখেছে :

"এই রুশ যুদ্ধের হওয়া উচিত ছিল আধুনিক কালের সব চাইতে জনপ্রিয় যুদ্ধ : এ যুদ্ধ শুভবুদ্ধির যুদ্ধ ; সত্যিকারের স্বার্থ, শান্তি ও সকলের নিরাপত্তার যুদ্ধ ; এ যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ শান্তিকামী ও রক্ষণশীল।

"এ যুদ্ধ একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য যুদ্ধ ; অনিশ্চয়তার অবসান ও নিরাপত্তার সূচনার যুদ্ধ। সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ একটি নতুন দিগন্ত উদঘাটিত হতে চলেছিল। ইওরোপীয় ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ; বাকি ছিল শুধু তাকে সংগঠিত করে তোলা।

"এইসব বৃহৎ লক্ষ্যকে পূর্ণ করে, সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করে, আমার নিজস্ব 'কংগ্রেস' ও 'পবিত্র মৈত্রী' গড়ে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু সে ভাবনা-চিন্তাগুলি আমার কাছ থেকে চুরি করা হল। বৃহৎ রাষ্ট্র-কর্ণধারদের সেই পুনর্মিলন সভায় এক পরিবারের মত আমরা আমাদের স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করতাম এবং মনিবের কাছে করণিকের মত তার বিবরণ জনগণের কাছে পেশ করতাম।

"বস্তুত, এইভাবে ইওরোপ একটা জাতি হিসাবে গড়ে উঠত, এবং যে-কোন মানুষ যেকোনস্থানে বেড়াতে বের হলে একই পিতৃভূমিতে বাস করার অনুভূতি লাভ করত। আমি অবশ্যই দাবী করতাম যেসব নদীতে পথ চলবার অধিকার সকলকে দেওয়া হোক, সব সমুদ্র আসুক সকলের অধিকারে, আর এখন থেকে সব বিরাট সেনাবাহিনীকে রাষ্ট্রপ্রধানদের রক্ষীতে পরিণত করা হোক।

"সেই মহান, শক্তিমান, চমৎকার, শান্তিময় ও গৌরবময় পিতৃভূমির কেন্দ্রস্বরূপ ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে আমি ঘোষণা করতাম যে তার সীমান্ত চিরঅপরিবর্তনীয়; সব ভবিষ্যৎ যুদ্ধই সম্পূর্ণরূপে আত্মরক্ষামূলক, সবরকম ক্ষমতাবিস্তার জাতীয়তাবিরোধী। সাম্রাজ্যের আসনে বসাতাম আমার ছেলেকে, আমার একনায়কত্বের সূচনা হত।

"প্যারিস হয়ে উঠত পৃথিবীর রাজধানী, আর ফরাসী জাতি হত সকল জাতির ঈর্ষার বস্তু।

"তারপর আমার ছেলের রাজকীয় শিক্ষানবীশীর আমলে সম্রাজ্ঞীকে সঙ্গে নিয়ে আমার অবসরকাল, আমার বার্ধক্যকে কাটাতাম নিজেদের ঘোড়ায় চেপে সত্যিকারের গ্রাম্য দম্পতির মত, ধীরে সুস্থে ঘুরে বেড়াতাম সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, শুনতাম সকলের অভাব-অভিযোগ, তার প্রতিকার করতাম, সর্ব দিকে ও সর্বত্র গড়ে তুলতাম বড় বড় বেসরকারী অট্টালিকা, নানা কল্যাণ-ব্যবস্থা।"

নরহত্যাকারীর বিষণ্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যার বিধি-নির্দিষ্ট নিয়তি সেই নেপোলিয়নও নিজেকে বুঝিয়েছিল যে মানুষের কল্যাণই ছিল তার সব কাজের লক্ষ্য, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল তার হাতে, আর সেই ক্ষমতার বলে সে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারত আশীর্বাদ ও কল্যাণ।

রুশ যুদ্ধ সম্পর্কে সে আরও লিখেছে: "যে চার লক্ষ মানুষ ভিশ্চুলা নদী অতিক্রম করেছিল তাদের মধ্যে অর্ধেক ছিল অস্ট্রীয়া, প্রাশিয়া, স্যাকসন, পোল্যাণ্ড, ব্যাভেরিয়া, উর্টেমবুর্গ, মেক্‌লেন্‌বুর্গ, স্পেন, ইতালি ও নেপ্‌ল্‌সের মানুষ। সঠিক বলতে গেলে রাজকীয় সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য এসেছিল হল্যাণ্ড, বেল্‌জিয়াম, রাইন নদীর সীমান্ত অঞ্চল, পিড্‌মণ্ট, সুইজারল্যাণ্ড, জেনেভা, তাস্কান, রোম, বত্রিশতম সামরিক ডিভিসন, ব্রেমেন, হাম্‌বুর্গ প্রভৃতি দেশ থেকে; তাদের মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা বলত বড় জোর এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মানুষ। প্রকৃতপক্ষে রাশিয়া অভিযানে ফ্রান্স হারিয়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও কম সৈন্য; আর ভিল্‌না থেকে মস্কোতে পশ্চাদ্‌-পসরণের পথে বিভিন্ন যুদ্ধে রুশ বাহিনী হারিয়েছে তার চার গুণেরও বেশী সৈন্য; মস্কো পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে এক লক্ষ রুশ বনে-জঙ্গলে প্রাণ হারিয়েছে

শীতে ও খাদ্যাভাবে ; শেষ পর্যন্ত, মস্কো থেকে ভিলনা পর্যন্ত যেতে আবহাওয়ার প্রচণ্ডতায়ও রুশ বাহিনীর অনেক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে ; ফলে ভিল্না পর্যন্ত পৌঁছতে তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ হাজার, আর কালিশ্‌-এ আঠারো হাজারেরও কম।"

নেপোলিয়ন কল্পনা করেছিল যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধটা তার ইচ্ছাতেই হয়েছিল, আর সে যুদ্ধের ভয়াবহতা তার অন্তরকে মোটেই বিচলিত করে নি। যা কিছু ঘটেছে তার সব দায়িত্বই সে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করেছে ; তার অন্ধকারাচ্ছন্ন মন এই বিশ্বাসের মধ্যেই যুক্তি খুঁজে পেয়েছে যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সেই যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে তাদের মধ্যে হেসে এবং ব্যাভেরিয়ার তুলনায় ফ্রান্সের মানুষ ছিল সংখ্যায় অল্প।

অধ্যায়—৩৯

নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে ও বিচিত্র ইউনিফর্মে হাজার হাজার মানুষ দাভিদভ-পরিবার ও রাজকীয় ভূমিদাসদের মালিকানাভুক্ত সেইসব উপত্যকায় ও প্রান্তরে মরে পড়ে আছে যেখানে শত শত বৎসর ধরে বরদিনো, গোর্কি, শেভার্দিনো ও সেমেনভ্‌স্ক্‌-এর চাষীরা ফসল কেটে ঘরে তুলেছে, গরু-ঘোড়া চড়িয়েছে। বিভিন্ন ড্রেসিং-স্টেশনকে ঘিরে প্রায় তিন একর জমির ঘাস ও মাটি রক্তে ভিজে গেছে। বিভিন্ন অস্ত্রধারী আহত ও অনাহত মানুষ ভয়ার্ত মুখে দলে দলে নিজেদের টেনে নিয়ে গেল—কেউ একটা সেনাদল থেকে ফিরে গেল মোঝায়েস্ক্‌-এ, কেউ বা অন্য দল থেকে ফিরে গেল ভালুভো-তে। অন্যরা ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত অবস্থায় অফিসারদের নির্দেশে এগিয়ে গেল সামনে। অন্যরা ঘাঁটি আগলে গোলাগুলি চালাতে লাগল।

যে রণক্ষেত্র ছিল প্রভাত সূর্যে ঝলসিত বেয়নেটের ঝিকিমিকি ও ধোঁয়ার খণ্ড মেঘের ঝল্‌কানিতে সুন্দর, সেখানে এখন ছড়িয়ে আছে ভেজা কুয়াশা ও ধোঁয়া, আর সোরা ও রক্তের একটা বিচিত্র গন্ধ। মেঘ জমল, ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে লাগল মৃত ও আহতদের উপর, ভয়ার্ত, ক্লান্ত ও সন্দিগ্ধ মানুষগুলোর উপর ; যেন বলতে চাইল : "যথেষ্ট হয়েছে ! যথেষ্ট ! এবার বন্ধ কর ....নতুন করে ভাব ! কি করছ তোমরা ?"

খাদ্য ও বিশ্রামের অভাবে পীড়িত উভয় পক্ষের সৈন্যদের মনেই যেন এখন সন্দেহ জেগেছে—এখনও তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে এই হানাহানি করেই চলবে কি না ; প্রত্যেকের মুখেই স্পষ্ট দ্বিধার ভাব ; প্রত্যেকের অন্তরে একই প্রশ্ন : "কিসের জন্য, কার জন্য আমি অপরকে মারব আর নিজে মরব ? .... তোমরা যাকে খুশি মারতে পার, কিন্তু আমি আর ওকাজ করতে চাই না !" সন্ধ্যা নাগাদ এই চিন্তা সকলের মনেই দানা বেঁধে উঠল। যেকোন মুহূর্তে এইসব মানুষরা নিজেদের কাজে নিজেরাই আতংকিত হয়ে উঠতে পারে,

সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যেকোন দিকে চলে যেতে পারে।

কিন্তু হায়, যদিও যুদ্ধের শেষের দিকে সৈন্যরা নিজেদের কাজকে নিজেরাই ভয় করতে লাগল, সেখান থেকে সরে যেতে পারলে তারা সুখীই হত, তবু একটা দুর্বোধ্য, রহস্যজনক শক্তি তাদের চালাতে লাগল, তখনও তারা কামান-বন্দুক নিয়ে তৈরি হল, গুলি-বারুদ ভরল, নিশানা ঠিক করল, আগুন ধরাল; অথচ প্রতি তিনজন গোলন্দাজের মাত্র একজন বেঁচে আছে, তারা চলছে টলতে টলতে আর ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে, ঘামে, রক্তে ও বারুদে তাদের সারা শরীর ছেয়ে গেছে। আগের মতই দ্রুতগতিতে ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দুই পক্ষ থেকেই কামানের গোলা ছুটছে, মানুষের দেহ বিধ্বস্ত হচ্ছে, আর যে ভয়ংকর কাজটি পরিচালিত হচ্ছে কোন মানুষের ইচ্ছায় নয়, মানুষের ভাগ্য-নিয়ন্তা ঈশ্বরের ইচ্ছায়, সে কাজ সমানে এগিয়ে চলেছে।

সেই সময় রুশ বাহিনীর বিশৃংখল পশ্চাৎ ভাগটা দেখলেই যে কেউ বলে দিতে পারত যে ফরাসীরা আর একটু কর্মতৎপর হলেই রুশ বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; আবার ফরাসী বাহিনীর পশ্চাৎভাগটা দেখলেও যে কেউ বলে দিতে পারত যে রুশরা আর একটু কর্মতৎপর হলেই ফরাসীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ফরাসী বা রুশ কোন পক্ষই তৎপর হল না, যুদ্ধের আগুন ধিকি ধিকি করেই জ্বলতে লাগল।

রুশরা সে চেষ্টা করল না কারণ তারা ফরাসীদের আক্রমণ করে নি। যুদ্ধের সূচনায় তারা মস্কোর পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়েছিল, এবং এখন যুদ্ধের শেষ লগ্নেও তারা সেই একই কাজ করে চলেছে। কিন্তু ফরাসীদের ঘাঁটি থেকে তাড়িয়ে দেবার উদ্দেশ্যও যদি রুশদের থাকত, তাহলেও তারা একবার শেষ চেষ্টা করতে পারত না, কারণ গোটা রুশবাহিনী তখন ভেঙে পড়েছে, যুদ্ধের ফলে তাদের একটা অংশও অক্ষত নেই, আর নিজেদের ঘাঁটি আগলে রাখলেও তাদের অর্ধেক সৈন্যকে তারা হারিয়েছে।

আর ফরাসীরা—তাদের মনে ছিল পনেরো বছর ধরে শুধু জয়লাভের স্মৃতি, নেপোলিয়নের অপরাজেয়তায় ছিল তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, তারা জানত যে যুদ্ধক্ষেত্রের একটা অংশ তাদের দখলে এসেছে, তারা হারিয়েছে মোট সৈন্যসংখ্যার মাত্র এক-চতুর্থাংশ এবং বিশ হাজার সৈন্যের রক্ষীবাহিনী সম্পূর্ণ অটুট আছে—তাই তারা অনায়াসেই সে চেষ্টাটা করতে পারত। রুশ বাহিনীকে তাদের ঘাঁটি থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্যই ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করেছিল; কাজেই সে চেষ্টা করাই তাদের উচিত ছিল, কারণ রুশরা যতক্ষণ মস্কোর পথ অবরোধ করে রাখতে পারবে ততক্ষণ ফরাসীদের উদ্দেশ্য সফল হবে না, তাদের সব চেষ্টা, সব ক্ষয়-ক্ষতি বিফলে যাবে। কিন্তু ফরাসীরা সে চেষ্টা করল না। অনেক ইতিহাসকার বলে থাকেন, নেপোলিয়ন যদি শুধু তার "ওল্ড গার্ডস্" কে কাজে লাগাত তাহলেই সে যুদ্ধ

জয় করতে পারত। কিন্তু নেপোলিয়ন তার "গার্ডস"কে ব্যবহার করলে কি হত সেকথা বলা আর হেমন্তকালটা বসন্ত কাল হলে কি হত সেকথা বলা তো একই ব্যাপার। কিন্তু তা হয় নি; ইচ্ছা ছিল না বলে যে নেপোলিয়ন তার "গার্ডস্"কে যুদ্ধে নামায় নি তা তো নয়, আসলে সেটা করা যায় নি। ফরাসীবাহিনীর সব সেনাপতি, কর্মচারি ও সৈনিকরাই জানত যে তা করা যাবে না, কারণ সৈন্যদের ভগ্নমনোবলই তা করতে দিত না।

নিজের শক্তিমান বাহুটা অক্ষম, পঙ্গু হয়ে যাওয়ার দুঃস্বপ্ন যে শুধু নেপোলিয়নই দেখেছিল তা নয়, যে শত্রুপক্ষ অর্ধেক সৈন্য হারাবার পরেও যুদ্ধের একেবারে শেষ লগ্নেও তার সূচনাকালের মতই একই ভয়াবহ মূর্তিতে নিজ ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে আছে, তার নিজের বাহিনীর সব সেনাপতি ও সৈনিকের মনেও পূর্বেকার সব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সেই একই আতংকের অনুভূতি বাসা বেঁধে ছিল। আক্রমণকারী ফরাসী বাহিনীর নৈতিক শক্তি তখন ফুরিয়ে গেছে। বরদিনোর রণক্ষেত্রে রুশবাহিনী সেই জয়লাভ করে নি যার নাম একটি যষ্টিখণ্ডের মাথায় বাঁধা পতাকা নামক কতকগুলো বস্তুকে দখল করা এবং যে মাটির উপর সৈন্যরা দাঁড়িয়ে ছিল এবং এখনও দাঁড়িয়ে আছে তাকে দখল করা; কিন্তু যে নৈতিক জয়লাভের ফলে শত্রুপক্ষের মনে এই দৃঢ় ধারণা জন্মে যে প্রতিপক্ষ নৈতিক শক্তিতে তার চাইতে অধিক বলীয়ান এবং সে নিজে অনেক বেশী অক্ষম সেই নৈতিক জয় রুশদের করায়ত্ত হয়েছে। আক্রমণের মুখে মারাত্মকভাবে আহত একটা ক্রুদ্ধ জন্তুর মতই ফরাসী আক্রমণকারীরা তখন বুঝতে পেরেছে যে ধ্বংস অনিবার্য হলেও এখন আর থামা চলবে না; রুশবাহিনীর অবস্থাও তথৈবচ; অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে তাদেরও আর পিছু হটা চলে না। ফরাসীবাহিনী যে গতিবেগ সঞ্চয় করেছে তার প্রেরণাতেই তারা এখনও মস্কোর দিকে এগিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেখানে পৌঁছে রুশদের পক্ষ থেকে কোনরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই তাদের মরতে হবে বরদিনো যুদ্ধের মারাত্মক ক্ষতস্থান থেকে রক্তক্ষরণের ফলে। তাই বরদিনো যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ নেপোলিয়ন অর্থহীনভাবে মস্কো থেকে পালিয়ে গেল, স্মোলেনস্ক রোড ধরে পশ্চাদপসরণ করল, তার পাঁচ লক্ষ সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল, নেপোলিয়নশাসিত ফ্রান্সের পতন হল; সর্বপ্রথম বরদিনোতেই অধিকতর মনোবলসম্পন্ন একটি প্রতিপক্ষের হাত তার উপর চেপে বসল।

॥ দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত ॥

সংগ্রাম ও শান্তি

তৃতীয় খণ্ড

একাদশপর্ব

অধ্যায়—১

গতির পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতা মানুষের পক্ষে বোধগম্য নয়। গতির যেকোন নিয়ম মানুষের কাছে তখনই বোধগম্য হয়ে ওঠে যখন গতির যে-কোন একটা নির্বাচিত অংশকে বেছে নিয়ে সেটাকে সে জানতে চেষ্টা করে। প্রাচীন মানুষদের একটা সুপরিচিত ধাঁধা প্রচলিত আছে যে, একটা কচ্ছপ অপেক্ষা দশ গুণ দ্রুতগতিতে ছুটতে পারা সত্ত্বেও আকিলিস কখনও সেই কচ্ছপটাকে অনুসরণ করে তাকে ধরে ফেলতে পারবে না। আকিলিস যতক্ষণে তার ও কচ্ছপটার মাঝখানের ব্যবধানটাকে পার হবে ততক্ষণে কচ্ছপটা আরও দশ ভাগের একভাগ দূরত্ব এগিয়ে যাবে: আকিলিস যতক্ষণে সেই দশম ভাগটি পার হবে ততক্ষণে কচ্ছপটা এগিয়ে যাবে আরও একশ ভাগের এক ভাগ, এবং এইভাবে অনন্তকাল ধরেই ব্যবধানটা থেকেই যাবে। প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে এ সমস্যাটা ছিল সমাধানের অতীত। আকিলিস যে কোন দিন কচ্ছপটাকে ধরতে পারবে না এই অবাস্তব সিদ্ধান্তের কারণটা নিম্নরূপ: গতিকে ইচ্ছাকৃতভাবে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড অংশে ভাগ করে দেখা হত, অথচ আকিলিস ও কচ্ছপ দুজনের গতিই আসলে ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন।

গতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে নিয়ে আমরা সমস্যার একটা সমাধানের কাছাকাছি যেতে পারি মাত্র, কখনও সেখানে পৌঁছতে পারি না। যখন আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমের ধারণা, একদশমাংশের সমানুপাতিক জ্যামিতিক হ্রাস-বৃদ্ধির ধারণা, এবং অনন্ত পর্যন্ত সেই হ্রাস-বৃদ্ধির যোগফলের ধারণা করতে পারব তখনই এ সমস্যার সমাধানও আমরা পেয়ে যাব।

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমকে নিয়ে আলোচনার কৌশল অর্জন করার ফলে গণিতশাস্ত্রের একটি আধুনিক শাখা এখন গতিসংক্রান্ত এমন সব জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে যাকে একদিন সমাধানের অতীত বলে মনে করা হত।

প্রাচীনকালে অজ্ঞাত গণিতশাস্ত্রের এই আধুনিক শাখা গতিসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনার সময় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতমের ধারণাকে স্বীকার করে, সমর্থন করে গতির পরিপূর্ণ ধারাবাহিকতাকে এবং তার ফলে ধারাবাহিক গতির আলোচনা না করে গতির স্বতন্ত্র অংশ নিয়ে আলোচনা করার দরুণ যে অনিবার্য ভুলকে মানুষ এড়িয়ে চলতে পারে না তাকে সংশোধন করতে সক্ষম হয়েছে।

ঐতিহাসিক অগ্রগতির নিয়মকে খুঁজতে গিয়েও সেই একই ব্যাপার ঘটে। অসংখ্য মানুষের ইচ্ছা থেকে উদ্ভূত মানবতার গতিপথও ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্ন।

এই ধারাবাহিক অগ্রগতির নিয়মকে জানাই ইতিহাসের লক্ষ্য। সকল মানুষের ইচ্ছার যোগফল থেকে উদ্ভূত সেইসব নিয়মকে জানবার চেষ্টায় মানুষের মন কতকগুলি ইচ্ছাকৃত, বিচ্ছিন্ন একককে ধরে নেয়। ইতিহাসের প্রথম পদ্ধতিই হল ধারাবাহিক ঘটনাবলী থেকে একটি নির্বাচিত অংশকে বেছে নিয়ে অন্য ঘটনা থেকে আলাদা করে তাকে বিচার করা, যদিও ঘটনার সূচনা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না, কারণ একটা ঘটনা নিরবিচ্ছিন্নভাবে অপর একটি ঘটনা থেকেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হল কোন একজন মানুষের—রাজা অথবা সেনাপতির—কার্যাবলীকে বহু মানুষের ইচ্ছার যোগফলের সমান বলে বিবেচনা করা; অথচ যেকোন একটি ঐতিহাসিক ব্যক্তির কাজের ভিতর দিয়ে বহু মানুষের ইচ্ছার যোগফল কখনও প্রকাশিত হয় না।

সত্যের কাছাকাছি পৌঁছবার চেষ্টায় ইতিহাস-বিজ্ঞান ক্রমাগত ছোট ছোট একককে নিয়ে পরীক্ষা করে। কিন্তু সে এককটি যত ছোটই হোক, আমরা মনে করি যে একটি একককে অন্যগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করা, অথবা কোন ঘটনার সূচনা আছে বলে ধরে নেওয়া, অথবা এ কথা বলা যেকোন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপের ভিতর দিয়ে বহু মানুষের ইচ্ছা প্রকাশিত হয়—আসলে এসবই মিথ্যা।

ইতিহাসের যেকোন সিদ্ধান্তকে ধুলায় লুটিয়ে দিতে কোনরকম কঠিন বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন হয় না। যেকোন একটি বড় একককে বেছে নিয়ে আলোচনা করাই যথেষ্ট।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রতম একককে গ্রহণ করলে এবং তাদের সংগঠিত করে তোলার কৌশলটি অধিগত করতে পারলেই আমার ইতিহাসের নিয়মে পৌঁছতে পারব বলে আশা করতে পারি।

ইওরোপে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পনেরটি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষের এক অসাধারণ আন্দোলন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। মানুষ তাদের চিরাচরিত

কাজকর্ম ছেড়ে দিয়েছে, ইওরোপের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেছে, পরস্পরকে লুঠ করেছে ও হত্যা করেছে, কখনও জয়লাভ করেছে আবার নিরাশায় ডুবে গেছে, আর বেশ কয়েক বছর ধরে জীবনের গতিটাই পাল্টে গেছে, একটা ব্যাপক গতি কখনও দ্রুত হয়েছে, কখনও হয়েছে মন্থর। এই আন্দোলনের কারণ কি, কোন্ নিয়মে এটা পরিচালিত হয়েছে? সে প্রশ্ন জেগেছে মানুষের মনে।

এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ইতিহাসকাররা আমাদের সামনে তুলে ধরেছে প্যারিস নগরীর একটি ভবনের কয়েক ডজন মানুষের বাণী ও কার্যাবলী, আর সেই বাণী ও কার্যাবলীর নাম দিয়েছে "বিপ্লব"; তারপর তারা আমাদের দিয়েছে স্বয়ং নেপোলিয়নের এবং তার সমর্থক ও বিরোধী কিছু মানুষের বিস্তারিত জীবনী; আর অন্যদের উপর এইসব মানুষের প্রভাবের কথা শুনিয়ে আমাদের বলেছে: এই কারণেই এই আন্দোলন ঘটেছে, এবং এগুলিই তার কারণ।

কিন্তু মানুষের মন শুধু যে এ ব্যাখ্যাকে বিশ্বাস করতে চায় নি তাই নয়, বরং পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে এ ব্যাখ্যা ভ্রান্ত, কারণ এখানে একটি দুর্বলতর ঘটনাকে একটি অধিকতর শক্তিশালী ঘটনার কারণ বলে ধরা হয়েছে। বহু মানুষের ইচ্ছা থেকেই জন্ম নিয়েছে নেপোলিয়ন ও বিপ্লব, আর সেই মানবিক ইচ্ছার যোগফলই প্রথমে তাদের সহ্য করেছে এবং পরে তাদের ধ্বংস করেছে।

ইতিহাসে লেখা হয়েছে, "যখনই কোন বিজয়-অভিযান হয়েছে, তখনই দেখা দিয়েছে দিগ্বিজয়ী; যখনই কোন রাজ্যে কোন বিপ্লব ঘটেছে, তখনই মহাপুরুষরা দেখা দিয়েছে।" কিন্তু মানুষের বিচার-বুদ্ধি বলে, একথা ঠিক যে যখনই দিগ্বিজয়ীরা দেখা দেয় তখনই যুদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু তাতে একথা প্রমাণ হয় না যে বিজয়ী বীররাই যুদ্ধ ঘটায় এবং কোন একটি মানুষের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যুদ্ধের নিয়মগুলি খুঁজে পাওয়া যাবে। আমি যখনই আমার ঘড়ির দিকে তাকাই আর তার কাঁটাটা থাকে দশটার ঘরে, তখনই পার্শ্ববর্তী গির্জার ঘণ্টা শুনতে পাই; কিন্তু তার থেকে আমি এটা ধরে নিতে পারি না যে যেহেতু ঘড়ির কাঁটা দশটার ঘরে গেলেই ঘণ্টাটা বাজতে শুরু করে, সেই হেতু ঘড়ির কাঁটার অবস্থানের ফলেই ঘণ্টাটা বাজে।

যখনই একটা যন্ত্র-যানকে চলতে দেখি তখনই একটা হুইস্‌ল্ শুনতে পাই এবং দেখতে পাই যে ভাল্‌ভগুলো খুলছে আর চাকাগুলি ঘুরছে; কিন্তু তাই বলে আমি অনুমান করতে পারি না যে হুইস্‌লের শব্দ ও চাকার ঘূর্ণনই এঞ্জিনটার চলার কারণ।

চাষীরা বলে থাকে, ওক-গাছে ফুল ফোটে বলেই শেষ বসন্তে ঠাণ্ডা বাতাস বয়, আর বাস্তবক্ষেত্রেও ওক গাছে ফুল ফুটতে শুরু করলেই বসন্ত-

কালের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে থাকে। কিন্তু ওককুঁড়িরা পাপড়ি মেললেই কেন যে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে তা না জানলেও আমি কিন্তু চাষীদের সঙ্গে একমত নই যে ওক-কুঁড়িদের ফুটে ওঠাই ঠাণ্ডা বাতাসের কারণ। জীবনের অন্য সব ঘটনার মতই সেখানেও আমি দেখতে পাই ঘটনার আকস্মিক যোগাযোগমাত্র। ঘড়ির কাঁটা, ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ্‌ ও চাকা, এবং ওক গাছের দিকে যত সতর্কতার সঙ্গেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, কোনমতেই কিন্তু ঘণ্টা বাজবার, ইঞ্জিন চলবার ও বসন্ত-বাতাস বইবার কারণকে আবিষ্কার করতে পারব না। সেটা করতে হলে আমার দৃষ্টিকোণকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে আমাকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে অংকুরের, ঘণ্টার ও বাতাসের গতির নিয়মকে। ইতিহাসকেও তাই করতে হবে। আর সেইদিকেই প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।

ইতিহাসের নিয়মকে জানতে হলে আমাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তুকে সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে, রাজা, মন্ত্রী ও সেনাপতিদের ছেড়ে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেইসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ের দিকে যা জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে। এই পথে ইতিহাসের নিয়মকে বুঝবার পথে মানুষ কতদূর অগ্রসর হতে পারবে তা কেউ বলতে পারে না; কিন্তু একথা ঠিক যে একমাত্র এই পথেই ইতিহাসের নিয়ম আবিষ্কারের সম্ভাবনা রয়েছে; এবং রাজা, সেনাপতি ও মন্ত্রীদের কার্য-কলাপের বর্ণনায় এবং সে সম্পর্কে তাদের ভাবনা-চিন্তার কথা বলতে ইতিহাসকাররা যতটা মানসিক প্রচেষ্টা নিয়োগ করেছে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও এইদিকে প্রয়োগ করা হয় নি।

অধ্যায়—২

ইওরোপের একডজন দেশের সৈন্যদল রাশিয়াকে লক্ষ্য করে ছুটে এসেছে। তারা স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ পৌঁছবার আগে পর্যন্ত এবং পরে স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে বরদিনো পর্যন্ত রুশ বাহিনী ও জনগণ ওরকম সংঘর্ষকে এড়িয়েই চলছে। ফরাসী বাহিনী তাদের লক্ষ্য মস্কোর দিকে এগিয়ে চলেছে, একটা পতনশীল বস্তু যত পৃথিবীর দিকে নেমে আসে ততই তার গতিবেগ যেরকম বেড়ে যায়, সেই রকম ফরাসী বাহিনীও যতই তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়েছে ততই তাদের গতিবেগ বেড়েছে। পিছনে পড়ে আছে ক্ষুধায় কাতর একটি শত্রু-দেশের হাজার ভার্স্ট' জমি, সম্মুখে লক্ষ্যস্থল থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছে মাত্র কয়েক ভার্স্ট' জমি। নেপোলিয়নের সেনাদলের প্রতিটি সৈনিক সেকথা উপলব্ধি করছে, আর নিজের আবেগেই অভিযান এগিয়ে চলেছে।

রুশবাহিনী যত পিছিয়ে যাচ্ছে, শত্রুপক্ষের মনে ঘৃণার আগুন ততই তীব্র হিংস্রতায় জ্বলে উঠছে; এরা যত পিছিয়ে যাচ্ছে, ওদের সৈন্যসংখ্যা

তত বাড়ছে তত বেশী সংহত হচ্ছে। সংঘর্ষ বাধল বরদিনোতে। কোন দলই ছত্রভঙ্গ হয় নি, কিন্তু অধিকতর গতিবেগসমন্বিত কোন গোলকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে অপর গোলকটি যেরকম অনিবার্যভাবে ছিটকে ফিরে আসে, ঠিক তেমনিভাবেই সংঘর্ষের সঙ্গে সঙ্গেই রুশবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল; আর ওদিকে সংঘর্ষের ফলে সব শক্তি নিঃশেষিত হওয়া সত্ত্বেও সেই গতিবেগের টানেই অভিযানের গোলকটি ও সেই একই অনিবার্যতায় বেশ কিছুদূর এগিয়ে গেল।

রুশরা মস্কো থেকেও আশি মাইল পিছিয়ে গেল, আর ফরাসীরা মস্কো পৌঁছে সেখানেই থেমে গেল। তারপর পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে একটি যুদ্ধও হয় নি। ফরাসীরা একটুও নড়ল না। মারাত্মক আহত রক্তাক্ত জন্তু যে রকম ক্ষতস্থান চাটতে থাকে, ঠিক সেইভাবে তারা পাঁচটি সপ্তাহ মস্কোতে চুপচাপ কাটিয়ে দিল; তারপর কোন নতুন কারণ ছাড়াই হঠাৎ পালাতে শুরু করল: কালুগা রোড পর্যন্ত ছুটে গেল এবং কোনরকম গুরুতর যুদ্ধ ছাড়াই অধিকতর গুরুতর গতিতে ফিরে গেল স্মোলেন্স্ক্-এ, স্মোলেন্স্ক্ ছাড়িয়ে, বেরেজিনা ছাড়িয়ে, ভিল্না ছাড়িয়ে, আরও অনেক দূরে।

২৬শে অগস্ট সন্ধ্যায় কুতুজভ ও রুশবাহিনী ঠিক ঠিক বুঝতে পারল যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে। সেই সংবাদই কুতুজভ সম্রাটকে পাঠাল। শত্রুকে একেবারে খতম করতে সে নতুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে সেনাদলকে নির্দেশ দিল; কাউকে ঠকাবার জন্য সে একাজ করে নি, কিন্তু এই যুদ্ধে যোগদানকারী অন্য সকলের মতই সেও জানত যে শত্রুপক্ষ পরাস্ত হয়েছে।

কিন্তু সেদিন সারা সন্ধ্যায় এবং পরের দিন একের পর এক অশ্রুতপূর্ব ক্ষতির সংবাদ আসতে লাগল; খবর এল যে অর্ধেক সৈন্য নষ্ট হয়েছে; কাজেই নতুন করে যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আরও সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, আহতদের একজায়গায় করা হচ্ছে, নতুন করে রসদ সরবরাহ করা হচ্ছে, নিহতদের সংখ্যানিরূপিত হচ্ছে, নিহত অফিসারদের জায়গায় নতুন অফিসার নিয়োগ করা হচ্ছে, এবং সৈনিকদের উপযুক্ত খাদ্য ও ঘুমের ব্যবস্থা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করা অসম্ভব। এদিকে যুদ্ধের ঠিক পরদিন সকালেই ফরাসীবাহিনী নিজের গতিবেগের তাগিদেই রুশবাহিনীর দিকে এগিয়ে গেল, কুতুজভের মনেও আক্রমণের ইচ্ছা জাগল, আর গোটা বাহিনীরও সেই একই ইচ্ছা। কিন্তু একটা আক্রমণের জন্য ইচ্ছাটাই তো যথেষ্ট নয়, আক্রমণ করতে হলে তার সম্ভাবনাটা অন্তত থাকা চাই, কিন্তু সেই সম্ভাবনা তখন ছিল না। একটি দিনের পশ্চাদপসরণ স্থগিত রাখা তখন অসম্ভব, ঠিক সেই একইভাবে তার পরেরদিন এবং তৃতীয় দিনেও পশ্চাদপসরণ স্থগিত রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ল, এবং শেষ পর্যন্ত ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে সেনাবাহিনী যখন মস্কোর

কাছাকাছি পৌঁছল, তখনও সেনাদলের সর্বস্তরের মনোবল যতই শক্ত থাকুক ঘটনার চাপে তাকে মস্কো ছাড়িয়ে সরে যেতে হল। সেনাদল আরও একটা দিন পিছু হটে মস্কোকে শত্রুর হাতে ফেলে সরে গেল।

যে সমস্ত লোক ভাবতে অভ্যস্ত যে অভিযান ও যুদ্ধের নক্সা সেনাপতিরাই তৈরি করে থাকে—যেমন পড়ার ঘরে একটা মানচিত্র সামনে নিয়ে আমরাও কল্পনা করতে পারি একজন সেনাপতি এ-যুদ্ধ অথবা সে-যুদ্ধের কি ব্যবস্থা করবে—তাদের সামনে কিন্তু এই প্রশ্নগুলি দেখা দেয়: পশ্চাদপসরণের কালে কুতুজভ এটা বা ওটা করল না কেন? ফিলিতে পৌঁছবার আগেই কেন সে একটা ঘাঁটি স্থাপন করল না? মস্কোকে ফেলে রেখে কেন সে সঙ্গে সঙ্গেই কালুগা রোড ধরে হটে গেল না? ইত্যাদি। সেরকম ভাবতে অভ্যস্ত লোকরা ভুলে যায়, অথবা জানেই না, যে একজন প্রধান সেনাপতির কর্মধারা কতকগুলি অনিবার্য পরিস্থিতির দ্বারা সীমিত। আমরা মনে করি যে কোন একটি বিশেষ ঘটনা থেকেই একজন প্রধান সেনাপতির কাজ শুরু হয়, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। প্রধান সেনাপতিকে সবসময়ই থাকতে হয় নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি ঘটনাস্রোতের মাঝখানে, কাজেই কোন একটি মুহূর্তের ঘটনা পরিপূর্ণ তাৎপর্যকে সে ধরতে পারে না। প্রতিমুহূর্তে আমাদের অগোচরে ঘটনাটির রূপ বদলায়, আর সেই পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোতের মাঝখানে প্রতিটি মুহূর্তে প্রধান সেনাপতিকে কাটাতে হয় ষড়যন্ত্র, দুশ্চিন্তা, জরুরী অবস্থা, কর্তৃপক্ষ, পরিকল্পনা, ভীতি-প্রদর্শন ও প্রবঞ্চনার এক জটিল আবর্তের মধ্যে; পরস্পরবিরোধী অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর তাকে অনবরত দিতে হয়।

সামরিক পণ্ডিতরা বলে থাকেন, ফিলি পৌঁছবার আগেই তার সেনাদলকে কালুগা রোডে সরিয়ে নেওয়াই কুতুজভের উচিত ছিল; কেউ নাকি সেরকম প্রস্তাবও তার কাছে করেছিল। কিন্তু একজন প্রধান সেনাপতির কাছে তো একটি মাত্র প্রস্তাব থাকে না, থাকে ডজনখানেক প্রস্তাব; বিশেষ করে কোন সংকট-কালে তো কথাই নেই। আবার সেসব প্রস্তাবও সমর-কৌশলের দিক থেকে পরস্পরবিরোধীই হয়ে থাকে।

মনে হতে পারে যে সেই সব প্রস্তাবের ভিতর থেকে একটি বেছে নেওয়াই প্রধান সেনাপতির কাজ। কিন্তু তাও সে করতে পারে না। ঘটনা ও সময় তো বসে থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ২৮শে তারিখে তাকে বলা হল যে কালুগা রোড পার হয়ে যাওয়া হোক, কিন্তু ঠিক সেইমুহূর্তে একজন অ্যাডজুটাণ্ট মিলরাদভিচ থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে জানতে চাইল, সে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না পিছু হটে যাবে। সেইমুহূর্তেই তাকে একটা জবাব দিতে হবে। আর পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেওয়া মানেই কালুগা রোড পার হয়ে সরে যাওয়া। সেই অ্যাডজুটাণ্টের পরেই রসদ-সরবরাহ-অধ্যক্ষ এসে শুধাল,

খাদ্য-ভাণ্ডারকেও সঙ্গে নেওয়া হবে কিনা; হাসপাতালের প্রধান এসে জানতে চাইল, আহতদের কোথায় রাখা হবে; সংবাদবাহক পিতার্সবুর্গ থেকে সম্রাটের যে চিঠি নিয়ে এল তাতে দেখা গেল মস্কো ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব; প্রধান সেনাপতির যে প্রতিদ্বন্দ্বীটি সব সময় তাকে প্যাঁচে ফেলতে চেষ্টা করছে (মাত্র একটি নয়, সেরকম লোক বেশ কয়েকজন আছে) সে এমন একটা নতুন পরিকল্পনা এনে হাজির করল যেটা কালুগা রোডের দিকে যাবার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাছাড়া নিজের শক্তি বজায় রাখার জন্য প্রধান সেনাপতির নিজেরও তো আহার-নিদ্রার প্রয়োজন আছে। আছে আরও হরেক রকম ঝামেলা। একজন মাননীয় সেনাপতি এসে পুরস্কার-বিতরণের ব্যাপারে তাকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে নালিশ জানাল, জেলার অধিবাসীরা তাদের জন্য রক্ষা-ব্যবস্থার আবেদন করল, স্থানীয় অঞ্চল পরিদর্শন করে এসে জনৈক ইন্সপেক্টর যে প্রতিবেদন পেশ করল সেটা পূর্ববর্তী আর এক অফিসারের প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিপরীত; আর পর্যবেক্ষণরত গুপ্তচর কয়েদি ও সেনাপতি এসে শত্রুপক্ষের সেনাদলের অবস্থানের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দাখিল করল। একজন প্রধান সেনাপতির কাজের সমালোচনা করার সময় সাধারণ মানুষ এইসব অনিবার্য পরিস্থিতিকে ভুল বোঝে, অথবা ভুলেই যায়। তাই তারা বলতে পারে যে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রধান সেনাপতি স্বাধীনভাবেই স্থির করতে পারত মস্কো ত্যাগ করে যাওয়া হবে, না তাকে রক্ষা করা হবে। অথচ মস্কো থেকে চার মাইলেরও কম দূরত্বে অবস্থিত রুশ বাহিনীর সামনে সে-রকম কোন প্রশ্নই ছিল না। সে প্রশ্নের মীমাংসা হল কখন? ত্রিসাতে, স্মোলেন্স্ক-এ, সব চাইতে স্পষ্টভাবে ২৪শে অগস্ট শেভার্দিনোতে আর ২৪শে তারিখে বরদিনোতে এবং বরদিনো থেকে ফিলিতে পশ্চাদপসরণের কালে প্রতিটি দিনে, প্রতিটি ঘণ্টায় ও প্রতিটি মিনিটে।

অধ্যায়—৩

কুতুজভ এর্মোলভকে পাঠিয়েছিল ঘাঁটি পরিদর্শনে; সে যখন ফিরে এসে ফিল্ড-মার্শালকে জানাল যে মস্কোর আগে সেখানে যুদ্ধ করা অসম্ভব, তাদের পশ্চাদপসরণ করতেই হবে, তখন কুতুজভ নীরবে তার দিকে তাকাল।

"তোমার হাতটা দাও তো," বলে তার নাড়ি দেখে কুতুজভ বলল, "তুমি তো সুস্থ নও হে। কি বলছ ভাল করে ভেবে দেখ।"

বিনা যুদ্ধে মস্কো থেকে পিছু হটে যাবার সম্ভাবনাকে কুতুজভ মেনে নিতে পারল না।

মস্কোর দর্গমিলভ ফটক থেকে চার মাইল দূরবর্তী পক্লোনি পাহাড়ের উপর কুতুজভ গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ল।

সেনাপতিদের এক বড় দল তাকে ঘিরে ধরল ; মস্কো থেকে এসে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তাদের সঙ্গে যোগ দিল। দলে দলে ভাগ হয়ে তারা বর্তমান পরিস্থিতির সুবিধা ও অসুবিধা, সেনাদলের অবস্থা, বিভিন্ন পরিকল্পনা, মস্কোর অবস্থা, এবং সাধারণভাবে যুদ্ধসংক্রান্ত সমস্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল। যদিও এই উদ্দেশ্যে তাদের ডাকা হয় নি, যদিও কোন সভাও ডাকা হয় নি, তবু তাদের সকলেরই এটাকে একটা সমর-পরিষদ বলেই মনে হল। সবকিছু নিয়েই প্রকাশ্য আলোচনা চলল। কেউ কোন ব্যক্তিগত সংবাদ দিলে বা চাইলে তা ফিস্‌ ফিস্‌ করে শেষ করেই আবার সাধারণ আলোচনায় ফিরে গেল। কারও মুখে তামাশার কথা নেই, উচ্চহাসি নেই, এমন কি মৃদু হাসিও নেই। অবস্থানুযায়ী সকলেই বেশ গম্ভীর। আলোচনার সময় বিভিন্ন দল প্রধান সেনাপতির বেঞ্চিটার কাছাকাছিই রইল, যাতে সব কথা সে শুনতে পায়। প্রধান সেনাপতিও মন দিয়ে তাদের কথা শুনতে লাগল, মাঝে মাঝে তাদের কথাগুলি আবার বলতে বলল, কিন্তু নিজে কোন আলোচনায় অংশ নিল না, অথবা কোন মতামতও প্রকাশ করল না।… কুতুজভের মুখের ভাব ক্রমেই গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠতে লাগল। এইসব আলোচনা থেকে একটা কথাই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল : একেবারে আক্ষরিক অর্থেই মস্কো রক্ষা করা অসম্ভব ; অর্থাৎ কোন বুদ্ধিহীন সেনাপতি যদি যুদ্ধের হুকুম দেয় তাহলে গোলমালের সৃষ্টি হবে, কিন্তু যুদ্ধ হবে না। যুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব জেনেও সেনাপতি কেমন করে তাদের সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাবে ? যদিও বেনিংসেন তখনও মস্কো রক্ষার পক্ষপাতী এবং অন্যরা তাই নিয়ে আলোচনা করছে, তবু সমস্যাটা বিরোধ ও ষড়যন্ত্রের একটা ওজুহাত ছাড়া আর কিছুই নয়। কুতুজভ সেটা ভালই জানে।

বেনিংসেন রুশ দেশপ্রেমের প্রকাশ হিসাবে তখনও মস্কো রক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। তার উদ্দেশ্যটা কিন্তু কুতুজভের কাছে দিনের আলোর মত পরিষ্কার : প্রতিরোধব্যবস্থা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে বিনা যুদ্ধে সেনাবাহিনীকে স্প্যারো হিলস্‌ পর্যন্ত নিয়ে আসার সব দোষ কুতুজভের মাথায় চাপিয়ে দেবে ; যদি সফল হয় তাহলে কৃতিত্বটা সে নিজেই দাবী করবে ; আর যদি যুদ্ধটা একেবারেই না হয় তাহলে মস্কো ছেড়ে যাবার অপরাধ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। কিন্তু সে ষড়যন্ত্রের কথা এখন বুড়ো মানুষটির মনে স্থান পেল না। একটিমাত্র ভয়ংকর প্রশ্নই তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে, কিন্তু কারও কাছ থেকেই সে প্রশ্নের জবাব সে শুনতে পায় নি। তার প্রশ্নটি হল : "সত্যি কি আমিই নেপোলিয়নকে মস্কো আসতে দিয়েছি, কিন্তু সে কখন ? কখন সে সিদ্ধান্ত নিলাম ? গতকাল যখন প্লাতভকে পিছু হটবার হুকুম দিয়েছিলাম তখন কি ? অথবা আগের দিন সন্ধ্যায় যখন বেনিংসেনকে হুকুম জারি করতে বলে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন ? নাকি আরও

আগে ? ...এই ভয়ংকর ব্যাপারটা কখন স্থির হয়েছিল। মস্কো ছেড়ে চলে যেতেই হবে। সেনাবাহিনীকে পিছু হঠতে হবেই। আর সে হুকুম দিতেই হবে।" কিন্তু এই ভয়ংকর হুকুম দেওয়া তো সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব থেকে পদত্যাগ করারই সামিল। কিন্তু তাতো করা যায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস একমাত্র সেই পারবে রাশিয়াকে রক্ষা করতে, আর তাই সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং জনগণের ইচ্ছায় তাকে প্রধান সেনাপতি মনোনীত করা হয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এই কঠিন পরিস্থিতিতে একমাত্র সেই পারে সেনাবাহিনীকে পরিচালনার দায়িত্ব নিতে এবং সারা বিশ্বে একমাত্র সেই পারে নির্ভয়ে অপরাজেয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ; আর তাই সেই হুকুমটা জারি করার কথা ভাবতেই সে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু একটা কিছু তো করতেই হবে, আর তার চারদিকের আলোচনা যেরকম নিরঙ্কুশ হয়ে উঠছে তাতে এখনই এসব থামাতে হবে।

কয়েকজন জাঁদরেল সেনাপতিকে সে কাছে ডাকল।

"ভাল হোক মন্দ হোক আমার মাথাটাকে নিজের উপরেই নির্ভর করতে হবে।" বেঞ্চি থেকে উঠে এই কথা বলে সে ফিলির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল ; সেখানেই তার গাড়ি অপেক্ষা করছে।

অধ্যায়—৪

আন্দ্রু সাভস্তিয়ানভ-এর কুঁড়ে ঘরের একটা অপেক্ষাকৃত ভাল ও বড় অংশে ছটোর সময় সমর-পরিষদের সভা বসল। বস্তু বড় চাষী-পরিবারের পুরুষ, নারী ও বাচ্চারা বারান্দার ওপারে পিছনের ঘরটাতে ভিড় করল। শুধু আন্দ্রুর ছয় বছরের নাতনি—প্রশান্ত মহামহিম নিজেই যার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছে এবং চা খাবার সময় যাকে একটুকরো চিনিও দিয়েছে—সেই মলাশা রইল বড় ঘরটার ইটের উনুনের উপর। উনুনটার উপর থেকেই মলাশা সলজ্জ আনন্দের সঙ্গে সেনাপতিদের মুখ, ইউনিফর্ম ও নানারকম সম্মান-ভূষণের দিকে তাকাতে লাগল ; তারা সকলেই ঘরের কোণে দেবমূর্তির নীচে চওড়া বেঞ্চিগুলোতে বসেছে। আর "বুড়ো দাদু" স্বয়ং—মলাশা মনে মনে কুতুজভকে ওই নামেই ডাকে—আলাদা হয়ে বসেছে উনুনের পিছনে অন্ধকারের মধ্যে। একটা ভাঁজ-করা হাতল-চেয়ারে সে একেবারে ডুবে বসেছে, অনবরত গলা ঝাড়ছে, আর বোতাম-খোলা কলারটা টানছে। যারা ঘরে ঢুকছে তারাই একে একে ফিল্ড-মার্শালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ; সে কারও হাতটা চেপে ধরছে, আবার কারও দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ছে। তার অ্যাডজুটান্ট কেসারভ কুতুজভের সামনেকার জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে রেগে হাতটা নাড়াতেই কেসারভ বুঝতে পারল প্রশান্ত মহামহিম চান যে তার মুখটা দেখা যাক।

একে একে সভায় হাজির হল এর্মোলভ, কেসারভ, ও তল্; সকলের সামনে বসেছে বার্কলে দ্য তলি। তার গলায় ঝুলছে সেণ্ট জর্জের ক্রস্; মুখটা ম্লান ও অসুস্থ; দু'দিন যাবৎ জ্বর হচ্ছে; এখানে শীতে কাঁপছে। তার পাশেই উভারভ ও ছোটখাট দখ্‌তুরভ। অপরদিকে বসে আছে কাউণ্ট অস্তারম্যানতলস্তয়; নিজের চিন্তায়ই মগ্ন। রায়েভ্‌স্কি একবার কুতুজভের দিকে একবার দরজার দিকে অধৈর্য হয়ে তাকাচ্ছে। কনভ্‌নিৎসিন-এর একটা নরম ধূর্ত হাসি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট মলাশার মুখেও হাসি দেখা দিল।

সকলেই বেনিংসেনের জন্য অপেক্ষা করছে। ঘাঁটি পরিদর্শনের অজুহাতে সে আচ্ছা খানাটা শেষ করতে ব্যস্ত রয়েছে। চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত সকলে তার জন্য অপেক্ষা করল; কোনরকম আলোচনা শুরু হল না।

বেনিংসেন কুড়ে ঘরে ঢুকলে তবে কুতুজভ তার কোণটা ছেড়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে এল, কিন্তু পাছে মোমবাতির আলো মুখে পড়ে তাই বেশী কাছে এল না।

একটি প্রশ্ন দিয়েই বেনিংসেন পরিষদের সভা শুরু করল: "আমরা কি বিনা যুদ্ধে রাশিয়ার প্রাচীন ও পবিত্র রাজধানী ছেড়ে যাব, না কি তাকে রক্ষা করব?" অনেকক্ষণ সকলেই চুপচাপ। সকলেরই মুখ ভ্রূকুটিকুটিল; শুধু কুতুজভের ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ ও কাশির দমক সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। সকলের চোখই তার উপর নিবদ্ধ। মলাশাও "বুড়ো দাদু"র দিকে তাকাল।

বেনিংসেনের কথাগুলির ক্রুদ্ধ প্রতিধ্বনি করে হঠাৎ সে বলে উঠল, "রাশিয়ার প্রাচীন ও পবিত্র রাজধানী! আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই ইয়োর এক্সেলেন্সি যে একজন রুশের কাছে এ প্রশ্নের কোন অর্থই নেই। (শরীরটাকে সে সামনের দিকে একটু ঝুঁকিয়ে দিল।) এ প্রশ্ন তোলাই যেতে পারে না, এটা অর্থহীন। যে প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার জন্য এই ভদ্রলোকদের এখানে ডেকেছি সেটা সামরিক প্রশ্ন। রাশিয়াকে রক্ষা করার প্রশ্ন। বিনা যুদ্ধে মস্কো ছেড়ে দেওয়াই ভাল, না কি একটা যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সেনাবাহিনী এবং মস্কো দুটোই হারাবার ঝুঁকি নেওয়া ভাল? সেই প্রশ্ন সম্পর্কে আমি আপনার অভিমত চাই।" কুতুজভ আবার চেয়ারে ডুবে গেল।

আলোচনা শুরু হল। বেনিংসেন তখন ভাবে নি যে খেলায় তার হার হয়েছে। ফিলিতে একটা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ যে অসম্ভব বার্কলে ও অন্যান্য-দের এই অভিমত স্বীকার করে নিয়েও রুশ দেশপ্রেম ও মস্কো-প্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে প্রস্তাব করল, রাতারাতি সৈন্যদের ডান দিক থেকে বাঁ দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক, আর পরদিন ফরাসীদের দক্ষিণ ব্যূহকে আক্রমণ করা হোক। দেখা দিল মত-বিরোধ; স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক যুক্তি দেখানো হল। সবকিছু দেখে শুনে মলাশা কিন্তু পরিষদ কথাটার একটা ভিন্ন

অর্থই বুঝল। তার মনে হল এটা যেন "বুড়ো দাদু" ও "লম্বাকোট" এর (অর্থাৎ বেনিংসেনের) মধ্যে একটা ব্যক্তিগত ঝগড়ামাত্র। কথা বলতে বলতে তারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছে; অবশ্য মনে মনে সে "বুড়ো দাদু"র পক্ষেই রইল।

কুতুজভ বলল, "ভদ্রজন, কাউণ্টের এই পরিকল্পনা আমি সমর্থন করতে পারি না। শত্রুপক্ষের খুব কাছাকাছি থেকে সৈন্য পরিচালনা করাটা সব-সময়ই বিপজ্জনক; সামরিক ইতিহাসে এই মতের সমর্থন মিলবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ·····" দৃষ্টান্তের খোঁজে কুতুজভ একটু থেমে কিছু ভাবল; তারপর বেনিংসেনের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, "হ্যাঁ হয়েছে; ফ্রিড্‌ল্যাণ্ডের যুদ্ধের কথাই ধরা যাক; কাউণ্টের নিশ্চয় স্মরণ আছে যে সে যুদ্ধটা···যে পুরোপুরি সফল হয় নি তার একমাত্র কারণ আমাদের সৈন্যকে নতুন করে সাজানো হয়েছিল শত্রুপক্ষের বড় বেশী নিকটে·····"

তারপর ক্ষণিকের নীরবতা; কিন্তু সকলেরই মনে হল সে নীরবতা বড়ই দীর্ঘ।

আলোচনা নতুন করে শুরু হল, কিন্তু মাঝে মাঝেই থেমে গেল; সকলেই বুঝল যে আর বেশী কিছু বলার নেই।

একটা বিরতির সময় যেন কথা বলার জন্য প্রস্তুত হতেই কুতুজভ বড় করে একটা শ্বাস টানল। সকলে তার দিকে তাকাল।

"দেখুন ভদ্রজন, দেখছি যে ভাঙা বাসনপত্রের দাম আমাকেই দিতে হবে।" কথাটা বলে সে ধীরে ধীরে চেয়ার থেকে উঠে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। "ভদ্রজন, আপনাদের অভিমত শুনলাম। আপনারা কেউ কেউ আমার সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু আমার সরকার ও আমার দেশ আমাকে যে কর্তৃত্ব দিয়েছে তার বলে আমি পশ্চাদপসরণের হুকুম দিলাম।"

একথার পরে যে গাম্ভীর্য ও নীরবতার সঙ্গে সেনাপতিরা সেখান থেকে সরে পড়তে লাগল তা দেখে মনে হল যেন একটা শোকযাত্রা শেষ হয়েছে।

মলাশা অনেকক্ষণ থেকেই রাতের খাবারের জন্য অপেক্ষা করছিল; উনুনের পিছন দিক দিয়ে সতর্কভাবে নেমে সেনাপতিদের পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেনাপতিদের বিদায় দিয়ে টেবিলের উপর কনুই দুটো রেখে কুতুজভ অনেকক্ষণ বসে রইল; তার মনে সেই একই ভয়ংকর চিন্তা: "কখন, কখন মস্কো ছেড়ে যাওয়াটা অনিবার্য হয়ে উঠল? এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা কখন নেওয়া হল? এজন্য কে দোষী?"

অনেক রাতে অ্যাডজুটাণ্ট শ্নিদার এসে তাকে বলল, "আমি তো এটা আশা করি নি; এরকম যে ঘটবে তা তো ভাবি নি।"

"আপনার একটু বিশ্রাম নেওয়া উচিত প্রশান্ত মহামহিম," শ্নিদার বলল।

“কিন্তু না! তুর্কীদের মত এখনও যে তাদের ঘোড়ার মাংস খাওয়াটা বাকি আছে!” মোটা মুঠি দিয়ে টেবিলের উপর সজোরে আঘাত করে কুতুজভ সোচ্চারে বলে উঠল। “তাই তাদের খেতে হবে, শুধু যদি……”

অধ্যায়—৫

ঠিক সেই সময়ে বিনাযুদ্ধে পশ্চাদপসরণের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ মস্কো থেকে লোকাপসরণ ও মস্কো-দহন যখন চলছে সেই ঘটনার মূল উস্কানিদাতা হয়েও রস্তপ্‌চিনের আচরণ কিন্তু তখন চলেছে কুতুজভ থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে।

বরদিনোর যুদ্ধের পরে বিনাযুদ্ধে মস্কো থেকে সৈন্য অপসারণ যেমন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততখানি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল মস্কো পরিত্যাগ ও মস্কো-দহন।

কোনরকম যুক্তি দিয়ে নয়, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং আমাদের পিতৃপুরুষের মধ্যে যে অনুভূতি নিহিত রয়েছে তার অনুপ্রেরণাতেই প্রতিটি রুশ এটা ভবিষ্যবাণী করতে পারত।

মস্কোতে যা ঘটেছে স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে শুরু করে রাশিয়ার সব শহরে ও গ্রামেও তাই ঘটেছে, অথচ রস্তপ্‌চিন তার ইস্তাহার নিয়ে কোথাও যুদ্ধে নামে নি। নিরাসক্তভাবেই সাধারণ মানুষ শত্রুর জন্য অপেক্ষা করেছে, কোনরকম হাঙ্গামা করে নি বা পরস্পর খেয়োখেয়ি করে নি, সংকট-মুহূর্তেও ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শত্রু কাছাকাছি এসে পড়লেই ধনীরা বিষয়-সম্পত্তি ফেলে পালিয়েছে আর গরীবরা সেখানেই থেকে গেছে এবং যা কিছু ছিল সব পুড়িয়ে দিয়েছে, ধ্বংস করেছে।

এটাই যে ঘটবে, চিরকালই ঘটবে, প্রতিটি রুশ মানুষের মনে সেই ধারণাই ছিল এবং আজও আছে। এই চেতনা এবং মস্কো বেদখল হবার একটা আশংকা ১৮১২ সালের মস্কোর রুশ সমাজের মনে ছিল। জুলাইতে এবং অগস্টের শুরুতে যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারাই প্রমাণ করেছে যে এরকম একটা আশংকা তাদের ছিল।

তাদের বলা হয়েছিল, “বিপদ থেকে পালিয়ে যাওয়া লজ্জার ব্যাপার; একমাত্র ভীরুরাই মস্কো থেকে পালাচ্ছে।” রস্তপ্‌চিন তার সৈন্যদের বুঝিয়েছে যে মস্কো ছেড়ে যাওয়াটা লজ্জার ব্যাপার। ভীরু বদনাম নিতে তারা লজ্জা বোধ করত, মস্কো ছেড়ে যেতে তারা লজ্জা পেত, তবু তারা মস্কো ছেড়ে গিয়েছিল কারণ তারা জানত যে তাছাড়া উপায় নেই। কেন তারা গেল? একথা মনে করা অসম্ভব যে বিজিত দেশসমূহে নেপোলিয়ন যে ত্রাসের সঞ্চার করেছে তার বিবরণ শুনিয়ে রস্তপ্‌চিন তার সৈন্যদের ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। সর্বপ্রথম যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা সকলেই শিক্ষিত

ও ধনী মানুষ; তারা তো ভাল করেই জানত যে ভিয়েনা ও বার্লিন এখনও অক্ষতই রয়েছে, নেপোলিয়নের দখলে থাকার সময় সেখানকার অধিবাসীরা তো মনোহর ফরাসীদের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ মনের সুখেই দিন কাটিয়েছে; রুশরা, বিশেষ করে রুশ মহিলারা তো তখন ফরাসীদের খুবই পছন্দ করত।

তারা চলে গিয়েছিল কারণ মস্কোতে ফরাসী শাসন চললে অবস্থা ভাল হবে কি মন্দ হবে সে প্রশ্নই তাদের মনে আসে নি। ফরাসী শাসনাধীনে থাকার প্রশ্নই ওঠে না, সেটাই তো সবচাইতে শোচনীয় অবস্থা। বরদিনোর যুদ্ধের আগেই তারা চলে গিয়েছিল, যুদ্ধের পরে তো তাদের গতি আরও বেড়ে গিয়েছিল, যদিও রস্তপ্‌চিন মস্কো রক্ষার আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছিল যে আইবেরীয় ঈশ্বর-জননীর অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবমূর্তিকে সঙ্গে নিয়েই যুদ্ধযাত্রা করা হবে, এমন একটা বেলুন আকাশে ওড়ানো হবে যা ফরাসীদের ধ্বংস করে ফেলবে; এছাড়া আরও অনেক আজেবাজে কথাই তার ইস্তাহারে লেখা হয়েছিল। তারা জানত যুদ্ধ যা করবার সৈন্যরাই করবে; আর তারা যদি সফল না হয় তাহলে তরুণী মহিলাদের ও গৃহ-ভৃত্যদের মস্কোর তিন পাহাড়ে নিয়ে গিয়ে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে লড়াই করালে তাতে কোন লাভ হবে না; কাজেই তাদের সব বিষয়সম্পত্তি শত্রুর হাতে ফেলে যেতে যত দুঃখই হোক, যেতে তাদের হবেই। এত বড় একটা সম্পদশালী নগরীকে ধ্বংস হবার জন্য শত্রুর হাতে ফেলে যাবার ভয়ংকর তাৎপর্যের কথা তারা একবারও ভাবল না, কারণ কাঠের অট্টালিকায় সমৃদ্ধ এত বড় একটা নগরী শত্রুর হাতে পরিত্যক্ত হলে তাকে তো অতি অবশ্যই পুড়িয়ে ফেলা হবে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিচার-বিবেচনা মতই চলে গেল, অথচ তারা চলে গিয়েছিল বলেই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটতে পেরেছিল যেটা চিরকালের মত রুশ জনগণের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের স্মারক হয়ে থাকবে। পাছে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের হুকুমে আটকা পড়ে যেতে হয় এই ভয়ে যে মহিলাটি জুন মাসেই তার নিগ্রো দাসদাসী ও নারী-ভাঁড়দের সঙ্গে নিয়ে এই ভেবে মস্কো থেকে তার সরাতভ জমিদারিতে চলে গিয়েছিল যে সে তো নেপোলিয়নের চাকরানি নয়, আসলে কিন্তু সেই মহিলাটিই সত্যি সত্যি এমন একটা মহৎ কর্ম করেছিল যার ফলে বেঁচে গিয়েছিল সারা রাশিয়া দেশটা। আর কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তো এই যারা মস্কো ছেড়ে যাচ্ছে তাদের ঠাট্টা করছে, আবার নিজেই সরকারী আপিস সরিয়ে নিচ্ছে; একবার যত রাজ্যের মাতালদের ধরে এনে তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে যত সব অকেজো অস্ত্রশস্ত্র, আবার দেবমূর্তিসহ শোভাযাত্রা বের করছে, নয় তো ফাদার অগাস্তিনকে দেবমূর্তি এবং সন্তদের স্মৃতি-চিহ্ন সরাতে নিষেধ করছে; মস্কোর সব ব্যক্তিগত গাড়ি আটক করে যে বেলুনটা লেপ্‌পিচ্‌ তৈরি করছে একশ' ছত্রিশটা গাড়িতে করে সেটাকে বয়ে আনছে; কখনও বা মস্কোতে আগুন ধরিয়ে

দেবার ইঙ্গিত করে বলছে যে সে তার নিজের বাড়িতে আগুন ধরিয়েছে; কখনও বা তার অনাথ আশ্রমটি ধ্বংস করার জন্য তীব্র নিন্দা করে ফরাসীদের কাছে চিঠি লিখছে; আবার কখনও মস্কো পুড়িয়ে দেবে বলে বড়াই করে পরক্ষণেই সে কাজের নিন্দা করছে; কখনও হুকুম দিচ্ছে সব গুপ্তচরদের তার কাছে এনে হাজির করা হোক, আবার কখনও সেকাজ করার জন্য লোকজনদের তিরস্কার করছে; একবার সব ফরাসী অধিবাসীদের মস্কো থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আবার মস্কোতে গোটা ফরাসী উপনিবেশের কেন্দ্রমণি মাদাম অবার্ত চামেকে থাকবার অনুমতি দিচ্ছে, কিন্তু পরক্ষণেই শ্রদ্ধের প্রবীণ পোস্ট-মাস্টার ক্লিউচারভেকে বিনা দোষে গ্রেপ্তার করে নির্বাসিত করার হুকুম দিচ্ছে; এই ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য লোকজনদের তিন পাহাড়ে সমবেত করছে, আবার একটি লোককে খুন করবার জন্য তাদের হাতে তুলে দিয়ে পিছনের ফটক দিয়ে নিজেই সরে পড়ছে; একবার ঘোষণা করছে যে মস্কোর পতন হলে সেও আর বেঁচে থাকবে না, আবার যুদ্ধের ব্যাপারে তার নিজের মনোভাব নিয়ে অ্যালবামে কবিতা লিখছে ফরাসী ভাষায় ("জন্মেছিলাম তাতার হয়ে,/হতে চেয়েছিলাম রোমান,/ফরাসীরা আমাকে বলত বর্বর,/আর রুশরা—জর্জেস্ দাঁদ"—(জর্জেস্ দাঁদ মলিয়েরের নাটকের একটি প্রধান চরিত্র) —কি যে ঘটছে তার কিছুই এই লোকটি বুঝত না, সে শুধু চাইত এমন কিছু করতে যাতে লোককে অবাক করে দেওয়া যায়, চাইত দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ কোন বীরত্বপূর্ণ কাজ করতে; ছোট ছেলের মতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনিবার্য ঘটনা নিয়ে ছেলেখেলা করতে—মস্কো ত্যাগ করে তাকে জ্বালিয়ে দিতে—আর সর্বদা চেষ্টা করত তার দুর্বল হাতে জনমতের প্রচণ্ড স্রোতকে কখনও দ্রুততর করতে, আবার কখনও আটকে দিতে, অথচ নিজেই ভেসে যেত সেই স্রোতের টানে।

অধ্যায়—৬

দরবারের সঙ্গে ভিল্‌না থেকে পিতার্সবুর্গে ফিরে হেলেন খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়ল। পিতার্সবুর্গে থাকতে সাম্রাজ্যের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত জনৈক গণ্যমান্য ব্যক্তির বিশেষ অনুগ্রহ সে পেত। ভিল্‌নাতে থাকার সময় একজন তরুণ বিদেশী প্রিন্সের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। সে যখন পিতার্সবুর্গে ফিরে এল তখন সেই গণ্যমান্য ব্যক্তিটি এবং প্রিন্স দুজনই সেখানে উপস্থিত, আর দুজনই নিজ নিজ অধিকারে অটল। হেলেনের সামনে দেখা দিল নতুন সমস্যা—কাউকে আঘাত না দিয়ে কেমন করে দুজনের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখা যায়।

অন্য যেকোন নারীর পক্ষে যেটা কঠিন, এমন কি অসম্ভব বলে মনে হতে পারত কাউন্টেস বেজুখভা কিন্তু তাতে মোটেই বিচলিত বোধ করল না;

অত্যন্ত চতুরা নারী হিসাবে তার যে খ্যাতি আছে সেটা অকারণে নয়। সে যদি লুকোছাপা করত, অথবা কৌশলে এই অসুবিধাজনক অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে চাইত, তাহলে পরোক্ষে নিজের দোষ স্বীকার করে সে নিজেরই বিপদ ডেকে আনত। কিন্তু যে কোন মহাপুরুষের মতই হেলেনও খুশিমত কাজ করতে পারে; তাই সে এমন একটা ভাব দেখাতে শুরু করল যেন সে ঠিক কাজই করছে, আর দোষ যা কিছু তা অন্যরা করছে।

তরুণী বিদেশীটি যেদিন প্রথম তাকে তিরস্কার করল সেইদিনই সুন্দর মাথাটি তুলে একটুখানি ঘুরে দৃঢ়স্বরে বলল:

"পুরুষের উপযুক্ত কথাই বটে—যেমন স্বার্থপর, তেমনই নিষ্ঠুর! অন্য কিছু আমি আশাও করি নি। একটি নারী আপনার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছে, কষ্ট ভোগ করছে, আর এই তার পুরস্কার! আমার অনুরাগ ও বন্ধুত্বের জবাবদিহি দাবী করবার কি অধিকার আপনার আছে মঁসিয়? সেই মানুষটি আমার কাছে বাবার চাইতেও বেশী!"

প্রিন্স কি যেন বলতে যাচ্ছিল, হেলেন তাকে বাধা দিল।

বলল, "দেখুন, হতে পারে তিনি পিতৃসুলভ মনোভাব ছাড়াও আমার প্রতি অন্য কোন মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু সেজন্য তো তার সামনে আমার বাড়ির দরজাটা বন্ধ করে দিতে পারি না। আমি তো পুরুষ নই যে অকৃতজ্ঞতা দিয়ে দয়ার ঋণ শোধ করব! একটা কথা জেনে রাখুন মঁসিয়, আমার অন্তরে যেসব গভীর কথা আছে তার জন্য একমাত্র ঈশ্বর ও বিবেকের কাছেই আমি জবাবদিহি করে থাকি," আকাশের দিকে চোখ রেখে নিজের সুন্দর, উদ্ধত বুকের উপর হাত রেখে সে কথা শেষ করল।

"কিন্তু ঈশ্বরের দোহাই, আপনি আমার কথাটাও শুনুন।"

"আমাকে বিয়ে কর, আমি তোমার দাস হয়ে থাকব!"

"কিন্তু সে তো অসম্ভব!"

"আমাকে বিয়ে করে আপনি নিজেকে ছোট করতে পারেন না, আপনি····" হেলেন কেঁদে ফেলল।

প্রিন্স তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু হেলেন হতবুদ্ধির মত কাঁদতে কাঁদতে বলল যে তার বিয়ের পথে তো কোন বাধা থাকতে পারে না, এরকম ঘটনা তো আগেও ঘটেছে (তৎকালে এরকম ঘটনা খুব কমই ছিল, কিন্তু সে নেপোলিয়ন ও আরও কয়েকজন পদস্থ লোকের নাম করল), সে কখনও তার স্বামীর স্ত্রী হতে পারে নি, তাকে একেবারে বলি দেওয়া হয়েছে।

প্রায় বশংবদ হয়েই প্রিন্স বলল, "কিন্তু আইন, ধর্ম····"

"আইন, ধর্ম····এই ব্যবস্থাটাই যদি তারা না করতে পারে তাহলে কিসের জন্য তাদের আবিষ্কার করা হয়েছে?" হেলেন বলল।

এইরকম একটা সহজ কথা তার মনে আসে নি দেখে প্রিন্স অবাক হয়ে

গেল; যীশু সমিতির পবিত্র দাদাদের কাছে সে পরামর্শ চাইল; তাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কয়েকদিন পরে হেলেন তার স্টোন আইল্যাণ্ডের পল্লীভবনে যে চমৎকার ভোজ-উৎসবের আয়োজন করল সেখানে এসে হাজির হল মঁসিয় দ্য যোবার্ত। যৌবনোত্তর এই মনোরম মানুষটির মাথাভর্তি বরফ-সাদা চুল, চোখ দুটি উজ্জ্বল কালো, পরনে ভ্রমণের পোশাক। আলোকিত বাগানে বাজনা শুনতে শুনতে যেসুইট ভদ্রলোকটি হেলেনকে বোঝাল ঈশ্বরের প্রতি, খৃস্টের প্রতি, পবিত্র অন্তরের প্রতি ভালবাসার কথা, এবং এ জগতে ও পরলোকে একমাত্র ক্যাথলিক ধর্ম যে সান্ত্বনা দিতে পারে তার কথা। হেলেন অভিভূত হল, একাধিকবার তার চোখে এবং মঁসিয় দ্য যোবার্তের চোখে জল এল, তাদের গলা কাঁপতে লাগল। এমন সময় নৃত্য-সঙ্গীটি এসে পড়ায় হেলেনের ভবিষ্যৎ বিবেক-রক্ষকের সঙ্গে আলোচনায় ছেদ পড়ল; কিন্তু পরদিন সন্ধ্যায় মঁসিয় দ্য যোবার্ত আবার এল হেলেনের সঙ্গে নিভৃতে দেখা করতে, এবং তারপরে প্রায়ই আসতে লাগল।

একদিন সে কাউণ্টেসকে একটা রোমান ক্যাথলিক গির্জায় নিয়ে গেল; সেখানে সে বেদীর সামনে নতজানু হয়ে বসল। মধ্যবয়সী মনোরম ফরাসী ভদ্রলোকটি তার মাথায় হাত রাখল, আর—পরবর্তীকালে হেলেনই বলেছে—তার মনে হল একটা মৃদু হাওয়া যেন তার অন্তরকে স্পর্শ করল। তাকে বলা হল যে এটাই মহতী করুণা।

তারপরে একজন লম্বা ফ্রক-পরা পাদ্রিকে তার কাছে আনা হল। তার কাছে হেলেন সব অপরাধের কথা বলল, আর পাদরিও তাকে সব পাপ থেকে মুক্তি দিল। কয়েকদিন পরেই হেলেন জেনে খুশি হল যে আসল ক্যাথলিক গির্জায় তাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছে, আর কয়েকদিনের মধ্যেই পোপ স্বয়ং তার কথা শুনতে পাবে এবং তাকে একটা বিশেষ দলিল পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু চাতুরির খেলায় যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে যে একজন বোকাও চতুরতর লোকের উপর টেক্কা মারে, তেমনই হেলেনও বুঝতে পারল যে এসব কিছুরই প্রধান উদ্দেশ্য হল তাকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করে যেসুইট প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য অর্থ আদায় করা, আর তাই সেও জিদ ধরে বসল যে টাকা পয়সা দেবার আগেই স্বামীর কাছ থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি নেওয়া হোক। তার মতে, মানুষের কামনা-বাসনাকে পরিতুষ্ট করে কতকগুলি সম্পত্তি রক্ষা করাই হল সব ধর্মের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যকে মনে রেখেই একদা তার ধর্ম-পিতার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে সে প্রশ্ন করে বসল, তার বিয়েটা তার পক্ষে কতটা বাধ্যতামূলক?

গোধুলির আলোয় তারা দুজন বসে ছিল বৈঠকখানার জানালার ধারে।

জানালা দিয়ে ভেসে আসছে ফুলের গন্ধ। হেলেন যে সাদা পোশাকটি পরে আছে তার ভিতর দিয়ে তার কাঁধ ও বুক স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ভাল ভাল খাওয়া-পরার ফলে পাদরিটির চেহারা বেশ গোলগাল, চিবুকটি পরিষ্কার করে কামানো, মনোরম কঠিন মুখ, দুখানি সাদা হাত হাঁটুর উপর ভাঁজ করা; সে হেলেনের খুব কাছাকাছি বসেছে, ঠোঁটে ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম হাসির রেখা, শান্ত ও সানন্দ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে হেলেনের রূপ, আর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিজের মতামত বোঝাতে বোঝাতে মাঝে মাঝেই তার মুখের দিকে তাকাচ্ছে। হেলেনও একটা অস্বস্তিকর হাসির সঙ্গে তাকিয়ে আছে তার কোঁকড়া চুল ও পরিষ্কার করে কামানো ফোলা-ফোলা ঈষৎ কৃষ্ণাভ থুত্‌নির দিকে, আর প্রতিমুহূর্তেই আশা করছে যে আলোচনাটা একটা নতুন মোড় নেবে। কিন্তু সঙ্গিনীটির রূপ-সুধা পান করতে থাকলেও পাদরিটি কিন্তু নিজের আলোচনার মধ্যেই ডুবে রইল।

সেসব কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে হেলেন হঠাৎ মোহময়ী হাসি হেসে বলে উঠল: "কিন্তু আমি মনে করি, একটি মিথ্যা ধর্ম যে বন্ধন আমার উপর আরোপ করেছিল সৎ ধর্মকে বরণ করার পরে তা আর আমাকে বেঁধে রাখতে পারে না।"

এইভাবে কলম্বাসের ডিমের মত সরলতার সঙ্গে ব্যাপারটাকে তার সামনে উপস্থিত করায় হেলেনের বিবেক-রক্ষকটি অবাক হয়ে গেল। ছাত্রীটির এই অপ্রত্যাশিত দ্রুত উন্নতি দেখে সে খুশি হল, কিন্তু অনেক-পরিশ্রম করে বিতর্কের যে সৌধটি সে গড়ে তুলেছে তাকেও পরিত্যাগ করতে পারল না।

"আগে আমাদের পরস্পরকে বুঝতে দিন কাউন্টেস," হেসে কথাটা বলে পাদরি আবার তার মানসকন্যার যুক্তিকে খণ্ডন করতে শুরু করল।

অধ্যায়—৭

হেলেন বুঝতে পারল, যাজকীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা খুবই সরল ও সহজ; তার পরিচালকরা যে অসুবিধার সৃষ্টি করছে তার একমাত্র কারণ অযাজকীয় কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটাকে কিভাবে নেবে সেবিষয়ে তাদের মনে সংশয় আছে।

তাই সে স্থির করল, এব্যাপারে সমাজের উপর মহলের মনোভাবটা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। বয়স্ক গণ্যমান্য লোকটির মনে ঈর্ষা জাগাতে সে অপর প্রণয়প্রার্থীকে যেকথা বলেছে সেই কথাই তাকেও বলল, অর্থাৎ সে তাকেও বোঝাল যে হেলেনের উপর যদি কোন অধিকার পেতে হয় তাহলে তাকে বিয়ে করতেই হবে। যে নারীর স্বামী এখনও বেঁচে আছে তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে তরুণতর প্রণয়প্রার্থীর মতই এই গণ্যমান্য ব্যক্তিটিও প্রথমে খুবই হকচকিয়ে গেল, কিন্তু হেলেন যত দৃঢ়তার সঙ্গে তাকে বোঝাল যে ব্যাপারটা

যেকোন কুমারী মেয়েকে বিয়ে করার মতই সরল ও স্বাভাবিক তখন সেও কিছুটা প্রভাবিত হল। হেলেন যদি তিলমাত্র ইতস্তত ভাব, লজ্জা, বা গোপনীয়তার লক্ষণ দেখাত তাহলেই তার ঘুঁটি কেঁচে যেত; কিন্তু গোপনীয়তা বা লজ্জার কোনরকম লক্ষণ না দেখিয়ে সে পিতার্সবুর্গময় তার বন্ধুদের বলে বেড়াতে লাগল যে প্রিন্স ও গন্যমান্য ব্যক্তিটি উভয়েই তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছে, কিন্তু সে দুজনকেই ভালবাসে বলে কারও মনে আঘাত দিতে ভয় পাচ্ছে।

ফলে সঙ্গে সঙ্গে পিতার্সবুর্গময় যে গুজবটা ছড়াল সেটা হেলেনের স্বামীর সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা নয়, কথাটা হল হতভাগিনী সুন্দরী হেলেন সন্দেহের দোলায় দুলছে যে দুজনের মধ্যে কাকে তার বিয়ে করা উচিত। কাজটা মোটেই সম্ভবপর কিনা সেটা আর এখন কোন সমস্যা নয়, একমাত্র সমস্যা হচ্ছে কোন্ বিয়েটা অধিক বাঞ্ছনীয় এবং আদালত সেটাকে কি চোখে দেখবে। এক স্বামী জীবিত থাকতে পুনর্বিবাহ ভাল কি মন্দ তা নিয়ে সাধারণ মানুষ কোন আলোচনাতেই গেল না; তারা বলতে লাগল, "তোমার—আমার চাইতে জ্ঞানী-গুণী লোকরা" নিশ্চয়ই সে ব্যাপারের একটা মীমাংসা করে ফেলেছে, কাজেই এখন সে সিদ্ধান্তের ভাল-মন্দ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা মানেই নিজের নির্বুদ্ধিতা এবং সমাজে বসবাসের অনুপযুক্ততা প্রকাশ করা।

একমাত্র মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না আখসিমভাই সরাসরি একটা বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে বসল। ভদ্রমহিলা পিতার্সবুর্গে এসেছে তার এক ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। একটা বল-নাচের আসরে হেলেনকে দেখতে পেয়ে তাকে ঘরের ঠিক মাঝখানে থামিয়ে সে রুক্ষস্বরে বলে উঠল: "আজকাল দেখছি জীবিত পুরুষের স্ত্রীরাও আবার বিয়ে করছে! আপনি হয়তো ভাবছেন যে একটা নতুন কিছু করলেন। কিন্তু একথা লোকে অনেক আগেই ভেবেছে। সব বেশ্যালয়েই একাজ চলে।" কথাক'টি বলেই মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্না ভয়-দেখানো ভঙ্গীতে হাতের আস্তিন গুটিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সকলে মারিয়া দিমিত্রিয়েভ্নাকে ভয় করলেও পিতার্সবুর্গে তাকে একটি ভাঁড় বলেই মনে করা হয়। কাজেই সকলে তার কথা শুনলেও বিশেষ কোন গুরুত্ব দিল না।

মেয়ের সঙ্গে দেখা হলেই প্রিন্স ভাসিলি তাকে বলে: "হেলেন, তোমাকে একটা কথা বলার আছে"; তাকে এককোণে টেনে নিয়ে যায়। "কিছু কিছু কথা আমার কানে এসেছে···বুঝতেই পারছ। দেখ সোনা, তোমার ভাল শুনলে তোমার বাবার মনটা যে আনন্দে নেচে ওঠে তা তো তুমি জান ···অনেক কষ্ট তুমি পেয়েছ···কিন্তু সোনা, নিজের মনের সঙ্গেই বোঝাপড়া

করে নিও। এইটুকুই আমার বলার কথা।" নিজের আবেগকে গোপন রেখে মেয়ের গালে গাল রেখে প্রিন্স ভাসিলি সেখান থেকে সরে গেল।

বিলিবিন হেলেনের সেইসব পুরুষ বন্ধুদের একজন যারা কখনও প্রেমিক হতে চায় নি। একটা ছোট ঘরোয়া বৈঠকে সে একদিন তার মতামতটা হেলেনকে শুনিয়ে দিল।

হেলেন বলল, "শোন বিলিবিন," সাদা আংটি-পরা আঙুলগুলি দিয়ে সে বিলিবিনের কোটের আস্তিন স্পর্শ করল। "বোনের মত ভেবেই আমাকে বলে দাও, আমার কি করা উচিত। দুজনের কাকে?"

চোখের পাতায় ভাঁজ ফেলে বিলিবিন একটু চিন্তা করল; তার ঠোঁটে হাসি ফুটল।

বলল, "তুমি তো জান এবিষয়ে আমি একেবারে অপ্রস্তুত নই। সত্যিকারের বন্ধু হিসাবে তোমার এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক—অনেক ভেবেছি। কি জান, তুমি যদি প্রিন্সকে বিয়ে কর," সে একটি আঙুল বেঁকাল, "তাহলে অপরটিকে বিয়ে করার সুযোগ চিরদিনের মত হারাবে; তাছাড়া, আদালতকেও অসন্তুষ্ট করবে। কিন্তু তুমি যদি বুড়ো কাউণ্টটিকে বিয়ে কর তাহলে তার শেষের দিনগুলিকে তুমি সুখী করতে পারবে, এবং সেই মহাযানের বিধবা হলেও…প্রিন্স আর তোমাকে বিয়ে করবে না।" বিলিবিন তার কপালটা ঘসতে লাগল।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে পুনরায় তার আস্তিনটা ছুঁয়ে হেলেন বলল, "এই তো সত্যিকারের বন্ধুর কথা! কিন্তু তুমি তো জান, আমি দুজনকেই ভালবাসি, কাউকে কষ্ট দিতে চাই না। তাদের দুজনের সুখের জন্য আমি জীবন দিতেও প্রস্তুত।"

সেক্ষেত্রে তো তার আর কিছু করার নেই এমনি ভঙ্গীতে বিলিবিন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল।

"মহীয়সী নারী! সোজা কথায় বললে তো এই কথাই বলতে হয়। এ দেখছি একই সঙ্গে তিনজনকেই বিয়ে করতে চায়।" সে ভাবল।

স্পষ্ট কথা বলার খ্যাতি বিলিবিনের আছে। সে প্রশ্ন করল, "কিন্তু আমাকে বল দেখি, তোমার স্বামী ব্যাপারটাকে কি চোখে দেখবে? সে কি এতে রাজী হবে?"

হেলেন বলল, "ওঃ, সে আমাকে কত ভালবাসে! আমার জন্য সে সব করবে।"

"এমন কি তোমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদও করবে?" বিলিবিন রসিকতা করে শুধাল।

হেলেন হেসে উঠল।

আর একটি মানুষ এই প্রস্তাবিত বিয়ের যুক্তিবত্তায় সন্দেহ প্রকাশ

করল; সে হেলেনের মা প্রিন্সেস কুরাগিনা। বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং স্বামী বেঁচে থাকতে পুনর্বিবাহের সম্ভাবনা সম্পর্কে সে জনৈক রুশ পুরোহিতের পরামর্শ চাইল। পুরোহিত জানাল যে সেটা অসম্ভব এবং ধর্ম-পুস্তকের একটা অংশ দেখিয়ে দিল যেখানে স্বামী বর্তমানে পুনর্বিবাহকে পরিষ্কার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই সব অখণ্ডনীয় যুক্তিতে সুসজ্জিত হয়ে প্রিন্সেস কুরাগিনা একদিন খুব সকালে মেয়ের কাছে গিয়ে হাজির হল।

মনোযোগ দিয়ে মার আপত্তিগুলো শুনে নিয়ে হেলেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে ফেলল।

বুড়ি প্রিন্সেস বলল, "কিন্তু এখানে তো পরিষ্কার বলা আছে: 'বিবাহ-বিচ্ছিন্নাকে যে বিয়ে করবে…".

হেলেন এবার রুশ ছেড়ে ফরাসী ভাষায় বলে উঠল, "আঃ মামন, বাজে কথা বলো না! তুমি কিছু বোঝ না। আমার অনেকরকম দায়-দায়িত্ব আছে।"

"কিন্তু সোনা…"

"আঃ মামণি, কেন যে তুমি বুঝতে পারছ না, যে পবিত্র পিতার সবরকম বিধান দেবার অধিকার আছে…"

ঠিক সেইসময় হেলেনের জনৈক সহচরী এসে জানাল, হিজ হাইনেস নাচ-ঘরে এসেছে, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

"না, তাকে বলে দাও তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না; তিনি তার কথা রাখেন নি, তাই আমি তার উপর প্রচণ্ড চটে গছি।"

"কাউণ্টেস, সব পাপেরই তো মার্জনা আছে," ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুকেশ এক যুবক ঘরে ঢুকল; তার মুখ ও নাক দুইই লম্বা।

বুড়ি প্রিন্সেস সসম্মানে উঠে অভিবাদন করল। যুবকটি কিন্তু তার দিকে নজরই দিল না। মেয়ের দিকে মাথা নেড়ে প্রিন্সেস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"হ্যাঁ, মেয়ে তাহলে ঠিকই বলেছে," বুড়ি প্রিন্সেস মনে মনে বলল। হিজ হাইনেসের আবির্ভাবেই তার সব বিশ্বাস উধাও হয়ে গেল। "মেয়েই ঠিক, কিন্তু আমাদের যে যৌবন আর ফিরে আসবে না সেই যৌবনকালে আমরা কেন একথা জানলাম না? অথচ কথাটা কত সহজ।" ভাবতে ভাবতে বুড়ি প্রিন্সেস গাড়িতে উঠে বসল।

অগস্টের গোড়ার দিকেই হেলেনের ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল; স্বামীকে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিল—সে স্থির করেছে এন. এন. কে বিয়ে করবে, সত্যধর্মকে অবলম্বন করেছে, আর তাই অনুরোধ জানাচ্ছে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলি যেন সুসম্পন্ন করা হয়;

পত্রবাহকই সব ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে বলবে।

"বন্ধু আমার, ঈশ্বরের কথা প্রার্থনা করি তাঁর পবিত্র ও শক্তিমান আশ্রয় তিনি তোমাকে দান করুন—তোমার বন্ধু হেলেন।"

এই চিঠি যখন পিয়েরের বাড়িতে পৌঁছল সে তখন বরদিনোর যুদ্ধক্ষেত্রে।

অধ্যায়—৮

বরদিনোর যুদ্ধের শেষের দিকে দ্বিতীয়বার রায়েভ্‌স্কি কামানশ্রেণী থেকে নেমে এসে পিয়ের একদল সৈন্যের সঙ্গে একটা নালার ভিতর দিয়ে এগিয়ে ড্রেসিং-স্টেশনে পৌঁছল এবং সেখানকার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে ও আর্তনাদ-চীৎকার শুনে চলার গতি বাড়িয়ে দিয়ে একদল সৈন্যের দলের মধ্যে আটকে গেল।

এখন তার মনের একমাত্র বাসনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সারাদিনের এই মর্মন্তুদ অনুভূতি থেকে বেরিয়ে জীবনের সাধারণ পরিবেশে ফিরে যাওয়া এবং ঘরে ঢুকে নিজের বিছানায় চুপচাপ শুয়ে থাকা। তার মনে হল, একমাত্র জীবনের স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে গেলেই সে নিজেকে এবং সারাদিন যা দেখেছে ও অনুভব করেছে তাকে বুঝতে পারবে। কিন্তু সে স্বাভাবিক পরিবেশ তো কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়।

যদিও যেপথ ধরে সে চলেছে সেখানে গোলাগুলির হিস্‌-হিস্ শব্দটা নেই; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশই চারদিকে ছড়িয়ে আছে। সেই একই যন্ত্রণা, ক্লান্তি, মাঝে মাঝেই অদ্ভুত নিরাসক্ত সব মুখ, একই রক্ত, একই সৈনিকদের ওভারকোট, একই গোলাগুলির শব্দ, দূরাগত হলেও এখনও তারা ত্রাসের সৃষ্টি করে, আর তাছাড়া সেই একই দুর্গন্ধ বাতাস ও ধুলো।

মোঝাইস্ক রোড ধরে মাইল দুই হেঁটে পিয়ের পথের পাশে বসে পড়ল।

গোধূলি নেমে এসেছে; কামানের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেছে। কনুইয়ে ভর দিয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে চলমান ছায়ার দিকে তাকিয়ে পিয়ের অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল। সর্বক্ষণই সে কল্পনা করছে যেন একটা কামানের গোলা প্রচণ্ড শব্দ করে তার দিকে ছুটে আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে শিউরে উঠে বসছে। কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল তা সে জানে না। মাঝ রাতে তিনটি সৈনিক কিছু জ্বালানি কাঠ এনে তার পাশে বসে আগুন জ্বালাতে শুরু করল।

পিয়েরের দিকে আড়-চোখে তাকিয়ে সৈনিক তিনটি আগুন জ্বালিয়ে একটা লোহার পাত্র তার উপর বসিয়ে দিল এবং কিছু শুকনো পাউরুটি ছিঁড়ে পাত্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাতে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিল। সেই চটচটে খাবারের মধুর গন্ধ ধোঁয়ার গন্ধের সঙ্গে মিশে গেল। পিয়ের উঠে বসে নিঃশ্বাস ছাড়ল। তার দিকে না তাকিয়েই সৈনিক তিনজন খেতে খেতে

গল্প করতে লাগল।

হঠাৎ তাদের একজন পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে বলুন তো ?" সে যেন বলতে চাইল: "আপনি খেতে চাইলে কিছুটা খাদ্য আপনাকে দিতে পারি, শুধু আপনি একজন সৎলোক কি না সেটা আমাদের জানা দরকার।"

সামাজিক দিক থেকে সৈনিকদের যতটা কাছাকাছি আসা যায় যাতে তারা তাকে ভাল করে বুঝতে পারে সেই চেষ্টা করাই দরকার মনে করে পিয়ের বলল, "আমি, আমি""আমি একজন অসামরিক অফিসার, তবে আমার লোকজনরা এখানে নেই। যুদ্ধক্ষেত্রে এসে আমি তাদের হারিয়ে ফেলেছি।"

"তাই তো! একটি সৈনিক বলল।

অন্য একজন মাথা নাড়ল।

"একটু জাবনা খাবেন না কি ?" বলে প্রথম সৈনিক একটা কাঠের চামচ পরিষ্কার করে মুছে পিয়েরের হাতে দিল।

আগুনের পাশে বসে সেই জাবনা খেতে খেতে পিয়েরের মনে হল আজ পর্যন্ত যত খাবার সে খেয়েছে এটাই তার মধ্যে সবচাইতে স্বাদু। সে লোভীর মত উপুড় হয়ে খেতে লাগল। আগুনের আলো পড়েছে তার মুখে। সৈন্যরা নীরবে তার দিকে তাকাল।

একজন বলল, "আপনি কোথায় যাবেন ? আমাদের বলুন !"

"মোঝাইস্ক-এ।"

"আপনি একজন ভদ্রলোক, তাই না ?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার নাম ?"

"পিতর কিরিলিচ।"

"ঠিক আছে পিতর কিরিলিচ, আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরাই আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব।"

ঘুটঘুটি অন্ধকারের মধ্যে সৈন্যরা পিয়েরকে সঙ্গে নিয়ে মোঝাইস্ক-এর দিকে হাঁটতে লাগল।

মোঝাইস্ক-এর কাছাকাছি পৌঁছে খাড়া পাহাড় বেয়ে শহরে উঠবার মুখেই মোরগ ডাকতে শুরু করল। তার সরাইখানাটা যে পাহাড়ের নীচে এবং সে যে সেটা পার হয়ে এসেছে সেকথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পিয়ের সৈন্যদের সঙ্গেই উপরে উঠতে লাগল। তার মনের ভুলো অবস্থাটা তখন এতই বেড়ে গেছে যে মাঝপথে তার সহিসের সঙ্গে দেখা না হলে সরাইখানার কথাটা তার মনেই পড়ত না। পিয়েরের সাদা টুপি দেখেই সহিস তাকে অন্ধকারেও চিনতে পারল।

বলে উঠল, "ইয়োর এক্সেলেন্সি! আরে, আমরা তো আপনার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম! আপনি হেঁটে যাচ্ছেন কেন? আর যাচ্ছেনই বা কোথায়?"

"তাই তো!" পিয়ের বলল।

সৈনিকরা থেমে গেল।

একজন বলল, "আপনার লোকদের তাহলে পেয়ে গেছেন? আচ্ছা, তাহলে বিদায় পিতর কিরিলিচ—তাই তো?"

আর একজনও সেই কথাই বলল, "বিদায় পিতর কিরিলিচ।"

"বিদায়।" বলে পিয়ের সহিসকে নিয়ে সরাইখানার দিকে পা বাড়াল।

"ওদের কিছু দেওয়া উচিত," এইকথা ভেবে সে পকেটে হাত দিল। কিন্তু ভিতর থেকে কে যেন বলল, "না, না দেওয়াই ভাল।"

সরাইখানায় একটা ঘরও পাওয়া গেল না; সবগুলিই ভর্তি। পিয়ের উঠোনে নেমে গেল; আপাদমস্তক ঢেকে গাড়ির মধ্যেই শুয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৯

বালিশে মাথা রাখতে না রাখতেই পিয়ের ঘুমিয়ে পড়ল; কিন্তু হঠাৎ যেন বাস্তবেই ঘটছে এমনই স্পষ্টভাবেই তার কানে এল কামানের বুম্-বুম্-বুম্, অর্ধবৃত্তাকার গোলার শিস, আর্তনাদ ও চীৎকার, নাকে লাগল রক্ত ও বারুদের গন্ধ, আর আতংক ও মৃত্যু-ভয় তাকে চেপে ধরল। সভয়ে চোখ খুলে জোব্বার ভিতর থেকে মাথাটা বের করল। উঠোনটা চুপচাপ। শুধু কে একজন আর্দালি কাদার ভিতর দিয়ে ফটক পার হয়ে এসে সরাইওয়ালার সঙ্গে কি যেন কথা বলল। তার উঠে বসার শব্দে চমকিত হয়ে কয়েকটা পায়রা পিয়েরের মাথার উপর থেকে উড়ে গেল। দুটো চালাঘরের কালো ছাদের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার তারা ভরা আকাশটা দেখা যাচ্ছে।

আবার মাথাটা ঢেকে সে ভাবল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সেসব কিছুই নেই। হায়রে, ভয় কী ভয়ংকর চিজ, আর কী রকম লজ্জাজনকভাবে আমি তার কাছে ধরা দিলাম! কিন্তু তারা···তারা তো সারাক্ষণই ধীর, স্থির ছিল··· শেষ পর্যন্ত·····।"

পিয়েরের মনে তারা মানে সেইসব সৈন্যরা যারা কামানশ্রেণীতে কর্মরত ছিল, যারা তাকে আহার্য দিয়েছে। তারা, পূর্বে অপরিচিত সেইসব সৈন্যদের মুখ স্পষ্ট হয়ে তার সামনে ভেসে উঠল।

ঘুমিয়ে পড়তে পড়তেই পিয়ের ভাবতে লাগল, "যদি সৈনিক হতাম, স্রেফ একজন সৈনিক! সম্পূর্ণভাবে সকলের সঙ্গে মিশে যাওয়া, তাদের মতই চিন্তা-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমার বাইরের মানুষটার এই অকারণ খোলসটা, এই শয়তানী বোঝাটা ঝেড়ে ফেলব কেমন করে? একসময় ছিল

যখন এসবই করতে পারতাম। বাবার কাছ থেকে পালিয়ে যেতে পারতাম। অথবা দলখভের সঙ্গে দ্বৈতযুদ্ধের পরে আমাকে সৈনিকের কাজ দিয়ে পাঠানোও হতে পারত।" পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি তার মনের মধ্যে ভিড় করে এল।

"ঘোড়ার সাজ পরানোর সময় হয়েছে ইয়োর এক্সেলেন্সি! ইয়োর এক্সেলেন্সি! এখনই ঘোড়ার সাজ পরাতে হবে। সময় হয়ে গেছে ইয়োর এক্সেলেন্সি!...."

সহিস তাকে ডাকছে। সূর্যের আলো এসে পড়েছে পিয়েরের মুখে। সরাইখানার নোংরা উঠোনটার দিকে সে তাকাল। মাঝখানে পাম্পের কাছে সৈনিকরা তাদের শুটকো ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াচ্ছে, গাড়িগুলো ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিরক্ত হয়ে মুখটা ঘুরিয়ে চোখ বুজে সে আবার গাড়ির মধ্যেই বসে পড়ল। "না, এসব আমি চাই না, এসব দেখতে ও বুঝতেও চাই না। স্বপ্নে যে দেখেছিলাম তাকে আমি বুঝতে চাই। আর এক সেকেণ্ড স্বপ্নটা চলতে থাকলেই তো সব বুঝতে পারতাম।"

সহিস, কোচয়ান ও সরাইওয়ালা এসে পিয়েরকে বলল, একজন অফিসার খবর এনেছে যে ফরাসীরা মোঝায়েস্ক-এর কাছে পৌঁছে গেছে, আর আমাদের সৈন্যরা সেখান থেকে সরে যাচ্ছে।

পিয়ের উঠল; ঘোড়ার সাজ পরিয়ে পথে তাকে তুলে নিতে বলে সে পায়ে হেঁটে শহরের পথে বেরিয়ে পড়ল।

প্রায় দশ হাজার আহতকে পিছনে ফেলে সৈন্যরা এগিয়ে চলেছে। সব বাড়ির উঠোনে আহত সৈন্য, জানালায় আহত সৈন্য, রাস্তাভর্তি আহত সৈন্য। কিছু গাড়িতে আহতদের নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে; পথে পথে সেই-সব গাড়িকে ঘিরে শোনা যাচ্ছে চেঁচামেচি, শাপশাপান্ত, আর ঘুসোঘুসি। নিজের গাড়িটা এসে পড়ায় একজন পরিচিত আহত জেনারেলকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পিয়ের মস্কোর পথ ধরল। পথেই পিয়ের শুনতে পেল তার শ্যালক আনাতোল ও প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যু-সংবাদ।

অধ্যায়—১০

৩০শে অগস্ট পিয়ের মস্কো পৌঁছল। নগরের ফটকের কাছেই দেখা হল কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের অ্যাডজুটাণ্টের সঙ্গে।

অ্যাডজুটাণ্ট বলল, "আমরা তো সর্বত্র আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কাউণ্ট আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। তার ইচ্ছা, একটা গুরুতর কাজের ব্যাপারে আপনি অবিলম্বে তার সঙ্গে দেখা করুন।"

বাড়িতে না গিয়ে সেখান থেকেই একটা গাড়ি নিয়ে পিয়ের সোজা চলে গেল মস্কোর প্রধান সেনাপতির সঙ্গে দেখা করতে।

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন সেইদিন সকালেই তার সকোল্‌নিকির গ্রীষ্মাবাস থেকে মস্কো ফিরেছে। বাড়ির প্রথম ঘরটা এবং অভ্যর্থনা-ঘরটা সরকারী কর্মচারিতে ভর্তি। ভাসিলচিকভ ও প্লাতভ ইতিমধ্যেই কাউণ্টের সঙ্গে দেখা করে তাকে বুঝিয়েছে যে মস্কো রক্ষা করা অসম্ভব, তাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিতেই হবে। যদিও মস্কোর অধিবাসীদের কাছে সংবাদটা গোপন রাখা হয়েছে, তবু অফিসাররা—বিভিন্ন সরকারী বিভাগের প্রধানরা—জানে যে অচিরেই মস্কো শত্রুর হাতে পড়বে, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন নিজেও তা জানে; শুধু নিজ নিজ বিভাগের কি ব্যবস্থা তারা করবে সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত দায়দায়িত্ব এড়াবার জন্যই তারা শাসনকর্তার কাছে এসেছে।

পিয়ের অভ্যর্থনা-ঘরে ঢুকতেই একজন সামরিক বার্তাবহ রস্তপ্‌চিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নানাবিধ প্রশ্নের জবাবে হাত নেড়ে মাত্র একটা হতাশা-ব্যঞ্জক ভঙ্গী করে সে ঘরটা পার হয়ে গেল।

অভ্যর্থনা-ঘরে বসে পিয়ের ক্লান্ত চোখে বৃদ্ধ ও তরুণ, সামরিক ও অসামরিক, সব অফিসারদেরই দেখতে লাগল। দেখে মনে হল, তারা সকলেই অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত। পিয়ের একটা দলের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের একজনকে সে চেনে। পিয়েরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তারা আবার গল্প করতে লাগল।

"তাদের যদি এখন বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে পরে ফিরিয়ে আনা হয় তাতে তো কোন ক্ষতি হবে না, কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে কেউ কিছু বলতে পারে না।"

হাতের একটা ছাপানো কাগজ দেখিয়ে আর একজন বলল, "কিন্তু এতে কি লিখেছে সেটা দেখ····"

"ওটা অন্য ব্যাপার। ওটা জনসাধারণের জন্য দরকার," প্রথম জন বলল।

"ওটা কি?" পিয়ের শুধাল।

"ওঃ, এটা একটা নতুন ইস্তাহার।"

পিয়ের সেটা নিয়ে পড়তে লাগল।

"প্রশান্ত মহামহিম (কুতুজভ) তার দিকে অগ্রসরমান সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিতে মোঝায়েস্ক-এর ভিতর দিয়ে এগিয়ে এমন একটা জায়গায় শক্ত ঘাঁটি গেড়েছেন যেখানে শত্রুপক্ষ তাকে শীঘ্র আক্রমণ করতে পারবে না। এখান থেকে আটচল্লিশটি কামান ও গোলাবারুদ তাকে পাঠানো হয়েছে; প্রশান্ত মহামহিম বলেছেন শেষ রক্তবিন্দু দিয়েও তিনি মস্কোকে রক্ষা করবেন, এমন কি পথে পথে যুদ্ধ করতেও তিনি প্রস্তুত। ভাইসব, আদালত বন্ধ হয়ে গেলেও আপনারা বিচলিত হবেন না; শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ করতে হবে; শয়তানদের সঙ্গে শয়তানী ব্যবহারই আমরা করব। সময় হলে শহর

ও গ্রামের সব ছেলেদেরই আমার দরকার হবে, দু' একদিন আগেই আমি ডাক পাঠাব, কিন্তু এখনই তাদের দরকার হচ্ছে না। তাই আমি চুপ করে আছি। সেদিন একটা কুড়ুলও দরকার হবে, একটা বর্শাও কাজে লাগবে, কিন্তু সবচাইতে ভাল একটা তিন-ফলা ত্রিশূল: একটা ফরাসী এক আঁটি জইয়ের চাইতে বেশী ভারী নয়। কাল ডিনারের পরে ঈশ্বর-জননীর আইবেরীয় মূর্তি নিয়ে আমি ক্যাথারিন হাসপাতালে আহতদের কাছে যাব, সেখানে তাদের জন্য সংগ্রহ করব আশীর্বাদী জল। সেই জল তাদের দ্রুত আরোগ্যলাভ করতে সাহায্য করবে। আমি নিজেও এখন ভাল আছি; একটা চোখে ঘা হয়েছিল, কিন্তু এখন দুই চোখেই দেখতে পাচ্ছি।"

পিয়ের বলল, "কিন্তু সৈন্যরা আমাকে বলেছে যে শহরে যুদ্ধ করা অসম্ভব; অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে...."

"বটেই তো! আমরাও তো সেই কথাই বলছিলাম।" প্রথম বক্তা বলল।

পিয়ের শুধাল, "আমার একটা চোখে ঘা হয়েছিল, এখন দুই চোখেই দেখতে পাচ্ছি—একথার মানে কি?"

অ্যাডজুটান্ট হেসে বলল, "কাউন্টের চোখে আঞ্জনি হয়েছিল; আমি যখন তাকে বললাম যে লোকজনরা ব্যাপারটা জানতে চাইছে তখন তিনি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভাল কথা কাউন্ট," হঠাৎ একটু হেসে সে পিয়েরকে বলল, "আমরা শুনেছি আপনার একটা পারিবারিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, কাউন্টেস মানে আপনার স্ত্রী…"

পিয়ের নিরাসক্ত গলায় বলল, "আমি কিছু শুনি নি; কিন্তু আপনারা কি শুনেছেন?"

"দেখুন, মানুষ তো অনেক সময় অনেক কিছু বানিয়েও বলে। আমি যা শুনেছি তাই বলছি।"

"কিন্তু আপনি কি শুনেছেন?"

সেই একই হাসি হেসে অ্যাডজুটান্ট বলল, "দেখুন, লোকে বলছে, কাউন্টেস, মানে আপনার স্ত্রী নাকি বিদেশে পাড়ি দিচ্ছেন। আমি অবশ্য আশাকরি যে কথাটা একদম বাজে…"

অন্যমনস্কভাবে চারদিকে তাকিয়ে পিয়ের বলল, "হয়তো তাই। আচ্ছা, ওই লোকটি কে?" একটি বেঁটে বুড়ো লোককে দেখিয়ে সে বলল। লোকটির পরনে একটা পরিষ্কার নীল রঙের চাষীদের ওভারকোট, বরফ-সাদা লম্বা দাড়ি ও ভুরু, লালচে মুখ।

"ওই লোকটি? ও তো একজন ব্যবসায়ী, মানে ওই তো রেস্তোরাঁওয়ালা ভেরেশ্‌চাগিন। সেই ইস্তাহারের ঘটনাটা আপনি হয় তো শুনেছেন।"

বৃদ্ধ লোকটির কঠিন শান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার কোন

লক্ষণ সেখানে আছে কি না দেখে পিয়ের বলল, "ওঃ, তাহলে এই সেই ভেরেশ্‌চাগিন!"

অ্যাডজুটান্ট বলল, "না, এ লোকটি সে নয়; যে ইস্তাহারটি লিখেছিল এ তার বাবা। যুবকটি এখন কারাগারে; মনে হয় তার কপালে দুঃখ আছে।"

তারকাপরিহিত একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক এবং গলায় ক্রুশ ঝোলানো একজন জার্মান অফিসার বক্তার দিকে এগিয়ে এল।

অ্যাডজুটান্ট বলল, "জানেন তো, ব্যাপারটা খুবই গোলমেলে। ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় দু'মাস আগে। কাউন্টকে খবরও দেওয়া হয়। তিনি তদন্তের আদেশ দেন। এখানে গেব্রিয়েল আইভানভিচ তদন্ত করেন। ইস্তাহারটি ঠিক তেষট্টি জনের হাত ঘুরেছে। তিনি একজনকে শুধালেন, 'আপনি এটা কার কাছে পেলেন?' 'অমুকের কাছ থেকে।' তিনি আর একজনের কাছে গেলেন। 'আপনি কার কাছে পেলেন?' এইভাবে শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছে গেলেন একজন অর্ধশিক্ষিত ব্যবসায়ী ভেরেশ্‌চাগিনের কাছে।" অ্যাডজুটান্ট হেসে ফেলল। "তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'তোমাকে এটা কে দিয়েছে?' আসলে কিন্তু সে যে ওটা কার কাছ থেকে পেয়েছে সেটা আমরা জানতাম। পোস্টমাস্টার ছাড়া আর কার কাছে পাবে? কিন্তু তাদের মধ্যেও একটা বোঝাপড়া ছিল। সে জবাব দিল: 'কারও কাছ থেকে নয়; আমি নিজেই লিখেছি।' তারা তাকে ভয় দেখাল। জেরা করল, কিন্তু তার এক কথা: 'আমি নিজেই লিখেছি।' কাউন্টকে সেই কথাই বলা হল। তিনি লোকটিকে ডেকে পাঠালেন। 'এ ইস্তাহার তুমি কার কাছে পেয়েছ?' 'আমি নিজেই লিখেছি।' দেখুন, কাউন্টকে তো আপনারা চেনেন," গর্বের হাসি হেসে অ্যাডজুটান্ট বলতে লাগল, "তিনি ভয়ংকর রেগে গেলেন,—আর লোকটির ধৃষ্টতা, মিথ্যাচার, ও একগুঁয়েমির কথা একবার ভাবুন তো।"

পিয়ের বলল, "কাউন্ট চেয়েছিলেন সে বলুক যে ক্ল্যুচারেভ-এর কাছে পেয়েছে? আমি তো তাই জানি!"

অ্যাডজুটান্ট হতাশ হয়ে বলল, "মোটেই না। এছাড়া আরও অনেক পাপকর্মের কৈফিয়ৎ ক্ল্যুচারেভের দেবার ছিল, আর সেই কারণেই তার নির্বাসন হয়েছে। কিন্তু আসল কথা হল কাউন্ট বড়ই বিব্রত হলেন। বললেনও 'তুমি নিজে কি করে এটা লিখতে পারলে?' টেবিলের উপর থেকে তিনি হাম্বুর্গ গেজেটখানা তুলে নিলেন। 'এই তো সেটা! তুমি নিজে এটা লেখ নি, অনুবাদ করেছ মাত্র, আর জঘন্য অনুবাদ করেছ, কারণ তুমি ফরাসী ভাষাটাও জান না, মূর্খ কোথাকার!' আর কি মনে করছেন? লোকটি বলল, 'না, আমি অন্য কোন কাগজপত্র দেখি নি, নিজেই এটা লিখেছি।' আর সেখানেই ইতি ঘটল। কাউন্ট তার বাবাকে ডেকে আনলেন, কিন্তু যুবকটি একতিল নড়ল না। যতদূর মনে হয় তাকে বিচারের জন্য পাঠানো

হয় এবং কঠোর পরিশ্রমের শাস্তি হয়। এখন বাবা এসেছে তার হয়ে উমেদারি করতে। কিন্তু ছেলেটা আসলে অকর্মার ধাড়ি! এ ধরনের ব্যবসায়ীর ছেলে যেরকম হয়ে থাকে—নারীঘাতক ফুলবাবুটি। কোথায় কতকগুলি বক্তৃতা শুনেই ভেবে নিয়েছে যে শয়তানও তার সমকক্ষ নয়। ছোকরা ওইরকমই বটে। এখানে স্টোনব্রীজ-এর পাশে তার বাবা একটা খাবারের দোকান চালায়। জানেন তো, সেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের একটা বড় মূর্তি আঁকা আছে; তাঁর এক হাতে রাজদণ্ড, আর অন্য হাতে একটি গোলক। তারপর, কয়েকদিনের জন্য সেই দেবমূর্তিটিকে নিয়ে বাড়ি নিয়ে এল, আর এনে কি করল জানেন? একটা বদমায়েশ চিত্রকরকে খুঁজে পেতে নিয়ে এল···

অধ্যায়—১১

এই নতুন কাহিনীর মাঝখানে প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে পিয়েরের ডাক এল।

সে যখন ঘরে ঢুকল কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন তখন মুখটা কুঁচকে হাত দিয়ে কপাল ও চোখ ঘসছিল। একটি বেঁটে লোক কি যেন বলছিল, কিন্তু পিয়ের ঘরে ঢুকতেই সে কথা থামিয়ে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে রস্তপ্‌চিন বলে উঠল, "এই যে মহাবীর, কেমন আছ? তোমার সাহসিকতার কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু সেকথা নয়। নিজেদের মধ্যেই বলছি বাপু, তুমি কি ভ্রাতৃসংঘের লোক?" পিয়ের চুপ করে রইল। "আমি সঠিক খবরই রাখি বন্ধু, কিন্তু এও জানি ভ্রাতৃসংঘে তো কত লোকই যায়, আর যারা মানুষকে বাঁচাবার নামে রাশিয়াকে ধ্বংস করতে চায় আশাকরি তুমি তাদের দলের নও।"

"হ্যাঁ, আমি ভ্রাতৃসংঘী," পিয়ের জবাব দিল।

"তাহলেই ব্যাপারটা বোঝ হে বাপু! আশাকরি তুমি জান যে মেসার্স স্পেরান্‌স্কি ও ম্যাগ্‌নিৎস্কিকে যথাস্থানে পাঠানো হয়েছে। মিঃ ক্ল্যুচারভেরও সেই দশাই হয়েছে। অন্য যারা সলোমনের মন্দির গড়ার ওজুহাতে পিতৃভূমির মন্দিরকে ধ্বংস করতে চেয়েছে তাদেরও সেই একই দশা হয়েছে। এসব কাজের স্বপক্ষে যে যথেষ্ট যুক্তি আছে তা তুমি নিশ্চয় বোঝ, আর ক্ষতিকর লোক না হলে পোস্টমাস্টারটিকে আমি নির্বাসনে পাঠাতাম না। এখন আমি জানতে পেরেছি যে তার শহর ছেড়ে যাবার ব্যাপারে তোমার গাড়িটা তুমি তাকে ধার দিয়েছ এবং নিরাপদ আশ্রয়ে রাখার জন্য তার কাগজপত্রগুলিও নিয়েছ। আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমার কোন ক্ষতি হোক তা আমি চাই না; আর—যেহেতু তুমি আমার অর্ধেক বয়সের ছেলে—তাই বাবার মতই তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি এধরনের লোকের সঙ্গে সব সম্পর্ক

ছিন্ন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাও।"

"কিন্তু ক্ল্যুচারভ অন্যায়টা কি করেছে কাউণ্ট ?" পিয়ের জিজ্ঞাসা করল।

রস্তপ্‌চিন চেঁচিয়ে বলল, "সেটা আমার জানবার কথা, কিন্তু তোমার প্রশ্ন করবার কথা নয়।"

রস্তপ্‌চিনের দিকে না তাকিয়েই পিয়ের বলল, "নেপোলিয়নের ইস্তাহার প্রচারের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে, কিন্তু কাজটা যে সেই করেছে তাতো প্রমাণ হয় নি। আর ভেরেশ্‌চাগিন…"

"তাই নাকি ?" হঠাৎ ভুরু কুঁচকে রস্তপ্‌চিন চেঁচিয়ে বলল। "ভেরেশ্‌চাগিন একটা দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক; তার উপযুক্ত শাস্তি সে পাবে। কিন্তু আমার কাজের সমালোচনা করার জন্য আমি তোমাকে ডাকি নি, ডেকেছি পরামর্শ দিতে—ইচ্ছা করলে আদেশও বলতে পার। আমার অনুরোধ, তুমি শহর ছেড়ে চলে যাও, ক্ল্যুচারেভর মত লোকদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন কর। যেকোন লোকের মাথার পোকা আমি বের করে দেবই"—হঠাৎ তার খেয়াল হল যে বিনা দোষেই সে বেজুকভকে ধমকাচ্ছে; তাই বন্ধুর মত পিয়েরের হাতখানা হাতে নিয়ে বলল, "একটা চরম বিপর্যয়ের মুখে আমরা দাঁড়িয়েছি; যাদের নিয়ে আমাকে কাজ করতে হয় তাদের প্রতি ভদ্রতা দেখাবার মত সময় আমার নেই। আমার মাথার মধ্যে ঘূর্ণিঝড় চলছে। আচ্ছা বাপু, বলতো, ব্যক্তিগতভাবে তুমি কি করছ ?"

চোখ না তুলে, অথবা মুখের চিন্তিত ভাবটা না বদলেই, পিয়ের জবাব দিল, "কেন, কিছুই করছি না।"

কাউণ্টের চোখে ভ্রূকুটি।

"বন্ধু হিসাবে একটা উপদেশ দিচ্ছি বাপু। যত তাড়াতাড়ি পার কেটে পড়। এছাড়া আমার আর কিছু বলার নেই। শুনবার মত কান যার আছে সেই তো সুখী। বিদায়। ওহো, ভাল কথা," দরজার দিকে তাকিয়ে পিয়েরকে চেঁচিয়ে বলল "একথা কি সত্যি যে কাউণ্টেস যীশু সমিতির পবিত্র পিতাদের খপ্পরে পড়েছেন ?"

পিয়ের জবাব দিল না, ঘর থেকে চলে গেল; এত রুষ্ট ও ক্রুদ্ধ সে আগে কখনও হয় নি।

যখন বাড়ি ফিরল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যায় জন-আটেক লোক তার সঙ্গে দেখা করতে এল; একজন কমিটির সেক্রেটারি, তার ব্যাটেলিয়নের একজন কর্ণেল, তার নায়েব ও আরও কিছু খাতক। সকলেই কোন না কোন কাজ নিয়ে তার কাছে এসেছে, কিন্তু কোন কথাই পিয়েরের ভাল লাগছে না, ভাল করে বুঝতেও পারছে না, শুধু তাদের হাত এড়াবার জন্যই কোনরকমে জবাব দিতে লাগল। সকলে চলে গেলে যখন একলা

হল তখন স্ত্রীর চিঠিটা খুলে পড়ল।

"তারা, কামানশ্রেণীর সৈন্যরা, প্রিন্স আন্‌দ্রু নিহত…সেই বুড়ো মানুষটি …সরলতাই ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ। কষ্টভোগ করাও দরকার…সব কিছুর অর্থ…প্রস্তুত থাকতে হবে…আমার স্ত্রী বিয়ে করতে যাচ্ছে…ভুলতে হবে, বুঝতে হবে…" পোশাক না ছেড়েই সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতেই নায়েব এসে খবর দিল, কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের বিশেষ দূত হিসাবে একজন পুলিশ অফিসার এসে জানতে চাইছে, কাউণ্ট বেজুখভ শহর ছেড়ে চলে গেছে কি না, অথবা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে কি না।

নানা কাজে ডজনখানেক লোক বৈঠকখানায় পিয়েরের জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে তাদের সঙ্গে দেখা করতে না গিয়ে পিয়ের পিছনের বারান্দা দিয়ে ফটক পেরিয়ে বেরিয়ে গেল।

সেইসময় থেকে মস্কোর ধ্বংস শেষ হওয়া পর্যন্ত বেজুখভ পরিবারের লোকজনরা অনেক খোঁজখবর করেও পিয়েরকে আর কখনও দেখতে পেল না, বা সে কোথায় আছে তাও জানতে পারল না।

অধ্যায়—১২

১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অর্থাৎ শত্রুপক্ষ শহরে ঢোকার আগে পর্যন্ত রস্তভরা মস্কোতেই রইল।

অবলেন্‌স্কির কসাক রেজিমেণ্টে যোগ দিয়ে পেত্‌য়া বেলায়া জারকভ-এর উদ্দেশে যাত্রা করার পর থেকেই কাউণ্টেসের মনে ভয় ধরল। অনেক পরিচিতের তার দুই ছেলেই যুদ্ধে গেছে, দুজনই তার আশ্রয় থেকে দূরে চলে গেছে, আজ হোক কাল হোক তিন ছেলের মতই তারা দুজনই বা যে কোন একজন মারা যেতে পারে—এই চিন্তা সেই গ্রীষ্মকালেই সর্বপ্রথম নিষ্ঠুর সত্যের মত তার মনে এল। সে নিকলাসকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করল, নিজেই পেত্‌য়ার কাছে চলে যেতে চাইল, বা পিতার্সবুর্গের কাছাকাছি কোথাও তার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করল, কিন্তু কোনটাই সম্ভব হল না। কাউণ্টেস রাতে ঘুমতে পারে না, অথবা ঘুমলেও স্বপ্ন দেখে তার ছেলেরা মরে পড়ে আছে। অনেক সলা-পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার পরে কাউণ্ট তাকে শান্ত করার একটা উপায় বের করল। পেত্‌য়াকে অবলেন্‌স্কির রেজিমেণ্ট থেকে বদলি করিয়ে মস্কোর কাছে ট্রেনিংরত বেজুখভের রেজিমেণ্টে আনার ব্যবস্থা করল। সামরিক চাকরিতে থাকলেও এই বদলির ফলে কাউণ্টেসের মনে এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে যে তার একটি ছেলে অন্তত তার পক্ষছায়ায় থাকবে এবং এখান থেকে তার যুদ্ধে যোগদান করার সম্ভাবনাটা অনেক কম।

পেত্‌য়ার ফিরে আসার সময় যতই কাছে আসতে লাগল কাউণ্টেস ততই অস্থির হয়ে উঠল। তার কেবলই মনে হতে লাগল যে এত সুখ তার কপালে সইবে না। সোনিয়া, প্রিয় নাতাশা, এমন কি স্বামী কাছে এলেও সে বিরক্ত হয়। ভাবে, "তাদের দিয়ে আমি কি করব? পেত্‌য়া ছাড়া অন্য কাউকে আমি চাই না।"

অগস্টের শেষ দিকে রস্তভরা নিকলাসের একটা চিঠি পেল। ঘোড়া কিনতে ভরোনেজ প্রদেশে গিয়ে সেখান থেকেই সে চিঠি লিখেছে। কিন্তু চিঠি পেয়েও কাউণ্টেসের অস্থিরতা গেল না। একটি ছেলে এখন বিপদমুক্ত হয়েছে জেনে পেত্‌য়ার জন্য তার উদ্বেগ আরও বেড়ে গেছে।

২০শে অগস্ট নাগাদ রস্তভদের পরিচিত প্রায় সকলেই মস্কো ছেড়ে চলে গেল; সকলে অনেক পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও তার সোনা-মাণিক পেত্‌য়া ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউণ্টেস কিছুতেই মস্কো ছেড়ে যেতে রাজী হল না। সে এল ২৮শে অগস্ট। যে গভীর মমতায় মা তাকে কাছে টেনে নিল তাতে ষোল বছরের অফিসার খুশি হল না। ছেলেকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখার বাসনা গোপন করে রাখলেও পেত্‌য়া মার মনের কথা বুঝতে পারল এবং পাছে সে নিজেও আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, পাছে তার আচরণে 'মেয়েলিপনা' প্রকাশ পায়, এই আশংকায় সে মাকে এড়িয়ে চলতে লাগল, এবং যে ক'টা দিন মস্কোতে থাকল সে সময়টা নাতাশাকে নিয়েই কাটাতে লাগল; নাতাশার প্রতি চিরদিনই একটা প্রায় প্রেমিকসুলভ ভ্রাতৃস্নেহ সে পোষণ করত।

কাউণ্টের চিরাচরিত অব্যবস্থার ফলে ২৮শে তারিখে তাদের যাত্রার কোন আয়োজনই করা হয় নি। সংসারের মালপত্র বয়ে নেবার জন্য রিয়াজান ও মস্কোর জমিদারি থেকে যেসব গাড়ি আসার কথা তারা ৩০শে তারিখের আগে এসে পৌঁছল না।

২৮শে থেকে ৩১শে পর্যন্ত সারা মস্কো হৈ-হল্লায় তোলপাড় হয়ে উঠল। প্রতিদিন হাজার হাজার আহত সৈন্যকে বরদিনো থেকে দরগমিলভ ফটক দিয়ে এনে মস্কোর নানা অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হতে লাগল, আর হাজার হাজার গাড়ি অধিবাসীদের ও তাদের মালপত্র নিয়ে অন্য সব ফটক দিয়ে মস্কো থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। রস্তপ্‌চিনের ইস্তাহার সত্ত্বেও, সেগুলির জন্যই হোক অথবা ছাড়াই হোক, পরস্পরবিরোধী বিস্ময়কর সব গুজব শহরময় ছড়াতে লাগল। কেউ বলছে, কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হবে না; আবার কেউ বলছে, সব দেবমূর্তিগুলিকে গির্জা থেকে বের করে আনা হয়েছে। এবং সকলকেই মস্কো ছেড়ে চলে যেতে বলা হয়েছে। কেউ বলছে, বরদিনোর পরে আর একটা যুদ্ধ হয়েছে এবং সেখানে ফরাসীরা হটে গেছে; আবার কেউ বলছে উল্টো কথা—রুশবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেছে।

কিন্তু গুজব যাই রটুক, একটা কথা সকলেই বুঝতে পেরেছে যে মস্কো ছেড়ে যেতেই হবে; কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে গিয়ে নিজ নিজ জিনিসপত্র বাঁচাবার চেষ্টা করাই কর্তব্য।

মস্কো দখলের আগের তিনটে দিন রস্তভ পরিবারের সকলেই নানা কাজে ব্যস্ত থাকল। পরিবারের কর্তা কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভ অনবরত শহরময় ঘুরে সবরকম গুজব সংগ্রহ করে এনে বাড়ি ফিরে তাড়াতাড়ি যাত্রার আয়োজন শেষ করার হুকুম চালাতে লাগল।

কাউণ্টেস মালপত্র বাঁধাছাঁদা করা দেখছে, সবকিছুতেই খুঁতখুঁত করছে, সবসময় পেত্‌য়ার পিছন পিছন ঘুরছে, আর সে সর্বদা নাতাশার সঙ্গে থাকছে দেখে ঈর্ষায় জ্বলছে। কাজের কাজ যা সেটুকু করছে সোনিয়া। কিন্তু ইদানীং সেও খুব বিষণ্ণ ও চুপচাপ হয়ে গেছে। নিকলাসের চিঠিতে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে তার দেখা হওয়ার সংবাদ পড়ে কাউণ্টেস সোনিয়ার সামনেই খুশিমনে বলেছিল যে প্রিন্সেস ও নিকলাসের এই দেখা-সাক্ষাতে করুণাময় ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ দেখা যাচ্ছে।

কাউণ্টেস বলেছিল, "নাতাশার সঙ্গে বলকন্‌স্কির বিয়ের প্রস্তাবে আমি কোনদিনই খুশি হই নি; আমি সবসময়ই চেয়েছি নিকলাস প্রিন্সেসকে বিয়ে করুক, আর আমি এও জানতাম যে সেটাই ঘটবে। তাহলে কী ভালই না হয়!"

সোনিয়া বোঝে যে সেটাই ঠিক: নিকলাস একটি ধনবতী মহিলাকে বিয়ে করলে তবেই রস্তভদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটতে পারে, আর সেদিক থেকে প্রিন্সেসই যোগ্য পাত্রী। কিন্তু তার পক্ষে ব্যাপার বড়ই তিক্ত। তবু নিজের সব দুঃখ কষ্ট সত্ত্বেও সারাদিন সেই যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। কাউণ্ট আর কাউণ্টেস তো হুকুম করেই খালাস। পেত্‌য়া ও নাতাশা তো সারাদিন ছুটোছুটি করেই বেড়াচ্ছে; কাজে সাহায্য করার বদলে তারা বরং বাঁধার সৃষ্টি করছে। মনে মনে তারা দুজনই খুব খুশি। তাদের খুশির একটা বড় কারণ যুদ্ধটা মস্কোর দিকে এগিয়ে আসছে, শহরের ফটকে-ফটকেই যুদ্ধ হবে, সকলকেই অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, সকলেই পালাচ্ছে—কোথাও না কোথাও চলে যাচ্ছে; মোটকথা একটা অসাধারণ কিছু ঘটতে যাচ্ছে, আর সেটা সব সময়ই উত্তেজক, বিশেষতঃ যুবক-যুবতীদের কাছে।

অধ্যায়—১৩

৩১শে অগস্ট শনিবার রস্তভদের বাড়ির সে এক লণ্ডভণ্ড অবস্থা। দরজাগুলো হাট করে খোলা, আসবাবপত্র হয় বের করে নেওয়া হচ্ছে নয়তো এ-ঘর থেকে ও-ঘর করা হচ্ছে, আয়না ও ছবিগুলো সব নামিয়ে ফেলা হয়েছে। ঘরময় ট্রাংক ভর্তি, খড়, প্যাকিং-এর কাগজ ও দড়ি ইতস্তত ছড়ানো। চাবী

ও গৃহ-ভৃত্যরা মালপত্র নিয়ে ভারী কার্পেটের উপর দিয়ে থপ্‌থপ্‌ করে হাঁটছে। উঠোনে চাষীদের গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে; কতকগুলি উঁচু করে বোঝাই হয়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে, কতকগুলি এখনও খালি।

কাউণ্ট সকালেই বেরিয়ে গেছে। হৈ-হট্টগোলে কাউণ্টেসের মাথা ধরেছে; ভিনিগারের পট্টি মাথায় লাগিয়ে সে নতুন বসবার ঘরে শুয়ে আছে। পেত্যা বাড়ি নেই; বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে; তার সঙ্গে একযোগে অসামরিক বিভাগ থেকে সোজা সামরিক বিভাগে বদলির জন্য চেষ্টা করছে। সোনিয়া নাচঘরে কাঁচের ও চীনে মাটির বাসনপত্র প্যাক করার তদারকি করছে। চারদিকে ছড়ানো পোশাক, ফিতে ও স্কার্ফের মধ্যে একটা পুরনো বল-নাচের পোশাক হাতে নিয়ে নাতাশা মেঝেতে বসে আছে।

সকলেই কাজে ব্যস্ত অথচ সে নিজে কিছুই করছে না—এতে নাতাশা লজ্জা বোধ করছে; সকাল থেকে বারকয়েক কাজ করতে চেষ্টাও করেছে, কিন্তু তাতে মন দিতে পারে নি, আর সমস্ত মন দিয়ে সাধ্যমত কাজ করতে না পারলে কোন কাজ করা তার পক্ষে সম্ভবই নয়। চীনামাটির বাসন বাঁধা-ছাঁদার সময় সে কিছুক্ষণ সোনিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করল, কিন্তু একটু পরেই সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে। পুরনো পোশাক ও ফিতেগুলি দাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে প্রথমটায় বেশ মজাই লাগল, কিন্তু সেকাজটা শেষ হয়ে গেলে তার আর কাজে উৎসাহ রইল না।

"দুনিয়াশা, তুমি সব গুছিয়ে বেঁধে ফেল! কি বল সোনা?" দুনিয়াশা রাজী হতেই নাতাশা মেঝের উপর বসে পড়ে পুরনো বল-নাচের পোশাকটা হাতে নিয়ে এমন একটা দিবাস্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল যার সঙ্গে তার বর্তমান চিন্তাধারার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই। পাশের ঘরে দাসীদের কথাবার্তায় তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেল, তারা সকলেই বারান্দায় ছুটে যাচ্ছে। নাতাশা উঠে জানালা দিয়ে তাকাল। আহত মানুষে বোঝাই গাড়ির একটা লম্বা সারি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে।

দোকানী, বুড়ি নার্স, রাঁধুনি, কোচয়ান, পরিচারক, গাড়োয়ান ও খানসামার দল ফটকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আহতদের দেখছে।

একখানা পরিষ্কার ছোট রুমাল মাথার উপর ফেলে দুই হাতে তার দুটো কোণ ধরে নাতাশা রাস্তায় নেমে গেল।

আগেকার গৃহকর্ত্রী মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ভিড় ঠেলে বাকলের মাদুরে তৈরি ছইওয়ালা একটা গাড়ির কাছে গিয়ে ভিতরে শায়িত একটি বিবর্ণ তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। নাতাশা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সলজ্জভাবে থেমে গেল এবং তার কথাগুলি মন দিয়ে শুনতে লাগল; রুমালটা তখনও তার হাতেই ধরা আছে।

সে তখন বলছে, "তাহলে মস্কোতে আপনার কেউ নেই ? কোন একটা বাড়িতে থাকতে পারলেই আপনার পক্ষে ভাল হয়···ধরুন আমাদের বাড়িতে ....বাড়ির লোকরা চলে যাচ্ছেন।"

অফিসারটি ক্ষীণ গলায় বলল, "সে অনুমতি মিলবে কি না জানি না। ঐ আমাদের কম্যাণ্ডিং অফিসার আসছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করুন," বলে সে একজন মজবুত গড়নের মেজরকে দেখিয়ে দিল।

ভয়ার্ত চোখে আহত অফিসারটির দিকে তাকিয়ে নাতাশা তৎক্ষণাৎ মেজরের দিকে এগিয়ে গেল।

শুধাল, "আহত লোকরা কি আমাদের বাড়িতে থাকতে পারে ?"

মেজর একটু হেসে টুপিতে হাত রাখল।

চোখ কুঁচকে হেসে বলল, "আপনি কোন্‌টিকে চান মাদ্‌ময়জেল ?"

নাতাশা শান্তভাবে প্রশ্নটারই পুনরাবৃত্তি করল; তার মুখের গম্ভীরভাব ও চালচলন দেখে মেজরের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, একটু ভেবে নিয়ে ইতিবাচক জবাব দিল।

বলল, "হ্যাঁ, কেন পারবে না ? নিশ্চয় থাকতে পারে।"

ঘাড়টা ঈষৎ কাৎ করে নাতাশা দ্রুতপায়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার কাছে ফিরে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "ওরা থাকতে পারে। উনি বললেন থাকতে পারে!"

যে গাড়িতে অফিসারটি শুয়েছিল সেটাকে রস্তভদের উঠোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। বাকি গাড়িগুলোকে প্রোভার্স্কায়া স্ট্রীটের অধিবাসীদের আমন্ত্রণে হয় তাদের উঠোনে ঢুকিয়ে দেওয়া হল, নয়তো তাদের ফটকের সামনে থামিয়ে দেওয়া হল। দৈনন্দিন জীবনের রুটিন-বাঁধা কাজের বাইরে নতুন লোকদের নিয়ে একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে নাতাশা খুব খুশি। সে ও মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না দুজনে মিলে যত পারল তত বেশী আহত সৈনিকদের তাদের উঠোনে নিয়ে আসতে চেষ্টা করল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "আপনার বাবাকে কিন্তু বলা উচিত।"

"ওসব কথা রাখুন। অসুবিধার কি আছে? একটা দিনের জন্য আমরা বৈঠকখানায় চলে যেতে পারি। আমাদের বাড়ির অর্ধেকটাই ওরা পেতে পারে।"

"কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখুন। এদের যদি একটা কোণের অংশে চাকরদের ঘরে অথবা নার্সদের ঘরেও রাখি, তাহলেও তো অনুমতির দরকার।"

"বেশ তো, আমি অনুমতি আনছি।"

নাতাশা ছুটে বাড়ির ভিতর চলে গেল। বৈঠকখানার আধখোলা দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। ঘরটা ভিনিগার ও হফ্‌ম্যান ড্রপ-এর গন্ধে ভর্তি।

"মামণি কি ঘুমিয়েছ ?"

"আরে, ঘুম আবার কোথায় ?"—ঝিমুনি কাটিয়ে জেগে উঠে কাউণ্টেস বলল।

মায়ের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের মুখটা তার মুখের কাছাকাছি নিয়ে নাতাশা বলল, "লক্ষ্মী মামণি! আমি দুঃখিত, তুমি আমাকে ক্ষমা কর, একাজ আর কখনও করব না। তোমার ঘুমটাই ভাঙিয়ে দিলাম! মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না আমাকে পাঠিয়ে দিল: ওরা কয়েকজন আহত অফিসারকে এখানে নিয়ে এসেছে। তুমি কি তাদের থাকতে দেবে? কোথাও তাদের যাবার জায়গা নেই। আমি জানতাম তুমি তাদের থাকতে দেবে…" এক নিঃশ্বাসে সে কথাগুলি শেষ করল।

"কোন্ অফিসার? কাদের নিয়ে এসেছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।" কাউণ্টেস বলল।

নাতাশা হেসে উঠল; কাউণ্টেসের মুখেও মৃদু হাসি।

"আমি জানতাম তুমি অনুমতি দেবে…তাহলে ওদের বলি গে," মাকে চুমো খেয়ে নাতাশা দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

হল-এ বাবার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কাউণ্ট খারাপ খবর নিয়ে এসেছে।

বিরক্তিভরা গলায় বলল, "আমাদের বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে! ক্লাব বন্ধ হয়ে গেছে; পুলিশও চলে যাচ্ছে।"

"বাপি, কয়েকজন আহত লোককে আমি বাড়িতে ডেকে এনেছি—ঠিক করি নি বাপি?" নাতাশা বলল।

কাউণ্ট অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিল, "তা তো বটেই। কিন্তু সেটা তো কথা নয়। ও সব আজেবাজে কাজে মন দেবার সময় এখন নয়, গোছগাছে হাত লাগাও, কাল আমাদের যেতেই হবে, অবশ্য যেতে হবে।…"

বড় নায়েব ও চাকরবাকরদেরও কাউণ্ট সেই একই হুকুম দিল।

ডিনারের সময় বাড়িতে ফিরে পেত্‌য়া বাইরে যেসব খবর শুনে এসেছে তাই বলল। ক্রেমলিন-এ সকলকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হচ্ছে; যদিও রস্তপ্‌চিনের ইস্তাহারে বলা হয়েছে যে দু' তিনদিন আগেই সকলকে ডাক দেওয়া হবে, তবু ইতিমধ্যেই হুকুম জারি হয়ে গেছে যে সকলকেই সশস্ত্র হয়ে আগামীকাল তিন পাহাড়ে সমবেত হতে হবে; সেখানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হবে।

ছেলের আগ্রহে উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে কাউণ্টেসের বুক কেঁপে উঠল। সে বুঝল, এখন যদি ছেলেকে যুদ্ধে না যাওয়ার কথা বলা হয় তাহলে সে সৈনিক, মর্যাদা, পিতৃভূমি প্রভৃতি এমন সব অর্থহীন, পুরুষসুলভ, একগুঁয়ে কথা বলতে শুরু করবে যার প্রতিবাদ করা যায় না; কাজেই তার আগেই যাত্রার আয়োজন শেষ করে পেত্‌য়াকে তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব দিয়ে সঙ্গে নিয়ে যাবার আশায় কাউণ্টেস তার কথায় কোন জবাব দিল না; ডিনারের পরেই কাউণ্টকে একপাশে ডেকে নিয়ে চোখের জল ফেলে তাকে

মিনতি করল, অতিক্রত, সম্ভব হলে সেই রাতেই যেন তাদের সকলকে এখান থেকে চলে যেতে না পারলে আতংকেই সে মারা যাবে। এখন যে সে সব কিছুতেই ভয় পাচ্ছে সেকথা লুকোবার কোন চেষ্টাই সে করল না।

অধ্যায়—১৪

মাদাম শোস তার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গিয়েছিল। মিয়াস্নিৎস্কি স্ট্রীটে একটা মদের দোকানে সে যা দেখে এসেছে সে বিবরণ শুনে কাউণ্টেসের ভয় আরও বেড়ে গেল। সেই রাস্তা দিয়ে ফিরবার সময় দোকানের সামনে মাতালদের হৈ-হল্লোড়ের জন্য সে পথ দিয়ে হাঁটতে পারে নি। একটা গাড়ি নিয়ে গলির পথ ধরে বাড়ি ফিরেছে। গাড়ির চালক তাকে বলেছে, সরকারী হুকুম পেয়ে লোকজনরা মদের দোকানের পিপে ভেঙে মদ গিলছে।

ডিনারের পরে রস্তভ পরিবারের সকলেই মহা উৎসাহে জিনিসপত্র বাঁধাছাদার কাজে লেগে পড়ল। বুড়ো কাউণ্টও হঠাৎ কাজে লেগে গেল। সে একবার উঠোন থেকে ঘরে ঢুকছে, আবার ঘর থেকে উঠোনে নামছে, আর সারাক্ষণ এলোমেলো হুকুম চালাচ্ছে আর দাপাদাপি করছে। পেত্‌রা উঠোনের কাজের তদারকি করছে। কাউণ্টের এলোমেলো হুকুমদারীর ফলে সোনিয়ার মাথাই গুলিয়ে গেছে, সে যে কি করবে তাই বুঝতে পারছে না। চাকরবাকররা ঘরে ও উঠোনে ছুটোছুটি করছে আর তর্কাতর্কি করছে। নাতাশা সব দেখেশুনে কাজে হাত লাগাল।

কাউণ্ট অনেক মূল্যবান বুটীদার ফরাসী পর্দা ও পারসিক কার্পেট দিয়ে ঘর সাজিয়েছিল। নাতাশা কাজে নেমেই দেখল নাচঘরে দুটো বাক্স খোলা পড়ে আছে; একটা বাসনপত্রে প্রায় ভর্তি, আর একটাতে বোঝাই করা হয়েছে কার্পেট। এখন টেবিলের উপর অনেক জিনিস পড়ে আছে এবং ভাঁড়ার ঘর থেকে আরও জিনিস আনা হচ্ছে। ফলে চাকরদের আরও একটা বাক্স আনতে পাঠানো হয়েছে।

নাতাশা বলল, "সোনিয়া, একটু সবুর কর—এই দুটো বাক্সেই সব ভরা যাবে।"

"পারবেন না মিস, আমরা চেষ্টা করে দেখছি," খানসামার সহকারীটি বলল।

"না, এক মিনিট সবুর কর।"

নাতাশা দ্রুত হাতে কাগজে মোড়া ডিস-প্লেটগুলো বাক্সের ভিতর থেকে বের করতে লাগল।

বলল, "ডিসগুলো কার্পেটের সঙ্গে এখানে যাবে।"

"সে কি! শুধু কার্পেটগুলোকে তিনটে বাক্সে ধরাতে পারাই তো মহা-

ভাগ্যের কথা," খানসামার সহকারীটি বলল।

"আঃ, দয়া করে থাম!" নাতাশা দ্রুত হাতে অভ্যস্ত কৌশলের সঙ্গে জিনিসগুলো সাজাতে শুরু করল। এগুলোর কোন দরকার নেই, কিছু কিয়েভ-এর থালা সে একপাশে সরিয়ে রাখল। "এগুলো—হ্যাঁ, এগুলো কার্পেটের মধ্যেই যাবে," চীনে মাটির স্যাক্সনি ডিসগুলি দেখিয়ে বলল।

সোনিয়া তিরস্কারের সুরে বলল, "ছাড় তো নাতাশা! আমরাই সব প্যাক করছি!"

কিন্তু নাতাশা তার কথা শুনল না। সবকিছু বের করে নতুন করে প্যাক করতে বসল; স্থির করল, কমদামী রুশ কার্পেট ও অপ্রয়োজনীয় চীনে মাটির বাসনগুলি মোটেই নেবে না। বাক্স থেকে সব জিনিস বের করে তারা যখন নতুন করে প্যাক করতে শুরু করল তখন সস্তা দামের জিনিসপত্রগুলো প্রায় সব বাদ দিয়ে দেখা গেল যে মূল্যবান জিনিসগুলো প্রায় সবই দুটো বাক্সেই ধরে গেল। শুধু কার্পেটের বাক্সের ডালাটা কিছুতেই পড়ছে না। আরও কিছু জিনিস হয় তো বাদ দেওয়া যেত, কিন্তু নাতাশা নিজের ইচ্ছা মতই কাজ করতে লাগল। জিনিসগুলো নতুন করে সাজিয়ে—বসিয়ে পেত্‌য়া ও খানসামার সহকারীকে বলল ডালাটাকে চেপে ধরতে। নিজেও সাধ্যমত চাপ দিতে লাগল।

সোনিয়া বলল, "যথেষ্ট হয়েছে নাতাশা। দেখছি তোমার কথাই ঠিক, কিন্তু উপর থেকে আর একটা জিনিস বের করে নিলেই তো হয়।"

"না, কিছুই বের করব না!" নাতাশা চেঁচিয়ে বলল। একহাতে ঘর্মাক্ত মুখের উপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে অন্য হাতে কার্পেটগুলোকে চেপে ধরে বলল, "এবার চাপ দাও পেত্‌য়া! চাপ দাও ভাসিলিচ, জোরে চাপ দাও!"

কার্পেটগুলো একটু বসে গেল, আর ডালাটাও বন্ধ হল। নাতাশা খুশিতে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, তার চোখ দুটি জলে ভরে গেল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। সে আবার নতুন করে কাজে হাত দিল, আর এবার সকলেই তার উপর পুরোপুরি ভরসা পেল। এমন কি কাউণ্টকে যখন বলা হল যে নাতাশা তার অনেক হুকুম বাতিল করে দিয়েছে তখনও সে মোটেই রাগ করল না।

কিন্তু সকলে মিলে অনেক রাত পর্যন্ত যথেষ্ট খেটেও সব জিনিস প্যাক করে শেষ করা গেল না। কাউণ্টেস আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আর কাউণ্টও পরদিন সকাল পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত রেখে শুতে চলে গেল।

সোনিয়া ও নাতাশা পোশাক না ছেড়ে বসার ঘরেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সেই রাতেই পোভার্স্কায়ার পথ ধরে আরও একটি আহত লোককে নিয়ে আসা হল। মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটকেই দাঁড়িয়েছিল; সেই তাকে রস্তভদের

বাড়ির উঠোনে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করল। মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার মনে হল সে একটি জাঁদরেল লোক। একটা ভাল ঢাকা গাড়িতে করে তাকে আনা হয়েছে; তার শরীরটা আগাগোড়া এপ্রন দিয়ে ঢাকা। চালকের বক্সের পাশে বসেছিল একটি সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ পরিচারক। গাড়ির পিছন পিছন এল একজন ডাক্তার ও দুটি সৈনিক।

বুড়ি গৃহকর্ত্রী বুড়ো পরিচারকটিকে বলল, "দয়া করে এখানে আসুন। মনিবরা চলে যাচ্ছেন, কাজেই পুরো বাড়িটাই খালি হয়ে যাবে।"

বুড়ো লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "বেশ তো তাই হোক। ওকে যে জীবিত অবস্থায় বাড়িতে নিয়ে যেতে পারব সে আশা আর করি না! মস্কোতে আমাদের নিজেদের একটা বাড়ি আছে, কিন্তু সেটা তো এখান থেকে অনেক দূর, আর সে বাড়িতে এখন কেউই নেই।"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "দয়া করে ভিতরে আসুন, আমার মনিবের বাড়িতে সবকিছুই পাবেন। ···উনি কি খুবই অসুস্থ?"

পরিচারকটি হতাশার ভঙ্গী করল।

"ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারব বলে আর আশা নেই! ডাক্তার ডাকতে হবে!"

বুড়ো বক্স থেকে নেমে পিছনের গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

ডাক্তার বলল, "ঠিক আছে।"

বুড়ো আবার তাদের গাড়িতে ফিরে এল; ভিতরে তাকিয়ে হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল, কোচয়ানকে উঠোনে ঢুকতে বলে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার পাশে দাঁড়াল।

বুড়ি বলল, "হা প্রভু যীশুখৃস্ট!"

আহত লোকটিকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। "মনিবরা কোনরকম আপত্তি করবেন না···"

আহত লোকটিকে দোতলায় তোলা যাবে না। কাজেই নীচের যে ঘরটা মাদাম শোসকে দেওয়া হয়েছে সেখানেই তাকে তোলা হল।

আহত লোকটি প্রিন্স আন্দ্রু বলকন্‌স্কি।

অধ্যায়—১৫

মস্কোর শেষের দিনটি এসে পড়ল। হেমন্তের একটি উজ্জ্বল রবিবার। প্রতি রবিবারের মতই সর্বত্র গির্জায় ঘণ্টা বাজত। শহরের কপালে কি যে আসছে তা এখনও কেউ বুঝতে পারছে না।

শুধু দুটো জিনিস থেকে মস্কোর সামাজিক অবস্থাটার হদিস পাওয়া যাচ্ছে—দরিদ্র জনসাধারণ আর জিনিসপত্রের দাম। কারখানার শ্রমিক, গৃহ-ভৃত্য ও চাষীদের একটা মস্ত বড় দল—কিছু অফিসার, ধর্মীয় মহাবিদ্যা-

লয়ের ছাত্র ও ভদ্রলোকও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—খুব সকালেই তিন পাহাড়ে চলে গেছে। সেখানে তারা রস্তপ্‌চিনের জন্ম অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল, কিন্তু সে এল না; তখন তাদের দৃঢ় ধারণা হল যে মস্কো পরিত্যাগ করা হবে, আর তারাও শহরের নানা মদের দোকানে ও খাবার দোকানে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিনকার দ্রব্যমূল্য থেকেও অবস্থাটা বোঝা গেল। অস্ত্রশস্ত্র, সোনা, ও গাড়ি-ঘোড়ার দাম বাড়ছে, আর নোটের মূল্যবান ও নাগরিক প্রয়োজনের জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত কমছে; ফলে দুপুর নাগাদ দেখা গেল, কাপড় ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস গাড়িভর্তি করে নিয়ে গিয়ে তার বিনিময়ে দাম পেল গাড়ি ভাড়ার অর্ধেক; ওদিকে চাষীদের ঘোড়া প্রতি ভাড়া উঠল পাঁচ শ' রুবল, আর আসবাবপত্র, আয়না ও ব্রোঞ্জের জিনিস বিনামূল্যে বিলিয়ে দেওয়া হতে লাগল।

রস্তভদের সেকেলে বাড়িতে কিন্তু সাবেকি জীবনযাত্রা ভেঙে পড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শুধু দেখা গেল, ভূমিদাসদের মস্তবড় দলের মধ্যে তিনজন রাতারাতি উধাও হয়ে গেল, কিন্তু কোন কিছু চুরি হয় নি; আর জমিদারি থেকে যে ত্রিশখানা চাষীদের গাড়ি এসেছিল সেগুলোর দাম অত্যন্ত বেড়ে গেল।

সেদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ আস্তে পা ফেলে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সবে ভোরের দিকে কাউন্টেস একটু ঘুমিয়েছে, পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই এই সতর্কতা। লিলাক-রঙের ড্রেসিং-গাউন পরে কাউন্ট বারান্দায় এসে দাঁড়াল। মালবোঝাই গাড়িগুলো উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রী-গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে সামনের ফটকে। বড় নায়েব বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি বুড়ো আর্দালি ও হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা একজন তরুণ অফিসারের সঙ্গে কথা বলছে। কাউন্টকে দেখতে পেয়ে বড় নায়েব অর্থপূর্ণ কঠোর অঙ্গভঙ্গী করে তাদের দুজনকেই চলে যেতে বলল।

"আরে ভাসিলিচ, সব প্রস্তুত তো?" কাউন্ট শুধাল; তারপর টাক মাথায় টোকা দিতে দিতে খুশিমনে অফিসার ও আর্দালিটির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। (কাউন্ট নতুন নতুন মুখ দেখতে ভালবাসে।)

"এক্ষুণি ঘোড়া যুত্‌তে পারি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কাউন্টেসের ঘুম ভাঙলেই আমরা যাত্রা করব।" অফিসারটির দিকে ফিরে বলল, "কি ব্যাপার মশায়? আপনারা কি আমার বাড়িতেই আছেন না কি?"

অফিসারটি আরও কাছে এগিয়ে গেল; হঠাৎ তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

"কাউন্ট, আপনি যদি দয়া করে…ঈশ্বরের দোহাই, আপনার গাড়ির এক-কোণে আমাকে একটু জায়গা দেন। আমার সঙ্গে জিনিসপত্র কিছু নেই…

একটা বোঝাই গাড়িতে যেতে পারলে আমি সুস্থ থাকতে পারব…"

অফিসারের কথা শেষ হবার আগেই তার আর্দালিও মনিবের হয়ে ওই একই অনুরোধ জানাল।

কাউণ্ট তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "নিশ্চয়, নিশ্চয়! আমি খুশি হব, খুব খুশি হব! ভাচিলিচ, একটা ব্যবস্থা কর তো। দু' একটা গাড়ির মাল নামিয়ে ফেল। আরে, তাতে আর কি হল…যা কিছু দরকার করে ফেল।"

কাউণ্ট একবার চারদিকে তাকাল। উঠোনে, ফটকে, বাড়ির বাইরের অংশের জানালায় আহত অফিসার ও তাদের আর্দালিদের ভিড়। সকলেই কাউণ্টের দিকে তাকিয়ে আছে, বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছে।

বড় নায়েব বলল, "গ্যালারিতে চলে আসুন ইয়োর এক্সেলেন্সি। এবার বলুন, ছবিগুলোর কি করা হবে?"

আহতদের মধ্যে যারা গাড়িতে যেতে চায় তাদের যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয় এই কথা বলতে বলতেই কাউণ্ট বড় নায়েবের সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে গেল।

পাছে তার কথা কেউ শুনে ফেলে এই ভয়ে কাউণ্ট গলা নামিয়ে বলল, "আরে, কোন অসুবিধা নেই, কিছু জিনিস নামিয়ে নিলেই হবে।"

নটার সময় কাউণ্টেসের ঘুম ভাঙল; তার পুরনো সহচরী মাত্রিনা তিমোফীভ্না এসে জানাল, মাদাম শোস খুব রেগে গেছে, কারণ তার ট্রাংকটা গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কাউণ্টের হুকুমমত আহত সৈন্যদের জায়গা করে দিতে গাড়িতে বোঝাই করা অনেক মালপত্র নামিয়ে ফেলা হচ্ছে। কাউণ্টেস স্বামীকে ডেকে পাঠাল।

"এসব কি শুনছি গো? শুনলাম গাড়ি থেকে সব মাল নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে?"

"কি জান সোনা, তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম…প্রিয় কাউণ্টেস…একজন অফিসার এসে আহতদের জন্য কয়েকটা গাড়ি চাইলেন। যাই বল, আমাদের যা জিনিসপত্র তা তো আবার কিনে নেওয়া যাবে, কিন্তু আহতদের ফেলে গেলে তাদের কি দশা হবে সেটা ভেবে দেখ! …সত্যি তো, আমাদেরই উঠোনে—আর আমরাই তাদের ডেকে এনেছি, তাদের মধ্যে অফিসাররাও আছেন…বুঝতেই তো পারছ গো…তাই আমি মনে করি যে তাদের তুলে নেওয়া হোক…তাড়াতাড়ির কি আছে?"

টাকাপয়সার ব্যাপারে কাউণ্ট সবসময়ই ভয়ে ভয়ে কথা বলে থাকে। ওদিকে কাউণ্টেসও সব সময়ই এ ধরনের ভীরু-ভীরু কথার প্রতিবাদ করে থাকে; এটাকে সে তার কর্তব্য বলেই মনে করে।

কাউণ্টেস বলল: "শোন কাউণ্ট, তুমি এমন বন্দোবস্তই করেছ যে বাড়িটার জন্য আমরা কিছুই পাচ্ছি না, আর এখন তুমি কি না আমাদের—

তোমার ছেলেমেয়েদের সব সম্পত্তি ফেলে দিতে চাইছ! তুমি তো নিজেই বলেছ যে আমাদের বাড়িতে যা জিনিসপত্র আছে তার দাম লাখ রুবল। এতে আমার মত নেই, মোটেই মত নেই! তোমার যা খুশি কর! আহতদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব সরকারের; সেটা তারাও জানে। লোপুখিনদের বাড়ির দিকে চেয়ে দেখ, দু' দিন আগেই সে বাড়ি থেকে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। অন্য সকলে তাই তো করে। আর আমরাই বোকার মত কাজ করি। আমাকে তুমি দয়া দেখাতে না পার, কিন্তু ছেলেমেয়েদের প্রতি কিছুটা সদয় হও।"

হতাশভাবে দুই হাত ঘুরিয়ে কাউন্ট কোন কথা না বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তার পিছন পিছন এসে নাতাশা বলল, "তুমি এসব কি করছ বাপি?"

"কিছু না! তা দিয়ে তোমার কি দরকার?" কাউন্ট রেগে বলল।

নাতাশা বলল, "কিন্তু আমি শুনেছি। মামণি আপত্তি করছে কেন?"

"তা দিয়ে তোমার কি দরকার?" কাউন্ট চেঁচিয়ে উঠল।

নাতাশা জানালা পর্যন্ত এগিয়ে এসে ভাবতে লাগল।

"বাপি! বের্গ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসছে," জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সে বলল।

অধ্যায়—১৬

রস্তভদের জামাই বের্গ এর মধ্যেই কর্ণেল হয়েছে; ভ্লাদিমির ও আন্না সম্মান-পদক ঝুলিয়েছে; এখনও দ্বিতীয় বাহিনীর প্রথম ডিভিসনের সহকারী কম্যাণ্ডারের প্রধান কর্মচারির সহকারীর নির্ঝঞ্ঝাট ও সুখের চাকরিতেই কাজ করে চলেছে।

১লা সেপ্টেম্বর সে সেনাদল থেকে মস্কো এসেছে।

মস্কোতে তার কোন কাজ ছিল না; কিন্তু যখন দেখল যে সকলেই ছুটি নিয়ে কোন না কোন কাজে মস্কো যাচ্ছে, তখন সেও পারিবারিক ও গৃহস্থালির কারণে ছুটি চাওয়াটা দরকার বোধ করল।

কোন রাজপুত্রের মত সুদৃশ্য দুটো ঘোড়ায় টানা নিজের ফিটফাট ছোট গাড়িটা হাঁকিয়ে বের্গ শ্বশুরবাড়ি এসে হাজির হল। উঠোনের গাড়িগুলোকে ভাল করে দেখতে দেখতে বারান্দায় পৌঁছে একখানা পরিষ্কার রুমাল পকেট থেকে বের করে তাতে একটা গিঁট দিল।

বাইরের ঘর থেকে অধৈর্য হয়ে পা ফেলে বৈঠকখানায় ঢুকে সে কাউন্টকে আলিঙ্গন করল, নাতাশা ও সোনিয়ার হাতে চুমো খেল এবং তাড়াতাড়ি "মামণির" স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করল।

কাউন্ট বলল, "যা দিনকাল পড়েছে তার মধ্যে আবার স্বাস্থ্য? এবার

তোমার খবর বল। সেনাদল কি পশ্চাদপসরণ করবে, না কি আর একটা যুদ্ধ হবে ?"

বের্গ বলল, "আমাদের পিতৃভূমির কপালে যে কি আছে তা একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন বাপি। সেনাদল তো বীরত্বে টগবগ করছে, আর নেতারা সমর-পরিষদের বৈঠকে বসেছেন। কি যে হবে তা কেউ জানে না। কিন্তু মোটামুটিভাবে আপনাকে বলতে পারি বাপি, রুশবাহিনী যে বীরত্বের মনোভাব, যে প্রাচীনকালের শৌর্যবীর্যের স্বাক্ষর রেখেছে ২৬ তারিখেরযুদ্ধে—কোন ভাষায় তার বর্ণনা করা যায় না। আপনাকে বলছি বাপি (একজন জেনারেলের নকল করে বের্গ নিজের বুকে করাঘাত করল, যদিও সেটা করা উচিত ছিল "রুশবাহিনী" কথাটা বলার সময়), খোলাখুলিই বলছি যে আমরা সেনাপতিরা প্রায় কিছুই করি নি, বরং তাদের প্রাচীনকালের শৌর্য প্রদর্শনের বেলায় বাধা দিতে পর্যন্ত পারি নি। আপনাকে নিশ্চয় করে বলতে পারি, সেনাদলের সম্মুখে থেকে জেনারেল বার্কলে দ তলি সর্বত্রই নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছেন। আমাদের সেনাদলের ঘাঁটি ছিল একটা পাহাড়ের পাশে। ভাবতে পারেন!"

সেই দিনগুলিতে শোনা যেসব কাহিনী তার মনে ছিল বের্গ সে সবগুলিই একে একে বলে গেল। নাতাশা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে সে একটু বিচলিত বোধ করল।

একটু হেসে বলতে লাগল, "সবকিছু মিলিয়ে রুশ যোদ্ধারা যে বীরত্ব দেখিয়েছে তা যেমন কল্পনাতীত, তেমনই বর্ণনাতীত! রাশিয়া আজ মস্কোতে নেই, তার আসন পাতা রয়েছে তার বীর পুত্রদের অন্তরে! তাই নয় কি বাপি ?"

ঠিক সেইসময় কাউণ্টেস ঘরে ঢুকল; তার চোখে মুখে ক্লান্তি ও বিরক্তির ছাপ। বের্গ লাফিয়ে উঠে কাউণ্টেসের হাতে চুমো খেল, তার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিল, মাথা নেড়ে সহানুভূতি প্রকাশ করে তার পাশেই দাঁড়িয়ে রইল।

"সত্যি বলছি মামণি, রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের পক্ষে আজ বড়ই দুর্দিন, বড়ই কষ্টের দিন। কিন্তু আপনি এত উৎকণ্ঠিত হচ্ছেন কেন ? এখান থেকে যাবার মত অনেক সময় হাতে পাবেন…"

স্বামীর দিকে ঘুরে কাউণ্টেস বলল, "চাকরবাকরগুলো যে কি করছে বুঝি না। এইমাত্র বলল, এখনও কিছু তৈরি হয় নি। দেখাশুনা করবার মত একজন লোক তো চাই। এ সময় মিতেংকা থাকলে কত ভাল হত। কাজ যেন আর শেষ হতে চাইছে না।"

কাউণ্ট কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল। চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই মুহূর্তে সম্ভবত নাকটা ঝাড়বার জন্যই বের্গ রুমালটা বের করল। গিঁটটা চোখে পড়তেই অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে কি যেন ভাবল।

বলল, "আপনার কাছে একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা করছি বাপি।"

"হুম্‌…" বলে কাউণ্ট থেমে গেল।

বের্গ হেসে বলল, "এইমাত্র ইউসুপভ-এর বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে আসছিলাম, এমন সময় আমার পরিচিত একটি নায়েব ছুটে এসে জানতে চাইল, আমি কিছু জিনিস কিনব কি না। কৌতূহলবশত ভিতরে ঢুকে দেখলাম একটা ছোট সুন্দর কাবার্ড ও একটা ড্রেসিং-টেবিল। আপনি তো জানেন ভেরার ওরকম একটা কার্বার্ডের খুব শখ, আর এই নিয়ে আমরা কত ঝগড়া পর্যন্ত করেছি। আর জিনিসটা কী সুন্দর। একটা চোরা ইংলিশ টানা পর্যন্ত আছে! ভেরা অনেক দিন থেকে এরকম একটা জিনিস চাইছে। কি জানেন, আমি ওকে বেশ অবাক করে দিতে চাই। আমার উঠোনে তো অনেক গাড়ি দেখলাম। ওর একটা আমাকে দিন, লোকটিকে ভাল টাকাই দেব, আর…"

কাউণ্ট ভুরু কুঁচকে কাশল।

"কাউণ্টেসকে বল, আমি কোন হুকুম দেই না।"

বের্গ বলল, "অসুবিধা হলে থাক; শুধু ভেরার জন্যই জিনিসটা নিতে চেয়েছিলাম।"

"আঃ, উচ্ছন্নে যাও, তোমরা সবাই উচ্ছন্নে যাও! …" বুড়ো কাউণ্ট চেঁচিয়ে উঠল। "আমার মাথার ভিতরটা ঘুরছে।"

কাউণ্ট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। কাউণ্টেস কাঁদতে শুরু করল।

"সত্যি মামণি! বড়ই দুর্দিন।" বের্গ বলল।

বাবার সঙ্গে সঙ্গে নাতাশাও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; তারপর কি করবে বুঝতে না পেরে প্রথমে তাকে অনুসরণ করে পরে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

পেত্‌য়া ছিল বারান্দায়; যেসব চাকর মস্কো ছেড়ে চলে যাচ্ছে সে তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে দিচ্ছে। বোঝাই গাড়িগুলো তখনও উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। একটার দড়িগুলো খুলে ফেলা হয়েছে, আর আর্দালির সহায়তায় একজন অফিসার সেই গাড়িটা বেয়ে উঠছে।

পেত্‌য়া নাতাশাকে শুধাল, "ব্যাপার কি বল তো?"

নাতাশা বুঝল, বাবা-মা কি নিয়ে ঝগড়া করছে, সেটাই সে জানতে চাইছে। কোন কথা বলল না।

পেত্‌য়াই বলল, "বাপি সবগুলো গাড়িই আহতদের জন্য দিতে চাইছে। আর তাই নিয়েই ঝগড়া। ভাসিলিচ আমাকে বলেছে। আমি মনে করি…।"

নাতাশা হঠাৎ রেগে গিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল, "আমি মনে করি

এটা এত ভয়ংকর, এত ঘৃণ্য, এত···কি বলব জানি না। আমরা কি জঘণ্য জার্মান ?"

চাপা কান্নার আবেগে তার গলা আটকে গেল ; পাছে রাগটা ধরা পড়ে যায় তাই সে মুখ ঘুরিয়ে ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

কাউণ্টেসের পাশে বসে বের্গ তাকে পরমাত্মীয়ের মত সান্ত্বনা দিচ্ছে। কাউন্ট পাইপ হাতে নিয়ে ঘরময় পায়চারি করছে। এমন সময় ক্রোধে মুখটা বিকৃত করে নাতাশা ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে দ্রুতপায়ে মার দিকে এগিয়ে গেল।

আর্তকণ্ঠে বলল, "এ তো ভয়ংকর ! এ তো ঘৃণ্য ! এরকম হুকুম তুমি দিতে পার না।"

ভীত, বিব্রত চোখে বের্গ ও কাউণ্টেস তার দিকে তাকাল। জানালায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাউন্ট কান পাতল।

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "মামণি, এ অসম্ভব ; উঠোনে কী হচ্ছে নিজে গিয়ে দেখে এস ! তাদের ফেলে রেখে যাওয়া হবে !···"

"তোমার হল কি ? কাদের কথা বলছ ? কি চাও তুমি ?"

"কেন, আহত লোকগুলো ! এ তো অসম্ভব মামণি ! এ তো দানবীয় কাজ। ···না, লক্ষ্মী মামণি, এ হতে পারে না। আমাকে ক্ষমা কর লক্ষ্মী মামণি···কিছু বাড়তি জিনিস সঙ্গে গেল কিনা তাতে কি যায় আসে ? ···একবার শুধু দেখে এস উঠোনে কি হচ্ছে···মামণি ! ···এ অসম্ভব !···"

মুখ না ফিরিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়েই কাউন্ট সব শুনছে। হঠাৎ নাক ঝেড়ে সে মুখটা জানালার আরও কাছে সরিয়ে নিল।

কাউণ্টেস মেয়ের দিকে তাকাল, মুখটা মায়ের জন্য লজ্জায় আনত, ক্রোধে উচ্ছ্বসিত ; স্বামী কেন যে মুখ না ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাও বুঝতে পারল ; বিব্রত চোখে চারদিকে তাকাল।

কিন্তু হাল না ছেড়েই বলল, "আঃ তোমাদের যা খুশি কর ! আমি কি কাউকে বাধা দিচ্ছি ?"

"মামণি, লক্ষ্মীটি, আমাকে ক্ষমা কর।"

কিন্তু কাউণ্টেস মেয়েকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল।

"ওগো, যা ভাল মনে কর তাই বলে দাও···তুমি তো জান এসব আমি ঠিক বুঝি না," চোখ নীচু করে কাউণ্টেস বলল।

"ডিমরা···ডিমরা এখন মুরগিদের শেখাচ্ছে···" কাউণ্ট বিড়বিড় করে বলল ; খুশিতে তার চোখে জল এসে গেছে ; সে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরল। আর স্ত্রীও সলজ্জ দৃষ্টি লুকোবার জন্য তার বুকে মাথা রাখল।

"বাপি ! মামণি ! আমি কি ওদিকটা দেখব ? কি বল ?" নাতাশা শুধাল "এখনও দরকারী জিনিসপত্র প্রায় সবই আমরা সঙ্গে নিতে পারব।"

কাউন্ট সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়ল, আর নাতাশা হরিণীর মত চকিত চরণে নাচঘর ও বাইরের ঘর পেরিয়ে সোজা উঠোনে নেমে গেল।

চাকরবাকররা নাতাশাকে ঘিরে ধরল, কিন্তু তার অদ্ভুত হুকুম বিশ্বাসই করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত কাউন্ট নিজে এসে স্ত্রীর নামে ঘোষণা করে দিল যে সবগুলি গাড়ি আহতদের জন্য ছেড়ে দিতে হবে, আর ট্রাংকগুলোকে ভাঁড়ার ঘরে ফিরিয়ে নিতে হবে।

যেন এই কাজটি আরও আগে না করার প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই বাড়ির সবগুলো মানুষই একযোগে আহতদের গাড়িতে তুলে দেবার নতুন কর্তব্যটি পালন করতে সাগ্রহে এগিয়ে এল। আহতরা নিজেদের টানতে টানতে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিবর্ণ অথচ খুশিমুখে গাড়ির চারদিকে জড় হতে লাগল। গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে এই খবর ছড়িয়ে পড়ায় আশপাশের বাড়ি থেকেও আহতরা বেরিয়ে এসে রস্তভদের উঠোনে জমা হতে লাগল। অনেকে বলল, মালপত্র নামাবার দরকার নেই, তারা সেগুলির উপরে বসেই যেতে পারবে। কিন্তু মাল নামাবার কাজ একবার শুরু হয়ে যাওয়ায় আর থামানো গেল না।

নায়েব বলল, "আমরা আরও চারজনকে নিতে পারি। তারা আমার গাড়িতেই যাবে, নইলে তাদের দশা কি হবে?"

কাউন্টেস বলল, "আমার পোশাকের গাড়িটা ওদের দিয়ে দাও। দুনিয়াশা আমার সঙ্গে বড় গাড়িতেই যেতে পারবে।"

পোশাকের গাড়িটাকে খালি করে দু' দরজা পরের বাড়ির সামনে সেটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল সেখানকার আহতদের তুলে নিতে। চাকরসমেত গোটা বাড়িটাই খুশিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। নাতাশার মন এত বেশী খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে যে তেমনটি অনেকদিন হয় নি।

একটা ট্রাংককে গাড়ির পিছনের পাদানিতে বসিয়ে দেবার চেষ্টায় চাকররা বলল, "এটাকে কিসের সঙ্গে বাঁধব? অন্তত একটা গাড়ি রেখে দিতেই হবে।"

"এতে কি আছে?" নাতাশা শুধাল।

"কাউন্টের বইপত্র।"

"ছেড়ে দাও, ভাসিলিচ ওটা তুলে রাখবে। ওটার দরকার নেই।"

ফিটনটা যাত্রীতে ভর্তি হয়ে গেছে; কাউন্ট পিতর বসবার জায়গা পাবে কিনা সন্দেহ।

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "বক্সের উপরে। তুমি বক্সের উপর বসবে পেত্‌য়া, পারবে না?"

সোনিয়াও সারাক্ষণ কাজে ব্যস্ত, কিন্তু তার কাজের লক্ষ্য নাতাশার চাইতে আলাদা। যেসব জিনিস ফেলে যাওয়া হচ্ছে সেগুলি গুছিয়ে রেখে

কাউণ্টেসের নির্দেশমত সে তার একটা ফর্দ তৈরি করছে; যথাসম্ভব বেশী জিনিস সঙ্গে নিতেই সে চেষ্টা করছে।

অধ্যায়—১৭

বিকেল দুটোর আগেই রস্তভদের চারখানা গাড়ি পুরো ভর্তি হয়ে সামনের দরজায় এসে দাঁড়াল। একটার পর একটা গাড়ি আহতদের নিয়ে উঠোন থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

যে কালেচ্‌-গাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেটা সামনের বারান্দার পাশ দিয়ে যাবার সময় সোনিয়ার নজর সেদিকে গেল। ফটকে দাঁড়ানো মস্ত বড় উঁচু গাড়িটাতে সোনিয়া তখন একটি দাসীকে নিয়ে কাউণ্টেসের জন্য একটা আসন পাতার আয়োজন করছিল।

গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে সে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কার কালেচ্‌?"

দাসী জবাব দিল, "সে কি, আপনি জানেন না মিস? উনিই তো আহত প্রিন্স; আমাদের বাড়িতেই রাত কাটিয়েছেন, আর আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

"কিন্তু তিনি কে? তার নাম কি?"

"তিনিই তো আমাদের—প্রিন্স বল্কন্‌স্কি স্বয়ং।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে দাসী বলল, "সকলে বলছে তিনি মারা যাবেন।"

গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোনিয়া ছুটে কাউণ্টেসের কাছে গেল। শাল ও ওড়না পরে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে ক্লান্ত দেহে কাউণ্টেস ঘরের মধ্যেই পায়চারি করছে। যাত্রার আগে সকলে বন্ধ ঘরের মধ্যে সমবেত হয়ে নীরবে একবার প্রার্থনা করবে—এটাই রীতি। কাউণ্টেস সেইজন্যই অপেক্ষা করছে। নাতাশা ঘরে নেই।

সোনিয়া বলল, "মামণি, মারাত্মক আহত হয়ে প্রিন্স আন্দ্রু এখানেই আছেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

কাউণ্টেস হতাশ ভঙ্গীতে তাকাল; সোনিয়ার হাতটা চেপে ধরে চারদিক দেখল।

"নাতাশা?" সে অস্ফুট স্বরে বলল।

এইমুহূর্তে তাদের কাছে এই সংবাদের একটিই মাত্র তাৎপর্য। নাতাশাকে তারা চেনে; এ খবর তার কানে গেলে যে কি ঘটবে সেই ভয়েই এই লোকটির প্রতি তাদের দুজনের সহানুভূতিতেই ভাটা পড়ল।

সোনিয়া বলল, "নাতাশা এখনও জানে না, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছেন।"

"তুমি বলছ সে মরতে বসেছে ?"

সোনিয়া মাথা নাড়ল।

সোনিয়াকে জড়িয়ে ধরে কাউণ্টেস কেঁদে উঠল।

ভাবল, "ঈশ্বর যে কখন কি করেন তা আমাদের বুদ্ধির অগোচর।" সর্বশক্তিমানের অদৃশ্য হাত ক্রমেই যেন ঘটনাবলীর ভিতর দিয়ে প্রত্যক্ষগোচর হয়ে উঠছে।

উত্তেজিত মুখে ঘরে ঢুকে নাতাশা শুধাল, "আচ্ছা মামণি, সবই তো প্রস্তুত। ব্যাপার কি ?"

কাউণ্টেস বলল, "কিছু না তো। সব প্রস্তুত হয়ে থাকলে এবার আমরা যাত্রা করি।"

নিজের মুখের উত্তেজনা লুকোবার জন্য কাউণ্টেস ওড়না দিয়ে মুখটা ঢেকে দিল। সোনিয়া নাতাশাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

নাতাশা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

"ব্যাপার কি ? কি হয়েছে ?"

"কিছু না…না…"

সহজ বুদ্ধিতে একটা কিছু আঁচ করে নাতাশা বলল, "আমার পক্ষে খুব খারাপ কিছু কি ? সেটা কি ?"

সোনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল, কোন জবাব দিল না। কাউণ্ট, পেত্‌য়া, মাদাম শোস, মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ও ভাসিলিচ বৈঠকখানায় ঢুকে দরজাগুলো বন্ধ করে দিল। তারপর সকলে বসে পড়ে কিছুক্ষণ নীরবে কাটাল; কেউ কারও দিকে তাকাল না।

প্রথমে উঠে দাঁড়াল কাউণ্ট; দেবমূর্তির সামনে ক্রুশ-চিহ্ন এঁকে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অন্য সকলেও তাই করল। তারপর কাউণ্ট মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ও ভাচিলিচকে আলিঙ্গন করল। তারা দুজন মস্কোতেই থেকে যাচ্ছে; তারা যখন তার হাত ধরে কাঁধে চুমো খেল কাউণ্ট তখন আলতোভাবে তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে কিছু সান্ত্বনা ও স্নেহের বাণী শোনাল। ভজনালয়ে ঢুকে কাউণ্টেস দেখল দেয়ালে ঝোলানো একটি দেবমূর্তির সামনে সোনিয়া নতজানু হয়ে বসে আছে।

পেত্‌য়া যেসব লোকদের তরবারি ও ছুরি দিয়েছিল তারা উঁচু বুটের মধ্যে ট্রাউজার গুঁজে দিয়ে, কোমরবন্ধগুলো শক্ত করে এঁটে যারা এখানেই থেকে যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে একে একে বিদায় নিতে শুরু করেছে।

কোথাও যাবার আগে যেমন হয়ে থাকে, অনেককিছুই ভুল হয়েছে বা ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে; কাউণ্টেসকে গাড়িতে তুলে দেবার জন্য দুটি চাকর গাড়ির পাদানির দুপাশে দাঁড়িয়ে আছে; আর দাসীরা ছুটাছুটি করে টুকিটাকি জিনিস নিয়ে একবার গাড়ি, কালেচ্‌ ও কিটনের দিকে ছুটে

আসছে, আবার বাড়ির ভিতরে যাচ্ছে।

কাউণ্টেস বলল, "ওরা সব সময় সবকিছু ভুলে যাবে। তুমি কি জান না যে এভাবে আমি বসতে পারি না ?"

দুনিয়াশা কোন কথা না বলে দাঁতে দাঁত চেপে ক্ষুব্ধ মুখে গাড়ির মধ্যে ঢুকে আসনটাকে নতুন করে পাততে লাগল।

মাথা নেড়ে কাউণ্ট বলল, "আঃ, চাকরগুলোও হয়েছে বটে !"

বুড়ো কোচয়ান এফিম বক্সে সোজা হয়ে বসে আছে; চারদিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে একবার তাকিয়েও দেখছে না। কাউণ্টেস একমাত্র তাকেই ভরসা করে নিজের গাড়িটা চালাতে দেয়। ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতায় সে জানে যে "ঈশ্বরের নাম নিয়ে গাড়ি ছেড়ে দাও !" এ হুকুম আসতে এখনও দেরি আছে; সে জানে, হুকুম হবার পরেও আরও দু' একবার গাড়ি থামাতে হবে, ভুল করে ফেলে-আসা কিছু জিনিসপত্র আনতে আবার তারা বাড়ির ভিতর ঢুকবে এবং তারপরেও আবার তাকে থামিয়ে কাউণ্টেস জানালা দিয়ে মুখ বের করে ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে পাহাড় থেকে নামবার সময় তাকে খুব সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে বলবে। এসবই তার জানা; তাই ঘোড়াগুলোর চাইতেও বেশী ধৈর্যের সঙ্গে সে অপেক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত সকলে উঠে বসল, গাড়ির সিঁড়িগুলো ভাঁজ করে তুলে দেওয়া হল, দরজা বন্ধ করা হল, একজনকে পাঠানো হল একটা বস্ত্র আনতে, আর কাউণ্টেস মাথা বের করে যা বলার ছিল তাই বলল। এফিম ইচ্ছা করেই টুপিটা তুলে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। সহিস ও অন্য চাকররাও তাই করল। টুপিটা মাথায় বসিয়ে এফিম বলল, "ঈশ্বরের নাম নিয়ে যাত্রা কর। শুরু কর !" ঘোড়াগুলো নড়ে উঠল, গাড়ির চাকায় শব্দ হল, গাড়িটা দুলে উঠল। সহিস চলতি গাড়িতে লাফিয়ে উঠল; একটা ঝাঁকুনি খেয়ে উঠোন পেরিয়ে গাড়িটা অসমান রাস্তায় পড়ল; অন্য গাড়িগুলো দুলতে দুলতে পিছু নিল; গাড়ির একটা শোভাযাত্রা পথ ধরে এগিয়ে চলল। বাড়ির উল্টো দিকের গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় গাড়ি, কালেচ্‌ ও ফিটনের সব যাত্রীরাই ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল। যারা মস্কোতেই থেকে গেল তারা যাত্রীদের বিদায় জানাতে গাড়িগুলোর দুই পাশে হাঁটতে লাগল।

কাউণ্টেসের পাশে বসে পরিত্যক্ত, বিক্ষুব্ধ মস্কোর অপস্রিয়মান দেয়ালগুলির দিকে তাকিয়ে নাতাশার মনে আনন্দের যে অনুভূতি জাগল এর আগে সেরকম অনুভূতি তার জীবনে কদাচিৎ এসেছে। মাঝে মাঝে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার পিছনে তাকাচ্ছে, একবার সামনে সারিবদ্ধ আহতদের দিকে তাকাচ্ছে। সেই সারির একেবারে সামনে আছে প্রিন্স আন্দ্রুর দুই-তালা কালেচ্‌-গাড়িটা। সে গাড়ির মধ্যে কে আছে তা সে জানে না, কিন্তু যতবার সারির দিকে তাকাচ্ছে ততবারই ওই কালেচ্‌টা

তার চোখে পড়ছে। সে জানে যে গাড়িটা তার সামনেই আছে।

কুদ্রিনোতে অনুরূপ আরও কয়েকটি গাড়ির শোভাযাত্রা এল নিকিৎস্কি, প্রেস্নিয়া ও পদ্নভিন্স্ক স্ট্রীট থেকে। সদোভায়া স্ট্রীট ধরে এগোবার সময় সবগুলো যাত্রী-গাড়ি ও মালগাড়ি দুটো সারি বেঁধে পাশাপাশি এগিয়ে চলল।

সুখারেভ জলের গম্বুজটা ঘুরে যাবার সময় নাতাশা হঠাৎ সানন্দ বিস্ময়ে চীৎকার করে উঠল:

"আরে! মামণি, সোনিয়া, দেখ, তিনি যাচ্ছেন!"

"কে? কে?"

"দেখ! হ্যাঁ, সত্যি বলছি, ঐ তো বেজুখভ!" কোচয়ানের লম্বা কোট পরিহিত একটি দীর্ঘকায় লোককে দেখিয়ে নাতাশা বলল। লোকটির চালচলন দেখেই বোঝা যাচ্ছে সে ছদ্মবেশে চলেছে। সঙ্গে ফ্রীজ-কোট পরা একটি ফ্যাকাসে-মুখ, দাড়িবিহীন বুড়ো লোক।

নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, ঠিক বেজুখভ; কোচয়ানের কোট গায়ে, সঙ্গে একটি অদ্ভুত-দর্শন বুড়ো। সত্যি, তাকিয়ে দেখ!"

"না, সে নয়। কী বাজে বকছ?"

নাতাশা চেঁচিয়ে বলল, "মামণি, আমার মাথাটা বাজি, নির্ঘাৎ সে! আমি নিশ্চিত বলতে পারি। থাম, থাম!" সে কোচয়ানকে লক্ষ্য করে বলল।

কিন্তু কোচয়ান থামতে পারল না, কারণ মেশ্‌চান্‌স্কি স্ট্রীট থেকে আরও অনেক গাড়ি এসে পড়ল, আর তারা সকলেই রস্তভদের রাস্তা আটকে না থেকে এগিয়ে যেতে বলল।

যদিও এখন লোকটি আরও দূরে চলে গেছে তবু রস্তভরা সকলেই পিয়েরকে—বা হুবহু তার মত দেখতে একটি লোককে—দেখতে পেল; একটা কোচোয়ানের কোট গায়ে চড়িয়ে মাথাটা নীচু করে গম্ভীর মুখে হেঁটে চলেছে; পাশে একটি ছোটখাট দাড়িহীন বুড়ো মানুষ; দেখে মনে হয় পরিচারক। বুড়ো লোকটি খেয়াল করল যে গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে কে যেন তাদের দিকে তাকিয়ে আছে; সশ্রদ্ধভাবে পিয়েরের কনুই ছুঁয়ে তাকে কি যেন বলে গাড়িটা দেখাল। পিয়ের চিন্তায় ডুবে ছিল, প্রথমে তার কথা বুঝতে পারল না। পরে বুড়োর নির্দেশমত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে নাতাশাকে চিনতে পারল এবং প্রথম আবেগের টানেই দ্রুতপায়ে গাড়িটার দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু ডজনখানেক পা ফেলার পরেই কিছু মনে পড়ায় থেমে গেল।

নাতাশার মুখটা রহস্যময় মমতায় জ্বলজ্বল করতে লাগল।

পিয়েরের দিকে হাত বাড়িয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, "পিতর, কিরিলভিচ, এখানে এস! আমরা তাকে চিনতে পেরেছি! কী আশ্চর্য! …আপনি

এখানে কি করছেন? আপনার এরকম চেহারা হয়েছে কেন?"

চলমান গাড়ি থেকেই নাতাশা হাত বাড়িয়ে দিল। গাড়ির পাশে হাঁটতে হাঁটতেই সে হাতটায় চুমো খেল।

বিস্মিত ও সহানুভূতিপূর্ণ সুরে কাউন্টেস বলল, "ব্যাপার কি কাউন্ট?"

"কি? কি? কেন? এসব প্রশ্ন করবেন না," বলে পিয়ের নাতাশার দিকে মুখ ফেরাল; তার আনন্দে রক্তিম মুখখানি দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল।

"আপনি তাহলে মস্কোতেই আছেন?"

পিয়ের ইতস্তত করল।

"মস্কোতে? হ্যাঁ, মস্কোতে। বিদায়!"

নাতাশা বলে উঠল, "হায়, আমি যদি পুরুষ মানুষ হতাম! তাহলে ঠিক ওর সঙ্গে থেকে যেতাম। কী চমৎকার! মামণি, যদি রাজী হও তো আমি থেকে যাই।"

নাতাশার দিকে তাকিয়ে পিয়ের কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কাউণ্টেস তাকে বাধা দিল।

"শুনেছি, আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম," পিয়ের জবাব দিল। "কাল আর একটা যুদ্ধ হবে…" নাতাশা তাকে বাধা দিল।

"কিন্তু আপনার কি হয়েছে কাউন্ট? আপনি যে একেবারেই বদলে গেছেন।…"

"আঃ, কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না, কিচ্ছু না! আমি নিজেই জানি না। কাল…কিন্তু না! বিদায়, বিদায়! …বড়ই খারাপ সময় চলেছে!" সে ফুটপাতে পা বাড়িয়ে দিল।

নাতাশা অনেকক্ষণ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রইল; একটা রহস্যময় খুশির হাসিতে তার মুখটা ঝলমলিয়ে উঠল।

অধ্যায়—১৮

বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে শেষের দুটো দিন পিয়ের তার উপকারী মৃত বাজ্‌দীপ-এর খালি বাড়িতেই বাস করছে। ব্যাপারটা এইভাবে ঘটেছে।

মস্কোতে ফিরে আসার পরে এবং কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন কিছুক্ষণ সে বুঝতেই পারল না সে কোথায় আছে এবং তাকে কি করতে হবে। যখন তাকে জানানো হল যে অভ্যর্থনা-ঘরে যারা তার জন্য অপেক্ষা করছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে একটি ফরাসী ভদ্রলোক, আর সে তার স্ত্রী কাউণ্টেস হেলেনের কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে এসেছে, তখন সহসা একটা বিশৃঙ্খলা ও হতাশারভাব তাকে একেবারে পেয়ে বসল। তার মনে হল, সব শেষ হয়ে গেছে, সবকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে

যাচ্ছে, কেউ ঠিক নয় বা কেউ ভুল নয়, ভবিষ্যতের কোন আশা নেই, আর এ পরিস্থিতির হাত থেকেও পরিত্রাণ নেই। অস্বাভাবিকভাবে হেসে বিড় বিড় করে কি যেন বলল, প্রথমে হতাশ হয়ে একটা সোফায় বসে পড়ল, তারপর উঠে অভ্যর্থনা-ঘরের দরজার কাছে গিয়ে একটা ফোকড়ের ভিতর দিয়ে উঁকি দিল, এবং দুই হাত ঘোরাতে ঘোরাতে এসে একটা বই তুলে নিল। বড় নায়েব দ্বিতীয়বার ঘরে ঢুকে বলল, যে ফরাসী লোকটি কাউণ্টেসের চিঠি নিয়ে এসেছে সে একমিনিটের জন্য হলেও একবার দেখা করতে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, আর বাজ্‌দীভ-এর বিধবা পত্নীর কাছ থেকে আগত একজন জানাচ্ছে, যেহেতু বিধবাটি গ্রামে ফিরে যাচ্ছে তাই পিয়ের যেন তার স্বামীর বইগুলোর ভার বুঝে নেয়।

পিয়ের বলল, "ও, হ্যাঁ, একমিনিট সবুর কর····না, থাক। ····গিয়ে বল, আমি এখনই যাচ্ছি।"

কিন্তু লোকটি বেরিয়ে যেতেই পিয়ের টেবিল থেকে টুপিটা নিয়ে অন্য দরজা দিয়ে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বারান্দায় কেউ ছিল না। গোটা বারান্দাটা পেরিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত চলে গেল এবং ভুরু কুঁচকে দুই হাতে কপালটা ঘসে প্রথম চাতাল পর্যন্ত নেমে গেল। হলের দারোয়ান সামনের দরজাতেই দাঁড়িয়েছিল। পিয়ের যে চাতালে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে একটা দ্বিতীয় সিঁড়ি নেমে গেছে পিছনের ফটকে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে সে উঠোনে চলে গেল। কেউ তাকে দেখতে পায় নি। কিন্তু সেখানে কয়েকটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল; পিয়ের ফটকের বাইরে পা দিতেই কোচয়ান ও দারোয়ান তাকে দেখে টুপি তুলল। পিয়ের যখন বুঝতে পারল যে সে ধরা পড়ে গেছে তখন সে উঠ পাখির মত ব্যবহার করে বসল: উট পাখি যেমন অন্যের নজর এড়াতে ঝোপের মধ্যে মাথা গুঁজে দেয়, পিয়েরও তেমনি মাথাটা নুইয়ে দ্রুত পা ফেলে রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল।

সেদিন যেসব কাজ পিয়েরের হাতে ছিল তার মধ্যে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর বই ও কাগজপত্রের সুরাহা করাটাই তার কাছে সবচাইতে দরকারী বলে মনে হল।

একটা গাড়ি ভাড়া করে চালককে বলল "প্যাট্রিয়ার্কস্‌ পণ্ড"-এ যেতে; বাজ্‌দীভ-এর বিধবা পত্নী সেখানেই থাকে।

বোঝাই গাড়িগুলো সারি বেঁধে চারদিক থেকে অনবরত মস্কো থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে আর জোড়াতালি-মারা পুরনো গাড়ি থেকে তার মোটা শরীরটা যাতে ছিটকে না পড়ে সেদিকে খেয়াল রেখে পিয়ের স্কুল-পালানো ছেলের মত খুশির মেজাজে চালকের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

লোকটি বলল, ক্রেমলিনে আজ সব্বাইকে অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে, কাল

প্রত্যেককে পাঠিয়ে দেওয়া হবে তিন পাহাড় ফটকের ওপারে, সেখানে একটা প্রচণ্ড লড়াই হবে।

“প্যাট্রিয়ার্কস্ পন্ড”-এ পৌঁছে পিয়ের বাজ্‌দীভের বাড়িটা খুঁজে নিল। অনেকদিন এখানে আসা হয় নি। ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ঢোকার শব্দে গেবাসিম বেরিয়ে এল। পাঁচ বছর আগে তর্ঝক-এ এই ফ্যাকাসে দাড়িহীন বুড়ো লোকটাকেই সে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর সঙ্গে দেখেছিল।

“বাড়ি আছেন ?” পিয়ের শুধাল।

“যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তার ফলে সোফিয়া দানিলভনা বাচ্চাদের নিকে তর্ঝক জমিদারিতে চলে গেছেন ইয়োর এক্সেলেন্সি।”

“আমাকে ভিতরে যেতেই হবে, বইগুলো একবার দেখতে চাই”, পিয়ের বলল।

“দয়া করে ভিতরে আসুন। আমার স্বর্গত মনিবের ভাই মকার আলেক্সিভিচ এখানেই আছেন, কিন্তু আপনি তো জানেন তার অবস্থাও খুব দুর্বল,” বুড়ো চাকরটি বলল।

পিয়ের জানে যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর আধাপাগল ভাই মকার আলেক্সিভিচ একটি পাঁড় মাতাল।

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। ভিতরে চল·····” বলে পিয়ের বাড়ির ভিতর ঢুকল।

একটি লাল নাক, টাক মাথা, লম্বা বুড়ো লোক বাইরের ঘরে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে ড্রেসিং-গাউন, পায়ে উঁচু রবারের জুতো। পিয়েরকে দেখে রাগে বিড়বিড় করতে করতে সে বারান্দা ধরে চলে গেল।

গেরাসিম বলল, “একসময় খুব চালাক-চতুর লোক ছিলেন, কিন্তু ইয়োর অনার তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন বড়ই দুর্বলা হয়ে পড়েছেন। আপনি কি পড়ার ঘরে যাবেন ?” পিয়ের মাথা নাড়ল। ঘরটা যেমন সিল-মারা ছিল তেমনই আছে। সোফিয়া দানিলভ্‌না বলে গেছেন, আপনার কাছ থেকে কেউ এলে তাকে যেন বইগুলো দিয়ে দেই।”

উপকারীর জীবদ্দশায় এই বিষণ্ণ পড়ার ঘরটাতে দুরুদুরু বুকে পিয়ের অনেকবার ঢুকেছে। যোসেফ বাজ্‌দীভ-এর মৃত্যুর পরে কারও হাত না পড়ায় ধুলোময়লাতে ঘরটা আরও বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

একটা জানালা খুলে দিয়ে গেরাসিম পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিয়ের চারদিক ঘুরে দেখল, যে কাবার্ডে হাতে-লেখা পুঁথিগুলি থাকে সেদিকে গেল এবং যে গ্রন্থগুলি একদিন ছিল সংঘের পবিত্রতমবস্তু সেগুলি বের করে নিল। ধুলি-মলিন লেখার টেবিলে বসে পাণ্ডুলিপিগুলি সামনে মেলে ধরল. আবার বন্ধ করল, একপাশে সরিয়ে রাখল, তারপর দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে ধ্যানে ডুবে গেল।

গেরাসিম বারকয়েক সতর্কভাবে ঘরে এল; প্রত্যেকবারই পিয়েরকে সেই একই ভঙ্গীতে বসে থাকতে দেখল।

দু' ঘণ্টার বেশী পার হয়ে গেল। পিয়েরের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য গেরাসিম সাহস করে দরজার কাছে একটু শব্দ করল; কিন্তু পিয়ের তা শুনতে পেল না।

"কোচয়ানকে কি ছেড়ে দেব ইয়োর অনার?"

"ওঃ, হ্যা!" ধ্যানভেঙে ত্বরিতে উঠে পিয়ের বলল। তারপর গেরাসিমের কোটের একটা বোতাম ধরে অশ্রুভেজা, রহস্যময় চোখে বুড়ো লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমি বলছি কি, কাল যে একটা যুদ্ধ হবে তা কি তুমি জান?

"সেইরকমই শুনেছি," লোকটি জবাব দিল।

"আমার অনুরোধ, আমি কে সেকথা কাউকে বলোনা, আর আমি যা বলছি তাই কর।"

গেরাসিম বলল, "ঠিক আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনি কিছু খাবেন কি?"

"না, কিন্তু একটা জিনিস আমি চাই। পরিষ্কার জামা-কাপড় আর একটা পিস্তল," অপ্রত্যাশিতভাবে মুখটা লাল করে পিয়ের বলল।

একমুহূর্ত ভেবে গেরাসিম বলল, "তাই হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

সারাটাদিন পিয়ের একাকি সেই পড়ার ঘরেই কাটাল। গেরাসিম শুনতে পেল সে অস্থিরভাবে ঘরময় পায়চারি করছে আর আপন মনেই কথা বলছে। সেই ঘরের বিছানাতেই রাতটাও কাটাল।

এ বাড়িতে অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটতে গেরাসিম দেখেছে; তাই পিয়ের এ বাড়িতে থাকাতেও সে বিস্মিত হল না, বরং একজন লোক পেয়ে খুশিই হল। সেদিন সন্ধ্যায়ই বিনা প্রশ্নে সে পিয়েরের জন্য একটা কোচয়ানের কোট ও টুপি এনে দিল এবং কথা দিল যে পিস্তলটা পরেরদিন যোগাড় করে দেবে। সন্ধ্যাবেলা মকার আলেক্সিভিচ তার উঁচু রবারের জুতো পরে দরজা পর্যন্ত এসে করুণ চোখে পিয়েরের দিকে তাকাল। কিন্তু পিয়ের তার দিকে চোখ ফেরাতেই ড্রেসিং-গাউনে শরীরটা ঢেকে লাজুক অথচ ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। গেরাসিমের এনে দেওয়া কোটটাকে উত্তাপের সাহায্যে জীবাণুমুক্ত করে সেটাকে গায়ে চাপিয়ে পিয়ের যখন বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে সুখারেভ মার্কেটে যাচ্ছিল পিস্তল কিনতে তখনই তার সঙ্গে রস্তভদের দেখা হয়ে যায়।

অধ্যায়—১৯

মস্কোর ভিতর দিয়ে রিয়াজান রোডে পশ্চাদপসরণের কুতুজভের হুকুমনামাটা জারী করা হল ১লা সেপ্টেম্বর রাতে।

প্রথম সেনাদল সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রা করল; সারারাত কোনরকম তাড়াহুড়া না করে তারা ধীরেসুস্থে পিছিয়ে চলল। অবশ্য ভোরবেলা দরগমিলভ সেতুর নিকটবর্তী শহরের কাছে পৌঁছে তারা দেখতে পেল, তাদের সামনে দলে দলে সৈন্য ভিড় করে সেতু পার হচ্ছে, বিপরীত দিক থেকে উঠে এসে রাজপথ ও গলি আটকে দিচ্ছে, আবার পিছন দিক থেকে অসংখ্য সৈন্য অকারণ তাড়াহুড়ায় ও আতঙ্কে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। তারা সেতুর দিকে, সেতুর উপরে এবং নানা খাঁড়ি ও নৌকোর দিকে ছুটে যাচ্ছে। স্বয়ং কুতুজভ ঘুরপথে গাড়ি হাঁকিয়ে মস্কোর অপর দিকে পৌঁছে গেছে।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল নাগাদ বাহিনীর একমাত্র পিছনের অংশটাই রয়ে গেল দরগামিলভের উপকণ্ঠস্থ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে। মূল বাহিনী তখন মস্কোর অপর দিকে অথবা মস্কো ছাড়িয়ে চলে গেছে।

ঠিক সেই সময় ২রা সেপ্টেম্বর সকাল দশটায় পক্লোনি পাহাড়ের উপর সৈন্যপরিবৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে সম্মুখে প্রসারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে আছে। ২৬শে অগস্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ বরদিনোর যুদ্ধ থেকে ফরাসী বাহিনীর মস্কোতে প্রবেশ পর্যন্ত একটা উত্তেজনাপূর্ণ স্মরণীয় সপ্তাহ ধরে দেখা দিয়েছে সেই অপ্রত্যাশিত হেমন্তের আবহাওয়া যা হঠাৎ এসে সকলকে অবাক করে দেয়, যখন সূর্য নেমে এসে বসন্তকালের চাইতে বেশী উত্তাপ ছড়ায়, যখন বিরল পরিষ্কার আবহাওয়ায় সবকিছু ঝল্মল্ করে চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়, যখন হেমন্তের সুরভিত বাতাস শ্বাস টেনে হৃদপিণ্ড শক্তিশালী ও তাজা হয়ে ওঠে, যখন রাতগুলি পর্যন্ত আতপ্ত হয়ে ওঠে, যখন সেই অন্ধকারে আতপ্ত রাতে সোনালী তারারা অনবরত আকাশ থেকে খসে পড়ে আমাদের চকিত ও আনন্দিত করে তোলে।

২রা সেপ্টেম্বর সকাল দশটাতেও সেই একই আবহাওয়া চলেছে।

সকালের উজ্জ্বলতায় যাদুর স্পর্শ। পক্লোনি পাহাড় থেকে দেখা যাচ্ছে, মস্কো তার নদী, বাগান ও গির্জা নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত; তার বুকে যেন বয়ে চলেছে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা; সূর্যের আলোয় তার গম্বুজগুলো তারার মত ঝলমল করছে।

বিশিষ্ট স্থাপত্যকীর্তিসমন্বিত এই বিচিত্র শহরটির দিকে তাকিয়ে নেপোলিয়নের মন সেই ঈর্ষাতুর অস্বস্তিকর কৌতূহলে ভরে উঠল যা মানুষ বোধ করে একটা অজ্ঞাতপূর্ব বিপরীত জীবনধারার স্বাদ পেলে। শহরটি যেন তার নিজস্ব জীবনযাত্রার তাগিদে বেঁচে আছে। অনেক দূর থেকেও যে অস্পষ্ট লক্ষণ দেখে মৃত ও জীবিতের পার্থক্য বোঝা যায়, তা দেখেই পক্লোনি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন এই শহরটির প্রাণ-স্পন্দনকে অনুভব করতে পারল; একটি সুন্দর মহান দেশের শ্বাস-প্রশ্বাস যেন তার নাড়িতে স্পন্দিত হতে লাগল।

মস্কোর দিকে তাকিয়ে প্রতিটি রুশই তাকে মা বলে মনে করে ; নগর-জননী হিসাবে তার তাৎপর্য ধরতে না পারলেও মস্কোর এই নারী-চরিত্র প্রতিটি বিদেশীর চোখেও ধরা পড়ে ; নেপোলিয়নের চোখেও পড়ল।

"ঐ তো সেই অসংখ্য গির্জাশোভিত এসিয়ার শহর মস্কো ! শেষ পর্যন্ত তাহলে এলাম সেই বিখ্যাত শহরে ! সময় হয়েছে নিকট এবার।" ফরাসীতে কথাগুলি বলে নেপোলিয়ন ঘোড়া থেকে নামল ; মস্কোর একখানা মানচিত্র সামনে খুলে ধরবার হুকুম দিয়ে দোভাষী লেরয়ে দ্য ইদেভিল্‌কে ডেকে পাঠাল।

"যে শহরকে শত্রু দখল করেছে সে তো মানহারা কুমারীর মত," সে ভাবল (স্মোলেন্স্ক-এ কথাটা সে তুচ্‌কভকে বলেছিল)। সেই দৃষ্টিতেই সে এই অদৃষ্টপূর্ব প্রাচ্য সুন্দরীর দিকে তাকিয়ে রইল। তার দীর্ঘদিনের অপ্রাপনীয় বাসনা যে শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হয়েছে সেকথা ভেবে তার অবাক লাগছে। সকালের পরিষ্কার আলোয় একবার শহরকে দেখছে, একবার মানচিত্রের দিকে তাকাচ্ছে, তার খুঁটিনাটি বিচার করছে, আর তাকে পাবার নিশ্চিত আশ্বাসে মনটা উত্তেজনায় ও ভয়ে দুলে উঠছে।

সে ভাবতে লাগল : "এর কি অন্যথা হতে পারত ? এই তো রাজধানী আমার পায়ের তলে পড়ে আছে। কোথায় এখন আলেক্সান্দার, আর কিই বা তিনি ভাবছেন ? একটা আশ্চর্য সুন্দর মহান নগরী, আর একটা আশ্চর্য ও মহান মুহূর্ত ! কোন্ আলোয় আমি তাদের কাছে দেখা দেব !" নিজের সৈন্যদের কথা মনে করে সে ভাবল, "এই তো সেই নারী, এইসব দুর্বল-হৃদয় মানুষদের পুরস্কার। আমার মুখের একটি কথা, আমার হাতের একটি ইসারা, সঙ্গে সঙ্গে জারদের এই প্রাচীন শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু আমার ক্ষমা তো বিজিতের মাথায় নেমে আসবার জন্য সদাই প্রস্তুত। আমাকে উদার হতে হবে, সত্যিকারের মহৎ হতে হবে। কিন্তু না, আমি মস্কোতে এসে গেছি এটা সত্য হতে পারে না," হঠাৎ তার মনে হল কথাটা। "কিন্তু ওই তো সে আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে, তার সোনালী গম্বুজ ও ক্রুশগুলি সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে। কিন্তু আমি তাকে মুক্তি দেব। বর্বরতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রাচীন স্মৃতিস্তম্ভের গায়ে আমি উৎকীর্ণ করে যাব ন্যায় ও করুণার মহান বাণী। এটাই আলেক্সান্দারকে সবচাইতে বেশী ব্যথা দেবে, তাকে আমি চিনি। (নেপোলিয়নের ধারণা যা কিছু ঘটছে নিজের এবং আলেক্সান্দারের মধ্যে ব্যক্তিগত সংঘর্ষই তার প্রধান তাৎপর্য) ক্রেমলিনের মাথায় দাঁড়িয়ে—হ্যাঁ ঐ তো ক্রেমলিন—আমি তাদের দেব সঠিক বিধান, তাদের শিখিয়ে দেব সভ্যতার প্রকৃত অর্থ, এমন ব্যবস্থা করব যাতে বয়াররা (জারের প্রধান সহকারীর দল) বংশ বংশ ধরে তাদের বিজেতাকে ভালবাসার সঙ্গে স্মরণ করে। প্রতিনিধি-দলকে বলব, যুদ্ধ আমি চাই নি, কোন-

দিনই চাই না ; আমি যুদ্ধ করেছি শুধু তাদের রাজদরবারের ভ্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে ; আলেক্সান্দারকে আমি ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি ; মস্কোতে আমার নিজের এবং আমার জনগণের উপযুক্ত শর্তে সন্ধির প্রস্তাব আমি মেনে নেব। যুদ্ধের সৌভাগ্যকে একজন সম্মানিত নৃপতিকে অসম্মান দেখাবার কাজে লাগাতে আমি চাইনা। তাদের ডেকে বলব, 'বয়ারগণ, আমি যুদ্ধ চাই না, চাই আমার প্রজাবৃন্দের শান্তি ও কল্যাণ।' যাই হোক, আমি জানি তাদের উপস্থিতি আমাকে অনুপ্রাণিত করবে, যেমন সব সময়ই করে থাকি তাদের সঙ্গেও সেইভাবেই কথা বলব : স্পষ্টভাবে, প্রভাব বিস্তার করে, মহত্ত্বের সঙ্গে। কিন্তু আমি মস্কোতে পৌঁচেছি—এ কি সত্য হতে পারে? হ্যাঁ, ওই তো সে পড়ে আছে।"

"বয়ারদের আমার সামনে হাজির কর," দলের লোকদের বলল।

ঝক্‌ঝকে পোশাক পরা একজন জেনারেল সঙ্গে সঙ্গে বয়ারদের আনতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

দু' ঘণ্টা কেটে গেল। নেপোলিয়ন খাওয়া শেষ করে পক্‌লোনি পাহাড়ের উপর সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রতিনিধিদলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। বয়ারদের কাছে যে ভাষণটি দেবে কল্পনাও সেটা স্পষ্ট রূপ পেয়ে গেছে। নেপোলিয়নের ধারণামতে সে ভাষণ মর্যাদা ও মহত্ত্বে পরিপূর্ণ।

মস্কোর প্রতি যে উদারতা দেখাবে বলে সে স্থির করেছে তার দ্বারা সে নিজেই অভিভূত হয়ে পড়েছে। জারদের প্রাসাদে অনুষ্ঠিত যে সমাবেশে রাশিয়ার এবং তার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্র মিলিত হবে কল্পনায় তার দিন-ক্ষণ পর্যন্ত সে স্থির করে ফেলেছে। মনে মনে এমন একজন শাসনকর্তা নিয়োগ করেছে যে জনগণের হৃদয় জয় করবে। মস্কোতে অনেক দাতব্য প্রতিষ্ঠান আছে জেনে সে মনে মনে স্থির করেছে যে সে সবগুলিতেই সে করুণা বিতরণ করবে। আফ্রিকাতে সে যেমন আরবদের মত মস্তকাবরণ পরে মসজিদে গিয়ে বসেছিল, তেমনই মস্কোতেও সে জারদের মতই সকলের উপকার করবে। এবং শেষ পর্যন্ত রুশদের অন্তরকে স্পর্শ করার উদ্দেশ্যে সে স্থির করল যে এইসব প্রতিষ্ঠানের গায়ে সে বড় বড় অক্ষরে খোদাই করে দেবে : 'এই প্রতিষ্ঠানকে আমার আদরের মায়ের নামে উৎসর্গ করা হইল।' অথবা শুধু লেখা হবে : **Maison de la Mere** (মাতৃ সদন)। কিন্তু আমি কি সত্যি মস্কোতে এসেছি? হ্যাঁ, ওই তো সে আমার সামনে পড়ে আছে। কিন্তু শহর থেকে প্রতিনিধিদল আসতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?" সে অবাক হল।

ইতিমধ্যে তার দলবলের পিছন দিকে জেনারেল ও মার্শালদের মধ্যে ফিস্‌ফিস্ করে একটা উত্তেজিত আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। প্রতিনিধিদলকে নিয়ে আসতে যারা গিয়েছিল তারা এই সংবাদ নিয়ে ফিরে এসেছে যে মস্কো এখন জনশূন্য, প্রত্যেকেই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। যারা আলোচনা করছে

তাদের মুখ বিবর্ণ ও বিচলিত। অধিবাসীরা মস্কো ত্যাগ করে চলে গেছে এ সংবাদে তারা শঙ্কিত নয়, তাদের শঙ্কা হচ্ছে সম্রাটের মর্যাদাকে হাস্যকর করে না তুলে কেমন করে তাকে বলা হবে যে বৃথাই সে এতক্ষণ বয়ারদের জন্য অপেক্ষা করে আছে : মস্কোতে এখন পাঁড় মাতাল ছাড়া আর কেউ নেই। কেউ বলল, কোনরকম একটা প্রতিনিধিদল খাড়া করা হোক; আবার অন্যরা তাতে আপত্তি করে বলল, আগে সাবধানে সুকৌশলে সম্রাটকে তৈরি করে নিয়ে তারপর সত্য কথাই বলা হোক।

"তাকে বলতে তো হবেই। কিন্তু ভদ্রজনরা…"

অবস্থাটা আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছে কারণ বড় বড় পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে সম্রাট প্রসারিত মানচিত্রের পাশে ধৈর্যের সঙ্গে পায়চারি করছে এবং উজ্জ্বল গর্বের হাসি হেসে কপালের উপর হাত তুলে বারবার মস্কোর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে।

"কিন্তু এ যে অসম্ভব," দলের লোকরা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে উঠল; কিন্তু "এটা হাস্যকর" এই আসল কথাটা সাহস করে বলতে পারল না।

শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে সম্রাট তার অভিনেতাসুলভ স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই বুঝতে পারল যে অত্যন্ত বেশীক্ষণ বিলম্বিত হওয়ার ফলে সেই মহান মুহূর্তটি তার মহত্বকে হারিয়ে ফেলেছে; সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তুলে একটা ইঙ্গিত করল। তারপরেই শোনা গেল কামানের একটা সংকেত-ধ্বনি, আর মস্কোর বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকা সৈন্যরা তিভের, কালুগা ও দরগমিলভ ফটক দিয়ে শহরে ঢুকতে শুরু করল। পরস্পরের সঙ্গে রেশারেশি করে দ্রুত, আরও দ্রুত তারা জোড় কদমে বা দুল্‌কি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, অশ্বক্ষুর থেকে উত্থিত ধোঁয়ায় নিজেরাই ঢেকে গেল, সকলের কান-ফাটানো সম্মিলিত কোলাহলে বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সৈন্যদের গতির টানে নেপোলিয়নও তাদের সঙ্গে দরগমিলভ ফটক পর্যন্ত গিয়ে থামল, ঘোড়া থেকে নেমে কামের-কোলেজ্স্কি প্রাচীরের পাশে অনেকক্ষণ পায়চারি করল প্রতিনিধিদলের প্রতীক্ষায়।

অধ্যায়—২০

ইতিমধ্যে মস্কো হয়ে গেছে। কিছু লোক তখনও আছে, হয়তো আগেকার জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগের একভাগ; তবু ফাঁকা। রানী-মৌমাছিহীন একটা মুমূর্ষ মৌচাক যে অর্থে ফাঁকা।

ভাসা-ভাসা চোখে অন্য যেকোন মৌচাকের মত জীবন্ত দেখালেও রানী-মৌমাছিহীন মৌচাকে কোন জীবন থাকে না।

জীবন্ত মৌচাকের মতই রানীহীন মৌচাক ঘিরেও মৌমাছিরা চক্রাকারে ঘোরে মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তপ্ত রোদ গায়ে মেখে; অন্য মৌচাকের মতই দূর থেকে

মধুর গন্ধ পাওয়া যায়, মৌমাছিরা ভিতরে-বাহিরে একইভাবে উড়তে থাকে। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে চাকে তখন আর জীবন নেই। মৌমাছিরা ঠিক আগের মত ওড়ে না, মৌমাছি-পালকের নাকেও আগের মত গন্ধ আসে না। মৌমাছি-পালক যখন রুগ্ন মৌচাকের দেয়ালে টোকা দেয় তখন আগে যেমন মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মৌমাছি তলপেটকে ভয়ংকরভাবে সংকুচিত করে একস্বরে গুঞ্জন করে উঠত, পাখনার দ্রুত ঝটপটানিতে একটা বায়বীয় জীবন্ত শব্দ তুলত, তার পরিবর্তে পরিত্যক্ত মৌচাক থেকে শোনা যায় শুধু বিভিন্ন অংশ থেকে আসা একটা অসংলগ্ন ভোঁ-ভোঁ শব্দ। শান্ত্রী-মৌমাছিরা যেভাবে তলপেটটা তুলে বিপদ-সংকেত জানাত এবং মৌচাকটিকে রক্ষায় জীবন দিতে প্রস্তুত হত এখন আর সেটা দেখা যাবে না। ফুটন্ত জলের মত স্পন্দিত কর্মব্যস্ততার পরিমিত শান্ত শব্দের পরিবর্তে এখন শোনা যাবে নানা বিশৃংখল বেসুরো শব্দ। মৌচাকের ভিতরে ও বাইরে লম্বা কালো দস্যু-মৌমাছিগুলি মধুতে মাখামাখি হয়ে ভীরু ধীর গতিতে উড়ে বেড়ায়। তারা হুল ফোটায় না, ভয়ে কুঁকড়ে সরে যায়। আগে একমাত্র মধুবাহী মৌমাছিরাই চাকের ভিতরে ঢুকত, বেরিয়ে আসত শূন্য দেহে, আর এখন তারা বেরিয়ে আসছে মধু বোঝাই হয়ে। আগে থাকত একটা পরিষ্কার চটচটে মেঝে, সেখানে বইত মৌমাছিদের পাখার হাওয়া, আর এখন মেঝেতে ছড়িয়ে আছে মোমের টুকরো, বিষ্ঠা, মুমূর্ষু, মৌমাছিরা কোনরকমে পা নাড়ছে, আর মরা মৌমাছিগুলোকেও সরিয়ে দেওয়া হয় নি।

মৌমাছি-পালক চাকের উপরের অংশটা খুলে ভিতরটা পরীক্ষা করে দেখে। মধুচক্রের প্রতিটি খোপ মোম দিয়ে ভর্তি করার কাজে ব্যস্ত থাকা মৌমাছির পরিবর্তে এখন সে দেখতে পায় শুধু মধুচক্রের একটা জটিল সুকৌশল গঠন, কিন্তু আগেকার পবিত্রতার স্পর্শ তাতে নেই। সবই উপেক্ষিত, পচা। কালো কালো দস্যু-মৌমাছিগুলি দ্রুতপায়ে চোরের মত মধুচক্রের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে, আর ছোট ছোট গৃহিণী-মৌমাছিগুলি নিরুৎসাহভাবে বিকৃত দেহ নিয়ে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দস্যুগুলোকে তাড়াবার কোন চেষ্টাই করছে না; যেন জীবনের সব বোধ, সব বাসনাই হারিয়ে ফেলেছে। মৌমাছি-পালক মধ্যেকার দুটো বেড়া ফাঁক করে জীবকোষগুলোকে পরীক্ষা করে। আগে যেখানে পিঠে পিঠ লাগিয়ে হাজার হাজার মৌমাছি কালো বৃত্ত রচনা করে রাখত যেন জন্মের গভীর রহস্যকে ঢেকে রাখবার জন্যই, এখন সেখানে সে দেখে শুধু কয়েক শ' নিস্তেজ, নিরুৎসাহ মৌমাছির ঘুমন্ত খোলস। নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা প্রায় মরতে বসেছে; যে আশ্রয়কে তারা এতদিন রক্ষা করেছে, এখন আর যার কোন অস্তিত্বই নেই, তারই উপরে তারা বসে আছে। তাদের গায়ে ধ্বংস ও মৃত্যুর গন্ধ। শুধু কয়েকটা মৌমাছি এখনও নড়ছে, উঠছে,

শত্রুর হাতের উপর বসবার জন্ম কোনক্রমে উড়ছে, শেষবারের মত হুল ফুটিয়ে মরবার ইচ্ছাটা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে; বাকিগুলো সব মরে গেছে, মাছের আঁসের মত ঝরে পড়ছে। মৌমাছি-পালক চাকটা বন্ধ করে, তার উপর একটা খড়ির দাগ কাটে, তারপর সময়মত ভিতর থেকে সবকিছু বের করে এনে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে।

মস্কো যখন ঠিক সেইরকম ফাঁকা তখনই ক্লান্ত বিষণ্ণ নেপোলিয়ন কামের-কোলেজ্স্কি প্রাচীরের সামনে পায়চারি করতে করতে প্রতিনিধিদলের জন্ম অপেক্ষা করছে; নেহাৎই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হলেও তার বিবেচনায় এই সৌজন্ম রক্ষা করে চলা প্রয়োজন।

মস্কোর কোণে কোণে তখনও কিছু লোক উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে; তারা যে কি করছে সেটা না বুঝেই পুরনো অভ্যাসবশত ঘোরাফেরা করছে।

অনেক বিচার-বিবেচনার পরে নেপোলিয়নকে যখন জানানো হল যে মস্কো জনশূন্য, তখন সে সংবাদদাতার দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েই সরে গেল এবং নীরবে পায়চারি করতে লাগল।

"আমার গাড়ি!" হাঁক দিল।

কর্তব্যরত এড-ডি-কংয়ের পাশে বসে নেপোলিয়ন শহরতলীর দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। নিজের মনেই বলল, "মস্কো পরিত্যক্ত! কী অবিশ্বাস্য ঘটনা!"

শহরে না ঢুকে সে দরগমিলভ শহরতলীর একটা সরাইখানায় উঠল।

নাটকীয় ঘটনাটি আর ঘটল না।

অধ্যায়—২১

রাত দুটো থেকে বিকেল পর্যন্ত রুশ সৈন্যরা মস্কোর উপর দিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল; আহত সৈন্য ও অবশিষ্ট অধিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে গেল।

সৈন্যদের চলাচলের সবচাইতে বেশী চাপ পড়ল স্টোন, মস্ক্ভা ও ইয়াউজা সেতুর উপর।

সৈন্যরা যখন দু'দলে ভাগ হয়ে ক্রেম্লিনকে ঘুরে যাচ্ছিল, মস্কভা ও স্টোন সেতুর উপর ভিড় করছিল, তখন বহুসংখ্যক সৈন্য সেই ভিড় ও জ্যাম-জটের সুযোগ নিয়ে সেইসব সেতুর উপর থেকে পিছিয়ে এসে নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে পড়ল এবং "সুন্দরী ভাসিলি" গির্জার পাশ দিয়ে ও বরভিৎস্কি ফটকের নীচ দিয়ে পাহাড় বেয়ে উঠে রেড স্কোয়ারে ফিরে গেল; সহজাত প্রবৃত্তিই যেন তাদের বলে দিল, সেখানে গেলে তারা সহজেই এমন সব জিনিস হাতাতে পারবে যা তাদের নয়। সস্তা নীলামে যেসব লোক ভিড় করে তারা এসে বাজারের অলিগলি সব ভরে ফেলেছে; কিন্তু কেন নীলাম-ওয়ালা গলা ছেড়ে খদ্দেরদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছে না; কোন ফেরিওয়ালা

সেখানে নেই, নেই ক্রয়েচ্ছু মেয়েদের ভিড়; শুধু ইউনিফর্ম ও ওভারকোট পরা সৈন্যরাই ভিড় করেছে; তাদের হাতে কিন্তু বন্দুক নেই; খালি হাতে তারা নীরবে বাজারে ঢুকছে আর নানারকম বাণ্ডিল হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ব্যবসায়ী ও তাদের সহকারীরা বিমূঢ়ভাবে ইতস্তত চলাফেরা করছে। একবার দোকানের তালা খুলছে, আবার লাগাচ্ছে, আর সহকারীদের সহায়তায় যতটা পারছে মালপত্র সরিয়ে নিচ্ছে। বাজারের সামনে স্কোয়ারের মধ্যে ভেরীবাদকরা জমায়েতের বাজনা বাজাচ্ছে, কিন্তু তা শুনে সৈন্যরা তাদের দিকে এগিয়ে না গিয়ে বরং আরও দূরে সরে যাচ্ছে। দোকানে ও গলিতে সৈন্যদের মধ্যে এমন কিছু লোক দেখা যাচ্ছে যাদের পরনে ধূসর কোট, মাথা কামানো (জেল থেকে ছাড়া পাওয়া বন্দীর দল)। দুজন অফিসার ইলিংকা স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। একজনের ইউনিফর্মের উপর চাদর জড়ানো, একটা শুটকো গাঢ় ধূসর রঙের ঘোড়ায় আসীন; অপরজনের গায়ে ওভার কোট, রাস্তায় দণ্ডায়মান। তৃতীয় একজন অফিসার ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে এল।

“জেনারেল হুকুম দিয়েছেন, এই মুহূর্তে সব্বাইকে তাড়িয়ে নিয়ে যেতে হবে। এ যে অসহ্য! অর্ধেক সৈন্য সরে পড়েছে।”

বন্দুকবিহীন তিনজন পদাতিক সৈন্য ওভারকোটের তলাটা উঁচু করে তুলে বাজারের গলিতে কেটে পরছিল; তাদের দেখে অফিসারটি চেঁচিয়ে বলল, “তোমরা কোথায় যাচ্ছ? ···কোথায়? ···থামো, রাস্কেলের দল!”

অপর অফিসার বলল, “কিন্তু ওদের আপনি থামাবেন কেমন করে? ওদের তো একত্রে পাওয়াই যাচ্ছে না। অন্যরা পথ আটকাবার আগেই সেনাবাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে।”

“কিন্তু এগিয়ে যাবে কেমন করে? ওরা তো ওখানে আটকে গেছে, সেতুর উপর যেন খোঁটা গেড়েছে, মোটেই নড়ছে না। বাকিরা যাতে পালাতে না পারে সেজন্য তাদের ঘেরাও করা দরকার নয় কি?”

সিনিয়র অফিসার চেঁচিয়ে বলল, “চলে আসুন, ওখানে যান, ওদের তাড়িয়ে দিন!”

চাদর জড়ানো অফিসারটি ঘোড়া থেকে নেমে একজন ভেরীবাদককে ডেকে তাকে নিয়ে ঢাকা বারান্দায় চলে গেল। কয়েকটি সৈনিক দল বেঁধে ছুট দিল। নাকের কাছে গালের উপর লাল তিলওয়ালা একটি দোকানী হাত দোলাতে দোলাতে তারদিকে এগিয়ে এল।

বলল, “ইয়োর অনার! দয়া করে আমাদের বাঁচান! ছোটখাট জিনিস খোয়া গেলে আমরা কিছু মনে করি না, আপনারা যা খুশি নিতে পারেন—তাতে আমরা খুশিই হব। ···এমন একজন সম্মানিত ভদ্রলোকের জন্য একটুকরো কাপড় আমি এক্ষুণি এনে দিচ্ছি, দরকার হলে দুটো

টুকরোও খুশি হয়েই দেব। অবস্থাটা তো বুঝতেই পারছি: কিন্তু এসব কী হচ্ছে—এ যে শ্রেফ ডাকাতি; আপনি কি দয়া করে কিছু পাহারা বসাতে পারেন না যাতে আমরা অন্ততঃ দোকানগুলো বন্ধ করতে পারি⋯"

কয়েকজন দোকানী অফিসারকে ঘিরে দাঁড়াল।

কড়া চেহারার একজন রেগে বলল, "আঃ, কী বোকার মত বকছ। মাথাটাই যখন কাটা যাচ্ছে তখন কি কেউ চুলের লাগি কাঁদে। দয়া করে ভিতরে আসুন ইয়োর অনার!"

গুটকো লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "বকবকই বটে! এখানে আমার তিনটে দোকানে লাখ রুবল দামের মালপত্র আছে। সৈন্যরা চলে গেলে কি সেসব বাঁচানো যাবে? আর মানুষগুলোও হয়েছে বটে! 'ঈশ্বরের মার দুনিয়ার বার।"

প্রথম দোকানী অভিনন্দন জানিয়ে বলল, "ভিতরে আসুন ইয়োর অনার!"

অফিসারটি বিব্রত বোধ করতে লাগল; তার মুখে ইতস্ততভাব।

"এটা আমার কাজ নয়," বলেই সে তাড়াতাড়ি গলিতে পা বাড়াল।

একটা খোলা দোকানের ভিতর থেকে ঘুসোঘুসি ও গালাগালির শব্দ শোনা গেল। অফিসারটি সেখানে আসা মাত্রই মাথা কামানো ধূসর কোট পরা একটি লোককে সজোরে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলে দেওয়া হল।

লোকটি ডিগবাজী খেয়ে ব্যবসায়ী ও অফিসারটির মাঝখান দিয়ে ছুটে চলে গেল। দোকানের মধ্যে যেসব সৈন্য ছিল অফিসারটি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঠিক সেইমুহূর্তে মস্ক্ভা সেতুর উপরকার প্রচণ্ড ভিড়ের ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর আর্তনাদ ভেসে এল, আর অফিসারটি ছুটে খোয়ারের ভিতরে ঢুকল।

"কি হল? কি হল?" সে শুধাল, কিন্তু তার সহকর্মীটি ততক্ষণে "সুন্দরী ভাসিলি"র পাশকাটিয়ে আর্তনাদ লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে।

অফিসারটিও ঘোড়ায় চেপে তার পিছু নিল। সেতুর উপর পৌঁছে দেখতে পেল দুটো কামান দাঁড়িয়ে আছে, পদাতিক সৈন্যরা সেতু পার হচ্ছে, কয়েকটা গাড়ি উল্টে গেছে, আর কতক সৈন্যরা ভয় পেয়েছে, কতক হাসছে। কামানের পাশে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে; তাতে ঘোড়া জুড়ে দেওয়া হচ্ছে। গলায় কলার পরানো চারটে কুকুর চাকা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা উঁচু করে বোঝাই করা হয়েছে, আর উল্টো করে বসানো একটা বাচ্চাদের চেয়ারের পাশে বসে একটি চাষী স্ত্রীলোক মর্মভেদী চীৎকার করছে। সহকর্মী-অফিসাররা জানাল, জেনারেল এর্মালভ এখানে পৌঁছে যখন জানতে পারল যে সৈন্যরা দোকানে দোকানে ঢুকে পড়েছে, আর নাগরিকরা সেতুর উপরে জট পাকিয়ে ফেলেছে, তখন সে হুকুম দেয় যে

সেতুকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবার ভান করে কামান দুটোকে সেইদিকে তাক করে বসানো হোক, আর তার ফলেই ভিড়ের লোকজন ও স্ত্রীলোকটি আর্তনাদ শুরু করে দিয়েছে। ভিড়ের লোকরা ধাক্কাধাক্কি করে, গাড়ি উল্টে ফেলে বেপরোয়াভাবে চীৎকার করতে করতে সেতুর মুখটা ফাঁকা করে দিয়েছে, আর তাই সৈন্যরা এখন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে।

অধ্যায়—২২

ইতিমধ্যে শহর জনশূন্য হয়ে গেছে। রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। সব ফটক ও দোকানপাটই বন্ধ; শুধু শুঁড়িখানাগুলো ঘিরে এখানে-ওখানে কিছু চেঁচামেচি ও মাতলামির গান শোনা যাচ্ছে। পথে কোন গাড়ি নেই। পায়ের শব্দও কদাচিৎ কানে আসে। পোভাঁস্কায়া নিস্তব্ধ ও জনহীন। রস্তভদের বাড়ির প্রকাণ্ড উঠোনে পড়ে আছে শুধু খড়ের স্তূপ আর ঘোড়ার গোবর; একটা মানুষও চোখে পড়ছে না। বাড়ির মস্তবড় বৈঠকখানায় জিনিসপত্র সবই আছে, কিন্তু মানুষ আছে মাত্র দুটি। উঠোনের দারোয়ান ইগ্‌নাৎ আর ভাসিলিচের নাতি ছোকরা-চাকর মিশ্‌কা; ঠাকুর্দার সঙ্গে সেও মস্কোতে থেকে গেছে। মিশ্‌কা ক্ল্যাভি কর্ডটা খুলে এক আঙুল দিয়ে সেটাকে ঠুকছে। ইগ্‌নাৎ দুই হাত আড়াআড়িভাবে বুকের উপর রেখে বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে খুশিতে হাসছে।

হঠাৎ দুই হাতে কিবোর্ডে ঠেকা দিতে দিতে ছেলেটা বলে উঠল, "খুব চমৎকার, কি বল ইগ্‌নাৎ খুড়ো?"

আয়নায় নিজের দন্তবিকাশ দেখে বিস্মিত ইগ্‌নাৎ বলল, "কী আশ্চর্য!"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে বলে উঠল "বেয়াদপি! বেয়াদপি! মোটা জালাটা কী রকম দাঁত বের করেছে দেখ! তুমি কি এই জন্যই এখানে আছ? ওদিকে কিচ্ছু পরিষ্কার করা হয় নি, আর ভাসিলিচ খেটে খেটে মারা গেল। একটু সবুর কর!"

বেল্টটা ঠিক করতে করতে চোখ নীচু করে ইগ্‌নাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটি বলল, "আমি খুব আস্তে আস্তেই বাজাচ্ছিলাম মাসি।"

হাত তুলে মারের ভয় দেখিয়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না বলল, "তোমাকেও আস্তে আস্তেই কিছু দেব, বাঁদর কোথাকার! যাও, ঠাকুর্দার জন্য সামোভারটা গরম কর গে।"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ক্ল্যাভিকর্ডের ধুলো ঝেড়ে সেটা বন্ধ করল; দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে প্রধান দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

উঠোনে নেমে একটু থেমে ভাবতে লাগল এখন কোথায় যাবে—চাকরদের ঘরে গিয়ে ভাচিলিচের সঙ্গে চা খাবে, না কি ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে সেটাকে

একটু গোছগাছ করবে।

শান্ত রাজপথে দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। কে যেন ফটকে এসে থামল। সিটকিনির শব্দ হল, কে যেন সেটা খুলবার চেষ্টা করছে।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

“কি চাই ?”

“কাউন্ট—কাউন্ট ইলিয়া অন্দ্রিভিচ রস্তভ।”

“কিন্তু আপনি কে ?”

“একজন অফিসার, তার সঙ্গে দেখা করতে চাই, নম্র, মার্জিত রুশ গলায় জবাব এল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ফটক খুলে দিল। আঠারো বছর বয়সের একটি অফিসার উঠোনে ঢুকল; রস্তভদের মতই গোল তার মুখের আদল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না সাদরে বলল, “তারা তো চলে গেছেন স্যার। কাল সন্ধ্যাবেলায় চলে গেছেন।”

তরুণ অফিসারটি ঢুকবে কি ঢুকবে না ইতস্তত করে জিভ দিয়ে চুক-চুক শব্দ করল।

বলল, “আঃ, বড়ই মুস্কিল হল! আমার গতকালই আসা উচিত ছিল। কী দুঃখের কথা!”

এদিকে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ছেলেটির মুখের রস্তভ পরিবারের আদল, তারা ছেঁড়া কোট ও ছেঁড়া বুটের দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল।

বলল, “কাউন্টের সঙ্গে কি জন্য দেখা করতে চাইছেন ?”

“দেখুন, মানে…কোন লাভ নেই! বিরক্ত স্বরে কথাটা বলে চলে যাবার জন্যই সে ফটকে হাত দিল।

ইতস্তত করে আবার থামল।

তারপর হঠাৎ বলে উঠল, “দেখুন, আমি কাউন্টের একজন আত্মীয়; তিনি আমার প্রতি খুব সদয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন আমার জামা-জুতো সবই শতচ্ছিন্ন, হাতেও টাকা নেই, তাই কাউন্টের কাছে এসেছিলাম কিছু…”

মাভ্রা কুজমিনিচ্‌না তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

“একমিনিট অপেক্ষা করুন স্যার! ক্ষণিকমাত্র”, সে বলল।

অফিসারটি ফটকের হাতল থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই সে পিছনের উঠোন দিয়ে চাকরদের ঘরের দিকে চলে গেল।

উঠোনে হাঁটতে হাঁটতে অফিসারটি নিজের ছেঁড়া বুট জোড়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নীচু করে ঈষৎ হাসল। ভাবল, “কী দুঃখ যে খুড়োমশায়ের সঙ্গে দেখা হল না! এই বৃদ্ধটিও কী ভাল! উনি ছুটে গেলেন কোথায়? আমার রেজিমেন্ট তো এতক্ষণে রগোঝ্‌স্কি ফটকের কাছে পৌঁছে গেছে;

রেজিমেণ্টকে ধরবার সোজা পথটাই বা কেমন করে খুঁজে পাব ?" ঠিক সেই-সময় একখানা পাকানো ডোরা-কাটা রুমাল হাতে নিয়ে মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না এসে হাজির হল। কয়েক পা দূরে থাকতেই রুমালের পাক খুলে একখানা পঁচিশ রুবলের সাদা নোট বের করে তাড়াতাড়ি সেটা তার হাতে গুঁজে দিল।

"হিজ এক্সেলেন্সি বাড়ি থাকলে অবশ্য আত্মীয় হিসাবে তিনি…কিন্তু এ অবস্থায়…"

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌নার মুখ লাল হয়ে উঠল। অফিসারটি আপত্তি না করে নীরবে নোটটা নিয়ে তাকে ধন্যবাদ দিল।

মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না ত্রুটিস্বীকারের ভঙ্গীতে আবার বলল, "কাউণ্ট যদি বাড়ি থাকতেন…খৃস্ট আপনার সহায় হোন স্যার! ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন!" সে মাথাটা নোয়াল; অফিসারটি বেরিয়ে গেল।

মাথা দুলিয়ে খুশিতে হাসতে হাসতে অফিসারটি পরিত্যক্ত পথ বেয়ে দ্রুত হাঁটতে লাগল যাতে ইয়াউজা সেতুতেই তার রেজিমেণ্টকে ধরতে পারে।

কিন্তু মাভ্রা কুজ্‌মিনিচ্‌না অশ্রুভেজা চোখে বেশ কিছুক্ষণ ফটকেই দাঁড়িয়ে রইল; অজ্ঞাত তরুণ অফিসারটির প্রতি মাতৃস্নেহ ও করুণার অপ্রত্যাশিত প্রবাহে তার বুকটা ভরে উঠেছে; বিষণ্ণ অন্তরে সে মাথাটা দোলাতে লাগল।

অধ্যায়—২৩

বরবার্কার উপরে অবস্থিত একটা অসমাপ্ত বাড়ির একতলার মদের দোকান থেকে মাতালদের হৈ-হল্লা ও গান ভেসে আসছে। একটা ছোট নোংরা ঘরের টেবিলের চার পাশে বেঞ্চিতে বসে আছে জনাদশেক কারখানার মজুর। আবছা দৃষ্টি ও হাঁ-করা মুখে ঘর্মাক্ত অবস্থায় তারা বেশ কষ্ট করে একটা না একটা গান করে চলেছে। সে গানে কোন তাল-লয় নেই, গাইতে বেশ কষ্টও হচ্ছে, গান গাওয়ার জন্যই যে গাইছে তাও নয়, তারা যে মাতাল হয়ে বেশ মৌজে আছে সেটা দেখাতেই গান করছে। পরিষ্কার নীল কোটপরা একটি লম্বা সুকেশ ছেলে অন্য সকলের উপরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট দুটো পাতলা, চাপা ও বাঁকা না হলে এবং চোখ দুটো স্থির ও বিষণ্ণ না হলে সুন্দর খাড়া নাকের জন্য তার মুখটা বেশ ভালই দেখাত। একটা কিছু বলার জন্যই সে উঠে দাঁড়িয়েছে; কনুই পর্যন্ত আস্তিন গুটিয়ে সকলের মাথার উপর দিয়ে সাদা হাতটা ঘোরাচ্ছে; নোংরা আঙুলগুলোকে অস্বাভাবিকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোটের আস্তিনটা বারবার নেমে যাচ্ছে, আর সেও বাঁ হাত দিয়ে সেটাকে বার বার গুটিয়ে নিচ্ছে, যেন যে পেশীবহুল হাতটা সে ঘোরাচ্ছে সেটা খোলা থাকা খুবই দরকারী। গানের ফাঁকে ফাঁকেই বারান্দায় ও ফটকে চীৎকার, লড়াই ও ঘুসোঘুসির শব্দ শোনা

যাচ্ছে। লম্বা ছেলেটি হাত নাড়তে লাগল।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "এসব থামাও! ওখানে লড়াই চলেছে বাছাধনরা!" তারপর আস্তিন গোটাতে গোটাতেই বাইরের ফটকে চলে গেল।

কারখানার মজুররা তার পিছু নিল; লম্বা ছেলেটার নেতৃত্বে এই লোকগুলি সকালেই মদের দোকানে ঢুকে মদ খাচ্ছিল; কারখানা থেকে কিছু চামড়া নিয়ে এসেছিল, আর তার বদলেই তাদের সকলকে মদ দেওয়া হচ্ছিল। এদিকে নিকটবর্তী কামারশাল থেকে একদল কামার শুঁড়িখানায় হৈ-হট্টগোল শুনে ওরা দোকানের দরজা ভেঙে ঢুকেছে ভেবে তারাও জোর করে ঢুকতে চাইল, আর তাই নিয়ে ফটকে দুই দলের মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

দোকানের মালিক দরজার কাছেই একটা কামারকে মারছিল; মজুররা এসে পড়তে কামারটা মালিকের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সপাটে পথের উপর পড়ে গেল।

আর একটি কামার বুক দিয়ে মালিককে ঠেলে দরজা দিয়ে ঢুকতে চেষ্টা করল।

আস্তিন-গুটানো ছেলেটা কামারের মুখে এক ঘুসি মেরে চীৎকার করে বলল, "ওরা আমাদের সঙ্গে লড়তে এসেছে হে!"

সেইসময় প্রথম কামারটি উঠে নিজের ছড়ে-যাওয়া মুখটাকে আঙুল দিয়ে আঁচড়ে রক্ত বের করে কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে বলল:

"পুলিশ! খুন! ···একটা লোককে ওরা খুন করেছে!"

কাছাকাছি আর একটা ফটক দিয়ে বেরিয়ে এসে একটি স্ত্রীলোক চেঁচাতে শুরু করল, "হায় কপাল!..." একটা লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে—খুন করেছে!····"

রক্তাক্ত কামারটিকে ঘিরে ভিড় জমে গেল।

দোকানের মালিককে ডেকে একজন বলল, "মানুষের অনেক কিছু তো লুঠ করেছ—তাদের শেষ শার্টটা পর্যন্ত নিয়েছ। ওরে চোর, একটা মানুষকে কেন খুন করেছিস?"

লম্বা ছেলেটা একবার দোকানীর দিকে, একবার কামারের দিকে তাকিয়ে যেন ভাবতে লাগল এবার কার সঙ্গে লড়বে।

হঠাৎ দোকানীর দিকে ফিরে বলল, "এই খুনী! ওকে বেঁধে ফেল বাছারা!"

যে লোকগুলি এগিয়ে এসেছিল তাদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এবং মাথার টুপিটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দোকানের মালিক চেঁচিয়ে বলল, "আমাকে তো বাঁধতে চাইবেই!"

যেন তার এই কাজের একটা রহস্যময় ক্ষতিকর তাৎপর্য আছে এই কথা

ভেবে মজুররা ইতস্তত করে থেমে গেল।

"আইনের খবর আমি ভালই জানি স্যাঙাৎরা! ব্যাপারটাকে পুলিশের ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে যাব। তার কাছে আমি যেতে পারব না ভেবেছ? আজকালকার দিনে ডাকাতি করার অধিকার কারও নেই!" টুপিটা তুলে নিয়ে মদের দোকানী বলল।

"তাহলে চলে এস! তাহলে চলে এস!" মদের দোকানী ও লম্বা ছেলেটা পরপর কথাটা বলল। দুজন একসঙ্গে পথে নামল।

রক্তমাখা কামারটিও চলল তাদের পাশে। চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে কারখানার মজুররাও তাদের পিছু পিছু চলল।

মরসিকার মোড়ে জুতো তৈরির সাইনবোর্ড ঝোলানো বন্ধ-জানালা একটা বড় বাড়ির বিপরীত দিকে জনা বিশেক শুকনো, ক্লান্ত, বিষণ্ণ-মুখ মুচি ওভারল ও ছেঁড়া লম্বা কোট পরে দাঁড়িয়েছিল।

একটি শুটকো মজুর ভুরু কুঁচকে পাতলা দাড়ি দুলিয়ে বলছে, "তার তো উচিত লোকদের প্রাপ্য ঠিকমত দেওয়া। কিন্তু সে আমাদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর এখন ভাবছে আমাদের তাড়াতে পারলেই বাঁচে। সপ্তাহ ভরে আমাদের ভুল বুঝিয়েছে, আর আজ আমাদের এই সংকটের মধ্যে ফেলে সটকে পড়েছে।"

রক্তমাখা লোকটিসহ ভিড়কে দেখে মুচিরা কথা থামিয়ে সাগ্রহ কৌতূহলে চলমান ভিড়ের সঙ্গে মিশে গেল।

"এরা সব কোথায় চলেছে?"

"কেন, নিশ্চয় পুলিশের কাছে!"

"আমি বলছি, আমাদের যে মেরেছে সেটা কি সত্যি?"

"তোমার কি মনে হয়? ওরা কি বলছে তাই শোন।"

অনেক প্রশ্ন ও উত্তর শোনা গেল। বর্ধিত ভিড়ের সুযোগ নিয়ে শুঁড়িখানার মালিক পিছনে কেটে পড়ে দোকানে ফিরে গেল।

শত্রু যে সরে পড়েছে সেটা লক্ষ্য না করে লম্বা যুবকটি খোলা হাতটা ঘোরাতে ঘোরাতে অনবরত বকতে লাগল। তাকে ঘিরেই সকলে ভিড় করে চলল।

"সরকারকে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে, আইন চালাতে হবে, সরকার তো আছেই সেইজন্যে। ভালমানুষ খৃস্টানরা, আমি ঠিক বলি নি?" প্রায় অদৃশ্য হাসি হেসে যুবকটি বলল। "সে ভেবেছে সরকার বলে কিছু নেই! সরকার ছাড়া কখনও চলে? সরকার না থাকলে তো সকলেই আমাদের লুঠ করত।"

ভিড়ের ভিতর থেকে অনেকে বলে উঠল, "কি বাজে কথা বলছ? তারা কি এইভাবে মস্কো ছেড়ে দেবে? তারা ঠাট্টা করে কি বলল, আর তাই

তুমি বিশ্বাস করলে ! প্রচুর সৈন্য কি যাচ্ছে না ? সত্যি কি তাকে (নেপোলিয়নকে) আসতে দেবে ! সরকার কি এইজন্যেই আছে। বরং জনসাধারণ কি বলছে তাই শোন।"

চীনা-টাউনের প্রাচীরের পাশে একটা ছোট দল পশমী কোট-পরা একটি লোককে ঘিরে ভিড় করেছে। লোকটির হাতে একটা কাগজ।

"সম্রাটের আদেশ-পত্র, সম্রাটের আদেশ-পত্র পড়া হচ্ছে !" ভিড়ের ভিতর থেকে অনেকের গলা শোনা গেল। সকলে পাঠকের দিকে ছুটতে শুরু করল।

পশমী কোট পরা লোকটি ৩১শে অগস্ট তারিখের ইস্তাহার পড়ছে। চারদিক থেকে লোককে ভিড় করে আসতে দেখে লোকটি কিছুটা বিচলিত বোধ করল, কিন্তু লম্বা ছেলেটি ভিড় ঠেলে তার কাছে হাজির হয়ে পড়ার দাবী জানাতে সে কাঁপা গলায় ইস্তাহারটা গোড়া থেকে পড়তে লাগল।

"কাল ভোরেই আমি প্রশান্ত মহামহিমের কাছে যাব, (বিজয়ীর হাসি হেসে ভুরু কুঁচকে লম্বা ছেলেটা বলল "প্রশান্ত মহামহিম") এই শয়তানদের সমূলে বিনাশ করতে তার সঙ্গে পরামর্শ করব, কাজ করব, সেনাবাহিনীকে সাহায্য করব। তাদের ধ্বংস করার কাজে আমরাও অংশগ্রহণ করব, এইসব অতিথিদের জাহান্নামে পাঠাব। ডিনারের সময় ফিরে এসেই কাজ শুরু করব। এই শয়তানদের একেবারে তচনচ করে ছাড়ব।"

শেষের কথাগুলি যখন পড়া হল তখন চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ। লম্বা ছেলেটি বিষণ্ণভাবে মাথাটা নুইয়ে রেখেছে। স্পষ্ট বোঝা গেল যে শেষের অংশটা কেউই বুঝতে পারে নি। বিশেষ করে "ডিনারের সময় ফিরে এসে" কথাটায় পাঠক ও শ্রোতা সকলেই অসন্তুষ্ট হয়েছে। এসব সাধারণ কথা তো যেকেউ বলতে পারে, একজন উচ্চতম কর্তৃপক্ষের ইস্তাহারে একথা থাকা উচিত হয় নি।

সকলেই নিরাশ হয়ে চুপ করে রইল। লম্বা যুবকটি ঠোঁট নাড়তে নাড়তে এ-পাশে ও-পাশে দুলতে লাগল।

"ওকে জিজ্ঞাসা করা উচিত⋯ওই তো তিনি স্বয়ং !" ⋯"ঠিক, ওকেই জিজ্ঞাসা করা হোক !" "কেন করব না ? উনি সব বুঝিয়ে বলবেন"⋯হঠাৎ ভিড়ের পিছন দিক থেকে এই ধরনের নানা কথা কানে এল। দুই দল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্কোয়ারের দিকে যাচ্ছিল; সকলেরই দৃষ্টি গেল তার গাড়ির উপর।

কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের হুকুম পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সকালেই গিয়েছিল বজরা পুড়িয়ে দিতে; সেই ব্যাপারে বহু টাকা পকেটস্থ করেই সে ফিরছে। একদল লোককে এগিয়ে আসতে দেখে সে কোচয়ানকে গাড়ি থামাতে বলল।

লোকদের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলল, "এরা সব কারা ?"

কোন জবাব না পেয়ে আবার চীৎকার করে বলল. "এরা সব কারা ?"

পশমী কোট পরা দোকানী জবাব দিল, "ইয়োর অনার, হাইয়েস্ট এক্সেলেন্সি কাউণ্টের ঘোষণা মতে এরা জীবন পণ করে দেশের সেবা করতে চায় ; এটা কোনরকম দাঙ্গাহাঙ্গামা নয়, কিন্তু যেহেতু হাইয়েস্ট এক্সেলেন্সি বলেছেন…"

পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলল, "কাউণ্ট তো চলে যান নি, এখানেই আছেন ; তোমাদের সম্পর্কেও একটা ঘোষণা প্রচার করা হবে। …চালাও !" কোচয়ানকে হুকুম দিল।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথাগুলি যারা শুনতে পেল লোকজন এসে তাদের চারদিকে ভিড় করল ; চলমান গাড়িটার দিকে তাকাল।

সেইমুহূর্তে পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও শংকিত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে কোচয়ানকে কি যেন বলল। ঘোড়াগুলো গতি বাড়িয়ে দিল।

লম্বা যুবকটি চেঁচিয়ে বলল, "সব ফাঁকিবাজী হে ! ওর পিছু নাও ! ওকে যেতে দিও না হে বাছারা ! আমাদের প্রশ্নের জবাব দিয়ে তবে চলে যাক। ওকে ধর !" চীৎকার করতে করতে সকলে গাড়িটার পিছনে ছুটতে লাগল।

উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে বলতে ভিড়ের লোকজন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনুসরণ করে লুবিয়াংকা স্ট্রীটের দিকে চলল।

ভিড়ের মধ্যে নানা কণ্ঠস্বরে বারবারই উচ্চারিত হতে লাগল, "ঐ দেখ, ভদ্রলোক আর ব্যবসায়ীরা ভেগেছে, আর আমাদের রেখে গেছে মরতে। ওরা কি মনে করে আমরা কুকুরের দল ?"

অধ্যায়—২৪

১লা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ হয়ে মস্কোতে ফিরে গেল ; তার কারণ সমর পরিষদে তাকে আমন্ত্রণ করা হয় নি এবং শহর রক্ষার যে প্রস্তাব সে দিয়েছিল কুতুজভ তাকেও আমল দেয় নি। তাছাড়া, শিবিরে এসে সে যখন বুঝল যে শহরের শান্ত ভাব ও দেশপ্রেমের উত্তেজনাকে শুধু যে গৌণ ব্যাপার বলে মনে করা হচ্ছে তাই নয়, মনে করা হচ্ছে সম্পূর্ণ অবান্তর ও গুরুত্বহীন ব্যাপার বলে, তখন তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এইসব দেখেশুনে বিচলিত, আহত ও বিস্মিত হয়ে রস্তপ্‌চিন মস্কো ফিরে এল। নৈশাহারের পরে পোশাক না ছেড়েই সে একটা সোফায় শুয়ে পড়ল ; মাঝরাতের ঠিক পরেই জনৈক সংবাদবাহক কুতুজভের একটা চিঠি নিয়ে এসে তার ঘুম ভাঙাল। চিঠিতে কাউণ্টকে অনুরোধ করা হয়েছে, যেহেতু সেনাবাহিনী মস্কো ছাড়িয়ে রিয়াজান রোডের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছে সেইজন্য পুলিশ অফিসারদের সেখানে পাঠিয়ে দেয়। রস্তপ্‌চিনের কাছে এটা কোন খবরই নয়। মস্কো পরিত্যক্ত

হবে সেকথা সে যে আগেরদিন পক্লোনি পাহাড়ের উপর কুতুজভের সঙ্গে সাক্ষাতের পরেই জানতে পেরেছে তাই শুধু নয়, কথাটা সে জেনেছে বরদিনো যুদ্ধের পর থেকেই, কারণ সে যুদ্ধের পর থেকে সেনাপতিরা যে যখন মস্কো এসেছে সকলেই একবাক্যে বলেছে যে আর একটা যুদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব; তাছাড়া তখন থেকেই প্রতি রাত্রে সব সরকারী সম্পত্তি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রস্তপ্‌চিনের নিজের অনুমতিক্রমেই অর্ধেক বাসিন্দা মস্কো ছেড়ে চলে গেছে। তথাপি রাতের বেলা সুখনিদ্রাটুকু ভেঙে দিয়ে সে খবরটা একটা সাধারণ চিঠির আকারে কুতুজভের হুকুমসহ আমায় সে বিস্মিত ও বিরক্ত করেছে।

পরবর্তীকালে নিজের স্মৃতিকথায় এই সময়কার কার্যাবলী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সে বারবার বলেছে যে দুটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়দ্বারা সে তখন পরিচালিত হয়েছে: মস্কোতে শান্তি বজায় রাখা এবং অধিবাসীদের চলে যাওয়া ত্বরান্বিত করা। এই দুটি উদ্দেশ্যকে স্বীকার করে নিলে রস্তপ্‌চিনের তৎকালীন সব কাজকর্মই নিন্দার অতীত বলে মনে হবে। "পবিত্র স্মৃতিচিহ্নসমূহ, অস্ত্রশস্ত্র, কামান-বন্দুক; গোলা-বারুদ ও শস্য-ভাণ্ডার কেন সরিয়ে ফেলা হয় নি? কেন হাজার হাজার অধিবাসীকে ঠকিয়ে বিশ্বাস করানো হয়েছিল যে মস্কোকে শত্রুর হাতে তুলে দেওয়া হবে না—তাদের সর্বনাশ করা হবে না।" কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের কৈফিয়ৎ, "শহরের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে।" …"সরকারী আপিসগুলো থেকে বস্তা-বস্তা অকেজো কাগজপত্র, আর লেপ্‌পিসের বেলুন ও অন্যান্য জিনিসপত্র কেন সরানো হয়েছিল?" রস্তপ্‌চিনের কৈফিয়ৎ, "শহরকে ফাঁকা করে রেখে যেতে।" জন-শান্তি বিপন্ন—একথা মেনে নিলে যেকোন কাজেরই সমর্থন মেলে।

ত্রাসের রাজত্বের সব ভয়াবহতার একমাত্র ভিত্তি জনগণের শান্তি বিধানের কামনা।

তাহলে ১৮১২ সালে মস্কোর শান্তি বিঘ্নিত হবার ভয় কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের মনে এসেছিল কেন? শহরে একটা বিদ্রোহ দেখা দেবার সম্ভাবনার কথা ভাববার কি কারণ ছিল? অধিবাসীরা মস্কো ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আর পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যরা এসে সে স্থান পূর্ণ করছিল। তার ফলে সাধারণ মানুষ দাঙ্গা বাঁধাবে কেন?

শত্রু যখন একটা শহরে ঢোকে তখন মস্কোতে অথবা রাশিয়ার অন্য কোন জায়গায় কখনও গণ-অভ্যুত্থানের মত কোন ঘটনা ঘটে নি। ১লা ও ২রা সেপ্টেম্বর তারিখেও দশ হাজারের বেশী মানুষ মস্কোতে ছিল, কিন্তু শাসনকর্তার নির্দেশে তার বাড়ির সামনে সমবেত কিছু লোকের উচ্ছৃংখলতা ছাড়া আর কোথাও কিছু ঘটে নি। একথা তো খুবই পরিষ্কার যে বরদিনোর যুদ্ধের পরে মস্কো পরিত্যাগ করা যখন নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল, অন্ততপক্ষে তার

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তখন অস্ত্রশস্ত্র বিলিয়ে এবং ইস্তাহার বিলি করে জনসাধারণকে উত্তেজিত না করে রস্তপ্‌চিন যদি পবিত্র স্মৃতি-চিহ্ন, গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ও টাকাপয়সা সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করত এবং লোকজনদের খোলাখুলি বলে দিত যে শহরটাকে পরিত্যাগ করা হবে, তাহলে জনসাধারণের মধ্যে একটা গোলযোগের আশংকা করার কারণ অনেক কমে যেত।

দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হলেও রস্তপ্‌চিন ছিল আশাবাদী ও আবেগপ্রবণ; সব সময় উর্ধ্বতম শাসকমহলেই সে চলাফেরা করত; যাদের পরিচালক বলে সে নিজেকে ভাবত সেই জনসাধারণের সঙ্গে তার সম্যক পরিচয় ছিল না। যদিও সে জানত যে দুর্দিন আসছে, তবু একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত না যে মস্কোকে ছেড়ে যেতে হবে, আর তাই সেজন্য সে প্রস্তুতও ছিল না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অধিবাসীরা মস্কো ছেড়ে গেল। সরকারী আপিসগুলো সরিয়ে দেওয়া হল কর্মচারিদের দাবীতে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাউণ্টকে সে দাবী মেনে নিতে হয়েছিল। তীব্র কল্পনাবিলাসী মানুষের বেলায় যেমনটি হয়ে থাকে, মস্কো ছেড়ে চলে যেতে হবে এ-কথাটা অনেকদিন আগে থেকেই জানলেও রস্তপ্‌চিন সেটা জানত বুদ্ধি দিয়ে, কিন্তু অন্তরে তা বিশ্বাস করত না, আর তাই এই নতুন পরিস্থিতির জন্য কোন মানসিক প্রস্তুতিও সে নেয় নি।

তার যতকিছু কাজকর্ম (কার্যক্ষেত্রে তা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল সেটা অন্য প্রশ্ন) সব কিছুরই লক্ষ্য ছিল জনগণের মনে দেশাত্মবোধক ফরাসী-বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা।

কিন্তু ঘটনাবলী যখন প্রকৃত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল, যখন ফরাসী-বিদ্বেষের বুলিতে আর কুললো না, এমন একটা যুদ্ধের ভিতর দিয়ে সে বিদ্বেষকে প্রকাশ করাও সম্ভব হল না, মস্কোর একমাত্র প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসের যখন আর কোন দামই রইল না, যখন সব মানুষ এককাট্টা হয়ে সবকিছু ছেড়ে স্রোতের মত মস্কো ছেড়ে যেতে লাগল এবং সেই নেতিবাচক কাজের ভিতর দিয়েই তাদের জাতীয়তাবোধের প্রমাণ রাখল, তখন জননেতার যে ভূমিকা রস্তপ্‌চিন বেছে নিয়েছিল অকস্মাৎ সেটা একেবারেই অর্থহীন হয়ে দেখা দিল। অপ্রত্যাশিতভাবে নিজেকে বড়ই হাস্যকর, দুর্বল ও নিঃসঙ্গ মনে হল; পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল যেন।

ঘুম থেকে জেগে উঠে কুতুজভের সেই অনুত্তাপ, অবশ্য-পালনীয় চিঠি পেয়ে সে আরও বেশী বিরক্ত হয়ে উঠল। যেসব সরকারী সম্পত্তি বিশেষভাবে তার হেফাজতে রাখা আছে সেসবই এখনও মস্কোতেই রয়েছে; সেসবকিছু সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এখন আর সম্ভব নয়।

"এরজন্য কে দায়ী? কে এই সংকট ডেকে এনেছে?" রস্তপ্‌চিন স্মৃতি–

মন্থন শুরু করল। "নিশ্চয় আমি নই। আমি তো তৈরি হয়েই ছিলাম। মস্কো ছিল আমার হাতের মুঠোয়। আর তারা কি না তার এই হাল করে ছাড়ল! যত সব পাষণ্ড! বিশ্বাসঘাতক! কাদের যে সে পাষণ্ড ও বিশ্বাসঘাতক বলল তা সে নিজেই ভাল করে জানে না।

মস্কোর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব লোক তার কাছে এসেছিল, রস্তপ্‌চিন সারারাত তাদের জন্য হুকুম জারি করল। যারা তার কাছাকাছি থাকে তারা কোনদিন কাউন্টকে এত বিষণ্ণ ও বিরক্ত দেখে নি।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, রেজিস্ট্রার বিভাগের ডিরেক্টর খবর পাঠিয়েছেন···" পরিষদ থেকে, সেনেট থেকে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, ফাউণ্ডলিং হাসপাতাল থেকে, সহযোগী বিশপের কাছ থেকে লোক এসেছে···খবরের জন্য···ফায়ার ব্রিগেড সম্পর্কে আপনার কি নির্দেশ? কারা-শাসনকর্তার কাছ থেকে··· পাগলা গারদের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছ থেকে···সারারাত এই ধরনের ঘোষণা কাউন্টের কাছে অনবরত আসতে লাগল।

এই সবরকম প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত ও ক্রুদ্ধ জবাবে সে শুধু জানাল, এখন আর তার হুকুমের কোন দরকার নেই, তার সব সযত্নরচিত পরিকল্পনা এবার অন্য কেউ নষ্ট করে ফেলেছে। এখন যা কিছু ঘটবে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই একজনকেই বহন করতে হবে।

রেজিস্ট্রার বিভাগের প্রশ্নের জবাবে সে বলল, "আঃ, সেই মাথা-মোটা লোকটাকে বলে দাও, তার সব দলিলপত্র রক্ষা করতে তাকেই এখানে থাকতে হবে। ফায়ার ব্রিগেড সম্পর্কে বোকার মত প্রশ্ন করছ কেন? তাদের সঙ্গে তো ঘোড়া আছে, তারা ভ্লাদিমির চলে যাক; ঘোড়াগুলো যেন ফরাসীদের হাতে না পড়ে।"

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, পাগলা গারদের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসেছেন: তাকে কি হুকুম দেবেন?"

"আমার হুকুম? তারা চলে যাক। বাস। ···আর পাগলদের শহরে ছেড়ে দেওয়া হোক। যখন পাগলরাই আমাদের সৈন্যদের চালাচ্ছে, তখন নিশ্চয় ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে অন্য পাগলদের মুক্তি দেওয়া হোক।"

কারাগারের দণ্ডিত বন্দীদের সম্পর্কে একটা প্রশ্নের উত্তরে রস্তপ্‌চিন রেগে শাসনকর্তাকে বলল:

"আপনি কি আশা করেন তাদের পাহারা দেবার জন্য আপনাকে আমি দুই ব্যাটেলিয়ন সৈন্য দেব? সৈন্য পাব কোথায়? তাদের ছেড়ে দিন, বাস, মিটে গেল!"

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দী আছেন, মেশ্‌কভ, ভেরেশ্‌চাগিন...."

"ভেরেশ্‌চাগিন! তাকে এখনও ফাঁসি দেওয়া হয় নি?" রস্তপ্‌চিন

চেঁচিয়ে উঠল। "তাকে আমার কাছে নিয়ে এস !"

অধ্যায়—২৫

সকাল নটা নাগাদ মস্কোর ভিতর দিয়ে সৈন্যদের চলাচল শুরু হয়ে গেল। তখন থেকে আর কেউ নির্দেশের জন্য কাউন্টের কাছে এল না। যারা যেতে পারল নিজের থেকেই চলে গেল, আর যারা থেকে গেল তারাও নিজেরাই কর্তব্য স্থির করল।

সকোল্‌নিকি যাবার জন্য গাড়ি আনতে বলে কাউন্ট পড়ার ঘরে গিয়ে দুই হাত জোড় করে বিষণ্ণ, বিবর্ণ মুখে চুপচাপ বসে রইল।

দেশ যখন শান্ত ও গোলযোগহীন থাকে তখন প্রত্যেক শাসকই ভাবে যে একমাত্র তার চেষ্টাতেই তার শাসনাধীন লোকগুলি চলাফেরা করে, আর এই অপরিহার্যতার চেতনার মধ্যেই সব শাসক তার সব চেষ্টা ও শ্রমের প্রধান পুরস্কার খুঁজে পায়। ইতিহাসের সমুদ্র যখন শান্ত থাকে তখন শাসক-কর্তৃপক্ষ তার ভঙ্গুর নৌকোখানিকে একটা আঁকড়ার সাহায্যে জল-জাহাজের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিজে চলতে থাকে আর স্বাভাবিকভাবেই কল্পনা করে যে তার চেষ্টাতেই জাহাজখানা চলছে। কিন্তু যেই ঝড় ওঠে, সমুদ্র বিক্ষুব্ধ হয়, জাহাজ চলতে থাকে, তখন আর সে ভ্রান্তি ধারণা থাকা সম্ভব নয়। জাহাজ তখন নিজের প্রচণ্ড গতিতেই এগিয়ে চলে, নৌকোর আঁকড়াটা আর সেই চলমান জাহাজে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই শাসক আর শাসক থাকে না। শক্তির উৎস থাকে না, সে হয়ে যায় একটি তুচ্ছ, অকর্মন্য, দুর্বল মানুষ।

রস্তপ্‌চিনেরও তাই মনে হচ্ছে, আর সেইজন্যই সে আরও চটে গেছে।

যে পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে জনতা থামিয়েছিল সে যখন রস্তপ্‌চিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ঠিক তখনই একজন অ্যাডজুটান্ট এসে খবর দিল যে ঘোড়ার সাজ পরানো হয়েছে। দুজনের মুখই বিবর্ণ; তার নির্দেশ মতই কাজ করা হয়েছে এ-সংবাদ জানিয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কাউন্টকে খবর দিল যে অনেক লোক তার উঠোনে ভিড় করেছে; তারা দেখা করতে চায়।

একটি কথাও না বলে রস্তপ্‌চিন উঠে তাড়াতাড়ি পা ফেলে তার বিলাস-বহুল বৈঠকখানায় ঢুকে ব্যাল্‌কনির দরজার কাছে গেল, হাতলে হাত রাখল, আবার ছেড়ে দিল, তারপর জানালার ধারে গেল; সেখান থেকে বাইরের জনতাকে আরও ভালভাবে দেখা যায়। লম্বা ছেলেটি সকলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ঘোরাচ্ছে, আর কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে কি যেন বলছে। রক্ত-মাখা কামারটি বিষণ্ণ মুখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বন্ধ জানালার ভিতর দিয়ে বহুকণ্ঠের গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

জানালার কাছ থেকে ফিরে এসে রস্তপ্‌চিন বলল, "আমার ঘোড়া কি হাজির ?"

"হাজির ইয়োর এক্সেলেন্সি," অ্যাড্‌জুটাণ্ট বলল।

রস্তপ্‌চিন আবার ব্যালকনির দরজায় গেল।

"কিন্তু ওরা কি চায় ?" পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জিজ্ঞাসা করল।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি, ওরা বলছে যে আপনার হুকুমমত ওরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তৈরি হয়েছে, আর তাই ওরা বিশ্বাসঘাতকতার কথা কি যেন বলছে। জনতা খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে ইয়োর এক্সেলেন্সি—আমি কোনরকমে ওদের হাত এড়িয়ে চলে এসেছি। ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমার পরামর্শ যদি শোনেন তো বলি...."

"আপনি যেতে পারেন। কি করতে হবে সেকথা বলার জন্য আপনাকে দরকার হবে না!" রস্তপ্‌চিন সক্রোধে বলল।

জনতার দিকে চোখ রেখে সে ব্যালকনির দরজায় দাঁড়িয়ে রইল।

এসব কিছুর জন্য যে লোকটি দায়ী তার বিরুদ্ধে অবরুদ্ধ ক্রোধে সে ভাবতে লাগল, "তারাই তো রাশিয়ার এই হাল করেছে! আমার এই হাল করেছে!" ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভাবল, "ওই এক উচ্ছৃংখল জনতা, সমাজের আবর্জনা: তাদের বোকামির জন্যই ওরা মাথা তুলতে পেরেছে! ওরা একটা শিকার খুঁজছে।" একথাটা তার মনে হল কারণ সে নিজেই এমন একটি শিকার খুঁজছে যার উপর মনের ঝালটা মেটানো যায়।

"গাড়ি কি হাজির ?" সে আবার শুধাল।

"হ্যাঁ ইয়োর এক্সেলেন্সি। ভেরেশ্‌চাগিন সম্পর্কে আপনার কি হুকুম ? সে তো বারান্দায় অপেক্ষা করছে," অ্যাড্‌জুটাণ্ট বলল।

যেন এক অপ্রত্যাশিত স্মৃতির আঘাতে রস্তপ্‌চিন বলে উঠল, "আঃ!"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দৃঢ় পদক্ষেপে সে বাইরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সব কথা থেমে গেল, মাথার সব টুপি নেমে গেল, সব চোখ পড়ল কাউণ্টের উপর।

কাউণ্ট হঠাৎই উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "শুভ সকাল বাছারা! তোমরা এখানে এসেছ বলে ধন্যবাদ। একমুহূর্তের মধ্যেই আমি তোমাদের কাছে যাচ্ছি, কিন্তু আগে শয়তানদের সঙ্গে ফয়সালা করতে হবে। যে শয়তানরা মস্কোর সর্বনাশ করেছে তাদের শাস্তি দিতেই হবে। আমার জন্য অপেক্ষা করে থাক।"

তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে সরে গিয়ে কাউণ্ট সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

ভিড়ের মধ্যে সমর্থন ও সন্তোষের একটা গুঞ্জন বয়ে গেল। "তিনি শয়তানদের সঙ্গে একটা ফয়সালা করবেনই, তোমরা দেখে নিও। আর তোমরা বলছ যে ফরাসীরা—আইন কাকে বলে সেটা তিনিই তোমাদের

দেখিয়ে দেবেন।" তারা এমনভাবে কথা বলতে লাগল যেন এই লোকটির উপর ভরসা না রাখার জন্য একে অন্যকে তিরস্কার করছে।

কয়েক মিনিট পরে একজন অফিসার দ্রুতপায়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এসে কি যেন হুকুম করল, আর অশ্বারোহীর দল সারি দিয়ে দাঁড়াল। জনতা সাগ্রহে ব্যালকনি থেকে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল। ক্রুদ্ধ, দ্রুত পা ফেলে রস্তপ্‌চিন সেখানে বেরিয়ে এসে এমনভাবে চারদিকে তাকাতে লাগল যেন কাউকে খুঁজছে।

"কোথায় সে ?" সে খোঁজ করল। বলতে বলতেই সে দেখতে পেল একটি যুবক বাড়িটার মোড় ঘুরে দুই দল অশ্বারোহীর মাঝখান দিয়ে এগিয়ে আসছে। তার ঘাড়টা সরু ও লম্বা, অর্ধেক কামানো মাথায় আবার ছোট ছোট চুল গজিয়েছে। যুবকটির পরনে শেয়ালের লোমের পাড়বসানো নীল কাপড়ের ছেঁড়া জামা, একদিন হয়তো সেটা সৌখীন ছিল, শনপাটের নোংরা কয়েদীর ট্রাউজার, আর পাতলা, নোংরা ছেঁড়া বুট। দুটি দুর্বল পায়ে ভারী শেকল বাঁধা, যার ফলে তার চলতে কষ্ট হচ্ছে।

"আঃ!" বলে রস্তপ্‌চিন তাড়াতাড়ি যুবকটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বারান্দার একেবারে নীচের সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল, "ওকে এখানে নিয়ে এস।"

শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ তুলে যুবকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে এগিয়ে গেল। কোটের কলারটা গলায় চেপে বসায় একটা আঙুল দিয়ে সেটাকে ঠেলে ধরে ঘাড়টাকে দু'বার এদিক-ওদিকে ঘোরাল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কাজে অনভ্যস্ত হাত দুটি জোড় করে বিনীতভাবে দাঁড়াল।

কয়েক সেকেণ্ড সব চুপ। শুধু পিছনের সারির যে লোকগুলো সেই একটি জায়গার দিকে এগিয়ে আসতে চাপ দিচ্ছে তাদের দীর্ঘশ্বাস, আর্তনাদ ও পা ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

যুবকটি যতক্ষণ সিঁড়িতে তার নির্দিষ্ট জায়গায় না এল ততক্ষণ পর্যন্ত রস্তপ্‌চিন ভুরু কুঁচকে এক হাতে মুখটা মুছতে মুছতে দাঁড়িয়ে রইল।

কণ্ঠস্বরে একটা ধাতব শব্দ তুলে বলল, "বাছারা! এই লোকটি, এই ভেরেশ্‌চাগিনই সেই শয়তান যার কৃতকর্মের ফলে মস্কো আজ ধ্বংস হতে বসেছে।"

লোমের পট্টি দেওয়া কোট পরা যুবকটি একটু ঝুঁকে বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে; আঙুলগুলো সামনের দিকে একত্র করা। মাথাটা অর্ধেক কামানোর ফলে বিকৃতদর্শন শীর্ণ তরুণ মুখখানি অসহায়ভাবে ঝুলে পড়েছে। কাউণ্টের প্রথম কথাগুলি শুনেই সে ধীরে ধীরে মাথা তুলে তারদিকে তাকাল; যেন কিছু বলতে চাইল, অথবা অন্তত তার চোখে চোখ রাখতে চাইল। যুবকটির লম্বা সরু গলার একটা শিরা দড়ির মত ফুলে উঠে কানের

কাছে নীল হয়ে গেল; হঠাৎ তার মুখটা লাল হয়ে উঠল।

সকলের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ। সেও জনতার দিকে তাকাল; তাদের মুখের ভাব দেখে কিছুটা আশান্বিত হয়ে একটুকরো ভীরু, বিষণ্ণ হাসি ফুটল তার মুখে; মাথাটা নীচু করে সিঁড়িতে পা দিল।

"সে জারের প্রতি, তার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বোনাপার্তের দলে ভিড়েছে। একমাত্র সেই রাশিয়ার নামে কলংক লেপন করেছে, মস্কোকে ধ্বংস করেছে," কর্কশ, জোরালো গলায় কথাগুলি বলে রস্তপ্‌চিন হঠাৎ ভেরেশচাগিনের দিকে তাকাল; তখনও সে একই বিনীত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে। সে দৃশ্য দেখে জ্বলে উঠে রস্তপ্‌চিন হাত তুলে জনতাকে সম্বোধন করে চীৎকার করে বলে উঠল:

"ওকে নিয়ে তোমরা যা ভাল মনে কর তাই কর! ওকে তোমাদের হাতেই তুলে দিলাম!"

জনতা নিশ্চুপ; ক্রমেই একে অন্যের আরও কাছে ঘেঁসে দাঁড়াল। এইভাবে পরস্পর ঠেলাঠেলি করা, এই রুদ্ধ বাতাসে শ্বাস টানা, একটুও নড়াচড়া করবার জায়গা না পেয়ে একটা অজ্ঞাত, দুর্বোধ্য ও ভয়ংকর কিছুর জন্য অপেক্ষা করা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে। যারা সামনে দাঁড়িয়ে আছে, যারা সবকিছু দেখেছে ও শুনেছে, তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করে দাঁড়িয়ে আছে, আর যারা পিছন থেকে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করছে তাদের ঠেলে রাখছে।

রস্তপ্‌চিন চীৎকার করে বলল, "ওকে মার! ···বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু হোক, রাশিয়ার নামে সে যেন আর কলংক লেপন করতে না পারে! ওকে কেটে ফেল। আমি হুকুম দিচ্ছি।"

যত না মুখের কথায় তার চাইতে বেশী রস্তপ্‌চিনের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে জনতা আর্তনাদ করে ঢেউয়ের মত এগিয়ে গিয়েও আবার থেমে গেল।

সেই ক্ষণিক নিস্তব্ধতার মাঝখানে ভেরেশ্‌চাগিন ভীরু অথচ নাটকীয় স্বরে বলে উঠল, "কাউণ্ট! আমাদের দুজনের মাথার উপরে একই আকাশ·····" মাথাটা তুলল; সরু গলার মোটা শিরাটা আবারও রক্তে ভরে উঠল; মুখের উপর অতিদ্রুত রঙের ছোপ পড়ে আবার মিলিয়ে গেল।

যা বলতে চেয়েছিল তা বলা হল না।

ভেরেশ্‌চাগিনের মতই বিবর্ণ মুখে রস্তপ্‌চিন চীৎকার করে বলল, "ওকে কেটে ফেল! আমি হুকুম দিচ্ছি!"

নিজের তরবারি কোষমুক্ত করে অশ্বারোহী অফিসার চেঁচিয়ে বলল, "তরবারি খোল!"

জনতার মধ্যে আবার একটা ঢেউ উঠল; সে ঢেউ প্রথম সারিতে পৌঁছে তাকে বারান্দার প্রথম ধাপে পৌঁছে দিল। লম্বা যুবকটি মুখে প্রস্তরকঠিন ভাব

ফুটিয়ে হাত তুলে ভেরেশ্‌চাগিনের পাশে দাঁড়াল।

অশ্বারোহী অফিসার ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ওকে তরবারির আঘাত হান!"

ক্রোধে বিকৃত মুখ একটি সৈন্য তার তরবারির ভোঁতাদিক দিয়ে ভেরেশ্‌চাগিনের মাথায় আঘাত করল।

কেন যে তাকে এভাবে আঘাত করা হল সেটা বুঝতে না পেরে ভীরু বিস্ময়ে ভীত দৃষ্টিতে চারদিকে তাকিয়ে ভেরেশ্‌চাগিন "আঃ!" বলে চীৎকার করে উঠল। ভিড়ের মধ্যেও অনুরূপ সবিস্ময়ে আর্তনাদ ও আতংক ছড়িয়ে পড়ল। বিষণ্ণ গলায় কে যেন বলে উঠল "হায় প্রভু!"

বিস্ময়সূচক শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই ভেরেশ্‌চাগিন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করে উঠল, আর সেই আর্তনাদ হল মারাত্মক। মানুষের অনুভূতির যে প্রাচীর এতক্ষণ জনতাকে সংযত রেখেছিল এবার চরম সীমায় পৌঁছে সেটা ভেঙে পড়ল। অপরাধ শুরু হয়েছিল, এবার তাকে সম্পূর্ণ করতে হবে। তিরস্কারের যন্ত্রণাকাতর আর্তনাদ জনতার ভয়ংকর ক্রুদ্ধ গর্জনের তলে ডুবে গেল। সপ্তম ও সর্বশেষ আঘাত যেভাবে একটা জাহাজকে চুরমার করে দেয়, তেমনই অপ্রতিহত শেষ ঢেউটি পিছন থেকে ধেয়ে এসে প্রথম সারির উপর আছড়ে পড়ল, তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল, ডুবিয়ে দিল। অশ্বারোহী সৈনিকটি আবার আঘাত হানতে উদ্যত হল। ভেরেশ্‌চাগিন আতঙ্কে আর্তনাদ করে দুই হাতে মাথাটা ঢেকে ভিড়ের দিকে ছুটে গেল। লম্বা যুবকটির সঙ্গে ধাক্কা খেতেই সেও দুইহাতে তার সরু গলাটা চেপে ধরে বেপরোয়া ভঙ্গীতে চীৎকার করে উঠে তাকে নিয়েই অগ্রসরমান জনতার পায়ের নীচে পড়ে গেল।

কেউ ভেরেশ্‌চাগিনকে আঘাত করল, তার পোশাক ছিঁড়ে ফেলল, কেউ বা ঝাঁপিয়ে পড়ল লম্বা যুবকটির উপর। যারা পায়ের নীচে চাপা পড়ল আর যারা লম্বা ছেলেটাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করল তাদের মিলিত আর্তনাদে জনতার রোষবহ্নি আরও প্রদীপ্ত হয়ে উঠল। রক্তাপ্লুত যুবকটিকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার আগেই ক্রুদ্ধ জনতা মারতে মারতে তাকে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করে ফেলেছে। আরব্ধ কাজটাকে অতিদ্রুত শেষ করার চেষ্টা সত্ত্বেও যারা ভেরেশ্‌চাগিনকে আঘাত করছে, গলা টিপে ধরছে, টানা-হেঁচড়া করছে তারা তাকে একেবারে শেষ করতে পারল না, কারণ ভিড়ের লোকজন চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি করে মাঝখানে এমনভাবে জমাট বেঁধে গেছে যে তারা না পারছে তাকে মেরে ফেলতে, না পারছে তাকে ছেড়ে দিতে।

"আরে, একটা কুড়ুল দিয়ে মার! ····বিশ্বাসঘাতক, খৃস্টকে বেচে দিয়েছে ····এখনও প্রাণে বেঁচে আছে···নাছোড়বান্দা····ঠিক দাওয়াই দেওয়া হয়েছে।

কষ্ট না দিলে চোর শায়েস্তা হয় না। টাড়ি চালাও! ···সে কি—তবু বেঁচে আছে?"

আক্রান্ত যুবকটি যখন লড়াইতে ক্ষান্ত দিল, তার চীৎকার যখন একটা একটানা লম্বা মৃত্যু-গোঙানিতে পরিণত হল, তখনই ধরাশায়ী রক্তাক্ত দেহটার চারপাশ থেকে ভিড় সরে যেতে লাগল। প্রত্যেকেই একবার এগিয়ে এসে নিজেদের কৃতকর্মের ফল দেখে ভয়ে, বিস্ময়ে ও ধিক্কারে পিছিয়ে যেতে লাগল।

"হে প্রভু! মানুষ কি আজ বন্যপশু হয়ে গেছে! কেমন করে ও এখনও বেঁচে আছে?" ভিড়ের মধ্যে নানা কণ্ঠস্বর শোনা যেতে লাগল। "আর একেবারেই ছেলেমানুষ···নিশ্চয় কোন ব্যবসায়ীর ছেলে। কী মানুষ সব! ····আর তারা বলছে ও সঠিক লোক নয়····কেমন করে নয়? ····হে প্রভু! ঐ তো আরও একজনকে মেরেছে—সকলেই বলছে তার প্রায় হয়ে এসেছে ····হায়রে মানুষ ····তাদের কি পাপের ভয় নেই? ····" সেই একই জনতা এখন যন্ত্রণাদীর্ণ ক্ষোভের সঙ্গে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে বলছে; লোকটির সরু গলাটা অর্ধেক কেটে ফেলা হয়েছে; কালসিটে-পড়া মুখটা রক্তে ও ধুলোয় মাখামাখি।

একজন কষ্টসহিষ্ণু পুলিশ অফিসার হিজ এক্সেলেন্সির বাড়ির উঠোনে একটা মৃতদেহ পড়ে থাকা ভাল দেখায় না বিবেচনা করে অশ্বারোহী সৈনিকদের সেটাকে সরিয়ে ফেলতে বলল। দুজন অশ্বারোহী সৈনিক বিকৃত ঠ্যাং ধরে মাটির উপর দিয়ে টানতে টানতে মৃতদেহটাকে নিয়ে গেল। রক্তাক্ত, ধূলি-কলংকিত, আধা-কামানো মাথা ও লম্বা গলাটা মাটির উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেল। জনতা আতঙ্কে চোখ ফিরিয়ে নিল।

যেমুহূর্তে ভেরেশ্‌চাগিন মাটিতে পড়ে গেল এবং জনতা বর্বর উল্লাসে তাকে ঘিরে ধরল তখন সহসা রস্তপ্‌চিনের মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল; পিছনের ফটকে যেখানে তারজন্য গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সেদিকে না গিয়ে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে সেসব না বুঝেই মাথা নীচু করে দ্রুত পা ফেলে সে বারান্দা ধরে একতলার ঘরগুলোর দিকে যেতে লাগল। কাউন্টের মুখ সাদা হয়ে গেছে, নীচের চোয়ালের তীব্র কাঁপুনিকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারছে না।

"এই পথে ইয়োর এক্সেলেন্সি····ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?···দয়া করে এই দিকে····" পিছন থেকে একটা ভয়ার্ত কম্পিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

কাউন্ট রস্তপ্‌চিন কোন জবাব দিতে পারল না, বাধ্য ছেলের মত মুখ ঘুরিয়ে নির্দেশিত পথে এগিয়ে গেল। পিছনের ফটকে দাঁড়িয়েছিল তার কালিচে-গাড়ি। ভিড়ের লোকদের উন্মাদ কণ্ঠস্বর তখনও শোনা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি আসনে বসে কোচয়ানকে বলল, সকোল্‌নিকিতে তার পল্লী-ভবনের দিকে গাড়ি চালাতে।

মিয়াস্‌নিৎস্কি স্ট্রীটে পৌঁছে যখন উন্মত্ত জনতার চীৎকার আর শোনা গেল

না তখন কাউণ্টের অনুশোচনা শুরু হল। অধীনস্থ কর্মচারিদের সামনে যে উত্তেজনা ও ভীতি সে প্রকাশ করেছে সেকথা মনে করে সে দুঃখিত হল। ফরাসীতে নিজেকেই বলতে লাগল, "হাঙ্গামাকারী জনতা কী ভয়ংকর—বিরক্তিকর। তারা যেন নেকড়ে বাঘ, মাংস না খেলে তাদের তৃপ্তি হয় না। 'কাউণ্ট! আমাদের দুজনেরই মাথার উপরে আছেন একই ঈশ্বর!' —ভেরেশ্‌চাগিনের কথাগুলি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, আর একটা অসন্তুষ্টির স্রোত তার শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগল। কিন্তু এটা তার ক্ষণিকের অনুভূতিমাত্র; কাউণ্ট রস্তপ্‌চিনের মুখে দেখা দিল আত্ম-নিন্দার হাসি। ভাবল, "আমার তো অন্য কর্তব্যও ছিল। জনগণকে তো শান্ত করতে হবে। জনকল্যাণের জন্য আরও অনেকে প্রাণ দিয়েছে—এখনও দিচ্ছে। …আমি যদি শুধুমাত্র থিয়োডোর ভাসিলিয়েভিচ হতাম তাহলে আমার কর্মধারা হত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রধান সেনাপতি হিসাবে আমার জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য।"

গাড়ির নরম গদীতে বসে ঈষৎ দুলতে দুলতে এবং জনতার সেই ভয়ঙ্কর হল্লা আর কানে না আসাতে রস্তপ্‌চিনের শরীরটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল, আর সেইসঙ্গে মনটাকেও শান্ত করে তুলবার উপযুক্ত করার কাজে ব্যাপৃত হল।

সে যা করেছে তারজন্য নিজের বিচার-বুদ্ধি তাকে দোষী তো করলই না, বরং একটি অপরাধীকে শাস্তি দেবার এবং সেইসঙ্গে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করবার এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে বলে আত্ম-তুষ্টিতে তার মন ভরে উঠল।

ভেরেশ্‌চাগিনকে বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, রস্তপ্‌চিন ভাবতে লাগল (যদিও সেনেট তাকে কঠোর সশ্রম দণ্ডমাত্র দিয়েছিল) "সে তো একটি বিশ্বাসঘাতক, গুপ্তচর। আমি তো তাকে বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে পারি না, তাই একঢিলে দুই পাখি মেরেছি: ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করতে তাদের হাতে একটি শিকার তুলে দিয়েছি, আর সেইসঙ্গে একজন দুষ্কৃতকারীকে শাস্তি দিয়েছি।"

দেশের বাড়িতে পৌঁছে গৃহস্থালীর ব্যাপারে নানান নির্দেশাদি দিতে শুরু করে কাউণ্ট সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেল।

আধঘণ্টা পরেই দ্রুতগামী অশ্বচালিত গাড়িতে চেপে সকোলনিকির মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে তার মনে অতীতকে নিয়ে কোন চিন্তাই এল না, এখন তার চিন্তা শুধু যা ঘটবে তাকে নিয়ে। সে শুনেছে কুতুজভ এখন ইয়াউজা সেতুতে আছে; তাই সেখানেই সে চলেছে। কুতুজভের ধোকাবাজির জন্য তাকে যে ক্রুদ্ধ, হুল-ফোটানো কথাগুলি শোনাবে সেটাই মনে মনে আওড়াচ্ছে। সেই বুড়ো শেয়ালকে সে বুঝিয়ে দেবে, শহর পরিত্যাগ

করে যে দুর্গতিকে সে ডেকে এনেছে, যেভাবে রাশিয়ার সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়বে তারই বাহাত্তুরে বুড়ো মাথার উপর। কুতুজভ যা যা বলবে মনে মনে সেগুলি ভাবতেই রস্তপ্‌চিন রাগে গাড়ির মধ্যেই মুখ ফিরিয়ে কঠোর দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

সকোল্‌নিকির মাঠও পরিত্যক্ত। শুধু একেবারে শেষ প্রান্তে অতিথিশালা ও পাগলাগারদের সামনে সাদা পোশাকপরা কিছু লোক দেখা যাচ্ছে, আর তাদের মতই আরও কিছু লোক মাঠে হাঁটতে হাঁটতে যার যার মত চীৎকার করছে, হাত-পা নাড়ছে।

তাদের মধ্যে একজন কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের গাড়িচলার পথটা পার হবার জন্য সেইদিকেই ছুটে আসছে। এইসব ছাড়া-পাওয়া পাগলগুলোকে বিশেষ করে যে পাগলটা তাদের দিকে দৌড়ে আসছে তাকে দেখে স্বয়ং কাউন্ট, তার কোচয়ান ও অশ্বারোহী সৈনিকরা আতংকে ও কৌতূহলে সেইদিকে তাকাতে লাগল।

ঝোলা ড্রেসিং-গাউন পরে লম্বা সরু পা ফেলে এপাশ-ওপাশ দুলতে দুলতে পাগলাটা সবেগে ছুটছে, তার দৃষ্টি রস্তপ্‌চিনের উপর নিবদ্ধ, কর্কশ গলায় চীৎকার করতে করতে সে ইসারায় তাকে থামতে বলছে। পাগলটার গম্ভীর, বিষণ্ণ মুখটা শুকনো ও হলুদে, মুখে অসমান দাড়ি, চোখের জাফরান-হলুদ সাদা অংশের মধ্যে উজ্জ্বল কালো মণি দুটো নীচের পাতার কাছে অস্থির-ভাবে ঘুরছে।

"থাম! ঘোড়া থামাও, আমি বলছি," তীক্ষ্ণ স্বরে সে চীৎকার করে উঠল; হাত-পা নেড়ে প্রতিটি কথার উপর অতিরিক্ত জোর দিয়ে সে অনবরত চেঁচাতে লাগল।

কালিচে-গাড়িটাকে ধরে ফেলে সে তার পাশে পাশে দৌড়তে লাগল।

"তিনবার তারা আমাকে খুন করেছে, তিনবার আমি মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠেছি। তারা আমাকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছে, ক্রুশে বিদ্ধ করেছে… আমি আবির্ভূত হবই…হবই…হবই। তারা আমার দেহটাকে ছিঁড়েছে। ঈশ্বরের রাজ্যের পতন ঘটানো হবে। তিনবার আমি তার পতন ঘটাব, আবার তিনবার তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব!" ক্রমেই গলা চড়াতে চড়াতে সে চেঁচাতে লাগল।

জনতা যখন ভেরেশ্‌চাগিনকে ঘিরে ধরেছিল তখনকার মতই কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের মুখটা হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিল। কাঁপা গলায় কোচয়ানকে বলল, "চালাও…আরও জোরে!" কালিচে-গাড়িটা যত দ্রুত সম্ভব উড়ে চলল, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত পাগলাটার হতাশ আর্তকণ্ঠ তার কানে বাজতে লাগল, ক্রমেই দূর হতে দূরে অস্পষ্টতর হয়ে এল; তার চোখের

সামনে আর কিছু নেই, শুধু ভাসতে লাগল লোমের পটি বসানো কোট পরা "সেই বিশ্বাসঘাতকের" বিস্মিত, ভয়ার্ত, রক্তাক্ত মুখটা।

এই মানসিক ছবিটা এত টাটকা যে রস্তপ্‌চিনের মনে হল সেটা বুঝি তার বুকের মধ্যে কেটে বসেছে, সেখানে রক্ত ঝরাচ্ছে। এইমুহূর্তে তার স্পষ্ট মনে হল, সেই স্মৃতির রক্তাক্ত চিহ্ন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে না, বরং সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তীব্রতর নিষ্ঠুরতায় ও বেদনায় তার বুকের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকবে। নিজের কথাগুলি এখনও তার কানে বাজছে: "ওকে কেটে ফেল। আমি হুকুম দিচ্ছি!"····

সে ভাবল, "এ কথাগুলি কেন বলেছিলাম? হঠাৎই বলে ফেলেছি···· বলার কোন দরকার ছিল না। তাহলে তো কিছুই ঘটত না।" যে অশ্বারোহী সৈনিকটি আঘাত করেছিল তার ভীত, ক্রুদ্ধ মুখটা সে যেন দেখতে পেল; লোমের পটি দেওয়া কোট-পরা ছেলেটির সেই নীরব, ভীরু তিরস্কারের দৃষ্টিটা যেন তার দিকেই পড়ে আছে।" কিন্তু আমি তো নিজের জন্য একাজ করি নি। একাজ করতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম····ক্ষিপ্ত জনতা, বিশ্বাসঘাতক, জনকল্যাণ," সে ভাবতে লাগল।

সৈন্যরা তখনও ইয়াউজা সেতুতে ভিড় করে আছে। দিনটা গরম। সেতুর পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে কুতুজভ হাতের চাবুকটা দিয়ে বালির উপর আঁকিবুকি টানছে, এমন সময় একটা কালিচে সশব্দে এসে হাজির হল। টুপিতে পালক লাগানো, জেনারেলের ইউনিফর্মধারী একটি লোক কুতুজভের সামনে হাজির হয়ে ফরাসীতে কি যেন বলল। লোকটি কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন। কুতুজভকে বলল, সে এসেছে কারণ রাজধানী মস্কো আর নেই, সেখানে আছে শুধু সৈন্যরা।

"প্রশান্ত মহামহিম যদি আমাকে না বলতেন যে আর একটা যুদ্ধ না করে তিনি মস্কো পরিত্যাগ করবেন না, তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম হত; এসব ঘটতই না," সে বলল।

সে যা বলছে তার অর্থ বুঝতে না পেরে কুতুজভ এমনভাবে রস্তপ্‌চিনের দিকে তাকাল যেন এইমুহূর্তে লোকটির মুখে কি লেখা আছে সেটা পড়বার চেষ্টাই সে করছে। রস্তপ্‌চিন বিচলিত হয়ে চুপ করল। ঈষৎ মাথা নেড়ে স্থিরনিবদ্ধ দৃষ্টি রস্তপ্‌চিনের মুখের উপর থেকে না সরিয়েই কুতুজভ ধীরে ধীরে নীচু গলায় বলতে লাগল:

"না! একটা যুদ্ধ ছাড়া আমি মস্কো পরিত্যাগ করব না!"

এই কথাগুলি বলার সময় কুতুজভ মনে মনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কিছু ভাবছিল অথবা ইচ্ছা করেই সে কথাগুলি বলল; রস্তপ্‌চিন কিন্তু আর কোন কথা না বলেই দ্রুত সেখান থেকে চলে গেল। আর কী আশ্চর্য কথা, মস্কোর শাসন-

কর্তা গর্বোদ্ধত কাউন্ট রস্তপ্‌চিন একটা কসাক চাবুক হাতে নিয়ে সেতুর কাছে গিয়ে হাজির হল এবং পথ-অবরোধকারী গাড়িগুলোকে হটিয়ে দিতে সমানে চীৎকার করতে লাগল।

অধ্যায়—২৬

বিকেল চারটে নাগাদ মুরাত-এর সৈন্যরা মস্কোতে ঢুকতে শুরু করল। সকলের আগে অশ্বপৃষ্ঠে উর্টেমবের্গ হুজারদের একটা দল, তাদের পিছনে অসংখ্য দলবল নিয়ে নেপল্‌স্‌-এর রাজা স্বয়ং।

আর্বাত স্ট্রীটের মাঝামাঝি সেণ্ট নিকলাসের অলৌকিক দেবমূর্তির গির্জার কাছে পৌঁছে মুরাত থামল; সে ক্রেমলিন দুর্গের অবস্থা জানবার জন্য যে অগ্রবর্তী সেনাদলকে পাঠানো হয়েছে তাদের খবরের জন্যই সে অপেক্ষা করতে লাগল।

যারা মস্কোতেই থেকে গেছে তাদের একটা দল মুরাতের চারপাশে ভিড় করল। পালক ও সোনার পোশাকে সজ্জিত লম্বা-চুল এই বিচিত্র সেনাপতিটিকে দেখে তারা বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে তার দিকে তাকাতে লাগল।

নীচুগলায় তাদের বলতে শোনা গেল, "ইনিই কি ওদের জার না কি? তা লোকটি মন্দ নয়!"

একজন অশ্বারোহী দোভাষী তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

"মাথার টুপি খুলে ফেল....সব টুপি খুলে ফেল।" ভিড়ের মধ্যে একজনের মুখ থেকে আরেকজনের মুখে মুখে কথাটা ফিরতে লাগল। দোভাষী বুড়ো দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করল ক্রেমলিন অনেক দূরে কি না। অনভ্যস্ত পোলিশ উচ্চারণে বিব্রত দরোয়ান বুঝতেই পারল না যে দোভাষী রুশ ভাষাতেই কথা বলছে; তার কথা কিছুই বুঝতে না পেরে সে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ল।

মুরাত দোভাষীর কাছে এগিয়ে এসে বলল, ওদের জিজ্ঞাসা কর রুশ-সৈন্যরা কোথায় আছে। একজন রুশ কথাটা বুঝতে পারল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই একযোগে দোভাষীর প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। অগ্রবর্তী সেনাদল থেকে ফিরে এসে একজন ফরাসী অফিসার জানাল, দুর্গের ফটকে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে, আর সম্ভবত সেখানে একদল সৈন্য লুকিয়ে ওৎ পেতে আছে।

"ভাল কথা!" বলে মুরাত দলের একজনের দিকে ফিরে হুকুম দিল, ফটকের উপর গোলাবর্ষণের জন্য চারটে হাল্কা কামান সেইদিকে নিয়ে যাওয়া হোক।

মুরাতের পিছন পিছন কামানগুলি এগিয়ে চলল; আর্বাত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। ভজ্‌দ্‌ভিঝেংকা স্ট্রীটের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তারা থেমে গেল;

স্কোয়ারের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করল। কয়েকজন ফরাসী অফিসার কামান বসানোর কাজের তত্ত্বাবধান করতে করতে ছোট দুরবীনে চোখ লাগিয়ে ক্রেমলিনকে দেখতে লাগল।

ক্রেমলিনে সান্ধ্য-উপাসনার ঘণ্টা বাজছে; সে শব্দ শুনে ফরাসীরা সচকিত হয়ে উঠল; তারা ধরে নিল ওটা সৈন্যদের প্রতি সংকেত-ধ্বনি। কয়েকজন পদাতিক সৈনিক কুতাফিয়েভ ফটকের দিকে ছুটে গেল। সেখানে কড়িকাঠ ও কাঠের পর্দা বসানো হয়েছে, আর অফিসার ও সৈন্যরা সেদিকে ছুটে যেতেই ফটকের নীচ থেকে দুটো বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হল। কামানের পাশে দণ্ডায়মান একজন সেনাপতি অফিসারকে কিছু নির্দেশ দিতেই সে আবার তার সৈন্যদের নিয়ে সেখানে ছুটে গেল।

ফটক থেকে আরও তিনটে গুলির শব্দ এল।

একটা গুলি লাগল জনৈক ফরাসী সৈনিকের পায়ে, আর পর্দার পিছন থেকে কয়েকটি গলার অদ্ভুত শব্দ ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে যেন কোন হুকুম এসেছে এমনিভাবে ফরাসী সেনাপতি, অফিসার ও সৈনিকদের মুখের আনন্দ প্রশান্তির পরিবর্তে দেখা দিল সংগ্রাম ও কষ্ট সহ্য করার সংহত প্রস্তুতির দৃঢ়তা। মার্শাল থেকে সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছেই এ জায়গাটা আর ভজ্‌দ্‌ভিঝেংকা, বা মখাভায়া, বা কুতাফিয়েভ স্ট্রীট, অথবা ত্রয়স্তা ফটক নয়, এটা একটা নতুন রণক্ষেত্র যা হয় তো অচিরেই রক্তক্ষয়ী হয়ে দেখা দেবে। সকলেই সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। ফটক থেকে ভেসে আসা চীৎকার থেমে গেল। কামানগুলো এগিয়ে চলল, গোলন্দাজ সৈনিকরা মশালের ছাই ঝেড়ে ফেলল, একজন অফিসার হুকুম দিল: "কামান দাগ!" তারপরই শোনা গেল দুটো গোলা ছুটে আসার শোঁ-শোঁ শব্দ। গোলা দুটি আছড়ে পড়ল ফটকের পাথরে ও কাঠের কড়ি ও পর্দার উপর; স্কোয়ারের উপর দেখা দিল দুটো ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

সেই গোলার শব্দের প্রতিধ্বনি পাথরে-গড়া ক্রেমলিনের মাথার উপর থেকে মিলিয়ে যাওয়ার কয়েকমুহূর্ত পরেই ফরাসীরা তাদের মাথার উপরে একটা বিচিত্র শব্দ শুনতে পেল। হাজার হাজার কাক প্রাচীরের উপর দিয়ে উড়ে এসে বাতাসে পাক খেতে লাগল, আর কর্কশ গলায় ডাকতে ডাকতে সশব্দে পাখা ঝাপ্‌টাতে লাগল। সেই শব্দের সঙ্গে মিশে ফটক থেকে ভেসে এল একটি মাত্র মানুষের চীৎকার, এবং ধোঁয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল চাষীর কোট-পরা খোলা মাথার একটি মূর্তি। একটা বন্দুক বাগিয়ে ধরে সে ফরাসীদের দিকে তাক করল। ফরাসী অফিসার আর একবার হুকুম দিল, "কামান দাগ!" আর একই সঙ্গে শোনা গেল একটা বন্দুকের ও দুটো কামানের শব্দ। ফটকটা আবার ধোঁয়ায় ঢেকে গেল।

পর্দার ওপাশে কিছুই নড়ছে না; ফরাসী পদাতিক সৈন্য ও অফিসাররা

ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। ফটকের পথের উপর তিনজন আহত হয়ে ও চারজন মরে পড়ে আছে। চাষীর কোট-পরা দুটি লোক প্রাচীরের নীচ থেকে জ্‌নামেংকার দিকে ছুটে গেল।

"এসব সরিয়ে ফেল!" কড়িকাঠ ও মৃতদেহগুলি দেখিয়ে একজন অফিসার হুকুম করল, আর ফরাসী সৈন্যরা আহতদের পাঠিয়ে দিয়ে মৃতদেহগুলিকে আলিসার উপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

এই লোকগুলি কারা তা কেউ জানল না। "ওদের সরিয়ে ফেল!" ওদের সম্পর্কে শুধু এইটুকুই বলা হল। আর আলিসার উপর দিয়ে তাদের ছুঁড়ে ফেলা হল, এবং পরে যাতে দুর্গন্ধ ছড়াতে না পারে সেজন্য পরে সেখান থেকেও সরিয়ে দেওয়া হল। একমাত্র থিয়েরই তাদের স্মৃতির প্রতি কয়েকটি উচ্ছ্বসিত পংক্তি উৎসর্গ করেছে: "এই হতভাগ্যরা পবিত্র দুর্গ দখল করেছিল, অস্ত্রাগার থেকে নিজেরাই বন্দুক সংগ্রহ করে ফরাসীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছিল। তাদের অনেকেই তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল; ক্রেমলিনকে মুক্ত করা হয়েছিল তাদের উপস্থিতি থেকে।"

মুরাতকে জানানো হল, রাস্তা পরিষ্কার। ফরাসীরা ফটকের ভিতর ঢুকে পড়ল, সেনেট স্কোয়ারে তাঁবু খাটাল। সেনেট ভবনের জানালা দিয়ে সৈনিকরা জালানির জন্য চেয়ার ছুঁড়ে ফেলতে লাগল স্কোয়ারের মধ্যে, আর তাই দিয়ে সেখানে আগুন জ্বালানো হল।

অন্য সেনাদলগুলি ক্রেমলিনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে মরসেকা, লুবিয়াংকা ও পক্রোভ্‌কা স্ট্রীট বরাবর শিবির ফেলল। অন্যরা আস্তানা পাতল ভজ্‌দ্ভিঝেংকা, নিকোল্‌স্কি ও তিভারস্কয় স্ট্রীটে। কোন বাড়ির মালিককে খুঁজে না পাওয়ায় শহরের স্বাভাবিক ব্যবস্থামত ফরাসীদের কোথাও অধিবাসীদের কাঁধে চাপানো গেল না; সকলেই তাঁবুতে বাসা বাঁধল।

ফরাসীরা ছিন্নবাস, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, এবং মূল সংখ্যার তিনভাগের একভাগে পরিণত হলেও সুন্দর শোভাযাত্রা সহকারেই মস্কোতে প্রবেশ করল। সেনাদল শ্রান্ত ও ক্ষীণবল, তবু সংগ্রামশীল ও ভয়ংকর। কিন্তু বিভিন্ন আস্তানায় চলে যাবার আগে পর্যন্তই তারা ছিল সৈনিক। কিন্তু যে মুহূর্তে বিভিন্ন রেজিমেন্টের সৈন্যরা ঐশ্বর্যবানদের পরিত্যক্ত বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ল তখন থেকেই সেনাবাহিনী কোথায় হারিয়ে গেল, তার জায়গায় দেখা দিল এমন কিছু জীব যারা পরিচয়হীন, না নাগরিক না সৈন্য, তাদের বলা চলে লুঠেরার দল। পাঁচ সপ্তাহ পরে সেই মানুষগুলিই যখন মস্কো ছেড়ে চলে গেল তখন আর তারা একটা সেনাদল হয়ে গড়ে উঠতে পারল না। তারা তখন একদল উচ্ছৃংখল লুঠেরা, যার কাছে যা মূল্যবান বা দরকারী মনে হল সেই জিনিসই হাতিয়ে নিয়ে তারা চলে গেল। মস্কো ছেড়ে যাবার সময় কারও লক্ষ্যই আর জয় করা নয়, তাদের একমাত্র লক্ষ্য যে যা

পেয়েছে সেটাকে হাতে রাখা। একটা বাঁদর যেমন সরু গলা কলসির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুঠোভর্তি বাদাম পেয়ে সেগুলো হারাবার ভয়ে কিছুতেই মুঠি খোলে না এবং মারা যায়, সেইরকম ফরাসীরা যখন মস্কো ছেড়ে গেল তখন তাদেরও মৃত্যু অনিবার্য হয়ে উঠল, কারণ লুঠের মাল সঙ্গে নিয়েই তারা চলল, আর যা তারা চুরি করেছে তা ফেলে যাওয়াও বাঁদরের বাদাম ফেলে যাওয়ার মতই অসম্ভব। প্রতিটি রেজিমেণ্ট মস্কোর একটা অঞ্চলে ঢুকবার দশ মিনিট পরেই একটি সৈনিক বা অফিসারের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। সামরিক ইউনিফর্ম ও চটের বুটপরা লোকগুলিকে দেখা গেল এঘর থেকে ও-ঘরে হেসে হেসে হেঁটে বেড়াচ্ছে। মদের ঘরে এবং ভাঁড়ার ঘরেও সকলকে খাবারদাবার নিয়ে ব্যস্ত দেখা গেল, কেউবা ভাঙছে গাড়ি-ঘরের তালা। কেউ বা আস্তাবলের দরজা, কেউ বা রান্নাঘরে আগুন জ্বালিয়ে আস্তিন গুটিয়ে ময়দা মাখছে, রুটি সেঁকছে, আবার মেয়েদের ও বাচ্চাদের কখনও ভয় দেখাচ্ছে, কখনও তাদের নিয়ে মজা করছে, আদর করছে। দোকান ও বাড়িগুলোতে এধরনের মানুষ অনেক আছে,—কিন্তু একটিও সৈনিক কোথাও নেই।

ফরাসী কমাণ্ডাররা হুকুমের পর হুকুম জারি করল, সৈন্যদের শহরে ছড়িয়ে পড়া নিষিদ্ধ করা হল, অধিবাসীদের উপর অত্যাচার—উৎপীড়ন অথবা লুঠতরাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হল, সেই সন্ধ্যায় সৈন্যদের নাম-ডাকবার কথাও ঘোষণা করা হল। কিন্তু এতসব ব্যবস্থা সত্ত্বেও যেসব মানুষ একটু আগে পর্যন্তও ছিল একটা সেনাদল তারাই প্রচুর আরাম ও জিনিসপত্র সমন্বিত ঐশ্বর্যশালী পরিত্যক্ত শহরটার বুকে জলস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ল। একদল ক্ষুধার্ত গরু-মোষ যখন ফসলহীন মাঠ পার হয় তখন তাদের সহজেই বাগে রাখা যায়, কিন্তু যেই তারা একটা ফসলভরা মাঠে পৌছয় অমনি তারা হাতের বাইরে চলে যায়, ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে; ফরাসী সৈন্যরা সেইভাবেই সমৃদ্ধ শহরটার বুকে ছড়িয়ে পড়ল।

মস্কোর অধিবাসীরা কেউ নেই; জল যেরকম বালির ভিতর দিয়ে চুঁইয়ে নীচে পড়ে, সৈন্যরাও সেইরকম ক্রেমলিন থেকে বেরিয়ে দুর্বার গতিতে শহরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। একটা অশ্বারোহী সেনাদল কোন ব্যবসায়ীর বাড়িতে ঢুকে সেখানে ঘোড়া রাখবার মত যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও অন্য আর একটা বাড়িতে গিয়ে ঢুকল। কারণ সেটাকে আরও একটু ভাল বলে মনে হল। অনেকেই কয়েকটা বাড়ি দখল করে নিয়ে খড়ি দিয়ে তাদের নাম লিখে রাখল, আর তাই নিয়ে অন্য দলের সঙ্গে ঝগড়া করল, এমন কি লড়াই পর্যন্ত করল। বাসস্থান ঠিক করার আগেই সৈন্যরা শহর দেখতে পথে বেরিয়ে পড়ল; যখন শুনল যে সবকিছুই পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে তখন তারা সেইসব জায়গার উদ্দেশ্যে ছুটল যেখানে মূল্যবান জিনিস-

পত্র মিলবে। অফিসাররা ছুটল সৈন্যদের বাধা দিতে, কিন্তু তারাও সেই একই কাজে লেগে গেল। সামান্য কিছু অধিবাসী যারা মস্কোতেই ছিল তারা লুঠের হাত থেকে বাঁচবার জন্য কমাণ্ডিং অফিসারদের নিজ নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এল। প্রচুর ঐশ্বর্য; তার কোন সীমা নেই; ফরাসীরা যেসব অঞ্চল দখল করেছে তার চারপাশে রয়েছে আরও কত অনাবিষ্কৃত বেদখল অঞ্চল; তারা ভাবল সেখানে হয়তো আরও ধনরত্ন পাওয়া যাবে। মস্কো যেন ক্রমেই সেনাদলকে পাকে পাকে বেশী করে ঘিরে ধরল। শুকনো মাটিতে যখন জল ঢালা হয় তখন জল ও মাটি দুইই অদৃশ্য হয়ে যায়, দেখা দেয় কাদা; ঠিক সেইরকম একটা সমৃদ্ধ পরিত্যক্ত শহরে ক্ষুধার্ত সেনাদলের প্রবেশের ফলে দেখা দিল অগ্নিকাণ্ড ও লুঠতরাজ; সেনাদল ও সমৃদ্ধ শহর দুইই ধ্বংস হল।

ফরাসীরা বলে, রস্তপ্‌চিনের হিংস্র দেশপ্রেমই মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী, রুশরা বলে দায়ী ফরাসীদের বর্বরতা। আসলে কিন্তু কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে মস্কোর অগ্নিকাণ্ডকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মস্কোকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কারণ সেখানকার যে অবস্থা হয়েছিল তাতে একশ' ত্রিশটি নিম্নমানের অগ্নি-নির্বাপক যন্ত্র থাকুক আর নাই থাকুক, কাঠের তৈরি যেকোন শহরই পুড়তে বাধ্য। খড়কুটোর স্তূপের উপর কয়েক দিন ধরে অনবরত আগুনের ফুল্‌কি পড়লে সেটা যেমন পুড়তে বাধ্য ঠিক তেমনই পরিত্যক্ত মস্কোর অগ্নিদগ্ধ হওয়াও ছিল অনিবার্য। বাড়ির মালিকরা যখন বাড়িতে বাস করে এবং একটা পুলিশ বাহিনী উপস্থিত থাকে তখনও যে কাঠের তৈরি শহরে অগ্নিকাণ্ড ছাড়া একটা দিনও কাটে না, সেই শহরের অধিবাসীরা যখন ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে, সেসব দখল করেছে সৈন্যরা, তারা পাইপ টানছে, সেনেট ভবনের চেয়ার দিয়ে সেনেট স্কোয়ারেই আগুন জ্বালাচ্ছে, দিনে দুবার করে খানা পাকাচ্ছে। তখন কি সে শহরে আগুন না লেগে পারে। রস্তপ্‌চিনের হিংস্র দেশপ্রেম এবং ফরাসীদের বর্বরতাকে এব্যাপারে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই। মস্কোতে আগুন লাগিয়েছিল সৈন্যদের পাইপ, রান্নাঘরের ও শিবিরের আগুন, আর পরের বাড়ি দখল করেছিল যে শত্রু সৈন্যরা তাদের অসতর্কতা। গৃহদাহের ঘটনা যদি ঘটেও থাকে তবু সেটাকেই কারণ বলে ধরা চলে না, কারণ গৃহদাহের কোন ঘটনা না ঘটলেও মস্কো অগ্নিদগ্ধ হতই।

ফরাসীদের পক্ষে রস্তপ্‌চিনের হিংস্রতাকে দায়ী করা এবং রুশদের পক্ষে শয়তান বোনাপার্তকে দায়ী করা যতই লোভনীয় হোক, একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে অগ্নিকাণ্ডের সেরকম কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না, কারণ মালিকরা যখন কোন গ্রাম, কারখানা, বা বাড়ি ছেড়ে যায় এবং অপরিচিত লোকদের সেখানে বাস করতে ও পরিজ রান্না করতে দেওয়া হয়,

তখন সেই গ্রাম, কারখানা বা বাড়িতে যেমন আগুন লাগতে বাধ্য, তেমনই মস্কোর অগ্নিকাণ্ডও ছিল অনিবার্য। একথা সত্য যে অধিবাসীরাই মস্কোকে পুড়িয়েছিল, কিন্তু পুড়িয়েছিল সেই অধিবাসীর যারা মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল, মস্কোতে যারা তখনও ছিল তারা নয়। বার্লিন, ভিয়েনা, এবং অন্যসব শহরের মত শত্রুকবলিত মস্কো যে অক্ষুণ্ণ থাকল না তার সহজ কারণ তার অধিবাসীরা শহরকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, শহরে থেকে তারা রুটি ও নুন দিয়ে ফরাসীদের অভ্যর্থনা করে নি, শহরের চাবি তাদের হাতে তুলে দেয় নি।

অধ্যায়—২৭

মস্কোর জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলেমিশে ফরাসীরা একসময় এমন একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে ২রা সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় পিয়ের নিজেও বাস করছিল।

অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একান্ত নির্জনে দুটো দিন কাটাবার পরে পিয়েরের মনের অবস্থা তখন প্রায় পাগলামির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে। একটিমাত্র চিন্তাই তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এই চিন্তাটি কখন কিভাবে তার মাথায় ঢুকেছে তা সে জানে না, কিন্তু অতীতের কিছুই তার মনে নেই, বর্তমানের কথাও কিছুই সে বোঝে না, যা কিছু দেখে আর যা কিছু শোনে সবই তার কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়।

জীবনের দাবীর যে জটিল জালে সে বাঁধা পড়েছে, বর্তমান অবস্থায় যার হাত থেকে সে নিজেকে মুক্ত করতে পারছে না, তার কবল থেকে পালাবার জন্যই সে বাড়ি ছেড়েছে। যোসেফ আলেক্সিভিচের বাড়িতে সে এসেছিল স্বর্গত মানুষটির বই ও কাগজপত্রের বিলি-ব্যবস্থা করার অছিলায়, কিন্তু আসলে সে এসেছিল জীবনের গোলযোগের কবল থেকে শান্তির সন্ধানে, কারণ তার মনে যোসেফ আলেক্সিভিচের স্মৃতি যে শাশ্বত, গম্ভীর, শান্ত চিন্তার সঙ্গে জড়িত সেটা তার নিজের তৎকালীন অশান্ত জীবনের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে তখন খুঁজছিল একটি শান্ত আশ্রয়, সেই আশ্রয়ই সে পেয়ে গেল যোসেফ আলেক্সিভিচের পড়ার ঘরে। পড়ার ঘরের মৃত্যুশীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে সে যখন ধূলিমলিন লেখার টেবিলের উপর কনুই রেখে বসে থাকে তখনই একের পর এক বিগত কয়েকদিনের স্মৃতি, বিশেষ করে বরদিনো যুদ্ধের স্মৃতি—কল্পনায় তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বড়ই তুচ্ছ ও অর্থহীন বলে মনে হয়। গেরাসিম যখন তাকে দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে তুলল তখনই তার মনে হল যে জনসাধারণ কর্তৃক মস্কোকে রক্ষার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে সেও অংশ নেবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে গেরাসিমকে বলল তাকে একটা চাষীর কোট ও একটা

পিস্তল যোগাড় করে দিতে। তাকে আরও জানাল যে নিজের নাম গোপন করে সে যোসেফ আলেক্সিভিচের বাড়িতেই থাকবে।

তারপর মস্কো রক্ষার কাজে জনসাধারণের সঙ্গে যোগ দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে কোটটা কিনবার পরেই যখন রস্তভ্‌দের সঙ্গে পিয়েরের দেখা হয়ে গেল এবং নাতাশা তাকে বলল: "আপনি কি মস্কোতেই আছেন?...কী চমৎকার!" তখনই চকিতে তার মনে হল যে সত্যি তো, মস্কো যদি বেদখল হয়েও যায় তবু তার পক্ষে এখানে থেকে নিয়তিনির্দিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করাই তো সবচাইতে ভাল কাজ।

কোন কিছুতেই পিছ-পা হবেনা এই ধারণা নিয়েই পরদিন সে তিনপাহাড় ফটকে গেল। কিন্তু সেখান থেকে বাড়িতে ফিরে যখন তার মনে স্পষ্ট ধারণা হল যে মস্কোকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হবে না তখনই হঠাৎ তার মনে হল, যেকাজকে আগে সে একটা সম্ভাবনামাত্র বলে মনে করেছিল সেটাই এখন হয়ে উঠেছে একান্ত প্রয়োজনীয় ও অনিবার্য। নাম ভাড়িয়ে তাকে মস্কোতে থাকতেই হবে, নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করে তাকে হত্যা করতে হবে, হয় নিজে মরবে আর না হয় সারা ইওরোপের সব দুঃখের অবসান করবে—তার ধারণা একমাত্র নেপোলিয়নের জন্যই ইওরোপের এত দুঃখ।

১৮০৯ সালে একটি জার্মান ছাত্র যখন ভিয়েনাতে নেপোলিয়নের প্রাণনাশের চেষ্টা করেছিল তার বিস্তারিত বিবরণ সবই পিয়ের জানে। সে জানে যে ছাত্রটিকে গুলি করে মারা হয়েছিল। নিজের পরিকল্পনা মত কাজ করতে হলে নিজের জীবনের যে ঝুঁকি নিতে হবে সেই চিন্তাই তাকে আরও বেশী উত্তেজিত করে তুলল।

দুটি প্রবল অনুভূতি দুর্বার বেগে পিয়েরকে এই উদ্দেশ্যের দিকে টানছে। প্রথম অনুভূতিটি হচ্ছে—সকলের আসন্ন বিপদের মুখে ত্যাগ ও কষ্ট ভোগের প্রয়োজনীয়তা; এই একই অনুভূতি তাকে ২৫শে তারিখে টেনেনিয়ে গিয়েছিল মোঝায়েস্ক-এ, আর সেখান থেকে যুদ্ধের একেবারে ঘন আবর্তের মাঝখানে, এবং এখনও তাকে নিজের বাড়ি থেকে বের করে এনেছে, চিরাভ্যস্ত বিলাস ও আরামের পরিবর্তে তাকে শুতে দিয়েছে শক্ত সোফায় আর খেতে দিচ্ছে গেরাসিমের সঙ্গে একই খাদ্য। অপর অনুভূতিটি হচ্ছে যা কিছু গতানুগতিক, কৃত্রিম ও মানবিক—যাকে অধিকাংশ মানুষ জাগতিক পরমার্থ বলে মনে করে—তার প্রতি রুশ মনের স্বাভাবিক অস্পষ্ট বিরাগ।

এদিকে আজ যদি সে অন্য সকলের মত মস্কো ছেড়ে চলে যায় তাহলে তার বাড়ি থেকে পলায়ন, এই চাষীর কোট, এই পিস্তল, রস্তভদের কথা, তার ঘোষণা যে সে মস্কোতেই থাকবে,—সবই যে অর্থহীন হয়ে পড়বে; শুধু তাই নয়, সবই হবে ঘৃণার্হ ও হাস্যকর, আর সেটাই পিয়েরের পক্ষে অসহ্য।

যেমন হয়ে থাকে, পিয়েরের শারীরিক অবস্থা ও তার মানসিক অবস্থার

সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। অনভ্যস্ত মোটা খাবার, ক'দিনের অনবরত ভদকা পান, মদ ও চুরুটের অভাব, নোংরা পোশাক, শয্যাবিহীন ছোট সোফায় প্রায় নিদ্রাহীন দুটি রাত যাপন—সব কিছু মিলে তাকে এমন একটা উত্তেজনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যেটা পাগলামিরই নামান্তর।

দুপুর দুটো বাজে। ফরাসীরা মস্কোতে ঢুকে পড়েছে। পিয়ের তা জানে, তবু কাজের পথে না গিয়ে সে শুধু মনে মনে তার পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ নিয়েই চিন্তা করছে। কল্পনায় আঘাত হানবার কথা অথবা নেপোলিয়নের মৃত্যুর কথা যত না ভাবছে তার চাইতে অনেক বেশী করে, অসাধারণ স্পষ্টতা ও বিষণ্ণ আনন্দের সঙ্গে কল্পনা করছে নিজের ধ্বংস ও বীরত্বপূর্ণ কষ্টসহিষ্ণুতার কথা।

ভাবছে, "হ্যাঁ, একাকি, সকলের জন্য, আমি হয় একাজ করব, নয় তো মরব। হ্যাঁ, এগিয়ে যাব…তারপর সহসা…পিস্তল, না ছুরি? …একই কথা! বলব, 'আমি নই, বিধাতার হাতই তোমাকে শাস্তি দিল।' সে কল্পনা করল, নেপোলিয়নকে মারবার সময় এই কথাগুলি তাকে বলবে। "এবার আমাকে ধর, মৃত্যুদণ্ড দাও!" মাথাটা নুইয়ে বিষণ্ণ অথচ কঠিন মুখে সে নিজেকেই বলতে লাগল।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পিয়ের যখন এইভাবে নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল তখন পড়ার ঘরের দরজা খুলে দ্বারপথে দেখা দিল মকার আলেক্সিভিচের মূর্তি; আগে সে ছিল কত ভীরু, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।

ড্রেসিং-গাউনটা বাঁধা হয় নি, মুখটা রক্তিম ও বিকৃত। মনে হয় মদ খেয়েছে। পিয়েরকে দেখে প্রথমে কিছুটা বিচলিত হল, কিন্তু পিয়েরের মুখের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে সঙ্গে সঙ্গে সাহস ফিরে পেল; স্খলিত পায়ে ঘরের মাঝখানে এগিয়ে গেল।

দৃঢ় কর্কশ গলায় বলল, "ওরা ভয় পেয়েছে। আমি বলছি, আমি আত্মসমর্পণ করব না, আমি বলছি…ঠিক বলি নি স্যার?"

সে থামল; হঠাৎ টেবিলের পিস্তলটা চোখে পড়ায় অপ্রত্যাশিত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেটা তুলে নিয়ে ছুটে বারান্দায় চলে গেল।

গেরাসিম ও দরোয়ান মকার আলেক্সিভিচের পিছন পিছনই এসেছিল; তারা তাকে থামিয়ে পিস্তলটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল। বারান্দায় বেরিয়ে এসে পিয়ের এই আধপাগল বুড়ো লোকটার দিকে করুণা ও বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল। মকার আলেক্সিভিচ ভুরু কুঁচকে পিস্তলটা আঁকড়ে ধরে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল; তার মাথায় নিশ্চয় কোন বীরত্বপূর্ণ কাজের ছবি ঢুকেছে।

"অস্ত্র নাও! আটক কর! না, এটা তোমরা পাবে না!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভাল মানুষের মত—দয়া করুন স্যার, ওসব যেতে দিন! দয়া করে····" কনুই দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে মকার আলেক্সিভিচকে দরজার দিকে নিয়ে যেতে যেতে গেরাসিম বলতে লাগল।

"কে তুমি? বোনাপার্ত!····" মকার আলেক্সিভিচ চেঁচিয়ে বলল।

"কথাটা ঠিক হল না স্যার। দয়া করে আপনার ঘরে চলুন, বিশ্রাম নিন। পিস্তলটা আমাকে দিন।"

"সরে যা হীন ক্রীতদাস! আমাকে ছুঁস না! এটা দেখছিস?" মকার আলেক্সিভিচ পিস্তলটা ঘুরিয়ে বলল।

গেরাসিম ফিসফিস করে দরোয়ানকে বলল, "ধরে ফেল!"

তারা দুজনে মকার আলেক্সিভিচের হাত ধরে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চলল।

একটা ধ্বস্তাধ্বস্তির বিশৃংখল শব্দ ও একটা কর্কশ মাতালের কণ্ঠস্বরে বারান্দাটা ভরে উঠেছে।

সহসা আরও একটা শব্দ, একটা মর্মভেদী নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ধ্বনিত হল, আর রাঁধুনিটি ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

"তারা এসে পড়েছে! হা ভগবান! হে প্রভু, তারা চারজন, অশ্বারোহী!" রাঁধুনি চেঁচিয়ে বলল।

গেরাসিম ও দরোয়ান মকার আলেক্সিভিচকে ছেড়ে দিল; নিস্তব্ধ বারান্দায় শোনা যেতে লাগল সামনের দরজায় কয়েকটি হাতের খট্‌খট্‌ শব্দ।

অধ্যায়—২৮

পিয়ের স্থির করেছে যতদিন তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয় ততদিন নিজের পরিচয় গোপন রাখবে এবং সে যে ফরাসী জানে সেটাও প্রকাশ করবে না। ফরাসীরা ঢোকামাত্রই যাতে লুকিয়ে পড়তে পারে সেজন্য সে আধখোলা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ফরাসীরা ঢোকার পরেও পিয়ের সরে গেল না—একটা দুর্বার কৌতূহল তাকে সেখানেই আটকে রাখল।

তারা দুজন এসেছে। একজন অফিসার—দীর্ঘদেহ, সুদর্শন, সৈনিকসুলভ চেহারা—অপরজন সম্ভবত আর্দালি, রোদে পোড়া, বেঁটে, সরু, তোবড়ানো গাল, ভাবলেশহীন মুখ। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে ঈষৎ খুঁড়িয়ে অফিসারটি সামনে এগিয়ে এল। কয়েক পা এগিয়ে থামল, বুঝল যে বাসাটা ভালই, ফটকে দাঁড়ানো সৈন্যদের দিকে ফিরে চড়া গলায় ঘোড়াগুলো রাখবার হুকুম দিল। তারপর এক ঝট্‌কায় কনুইটা তুলে গোঁফে তা দিল, আস্তে টুপিটা স্পর্শ করল।

চারদিকে তাকিয়ে হেসে ফরাসীতে বলল, "সকলকে জানাই শুভদিন।"

কেউ কোন জবাব দিল না:

অফিসারটি গেরাসিমকে শুধাল, "তোমার মনিব বাড়িতে আছে ?"

ভীত সপ্রশ্ন চোখে গেরাসিম অফিসারের দিকে তাকিয়ে রইল।

করুণার হাসি হেসে অফিসার বলল, "বাসা, বাসা, বাসাবাড়ি! ফরাসীরা ভালমানুষ। আরে, হল কি! দেখ, আমাদের চটিও না হে বুড়ো!" ভয়ার্ত নিঃশব্দ গেরাসিমের কাঁধে চাপড় দিয়ে সে বলল। "আচ্ছা, এ বাড়িতে কি কেউ ফরাসী বলতে পারে না ?" চারদিকে তাকিয়ে পিয়েরের চোখে চোখ পড়তে সে আবার ফরাসীতে প্রশ্ন করল। পিয়ের দরজা থেকে সরে গেল।

অফিসার পুনরায় গেরাসিমের দিকে ঘুরে ঘরগুলি দেখাতে বলল।

"মনিব বাড়ি নেই—বুঝতে পারছি না⋯আমাকে, আপনি⋯" কথাগুলিকে বোধগম্য করার জন্য আরও বিকৃত করে গেরাসিম বলল।

ফরাসী অফিসারটি গেরাসিমের নাকের কাছে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে হেসে হেসে জানাল যে সেও তার কথা বুঝতে পারছে না, তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল। পিয়েরের ইচ্ছা সরে গিয়ে লুকিয়ে পড়বে, কিন্তু সেইমুহূর্তে সে দেখতে পেল মকার আলেক্সিভিচ পিস্তলটা হাতে নিয়ে রান্নাঘরের খোলা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাগলের মত ধূর্ত চোখে ফরাসী লোকটির দিকে তাকিয়ে মকার আলেক্সিভিচ পিস্তল তুলে তার দিকেই তাক করল।

ঘোড়া টিপবার চেষ্টা করে মাতাল লোকটি চীৎকার করে উঠল, "ওদের খতম কর!" সে চীৎকার শুনে অফিসারটি ঘুরে দাঁড়াল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে পিয়ের মাতালটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পিয়ের যখন পিস্তলে হাত রেখে সেটা চেপে ধরল, তখনই মকার আলেক্সিভিচও বন্দুকের ঘোড়ার উপর আঙুল রাখল। কানে তালা লাগানো একটা শব্দ হল, কালো ধোঁয়ায় সবকিছু ঢেকে গেল। ফরাসী লোকটি বিবর্ণ মুখে দরজার দিকে ছুটে গেল।

ফরাসী ভাষার জ্ঞান লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা ভুলে গিয়ে পিয়ের পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অফিসারের দিকে ছুটে গেল এবং তার সঙ্গে ফরাসীতেই কথা বলল।

"আপনি আঘাত পান নি তো ?"

"মনে তো হয় না।" দেয়ালের ভাঙা পলস্তরা দেখিয়ে বলল, "কিন্তু ভাগ্যগুণে আজ খুব বেঁচে গিয়েছি। লোকটি কে ?" কঠোর দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে অফিসারটি বলল।

নিজের অভিসন্ধির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সত্যি, যা ঘটে গেল সেজন্য আমি হতাশ হয়ে পড়েছি। লোকটি এক হতভাগ্য পাগল ; ও যে কি করেছে তা নিজেই জানে না।"

অফিসারটি মকার আলেক্সিভিচের কাছে গিয়ে তার কলারটা চেপে ধরল।

মকার আলেক্সিভিচ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে; দেয়ালে হেলান দিয়ে এমনভাবে ঢুলছে যেন এখনই ঘুমিয়ে পড়বে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে ফরাসীটি বলল, "গুণ্ডা! এর দাম তোমাকে দিতে হবে। আমরা ফরাসীরা জয়লাভের পরে দয়া দেখাই, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকদের আমরা ক্ষমা করি না।" তার চোখে বিষণ্ণ মর্যাদার অভিব্যক্তি।

পিয়ের ফরাসীতেই তাকে বার বার অনুরোধ জানাল, অক্ষম মাতালটাকে যেন শাস্তি না দেওয়া হয়। মুখে সেই একই বিষণ্ণতার আভাষ এনে ফরাসীটি নীরবে তার কথাগুলি শুনল, তারপর হঠাৎ হেসে পিয়েরের দিকে মুখ ফেরাল। একটা অতি নাটকীয় ভদ্রতার প্রকাশ ফুটে উঠল তার মুখে; সে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

বলল, "আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনি ফরাসী?"

একজন ফরাসীর পক্ষে এ অনুমান সন্দেহাতীত। একমাত্র ফরাসীর পক্ষেই কোন মহৎ কাজ করা সম্ভব, আর তার জীবন—১৩শ লাইট রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন ম. রাম্বালের জীবন—রক্ষা করা নিঃসন্দেহে একটা মহৎ কাজ।

কিন্তু সিদ্ধান্তটি এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত অফিসারের দৃঢ় ধারণাটি যতই সন্দেহাতীত হোক, তার এই ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া দরকারী বলেই পিয়েরের মনে হল।

সে তাড়াতাড়ি বলল, "আমি একজন রুশ।"

"ফু, ফু, ফু। ও কথা অন্যদের বলবেন," তার নাকের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে অফিসারটি হেসে বলল। "অচিরেই আপনি আমাকে সব কথা বলবেন। একজন সহযোগীর সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুশি হলাম। আচ্ছা, এই লোকটাকে নিয়ে কি করা যায় বলুন তো?" ভাইয়ের মত পিয়েরকে সম্বোধন করে বলল।

শেষ প্রশ্নের জবাবে আর একবার মকার আলেক্সিভিচের পরিচয় দিয়ে পিয়ের জানাল, তাদের আসার ঠিক আগেই এই পাগলা বুড়োটা গুলিভরা পিস্তলটা হাতিয়ে নেয়, তার কাছ থেকে সেটা' ছিনিয়ে নেবার সময় তারা পায় নি; কাজেই একাজের জন্য অফিসার যেন তাকে শাস্তি না দেয়।

ফরাসীটি বুক ফুলিয়ে দুই হাতে একটা গম্ভীর অঙ্গভঙ্গী করল।

"আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন। আপনি একজন ফরাসী। আপনি বলছেন ওকে ক্ষমা করতে? আপনার প্রার্থনা মঞ্জুর। লোকটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" তাড়াতাড়ি সোৎসাহে কথাগুলি বলে পিয়েরের হাত ধরে তাকে নিয়ে অফিসার ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।

গুলির শব্দ শুনে সৈন্যরা উঠোন থেকে বারান্দায় ছুটে এসেছে; কি হয়েছে শুনে নিয়ে তারা অপরাধীকে শাস্তি দিতে উদ্যত হল, কিন্তু অফিসার

কড়াগলায় তাদের বাধা দিল।

"দরকার হলেই তোমাদের ডাকা হবে," সে বলল।

সৈন্যরা বেরিয়ে গেল। আর্দালিটি ইতিমধ্যেই রান্নাঘরে ঢুকেছিল। সেখান থেকে ফিরে এসে বলল, "ক্যাপ্টেন, রান্নাঘরে ঝোল ও পাঁঠার ঠ্যাং আছে। আপনাকে খেতে দেব কি?"

"হ্যাঁ, আর কিছু মদ," ক্যাপ্টেন জবাব দিল।

অধ্যায়—২৯

ফরাসী অফিসার যখন পিয়েরকে নিয়ে ঘরে ঢুকল তখন পিয়ের আবার ভাবল, সে যে ফরাসী নয়—সেটা তাকে নিশ্চিত করে বলে দেওয়া তার কর্তব্য, কিন্তু অফিসার তার কথায় কানই দিল না। লোকটি এত বিনয়ী, ভদ্র, ভাল মানুষ, এবং তার প্রাণরক্ষা করার জন্য পিয়েরের প্রতি এমন আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ যে পিয়ের তার কথা না রেখে পারল না, তার সঙ্গে গিয়ে বৈঠকখানায় বসল। পিয়ের যখন বার বার বলতে লাগল যে সে ফরাসী নয়, তখন ক্যাপ্টেন খুব অবাক হয়ে গেল; এত বড় একটা সুখ্যাতিকে মানুষ কেমন করে অগ্রাহ্য করতে পারে তা সে বুঝতেই পারল না; যাহোক, সে কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পিয়ের যদি একান্তই রুশ পরিচয়ে থাকতে চায় তো তাই থাকুক, কিন্তু তার প্রাণ রক্ষার জন্য সে পিয়েরের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে।

পিয়েরের ভাল অথচ নোংরা পোশাক এবং তার আঙুলের আংটির দিকে তাকিয়ে অফিসার বলল, "ফরাসীই হোন আর ছদ্মবেশী রুশ প্রিন্সই হোন, আপনার জন্যই আমি জীবনে বেঁচে আছি, আর তাই আপনার কাছে বন্ধুত্বের প্রস্তাব করছি। অপমান কিংবা উপকার, একজন ফরাসী কোনদিন এর কোনটাই ভোলে না। আপনি আমার বন্ধু হোন। এই আমার একমাত্র বলার কথা।"

অফিসারের কণ্ঠস্বরে, তার মুখের ভাবে ও ভঙ্গীতে এমন সৎস্বভাব ও আভিজাত্য প্রকাশ পেল যে তার হাসির জবাবে ঈষৎ হেসে পিয়ের নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"৭ই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের জন্য মহাবীর পদকপ্রাপ্ত, ১৩শ লাইট রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন রাম্বেল," সে আত্মপরিচয় ঘোষণা করল; গোঁফের নীচেকার ঠোঁটদুটি আত্মতুষ্টির অপ্রতিরোধ্য হাসিতে বেঁকে গেল। "এবার আপনি দয়া করে বলবেন কি, একটা পাগলের বুলেট শরীরে নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে থাকার পরিবর্তে কার সঙ্গে এমন মধুর আলাপনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে?"

পিয়ের জবাবে জানাল, নিজের নামটা সে তাকে বলতে পারছে না;

তারপর মুখ লাল করে একটা নাম খুঁজে নেবার এবং নামটা লুকোবার কারণ সম্পর্কে একটা কিছু বলবার চেষ্টা করতেই ফরাসীটি তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিল।

"আহা, ঠিক আছে! আপনার কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি একজন অফিসার...হয় তো উর্ধ্বতন অফিসার। আমাদের বিরুদ্ধে আপনি অস্ত্র ধরেছেন। সেটা আমার দেখার কথা নয়। আমার জীবনের জন্য আমি আপনার কাছে ঋণী। সেটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আপনার সেবায় আমি সদাপ্রস্তুত। আপনি কি ভদ্র শ্রেণীর?" গলায় একটা প্রশ্নের সুর এনে সেকথা শেষ করল। পিয়ের মাথা নীচু করল। "আপনার নামটি যদি বলেন। আর কিছুই জানতে চাই না। মঁসিয় পিয়ের...চমৎকার! শুধু ওইটুকুই জানতে চাই।"

যখন মাংস ও ওমলেট পরিবেশন করা হল, সামোভার ও ভদ্‌কা আনা হল, আর সেই সঙ্গে খানিকটা মদ, তখন রাম্বেল পিয়েরকে ডিনারে আমন্ত্রণ জানাল, আর নিজে একটি স্বাস্থ্যবান ক্ষুধার্ত লোকের মত অতিদ্রুত গোগ্রাসে গিলতে লাগল; শক্ত দাঁত দিয়ে চিবুতে চিবুতে অনবরত ঠোঁট চাটতে চাটতে বার বার বলতে লাগল—"চমৎকার! সুস্বাদু!" তার মুখটা লাল হয়ে উঠল, ঘাম ঝরতে লাগল। পিয়েরও ক্ষুধার্ত, সানন্দে ডিনারে যোগ দিল। আর্দালি মোড়েল একটা গরম জলের পাত্র এনে এক বোতল ক্লারেট তার মধ্যে বসিয়ে দিল। পরিতৃপ্তিসহকারে পান-ভোজনের ফলে ক্যাপ্টেন আরও ফূর্তিবাজ হয়ে সারাক্ষণ বক্‌ বক্‌ করতে লাগল।

"প্রিয় মঁসিয় পিয়ের, ঐ পাগলাটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্য আমার কাছে একটা প্রতিশ্রুত মোমবাতি আপনার প্রাপ্য হয়েছে...কি জানেন, আমার দেহে ইতিমধ্যেই অনেক বুলেট ঢুকেছে। এখানে একটা ঢুকেছে ওয়াগ্রামে (সে পার্শ্বদেশ স্পর্শ করল) আর দ্বিতীয়টা স্মোলেন্স্কে—এ" —গালের ক্ষতটা দেখাল—"আর এই যে পাটা দেখছেন একেবারেই নড়তে-চড়তে চায় না, এটা ঢুকেছে ৭ই তারিখের লা মস্কোয়ার মহাযুদ্ধে (* ফরাসীরা বরদিনোর যুদ্ধকে বলত 'লা মস্কোয়া')। পবিত্র ঈশ্বর! সে এক চমৎকার ব্যাপার! সেই গোলাগুলির প্রবল বন্যা একটা দেখার মত দৃশ্য। সত্যি বলছি, সেখানে আপনারা আমাদের মহামুস্কিলে ফেলেছিলেন। সে যুদ্ধের জন্য আপনারা গর্ব করতে পারেন। আর আমার কথা যদি বলেন, যদিও সেখান থেকেই আমি কাশিটা বাধিয়েছি, তবু সেখানে আরও একবার যেতে আমি প্রস্তুত। সেদৃশ্য যারা দেখে নি তাদের জন্য আমার করুণা হয়।"

"আমি সেখানে ছিলাম," পিয়ের বলল।

"বাঃ, সত্যি? তাহলে তো আরও ভাল! সত্যি, আপনারা সাহসী শত্রু বটে। আমার পাইপের দোহাই, বড় দুর্গটা থেকে লড়াই ভালই

হয়েছিল," ফরাসীটি বলতে লাগল। "তার জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। তিনবার সেখানে হানা দিয়েছিলাম—আমি যে এখানে বসে আছি এটা যেমন সত্য। সেটাও তেমনই সত্য। তিনবার আমরা কামানের সামনে হাজির হলাম, আর তিনবারই কার্ডবোর্ডের মূর্তির মত পিছু হটে গেলাম। সত্যি, সে বড়ই সুন্দর ম'সিয় পিয়ের! ঈশ্বর সাক্ষী, আপনাদের বোমারুরা খুব ভাল। দু'বার আমি তাদের খুব কাছে থেকে দেখেছি। চমৎকার লোক! আমাদের 'নেপল্‌সের রাজা' তো সবই জানেন, তিনিও বলে উঠলেন 'সাবাস'! হা, হা! তাহলে আপনিও আমাদের মতই একজন সৈনিক।" একটু থেমে সে হেসে বলল। "খুব ভাল কথা, আরও ভাল কথা ম'সিয় পিয়ের! যুদ্ধে ভয়ংকর....নারী ঘটিত ব্যাপারে...মহাবীর (সে চোখ টিপে হাসল), এই তো ফরাসীদের পরিচয় ম'সিয় পিয়ের, তাই নয় কি?"

ক্যাপ্টেন এতই সরল ও আমুদে মানুষ, এবং নিজেকে নিয়ে এতই তুষ্ট যে খুশি মনে তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরও বুঝি চোখ টিপল। সম্ভবত "মহাবীর" কথাটা থেকেই মস্কোর কথা ক্যাপ্টেনের মনে পড়ে গেল।

"ভাল কথা, দয়া করে বলুন তো, মেয়েরা সবাই মস্কো ছেড়ে চলে গেছে একথা কি সত্যি? অদ্ভুত কথা তো! এখানে থাকতে তাদের কিসের ভয়?"

"রুশরা প্যারিসে প্রবেশ করলে কি ফরাসী মহিলারা প্যারিস ছেড়ে চলে যেতেন না?" পিয়ের শুধাল।

"হা, হা, হা!" পিয়েরের কাঁধ চাপড়ে দিয়ে ফরাসীটি মুচ্‌কি হেসে বলল। "কথার মত কথা বটে! প্যারিস?... কিন্তু প্যারিস প্যারিস..."

"প্যারিস—পৃথিবীর রাজধানী," পিয়ের তার কথাটা শেষ করে দিল।

ক্যাপ্টেন পিয়েরের দিকে তাকাল। কথার মাঝখানে থেমে গিয়ে চোখে হাসি ফুটিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকাটা তার অভ্যাস।

"দেখুন, আপনি যদি না বলে দিতেন যে আপনি রুশ তাহলে আমি বাজি ধরে বলতাম যে আপনি একজন প্যারিসীয়! আপনার মধ্যে সেই জিনিসটি আছে···সেটা যে কি তা ঠিক জানি না, তবে সেই···" গুণের কথাটা বলে সে আবার নিঃশব্দে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রইল।

পিয়ের বলল, "আমি প্যারিসে গিয়েছি। সেখানে তিন বছর কাটিয়েছি।"

"তা বটে, দেখলেই সেটা বোঝা যায়। প্যারিস! যেলোক প্যারিসকে চেনে না সে তো বর্বর। দুই লীগ দূর থেকেও একজন প্যারিসীয়কে দেখে আপনি বলে দিতে পারেন। প্যারিস হচ্ছে তালমা, লা দুচেনয়, পোতিয়ের, সর্বোন, রাজপথ।" আগের কথার তুলনায় পরের কথাগুলি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে দেখে সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: "পৃথিবীতে মাত্র একটি প্যারিসই

আছে। প্যারিসে কাটিয়েও আপনি রুশই রয়ে গেছেন। দেখুন সেজন্য আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা একটুও কমে নি!"

পেটে কিছুটা মদ পড়েছে, নানা দুশ্চিন্তায় অনেকগুলি দিনও কেটেছে, তাই এই আমুদে স্বভাবের লোকটির সঙ্গে কথা বলতে পিয়েরের ভালই লাগছে।

"মহিলাদের কথাতেই যাওয়া যাক—শুনেছি তারা খুবই মনোরমা। ফরাসী বাহিনী মস্কোতে এসেছে বলেই তাদের তৃণভূমিতে গিয়ে মাথা গুঁজে থাকতে হবে, এটা বড়ই দুঃখের কথা। মেয়েরা কী সুযোগই না হারালেন! আপনাদের চাষীরা, অবশ্য তাদের কথা আলাদা, কিন্তু আপনাদের মত সভ্য মানুষদের তো আমাদের ভালভাবেই জানা উচিত। ভিয়েনা, বার্লিন, মাদ্রিদ, নেপল্‌স্‌, রোম, ওয়ারস, পৃথিবীর সবগুলি রাজধানী আমরা দখল করেছি…সকলে আমাদের ভয় করে, কিন্তু ভালবাসে। যারা জানে তাদের কাছে আমরা লোক ভাল। তারপর সম্রাট…" এখানে পিয়ের তাকে বাধা দিল।

"সম্রাট," পিয়ের আর একবার কথাটা উচ্চারণ করল, সহসা তার মুখটা বিষণ্ণ ও বিব্রত হয়ে উঠল, "সম্রাটও কি…?"

"সম্রাট? তিনি তো উদারতা, করুণা, ন্যায়, শৃংখলা, প্রতিভার প্রতিমূর্তি—এই তো সম্রাটের পরিচয়! আমি রাম্বেল একথা বলছি…স্থির জানবেন, আট বছর আগে আমি ছিলাম তার শত্রু। আমার বাবা ছিলেন বিদেশ থেকে আগত একজন কাউন্ট।…কিন্তু এই মানুষটি আমাকে জয় করেছেন। তিনি আমাকে হাত করে ফেলেছেন। যে জাঁকজমক ও গৌরব দিয়ে তিনি ফ্রান্সকে মুড়ে দিয়েছেন সেদৃশ্য তো আমি ভুলতে পারি না। যখন বুঝতে পারলাম তিনি কি চান—যখন দেখলাম যে তিনি আমাদের জন্য একটা ফুলের বিছানা পাতার আয়োজন করছেন। তখন নিজেকে বললাম: 'এই তো রাজা,' আর তার সেবায় আত্মনিয়োগ করলাম! বুঝেছেন! হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু, অতীত-বর্তমান সর্বযুগের তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ।"

অপরাধীর ভঙ্গীতে তাকিয়ে পিয়ের তো-তো করে বলল, "তিনি কি মস্কো এসেছেন?"

ফরাসীটি তার অপরাধীসুলভ মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।

"না, তিনি কাল আসবেন," বলে সে আবার নিজের কথায় ফিরে গেল।

ফটকে কিছু লোকের চেঁচামেচিতে তাদের কথায় বাধা পড়ল। মোরেল এসে জানাল, কিছু উর্তেমবের্গ হুজার এসে এ-বাড়ির উঠোনে ঘোড়া রাখতে চাইছে। এই গোলযোগটি দেখা দিয়েছে তার কারণ ফরাসীতে তাদের যা বলা হয়েছে হুজাররা তা বুঝতে পারে নি।

ক্যাপ্টেন তাদের বড় সার্জেন্টকে ডেকে এনে কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল, সে কোন্ রেজিমেন্টের লোক, তার কম্যাণ্ডিং অফিসার কে, আর কোন্ অধিকারে পূর্বেই দখল-করা একটা বাসা বেদখল করতে সে এসেছে। জার্মানটি ফরাসী ভাষা যৎসামান্য জানে; প্রথম দুটি প্রশ্নের জবাবে রেজিমেন্টের নাম ও কম্যাণ্ডিং অফিসারের নাম বলে দিল, কিন্তু তৃতীয় প্রশ্নটি ঠিক-ঠিক বুঝতে না পেরে নিজের জার্মান ভাষার সঙ্গে ভাঙা-ভাঙা ফরাসী মিশিয়ে বলল যে সে তার রেজিমেন্টের কোয়ার্টার-মাস্টার, আর তার কম্যাণ্ডারই একটার পর একটা বাড়ি দখল করার হুকুম দিয়েছে। পিয়ের জার্মান ভাষা জানে; সে জার্মানটির কথা ভাষান্তর করে ক্যাপ্টেনকে শোনাল, আর ক্যাপ্টেনের জবাব জার্মান ভাষায় উর্টেম্‌বের্গ হুজারকে শুনিয়ে দিল। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে জার্মানটি নতি স্বীকার করে তার সৈন্যদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে গেল। ক্যাপ্টেন বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে কিছু হুকুম জারি করল।

ঘরে ফিরে এসে দেখল দুই হাতের মধ্যে মাথা রেখে পিয়ের সেই একই জায়গায় বসে আছে। তার মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন। সেইমুহূর্তে সত্যি সে যন্ত্রণাক্লিষ্ট। ক্যাপ্টেন বেরিয়ে গেলে সে যখন ঘরের মধ্যে একা, তখন হঠাৎ সে যেন নিজেকে ফিরে পেল, নিজের অবস্থা বুঝতে পারল। মস্কো বেদখল হয়েছে, আনন্দিত বিজয়ী পক্ষ মস্কোর প্রভু হয়ে বসেছে এবং তার উপর মাতব্বরী করছে, আসল কথা সেটা নয়। সে অবস্থাটাও বেদনাদায়ক, তবু এই মুহূর্তে পিয়েরের যন্ত্রণার কারণ সেটা নয়। নিজের দুর্বলতার বোধই তাকে কষ্ট দিচ্ছে। যে 'গভীর বিষণ্ণতার মধ্যে তার বিগত দিনগুলি কেটেছে, তার পরিকল্পনামত কাজ হাসিল করার পক্ষে যে বিষণ্ণতা একান্ত প্রয়োজন, কয়েকপাত্র মদ আর এই সৎস্বভাবের মানুষটির সঙ্গে আলোচনা তার মন থেকে সেই বিষণ্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। পিস্তল, ছুরি ও চাষীর কোট প্রস্তুত। পরদিনই নেপোলিয়ন শহরে ঢুকবে। পিয়ের এখনও মনে করে যে এই দুষ্কৃতকারীকে হত্যা করা দরকার, করা উচিত, কিন্তু এখন তার মনে হচ্ছে যে সেকাজ সে করতে পারবে না। কেন তা সে জানে না, কিন্তু কেমন একটা আভাষ সে পেয়েছে যে অভিপ্রায় মত কাজটি সে করবে না। এই দুর্বলতা স্বীকার করতে তার বাধছে, কিন্তু অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে যে এই দুর্বলতাকে জয় করতে সে পারবে না; প্রতিহিংসা, হত্যা ও আত্মোৎসর্গের যে মানসিক বিষণ্ণতা তাকে পেয়ে বসেছিল, প্রথম মানুষটির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলেই তা ধুলোর মত মিলিয়ে গেছে।

ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা শিস দিতে দিতে ক্যাপ্টেন ঘরের মধ্যে ঢুকল।

ফরাসী লোকটির যে বকবকানি শুনে এতক্ষণ সে মজা পাচ্ছিল, এখন

তাতে তার বিরক্তি দেখা দিল। তার শিস, চালচলনে, গোঁফে চাড়া দেবার ভঙ্গী, সবই আপত্তিকর মনে হতে লাগল। "আমি এখনই চলে যাব, তার সঙ্গে আর একটি কথাও বলব না," পিয়ের ভাবল। একথা ভাবলেও সে কিন্তু সেখানেই বসে রইল। একটা আশ্চর্য দুর্বলতা তাকে যেন সেখানে বেঁধে রেখেছে; উঠে চলে যেতে চাইল, কিন্তু পারল না।

অপরদিকে ক্যাপ্টেন তখন খুব খুশি। দু'বার সে ঘরময় পায়চারি করল। যেন কোন চিন্তায় বেশ মজা পেয়েছে এমনিভাবে চোখ দুটি চকচক করছে, গোঁফটা হাসিতে বেঁকে যাচ্ছে।

হঠাৎ সে বলে উঠল, "ঐ উর্তেম্‌বের্গারদের কর্ণেলটি খুব মজার লোক। লোকটি জার্মান, কিন্তু তবু বেশ ভাল লোক। ...কিন্তু জার্মান তো।" পিয়েরের দিকে মুখ করে বসে বলল, "ভাল কথা, আপনি তাহলে জার্মান ভাষা জানেন?"

পিয়ের নীরবে তার দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, 'আশ্রয়'-এর জার্মান প্রতিশব্দ কি?"

পিয়ের বলল, "আশ্রয়? ওটার জার্মান প্রতিশব্দ unterkunft."

"কিভাবে কথাটা উচ্চারণ করেন?" সন্দিগ্ধ গলায় ক্যাপ্টেন তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল।

"Unterkunft," পিয়ের পুনরায় বলল।

"ওন্তেরকফ," বলে হাসি-হাসি চোখে ক্যাপ্টেন কয়েক সেকেণ্ড পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রইল। "এই জার্মানরা পাক্কা বুদ্ধু, আপনিও কি তাই মনে করেন না মঁসিয় পিয়ের?"

তারপরেই খুশি মনে বলল, "আচ্ছা, বরং এই মস্কো বোদ্‌র্ আর এক বোতল নেওয়া যাক। শরীরটা গরম করতে মোরেল আর একটা ছোট বোতল অবশ্যই দেবে। মোরেল!" সে হাঁক দিল।

মোরেল একটা মোমবাতি ও মদের বোতল এনে দিল। মোমবাতির আলোয় পিয়েরের দিকে তাকিয়ে তার মুখের বিপর্যস্ত ভাব দেখে ক্যাপ্টেন বিস্মিত হল। আন্তরিক সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে রাম্বেল তার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

পিয়েরের হাতটা ছুঁয়ে বলল, "এই যে, আমরা এখনও বিষণ্ণ। আমি কি আপনাকে বিচলিত করেছি? না, সত্যি আমার বিরুদ্ধে আপনার কিছু বলার আছে কি? হয়তো বর্তমান পরিস্থিতিই এরজন্য দায়ী।"

পিয়ের জবাব দিল না, সাদর দৃষ্টিতে ফরাসীটির চোখে চোখ রাখল; তার সহানুভূতিপূর্ণ চাউনি তাকে খুশি করেছে।

"সত্যি বলতে কি, আমার ঋণের কথা না তুলেও বলতে পারি, আপনাকে আমি বন্ধু বলেই মনে করি। আপনার জন্য কি করতে পারি বলুন? এটা

জীবন-মরণের সম্পর্ক। বুকে হাত রেখে একথা বলছি," বুকে আঘাত করে সে বলল।

"আপনাকে ধন্যবাদ," পিয়ের বলল।

তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ক্যাপ্টেনের মুখটা হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"সেক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্বের জন্য পান করছি," খুশিমনে দুটি গ্লাসে মদ ঢেলে সে চেঁচিয়ে বলল।

পিয়ের একটা গ্লাস হাতে নিয়ে সেটা খালি করে ফেলল। রাম্বেলও তার গ্লাসটা খালি করে আবার পিয়েরের হাতে চাপ দিল; টেবিলের উপর কনুই রেখে বিষণ্ণ ভঙ্গীতে বসে রইল।

তারপর বলতে শুরু করল, "হ্যাঁ প্রিয় বন্ধু, ভাগ্যের এমনি খেয়ালীপনা। কে বলতে পারত যে আমি একদিন সৈনিক হব, বোনাপার্তের অধীনে একটা অশ্বারোহী বাহিনীর ক্যাপ্টেন হব? অথচ আমি তারই সঙ্গে মস্কো এসেছি। আপনাকে বলা দরকার বন্ধু যে আমাদের বংশ ফ্রান্সের অন্যতম প্রাচীন বংশ।"

ফরাসীসুলভ সহজ, সরল, দিলখোলাভাবে ক্যাপ্টেন পিয়েরকে শোনাল তার পূর্বপুরুষ, তার শৈশব, যৌবন ও পরিণত জীবনের কথা, তার আত্মীয়-স্বজন এবং আর্থিক ও পারিবারিক অবস্থার কথা।

"কিন্তু এসবই তো জীবনের পরিবেশ, আসল কথা তো ভালবাসা—ভালবাসা। ঠিক বলি নি মঁসিয় পিয়ের?" ক্রমেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠছে। "আর এক গ্লাস দেব?"

পিয়ের আবারও গ্লাসটা খালি করে তৃতীয়বার ভরে নিল।

চকচকে চোখে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন তার ভালবাসার কাহিনী বলতে শুরু করল, "আঃ, নারী, নারী!"

অফিসারটির সুদর্শন আত্মতৃপ্ত মুখ দেখে এবং যে সাগ্রহ উৎসাহ নিয়ে সে নারীঘটিত ব্যাপার বলতে শুরু করল তা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে এধরনের ব্যাপারের কিছু ঘাটতি ছিল না। ভালবাসার যে ইন্দ্রিয়জ বৈশিষ্ট্যকে ফরাসীরা ভালবাসার বিশেষ আকর্ষণ ও কাব্যময়তা বলে মনে করে যদিও তার কোন অভাব রাম্বেলের ভালবাসার গল্পগুলিতে ছিল না, তবু তার কাহিনীকে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সে বলতে লাগল যেন একমাত্র সেই ভালবাসার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং তার আকর্ষণকে অনুভব করেছে। তাছাড়া, এমন আকর্ষণীয় করে সে নারীর বর্ণনা দিতে লাগল যে পিয়ের আগ্রহের সঙ্গেই তার সব কথা শুনতে লাগল।

একটা কথা পরিষ্কার—যে প্রেম ফরাসীদের এত প্রিয় সেটা একদিকে যেমন সেই নীচ, সরল অনুভূতি নয় যা একসময় পিয়ের তার স্ত্রীর প্রতি অনুভব

করত, আবার অন্যদিকে সেই রোমান্টিক ভালবাসাও নয় যা সে নাতাশার বেলায় অনুভব করেছে ; যে প্রেমকে ফরাসীরা পূজা করে তা হচ্ছে প্রধানত নারীর প্রতি একটা অস্বাভাবিক সম্পর্ক এবং পরস্পরবিরোধী অনুভূতির এমন একটা সঙ্গম যা প্রেমকে করে তোলে মোহময়।

তাই ক্যাপ্টেন অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্কা মার্কুইস-পত্নীর প্রতি ভালবাসার কাহিনী বলল। আবার তারই নিষ্পাপ ষোড়শী কন্যার প্রতি ভাবাসার কাহিনীও শোনাল। মাতা ও কন্যার মধ্যে উদারতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত যেভাবে মা নিজে ত্যাগ স্বীকার করে মেয়েকে তার সঙ্গে বিয়ে দিল সেকথা দূর অতীতের স্মৃতি হলেও আজও তা ক্যাপ্টেনকে শিহরিত করে তুলল। তারপর সে এমন একটি ঘটনা বলল যেখানে স্বামী নিয়েছিল প্রেমিকের ভূমিকা আর সে—অর্থাৎ প্রেমিক—নিয়েছিল স্বামীর ভূমিকা; তাছাড়া যে জার্মেনিতে "আশ্রয়" কে বলে Unter kunft এবং যেখানে স্বামীরা খায় "সোর্‌ক্রোত্‌" (বাঁধাকপির ঝোল) আর তরুণীরা হয় "অতি সুন্দরী" সেই দেশের স্মৃতি থেকে বেশ কয়েকটি মজার গল্পও শোনাল।

অবশেষে দ্রুত অঙ্গভঙ্গী সহকারে জলজলে মুখে পোল্যাণ্ডের সেই সাম্প্রতিক কাহিনীটি সে বলে গেল যা আজও ক্যাপ্টেনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে : সে জনৈক পোলের জীবন রক্ষা করলে সেই পোল নিজে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চলে যাবার সময় মোহময়ী স্ত্রীকে রেখে গেল তারই আশ্রয়ে। ক্যাপ্টেনের সুখের অন্ত নেই, মোহিনী পোলিশ মহিলা তার সঙ্গেই পালিয়ে যেতে চাইল, কিন্তু উদারতার অনুপ্রেরণায় ক্যাপ্টেন স্ত্রীকে স্বামীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বলল : "আমি আপনার জীবন রক্ষা করেছি, এবার আপনার সম্মান রক্ষা করলাম!" কথাগুলি বলে ক্যাপ্টেন চোখ মুছল, একবার কেঁপে উঠল, যেন এই মর্মস্পর্শী স্মৃতির ফলে তার মনে যে দুর্বলতা জেগেছে তাকেই দূর করে দিল।

একটু রাত হলে মদের প্রভাবে প্রায়ই যেমনটি হয়ে থাকে, পিয়ের বেশ মনোযোগ দিয়ে ক্যাপ্টেনের কাহিনীগুলি শুনল, সবই বুঝতেও পারল, আর কেন কে জানে সহসা নিজের স্মৃতিগুলো একের পর এক তার মনের সামনে ভিড় করে এল। এইসব ভালবাসার গল্প শুনতে শুনতে অপ্রত্যাশিতভাবে নাতাশার প্রতি ভালবাসার কথা তার মনে পড়ে গেল। কল্পনায় সেই ভালবাসার ছবিগুলোকে সে রাম্বেলের কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। ভালবাসা ও কর্তব্যের সংঘাতের কাহিনী শুনতে শুনতে পিয়ের যেন চোখের সামনে দেখতে পেল সুখারেভ জল-গম্বুজের নীচে প্রেমিকার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাতের বিস্তারিত দৃশ্যাবলী। সাক্ষাতের সময়ে কিন্তু তার মনে কোন প্রভাব পড়ে নি,—সেসব কথা সে একবারও মনে করে নি। অথচ এখন তার মনে হচ্ছে সেই সাক্ষাতের মধ্যে অত্যন্ত গুরুতর ও কাব্যময়

কিছু ছিল।

"পিতর কিরিলভিচ, এখানে আসুন! আমরা আপনাকে চিনতে পেরেছি", এই মুহূর্তে যেন সেই কথাগুলি সে শুনতে পাচ্ছে, চোখের সামনে তাকে দেখতে পাচ্ছে, দেখতে পাচ্ছে তার চোখ, তার হাসি, তার ভ্রমণসঙ্গী ওড়না, তার একগুচ্ছ কুন্তল""তার মনে হল এসব কিছুই যেন বিষণ্ণতা দিয়ে মোড়া।

মোহিনী পোলিশ মহিলার কাহিনী শেষ করে ক্যাপ্টেন জানতে চাইল, প্রেমের জন্য ত্যাগস্বীকার এবং প্রকৃত স্বামীর ঈর্ষার কোন অভিজ্ঞতা কোনদিন পিয়েরের হয়েছে কি না।

এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পিয়ের মাথাটা তুলল, নিজের মনের কথা প্রকাশ করবার একটা প্রয়োজনীয়তা বোধ করল। বলতে লাগল, নারীর প্রতি ভালবাসাকে সে বোঝে স্বতন্ত্রভাবে। বলল, সারাজীবন যে একটিমাত্র নারীকেই ভালবেসেছে এবং এখনও ভালবাসে, আর সে নারী কখনও তার হবে না।

ক্যাপ্টেন বলল, "Tiens !"

পিয়ের তখন বুঝিয়ে বলল, এই নারীকে সে প্রথম জীবনেই ভালবাসত, কিন্তু তখন সে তার কথা ভাবতেও সাহস করত না, কারণ সে নারী তখন ছিল খুবই ছোট, আর সে নিজেও তখন ছিল নামগোত্রহীন এক অবৈধ সন্তান। তারপর বংশ-মর্যাদা ও সম্পত্তি লাভের পরেও তার কথা ভাবতে সাহস করল না, কারণ তাকে সে বড় বেশী ভালবাসত, তাকে স্থান দিয়েছিল পৃথিবীর সব কিছুর উপরে, বিশেষ করে নিজেরও উপরে।

এই পর্যন্ত বলে পিয়ের ক্যাপ্টেনকে শুধাল, ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে কি না।

ক্যাপ্টেন এমন একটা ভঙ্গী করল যার অর্থ—সে বুঝুক আর নাই বুঝুক, পিয়ের তার কাহিনী চালিয়ে যাক।

"আধ্যাত্মিক প্রেম, মেঘের মত""" সে তো-তো করে বলল।

মদের প্রভাবে হোক, অথবা খোলাখুলি বলার ঝোঁকে হোক, বা এই লোকটি যে তার কাহিনীর নায়ক-নায়িকাদের জানে না এবং কোনদিন জানবেও না এই চিন্তার ফলেই হোক, অথবা এসব কিছু মিলিয়েই হোক, একটা কিছু পিয়েরের জিভকে খুলে দিয়েছে। বহু দূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে সে তার জীবনের সমগ্র কাহিনী বলতে লাগল: তার বিয়ে, তার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর প্রতি নাতাশার ভালবাসা, তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এবং তার সঙ্গে তার নিজের সরল সম্পর্কের কথা। রাম্বেলের নানা প্রশ্নের জবাবে যেকথা প্রথম লুকিয়েছিল তাও বলে ফেলল—নিজের পদমর্যাদা, এমন কি নামটা পর্যন্ত।

পিয়েরের কাহিনীর মধ্যে যা ক্যাপ্টেনকে সব চাইতে বেশী মুগ্ধ করল তা

হল—পিয়ের খুব ধনী, মস্কোতে তার দুটো প্রাসাদোপম বাড়ি আছে, সে সব কিছু ছেড়েছে কিন্তু শহর ছাড়ে নি, নাম ও বাসস্থান লুকিয়ে সেখানেই থেকে গেছে।

অনেক রাত হলে দুজন একসঙ্গে পথে বেড়িয়ে এল। রাতটা আতপ্ত ও হাল্কা। পক্রোভ্‌কার উপরে বাঁ দিকের বাড়িটায় আগুন জ্বলছে—মস্কোতে এই প্রথম আগুনের সূত্রপাত। ডানদিকে আকাশের বুকে কাস্তের মত ক্ষীয়মান চাঁদ, তার বিপরীতদিকে ঝুলে পড়েছে সেই উজ্জ্বল ধূমকেতুটি যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পিয়েরের অন্তরের ভালবাসা। গেরাসিম, রাঁধুনি ও দুটি ফরাসী সৈনিক ফটকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাসি, দুটি ভিন্ন ভাষায় পরস্পরের কাছে দুর্বোধ্য ভাষায় তাদের কথাবার্তা কানে আসছে। শহরের আলোর আভার দিকে তারা তাকিয়ে আছে।

এত বড় শহরে অনেক দূরের একটিমাত্র ছোটখাট অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে ভয়ের কিছু থাকতে পারে না।

অনেক উপরের নক্ষত্রখচিত আকাশ, চাঁদ, ধূমকেতু ও আগুনের আভার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মন আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। "এই তো, এই তো ভাল, এর বেশী আর কি চাই?" সে ভাবল। সহসা নিজের অভিপ্রায়ের কথা মনে পড়ায় তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল, এত দুর্বল লাগল যে পড়ে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে বেড়াটার গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

নতুন বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই অস্থির পদক্ষেপে ফটক ছেড়ে নিজের ঘরে চলে গেল; সোফায় শুয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—৩০

২রা সেপ্টেম্বর যে প্রথম অগ্নিকাণ্ডটি শুরু হল পলাতক মস্কোবাসীরা এবং পশ্চাদপসরণকারী সৈনিকরা ভিন্ন ভিন্ন পথ থেকে বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে সেটা দেখতে দেখতে চলল।

রস্তভ পরিবার সে রাতটা কাটাল মস্কোর চোদ্দ মাইল দূরবর্তী মিতিশ্‌চিতে। ১লা সেপ্টেম্বর এত দেরি করে তারা যাত্রা করল, গাড়ি-ঘোড়া ও সৈন্যরা এমনভাবে পথঘাট আটকে রেখেছে, এত বেশী জিনিসপত্র ভুল করে ফেলে আসার দরুণ চাকরদের আবার ফেরৎ পাঠাতে হল, তারা স্থির করল মস্কো থেকে তিন মাইল দূরের একটা জায়গায় রাত কাটাবে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে, আর পথেও বারবার এমন বিলম্ব ঘটতে লাগল যে তারা মাত্র বড় মিতিশ্‌চি পর্যন্তই পৌঁছতে পারল। সেদিন সন্ধ্যা দশটায় রস্তভ পরিবারের লোকজন এবং তাদের সঙ্গে ভ্রমণরত আহতদের সেই বড় গ্রামটার উঠোনে ও বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া হল। রস্তভ পরিবারের

চাকর ও কোচয়ান এবং আহত অফিসারদের আর্দালিরা মনিবদের সেবা-শুশ্রূষা শেষ করে রাতের খাবার খেল, ঘোড়াগুলোকে দানাপানি দিল, তারপর বারান্দায় বেরিয়ে এল।

পার্শ্ববর্তী একটা কুটিরে ভাঙা কব্জি নিয়ে শুয়েছিল রায়েভ্‌স্কির অ্যাড্‌জুটান্ট। তীব্র যন্ত্রণায় সে করুণস্বরে অনবরত আর্তনাদ করছে; হেমন্ত রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সে আর্তনাদ ভয়ংকর হয়ে বাজতে লাগল। প্রথম রাতটা সে রস্তভদের সঙ্গে একই উঠোনে কাটিয়েছে। কাউন্টেস বলল, তার কাতরানির শব্দে সে চোখের পাতা বুজতে পারে নি। তাই আহত লোকটির কাছ থেকে দূরে থাকবার জন্য কাউন্টেস মিতিশ্‌চিতে আরও খারাপ একটা কুটিরে উঠে গেল।

রাতের অন্ধকারে একটি চাকরের নজরে পড়ল, বারান্দার সামনে দাঁড়ানো একটা উঁচু গাড়ির মাথার উপরে আর একটা আগুনের আভা দেখা যাচ্ছে। একটা আভা অনেক আগে থেকেই চোখে পড়ছিল; সকলেই জানত ছোট মিতশ্‌চি পুড়ছে—মামোনভের কসাকরা সেখানে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

“দেখ, দেখ ভাইসব, ওই আর একটা আগুন!” জনৈক আর্দালি বলে উঠল।

সকলেরই দৃষ্টি সেই আগুনের দিকে পড়ল।

“কিন্তু ওরা তো বলল মামোনভের কসাকরা ছোট মিতিশ্‌চিতে আগুন লাগিয়েছে।”

“কিন্তু ওটা তো মিতিশ্‌চি নয়, সেখান থেকে অনেক দূরে।”

“দেখ, দেখ, মনে হচ্ছে ওটা নির্ঘাৎ মস্কো!”

যারা দেখছিল তাদের দুজন ঘুরে গাড়ির অপর পাশে গিয়ে পাদানিতে বসে পড়ল।

“এটা তো আরও খানিকটা বাঁদিকে; আরে, ছোট মিতিশ্‌চি তো ওই দূরে, এটা তো ঠিক তার বিপরীত দিকে।”

আরও কয়েকজন এসে প্রথম দুজনের সঙ্গে যোগ দিল।

একজন বলল, “কি রকম জ্বলছে দেখ। আগুনটা লেগেছে মস্কোতে, হয় সুশ্‌চেভ্‌স্কি নয় তো রগোঝ্‌স্কি অঞ্চলে।”

একথার কোন জবাব কেউ দিল না; বেশ কিছু সময় সকলেই নীরবে অনেক দূরের সেই দ্বিতীয় অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখার দিকে তাকিয়ে রইল।

কাউন্টের খানসামা বুড়ো দানিয়েল তেরেন্তিচ সেখানে এসে মিশ্‌কাকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

“হা করে কি দেখছ অকর্মার ধারি…? কাউন্ট তো ডাকতে পারেন, আর সেখানে কেউ নেই; যাও, পোশাক-পত্তরগুলো গুছিয়ে নাও।”

মিশ্‌কা বলল, "আমি তো ছুটে এসেছি জল নিতে।"

জনৈক পরিচারক বলল, "তুমি কি মনে কর দানিয়েল তেরেন্তিচ? আগুনটা মস্কোতে বলে মনে হচ্ছে না?"

দানিয়েল তেরেন্তিচ জবাব দিল না। আবার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সবলেই চুপচাপ। আগুনের আভা ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে, কখনও উঠছে কখনও পড়ছে, ক্রমেই দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

আর একজন বলল, "ঈশ্বর দয়া করুন…কী বাতাস, আর সবই তো শুকনো…।"

"ওদিকে দেখ! কী কাণ্ডকারখানাই চলছে। হে প্রভু! ঐ যে দেখতে পাচ্ছ কাকগুলিও উড়ে পালাচ্ছে। প্রভু পাপীদের করুণা করুন!"

"ওরা আগুন নিভিয়ে ফেলবে। কোন ভয় নেই!"

"কে নেভাবে?" এতক্ষণ চুপ করে থেকে এবার দানিয়েল তেরেন্তিচ বলল। তার কণ্ঠস্বর শান্ত, বিবেচক। "ভাইসব, ওই তো মস্কো…জননী মস্কো, তার সাদা…" তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল; শোনা গেল একটি বৃদ্ধের চাপা কান্না।

ঐ আগুনের আভার তাৎপর্য বুঝবার জন্য তারা সকলেই যেন এরজন্যই অপেক্ষা করে ছিল। দীর্ঘশ্বাস, প্রার্থনার বাণী, আর কাউন্টের বুড়ো খানসামার চাপা কান্না শোনা যেতে লাগল।

অধ্যায়—৩১

কুটিরে ফিরে গিয়ে খানসামা কাউন্টকে জানাল, মস্কো জ্বলছে। ড্রেসিং-গাউনটা গায়ে চড়িয়ে কাউন্ট বাইরে গেল দেখতে। সোনিয়া ও মাদাম শোস্ তখনও পোশাক ছাড়ে নি; তারাও সঙ্গে গেল। শুধু নাতাশা ও কাউন্টেস ঘরে রইল। পেত্‌য়া পরিবারের সঙ্গে নেই; সে এখন রেজিমেন্টের সঙ্গে ত্রয়েস্তার পথে।

মস্কোতে আগুন জ্বলছে শুনে কাউন্টেস কাঁদতে শুরু করল। নাতাশা বিবর্ণ মুখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বেঞ্চিতেই বসে রইল, বাবার কথায় কানই দিল না। তিনটে বাড়ি দূরে অ্যাডজুটান্টের অবিশ্রাম আর্তনাদই সে শুনছে।

শীতার্ত, ভীত হয়ে উঠোন থেকে ফিরে এসে সোনিয়া বলল, "ওঃ, কী ভয়ঙ্কর। আগুনের আভা এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে মনে হচ্ছে গোটা মস্কোই পুড়বে! নাতাশা, চেয়ে দেখ! এখন জানালা থেকেই দেখতে পাবে।"

কিন্তু নাতাশা এমনভাবে তার দিকে তাকাল যেন কিছুই বুঝতে পারে নি; ঘরের কোণের স্টোভটার দিকেই তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। যে কারণেই হোক সোনিয়া সকালেই নাতাশাকে বলে দিয়েছে যে প্রিন্স আন্দ্রু আহত অবস্থায়

তাদের সঙ্গেই যাচ্ছে; সেই থেকেই নাতাশা কেমন যেন অর্ধচেতন অবস্থায় আছে। ওদিকে কাউণ্টেস সোনিয়ার উপর ভীষণ রেগে গেছে। সোনিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার কাছে ক্ষমা চেয়েছে এবং যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতেই এখন সে দিদির প্রতি অখণ্ড মনোযোগ দিচ্ছে।

সে বলল, "দেখ নাতাশা, কী ভয়ঙ্করভাবে আগুন জ্বলছে!"

"কি জ্বলছে?" নাতাশা শুধাল। "ওঃ, হ্যাঁ, মস্কো।"

সোনিয়া পাছে দুঃখ পায় তাই সে জানালার দিকে মুখটা ফেরাল, এমনভাবে মুখটা বাড়াল যে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর আবার আগের মতই বসে পড়ল।

"কিন্তু তুমি তো কিছুই দেখলে না!"

"হ্যাঁ, ঠিক দেখেছি," নাতাশা জবাব দিল।

কাউণ্টেস ও সোনিয়া দুজনই বুঝতে পারল যে এখন নাতাশার কাছে মস্কো, বা মস্কোর অগ্নিকাণ্ড, বা অন্য কোন কিছুরই কোন গুরুত্ব নেই।

কাউণ্ট ফিরে এসে বেড়ার ওপাশে শুয়ে পড়ল। কাউণ্টেস মেয়ের কাছে এগিয়ে গেল, তার অসুখ করলে যেরকম করে থাকে সেইভাবে হাতের পিঠটা দিয়ে নাতাশার মাথাটা স্পর্শ করল, জ্বর হয়েছে কি না বুঝবার জন্য তার কপালে ঠোঁট ছোঁয়াল, শেষ পর্যন্ত তাকে চুমো খেল।

বলল, "তুমি যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছ। তোমার সারা শরীর কাঁপছে। তুমি বরং শুয়ে পড় গে।"

"শুয়ে পড়ব? ঠিক আছে, শুয়ে পড়ব। এখনই শুয়ে পড়ব," নাতাশা বলল।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রিন্স আন্দ্রু তাদের দলের সঙ্গেই যাচ্ছে—সকালে একথা শোনার পরেই নাতাশার মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছিল: সে কোথায় যাচ্ছিল? কেমন করে আহত হল? আঘাত কি গুরুতর? সে কি তাকে একবার দেখতে পারে না? কিন্তু তাকে যখন বলা হল যে সে প্রিন্স আন্দ্রুকে দেখতে পাবে না, তার আঘাত গুরুতর, কিন্তু জীবনের কোন আশংকা নেই, তখন সে প্রশ্ন করা ছেড়ে দিল, কথা বলা বন্ধ করল; অপরের কোন কথাতেই তার বিশ্বাস নেই; তার ধারণা হল সে যত যাই বলুক ওই একই জবাব তাকে শুনতে হবে। সারা পথ সে গাড়ির এক কোণে চোখ বড় বড় করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল। মনে মনে সে একটা মতলব আঁটছে, একটা কিছু করার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, অথবা নিয়ে ফেলেছে। কাউণ্টেস মেয়ের হাবভাব ভালই জানে; কিন্তু তার মতলবটা যে কি সেটা না জানায় আরও শঙ্কিত হয়ে যন্ত্রণা পেতে লাগল।

"নাতাশা, লক্ষ্মী মেয়ে, পোশাক ছেড়ে ফেল; আমার বিছানায়ই শুয়ে পড়।"

খাটে কেবল কাউণ্টেসের জন্যই বিছানা পাতা হয়েছে। মাদাম শোস্

দুটি মেয়েকে নিয়ে মেঝেতে খড়ের উপর শোবে।

"না মামণি, আমি এখানে মেঝেতেই শোব," বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়ে নাতাশা জানালার কাছে গিয়ে সেটা খুলে দিল। খোলা জানালা দিয়ে অ্যাডজুটান্টটির আর্তনাদ আরও স্পষ্ট হয়ে কানে আসছে। রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে সে মাথাটা বাড়িয়ে দিল। কাউণ্টেস দেখল, তার সরু গলাটা চাপা কান্নার আবেগে কাঁপছে, জানালার ফ্রেমের উপর দপ্ দপ্ করছে। নাতাশা জানে এ আর্তনাদ প্রিন্স আন্‌দ্রুর নয়; সে আছে তাদের একই উঠোনের মধ্যে বারান্দার ওপাশের একটা ঘরের একাংশে। কিন্তু এই অবিশ্রাম ভয়ঙ্কর আর্তনাদ শুনে তার কান্না পাচ্ছে। কাউণ্টেস ও সোনিয়া দৃষ্টি-বিনিময় করল।

আস্তে নাতাশার কাঁধে হাত রেখে কাউণ্টেস বলল, "শুয়ে পড় লক্ষীটি; শুয়ে পড় সোনা। এস, শোবে এস।"

"ওঃ, হ্যাঁ····এখনই শুয়ে পড়ব," বলে নাতাশা তাড়াতাড়ি পোশাক ছাড়তে লাগল।

পোশাক ছেড়ে ড্রেসিং-জ্যাকেটটা পরে মেঝের বিছানায় বসে সে চুল বাঁধতে লাগল। অভ্যস্ত আঙুল চালিয়ে চুল বাঁধা শেষ করে সে খড়ের উপর পাতা চাদরের উপর শুয়ে পড়ল দরজার দিকটাতে।

সোনিয়া বলল, "নাতাশা, তুমি বরং মাঝখানে শোও।"

নাতাশা বলল, "আমি এখানেই থাকব। তুমি শুয়ে পড়।" সে বালিশে মুখ ঢাকল।

কাউণ্টেস, মাদাম শোস্ এবং সোনিয়াও তাড়াতাড়ি পোশাক ছেড়ে শুয়ে পড়ল। দেবমূর্তির সামনেকার বাতিটাই ঘরের একমাত্র আলো। কিন্তু উঠোনে এসে পড়েছে মাইল দেড়েক দূরের ছোট মিতিশ্‌চির আগুনের আলো; মামোনভের কসাকরা পথের উপর যে মদের আড্ডা বসিয়েছে সেখান থেকে ভেসে আসছে লোকজনের হল্লার শব্দ; অ্যাডজুটান্টের অবিশ্রাম আর্তনাদ তখনও শোনা যাচ্ছে।

চুপচাপ শুয়ে থেকে নাতাশা ঘরের ভিতর-বাইরের সব শব্দই শুনতে লাগল। মার প্রার্থনা, দীর্ঘশ্বাস ও বিছানায় নড়াচড়ার শব্দ, মাদাম শোসের পরিচিত নাকডাকার শিস, আর সোনিয়ার মৃদু নিঃশ্বাস। কাউণ্টেস একবার নাতাশাকে ডাকল। নাতাশা সাড়া দিল না।

"মনে হচ্ছে ও ঘুমিয়ে পড়েছে মামণি," সোনিয়া বলল।

একটু চুপ করে থেকে কাউণ্টেস আবার কথা বলল; এবার কেউ সাড়া দিল না।

তার একটু পরেই নাতাশার মার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। তার ছোট খালি পাটা লেপের ভিতর থেকে বেরিয়ে খালি মেঝেতে

ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, তবু নাতাশা একটুও নড়ল না।

যেন সকলের উপর জয়লাভের উৎসব পালন করতে দেয়ালের ফাটলের ভিতর থেকে একটা ঝিঁঝিঁ পোকা ডেকে উঠল। অনেক দূরে একটা কাক ডাকল, কাছে আর একটা কাক তাতে সাড়া দিল। মদের আড্ডার হৈচৈ থেমে গেছে, শুধু অ্যাডজুটান্টের আর্তনাদ এখনও শোনা যাচ্ছে। নাতাশা উঠে বসল।

"সোনিয়া, ঘুমিয়েছ? মামণি?" সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল। কেউ সাড়া দিল না। নাতাশা সাবধানে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, ক্রুশ চিহ্ন আঁকল, ঠাণ্ডা নোংরা মেঝেতে পা ফেলে সাবধানে হাঁটতে লাগল। বিড়ালছানার মত পা টিপে টিপে দরজার কাছে গিয়ে ঠাণ্ডা হাতলটা চেপে ধরল।

দরজা খুলে চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দার ঠাণ্ডা মাটির মেঝেতে পা ফেলল। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশ আরাম লাগছে। একটি ঘুমন্ত লোকের গায়ে পা লাগতেই সে তাকে ডিঙিয়ে গেল; কুটিরের যে অংশে প্রিন্স আন্‌দ্রু শুয়ে আছে সেদিককার দরজাটা খুলল। অন্ধকার। ঘরের এক কোণে বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে; পাশের বেঞ্চিটার উপর একটা লম্বা ফিতেওয়ালা চর্বি-বাতি ধিকিধিকি জ্বলছে।

সেদিন সকালে যেমুহূর্তে সে শুনেছে যে আহত প্রিন্স আন্‌দ্রু সেখানেই আছে তখনই সে স্থির করেছে তাকে দেখতে যাবে। কেন যাবে তা সে জানে না, তাকে দেখলে নিজে কষ্ট পাবে তাও জানে, তবু তার মনে হয়েছে যে দেখা করা দরকার।

রাতে তার সঙ্গে দেখা করার আশা নিয়েই সে সারাটা দিন কাটিয়েছে। কিন্তু সেইমুহূর্তটি যখন সমাগত তখন তার মন আশংকায় ভরে উঠেছে—না জানি কি দেখবে। কি ভাবে সে পঙ্গু হয়েছে? কতটা অক্ষত আছে? তার অবস্থাও কি অবিরাম আর্তনাদকারী অ্যাডজুটান্টের মত? হ্যাঁ। ঠিক সেই রকমই হবে। কল্পনায় সে যেন তাকে মূর্তিমান আর্তনাদরূপেই দেখতে পেল। একটা দুর্বার আবেগে সামনে এগিয়ে গেল। অতি সাবধানে এক পা এক পা করে এগিয়ে ছোট ঘরটার মাঝখানে পৌঁছে গেল। ঘরে একটা তল্পিও রয়েছে। আর একটি লোক—তিমোখিন—দেবমূর্তির নীচে বেঞ্চিটার এক কোণে শুয়ে আছে। অন্য দুজন—ডাক্তার ও খানসামা—শুয়ে আছে মেঝেতে।

উঠে বসে খানসামা ফিসফিস করে কি যেন বলল। আহত পায়ের ব্যথায় তিমোখিন জেগেই ছিল; সাদা সেমিজ, ড্রেসিং-জ্যাকেট ও রাত-টুপি পরা একটি মেয়ের বিচিত্র ছায়ামূর্তি দেখে সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। খানসামা ঘুম-ঘুম ভয়ার্ত গলায় বলে উঠল, "তুমি কি চাও? ব্যাপার কি?" তখন নাতাশা দ্রুতপায়ে এক কোণে শুয়ে থাকা বস্তুটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে

দেখতে মোটেই মানুষের মত নয়, তবু সে তাকে দেখবেই। খানসামাকে পার হয়ে এগিয়ে গিয়ে মোমবাতির আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল দুই হাত লেপের বাইরে রেখে প্রিন্স আন্দ্রুই শুয়ে আছে—ঠিক যেরকমটি সে তাকে অনেকবার দেখেছে।

সে আগেকার মতই আছে, কিন্তু তার মুখের জ্বরতপ্ত বর্ণ, তার দিকে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ফেরানো চোখের ঝিকিমিকি দৃষ্টি, বিশেষ করে শিশুর মত নরম গলা তার মধ্যে এমন একটা নিষ্পাপ শিশুসুলভ ভাব ফুটিয়ে তুলেছে যা সে আগে কখনও দেখে নি। প্রিন্স আন্দ্রুর কাছে এগিয়ে গিয়ে যৌবন-সুলভ দ্রুত ও নমনীয় ভঙ্গীতে তার সামনে নতজানু হল।

প্রিন্স আন্দ্রু হেসে তার দিকে ছাতাটা বাড়িয়ে দিল।

অধ্যায়—৩২

বারদিনোর প্রান্তরে একটা অ্যাম্বুলেন্স ঘাঁটিতে আশ্রয় পাবার পরে প্রিন্স আন্দ্রুর সাতটা দিন কেটে গেছে। ডাক্তাররা বলেছিল, জ্বর-জ্বর ভাব ও আঘাতপ্রাপ্ত পাকস্থলীর প্রদাহের ফলে তার মৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু সপ্তম দিনে সে বেশ মৌজ করে চা ও পাউরুটি খেল, আর ডাক্তারও দেখল যে তার শরীরের উত্তাপ নেমে গেছে। সকালেই তার জ্ঞানও ফিরে এসেছে। মস্কো ছাড়বার পরে প্রথম রাতটা বেশ গরমই ছিল, আর সেও ছিল একটা কালিচে-গাড়িতে কিন্তু মিতিশচিতে পৌঁছে আহত লোকটি নিজেই বলল, তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে একটু চা খেতে দেওয়া হোক। কুটির স্থানান্তরের দরুণ যন্ত্রণায় সে আবার আর্তনাদ করতে লাগল; জ্ঞানও হারাল। শিবির-শয্যায় শুইয়ে দেবার পরে অনেকক্ষণ সে চোখ বুজে চুপচাপ পড়ে রইল। তারপর চোখ মেলে ধীরে ধীরে বলল: "আমার চা?" প্রাত্যহিক জীবনের এই তুচ্ছ কথাটা তার মনে আছে দেখে ডাক্তার অবাক হয়ে গেল। প্রিন্স আন্দ্রুর নাড়ি দেখে অবস্থার উন্নতি হয়েছে বুঝতে পেরে ডাক্তার যেমন বিস্মিত হল, তেমনই অসন্তুষ্টও হল। অসন্তুষ্টির কারণ অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, রোগী যদি এখন মারা না যায় তাহলে পরে আরও অনেক বেশী কষ্ট পেয়ে মরবে। প্রিন্স আন্দ্রুর রেজিমেণ্টের লাল-নাক মেজর তিমোখিন মস্কোতেই তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে; বরদিনোর যুদ্ধে একটা পা আহত হওয়ায় সেও প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গেই চলেছে। তাদের সঙ্গে আছে একটি ডাক্তার, প্রিন্স আন্দ্রুর খানাসামা তার কোচয়ান ও দুটি আর্দালি।

প্রিন্স আন্দ্রুকে একটু চা দেওয়া হল। সাগ্রহে সেটা খেয়ে সে জ্বরো চোখে সামনের দিকে তাকাল; যেন কোন কিছু মনে করতে ও বুঝতে চেষ্টা করছে।

"আর চাই না। তিমোখিন কি এখানে আছেন?" সে শুধাল।

তিমোখিন বেঞ্চিটা ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল।

"আমি এখানেই আছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।"

"আপনার ঘাটা কেমন আছে?"

"আমার স্যার? ভাল আছে। আপনার অবস্থা কেমন?"

প্রিন্স আন্দ্রু আবার কি যেন মনে করতে চেষ্টা করল।

"একটা বই কি পাওয়া যাবে না?" সে শুধাল।

"কি বই?"

"সুভাষিতাবলী। আমার কাছে নেই।"

ডাক্তার তাকে কথা দিল, একটা বই যোগাড় করে দেবে; তারপর সে কেমন আছে জানতে চাইল। প্রিন্স আন্দ্রু অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথাযথভাবে সব প্রশ্নের জবাব দিল; তারপর একটা তাকিয়া দিতে বলল, কারণ বিছানায় শুয়ে সে আরাম পাচ্ছে না, কষ্ট বোধ হচ্ছে। যে আলখাল্লাটা দিয়ে তার শরীর ঢাকা ছিল ডাক্তার ও খানসামা সেটাকে তুলে দিল; ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসা পচা মাংসের দুর্গন্ধে মুখ বিকৃত করে তারা সেই ভয়ংকর জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগল। ডাক্তার খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে ড্রেসিংটা বদলে দিতে গিয়ে আহত লোকটিকে পাশ ফিরিয়ে দিল, আর তাতেই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করতে করতে সে আবার অজ্ঞান হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করল। বার বার বলতে লাগল, বইটা এনে তার বিছানার নীচে রাখা হোক।

বলল, "তাতে আপনাদের অসুবিধাটা কোথায়? বইটা আমার সঙ্গে নেই। দয়া করে একখানা বই এনে মুহূর্তের জন্য বিছানার নীচে রেখে দিন," সে করুণ সুরে অনুরোধ জানাল।

ডাক্তার হাত ধুতে বারান্দায় চলে গেল।

খানসামা তার হাতে জল ঢেলে দিল। সেই সময় ডাক্তার তাকে বলল, "তোমাদের তো বিবেক বলে কিছু নেই। একমুহূর্ত আমি নজর রাখি নি··· এ যে কী যন্ত্রণা জান তো; উনি যে কি করে সহ্য করছেন ভেবে পাই না।"

খানসামা বলল, "প্রভু যীশু খৃস্টের দোহাই, বিছানার নীচে কিছু রাখা হোক!"

মিতিশ্‌চিতে কালিচে-গাড়িটা থামবার পরে প্রিন্স আন্দ্রু যখন তাকে কুটিরে নিয়ে যেতে বলল, তখনই সে প্রথম বুঝতে পারল সে কোথায় আছে, তার কি হয়েছে, সে আঘাত পেয়েছে এবং কেমন করে পেয়েছে। কুটিরে নিয়ে যাবার সময় সে আবার যন্ত্রণায় জ্ঞান হারায়; পুনরায় জ্ঞান ফিরে পাবার পরে চা খেতে খেতে সব কথা তার নতুন করে মনে পড়ে গেল। একটা নতুন ধরনের চিন্তা এসে তার মনে সুখের ভরসা যোগাল। মনে হল, সুখের একটা নতুন উৎস সে খুঁজে পেয়েছে, আর সে সুখ

"সুভাষিতাবলী"র সঙ্গে জড়িত। সেইজন্যই একখানা বই সে চেয়েছে। পাশ ফিরিয়ে শুইয়ে দেবার সময় আবার সব গোলমাল হয়ে গেল। তৃতীয় বারের মত যখন জ্ঞান ফিরে পেল তখন চারদিকে রাতের নিস্তব্ধতা। কাছাকাছি সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। বারান্দা থেকে একটা ঝিঁ ঝিঁ ডেকে উঠল; রাস্তায় কে যেন চেঁচিয়ে গান করছে; টেবিলে, দেবমূর্তির উপরে ও দেয়ালে আরশুলাগুলো খস্‌খস্‌ করে চলাফেরা করছে; বিছানার মাথার কাছে এবং পাশের মোমবাতিটাকে ঘিরে একটা বড় মাছি ফর্‌ফর্‌ করে উড়ছে; মোমবাতির পলতেটা পুড়ে গিয়ে ব্যাঙের ছাতার আকার নিয়েছে।

তার মনের অবস্থাটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। একটি সুস্থ মানুষ সাধারণত একই সঙ্গে অসংখ্য বিষয় ভাবতে পারে, অনুভব করতে পারে, স্মরণ করতে পারে; কিন্তু দরকার হলে একটি চিন্তাধারাকে বেছে নিয়ে সমস্ত মনোযোগকে তার উপর নিবদ্ধ করার ক্ষমতাও সে রাখে। একটি সুস্থ মানুষ গভীরতম চিন্তাভাবনা থেকে বেরিয়ে এসে একজন আগন্তুকের সঙ্গে দু' একটা ভদ্রতার কথা বলে আবার নিজের চিন্তায় ফিরে যেতে পারে। কিন্তু সে ব্যাপারে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনটা স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। তার মনের সব ক্ষমতাই আগের চাইতে বেশী সক্রিয় ও পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সে ক্ষমতা কাজ করে তার ইচ্ছার বাইরে। একই সঙ্গে বহু বিচিত্র বিষয় নিয়ে সে ভাবতে পারে; কিন্তু কাজ করতে করতেই সহসা একটা অপ্রত্যাশিত ধারণা এমনভাবে তার মনে বাসা বাঁধে যে সেটাকে সরিয়ে দেবার কোন শক্তিই তার থাকে না।

নিস্তব্ধ কুটিরের আধো অন্ধকারে শুয়ে জ্বরতপ্ত বিস্ফারিত চোখ মেলে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে সে ভাবতে লাগল, "হ্যাঁ, এমন একটা নতুন সুখ আমার কাছে প্রকাশ পেয়েছে যা থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখা যায় না। সে সুখের আসন জড়বস্তুর বাইরে, সে সুখ একমাত্র আত্মার, সে সুখ ভালবাসার। সব মানুষই তাকে বুঝতে পারে, কিন্তু তাকে সম্যক ধারণা করা, তার ব্যবস্থা করা একমাত্র ঈশ্বরের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু ঈশ্বরই বা কিভাবে সে বিধানের প্রয়োগ করলেন? আর কেনই বা ঈশ্বর-পুত্র…?"

সহসা তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেল, প্রিন্স আন্‌দ্রু শুনতে পেল (সেটা বাস্তব না স্বপ্ন তা সে জানে না) একটা মৃদু ফিস্‌ ফিস্‌ স্বর অনবরত তালে তালে বলছে "পিতি-পিতি-পিতি," তারপর "তি-তি", তারপর আবার "পিতি-পিতি-পিতি", এবং আবার "তি-তি"। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, মুখের উপর, ঠিক মাঝখানটাতে সেই ফিস্‌-ফিস্‌ শব্দের তালে তালে অতি সূক্ষ্ম সূচ ও ভাঙা কুঁচি দিয়ে একটা আশ্চর্য বায়বীয় কিছু গড়ে উঠেছে। মনে হল তাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে যাতে এই বায়বীয় জিনিসটা ভেঙে না পড়ে; কিন্তু তবু সেটা ভেঙে যেতে লাগল এবং সেই তালবদ্ধ শব্দের

সঙ্গে সঙ্গে আবার ধীরে ধীরে গড়ে উঠল; প্রিন্স আন্দ্রু নিজের মনেই বলতে লাগল—"সেটা বড় হচ্ছে, বড় হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে, বড় হচ্ছে।" সেই ফিসফিসানি শুনতে শুনতে এবং সূচীশিল্পের গলা জিনিসটাকে দেখতে দেখতে সে চকিতে আরও দেখতে পেল মোমবাতিটাকে ঘিরে একটা লাল আলোর বৃত্ত, শুনতে পেল আরশোলাদের খস্খস্ শব্দ, এবং তার বালিশে মুখের উপর উড়ন্ত একটা মাছির গুণগুনানি। মাছিটা যতবার মুখের উপর পড়ছে ততবার সেখানটায় জ্বালা করছে, অথচ কী আশ্চর্য, মাছিটা সেই বায়বীয় জিনিসটাকে আঘাত করা সত্ত্বেও সেটা ভেঙে যাচ্ছে না। কিন্তু এসব ছাড়া আরও একটা বড় ব্যাপার সেখানে ছিল। দরজার কাছে একটা সাদামত কিছু—একটা স্ফিন্‌ক্‌স্-এর মূর্তি; সেটাও তাকে পীড়া দিতে লাগল।

সে ভাবল, "ওইতো টেবিলের উপর আমার শার্টটা, ওই তো আমার পা দুটো, ওই তো দরজা, কিন্তু ওটা অনবরত বড় হচ্ছে কেন, ছড়িয়ে পড়ছে কেন, আর কেনই বা 'পিতি-পিতি-পিতি' আর 'তি-তি', আর 'পিতি-পিতি-পিতি'…? যথেষ্ট হয়েছে, দয়া করে চলে যাও!" যন্ত্রণাকাতর গলায় প্রিন্স আন্দ্রু কাকে যেন মিনতি জানাল। আর সহসা চিন্তা ও অনুভূতিগুলি আবার তার মনের উপরে ভেসে উঠল বিশেষ স্পষ্টতায় ও শক্তিতে।

পরিষ্কারভাবে সে আবার ভাবল, "হ্যা—ভালবাসা। কিন্তু সে ভালবাসা নয় যা ভালবাসে কোন কিছুর জন্য, গুণের জন্য, উদ্দেশ্যের জন্য, আর অন্য কোন কারণের জন্য, কিন্তু সেই ভালবাসা যা আমি—সুখের মুখে দাঁড়িয়ে—প্রথম জেনেছি যখন আমার শত্রুকে দেখেও তাকে ভালবেসেছি। সেই ভালবাসার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে যা আত্মারই একান্ত সত্তা, যার কোন পাত্রের দরকার হয় না। সেই আনন্দের অনুভূতি আমি আবার লাভ করেছি। প্রতিবেশীকে ভালবাসা, শত্রুকে ভালবাসা, সব কিছুকে ভালবাসা, তার সব আত্মপ্রকাশের মধ্যে ঈশ্বরকে ভালবাসা। প্রিয়জনকে তুমি ভালবাসতে পার মানবিক ভালবাসা দিয়ে, কিন্তু শত্রুকে ভালবাসা যায় একমাত্র ঐশ্বরিক ভালবাসা দিয়ে। তাই তো শত্রুকে ভালবেসে এত আনন্দ আমি পেয়েছি। তার কি হয়েছে? সে কি বেঁচে আছে…?"

"মানবিক ভালবাসার ক্ষেত্রে ভালবাসা থেকে ঘৃণায় যাওয়া যায়, কিন্তু ঐশ্বরিক ভালবাসার পরিবর্তন নেই। না, মৃত্যু বা অন্য কিছুই তাকে ধ্বংস করতে পারে না। সেটাই তো আত্মার মূল ধর্ম। অথচ এ জীবনে কত মানুষকেই না ঘৃণা করেছি? আর যত ভালবেসেছি ও ঘৃণা করেছি তাকে যত আর কাউকে নয়।" সঙ্গে সঙ্গে নাতাশার ছবি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল তার সামনে। নাতাশার অনুভূতি, তার যন্ত্রণা, তার লজ্জা, তার অনুতাপ সবই সে বুঝতে পারল। এই প্রথম সে বুঝতে পারল নাতাশাকে প্রত্যাখ্যান

করার নিষ্ঠুরতা, তার সঙ্গে বিরোধের নিষ্ঠুরতা। "যদি আর একটিবার তার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হত। শুধু একবার, সেই দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে যদি বলতে পারতাম…"

"পিতি-পিতি-পিতি, তি-তি, পিতি-পিতি-পিতি বুম্!" মাছিটা উড়ছে …আর সহসা তার মন চলে গেল আর এক জগতে—বাস্তব ও বিকারের এক জগতে যেখানে ঘটে চলেছে একটি বিশেষ ঘটনা। সেই জগতে একটা কিছু এখনও গড়ে উঠছে, ভেঙে পড়ছে না, একটা কিছু ক্রমেই বড় হচ্ছে, লাল বৃত্তসহ মোমবাতিটা এখনও জ্বলছে, দরজার কাছে সেই শার্টের মত স্ফিন্‌ক্স্‌টা পড়ে আছে: কিন্তু এসব কিছু ছাড়া আরও একটা কিছুর ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল, এক ঝলক তাজা বাতাস ঘরে ঢুকল, আর দরজায় দেখা দিল আর একটি নতুন সাদা স্ফিন্‌ক্স্‌। আর যে নাতাশার কথা সে এইমাত্র ভাবছিল তারই বিবর্ণ মুখ ও চকচকে চোখ বসানো এই নতুন স্ফিন্‌ক্স্‌-এর মূর্তিতে।

কল্পনা থেকে সেই মুখটাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টায় প্রিন্স আন্দ্রু ভাবল, "ওঃ, এই অবিরাম বিকার কী যন্ত্রণাদায়ক।" কিন্তু সে মুখ বাস্তব রূপ নিয়ে থেকেই গেল, আরও কাছে এগিয়ে এল। সেই বিচিত্র মুখখানি তার একেবারে সামনে। নিজের বুদ্ধিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় প্রিন্স আন্দ্রু সব শক্তি একত্র করল, একটু সরে গেল, আর সহসা তার কানে কি যেন বেজে উঠল, চোখের উপর নেমে এল আবছায়া, জলে ডুবন্ত মানুষের মত সে চেতনা হারাল। যখন সম্বিত ফিরে পেল তখন নাতাশা, সেই জীবন্ত নাতাশা যাকে সে সবার চাইতে ভালবাসতে চেয়েছে তার নবলব্ধ পবিত্র ঐশ্বরিক ভালবাসা দিয়ে, সেই নাতাশা তার সামনে নতজানু হয়ে আছে। সে বুঝল এ নাতাশা প্রকৃতই জীবন্ত; সে বিস্মিত হল না, বরং সুখী হল। নতজানু হয়ে নিশ্চলভাবে বসে ভয়ার্ত দুটি চোখ তার মুখের উপর রেখে নাতাশা কোনক্রমে কান্না চেপে রেখেছে। তার মুখ বিবর্ণ, কঠিন। শুধু নীচের দিকটা কাঁপছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে প্রিন্স আন্দ্রু হাসল; হাতটা বাড়িয়ে দিল।

"তুমি?" সে বলল। "কী ভাগ্য!"

নতজানু অবস্থাতেই নাতাশা দ্রুত অথচ সাবধানে তার আরও কাছে এগিয়ে গেল, সযত্নে তার হাতটা টেনে নিল, ঝুঁকে পড়ে আলতো করে ঠোঁট দুটি ছুঁইয়ে হাতের উপর চুমো খেল।

মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "আমাকে ক্ষমা কর! আমাকে ক্ষমা কর!"

"আমি তোমাকে ভালবাসি," প্রিন্স আন্দ্রু বলল।

"ক্ষমা…!"

"কিসের ক্ষমা ?" প্রিন্স আন্দ্রু শুধাল।

"আমি যা ক-রে-ছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কর!" প্রায় অশ্রুত ভাঙা-ভাঙা গলায় নাতাশা বলল; কোন রকমে ঠোঁট ছুঁইয়ে তার হাতে চুমো খেতে লাগল।

নাতাশার মুখটা তুলে ধরে তার চোখে চোখ রেখে প্রিন্স আন্দ্রু বলল, "তোমাকে আমি আগের চাইতে আরও বেশী ভালবাসি।"

আনন্দের অশ্রুভরা দুটি চোখ তুলে ভীরু দৃষ্টিতে নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে তাকাল। তার শীর্ণ বিবর্ণ মুখ, ফোলা ঠোঁট দুটি বড়ই সাধারণ—দেখলে ভয় করে। কিন্তু প্রিন্স আন্দ্রু তা দেখল না, সে দেখল তার সুন্দর দুটি চকচকে চোখ। পিছন থেকে অনেকের কণ্ঠস্বর দুজনই শুনতে পেল।

খানসামা পিতর জেগে উঠে ডাক্তারকে জাগিয়েছে। পায়ের ব্যথার জন্য তিমোখিন মোটেই ঘুমোয় নি; বেঞ্চির উপর গুটিশুটি মেরে শুয়ে একটা চাদর দিয়ে শরীরটাকে ঢেকে সে অনেকক্ষণ ধরেই সব কিছু দেখছিল।

বিছানা থেকে উঠে ডাক্তার বলল, "এটা কি? দয়া করে চলে যান মাদাম!"

সেইমুহূর্তে একটি দাসী এসে দরজায় টোকা দিল; মেয়েকে না দেখতে পেয়ে কাউণ্টেস তাকে পাঠিয়েছে।

সদ্য ঘুম ভেঙে ওঠা স্বপ্নাচ্ছন্ন রোগীর মত নাতাশা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; ঘরে ফিরে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল।

সেদিন থেকে রস্তভদের অবশিষ্ট ভ্রমণকালে প্রতিটি বিরামস্থলে এবং যেখানেই তারা রাত কাটিয়েছে, নাতাশা কখনও আহত বল্কন্স্কির কাছছাড়া হয় নি; আর ডাক্তারকেও স্বীকার করতে হয়েছে যে একটি তরুণীর কাছ থেকে এতটা মানসিক দৃঢ়তা অথবা একটি আহত মানুষকে সেবা করবার এতটা নিপুণতা সে আশা করে নি।

পথের মধ্যেই প্রিন্স আন্দ্রু যদি তার মেয়ের হাতের উপরেই মারা যায়—ডাক্তারের কথামত তা তো সহজেই ঘটতে পারে—কাউণ্টেসের কাছে সেটা যত ভয়াবহই মনে হোক না কেন, তবু সে নাতাশাকে বাধা দিতে পারল না। যদিও আহত মানুষটি ও নাতাশার মধ্যে এখন যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে তাতে সকলেরই মনে হল যে প্রিন্স আন্দ্রু সেরে উঠলে তাদের বিয়ের প্রস্তাবটি নতুন করে তোলা হবে, তবু কেউই মুখে সেকথা বলল না—নাতাশা ও প্রিন্স আন্দ্রু তো নয়ই: জীবন-মৃত্যুর যে অমীমাংসিত প্রশ্নটি তখন শুধু বল্কন্স্কির মাথার উপরে নয়, সারা রাশিয়ার উপরেই ঝুলে আছে, সেটাই এখন অন্য সব বিচার-বিবেচনার পথকে রোধ করে দাঁড়িয়েছে।

অধ্যায়—৩৩

৩রা সেপ্টেম্বর অনেক দেরিতে পিয়েরের ঘুম ভাঙল। মাথাটা ধরে আছে, পোশাক না ছেড়েই যে বিছানায় শুয়েছিল সেটা বড়ই অস্বস্তিকর লাগছে, আগেরদিন একটা লজ্জাজনক কাজ করার অস্পষ্ট চেতনা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে আছে। সেই লজ্জাজনক কাজটা ক্যাপ্টেন রাম্বেলের সঙ্গে গতকালের আলোচনা।

ঘড়িতে এগারোটা বাজে, কিন্তু বাইরেটা বেশ অন্ধকার মনে হচ্ছে। পিয়ের উঠে চোখ মুছল; কুঁদোতে খোদাই-করা যে পিস্তলটা গেরাসিম লেখার টেবিলে রেখে গেছে সেটা চোখে পড়তেই পিয়েরের মনে পড়ে গেল সে কোথায় আছে, আর সেইদিনই তার ভাগ্যে কি আছে।

"আমার কি অনেক দেরি হয়ে যায় নি?" সে ভাবল। "হয় তো সে দুপুরের আগে মস্কোতে ঢুকবে না।"

ভবিষ্যতের চিন্তায় মাথা না ঘামিয়ে সে তাড়াতাড়ি কাজে লেগে গেল।

পোশাক ঠিক করে পিস্তলটা নিয়ে বেরিয়ে যাবে, এমন সময় এই প্রথম তার মনে হল যে এভাবে পিস্তলটা হাতে নিয়ে রাজপথ ধরে সে চলতে পারে না। এত বড় একটা পিস্তলকে কোটের নীচে লুকিয়ে রাখাও শক্ত। সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে এটাকে বেল্টের নীচে অথবা বগলের নীচে লুকিয়ে রেখেও চলা সম্ভব নয়। তাছাড়া এটা থেকে গুলি ছোঁড়া হয়ে গেছে, নতুন করে গুলি ভরার আর সময় হয়ে ওঠে নি। "ঠিক আছে, ছুরিতেই কাজ চলবে," নিজের মনেই বলল, যদিও পরিকল্পনা করার সময় সে একাধিকবার স্থির করেছে যে ১৮০৯ সালে একটা ছুরি নিয়ে নেপোলিয়নকে হত্যা করার চেষ্টা করেই ছাত্রটি মস্তবড় ভুল করেছিল। তবু পিয়ের তাড়াতাড়িতে পিস্তলের সঙ্গে সবুজের খাপে ভরা একটা খাঁজ-কাটা ভোঁতা ছুরিও সঙ্গে নিল। পিস্তলের সঙ্গে ছুরিটাও সে কিনেছিল সুখারেভ বাজার থেকে। সেটাকে ওয়েস্টকোটের নীচে লুকিয়ে রাখল।

কোটের উপর একটা কটিবন্ধ বেঁধে টুপিটাকে কপালের উপর টেনে দিয়ে কোনরকম শব্দ না করে ক্যাপ্টেনকে এড়িয়ে বারান্দাটা পার হয়ে পিয়ের রাস্তায় পা দিল।

আগের সন্ধ্যায় যে অগ্নিকাণ্ডকে সে উদাসীন চোখে তাকিয়ে দেখেছে আজ রাতে সেটা অনেক বড় হয়ে উঠেছে। মস্কোর বিভিন্ন স্থান আগুনে পুড়েছে। নদীর ওপারে ক্যারেজ রোর দালানগুলো, বাজার ও পোভার্স্ক'য়, মস্ক্‌ভা নদীর উপরকার বজরা আর দরগমিলভ সেতুর পার্শ্বস্থ কাঠের গোলা—সব জ্বলছে।

পিয়ের গলিপথ ধরে পোভার্স্ক'য় গেল, সেখান থেকে গেল আর্বাতে অবস্থিত সেণ্ট নিকলাস গির্জায়; অনেক আগেই সে স্থির করেছে ওখানেই কাজটা সমাধা করা উচিত। অধিকাংশ বাড়িরই ফটকে তালা, খড়খড়ি

তোলা। রাজপথ ও গলি জনশূন্য। মাঝে মাঝে কিছু রুশকে দেখতে পেল; তাদের মুখে উৎকণ্ঠা ও ভয়। কিছু ফরাসী সৈন্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে এমনভাবে চলেছে যেন এটা শহর নয়, সেনা-শিবির। রুশ ও ফরাসী সকলেই পিয়েরকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। তার উচ্চতা ও মজবুত চেহারা ছাড়াও তার মুখে ও সারা দেহে এমন একটা বিচিত্র যন্ত্রণার ভাব ফুটে উঠেছে যে রুশরা তার দিকে তাকিয়ে ভাবছে সে কোন্ জাতের মানুষ। ফরাসীরা অবাকচোখে তাকে দেখছে কারণ অন্য রুশরা যেখানে ফরাসীদের দেখছে ভয় ও কৌতূহলের সঙ্গে, সেখানে পিয়ের তাদের একেবারেই আমল দিচ্ছে না। একটা বাড়ির ফটকে তিনজন ফরাসী রুশদের কি যেন বুঝিয়ে বলছে, কিন্তু তারা কিছুই বুঝতে পারছে না দেখে ফরাসীরা পিয়েরকে থামিয়ে জানতে চাইলো সে ফরাসী জানে কি না।

পিয়ের মাথা নেড়ে চলে গেল। চারদিকে যা কিছু ঘটছে তার দিকে না আছে তার কান, না আছে তার দৃষ্টি। নিজের সংকল্পকে মনের মধ্যে বয়ে নিয়ে সে সভয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। কিন্তু উদ্দেশ্য সাধন করা তার কপালে নেই। পথে আর কোন বাধা না পেলেও তার অভিপ্রায় সফল করা যেত না, কারণ দরগমিলভ শহরতলি থেকে ক্রেমলিন যাবার পথে নেপোলিয়ন চার ঘণ্টারও বেশী সময় আগে আর্বাত পার হয়ে গেছে; এখন সে অত্যন্ত বিষণ্ণ মনে ক্রেমলিনের রাজকীয় পাঠকক্ষে বসে অগ্নিনির্বাপন ও লুঠতরাজ বন্ধ করা এবং অধিবাসীদের আশ্বস্ত করার ব্যাপারে অবিলম্বে যে সব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার তৎসংক্রান্ত বিস্তারিত ও সঠিক হুকুম জারি করছে। কিন্তু পিয়ের এসব কিছুই জানে না: নিজের আসন্ন কর্তব্যের মধ্যেই সে ডুবে আছে; তার একমাত্র দুশ্চিন্তা পাছে চরম মুহূর্তে দুর্বলতা এসে তাকে ঘিরে ধরে এবং তার আত্মমর্যাদা হারিয়ে যায়।

কোন কিছু না শুনলে ও না দেখলেও সহজাত প্রবৃত্তিতেই সে পথ চিনে এগিয়ে চলল; পোভার্স্কয়ের গলি পথে যেতে সে কোনরকম ভুল করল না।

সেই রাস্তা ধরে যত এগোচ্ছে ততই ধোঁয়া ঘনতর হচ্ছে—আগুনের তাপ পর্যন্ত তার গায়ে লাগছে। মাঝে মাঝে বাড়ির ছাদ থেকে আগুনের লেলিহান জিহ্বা উঠতে দেখা যাচ্ছে। যদিও বুঝতে পারছে যে তার চারদিকে অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে, তবু সে যে অগ্নিকাণ্ডের দিকেই এগিয়ে চলেছে সেটা পিয়ের বুঝতে পারে নি। একদিকে পোভার্স্কয় আর অন্যদিকে প্রিন্স গ্রুজিন্স্কির বাড়ির বাগান সংলগ্ন একটা প্রশস্ত খোলা জায়গার ভিতরকার ফুটপাত ধরে যেতে যেতে হঠাৎ পিয়ের শুনতে পেল খুব কাছেই একটি স্ত্রীলোক অসহায়ভাবে কাঁদছে। স্বপ্নোত্থিতের মত পিয়ের মাথাটা তুলল।

পথের পাশে ধুলো ঢাকা শুকনো ঘাসের উপর নানারকম গৃহস্থালির জিনিসপত্র স্তূপীকৃত হয়ে আছে: পালঙ্কের বিছানা, সামোভার, দেবমূর্তি,

ট্রাংক, কত কি। ট্রাংকের পাশে একটি শুকনো চেহারার স্ত্রীলোক মাটিতে বসে আছে; স্ত্রীলোকটি বয়স্কা, উপরের পাটির দাঁতগুলো উঁচু, পড়নে কালো জোব্বা ও টুপি। কি যেন বলতে বলতে চাপা কান্নার আবেগে তার শরীরটা দুলছে। দশ ও বারো বছরের দুটি মেয়ে নোংরা খাটো ফ্রক ও জোব্বা পরে ভয়ার্ত, বিমূঢ় মুখে মার দিকে তাকিয়ে আছে। বছর সাতেকের ছোট ছেলেটি অন্য কারও ওভার কোট ও বড় মাপের একটা টুপি পরে বুড়ি নার্সের কোলে চড়ে চীৎকার করছে। একটা নোংরা দাসী খালি পায়ে ট্রাংকের উপর বসে আছে। স্ত্রীলোকটির স্বামীর পরনে সরকারী কর্মচারির পোশাক, বাঁকানো গোঁফ, মাথায় চৌকো টুপি; ভাবলেশহীন মুখে ট্রাংকগুলো সরিয়ে তার ভিতর থেকে পোশাকপত্র টেনে বের করছে।

পিয়েরকে দেখামাত্রই স্ত্রীলোকটি তার পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ল।

"ভাল মানুষরা, ভাল খৃস্টানরা, আমাকে বাঁচান, আমাকে সাহায্য করুন, প্রিয় বন্ধুরা...যে কেউ আমাদের সাহায্য করুন...." চাপা কান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে বিড়বিড় করে বলতে লাগল। আমার মেয়ে...আমার মেয়ে! আমার ছোট যে পড়ে রইল। আগুনে পুড়ে গেল! উঃ! এইজন্যই কি তাকে মানুষ করলাম....উঃ!"

নীচু গলায় স্বামী বলল, "কেঁদ না মারি নিকলায়েভ্‌না! নিশ্চয় দিদি তাকে নিয়ে গেছে, নইলে সে যাবে কোথায়?"

হঠাৎ কান্না থামিয়ে স্ত্রীলোকটি সক্রোধে গর্জে উঠল, "রাক্ষস! পাষণ্ড! তোমার তো হৃদয় বলে কিছু নেই, নিজের সন্তানের জন্যও কোন মমতা নেই। অন্য পুরুষ হলে তাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করে আনত। কিন্তু এ তো রাক্ষস, মানুষ নয়, বাপও নয়!" চাপা কান্নার ফাঁকে সে পিয়েরকে ডেকে বলল, "আপনি তো স্যার একজন সম্মানিত লোক। আশেপাশে আগুন লাগল, আমার বাড়ির দিকে ধাওয়া করল, দাসী চেঁচিয়ে উঠল 'আগুন!' আর আমরা জিনিসপত্র গুছাতে গেলাম। যে অবস্থায় ছিলাম সেইভাবেই বেরিয়ে এলাম...এই তো মাত্র সঙ্গে আনতে পেরেছি....দেবমূর্তি, আমার যৌতুকের বিছানা, আর সবই তো গেছে! বাচ্চাদের ধরে নিয়ে এলাম। কিন্তু কাতিকে আনতে পারলাম না! উঃ! হে প্রভু!...." আবার সে ফোঁপাতে শুরু করল। "আমার বাছা, আমার সোনা! পুড়ে গেল! পুড়ে গেল!"

"কিন্তু তাকে কোথায় ফেলে এসেছেন?" পিয়ের শুধাল।

তার দৃপ্ত মুখ দেখে স্ত্রীলোকটির মনে হল, এ হয় তো তাকে সাহায্য করতে পারে।

পা ধরে চেঁচিয়ে বলল, "ওঃ, প্রিয় মহাশয়! আমার রক্ষাকর্তা, আমার বুকটাকে শান্ত করুন!...আনিস্কা, এই মেয়েটা, যা না, ওকে পথটা দেখিয়ে

দে !" রেগে হা করে দীর্ঘ দাঁতের পাটি বের করে সে চেঁচিয়ে দাসীটিকে বলল।

পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমাকে রাস্তাটা দেখিয়ে দাও, দেখিয়ে দাও,...আমি ঠিক করে দেব।"

নোংরা দাসীটি ট্রাংক থেকে নেমে চুল ঠিক করে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে খালি পায়ে পথ দেখিয়ে চলল। পিয়েরের মনে হল, গভীর মূর্ছার পরে সে যেন আবার বেঁচে উঠেছে। মাথাটা খাড়া করল, জীবনের আলোয় দুই চোখ জ্বলতে লাগল, দ্রুত পায়ে দাসীকে অনুসরণ করে পোভার্স্কয়তে পৌঁছে গেল। কালো ধোঁয়ার মেঘে সারাটা রাস্তা ঢেকে গেছে। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আগুনের জিহ্বা উঁকি মারছে। অনেক লোক জড় হয়েছে অগ্নিকাণ্ডের সামনে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে জনৈক ফরাসী জেনারেল চার পাশের লোকজনদের কি যেন বলছে। দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পিয়ের জেনারেলের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু ফরাসী সৈনিকরা তাকে বাধা দিল।

"ওদিকে যেতে পারবেন না," একজন বলল।

মেয়েটি বলল, "এদিকে আসুন খুড়ো। গলি ধরে নিকুলিন্সকে পাশ কাটিয়ে আমরা চলে যাব।"

পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দাসীর সঙ্গে ছুটতে লাগল। মেয়েটি ছুটো রাস্তা পার হয়ে বাঁদিকে একটা গলিতে ঢুকল; তিনটে বাড়ি পেরিয়ে ডানদিকের একটা উঠোনে ঢুকল।

"এই তো কাছেই", বলে মেয়েটি দৌড়ে উঠোন পার হয়ে কাঠের বেড়ার ফটকটা খুলে ফেলল। সেখানে দাঁড়িয়েই বাড়িটার ছোট কাঠের অংশটা আঙুল দিয়ে দেখাল; সেটা তখন দাউ-দাউ করে জ্বলছে। একটা দিক ভেঙে পড়েছে, অপর দিকটা জ্বলছে, জানালার ফাঁকে ও ছাদের ভিতর দিয়ে আগুনের শিখা বেরিয়ে আসছে।

বেড়ার ফটক দিয়ে ঢুকতে গিয়ে গরম বাতাস গায়ে লাগতে পিয়ের আপনা থেকেই থেমে গেল।

"কোন্‌টা ? তোমাদের বাড়ি কোন্‌টা ?" সে শুধাল।

একটা দিক দেখিয়ে মেয়েটি আর্তনাদ করে বলল, "উঃ! ঐ তো, ঐ তো আমাদের বাসা। হায় সোনা, তুমি পুড়ে মরলে! কাতি, সোনা-মানিক আমার! উঃ!"

পিয়ের সেদিকটায় ছুটে গেল, কিন্তু আগুনের হল্কার জন্য এগোতে না পেরে ঘুরে বড় বাড়িটার সামনের দিকে চলে গেল। সে বাড়ির ছাদের নীচটা শুধু জ্বলছে আর একদল ফরাসী সেখানে ভিড় করেছে। লোকগুলি কি করছে সেটা প্রথমে পিয়ের বুঝতে পারে নি; কিন্তু যখন সে দেখল একজন ফরাসী ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে একটি চাষীকে আঘাত করছে আর তার কাছ থেকে

একটা শেয়ালের লোমের কোট ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করছে, তখনই সে বুঝল যে সেখানে লুঠতরাজ চলছে; কিন্তু তা নিয়ে ভাববার মত সময় তার নেই।

দেয়াল ও ছাদ ভেঙে পড়ার শব্দ, আগুনের শিখার হিস্‌-হিস্‌ শব্দ, উত্তেজিত জনতার চেঁচামেচি ও আগুনের কুণ্ডলি—সব কিছু মিলিয়ে পিয়েরের মনে একটা উদ্দীপনার সৃষ্টি হল। বাসাটার অন্যদিকে ছুটে গিয়ে ভিতরে ঢুকবার মুখেই মাথার উপরে অনেকের চীৎকার শুনতে পেল, আর তখনই একটা ভারি জিনিস হুড়মুড় করে তার পাশেই এসে পড়ল।

পিয়ের মুখ তুলে দেখল, বড় বাড়িটার জানালায় কয়েকজন ফরাসী দাঁড়িয়ে আছে। তারাই ধাতুর জিনিসপত্র ভর্তি একটা দেরাজ এই মাত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। নীচে দাঁড়ানো অপর কয়েকজন ফরাসী দেরাজটার দিকে এগিয়ে গেল।

পিয়েরকে দেখিয়ে তাদের একজন বলে উঠল, "এই লোকটা কি চায়?"

পিয়ের চীৎকার করে বলল, "ওই বাড়িতে একটি শিশু আছে? তোমরা কি একটি শিশুকে দেখেছ?"

"কি বলছে লোকটা? এগিয়ে চল!" কয়েকজন বলল; পাছে পিয়ের দেরাজের কিছু প্লেট ও ব্রোঞ্জের জিনিস চেয়ে বসে এই ভয়ে একটি সৈনিক সদর্পে তার দিকে এগিয়ে এল।

উপর থেকে একজন ফরাসী চেঁচিয়ে বলল, "একটি শিশু? বাগানে কার যেন কান্না শুনেছি। এ লোকটি নিশ্চয় সেই বাচ্চাটাকেই খুঁজছে। যাই হোক না কেন, তোমাকে তো মানুষের মত আচরণ করতে হবে⋯"

"কোথায় সে? কোথায়?" পিয়ের বলল।

বাড়ির পিছন দিককার বাগানটা দেখিয়ে ফরাসীটি জানালা থেকে চেঁচিয়ে বলল, "ওখানে! ওখানে! একটু অপেক্ষা কর—আমি নেমে আসছি।"

দু' এক মিনিট পরেই কালো চোখ ও গালে তিল একটি ফরাসী সত্যি সত্যি একতলার জানালা দিয়ে লাফিয়ে নেমে এল এবং পিয়েরের কাঁধটা চেপে ধরে বাগানের দিকে ছুটে গেল।

সহকর্মীদের ডেকে বলল, "তোমরা সকলেই তাড়াতাড়ি নেমে এস। ক্রমেই গরম বাড়ছে।"

বাড়ির পিছনে কাঁকর বিছানো পথে পৌঁছে ফরাসীটি পিয়েরের হাত ধরে টেনে দেখিয়ে দিল, কাঁকর বিছানো গোলাকার জায়গায় আসনের নীচে গোলাপী পোশাক পরা একটি তিন বছরের মেয়ে শুয়ে আছে।

"ওই তোমার শিশু! আরে, এ যে একটা মেয়ে, তাহলে তো আরও ভাল!" ফরাসীটি বলল। "বিদায় হে মোটা! আমাদেরও মানুষের মতই ব্যবহার করতে হয়; কি জান, আমরা সকলেই তো মরণশীল।" কথাগুলি বলে লোকটি তার সহকর্মীদের দিকে ছুটে গেল।

আনন্দে রুদ্ধশ্বাস পিয়ের ছুটে গিয়ে ছোট মেয়েটিকে কোলে তুলে নিতে গেল। কিন্তু একজন অপরিচিত মানুষকে দেখে রুগ্ন, গলা ফোলা মেয়েটি চীৎকার করে ছুটতে আরম্ভ করল। পিয়ের অবশ্য তাকে ধরে কোলে তুলে নিল। মেয়েটি বেপরোয়াভাবে চেঁচাতে চেঁচাতে পিয়েরের হাত থেকে ছাড়া পাবার জন্য তাকে আঁচড়াতে-কামড়াতে শুরু করে দিল। কোন নোংরা জন্তুকে ছোঁবার মতই পিয়েরের মনে আতংক ও বিরক্তি দেখা দিল। তবু মেয়েটিকে ছুঁড়ে ফেলে না দিয়ে তাকে নিয়ে বড় বাড়িটার দিকে ছুটে গেল। অবশ্য যেপথে সে এসেছিল এখন সেপথে ফিরে যাওয়া অসম্ভব; দাসী অনিস্কা সঙ্গে নেই; করুণা ও বিরক্তির মিশ্র অনুভূতিতে ক্রন্দনরত ভেজা মেয়েটিকে যথাসম্ভব আদরের সঙ্গে বুকে চেপে ধরে পিয়ের আর একটা পথের খোঁজে বাগানের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

অধ্যায়—৩৪

নানা উঠোন ও গলি দিয়ে ছুটতে ছুটতে ছোট বোঝাটি নিয়ে পিয়ের পোভার্স্ক'য়ের এক কোণে অবস্থিত গ্রুজিন্‌স্কি বাগানে ফিরে এল। প্রথমে সে জায়গাটা চিনতেই পারে নি, কারণ বিভিন্ন বাড়ি থেকে টেনে বের করা মালপত্রে ও লোকজনের ভিড়ে জায়গাটা এখন ভিড়ে ভিড়াক্কার। মালপত্রসহ অনেক রুশ পরিবার ছাড়া বিচিত্র পোশাক পরা কিছু ফরাসী সৈন্যও সেখানে ভিড় করেছে। পিয়ের তাদের দিকে ফিরেও চাইল না। মেয়েটিকে মার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্য কাউকে বাঁচাতে যাবার জন্য সেই সরকারী কর্মচারির পরিবারটিকেই সে খুঁজতে লাগল। এখনও তার অনেক কিছু করার আছে, আর সেটা তাড়াতাড়িই করতে হবে। আগুনের তাপে ও ছুটে আসার জন্য তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে; এইমুহূর্তে তার মধ্যে যেন ফিরে এসেছে যৌবনের শক্তি, উদ্দীপনা ও সংকল্পের দৃঢ়তা। মেয়েটি এখন শান্ত হয়েছে; ছোট ছোট হাত দিয়ে পিয়েরের কোটটা চেপে ধরে একটা ছোট বন্য পশুর মত চারদিকে তাকাচ্ছে। পিয়ের মাঝে মাঝে হেসে তার দিকে তাকাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, সেই ভয়ার্ত, রুগ্ন ছোট মুখখানিতে সে যেন একটা সকরুণ নিষ্পাপ কিছু দেখতে পাচ্ছে।

সরকারী কর্মচারি অথবা তার স্ত্রীকে কোথাও খুঁজে পেল না। বড় বড় পা ফেলে ভিড়ের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে সে সকলেরই মুখটা ভাল করে দেখতে লাগল। আপনা থেকেই একটি জর্জীয় বা আর্মেনীয় পরিবারের দিকে তার নজর গেল। পরিবারে মোট তিনটি মানুষ; একটি অতীব সৌম্যদর্শন প্রাচ্য দেশীয় বৃদ্ধ; পরনে কাপড়ে-ঢাকা ভেড়ার চামড়ার নতুন কোট ও নতুন বুট; অনুরূপ চেহারার একটি বৃদ্ধা ও একটি যুবতী। যুবতীটির কালো বাঁকা ভুরু,

লম্বা, সুন্দর, ভাবলেশহীন মুখে অসাধারণ উজ্জ্বলতা। পিয়েরের মনে হল সে যেন প্রাচ্য সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছবি। খোলা জায়গায় ইতস্তত ছড়ানো জিনিসপত্র ও লোকজনের মাঝখানে দামী সাটিনের জোব্বা ও উজ্জ্বল লিলাক রঙের শাল পরে সে বসে আছে; দেখে মনে হচ্ছে যেন একটি সুন্দর, সতেজ স্পষ্টতই বিদেশী গাছকে এনে বরফের বুকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। স্পষ্টতই নিজের রূপ সম্পর্কে সে সচেতন, এবং সেজন্য ভীতও বটে। তার মুখটা পিয়েরের বড় ভাল লাগল, বেড়ার পাশ দিয়ে দ্রুত পায়ে যেতে যেতে ও বার কয়েক সে তার দিকে ফিরে তাকাল। বেড়ার ধারে পৌঁছেও যাদের খুঁজছে তাদের না পেয়ে সে থেমে চারদিকে তাকাল।

মেয়েটি কোলে থাকায় সকলেরই দৃষ্টি পড়ছে তার উপর। একদল রুশ নরনারী তার চারদিকে ভিড় করে দাঁড়াল।

তারা শুধাল, "আপনার কি কেউ হারিয়েছে? আপনি তো একজন ভদ্রশ্রেণীর লোক, তাই না? এটি কার মেয়ে?"

জবাবে পিয়ের ব্যাপারটা খুলে বলে জানতে চাইল তারা কেউ সেই স্ত্রীলোকটিকে চেনে কি না।

একটি বুড়ো ডিয়েকন বলল, "আরে, নিশ্চয় আনৃফেরভরা হবে। প্রভুর অনেক দয়া, প্রভুর অনেক দয়া!"

একটি স্ত্রীলোক বলল, "আন্‌ফেরভরা? না। তারা তো সকলেই চলে গেছে। এটি নিশ্চয় মারি নিকলায়েভ্‌না অথবা আইভানভদের মেয়ে হবে!"

একজন গৃহ-ভৃত্য বলল, "উনি বলছেন একটি 'স্ত্রীলোক', কিন্তু মারি নিকলায়েভ্‌না তো একটি মহিলা।"

পিয়ের বলল, "তোমরা তাকে চেন? শুট্‌কো চেহারা, লম্বা দাঁত।"

"নিশ্চয় মারি নিকলায়েভ্‌না! ওই নেকড়ের দল যখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন তারা বাগানের ভিতরে চলে এসেছিল," ফরাসী সৈন্যদের দেখিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল।

"হে প্রভু, দয়া কর!" ডিয়েকন বলল।

"ওদিকে চলে যান, ওরা সেখানেই আছে। নিশ্চয় সে। সে তো অনবরত হা-হুতাশ করছে আর কাঁদছে।" স্ত্রীলোকটি বলতে লাগল। "নিশ্চয় সেই হবে। এই যে, এদিকে!"

কিন্তু তার কথা পিয়েরের কানে গেল না। কয়েক পা দূরে যে কাণ্ডটা ঘটছে কয়েক সেকেণ্ড ধরে সেটাই সে দেখছে। সেই আর্মেনীয় পরিবার ও দুটি ফরাসী সৈনিককেই সে দেখছে। সৈনিকদের একজন ছোটখাট, চটপটে, পরনের নীলকোটটা কোমড়ের কাছে দড়ি দিয়ে বাঁধা, মাথায় রাত-টুপি, খালি পা। অপর জনের চেহারাটাই বিশেষ করে পিয়েরের নজরে পড়েছে;

লোকটি লম্বা, লিকলিকে, গোল কাঁধ, ভাল চুল, ধীর গতি, আর মুখে একটা বোকা-বোকা ভাব। পরনে মেয়েদের ঢিলে পশমী ঘাঘরা, নীল ট্রাউজার ও বড়, ছেঁড়া চটের বুট। খালি পা, ছোটখাট, নীলকোট পরা ফরাসীটি আর্মেনীয়দের কাছে গিয়ে কি যেন বলেই বুড়ো মানুষটির পা চেপে ধরল, আর সেও সঙ্গে সঙ্গে বুট জোড়া খুলতে শুরু করল। পশমী ঘাঘরাপরা অপর ফরাসীটি সুন্দরী আর্মেনীয় মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে দুই হাত পকেটে ঢুকিয়ে নীরব ও নিশ্চলভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

হঠাৎ বাচ্চাকে সেই স্ত্রীলোকটির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে পিয়ের বলল, "এই যে, মেয়েটিকে নাও! ওর বাপ-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিও!" ক্রন্দনরতা মেয়েটিকে মাটিতে নামিয়ে রেখে পিয়ের আবার সেই ফরাসী সৈনিক ও আর্মেনীয় পরিবারের দিকে ফিরে তাকাল।

বুড়ো লোকটি ইতিমধ্যেই খালি পা হয়ে বসে আছে। ছোটখাট ফরাসীটি দ্বিতীয় বুটটা হাতিয়ে নিয়ে দুটো বুটে ঠোকাঠুকি করছে। বুড়ো লোকটি কান্নায় ভাঙা গলায় কি যেন বলছে, কিন্তু পিয়ের একনজর সেদিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল; তার সমস্ত মনোযোগ তখন পশমী ঘাঘরাপরা ফরাসীটির উপর নিবদ্ধ; সে তখন ঈষৎ দুলতে দুলতে যুবতীটির আরও কাছে এগিয়ে গেছে। পকেট থেকে হাত দুটি বের করে মেয়েটির গলা চেপে ধরেছে।

আর্মেনীয় সুন্দরীটি তখনও নিশ্চল হয়ে একই ভঙ্গীতে বসে আছে; চোখের দীর্ঘ পাতা দুটি নেমে এসেছে; যেন সৈনিকটি তাকে নিয়ে কি করছে তা সে দেখছেও না, বুঝছেও না।

পিয়ের তাদের কাছে ছুটে যেতেই পশমী ঘাঘরাপরা লম্বা লুঠেরাটা আর্মেনীয় যুবতীর গলার নেকলেস ধরে টান দিয়েছে, আর যুবতীটি গলাটা চেপে ধরে তারস্বরে চীৎকার করছে।

ঘাড় ধরে সৈনিকটিকে একপাশে ঠেলে দিয়ে পিয়ের কর্কশ গলায় বলে উঠল, "মেয়েটিকে ছেড়ে দাও!"

সৈনিকটি মাটিতে পড়েই উঠে দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু তার বন্ধুটি বুটজোড়া ফেলে দিয়ে তলোয়ার বের করে রুদ্র মূর্তিতে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল।

চীৎকার করে বলল, "এদিকে তাকাও, একটিও বাজে কথা নয়!"

পিয়ের তখন এত রেগে গেছে যে সে সব কিছু ভুলে গেল, তার শক্তি যেন দশগুণ বেড়ে গেল। খালি পা ফরাসীটির দিকে ধেয়ে গিয়ে সে তলোয়ার তুলবার আগেই একঘুসিতে তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ঘুসির পর ঘুসি চালাতে লাগল। ভিড়ের ভিতর থেকে তার সহর্ষ জয়ধ্বনি উঠল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ফরাসী উহ্‌লানদের একটি অশ্বারোহীপাহারা-বাহিনী মোড় ঘুরে সেখানে এসে হাজির হল। উহ্‌লানরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পিয়ের

ও ফরাসী সৈনিকটিকে ঘিরে দাঁড়াল। তারপর কি হল কিছুই পিয়েরের মনে নেই। শুধু মনে আছে, সে যেন কাকে মারল, আর নিজেও তার হাতে মার খেল, এবং শেষ পর্যন্ত তার হাত দুটি বেঁধে ফেলা হল, এবং একদল ফরাসী সৈনিক তাকে ঘিরে ধরে তার শরীরটা খুঁজে খুঁজে দেখছে।

"লেফ্‌টেন্যাণ্ট-এর কাছে একখানা ছুরি আছে," সর্বপ্রথম এই কথাগুলিই পিয়ের বুঝতে পারল।

"অ্যাঁ, একটা অস্ত্র ?" এই কথা বলে অফিসার খালি পা সৈনিকটির দিকে মুখ ফেরাল ; তাকেও পিয়েরের সঙ্গেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। "ঠিক আছে, তোমার যা বক্তব্য তা সামরিক আদালতেই বলো।" সে পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। "তুমি ফরাসী বলতে পার ?"

রক্তবর্ণ চোখ তুলে পিয়ের চারদিকে তাকাল, কোন জবাব দিল না। তার মুখটা নিশ্চয় ভয়ংকর দেখাচ্ছে কারণ অফিসার ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলতেই আরও চারজন উহ্‌লান দল ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে পিয়েরের দুই পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

পিয়েরের বেশ কিছুটা দূরে থেকে অফিসার আবার শুধাল, "তুমি ফরাসী বলতে পার ?....দোভাষীকে ডাক।"

অসামরিক রুশ পোশাক পরা একটি ছোট-খাট মানুষ সেনাদলের ভিতর থেকে ঘোড়ায় চড়ে সামনে এগিয়ে এল। তার পোশাক ও কথা বলার ভঙ্গী দেখে পিয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাকে চিনতে পারল—লোকটি মস্কোর কোন দোকানের ফরাসী দোকানদার।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরকে লক্ষ্য করে দোভাষী বলল, "একে তো দেখে সাধারণ লোক বলে মনে হচ্ছে না।"

"আরে, একে তো দেখতে অবিকল ঘর জ্বালানিয়া লোকেরই মত। ওকে জিজ্ঞাসা কর ও কে।"

বাজে রুশ ভাষায় লোকটি শুধাল, "আপনি কে ? বড় কর্তার প্রশ্নের জবাব দিন।"

পিয়ের হঠাৎ ফরাসীতেই জবাব দিল, "আমি কে তা আপনাকে বলব না। আমি আপনার বন্দী—নিয়ে চলুন।"

অফিসার ভ্রূকুটি করে তো-তো করে বলল, "ও, ও ! বেশ, তাহলে অগ্রসর হও।"

উহ্‌লানদের ঘিরে একটা ভিড় জমে উঠেছে। পিয়েরের একেবারে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে একটি চাষী স্ত্রীলোক, সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে। সৈন্যরা সদলে রওনা হলে সে সামনে এগিয়ে গেল।

বলল, "ওরা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বাবা ? কিন্তু এই ছোট মেয়েটা, এই ছোট মেয়েটা যদি তার না হয় তাহলে একে নিয়ে আমি কি

করব ?"

"ওই স্ত্রীলোকটি কি চায় ?" অফিসার জানতে চাইল।

পিয়ের যেন নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। যে ছোট মেয়েটিকে সে উদ্ধার করেছে তাকে দেখে তার বড়ই আনন্দ হল।

সে অস্ফুট গলায় বলল, "ও কি চায় ?" ও আমার মেয়েটিকে নিয়ে এসেছে; এইমাত্র তাকে আমি আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়েছি।...বিদায়! এই উদ্দেশ্যহীন, মিথ্যা কথাটা কেমন করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল তা বুঝতে না পেরে সে বিজয়ীর দৃঢ় পদক্ষেপে ফরাসী সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল।

লুঠতরাজ থামাবার জন্য এবং বিশেষ করে যারা এই অগ্নিকাণ্ডের নায়ক—জনসাধারণের মতে তাদের বেশীর ভাগই সেদিন এসেছিল উর্ধ্বতন ফরাসী অফিসারদের ভিতর থেকেই—তাদের ধরবার জন্য দুরোস্‌নেল-এর হুকুমে মস্কোর বিভিন্ন রাস্তায় যেসব প্রহরীদল পাঠানো হয়েছিল, এই ফরাসী প্রহরীদল তাদেরই একটি। অনেক রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রহরীদল সন্দেহক্রমে আরও পাঁচজন রুশকে গ্রেপ্তার করল: একটি ছোট দোকানদার, দুটি ছাত্র, একজন চাষী ও একজন গৃহ-ভৃত্য; তাছাড়া কিছু লুঠেরাও ছিল। কিন্তু এইসব নানা ধরনের সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের মধ্যে পিয়েরকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল সবার চাইতে সন্দেহভাজন বলে। সেইরাতে তাদের সকলকে যখন নিয়ে আসা হল জুবভ প্রাচীরের উপরে অবস্থিত সেই বড় বাড়িটাতে যেটাকে রক্ষীনিবাস রূপে ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন কড়া পাহারায় পিয়েরকে রাখা হল সকলের থেকে আলাদা করে।

দ্বাদশ পর্ব

অধ্যায়—১

সেইসময় পিতার্সবুর্গের উপরমহলে ফরাসী রুমিয়ান্ত্‌সেভ, জারপন্থী মারিয়া ফীদরভ্‌না ও অন্যদের দলের মধ্যে একটা জটিল সংঘাত ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে, আর দরবার মহলের অলস মানুষদের গুনগুনানিতে সেটা চাপা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু পিতার্সবুর্গের শান্ত, বিলাসবহুল জীবন কেবলমাত্র বাস্তব জীবনের অপচ্ছায়া ও চিন্তা নিয়েই ব্যস্ত: সে জীবন তার পুরনো পথ ধরেই চলেছে; ফলে রুশ জনগণের বিপদ ও কঠিন অবস্থার কথা তাদের বোঝানো খুবই শক্ত। সেখানে চলেছে সেই একই অভ্যর্থনা-সভা ও বলনাচের আসর, ফরাসী থিয়েটার, রাজদরবারকে ঘিরে সেই স্বার্থ, চাকরি ও ষড়যন্ত্রের খেলা। কেবলমাত্র একেবারে উচ্চতম মহলে বাস্তব অবস্থার অসুবিধা-

গুলি স্মরণ করবার চেষ্টা হচ্ছে। এই কঠিন পরিস্থিতিতে দুই সম্রাজ্ঞীর ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহারের নানা গল্প সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। সম্রাজ্ঞী মারিয়ার একমাত্র চিন্তা তার পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা নানা দাতব্য ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ; সে নির্দেশ দিয়েছে, ঐসব প্রতিষ্ঠানকে কাজানে সরিয়ে নিতে হবে, আর তাদের জিনিসপত্র বাঁধাছাদাও হয়ে গেছে। অবশ্য সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তার কি নির্দেশ, তখন স্বভাবসিদ্ধ রুশ দেশপ্রেমের অনুপ্রেরণায় সে জবাব দিল, রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে কোন নির্দেশ সে দেবে না, কারণ সেটা রাষ্ট্রের ব্যাপার, তবে ব্যক্তিগতভাবে তার কথা হল—সে পিতার্সবুর্গ ছাড়বে একেবারে সকলের শেষে।

২৬শে অগস্ট, ঠিক বরদিনো যুদ্ধের দিনে, আন্না পাভ্‌লভ্‌নার বাড়িতে একটা সান্ধ্যসম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছে। মহাত্মা সের্গেইয়ের একটি দেবমূর্তি সম্রাটকে পাঠাবার সঙ্গে সঙ্গে মহামান্য বিশপ তাকে যে চিঠিখানি লিখেছে সেটা পাঠ করাই ঐ সম্মিলনীর প্রধান অনুষ্ঠান। বক্তা হিসাবে প্রিন্স ভাসিলির খ্যাতি আছে; চিঠিটা সেই পড়বে। আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সান্ধ্য বৈঠকে এধরনের পাঠের একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য সব সময়ই থাকে। সে আশা করছে সেদিন সন্ধ্যায় কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে; ফরাসী থিয়েটার দেখার জন্য তাদের লজ্জায় ফেলে তাদের মনে দেশাত্মবোধকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ইতিমধ্যেই অনেকে হাজির হয়েছে, কিন্তু যাদের উপস্থিতি সে আশা করছে তারা সকলে এসে না পৌঁছায় আন্না পাভ্‌লভ্‌না পাঠ শুরু করতে না দিয়ে একটা সাধারণ আলোচনা শুরু করে দিয়েছে।

পিতার্সবুর্গে সেদিনকার বড় খবর কাউণ্টেস বেজুখভার অসুখ। কয়েকদিন আগে সে অপ্রত্যাশিতভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে; সাধারণত যেসব বৈঠকের মধ্যমণি হয়ে সে বিরাজ করে সে রকমের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে সে হাজির হতে পারে নি, কারও সঙ্গে নাকি দেখাও করছে না, এবং পিতার্সবুর্গের যে-সব নামী ডাক্তাররা সাধারণত তার চিকিৎসা করে তাদের বদলে জনৈক ইতালীয় ডাক্তার একটা নতুন অসাধারণ পদ্ধতিতে তার চিকিৎসা করছে।

সকলে ভাল করেই জানে যে একই সঙ্গে দুই স্বামীকে বিয়ে করার অসুবিধার ফলেই এই মনোহারিণী কাউণ্টেসটি অসুস্থ হয়ে পড়েছে, আর ইতালীয় ডাক্তারটির চিকিৎসাই হচ্ছে সেই অসুবিধা দূর করা; কিন্তু আন্না পাভ্‌লভ্‌নার সম্মুখে সেকথা বলার, এমন কি সেকথা জানার ভাব দেখাবার সাহসও কারও নেই।

"সকলেই বলছে বেচারী কাউণ্টেস খুব অসুস্থ। ডাক্তার বলছে তার এন্‌জায়না পেক্টরিস হয়েছে।"

"এন্‌জায়না ? ওঃ, সে যে ভয়ানক অসুখ !"

"সকলে বলছে, এন্‌জায়নাকে ধন্যবাদ, দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এবার মিলন ঘটেছে"…।" মহাখুশির সঙ্গে সকলে "এন্‌জায়না" কথাটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগল।

"সকলে বলছে, বুড়ো কাউণ্টের অবস্থা শোচনীয়। ডাক্তার যখন বলল যে রোগীর অবস্থা বিপজ্জনক তখন সে শিশুর মত কেঁদেছে।"

"ওঃ, কী ভয়ঙ্কর ক্ষতিই না হবে ; তিনি তো একটি মনোহারিণী স্ত্রীরত্ন।"

ঠিক সেইসময় সেখানে হাজির হয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "আপনারা বেচারী কাউণ্টেসের কথা বলছেন ? খবর নিতে আমি লোক পাঠিয়েছিলাম, শুনলাম এখন কিছুটা ভাল। ওঃ, তিনি তো অবশ্যই পৃথিবীর মধ্যে সকলের চাইতে মনোরমা নারী। আমরা ভিন্ন দলের লোক, কিন্তু তাই বলে যে প্রশংসা তার প্রাপ্য তা তো জানাতেই হবে। তার ভাগ্যই খারাপ।"

বিখ্যাত ডাক্তারদের না ডেকে একজন হাতুড়ে দিয়ে তার চিকিৎসা করানো হচ্ছে বলে একটি অনভিজ্ঞ যুবক বিস্ময় প্রকাশ করল। আন্না পাভ্‌লভ্‌না সঙ্গে সঙ্গে তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "আপনি হয় তো আমার চাইতে ভাল খবর রাখেন, কিন্তু খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে আমি জেনেছি যে এই ডাক্তারটি খুব জ্ঞানী ও গুণী। তিনি স্পেনের রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক।"

এইভাবে যুবকটিকে বিধ্বস্ত করে দিয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌না আর একটা দলের কাছে এগিয়ে গেল। সেখানে বিলিবিন অস্ট্রীয়দের নিয়ে কথা বলছে আর একটা "রসিকতার" জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

"পেত্রপল-এর বীর" উইৎগেন্‌স্তিন ফরাসীদের কাছ থেকে যেসব অস্ট্রীয় পতাকা হস্তগত করেছিল সেগুলি ভিয়েনায় পাঠাবার সময় তার সঙ্গে যে কূটনৈতিক চিঠিটি পাঠানো হয়েছিল তার উল্লেখ করে বিলিবিন বলল, "আমি তো মনে করি চিঠির মন্তব্যটি মজাদার।"

"কি ? সেটা কি ?" আন্না পাভ্‌লভ্‌না শুধাল।

নিজের লেখা সেই কূটনৈতিক চিঠির আসল বয়ানটিই সে বলে দিল।

"সম্রাট এই অস্ট্রীয় পতাকাগুলি ফেরৎ পাঠাচ্ছেন ; বিপথে যাওয়া বন্ধুত্বপূর্ণ পতাকাগুলিকে ভুল পথের উপর পাওয়া গিয়েছিল," কথাগুলি শেষ করার পরে বিলিবিনের কুঞ্চিত ভুরু আবার সমান হয়ে গেল।

"চমৎকার ! চমৎকার !" প্রিন্স ভাসিলি মন্তব্য করল।

প্রিন্স হিপোলিত অপ্রত্যাশিতভাবে উঁচু গলায় বলল, "ওয়ারস যাবার পথ বোধ হয়।" কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে সকলেই তার দিকে তাকাল। প্রিন্স হিপোলিতও পুলকিত বিস্ময়ে চারদিকে তাকাল। নিজের কথাগুলির অর্থ সে নিজেও ভাল করে জানে না। কূটনৈতিক চাকরি-জীবনে যে অনেকবার

লক্ষ্য করেছে যে এই ধরনের আকস্মিক উক্তিকে সকলেই বুদ্ধির পরিচায়ক বলে মনে করে। যাই হোক, এই সময় আন্না পাভ্‌লভ্‌না যার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই দেশাত্মবোধ-হীন লোকটি ঘরে ঢুকল, আর সেও হেসে প্রিন্স হিপোলিতের দিকে একটা আঙুল নেড়ে প্রিন্স ভাসিলিকে টেবিলের কাছে ডেকে নিয়ে গেল; তার হাতে তুটো মোমবাতি ও পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে পাঠ শুরু করতে বলল। সকলেই নীরব হয়ে গেল।

প্রিন্স ভাসিলি পড়তে লাগল: "মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধান ও সম্রাট! মা যে-ভাবে আকুল সন্তানদের কোলে টেনে নেন, আমাদের প্রাচীন রাজধানী, নব জেরুজালেম মস্কোও সেইভাবে বরণ করছে তার খৃস্টকে"—"তার" কথাটাকে সে বিশেষ জোর দিয়ে পড়ল—"এবং কুয়াশার আবরণের ভিতর দিয়ে আপনার শাসনকালের উজ্জ্বল গৌরব প্রত্যক্ষ করে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় গেয়ে উঠেছে, "হোসান্না; যিনি আসছেন তিনিই ধন্য!"

প্রিন্স ভাসিলি শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করল অশ্রুপূর্ণ স্বরে।

বিলিবিন মনোযোগ দিয়ে তার নখগুলি পরীক্ষা করতে লাগল। অন্য অনেককে দেখে মনে হল তারা যেন ভয় পেয়েছে। আন্না পাভ্‌লভ্‌না পরবর্তী কথাগুলিকে ফিস্‌ফিস্‌ করে আগাম বলে দিল: "ফ্রান্সের সীমান্ত হতে আগত সাহসী ও উদ্ধত গোলিয়াত...."

প্রিন্স ভাসিলি পড়তে লাগল।

"ফ্রান্সের সীমান্ত হতে আগত সাহসী ও উদ্ধত গোলিয়াত মৃত্যুবাহী ত্রাস দিয়ে রাশিয়াকে ঢেকে দিক; রুশ ডেভিডের হাতের গুল্‌তি স্বরূপ বিনীত বিশ্বাস সহসা আঘাত করবে তার রক্ত পিপাসু গর্বোদ্ধত শিরে। ঈশ্বরের সেবক এবং প্রাচীনকালে আমাদের দেশের দুর্দিনের ত্রাণকর্তা মহাত্মা সের্গেইর দেবমূর্তিটি ইয়োর ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির হাতে অর্পণ করা হল। ঈশ্বরের কাছে আমার এই একান্ত প্রার্থনা, সর্বশক্তিমান যেন এই ন্যায়বান জাতির মাথা উঁচু রাখেন, করুণা করে ইয়োর ম্যাজেস্টির মনোবাসনা পূর্ণ করেন।"

"কী জোর! কী রচনা ভঙ্গী!" পাঠক ও লেখক দুয়েরই প্রশংসা-বাক্য উচ্চারিত হতে লাগল।

এই পাঠ শুনে উৎসাহিত হয়ে আন্না পাভ্‌লভ্‌নার অতিথিরা অনেকক্ষণ ধরে পিতৃভূমির অবস্থা নিয়ে আলোচনা করল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই যে যুদ্ধ হবে তার ফলাফল নিয়ে নানারকম অনুমান করতে লাগল।

আন্না পাভ্‌লভ্‌না বলল, "ঠিক দেখবেন, আগামী কাল সম্রাটের জন্ম-দিনেই আমরা খবর পাব। আমার মনের পূর্বাভাষ কিন্তু অনুকূল!"

অধ্যায়—২

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার পূর্বাভাষ বাস্তবে রূপায়িত হল। পরদিন সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রাসাদ-গির্জায় যে প্রার্থনা-অনুষ্ঠান ছিল সেখানে প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে গির্জার বাইরে ডেকে এনে প্রিন্স কুতুজভের একটা চিঠি দেওয়া হল। যুদ্ধের দিনেই ততারিনভা থেকে কুতুজভ একটা প্রতিবেদন পাঠিয়েছে। লিখেছে, রুশ সৈন্যরা এক পাও হটে যায় নি, আমাদের চাইতে ফরাসীদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশী, আর পুরো তথ্য সংগ্রহ না করেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাড়াতাড়িতে সে এই চিঠি লিখছে। বোঝাই যাচ্ছে যে জয়লাভ হবেই। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা ছেড়ে চলে আসার আগেই সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানানো হল তাঁর সহায়তা ও জয়লাভের জন্য।

আন্না পাভ্‌লভ্‌নার মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে। সারা সকাল শহরের বুকে একটা সানন্দ উৎসবের হাওয়া বইতে লাগল। সকলেই বিশ্বাস করল যে জয় সম্পূর্ণ হয়েছে, কেউ কেউ নেপোলিয়নের গ্রেপ্তার হওয়া, তার সিংহাসনচ্যুতি এবং ফ্রান্সের নতুন শাসনকর্তা মনোনয়নের কথাও বলতে লাগল।

দরবারের সভাসদদের এই খুশির দুটি কারণ—সম্রাটের জন্মদিনে পাওয়া সংবাদ এবং জয়লাভের ঘটনা। এ যেন একটা সার্থক পরিকল্পনাপ্রসূত বিস্ময়। কুতুজভের প্রতিবেদনে রুশ ক্ষয়-ক্ষতিরও উল্লেখ ছিল; ছিল তুচ্‌কভ্‌, ব্যাগ্রেশন ও কুতাসভ-এর নাম। অবশ্য পিতার্সবুর্গ মহলে এই দুঃখজনক ব্যাপারটার একটি মাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আলোচনা চলতে লাগল: সেটা কুতাসভ-এর মৃত্যু। প্রত্যেকে তাকে চিনত, সম্রাট তাকে পছন্দ করত, সে ছিল বয়সে নবীন ও আকর্ষণীয়। সেদিন প্রত্যেকের মুখে একটি কথাই শোনা গেল:

"কী আশ্চর্য যোগাযোগ! ঠিক প্রার্থনা-অনুষ্ঠানের সময়েই। কিন্তু কুতাসভ কী ক্ষতিটাই না করে গেল। কত যে দুঃখ পেয়েছি!"

ভবিষ্যদ্বক্তার গর্ব নিয়ে ভাসিলি বলল, "কুতুজভ সম্পর্কে আপনাদের আমি কি বলেছিলাম? আমি আগাগোড়াই বলে এসেছি যে সেই একমাত্র লোক যে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করতে সক্ষম।"

কিন্তু পরের দিন সেনাদল থেকে কোন সংবাদ এল না। জনসাধারণের মনে উদ্বেগ দেখা দিল। উৎকণ্ঠায় সম্রাটের দুঃখ বাড়তে লাগল; দুঃখ বাড়ল সভাসদদেরও।

"সম্রাটের অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন!" তারা বলাবলি করতে লাগল; আর আগের দিনের মত কুতুজভের প্রশংসায় পঞ্চমুখ না হয়ে সম্রাটের এই উৎকণ্ঠার জন্য তাকেই দোষী করল। প্রিন্স ভাসিলিও সেদিন কুতুজভকে নিয়ে গর্ব প্রকাশ করতে পারল না; প্রধান সেনাপতির প্রসঙ্গ উঠলেই চুপ করে থাকল। সন্ধ্যার দিকে আর একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ এই উৎকণ্ঠার সঙ্গে যুক্ত হল। সেই ভয়ঙ্কর অসুখেই কাউন্টেস হেলেন বেজুখভা হঠাৎ মারা গেছে।

বড় বড় জনসমাবেশে সরকারীভাবে সকলেই বলল যে অ্যান্জায়না পেক্টোরিসের আক্রমণেই কাউন্টেস বেজুখভার মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু ঘনিষ্ঠ মহলে বিস্তারিত আলোচনা চলতে লাগল যে স্পেনের রাণীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক বিশেষ ফল পাবার জন্য একটি বিশেষ ওষুধ অল্প মাত্রায় খেতে দিয়েছিল; কিন্তু বুড়ো কাউন্ট তাকে সন্দেহ করত বলে এবং স্বামী তার চিঠির কোন জবাব দিত না বলে (হতভাগ্য, দুশ্চরিত্র পিয়ের) যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে হেলেন হঠাৎ সেই ওষুধটা বেশী মাত্রায় খেয়ে ফেলে এবং তার ফলেই কোনরকম চিকিৎসার আগেই তীব্র যন্ত্রণায় তার মৃত্যু হয়েছে। আরও বলা হচ্ছে, প্রিন্স ভাসিলি ও বুড়ো কাউন্ট ইতালীয় ডাক্তারটির উপর ক্ষেপে গিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তার হতভাগিনী মৃতার এমন সব চিঠি তাদের দেখিয়েছে যে তারা আর এ নিয়ে কোনরকম উচ্চবাচ্য করে নি।

তিনটি দুঃখজনক ঘটনা নিয়েই সর্বত্র আলোচনা চলতে লাগল: সম্রাট কোন সংবাদ পাচ্ছে না, কুতুজভের মৃত্যু হয়েছে, আর হেলেন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে।

কুতুজভের প্রতিবেদনের পরবর্তী তৃতীয় দিনে একজন গ্রাম্য ভদ্রলোক মস্কো থেকে এসে পৌঁছলে ফরাসীদের কাছে মস্কোর আত্মসমর্পণের খবর শহরময় রটে গেল। অবস্থা ভয়ঙ্কর! সম্রাটের কী অবস্থা! কুতুজভ বিশ্বাসঘাতক; মেয়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে যারাই প্রিন্স ভাসিলির সঙ্গে দেখা করতে আসছে তাদের কাছেই পূর্বেকার কুতুজভের প্রশংসার কথা ভুলে গিয়ে তার সম্পর্কে সে বলতে লাগল, একটি অন্ধ, অকর্মণ্য বৃদ্ধের কাছ থেকে এছাড়া অন্য কিছু আশা করাই অসম্ভব ছিল।

"আমি শুধু এই ভেবে অবাক হই যে এরকম একটা লোকের হাতে রাশিয়ার ভাগ্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।"

যতক্ষণ পর্যন্ত সংবাদটা বেসরকারী স্তরে ছিল ততক্ষণ তবু তাকে সন্দেহ করার একটা সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পরদিন কাউন্ট রস্তপ্‌চিনের কাছ থেকে এই চিঠি পাওয়া গেল:

"প্রিন্স কুতুজভের অ্যাড্জুটাণ্ট আমাকে যে চিঠিটা এনে দিয়েছে তাতে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন—পুলিশ অফিসাররা যেন সেনাদলকে রিয়াজান রোড ধরে পরিচালিত করেন। তিনি লিখেছেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে তিনি মস্কো পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন। মহাশয়! কুতুজভের কাজের ফলে রাজধানীর ও আপনার সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ণীত হয়ে গেল! যে নগর রাশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রভূমি, যে নগরে আপনার পিতৃপুরুষের ভস্ম সমাহিত হয়ে আছে, সেই নগর পরিত্যাগের সংবাদ শুনে সারা রাশিয়া শিউরে উঠবে। আমি সেনাবাহিনীকেই অনুসরণ করব। সব কিছুই সরিয়ে দিয়েছি; এখন পিতৃভূমির ভাগ্যের জন্য অশ্রুজলই আমার একমাত্র সম্বল।"

এই চিঠি পেয়ে সম্রাট নিম্নলিখিত আদেশসহ প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে কুতুজভের কাছে পাঠাল :

"প্রিন্স মাইকেল ইলারিয়োনভিচ! ২১ শে অগস্টের পরে আপনার কাছ থেকে আর কোন চিঠি পাই নি, অথচ ১লা সেপ্টেম্বর ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এর মারফৎ মস্কোর প্রধান সেনাপতির কাছ থেকে এই দুঃখজনক সংবাদ আমি পেয়েছি যে আপনি সসৈন্যে মস্কো পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সংবাদের কি প্রতিক্রিয়া আমার উপর হয়েছে তা আপনি নিজেই কল্পনা করতে পারেন; আপনার নীরবতা আমার বিস্ময়কে আরওবাড়িয়ে তুলেছে। সেনাবাহিনীর বর্তমান পরিস্থিতি এবং যে কারণে এই দুঃখজনক সিদ্ধান্ত নিতে আপনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য শুনবার জন্য অ্যাডজুটাণ্ট-জেনারেল প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কিকে দিয়ে এই চিঠি পাঠালাম।"

অধ্যায়—৩

মস্কো পরিত্যাগের ন'দিন পরে সেই ঘটনার সরকারী ঘোষণাপত্র নিয়ে কুতুজভের এক দূত পিতার্সবুর্গে এসে পৌঁছল। ওই ফরাসী দূত মিচদ রুশ ভাষা জানত না; নিজের সম্পর্কে সে বলত, বিদেশী হলেও সে মনে-প্রাণে রুশ।

স্টোন দ্বীপের রাজপ্রাসাদের পাঠকক্ষে সম্রাট সঙ্গে সঙ্গে তার সঙ্গে দেখা করল। অভিযানের আগে মিচদ কখনও মস্কো দেখে নি, সে রুশ ভাষাও জানে না, তথাপি প্রদগ্ধ মস্কোর আগুনের শিখায় সারা পথ এসে মহামান্য সম্রাটকে মস্কোর ভস্মীভূত হবার কথা জানাতে সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। তার বিষণ্ণ মুখ দেখেই সম্রাট শুধাল, "আপনি কি কোন খারাপ সংবাদ এনেছেন কর্ণেল ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখ নীচু করে মিচদ বলল, "খুব খারাপ খবর মহাশয়। মস্কো পরিত্যক্ত হয়েছে।"

'সম্রাটের মুখ হঠাৎ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল; সে সঙ্গে সঙ্গে শুধাল, "তারা কি বিনা যুদ্ধে আমার রাজধানী ছেড়ে এসেছে ?"

মিচদ সসম্মানে কুতুজভের বাণীটিই তার কাছে প্রকাশ করল: মস্কোতে যুদ্ধ করা ছিল অসম্ভব; সেনাবাহিনী ও মস্কো দুটোকেই হারানো অথবা শুধু মস্কোকে হারানো—মাত্র এই দুটি বিকল্পই সামনে ছিল, আর ফিল্ড-মার্শাল দ্বিতীয়টি বেছে নিয়েছে।

মিচদের দিকে না তাকিয়েই সম্রাট নীরবে তার কথা শুনল।

জানতে চাইল, "ফরাসীরা কি নগরে প্রবেশ করেছে ?"

"হ্যাঁ মহাশয়, মস্কো এখন ভস্মে পরিণত হয়েছে। আমি যখন মস্কো ছেড়ে আসি তখন সারা নগর জ্বলছে," দৃঢ়কণ্ঠে মিচদ জবাব দিল, কিন্তু তারপরেই

সম্রাটের দিকে তাকিয়ে সে কৃতকর্মের জন্য ভীত হয়ে পড়ল।

সম্রাট শ্বাস টানছে দ্রুত, অতি দ্রুত, তার নীচের ঠোঁটটি কাঁপছে, দুটি নীল চোখ সঙ্গে সঙ্গে জলে ভরে উঠেছে।

কিন্তু সে মুহূর্তের ঘটনা। হঠাৎ তার চোখ ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল, যেন এই দুর্বলতা প্রকাশের জন্য নিজেকেই দোষী করছে। মাথা তুলে দৃঢ়স্বরে মিচদকে বলল :

"যা কিছু ঘটছে তা থেকেই বুঝতে পারছি কর্ণেল যে আমাদের প্রভূত ত্যাগ স্বীকার করানোই বিধাতার ইচ্ছা।....সর্বব্যাপারে তাঁর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করতে আমি প্রস্তুত : কিন্তু মিচদ, আমাকে বলুন, তাদের চোখের সামনে যখন আমার প্রাচীন রাজধানী বিনা যুদ্ধে পরিত্যক্ত হল তখন সেনাদলকে আপনি কি অবস্থায় দেখে এলেন? কোন সাহসের অভাব কি আপনি লক্ষ্য করেছেন?...."

মিচদ যখন দেখল যে মহামান্য নৃপতি শান্ত হয়েছে, তখন সেও শান্ত হল, কিন্তু সম্রাটের সোজাসুজি প্রশ্নের যে সোজাসুজি জবাব দেওয়া দরকার তার জন্য তখনই নিজেকে প্রস্তুত করতে পারল না।

সময় কাটাবার জন্য প্রশ্ন করল, "মহাশয়, একজন রাজভক্ত সৈনিকের পক্ষে উপযুক্তভাবে খোলাখুলি কথা বলবার অনুমতি কি আমাকে দেবেন?"

সম্রাট জবাব দিল, "সবসময় আমি তাই চাই কর্ণেল। আমার কাছে কিছুই লুকোবেন না, প্রকৃত অবস্থাটা আমি জানতে চাই।"

মনে মনে একটা সদুত্তর তৈরি করে ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে মিচদ বলল, "মহাশয়, আমি যখন সেনাদলকে ছেড়ে চলে আসি তখন প্রধানতম ব্যক্তি থেকে নিম্নতম সৈনিকটি পর্যন্ত প্রত্যেককেই দেখেছি এক বেপরোয়া, যন্ত্রণাদীর্ণ আতংকে...."

কঠোর ভ্রূভঙ্গীসহকারে সম্রাট তাকে বাধা দিল, "সে কি? দুর্ভাগ্য কি আমার রুশ সেনাদলের মনোবলও ভেঙে দেবে?...কখনও না।"

নিজের তৈরি-করা কথাগুলি বলার জন্য মিচদ এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিল।

সসম্ভ্রমে বলল, "মহাশয়, আপনার সরল হৃদয়ের বশে পাছে আপনি সন্ধি করতে সম্মত হন এটাই তাদের একমাত্র ভয়।" রুশ জাতির এই প্রতিনিধিটি সগর্বে ঘোষণা করল, "যুদ্ধের জন্য এবং তারা যে আপনার প্রতি কত অনুরক্ত নিজেদের জীবন দিয়ে সেটা প্রমাণ করবার জন্য তাদের বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে..."

"আঃ।" পরম নিশ্চিন্ত হয়ে দু'চোখে মমতার আলো ফুটিয়ে সম্রাট মিচদের কাঁধটা চাপড়ে দিল। "আপনি আমাকে বড়ই স্বস্তি দিলেন কর্ণেল।"

মাথা নীচু করে সম্রাট কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

তারপরেই সোজা হয়ে বসে মিচদকে উদ্দেশ করে রাজকীয় ভঙ্গীতে বলল, "বেশ, তাহলে সেনাদলে ফিরে যান ; যেখানেই যাবেন সেখানেই আমার সাহসী সৈনিক ও ভাল মানুষ প্রজাদের বলবেন, যখন আর একটি সৈনিকও অবশিষ্ট থাকবে না তখন আমি স্বয়ং আমার প্রিয় অভিজাত সম্প্রদায় ও চাষীদের নেতৃত্ব দেব, আমার সাম্রাজ্যের শেষ শক্তিটুকুকেও কাজে লাগাব।" ক্রমাগত উজ্জীবিত হয়ে সম্রাট বলতে লাগল, "আমার দেশ যে এখনও আমাকে কী দিতে পারে সে ধারণা শত্রুর নেই।" আবেগোচ্ছল সুন্দর চোখ দুটি আকাশের দিকে তুলে বলল, "কিন্তু বিধাতার যদি এই বিধান হয় যে আমার পিতৃ-পুরুষের সিংহাসনে আমার বংশধররা আর বসবে না, তাহলে আমার যথাসর্বস্ব নিঃশেষ করে দিয়ে এতদূর পর্যন্ত দাড়ি গজিয়ে (বুকের অর্ধেকটা পর্যন্ত দেখাল) আমার দীনতম প্রজার সঙ্গে একসাথে বসে শুধু আলু খাব, তবু আমার দেশের এবং আমার প্রিয় মানুষদের অসম্মানে স্বাক্ষর করব না।"

উত্তেজিত কণ্ঠে এই কথাগুলি বলে বুঝি বা নিজ চোখের উদগত অশ্রুকে মিচদের কাছ থেকে লুকোবার জন্যই সম্রাট সহসা মুখটা ঘুরিয়ে ঘরের এক কোণে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে সম্রাট মিচদের কাছে ফিরে গেল এবং তার কনুইএর নীচে ধরে প্রবল বেগে ঝাঁকুনি দিতে লাগল। সম্রাটের সুদর্শন মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে ; দৃঢ় সংকল্পে ও ক্রোধে চোখ দুটি জ্বলছে।

"কর্ণেল মিচদ, আজ যা বললাম সেকথা ভুলে যাবেন না, হয় তো একদিন আনন্দের সঙ্গে কথাগুলি আমরা স্মরণ করতে পারব....হয় নেপোলিয়ন, না হয় আমি," বুকে হাত দিয়ে সম্রাট বলল "দুজন এক সঙ্গে আর আমরা রাজত্ব করতে পারি না। তাকে আমি চিনতে পেরেছি ; সে আমাকে আর ঠকাতে পারবে না..."

ভুরু কুঁচকে সম্রাট থামল।

এইসব কথা শুনে এবং সম্রাটের চোখে দৃঢ় সংকল্পের আভাব দেখে মিচদ—বিদেশী হলেও যে মনে-প্রাণে রুশ—সেই মহামুহূর্তটিতে অনুভব করল যে কথাগুলি তাকে সম্মোহিত করেছে, এবং যে রুশ জাতির প্রতিভূ বলে সে নিজেকে মনে করে তাদের এবং নিজের মনোভাবকে নিম্নোক্ত ভাষায় প্রকাশ করল :

"মহাশয় ! এই মুহূর্তে ইয়োর ম্যাজেস্টি স্বাক্ষর করলেন জাতির গৌরব ও ইওরোপের মুক্তির দলিলে !"

মাথাটা কাত করে সম্রাট তাকে বিদায় দিল।

অধ্যায়—৪

আমরা যারা সেই সব দিনগুলিতে বেঁচে ছিলাম না তাদের পক্ষে এটা

কল্পনা করা স্বাভাবিক যে অর্ধেক রাশিয়া যখন বিজিত হয়েছে, তার অধিবাসীরা যখন দূর দূর দেশে পালিয়ে যাচ্ছে, পিতৃভূমি রক্ষার জন্য যখন একটার পর একটা বাধ্যতামূলক সেনাদল গড়ে তোলা হচ্ছে, তখন উচ্চতম থেকে নিম্নতম মর্যাদার সমস্ত রুশ অধিবাসী নিজেদের বিসর্জন দিচ্ছে, পিতৃভূমিকে রক্ষা করছে, আর না হয় তো তার পতনে চোখের জল ফেলছে। সে সময়কার কাহিনী ও বিবরণে ব্যতিক্রমবিহীনভাবে শুধুমাত্র রুশদের আত্ম-ত্যাগ, দেশাত্মবোধ, হতাশা, দুঃখ, বীরত্বের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা সেরকম ছিল না। আমাদের কাছে সেইরকমই মনে হয় কারণ আমরা শুধু দেখি তৎকালীন ঐতিহাসিক স্বার্থ, সমকালীন মানুষের যেসব ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল সেদিকে নজর দেই না। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে সেই মুহূর্তের ব্যক্তিগত স্বার্থগুলি সাধারণ স্বার্থকে এত বেশী মাত্রায় ছাড়িয়ে যায় যে তার ফলে সাধারণ স্বার্থগুলিকে আমরা না পারি বুঝতে, না পারি দেখতে। তৎকালীন অধিকাংশ মানুষই ঘটনার সাধারণ অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি না দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছে, আর তৎকালে তাদের কার্যকলাপই ছিল সবচাইতে দরকারি।

যারা সাধারণ ঘটনাপ্রবাহকে বুঝতে এবং আত্মত্যাগ ও বীরত্বের সঙ্গে তাতে অংশ নিতে চেষ্টা করল, তারা সব কিছুকেই দেখল উল্টো করে, আর সাধারণের ভালর জন্য যা কিছু করল সবই অদরকারি ও নির্বোধের কাজ হয়ে দেখা দিল—যেমন পিয়ের ও মমোনভএর রেজিমেন্টগুলি রুশ গ্রামগুলিতে লুঠতরাজ চালাল, আর তরুণীরা ঘরে ঘরে যেসব ব্যাণ্ডেজ তৈরি করল তা কোনদিন আহতদের কাছে পৌঁছল না, ইত্যাদি। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে জ্ঞান-বৃক্ষের ফলভক্ষণের উপর যে নিষেধাজ্ঞা প্রচলিত আছে সেটাই বিশেষভাবে প্রযোজ্য। একমাত্র অচেতন কাজকর্মগুলিই ফলপ্রসূ হয়, আর যে মানুষ ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশ গ্রহণ করে সে কদাপি তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারে। সে চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়।

তৎকালীন রাশিয়ার ঘটনাবলীর সঙ্গে যে মানুষ যত বেশী ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিল তার তাৎপর্য সে তত কম বুঝেছে। পিতার্সবুর্গে এবং মস্কো থেকে অনেক দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে মহিলা ও অসামরিক ইউনিফর্মধারী ভদ্রজনরা রাশিয়া ও তার রাজধানীর জন্য চোখের জল ফেলল, আত্মত্যাগের কথা বলল; কিন্তু যে সেনাবাহিনী মস্কো ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা মস্কো নিয়ে কথাবার্তা বা চিন্তা ভাবনা থোরাই করেছিল; মস্কোর অগ্নিদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ আবার যখন তাদের দৃষ্টিগোচর হল, তখন ফরাসীদের উপর প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা কেউ নিল না, বরং তারা শুধু ভেবেছিল নিজেদের বেতন, বাসস্থান, মদবিক্রিকারিণী মাত্রিস্কা, ও অন্য সব অনুরূপ কথা।

যুদ্ধের চাকরিতে লিপ্ত হবার পরে নিকলাস রস্তভও দেশরক্ষার কাজে

ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন ধরে অংশ নিল, কিন্তু তার মনে আত্মত্যাগের কোন উদ্দেশ্য না থাকায় রাশিয়ার ঘটনাবলীকে সে দেখেছে নৈরাশ্যহীনভাবে, আর তা নিয়ে সে নিজে কোনরকম মাথাও ঘামায় নি। তার বক্তব্য, মাথা ঘামাবার জন্য তো কুতুজভ ও অন্যরাই রয়েছে।

এইরকম মানসিক অবস্থার মধ্যেই সে জানতে পারল যে তার ডিভিসনের জন্য ঘোড়া কিনতে তাকে ভরোনেঝ পাঠানো হবে। খবর পেয়ে যুদ্ধে যোগ দিতে না পারার জন্য কোনরকম দুঃখ তো তার হলই না, বরং সে খুব খুশিই হল; আর সেকথা সে গোপনও করল না।

বরদিনোর যুদ্ধের কয়েকদিন আগে প্রয়োজনীয় টাকাপয়সা ও ক্ষমতাপত্র হাতে পেয়ে কয়েকজন হুজারকে আগাম পাঠিয়ে দিয়ে নিজে ডাক-ঘোড়ার সঙ্গে ভরোনেঝ, যাত্রা করল।

সেনাদল কর্তৃক অশ্বাদি পশুর খাদ্যসংগ্রহের কার্যকলাপ, খাদ্যবাহী ট্রেনের চলাচল ও হাসপাতালসমাকীর্ণ অঞ্চল থেকে দূরে চলে যেতে পারার কী অপার আনন্দ যে নিকলাস পেল তা শুধু সেই বুঝবে যার নিজের সে অভিজ্ঞতা হয়েছে—অর্থাৎ একাদিক্রমে কয়েকটা মাস যাকে কাটাতে হয়েছে অভিযান ও যুদ্ধের পরিবেশের মধ্যে। সৈন্য, মালগাড়ি ও শিবিরের নোংরা পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে সে যখন গ্রামের মধ্যে পৌঁছে গেল, দেখতে পেল চাষী স্ত্রী-পুরুষ, ভদ্র লোকদের পল্লীভবন, মাঠে মাঠে গরু-মোষ চড়ছে, ডাক-ঘরে স্টেশন-মাস্টাররা ঘুমচ্ছে, তখন তার এত আনন্দ হল যেন এসব বস্তু সে এই প্রথম দেখছে। অনেক সময় পর্যন্ত যা তাকে বিশেষভাবে বিস্মিত ও আনন্দিত করল তা হল—স্বাস্থ্যবতী তরুণীদের পিছনে ডজন-ডজন অফিসার এখানে ঘুর-ঘুর করছে না; বরং একজন অফিসার পথে যেতে যেতে তাদের সঙ্গে হাসি-তামাশা করায় তারা বেশ খুশিই হচ্ছে।

খুব খুশি মনে রাতের বেলা নিকলাস ভরোনেঝ-এর একটা হোটেলে উঠল, শিবির-জীবনে অনেকদিন যেসব জিনিস পায় নি তার হুকুম দিল, এবং পরদিন পরিষ্কার করে কামিয়ে অনেকদিন পরে পুরো ইউনিফর্ম পরে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেল।

বেসামরিক বাহিনীর কম্যাণ্ডার একজন বৃদ্ধ জেনারেল; নিজের সামরিক খেতাব ও পদমর্যাদায় খুব খুশি। বেশ গুরু-গম্ভীর ভঙ্গীতে সে নিকলাসের কাছ থেকে যুদ্ধের খবরাখবর জেনে নিল। নিকলাসও খোস মেজাজে ছিল বলে তার এই ব্যবহারে সেও বেশ মজাই পেল।

সেখান থেকে সে গেল শাসনকর্তার কাছে। লোকটি ছোটখাট, সরল, অমায়িক। নিকলাসকে একটা আস্তাবলের খবর দিল, শহরের একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী ও শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরের জনৈক ঘোড়ার মালিক জোতদারের নাম বলে দিল এবং সর্বপ্রকারে তাকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল।

বিদায় দেবার সময় শাসনকর্তা বলল, "আপনি কাউণ্ট ইলিয়া রস্তভের ছেলে? আমার স্ত্রী আপনার মার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা সকলে মিলিত হই—আজই তো বৃহস্পতিবার, কাজেই দয়া করে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন।"

সেখান থেকে ফিরেই ডাক-ঘোড়া ভাড়া করে, স্কোয়াড্রন কোয়ার্টার মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে নিকলাস চৌদ্দ মাইল দূরের জোতদার ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

জোতদার ভদ্রলোক অবিবাহিত, প্রাক্তন অশ্বারোহী সৈনিক, অশ্বানুরাগী, ক্রীড়াবিদ; বেশ কিছু একশ' বছরের পুরনো ব্র্যাণ্ডি ও কিছু পুরনো হাঙ্গেরীয় মদের মালিক।

সামান্য কথাবার্তার পরেই নিকলাস ছ'হাজার রুবল দামে সতেরোটি বাছাই ঘোড়া কিনে ফেলল। আহারাদির পরে একটু বেশী মাত্রায় হাঙ্গেরীয় মদ পেটে ঢেলে নিকলাস বিদায় নিল। এর মধ্যেই লোকটির সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। বিদায়ের আগে পরস্পরকে চুমো খেয়ে নিকলাস সেই শোচনীয় রাস্তায় গাড়ি ছুটিয়ে দিল। কোচয়ানকে বার বার তাগাদা দিতে লাগল যাতে যথাসময়ে শাসনকর্তার মজলিসে পৌঁছনো যায়।

পোশাক ছেড়ে, মাথায় জল ঢেলে, আতর মেখে, নিকলাস যখন শাসনকর্তার বাড়িতে পৌঁছল তখন বেশ দেরি হয়ে গেছে; ঢুকতে ঢুকতেই বলল, "একেবারে না আসার চাইতে দেরিতে আসাও ভাল।"

বলনাচের আসর নয়, নাচের কথা ঘোষণাও করা হয় নি, কিন্তু সকলেই জানে যে ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না ক্ল্যাভিকর্ডে ভাল্‌স্‌ ও একোসাস বাজাবে, নাচও হবে; তাই সকলেই সেজন্য তৈরি হয়েই এসেছে।

১৮১২ সালের মফঃস্বলের জীবনযাত্রা যথাপূর্বভাবেই চলেছে; শুধু তফাতের মধ্যে মস্কো থেকে অনেক সম্পন্ন পরিবার সেখানে চলে আসায় জীবনযাত্রা অধিকতর প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে এবং রাশিয়ার অন্য সব জায়গার মতই একটা বিশেষ রকমের বেপরোয়া "যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন ভাব" দেখা দিয়েছে; ফলে সাধারণ কথাবার্তায় আবহাওয়া ও কুশল-বিনিময়ের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে মস্কো, সেনাদল ও নেপোলিয়ন।

ভরোনেঝের সেরা মানুষরাই শাসনকর্তার বাড়িতে জমায়েত হয়েছে।

হুজার ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে চারদিকে আতর ও মদের সুগন্ধ ছড়িয়ে যেমুহূর্তে নিকলাস ঘরে ঢুকল এবং মুখে উচ্চারণ করল "একেবারে না আসার চাইতে বিলম্বে আসাও ভাল" আর অন্য অনেকের মুখে কথাটার পুনরাবৃত্তি হল, সঙ্গে সঙ্গেই সকলে তাকে ঘিরে ধরল; সকলেরই দৃষ্টি তার উপর। নিকলাসের মন বলল, এখানে এসে যথাযোগ্য স্থানটি সে পেয়েছে—সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়েছে: দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের পরে এ পরিস্থিতি বড়ই মনোরম,

একেবারে নেশা ধরিয়ে দেবার মত। ডাক-ঘাঁটিতে, সরাইখানায়, জোতদারের ঘরে—সর্বত্রই কুমারীরা তাকে দর্শন করে কৃতার্থ হয়েছে; এখানে শাসনকর্তার মজলিসেও বিবাহিত ও অবিবাহিত অসংখ্য সুন্দরী তরুণী তার একটুখানি চোখের চাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে আছে। প্রথম দিনেই নারী ও বালিকারা তার সঙ্গে হাসি-খেলায় মেতেছে, আর এই সুদর্শন বেপরোয়া হুজার যুবকটিকে কেমন করে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করা যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। তাদের মধ্যে শাসনকর্তার স্ত্রীও একজন; সে তো প্রথম থেকেই রস্তভকে নিকট আত্মীয় হিসাবে গ্রহণ করে তাকে "নিকলাস" বলে ডাকতে শুরু করেছে।

সত্যি সত্যি ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না ভাল্‌স্‌ ও একোসাস বাজাল এবং নাচও চলল। সে নাচে অংশ নিয়ে নিকলাস তার সাবলীল দেহভঙ্গীতে মফঃস্বল শহরটিকে আরও বেশী মুগ্ধ করে ফেলল। এমন কি নিকলাস নিজেও সে রাতে নিজের নাচ দেখে নিজেই অবাক হয়ে গেল। এত ভাল তো সে মস্কোতেও কোন দিন নাচে নি।

সারা সন্ধ্যা নিকলাসের মনোযোগ কেড়ে নিল একটি নীলনয়না, মোটা-সোটা, মনোরমা সুন্দরী; মফঃস্বলের জনৈক পদস্থ অফিসারের স্ত্রী। অপর লোকের সব স্ত্রীরাই যুবকদের জন্য সৃষ্ট হয়েছে—খুশি-খুশি যুবক-মনের এই সরল প্রত্যয়ের বশেই রস্তভ কখনও সেই মহিলাটির সঙ্গ ছাড়ল না, আর তার স্বামীর সঙ্গে এমন ভাব জমিয়ে তুলল যে মুখে না বললেও তারা দুজনেই বুঝতে পেরেছে যে নিকলাস ও এই মহিলাটির মধ্যে ভাবটা বেশ জমবে। স্বামীটি কিন্তু মোটেই এ প্রত্যয়ের অংশীদার হল না; অতীব বিষণ্ণভাবেই সে রস্তভের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগল। কিন্তু নিকলাসের দিলখোলা ব্যবহার এতই বাঁধ-ভাঙা হয়ে দেখা দিল যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বারকয়েক নিকলাসের হাসি-তামাশায় যোগ দিতে হল। সন্ধ্যার শেষের দিকে অবশ্য স্ত্রীর মুখ যতই রক্তিম ও উচ্ছ্বসিত হতে লাগল স্বামীটির মুখ ততই বিষণ্ণ ও গম্ভীর হতে থাকল; যেন তাদের দুজনের জন্য একটা নির্দিষ্ট প্রাণ-শক্তির বরাদ্দ আছে, আর তাই স্ত্রীর প্রাণ-শক্তি যত বাড়তে থাকে, স্বামীর প্রাণ-শক্তি ততই হ্রাস পায়।

অধ্যায়—৫

নিকলাস একটা হাতল-চেয়ারে ঈষৎ ঝুঁকে বসেছে সুন্দরী মহিলার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে; মুখের হাসিটি অক্ষুণ্ণ রেখে মহিলাটির পৌরাণিক যুগসুলভ স্তুতি-ভাষণে মুখর হয়ে উঠেছে।

‘আঁটো রাইডিং-ব্রীচেস পরা পা দুটিকে নাচাতে নাচাতে আতরের গন্ধ ছড়িয়ে নিকলাস জানাল, এই ভরোনেঝের একটি মহিলাকে নিয়ে পালিয়ে

যাবার তার বড় সাধ।

"কোন্ মহিলা ?"

"মহিলা মনোরমা, স্বর্গীয়া। চোখ দুটি নীল, মুখখানি প্রবাল ও হস্তিদন্তের মিশ্রণ, আর তায়ানার দেহসৌষ্ঠব....।"

স্বামীটি এগিয়ে এসে বিষণ্ণকণ্ঠে জানতে চাইল, সে কি বিষয়ে কথা বলছে।

"আরে, নিকিতা আইভানিচ!" সবিনয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিকলাস চেঁচিয়ে বলল; তারপর যেন নিকিতা আইভানিচকে তার ঠাট্টার অংশীদার করার বাসনায়ই তাকে জানাল যে একটি সুন্দরী মহিলাকে নিয়ে সে পালিয়ে যাবে।

দুজনই হেসে উঠল—স্বামী বিষণ্ণভাবে, স্ত্রী খুশিতে। শাসনকর্তার ভালমানুষ স্ত্রীটি অসম্মতিসূচক দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে এল।

"আন্না ইগ্‌নাত্‌য়েভ্‌না তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন নিকলাস। চলে এস। তুমি তো জান, তোমাকে নামধরে ডাকবার অধিকার তুমিই আমাকে দিয়েছ।"

"তা তো বটেই মাসি। কিন্তু তিনিটি কে ?"

"আন্না ইগ্‌নাত্‌য়েভ্‌না মান্‌ভিন্ত্‌সেভা। তার কোন্ বোন-ঝিকে তুমি নাকি বাঁচিয়েছ....মনে করতে পার কি ?"

"আমি তো অনেককেই বাঁচিয়েছি!" নিকলাস বলল।

"তার বোন-ঝির নাম প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কয়া। সেও মাসির সঙ্গে ভরোনেঝে এসেছে। ও হো! তোমার মুখটা দেখছি লাল হয়ে উঠেছে। সেকি, তুমি কি তাহলে..."

"দাঁড়ান! দয়া করে ওভাবে কথা বলবেন না মাসি!"

"ঠিক আছে ঠিক আছে!....আঃ, আচ্ছা মানুষ বটে তুমি!"

শাসনকর্তার স্ত্রী তাকে একটি লম্বা, মজবুত গড়নের বৃদ্ধা মহিলার কাছে নিয়ে হাজির করল। মহিলাটির মাথায় নীল ওড়না, শহরের গণ্যমান্যদের সঙ্গে সবে তাস খেলা শেষ করেছে। ইনিই মাল্‌ভিন্ত্‌সেভা, প্রিন্সেস মারির মাসি; ধনবতী নিঃসন্তান বিধবা, ভরোনেঝেই থাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তাস খেলার হিসাবনিকাশ করছিল। যে জেনারেলটি তার কাছ থেকে অনেক টাকা জিতে নিয়েছে তাকে তিরস্কার করতে করতেই সে চোখ তুলে কড়া চোখে তাকাল।

নিকলাসের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "খুব খুশি হলাম বাবা, দয়া করে বাড়িতে এসে দেখা করো।"

প্রিন্সেস মারি, তার স্বর্গত পিতা ও প্রিন্স আন্দ্রুর খোঁজ খবর নেবার পরে আর একবার নিকলাসকে তার বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে মহিলাটি

তাকে ছেড়ে দিল।

মাল্‌ভিন্ত্‌সেভার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিকলাস আবার নাচে যোগদিতেই যাচ্ছিল, এমন সময় শাসনকর্তার স্ত্রীটি এসে তার আস্তিনে হাত রেখে বলল যে তার সঙ্গে সে কিছু কথা বলতে চায়; তারপর তাকে নিয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই সেখানে অন্য যারা ছিল তারা বেরিয়ে গেল।

মমতাভরা ছোট মুখখানিতে গাম্ভীর্যের ভাব এনে শাসনকর্তার স্ত্রী বলতে শুরু করল, "তুমি কি জান বাবা যে সেই হবে তোমার উপযুক্ত পাত্রী: ব্যবস্থা করে ফেলব কি?"

"আপনি কি বলতে চাইছেন মাসি?" নিকলাস শুধাল।

প্রিন্সেসের সঙ্গে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেব। ক্যাথারিন পেত্রভ্‌না অবশ্য লিলির কথাই বলছে, কিন্তু আমি বলেছি, না—প্রিন্সেস! ব্যবস্থা করে ফেলি, কি বল? আমি জানি, তোমার মা এজন্য আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। সত্যি, মেয়েটি খুবই মনোরমা! আর একেবারে সাদাসিদেও নয়।"

"মোটেই না," নিকলাস সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। কি বলছে সেটা না বুঝেই বলে উঠল, "তবে কি জানেন মাসি, একজন সৈনিক হিসাবে নিজেকে কারও উপর চাপিয়ে দিতেও চাই না, আবার ফিরিয়ে দিতেও চাইনা।"

"ঠিক আছে; মনে রেখ যে এটা তামাসা নয়!"

"মোটেই না!"

"ঠিক, ঠিক," যেন নিজের মনেই শাসনকর্তার স্ত্রী বলল। "কিন্তু বাবা, একটা কথা, আর যাই হোক ওই সুন্দরীটির প্রতি তুমি বড় বেশী মনোযোগ দিচ্ছ। সত্যি, স্বামীটির জন্য দুঃখ হয়..."

সরল মনে নিকলাস বলল, "না, না, ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়েছে।" তার মাথায় এটা ঢুকল না যে তার কাছে যেটা মজার খেলা অন্যের কাছে সেটা মজার ব্যাপার নাও হতে পারে।

আহারের সময় হঠাৎ নিকলাসের মনে হল, "শাসনকর্তার স্ত্রীকে কী সব বাজে কথা বলে দিলাম। তিনি হয়তো সত্যি সত্যি বিয়ের ব্যবস্থা করে বসবেন...আর সোনিয়া....?" বিদায় নেবার সময় শাসনকর্তার স্ত্রী যখন আর একবার হেসে বলল, "তাহলে মনে থাকে যেন!" তখন নিকলাস তাকে একপাশে ডেকে নিয়ে গেল।

"দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি মাসি..."

"কি ব্যাপার বাবা? এস, এখানেই বসা যাক।"

সহসা নিকলাসের মনে হল, এই অপরিচিতা নারীটির কাছে তার অত্যন্ত গোপন কথাগুলি (যা সে তার মা, বোন, বা বন্ধুর কাছেও বলে নি,) বলা দরকার। পরবর্তীকালে এই ঘটনাটি মনে পড়লেই সেভাবে নেহাৎ খেয়ালের বশেই সে খোলাখুলিভাবে কথাগুলি বলেছিল: অথচ সেই দিলখোলা

মনের উচ্ছ্বাস ও আরও কিছু তুচ্ছ ঘটনা মিলে তার ও তার পরিবারের সকলের উপর একটা প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল।

"কি জানেন মাসি, মামণির অনেক দিনের ইচ্ছা যে আমি একটি ধনবতী উত্তরাধিকারিণীকে বিয়ে করি, কিন্তু টাকার জন্য বিয়ে করার ব্যাপারটাই আমার কাছে ঘৃণার্হ বলে মনে হয়।"

"আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি," শাসনকর্তার স্ত্রী বলল।

"কিন্তু প্রিন্সেস বল্‌কন্‌স্কয়ার ব্যাপারটা আলাদা। সত্য কথাই আপনাকে বলব। প্রথমত, আমি তাকে খুব পছন্দ করি, তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করি; তার উপরে এই পরিস্থিতিতে এমন অদ্ভুতভাবে তার সঙ্গে দেখা হবার পরে আমার তো প্রায়ই মনে হয়েছে: 'এটাই নিয়তি।' বিশেষ করে যদি মনে রাখেন যে মামণি অনেকদিন থেকেই এটা ভাবছে; কিন্তু আগে তো কখনও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি; যেভাবেই হোক না কেন দেখাসাক্ষাৎটা ঘটে ওঠে নি। যতদিন পর্যন্ত আমার বোনের সঙ্গে তার দাদার বিয়ের কথা ছিল ততদিন অবশ্য তাকে বিয়ে করার কথা ভাবার কোন প্রশ্নই ছিল না। আর কী আশ্চর্য, নাতাশার বিয়েটা ভেঙে যাওয়া মাত্রই তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল....আর সব কিছুই....কাজেই বুঝতেই পারছেন....আপনাকে ছাড়া আর কাউকে একথা বলি নি, কোনদিন বলবও না।"

শাসনকর্তার স্ত্রী সকৃতজ্ঞভাবে তার কনুইটা চেপে ধরল।

"আমার জ্ঞাতি বোন সোনিয়াকে আপনি জানেন? আমি তাকে ভালবাসি, বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি, বিয়ে করবও...কাজেই বুঝতেই পারছেন এ বিয়ের কোন প্রশ্নই....—" মুখ লাল করে নিকলাস অসংলগ্নভাবে কথাগুলি বলল।

"এটা কী রকম দৃষ্টিভঙ্গী বাবা! তুমি তো জান সোনিয়া নিঃসম্বল, আর তুমি নিজেই বলছ যে তোমার বাবার অবস্থা খুবই খারাপ। আর তোমার মা? এযে হবে তার মৃত্যুর সামিল। এই গেল এক দিক। আর সোনিয়ার জীবনটাই বা কি রকম হবে—যদি তার হৃদয় বলে কোন পদার্থ থাকে? তোমার মা হতাশায় ভেঙে পড়বে, তোমরা সকলে সর্বস্বান্ত হবে....না বাবা, তোমার ও সোনিয়ার এটা বোঝা উচিত।"

নিকলাস চুপ করে রইল। যুক্তিগুলো শুনতে তার ভাল লাগল।

একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "যেকোন অবস্থায়ই এটা অসম্ভব মাসি। তাছাড়া, প্রিন্সেসই কি আমাকে গ্রহণ করবে? আরও কথা, এখন তো তার শোকের সময়। এ সময় কি এসব কথা ভাবা যায়!"

শাসনকর্তার স্ত্রী জবাব দিল, "কিন্তু তুমি কি ভাবছ যে আমি এখনই তোমার বিয়ে দিচ্ছি? সব কাজেরই তো একটা সঠিক সময় আছে।"

তার হাতটায় চুমো খেয়ে বলল, "কী ভাল ঘটকী আপনি মাসি...."

অধ্যায়—৬

রস্তভের সঙ্গে দেখা হবার পরে মস্কো পৌঁছে প্রিন্স মারি দেখল তার ভাই-পো এবং তাঁর শিক্ষক সেখানেই আছে, আর প্রিন্স আন্দ্রুর একটা চিঠি পেল যাতে কিভাবে তার মাসি মাল্‌ভিন্তসেভার সঙ্গে ভরোনেঝে দেখা করা যাবে সেই নির্দেশ জানানো হয়েছে।

প্রলোভনের সামিল যে অনুভূতি বাবার অসুখের সময় তাকে যন্ত্রণা দিয়েছে, তার মৃত্যুর পর থেকে, বিশেষ করে রস্তভের সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যাত্রার আয়োজন, দাদার জন্য উৎকণ্ঠা, নতুন বাড়িতে সংসার পাতা, নতুন লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা, এবং ভাই-পোর লেখাপড়ার দিকে নজর রাখা, প্রভৃতি নানা কাজে সে অনুভূতি যেন চাপাই পড়ে গিয়েছিল। এখন শান্ত পরিবেশে একটি মাস কাটাবার পরে সে আবার নতুন করে বাবাকে হারাবার দুঃখ এবং তার সঙ্গে জড়িত রাশিয়ার সর্বনাশের বেদনা অনুভব করছে। আপনজন বলতে তার তো এখন একমাত্র দাদাই অবশিষ্ট আছে; তাই তার বিপদের আশংকায় সে এখন অনবরত উত্তেজনা ও যন্ত্রণা বোধ করছে। সে যে ভাই-পোটির লেখাপড়া ভালভাবে চালাতে পারছে না তা নিয়েও তার দুশ্চিন্তার অবধি নেই—তথাপি অন্তরের গভীরে সে এখন শান্তি পেয়েছে—রস্তভের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে যেসব ব্যক্তিগত স্বপ্ন ও বাসনা তার মধ্যে জেগে উঠছিল তাদের স্তব্ধ করে দিতে পারার চেতনা থেকেই সে শান্তির উদ্ভব।

শাসনকর্তার স্ত্রী পরদিনই মাল্‌ভিন্তসেভার কাছে গিয়ে হাজির হল এবং মাসির সঙ্গে তার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা শেষ করে বলল, যদিও বর্তমান পরিস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক বাকদানের কথা ভাবাও যায় না, তবু দুটি যুবক-যুবতীকে এমনভাবে কাছাকাছি আনা দরকার যাতে তারা পরস্পরকে বুঝতে পারে। মাল্‌ভিন্তসেভা সম্মতি জানালে শাসনকর্তার স্ত্রী মারির সামনেই রস্তভের কথা বলতে শুরু করে দিল; তার প্রশংসা করল, প্রিন্সেস মারির নাম উল্লেখ করামাত্রই যে তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল সেকথাও বলল। প্রিন্সেস মারির মনে কিন্তু আনন্দের বদলে দেখা দিল বিষাদ—তার মনের শান্তি নষ্ট হল, নতুন করে দেখা দিল বাসনা, সন্দেহ, আত্ম-ধিক্কার ও আশা।

রস্তভ আসার আগের দুটি দিন প্রিন্সেস মারি অবিরাম ভাবতে লাগল, সে এলে তার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করবে। একবার ভাবল সে যখন মাসির সঙ্গে দেখা করবে তখন সে নিজে বৈঠকখানায় যাবেই না, কারণ এই শোকের সময় কোন অতিথির সঙ্গে দেখা করা তার পক্ষে উচিত হবে না; আবার ভাবল, সে মানুষটি তারজন্য যা করেছে তার পরে সেটা তার প্রতি খুবই রূঢ় আচরণ হবে।

কিন্তু রবিবারে গির্জা থেকে আসার পরে পরিচারক যখন বৈঠকখানায়

এসে জানাল যে কাউন্ট রস্তভ এসেছে, তখন প্রিন্সেস মোটেই বিচলিত বোধ করল না, শুধু তার গালে লাগল একটু রঙের ছোঁয়া, চোখ দুটি খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

রস্তভ ঘরে ঢুকলে প্রিন্সেস একমুহূর্তের জন্য চোখ দুটি নামিয়ে নিল যাতে অতিথি মাসির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পায়; তারপরেই নিকলাস তার দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই সে মাথাটা তুলে চকচকে চোখে তার দিকে তাকাল। মর্যাদা ও কমনীয় তার সঙ্গে মুখে খুশির হাসি ফুটিয়ে সে অর্ধেক উঠে দাঁড়াল, সুন্দর হাতখানি বাড়িয়ে দিল, আর এমন স্বরে কথা বলতে লাগল যাতে এই প্রথম লাগল নারীত্বের প্রথম স্পন্দন। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ অবাক বিস্ময়ে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। সে নিজে প্রেমকলায় যথেষ্ট পারদর্শিনী, তবু যে পুরুষকে আকর্ষণ করতে চায় তার সঙ্গে দেখা হলে সে নিজেও এর চাইতে ভালভাবে ব্যাপারটাকে সামাল দিতে পারত না।

“হয় কালো রংটা তাকে বিশেষভাবে মানায়, অথবা আমার অজান্তেই সে প্রভূত উন্নতি করে ফেলেছে!” মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ভাবল।

সেই মুহূর্তে প্রিন্সেস মারির যদি চিন্তা করার ক্ষমতা থাকত তাহলে নিজের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে সে হয় তো মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ অপেক্ষাও বেশী আশ্চর্য হত। সেই পরিচিত প্রিয় মুখখানিকে চেনামাত্রই একটা নতুন জীবনী-শক্তি যেন তাকে পেয়ে বসল, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাকে কথা বলতে ও কাজ করতে বাধ্য করল। রস্তভ ঘরে ঢুকতেই তার মুখটা সহসা বদলে গেল। যেন একটা খোদাই-করা চিত্রিত লণ্ঠনের আলো হঠাৎ জ্বেলে দেওয়া হল, আর সহসা যা কিছু এতক্ষণ ছিল অন্ধকার, স্থূল ও অর্থহীন, তাই প্রকাশ পেল অপ্রত্যাশিত ও উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যে। যে পবিত্র, আত্মিক ও আন্তরিক বেদনার ভিতর দিয়ে এতকাল সে চলে এসেছে তা যেন এই প্রথম বাইরে প্রকাশ পেল।

রস্তভের চোখেও এসবই স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল, যেন সেও তার সারা জন্মের চেনা। রস্তভের মনে হল, যে মানুষটি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে তার পরিচিত অন্য সকলের চাইতে স্বতন্ত্র ও ভাল, এমন কি তার নিজের চাইতেও ভাল।

কথাবার্তা যা হল তা খুবই সরল ও সাধারণ। যুদ্ধ নিয়ে কথা হল, আর অন্য সকলের মতই তা নিয়ে নিজেদের দুঃখকে তারা অযথা বাড়িয়ে বলল; তাদের শেষ দেখা, শাসনকর্তার স্ত্রী, নিকলাসের আত্মীয় স্বজন এবং প্রিন্সেস মারির কথা নিয়েও তারা আলোচনা করল।

আলোচনার ফাঁকে একসময় নিকলাস প্রিন্স আন্দ্রুর ছোট্ট ছেলেটির দিকে নজর দিল, তাকে আদর করে জানতে চাইল সে একজন হুজার হতে চায় কিনা। ছেলেটিকে হাঁটুর উপর বসিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে করতে

প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। যে শিশুটিকে সে ভালবাসে তাকে ভালবাসার মানুষটির কোলে দেখে প্রিন্সেস মারি সুখী, ভীরু চোখে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। নিকলাসও সেটা বুঝতে পেরে খুশিতে লাল হয়ে খেলার ছলে শিশুটিকে চুমো খেতে লাগল।

শোকের সময় চলছে বলে প্রিন্সেস মারি সমাজে বের হয় না, আর নিকলাসও পুনরায় তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটা উচিত বলে মনে করছে না; অবশ্য গভর্ণরের স্ত্রী তার ঘটকালির কাজ চালিয়েই যাচ্ছে; প্রিন্সেস মারির স্তুতি-বাক্যগুলি পৌঁছে দিচ্ছে নিকলাসের কানে, আর তার স্তুতি-বাক্য পৌঁছে দিচ্ছে প্রিন্সেসের কানে, আর নিকলাসকে বার বার বলছে বিয়ের কথা ঘোষণা করতে। সেজন্য মাস-অনুষ্ঠানের আগে বিশপের বাড়িতে দুজনের সাক্ষাতের একটা ব্যবস্থা করল।

রস্তভ শাসনকর্তার স্ত্রীকে বলল সে প্রিন্সেস মারিকে বিয়ের কথা কিছু বলবে না, কিন্তু সেখানে যাবে।

তিল্‌সিটে যেমন সকলে যা ঠিক বলে মনে করেছে তাতে রস্তভ কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করে নি, এখানেও তেমনই সে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির হাতেই নিজেকে ছেড়ে দিল, যদিও সে দুর্বার শক্তি যে তাকে কোথায় নিয়ে যাবে তাও সে জানে না। সে জানে, সোনিয়াকে কথা দেবার পরে প্রিন্সেস মারির কাছে মনের কথা প্রকাশ করাটা হবে খুবই নীচ কাজ। সে আরও জানে যে কোনরকম নীচ কাজ সে কদাপি করবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে সে একথাও জানে (অন্তত মনেপ্রাণে অনুভব করে) যে পরিপার্শ্বিক অবস্থার হাতে এবং যারা তাকে চালাচ্ছে তাদের হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সে কোন অন্যায় করছে না, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছে—জীবনে যত কিছু কাজ করেছে সে সব কিছুর চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

প্রিন্সেস মারির সঙ্গে সাক্ষাতের পরে তার বহিরঙ্গ জীবন আগের পথেই চলতে থাকলেও আগে তার যা কিছু ভাল লাগত এখন আর তা ভাল লাগে না; প্রায়ই সে প্রিন্সেসের কথাই ভাবে। কিন্তু আগে আগে যুবতী মহিলাদের সম্পর্কে, এমন কি একসময় অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সোনিয়া সম্পর্কেও সে যে ভাবে ভাবনা চিন্তা করত, প্রিন্সেস মারি সম্পর্কে চিন্তাটা ঠিক সেরকম নয়। ঐ সব যুবতীদের সে দেখতে যেমন সব সৎ অন্তঃকরণের যুবকরা দেখে থাকে; অর্থাৎ তাদের দেখতে সম্ভাবিত স্ত্রীরূপে, কল্পনায় তাদের মানিয়ে নিত বিবাহিত জীবনের পরিবেশের সঙ্গে: সাদা ড্রেসিং-গাউন, চায়ের টেবিলে স্ত্রী, স্ত্রীর গাড়ি, বাচ্চারা, মামণি, বাপি, তাদের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক, ইত্যাদি—আর ভবিষ্যতের সেইসব ছবি তাকে আনন্দ দিত। কিন্তু যে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে সকলে তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করছে তাকে ভবিষ্যৎ বিবাহিত জীবনের ছবির সঙ্গে সে মোটেই জড়াতে পারছে না। সে চেষ্টা করলেও ছবিগুলি হয়ে উঠছে

সামঞ্জস্যবিহীন ও মিথ্যা। তা দেখে সে ভয় পায়।

অধ্যায়—৭

বরদিনোর যুদ্ধের সংবাদ এবং নিহত ও আহতদের ব্যাপারে আমাদের ক্ষয়-ক্ষতির ভয়াবহ সংবাদ, আর তার চাইতেও ভয়ংকর মস্কো পরিত্যাগের সংবাদ ভরোনেঝ-এ পৌঁছল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। প্রিন্সেস মারি দাদার আহত হবার সংবাদ জেনেছে গেজেট থেকে; কিন্তু তার সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট খবর জানতে না পেরে প্রিন্স আন্দ্রুর খোঁজে নিজেই যাত্রা করার জন্য তৈরি হয়েছে।

বরদিনোর যুদ্ধ এবং মস্কো পরিত্যাগের খবর শুনে রস্তভের মনে হতাশা, ক্রোধ, প্রতিহিংসার বাসনা, অথবা কোনরকম অনুভূতিই জাগল না; শুধু ভরোনেঝের যা কিছু সবই তার কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর হয়ে উঠল; লজ্জা ও অকর্মণ্যতার একটা অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল। সব আলোচনাই তার কাছে আন্তরিকতাবিহীন বলে মনে হতে লাগল; কেমন করে সব কিছুর বিচার করবে তাও সে জানে না; তার মনে হল, একমাত্র রেজিমেণ্টে ফিরে গেলেই সব কিছু আবার তার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ঘোড়া কেনার ব্যাপারে তাড়াহুড়া শুরু করে দিল, এবং অকারণেই চাকর ও স্কোয়াড্রন কোয়ার্টার মাস্টারের উপর রাগারাগি করতে লাগল।

তার যাত্রার কয়েকদিন আগে রুশদের জয়লাভ উপলক্ষ্যে ভজনালয়ে একটা বিশেষ ধন্যবাদজ্ঞাপক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। নিকলাসও সেখানে উপস্থিত ছিল। শাসনকর্তার কিছুটা পিছনে দাঁড়িয়ে সে নানান বিষয় চিন্তা করছিল। অনুষ্ঠান শেষ হলে শাসনকর্তার স্ত্রী তাকে ইসারায় ডাকল।

মাথা নেড়ে বিপরীতদিকে দাঁড়ানো মহিলাটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "প্রিন্সেসকে দেখেছ?"

নিকলাস সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সেস মারিকে চিনতে পারল; অবগুণ্ঠনের আড়ালে তার রেখাচিত্র দেখে যতটা নয় তার চাইতে বেশী তার উদ্বেগ, ভীরুতা ও করুণার ভাব দেখে। প্রিন্সেস মারি নিজের চিন্তায়ই ডুবে ছিল; গির্জা থেকে যাবার আগে শেষবারের মত সে ক্রুশ-চিহ্ন আঁকল।

নিকলাস অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। আগে যে মুখ সে দেখেছে সেই একই মুখ, সেই একই পরিশীলিত আত্মিক সাধনার প্রকাশ, কিন্তু এখন সেই মুখ সম্পূর্ণ অন্যভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সে মুখে দুঃখ, প্রার্থনা ও আশার এক সকরুণ প্রকাশ। নিকলাস নিজের থেকেই তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল যে তার দুঃখের কথা সে শুনেছে, আর সর্বান্তঃকরণে তাকে সহানুভূতি জানাচ্ছে। তার কণ্ঠস্বর শোনার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্সেস

মারির মুখে যেন একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে তার দুঃখ ও আনন্দ দুইকেই উজ্জ্বল করে তুলল।

রস্তভ বলল, "আপনাকে একটা কথা বলার ছিল প্রিন্সেস। আপনার দাদা প্রিন্স আনৃদ্রু নিকলায়েভিচ যদি বেঁচে না থাকত তাহলে সে খবর সঙ্গে সঙ্গে গেজেটে ঘোষণা করা হত, কারণ সে একজন কর্ণেল।"

তার কথা সম্যক বুঝতে না পারলেও তার মুখের সক্ষেদ সহানুভূতির প্রকাশ লক্ষ্য করে প্রিন্সেস মারি রস্তভের দিকে তাকাল।

নিকলাস বলতে লাগল, "এমন অনেক ঘটনার কথা আমি জানি যেখানে বোমার একটা টুকরোর আঘাত (গেজেটে বলা হয়েছে গোলা) হয় সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক হয়েছে, অথবা খুবই তুচ্ছ হয়েছে। আমরা তো ভালটাই আশা করব; আমি নিশ্চিত জানি...."

প্রিন্সেস মারি তার কথায় বাধা দিল।

"ওঃ, সে যে কী ভয়ংকর..." আবেগের আতিশয্যে সেকথা শেষ করতে পারল না; সাবলীল ভঙ্গীতে মাথাটা নীচু করে পরে সকৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারি মাসির সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় নিকলাস বাইরে বের হল না; ঘোড়া-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হিসাবপত্র মেটাবার জন্য ঘরেই থাকল। সেকাজ যখন শেষ হয় তখন যতটা রাত হয়েছে তাতে না বাইরে যাওয়া চলে, না ঘুমতে যাওয়া চলে; অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঘরময় পায়চারি করতে করতে সে নিজের জীবনের কথাই ভাবতে লাগল; অথচ একাজটা সে কদাচিৎ করে থাকে।

স্মোলেন্স্ক্ প্রদেশে যখন প্রিন্সেস মারিকে দেখেছিল তখন তাকে রস্তভের খুব ভাল লেগেছিল। এখন ভেরোনেঝ-এ দেখা হবার পর তার প্রভাব যে প্রীতিপ্রদ হয়েছে তাই নয়, সেটা বেশ শক্তিশালী হয়েই দেখা দিয়েছে। এখানে তার মধ্যে যে বিশেষ নৈতিক সৌন্দর্য নিকলাস দেখতে পেয়েছে তাতে সে মুগ্ধ হয়েছে। অবশ্য সে এখন যাত্রার আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত; তাই তার সঙ্গে পুনরায় দেখা হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলে দুঃখ প্রকাশ করার কথাটা তার মাথায়ই আসে নি। কিন্তু সেদিন গির্জায় তার সাক্ষাৎটা নিকলাসের মনে এত গভীর দাগ কেটেছে যে তার মানসিক শান্তির পক্ষে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়। সেই ম্লান, বিষণ্ণ, পরিশীলিত মুখ, সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই শান্ত শোভন ভঙ্গিমা, আর বিশেষ করে তার সারা অঙ্গে ফুটে ওঠা গভীর বেদনা তাকে উদ্বেলিত ও সহানুভূতিশীল করে তুলেছে। পুরুষ মানুষের মধ্যে উচ্চতর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রকাশকে সে সহ্য করতে পারে না (সেইজন্যই প্রিন্স আন্দ্রু কে তার পছন্দ নয়), তাকে সে দার্শনিকতা ও স্বপ্নালুতা বলে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকে, কিন্তু সেই একই দুঃখ যখন প্রিন্সেস মারির ক্ষেত্রে তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত একটি গোটা আধ্যাত্ম

জগৎকে প্রকাশ করে দিল তখন সেটাই এক অনিবার্য আকর্ষণ হয়ে দেখা দিল।

নিজের মনেই বলল, "সে এক আশ্চর্য নারী। সত্যিকারের দেবদূত! কেন আজ আমি স্বাধীন নই? সোনিয়াকে নিয়ে এত তাড়াহুড়া করেছিলাম কেন?" আপনা থেকেই দুজনের তুলনা জাগল তার মনে: একজনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার তিলমাত্র নেই, আর অপরজনের মধ্যে আছে তার প্রাচুর্য—এই আধ্যাত্মিকতার সম্পদ নিজের মধ্যে নেই বলেই সেটা তার কাছে আরও বেশী মূল্যবান। আজ যদি সে স্বাধীন থাকত তাহলে কি ঘটতে পারত সেই ছবিটাই তার সামনে দেখা দিল। প্রিন্সেসের কাছে সে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারত, সেই হতে পারত তার স্ত্রী। কিন্তু না, সে কল্পনাও আজ সে করতে পারে না। সে ভয় পেল, মনের সামনে কোন স্পষ্ট ছবিই ফোটাতে পারল না। অনেকদিন আগেই সোনিয়াকে নিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ছবি সে দেখেছে; সে ছবি স্পষ্ট ও সরল, কারণ সোনিয়াকে সে ভাল করে চেনে, কিন্তু প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে ভবিষ্যতের ছবি দেখা অসম্ভব, কারণ তাকে সে চেনে না, শুধুই ভালবাসে।

সোনিয়াকে নিয়ে দিবাস্বপ্ন দেখার মধ্যে একটা মজা আছে, একটা ফুর্তির ব্যাপার আছে, কিন্তু প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা সব সময়ই শক্ত, কিছুটা ভীতিপ্রদ।

সে ভাবতে লাগল, "আহা কী তার প্রার্থনার ধরন! তার সমস্ত অন্তর যেন সেই প্রার্থনার মধ্যে ডুবে যায়। হ্যাঁ, সেই প্রার্থনাই তো পাহাড় টলাতে পারে; আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তার প্রার্থনার উত্তর সে পাবে।" হঠাৎ তার মনে হল, "আমি যা চাই তার জন্য প্রার্থনা করছি না কেন? আমি কি চাই? স্বাধীন হতে, সোনিয়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে....তিনি তো ঠিকই বলেছেন," শাসনকর্তার স্ত্রীর কথাগুলি মনে পড়ে গেল: "সোনিয়াকে বিয়ে করলে তার ফলে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই জুটবে না। গোলমাল, মামণির দুঃখ""সম্পত্তি নিয়ে অসুবিধা""গোলমাল, ভয়ংকর গোলমাল! তাছাড়া তাকে আমি ভালবাসি না—যেমন ভালবাসা উচিত। হে ঈশ্বর! এই ভয়ংকর. জটিল পরিস্থিতি থেকে আমাকে উদ্ধার কর!" সহসা সে প্রার্থনা করতে শুরু করল। "হ্যাঁ, প্রার্থনা পাহাড় টলাতে পারে, কিন্তু বিশ্বাস থাকা চাই, ছেলেবেলায় নাতাশা ও আমি যে প্রার্থনা করতাম তা নয়, বরঞ্চ যেন চিনি হয়ে যায়—আর সত্যি তাই হয়েছে কিনা দেখতে আমরা উঠোনে ছুটে যেতাম। না, কোন তুচ্ছ জিনিসের জন্য এখন আমি প্রার্থনা করছি না।" পাইপটা এক কোণে রেখে দুই হাত জোড় করে সে দেবমূর্তির সামনে বসল। প্রিন্সেস মারির স্মৃতিতে বিগলিত হয়ে অনেক দিন পরে সে প্রার্থনা করতে লাগল। তার চোখ জলে ভরে উঠল, গলা আটকে গেল, আর তখনই দরজা খুলে লাভ্রুশ্‌কা ঘরে ঢুকল কিছু কাগজপত্র নিয়ে।

হঠাৎ নিজের মনোভাব পাল্টে ফেলে নিকলাস চীৎকার করে উঠল, "বোকার ডিম! না ডাকতেই ঘরে ঢুকেছ কেন?"

ঘুম-ঘুম গলায় লাভ্রুশ্‌কা বলল, "শাসনকর্তার কাছ থেকে একজন লোক এসেছে একটা চিঠি নিয়ে।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে ধন্যবাদ। তুমি যেতে পার!"

নিকলাস চিঠি দুটো নিল; একটা মার চিঠি, অপরটা সোনিয়ার। হাতের লেখা দেখে চিনতে পেরে প্রথমে সে সোনিয়ার চিঠিটাই খুলল। কয়েক লাইন পড়তেই তার মুখটা ম্লান হয়ে গেল, ভয়ে ও আনন্দে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল।

"না, এ সম্ভব নয়!" সে চেঁচিয়ে বলে উঠল।

বসে থাকতে পারল না, চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে পায়চারি করতে লাগল। চোখ তুলে তাকাল, আবার পড়ল, আবার, ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুই কাঁধ সোজা করল, হাঁ করে দুই হাত টান-টান করল, দুই চোখে স্থির দৃষ্টি। ঈশ্বর তার কথা শুনবে এই বিশ্বাস নিয়ে এইমাত্র যা প্রার্থনা করেছে তাই ঘটেছে; কিন্তু নিকলাস এতদূর বিস্মিত হয়েছে যেন এটা অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত, আর যেহেতু এত তাড়াতাড়ি এটা ঘটেছে যাতে প্রমাণ হয় যে এটা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘটে নি, ঘটেছে ঘটনার সাধারণ যোগাযোগের ফলে।

যে বন্ধন নিকলাসকে শৃংখলিত করে রেখেছিল, যার হাত থেকে মুক্তির কোন সম্ভাবনাই ছিল না বলে তার ধারণা, সোনিয়ার এই অপ্রত্যাশিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চিঠি তাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। সে লিখেছে, রস্তভ পরিবারের মস্কোর প্রায় সব সম্পত্তির ক্ষতি হওয়ার মত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার কথা, নিকলাস যাতে প্রিন্সেস বলকন্‌স্কয়াকে বিয়ে করে সেই মর্মে কাউণ্টেসের উপর্যুপরি ঘোষণার কথা এবং ইদানীংকালে নিকলাসের নীরবতা ও উদাসীনতার কথা—এইসব কিছুর ফলেই সে স্থির করেছে সব প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্তি দিয়ে সে নিকলাসকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এনে দেবে।

সে লিখেছে, "যে পরিবার আমার প্রতি এত ভাল ব্যবহার করেছে আমিই তার দুঃখ বা বিরোধের কারণ হব, এ চিন্তাও আমার পক্ষে বেদনাদায়ক। যাদের আমি ভালবাসি তাদের সুখ ছাড়া আমার ভালবাসার অন্য কোন লক্ষ্য নেই; সুতরাং নিকলাস, আমার মিনতি নিজেকে তুমি স্বাধীন বলে বিবেচনা করো; স্থির জেনো, যাই ঘটুক না কেন তোমাকে এত ভালবাসা আর কেউ দিতে পারবে না যা দিয়েছে

তোমার সোনিয়া।"

দুটো চিঠিই এসেছে ত্রয়ৎসা থেকে। কাউণ্টেসের চিঠিতে আছে মস্কোতে তাদের শেষের দিনগুলি, তাদের যাত্রা এবং তাদের সমস্ত সম্পত্তি ধ্বংস

হওয়ার বিবরণ। চিঠিতে কাউণ্টেস আরও জানিয়েছে, আহত অবস্থায় প্রিন্স আন্‌দ্রু তাদের সঙ্গেই পথ চলেছে; তার অবস্থা খুবই সংকটজনক ছিল, কিন্তু ডাক্তার এখন আশা দিয়েছে। সোনিয়া ও নাতাশাই তার সেবা করেছে।

পরদিন মার চিঠি নিয়ে নিকলাস প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা করতে গেল। "নাতাশা তার সেবা করেছে" এ কথাটার অর্থ কি হতে পারে তা নিয়ে দুজনের কেউই একটা কথাও বলেনি, কিন্তু এই চিঠিটাকে ধন্যবাদ, নিকলাস হঠাৎই প্রিন্সেসের পরম আত্মীয়ের মত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল।

পরদিন প্রিন্সেস মারির ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ যাত্রার প্রাক্কালে নিকলাস তাকে বিদায় জানাল, আর তার কয়েক দিন পরেই রেজিমেণ্টে যোগ দিতে যাত্রা করল।

অধ্যায়—৮

নিকলাসের প্রার্থনার উত্তরে ত্রয়ৎসা থেকে লিখিত সোনিয়ার যে চিঠিটা এসেছে তার গোড়াকার কথাটা এই: কোন ধনবতী উত্তরাধিকারিণীর সঙ্গে নিকলাসের বিয়ে দেবার চিন্তাটা কাউণ্টেসকে ক্রমেই বেশী করে চেপে ধরেছে। সে জানে যে সোনিয়াই সে পথের প্রধান বাধা, আর তাই কাউণ্টেসের বাড়িতে সোনিয়ার জীবন ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, বিশেষ করে বোগুচারভোতে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে নিকলাসের দেখা হয়েছে এই মর্মে তার চিঠি পাবার পর থেকে অবস্থাটা চরমে উঠেছে। সোনিয়ার প্রতি অসম্মানকর বা নিষ্ঠুর উক্তি করতে পারার কোন সুযোগই কাউণ্টেস ছেড়ে দেয় না।

কিন্তু মস্কো ছেড়ে আসার কয়েকদিন আগে নানান ঘটনায় বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে কাউণ্টেস সোনিয়াকে কাছে ডাকল; কোন রকম বকাবকি না করে এবং দাবী না জানিয়ে সাশ্রুনেত্রে তাকে মিনতি জানাল, এই পরিবার তার জন্য যা কিছু করেছে তার প্রতিদানে সে যেন স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিকলাসের সঙ্গে বিবাহসম্পর্কিত সব বন্ধন ছিন্ন করে ফেলে।

"যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে এই কথা না দিচ্ছ ততক্ষণ আমি শান্তি পাব না।"

সোনিয়া হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল; কাঁদতেই জবাব দিল যে সে সব কিছু করতে রাজী, সব কিছুর জন্য প্রস্তুত, কিন্তু কোন কথা দিল না, কি করবে তা নিজেই স্থির করতে পারল না। যে পরিবার তাকে লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে তো হবেই। অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকারই তো সোনিয়ার অভ্যাস। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত যখনই আত্ম-ত্যাগের কোন কাজ সে করেছে তখনই এই সুখের চেতনা তার

মনে জেগেছে যে এই কাজের ফলে সে নিজের চোখে এবং অপরের চোখে আরও বড় হয়ে উঠবে, আর তাকে নিকলাসের আরও যোগ্য করে তুলবে ; পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চাইতে সে যে নিকলাসকে বেশী ভালবাসে। কিন্তু এখন এরা যে তাকে সেই বস্তুটিকেই বিসর্জন দিতে বলছে যা তার সব আত্ম-বিসর্জনের একমাত্র পুরস্কার, তার জীবনের একমাত্র অর্থ। আর এই প্রথম সেই পরিবারটির প্রতি তিক্ততায় তার মন ভরে উঠল যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল শুধু একদিন অনেক বেশী যন্ত্রণা দেবার জন্য ; নাতাশার প্রতিও ঈর্ষা জাগল তার মনে ; এই মেয়েটি কোনদিন কারও জন্য কোন কিছু ত্যাগ না করেও সকলের ভালবাসাই পেয়ে এসেছে। আর এই প্রথম সোনিয়া অনুভব করল যে নিকলাসের প্রতি তার পবিত্র, শান্ত ভালবাসার ভিতর থেকে জেগে উঠেছে এমন একটি উচ্ছ্বসিত আবেগ যা নীতি, পুণ্য ও ধর্মের চেয়েও শক্তিশালী। সেই আবেগের প্রভাবে সোনিয়া কাউণ্টেসকে এড়িয়ে চলতে লাগল, স্থির করল যতদিন নিকলাসের সঙ্গে দেখা না হয় ততদিন অপেক্ষা করবে ; উদ্দেশ্য তাকে মুক্তি দেওয়া নয়, বরং দেখা হলেই তাকে চিরদিনের মত নিজের সঙ্গে বেঁধে ফেলা।

মস্কোতে শেষের কয়েকটা দিন রস্তভ পরিবারে এমন হট্টগোল ও ভয়ের আবহাওয়া চলল যে সোনিয়ার মনের বিষণ্ণ চিন্তাগুলো চাপা পড়ে গেল। নানা কাজকর্মের মধ্যে ডুবে থাকতে পেরে সে খুশিই হল। কিন্তু যখন সে তাদের বাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুর উপস্থিতির কথা শুনল তখন এই সানন্দ অনুভূতি তাকে পেয়ে বসল যে নিকলাসের কাছ থেকে তার দূরে সরে যাওয়াটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সে জানত, নাতাশা প্রিন্স আন্দ্রু ছাড়া আর কাউকে ভালবাসে না, তার ভালবাসায় কখনও ইতি ঘটে নি। সে জানত, এই ভয়ংকর পরিস্থিতিতে পুনরায় একত্র হলে আবার তারা পরস্পরের প্রেমে পড়বে, আর সে অবস্থায় নিকলাস আর প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ সেটা সামাজিক বিধিতে নিষিদ্ধ। শেষের কয়েকটা দিন এবং তাদের যাত্রার প্রথম কয়েকটা দিন এই চিন্তায়ই সোনিয়া উল্লসিত হয়ে উঠল যে স্বয়ং বিধাতা তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে।

পথে রস্তভ পরিবার একটা পুরো দিনের জন্য প্রথম যাত্রা বিরতি করল ত্রয়ৎসা মঠে।

মঠের অতিথিশালায় তিনটে বড় ঘর তাদের ছেড়ে দেওয়া হল ; তার একটাতে প্রিন্স আন্দ্রুকে থাকতে দেওয়া হল। আহত লোকটির অবস্থা সেদিন অনেকটা ভাল ; নাতাশা তার কাছেই বসেছিল। পাশের ঘরে কাউণ্ট ও কাউণ্টেস সসম্মানে মঠাধিপতির সঙ্গে কথা বলছে ; পূর্বপরিচিত মঠের কল্যাণকামী হিসাবেই মঠাধিপতি তাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। প্রিন্স আন্দ্রু ও নাতাশার মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে তা জানবার কৌতূহলে

সোনিয়াও সেখানে হাজির হয়েছে। দরজার ভিতর দিয়েই সে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। দরজা খুলে উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে এল নাতাশা। তাকে স্বাগত জানাতে মঠাধিপতি উঠে দাঁড়িয়ে ডান হাতের ঝোলা আস্তিনটা গুটিয়ে নিল; কিন্তু সেদিকে নজর না দিয়ে নাতাশা সোনিয়ার কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরল।

কাউন্টেস বলল, "নাতাশা, কি চাইছ? এদিকে এস!"

আশীর্বাদ লাভের জন্য নাতাশা মঠাধিপতির কাছে এগিয়ে গেল; সে পরামর্শ দিল, ঈশ্বর ও সন্ত প্রভুর কাছে সাহায্য ভিক্ষা কর।

মঠাধিপতি চলে যেতেই নাতাশা বন্ধুর হাত ধরে তাকে নিয়ে খালি ঘরটাতে গেল।

নাতাশা বলল, "সোনিয়া, ও কি বাঁচবে? সোনিয়া, আমি কত সুখী, অথচ কত দুঃখী!...সোনিয়া, ছোট্ট পাখিটি, সবই তো যেমনটি ছিল তেমনই আছে। শুধু ও যদি বেঁচে ওঠে! ও তো...না, না, তা হতে পারে না... কারণ....কারণ..." নাতাশা কেঁদে উঠল।

সোনিয়া মৃদু গুঞ্জণে বলল," ঠিক! আমি জানতাম। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!"

সোনিয়াও ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নাতাশাকে চুমো খেল, সান্ত্বনা দিল। ভাবল, "শুধু ও যদি বেঁচে ওঠে!" দুজনেই কাঁদল, কথা বলল, চোখের জল মুছল, তারপর একসঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। সাবধানে দরজা খুলে নাতাশা ভিতরে তাকাল; সোনিয়া তার পাশে আধ-খোলা দরজায় গিয়ে দাঁড়াল।

প্রিন্স আন্দ্রু তিনটে বালিশের উপর উঁচু হয়ে শুয়ে আছে। বিবর্ণ মুখখানি শান্ত, চোখ দুটি বন্ধ, নিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাসের লক্ষণ চোখে পড়ছে।

সঙ্গিনীর হাতটা ধরে দরজা থেকে পিছিয়ে এসে সোনিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "ওঃ নাতাশা!"

"কি হল? কি হল?" নাতাশা শুধাল।

"ওই যে, ওই যে..." সোনিয়া বলল; তার মুখটা সাদা হয়ে গেছে, ঠোঁট কাঁপছে।

আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সোনিয়াকে নিয়ে নাতাশা জানালার কাছে গেল; সোনিয়ার কথাগুলি এখনও সে বুঝতে পারে নি।

গম্ভীর, ভয়ার্ত মুখে সোনিয়া বলল, "তোমার মনে আছে অত্রাদ্নয়েতে বড়দিনের সময়...তোমার জন্য যখন আয়নায় তাকিয়েছিলাম...? তোমার কি মনে আছে আমি কি দেখেছিলাম?"

বিস্ফারিত চোখে নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ!"

সোনিয়া বলতে লাগল, "তোমার মনে আছে? তখন আমি এটাই দেখেছিলাম আর সেকথা তোমাকে, দুনিয়াশাকে, সকলকে বলেছিলাম।

দেখেছিলাম, সে বিছানায় শুয়ে আছে, চোখ দুটি বন্ধ, একটা গোলাপী লেপ দিয়ে ঢাকা, দুই হাত এক করা।" তার দৃঢ় বিশ্বাস, এইমাত্র সে যা দেখেছে সেটা আয়না দেখা ছবির হুবহু অনুরূপ।

আসলে তখন সে কিছুই দেখে নি, যা প্রথম মাথায় এসেছিল তাই বলে দিয়েছিল; কিন্তু তখন যেটা সে বানিয়ে বলেছিল সেটা অন্য যেকোন স্মৃতির মতই এখন তার কাছে সত্য বলে মনে হচ্ছে।

নাতাশাও চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোলাপী রংই ছিল।" তারপর চিন্তিতভাবে বলল, "কিন্তু এর অর্থ কি?"

তার হাতটা চেপে ধরে সোনিয়া বলল, "ওঃ, আমি জানি না, সবই কেমন অদ্ভুত।"

কয়েক মিনিট পরে প্রিন্স আন্দ্রু ঘণ্টা বাজাতেই নাতাশা তার কাছে চলে গেল, কিন্তু অসম্ভব রকমের উত্তেজিত ও অভিভূত হয়ে সোনিয়া জানালায় দাঁড়িয়েই যা ঘটেছে তার বিস্ময়করতা নিয়ে চিন্তা করতে লাগল।

সেদিনই সেনাবাহিনীতে চিঠি পাঠাবার একটা সুযোগ ছিল। কাউণ্টেস তাই ছেলেকে চিঠি লিখতে বসেছে।

বোন-ঝিকে যেতে দেখে চিঠি থেকে চোখ তুলে কাউণ্টেস বলল, "সোনিয়া, তুমি নিকলাসকে লিখবে না?" নরম কাঁপা গলায় কথা বললেও কাউণ্টেসের মনের কথা সবই সোনিয়া বুঝতে পারল। ঐ দুটি চোখে প্রকাশ পাচ্ছে মিনতি, কোন কিছু চাইবার লজ্জা, প্রত্যাখ্যানের ভয়, আর প্রত্যাখ্যাত হলে তীব্র বিদ্বেষের জন্য প্রস্তুতি।

কাউণ্টেসের কাছে গিয়ে নতজানু হয়ে সোনিয়া তার হাতে চুমো খেল।

বলল, "হ্যাঁ মামণি, লিখব।"

সেদিন যা কিছু ঘটেছে, বিশেষ করে তার স্বপ্ন-দর্শনের যে রহস্যময় পুনরাবৃত্তি সে এই মাত্র দেখেছে, তাতে সোনিয়ার মনটা নরম হয়েছে, উত্তেজিত হয়েছে। অভিভূত হয়েছে। এখন সে বুঝতে পেরেছে যে নাতাশার সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর সম্পর্কটা নতুন করে গড়ে ওঠায় নিকলাসের পক্ষে প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করার পথে বিঘ্ন দেখা দেবে, আর তাই আনন্দিত চেতনায় সেই আত্মত্যাগের মনোভাব আবার ফিরে এসেছে যাতে সে অভ্যস্ত, যা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে ভালবাসে। আর তাই একটা মহৎ কর্মসাধনের সানন্দ চেতনায় সেই আবেগভরা চিঠিটা সে লিখেছে—যদিও চোখের জল এসে তার পশম-কালো চোখ দুটিকে ভিজিয়ে দিয়ে বার বার বাধা দিয়েছে—যা পেয়ে নিকলাস অবাক হয়ে গেছে।

অধ্যায়—৯

অফিসার ও সৈনিকরা পিয়েরকে গ্রেপ্তার করে রক্ষী-ভবনে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ অথচ সসম্মান আচরণ করতে লাগল। তার প্রতি-ব্যবহারে তাদের মনে এখনও একটা অনিশ্চয়তা কাজ করছে—লোকটি কে হতে পারে; হয় তো একজন খুব গণমান্য লোকই হবে; আবার তাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংঘর্ষের ফলে লোকটির প্রতি শত্রুসুলভ বিদ্বেষও রয়েছে।

কিন্তু পরদিন সকালে যখন রক্ষীদল চলে গেল, তখন পিয়ের বুঝতে পারল যে অফিসার ও সৈনিকসহ নতুন রক্ষীদলের চোখে তার কোন অভিনবত্ব ধরা পড়ল না; বস্তুত চাষীর কোট-পরা এই শক্ত-সমর্থ লোকটার মধ্যে তারা তো সেই পরাক্রমশালী মানুষটিকে দেখছে না যে লুঠেরা ও প্রহরীদলের সঙ্গে বেপরোয়াভাবে লড়াই করেছিল এবং একটি শিশুকে রক্ষা করার জন্য গম্ভীর কথাগুলি বলেছিল; তারা তার মধ্যে দেখল শুধু ১৭ নম্বরের একটি রুশ বন্দীকে যাকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হুকুমে গ্রেপ্তার করে আটক রাখা হয়েছে। তাই সেদিন তাকে অন্যসব সন্দেহভাজন রুশ বন্দীদের সঙ্গে এক ঘরেইরাখা হল, কারণ যে আলাদা ঘরটাতে সে ছিল সেটা জনৈক অফিসারকে দেওয়া হয়েছে।

যেসব রুশদের সঙ্গে পিয়েরকে আটক রাখা হয়েছে তারা সকলেই একেবারে নিম্নশ্রেণীর মানুষ। তাকে ভদ্রলোক বলে চিনতে পেরে, বিশেষত সে ফরাসী ভাষায় কথা বলছে দেখে, তারা তাকে এড়িয়ে চলতে লাগল। তাকে নিয়ে সকলে হাসি-ঠাট্টা করছে দেখে পিয়ের দুঃখ পেল।

সেদিন সন্ধ্যায় সে জানতে পারল, এইসব বন্দীদের (হয় তো সেও তাদের মধ্যে একজন) আগুন লাগাবার অভিযোগে বিচার করা হবে। তৃতীয় দিনে অন্য সকলের সঙ্গে তাকেও একটা বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দুজন কর্ণেল ও অন্য ফরাসী সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে একজন সাদা গোঁফওয়ালা ফরাসী জেনারেল বসে আছে। অন্য সকলের মতই পিয়েরকেও জিজ্ঞাসা করা হল সে কে, কোথায় ছিল, কি উদ্দেশ্যে, ইত্যাদি।

পিয়ের জানে এই বিচারের ব্যবস্থাটা পুরোপুরি একটা লোক-দেখানো ব্যাপার। সে জানে, সে এই লোকগুলির মুঠোর মধ্যে পড়েছে, গায়ের জোরে তারা তাকে এখানে এনেছে, সেই গায়ের জোরেই তার কাছ থেকে প্রশ্নের উত্তর দাবী করার অধিকার তারা পেয়েছে, আর তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা। আর যেহেতু তাকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষমতা ও ইচ্ছা দুইই তাদের আছে, সেইহেতু এই তদন্ত ও বিচারের ব্যবস্থাটা একান্তই অপ্রয়োজনীয়। এটা তো জানা কথা যে জবাব যাই হোক তার শাস্তি হবেই; যখন তাকে প্রশ্ন করা হল গ্রেপ্তারের সময় সে কি করছিল, তখন পিয়ের করুণভাবে বলল যে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার করে একটি শিশুকে তার বাবা-মার হাতে তুলে দিচ্ছিল। সে

লুঠেরাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল কেন? পিয়ের জবাব দিল, "একটি স্ত্রীলোককে বাঁচাবার জন্য," আর "অসম্মানিত একটি নারীকে রক্ষা করা প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য, এবং..." তারা তার কথায় বাধা দিল, কারণ এসব কথা তারা শুনতে চায় না। সাক্ষীরা তাকে যেখানে দেখতে পেয়েছিল সেই অগ্নিদগ্ধ বাড়িটার উঠোনে সে কেন গিয়েছিল? পিয়ের জবাব দিল, সে মস্কোর অবস্থাটা দেখতে গিয়েছিল। আবার তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সে কে? আবার সে জানাল যে প্রশ্নের জবাব সে দেবে না।

"রেখে দাও, খারাপ....খুব খারাপ," সাদা গোঁফ ও লাল মুখ জেনারেলটি কঠোর গলায় বলে উঠল।

চতুর্থ দিনে জুবভ্‌স্কি প্রাচীরেও আগুন জলে উঠল।

পিয়ের ও অন্য তেরোজনকে নিয়ে যাওয়া হল ক্রিমীয় সেতুর নিকটবর্তী জনৈক বণিকের বাড়ির গাড়ির আড্ডায়। রাজপথ দিয়ে যেতে যেতে পিয়েরের দম বন্ধ হয়ে এল; সারা শহর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। চারদিকেই আগুন জলছে। মস্কো পুড়ে যাওয়ার তাৎপর্য সে তখনও বুঝতে পারে নি; সভয়ে আগুনের দিকে তাকাল।

ক্রিমীয় সেতুর নিকটবর্তী গাড়ির আড্ডাখানায় সে চার দিন কাটাল। সেখানেই ফরাসী সৈন্যদের কথাবার্তা থেকে সে জানতে পারল, যাদের সেখানে আটক রাখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে মার্শালের সিদ্ধান্ত যেকোন দিন পৌঁছে যাবে। মার্শালটি যে কে তা পিয়ের জানতে পারল না। স্পষ্টতই তাদের কাছে মার্শাল নিশ্চয়ই একটি খুব বৃহৎ রহস্যময় শক্তি।

৮ই সেপ্টেম্বরের আগেকার যে কয়টা দিন ধরে বন্দীদের দ্বিতীয় দফা জেরা চলতে লাগল, পিয়েরের কাছে সেই দিনগুলি ছিল কঠোরতম।

অধ্যায়—১০

৮ই সেপ্টেম্বর একজন অফিসার—রক্ষীরা তাকে যেরকম সম্মান দেখাল তাতেই বোঝা গেল সে একজন গণমান্য লোক—এসে গাড়ির আড্ডায় ঢুকল। হাতে একখানি কাগজ নিয়ে সে উপস্থিত রুশদের সকলেরই নাম ধরে ডাকল; শুধু পিয়েরকে ডাকল "একজন লোক যে তার নাম বলে নি" বলে। নির্বিকার উদাসভাবে বন্দীদের দিকে তাকিয়ে সে ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে হুকুম দিল, মার্শালের কাছে নিয়ে যাবার আগে এদের যেন ভাল পোশাক পরিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয়। একঘণ্টা পরে একদল সৈন্য এসে পিয়ের ও অন্য তেরোজনকে নিয়ে "কুমারীক্ষেত্রে" হাজির করল। দিনটি সুন্দর, বৃষ্টির পরে রোদ উঠেছে, বাতাসে এক কণা ধুলো নেই। চারদিক ধোঁয়ায় ঢেকে নেই; শুধু কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। আগুনের

শিখা চোখে পড়ছে না, চারদিকেই শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠছে, যতদূর পিয়েরের চোখ গেল সারা মস্কো একটা প্রকাণ্ড ভস্মীভূত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে পিয়ের অতিপরিচিত অঞ্চলগুলিকেও চিনতে পারল না। এখানে-ওখানে গির্জাগুলো চোখে পড়ল; সেগুলি পোড়ানো হয় নি। ক্রেমলিনকেও ধ্বংস করা হয় নি। গম্বুজ ও মহান আইভানের ঘণ্টাঘরসমেত ক্রেমলিনের সাদা বাড়িটা চকচক করছে। নব কনভেন্টের গম্বুজগুলি ঝিকমিক করছে, ঘণ্টাগুলি স্পষ্ট শব্দে বাজছে। ঘণ্টা শুনে পিয়েরের মনে পড়ল আজ রবিবার, কুমারী উৎসবের দিন। কিন্তু উৎসব পালন করতে কেউ সেখানে হাজির হয় নি। সর্বত্র কালো কালো ধ্বংসস্তূপ; ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত যে দুচারজন ভয়ার্ত রুশকে দেখা যাচ্ছে তারাও ফরাসীদের দেখলেই লুকিয়ে পড়তে চেষ্টা করছে।

এটা পরিষ্কার যে রুশ নীড় ধ্বংস হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে, কিন্তু বিধ্বস্ত রুশ জীবনযাত্রার জায়গায় সেই ভাঙা নীড়ের উপর গড়ে উঠেছে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ফরাসী শৃঙ্খলা। যে সৈনিকরা তাকে ও অন্য অপরাধীদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের চোখে পিয়ের এই সত্যকে দেখতে পেল; দেখতে পেল দুই ঘোড়ার গাড়িতে চেপে যে গণ্যমান্য অফিসারটি চলেছে তার চোখে। পিয়েরের মনে হল সে যেন একটা তুচ্ছ কাঠের টুকরো, এমন একটা যন্ত্রের চাকার মধ্যে পড়ে গেছে যার কাজকর্ম সে বুঝতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রটা বেশ ভালভাবেই চলছে।

তাকে ও অন্য বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হল কুমারী ক্ষেত্রের ডান দিকে মস্ত বাগানওয়ালা একটা বড় সাদা বাড়িতে। প্রিন্স শের্বাতভ-এর বাড়ি; আগে এ বাড়িতে পিয়ের প্রায়ই আসত। সৈনিকদের কথাবার্তা থেকে সে জানতে পেরেছে, এই বাড়িতে এখন এক্‌মুল-এর ডিউক (দাভুত) মার্শাল বাস করে।

ফটকে পৌঁছে তাদের একে একে ভিতরে ঢোকান হল। পিয়েরের স্থান ষষ্ঠ। কাঁচের ঘর, বাইরের ঘর ও হল ঘরের ভিতর দিয়ে একটা লম্বা নীচু পড়ার ঘরে তাকে নিয়ে যাওয়া হল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একজন অ্যাডজুটাণ্ট।

নাকের উপর চশমা রেখে ঘরের একেবারে শেষ কোণে টেবিলের উপর ঝুঁকে বসে আছে দাভুত। পিয়ের তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও একটা কাগজ দেখতে ব্যস্ত থাকায় দাভুত চোখ তুলল না। চোখ না তুলেই নীচু গলায় বলল:

"কে তুমি?"

পিয়ের নীরব, একটা কথাও তার মুখ থেকে বের হল না। সে জানে, দাভুত শুধু একজন ফরাসী জেনারেলই নয়, নিষ্ঠুরতার জন্যও সে কুখ্যাত।

দাভুত বসে আছে ছাত্রের জবাব শুনবার জন্য অপেক্ষারত কড়া ধাতের স্কুল-শিক্ষকের মত। তার ঠাণ্ডা মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়ের বুঝতে পারল, জবাব দিতে একমুহূর্ত বিলম্ব ঘটলে তার ফলে তার জীবনটাই চলে যেতে পারে; কিন্তু সে যে কি বলবে তাই জানে না। দাভুত মাথা তুলল, চশমাজোড়াকে কপালের উপর ঠেলে দিল, চোখ কুঁচকে পিয়েরের দিকে তাকাল।

পিয়েরকে ভয় দেখাবার জন্যই মাপা ঠাণ্ডা গলায় বলল, "লোকটিকে আমি চিনি।"

যে ঠাণ্ডা স্রোতটা এতক্ষণ পিয়েরের পিঠ বেয়ে নামছিল এবার সেটা পাক-সাঁড়াশীর মত তার মাথাটাকেই চেপে ধরল।

"আপনি আমাকে চিনতে পারেন না জেনারেল, আমি কখনও আপনাকে দেখি নি...."

তার কথায় বাধা দিয়ে উপস্থিত অপর একজন জেনারেলকে দাভুত বলল, "ও একজন রুশ গুপ্তচর।"

দাভুত ঘুরে বসল। অপ্রত্যাশিতভাবে গলা কাঁপিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল:

"না মঁসিয়, আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। আমি একজন বেসামরিক অফিসার; মস্কো ছেড়ে যাই নি।"

"তোমার নাম?" দাভুত শুধাল।

"বেজুখভ।"

"তুমি যে মিথ্যা বলছ না তার কি প্রমাণ আছে?"

এ কথায় আহত না হয়ে অনুনয়ের সুরে পিয়ের বলল, "মঁসিয়!"

দাভুত চোখ তুলে একাগ্র দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড তারা পরস্পরকে দেখল, আর সেই দৃষ্টিই পিয়েরকে রক্ষা করল। যুদ্ধ ও আইনের দৃষ্টিতে সেই দৃষ্টি দুটি মানুষের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক গড়ে তুলল। সেইমুহূর্তে দুজনের মনের মধ্যেও অস্পষ্টভাবে কিছু ঘটে গেল; তারা বুঝল, তারা দুজনেই মানবতার সন্তান, দুই ভাই।

একমুহূর্ত কি ভেবে দাভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, "তুমি যে সত্য কথাই বলছ সেটা আমার কাছে কি ভাবে প্রমাণ করবে?"

পিয়েরের মনে পড়ে গেল রাম্বালের কথা; তার নাম, রেজিমেণ্ট ও যে রাস্তায় তার বাড়ি সব বলে দিল।

"তুমি যা বলছ তা নও," দাভুত আবার বলল।

কম্পিত স্খলিত কণ্ঠে পিয়ের তার বক্তব্যের স্বপক্ষে প্রমাণ দিতে লাগল। কিন্তু সেইমুহূর্তে একটি অ্যাডজুটাণ্ট ঘরে ঢুকে দাভুতকে কি যেন বলল।

সে সংবাদ শুনে দাভুতের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; সে ইউনিফর্মের বোতাম আঁটতে লাগল। মনে হল, পিয়েরের কথা সে বেমালুম ভুলে গেছে।

অ্যাডজুটাণ্টটি বন্দীর কথা স্মরণ করিয়ে দিতে সে ভ্রুকুটি করে মাথাটা পিয়েরের দিকে নেড়ে তাকে সরিয়ে নেবার হুকুম দিল। তাকে যে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে পিয়ের তা বুঝতে পারল না।

মুখ ফিরিয়ে দেখল, অ্যাডজুটাণ্টটি দাভুতকে আর একটা প্রশ্ন করছে।

"হ্যাঁ, অবশ্য!" দাভুত উত্তর দিল, কিন্তু এই "হ্যাঁ"-র যে কি অর্থ তা পিয়ের বুঝতে পারল না।

সে যে কোথায় গিয়েছিল, অনেক দূরে কি না, অথবা কোন্ দিকে—পরবর্তীকালে এসব কিছুই পিয়ের স্মরণ করতে পারে নি। তার বুদ্ধিবৃত্তি অবশ হয়ে গেল, কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়ল, কোন দিকে লক্ষ্য না করে অন্যের সঙ্গে পা মিলিয়ে এগিয়ে চলল, এবং অন্য সকলে যখন থামল তখন সেও থেমে গেল। একটা চিন্তাই তখন তার মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল: কে তার মৃত্যুদণ্ড দিল? যে কমিশন তাকে প্রথম জেরা করেছিল তারা নয়। এমন মানবিক দৃষ্টিতে দাভুত তার দিকে তাকিয়েছিল যে সেও হতে পারে না। আর একমুহূর্ত পরেই দাভুত তার ভুল বুঝতে পারত, কিন্তু তখনই অ্যাডজুটাণ্টটি এসে তার চিন্তায় বাধা দিল। তাহলে কে তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, তাকে হত্যা করছে, জীবন থেকে তাকে বঞ্চিত করছে—তাকে, পিয়েরকে, অনেক স্মৃতি, আকাঙ্খা, আশা ও চিন্তার একটি মানুষকে? একাজ কে করছে? পিয়েরের মনে হল, কেউ না।

একটা ব্যবস্থা মাত্র—ঘটনার একটা সমাবেশ মাত্র।

যেকোন রকমের একটা ব্যবস্থা তাকে—পিয়েরকে—হত্যা করছে, জীবন থেকে, সব কিছু থেকে বঞ্চিত করছে, তাকে ধ্বংস করছে।

অধ্যায়—১১

প্রিন্স শের্বাতভের বাড়ি থেকে বন্দীদের সোজা নিয়ে যাওয়া হল কুমারী-ক্ষেত্রে—সন্ন্যাসিনীদের মঠের বাঁ দিকে একেবারে সব্জিবাগানের কাছে। সেখানে একটি খুঁটি পোঁতা হয়েছে। খুঁটিটা ছাড়িয়ে একটা নতুন গর্ত খোড়া হয়েছে, আর খুঁটি ও গর্তের কাছাকাছি অনেক মানুষ অর্ধবৃত্তাকারে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিড়ের মধ্যে আছে অল্প কয়েকজন রুশ, আর নেপোলিয়নের অনেক সৈন্যসামন্ত—নানা ইউনিফর্মে সজ্জিত জার্মান, ইতালীয় ও ফরাসী। খুঁটির ডাইনে ও বাঁয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে নীল ইউনিফর্ম, লাল স্কন্ধত্রাণ, উঁচু বুট ও শাকো পরিহিত ফরাসী সৈন্যরা।

তালিকা অনুযায়ী বন্দীদের পর পর দাঁড় করিয়ে দিয়ে (পিয়েরের স্থান ষষ্ঠ) খুঁটিটার দিকে নিয়ে যাওয়া হল। সহসা তাদের দুদিক থেকে ভেরী বেজে উঠল; সেই শব্দে পিয়েরের মনে হল বুঝি তার মনের একটা অংশকে

ছিঁড়ে ফেলা হল। চিন্তা করবার ও বুঝবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে। শুধু শুনতে পাচ্ছে আর দেখতে পাচ্ছে। তখন তার শুধু একটি ইচ্ছা—যে ভয়ঙ্কর জিনিস ঘটতে যাচ্ছে সেটা তাড়াতাড়ি ঘটে যাক। অন্য বন্দীদের দিকে তাকিয়ে পিয়ের তাদের ভাল করে লক্ষ্য করতে লাগল।

প্রথম দুজন কয়েদী, মাথা কামানো। একজন লম্বা, লিকলিকে, অপর জনের ময়লা রং, লোমশ পেশীবহুল দেহ, চ্যাপ্টা নাক। তৃতীয়জন গৃহ-ভৃত্য, বছর পঁয়তাল্লিশ বয়স, ধূসর চুল, নাদুসনুদুস চেহারা। চতুর্থজন চাষী, খুব সুন্দর, হাল্কা বাদামী চওড়া দাড়ি ও কালো চোখ। পঞ্চম একজন কারখানার মজুর, হলদে মুখ, ঢিলে জোব্বা পরা আঠারো বছরের একটি ছেলে।

পিয়ের শুনতে পেল, ফরাসীরা বলাবলি করছে, তাদের আলাদা গুলি করবে, না জোড়ায় জোড়ায়। শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় অফিসার বলল, "জোড়ায় জোড়ায়।"

চাদর পরিহিত একজন ফরাসী পদস্থ ব্যক্তি বন্দীদের ডান দিকে এসে রুশ ও ফরাসী ভাষায় দণ্ডাদেশ পাঠ করল।

দু' জোড়া ফরাসী সৈন্য অপরাধীদের দিকে এগিয়ে গেল; অফিসারের হুকুমে সারির প্রথমে দাঁড়ানো কয়েদী দুজনকে ধরল। খুঁটির কাছে পৌঁছে কয়েদী দুজন থামল; থলে আনা হল; আহত পশু যেভাবে আগুয়ান শিকারীর দিকে তাকায় তারাও সেইভাবে নিঃশব্দে চারদিকে তাকাতে লাগল। একজন অনবরত ক্রুশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল, অপরজন পিঠ চুলকোতে চুলকোতে হাসির মত করে ঠোঁট নাড়তে লাগল। সৈনিকরা দ্রুত হাতে তাদের চোখ বেঁধে দিল, মাথার উপর দিয়ে থলে দুটি নামিয়ে দিল; আর দুজনকেই খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলল।

বারোজন নিপুণ বন্দুকবাজ বন্দুক নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সেনাদলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে খুঁটি থেকে আট পা দূরে দাঁড়াল। পাছে আসন্ন ঘটনাটা চোখে দেখতে হয় এই ভয়ে পিয়ের মুখ ফিরিয়ে নিল। হঠাৎ কটাস্ করে এমন একটা কুণ্ডলি পাকানো শব্দ কানে এল যেটা যেকোন ভয়ঙ্কর কামানের শব্দের চাইতেও জোরালো। পিয়ের ঘুরে তাকাল। কিছুটা ধোঁয়া উড়ছে, আর ফরাসী সৈনিকরা বিবর্ণ মুখে ও কম্পিত হাতে গর্তটার কাছে কি যেন করছে। আরও দুজন বন্দীকে আনা হল। একইভাবে একই দৃষ্টিতে তারা দুজনও চারদিকের দর্শকদের দিকে বৃথাই প্রাণরক্ষার নীরব আবেদন নিয়ে তাকাতে লাগল। তাদের ভাগ্যে যে কি ঘটতে চলেছে তাও তারা বুঝতে পারছে না বা বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের কাছে জীবনের যে কি অর্থ তা তারা জানে, আর তাই সে জীবন যে কেউ নিতে পারে এটা তারা না পারছে বুঝতে, আর না পারছে বিশ্বাস করতে।

এবারও পিয়ের এসব দেখতে চাইল না, মুখটা ঘুরিয়ে নিল ; কিন্তু আবার সেই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দ তার কানে এল, আর সেইমুহূর্তে সে দেখল ধোঁয়া, রক্ত, আর বিবর্ণ মুখ ফরাসী সৈন্য ; এবারও তারা খুঁটির পাশে কম্পিত হাতে কি যেন করছে। জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলে চারদিক তাকিয়ে যেন জানতে চাইল এসবের অর্থ কি। যতগুলি চোখের উপর চোখ পড়ল সর্বত্রই ঐ একই জিজ্ঞাসা সে দেখতে পেল।

তার নিজের অন্তরের মধ্যে যে হতাশা, আতঙ্ক ও সংঘাত দেখা দিয়েছে তারই প্রতিফলন সে দেখতে পেল প্রতিটি রুশ ও ফরাসী সৈনিক এবং অফিসারদের মুখে ; একটিও ব্যতিক্রম নেই। মুহূর্তের জন্য তার মনের মধ্যে একটি প্রশ্নই ঝল্‌সে উঠল ; "কিন্তু কে তাহলে এসব করছে ? এরা সকলেই তো আমাদের মত কষ্ট পাচ্ছে। তাহলে কে সে ? কে ?"

"৮৬তম বন্দুকবাজরা, আগে বাড় !" কে যেন চীৎকার করে বলল।

এবার পিয়েরের ঠিক পূর্ববর্তী পঞ্চম বন্দীটিকে নিয়ে যাওয়া হল—একা। পিয়ের বুঝতে পারল না যে সে বেঁচে গেছে, তাকে এবং অন্যদের সেখানে আনা হয়েছে শুধু এইসব মৃত্যুদণ্ড দেখতে। সে কিন্তু কোন রকম আনন্দ বা স্বস্তি বোধ করল না ; ক্রমবর্ধমান আতংকের সঙ্গে সব কিছু দেখতে লাগল। ঢিলে জোব্বা পরা সেই কারখানার ছেলেটিই পঞ্চম বন্দী। তার গায়ে হাত দিতেই সে আতঙ্কে লাফিয়ে একপাশে সরে গিয়ে পিয়েরকে জড়িয়ে ধরল। (পিয়ের শিউরে উঠে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল।) ছেলেটি হাঁটতেও পারছে না। দুই বগলের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে তারা তাকে টেনে নিয়ে চলল ; সে চেঁচাতে লাগল। খুঁটির কাছে নিয়ে যেতেই সে চুপ করে গেল, যেন হঠাৎ তার মধ্যে একটা বোধ ফিরে এসেছে। সে কি বুঝতে পেরেছে যে আর্তনাদ করা অর্থহীন, অথবা সে কি ভেবেছে যে এরা তাকে খুন করবে এটা একান্তই অবিশ্বাস্য। সে যাই হোক, খুঁটির পাশে দাঁড়িয়ে সে চোখ বেঁধে দেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল এবং একটা আহত জন্তুর মত চকচকে চোখ মেলে চারদিকে তাকাতে লাগল।

এবারে পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে চোখ বন্ধ করতে পারল না। ভিড়ের অন্য সকলের মতই এই পঞ্চম হত্যাকাণ্ডের সময় তার কৌতূহল ও উত্তেজনাও একেবারে চরমে উঠেছে। অন্য সকলের মতই পঞ্চম লোকটিও চুপচাপ হয়ে গেছে ; ঢিলে জোব্বাটাকে আরও ভাল করে গায়ে জড়িয়ে একটা খালি পা দিয়ে অন্য পাটা ঘসছে।

তারা যখন তার চোখ বেঁধে দিল তখন পিছনের গিঁটটা মাথায় লাগছিল বলে নিজেই সেটা ঠিক করে নিল ; রক্তাক্ত খুঁটিটার গায়ে তাকে ঠেলান দিয়ে দাঁড় করানো হলে সে নিজেই হেলান দিল এবং কিছুটা অস্বস্তি বোধ করায় সোজা হয়ে দাঁড়াল, পা দুটোকে ঠিক করে নিল, আরাম করে হেলান দিয়ে

দাঁড়াল। পিয়ের তার উপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল না, তার সব গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগল।

হয়তো একটা হুকুম দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরে আটটা বন্দুকের শব্দও হয়েছিল ; কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক চেষ্টা করেও গুলির এতটুকু শব্দ শোনার কথা পিয়ের মনে করতে পারত না। সে শুধু দেখেছিল, মজুরটি হঠাৎ তার বন্ধন-দড়ির উপরেই পড়ে গেল, দুটো স্থানে রক্ত দেখা গেল, ঝুলন্ত শরীরটার ভারে দড়িগুলো ঢিলে হয়ে গেল, আর মজুরটি বসে পড়ল, মাথাটা অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে আছে, আর একটা পা ভাঁজ হয়ে আছে। পিয়ের খুঁটিটার দিকে এগিয়ে গেল। কেউ তাকে বাঁধা দিল না। বিবর্ণ ভয়ার্ত লোকগুলো মজুরটিকে ঘিরে কি যেন করছে। ঘন গোঁফওয়ালা একটি বুড়ো ফরাসী যখন দাড়িগুলো খুলছিল তখন তার নীচের চোয়ালটা অনবরত কাঁপছে। শরীরটা পড়ে গেল। সৈনিকরা বিশ্রীভাবে সেটাকে খুঁটির কাছ থেকে টেনে নিয়ে গর্তের মধ্যে ঠেলে দিতে লাগল।

তারা সকলেই নিশ্চিতভাবে জানে যে তারা অপরাধী ; যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের অপরাধের চিহ্নকে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

গর্তের ভিতরে তাকিয়ে পিয়ের দেখল, কারখানার ছেলেটি হাঁটু দুটোকে মাথার কাছে নিয়ে পড়ে আছে ; একটা কাঁধ অপর কাঁধটার চাইতে বেশী উঁচু হয়ে আছে। সেই কাঁধটা তালে তালে ওঠা-নামা করছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই কোদালভর্তি মাটি তার শরীরের উপর ছড়িয়ে দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। একটি সৈনিক ক্রুদ্ধ কণ্ঠে পিয়েরকে চলে যেতে বলল। কিন্তু পিয়ের তার কথা বুঝতে পারল না, খুঁটিটার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল, কেউ তাড়িয়ে দিল না।

গর্তটা ভর্তি হয়ে গেলে আবার একটা হুকুম দেওয়া হল। পিয়েরকে তার জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল, খুঁটির দুই পাশের দুই সারি সৈন্য অর্ধেক ঘুরে গিয়ে মাপা পা ফেলে সেটার পাশ দিয়ে চলে গেল। বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়ানো চব্বিশটি বন্দুকবাজ ছুটে যার যার নিজের জায়গায় চলে গেল।

পিয়ের বিস্ময়বিমূঢ় চোখে বন্দুকবাজদের দিকেই তাকিয়েছিল। একজন ছাড়া আর সকলেই সেনাদলের সঙ্গে ফিরে গেল। এই যুবক সৈনিকটি গর্তের কাছে ঠিক সেই জায়গাটাতেই দাঁড়িয়ে রইল যেখান থেকে সে গুলি ছুঁড়েছিল। তার মুখটা মরার মত সাদা, শাকো পিছনের দিকে সরানো, আর বন্দুকটা মাটির উপরে রাখা। সে মাতালের মত দুলছে ; পাছে পড়ে যায় তাই একবার কয়েক পা এগোচ্ছে, আবার পিছিয়ে যাচ্ছে। একটি বৃদ্ধ নন-কমিশনড্ অফিসার দলের ভিতর থেকে ছুটে এসে তাকে কনুই দিয়ে জাপ্‌টে ধরে দলের দিকে নিয়ে গেল। রুশ ও ফরাসীদের ভিড় কমতে শুরু

করেছে। সকলেই মাথা নীচু করে নীরবে চলে যাচ্ছে।

একটি ফরাসী সৈনিক বলল, "এ থেকেই ওরা আগুন দেবার উচিত শিক্ষা পাবে।"

পিয়ের ঘুরে বক্তার দিকে তাকাল। সৈন্যটি নিজের কৃতকর্মের জন্য কিছুটা স্বস্তি পেতে চেষ্টা করছে, কিন্তু পাচ্ছে না। কথা শেষ না করেই সে হাত দিয়ে একটা অর্থহীন ভঙ্গী করে চলে গেল।

অধ্যায়—১২

প্রাণদণ্ড-পর্ব শেষ হবার পরে পিয়েরকে অন্য সব বন্দীদের কাছ থেকে আলাদা করে একটা ছোট, বিধ্বস্ত, দুর্গন্ধময় গির্জায় একলা রেখে দেওয়া হল।

সন্ধ্যার দিকে দুটি সৈনিকসহ একজন নন-কমিশন্ড্ অফিসার সেখানে ঢুকে বলল যে তাকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং এখন তাকে যুদ্ধ-বন্দীদের জন্য নির্দিষ্ট ব্যারাকে যেতে হবে। তাকে বলা হল না বুঝেই সে উঠে সৈন্যদের সঙ্গে চলল। তারা তাকে নিয়ে গেল মাঠের উঁচুদিকটার শেষ প্রান্তে। সেখানে পোড়া তক্তা, কড়ি ও বরগা দিয়ে কতকগুলি চালাঘর বানানো হয়েছে। তারই একটার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। অন্ধকারে জনা বিশেক মানুষ পিয়েরকে ঘিরে ধরল। তারা কে, কেন এখানে এসেছে, আর তার কাছেই বা কি চায়—এসব কিছুই বুঝতে না পেরে সে তাদের দিকে তাকাল। তারা যা বলল তা শুনল, কিন্তু কোন কথার অর্থ বুঝতে পারল না। তাদের প্রশ্নের জবাব দিল, কিন্তু কারা সে জবাব শুনছে, বা শুনে বুঝতে পারছে কি না তাও ভাবল না। তাদের মুখের দিকে, শরীরের দিকে তাকাল, কিন্তু সবকিছুই অর্থহীন মনে হল।

যেমুহূর্তে সে মানুষের হাতে মানুষের সেই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড দেখেছে, অথচ তারা কেউ সে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চায় নি, তখন থেকেই জীবনের মূল উৎসই যেন সহসা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে; সব কিছুই ভেঙে পড়ে একটা অর্থহীন জঞ্জালের স্তূপে পরিণত হয়েছে। নিজের কাছে স্বীকার না করলেও এই জগতের সুষ্ঠু পরিচালনা, মানবতা, নিজের আত্মা, এবং ঈশ্বরের উপর তার যে বিশ্বাস ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। এ অভিজ্ঞতা তার আগেও হয়েছে, কিন্তু এখানকার মত এমন তীব্র অভিজ্ঞতা কখনও হয় নি। এখন তার মনে হচ্ছে, গোটা পৃথিবীটাই তার চোখের সামনে ভেঙে পড়েছে, পড়ে আছে শুধু অর্থহীন ধ্বংসস্তূপ, অথচ এব্যাপারে তার নিজের কোন দোষ নেই। সে অনুভব করছে, জীবনের অর্থকে নতুন করে বিশ্বাস করবার ক্ষমতাও তার নেই।

অন্ধকারে সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে; বোঝা যাচ্ছে তার প্রতি

তাদের অসীম আগ্রহ। তারা তাকে কি যেন বলছে, কি সব প্রশ্ন করছে। তারা তাকে অন্য কোনখানে নিয়ে চলল, এবং শেষ পর্যন্ত চালাটার এমন একটা কোণে নিয়ে গেল যেখানে চারদিককার মানুষগুলো হাসছে আর কথা বলছে।

"আচ্ছা, তাহলে স্যাঙাৎরা...ইনিই সেই প্রিন্স যে..." "যে" শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে চালার অপর দিক থেকে কে যেন বলে উঠল।

দেয়ালে পিঠ দিয়ে একগাদা খড়ের উপর নীরব, নিশ্চল হয়ে বসে পিয়ের একবার চোখ খুলছে, একবার বন্ধ করছে। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে কারখানার ছেলেটির সেই ভয়ংকর মুখ—তার সরলতার জন্যই বুঝি বেশী ভয়ংকর—আর সেই সব হত্যাকারীর মুখ যারা আত্ম-গ্লানির জন্যই যেন আরও ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। আবার চোখ খুলে চারদিককার অন্ধকারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

তারপাশেই উবু হয়ে বসে আছে একটি ছোটখাট মানুষ। নড়াচড়া করলেই শরীর থেকে ঘামের যে তীব্র গন্ধ আসছে তা থেকেই সে প্রথম লোকটির উপস্থিতি টের পেয়েছে। অন্ধকারে লোকটি নিজের পা নিয়ে কি যেন করছে; তার মুখ দেখতে না পেলেও পিয়ের বুঝতে পারছে যে লোকটি বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্ধকারে কিছুটা অভ্যস্ত হবার পরে পিয়ের দেখল, লোকটি তার পায়ের পট্টি খুলছে, আর যেভাবে খুলছে তাতে পিয়েরের মনে আগ্রহ দেখা দিল।

এক পায়ের পট্টির দড়িটা খুলে সাবধানে সেটাকে পাকে পাকে খুলে সঙ্গে সঙ্গে অপর পায়ের কাজ শুরু করে লোকটি পিয়েরের দিকে তাকাল। এক হাতে দড়িটা ঝুলিয়ে রেখেই আর এক হাতে দ্বিতীয় পায়ের পট্টিটা খুলতে শুরু করল। এইভাবে নিপুণ দক্ষতায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুই পায়ের পট্টি খুলে লোকটি মাথার উপরকার একটা গজালে সেদুটো ঝুলিয়ে রাখল। তারপর একটা ছুরি বের করে কি যেন কাটল, ছুরিটা বন্ধ করল, মাথার কাছে বিছানার নীচে রেখে দিল। তারপর পিয়েরের দিকে তাকাল।

"আপনি অনেক গোলযোগ পুইয়েছেন, কি বলেন স্যার?" ছোট্ট মানুষটি হঠাৎ বলে উঠল।

তার সুরেলা কণ্ঠস্বরে এত দয়া ও সরলতা ঝরে পড়ল যে পিয়ের জবাব দিতে চেষ্টা করল, কিন্তু তার চোয়াল কাঁপতে লাগল, দুই চোখে জল এসে গেল।

পিয়েরের এই বিহ্বলতা প্রকাশের এতটুকু সময় না দিয়ে ছোট মানুষটি সেই একই মনোরম স্বরে সঙ্গে সঙ্গে বলতে লাগল:

"আরে বাবা, বেজার হবেন না!...বেজার হবেন না বন্ধু—'এক ঘণ্টা কষ্ট কর, আর এক যুগ বেঁচে থাক!' এটাই তো আসল কথা গো বন্ধু। আর

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এর মধ্যেও আমরা বেঁচে আছি। এই সব মানুষদের মধ্যে যেমন খারাপ লোক আছে, তেমনই ভাল লোকও আছে।" কথা বলতে বলতে সে সহজেই হাঁটুর উপর ভর করে উঠে দাঁড়াল, কাশল, তারপর চালাটার অপর দিকে চলে গেল।

"অ্যাঁ, ব্যাটা পাজি তুমি!" পিয়ের শুনতে পেল এই লোকটিই ওধারে কথা বলছে। "তাহলে তুমি এসেছ, ব্যাটা পাজি। তার তাহলে মনে আছে....ঠিক আছে, ঠিক আছে, ওতেই হবে!"

একটা ছোট কুকুর তার দিকে লাফিয়ে উঠছিল; সেটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সৈনিকটি তার জায়গায় ফিরে এসে বসল। তার হাতে ছেঁড়া কাপড়ে জড়ানো কি যেন রয়েছে।

পুটুলি খুলে পিয়েরের দিকে কিছু সিদ্ধ আলু এগিয়ে দিয়ে সে আগেকার মতই সশ্রদ্ধ স্বরে বলল, "এই যে, কিছু খান স্যার। ডিনারে ছিল ঝোল, আর আলু তো চমৎকার!"

পিয়ের সারাদিন কিছু খায় নি। আলুর ঘ্রাণ তার খুবই ভাল লাগল। সৈন্যটিকে ধন্যবাদ জানিয়ে খেতে শুরু করল।

সৈনিকটি হেসে বলল, "আচ্ছা, ভাল তো? আপনার তো ভাল লাগা উচিত।"

একটা আলু নিয়ে ছুরিটা বের করে হাতের উপরেই সেটাকে দু'খণ্ড করে কেটে তাতে একটু নুন ছড়িয়ে দিয়ে পিয়েরের হাতে দিল।

আবার বলল, "আলুগুলি চমৎকার! এরকম আগে খেয়েছেন!"

পিয়েরের মনে হল এর চাইতে বেশী সুস্বাদু কিছু সে কখনও খায় নি।

বলল, "আরে, আমি তো ভাল আছি, কিন্তু ওই বেচারিদের ওরা গুলি করল কেন? শেষটির তো বিশ বছরও বয়স হয় নি।"

ছোট মানুষটি বলল, "চু, চু...! কী পাপ! কী পাপ! আচ্ছা স্যার, আপনি কেন মস্কোতে রয়ে গেলেন?"

পিয়ের জবাব দিল, "ওরা এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে ভাবতে পারি নি। হঠাৎই থেকে গেছি আর কি।"

"আর ওরা আপনাকে গ্রেপ্তার করল কেমন করে বাবা? আপনার বাড়িতে?"

"না, আমি অগ্নিকাণ্ড দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানেই ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করে, আর আগুন লাগানোর অভিযোগে বিচার করে।"

ছোট মানুষটি শুধু বলল, যেখানে আইন আছে, সেখানেই আছে অন্যায়।"

আলুর শেষটুকু চিবোতে চিবোতে পিয়ের শুধাল, "আপনি কি অনেক দিন এখানে আছেন?"

"আমি ? আমাকে তো গত রবিবারে ধরে এনেছে, মস্কোর একটা হাসপাতাল থেকে।"

"আরে, আপনি তাহলে একজন সৈনিক ?"

"হ্যাঁ, আমরা আপ্‌শেরন রেজিমেণ্টের সৈনিক। জ্বরে মরে যাচ্ছিলাম। কেউ কিছু জানায় নি। প্রায় জন বিশেক সেখানে শুয়েছিলাম। আমাদের কোন ধারণাই ছিল না, কখনও ভাবিও নি।"

"এখানে কি খুব খারাপ লাগছে ?" পিয়ের শুধাল।

"কিন্তু উপায় কি বলুন বাবা ? আমার নাম প্লাবন, উপাধি কারাতায়েভ," পিয়েরের পক্ষে ডাকবার সুবিধা হবে মনে করেই সে নামটা বলল। "রেজিমেণ্টে সকলে আমাকে ডাকে 'ছোট বাজপাখি' বলে। খারাপ না লেগে কি পারে ? মস্কো—তো সব শহরের জননী। তার এই অবস্থা দেখলে কি দুঃখ না হয়ে পারে ? কিন্তু কথায় বলে 'পোকা বাঁধাকপির পাতা কেটে ভিতরে ঢোকে, কিন্তু মরে সকলের আগে !"

"কি ? কি বললেন ?" পিয়ের শুধাল।

"কে ? আমি ?" কারাতায়েভ বলল। "আমি বলি, ঘটনা তো আমাদের হিসাব মত ঘটে না, ঘটে ঈশ্বরের হিসাবে।" তারপর সঙ্গে সঙ্গে বলতে শুরু করল, "আচ্ছা স্যার, আপনার তো পরিবার আছে, জমিদারি আছে ? আর একটা বাড়িও ? তার মানে আপনার প্রচুর আছে, কি বলেন ? আর গৃহিণীও ? আর বুড়ো বাবা-মা, তারা এখনও বেঁচে আছেন কি ?"

অন্ধকারে দেখা না গেলেও পিয়ের বুঝতে পারল যে এই প্রশ্নগুলি করার সময় করুণার চাপা হাসিতে সৈনিকটির ঠোঁট দুটি কুঁচকে গেল। পিয়েরের বাবা-মা বেঁচে নেই শুনে, বিশেষ করে মা নেই শুনে সে খুব দুঃখ পেল।

বলল, "স্ত্রী পরামর্শ দেয়, শাশুড়ি জানায় আদর, কিন্তু মার মত আপন জন কেউ নেই ! আচ্ছা আপনার ছেলে-মেয়ে আছে তো ?"

নেতিবাচক জবাব শুনে লোকটি দুঃখ পেল ; তাড়াতাড়ি বলল, "ঠিক আছে ! আপনার তো অল্প বয়স, ঈশ্বরের দয়া হলেই সন্তান হবে। সব চাইতে বড় কথাই হল মিলেমিশে থাকা—"

"কিন্তু এখন তো সবই সমান," পিয়ের না বলে পারল না।

কারাতায়েভ বলে উঠল, "আহা বাছা ! কারাগার অথবা ভিখারীর কাঁথাকে অগ্রাহ্য করবেন না !"

বেশ আরাম করে বসে সে একটু কাশল। মনে হল, একটা লম্বা গল্প বলার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে।

বলতে আরম্ভ করল, "দেখুন বাবা, আমি তো বাড়িতেই বাস করছিলাম। আমাদের একটা ভাল বাড়ি ছিল, প্রচুর জমি ছিল, আমরা চাষীরা তো সুখেই ছিলাম, আর বাড়িটার জন্যও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে।

বাবাকে নিয়ে যখন ফসল কাটতে যেতাম তখন আমরা হতাম সাতজন। ভালই ছিলাম। সত্যিকারের চাষী ছিলাম। কিন্তু কি যে ঘটল…"

প্লাতন কারাতায়েভ তার দীর্ঘ কাহিনীসূত্রে জানাল—কাঠ কাটতে অন্যের জঙ্গলে ঢুকলে প্রহরী তাকে ধরে ফেলে, বিচার হয়, বেত্রাঘাত হয়, তার পর তাকে সৈন্যদলে চালান করে দেওয়া হয়।

ঈষৎ হাসির সঙ্গে গলার সুর পাল্টে ফেলে সে বলে চলল, "দেখুন বাবা, আমরা এটাকে দুর্ভাগ্য বলেই মনে করেছিলাম, কিন্তু সেটাই বড় হয়ে দেখা দিল। আমি সেই পাপকাজ না করলে আমার ভাইকে সৈন্য হতে হত। কিন্তু তার, আমার ছোট ভাইয়ের পাঁচটি সন্তান, আর আমি ফেলে এসেছি শুধু স্ত্রীকে। আমাদের একটি ছোট মেয়ে ছিল, কিন্তু আমি সৈন্যদলে চলে যাবার আগেই ঈশ্বর তাকে নিয়ে নিলেন। ছুটিতে বাড়ি গেলে কি দেখি তাও বলছি; দেখি তারা আগের চাইতে ভাল আছে। উঠোন-ভরা গরু-মোষ, মেয়েরা সব ভাল আছে, দুই ভাই বিদেশে মাইনে পাচ্ছে, একমাত্র ছোট ভাই মাইকেল বাড়িতে থাকে। বাবা বলে, 'আমার কাছে সব সন্তানই সমান; যে আঙুলেই কামড় লাগুক, আঘাত সমানই লাগে। কিন্তু সৈন্য হিসাবে যদি প্লাতনের মাথা কামানো না হত তাহলে তো মাইকেলকেই যেতে হত।' বিশ্বাস করুন, বাবা সকলকে কাছে ডেকে এনে আমাদের নিয়ে গেল দেবমূর্তির সামনে। বলল, 'মাইকেল, ওর পায়ের কাছে নত হও; আর তুমি বৌমা, তুমিও নত হও; আর তোমরা নাতি-নাতনিরা, তোমরাও ওর কাছে নত হও!' …বুঝলেন তো ব্যাপারটা? এইরকমই হয়। ভাগ্য একটা মাথা চায়। কিন্তু আমরাই শুধু বিচার করি, 'এটা ভাল নয়—এটা ঠিক নয়!' আমাদের ভাগ্য হচ্ছে টানা-জালের জলের মত: যতক্ষণ টানবেন ততক্ষণ ফুলে-ফেঁপে উঠবে, কিন্তু যেই জল থেকে টেনে তুলবেন অমনি সব ফাঁকা! এইরকমই হয়!"

প্লাতন তার আসনটাকে খড়ের উপর সরিয়ে নিল।

একটু চুপ করে থেকে উঠে দাঁড়াল।

"আচ্ছা, মনে হচ্ছে আপনার ঘুম পাচ্ছে," বলে তাড়াতাড়ি ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সে বার বার বলতে লাগল:

"প্রভু যীশুখৃস্ট, মহাত্মা সন্ত নিকলাস, ফ্রোলা ও লাভ্রা! প্রভু যীশুখৃস্ট, মহাত্মা সন্ত নিকলাস, ফ্রোলা ও লাভ্রা! প্রভু যীশুখৃস্ট, আমাদের প্রতি করুণা কর, আমাদের রক্ষা কর!" কথা শেষ করে আভূমি নত হল, উঠে দাঁড়াল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল, তারপর আবার খড়ের স্তূপের উপরে বসে পড়ল।" এই তো পথ। হে ঈশ্বর, আমাকে পাথরের মত শুইয়ে দাও, পাঁউরুটির মত জাগিয়ে তোল" বিড়বিড় করে বলতে বলতে কোটটা গায়ে চাপা দিয়ে সে শুয়ে পড়ল।

পিয়ের শুধাল, "আপনি কি প্রার্থনা করলেন ?"

প্রায় ঘুমের মধ্যে প্লাতন অস্ফুটে বলল, "অ্যাঁ ? আমি কি বলছিলাম ? প্রার্থনা করছিলাম। আপনি প্রার্থনা করেন না ?"

"হ্যাঁ, করি," পিয়ের বলল। "কিন্তু ওই যে ফ্রোলা ও লাভ্রা বললেন, ওটা কি ?"

প্লাতন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "এই কথা! ওরা হলেন 'ঘোড়াদের' দুই সন্ত। জন্তু-জানোয়ারদের প্রতিও তো করুণা করা চাই। আরে, পাজিটা! বেশ তো কুঁকড়ে গরম হয়ে আছ দেখছি, এই কুক্কুরীর বাচ্চা!" পায়ের কাছে শুয়ে থাকা কুকুরটার গায়ে হাত বুলিয়ে পুনরায় পাশ ফিরে শুয়ে প্লাতন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে অনেক দূর থেকে কান্না ও আর্তনাদের শব্দ ভেসে আসছে, চালাঘরের ফাটল দিয়ে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ভিতরটা শান্ত ও অন্ধকার। অনেকক্ষণ পর্যন্ত পিয়েরের ঘুম এল না; অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে প্লাতনের নাসিকা-গর্জন শুনতে শুনতে তার মনে হল, যে পৃথিবী ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল সেটাই যেন নতুন রূপে, নতুন ও অবিচলিত ভিত্তির উপর নতুন করে গড়ে উঠছে তার আত্মার মধ্যে।

অধ্যায়—১৩

যে চালাঘরে পিয়েরকে রাখা হয়েছে সেখানেই রাখা হয়েছে আরও তেইশটি সৈনিক, তিনটি অফিসার ও দুটি কর্মচারীকে। সেখানেই পিয়ের চারটি সপ্তাহ কাটাল।

পরবর্তীকালে সেই দিনগুলির কথা মনে হলে আর সব কিছুই অস্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়; একমাত্র প্লাতন কারাতায়েভ ছাড়া; তার মনে প্লাতনের মূর্তিটি সর্বদাই বিরাজ করছে অত্যন্ত স্পষ্ট এক মূল্যবান স্মৃতি হয়ে, রাশিয়ার যা কিছু ভাল ও অখণ্ড তারই প্রতিমূর্তি হয়ে। পরদিন ভোরে পিয়ের যখন তার সেই পার্শ্ববর্তী লোকটিকে দেখল তখন সর্বপ্রথম তার মনে জাগল একটা অখণ্ডতার আভাষ: কোমরে দড়ি দিয়ে বাঁধা ফরাসী ওভারকোট, সৈনিকের টুপি ও কাঠের জুতো পরিহিত প্লাতনের গোটা শরীরটাই যেন এক অখণ্ডতার প্রতিমূর্তি। তার মাথাটা 'অখণ্ড' তার পিঠ, বুক, ঘাড়, এমন কি সর্বদা আলিঙ্গন-উন্মুখ দুই প্রসারিত হাত, তার স্মিত হাসি এবং বড় বড় শান্ত দুটি বাদামী চোখ—সবই অখণ্ড।

একজন বুড়ো সৈনিকের ভঙ্গীতে নিজের যুদ্ধের অভিযানের কথা সে বলেছে তা থেকেই বোঝা যায় তার বয়স পঞ্চাশ হয়েছে। সে নিজে তার বয়স জানে না, সেটা স্থির করতেও অপারগ। কিন্তু তার ঝকঝকে, উজ্জ্বল, সাদা দুই পাটি অর্ধবৃত্তাকার দাঁত যেমন সুস্থ তেমনই মজবুত, তার দাড়িতে

বা মাথার একটা সাদা চুল নেই, তার সারা দেহে নমনীয়তা, দৃঢ়তা ও কষ্টসহিষ্ণুতার আভাষ।

গ্রেপ্তার হবার পরে প্রথম কয়েকদিন তার শারীরিক শক্তি ও কর্মপটুতা এত বেশী ছিল যে ক্লান্তি ও রোগ কাকে বলে তাই সে জানত না। প্রতি রাতে শোবার আগে সে বলত: "প্রভু, আমাকে শুইয়ে দাও পাথরের মত, আর জাগিয়ে তোল একটুকরো পাঁউরুটির মত।" আর প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বলত: "আমি শুয়েই কুঁকড়ে গিয়েছিলাম, জেগে উঠেই গা ঝাড়া দিয়েছি।" সত্যি, শোয়ামাত্রই সে ঘুমিয়ে পড়ত পাথরের মত, আর শরীরটাকে একবার ঝাড়া দিয়েই মুহূর্তের মধ্যে কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেত, ঠিক ছোট ছেলেরা যেমন ঘুম থেকে উঠেই খেলার জন্য তৈরি হয়ে যায়। সব কাজই সে করতে পারত, খুব ভাল না পারলেও মন্দও নয়। সে রুটি সেঁকত, রান্না করত, সেলাই করত, জুতো মেরামত করত। সবসময়ই কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত, গল্প করত আর গান গাইত শুধু রাতে। শিক্ষিত গায়কের মত সে গাইত না, গাইত পাখির মত যখন যেভাবে খুশি।

বন্দী হবার পরে তার মুখে দাড়ি গজাল; মনে হল, সামরিক ও অন্য যা কিছু তার চরিত্রের বিপরীত সে সব কিছু ঝেড়ে ফেলে সে ফিরে গেছে তার আগেকার চাষীর জীবনে।

"এবার সৈনিকের ছুটি—শার্ট থাকছে ব্রীচেসের বাইরে", সে বলত।

সৈনিক জীবনের কথা বলতে তার ভাল লাগত না, অবশ্য সে সম্পর্কে কোন অভিযোগও তার ছিল না; প্রায়ই বলত যে সারা সৈনিক জীবনে মাত্র একবার তাকে চাবুক খেতে হয়েছে। যখনই কিছু বলত নিজের "খৃস্টীয়" জীবনের (চাষীর জীবনকে সে ঐ নামেই উল্লেখ করত) পুরনো ও মূল্যবান স্মৃতির কথাই বলত।

অন্য সব বন্দীদের কাছে প্লাতন কারাতায়েভ নেহাৎই একজন অতি সাধারণ সৈনিক। তারা তাকে ডাকত "ছোট বাজপাখি" অথবা "প্লাতোশা বলে, তাকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করত, নানা কাজে পাঠাত। কিন্তু পিয়েরের কাছে সে রয়ে গেল প্রথম রাতের দেখা সেই একই মূর্তি: সরলতা ও সত্যের এক অপরিমেয়, অখণ্ড, শাশ্বত প্রতিমূর্তি।

একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া প্লাতন কারাতায়েভ অন্য কিছুই মুখস্থ রাখতে পারত না। কথা বলতে আরম্ভ করে কিভাবে যে শেষ করবে তাও জানত না।

তার কথার অর্থে চমকে উঠে পিয়ের মাঝে মাঝে তাকে কথাটা আর একবার বলতে অনুরোধ করত, কিন্তু একমুহূর্ত আগে যে কথাগুলি বলছে প্লাতন আর একবার তা বলতে পারত না। তার প্রিয় গান: "স্বদেশ", "বার্চগাছ" ও "আমার রুগ্ন হৃদয়"—এর কথাগুলিও সে পিয়েরকে আলাদা করে বলতে পারত না; বললেও গানের বাইরে সে কথাগুলির কোন অর্থই

খুঁজে পাওয়া যেত না। তার প্রতিটি কথা ও কাজই অজ্ঞাত এক কর্মধারার বহিঃপ্রকাশ—সেই কর্মধারা তারই জীবন। কিন্তু তার জীবনের তো আলাদা করে কোন অর্থ নেই। এক অখণ্ড সত্তার অংশ হিসাবেই তো তার যার কিছু অর্থ। ফুলের ভিতর থেকে যেমন ভেসে আসে গন্ধ, তেমনই তার কথা ও কাজ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে অনিবার্য স্বাভাবিকতায়। আলাদা করে কোন একটি কথা বা কাজের কোন মূল্য বা তাৎপর্য সে বুঝতে পারে না।

অধ্যায়—১৪

প্রিন্সেস মারি যখন নিকলাসের কাছে শুনল যে তার দাদা ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এ রস্তভদের বাড়িতে আছে তখনই সে সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হল; মাসির কোন নিষেধই শুনল না; শুধু নিজে নয়; ভাই-পোটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে বলে স্থির করল। একাজটা কঠিন কি সহজ, সম্ভব কি অসম্ভব, তা সে কাউকে জিজ্ঞাসা করল না, জানতেও চাইল না: দাদা মৃত্যুর পথে; এ সময় তার কাছে থাকা এবং তার ছেলেকে তার কাছে নিয়ে যাওয়া তার কর্তব্য; তাই সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। প্রিন্স আন্দ্রু যে নিজে তাকে কিছুই জানায় নি তার কারণ হিসাবে সে ভাবল, হয় তো অত্যধিক দুর্বলতার জন্য সে নিজে চিঠি লিখতে পারছে না, অথবা এই দীর্ঘ পথযাত্রা তার পক্ষে এবং দাদার ছেলেটির পক্ষে যেমন কষ্টকর তেমনই বিপজ্জনক বলেই সে মনে করছে।

কয়েকদিনের মধ্যেই প্রিন্সেস মারি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। যাত্রার আয়োজনের মধ্যে আছে একটা বড় পারিবারিক গাড়ি যাতে চড়ে সে ভরোনেজ গিয়েছিল, একটা আধ-খোলা ছোট এক্কা, ও একটা মালগাড়ি। তার সঙ্গে যাচ্ছে মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে, ছোট্ট নিকলাস ও তার শিক্ষক, বুড়ি নার্স, তিনটি দাসী, তিখন, যুবক পরিচারক ও সংবাদবাহক।

মস্কোর ভিতর দিয়ে প্রচলিত পথে যাওয়ার কথা ভাবাই যায় না। প্রিন্সেস মারিকে বাধ্য হয়ে লিপেৎস্ক, রিয়াজান, ভ্লাদিমির ও শুয়ার ভিতর দিয়ে যে ঘোরা পথটা বেছে নিতে হল সেটা খুব দীর্ঘ, আর সে পথের সব জায়গায় ডাক-ঘোড়া পাওয়া যায় না বলে খুবই কষ্টসাধ্য; আর যেহেতু রিয়াজানের কাছে ফরাসীরা দেখা দিয়েছে সেজন্য পথটা বিপজ্জনকও বটে।

এই কষ্টকর পথযাত্রায় প্রিন্সেস মারির উদ্যম ও মনের জোর দেখে মাদময়জেল বুরিঁয়ে, দেসালেস ও চাকরবাকররা অবাক হয়ে গেছে। সকলের পরে সে শুতে যায়, আর ঘুম থেকে ওঠে সকলের আগে; কোন কষ্টই তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না। তার উদ্যম ও কর্মশক্তির ফলেই দ্বিতীয় সপ্তাহের শেষ নাগাদ তারা ইয়ারোস্লভ্‌ল্‌-এর কাছে পৌঁছে গেল।

ভরোনেঝ-এ শেষের দিন ক'টা ছিল তার জীবনের সব চাইতে সুখের দিন। রস্তভের প্রতি ভালবাসা আর তাকে যন্ত্রণা দেয় না, বিচলিত করে না। সে ভালবাসা তার সারা মন জুড়ে আছে, তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, তার বিরুদ্ধে সে আর এখন লড়াই করে না। স্পষ্ট করে নিজেকে না বললেও ইদানীং তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে যে সে ভালবেসেছে এবং ভালবাসা পেয়েছে।

কিন্তু মনের একদিককার এই সুখ দাদার জন্য দুঃখবোধের পথে কোনরকম বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি; উপরন্তু, মনের এই প্রশান্তির ফলে দাদার প্রতি মনোভাবকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

ভ্রমণের সময় যেরকম ঘটে থাকে, প্রিন্সেস মারি শুধু যাত্রার কথাই ভাবতে লাগল, উদ্দেশ্যটা ভুলে রইল। কিন্তু ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এর যত কাছে এগোতে লাগল ততই সন্ধ্যার মধ্যেই যে দৃশ্যের সম্মুখীন তাকে হতে হবে তার চিন্তা নতুন করে মনে জাগল, তার উত্তেজনাকে চরমে তুলে দিল।

রস্তভরা কোথায় আছে এবং প্রিন্স আন্দ্রু কেমন আছে তা জানবার জন্য সংবাদটাকে আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বড় গাড়িটা শহরের ফটক দিয়ে ঢুকলে প্রিন্সেস মারি যখন জানালা দিয়ে মুখটা বের করল তখন তার মুখের ভয়ঙ্কর ফ্যাকাসেভাব দেখে লোকটি ভয় পেয়ে গেল।

বলল, "সব খোঁজ নিয়েছি ইয়োর এক্সেলেন্সি: রস্তভরা আছেন স্কোয়ারের ভিতরে বণিক ব্রোনিকভের বাড়িতে; এখান থেকে বেশী দূর নয়, ভলগার একেবারে দক্ষিণ তীরে।"

প্রিন্সেস মারি সভয়ে তার দিকে তাকাল; যেকথা সে সব চাইতে বেশী করে জানতে চাইছে তার জবাব লোকটি দিচ্ছে না কেন: তার দাদা কেমন আছে? মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়েই প্রশ্নটা করল।

"প্রিন্স কেমন আছেন?"

"হিজ এক্সেলেন্সি তাদের সঙ্গে এক বাড়িতেই আছেন।"

"তাহলে বেঁচে আছে," এইকথা ভেবে বলল, "সে কেমন আছে?"

"চাকররা বলছে, একই রকম।"

"একই রকম" মানে কি সেটা প্রিন্সেস মারি জিজ্ঞাসা করল না; সকলের অলক্ষ্যে সাত বছরের নিকলাসের দিকে একবার তাকিয়ে সেই যে মাথা নীচু করল, ভারী গাড়িটা দুলে দুলে ঝাঁকুনি দিতে দিতে সশব্দে চলতে চলতে না থামা পর্যন্ত আর সে মাথা তুলল না। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে গাড়ির সিঁড়িটা নামিয়ে দেওয়া হল।

গাড়ির দরজা খুলে গেল। বাঁ দিকে জল—একটা বড় নদী—ডান দিকে বারান্দা। ফটকে অনেকে দাঁড়িয়ে আছে: চাকরবাকর, আর একটি গোলাপী মেয়ে; মেয়েটি যেন মুখ ভার করে হাসছে। (মেয়েটি সোনিয়া।)

প্রিন্সেস মারি সিঁড়ি বেয়ে ছুটে চলল। মেয়েটি তেমনই কৃত্রিম হাসির সঙ্গে বলে উঠল, "এই পথে, এই পথে!" হলে ঢুকে প্রিন্সেস সামনেই দেখতে পেল প্রাচ্য দেশীয় চেহারার একটি বর্ষীয়সী মহিলাকে। মহিলাটি দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল। কাউন্টেস।

প্রিন্সেস মারিয়াকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেল।

ফরাসীতে বলল, "বাছা আমার! তোমাকে কত ভালবাসি; কতদিন হল তোমার কথা শুনছি, জানছি।"

প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল ইনিই কাউন্টেস; এর সঙ্গে কিছু বলা দরকার। ফরাসীতে কিছু সৌজন্যসূচক কথা বলে সে শুধাল: "ও কেমন আছে?"

"ডাক্তার বলছে আর কোন বিপদ নেই," কথাগুলি মুখে বললেও দীর্ঘশ্বাস ফেলে এমনভাবে চোখ তুলে তাকাল যাতে তার কথার প্রতিবাদই বুঝি প্রকাশ পেল।

প্রিন্সেস বলল, "সে কোথায়? আমি কি তাকে দেখতে পারি—দেখতে পারি?"

"একটু দেরি কর প্রিন্সেস, একটু। এটি বুঝি তার ছেলে?" দেসেলেসের সঙ্গে ঘরে ঢুকতেই ছোট্ট নিকলাসকে দেখিয়ে কাউন্টেস বলল। "বাড়িটা বেশ বড়, সকলেরই জায়গা হয়ে যাবে। আহা, কী চমৎকার ছেলেটি!"

কাউন্টেস প্রিন্সেস মারিকে নিয়ে বৈঠকখানায় গেল। সেখানে সোনিয়া ও মাদ্‌ময়জেল বুরিঁয়ে গল্প করছিল। কাউন্টেস ছেলেটিকে আদর করতে লাগল, আর বুড়ো কাউন্ট এসে প্রিন্সেসকে স্বাগত জানাল। প্রিন্সেস মারি যখন তাকে সর্বশেষ দেখেছিল তারপর থেকে বুড়ো কাউন্ট অনেক বদলে গেছে। তখন সে ছিল চটপটে, ফুর্তিবাজ, আত্মপ্রত্যয়শীল একটি বৃদ্ধ, আর এখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে একটি করুণ, বিভ্রান্ত মানুষ। প্রিন্সেস মারির সঙ্গে কথা বলার সময় সে অনবরত চারদিকে তাকাচ্ছে, যেন জানতে চাইছে তার ব্যবহার ঠিক হচ্ছে কি না। মস্কোর ধ্বংস এবং তার সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাবার পরে অভ্যস্ত আশ্রয় থেকে সরে এসে সে যেন নিজের গুরুত্ববোধটাই হারিয়ে ফেলেছে, যেন ধরেই নিয়েছে জীবনে তার আর কোন স্থান নেই।

সোনিয়ার পরিচয় দিয়ে বলল, "এটি আমার জ্ঞাতি বোন-ঝি—তোমার সঙ্গে ওর পরিচয় নেই প্রিন্সেস?

প্রিন্সেস মারি সোনিয়ার দিকে তাকাল, মনের বিরূপ অনুভূতিকে চাপা দেবার চেষ্টা করে তাকে চুমো খেল। কিন্তু এখানকার সকলের মনের অবস্থাই তার থেকে আলাদা দেখে তার খুব কষ্ট হতে লাগল।

সকলের দিকে ফিরে সে আবার শুধাল, "সে কোথায়?"

সোনিয়া লজ্জায় লাল হয়ে বলল, "তিনি নীচে আছেন। নাতাশা তার

কাছে আছে। তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে। আপনাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে প্রিন্সেস।"

বিরক্তিতে প্রিন্সেস মারির চোখে জল এসে গেল। মুখ ঘুরিয়ে কাউন্টেস-কে আবার জিজ্ঞাসা করতে যাবে কিভাবে তার কাছে যাবে, এমন সময় দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘুরে তাকিয়ে প্রিন্সেস দেখল নাতাশা প্রায় ছুটে আসছে—অনেকদিন আগে মস্কোতে যাকে দেখে তার মোটেই ভাল লাগে নি সেই নাতাশা।

কিন্তু নাতাশার মুখের দিকে তাকিয়েই সে বুঝতে পারল যে এতক্ষণে একজন সমব্যথী সে পেয়েছে; এই তো বন্ধু। প্রিন্সেস ছুটে নাতাশার কাছে গেল, তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রুর বিছানার মাথার কাছে বসে প্রিন্সেস মারির আসার সংবাদ শোনা মাত্রই সে ছুটে এখানে চলে এসেছে।

ছুটতে ছুটতে সে যখন বৈঠকখানায় ঢুকল তখন তার উত্তেজিত মুখে শুধু একটি লক্ষণই ফুটে উঠেছে—ভালবাসার লক্ষণ—সীমাহীন ভালবাসা—প্রিন্স আন্দ্রুর প্রতি, প্রিন্সেস মারির প্রতি, তার প্রেমিকের যারাই নিকটজন তাদের প্রতি; সে মুখে আরও ফুটে উঠেছে করুণা, অন্যের জন্য কষ্টস্বীকার, এবং অপরের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করার একান্ত বাসনা। এই মুহূর্তে নাতাশার অন্তরে নিজের চিন্তা অথবা প্রিন্স আন্দ্রুর সঙ্গে তার সম্পর্কের চিন্তার কোন স্থান নেই।

নাতাশার মুখের উপর প্রথম দৃষ্টিপাতের ফলেই তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্না প্রিন্সেস মারি এসব কথা বুঝতে পেরেছে; তাই তো তার কাঁধে মাথা রেখে দুঃখের সুখে সে কাঁদছে।

"চল, ওর কাছে চল মারি," বলেই নাতাশা তাকে অন্য ঘরে নিয়ে চলল।

প্রিন্সেস মারি মাথা তুলে চোখ মুছে নাতাশার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। সে বুঝল, এর কাছ থেকেই সে সব কিছু জানতে ও বুঝতে পারবে।

"কেমন...." প্রশ্ন করতে গিয়েও সে থেমে গেল।

তার মনে হল, কথায় প্রশ্ন করা বা জবাব দেওয়া দুইই অসম্ভব। নাতাশার চোখ-মুখই তাকে সব কথা পরিষ্কারভাবে, গভীরভাবে বুঝিয়ে দেবে।

নাতাশা তার দিকে তাকিয়ে আছে; মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছে, ইতস্তত করছে সব কথা বলবে কি না। হঠাৎ নাতাশার ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে উঠল, মুখের চারদিকে বিশ্রী ভাঁজ দেখা দিল, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রিন্সেস মারি সব বুঝতে পারল।

তবু আশা ছাড়ল না; যেকথার উপর তার নিজেরই ভরসা নেই সে কথায়ই প্রশ্ন করল:

"কিন্তু তার ঘাটা কেমন আছে? সাধারণ অবস্থাই বা কেমন?"

"তুমি, তুমি,...নিজেই দেখতে পাবে" নাতাশা এর বেশী কিছু বলতে পারল না।

দুজনই আরও কিছুক্ষণ নীচেই বসে রইল; তারপর কান্না থামলে শান্ত মুখে তার ঘরের দিকে পা বাড়াল।

"সমস্ত রোগটা কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? তার অবস্থা কি অনেকদিন থেকেই খারাপ? কখন এরকম হল?" প্রিন্সেস মারি একে একে খোঁজ নিতে লাগল।

নাতাশা বলল, জ্বর ভাব ও যন্ত্রণার জন্য বেশ বিপদ দেখা দিয়েছিল, কিন্তু ত্রয়েৎসায় এসে সেটা কেটে গেল, তখন ডাক্তার শুধু গ্যাংগ্রিনের আশংকা করতে লাগল। সে বিপদও কেটে গেছে। ইয়ারোস্লাভ্‌ল্ আসার পর থেকে ক্ষতস্থানে পুঁয হতে শুরু করল, তবে ডাক্তার বলল যে এটা স্বাভাবিক পথেই মোড় নেবে। তারপর দেখা দিল জ্বর, কিন্তু ডাক্তার বলেছে যে জ্বরটা গুরুতর কিছু নয়।"

উদ্গত কান্নাকে চাপা দিয়ে নাতাশা বলল, "কিন্তু দুদিন আগে হঠাৎ এটা ঘটেছে। কেন তা জানি না, কিন্তু সে যে কেমন হয়ে গেছে সেটা নিজেই দেখতে পাবে।"

"সে কি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে? শুকিয়ে গেছে?" প্রিন্সেস জানতে চাইল।

"না, ঠিক তা নয়, আরও খারাপ। নিজেই দেখবে। ও মারি, সে এত ভাল, সে বাঁচতে পারে না, বাঁচতে পারে না, কারণ..."

অধ্যায়—১৫

পরিচিত ভঙ্গীতে প্রিন্স আন্দ্রুর দরজাটা খুলে নাতাশা যখন তার আগে আগে প্রিন্সেস মারিকে ঘরে ঢুকতে দিল, তখন প্রিন্সেসের বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা কান্না ঠেলে উঠছে। অনেক চেষ্টা করে এখন নিজেকে কিছুটা শান্ত করলেও সে জানে যে দাদাকে দেখে সে চোখের জল রাখতে পারবে না।

"দুদিন আগে হঠাৎ এটা ঘটেছে," এই কথার দ্বারা নাতাশা কি বোঝাতে চেয়েছিল প্রিন্সেস তা বুঝতে পেরেছে। কথাগুলির অর্থ, সে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে; এভাবে নরম হয়ে যাওয়া, শান্ত হয়ে যাওয়া আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ। দরজায় পা রাখতে গিয়েই কল্পনায় সে আন্দ্রুর ছেলেবেলার মুখখানি যেন দেখতে পেল। সে নিশ্চিত জানে, মৃত্যুর আগে তার বাবা যেমন বলেছিল আন্দ্রুও তেমনই নরম, মমতা ভরা স্বরে তার সঙ্গে কথা বলবে, আর সেও তা সহ্য করতে না পেরে তার সামনেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে। কিন্তু আগে হোক পরে হোক, ঘরে তো ঢুকতে হবেই; সে ভিতরে গেল। আন্দ্রুকে যতই স্পষ্ট

করে দেখতে পাচ্ছে, নিজের ক্ষীণ দৃষ্টিতে যতই তার চোখ-মুখ পরিষ্কার হচ্ছে ফুটে উঠছে, ততই চাপা কান্না তার গলা বেয়ে ঠেলে উপরে উঠে আসছে; তারপরই তার মুখটা সে দেখতে পেল, তার চোখে চোখ পড়ল।

কাঠবেড়ালের লোমের ড্রেসিং-গাউন পরে চারদিকে বালিশ রেখে সে একটা ডিভানে শুয়ে আছে। শীর্ণ, বিবর্ণ চেহারা। সরু, সাদা একটা হাতে একখানা রুমাল, অন্য হাতে নবোদ্গত গোঁফে আস্তে আস্তে টোকা দিচ্ছে, ধীরে ধীরে আঙুলগুলি নড়ছে। তারা ঘরে ঢুকতেই একদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার মুখখানি দেখে, চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে প্রিন্সেস মারির গতি সহসা শিথিল হয়ে এল; তার মনে হল, চোখের জল শুকিয়ে গেছে, চাপা কান্না থেমে গেছে। তার চোখ-মুখের ভাষা বুঝতে পেরে সহসা নিজেকে বড়ই অপরাধী মনে হল; একটা ভীরুতা তাকে ঘিরে ধরল।

নিজেকেই শুধাল, "কিন্তু কিসে আমি অপরাধী?" আন্‌দ্রুর ঠাণ্ডা, কঠোর দৃষ্টি যেন জবাব দিল, "কারণ তুমি বেঁচে আছ, জীবিতের কথা ভাবছ, আর আমি..."

তার যে গভীর দৃষ্টি বাইরের পরিবর্তে ভিতরটাকেই দেখতে পায় তাতে ফুটে উঠেছে একটা বিরূপতার আভাষ।

বোনের হাতটা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

দৃষ্টির মতই শান্ত ও নিস্পৃহ গলায় বলল, "কেমন আছ মারি? এখানেই বা এলে কেমন করে?"

আন্‌দ্রুর গলার স্বর শুনে প্রিন্সেস মারি হতবাক হয়ে গেল। সে যদি যন্ত্রণায় চীৎকার করত তাহলে সে চীৎকারও বুঝি প্রিন্সেস মারির বুকে এতখানি ত্রাসের সঞ্চার করতে পারত না।

সেই একই ধীর, শান্ত গলায় সে আবার বলল, "ছোট্ট নিকলাসকে সঙ্গে করে এনেছ কি?"

"এখন কেমন আছ?" প্রশ্নটা করে প্রিন্সেস মারি নিজেই অবাক হয়ে গেল।

"সেটা তুমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করো," সে জবাব দিল। পুনরায় স্নেহশীল হবার চেষ্টায় শুধু ঠোঁট দুটি নেড়েই সে ফরাসীতে বলল:

"এখানে আসার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ।"

প্রিন্সেস মারি তার হাতটা চেপে ধরল। সে চাপে আন্‌দ্রুর মুখটা ঈষৎ কুঞ্চিত হল। আন্‌দ্রু চুপ, পিন্সেসও জানে না কি বলবে। এখন সে বুঝতে পেরেছে দুদিন আগে আন্‌দ্রুর কি হয়েছে। আন্‌দ্রুর কথায়, গলার স্বরে, বিশেষ করে তার শান্ত বিরূপ দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে পৃথিবীর সবকিছু থেকে বিচ্ছেদ, আর একটি জীবিত মানুষের বেলায় সেটা বড়ই ভয়ংকর। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, অনেক চেষ্টা করে তবে সে জীবিতকে বুঝতে পারছে, কিন্তু

আসলে সে বুঝতে পারছে না, বুঝবার শক্তি নেই বলে নয়, আসল কারণ সে বুঝেছে অন্য কিছু—এমন কিছু যাকে জীবিতরা বোঝে না, বুঝতে পারে না—সেই বোধই এখন তার মনকে ভরে রেখেছে।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে নাতাশাকে দেখিয়ে সে বলল, "দেখ, কী বিচিত্র পথে ভাগ্য আবার আমাদের মিলিয়ে দিয়েছে। সে তো সারাক্ষণই আমার দেখাশোনা করছে।"

প্রিন্সেস মারি কথাগুলি শুনল, কিন্তু এসব কথা আন্দ্রু বলছে কেমন করে তা সে বুঝতে পারল না। সে-অনুভূতিশীল, মমতাময় প্রিন্স আন্দ্রু,—কেমন করে তার সামনেই এসব কথা তাকেই বলতে পারল যাকে সে ভালবাসে আর যে তাকে ভালবাসে? তার যদি জীবনের আশা থাকত তাহলে এমন আপত্তিজনক সুরে এই কথাগুলি সে বলতে পারত না। সে যদি না জানত যে সে মরতে চলেছে তাহলে সে কি ওকে করুণা না করে পারত? ওর সামনে এমন কথা বলতে পারত? এর একমাত্র ব্যাখ্যা সে আজ উদাসীন, কারণ অন্য কিছু, অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ কিছু, তার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছে।

আলোচনা হতে লাগল নিস্পৃহ ও অসংলগ্নভাবে; মাঝে মাঝেই বাধা পড়ল।

"মারি এসেছে রিয়াজানের পথে," নাতাশা বলল।

"সত্যি?" আন্দ্রু শুধাল।

"ওরা বলছে যে গোটা মস্কো পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, আর...."

নাতাশা থেমে গেল। কথা বলা অসম্ভব। বোঝা যাচ্ছে যে আন্দ্রু মন দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

আন্দ্রু বলল, "হ্যাঁ, সকলেই তাই বলছে। বড়ই দুঃখের কথা।" অন্যমনস্কভাবে আঙুল দিয়ে গোঁফে টোকা দিতে দিতে সে সামনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তারপর যেন দুজনের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে কথা বলার বাসনাতেই প্রিন্স আন্দ্রু হঠাৎ বলে উঠল, "তাহলে কাউন্ট নিকলাসের সঙ্গে তোমার দেখা হল মারি? সে তো এখানে লিখেছে, যে তোমাকে তার খুব পছন্দ। তোমারও যদি তাকে ভাল লেগে থাকে তাহলে তো তোমাদের বিয়ে হলে বেশ ভালই হয়।"

প্রিন্সেস মারি তার কথাগুলি শুনল, কিন্তু জীবিত সব কিছু থেকে সে যে এখন কতদূরে চলে গেছে তারই প্রমাণ ছাড়া কথাগুলির মধ্যে তার কোন অর্থই সে খুঁজে পেল না।

"আমার কথা কেন বলছ? শান্তভাবে বলে মারি নাতাশার দিকে তাকাল।

নাতাশা বুঝতে পারল, কিন্তু মারির দিকে তাকাল না। তিনজনই আবার

নিশ্চুপ।

প্রিন্সেস মারি হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠল, "আন্দ্রু, ছোট্ট নিকলাসকে দেখবে না? সে তো সবসময় তোমার কথা বলে।"

প্রিন্স আন্দ্রু এই প্রথম একটুখানি হাসল, কিন্তু প্রিন্সেস মারি তো তার মুখকে ভালভাবেই চেনে, সে সভয়ে প্রত্যক্ষ করল, সুখের জন্য বা ছেলের প্রতি স্নেহবশতঃ আন্দ্রু হাসে নি, হেসেছে শান্ত শ্লেষে, কারণ তার মনে হয়েছে যে তাকে জাগিয়ে রাখবার শেষ চেষ্টা হিসাবেই প্রিন্সেস কথাগুলি বলেছে।

"হ্যাঁ, তাকে দেখলে আমি খুশি হব। সে বেশ ভাল আছে তো?"

ছোট্ট নিকলাসকে যখন প্রিন্স আন্দ্রুর ঘরে আনা হল তখন সে ভয়ার্ত চোখে বাবার দিকে তাকাল, কিন্তু কাঁদল না, কারণ আর কেউই কাঁদছে না। প্রিন্স আন্দ্রু তাকে চুমো খেল, কিন্তু কি কথা তাকে বলবে তা বুঝতে পারল না।

নিকলাসকে বাইরে নিয়ে যাবার পরে প্রিন্সেস মারি আবার দাদার কাছে গেল, তাকে চুমো খেল, কিন্তু এবার আর চোখের জল রোধ করতে পারল না, কাঁদতে লাগল।

প্রিন্স আন্দ্রু একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

বলল, "নিকলাসের জন্য কাঁদছ?"

প্রিন্সেস মারি মাথা নেড়ে কাঁদতেই লাগল।

"মারি, তুমি কি 'সুভাষিতাবলী'..." প্রিন্স আন্দ্রু থেমে গেল।

"কি বললে?"

"কিছু না। এখানে তুমি কেঁদ না," সেই একই নিস্পৃহভাবে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকিয়ে সে বলল।

সে কান্না দেখে প্রিন্স আন্দ্রু বুঝতে পারল, ছোট্ট নিকলাস এবার পিতৃহারা হবে সে চিন্তায়ই প্রিন্সেস মারি কাঁদছে। আপ্রাণ চেষ্টায় সে জীবনের পথে ফিরে আসতে চাইল, তাদের মত করে সব কিছু দেখতে চাইল।

ভাবল, "হ্যাঁ, এদের কাছে সেটা দুঃখের।' কিন্তু কত সহজ, সরল।"

"আকাশের পাখিরা বীজ বোনে না, ফসলও কাটে না, তবু তোমাদের পরম পিতা তাদের আহার যোগায়, কথাগুলি সে নিজেকে বলল, আর প্রিন্সেস মারিকেও বলতে চাইল; "কিন্তু না, ওরা বুঝবে না, কথাটা ওরা ওদের মত করে নেবে। ওরা বুঝতে পারে না, যেসব অনুভূতিকে ওরা মূল্য দেয়—আমাদের সেইসব অনুভূতিই অপ্রয়োজনীয়। পরস্পরকে আমরা বুঝতে পারি না।" সে চুপ করে রইল।

প্রিন্স আন্দ্রুর ছেলের বয়স সাত। একটু-আধটু পড়তে পারে, কিছুই জানে না। সেদিনের পর থেকে অনেক কিছুর ভিতর দিয়ে সে জীবন

কাটিয়েছে, জ্ঞান লাভ করেছে, দেখেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী কালে যেসব বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী সে হয়েছে সেগুলি যদি সেদিন তার আয়ত্তে থাকত তাহলেও তার বাবা, মারি ও নাতাশার মধ্যে যে দৃশ্যটি অভিনীত হতে সে দেখেছে তার অর্থকে সেদিনের আরও ভালভাবে বা গভীরভাবে বুঝতে পারত না। সব কিছুই সে বুঝেছে, না কেঁদে নাতাশার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে নীরবে তার দিকেই এগিয়ে গেল, সুন্দর চিন্তামগ্ন ছুটি চোখ মেলে সলজ্জভাবে তার দিকে তাকাল, তার গোলাপী উপরের ঠোঁটটা কাঁপতে লাগল।

তারপর থেকেই সে দেসালেস ও কাউণ্টেসকে এড়িয়ে চলতে লাগল; হয় একাকি বসে থাকে, নয়তো ভীরু পায়ে প্রিন্সেস মারি অথবা নাতাশার কাছে যায়, শান্ত লাজুক ভঙ্গীতে তাদের জড়িয়ে ধরে।

প্রিন্স আন্দ্রুর কাছ থেকে চলে যাবার পরে প্রিন্সেস মারি ভালভাবেই বুঝতে পারল কি লেখা ছিল নাতাশার মুখে। আন্দ্রুকে বাঁচিয়ে তোলার কোনরকম আশার কথা সে আর কোনদিন নাতাশাকে বলে নি। নাতাশার সঙ্গে পালা করে আন্দ্রুর সোফার পাশে বসে থাকে, চোখের জল ফেলে না, অনবরত প্রার্থনা করে, একান্ত অন্তরে সেই শাশ্বত ও অপরিমেয়র দিকেই তাকিয়ে থাকে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির উপরে যাঁর উপস্থিতির প্রভাব এখন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—১৬

প্রিন্স আন্দ্রু জানে সে মরবে; শুধু তাই নয়, সে বুঝতে পারছে সে মরতে চলেছে, এখনই অর্ধমৃত। পার্থিব সব কিছু থেকে একটা দূরত্ব বোধ, অস্তিত্বের একটা বিচিত্র আনন্দময় হাল্কাভাবের চেতনা তাকে ঘিরে ধরেছে। কোনরকম তাড়াহুড়া বা উত্তেজনা ছাড়াই আসন্ন মৃত্যুর জন্য সে অপেক্ষা করছে। যে দুর্লংঘ্য, শাশ্বত, অতিদূর, অজ্ঞাতের উপস্থিতি সে সারাজীবন অনুভব করেছে আজ সে কাছে এসেছে; একটা বিচিত্র হাল্কা অভিজ্ঞতার মধ্যে সে যেন বোধগম্য হয়ে উঠছে....

আগে আগে এই পরিণতিকে সে ভয় পেত। ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর—এই পরিণতির—অভিজ্ঞতা তার দু'বার হয়েছে, কিন্তু এখন আর সেই ভয়কে সে বুঝতে পারছে না।

একটা গোলা যখন লাটিমের মত তার সামনে পাক খাচ্ছিল তখনই প্রথম এই ভয় সে পেয়েছিল; শস্যহীন ক্ষেত, ঝোপঝাড় ও আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পেরেছিল যে সে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছে। আহত হবার পরে আবার যখন নিজেকে ফিরে পেল, জীবনের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে শাশ্বত,

চিরমুক্ত ভালবাসার কমলটি যখন মুহূর্তের মধ্যে তার অন্তরের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তখন আর তার মৃত্যুর ভয় রইল না, মৃত্যুর চিন্তাই সে ছেড়ে দিল।

আহত হবার পরে সে যখন নির্জনতা, যন্ত্রণা ও আংশিক বিকারের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তখন সদ্য প্রকাশিত শাশ্বত প্রেমের মধ্যে সে যতই ডুব দিচ্ছিল ততই নিজের অজ্ঞাতে সে পার্থিব জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলছিল। সব কিছুকে, সকল জীবকে ভালবাসা, ভালবাসার জন্য প্রতিনিয়ত নিজেকে বিসর্জন দেওয়ার অর্থ কোন একজনকে ভালবাসা নয়, পার্থিব জীবনটাকে চালিয়ে যাওয়া নয়। ভালবাসার এই রীতিতে সে যতই উদ্বুদ্ধ হতে লাগল ততই সে জীবনকে পরিহার করে চলল, ততই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী প্রাচীরটাকে সে ভেঙে ফেলতে লাগল। সেই সময়ে মৃত্যুর চিন্তা মনে এলেই সে নিজেকে বলত: "আরে, তাতে কি হল? সে তো আরও ভাল!"

কিন্তু মিতিশ্‌চির সেই রাতে অর্ধ বিকারের মধ্যে সে যখন সেই বহুবাঞ্ছিতাকে সামনে দেখতে পেল, তার ঠোঁটের উপর নিজের হাতটা রেখে সেই নারী যখন সুখের অশ্রু ঝরাল চোখে, তখন নিজের অলক্ষ্যেই একটি নারীর প্রতি ভালবাসা আবার তার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করল, আবার তাকে বেঁধেছিল জীবনের সঙ্গে। একটা সানন্দ উদ্বিগ্ন চিন্তা তার মনে বাসা বাঁধল। অ্যাম্বুলেন্স ঘাঁটিতে কুরাগিনের সঙ্গে দেখা হবার মুহূর্তটি স্মরণ করতে গিয়ে তখন তার মনের ভাব কি রকম হয়েছিল তা সে মনে করতে পারে না, কিন্তু কুরাগিন বেঁচে আছে কি না সে চিন্তা তাকে কষ্ট দিয়েছিল। সে সম্পর্কে খোঁজ নেবার সাহস পর্যন্ত তার হয় নি।

তার অসুস্থতা স্বাভাবিক গতিতেই চলছিল, কিন্তু "এটা হঠাৎ ঘটল" বলতে গিয়ে নাতাশা যে অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে সেটা ঘটেছে প্রিন্সেস মারি আসার দু'দিন আগে। জীবন ও মৃত্যু সেই শেষ আত্মিক সংগ্রামে মৃত্যুই বিজয়ী হয়েছে। তার থেকে এই অপ্রত্যাশিত উপলব্ধি তার হয়েছে, যে-জীবন নাতাশার প্রতি ভালবাসার রূপ ধরে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে তাকে সে এখনও মূল্যবান মনে করে, আর তাই অজ্ঞাতপূর্ব একটা আতংক তাকে আক্রমণ করেছে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ডিনারের পরে আগের মতই একটু জ্বরভাব হয়েছে, চিন্তার ধারা হয়ে উঠেছে অস্বাভাবিক রকমের স্বচ্ছ। সোনিয়া বসে আছে টেবিলের পাশে। প্রিন্স আন্‌দ্রু ঘুমে ঢুলছে। সহসা একটা আনন্দের অনুভূতি জাগল তার মনে।

"আঃ, সে এসেছে!" সে ভাবল।

আর সত্যি তাই: সোনিয়ার জায়গায় নিঃশব্দে এসে বসেছে নাতাশা।

যবে থেকে নাতাশা তার দেখাশোনা করতে শুরু করেছে তবে থেকেই

তার উপস্থিতি সে সবসময়ই বুঝতে পারে। তার মুখের উপর থেকে মোমবাতির আলোটাকে আড়াল করে নাতাশা একটা হাতল-চেয়ারে বসে মোজা বুনছে। প্রিন্স আন্দ্রু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিল, যেসব বুড়ি নার্স মোজা বোনে তাদের মত রোগীর শুশ্রূষা কেউ করতে পারে না, মোজা বোনার মধ্যে একটা শান্তভাব আছে; সেই থেকেই নাতাশা মোজা বোনা শিখছে। তার হাতে সূচ চলছে দ্রুতগতিতে, তার চিন্তান্বিত আনত মূর্তিটা দেখা যাচ্ছে। একটু নড়তেই সুতোর গোলাটা হাঁটুর উপর থেকে গড়িয়ে পড়ল। প্রিন্স আন্দ্রুর দিকে একবার তাকিয়ে গোলাটা কুড়িয়ে নিয়ে সে আবার আগের জায়গায় গিয়ে বসল।

প্রিন্স আন্দ্রু শোয়া অবস্থাতেই নাতাশার দিকে তাকাল; বুঝতে পারল, একটা ভারী শ্বাস টানবার ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও তা না করে খুব সাবধানে শ্বাস টানতে লাগল।

ত্রয়ৎসা মঠে অতীতের কথা প্রসঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রু নাতাশাকে বলেছিল, বেঁচে থাকলে এই ক্ষতের জন্য সে ঈশ্বরকে চিরদিন ধন্যবাদ দেবে, কারণ এই ক্ষতই তাদের দুজনকে আবার মিলিয়ে দিয়েছে। তারপর থেকে তারা কোনদিন ভবিষ্যতের কথা বলে নি।

নাতাশার দিকে তাকিয়ে ইস্পাতের সূঁচের শব্দ শুনতে শুনতে সে ভাবল: "এ কি হতে পারে, না পারে না? এমন অদ্ভুতভাবে ভাগ্য আমাকে ওর কাছে নিয়ে এসেছে কি শুধু আমাকে মেরে ফেলবার জন্য? ···এও কি সম্ভব যে জীবনের সত্যকে আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে শুধু এটাই বোঝাতে যে মিথ্যার পথেই আমি জীবনটাকে কাটিয়েছি? পৃথিবীর সব কিছুর চাইতে ওকে আমি বেশী ভালবাসি। কিন্তু ওকে ভালবেসে আমি কি করব?" নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখ হতে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে গেল।

সে শব্দ শুনে নাতাশা মোজাটা রেখে তার দিকে ঝুঁকল; হঠাৎ তার চকচকে চোখের দিকে চোখ পড়তেই আস্তে পা ফেলে তার কাছে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"তুমি কি ঘুমিয়েছ?"

"না, অনেকক্ষণ ধরে তোমাকে দেখছি। তোমার আসা আমি টের পেয়েছি। তুমি এলে যে মৃদু প্রশান্তির স্বাদ পাই তা আর কেউ দিতে পারে না। ···সে এক আলো। সুখে আমার কাঁদতে ইচ্ছা করছে।"

নাতাশা আরও কাছে এগিয়ে গেল। পরমানন্দে তার চোখ ঝিল্‌মিল্‌ করছে।

"নাতাশা, আমি তোমাকে বড় বেশী ভালবাসি! পৃথিবীর অন্য সব কিছুর চাইতে বেশী।"

"আর আমি!" —মুহূর্তের জন্য নাতাশা মুখটা ফিরিয়ে নিল। শুধাল,

বলল, "বড় বেশী বললে কেন ?"

"কেন বড় বেশী ? ...আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, তোমার মন কি বলে—আমি বাঁচব তো ? তুমি কি মনে কর ?"

"সেবিষয়ে তো আমি নিশ্চিত, সম্পূর্ণ নিশ্চিত !" গভীর আগ্রহে তার ছুটি হাত ধরে নাতাশা প্রায় চেঁচিয়ে বলল।

প্রিন্স আন্‌দ্রু কিছুক্ষণ চুপ করে রইল।

"তাহলে কী ভালই হত !" নাতাশার হাতটা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

নাতাশার মনে সুখের উচ্ছ্বাস, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এ চলবে না, আন্‌দ্রুকে শান্ত হয়ে থাকতে হবে।

আন্‌দ্রুকে চেপে রেখে বলল, "কিন্তু তুমি ঘুমোও নি। ঘুমোতে চেষ্টা কর...দোহাই !"

প্রিন্স আন্‌দ্রু তার হাতটা চেপে ধরে ছেড়ে দিল; নাতাশা ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল। দু'বার তার দিকে তাকাল, দু'বারই দেখল প্রিন্স আন্‌দ্রুর উজ্জ্বল চোখ দুটি তার দিকেই তাকিয়ে আছে। নাতাশা মোজা বোনায় মন দিল, স্থির করল শেষ না করা পর্যন্ত মুখ ফেরাবে না।

প্রিন্স আন্‌দ্রুও অচিরেই চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ল। বেশীক্ষণ ঘুম হল না, হঠাৎই চমকে জেগে উঠল, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

ঘুমোবার আগেও সে একথাই ভাবছিল—জীবন ও মৃত্যুর কথা, প্রধানত মৃত্যুর কথা। মনে হল, ক্রমেই সে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে।

"ভালবাসা ? ভালবাসা কি ?" সে ভাবতে লাগল।

"ভালবাসা মৃত্যুকে বাধা দেয়। ভালবাসাই জীবন। যা কিছু বুঝি, ভালবাসি বলেই বুঝি। একমাত্র ভালবাসাতেই সব কিছু এক হয়। ভালবাসাই ঈশ্বর, আর মরে যাওয়া মানেই আমি, সেই ভালবাসার একটি অংশ, সেই শাশ্বত উৎসে ফিরে যাব।" এই চিন্তার মধ্যে সে কিছুটা সান্ত্বনা পেল। কিন্তু সে তো চিন্তা মাত্র। তাতে কিসের যেন অভাব আছে, যথেষ্ট পরিষ্কার নয়. বড় বেশী একপেশে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মস্তিষ্কের বোনা জাল। ফিরে এল আগেকার সেই উত্তেজনা ও অস্পষ্টতা। সে ঘুমিয়ে পড়ল।

স্বপ্ন দেখল, সেই ঘরেই সে ঘুমিয়ে আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থ ও অক্ষত। নানা ধরনের সাধারণ মানুষ তার সামনে এল। সে তাদের সঙ্গে কথা বলল, নানা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা করল। তারা যেন কোথায় যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। প্রিন্স আন্‌দ্রু আবছাভাবে বুঝতে পারল, এসবই তুচ্ছ, আরও বড় কাজ তার হাতে আছে, কিন্তু সে কথা বলেই চলল, তার চুটকি কথায় সকলকে তাক লাগিয়ে দিল। ক্রমে সকলেই অলক্ষ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, আর সব চাইতে বড় হয়ে দেখা দিল রুদ্ধদ্বার ঘরে আলোচনার যোগ্য একটি মাত্র প্রশ্ন। সে উঠে দাঁড়াল; দরজায় সিটকিনি টেনে তালা লাগাতে এগিয়ে গেল।

যথাসময়ে তালাটা লাগাতে পারবে কি না তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। তাড়াতাড়ি যেতে চেষ্টা করল, কিন্তু পা চলল না, বুঝতে পারল যে সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করলেও সে যথাসময়ে দরজায় তালা লাগাতে পারবে না। একটা যন্ত্রণাদায়ক ভয় তাকে পেয়ে বসল। সে ভয় মৃত্যু-ভয়। মৃত্যু দুয়ারে দাঁড়িয়ে। কিন্তু যেই সে কোনরকমে হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগোতে লাগল তখনই দরজার ওপারের সেই ভয়ঙ্কর বস্তুটি দরজা ঠেলে জোর করে ঢুকতে চেষ্টা করল। কোন মানুষ নয়—মৃত্যুই দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকছে; তাকে ঠেকিয়ে রাখতেই হবে। তালা লাগানো আর সম্ভব নয় বলে সে দরজা ঠেলে রাখার শেষ চেষ্টা করল, কিন্তু তার চেষ্টা বড়ই দুর্বল ও এলোমেলো; সেই ভয়ঙ্কর পিছন থেকে দরজায় ধাক্কা দিল, দরজাটা খুলে আবার বন্ধ হয়ে গেল।

আবার সে বাইরে থেকে ঠেলা দিল। আন্‌দ্রুর শেষ মানবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল; দরজার পাল্লা দুটো নিঃশব্দে খুলে গেল। সে ঢুকল, ঢুকল মৃত্যু, প্রিন্স আন্‌দ্রু মারা গেল।

কিন্তু যেমুহূর্তে সে মারা গেল সেই মুহূর্তে প্রিন্স আন্‌দ্রুর মনে পড়ল যে সে ঘুমিয়েছিল, আর ঠিক যে মুহূর্তে সে মারা গেল তখনই অনেক চেষ্টার পরে সে জেগে উঠেছে।

“হ্যাঁ, এই তো মৃত্যু! আমি মরে গিয়েছিলাম—আবার জেগে উঠেছি। হ্যাঁ, মৃত্যুই তো জাগরণ।” আর সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর আলোকিত হয়ে উঠল; যে যবনিকা অজ্ঞাতকে আড়াল করে রেখেছিল তার আত্মিক দৃষ্টির সম্মুখ থেকে সেটা সরে গেল। মনে হল, যেসব শক্তি এতদিন তার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে ছিল তারা ছাড়া পেয়েছে; সেই বিচিত্র ভারহীনতা আর কোন দিন তাকে ছেড়ে যায় নি।

ঠাণ্ডা ঘামের মধ্যে জেগে উঠে সে যখন ডিভানে নড়াচড়া করল তখন নাতাশা কাছে গিয়ে জানতে চাইল কি হয়েছে। সে কোন জবাব দিল না; কিছু বুঝতে না পেরে অদ্ভুতভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিন্সেস মারি আসার দুদিন আগে এই ঘটনাই ঘটেছিল। ডাক্তারের মতে ক্ষয়কারী জ্বরটা সেদিন থেকেই উৎকট আকার ধারণ করেছে, কিন্তু নাতাশা ডাক্তারের কথায় কান দিল না; তার চোখে ধরা পড়ল কতকগুলি সুস্পষ্ট ভয়ঙ্কর নৈতিক লক্ষণ।

সেদিন থেকেই ঘুম থেকে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্স আন্‌দ্রু যেন জীবন থেকেও জেগে উঠতে লাগল। একটা স্বপ্নের সময়কালের সঙ্গে তুলনায় ঘুম থেকে জাগরণের যে গতি তা দেখে বিচার করলে জীবনের সময়কালের সঙ্গে তুলনায় এই জাগরণের গতি মোটেই শ্লথতর নয়।

এই তুলনামূলক ধীরগতি জাগরণের মধ্যে ভয়ঙ্কর বা দুর্বার কিছু ছিল না।

তার শেষের দিনগুলি অতি সাধারণ ও সরলভাবেই কাটতে লাগল। প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা কখনও তাকে ছেড়ে যায় না; এটা তারাও বুঝতে পারল। কিন্তু তারা কাঁদল না, ভয়ে শিউরেও উঠল না; শেষের ক'টা দিন তারা নিজেরাও বুঝতে পারল যে তারা আর প্রিন্স আন্দ্রুর সেবা করছে না (সে এখন আর তাদের মধ্যে নেই, তাদের ছেড়ে গেছে), সেবা করছে তার দেহের। এই অনুভূতি দুজনের মনেই তখন এত প্রবল যে মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বহিরঙ্গ দিকটা তাদের আর আঘাত দিতে পারছে না, তাই তাদের মনে শোকও জাগছে না। তার সামনে বা অন্যত্র তারা আর চোখের জল ফেলছে না, তাকে নিয়ে আলোচনাও করছে না। মনে মনে তারাও বুঝেছে, নিজেদের বুকের কথাকে তারা মুখের কথায় প্রকাশ করতে পারবে না।

দুজনই দেখছে সে ধীরে ধীরে নিঃশব্দে মৃত্যুর গভীর থেকে গভীরে তলিয়ে যাচ্ছে; দুজনই জানে যে এটা ঘটবেই, আর ঘটাই স্বাভাবিক।

সে দোষ স্বীকার করল, প্রার্থনা করল: সকলেই এসে তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেল। ছেলেকে যখন তার কাছে নিয়ে গেল তখন সে বালকের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট ছুঁইয়ে মুখটা ফিরিয়ে নিল, কাজটা কষ্টকর ও দুঃখজনক বলে নয়, তার ধারণা যে শুধু এইটুকুই তার করণীয়; কিন্তু তাকে যখন ছেলেকে আশীর্বাদ করতে বলা হল তখন সে তাও করল, তারপর চারদিকে তাকাতে লাগল, যেন জানতে চাইল তার আর কিছু করণীয় আছে কি না।

আত্মা ছেড়ে যাবার সময় যখন দেহের শেষ খিঁচুনি দেখা দিল তখনও প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা তার পাশেই ছিল।

চোখের সামনে দেহটা ঠাণ্ডা হয়ে এল; কয়েক মিনিটের জন্য একেবারে নিশ্চল হয়ে পড়ে রইল। প্রিন্সেস মারি বলল, "সব কি শেষ হয়ে গেল?" নাতাশা এগিয়ে গেল, মৃত চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিল। চোখের পাতা বন্ধ করে দিল, কিন্তু তাতে চুমো না খেয়ে এই একান্ত প্রিয়জনটির শেষ স্মৃতি তার দেহটাকে জড়িয়ে ধরল।

"ও কোথায় চলে গেল? এখন কোথায় আছে?...."

দেহটাকে ধুয়ে-মুছে সাজিয়ে যখন টেবিলের উপরে শবাধারে রাখা হল তখন সকলে এসে তার কাছ থেকে বিদায় নিল, সকলেই কাঁদতে লাগল।

ছোট নিকলাসও কাঁদল, কারণ বেদনাদায়ক বিহ্বলতায় তার অন্তরটা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কাউন্টেস ও সোনিয়া কাঁদল নাতাশার প্রতি করুণায়, কারণ সে আর নেই। বুড়ো কাউন্ট কাঁদল, কারণ সে জানে যে অচিরেই তাকেও এই ভয়ঙ্কর পথে পা বাড়াতে হবে।

এবার নাতাশা ও প্রিন্সেস মারিও কাঁদল, কিন্তু সে কান্না নিজেদের দুঃখে নয়; তাদের চোখের সম্মুখে মৃত্যুর যে সরল গম্ভীর রহস্য উদ্ঘাটিত হল তারই চেতনায় আবিষ্ট মনের শ্রদ্ধায় ও আবেগে তারা কাঁদতে লাগল।

ত্রয়োদশ পর্ব

অধ্যায়—১

মানুষের মন কখনও কোন ঘটনার কারণসমূহকে পুরোপুরি জানতে পারে না, অথচ জানবার বাসনা নিহিত আছে মানুষের মনের গভীরে। বহু কারণাংশের যেকোন একটিকেই যেখানে আলাদা করে দেখলে কারণ বলে মনে হতে পারে তাদের জটিলতাকে বিচার করে না দেখে মানুষ কারণের কাছাকাছি যেকোন একটি কারণাংশকেও মূল কারণ বলে ধরে নিয়ে বলে ওঠে: "এটাই কারণ।" ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম এবং সব চাইতে প্রাচীন অভিমত ছিল নানা দেবদেবীর ইচ্ছাকেই কারণ বলে গ্রহণ করা, আর তার পরে সে জায়গা নিয়েছিল তাদের ইচ্ছা যারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত—অর্থাৎ ইতিহাসের মহানায়ক যারা। কিন্তু যেকোন ঐতিহাসিক ঘটনাই তাতে অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের কার্যাবলীর ফল; সেই ঘটনার মূলে প্রবেশের চেষ্টা করলেই স্পষ্ট বোঝা যাবে যে ইতিহাসের মহানায়কদের ইচ্ছা জনসাধারণের কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করে না, বরং তার দ্বারাই বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক ঘটনার তাৎপর্যকে আমরা যেভাবেই বুঝি না কেন তাতে কিছু যায়-আসে না; তথাপি যে মানুষ বলে যে নেপোলিয়নের ইচ্ছানুসারেই পশ্চিমের মানুষগুলি পুব দিকে গিয়েছিল এবং যে মানুষ বলে যে এ ঘটনা ঘটবে বলেই ঘটেছিল, তাদের মধ্যে সেই একই পার্থক্য দেখা যায় যেমনটি দেখা যেত সেই দুটি দলের মধ্যে যাদের একদল বলত যে পৃথিবীটা স্থির আর অন্য সব গ্রহ তার চারদিকে ঘুরছে এবং অন্য দল বলত যে পৃথিবীকে কে ধরে আছে তা তারা জানে না, তবে একথা জানে যে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই পৃথিবী ও অন্যসব গ্রহের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সব কারণের সেরা কারণটি ছাড়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার আর কোন কারণ নেই, থাকতে পারে না। কিন্তু ঐসব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রণ করবার মত নিয়ম-কানুন আছে, আর তার কিছু কিছু আমাদের জানাও বটে। কিন্তু সেই সব নিয়ম-কানুনকে আবিষ্কার করা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন কোন একটি মানুষের ইচ্ছার মধ্যে সেই কারণকে খুঁজবার চেষ্টাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করি, ঠিক যেভাবে মানুষ যখন পৃথিবীর স্থিরত্বের ধারণাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করল একমাত্র তখনই গ্রহনিচয়ের গতিবিধির নিয়ম আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছিল।

'ইতিহাসকাররা মনে করে, বরদিনোর যুদ্ধ এবং শত্রু-কর্তৃক মস্কো দখল ও অগ্নিদগ্ধ করে তার ধ্বংস সাধনের পরেই ১৮১২ সালের যুদ্ধের সব চাইতে

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে রিয়াজান হতে কালুগা রোড এবং তারুতিনো শিবির পর্যন্ত রুশ বাহিনীর অভিযান—ক্রাস্নয়া পখ্‌রা নদী বরাবর সৈন্যদের তথাকথিত পার্শ্বযাত্রা। সেই প্রতিভাদীপ্ত জয়ের গৌরব তারা দিয়ে থাকে বিভিন্ন মানুষকে, আর সে গৌরব কার প্রাপ্য তা নিয়ে বিতর্কও আছে। এমন-কি ফরাসী ইতিহাসকাররা সমেত বিদেশী ইতিহাসকাররাও সেই পার্শ্বযাত্রার কথা বলতে গিয়ে রুশ সেনানায়কদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু যুদ্ধবিষয়ক লেখকরা, এবং তাদের দেখাদেখি অন্যরাও, কেমন করে মনে করে যে এই অভিযানটি একটি মাত্র মানুষের গভীর ধ্যান-ধারণারই ফল যে রাশিয়াকে রক্ষা করেছে এবং নেপোলিয়নকে ধ্বংস করেছে সেটা বোঝা খুব শক্ত। প্রথমত, এই পার্শ্বযাত্রার মধ্যে গভীর জ্ঞান ও প্রতিভার পরিচয় কোথায় আছে সেটাই বোঝা শক্ত, কারণ যখন আক্রান্ত হবার কোন ভয় নেই তখন একটি সেনাদলের পক্ষে সেই জায়গায় অবস্থান করাই যে সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক যেখানে যথেষ্ট খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যাবে সেটা বুঝতে তো খুব বেশী মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না; ১৮১২ সালে মস্কো থেকে পশ্চাদপসরণের পরে সেনাদলের পক্ষে সব চাইতে ভাল ঘাঁটি যে কালুগা রোড সেটা তো যেকোন একটা তেরো বছরের স্বল্পবুদ্ধি ছেলেও অনুমান করতে পারত। সুতরাং কোন্ যুক্তিবলে ইতিহাসকাররা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এই রণ-কৌশল গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক সেটা বোঝা অসম্ভব। তাছাড়া, এটা বোঝা আরও শক্ত যে তারা কেন মনে করে বসল যে রাশিয়াকে রক্ষা করার এবং ফরাসীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই রণ-কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল; কারণ এই রণ-কৌশলের আগে, সমকালে, বা পরবর্তীকালে যদি অন্য কোনরকম পরিস্থিতি দেখা দিত তাহলে সেটা রুশদের পক্ষে ধ্বংসাত্মক এবং ফরাসীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠতেও পারত। সেই সেনাযাত্রার সময় থেকেও যদি রুশদের অবস্থার উন্নতি ঘটতে আরম্ভ করে থাকে. তাহলেও তো একথা বলা যায় না যে ঐ যাত্রাই তার কারণ।

মস্কো যদি ভস্মীভূত না হত তাহলে কি হত? মুরাত যদি রুশদের দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দিত? নেপোলিয়ন যদি নিষ্ক্রিয় না হত? বেনিংসেন ও বার্ক্‌লের পরামর্শমত রুশবাহিনী যদি ক্রাস্নয়া পখ্‌রাতে যুদ্ধ করত? রুশরা যখন পখ্‌রা নদী পেরিয়ে এগোচ্ছিল তখন যদি ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করত? নেপোলিয়ন যে উৎসাহ-উদ্যমের সঙ্গে স্মোলেন্স্ক-এ রুশদের আক্রমণ করেছিল তার দশ ভাগের এক ভাগ উৎসাহ-উদ্যম নিয়েও সে যদি তারুতিনোর পথে তাদের আক্রমণ করত তাহলে কি হত? ফরাসীরা যদি পিতার্সবুর্গের দিকে এগিয়ে যেত তাহলেই বা কি হত? ...এইসব ঘটনার যেকোন একটা ঘটলেই পার্শ্বযাত্রা মুক্তির বদলে ধ্বংস বয়ে আনতে পারত।

তৃতীয় কথা এবং সব চাইতে দুর্বোধ্য কথা এই যে ইতিহাস নিয়ে যারা

আলোচনা করে তারাও ইচ্ছা করেই বুঝতে চায় না যে এই পার্শ্বযাত্রা কোন একটি মানুষের ব্যাপার নয়, কেউই আগে থেকে এটা ভাবে নি, আর বাস্তব ক্ষেত্রে, ফিলি (রুশ-বাহিনীর পশ্চাদপরসণের পথে সর্বশেষ গ্রাম) থেকে পশ্চাদপসরণের মতই, এই পার্শ্বযাত্রাটা পুরোপুরিভাবে কোন সময়ই কারও মাথায় ছিল না, একটু-একটু করে, ধাপে-ধাপে, ঘটনার পর ঘটনার ভিতর দিয়ে অসংখ্য বিচিত্র পরিস্থিতির পরিণতিতে এটা ঘটেছে ; ব্যাপারটা পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিল একমাত্র তখন যখন ঘটে যাবার পরে সেটা অতীতের বিষয় হল।

ফিলির বৈঠকে রুশ কম্যাণ্ডারদের মাথায় স্বাভাবিকভাবেই একটি মাত্র পথের কথাই এসেছিল,—সোজা নিঝ্‌নি রোড ধরে পিছু হটে যাওয়া। কিন্তু কমিসারিয়েট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ল্যানস্কয় প্রধান সেনাপতিকে জানাল, সেনাবাহিনীর রসদের মোটা অংশই মজুত করা আছে তুলা ও রিয়াজান প্রদেশের ওকানদীর তীর বরাবর ; কাজেই নিঝ্‌নি রোড ধরে গেলে সেনাদল প্রশস্ত ওকানদীর দ্বারা রসদ-ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, আর প্রথম শীতে ওকানদী পার হওয়া যাবে না। নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদের পথ ধরে সোজা পিছিয়ে যাবার পরিবর্তে কেন অন্য পথ ধরতে হয়েছিল এখানেই তার হদিস পাওয়া যায়। সেনাদল রিয়াজান রোড ধরে আরও দক্ষিণে এগিয়ে চলল রসদের দিকে। পরবর্তীকালে ফরাসীদের নিষ্ক্রিয়তা, তুলার অস্ত্রাগারের নিরাপত্তার চিন্তা এবং রসদের কাছাকাছি যাবার সুবিধা—এই তিনটি পরিস্থিতির ফলেই সেনাদল আরও দক্ষিণে বেঁকে তুলা রোড ধরল। পখ্‌রা নদীর ওপারে তুলা রোডে পৌঁছে রুশ কম্যাণ্ডাররা স্থির করল পদোল্‌স্ক্‌-এই থেকে যাবে ; তখনও তারা তারুতিনো ঘাঁটির কথা চিন্তাই করে নি ; কিন্তু অসংখ্য ঘটনা ও ফরাসী সৈন্যদের পুনরাবির্ভাব, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্ভাবনা, এবং সর্বোপরি কালুগা প্রদেশে রসদের প্রাচুর্য—সবকিছু মিলে আমাদের সৈন্যদের বাধ্য করল আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে এবং তুলা থেকে কালুগা রোড ধরে তারুতিনোর দিকে এগিয়ে যেতে ; যেসব রাস্তায় রসদ মজুত করা ছিল তার মধ্যস্থলেই তারুতিনোর অবস্থান। মস্কো পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয়েছিল সেটা বলা যেমন অসম্ভব, ঠিক তেমনই তারুতিনো যাবার সিদ্ধান্ত কখন নেওয়া হয়েছিল বা কে নিয়েছিল সেটা সঠিকভাবে বলাও অসম্ভব। অসংখ্য বিচিত্র ধরনের ঘটনার ফলে সেনাবাহিনী যখন সেখানে পৌঁছে গেল একমাত্র তখনই সকলে নিশ্চিত হয়ে ভাবল যে এই যাত্রাই ছিল তাদের অভিপ্রেত এবং বহুকাল আগেই তারা এর ফলটা দেখতে পেয়েছিল।

অধ্যায়—২

বিখ্যাত পার্শ্বযাত্রা ব্যাপারটা মোটামুটি এই : ফরাসীদের অগ্রগতি বন্ধ হবার পরে আক্রমণকারীদের কাছ থেকে অবিরাম পশ্চাদপসরণকারী রুশ বাহিনী নিজেদের গতি-পথ পরিবর্তন করল এবং যখন দেখল যে শত্রু তার পিছনে ধাওয়া করছে তখন স্বভাবতই তারা সেইদিকে এগোতে লাগল যেখানে প্রচুর রসদ মজুদ ছিল।

রুশ বাহিনীর প্রতিভাধর কম্যাণ্ডারদের কথা না ভেবে আমরা যদি সে বাহিনীটাকে পরিচালকহীন রূপে কল্পনা করি তাহলে সে বাহিনীর পক্ষে যেসব অঞ্চলে অধিকাংশ রসদ পাওয়া যাবে এবং যেটা দেশের সব চাইতে সমৃদ্ধ অঞ্চল সেখান দিয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে আবার মস্কো ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হত না।

নিঝ.নি থেকে রিয়াজান, তুলা ও কালুগা রোড ধরে চলাটা এতই স্বাভাবিক যে রুশ লুঠেরারাও ঐ পথেই চলাচল করে থাকে, আর পিতার্সবুর্গ থেকে কুতুজভকেও ঐ পথেই সৈন্য চালিয়ে নিতে বারবার বলা হচ্ছিল। রিয়াজান রোড ধরে সৈন্য চালানোর জন্য তারুতিনোতে কুতুজভকে সম্রাটের কাছ থেকে তীব্র ভৎ'সনাই শুনতে হল; অথচ কালুগার কাছে যেখানে সে ইতিমধ্যেই ঘাঁটি পেতেছে সম্রাটের চিঠিতে তাকে সেখানে যাবার নির্দেশই দেওয়া হল।

একটা বলের মত গড়াতে গড়াতে রুশ বাহিনী স্বাভাবিকভাবে যেখানে যাবার কথা সেখানেই পৌছে গেল। কুতুজভের কৃতিত্ব তথাকথিত সমর কৌশলগত প্রতিভায় নয়, তার কৃতিত্ব যে একমাত্র সেই ঘটনার তাৎপর্যকে বুঝতে পেরেছিল। ফরাসী বাহিনীর তৎকালীন নিষ্ক্রিয়তার অর্থ একমাত্র সেই বুঝতে পেরেছিল, একমাত্র সেই বারবার বলেছে যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, প্রধান সেনাপতি হিসাবে শত্রুকে আক্রমণ করতে চাওয়াটাই তার কাছে প্রত্যাশিত হলেও রুশ বাহিনীকে অকারণ সংঘর্ষ থেকে নিবৃত্ত করতে সেই সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করেছিল।

বরদিনোতে আহত জন্তুটিকে পলায়মান শিকারী যেখানে রেখে গিয়েছিল সে সেখানেই পড়ে রইল; কিন্তু সে তখনও বেঁচে আছে কি না, শক্তিশালী হয়েও নেহাৎ পড়ে আছে কিনা, সেকথা শিকারী জানত না। হঠাৎ জন্তটার আর্তনাদ শোনা গেল।

সেই আহত পশুর (ফরাসী বাহিনী) যে আর্তনাদ তার শোচনীয় অবস্থাটাকে প্রকাশ করে দিল সেটা হল শান্তির প্রস্তাব দিয়ে লরিস্টানকে কুতুজভের শিবিরে প্রেরণ।

নেপোলিয়ন সবসময়ই বিশ্বাস করত যে তার মাথায় যা আসে সেটাই ঠিক; যতই অর্থহীন হোক যে কথাগুলি প্রথম তার মনে এল তাই সে কুতুজভকে লিখে পাঠাল।

লিখল : "মঁসিয় লি প্রিন্স কুতুজভ, কয়েকটি বিশেষ প্রশ্ন নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আমার একজন অ্যাডজুটান্ট-জেনারেলকে আপনার কাছে পাঠাচ্ছি। ইয়োর হাইনেসের কাছে আমার মিনতি, সে আপনাকে যা বলবে, বিশেষ করে দীর্ঘকাল ধরেই আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতি যে সম্মান ও বিশেষ শ্রদ্ধা আমি পোষণ করে আসছি সেই মনোভাবকে সে যখন প্রকাশ করবে, তখন আপনি যেন তার কথায় বিশ্বাস করেন। এ চিঠির আর কোন উদ্দেশ্য নেই ; মঁসিয় লি প্রিন্স কুতুজভ, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তাঁর পবিত্র ও সদয় আশ্রয়ে তিনি আপনাকে রক্ষা করুন !

মস্কো, ৩০ শে অক্টোবর, ১৮১২ নেপোলিয়ন।"

কুতুজভ জবাব দিল : "আমাকে কোনরকম মিটমাটের উদ্যোক্তা বলে মনে করলে উত্তরপুরুষ আমাকে অভিশাপ দেবে। আজ এই আমার জাতির মনোভাব।" কিন্তু সেনাদল যাতে আক্রমণ না করে সেজন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে লাগল।

যে একটা মাস ধরে ফরাসী সৈন্যরা মস্কোতে লুঠতরাজ করে ফিরছিল আর রুশ সৈন্যরা তারুতিনোতে তাঁবু ফেলে চুপচাপ বসেছিল, সেই সময়কালে দুই সেনাদলের মধ্যে কি মনোবলে কি সংখ্যায় একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে—তার ফলে এখন রুশ পক্ষের দিকেই পাল্লাটা ভারী হয়েছে। যদিও ফরাসী বাহিনীর অবস্থা ও সংখ্যার কথা রুশরা জানত না, তবু এই পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণ করার প্রয়োজনটা অসংখ্য লক্ষণের ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেতে লাগল। সে লক্ষণগুলি হল : লরিস্টনের দৌত্য ; তারুতিনোতে রসদের প্রাচুর্য ; চতুর্দিক থেকে ফরাসীদের নিষ্ক্রিয়তা ও বিশৃংখলার সংবাদ ; চমৎকার আবহাওয়া ; আমাদের রেজিমেণ্টে নতুন সৈনিকের অবিরাম যোগদান ; রুশ সৈন্যদের লম্বা বিশ্রাম ও কাজ করার জন্য অধৈর্য হয়ে ওঠা ; যে ফরাসী বাহিনী এতকাল ছিল দৃষ্টির আড়ালে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত হবার জন্য তারুতিনোতে অবস্থিত ফরাসীদের সম্পর্কে খুব নিকটবর্তী রুশ ঘাঁটির সৈন্যদের কৌতূহল ; ফরাসীদের বিরুদ্ধে চাষী ও গেরিলা সৈন্যদের সহজ জয়লাভের সংবাদ ও তজ্জনিত উৎসাহ বৃদ্ধি ; ফরাসীরা যতদিন মস্কোতে থাকবে ততদিন রাশিয়ার প্রতিটি মানুষের মনে প্রতিশোধের তীব্র স্পৃহা ; এবং সর্বোপরি প্রতিটি রুশসৈনিকের মনের অস্পষ্ট ধারণা যে তুলনামূলকভাবে উভয়দলের সৈন্যসংখ্যার পরিবর্তন ঘটেছে, আর সেটা ঘটেছে আমাদেরই স্বপক্ষে। তুলনামূলক শক্তির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটার ফলে সৈন্যদের অগ্রাভিযান অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘড়ির মিনিটের কাঁটাটা একটা বৃত্ত পূর্ণ করামাত্রই যেমন ঘড়িটা বাজতে শুরু করে তেমনই উচ্চতর মহলের ফিস-ফিস, ফুস-ফুস এবং বর্ধিত কর্মপ্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে এই পরিবর্তনই ঘোষিত হচ্ছে।

অধ্যায়—৩

রুশ বাহিনী পরিচালিত হচ্ছে সপার্ষদ কুতুজভের হাতে এবং পিতার্সবুর্গ থেকে সম্রাটের হাতে। মস্কো পরিত্যাগের সংবাদ পিতার্সবুর্গে পৌঁছবার আগেই গোটা অভিযানের একটা বিস্তারিত পরিকল্পনা রচনা করে কুতুজভকে পাঠানো হয়েছিল সেই মত কাজ করতে।

যদিও মস্কো আমাদের হাতে আছে এটা ধরে নিয়েই পরিকল্পনাটা রচিত হয়েছিল তবু কর্ম-পরিষদ কর্তৃক সেটা অনুমোদিত ও গৃহীত হয়েছিল। কুতুজভ উত্তরে শুধু জানাল যে এতটা দূর থেকে পাঠানো ব্যবস্থা অনুসারে কাজ করার অনেকরকম অসুবিধা আছে। কাজেই সম্ভাবিত অসুবিধা দূর করার জন্য নতুন নির্দেশাদি পাঠানো হল; সেই সঙ্গে কুতুজভের কাজকর্মের উপর নজর রাখতে এবং সে সম্পর্কে প্রতিবেদন পাঠাতে নতুন লোকও পাঠানো হল।

এছাড়া, রুশ বাহিনীর গোটা কর্ম-পরিষদও নতুন করে গঠিত হয়েছে। ব্যাগ্রেশন নিহত হওয়ায় এবং বার্ক্‌লে আক্রোশবশত চলে যাওয়ায় সেই দুটি শূন্যপদেও লোক নেওয়া দরকার। তা নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাও চলতে লাগল।

কুতুজভ ও তার কর্ম-পরিষদের প্রধান বেনিংসেনের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ; সম্রাটের ব্যক্তিগত প্রতিনিধির উপস্থিতি, এবং এইসব রদ-বদলের ফলে সেনাবাহিনীর কর্মচারিদের মধ্যে নানারকম দলাদলি চলতে লাগল। যুদ্ধ কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিজস্ব গতিতেই চলতে থাকল।

সম্রাটের ২রা অক্টোবরে লেখা যে চিঠিটা কুতুজভের হাতে পৌঁছল তারুতিনো যুদ্ধের পরে তাতে লেখা হয়েছিল: "প্রিন্স মাইকেল ইলারিয়নভিচ! ২রা সেপ্টেম্বর থেকে মস্কো শত্রুপক্ষের হাতে রয়েছে। আপনার সর্বশেষ প্রতিবেদনটি লেখা হয়েছে ২০ শে তারিখে; এই সময় কালের মধ্যে আপনি শত্রুর বিরুদ্ধে অথবা প্রাচীন রাজধানীর উদ্ধারে কোনরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি, কিন্তু আপনার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুসারে আপনি আরও পিছিয়ে গিয়েছেন। শত্রুপক্ষের একটা ছোট দল ইতিমধ্যেই সেরপুখভ দখল করেছে, এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে অপরিহার্য বিখ্যাত অস্ত্রাগারসহ তুলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। জেনারেল উইন্তিন্‌গরদের প্রতিবেদন থেকে আমি জানতে পেরেছি যে দশ হাজার সৈন্যের একটি শত্রুপক্ষীয় দল পিতার্সবুর্গ রোড ধরে এগিয়ে চলেছে। কয়েক হাজার সৈন্যের আর একটি দল দিমিত্রভের দিকে এগিয়ে আসছে। একটা তৃতীয় সেনাদল ভ্লাদিমির রোড ধরে এগোচ্ছে এবং একটা চতুর্থ বড় দল রুজা ও মোঝায়েস্ক-এর মধ্যে ঘাঁটি করেছে। নেপোলিয়ন স্বয়ং ২৫ শে তারিখ পর্যন্ত মস্কোতেই ছিলেন। এইসব সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে শত্রুপক্ষ যখন তার বড় বড় সেনাদলকে নানা দিকে ছড়িয়ে রেখেছে এবং নেপোলিয়ন ও তার রক্ষীবাহিনী মস্কোতেই রয়েছে তখনও কি আপনার

সম্মুখস্থ শত্রুপক্ষ এতদূর শক্তিশালী হতে পারে যে আপনি তাদের আক্রমণ করতে পারছেন না? বরং আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের চাইতে দুর্বলতর সেনাদল নিয়ে সেই হয়তো আপনার পশ্চাদ্ধাবন করছে। আমার তো মনে হয় এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একটি দুর্বলতর শত্রুকে আক্রমণ করে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া, অন্ততপক্ষে তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করাই আপনার পক্ষে সুবিধাজনক; তাতে যে সমস্ত অঞ্চল এখন ফরাসীদের দখলে আছে তার কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুনর্দখল করে তুলা এবং ভিতরকার অন্য শহরগুলিকে বিপদমুক্ত করা যাবে। এদিকে বর্তমান অবস্থায় পিতার্সবুর্গে বেশী সৈন্য রাখা সম্ভব হয় নি; ফলে যেকোন রকমের একটা সেনাদল নিয়ে এসে শত্রু যদি এ রাজধানীটিকেও বিপন্ন করে তোলে তার সব দায়-দায়িত্ব আপনাকেই বহন করতে হবে; কারণ আপনার যে বাহিনীকে রাখা হয়েছে তাতে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও উদ্যমের সঙ্গে চললে এই নতুন বিপদকে এড়িয়ে চলা খুবই সম্ভবপর। স্মরণ রাখবেন, মস্কো ছেড়ে আসার জন্য শুধু দেশবাসীর কাছে আপনার জবাবদিহি করাটা এখনও বাকি আছে। আপনি জানেন, আপনাকে পুরস্কৃত করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত আছি। সে দুর্বলতা আমাকে দুর্বল করবে না, কিন্তু আপনার কাছ থেকে সেই উৎসাহ, দৃঢ়তা ও সাফল্য আশা করার অধিকার আমার এবং গোটা রাশিয়ার অবশ্যই আছে; আপনার বুদ্ধি, সামরিক প্রতিভা এবং আপনার অধীনস্থ সৈন্যদের সাহসের গুণে সে প্রত্যাশা আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি।"

এই চিঠি যখন পাঠানো হল ততদিনে কুতুজভ আর তার সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখতে পারল না; একটা সংঘর্ষ এর মধ্যেই ঘটে গেছে।

২রা অক্টোবর সীমান্ত ঘাঁটির শাপোভালভনামক একটি কসাক টহল দেবার সময় একটি খরগোসকে মেরে ফেলে এবং আর একটিকে আহত করে। আহত খরগোসটির পিছনে ধাওয়া করে জঙ্গলের একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে সেখানে অবস্থিত মুরাতের সেনাবাহিনীর বাম ব্যূহের কাছে পৌঁছে যায়। সে যে ফরাসীদের হাতে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিল ফিরে এসে হাসতে হাসতে সেকথা সহকর্মীদের কাছে গল্প করল। আর সে গল্প শুনে জনৈক কর্নেল তার কম্যাণ্ডারকে খবরটা জানিয়ে দিল।

কসাকটিকে ডেকে পাঠিয়ে নানারকম প্রশ্ন করা হল। কসাক অফিসাররা এই সুযোগে কয়েকটা ঘোড়া হাতিয়ে নিতে চাইল, কিন্তু একজন ঊর্ধ্বতন অফিসার ব্যাপারটা আরও উপরে জানিয়ে দিল। উপর মহলে তখন খুবই রেশারেশি চলছে। কয়েকদিন আগেই এর্মোলভ বেনিংসেনের সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে এসেছে, আক্রমণ শুরু করার জন্য প্রধান সেনাপতির উপর যেন চাপ সৃষ্টি করা হয়।

বেনিংসেন উত্তরে তাকে বলেছে, "আমি যদি আপনাকে না জানতাম তা

হলে ভাবতাম যে আপনি মুখে যা বলছেন আসলে তা চাইছেন না। আমি যে পরামর্শই দেই না কেন, হিজ হাইনেস অবশ্যই করবেন ঠিক তার উল্টোটি।”

কসাকটির প্রতিবেদন এবং অশ্বারোহী টহলদার পাঠানোতেই প্রমাণ পাওয়া গেল যে সন্ধিক্ষণ সমাগত। কসে পাক-দেওয়া স্প্রিংটা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে শুরু করেছে, ঘণ্টা বাজছে। নিজের সব শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা এবং মানব-চরিত্রের জ্ঞান সত্ত্বেও কসাকটির প্রতিবেদন, বেনিংসেনের চিঠি, তার মতে সম্রাটের অভিপ্রায়, এবং সব জেনারেলের ঐক্যমতের কথা চিন্তা করে কুতুজভ আর সেনাদলের অনিবার্য অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে রাখতে পারল না, নিষ্ফল এবং ক্ষতিকর জেনেও সেই কাজটি করার হুকুমই দিল—অর্থাৎ যা ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাতে নিজের সম্মতি জানাল।

অধ্যায়—৪

কসাকটি খবর দিল যে ফরাসী বাহিনীর বাঁ দিকটা অরক্ষিত; তার সঙ্গে বেনিংসেনের চিঠি এসে এটাই বুঝিয়ে দিল যে এখনই আক্রমণের নির্দেশ দেওয়া দরকার: দিন স্থির হল ৫ই অক্টোবর।

৪ঠা অক্টোবর সকালে কুতুজভ হুকুম-নামায় সই করল। তল্ সেটা এর্‌মোলভকে পড়ে শোনাল; তাকে বাকি ব্যবস্থার উপর নজর রাখতে বলল।

“ঠিক আছে—ঠিক আছে। এখন আমার হাতে সময় নেই,” বলে এর্‌মোলভ কুটির থেকে বেরিয়ে গেল।

তল্ যে হুকুমনামাটা রচনা করল সেটা খুবই ভাল হয়েছে। অস্তারলিজের হুকুমনামার মতই এটাও লেখা হল—তবে এবার আর জার্মান ভাষায় নয়।

“প্রথম সেনাদল এখানে-এখানে যাবে,” “দ্বিতীয় সেনাদল ওখানে-ওখানে যাবে,” ইত্যাদি। কাগজে-কলমে সেনাদলগুলি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল এবং শত্রু বিধ্বস্ত হল। সব হুকুমনামার বেলায়ই যা হয়ে থাকে, আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে সব কিছুই ভাবা হল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যেরকম ঘটে থাকে, একটি সেনাদলও যথানির্দিষ্ট সময়ে এসে পৌঁছল না।

হুকুমনামার প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি তৈরি হবার পরে একজন অফিসারকে ডেকে সেগুলো এর্‌মোলভের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অশ্বারোহী রক্ষী বাহিনীর যে তরুণ অফিসারটির উপর এই কাজের ভার দেওয়া হল সে কুতুজভের একজন আর্দালি। এত বড় কাজের ভার পেয়ে খুশি মনে সে এর্‌মোলভের বাসায় গেল।

“চলে গেছেন,” এর্‌মোলভের আর্দালি জানাল।

অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর অফিসারটি তখন আর এক জেনারেলের কাছে গেল; এর্‌মোলভকে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা যায়।

"না, জেনারেলও বেড়িয়ে গেছেন।"

ঘোড়ায় চেপে অফিসার অন্য একজনের কাছে গেল।

"না, তিনিও বেড়িয়ে গেছেন।"

"এই বিলম্বের জন্য তারা আবার আমাকে না দায়ী করেন। যত সব বাজে ব্যাপার!" ভাবতে ভাবতে অফিসারটি গোটা শিবিরটা চক্কর দিল। একজন বলল, অন্য কয়েকজন জেনারেলের সঙ্গে এর্‌মোলভকে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে দেখেছে; অন্যরা বলল সে নিশ্চয় বাড়ি ফিরে গেছে। অফিসারটি সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করল; খাবার সময় পর্যন্ত পেল না। কিন্তু এর্‌মোলভকে কোথাও পাওয়া গেল না; সে যে কোথায় গেছে তা কেউ জানে না। একজন সহকর্মীর কাছ থেকে কোনরকমে কিছু খেয়ে সে আবার সামনের দিকে ছুটল মিলরাদভিচের খোঁজে। সেও বেরিয়ে গেছে; তবে সেখান থেকে বলে দেওয়া হল যে জেনারেল কিকিন-এর বলনাচের আসরে তাকে পাওয়া যেতে পারে।

"কিন্তু সেটা কোথায়?"

অনেক দূরে একটা বাড়ি দেখিয়ে কসাক অফিসারটি বলল, "কেন, ঐ তো, ঐ এচ্‌কিনোতে।"

"সে কি? আমাদের সীমানার বাইরে?"

"দুটো রেজিমেণ্টকে ঘাঁটিতে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তারা ওখানে মজা করছে। জঘন্য! দুটো ব্যাণ্ড আর তিন দল গায়িকা!"

অফিসারটি আমাদের সীমানার ওপারে এচ্‌কিনোর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। অনেকদূর থেকেই বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা নৃত্য-সঙ্গীতের সুর তার কানে এল।

অবিরাম শিস ও তর্‌বানের (একরকম তারের যন্ত্র) বাজনার সঙ্গে শুনতে পেল গান "ঐ প্রান্তরে....ঐ প্রান্তরে!" মাঝে মাঝেই উল্লাস-ধ্বনিতে তাও চাপা পড়ে যাচ্ছে। আটটা বেজে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে একটা বড় বাড়ির বারান্দায় গিয়ে সে দাঁড়াল। একদিকে রুশ সৈন্য আর অন্যদিকে ফরাসী সৈন্য থাকা সত্ত্বেও বাড়িটা অক্ষতই আছে। ভিতরে ঢুকে দেখল, সব প্রধান জেনারেলরাই সেখানে হাজির; এর্‌মোলভের দশাসই মূর্তিটাও আছে। সকলেরই কোটের বোতাম খোলা; লাল মুখে অর্ধবৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে তারা হো-হো করে হাসছে। ঘরের মাঝখানে একটি সুদর্শন বেঁটে জেনারেল মহা উৎসাহে ত্রেপাক নাচছে।

"হা, হা, হা! সাবাস নিকলাস আইভানিচ! হা, হা, হা!"

অফিসারটির মনে হল একটা গুরুতর নির্দেশলঙ্ঘন; এরকম সময়ে এখানে আসায় তার দ্বিগুণ অপরাধ হয়েছে; তার অপেক্ষা করাই উচিত ছিল; কিন্তু একজন জেনারেল তাকে দেখে ও তার মুখে সব শুনে এর্‌মোলভকে খবর দিল।

ভ্রূকুটিত মুখে এগিয়ে এসে এর্‌মোলভ অফিসারটির বক্তব্য শুনল; কোন

কথা না বলে কাগজগুলি তার হাত থেকে নিয়ে নিল।

কর্তব্যরত একজন সহকর্মী এর্‌মোলভ প্রসঙ্গে অশ্বারোহী রক্ষীবাহিনীর অফিসারটিকে বলল, "তুমি কি মনে কর তিনি হঠাৎই বেরিয়ে গিয়েছিলেন? এটা একটা চাল। কনভ্‌নিৎসিনকে বিপদে ফেলবার জন্য ইচ্ছা করেই এটা করা হয়েছে। দেখো, কাল কী কেচ্ছাটাই না হবে!"

অধ্যায়—৫

কুতুজভ বলেই রেখেছিল পরদিন তাকে যেন বেশ সকালেই ঘুম থেকে ডেকে দেওয়া হয়। শীর্ণদেহ বৃদ্ধ মানুষটি তাড়াতাড়ি প্রার্থনা করল, পোশাক পরল, এবং যে যুদ্ধে তার সম্মতি নেই তাতেই সৈন্য পরিচালনা করতে হবে মনের মধ্যে এই খুঁতখুঁতি নিয়েই কালিচে গাড়িতে চেপে লেতাশোভ্‌কা (তারুতিনো থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরের একটা গ্রাম) থেকে নির্দিষ্ট জায়গার দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল। কালিচেতে বসে সে একবার ঝিমুচ্ছে, আবার জেগে উঠছে, আর তখনই কান পেতে শুনতে চেষ্টা করছে যুদ্ধ শুরু হবার ইঙ্গিত স্বরূপ কোন কামানের শব্দ ডান দিক থেকে আসছে কি না। স্যাঁতসেতে, একঘেয়ে হেমন্তের সকাল সবে ভোর হচ্ছে। তারুতিনোর কাছাকাছি পৌঁছে কুতুজভ দেখতে পেল, অশ্বারোহী সৈন্যরা তার যাবার পথটা পেরিয়েই ঘোড়াগুলোকে জল খাওয়াতে নিয়ে চলেছে। কুতুজভ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের দিকে তাকাল, গাড়িটা থামাল, জিজ্ঞাসা করল তারা কোন্ রেজিমেণ্টের লোক। যে সেনাদলের নাম তারা বলল তাদের তো এখন অনেক দূর এগিয়ে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে থাকার কথা। "হয় তো একটা ভুল হয়ে গেছে," বৃদ্ধ সেনাপতি ভাবল। কিন্তু আরও কিছুটা এগিয়ে দেখল, পদাতিক রেজিমেণ্টের সৈন্যরা অস্ত্রশস্ত্র একজায়গায় জড় করে রেখে আধা পোশাক পরে যই—পরিজ খাচ্ছে আর জ্বালানি বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সে একজন অফিসারকে ডেকে পাঠাল। অফিসার এসে জানাল, যুদ্ধযাত্রার কোন হুকুম তারা পায় নি।

"সে কি! পাওয়া যায় নি...." বলতে গিয়েও কুতুজভ সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করল; একজন উর্ধ্বতন অফিসারকে ডেকে পাঠাল। কালিচে থেকে নেমে মাথাটা নীচু করে নিঃশব্দে পায়চারি করতে লাগল; নিঃশ্বাস খুব দ্রুত পড়ছে। যাকে ডাকা হয়েছিল সেই অফিসার এইখানে আসতেই কুতুজভের মুখটা রাঙা হয়ে উঠল; এই ভুলের জন্য অফিসারটিই দায়ী বলে নয়, সে রাগ দেখাবার মত যথেষ্ট উপযুক্ত একজন লোক বলে। কাঁপতে কাঁপতে, হাঁপাতে হাঁপাতে বুড়ো মানুষটি একেবারে ক্ষেপে গেল, এইখানে তার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে হাত তুলে তাকে শাসাল, চীৎকার করল, গালাগালি দিয়ে ভূত তাগিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন ব্রোজিন নামক আর একটি লোক ঘটনাক্রমে সেখানে এসে হাজির হয়েছিল; কোন দোষে সে দোষী নয়; তবু তার কপালেও সেই একই লাঞ্ছনা জুটল।

"কী রকম বদমাস লোক হে তোমরা? সব্বাইকে গুলি করব। পাজির দল!" হাত ঘোরাতে ঘোরাতে নিজেও কাঁপতে কাঁপতে কুতুজভ কর্কশ গলায় চীৎকার করে বলল।

তার দৈহিক যন্ত্রণা দেখা দিল। সে একজন প্রধান সেনাপতি, প্রশান্ত মহামহিম, সকলেই বলে তার মত শক্তিধর মানুষ রাশিয়াতে দ্বিতীয়টি নেই: অথচ এই অবস্থায় সে যেন গোটা সেনাবাহিনীর কাছে হাসির খোরাক হয়ে উঠেছে। সে তখন নিজের মনেই ভাবছে: "আজ তো এত তাড়াহুড়া করে প্রার্থনা করার কোন দরকার আমার ছিল না, বা সারা রাত জেগে চিন্তা করারও দরকার ছিল না। আমি যদি জোচ্চোর অফিসার হতাম তাহলে তো কেউ আমাকে এভাবে ঠাট্টা করতে সাহস পেত না…আর এখন!" তাকে যেন দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয়েছে সেইরকম যন্ত্রণাই সে ভোগ করছে; তাই তো রাগে, দুঃখে সে চীৎকার করছে। কিন্তু বেশীক্ষণ তার শক্তিতে কুলোল না; চারদিকে তাকিয়ে যখন বুঝতে পারল যে সে অনেক আজেবাজে বকেছে, তখনই আবার গাড়িতে চেপে নিঃশব্দে গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল।

তার রাগ একবার ফুরিয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। চোখ মিটমিট করে সকলের কৈফিয়ৎ ও যুক্তির ফিরিস্তি শুনল (এর্মোলভ অবশ্য পরদিনের আগে তার সঙ্গে দেখা করতেই এল না); আর যে সেনাসমাবেশ ও যুদ্ধযাত্রা আজ করা গেল না সেটা পরদিন করা হোক এই মর্মে বেনিংসেন, কনভ্-নিৎসিন ও তোল্-এর পীড়াপীড়িতে কুতুজভকে আর একবার সে প্রস্তাবে সম্মতি দিতেই হল।

অধ্যায়—৬

পরদিন সন্ধ্যায় সৈন্যরা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হল এবং রাতেই যাত্রা শুরু করল। হেমন্তের রাতের আকাশে গাঢ় লাল মেঘ জমেছে, কিন্তু বৃষ্টি নেই। মাটি ভিজে, কিন্তু কর্দমাক্ত নয়; সৈন্যরা নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে, শুধু মাঝে মাঝে গোলন্দাজ বাহিনীর ঝন্ ঝন্ শব্দ ঈষৎ কানে আসছে। সৈন্যদের জোরে কথা বলতে, পাইপ টানতে, বা আগুন জ্বালাতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে; তারাও ঘোড়ার ডাক বন্ধ করার চেষ্টা করছে। অভিযানের এই গোপনীয়তা তাদের বেশী করে মুগ্ধ করেছে; মনের সুখে তারা এগিয়ে চলেছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গেছে মনে করে কিছু দল থেমে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রেখে ঠাণ্ডা মাটিতেই বসে পড়ল; কিন্তু বেশীর ভাগ সৈন্যই সারারাত ধরে এগিয়ে

চলল এবং এমন সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যেখানে যাওয়া তাদের উচিত ছিল না।

একমাত্র কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ তার কসাকদের নিয়ে যথাসময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। স্তমিলভা গ্রাম থেকে দিমিত্রভ্স্ক্ যাবার পথের ধারে একটা বনের প্রান্তে পৌঁছে এই সেনাদলটি থামল।

ভোরের দিকে কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ ঝিমুচ্ছিল, এমন সময় ফরাসী বাহিনী ছেড়ে আসা একটি সৈনিককে এনে হাজির করায় তার ঘুম ভেঙে গেল। লোকটি পনিয়াতোস্কি সেনাদলের একজন পোলিশ সার্জেন্ট; পোলিশ ভাষাতেই সে বলল যে, তাকে অনেক আগেই অফিসার করা উচিত ছিল, তাদের যেকোন লোকের চাইতে সে বেশী সাহসী, অথচ তাকে খুবই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় বলেই সে তাদের ছেড়ে এসেছে, আর তাদের ভালভাবে শিক্ষা দিতে চায়। আরও বলল, সেখান থেকে মাত্র এক ভার্স্ট দূরে মুরাত রাতটা কাটাচ্ছে, আর মাত্র একশ সৈন্যের একটা দল যদি তার সঙ্গে দেওয়া হয় তাহলে সে তাকে জীবিত গ্রেপ্তার করতে পারবে। কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ সহ-অফিসারদের সঙ্গে পরামর্শ করল। প্রস্তাবটা এতই লোভনীয় যে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। সকলেই স্বেচ্ছায় যেতে রাজী হল এবং একবার চেষ্টা করে দেখার পরামর্শ দিল। অনেক যুক্তি-তর্ক ও বাদানুবাদের পরে স্থির হল, মেজর-জেনারেল গ্রেকভ দুটি কসাক রেজিমেণ্ট নিয়ে পোলিশ সার্জেন্টের সঙ্গে যাবে।

যাত্রার আগে কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ সার্জেন্টকে বলল, "মনে রেখো, যদি মিথ্যা বলে থাক তো তোমাকে কুকুরের মত ফাঁসিতে ঝোলানো হবে; কিন্তু যদি সত্য হয় তাহলে পাবে এক শ' স্বর্ণমুদ্রা।"

কোন জবাব না দিয়ে সার্জেন্ট গম্ভীরভাবে ঘোড়ায় চেপে গ্রেকভের সঙ্গে চলে গেল। তারা জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ প্রথম ভোরের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এল। নিজের দায়িত্বে যে কাজ সে করেছে সেজন্য বেশ উত্তেজনাও বোধ করছে। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় ও নিভে-আসা শিবির-আগুনের আলোয় সে শত্রু-শিবিরের দিকে তাকাল। ডানদিকে খোলা জায়গায় এখন আমাদের সেনাদলকে দেখতে পাবার কথা। সেইদিকে ভাল করে তাকিয়েও তাদের দেখতে পেল না। কাউণ্টের মনে হল, ফরাসী শিবির কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে; তার ক্ষীণদৃষ্টি অ্যাডজুটাণ্টটিও সেকথা সমর্থন করল।

শিবিরের দিকে তাকিয়ে কাউণ্ট অর্লভ বলল, "আঃ, সত্যি খুব দেরি হয়ে যাচ্ছে।"

হঠাৎ তার মনে হল যে এই সার্জেন্ট একটি প্রতারক, সে মিথ্যা কথা বলেছে; এই দুটি রেজিমেন্টের অনুপস্থিতির জন্য রুশ আক্রমণটাই ব্যর্থ হয়ে

যাবে, তাদের সে যে কোথায় নিয়ে যাবে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এত সৈন্যের মধ্যে থেকে একজন প্রধান সেনাপতিকে কেমন করে গ্রেপ্তার করা যাবে!

কাউণ্ট বলল, "আমি নিশ্চিত বলছি ওই রাস্কেলটা মিথ্যা বলেছে।"

একজন বলল, "তাদের তো এখনও ফিরিয়ে আনা যায়।"

"অ্যা? সত্যি....তুমি কি মনে কর? তাদের এগিয়ে যেতে দেব, না দেব না?"

"আপনি কি তাদের ফিরিয়ে আনতে চান?"

"ফিরিয়ে আন, ওদের ফিরিয়ে আন!" হঠাৎ দৃঢ়সংকল্পে অর্লভ বলে উঠল। "নইলে বড় বেশী দেরী হয়ে যাবে। এখনই আলো ফুটেছে।'

অ্যাডজুটাণ্ট জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

গ্রেকভ ফিরে এলে কাউণ্ট অর্লভ-দেনিসভ উত্তেজনাবশে আক্রমণ করাই স্থির করল। সঙ্গের লোকজনদের মনেও সেই একই উত্তেজনা।

"ঘোড়ায় চাপো!" সে চাপা গলায় হুকুম দিল। সৈন্যরা জায়গামত দাঁড়িয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল।...."আগে বাড়, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হোন!"

"হুর্‌রা—আ—আ!" সারা বন প্রতিধ্বনিত হল। কসাক দলটি বর্শা বাগিয়ে নালাটা পেরিয়ে শিবিরের দিকে ছুটে চলল।

প্রথম যে ফরাসী সৈনিকটি কসাকদের দেখতে পেল সে সভয়ে চীৎকার করে উঠল—আর শিবিরে যে যেখানে ছিল—কেউ পোশাক পরে নি, সবে ঘুম থেকে উঠেছে—সকলেই যে যেদিকে পারল ছুট দিল; রইল কামান, বন্দুক, আর ঘোড়া।

পিছনে ও চারদিকে নজর না দিয়ে কসাকরা যদি ফরাসীদের পিছু নিত তাহলে তারা সেখানকার সব কিছু সহ স্বয়ং মুরাতকেও গ্রেপ্তার করতে পারত। অফিসাররাও তাই চেয়েছিল। কিন্তু লুটের মাল ও বন্দীদের হাতের মুঠোয় পাওয়ায় কসাকদের এক পাও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তখন অসম্ভব। কেউ কোন হুকুমের পরোয়াই করল না। এক জায়গাতেই পনেরোশ' কয়েদি ও আটত্রিশটি বন্দুক পাওয়া গেল; তাছাড়া পতাকা, ঘোড়া, গদী, ঘোড়ার সাজ ও অন্য টুকিটাকি জিনিস তো আছেই। সব কিছুর বন্দোবস্ত করতে হবে, বন্দী ও বন্দুকগুলোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে, লুটের মাল ভাগ করতে হবে—তারজন্য চীৎকার-চেঁচামেচি ও নিজেদের মধ্যে ছোটখাট লড়াইও হল—এইসব নিয়েই কসাকরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পিছন থেকে তাড়া না খাওয়ায় ফরাসীরা ক্রমে শান্ত হল: নানা দলে ভাগ হয়ে গুলি চালাতে শুরু করল। অর্লভ-দেনিসভ অন্য সেনাদলের আসার প্রতীক্ষায় থেকে আর অগ্রসর হল না।

এদিকে বেনিংসেন ও তোল্‌-এর নেতৃত্বাধীন পদাতিক সেনাদলগুলি

হুকুমনামা অনুসারেই যথারীতি যাত্রা করলেও নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছে পৌঁছে গেল অন্য কোন স্থানে। অবশ্য কিছু সেনাদল শেষ পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানেই গিয়ে হাজির হল; কিন্তু তখন এত দেরি হয়ে গেছে যে তারা কোন কাজে লাগার পরিবর্তে শত্রুপক্ষের গোলাগুলির শিকারে পরিণত হল। তোল্ ঘোড়া ছুটিয়ে মহাউৎসাহে সর্বত্র ছুটে বেড়াল; কিন্তু দেখল সর্বত্র সব কিছুই বিপর্যস্ত, এলোমেলো। যখন একটা জঙ্গলের মধ্যে বাগভূত-এর সেনাদলের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে; অনেক আগেই তাদের অর্লভ-দেনিসভের সঙ্গে যোগ দেবার কথা। উত্তেজিত ও বিরক্ত হয়ে একজন কাউকে এজন্য দায়ী করতে গিয়ে তোল্ সেই সেনাদলের কম্যাণ্ডারের কাছে হাজির হয়ে তাকে যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করে শেষ পর্যন্ত বলল যে তাকে গুলি করা উচিত। জেনারেল বগভূত একজন শান্ত প্রকৃতির বৃদ্ধ যোদ্ধা; এইভাবে দেরি হওয়াতে এবং সর্বত্র গোলমাল ও ভুল-বোঝাবুঝির ফলে বিচলিত হওয়ায় সেও হঠাৎ ভীষণ রেগে গেল; সকলকে অবাক করে দিয়ে নিজের স্বভাববিরুদ্ধভাবে তোল্-এর প্রতি অনেক অশোভন উক্তি করে বসল।

"অন্যের কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়াটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু অন্য যে-কোন লোকের মতই আমার লোকজনদের নিয়ে মরতে পারি," এই কথা বলে একটিমাত্র সেনাদল নিয়ে সে এগিয়ে গেল।

শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণের মুখে একটা মাঠে নেমে এই সাহসী জেনারেলটি সৈন্যদের নিয়ে সোজা এগিয়ে গেল; গভীর উত্তেজনায় একবার ভেবেও দেখল না এই অবস্থায় একটিমাত্র সেনাদল নিয়ে যুদ্ধের মধ্যে এগিয়ে যাওয়ায় কোন ফল হবে কি না। রাগে সে তখন দিশেহারা; বিপদ, কামানের গোলা, বুলেট—যা হোক একটা কিছু তার চাই। প্রথম আসা একটি বুলেটেই তার মৃত্যু হল, অন্য বুলেটে মরল তার অনেক সৈন্য। নেহাৎ অকারণেই তার সেনাদল আরও কিছুক্ষণ সেই গুলিবর্ষণের মুখে টিকে রইল।

অধ্যায়—৭

এদিকে আর একটা সেনাদল সম্মুখ থেকে ফরাসীদের আক্রমণ করবে এ-রকম কথা ছিল, কিন্তু সে দলের সঙ্গে ছিল কুতুজভ। সে ভাল করেই জানত যে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত এই যুদ্ধের ফলে গোলমাল সৃষ্টি ছাড়া আর কোন লাভই হবে না, তাই সৈন্যদের টেনে রাখতে সে সাধ্যমত চেষ্টা করে চলল। মোটেই এগিয়ে গেল না।

ছোট ধূসর ঘোড়াটায় চেপে সে নীরবে পথ চলতে লাগল, আর কেউ যুদ্ধের কথা বললে ধীরে সুস্থে তার কথার জবাব দিতে লাগল।

মিলরাদভিচ অগ্রসর হবার অনুমতি চাইলে তাকে বলল, "'আক্রমণ' কথাটা তো তোমাদের সকলের জিভেই লেগে আছে, কিন্তু কোন রকম জটিল

সেনাসমাবেশ করতে যে আমরা অক্ষম সেকথাটা তোমরা কেউ বুঝতে পারছ না।"

অন্য একজনকে বলল, "আজ সকালে আমরা মুরাতকে বন্দী করতে পারি নি, ঠিক সময়ে সেখানে পৌঁছতেও পারি নি; এখন আর কিছু করার নেই।"

কুতুজভকে খবর দেওয়া হল, ফরাসীদের পিছন দিকে যেখানে আগে কোন সৈন্য ছিল না এখন সেখানে দুই ব্যাটেলিয়ন পোলিশ সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছে। একথা শুনে পশ্চাদ্বর্তী এর্‌মোলভের দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে সে বলল, "দেখলে তো! এরা আক্রমণ করতে বলছে, সব রকম ফন্দি-ফিকির করতে বলছে, কিন্তু কাজের বেলায় কেউ কিছু করছে না, আর ওদিকে শত্রুপক্ষ আগে থেকে খবর পেয়ে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করে ফেলছে।"

একথা শুনে এর্‌মোলভ চোখ কুঁচকে একটু হাসল। বুঝতে পারল, তার উপরকার ঝড়টা উড়ে গেছে; এটুকু খোঁচা দিয়েই কুতুজভ এখন খুশি থাকবে।

পার্শ্ববর্তী রায়েভ্‌স্কিকে কনুইয়ের খোঁচা দিয়ে বলল, "আমাকে নিয়ে বেশ একটু মস্করা করে নিলেন।"

একটু পরেই এর্‌মোলভ কুতুজভের কাছে গিয়ে সশ্রদ্ধভাবে নিবেদন করল:

"ইয়োর হাইনেস, আক্রমণের হুকুম যদি দিতে চান তো এখনও সময় আছে—শত্রুরা এখনও সরে পড়ে নি। আর তা যদি না করেন তো রক্ষী-বাহিনী এক ফোঁটা ধোঁয়াও দেখতে পাবে না।"

কুতুজভ জবাব দিল না, কিন্তু তাকে যখন জানানো হল যে মুরাতের সৈন্যরা পিছু হটছে তখন সে সৈন্যদের অগ্রসর হবার হুকুম দিল; যদিও প্রতি একশ' পা অন্তর সে একবার করে পৌনে এক ঘণ্টার মত থামতে লাগল।

যুদ্ধ যা করার তা অর্লভ-দেনিসভের কসাকরাই করল; বাকি সৈন্যদের মধ্যে শত শত লোক অকারণেই প্রাণ হারাল।

এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ কুতুজভ পেল হীরক-পদক, বেনিংসেন পেল হীরক ও লাখ রুবল, অন্যরাও পদমর্যাদা অনুসারে মনোমত পুরস্কার পেয়ে খুশি হল, আর কর্মচারিদের মধ্যে নতুন করে রদ-বদল করা হল।

তারুতিনো যুদ্ধের পরে রুশ অফিসার ও জেনারেলরা বলল, "আমাদের নিয়ে এইরকমই করা হয়, মাথা-মুণ্ডু কিছুই ঠিক থাকে না!" তারা বলতে চাইল, কতকগুলো বোকা মিলে সব তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে, আমরা হলে এরকম করতাম না। একথা সব সময়ই বলা হয়। কিন্তু একথা যারা বলে তারা হয় কি বলছে তাই জানে না, আর না হয় তো ইচ্ছা করেই নিজেদের ঠকায়। তারুতিনো, বরদিনো, বা অস্তারলিজ—কোন যুদ্ধই

পরিকল্পনামাফিক হয় না। এটা একেবারে মূল সত্য।

সংখ্যা স্বাধীন শক্তি একটা যুদ্ধের গতিকে প্রভাবিত করে, সে গতি-পথ আগে থেকে জানা যায় না, এবং কোন একটি শক্তির দ্বারা নির্দেশিত পথের সঙ্গে মেলেও না।

যদি ইতিহাসকারদের, বিশেষ করে ফরাসী ইতিহাসকারদের বিবরণে দেখা যায় যে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহগুলি পূর্বরচিত পরিকল্পনা অনুসারেই পরিচালিত হয়েছে তাহলে একমাত্র এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে সেসব বিবরণই মিথ্যা।

স্পষ্টতই তারুতিনোর যুদ্ধ তোল্-এর লক্ষ্যে পৌঁছে নি; কাউন্ট অর্লভ-দেনিসভ যুদ্ধে গিয়েছিল মুরাতকে বন্দী করতে, সে উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নি; গোটা সেনাদলকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করবার যে উদ্দেশ্য বেনিংসেন ও অন্য অনেকের ছিল তাও পূর্ণ হয় নি; নিজেকে খ্যাতিমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে অফিসার যুদ্ধে গিয়েছিল তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি; বা যে কসাকরা আরও বেশী লুটের মালের আশায় ছিল তাও তারা পায় নি; ইত্যাদি। কিন্তু যুদ্ধের সত্যিকারের ফল যা হল, সেদিন গোটা রাশিয়া যে ফলকে কামনা করেছিল—ফরাসীদের রাশিয়া থেকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করা—সেটাই যদি এ যুদ্ধের লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে তো ঐ পরিস্থিতিতে যা ঘটা উচিত ছিল তারুতিনোর যুদ্ধে ঠিক তাই ঘটেছে। সে যুদ্ধের যা সত্যিকারের ফলাফল তার চাইতে সুবিধাজনক আর কোন ফলের কথা তো কল্পনাও করা যায় না। ন্যূনতম প্রচেষ্টা ও তুচ্ছ ক্ষয়-ক্ষতির ভিতর দিয়ে প্রচণ্ড গোলযোগ সত্ত্বেও সারা অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফলটিই অর্জিত হল: পশ্চাদপসরণের স্থলে অগ্রগমন, ফরাসীদের দুর্বলতাকে উদ্ঘাটন, আর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের জন্য নেপোলিয়নের বাহিনী যে আঘাতের জন্য অপেক্ষা করেছিল তারই ব্যবস্থা গ্রহণ।

অধ্যায়—৮

“মস্কোয়া”র গৌরবময় জয়লাভের পরে নেপোলিয়ন মস্কোতে প্রবেশ করল। জয়লাভ সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না কারণ যুদ্ধক্ষেত্রটি তখন ফরাসীদের দখলে। প্রাচীন রাজধানীকে পিছনে ফেলে রুশরা পশ্চাদপসরণ করে চলেছে। খাদ্য, অস্ত্র, বারুদ ও অপরিমেয় সম্পদে ভরা মস্কো এসেছে নেপোলিয়নের হাতে। ফরাসীদের তুলনায় অর্ধেক সৈন্য-শক্তি নিয়ে রুশ বাহিনী একটা মাসের মধ্যে একবারও আক্রমণের চেষ্টা পর্যন্ত করল না। নেপোলিয়নের অবস্থা তখন খুবই সুবিধাজনক। দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে সে তখন রুশ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধ্বংস করতে পারে; সুবিধাজনক শর্তে সন্ধির আলোচনা করতে পারে, অথবা তাতে ব্যর্থকাম হলে পিতার্সবুর্গকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হতে পারে; এমন কি বেগতিক বুঝলে স্মোলেন্স্ক্ বা

ভিল্‌নাতে ফিরে যেতে পারে, অথবা মস্কোতেই থেকে যেতে পারে : সংক্ষেপে, ফরাসীরা যে সুবিধাজনক অবস্থায় আছে সেটাকে বজায় রাখতে কোন বিশেষ প্রতিভারই দরকার হয় না। সেজন্য দরকার শুধু কতকগুলি অত্যন্ত সরল ও সহজ পদক্ষেপ : সৈন্যদের লুঠতরাজ করতে না দেওয়া; শীতের পোশাকের ব্যবস্থা করা—একটা গোটা বাহিনীর পক্ষে যথেষ্ট শীতবস্ত্র তখন মস্কোতে ছিল; এবং সুশৃংখল পদ্ধতিতে রসদ সংগ্রহ করা—ফরাসী ইতিহাসকারদের মত অনুসারেই গোটা বাহিনীর ছ' মাসের মত রসদ তখন মস্কোতে ছিল। তথাপি সব প্রতিভার সেরা প্রতিভা যে নেপোলিয়ন, ইতিহাসকারদের মতে সৈন্যদের উপর যার নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ ছিল, সে এর কোন পন্থাই অবলম্বন করল না।

সেরকম কিছু তো করলই না, উপরন্তু যতগুলি পথ তার সামনে খোলা ছিল তার মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিহীন ও ক্ষতিকর পথটাই সে বেছে নিল। নেপোলিয়ন তো কত কিছুই করতে পারত : শীতকালটা মস্কোতে থাকতে পারত, পিতার্সবুর্গের পথে অথবা নিঝ্‌নি-নভ্‌গরদের পথ ধরে অগ্রসর হতে পারত, অথবা আরও উত্তরের অথবা আরও দক্ষিণের কোন পথে (যেমন পরবর্তীকালে কুতুজভ যে পথ ধরেছিল) ফিরে যেতে পারত; অথবা সে বাস্তব ক্ষেত্রে যা করল তার চাইতে বোকামি বা বিপজ্জনক আর কিছু কল্পনাও করা যায় না। অক্টোবর পর্যন্ত সে মস্কোতেই কাটাল, সৈন্যদের যথেচ্ছ লুটতরাজের সুযোগ দিল, তারপর একটা সেনাদলকে রেখে যাবে কি না সেবিষয়ে ইতস্তত করে মস্কো পরিত্যাগ করল, যুদ্ধে যোগদান না করে কুতুজভের সঙ্গে যোগাযোগ করল, ডাইনে মোড় নিয়ে মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্‌-এ পৌছল; আবারও সোজাসুজি এগিয়ে কুতুজভের পথটা না ধরে তার পরিবর্তে বিধ্বস্ত স্মোলেন্স্ক্‌ রোড ধরে মোঝায়েস্ক্‌এ ফিরে গেল। পরবর্তী ঘটনাতেই প্রমাণ হয়েছে যে এর চাইতে নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং সেনাবাহিনীর পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকর আর কিছুই ভাবা যেত না। নিজের বাহিনীকে ধ্বংস করাই যদি নেপোলিয়নের লক্ষ্য ছিল তাহলেও তো রুশবাহিনী যা করুক বা না করুক, অত্যন্ত নিপুণ কোন রণ-কুশলীও তো সে উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি কার্যে পরিণত করার জন্য এর চাইতে সফল কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করতে পারত না।

প্রতিভাধর বীর নেপোলিয়ন কিন্তু এই কাজটিই করল। কিন্তু নেপোলিয়ন ইচ্ছা করেই তার বাহিনীকে ধ্বংস করেছে, অথবা অত্যন্ত বোকার মতই সে এ কাজ করেছে, এ কথা বলা নিশ্চয়ই ঠিক হবে না; যেমন ঠিক হবে না যদি বলা হয় যে সে খুব কুশলী ও প্রতিভাধর বলেই নিজের ইচ্ছা অনুসারেই তার বাহিনীকে মস্কোতে নিয়ে গিয়েছিল।

উভয় ক্ষেত্রেই যে সব নিয়ম যুদ্ধের গতিকে পরিচালিত করেছে তার

সঙ্গে নেপোলিয়নের ব্যক্তিগত ক্রিয়া-কলাপ আকস্মিকভাবেই মিলে গিয়েছে মাত্র; নইলে যেকোন সৈনিকের ব্যক্তিগত কার্যকলাপের চাইতে তার নিজের কার্যকলাপের কোন বিশেষ গুরুত্ব নেই।

ইতিহাসকাররা ভুল করেই বলে থাকে যে মস্কোতে এসে নেপোলিয়নের বিদ্যাবুদ্ধি দুর্বলতর হয়ে গিয়েছিল; আর তারা একথা বলে কারণ ফলাফলগুলি তার কার্যাবলীকে সমর্থন করে নি। আগেও যেমন করেছে, এবং ১৮১৩ সালের পরেও যেমন করেছে, তেমনই নিজের সব ক্ষমতা ও শক্তিকে নিয়োগ করেই সে নিজের ও সেনাবাহিনীর ভাল করতেই চেয়েছে। এক্ষেত্রেও তার কার্যাবলী মিশরে, ইতালিতে, অস্ট্রিয়ায় এবং প্রাশিয়াতে তার কার্যাবলীর তুলনায় কিছু কম বিস্ময়কর ছিল না। মিশরে তার প্রতিভা কতখানি খাঁটি ছিল সেকথা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না, কারণ তার বড় বড় জয়ের বর্ণনা আমরা শুনেছি ফরাসীদেরই মুখে। অস্ট্রিয়া বা প্রাশিয়াতে তার প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ণ আমরা করতে পারি না, কারণ সেখানেও আমাদের সব তথ্যের উৎস হয় ফরাসী, না হয় জার্মান। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, নিজেদের লজ্জাকে ঢাকবার জন্য তার প্রতিভাকে স্বীকার করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। সমস্ত ব্যাপারটাকে সহজ, সরল চোখে দেখবার অধিকার অর্জন করতে অনেক মূল্য আমরা দিয়েছি, আর তাই সে অধিকার আমরা ছাড়ব না।

অন্য সব জায়গার মতই মস্কোতেও তার ক্রিয়াকলাপ সমান বিস্ময়কর ও প্রতিভার পরিচায়ক। মস্কোতে ঢোকার মুহূর্ত থেকে তাকে ছেড়ে যাবার ক্ষণটি পর্যন্ত সে হুকুমের পর হুকুম জারি করেছে, পরিকল্পনার পর পরিকল্পনা রচনা করেছে। কোন নাগরিক নেই, প্রতিনিধি-দল নেই, মস্কো পুড়ছে, কিন্তু তাতে সে বিচলিত হয় নি। নিজের সৈন্যদের কল্যাণ, শত্রুর কার্যকলাপ, রাশিয়ার সাধারণ মানুষের কল্যাণ, প্যারিসের ঘটনাবলীর গতিবিধি, অথবা প্রত্যাশিত সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে কূটনৈতিক আলোচনা—কোন কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

অধ্যায়—৯

সামরিক ব্যাপারের দিক থেকে মস্কোতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই নেপোলিয়ন জেনারেল সাবাস্তিয়ানিকে কড়া হুকুম দিল রুশ বাহিনীর গতিবিধির উপর নজর রাখতে, বিভিন্ন পথে সেনাদল পাঠাবার ব্যবস্থা করল, আর কুতুজভকে খুঁজে বের করার ভার দিল মুরাতের উপর। তারপর ক্রেমলিনকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে নানারকম নির্দেশ দিল, আর রাশিয়ার গোটা মানচিত্রের বুকে ভবিষ্যতে অভিযান চালাবার একটা চমৎকার পরিকল্পনাও তৈরি করে ফেলল।

কূটনৈতিক প্রশ্নের প্রসঙ্গে নেপোলিয়ন ক্যাপ্টেন ইয়াকভ্‌লেভকে ডেকে পাঠাল। তার সর্বস্ব লুঠ করে এমনভাবে ছেঁড়া পোশাক পরিয়ে ছেড়েছে যে সে বেচারি মস্কো ছেড়ে যাবার পথ পায় নি। তাকে ডেকে এনে নেপোলিয়ন নিজের নীতি ও উদারতার কথা পুংখানুপুংখভাবে বুঝিয়ে বলল এবং সম্রাট আলেক্সান্দারের বরাবরে একটা চিঠি লিখে তাকে পিতার্সবুর্গে পাঠিয়ে দিল। চিঠিতে লিখল, তার বন্ধু এবং ভাইকে একথা জানানো সে কর্তব্য বলে মনে করে যে মস্কোতে রস্তপচিনের কার্যকলাপ খুবই শোচনীয়।

সেই একইভাবে নিজের মতামত ও উদারতার কথা তুতোলমিনকে বুঝিয়ে বলে সেই বুড়ো মানুষটিকেও পিতার্সবুর্গে পাঠাল আলোচনা চালাতে।

আইনঘটিত ব্যাপারে অগ্নিকাণ্ডের ঠিক পরেই সে হুকুম দিল, যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের খুঁজে এনে ফাঁসি দেওয়া হোক। তার বাড়িটাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবার হুকুম দিয়ে শয়তান রস্তপ্‌চিনকে শাস্তি দিল।

শাসনকার্যসংক্রান্ত ব্যাপারে মস্কোর জন্য একটা গঠনতন্ত্র মঞ্জুর করা হল। একটা পৌরসভা স্থাপন করে নিম্নলিখিত ঘোষণা জারি করা হল:

মস্কোর অধিবাসীগণ!

"আমাদের দুর্ভাগ্য বড়ই নিষ্ঠুর, কিন্তু আপনাদের সম্রাট ও নৃপতি হিজ ম্যাজেস্টি সে দুর্ভাগ্যের গতিকে রোধ করতে চান। অবাধ্যতা ও অপরাধের শাস্তি তিনি কিভাবে দিয়ে থাকেন অনেক ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়ে সে শিক্ষা আপনারা পেয়েছেন। বিশৃঙ্খলার অবসান করে জনগণের নিরাপত্তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আপনাদের ভিতর থেকেই মনোনীত একটি পিতৃতুল্য শাসক-কর্তৃপক্ষ আপনাদের পৌরসভা ও নগর-সরকার গড়ে তুলবে। তারাই আপনাদের দেখাশোনা করবেন, আপনাদের প্রয়োজন ও কল্যাণের ব্যবস্থা করবেন। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা কাঁধের উপর দিয়ে কোণাকুণিভাবে একটা লাল ফিতে পরবেন. আর পৌরপিতা তাছাড়াও একটি সাদা কোমরবন্ধ পরবে। কিন্তু তারা যখন কর্তব্যরত অবস্থায় থাকবেন না তখন শুধু বাম বাহুতে একটা লাল ফিতে জড়িয়ে রাখবেন।

"নগর-পুলিশকে পুরনো ব্যবস্থামতই গড়ে তোলা হয়েছে; তাদের কার্যকলাপে ইতিমধ্যেই ভাল ফলও পাওয়া গেছে। সরকার দু'জন কমিসারী-জেনারেল বা পুলিশ-প্রধান নিয়োগ করেছেন; নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের জন্য ওয়ার্ড-ক্যাপ্টেনও নিয়োগ করা হয়েছে। বাম বাহুতে সাদা ফিতে দেখেই আপনারা তাদের চিনতে পারবেন। ছোট-বড় মিলিয়ে বেশ কয়েকটি গির্জা খোলা হয়েছে; সেখানে নির্বিঘ্নে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। আপনাদের

প্রতিবেশী নাগরিকরা প্রতিদিনই নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসছে; দুর্ভাগ্যের দরুণ যে সাহায্য ও আশ্রয় তাদের প্রয়োজন তা যাতে তারা পান তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি করতে এইসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য এটাও প্রয়োজন যে আপনারাও এব্যাপারে সর্বশক্তি নিয়োগ করবেন, যে দুর্ভাগ্যের শিকার আপনারা হয়েছেন যথাসম্ভব তাকে ভুলে যাবেন, এই আশা পোষণ করবেন যে আপনাদের ভাগ্য এত বেশী নিষ্ঠুর নয়, একটা বিষয়ে নিশ্চিত থাকুন যে আপনাদের শরীরের উপর এবং অবশিষ্ট সম্পত্তির উপর যারা হাত দিতে চেষ্টা করবে তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে অনিবার্য ও লজ্জাকর মৃত্যু এবং আপনাদের সর্বপ্রকার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনরকম সন্দেহ পোষণ করবেন না, কারণ যিনি সব নৃপতির সেরা এবং সর্বাপেক্ষা ন্যায়বান এটাই তার ইচ্ছা। সৈনিকগণ ও নাগরিকগণ, আপনারা যে জাতির মানুষই হোন না কেন, জনগণের মনে আস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করুন, পরস্পর ভাইয়ের মত বাস করুন, পরস্পরকে সাহায্য করুন, আশ্রয় দিন, যারা অসৎ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাদের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে ঐক্যবদ্ধ হোন, সামরিক ও অসামরিক কর্তৃপক্ষকে মান্য করে চলুন, তাহলেই আপনাদের চোখের জলের ধারা বন্ধ হবে।”

সেনাবাহিনীর রসদের ব্যাপারে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিল, সেনাদল পর্যায়ক্রমে মস্কো প্রবেশ করবে a la maraude (লুঠেরা হিসাবে), এমনভাবে নিজেদের রসদ সংগ্রহ করবে যাতে সেনাবাহিনীর ভবিষ্যতের ব্যবস্থা হয়ে যায়।

ধর্মের ব্যাপারে নেপোলিয়ন নির্দেশ দিল, পুরোহিতদের ফিরিয়ে আনা হোক এবং গির্জায় গির্জায় আবার ধর্মীয় অনুষ্ঠান চালু হোক।

ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেনাবাহিনীর রসদের ব্যাপারে নিম্নলিখিত ইস্তাহার সর্বত্র প্রচার করা হল:

ঘোষণা—

“শুনুন! মস্কোর যেসব শান্তিকামী অধিবাসী, শিল্পকর্মী ও মজুর দুর্ভাগ্যের দরুণ নগর থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, অকারণ ভয়ে যেসব চাষীরা এখনও মাঠ থেকে দূরে সরে আছেন, তারা সকলেই শুনুন! এই রাজধানীতে শান্তি ফিরে আসছে, শৃংখলা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। আপনাদের দেশবাসীরা সাহসের সঙ্গে তাদের গুপ্ত ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের প্রতি এবং তাদের সম্পত্তির প্রতি যে কোনরকম হিংসাত্মক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি হচ্ছে। হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাট ও নৃপতি তাদের সকলকে আশা দিয়েছেন; একমাত্র যারা তার আদেশ অমান্য করছে তারা ভিন্ন আর কাউকেই তিনি

শত্রু বলে মনে করেন না। আপনাদের সব দুর্ভাগ্যের অবসান করে আবার আপনাদের নিজ নিজ গৃহে ও পরিবারের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেই তিনি চান। সুতরাং তার এই মহৎ অভিপ্রায়ে আপনারা সাড়া দিন, নির্ভয়ে আমাদের কাছে আসুন। অধিবাসীবৃন্দ, পরিপূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আপনাদের আবাসে ফিরে আসুন। আপনাদের যা কিছু প্রয়োজন অচিরেই সব পাবেন। কারিগর ও শিল্পশ্রমিকগণ, আপনাদের কাজে, আপনাদের ঘরে, আপনাদের দোকানে ফিরে আসুন; সর্বত্রই রক্ষীরা আপনাদের সাহায্যার্থে অপেক্ষা করে আছে। আপনাদের কাজের উপযুক্ত মজুরি আপনারা পাবেন। আর শেষ কথা, যে-সব চাষীরা ভয়ে বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে আছেন তারাও নির্ভয়ে ফিরে আসুন; বিশ্বাস করুন আপনাদের জন্য সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। নগরে যেসব বাজার বসানো হয়েছে সেখানে চাষীরা তাদের উদ্বৃত্ত রসদ এবং জমির ফসল নিয়ে আসতে পারবেন। তারা যাতে স্বাধীনভাবে সেসব বিক্রি করতে পারেন তার জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি নিয়েছেন: (১) আজ থেকে চাষী, কৃষিজীবী, এবং মস্কোর উপকণ্ঠের অধিবাসীরা নির্বিঘ্নে তাদের সবরকম জিনিসপত্র দুটি নির্দিষ্ট বাজারে নিয়ে যেতে পারবেন—তাদের একটি মখভায়া স্ট্রীটে এবং অন্যটি রসদ বাজারে অবস্থিত। (২) ক্রেতা ও বিক্রেতা যে দর সাব্যস্ত করবে সেই দরেই সব জিনিসপত্র তাদের কাছ থেকে কেনা হবে; কোন বিক্রেতা যদি তার জিনিসের ন্যায্য দাম না পান তাহলে তিনি ইচ্ছা করলেই তার জিনিস গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, কোন ওজুহাতেই কেউ তাকে বাধা দিতে পারবেনা। (৩) প্রতি সপ্তাহের রবিবার ও বুধবার প্রধান কেনা-বেচার দিন স্থির করা হয়েছে, এবং তদুদ্দেশ্যে মঙ্গলবার ও শনিবার মালগাড়িগুলি পাহারা দেবার জন্য বড় রাস্তা বরাবর অনেক দূর পর্যন্ত সৈন্য মোতায়েন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। (৪) চাষীরা যাতে তাদের মালগাড়ি ও ঘোড়া নিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে যেতে পারে তদনুরূপ ব্যবস্থাও করা হয়েছে। (৫) স্বাভাবিক বেচা-কেনা চালু করার জন্য অবিলম্বে সবরকম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

"নগর ও গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ, আর মজুর ও শিল্পকর্মীরা, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে আপনাদের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে, হিজ ম্যাজেস্টি সম্রাট ও নৃপতির এই পিতৃসুলভ মনোবাঞ্ছাকে আপনারা পূর্ণ করুন, জন-কল্যাণের কাজে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তার পদপ্রান্তে রাখুন আপনাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস; আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে বিলম্ব করবেন না!"

সেনাদল ও জনসাধারণের মনোবলকে বাড়িয়ে তুলবার জন্য মাঝে মাঝেই অবস্থার পর্যালোচনা করে পুরস্কার বিতরণ করা হতে লাগল। অধিবাসীদের সান্ত্বনা দেবার জন্য সম্রাট স্বয়ং অশ্বারোহণে রাজপথ পরিক্রমা করতে লাগলো এবং প্রচুর রাজকার্য থাকা সত্ত্বেও তাঁর হুকুমে প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারগুলিতে

পদার্পণ করতে লাগল।

মুকুটধারীদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানবপ্রীতির ক্ষেত্রেও নেপোলিয়ন সাধ্যায়ত্ত সব কিছুই করল। সমস্ত দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মাথায় maison de ma mere শব্দগুলি খোদাই করিয়ে গভীর পুত্রস্নেহের সঙ্গে রাজকীয় মহানুভবতাকে মিশিয়ে প্রকাশ করল। অনাথ হাসপাতালটি পরিদর্শন করে অনাথ শিশুদের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিত চুম্বনের জন্য, তুতোল্‌মিনের সঙ্গে সদয়ভাবে কথাবার্তাও বলত। তারপর, থিয়ের্সের বর্ণনা অনুসারে নিজের তৈরি জাল রুশ টাকায় সৈন্যদের বেতন দেবার হুকুম করল: "নিজের এবং ফরাসী বাহিনীর যোগ্য উপায়ে এইভাবে টাকার ব্যবস্থা করে যাদের সর্বস্ব পুড়ে গেছে তাদেরও সাহায্য দেবার বন্দোবস্ত করল। কিন্তু যেহেতু তখন খাদ্য এতই দুর্মূল্য যে তা বিদেশীদের দেওয়া চলে না, আর বিদেশীরা তো অধিকাংশই শত্রু, তাই বাইরে থেকে খাদ্য কেনবার জন্য তাদের টাকা দেওয়াটাই নেপোলিয়ন বাঞ্ছনীয় মনে করল এবং তাদের মধ্যে কাগজের রুবল বিতরণের ব্যবস্থা করল।"

সেনাদলের মধ্যে কঠোর শৃংখলা রক্ষার জন্য অনবরত হুকুম জারি করা হতে লাগল যে যারা সামরিক কর্তব্য পালন না করবে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে এবং কঠোর হাতে ডাকাতি বন্ধ করতে হবে।

অধ্যায়—১০

কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এইসব বিধান, প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা অনুরূপ পরিস্থিতিতে প্রচারিত অন্য সব বিধি-ব্যবস্থার চাইতে কোন অংশে খারাপ না হলেও সমস্যার একেবারে মূলে পৌঁছতে পারল না; মূল যন্ত্র থেকে বিচ্যুত ঘড়ির কাঁটার মত উদ্দেশ্যবিহীন এলোমেলোভাবে দুলতে লাগল যেন।

সামরিক দিক থেকে বলা যায়, অভিযানের যে পরিকল্পনা সম্পর্কে থিয়ের্স মন্তব্য করেছে "এর চাইতে গভীরতর, কুশলতর, বা আশ্চর্যতর কোন পরিকল্পনা তার (নেপোলিয়নের) প্রতিভার পক্ষেও সম্ভব হয় নি," সেটাকে কিন্তু মোটেই কার্যকর করা যায় নি, বা কখনও যেতও না, কারণ সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সঙ্গে সে পরিকল্পনার কোন যোগই ছিল না। ক্রেমলিনের যে সুরক্ষা-ব্যবস্থার জন্য "লা মস্ক্" (স্বর্গীয় আশীর্বাদধন্য ব্যাসিল গির্জাকে নেপোলিয়ন এই নামেই উল্লেখ করত) গির্জাকে ধূলিসাৎ করতে হত সেটা একেবারেই বৃথা প্রমাণিত হল। ক্রেমলিনে সুরঙ্গ খোঁড়ার ফলে নেপোলিয়নের এই মনোবাসনা পূর্ণ করারই সহায়ক হল যে সে মস্কো ছেড়ে চলে যাবার পরেই যেন ক্রেমলিনকে উড়িয়ে দেওয়া হয়—যেমন ছোট ছেলে চায় যে মেঝের যে-জায়গাটাতে সে আঘাত পেয়েছে কেউ এসে সেই জায়গাটাকে আঘাত করুক। রুশ বাহিনীর পিছু নেবার ব্যাপারে নেপোলিয়নের খুবই

উৎসাহ ছিল, আর তার ফলও হল অশ্রুতপূর্ব। ষাট হাজার সৈন্যের রুশ বাহিনী ফরাসী সেনাপতিদের দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, আর—থিয়েরের মতে—যেভাবে একটা হারানো পিন খুঁজে পাওয়া যায় সেইভাবে ঘটনাক্রমেই তাদের দেখা মিলল মুরাতের কৌশল ও প্রতিভার দৌলতে।

কূটনীতির ব্যাপারে, তুতোলমিন ও ইয়াকভলেভের কাছে নিজের মহানুভবতা ও ন্যায়পরায়ণতার যেসব বুলি নেপোলিয়ন আউড়েছিল সেসবই বৃথা হয়ে গেল: নেপোলিয়ন এই দূতদের সঙ্গে দেখা করল না এবং তাদের দৌত্যের কোন জবাবও দিল না।

আইন ঘটিত ব্যাপারে, তথাকথিত অগ্নিপ্রদানকারীদের মৃত্যুদণ্ডের পরেও মস্কোর বাকি অংশটা পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শাসন-পরিচালনার ব্যাপারে, পৌরসভা প্রতিষ্ঠার ফলে লুটতরাজ বন্ধ হল না; শুধু যাদের নিয়ে পৌরসভা গঠিত হল তারাই শৃঙ্খলা রক্ষার নামে মস্কোতে লুটতরাজ চালাল, আর না হয় তো লুটতরাজের হাত থেকে কেবলমাত্র নিজেদের ধন-সম্পত্তি বাঁচাবার চেষ্টা করল।

ধর্মের ব্যাপারেও বিশেষ কোন সুফল দেখা গেল না। মস্কোতে যে দু' তিনজন পুরোহিতকে পাওয়া গেল তারা নেপোলিয়নের ইচ্ছা পালন করতে চেষ্টা করল, কিন্তু প্রার্থনা-অনুষ্ঠান চালাবার সময় জনৈক ফরাসী সৈনিক তাদের একজনের মুখে চড় মেরে বসল, এবং অপরজনের সম্পর্কে জনৈক ফরাসী অফিসার মন্তব্য করল: "আমি যে পুরোহিতটিকে খুঁজে এনে ধর্মানুষ্ঠানের কাজ করতে বললাম সে গির্জাটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তালা লাগিয়ে দিল। কিন্তু সেই রাতেই আবার দরজা ভাঙা হল, তালাগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করা হল, পুঁথিগুলো নষ্ট করা হল এবং অন্য সবরকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা হল।"

ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে শিল্প-শ্রমিক ও চাষীদের প্রতি যে ঘোষণা প্রচার করা হল তাতে কোনরকম সাড়া মিলল না। শিল্প-শ্রমিকদের পাত্তাই পাওয়া গেল না, আর যেসব কমিসাররা ঘোষণাপত্র নিয়ে শহর ছেড়ে অনেকবেশী দূরে গেল চাষীরা তাদের ধরে ধরে খুন করল।

জনসাধারণ ও সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য যেসব থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হল তাতেও কোন সুফল পাওয়া গেল না। খাঁটি এবং মেকি কাগজের টাকায় তখন মস্কো ছেয়ে গেছে; তার দামও পড়ে গেছে। লুণ্ঠনকারী ফরাসীদের একমাত্র লক্ষ্য সোনার দিকে। শুধু যে নেপোলিয়নের দেওয়া কাগজের টাকাই মূল্যহীন হয়ে পড়ল তাই নয়, সোনার তুলনায় রূপোর দামও পড়ে গেল।

কিন্তু সেসময়ে কর্তৃপক্ষ যেসব হুকুম জারি করেছিল তার মধ্যে বিফলতার সবচাইতে বিস্ময়কর উদাহরণ হল লুটতরাজ বন্ধ করতে ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে

আনতে নেপোলিয়নের প্রচেষ্টা।

সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এই সব প্রতিবেদনই পাওয়া গেল :

"নির্দেশনামা সত্ত্বেও শহরে লুটতরাজ অবাধে চলেছে। এখনও শৃঙ্খলা ফিরে আসে নি এবং একটি ব্যবসায়ীও বিধিসম্মতভাবে ব্যবসাপত্র চালাচ্ছে না। সেনাদলের সঙ্গের ব্যবসায়ীরাই শুধু ব্যবসাপত্র চালাতে সাহস করছে, আর তারা তো বেচছে শুধু চোরাই মাল।"

"আমার ওয়ার্ডের আশেপাশে তৃতীয় কোরের সেনাদল লুটতরাজ চালাচ্ছে; যেসব হতভাগ্য অধিবাসী যৎসামান্য যা কিছু এখনও হাতে আছে তাই নিয়ে মাটির নীচে আশ্রয় নিয়েছে; তাদের শেষ সম্বলটুকু কেড়ে নিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে সৈনিকরা নিষ্ঠুরভাবে তাদের তরবারি দিয়ে আঘাত করছে; এরকম ঘটনা বার বার আমার চোখে পড়েছে।"

"সৈন্যরা ডাকাতি করছে, লুট করছে, এছাড়া নতুন কিছু নেই—৯ই অক্টোবর।"

"ডাকাতি ও লুট সমানে চলেছে। আমাদের অঞ্চলে একটা চোরের দল গড়ে উঠেছে; শক্তিশালী সেনাদল পাঠিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত—১১ই অক্টোবর।"

"সম্রাট অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছেন এই কারণে যে লুটতরাজ বন্ধ করার কড়া নির্দেশ সত্ত্বেও লুটেরা রক্ষীবাহিনীদের দলে দলে ক্রেমলিনে ফিরতে দেখা যাচ্ছে। পুরনো রক্ষী দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও লুটতরাজ তীব্র আকারে নতুন করে দেখা দিয়েছে গতকাল সন্ধ্যায়, রাতে ও আজ। সম্রাট অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, তার দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত যেসব বাছাই সৈনিকদের উচিত শৃঙ্খলার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তারাই এতদূর অবাধ্য হয়ে উঠেছে যে সামরিক রসদের ঘাঁটি ও গুদামে পর্যন্ত তারা হানা দিয়েছে। অন্যরা আবার শান্ত্রী ও অফিসারদের অমান্য করে, এমন কি তাদের গালাগালি ও মারধোর করে নিজেদেরই অসম্মান ডেকে এনেছে।

শাসনকর্তা লিখেছে, "রাজপ্রাসাদের গ্র্যাণ্ড মার্শাল তিক্ত ভাষায় অভিযোগ করেছে, বার বার হুকুম দেওয়া সত্ত্বেও সৈন্যরা সারা উঠোনে, এমন কি সম্রাটের জানালার নীচেও মলমূত্র ত্যাগ করছে।"

লাগাম-ছাড়া গরু-ঘোড়ার মত বেপরোয়াভাবে ইতস্তত ছুটাছুটি করে যে ফসল তাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারত তাকেই পায়ের নীচে মাড়িয়ে সৈন্যরা মস্কোতে থেকে দিনের পর দিন মরতে লাগল। কিন্তু তবু তারা মস্কো ছেড়ে গেল না।

তবু সেইদিন থেকে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল যেদিন স্মোলেন্স্ক্ রোডে মালবাহী ট্রেনটা আটক করা হল এবং তারুতিনোতে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। একটা সেনাদল পরিদর্শনের সময় অপ্রত্যাশিতভাবে

তারুতিনো যুদ্ধের সংবাদ পেয়েই রুশদের শাস্তি দেবার ইচ্ছা জাগল নেপোলিয়নের মনে (থিয়ের্স তাই লিখছে), আর সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর দাবী মেনে নিয়ে তাদের প্রত্যাবর্তনের আদেশ দিল।

মস্কো থেকে পালাবার সময় সৈন্যরা যে যা চুরি করেছিল সব সঙ্গে নিয়ে চলল। নেপোলিয়ন ও তার ব্যক্তিগত সব সম্পত্তি সঙ্গে নিয়েই চলল, কিন্তু একটা মাল-ট্রেন সেনাবাহিনীর গতিরোধ করায় খুব আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল (থিয়ের্সের কথা)। তবু যুদ্ধের অভিজ্ঞতার দরুন বাড়তি যানবাহনগুলো পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিল না। সৈন্যরা যেসব কালিচে-গাড়ি ও অন্য বড় বড় গাড়িতে করে যাচ্ছিল সেদিকে তাকিয়ে থেকে নেপোলিয়ন বলল, এ তো ভালই হয়েছে ; রসদ এবং রুগ্ন ও আহতদের বয়ে নেবার জন্য এই গাড়িগুলি ব্যবহার করা যাবে।

গোটা সেনাবাহিনীর অবস্থা দাঁড়াল সেই আহত জন্তুটির মত যে বুঝতে পারছে যে একটু একটু করে সে মরতে চলেছে অথচ কি যে করছে তা নিজেই জানে না। মস্কোতে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে তার ধ্বংস পর্যন্ত নেপোলিয়ন ও তার সেনাবাহিনীর সমর-কৌশল ও লক্ষ্যকে পর্যালোচনা করা আর একটি মারাত্মকভাবে আহত জন্তুর মৃত্যুকালীন লাফঝাঁপ ও থরো থরো কাঁপন লক্ষ্য করা একই কথা। প্রায়ই দেখা যায় আহত জন্তুটি খস্‌খস্ শব্দ শুনলেই সোজা শিকারীর বন্দুকের দিকে ছুটে যায়, একবার এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে এবং নিজের মৃত্যুকেই ত্বরান্বিত করে। তারুতিনো যুদ্ধের খস্‌খসানি জন্তুটিকে ভয় পাইয়ে দিল, সে ধেয়ে গেল শিকারীর বন্দুকের দিকে, তার কাছে পৌঁছে গেল, ফিরে এল এবং শেষ পর্যন্ত—যেকোন বন্য পশুর মতই—সেই একান্ত অসুবিধাজনক ও বিপজ্জনক পথ ধরেই পিছন দিকে ছুটতে লাগল যেখানকার গন্ধ তার পরিচিত।

একটি অসভ্য মানুষ যেমনভাবে যে জাহাজের সম্মুখস্থ প্রতিমূর্তিটাই বুঝি জাহাজটাকেই চালায়, তেমনই আমরাও মনে করি যে নেপোলিয়নই এত সব গতিবিধির নেতা ; কিন্তু এই সময়টাতে নেপোলিয়ন যেন সেই ছোট ছেলেটির মতই আচরণ করতে লাগল যে গাড়ির ভিতরে বসে এক জোড়া দড়ি হাতে নিয়ে ভাবে যে গাড়িটাকে সেই চালাচ্ছে।

অধ্যায়—১১

৬ই অক্টোবর খুব সকালে পিয়ের চালাঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল ; ফিরে এসে দরজার পাশে থেমে বাঁকা-পা, নীল-লোমের ছোট কুকুরটার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করল। কুকুরটা তার চার পাশে লাফাতে লাগল। ছোট কুকুরটা তাদের চালাতেই থাকে ; রাত্তিরে কারাতায়েভের পাশে ঘুমোয় ; মাঝে মাঝে শহরে চলে যায়, কিন্তু ঠিক ফিরে আসে। হয় তো কোনদিনই

কুকুরটার কোন মালিক ছিল না ; এখনও নেই ; তাই ওর কোন নামও নেই। ফরাসীরা ওকে ডাকত "আজোর" বলে ; গল্প-বলিয়ে সৈনিকটি ওকে ডাকে "ফেমগাল্কা" ; কারাতায়েভ ও অন্যরা ডাকে "গ্রে", কখনও বা "ফ্ল্যাবি।" কোন মনিব নেই, নাম নেই, জাতি-বর্ণ নেই, কিন্তু তাতে নীল-ধূসর কুকুরটার কোন সুখ-দুঃখ নেই। লোমশ লেজটাকে পালকের মত উঁচে তুলে নাচায় ; প্রায়ই পিছনের একটা পা তুলে তিন পায়ে এমন সুন্দর দৌড়য় যেন চারটে পা ব্যবহার করাটাই অতি বাজে কাজ। সব কিছুতেই ও খুশি। কখনও গড়াগড়ি দিতে দিতে আনন্দে ঘেউ-ঘেউ করে, কখনও গম্ভীর মুখে রোদ পোয়ায়, আবার কখনও একটুকরো কাঠ বা খড় নিয়েই মনের সুখে খেলা করে।

এতদিনে পিয়েরের পোশাক বলতে দাঁড়িয়েছে একটা ময়লা ছেঁড়া শার্ট, একজোড়া সৈনিকদের ট্রাউজার—কারাতায়েভের পরামর্শে শরীরটা গরম রাখবার জন্যে সেটাকে সে গোড়ালির কাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে—আর চাষীদের কোট ও টুপি। এই সময়ের মধ্যে তার শরীরের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। এখন আর তাকে শক্ত-সমর্থ বলা যায় না, তবে তাকে দেখলে তার বংশানুক্রমিক শক্তি-সামর্থ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গোঁফ-দাড়িতে মুখের নীচটা ঢেকে গেছে, উকুন-ভরা জট-পাকানো চুল মাথাটাকে ঢেকে রেখেছে টুপির মত। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে একটা দৃঢ়, শান্ত, ও সোৎসাহ সতর্কতার ভাব। তার চোখে আগে যে অলস গতি দেখা যেত তার জায়গায় এখন দেখা দিয়েছে একটা সোৎসাহ বিরোধিতা ও কাজের মনোভাব।

পিয়ের প্রথমে মাঠের উপর দিয়ে তাকিয়ে গাড়ি-ঘোড়া ও অশ্বারোহীদের দেখল, তারপর দৃষ্টি ফেরাল নদীর ওপারে, তারপর কুকুরটার দিকে, এবং শেষে নিজের পায়ের নোংরা, মোটা, বড় বড় আঙুলগুলোকে নানা ভঙ্গীতে নেড়ে চেড়ে সেইদিকেই তাকাল। যতবার খোলা পা দুটোর দিকে তাকাচ্ছে ততবারই আত্মতুষ্টিভরা হাসিতে মুখটা ভরে উঠছে। পা দুটোর দিকে তাকালেই তার মনে পড়ে যায় এই কয়েক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার কথা ; আর সে স্মৃতি তার কাছে মধুর।

কয়েকদিন ধরেই আবহাওয়া বেশ শান্ত ও পরিষ্কার ; সকালবেলা কিছুটা নীহার পড়ে—একেই বলে "বুড়িবৌদের গ্রীষ্মকাল।"

বাতাস রৌদ্রতপ্ত ; সকালবেলাকার নীহারের সতেজ স্পর্শে সেই আতপ্ত বাতাস আরও মনোরম লাগছে।

দূরে ও নিকটে সব কিছুর উপরেই লেগেছে সেই হঠাৎ আলোর ঝলকানি যা শুধু হেমন্তের এই সময়টাতেই দেখা যায়। দূরে দেখা যাচ্ছে "চাতক পাহাড়", তার গ্রাম, গির্জা, ও সাদা বড় বাড়িটা সমেত। পাতা-ঝরা গাছগুলি, বালি, ইট ও বাড়িগুলির ছাদ, গির্জার সবুজ চূড়া, আর দূরের সাদা

বাড়ির কোণগুলি—স্বচ্ছ বাতাসে সব কিছুই ফুটে উঠেছে সূক্ষ্ম রেখায় ও অস্বাভাবিক স্পষ্টতায়। কাছেই দেখা যাচ্ছে ফরাসীদের দ্বারা দখল-করা অর্ধদগ্ধ প্রাসাদটার ধ্বংসাবশেষ; বেড়ার ধারে গাঢ় সবুজ রঙের লিলাক ফুলের ঝোপগুলোও চোখে পড়ছে। যে ধ্বসে-পড়া বাড়িটাকে খারাপ আবহাওয়ায় অত্যন্ত কুৎসিত দেখায়, এখনকার নিশ্চল পরিষ্কার উজ্জ্বলতায় তাকেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে।

জনৈক ফরাসী কর্পোরাল ঘরোয়াভাবে কোটের বোতাম খুলে মাথায় একটা খুলি-টুপি পরে এবং মুখে একটা ছোট পাইপ গুঁজে চালার কোণ থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুর মত চোখ টিপে পিয়েরের দিকে এগিয়ে গেল।

"কী একখানা রোদ মঁসিয় কিরিল! (পিয়েরকে তারা ঐ নামেই ডাকে।) কি বলেন? ঠিক যেন বসন্তকাল।"

দরজায় হেলান দিয়ে কর্পোরাল পাইপটা পিয়েরের দিকে এগিয়ে দিল, যদিও সে যতবার পাইপটা এগিয়ে দিয়েছে ততবারই পিয়ের সেটা ফিরিয়ে দিয়েছে।

"এই আবহাওয়ায় পথে বের হওয়া⋯" লোকটি বলতে শুরু করল। পথে বের হবার কথায় পিয়ের ব্যাপারটা জানতে চাইলে কর্পোরাল বলল যে প্রায় সব সৈন্যই তো চলে যাচ্ছে, আর ঐদিনই বন্দীদের সম্পর্কে একটা আদেশ প্রচার করা হবে। সকলভ নামক এই চালারই পিয়েরের একজন সঙ্গীর মুমূর্ষু অবস্থা; পিয়ের কর্পোরালকে জানাল যে তার সম্পর্কে একটা কিছু করা দরকার। জবাবে কর্পোরাল পিয়েরকে বলল, পিয়েরের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, তাদের একটা অ্যাম্বুলেন্স ও একটা স্থায়ী হাসপাতাল আছে, রোগীদের যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই করা হবে, আর কর্তৃপক্ষ সম্ভাবিত সব ঘটনার কথা আগে থেকেই জানেন।

"তাছাড়া, আপনি তো জানেন মঁসিয় কিরিল, আপনি শুধু ক্যাপ্টেনকে মুখের কথাটি বললেই সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তিনি কখনই কোন কিছু ভুলে যান না। তিনি রোঁদে বের হলে তার সঙ্গে কথা বলুন, আপনার জন্য তিনি সব কিছু করবেন।"

(কর্পোরাল যে ক্যাপ্টেনটির কথা বলল তার সঙ্গে পিয়েরের প্রায়ই দীর্ঘ গাল-গল্প হয়; সে লোকটি তাকে অনেক সুযোগ-সুবিধা করে দিয়েছে।)

"এই তো সেদিন তিনি আমাকে বললেন," কি জান সেন্ট তমাস, মঁসিয় কিরিল একজন লেখাপড়া-জানা লোক, ফরাসী বলতে পারেন। তিনি একজন দুর্দশাগ্রস্ত সিনর, কিন্তু একজন মানুষের মত মানুষ। তিনি সব জানেন, বোঝেন⋯তিনি যদি আমার কাছে কিছু চান, আমি তাকে ফিরিয়ে দেব না। কি জান, লেখাপড়া শিখলেই মানুষ শিক্ষার কদর ও ভদ্র লোকের দাম বোঝে। "আপনার সুবিধার জন্যই কথাটা বললাম মঁসিয়

ফিরিল। সেদিন যদি আপনি না থাকতেন তাহলে তো অবস্থা বেশ খারাপই হত।"

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে কর্পোরাল চলে গেল। (যে ঘটনার কথা সে উল্লেখ করল সেটা কয়েকদিন আগে ঘটেছে—বন্দী ও ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে একটা লড়াই বেঁধে গেলে পিয়ের তার বন্ধুদের শান্ত করেছিল।) পিয়েরকে কর্পোরালের সঙ্গে কথা বলতে শুনে কয়েকজন বন্দী ব্যাপারটা জানতে চাইল। পিয়ের যখন ফরাসী সৈন্যদের মধ্যে ছেড়ে চলে যাবার কথা বলছিল, তখন ছিন্নবস্ত্র পরিহিত একটি ফরাসী সৈন্য বিবর্ণ মুখে চালাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। অভিবাদনের ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি কপালে আঙুল ঠেকিয়ে সে পিয়েরকে জিজ্ঞাসা করল, প্লাতোচ নামক যে সৈন্যটিকে সে একটি শার্ট দিয়ে গেছে সেলাই করতে সে চালাঘরে আছে কি না।

এক সপ্তাহ আগে ফরাসী সৈন্যদের জুতোর চামড়া ও কাপড় দেওয়া হয়েছে; তারা আবার সেগুলো বন্দীদের দিয়েছে বুট ও শার্ট তৈরি করে দেওয়ার জন্য।

পরিষ্কার ভাঁজ-করা একটা শার্ট নিয়ে এসে কারাতায়েভ বলল, "তৈরি, একেবারে তৈরি ভাই।"

গরম আবহাওয়ায় কাজের সুবিধার জন্য কারাতায়েভ পরেছে শুধু ট্রাউজার আর ঝুল-কালির মত কালো একটা ছেঁড়া শার্ট। লেবুগাছের বাকল দিয়ে তৈরি একটা টুকরো দিয়ে চুলটাকে গোল করে বেঁধেছে; ফলে তার গোল মুখটাকে আরও গোল এবং আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

নিজের হাতে সেলাই করা শার্টটাকে মেলে ধরে প্লাতন হেসে বলল, "কথা যখন দিয়েছি তখন কাজ হাসিল হবেই। বলেছিলাম শুক্রবার, এই নাও শার্ট তৈরি।"

ফরাসী সৈনিকটি অস্বস্তির সঙ্গে চারদিকে তাকাল; তারপর ইতস্তত ভাবটা কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ইউনিফর্মটা খুলে ফেলে শার্টটা পরে ফেলল। তার শুকনো, বিবর্ণ শরীরে শুধু একটা তেল-চিটচিটে লম্বা সিল্কের ওয়েস্টকোট পরা ছিল; শার্ট ছিল না। নিশ্চয়ই তার মনে ভয় ছিল যে বন্দীরা তাকে দেখে হাসবে; তাই সে খুব তাড়াতাড়ি শার্টের মধ্যে মাথাটা গলিয়ে দিল। কিন্তু বন্দীরা একটা কথাও বলল না।

শার্টটাকে টেনে দিয়ে প্লাতন বার বার বলতে লাগল, "দেখ, কী সুন্দর মাপমত হয়েছে।"

চোখ না তুলেই মাথা ও হাত শার্টের মধ্যে গলিয়ে দিয়ে ফরাসীটি শার্টের সেলাইটাই পরীক্ষা করতে লাগল।

নিজের কাজে নিজেই খুশি হয়ে একগাল হেসে প্লাতন বলল, "দেখ ভাই, এটা তো সেলাইয়ের দোকান নয়, আর ঠিকমত যন্ত্রপাতিও আমার কাছে

নেই ; কথায় বলে, একটা উকুন মারতেও যন্ত্র থাকা চাই।”

সৈনিকটি ফরাসীতে বলল, “ভাল হয়েছে, খুব ভাল হয়েছে ; তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু কিছুটা কাপড় তো বাড়তি হবার কথা।”

কারাতায়েভ তবু নিজের কাজের প্রশংসা করেই বলতে লাগল। শরীরের সঙ্গে বসে গেলে মাপে আরও ঠিক হবে। পরতে খুব ভাল লাগবে, আরাম পাবে…”

ফরাসীটি পুনরায় হেসে বলল, “ধন্যবাদ, ধন্যবাদ বুড়ো। …কিন্তু বাড়তি কাপড়টা ?” এক রুবলের নোটটা বের করে কারাতায়েভকে দিল। “কিন্তু বাড়তি কাপড়টা আমাকে দিয়ে দাও।”

পিয়ের বুঝল, প্লাতন ফরাসীটির কথাগুলো বুঝতে পারছে না, কিন্তু কিছু বলল না। টাকাটা পেয়ে কারাতায়েভ ফরাসী সৈনিকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার নিজের কাজের প্রশংসায় মেতে উঠল। কিন্তু ফরাসীটির বাড়তি কাপড়টুকু চাইই ; তাই সে পিয়েরকে বলল তার কথাগুলি ভাষান্তরিত করে দিতে।

কারাতায়েভ তখন বলল, “ওটুকু কাপড় কিসের জন্য চাইছ ? ও দিয়ে আমাদের জন্য পায়ের পট্টি হত। ঠিক আছে, কিছু মনে করো না।” হঠাৎ কারাতায়েভের মুখের ভাবটা বদলে গেল ; বিষন্ন মুখে নিজের শার্টের ভিতর থেকে একবাণ্ডিল কাটা কাপড় বের করে ফরাসীটিকে দিল। “ভাইরে !” বলেই কারাতায়েভ তার দিকে না তাকিয়েই চলে গেল। ফরাসীটি কাপড়ের দিকে তাকাল, একমুহূর্ত কি যেন ভাবল, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল, আর তারপরেই যেন পিয়েরের চাউনিই তাকে কিছু বলে দিয়েছে এমনিভাবে হঠাৎ সে মুখটা লাল করে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে বলল, “প্লাতোচ্ ! হেই প্লাতোচ ! এগুলো তুমিই রেখে দাও !” টুকরো কাপড়গুলো ফিরিয়ে দিয়েই মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

মাথাটা নেড়ে নেড়ে কারাতায়েভ বলল, “এই তো, চেয়ে দেখ। সকলে বলে, ওরা খৃস্টান নয়, ওদেরও মন আছে। তাই তো বুড়োরা বলে : ‘যে হাত ঘামে সেই হাতই খোলা, আর শুকনো হাতই মুঠো করা।’ লোকটির পোশাক নেই, তবু সে এগুলো ফিরিয়ে দিয়ে গেল।”

কারাতায়েভ চিন্তিতভাবে হেসে কাপড়ের টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল।

“কিন্তু এ দিয়ে চমৎকার পায়ের পট্টি তৈরি হবে,” এই কথা বলে সে চালাঘরে ঢুকে গেল।

অধ্যায়—১২

পিয়েরকে বন্দী করার পরে চার সপ্তাহ কেটে গেছে ; ফরাসীরা তাকে সাধারণ কয়েদীদের কাছ থেকে সরিয়ে অফিসারদের চালায় নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু যে চালায় তাকে প্রথম রাখা হয়েছিল পিয়ের সেখানেই রয়ে গেছে।

একটি মানুষের পক্ষে যত রকম দুঃখকষ্ট সহ্য করা সম্ভব দগ্ধ ও বিধ্বস্ত মস্কোতে তারই অভিজ্ঞতা পিয়েরের হয়েছে ; কিন্তু তার শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্যকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে ধন্যবাদ এই সত্যকে যে এত সব দুঃখকষ্ট এমন ধীরে ধীরে এসেছে যে কবে তার শুরু হয়েছে তাই সে বলতে পারে না, এই পরিস্থিতিকে সে যে শুধু হেলায় সহ্য করেছে তাই নয়, সহ্য করেছে আনন্দের সঙ্গে। আর ঠিক এই সময়েই মনের সেই শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য সে পেয়েছে যার জন্য এতদিন সে বৃথাই চেষ্টা করে এসেছে। এতকাল নানাভাবে মনের এই শান্তির সন্ধানে সে ফিরেছে। শান্তি খুঁজেছে বিশ্ব-মানব-প্রীতির মধ্যে, ভ্রাতৃসংঘের কর্মধারার মধ্যে, শহর-জীবনের ভোগ-সুখের মধ্যে, মদ্যপানে, আত্মত্যাগের বীরত্বপূর্ণ কাজকর্মের মধ্যে। এবং নাতাশার প্রতি রোম্যান্টিক ভালবাসার মধ্যে। কিন্তু হায়, সেসব সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আজ কোনরকম চিন্তা-ভাবনা না করেই সেই শান্তি ও অন্তরের মিল সে খুঁজে পেয়েছে মৃত্যুর ভয়াবহতা, দুঃখকষ্ট ও কারাতায়েভের অন্তর-সম্পদের মধ্যে।

রাশিয়া, যুদ্ধ, রাজনীতি, বা নেপোলিয়নের চিন্তা এখন আর তার মনে আসে না। সে এখন পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে, এগুলো তার কাজ নয়, এসব ব্যাপারে তার মতামত কেউ চায় না, আর তাই তার দিক থেকে মতামত দেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। "রাশিয়া আর গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়া এক-সূত্রে গাঁথা নয়," কারাতায়েভের এই কথাগুলি সে মনে মনে আওড়াল। কথাগুলি তাকে আশ্চর্য রকমের সান্ত্বনা এনে দেয়। নেপোলিয়নকে হত্যা করার বাসনা এখন তার কাছে অর্থহীন, এমন কি হাস্যকর মনে হয়। স্ত্রীর প্রতি ক্রোধ এবং তার সঙ্গে জড়িত হয়ে নিজের নামকে কলংকিত করার দুশ্চিন্তা এখন তার কাছে শুধু তুচ্ছ নয়, একটা মজার ব্যাপার বলে মনে হয়। সেই নারী কোথায় কি রকম জীবন যাপন করছে, তাতে তার কি যায় আসে ? তাদের বন্দীর নাম যে কাউণ্ট বেজুকভ এ-কথা তারা জানুক বা না জানুক তাতে কার কি, আর তার নিজেরই বা কি ?

এখন পিয়েরের দিনমানের একমাত্র স্বপ্ন, কবে সে মুক্তি পাবে। অথচ পরবর্তীকালে সারা জীবনভোর মহা উৎসাহের সঙ্গে সে চিন্তা করেছে ও কথা বলেছে এই একটি মাসের বন্দী-জীবনের কথা, সেই আনন্দ-ঘন অনুভূতির

কথা, এবং মনের সেই পরিপূর্ণ শান্তি ও অন্তর মুক্তির কথা যার অভিজ্ঞতা সে পেয়েছিল শুধু সেই ক'টি সপ্তাহে।

প্রথম দিনটিতেই খুব ভোরে উঠে চালাঘর থেকে বেরিয়ে সে যখন প্রথম দেখেছিল আধো অন্ধকারে ঢাকা কুমারী মাতার নব কনভেণ্টের গম্বুজ ও ক্রুশ, ধূলিমলিন ঘাসের উপর সাদা শিশিরকণাগুলি, "চাতক পাহাড়," বহুদূরে বিলীয়মান আঁকাবাঁকা নদীটির তরুছায়া-ঢাকা তীর, প্রথম যখন শ্বাস নিয়েছিল তাজা বাতাসে আর মস্কো থেকে উড়ে আসা কাকদের ডাক শুনেছিল মাঠের উপরে, একটু পরে যখন পূর্বদিকটা আলোয় ভরে গেল, মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সূর্যের রশ্মি, আর সঙ্গে সঙ্গে গম্বুজ ও ক্রুশ, সাদা শিশিরকণা, দূরবর্তী নদী, সব কিছু সেই আলোয় ঝল্‌মল্‌ করে উঠল—তখন এক অজ্ঞাতপূর্ব নতুন আনন্দ ও জীবনী শক্তির স্বাদ পেয়েছিল পিয়ের। সেই আনন্দ ও শক্তি গোটা বন্দীজীবনে তাকে ঘিরে রইল; শুধু তাই নয়, জীবনের দুঃখকষ্ট যত বাড়তে লাগল সেই আনন্দ ও শক্তিও ততই বেড়ে চলল।

তাছাড়া, এই চালাঘরে আসার পর থেকে সহ-বন্দীরা তার সম্পর্কে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করছে তাতেও তার এই অনুভূতি আরও তীব্র হয়েছে। তার বহু ভাষার জ্ঞান, তার প্রতি ফরাসীদের শ্রদ্ধা, তার সরলতা, তার দানশীলতা, তার শক্তিমত্তা, সঙ্গীদের প্রতি সদয় ব্যবহার, কোন কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা ও চিন্তা করার ক্ষমতা (অন্য সকলের কাছে ব্যাপারটা দুর্বোধ্য),—সব কিছু মিলিয়ে সকলের চোখে সে হয়ে উঠেছে একটি রহস্যময় উচ্চ কোটির মানুষ। শক্তিমত্তা, জীবন-সম্ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা, অন্যমনস্কতা ও সরলতা—এই যেসব গুণ এতকাল তার নিজস্ব জগতে চলার পথে ছিল প্রতিবন্ধকস্বরূপ, সেইসব গুণই এই মানুষদের চোখে তাকে এনে দিয়েছে নায়কের মর্যাদা। পিয়ের বোঝে, তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীই তার উপর চাপিয়েছে নতুন দায়িত্বভার।

অধ্যায়—১৩

৬ই ও ৭ই অক্টোবরের রাত থেকেই ফরাসীদের ফিরতি-যাত্রা শুরু হল; রান্নাঘর ও চালাগুলো ভেঙে দেওয়া হল, গাড়ি বোঝাই হল, সৈন্যদল ও মালগাড়ি যাত্রা শুরু করল।

সকাল সাতটায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে একটি ফরাসী রক্ষীদল চালাগুলির সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে শাকো, হাতে বন্দুক, পিঠে ভ্রমণ-গাঠ্‌রি ও বড় বড় বস্তা। সকলের মুখে ফরাসী ভাষার উত্তেজিত আলোচনা ও খিস্তি খেউড়ের খই ফুটতে লাগল।

চালার মধ্যে সকলেই পোশাক পরে, কোমরবন্ধ এঁটে তৈরি; শুধু আদেশের অপেক্ষা। কেবল রুগ্ন সৈনিক সকলভ খালি পায়ে আসনে বসে আছে; পোশাক পরে নি; তার বিবর্ণ মুখে চোখের চারদিক কালি পড়েছে। মুখটা শুকিয়ে যাওয়ার ফলে চোখ দুটো আরও বড় দেখাচ্ছে; সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সে বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে; কিন্তু কেউ তার দিকে নজর দিচ্ছে না দেখে সে নিজের মনেই গোঙাচ্ছে।

পিয়ের কোমরে একটা দড়ি জড়িয়েছে; জনৈক ফরাসী সৈন্যের দেওয়া চামড়া থেকে কারাতায়েভ তাকে যে জুতো জোড়া বানিয়ে দিয়েছে সেটাই পরেছে। রুগ্ন লোকটির কাছে গিয়ে পিয়ের তার পাশেই বসে পড়ল।

বলল, "জান সকলভ, ওরা সকলে যাচ্ছে না। এখানে ওদের একটা হাসপাতাল আছে। আমাদের চাইতে তুমি হয় তো ভালই থাকবে।"

লোকটি জোরগলায় আর্তনাদ করে উঠল, "হে প্রভু! আঃ, এবার আমি মরব! হে প্রভু!"

উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে পিয়ের বলল, "আমি আবার গিয়ে সরাসরি ওদের বলব।"

পিয়ের দরজার কাছে পৌঁছতেই আগের দিনের সেই পাইপওয়ালা কর্পোরাল দুজন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল। কর্পোরাল ও সৈন্যদের পরিধানে পথযাত্রার পোশাক, ভ্রমণ-গাঠ্রি ও শাকো. তাতে ধাতুর পাত আঁটা। সেই পোশাকে পরিচিত মুখগুলোই যেন বদলে গেছে।

হুকুমমত কর্পোরাল এসেছে দরজা বন্ধ করতে। বাইরে বের হবার আগে বন্দীদের গুণতি করা হবে।

পিয়ের বলল, "কর্পোরাল, এই রুগ্ন লোকটিকে নিয়ে কি করা যাবে···"

কিন্তু সেইমুহূর্তে কর্পোরালের হাব-ভাব দেখে পিয়েরের মনে সন্দেহ জাগল, এই লোকটি তার পরিচিত সেই কর্পোরাল, না অপরিচিত কেউ। তার উপর, পিয়ের কথা বলতে শুরু করতেই হঠাৎ দুপাশ থেকে দমাদ্দম ঢাক বেজে উঠল। পিয়েরের কথা শুনে কর্পোরাল ভুরু কুঁচকে অর্থহীন কিছু কথা বলে সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে দিল। চালাটা আধা অন্ধকার হয়ে গেল, আর দুদিকে ঢাকের শব্দের মধ্যে রুগ্ন লোকটির আর্তনাদ ডুবে গেল।

"সেই একই জিনিস!···আবারও!···" পিয়ের আপন মনেই বলে উঠল; তার শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ নেমে গেল। কর্পোরালের পরিবর্তিত মুখ, তার কণ্ঠস্বর, ঢাকের কাঠ-ফাটানো আওয়াজ—সবকিছুর ভিতর দিয়ে সেই রহস্যময় নির্বিকার শক্তিকেই যেন সে নতুন করে চিনতে পারল যা মানুষকে বাধ্য করেছে পরস্পরকে হত্যা করতে—যে শক্তির ফলকেই সে দেখেছে নানা প্রাণদণ্ডের মধ্যে। সে শক্তিকে ভয় করা অথবা তার কাছ থেকে পালাবার চেষ্টা করা, সে শক্তির যন্ত্র হিসাবে যা কাজ করে তাদের

কাছে কাকুতি-মিনতি জানানো—সব বৃথা। এসবই পিয়ের জানে। শুধু অপেক্ষা করা এবং সহ্য করা ছাড়া অন্য গতি নেই। পিয়ের রুগ্ন লোকটির কাছে আর ফিরে গেল না, তার দিকে ফিরেও তাকাল না, ভুরু কুঁচকে কুটীরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল।

দরজা খোলা হল। বন্দীরা ভেড়ার পালের মত গাদাগাদি করে দরজার কাছে ভিড় করল। পিয়ের তাদের ঠেলে জোর করে পথ করে নিয়ে সেই ক্যাপ্টেনটির দিকেই এগিয়ে গেল যে কর্পোরাল হিসাবে তাকে কথা দিয়েছিল যে তার জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। ক্যাপ্টেনের পরিধানেও অভিযানের পোশাক; তার নিস্পৃহ মুখে সেই একই জিনিস দেখা গেল যা পিয়ের দেখেছে কর্পোরালের কথায় আর ঢাকের বাজনায়।

ভীড়-করা বন্দীদের দিকে তাকিয়ে কঠোরভাবে ভ্রূভঙ্গী করে ক্যাপ্টেন বারবার বলতে লাগল, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!"

সব চেষ্টা বিফল হবে জেনেও পিয়ের তার দিকে এগিয়ে গেল।

যেন পিয়েরকে চিনতেই পারে নি এমনি নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে অফিসার শুধাল, "কি চাই?"

পিয়ের রুগ্ন লোকটির কথা বলল।

"যেমন করেই হোক সে হেঁটেই যাবে! শয়তান ভরসা!" বলেই ক্যাপ্টেন আর একবার তাড়া লাগাল, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!"

"কিন্তু লোকটি যে মরতে বসেছে," পিয়ের তবু বলল।

সক্রোধে ভুরু কুঁচকে ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে উঠল, "তাহলে তো ভালই হয়···"

"ড্রাম—দা—দা—দাম, দাম-দাম···" ঢাক বেজে উঠল। পিয়ের বুঝল, সেই রহস্যময় শক্তি লোকগুলিকে পুরোপুরি কব্জা করে ফেলেছে; এখন এদের কোন কথা বলা বৃথা।

অফিসার-বন্দীদের সৈনিক-বন্দীদের থেকে আলাদা করে তাদের সামনে যেতে বলা হল। পিয়েরকে নিয়ে অফিসারের সংখ্যা ত্রিশ, আর সৈনিক শ' তিনেক।

অন্য চালা থেকে আগত অফিসাররা সকলেই পিয়েরের অপরিচিত; তাদের পোশাক-পরিচ্ছদও তার চাইতে ভাল। তারা পিয়েরের দিকে, তার জুতোর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, যেন সে একজন বিদেশী। তার অনতিদূরেই একজন মোটাসোটা মেজর হেঁটে চলেছে; তার ফ্যাকাসে মুখটা ফোলা-ফোলা, রাগী-রাগী দেখতে; পরনের কাজান ড্রেসিং-গাউনটাকে একটা তোয়ালে দিয়ে বেঁধেছে; স্পষ্টতই অন্য বন্দীরা তাকে বেশ সমীহ করে চলছে। তার এক হাতে তামাকের থলে, সেই হাতটা সে ঢুকিয়ে রেখেছে ড্রেসিং-গাউনের ভিতরে; অন্য হাতে ধরে আছে পাইপের গোড়াটা। হাঁফাতে হাঁফাতে আর জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে সে সকলের

সঙ্গেই ঝগড়া করছে ; তার ধারণা সকলেই তাকে ধাক্কা মারছে, অথচ ধাক্কাধাক্কি করে এগোবার কোন কারণই তো নেই। অপর একজন ছোটখাট অফিসার সকলের সঙ্গেই কথা বলছে ; তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সারাদিনে কতটা পথ যাওয়া যাবে—এই নিয়ে আলোচনা করছে ; ফেল্ট্ বুট ও কমিসারিয়েট ইউনিফর্ম পরা আর একজন অফিসার এদিক-ওদিক ছুটে যাচ্ছে, মস্কোর ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাচ্ছে, আর যা দেখছে তার বিবরণ শোনাচ্ছে উচ্চকণ্ঠে। একজন তৃতীয় অফিসার কমিসারিয়েট-অফিসারের কথার প্রতিবাদ করল। কথা শুনলেই বোঝা যায় লোকটি পোল। সে বার বার বলতে লাগল যে কমিসারিয়েট-অফিসার স্থানগুলির ভুল বিবরণ শোনাচ্ছে।

মেজর রেগে বলল, "আপনার আপত্তিটা কোথায়? এটা সেন্ট নিকলাস না সেন্ট ব্লাসিয়াস তাতে কি যায় আসে? দেখছেন তো সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বাস। খতম্···আহা, তোমরা ঠেলছ কেন? রাস্তাটা কি যথেষ্ট চওড়া নয়?" বলেই সে পিছনের লোকটির দিকে তাকাল। সে কিন্তু মোটেই ঠেলছিল না।

আগুনে-পোড়া ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে বন্দীরা অনেকেই বলতে লাগল, "ওঃ, ওঃ, ওঃ! ওরা কী করেছে? নদীর ওপারে সব কিছু, আর জুবভা ও ক্রেমালন···তাকিয়ে দেখ! অর্ধেকটাও নেই। হ্যাঁ, আমি তো বলেছিলাম—নদীর ওপার পর্যন্ত সব কিছু গেছে, আর সেই কথাই ঠিক।"

মেজর বলে উঠল, "আচ্ছা, জানই তো সব পুড়ে গেছে, তাহলে সেকথা বলে আর লাভটা কি?"

খামভ্‌নিকির (এ অঞ্চলটা পোড়ে নি) একটা গির্জার কাছ দিয়ে যাবার সময় বন্দীরা সকলেই সহসা একপাশে সরে গেল ; সকলের কণ্ঠে ফুটে উঠল ত্রাশ ও বিরক্তির চীৎকার।

"আঃ, শয়তানের দল! নাস্তিকের দল!, হ্যাঁ ; মৃত, মৃত, লোকটা নির্ঘাৎ মৃত···সারা গায়ে কি যেন মাখানো!"

যে বস্তুটি দেখে সকলে চীৎকার করছে পিয়ের গির্জার সেই দিকটাতে এগিয়ে গেল। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল, কে যেন গির্জার বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে। একটা মানুষের মৃতদেহ ; বেড়ার গায়ে দাঁড় করিয়ে রেখেছে ; মুখে ঝুল-কালি মাখিয়ে দিয়েছে।

"এগিয়ে চল! কী শয়তান···এগিয়ে চল! ত্রিশ হাজার শয়তান!···" রক্ষীবাহিনীর লোকরা শাপ-শাপান্ত করতে লাগল ; আর ফরাসী সৈন্যরা নতুন উদ্যমে সেই সব বন্দীদের তলোয়ারের খোঁচায় এগিয়ে নিয়ে চলল যারা দাঁড়িয়ে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে ছিল।

অধ্যায়—১৪

খামভ্নিকি অঞ্চলের এড়ো পথ ধরে বন্দীরা এগিয়ে চলেছে। তাদের পিছনে চলেছে শুধু রক্ষীবাহিনীর লোক এবং তাদের যানবাহন ও মালগাড়ি। কিন্তু সরবরাহ-ভাণ্ডারের কাছে পৌছেই তারা মিশে গেল প্রকাণ্ড একসারি বারুদবাহী গাড়ি ও বেসরকারী যানবাহনের জটলার মধ্যে।

যারা সামনে রয়েছে তাদের রাস্তা পার হবার অপেক্ষায় বন্দীরা সেতুর মুখে থেমে গেল। সেতুর উপর থেকে তারা দেখল, সামনে ও পিছনে মাল-গাড়ির সীমাহীন ভিড়। ডানদিকে যেখানে কালুগা রোড নেস্কুচ্নির কাছে মোড় নিয়েছে সেখানে সেনাদল ও গাড়ির সীমাহীন সারি বহুদূর পর্যন্ত চোখে পড়ছে। এই সব সৈন্যই বিউহারনায়েস-এর দলের; তারাই যাত্রা করেছে অন্য সকলের আগে। পিছনে নদীর তীরবরাবর এবং "পাথর সেতু"র উপরে রয়েছে নে-র সেনাদল ও যানবাহন

বন্দীরা আছে দাভুত-এর সেনাদলের হেপাজতে। তারা ক্রিমীয় সেতু পার হচ্ছে; অনেকে ইতিমধ্যেই ভিড় থেকে বেরিয়ে কালুগা রোডে পড়েছে।

ক্রিমীয় সেতু পার হয়ে বন্দীরা কয়েক পা এগিয়ে থামল; তারপর আবার এগিয়ে চলল। চারদিক থেকে যানবাহন ও সৈন্যরা এসে ক্রমেই ভিড় বাড়াতে লাগল। কালুগা রোড থেকে সেতু পর্যন্ত কয়েক শ' পা এগোতেই তাদের একঘণ্টার বেশী সময় লাগল। কালুগা রোড ও ট্রান্সমস্ক্ভার সংযোগে পৌছে ভিড়ের চাপে বন্দীদের কয়েক ঘণ্টা সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে হল। সমুদ্র-গর্জনের মত চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল চাকার ঘর্ঘর, পায়ের শব্দ, আর রাগারাগি ও গালাগালির অবিশ্রাম চীৎকার। একটা পোড়া বাড়িতে হেলান দিয়ে পিয়ের সেই শব্দ শুনছে; তার কল্পনায় সেই শব্দের সঙ্গে এসে মিশেছে ঢাকের শব্দ।

পিয়ের যে আধ-পোড়া বাড়িটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কয়েকজন অফিসার-বন্দী পরিস্থিতিটা ভাল করে দেখবার জন্য সেই বাড়িরই প্রাচীরের উপর উঠে গেল।

তারা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, "কী ভিড়! ভিড়ের দিকে তাকাও!··· কামানের উপরে পর্যন্ত মালপত্র বোঝাই করেছে। দেখ, দেখ, বদমাসরা কত জিনিস লুট করেছে···ঐ দেখ। গাড়িতে লোকটার পিছনে কি রয়েছে।··· আরে, হা ভগবান, ওগুলো দেবমূর্তির ফ্রেম!···ওঃ, রাস্কেলের দল।···দেখ, ওই লোকটা কত জিনিস কাঁধে নিয়েছে; হাঁটতে পারছে না। হায় প্রভু, ওরা যে গাড়ির চাকাগুলো পর্যন্ত নিয়ে যাচ্ছে।···আর ট্রাংকের উপর বসে-থাকা ওই লোকগুলোকে দেখ···হায় ভগবান। ওরা যে লড়াই করছে···"

"ঠিক হয়েছে, লাগাও নাকের উপর একঘুষি—ঠিক নাকের উপর। এভাবে চললে আমরা তো সন্ধ্যার আগে বের হতেই পারব না। দেখ, ওদিকে দেখ…আরে, ওটা নিশ্চয় নেপোলিয়নের নিজের। কী সব ঘোড়া! আর মুকুটসহ যুক্তাক্ষর-চিত্রগুলি। সবটাই যেন একটা চলমান বাড়ির মত।…ঐ একটা লোকের বস্তাটা পড়ে গেল, আর সেটা খুঁজে পাচ্ছে না। আবার লড়াই…শিশু-কোলে একটা মেয়ে মানুষ; দেখতে মন্দ নয়! হ্যাঁ, এভাবে ছাড়া এগোবার পথ পাবে না…তাকিয়ে দেখ, ভিড়ের যেন শেষ নেই। রুশ কুমারীরা…হা ঈশ্বর, তারাও এসেছে! গাড়ির মধ্যে—দেখ, কেমন আরাম করে তারা বসেছে।"

খাম্‌ভনিকির গির্জার কাছে যেমন ঘটেছিল তেমনই কৌতূহলের ঢেউয়ের টানে বন্দীরা আবারও সামনের দিকে এগিয়ে গেল; চেহারাটা উঁচু-লম্বা হওয়ায় পিয়ের সকলের মাথার উপর দিয়েই তাদের এই কৌতূহলের কারণটা লক্ষ্য করতে পারল। বারুদের গাড়িগুলোর মাঝখানের তিনটে গাড়িতে গাদাগাদি করে বসে আছে কতকগুলি মেয়ে। চোয়াড়ে মুখ, পরনে জ্বলজ্বলে রঙের পোশাক। কর্কশ স্বরে চীৎকার করে তারা কি যেন বলছে।

সেই রহস্যময় শক্তিকে চিনবার মুহূর্ত থেকেই পিয়েরের কাছে কোন কিছুই আর বিচিত্র বা ভয়ংকর বলে মনে হচ্ছে না: কৌতুকভরে মুখে ঝুল-কালি মাখানো একটা মৃতদেহ নয়, এই চলমান মেয়েগুলো নয়, বা মস্কোর ধ্বংসাবশেষও নয়। এখন যা কিছু চোখে পড়ছে কিছুই তার মনের উপর দাগ কাটতে পারছে না—যেন একটা কঠোর সংগ্রামের প্রস্তুতির দরুণ তার মনকে দুর্বল করে দিতে পারে এমন কোন কিছুকেই সে আমল দিচ্ছে না।

মেয়েদের গাড়িটা চলে গেল। তার পিছন পিছন এল আরও গাড়ি, আরও সৈন্য, আরও মালগাড়ি, আরও সৈন্য, কামানের গাড়ি, সৈন্য, বারুদের গাড়ি, আরও সৈন্য, আর মাঝে মাঝেই মেয়ের দল।

পিয়ের কোন ব্যক্তিবিশেষকেই দেখছে না, দেখছে শুধু তাদের গতিবিধি।

মনে হচ্ছে, কোন অদৃশ্য শক্তি বুঝি এই সব লোকজন ও ঘোড়াকে টেনে নিয়ে চলেছে। পিয়েরের চোখের সামনে যারা নানা পথ ধরে ধেয়ে আসছে তাদের সকলেরই একই লক্ষ্য—তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাওয়া; সকলেই ধাক্কাধাক্কি করছে, রাগ করছে, মারামারি করছে, তাদের সাদা দাঁতগুলি ঝিকমিক করছে, ভুরু কুঁচকে উঠছে, চারদিক থেকে একই ধরনের গালাগালি ভেসে আসছে, আর সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে সেই একই কঠোর, নিষ্ঠুর ভাব যা সকালেই পিয়ের দেখেছে ঢাকের শব্দের সঙ্গে করপোরালের মুখে।

সন্ধ্যা নাগাদ রক্ষীদলের অধিনায়কের চীৎকার, হাঁকডাক ও আপ্রাণ চেষ্টায় চারদিক থেকে চিড়ে-চ্যাপ্টা হওয়া বন্দীরা কোন রকমে কালুগা রোডে

উঠে হাঁপ ছাড়ল।

বিশ্রাম না নিয়েই তারা দ্রুত হাঁটতে লাগল; থামল একেবারে সূর্যাস্তের মুখে। মালপত্রের গাড়িগুলোও পৌঁছে গেল; সকলে রাতের বিশ্রামের আয়োজন করতে লাগল। সকলেই ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চারদিক থেকে শোনা যেতে লাগল ঈশ্বরের দোহাই, ক্রুদ্ধ চীৎকার ও মারামারির শব্দ।

এই বিশ্রামের কালে রক্ষীদলের লোকরা বন্দীদের প্রতি আগের চাইতে অনেক বেশী খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। এখানেই প্রথম বন্দীদের খাদ্য-রেশন হিসাবে দেওয়া হল ঘোড়ার মাংস।

অফিসার থেকে শুরু করে নিম্নতম সৈনিক পর্যন্ত সকলেই প্রতিটি বন্দীর উপর যেন ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটাতে লাগল; অথচ আগে তাদের ব্যবহার ছিল কত বন্ধুত্বপূর্ণ।

এই আক্রোশ আরও বেড়ে গেল যখন বন্দীদের নাম ডাকার পরে দেখা গেল, যে রুশ সৈনিকটি শূল বেদনার ভান করছিল মস্কো ছাড়বার গোলমালের সুযোগে সে পালিয়েছে। পিয়ের দেখল, রাস্তা থেকে কিছুটা দূরে সরে যাওয়ার জন্য জনৈক ফরাসী একটি রুশ সৈনিককে নির্মমভাবে প্রহার করছে, আর রুশ সৈনিকটির পলায়নের জন্য একজন নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসারকে দায়ী করে তার বন্ধু সেই ক্যাপ্টেনটি তাকে কোর্ট-মার্শাল করবে বলে শাসাচ্ছে। নন-কমিশন্‌ড্‌ অফিসারটি যখন যুক্তি দেখাল যে সেই বন্ধুটি অসুস্থ থাকায় হাঁটতে পারছিল না, তখন অফিসারটি জবাবে বলল, যারা পিছিয়ে পড়বে তাদের গুলি করে মারবার হুকুম তো দেওয়াই ছিল। পিয়েরের মনে হল, যে মারাত্মক শক্তি প্রাণদণ্ডবিধানের সময় তাকে একেবারে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল, কিন্তু বন্দী অবস্থায় থাকার সময় যার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল, সেই শক্তি আবার তার অস্তিত্বের উপর চেপে বসেছে। সে শক্তি ভয়ংকর, কিন্তু পিয়ের অন্তরে অন্তরে অনুভব করল, সেই মারাত্মক শক্তি তাকে ধ্বংস করতে যত চেষ্টাই করুক, তার অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে, শক্তিশালী হয়ে উঠছে জীবনের এক নতুন শক্তি।

ঘোড়ার মাংস ও যবের ঝোল সহযোগে নৈশাহার সেরে সে বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে লাগল।

তারা মস্কোতে যা দেখেছে, অথবা ফরাসীদের কাছ থেকে যে রূঢ় ব্যবহার তারা পাচ্ছে, অথবা তাদের গুলি করে মারবার যে হুকুম জারী করা হয়েছে, পিয়ের বা অন্য কেউই সে সম্পর্কে কোন কথাই বলল না। যেন তাদের অবস্থার অবনতির প্রতিক্রিয়া হিসাবেই তারা বিশেষভাবে উজ্জীবিত ও আনন্দিত হয়ে উঠেছে। অভিযান-কালে যেসব মজার দৃশ্য তারা দেখেছে তারই স্মৃতি-চারণায় তারা সময় কাটাতে লাগল, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কোন

কথাই বলল না।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গেছে। আকাশে অনেক তারা জল্ জল্ করছে। পূর্ণ চাঁদের উদয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে অগ্নিকাণ্ডের মত একটা লাল আভা। প্রকাণ্ড লাল গোলকটি ধূসর পরিবেশের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গীতে দুলছে। ক্রমে তার রং হাল্কা হয়ে এল। সন্ধ্যার অবসান হয়েছে, কিন্তু এখনও রাত আসে নি। পিয়ের উঠে পড়ল; নতুন সঙ্গীদের ছেড়ে শিবির-আগুনগুলো পার হয়ে রাস্তার অপর পাশে চলে গেল; সে শুনেছে, সাধারণ সৈনিকদের সেখানেই রাখা হয়েছে। সে তাদের সঙ্গে কথা বলবে। পথে একটি ফরাসী শান্ত্রী তাকে থামাল, ফিরে যেতে হুকুম করল।

পিয়ের ফিরে গেল; শিবির-আগুনের পাশে সঙ্গীদের কাছে নয়, ফিরে গেল একটা গাড়ির কাছে; সেখানে কেউ নেই। গাড়ির চাকার পাশে দুই পা ভেঙে মাথাটা নুইয়ে ভিজে মাটির উপর বসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিজের চিন্তায়ই ডুবে রইল। হঠাৎ সে উচ্চকণ্ঠে হো-হো করে এমনভাবে হেসে উঠল যে আশপাশের সকলেই সবিস্ময়ে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, এই বিচিত্র, একক হাসির অর্থ কি।

"হা-হা-হা!" পিয়ের হাসছে। তারপর উচ্চকণ্ঠে নিজেকেই বলল, "সৈনিকটি আমাকে যেতে দিল না। তারা আমাকে ধরে আটক করেছে। আমাকে বন্দী করেছে। কি, আমাকে? আমাকে? আমার অমর আত্মাকে? হা-হা-হা! হা-হা-হা!…" হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেল।

একজন উঠে দেখতে এল, এই বিচিত্র মানুষটি নিজে-নিজেই হাসছে কেন? হাসি থামিয়ে পিয়ের উঠে পড়ল, কৌতূহলী লোকটার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে চারদিকে তাকাল।

সীমাহীন প্রকাণ্ড অস্থায়ী আস্তানাটা এতক্ষণ শিবির-আগুনের ফট্-ফট্ শব্দে ও নানা জনের কণ্ঠস্বরে মুখরিত ছিল; এখন সব নিস্তব্ধ; আগুনের লাল আভা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে আসছে। মাথার উপরে আকাশের গায়ে ভরা চাঁদটা ঝুলে আছে। আগে চোখে না পড়লেও দূরের বন ও প্রান্তর এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আরও দূরে, সব বন ও প্রান্তর পেরিয়ে, উজ্জ্বল দোদুল্যমান অসীম দূরত্ব যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পিয়ের বহুদূরবর্তী আকাশ ও ঝিকিমিকি তারাদের দিকে তাকাল। ভাবল, "আর এসবই তো আমি, এসবই তো আছে আমার অন্তরের মধ্যে, এই সব কিছুকে নিয়েই তো আমি। অথচ এই সবকিছুকে ধরে এনে ওরা কাঠের বেড়া দেওয়া চালাঘরের মধ্যে বন্দী করেছে!" সে হাসল; তারপর উঠে গিয়ে সঙ্গীদের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

অধ্যায়—১৫

অক্টোবরের গোড়ায় নেপোলিয়নের কাছ থেকে শান্তির প্রস্তাবের চিঠি নিয়ে আর একজন দূত এল কুতুজভের কাছে। যদিও নেপোলিয়ন তখন কুতুজভের কাছ থেকে অনতিদূরে কালুগা রোডেই ছিল, তবু সে চিঠিতে মস্কোর তারিখ দেওয়া। লরিস্তন আগে যে চিঠি এনেছিল তার যে জবাব কুতুজভ দিয়েছিল, এবারেও সেই একই জবাব দিয়ে সে জানিয়ে দিল, শান্তি স্থাপনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

দরখভের যে গেরিলা বাহিনী তারুতিনোর বাঁ দিকে কর্মরত ছিল সেখান থেকে অচিরেই খবর এল যে ক্রুসিয়ের-এর এক ডিভিশন সৈন্যকে ফর্‌মিন্স্ক-এ দেখা গেছে, আর যেহেতু তারা মূল ফরাসী বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, তাই অনায়াসেই তাদের ধ্বংস করা যাবে। সৈনিক ও অফিসাররা পুনরায় যুদ্ধের দাবী জানাল। তারুতিনোর অনায়াস জয়লাভের স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে জেনারেলরাও দরখভের প্রস্তাবমত কাজ করতে কুতুজভের উপর চাপ সৃষ্টি করল। কোন রকম আক্রমণের দরকার আছে বলে কুতুজভ মনে করল না। ফলে অনিবার্যভাবেই একটা সমঝোতা হল: ক্রুসিয়েরকে আক্রমণ করতে একটা ছোটখাট সেনাদলকে ফর্‌মিন্স্ক্‌-এ পাঠানো হল।

পরবর্তীকালে এই ছোট কাজটাই অত্যন্ত কষ্টকর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছিল; আর একটা বিচিত্র যোগাযোগের ফলে এই কাজের ভার পড়ল দখ্‌তুরভ্‌-এর উপর—এ লোকটি সেই বিনীত ছোটখাট দখ্‌তুরভ্‌ যার সম্পর্কে কেউ কখনও লেখে নি যে সে যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করেছে, রেজিমেণ্টের আগে আগে ছুটে গিয়েছে, কামানশ্রেণীর উপর ক্রুশ ছুঁড়ে দিয়েছে, ইত্যাদি, আর যার সম্পর্কে এই কথাই ভাবা হয়েছে ও বলা হয়েছে যে সে অস্থিরমতি ও স্বল্পবুদ্ধি—অথচ অস্তারলিজ থেকে শুরু করে ১৮:৩ সাল পর্যন্ত গোটা রুশ-ফরাসী যুদ্ধে আমরা তাকেই দেখেছি যে কোন সংকট-কালে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে। অস্তারলিজে সকলেই যখন পালাচ্ছিল আর মরছিল, পশ্চাৎ-রক্ষীদলের একজন জেনারেলও যখন উপস্থিত ছিল না, তখন একমাত্র সেই শেষ পর্যন্ত অগেজ্‌দ্‌ বাঁধে ছিল, রেজিমেণ্ট পরিচালনা করছিল, এবং সাধ্যমত সব কিছু রক্ষা করছিল। জ্বরে আক্রান্ত হয়েও নেপোলিয়নের গোটা বাহিনীর আক্রমণ থেকে স্মোলেন্স্ক শহরকে রক্ষা করতে মাত্র বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সে সেখানে গিয়েছিল। স্মোলেন্স্ক-এর মলাখভ ফটকে জ্বরের ঘোরে সবে একটু তন্দ্রা এসেছিল এমন সময় শহরের উপর বোমাবর্ষণের শব্দে জেগে উঠে সে সারাটা দিন স্মোলেন্স্ক শহরকে রক্ষা করেছিল। বরদিনোর যুদ্ধে যখন ব্যাগ্রেশনের মৃত্যু হল, বাম ব্যূহের দশ ভাগের ন' ভাগ সৈন্য নিহত হল, এবং ফরাসী গোলন্দাজ বাহিনী সর্বশক্তি নিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়ল, তখন এই অস্থিরমতি, স্বল্পবুদ্ধি দখ্‌তুরভকেই সেখানে পাঠানো হয়েছিল—প্রথমে অন্য কাউকে সেখানে পাঠিয়ে কুতুজভ যে ভুলটা করেছিল তাড়াতাড়ি সে ভুলের সংশোধন করা হয়েছিল। শান্তশিষ্ট, ছোটখাট দখ্‌তুরভ সেখানেই ঘোড়া ছুটিয়ে দিল, আর রুশ বাহিনীর শ্রেষ্ঠ গৌরবের প্রতিভূ হয়ে দেখা দিল বরদিনো। কাব্যে ও গল্পে অনেক মহাবীরের বর্ণনাই আমাদের শোনানো হয়েছে, কিন্তু দখ্‌তুরভ সম্পর্কে একটি কথাও কেউ বলে নি।

আবার এই দখ্‌তুরভকেই পাঠানো হল ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ, আর সেখান থেকে মালো—ইয়ারোস্লাভেৎস্‌-এ; সেখানেই হল ফরাসীদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ, আর সেখান থেকেই ফরাসী বাহিনীতে ভাঙনের সূত্রপাত ঘটল। অথচ অভিযানের সেই সময়কার অনেক প্রতিভাধর ও বীরের কথা আমাদের শোনানো হলেও দখ্‌তুরভ সম্পর্কে প্রায় কিছুই বলা হল না, অথবা যৎকিঞ্চিৎ বলা হলেও সেটা যেন নেহাৎই একটা দায় সারা কাজের মত করা হল। আর দখ্‌তুরভ সম্পর্কে এই নীরবতাই তার কৃতিত্বের সব চাইতে বড় প্রমাণ।

১০ই অক্টোবর তারিখে দখ্‌তুরভ ফর্‌মিন্‌স্ক-এর অর্ধেক পথ পার হয়ে অরিস্তভ গ্রামে থামল এবং প্রাপ্ত আদেশমত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। ঠিক সেই সময় গোটা ফরাসী বাহিনী যুদ্ধ করবার অভিপ্রায় নিয়ে মুরাত্‌-এর ঘাঁটিতে পৌঁছেই হঠাৎ বিনা কারণে বাঁ দিকে মোড় নিয়ে নব কালুগা রোডে পড়ে ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ ঢুকতে লাগল; সেখানে তখন ছিল শুধুমাত্র ক্রুসিয়ের। সেই সময় দখ্‌তুরভের অধীনে ছিল দরখভের সেনাদল ছাড়াও ফিনার ও সেস্‌লাভিন-এর দুটি ছোট গোরিলা বাহিনী।

১১ই অক্টোবর সন্ধ্যায় সেস্‌লাভিন একজন ফরাসী রক্ষী সৈন্যকে গ্রেপ্তার করে অরিস্তভ প্রধান ঘাঁটিতে এসে হাজির হল। বন্দীটি বলল, রুশ বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশটাই সেদিন ফর্‌মিন্‌স্ক্‌-এ ঢুকেছে, নেপোলিয়ন তাদের সঙ্গেই আছে, আর চারদিন আগেই গোটা বাহিনী মস্কো ছেড়ে চলে এসেছে। সেইদিন সন্ধ্যায়ই জনৈক পারিবারিক ভূমিদাস বরভস্ক্‌ থেকে এসে জানাল, একটা প্রকাণ্ড বাহিনীকে সে শহরে ঢুকতে দেখেছে। দখ্‌তুরভের দলের কয়েকজন কসাকও জানাল, ফরাসী রক্ষীবাহিনীকে তারা বরভস্ক্‌-এর পথে যেতে দেখেছে। এইসব সংবাদ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল, যেখানে তারা আশা করেছিল যে মাত্র একটি ডিভিশনের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে, সেখানে এখন গোটা ফরাসী বাহিনীই একটা অপ্রত্যাশিত পথে মস্কো থেকে এগিয়ে আসছে—অর্থাৎ তারা আসছে কালুগা রোড ধরে। এ অবস্থায় কি করা উচিত সেটা ঠিক বুঝতে না পারার জন্য তখনই সংঘর্ষে লিপ্ত হবার ইচ্ছা দখ্‌তুরভের ছিল না। তাকে হুকুম দেওয়া হয়েছে ফর্‌মিন্‌স্ক্‌ আক্রমণ করতে হবে। কিন্তু তখন তো সেখানে ছিল শুধুমাত্র ক্রুসিয়ের, কিন্তু এখন যে

গোটা ফরাসী বাহিনী সেখানে হাজির। এর্মলভ নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে চাইল, কিন্তু দখ্‌তুরভ জানাল, তার আগে কুতুজভের নির্দেশ অবশ্যই পেতে হবে। সুতরাং স্থির হল, তার কাছে একটা চিঠি পাঠানো হবে।

সেকাজের জন্য বল্‌খভিতিনভ নামক একজন দক্ষ অফিসারকে বেছে নেওয়া হল; একটা লিখিত প্রতিবেদন পেশ করা ছাড়াও সে মুখে মুখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবে। মধ্যরাতে চিঠি ও মৌখিক নির্দেশ নিয়ে বল্‌খভিতিনভ বাড়তি ঘোড়াসহ একজন কসাককে সঙ্গে নিয়ে প্রধান ঘাঁটির উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

অধ্যায়—১৬

হেমন্তের আতপ্ত অন্ধকার রাত। চারদিন ধরে বৃষ্টি হচ্ছে। দু'বার ঘোড়া বদল করে আঠালো কর্দমাক্ত পথে দেড় ঘণ্টায় বিশ মাইল ঘোড়া ছুটিয়ে রাত একটায় বল্‌খভিতিনভ লিতাশোভ্‌কায় পৌছল। একটা কুটিরের কঞ্চির বেড়ার গায়ে "জেনারেল স্টাফ" সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখে সেখানেই ঘোড়া থেকে নেমে হাতের লাগামটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে অন্ধকার পথে পা বাড়াল।

একটি লোক জেগে উঠে অন্ধকার পথেই সশব্দে নাক ঝাড়ছিল; তাকে দেখেই বলল, "কর্তব্যরত জেনারেলের কাছে আমাকে নিয়ে চল, তুড়ন্ত! খুব জরুরী।"

আর্দালিটি ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "সন্ধ্যা থেকে তিনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন; আজ তিন রাত তিনি ঘুমোন নি। আপনি আগে ক্যাপ্টেনকে ডেকে তুলুন।"

"কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, আমি জেনারেল দখ্‌তুরভের কাছ থেকে আসছি," অন্ধকারেই খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌খভিতিনভ বলল।

আর্দালি আগেই ঘরে ঢুকে কাকে যেন ডাকতে লাগল।

"ইয়োর অনার, ইয়োর অনার! একজন সংবাদবাহক।"

"কি? ব্যাপার কি? কার কাছ থেকে এসেছে?" একটা ঘুমজড়িত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

অন্ধকারে বক্তাকে দেখতে না পেলেও কথা শুনেই সে যে কনভ্‌নিৎসিন নয় সেটা অনুমান করে বল্‌খভিতিনভ বলল, "দখ্‌তুরভ এবং আলেক্সি পেত্রভিচের কথা থেকে।"

যে লোকটকে ডেকে তোলা হল সে হাই তুলে শরীরটা টান-টান করল।

কি যেন খুঁজতে বলল, "তাকে এখন জাগাতে চাই না। তিনি খুব অসুস্থ। হয় তো খবরটা গুজব মাত্র।"

"এই দেখুন চিঠি," বল্‌খভিতিনভ বলল। "আমার উপর হুকুম আছে, চিঠিটা এক্ষুণি দিতে হবে কর্তব্যরত জেনারেলের হাতে।"

"এক মিনিট অপেক্ষা করুন। মোমবাতিটা জ্বালাই। ব্যাটা রাস্কেল কোথাকার, জিনিসপত্র সব কোথায় যে লুকিয়ে রাখে?" শরীর টান-টান করে লোকটি আর্দালিকে বলল। (লোকটি কনভ্‌নিৎসিন-এর অ্যাডজুটান্ট শ্‌চেরবিনিন) "পেয়েছি, পেয়েছি।"

আর্দালি একটা দেশলাই ঠুকতে লাগল; শ্‌চেরবিনিন মোমবাতিদানের উপর কি যেন হাতড়াতে লাগল।

"আঃ, যত সব জানোয়ার!" লোকটি বিরক্ত গলায় বলল।

শ্‌চেরবিনিনের হাতের মোমবাতির আলোয় বল্‌খভিতিনভ তার যৌবন-দীপ্ত মুখটা দেখতে পেল। আর একটি ঘুমন্ত মানুষের মুখও তার চোখে পড়ল। সে কনভনিৎসিন।

মোমবাতির আলোয় শ্‌চেরবিনিন পত্রবাহককে দেখতে পেল। তার সর্বাঙ্গ কাদায় মাখামাখি; সেই আস্তিন দিয়ে মুখ মোছার ফলে মুখভর্তিও কাদা লেগেছে।

খামটা নিয়ে শ্‌চেরবিনিন শুধাল, "প্রতিবেদন কে পাঠিয়েছে?"

বল্‌খভিতিনভ বলল, "খবরটা নির্ভরযোগ্য। কয়েদীরা, কসাকরা ও স্কাউটরা সকলে একই কথা বলেছে।

গ্রেট-কোটে শরীর ঢেকে নৈশ টুপি মাথায় যে লোকটি শুয়েছিল তার কাছে যেতে যেতে শ্‌চেরবিনিন বলল, "কিছু করার নেই, তাকে ঘুম থেকে জাগাতেই হবে। পিতর পেত্রভিচ! (কনভ্‌নিৎসিন কিন্তু নড়ল না।) জেনারেল স্টাফ-এর চিঠি!" সে জানে এই কথা ক'টি নিশ্চয় তার ঘুম ভাঙিয়ে দেবে।

বস্তুত সঙ্গে সঙ্গেই নৈশ টুপি পরা মাথাটা জেগে উঠল। কনভ্‌নিৎসিনের মুখটা সুন্দর ও কঠিন; গাল দুটো জ্বরে লাল হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য বর্তমান থেকে বহুদূরের একটি স্বপ্নময় ভাব সে মুখে দেখা গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে চমকে উঠল, মুখের উপর নেমে এল তার স্বাভাবিক শান্ত, কঠিন ভাব।

আলোর দিকে মিট মিট করে তাকিয়ে সে ধীরে সুস্থে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা। ব্যাপারটা কি?"

অফিসারের বক্তব্য শুনতে শুনতেই কনভ্‌নিৎসিন সিল ভেঙে চিঠিটা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে পশমী মোজা-পরা পা দুটো মাটির মেঝেতে নামিয়ে সে বুটজোড়া পরতে শুরু করল। মাথার টুপিটা খুলে চুলটাকে কপালের উপর আঁচড়ে আবার টুপিটা পরে নিল।

"আপনি খুব দ্রুত এসেছেন তো ? চলুন, হিজ হাইনেসের কাছে যাওয়া যাক।"

কনভ্‌নিৎসিন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছে যে আনীত সংবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মোটেই সময় নষ্ট করা চলবে না। সংবাদ ভাল কি মন্দ তা সে ভাবল না। সেকথা জিজ্ঞাসাও করল না। সে ব্যাপারে তার কোন আগ্রহ নেই। যুদ্ধের ব্যাপারটাকে সে বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে বিচার করে না, বিচার করে অন্য কিছু দিয়ে। তার মনে একটা গভীর অব্যক্ত দৃঢ় ধারণা আছে যে শেষ পর্যন্ত সবই ভালয় ভালয় শেষ হবে, কিন্তু প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্তব্য করে যেতে হবে। আর তাই সে করে, সর্বশক্তি নিয়োগ করে কর্তব্য পালন করে। বার্কলে, রায়েভ্‌স্কি, এর্মলভ, প্লাতভ ও মিলোরা দভিচদের মত ৮১২ সালের তথাকথিত মহাবীরদের তালিকায় দখ্‌তুরভের মত পিতর পেত্রভিচ কনভ্‌নিৎসিনের নামটাও মনে হয় সৌজন্যের খাতিরেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দখ্‌তুরভের মতই সীমিত ক্ষমতা ও তথ্যের মানুষ বলেই তারও খ্যাতি ছিল ; দখ্‌তুরভের মতই সেও কখনও যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করে নি, কিন্তু যেখানেই সংকট সেখানেই তাকে সব সময় দেখা গেছে। কর্তব্যরত জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত হবার পর থেকে সে সর্বদাই দরজা খুলে ঘুমোয় ; তার হুকুম রয়েছে—প্রতিটি সংবাদবাহককে যেন তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলবার অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় সে সর্বদাই গোলাগুলির মধ্যে ছুটে যেত ; তাই কুতুজভ সেজন্য তাকে তিরস্কার করেছে, তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে ভয় পেয়েছে। দখ্‌তরভের মতই সেও তেমনি একটা কাঁটাওয়ালা চাকা যা কোন শব্দ করে না বা যার প্রতি কারও নজর পড়ে না, অথচ যে চাকাটা গোটা যন্ত্রের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

কুটির থেকে বেরিয়ে স্যাঁতসেতে অন্ধকার রাতের মধ্যে এসে কনভ্‌নিৎসিন ভ্রুকুটা কুঁচকাল—তার একটা কারণ মাথার যন্ত্রণাটা বেড়ে গেছে, আর অপর কারণ একটা অপ্রীতিকর চিন্তা ঢুকেছে তার মাথায় : এই সংবাদটা পাবার পরে এখানকার সব প্রভাবশালী লোকদের, এবং বিশেষ করে বেনিংসেনের বাসাটা কিভাবে নড়ে উঠবে ; তারুতিনোর পর থেকে কুতুজভের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা তো একেবারে আদায়-কাঁচকলায়। এই চিন্তাটাই তার কাছে অপ্রীতিকর, যদিও সে জানে যে এ ব্যাপারে কিছুই করার নেই।

বাস্তবক্ষেত্রেও সে গিয়ে তোল্‌কে সংবাদটা জানাতেই সে তার সঙ্গে একই ঘরে বসবাসকারী জেনারেলটি যুদ্ধ সম্পর্কে তার পরিকল্পনার কথা বোঝাতে লাগল। ক্লান্ত নীরবতার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কথাবার্তা শুনবার পরে কনভ্‌নিৎসিন তাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে অবিলম্বে তাদের হিজ হাইনেসের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

অধ্যায়—১৭

সব বুড়ো মানুষের মতই কুতুজভও রাতে বেশীক্ষণ ঘুমতে পারে না। দিনের বেলায় প্রায়ই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু রাতে পোশাক না ছেড়ে বিছানায় শুয়ে সাধারণত জেগে থেকে নানা কথা ভাবে।

এখনও ফোলা-ফোলা হাতের উপর ক্ষতচিহ্নিত ভারী মাথাটা রেখে সে বিছানায় শুয়ে আছে ; গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে এক চোখে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে।

সম্রাটের সঙ্গে অধিক যোগাযোগের ফলে তার উপর বেনিংসেনের প্রভাবটাই অন্য সকলের চাইতে বেশী হওয়ায় বেনিংসেন ইদানীং কুতুজভকে এড়িয়েই চলে ; ফলে তার এবং তার সেনাদলের পক্ষে অকারণ আক্রমণাত্মক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাটা কম হওয়ায় কুতুজভ বেশ স্বস্তিও অনুভব করছে। তারুতিনোর যুদ্ধ ও তার আগের দিনের শিক্ষার কথা কুতুজভ বেশ বেদনার সঙ্গেই স্মরণ করে থাকে ; তার ধারণা সে শিক্ষার প্রভাব অন্যদের উপরেও পড়েছে।

কুতুজভ ভাবে : "তাদের বোঝা দরকার যে আক্রমণ করলে আমাদের শুধু ক্ষতিই হবে। ধৈর্য আর সময়ই হচ্ছে আমার যোদ্ধা, আমার বিজয়ী বীর।" সে জানে, কাঁচা থাকতে আপেল তোলা উচিত নয়। যখন পাকবে তখন ওটা আপনি পড়বে ; কাঁচা অবস্থায় পাড়লে আপেলটা নষ্ট হবে, গাছের ক্ষতি হবে, আর তোমার দাঁত টকে যাবে। অভিজ্ঞ শিকারীর মত সে জানে যে জন্তুটা আহত হয়েছে, পুরো শক্তি নিয়ে রাশিয়ার পক্ষে যতখানি আঘাত করা সম্ভব ততখানি আহত হয়েছে। কিন্তু সে আঘাত মারাত্মক কিনা সেটা এখনও অনিশ্চিত। কিন্তু এখন লরিস্তন ও বার্থিলেমিকে পাঠানোর ফলে এবং গেরিলাদের বিবরণ অনুসারে কুতুজভ প্রায় নিশ্চিত যে আঘাতটা মারাত্মকই হয়েছে। কিন্তু আরও প্রমাণ তার চাই, আর সেজন্য অপেক্ষা করা দরকার।

"ওকে কতখানি আহত করা গেছে সেটা দেখতে ওরা চাইছে দৌড়ে যেতে। অপেক্ষা কর, তাহলেই দেখতে পাবে। অবিরাম চলা মানেই অবিরাম অগ্রগতি! কিসের জন্য? নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলতে! যুদ্ধ যেন একটা মজার ব্যাপার। তারা সব ছেলেমানুষের মত—সকলেই দেখাতে চায় তারা কত ভাল যুদ্ধ করতে পারে, ফলে তাদের কাছ থেকে ঘটনার কোন অর্থপূর্ণ বিবরণই পাওয়া যায় না। কিন্তু এখন তো তার কোন প্রয়োজন নেই।"

বরদিনোর আঘাতটা মারাত্মক হয়েছে কি না এই অনিশ্চিত প্রশ্নটা একটা পুরো মাস ধরে কুতুজভের মাথার মধ্যে ঘুরছে। একদিকে ফরাসীরা মস্কো দখল করেছে। অন্যদিকে কুতুজভ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করে যে

সে নিজে এবং সব রুশরা মিলে সর্বশক্তি দিয়ে যে ভয়ংকর আঘাত হেনেছে সেটা মারাত্মক হতে বাধ্য। কিন্তু সে যাই হোক প্রমাণ তো দরকার; প্রমাণের জন্য সে একটা মাস অপেক্ষা করেছে; যত অপেক্ষা করেছে ততই বেশী অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ব্রুসিয়েরের ডিভিশন সম্পর্কে দরখভের প্রতিবেদন, নেপোলিয়নের সেনাদলের দুর্দশা সম্পর্কে গেরিলাদের সংবাদ, মস্কো ছেড়ে যাবার প্রস্তুতির গুজব—সব কিছু এই ধারণাকেই সমর্থন করছে যে ফরাসী বাহিনী মার খেয়ে পালাবার তাল করছে। কিন্তু এসবই তো ধারণামাত্র; যুবকদের কাছে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও কুতুজভের কাছে তা নয়। ষাট বছরের অভিজ্ঞতায় সে জানে গুজবকে কতটা মূল্য দেওয়া যায়; এতে আত্মতুষ্টির অবকাশ মেলে, কিন্তু বিরূপ পরিস্থিতির কোন মূল্যায়ন হয় না। তাই তার মনে স্বস্তি নেই। রুটিনমাফিক সব কাজই সে করে—সহযোগীদের সঙ্গে আলোচনা করে, চিঠিপত্র লেখে, পিতার্সবুর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, ইত্যাদি। কিন্তু একমাত্র সেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পায় ফরাসীদের ধ্বংস, আর সেটাই তার অন্তরের একমাত্র কামনা।

১১ই অক্টোবর রাতে হাতের উপর ভর দিয়ে শুয়ে শুয়ে সেইকথাই সে ভাবছিল।

পাশের ঘরে কারা যেন এসেছে; তোল্, কনভ্‌নিৎসিন ও বল্‌খভিতিনভের পায়ের শব্দ কানে এল।

"আরে, ওখানে কারা? ভিতরে আসুন, ভিতরে আসুন! খবর কি?" ফিল্ডমার্শাল তাদের ডাকল।

একটি পরিচারক মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল। তোল্ সংক্ষেপে খবরটা জানাল।

"সংবাদ এনেছে কে?" এমনভাবে তাকিয়ে কুতুজভ প্রশ্নটা করল যে মোমবাতির আলোয় তার কঠোরতা তোল্-এর দৃষ্টি এড়াল না।

"এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ইয়োর হাইনেস।"

"তাকে ভিতরে ডাকুন, এখানে ডেকে আনুন।"

কুতুজভ একটা পা ঝুলিয়ে বিছানায় উঠে বসল; অপর ভাঁজ-করা পায়ের উপর রইল তাঁর ভুঁড়িটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে সংবাদবাহকের দিকে তাকাল, যেন নিজের মনের কথাটাই তার মুখের উপর দেখতে চাইল।

বুকের উপর খোলা শার্টটা টেনে মিলিয়ে দিয়ে বার্ধক্যজনিত নীচু গলায় বল্‌খভিতিনভকে বলল, "আমাকে বল, আমাকে বল বন্ধু। কাছে এস—আরও কাছে। আমার জন্য কি খবর তুমি এনেছ? অ্যা? নেপোলিয়ন মস্কো পরিত্যাগ করেছে এই তো? তুমি ঠিক জান? অ্যা?"

তাকে যা কিছু বলে দেওয়া হয়েছিল বল্‌খভিতিনভ গোড়া থেকে সব কথা সবিস্তারে বলল।

"আরও তাড়াতাড়ি বল, আরও তাড়াতাড়ি! আমাকে কষ্ট দিও না!" কুতুজভ তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল।

বল্‌খভিতিনভ সব কথা বলে নির্দেশের অপেক্ষায় চুপ করে রইল। তোল্ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কুতুজভ তাকে থামিয়ে দিল। নিজে কিছু বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু হঠাৎ তার মুখটা কুঁচকে ভাঁজ হয়ে গেল। তোল্-এর দিকে হাতটা নেড়ে ঘরের বিপরীত দিকে ঝোলানো দেবমূর্তিগুলির ছায়ায় যে কোণটা অন্ধকার হয়ে আছে সেইদিকে চলে গেল।

দুই হাত জোড় করে কাঁপা-গলায় বলতে লাগল, "হে প্রভু, হে আমার সৃষ্টিকর্তা, আমাদের প্রার্থনা তুমি শুনেছ···রাশিয়া বাঁচলো। হে প্রভু, তোমাকে ধন্যবাদ।"

কুতুজভ কাঁদতে লাগল।

অধ্যায়—১৮

এই সংবাদ পাবার পর থেকে অভিযানের শেষ দিন পর্যন্ত কুতুজভের সমস্ত কাজকর্মের একমাত্র লক্ষ্য হল ছলে, বলে, কৌশলে, ও অনুরোধে তার সৈন্যদের ধ্বংসের মুখ শত্রুর বিরুদ্ধে অনর্থক আক্রমণ, রণ-কৌশল ও সংঘর্ষ থেকে বিরত রাখা। দখ্‌তুরভ মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস-এ চলে গেল, কিন্তু কুতুজভ মূল বাহিনীর সঙ্গেই রয়ে গেল, আর কালুগা থেকে সকলকে চলে যেতে হুকুম দিল; সে শহর থেকে আরও পিছনে সরে যাওয়া তার কাছে খুবই সহজ বলে মনে হল।

কুতুজভ সর্বত্রই পশ্চাদপসরণ করে চলল, কিন্তু শত্রুপক্ষ তার পশ্চাদপসরণের জন্য অপেক্ষা না করেই বিপরীত মুখে পালাতে লাগল।

নেপোলিয়নের ইতিহাসকাররা তারুতিনো এবং মালো-ইয়ারো-স্লাভেৎস্-এ তার সুকৌশল সৈন্য-পরিচালনার কথা আমাদের শুনিয়েছে; আর নেপোলিয়ন যদি সময়মত দক্ষিণের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করতে পারত তাহলে কি ঘটতে পারত তা নিয়েও অনেক জল্পনা-কল্পনাও করেছে।

কিন্তু নেপোলিয়নের দক্ষিণ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যে কোন বাধাই ছিল না (কারণ রুশ বাহিনী কোথাও তাকে বাধা দেয় নি) সেকথা না হয় নাই বলা হল; তবু ইতিহাসকাররা ভুলে গেছে যে কোন কিছুই তখন আর নেপোলিয়নের বাহিনীকে রক্ষা করতে পারত না, কারণ ততক্ষণে তার মধ্যে অনিবার্য ধ্বংসের বীজটি বপন করা হয়ে গেছে। যে বাহিনী মস্কোতে প্রচুর রসদের সরবরাহ পেয়েও তাকে মজুত না করে পায়ের নীচে পিষে নষ্ট করেছে এবং স্মোলেনস্ক-এ পৌঁছে খাদ্যসম্ভার গুদামজাত না করে কেবল লুটই করেছে, সেই বাহিনী কালুগা প্রদেশে গিয়ে কেমন করে সুবুদ্ধি ফিরে

পাবে যখন সেখানেও বাস করত মস্কোর মতই সব রুশ অধিবাসীরা এবং সেখানেও জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাক করে দেবার মত সব কিছুই ছিল ?

সে বাহিনী কোথাও গিয়ে বাঁচতে পারত না। বরদিনোর যুদ্ধ এবং মস্কো ধ্বংসের পরে তার ভিতরে-ভিতরে যেন ধ্বংসের বীজ আপনা থেকেই রোপিত হয়ে গিয়েছিল।

স্বয়ং নেপোলিয়ন ও তার সৈন্যসহ যারা একদিন ছিল একটা বাহিনীর সদস্য তারাই পালাতে লাগল কোথায় পালাচ্ছে তা না জেনে ; যে অসহায় অবস্থার সম্পর্কে তখন তারা সকলেই অল্প-বিস্তর সচেতন তার হাত থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে বাঁচাটাই তখন প্রত্যেকেরই একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছে।

তাই তো দেখতে পাই. জেনারেলরা সকলে একত্রে আলোচনার ভান করে মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্-এর বৈঠকে সমবেত হয়ে নানা রকম অভিমত প্রকাশ করলেও একেবারে সকলের শেষে কথা বলতে উঠে সরল-হৃদয় সৈনিক মুতোঁ যখন বলল যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে যাওয়াই এখন একমাত্র দরকারী কাজ, তখন সকলের মুখই বন্ধ হয়ে গেল ; এমন কি এই সর্বজন-স্বীকৃত সত্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নও কিছুই বলতে পারল না।

পালিয়ে যাওয়াই যে দরকার সেকথাটা সকলে বুঝলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়ার মধ্যে একটা লজ্জাবোধ তবু থেকেই গেল। সেই লজ্জাকে জয় করার জন্য একটা বাইরের আঘাতের খুবই দরকার ছিল, আর যথাসময়েই সে আঘাতটাও এল। তাকেই ফরাসীরা বলত "le hourra de l' Empereur,"

মালো-ইয়ারোস্লাভেৎস্-এর বৈঠকের পরদিন খুব সকালে একদল মার্শাল ও একজন পরিদর্শককে সঙ্গে নিয়ে নেপোলিয়ন নিজের এলাকার মধ্যেই অশ্বারোহণে বেরিয়েছিল ; পূর্বেকার ও আসন্ন যুদ্ধের ঘটনাস্থল এবং সেনাবাহিনী পরিদর্শনের জন্যই নাকি তার এই পরিক্রমণ। যাই হোক, কয়েকজন কসাক লুটের মালের খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে নেপোলিয়নের দেখা পেয়ে যায় এবং তাকে প্রায়, গ্রেপ্তার করবার উপক্রম করে। কসাকরা যে তখন নেপোলিয়নকে গ্রেপ্তার করে নি, নেপোলিয়ন যে তখনকার মত বেঁচে গিয়েছিল, তার কারণ কসাকদের মন ছিল তখন লুটের মালের দিকে। সৈন্যদের ছেড়ে তারা লুটতরাজের দিকেই মন দিল। নেপোলিয়নকে ফেলে তারা ছুটল লুটের সন্ধানে, নেপোলিয়ন কোনক্রমে পালিয়ে বাঁচল।

সৈন্যপরিবেষ্টিত অবস্থায় স্বয়ং সম্রাটই যখন এত সহজে শত্রুপক্ষের হাতে পড়তে পারত সে অবস্থায় নিকটবর্তী পরিচিত পথ ধরে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। চল্লিশ বছরের পুরনো পাকস্থলী নিয়ে নেপোলিয়ন সৈনিকটির কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারল ; তার পূর্বেকার গতিশীলতা ও

সাহস এখন আর নেই ; তাছাড়া কসাকরাও তাকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছে ; তাই মুতোঁর সঙ্গে একমত হয়ে সে সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল,—ইতিহাসকাররা তাই বলে—স্মোলেন্স্ক রোড ধরে পশ্চাদপসরণ করা হোক।

নেপোলিয়ন যে মুতোঁর সঙ্গে একমত হল এবং সৈন্যবাহিনী পশ্চাদপসরণ করল, তাতে কিন্তু একথা প্রমাণ হয় না যে নেপোলিয়নই তার বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ঘটিয়েছিল ; বরং বলা যায়, যে শক্তিসমূহ গোটা বাহিনীকে প্রভাবিত করে তাকে মোঝায়েস্ক্ (অর্থাৎ স্মোলেন্স্ক্) রোড ধরে পরিচালিত করেছিল সেই শক্তিই একই সঙ্গে নেপোলিয়নকেও প্রভাবিত করেছিল।

অধ্যায়—১৯

একজন গতিশীল মানুষ সব সময়ই তার চলার সপক্ষে একটা লক্ষ্য খুঁজে নেয়। এক হাজার ভার্স্ট পথ অতিক্রম করতে হলে তাকে কল্পনা করে নিতেই হবে যে সেই হাজার ভার্স্টের শেষে তার জন্য একটা ভাল কিছু অপেক্ষা করে আছে। চলার শক্তি অর্জন করতে হলে একটা প্রতিশ্রুত-দেশের সম্ভাবনা সম্মুখে রাখতেই হবে।

ফরাসীদের অগ্রগতির সম্মুখে সেই প্রতিশ্রুত দেশটি ছিল মস্কো, আর তাদের পশ্চাদপসরণের সময় সেটি হয়েছে তাদের স্বদেশ। কিন্তু সে স্বদেশ তো বহুদূরে ; যে মানুষকে এক হাজার ভার্স্ট যেতে হবে তার পক্ষে একান্তভাবে প্রয়োজন শেষ লক্ষ্যকে সরিয়ে রেখে নিজেকে এই কথা বলা : "আজ আমি চল্লিশ ভার্স্ট দূরের এমন একটা স্থানে পৌঁছব যেখানে পাব বিশ্রাম, যেখানে রাতটা কাটাতে পারব।" প্রথম দিনের যাত্রাপথে সেই বিশ্রাম-স্থলটিই তার শেষ লক্ষ্যকে ঢেকে দিয়ে তার সব আশা-আকাংখাকে আকর্ষণ করে। আর ব্যক্তিবিশেষের এই মনোভাব সমষ্টির ক্ষেত্রে আরও বহুগুণ শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

পুরনো স্মোলেন্স্ক্ রোড ধরে আগুয়ান ফরাসী বাহিনীর শেষ লক্ষ্য তাদের স্বদেশভূমি তখন অনেক দূরে ; তাদের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য হচ্ছে স্মোলেন্স্ক ; তাই সমগ্র সেনাবাহিনীর মনের মধ্যে বহুগুণে বর্দ্ধিত হয়ে তাদের সব আশা ও আকাংখা সেইপথেই তাদের টেনে নিয়ে চলল। স্মোলেন্স্ক্-এ তাদের জন্য প্রচুর খাদ্য ও নতুন সেনাদল অপেক্ষা করছে এ-কথা যে তারা জানত তা নয় ; সেরকম কোন কথা তাদের বলাও হয় নি (বরং উর্ধ্বতন অফিসাররা এবং স্বয়ং নেপোলিয়নও জানত যে সেখানে রসদের একান্ত অভাব আছে)। কিন্তু একমাত্র এই আশা ও আকাংখাই তাদের দিয়েছে এগিয়ে চলার এবং বর্তমান দুঃখদুর্দশা সহ্য করবার শক্তি। কাজেই একথা যারা জানত এবং

যারা জানত না দুই দলই নিজেদের প্রতারিত করে আশ্বাসের স্থল হিসাবে স্মোলেন্স্ক-এর দিকেই ছুটে চলল।

বড় রাস্তায় পড়ে ফরাসীরা বিস্ময়কর উদ্যম ও অশ্রুতপূর্ব দ্রুতগতিতে পালাতে লাগল নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে! একই প্রেরণা ফরাসী সৈন্যদের এক-সূত্রে বেঁধে দিল, উৎসাহ যোগাল; তাছাড়া আরও একটি কারণ তাদের একসঙ্গে বেঁধেছিল—সেটা তাদের প্রবল সংখ্যা। মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের মতই তাদের সমষ্টিগত প্রবলতা প্রতিটি মানব-অণুকে নিজের দিকে টেনে নিল। তারা হাজারে হাজারে এক জাতি, এক প্রাণ হয়ে ছুটতে লাগল।

এই সন্ত্রাস ও দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য প্রত্যেকেই তখন চাইছে নিজেকে বন্দী হিসাবে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে; কিন্তু একদিকে যাত্রার লক্ষ্যস্থল স্মোলেন্স্ক্-এর প্রতি সম-আকর্ষণের শক্তি সকলকে একই পথে টেনে নিয়ে চলল, আবার অন্যদিকে একটা আর্মি কার তো কোন কোম্পানির কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে পারে না; যদিও ফরাসীরা নিজেদের আলাদা করে নিয়ে যে কোন উপযুক্ত ওজুহাতে আত্মসমর্পণের সুযোগ খুঁজতে লাগল, সে সুযোগ কিন্তু তাদের সামনে এল না। তাদের সংখ্যাধিক্য এবং সমবেত দ্রুত গতির জন্যই তারা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল; সর্বশক্তি নিয়োগ করে ফরাসীরা যেভাবে ছুটতে লাগল তাতে রুশদের পক্ষে তাদের গতিরোধ করা শুধু কষ্টকর নয়, অসম্ভব হয়ে পড়ল। একটা বিশেষ সময়-সীমার পরে কোন যান্ত্রিক বিচ্ছেদই জীবদেহের পচনকে ত্বরান্বিত করতে পারে না।

একতাল বরফ একমুহূর্তেই গলে যেতে পারে না। এমন একটা নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে যার কমে তাপের কোন মাত্রা প্রয়োগ করেই বরফকে গলানো যায় না। পরন্তু, তাপ যত বেশী হয়, অবশিষ্ট বরফটা তত বেশী জমাট বেঁধে যায়।

রুশ কম্যাণ্ডারদের মধ্যে একমাত্র কুতুজভই এটা বুঝত। স্মোলেন্স্ক্ রোড ধরে ফরাসীদের পলায়ন যখন স্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন ১১ই অক্টোবর রাতে কনভ্‌নিৎসিন যেটা আগে থেকেই দেখতে পেয়েছিল তাই ঘটতে লাগল। উর্ধ্বতন অফিসাররা সকলেই চাইল নাম করতে, শত্রুকে মারতে, অবরোধ করতে, বন্দী করতে, ফরাসীদের পরাভূত করতে। সকলেই যুদ্ধের জন্য হৈ-হৈ করে উঠল।

একমাত্র কুতুজভই আক্রমণ প্রতিহত করতে সাধ্যমত চেষ্টা করল (যে-কোন প্রধান সেনাপতির পক্ষেই সে সাধ্য খুবই সীমিত)।

আজ আমরা যা বলছি সেদিন কুতুজভ তা বলতে পারে নি: "আমাদের সৈন্যদের মৃত্যু ডেকে এনে আর ভাগ্যহীন লোকগুলোকে অমানুষিকভাবে হত্যা করে কেন এই যুদ্ধ, কেন এই পথ-অবরোধ? যখন বিনা যুদ্ধেই তাদের

সেনাদলের এক তৃতীয়াংশ মস্কো থেকে ভিয়াজ্‌মা রোডের উপর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তখন এ যুদ্ধের কি দরকার?" কিন্তু পরিণত বুদ্ধির উপর নির্ভর করে সে তাদের বলল স্বর্ণ-সেতুর কথা; সঙ্গে সঙ্গে তারা হেসে উঠল, কটূক্তি করল, মরণোন্মুখ জন্তুটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে, উল্লাসে ফেটে পড়ল।

এর্মলভ, মিলরাদভিচ, প্লাতভ এবং অন্যরা ভিয়াজমার কাছে ফরাসীদের মুঠোর মধ্যে পেয়ে দুটো ফরাসী কোরকে বিচ্ছিন্ন করে ভেঙে চুরমার করে দেবার ইচ্ছাকে সংযত করতে পারল না; তাদের এই অভিপ্রায় কুতুজভকে জানাবার উদ্দেশ্যে খামে ভরে তাকে পাঠিয়ে দিল এক তাড়া সাদা কাগজ।

সৈন্যদের বাধা দিতে কুতুজভ সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু রাস্তা বন্ধ করে দেবার চেষ্টায় সৈন্যরা আক্রমণ করে বসল। শুনেছি, পদাতিক রেজিমেণ্টগুলি বাজনা বাজিয়ে ঢাক পিটিয়ে আক্রমণ করতে এগিয়ে গেল এবং হাজার হাজার মানুষ খুন হল।

কিন্তু তারা না পারল পথ আটকাতে, আর না পারল কাউকে পরাজিত করতে; বিপদের মুখে পড়ে ফরাসী বাহিনী আরও সুসংহত হয়ে ধীরে ধীরে সংখ্যায় কমতে কমতেও স্মোলেনস্ক্‌-এর মারাত্মক পথ ধরে এগিয়ে চলল।

ত্রয়োদশ পর্ব সমাপ্ত

চতুর্দশ পর্ব

অধ্যায়—১

বরদিনোর যুদ্ধ, তার পরেই মস্কো দখল এবং বিনা যুদ্ধে ফরাসীদের পলায়ন—এটা ইতিহাসের একটি পরম শিক্ষনীয় ঘটনা।

সব ইতিহাসকারই একমত যে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির পারস্পরিক সংঘর্ষের বহিরঙ্গ কার্যকলাপই যুদ্ধের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এবং সে যুদ্ধের অল্প-বিস্তর সাফল্যের ফল অনুসারেই রাষ্ট্রের ও জাতির শক্তির হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে।

কোন রাজা বা সম্রাট অন্য এক রাজা বা সম্রাটের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে একটা সেনাবাহিনী গড়ে তোলে, শত্রুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তিন, পাঁচ, অথবা দশ হাজার মানুষকে মেরে জয়লাভ করে, এবং একটা রাজ্য ও কয়েক লক্ষ লোকের একটা জাতিকে পদানত করে—এ ধরনের ঐতিহাসিক

বিবরণ খুব বিস্ময়কর মনে হলেও ইতিহাসের ঘটনাবলী (আমরা যতদূর জানি) এই বক্তব্যের সত্যতাকেই সমর্থন করে যে এক সেনাদলের বিরুদ্ধে অপর সেনাদলের সাফল্যের তারতম্যই সেই জাতির শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ, অন্তত পক্ষে একটি মৌলিক নির্দেশক—যদিও এটা খুবই দুর্বোধ্য যে একটা জাতির একশ' ভাগের এক ভাগ মাত্র হয়েও একটা সেনাদলের পরাজয় ঘটলে একটা গোটা জাতি কেন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। যেই একটি সেনাদল জয়লাভ করল অমনি সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী জাতির অধিকার বিজিতের সর্ব রকম স্বার্থের পরিপন্থী হয়ে বৃদ্ধিলাভ করে। একটা সেনাদল পরাজিত হল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা জাতি তার সব অধিকার হারিয়ে ফেলল, আর সেই সেনাদল যদি সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হল তো গোটা জাতি হল সম্পূর্ণ পদানত।

ইতিহাস অনুসারে প্রাচীনকাল থেকেই এই চলে আসছে, এবং আমাদের কালেও তাই চলেছে। নেপোলিয়নের সব যুদ্ধ এই নীতিকেই সমর্থন করে। অস্ট্রীয় বাহিনী যতটা পরাজয় বরণ করেছে সে অনুপাতে অস্ট্রীয়া তার অধিকার হারিয়েছে, আর সেই অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে ফ্রান্সের অধিকার ও শক্তি। জেনা ও অয়েরস্তাদ-এ ফরাসীদের জয়লাভ প্রাশিয়ার স্বাধীন সত্তাকে ধ্বংস করেছে।

কিন্তু তারপরে ১৮১২-তে ফরাসীরা মস্কোর কাছে একটা জয়লাভ করল। মস্কো দখল করা হ'ল, আর তারপরে আর কোন যুদ্ধ হল না, কিন্তু রাশিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হল না, বিলুপ্ত হয়ে গেল ছয় লক্ষ সৈন্যসমন্বিত ফরাসী বাহিনী এবং তারপরে নেপোলিয়ন-শাসিত ফ্রান্স দেশটা পর্যন্ত। ইতিহাসের বিধানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ঘটনাকে বিকৃত করে একথা বলাও অসম্ভব যে বরদিনোর রণক্ষেত্র রুশদের হাতেই থেকে গিয়েছিল, অথবা মস্কোর পরে আর যেসব যুদ্ধ হয়েছিল তাতেই নেপোলিয়নের সেনাদল বিধ্বস্ত হয়েছিল।

বরদিনোতে ফরাসীদের জয়লাভের পরে সাধারণভাবে আর কোন যুদ্ধ হয় নি, গুরুতর কোন সংঘর্ষও ঘটে নি, তথাপি ফরাসী বাহিনীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেল। এর অর্থ কি? এটা যদি চীনের ইতিহাস থেকে নেওয়া কোন দৃষ্টান্ত হত তাহলে আমরা বলতে পারতাম যে এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনাই নয় (কোন কিছু যখন তাদের হিসাবের সঙ্গে খাপ খায় না ইতিহাসকাররা তখন সুবিধামত এই কথাই বলে থাকে); এটা যদি কোন ছোটখাট সংঘর্ষ হত, তাহলে এটাকে ব্যতিক্রম বলে ধরে নিতে পারতাম; কিন্তু এই ঘটনাটি ঘটেছে আমাদের পিতৃপুরুষের চোখের সামনে, তাদের কাছে এটা ছিল তাদের পিতৃভূমির জীবন-মরণের প্রশ্ন, আর আমাদের জ্ঞানমত এটা ঘটেছিল বৃহত্তম একটি যুদ্ধে।

১৮৮২-র অভিযানে বরদিনোর যুদ্ধ ফরাসী বিতাড়ন পর্যন্ত এই অধ্যায়টিই

প্রমাণ করেছে যে একটা যুদ্ধে জয়লাভ করলেই একটা দেশকে জয় করা যায় না, এবং দেশজয়ের কোন অনিবার্য সংকেতও সেটা নয়; এতে আরও প্রমাণ হয়েছে, যে-শক্তি একটা জাতির ভাগ্য নির্ধারণ করে সে-শক্তি কোন বিজয়ীর হাতে থাকে না, সেনাদল ও যুদ্ধের মধ্যেও থাকে না, থাকে অন্য কোথাও।

মস্কো ছেড়ে আসার আগে ফরাসী বাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ফরাসী ইতিহাসকাররা বলেছে যে অশ্বারোহী বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী ও যানবাহন ব্যবস্থা ছাড়া আর সবদিক থেকেই "গ্র্যাণ্ড আর্মি"র অবস্থা বেশ ভালই ছিল—আর পশুদের কোন রকম খাদ্যই ছিল না। সে দুর্ভাগ্যের কোন প্রতিকার কারও হাতে ছিল না, কারণ সে জেলার চাষীরা সব খড় পুড়িয়ে দিয়েছিল যাতে সেগুলি ফরাসীদের হাতে না পড়ে।

জয়লাভ করেও ঈপ্সিত ফল পাওয়া গেল না, কারণ চাষী কার্প ও ভ্লাস এবং অনুরূপ অসংখ্য চাষী চড়া দাম পেয়েও তাদের খড় নিয়ে মস্কোতে যায় নি, সব পুড়িয়ে দিয়েছে।

এমন দুটি লোককে কল্পনা করা যাক যারা দ্বৈত যুদ্ধের সব রকম নিয়ম-কানুন মেনে তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করতে এসেছে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলল; হঠাৎ একজন যোদ্ধা যখন বুঝতে পারল যে সে আহত হয়েছে আর ব্যাপারটা ঠাট্টা-ইয়ার্কি নয়, তখন সে তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতের কাছে যে মুগুরটা পেল তাই ঘোরাতে শুরু করল। তারপর কল্পনা করা যাক, যে-যোদ্ধাটি কার্যোদ্ধারের শ্রেষ্ঠ এবং সহজতম পথটি বেছে নিল সেই কিন্তু আবার বীরত্বের চিরাচরিত ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আসল কথা গোপন করে প্রচার করে দিল যে দ্বৈতযুদ্ধের সব নিয়ম-কানুন মেনে তরবারির সাহায্যেই সে জয়লাভ করেছে। সেই দ্বৈতযুদ্ধের এ হেন বিবরণ থেকে কত রকম গোলমাল ও অস্পষ্টতার সৃষ্টি যে হতে পারে তা তো সহজেই কল্পনা করা যায়।

এক্ষেত্রে দ্বৈতযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক প্রতিদ্বন্দী হচ্ছে ফরাসী বাহিনী; তার যে প্রতিপক্ষ তরবারি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মুগুর তুলে নিয়েছে সে হল রুশ জনগণ; যারা দ্বৈতযুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছে তারা হল এই ঘটনার বর্ণনাকারী ইতিহাসকাররা।

স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর অগ্নিকাণ্ডের পরে যে যুদ্ধ শুরু হল তাতে যুদ্ধের সাবেকী ঐতিহ্যের কিছুই পালন করা হল না। শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া, যুদ্ধের পরে পশ্চাদপসরণ করা, বরদিনোতে প্রচণ্ড আঘাত হানার পরে নতুন করে পশ্চাদপসরণ করা, মস্কোকে জ্বালিয়ে দেওয়া, লুটেরাদের গ্রেপ্তার করা, যান-বাহন বাজেয়াপ্ত করা, আর গেরিলা যুদ্ধ—এ সবেতেই তো নিয়মকে লংঘন করা হয়েছে।

নেপোলিয়ন এটা বুঝতে পেরেছিল ; সময় সময় সে মস্কোতে দ্বৈতযুদ্ধের সঠিক মনোভাবও গ্রহণ করেছে এবং প্রতিপক্ষের তরবারির বদলে মাথার উপরে একটা মুগুরকে উদ্যত হতে দেখে সে কুতুজভ ও সম্রাট আলেক্সান্দারের কাছে এই মর্মে অভিযোগ করতেও ছাড়ে নি যে সব রকম নিয়ম-কানুন লংঘন করে যুদ্ধটা চালানো হচ্ছে—যেন মানুষ মারার ব্যাপারেও কোন নিয়ম-কানুন থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে ফরাসীদের প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং কিছু উচ্চপদস্থ রুশ কর্মচারিকর্তৃক মুগুর-যুদ্ধটা লজ্জাজনক বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও জনযুদ্ধের মুগুরটাকে যথাসম্ভব ক্ষতিকরভাবে ও প্রচণ্ড শক্তিতে উদ্যত করা হল, এবং কারও পরামর্শ, রুচি বা অন্য কিছুর পরোয়া না করে অর্থহীন সরলতার সঙ্গে সেটাকে বার বার তুলতে ও নামাতে লাগল, এবং ফরাসীদের মারতে মারতে একসময় গোটা অভিযানকেই বিধ্বস্ত করে দিল।

১৮১৩ সালে ফরাসীরা যা করেছিল তার পরিবর্তে এরা যে নিয়মমাফিক অভিবাদন জানিয়ে সবিনয়ে ও সমাদরে নিজেদের তরবারির হাতলটা উদার বিজয়ীর দিকে এগিয়ে না ধরে সংকট-মুহূর্তে কোন রকম নিয়মের তোয়াক্কা না করে হাতের কাছে যে মুগুরটা পেয়েছে সেটাকেই তুলে নিয়ে অনবরত আঘাত করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের অন্তরের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার বদলে জেগে উঠেছে অবহেলা ও সহানুভূতি—একটা জাতির পক্ষে সেটা ভালই হয়েছে।

অধ্যায়—২

যুদ্ধের তথাকথিত নিয়মের অন্যতম স্পষ্ট ও সুবিধাজনক ব্যতিক্রম হচ্ছে একত্র সম্মিলিত বহুজনের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট দলে আক্রমণ চালানো। জাতীয় স্তরের যুদ্ধেই এধরনের আক্রমণ চালানো হয়ে থাকে। এধরনের আক্রমণের ক্ষেত্রে দুটো জনতা পরস্পরের মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে দু'দলেই সরে যায়, এককভাবে আক্রমণ করে, অধিকতর শক্তিশালী প্রতিপক্ষের আক্রমণের মুখে পালিয়ে যায়, কিন্তু সুযোগ পেলেই আবার আক্রমণ করে। এই যুদ্ধই করেছিল স্পেনের গেরিলারা, ককেসাসের পার্বত্য জাতিরা, এবং ১৮১২-তে রুশরা।

এধরনের যুদ্ধকে লোকে "গেরিলা যুদ্ধ" বলে ; তারা ধরে নেয় যে নামেই এর তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে। কিন্তু এধরনের যুদ্ধ কোন নিয়মের আওতায় আসে না এবং অব্যর্থ বলে স্বীকৃত একটি সুপরিচিত রণ-নীতির এটা সম্পূর্ণ বিরোধী। সে নীতিটা হল—সংঘর্ষের সময় প্রতিপক্ষের চাইতে অধিকতর শক্তিশালী হতে হলে আক্রমণকারীকে সর্বশক্তি একত্রীভূত করতে হবে।

গেরিলা যুদ্ধ (ইতিহাসই সাক্ষী যে সেটা সর্বদাই সফল) এই নীতিকে

সরাসরি লংঘন করে চলে।

এই স্ববিরোধিতার কারণ হল—সমর-বিজ্ঞানে ধরেই নেওয়া হয় যে একটি বাহিনীর শক্তি ও তার সৈন্যসংখ্যা সমার্থবাচক। সমর-বিজ্ঞান বলে, সৈন্য যত বেশী শক্তিও তত বেশী।

সমর-বিজ্ঞানের পক্ষে এ-কথা বলা আর বলবিদ্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভড়ের উল্লেখ করে বলবেগের সংজ্ঞা নিরূপণ করা একই কথা।

বলবেগ ভড় ও গতির ফলস্বরূপ।

সামরিক ব্যাপারে একটি বাহিনীর শক্তি ভড় এবং একটি অজ্ঞাত কিছুর ফলস্বরূপ।

একটি বাহিনীর শক্তি যে তার আকারের অনুরূপ হয় না, ছোট ছোট দল যে বড় দলকে পরাস্ত করে, তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় দেখতে পেয়ে সমর-বিজ্ঞান অস্পষ্টভাবে একটি অজ্ঞাত শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করে এবং সেটাকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করে।

একটি বাহিনীর মনোবল হচ্ছে সেই অজ্ঞাত শক্তি; তাকে জড় দিয়ে গুণ করলেই আসল শক্তিটাকে পাওয়া যায়। এই অজ্ঞাত কিছুর—একটা বাহিনীর মনোবলের—সংজ্ঞা নিরূপণ করা এবং তার তাৎপর্যকে প্রকাশ করা বিজ্ঞানের একটা সমস্যা।

দশটি সৈনিক, দশটি ব্যাটেলিয়ন, বা দশটি ডিভিশন পনেরোটি সৈনিক, ব্যাটেলিয়ন, বা ডিভিশনের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে—অর্থাৎ অপর-পক্ষকে মেরে ফেলে বা বন্দী করে, অথচ নিজপক্ষের মারা যায় চারজন; তার অর্থ, একপক্ষে যায় চারজন, আর অপরপক্ষে যায় পনেরো জন। ফলে চার হয়ে যায় পনেরোর সমান, আর তাই ৪-ক = ১৫-খ। ফলে ক/খ= ১৫/৪। এই সমীকরণ থেকে আমরা সেই অজ্ঞাত বস্তুর মূল্যমানটা পাই না, পাই দুটো অজ্ঞাতবস্তুর আনুপাতিক হার। বিভিন্ন নির্বাচিত ঐতিহাসিক ঘটনাকে (যুদ্ধ, অভিযান, যুদ্ধের সময়কাল) এই সমীকরণের অন্তর্ভুক্ত করলে এমন একটা সংখ্যা-শ্রেণী পাওয়া যেতে পারে যার মধ্যে নিহিত আছে কতকগুলি বিধি আর সেগুলি অবশ্যই আবিষ্কারযোগ্য।

একটি বাহিনী আক্রমণ চালাবে একযোগে আর পশ্চাদপসরণ করবে ছোট ছোট দলে—রণ-কৌশলের এই নিয়মই অজান্তে স্বীকার করে যে একটি বাহিনীর শক্তি নির্ভর করে তার মনোবলের উপর। আক্রমণ প্রতিহত করতে যে শৃংখলার দরকার একটা সেনাদলকে গোলাগুলির মুখে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার চাইতে অনেক বেশী শৃংখলা প্রয়োজন। কিন্তু এই নিয়মের মধ্যে সেনাদলের মনোবলকে ধরা হয় নি; তাই বার বার এটা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে।

রণকৌশল অনুসারে আত্মরক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হওয়া

উচিত হলেও ফরাসী বাহিনী ১৮১২-তে পশ্চাদপসরণের সময় একটি দলেই সংঘবদ্ধ হয়েছিল, কারণ তখন সেনাদলের মনোবল এতদূর ভেঙে পড়েছিল যে একমাত্র ভয়ই তাদের একত্র রাখতে পেরেছিল। অপরদিকে, নিয়ম অনুসারে রুশদের উচিত ছিল একযোগে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করা, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা ভাগ হয়ে গিয়েছিল ছোট ছোট দলে, কারণ তাদের মনোবল তখন এতই উঁচুপর্দায় উঠেছিল যে কোন একটি সৈনিক বিনা হুকুমে ফরাসীদের উপর আঘাত হানতে লাগল, অথচ বাধ্যতামূলকভাবে নিজেদের কোনরকম দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদের মুখে ঠেলে দিতে হল না।

অধ্যায়—৩

ফরাসীদের স্মোলেন্স্ক-এ প্রবেশের পর থেকেই তথাকথিত দলীয় যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

দলীয় যুদ্ধবিগ্রহ সরকারীভাবে স্বীকৃত হবার আগেই কসাক ও চাষীদের হাতে হাজার হাজার দলছাড়া শত্রুসৈন্য, লুটেরা ও ঘোড়ার খাদ্য-চোর নিহত হয়েছে; একটা দলছাড়া পাগলা কুকুরকে অন্য কুকুররা যেভাবে মেরে ফেলে তারাও এইসব ফরাসীদের সেইভাবেই মেরেছে। দেনিস দাভিদভই প্রথম এধরনের লড়াইয়ের মূল্য বুঝেছিল।

২৪শে অগস্ট দাভিদভের প্রথম দলীয় সেনাদল গঠিত হল; তারপর আরও অনেককে স্বীকৃতি দেওয়া হল। অভিযান যত অগ্রসর হয়ে চলল ততই এধরনের অসংখ্য সেনাদল গড়ে উঠতে লাগল।

এই বেসরকারী সেনাদলগুলি বিরাট বাহিনীটাকে একটু একটু করে ভাগে-ভাগে ধ্বংস করতে লাগল। ফরাসী বাহিনীরূপী শুকনো গাছ থেকে যে-সব পাতা আপনা থেকেই ঝরে পড়ছিল তারা কেবল সেগুলিকে সংগ্রহ করতে লাগল, কখনও বা গাছটাকে ঝাঁকিও দিল। অক্টোবর নাগাদ ফরাসীরা, যখন স্মোলেন্স্ক-এর দিকে পালাতে শুরু করেছে ততদিনে ছোট-বড় নানা আকারের ও চরিত্রের শত শত এই ধরনের সেনাদল গড়ে উঠেছে। কতকগুলি গড়ে উঠল পুরোপুরি সামরিক কায়দায়; তাদের মধ্যে পদাতিক, অশ্বারোহী, কর্মচারি এবং জীবনযাত্রার আয়াস-আরাম সবই ছিল। কতকগুলি গড়ে উঠল কেবলমাত্র কসাক অশ্বারোহী নিয়ে। পদাতিক, অশ্বারোহী, চাষী ও জোতদারদের নিয়েও অনেক দল এখানে-ওখানে গড়ে উঠল; তাদের পরিচয় কেউ জানল না। জনৈক গির্জা-কর্মী একটা দল গড়ে এক মাসে’কয়েক শ শত্রুকে বন্দী করল; আর জনৈক গ্রাম-প্রধানের স্ত্রী ভাসিলিসা কয়েক শ’ ফরাসীকে হত্যা করল।

দলীয় যুদ্ধের আগুন তীব্রতর হয়ে জ্বলে উঠল অক্টোবরের শেষের দিকে।

প্রথম অধ্যায় সবে শেষ হয়েছে; নিজেদের সাহস দেখে যোদ্ধারা নিজেরাই অবাক; প্রতি মিনিটে তাদের শংকা এই বুঝি ফরাসীরা তাদের ঘিরে ফেলে গ্রেপ্তার করে; ঘোড়ার পিঠ থেকে না নেমেই তারা জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, নামবার সাহস হয় না, সর্বদাই ভয় ফরাসীরা বুঝি পিছু নিয়েছে। অক্টোবরের শেষ নাগাদ এধরনের যুদ্ধ একটা নির্দিষ্ট আকার লাভ করল; সকলেই পরিষ্কার বুঝতে পারল ফরাসীদের বিরুদ্ধে কতটা এগুনো যেতে পারে এবং কতটা পারে না। যে ছোট দলগুলি অনেক আগে থেকেই কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং খুব কাছে থেকে ফরাসীদের দেখেছে, তারা যেসব কাজকে সম্ভব বলে মনে করে বড় দলের অধিনায়করা তা কল্পনাও করতে পারে না। যেসব কসাক ও চাষীরা ফরাসীদের মধ্যে লুকিয়ে ঢুকে পড়েছে তারা সবকিছুই সম্ভব বলে মনে করে।

২২শে অক্টোবর বেসরকারী দলের অন্যতম নেতা দেনিসভ তার দলবল নিয়ে গেরিলা উদ্দীপনার একেবারে চরমে উঠল। ভোর থেকে সে সদলবলে এগিয়ে চলেছে। যে জঙ্গলটা বড় রাস্তাটাকে ঘিরে রেখেছে সারাদিন সেই জঙ্গলের ভিতর থেকে সে দেখেছে, অশ্বারোহী বাহিনীর মালপত্র ও রুশ বন্দীদের নিয়ে একটা বড় ফরাসী দল কড়া পাহারায় স্মোলেন্স্ক-এর দিকে এগিয়ে চলেছে। দেনিসভ এবং দলখভ (সেও একটা ছোট দল নিয়ে দেনিসভের কাছাকাছিই ঘোরাফেরা করছিল) ছাড়া কয়েকটা ডিভিশনের কম্যাণ্ডারও এই দলটির কথা জানতে পেরে দাঁতে শান দিতে শুরু করল। এইসব বড় দলের দুজন কম্যাণ্ডার—একজন পোল ও অপরজন জার্মান—সঙ্গে সঙ্গে দেনিসভকে আমন্ত্রণ জানাল, একসঙ্গে দলটিকে আক্রমণ করতে তাদের দলের সঙ্গে যোগ দিতে।

তাদের দলিলপত্র পড়ে দেনিসভ বলল, "না ভাই, আমার নিজেরই যথেষ্ট গোঁফ গজিয়েছে"; জার্মানটিকে লিখে জানাল, এরকম একজন সাহসী ও বিখ্যাত জেনারেলের অধীনে কাজ করবার আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাকে সে সুখ থেকে বঞ্চিত থাকতে হচ্ছে, কারণ সে ইতিমধ্যেই একজন জেনারেলের অধীনে কাজ করছে। পোলিশ জেনারেলকেও সেই একই মর্মে চিঠি লিখে জানাল, সে ইতিমধ্যেই একজন জার্মান জেনারেলের অধীনে কাজ করছে।

এইভাবে সব বন্দোবস্ত করে দেনিসভ ও দলখভ স্থির করল, উপরওয়ালাদের কিছু না জানিয়ে নিজেদের ছোট দল নিয়েই তারা ঐ যাত্রীদলটিকে আক্রমণ করে দখল করে নেবে। ২২শে অক্টোবর দলটা মিকুলিনো গ্রাম থেকে শামশেভো গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। মিকুলিনো ও শামশেভোর মাঝখানে রাস্তার বাঁ দিকে মস্তবড় সব জঙ্গল কোথাও একেবারে রাস্তা পর্যন্ত প্রসারিত, আবার কোথাও বা রাস্তা থেকে এক ভার্স্ট বা তার কিছু দূরে

অবস্থিত। দেনিসভ ও তার দল সারাদিন সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে গেল; কখনও জঙ্গলের বেশ ভিতর দিয়ে, কখনও বা জঙ্গলের একেবারে কিনারা ধরে; কিন্তু কোন সময়ই আগুয়ান ফরাসী দলটিকে দৃষ্টির বাইরে যেতে দিল না। সকালেই দেনিসভের দলের কসাকরা ঘোড়ার জিন-ভর্তি দুটো মালগাড়িকে আক্রমণ করে নিয়ে এল; জঙ্গল যেখানে রাস্তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে সেখানে গাড়ি দুটো কাদায় আটকে গিয়েছিল। তারপর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দলটা ফরাসীদের উপর সারাক্ষণ নজর রেখেছে, কিন্তু আক্রমণ করে নি। ফরাসী দলটাকে নির্ভয়ে চুপচাপ শাম্‌শেভোতে পৌঁছতে দেওয়া দরকার, কারণ পূর্ব ব্যবস্থা মত সেখানে একটি পাহারাওয়ালার কুটিরে দলখভের আসার কথা আছে; তারপরেই ভোরবেলা তারা অতর্কিতে দুদিক থেকে দলটার মাথার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তুষারপিণ্ডের মত; এক আঘাতেই তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিয়ে দখল করে নেবে।

তাদের পিছনে মিকুলিনো থেকে দুই ভার্স্ট' দূরে জঙ্গলটা যেখানে রাস্তা পর্যন্ত প্রসারিত সেখানে ছয় জন কসাককে মোতায়েন করা হয়েছে; কোন নতুন ফরাসী দলকে দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের খবর দিতে হবে।

শামেশেভো ছাড়িয়ে রাস্তার উপর অনুরূপভাবে নজর রাখবে দলখভ; অন্য ফরাসী সৈন্যরা কতদূরে আছে সেদিকে খেয়াল রাখবে সে। তাদের হিসাবমত এই দলটাতে পনেরো শ' লোক আছে। দেনিসভের আছে দু'শ,' আর দলখভের লোকের সংখ্যাও ঐরকমই। কিন্তু সংখ্যার এই তারতম্য দেনিসভকে দমাতে পারল না। তার এখন একমাত্র জানা দরকার এরা সব কোন্‌ সৈন্য এবং শত্রুপক্ষের ভিতর থেকে একটা "জিভ"—অর্থাৎ একটা লোককে গ্রেপ্তার করা যায় কি না সকালবেলাকার মালগাড়ির উপর আক্রমণটা এত দ্রুত সারা হয়েছিল যে মালগাড়ির সঙ্গে যে ফরাসী সৈন্য ছিল তাদের সকলকেই মেরে ফেলা হয়েছে; কেবল একটা ঢাক বাজিয়ে ছেলেকে জীবন্ত ধরা হয়েছে; কিন্তু যেহেতু সেও দলছাড়া তাই সেনাদল সম্পর্কে বিশেষ কোন খবরই সে বলতে পারল না।

গোটা সেনাদল পাছে সতর্ক হয়ে যায় এই ভয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করাটা দেনিসভ বিপজ্জনক বলেই মনে করছে। তাই সে তার দলের চাষী তিখন শ্‌চেরবাতিকে শাম্‌শেভোতে পাঠিয়েছে, যাতে সে অন্তত এমন একজন ফরাসী ভাণ্ডারীকেও ধরে আনতে পারে যাকে আগে আগে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায়—৪

হেমন্তের একটি আতপ্ত বর্ষার দিন। আকাশে ও দিগন্তে ঘোলা জলের রং। মাঝে মাঝে একটা কুয়াসা নেমে আসছে, আর তারপরেই হঠাৎ বৃষ্টির

তির্যক ফোঁটা পড়তে শুরু করছে।

গায়ে জোব্বা ও মাথায় ভেড়ার চামড়ার টুপি চড়িয়ে দেনিসভ একটা শুঁটকো ঘোড়ায় চেপে চলেছে। পোশাক বেয়ে বৃষ্টির ধারা গড়িয়ে পড়ছে। ঘোড়াটা মাথা ঘুরিয়ে কান হেলিয়ে চলেছে। ঘোড়ার মতই বৃষ্টির ছাঁট এড়াবার জন্ম সেও মুখ ঘুরিয়ে সাবধানে সামনের দিকে তাকাচ্ছে। ছোট ঘন কালো দাড়িওয়ালা সরু মুখটাকে রাগী দেখাচ্ছে।

দেনিসভের পাশেই যথারীতি রয়েছে তার এক সহকর্মী; জোব্বা ও ভেড়ার চামড়ার টুপি পরে সেও চলেছে একটা বড় চকচকে ডন ঘোড়ায় চেপে।

তৃতীয় এসাউল লভায়েস্কি লোকটি দীর্ঘকায়; একটা তীরের মত খাড়া; মুখ বিবর্ণ, চুল ভাল, কুতকুতে হাল্কা চোখ, মুখে ও চালচলনে শান্ত আত্মতুষ্টির প্রকাশ।

তাদের আগে আগে হেঁটে চলেছে একটি চাষী পথ-প্রদর্শক। পরনে ধূসর চাষী কোট, মাথায় সাদা বোনা টুপি।

কিছুটা পিছনে মস্ত লেজ ও লোমশ একটা ছোট, শুট্‌কো কির্‌ঘিজ ঘোড়ায় চেপে চলেছে নীল রঙের ফরাসী ওভারকোট পরা একটি তরুণ অফিসার। ঘোড়াটার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে।

তার পিছনে ঘোড়ায় চেপে চলেছে একজন হুজার। তার পিছনে ঘোড়ার পাছার উপর বসে চলেছে ছেঁড়া ফরাসী ইউনিফর্ম ও নীল টুপি পরা একটা ছেলে। ঠাণ্ডা লাল হাত দিয়ে ছেলেটা হুজারকে ধরে আছে; ভুরু তুলে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছে। এটিই সে ফরাসী ঢাক-বাজিয়ে ছেলে যাকে সকালে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

তাদের পিছন-পিছন জঙ্গল-কাটা বনপথ ধরে চলেছে তিন-চার সারি হুজার, তারপর কসাক; তাদের কারও পরনে পশমী জোব্বা, কারও ফরাসী ওভারকোট, কারও বা মাথায় ঘোড়ার কাপড় ছড়ানো। ঘোড়াগুলো আসলে বাদামী বা ফুটফুট রঙের যাই হোক না কেন, বৃষ্টিতে ভিজে এখন সবগুলোকেই কালো দেখাচ্ছে। লোমগুলো ভিজে জট পাকিয়ে যাওয়ায় ঘাড়গুলোকে খুব সরু মনে হচ্ছে। গা থেকে ধোঁয়া উঠছে। জামা, জিন, লাগাম, সব কিছুই রাস্তায় জমে-থাকা পচা পাতার মত জলে ভিজে পিছল ও স্যাঁৎসেতে হয়ে উঠেছে। বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কসাকদের সারির মধ্যে ফরাসী ও কসাকদের ঘোড়ায় টানা দুটো মালগাড়ি গাছের কাটা ডালপালা ও গর্তের জলের ভিতর দিয়ে কোন রকমে এগিয়ে চলেছে।

রাস্তার মধ্যে একটা জলের গর্তকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে দেনিসভের ঘোড়াটা একপাশে কিছুটা সরে যেতেই চালকের হাঁটুটা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

"আঃ, মহা শয়তান !" দেনিসভ রেগে চেঁচিয়ে উঠল ; দাঁত বের করে তিন চাবুক কসাল ঘোড়াটার পিঠে ; নিজের ও সঙ্গীদের গায়ে ছিটকে এসে কাদা লাগল।

একে বৃষ্টি তায় ক্ষুধা (সকাল থেকে কারও কিছু খাওয়া হয় নি), দেনিসভের মন-মেজাজ এমনিতেই ভাল নেই ; তার উপর এখনও পর্যন্ত দলখভের কোন পাত্তা নেই, এবং একটা "জিভ্"কে আটক করতে যে লোকটাকে পাঠানো হয়েছে সেও এখনও ফেরে নি।

"একটা যান-বাহনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আজকের মত সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। একা একা ওদের আক্রমণ করার অনেক ঝুঁকি ; আর আক্রমণটা যদি একদিন পিছিয়ে দেই তাহলে বড় কোন গেরিলা দল আমাদের নাকের উপর দিয়ে শিকারটা ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।" ভাবতে ভাবতেই দেনিসভ অনবরত সামনের দিকে তাকাচ্ছে ; মনে আশা, যদি দলখভের কোন লোককে দেখতে পায়।

জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা পথে তারা পৌঁছে গেল যেখান থেকে ডান দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। দেনিসভ থামল।

বলল, "কে যেন আসছে।"

এসাউলও সেইদিকে তাকাল। বলল, "দুজন আসছে, একজন অফিসার ও একজন কসাক। কিন্তু লেফ্‌টেনান্ট-কর্নেল স্বয়ং আসছেন বলে তো মনে হচ্ছে না।"

একটা উৎরাই ধরে নেমে যাওয়ায় ফলে অশ্বারোহী দুজনকে আর দেখা গেল না ; কিন্তু কয়েক মিনিট পরে আবার তারা দেখা দিল। সামনে একজন অফিসার ; চুল ও পোশাক জলে ভিজে গেছে ; হাতের চামড়ার চাবুকটা চালাচ্ছে ; ট্রাউজার উঠে গেছে হাঁটুর উপরে। পিছনে রেকাবে পা রেখে দাঁড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে একটি কসাক। অফিসারটির বয়স খুবই অল্প, চওড়া গোলাপী মুখ, তীক্ষ্ণ ফুর্তিবাজ চোখ ; ঘোড়া ছুটিয়ে দেনিসভের কাছে পৌঁছে তার হাতে একটা ভেজা খাম দিল।

বলল, "জেনারেলের কাছ থেকে। খামটা শুকনো নেই বলে ক্ষমা করবেন।"

ভুরু কুঁচকে দেনিসভ খামটা নিয়ে খুলে ফেলল।

লভায়েস্কিকে লক্ষ্য করে অফিসারটি বলল, "সেখানে সকলেই অনবরত বলেছে : 'এটা বিপজ্জনক, এটা বিপজ্জনক।' কিন্তু কমারভ ও আমি—" কসাকটিকে দেখাল—"প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে পিস্তল আছে।…কিন্তু এ কে ?" ঢাক-বাজিয়ে ছোকরাকে দেখে সে প্রশ্ন করল। "কোন বন্দী কি ? আপনারা এরই মধ্যে লড়াই শুরু করে দিয়েছেন ? ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি কি ?"

চিঠিটা পড়ে দেনিসভ চেঁচিয়ে বলল, "রস্তভ! পেত্য়া! কেন বল নি তুমি কে?" সে হেসে তরুণের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

অফিসারটি পেত্য়া রস্তভ।

সারাটা পথ পেত্য়া নিজেকে তালিম দিতে দিতে এসেছে—পূর্ব পরিচয়ের কথা না জানিয়ে দেনিসভের সঙ্গে একজন বয়স্ক লোকের মতই ব্যবহার করবে। কিন্তু দেনিসভ হেসে উঠতেই পেত্য়ার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, খুশিতে তাতে লালের ছোপ লাগল, এতক্ষণ পর্যন্ত যে সরকারী আদব-কায়দার তালিম নিচ্ছিল সেটা ভুলে গিয়ে দেনিসভকে বলতে লাগল, ইতিমধ্যেই ভিয়াজমার কাছে একটা যুদ্ধে সে অংশ নিয়েছে, এবং হুজার হিসাবে সেখানে বেশ বিখ্যাত হয়ে উঠেছে।

দেনিসভ তাকে বাধা দিয়ে বলল, "তোমাকে দেখে খুশি হলাম।" তার মুখে আবার উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠল।

সঙ্গীকে বলল, "মাইকেল ফিয়কৃলিতিচ, জান আবার সেই জার্মানের চিঠি।" পেত্য়াকে দেখিয়ে বলল, "ও তো তার অধীনেই আছে।"

দেনিসভ সঙ্গীকে জানাল, চিঠিতে জার্মান জেনারেলটি আবারও সেই দাবীই জানিয়েছে যে যানবাহনের উপর আক্রমণ চালাতে সে যেন তার সঙ্গে হাত মেলায়।

তারপর বলল, "আমরা যদি এ সুযোগ না নেই, তাহলে কাল সেই আমাদের নাকের উপর দিয়ে সুযোগটা ছিনিয়ে নেবে।"

নতুন করে অ্যাড্জুটান্ট ও জেনারেলের খেলা শুরু করে পেত্য়া অভিবাদনের ভঙ্গীতে হাত তুলে বলল, "কোন হুকুম দেবেন কি ইয়োর অনার? না কি আমি আপনার সঙ্গেই থাকব?"

"হুকুম?" দেনিসভ চিন্তিতভাবে বলল। "তুমি কি কাল পর্যন্ত থাকতে পারবে?"

"আহা, তাই করুন…আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারি কি?" পেত্য়া চেঁচিয়ে বলল।

দেনিসভ শুধাল, "কিন্তু জেনারেল তোমাকে ঠিক কি বলে দিয়েছে? এখনি ফিরতে বলেছে কি?"

পেত্য়ার মুখ লাল হয়ে উঠল।

"তিনি কিছুই বলেন নি। আমার তো মনে হয় থাকতে পারি।"

দেনিসভ বলল, "বেশ, ঠিক আছে।"

নিজের লোকদের দিকে ফিরে একটা দলকে বিশ্রামস্থলে যেতে বলল; জায়গাটা জঙ্গলের মধ্যে পাহারাদারের কুটিরের কাছে; কিবৃঘিজ ঘোড়সওয়ার অফিসারটিকে বলল দলখভের খোঁজ করতে এবং সে সন্ধ্যায় আসবে কি না সেটা জানতে। দেনিসভের নিজের ইচ্ছা, সঙ্গী ও পেত্য়াকে নিয়ে

জঙ্গলের সেই প্রান্তে চলে যাবে যেখানে সেটা শাম্‌শেভো পর্যন্ত বিস্তৃত; ফরাসীদের যে সাময়িক আশ্রয়স্থলটাকে পরদিন আক্রমণ করা হবে সেখান থেকে তার কিছু অংশের উপর নজর রাখা যাবে।

চাষী পথ-প্রদর্শককে বলল, "আচ্ছা বুড়ো, আমাদের শাম্‌শেভোতে নিয়ে চল।"

দেনিসভ, পেত্‌য়া, ও সঙ্গীটি কসাক ও হুজারদের সঙ্গে নিয়ে একটা খাঁড়ি পেরিয়ে বাঁ দিক দিয়ে জঙ্গলের শেষ প্রান্তের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

অধ্যায়—৫

বৃষ্টি থেমে গেছে। শুধু কুয়াসা নামছে, আর গাছ থেকে জলের ফোঁটা পড়ছে। দেনিসভ, তার সঙ্গী ও পেত্‌য়া নীরবে চলেছে। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বোনা টুপি মাথায় চাষীটি। বাকলের জুতো পায়ে গাছের শিকড় ও ভেজা পাতার উপর দিয়ে সে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের শেষ প্রান্তের দিকে।

একটা উঁচু জায়গায় উঠে সে থামল, চারদিকে তাকাল, তারপর যেখানে গাছগুলো ফাঁকাফাঁকা সেইদিকে এগিয়ে চলল। একটা বড় ওক গাছের পাতাগুলি এখনও ঝরে পড়েনি। সেখানে পৌঁছে হাত বাড়িয়ে সে রহস্যজনকভাবে ইঙ্গিতে কি যেন দেখাল।

দেনিসভ ও পেত্‌য়া ঘোড়া ছুটিয়ে তার কাছে এগিয়ে গেল। চাষীটি যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে তারা ফরাসীদের দেখতে পেল। বনের ঠিক ওপারে একটা উৎরাইয়ের বুকে বসন্তকালীন গমের একটা ক্ষেত দেখা গেল। ডান দিকে একটা গভীর খাঁড়ির ওপারে একটা ছোট গ্রাম ও ভাঙা ছাদওয়ালা একটা বাড়িও আছে। গ্রামের মধ্যে, বাড়িটাতে, বাগানে, কূয়োর পাশে, পুকুরের ধারে, সবটা উঁচু জায়গায়, সেতুটা থেকে রাস্তা বরাবর পাঁচ'শ' গজ দূর পর্যন্ত আগাগোড়া মানুষের পর মানুষের জমায়েত চোখে পড়ল কাঁপা কাঁপা কুয়াসার ভিতর দিয়ে। অ-রুশ ভাষায় ঘোড়াগুলোকে ডাকাডাকি এবং পরস্পরের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে।

ফরাসীদের উপর থেকে চোখ না সরিয়েই দেনিসভ নীচু গলায় বলল, "বন্দীকে এখানে নিয়ে এস।"

একটি কসাক ঘোড়া থেকে নেমে ছেলেটিকে তুলে দেনিসভের কাছে নিয়ে গেল। ফরাসী সৈন্যদের দেখিয়ে দেনিসভ তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে-ওখানে যারা রয়েছে তারা কারা। ঠাণ্ডা হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে ভুরু দুটো তুলে ছেলেটি সভয়ে দেনিসভের দিকে তাকাল, কিন্তু যা কিছু সে

জানে সব কথা বলার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে এলোমেলো জবাব দিতে লাগল ; দেনিসভ যা জিজ্ঞাসা করল তাতেই সায় দিয়ে চলল। ভুরু কুঁচকে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে দেনিসভ তার সঙ্গীর অনুমান জানতে চাইল।

পেত্য়া দ্রুত মাথা ঘুরিয়ে একবার ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটির দিকে, একবার দেনিসভের দিকে, একবার তার সঙ্গীর দিকে, এবং একবার গ্রাম ও পথ বরাবর অবস্থিত ফরাসীদের দেখতে লাগল। তার একমাত্র চেষ্টা, কোন কিছুই যেন দৃষ্টি না এড়ায়।

চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে করতে দেনিসভ বলল, “দলখণ্ড আসুক আর না আসুক, আমরা ওদের দখল করবই।”

সঙ্গী বলল, “জায়গাটা খুবই উপযুক্ত।”

দেনিসভ বলল, “ঠিক আছে, জলাভূমির পাশ দিয়ে পদাতিক সেনাদের পাঠাও। তারা বাগানটা পর্যন্ত ধেয়ে যাবে। তুমি কসাকদের নিয়ে ওখানে গিয়ে ঘিরে ফেলবে”—সে গ্রামের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাল—“আর হুজারদের নিয়ে আমি যাব এখান থেকে। আর সংকেত করা মাত্রই গুলি…”

সঙ্গী বলল, ‘‘গহ্বরটা অনতিক্রমণীয়—ওখানেও একটা জলাভূমি আছে। ঘোড়াগুলো ডুবে যাবে। আমাদের ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে হবে আরও বাঁ দিক দিয়ে…”

তারা যখন নীচু গলায় কথা বলছে সেই সময় পুকুরের পাশের নীচু জমিটা থেকে একটা গুলির শব্দ হল, একটা সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল, তারপর আর একটা, আর সঙ্গে সঙ্গে নীচের ঢালু জায়গাটা থেকে শত শত ফরাসীর খুশির হৈ-হল্লা শোনা গেল। মুহূর্তের জন্য দেনিসভ ও তার সঙ্গী সরে গেল। তারা এত কাছে চলে গিয়েছিল যে তারা ভাবল যে তারাই এই গুলি ও হৈ-হল্লার কারণ। কিন্তু তাদের জন্য সেসব হয় নি। আরও নীচে একটা লোক লাল পোশাক পরে জলাভূমির ভিতর দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। ফরাসীরা তাকে লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়েছে, চেঁচামেচি করেছে।

সঙ্গীটি বলল, “সে কি, ও যে আমাদের তিখন।”

“তাই তো! তাই তো!”

“রাস্কেল।” দেনিসভ বলল।

“ও ঠিক চলে যাবে,” চোখ কুঁচকে সঙ্গী বলল।

যাকে ওরা তিখন বলল সে দৌড়ে নদীর কাছে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিল, জল ছিটকে উঠল, মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল, তারপর হাত-পা ছুঁড়ে জল থেকে উঠেই ছুট লাগাল। ফরাসীরা তার পিছু নিয়ে শেষটা থেমে গেল।

“লোকটা চালাক আছে,” সঙ্গীটি বলল।

বিরক্ত মুখে দেনিসভ বলল, ‘‘কি জানোয়াররে বাবা। এতক্ষণ ও কি

করছিল ?"

"লোকটা কে ?" পেত্য়া শুধাল।

আমাদের "প্লাস্তন" (পদাতিক বন্দুকবাজ)। একটা "জিভকে" ধরে আনতে ওকে পাঠিয়েছিলাম।

"ওঃ, তাই," পেত্য়া এমনভাবে মাথা নেড়ে কথাটা বলল যেন সে সব কিছু বুঝতে পেরেছে ; আসলে কিন্তু সে কিছুই বোঝে নি।

তিখন শ্চেরবাতি তাদের দলের অপরিহার্য লোকদের অন্যতম। সে গজাত নদীর কাছাকাছি পক্রোভ্স্ক-এর একজন চাষী। কাজের ভার নিয়ে দেনিসভ যখন প্রথম পক্রোভ্স্ক-এ এসেছিল এবং গ্রাম-প্রধানকে ডেকে ফরাসীদের খোঁজ-খবর জানতে চেয়েছিল তখন অন্য সব গ্রাম প্রধানদের মতই নিজেকে বাঁচাবার জন্য সে বলেছিল, কোন ফরাসীকে সে দেখে নি, বা তাদের সম্পর্কে কিছু শোনেও নি। কিন্তু দেনিসভ যখন বুঝিয়ে বলল যে ফরাসীদের মেরে ফেলাই তার উদ্দেশ্য, আর তাই সে জানতে চাইছে সে-অঞ্চলে কোন ফরাসী এসেছে কি না, তখন গ্রাম-প্রধান জবাব দিল যে কিছু লুটেরা তাদের গ্রামে এসেছিল, কিন্তু একমাত্র তিখন শ্চেরবাতিই তাদের খোঁজ খবর রাখে। দেনিসভ তিখনকে ডাকিয়ে এনে তার কাজকর্মের অনেক প্রশংসা করে গ্রাম-প্রধানের সামনেই জার ও দেশের প্রতি আনুগত্য এবং পিতৃভূমির সব সন্তানেরই যে ফরাসীদের ঘৃণা করা উচিত সেবিষয়ে কিছু কথা বলেছিল।

দেনিসভের কথায় ভয় পেয়ে তিখন বলেছিল, "আমরা তো ফরাসীদের কোন ক্ষতি করি নি। কি জানেন, তাদের নিয়ে একটু মজা করেছি আর কি। জন বিশেকের মত লুটেরাদের মেরে ফেলেছি বটে, কিন্তু আর কারও কোন ক্ষতি তো করি নি…"

পরদিন চাষীটির কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে দেনিসভ যখন পক্রোভ্স্ক ছেড়ে চলে গেল তখন তাকে জানানো হল যে তিখন তাদের দলে যোগ দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে থাকার অনুমতি চাইছে। দেনিসভ অনুমতি দিয়েছে।

প্রথম দিকে তিখন আজেবাজে কাজগুলি করত ; আগুন জ্বালাত, জল আনত, মরা ঘোড়ার চামড়া ছাড়াত, ইত্যাদি ; কিন্তু অচিরেই দলীয় লড়াইয়ের প্রতি তার আকর্ষণ ও যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া গেল। রাতের বেলা লুঠতরাজ করতে বেরিয়ে ফরাসীদের পোশাক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসত ; বলে দিলে কিছু বন্দীও ধরে আনত। তখন দেনিসভ তাকে আজেবাজে কাজ থেকে মুক্তি দিয়ে অভিযানে বের হবার সময় তাকে সঙ্গে নিত এবং তাকে কসাকদের সঙ্গে ভর্তি করে নিল।

তিখন ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসে না ; সব সময় পায়ে হেঁটে চলে ; কিন্তু

কখনও অশ্বারোহীদের থেকে পিছনে পড়ে থাকে না। তার সঙ্গে থাকে একটা ছোট বন্দুক, একশ' বর্শা ও একটা কুড়ুল। তিখন খুব ভালভাবে কাঠ চিরতে পারে, কুড়ুল দিয়ে ছোট ছোট কাঠের পেরেক ও চামচে বানাতে পারে। দেনিসভের দলে তার একটা বিশিষ্ট আসন তৈরি হয়েছে। যখনই বিশেষ কষ্টকর ও বাজে কোন কাজ করার দরকার হয়—একটা গাড়িকে কাদার ভিতর থেকে ঠেলে তোলা, লেজ ধরে টেনে একটা ঘোড়াকে জলাভূমির ভিতর থেকে বের করে আনা, তার ছাল ছাড়ানো, ফরাসীদের মধ্যে ঢুকে পড়া, অথবা একদিনে ত্রিশ মাইলের বেশী হাঁটা—তখন সকলেই হাসতে হাসতে তিখনকে দেখিয়ে দেয়।

সকলেই বলে, "এতে শয়তানটার কিছু হবে না—ও তো ঘোড়ার মত শক্তি রাখে।"

একবার তিখন একটি ফরাসীকে গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করলে ফরাসীটি পিস্তল ছুঁড়ে তার পিঠের মাংসল জায়গাটাতে গুলি করেছিল। ভদ্কা খেয়ে ও তার প্রলেপ লাগিয়েই তিখন সে ঘাটা সারিয়ে তুলেছিল। সেই থেকে দলের সকলেই ঘটনাটা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে, আর তিখনও হাসিমুখে তাতে যোগ দেয়।

কসাকরা তাকে ক্ষেপাবার জন্য বলে, "হ্যালো সাঙাৎ! আর কখনও যাবে? কেমন একখানা দিয়েছে?" তিখন রাগের ভান করে ইচ্ছা করেই চোখ-মুখ পাকিয়ে ফরাসীদের সম্পর্কে নানারকম হাসির কথা বলে এই ঘটনায় তিখনের আচরণে একটাই পরিবর্তন দেখা গেল—আহত হবার পর থেকে সে আর কাউকে বন্দী করে আনে না।

দলের মধ্যে সেই সবচাইতে সাহসী ও দরকারী লোক। আক্রমণের অধিকতর সুযোগ আর কেউ পায় নি, আর কেউই তার চাইতে বেশী ফরাসীদের গ্রেপ্তার করতে বা মারতে পারে নি; ফলে সব কসাক ও হুজাররাই তাকে ভাঁড় বানিয়ে তুলেছে, আর সেও স্বেচ্ছায় সে ভূমিকাটিকে মেনে নিয়েছে। গত রাতে দেনিসভ তাকে শামশেভো পাঠিয়েছে একটি "জিভ"কে গ্রেপ্তার করে আনতে। কিন্তু হয় মাত্র একটি ফরাসীকে নিয়ে আসতে তার মন চায় নি, অথবা সারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে; কারণ যাই হোক এখন দিনের বেলায় ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে একেবারে ফরাসীদের আওতার মধ্যে ঢুকে পড়েছে এবং—উপর থেকে দেনিসভ যে-রকমটা দেখতে পেয়েছে—ফরাসীরাও তাকে ঠিক দেখতে পেয়েছিল।

অধ্যায়—৬

পরদিনের আক্রমণ সম্পর্কে সঙ্গীর সঙ্গে কিছু কথা বলে দেনিসভ ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফিরে চলল।

পেত্‌রাকে বলল, "চল হে ছেলে, এবার গিয়ে শরীরটাকে শুকিয়ে নেওয়া যাক।"

পাহারা-ঘরে পৌঁছে দেনিসভ থেমে জঙ্গলের দিকে ভাল করে তাকাল। গাছপালার ভিতর দিয়ে একটি লোক লম্বা হাল্কা পায়ে এগিয়ে আসছে। তার পা দুটি লম্বা, লম্বা হাত দুটি দু' পাশে ঝুলছে, পরনে খাটো কুর্তা, বাকলের জুতা ও কাজান টুপি। তার কাঁধে একটা ছোট বন্দুক, আর কোমরবন্ধে একটা কুড়ুল গোঁজা। দেনিসভকে দেখেই সে তাড়াতাড়ি কি একটা যেন ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিল, মাথার ভিজে টুপিটা খুলল। তারপর কম্যাণ্ডারের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটি তিখন। বলীরেখা ও ছোট ছোট গর্তভরা মুখ ও ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটি আত্মতৃপ্তির খুশিতে ঝিল্‌মিল্‌ করছে। মাথাটা তুলে যেন একটা হাসিকে চেপে রেখে দেনিসভের দিকে তাকাল।

"আচ্ছা, তুমি কোথায় উধাও হয়েছিলে," দেনিসভ শুধাল।

ক্যাসফেঁসে অথচ সুরেলা মোটা গলায় তিখন সাহসের সঙ্গে তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "কোথায় উধাও হয়েছিলাম? আমি তো গিয়েছিলাম ফরাসীদের ধরে আনতে।"

"দিনের আলোয় ওখানে ঢুঁ মেরেছিলে কেন? গাধা কোথাকার! আচ্ছা, একটাকেও আন নি কেন?"

"আহা, একটাকে তো ঠিকই এনেছিলাম," তিখন বলল।

"সে কোথায়?"

"দেখুন, খুব ভোরেই তাকে ধরেছিলাম," তিখন বলতে লাগল। "তাকে জঙ্গলে নিয়ে এলাম। পরে বুঝলাম তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। তাই ভাবলাম আবার গিয়ে একটু ভাল কাউকে আনব।"

দেনিসভ সঙ্গীকে বলল, "দেখলে তো?…কী শয়তান—ঠিক যা ভেবেছিলাম। তাকেই নিয়ে এলে না কেন?"

তিখন সঙ্গে সঙ্গে সক্রোধে বলে উঠল, "তাকে এনে কি লাভ হত? তাকে দিয়ে আপনার কাজ হত না। আপনার কি রকম লোক চাই তা যেন আমি জানি না!"

"তুমি একটা জানোয়ার!…তারপর?"

তিখন বলতে লাগল, "আর একজনের খোঁজে গেলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এইভাবে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে শুয়ে পড়লাম। (হঠাৎ সে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল।) একজন এসে হাজির হল, অমনি তাকে জাপটে ধরলাম, এইভাবে। (সে লাফিয়ে উঠল।) বললাম, 'চল কর্ণেলের কাছে।' সে চেঁচাতে শুরু করে দিল, আর হঠাৎ তারা চারজন হয়ে গেল। ছোট ছোট তলোয়ার নিয়ে তারা আমার দিকে ধেয়ে এল। আমিও কুড়ুল নিয়ে রুখে দাঁড়ালাম, এইভাবে: বললাম, 'তোমরা কি করতে চাও? খ্রীস্ট তোমাদের

সহায় হোন।'" বুকটা চিতিয়ে ক্রুদ্ধ গলায় চীৎকার করে হাত নেড়ে তিখন বলল।

চোখ মিট্‌মিট্ করে তাকিয়ে সঙ্গীটি বলল, "হ্যাঁ, তুমি যে জলের ভিতর দিয়ে কিভাবে পালাচ্ছিলে সেটা আমরা পাহাড়ের উপর থেকে দেখেছি।"

পেত্‌য়ার ভীষণ হাসি পেল, কিন্তু তারা কেউই হাসল না। এসবের অর্থ কি বুঝতে না পেরে সে একবার তিখনের মুখের দিকে, একবার সঙ্গীটির এবং একবার দেনিসভের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

রাগে কাশতে কাশতে দেনিসভ বলল, "ওসব ভাঁড়ামি রাখ! প্রথমটিকেই কেন ধরে আনলে না?"

তিখন এক হাতে পিঠ ও অন্য হাতে মাথা চুলকোতে লাগল; তারপর হঠাৎ বোকার মত দন্তপাতি বিকশিত করল; ফলে একটা পড়া দাঁতের ফোঁকলা জায়গাটা বেরিয়ে পড়ল (এই জন্যই তাকে শ চেরবাতি—অর্থাৎ ফোঁকলা-দাঁতি বলে ডাকে)। দেনিসভ মুচকি হাসল; পেত্‌য়া খুশিতে হো-হো করে হেসে উঠল; তিখনও সে হাসিতে যোগ দিল।

তিখন বলল, "আহা, সে যে একেবারেই অকর্মার ধাড়ি। তার পোশাক—তাও বাজে! তাকে আনি কেমন করে? আর কী অভদ্র, ইয়োর অনার। বলে কি না, 'আমি নিজেই তো একজন জেনারেলের ছেলে, আমি যাব না!'"

দেনিসভ বলল, "তুমি একটা জানোয়ার। আমি চেয়েছিলাম তাকে প্রশ্ন করে···"

তিখন বলল, "কিন্তু আমি তাকে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলল বিশেষ কিছু জানে না। আরও বলল, 'আমরা তো অনেকে রয়েছি, কিন্তু সকলেই এলেবেলে—নামেই সৈনিক। জোর গলায় একটা হাঁক দাও, দেখবে সবগুলো ধরা দেবে।'" দেনিসভের চোখে চোখ রেখে তিখন হেসে ফেলল।

"তোমাকে একশ' চাবুক লাগাব—ভাঁড়ামি করার মজা শিখিয়ে দেব!" দেনিসভ রুক্ষকণ্ঠে বলল।

তিখন সক্ষোভে বলল, "কিন্তু আপনি রাগ করছেন কেন? এমন ভাব দেখাচ্ছেন যেন আপনার ফরাসীদের আমি চোখেই দেখি নি। অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত সবুর করুন, আপনার যে ক'জন চাই এনে দেব—চান তো তিন জনকে এনে দেব।"

"ঠিক আছে; এবার চলা যাক," বলে দেনিসভ ঘোড়া চালিয়ে দিল; পাহারা-ঘর পর্যন্ত রাগে ভুরু কুঁচকে চুপচাপ চলতে লাগল।

তিখন কিছুটা পিছিয়ে পড়ল। পেত্‌য়া শুনতে পেল, তিখন যে বুটজোড়া ঝোপের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছিল তা নিয়ে কসাকরা তিখনের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করছে।

তিখনের কথা শুনে ও হাসি দেখে পেত্‌য়া যেরকম হাসির দমকে ফেটে পড়েছিল সেটা কেটে যেতে এবং তিখন একটা মানুষকে মেরে ফেলেছে সে-কথা বুঝবার পরে পেত্‌য়া খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সে ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটার দিকে তাকাল; বুকের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করল। কিন্তু এ অস্বস্তি শুধু মুহূর্তের জন্য। তার মনে হল, তাকে মাথা উঁচু করে চলতে হবে, সাহস দেখাতে হবে, আগামীকালের অভিযান সম্পর্কে সঙ্গীটির সঙ্গে আলোচনা করতে হবে; যে দলে সে এসে পড়েছে তার উপযুক্ত তাকে হতেই হবে।

যে অফিসারটিকে খবর নিতে পাঠানো হয়েছিল তার সঙ্গে পথেই দেখা হয়ে গেল। সে খবর দিল, দলখভ অচিরেই এসে পড়বে এবং সে বহাল তবিয়তেই আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দেনিসভ খুশি হয়ে উঠল। পেত্‌য়াকে কাছে ডেকে বলল: “আরে, এবার তোমার কথা বল।”

অধ্যায়—৭

পরিবারের লোকজনরা মস্কো ত্যাগ করার পরেই পেত্‌য়া তাদের ছেড়ে নিজের রেজিমেন্টে যোগ দেয় এবং অচিরেই একটা বড় গেরিলা দলের অধিনায়ক জেনারেল তাকে আর্দালি হিসাবে নিয়ে নেয়। কমিশন পাবার পর থেকে, বিশেষ করে যবে থেকে সে সক্রিয় সেনাদলে যোগ দিয়েছে এবং ভিয়াজ্‌মার যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, তখন থেকে বড় হয়ে ওঠার একটা সানন্দ উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে; সত্যিকারের বীরত্বপূর্ণ কিছু করবার কোন সুযোগ যাতে হাতছাড়া হয়ে না যায় তার জন্য সে সদাসর্বদাই একান্ত তৎপর। সেনাবাহিনীতে এসে সে যা কিছু দেখেছে ও জেনেছে তাতে তার মন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার এও মনে হয়েছে যে সে যেখানে যেখানে থাকছে না আসল বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধটা সেখানেই ঘটে যাচ্ছে। তাই যেখানে সে নেই সেখানেই ছুটে যেতে তার এত তাড়া।

২১শে অক্টোবর তার জেনারেল জানাল যে একজন কাউকে দেনিসভের দলের কাছে পাঠাতে হবে; তখন পেত্‌য়া এমন করুণভাবে সেখানে যাবার অনুমতি চাইল যে জেনারেল আপত্তি করতে পারল না। কিন্তু পাঠাবার সময় জেনারেলের মনে পড়ে গেল ভিয়াজ্‌মার যুদ্ধে পেত্‌য়ার পাগলের মত কাণ্ড-কারখানা; তাকে যেখানে পাঠানো হয়েছিল, সোজা রাস্তা ধরে সেদিকে না গিয়ে সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল ফরাসী অগ্রবর্তী বাহিনীর একেবারে গোলাগুলির মুখে এবং সেখানে দু' দু'বার নিজের পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়েছিল। তাই জেনারেল এখন স্পষ্ট করে তাকে বলে দিয়েছে,

দেনিসভের কোন অভিযানে সে অংশ নিতে পারবে না। তাই তো দেনিসভ যখন জিজ্ঞাসা করেছিল সে থেকে যেতে পারবে কি না তখন পেত্য়া জবাব দিতে ইতস্তত করেছিল ; তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। বনের প্রান্তে উপস্থিত হবার আগে পর্যন্ত পেত্য়া ভেবেছিল যে জেনারেলের নির্দেশ সে কঠোরভাবে মেনে চলবে এবং অবিলম্বে ফিরে যাবে। কিন্তু ফরাসীদের দেখতে পেয়ে এবং তিখনকে দেখার পরে যখন সে জানতে পারল যে সেরাতে নিশ্চয় একটা আক্রমণ চালানো হবে তখন সে হঠাৎ মতটা পাল্টে ফেলে স্থির করে বসল, যে জেনারেলকে সে এতদিন পর্যন্ত শ্রদ্ধা করে এসেছে সে একটি বদ্‌খত্‌ জার্মান, আর দেনিসভ একজন বীর, সঙ্গীটিও বীর, এমন কি তিখনও বীর ; তাই এই সংকটকালে তাদের ছেড়ে যাওয়া তার পক্ষে খুবই লজ্জাজনক ব্যাপার হবে।

দেনিসভ, পেত্য়া ও সঙ্গীটি যখন পাহারা-ঘরে পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গোধূলির আলোয় ঘোড়াগুলোকে দেখা যাচ্ছে ; কসাক ও হুজাররা জঙ্গলের এমন জায়গায় আগুন জ্বালিয়েছে যেখান থেকে ফরাসীরা ধোঁয়া দেখতে পাবে না। ছোট পাহারা-ঘরের বারান্দায় অনেক কসাক আস্তিন গুটিয়ে মাংস কাটছে। ঘরের মধ্যে দেনিসভের দলের তিনটি অফিসার একটা দরজাকে টেবিলের উপরকার কাঠে রূপান্তরিত করছে। পেত্য়া ভেজা পোশাক ছেড়ে সেগুলো শুকতে পাঠিয়ে সঙ্গে সঙ্গে খাবার টেবিল পাতার কাজে অফিসারকে সাহায্য করতে লেগে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যে টেবিল তৈরি হয়ে গেল ; একটা তোয়ালেও বিছিয়ে দেওয়া হল। টেবিলে পরিবেশন করা হল ভদ্‌কা, এক ফ্লাস্ক রাম, সাদা রুটি, ঝল্‌সানো মাংস ও নুন।

অফিসারদের সঙ্গে টেবিলে বসে দুই হাতে চর্বিওয়ালা সুস্বাদু মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে পেত্য়ার মনে সকলের জন্য একটা শিশুসুলভ রোমাঞ্চকর ভালবাসা জেগে উঠল ; ফলে তার মনেও বিশ্বাস জন্মাল যে অন্যরাও তাকে সেইভাবেই ভালবাসে।

সে দেনিসভকে বলল, "আচ্ছা ভাসিলি দিমিত্রিচ, আপনি কি মনে করেন, আমার এখানে এই ক'টা দিন থাকা কি ঠিক হবে?" জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে সে নিজেই জবাবটা দিল : "দেখুন, আমাকে বলা হয়েছিল খুঁজে বের করতে—তা আমি তো খুঁজছি···শুধু আমাকে একেবারে ভিতরে···মানে আসল ঘটনার মধ্যে যেতে দেবেন। আমি কোন পুরস্কার চাই না···কিন্তু আমি চাই···"

পিছনে হেলান দিয়ে হাত নেড়ে দাঁতে দাঁত চেপে পেত্য়া চারদিকে তাকাতে লাগল।

দেনিসভ হেসে বলল, "একেবারে প্রধান ঘটনার মধ্যে···"

পেত্‌য়া বলতে লাগল, "শুধু দয়া করে আমাকে একটু পরিচালনার দায়িত্ব দিন, যাতে আমি সত্যি পরিচালনার সুযোগটা পাই। তাতে আপনার কি আসে-যায় ?··· ও হো, আপনার একটা ছুরি চাই ?" জনৈক অফিসারের দিকে মুখ ঘুরিয়ে পেত্‌য়া বলল।

একটা ভাঁজ-করা ছুরি তার দিকে এগিয়ে দিল। অফিসার ছুরিটার প্রশংসা করল।

মুখ লাল করে পেত্‌য়া বলল, "দয়া করে ওটা রেখে দিন। আমার ওরকম আরও আছে।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলল, "হা ঈশ্বর! আমি তো একেবারেই ভুলে গেছি। আমার কাছে কিছু কিসমিস আছে, খুব ভাল জিনিস, একেবারে বীঁচি নেই। আমাদের সঙ্গে একজন নতুন দোকানী এসেছে, সে খুব ভাল ভাল জিনিস রাখে। আমি দশ পাউণ্ড কিনে নিয়েছি। মিষ্টি কিছু খাওয়াটা আমার অভ্যাস আপনাদেরও চাই তো ?···" পেত্‌য়া ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে গেল এবং কয়েকটা থলে ভর্তি প্রায় পাঁচ পাউণ্ড কিসমিস নিয়ে ফিরে এল। "আপনারা কিছু নিন, কিছু নিন!"

সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার একটা কফি-পাত্র চাই, তাই না ? দোকানীর কাছ থেকে আমি একটা চমৎকার কফি-পাত্র কিনেছি। তার জিনিসপত্রগুলোই চমৎকার। আর লোকটি খুব সৎ, সেটাই বড় কথা। আপনাকে একটা পাঠিয়ে দেব। আর আপনার চকমকি পাথরগুলো বোধ হয় অকেজো হয়ে গেছে, বা ক্ষয় হয়ে গেছে—মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আমার সঙ্গেই কিছু পাথর আছে, এই দেখুন না"—একটা থলে দেখাল—একশ' পাথর আছে। খুব সস্তায় কিনেছি। যতগুলি চান নিয়ে নিন, দরকার হলে সবগুলিও···"

পরক্ষণেই বড় বেশী কথা বলে ফেলছে ভেবে সে হঠাৎ চুপ করে গেল। মনে করতে চেষ্টা করল, এই রকম বোকামির কাজ আর কিছু করেছে কি না। সারাদিনের ঘটনার কথা ভাবতে গিয়ে ঢাক-বাজিয়ে ছোকরাটার কথা মনে পড়ে গেল , "এখানে আমরা তো তোফা আছি, কিন্তু তার কি হল ? এরা তাকে কোথায় রেখেছে ? তাকে খেতে দিয়েছে তো ? তার মনে আঘাত দেয় নি তো ?" চকমকি পাথর নিয়ে অনেক কথা বলে ফেলায় এখন আর তার কথা বলতে সাহস হল না।

ভাবল, "তার কথা যদি জিজ্ঞাসা করি তো বলবে, 'ও নিজে ছেলেমানুষ, তাই ছোট ছেলের প্রতি করুণা দেখাচ্ছে।' কাল দেখিয়ে দেব আমি ছেলেমানুষ কি না। আহা, ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করলে কি খারাপ শোনাবে ? ঠিক আছে, যা হয় হবে।"

সে শুধাল, "যে ছেলেটিকে বন্দী করা হয়েছে তাকে ডেকে এনে কিছু খেতে দিতে পারি কি ?···হয় তো···"

দেনিসভ বলল, "সত্যি, ছেলেটা বেচারি। তাকে ডেকে আন। তার নাম ভিন্‌সেণ্ট বোসে। তাকে ডেকে পাঠাও।"

"আমিই ডেকে আনছি," পেত্‌য়া বলল।

"হ্যাঁ, হাঁ, ডাকো। বেচারি," দেনিসভ কথাটা আর একবার বলল।

পেত্‌য়া তখন দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল। অফিসারদের ফাঁক দিয়ে গলে সে দেনিসভের কাছে এসে বলল :

"আপনাকে একবার চুমো খেতে দিন। আঃ, আপনি কত ভাল, কত চমৎকার!"

দেনিসভকে চুমো খেয়ে সে দৌড়ে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল।

দরজার বাইরে থেকে চেঁচিয়ে ডাকল, "বোসে! ভিন্‌সেণ্ট।"

অন্ধকারে কে যেন শুধাল, "কাকে চান স্যার?"

পেত্‌য়া জবাব দিল, যে ফরাসী ছেলেটিকে সেদিনই গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে তাকেই খুঁজছে।

"ওঃ, ভেসেন্নি?" একজন কসাক বলল।

ছেলেটির নাম ভিনসেণ্ট। ইতিমধ্যেই কসাকরা তাকে "ভেসেন্নি" এবং চাষী ও সৈনিকরা "ভেস্‌নিয়া" বানিয়ে ফেলেছে। দুটো নামকরণেই বসন্ত (ভেস্‌না) কথাটার ইঙ্গিত রয়েছে; ছেলেটি সকলের মনে বসন্তের আমেজই এনে দিয়েছে।

"ওখানে আগুনের পাশে বসে শরীরটা গরম করছে। হো, ভেসেনিয়া! ভেসেনিয়া!—ভেসেন্নি!" অন্ধকারেই তারা হাসাহাসি করে ডাকতে লাগল।

পাশে দাঁড়ানো একটি হুজার বলল, "ছেলেটি বেশ চটপটে। কিছুক্ষণ আগেই আমরা তাকে কিছু খেতে দিয়েছি। তার ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছিল।"

অন্ধকারে কাদার ভিতর দিয়ে ছুটে আসা খালি পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটি দরজায় হাজির।

পেত্‌য়া ফরাসীতে বলল, "আরে, এই যে তুমি! কিছু খাবে কি? কোন ভয় নেই, ওরা তোমাকে মারবে না। এস, ভিতরে এস।"

প্রায় শিশুর মত কাঁপা গলায় ছেলেটি বলল, "ধন্যবাদ মঁসিয়ে।" নোংরা পা দুটো চৌকাঠে ঘসতে লাগল।

ছেলেটিকে অনেক কথা বলার ইচ্ছা পেত্‌য়ার ছিল, কিন্তু বলবার সাহস হল না। একটু দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটির হাত ধরে চাপ দিল। "ভিতরে এস, ভিতরে এস!" শান্ত মৃদুস্বরে আর একবার কথাটা বলল। দরজাটা খুলে তাকেই আগে ঢুকতে দিল।

ছেলেটিকে ঢুকিয়ে দিয়ে পেত্‌য়া কিছুটা দূরে গিয়ে বসল। তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াটা তার পক্ষে মর্যাদাহানিকর বলে মনে হল। পকেটে হাত

দিয়ে টাকাগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিছু টাকা ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটিকে দিলে কি সেটা হাস্যকর মনে হবে!

অধ্যায়—৮

দলখভ এসে পড়ায় পেত্‌য়ার মনোযোগ ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটির উপর থেকে সরে গেছে। ইতিমধ্যেই দেনিসভ তাকে দিয়েছে মাংস ও ভদ্‌কা, তাকে পরিয়ে দিয়েছে একটা রুশ কোট যাতে অন্য বন্দীদের সঙ্গে পাঠিয়ে না দিয়ে তার দলেই রেখে দেওয়া হয়। সেনাদলে এসে দলখভের অসাধারণ সাহসিকতা ও ফরাসীদের প্রতি নিষ্ঠুরতার অনেক গল্প পেত্‌য়া শুনেছে। তাই সে কুটিরে ঢোকার পর থেকে পেত্‌য়া তার উপর থেকে চোখ সরায় নি, নিজের মনে সাহস এনে মাথা উঁচু করে রেখেছে। যাতে সে এই মহৎ সঙ্গের অনুপযুক্ত না হয়ে পড়ে।

দলখভের চেহারার সরলতায় পেত্‌য়া অবাক হয়ে গেল।

দেনিসভের পরনে কসাক কোট, মুখে দাঁড়ি, অঘটন-ঘটনকারী নিকলাসের মূর্তি তার বুকে, তার কথা বলার ধরন ও কাজকর্মই বলে দেয় তার অসাধারণ মর্যাদার কথা। কিন্তু যে দলখভ মস্কোতে পরত একটা পারসিক পোশাক, এখন তাকে দেখলে রক্ষীবাহিনীর একজন ঠিক-ঠিক অফিসার বলেই মনে হয়। তার মুখ পরিষ্কার করে কামানো, পরনে রক্ষীবাহিনীর মোটা কোট, বোতামের ঘরে একটা সেণ্ট জর্জের স্মরণ ঝোলানো, মাথায় একটা লুট-করা টুপি খাড়া করে বসানো। ভেজা পশমী জোব্বাটা ঘরের এক কোণে খুলে রেখে কারও সঙ্গে কুশল-বিনিময় না করে সোজা দেনিসভের কাছে গিয়ে কাজকর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। দেনিসভ সব কথাই খুলে বলল।

“এই অবস্থা। কিন্তু তারা কি ধরনের সৈন্য আর তাদের সংখ্যাই বা কত সেসবই আমাদের অবশ্য জানতে হবে। সেখানে যাবার দরকার হবে। তারা সংখ্যায় কতজন আছে সেটা সঠিক না জেনে আমরা কাজ শুরু করতে পারি না। সুনির্দিষ্ট ও সঠিকভাবে কাজ করতে আমি ভালবাসি। এখানে—এই ভদ্রমশায়দের কেউ একজন কি আমার সঙ্গে ফরাসী শিবিরে যেতে পারবেন? আমি একটা বাড়তি ইউনিফর্ম এনেছি।”

“আমি, আমি···আমি যাব আপনার সঙ্গে,” পেত্‌য়া বলল।

দলখভকে লক্ষ্য করে দেনিসভ বলল, “আপনার সেখানে যাবার কোনই দরকার নেই, আর ওকে তো আমি কিছুতেই যেতে দেব না···”

“এটা আমার পছন্দ!” পেত্‌য়া বলে উঠল। “কেন আমি যেতে পাব না?”

"কারণ যাওয়াটা বৃথা।"

"দেখুন, মাফ করবেন, কারণ…কারণ…আমি যাব, বাস। আপনি আমাকে সঙ্গে নেবেন তো?" দলখভের দিকে ফিরে সে বলল।

ফরাসী ঢাক-বাজিয়ে ছেলেটিকে ভাল করে লক্ষ্য করতে করতে দলখভ অন্যমনস্কভাবে বলল, "কেন নেব না?" দেনিসভকে শুধাল, "এই বাচ্চাটা কি অনেকদিন আপনার সঙ্গে আছে?"

"ওকে আজই ধরা হয়েছে, কিন্তু কিছুই জানে না। ওকে আমার সঙ্গেই রেখে দিচ্ছি।"

"বেশ, আর অন্যদের কোথায় রেখেছেন?" দলখভ জানতে চাইল।

"কোথায়? তাদের পাঠিয়ে দিয়েছি, আর একটা রসিদ নিয়েছি, দেনিসভ মুখ লাল করে চেঁচিয়ে বলল। "আর আমি সাহস করেই বলছি যে বিবেকের বিরুদ্ধে আমি একটা লোকেরও জীবন নেই নি। খোলাখুলিই বলছি, একজন সৈনিকের সম্মানকে কলংকিত করার পরিবর্তে ত্রিশ অথবা তিন শ' লোককে কড়া পাহারায় শহরে পাঠিয়ে দেওয়া কি আপনার পক্ষে কঠিন কাজ হত?"

নিরাসক্ত ব্যঙ্গের স্বরে দলখভ বলল, "এই ষোল বছরের কাউণ্টের মুখে এসব অমায়িক কথা মানায়, কিন্তু আপনি এসব কথা বন্ধ করুন।"

পেত্য়া সলজ্জ ভঙ্গীতে বলল, "সে কি? আমি তো কিছু বলি নি! শুধু বলেছি, আপনার সঙ্গে অবশ্যই যাব।"

দলখভ বলতে লাগল, "দেখুন, আপনার আর আমার পক্ষে এ ধরনের কথা এখন বন্ধ করাই ভাল। আচ্ছা, এই ছেলেটাকে আপনার কাছে রেখেছেন কেন? ওর জন্য দুঃখ হচ্ছে বলে তো। আপনার এই "রসিদের" ব্যাপারটা কি আমরা জানি না? আপনি পাঠালেন একশ' আর সেখানে পৌঁছল ত্রিশ। বাকিরা হয় না খেয়ে মরে, নয় তো তাদের মেরে ফেলা হয়। সুতরাং তাদের না পাঠানোটাও কি আসলে একই ব্যাপার নয়?"

সঙ্গীটি তার হাল্কা রঙের চোখ দুটি কুঁচকে সমর্থনসূচক ঘাড় নাড়ল।

"সেটা কথা নয়। ব্যাপারটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই না। আমি শুধু এটাকে আমার বিবেকের উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আপনি বলছেন তারা তো মরবেই। ঠিক আছে। কিন্তু আমি তো মারছি না!"

দলখভ হাসতে লাগল।

"বিশ বার তো পার হয়ে গেল, কে তাদের বলেছিল আমাকে গ্রেপ্তার না করতে? আমাকে ধরতে পারলে তো একটা অ্যাস্পেন গাছেই ঝুলিয়ে দিত, আর যত উদারতাই দেখান আপনারও সেই একই হাল হত।" সে থামল। "যাই হোক, আমাদের কাজ তো চালাতেই হবে। কসাককে আমার কিটটা আনতে বলুন। তাতে দুটো ফরাসী ইউনিফর্ম আছে। দেখ হে, তুমি আমার

সঙ্গে যাচ্ছ তো ?" সে পেত্‌য়াকে শুধাল।

"আমি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়," প্রায় অশ্রুসজল চোখে দেনিসভের দিকে তাকিয়ে পেত্‌য়া বলল।

দেনিসভের সব আপত্তির জবাবে পেত্‌য়া শুধু বলল, যেন তেন প্রকারের বদলে সঠিকভাবে সব কাজ করতে সেও অভ্যস্ত, আর ব্যক্তিগত বিপদের কথা সে কখনও ভাবে না।

"কারণ আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন যে ওখানে তারা কতজন আছে সেটা যদি আমরা না জানতে পারি…তার উপর নির্ভর করছে শত শত জীবন, আর এদিকে আমরা মাত্র দু'জন। তাছাড়া, আমার যাবার একান্ত ইচ্ছা, আমি যাবই, কাজেই আমাকে বাধা দেবেন না," সে বলল। "তার ফল আরও বেশী খারাপ হবে…"

অধ্যায়—৯

ফরাসী গ্রেটকোট ও শাকো গায়ে চড়িয়ে পেত্‌য়া আর দলখভ ঘোড়ায় চেপে সেই খোলা জায়গাটায় গেল যেখান থেকে দেনিসভ ফরাসী শিবিরটা দেখতে পেয়েছিল। তারপর গাঢ় অন্ধকারে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে খাঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। নীচে পৌঁছে দলখভ সঙ্গী কসাকদের সেখানেই অপেক্ষা করতে বলে রাস্তাটা ধরে সেতুর দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। উত্তেজনায় অধীর হয়ে পেত্‌য়া চলল তার পাশে পাশে।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "যদি ধরা পড়ি আমাকে ওরা জীবন্ত গ্রেপ্তার করতে পারবে না! আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।"

অতি দ্রুত ফিস্ ফিস্ করে দলখভ বলল, "রুশ ভাষায় কথা বলো না," আর ঠিক সেইমুহূর্তে অন্ধকারের ভিতর থেকে তাদের কানে এল ; Qui vive (কে যায় ?) আর একটা বন্দুকের ধাতব শব্দ।

পেত্‌য়ার মুখে রক্ত উঠে এল ; পিস্তলটা চেপে ধরল।

দলখভ ফরাসীতে জবাব দিল. "বর্শাধারী ষষ্ঠ রেজিমেন্ট।" ঘোড়ার গতি সে কমালও না, বাড়ালও না।

সেতুর উপর শাস্ত্রীর কালো মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে।

"সংকেত বাক্য ?"

ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে দলখভ পায়ে হাঁটা গতিতে এগিয়ে চলল। প্রশ্ন করল. "কর্নেল জেরার্দ এখানে আছে কি না বল ?"

কোন জবাব না দিয়ে তার পথ আটকে শাস্ত্রী আবার বলল, "সংকেত-বাক্য ?"

"একজন অফিসার যখন রোঁদে বের হয় তখন শাস্ত্রীরা তার কাছে

সংকেত বাক্য শুনতে চায় না," দলখভ সহসা গর্জে উঠে শান্ত্রীকে লক্ষ্য করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। "আমি জানতে চাইছি, কর্নেল এখানে আছে কি না?"

শান্ত্রী এক পাশে সরে দাঁড়াল; তার জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে দলখভ ধীর গতিতে ঘোড়া চালিয়ে দিল।

একটি অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্তিকে রাস্তা পার হতে দেখে দলখভ তাকে থামিয়ে কম্যাণ্ডার ও অফিসাররা কোথায় আছে জানতে চাইল। বস্তা কাঁধে সেই সৈনিকটি থামল, দলখভের ঘোড়ার কাছে এগিয়ে গেল, ঘোড়ার গায়ে হাত দিয়ে দেখল, তারপর সহজভাবে বন্ধুর মত বুঝিয়ে বলল যে কম্যাণ্ডার ও অফিসাররা পাহাড়ের আরও উঁচুতে ডান দিকের একটা গোলাবাড়ির উঠোনে রয়েছে।

রাস্তার দুই পাশে শিবির-আগুনকে ঘিরে ফরাসীদের কথাবার্তা কানে এল। তার ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দলখভ সেই উঠোনের দিকে এগিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকে ঘোড়া থেকে নেমে সে একটা বড় জল্‌জলে শিবির-আগুনের দিকে এগিয়ে গেল। আগুনটা ঘিরে কয়েকজন জোর গলায় কথাবার্তা বলছে। আগুনের এক কোণে একটা ছোট গামলায় কি যেন সিদ্ধ হচ্ছে। খাড়া টুপি ও নীল ওভারকোট পরা একটি সৈনিক পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে তার ভিতরকার বস্তুটাকে নাড়ছে।

আগুনের অপর দিকে ছায়ায় উপবিষ্ট একজন অফিসার বলল, "আর, সে লোকটা বড় কঠিন ঠাঁই!"

আর একজন হেসে বলল, "লোকগুলোকে সে বিপদে ফেলবে।"

দলখভ ও পেত্‌য়ার ঘোড়ার শব্দ কানে আসতে তারা অন্ধকারে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

দখলভ সানন্দে উচ্চকণ্ঠে বলে উঠল, "বঁজুর, মঁসিয়!"

অন্ধকারে উপবিষ্ট অফিসারদের মধ্যে একটা আলোড়ণ দেখা দিল, দীর্ঘস্কন্ধ দীর্ঘকায় একটি অফিসার আগুনটা ঘুরে দলখভের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

বলল, "আরে, ক্লিমেণ্ট না কি? কোথায় হাওয়া হয়ে···" নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে থেমে গেল; ভুরু কুঁচকে অপরিচিত জনের মত দলখভকে স্বাগত জানিয়ে তার জন্য কি করতে পারে তা জানতে চাইল।

দলখভ বলল, সে ও তার সঙ্গী অনেকক্ষণ থেকেই তাদের রেজিমেণ্টটাকে ধরতে চেষ্টা করছে; তারপর সাধারণভাবে সকলকে উদ্দেশ করেই জানতে চাইল, তারা ষষ্ঠ রেজিমেণ্টের কোন খবর রাখে কি না। তারা কেউ কিছু জানে না; পেত্‌য়ার মনে হল তার ও দলখভের দিকে তারা শত্রুতাপূর্ণ সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাতে শুরু করেছে। কয়েক সেকেণ্ডেও সকলেই চুপচাপ।

পিছন থেকে একজন চাপা হাসির সঙ্গে বলে উঠল, "সন্ধ্যা বেলাকার ঝোলের আশা করে যদি এসে থাক তাহলে বড়ই দেরি করে ফেলেছ।"

দলখভ জবাব দিল, তারা ক্ষুধার্ত নয়, আর সেই রাতেই তাদের আরও এগিয়ে যেতেই হবে।

যে সৈনিকটি পাত্রটাকে নাড়ছিল তার হাতে ঘোড়া দুটোকে ছেড়ে দিয়ে সে দীর্ঘস্কন্ধ অফিসারটির পাশে বসে পড়ল। সে অফিসারটি কিন্তু দলখভের উপর থেকে চোখ না সরিয়ে পুনরায় জানতে চাইল, সে কোন্ রেজিমেণ্টের লোক। প্রশ্নটা যেন শুনতেই পায় নি এমনি ভাব দেখিয়ে দলখভ কোন জবাব দিল না, পকেট থেকে একটা বেঁটে ফরাসী পাইপ বের করে আগুন ধরাল, তারপর জিজ্ঞাসা করল, তাদের সামনের রাস্তাটা কতদূর পর্যন্ত কসাকদের হাত থেকে নিরাপদ।

আগুনের পিছন থেকে একজন অফিসার জবাব দিল, "সে দস্যুরা তো সর্বত্র রয়েছে।"

দলখভ বলল, "তার সঙ্গী ও তার মত দলছাড়াদের পক্ষেই কসাকরা বিপজ্জনক, কিন্তু তারা হয়তো বড় কোন দলকে আক্রমণ করতে সাহস করবে না, কি বলেন?" কেউ কোন জবাব দিল না।

শিবির-আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে পেত্‌য়া ভাবছে, "এবার উনি চলে আসবেন।"

কিন্তু দলখভ আবার সেই আলোচনাই নতুন করে শুরু করল এবং সরাসরি প্রশ্ন করতে লাগল, প্রতিটি ব্যাটেলিয়নে কত সৈন্য আছে, কতগুলি ব্যাটেলিয়ন আছে, আর বন্দীই বা কতজন আছে। সেই দলের সঙ্গের রুশ বন্দীদের কথা জানতে গিয়ে দলখভ বলল:

"এই মরা মানুষগুলোকে টেনে নিয়ে চলা একটা ভয়ংকর কাজ! এসব ছোটলোককে গুলি করে মেরে ফেলাই ভাল।" বলেই সে এমন অদ্ভুতভাবে হো-হো করে হেসে উঠল যে পেত্‌য়ার মনে হল ফরাসীরা অবিলম্বেই তাদের ছদ্মবেশ ধরে ফেলবে। নিজের অজ্ঞাতেই সে আগুনের কাছ থেকে এক পা পিছিয়ে গেল।

দলখভের হাসির জবাবেও কেউ কিছু বলল না। জনৈক ফরাসী অফিসার গ্রেট কোটটা মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল বলে তারা তাকে দেখতে পায় নি। এবার সে উঠে একজন সঙ্গীর কানে কানে কি যেন বলল। দলখভ উঠে পড়ল; যে সৈনিকটি ঘোড়া দুটিকে ধরে রেখেছিল তাকে ডাকল।

আপনা থেকেই দলখভের আরও কাছে সরে গিয়ে পেত্‌য়া ভাবল, "ওরা কি ঘোড়া দুটো এনে দেবে?"

ঘোড়া দুটো আনা হল।

"শুভ সন্ধ্যা মশায়রা," দলখভ বলল।

পেত্‌য়ারও ইচ্ছা হল বলে "শুভ রাত্রি," কিন্তু একটা কথাও তার মুখে এল না। অফিসাররা তখন পরস্পর ফিস্‌ফিস্ করছে। দলখভের ঘোড়ায়

চাপতে বেশ দেরি হল, কারণ ঘোড়াটা কিছুতেই স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছিল না। তারপর সে হাঁটা-গতিতে উঠোনটা পেরিয়ে গেল। পেত্য়াও চলতে লাগল তার পাশে পাশে; মুখ ফিরিয়ে দেখার সাধ হল ফরাসীরা তাদের পিছনে ছুটে আসছে কি না, কিন্তু সাহসে কুলোল না।

রাস্তায় পড়ে দলখভ আর খোলা মাঠ পেরিয়ে ঘোড়া ছোটাল না, চলল গ্রামের ভিতর দিয়ে। একটা জায়গায় থেমে সে কান পাতল। শুধাল, "শুনতে পাচ্ছ?" পেত্য়া রুশ গলার শব্দ চিনতে পারল, দেখল শিবির-আগুনকে ঘিরে বসে আছে রুশ বন্দীদের কালো কালো মূর্তি। সেতুর কাছে নেমে এসে পেত্য়া ও দলখভ শান্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সে বেচারি একটিও কথা না বলে বিষণ্ণ মনে পায়চারি করে চলেছে। তারপর তারা সেই খাঁড়িতে নেমে গেল যেখানে কসাকরা তাদের জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

"আচ্ছা, এবার বিদায়। দেনিসভকে বলে দিও 'দিনের আলো ফুটতেই প্রথম গুলির সঙ্গে সঙ্গে,'" এই কথা বলেই দলখভ ঘোড়া ছুটিয়ে দিচ্ছিল, কিন্তু পেত্য়া তাকে জড়িয়ে ধরল।

চেঁচিয়ে বলল, "সত্যি! আপনি কত বড় বীর। আঃ, কী সুন্দর, কী চমৎকার! আপনাকে আমি কত ভালবাসি!"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে!" দলখভ বলল। কিন্তু পেত্য়া তাকে ছেড়ে দিল না। সেই অস্পষ্ট আলোয় দলখভ দেখল, পেত্য়া তার উপর নুয়ে পড়েছে, তাকে চুমো খেতে চাইছে। দলখভ তাকে চুমো খেল, হাসল, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যায়—১০

পাহারাদারের কুটিরে পৌঁছে পেত্য়া বারান্দাতেই দেনিসভের দেখা পেল। পেত্য়াকে যেতে দিয়ে দেনিসভ তার ফিরে আসার প্রতীক্ষায় উত্তেজনা, উদ্বেগ, ও আত্ম-তিরস্কারের ভিতর দিয়ে সময় কাটাচ্ছিল।

সে বলে উঠল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! কিন্তু তুমি কি জান, তোমার জন্য আমি ঘুমতে পারি নি! যাহোক, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখন শুয়ে পড়। সকাল হবার আগে এখনও একটু চোখ বুজে নিতে পারব।"

পেত্য়া বলল, "কিন্তু···না, আমি এখনই ঘুমতে চাই না। তাছাড়া, আমি জানি ঘুমিয়ে পড়লেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। তাই যুদ্ধের আগে না ঘুমনোটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।"

কুটিরের ভিতরে বসে খুশি মনে সে অভিযানের খুঁটিনাটি বিষয়গুলির কথা ভাবতে লাগল; পরদিন যা ঘটবে তাও কল্পনা করতে লাগল। যখন দেখল দেনিসভ ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে তখনও বেশ অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু গাছ থেকে তখনও ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। কুটিরের কাছেই কসাকদের ঝুপড়ি ও ঘোড়াগুলোর কালো কালো চেহারা চোখে পড়ছে। কুটিরের পিছনে দুটো মালগাড়ি ও ঘোড়ার কালো কালো ছায়া এবং খাড়ির মধ্যে নিভে-আসা আগুনের লাল আভা দেখা যাচ্ছে। সব কস্যাক ও হুজাররা ঘুমিয়ে পড়ে নি; এখানে-ওখানে জল পড়া ও ঘোড়ার চিবনোর শব্দের ফাঁকে ফাঁকে নীচু গলার ফিস্‌ফিস্‌ শব্দ কানে আসছে।

বাইরে এসে পেত্‌য়া অন্ধকারের দিকে তাকাল; মালগাড়ির দিকে এগিয়ে গেল। গাড়ির নীচে একজনের নাক ডাকছে, চারদিকে ঘোড়াগুলো যই চিবচ্ছে। অন্ধকারে নিজের ঘোড়াটাকে চিনতে পেরে পেত্‌য়া সেই দিকে এগিয়ে গেল। ইউক্রেনীয় জাতের ঘোড়া হলেও পেত্‌য়া ঘোড়াটাকে "করবাখ্‌" বলে ডাকে।

ঘোড়াকে চুমো খেয়ে পেত্‌য়া বলল, "দেখ করবাখ! কাল কিছু কাজের কাজ হবে।"

যে কসাকটি গাড়ির নীচে বসেছিল সে বলল. "আপনি এখনও ঘুমোন নি স্যার?"

"না, আরে···লিখাচিভ—এটাই তো তোমার নাম? তুমি কি জান এইমাত্র আমি ফিরেছি। আমরা ফরাসী শিবিরে ঢুকেছিলাম।"

পেত্‌য়া সমুদয় বিবরণ তাকে জানাল।

কসাক বলল, "এখন আপনার একটু ঘুমিয়ে নেওয়া উচিত।"

"এ আমার অভ্যাস আছে," পেত্‌য়া বলল। "বলি কি, তোমাদের পিস্তলের পাথরগুলো কি ক্ষয়ে গেছে? আমার সঙ্গে কিছু পাথর আছে। তোমার কি দরকার আছে? কয়েকটা নিতে পার।"

কসাকটি গাড়ির নীচ থেকেই মুখ বাড়িয়ে পেত্‌য়াকে ভাল করে দেখল।

পেত্‌য়া বলল, "সব কিছু সঠিকভাবে করাই আমার অভ্যাস। অনেকেই কোনরকমে কাজ সারে, আর পরে সেজন্য পস্তায়। সেটা আমি পছন্দ করি না।"

"ঠিক কথা," কসাক বলল।

"হ্যাঁ, আর একটা কথা! দেখ ভাই, দয়া করে আমার তরবারিটা একটু শান দিয়ে দিতে পার? পারবে কি?"

"নিশ্চয় পারব।"

লিখাচিভ উঠে এল। থলিটা হাতড়ে কি যেন বের করল, অচিরেই শান-পাথরে ইস্পাত ঘসার একটা যুদ্ধের মত শব্দ পেত্‌য়ার কানে এল। গাড়ির উপর উঠে সে এক কোণে বসল। কসাকটি মালগাড়ির নীচে বসেই তরবারিতে শান দিতে লাগল।

"বলছি কি! বাচ্চারা সবাই কি ঘুমিয়ে পড়েছে?" পেত্য়া শুধাল।

"কতক ঘুমিয়েছে, কতক ঘুমোয় নি—যেমন আমরা।"

"আচ্ছা, সেই ছেলেটা?"

"ভেসেন্নি? আরে, সে তো ওখানে বারান্দাতেই শুয়ে পড়েছে। ভয় পাবার পরে এখন ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে।"

পেত্য়া অনেকক্ষণ চুপ করে নানান শব্দ শুনতে লাগল। অন্ধকারে পায়ের শব্দ শুনতে পেল একটা কালো মূর্তি এগিয়ে এল।

গাড়ির কাছে এসে শুধাল, "কি ধার দিচ্ছ?"

"কেন, এই ভদ্রলোকের তরবারি।"

"ঠিক আছে," লোকটি বলল; পেত্য়ার ধারণা সে একজন হুজার; "কাপটা কি এখানে ফেলে গেছি?"

"ওখানে, চাকাটার পাশে।"

হুজার কাপটা তুলে নিল।

"শীঘ্রই ভোর হবে," হাই তুলে কথাটা বলে সে চলে গেল।

পেত্য়া অবশ্যই জানে যে রাস্তা থেকে এক ভার্স্ট দূরে জঙ্গলের মধ্যে দেনিসভের গেরিলাদের দলে সে আছে; ফরাসীদের কাছ থেকে আটক-করা একটা মালগাড়ির উপর সে বসে আছে; পাশে ঘোড়াগুলো এক দিগড়িতে বাঁধা রয়েছে; মালগাড়ির নীচে বসে লিখাচিভ তারই তরবারিতে শান দিচ্ছে; ডান দিকের বড় কালো ছায়াটা পাহারাদারের ঘর; বাঁ দিকে নীচে লাল আলোটা শিবিরের নিভে-আসা আগুন; যে লোকটা কাপ নিতে এসেছিল সে একটি হুজার। এসবই তার জানবার কথা, কিন্তু এই মুহূর্তে এসব কিছুই সে জানে না, জানতে চায়ও না। সে এখন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে; সেখানে কোন কিছুই বাস্তবের অনুরূপ নয়। বড় কালো ছায়াটা আসলে পাহারাদারের কুটির হলেও সেটা পৃথিবীর নীচে একেবারে অতলে যাবার একটা গহ্বরও হতে পারে। লাল আলোটা হয় তো একটা আগুন, আবার ওটা তো একটা প্রকাণ্ড দানবের চোখও হতে পারে। হয় তো সত্যি সত্যি সে বসে আছে একটা মালগাড়ির উপর, কিন্তু এও তো হতে পারে যে মালগাড়ি না হয়ে ওটা একটা ভয়ংকর উঁচু মিনার যেখান থেকে পড়ে গেলে সে হয় তো সারাদিন, বা সারা মাস ধরেই পড়তে থাকবে, অথবা শুধু পড়তেই থাকবে, কোনদিন আর নীচে পৌছবে না। হয় তো কসাক লিখাচিভই মালগাড়ির নীচে বসে আছে, কিন্তু সে তো এমন একটি পরম দয়ালু, পরম সাহসী, পরম আশ্চর্য ও পরম চমৎকার মানুষ হতে পারে যার কথা পৃথিবীর কেউ জানে না। হয় তো একটি হুজারই জল নিতে এসে ফিরে গেছে, কিন্তু আসলে হয় তো সে উধাও হয়েছে—একেবারে অদৃশ্য হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।

এখন পেত্য়া যাই দেখুক কিছুতেই বিস্মিত হবে না। সে এখন রূপকথার রাজ্যে বাস করছে ; সেখানে সবই সম্ভব।

আকাশের দিকে তাকাল। আকাশটাও যেন পৃথিবীর মতই রূপকথার দেশ। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে, গাছের উপর দিয়ে মেঘেরা ভেসে যাচ্ছে, যেন তারাদের মুখের ঘোমটা খুলে দিচ্ছে। অনেক সময় মনে হচ্ছে যেন মেঘেরা সরে যাচ্ছে আর পরিষ্কার কালো আকাশ বেরিয়ে আসছে। কখনও মনে হচ্ছে আকাশটা উপরে উঠে যাচ্ছে, একেবারে মাথার উপরে অনেক উঁচুতে, আবার মনে হচ্ছে সেটা এত নীচে নেমে এসেছে যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে।

পেত্য়ার চোখ দুটি বুজে এল ; সে একটু ঢুলতে লাগল।

গাছ থেকে জল পড়ছে। চুপি-চুপি কথা শোনা যাচ্ছে। ঘোড়াগুলো হ্রেষারব করে পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে। একজন নাক ডাকাচ্ছে।

"ও ঝেগ্-ঝেগ্, ও ঝেগ্-ঝেগ্..." শান-পাথরে তরবারি ঘসার শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ পেত্য়া শুনতে পেল, সম্মিলিত অর্কেস্ট্রায় একটা অজানা, মধুর, গম্ভীর মন্ত্র বাজছে। পেত্য়ার সুর-জ্ঞান নাতাশার মতই, যদিও নিকলাসের চাইতে বেশী, কিন্তু সে কখনও গান শেখে নি বা তা নিয়ে ভাবেও নি। তাই অপ্রত্যাশিতভাবে যে সুর তার কানে এল তাই তার কাছে তাজা ও আকর্ষণীয় বলে মনে হল। সুরটা ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে ; এক যন্ত্র থেকে অপর যন্ত্রে সঞ্চারিত হচ্ছে। যে সুরটা বাজানো হচ্ছে সেটা "ফুগ্" (পর্যায়ক্রমিক সঙ্গীত)—যদিও "ফুগ" কাকে বলে পেত্য়া তা জানে না। যন্ত্রগুলিকে কখনও মনে হচ্ছে বেহালা, কখনও বা শিঙা, কিন্তু ঐ দুটোর চাইতেই অনেক ভাল ও অনেক স্পষ্ট। সেগুলি পর্যায়ক্রমে বাজতে বাজতে একসঙ্গে মিশে গেল ; আবার আলাদা হয়ে গেল, আবার মিশে গেল। কখনও বেজে উঠল গির্জার গম্ভীর সঙ্গীত, কখনও বা আশ্চর্য এক জয়গান।

সামনে তাকিয়ে পেত্য়া ভাবল, "আরে—আমি কি স্বপ্ন দেখেছি! কানের মাধ্য বাজছে। হয় তো এ সঙ্গীত আমারই নিজস্ব। ঠিক আছে, বাজো আমার সঙ্গীত! এবার!..."

সে চোখ বুজল, আর অমনি চারদিক থেকে ভেসে এল সুর, মিশে গেল, আলাদা হল, মিশে গেল, তারপর সব সুর মিলে মিশে একটি মধুর গম্ভীর মন্ত্র হয়ে উঠল। পেত্য়া নিজের মনেই বলল, "আহা, কী আনন্দময়! ঠিক আমার মনের মতন!" প্রকাণ্ড অর্কেস্ট্রাটাকে পরিচালিত করার ইচ্ছা জাগল তার মনে।

"এবার ধীরে, ধীরে মিলিয়ে যাও।" শব্দগুলি তার কথা শুনল। "এবার পূর্ণতর, আরও আনন্দময়। আরও—আরও আনন্দময়!" অমনি কোন অজ্ঞাত গভীরতা থেকে উঠল বর্দ্ধিত শব্দরাশি। "এবার সব স্বর এক

হয়ে যাও!" পেত্য়া হুকুম দিল। আর অনেকদূর থেকে সে শুনতে পেল প্রথমে পুরুষের কণ্ঠস্বর, তারপর নারীদের। সে শব্দ সম্মিলিত বিজয়-গর্বে ক্রমেই বেড়ে চলল, আর পেত্য়া ভয়ে ও আনন্দে কান পেতে তাদের অপার সৌন্দর্য শুনতে লাগল।

একটা গম্ভীর জয়যাত্রার সঙ্গীত, গাছের জলপড়ার শব্দ, ও তরবারির হিস্‌হিস্ একত্রে মিশে ধ্বনি উঠল "ও ঝেগ্-ঝেগ্-ঝেগ্…"

সে ধ্বনি কতক্ষণ ছিল পেত্য়া জানে না : সে আনন্দে মজে গেল, নিজের আনন্দে নিজেই অবাক হল, আর মনে মনে দুঃখ পেল যে এ আনন্দের কেউ অংশীদার নেই। লিখাচিভের ডাকে তার স্বপ্ন ভেঙে গেল।

"এটা হয়ে গেছে ইয়োর অনার; এটা দিয়ে একটা ফরাসীকে কেটে দু' টুকরো করতে পারবেন।"

পেত্য়া জেগে উঠল।

"আলো ফুটেছে, সত্যি আলো ফুটেছে," সে চেঁচিয়ে উঠল।

যে ঘোড়াগুলোকে আগে দেখা যাচ্ছিল না এখন সেগুলির লেজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে; পাতাঝরা ডালের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টি-ভেজা আলো দেখা যাচ্ছে। শরীরটাকে নাড়া দিয়ে পেত্য়া লাফ দিয়ে উঠল, পকেট থেকে একটা রুবল বের করে লিখাচিভকে দিল, তারপর তরবারিটা ঘুরিয়ে ধার পরীক্ষা করে, খাপে ভরে নিল। কসাকরা ঘোড়া খুলে দিয়ে কসে জিন আঁটতে লাগল।

লিখাচিভ বলল, "এই তো কম্যাণ্ডার এসে গেছেন।"

দেনিসভ পাহারাদারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল; পেত্য়াকে ডেকে নিয়ে সকলকে তৈরি হবার হুকুম দিল।

অধ্যায়—১১

আধো অন্ধকারে লোকজনরা ঘোড়া খুঁজে নিয়ে, জিন পরিয়ে, একত্র হল। দেনিসভ পাহারাদারের কুটিরের পাশে দাঁড়িয়ে শেষ নির্দেশাদি দিতে লাগল। দলের পদাতিক বাহিনী পথে নামল। শত শত পায়ে কাদা ছিটিয়ে প্রথম ঊষার কুয়াশার ভিতর দিয়ে তারা জঙ্গলের মধ্যে অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গীটিও তার দলের লোকদের কিছু হুকুম দিল। ঘোড়ার রাশ হাতে নিয়ে সওয়ার হবার হুকুমের অপেক্ষায় পেত্য়া অধৈর্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করায় তার মুখটা জল্‌জল্ করছে; চোখ দুটো খুব ঝক্‌ঝকে দেখাচ্ছে। শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নামছে; সারা শরীরের ধমনী-গুলো তালে তালে চলছে।

দেনিসভ শুধাল, "সব কিছু তৈরি? এবার ঘোড়া আন।"

ঘোড়া আনা হল। জিনটা ঢিলে থাকায় দেনিসভ কসাকটির উপর রাগ করল, তাকে বকুনি দিল, তারপর সওয়ার হয়ে বসল। পেত্‌য়া রেকাবে পা দিল। পিছন ফিরে একবার হুজারদের দেখে নিয়ে দেনিসভের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

বলল, "ভাসিলি দিমিত্রিচ, আমাকে একটা কাজের ভার দিন। দয়া করে···ঈশ্বরের দোহাই··· !"

দেনিসভ বোধ হয় পেত্‌য়ার অস্তিত্বই ভুলে গিয়েছিল। মুখটা ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল।

কঠোর কণ্ঠে বলল, "তোমার কাছে আমার একটাই কথা। আমাকে মেনে চলবে; কোথাও নিজের থেকে নাক গলাবে না।"

পেত্‌য়াকে সে আর একটি কথাও বলল না; সারা পথ নিঃশব্দে ঘোড়া চালাল। যখন বনের প্রান্তে পৌঁছল তখন মাঠের উপর পরিষ্কার আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দেনিসভ ফিস্‌ফিস্‌ করে সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলছে; কসাকরা পেত্‌য়া ও দেনিসভকে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সকলে চলে গেলে দেনিসভ ঘোড়ার পিঠে হাত রেখে পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে নামতে শুরু করল। ঘোড়াগুলো আরোহীসমেত খাঁড়িতে নেমে গেল। পেত্‌য়া দেনিসভের পাশেই আছে; তার নাড়ির গতি ক্রমাগত বাড়ছে। ক্রমেই আলো বাড়ছে, কিন্তু দূরের জিনিস তখনও কুয়াশায় ঢাকা। উপত্যকায় পৌঁছে দেনিসভ পিছনে তাকাল; ইশারায় একটি কসাককে কাছে ডাকল।

বলল, "সংকেত!"

কসাকটি হাত তুলল; একটা গুলি সশব্দে ছুটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে ঘোড়ার জোর কদমে ছোটার শব্দ শোনা গেল, বিভিন্ন দিক থেকে চীৎকার উঠল, আরও গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ হল।

ঘোড়ার ক্ষুরের ও চীৎকারের প্রথম শব্দ শুনেই পেত্‌য়া ঘোড়ার পিঠে চাবুক কসাল, রাশ আলগা করে দিয়ে সামনে ছুটে গেল; দেনিসভের কোন কথা কানেই নিল না। পেত্‌য়ার মনে হল, প্রথম গুলিটা ছোঁড়ার মুহূর্তেই সহসা যেন দুপুরের আলো দেখা দিল। ঘোড়া ছুটিয়ে সে সেতুর দিকে চলল। কসাকরা চলেছে তার আগে আগে। সেতুর উপরে জনৈক কসাকের সঙ্গে তার ধাক্কা লাগল; সে পিছিয়ে পড়েছিল, জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। তার সামনে সৈন্যরা সম্ভবত ফরাসী সৈন্যরা রাস্তা পার হবার জন্য ডান থেকে বাঁ দিকে ছুটছে। তাদের একজন পেত্‌য়ার ঘোড়ার পায়ের নীচে কাদার মধ্যে পড়ে গেল।

একটা কুটিরের চারপাশে কসাকরা ভিড় করেছে; তারা একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত। ভিড়ের ভিতর থেকে ভয়ংকর আর্তনাদ শোনা গেল। ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাজির হল পেত্‌য়া। প্রথমেই তার চোখে পড়ল, একটি ফরাসী

সৈনিক তাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়বার জন্ত বর্শার হাতলটা ধরে আছে ; তার মুখ বিবর্ণ, চোয়াল কাঁপছে।

"হুর্‌রা।···বাছারা!···আমাদের!" পেত্‌য়া চেঁচিয়ে বলল। তারপর উত্তেজিত ঘোড়ার রাশ ঢিল দিয়ে গ্রাম্য পথ ধরে ছুটে গেল।

সামনের দিকে গুলির শব্দ শোনা গেল। কসাকরা, হুজাররা, ছেঁড়া পোশাকপরা রুশ বন্দীরা রাস্তার হু'পাশ থেকে ছুটে এসে জোর গলায় অসংলগ্নভাবে চীৎকার করে কি যেন বলছে। বেশ সাহসী দেখতে একজন ফরাসী হুজারদের দিকে হাতের বেয়নেট উত্তত করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তার পরনে নীল ওভারকোট, মাথায় টুপি নেই, লাল মুখটা ভ্রূকুটিকুটিল। পেত্‌য়া যখন ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে গেল ততক্ষণে লোকটি ধরাশায়ী হয়েছে। "আবার বড় বেশী দেরি হয়ে গেল!" কথাটা বিত্যুৎগতিতে পেত্‌য়ার মনে উদয় হল ; ঘোড়া ছুটিয়ে সে আবার সেইদিক পানে গেল যেখান থেকে বারবার গুলির শব্দ আসছে। আগেরদিন রাতে দলখভের সঙ্গে সে যে বাড়ির উঠোনে গিয়েছিল সেখান থেকেই গুলি আসছে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতরকার বাঁশের বেড়ার আড়ালে ঘাঁটি গেড়ে ফরাসীরা ফটকে সমবেত কসাকদের উপর গুলি চালাচ্ছে। ফটকের কাছে এগিয়ে পেত্‌য়া ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দলখভকে দেখতে পেল ; বিবর্ণ মুখে সে লোকজনদের উদ্দেশে চীৎকার করে বলছে, "ঘুরে যাও! পদাতিক বাহিনীর জন্ত অপেক্ষা কর!" ততক্ষণে পেত্‌য়া তার কাছে পৌঁছে গেল।

"অপেক্ষা?···হুর্‌রা—আ-আ!" পেত্‌য়া চীৎকার করে উঠল। এক মুহূর্তও না থেমে যেখান থেকে গুলির শব্দ আসছে, যেখানে ধোঁয়া সব চাইতে ঘন সেইদিকে ছুটে গেল।

গুলিবর্ষণের শব্দ হল ; কিছু বুলেট হিস্‌-হিস্‌ করে পাশ দিয়ে চলে গেল, কিছু গিয়ে ছিটকে পড়ল কোন কিছুর উপর। কসাকরা ও দলখভ পেত্‌য়াকে অনুসরণ করে ফটকের দিকে ঘোড়া চালিয়ে দিল। ঘন ধোঁয়ার মধ্যে কিছু ফরাসী অস্ত্র ফেলে দিয়ে ঝোপ থেকে ছুটে বেরিয়ে এল কসাকদের সামনে, অন্যরা পাহাড় বেয়ে পুকুরের দিকে নেমে গেল। ওদিকে পেত্‌য়া উঠোনের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছোটাতে ছোটাতে রাশটা হাতে না ধরে ছুই হাতই অদ্ভুতভাবে ঘোরাতে লাগল, আর ক্রমেই জিন থেকে সরে যেতে লাগল। জোড় কদমে ছুটতে ছুটতে একটা নিভন্ত আগুনের কাছে পৌঁছে ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল, আর পেত্‌য়া থপাস্‌ করে ভেজা মাটিতে পড়ে গেল। কসাকরা দেখল, তার মাথাটা নিশ্চল থাকলেও হাত-পাগুলো খুব তাড়াতাড়ি নড়ছে। একটা বুলেট তার খুলির মধ্যে ঢুকে গেছে।

এদিকে উর্ধ্বতন ফরাসী অফিসারটি তরবারির মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা করল যে তারা আত্মসমর্পণ

করছে। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে দলখভ ঘোড়া থেকে নেমে পেত্য়ার কাছে গেল। সে তখন হাত ছড়িয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে।

"শেষ!" ভুরু কুঁচকে কথাটা বলে দলখভ ফটকের দিকে এগিয়ে গেল। দেনিসভ ঘোড়া ছুটিয়ে তার দিকেই আসছে।

মৃত্যুর অভ্রান্ত লক্ষণ তার কাছে খুবই পরিচিত। দূর থেকে পেত্য়ার দেহটাকে সেইভাবে পড়ে থাকতে দেখে দেনিসভও চীৎকার করে বলল, "মেরে ফেলেছে?"

"সব শেষ!" দলখভ পুনরায় কথাটা বলল; বলে যেন খুশি হল। তারপর তাড়াতাড়ি বন্দীদের দিকে এগিয়ে গেল। কসাকরা এসে তাদের ঘিরে ফেলেছে। সে দেনিসভকে উদ্দেশ করে বলল, "আমরা ওদের নিয়ে যাব না!"

দেনিসভ জবাব দিল না; পেত্য়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল; তারপর কম্পিত হাতে পেত্য়ার রক্তমাখা কর্দমাক্ত মুখখানাকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে ধরল। মুখটা এর মধ্যেই সাদা হয়ে গেছে।

পেত্য়ার কথাগুলি তার মনে পড়ে গেল: "মিষ্টি কিছু খাওয়া আমার অভ্যাস। কিসমিসগুলি খুব ভাল···সব নিন!" কুকুরের মত আর্তনাদ করে দেনিসভ ঘুরে দাঁড়াল। সে শব্দ শুনে কসাকরা সবিস্ময়ে তার দিকে তাকাল। দেনিসভ হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের বেড়াটার কাছে গিয়ে সেটাকে চেপে ধরল।

দেনিসভ ও দলখভ যে রুশ বন্দীদের উদ্ধার করল তাদের মধ্যেই ছিল পিয়ের বেজুখভ।

অধ্যায়—১২

মস্কো থেকে পথ চলার পুরো সময়-কালের মধ্যে বন্দীদের সম্পর্কে ফরাসী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোন নতুন আদেশ জারী করা হয় নি। সেই বন্দীদের দলে পিয়েরও ছিল। মস্কো ছাড়বার সময় বন্দীরা যে সেনাদল ও মালবাহী গাড়ির সঙ্গে ছিল, ২২শে অক্টোবর তারা আর সে দলের সঙ্গে ছিল না। যাত্রার প্রথম দিকে জঞ্জাল-ভর্তি যে গাড়িগুলো তাদের সঙ্গে চলছিল তাদের অর্ধেক দখল করে নিয়েছে কসাকরা, আর বাকি অর্ধেক সামনে এগিয়ে গেছে। অশ্বহীন যে অশ্বারোহী সৈন্যরা বন্দীদের আগে আগে চলছিল তাদের একজনও নেই; সকলেই উধাও হয়ে গেছে। প্রথম দিকে বন্দীরা তাদের যে কামান-শ্রেণী দেখতে পেয়েছিল, এখন তার জায়গায় এসেছে মার্শাল জুনোৎ-এর মস্তবড় মালবাহী গাড়ি; ওয়েস্টফেলীয় সৈন্যরা সেটাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলেছে। বন্দীদের পিছন-পিছন আসছে অশ্বারোহী বাহিনীর একটা মালবাহী গাড়ি।

যে ফরাসী বাহিনী এতদিন তিন সারিতে অগ্রসর হচ্ছিল, ভিয়াজমা থেকে তারা চলেছে এক সারিতে। মস্কো ছেড়ে আসার পরে প্রথম বিশ্রাম ঘাঁটিতে পিয়ের বিশৃংখলার যে লক্ষণগুলি দেখতে পেয়েছিল তা এখন চরমে উঠেছে।

যে রাস্তা ধরে তারা চলেছে তার দুই পাশে পড়ে আছে যত মরা ঘোড়া; ছেঁড়া পোশাক পরা যেসব সৈনিক বিভিন্ন রেজিমেণ্ট থেকে পিছিয়ে পড়েছিল তারা অনবরত দল বদল করে চলেছে, কখনও একটা চলতি দলে যোগ দিচ্ছে, আবার পিছিয়ে পড়ছে।

চলতে চলতে বারকয়েক ভুল করে বিপদ-সংকেত দেওয়ার ফলে পাহারাদার সৈন্যরা বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়ে ছুটে পালাতে শুরু করে; ফলে নিজেরাই ধাকাধাক্কি করে মরে; আর পরে আবার একত্র হলে অকারণ ত্রাসের জন্য একে-অন্যকে গালাগালি করতে থাকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর ভাণ্ডার, বন্দীদের পাহারা-দল ও জুনোৎ-এর মালবাহী গাড়ি—তিনটে দল একসঙ্গে চললেও তারা যেন একই সঙ্গে আলাদা ও এক, যদিও প্রতিটি দলের লোকজনই অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে।

গোলন্দাজ বাহিনীর মালপত্রবাহী গাড়ির সংখ্যা একশ' কুড়ি; এখন অবশিষ্ট আছে ষাটের মত, বাকিগুলো হয় বেদখল হয়েছে, নয়তো পিছিয়ে পড়েছে। জুনোৎ-এর মালগাড়িরও কতকগুলি বেদখল হয়েছে অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে। তিনটে মালগাড়ি আক্রমণ করে লুট করেছে দাভুৎ-এর সেনাদলের দলছাড়া সৈন্যরা। জার্মানদের কথাবার্তা থেকে পিয়ের জানতে পেরেছে যে বন্দীদের তুলনায় মালবাহী গাড়িগুলোর জন্য একটা বড় রকমের রক্ষীবাহিনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে; মার্শালের নিজের হুকুমেই তাদেরই সহকর্মী একজন জার্মানকে গুলি করে মারা হয়েছে, কারণ মার্শালের নিজস্ব একটা রূপোর চামচ তার কাছে পাওয়া গিয়েছিল।

বন্দীদের দলগুলি প্রায় সবই বরফে জমাট বেঁধে গেছে। যে একশ' ত্রিশ জন মস্কো থেকে যাত্রা করেছিল তাদের মধ্যে এখন অবশিষ্ট আছে একশ' জনেরও কম। অশ্বারোহী বাহিনীর জিন অথবা জুনোৎ-এর মালপত্রের চাইতেও পাহারাদারদের কাছে বন্দীরাই বড় বোঝা। তারা জানে, জিনগুলো এবং জুনোৎ-এর চামচগুলো তবু কিছু কাজে লাগতে পারে, কিন্তু একদল শীতার্ত ক্ষুধিত সৈন্য সমপরিমাণে শীতার্ত ও ক্ষুধিত রুশদের পাহারা দিতেই থাকবে (তাদের অনেকেই ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে পিছিয়ে পড়েছে এবং এ অবস্থায় তাদের গুলি করে মারার হুকুমও আছে)—এটা শুধু দুর্বোধ্যই নয়, একান্ত আপত্তিকরও বটে। নিজেদের কষ্টকর অবস্থায় বন্দীদের প্রতি কোনরূপ করুণা দেখাতেও যেন তারা ভয় পেল এবং তাদের প্রতি রূঢ় ও কঠোর ব্যবহার করতে লাগল।

দরগবুঝ-এ পাহারাদার সৈন্যরা বন্দীদের একটা আস্তাবলে তালাবদ্ধ করে রেখে নিজেদের ভাঁড়ারই নিজেরা লুট করতে চলে গেলে কয়েকজন সৈনিক-বন্দী দেয়ালের নীচ দিয়ে সুরঙ্গ কেটে পালিয়ে গেল। কিন্তু ফরাসীরা আবার তাদের গ্রেপ্তার করে গুলি করে মেরে ফেলল।

যাত্রার মুখে অফিসার-বন্দীদের অন্য বন্দীদের থেকে আলাদা করে রাখার যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেটা অনেকদিনই উঠে গেছে। যারা হাঁটতে পারল তারাই একসঙ্গে চলতে লাগল; তৃতীয় ঘাঁটির পরেই পিয়ের কারাতায়েভ ও তার নীল-ধূসর বাঁকা-ঠ্যাং কুকুরটার দলে যোগ দিল।

মস্কো ছেড়ে আসার পরে তৃতীয় দিনে কারাতায়েভ আবার সেই জ্বরে পড়ল মস্কোর হাসপাতালে থাকতে যে জ্বরে সে ভুগেছিল। সে ক্রমে যতই দুর্বল হয়ে পড়ল পিয়ের ততই তার কাছ থেকে সরে যেতে লাগল। কেন তা পিয়ের জানে না, কিন্তু যেদিন থেকে কারাতায়েভ দুর্বল হতে লাগল সেদিন থেকেই পিয়ের যেন কিছুটা অনিচ্ছাতেই তার কাছে যেত। কাছে গেলেই করাতায়েভের চাপা গোঙানি কানে আসে, তার শরীরের দুর্গন্ধ ক্রমেই বেশী করে নাকে আসে, আর পিয়ের ততই তার কাছ থেকে দূরে সরে যায়; তার কথা ভাবেও না।

চালাঘরে বন্দী থাকার সময় পিয়ের জেনেছিল—বুদ্ধি দিয়ে নয়, সমস্ত সত্তা দিয়ে, জীবন দিয়ে জেনেছিল যে, মানুষের সৃষ্টি হয়েছে সুখের জন্য, সুখ আছে তার অন্তরে, আছে মানুষের সহজ, সরল প্রয়োজনের পরিপূর্তিতে; দুঃখের উদ্ভব হয় অভাব থেকে নয়, প্রয়োজনাতিরিক্ত জিনিসের প্রতি আসক্তি থেকে। আর এখন এই তিন সপ্তাহের ভ্রমণ-কালে আর একটি সান্ত্বনাদায়ক নতুন সত্যকে সে জেনেছে—এই পৃথিবীতে ভয়ংকর বলে কিছু নেই। জেনেছে, যন্ত্রণা ও মুক্তিরও সীমা আছে, আর সে সীমা পরস্পরের খুব কাছাকাছি; গোলাপের বিছানায় শুয়ে একটি কুঁচকানো পাপড়ির জন্য মানুষ ঠিক ততখানি কষ্টই পায় যেটা সে ভোগ করছে স্যাঁতসেঁতে খালি মেঝের উপর ঘুমিয়ে, যখন শরীরের একদিক গরম হতে না হতেই অপর দিকটা ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে; আঁটো নাচের জুতো পরলে যতখানি কষ্ট পেত, এখন ঘা-ভর্তি খালি পায়ে হাঁটতেও সেইরকম কষ্টই পাচ্ছে। নতুন করে আবিষ্কার করেছে, রাতের বেলা আস্তাবলে তালাবদ্ধ অবস্থায় সে যতটা স্বাধীন আছে, স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করার সময় তার চাইতে বেশী স্বাধীন ছিল না। এখন তার কাছে সব চাইতে যন্ত্রণাদায়ক তার ঘা-ভর্তি খালি পা দুটো। (ঘোড়ার মাংস ক্ষুধাবর্ধক ও পুষ্টিকর, নুনের বদলে যে বারুদ তারা ব্যবহার করে তার যবক্ষার-স্বাদও এখন ভালই লাগে; ঠাণ্ডাও খুব বেশী নয়, দিনের বেলা হাঁটতে বেশ গরমই লাগে, আর রাতের জন্য আছে শিবির-আগুন; যেসব উকুন শরীরটাকে কুরে কুরে খায় তারাই এখন শরীরটাকে

গরম রাখে।) প্রথমেই যে জিনিসটা অসহ্য মনে হল সেটা তার পা দুটো।

দ্বিতীয় দিন পথ চলার পরে শিবির-আগুনে পা দুটো পরীক্ষা করে পিয়ের ভাবল, 'সে পা নিয়ে হাঁটা অসম্ভব। কিন্তু যখন সকলে উঠে পড়ল তখন সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে হাঁটতে লাগল; শরীর একটু গরম হলে হাঁটতে আর কোন কষ্ট হল না, কিন্তু রাতে পা দুটো আগের চাইতে ভয়ংকর দেখালো। কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে সে অন্য কথা ভাবতে লাগল।

এতদিনে পিয়ের মানব জীবনের পরিপূর্ণ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পেরেছে; উপলব্ধি করেছে মানুষের সেই আত্মরক্ষাকারী শক্তিকে যার সাহায্যে মনকে এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট করা যায়; এ যেন বয়লারের সেই সেফটি-ভাল্‌ভটি যার সাহায্যে তাপ একটা নির্দিষ্ট সীমাকে ছাড়িয়ে ফেলেই বাড়তি তাপটাকে বের করে দেওয়া হয়।

যে বন্দীরা পিছিয়ে পড়েছিল তাদের ওরা কিভাবে গুলি করে মেরেছিল তা পিয়ের চোখে দেখে নি, কানেও শোনেনি, যদিও একশ'র বেশী বন্দী সেই পথেই মৃত্যু বরণ করেছে। কারাতায়েভের কথা সে ভাবে না; সেও প্রতিদিন আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে; অচিরেই তারও সেই দশা হবে। পিয়ের নিজের কথা আরও কম ভাবে। অবস্থা যতই কঠিনতর হয়ে উঠছে, ভবিষ্যৎ হয়ে উঠছে আরও ভয়ংকর, ততই সান্ত্বনাদায়ক আনন্দময় চিন্তা, স্মৃতি ও কল্পনারা তার বর্তমান অবস্থাকে ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

অধ্যায়—১৩

২২শে অক্টোবর দুপুরে কর্দমাক্ত পিছল পথে চড়াই বেয়ে উঠতে উঠতে পিয়ের একবার তার পায়ের দিকে একবার উঁচু-নীচু রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। মাঝে মাঝে চারদিকে পরিচিত ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আবার তার পায়ের দিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে। দুইই তার কাছে সমান পরিচিত, সমান নিজস্ব। নীল-ধূসর খোঁড়া কুকুরটা মনের খুশিতে রাস্তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে। কখনও পিছনের একটা পা তুলে তিন পায়ে লাফাচ্ছে। আবার ছুটছে চার পায়ে, মরা জন্তুর উপর বসে-থাকা কাকগুলোর দিকে ছুটে যাচ্ছে ঘেউ-ঘেউ করে। মস্কোর চাইতে এখন কুকুরটা আরও খুশি ও চকচকে হয়েছে। চারদিকে মানুষ থেকে ঘোড়া পর্যন্ত নানা জন্তুর পচা মাংস পড়ে আছে; লোকজনের যাতায়াতের ফলে নেকড়েগুলো আসতে পারছে না, ফলে কুকুরটা যথেচ্ছভাবে মাংস খেতে পারছে।

সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। মনে হয়েছিল যেকোন সময় বৃষ্টিটা থামতে পারে, এবং আকাশ পরিষ্কার হতে পারে, কিন্তু একটু থেমেই আবার জোর বৃষ্টি নামল। জলে-ভেজা রাস্তাটা আর জল শুষে নিতে পারল না, ফলে গাড়ির

চাকার দাগ বেয়ে জলের স্রোত বয়ে চলল।

দুই দিকে তাকাতে তাকাতে পিয়ের হাঁটছে। তিনটে করে পা আঙুলে গুণছে। বৃষ্টিকে উদ্দেশ করে সে বলে উঠল, "এইবার, আবার, চালিয়ে যাও! জোরছে চালো!"

মনে হল সে কিছুই ভাবছে না, কিন্তু অন্তরের গভীরতম তলে একটা গুরুত্বপূর্ণ, সান্ত্বনাদায়ক বিষয় নিয়ে তার মন মেতে আছে। আগের দিন কারাতায়েভের সঙ্গে তার যে কথা হয়েছে তা থেকে অনুমিত একটি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তই সেই বিষয়।

গতকালের বিশ্রাম—ঘাঁটিতে শিবির-আগুনটা নিভে যাওয়ায় পিয়ের উঠে পার্শ্ববর্তী জ্বলন্ত আগুনটার দিয়ে এগিয়ে গেল। সেখানে একটা গ্রেটকোটে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে প্লাতন কারাতায়েভ সৈন্যদের একটা গল্প বলছে। মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। এসময় সাধারণত কারাতায়েভের জ্বরটা ছেড়ে যায়, সে বেশ সুস্থ বোধ করে। তবু কারাতায়েভের রোগজীর্ণ কণ্ঠস্বর শুনে এবং আগুনের আভায় উজ্জ্বল করুণ মুখটা দেখে পিয়েরের বুকটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠল। লোকটির প্রতি এই করুণার উদ্রেক হওয়ায় পিয়ের ভয় পেয়ে গেল, সেখান থেকে চলে যেতে চাইল, কিন্তু আর কোন আগুন না থাকায় প্লাতনের দিকে না তাকিয়ে চেষ্টা করে সেখানেই বসে পড়ল।

"আরে, কেমন আছ?" শুধাল।

"কেমন আছি? রোগ নিয়ে গজ্‌গজ্ করলে তো ঈশ্বর মৃত্যুই দেবেন," এই জবাব দিয়ে প্লাতন আবার গল্পটা বলতে শুরু করল।

বিবর্ণ শীর্ণ মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে আর দুই চোখে খুশির ঝিলিক তুলে বলতে লাগল, "তারপর, শোনরে ভাই…"

পিয়ের গল্পটা অনেকদিন শুনেছে। কারাতায়েভ খুশিতে ডগমগ হয়ে তাকেই অন্তত ছ'বার গল্পটা শুনিয়েছে। কিন্তু ভালভাবে জানা হলেও পিয়ের এমনভাবে গল্পটা শুনতে লাগল যেন এই নতুন শুনেছে; শুনতে শুনতে কারাতায়েভের শান্ত উচ্ছ্বাস যেন তার মধ্যেও সঞ্চারিত হল। জনৈক বুড়ো বণিককে নিয়েই গল্প। সপরিবারে সে সৎ ও ধর্মভীরু জীবন যাপন করত। একদা একজন ধনী বণিকের সঙ্গে সে গিয়েছিল নিঝ্‌নি মেলায়।

একটা সরাইখানায় উঠে রাতে দুজনই শুতে গেল; সকালে দেখা গেল সঙ্গীটির সর্বস্ব লুঠ হয়েছে, আর গলাকাটা অবস্থায় পড়ে আছে। একটা রক্তমাখা ছোরা পাওয়া গেল বণিকের বালিশের তলায়। তার বিচার হল, তাকে চাবুক মারা হল, তারপর দুই নাক ফুটো করে কঠোর শাস্তি ভোগের জন্য সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেওয়া হল।

"তারপর, ভাইরে, এইভাবে দশটা বছর বা তারও বেশী সময় কেটে গেল। বুড়ো মানুষটা অনুগতভাবে কয়েদীর জীবন যাপন করতে লাগল।

কখনও কোন অন্যায় করে না। শুধু মৃত্যুর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে। একদিন আমাদের মতই বুড়ো মানুষটাকে নিয়ে কয়েদীরা জমা হল। সকলেই যার যার শাস্তির কারণ ও ঈশ্বরের প্রতি পাপের কথা বলতে লাগল। একজন বলল সে একটি লোককে খুন করে এসেছে, আর একজন বলল দুটি, তৃতীয় জন ঘরে আগুন জ্বালিয়ে এসেছে, অপর একজন ছিল নেহাৎই ভবঘুরে। কোন অন্যায় কাজ করে নি। এইভাবে তারা বুড়োকে শুধাল, 'তোমার কি জন্য শাস্তি হয়েছে বাবা?'—সে বলল, 'আমি ভোগ করছি নিজের ও অপরের পাপের শাস্তি। কিন্তু আমি কাউকে খুন করি নি, যা আমার নয় তাতে কখনও হাত দেই নি, শুধু যারা আমার চাইতেও গরীব তাদের সাহায্য করেছি। প্রিয় ভাই সব, আমি ছিলাম একজন বণিক ; বিষয় সম্পত্তিও প্রচুর ছিল।' তারপর সে পরপর সব কথা খুলে বলল। 'নিজের জন্য আমি দুঃখ করি না। মনে হয় ঈশ্বর আমাকে শুদ্ধ করেছেন! শুধু দুঃখ হয় আমার বুড়ি বৌটা আর ছেলেমেয়েদের জন্য।' এই বলে বুড়ো কাঁদতে লাগল। ঘটনাচক্রে যে লোকটা অপর বণিকটিকে খুন করেছিল সেও ছিল সেই কয়েদীদের দলে। সে বলল, 'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছিল বাবা? কখন, কোন মাসে?' সব কথা শুনবার পরে তার বুকটা টনটন করে উঠল। তখন সে বুড়ো লোকটির কাছে এইভাবে এসে তার পায়ের উপর পড়ল। বলল, "আমার জন্যই তুমি মরতে চলেছ বাবা। সত্যি বলছি বাছারা, অকারণেই এই নির্দোষ লোকটি কষ্ট ভোগ করছে। সেকাজটা করেছিলাম আমি, আর আমিই তোমার ঘুমের মধ্যে তোমার মাথার নীচে ছুরিটা রেখে দিয়েছিলাম। খ্রীস্টের দোহাই, তুমি আমাকে ক্ষমা কর বাবা!"

কারাতায়েভ থামল ; স্মিত হেসে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল ; দুটো পা জুড়ে নিল।

"আর বুড়ো মানুষটা বলল, 'ঈশ্বর তোমাকে ক্ষমা করবেন ; তাঁর চোখে আমরা সকলেই পাপী। আমার নিজের পাপের ফলই আমি ভোগ করছি,' এই বলে সে খুব কাঁদতে লাগল। আচ্ছা, "তোমরা কি মনে কর বন্ধুরা?" কারাতায়েভ প্রশ্ন করল ; উচ্ছ্বসিত হাসিতে তার মুখটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল, যেন এখন সে যা বলল তার মধ্যেই রয়েছে এই গল্পের প্রধান আকর্ষণ ও পুরো অর্থ। "তোমরা কি মনে কর প্রিয় বন্ধুরা? সেই খুনী কর্তৃপক্ষের কাছে দোষ স্বীকার করল। বলল, 'আমি ছ'জনের প্রাণ নিয়েছি, (লোকটা মহাপাপী) কিন্তু আমি সব চাইতে বেশী দুঃখিত এই বুড়ো মানুষটির জন্য। তাকে আর কষ্ট দেবেন না।' এইভাবে সে নিজের দোষ স্বীকার করল, সব লিখে দেওয়া হল, যথাসময়ে কাগজপত্র পাঠানো হল। জায়গাটা অনেক দূরে ; নানা প্রশ্ন নিয়ে বিচার-বিবেচনা চলতে লাগল, যথারীতি কাগজ ভরে গেল ; এদিকে সময়ও পার হতে লাগল। সমস্ত ব্যাপারটা জারের কাছে

গেল। কিছুদিন পরে জারের নির্দেশ এল: বণিককে মুক্তি দেওয়া হোক এবং ঘোষণানুযায়ী ক্ষতিপূরণও দেওয়া হোক। কাগজপত্র এলে তারা বুড়ো মানুষটিকে খুঁজতে লাগল। 'যে নির্দোষ বুড়ো মানুষটি অকারণে কষ্টভোগ করছিল সে কোথায়? জারের কাছ থেকে একখানা কাগজ এসেছে!' তারা লোকটিকে খুঁজতে লাগল। "এইখানে কারাতায়েভের নীচের চোয়ালটা কাঁপতে লাগল। "কিন্তু ইতিমধ্যেই সে ঈশ্বরের ক্ষমা পেয়ে গেছে—লোকটি মারা গেছে! এই হল ব্যাপার!" কথা শেষ করে কারাতায়েভ স্মিত হেসে নীরবে বহুক্ষণ সামনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আর পিয়েরের অন্তর অস্পষ্টভাবে কিন্তু আনন্দের সঙ্গে ভরে উঠল গল্পের জন্য নয়, তার রহস্যময় তাৎপর্যের জন্য: বলতে বলতে কারাতায়েভের মুখখানি যে উচ্ছ্বসিত আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং সেই আনন্দের যে অতীন্দ্রিয় তাৎপর্য আছে তাতেই ভরে উঠল তার অন্তর।

অধ্যায়—১৪

"যার যার জায়গায়!" হঠাৎ একটা উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

পাহারাদার সেনাদল ও বন্দীদের মধ্যে উত্তেজনার একটা মধুর অনুভূতি এবং আনন্দময় গম্ভীর কোন কিছুর প্রত্যাশা দেখা দিল। চারদিক থেকে ভেসে এল সামরিক নির্দেশ; সুবেশধারী একদল অশ্বারোহী ভাল ঘোড়ায় চেপে বাঁ দিক থেকে এসে বন্দীদের পাশ দিয়ে চলে গেল। কর্তৃপক্ষ স্থানীয় লোকের আবির্ভাব আসন্ন হলে যে কৎকণ্ঠা জাগে তারই স্পষ্ট প্রকাশ সকলের মুখে। বন্দীরা এক জায়গায় ভিড় করল; তাদের রাস্তা থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া হল। পাহারাদাররা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"সম্রাট! সম্রাট! মার্শাল! ডিউক!" ঝকঝকে অশ্বারোহী দলটি চলে যেতে না যেতেই ছ'টি ধূসর ঘোড়ায় টানা একটা গাড়ি সশব্দে চলে গেল। পিয়ের মুহূর্তের জন্য তিন-কোণা টুপি মাথায় একটি লোককে দেখতে পেল; তার ফোলা ফোলা সুদর্শন সাদা মুখে প্রসন্ন দৃষ্টি। পিয়েরের দশাসই দর্শনীয় চেহারার উপর তার চোখ পড়ল; যেরকম ভ্রূকুটি করে লোকটি পিয়েরের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিল তা দেখে তার মনে হল, লোকটির মনে তার প্রতি সহানুভূতি জাগলেও সে সহানুভূতিকে চেপে রাখতেই সে চায়।

ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ভীত রক্তিম মুখে তার ঘোড়াটার পিঠে চাবুক কসতে কসতে গাড়ির পিছনে ছুটে গেল। সৈন্যরা কয়েকজন অফিসারের একটা দলকে ঘিরে দাঁড়াল। সকলের মুখেই উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তার আভাষ।

পিয়ের শুনতে পেল সকলেই জিজ্ঞাসা করছে, "তিনি কি বললেন? তিনি কি বললেন?"

মার্শাল যখন চলে গেল, আর বন্দীরা একত্রে ভিড় করল, তখন পিয়ের কারাতায়েভকে দেখতে পেল। সকাল থেকে তার দেখা মেলে নি। ছোট ওভারকোটটা পরে সে একটা বার্চ গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে। গতকাল গল্প বলার সময় যে সানন্দ অনুভূতি ফুটে উঠেছিল তার মুখে, তা ছাড়াও একটা শান্ত গাম্ভীর্যের আভাষ এখন সেখানে ছড়িয়ে পড়েছে।

অশ্রুভরা সদয় গোল গোল দুটি চোখ মেলে কারাতায়েভ পিয়েরের দিকে তাকাল; সে যেন চাইছে পিয়ের তার কাছে যাক যাতে সে কিছু বলতে পারে। কিন্তু পিয়ের তখনও মনস্থির করতে পারে নি। সে এমন ভাব দেখাল যেন কারাতায়েভের দৃষ্টি তার নজরে পড়ে নি। তাড়াতাড়ি সে সেখান থেকে সরে গেল।

বন্দীরা এগিয়ে গেলে পিয়ের আবার ঘুরে তাকাল। কারাতায়েভ তখনও রাস্তার পাশে বার্চ গাছের নীচে বসে আছে; তার মাথার উপর ঝুঁকে দুটি ফরাসী সৈনিক কি যেন বলছে। পিয়ের আবার ফিরে তাকাল। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগল।

কারাতায়েভ যেখানে বসেছিল তার পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ এল। পিয়ের সেটা পরিষ্কার শুনতে পেল, কিন্তু সেইমুহূর্তে তার মনে হল স্মোলেন্স্ক পৌছতে আর ক'টা ঘাঁটি বাকি আছে সে হিসাবটা এখনও শেষ করা হয় নি। আবার সে হিসাব করতে শুরু করল। দুটি ফরাসী সৈনিক তার পাশ দিয়ে চলে গেল; একজনের হাতে একটা ধূমায়মান বন্দুক নীচু করে ধরা। দুজনেরই মুখ বিবর্ণ। একজন ভীরু চোখে পিয়েরকে দেখছে। তাদের চোখে মুখে ঠিক সেই ভাব যা পিয়ের দেখছিল মৃত্যুদণ্ড পাবার মুহূর্তে সেই তরুণ সৈনিকটির মুখে। তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মনে পড়ে গেল যে দুদিন আগে এই লোকটিই আগুনে শুকোতে গিয়ে তার শার্টটা পুড়িয়ে ফেলেছিল এবং তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল।

কারাতায়েভ যেখানে বসেছিল তার পিছনে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে। পিয়ের ভাবল, "জানোয়ারটা কী বোকা! এরকম ঘেউ ঘেউ করছে কেন?"

যেখানে গুলিটা ছোঁড়া হয়েছে এবং কুকুরটা ডাকছে, পিয়েরের বন্ধু কয়েদী-সৈনিকরা কিন্তু পিয়েরের মত সেদিকে মোটেই তাকাল না, কিন্তু তাদের সকলের দৃষ্টিই তখন কঠিন হয়ে উঠেছে।

অধ্যায়—১৫

ভাণ্ডার, বন্দী ও মার্শালের মালপত্রবাহী গাড়ি সবই শাম্‌শোভো গ্রামে থামল। সকলেই শিবির-আগুন ঘিরে বসে পড়ল। পিয়ের আগুনের কাছে গিয়ে খানিকটা ঝল্‌সানো শূকর মাংস খেল, তারপর আগুনের দিকে পিঠ

দিয়ে শোয়ামাত্রই ঘুমিয়ে পড়ল। বরদিনোর যুদ্ধের পরে মোঝায়েস্কের মতই এখানেও সে আবার ঘুম দিল।

আবারও সত্য ও কল্পনা একাকার হয়ে গেল ; আবারও সে বা অন্য কেউ তার চিন্তাকে ভাষা দিল ; হয় তো বা সেই একই চিন্তা যা ভাষা পেয়েছিল মোঝায়েস্কে তার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে।

"জীবনই সব। জীবনই ঈশ্বর। সব কিছু বদলায়, এগিয়ে চলে, আর সেই এগিয়ে চলাই ঈশ্বর। যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণই আনন্দ আছে ঈশ্বর চেতনার মধ্যে। জীবনকে ভালবাসাই ঈশ্বরকে ভালবাসা। যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে, নির্দোষ যন্ত্রণার ভিতর দিয়ে এই জীবনকে ভালবাসাই তো অন্য সব কিছু অপেক্ষা কঠিন ও পবিত্র।"

"কারাতায়েভ!" পিয়েরের মনে পড়ে গেল।

হঠাৎ সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পেল সেই দীর্ঘবিস্মৃত সদয় বৃদ্ধটিকে যে তাকে সুইজারল্যাণ্ডে ভূগোল শিখিয়েছিল। "একটু সবুর কর," বলে বুড়ো মানুষটি তাকে একটা ভূগোলক দেখাল। এই ভূ-গোলকটি জীবন্ত—কোন নির্দিষ্ট আয়তনবিহীন একটি স্পন্দনশীল গোলক। অনেকগুলি বিন্দুকে পর পর চেপে তার পরিধি গড়ে তোলা হয়েছে ; সেই বিন্দুগুলি পরিবর্তিত হয় ও স্থান পরিবর্তন করে ; কখনও কয়েকটি মিলে একটি হয়ে যায়, আবার কখনও একটি ভেঙে অনেকগুলি হয়ে যায়। প্রতিটি বিন্দু ছড়িয়ে পড়ে যত বেশী সম্ভব স্থান দখল করতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ একই কাজ করতে গিয়ে অন্য বিন্দুগুলি সেটাকে চেপে ধরে, অনেক সময় সেটাকে ধ্বংস করে ফেলে, আবার অনেক সময় সেটার সঙ্গে মিশে যায়।

"এই তো জীবন," বুড়ো শিক্ষক বলল।

পিয়ের ভাবল, "কথাটা কত সরল ও পরিষ্কার। আগে কেন যে এটা বুঝি নি?"

"ঈশ্বর আছেন কেন্দ্রে ; প্রতিটি বিন্দু এমনভাবে প্রসারিত হতে চায় যাতে তাঁকে যথাসম্ভব বেশী করে প্রতিবিম্বিত করা যায়। প্রতিটি বিন্দু বড় হয়, মিশে যায়, উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, অতলে তলিয়ে যায়, আবার ভেসে ওঠে। ঐ তো ওখানে, কারাতায়েভ নিজেকে প্রসারিত করে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বুঝতে পারছ বাবা?" শিক্ষক বলল।

"বুঝতে পারছ হে গাড়োল?" কে যেন চীৎকার করে উঠল ; পিয়েরের ঘুম ভেঙে গেল।

সে উঠে বসল। একটি ফরাসী এইমাত্র একজন কৃশ সৈন্যকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আগুনের পাশে বসে পড়ে একটা শিকের সাহায্যে একটুকরো মাংস ঝলসাচ্ছে। তার আস্তিন গোটানো ; পেশীবহুল লোমশ লাল হাতের বেঁটে আঙুল দিয়ে বেশ সুকৌশলে শিকটাকে ঘোরাচ্ছে। পোড়া কয়লার

আভায় তার বাদামী বিষণ্ণ মুখ ও ভ্রুকুটিকুটিল ভুরু দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

যে সৈন্যটি তার পিছনে দাঁড়িয়েছিল তার দিকে ফিরে বিড়বিড় করে বলল, "ওর পক্ষে সবই সমান। ডাকাত কোথাকার! পালাও!"

শিকটা ঘোরাতে ঘোরাতে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল। পিয়ের মুখ ঘুরিয়ে অন্ধকারের দিকে চোখ ফেলল। ফরাসীটি যে রুশ সৈন্যটিকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে সে আগুনের কাছে বসে হাত দিয়ে যেন কার গায়ে চাপড় মারছে। আরও ভাল করে পিয়ের নীল-ধূসর কুকুরটাকে চিনতে পারল; সৈন্যটির পাশে বসে সে লেজ নাড়ছে।

"আহা, ও কি এসে গেছে? কিন্তু প্লাত—" বলতে গিয়েও সে কথাটা শেষ করতে পারল না।

সহসা একযোগে অনেক স্মৃতি কল্পনায় তার মনের মধ্যে ভিড় করে এল—গাছের নীচে বসে প্লাতন যেভাবে তার দিকে তাকিয়েছিল, সেখান থেকে আসা যে গুলির শব্দ সে শুনেছিল, কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ, তাকে পাশ কাটিয়ে ছুটে যাওয়া দুটি ফরাসী সৈনিকের অপরাধী মুখ, নীচে নামানো ধূমায়মান বন্দুক, এখানে কারাতায়েভের অনুপস্থিতি—সে যেন প্রায় বুঝে ফেলেছে যে কারাতায়েভকে মেরে ফেলেছে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, কেন তা সে জানে না, পিয়েরের মনে পড়ে গেল আর একটি গ্রীষ্ম-সন্ধ্যার স্মৃতি যেদিনটা সে তার কিয়েভের বাড়ির বারান্দায় একটি সুন্দরী পোলিশ মহিলার সঙ্গে কাটিয়েছিল। দিনের ঘটনাগুলিকে একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা না করে, অথবা তার থেকে কোন সিদ্ধান্ত না টেনে পিয়ের চোখ বুজল; গ্রীষ্মকালীন পল্লীর একটা দৃশ্য তার চোখের সামনে ভেসে উঠল; তার সঙ্গে মিশল জলে নেমে স্নানের স্মৃতি, একটি স্পন্দনশীল ভূ-গোলকের স্মৃতি, আর সঙ্গে সঙ্গে সে এমনভাবে ডুবে গেল যেন জলস্রোত এসে তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গেল।

সূর্যোদয়ের আগেই চীৎকার-চেঁচামেচি ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। ফরাসী সৈন্যরা ছুটে পালাচ্ছে।

তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল, "কসাকরা এসেছে!" মুহূর্তকাল পরে একদল রুশ পিয়েরকে ঘিরে দাঁড়াল।

কি যে ঘটে যাচ্ছে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে তা বুঝতেই পারল না। শুধু শুনতে পেল, চারদিকে তার বন্ধুরা আনন্দে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কসাক ও হুজারদের জড়িয়ে ধরে বুড়ো সৈন্যরা কেবলই কাঁদছে আর বলছে, "ভাইরা আমার! প্রিয়জন আমার! আদরের মাণিক আমার!"

হুজার ও কসাকরা বন্দীদের চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল। কেউ তাদের পোশাক দিল, কেউ বুট দিল, কেউ বা দিল রুটি। তাদের মাঝখানে বসে

পিয়েরও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, একটা কথাও বলতে পারল না। প্রথম যে সৈনিকটি তার কাছে এগিয়ে এল তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে চুমো খেতে লাগল।

বিধ্বস্ত বাড়িটার ফটকে দাঁড়িয়ে আছে দলখভ। নিরস্ত্র ফরাসীরা ভিড় করে চলে যাচ্ছে তার সামনে দিয়ে। উত্তেজিত ফরাসীরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দলখভের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা চুপ করে গেল। বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে আছে তার কসাক; বন্দীদের গুণছে, আর প্রতি একশ' জন গোণা হয়ে গেলে খড়ি দিয়ে ফটকে একটা করে দাগ দিচ্ছে।

দলখভ কসাককে শুধাল, "কতজন হল?"

"দ্বিতীয় শত হল," কসাক জবাব দিল।

দলখভ অনবরত বলছে, "ফাইলেজ, ফাইলেজ! (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও!)' কথাটা সে ফরাসীদের কাছ থেকে শিখেছে। বন্দীদের চোখে চোখ পড়তেই তার দুই চোখে একটা নিষ্ঠুর আলো ঝিলিক দিয়ে উঠছে।

বাগানে একটা গর্ত খোঁড়া হয়েছে। কসাকরা পেত্য়া রস্তভের মৃতদেহটা সেখানে বয়ে নিয়ে চলেছে। খালি মাথায়, বিষণ্ণ মুখে দেনিসভ চলেছে তাদের পিছনে পিছনে।

অধ্যায়—১৬

২৮শে অক্টোবরের পরে প্রথম বরফ পড়তে আরম্ভ হলে ফরাসীদের পলায়ন আরও শোচনীয় আকার ধারণ করল। লোকগুলো বরফে জমে যেতে লাগল, অনেকে শিবির-আগুনে ঝলসেই মারা পড়ল। ওদিকে লোমের পোশাক-পরা লোকদের নিয়ে গাড়ির পর গাড়ি চলতে লাগল। সম্রাট, রাজন্যবর্গ, ডিউকবৃন্দ যে যা চুরি করেছিল সব গেল সেইসব গাড়িতে; কিন্তু ফরাসী বাহিনীর পলায়ন ও ভাঙন আগের মতই চলতে লাগল।

রক্ষীবাহিনীকে না ধরেই (গোটা যুদ্ধের সময় তারা লুটতরাজ ছাড়া আর কিছুই করে নি) ফরাসী বাহিনীর মোট সৈন্য সংখ্যা ছিল তিয়াত্তর হাজার। মস্কো থেকে ভিয়াজ্মা যেতেই সে সৈন্য সংখ্যা কমে দাঁড়াল ছত্রিশ হাজার, যদিও যুদ্ধে মারা পড়েছে অনধিক পাঁচ হাজার মাত্র। এইভাবে শুরু করে পরবর্তীকালের সৈন্যসংখ্যা হ্রাসের হারটা গাণিতিক নিয়মেই নির্ধারণ করা যেতে পারে। শীতের তীব্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি, পশ্চাদনুসরণ, পথের প্রতিবন্ধকতা, বা অন্য বিশেষ কারণগুলি ছাড়াই মস্কো থেকে ভিয়াজ্মা, ভিয়াজ্মা থেকে স্মোলেনস্ক, স্মোলেনস্ক থেকে বেরিজিনা, এবং বেরিজিনা থেকে ভিল্না

—সর্বস্তরে ফরাসী বাহিনী একই হারে গলে গেল, ধ্বংস হয়ে গেল'। ভিয়াজ্‌মার পর থেকে ফরাসী বাহিনী তিন সারির পরিবর্তে এক সারিতে ভিড় করতে লাগল এবং শেষ পর্যন্ত সেইভাবেই চলল। বের্থিয়ের তার অবস্থা বর্ণনা করতে সম্রাটকে এই রকম লিখল (এখন আমরা জেনেছি একটি সেনাবাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে একজন অধিনায়ক অফিসার সত্য থেকে কতদূরে সরে যেতে পারে):

"গত দু'তিন দিনের যাত্রাপথের বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন সেনাদলের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তাদের অবস্থা সম্পর্কে সম্রাটের কাছে একটা প্রতিবেদন পাঠানো আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। তারা প্রায় দলছুট হয়ে পড়েছে সৈন্যদের এক-চতুর্থাংশও তাদের রেজিমেন্টের পতাকাতলে সমবেত আছে কি না সন্দেহ, বাকিরা যার যেদিকে খুশি চলেছে; নিয়ম-শৃংখলার হাত এড়িয়ে খাদ্য-সংগ্রহের আশাতেই তারা ছুটছে। সাধারণভাবে তারা মনে করে যে স্মোলেন্‌স্ক্‌ই একমাত্র স্থান যেখানে তাদের অবস্থার উন্নতি হবার আশা আছে। গত কয়েক দিনে দেখা গেছে, অনেক সৈন্য তাদের কার্তুজ ও অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে, আপনার চূড়ান্ত পরিকল্পনা যাই হোক না কেন, ইয়োর ম্যাজেস্টির সেবার স্বার্থেই এটা জরুরী যে গোটা বাহিনীকে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এ সমবেত করা হোক, এবং যেসব অশ্ববিহীন অশ্বারোহী সৈন্য, অপ্রয়োজনীয় মালপত্র ও গোলন্দাজ বাহিনীর মালপত্র এখন আর সৈন্যসংখ্যার সমানুপাতিক নয় সেইসব অকার্যকর বোঝার হাত থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত করা হোক। সৈন্যরা ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নতুন করে খাদ্য সরবরাহ ও কয়েক দিনের বিশ্রাম তাদের দরকার। এই কয়দিনে রাস্তায় অথবা সাময়িক আস্তানায় অনেকে মারা গেছে। পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে, ভয় হয় জরুরী প্রতিকারের ব্যবস্থা না হলে নতুন করে যুদ্ধ বাধলে সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে না।

"৯ই নভেম্বর: স্মোলেন্‌স্ক্‌ থেকে ত্রিশ ভার্স্ট দূরে।"

স্খলিত পায়ে কোনরকমে স্মোলেন্‌স্ক্‌-এর স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে খাদ্যের সন্ধানে বিফল মনোরথ হয়ে ফরাসীরা পরস্পরকে খুন করল, নিজেদের খাদ্য লুট করল, এবং সবকিছু লুট করা শেষ হবার পরে আরও দ্রুত পালিয়ে গেল।

কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, কিছুই জানে না। প্রতিভাধর নেপোলিয়ন জানত আরও কম, কারণ তার কাছে কেউ কোন নির্দেশ পাঠায় নি। তথাপি সে নিজে এবং তার আশপাশের লোকরা তাদের পুরনো অভ্যাসমতই চলতে লাগল: হুকুম জারী করল, চিঠি লিখল, প্রতিবেদন পাঠাল, দৈনিক নির্দেশও ঘোষণা করল, একে অন্যকে Sire, mon, prince d' Eckmul, roi de

Naples ইত্যাদি বলে সম্বোধনও করল। কিন্তু এইসব হুকুম ও প্রতিবেদন শুধু কাগজেই রইল, তার কিছুই কার্যে পরিণত করা হল না, কারণ কার্যে পরিণত করা সম্ভব ছিল না। যদিও একে অন্যকে ম্যাজেস্টি, হাইনেস, বা কাজিন বলে ডাকত, তবু তারা সকলেই জানত যে তারা অতি শোচনীয় জীব, অনেক অন্যায় তারা করেছে, আর এখন তার জন্য মাশুল গুণতে হচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রতি দরদ দেখাবার ভান করলেও আসলে প্রত্যেকেই ভাবছে শুধু নিজের কথা, ভাবছে কত শীঘ্র এখান থেকে পালিয়ে নিজেকে বাঁচাবে।

অধ্যায়—১৭

মস্কো থেকে নিয়েমেন ফিরবার পথে রুশ ও ফরাসী বাহিনীর গতিবিধি ছিল অনেকটা কানা রুশোর কানামাছি খেলারই মত। সেই খেলায় দুজন খেলুড়ের চোখ বেঁধে দেওয়া হয়; তাদের মধ্যে একজন মাঝে মাঝে একটা ছোট ঘণ্টা বাজিয়ে নিজের অবস্থান জানিয়ে দেয়। প্রথমে সে ঘণ্টা বাজায় নির্ভয়ে, কিন্তু কোন শক্ত কোণে আটকা পড়লে যথাসম্ভব নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করে, আর প্রায়ই পালাতে গিয়ে সোজা প্রতিপক্ষের হাতের মধ্যে ধরা পড়ে যায়।

প্রথমে কালুগা রোড ধরে যাবার সময় নেপোলিয়নের সৈন্যরা সকলকে তাদের উপস্থিতি জানিয়েই চলতে লাগল, কিন্তু পরে স্মোলেন্স্ক্ রোডে পৌঁছে তারা ঘণ্টার ঘুন্টিটা চেপে ধরে ছুটতে লাগল এবং পালাতে গিয়ে সোজা রুশদের খপ্পরে ধরা পড়ল।

একটা সেনাদল পালাচ্ছে, অপর সেনাদল তাদের পিছু নিয়েছে। স্মোলেন্স্ক্ ছাড়িয়ে ফরাসীদের সামনে কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন পথ খোলা ছিল। সহজেই মনে করা যেতে পারে যে সেখানে চারদিন অবস্থানের সময় ফরাসী বাহিনী নিশ্চয় শত্রুপক্ষের উপস্থিতি জানতে পারত, আরও সুবিধাজনক কোন ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে পারত, এবং নতুন কোন পথের কথা ভাবতে পারত। কিন্তু চারদিন বিশ্রামের পরে কোনরকম পরিকল্পনা বা কৌশল ছাড়াই তারা চিরাচরিত পথ ধরে ছুটতে আরম্ভ করল; বাঁয়েও গেল না, ডাইনেও গেল না, সোজা এগিয়ে গেল ক্রাস্‌নু ও ওর্শার ভিতর দিয়ে সব চাইতে খারাপ পুরনো রাস্তাটা ধরে।

শত্রু সম্মুখ দিক থেকে আসবে না, আসবে পিছন থেকে—এই আশায় ফরাসীরা পালাবার পথে এত দূরে ছড়িয়ে পড়ল যে অনেক জায়গায় তাদের পরস্পরের দূরত্ব চব্বিশ ঘণ্টাকেও ছাড়িয়ে গেল। প্রথমে সম্রাট, পরে রাজন্যবর্গ, তারপরে ডিউকরা—তাদের সামনে সকলেই পালাচ্ছে। নীপার পেরিয়ে নেপোলিয়ন ডান দিকের রাস্তা ধরবে—সেটাই তার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কাজ

হত—এই আশায় রুশ বাহিনী ডাইনে মোড় নিয়ে ক্রাস্নুতে গিয়ে বড় রাস্তায় পড়ল। আর কানামাছি খেলার মতই ফরাসীরা এসে আমাদের অগ্রবর্তী বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে পড়ল। অপ্রত্যাশিতভাবে শত্রুকে দেখতে পেয়ে ফরাসীরা হতভম্ব হয়ে গেল, আকস্মিক ভয়ে থমকে দাঁড়াল, কিন্তু তার পরেই পিছনের বন্ধুদের ফেলে রেখে নতুন করে পালাতে শুরু করল। তারপর তিনদিন ধরে ফরাসী বাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন শাখা—প্রথমে মুরাত-এর দল, তারপর দাভুৎ-এর দল, এবং তারপর নে-র দল—সকলেই রুশবাহিনীর মুঠোর মধ্যে পড়ে গেল। তারা পরস্পরকে ছেড়ে গেল; ভারী মালপত্র, কামান-বন্দুক এবং অর্ধেক সৈন্য ফেলে রেখে ডান দিকে অর্ধবৃত্তাকারে রাতের অন্ধকারে রুশ বাহিনীর পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

সকলের শেষে এল নে; কারও পথে না পড়লেও সে স্মোলেন্স্ক্-এর দেয়ালগুলো উড়িয়ে দিতে লাগল, কারণ ঐ দেয়ালের গায়ে ধাক্কা খেয়ে সে দেয়ালকেই শাস্তি দিতে চাইল। দশ হাজার সৈন্য ছিল নে-র অধীনে; কিন্তু ওর্শাতে সে নেপোলিয়নের কাছে পৌঁছল মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে; বাকি সব সৈন্য ও কামান-বন্দুক সে ফেলে এসেছে; একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে সে নীপার নদী পার হয়ে এসেছে।

ওর্শা থেকে ভিল্না রোড ধরে তারা আরও দূরে পালাতে লাগল; পশ্চাদ্ধাবনকারী সৈন্যদের সঙ্গে তখনও চলল তাদের কানামাছি খেলা। বেরিজিনাতে তারা আবার দলছুট হয়ে পড়ল, অনেকে নদীতে ডুবে মরল, অনেকে আত্মসমর্পণ করল, আর যারা নদী পার হতে পারল তারা পালিয়ে গেল আরও দূরে। তাদের সর্বাধিনায়ক লোমের কোট পরে স্লেজে চেপে একাই ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল, পিছনে রেখে গেল সঙ্গীসাথীদের। আরও যারা পারল তারাও চলে গেল, আর যারা পারল না তারা হয় আত্মসমর্পণ করল, নয় তো মরল।

অধ্যায়—১৮

এ অভিযান যেন ফরাসীদের পলায়নেরই বৃত্তান্ত; এতে তারা যেন যথাশক্তি আত্ম-হননেই মেতে উঠল। যেদিন তারা কালুগা রোড ধরল সেদিন থেকে তাদের নেতার সেনাবাহিনী থেকে পলায়নের দিন পর্যন্ত তাদের গতিবিধি ছিল একেবারেই অর্থহীন। সুতরাং লোকে একথা ভাবতে পারত, যে ইতিহাসকাররা মনে করে যে একটি মানুষের ইচ্ছাই জনতার কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তাদের পক্ষে এই সময়কার পশ্চাদপসরণের বাহিনীকে তাদের মতবাদের সঙ্গে খাপখাওয়ানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিন্তু না! এই অভিযান সম্পর্কে ইতিহাসকাররা পাহাড়প্রমাণ বই লিখেছে, আর সর্বত্রই বিস্তারিত-

ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে নেপোলিয়নের সুব্যবস্থা, তার সমর-কৌশল, সৈন্য-পরিচালনার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, এবং তার মার্শালদের সামরিক প্রতিভার কথা।

একটি রসদ-সমৃদ্ধ অঞ্চলে যাবার রাস্তা খোলা ছিল; পরবর্তীকালে কুতুজভ যে রাস্তা বরাবর তার পশ্চাদ্ধাবন করেছিল সেই সমান্তরাল রাস্তাটাও খোলা ছিল; তবু নেপোলিয়ন যে মালো—ইয়ারোস্লাভেৎস্ থেকে পশ্চাদপসরণের সময় অপ্রয়োজনে একটা বিধ্বস্ত রাস্তা ধরে পশ্চাদপসরণ করেছিল তার ব্যাখ্যাস্বরূপ আমাদের বলা হয়েছে যে গভীর বিচার-বিবেচনাই নাকি তার কারণ। তার স্মোলেনস্ক্ থেকে ভর্শা পর্যন্ত পশ্চাদপসরণের পক্ষেও সেই একই গভীর বিচার-বিবেচনার কথা বলা হয়েছে। তারপর বর্ণনা করা হয়েছে ক্রাস্নুতে তার বীরত্বের। বলা হয়েছে, সেখানে সে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত ছিল, ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধে নেতৃত্ব দিতেও রাজী ছিল, আর একটা বার্চের ডাল হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলেছিল:

"সম্রাট হিসাবে আমি দীর্ঘকাল কাজ করেছি, এবার সেনাপতি হিসাবে কাজ করার সময় এসেছে।" তথাপি অবশিষ্ট বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত সৈন্যদের ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে পরক্ষণেই আবার সে পালিয়ে গিয়েছিল।

তারপর আমাদের বলা হয়েছে মার্শালদের অন্তরের মহত্ত্বের কথা—বিশেষ করে নে-র কথা—আর সে মহত্ত্বের তো এই স্বরূপ; বাহিনী-পতাকা, কামান-বন্দুক ও নয়-দশমাংশ সৈন্যকে ফেলে রেখে রাতের অন্ধকারে বনের আড়াল দিয়ে নীপার নদী পার হয়ে সে ভর্শাতে পালিয়ে গিয়েছিল।

এবং সবশেষে, বীরত্বপূর্ণ সেনাদলের কাছ থেকে মহান সম্রাটের চূড়ান্ত যাত্রাকে ইতিহাসকাররা বর্ণনা করেছে একটি মহৎ ও প্রতিভার স্মারক রূপে। এমন কি যে চূড়ান্ত পলায়নকে সাধারণ ভাষায় নীচতার সর্বনিম্ন ধাপ বলে বর্ণনা করা হয়, যা নিয়ে প্রতিটি শিশুকেও লজ্জা পেতে শেখানো হয়,—তাকেও ইতিহাসকারদের ভাষায় সমর্থন জানানো হয়েছে।

ঐতিহাসিক যুক্তির সুতোকে যখন আর টানা যায় না, কোন কাজ যখন মানুষ যাকে সঠিক, এমন কি ন্যায় বলে মনে করে তার সম্পূর্ণ বিরোধী হয়, তখনই ইতিহাসকাররা "মহত্ত্ব" নামক একটি আত্মরক্ষাকারী ধারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। মনে হয়, 'মহত্ত্ব' বুঝি ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠির অতীত। মহাপুরুষের পক্ষে কিছুই অন্যায় নয়; এমন কোন নৃশংসতা নেই যার জন্য একজন মহাপুরুষকে দোষী করা যায়।

গরম লোমের পোশাকে শরীর ঢেকে নেপোলিয়ন স্বদেশে পালিয়ে গেল; মৃত্যুর মুখে ফেলে রেখে গেল তাদের যারা শুধু তার সহকর্মী নয়, যাদের সে এখানে নিয়ে এসেছিল। সে ভাবল খুব ভাল কাজই করেছে, আর তাই ভেবে তার মনও শান্ত হল।

নেপোলিয়ন বলল, "মহান থেকে হাস্যকরের ব্যবধান মাত্র একটি

ধাপের।" আর সারা বিশ্ব পঞ্চাশ বছর ধরে তারই পুনরাবৃত্তি করে গেল: "মহান! মহিমময়! নেপোলিয়ন মহিমময়!" মহান থেকে হাস্যকরের ব্যবধান মাত্র একটি ধাপের।

একথা কারও মনে হল না যে, ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ডের বিচারে যে মহত্ত্ব তুল্যমূল্য নয় তাকে স্বীকার করার অর্থই নিজের অন্তঃসারশূন্যতা ও অপরিমেয় নীচতাকে স্বীকার করা।

আমার কাছে, যেহেতু খৃস্টের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি ভাল ও মন্দের মানদণ্ড, মানুষের কোন কাজই বিচারের ঊর্ধ্বে নয়। যেখানে সরলতা, সাধুতা ও সত্য অনুপস্থিত, সেখানে কোন মহত্ত্ব থাকতে পারে না।

অধ্যায়—১৯

১ ·১২ সালের অভিযানের শেষাংশের বিবরণ পড়ে কোন্ রুশ অধিবাসীর মনে দুঃখ, অসন্তোষ ও বিহ্বলতার একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি জাগে নি? আমাদের তিন তিনটি বাহিনী যখন যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য নিয়ে ফরাসীদের ঘিরে ধরেছিল, ক্ষুধার্ত ও শীতার্ত বিশৃংখল ফরাসীরা যখন দলে দলে আত্মসমর্পণ করছিল, যখন (ইতিহাসকারদের বিবরণ মতে) রুশদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ফরাসীদের প্রতিরোধ করা, তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলা এবং সব্বাইকে গ্রেপ্তার করা,—তখন সব ফরাসীদের কেন গ্রেপ্তার বা ধ্বংস করা হয় নি, এ প্রশ্ন নিজের কাছে কে না করেছে?

এটা কি করে ঘটল যে, রুশ বাহিনী যখন সংখ্যায় ফরাসীদের তুলনায় দুর্বলতর ছিল তখন তারা বরদিনোতে লড়তে পারল, আর যখন তারা তিন দিক থেকে ফরাসীদের ঘিরে ফেলল, যখন তাদের গ্রেপ্তার করাই ছিল তাদের লক্ষ্য, তখন তারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারল না? ফরাসীরা কি আমাদের চাইতে এত বেশী উঁচুদরের যোদ্ধা যে অধিক সংখ্যক সৈন্য নিয়ে ঘিরে ফেলেও আমরা তাদের মারতে পারি নি? সেটা ঘটল কেমন করে?

এই সব প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস (অথবা ঐ নামে যাকে ডাকা হয়) বলে, এটা ঘটেছিল কারণ কুতুজভ এবং তর্মাসভ এবং চিচাগভ এবং অমুক লোক ও তমুক লোক অমুক-তমুক রণ-কৌশলকে কার্যে পরিণত করে নি।

কিন্তু কেন তারা তা করে নি? আর পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী কোন লক্ষ্যকে কার্যে পরিণত না করার অপরাধে যদি তারা অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে কেন তাদের বিচার হল না, শাস্তি হল না? কিন্তু একথা যদি স্বীকার করেও নেওয়া যায় যে কুতুজভ, চিচাগভ ও অন্যরাই রুশ ব্যর্থতার কারণ তাহলেও তো এটা দুর্বোধ্যই থেকে যায় যে ক্রাসনৃ ও বেরিজিনাতে (দু' জায়গাতেই আমাদের সৈন্যসংখ্যা বেশী ছিল) রুশ বাহিনী সুবিধাজনক অবস্থাতে থেকেও

কেন রুশদের লক্ষ্য অনুযায়ী মার্শালগণ, রাজন্যবর্গ ও সম্রাটসহ গোটা ফরাসী বাহিনীকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।

কুতুজভ আক্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল এই কথা বলে রুশ সামরিক ইতিহাসকাররা এই অদ্ভুত ঘটনার যে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে সেটাও ভিত্তিহীন, কারণ আমরা জানি ভিয়াজ্‌মায় এবং তারুতিনোতে কুতুজভ সেনাদলকে আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

যে রুশবাহিনী অনেক কম শক্তি নিয়ে বরদিনোতে পূর্ণ শক্তিতে শক্তিমান শত্রুর সঙ্গে পাল্লা লড়তে পারল, কেন তারা ক্রাসনুয় ও বেরিজিনাতে অধিকতর শক্তিশালী পক্ষ হওয়া সত্ত্বেও বিশৃংখল ফরাসীদের হাতে মার খেল?

শত্রুপক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে নেপোলিয়ন ও তার মার্শালদের গ্রেপ্তার করাই যদি রুশদের লক্ষ্য ছিল—সে লক্ষ্য যে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, সে উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিটি চেষ্টা অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে প্রতিহত হয়েছে—তাহলে তো অভিযানের এই শেষ পর্যায়কে ফরাসীরা যে তাদের জয়ের পর জয় বলে মনে করে সেটাই ঠিক, আর রুশ ইতিহাসকাররা যে সেটাকে আমাদের জয় বলে মনে করে সেটাই সম্পূর্ণ ভুল।

রুশ সামরিক ইতিহাসকাররা যদি যুক্তির দাবী মেনে চলে তাহলে তাদের স্বীকার করতেই হবে যে রুশবাহিনীর শৌর্য, দেশসেবা প্রভৃতি সম্পর্কে যত উচ্ছ্বসিত কাব্য তারা রচনা করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে মস্কো থেকে ফরাসীদের পশ্চাদপসরণ নেপোলিয়নের জয়ের পর জয় এবং কুতুজভের পরাজয়ের পর পরাজয়েরই স্বাক্ষর বহন করে।

কিন্তু জাতীয় গর্ববোধের ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে রেখেও যেকোন মানুষেরই মনে হবে যে এধরনের সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী, কারণ ফরাসীদের উপর্যুপরি জয় তাদের এনে দিয়েছিল পরিপূর্ণ ধ্বংস, আর রুশদের উপর্যুপরি পরাজয়ের ফল হল শত্রুপক্ষের সার্বিক বিনষ্টি এবং তাদের দেশের মুক্তি।

এই স্ববিরোধের উৎস খুঁজতে হবে একটিমাত্র ঘটনার মধ্যে: ইতিহাসকাররা সম্রাট ও জেনারেলদের চিঠিপত্র, স্মৃতিকথা, প্রতিবেদন, প্রকল্প ইত্যাদি থেকে তাদের রচনার উপাদান সংগ্রহ করতে গিয়ে ১৮১২ সালের অভিযানের শেষ পর্যায়ে এমন একটি লক্ষ্যের কথা বলেছে—অর্থাৎ মার্শালবর্গ ও সেনাবাহিনীসহ নেপোলিয়নকে ছিন্নভিন্ন করে গ্রেপ্তার করা—কোনকালেই যার কোন অস্তিত্বই ছিল না।

এরকম কোন লক্ষ্য কখনও ছিল না বা থাকতে পারে না, কারণ সেটা একান্তই অর্থহীন এবং তাকে কার্যে পরিণত করা একেবারেই অসম্ভব।

সেটা যে অর্থহীন· তার প্রথম কারণ, নেপোলিয়নের ছত্রভঙ্গ বাহিনী তখন যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে রাশিয়া থেকে পালাচ্ছিল, আর প্রতিটি রুশ তখন

সেটাই চাইছিল। কাজেই ফরাসীরা যখন প্রাণপণ শক্তিতে পালিয়েই যাচ্ছে তখন অকারণ যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রয়োজনটা কোথায়?

দ্বিতীয়, যে সৈন্যরা পালিয়ে যেতেই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে তাদের পথ আটকে দেবার তো কোনই অর্থ হয় না।

তৃতীয়, যে-ফরাসী বাহিনী বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজেকে নিজেই এমনভাবে ধ্বংস করে চলছিল যেপথে কোনরকম বাধার সম্মুখীন না হয়েও মূল বাহিনীর একশ' ভাগের এক ভাগের বেশী সৈন্য নিয়েও সীমান্ত পার হতে পারে নি, তাকে ধ্বংস করার জন্য নিজেদের সৈন্য নষ্ট করা হত একান্তই অর্থহীন।

চতুর্থ, সম্রাট, রাজন্যবর্গ, এবং ডিউকবৃন্দকে গ্রেপ্তারের বাসনাটাই অর্থহীন হত,—তাদের গ্রেপ্তার করা হলে সেটা যে রুশদের পক্ষে খুবই বেশীরকমের হতবুদ্ধিকর হত সেকথা তো সেসময়কার সবচাইতে নিপুণ কূটনীতিবিদরাই (জোসেফ দ্য মেইস্তার প্রভৃতিরা) স্বীকার করেছে। ফরাসী সৈন্যদের গ্রেপ্তার করার বাসনা আরও বেশী অর্থহীন হত, কারণ ক্রাস্নুতে পৌঁছবার আগেই আমাদের সৈন্যসংখ্যা কমতে কমতে অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছিল; যখন আমাদের নিজেদের সৈন্যরাই পুরো রেশন পাচ্ছিল না, আর যাদের ইতি মধ্যেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে তারাই ক্ষুধায় মরতে বসেছে, সেই পরিস্থিতিতে একটা গোটা সৈন্যদলকে বন্দী করে পাহারা দিয়ে নিয়ে যেতে একটা গোটা ডিভিশন সৈন্যেরই দরকার হয়ে পড়ত।

নেপোলিয়ন ও তার বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে গ্রেপ্তার করার গুরুগম্ভীর পরিকল্পনাগুলি সেই বাজার-মালির পরিকল্পনারই মত যে বাগানে ঢুকে গাছের চারা মাড়িয়ে দেওয়ার জন্য গরুটাকে তাড়িয়ে দিতে ফটক পর্যন্ত ছুটে গিয়ে তার মাথায়ই মারল লাঠির ঘা। তার স্বপক্ষে একটিমাত্র কথাই বলা যায় যে সে খুব রেগে গিয়েছিল। কিন্তু এইসব প্রকল্প যারা রচনা করেছিল তাদের স্বপক্ষে একথাও বলা যাবে না, কারণ ফুলের কেয়ারি মাড়িয়ে দেবার ফলে তাদের অন্তত কোন ক্ষতি হয় নি।

নেপোলিয়নকে তার সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন করা যে অর্থহীন তাই শুধু নয়, সেটা অসম্ভবও বটে।

সেটা যে অসম্ভব তার প্রথম কারণ, অভিজ্ঞতা থেকেই জানা যায় যে রণক্ষেত্রে তিন মাইল দীর্ঘ সেনা সমাবেশ কখনও পরিকল্পনামাফিক চলতে পারে না; চিচাগভ, কুতুজভ ও উইৎগেন্স্তিন যথাসময়ে একটা নির্দিষ্টস্থানে মিলিত হবে—তার সম্ভাবনা এতই সুদূর যে সেটা প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। বস্তুত, পরিকল্পনাটা হাতে পেয়ে কুতুজভ তো বলেইছিল যে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত কোন পরিকল্পনা বাঞ্ছিত ফল এনে দিতে পারে না।

দ্বিতীয়, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে, যে দুর্বার গতিতে নেপোলিয়নের

সৈন্যরা পালাচ্ছিল তাকে স্তব্ধ করে দিতে হলে রুশদের তৎকালীন সৈন্যশক্তি অপেক্ষা আরও বহুগুণ সৈন্যের প্রয়োজন হত।

তৃতীয়, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে "বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া" এই সামরিক কথাটাই অর্থহীন। একটুকরো রুটিকে কেটে বিচ্ছিন্ন করা যায়, কিন্তু একটা সেনাদলকে তা করা যায় না। একটা সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করা—তার পথ আটকে দেওয়া—সম্পূর্ণ অসম্ভব, কারণ গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলবার প্রচুর পথ সব সময়ই খোলা থাকে; তাছাড়া আছে রাতে যখন কিছুই চোখে দেখা যায় না; সমর-বিজ্ঞানীরা তো ক্রাস্নু ও বেরিজিনার দৃষ্টান্ত থেকেই সেটা ভালভাবে বুঝতে পারে। যারা বন্দী হতে চায় একমাত্র তাদেরই বন্দী করা যায়, যেমন যে পাখি হাতে এসে বসে তাকেই শুধু ধরা সম্ভব। সৈন্যরা যখন জার্মানদের মত রণ-কৌশল হিসাবে আত্মসমর্পণ করে একমাত্র তখনই তাদের বন্দী করা যায়। কিন্তু ফরাসী সৈন্যরা সে কৌশলকে গ্রহণীয় বলে মনে করে নি, কারণ কি পলায়নে কি বন্দী-জীবনে ক্ষুধায় এবং শীতে মৃত্যু তাদের অনিবার্য নিয়তি।

চতুর্থ এবং প্রধান কথা, সেটা অসম্ভব এই কারণে যে, জগতের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত ১৮১২ সালের মত ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে কখনও কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয় নি; ফরাসীদের পশ্চাদ্ধাবন করতে রুশ-বাহিনীকে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হয়েছে; তার বেশী কিছু করতে গেলে সে নিজের ধ্বংসকেই ডেকে আনত।

তারুতিনো থেকে ক্রাস্নু যাবার পথে রুশবাহিনী রুগ্ন অথবা দলছুট হিসাবে পঞ্চাশ হাজার সৈন্যকে হারাল, অর্থাৎ সংখ্যাটা যেকোন একটা বড় প্রাদেশিক শহরের জনসংখ্যার সমান। অর্ধেক সৈন্য মারা পড়ল বিনা যুদ্ধে।

অভিযানের এইরকম একটা পর্যায়ে—যখন সৈন্যদের ছিল না বুট, ছিল না ভেড়ার চামড়ার কোট, ছিল না যথেষ্ট খাদ্য, ভদ্‌কা তো একেবারেই ছিল না, পনেরো ডিগ্রি তুষারপাতের মধ্যে মাসের পর মাস রাত কাটিয়েছে বাইরে তাঁবু খাটিয়ে, যখন দিনের আলো থাকত মাত্র সাত কি আট ঘণ্টা, আর বাকি রাতটাতে শৃংখলা বজায় রাখা ছিল অসম্ভব, যখন কেবলমাত্র যুদ্ধের কয়েক ঘণ্টা নয়, মাসের পর মাস সৈন্যদের এমন একটা মৃত্যুপুরীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেখানে শৃংখলা ভেঙে পড়তে বাধ্য, যখন প্রতিটি মুহূর্তে তারা যুদ্ধ করেছে ক্ষুধা ও শীতের আক্রমণে মৃত্যুর বিরুদ্ধে, যখন মাত্র একটি মাসে অর্ধেক সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল—অভিযানের সেই পর্যায় সম্পর্কে ইতিহাসকাররা আমাদের শোনাবেন মিলোরাদভিচের কোন্ পথে কোথায় সৈন্য পরিচালনা করা উচিত ছিল, তর্মাসভের কোন্ নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া উচিত ছিল, হাঁটু পর্যন্ত বরফের ভিতর দিয়ে নদী পেরিয়ে চিচাগভের যাওয়া উচিত ছিল অন্য কোন্‌খানে, এবং যেন তেন প্রকারেন ফরাসী বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করা ও

পর্যন্ত করা উচিত ছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

অর্ধেক সৈন্য মৃত্যুর মুখে চলে পড়লেও জাতির যোগ্য লক্ষ্য পূরণে যা কিছু করা সম্ভব এবং যা কিছু করা উচিত রুশ সৈন্যরা সেসবই করেছে; রাশিয়ার অন্য একদল মানুষ বৈঠকখানায় আরামে বসে তাদের অসম্ভব কিছু করতে বলেছে বলেই রুশ সৈন্যদের কোনরকম দোষ দেওয়া উচিত নয়।

প্রকৃত সত্য ও ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে বিচিত্র স্ববিরোধকে আজ বোঝা শক্ত তার কারণই হল, ইতিহাসকাররা লিখেছে সুন্দর সুন্দর কথা দিয়ে বিভিন্ন জেনারেলের মনোভাবের ইতিহাস, প্রকৃত ঘটনার ইতিহাস নয়।

তাদের আগ্রহ মিলোরাদভিচের কথায়, আর অমুক বা তমুক জেনারেল যেসব পুরস্কার পেয়েছে তার প্রতি; কিন্তু যে পঞ্চাশ হাজার মানুষ হাসপাতালে অথবা কবরের নীচে পড়ে রইল তাদের কথা সেই ইতিহাসকারদের মনকে টানে নি, কারণ সেটা তাদের অনুসন্ধানের আওতার মধ্যে পড়ে না।

অথচ কেউ যদি প্রতিবেদন ও সাধারণ পরিকল্পনাগুলি বাতিল করে দিয়ে যে লাখ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সেইসব ঘটনায় অংশ নিয়েছিল তাদের কথা আলোচনা করে তাহলেই যেসব সমস্যাকে সমাধানের অতীত বলে মনে হয়েছে সেসব কিছুরই অত্যন্ত সহজ ও সরল সমাধানের সূত্র সে সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে যাবে।

নেপোলিয়ন ও তার সেনাদলকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা এক ডজন মানুষের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও কোনকালে ছিল না। থাকতে পারে না, কারণ সে চিন্তাই অর্থহীন ও অবাস্তব।

জনসাধারণের মনে ছিল একটি লক্ষ্য: 'দেশকে আক্রমণের হাত থেকে মুক্ত করা। প্রথমত, ফরাসীরা যখন নিজে থেকেই পালাতে শুরু করল তখনই সে লক্ষ্য সিদ্ধ হয়ে গেল, কাজেই তাদের পলায়ন না থামানোটাই তখন একমাত্র কাজ। দ্বিতীয়ত, যে গেরিলা যুদ্ধে ফরাসীরা ধ্বংস হচ্ছিল তাতেই সে লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছে; তৃতীয়ত, রুশ বাহিনীর একটা বড় অংশ তখন ফরাসীদের পিছনে ধাওয়া করে চলেছে, তারা থামলেই সব শক্তি নিয়ে ফরাসীদের আক্রমণ করতে তারা প্রস্তুতই ছিল।

রুশ বাহিনীকে তখন কাজ করতে হয়েছিল ধাবমান জন্তুর পিঠে চাবুকের মত। আর অভিজ্ঞ কোচয়ানমাত্রই জানে যে ধাবমান জন্তুটার মাথায় চাবুকের ঘা বসানোর চাইতে ভয়-দেখানো ভঙ্গীতে চাবুকটাকে উদ্যত রাখাটাই শ্রেয়তর।

চতুর্দশ পর্ব সমাপ্ত

পঞ্চদশ পর্ব

অধ্যায়—১

একটি মুমূর্ষু জন্তুকে দেখলে মানুষের মনে আতংক জাগে : চোখের সামনে তারই অনুরূপ একটি জীব মরতে বসেছে। কিন্তু যখন কোন প্রিয় ঘনিষ্ঠ মানুষের মৃত্যু ঘটে তখন জীবন অবসানের এই ত্রাস ছাড়াও দেখা দেয় একটা কাটা ঘা, একটা আত্মিক ক্ষত, দৈহিক ক্ষতের মতই সে ক্ষত কখনও মারাত্মক হয়, কখনও শুকিয়ে যায়, কিন্তু বাইরে থেকে যেকোনরকম খোঁচা লাগলেই ব্যথা লাগে, কুঁকড়ে ওঠে।

প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যুর পরে নাতাশা ও প্রিন্সেস মারিরও সেই অবস্থা হল ; মৃত্যুর যে ভীতিপ্রদ মেঘ ছায়া ফেলেছে তাদের উপর তার মুখোমুখি হয়ে বিষণ্ণ মনে তারা চোখ বুজে রইল, জীবনের দিকে চোখ মেলে তাকাবার সাহস তাদের নেই ; যেকোনরকম বেদনাদায়ক স্পর্শ থেকে ক্ষতস্থানকে তারা সযত্নে রক্ষা করে চলল। রাস্তায় দ্রুত ধাবমান একটা গাড়ি, ডিনারে যোগ দেবার ডাক, কি পোশাক পরে বের হবে সে সম্পর্কে দাসীর প্রশ্ন, অথবা কোনরকম আন্তরিকতাবিহীন বা দুর্বল সহানুভূতি : এ সব কিছুই তাদের কাছে অপমান বলে মনে হয়, ক্ষতস্থান বেদনায় নতুন করে টাটিয়ে ওঠে, যে কঠোর ভয়ংকর সঙ্গীত কল্পনায় এখনও তাদের কানে প্রতিধ্বনিত হয় তাকে ভাল করে শুনবার জন্য যে প্রশান্তি প্রয়োজন হয় তাও বিঘ্নিত হয়, মুহূর্তের জন্য যে রহস্যময় সীমাহীন দৃশ্য তাদের সামনে খুলে গিয়েছিল সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা আর হয়ে ওঠে না।

একমাত্র যখন তারা দুজন একত্র থাকে তখনই এই সব অপমান ও বেদনা থেকে তারা মুক্তি পায়। নিজেদের মধ্যেও তারা খুব কম কথা বলে, আর যখন বলে তাও অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েই বলে।

ভবিষ্যতের আলোচনাকে দুজনই এড়িয়ে চলে। ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে স্বীকার করাটাই তাদের কাছে প্রিন্স আন্দ্রুর স্মৃতিকে অসম্মান দেখানোর সামিল। যে মারা গেছে তার সম্পর্কিত সব কিছুকেই তারা সযত্নে এড়িয়ে চলে। তাদের মনে হয়, যে জীবনকে তারা পার হয়ে এসেছে তার অভিজ্ঞতাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, প্রিন্স আন্দ্রুর জীবনের যেকোন ঘটনার উল্লেখ করলেই তাদের চোখের সামনে যে রহস্য রূপায়িত হত, তার মহত্ব ও পবিত্রতা বিঘ্নিত হবে।

একাদিক্রমে কথা বলা থেকে বিরত থাকা এবং সেবিষয় সম্পর্কিত সব কিছুকে অনবরত এড়িয়ে চলার ফলে তাদের মনের অনুভূতি অধিকতর পবিত্রতা ও স্পষ্টতা নিয়ে তাদের মনের সামনে ভেসে ওঠে।

কিন্তু নির্ভেজাল পরিপূর্ণ সুখের মতই নির্ভেজাল পরিপূর্ণ দুঃখও অসম্ভব। প্রিন্সেস মারি এখন তার নিজের ভাগ্যেরএকমাত্র স্বাধীন বিধাতা ; সে তার ভাইপোটিরও অভিভাবিকা ও শিক্ষয়িত্রী ; কাজেই প্রথম পক্ষকাল যে দুঃখের রাজ্যে সে বাস করেছে সর্বপ্রথম তাকেই সেখান থেকে বাস্তব জীবনে ফিরে আসতে হয়েছে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে চিঠি এলে তার জবাব দেয় ; যে ছোট ঘরটায় ছোট নিকলাস থাকে সেটা স্যাঁতসেতে, আর তাই তার কাশি হয়েছে ; আল্‌পাতিচ্‌ই তো স্মাভ্‌ল্‌ থেকে সেখানকার অবস্থার কথা জানিয়ে প্রস্তাব ও পরামর্শ দিয়েছে যে মস্কোতে ভজ্‌দ্‌ভিজেংকা স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরে যাওয়াই তাদের উচিত ; সে বাড়িটা অক্ষতই আছে. সামান্য মেরামত করে দিলেই চলবে। জীবন তো কোথাও থেমে থাকে না ; কাজেই বাঁচতে তো হবেই। প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যুর পর থেকে প্রিন্সেস মারি যে নির্জন ধ্যানের রাজ্যে ডুবে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে যত কষ্টই হোক, নাতাশাকে একলা ফেলে যেতে তার যত দুঃখ ও লজ্জাই হোক, তবু জীবনের নানা চিন্তার দাবীই বড় হয়ে দেখা দিল, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে দাবীর কাছে সে নতি স্বীকার করল। আল্‌পাতিচের সঙ্গে বসে হিসাবপত্র দেখল, ভাইপোর ব্যাপারে দেসালেসের সঙ্গে আলোচনা করল, এবং মস্কো ফিরে যাবার হুকুম দিয়ে সেজন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল।

নাতাশা একা পড়ে গেল ; প্রিন্সেস মারি যবে থেকে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল তখন থেকে তার কাছ থেকেও সে সরে গেল।

প্রিন্সেস মারি কাউন্টেসকে বলল, নাতাশাকেও তাদের সঙ্গে মস্কো যেতে দেওয়া হোক ; বাবা-মা সানন্দে সে প্রস্তাব গ্রহণ করল, কারণ তারা দেখছে তাদের মেয়েটি দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে, আর স্থান পরিবর্তন ও মস্কোর ডাক্তারদের পরামর্শের ফল তার পক্ষে ভালই হবে।

সে প্রস্তাব করা হলে নাতাশা বলল, "আমি কোথাও যাচ্ছি না। দয়া করে আমাকে একা থাকতে দাও!" অনেক কষ্টে দুঃখের চাইতে বিরক্তির চোখের জল চেপে সেখান থেকে ছুটে চলে গেল।

সে বুঝল, প্রিন্সেস মারি তাকে ছেড়ে যাচ্ছে, তার দুঃখ তাকে একাই সইতে হবে। বেশীর ভাগ সময় সে নিজের ঘরে একাই কাটায়। এই নির্জনতা তাকে ক্লান্ত করে তোলে, যন্ত্রণা দেয়, তবু সেটা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কেউ ঘরে ঢুকলেই সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়, মুখের ভাব বদলে জায়গা বদল করে, একটা বই বা সেলাই হাতে নেয়. অনধিকারপ্রবেশকারী কতক্ষণে চলে যাবে তার জন্য অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করে।

সারাক্ষণই তার মনে হয়, যার দিকে তার অন্তরের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে যেকোন মুহূর্তেই তার ভিতরে সে প্রবেশ করতে পারবে।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে একদিন শীর্ণ, বিবর্ণ শরীর কালো পশমী গাউনে

ঢেকে, চুলে কোনরকমে একটা গিঁট বেঁধে, সোফার উপর গুড়িসুড়ি মেরে বসে, ওড়নার একটা কোন পালিশ করতে করতে নাতাশা দরজাটার এক কোণের দিকে তাকিয়েছিল।

সে তাকিয়ে আছে সেই দিকে যেদিক দিয়ে প্রিন্স আন্দ্রু চলে গিয়েছে—জীবনের ওপারে। জীবনের সেই পরপারের কথা নাতাশা আগে কখনও ভাবে নি, সেটা তার কাছে মনে হত বহুদূরের এক দুর্গম স্থান, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অনেক কাছের, অনেক ঘনিষ্ঠ এবং অনেক বেশী বোধগম্য; বরং এখন জীবনের এপারটাই শূন্যতা ও নির্জনতায় ভরা, যন্ত্রণা ও অমর্যাদায় আকীর্ণ।

প্রিন্স আন্দ্রু এখন যেখানে আছে বলে সে জানে সেইদিকেই সে তাকিয়ে আছে; কিন্তু এখানে সে যে রূপে ছিল তা থেকে কোন ভিন্নতর রূপে সে তাকে কল্পনাই করতে পারে না। এখনও সে তাকে সেইভাবেই দেখছে যেভাবে দেখেছিল মিতিশ্‌চিতে, ত্রয়ত্সায়, এবং ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এ।

সে প্রিন্স আন্দ্রুর মুখ দেখতে পেল, তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, তার ও নিজের কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করল, আর মাঝে মাঝে এমন সব সংলাপ বানিয়ে বলল যা তারা বলতে পারত।

ওই তো শীর্ণ বিবর্ণ হাতের উপর মাথাটা রেখে ভেলভেটের জোব্বা পরে সে হাতল-চেয়ারটায় হেলান দিয়ে শুয়ে আছে। বুকটা ভয়ংকরভাবে বসে গেছে, কাঁধ দুটো ঠেলে উঠেছে। দুটি ঠোঁট দৃঢ়বদ্ধ, দুই চোখে আলোর ঝিলিক, বিবর্ণ কপালে কখনও ভাঁজ পড়ছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা পা দ্রুত গতিতে ঈষৎ কাঁপছে। নাতাশা জানে সে ভয়ংকর ব্যথার সঙ্গে লড়ছে। "সে ব্যথাটা কেমন ধারা? কেন এ ব্যথা তার হল? তার কেমন লাগছে? ব্যথাটা তাকে কিভাবে কষ্ট দিচ্ছে?" নাতাশা ভাবতে লাগল। সে যে তাকে দেখছে সেটা লক্ষ্য করে প্রিন্স আন্দ্রু চোখ তুলে বলতে লাগল:

"একটি যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে চিরদিনের মত নিজেকে বেঁধে ফেলা—সে বড় ভয়ংকর। সে যে নিয়ত যন্ত্রণা।" সেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নাতাশার দিকে তাকাল। কি বলবে বুঝবার আগেই নাতাশা যথারীতি জবাব দিয়ে বসল: "এরকম চলতে পারে না—চলবে না। তোমাকে সেরে উঠতেই হবে—সম্পূর্ণ সেরে উঠতে হবে।"

সেই দৃশ্যের একেবারে গোড়া থেকেই সে তাকে দেখতে পেল; তখনকার পরিবেশটি যেন নতুন করে আবার ঘটল। কথাগুলির সঙ্গে প্রিন্স আন্দ্রুর চোখে যে দীর্ঘ, বিষণ্ণ, কঠিন দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল তাও তার মনে পড়ে গেল; সে দৃষ্টির তিরস্কার ও হতাশার অর্থও সে বুঝতে পারল।

নাতাশা নিজেকেই বলতে লাগল, "স্বীকার করেছিলাম যে সে যদি কষ্ট পেয়েই চলতে থাকে তাহলে সেটা সত্যিই ভয়ংকর ব্যাপার হবে। অবস্থাটা

তার পক্ষে ভয়ংকর হবে জেনেই কথাটা বলেছিলাম, কিন্তু সে তার ভিন্ন অর্থ করল। ভাবল, ব্যাপারটা আমার দিকে থেকে ভয়ংকর হবে। তখনও সে বাঁচতে চাইছে, মৃত্যুকে ভয় করছে। আর কি রকম বোকার মত অদ্ভুতভাবে তাকে আমি কথাগুলি বললাম! যা আমার মনের কথা তা আমি বলতে পারি নি। ভেবেছিলাম সম্পূর্ণ অন্য রকম। মনের কথা যদি বলতে পারতাম তাহলে আমার বলা উচিত ছিল: সে যদি মুমূর্ষু অবস্থায়ই চলতে থাকে, আমার চোখের সামনেই যদি একটু একটু করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, তাহলেও এখন আমি যে অবস্থায় আছি তার তুলনায় অধিকতর সুখীই হতাম। এখন তো কিছু নেই···কেউ নেই। সে কি তা জানত? না, সে জানত না, কোন দিন জানবে না। আর সে ভুল শুধরে নেবার কোন—কোন সম্ভাবনাই এখন আর নেই।" এখন আবার মনে হচ্ছে সেই একই কথাগুলি প্রিন্স আন্দ্রু আবার তাকে বলছে, আর নাতাশা কল্পনায় সম্পূর্ণ আলাদা উত্তর তাকে দিচ্ছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে নাতাশা বলল: "তোমার পক্ষে ভয়ংকর, কিন্তু আমার পক্ষে নয়। তুমি তো জান, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনের কোন অর্থ নেই, আর তোমার সঙ্গে কষ্ট ভোগ করাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ।" তার হাতটা ধরে নাতাশা তাতে চাপ দিল, প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যুর চার দিন আগেকার সেই ভয়ংকর সন্ধ্যায় ঠিক যেভাবে তার হাতটাকে সে চেপে ধরেছিল। কল্পনায় সে মমতা ও ভালবাসা মাখানো সেই কথাগুলি বলতে লাগল যা সে তখনও বলতে পারত, কিন্তু বলছে শুধু এখন: "আমি তোমাকে ভালবাসি।···তোমাকেই! আমি ভালবাসি, ভালবাসি···' গভীর আবেগে নিজের হাত চেপে ধরে আপ্রাণ চেষ্টায় দাঁতে দাঁত চেপে সে কথাগুলি বলল···

মধুর দুঃখ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, দুই চোখ জলে ভরে এল: পরক্ষণেই সহসা নিজেকেই প্রশ্ন করল, কাকে সে বলছে এসব কথা? আবার সবকিছুই একটা শুষ্ক, কঠোর বিমূঢ়তায় ঢেকে গেল; ভ্রূকুটিকুটিল চোখে আবার সে ফিরে তাকাল বর্তমান জগতের দিকে। আর এখন, এখন তার মনে হল, রহস্যের যবনিকাকে সে ভেদ করতে পেরেছে। কিন্তু যে মুহূর্তে তার মনে হল যে ধারণার অতীত সত্য তার কাছে প্রকাশিত হতে চলেছে ঠিক তখনই দরজার হাতলের একটা খটাখট আওয়াজ তার কানে এসে বিঁধল।

দাসী দুনিয়াশা দ্রুত পায়ে আচমকা ঘরে ঢুকল, তার মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি।

অদ্ভুত উত্তেজিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "দয়া করে এখনই আপনার বাবার কাছে চলুন। "বড়ই দুর্ভাগ্য···পিতর ইলিনিচ···একটা চিঠি," ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে সে কথা শেষ করল।

অধ্যায়—২

সাধারণভাবে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতাবোধ ছাড়াও নিজের পরিবার থেকে একটা বিশেষ বিচ্ছিন্নতার বোধ নাতাশাকে পেয়ে বসেছে। বাবা মা ও সোনিয়া—সকলেই তার এত ঘনিষ্ঠ, এত পরিচিত, এত সাধারণ যে তাদের সব কথা, সব মনোভাবই তার সাম্প্রতিক জীবনের প্রতি একটা বিদ্রূপস্বরূপ; তাদের সম্পর্কে সে যে উদাসীন তাই শুধু নয়, তাদের প্রতি সে একান্তই বিরূপ। তাই দুনিয়াশার মুখে পিতর ইলিনিচ ও দুর্ভাগ্য কথাদুটি শুনেও তার অর্থটা যেন ঠিক ধরতে পারল না।

"কিসের দুর্ভাগ্য? তাদের কি দুর্ভাগ্য ঘটতে পারে? তারা তো নিজেদের পুরনো, শান্ত, সাধারণ জীবনযাত্রাকেই চালিয়ে যাচ্ছে," নাতাশা ভাবল।

সে যখন নাচ-ঘরে ঢুকল তখন তার বাবা দ্রুত পায়ে তার মার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার গালে ভাঁজ পড়েছে, চোখের জলে ভিজে গেছে। কান্নায় গলা আটকে আসছিল বলে বাবা সে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে। নাতাশাকে দেখে হতাশভাবে হাত নাড়তে নাড়তে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। গোল নরম মুখখানা কান্নায় বিকৃত হয়ে উঠল।

"পে···পেতয়া···যাও, যাও, ও···ডাকছে···" শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে বাবা দুর্বল পা ফেলে কোন রকমে চেয়ারের কাছে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে ধপাস করে বসে পড়ল।

সহসা নাতাশার সারা শরীরের ভিতর দিয়ে যেন একটা বিদ্যুৎ-প্রবাহ বয়ে গেল। তীব্র ব্যথার আঘাতে আর্ত হৃদয়ে সে একটা ভয়ংকর বেদনা অনুভব করল; মনে হল, তার ভিতরটা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে, সে যেন মরতে বসেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই বেদনার পরিবর্তে দেখা দিল একটা মুক্তির অনুভূতি—যে বেদনাদায়ক সংযম তাকে জীবন থেকে সরিয়ে রেখেছিল তার হাত থেকে মুক্তি। 'বাবার এই দৃশ্য, দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে-আসা মার ভয়ংকর উন্মাদ চীৎকার—মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিল নিজেকে, তার সব দুঃখকে।

সে বাবার কাছে ছুটে গেল, কিন্তু বাবা দুর্বলভাবে হাত নেড়ে মার ঘরটা দেখিয়ে দিল। প্রিন্সেস মারি বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। তার মুখ বিবর্ণ, থুত্‌নি কাঁপছে; নাতাশার হাত ধরে কি যেন বলল। নাতাশা তাকে দেখতে পেল না, তার কথাও শুনতে পেল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্য দরজায় একটু থামল, বুঝি বা নিজের সঙ্গেই লড়াই করল, তারপর ছুটে গেল মার কাছে।

অদ্ভুত ভঙ্গীতে কাউণ্টেস হাতল-চেয়ারে শুয়ে আছে। শরীরটা টান-টান করে দেয়ালে মাথা ঠুকছে। সোনিয়া ও দাসী তার দুই হাত ধরে আছে।

কাউণ্টেস চীৎকার করছে, "নাতাশা! নাতাশা! এ সত্য নয়···এ সত্য নয়··ও মিথ্যা কথা বলছে···নাতাশা।" সকলকে ঠেলে দিয়ে সে আর্তনাদ করে উঠল, "তোমরা চলে যাও; একথা সত্য নয়! মারা গেছে!···হা, হা, হা!···এ কথা সত্য নয়।"

হাতল চেয়ারে এক হাঁটু রেখে নাতাশা মার উপর ঝুঁকে দাঁড়াল, অপ্রত্যাশিত শক্তিতে তাকে তুলে ধরে তার মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল, তারপর মাকে জড়িয়ে ধরল।

"মামণি!···লক্ষ্মী সোনা!···এই তো আমি এসেছি সোনামণি!"

নাতাশা ফিস্‌ফিস্‌ করে অবিশ্রাম কথা বলতে লাগল।

কিছুতেই মাকে ছাড়ল না, গভীর মমতায় তাকে জড়িয়ে ধরে রইল, একটা বালিশ ও গরম জল আনতে বলল, বোতাম খুলে মার পোশাকটা ছিঁড়ে খুলে ফেলল।

"লক্ষ্মী সোনা মা···মামণি, মানিক আমার!"···মার মাথায়, হাতে, মুখে বার বার চুমো খেয়ে সে বলতে লাগল, আর তার নিজের অবারণ চোখের জল নাক ও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

কাউণ্টেস মেয়ের হাত চেপে ধরে চোখ বুজল, মুহূর্তের জন্য শান্ত হল। সহসা অনভ্যস্ত দ্রুতগতিতে উঠে বসল, ফাঁকা চাউনিতে চারদিকে তাকাল, আর নাতাশাকে দেখতে পেয়ে সর্বশক্তি দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরল, মেয়ের বেদনাদীর্ণ মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অস্পষ্ট নিম্নস্বরে বলল, "নাতাশা, তুমি তো আমাকে ভালবাস? নাতাশা, তুমি তো আমাকে ঠকাবে না? সব সত্য আমাকে খুলে বলবে তো?"

জল-ভরা চোখ মেলে নাতাশা মার দিকে তাকাল; সে চোখে ভালবাসা ও ক্ষমার মিনতি ছাড়া আর কিছু নেই।

যে প্রচণ্ড দুঃখ তার মাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে তার কিছুটা ভার নিজের উপর নেবার আপ্রাণ চেষ্টায় নাতাশা বার বার বলতে লাগল, "লক্ষ্মী মামণি আমার!"

কিন্তু জীবনে ফুটে ওঠার কালে তার বড় আদরের ছেলেটি নিহত হয়েছে আর সে নিজে এখনও বেঁচে আছে—এ-কথা মা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই তো বাস্তব সত্যের সঙ্গে সংগ্রামে বিফল হয়ে আবার সে ফিরে গেল বিকারের জগতে।

সেদিনটা, সেরাতটা, এবং তার পরের দিন ও রাত যে কিভাবে কাটল তা নাতাশার মনে পড়ে না। সে একটুও ঘুমল না, মাকে ছেড়ে কোথাও গেল না। ধৈর্যশীল ভালবাসা দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত মাকে ঘিরে রাখল।

কোন কথা নয়, সান্ত্বনা নয়, শুধু তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনার অক্লান্ত প্রয়াস।

তৃতীয় রাতে কয়েক মিনিটের জন্য কাউণ্টেস একেবারে চুপচাপ হয়ে গেল। চেয়ারের হাতলে মাথা রেখে নাতাশা চোখ বুজল, কিন্তু বিছানায় ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দে আবার চোখ মেলল। বিছানায় উঠে বসে কাউণ্টেস মৃদুস্বরে কথা বলছে।

"তুমি আসায় কত খুশি হয়েছি। তুমি ক্লান্ত। একটু চা খাবে না?" নাতাশা তার কাছে এগিয়ে গেল। মেয়ের হাতখানি ধরে কাউণ্টেস বলেই চলল, "তুমি দেখতে কত ভাল হয়েছ, আরও মানুষের মত হয়ে উঠেছ।"

"মামণি! কী বলছ তুমি?"

"নাতাশা, সে নেই, সে নেই!"

মেয়েকে জড়িয়ে ধরে এই প্রথম কাউণ্টেস কেঁদে উঠল।

অধ্যায়—৩

প্রিন্সেস মারি তার যাত্রা স্থগিত রাখল। সোনিয়া ও কাউণ্ট নাতাশার কাজগুলি করতে চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। তারা বুঝল, একমাত্র নাতাশাই তার মার অকারণ হতাশাকে সংযত রাখতে পারে। তিনটি সপ্তাহ নাতাশা মার পাশে সর্বক্ষণ রইল; তার ঘরেই একটা লাউঞ্জ-চেয়ারে ঘুমোয়, তাকে খাওয়ায়-দাওয়ায়, অনবরত তার সঙ্গে কথা বলে, কারণ একমাত্র তার মুখের মমতামাখা কথাগুলি কানে গেলেই তার মা শান্ত থাকে।

কিন্তু মার আহত মন সুস্থ হল না। পেত্‌য়ার মৃত্যু তার জীবনের অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। পেত্‌য়ার মৃত্যু-সংবাদ যখন এল তখন সে ছিল পঞ্চাশ বছরের একটি তাজা উৎসাহে ভরা নারী, আর একমাস পরে সে যখন ঘর থেকে বের হল তখন সে জীবনে সম্পূর্ণ বীতস্পৃহ একটি নিরাসক্ত বৃদ্ধা। কিন্তু যে আঘাত কাউণ্টেসকে ঠেলে দিল প্রায় মৃত্যুর মুখে, সেই দ্বিতীয় আঘাত নাতাশাকে ফিরিয়ে আনল নবজীবনের মধ্যে।

নাতাশা ভেবেছিল তার জীবন শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু মার প্রতি ভালবাসা তাকে অপ্রত্যাশিতভাবে বুঝিয়ে দিল, যে ভালবাসা জীবনের মূল কথা তা এখনও তার মধ্যে সক্রিয়। ভালবাসা জেগে উঠেছে, আর সেই সঙ্গে জীবনও জেগেছে।

প্রিন্স আন্দ্রুর শেষ দিনগুলি প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার জীবনকে একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে; এই নতুন দুঃখ তাদের দুজনকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলল। প্রিন্সেস মারি তার যাত্রা স্থগিত রাখল; তিনটি সপ্তাহ ধরে রুগ্ন শিশুর মত নাতাশার পরিচর্যা করল। মার শয়ন-কক্ষে কাটানো শেষের

সপ্তাহ ক'টি নাতাশার দৈহিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল।

একদিন বিকেলে নাতাশাকে জ্বরে কাঁপতে দেখে প্রিন্সেস মারি তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। নাতাশা শুয়ে পড়ল, কিন্তু পর্দাগুলো নামিয়ে দিয়ে প্রিন্সেস মারি যখন চলে যাচ্ছিল তখন সে তাকে ডাকল।

"আমার ঘুমতে ইচ্ছা করছে না মারি, আমার কাছে একটু বস।"

"তুমি ক্লান্ত—ঘুমতে চেষ্টা কর।"

"না, না। কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলে? মা আমার খোঁজ করবে।"

"মা এখন ভাল আছে। আজ সে বেশ ভালভাবে কথা বলেছে।" প্রিন্সেস মারি বলল।

নাতাশা বিছানায় শুয়ে ঘরের আধা-অন্ধকারে প্রিন্সেস মারির মুখটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, "প্রিন্সেস মারি কি তার মত দেখতে? হ্যাঁ, তার মতই, তবু তার মত নয়। কিন্তু এও তো আমার কাছে নতুন, বিচিত্র, অজ্ঞাত। এও আমাকে ভালবাসে। কি আছে এর অন্তরে? যা কিছু ভাল সব। কিন্তু কেমন করে? এর মনটি কার মত? আমার সম্পর্কে এর ধারণা? সত্যি, প্রিন্সেস মারি চমৎকার মানুষ!"

প্রিন্সেস মারির হাতটা টেনে নিয়ে নাতাশা ভীরু গলায় বলল, "মারি, তুমি আমাকে খারাপ ভেবো না। ভাববে না তো? প্রিয় মারি, তোমাকে আমি কত ভালবাসি! এস আমরা বন্ধু হই, খুব বন্ধু।"

তাকে জড়িয়ে ধরে নাতাশা তার মুখে ও হাতে চুমো খেল; তাতে প্রিন্সেস মারি লজ্জা পেল, আবার সুখীও হল।

সেদিন থেকেই প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার মধ্যে দুই সখীর মত একটা ভীরু উচ্ছ্বসিত বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। তারা সব সময় পরস্পরকে চুমো খায়, ভাল ভাল কথা বলে, অধিকাংশ সময় এক সঙ্গে কাটায়। যখন তারা একা থাকে তার তুলনায় তারা পরস্পরের মধ্যে গভীরতর মিল অনুভব করে যখন তারা একত্রে কাটায়। তাদের মধ্যে গড়ে উঠল বন্ধুত্বের চাইতেও অধিকতর শক্তিশালী একটা অনুভূতি; একে অন্যের উপস্থিতিতে পায় যেন জীবনের এক নতুন অনুভূতি।

কখনও তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে থাকে; কখনও বিছানায় শুয়ে কথা বলতে বলতে রাত ভোর করে দেয়। বেশীর ভাগ সময় বলে দূর অতীতের কথা। প্রিন্সেস মারি বলে তার শৈশবের কথা, মার কথা, বাবার কথা, তার দিবাস্বপ্নের কথা। আর নাতাশাও প্রিন্সেস মারির প্রতি ভালবাসায় তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের অতীতকেও ভালবাসতে শিখেছে, জীবনের

যেদিকটা তার কাছে দুরধিগম্য ছিল তাকেও বুঝতে শিখেছে। ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে দুজনেই জীবনকে দেখতে শিখেছে নতুন দৃষ্টিতে, নতুন বিশ্বাসে—জীবনের প্রতি, তার আনন্দের প্রতি বিশ্বাসে।

আগের মতই কখনও তারা প্রিন্স আন্দ্রুর কথা বলে না; কথা বলে নিজেদের মনের মহৎ ভাবনাকে তারা ছোট করতে চায় না; কিন্তু তার সম্পর্কে তাদের এই নীরবতার ফলে ক্রমেই তারা নিজেদের অজ্ঞাতেই তাকে ভুলে যেতে লাগল।

নাতাশা এতই শীর্ণ, বিবর্ণ ও দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সকলেই তার স্বাস্থ্যের কথা বলে, আর তাতে সেও খুশি হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা ভয় তাকে চেপে ধরে—শুধু মৃত্যুর ভয় নয়, রোগ, দুর্বলতা ও খারাপ দেখাবার ভয়; অনিচ্ছা সত্ত্বেও খোলা হাতটাকে সে ভাল করে লক্ষ্য করে, তার শীর্ণতায় বিস্মিত হয়, আর সকালে উঠেই নিজের করুণ মুখখানি আয়নায় দেখে। সে বুঝতে পারে এইরকম হওয়াই স্বাভাবিক, তবু তার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে যায়।

একদিন তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে তার হাঁপ ধরে গেল। কিছু না বুঝেই তক্ষুনি নীচে নেমে গেল এবং নিজের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য আবার দৌড়ে উপরে উঠে গেল।

অন্য এক সময় দুনিয়াশাকে ডাকতে গিয়ে গলাটা কেঁপে ওঠায় আবার তাকে ডাকল—আর ডাকল সেই বুকের ভিতর থেকে আসা গলায় যে গলায় সে গান করত; তারপর কান পেতে নিজেই নিজের গলা শুনতে লাগল।

সে জানত না, একথা বিশ্বাসও করত না, কিন্তু যে চটচটে কাদায় ঢাকা পড়ার জন্য তার আত্মা দুর্ভেদ্য হয়ে উঠেছিল তার কাছে, সেই কাদার স্তরের নীচ থেকে নরম ঘাসের অংকুরগুলি এর মধ্যেই মাথা তুলতে শুরু করেছে; মাটিতে শিকড় গজিয়ে তাদের জীবন্ত সবুজের আভায় সেই অংকুরগুলি তার সব দুঃখকে এমনভাবে ঢেকে দেবে যে অচিরেই তাকে আর দেখা যাবে না। তার মনের ক্ষত ভিতর থেকে সেরে উঠতে শুরু করেছে।

জানুয়ারির শেষ দিকে প্রিন্সেস মারি মস্কো যাত্রা করল; নাতাশা যাতে তার সঙ্গে গিয়ে ডাক্তার দেখায় সেজন্য কাউণ্ট পীড়াপীড়ি করতে লাগল।

অধ্যায়—৪

ভিয়াজমাতে শত্রুপক্ষকে পরাভূত করে তচনচ করে দিতে অতি-উৎসাহী সৈন্যদলকে কুতুজভ সংযত করে রাখতে পারেনি। সেই সংঘর্ষের পর থেকে পলায়মান ফরাসীদের এবং তাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী রুশদের অগ্রগতি ক্রাসনু পর্যন্ত বিনা যুদ্ধেই চলতে থাকল। পলায়ন ছিল এতই দ্রুতগতি যে পশ্চা-

ধাবনকারী রুশবাহিনী ফরাসীদের সঙ্গে তাল রাখতে পারে নি। অশ্বারোহী ও গোলন্দাজ বাহিনীর ঘোড়াগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়ল, আর ফরাসীদের গতিবিধির যেসব খবর পাওয়া গেল তাও কোন ক্ষেত্রেই নির্ভরযোগ্য নয়।

দৈনিক সাতাশ মাইল হারে একটানা পথ চলার ফলে রুশ বাহিনীর সৈন্যরা এতই শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে আরও দ্রুত চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হল না।

রুশ বাহিনী যে কতখানি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেটা বুঝতে হলে শুধু এই সত্যটাই জানা প্রয়োজন যে তারুতিনোর পরে পাঁচ হাজারের মত নিহত ও আহত করে এবং শতাধিক বন্দীকে হারিয়ে যে রুশ বাহিনী এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে তারুতিনো ছেড়ে এসেছিল তারা ক্রাস্নয়েতে পৌঁছল মাত্র পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে।

ফরাসীদের পলায়ন যেমন তাদের বাহিনীর ধ্বংস সাধন করেছিল, ঠিক তেমনই রুশদের পশ্চাদ্ধাবনের দ্রুতগতিও হয়েছিল আমাদের বাহিনীর পক্ষে ধ্বংসাত্মক। দুইয়ের মধ্যে একমাত্র তফাৎ হল—রুশ বাহিনীর গতি ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, ফরাসীদের মত তাদের মাথার উপর ধ্বংসের খড়্গ ঝুলছিল না; আর যেখানে রুগ্ন ফরাসীদের ফেলে যেতে হল শত্রুর হাতে, রুগ্ন রুশদের ফেলে যাওয়া হল তাদের নিজেদেরই লোকের হাতে। নেপোলিয়নের বাহিনীর ক্ষয়-ক্ষতির প্রধান কারণ তাদের চলার দ্রুতগতি, আর রুশ বাহিনীর তুলনামূলক সৈন্য-সংখ্যার হ্রাসই তার চূড়ান্ত প্রমাণ।

পিতার্সবুর্গের কর্তৃপক্ষ এবং রুশ বাহিনীর জেনারেলরা সকলেই তখন চাইছিল ফরাসীদের পলায়ন। কুতুজভ ও ফরাসীদের পলায়নের পথে বিঘ্নসৃষ্টির চেষ্টা না করে তারুতিনো ও ভিয়াজ্‌মার মতই এখানেও সেই একই লক্ষ্যে সাধ্যমত সর্বশক্তি নিয়োগ করল এবং আমাদের বাহিনীর গতিকে যথাসম্ভব শ্লথ করে রাখল।

প্রতিটি রুশ সৈন্যের মত কুতুজভও মনে-প্রাণে বুঝল ও জানল—যুক্তি বা রণ-বিজ্ঞানের সাহায্যে নয়, সমগ্র রুশ সত্তা দিয়ে—যে ফরাসীরা পরাজিত হয়েছে, শত্রুরা পালাচ্ছে, তাদের তাড়িয়ে দিতেই হবে; কিন্তু সেইসঙ্গে বৎসরের এই সময়টাতে এরকম তুলনাবিহীন দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে চলার যে কত কষ্ট, কত দুঃখ সৈন্যদের মতই সেটাও কুতুজভ ভালই বুঝতে পারল।

কিন্তু যেসব জেনারেল—বিশেষ করে রুশ বাহিনীর বিদেশী জেনারেলরা—চাইল নিজেদের জন্য খ্যাতি অর্জন করতে, কাউকে তাক লাগিয়ে দিতে, এবং কোন না কোন কারণে রাজা ও ডিউককে গ্রেপ্তার করতে, তারা ভাবল যে যুদ্ধ করে বিজয়ী হবার এই তো সময়। তাই তারা যখন ছেঁড়া জুতো ও ছেঁড়া পোশাক পরা অর্ধভুক্ত সৈন্য নিয়েই একের পর এক যুদ্ধের প্রকল্প উপস্থিত করতে লাগল, কুতুজভ তখন শুধু বারবার দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিতে

লাগল।

রুশ বাহিনী যেখানেই ফরাসী বাহিনীর একেবারে ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ল, এইভাবে নিজেদের বিশিষ্ট করে তুলবার, রণ-কৌশল প্রয়োগ করবার, শত্রুকে পরাজিত ও তচ্‌নচ্‌ করে দেবার বাসনা সেখানেই বিশেষ করে প্রকট হতে লাগল।

সেটাই ঘটল ক্রাস্নুতে; তারা আশা করেছিল তিনটি ফরাসী সেনাদলের একটির সঙ্গে সেখানেই তাদের মোলাকাত হবে; কিন্তু তার বদলে সেখানে তারা হাজির হল ষোল হাজার সৈন্যসহ স্বয়ং নেপোলিয়নের মুখোমুখি। সেখানে একটি বিধ্বংসী সংঘর্ষকে পরিহার করে নিজের সৈন্যদের অক্ষত রাখতে কুতুজভের সর্বপ্রকার চেষ্টা সত্ত্বেও পথশ্রমে ক্লান্ত রুশদের হাতে বিশৃংখল ফরাসী সৈন্যদের নিধন-যজ্ঞ তিনদিন ধরে চলল ক্রাস্নুর পথে-প্রান্তরে।

তোল্ একটা নির্দেশ-নামা লিখেছিল: "প্রথম সেনাদল অমুক অমুক দিকে এগিয়ে যাবে" ইত্যাদি। কিন্তু যথারীতি সে নির্দেশনামা মোতাবেক কিছুই ঘটল না। উর্তেম্বের্গের প্রিন্স ইউজেন একটা পাহাড়ের উপর থেকে পলায়মান ফরাসীদের উপর গোলাবর্ষণ করতে লাগল। আরও সৈন্য সে চেয়ে পাঠাল, কিন্তু কেউ এল না। ফরাসীরা রুশদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালাতে লাগল; রাতের আঁধারে জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে যথাসাধ্য ছুটতে লাগল।

মিলরাদভিচ তো নিজেই নিজেকে বলত "ভয় ও নিন্দার অতীত এক নাইট।" ফরাসীদের সঙ্গে আলোচনা চালানো ছিল তার প্রিয় কাজ। ফরাসীদের কাছে দূত পাঠিয়ে সে তাদের আত্মসমর্পণ দাবী করল, অনেক সময় নষ্ট করল, কিন্তু তাকে যা করতে বলা হয়েছিল তার কিছুই করল না।

ঘোড়ায় চেপে অশ্বারোহী বাহিনীর সামনে হাজির হয়ে ফরাসীদের দেখিয়ে সে বলল, "দেখ বাছারা, ওই সেনাদলটা তোমাদের দিয়ে দিলাম।"

অশ্বারোহী সৈন্যরা তখন ঘোড়ার পেটে কাঁটা মেরে তরবারি উঁচিয়ে অনেক কষ্টে সেই সেনাদলের সামনে, অর্থাৎ ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া তুষারপাতে আহত ও অভুক্ত একদল ফরাসীর সামনে গিয়ে হাজির হল; তারাও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল; তারা তো অনেক আগে থেকে এই-জন্যে অপেক্ষা করেইছিল।

ক্রাস্নুতে তারা ছাব্বিশ হাজার ফরাসীকে বন্দী করল, কয়েক শ' কামান দখল করল, আর পেল "মার্শালের দণ্ড" নামক একটা লাঠি; কার কতখানি কৃতিত্ব তাই নিয়ে তর্ক করল, এবং নিজেদের সাফল্যে খুশিও হল; যদিও নেপোলিয়নকে, নিদেন পক্ষে কোন মার্শাল বা নায়ককে পাকড়াও করতে না পারায় তারা দুঃখিত হল এবং সে অক্ষমতার জন্য পরস্পরকে, বিশেষ করে কুতুজভকে দায়ী করতে লাগল।

আবেগের তাড়নায় পরিচালিত এই লোকগুলি আসলে অনিবার্য নিয়মের হাতে অন্ধ যন্ত্রমাত্র হলেও তারা নিজেদের ভাবল এক একজন মহাবীর; মনে করল যে একটি মহান, সম্মানিত কাজ তারাই সম্পন্ন করেছে। সব দোষ তারা চাপাল কুতুজভের ঘাড়ে; বলল, অভিযানের গোড়া থেকেই সে নেপোলিয়নকে পরাজিত করার পথে বাধার সৃষ্টি করেছে, নিজের বাসনা পূরণ করা ছাড়া আর কিছুই সে ভাবে নি, কাপড়ের কলগুলিতে বেশ আরামে ছিল বলে সেখান থেকে এক পাও নড়তে চায় নি, ক্রাস্নুতে সে রুশ বাহিনীর অগ্রগতিকে ঠেকিয়ে দিল কারণ সেখানে নেপোলিয়ন আছে শুনেই তার মুণ্ডু ঘুরে গিয়েছিল, এবং এটাও হতে পারে যে নেপোলিয়নের সঙ্গে তার একটা বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছিল, তাকে বেশ কিছু ঘুষ দেওয়া হয়েছিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুধু যে সমসাময়িকরা আবেগের বশে এইসব কথা বলেছে তাই নয়, পরবর্তী যুগ এবং ইতিহাসও নেপোলিয়নকে মহান পুরুষ বলে প্রশংসা করেছে, আর কুতুজভকে বিদেশীরা বর্ণনা করেছে একজন ফন্দিবাজ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুর্বল বৃদ্ধ সভাসদরূপে; আর তার সম্পর্কে রুশদের বর্ণনা কিছুটা অস্পষ্ট—সে যেন এক ধরনের পুতুল, শুধু একটা রুশ নামের অধিকারী বলেই কিছুটা কাজের লোক।

অধ্যায়—৫

১৮১২ ও ১৮১৩ সালে কুতুজভের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ভুল কাজের অভিযোগ আনা হল। সম্রাট তার উপর অসন্তুষ্ট হল। এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে সম্প্রতি লিখিত একখানি ইতিহাসের পুঁথিতে বলা হয়েছে, কুতুজভ ছিল একজন ধূর্ত, মিথ্যাবাদী সভাসদ, নেপোলিয়নের নাম শুনেই ভয়ে জড়সড়, ক্রাস্নুতে ও বেরিজিনাতে তার ভুলের জন্যই রুশ বাহিনী ফরাসীদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের গৌরব থেকে বঞ্চিত হয়েছিল;

রুশ মানসিকতা যেসব মহাপুরুষদের (Grands Hommes) স্বীকার করে না তাদের নয়, কিন্তু যেসব বিরল ও একক ব্যক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে উপলব্ধি করে তার কাছেই নিজের ইচ্ছাকে সঁপে দেয়, এই তাদের নিয়তি। উচ্চতর বিধানকে মেনে নেবার জন্য জনতার ঘৃণা ও বিদ্বেষ এইভাবেই তাদের দণ্ডিত করে।

বিচিত্র ও ভয়ংকর শোনালেও যে-নেপোলিয়ন ইতিহাসের হাতের একটি অতি নগণ্য যন্ত্রমাত্র, যে কখনও কোথাও, এমন কি নির্বাসন-কালেও, কোনরকম মানবিক মর্যাদার স্বাক্ষর রাখতে পারে নি, সেই নেপোলিয়নই রুশ ইতিহাসকারদের কাছে স্তুতিবচন ও উৎসাহের বস্তু, সেই এক মহাপুরুষ।

কিন্তু কুতুজভ—সে মানুষটি একেবারে শুরু থেকে ১৮১২ সালে তার কাজের শেষ পর্যন্ত, বরদিনো থেকে ভিল্‌না পর্যন্ত, একটিবারও কি কথায় আর কি কাজে কখনও দোলাচলচিত্ত হয় নি, আত্মত্যাগ ও ভবিষ্যৎ-সচেতনতার এমন একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যা ইতিহাসের ব্যতিক্রমস্বরূপ,—সেই কুতুজভ তাদের কাছে একটি অস্পষ্ট করুণার পাত্রবিশেষ ; তার সম্পর্কে এবং ১৮১২ সাল সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেই তারা কেমন যেন লজ্জা বোধ করে।

অথচ একটিমাত্র লক্ষ্যে স্থিরদৃষ্টি হয়ে কর্মের পথে এগিয়ে চলার এমন আর একটি ঐতিহাসিক চরিত্রের কল্পনা করাও তো শক্ত ; আর সমগ্র জাতির ইচ্ছার অধিকতর উপযুক্ত বা তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর একটি লক্ষ্যের কথা কল্পনা করাও তো সমান শক্ত। আবার, ১৮১২ সালে কুতুজভের সমগ্র কর্মপ্রচেষ্টা যে লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল, অন্য কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তির দ্বারা সেরূপ পরিপূর্ণভাবে লক্ষ্য পূর্ণ করবার আর একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতা থেকে খুঁজে বের করা তো ততোধিক শক্ত।

কুতুজভ কখনও ""পিরামিডের উপর থেকে নীচে তাকিয়ে চল্লিশ শতাব্দীর" কথা বলে নি, বলে নি পিতৃভূমির জন্য তার ত্যাগের কথা, সে কি করতে চেয়েছিল বা করতে পেরেছিল তার কথা : সাধারণভাবে বলা যায়, সে কখনও নিজের কথা বলে নি, কোন মুখোশ আঁটে নি মুখে, অতি সাধারণ মানুষের মত অত্যন্ত সরলভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে, মুখেও বলেছে সরলতম সাধারণ কথা। চিঠি লিখেছে মেয়েদের কাছে আর মাদাম দ্য স্তাইলের কাছে, উপন্যাস পড়েছে, সুন্দরীদের সঙ্গ ভালবেসেছে, জেনারেল, অফিসার ও সৈনিকদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করেছে, এবং কেউ কিছু প্রমাণ করতে চাইলে কখনও তার প্রতিবাদ করে নি। ইয়াউজা সেতুর কাছে কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন যখন ঘোড়া ছুটিয়ে কুতুজভের কাছে এসে ব্যক্তিগতভাবে তাকে তিরস্কার করে বলেছিল : "আপনি যেকথা দিয়েছিলেন বিনা যুদ্ধে মস্কো ছেড়ে যাবেন না তার কি হল ?" কুতুজভ তখন উত্তরে বলেছিল : "বিনা যুদ্ধে আমি মস্কো ছেড়ে যাব না," যদিও তখন মস্কো পরিত্যক্ত হয়েই গেছে। সম্রাটের কাছ থেকে এসে আরাকৃচিভ যখন বলল যে এর্মলভকে গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধানের পদে নিযুক্ত করা উচিত তখন কুতুজভ জবাব দিল : "ঠিক, এই কথাই আমি নিজেও ভাবছিলাম,'' যদিও একমুহূর্ত আগে এর উল্টো কথাই সে বলেছিল। একদল নির্বোধ জনতার মধ্যে যখন একমাত্র সেই বুঝেছে আসন্ন ঘটনাবলীর প্রচণ্ড তাৎপর্য, তখন মস্কোর সে মহাবিপদের জন্য রস্তপ্‌চিন তাকেই দায়ী করুক আর নিজেকেই দায়ী করুক তাতে কি আসে—যায় ? আর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান হিসাবে কে নিযুক্ত হল না হল, তাতেও তো বিশেষ কিছুই আসে-যায় না।

নিজে কখন কি বলছে না বলছে সে খেয়াল না থাকলেও এই মানুষটি

কিন্তু পুরো কর্মকাণ্ডের মধ্যে একবারও এমন একটি কথা উচ্চারণ করে নি যা সমগ্র যুদ্ধকালে তার একমাত্র লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। স্পষ্টই বোঝা যায়, সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সে বার বার নিজের মনের কথাকেও প্রকাশ করেছে ; যদিও সে জানত যে তাকে কেউ ঠিক ঠিক বুঝবে না। যে বয়োদিনের যুদ্ধে অন্য সকলের সঙ্গে তার মত-পার্থক্যের সূচনা সেখান থেকে আরম্ভ করে একমাত্র সেই বলেছে যে বরদিনোর যুদ্ধে তাদের জয় হয়েছে, আর মুখের কথায়, চিঠিপত্রে, ও প্রতিবেদনে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেই একই কথা সে বারবার বলেছে। একমাত্র সেই বলেছে, মস্কোকে হারানো মানেই রাশিয়াকে হারানো নয়। লরিস্তনের শান্তি-প্রস্তাবের উত্তরে সে বলেছে ; কোন রকম সন্ধি হতে পারে না, কারণ সেটাই জনগণের ইচ্ছা। ফরাসীদের পশ্চাদপসরণের সময় একমাত্র সেই বলেছে, আমাদের সব রণ-কৌশল বৃথা, আমাদের আশাতিরিক্ত ভালভাবেই আপনা থেকেই সব কিছু ঘটে চলেছে ; শত্রুকে একটা "সোনালী সেতু" অবশ্যই দিতে হবে ; তারুতিনো, বা ভিয়াজ্‌মা, বা ক্রাস্‌নুয় যুদ্ধের কোন প্রয়োজন নেই ; সীমান্তে পৌঁছবার জন্য কিছু সৈন্য আমাদের সঙ্গে রাখতেই হবে ; এবং দশজন ফরাসীর বিনিময়েও একজন রুশকে বলি দিতে সে রাজী নয়।

আর এই সভাসদটি—এইভাবেই তাকে বর্ণনা করা হয়েছে—সম্রাটকে খুশি করার জন্য আরাকৃচিভের কাছে মিথ্যা বললেও সেই সম্রাটের বিরূপতাকে মেনে নিয়ে ভিল্‌নায় বলেছে, সীমান্তের ওপারে যুদ্ধকে চালিয়ে নেওয়া অর্থহীন ও ক্ষতিকর।

একমাত্র সেই যে ঘটনাবলীর তাৎপর্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল তার প্রমাণ শুধু তার মুখের কথাই নয়। তিলমাত্র ব্যতিক্রমবিহীনভাবে তার সব কাজই পরিচালিত হয়েছিল একটিমাত্র ত্রিবিধ লক্ষ্যের দিকে (১) ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। (২) তাদের পরাজিত করা, এবং (৩) আমাদের জনগণ ও আমাদের সৈন্যদের দুঃখ-কষ্টকে যথাসম্ভব কম রেখে শত্রুকে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করা।

এই সময়াপহরক কুতুজভ যার নীতি ছিল "ধৈর্য ও সময়," চূড়ান্ত যুদ্ধের এই শত্রুই কিন্তু অতুলনীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে সব রকম প্রস্তুতি নিয়ে বরদিনোতে যুদ্ধ করেছিল। এই কুতুজভ অস্তারলিজের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই বলেছিল যে সে যুদ্ধে আমাদের হার হবে ; অন্য সকলের মতের বিরুদ্ধে সেই বৃদ্ধ পর্যন্ত বলেছে যে বরদিনোতে আমাদের জয় হয়েছে, অথচ যুদ্ধে জয়লাভ করে কোন সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণ করেছে এ রকম ঘটনা আগে কখনও ঘটে নি। পশ্চাদপসরণের সময় একমাত্র সেই বারবার বলেছে যে তখন আর অকারণে কোন যুদ্ধ করা উচিত নয় ; নতুন করে আর একটা যুদ্ধ শুরু করা অথবা রুশ সীমান্ত অতিক্রম করাও উচিত নয়।

কিন্তু সকলের অভিমতের বিরোধিতা করে সেই বৃদ্ধ মানুষটি একাকি কেমন করে তৎকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে জনমতের গুরুত্বটা এমনভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল যাতে সারা কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটিবারের জন্যও তাকে তা থেকে সরে যেতে হয় নি ?

তৎকালীন ঘটনাবলীর তাৎপর্যকে প্রত্যক্ষ করবার এই অসাধারণ ক্ষমতার উৎস ছিল তার অন্তরের নিষ্কলুষ জাতীয়তাবোধ।

তার এই জাতীয়তাবোধের স্বীকৃতি হিসাবেই জনসাধারণ স্বয়ং জারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে—রাজানুগ্রহবঞ্চিত একটি বৃদ্ধকেই—এই জাতীয় যুদ্ধে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছিল। আর এই জাতীয়তাবোধই তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল মানবিকতার সেই সর্বোচ্চ মঞ্চে যেখান থেকে প্রধান সেনাপতিরূপে সে তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল মানুষকে হত্যা ও ধ্বংস করতে নয়,—তাদের রক্ষা করতে, তাদের করুণা করতে।

ইওরোপীয় নায়কের—মানুষের তথাকথিত শাসনকর্তার যে নকল ছাঁচ ইতিহাস আবিষ্কার করেছে, তার মধ্যে ফেলে এই সরল, বিনয়ী ও প্রকৃত মহৎ মূর্তিটিকে ঢালাই করা যায় নি।

অনাগত ভৃত্যের দৃষ্টিতে কোন মানুষই মহৎ হতে পারে না, কারণ মহত্ত্ব সম্পর্কে তারও একটা নিজস্ব ধারণা থাকে।

অধ্যায়—৬

তথাকথিত ক্রাস্নু যুদ্ধের প্রথম দিনটি ছিল ৫ই নভেম্বর। সন্ধ্যার দিকে—জেনারেলদের মধ্যে অনেক বিতর্ক ও ভুলভ্রান্তির পরে, এবং পরস্পরবিরোধী হুকুম দিয়ে অ্যাডজুটাণ্টদের দিকে দিকে পাঠিয়ে দেবার পরে—যখন একটা কথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে শত্রুপক্ষ সর্বত্র পালাতে শুরু করেছে এবং আর কোন যুদ্ধ হবে না, তখন কুতুজভ ক্রাস্নু ছেড়ে দোক্রুতে চলে গেল; তার প্রধান ঘাঁটি সেইদিনই সেখানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

পরিষ্কার দিন। তুষার ঝরছে। ছোট, মোটা সাদা ঘোড়ার পিঠে চেপে কুতুজভ দোক্রু চলেছে; পিছনে চলেছে অসন্তুষ্ট জেনারেলদের একটা বড় দল; তারা ফিস্‌ফিস্‌ করে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। পথের দুধারে আগাগোড়া সেদিনকার ফরাসী বন্দীরা (সংখ্যায় তারা সাত হাজার) দলে দলে শিবির-আগুনের পাশে ভিড় করে শরীর গরম করছে। দোক্রুর কাছাকাছি এক জায়গায় ছিন্নবাস পরিহিত বন্দীদের একটা মস্ত বড় দল কলগুঞ্জনে ব্যস্ত; হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই দিয়ে শরীরটা ঢেকেছে, ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে; রাস্তার উপর এক সারি ফরাসী কামানের পাশে

তারা দাঁড়িয়ে আছে। প্রধান সেনাপতিকে দেখে তাদের কলগুঞ্জন থেমে গেল ; সকলেরই চোখ পড়ল কুতুজভের উপর ; তার মাথায় লাল পটি দেওয়া সাদা টুপি, আর একটা প্যাড-লাগানো ওভার কোট। সাদা ঘোড়ায় চেপে সে ধীরে ধীরে তাদের পার হয়ে গেল ; কামানগুলো কোথায় দখল করা হয়েছে আর সৈনিকদের কোথায় বন্দী করা হয়েছে সেকথা বুঝিয়ে বলতে লাগল একজন জেনারেল।

কুতুজভ কি যেন ভাবছে ; জেনারেলের কথাগুলি তার কানে গেল না। অসন্তোষভরা চোখ দুটি কুঁচকে সে একদৃষ্টিতে হতভাগা বন্দীদের দিকেই তাকিয়ে চলেছে। তুষারপাতের ফলে নাক ও গাল বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাদের প্রায় সকলকেই কিম্ভূত দেখাচ্ছে ; প্রায় সকলেরই চোখ লাল, ফোলা-ফোলা, পুঁজ জমেছে।

একদল ফরাসী রাস্তার খুব কাছে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মধ্যে দুজন এক-টুকরো কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে ; একজনের মুখে ঘা দগ্‌দগ্‌ করছে। তাদের দ্রুত সঞ্চালিত দৃষ্টির মধ্যে কেমন একটা ভয়ংকর পশুর মত ভাব ফুটে উঠেছে।

কুতুজভ অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে এই সৈন্য দুটির দিকে তাকিয়ে রইল। তার মুখে ভাঁজ পড়ল, চোখ কুঁচকে গেল, চিন্তিতভাবে মাথাটা দোলাতে লাগল। আর এক জায়গায় দেখল, একটি কৃশ সৈনিক একজন ফরাসীর কাঁধে হাত রেখে বন্ধুর মত কি যেন বলছে। সেই একইরকম মুখের ভাব করে কুতুজভ আর একবার মাথাটা দোলাতে লাগল।

ফরাসীদের কাছ থেকে দখল-করা কতকগুলি পতাকার দিকে প্রধান সেনাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে একজন জেনারেল সমানে কথা বলে যাচ্ছিল ; তার দিকে ফিরে কুতুজভ শুধাল, "আপনি কি বলছিলেন ?···ওঃ, ঐ পতাকাগুলির কথা !"

অন্যমনস্কভাবে কুতুজভ চারদিকে তাকাল। চারদিক থেকে হাজার হাজার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে, আর মুখের একটা কথার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

প্রিয়োব্রাঝেন্‌স্ক্‌ রেজিমেণ্টের সামনে দাঁড়িয়ে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ বুজল। পারিষদবর্গের একজন ইঙ্গিতে সৈন্যদের বলল, পতাকাগুলো হাতে দিয়ে তারা প্রধান সেনাপতিকে ঘিরে দাঁড়াক। কুতুজভ কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল ; তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কর্তব্যের খাতিরে মাথাটা তুলে কথা বলতে শুরু করল। একদল অফিসার তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বেশ মনোযোগ দিয়ে অফিসারদের সেই বৃত্তের দিকে সে তাকাল ; তাদের কয়েকজনকে চিনতে পারল।

প্রথমে সৈনিকদের এবং পরে অফিসারদের সম্বোধন করে বলল,

"তোমাদের সকলকে ধন্যবাদ। কঠোর ও বিশ্বস্ত কাজের জন্য তোমাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই। জয় সম্পূর্ণ হয়েছে ; রাশিয়া তোমাদের ভুলবে না! চিরদিন তোমরা সম্মানিত থাকবে।"

কথা থামিয়ে সে আবার চারদিকে তাকাল।

একটি সৈনিক প্রিয়োব্রাঝেনস্ক পতাকার পাশে ফরাসী ঈগল-মার্কা একটা পতাকা ধরে ছিল। হঠাৎই তার হাতের ফরাসী ঈগলটাকে নীচু করে ফেলতেই কুতুজভ তাকে বলল, "ওর মাথাটা নীচু কর, নীচু কর! নীচু, আরও নীচু, ঠিক আছে। হুর্‌রা বাছারা!"

"হুর্‌-র্‌-রা!" হাজার কণ্ঠে উঠল গর্জন।

সৈন্যরা চীৎকার করতে লাগল। কুতুজভ ঘোড়ার পিঠে সামনে ঝুঁকে মাথাটা নীচু করল, তার চোখে একটা মৃদু, ব্যঙ্গের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

চীৎকার থেমে গেলে আবার বলল, "দেখ ভাইসব" ··সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব ও গলার স্বর বদলে গেল। এ যেন প্রধান সেনাপতি কথা বলছে না, কথা বলছে একটি সাধারণ বুড়ো মানুষ যে তার সহকর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা শোনাতে চায়।

অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা দিল ; তার কথা ভালভাবে শুনবার জন্য সকলেই এগিয়ে গেল।

"দেখ ভাইসব, আমি জানি এটা সহ্য করা তোমাদের পক্ষে শক্ত, কিন্তু কোন উপায় নেই! সহ্য কর ; আর বেশী দিন নয়। অতিথিদের বিদায় করতে পারলেই আমরা বিশ্রাম নেব। তোমাদের সেবার কথা জার ভুলবেন না। তোমরা কষ্ট পাচ্ছ। তবু তো তোমরা দেশেই রয়েছ, আর ওরা—দেখতেই তো পাচ্ছ ওদের কি হাল হয়েছে," বন্দীদের দেখিয়ে সে বলল। "আমাদের চাইতেও ভিক্ষুকের চাইতেও ওদের অবস্থা শোচনীয়। ওরা যখন শক্তিশালী ছিল, তখন আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু এখন আমরা ওদের প্রতি করুণা দেখাতে পারি। ওরাও তো মানুষ। তাই নয় কি বাছারা?"

চারদিকে তাকাল ; তার উপর নিবদ্ধ সশ্রদ্ধ বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টির মধ্যে সে সমবেত সকলের সহানুভূতিরই আভাষ পেল। তার মুখ ক্রমেই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, সেখানে ফুটে উঠল একটি বৃদ্ধ মানুষের মৃদু হাসি, তার ঠোঁটের কোণ দুটি সংকুচিত হল, চোখের উপর ভাঁজ পড়ল। কথা থামিয়ে বুঝি বা বিচলিত হয়েই সে মাথাটা নোয়াল।

হঠাৎ মাথা তুলে সে চীৎকার করে বলল, "কিন্তু কে ওদের এখানে আসতে বলেছিল? ঠিক শাস্তি হয়েছে, য—যত্ত…"

চাবুক ঘুরিয়ে সে জোড় কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সৈন্যরা আনন্দের সঙ্গে "হুর্‌রা!" বলে চেঁচিয়ে উঠল।

কুতুজভের কথাগুলি সৈনিকরা মোটেই বুঝতে পারে নি। ফিল্ড-মার্শালের কথাগুলি কেউ পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না! তার ভাষণটি শুরু হয়েছিল গম্ভীরভাবে। কিন্তু তারপরই হয়ে উঠল একটি বুড়ো মানুষের সরল মনের কথা; কিন্তু সেই ভাষণের সুস্থ আন্তরিকতা, জয়-গৌরবের সঙ্গে শত্রুর প্রতি করুণার মিশ্র অনুভূতি, এবং আমাদের আদর্শের ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে সচেতনতা—এসব কিছু সৈনিকরা শুধু যে বুঝেছিল তাই নয়, প্রতিটি সৈনিকের অন্তরকে তা স্পর্শ করেছিল; তাদের দীর্ঘ সানন্দ উল্লাস-ধ্বনিতেই তা প্রকাশ পেল। পরে জনৈক জেনারেল যখন কুতুজভের কাছে জানতে চাইল যে তার কালিচে-গাড়িটা আনতে পাঠানো হবে কিনা তখন সে প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে কুতুজভ অপ্রত্যাশিতভাবে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল; গভীর আবেগে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

অধ্যায়—৭

ক্রাস্নু যুদ্ধের সর্বশেষ দিন ৮ই নভেম্বর সৈন্যরা যখন রাতের বিশ্রাম-ঘাঁটিতে হাজির হল তখন গোধূলির অন্ধকার নেমে আসছে। সারাদিন আবহাওয়া শান্ত ছিল; মাঝে মাঝে সামান্য বরফও পড়েছে; কিন্তু সন্ধ্যার দিকে আবহাওয়া পরিষ্কার হতে লাগল। পড়ন্ত বরফের ভিতর দিয়ে লাল-কালো তারকাখচিত আকাশ দেখা দিল; তুষারপাত তীক্ষ্ণতর হল।

যে পদাতিক রেজিমেণ্টটি তারুতিনো ছেড়েছিল তিন হাজার সৈন্য নিয়ে এখন তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে মাত্র ন'শ'। সেই রেজিমেণ্টটাই বড় রাস্তার ধারে একটি গ্রামের রাতের ঘাঁটিতে এসে প্রথম পৌছল। কোয়ার্টারমাস্টাররা জানাল, রুগ্ন ও মৃত ফরাসী, অশ্বারোহী সৈন্য ও কর্মচারিতে সব কুটিরই ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু রেজিমেণ্ট-কম্যাণ্ডারের জন্য একটা ঘর পাওয়া যেতে পারে।

কম্যাণ্ডার ঘোড়া নিয়ে সেই ঘরটাতে গেল। বাকি রেজিমেণ্ট গ্রামের ভিতর দিয়ে এগিয়ে শেষ কুটিরটার সামনে তাদের অস্ত্রশস্ত্র স্তূপ করে রাখল।

বহু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমন্বিত একটা প্রকাণ্ড জন্তুর মত রেজিমেণ্ট তাদের বিছানা ও খাবার তৈরির কাজে লেগে গেল। একদল এক-হাঁটু বরফ ভেঙে গ্রামের দক্ষিণ দিকের বার্চের বনে ঢুকে গেল; সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে ভেসে আসতে লাগল কুড়ুল ও তলোয়ারের শব্দ, ডাল ভাঙার শব্দ, নানারকম খুশির হল্লা। আর একদল হাড়ি-কড়াই ও জইয়ের বিস্কুট বের করল এবং ঘোড়াগুলোকে খাবার দিল। তৃতীয় দলটা গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা করার কাজে লেগে গেল, ফরাসীদের মৃতদেহগুলি বয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল, ঘরের বোর্ড, শুকনো কাঠ ও চালের খড় টেনে নিয়ে আগুন জ্বালাল, আর বাঁশের বেড়া দিয়ে নিজেদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা

করতে লাগল।

জন পনেরো লোক একটা চালাঘরের ছাদটা খুলে ফেলার পরে হৈ-হৈ করে তার উঁচু বাঁশের বেড়াটা ধরে টেনে নামাতে চেষ্টা করছিল।

সকলে সমস্বরে বলে উঠল, "এবার, এক সাথে, সবাই মিলে, হেইয়ো জোয়ান, মারো টান!" ধপাস্ করে দেয়ালটা পড়ে গেল, সেইসঙ্গে জোয়ানরাও ছিটকে পড়ল। শুরু হয়ে গেল উচ্চ হাসি ও হল্লা।

"এবার এক সাথে হাত লাগাও। দুজন-দুজন করে। একটু সবুর কর বাছারা···একটা গান ধর!"

সকলে চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা মিষ্টি মোলায়েম গলায় গান শুরু হল। তৃতীয় কলিটা শেষ হতে শেষ স্বরটা যখন মিলিয়ে গেল, অমনি বিশটা কণ্ঠস্বর একসঙ্গে গর্জন করে উঠল: "উ—উ-উ-উ। এই তো চাই। এক সাথে। মারো টান, হেইয়ো জোয়ান।" কিন্তু হাজার চেষ্টারও বেড়াটা নড়ল না। সকলেই চুপ। শুধু শোনা গেল বড় বড় নিঃশ্বাসের শব্দ।

"এই যে ষষ্ঠ কোম্পানির বাছারা! আচ্ছা বদমাশ তো তোমরা! একটু হাত লাগাও না বাবা···আবার একদিন আমাদেরও তো ডাকতে হতে পারে।"

ষষ্ঠ কোম্পানির জন বিশেক সৈন্য গ্রামের দিকে যাচ্ছিল। তারাও এসে হাত লাগাল। আর পঁয়ত্রিশ ফুট লম্বা ও সাত ফুট উঁচু বাঁশের বেড়াটা হেলে দুলে গ্রামের পথ দিয়ে চলতে চলতে শ্রান্ত লোকগুলোর কাঁধের উপর কেটে বসতে লাগল।

"জোরসে ধরো···পড়ে যাচ্ছ নাকি? আরে, থামছ কেন? এই যে, ওদিকে ···"

অর্থহীন খুশি-ভরা বকাবকি অবাধে চলতে লাগল।

"হচ্ছে কি তোমাদের?" সহসা জনৈক সার্জেণ্ট-মেজরের কর্তৃত্বপূর্ণ গলা শোনা গেল। "এখানে ভদ্রলোকরা রয়েছেন; স্বয়ং জেনারেল রয়েছেন কুটিরে, আর তোমরা যত সব মুখ-ফাজিল শয়তান আর জানোয়ারের দল! এটাই তোমাদের প্রাপ্য!" চীৎকার করে কথাগুলি বলে প্রথম যাকে হাতের কাছে পেল তারই পিঠে লাগাল একটা মোক্ষম ঘুষি। "চেঁচামেচিটা কম করতে পার না?"

সকলে চুপ করল। বেড়ার উপর পড়ে গিয়ে আহত সৈনিকটির মুখ ছড়ে গিয়ে রক্ত পড়ছে; সে আর্তনাদ করে মুখ মুছতে লাগল।

সার্জেণ্ট-মেজর চলে যেতেই সভয়ে সে ফিস্‌ফিস্ করে বলে উঠল, "দেখ না, শয়তানটা কী মার মেরেছে! মুখটাকে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।"

"কেমন লাগছে বল?" কে যেন হাসতে হাসতে বলল। তারপর গলা নামিয়ে সকলে এগিয়ে চলল।

গ্রাম ছাড়িয়ে গিয়ে আবার তারা আগের মতই জোর গলায় কথা বলতে লাগল ; মাঝে মাঝেই তাতে চুটকি কথার ফোড়ন ।

কুটিরের মধ্যে প্রধান অফিসাররা জড়ো হয়ে আজকের ঘটনাবলী ও আগামীকালের রণ-কৌশল নিয়ে আলোচনা করছে । প্রস্তাব করা হয়েছে, আগামীকাল বাঁদিক ধরে এগিয়ে উপ-রাজাকে (মুরাত) বিচ্ছিন্ন করে গ্রেপ্তার করা হবে ।

সৈন্যরা যতক্ষণে বাঁশের বেড়াটাকে যথাস্থানে টেনে নিয়ে গেল ততক্ষণে চারদিকে শিবির-আগুনগুলো জ্বলে উঠে রান্নার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে । কাঠ ফেটে শব্দ হচ্ছে, বরফ গলছে, সৈনিকদের কালো-কালো ছায়াগুলি ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে ।

কুড়ুল ও কাটারিগুলো চারদিকে স্তূপ করে রাখা হয়েছে । সব কিছুই করা হয়েছে বিনা হুকুমে । রাতের মত কাঠ আনা হয়েছে, অফিসারদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে, কড়াইতে খাবার সিদ্ধ হচ্ছে, বন্দুক ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়েছে ।

উত্তরের দিক থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাঁশের বেড়াটাকে এনে সেইদিকে দাঁড় করানো হয়েছে । তার সামনেও একটা শিবির-আগুন জ্বালানো হয়েছে । সকলে ঢাক বাজাল, নাম ডাকা হল, রাতের খাবার খেল, রাতের মত আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসল—কেউ মোজা মেরামত করতে লাগল, কেউ বা পাইপ ধরাল, আবার কেউ বা পোশাক খুলে আগুনের তাতে শার্টের উকুন তাড়াতে বসে গেল ।

অধ্যায়—৮

একথা মনে হতে পারে যে রুশসৈন্যরা সেসময় যে অবিশ্বাস্য রকমের শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছিল—গরম জুতো ছিল না, ভেড়ার চামড়ার কোট ছিল না, মাথার উপরে ছাদ ছিল না, পায়ের নীচে ছিল আঠারো ডিগ্রির বরফ (১৮ ডিগ্রি=শূন্য ফারেনহিটের আট ডিগ্রি নীচে) এমন কি পুরো রেশনও ছিল না (কমিসারিয়েট বিভাগ সবসময় সেনাদলের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারত না)—তাতে সে দৃশ্য খুবই করুণ ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছিল ।

কিন্তু আসলে অত্যন্ত ভাল বাস্তব পরিবেশেও সেনাবাহিনী কখনও সে সময়কার চাইতে অধিক খুশি ও প্রাণচঞ্চল ছিল না । তার কারণ সৈন্যদের মধ্যে যারাই মন-মরা অথবা দুর্বল হয়ে পড়ল তাদেরই দিনের পর দিন সেনাদল থেকে ছাটাই করা হতে লাগল । দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে

দুর্বল সৈন্যদের পিছনে ফেলে আসা হল, আর দৈহিক ও মানসিক দিক থেকে যারা বাহিনীর প্রাণস্বরূপ তাদেরই শুধু রাখা হল।

অন্য সব জায়গার তুলনায় অষ্টম কোম্পানির বাঁশের বেড়াটার আড়ালেই সব চাইতে বেশী লোক জমায়েত হল। দু'জন সার্জেন্ট—মেজরও তাদের দলে গিয়ে বসে পড়ল; তাদের শিবির-আগুনই সব চাইতে বেশী জল্ জল্ করে জ্বলতে লাগল। তাদের বেড়ার পাশে বসার অনুমতির জন্য চাঁদা হিসাবে তারা কাঠ দাবী করতে লাগল।

"আরে মকিভ, তোমার হয়েছে কি কুকুরের বাচ্চা? তুমি কি শেষ হয়ে গেছ, না কি তোমাকে নেকড়েয় খেয়েছে? আরও কিছুটা কাঠ নিয়ে এস।" লাল-চুল, লাল-মুখ একটি লোক চোখ ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলল। ধোঁয়ায় চোখ জ্বালা করলেও আগুনের কাছ থেকে না সরেই সে অপর একটি সৈনিককে বলল, "আর তুমি দাঁড়কাক, যাও না, কিছু কাঠ নিয়ে এস!"

লাল-চুল লোকটি সার্জেন্টও নয়, কর্পোরালও নয়, কিন্তু গায়ে বেশ জোর আছে বলেই দুর্বলতর লোকগুলিকে দাপটের সঙ্গে হুকুম করছে। যাকে "দাঁড়কাক" বলা হল সেই শীর্ণ, ছোট খাট মানুষটি হুকুমমত উঠে দাঁড়াতেই আগুনের আলোয় দেখা গেল একটি সুদর্শন তরুণ এক বোঝা কাঠ বয়ে এনেছে।

"এখানে নিয়ে এস—খুব ভাল কাজ করেছ!"

তারা কাঠ চিঁরল, সেগুলোকে আগুনে ফেলে দিয়ে ফুঁ দিতে লাগল, গ্রেটকোটের কোণ দিয়ে হাওয়া করতে লাগল, ফট্ ফট্ শব্দ করে হু-হু করে জ্বলে উঠল। সকলে আরও ঘন হয়ে বসে পাইপ ধরাল। নবাগত সুদর্শন তরুণটি দুই হাত বুকের উপর কোনাকুনি ভাঁজ করে দুই পা বরফের উপর ঠুকতে লাগল।

"মাগো। শিশির কণাগুলো ঠাণ্ডা কিন্তু পরিষ্কার। ভালই হয়েছে যে আমি বন্দুকধারী…" গান গাইতে গাইতে সে মাঝে মাঝেই হিক্কা তোলার ভান করে চলল।

তরুণটির বুটের তলা ঝুলে আছে দেখে লাল-চুল লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, "দেখহে, তোমার জুতোর তলা যে উড়ে যাবে! এত নাচছই বা কেন?"

নর্তক থামল, ঝুলে-পড়া চামড়াটা খুলে নিয়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল।

"ঠিক বলেছেন বন্ধু," বলে তরুণটি বসে পড়ল। ঝোলার ভিতর থেকে একটুকরো নীল ফরাসী কাপড় বের করে পায়ের পাতাটা জড়িয়ে নিল। পা দুটো আগুনের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে বলল, "বাষ্প ওগুলোর ক্ষতি করে।"

"শীঘ্রই আমাদের নতুন বুট দেওয়া হবে। ওরা বলছেন, এদের তুলো-ধোনা করাটা শেষ হলেই আমরা 'ডবল কিট' পেয়ে যাব!"

একজন সার্জেন্ট-মেজর বলল, "মনে হচ্ছে কুকুরের বাচ্চা পেত্রভটা সকলের পিছনে পড়ে আছে।"

অপরজন বলল, "সারাক্ষণ আমি তার উপর নজর রেখেছি।"

"আচ্ছা, সৈনিক হিসাবে বেচারা বড়ই দুর্বল…"

"কিন্তু সকলে বলছে, তৃতীয় কোম্পানির ন'জনকে কাল খুঁজে পাওয়া যায় নি।"

"ঠিক, সবই ঠিক; কিন্তু কারও পা যদি জমে যায় তাহলে সে হাঁটবে কেমন করে?"

একথা যে বলল তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে ফিরে একটি বুড়ো সৈনিক বলল, "তুমিও তাই করতে চাও না কি?"

যে লোকটিকে "দাঁড়কাক" বলা হয়েছিল সে আগুনের ও-পাশে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "দেখুন, আপনি তো জানেন, মোটা লোক সরু হয়ে যায়, কিন্তু সরু লোকের কপালে জোটে মৃত্যু।" তারপর সার্জেন্ট-মেজরের দিকে ঘুরে দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল, "আমার কথাই ধরুন। ওদের বলুন, আমাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিক। আমার সারা শরীরে ব্যথা; আমি আর চলতে পারছি না।"

সার্জেন্ট-মেজর শান্ত গলায় বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে।"

সৈনিকটি আর কথা বলল না। গল্প-গুজব চলতে লাগল।

নতুন প্রসঙ্গের অবতারণা করে একজন বলল, "আজ ফরাসী বাবাজীদের অনেককে ধরা হয়েছে। তাদের কারও পায়েই সত্যিকারের বুট বলতে কিছু নেই। সব যেন সৈনিকের ভূত।"

নর্তক তরুণটি বলল, "কসাকরা তাদের বুটগুলি হাতিয়েছে। কর্ণেলদের জন্য ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে তাদের বাইরে বের করে দিয়েছে। তাদের দেখলে সত্যি করুণা হয়। তাদের যখন ফেলে দিল তখনও একজনকে জীবন্ত বলে মনে হল; তোমরা কি বিশ্বাস করবে, ওদের ভাষায় সে যেন বিড়বিড় করে কি বলল।"

প্রথম লোকটি বলতে লাগল, "কিন্তু ওরা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; মনে হয় বেশ বড় ঘরের মানুষ।"

"আহা, আপনি কি মনে করেন? ওদের সেনাদলে সব শ্রেণীর মানুষই আছে।"

নর্তক তরুণটি বিচলিত হাসি হেসে বলল, "কিন্তু আমাদের কথা ওরা কিছুই বোঝে না। আমি শুধিয়েছিলাম, সে কার প্রজা, তাতে নিজের ভাষায়ই বিড় বিড় করে কি যেন বলল। দুর্ভাগা আর কি!"

প্রথম লোকটি বলতে লাগল, "কিন্তু বন্ধুগণ, আশ্চর্যের কথা কি জান, মোঝায়েস্কের চাষীরা বলছে তারা যখন মৃতদেহগুলিকে রণক্ষেত্রে কবর

দিচ্ছিল তখনও যে সব মৃতদেহ প্রায় একমাসকাল সেখানে পড়েছিল সেগুলি তখনও ছিল কাগজের মত সাদা, পরিষ্কার, বারুদের ধোঁয়ার মত কোন গন্ধও তা থেকে পাওয়া যায় নি।”

“সেটা কি ঠাণ্ডার জন্য?” একজন শুধাল।

“তুমি খুব বুদ্ধিমান! ঠাণ্ডার জন্যই বটে! আরে, তখন তো বেশ গরম। যদি ঠাণ্ডার জন্যই হবে তাহলে তো আমাদের মৃতদেহগুলোও পচত না। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমাদের মৃতদেহগুলি দেখে এস, সব পচে গেছে, পোকা পড়েছে। তাদের টেনে নিয়ে যাবার সময় আমরা তো মুখে রুমাল বেঁধে মাথা ঘুরিয়ে নেই: কাজটা করা খুবই শক্ত। কিন্তু ওদের মৃতদেহগুলি কাগজের মত সাদা, বারুদের ধোঁয়ায় যেটুকু গন্ধ থাকে তাও নেই।”

সকলে চুপ।

সার্জেণ্ট-মেজর বলল, “তাহলে নিশ্চয় তাদের খাদ্যের ফল। তারা তো সকলেই ভদ্রলোকদের খাবার খেত।”

কেউ তার কথার প্রতিবাদ করল না।

“মোঝায়েস্কের যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী চাষীরা বলছে, চারদিকের দশটা গাঁয়ের লোক ডেকে এনে বিশদিন ধরে গাড়ি বোঝাই করেও মৃতদেহগুলি সরিয়ে দেওয়া শেষ করা যায় নি; আর নেকড়ের কথা যদি বল…”

জনৈক বুড়ো সৈনিক বলল, “এটাই তো আসল যুদ্ধ। মনে করে রাখবার মত একমাত্র যুদ্ধ। কিন্তু তারপর থেকে…লোকে শুধু যন্ত্রণাই ভোগ করছে।”

“আর তুমি কি জান বাবা, গত পরশু আমরা যেই তাদের দিকে ধেয়ে গেলাম, অমনি, বিশ্বাস কর, আমরা তাদের কাছে পৌঁছবার আগেই তারা বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। বলে উঠল, “ক্ষমা কর!” এটা তো মাত্র একটা ঘটনা। লোকে বলছে, প্লাতভ দু' দু'বার স্বয়ং পোলিয়নকে ধরেছিল। কিন্তু তাকে ধরার সঠিক মন্ত্র তো তার জানা ছিল না। তাকে ধরছে, আবার ধরছে, কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। সে হাতের মধ্যেই পাখি উড়ে যায়। তাকে মারবারও কোন পথ নেই।”

“তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি একটি পাকা মিথ্যাবাদী!”

“মিথ্যাবাদী, বটে! এটাই আসল সত্য।”

“সে যদি আমার হাতে পড়ত, তাহলে ধরামাত্রই একটা অ্যাস্পেন গাছের বর্শা দিয়ে তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলতাম। সে যে কত মানুষের সর্বনাশ করেছে!”

বুড়ো সৈনিকটি হাই তুলে বলল, “ওসব কথা এখন থামাও। সে আর এখানে আসছে না।”

আলোচনায় ভাঁটা পড়ল; সৈন্যরা ঘুমের আয়োজন করতে লাগল।

একজন সবিস্ময়ে আকাশের ছায়াপথের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,

"তারাগুলোর দিকে তাকাও। কী রকম অদ্ভুত কিরণ দিচ্ছে! মনে হবে বুঝিবা নারীরা তাদের কাপড় বিছিয়ে দিয়েছে।"

"ওটা আসছে বছর ভাল ফসলের লক্ষণ।"

"আরও কিছু কাঠ দরকার!"

"পিঠ গরম করি তো পেট ঠাণ্ডায় জমে যায়। আশ্চর্য ব্যাপার।"

"হা প্রভু!"

"ঠেলছ কেন? আগুনটা কি তোমার একার জন্য? দেখ, ও কেমন হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছে!"

সব চুপ হয়ে গেল। যারা ঘুমিয়ে পড়েছে তাদের নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। অন্যরা পাশ ফিরে শরীর গরম করতে করতে দু' একটা কথা বলছে। একশ' পা দূরের একটা শিবির-আগুনের পাশ থেকে হাসির হর্‌রা ভেসে এল।

একজন বলে উঠল, "পঞ্চম কোম্পানির গর্জনটা শোন! ওখানে অনেকে জমেছে!"

একজন উঠে পঞ্চম কোম্পানিতে চলে গেল।

ফিরে এসে বলল, "ওরা খুব ফুর্তি করছে। দুটি ফরাসী বাবাজী এসে হাজির হয়েছে। একজন একেবারে জমে গেছে, আর অপরজন রাজা-উজির মারছে। ব্যাটা গান গাইছে…"

"আরে, তাহলে আমিও গিয়ে দেখে আসি।"

বেশ কয়েকজন পঞ্চম কোম্পানির কাছে চলে গেল।

অধ্যায়—৯

পঞ্চম কোম্পানি বনের একেবারে প্রান্তে একটা গুপ্ত ডেরায় তখন বিশ্রাম করছে। বরফের মাঝখানে একটা বড় শিবির-আগুন উজ্জ্বল আভায় জ্বলছে; তার আলো, শুভ্র হিমানীকণায় ঢাকা গাছের ডালপালাগুলি আলোকিত হয়ে উঠেছে।

মাঝরাতে বনের ভিতর বরফের উপর তারা পায়ের শব্দ ও শুকনো ডালপালার মচ্‌-মচ্‌ শব্দ শুনতে পেল।

একজন বলল, "ভালুক আসছে হে।"

সকলে কান খাড়া করল। আগুনের উজ্জ্বল আলোয় বন থেকে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এল অদ্ভুত সাজে সজ্জিত দুটি মনুষ্যমূর্তি।

দু'জন ফরাসী; তারা বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। কর্কশ গলায় নিজেদের ভাষায় কি যেন বলতে বলতে তারা আগুনের কাছে এগিয়ে এল। আমাদের সৈন্যরা তাদের কথা কিছুই বুঝতে পারল না। একজন অপরজনের চাইতে

লম্বা ; তার মাথায় অফিসারের টুপি ; দেখে খুবই ক্লান্ত মনে হল। আগুনের কাছে এসে বলতে গিয়ে সে পড়ে গেল। অপরজন অনেক বেশী শক্ত-সমর্থ। মাথায় একটা শাল বাঁধা। সঙ্গীকে তুলে ধরে তার মুখটা দেখিয়ে কি যেন বলল। সৈন্যরা তাদের ঘিরে দাঁড়াল, রুগ্ন লোকটির জন্য একটা গ্রেটকোট পেতে দিল, আর দুজনের মত পরিজ্জ ও ভদ্‌কা এনে দিল।

ক্লান্ত লোকটি ফরাসী অফিসার রাম্বল, আর মাথায় শাল ঢাকা লোকটি তার আর্দালি মোরেল।

পরিজের পাত্রটা শেষ করে খানিকটা ভদ্‌কা পেটে ঢেলে মোরেলের মেজাজ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকমের খুশি হয়ে উঠল, সৈন্যদের সঙ্গে অবিরাম বকবক করতে লাগল, অবশ্য সৈন্যরা তার কথা কিছুই বুঝতে পারল না। রাম্বল কিছু খেল না, কনুইয়ের উপর মাথাটা রেখে আগুনের পাশে চুপচাপ শুয়ে থেকে রক্তিম শূন্য দৃষ্টি মেলে রুশ সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে রইল। মাঝে মাঝে একটা টানা আর্তনাদ করে আবার চুপ করে থাকছে। তার কাঁধের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোরেল সৈনিকদের বোঝাতে চেষ্টা করল যে সে একজন অফিসার, তাকে একটু গরমে রাখা দরকার। সেখানে উপস্থিত জনৈক রুশ অফিসার তার কর্ণেলের কাছে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইল, ফরাসী অফিসারটিকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে একটু গরমে রাখা চলবে কি না। লোকটি এসে জানাল, কর্ণেল লোকটিকে তার কাছেই পাঠিয়ে দিতে বলেছে ; তখন রাম্বলকে যেতে বলা হল। সে উঠে হাঁটতে চেষ্টা করতেই তার পা টলতে লাগল। পাশের সৈনিকটি ধরে না ফেললে সে পড়েই যেত।

একটি সৈনিক চোখ টিপে রাম্বলকে ঠাট্টা করে বলল, "একাজ আর কখনও করবেন না. কি বলেন ?"

"আরে বোকা কোথাকার ! কি বাজে বকছ, চাষাতো, একেবারে চাষা !" চারদিক থেকে সকলে তাকে বকতে লাগল :

তারা রাম্বলকে ঘিরে দাঁড়াল। দুজন সৈনিক দুদিক থেকে ধরে তাকে কুটিরে বয়ে নিয়ে চলল। তাদের গলা জড়িয়ে ধরে রাম্বল কাতর কণ্ঠে আর্তনাদ করে বলতে লাগল :

"আহা, ভাল মানুষের দল, আমার দয়ালু, বড় দয়ালু বন্ধুরা ! এরাই তো মানুষ ! আমার সাহসী, দয়ালু বন্ধুরা !" ছোট শিশুর মত সে একজন সৈনিকের কাঁধে মাথাটা রাখল।

এদিকে মোরেল তখন সৈন্যপরিবৃত হয়ে আগুনের পাশে সব চাইতে ভাল জায়গাটাতে বসে পড়েছে।

মোরেল বেশ শক্ত-সমর্থ ; ফোলা চোখ দুটো থেকে জল পড়ছে ; তার পরনে একটা মেয়েদের জোব্বা ; মাথায় টুপির উপরে মেয়েদের মত করে একটা শাল জড়িয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে যে তার নেশা হয়েছে। পাশের

সৈনিকটির গলাটা জড়িয়ে ধরে ভাঙা গলায় একটা ফরাসী গান ধরেছে।

মোরেল যে সৈনিকটিকে জড়িয়ে ধরেছে সে একজন গায়ক ও রসিক লোক। সে বলে উঠল, "এবার—এবার আমাদের শিখিয়ে দাও! আমি ঠিক তুলে নেব। বল—বল।"

চোখ মিটমিট করে মোরেল ফরাসীতে গেয়ে উঠল, "সাহসী রাজা চতুর্থ হেন্‌রি দীর্ঘজীবী হোন! সে শয়তানের আছে চারটি…"

সুরটা ঠিক মত ধরে নিয়ে সৈনিকটি হাত নেড়ে নেড়ে গানটার পুনরাবৃত্তি করল।

চারদিক থেকে হাসির হর্‌রা উঠল, "সাবাস! হা, হা, হা!"

মোরেলও মুখ কুঁচকে হেসে উঠল।

"বেশ, বেশ, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও!"

"তিন গুণের অধিকারী ত্রিনাথ আমার,
পানে দক্ষ, যুদ্ধে দড়,
সাহসেও বড় সড়…"

"বাঃ, বেশ তো চলছে। আচ্ছা, এবার তুমি গাও জালেতায়েভ।"

জালেতায়েভ অনেক কষ্টে ঠোঁট চেটে চেটে কথাগুলি উচ্চারণ করল।

"খাসা হয়েছে। ঠিক ফরাসীবাবাজীর মতই! হো, হো, হো! তুমি আর কিছু খাবে কি?"

"ওকে আরও খানিকটা পরিজ দাও। অনাহারের পরে পেটটা ভরাতে অনেক সময় লাগে।"

আরও খানিকটা পরিজ দেওয়া হল। মোরেল হাসতে হাসতে তৃতীয় পাত্রে হাত দিল। তাকে দেখে অল্প বয়সী সৈনিকরা সকলেই খুশি। কিন্তু এই সব বাজে হৈ-চৈ মর্যাদা হানিকর বিবেচনা করে বুড়ো সৈনিকরা আগুনের অপর দিকটাতে চুপচাপ শুয়ে রইল। অবশ্য কেউ কেউ মাঝে মাঝে কনুইতে ভর দিয়ে মোরেলকে দেখে মুচ্‌কি মুচকি হাসতে কসুর করল না।

কোট দিয়ে শরীরটা ঢাকতে ঢাকতে একজন বলল, "ওরাও তো মানুষ! তেতো সোমরাজ গাছও তো তার শিকড়েই জন্মায়।"

"হে প্রভু! হে প্রভু! আকাশে কত তারা! ভয়ংকর! তার মানে, প্রচণ্ড তুষারপাত…"

সকলে চুপ করে গেল।

তাদের কেউ দেখছে না জানতে পেরে তারারাও যেন কালো আকাশের বুকে কেলি শুরু করে দিল: এই জলছে, এই নিভছে, এই কাঁপছে, যেন পরস্পরের কানে কানে কোন রহস্যময় খুশির কথা বলছে।

অধ্যায়—১০

গাণিতিক হ্রাস-বৃদ্ধির একটা সমান হারে ফরাসী সৈন্যদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল। যে বেরিজিনা অতিক্রম সম্পর্কে এত কথা লেখা হয়েছে সেটা এই অভিযানের চূড়ান্ত পর্যায় মোটেই নয়, ফরাসী বাহিনীর ধ্বংসের একটা মধ্যবর্তী পর্যায় মাত্র। বেরিজিনা সম্পর্কে যে এত কথা লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তার কারণ—ফরাসীদের দিক থেকে দেখতে গেলে, তাদের বাহিনী যেসব বিপদ-আপদ অনেকদিন ধরেই সয়ে আসছিল হঠাৎ ঐ নদীর উপরকার সেতুর মুখে সেটা একটি মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত হয়ে এমন একটা শোচনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল যা প্রত্যেকের স্মৃতিতে স্পষ্ট হয়ে আছে, আর রুশদের দিক থেকে দেখতে গেলে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে পিতার্সবুর্গে তখন একটা নতুন পরিকল্পনা (আবারও সেটা প্ফুয়েলেরই সৃষ্টি) রচনা করা হয়েছিল যাতে বেরিজিনা নদীতে একটা সমর-কৌশলের ফাঁদ পেতে নেপোলিয়নকে ধরা যায়। প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিল যে সব কিছুই পরিকল্পনা-মাফিক ঘটবে, আর তাই তারা বার বার বলেছে যে বেরিজিনার মুখেই ফরাসী বাহিনীকে ধ্বংস করা হয়েছে। বস্তুত, সংখ্যাতত্ত্ব থেকে এটাই দেখা যায় যে বিনষ্ট কামান ও সৈন্যের বিচারে বেরিজিনার ফরাসীদের ক্ষয়-ক্ষতি ক্রাসনুর তুলনায় অনেক কমই হয়েছিল।

বেরিজিনা সেতু-মুখের একমাত্র গুরুত্ব হল, সেখানেই সন্দেহাতীতভাবে পরিষ্কার প্রমাণ হয়ে গেল যে ফরাসীদের পশ্চাদপসরণের পথকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার সবগুলি পরিকল্পনাই ছিল ভ্রান্ত, আর কুতুজভ ও সাধারণ সৈনিকরা যে কর্মপন্থা গ্রহণ করতে চেয়েছিল অর্থাৎ শত্রুপক্ষকে বাধা না দিয়ে কেবল অনুসরণ করে চলা সেটাই ছিল একমাত্র সঠিক পথ। ফরাসীরা তখন দলে দলে পালাচ্ছিল ক্রমাগত গতিবেগ বাড়িয়ে, তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টায়। তারা পালাচ্ছিল আহত জন্তুর মত; তাই তাদের পথে বাধা দেওয়া ছিল অসম্ভব। সেতুটা যখন ভেঙে পড়ল তখন নিরস্ত্র সৈনিক, মস্কোর অধিবাসী, এবং নারী ও শিশু সকলেই নৌকোর দিকে ধেয়ে গেল, ছুটে গেল বরফ-ঢাকা জলের দিকে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করল না।

এই আবেগ খুবই যুক্তিপূর্ণ। পলাতক এবং পশ্চাদ্ধাবনকারী দুয়েরই অবস্থা তখন সমান খারাপ। যতক্ষণ তারা নিজেদের লোকের মধ্যে ছিল ততক্ষণ প্রত্যেক পক্ষই নিজের লোকদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় ছিল। কিন্তু যারা আত্মসমর্পণ করল তারা অপর পক্ষের মত একই শোচনীয় অবস্থায় পড়লেও জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সমান অংশীদার হতে পারে না। বিজয়ী পক্ষের শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও অর্ধেক ফরাসী বন্দী যে শীতে ও ক্ষুধায় মারা গিয়েছিল একথা ফরাসীদের জানাবার কোন প্রয়োজন ছিল না,

কারণ তারা জানত যে এর অন্যথা হতে পারে না। যেসব দয়ালু রুশ কম্যাণ্ডার ফরাসীদের প্রতি সদয় ছিল—এমন কি রুশ সেনাদলভুক্ত ফরাসীরাও—বন্দীদের জন্য কিছুই করতে পারে নি। যে পরিস্থিতিতে রুশ বাহিনী পড়েছিল সেই একই পরিস্থিতিতে ফরাসী বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের ক্ষুধার্ত সৈনিকদের কাছ থেকে রুটি ও কাপড় ছিনিয়ে নিয়ে তা ফরাসীদের দেওয়া একান্তই অসম্ভব ছিল। ফরাসীরা ক্ষতির কারণ না হতে পারে, ঘৃণার বস্তু না হতে পারে, অপরাধীও না হতে পারে, কিন্তু তাদের কোন প্রয়োজন তো ছিল না। কিছু রুশ হয় তো তাও করেছিল, কিন্তু তারা বিরল ব্যতিক্রম।

ফরাসীদের পশ্চাতে নিশ্চিত ধ্বংস, কিন্তু সম্মুখে আশা। তাদের জাহাজগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ; সমবেত পলায়ন ছাড়া মুক্তির অন্য কোন পথ ছিল না, আর ফরাসীদের সব শক্তি সেইপথেই কেন্দ্রীভূত হল।

তারা যত পালাতে লাগল ততই তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল, বিশেষ করে বেরিজিনার পরে, কারণ পিতার্সবুর্গ পরিকল্পনার ফলে সেখানে রুশদের মনে নতুন আশা জেগেছিল। পিতার্সবুর্গ-বেরিজিনা পরিকল্পনা যদি বিফল হয় তো কুতুজভের জন্যই হবে, এই আশংকায় রুশ কম্যাণ্ডারদের অসন্তোষ, ঘৃণা ও পরিহাসের ভাষা ক্রমেই কঠোরতর হতে লাগল। পরিহাস ও ঘৃণাকে অবশ্য প্রকাশ করা হত সশ্রদ্ধ ভাষায়, কাজেই তার দোষটা যে কোথায় সে প্রশ্নও কুতুজভের পক্ষে তোলা সম্ভব ছিল না। সামনাসামনি সকলেই সৌজন্যের মুখোশ পরে থাকত, কিন্তু পিছন থেকে তাকে দেখে চোখ টিপত, আর পদে পদে তাকে ভুল পথে নিতে চেষ্টা করত।

তাকে বুঝতে পারত না বলেই এই লোকগুলো ধরেই নিয়েছিল যে বুড়োটার সঙ্গে কথা বলা বৃথা ; তাদের পরিকল্পনার গভীরতা সে কখনও পরিমাপ করতে পারবে না ; সবসময় সেই একই পুরনো কথা বলবে—বলবে "সোনালী সেতু"র কথা, বলবে যে এইসব ছিন্নবাস বিপর্যস্ত সৈন্যদের নিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করা অসম্ভব, ইত্যাদি। এসব কথা তারা অনেক শুনেছে। তাছাড়া, তার সব কথাই এত সহজ ও সরল, আর তাদের প্রস্তাবগুলি এতই জটিল ও কুশলী যে এটা একান্ত স্পষ্ট যে সে লোকটি বুড়ো ও নির্বোধ, আর তারা ক্ষমতাসীন না হলেও প্রতিভাবান।

খ্যাতিমান নৌ-সেনাধ্যক্ষ ও পিতার্সবুর্গের মহানায়ক উইৎগেন্‌স্তিন যখন সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল তখনই জেনারেলদের এই মনোভাব ও কথাবার্তা একেবারে তুঙ্গে উঠল। কুতুজভ সবই জানল, বুঝল ; কেবল দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। শুধু একবার, বেরিজিনার ব্যাপারের পরে, সে রাগে ফেটে পড়ল এবং বেনিংসেনকে (সে আলাদাভাবে সম্রাটের কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল) নিম্নবর্ণিত চিঠি লিখল :

“আপনার নষ্ট স্বাস্থ্যের কারণে ইয়োর এক্সলেন্সি যেন এই চিঠি পেয়েই দয়া করে কালুগা যাত্রা করেন এবং ইম্পিরিয়াল ম্যাজেস্টির কাছ থেকে আরও নির্দেশ ও কর্ম-নিযুক্তির জন্য সেখানেই অপেক্ষা করে থাকেন।

কিন্তু বেনিংসেনের যাত্রার পরে গ্র্যাণ্ড ডিউক জারেভিচ কন্‌স্তান্তিন পাভ্‌লভিচ সেনাদলের সঙ্গে যোগ দিল। এই অভিযানের গোড়ায় সে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু পরে কুতুজভ তাকে সরিয়ে দিয়েছিল। এবার সেনাদলে এসেই কুতুজভকে জানিয়ে দিল, আমাদের বাহিনীর যৎসামান্য সাফল্য ও অগ্রগতির মন্থরতার দরুণ সম্রাট তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সম্রাট নিজে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবে।

কি রাজদরবারে কি সমর ক্ষেত্রে সমান অভিজ্ঞ এই বৃদ্ধ মানুষটি—সেই কুতুজভ যে গত অগস্ট মাসে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হয়েছিল এবং গ্র্যাণ্ড ডিউক ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে সরিয়ে দিয়েছিল —যে নিজের ক্ষমতায় এবং সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মস্কো পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল, এবার সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে তার দিন শেষ হয়ে এসেছে, তার যা করার তা করা হয়েছে। আর যে ক্ষমতায় সে এখন অধিষ্ঠিত আছে বলে মনে করে সেটা আর তার নেই। আর শুধু যে রাজদরবারের মনোভাব থেকেই সে এটা বুঝতে পারল তাও নয়। সে বুঝল, যে সামরিক কর্মক্ষেত্রে তার ভূমিকা সে পালন করেছে সেখানকার কাজ শেষ হয়েছে, আর তার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। আর সেইসঙ্গে বার্ধক্যজীর্ণ শরীরের ক্লান্তি এবং দৈহিক বিশ্রামের প্রয়োজন সম্পর্কেও সে সচেতন হয়ে উঠল।

২৯ শে নভেম্বর কুতুজভ ভিল্‌না প্রবেশ করল—যাকে সে বলত “আদরের ভিল্‌না।” দু'বার সে ভিল্‌নার শাসনকর্তা হয়েছে। সমৃদ্ধ শহরটার কোন ক্ষতি হয় নি ; সেখানে সে পেল পুরনো বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত জনের সান্নিধ্য, পেল জীবনের সেই আরাম যা থেকে দীর্ঘকাল সে বঞ্চিত ছিল। আর হঠাৎই সেনাবাহিনী ও রাষ্ট্রের চিন্তা-ভাবনা থেকে সরে গিয়ে সেই শান্ত জীবনের মধ্যে সে ডুব দিল যাতে সে চিরদিন অভ্যস্ত ; মনে হল, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যা কিছু ঘটছে এবং এখনও করণীয় আছে, তাকে নিয়ে তার কোনরকম চিন্তা-ভাবনাই নেই।

যে দুর্গ-প্রাসাদে কুতুজভ এসে উঠেছে সেখানে সর্বপ্রথম তার সঙ্গে এসে দেখা করল চিচাগভ। নৌ-বিভাগের সাধারণ ইউনিফর্মের সঙ্গে একটা ছোরা ঝুলিয়ে এবং টুপিটাকে বগলদাবা করে সে দুর্গের বিবরণ ও শহরের চাবিগুলো কুতুজভের হাতে তুলে দিল। কুতুজভের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার খবর চিচাগভ জানত। তাই তার ব্যবহারে একটি

বাহাত্তুরে বুড়োর প্রতি এক অল্পবয়সীর তাচ্ছিল্যপূর্ণ অথচ শ্রদ্ধাশীল ব্যবহারই অতিমাত্রায় প্রকাশ পেল।

কথাপ্রসঙ্গে কুতুজভ বলল, চীনামাটির বাসনপত্রে বোঝাই যে গাড়িগুলি বরিসভে তার কাছ থেকে আটক করা হয়েছিল সেগুলি উদ্ধার করা হয়েছে এবং তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তাতে চিচাগভ জবাব দিল, "আপনি কি বলতে চান যে আমার খাবার থালাটাও নেই···বরং আপনি যদি কোন ডিনার-পার্টি দিতে চান তো আমি প্রয়োজনীয় সব কিছু সরবরাহ করতে পারি।"

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে কুতুজভ তার সূক্ষ্ম, অন্তর্ভেদী হাসির সঙ্গে বলল, "আমি যা বলেছি শুধু সেইটুকুই বলতে চেয়েছিলাম।"

সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কুতুজভ সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশকে ভিল্‌নাতেই আটকে রাখল। আশপাশের লোকরা বলেছে, সেই শহরে অবস্থানকালে সে অস্বাভাবিক রকমের শ্লথগতি এবং শারীরিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামরিক ব্যাপারে সে উপস্থিত হত অনিচ্ছাসত্ত্বে, সব কিছু জেনারেলদের উপর ছেড়ে দিল, এবং সম্রাটের আগমনের অপেক্ষায় অযথা আমোদ-প্রমোদে কাল কাটাতে লাগল।

৭ই ডিসেম্বর পিতার্সবুর্গ ছেড়ে সম্রাট তার দলবল—কাউণ্ট তলস্তয়, প্রিন্স বল্‌কন্‌স্কি, আরাক্‌চিভ ও অন্যান্যদের নিয়ে ১১ই তারিখে ভিল্‌না পৌঁছে স্লেজ নিয়ে সোজা গিয়ে উঠল দুর্গপ্রাসাদে। প্রচণ্ড তুষারপাত সত্ত্বেও শত শত জেনারেল ও রাজকীয় কর্মচারি পূর্ণ প্যারেড-ইউনিফর্মে সজ্জিত হয়ে দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল, আর সেমেনভ রেজিমেণ্টের একটা গার্ড-অব-অনারেরর ব্যবস্থা করা হল।।

একজন বার্তাবাহক ঘর্মাক্ত কলেবর তিন ঘোড়ায় টানা ত্রয়কা গাড়িতে চেপে সকলের আগে দুর্গদ্বারে পৌঁছে চীৎকার করে ঘোষণা করল, "আসছেন!" আর কন্‌ভনিৎসিন ছুটে গিয়ে কুতুজভকে খবরটা দিল; সে তখন দ্বার-রক্ষকের ছোট বাসায় অপেক্ষা করছিল।

এক মিনিট পরেই সেই বুড়ো মানুষটির মস্তবড় দশাসই মূর্তিটা হেলে দুলে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। পরনে পূর্ণ ইউনিফর্ম, বুকের উপর সম্মান-স্মারকগুলি ঝোলানো, পেটের উপর একটি চাদর জড়ানো। টুপিটাকে কাৎ করে মাথায় পরে নিল, দস্তানা দুটো হাতে নিল, তারপর বেশ কষ্ট করে এক পাশ হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তার সমতলে পৌঁছে সম্রাটের জন্য তৈরি প্রতিবেদনটি হাতে নিল।

চারদিকে ফিস্‌ফিস্‌ ও ছুটাছুটি শুরু হল। আর একটা ত্রয়কা গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে এল, সকলের দৃষ্টি ঘুরে গেল অগ্রসরমান স্লেজটার দিকে। তাতে সম্রাট ও বল্‌কন্‌স্কির মূর্তি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

পঞ্চাশ বছরের অভ্যাসবশত এ সবকিছুই বৃদ্ধ জেনারেলকে উত্তেজিত করে তুলল। অতিদ্রুত সযত্নে সাজ-পোশাকটা ঠিক করে নিল, টুপিটা ঠিক মত বসাল, মনে সাহস আনল, আর ঠিক যেমুহূর্তে স্লেজ থেকে নেমে সম্রাট তার দিকে চোখ তুলে তাকাল অমনি প্রতিবেদনটা তার হাতে দিয়ে কোমল কৃতজ্ঞ গলায় কথা বলতে শুরু করল।

সম্রাট দ্রুত সঞ্চালিত দৃষ্টিতে কুতুজভের মাথা থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখল, মুহূর্তের জন্য তার দৃষ্টি ভ্রূকুটিকুটিল হয়ে উঠল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেভাব দমন করে বুড়ো মানুষটির দিকে এগিয়ে গেল, হাত বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করল। দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত সেই আলিঙ্গনের ফলেও কুতুজভের বুকের ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

সম্রাট অফিসার ও সেমেনভ রেজিমেণ্টকে অভিনন্দন জানাল, তারপর পুনরায় বুড়ো মানুষটির হাতটা চেপে ধরে তার সঙ্গেই দুর্গে প্রবেশ করল।

ফিল্ড-মার্শালকে একাকি পেয়ে সম্রাট শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে শ্লথ গতি এবং ক্রাস্নয় ও বেরিজিনাতে ভুলের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করল, এবং বিদেশে আর একটি অভিযানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। কুতুজভ কোন উত্তর দিল না, কিছু মন্তব্যও করল না। সাত বছর আগে অস্তারলিজ রণক্ষেত্রে যে বিনীত, ভাবলেশহীন দৃষ্টি নিয়ে সম্রাটের নির্দেশ শুনেছিল, আজও সেই একই দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে ভারী শরীরটা দুলিয়ে কুতুজভ যখন নতশিরে নাচঘরটা পার হয়ে যাচ্ছিল, তখন কার যেন কণ্ঠস্বরে তার গতিরোধ হল :

“প্রশান্ত মহামহিম !”

কুতুজভ মাথা তুলল। অনেকক্ষণ কাউণ্ট তলস্তয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা রূপোর পাত্র হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। পাত্রের উপর একটা ছোট কি যেন রয়েছে। কুতুজভ কিছুই বুঝতে পারল না।

সহসা তার মনে পড়ে গেল ; তার গোল মুখে একটা প্রায় অলক্ষ্য হাসি খেলে গেল ; মাথা নীচু করে শ্রদ্ধাভরে সে পাত্র থেকে জিনিসটি তুলে নিল। জিনিসটি প্রথম শ্রেণীর অর্ডার অব সেণ্ট জর্জ।

অধ্যায়—১১

পরদিন ফিল্ড-মার্শাল একটি নৈশভোজ ও বলনাচের আয়োজন করল। সম্রাট উপস্থিত থেকে তাকে কৃতার্থ করল। কুতুজভ প্রথম শ্রেণীর অর্ডার অব সেণ্ট জর্জ লাভ করল, সম্রাট তাকে সুউচ্চ সম্মান দেখাল, কিন্তু সম্রাটের অসন্তোষের কথাও প্রত্যেকেই জানল। যথাবিহিত সৌজন্য দেখানো হল,

সে ব্যাপারে সম্রাটই প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করল, কিন্তু সকলেই জানল যে বুড়ো মানুষটিই দোষী, সে কোন কাজের নয়। ক্যাথারিনের সময়কার একটা রীতি অনুযায়ী কুতুজভ যখন হুকুম দিল, যেসব পতাকা দখল করা হয়েছে সম্রাট নাচঘরে ঢুকলেই সেগুলি তার পায়ের কাছে যেন নামিয়ে দেওয়া হয়, তখন সম্রাটের মুখটা ঈষৎ বিকৃত হয়ে গেল, বিড়বিড় করে সম্রাট যা বলল তার মধ্যে কেউ কেউ শুনতে পেল "পুরনো বিদূষক" কথা দুটি।

কুতুজভের প্রতি সম্রাটের অসন্তোষ বিশেষভাবে বেড়ে গেল ভিল্‌নাতে, কারণ আসন্ন অভিযানের গুরুত্বটা সে বুঝতে পারল না, বুঝিবা বুঝতে চাইলও না।

পরদিন সকালে সম্রাট যখন সমবেত রাজকর্মচারিদের বলল: "আপনারা শুধু রাশিয়াকে রক্ষা করেন নি, রক্ষা করেছেন সারা ইওরোপকে," তখনই সকলে বুঝল যে যুদ্ধ শেষ হয় নি।

শুধু কুতুজভই সেটা বুঝতে পারল না; সে প্রকাশ্যেই এই বলে নিজের মত ব্যক্ত করল যে নতুন কোন যুদ্ধ অবস্থার উন্নতি করতে পারবে না, রাশিয়ার গৌরবকেও বৃদ্ধি করতে পারবে না, শুধু যে গৌরব রাশিয়া অর্জন করেছে তাকে নষ্ট করবে। নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ করা অসম্ভব, জনসাধারণ যথেষ্ট কষ্ট সহ্য করেছে, পরাজয়ের সম্ভাবনাও তো রয়েছে—এই সব কথাই সে সম্রাটকে বোঝাতে চেষ্টা করল।

এই যখন ফিল্ড-মার্শালের মনোভাব তখন স্বভাবতই তাকে আসন্ন যুদ্ধের পথে একটা বিঘ্ন বলেই মনে করা হতে লাগল।

এই বুড়ো মানুষটির সঙ্গে অপ্রীতিকর সংঘর্ষ এড়াতে অস্তারলিজে তাকে নিয়ে যা করা হয়েছিল এবং রুশ অভিযানের একেবারে শুরুতে বার্কলেকে নিয়ে যা করা হয়েছিল সেই স্বাভাবিক পথটাই বেছে নেওয়া হল—ক্ষমতা সরিয়ে দেওয়া হল স্বয়ং সম্রাটের হাতে, আর এইভাবেই বুড়ো লোকটিকে কিছু না জানিয়ে প্রধান সেনাপতির পায়ের নীচ থেকে মাটি কেটে সরিয়ে দেওয়া হল।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই ধীরে ধীরে তার দলবলকে নতুন করে গড়া হল, আর আসল ক্ষমতা চলে গেল সম্রাটের হাতে। তোল্‌, কনভ্‌নিৎসিন ও এর্মলভ নতুন নতুন পদ পেল। সকলেই ফিল্ড-মার্শালের চরম দুর্বলতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কথা জোর গলায় বলে বেড়াতে লাগল।

তাকে মর্যাদার আসন থেকে সরিয়ে সে আসন অন্যকে দিতে হলে তার স্বাস্থ্য তো খারাপ হতেই হবে। আর আসলেও তার স্বাস্থ্য তো খারাপই ছিল।

সুতরাং তার ভূমিকা যখন শেষ হয়ে গেল তখন স্বাভাবিক ও সরল পথেই নতুন ও প্রয়োজনীয় অভিনেতার দ্বারা একে একে তার স্থান পূরণ করা হতে

লাগল।

১৮১২ সালের যুদ্ধের যে জাতীয় তাৎপর্য প্রতিটি রুশের অন্তরের নিধি তাছাড়াও সে যুদ্ধকে এবার লাভ করতে হবে একটা ইওরোপীয় তাৎপর্য।

জনসাধারণের পশ্চিম থেকে পূবে অভিযানের পরেই শুরু করতে হবে তাদের পূব থেকে পশ্চিমে অভিযান, আর সেই নতুন যুদ্ধের জন্য চাই এমন একজন নেতা যার গুণ-গরিমা ও মনোভাব কুতুজভ থেকে ভিন্ন, যে পরিচালিত হবে ভিন্ন অভিপ্রায়ের দ্বারা।

রাশিয়ার মুক্তি ও গৌরবের জন্য যেমন প্রয়োজন হয়েছিল কুতুজভকে, তেমনই জনগণকে পূব থেকে পশ্চিমে পরিচালিত করতে, জাতীয় সীমান্তকে নতুন করে নির্ধারণ করতে প্রয়োজন হল প্রথম আলেক্সান্দারকে।

ইওরোপ, শক্তি-সাম্য, বা নেপোলিয়ন বলতে কি বোঝায় কুতুজভ তা বুঝতে পারল না। সত্যি সে বুঝতে পারে নি। শত্রুকে ধ্বংস করে রাশিয়াকে মুক্ত করে গৌরবের শিখরে প্রতিষ্ঠিত করার পরে, একজন রুশ হিসাবে রুশ জনগণের প্রতিনিধির আর কিছু করার ছিল না। জাতীয় যুদ্ধের প্রতিনিধির সম্মুখে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই রইল না। কুতুজভের মৃত্যু হল।

অধ্যায়—১২

সাধারণত যা ঘটে থাকে, বন্দী থাকা অবস্থায় যেসব দৈহিক দুঃখকষ্ট ও মানসিক চাপ পিয়েরকে সহ্য করতে হয়েছিল তার ফল ফলতে লাগল সে অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের পরে। মুক্তি পেয়ে সে প্রথমে গেল ওরিল; সেখানে তিন দিন কাটিয়ে কিয়েভ যাত্রার মুখে অসুস্থ হয়ে তিনমাস শয্যাশায়ী হয়ে কাটাল। ডাক্তাররা বলল তার "পিত্ত জ্বর" হয়েছে। চিকিৎসা চলল, রক্তমোক্ষণ করা হল, খাবার ওষুধ দেওয়া হল—সে ভাল হয়ে উঠল

উদ্ধারলাভের সময় থেকে অসুস্থ হওয়া পর্যন্ত সময়ে যা কিছু ঘটেছিল তার প্রায় কোন কথাই পিয়েরের মনে নেই। শুধু মনে পড়ে একঘেয়ে ধূসর আবহাওয়া, কখনও বৃষ্টি পড়ছে, কখনও বরফ, শরীরের ভিতরে যন্ত্রণা, পায়ে ও এক পাশে ব্যথা। সাধারণভাবে আরও মনে পড়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের কথা, অফিসার ও জেনারেলদের কৌতূহল ও জেরার যন্ত্রণা, যানবাহন ও ঘোড়া সংগ্রহ করার অসুবিধা, এবং নিজের দিক থেকে সর্বক্ষণ চিন্তা ও অনুভূতির অক্ষমতা। মুক্তির দিনটিতেই সে দেখেছিল পেত্য়া রস্তভের মৃতদেহ। সেই একই দিনে জানতে পেরেছিল, বরদিনো যুদ্ধের পরে এক মাসেরও বেশী সময় বেঁচে থাকার পরে প্রিন্স আন্দ্রু সম্প্রতি মারা গেছে রস্তভদের ইয়ারোস্লাভ্‌ল্‌-এর বাড়িতে; সেই সঙ্গে দেনিসভ আরও জানিয়ে-

ছিল যে হেলেনের মৃত্যু হয়েছে, যদিও সে ধরেই নিয়েছিল যে এ খবরটা পিয়ের অনেক আগেই জেনেছে। সেসময় পিয়েরের কাছে সব কিছুই আশ্চর্য লেগেছিল : মনে হয়েছিল এসব কথার কোন তাৎপর্যই সে ধরতে পারছে না। তখন তার একমাত্র লক্ষ্য যেসব জায়গায় মানুষ মানুষকে খুন করছে সেখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালিয়ে এমন কোন শান্তিপূর্ণ আশ্রয়ে চলে যাওয়া যেখানে গেলে সে সেরে উঠবে, বিশ্রাম নিতে পারবে, এবং যে-সব বিচিত্র নতুন ঘটনার কথা শুনেছে তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করতে পারবে। কিন্তু ওরিলে পৌছেই সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। রোগ থেকে সেরে উঠে দেখল, তার দেখাশুনা করার জন্য মস্কো থেকে এসেছে তার দুই চাকর তেরেন্তি ও ভাস্কা; আর এসেছে তার জ্ঞাতি-বোন বড় প্রিন্সেস যে নিজের এলেৎসের জমিদারিতে থাকে এবং তার উদ্ধার ও অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তাকে দেখতে এসেছে।

একটু একটু করে রোগ থেকে সেরে উঠলেও অনেকদিন পর্যন্ত সে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেত, সে যেন এখন সেই বন্দীজীবনই কাটাচ্ছে। সেই অবস্থায়ই একটু একটু করে সে জেনেছে প্রিন্স আনদ্রুব মৃত্যু, তার স্ত্রীর মৃত্যু এবং ফরাসীদের ধ্বংসের খবর।

রোগ থেকে সেরে উঠতে উঠতে মুক্তির একটা সানন্দ অনুভূতি পিয়েরের অন্তরকে ভরে তুলল। অবাক হয়ে দেখল, অন্তরের এই মুক্তির অনুভূতি যেন একটা বাহ্যিক মুক্তির পরিবেশও রচনা করেছে। এখানে এই অপরিচিত শহরে সে একেবারে একা—কোন পরিচিত মানুষ নেই। কেউ তার কাছে কিছু চাইল না, তাকে কোথাও পাঠাল না। যা কিছু চেয়েছিল সবই সে পেয়েছে : যে স্ত্রীর চিন্তা ছিল তার নিরন্তর যন্ত্রণার কারণ সেও আর এখানে নেই, কারণ সে তো ইহলোকেই নেই।

"আঃ, কী সুন্দর! কী চমৎকার?" সুস্বাদু গোমাংস-চা সাজানো পরিষ্কার টেবিলটা যখন তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হয়, রাত হলে যখন সে একটা পরিষ্কার নরম বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, অথবা যখন তার মনে পড়ে যে ফরাসীরা চলে গেছে আর তার স্ত্রী ইহজগতে নেই, তখনই সে নিজের মনে বলে ওঠে, "আঃ, কী সুন্দর! কী চমৎকার!"

তারপর পুরনো অভ্যাসবশত নিজেকেই প্রশ্ন করে : "আচ্ছা, তারপর কি? এখন আমি কি করব?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেই জবাব দেয়, "ঠিক আছে, আমি বাঁচব। আঃ, কী চমৎকার!"

যে প্রশ্নটি আগে তাকে যন্ত্রণা দিত, জীবনের যে লক্ষ্যকে সে অবিরাম খুঁজে বেড়াত, এখন আর সে প্রশ্ন তার সামনে নেই। জীবনের লক্ষ্যকে অনুসন্ধান করে ফেরা যে সাময়িকভাবে দূর হয়েছে তাই নয়, তার জীবনে তার কোন অস্তিত্বই আর নেই, কোনদিন থাকবে না। আর জীবনের এই

লক্ষ্যহীনতাই তাকে এনে দিয়েছে পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দ, সুখের অনুভূতি।

সামনে কোন লক্ষ্য নেই, কারণ এখন সে পেয়েছে বিশ্বাস—কোন বিধান বা বাণী, বা ধারণায় বিশ্বাস নয়, সে বিশ্বাস চিরজাগ্রত, চিরপ্রকাশ ঈশ্বরের প্রতি। আগে নিজের গড়া লক্ষ্যের মধ্যেও সে ঈশ্বরকেই খুঁজেছে। সেই লক্ষ্যের সন্ধান আসলে ঈশ্বরেরই সন্ধান; বন্দী অবস্থায় সহসা সে জেনেছে, কোন বাণী বা যুক্তি দিয়ে নয়, জেনেছে প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে, সেই সত্য যা অনেককাল আগে তার ধাত্রী তাকে শুনিয়েছিল: ঈশ্বর এখানে এবং সর্বত্র বিরাজিত। বন্দী অবস্থায় সে জেনেছে, ভ্রাতৃসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত বিশ্বস্রষ্টার ধারণার চাইতে কারাতায়েভের ঈশ্বর অনেক বড়, অনন্ত ও অপরিমেয়। তার মনের অবস্থা এখন সেই মানুষের মত যে বহুদূরে দৃষ্টি মেলে কাউকে খুঁজতে গিয়ে নিজের পায়ের কাছেই তাকে দেখতে পায়। সারা জীবন চারদিকে মানুষদের মাথার উপর দিয়েই সে তার দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছে, অথচ তার বদলে তার উচিত ছিল শুধু নিজের সামনে দৃষ্টিকে মেলে ধরা।

অতীতে সেই দূরধিগম্য অসীমকে সে কখনও খুঁজে পায় নি। শুধু অনুভব করেছে কোথাও না কোথাও সে আছে, তাই তাঁকে খুঁজে ফিরেছে। যা কিছু কাছের, যা কিছু বোধগম্য তার মধ্যে সে দেখেছে শুধু সসীমকে, ক্ষুদ্রকে, সাধারণকে, অর্থহীনকে। চোখে একটা মানস দূরবীন লাগিয়ে অনেকদূরে দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দূরত্বের কুয়াশা ঢাকা যে তুচ্ছ জাগতিক বস্তুকে দেখেছে, স্পষ্ট করে দেখতে না পারার দরুণ তাকেই মনে হয়েছে মহৎ ও অনন্ত। ইওরোপীয় জীবনযাত্রা, রাজনীতি, ভ্রাতৃসংঘ, দর্শন, বিশ্বমানবতা—সব কিছুকেই সেই একইভাবে সে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু আজ সব কিছুর মধ্যেই সেই মহান, শাশ্বত ও অনন্তকে সে দেখতে শিখেছে, আর তাই স্বাভাবিকভাবেই দূরবীনটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চারদিকেই খুঁজে পেয়েছে সেই চিরপরিবর্তনশীল, শাশ্বত, অপরিমেয়, অনন্ত জীবনকে। দৃষ্টিকে যত কাছে নিয়ে আসছে ততই শান্তি-সুখে ভরে উঠছে হৃদয়। কিসের জন্য? এই ভয়ংকর প্রশ্ন এতদিন তার মনের মন্দিরকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু আজ সে প্রশ্নের কোন অস্তিত্ব নেই। কিসের জন্য? এই প্রশ্নের একটা সরল উত্তর এখন সর্বদাই তার মনের মধ্যে উপস্থিত: "কারণ ঈশ্বর আছেন, আর সে ঈশ্বরের ইচ্ছা না হলে মানুষের মাথার একগাছি চুলও পড়ে না।"

অধ্যায়—১৩

বাইরে থেকে দেখলে পিয়েরের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। চেহারা যেমন ছিল ঠিক সেইরকমই আছে। এখনও সে আগের মতই অন্যমনস্ক;

চোখের সামনে যা থাকে তার বদলে নিজের বিশেষ কোন জিনিস নিয়েই সে ব্যস্ত থাকে। সে আগে যা ছিল এবং এখন যা হয়েছে তার মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। আগে তাকে মনে হত দয়ালু কিন্তু দুঃখী মানুষ, তাই লোকে তাকে এড়িয়ে চলত, এখন জীবনের আনন্দের একটা হাসি সর্বদাই তার ঠোঁটে লেগে থাকে, অপরের প্রতি সহানুভূতি জ্বল্ জ্বল্ করে তার চোখে, তার জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে একটাই প্রশ্ন—তারাও কি তার মতই পরিতুষ্ট ; তাই তার উপস্থিতিতে মানুষ এখনও আনন্দিত বোধ করে।

আগে সে কথা বলত বেশী, কথা বললেই উত্তেজিত হয়ে উঠত, কদাচিৎ অন্যের কথা শুনত ; এখন সে কদাচিৎ কথার মধ্যে ডুবে যায়, এমনভাবে মন দিয়ে অন্যের কথা শোনে যে সকলেই সাগ্রহে নিজেদের গোপন কথা তাকে বলে।

যে প্রিন্সেস কোনদিনই পিয়েরকে পছন্দ করত না, কারণ বুড়ো কাউন্টের মৃত্যুর পর সে নিজেকে পিয়েরের উপর একটি বোঝা বলে মনে করত, কিন্তু এখন ওরিলে এসে অল্প কিছুদিন থেকেই পিয়েরকে তার ভাল লেগে গেছে। এদিকে পিয়েরও ধীরে ধীরে যেভাবে তার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে একজন অতি চতুর লোকও তা করতে পারত না। সে সর্বদাই প্রিন্সেসের যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলির স্মৃতিচারণ করত, আর তার প্রতি সহানুভূতি দেখাত। এই তিক্তহৃদয়, কঠোর, গর্বিত প্রিন্সেসটির মানবিক গুণগুলিকে বাইরে টেনে বের করাই এ ব্যাপারে পিয়েরের একমাত্র কৌশল।

প্রিন্সেস মনে মনে বলল, "খারাপ লোকের প্রভাবে না পড়ে সে যখন আমার মত লোকের সাথে মেশে, তখন তো সে খুব, খুবই সদয়।"

তার দুই চাকর তেরেন্তি ও ভাস্কাও পিয়েরের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। তাদের ধারণা, মনিব এখন অনেক সরল ও স্বাভাবিক হয়েছে। তেরেন্তি তো অনেক সময়ই তার পোশাক ছাড়িয়ে শুভরাত্রি জানাবার পরেও মনিবের বুট ও পোশাক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে থাকে, সে নতুন করে কথা বলতে শুরু করে কিনা দেখতে। আর পিয়ের ও তেরেন্তি গল্প করতে চাইছে বুঝতে পেরে সাধারণতই তাকে আরও কিছুক্ষণ ধরে রাখে।

হয়তো জিজ্ঞাসা করত, "আচ্ছা, বল তো···তোমরা খাবার পেতে কিভাবে ?"

আর তেরেন্তিও বলতে শুরু করত মস্কো ধ্বংসের কথা, বুড়ো কাউন্টের কথা, আর দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করত, অথবা পিয়েরের গল্প শুনত, আর তারপরে মনিবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারার সুখে ও তার প্রতি স্নেহে গদগদ হয়ে হল ঘরের দিকে চলে যেত।

যে ডাক্তার পিয়েরের চিকিৎসা করত এবং প্রতিদিন তাকে দেখতে আসত, যদিও সে মনে করত যে রোগজর্জর মানবতার স্বার্থে তার প্রতিটি

মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান, তবু সেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে পিয়েরের সঙ্গে গল্পগুজব করত।

ভাবত, "এ ধরনের লোকের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে; সে তো অন্য সব প্রাদেশিক লোকদের মত নয়।"

ফরাসী বাহিনীর কয়েকজন বন্দী ওরিলে থাকত। তাদের মধ্যে একজন তরুণ ইতালীয়কে ডাক্তারটি একদিন পিয়েরের সঙ্গে দেখা করাতে নিয়ে এল।

অফিসারটি প্রায়ই পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে আসতে লাগল, আর পিয়েরের প্রতি ইতালীয় যুবকটির অনুরাগ নিয়ে প্রিন্সেস প্রায়ই হাসি-ঠাট্টা করত।

পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে, তার সঙ্গে কথা বলতে, তার নিজের অতীত জীবনের কথা, বাড়ির কথা, ভালবাসার কথা বলতে পারলেই ইতালীয় যুবকটি খুব আনন্দ পেত। ফরাসীদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে মনের ক্ষোভ ঢালতে পারলে সে খুব খুশি হত।

একদিন সে পিয়েরকে বলল, "সব রুশ যদি তিলমাত্রও আপনার মতই হয়, তাহলে তো এরকম একটা জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মহাপাপ। ফরাসীদের হাতে আপনি এত কষ্ট সয়েছেন, অথচ তাদের প্রতি কোন শত্রুতা আপনি মনের মধ্যে পোষণ করেন না।"

শুধু ইতালীয় যুবকটির অন্তরের সৎগুণগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে এবং সেকাজে আনন্দ অনুভব করেই পিয়ের যুবকটির উচ্ছ্বসিত অনুরাগ অর্জন করতে পেরেছে।

ওরিলে অবস্থানের শেষের দিকে ভ্রাতৃসংঘের একজন পূর্ব পরিচিত ভাই কাউন্ট উইলার্স্কি পিয়েরের সঙ্গে দেখা করতে এল। ওরিল প্রদেশের একটা বড় জমিদারির এক উত্তরাধিকারিণীকে সে বিয়ে করেছে এবং সেই শহরে কমিসারিয়েট বিভাগে একটি অস্থায়ী চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছে।

আগেকার দিনে টাকাপয়সার ব্যাপার নিয়ে, বিশেষ করে কেউ টাকাপয়সা চাইতে এলে পিয়ের বড়ই বিপদে পড়ে যেত। নিজেকে প্রশ্ন করত, "দেব কি দেব না? আমার টাকাটা আছে, আর তার ওটা দরকার। কিন্তু অন্য কারও দরকার তো আরও বেশী। কার দরকার সব চাইতে বেশী? আর হয় তো দুজনই জোচ্চোর।" পুরনো দিনগুলোতে এইসব প্রশ্নের সামনে সে বড়ই অসহায় বোধ করত, আর যতক্ষণ দেবার মত কিছু থাকত ততক্ষণ যে এসে চাইত তাকেই দিয়ে দিত। সে সময় সম্পত্তির ব্যাপারে কোন প্রশ্ন দেখা দিলেই এক একজন এক একরকম পরামর্শ দিত, আর সে বড়ই বিপাকে পড়ে যেত।

কিন্তু এখন সে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছে যে এসব প্রশ্ন নিয়ে তার মনে এখন আর কোন সন্দেহ বা বিহ্বলতা নেই। তার মধ্যে এখন এমন একজন

বিচারক আসন পেতে বসেছে যে তার কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক বিধানের বলে কি করা উচিত আর কি করা উচিত নয় সেটা মুহূর্তেই স্থির করে দেয়।

এই নতুন বিচারকের আশ্রয় সে প্রথম লাভ করল যখন জনৈক ফরাসী বন্দী, একজন কর্ণেল, তার কাছে এল, অনেক বড় বড় কথা বলল, এবং এই বলে শেষ করল যে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে পাঠাবার জন্য তাকে চার হাজার ফ্রাঁ পিয়েরকে দিতেই হবে। তিল মাত্র অসুবিধা বোধ বা প্রচেষ্টা ছাড়াই পিয়ের টাকাটা দিতে অস্বীকার করল, আর পরে এই ভেবে বিস্মিত হল যে আগে যে-কাজটা ছিল প্রায় দুঃসাধ্য এখন সেটা কত সহজ ও সরলভাবে হয়ে গেল। আগতিক ব্যাপারে তার এই স্থির সিদ্ধান্তের মনোভাবের আর একটা প্রমাণ পিয়ের পেল তার স্ত্রীর ঋণ শোধ এবং মস্কোতে ও শহরতলীতে তার বাড়িঘরগুলি নতুন করে তৈরি করা সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তকে লক্ষ্য করে।

তার বড় নায়েব ওরিলে এসে পিয়েরের সঙ্গে দেখা করল। তার সঙ্গে বসে পিয়ের নিজের স্বল্প আয়ের হিসাব করল। বড় নায়েবের হিসাব মত মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের ফলে তার ক্ষতি হয়েছে প্রায় বিশ লক্ষ রুবল।

এই ক্ষতির জন্য সান্ত্বনা জানাতে প্রধান নায়েব তাকে হিসাব কষে দেখিয়ে দিল যে এইসব ক্ষতি সত্ত্বেও তার আয় হ্রাস না পেয়ে বরং আরও বৃদ্ধি পেতে পারে যদি সে তার স্ত্রীর ঋণ শোধ করতে অস্বীকার করে,—সে ঋণ শোধ করার কোন বাধ্যবাধকতা তার নেই—এবং তার মস্কোর বাড়ি এবং মস্কোর জমিদারিতে অবস্থিত পল্লীভবনটি নতুন করে তৈরি না করে; সেইসব বাড়ির জন্য তার বছরে ব্যয় হয় আশী হাজার রুবল, অথচ উপার্জন হয় না কিছুই।

স্মিত হাসির সঙ্গে পিয়ের বলল, "হ্যাঁ, সেকথা সত্যি। সেসবের আমার কোন প্রয়োজন নেই। সর্বস্বান্ত হয়ে আমি অধিকতর ধনী হয়েছি।"

কিন্তু জানুয়ারি মাসে সা ভেলিচ মস্কো থেকে এসে সেখানকার পরিস্থিতির একটা বিবরণ দিল এবং মস্কোর বাড়ি ও পল্লীভবন পুনরায় নির্মাণের দরুণ জনৈক স্থপতির একটা হিসাব দিয়ে বলল যে সে কাজ করার ব্যবস্থাটা পাকা হয়ে গেছে। সেইসময়ই প্রিন্স ভাসিলি এবং পিতার্সবুর্গের অন্য পরিচিত জনরা চিঠি লিখে তার স্ত্রীর ঋণের কথাটা জানিয়ে দিল। আর পিয়েরও স্থির করে ফেলল যে, নায়েবের যে প্রস্তাব তাকে এত খুশি করেছিল সেটা ছিল ভুল। কাজেই সে অবিলম্বে পিতার্সবুর্গ যাবে এবং স্ত্রীর ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবে, আর মস্কোতে বাড়িঘরও নতুন করে তৈরি করবে। সেটা যে কেন প্রয়োজন তা জানে না, কিন্তু এটা সে নিশ্চিত জানে যে কাজটা প্রয়োজনীয়। এতে তার আয় তিন-চতুর্থাংশ হ্রাস পাবে, কিন্তু এটা অবশ্য করতে হবে।

উইলার্স্কি'ও মস্কো যাচ্ছিল ; স্থির হল দুজন একসঙ্গেই যাবে।

ওরিলে স্বাস্থ্যোদ্ধারের সময় আনন্দ, মুক্তি ও জীবনের একটা অনুভূতি পিয়েরের হয়েছিল ; কিন্তু এবার যাত্রাপথে খোলা পৃথিবীতে এসে, শত শত নতুন মুখ দেখে, সেই অনুভূতি তীব্রতর হল। সারা পথ তার নিজেকে ছুটি-পাওয়া স্কুলের ছাত্রের মত মনে হতে লাগল। সরকারী গাড়ির কোচয়ান, ডাক-ঘাঁটির ওভারসিয়ার, রাস্তার ও গ্রামের চাষীর দল,—সব কিছুই তার কাছে নতুন করে অর্থবহ হয়ে উঠল। উইলার্স্কি অনবরত ইওরোপের তুলনায় রাশিয়ার অজ্ঞানতা, দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার নিন্দা করতে লাগল ; তবু তার উপস্থিতি ও মন্তব্য পিয়েরের আনন্দকে শুধু বাড়িয়েই তুলল। উইলার্স্কি যেখানে দেখে মৃত্যু, পিয়ের সেখানেই দেখে অসাধারণ জীবনী-শক্তি—যে শক্তি এই বরফাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের বুকে এই মৌলিক, বিচিত্র, অসাধারণ মানুষগুলির জীবনকে রক্ষা করছে। উইলার্স্কির কথার কোন প্রতিবাদ সে করল না, বরং তার সঙ্গে একমতই হল—যে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হবে না তাকে এড়িয়ে চলবার সহজতম পথই হল আপাতত একমত হওয়া—আর তার কথা শুনতে শুনতে পিয়ের আনন্দের হাসি হাসতে লাগল।

অধ্যায়—১৪

পিঁপড়ের টিপি ভেঙে দিলে পিঁপড়েরা ছুটোছুটি করে কোথায় যায়, কেন যায়, সেকথা বোঝা শক্ত : কেউ টিপি থেকে বেরিয়ে আসে আজেবাজে জিনিস, ডিম ও মরা পিঁপড়ে পিঠে নিয়ে, কেউ বা আবার ফিরে যায় টিপিতে ; কেনই বা তারা ঠেলাঠেলি করে, একে অন্যকে ছাড়িয়ে যায়, লড়াই করে। ঠিক সেইরকমই ফরাসীরা চলে যাবার পরে কেন যে রুশরা পুরনো মস্কোতে গিয়ে ভিড় করল তাও বোঝা খুব শক্ত। কিন্তু যখনই আমরা ভেঙে-যাওয়া টিপির চারপাশে পিঁপড়েদের ভিড় করতে দেখি, লক্ষ্য করি তাদের অধ্যবসায়, শক্তি ও সংখ্যার আধিক্য তখনই বুঝতে পারি, টিপি ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও অবিনশ্বর ও স্পর্শাতীত এমন কিছু তখনও থেকে যায় যা পিঁপড়ে-উপনিবেশকে শক্তি যোগায় ; আর ঠিক সেইভাবেই যদিও অক্টোবর মাসে মস্কোতে কোন রকম শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, গির্জা ছিল না, তীর্থস্থান ছিল না, ধনসম্পদ বা বাড়িঘরও ছিল না, তবুও সেটা ছিল অগস্ট মাসের সেই একই মস্কো। তখন সবই ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু এমন কিছু ধ্বংস হয় নি যা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে হয়েও অত্যন্ত শক্তিশালী ও অবিনশ্বর।

শত্রুমুক্ত হবার পরে যে প্রেরণায় সকলে চারদিক থেকে এসে মস্কোতে ভিড় করল তা ছিল যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনই ব্যক্তিগত, আর গোড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বর্বর ও পাশবিক। তবে একটা প্রেরণা সকলের মধ্যেই সমান-

ভাবে কাজ করছিল : যে স্থানটিকে একদা মস্কো বলা হত সেখানে পৌঁছে নিজেদের সাধ্যমত সেখানে কাজ করার বাসনা।

এক সপ্তাহের মধ্যে পনেরো হাজার অধিবাসী মস্কোতে হাজির হল, পক্ষকালের মধ্যে এল পঁচিশ হাজার ; এইভাবেই চলতে লাগল। ১৮১৩ সালের হেমন্তকালে সেই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে ১৮১২ সালের লোকসংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেল।

প্রথম দফায় মস্কোতে ঢুকল উইস্ত জিন্‌গেরোদের সেনাদলের কসাকরা, নিকটবর্তী গ্রামের চাষীরা, আর মস্কোর যেসব অধিবাসী পালিয়ে গিয়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল। মস্কোতে ঢুকে রুশরা যখন দেখল যে সব লুট হয়ে গেছে, তখন তারাও লুটপাট শুরু করে দিল। ফরাসীরা যেকাজ শুরু করেছিল সেটাই তারা চালিয়ে যেতে লাগল। বিধ্বস্ত বাড়িঘরে ও রাজপথে যা কিছু পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়েছিল সেগুলি গ্রামে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য দলে দলে মালগাড়ি মস্কোতে আসতে লাগল। কসাকরা যা পারল তাদের শিবিরে নিয়ে গেল, অধিবাসীরা অন্য বাড়ির জিনিসপত্র নিয়ে নিজেদের বোঝাই করতে লাগল, যেন সেগুলো তাদেরই সম্পত্তি।

প্রথম লুটেরাদের পরে এল দ্বিতীয় লুটেরা দল, তারপর তৃতীয় দল ; এমনি করে দল বাড়তে বাড়তে লুট করাটা ক্রমেই শক্ত হয়ে পড়ল, আর তাই সেকাজটা আরো সরাসরিভাবে শুরু হয়ে গেল।

ফরাসীরা মস্কোকে পেয়েছিল পরিত্যক্ত অবস্থায়, কিন্তু তখনও তারা পেয়েছিল ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানাবিধ শিল্পকর্ম সমন্বিত নিয়মিত জীবনযাত্রার সব রকম ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান, পেয়েছিল বিলাসের উপকরণ এবং সরকারী ও ধর্মীয় নানা প্রতিষ্ঠান। সেসব ব্যবস্থাই তখন নিষ্প্রাণ, তবু তো তাদের অস্তিত্ব ছিল। বাজার ছিল, দোকান ছিল, মালগুদাম ছিল, শস্য ভাণ্ডার ছিল—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি মালপত্র বোঝাই ছিল—ছিল ছোট-বড় কারখানা, বিলাসদ্রব্যে ভর্তি বড় বড় প্রাসাদ ও সম্পন্ন বাড়িঘর, হাসপাতাল, কারাগার, সরকারী আপিস, গির্জা ও ভজনালয় ফরাসীরা যত বেশী দিন থাকল ততই শহর-জীবনের এইসব সুখ-সুবিধা লোপ পেতে লাগল ; আর শেষ পর্যন্ত সব কিছু তালগোল পাকিয়ে লুট-তরাজের একটা নিষ্প্রাণ দৃশ্যে পরিণত হল।

ফরাসীদের লুটতরাজ যত চলতে থাকল ততই মস্কোর ধন-সম্পত্তি এবং লুটেরাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু শহর পুনর্দখলের পরে রুশদের হাতে যে লুটতরাজ শুরু হল তার ফল হল বিপরীত : যে লুটতরাজ যত বেশী দিন ধরে চলতে থাকল আর লুটেরাদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই শহরের ধনসম্পত্তি ও নিয়মিত জীবনযাত্রা দ্রুততর গতিতে পুনর্গঠিত হতে লাগল।

লুটেরা ছাড়াও নানা ধরনের মানুষ মস্কোতে ফিরে এল ; কেউ এল

কৌতূহলবশে, কেউ এল সরকারী কর্তব্যের তাগিদে, কেউ এল নিজের স্বার্থের টানে; বাড়ির মালিক, পাদরি, নানা রকমের সরকারী কর্মচারি, ব্যবসায়ী, মিস্ত্রি, চাষীরা—সকলেই সারা শরীরের রক্ত যেভাবে হৃদপিণ্ডে ছুটে যায় সে ভাবে জলস্রোতের মত মস্কোর দিকে ধেয়ে আসতে লাগল।

যেসব চাষীরা লুটের মাল বয়ে নিয়ে যাবার জন্য খালি গাড়ি নিয়ে এসেছিল, এক সপ্তাহের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ তাদের থামিয়ে সেই সব গাড়িতে করে মৃতদেহগুলি শহরের বাইরে পাঠাতে লাগল অন্য চাষীরা বন্ধুদের এই মুশকিলের খবর পেয়ে যই, যব ও খড় নিয়ে শহরে এল এবং রেশারেশি করে সে সব জিনিসের দাম আগের চাইতেও কমিয়ে দিল। ছুতোর মিস্ত্রিরা বেশী মজুরীর আশায় প্রতিদিন দলে দলে মস্কোতে আসতে লাগল; চারদিকেই শুরু হল কাঠ চেরাই, নতুন বাড়ি তৈরি, আর পুরনো পোড়া বাড়ির মেরামতের কাজ। ব্যবসায়ীরা বাজার চালু করল। আধপোড়া বাড়িগুলোতে হোটেল ও মদের দোকান খোলা হল যেসব গির্জা পুড়ে যায় নি সেখানে পাদরিরা ভজন-পূজন শুরু করে দিল। গির্জার যেসব সম্পত্তি চুরি হয়ে গিয়েছিল দাতারা সেগুলি নতুন করে দান করল। সরকারী কর্মচারিরা তাদের কাজের টেবিল সাজিয়ে বসল। ফরাসীরা যেসব মালপত্র ফেলে গিয়েছিল উর্ধ্বতন কর্মচারি ও পুলিশ মিলে সেগুলো ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিল। যেসব বাড়িতে অন্য সব বাড়ি থেকে এনে মালপত্র বোঝাই করা হয়েছিল তার মালিকরা বলতে লাগল, সব জিনিস নিয়ে ক্রেমলিনের প্রাসাদে মজুত করাটা অন্যায়। আবার অন্য একদল বলতে লাগল, ফরাসীরা নানা বাড়ি থেকে মালপত্র এনে যেসব বাড়িতে মজুত করেছিল তার মালিকদের সে সব মালপত্রের মালিকানা দেওয়াটা অন্যায়। তারা পুলিশকে গালাগালি করল, তাদের ঘুষ দিল, আগুনে যেসব সরকারী গুদাম পুড়ে গিয়েছিল তার দামের পরিমাণ দশগুণ বাড়িয়ে নিয়ে সরকারী সাহায্যের দাবী জানাল। আর কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন ঘোষণা-পত্র লিখে চলল।

অধ্যায়—১৫

জানুয়ারির শেষে পিয়ের মস্কোতে গেল। তার বাড়ির সংলগ্ন যে অংশটা পোড়ে নি সেখানেই উঠল। কাউণ্ট রস্তপ্‌চিন ও অন্য কয়েকজন পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা করল। মনের ইচ্ছা, দিন দুই পরে পিতার্সবুর্গ যাত্রা করবে। বিধ্বস্ত কিন্তু নতুন করে গড়ে-ওঠা শহরের সকলেই বিজয়-উৎসবে ব্যস্ত; সব কিছুই যেন নব জীবনের উত্তাপে টগ্‌বগ্‌ করছে। পিয়েরকে দেখে সকলেই খুশি, সকলেই তার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক. সকলেই জানতে চায় তার অভিজ্ঞতার কথা। পিয়েরও সকলের প্রতিই প্রসন্ন, আবার পাছে কোথাও বাঁধা পড়ে যায় সেই আশংকায়ও সদাসতর্ক। গুরুত্বপূর্ণ বা

তুচ্ছ যে প্রশ্নই তাকে করা হয়, যেমন—সে এখন কোথায় থাকবে? নতুন করে বাড়িঘর তুলবে কি না? পিতার্সবুর্গে কবে যাবে, আর কারও জন্যে একটা পুলিন্দা নিয়ে যেতে পারবে কি?—সব প্রশ্নেরই তার একই জবাব: “হ্যাঁ, হয় তো,” অথবা “তাই তো মনে হয়,” ইত্যাদি।

সে শুনেছে, রস্তভরা এখন কস্ত্রমাতে আছে, কিন্তু নাতাশার কথা কদাচিৎ তার মনে পড়ে। মনে পড়লেও সেটা দূর অতীতের একটা মধুর স্মৃতিমাত্র।

আসার তিনদিন পরে ক্রবেৎস্কয়দের কাছে শুনল, প্রিন্সেস মারি মস্কোতেই আছে। প্রিন্স আন্দ্রুর মৃত্যু, যন্ত্রণা ও শেষের দিনগুলির কথা প্রায়ই তার মনে পড়ে; এখন যেন সে স্মৃতি স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল। প্রিন্সেস মারি মস্কোতে ভজ্‌দ্‌ভিজেংকা স্ট্রীটের বাড়িতেই—বাড়িটা পোড়ে নি—আছে শুনে সেই সন্ধ্যায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

যেতে যেতে পিয়ের ভাবতে লাগল প্রিন্স আন্দ্রুর কথা, তাদের বন্ধুত্ব, বিভিন্ন সময়ে তাদের সাক্ষাৎ, বিশেষ করে বরদিনোতে তাদের শেষ সাক্ষাতের কথা। সে ভাবতে লাগল: “এও কি সম্ভব যে মনের সেই তিক্ততা নিয়েই সে মারা গেছে? এও কি সম্ভব যে মৃত্যুর আগেও জীবনের অর্থ তার কাছে প্রকাশিত হয় নি?” তার মনে পড়ল কারাতায়েভ ও তার মৃত্যুর কথা। আপনা থেকেই এই দুটি মানুষের একটা তুলনা তার মনে এল; এরা দুজন কত আলাদা, অথচ তাদের মধ্যে মিলও কত: দুজনই বেঁচে ছিল, দুজনই মারা গেছে, আর তাদের দুজনকেই সে ভালবেসেছে।

বেশ বিষণ্ণ মনেই পিয়ের বুড়ো প্রিন্সের বাড়িতে পৌঁছে গেল। বাড়িটার অনেক ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু চেহারাটা পাল্টায় নি। পুরনো পরিচারকটি জানাল, প্রিন্সেস তার ঘরে চলে গেছে, আর রবিবারেই সে লোকজনদের সঙ্গে দেখা করে থাকে।

পিয়ের বলল, “আমার নাম করে বল। হয় তো তিনি দেখা করবেন।”

লোকটি বলল, “ঠিক আছে স্যার। দয়া করে ছবির ঘরটায় আসুন।”

কয়েক মিনিট পরে পরিচারক দেসালেসকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। দেসালেস জানাল, পিয়ের যদি আনুষ্ঠানিক রীতির অভাব ক্ষমা করে দোতলায় তার ঘরে যায় তাহলে প্রিন্সেস সানন্দে তার সঙ্গে দেখা করবে।

একটা নীচু ঘরে একটিমাত্র মোমবাতির আলোয় প্রিন্সেস বসে আছে; তার সঙ্গে আছে কালো পোশাক পরা আরও একজন। পিয়েরের মনে পড়ল, প্রিন্সেস সব সময়ই সঙ্গিনী নিয়ে থাকে; তবে তারা কারা আর কি রকম প্রকৃতির তা সে জানে না, মনেও নেই। কালো পোশাক পরা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে সে ভাবল, “নিশ্চয়ই প্রিন্সেসের কোন সঙ্গিনী।”

প্রিন্সেস তাড়াতাড়ি উঠে হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পিয়ের তার হাতে চুমো খাবার পরে তার পরিবর্তিত মুখের দিকে

তাকিয়ে প্রিন্সেস বলল, "আচ্ছা, তাহলে এইভাবেই আবার আমাদের দেখা হল। শেষ পর্যন্তও সে আপনার কথাই বলত।"

"আপনার নিরাপদে থাকার খবর পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। অনেকদিন পরে সেই প্রথম একটা সুখবর পেয়েছিলাম।"

কেমন যেন একটা অস্বস্তির সঙ্গে প্রিন্সেস সঙ্গিনীর দিকে তাকাল। তারপর আরও কিছু বলতে যাবার মুখেই পিয়ের তাকে বাধা দিল।

"ভাবুন তো—তার কথা আমি কিছুই জানতাম না! ভেবেছিলাম সে যুদ্ধে মারা গেছে। যা কিছু জেনেছি অন্যের মুখ থেকে শুনে জেনেছি। শুধু জানি যে রস্তভদের সঙ্গে তার একটা মনোমালিন্য ঘটেছিল···কী আশ্চর্য যোগাযোগ!"

পিয়ের উৎসাহের সঙ্গে দ্রুত কথা বলতে লাগল। একবার সঙ্গিনীটির মুখের দিকে তাকাল, দেখল তার সদয় ও সমনোযোগ দৃষ্টি তার উপরেই নিবদ্ধ; কেন যেন পিয়েরের মনে হল, কালো পোশাকের এই মানুষটি খুবই সদয় ও ভাল; তার সামনে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে খোলাখুলিভাবে সব কথা বলা চলে।

কিন্তু সে যখন রস্তভদের কথা বলল তখন প্রিন্সেস মারির মুখে একটা বিব্রতভাব ফুটে উঠল। তাড়াতাড়ি পিয়েরের মুখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সে কালো পোশাকের মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি কি সত্যি ওকে চিনতে পারেন নি?"

পিয়ের আর একবার সঙ্গিনীটির বিবর্ণ নরম মুখের দিকে তাকাল; তার কালো চোখের সাগ্রহ দৃষ্টির ভিতর দিয়ে দীর্ঘবিস্মৃত, মধুরতর, বড়ই প্রিয় কে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ভাবল, "কিন্তু না, তা হতে পারে না। এই কঠোর, শীর্ণ, বিবর্ণ মুখে যে অনেক বেশী বয়সের ছায়া! এ তো সে হতে পারে না। শুধু একে দেখে তার কথা আমার মনে পড়ছে।" কিন্তু সেইমুহূর্তে প্রিন্সেস মারি ডাকল "নাতাশা!" আর অনেক কষ্টে, অনেক চেষ্টায়, অনেক যত্নে মরচে-ধরা কব্জাওয়ালা দরজা খুলে যাওয়ার মত সে মুখে একটু হাসি খেলে গেল, আর সেই খোলা দরজা দিয়ে একঝলক সুগন্ধ এসে এমন সুখে পিয়েরের মনকে ভরে দিল যা সে অনেকদিন হল ভুলে গেছে, আর—অন্তত এইমুহূর্তে—যার কথা সে চিন্তাও করে নি। সে সুখ তার মনকে ভরে দিল, তাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে দিল। সে ঈষৎ হাসল; আর কোন সন্দেহ রইল না; এই তো নাতাশা; তাকে সে ভালবাসে।

সেইমুহূর্তে নাতাশার কাছে, প্রিন্সেস মারির কাছে, সর্বোপরি নিজের কাছে আপনা থেকেই পিয়ের এমন একটা গোপন কথাকে প্রকাশ করে বসল যার খবর সে নিজেই জানত না। আনন্দে ও যন্ত্রণায় তার মুখটা লাল হয়ে

উঠল। মনের উত্তেজনাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করল। কিন্তু লুকিয়ে রাখার যত চেষ্টা করতে লাগল ততই স্পষ্টতর ভাবে—ভাষার অতীত স্পষ্টতায়—এই সত্যকেই সে নিজের কাছে, নাতাশার কাছে, ও প্রিন্সেস মারির কাছে প্রকাশ করে দিল যে সে নাতাশাকে ভালবাসে।

পিয়ের ভাবল, “এ যে বড়ই অপ্রত্যাশিত।” পুনরায় প্রিন্সেস মারির সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আবারও সে নাতাশার দিকেই দৃষ্টি ফেরাল, আর গাঢ়তর রঙে রাঙা হয়ে উঠল তার মুখ, আনন্দ ও শংকা মিশ্রিত অধিকতর শক্তিশালী একটা উন্মাদনা তার অন্তরকে চেপে ধরল। তার কথাবার্তা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল ; কথার মাঝখানেই সে থেমে গেল।

পিয়ের প্রথমে নাতাশাকে খেয়াল করে নি, কারণ এখানে তাকে দেখতে পাবে এটা সে আশাই করে নি ; তাকে যে চিনতে পারে নি তার কারণ তার সঙ্গে শেষ দেখার পরে নাতাশার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সে অনেক শীর্ণ, বিবর্ণ হয়ে গেছে, কিন্তু তাকে চিনতে না পারার কারণ সেটা নয় ; তাকে যে চিনতে পারা যায় নি তার কারণ যে মুখের দুটি চোখে সব সময়ই ঝিলিক দিত জীবনানন্দের একটা চাপা হাসি, এখন প্রথম দর্শনের মুহূর্তে সে মুখে সেই হাসির ছায়ামাত্র ছিল না : ছিল শুধু সাগ্রহ মনোযোগ আর বিষণ্ণ জিজ্ঞাসা।

পিয়েরের বিব্রত ভাবটা কিন্তু নাতাশার মুখে প্রতিফলিত হল না ; একটা আনন্দের আভায় তার সারা মুখটা ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

অধ্যায়—১৬

প্রিন্সেস মারি বলল, “ও আমার কাছে থাকতে এসেছে। কাউন্ট ও কাউন্টেসও কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে এসে পড়বেন। কাউন্টেসের অবস্থা শংকাজনক। কিন্তু নাতাশার নিজেরও ডাক্তারকে দেখানো দরকার ছিল। তাই তারা ওকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন।”

নাতাশাকে সম্বোধন করে পিয়ের বলল, “ঠিক, আজকাল দুঃখ ছাড়া একটিও পরিবার আছে কি ? জানেন তো, যেদিন আমরা উদ্ধার পেলাম সেইদিনই ঘটনাটি ঘটল। তাকে আমি দেখেছি। কী যে আনন্দঘন মূর্তি ছেলেটির !”

নাতাশা চোখ তুলে তাকাল ; চোখ দুটি বিস্ফারিত ও উজ্জ্বল হয়েই যেন তার কথার জবাব দিল।

পিয়ের বলল, “সান্ত্বনার বাণী কিই বা শোনাব ? কিছু বলার নেই। এ-রকম একটি প্রাণোচ্ছল চমৎকার ছেলেকে কেনই বা মরতে হল ?”

"ঠিক, এখনকার দিনে বিশ্বাস ছাড়া বাঁচা বড় শক্ত," প্রিন্সেস মারি বলল।

তাকে বাধা দিয়ে পিয়ের তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "ঠিক, ঠিক, খুব ঠিক কথা।"

পিয়েরের চোখে সাগ্রহ দৃষ্টি রেখে নাতাশা শুধাল, "কেন ঠিক ?"

প্রিন্সেস মারি বলল, "কেন তাও জিজ্ঞাসা করছ ? ভবিষ্যতের কথা ভাবলেই…"

প্রিন্সেস মারির কথা শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা না করেই নাতাশা আবার সাগ্রহে পিয়েরের দিকে তাকাল।

পিয়ের বলতে লাগল, "কারণ আমাদের সকলের উপরে একজন ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাস যার আছে একমাত্র সেই ওর·· এবং আপনার এতবড় ক্ষতিকে সহ্য করতে পারে।"

কি যেন বলতে মুখ খুলেও নাতাশা হঠাৎ থেমে গেল। পিয়ের তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে প্রিন্সেস মারির কাছে জানতে চাইল বন্ধুর শেষের দিনগুলির কথা।

পিয়েরের বিব্রত ভাবটা এখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সে এটাও বুঝতে পারছে যে তার স্বাধীনতাও সম্পূর্ণ চলে গেছে। সে বুঝতে পারছে, তার প্রতিটি কথা ও কাজের এমন একজন বিচারক এখন এসেছে যার বিচার তার কাছে পৃথিবীর অন্য সকলের বিচারের চাইতে অধিক মূল্যবান। এখন কথা বলতে গেলেই সে ভাবছে তার কথা নাতাশার মনে কোন ভাবের সৃষ্টি করবে। সে যে ইচ্ছা করে নাতাশাকে খুশি করতে কথা বলছে তা নয়, কিন্তু সে যা কিছু বলছে নাতাশার দৃষ্টিকোণ থেকেই বলছে।

প্রিন্স আন্‌দ্রুকে যে অবস্থায় দেখতে পেয়েছিল সেই কথাই প্রিন্সেস মারি বলতে শুরু করল। কিন্তু পিয়েরের আধো-কম্পিত মুখ, তার প্রশ্ন, তার উৎকণ্ঠ চঞ্চল ভাব ধীরে ধীরে প্রিন্সেস মারিকে বাধ্য করল বিস্তারিত বিবরণ দিতে, যদিও সে বিবরণকে স্মরণে আনতে তার নিজেরই ভয় করে।

সমস্ত শরীরটাকে তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে তার কাহিনীকে সাগ্রহে শুনতে শুনতে পিয়ের বার বার বলতে লাগল, "ঠিক, ঠিক, আর তাই…?" "ঠিক, ঠিক, সে ক্রমেই শান্ত ও নরম হয়ে উঠল ? সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে সর্বদা একটা জিনিসই তো সে চেয়েছে—পরিপূর্ণ ভাল হতে—সুতরাং মৃত্যুকে সে ভয় করতে পারে না। যেটুকু দোষ তার ছিল—যদি কোন দোষ আদপেই থেকে থাকে—তাও তার নিজের তৈরি নয়। তাহলে সে নরম হয়েছিল ?…" সহসা নাতাশার দিকে ফিরে অশ্রুসিক্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "…কী সুখের কথা যে সে আপনাকে আবার দেখতে পেয়েছিল।"

নাতাশার মুখটা কুঁচকে গেল। চোখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। একমুহূর্তের

অস্ত চোখ নামিয়ে নিল। কথা বলবে কি বলবে না ভেবে ইতস্তত করতে লাগল।

তারপর শান্ত চাপা স্বরে বলল, "হ্যাঁ, সত্যি বড় সুখের। আমার কাছে সত্যি সুখের।" একটু থেমে বলল, "আর সে…সে…সে বলেছিল আমার ঘরে ঢোকার মুহূর্ত থেকেই সে এটা চাইছিল…"

নাতাশার গলা থেমে গেল। মুখ লাল হয়ে উঠল, দুই হাত এক করে হাঁটুটাকে চেপে ধরল, তারপর বেশ চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে মাথাটা তুলে দ্রুত কথা বলতে লাগল।

"মস্কো থেকে যখন যাত্রা করি তখন এর কিছুই আমরা জানতাম না। তার কথা জিজ্ঞাসা করার সাহসও হয় নি। তারপর হঠাৎ সোনিয়াই বলল যে সে আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছে। তার তখনকার অবস্থা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না, সে অবস্থা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। আমি শুধু চেয়েছিলাম তাকে দেখতে, তার সঙ্গে থাকতে।" ঘন ঘন শ্বাস টেনে অতি দ্রুত সে কথাগুলি বলল।

তারপর সে একটানা বলে গেল সেই সব কথা যা সে আজ পর্যন্ত আর কাউকে বলে নি—তাদের তিন সপ্তাহব্যাপী পথযাত্রা এবং ইয়ারোস্লাভ্ল্-এর জীবনযাত্রার সব অভিজ্ঞতার কথা।

অশ্রুসিক্ত চোখ দুটি নাতাশার উপর স্থির রেখে পিয়ের হাঁ করে সব কথা শুনল। শুনতে শুনতে প্রিন্স আন্‌দ্রু, বা মৃত্যু, বা তার কথা—কোন কিছু নিয়েই সে কিছু ভাবল না। শুধুই তার কথাগুলি শুনল, আর কথা বলতে বলতে যে যন্ত্রণা সে ভোগ করছে সেজন্য তার প্রতি করুণা বোধ করতে লাগল।

নাতাশার পাশে বসে প্রিন্সেস মারিও এই প্রথম শুনল তার দাদার শেষের দিনগুলি ও নাতাশার ভালবাসার কথা।

স্পষ্টতই সেই বেদনাদীর্ণ অথচ আনন্দময় কাহিনী বলা নাতাশার পক্ষে খুবই প্রয়োজন ছিল।

অন্তরের গোপনতম কথার সঙ্গে অতি তুচ্ছ বিবরণকে মিশিয়ে সে কথাগুলি বলতে লাগল; মনে হল, তার কথা বুঝি কোনদিন শেষ হবে না। অনেক সময়ই একই কথা দু'বার করে বলতে লাগল।

দরজার বাইরে দেসালেসের গলা শোনা গেল; সে জানতে চাইছে, ছোট্ট নিকলাস ঘরে ঢুকে শুভ রাত্রি জানাতে পারে কি না।

"আচ্ছা, এই সব—সব কথা," নাতাশা বলল।

নিকলাস ঢুকতেই তাড়াতাড়ি উঠে সে প্রায় দৌড়ে পর্দার আড়ালে ঢাকা দরজাটার দিকে গেল, দরজায় মাথাটা ঠুকে গেল, ব্যথায় বা দুঃখে আর্তনাদ করে সে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পিয়ের একদৃষ্টিতে দরজাটার দিকে তাকিয়ে রইল; এই পৃথিবীতে

সহসা কেন যে তার নিজেকে একেবারে একা মনে হল তা সে বুঝতে পারল না।

প্রিন্সেস মারিই তার অন্যমনস্কতা ভেঙে দিয়ে ভাইপোটির প্রতি তার মনোযোগ আকর্ষণ করল।

সেই আবেগের মুহূর্তে ছোট্ট নিকলাসের মুখের সঙ্গে তার বাবার মুখের বড় বেশী মিল দেখে পিয়ের এতদূর অভিভূত হয়ে পড়ল যে ছেলেটিকে চুমো খাবার পরেই সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, পকেট থেকে রুমালটা বের করে জানালার কাছে চলে গেল। তখনই প্রিন্সেস মারির কাছ থেকে বিদায়ও নিতে চাইল, কিন্তু সে তাকে ছাড়ল না।

"না, অনেক সময়ই নাতাশা ও আমি ছুটোর আগে ঘুমতে যাই না, কাজেই আপনি দয়া করে যাবেন না। খাবার দিতে বলছি। আপনি নীচে যান, আমরা এখনি আসছি।"

পিয়ের ঘর থেকে যাবার আগে প্রিন্সেস মারি তাকে বলল, "এই প্রথম নাতাশা তার সম্পর্কে এত কথা বলল।"

অধ্যায়—১৭

আলোকশোভিত বড় খাবার ঘরে পিয়েরকে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েক মিনিট পরে দরজায় পায়ের শব্দ শোনা গেল; নাতাশাকে নিয়ে প্রিন্সেস মারি ঘরে ঢুকল। একটা কঠিন গম্ভীরভাব মুখের উপর নেমে এলেও নাতাশা এখন বেশ শান্ত। একটা গুরুতর আন্তরিক আলোচনার পরে সাধারণত যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তারা তিনজনই এখন কিছু বিব্রত বোধ করল। আগেকার আলোচনায় ফিরে যাওয়া অসম্ভব, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা খারাপ দেখায়, অথচ কথা বলার ইচ্ছাটা পুরোপুরিই থাকে। তারা চুপচাপ টেবিলে গিয়ে বসল। পরিচারকরা চেয়ারগুলো পিছনে টেনে নিয়ে আবার সামনে ঠেলে দিল। পিয়ের টেবিল-তোয়ালের ভাঁজ খুলল, এবং নিস্তব্ধতা ভাঙবার জন্য প্রথমে নাতাশার দিকে ও পরে প্রিন্সেস মারির দিকে তাকাল। তাদের মনেও ঐ একই সংকল্প। দুজনের চোখেই জ্বলছে খুশির আলো, যেন বলছে দুঃখের পরেও জীবনে আছে আনন্দ।

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আপনি কি ভদকা খাবেন কাউণ্ট?" আর এই কথাগুলি যেন অতীতের ছায়াকে ঠেলে দিল দূরে। "এবার আপনার কথা বলুন। আপনার সম্পর্কে এমন সব অদ্ভুত আশ্চর্য কথা শুনেছি।"

এবার তার পক্ষে স্বাভাবিক মৃদু বিদ্রূপের হাসি হেসে পিয়ের বলল, "তা ঠিক। লোকে আমার সম্পর্কে এমন কথা বলে যা আমি কখনও স্বপ্নেও

ভাবি নি। মারি এব্রামভ্না আমাকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আমার কপালে কি ঘটেছে বা ঘটা উচিত ছিল তাই একটানা বলে গেলেন। আমার অভিজ্ঞতার কথা কেমন করে বলা উচিত সে পরামর্শ দিলেন স্তেপান স্তেপানিচ। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, নাম-করা লোক হওয়াটা খুব সোজা (আমিই তো এখন একজন নামী লোক); লোকে আমাকে নেমন্তন্ন করে নিয়ে আমার কথাই শুনিয়ে দেয়।"

নাতাশা হেসে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। তাকে বাধা দিয়ে প্রিন্সেস মারি বলল, "আমরা শুনেছি মস্কোতে আপনার দশ লাখ ক্ষতি হয়েছে। কথাটা কি সত্যি?

"কিন্তু আমি তো আগের চাইতে তিনগুণ ধনী হয়েছি," পিয়ের জবাবে বলল। তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি যে মুক্তি পেয়েছি সেটাই আমার সত্যিকারের লাভ।" কিন্তু প্রসঙ্গটা খুবই ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে দেখে সে আর কথা বাড়াল না।

"আপনি কি নতুন করে বাড়িঘর তৈরি করছেন?"

"হ্যাঁ। সাভেলিচ বলছে করতেই হবে।"

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আচ্ছা বলুন তো, যখন মস্কোতে থাকা স্থির করলেন তখন কি আপনি কাউন্টেসের মৃত্যুর সংবাদ জানতেন না?"

পিয়ের জবাব দিল, "না। আমি খবরটা শুনি ওরিলে। শুনে কত যে আঘাত পেয়েছিলাম তা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমরা আদর্শ দম্পতি ছিলাম না, কিন্তু তার মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে আঘাত করেছিল। দুটি মানুষের মধ্যে যখন ঝগড়া হয় তখন দুজনেরই দোষ থাকে, কিন্তু তাদের এক একজন যখন আর জীবিত থাকে না তখন অপরজনের দোষটা হঠাৎ বড় বেশী ভারী হয়ে দেখা দেয়। তার উপর এমন মৃত্যু…বন্ধু নেই, সান্ত্বনা নেই! তার জন্য আমি খুব, খুব দুঃখিত।" কথা শেষ করে নাতাশার মুখে সানন্দ সমর্থনের ভাব লক্ষ্য করে সে খুশি হয়ে উঠল।

প্রিন্সেস মারি বলল, "ঠিক, তাহলে তো আপনি আর একবার একটি বিবাহযোগ্য কুমার হলেন।"

পিয়েরের মুখটা হঠাৎ রাঙা হয়ে উঠল; অনেকক্ষণ পর্যন্ত সে নাতাশার দিকে চাইতেই পারল না। আবার তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল, নাতাশার মুখটা কঠোর, কঠিন, এমন কি সম্ভবত অবজ্ঞাসূচক হয়ে উঠেছে।

প্রিন্সেস মারি শুধাল, "আমরা শুনেছি আপনি নেপোলিয়নের সঙ্গে দেখা করেছেন, কথা বলেছেন; সেটা কি সত্যি?"

পিয়ের হাসল।

"না, মোটেই না। সকলেই কল্পনায় দেখে, বন্দী হওয়া মানেই নেপোলিয়নের অতিথি হওয়া। তাকে তো কখনও দেখিইনি, তার সম্পর্কে কিছু

শুনি নি পর্যন্ত—আমি ছিলাম অনেক নীচু স্তরের লোকদের সঙ্গে।"

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। বন্দী-জীবন সম্পর্কে কোন কথা বলার ইচ্ছা প্রথম দিকে পিয়েরের ছিল না; কিন্তু ক্রমে তাকে সেইদিকে নিয়ে যাওয়া হল।

ঈষৎ হেসে নাতাশা বলল, "কিন্তু আপনি যে নেপোলিয়নকে হত্যা করতেই মস্কোতে ছিলেন সেটা তো সত্যি? যখন সুখারেভ মিনারে আমাদের দেখা হয়েছিল তখনই আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম। সেকথা আপনার মনে পড়ে?"

পিয়ের স্বীকার করল যে কথাটা সত্যি; তারপর প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার প্রশ্নের টানে নিজের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে লাগল।

মৃদু হাসি হেসে প্রিন্সেস মারি একবার পিয়েরের দিকে, একবার নাতাশার দিকে তাকাতে লাগল। গোটা বিবরণের মধ্যে সে শুধু পিয়েরের ভালমানুষিরই পরিচয় পেল। কনুইতে ভর দিয়ে নাতাশা অবিচল মনোযোগের সঙ্গে পিয়েরকে দেখতে লাগল; বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদলাতে লাগল; মনে হল, পিয়েরের বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন তার অভিজ্ঞতার অংশীদার হয়ে উঠেছে। শুধু নাতাশার চাউনি নয়, তার উচ্ছ্বাস ও ছোট ছোট প্রশ্ন থেকেই পিয়ের বুঝতে পারল, সে যা বোঝাতে চাইছে ঠিক সেই কথাটিই নাতাশা বুঝতে পারছে। শুধু সে যা মুখে বলছে তাই নয়, যা সে বলতে চাইছে অথচ ভাষায় প্রকাশ করতে পারছে না সে সব কিছুই নাতাশা বুঝতে পারছে। যে শিশু ও নারীকে রক্ষা করতে গিয়ে পিয়েরকে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল তার বিবরণটা এইরকম: "সে বড় ভয়ানক দৃশ্য—শিশুরা পরিত্যক্ত, কেউ কেউ আগুনের মধ্যে···আমার চোখের সামনে একজনকে কেড়ে নিয়ে গেল···অনেক মেয়ে মানুষের মালপত্র কেড়ে নিল, কানের দুল ছিঁড়ে নিল···" বলতে বলতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল, সব কেমন গুলিয়ে যেতে লাগল। "তারপর একটা পাহারাদার বাহিনী এল, আর সব পুরুষদের—মানে যারা লুটতরাজ করছিল না তাদের—গ্রেপ্তার করল। আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম।"

"আমার নিশ্চিত বিশ্বাস আপনি সব কথা বলছেন না; আপনি নিশ্চয় কিছু করেছিলেন···" নাতাশা বলতে বলতে একটু থেমে যোগ করল, "কোন ভাল কাজ?"

পিয়ের বলতে লাগল। মৃত্যুদণ্ডের কথা বলতে গিয়ে ভয়াবহ অংশগুলো সে বাদ দিতে চাইল, কিন্তু নাতাশা জেদ ধরল যে কিছুই বাদ দেওয়া চলবে না।

কারাতায়েভের কথা বলতে শুরু করে পিয়ের থেমে গেল। ততক্ষণে সে টেবিল থেকে উঠে ঘরময় পায়চারি করছে, আর নাতাশার চোখ দুটি তাকে অনুসরণ করছে। সে বলতে লাগল:

"না, সেই অশিক্ষিত লোকটির কাছ থেকে—সেই সরল লোকটির কাছ থেকে আমি যা শিখেছি তা আপনারা বুঝতে পারবেন না।"

নাতাশা বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে; বলে যান! লোকটি এখন কোথায়?"

"প্রায় আমার চোখের সামনেই তারা তাকে মেরে ফেলেছে।"

কম্পিত গলায় পিয়ের তাদের পশ্চাদপসরণের শেষের দিনগুলি, কারাতায়েভের অসুস্থতা, ও তার মৃত্যুর কথাগুলি বলতে লাগল।

অভিযানের যেসব কথা এতদিন মনেও আনে নি সেইসব কথাই পিয়ের তাদের শোনাল। সেই সব অভিজ্ঞতার একটা নতুন অর্থ যেন সে এখন খুঁজে পেয়েছে।

তার কথাগুলি বুঝতে পেরে প্রিন্সেস মারি তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছে, কিন্তু এখন সে এমন কিছু পেয়েছে যাতে তার মনোযোগ আবিষ্ট হয়ে উঠেছে। নাতাশা ও পিয়েরের মধ্যে ভালবাসা ও সুখের সম্ভাবনা দেখতে পেয়ে তার অন্তর খুশিতে ভরে উঠেছে।

সকাল তিনটে বাজল। পরিচারকরা বিষণ্ণ কঠিন মুখে এসে মোমবাতি বদলে দিয়ে গেল, কিন্তু কেউ তাদের খেয়াল করল না।

পিয়েরের গল্প শেষ হল। উজ্জ্বল চোখ মেলে উচ্ছ্বসিত মনোযোগের সঙ্গে নাতাশা তার দিকে চেয়েই রইল। মনে হল, হয় তো পিয়ের মুখে যা বলে নি এমন কোন কথাকে সে ধরতে চেষ্টা করছে। বিব্রত লাজুক চোখে তার দিকে তাকিয়ে পিয়ের ভাবতে চেষ্টা করল, কোন্ কথা দিয়ে আর একটা নতুন বিষয়ের অবতারণা করা যায়। প্রিন্সেস মারি নীরব। কারওরই মনে হল না যে এখন তিনটে বাজে, শুতে যাবার সময় হয়েছে।

পিয়ের বলতে শুরু করল, "লোকে দুর্ভাগ্য ও কষ্টের কথা বলে, কিন্তু এই-মুহূর্তে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়: 'তুমি কি বন্দী হবার আগে যা ছিলে তাই থাকতে চাও, না আবার এইসব কষ্টের ভিতর দিয়ে চলতে চাও?' তাহলে ঈশ্বর করুন আমি যেন আবার সেই বন্দীত্ব ও ঘোড়ার মাংসই ফিরে পাই! আমরা মনে করি বাঁধা পথের বাইরে ছিটকে পড়লেই বুঝি সব গেল, কিন্তু একমাত্র তখনই তো শুরু হয় যা কিছু নতুন আর ভাল। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণই তো সুখ। আমাদের সামনে অনেক কিছু আছে।" নাতাশার দিকে ফিরে বলল, "একথাটা আপনাকে বলছি।"

সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছুর জবাবে নাতাশা বলল, "ঠিক, ঠিক; গোড়া থেকে এই জীবনের মধ্যেই নতুন করে বাঁচতে চাওয়া ছাড়া আমারও আর কিছু চাওয়া উচিত নয়।"

পিয়ের একাগ্রদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

নাতাশা বলল, "হ্যাঁ, তার বেশী কিছু না।"

“একথা সত্যি নয়, সত্যি নয়!” পিয়ের চীৎকার করে বলল। “আমি যে বেঁচে আছি, বেঁচে থাকতে চাই সেটা তো আমার দোষ নয়—আপনারও নয়।”

হঠাৎ নাতাশা মাথা নীচু করে দুই হাতে মুখটা ঢেকে কাঁদতে লাগল।

“কি হল নাতাশা?” প্রিন্সেস মারি বলল।

“কিছু না, কিছু না।” চোখের জলের ভিতর দিয়ে নাতাশা পিয়েরের দিকে তাকিয়ে হাসল। “শুভরাত্রি। শুতে যাবার সময় হয়েছে।”

পিয়ের উঠে বিদায় নিল।

প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার সঙ্গে যথারীতি শোবার ঘরেই দেখা হল। পিয়েরের কথা নিয়েই তারা আলোচনা করল। পিয়ের সম্পর্কে প্রিন্সেস মারি কোন মতামত ব্যক্ত করল না, নাতাশাও তার সম্পর্কে কিছু বলল না।

নাতাশা বলল, “আচ্ছা, শুভরাত্রি মারি। তুমি কি জান, আমার প্রায়ই ভয় হয়, তার সম্পর্কে (অর্থাৎ পিয়েরের কথা) এভাবে কোন কথা না বললে আমরা তাকে ভুলেই যাব!”

যেন নাতাশার কথার সমর্থনেই প্রিন্সেস মারি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল, কিন্তু মুখে সেকথা জানাল না। বলল, “ভুলে যাওয়া কি সম্ভব? আজ সব কথা বলতে পেরে আমার এত ভাল লাগছে। কথাগুলি বলা শক্ত, বলতে কষ্টও হয়, তবু বলা ভাল। খুব ভাল!” নাতাশা বলল। “আমি নিশ্চিত জানি সে আমাকে ভালবাসত। তাই তো সব তাকে বললাম।… ঠিক করি নি?” সহসা সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

“পিয়েরকে সব কথা বলা? নিশ্চয়। কী চমৎকার লোক।” প্রিন্সেস মারি বলল।

নাতাশার ঠোঁটে দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। অনেকদিন তার মুখে এমন হাসি প্রিন্সেস মারি দেখে নি। হঠাৎ নাতাশা বলে উঠল, “তুমি কি জান মারি, যে করেই হোক সে যেন পরিচ্ছন্ন, মসৃণ ও তাজা হয়ে উঠেছে—যেন এইমাত্র একটা 'রুশ বাথ' নিয়ে এসেছে: বুঝতে পারলে তো? একটা নৈতিক স্নানের কথাই আমি বলছি। ঠিক কি না?”

প্রিন্সেস মারি জবাব দিল, “ঠিক। তার অনেক উন্নতি হয়েছে।”

“পরনে একটা খাটো কোট, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা; ঠিক যেন এইমাত্র স্নান-ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন…বাপি বলত।”

“কেন যে সে (প্রিন্স আন্দ্রু) তাকে অন্য সকলের চাইতে বেশী পছন্দ করত তা আমি জানি,” প্রিন্সেস মারি বলল।

“ঠিক, আর সে তো সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্রের মানুষ। লোকে বলে, ভিন্ন চরিত্রের লোকরাই বন্ধু হয়। সেকথাটা নিশ্চয় ঠিক। সত্যি, সে তো সম্পূর্ণ

অন্য রকম—সবদিক থেকেই।"

"ঠিক, কিন্তু সে এক আশ্চর্য মানুষ।"

"আচ্ছা, শুভরাত্রি," নাতাশা বলল।

সেই একই দুষ্টুমির হাসি অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার মুখের উপর লেগে রইল।

অধ্যায়—১৮

সেরাতে পিয়েরের ঘুম আসতে অনেক দেরি হল। ঘরময় পায়চারি করল; কখনও কোন কঠিন সমস্যার চিন্তায় ভুরু কোঁচকাল, কখনও মুখ বেঁকিয়ে দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল, কখনও বা খুশিতে হেসে উঠল।

ভাবতে লাগল প্রিন্স আন্দ্রুর কথা, নাতাশার কথা, তাদের ভালবাসার কথা; কখনও অতীতের জন্য মনে ঈর্ষা দেখা দিল, আবার সে মনোভাবের জন্য পরমুহূর্তে নিজেকেই ভৎ'সনা করল। ছটা বেজে গেল। তখনও সে ঘরময় পায়চারিই করছে।

"আচ্ছা, এটা যদি অনিবার্যই হয় তাহলে আর কি করা যাবে? কি আর করা যাবে? নিশ্চয়ই এটাই ঘটবে।" কথাগুলি নিজেকেই বলে সে তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে শুতে গেল; মনটা খুশি ও উত্তেজিত, কিন্তু সব রকম ইতস্ততভাব থেকে মুক্ত।

কয়েকদিন আগে পিয়ের স্থির করেছিল শুক্রবার পিতার্সবুর্গে যাবে। বৃহস্পতিবারে সে যখন ঘুম থেকে উঠল তখন সাভেলিচ এসে জানতে চাইল যাত্রার জন্য বাঁধাছাঁদা করবে কি না।

"কি, পিতার্সবুর্গে? পিতার্সবুর্গে কেন? পিতার্সবুর্গে কে আছে?" যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল। ভাবল, "ও, হ্যাঁ, এই ঘটনার অনেক আগে কোন কারণে পিতার্সবুর্গ যেতে চেয়েছিলাম বটে। কেন? কিন্তু হয় তো আমাকে যেতেই হবে।" বুড়ো সাভেলিচের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, "লোকটি কত ভাল, সব দিকে নজর, সব কথা মনে রাখে। আর হাসিটিও কত সুন্দর!"

পিয়ের তাকে শুধাল, "আচ্ছা সাভেলিচ, তুমি কি মুক্তি পেতে চাও না?"

"আমার কাছে মুক্তির কি দাম ইয়োর এক্সেলেন্সি? আমরা স্বর্গত কাউন্টের—তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটুক—অধীনে কাজ করেছি, আবার আপনার অধীনেও কাজ করছি, কিন্তু কোনদিন তো আমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হয় নি।"

"আর তোমার ছেলেমেয়েরা?"

"ছেলেমেয়েরাও এইভাবেই কাটিয়ে দেবে। এমন মনিবের অধীনে বেঁচে থাকা চলে।"

পিয়ের বলল, "কিন্তু আমার বংশধরদের বেলায় ? ধর আমি হঠাৎ বিয়ে করলাম···তাও তো হতে পারে।" তার মুখে ঈষৎ হাসি।

"ইয়োর এক্সেলেন্সি যদি অনুমতি দেন তো বলি, তাহলে তো খুব ভাল হয়।"

পিয়ের ভাবল, "ব্যাপারটাকে সে কত সহজ মনে করছে। সে জানে না কাজটা কত সাংঘাতিক, কত বিপজ্জনক। আজ হোক, কাল হোক···কাজটা সাংঘাতিক।"

"তাহলে কি হুকুম হয় ? কাল রওনা দিচ্ছেন তো ?" সাভেলিচ শুধাল।

"না, আপাতত স্থগিত রাখছি। তোমাকে পরে বলব। তোমার অসুবিধা ঘটালাম বলে ক্ষমা কর," পিয়ের বলল ; সাভেলিচকে হাসতে দেখে ভাবল : "কী আশ্চর্য যে লোকটা বুঝতে পারছে না আমার কাছে এখন পিতার্সবুর্গ বলে কিছু নেই ; সকলের আগে সেই ব্যবস্থাটা পাকা করতে হবে। কিম্বা হয় তো ও সবই জানে, শুধু না জানার ভান করছে। একটু কথা বলে দেখব নাকি ও কি ভাবছে ? না, অন্য সময় হবে।"

প্রাতরাশের সময় পিয়ের তার দিদি প্রিন্সেসকে বলল যে আগেরদিন সে প্রিন্সেস মারির সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল, আর সেখানেই দেখা হয়েছিল—"কার সঙ্গে বল তো ? নাতাশা রস্তভার সঙ্গে ?"

তার সঙ্গে যদি আন্না সেমেনভ্‌নার দেখা হত তার চাইতে এটা অসাধারণ কি সে হল সেকথা প্রিন্সেস বুঝতেই পারল না।

"তুমি তাকে চেন ?" পিয়ের শুধাল।

"সেসময় তার সেই ব্যাপারটার কথা শুনেছিলাম। খুবই দুঃখের কথা।"

পিয়ের ভাবল, "না, এ হয় কিছু জানে না, আর নয়তো না জানার ভান করছে। একে কোন কথা না বলাই ভাল।"

প্রিন্সেস ও পিয়েরের যাত্রার জন্য খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করেছিল।

পিয়ের ভাবল, "এরা সকলেই কত সদয়। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যে সব বিষয়ের প্রতি এখন আর তাদের কোন আগ্রহ থাকতে পারে না তা নিয়ে এরা মাথা ঘামাচ্ছে কেমন করে।"

সেইদিনই পুলিশের বড় কর্তা এসে পিয়েরকে জানিয়ে গেল, যেসব মাল উদ্ধার করা হয়েছে সেইদিনই ক্রেম্‌লিন প্রাসাদ থেকে সেগুলি মালিকদের ফেরৎ দেওয়া হবে ; কাজেই সে যেন মাল আনতে একজন প্রতিনিধিকে সেখানে পাঠিয়ে দেয়।

পুলিশের বড় কর্তার মুখের দিকে তাকিয়ে পিয়ের ভাবল, "আর এই লোকটিও। অফিসারটি কত ভাল, কী সুন্দর দেখতে, আর কত সদয় ! লোকটি যে এই তুচ্ছ জিনিস নিয়েও মাথা ঘামাচ্ছে সেকথা ভাবা যায় !

অথচ লোকে বলে লোকটি সৎ নয়, ঘুষ খায়। যত সব বাজে কথা। তাছাড়া ঘুষ খাবে না কেন? এইভাবেই তো সে মানুষ হয়েছে, আর একাজ তো সকলেই করে। কিন্তু কি সদয় ও খুশি মাখানো মুখ, আর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন হাসছে।"

পিয়ের প্রিন্সেস মারির বাড়ি গেল ডিনার খেতে।

পোড়া বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে সেই ধ্বংসস্তূপের সৌন্দর্য দেখে সে বিস্মিত হল। শহরের পোড়া বাড়িগুলোর চিমনির স্তূপ আর ভেঙে-পড়া দেয়ালের বহুদূর প্রসারিত মনোরম সৌন্দর্য দেখে তার মনে পড়ে গেল রাইনের কথা, রোমের কলসিয়ামের কথা। পথে যেসব কোচয়ান ও তার সওয়ারীদের সঙ্গে দেখা হল, যে ছুতোর মিস্ত্রিরা নতুন বাড়ি তৈরি করার জন্য কুড়ুল দিয়ে কাঠ কাটছে, ফেরিওয়ালী ও দোকানীরা—সকলেই যেন সানন্দ উজ্জ্বল চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলছে: "আহা। এই তো তিনি এসেছেন! দেখা যাক এবার কি হয়!"

প্রিন্সেস মারির বাড়ির ফটকে পৌছে পিয়েরের মনে সন্দেহ জাগল, সত্যি কি সে কাল রাতে এখানে এসেছিল, সত্যি কি নাতাশার সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল, তার সঙ্গে কথা বলেছিল। "হয় তো সবই আমার কল্পনা; হয়তো ভিতরে ঢুকে দেখব তারা কেউ নেই।" কিন্তু ঘরে ঢোকা মাত্রই সমগ্র সত্তা দিয়ে সে নাতাশার উপস্থিতিকে অনুভব করল, নিজের সব স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলল। আগের দিনের মতই সে কালো পোশাক তার পরনে, সেই একইভাবে চুল বাঁধা, তবু সে আজ কত আলাদা। আগের দিন ঘরে ঢুকেও তাকে যদি এইরূপেই দেখত তাহলেও পিয়ের মুহূর্তের জন্যও তাকে চিনতে ভুল করত না।

শৈশবে এবং পরে প্রিন্স আন্দ্রুর বাগদত্তা হিসাবে সে তাকে যেরূপে চিনত নাতাশা এখন সেইরূপেই উপস্থিত। তার দুই চোখে একটা জিজ্ঞাসু আলোর ঝিলিক; তার মুখে বন্ধুত্বপূর্ণ ও বিচিত্র দুষ্টুমি ভরা ভাব।

পিয়ের তাদের সঙ্গে ডিনার খেল; হয়তো সারাটা সন্ধ্যা তাদের সঙ্গেই কাটাত, কিন্তু প্রিন্সেস মারি সান্ধ্য উপাসনায় যোগ দিতে যাবে বলে তার সঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

পরদিন সে সকাল-সকাল এল, ডিনার খেল, সারা সন্ধ্যা সেখানে কাটাল। যদিও অতিথিকে পেয়ে প্রিন্সেস মারি ও নাতাশা দুজনেই খুশি, যদিও পিয়েরের সব আগ্রহ এখন এই বাড়িটাতে কেন্দ্রীভূত, সন্ধ্যা নাগাদ তাদের সব কথাই বলা হয়ে গেল, আলোচনা ক্রমেই একটা তুচ্ছ বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যেতে লাগল এবং বার বার ভেঙে যেতে লাগল। পিয়ের এত বেশী সময় সেখানে থাকল যে প্রিন্সেস মারি ও নাতাশার মধ্যে দৃষ্টি-বিনিময় শুরু হয়ে গেল, যেন তারা ভাবছে লোকটি কখন উঠবে। পিয়ের সেটা লক্ষ্য করেও

চলে যেতে পারল না। সেও অস্বস্তি বোধ করল, বিব্রত হল, কিন্তু তবু বসেই রইল, কারণ উঠে বিদায় নেবার শক্তি তার নেই

প্রিন্সেস মারি যখন বুঝল যে এ বসে থাকার কোন শেষ নেই তখন সেই প্রথম উঠে দাঁড়াল, এবং মাথা ধরার কথা বলে শুভরাত্রি জানাল।

শুধাল, "তাহলে আপনি তো কালই পিতার্সবুর্গ যাচ্ছেন?"

যেন কিছুটা আহত হয়েছে এমনি বিস্মিত গলায় পিয়ের তাড়াতাড়ি জবাব দিল, "না, আমি যাচ্ছি না। হ্যাঁ…না…পিতার্সবুর্গ তো? কাল—কিন্তু এখনই শুভরাত্রি জানাচ্ছি না। আপনাদের যদি কোন দরকার থাকে তো আবার একবার আসব।" প্রিন্সেস মারির সামনে দাঁড়িয়ে মুখ লাল করে সে কথাগুলি বলল, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল না।

নাতাশা হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রিন্সেস মারি কিন্তু বেরিয়ে গেল না, একটা হাতল-চেয়ারে বসে গভীর উজ্জ্বল চোখে কঠোর একাগ্রদৃষ্টিতে পিয়েরের দিকে তাকাল। যে ক্লান্তি দেখা দিয়েছিল তার মুখে সেটা এখন সম্পূর্ণ চলে গেছে। একটা গভীর টানা নিঃশ্বাস ছেড়ে সে যেন দীর্ঘ আলোচনার জন্য প্রস্তুত হল।

নাতাশা ঘর থেকে চলে যেতেই পিয়েরের বিব্রত ভাবটা চলে গেল, সেখানে দেখা দিল অধীর উত্তেজনা। তাড়াতাড়ি একটা হাতল-চেয়ার প্রিন্সেস মারির কাছে টেনে নিল।

তার দৃষ্টির জবাবেই যেন বলতে লাগল, "হ্যাঁ, আপনাকে বলতেই চাইছিলাম। প্রিন্সেস, আপনি আমাকে সাহায্য করুন! আমি কি করব? আমি কি আশা করতে পারি? প্রিন্সেস, প্রিয় বান্ধবী আমার, শুনুন! আমি সব কথা জানি। আমি জানি আমি তার যোগ্য নই; জানি এখন এসব কথা বলা অসম্ভব। কিন্তু আমি তার দাদা হতে চাই। না, তা নয়, আমি চাই না, আমি পারি না…"

কথা থামিয়ে সে দুই হাতে মুখ ও চোখ ঘসতে লাগল।

চেষ্টা করে নিজেকে সংযত করে সে আবার বলল, "দেখুন, কখন যে ওকে ভালবেসে ফেলেছি তা আমি জানি না, কিন্তু সারাজীবন আমি ওকেই ভালবেসেছি, একমাত্র ওকে; ওকে এত ভালবেসেছি যে ওকে ছাড়া বেঁচে থাকার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। বর্তমানে তার কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব করতে পারি না, কিন্তু হয় তো একদিন সে আমার স্ত্রী হতে পারে এবং আমি হয় তো সে সম্ভাবনাকে…সে সম্ভাবনাকে…হারিয়ে ফেলতে পারি, এই চিন্তাই আমার কাছে মর্মান্তিক। বলুন, আমি কি আশা করতে পারি? প্রিয় প্রিন্সেস, বলুন আমি কি করব!" কোন জবাব না পেয়ে পিয়ের তার হাতটা স্পর্শ করল।

প্রিন্সেস মারি জবাব দিল, "আপনি যা বললেন সেই কথাটাই আমি

ভাবছি। আমার বক্তব্য শুনুন। আপনি ঠিকই বলেছেন যে এসময় তার কাছে ভালবাসার কথা বলা…”

প্রিন্সেস মারি থামল। সে বলতে যাচ্ছিল যে তার কাছে ভালবাসার কথা বলা অসম্ভব, কিন্তু সে থেমে গেল কারণ দুদিন আগে নাতাশার আকস্মিক পরিবর্তন দেখে সে বুঝেছে যে পিয়ের যদি তাকে ভালবাসার কথা বলে তাহলে সে আঘাত তো পাবেই না, বরং সেই জিনিসটিই সে এখন চাইছে।

তবু প্রিন্সেস বলল, “এখন সেকথা বললে কিছু হবে না।”

“কিন্তু আমি কি করব?”

“সেটা আমার উপর ছেড়ে দিন,” প্রিন্সেস মারি বলল। “আমি জানি ..”

পিয়ের প্রিন্সেস মারির চোখের দিকেই তাকিয়েছিল।

বলল, “তারপর?…তারপর?”

প্রিন্সেস মারি নিজেকে শুধ্‌রে নিয়ে বলল, “আমি জানি সে আপনাকে ভালবাসে…ভালবাসবে।”

কথাগুলি প্রিন্সেস মারির মুখ থেকে বের হবার আগেই পিয়ের লাফিয়ে উঠল, ভয়ার্ত মুখে তার হাতটা চেপে ধরল।

“কিসের থেকে আপনি একথা ভাবছেন? আপনি মনে করেন যে আমি আশা করতে পারি? আপনি মনে…”

প্রিন্সেস মারি হেসে বলল, “হাঁ, আমি তাই মনে করি। ওর বাবা-মার কাছে চিঠি লিখুন, আর ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিন। সুবিধামত আমি ওকে বলব। আমিও চাই এটা ঘটুক। আমার মন বলছে এটা ঘটবে।”

“না, এ হতে পারে না! আমি কত সুখী! কিন্তু এ হতে পারে না… আমি কত সুখী! না, এ হতে পারে না!” প্রিন্সেস মারির হাতে চুমো খেয়ে পিয়ের বার বার বলতে লাগল।

প্রিন্সেস মারি বলল, “আপনি পিতার্সবুর্গ চলে যান। সেটাই সব চাইতে ভাল হবে। আমি আপনাকে লিখব।”

“পিতার্সবুর্গে? চলে যাব? বেশ, তাই যাব। কিন্তু কাল আবার আসতে পারি তো?”

পরদিন পিয়ের বিদায় নিতে এল। আজ নাতাশা আগের দিনের-মত ততটা প্রাণ-চঞ্চল নয়; কিন্তু তার দিকে তাকিয়ে পিয়েরের মনে হল সে বুঝি নিজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে, যেন তাদের কারও কোন অস্তিত্ব নেই, একমাত্র সুখ ছাড়া আর কিছু নেই। প্রতিটি চাউনি, প্রতিটি ভঙ্গী, প্রতিটি কথা তার অন্তরকে আনন্দে ভরে তুলল; নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করল, “এও

কি সম্ভব ? না, এ হতে পারে না।"

বিদায় নেবার সময় নাতাশার শীর্ণ নরম হাতখানি ধরে কিছু বেশী সময় নিজের হাতের মধ্যে না রেখে সে পারল না।

"এও কি সম্ভব যে এই হাত, ওই দুটি চোখ, নারীর সৌন্দর্যের এই রত্ন-ভাণ্ডার যা আজ আমার কাছে এত অপরিচিত তাই একদিন চিরদিনের মত আমার হবে, আমার নিজের মতই একান্ত পরিচিত হবে ?…না, সে অসম্ভব…!"

"বিদায় কাউন্ট," কথাটা উঁচু গলায় বলে তারপর ফিসফিস করে নাতাশা বলল, "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব।"

আর এই কয়েকটি সহজ কথা, তার চাউনি, তার মুখের ভাব—সবই দুটি মাস ধরে পিয়েরের কাছে হয়ে রইল অক্ষয় স্মৃতি, ব্যাখ্যা ও সুখ-চিন্তার বিষয়। "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব…" হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেমন করেই না সে কথাগুলি বলল ? হ্যাঁ, "আপনার ফিরে আসার জন্য আমি উৎকণ্ঠ হয়ে অপেক্ষা করে থাকব।" আহা, আমি আজ কত সুখী ! আমার ভাগ্যে কি ঘটছে ? আমি কত সুখী !" পিয়ের আপন মনেই বলতে লাগল।

অধ্যায়—১৯

হেলেনের সঙ্গে পূর্বরাগের সময় যা কিছু পিয়েরকে বিপন্ন করে তুলেছিল তার কিছুই এখন পিয়েরের অন্তরে নেই। একটা লজ্জাবোধ থেকে তাকে কখনও একবার বলা কথা দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করতে হয় নি, অথবা বলতে হয় নি, "আহা, ও কথাটা কেন বললাম না ?" অথবা "কেনই বা আমাকে বলতে হল 'Fe vous aime' ?" উল্টে সে বা নাতাশা যা বলেছে তার প্রতিটি কথা সে এখন কল্পনায় পুনরাবৃত্তি করে ; নাতাশার মুখ ও তার হাসির প্রতিটি ছবি মনে মনে নতুন করে আঁকে ; কিছুই বাদ দিতে বা যোগ করতে চায় না, শুধুই বার বার তার পুনরাবৃত্তি করে। যেপথে থেকেছে সেটা ঠিক কি ভুল সেবিষয়ে, সন্দেহের ছায়ামাত্র এখন তার মনে নেই। শুধু মাঝে মাঝে একটা ভয়ংকর সন্দেহ তার মনের মধ্যে উঁকি দেয় : "এসবই স্বপ্ন নয় তো ? প্রিন্সেস মারি ভুল করে নি তো ? আমি নিজেই বড় বেশী অহংকারী বা আত্মবিশ্বাসী নই তো ? আমি এসবই বিশ্বাস করছি, আর হঠাৎ একদিন প্রিন্সেস মারি তাকে কথাটা বলবে আর সে হেসে বলবে : "কি আশ্চর্য ! তিনি নিশ্চয় নিজেকে ভুল বুঝিয়েছেন। তিনি কি জানেন না যে তিনি একজন পুরুষ মানুষ, শুধুই মানুষ, আর আমি…? আমি তো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মহত্তর কিছু।"

এই একটি মাত্র সন্দেহ প্রায়ই পিয়েরকে বিপন্ন করে তোলে। সে এখন

কোন পরিকল্পনা করে না। আসন্ন সুখটা তার কাছে এতই ধারণার অতীত বলে মনে হয় যেন সেটা পেলেই সব কিছুর অবসান ঘটবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই সব কিছুর অবসান।

একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের বিকার তাকে পেয়ে বসেছে। তার মনে হচ্ছে, তার ভালবাসা এবং নাতাশার ভালবাসা পাবার সম্ভাবনা—এই দুয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে জীবনের অর্থ—শুধু তার নয়, সমগ্র জগতের। কখনও কখনও তার মনে হয়, সকলেই যেন তার ভবিষ্যৎ সুখ নিয়েই মত্ত হয়ে আছে। আবার কখনও মনে হয়, অন্য সকলেই তার মত সুখী, শুধু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার ভান করে সে সুখকে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করে। প্রতিটি কথায় ও ভঙ্গীতে তার নিজের সুখের উল্লেখই সে দেখতে পায়।

যখন তাকে বলা হত যে তার সিভিল সার্ভিসে যোগ দেওয়া উচিত, অথবা যখন যুদ্ধ বা অন্য কোন রাজনীতির বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হত যে এইসব ঘটনার ফলাফলের উপরেই সকলের কল্যাণ নির্ভর করছে, তখন সে করুণার হাসি হেসে সেসব কথা শুনত, আর বিচিত্র সব মন্তব্য করে সকলকে অবাক করে দিত। কিন্তু এখন যারা জীবনের অর্থ বোঝে বলে সে মনে করে এবং যে দুর্ভাগারা তা বোঝে না তাদের প্রত্যেককেই সে দেখে নিজ অন্তরের আবেগের উজ্জ্বল আলোয়, আর সঙ্গে সঙ্গে অতি সহজে প্রত্যেকের মধ্যেই সে দেখতে পায় যা কিছু ভাল, যা কিছু ভালবাসার যোগ্য।

মৃতা স্ত্রীর ব্যাপার ও কাগজপত্র নিয়ে আলোচনার সময় তার স্মৃতি পিয়েরের মনে একমাত্র করুণা ছাড়া আর কোন অনুভূতি জাগায় না—আজ সে যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছে তার সন্ধান সে বেচারি জানত না বলেই তার জন্য পিয়েরের করুণা হয়। প্রিন্স ভাসিলি ইতিমধ্যে নতুন পদমর্যাদা পেয়েছে, কয়েকটা নতুন সম্মান-পদকও লাভ করেছে; তাই এখন সে বেশ গর্বিত; অথচ পিয়েরের চোখে সেই শোচনীয় সদয় বৃদ্ধটি একান্ত করুণার পাত্র।

পরবর্তী জীবনে এই সময়কার সুখময় উন্মত্ততার কথা প্রায়ই পিয়েরের মনে পড়ত। এইসময় নানা মানুষ ও ঘটনার যে অর্থ তার মনে গড়ে উঠেছিল তা চিরদিন তার কাছে সত্য হয়েই ছিল। পরবর্তীকালে সে সব ধারণাকে সে পরিত্যাগ তো করেই নি, বরং যখনই মনে কোন সন্দেহ বা বিরোধ দেখা দিত তখনই সে এই উন্মাদনার সময়কার মতামত দিয়ে তার বিচার করত, আর সব সময় পূর্বেকার সিদ্ধান্তগুলিই সঠিক প্রমাণিত হত।

সে ভাবত, "তখন আমাকে হয়ত বিচিত্র ও অদ্ভুত মনে হত, কিন্তু আমাকে যতটা পাগল বলে মনে হত আমি ততটা পাগল ছিলাম না। বরং অন্য যেকোন সময়ের তুলনায় তখনই আমি ছিলাম বিজ্ঞতর, আমার অন্তর্দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণতর, এবং জীবনে যা কিছু জানার যোগ্য সবই জেনেছিলাম, কারণ…কারণ তখন আমি সুখী ছিলাম।"

মানুষকে ভালবাসবার আগেই তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যকে—যাকে সে বলত "সৎ গুণাবলী"—আবিষ্কার করার ব্যাপারে সে যে অপেক্ষা করে থাকত না এটাই ছিল পিয়েরের পাগলামি ; এখন তার অন্তর ভালবাসায় দুকুল ছাপিয়ে গেছে, আর অকারণে মানুষকে ভালবেসে তাদের ভালবাসবার সন্দেহাতীত কারণগুলি সে খুঁজে পেয়েছে।

অধ্যায়—২০

সেই প্রথম সন্ধ্যায় নাতাশা যখন সানন্দ তামাসার সুরে প্রিন্সেস মারিকে পিয়ের সম্পর্কে বলেছিল ; "ওকে দেখে মনে হচ্ছে বুঝি এই মাত্র 'রুশ বাথ' থেকে বেরিয়ে এসেছেন—পরনে একটা খাটো কোট, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা," তখন পিয়ের চলে যাবার পরে নাতাশার অন্তরের মধ্যে জেগে উঠেছিল অজ্ঞাতপূর্ব ও লুকনো এমন কিছু যাকে কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।

তার মুখ, হাঁটা-চলা, চাউনি, কণ্ঠস্বর : সব কিছু সহসা বদলে গেল। সবিস্ময়ে সে অনুভব করল, একটা জীবনী-শক্তি ও সুখের আশা জেগে উঠে প্রকাশের পথ খুঁজছে। সেই সন্ধ্যা থেকেই অতীত জীবনের সব কিছু যেন সে ভুলে গেল। জীবনের অবস্থা নিয়ে কোন অভিযোগ নেই, অতীত সম্পর্কে একটি কথাও বলে না, ভবিষ্যতের কোন সুখের পরিকল্পনা করতেও আর ভয় পায় না। পিয়ের সম্পর্কে অতি সামান্য কথাই বলে, কিন্তু প্রিন্সেস মারি যখন তার কথা উল্লেখ করে তখনই একটা দীর্ঘ-নির্বাপিত আলো জ্বলে ওঠে তার চোখে, ঠোঁট দুটি বেঁকে যায় একটা বিচিত্র হাসিতে।

নাতাশার এই পরিবর্তন দেখে প্রথমে প্রিন্সেস মারি বিস্মিত হত ; কিন্তু পরে তার অর্থ বুঝতে পেরে সে দুঃখ পায়। এই পরিবর্তনের কথা মনে এলেই সে ভাবে : "তাহলে কি আমার দাদার প্রতি তার ভালবাসা এতই সামান্য ছিল যে এত শীঘ্রই তাকে ভুলে গেল ?" কিন্তু নাতাশা কাছে এলে সে মোটেই বিরক্ত হয় না, কোনরকম অনুযোগও করে না। জীবনের যে নবজাগ্রত শক্তি নাতাশাকে গ্রাস করেছে সেটা তার কাছে এতই অপ্রতিরোধ্য ও অপ্রত্যাশিত যে তার উপস্থিতিতে প্রিন্সেস মারিও অনুভব করে যে অন্তর থেকে নাতাশাকে তিরস্কার করার কোন অধিকারই তার নেই।

এত পরিপূর্ণ ও খোলাখুলিভাবে এই নতুন অনুভূতির কাছে নাতাশা নিজেকে সঁপে দিয়েছে যে তার যে আর কোন দুঃখ নেই, তার অন্তর যে এখন আনন্দে উজ্জ্বল এ সত্যকে লুকোবার কোন চেষ্টাই সে করে না।

পিয়েরের সঙ্গে নৈশ আলোচনা শেষ করে প্রিন্সেস মারি যখন নিজের ঘরে ফিরে গেল তখন দরজার মুখেই তার সঙ্গে নাতাশার দেখা হয়ে গেল।

"সে কথা বলেছে ? সত্যি ? কথা বলেছে ?" সে বার বার প্রশ্ন করল।

একটা আনন্দের অথচ দুঃখের প্রকাশ নাতাশার মুখে স্থির হয়ে রইল; এই আনন্দটুকুর জন্যও যেন সে ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

"দরজায় কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করছিল, কিন্তু আমি জানতাম তুমি আমাকে বলবে।"

নাতাশার এই একাগ্র দৃষ্টির অর্থ প্রিন্সেস মারি বুঝল, তাতে অভিভূতও হল, তবু নাতাশার এই উত্তেজনা তাকে দুঃখ দিল, তার কথাগুলি তাকে ব্যথা দিল। প্রিন্সেস মারির মনে পড়ল দাদার কথা, তার ভালবাসার কথা।

ভাবল, "কিন্তু কি আর করা যাবে? ও তো নিরুপায়।"

তারপর বিষণ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে পিয়েরের সব কথা সে নাতাশাকে বলল। পিয়েরের পিতার্সবুর্গ চলে যাচ্ছে শুনে নাতাশা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যেন বুঝতে পারে নি এমনিভাবে বলে উঠল, "পিতার্সবুর্গে!"

কিন্তু প্রিন্সেস মারির মুখে বেদনার ছায়া লক্ষ্য করে তার এই দুঃখের কারণটি অনুমান করে নাতাশা সহসা কাঁদতে লাগল।

বলল, "মারি, তুমিই বলে দাও আমি কি করব! ভয় হচ্ছে আমি বুঝি খারাপ হয়ে যাব। তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আমাকে বলে দাও…"

"তুমি তাকে ভালবাস?"

"হ্যাঁ," নাতাশা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল।

"তাহলে কাঁদছ কেন? তোমাকে নিয়ে তো আমিও সুখী," প্রিন্সেস মারি বলল; নাতাশার চোখে জল দেখে তার আনন্দকে সে ক্ষমা করেছে।

"এখনই কিছু হচ্ছে না—একদিন হবে। ভাব তো, যখন আমি তার স্ত্রী হব আর তুমি নিকলাসকে বিয়ে করবে তখন কী মজাই না হবে!"

"নাতাশা, তোমাকে তো বলেছি ওকথা তুলবে না। এস, তোমার কথাই হোক।"

দুজনই চুপ করে গেল।

"কিন্তু পিতার্সবুর্গে যাবে কেন?" হঠাৎ প্রশ্ন করে নাতাশা তাড়াতাড়ি নিজেই তার জবাব দিল। "কিন্তু না, না, তাকে যেতেই হবে…হ্যাঁ মারি। সে অবশ্যই যাবে…"

॥ পঞ্চদশ পর্ব সমাপ্ত ॥

॥ প্রথম পরিশিষ্ট ॥

অধ্যায়—১

সাত বছর পার হয়ে গেছে। ইওরোপীয় ইতিহাসের ঝঞ্চাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র তার তটপ্রান্তে স্তিমিত হয়ে এসেছে; মনে হয় বুঝি শান্তই হয়েছে। কিন্তু যেসব রহস্যময় শক্তি (তাদের কর্ম-পদ্ধতির বিধি-বিধান আমাদের কাছে অজ্ঞাত বলেই রহস্যময়) মানব-সমাজকে পরিচালিত করে তাদের কর্ম-ধারা অব্যাহতই রয়েছে।

ইতিহাস-সমুদ্রের উপরিভাগ শান্ত দেখালেও কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখেই মানুষের অগ্রগতির ধারা অবিরাম বয়ে চলেছে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠি গড়ে উঠেছে আবার ভেঙে গেছে; নানা রাজ্যের ভাঙা-গড়া ও মানুষের স্থানচ্যুতির উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে।

ইতিহাস-সমুদ্রের তরঙ্গাভিঘাত এখন আর আগের মত এক সৈকত থেকে অপর সৈকতে আছড়ে পড়ছে না; গভীর তলদেশে টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে। ইতিহাসের বিখ্যাত প্রতিভূরা এখন আর ঢেউয়ের টানে এক তীর থেকে অপর তীরে চলে যাচ্ছে না। মনে হয় এখন তারা একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সেনাদলের প্রধান হিসাবে ইতিহাসের যেসব নায়ক একদা যুদ্ধ, অভিযান ও লড়াইয়ে জনগণের গতিবিধিকে পরিচালিত করত তারাই এখন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সংঘবদ্ধতা, বিধি-বিধান ও সন্ধির সাহায্যে জনগণের অশান্ত গতিকে নিয়ন্ত্রিত করছে।

ইতিহাসের নায়কদের এইসব কার্য-কলাপকে ইতিহাসকাররা বলে "প্রতিক্রিয়া।"

এই সময়ের পর্যালোচনাকালে তারা ইতিহাসের নায়কদের তীব্র সমালোচনা করে থাকে; তাদের মতে তারা প্রতিক্রিয়াপন্থী। আলেক্সান্দার ও নেপোলিয়ন থেকে আরম্ভ করে মাদাম দ্য স্তায়েল, ফোটিয়াস, শেলিং, ফিক্‌টে, চাতুব্রায়াদঁ ও অন্য যারাই তাদের সমালোচনার শিকার হয়েছে, তাদের কঠোর বিচারে তারাই হয় প্রগতিবাদী হিসাবে মুক্তি পেয়েছে, আর না হয় তো প্রতিক্রিয়াপন্থীরূপে দণ্ডিত হয়েছে।

তাদের বিবরণ অনুসারে সেই সময়ে রাশিয়াতেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল; তার প্রধান অপরাধী ছিল প্রথম আলেক্সান্দার; অথচ সেই লোকই তাদের মতেই তার রাজত্বকালের শুরুতে ছিল রাশিয়ার রক্ষাকর্তা এবং উদারনৈতিক আন্দোলনের প্রধান উদ্যোক্তা।

আজকের রুশ সাহিত্যে স্কুলের ছাত্র থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত ইতিহাস-

কারদের মধ্যে এমন একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নিজ রাজত্বকালে আলেক্সান্দার যেসব ভুল করেছিল তার জন্য তাকে লক্ষ্য করে একটা ছোট পাথরও ছুঁড়ে মারে না।

"তার উচিত ছিল এইভাবে এবং ওভাবে কাজ করা। একক্ষেত্রে তিনি ঠিক কাজই করেছেন, কিন্তু ওক্ষেত্রে করেছেন ভুল। রাজত্বের গোড়ার দিকে এবং ১৮১২ সালে তিনি আশ্চর্য রকমের ভাল কাজ করেছেন, কিন্তু পোল্যাণ্ডকে নতুন শাসনতন্ত্র দিয়ে, পবিত্র মৈত্রীচুক্তি স্থাপন করে, আরাকৃচীভের হাতে ক্ষমতা দিয়ে, গোলিৎসিনকে ও মরমীয়াবাদকে সমর্থন করে এবং পরবর্তীকালে শিশ্‌কভ ও ফোটিয়াসকে অনুগ্রহ দেখিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছেন। সক্রিয় সেনাদলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে এবং সেমেনভ রেজিমেন্টকে ভেঙে দিয়েও তিনি ভুল করেছেন।"

মানবজাতির কিসে কল্যাণ হয় সে সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে ইতিহাসকাররা তার উদ্দেশ্যে যত নিন্দা-বাক্য উচ্চারণ করেছে তা লিপিবদ্ধ করতে হলে ডজনখানেক পৃষ্ঠার দরকার হবে।

এইসব নিন্দা-তিরস্কারের অর্থ কি?

প্রথম আলেক্সান্দারের রাজত্বের গোড়ার দিকে তার উদারনৈতিক প্রয়াস, নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ, ১৮১২ সালে ও ১৮১৩ সালের অভিযানে তার দৃঢ়তা প্রভৃতি তার যেসব কাজের জন্য ইতিহাসকাররা তার প্রশংসা করে থাকে সেসবই কি ঐ একই উৎস থেকে প্রবাহিত নয়: তার জন্ম, শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনযাত্রার যে পরিবেশে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল এবং যা থেকে সেইসব কাজগুলিও উৎসারিত হয়েছিল যার জন্য তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে (যেমন পবিত্র মৈত্রীচুক্তি, পোল্যাণ্ড প্রত্যর্পণ, ১৮২০ ও তার পরবর্তীকালের প্রতিক্রিয়া)—সে সব কিছুরই উৎস কি এক নয়?

ঐ সব নিন্দা-তিরস্কারের মূল ভিত্তিটা কি?

মূল ভিত্তি হল: প্রথম আলেক্সান্দারের মত ইতিহাসের একটি মুখ্য চরিত্র যে মানব-ক্ষমতার একেবারে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ছিল,—ক্ষমতার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত ষড়যন্ত্র,—খোসামোদ ও আত্ম-প্রবঞ্চনার মত প্রচণ্ড শক্তিগুলি যার উপর অবিরাম প্রভাব বিস্তার করতে সক্রিয় ছিল,—ইওরোপে সংঘটিত সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব যাকে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে বহন করতে হত; কোন কাল্পনিক চরিত্র না হয়ে যে ছিল একটি জীবন্ত চরিত্র, প্রতিটি জীবন্ত মানুষের মতই সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি যার ছিল ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুরাগ—পঞ্চাশ বছর আগে ("যুদ্ধ ও শান্তি" উপন্যাসখানি সমাপ্ত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে) মানব-কল্যাণের সেই ধারণা ও তাৎপর্য-বোধ নিশ্চয় তার ছিল না, বর্তমান কালের একজন অধ্যাপক যৌবনকাল থেকে অধ্যয়ন-কার্যে ব্যাপৃত থেকে—নানা পুথি ও বক্তৃতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে যে ধারণা ও তাৎপর্য-

বোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু একথা যদি ধরেই নেওয়া যায় যে পঞ্চাশ বছর আগে মানবকল্যাণ সম্পর্কে প্রথম আলেক্সান্দারের ধারণাটা ভুল ছিল, তাহলে তো অনিবার্যভাবেই এটাও আমাদের ধরে নিতেই হয় যে আজ যে ইতিহাসকার আলেক্সান্দারের বিচার করছে কালের যাত্রাপথে একদিন তার ধারণাও ভ্রান্ত বলে পরিগণিত হবে। এই অনুমান আরও স্বাভাবিক ও অনিবার্য এই কারণে যে ইতিহাসের পথ-পরিক্রমার পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই নতুন নতুন লেখকের আবির্ভাবের সঙ্গে মানব-কল্যাণের ধারণাও প্রতি বছরই পরিবর্তিত হয়; ফলে আজ যা ভাল দশ বছর পরে তাই মন্দ বলে পরিগণিত হয়; এবং এর বিপরীত ক্রমও সমান সত্য। আরও বড় কথা: ইতিহাসের পথ-পরিক্রমায় কি ভাল আর কি মন্দ তা নিয়ে সমকালীন ইতিহাসকারদের মধ্যেও মতবিরোধের অন্ত নেই: পোল্যাণ্ডকে নতুন শাসন-অধিকার দান এবং পবিত্র মৈত্রীচুক্তি সম্পাদনের জন্য কেউ বা আলেক্সান্দারকে প্রশংসা করে, আবার কেউ বা নিন্দা করে।

আলেক্সান্দার বা নেপোলিয়নের কার্যাবলীকে দরকারী বা ক্ষতিকর কোনটাই বলা যায় না, কারণ সেগুলি কেন দরকারী বা ক্ষতিকর সেটা বলাই তো অসম্ভব। সেসব কার্যাবলী যদি কারও অসন্তোষের কারণ হয় তাহলে তো তার একমাত্র কারণ যে কল্যাণ সম্পর্কে তার সীমিত জ্ঞানের সঙ্গে সেগুলো মেলে না। মস্কোতে আমার পৈত্রিক ভবনকে রক্ষা করা, অথবা রুশ বাহিনীর গৌরব, অথবা পিতার্সবুর্গ ও অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমৃদ্ধি, অথবা পোল্যাণ্ডের মুক্তি, অথবা রাশিয়ার মহত্ত্ব, অথবা ইওরোপের শক্তি-সাম্য। অথবা "প্রগতি" নামধারী ইওরোপীয় কিছু সংস্কৃতি—আমার কাছে ভাল বা খারাপ যাই মনে হোক, একথা তো স্বীকার করতেই হবে যে প্রতিটি ঐতিহাসিক চরিত্রের এসব ছাড়াও এমন কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে যা আমার কাছে অনধিগম্য।

কিন্তু ধরে নেওয়া যাক যে বিজ্ঞান নামক শক্তিটি সব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে ভাল-মন্দের এমন একটা শাশ্বত মাপ-কাঠি আমাদের হাতে তুলে দিতে পারে যা দিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাবলীর বিচার করা যেতে পারে: বলা যাক যে আলেক্সান্দার সব কিছুই অন্যভাবে করতে পারত, বলা যাক—আজকের নিন্দুকরা জাতীয়তা, স্বাধীনতা, সাম্য ও প্রগতির যে কর্মসূচী তাকে দিত সেই অনুসারেই সেসব কাজ করতেও পারত। ধরা যাক, এই কর্মসূচী প্রনয়ণ তখন সম্ভব ছিল, এবং আলেক্সান্দার তদনুসারেই সব কাজই করল। কিন্তু তৎকালীন সরকারী রীতিনীতির যারা বিরোধিতা করেছিল, ইতিহাসকারদের মতে যাদের কাজকর্ম ছিল ভাল ও কল্যাণকর, সেক্ষেত্রে তাদের কি হত? তাদের কাজকর্মের তো কোন

অস্তিত্বই থাকত না : থাকত না জীবনের লক্ষণ, থাকত না কিছুই।

একথা যদি আমরা স্বীকার করি যে মানুষের জীবন বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত; তাহলে তো জীবনের সম্ভাবনাকেই ধ্বংস করা হয়।

অধ্যায়—২

যদি ইতিহাসকারদের মতই ধরে নেওয়া হয় যে মহাপুরুষরাই মানব সমাজকে বিশেষ বিশেষ লক্ষ্যে পৌছে দেয়—যেমন রাশিয়া অথবা ফ্রান্সের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, ইওরোপের শক্তি-সাম্য প্রতিষ্ঠা, বিপ্লবের ভাবধারার প্রচার, সাধারণ অগ্রগতি, বা অন্য কিছু—তাহলে তো আকস্মিকতা ও প্রতিভার তত্ত্ব ছাড়া ইতিহাসের ঘটনাবলীকে ব্যাখ্যা করাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে যেসব ইওরোপীয় যুদ্ধ হয়েছিল তার লক্ষ্য যদি হয়ে থাকে রাশিয়ার উচ্চাকাংখার পূর্ণতা, তাহলে তো পূর্ববর্তী সব যুদ্ধ ও এই অভিযান ছাড়াই সে লক্ষ্যসাধন করা যেত। আবার ফ্রান্সের উচ্চাকাংখাই যদি তার লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলেও তো বিপ্লব ও সাম্রাজ্য ছাড়াই তা পূর্ণ করা যেত। নব ভাবধারার প্রচারই যদি তার লক্ষ্য হত তাহলে তো যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবর্তে মুদ্রণ-যন্ত্রই সে কাজ আরও ভালভাবে করতে পারত। সভ্যতার অগ্রগতি যদি লক্ষ্য হত তাহলে তো সহজেই বোঝা যায় যে সম্পত্তি ও মানব জীবনের ধ্বংস সাধন ছাড়াই সভ্যতা বিস্তারের আরও অনেক ভাল ভাল পথ আছে।

তাহলে ঘটনাগুলি অন্যভাবে না ঘটে এভাবে ঘটল কেন?

কারণ এটাই প্রকৃত ঘটনা! ইতিহাস বলে, "আকস্মিকতা পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আর প্রতিভা সেটাকে কাজে লাগিয়েছিল।"

কিন্তু আকস্মিকতা কি? প্রতিভাই বা কি?

আকস্মিকতা এবং প্রতিভা কোন সত্যিকারের বস্তুকে বোঝায় না; কাজেই তাদের সংজ্ঞাও দেওয়া যায় না। এই কথা দুটি ঘটনাকে বোঝার একটা স্তরের দ্যোতকমাত্র। একটা বিশেষ ঘটনা কেন ঘটে তা আমি জানি না; আমি মনে করি সেটা জানা যায় না; আর তাই আমি সেটা জানতে চেষ্টাও করি না, আকস্মিকতার দোহাই পাড়ি। আমি দেখি, এমন একটা শক্তি কতকগুলি ফল ফলায় যা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে; এটা কেন ঘটে তা আমি জানি না, তাই প্রতিভার কথা বলি।

মেষপালক একদল ভেড়ার মধ্যে যে ভেড়াটাকে রোজ একটা বিশেষ খোঁয়াড়ে নিয়ে গিয়ে দানা-পানি দেয়, সেটাই অন্যগুলির চাইতে দ্বিগুণ মোটা হয়, এবং প্রতিভাধর হয়ে ওঠে। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সেই চর্বিওয়ালা মোটা ভেড়াটাকেই মাংসের প্রয়োজনে জবাই করা হয়।

কিন্তু একটু চিন্তা করলেই ভেড়ার দল বুঝতে পারে যে তাদের

ভাগ্যে যা কিছু ঘটে তা তাদের ভেড়ার উপযুক্ত লক্ষ্য সাধনের জন্যই ঘটে ; তাদেরও এ সত্য স্বীকার করতেই হবে তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে তার উপর তাদের কোন হাত ছিল না ; তাহলেই পুরুষ্টু ভেড়াটার ভাগ্যের পরিণতিটা তারা সহজেই বুঝতে পারবে। কেন তাদের পুরুষ্টু করা হয় সেটা যদি বুঝতে নাও পারে, অন্তত এটুকু তারা বুঝতে পারবে যে ঐ ভেড়াটার কপালে যা ঘটেছে সেটা আকস্মিকভাবে ঘটে নি ; তাহলেই তাদের আর আকস্মিকতা অথবা প্রতিভার তত্ত্বের কোন দরকার হবে না।

আমাদের কেবল এইটুকু স্বীকার করতে হবে যে ইওরোপের সেই প্রচণ্ড আলোড়নের উদ্দেশ্য কি ছিল তা আমরা জানি না, আমরা জানি শুধু যা ঘটেছে তাকে—অর্থাৎ নরহত্যা—প্রথমে ফ্রান্সে, তারপর ইতালিতে, আফ্রিকায়, প্রাশিয়ায়, অষ্ট্রিয়ায়, স্পেনে ও রাশিয়ায় ; আরও জানি, পশ্চিম থেকে পূবে এবং পূব থেকে পশ্চিমে মানুষের চলাচল ও গতিবিধিই এই সব ঘটনার মূল কথা ও উদ্দেশ্য ; তার জন্য নেপোলিয়ন ও আলেক্সান্দারের মধ্যে কোন বিরল ক্ষমতা ও প্রতিভার খোঁজ করার কোন দরকার হয় না ; তাদের সাধারণ মানুষের চাইতে অন্য কিছু বলে মনে করা আর তখন সম্ভবই হবে না ; যেসব ছোটখাট ঘটনা এই লোকগুলিকে এত বড় করে তুলেছে তাকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোনরকম আকস্মিকতার আশ্রয়ও আমাদের নিতে হবে না ; বরং এই সত্যই আমরা স্পষ্ট করে উপলব্ধি করতে পারব যে ঐসব ছোটখাট ঘটনাগুলি একান্তই অনিবার্য ছিল।

চরম উদ্দেশ্যকে জানার দাবীকে অস্বীকার করলেই আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারব যে কোন একটি গাছে যে ফুল ফোটে বা ফল ফলে তার চাইতে ভাল ফুল ফোটা বা ফল ফলার কথা যেমন কেউ কল্পনা করতে পারে না, তেমনই নেপোলিয়ন ও আলেক্সান্দার যে লক্ষ্য সাধন করেছিল অন্য কোন দুটি মানুষ যে তাদের চাইতে ভালভাবে সে লক্ষ্য সাধন করতে পারত সে কল্পনা করাও অসম্ভব।

অধ্যায়—৩

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইয়োরোপে যেসব ঘটনা ঘটেছে তার মূলগত প্রধান তাৎপর্যই হচ্ছে ইয়োরোপের অধিকাংশ মানুষের স্থান-পরিবর্তন—প্রথমে পশ্চিম থেকে পূবে, এবং পরে পূব থেকে পশ্চিমে। শুরুতে ছিল পশ্চিম থেকে পূবে যাওয়া। পশ্চিমের মানুষরা যাতে মস্কোতে একটা যুদ্ধকালীন অভিযান চালাতে পারে তার জন্য প্রয়োজন ছিল (১) পূবের রণকুশল সামরিক গোষ্ঠির সঙ্গে সংঘর্ষে এঁটে উঠবার মত যথেষ্ট সংখ্যক একটি সামরিক গোষ্ঠিরূপে নিজেদের গড়ে তোলা, (২) প্রতিষ্ঠিত সব রকম ঐতিহ্য ও রীতিনীতিকে

বিসর্জন দেওয়া, এবং (৩) সামরিক অভিযানের সময় নেতৃপদে এমন একজন লোককে রাখা যে অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম প্রতারণা, দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যাকে সমর্থন করতে পারবে।

ফরাসী বিপ্লবের শুরু থেকেই অনুপযুক্ত পুরনো বড় দলটাকে এবং সেই-সঙ্গে পুরনো সব অভ্যাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করা হতে লাগল, এবং ধাপে ধাপে তার চাইতেও বড় এমন আর একটা দলকে গড়া হতে লাগল যাদের রীতিনীতি নতুন আর ঐতিহ্যও নতুন, এবং এমন একজনকে মাথার উপরে বসানো হল যে যা কিছু করা হোক না কেন সে সব কিছুর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বিচিত্র এক যোগাযোগের ফলে বিভিন্ন ক্রমবর্ধমান ফরাসী উপদলের ভিতর থেকে এমন একটি লোকের আবির্ভাব ঘটল যার কোন পূর্ব ইতিহাস নেই, ঐতিহ্য নেই, নাম নেই, এমন কি যে নিজে ফরাসীও নয়। কোন দলে যোগ না দিলেও তাকেই ঠেলে দেওয়া হল সকলের সম্মুখে।

সহকর্মীদের অজ্ঞতা, বিরোধী শক্তিগুলির দুর্বলতা ও গুরুত্বহীনতা, খোলাখুলি নিজের মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারা, আর সর্বোপরি একটা চোখ-ধাঁধানো ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর সীমাবদ্ধতাই সেই লোকটিকে সামরিক নেতৃপদে উন্নীত করে দিল। যে বাহিনীটিকে ইতালিতে পাঠানো হল তার সৈনিকদের ক্ষুরধার রণকুশলতা, প্রতিপক্ষগুলির যুদ্ধে অনীহা, এবং নিজের শিশুসুলভ ঔদ্ধত্য ও আত্ম-বিশ্বাসই তাকে এনে দিল সামরিক খ্যাতি। সে যেখানে যায় সেখানেই অসংখ্য তথাকথিত সুযোগ যায় তার সঙ্গে। ফ্রান্সের শাসক দলের বিরাগভাজন হওয়াটাও তার ভাগ্যে অনুকূল হয়েই দেখা দেয়। পূর্বনির্দিষ্ট পথগুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টাও সফল হল না: রাশিয়ার চাকরিতে তাকে নেওয়া হল না, তুরস্কে চাকরির চেষ্টা ব্যর্থ হল। ইতালির যুদ্ধে বার বার ধ্বংসের একেবারে মুখোমুখি হয়েও প্রতিবারই একান্ত অপ্রত্যাশিত-ভাবে সে রক্ষা পেল। যেসব রুশ বাহিনীর হাতে তার সুনাম ও মর্যাদা নষ্ট হতে পারত তারাও নানারকম কূটনৈতিক কারণে তখন মঞ্চে অবতীর্ণ হতে পারল না।

ইতালি থেকে ফিরে গিয়ে সে দেখতে পেল, প্যারিসের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার মুখে; শাসন-ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত ছিল সেই ভাঙনের মুখে তারা অনিবার্যভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আর ঘটনাক্রমেই এই বিপদ থেকে উদ্ধারের একটা সুযোগ এল আফ্রিকায় একটি উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন অভিযানের রূপে। আবার সেই তথাকথিত আকস্মিক সুযোগ হল তার সঙ্গী। একটা গুলিও ছোঁড়া হল না, অথচ দুর্ভেদ্য মাল্টা আত্মসমর্পণ করল; তার অত্যন্ত বেপরোয়া পরিকল্পনাগুলিও সাফল্যমণ্ডিত হল। শত্রুপক্ষের যে নৌবহরের চোখ এড়িয়ে পরবর্তীকালে একটি নৌকোও পার পায় নি

তার চোখে ধুলো দিয়ে তার গোটা বাহিনী নির্বিঘ্নে সরে পড়ল। আফ্রিকায় প্রায় নিরস্ত্র অধিবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হল। আর যারা এইসব অপরাধ করল তারা, বিশেষ করে তাদের নেতা, নিজেদের নিশ্চিত করে বোঝাল যে একাজ তো প্রশংসার্হ, গৌরবজনক—সিজার ও মহান আলেক্সান্দারও তো এই কাজই করেছে, আর তাই এ কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।

গৌরব ও আভিজাত্যের এই আদর্শই এই লোক ও তার সঙ্গীসাথীদের আফ্রিকায় নিয়ে গেল সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। সে যা কিছু করে তাতেই আসে সাফল্য। মহামারী তাকে স্পর্শ করে না। বন্দীকে হত্যার নিষ্ঠুরতাও তার বেলায় অপরাধ বলে গণ্য হয় না। সঙ্গীসাথীদের বিপদের মুখে ফেলে রেখে সে যখন নিতান্ত ছেলেমানুষের মত অকারণে অত্যন্ত হীনভাবে আফ্রিকা থেকে চলে গেল তখন সেজন্য তাকে প্রশংসাই করা হল, এবং পুনরায় শত্রুপক্ষের নৌবহর দুই দুই বার তাকে পালাতে দিল। সফলতার সঙ্গে এইসব অপরাধ করার উল্লাসে মত্ত হয়ে সে যখন প্যারিসে পৌছল তখন দেখা গেল, যে প্রজাতন্ত্রী সরকার এক বছর আগে তাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারত তার নাভিশ্বাস উঠেছে। সেইমুহূর্তে সবরকম দলগত রেশারেশি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একজন নবাগত হিসেবে তার উপস্থিতি স্বভাবতই তাকে তুলে ধরল উচ্চ পদে—আর নিজের সেরকম কোন পরিকল্পনা না থাকলেও সেই নতুন ভূমিকার জন্য সে তখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

তার কোন পরিকল্পনা ছিল না, সব কিছুতেই তার ভয়, তবু সব দলই তাকে আঁকড়ে ধরল, তার সহযোগিতা দাবী করল।

ইতালি ও মিশরে অর্জিত গৌরব ও সুনাম তখন তার করায়ত্ত; তার উপর আছে তার উন্মাদোচিত আত্ম-প্রশস্তি, যেকোন অন্যায় কাজ করার উপযুক্ত সাহসিকতা এবং খোলাখুলি মিথ্যা বলার ক্ষমতা। কাজেই আসন্ন কর্তব্য সাধনের সেই তো একমাত্র যোগ্য লোক।

আসনটি তো তার জন্যই অপেক্ষা করে ছিল; কাজেই নিজের ইচ্ছা ছাড়াই এবং নিজের অস্থিরচিত্ততা, পরিকল্পনার অভাব, এবং সব ভুলভ্রান্তি সত্বেও ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ল। সে ষড়যন্ত্র সফল হল।

আইন-পরিষদের একটা সভায় তাকে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ভয়ে তার দিশেহারা অবস্থা; কোন রকমে পালাতে পারলে বাঁচে। মূর্ছা যাবার ভান করে সে এমন সব অর্থহীন উক্তি করে বসল যাতে তার বারোটা বেজে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ফ্রান্সের একদা গর্বিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি শাসকরা তখন বুঝতে পেরেছে যে তাদের খেলা সাঙ্গ হয়েছে, তারা তখন সেই লোকটির চাইতেও বিমূঢ়; যেসব কথা বললে সেইমুহূর্তেই তাকে ধ্বংস করা যেত তা তারা মুখেই আনল না।

আকস্মিক সুযোগ, লক্ষ লক্ষ আকস্মিক সুযোগ তার হাতে তুলে দিল

ক্ষমতা, আর সকলেই যেন চুক্তি করে সে ক্ষমতাকে সমর্থন জানাল। ফ্রান্সের যে শাসকরা তার কাছে নতি স্বীকার করল তারাও আকস্মিকতারই ফসল; সেই আকস্মিকতার প্রভাবেই রাশিয়ার প্রথম পল তার রাজত্বকে স্বীকৃতি দিল; ঘটনাচক্রেই তার বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র করা হল তা যে ব্যর্থ হল তাই শুধু নয়, তার ফলে তার শক্তি আরও বৃদ্ধি পেল। আকস্মিক ঘটনার ফলেই দুক্ দ্য এঙ্গিন তার হাতে পড়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে তার হাতেই নিহত হয়—ফলে জনতার মনে এই ধারণাই দৃঢ়তর হয় যে একাজ করার অধিকার তার আছে, কারণ সে শক্তি তার আছে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একটা অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজন করেও (করলে হয় তো তার ধ্বংসই ছিল অনিবার্য) আকস্মিক ঘটনাচক্রেই সে বাসনা পরিত্যাগ করে অপ্রত্যাশিতভাবে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল ম্যাক্ ও অস্ট্রিয়ানদের উপরে, আর বিনা যুদ্ধে তারা আত্ম-সমর্পণ করল। আকস্মিক ঘটনাচক্র আর প্রতিভাই তাকে বিজয়-গৌরব এনে দিল অস্টারলিজ-এ; আর আকস্মিকভাবেই সব মানুষ, কেবল ফ্রান্সের নয়, সারা ইয়োরোপের মানুষ—একমাত্র ইংলণ্ড বাদে—স্বীকার করে নিল তার কর্তৃত্ব, তার নতুন পদ-মর্যাদা, তার গৌরব ও জাঁকজমকের আদর্শ।

নিজেদের শক্তির পরিমাপ করতে এবং আসন্ন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতেই পশ্চিমদেশীয় শক্তিগুলি বার বার পূবের দিকে পা বাড়াল—১৮০৫, ১৮০৬, ১৮০৭, ও ১৮০৯-এ ও আর উত্তরোত্তর তাদের শক্তি বাড়তে লাগল। ১৮১১-তে যে জন-গোষ্ঠিটি গড়ে উঠেছিল ফ্রান্সে, তার সঙ্গে এককাট্টা হয়ে যোগ দিল মধ্য ইয়োরোপের একটা বড় জন-গোষ্ঠি। দল যত বড় হতে লাগল দলপতির শক্তি ততই বাড়তে লাগল। দশ বছরব্যাপী প্রস্তুতির কালে এই লোকটি ইয়োরোপের সব রাজা-রাজড়ার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলল। একের পর এক তারা ছুটে এল তার কাছে নতি স্বীকার করতে। এই মহামানবটির করুণা লাভের আশায় প্রাশিয়ার রাজা পাঠাল নিজের স্ত্রীকে; এই লোকটি যদি সিজার-বংশের একটি কন্যাকে তার শয্যা-সঙ্গিনী করে তাহলে অস্ট্রিয়ার সম্রাট নিজেকে অনুগৃহীত মনে করবে; সব জাতির কাছে যা কিছু পবিত্র তার প্রতিভূস্বরূপ পোপ এই মহামানবটিকে তুষ্ট করতে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করল। যেন স্বীয় ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নেপোলিয়ন নিজেকে তৈরি করছে না, যারা রয়েছে তার চারপাশে তারাই তাকে তৈরি করে তুলছে আসন্ন ঘটনাবলীর দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করে। এমন কোন কাজ, কোন পাপ, কোন ছোটখাট জালিয়াতি সে করে নি যা তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখে মহৎ কীর্তি হিসাবে ঘোষিত হয় নি। জার্মানরা তো তার সম্মানে জেনা ও অরস্তাদ-এ একটা ভোজ-সভারই আয়োজন করেছিল। এই লোকটি শুধু নিজেই মহান নয়, মহান তার পূর্বপুরুষরা, তার ভ্রাতাগণ, তার বি-পুত্রগণ, ও শ্যালকগণও। যেটুকু বুদ্ধি-বিবেচনা তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল

সেটুকুও নিঃশেষ করে একটা ভয়ংকর ভূমিকা পালনের জন্য তাকে প্রস্তুত করে তুলতে সব কিছুই করা হল। এইভাবে সে নিজে যখন প্রস্তুত হল, তখনকার সৈন্যরাও প্রস্তুত।

অভিযান পূবদিকে অগ্রসর হল—পৌছল চরম লক্ষ্য মস্কোতে। নগর অধিকৃত হল; অস্তারলিজ থেকে ওয়াগ্রাম পর্যন্ত আগেকার সব যুদ্ধে শত্রুপক্ষের যত ক্ষতি হয়েছিল এবার তার চাইতে অনেক বেশী ক্ষয়-ক্ষতি হল রুশবাহিনীর। কিন্তু এবার চাকা ঘুরল। যে আকস্মিকতা ও প্রতিভা এতদিন সাফল্যের পর সাফল্যের এক নির্বিঘ্ন স্রোতের মুখে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে এসেছে পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের পথে, হঠাৎ এবার তার পরিবর্তে দেখা দিল অসংখ্য আকস্মিক ঘটনার এক উল্টো স্রোত—বরদিনোতে তার মাথায় সর্দি বসে যাওয়া থেকে মস্কোর অগ্নিকাণ্ডের স্ফুলিঙ্গ ও বরফপাত পর্যন্ত—আর প্রতিভার পরিবর্তে এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল নির্বুদ্ধিতা ও অপরিমেয় নীচতা।

আক্রমণকারীরা পালাচ্ছে, ফিরে দাঁড়াচ্ছে, আবার পালাচ্ছে; এবার কিন্তু আকস্মিকতার স্রোত বইতে লাগল নেপোলিয়নের স্বপক্ষে না হয়ে তার বিরুদ্ধে।

আগেকার পশ্চিম-পূব অভিযানের মতই একটা বড় রকমের পূব-পশ্চিম পাল্টা অভিযান গড়ে উঠল। ১৮০৫, ১৮০৭ ও ১৮০৯-এর অভিযানের মতই একটা পূব-পশ্চিম অভিযান শুরু হল, সেই একইভাবে দলের পর দল এসে যোগ দিতে লাগল; যোগ দিল মধ্য ইয়োরোপের মানুষরা; মাঝপথে সেই একই ইতস্ততভাব, এবং লক্ষ্যে পৌছবার পথে সেই একই ক্রমবর্ধমান দ্রুতগতি।

শেষ লক্ষ্য প্যারিসে পৌছনো হল। নেপোলিয়নের রাজত্ব ও বাহিনী ধ্বংস হল। নেপোলিয়নের কিছুই আর করার নেই; এখন তার সব কাজই সকরুণ ও নীচ। কিন্তু আবার ঘটল সেই দুর্বোধ্য আকস্মিক ঘটনা। মিত্রশক্তিরা নেপোলিয়নকে ঘৃণা করে; তাকেই মনে করে তাদের সব দুঃখ-দুর্দশার কারণ। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থেকে বিচ্যুৎ হয়ে, সব পাপকর্ম ও চালাকি ধরা পড়ে যাওয়ার ফলে, সকলের চোখেই তার সমাজচ্যুত দুষ্কৃতকারীর সেই মূর্তিই ফুটে ওঠা উচিত ছিল যা সে ছিল দশ বছর আগে এবং পরের এক বছর। কিন্তু কোন বিচিত্র আকস্মিক ঘটনার ফলে সে মূর্তি কারও চোখে ধরা পড়ল না। তার অভিনয় এখনও শেষ হয় নি। যে মানুষটি দশ বছর আগে এবং পরের এক বছর ছিল একটি সমাজচ্যুত দুষ্কৃতকারী তাকে পাঠানো হল জাহাজে ফ্রান্স থেকে দু দিনের পথ একটা দ্বীপে; যেকারণেই হোক সেই দ্বীপটিকে তার রাজ্য হিসাবেই উপহার দেওয়া হল, তার জন্য রক্ষীর ব্যবস্থা করা হল, লক্ষ লক্ষ টাকা তাকে দেওয়া হল।

অধ্যায়—৪

জাতিসমূহের বন্যাস্রোত স্বাভাবিকখাতেই ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল। প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ স্তিমিত হয়ে এলেও তার শান্ত বুকে গড়ে উঠল অনেক ঘূর্ণাবর্ত, আর তাতে ভেসে বেড়াতে লাগল সেইসব কূটনীতিকের দল যাদের ধারণা তারাই বন্যাস্রোতকে স্তিমিত করেছে।

কিন্তু সমুদ্রের শান্ত বুক আবার সহসা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল; কূটনীতিকরা মনে করল, তাদের মতবিরোধিতাই প্রাকৃতিক শক্তির এই নতুন চাপের কারণ; তাদের ধারণা হল রাষ্ট্র-প্রধানদের মধ্যে আবার যুদ্ধ বাধবে; সে সংকটের কোন সমাধান নেই। কিন্তু সে ক্রমবর্ধমান তরঙ্গাভিঘাত তাদের প্রত্যাশিত অঞ্চল থেকে এল না। এল আগের মত সেই একই কেন্দ্র থেকে—এল প্যারিস থেকে। পশ্চিম থেকে দেখা দিল শেষ উল্টো টান: যে কূটনৈতিক সমস্যা ছিল আপাতবিচারে অনতিক্রমণীয় সেই উল্টো টানেই তার সমাধান হয়ে গেল; ইতিহাসের সেই অধ্যায়ের সামরিক অভিযানের অবসান ঘটল।

যে মানুষটি ফ্রান্সকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছিল সে ফ্রান্সে ফিরে এল একেবারে একা—কোন ষড়যন্ত্র করে নয়, কোন সৈন্য সঙ্গে নিয়ে নয়। তখন যেকোন রক্ষী তাকে বন্দী করতে পারত; কিন্তু কি এক বিচিত্র কারণে কেউ তা করল না; আগের দিন পর্যন্ত যে মানুষটিকে সকলে অভিশাপ দিয়েছে এবং একমাস পরে আবার অভিশাপ দেবে, তাকেই সকলে মহা উৎসাহে স্বাগত জানাল।

একটা সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য সে মানুষটিকে আজও প্রয়োজন।

সে কাজ সম্পন্ন হল।

শেষ ভূমিকার অভিনয় শেষ হল। অভিনেতাকে বলা হল: এবার রাজবেশ খুলে ফেল, মুখের পাউডার ও রং ধুয়ে ফেল। তাকে আর দরকার হবে না।

কয়েক বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে নিজের দ্বীপে একান্ত নির্জনে একটি করুণ হাসির নাটকে সে অভিনয় করে চলেছে; নিজের অতীত কর্মধারার কোন সমর্থনের আর কোন প্রয়োজন না থাকলেও ষড়যন্ত্র ও মিথ্যা ভাষণের দ্বারা তাকেই সমর্থন করে চলেছে। সারা জগতের কাছে এতদিনে এই সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যতদিন পর্যন্ত একটি অদৃশ্য হাত তাকে পরিচালিত করেছে ততদিন মানুষ যাকে ক্ষমতাবলে ভুল করেছিল আসলে সেটা কি ছিল।

এবার নাটকের যবনিকা ফেলে দিয়ে এবং অভিনেতার সব সাজ-পোশাক খুলে ফেলে ম্যানেজার তাকে আমাদের সামনে এনে হাজির করল।

"দেখুন, কাকে আপনারা বিশ্বাস করেছিলেন! এই তো সেই লোক! এখন কি বুঝতে পেরেছেন যে আপনাদের যে মুগ্ধ করেছিল সে ঐ লোক নয়, সে আমি?"

কিন্তু ঘটনার তীব্রতায় হতচকিত হওয়ায় এ সত্য উপলব্ধি করতে মানুষের অনেক দেরি হয়ে গেল।

এর চাইতেও অধিকতর সামঞ্জস্য ও অনিবার্যতা চোখে পড়ে পূব থেকে পশ্চিমে পাল্টা আক্রমণের নায়ক প্রথম আলেক্সান্দারের জীবনে।

পূব-পশ্চিম অভিযানের নায়ক হিসাবে সে যখন অন্য সবাইকে ছাড়িয়ে মাথা তুলেছিল তখন তার কি কি গুণ থাকা দরকার ছিল?

দরকার ছিল ন্যায়বোধ ও ইয়োরোপীয় ঘটনাবলীর প্রতি সহানুভূতির; কিন্তু ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বারা আচ্ছন্ন গতানুগতিক সহানুভূতি নয়; তৎকালের যেসব রাষ্ট্রপ্রধান তার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল তাদের অপেক্ষা উন্নত নৈতিক চরিত্র; একটি শান্ত, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব; আর নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ক্ষোভ। প্রথম আলেক্সান্দারের চরিত্রে এ সবই ছিল; অসংখ্য তথাকথিত আকস্মিক যোগাযোগ তার জীবনে এসবই গড়ে দিয়েছিল: তার শিক্ষা, প্রথম জীবনের উদারনৈতিক মতবাদ, চারদিকের পরামর্শদাতার দল, আর অস্তারলিজ, তিলজিট, ও এরফুর্ট।

জাতীয় যুদ্ধের সময়ে সে নিষ্ক্রিয় ছিল, কারণ তখন তাকে প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু যেমুহূর্তে একটি ব্যাপক ইয়োরোপীয় যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠল, সেইমুহূর্তেই সে স্বস্থানে আবির্ভূত হয়ে ইয়োরোপের দেশগুলিকে সংঘবদ্ধ করে লক্ষ্যপথে এগিয়ে নিয়ে গেল।

লক্ষ্যে পৌঁছনো হল। ১৮১৫-র চূড়ান্ত যুদ্ধের পরে সর্বরকম সম্ভবপর ক্ষমতা আলেক্সান্দারের করায়ত্ত হল। কিন্তু সে ক্ষমতাকে সে কিভাবে ব্যবহার করল?

প্রথম আলেক্সান্দার ইয়োরোপে শান্তির প্রতিষ্ঠাতা, প্রথম জীবন থেকেই নিজের দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট, পিতৃভূমিতে নব নব উদারনৈতিক চিন্তাধারার প্রবর্তক। তার হাতে এখন সর্বাধিক ক্ষমতা। দেশের মানুষের কল্যাণ সাধনের এই তো উপযুক্ত সময়। সুদূর দ্বীপে বসে নির্বাসিত নেপোলিয়ন ছেলেমানুষের মত মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে কেমন করে সে মানবজাতিকে সুখের পথ দেখাতে পারত। প্রথম আলেক্সান্দারের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে, ঈশ্বরের হাত নেমেছে তার মাথায়; অথচ সহসা তার মনে হল, এ ক্ষমতা অতি তুচ্ছ; তাই দূরে সরে গিয়ে সব ক্ষমতা সে তুলে দিল সেইসব নগণ্য মানুষদের হাতে যাদের সে এতকাল ঘৃণা করে

এসেছে। মুখে একমাত্র কথা :

"আমাদের জন্য নয়, আমাদের জন্য নয়, সব কিছু উৎসর্গিত হোক তোমারই নামে !···তোমাদের সকলের মতই আমিও তো মানুষ। মানুষের মতই আমাকে বাঁচতে দাও ; আত্মা ও ঈশ্বরের কথা চিন্তা করতে দাও।"

সূর্য এবং প্রতিটি পরমাণু যেমন একাধারে একটি সম্পূর্ণ জগৎ আবার একটা সমগ্র সত্তার অংশমাত্র, তেমনই প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব আদর্শ ও লক্ষ্যের বাহক হয়েও মানব বুদ্ধির অতীত একটি সাধারণ আদর্শের ও লক্ষ্যের বাহক।

একটি মৌমাছি ফুলের উপর বসতে গিয়ে একটি শিশুর শরীরে হুল ফুটিয়ে দিল। সেই থেকে শিশুটি মৌমাছিকে ভয় পায় ; বলে যে মানুষের শরীরে হুল ফোটাতেই মৌমাছির জন্ম। মৌমাছিকে ফুলের পাপড়ি থেকে মধু সংগ্রহ করতে দেখে কবি তার প্রশংসা করে, আবার একথাও বলে যে ফুলের গন্ধ লুটতেই মৌমাছির জন্ম। ফুল থেকে পরাগ সংগ্রহ করে মৌমাছি যখন তাকে মৌচাকে বয়ে নিয়ে যায় তখন একজন মৌমাছি-পালক বলে যে মধু-সংগ্রহ করাই মৌমাছির কাজ। আবার অন্য একজন মৌমাছি-পালক যে মৌমাছির জীবনযাত্রা ভালভাবে লক্ষ্য করেছে সে বলে, মৌমাছি পরাগ-রেণু সংগ্রহ করে বাচ্চা মৌমাছিকে খাওয়াতে এবং মক্ষীরাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে ; বংশবৃদ্ধির জন্যই তার জন্ম। একজন উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী দেখে, একটি মৌমাছি পুং-পুষ্প থেকে পরাগ সংগ্রহ করে উড়ে গিয়ে তাকে গর্ভকেশরে স্থাপন করে ; তার কাছে এটাই মৌমাছি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। অপর একজন উদ্ভিদের স্থানান্তরে গমনের ঘটনায় মৌমাছির সহযোগিতাকে লক্ষ্য করে বলে যে সেটাই মৌমাছির জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু প্রথম, দ্বিতীয়, অথবা তৃতীয়—মানুষের বুদ্ধিগত কোন কর্মধারাই মৌমাছির জীবনের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। এইসব উদ্দেশ্যের সন্ধানে মানুষের বুদ্ধি যত উপরে উঠতে থাকে ততই একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে চরম লক্ষ্য আমাদের বুদ্ধির অতীত।

মৌমাছির জীবনের সঙ্গে জীবনের আত্মপ্রকাশের অন্য মাধ্যমগুলির সম্পর্কটাই একমাত্র জিনিস মানুষের বুদ্ধি যাকে ধরতে পারে। ঐতিহাসিক চরিত্র ও জাতিসমূহের উদ্দেশ্যের বেলায়ও একথা সমান সত্য।

অধ্যায়—৫

১৮১৩ সালে বেজুখভের সঙ্গে নাতাশার বিয়েই প্রাচীন রস্তভ-পরিবারের শেষ সুখের ঘটনা। কাউন্ট ইলিয়া রস্তভ সেই বছরই মারা গেল ; আর

সর্বত্র যেরকম ঘটে থাকে, পিতার মৃত্যুর পরেই পারিবারিক বন্ধনও ভেঙে পড়ল।

আগের বছরের নানা ঘটনা : মস্কোর অগ্নিকাণ্ড ও সেখান থেকে পলায়ন, প্রিন্স আন্‌দ্রুর মৃত্যু, নাতাশার হতাশা, পেত্‌য়ার মৃত্যু, ও বৃদ্ধা কাউণ্টেসের শোক—আঘাতের পর আঘাত হানলো বুড়ো কাউণ্টের মাথায়। এসব ঘটনার কোন তাৎপর্যই সে বুঝতে পারল না ; আধ্যাত্মিক প্রশান্তির সঙ্গে সে পক্বকেশ মাথাটাকে নোয়াল ; যেন প্রার্থনা করল আরও আঘাত এসে তাকে শেষ করে দিক। তাকে কখনও মনে হত ভয়ার্ত ও হতবুদ্ধি, আবার কখনও মনে হত অসম্ভব রকমের জীবন্ত ও উদ্যমশীল।

নাতাশার বিয়ের ব্যবস্থাদি নিয়ে বেশ কিছুদিন ব্যস্ত থাকল। ডিনার ও সাপারের আয়োজন করল ; সবসময়ই চেষ্টা করত হাসি খুশি থাকতে ; কিন্তু যারা তাকে জানত, তাকে ভালবাসত তারা সবই বুঝত, বৃদ্ধকে করুণার চোখে দেখত।

পিয়ের ও তার স্ত্রী চলে গেলে সে খুবই চুপচাপ হয়ে গেল ; সব সময়ই বলতে লাগল, কিছুই তার ভাল লাগে না। কয়েকদিন পরেই সে অসুস্থ হয়ে বিছানা নিল। ডাক্তার যতই আশা দিক, প্রথম থেকেই সে জানত যে আর কোনদিনই সে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। কাউণ্টেস পোশাক না ছেড়েই তার বালিশের পাশে একটা হাতল-চেয়ারে বসে পক্ষকাল কাটিয়ে দিল। যতবার কাউণ্টকে ওষুধ খাওয়ায় ততবারই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে নিঃশব্দে তার হাতে চুমো খেত। শেষ দিনেও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাদের সম্পত্তি নষ্ট করার জন্য কাউণ্টেসের কাছে, তাদের অনুপস্থিত ছেলের কাছে ক্ষমা চাইত—তার ধারণা তাদের কাছে সেটাই তার প্রধান অপরাধ। অনুষ্ঠানাদির পরে সে শান্তভাবে মারা গেল ; পরদিন দলে দলে পরিচিত লোকজন এসে মৃতের প্রতি তাদের শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে গেল। জীবিতকালে তারাই কাউণ্টকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলেও এখন সকলেই বলল : "যাই বল না কেন কাউণ্ট খুবই যোগ্য লোক ছিলেন। আজকাল এরকম লোক চোখে পড়ে না।...নিজ নিজ দুর্বলতা আমাদের কার না আছে ?"

বাবার মৃত্যু-সংবাদ যখন নিকলাসের কাছে পৌঁছল তখন সে রুশ বাহিনীর সঙ্গে প্যারিসে ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কমিশন থেকে পদত্যাগ করে পদত্যাগ-পত্র গৃহীত হবার জন্য অপেক্ষা না করেই সে ছুটি নিয়ে মস্কো চলে গেল। কাউণ্টের মৃত্যুর একমাস পরেই তার আর্থিক অবস্থা পরিষ্কার বোঝা গেল। তার যেসব ছোটখাট ধার-দেনার কথা কেউ সন্দেহই করে নি তাই যখন সর্বসাকুল্যে একটা মোটা অংক হয়ে দেখা দিল, তখন সকলেই বিস্মিত হল। ঋণের পরিমাণ সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ।

বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়রা নিকলাসকে উত্তরাধিকার অস্বীকার করার পরামর্শ

দিল। কিন্তু এই অস্বীকৃতি তার পিতার পবিত্র স্মৃতিকে কলংকিত করবে এ-কথা ভেবে সেসব পরামর্শ বাতিল করে দিয়ে সে উত্তরাধিকার এবং সেই সঙ্গে ঋণ-পরিশোধের দায়কে স্বীকার করে নিল।

যেসব পাওনাদার এতকাল চুপ করে ছিল এবার তারা সদলে এসে যার যার পাওনা-গণ্ডা দাবী করতে লাগল। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যা ঘটে থাকে, কার আগে কে পাওনা বুঝে পাবে তাই নিয়ে পাওনাদারদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। নিকলাসকে কেউ এতটুকু রেহাই দিল না, শান্তি দিল না; এতকাল যারা বুড়ো মানুষটিকে করুণা করে এসেছে তারাই উত্তরাধিকারী যুবকটিকে নির্মমভাবে ছেঁকে ধরল।

নিকলাসের কোন পরিকল্পনাই সফল হল না। নিলামে সম্পত্তি বিক্রি হয়ে গেল অর্ধেক মূল্যে; অর্ধেক ঋণ তখনও বাকি রয়ে গেল। ভগ্নিপতি বেজুখভ যে ত্রিশ হাজার রুবল দিল নিকলাস সেটা হাত পেতে নিল। অবশিষ্ট ঋণের দায়ে পাছে জেল খাটতে হয় তাই সে নতুন করে সরকারী চাকরি গ্রহণ করল।

পরবর্তী শূন্য পদেই তাকে কর্ণেল করা হবে জেনেও সে সেনাবাহিনীতে ফিরে যেতে পারল না, কারণ জীবনের একমাত্র অবলম্বন হিসাবে মা তাকে সম্পূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরল; কাজেই পরিচিত লোকজনের মাঝখানে মস্কোতে বাস করতে যত অনিচ্ছাই থাকুক, সিভিল সার্ভিসের চাকরিকে যতই ঘৃণা করুক, তবু মস্কোতে সেই চাকরিতেই সে ঢুকল, অতি প্রিয় সামরিক পরিচ্ছদ খুলে ফেলে মাকে ও সোনিয়াকে নিয়ে মস্কোর দরিদ্র পল্লী সিভ্‌ৎসেভ ভ্রাঝেক-এর একটা ছোট বাড়িতে গিয়ে উঠল।

সেসময় নাতাশা ও পিয়ের পিতার্সবুর্গে বাস করছিল; নিকলাসের অবস্থার কোন স্পষ্ট ধারণা তাদের ছিল না। ভগ্নিপতির কাছ থেকে টাকা ধার নেওয়ার জন্য নিজের শোচনীয় অবস্থাটা তার কাছ থেকে গোপন রাখতেই সে চেষ্টা করেছিল। তার অবস্থা আরও সংকটজনক হয়ে উঠল কারণ বারো শ' রুবল মাস-মাইনেতে তাকে যে মার, সোনিয়ার ও নিজের খরচ চালাতে হচ্ছে তাই শুধু নয়, তাদের দারিদ্র্যের খবরটা মার কাছ থেকে লুকিয়েও রাখতে হচ্ছে। যে বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে কাউণ্টেস শৈশব থেকে লালিত-পালিত হয়েছে তাকে বাদ দিয়ে জীবন ধারণ করার কথা সে ভাবতেই পারে না; কাজেই ছেলের পক্ষে কতটা কষ্টকর হতে পারে সেটা না বুঝেই কাউণ্টেস কোন বান্ধবীকে বাড়িতে ডেকে আনতে গাড়ি পাঠাতে বলে (এখন তাদের নিজেদের গাড়ি নেই), কখনও বা নিজের জন্য হুকুম করে দামী খাবারের, ছেলের জন্য মদের, অথবা হয় নাতাশার জন্য, নয় তো সোনিয়ার জন্য, না হয় নিকলাসের জন্যই কোন দামী উপহারের দরুন টাকার জন্য চাপ দেয়।

সোনিয়া সংসার চালায়, মাসির সেবা করে, তাকে পড়ে শোনায়, তার

খেয়াল ও বদমেজাজ সহ্য করে, এবং কাউণ্টেসের কাছ থেকে সংসারের দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখতে নিকলাসকে সাহায্য করে। তার মার জন্য সোনিয়া যা করছে সেজন্য নিকলাস তার প্রতি অপরিশোধ্য ঋণ অনুভব করে, তার ধৈর্য ও সেবার প্রশংসা করে, কিন্তু সব সময় তার কাছ থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে।

নিকলাসের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয়তর হতে লাগল। মাস-মাইনে থেকে কিছু উদ্বৃত্ত রাখা স্বপ্নবৎ অলিক। কিছু জমাতে তো পারেই না, বরং মার দাবী-দাওয়া মেটাতে তাকে কিছু কিছু ধার-দেনাও করতে হয়। কিছু কিছু আত্মীয়ার পরামর্শমত কোন ধনবতী নারীকে বিয়ে করার কথা সে ভাবতেই পারে না। মুক্তির আর একটা পথ—মায়ের মৃত্যুর কথা কখনও তার মাথায়ই আসে নি। তার কোন কামনা নেই, কোন কিছুই সে আশা করে না। নিজের অবস্থাকে নীরবে সহ্য করতে পারার মধ্যেই সে মনে মনে একটা কঠোর সন্তুষ্টি অনুভব করে। পুরনো পরিচিত জন, তাদের সহানুভূতি ও সাহায্যের প্রস্তাব—সব কিছুকেই সে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করে। এড়িয়ে চলে সব রকম আমোদ-প্রমোদ ও সাধ-আহ্লাদ। এমন কি বাড়িতেও মার সঙ্গে তাস খেলা, ঘরময় পায়চারি করা, এবং একটার পর একটা পাইপ ধরানো ছাড়া আর কিছুই করে না। মনের মধ্যে সেই বিষণ্ণতাকেই সযত্নে লালন করে একমাত্র যার সাহায্যে এই দুরবস্থাকে সে সহ্য করতে পারে।

অধ্যায়—৬

শীতের গোড়াতেই প্রিন্সেস মারি মস্কোতে এল। শহরে প্রচলিত আলোচনা থেকেই সে রস্তভদের অবস্থা জানতে পারল, জানতে পারল "মায়ের জন্য ছেলের আত্মত্যাগের কথা।"

নিকলাসের প্রতি গভীর প্রীতিবশত মারি নিজের মনেই বলল, "তোমার কাছ থেকে এছাড়া অন্য কিছু আমি কখনও আশা করি নি।" নিজেকে সে রস্তভ পরিবারেরই একজন বলে মনে করে। তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে সে ভাবল, এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে একবার দেখা করা তার কর্তব্য। কিন্তু ভরোনেঝ-এ নিকলাসের সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্মরণ করে সেকাজ করার সাহস তার হচ্ছিল না। তবু মস্কোতে আসার কয়েক-সপ্তাহ পরে অনেক চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

নিকলাসের ঘরের ভিতর দিয়েই কাউণ্টেসের ঘরে যাবার পথ; নিকলাসের সঙ্গেই তার প্রথম দেখা হল। প্রিন্সেস মারি আশা করেছিল নিকলাস তাকে সাদরেই গ্রহণ করবে, কিন্তু তার পরিবর্তে প্রথম দৃষ্টিতেই তার চোখে এমন একটা নিরাসক্ত, কঠিন, ও গর্বিতভাব দেখতে পেল যা সে

আগে কখনও দেখে নি। নিকলাস তার স্বাস্থ্যের কথা জানতে চাইল, মার ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে পাঁচ মিনিট বসেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রিন্সেস কাউণ্টেসের ঘর থেকে বেরিয়ে এলে নিকলাস আবার তার সঙ্গে দেখা করল, গম্ভীর, কঠিন মুখে তাকে নিয়ে বাইরের ঘরে গেল। মার স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে কোন জবাবই দিল না। তার চোখ-মুখ দেখে মনে হল যেন বলতে চায়: "তাতে তোমার কি দরকার? আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।"

প্রিন্সেসের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবার পরে সোনিয়াকে সামনে পেয়ে নিকলাস সোচ্চারে বলে উঠল, "কেন সে এখানে ঘুর্-ঘুর্ করতে আসে? কি চায় সে? এই সব মহিলা ও তাদের ভদ্রতাকে আমি সইতে পারি না।"

নিজের খুশিকে চেপে রাখতে না পেরে সোনিয়া বলে উঠল, "আঃ নিকলাস, এসব কথা তুমি বলতে পারলে কেমন করে? ও এত ভাল, আর মামণি ওকে এত ভালবাসে!"

নিকলাস জবাব দিল না, যেন প্রিন্সেসের কথা মুখেই আনতে চায় না। বুড়ি কাউণ্টেস কিন্তু সেই থেকে প্রতিদিনই বেশ কয়েকবার প্রিন্সেস মারির কথা বলে।

কাউণ্টেস তার গুণকীর্তন করে, ছেলেকে তার সঙ্গে দেখা করতে পীড়াপীড়ি করে, নিজে প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু নিকলাস সারাক্ষণ চুপ করেই থাকে। তাতে কাউণ্টেস আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে।

বলে, "মেয়েটি বড় ভাল; খাসা মেয়ে। তার কাছে গিয়ে তোমার দেখা করা উচিত। তাছাড়া, সদাসর্বদা শুধু আমাদের মুখ দেখতে তো তোমার ভাল না লাগারই কথা।"

"কিন্তু মামণি, সেখানে যাবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই।"

"একসময় তুমি সেখানে যেতে চাইতে, আর এখন চাও না। সত্যি বলছি, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। এই তোমার মন খারাপ হয়, এই তুমি কারও সঙ্গে দেখা করতে চাও না।"

"মন খারাপের কথা তো আমি কখনও বলি নি।"

"সে কি, এই তো নিজের মুখেই বললে তার সঙ্গে দেখা করতেও চাও না। ও তো খুব ভাল মেয়ে, তুমি তো সবসময়ই ওকে পছন্দ করতে, কিন্তু এখন যে হঠাৎ তোমার মাথায় কি ঢুকেছে তা তুমিই জান। আমার কাছে তুমি সব কথা লুকিয়ে চল।"

"মোটেই তা নয় মামণি।"

"তবু যদি তোমাকে কোন খারাপ কাজ করতে বলতাম—তোমাকে তো বলছি ভদ্রতার খাতিরে তার সঙ্গে একবার দেখা করতে। সৌজন্যের খাতিরেই তো সেটা করা দরকার…। ঠিক আছে, আমার বলা আমি বললাম,

এরপরেও যদি মার কাছ থেকে লুকোবার মত কোন গোপন কথা তোমার থাকে তো আমি তার মধ্যে নাক গলাতে চাই না।"

"বেশ তো, তুমি যদি চাও তো আমি যাব।"

"এটা তো আমার কোন ব্যাপার নয়। তোমার জন্যই কথাটা বলছি।"

নিকলাস দীর্ঘশ্বাস ফেলল, গোঁফ কামড়াল, তারপর মার মনটাকে অন্য দিকে ঘোরাতে তাস নিয়ে পেশেন্সের ছক বিছিয়ে দিল।

পরদিন সেই একই সংলাপের পুনরাবৃত্তি ঘটল; তার পরের দিন, এবং তারও পরের দিন।

রস্তভ পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে নিকলাসের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত রকমের শীতল অভ্যর্থনার পরে প্রিন্সেস মারিও নিজের কাছে স্বীকার করল যে প্রথম দেখা করতে না যাওয়াটাই তার উচিত ছিল।

আত্ম-গর্বে সে নিজেকে বোঝাল, "এছাড়া আর কিছু তো আমি আশা করি নি। তার কাছে তো আর কোন দরকার ছিল না। আমি গিয়েছিলাম বৃদ্ধা মহিলাটির সঙ্গে দেখা করতে; তিনি আমাকে চিরদিনই ভালবাসেন, তার কাছে আমি অনেক দিক থেকে দায়বদ্ধ।"

মধ্যশীতের একটা দিন। পড়ার ঘরে বসে সে ভাই-পোকে পড়াচ্ছিল, এমন সময় খবর এল রস্তভ এসেছে দেখা করতে। মনে মনে সংকল্প করল, কিছুতেই ধরা দেবে না, মনের উত্তেজনা কোন মতেই প্রকাশ করবে না। মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে বৈঠকখানায় গেল।

নিকলাসের মুখের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাতেই প্রিন্সেস মারি বুঝতে পারল শুধুমাত্র সৌজন্যের খাতিরেই সে এসেছে; তাই নিজের স্বর সে মোটেই পাল্টাল না।

দুজনের মধ্যে কথা হল কাউন্টেসের স্বাস্থ্য নিয়ে, বন্ধুদের নিয়ে, যুদ্ধের সর্বশেষ সংবাদ নিয়ে। তারপর দশ মিনিট পরে ভদ্রতার পাট চুকে যেতেই নিকলাস বিদায় নিতে উঠে দাঁড়াল।

মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁর সহায়তায় প্রিন্সেস বেশ ভালভাবেই কথাবার্তা চালিয়ে গেল; কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে নিকলাস যখন উঠে দাঁড়াল তখন যেন অসম্ভব একটা ক্লান্তি তাকে ঘিরে ধরল, মনে প্রশ্ন জাগল কেন সে জীবনে সুখের মুখ দেখতে পাবে না; অন্যমনস্কভাবে সে চুপ করে বসে রইল, উজ্জ্বল চোখ দুটি সামনের দিকে নিবদ্ধ, নিকলাস যে উঠে দাঁড়িয়েছে সেটাও সে লক্ষ্য করে নি।

নিকলাস তার দিকে তাকাল; হঠাৎ প্রিন্সেসের জন্য তার নিজেরই দুঃখ হল, মনে হল প্রিন্সেসের এই দুঃখের জন্য হয়তো সে নিজেই দায়ী। ইচ্ছা হল প্রিন্সেসকে একটু সাহায্য করে, কিছু ভাল কথা বলে, কিন্তু বলার মত কিছুই খুঁজে পেল না।

বলল, "বিদায় প্রিন্সেস!"

প্রিন্সেস চমকে উঠল, তার মুখ লাল হয়ে উঠল, গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে বলল, "মাফ্ করবেন, আপনি কি সত্যি চলে যাচ্ছেন কাউণ্ট? বেশ, তাহলে বিদায়! আরে, কাউণ্টেসের জন্য যে একটা কুশন দরকার!"

"একটু অপেক্ষা কর, আমি এনে দিচ্ছি," বলে মাদ্‌ময়জেল বুরিয়েঁ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দুজনই চুপ। মাঝে মাঝে একে অন্যকে দেখছে।

অবশেষে নিকলাস বিষণ্ণ হেসে বলল, "হ্যাঁ প্রিন্সেস; বগুচারোভোতে আমাদের শেষ সাক্ষাতের পরে খুব বেশী দিন পার হয় নি, হয়তো এরই মধ্যে কত জলই না গড়িয়ে গেছে। তখন আমরা সকলে কী দুঃখেই না পড়েছিলাম, অথচ সেই দিনগুলোকে ফিরিয়ে আনতে অনেক কিছু দিতেই আমি প্রস্তুত। ··কিন্তু সেদিন আর ফিরবে না।"

প্রিন্সেস মারি উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে একদৃষ্টিতে নিকলাসের দিকে তাকাল। যেন তার কথাগুলির গোপন তাৎপর্যকে বুঝতেই চেষ্টা সে করছে। বলল, "ঠিক, ঠিক. কিন্তু অতীতের জন্য অনুশোচনা করার কোন কারণ তো আপনার নেই। আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি তাতে তো মনে হয় খুশির সঙ্গেই আপনি সে দিনকে স্মরণ করবেন, কারণ যে আত্মত্যাগের দ্বারা সে জীবন পরিপূর্ন···"

নিকলাস তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিয়ে বলল, "আপনার প্রশংসা আমি মেনে নিতে পারলাম না; বরং নিজেকে আমি অবিরাম তিরস্কার করেই চলেছি।···কিন্তু না, এবিষয়টি মনের মতও নয়, সুখেরও নয়।"

নিকলাসের মুখে পুনরায় আগেকার মতই কাঠিন্য ও শীতলতা ফুটে উঠল। কিন্তু যে মানুষটিকে প্রিন্সেস জানত ও ভালবাসত তার দেখা সে এর মধ্যেই পেয়ে গেছে। তাকে উদ্দেশ করেই সে বলতে লাগল:

"ভেবেছিলাম একথা বলবার অনুমতি আপনি আমাকে দেবেন। আপনার···এবং আপনার পরিবারের অন্য সকলের এত কাছে আমি এসেছিলাম যে ভেবেছিলাম আমার সহানুভূতিকে আপনি ভুল বুঝবেন না; কিন্তু আমারই ভুল হয়েছিল।" হঠাৎ তার গলা কাঁপতে লাগল, "কেন জানি না আপনি যেন বদলে গেছেন, আর···"

"এ কেনর হাজার কারণ আছে,"—নিকলাস "কেন" কথাটার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলল। "ধন্যবাদ প্রিন্সেস; অনেক সময়ই এটা কষ্টের।"

"তাহলে এটাই কারণ! এটাই কারণ!" প্রিন্সেস মারির বুকের মধ্যে কে যেন ফিস্‌ফিস্ করে বলল। "না, শুধু এই সদয়, হাসিখুশি, খোলামেলা

দৃষ্টিকে, শুধু এই সুন্দর বহিরারণকে তো আমি ভালবাসি নি। ভালবেসেছি তার মহৎ, স্থিতপ্রজ্ঞ, আত্মত্যাগী মনকেও। ঠিক, সে এখন গরীব আর আমি ধনী···হাঁ, সেটাই একমাত্র কারণ···হ্যাঁ, তা যদি না হত···” নিকলাসের আগেকার মমতা স্মরণ করে এবং এখনকার বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা তার শীতল ব্যবহারের কারণটা সে বুঝতে পারল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই নিকলাসের আরও কাছে সরে গিয়ে প্রিন্সেস মারি প্রায় চীৎকার করে বলে উঠল, “কিন্তু কেন, কাউণ্ট কেন? আমাকে বলুন। আপনাকে বলতেই হবে।”

নিকলাস নীরব।

প্রিন্সেস বলতে লাগল, “আপনার কেনগুলি আমি বুঝতে পারছি না কাউণ্ট, কিন্তু স্বীকার করছি···আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি। যেকারণেই হোক আপনার সঙ্গে আমার যে বন্ধুত্ব ছিল তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছেন। আর সেখানেই আমার দুঃখ।” তার কণ্ঠ অশ্রুসিক্ত, দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ: “জীবনে সুখের মুখ এত অল্প দেখেছি যে যা কিছু হারাই তাই আমার কাছে সহ্যের অতীত।···মাফ করবেন, বিদায়!” সহসা কেঁদে উঠে সে দ্রুতপায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাকে থামাবার চেষ্টায় নিকলাস ডাকল, “প্রিন্সেস, ঈশ্বরের দোহাই! প্রিন্সেস!”

প্রিন্সেস ঘুরে দাঁড়াল। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল—আর যা মনে হয়েছিল অসম্ভব ও অনেক দূরে তাই সহসা হয়ে উঠল সম্ভব, অনিবার্য, অনেক কাছে।

অধ্যায়—৭

১৮১৩-র শীতকালে নিকলাস প্রিন্সেস মারিকে বিয়ে করে স্ত্রী, মা ও সোনিয়াকে নিয়ে বল্ড হিল্‌স্-এ চলে গেল।

স্ত্রীর সম্পত্তির এতটুকুও বিক্রি না করে চার বছরের মধ্যে বাকি ঋণ শোধ করে দিল এবং একজন জ্ঞাতির মৃত্যুতে উত্তরাধিকারসূত্রে একটা ছোট সম্পত্তি পেয়ে পিয়েরের ঋণটাও শোধ করে দিল।

আরও তিন বছরে ১৮২০ সালের মধ্যেই সব কিছু এমনভাবে ব্যবস্থা করল যাতে বল্ড হিল্‌স্ সংলগ্ন একটা ছোট সম্পত্তি সে কিনে ফেলল, এবং জীবনের একমাত্র প্রিয় স্বপ্ন অত্রাদ্‌নুকে আবার কিনে নেবার জন্য আলোচনা শুরু করে দিল।

প্রয়োজনের তাগিদে খামারের কাজে হাত দিয়ে সেকাজটা তার এতই

ভাল লেগে গেল যে এখন সেটাই তার প্রিয় এবং প্রায় একমাত্র কাজ হয়ে উঠেছে। নিকলাস খুব সাদাসিদেভাবে খামার চালায়ঃ বর্তমানে প্রচলিত নতুন নতুন বিলাতি চাষ-ব্যবস্থা সে পছন্দ করে না। নিজের ক্ষেতে ফসল বোনা ও খড় কাটার মত যন্ত্র নিয়েই সে অন্য চাষীদের ক্ষেতে ফসল বোনা ও খড় কাটার ব্যবস্থা করে দিত। ফলে চাষীদের সহযোগিতায় নিকলাসের ফসল বোনা ও ফসল কাটা এত ভালভাবে এবং এত আগে আগে হয়ে যেত যা অন্য কোন জমির মালিকের বেলায়ই সম্ভব হত না।

পারিবারিক ভূমিদাসদের—তাদের সে বলত "ড্রোণ"—কাজে লাগানো সে পছন্দ করত না। সকলেই বলত, লাই দিয়ে-দিয়ে সে তাদের মাথাটি খেয়েছে। কখনও কোন ভূমিদাসকে শাস্তি দেবার দরকার হলে সে যে কি করবে তাই বুঝে উঠত না, আর বাড়ির সকলের সঙ্গেই তা নিয়ে পরামর্শ করত অবশ্য চাষীদের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নিতে সে কখনও ইতস্তত বোধ করত না। সে জানত সে যাই করুক সব চাষীরাই সেটা মাথা পেতে নেবে। চারদিকে নিকলাসের জয়-জয়কার পড়ে গেল। তার লোকবল দ্রুত বাড়তে লাগল: পার্শ্ববর্তী সব জমিদারি থেকে ভূমিদাসরা এসে তার কাছে ধর্না দিত বিক্রি হবার জন্য। তার মৃত্যুর অনেকদিন পরেও তার সুশাসনের স্মৃতি ভূমিদাসরা সসম্মানে নিজ নিজ অন্তরে রক্ষা করে চলত। "তিনি তো কর্তার মত কর্তা···প্রথমে চাষীদের কাজ, তারপর নিজের। অবশ্য কোন কিছুকেই তিনি অবহেলা করতেন না—একথায় তিনিই তো ছিলেন সত্যি-কারের কর্তা!"

অধ্যায়—৮

পরিচালনাসংক্রান্ত একটা বিষয় নিয়ে নিকলাস মাঝে মাঝে চিন্তিত বোধ করত—সেটা তার বদমেজাজ আর ঘুষি চালানোর অনেকদিনের হুজারী অভ্যাস। প্রথম প্রথম সে এতে দোষের কিছু দেখতে পেত না, কিন্তু বিয়ের দ্বিতীয় বছরেই এধরনের দণ্ডবিধানের ব্যাপারে হঠাৎ তার মতটা বদলে গেল।

একবার গ্রীষ্মকালে সে বগুচারেভোর গ্রাম-প্রধানকে ডেকে পাঠাল। তার বিরুদ্ধে ছিল অন্যায় আচরণ ও নানারকম বিধিবহির্ভূত কাজের অভিযোগ। নিকলাস বাইরে গেল তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। গ্রাম-প্রধান কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবার পরেই চেঁচামেচি ও ঘুষির শব্দ শোনা গেল। প্রাতরাশে যোগ দিতে এসে নিকলাস স্ত্রীর কাছে গেল। স্ত্রী তখন সেলাইয়ের ফ্রেমটার উপর ঝুঁকে বসে ছিল। সকালে সে কি কি করেছে তার ফিরিস্তি

দিতে গিয়ে নিকলাস বগুচারেভোর গ্রাম-প্রধানের কথাও বলল। কাউণ্টেস মারির মুখ প্রথমে রক্তবর্ণ ও পরে বিবর্ণ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে ঠোঁট চেপে সে বসে রইল। স্বামীর কোন কথার জবাবই দিল না।

গ্রাম-প্রধানের কথা মনে হতেই রেগে টং হয়ে নিকলাস চেঁচিয়ে বলল, "লোকটা এত বেহায়া আর পাজী। যদি আমাকে বলত যে মদ খেয়েছিল বলে সে কিছু দেখাশোনা করতে পারে নি···আরে, তোমার কি হয়েছে মারি ?" হঠাৎ নিকলাস প্রশ্ন করল।

কাউণ্টেস মারি মাথা তুলে কি যেন বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু তখনই আবার মুখ নামিয়ে নিল ; ঠোঁট দুটি বেঁকে যেতে লাগল।

"আরে, কি হয়েছে বল না লক্ষ্মীটি ?"

চোখে জল এলে কাউণ্টেস মারিকে বড় সুন্দর দেখায়। সে তো বেদনায় বা বিরক্তিতে কখনও কাঁদে না, কাঁদে দুঃখে ও করুণায়, আর তখনই তার দুটি উজ্জ্বল চোখে ফুটে ওঠে এক দুর্বার মোহ।

নিকলাস তার হাতটা ধরতেই সে আর নিজেকে সামলাতে পারল না ; কাঁদতে শুরু করল।

"নিকলাস, আমি সব দেখেছি···সে দোষ করেছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে তুমি কেন···নিকলাস !" কাউণ্টেস মারি দুই হাতে মুখ ঢাকল।

নিকলাস কিছুই বলল না। মুখ লাল করে স্ত্রীর কাছ থেকে সরে গিয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। স্ত্রী কেন কাঁদছে তা সে বুঝতে পেরেছে, কিন্তু অন্তরের দিক থেকে তার সঙ্গে একমত হয়ে কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না যে শিশুকাল থেকে যাকে সে প্রাত্যহিক ঘটনা বলে জেনে এসেছে সেটা অন্যায় কাজ। সে নিজেকেই শুধাল : "এটা কি নেহাৎই মেয়েলিপনা, না কি তার বিচারই ঠিক ?" এ সমস্যার সমাধানের আগেই সে আর একবার স্ত্রীর ভালবাসা ও বেদনায় ভরা মুখখানির দিকে তাকাল, আর তখনই সহসা বুঝতে পারল যে তার স্ত্রীর কথাই ঠিক ; এতকাল ধরে সে নিজেই ভুল পথে চলে এসেছে।

স্ত্রীর কাছে গিয়ে ধীর গলায় বলল, "মারি, এ জিনিস আর কখনও ঘটবে না ; আমি তোমাকে কথা দিলাম।"

ক্ষমাপ্রার্থী বালকের মত সে আর একবার বলল, "কখনও না।"

কাউণ্টেসের দুই চোখে আরও বেশী করে জলের ধারা নামতে লাগল। স্বামীর হাতখানা নিয়ে তাতে চুমো খেল।

নিকলাসের আঙুলে পরা ছিল লাওকুন-এর মাথা খোদাই-করা পাথর বসানো একটা আংটি। সেটার দিকে তাকিয়ে কাউণ্টেস মারি শুধাল, "তোমার আঙুলের পাথরটা কখন ভেঙে ফেললে ?"

"আজই—ঐ একই ব্যাপার। ও মারি, সেকথা আর আমাকে মনে

করিয়ে দিও না!" নিকলাসের মুখটা আবার রাঙা হয়ে উঠল। "তোমাকে কথা দিচ্ছি, এ ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটবে না।" ভাঙা আংটিটা দেখিয়ে বলল, "আর এটাই হবে আমার প্রতিশ্রুতির স্মারক।"

তারপর থেকে গ্রাম-প্রধান অথবা নায়েবদের সঙ্গে আলোচনাপ্রসঙ্গে যখনই নিকলাসের মুখে রক্ত উঠে আসে, হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হতে শুরু করে, তখনই সে আঙুলের ভাঙা আংটিটা তুলে ধরে, আর যার উপরে সে রাগ করছিল তার সামনেই নিজের চোখ দুটো নামিয়ে আনে। কিন্তু পুরো বারোটি মাসের মধ্যে দু' একবার সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলেও গেছে; তখনই সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে সে ভুল স্বীকার করেছে এবং পুনরায় কথা দিয়েছে যে সেটাই শেষবার।

স্ত্রীকে বলত, "মারি, তুমি আমাকে ঘৃণা কর। সেটাই আমার প্রাপ্য।"

স্বামীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টায় স্ত্রী বিষণ্ণ গলায় বলত, "নিজেকে সংযত করবার মত যথেষ্ট মনের জোর যদি তোমার না থাকে, তাহলে চলে যাও, এখনই চলে যাও।"

এ তল্লাটের ভদ্রসমাজ নিকলাসকে শ্রদ্ধা করত, কিন্তু পছন্দ করত না। স্বীয় সমাজের স্বার্থ নিয়ে সে মাথা ঘামাত না, ফলে কেউ তাকে ভাবত অহংকারী, আবার কেউ ভাবত বোকা। সারা গ্রীষ্মকালটা সে খামারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকত। হেমন্তকালে চলে যেত শিকারে—একমাস, এমন কি দুমাসও বাড়ি ছেড়ে থাকত। শীতকালে অন্য গ্রামগুলি দেখতে যেত, আর পড়াশুনা করে সময় কাটাত। বেশীর ভাগ পড়ত ইতিহাসের বই, আর সে-জন্য প্রতি বছরই বেশ কিছু টাকা ব্যয় করত। এইভাবে একটা ভাল গ্রন্থাগার সে গড়ে তুলেছে; নিয়ম করে নিয়েছে, যত বই কেনা হবে সব সে পড়বে। ক্রমে পড়াটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেল; পড়তে বসলেই সে একটা বিশেষ ধরনের আনন্দ পায়। শীতকালটা বিশেষ কোন কাজে বাইরে না গেলে বাড়িতে পরিবারের সঙ্গেই কাটায়। এইভাবে স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠতে লাগল: প্রতিদিন স্ত্রীর মধ্যে আবিষ্কার করতে লাগল নব নব আত্মিক সম্পদ।

বিয়ের পর থেকে সোনিয়া নিকলাসের বাড়িতেই থাকে। বিয়ের আগে নিকলাস স্ত্রীকে সোনিয়া সম্পর্কে সব কথাই বলেছে; সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে সোনিয়ার প্রচুর প্রশংসা করেছে। প্রিন্সেস মারিকে ব'লছে, এই বোনটির প্রতি সে যেন সদয় ব্যবহার করে। কাউন্টেস মারি ভাল করেই বুঝতে পেরেছে যে নিকলাস সোনিয়ার প্রতি অবিচার করেছে; তার মনে হয়েছে, তার সম্পত্তির জন্যই নিকলাস তাকে পছন্দ করেছে। সোনিয়ার কোন দোষ সে দেখতে পায় নি। তার প্রতি ভাল ব্যবহার করতেই চেষ্টা করেছে, তবু অনেক সময় তার প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করেছে।

একসময় বন্ধু নাতাশার সঙ্গে সোনিয়ার বিষয়ে কথা প্রসঙ্গে নিজের অবিচারের কথাই তাকে বলল।

নাতাশা বলল, "কি জান, তুমি তো 'সুভাষিতাবলী' অনেক বেশী পড়েছ—তাতে একটা অনুচ্ছেদ আছে যেটা সোনিয়ার বেলায় খুব খাটে।"

"কোন্‌টা বল তো?" কাউণ্টেস মারি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল।

"যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, আর যার কিছু নেই তার কাছ থেকে সব নেওয়া হবে।" মনে পড়ে? সোনিয়া সেই মানুষ যার কিছু নেই; কেন নেই তা আমি জানি না। হয় তো আত্মসর্বস্বতার অভাব, আমি জানি না; কিন্তু তার কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, সব কিছু নেওয়া হয়েছে। অনেক সময় তার জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। আগে আমি খুব চাইতাম যে নিকলাস তাকে বিয়ে করুক, কিন্তু সব সময়ই আমার মনে কেমন যেন একটা ধারণা ছিল যে সেটা ঘটবে না। সে এক ফলহীন ফুল; কি জান—এক ধরনের স্ট্রবেরি ফুলের মত। অনেক সময় তার জন্য আমার দুঃখ হয়; আবার অনেক সময় ভাবি, সে দুঃখকে সে তোমার-আমার মত করে অনুভব করে না।"

কাউণ্টেস মারির মনে হল, সত্যি সত্যি সোনিয়া নিজের অবস্থাকে কষ্টকর বলে মনে করে না; ফলহীন ফুলের ভাগ্যকেই সে মেনে নিয়েছে। সে কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে না, ভালবাসে গোটা পরিবারকে। বিড়ালের মতই তার অনুরাগ মানুষের প্রতি নয়, বাড়ির প্রতি। সে বুড়ি কাউণ্টেসের সেবা করে, ছোটদের আদর দিয়ে নষ্ট করে, ছোটখাট সেবার জন্য সদাই প্রস্তুত থাকে, আর সকলেই বিনা কৃতজ্ঞতায়ই সে সেবা গ্রহণ করে।

বল্ড হিল্‌স্‌-এর পল্লী ভবনটাকে নতুন করে গড়া হয়েছে; অবশ্য বুড়ো প্রিন্সের আমলের মত ততটা বড় মাপে নয়। আর্থিক অসুবিধার মধ্যে অত্যন্ত সাদামাঠাভাবেই বাড়িটা তৈরি করা হয়েছে। পুরনো পাথরের ভিতের উপর প্রকাণ্ড বাড়িটা বানানো হয়েছে কাঠ দিয়ে; তার পলস্তরা করা হয়েছে কেবল ভিতরের দিকটা। নিজস্ব ভূমিদাস ছুতোর মিস্ত্রিরাই নিজেদের বার্চ কাঠ দিয়ে বানিয়েছে খুব সাধারণ শক্ত সোফা, হাতল-চেয়ার, টেবিল ও চেয়ার। বাড়িটা বেশ বড়; তাতে পারিবারিক ভূমিদাসদের জন্য ঘর আছে; আছে অতিথিদের থাকার ব্যবস্থা। রস্তভদের গোটা পরিবার এবং বল্‌কন্‌স্কিদের আত্মীয়স্বজনরা মাঝে মাঝে বল্ড হিল্‌স্‌-এ আসে ষোলটা ঘোড়া ও ডজনখানেক চাকর-বাকর নিয়ে; থাকে মাসের পর মাস। তাছাড়া, বছরে চারবার করে নামকরণ-দিবস ও জন্ম-দিবস উপলক্ষ্যে শ' খানেক অতিথি এসে দু'একটা দিন কাটিয়ে যায়। বছরের বাকি সময়টা দৈনন্দিন জীবনের বাঁধা পথ ধরেই চলে; প্রাতরাশ, লাঞ্চ, ডিনার ও সাপারের ব্যবস্থা সম্পত্তির আয় থেকেই চলে যায়।

অধ্যায়—৯

১৮২০ সালের পাঁচই ডিসেম্বর, সেণ্ট নিকলাস দিবসের সন্ধ্যা। হেমন্তের শুরু থেকেই নাতাশা স্বামী-পুত্র নিয়ে দাদার বাড়িতেই আছে। পিয়ের গেছে পিতার্সবুর্গে নিজের কাজে ; বলে গেছে সেখানে তিন সপ্তাহ থাকবে, কিন্তু প্রায় সাত সপ্তাহ কেটে গেছে ; যেকোন সময় তার ফেরার কথা।

বেজুখভ পরিবার ছাড়াও নিকলাসের প্রবীণ বন্ধু অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভাসিলি দিমিত্রিচ দেনিসভ ৫ই ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে রস্তভদের বাড়িতেই আছে।

৬ই তারিখে তার নামকরণ-উৎসব। বাড়িতে তখন অনেক অতিথির সমাগম হবে। নিকলাস জানে সেদিন তাকে নতুন পোশাক পরতে হবে, যে গির্জাটি সে নিজে তৈরি করেছে সেখানে যেতে হবে, যেসব অতিথিরা তাকে অভিনন্দন জানাতে সেখানে সমবেত হবে তাদের অভ্যর্থনা করতে হবে, তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করতে হবে, ভদ্রজনদের নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। সেদিনের সন্ধ্যাটা সে কিন্তু স্বাভাবিক কাজকর্ম নিয়েই কাটাতে ইচ্ছুক। করলও তাই। ডিনারের সময় সে বাড়ি ফিরে এল, স্ত্রীর সঙ্গে একান্তে কথা বলার সময় না থাকায় সোজা গিয়ে বসল বিশ জনের জন্য আয়োজিত লম্বা খাবারের টেবিলে। বাড়ির সকলেই তখন সেখানে হাজির। টেবিলে বসেছে তার মা, মার বান্ধবী বেলোভা, তার স্ত্রী, গভর্নেস ও শিক্ষিকাসহ তাদের তিনটি সন্তান, সোনিয়া, দেনিসভ, নাতাশা ও তার তিন সন্তান, তাদের গভর্নেস, এবং স্বর্গত প্রিন্সের স্থপতি বুড়ো মাইকেল আইভানভিচ ; অবসর নিয়ে সে বল্ড হিল্‌স্‌-এ বাস করছে।

কাউণ্টেস মারি বসেছে টেবিলের অপর প্রান্তে। স্বামীর হাবভাব দেখেই মনে হল তার মন-মেজাজ ভাল নেই। এভাবে তাকে অকারণে ক্ষুব্ধ হতে দেখে কাউণ্টেস মারি মনে আঘাত পেল, দুঃখিত হল। স্বামী কোথায় গিয়েছিল সেটা জানতে চাইল। নিকলাস জবাব দিল। স্ত্রী আবার জানতে চাইল, খামারে সব কিছু ঠিক ঠিক চলছে কি না। স্ত্রীর অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বিরক্ত হয়ে সেও ভুরু কুঁচকে তাড়াতাড়ি একটা জবাব দিল।

কাউণ্টেস মারি ভাবল, "তাহলে আমি ভুল করি নি। কিন্তু সে আমার উপর বিরক্ত হল কেন ?"

দেনিসভকে ধন্যবাদ ; সে আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দিল ; সকলে খোলা মনে কথা বলতে শুরু করল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোন কথা হল না। টেবিল ছেড়ে যাবার আগে তারা যথারীতি বুড়ি কাউণ্টেসকে ধন্যবাদ

জানাল। তারপর কাউণ্টেস মারি হাত বাড়িয়ে স্বামীর হাতে চুমো খেল; জানতে চাইল, সে রাগ করেছে কেন।

নিকলাস জবাবে বলল, "কী সব অদ্ভুত ধারণা যে তোমার মাথায় আসে। রাগ করার কথাই তো আমার মনে আসে নি।"

নিকলাস ও তার স্ত্রীর দিনগুলি সুখেই কাটছে। তাদের সুখ দেখে মাঝে মাঝে সোনিয়া ও বুড়ি কাউণ্টেসেরও ঈর্ষা হয়। তবু তার মধ্যেই দুজনের খিটিমিটিও বাধে। কাউণ্টেস মারির গর্ভাবস্থার পর থেকেই সেটা মাঝে-মাঝেই ঘটছে।

খুশি মনে বেশ শুনিয়ে শুনিয়েই নিকলাস বলল, "দেখুন মাননীয়া ভদ্র-মহোদয়া, সকাল ছ'টা থেকে ঠায় দুপায়েই তো চলছি। কাল আবার অনেক কষ্ট আছে কপালে। সুতরাং এবার একটু বিশ্রাম চাই।"

স্ত্রীকে আর একটি কথাও না বলে সে ছোট বৈঠকখানায় গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ল।

কাউণ্টেস মারি ভাবল, "সর্বদা এই তো চলেছে। আমার সঙ্গে ছাড়া আর সকলের সঙ্গেই ও কথা বলে। বুঝেছি···বুঝেছি, ওর কাছে আমি বিরক্তিকর হয়ে উঠেছি, বিশেষ করে আমার এই অবস্থায়।" সে একবার তাকাল নিজের স্ফীত উদরের দিকে, আবার আয়নায় তাকাল নিজের ফ্যাকাসে, শুকনো মুখের দিকে; চোখ দুটো আগের চাইতে অনেক বড় দেখাচ্ছে।

তার কাছে সব কিছুই বিরক্তিকর বোধ হচ্ছে—দেনিসভের চীৎকার ও উচ্চহাসি, নাতাশার কথা, বিশেষ করে সোনিয়ার বাঁকা চাউনি।

কিছুক্ষণ অতিথিদের সঙ্গে বসে থেকে কাউণ্টেস মারি নিঃশব্দে সেখান থেকে বেরিয়ে নার্সারিতে গেল।

ছেলেমেয়েরা চেয়ার দিয়ে গাড়ি বানিয়ে "মস্কো যাওয়া" খেলছে; মাকেও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে ডাকল। কিছুক্ষণ বসে তাদের সঙ্গে খেলা করল, কিন্তু স্বামীর কথা, তার অকারণ রাগের কথা মনে করে চিন্তিত হল। উঠে দাঁড়িয়ে পা টিপে টিপে ছোট বৈঠকখানার দিকে গেল।

নিজেকে বলল, "হয় তো সে ঘুমোয় নি; তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে হবে।" বড় ছেলে ছোট্ট আন্দ্রু মাকে নকল করে পা টিপে টিপে তাকে অনুসরণ করল। মা খেয়ালই করল না।

বড় বৈঠকখানায় তার সঙ্গে দেখা হতেই সোনিয়া বলল, "সে হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে মারি—তাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আন্দ্রু হয় তো তাকে জাগিয়ে তুলবে।"

কাউণ্টেস মারি মুখ ঘুরিয়ে তাকাল, দেখল ছোট্ট আন্দ্রু পিছন পিছন আসছে, বুঝল যে সোনিয়া ঠিকই বলেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ লাল হয়ে

উঠল, কিন্তু কোন কড়া কথা উচ্চারণ করল না। সোনিয়াকে কিছু না বলে ইসারায় আন্‌দ্রুকে চুপি-চুপি আসতে বলে সে দরজার কাছে গেল। সোনিয়া অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। নিকলাস যে ঘরে ঘুমিয়েছিল সে ঘর থেকে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। সে শব্দ স্ত্রীর কাছে খুবই পরিচিত। শুনতে শুনতেই সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল স্বামীর মসৃণ, সুন্দর কপাল, তার গোঁফ, তার সমস্ত মুখ ; ঘুমের মধ্যে রাতের নিস্তব্ধ প্রহরে সে-সব সে অনেকবার দেখেছে। হঠাৎ নিকলাস নড়ে চড়ে গলা খাঁকারি দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোট আন্‌দ্রু দরজার বাইরে থেকে বলে উঠল, "বাপি! মামণি এখানে দাঁড়িয়ে আছে!" কাউণ্টেস মারি ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ছেলেকে ইসারা করল। সে চুপ করে গেল। মুহূর্তের নীরবতা। সে নীরবতা কাউণ্টেস মারির কাছে ভয়ংকর। সে জানে, ঘুম ভাঙানোটা নিকলাস খুব অপছন্দ করে। আবার নিকলাসের গলা পরিষ্কার করার ও নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেল। সে বিরক্ত কণ্ঠে বলল :

"একমুহূর্তও শান্তিতে থাকতে পারি না। মারি, তুমি কি ওখানে? কেন ওকে এখানে এনেছ?"

"আমি শুধু তোমাকে দেখতে এসেছিলাম ; খেয়াল করি নি···তুমি আমাকে ক্ষমা কর···"

নিকলাস কাশল। আর কিছু বলল না।

কাউণ্টেস মারি দরজা থেকে সরে এসে ছেলেকে নিয়ে নার্সারিতে ফিরে গেল। পাঁচ মিনিট পরে বাবার আদরের মেয়ে তিন বছরের কৃষ্ণাক্ষী নাতাশা যখন দাদার কাছে শুনল যে বাপি ঘুমচ্ছে আর মা আছে বৈঠকখানায় তখন সে মার অলক্ষে একদৌড়ে বাবার কাছে চলে গেল। কালো চোখের ছোট মেয়েটি সাহস করে দরজাটা সশব্দে খুলে ফেলল, ছোট ছোট পা ফেলে সোফার কাছে এগিয়ে গেল ; বাবা তার দিকে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়েছিল ; নাতাশা পা টিপে এগিয়ে গিয়ে বাবার মাথার নীচেকার হাতে চুমো খেল। মৃদু হেসে নিকলাস মুখ ফেরাল।

দরজায় শোনা গেল কাউণ্টেস মারির উদ্‌ভ্রান্ত চাপা কণ্ঠস্বর : "নাতাশা! নাতাশা! বাপি এখন ঘুমবে।"

ছোট্ট নাতাশা জোর দিয়ে বলল, "না মামণি, বাপি এখন ঘুমবে না। সে তো হাসছে।"

নিকলাস উঠে বসল ; মেয়েকে কোলে তুলে নিল।

স্ত্রীকে বলল, "ভিতরে এস মারি।"

ভিতরে ঢুকে সে স্বামীর পাশে বসল।

সভয়ে বলল, "আমি বুঝতে পারি নি যে ছেলেটা আমার পিছু পিছু আসছিল। তোমার ঘরে একটু উঁকি দিয়েছিলাম মাত্র।"

ছোট মেয়েটিকে এক হাতে ধরে নিকলাস আর একহাতে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে তার চুলে চুমো খেল।

নাতাশাকে বলল, “মামণিকে একটা চুমো খাই ?”

নাতাশা লজ্জায় হেসে ফেলল।

নিকলাস যে জায়গাটায় চুমো খেয়েছিল সেটা ইসারায় দেখিয়ে সে ধমক দিয়ে বলল, “আবার !”

স্ত্রীর মনের কথা বুঝতে পেরে নিকলাস বলল, “আমি তো বুঝতে পারি না কিসে তুমি জানলে যে আমি রাগ করেছি।”

“তুমি ওরকম ভাব দেখালে আমি যে কত দুঃখ পাই, কত একলা বোধ করি সে ধারণা তোমার নেই। আমার সব সময়ই মনে হয়…”

নিকলাস হেসে বলল, “বাজে কথা বলো না মারি। তোমার এজন্য লজ্জা হওয়া উচিত !”

“মনে হচ্ছে তুমি আমাকে ভালবাসতে পার না ; আমি এত সাদাসিদে …চিরকালই তাই…আর এখন …এই অবস্থায়…”

“আঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না ! রূপের জন্য তো ভালবাসা নয়, ভালবাসাই মানুষকে সুন্দর করে। ‘মাল্‌ভিনা’ এবং ঐ ধরনের নারীদেরই মানুষ রূপের জন্য ভালবাসে। কিন্তু আমার স্ত্রীকে কি আমি ভালবাসি না ? যদি ভাল না বাসি, কিন্তু…কিভাবে যে বলব ঠিক বুঝতে পারছি না…”

“আমি জানি। তাহলে আমার উপর তুমি রাগ করো নি তো ?”

“ভীষণ রাগ করেছি !” সোফা থেকে উঠে নিকলাস হাসতে হাসতে বলল। “আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান মারি ? ভাবছিলাম, পিয়েরকে বসন্তকাল পর্যন্ত থেকে যেতে বলব।”

হলঘরে কার যেন পায়ের শব্দ শোনা গেল।

“কেউ এসেছে।”

“নিশ্চয় পিয়ের। আমি দেখছি,” বলে কাউণ্টেস মারি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নিকলাস ছোট মেয়েটিকে নিয়ে ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিল। একসময় হাঁপিয়ে উঠে মেয়েকে কাঁধ থেকে নামিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। অকারণেই তার মনে হল : একদিন এই মেয়ে বড় হবে ; সে বুড়ো বয়সে তাকে সমাজে নিয়ে যাবে, আর তার বাবা যেভাবে মেয়ের সঙ্গে “দানিয়েল কুপার” নাচত, সেও সেইভাবে এই মেয়ের সঙ্গে মাজুর্কা নাচবে।

কয়েক মিনিট পরেই কাউণ্টেস মারি ঘরে ঢুকে বলল, “সে এসেছে। আহা, আমাদের নাতাশার জীবনে যেন জোয়ার এসেছে। এখন যদি তাকে দেখ ! চল, চল, তাড়াতাড়ি চল।” মেয়েটি বাবাকে জড়িয়ে ধরে আছে দেখে বলল, “অনেক হয়েছে ; এবার ওকে ছেড়ে দাও তো !”

মেয়ের হাত ধরে নিকলাস বেরিয়ে গেল।

কাউন্টেস মারি নিজের মনেই বলে উঠল, "মানুষ যে এত সুখী হতে পারে তা আমি কখনও বিশ্বাস করতে পারতাম না।" মৃদু হাসিতে তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; আবার সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলল; দুটি গভীর চোখে ফুটে উঠল শান্ত বিষণ্ণতা; যেন সুখের ভিতর দিয়েই সে অনুভব করল যে এমন আর একরকমের সুখ আছে যা এই জীবনে পাওয়া যায় না, অথচ এই মুহূর্তে আপনা থেকেই সে সুখের চিন্তা তার মনে জাগল।

অধ্যায়—১০

নাতাশার বিয়ে হয়েছিল ১৮১৩-র বসন্তকালের গোড়ার দিকে; ১৮২০তেই তার তিনটি মেয়ে হয়েছে; তাছাড়া আছে অনেক আশার ধন কোলের ছেলেটি। নাতাশা আরও শক্ত সমর্থ হয়েছে, মোটা হয়েছে; আজকের স্বাস্থ্যবতী জননী নাতাশার মধ্যে সেদিনের সেই তন্বী তরুণী নাতাশাকে চেনাই শক্ত। দেহ-রেখা আগের চাইতে স্পষ্টতর হয়েছে, মুখে দেখা দিয়েছে একটা প্রশান্ত, গম্ভীরভাব। মুখের সেই উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, রমণীয় ভাবটা আর নেই। তার দেহ ও মুখ এখন নেহাৎই গতানুগতিক; আত্মার সাক্ষাৎ সেখানে কদাচিৎ মেলে। চোখে পড়ে শুধু একটি স্বাস্থ্যবতী, সুন্দরী, উর্বরা নারীমূর্তি। মুখে সেদিনের সেই কণক-দীপ্তি কচিৎ কখনও জ্বলে ওঠে; আর তখন সে যেন আগেকার চাইতেও মনোরমা হয়ে ওঠে।

বিয়ের পর থেকে নাতাশা ও তার স্বামী মস্কোতে, পিতার্সবুর্গে, মস্কোর নিকটবর্তী জমিদারিতে, অথবা নাতাশার মার কাছে অর্থাৎ নিকলাসের বাড়িতেই থেকেছে। তরুণী কাউন্টেস বেজুখভা সমাজে বড় একটা যাতায়াত করে না; আর গেলেও সেখানকার লোকজন তাকে নিয়ে খুশি নয়; তাদের চোখে সে মনোরমাও নয়, সৌজন্যপূর্ণও নয়। নাতাশা যে একলা থাকাই পছন্দ করে তা কিন্তু নয়; কিন্তু গর্ভিনী অবস্থা, সন্তানের জন্ম, তাদের লালন-পালন, ও স্বামীকে সঙ্গ দানে তার এত বেশী সময় কেটে যায় যে সমাজে যাবার সময়ই হয় না। বিয়ের আগে যারা নাতাশাকে চিনত তারা তো তার এই পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেত। একমাত্র বুড়ি কাউন্টেস মায়ের মন দিয়ে বুঝতে পারত যে নাতাশার যত কিছু হৈ চৈ সবই ছিল স্বামী ও সন্তানের প্রয়োজনে; সে বলত, নাতাশা যে একদিন আদর্শ স্ত্রী ও জননী হবে তা সে আগেই জানত।

কাউন্টেস বলে, "শুধু তার স্বামী সন্তানের প্রতি ভালবাসা সব সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এটাই যা সমস্যা।"

কিন্তু সাধারণভাবে সমাজের ধার না ধারলেও নাতাশার কাছে তার আত্মীয়-স্বজনের সমাজ খুবই মূল্যবান—কাউন্টেস মারি ও তার দাদা, তার মা ও সোনিয়ার সঙ্গ সে খুবই পছন্দ করে। স্বামী-সন্তানকে নিয়ে নাতাশা এত বেশী বিব্রত থাকে যে তার পোশাক পরিচ্ছদ, চুল বাঁধার ধরন, অপরকে ঈর্ষার চোখে দেখা—এসব কিছু নিয়েই সকলের মধ্যে হাসি ঠাট্টা পর্যন্ত চলত। সাধারণভাবে সকলেই মনে করে যে পিয়ের তো স্ত্রীর একেবারে হাতের মুঠোয়। কথাটা সত্যি। বিয়ের প্রথম দিনই নাতাশা তার দাবীগুলি জানিয়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল, পিয়েরের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মালিক সে ও তার পরিবার। এই সম্পূর্ণ নতুন কথা শুনে পিয়ের তো অবাক। সে যেমন বিস্মিত হল, তেমনই আত্মতুষ্টিও বোধ করল, স্ত্রীর দাবীকে মেনেও নিল।

বাড়ির বাইরে পিয়ের স্ত্রীর নির্দেশ এত বেশী মেনে চলে যে কোন মেয়ের সঙ্গে ঢলাঢলি করা তো দূরের কথা হেসে কথা বলতে পর্যন্ত সাহস করে না; সখ করে কখনও ক্লাবে খেতে পারে না, খুশি মত টাকা খরচ করতে পারে না, এবং বিশেষ কাজ ছাড়া বেশীক্ষণ বাড়ির বাইরে কাটাতে সাহস করে না। অবশ্য এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বাড়ির ভিতরে নিজের জীবন এবং পরিবারের সকলকে চালাবার সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব পিয়ের নিজের হাতে পেয়েছে। বাড়িতে নাতাশা চলে স্বামীর ক্রীতদাসীর মত; সে যখন লেখাপড়া করে গোটা বাড়িটা তখন পা টিপে টিপে চলে। মুখ খুলতে না খুলতেই তার হুকুম পালিত হয়। মনের বাসনা প্রকাশ করামাত্রই নাতাশা এক লাফে ছুটে গিয়ে তা পূর্ণ করে দেয়।

এইভাবে বিবাহিত জীবনের সাতটা বছর কাটাবার পরে পিয়েরের মনে এই সানন্দ অনুভূতি হল যে সে নিজে লোক খারাপ নয়, আর এই অনুভূতির কারণ স্ত্রীর মধ্যে সে নিজেকে প্রতিবিম্বিত হতে দেখেছে। মনে হল, তার মধ্যে ভাল মন্দ দুইই ওতঃপ্রোতভাবে মিশে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে যা কিছু ভাল তার প্রতিবিম্ব পড়েছে স্ত্রীর মধ্যে, আর যা কিছু ঠিক ভাল নয় তাই খারিজ হয়ে গেছে। আর এটা কোন বিচার-বিবেচনার ফল নয়, একটা প্রত্যক্ষ ও রহস্যময় প্রতিফলন।

অধ্যায়—১১

রস্তভদের বাড়িতে থাকার সময় দু'মাস আগে পিয়ের একটা চিঠি পেল প্রিন্স থিয়োডোরের কাছ থেকে; পিয়ের যার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তেমন একটা সমিতিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় যোগ দিতে তাকে পিতার্সবুর্গে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে (নাতাশা সব সময়ই স্বামীর চিঠি পড়ে থাকে) নাতাশা বলল, স্বামীর অনুপস্থিতি তার পক্ষে কষ্টদায়ক হলেও তার পিতার্সবুর্গে যাওয়া উচিত। পিয়েরের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির জবাবে নাতাশা তাকে যেতেই বলল, কিন্তু সেইসঙ্গে তার ফিরে আসার একটা নির্দিষ্ট তারিখও ঠিক করে দিল। তাকে চার সপ্তাহের ছুটি দেওয়া হল।

একপক্ষকালের বেশী হয়ে গেল সে ছুটি ফুরিয়েছে। ফলে নাতাশা সবসময়ই ভয়ে ভয়ে থাকে, কেমন যেন মন-মরা, বিরক্তভাব।

সেই পক্ষকালের মধ্যেই এসে হাজির হল দেনিসভ। সে এখন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল, বর্তমান বিধিব্যবস্থায় খুবই অসন্তুষ্ট। নাতাশাকে দেখে তার মনে যুগপৎ দেখা দিল দুঃখ ও বিস্ময়। ক্লান্ত বিষণ্ণ দৃষ্টি, কদাচিৎ কথার জবাব দেয়, সবসময়ই নার্সারির কথা বলে। একদিন যে তার মনকে ভুলিয়েছিল আজ এই তার স্বরূপ।

নাতাশা সারাক্ষণ মন-মরা ও খিট্‌খিটে হয়ে থাকে ; বিশেষ করে যখন মা, দাদা, সোনিয়া, অথবা কাউন্টেস মারি তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে পিয়েরের কাজকে সমর্থন করে, তার ফিরতে বিলম্ব হবার কৈফিয়ৎ দেয়।

যে কাজকে সে কিছুদিন আগেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করত তার সম্পর্কেই এখন বলে, "যত সব বাজে, অর্থহীন কাজ—এসব আলোচনার কোন শেষ নেই—যত সব বাজে সমিতি !"

একমাত্র ছেলে পেত্‌য়াকে আদর করতে সে নার্সারিতে চলে যায়। আর কেউই এই তিন বছরের প্রাণীটির মত করে তাকে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে পারে না—যুক্তিপূর্ণ কথাও বলতে পারে না। সেই প্রাণীটি যেন বলে : "তুমি রাগ করেছ, তোমার মনে ঈর্ষা জেগেছে, তুমি ভয় পেয়েছ—কিন্তু আমি তো আছি ! আর আমিই সেই···।" একথার কোন জবাব নেই। এ তো সত্যের চাইতেও সত্য।

এই দুশ্চিন্তা-ভরা একটা পক্ষকাল নাতাশা ছোট্ট প্রাণীটিকে নিয়ে এত বেশী মাতামাতি করল যে তার ফলে তাকে মাত্রাতিরিক্ত খাওয়াল ; সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। ছেলের অসুখ দেখে সে ভীষণ ভয় পেল, অথচ, এটাই তার দরকার ছিল। তাকে সেবাযত্ন করতে পেয়ে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা সহ্য করা তার পক্ষে সহজতর হল।

বাচ্চাটার সেবাযত্ন করতে করতেই সামনের ফটকে সে পিয়েরের স্লেজের শব্দ শুনতে পেল। বুড়ি নার্স সুখবরটি নিয়ে হাসিমুখে দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকল।

পাছে ছেলের ঘুম ভেঙে যায় তাই কোনরকম নড়াচড়া না করে নাতাশা ফিস্‌ফিস্ করে শুধাল, "সে কি এসেছে ?"

নার্সও ফিস্‌ফিস্ করে জবাব দিল, "তিনি এসেছেন মা'ম।"

নাতাশার মুখে রক্ত উঠে এল ; আপনা থেকেই চলতে চাইল পা ; কিন্তু

সে লাফিয়ে ছুটে যেতে পারল না। বাচ্চাটি আবার চোখ মেলে তার দিকে তাকাল। যেন বলতে চাইল, "তুমি এখানে ?" তারপর ধীরে ধীরে ঠোঁট চাটতে লাগল।

সাবধানে মাই টেনে নিয়ে নাতাশা তাকে একটু দোলা দিল, তারপর তাকে নার্সের হাতে তুলে দিয়ে দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এত তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে আসায় বিবেকের তাড়নায়ই যেন দরজায় থেমে পিছন ফিরে তাকাল। নার্স ছেলেকে খাটের রেলিংয়ের উপরে তুলে ধরেছে। হেসে নীচু গলায় বলল, "আপনি যান মা'ম! কোন চিন্তা করবেন না, যান !"

নাতাশা হাল্কা পা ফেলে ছুটে গেল বাইরের ঘরের দিকে।

পাইপ মুখে দিয়ে দেনিসভ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল নাচ-ঘরে, আর তখনই প্রথম বারের মত চিনতে পারল পুরনো দিনের নাতাশাকে। তার পরিবর্তিত মুখ থেকে উৎসারিত হচ্ছে উজ্জ্বল সানন্দ আলোর বন্যা।

পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে নাতাশা বলছে, "সে এসেছে" ; পিয়ের ফিরে এসেছে বুঝতে পেরে দেনিসভও খুশি হয়ে উঠল।

ঝুল-বারান্দায় পৌঁছে নাতাশা দেখল, লোমের কোট গায়ে একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ গলার স্কার্ফটা খুলছে "ঐ তো সে ! সত্যি সে ! সে এসেছে !" বলতে বলতে নাতাশা ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল, তার মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরল, তারপর তাকে সরিয়ে দিয়ে তার রক্তিম খুশি-খুশি মুখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, "সত্যি সে ; যেমন সুখী তেমনই সন্তুষ্ট···"

তখনই সহসা তার মনে পড়ে গেল গত একপক্ষকালের উদ্বেগ ও যন্ত্রণার কথা ; মুখ থেকে নিভে গেল খুশির আলো, চোখ কুঁচকে উঠল, ক্রুদ্ধ তিরস্কার বর্ষণ করে পিয়েরকে বিব্রত করে তুলল।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল কাজ করেছ। তোমার তো মজা, সুখে দিন কাটিয়েছ···কিন্তু আমার কি হাল ? অন্তত ছেলেমেয়েদের কথাও তো ভাবা উচিত ছিল। আমার এই অবস্থা, বুকের দুধ নষ্ট হয়ে গেছে···পেত্‌য়া মরতে বসেছিল। আর তুমি সেখানে ফুর্তি করছিলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফুর্তি···"

পিয়ের জানে তার কোন দোষ নেই ; আরও আগে আসা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না ; সে জানে এই বকবকানি আরও দু'এক মিনিট চলবে ; আরও জানে যে সে নিজে বেশ খুশিই আছে। হাসতে চাইল, কিন্তু সাহসে কুলোল না। করুণ-করুণ মুখ করে ঝুঁকে দাঁড়াল।

"সত্যি বলছি, এর আগে আসার উপায় ছিল না। কিন্তু পেত্‌য়া কেমন আছে ?"

"এখন ভাল আছে। এস ! তোমার লজ্জা হচ্ছে না দেখে আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি ! তোমাকে ছাড়া আমি যে কেমন হয়ে গিয়েছিলাম, কত

কষ্ট পেয়েছি, তা যদি নিজের চোখে দেখতে!"

"এখন ভাল আছ তো?"

পিয়েরের হাত ধরে টেনে নাতাশা বলল, "চল, চল।" তারা নিজেদের ঘরের দিকে পা বাড়াল।

নিকলাস ও তার স্ত্রী যখন পিয়েরকে দেখতে এল সে তখন নার্সারিতে ছোট ছেলেকে হাতে নিয়ে নাচাচ্ছে। ছেলেটির ফোকলা মুখে স্বর্গীয় হাসির ছটা। ঝড় অনেকক্ষণ থেমে গেছে; নাতাশার মুখে তখন খুশির উজ্জ্বল আলোর ঝিকিমিকি; মমতাভরা চোখে সে স্বামী ও পুত্রের দিকে তাকিয়ে আছে।

শুধাল, "প্রিন্স থিয়োডোরের সঙ্গে সব কথা আলোচনা করেছ তো?"

"হাঁ, চমৎকার আলোচনা হয়েছে।"

"আচ্ছা, প্রিন্সেসের সঙ্গে দেখা হয়েছে? একথা কি সত্যি যে সে ভালবেসেছে···"

"সত্যি; কিন্তু ভাব তো···"

সেইমুহূর্তে নিকলাস ও কাউন্টেস মারি ঘরে ঢুকল। ছেলেকে হাতের উপর রেখেই পিয়ের ঝুঁকে পড়ে তাদের চুমো খেল, সব জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দিতে লাগল। কিন্তু তার মন তখনও পড়ে আছে ছোট ছেলের দিকে।

কাউন্টেস মারি বলল, "কী মিষ্টি দেখতে! আচ্ছা নিকলাস, এমন মিষ্টি মধুর মুখ কি তোমাকে টানে না? আমি তো অবাক হয়ে যাই।"

ঠাণ্ডা চোখে বাচ্চাটির দিকে তাকিয়ে নিকলাস বলল, "ওসব আমার আসে না, আমি পারি না। একদলা মাংসপিণ্ড!"

স্বামীকে সমর্থন করে কাউন্টেস মারি বলল, "অথচ ও কিন্তু খুব স্নেহশীল পিতা, অবশ্য বাচ্চারা এক বছরের মত বড় হলে তবে···"

নাতাশা বলল, "পিয়ের কিন্তু ওদের খুব আদর যত্ন করে। সে তো বলে তার হাতটা না কি বাচ্চাদের আসনের মত করেই তৈরি করা হয়েছে। দেখই না।"

"শুধু সেজন্যই নয়···" পিয়ের হঠাৎ হেসে উঠল। ছেলেকে তুলে দিল নার্সের হাতে।

অধ্যায়—১২

অন্য সব বড় সংসারের মতই বল্ড হিল্‌স্‌-এও অনেকগুলি ছোট ছোট স্বতন্ত্র জগৎ মিলেমিশে একটা বড় জগৎ গড়ে উঠেছে; যদিও প্রত্যেকেই নিজ

নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলে এবং অন্যের বৈশিষ্ট্যকেও মেনে নেয়। সুখ-দুঃখের যে ঘটনাই সে বাড়িতে ঘটুক সেটা সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়, যদিও সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আনন্দ বা দুঃখ প্রকাশের যার যার নিজস্ব বিশেষ কতকগুলি কারণ অবশ্যই থাকে।

যেমন ধরা যাক, পিয়েরের প্রত্যাবর্তন একটা আনন্দময় বড় রকমের ঘটনা, আর সকলেই সেটাকে সেইভাবেই গ্রহণ করেছে।

পিয়ের ফিরে আসায় চাকর-মহল খুশি হয়েছে কারণ তারা জানে যে সে উপস্থিত থাকলে নিকলাস প্রত্যহ জমিদারি দেখতে যাবে না, তার মন মেজাজও ভাল থাকবে; তাছাড়া, উৎসব উপলক্ষ্যে তারা ভাল ভাল উপহারও পাবে।

পিয়ের ফিরে আসায় ছোটরা ও তাদের গভর্নেসরা খুশি হয়েছে কারণ অন্য কেউ তার মত করে তাদের সবাইকে সামাজিক জীবনযাত্রার মধ্যে টেনে আনে না। একমাত্র সেই ক্ল্যাভিকর্ড-এ সেরকম "একোসাস"-এর সুর বাজাতে পারে যার সঙ্গে সবরকম নাচই নাচা যায়; তাছাড়া, তারা জানে তাদের সকলের জন্যই সে নানান উপহার এনেছে।

ছোট্ট নিকলাস এখন পনেরো বছরের সুঠাম তরুণ: যেমন দেখতে সুন্দর তেমনই বুদ্ধিমান; হালকা বাদামী রঙের কোঁকড়ানো চুল, আর সুন্দর দুটি চোখ। সে খুশি হয়েছে কারণ পিয়ের কাকাকে সে খুব ভালবাসে। পিয়েরের সঙ্গে তার দেখা হয় কালে-ভদ্রে: কেউ তাকে পিয়েরকে ভালবাসতে শেখায়ও নি। কাউণ্টেস মারি তাকে বড় করে তুলেছে; সে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে নিকলাস যাতে তার স্বামীকে তার মতই ভালবাসে; ছোট নিকলাসও তাকে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু সে ভালবাসার সঙ্গে যেন একটু ঘৃণার ছোঁয়া থাকে। কিন্তু পিয়েরকে সে যেন পুজো করে। নিকলাসের মত একজন হুজার বা নাইট হতে সে চায় না, সে চায় পিয়েরের মত জ্ঞানী, গুণী ও দয়ালু হতে। পিয়ের কাছে এলেই তার মুখটা খুশিতে জল্ জ্বল্ করে; পিয়ের তাকে কিছু বললেই তার মুখ লাল হয়ে ওঠে, দম আটকে আসে। তার সব কথা সে কান পেতে শোনে এবং পরেও তা নিয়ে অনেক ভাবে। পিয়েরের অতীত জীবন, ১৮১২-র আগেকার দুঃখের কথা (চুপি চুপি শোনা কিছু কথা থেকেই একটা অস্পষ্ট ছবি সে নিজের মনেই এঁকে নিয়েছে), মস্কোর কাণ্ডকারখানা, বন্দী জীবন, প্লাতন কারাতায়েভ (পিয়েরের মুখ থেকে শোনা). নাতাশার প্রতি ভালবাসা, এবং যে বাবার কথা সে মনেই করতে পারে না তার সঙ্গে পিয়েরের বন্ধুত্ব—সব কিছু মিলিয়ে তার চোখে পিয়ের হয়ে উঠেছে একটি নায়ক ও মহাপুরুষ।

অতিথিরা পিয়েরকে স্বাগত জানিয়েছে কারণ সে সর্বদাই যেকোন মজলিসকে প্রাণবন্ত ও সংঘবদ্ধ করে তুলতে সাহায্য করে।

স্ত্রী ছাড়াও পরিবারের অন্য সব বড়রাও এমন একজন বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুশি হয়েছে যে কাছে থাকলে জীবনযাত্রা আরও স্বচ্ছন্দ ও শান্তিময় হয়ে ওঠে।

বাড়ির বুড়িরা উপহার পেয়েই খুশি ; বিশেষত এবার নাতাশা আবার আগেকার মত হয়ে উঠবে।

এইসব আলাদা জগতের আলাদা মনোভাব পিয়ের ভালই বাসে ; সেইভাবেই সে তাদের সকলেরই বাসনা পূর্ণ করেছে।

পূর্বেকার ব্যয়বহুল ব্যবস্থা মতই পারিবারিক জীবন শুরু করার সময় থেকেই পিয়ের সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছে যে আগেকার তুলনায় এখন তার ব্যয় হয় অর্ধেক, অথচ প্রধানত প্রথমা স্ত্রীর ঋণের দরুণ সংসারে যে বিশৃংখলা দেখা দিয়েছিল তারও অনেক উন্নতি দেখা দিয়েছে।

জীবনযাত্রা সীমিত বলেই তার ব্যয়ও এখন আগের তুলনায় কম : সেই ব্যয়বহুল বিলাসিতা, সেধরনের জীবনযাত্রা তো যেকোন মুহূর্তে বদলানো যায় ; এখন আর সেভাবে সে জীবন চালায় না, চালাতে চায়ও না। সে বোঝে, বর্তমান জীবনযাত্রা মৃত্যুর দিন অবধি পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেছে, তার কোন পরিবর্তন করা তার সাধ্যায়ত্ত নয় ; এই জীবনযাত্রাই অল্প ব্যয়সাধ্য।

হাসি মুখে পিয়ের জিনিসপত্রগুলি সাজিয়ে রাখছিল।

দোকানীর মত করে একটা কাপড়ের ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, "এটা কেমন হয়েছে বল তো ?"

বড় মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নাতাশা সামনেই বসেছিল ; স্বামীর উপর থেকে কাপড়টার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, "বেলোভার জন্য তো ? চমৎকার !" হাত দিয়ে কাপড়টা দেখল।

"নিশ্চয় এক আর্শিন-এর দাম এক রুবল হবে ?"

পিয়ের দামটা বলল।

"এত সস্তা !" নাতাশা মন্তব্য করল। "মেয়েরা কী খুশিই না হবে। আর যাও ! শুধু আমার জন্য এটা না আনলেও পারতে।" মুক্তোবসানো সোনার চিরুনিটার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে বলল।

পিয়ের জবাব দিল, "এডেলই তো লোভ দেখাল : সেই তো বার বার এটা কিনতে বলল।"

সেটাকে চুলে গুঁজে দিয়ে নাতাশা বলল, "কখন পড়ব এটা ? ছোট্ট মাশাকে নিয়ে যখন সমাজে যাব তখন ? হয় তো তখন আবার এটাই ফ্যাশন হয়ে উঠবে। আচ্ছা, এবার চল।"

উপহারের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিয়ে তারা প্রথমে নার্সারিতে, ও পরে বুড়ি কাউন্টেসের ঘরে গেল।

কাউণ্টেস সঙ্গী বেলোভাকে নিয়ে যথারীতি গ্র্যাণ্ড পেসেন্স খেলতে বসেছে। বগলে পার্শেলগুলো নিয়ে পিয়ের ও নাতাশা ঘরে ঢুকল।

কাউণ্টেসের বয়স যখন ষাটের উপর; সব চুল পাকা, মাথার কুঁচি-বসানো টুপিতে মুখটাই প্রায় ঢেকে গেছে। মুখে ভাঁজ পড়েছে, উপরের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এসেছে।

পর পর ছেলে ও স্বামীর মৃত্যুতে তার মনে হয়েছিল আকস্মিকভাবেই এ জগৎ তাকে ভুলে গেছে, বেঁচে থাকার সব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই গেছে হারিয়ে। সে খায়, পান করে, ঘুমোয়, জেগে থাকে, কিন্তু ঠিক বেঁচে থাকে না। জীবনে কোন নতুন ছাপ আঁকা পড়ে না। জীবনের কাছে সে শান্তি ছাড়া আর কিছু চায় না; একমাত্র মৃত্যু দিতে পারে সে শান্তি। কিন্তু মৃত্যু যতদিন না আসে ততদিন তো তাকে বেঁচে থাকতেই হবে, অথবা সব জৈব শক্তিকেই ব বহার করতে হবে। শরীরের বিভিন্ন যন্ত্রকে কাজ করানো ছাড়া তার জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তাকে খেতে হয়, ঘুমতে হয়, চিন্তা করতে হয়, কথা বলতে হয়, কাঁদতে হয়, কাজ করতে হয়, রাগ দেখাতে হয়, আরও অনেক কিছু করতে হয় শুধু এই কারণে যে তার পাকস্থলী আছে, মস্তিষ্ক আছে, স্নায়ুতন্ত্র আছে, একটি যকৃৎ আছে। সে কথা বলে যেহেতু তার জিভ ও ফুসফুসের অনুশীলন করা দরকার। ছোট শিশুর মতই সে কাঁদে যেহেতু তার নাকটা পরিষ্কার হওয়া দরকার, ইত্যাদি। একটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাছে যে কাজ উদ্দেশ্যপূর্ণ, তার কাছে সেটা একটা অছিলামাত্র।

যেমন, আগের দিন যদি একটু ভারী খাওয়া হয়ে যায় তো সকালে তার রাগ করা দরকার হয়ে পড়ে, আর সেজন্য অছিলা হিসাবে সে বেছে নেয় বেলোভার বধিরতাকে।

ঘরের এক কোণ থেকে নীচু গলায় তাকে কিছু বলতে শুরু করে:

হয় তো বলে, "আজ দিনটা একটু গরম মনে হচ্ছে সোনা।"

বেলোভা জবাব দিল, "ঠিক, ঠিক, তারা এসেছে।" কাউণ্টেসও রেগে বলল- "হায় প্রভু! মেয়েটা কি বোকা আর কালা!"

আর একটা অছিলা তার নস্য—সেটা হয় বেশী শুকনো, নয় তো বেশী ভেজা, আর নয় তো ভাল গুঁড়ো হয় না। এইসব বিরক্তি প্রকাশের পরে তার মুখটা হল্‌দে হয়ে যায়। বেলোভা আবার কখন কালা হবে, নস্য ভেজা হবে, আর কাউণ্টেসের মুখ হল্‌দে হবে, দাসীরা সেটা অভ্রান্তভাবেই বুঝতে পারে।

বৃদ্ধার এই অবস্থা সংসারের সকলেই বোঝে, কিন্তু মুখে কেউ বলে না, সাধ্যমত তার সব প্রয়োজন মেটাতে চেষ্টা করে। শুধু নিকলাস, পিয়ের, নাতাশা ও কাউণ্টেস মারির মধ্যে বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে দু'একবার দৃষ্টি বিনিময়ের ভিতর দিয়েই প্রকাশ পায় যে তারা বৃদ্ধার অবস্থাটা ঠিকই বুঝতে

পেয়েছে।

কিন্তু সে দৃষ্টি আরও অনেক কিছুই প্রকাশ করে: বুঝি বলে, তার জীবনে যা করণীয় ছিল তা সে করেছে, আজ তাকে যা দেখছি সেটাই তার সমগ্র রূপ নয়, একদিন আমরা সকলেই তার মত হব, তাই তার সব খেয়াল হাসিমুখে মেনে নিয়েছি, একদিন যে ছিল পরম মূল্যবান, তাদের মতই জীবন-শক্তিতে পরিপূর্ণ আর তাই করুণার যোগ্য তার জন্য নিজেদের সংযত করেছি। সে দৃষ্টি যেন বলে, "একদিন তো আমরা সকলেই মরব।"

শুধু এ সংসারে যারা সত্যি হৃদয়হীন, যারা নির্বোধ, আর যারা একেবারেই শিশু, তারাই একথাটা বুঝতে পারে না, আর তাই তাকে এড়িয়ে চলে।

অধ্যায়—১৩

পিয়ের ও তার স্ত্রী যখন বৈঠকখানায় ঢুকল কাউন্টেস তখন মানসিক অনুশীলনের প্রয়োজনে যথারীতি পেশেন্স খেলায় ব্যস্ত ছিল। স্বভাবসিদ্ধভাবেই সে তাকে স্বাগত জানিয়ে ব'লল, "অনেকদিন পরে সোনা, অনেকদিন পরে! তোমার জন্য অপেক্ষা করে করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!" উপহারগুলি পেয়ে আবার সেই একই পুরনো মন্তব্য করল, "উপহারটার তো দাম নয়, আসলে দামী হল তুমি যে আমার কাছে ফিরে এসেছ সেটাই; আমি তো বুড়ো হয়েছি···।" মুখে কথাগুলি বললেও স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেইমুহূর্তে পিয়েরকে দেখে কাউন্টেস খুশি হয় নি, কারণ তার ফলে অসমাপ্ত খেলায় বাধা পড়েছে।

পেশেন্স খেলা শেষ করে তবে সে উপহারগুলি ভাল করে দেখতে লাগল। খুব ভাল জাতের এক বাক্স তাস, উজ্জ্বল নীল রংয়ের একটা "সেভ্রে" চায়ের কাপ—তার উপর মেষপালিকার ছবি আঁকা ও একটা ঢাকনা দেওয়া—আর একটা নস্যের কৌটো, তার উপর ভাল কারিগর দিয়ে কাউন্টেসের ছবি খোদাই করে আঁকা। এরকম একটা কৌটো কাউন্টেসের অনেকদিনের ইচ্ছা, কিন্তু এখন সেকথা জানাতে তার ইচ্ছা হল না; সে তাসের বাক্সের দিকেই নজর দিল।

অন্য সব সময়ের মতই বলল, "ধন্যবাদ সোনা, তুমি আমাকে খুব খুশি করেছ। কিন্তু তুমি যে নিজেকে ফিরিয়ে এনেছ সেটাই সব চাইতে বড় কথা—কিন্তু তোমার বৌকে আচ্ছা করে বকে দিও তো; এরকমটা আমি কখনও দেখি নি। ওকে নিয়ে কি করি বলতো? তুমি চলে গেলে ও যেন পাগলের মত হয়ে যায়। কোনদিকে নজর থাকে না, কোন কথা মনে থাকে না···" তারপর সঙ্গিনীর দিকে ফিরে বলল, "দেখ আন্না তিমোফীভ্না,

ছেলে আমার জন্য কী সুন্দর একবাক্স তাস এনেছে!"

বেলোভা উপহারগুলির প্রশংসা করল ; তার পোশাকের কাপড় পেয়েও খুশি হল।

তারপর সকলে মিলে সামোভারকে ঘিরে চায়ের টেবিলে বসল। পিয়ের একে একে কাউণ্টেসের সব প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল—প্রিন্স ভাসিলি বুড়ো হয়ে গেছে কি না, কাউণ্টেস মারি আলেক্সীভ্না তাকে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছে কি না ; তাছাড়া আরও এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল যাতে কারও কোন আগ্রহ নেই, এমন কি যেসব প্রশ্নের কথা সে নিজেও আর ভাবে না।

কথায় কথায় দেনিসভের আগ্রহে যুদ্ধের কথা ; রাজনীতির কথা উঠল। বুড়ি কাউণ্টেস সেসব আলোচনার মাথামুণ্ডু বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠে গেল। ওদিকে পাশের ঘরে ছেলেমেয়েদের ও নাতাশার হৈ-হল্লা শুনে তাদের তদারকি করতে পিয়েরও চলে গেল।

অধ্যায়—১৪

কিছুক্ষণ পরে ছেলেমেয়েরা ঘরে ঢুকল শুভরাত্রি জানাতে। তারা সকলকে চুমো খেল, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গভর্নেসরা অভিবাদন করল, তারপর চলে গেল। শুধু থেকে গেল ছোট্ট নিকলাস ও তার শিক্ষক। দেসালেস চুপি চুপি নিকলাসকে নীচে নেমে যেতে বলল।

নিকলাস বল্‌কন্‌স্কিও মৃদু স্বরে বলল, "না মঁসিয়ে দেসালেস, আমি কাকিমাকে বলছি আমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিতে।"

কাকিমার কাছে গিয়ে বলল, "মা তাঁতে, দয়া করে আমাকে এখানে থাকতে দাও।"

তার মুখে ফুটে উঠল অনুরোধ, উত্তেজনা ও উচ্ছ্বাস। তার দিকে একবার তাকিয়ে কাউণ্টেস মারি পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

বলল, "তুমি যতক্ষণ আছ ততক্ষণ ও এখান থেকে নড়বে না।"

সুইস্ শিক্ষিকটির'দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে পিয়ের বলল, "একটু পরেই ওকে আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি মঁসিয়ে দেসালেস। শুভরাত্রি!" তারপর নিকলাসের দিকে ফিরে বলল, "আমাদের দুজনের মধ্যে তো এখনও ভালকরে দেখা সাক্ষাৎই হয় নি। দেখ মারি, ও কত বড় হয়ে গেছে!"

"আমার বাবার মত?" উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত চোখ মেলে পিয়েরের দিকে তাকিয়ে রক্তিম মুখে ছেলেটি শুধাল।

পিয়ের মাথা নাড়ল। তারপর আবার শুরু হল পিয়ের ও দেনিসভের আলোচনা। মারি উল বুনতে বসে গেল ; নাতাশার চোখ সারাক্ষণ স্বামীর উপর। নিকলাস ও দেনিসভ উঠে পাইপ নিয়ে ধূমপান করল, সোনিয়ার

কাছ থেকে আরও চা আনল। কোঁকড়া-চুল ছেলেটি সকলের অলক্ষ্যে ঘরের এককোণে বসে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে সকলে যখন নৈশ ভোজনের জন্ত উঠে পড়ল তখন ছোট্ট নিকলাস বল্‌কন্‌স্কি পিয়েরের কথা গিয়ে বলল, "পিয়ের কাকা, তুমি···না··· আচ্ছা, বাপি বেঁচে থাকলে·· সে কি তোমার সঙ্গে একমত হত?"

হঠাৎ পিয়ের বুঝতে পারল, ছোট ছেলেটির উপস্থিতিতে এসব আলোচনা করা ঠিক হয়নি। কিন্তু একটা জবাব তো দিতেই হবে।

"হাঁ, তাই তো মনে হয়," অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা বলে সে বেরিয়ে গেল।

অধ্যায়—১৫

ড্রেসিং-গাউন পরে নিকলাস যখন শোবার ঘরে ঢুকল, কাউণ্টেস মারি তখন টেবিলে বসে কি যেন লিখছে।

"কি লিখছ মারি?" নিকলাস শুধাল।

কাউণ্টেস মারির মুখ রাঙা হয়ে উঠল। "একটা দিন-পঞ্জী লিখছি নিকলাস," বলে নীল রংয়ের খাতাটা তার হাতে তুলে দিল।

"দিনপঞ্জী? বল কি?" একটু ঠাট্টার হাসি হেসে সে খাতাটা খুলে পাতা ওল্টাল। সত্যি, ফরাসীতে লেখা একটা দিনপঞ্জী। কাউণ্টেস মারি ও ছেলেদের দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি কথা লিখে রাখা হয়েছে। খানিকটা দেখে খাতাটা টেবিলে রেখে দিল।

কাউণ্টেস মারি বলল, "দেখ, ছোট্ট নিকলাসকে নিয়ে মাঝে-মাঝেই আমার বড় চিন্তা হয়। এরকম ছেলে সচরাচর দেখা যায় না। আমার ভয় হয়, নিজের ছেলেমেয়েদের দিকে নজর দিতে গিয়ে আমি হয় তো ওকে অবহেলা করছি। আমাদের তো সন্তান আছে, আত্মীয়-স্বজন আছে, কিন্তু ওর তো কেউ নেই। সব সময় নিজের চিন্তায়ই ডুবে থাকে।"

"দেখ, আমার তো মনে হয় না তার জন্ত তুমি নিজেকে দোষী করতে পার। স্নেহময়ী মা তার জন্ত যা কিছু করতে পারত সেসবই তো তুমি করেছ, এখনও করছ, আর সেজন্ত আমিও খুব খুশি। সত্যি ছেলেটি ভাল, খুব ভাল। আজ সন্ধ্যায় তো মন্ত্রমুগ্ধের মত পিয়েরের কথাগুলি শুনছিল। ভাল ছেলে, বড় ভাল ছেলে।"

কাউণ্টেস মারি বলল, "তবু আমি তো তার নিজের মা নই। সেটা আমি বুঝি আর তাই তো ভয় পাই। চমৎকার ছেলে, কিন্তু তাকে নিয়ে আমার ভয়ও খুব। কিছু সঙ্গীসাথী থাকলে তার পক্ষে ভাল হত।"

নিকলাস বলল, "সে ব্যবস্থাও শিগ্‌গিরই হবে। পরের গ্রীষ্মকালেই আমি তাকে পিতার্সবুর্গ নিয়ে যাব।"

কাউণ্টেস মারি মুখে কিছু বলল না। স্বামীর হাতটা হাতে নিয়ে চুমো খেল।

ছোট্ট ভাই-পোটির কথাই ভাবতে লাগল। পিয়েরের কথাগুলি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে—স্বামীর এই কথাটা তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছে। ছেলেটির স্পর্শকাতর চরিত্রের আরও অনেক বৈশিষ্ট্যই তার মনে পড়ে গেল। তার কথা ভাবতে গিয়ে সে নিজের ছেলেমেয়েদের কথাও ভাবল। তাদের মধ্যে কোন তুলনা সে করল না, কিন্তু তাদের প্রতি নিজের মনোভাবের সঙ্গে ছোট্ট নিকলাসের প্রতি নিজের মনোভাবকে সে তুলনা না করে পারল না; অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে সে বুঝল যে ছোট নিকলাসের প্রতি তার মনোভাবে কোথায় যেন কিছু ত্রুটি আছে।

অনেক সময় সে মনে করে, তাদের বয়সের জন্যই তার মনোভাবের এই পার্থক্য ঘটে, কিন্তু তবু নিজের মনে সে বোঝে যে সে অপরাধী, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে, তার প্রতি সে আরও ভাল ব্যবহার করবে, অসাধ্য সাধন করবে—খৃস্ট যেভাবে মানুষকে ভালবাসত। সেইভাবেই এ জীবনে সে ভালবাসবে স্বামীকে, সন্তানকে, ছোট্ট নিকলাসকে, সব প্রতিবেশীকে। কাউণ্টেস মারির মন সর্বদাই উড়ে চলে অনন্ত ও শাশ্বতের পানে, আর তাই কখনও শান্তি পায় না। তার মুখে ফুটে উঠল উন্নত মনের কঠিন ভাব, দেহবন্ধনে আবদ্ধ আত্মার গোপন যন্ত্রণা। নিকলাস একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। "হে ঈশ্বর! সে মরে গেলে আমাদের কি হবে? তার এই মুখ দেখলেই যে সেই ভয়ই আমাকে পেয়ে বসে।" এই কথা ভাবতে ভাবতে দেবমূর্তির সামনে বসে সে সান্ধ্য প্রার্থনা শুরু করল।

অধ্যায়—১৬

নাতাশা ও পিয়ের নিজেদের মধ্যে যেভাবে কথা বলতে শুরু করল তা একমাত্র স্বামী-স্ত্রীই বলতে পারে। বড় বড় চোখ তুলে নাতাশা স্বামীর দিকে এগিয়ে গেল, তার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বলে উঠল: "এখন তুমি সম্পূর্ণ আমার, আমার! তোমাকে আর পালাতে দেব না!" —আর সেইমুহূর্ত থেকে যে সংলাপ শুরু হল তা কোন যুক্তি মানে না, বুঝি বা নিজেকেও মানে না; আপন বেগে আপনি উৎসারিত হয়ে চলে, পরস্পর পরস্পরকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

নাতাশা পিয়েরকে বলল তার দাদার জীবন ও কাজকর্মের কথা; তার অনুপস্থিতিতে সে যে কত কষ্ট পেয়েছে, সে যে মারিকে কত ভালবাসে, মারি যে তার তুলনায় অনেক ভাল—এমনি সব কথা। নাতাশা যে তার চাইতে অনেক বড় সেকথা আন্তরিকভাবেই স্বীকার করলেও সে কিন্তু পিয়েরের

কাছে এ দাবীও সেইসঙ্গে রাখল যে পিয়েরকে কিন্তু মারি এবং অন্য সব মেয়ের চাইতে তাকেই বেশী ভালবাসতে হবে, বিশেষ করে এখন পিতার্সবুর্গে অনেক নারী দেখে আসার পর সেকথা তাকে অতি অবশ্য নতুন করে ঘোষণা করতে হবে।

নাতাশার কথার জবাবে পিয়ের বলল, এবার পিতার্সবুর্গে গিয়ে ডিনারে ও বল নাচের আসরে মহিলাদের সঙ্গে মেলামেশা করাটা তার কাছে বড়ই অসহ্য লেগেছে।

বলল, "মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার কায়দাই ভুলে গেছি। সব কেমন এক-ঘেয়ে লাগত। তাছাড়া, আমি খুব ব্যস্তও ছিলাম।"

নাতাশা একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল:

"মারি চমৎকার মেয়ে! ছেলেমেয়েদের কথা খুব ভাল বুঝতে পারে। মনে হয় সে যেন তাদের মনের ভিতরটা পর্যন্ত দেখতে পায়। ধর না গতকাল মিতা দুষ্টুমি করছিল…"

পিয়ের বাধা দিয়ে বলল, "ঠিক তার বাবার মত।"

নাতাশা হঠাৎ চুপ করে গেল। একটু পরে বলল, "আমি এতক্ষণ কি ভাবছিলাম জান? প্লাতন কারাতায়েভের কথা।"

পিয়ের উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, "ওঃ, প্লাতন কারাতায়েভ? আমাদের পারিবারিক জীবনটা দেখলে সে খুব খুশি হত। সব কিছুর মধ্যেই সে দেখতে চায় মিল, সুখ, শান্তি; তাকে এনে আমাদের জীবনটা দেখাতে পারলে আমি গর্ববোধ করতাম। ভাল কথা—তুমি তো কেবলই আমার অনুপস্থিতির কথা বলছ, কিন্তু তুমি কি বিশ্বাস করবে এই বিরহের পরে তোমাকে এখন কত বেশী ভাল লাগছে…"

"হ্যাঁ, আমার ভাবা উচিত…" নাতাশা বলতে শুরু করল।

"না, সেকথা নয়। তোমাকে না ভালবেসে আমি পারি না। আমার মত এমন ভালবাসতেও কেউ পারে না, কিন্তু এটা একটা বিশেষ ব্যাপার… সত্যি বলছি, অবশ্য—" পিয়ের কথাটা শেষ করল না; কারণ চার চোখের মিলনেই বাকিটা বলা হয়ে গেল।

নাতাশা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, "এই যেসব মধুচন্দ্রিকা নিয়ে এত হৈ-চৈ, প্রথমেই নাকি জীবনের যত মধুমাস,—এসবের কোন মানে হয়! বরং এখনই তো সব চেয়ে সেরা সময়। শুধু তুমি যদি দূরে চলে না যাও! তোমার মনে পড়ে, আমরা কত ঝগড়া করতাম? আর সব সময়ই দোষ ছিল আমার। সব সময়। আর কি নিয়ে যে ঝগড়া করতাম—তাও ছাই মনে পড়ে না!"

পিয়ের হেসে বলল, "কারণ তো একটাই…ঈর্ষা…"

"ওকথা বলো না! আমি সইতে পারি না!" তার চোখে আগুনের

ঝিলিক। একটু থেমে বলল, "তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?"

"না। আর হলেও আমি তাকে চিনতেই পারতাম না।"

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ।

যে মেঘ জমেছিল তাদের মনে সেটাকে উড়িয়ে দিতে নাতাশা বলতে আরম্ভ করল, "আরে জান ? তুমি যখন পড়ার ঘরে কথা বলছিলে তখন আমি তোমাকেই দেখছিলাম। তোমরা যেন এক বোঁটায় দুটো ফল—তুমি আর তোমার ছেলে। ···ও হো, এবার আমাকে যেতে হবে। ওটাকে দুধ খাওয়াতে হবে। ···তোমাকে ফেলে যেতে কষ্ট হচ্ছে।"

কয়েক সেকেণ্ড দুজন আবার চুপ। তারপর একই সঙ্গে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একই সময় দুজন কথা বলতে শুরু করল। পিয়েরের মুখে তৃপ্তির হাসি, নাতাশার মুখে খুশির শান্ত হাসি।

"না, তুমি কি যেন বলছিলে ? বলে যাও।"

"না, তুমি বল ; আমার যত সব বাজে কথা," নাতাশা বলল।

পিয়ের যেকথা বলতে শুরু করেছিল সেটা শেষ করল। পিতার্সবুর্গে নিজের সাফল্যের কথাই বলল

"আমি শুধু বলতে চেয়েছি, যেসব চিন্তা-ভাবনা থেকে মহৎ ফসল ফলে আসলে সেগুলো খুব সরল, সহজ। আমার বক্তব্যের সার কথাই হল, পাপীরা যদি সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে, তাহলে সৎ লোকদেরও তাই করতে হবে। এটা তো খুব সোজা কথা।"

"ঠিক।"

"আর তুমি কি বলছিলে ?"

"আমি ? যত বাজে কথা।"

"তবু ?"

আরও উজ্জ্বল হাসি হেসে নাতাশা বলল, "আহা, অতিতুচ্ছ কথা। আমি বলতে চেয়েছি পেত্‌য়ার কথা : আজ যখন নার্স তাকে আমার কাছ থেকে নিতে এল, তখন সে হেসে চোখ বুঁজল, আমাকে জড়িয়ে ধরল আমি জানি, সে লুকোতে চাইছিল। কী মিষ্টি! ঐ যে, আবার কাঁদছে। আচ্ছা, চলি।" নাতাশা বেরিয়ে গেল।

এদিকে একতলায় ছোট্ট নিকলাস বল্‌কন্‌স্কির শোবার ঘরে একটা ছোট বাতি যথারীতি জ্বলছে। (ছেলেটি অন্ধকারকে ভয় পায় ; সে ভয় কিছুতেই যাচ্ছে না।) দেসালেস ঘুমোয় চারটে বালিশে ভর দিয়ে ; তার রোমক নাক থেকে সুরেলা শব্দ বের হতে থাকে। ছোট্ট নিকলাস ঘামে ভিজে সবে ঘুম থেকে উঠেছে। বিছানায় বসে হাঁ করে সামনে তাকিয়ে আছে। ঘুম ভেঙেছে একটা ভয়ংকর স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখেছে : সে আর পিয়ের কাকা

প্লুতার্কের বর্ণনামত শিরস্ত্রাণ পরে একটা মস্ত বড় সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করছে। হেমন্তের বাতাসে যেসব মাকড়শার জাল ভেসে বেড়ায় তারই মত কাৎ হয়ে চলেছে সেনাদল। সম্মুখে "গৌরব" ; সেটা মাকড়শার জালের মত হলেও আরও বেশী ঘন। সে ও পিয়ের ধীরে ধীরে লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ জালের সুতোগুলো জড়িয়ে গেল ; এগিয়ে চলা হল শক্ত। নিকলাস খুড়ো কঠিন, ভয়ংকর মূর্তিতে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

কিছু ভাঙা মোম ও কলম দেখিয়ে পিয়ের বলে উঠল, "এ কাজ তোমরা করেছ ? আমি তোমাদের ভালবাসতাম, কিন্তু আরাকৃচীভ হুকুম পাঠিয়েছেন, যারা এগিয়ে আসবে তাদের প্রথম জনকে আমি হত্যা করব।" ছোট্ট নিকলাস পিয়েরের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, কিন্তু পিয়ের সেখানে নেই। তার জায়গায় এসেছে তার বাবা—প্রিন্স আন্দ্রু—বাবার কোন আকার নেই, গঠন নেই, তবু সে আছে ; সেটা বুঝতে পেরে নিকলাস ভালবাসায় দুর্বল হয়ে পড়ল : মনে হল সে নিজেও শক্তিহীন, পঙ্গু, নিরাকার। বাবা তাকে আদর করল, করুণা করল। কিন্তু নিকলাস কাকা ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। নিকলাস ভয় পেল। তার ঘুম ভেঙে গেল।

"আমার বাবা !" নিকলাস ভাবল। (বাড়িতে প্রিন্স আন্দ্রুর দু'খানা প্রতিকৃতি থাকলেও নিকলাস কখনও তাকে মানুষের রূপে কল্পনা করে নি।) "বাবা আমার কাছে এসেছে, আমাকে আদর করেছে। আমার ও পিয়ের কাকার কাজকে সমর্থন করেছে। সে আমাকে যা করতে বলবে আমি তাই করব। মিউসিয়াস স্কাভোলা তার হাতটা পুড়িয়েছিল। আমার বেলায়ও কেন সেই একই ঘটনা ঘটবে না ? আমি জানি তারা চায় আমি লেখাপড়া শিখি। শিখবই তো। কিন্তু একদিন তো লেখাপড়া শেষ হবে, আর তখন তো আমাকে কিছু না কিছু করতেই হবে। ঈশ্বরের কাছে আমার কেবল একটি প্রার্থনা, প্লুতার্কের চরিত্রগুলোর মত আমার বেলায়ও কিছু ঘটুক ; তাহলে আমিও তাদের মতই কাজ করতে পারব। আরও ভাল কাজ করব। সকলেই আমাকে চিনবে, ভালবাসবে, আমাকে দেখে আনন্দ পাবে।" আর তখনই তার বুকটা দুলে উঠল ; সে কাঁদতে লাগল।

"তোমার কি অসুখ করেছে ?" তার কানে এল দেসালেসের গলা।

"না," বলে নিকলাস আবার বালিশে মাথা রাখল।

দেসালেস সম্পর্কে ভাবল, "তিনি খুব ভাল, দয়ালু ; আমিও তাকে ভালবাসি ! কিন্তু পিয়ের কাকা ! আঃ, কী এক আশ্চর্য মানুষ ! আর আমার বাবা ? আহা, বাবা, আমার বাবা ! হ্যাঁ, আমি এমন কিছু করব যাতে বাবাও খুশি হবে…"

॥ দ্বিতীয় পরিশিষ্ট ॥

অধ্যায়—১

ইতিহাস নানা জাতি ও মানবতার জীবনস্বরূপ। মানবতার জীবন, এমন কি একটিমাত্র জাতির জীবনকে আয়ত্তে এনে তাকে ভাষা দেওয়া, তাকে বর্ণনা করা স্বভাবতই অসম্ভব কাজ।

জনগণের যে জীবন স্পষ্টতই মরীচিকাসম তাকে করায়ত্ত করে বর্ণনা করার একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে সব প্রাচীন ইতিহাসকাররা। তারা বর্ণনা করেছে জনগণের শাসক ব্যক্তিবিশেষের কর্মধারাকে, আর সেই সব মানুষের কাজকেই তারা সমগ্র জাতির কাজ বলে ধরে নিয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল: সেই সব ব্যক্তি নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে এক একটা জাতিকে প্ররোচিত করেছে কিভাবে, আর এই সব ব্যক্তির ইচ্ছাই বা পরিচালিত হয়েছিল কিসের দ্বারা? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্রাচীন কালের মানুষরা ঐশ্বরিক শক্তির অবতারণা করেছে: সেই শক্তিই একদিকে একটা জাতিকে করেছে একজন নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছার বশীভূত, আবার অন্যদিকে সেই নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছাকে এমনভাবে পরিচালিত করেছে যাতে কোন পূর্বনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে।

মানবিক ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দ্বারাই প্রাচীনরা এইসব প্রশ্নের মীমাংসা করেছে।

আধুনিক ইতিহাস নীতিগতভাবে এই দুই মতবাদকেই বাতিল করে দিয়েছে।

মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মানুষের উপর দেবতার কর্তৃত্ব এবং বিভিন্ন জাতির কোন পূর্বনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত হওয়া প্রাচীন মানুষদের এই উভয়বিধ বিশ্বাসকে বাতিল করার পরে আধুনিক ইতিহাস পর্যালোচনা করবে শক্তির বহিঃপ্রকাশকে নয়, তার কারণকে। কিন্তু আধুনিক ইতিহাস তা করে নি। নীতির দিক থেকে প্রাচীনদের মতকে বাতিল করলেও কার্যত তাকেই তারা অনুসরণ করে চলেছে।

ঐশ্বরিক কর্তৃত্বসম্পন্ন এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত মানুষের পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাস আমাদের দিয়েছে হয় অসাধারণ, অতিমানবিক ক্ষমতার অধিকারী নায়কদের, আর না হয় তো নরপতি থেকে সাংবাদিক পর্যন্ত এমন সব সাধারণ মানুষদের যারা জনতাকে পরিচালিত করে। আগেকার দিনের ইহুদি, গ্রীক, বা রোমক জাতির যেসব ঈশ্বর-নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে প্রাচীন ইতিহাসকাররা মানব জাতির প্রতীক বলে মনে

করত, তার পরিবর্তে আধুনিক ইতিহাস তুলে ধরেছে তার নিজস্ব উদ্দেশ্যকে—সে উদ্দেশ্য ফরাসী, জার্মান, অথবা ইংরেজ জাতির কল্যাণ, অথবা সর্বোচ্চ-ক্ষেত্রে মানবজাতির কল্যাণ ও সভ্যতা; অবশ্য সে মানবজাতি বলতে সাধারণত বোঝায় একটি বৃহৎ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিমের একটি ক্ষুদ্র অংশের দখলদার মানুষের কল্যাণ ও সভ্যতাকে।

আধুনিক ইতিহাস প্রাচীন মানুষদের বিশ্বাসকে বাতিল করেছে, কিন্তু তার জায়গায় কোন নতুন ভাবধারাকে প্রতিষ্ঠা করে নি; এবং তার ফলে নতুন ইতিহাসকাররা অন্য পথে সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হয়েছে, অর্থাৎ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে (১) ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত জাতি এবং (২) এমন একটি পূর্বজ্ঞাত উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব যার দিকে এগিয়ে চলেছে এইসব জাতি ও মানব সমাজ।

গিবন থেকে বাক্‌ল্‌ পর্যন্ত আধুনিক ইতিহাসকারদের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে যতই অমিল থাকুক, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যতই নতুনত্ব থাকুক, তাদের সকলের লেখার ভিত্তি হিসাবে রয়েছে ঐ দুটি প্রাচীন ও অনিবার্য ধারণা।

১৭৮৯-তে প্যারিসে একটা উত্তেজনা দেখা দিল: সেটা বেড়ে চলল, ছড়িয়ে পড়ল, এবং মানুষের পশ্চিম থেকে পূবের দিকে এগিয়ে চলার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল। কয়েকবার সে গতি হল পূবমুখী; পূব থেকে পশ্চিমমুখী একটা পাল্টা অগ্রগতির সঙ্গে তার সংঘর্ষ বাধল; ১৮১২-তে সেটা পৌঁছল চূড়ান্ত লক্ষ্য মস্কোতে; তারপর একটা অদ্ভুত মিল রেখে শুরু হল প্রত্যাঘাত, আর আগের মতই মধ্য ইয়োরোপের জাতিগুলি তাতে যোগ দিল। প্রতি-আন্দোলন প্রথম আন্দোলনের যাত্রাস্থল প্যারিসে পৌঁছে মিলিয়ে গেল।

সেই বিশ বছরকালের মধ্যে অগণিত শস্যক্ষেত্রে চাষ-আবাদ হল না, অসংখ্য ঘর বাড়ি পুড়ল, বাণিজ্যের গতি পরিবর্তিত হল, লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছাড়ল, কেউ নিঃস্ব হল, কেউ বা ধনী হল, প্রেমধর্মে বিশ্বাসী লক্ষ লক্ষ খৃস্টান পরস্পরকে হত্যা করল।

এসবের অর্থ কি? এসব কেন ঘটল? কিসের জন্য মানুষ ঘর পোড়াল, মানুষকে খুন করল? এসব ঘটনার কারণ কি? কোন্ শক্তি তাদের দিয়ে এসব করাল। সেই সময়কার স্মৃতিস্তম্ভ ও ঐতিহ্যের মুখোমুখি হয়ে মানুষের মনে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে এই সব ন্যায্য প্রশ্নই তো উচ্চারিত হয়।

এইসব প্রশ্নের জবাবের আশায় মানুষের সাধারণ বুদ্ধি তো ইতিহাস-বিজ্ঞানের দিকেই চোখ ফেরায়, কারণ জাতি ও মানুষকে নিজেকে চিনতে শেখানোই তো ইতিহাসের লক্ষ্য।

ইতিহাস যদি প্রাচীনদের ধ্যান-ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখত তাহলে সে বলত মানুষদের পুরস্কার বা শাস্তি দিতে ঈশ্বরই নেপোলিয়নকে শক্তি দিয়েছেন,

দৈব উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে তার ইচ্ছাকে পরিচালিত করেছেন ; সেক্ষেত্রে এই উত্তরই হত স্পষ্ট ও পূর্ণ। লোকে নেপোলিয়নের দৈব তাৎপর্যে বিশ্বাস করতে পারে, নাও করতে পারে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে তার কাছে তৎকালীন ইতিহাসের কোন কিছুই দুর্বোধ্য ঠেকবে না, বা কোন স্ব-বিরোধিতাও তার চোখে পড়বে না।

কিন্তু আধুনিক ইতিহাস তো সে জবাব দিতে পারে না। মানুষের ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রাচীন ধারণাকে বিজ্ঞান স্বীকার করতে পারে না, আর তাই ইতিহাসকে অন্য জবাব দিতে হয়।

এইসব প্রশ্নের জবাবে আধুনিক ইতিহাস বলে : তুমি জানতে চাও এই আন্দোলনের অর্থ কি, তার কারণ কি, আর কোন্ শক্তি এইসব ঘটনা ঘটিয়েছে। শোন :

"ষোড়শ লুই ছিল অত্যন্ত অহংকারী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষ ; তার এই-এই রক্ষিতা ছিল, এই-এই মন্ত্রী ছিল, আর ফ্রান্সকে সে খুব খারাপভাবে শাসন করছিল। তার বংশধররাও ছিল দুর্বল মানুষ, আর খারাপ শাসনকর্তা। তাদেরও ছিল এই-এই প্রিয়পাত্র, আর এই-এই রক্ষিতা। তাছাড়া, কিছু লোক সেইসময় কিছু বইও লিখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্যারিসের প্রায় ডজন দুই লোক বলতে শুরু করল যে সব মানুষই স্বাধীন ও সমান। তার ফলেই সারা ফ্রান্স জুড়ে মানুষ একে অন্যকে আঘাত করতে লাগল, ডুবিয়ে মারতে লাগল। তারা রাজাকে হত্যা করল ; আরও অনেককে হত্যা করল। সেইসময়ে ফ্রান্সে একজন প্রতিভাধর মানুষ ছিল—নেপোলিয়ন। সে সর্বত্র সকলকে জয় করল—অর্থাৎ সে অনেক মানুষ মারল, কারণ সে ছিল একটি মহৎ প্রতিভা। যেকারণেই হোক সে গেল আফ্রিকাবাসীদের মারতে, আর এত ভালভাবে, এত সুকৌশলে ও সুচিন্তিতভাবে তাদের মারল যে ফ্রান্সে ফিরে এসে সে যখন হুকুম জারি করল যে সকলকেই তাকে মানতে হবে, তখন সকলেই তার বশ্যতা স্বীকার করল। সম্রাট হবার পরে সে আবার গেল ইতালি ; অস্ট্রিয়া ও প্রাশে সেখানকার মানুষদের মারতে। সেখানে সে অনেককে মেরে ফেলল। রাশিয়াতে আলেক্সান্দার নামে একজন সম্রাট ছিল ; ইয়োরোপে শৃংখলা ফিরিয়ে আনতে হবে এই মনস্থ করে সে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করল। ১৮০৭-এ সে হঠাৎ তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করল, কিন্তু ১৮১১-তে তাদের মধ্যে আবার বিবাদ বাধল ; আবার তারা অনেক লোক মারতে শুরু করল। নেপোলিয়ন ছয় লক্ষ সৈন্য নিয়ে রাশিয়ায় প্রবেশ করল, মস্কো দখল করল ; তারপরেই হঠাৎ সে মস্কো থেকে পালিয়ে গেল, আর সম্রাট আলেক্সান্দার, স্টিন ও অন্যান্যদের পরামর্শে ইয়োরোপের এই শান্তি বিঘ্নকারীর বিরুদ্ধে গোটা ইয়োরোপকে ঐক্যবদ্ধ করে তুলল। নেপোলিয়নের মিত্রপক্ষের লোকরা হঠাৎ তার শত্রু হয়ে গেল,

তাদের সেনাবাহিনীও তার বিরুদ্ধে এগিয়ে এল। মিত্রশক্তি নেপোলিয়নকে পরাজিত করল, প্যারিসে প্রবেশ করল, নেপোলিয়নকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করল, এবং তাকে এলবা দ্বীপে পাঠিয়ে দিল। অবশ্য তার সম্রাট উপাধিটা কেড়ে নিল না, তাকে সর্বপ্রকার সম্মানও দেখাল, যদিও পাঁচ বছর আগে এবং এক বছর পরে সকলেই তাকে দেখত একজন সমাজচ্যুত দস্যুর মত। তারপর যে ষোড়শ লুই ছিল এতদিন ফরাসী ও মিত্রশক্তির পরিহাসের পাত্র সেই আবার শাসন-কর্তৃত্বে ফিরে এল। আর নেপোলিয়ন তারই "ওল্ড গার্ড"দের সামনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে সিংহাসন পরিত্যাগ করে নির্বাসনে চলে গেল। তারপর সুকৌশলী রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদরা (বিশেষ করে তালেরাঁদ) ভিয়েনাতে আলোচনায় বসল, এবং তাদের আলোচনার দ্বারা কোন জাতিকে সুখী, কোন জাতিকে দুঃখী করে দিল। হঠাৎ কূটনীতিবিদ ও রাজাদের মধ্যে লড়াই বাঁধার উপক্রম দেখা দিল, উভয় পক্ষের সেনাদলকে যুদ্ধের হুকুম দেওয়া হয় আর কি, এমন সময় এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য নিয়ে নেপোলিয়ন এসে হাজির হল ফ্রান্সে, আর যে ফরাসীরা তাকে ঘৃণা করত তারাই সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে আত্মসমর্পণ করল। মিত্রপক্ষের নরপতিরা ক্ষেপে গিয়ে আবার ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিল। প্রতিভাধর নেপোলিয়নকে পরাজিতও করল; আর তখনই হঠাৎ তাকে একটা দস্যু বলে চিনতে পেরে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে পাঠিয়ে দিল। আর সেই নির্বাসিত লোকটি তার বড় আদরের প্রিয় ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ধীরে ধীরে সেই পাহাড়ের বুকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল, আর তার মহৎ কার্যাবলীকে রেখে গেল অনাগত দিনের মানুষের জন্য। কিন্তু ইয়োরোপে আবার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল; নরপতিগণ আর একবার প্রজাদের উপর উৎপীড়ন চালাতে লাগল।"

এটাকে ঐতিহাসিক বিবরণের প্রতি বিদ্রূপ—তার একটা হাস্যকর চিত্র বলে মনে করলে ভুল করা হবে। পরন্তু সেই যুগের বিভিন্ন রাষ্ট্রের স্মৃতিকথার সংকলক ও ইতিহাসের লেখক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ইতিহাসের লেখক ও সংস্কৃতির নব ইতিহাসের লেখক পর্যন্ত এইসব প্রশ্নের যেসব পরস্পর-বিরোধী উত্তর দিয়েছে অথচ প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারে নি তারই একটা অত্যন্ত মৃদু বিবরণ এখানে দেওয়া হল।

এই সব উত্তর এত অদ্ভুত ও অবাস্তব মনে হবার আসল কারণ, আধুনিক ইতিহাস বধির লোকের মত এমন সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে যা কেউ জিজ্ঞাসা করে নি।

মানবতার ও জনগণের অগ্রগতির বিবরণ দেওয়াই যদি ইতিহাসের উদ্দেশ্য হয় তাহলে তো প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে: কোন্ সে শক্তি যা জনগণকে পরিচালিত করে? এই প্রশ্নের উত্তরে আধুনিক ইতিহাস যত্ন সহকারে হয়

বলেছে যে নেপোলিয়ন ছিল মস্ত প্রতিভা, অথবা ষোড়শ লুই ছিল অহংকারী, অথবা কিছু লেখক কিছু বই লিখেছে।

এসবই সত্য হতে পারে, মানুষ সেটা মেনে নিতেও প্রস্তুত, কিন্তু প্রশ্ন তো সেটা নয়। এসবই উল্লেখযোগ্য হত যদি আমরা এমন একটি স্বয়ম্ভু ঐশ্বরিক শক্তিকে স্বীকার করতাম যিনি নেপোলিয়ন, লুই ও লেখকদের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহকে পরিচালিত করেন; কিন্তু আমরা তা স্বীকার করি না, আর তাই নেপোলিয়ন, লুই, অথবা লেখকদের কথা বলার আগেই এইসব লোকের সঙ্গে রাষ্ট্রসমূহের অগ্রগতি ও আন্দোলনের সম্পর্কটা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া দরকার

ঐশ্বরিক শক্তির পরিবর্তে অন্য কোন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে; সে শক্তি কি দিয়ে গঠিত তা আমাদের বুঝিয়ে বলতে হবে, কারণ ইতিহাসের সমস্ত আকর্ষণই সেই শক্তিতে নিহিত।

ইতিহাস যেন ধরেই নিয়েছে যে এই শক্তি স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনজ্ঞাত। কিন্তু এটাকে জানা বলে মনে করবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠের পরে এ সন্দেহ না জন্মে পারে না যে সত্যি সত্যি এটা সকলের জানা কি না।

অধ্যায়—২

কোন্ শক্তি জাতিসমূহকে পরিচালিত করে?

জীবনীমূলক ইতিহাসকার এবং বিভিন্ন জাতির ইতিহাসকার এই শক্তিকে নায়ক ও শাসকদের জন্মগত শক্তি বলে মনে করে। তাদের বিবরণ অনুযায়ী সব ঘটনাই ঘটে নেপোলিয়ন, আলেক্সান্দার, বা অন্য কোন ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে। তাদের এ ধারণা সন্তোষজনক হতে পারত যদি প্রতিটি ঘটনার মাত্র একজন করে ইতিহাসকার থাকত। কিন্তু যেমুহূর্তে বিভিন্ন জাতি ও ভাবধারার ইতিহাসকার একই ঘটনার বিবরণ দিতে শুরু করে, তখনই তারা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে, কারণ এই শক্তিকে যে তারা শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বোঝে তাই নয়, অনেক সময়ই বোঝে সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধীভাবে। এক ইতিহাসকার বলে ঘটনাটি ঘটিয়েছে নেপোলিয়নের শক্তি, আবার অন্য জন বলে ঘটিয়েছে আলেক্সান্দারের শক্তি, অন্য কেউ কোন তৃতীয় ব্যক্তির নাম করে। তাছাড়া, একই ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন শক্তির কথাও তারা বলে। যেমন বোনাপার্তপন্থী থিয়ের্স বলে, নেপোলিয়নের গুণাবলী ও প্রতিভার ওপরেই তার শক্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রজাতন্ত্রপন্থী লাঁফ্রে বলে, সে শক্তির ভিত্তি চালাকি ও জনগণকে প্রবঞ্চনা।

সার্বিক ইতিহাসের যেসব লেখকের কারবার সব জাতিকে নিয়ে তারা

তো বিশেষজ্ঞ ইতিহাসকারদের মতকে ভ্রান্ত বলেই মনে করে। তারা নায়ক বা শাসকদের কোন জন্মগত শক্তিকে স্বীকারই করে না; তারা মনে করে, বিভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত বহু শক্তির ফলই সেই শক্তি যা ঘটনাকে ঘটায়। একটি যুদ্ধ অথবা একটি জাতির অধীনতার বর্ণনা দিতে গিয়ে সাধারণ ইতিহাসকার তার কারণের অনুসন্ধান করে সেই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বহু মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, কোন একটি মানুষের শক্তির মধ্যে নয়।

১৮১৩-র অভিযান অথবা বুরবন-বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠার বর্ণনা দিতে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ইতিহাসকাররা স্পষ্টই বলে যে আলেক্সান্দারের ইচ্ছায়ই এইসব ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সার্বিক ইতিহাসকার জার্ভিনাস প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে ঐ দুটি ঘটনার পিছনে রয়েছে আলেক্সান্দারের ইচ্ছা ছাড়াও আরও অনেক কিছু—যেমন স্তিন, ম্যাটার্নিক, মাদাম দ স্তায়েল, তালেরাঁদ, ফিক্‌টে, চাতুব্রিয়াঁদ, ও অন্যদের কাজকর্ম। এইভাবে তাদের মধ্যে বিরোধিতা একান্তই স্পষ্ট।

আর একটি তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসকার আছে—তথাকথিত সংস্কৃতির ইতিহাসকার—যারা এই শক্তিকে একটা স্বতন্ত্র কিছু বলে মনে করে এই শক্তির মধ্যে তারা আবিষ্কার করে সংস্কৃতিকে—মানসিক ক্রিয়াকলাপকে। তাদের মতে, কতকগুলি ব্যক্তির আচরণের দ্বারা যদি ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে অমুক-অমুক মানুষ অমুক-অমুক বই লিখেছে এই তথ্যের দ্বারা কেন তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না? তাদের মতে, প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পিছনেই তো কাজ করে মানুষের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তার ফসল। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির সঙ্গে ঐতিহাসিক ঘটনাকে সংযুক্ত করার যত চেষ্টাই তারা করুক, সাধারণ মানুষের পক্ষে সেটা বোঝা খুব সহজসাধ্য নয়। ফরাসী বিপ্লবের নির্মম হত্যাকাণ্ড কি মানব-সাম্যের ফল হতে পারে? অথবা নিষ্ঠুর যুদ্ধ ও নরহত্যা মানুষকে ভালবাসার ফল?

কিন্তু এইসব ইতিহাসকারের সুকৌশল যুক্তিকে মেনে নিলেও—ভাবধারা নামক কোন অস্পষ্ট শক্তি জাতিকে পরিচালিত করে একথা মেনে নিলেও—ইতিহাসের মৌলিক প্রশ্নেও উত্তরটা তবু বাকি থেকেই যায়। পূর্বেকার দুটি শক্তি—নরপতিগণের ক্ষমতা এবং উপদেষ্টাও অন্যলোকের ক্ষমতার সঙ্গে আর একটা নতুন শক্তি-ভাবধারার শক্তি—যুক্ত হল মাত্র। নেপোলিয়নের ক্ষমতা ছিল, তাই ঘটনা ঘটেছিল, এটা বোঝা হয় তো সম্ভব; কিছু চেষ্টা করলে এটাও হয় তো বোঝা যায় যে নেপোলিয়ন ও অন্য কিছু শক্তি একত্র হয়ে ঘটনাটি ঘটিয়েছে; কিন্তু le Contract Social নামক একখানি বইয়ের প্রভাবে ফরাসীরা পরস্পরকে ডুবিয়ে মারতে শুরু করে দিল, বিনা ব্যাখ্যায় এটা বোঝা যায় না।

কিন্তু এধরনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গুণাগুণ যাই হোক না কেন, আর

একদিক থেকে সে ইতিহাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে নানা ধর্মীয়, দার্শনিক ও রাজনৈতিক মতবাদের চুল-চেরা বিচারের পরে যেমুহূর্তে তারা কোন সত্যিকারের ঐতিহাসিক ঘটনা—যেমন ১৮১২ সালের অভিযানের বর্ণনা দিতে বসে তখনই তারা সেটা কোন শক্তি প্রয়োগের ফল বলে বর্ণনা করে—পরিষ্কার বলে যে সে অভিযানটি নেপোলিয়নের ইচ্ছার ফলে ঘটেছে। আর সেকথা বলে সাংস্কৃতিক ইতিহাসকাররা অজান্তে নিজেদের মতেরই বিরোধিতা করে বসে; তারাই দেখিয়ে দেয়, যে নতুন শক্তি তারা উদ্ভাবন করেছে তা ইতিহাসের ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না; ইতিহাসের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই শক্তি দিয়েই করা যেতে পারে যাকে তারা স্বীকার করে না।

অধ্যায়—৩

একটা ট্রেন চলছে। একজন প্রশ্ন করল: এটাকে কে চালাচ্ছে? চাষী বলল, শয়তান চালাচ্ছে। আর একজন বলল, চাকাগুলো ঘুরছে বলেই গাড়িটা চলছে। তৃতীয় একজন বলল, বাতাসে যে ধোঁয়া উড়ছে সেটাই গাড়ির চলার কারণ।

চাষীর কথা অকাট্য। তার ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ। তাকে খণ্ডন করতে হলে প্রমাণ করতে হবে যে শয়তান বলে কিছু নেই, অথবা অন্য চাষীকে বলতে হবে যে শয়তান নয়, একজন জার্মান গাড়িটাকে চালাচ্ছে। একমাত্র তখনই স্ব-বিরোধিতার ফলে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের দুজনেরই ভুল হয়েছে। একমাত্র যে ধারণার দ্বারা গাড়ির গতিকে ব্যাখ্যা করা যায় তা হচ্ছে গতির উপযুক্ত একটি শক্তির ধারণা।

একমাত্র জনগণের অভিযানের উপযুক্ত একটি শক্তির ধারণার দ্বারাই সে ঘটনার ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

অথচ সেই ধারণাটাকে তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন ইতিহাসকার এমন সব বিভিন্ন ধরনের শক্তির উল্লেখ করেছে যা অভিযানের পক্ষে উপযোগী নয়। কেউ সেটাকে দেখে নায়কের সহজাত শক্তির মধ্যে, ঠিক যেভাবে গাড়ির বেলায় চাষী দেখে শয়তানকে; কেউ বা সেটাকে দেখে নানা শক্তির সম্মিলনের মধ্যে, চাকার ঘূর্ণনের মত; অন্যরা তাকে দেখে বুদ্ধিগত প্রভাবের মধ্যে, বায়ুতাড়িত ধোঁয়ার মত।

যতদিন পর্যন্ত লেখা হবে আলাদা আলাদা ব্যক্তির ইতিহাস, সিজার, আলেক্সান্দার, লুথার, অথবা ভল্‌তেয়ার, যারই হোক না কেন, যতদিন কোন ঘটনায় অংশগ্রহণকারী সব, সব মানুষের ইতিহাস লেখা না হবে, ততদিন একটা শক্তিকে মেনে না নিলে মানুষের অগ্রগতির বর্ণনা করা অসম্ভব। আর

ইতিহাসকারদের জানা একমাত্র ধারণাই তো সেই শক্তির ধারণা।

মানুষ সম্পর্কে বিচার করতে বসে এখন পর্যন্ত ইতিহাস বিজ্ঞানের অবস্থা বাজার প্রচলিত অর্থ—নোট ও মুদ্রার মত। জীবনীগ্রন্থ এবং বিশেষ জাতীয় ইতিহাস হচ্ছে নোটের মত। যতদিন পর্যন্ত কেউ সে নোটের নিরাপত্তায় প্রশ্ন না তুলছে ততদিন পর্যন্ত তাদের ব্যবহার করা চলে, কারও কোন ক্ষতি না করে তাদের উদ্দেশ্যও সার্বিকভাবে সাধিত হতে পারে। নায়কদের ইচ্ছা কেমন করে ঘটনাকে ঘটায় সে প্রশ্ন যদি ভুলে যাওয়া যায় তাহলে থিয়ের্স লিখিত ইতিহাসের অনুরূপ সব ইতিহাসই হৃদয়গ্রাহী ও শিক্ষনীয় হতে পারে, এমন কি কিছুটা কাব্যের ছোঁয়াও তাতে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নোট যখন অধিক সংখ্যায় ছাপা হয়, অথবা মানুষ যখন তার বিনিময়ে সোনা কিনতে চেষ্টা করে, তখনই যেমন নোটের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়, তেমনই ঐসব ইতিহাসের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে তখনই সন্দেহ দেখা দেয় যখন অনেক বেশী ইতিহাসের বই লেখা হয়, অথবা সরল মনে যখন কেউ প্রশ্ন করে বসে: কোন্ শক্তি বলে নেপোলিয়ন একাজ করেছিল?—অর্থাৎ প্রচলিত নোটের বিনিময়ে কেউ যখন বোধাতার প্রকৃত সোনা অর্জন করতে চায়।

সার্বিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের লেখকরা হচ্ছে সেইসব লোকের মত যারা নোটের ত্রুটিগুলো বুঝতে পেরে তার জায়গায় এমন ধাতু দিয়ে মুদ্রা তৈরি করতে চায় যাতে সোনার আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুপস্থিত। তাতে মুদ্রার ঠুন্‌ঠুন্ আওয়াজ হতে পারে, কিন্তু তার বেশী কিছু কাজে আসবে না। নোট হয়তো নির্বোধ লোকদের ঠকাতে পারে, কিন্তু খারাপ ধাতুর যে মুদ্রার ঠুন্‌ঠুন্ শব্দ ছাড়া আর কোন মূল্য নেই তা দিয়ে কাউকেই ঠকানো যায় না। সোনা যেমন একমাত্র তখনই সোনা যখন শুধু বিনিময়ের ক্ষেত্রে নয়, সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য, তেমনই সার্বিক ইতিহাসকাররা একমাত্র তখনই মূল্যবান হয়ে উঠবে যখন তারা ক্ষমতা কি? —ইতিহাসের এই মৌলিক প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে। সার্বিক ইতিহাসকাররা দেয় সে প্রশ্নের পরস্পরবিরোধী জবাব, আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসকাররা প্রশ্নটাকে এড়িয়ে গিয়ে জবাব দেয় অন্য কোন প্রশ্নের। আর নকল সোনার মুদ্রা যেমন ব্যবহার করা যায় শুধু সেই মানুষদের মধ্যে যারা সেটাকে সোনা বলে মেনে নেয় অথবা সোনা চেনেই না, তেমনই সার্বিক ইতিহাসকাররা, এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসকাররা, মানুষের মৌলিক প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য, এবং যে সাধারণ পাঠকের "গুরুত্বপূর্ণ" বিষয় পাঠে রুচি আছে তাদের মধ্যে কারেন্সি নোটের মতই কাজ করে।

অধ্যায়—৪

একটি জাতির ইচ্ছাকে একজন নির্বাচিত মানুষের ইচ্ছাধীন করা এবং সেই মানুষটির ইচ্ছাকে দেবতার অধীন করার যে দৈব ব্যবস্থা প্রাচীনরা বিশ্বাস করত তাকে পরিত্যাগ করার ফলে স্ববিরোধিতাকে এড়িয়ে ইতিহাসের পক্ষে একটা পাও চলা সম্ভব নয় যদি না সে দুটোর যেকোন একটা বেছে নেয় : হয় মানবিক ব্যাপারে দেবতার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের প্রাচীন বিশ্বাসে ফিরে যাওয়া, আর না হয় যে শক্তি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে ঘটায় এবং যাকে বলা হয় "ক্ষমতা" তার তাৎপর্যের একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া।

প্রথমটাতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কারণ সে বিশ্বাসকে ধ্বংস করা হয়েছে ; কাজেই ক্ষমতা বলতে কি বোঝায় সেটা ব্যাখ্যা করা একান্তভাবে প্রয়োজন।

নেপোলিয়ন হুকুম দিল, একটা সেনাবাহিনী গড়ে তুলে যুদ্ধে যাও। এ-কাজে আমরা এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে ছ'লক্ষ মানুষ কেন নেপোলিয়নের কথামত যুদ্ধে গেল সে প্রশ্ন করাটাও আমাদের কাছে অর্থহীন মনে হয়। তার হাতে ক্ষমতা ছিল, তাই সে যা হুকুম করেছে তাই করা হয়েছে।

যদি আমরা বিশ্বাস করি যে ঈশ্বরই তাকে ক্ষমতাটা দিয়েছিল তাহলে ব্যাখ্যাটা খুবই সন্তোষজনক হয়। কিন্তু যেমুহূর্তে সেটা স্বীকার করা হল না তখনই একজন মানুষ অপরের উপর যে ক্ষমতা বিস্তার করে আসলে সেটা কি তা নির্ধারণ করাটা জরুরি হয়ে পড়ে।

এটা দুর্বলের উপর সবলের দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপার হতে পারে না—হারকিউলিসের শক্তির মত দৈহিক শক্তির প্রয়োগ বা তার ভয় দেখিয়ে অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তারও না, এটা কোন নৈতিক শক্তির উপরেও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, কারণ নেপোলিয়নের মত যে সব নায়কের নৈতিক গুণাগুণ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে তাদের কথা ছেড়ে দিলেও ইতিহাসই আমাদের জানিয়েছে, যে একাদশ লুই অথবা মেটারনিক লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর শাসন ক্ষমতা চালিয়েছে তাদের কারও কোন বিশেষ নৈতিক গুণ ছিল না, বরং সাধারণভাবে বলা যায়, যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা শাসন করেছে তাদের যেকোন একজনের তুলনায় তারা ছিল নৈতিক দিক থেকে দুর্বলতর।

ক্ষমতার উৎস যদি দৈহিক অথবা নৈতিক গুণাবলীর মধ্যে না থাকে, তাহলে তাকে অবশ্যই অন্যত্র খুঁজতে হবে—খুঁজতে হবে ক্ষমতার অধিকারীর সঙ্গে জনগণের সম্পর্কের মধ্যে।

ক্ষমতা হচ্ছে জনগণের সেই সম্মিলিত ইচ্ছা যা ঘোষণার দ্বারা অথবা মৌন সম্মতির দ্বারা নির্বাচিত শাসকগণের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ক্ষমতা যদি শাসককে হস্তান্তরিত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই হয়, তাহলে পুগাচেভ কি জনগণের ইচ্ছার প্রতিনিধি ছিল? যদি তা না হয়, তাহলে প্রথম নেপোলিয়ন কেন তা হল? তৃতীয় নেপোলিয়নকে যখন বোলনে বন্দী করা হল তখন যদি সে অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে কেন পরবর্তীকালে তারাই অপরাধী হল যাদের সে গ্রেপ্তার করেছিল?

যে রাজপ্রাসাদের বিপ্লবে অনেক সময় মাত্র দু'জন কি তিনজন লোক অংশ গ্রহণ করে তার দ্বারাই কি একজন নতুন শাসকের হাতে জনগণের ইচ্ছাকে হস্তান্তরিত করা হয়? আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কি জনগণের ইচ্ছাকে বিজয়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়? ১৮০৮ সালে কি রাইন রাষ্ট্রসংঘের ইচ্ছাকে হস্তান্তর করা হয়েছিল নেপোলিয়নকে? ১৮০৯ সালে ফরাসীদের সঙ্গে যোগ-সাজসে আমাদের সেনাবাহিনী যখন অস্ট্রিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল, তখন কি রুশ জনগণের ইচ্ছাকে সমর্পণ করা হয়েছিল নেপোলিয়নের হাতে?

এইসব প্রশ্নের তিনটি জবাব সম্ভব?

হয় ধরে নিতে হয় (১) জনগণের ইচ্ছাকে সর্বদাই নিঃশর্তভাবে হস্তান্তর করা হয় পছন্দ-মত শাসক বা শাসকদের হাতে; সুতরাং প্রতিটি নতুন শক্তির আবির্ভাব, একদা ক্ষমতাসীন শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিটি সংগ্রামই প্রকৃত ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ বলে পরিগণিত হওয়া উচিত; অথবা (২) জনগণের ইচ্ছাকে হস্তান্তর করা হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট ও পূর্বজ্ঞাত শর্ত অনুসারে; আর তাতেই প্রমাণ হয় যে ক্ষমতাকে খর্ব করা, তার বিরুদ্ধাচরণ করা, এমন কি তাকে ধ্বংস করা শাসকগণ কর্তৃক তাদের উপর আরোপিত শর্তাবলীকে উপেক্ষা করারই ফল; অথবা (৩) জনগণের ইচ্ছাকে শর্তসাপেক্ষে শাসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, কিন্তু সে শর্তগুলি থাকে অজ্ঞাত ও অনির্দিষ্ট; আর শাসকগণ কর্তৃক সেইসব অজ্ঞাত শর্তাবলীকে কম-বেশী পূরণ করার ফলেই আবির্ভূত হয় বিভিন্ন শক্তি, দেখা দেয় তাদের সংঘর্ষ ও পতন।

আর এই তিন পথেই ইতিহাসকাররা শাসকদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে থাকে। অবশ্য তাদের মধ্যেও মত-পার্থক্যের অভাব নেই। একেক দল একেকভাবে সেই সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করে। সেই সবরকম ইতিহাসকে যদি একসূত্রে বাঁধা যায়, নতুনতম ইতিহাসকাররা তাই করে থাকে, তাহলে আমরা পাব রাজা-রাজরা ও লেখকদের ইতিহাস, জনগণের জীবনের ইতিহাস নয়।

অধ্যায়—৫

একটা জাতির জীবন অল্প কয়েকটি মানুষের জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ

থাকে না, কারণ ঐসব মানুষ ও জাতির মধ্যে যোগসূত্রটা এখনও আবিষ্কৃত হয় নি।

জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছা কয়েকটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের হাতে হস্তান্তরই সেই যোগসূত্রের ভিত্তি—এ মতবাদ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে সমর্থিত হয় নি। অবশ্য এই মতবাদকে অখণ্ডনীয় মনে হয় কারণ জনগণের ইচ্ছার হস্তান্তরের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখা যায় নি, কারণ সেটা কখনও ঘটে নি।

যাই ঘটুক না কেন এবং যে লোকই পুরোভাগে এসে দাঁড়াক না কেন, এই মতবাদ সব সময়ই বলতে পারে যে অমুক লোক নেতৃত্বে এসেছে কারণ সম্মিলিত ইচ্ছাকে তার হাতেই তুলে দেওয়া হয়েছিল।

ঐতিহাসিক প্রশ্নাবলীর যে উত্তর এই মতবাদ দিয়ে থাকে সেটা সেই লোকের উত্তরেরই অনুরূপ যে গোচারণ ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের গুণাগুণ অথবা চালকের মনোগত ইচ্ছার দিকে নজর না দিয়ে একদল গরু-মোষের গতি-পথ লক্ষ্য করেই বলে দেয় যে-জন্তুটি সকলের পুরোভাগে আছে সে যেদিকে যাবে গোটা দলই যাবে সেইদিকে।

"পুরোবর্তী জন্তুটি যেপথে চলে গোটা দল সেই পথেই যায়; অন্য জন্তুগুলির সম্মিলিত ইচ্ছা দলনেতার উপরেই অর্পিত হয়।" এই হল এক শ্রেণীর ইতিহাসকারের অভিমত।

আসলে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের হাতে জনগণের ইচ্ছাকে সমর্পণের মতটা কথার মার-প্যাঁচ মাত্র—প্রশ্নটাকেই অন্য কথায় ঘুরিয়ে বলা হয়।

ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে কে ঘটায়? ক্ষমতা। ক্ষমতা কাকে বলে? একজনের হাতে ন্যস্ত জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাই ক্ষমতা। কোন্ শর্তে জনগণের ইচ্ছাকে একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়? একমাত্র শর্ত হল, সেই মানুষটি জনগণের ইচ্ছাকে প্রকাশ করবে। অর্থাৎ, ক্ষমতা মানেই ক্ষমতা: অন্য কথায়, ক্ষমতা এমন একটা শব্দ যার অর্থ আমরা বুঝি না।

মানুষের ব্যাপারে ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ স্বীকার না করে "ক্ষমতা"-কে ঘটনার কারণ হিসাবে গণ্য করতে পারি না।

অভিজ্ঞতার দিক থেকে দেখলে ক্ষমতা কোন একজনের মনোবাসনার প্রকাশ এবং অন্যের দ্বারা সে বাসনা পূর্ণ করার মধ্যেকার সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে সম্পর্কের শর্তাবলীকে বোঝাতে হলে মানুষের পরিপ্রেক্ষিতে—দেবতার নয়—সেই বাসনা প্রকাশের ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দেবতা যদি কোন আদেশ ঘোষণা করে, প্রাচীন ইতিহাসের বর্ণনামত তাঁর ইচ্ছাকে প্রকাশ করে, তাহলে সে ইচ্ছার প্রকাশ হবে কালনিরপেক্ষ,

কোন কারণের দ্বারা সেটা ঘটবে না, কারণ দেবতাকে ঘটনার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। কিন্তু যে আদেশ মানুষের ইচ্ছার প্রকাশ, যা কালের অধীন এবং পরস্পর সম্পর্কিত—সেক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে সেই আদেশের যোগসূত্রকে বোঝাতে হলে আমাদের নতুন করে জানতে হবে : (১) যা কিছু ঘটে তার শর্ত : ঘটনা এবং ঘোষণা প্রচারকারী উভয়কেই কালের অধীন হয়ে চলতে হয়, এবং (২) যে মানুষ হুকুম করে এবং যারা সে হুকুম তামিল করে তাদের যোগসূত্রের অনিবার্যতা।

অধ্যায়—৬

সময়ের অধীন নয় বলে একমাত্র দেবতার ইচ্ছার প্রকাশই বহু বর্ষ বা শতাব্দীব্যাপী ঘটনা-শৃংখলের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে ; একমাত্র দেবতাই পারে তাঁর ইচ্ছার দ্বারা মানুষের অগ্রগতির দিক-নির্দেশ করতে ; কিন্তু মানুষ কালের অধীন, আর যা কিছু ঘটে তাতে সে নিজেই অংশ গ্রহণ করে।

প্রথম শর্ত অর্থাৎ কালের কথা বলতে গিয়ে আমরা দেখি, কিছু পূর্ব-ঘোষিত হুকুম ছাড়া কোন হুকুমই কার্যকর করা যায় না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমরা যখন বলি যে নেপোলিয়ন তার সৈন্যদের যুদ্ধে যাবার হুকুম দিয়েছিল, তখন সেই একটি হুকুমের মধ্যে পর পর অনেকগুলি হুকুমকে একত্রিত করে থাকি। নেপোলিয়ন একদিনেই রাশিয়া অভিযানের হুকুম দেয় না, তা দিতে পারে না। আজ হয়তো হুকুম করেছে ভিয়েনা, বার্লিন ও পিতার্সবুর্গে অমুক—অমুক চিঠি লেখা হোক ; কাল অমুক-অমুক হুকুম ও নির্দেশ জারি করেছে স্থল-বাহিনীকে, নৌবহরকে, কমিসারিয়েটকে, ইত্যাদি ইত্যাদি—লক্ষ লক্ষ হুকুমের এক আনুপূর্বিক শৃংখলের ফলে ফরাসী বাহিনী রাশিয়াতে ঢুকেছে।

নেপোলিয়ন তার সমগ্র রাজত্বকালে ইংলণ্ড অভিযানের হুকুম ঘোষণা করল, অন্য কোন অভিযানে এত সময় ও প্রচেষ্টা ব্যয় করল না, অথচ পুরো রাজত্বকালে সে পরিকল্পনাকে কখনও কার্যকর না করে বাস্তবক্ষেত্রে রাশিয়াতে অভিযান শুরু করল—তার কারণ প্রথম ক্ষেত্রে তার হুকুমগুলি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে মিলল না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলে গেল।

কোন হুকুমকে নিশ্চিতরূপে কার্যকর করতে হলে সেটা এমন হওয়া চাই যাকে কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু কোন্‌টাকে কার্যকর করা যাবে আর কোন্‌টাকে যাবে না সেটা জানা তো অসম্ভব ; লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযানের ক্ষেত্রেই যে একথা সত্য শুধু তাই নয়, সরলতম ঘটনার ক্ষেত্রেও তাই, কারণ উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ বাধা এসে তাকে কার্যকর করার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। প্রতিটি কার্যকর হুকুম

অকার্যকর অনেক হুকুমের মধ্যে একটিমাত্র। ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সব অসম্ভব হুকুমই অকার্যকর থেকে যায়। মাত্র স্বল্পসংখ্যক সম্ভবপর হুকুমই কার্যে রূপায়িত হয়।

বস্তুত, যারা হুকুম করে আর যারা হুকুম তামিল করে তাদের সম্পর্কটাই ক্ষমতা নামক ধারণার মূল কথা।

আমরা দেখেছি, কোন হুকুম একমাত্র তখনই কার্যকর হয় যখন একটি ঘটনা শৃংখলের সঙ্গে সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। এই মূল যোগসূত্র থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে যারা হুকুম করে আসল কাজে তারাই অংশ নেয় সব চাইতে কম, তাদের কর্মপ্রচেষ্টা কেবলমাত্র হুকুম করার ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে।

অধ্যায়—৭

যখন কোন ঘটনা ঘটতে থাকে তখন সে সম্পর্কে মানুষ তাদের মতামত ও মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে; আর যেহেতু অনেক মানুষের সম্মিলিত কাজের ফলেই ঘটনাগুলি ঘটে, কোন না কোন মত বা মনোভাব আংশিকভাবে হলেও পূর্ণ হয়েই থাকে। যখন ঘোষিত কোন একটি অভিমত পূর্ণ হয় তখন সেটাকেই ঘটনার পূর্ববর্তী হুকুম হিসাবে গণ্য করা হয়।

অনেক লোক একটা কাঠের গুঁড়িকে টানছে। কিভাবে কোথায় সেটাকে টেনে নেওয়া হবে সে সম্পর্কে নানা জনে নানা কথা বলছে। কাঠটাকে টেনে নেওয়া হয়ে গেলে দেখা গেল যে কোন একজনের কথামতই সেকাজটা হয়েছে। তাহলে তার হুকুমমতই কাজটা সম্পন্ন হল। এখানেই আমরা পাই হুকুম ও ক্ষমতার প্রাথমিক রূপ।

একটা বৃহত্তর জনসমাবেশ যখন একই লক্ষ্যে একটা কাজ করে তখন তাদের মধ্যে এই মতভেদ আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যেকারণেই হোক ফরাসীরা নিজেদের ডোবাতে ও খুন করতে শুরু করে দিল। সেই সঙ্গে লোকে এও বিশ্বাস করল যে ফ্রান্সের কল্যাণের জন্য, স্বাধীনতার জন্য, সাম্যের জন্য এটার প্রয়োজন ছিল। তারপর মানুষ মানুষকে মারতে মারতে পশ্চিম থেকে পূবে চলল, আর সেই সঙ্গে ফ্রান্সের গৌরব ও ইংলণ্ডের নীচতার অনেক বড় বড় বুলি আওড়াতে লাগল। ইতিহাস আমাদের বুঝিয়েছে যে এসব কথাই অর্থহীন ও পরস্পরবিরোধী, যেমন বিরোধ থাকে নিজের অধিকার রক্ষা ও মানুষকে হত্যার মধ্যে, এবং ইংলণ্ডকে ছোট করা ও রাশিয়াতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করার মধ্যে।

প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়ালে একটি সহজ প্রশ্নই দেখা দেয় : এটা কেমন করে সম্ভব যে লক্ষ লক্ষ মানুষ সম্মিলিতভাবে অপরাধ করে

—যুদ্ধ করে, নরহত্যা করে, ইত্যাদি ?

ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের বর্তমান জটিল ব্যবস্থার মধ্যে রাজা, মন্ত্রী, পার্লামেণ্ট, অথবা সংবাদপত্রের বিধান, নির্দেশ, অথবা হুকুম ছাড়া কোন ঘটনার কথা কি কল্পনা করা যায় ? রাজনৈতিক ঐক্য, দেশাত্মবোধ, শক্তি-সাম্য, অথবা সভ্যতার দ্বারা সমর্থিত নয় এমন কোন সম্মিলিত কর্ম-প্রয়াস কি থাকতে পারে ? কাজেই প্রতিটি ঘটনা অনিবার্যভাবেই কোন ঘোষিত ইচ্ছার সঙ্গে মিলে যায়, একজন বা বহুজনের ইচ্ছার ফলরূপে প্রতিভাত হয়।

জাহাজ যেদিকেই চলুক না কেন যে ঢেউ ভেঙে সেটা অগ্রসর হয় তাকে তো সব সময় জাহাজের সামনেই দেখা যাবে। জাহাজের যাত্রীদের কাছে সেই ঢেউই তো একমাত্র প্রত্যক্ষ গতি।

জাহাজ যখন একদিকে চলে তখন একই ঢেউ থাকে তার সামনে, আবার জাহাজের গতি যখন মাঝেমাঝেই পাল্টে যায় তখন সামনের ঢেউয়ের গতিও যায় পাল্টে।

যখনই যে ঘটনা ঘটে তখনই মনে হয় যে ঠিক ঐ ঘটনাটিই ছিল পূর্বদৃষ্ট ও হুকুমমাফিক। জাহাজ যেদিকেই যাক জলস্রোত সফেন তরঙ্গে একদিকেই চলতে থাকে; দূর থেকে দেখে মনে হয় জলস্রোত শুধু যে নিজের বেগে চলছে তাই নয়, জাহাজের গতিও নির্ধারণ করছে।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের যেসব ইচ্ছার প্রকাশ ঘটনাবলীর সঙ্গে হুকুমরূপে সম্পর্কিত সেগুলিকে ভালভাবে পরীক্ষা করে ইতিহাসকাররা ধরে নিয়েছে যে ঘটনাগুলি ঐসব হুকুমের উপরেই নির্ভরশীল। কিন্তু ঘটনাবলী এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সম্পর্ক বিচার করে আমরা দেখেছি যে সেই সব ব্যক্তি ও তাদের হুকুমই ঘটনার উপর নির্ভরশীল।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে আমরা ইতিহাসের দুটি মূল প্রশ্নের সরাসরি জবাব দিতে পারি :

(১) ক্ষমতা কি ?

(২) কোন্ শক্তি জাতিসমূহকে পরিচালিত করে ?

(১) ক্ষমতা হচ্ছে কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে অন্যদের এমন একটা সম্পর্ক যার ফলে সেই লোক কোন সম্মিলিত কাজের ক্ষেত্রে যত বেশী মতামত, ভবিষ্যদ্বাণী ও সমর্থন প্রকাশ করে সেই অনুপাতে কম অংশ নেয় সেই কাজে।

(২) জাতিসমূহ পরিচালিত হয় ক্ষমতার দ্বারা নয়, বুদ্ধিগত কাজের দ্বারা নয়, বা দুইয়ের যোগফলের দ্বারাও নয় (যদিও ইতিহাসকাররা তাই মনে করে), তাদের পরিচালিত করে সেই সমগ্র জনগণের কর্মধারা যারা এমনভাবে একত্র হয় যে যারা সেই ঘটনায় প্রত্যক্ষভাবে সব চাইতে বেশী অংশ

নেয় তারাই নিজেদের মাথায় বহন করে সব চাইতে কম দায়িত্ব এবং বিপরীৎক্রম।

নীতিগতভাবে ঘটনাকে ঘটায় তারা যাদের করায়ত্ত ক্ষমতা: কিন্তু দৈহিক শক্তির দিক থেকে ঘটায় তারা যারা সেই ক্ষমতাকে মেনে চলে। কিন্তু যেহেতু দৈহিক কর্ম ছাড়া নৈতিক কর্ম অচিন্ত্যনীয়, তাই কোন ঘটনার কারণ এ দুইয়ের কোনটাই নয়, প্রকৃত কারণ এই দুই শক্তির মিলন।

অথবা অন্য কথায়, যে ঘটনার বিচার আমরা করছি তার ক্ষেত্রে কারণের ধারণাটাই প্রযোজ্য নয়।

শেষ পর্যন্ত আমরা একটা অন্তহীন চক্রে পৌছে যাই। বিদ্যুৎ তাপ সৃষ্টি করে, আবার তাপ বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। পরমাণু পরস্পরকে আকর্ষণ করে, আর বিকর্ষণও করে।

তাপ ও বিদ্যুতের এবং পরমাণুর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে আমরা বলতে পারি না এটা কেন ঘটে; আমরা বলি যে এই ঘটে কারণ অন্যকিছু ভাবাই যায় না, কারণ এটাই হতে বাধ্য, আর এটাই নিয়ম। ঐতিহাসিক ঘটনার বেলায়ও এই কথাই প্রযোজ্য। যুদ্ধ এবং বিপ্লব কেন ঘটে আমরা জানি না। শুধু জানি, যেকোন একটা কাজ করতে হলে মানুষ এমনভাবে নিজেদের গড়ে তোলে যেখানে সকলেই অংশ নিতে পারে; আর আমরা বলি, এটা এইরকমই হয়, কারণ অন্য কিছু ভাবাই যায় না, অথবা অন্য কথায়, এটাই নিয়ম।

অধ্যায়—৮

যদি বাইরের ঘটনা নিয়ে ইতিহাসের কারবার হত তাহলে এই সরল ও সহজ নিয়ম প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট হত, এবং আমাদের যুক্তি-তর্কেরও অবসান ঘটত। কিন্তু ইতিহাসের নিয়ম মানুষকে নিয়ে। একটি পরমাণু বলতে পারে না যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মকে সে অনুভব করে না, আর তাই সে নিয়মটা অসত্য, কিন্তু ইতিহাসের বিষয় যে মানুষ সে পরিষ্কার বলে দেয়: আমি মুক্ত, স্বাধীন, কাজেই কোন নিয়মের অধীন নই।

অঘোষিত হলেও মানুষের ইচ্ছাশক্তির এই সমস্যা ইতিহাসের প্রতিটি ধাপে অনুভূত হয়।

সব চিন্তাশীল ইতিহাসকারই নিজের অজ্ঞাতে এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ইতিহাসের সব স্ব-বিরোধিতা ও অস্পষ্টতা, ইতিহাস-বিজ্ঞানের সব ভ্রান্ত পদক্ষেপের মূলেই রয়েছে এই সমস্যা সমাধানের অভাব।

প্রতিটি মানুষের যদি ইচ্ছার স্বাধীনতা থাকত, অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যদি নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে তো সব ইতিহাসই হয়ে যেত

অসংলগ্ন আকস্মিক ঘটনার একটি শ্রেণীমাত্র।

হাজার বছরের মধ্যে যদি দশ লক্ষের মধ্যে একটি মানুষও স্বাধীনভাবে অর্থাৎ নিজের ইচ্ছামত কাজ করতে পারত, তাহলে তো মানবজাতির কাজ-কর্ম সংক্রান্ত নিয়মকে লংঘন করে সেই মানুষের একটিমাত্র কাজই সমগ্র মানব জাতির উপর প্রযোজ্য সেই নিয়মের অস্তিত্বকেই অসম্ভব করে তুলত।

মানুষের সব কর্মের বিধায়ক হিসাবে যদি একটিমাত্র নিয়ম থাকে তাহলে তো স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকতেই পারে না, কারণ মানুষের ইচ্ছা তো সেই নিয়মেরই অধীন। স্বাধীন ইচ্ছার বহু প্রাচীন সমস্যাটির মূলেই আছে এই স্ববিরোধিতা।

সমস্যাটা হচ্ছে : ধর্মিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক বা দার্শনিক—যে দৃষ্টিকোণ থেকেই মানুষকে দেখি না কেন, সর্বত্রই দেখতে পাই এমন একটি বাধ্যতামূলক নিয়ম অন্য সবকিছুর মতই মানুষও যার অধীন, কিন্তু অন্তরের ভিতর থেকে যখন তাকে দেখি তখনই বুঝি যে আমরা মুক্ত, স্বাধীন।

এই বোধ থেকেই নিজেকে জানার সূত্রপাত ; সে জানা বুদ্ধিবহির্ভূত, এমন কি বুদ্ধি-নিরপেক্ষ। বুদ্ধি দিয়ে মানুষ নিজেকে দেখে, আর বোধি দিয়ে মানুষ নিজেকে জানে।

এই আত্ম-জ্ঞান ছাড়া কোন দেখা বা বুদ্ধির প্রয়োগের কথা চিন্তা করাই যায় না।

কোন কিছু বুঝতে হলে, দেখতে হলে, তা থেকে সিদ্ধান্ত টানতে হলে প্রথমেই মানুষকে জীবিত প্রাণী হিসাবে নিজেকে বুঝতে হবে। সে যে ইচ্ছা করতে পারে, নিজের ইচ্ছা-শক্তি সম্পর্কে সে যে সচেতন, একমাত্র এই বোধ দ্বারাই সে নিজেকে জীবিত প্রাণীরূপে জানতে পারে। যে ইচ্ছা তার জীবনের মূলকথা তাকে মানুষ স্বাধীন বলেই জানে।

তুমি বলতে পার : আমি স্বাধীন নই। কিন্তু এই তো আমি আমার হাতটা তুললাম, আবার নামিয়ে নিলাম। সকলেই বোঝে যে এই যুক্তি-বিহীন জবাব ইচ্ছার স্বাধীনতার পক্ষে একটি অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

আমাদের চৈতন্যের এই জবাব বুদ্ধির অধীন নয়।

স্বাধীনতার এই চেতনা যদি আত্ম-চেতনার একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ উৎস না হত তাহলে সেটা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার অধীন হত, কিন্তু আসলে সেরকম কোন অধীনতার অস্তিত্ব নেই, আর সেটা ধারণারও অতীত। মানুষের যদি স্বাধীনতা না থাকে, তাহলে তার মধ্যে জীবনও থাকে না।

স্বাধীনতার এই অভ্রান্ত ও অখণ্ডনীয় চেতনা পরীক্ষা ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, ব্যতিক্রমবিহীনভাবে সব চিন্তাশীল লোকই এটাকে স্বীকার করে, সব মানুষই অনুভব করে ; এই চেতনা ছাড়া মানুষের কোন ধারণাই সম্ভব নয়।

মানুষ এক সর্বশক্তিমান, সর্বকল্যাণময় ও সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সৃষ্টি। মানুষের স্বাধীনতার চেতনা থেকে উদ্ভূত যে পাপের ধারণা সেটা কি? এটাই ধর্মশাস্ত্রের প্রশ্ন।

সেই একই উৎস থেকে উদ্ভূত আর একটি প্রশ্ন, সমাজে মানুষের দায়িত্ব কি? এটা আইনের প্রশ্ন।

সহজাত চরিত্র এবং উদ্দেশ্যের প্রতিক্রিয়ার ফলে মানুষ কাজ করে। স্বাধীনতার চেতনা থেকে উদ্ভূত ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান কি, বিবেক কি? এটা নীতিশাস্ত্রের প্রশ্ন।

জাতি হিসাবে এবং মানুষ হিসাবে তার অতীত জীবনকে কিভাবে দেখা হবে—স্বাধীন সত্বা হিসাবে, না পূর্বনির্ধারিত কর্মের অধিকারী রূপে? এটা ইতিহাসের প্রশ্ন।

অধ্যায়—৯

ইচ্ছার স্বাধীনতা অথবা অনিবার্যতার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে জ্ঞানের অন্য সব শাখার তুলনায় ইতিহাসের কিছুটা সুবিধা রয়েছে: ইতিহাসের ক্ষেত্রে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার মূল কথার পরিবর্তে অতীতে তার প্রকাশকে নিয়েই আলোচনা করা হয়।

এব্যাপারে বিমূর্ত বিজ্ঞানের তুলনায় পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে ভূমিকা, অন্যসব বিজ্ঞানের তুলনায় ইতিহাসেরও সেই ভূমিকা।

ফলে ইচ্ছার স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার মধ্যে বিরোধ ধর্মশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং দর্শনশাস্ত্রের বেলায় যে সমাধানের অতীত রহস্য হয়ে দেখা দেয়, ইতিহাসের বেলায় তা হয় না। ইতিহাস পর্যালোচনা করে মানুষের সেই জীবনকে যেখানে এই দুটি পরস্পরবিরোধী ধারা আগে থেকেই ঐক্যবদ্ধ হয়ে আছে।

যদিও জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনা অংশত স্বাধীন এবং অংশত বাধ্যতামূলক হয়ে দেখা দেয়, তবু প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনা, মানুষের প্রতিটি কাজকেই সেই বিরোধিতা ছাড়াই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বোঝা যায়।

স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা কিভাবে মিলিত হতে পারে, এ দুটি ধারণার মূল কথাই বা কি, সে সমস্যার সমাধান করতে হলে ইতিহাস-বিজ্ঞানকে অন্য সব বিজ্ঞানের চাইতে একটা আলাদা পথ ধরতে হবে।

অনেক মানুষের অথবা মানুষ বিশেষের কোন কাজের বিচার যখন করতে বসি তখন আমরা সব সময়ই সেটাকে দেখি অংশত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং অংশত অনিবার্যতা নিয়মের ফল রূপে।

মানুষের দেশান্তরে গমন এবং বর্বর মানুষদের আক্রমণ, অথবা তৃতীয়

নেপোলিয়নের নানা বিধান, অথবা এক ঘণ্টা আগে বেড়াতে বেরিয়ে একজন লোকের কোন একটা পথকে বেছে নেওয়া—যার কথাই বলি না কেন কোথাওই কোন স্ববিরোধিতার কথা আমাদের মনে আসে না। এইসব কাজের মধ্যে কতটা স্বাধীনতা থাকে, আর কতটা থাকে অনিবার্যতা তা আমাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। যে দৃষ্টিকোণ থেকে একটা কাজকে বিচার করা হয় তদনুসারেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার আনুপাতিক হারের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, তবে সেটা সবসময়ই ঘটে বিপরীৎক্রম অনুসারে।

ধর্ম, মানুষের সাধারণ জ্ঞান, আইনশাস্ত্র, এবং ইতিহাস—সকলেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার এই সম্পর্ককে একভাবেই বোঝে।

সকলক্ষেত্রেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার এই হ্রাস-বৃদ্ধি তিনটি শর্তের উপর নির্ভর করে :

১) কাজটি যে করে বাইরের জগতের সঙ্গে সেই মানুষটির সম্পর্ক।

(২) কালের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

(৩) সেই কাজের কারণের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

(১) মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা লোকের তুলনায় যে মানুষটি জলে ডুবে যাচ্ছে তার ক্ষেত্রে অবশ্যই কাজের স্বাধীনতার তুলনায় অনিবার্যতার পরিমাণ অনেক বেশী। অনুরূপভাবেই যে মানুষ নির্জনে একাকি বাস করে তার তুলনায় যারা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে বাস করে, অথবা যারা পারিবারিক, কর্মস্থলঘটিত, বা ব্যবসাঘটিত দায়-দায়িত্ব দ্বারা আবদ্ধ, তাদের কাজে অবশ্যই স্বাধীনতা কম, অনিবার্যতাই বেশী।

(২) দ্বিতীয় বিবেচনার বিষয় সময়ের পরিবেশ। এই বিচারেই আজকের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ মানুষের তুলনায় প্রথম আদিম মানুষের পতনের ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা ছিল অনেক কম। সেই একই কারণে যেসব মানুষ কয়েক শতাব্দী আগে বাস করত তাদের জীবনযাত্রায় ও কাজে তারা ছিল সাম্প্রতিককালের মানুষের জীবনযাত্রার তুলনায় অনেক কম স্বাধীন।

(৩) বিবেচনার তৃতীয় বিষয়টি হল : কার্য-কারণের যে সীমাহীন শৃংখলের মধ্যে প্রতিটি ঘটনা বিধৃত তার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত। সেই কার্যকারণ শৃংখলার নিয়মে মানুষের প্রতিটি কাজ পূর্ববর্তী ঘটনার ফলস্বরূপ তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটি নির্দিষ্টস্থানে প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্তী ঘটনার কারণস্বরূপ।

শারীরবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিধানগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় যত বেশী হবে, আলোচ্য কাজটি যত সরল হবে, এবং কর্তার চরিত্র ও মানসিক গঠনের জটিলতা যত কম হবে, তত আমাদের কাজের এবং অন্য সকলের কাজের অনিবার্যতা বৃদ্ধি পাবে আর স্বাধীনতা হ্রাস পাবে।

এই তিনটি শর্তের উপরই মানুষের অপরাধের দায়িত্ব এবং ক্ষমার প্রশ্ন

নির্ভর করে। যে লোকের কাজের বিচার করা হয় তার পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি, কাজটি করা এবং সেবিষয়ে তদন্তের মধ্যে সময়ের হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং সেই কাজের কারণ-শৃংখলার জ্ঞানের হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারেই তার দায়িত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

অধ্যায়—১০

সুতরাং বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি, কালের দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং কার্য-কারণ শৃংখলের উপর নির্ভরতার হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীনতা ও অনিবার্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণার হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে থাকে।

ফলে এমন কোন মানুষকে নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি যার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগটা আমাদের ভালভাবে জানা, যার কাজ ও তার বিচারের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানটা অনেক বেশী, এবং যেখানে কাজটার কারণ সম্পর্কে আমরা খুবই অবহিত, সেক্ষেত্রে আমরা পাই সর্বোচ্চ অনিবার্যতা ও সর্বনিম্ন স্বাধীনতার ধারণা। বাইরের পরিবেশের উপর যে মানুষের নির্ভরতা খুবই কম, যার কাজ সংঘটিত হয়েছে খুবই সম্প্রতিকালে, এবং যার কাজের কারণ জানাটা আমাদের সাধ্যের অতীত, সেক্ষেত্রে আমরা পাই সর্বনিম্ন অনিবার্যতা ও সর্বোচ্চ স্বাধীনতার ধারণা।

অবশ্য এ দুইয়ের কোনক্ষেত্রেই পূর্ণ স্বাধীনতা অথবা পূর্ণ অনিবার্যতার ধারণা আমরা পাই না।

অনিবার্যতা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন এবং কোনরকম স্বাধীনতাবিহীন একটি মানুষের কাজের কথা কল্পনা করতে হলে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে অসীম সংখ্যক স্থান-সম্পর্কে, অসীম দীর্ঘকাল, এবং অসীম কার্য-শৃংখলের জ্ঞান আমাদের আছে।

আবার সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং অনিবার্যতা নিয়মের অধীন নয় এরকম একটি মানুষকে কল্পনা 'করতে হলে আমাদের কল্পনা করে নিতে হবে যে স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে সে সম্পূর্ণ একা, এবং কার্যের উপর নির্ভরতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যা আমাদের জানা তাকে বলি অনিবার্যতা নিয়ম, আর যেটা আমাদের কাছে অজ্ঞাত তাকে বলি জীবন-শক্তি। জীবনের মূল কথা যতটা জানি তার বাইরে অজ্ঞাত অবশিষ্টাংশ যা থাকে তাকেই ভাষায় বলা হয় জীবন-শক্তি।

সেইরকম ইতিহাসের ক্ষেত্রেও যা আমাদের জানা তাকে বলি অনিবার্যতা নিয়ম, যেটা অজ্ঞাত তাকে বলি স্বাধীন ইচ্ছা। মানব জীবনের নিয়ম সম্পর্কে

যতটা আমাদের জানা তার বাইরে অজ্ঞাত অবশিষ্টাংশ যা থাকে ইতিহাসের দিক থেকে তাকেই ভাষায় বলা হয় স্বাধীন ইচ্ছা।

অধ্যায়—১১

কালানুগ বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ এবং কারণের উপর নির্ভরশীল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশকেই ইতিহাস পরীক্ষা করে দেখে; অর্থাৎ বুদ্ধির বিধানের দ্বারা ইতিহাস এই স্বাধীন ইচ্ছার সংজ্ঞা নিরূপণ করে, আর সেই কারণেই ইতিহাস একটি বিজ্ঞান।

একটি স্বাধীন শক্তি সৌরজাগতিক বস্তুসমূহকে পরিচালিত করে—একথা স্বীকার করা জ্যোতির্বিজ্ঞানের পক্ষে যতটা প্রয়োজন, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রভাবিত করে এ-কথা স্বীকার করাও ইতিহাসের দিক থেকে ততটাই প্রয়োজন।

আবার এটাকে সত্য বলে ধরে নিলে বিধানের অস্তিত্ব অর্থাৎ যেকোন বিজ্ঞানের সম্ভাবনাকেই তো অস্বীকার করতে হয়। একটিমাত্র বস্তুও যদি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে তাহলে তো কেপ্‌লার ও নিউটনের বিধান সমূহকেই অস্বীকার করা হয়; সেক্ষেত্রে তো সৌরজাগতিক বস্তু-সমূহের গতির কোন ধারণাই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। একটিমাত্র কার্যও যদি স্বাধীন ইচ্ছায় পরিচালিত হয় তাহলে তো কোন ঐতিহাসিক বিধানেরই অস্তিত্ব থাকে না; সম্ভব হয় না কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে তোলা।

ইতিহাসের বিচারে মানুষের ইচ্ছা চলে একটি রেখা ধরে—সে রেখার একপ্রান্ত থাকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ঢাকা, আর অন্যপ্রান্তে মানুষের ইচ্ছার একটা চেতনা স্থান, কাল ও কার্য-কারণের শৃংখলের মধ্যে কাজ করে চলে।

এই কর্মক্ষেত্রটি যত বেশী আমাদের চোখের সামনে প্রসারিত হয়, ততই তার বিধানাবলী স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। এইসব বিধানকে আবিষ্কার করা ও তাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করাই ইতিহাসের সমস্যা।

এই বিধানের সন্ধান দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। একাজে ইতিহাসের পুরনো পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে চলেছে তারই পাশাপাশি চলেছে তার নতুন পদ্ধতি গড়ে তোলার কাজ।

সব মানবিক বিজ্ঞান এই পথেই এগিয়ে চলেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মে পৌঁছে গণিতশাস্ত্র বিশ্লেষণের পথকে পরিহার করে অতি সূক্ষ্ম, অজ্ঞাত বস্তুর সমন্বয়ের পথে পা রেখেছে। কার্য-কারণের তত্ত্বকে পরিহার করে গণিতশাস্ত্র বিধানের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছে।

অন্যভাবে হলেও চিন্তার এই একই পথ ধরেই এগিয়ে চলেছে অন্য সব

বিজ্ঞান। নিউটন যখন মাধ্যাকর্ষণ বিধানের সংজ্ঞা দিল তখন সে একথা বলল না যে সূর্য বা পৃথিবীর আকর্ষণের শক্তি আছে; সে বলল, বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম প্রতিটি বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমূহও সেই একই কাজ করে: কারণের প্রশ্নকে পরিহার করে তারা সকলেই বিধানের সন্ধানে ফেরে। ইতিহাসও সেই একই পথের পথিক। ব্যক্তি-বিশেষের জীবনের ঘটনার বিবরণ না হয়ে ইতিহাসের বিষয়বস্তু যদি হয় জাতিসমূহ ও মানুষের গতিকে জানা, তাহলে কার্য-কারণের তত্ত্বকে একপাশে সরিয়ে রেখে ইতিহাসকেও খুঁজে ফিরতে হবে স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশসমূহকে নিয়ন্ত্রণকারী বিধানকে।

অধ্যায়—১২

কোপার্নিকাসের বিধান আবিষ্কৃত ও প্রমাণিত হবার পর থেকে সূর্যের বদলে পৃথিবীটা ঘোরে এই সত্যের স্বীকৃতিই প্রাচীন মানুষের বিশ্বতত্ত্বকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সে বিধানকে অপ্রমাণ করতে পারলে হয় তো গ্রহ-উপগ্রহের গতির পুরনো ধারণাকে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হত, কিন্তু সেটাকে অপ্রমাণ না করে টোলোমীয় বিশ্বতত্ত্বে বিশ্বাস রাখা ছিল একান্তই অসম্ভব। তবু কোপার্নিকাসের বিধান আবিষ্কৃত হবার পরেও অনেককাল পর্যন্ত টোলোমীয় বিশ্বতত্ত্বের পঠন-পাঠন চলেছিল।

যেসময় একটিমাত্র মানুষ প্রমাণ করে দিল যে জন্ম ও অপরাধের সংখ্যা গাণিতিক বিধানের অধীন, এবং রাষ্ট্রের স্বরূপ নির্ধারিত হয় কতকগুলি ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্বারা, এবং জমির সঙ্গে মানুষের কতকগুলি সম্পর্কের ফলেই মানুষ এক দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি জমায়, তখন থেকেই সেই সব তত্ত্বের উপর গড়ে তোলা ইতিহাসের মূল ভিত্তিই ধ্বংস হয়ে গেল।

এই নববিধানগুলিকে খণ্ডন করে ইতিহাসের পূর্বতন ধারণাকে হয় তো রক্ষা করা যেত, কিন্তু সেটাকে খণ্ডন না করে ইতিহাসের ঘটনাবলীকে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ফলরূপে দেখা একেবারেই অসম্ভব বলে মনে হল। কারণ কতকগুলি বিশেষ ভৌগোলিক, জাতিতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক কারণের ফলেই যদি কোন বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং কোন বিশেষ জাতির স্থানান্তর-গমন ঘটে, তাহলে কোন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীন ইচ্ছাকে ঐ দুইয়ের কোন ঘটনার কারণ বলেই ধরা যায় না।

অথচ সংখ্যাতত্ত্ব, ভূগোল, রাজনীতিভিত্তিক অর্থনীতি, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের বিধানগুলি যখন পূর্ববর্তী ইতিহাসের মূল ধারণাগুলিরই সরাসরি বিরোধিতা করে, তখনও ইতিহাসের নতুন ধারার পাশাপাশি পুরনো ধারার অনুসরণও সমানভাবেই চলতে থাকে।

প্রাকৃতিক দর্শনে প্রাচীন ধারা ও নব্যধারার এই সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে বেশ জোরালোভাবেই চলতে লাগল। প্রাচীন ধারার পক্ষ সমর্থন করে ধর্মতত্ত্ব নব্যধারাকে আঘাত করল। কিন্তু সত্যই যখন জয়লাভ করল তখন ধর্মতত্ত্ব নতুন ভিত্তিভূমির উপরেই আসর জাঁকিয়ে বসল।

ইতিহাসের প্রাচীন ও নব্যধারার মধ্যেও সেই একই তীব্র, দীর্ঘ সংঘর্ষ আজও চলেছে; আজও ধর্মতত্ত্ব প্রাচীন ধারাকে সমর্থন করে নব্যধারাকে আঘাত করছে।

উভয়ক্ষেত্রেই ঘটছে চরম উত্তেজনা ও সত্যের অপহ্নব। একদিকে আছে ভীতি ও যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা হর্ম্যরাজীকে হারাবার আশংকা, আর অন্যদিকে আছে ধ্বংসের নেশা।

প্রাকৃতিক দর্শনের ক্রমবর্ধমান সত্যের বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করেছে তারা ভেবেছে, সে সত্যকে স্বীকার করার অর্থই ঈশ্বরে বিশ্বাস, সৌরজগতের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস, এবং "সন্ন্যাসিনীর পুত্র জোশুয়া"র অলৌকিক ঘটনাবলীতে বিশ্বাসের ধ্বংস। কোপার্নিকাস ও নিউটনের বিধানের সমর্থকদের, যেমন ভল্‌তেয়ারের মনে হয়েছিল যে জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিধানাবলী ধর্মকে ধ্বংস করেছে। তাই মাধ্যাকর্ষণ বিধানকে ধর্মবিরোধী অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

ঠিক অনুরূপভাবেই এখন মনে করা হচ্ছে যে আত্মা ও সৎ অসতের তত্ত্ব এবং তার উপর প্রতিষ্ঠিত সব রাষ্ট্র ও গির্জার ধারণাকে নষ্ট করবার, একমাত্র পথই হল অনিবার্যতার বিধানকে মেনে নেওয়া।

ভল্‌তেয়ারের মতই আজকের দিনের অনিবার্যতা বিধানের অবাঞ্ছিত সমর্থকরা সেই বিধানকেই ধর্মের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসাবে হাতে তুলে নিয়েছে; যদিও জ্যোতির্বিজ্ঞানে মাধ্যাকর্ষণ বিধানের মতই ইতিহাসের ক্ষেত্রে অনিবার্যতা বিধানও সেই সব ভিত্তিভূমিকে ধ্বংস করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালীই করে তুলেছে যার উপর গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র ও গির্জার শাসনব্যবস্থা।

সেদিন যেমন জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, আজও তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে, পরিদৃশ্যমান ঘটনাসমূহের মাপকাঠি হিসাবে একটি নিঃশর্ত কিছুকে স্বীকার করা বা না করারই গোটা মত-পার্থক্যের ভিত্তিস্বরূপ। জ্যোতির্বিজ্ঞানে সেটা ছিল পৃথিবীর স্থাবরত্ব, আর ইতিহাসে সেটা হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতা—স্বাধীন ইচ্ছা।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে পৃথিবীর জঙ্গমত্বকে স্বীকার করায় বিপদ ছিল তার ফলে পৃথিবীর স্থাবরত্ব ও গ্রহ-নক্ষত্রের জঙ্গমত্বের প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে অস্বীকার করতে হত; তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে স্থান, কাল ও কার্যকারণের অধীন করায় বিপদ হয়েছে, স্বীয় ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতার প্রত্যক্ষ

অনুভূতির অস্বীকৃতি। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন নব্য ধারায় বলা হয়েছিল : "একথা সত্য যে পৃথিবীর জঙ্গমতাকে আমরা অনুভব করি না, কিন্তু তার স্থাবরতাকে স্বীকার করলে আমরা পৌঁছে যাই একটা স্ববিরোধিতায়, আর তার জঙ্গমত্বকে স্বীকার করলে আমরা পাই বিধান," তেমনই ইতিহাসের ক্ষেত্রে নব্যধারায় বলা হয় : "এ কথা সত্য যে আমাদের পরনির্ভরতা সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, কিন্তু ইচ্ছার স্বাধীনতাকে স্বীকার করলে আমরা পৌঁছে যাই একটা স্ববিরোধিতায়, আর বহির্জগতের উপর, স্থান, কাল ও কার্য-কারণের উপর নির্ভরতাকে স্বীকার করলে আমরা পাই বিধান।"

প্রথম ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়েছিল একটি অবাস্তব স্থাবরতাকে পরিহার করে একটি অননুভূত জঙ্গমতাকে স্বীকার করা ; বর্তমান ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে প্রয়োজন হয়েছে এমন একটি স্বাধীনতাকে পরিহার করা যার কোন অস্তিত্ব নেই, আর এমন একটি পরনির্ভরতাকে স্বীকার করা যার সম্পর্কে আমরা সচেতন নই।

॥ সমাপ্ত ॥

The Online Library of Bangla Books